আমাদের

গ্রাহক গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে

আমরা বিজয়ার

সাদর সম্ভাষণ জানাই

॥ মাসিক বসুমতী ॥

২৬শ বর্ষ—
কার্তিক, ১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড,
১ম সংখ্যা

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে!

"আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ, কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, 'কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর, সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হ'ব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয় তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

একটা অতি পুরাতন গল্প

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য যুগে একবার বড় বড় ভটচায্যি পণ্ডিতেরা মিলে ভোগ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি কামনা করে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন তাঁদের চাঁই। সতীকে তিনি ঘরের মেয়ে ব'লে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন; কিন্তু সতীর ঐ যে তেকেলে বুড়ো বর—শিব-ঠাকুর—তাঁকে কর্ত্তা-কর্ত্তারা বেশ একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখতেন। কে ওটা ভাজড়, লক্ষ্মীছাড়া, অজানা, অচেনা? জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, না-মানুষ, না-দেবতা? তাই শিবের আর নিমন্ত্রণ হয়নি।

গম্ভীর ভাবে তিলক ফোঁটা কেটে যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জেলে গালভরা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে পণ্ডিতেরা হোম করতে বসেছিলেন। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা লক্-লক্ করে আকাশে উঠছিল। পণ্ডিতেরা তারস্বরে 'স্বাহা, স্বাহা' করতে করতে আগুনে ঘি ঢালছিলেন। সোমরসের পাত্র কর্ত্তাদের হাতে হাতে ঘুরছিল। এমন সময় দক্ষ প্রজাপতির মনে হোলো—কোথায় তিনি ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ—সমাজের শিরোমণি, হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা—আর তাঁর মেয়ে গিয়ে পড়লো কোন্ চালাচুলো-হীন অভাগার হাতে! তিনি শিবের নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন।

আসন্ন বিপদের ভয়ে সতীর বুক কেঁপে উঠলো। তিনি কাতর দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে চাইলেন। বোঝাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চায় কে? পণ্ডিতেরা সবাই যে সমাজের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা!

শিবের নিন্দা শুনে সতীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। যারা মহাকারণের সন্ধান জানে না, আপনাদের দর্পে অন্ধ, তারা আবার কি যজ্ঞ করবে? সতী মূর্চ্ছিতা হয়ে যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে দেহত্যাগ করলেন।

সতীর যারা অনুচর তারা শিবের কাছে সেই নিদারুণ সংবাদ নিয়ে গেল। গভীর অন্তস্তল ভেদ করে উঠলো একটা দীর্ঘশ্বাস। ত্রিনয়ন ধক্-ধক্ করে উঠে তা' থেকে বের হলো প্রলয়ের আগুন। দেখতে দেখতে শিবমূর্ত্তি রুদ্রমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হলো। আর সেই রুদ্রের দিগন্ত-বিস্তৃত জটাজাল থেকে লক্ষ লক্ষ ভূত, প্রেত, পিশাচ মার মার শব্দে দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে ছুটলো।

হায় রে কোথায় গেল যজ্ঞকুণ্ডের আগুন, কোথায় গেল সাধের তিলক ফোঁটা, কোথায় রইল জুটাজট। দক্ষের ঘর শ্মশানের মত পিশাচের নৃত্যভূমিতে পরিণত হলো।

শিব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। শিব স্তিমিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হলেন। সংসারের সঙ্গে আর তাঁর সম্বন্ধ রইল না।

যেখানে যেখানে সতীর অঙ্গ পড়েছিল, সেই সেই খানে হলো শাক্ত-সাধকদের সাধন-পীঠ। সতীর পুনর্জ্জীবন লাভই হোল তাঁদের সাধনার লক্ষ্য।

যুগ-যুগান্তরের তপস্যার পর সতী আবার পুনর্জ্জীবিতা হলেন হৈমবতী উমারূপে। সোণায় অঙ্গ মুড়ে, মদনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু শিবের ধ্যান তো ভাঙ্গলো না। কিন্তু ধ্যান যে ভাঙ্গাতে হবে—উমার সংসার যে তা' না হলে গড়ে উঠে না। মদন হেসে বললেন—"ভাবনা কি! আমি শিবের ধ্যানভঙ্গ করবো।" বাছা-বাছা পাঁচটি বাণ নিয়ে তিনি শিবের দিকে নিক্ষেপ করলেন। মহাযোগীর ধ্যান অকালে ভেঙ্গে গেল। তিনি ক্রুদ্ধ-নয়নে চেয়ে দেখলেন—সুমুখে মদন। একটা আগুনের হলকা যেন মদনের দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সৌভাগ্যদর্পিত মদন যেখানে বসেছিল, সেখানে পড়ে রইল এক মুঠো ছাই।

শিব আবার ধ্যানে বসলেন। আর উমা? তাঁর মনে শত ধিক্কার জেগে উঠলো। গয়না তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বল্কল প'রে মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গের আশায় শিবের পায়ের তলায় তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

যুগ-যুগান্তর কেটে গেল। কত ঝড়, কত বাদল, বজ্র মাথার উপর ডেকে গেল। উমার সাড়া নেই। তাঁর অন্তরাত্মা মহাশিবের সন্ধানে ছুটেছে।

তপস্যা যে দিন পূর্ণ হলো, সে দিন উমা চেয়ে দেখলেন, শিব তাঁর মুখের দিকে হাসিভরা চোখে চেয়ে আছেন। শিবেরও যে উমাকে চাই—আনন্দের সংসার যে তা' না হলে গড়বে না।

তার পর শিবের যে সন্তান হয়েছিল তিনিই দেব-সেনাপতি

কার্ত্তিকের। অসুরদের হাত থেকে স্বর্গরাজ্য তিনিই উদ্ধার করেছিলেন।

* * *

এই যে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারত—এই আমাদের সতী মায়ের দেহ। কোন্ অতীত যুগে মদ-দর্পিত শাসকের দল ঐশ্বর্য্যের লোভে এখানে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, সেই অবধি মায়ের প্রাণহীন দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে। যেখানে যেখানে সতীদেহের এক এক খণ্ড পড়েছে—বদরিকা থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত, হিন্দুকুশ থেকে গৌহাটী পর্য্যন্ত সাধকরূপী শিবাবতার সেই সেই খানে মায়ের দেহ পুনর্জ্জীবিত করতে সাধনায় ব্যাপৃত। এই মূর্চ্ছাগ্রস্ত দেহের উপর দিয়ে কত ঝড় বায়ু বয়ে গেল—হূণ এল, শক এল, পাঠান এল, মোগল এল—সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে পর্ত্তুগীজ এল, ফরাসী এল, ইংরেজ এল। একবার অকালে শিবের ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। আকাশে বিজলী রেখার মতো মারাঠার তরবারি চিকমিকিয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবের গুরুসিংহ মায়ের মূর্চ্ছাভঙ্গের কথা ঘোষণা করে গর্জ্জন করে উঠেছিল। কিন্তু মা তখনও আপনার শিবকে পুরাপুরি চিনতে পারেননি। যে ঐশ্বর্য্যে সেজে-গুজে তিনি শিবের সঙ্গে মিলিত হতে গেছলেন, তা' আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে শিবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে হলো।

* * *

তার পর আজ প্রায় দু'শো বছর কাটতে চললো। আজও বিভ্রাটিকা কাটেনি। আজও পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রান্তে অসুরের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। ভারত, শক্তিপীঠের সাধকেরা, তোমাদের সাধনা কি আজ পূর্ণ হয়েছে? তপঃ-শক্তিভূষিত মায়ের নূতন রূপ কি আজ তোমাদের চক্ষে ফুটেছে? মহাশিব কি হর্ষোৎফুল্ল চোখে মায়ের দিকে চেয়েছেন? দেব-সেনাপতির জন্মবার্ত্তা কি তোমরা শুনেছ? সংসার কি এবার সত্যই শিবের লীলাভূমি হবে?

শীত —রূপচাঁদ মল্লিক

—বাণীকুমার

এক —চিত্তরঞ্জন দাস

মূর্ত্তি —রমেশ পাল

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

মণি বাগচি

প্রতিভাই প্রতিভার মূল্য বুঝিতে পারে। তাই জগদীশচন্দ্র যখনও তার জে, সি, বোস হিসাবে খ্যাতিমান্ হইয়া উঠেন নাই, তখনই তাঁহার ভবিষ্য সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধা দৃষ্টি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিককে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন:

"সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্ব্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।"

আজ হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের যে ভাস্বর দীপ-শিখা সমগ্র পৃথিবীর চিন্তালোক আলোকিত করিয়া নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, আমাদেরই কুটীর-প্রাঙ্গণে সেই শিখা প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে দিন ভারতের এই পূর্ব্বাচলে, এই বাংলা দেশের আকাশে একই সময়ে আমরা যে যুগ্ম চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নব্য ভারতে তেমন চন্দ্রোদয় আর কখনো হয় নাই। ভাস্করাচার্য্যের পর বহু শতাব্দী ভারতবর্ষকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল বিজ্ঞান-জগতে নূতন কিছু করিবার জন্য। প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের নানা আবিষ্ক্রিয়া যে দিন রসায়ন ও বিজ্ঞানে ভারতের নব নব জাগরণের সূচনা করিল, সে দিন ইউরোপের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। শুধু কি সূচনা? জগদীশচন্দ্র ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করিলেন, যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অপরিজ্ঞাত—এমন কি অচিন্ত্য ছিল। তাই দেখিতে পাই, পৃথিবীর বিজ্ঞান-সমাজ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন, গ্যালিলিও প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে শ্রেণীতে জগদীশচন্দ্রের স্থানও সেই শ্রেণীতে। বিজ্ঞান-জগতে তিনি এক জন বড় যোদ্ধা হিসাবে পরিকীর্ত্তিত। উদ্ভিদ্ ও জীব-বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সেই প্রবাসের সংগ্রামের দিনে, স্বদেশ হইতে তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতেই। কবির সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটি সকলেরই জানা আছে। কী উৎসাহ ও আশ্বাস সে দিন কবি-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল:

"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হ'তে আনি
দীনা-হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরাইবে ধীরে।"

স্বদেশের প্রতিভা যে দিন বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ হইতে গৌরব লাভ করিল, সে দিনের সেই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন আর এক জন। তিনি দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ১৯০০ সাল। প্যারিস সহরে পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে এক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছে। জগদীশচন্দ্র সেই কংগ্রেসে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত। বক্তৃতার বিষয় ছিল: "জীব ও জড় পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা।" ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক-সমাজ এ বিষয়ে তখনও অপরিজ্ঞাত। সেই সময় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের সাফল্য স্বচক্ষে দেখিয়া স্বামিজী গৌরব বোধ করিলেন। জগদীশচন্দ্রের জয়লাভে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে জয়ধ্বনি ঘোষিত হইল: "আজ ২৩শে অক্টোবর। প্যারিসে মহা প্রদর্শনী। নানা দিক্-দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে।...এই বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ পাণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জে, সি, বোস। দেখলাম, তিনি আজ পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন! সমস্ত বৈজ্ঞানিক-সমাজের শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারত-বাসী, বাঙ্গালী! ধন্য বীর।"

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সমগ্র জীবন আলোচনা করিলে যে জিনিসটি আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়, তাহা তাঁহার অসাধারণ ও মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নহে—তাঁহার জীবন্ত ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম। প্রফুল্লচন্দ্রের ভিতর যেমন, জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে, কার্য্য ও চিন্তার ভিতরও তেমনি দেখিয়াছি একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম আর স্বাধীনতার প্রতি অবিচলিত অনুরাগ! বিদেশীরা তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়াছে তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আর তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করিয়া। নিরলস বিজ্ঞান-চর্চ্চার মধ্যেও দীনা-হীনা মাতৃভূমিকে জগদ্বরেণ্য করিবার স্বপ্ন তিনি দেখিতেন এবং বলিতে গেলে তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল ইহারই সাধনায়। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রেম ছিল সদাজাগ্রত। রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন: "বন্ধু, আমি এত দিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরী বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল; এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আমার হৃদয়ের

দুর ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। আমাকে যদি শত বার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতাম।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারি, জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, জাত্যভিমান কত গভীর ছিল। ভারতবর্ষকে জগতের সম্মুখে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। বিদেশে শত্রুকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও তিনি জননী জন্মভূমির কথা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। বহু বার তিনি ইংলণ্ডে অধ্যাপনার কার্য্য গ্রহণ করিয়া সেখানে বিজ্ঞানচর্চার জন্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশে পরীক্ষাগারের শত অসুবিধার কথা জানিয়াও তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে থাকিতে সম্মত হন নাই। সকলেই জানেন, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত শুনিতে জগদীশচন্দ্র কত ভালবাসিতেন; ভাবে তন্ময় হইয়া তিনি সে মাতৃস্তুতি শ্রবণ করিতেন।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবনের অবিনশ্বর কীর্ত্তি—"বসু-বিজ্ঞান মন্দির"—বৈজ্ঞানিক সমাজে যাহা "Bose Institute" নামে খ্যাত। ইহা ইউরোপ বা আমেরিকার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক পরীক্ষাগার বা ল্যাবোরেটরী নহে। যে নিবিড় দেশপ্রীতি তাঁহার সত্তার মধ্যে সর্ব্বদা স্পন্দিত হইত, সেই একই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন। সকলেই জানেন, মার্কনির বহু আগে জগদীশচন্দ্র বেতার-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তিনি যদি তাঁহার সাধনার ফলকে সে দিন অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে উক্ত বেতার-তত্ত্ব নিজের নামে পেটেণ্ট করিয়া লইয়া জগৎ-জোড়া খ্যাতির সঙ্গে কোটি কোটি টাকার অধিপতি হইতে পারিতেন—যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন। মেসার্স মুরহেড এণ্ড কোম্পানীর পেটেণ্ট এর প্রস্তাব তাই জগদীশচন্দ্র অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার ন্যায় ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়।

১৯১৭ সাল, ৩০শে নভেম্বর। জগদীশচন্দ্রের জীবনের চরম সার্থকতার দিন। ঐ দিন তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন 'বসু-বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা সত্যে পরিণত হয়! এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মন্দির-গাত্রে তাম্রফলকে জগদীশচন্দ্রের ভাষায় উৎকীর্ণ আছে: "ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান-মন্দির দেব-চরণে নিবেদন করিলাম।" সেই মন্দির উদ্বোধন দিবস জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। সর্ব্বজাতির, সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।" সেই দিনের উৎসব-আবাহনে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন: "মাতৃমন্দির-পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।" সম্পূর্ণ হিন্দু-ভারতীয় আদর্শে তৈরী এই মন্দিরটির ভিতরে "নিবেদিতা সরঃ" একটি অপূর্ব্ব পরিকল্পনার চমৎকার সৃষ্টি। প্রদীপহস্তে এক মহিমময়ী নারী দাঁড়াইয়া, সম্মুখে একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহাতে কুমুদ ও পদ্ম বিকশিত। ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতি ইহার সঙ্গে বিজড়িত। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত আছে। ইহার কারণ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় একদা উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পাইয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী—"বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প—এই তিনের সাধনায় সুসমঞ্জস-পূর্ণ শতদলের জীবন বাংলাদেশে আর কাহারও ছিল না।" তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কীর্ত্তি 'অব্যক্ত'। তাঁহার রচিত 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ। এই একটিমাত্র প্রবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সাহিত্য-সৃষ্টিতেই মন দিতেন তাহা হইলে এক জন বড় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। কবি-প্রতিভার অনুরূপ প্রতিভা তাঁহার ছিল। কবি ও শিল্পী হইতে হইলে যে সৌন্দর্য্যবোধ, যে সুষমার উপলব্ধি, যে রসানুভূতি আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল এই জন্যই। বলা বাহুল্য, উভয়েরই প্রকৃতি ও প্রতিভার সাদৃশ্য এই বন্ধুত্বের কারণ। কবি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পকলার নব জাগরণে জগদীশচন্দ্রের দান নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতবর্ষে তৈরী ও বঙ্গীয় পণ্য-শিল্পজাত নানা সামগ্রী তাঁহার প্রিয় ছিল। ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতায় তিনি সে যুগে স্বদেশীর এক জন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন।

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই অভিনন্দন-কবিতার শেষ কয়টি চরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা আজ জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে এই স্মরণাঞ্জলি নিবেদন করিলাম:

"তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানব-মর্ম্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক-শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়।"

ডাকঘর নাটকাভিনয়ে
গগনেন্দ্রনাথ, অবনী
ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মল
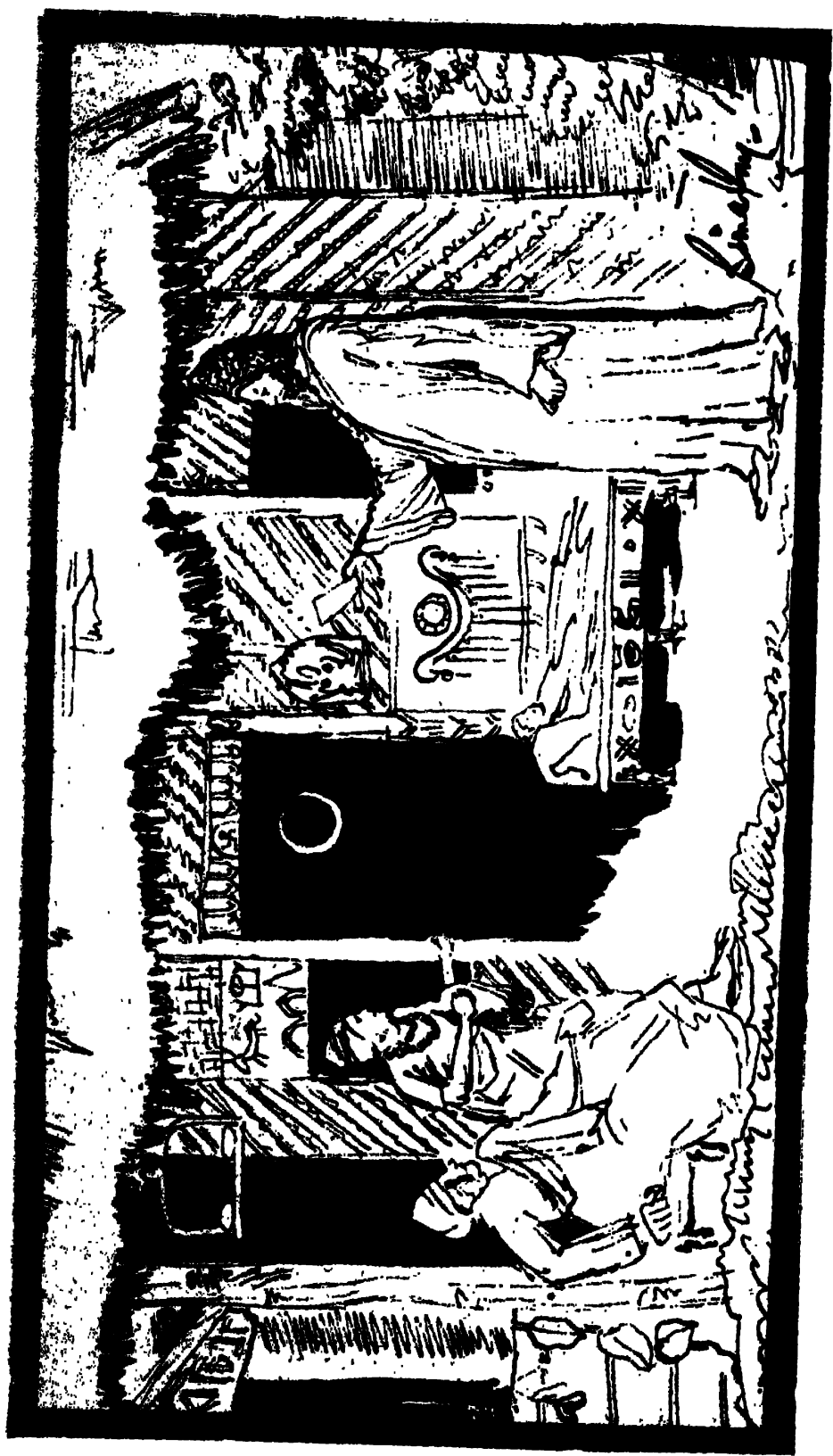
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক জন নিগ্রো বড় বাড়ীতে যাচ্ছিল গাধাগুলোকে খেতে দিতে, তার মুখেই কর্ণেল হেনরি ম্যাক্স- ওয়েল খবরটা পেলেন। খবর পেয়েই শেরিফকে টেলিফোন করলেন। ফলে শেরিফ জিমকে গ্রেফতার করে শহরে এনে কয়েদখানায় আটক করল। তার পর খাওয়া-দাওয়া সারতে বাড়ী চলে গেল।

খালি ঘরটার চারি পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে জিম কামিজের বোতামগুলি লাগাল, তার পর বেঞ্চির উপর বসে পড়ে জুতার ফিতা বাঁধতে লাগল। ভোর না হতেই সব কিছু এমনি তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, সে এক গেলাস জল খাবারও ফুরসত পায়নি। দরজার কাছে উঠে গিয়ে সরাই থেকে জল খেতে চাইল, কিন্তু সরাই খালি, শেরিফ জল রাখতে ভুলে গেছে।

ইতিমধ্যে জেলখানার আঙিনায় কয়েকটি লোক এসে একে একে জমায়েত হল। জিম জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল। ঠিক সেই সময় একটা মোটর এসে উপস্থিত হল, জন ছ'-সাত গাড়ী থেকে নামল। রাস্তার নানা দিক্ থেকে আরও কয়েক জন জেলখানার দিকে আসতে লাগল।

'জিম, তোমার বাড়ী কি হয়েছে হে?' কে এক জন জানতে চাইল।

জানলার গরাদে গাল চেপে জিম জনতার দিকে তাকাল। উপস্থিত লোকগুলির প্রত্যেককেই সে চেনে।

সে যে জেলখানায় এসেছে, শহরের তাবৎ লোক সে খবরটা জানল কেমন করে—কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জন কে প্রশ্ন করে উঠল:

'ব্যাপারটা দৈবাৎ হয়ে গেছে, তাই না জিম?'

এমন সময় একটা নিগ্রো ছেলে এক গাড়ী তুলা নিয়ে কারখানার দিকে গাড়ী হাঁকিয়ে গেল। গাড়ীটা জেলখানার সামনে আসতেই ছেলেটা গাধার পিঠে জোর চাবুক কষল, গাধা দু'টো প্রাণপণ ছুটল।

আর এক জন বলে উঠল, 'তোমার বিরুদ্ধে সরকারকে এমনি ভাবে লাগতে দেখে আমার গা জলে যায়।'

এমন সময় একটা খাবারের পাত্র হাতে ঝুলিয়ে দিয়ে শেরিফ এসে উপস্থিত হল। লোকগুলোকে ঠেলে দিয়ে দরজার তালা খুলে খাবারের পাত্রটি ভিতরে রেখে দিল।

শেরিফের পিছন থেকে জন কয়েক এগিয়ে এসে ঘাড় বাড়িয়ে ফাটক-ঘরের ভিতরটা দেখে নিল।

'তোমার জন্যে আমার পরিবার এই খাবার দিয়েছেন। খাবারটা খেয়ে নাও বাছা।'

জিম একবার খাবারের পাত্রটার দিকে তাকাল, তার পর শেরিফের দিকে, তার পর জেলের খোলা ফটকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'আমার খিদে নেই', সে বলল। মেয়েটার খিদে পেয়েছিল—খুউব খিদে পেয়েছিল।'

শেরিফ দরজা থেকে ফিরে এল, তার হাতখানা আপনা থেকেই পিস্তলের হাতলের কাছে সরে গেল। এত তাড়াতাড়ি সে ফিরল যে তার পিছনের লোকগুলির পা সে মাড়িয়ে দিল।

'থাক গে বাছা, এখন আর উতলা হয়ে লাভ নেই,' সে বলল। 'বসে একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর।'

দরজা বন্ধ করে আবার তালা লাগিয়ে রাস্তার দিকে কয়েক পা যেতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পিস্তলে টোটা ভরতি আছে কি না দেখে নিল।

জনতা জানলার পাশে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি সুরু করল। কেউ কেউ বা জানলার গরাদে ঠক্-ঠক্ শব্দ করতে লাগল। জিম তখন কাছে এসে তাদের দিকে তাকাল। গরাদের ফাঁকে মুখখানা বার করতে গিয়ে চিবুকে চাপ লাগল, দু'হাতে গরাদে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

"আচ্ছা জিম, কেমন করে এটা হল?" কে এক জন জিজ্ঞাসা করে। 'নিশ্চয় দৈবাৎ ঘটে গেছে, কি বল, তাই না?'

তার শীর্ণ লম্বা মুখখানা নিয়ে সে এমনি ভাবে তাকাল যে তার চোখের তারা দু'টো যেন বেরিয়ে আসবে। সব কিছু ঠিক আছে কি না জানবার জন্যে শেরিফ জানলার ধারে এসে উঁকি মেরে দেখল।

'কি করবে বাছা, সহজ ভাবেই সব কিছু নিতে হবে।

কন্যা

[আরস্কিন কল্ডওয়েল]

কি হয়েছিল—প্রশ্নটা যে লোকটা করল সে শেরিফকে ঠেলে দিয়ে পথ করে নিল। আর সকলে কাছে এসে ভিড় করল।

'কি হয়েছিল জিম, আমাদের সব বল।'

গরাদের ফাঁকে মুখটা এমনি ভাবে বাইরের দিকে ঠেলতে লাগল যে কাণ দু'টো যেন মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

'মেয়েটা বললে, খিদে পেয়েছে বাবা। আমি সইতে পারলাম না, ওর মুখে ও-কথা সত্যি আর সইতে পারলাম না।'

কে এক জন ভিড় ঠেলে জানলার কাছে এসে উপস্থিত হল।

'আচ্ছা জিম, তুমি ত অনায়াসে আমাদের বাড়ী থেকে মেয়েটার জন্তে দু'টো খাবার নিয়ে যেতে পারতে। আর তুমি ত এটা বেশ ভাল করেই জান যে তোমাকে আদয় আবার কিছু নেই।'

শেরিফ আর একবার ভিড় ঠেলে কাছে এল।

'কিন্তু সেটা ঠিক হত না', জবাবে জিম বলল। 'সারা বছর আমি খেটেছি। আমাদের সকলের সম্বৎসরের খাওয়া-পরার তাতে এতটুকু অনটন হওয়ার কথা ছিল না।'

এক বার থেমে গরাদের বাইরেকার কৌতূহলী মুখগুলির দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাল।

'ভাগে কাজ করেছি অনেকটা। কিন্তু তারা এসে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়ে গেল। অত ফসল ফলিয়েও ভিক্ষা করে খেতে হবে—এ আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না। তারা এসে সব নিয়ে গেল। মেয়েটা ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বলল, 'বাবা, খিদে পেয়েছে। আমি আর সইতে পারলাম না।'

'জিম, তুমি বরং এখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়,' শেরিফ বলে উঠল।

কে এক জন জবাবে বলে উঠল, 'কিন্তু তাই বলে মেয়েকে গুলী করে মারা আদৌ ঠিক হয়নি।'

'মেয়ে বললে তার খিদে পেয়েছে', জিম বললে। 'সারাটা মাস ধরেই সে বলে আসছে—খিদে পেয়েছে। রাত রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে বলে উঠেছে তার খিদে পেয়েছে।—আমি আর সইতে পারলাম না।'

'মেয়েটাকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তোমার। আমরা যেমন করেই হোক তাকে দু'টো খেতে দিতে পারতাম। তার মত একটা বাচ্চা মেয়েকে মেরে ফেলা তোমার উচিত হয়নি।'

'প্রচুর ফসল পেয়েছিলাম', জিম বলল। 'আমি সইতে পারলাম না। মেয়েটা সারা মাস ধরে ভুখা রয়েছে।'

'অত উতলা হয়ো না, জিম', ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে শেরিফ বললে।

জনতা এক দিক থেকে আর এক দিকে ভিড় জমাল।

কে এক জন জিজ্ঞাসা করল, 'তাই তুমি একটা বন্দুক তুলে নিয়ে মেয়েটাকে গুলী করে মারলে?'

'প্রাতে ঘুম থেকে জেগেই সে বলতে লাগল—তার খিদে পেয়েছে; আমি আর সইতে পারলাম না।'

জনতা কাছে আসবার জন্তে ঠেলাঠেলি করতে সুরু করল। লোক সব নানা দিক থেকে জেলখানার দিকে আসতে লাগল। এবং যারা সত্ত এসে পৌঁচেছে তারা জিম কি বলছে শুনবার জন্তে উৎসুক হয়ে এগোতে চেষ্টা করল।

'সরকারের হয় ত তোমার উপর কোন আক্রোশ আছে,' এক জন বলল; 'কিন্তু তবু মনে হয় যে কাজটা ঠিক হয়নি।'

'না করে পারলাম না,' জিম বললে। 'মেয়েটা আজ সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেই আবার বলল।'

ইতিমধ্যে জেলখানার আঙিনা, বড় রাস্তা, জেলখানার সামনেকার খালি জমিটা ছেলে-বুড়োয় ভরে গেছে। জিমের কথা শুনবার জন্তে সকলেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসতে চায়। এরই মধ্যে সারা শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, জিম কার্লাইল তার আট বছরের মেয়ে ক্লারাকে গুলী করে মেরেছে।

'আচ্ছা, জিম কার জমি ভাগে চষেছে?' এক জন প্রশ্ন করে।

'কর্ণেল হেন্‌রি ম্যাক্সওয়েল, ভিড়ের মধ্যে থেকে আর এক জন কে বলে উঠল। 'কর্ণেল হেন্‌রির কাছে জিম নয়-দশ বছর কাজ করছে।'

'ওর ভাগ কেড়ে নেওয়া হেন্‌রির ত প্রয়োজন থাকবার কথা নয়, তার ত নিজেরই প্রচুর রয়েছে। জিমের ভাগও কেড়ে নেওয়া তার কোন মতেই উচিত হয়নি।'

শেরিফ আর এক বার এগিয়ে আসবার চেষ্টা করল।

'আমার কিন্তু মনে হয়, সরকার জিমকে শাস্তি দিতেই চায়', কে এক জন বলে উঠল। 'যাই হোক, কাজটা উচিত হয়নি আদৌ।'

জনতার কাঁধের উপর দিয়ে তার মাথাটা গলিয়ে দিয়ে শেরিফ আরও কাছে যেতে চেষ্টা করল।

'আচ্ছা জিম, হেন্‌রি ম্যাক্সওয়েল কেন তোমার ভাগটা এসে নিয়ে গেল, বলতে পার?'

'সে এসে বললে, তার একটা গাধা মাস খানেক আগে মরে গেছে। আমাকে সে জন্তে খেসারত দিতে হবে।'

শেরিফ ততক্ষণে জানলার পাশে এসে পৌঁচেছে।

'তুমি বরং, জিম, এখন বিছানায় শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করে নাও,' শেরিফ বললে, 'জুতা খুলে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড় গে।'

ইতিমধ্যে ঠেলাঠেলিতে সে আবার একটু দূরে গিয়ে পড়ল।

'তুমি নিশ্চয়ই গাধাটাকে মেরে ফেলোনি, কি বল জিম?'

'গাধাটা এক দিন গোলা-বাড়ীতে মরে পড়েছিল,' জিম জবাবে বলল। 'তখন আমি তার কাছেও ছিলাম না। আপনা থেকেই গাধাটা মরে গেছল।'

শ্যামা মা

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

পাছে ভুলে যাই গো শ্যামা মায়,
সংসারেরি নানান্ কাজে জীবন-সাঁঝে
ঘুরে আশা-মরুর চারি সীমায়।
তাই দাঁড়িয়ে তিনি আপন মহিমায়—
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে, শ্মশানঘাটে
সেই মহাকালের লীলা-আঙ্গিনায়।
যেথা দিয়ে যেতেই হবে—নিঠুর ভবে
ফেলি' দেহের বোঝা তোমায় আমায়॥

আঁধার যখন আসবে ঘিরে, মরণ-তীরে
সুপ্ত করি সকল চেতনায়
ডুব্‌বে অপর রূপের মেলা কালোর ভেলা
ভাস্‌বে তখন মানস-যমুনায়;
তাই রূপরচনা নিবিড়-নীলিমায়
মিশিয়ে আঁধার মসীর মাঝে মায়ের সাজে
জাগেন হৃদে আপন করুণায়
পাছে ভুলে যাই গো শ্যামা মায়॥

জনতা আরও প্রবল ভাবে ঠেলাঠেলি সুরু করল। যারা জানলার কাছেই ছিল তারা দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেল, আর যারা পিছনে ছিল তারা কথা শুনবার জন্যে প্রবল ভাবে এগোতে চেষ্টা করতে লাগল, ফলে যারা মাঝখানে ছিল তারা দু'দিকের চাপে না-পারল এদিকে সরতে, না-পারল ওদিকে নড়তে। প্রত্যেকেই চেঁচাতে লাগল।

জিমের মুখখানা গরাদের ফাঁকে এমনি চেপেছিল এবং হাতের আঙুলগুলি এমন দৃঢ়মুষ্টিতে গরাদে আঁকড়ে ধরেছিল যে, আঙুলগুলো সাদা হয়ে উঠল।

জনতা তখন বড় রাস্তা দিয়ে খোলা জমিটার দিকে এগোতে লাগল। কে এক জন চীৎকার করছিল। সে একটা মোটর গাড়ীর উপর উঠে প্রাণপণে গালাগালি দিতে লাগল।

একটা লোক ভিড়ের মধ্য থেকে ঠেলাঠেলি করে পথ করে নিয়ে তার মোটর গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। গাড়ী হাঁকিয়ে সে একা চলে গেল।

জিম তখনও গরাদে আঁকড়ে ধরে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। শেরিফ জনতার দিকে পিছন ফিরে জিমকে যেন কি বলল। জিম কিছু শুনতে পেল বলে মনে হল না।

একটা লোক এক-গাড়ী সুতা নিয়ে যেতে যেতে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে থমকে দাঁড়াল। খোলা জমিটায় যে জনতা ভিড় করেছিল, সে দিকে একবার চেয়ে দেখল, তার পর ফিরে তাকাতেই জানলার ধারে জিমকে দেখতে পেল। বড় রাস্তায় হট্টগোল ক্রমেই বেড়ে চলল।

'কি হয়েছে জিম?'

কে এক জন রাস্তার ও-পাশ থেকে সুতা-বোঝাই গাড়ীটার কাছে এগিয়ে এল। সুতা-বোঝাই গাড়ীটার চাকায় একটা পা তুলে দিয়ে গাড়ীর চালককে কথা বলতে দেখল।

'মেয়েটা আজও ঘুম থেকে জেগে উঠেই বলল তার খেদে পেয়েছে।' জিম বলল।

এক মাত্র শেরিফই তার কথা শুনতে পেল।

সুতাওয়ালা লোকটা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গাড়ীর রাশ চাকার সঙ্গে বেঁধে ফেলে ভিড় ঠেলে মোটর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল, সেখানে খানিক আগেই গালাগালির ঝড় ব'য়ে গেছে। কিছুক্ষণ শুনে সে আবার তখুনি বড় রাস্তায় ফিরে গেল। সেখানে এক কোণে কয়েক জন নিগ্রো দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। লোকটা তাদের কাছে গিয়ে এক জনের হাতে গাড়ীর রাশটা তুলে দিল। নিগ্রোটা গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল, আর লোকটা গেল ভিড়ের মধ্যে মিশে।

যে লোকটি একা মোটর হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল, সে আবার ঠিক এই সময় ফিরে এল। ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে কয়েক মুহূর্ত সে গাড়ীতেই বসে রইল, তার পর দরজা খুলে নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে একটা তার সমান লম্বা লোহার ডাণ্ডা বার করল।

'জেলখানার দরজা ভেঙে জিমকে বার করে আন,' এক জন বলল। ওর 'ওখানে থাকাটা কোন মতেই ঠিক নয়।'

খোলা জমির জনতা আবার এগোতে লাগল। যে লোকটা মোটরের উপর দাঁড়িয়েছিল, সে লাফ দিয়ে নীচে নেমে এল এবং লোকগুলোও জেলখানার দিকে বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল।

মাটীর উপর লোহার ডাণ্ডাটি পড়েছিল, যে লোকটা সর্বাগ্রে সেখানে পৌঁছিল, সে-ই সেটা তুলে ধরল।

শেরিফ পিছু হটল।

'যা হবার হয়ে গেছে, বুঝেছ জিম, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না,' শেরিফ বললে।

এই বলেই সে পিছন ফিরে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

অনুবাদক: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাঁওতালী পূর্ণিমা

মণীন্দ্র রায়

মুক্তি চেয়েছি যতো দিন
শুধু বেড়েছে কাঙাল হৃদয়ের ঋণ।
কে জানে এমন অমাবস্যার পাথরেরচিত সীমা
ভেঙে চৌচির আসে রাঙা পূর্ণিমা।

একটি তিথির চাবি
খুলেছে শবরী রাতের আকাশ ঝাঁপি।
এ কি বিস্ময়, এ কি নব যৌবন।
আমারই দুয়ারে বাঁধা ছিল দেখি সাতটি রাজার ধন।

মুক্তার মতো নিটোল পৃথিবী
কাঁপে টলোমলো জ্যোৎস্নায় শ্লথ নীবি,
নীলা-গলা আলো পান্নার প্রেমে
এসেছে দৃপ্ত তালের মুঠিতে নেমে,
কি মিনতি বাঁধে কদম্ব অঞ্জলি,
কিশোর শাখের কঠিন পেশীতে গুম্ভিত কথাকলি।

দূর পাহাড়ের বুকে উপচানো বাঁকা
রেখায় কিসের আধো হাতছানি আঁকা,
কি যে বিচিত্র ইসারা নিঝুম সাঁওতালী গ্রাম-ছায়ে,
সে আঙিনা দিয়ে কবিতা আমার এল বুঝি লঘু পায়ে।

অমাবস্যার পাথুরে প্রাচীর
আজ ভেঙে চৌচির।
মুছে গেল যতো অপরিচয়ের সীমা।
জ্যোৎস্নার নীদে নামে মুখোমুখী সাঁওতালী পূর্ণিমা।

চিত্র পরিচয়

শ্রীশ্রীদুর্গার মূর্তিটি কলিকাতার একটি সার্ব্বজনীন পূজার জন্য খ্যাতনামা ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল নির্ম্মাণ করেন।

প্রচ্ছদের চিত্রটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আমরা ইউনিভার্সাল আর্ট গেলারীর সৌজন্যে পেয়েছি।

[বর্তমান চীনা-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কলাকারদের মধ্যে চ্যাং টিয়েন-ঈর মস্ত সম্মান। চীনা-ছাত্র এবং রসগ্রাহী চিন্তাশীল পাঠক-সমাজে তাঁর প্রভাব বিস্তর এবং ক্রমশ আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

চ্যাং টিয়েন-ঈর সাহিত্যিক ঐতিহ্য বা গোত্র চীনা নয়, আন্তর্জাতিক, স্পষ্ট, আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প-বোধসম্পন্ন। আর শুধু শিল্প-নিপুণতা বা শিল্প-সার্থকতাই নয়, তাঁর রচনায় শিল্প-সাধকতাও যথেষ্ট। বর্তমান গল্পটি পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলা দেশে বেমালুম দাঁড়িয়ে যায়।

চ্যাং টিয়েন-ঈর বর্তমান বয়েস চল্লিশ; প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা—গল্প, উপন্যাস, কিশোর-সাহিত্য সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ।]

পঞ্জিকা মতে শুভ দিন হলেও কালো মেঘে এবং গুবরে-পোকার চঞ্চলতায় বর্ষণেরই যেন আভাষ পাওয়া গেল।

দা-জেনের নাক দিয়ে জল ঝরছিল। অনবরত নাক টেনে আর নাক ঝেড়ে বিরক্ত হয়ে সে গাল পাড়তে, লাগল।

"কি সর্দি রে, শালা!"

তার মেজো ভাই, এড়-জেন তাকাল চার দিকে, বলল, "দাদার সর্দি হয়েছে খোকার কিন্তু কিছু হয়নি।"

"কি বললি?" দা-জেন তার কাছে তেড়ে গেল।

"আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি না।"

পচা আর নেড়ু সরে গিয়ে দা-জেন ও এড়-জেনের চেয়ে কয়েক পা আগে আগে হাঁটতে লাগল। গলা তুলে পিছনের দু'জনকে শুনিয়ে নেড়ু পচাকে এক গল্প বলতে সুরু করল।

"এক জনের মা, বুঝলি পচা, কাঠ-বেশ্যা। তার সঙ্গে মুদী দোকানের লোকটা মাসে চার-পাঁচ দিন করে ঘুমায় আর প্রত্যেক বার একটা করে টাকা দেয়…"

"হুম্‌ম্‌" নাক দিয়ে আওয়াজ বেরয় পচার, একবার আড় চোখে পিছনে দেখে নেয় সে।

"কার মা জানিস্?"

"না ত'; তার পর?"

"তার পর আছে, শুয়ি, লাওণ্ড নিউ আরো অনেকে আছে যারা তার মা'র সঙ্গে শোয়—তার মা'র ব্যবসাই ত' ঐ…"

হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে দা-জেন নেড়ুর গলা চেপে ধরলে। সে মুখ ফেরাতেই সদ্য নাক-ঝাড়া শিকনি নিয়ে দা-জেন মাখিয়ে দিল তার মুখে!

প্রত্যাবর্তন

(লেখক:—চ্যাং টিয়েন-ঈ)

"সর্দি না হলে প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না, জানিস্?"

দা-জেনের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল এড়-জেন। তার পর মুখ ফিরিয়েই নদীর পাড়ে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, "ঐ দেখ যায় পচা আর নেড়ুকে!"

পচা আর নেড়ু ঢিল দিয়ে জলে চিংড়ি লাফানোর চেষ্টা করছিল। বিনা-মাইনের নৈশ স্কুলে দা-জেনের সহপাঠী অত্যন্ত গুঁচা ছেলে তারা দু'জন। আওয়াজ শুনে নেড়ু তার ছোপানো মাথা ফেরাল।

"বেজন্মা গুলি আসছে রে! আমার ঢিলগুলি ঐ জন্যেই লাফাচ্ছে না; বেজন্মাদের মুখ দেখলে কখনো আমার দিন ভালো যায় না। মা মাগীটা ওদের কাঠ-বেশ্যা।"

"এ কি হচ্ছে ?"

"এই হচ্ছে," বলে দা-জেন নেড়ুর গালে প্রচণ্ড চড় কসিয়ে দিলে।

দু'জনে ঝটাপটি লেগে গেল। পচা এগিয়েছিল তার বন্ধুর সাহায্যে, কিন্তু দা-জেনের লাথির চোটে তাকে সরে দাঁড়াতে হ'ল। নেড়ুকে শায়েস্তা করে পচার দিকে দা-জেন এগোতেই পচা বিনা যুদ্ধে ভোঁ-দৌড় দিল। তাকে কিছুটা ধাওয়া করে দাঁড়িয়ে পড়ে এড়-জেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল দা-জেন।

কয়েকটি মেয়ে একটা গাছের নীচে খেলা করছিল। নাক টেনে মুখ দিয়ে থুথু ফেলে ভারিক্কি চালে বলল দা-জেন:

"ভাখ ত', ওখানে কোই য়ুয়ান আছে কি না? আহ্ চিয়াওর সঙ্গে খেলতে ওকে বারণ করেছিলাম আমি।"

কোই য়ুয়ানকে অবিশ্যি সেইখানেই পাওয়া গেল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে দড়ি নিয়ে লাফাচ্ছিল। তার কোলে সেজো ভাই সান-জেন আর ছোট বোন হুসিয়াও য়ুয়ান তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কোই য়ুয়ান বলছিল, "আহ্ চিয়াও, সান-জেনকে একটু কোলে নে, আমি লাফাবো।"

"কোই য়ুয়ান!" দা-জেন ধমকে উঠল।

সে কিন্তু স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে এক জরুরী খবর জানিয়ে দিল তাকে:

"বাবা ফিরে এসেছে।"

"এঁ্যা!" হতভম্ব হয়ে গেল দা-জেন।

এড়-জেন আশ্চর্য হয়ে তাকাল কোই য়ুয়ানের দিকে। তার যে এক জন বাবা ছিল এ কথাই তার মনে ছিল না।

"বাবা য়্যু-দাদুর মত না কি রে?" মুখে আঙুল পুরে সে জিজ্ঞাসা করল।

"বাবা কখন এসেছে?" দা-জেন জানতে চাইলে, তার মুখ অন্ধকার

"তুমি আর এড়-জেন বেরুবার পরই—"

অর্থাৎ তিন ঘণ্টার উপর বাবা ফিরেছে। আর তার চোখে পড়ল না যে ছোট বোন আহ্ চিয়াওর সঙ্গে খেলায় মেতে গেছে; নেড়ু উঠে দাঁড়িয়ে যে তার পাশ দিয়ে চলে গেল তা-ও তার নজরে এল না; নাক ঝাড়তেও ভুলে গেল সে। বাবার চিন্তাতেই তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মুকদেনের এক অস্ত্রের কারখানায় বাবা কাষ করত, জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া অধিকার করবার পরে তারা দক্ষিণে চলে আসে। কিছু দিন কষ্টে-সৃষ্টে চালাবার পর বাবার চাকরি গেল এবং চাকরির চেষ্টায় তাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হল। আজ এক বছর সে ঘর-ছাড়া এবং আজ অবধি একটা খবর পর্যন্ত তার পাওয়া যায়নি। তার পর আজ হঠাৎ বাবা ফিরে এসেছে।

দা-জেন বাবার সম্বন্ধে ভাবতে লাগল, ভাবতে লাগল বাবা বুড়ো হয়ে গেছে কি না, রূপকথার গল্পের মত সাত সমুদ্র পার হতে বড়লোক হয়ে ফিরেছে কি মা বাবা—সোনা-দানা-হীরে-জহরৎ নিয়ে?

"বাড়ীতে দেখতে যাচ্ছি আমি," বলে দা-জেন ছুটতে শুরু করে দিল।

"বাড়ীতে বাবা নেই," বলল কোই য়ুয়ান।

দা-জেন কিন্তু থামল একেবারে বাড়ীতে পৌছে। বাবা বাড়ীতে ছিল না, ছিল মা, বসে বসে চোখ মুছছিল। য়্যু-দিদিমা পাশে বসে বোঝাচ্ছিল তাকে:

"চ্যাংশু বুদ্ধিমান লোক। তাকে অবুঝ হলে চলবে কেন?"

"আমি মুখ দেখাতে পারব না তাকে। যে অন্যায় আমি করেছি…"

মা'র মুখের ভাব নিতান্ত করুণ। দা-জেন টেবিলে গিয়ে হাজার বর্ণমালার বর্ণপরিচয় খুলে ধরল চোখের সামনে, পড়বার ভঙ্গীতে।

"চ্যাংশুকে এখন কিছু না বলাই ভাল। আমরা সকলে মিলে—"

মা'র দিকে তাকিয়ে অনুকম্পায় বুড়ির মন ভরে গেল, বিছানার মাদুরের উপর তাদের দু'জনের দৃষ্টিই আবদ্ধ হয়ে রইল।

"এ কথা আর কদ্দিন চেপে রাখা যাবে?"

"তা হলে জানুক সে। ভয় কি তাতে?" বুড়ির কথায় জিঘাংসা প্রকাশ পায়। "চ্যাংশু অবুঝ নয়। এক বছরের উপর তার খবর নেই, কখনো একটা পয়সা পাঠায়নি সে। পাঁচ-পাঁচটা বাচ্ছা নিয়ে তুমি আর কি করতে পারতে? বাধ্য হয়েই তোমাকে—এতে তোমার লজ্জার কিছু নেই।"

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তার বাবা ভেবে দা-জেন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে এক জন লোক নিয়ে মুদীর দোকানের লিয়েন শু-হু উপস্থিত, তার হাতে মদের বোতল।

"এখন যাও, লিয়েন শু-হু, দয়া করে এখন যাও।" মা বেশ ভয় খেয়ে গেল।

"সে কি?"

"চ্যাংশু ফিরে এসেছে!"

"তাতে ভয় পাবার কি আছে—দাম দিয়েই ত' জিনিষ নেব। আর পয়সা ত' দিয়েছি! আর তোমার সাথে কারবার ত' শুধু আমার একার নয়?"

"তোমার পায়ে ধরছি লিয়েন শু-হু। ও জানে না…"

য়্যু-দিদিমা মাঝখানে কথা বলবার, বোঝবার চেষ্টা করল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঠাণ্ডা করবার, তুষ্ট করবার জন্য তাকে বলল, লিয়েন শু-হু, তুমি একটা বুদ্ধি-শুদ্ধিওয়ালা লোক। নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে তবেই না চ্যাংশুর-বৌ এই দুঃখ সইত। তার স্বামী ফিরে এসেছে, এখন তোমাদের বোঝা উচিত তার অবস্থা…"

"বুঝছি খুবই। কিন্তু কাঁচা পয়সা যে খরচা হয়েছে… ওকে আগাম দিয়ে রেখেছি যে—তার কি?"

"ভাগো, ভাগো শালা!" দা-জেন চেঁচিয়ে উঠল।

"এ শয়তান, কে রে? তোর এই বাবার কিন্তু নড়বার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই। বুঝলি হতভাগা? এখন কি করবি কর।"

"ও শু' বলছে, ও তোমায় পয়সা ফেরত দেবে," বুড়ির গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে এল।

"বেশ ত,' দিক্ না দিয়ে। আমি চার টাকা ওর কাছে—"

"কাল তোমায় দিয়ে দেব। তোমার পায়ে পড়ছি এখন চলে যাও।"

লিয়েন শু-য়ু বিছানায় উঠে বসল: "উঁহ, ও চলবে না। এসো লাও য়িং, উঠে বসো। আজ রাতটা এখানেই ফর্ত্তি করা যাক।"

দা-জেন জ্বালানি কাঠ এক খণ্ড তুলে ধরল।

তার মা লিয়েন শু-য়ুর কাছে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল, চলে যাবার জন্ম মিনতি করতে লাগল তাকে।

"দেখি দেখি, একটু হাসো দেখি। ভেংচানো মুখের জন্ম আমি আমার পয়সা খরচা করতে চাই না।"

হঠাৎ—একটা আওয়াজ হল! লিয়েন শু-য়ু'র মাথায় একটা কাঠ ভেঙে পড়ল। মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ততক্ষণে দা-জেনকে ধরবার জন্ম লিয়েন শু-য়ু উঠে দাঁড়িয়েছে।

গাল পেড়ে দা-জেন দু'হাতে লিয়েন শু-য়ু'র ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল, তার পর দাঁত বসিয়ে দিল তাতে। পা থেকে ছাড়াতে না ছাড়াতেই লিয়েন শু-য়ু'র মুখে এক ঘুষি বসিয়ে দিল সে। তার পর দরজার সামনে চৌকি টেনে পথ আটকে দিয়ে ছুটে পালাল সে। চৌকিতে হোঁচট খেয়ে লিয়েন শু-য়ু উল্টে পড়ল, দা-জেনকে আর ধাওয়া করা হল না তার।

"শালা তোমায় গোবরে চুবিয়ে মারবো আমি!" দৌড়তে দৌড়তে দা-জেন গাল পাড়তে লাগল।

লিয়েন শু-য়ু এবং আরো অনেককেই সে এর আগে আড়ালে গাল দিয়েছে, কিন্তু মুখের উপর কারুকে এই প্রথম। গত এক বছরের উপর বেশির ভাগ সময়ই মা'র কেটেছে কেঁদে এবং তাকে ছেড়ে যাবার জন্ম বাবার উদ্দেশে অভিযোগ জানিয়ে। কিন্তু যখন লিয়েন শু-য়ু বা আহ্ গুয়ি বা আর কেউ আসত, পাছে তারা চটে যায় তাই তখন মাকে জোর করে মুখে হাসি আনতে হত। মা'র ঐ হাসি দেখে দা-জেনের গা ঘিন-ঘিন করত। কখনো বা তারা মাকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত; কখনো বা মা দা-জেনকে সব ভাই-বোনকে নিয়ে দু'-তিন ঘণ্টার জন্ম বাইরে পাঠিয়ে দিত। কখনো বা তারা মাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেত, আর সারা রাত্রি আটকে রাখত। অসুখ হলেও নিস্তার ছিল না, তার উপরই তারা এসে মাকে বিরক্ত করত। অবিশ্যি এ সবের পরই পয়সা দিয়ে মা দা-জেনকে বাজার করতে, চাল-তরকারি কিনতে পাঠাতেন। যখন কেউ আসত না তখনই মা কাঁদত আর বাবার উদ্দেশে জানাত তার দুঃখ-কষ্টের কথা।

আর এমনি ভাবেই এক বছরের বেশি কেটে গেছে।

গাল পাড়তে পাড়তেই দা-জেনের দ্রুত পদক্ষেপ কিছুটা শান্ত হয়ে এল। গাছের নীচে বাচ্চাদের খেলা ভেঙে গেছে। এক প্রৌঢ় লোককে ঘিরে বাচ্চাদের জটলা শুরু হয়েছে। এ কে? অনেকটা বাবারই মতন দেখতে, কিন্তু বয়েস অনেক বেশি। সান-জেনকে কোলে নিয়ে তার সঙ্গে আধো-আধো কথা বলছিল লোকটা, সান-জেন কিন্তু অপরিচিতের কোলে থাকতে চায় না, অন্ত কোলে যাবার জন্ম কান্না জুড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ দা-জেন শঙ্কিত হয়ে উঠল।

"শোন কোই য়ুয়ান," বোনকে ডেকে বলল সে, "দৌড়ে মাকে গিয়ে বল, বাবা এখানে দাঁড়িয়ে।"

"মা ত' জানে বাবা এসেছে।"

"তবু যা, বলগে। দৌড়ে যা।"

দা-জেন গাছের দিকে এগোতে লাগল। তাকে চোখে পড়া মাত্র লোকটা হাঁক দিল:

"এই ক্ষুদে শয়তান! আমি যখন বাড়িতে এলাম তখন কোথায় লুকিয়েছিলি তুই? কতটা বড় হয়েছিস্ রে! চিনতে পারছিস্ আমায়?"

"বাবা!"

সান-জেন কোল থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছিল—আহ্-চিয়াওর কোলে যাবার জন্ম। আহ্ চিয়াওর কোলে গিয়ে মিট-মিট করে সে বাবাকে দেখতে লাগল।

মুখে হাত পুরে বোকার মত হাসতে লাগল এড়-জেন।

হ্সিও য়ুয়ান বাবার পা ধরে টানছিল কিন্তু বাবা তার দিকে তাকাতেই সে হেসে দূরে পালিয়ে গেল।

নীচু হয়ে বাবা দা-জেনের কাঁধে হাত রাখল।

"আমি ভেবেছিলাম তুই বেঁটে হবি। উঃ, কতটা লম্বা হয়েছিস শয়তান। তোর গলাটা এত লম্বা করলি কি করে?"

পচা ও নেড়ুকে কিছু দূরে আসতে দেখা গেল। দা-জেন তাদের উপর নজর রাখতে লাগল, বাবা তাদের লক্ষ্যও করল না। বাবা বার বার দেখতে লাগল দা-জেনকে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল তাকে। বাবার জন্ম মন-খারাপ করত কি না তার, খাবার তাদের যথেষ্ট ছিল কি না, তার এত সর্দি হল কি করে, এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মা'র দুর্বল স্বাস্থ্যই বা কেমন ছিল, ঘরে দু'টো চৌকি এল কি করে, বিছানায় ছারপোকা কেমন, দুষ্টুমির জন্ম দা-জেনকে মা'র প্রায়ই মারতে হত না কি? ইত্যাদি—আরো অনেক প্রশ্ন।

এই সময় হঠাৎ পচা আর নেড়ু চেঁচাতে শুরু করে দিল, আলাদা-আলাদা হয়ে চেঁচাতে লাগল তারা।

"ঐ ব্যাটা গাধা।"

"চ্যাংড়া মেয়েছেলে, এক টাকায় এক রাত মেলে!"

বাবা মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকাতেই তারা পিছিয়ে গেল।

"কি বলছে ওরা?" বাবার মুখ কালো হয়ে এল।

"ওদের নোংরা মুখ দিয়ে নোংরা কথা ছাড়া আর কিছুই বেরয় না।" পচাকে মাটিতে ফেলে দা-জেন চেপে ধরল, তার মুখে থুথু মাখিয়ে দিল, মুখে ধুলো গুঁজে দিল তার।

ফিরে তাকিয়ে দা-জেন দেখে বাবা নেই! পচাকে ছেড়ে দিয়ে গাল পাড়তে পাড়তে বাড়ির দিকে ছুটল সে। পথে একটা পাথরও কুড়িয়ে নিল, দরকার হলে বাবার সঙ্গে লড়তেও সে পেছপাও হবে না।

দা-জেন ঝাড়ি পৌঁছে দেখে নিয়েন শু-যু চলে গেছে। মা'র হাত চেপে ধরে বাবা তার কাছে একসঙ্গে অনেক কিছু জানতে চাইছে। য়্যু-দিদিমা অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আর কোই য়ুয়ান ভীত ভাবে দাঁড়িয়ে দরজার মুখে।

"আমার ভালো বোধ হচ্ছে না," বাবা বলছিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি বলো। বলো, আমার সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ কি না?"

মা কাঁদছিল, বাবার হাতের চাপে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল তার। বুড়ি বাবাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল।

"এ কি হচ্ছে চ্যাংশু? এ কি করছ তুমি? সবে ফিরেছ তুমি। কত দিন বাদে তোমরা মিলছ। এ কি করছ তুমি?"

"মা'র গায়ে তোমাকে আমি হাত তুলতে দেব না," দা-জেন চেঁচিয়ে উঠল।

সে কথায় বাবা ভ্রূক্ষেপ করল না, দিদিমাকে বলতে লাগল, "তুমি নিশ্চয়ই জানো, বুড়ি, তুমি নিশ্চয়ই জানো। ও তোমারই পালিতা মেয়ে। ও কখনই সত্যি কথা বলছে না, আমাকে কেবল বোকা বানাচ্ছে। সেলাই ছাড়া যদি অন্য কিছু ও না করে থাকে তবে ছ'জন মানুষকে ও খাওয়াত' কি করে?"

"মাকে ছাড়ো বলছি, বাবা!"

"দূর হ' হতভাগা!'

"মা'র গায়ে হাত তুলতে আমি তোমায় দেব না।"

আহ্ চিয়াও ও অন্যান্য বাচ্চারা দরজার কাছে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। আহ্ চিয়াওর কোল থেকে সান-জেনকে নিল কোই য়ুয়ান, সান-জেন কিন্তু মা'র কাছে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল।

দিদিমার কাছে এসে হ্ সিও য়ুয়ান তার হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে ফেলল। এড়-জেন দেয়ালে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল, তার অজান্তেই তার ইজের ভিজে গেল।

"ও নিশ্চয়ই ঠকাচ্ছে আমায়। সেলাই করে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে কখনোই ছ'জনকে খাওয়ানো যায় না। তা ছাড়া, ওর গায়েও তেমন শক্তি নেই..."

"তুমি জানোই আমি এদের খাওয়াতে পারব না, তবে এই পাঁচ জন বাচ্চা-সুদ্ধ কেন ফেলে গিয়েছিলে আমায়? আমার আর কি উপায়—"

বাবার আঘাতে মা জোরে কেঁদে উঠল। দা-জেন এগিয়ে গেল কিন্তু তার আগেই বুড়ী বাবাকে সরিয়ে নিয়েছে। চৌকির উপর বসে পড়ে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল বাবা, কামড়ে কামড়ে নিজের ঠোঁট সাদা করে ফেলল। তার অনুপস্থিতিতে কি কি ঘটেছে, বুড়ি একে একে সবই তাকে বলল। পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চাকে মা না খাইয়ে রাখতে পারে না, গায়ে বিশেষ শক্তিও নেই তার। এ ছাড়া, আর অন্য কি উপায় ছিল? বাবা এত দিনে একটা পয়সা পাঠায়নি, একটা খবর পর্য্যন্ত না। বলতে বলতে দেয়ালে ছায়া ঘনিয়ে এল, ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে এল সব।

বাবারও অনেক কিছু বলবার ছিল। পাকা কাষ খাবা কোথাও পায়নি। কোন খবর না পাঠালেও অহর্নিশ সে মা আর ছেলে-মেয়েদের কথাই ভেবেছে।

"আমি বুঝতে পারছি, এ ছাড়া আর উপায় ছিল না—এ সব আমার জন্যই হয়েছে, বুঝতে পারছি, তবু, তবু বুড়ি, ভেবে ছাখো, আমার বৌ—আমার নিজের বৌ কি না! আর আমি দিনরাত্রি শুধু তার কথাই ভেবেছি। কি দুর্ভাগা আমি! কি করে আর আমি..."

দেখতে দেখতে বাবার মত জোয়ান পুরুষ ভেঙে পড়ল, কচি ছেলের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

"আমার কিছু বলবার নেই, আমি..." মা'র কথা আটকে গেল। কনুয়ের উপর ভর দিয়ে মা কোন মতে উঠে বসল, তার পর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"এ দোষ আমার," মা দম নিয়ে বলতে লাগল, "মহাপাতক করেছি আমি। চ্যাংশু ঠিকই বলেছে। কিন্তু উপোসী বাচ্চাদের নিয়ে আমি আর কি করতে পারতাম!"

একটু থেমে মা আবার বলতে লাগল :—

"এখন, চ্যাংশু, তুমি ফিরে এসেছ—তোমার বাচ্চাদের এখন তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার যা করবার আমি করেছি, এখন থেকে ওদের ভার তোমার একার। আমার কলঙ্ক দিয়ে আমি তোমার জীবন নষ্ট করব না, তোমার লজ্জার কারণ হব না..."

বলতে বলতে মা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

"মা..." বলে লাফিয়ে উঠে দা-জেন তার পিছন পিছন ছুটল।

"কি করলে তুমি চ্যাংশু," বুড়ি উঠে দাঁড়াল।

"না বুড়ি, ওবে আমি দোষ দিতে পারি না। এ আমার অন্যায়। ওকে আমি দোষ দিতে পারি না।" বাবার মুখ দিয়ে কথাগুলি দ্রুত বেরিয়ে এল।

বুড়ি উঠেই দা-জেনের পিছন-পিছন ছুটে গেল। তার কোল থেকে পড়ে গিয়ে হ্ সিয়া ও য়ুয়ানের ঘুম ভেঙে গেল, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল সে, কিন্তু সেদিকে কারু নজর গেল না।

বাবা দৌড়ে ঘর থেকে বেরল, সান-জেনকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে তার পিছনে কোই য়ুয়ানও বেরিয়ে এল।

বাবাই সব চেয়ে জোরে দৌড়তে লাগল।

"ফিরে এসো, ফিরে এসো! আর দোষ দিচ্ছি না তোমায়, সত্যিই তোমার কোন দোষ নেই, বুড়ি, ওকে বলো, আমি বিশ্বাস করি ওর কোন দোষ নেই। ও চলে গেলে আমি আর বাঁচবো না..."

দৌড়ে এখনি মাকে তার ধরে ফেলতে হবে, বলতে হবে মাকে এসব তার নিজের দোষ, ক্ষমা চাইতে হবে তাকে মার কাছে।

জোরে, ক্রমশঃ আরো জোরে দৌড়তে লাগল বাবা, দৌড়তে দৌড়তে ডাকতে লাগল প্রাণপণ, "ফিরে এসো দা-জেনের মা! দা-জেনের মা! ফিরে এসো!"

অনুবাদক :—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

—নীরোদ রায়

শরৎ
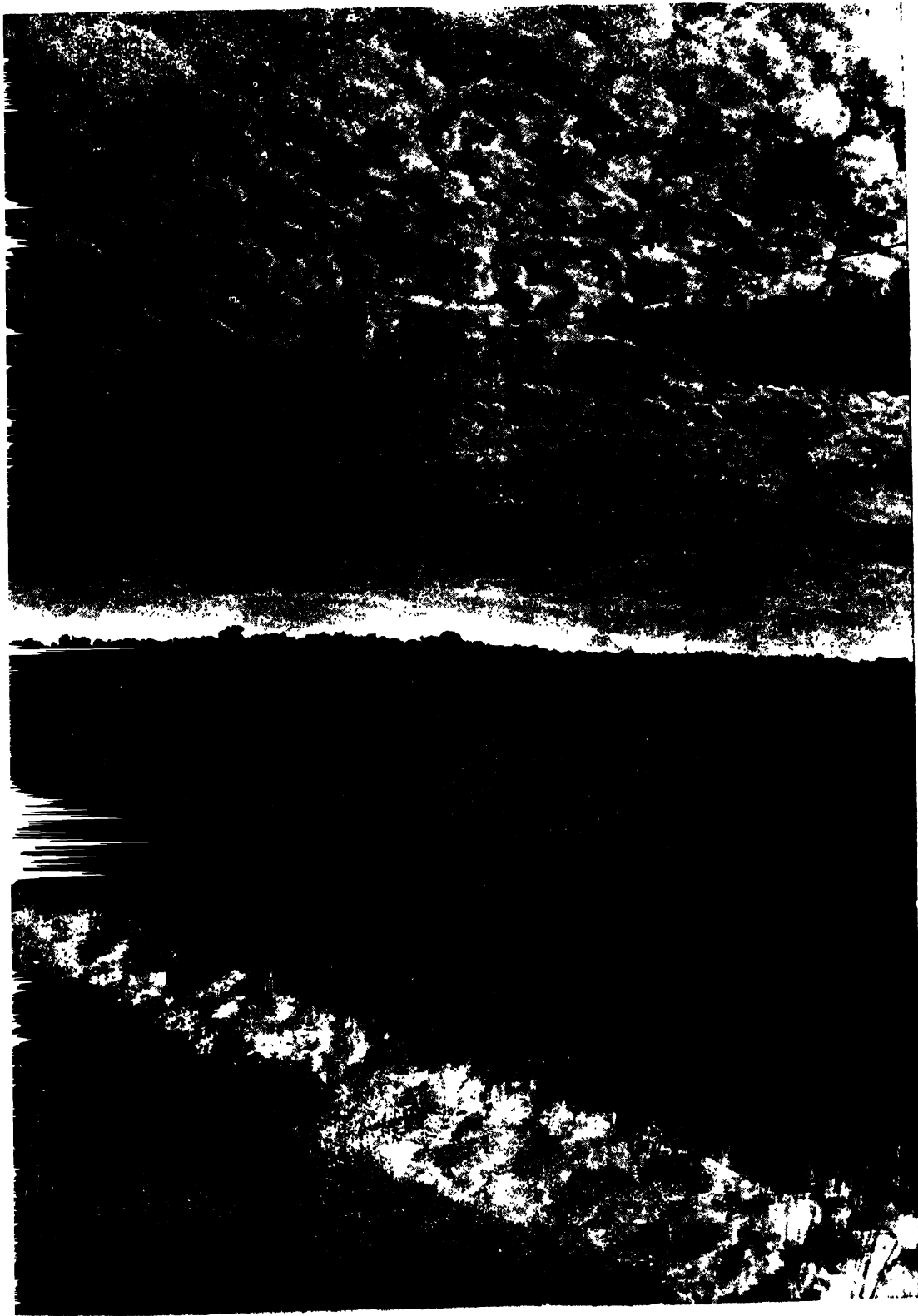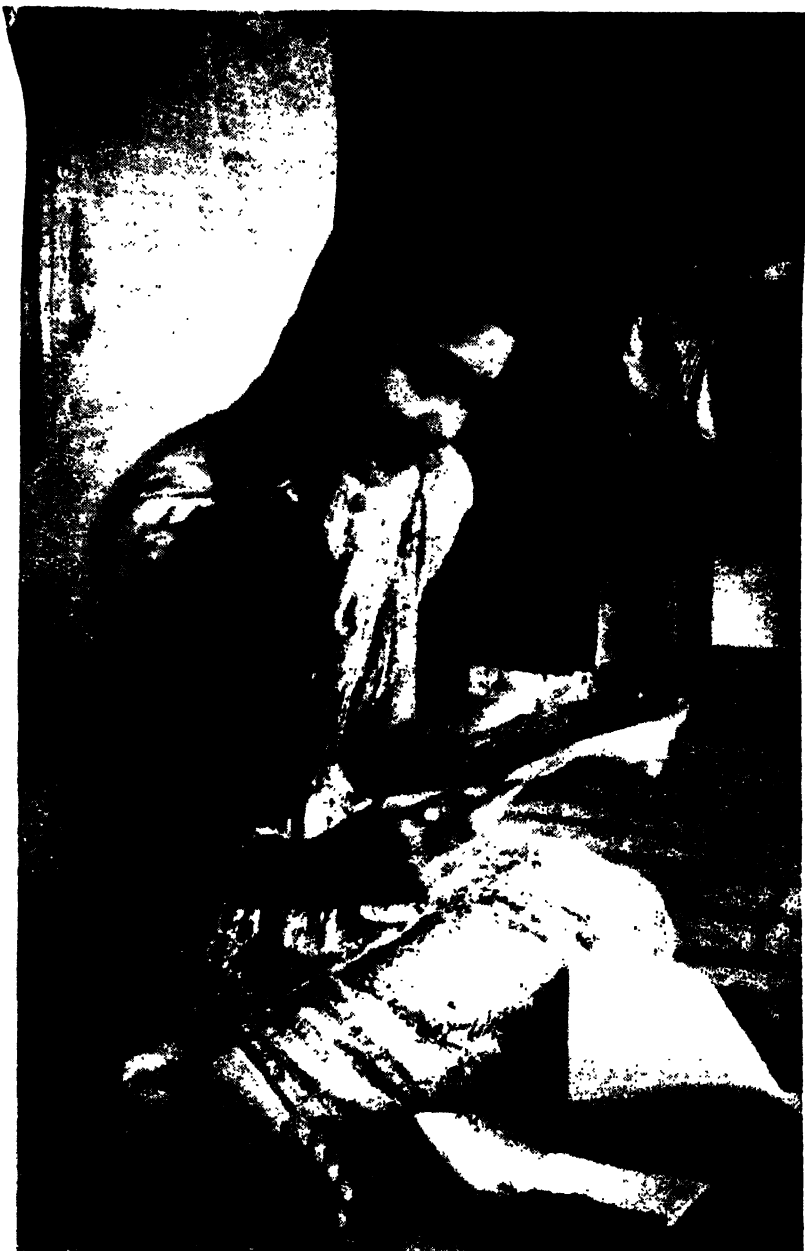
প্রেম-পত্তর —শি, ভ, বসু

অর্থহীন।　　—অজ্ঞাতনামা

অনেক অর্থ!　　—জয়ন্ত মৈত্র
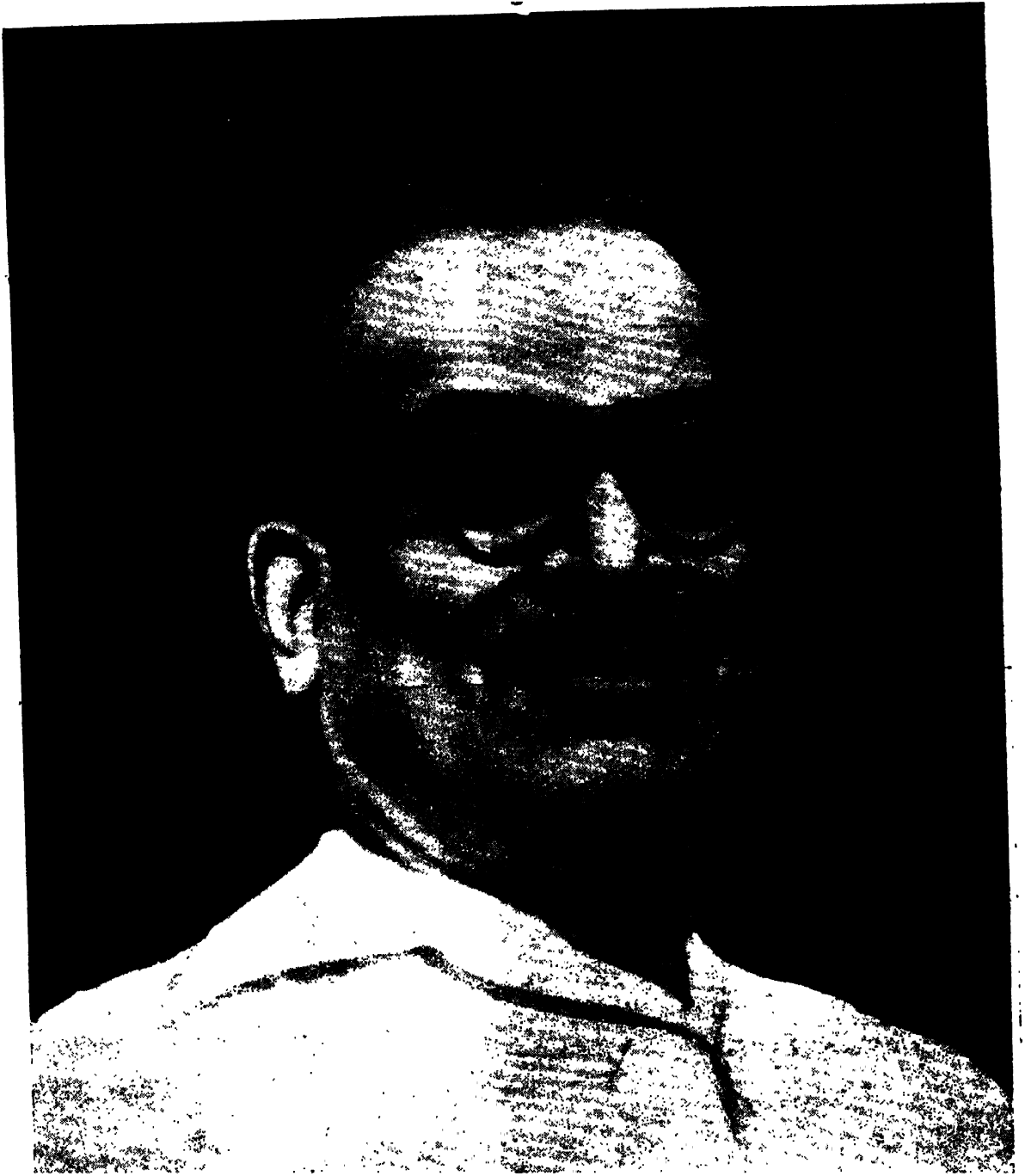
ছবিতে মহাত্মাজী কি আছেন ?

—বসুমতী

উত্তর ৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী

অসুখের বিধাতা (ডঃ বসু)

-নিয়মাবলী-

[illegible] হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্ত উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্ত বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।
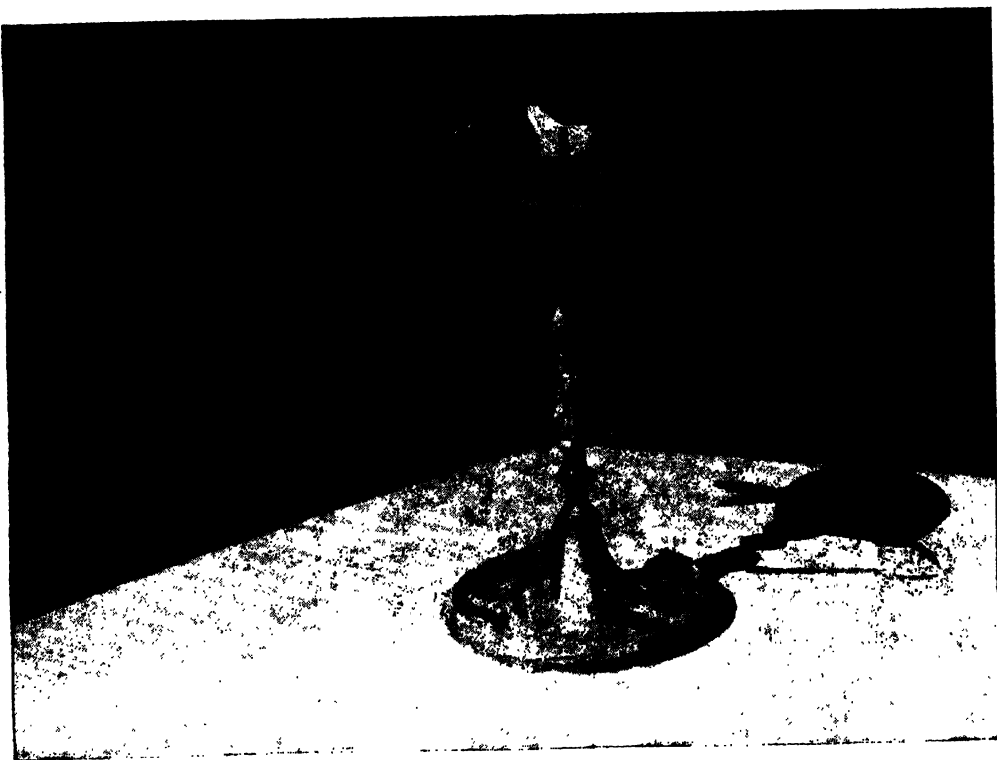
সন্ধ্যা (তৃতীয় পুরস্কার) —রামকিঙ্কর সিংহ

সন্ধ্যা । (দ্বিতীয় পুরস্কার) —ব্রজগোপাল নায়ক

পুরস্ক নি হত

বোবা-বধুর চোখ-ইশারা

স্বামী কৃষ্ণানন্দ

প্রেমের সন্ধানে
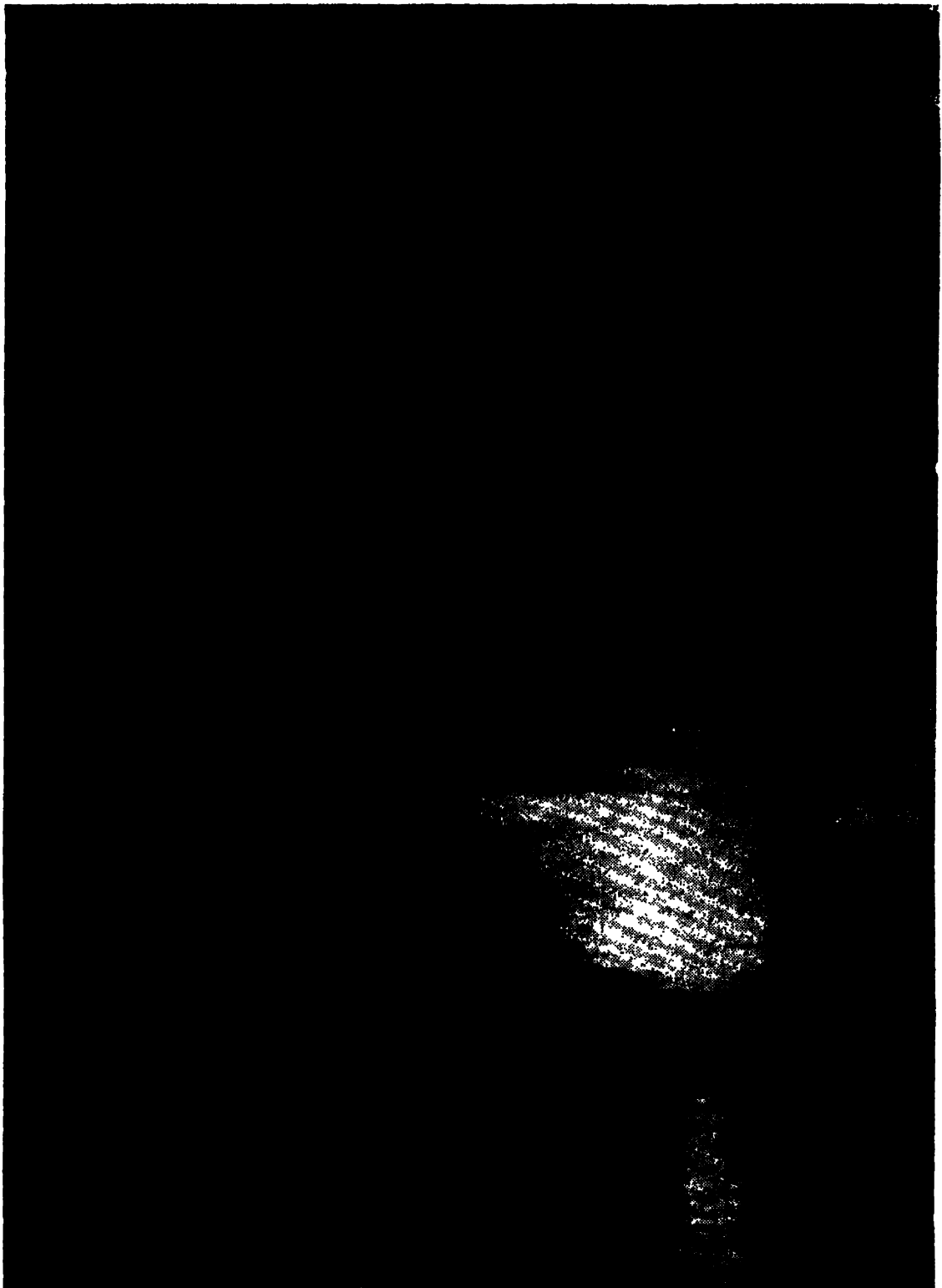
আমাদের প্রত্যেকের যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রত্যেকেই "আমি আমি" ভাবিয়া থাকি, আমাদের সেই যথার্থ স্বরূপটিকে স্বরূপ-জ্ঞান বা পুরুষ বলা হইয়া থাকে ; সেই কারণ অতঃপর আমরাও উহাকে লক্ষ্য করিয়া পুরুষ বলিতে থাকিব। কিন্তু এই পুরুষ শব্দ হইতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই পুরুষ শুধু পুংলিঙ্গ নরেরই যথার্থ "আমি" এবং স্ত্রীলিঙ্গ নারীর যথার্থ "আমি" নহেন—কারণ, নর ও নারী, এতদুভয়ের মধ্যে এই যে লিঙ্গভেদ, ইহা কেবল শরীরসম্বন্ধ লইয়াই হইয়া থাকে। বোবা-বধূর চোখ-ইশারা হইতে ইহা আমরা ক্রমশঃ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব যে আমাদের সকলেরই যাহা যথার্থ স্বরূপ বা "আমি," সেই স্বরূপ-জ্ঞান বা পুরুষ শরীর ও চিত্ত হইতে ভিন্ন বস্তু এবং উহা শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র হওয়ায় উহার কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই ; তদ্ধেতু এই পুরুষ শব্দে নর, নারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রাণী মাত্রেরই যথার্থ স্বরূপটিকে বা আমিটিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমাদের চৈতন্যস্বরূপ এই পুরুষটিকে নিত্যমুক্ত স্বভাব ও গুণাতীত হইয়াও কেন যে এইরূপ কল্পনার জালে পড়িয়া এই অজ্ঞানরূপিণী, নানা ভাবময়ী, দ্বন্দ্বশীলা, চঞ্চলা প্রকৃতির সহিত দ্রষ্টাদৃশ্যরূপ বা জ্ঞাতাজ্ঞেয়রূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ও উহাতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া এত হাসা-কাঁদা করিতেছেন—ইহার যথার্থ উত্তরটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে রোগের মূল কারণ জানা যাইবে না এবং যতক্ষণ রোগের মূল কারণটির সঠিক্ নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ রোগের যথার্থ ঔষধের ব্যবস্থা করাও কার্য্যতঃ সম্ভব হইবে না। অতএব যেমন করিয়াই হোক্ না কেন, আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটির উত্তর পাইতেই হইবে।

"শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে।
লুকানো কথার হাওয়া যেন বহে বন হ'তে উপবনে।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই পুরুষটির ভাবগতিক ও আমাদের এই কৌতুকময়ী বোবা বধূটির অবিচ্ছিন্ন চোখ-ইশারা দেখিয়া আমাদের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, এই পুরুষটি যেন তাঁর জীবনসর্ব্বস্বকে কোন কারণে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই হারান মহাধনটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রত এই তিন অবস্থাতেই অহরহঃ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু যাঁহাকে ইনি এত খুঁজাখুঁজি করিতেছেন, সে-ও নিশ্চয় এক জন যে-সে বা যেমন-তেমন নহেন —সে-ও এক জন কেউ-কেটা হবে নিশ্চয়। এই পুরুষটির কার্য্যকলাপ ও হাব-ভাব দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে, ইনি যাঁহাকে প্রাণ দিয়া চাহিতেছেন, তাঁহাকে যেন ইনি নিজের বাহিরে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ আপনা হইতে পৃথক্ বা পর রাখিয়াই তাঁহাকে যেন এই পুরুষটি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে কল্পনা দ্বারা এই পুরুষটি তাঁর অন্তরের মহাধনরূপ অর্দ্ধাঙ্গিনীকে আপনা হইতে এই ভাবে পৃথক্ বা পর করিয়াছেন, সেই মহামানময়ীও পুরুষেরই এই কল্পনার জালে নিজেকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া মানভরে নীরব বা বোবা হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং মনে মনে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাও করিয়াছেন—

"এবার শ্যাম এলে পরে আর কথা কইব না।"

—বিস্মৃত

যতক্ষণ কৃষ্ণ নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়া দাঁতে তৃণ লইয়া নতজানু ও যুক্তকর হইয়া মানময়ীর আরাধনা করিতে করিতে রাধারাণীর চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী না হইবেন, ততক্ষণ অভিমানিনী বৃন্দাবনেশ্বরী ঘোম্টাও খুলিবেন না, কথাও কহিবেন না।

"এ কি দেখি বিনোদিনি! আমোদিনী—বিষাদিনী
ভাবান্তর কেন লো এমন?
আঁখিনীরে ধরা ভাসে পূর্ণশশী রাহুগ্রাসে
নীলাঞ্চলে ঢেকেছ বদন।
হেরি নিশি-অবসান করেছ কি অভিমান?
তোল মুখ, হেসে ফিরে চাও।
কিঙ্করে করুণা করি রাখ প্রাণ, প্রাণেশ্বরি,
পায় ধরি মানভিক্ষা দাও।
হাসি নাই শশিমুখে কেন শেল হান বুকে?
বিনা দোষে রোষে রসাভাস।
মরি, ফুল্ল কমলিনী কেন হেন বিমলিনী
চরণে নেহার ক্রীতদাস।"

—দেবেন্দ্র বসু

আমাদের চৈতন্যস্বরূপ পুরুষটি দুরূহ বিরহ-ব্যথায় অস্থির হইয়া প্রাণের জ্বালায় পাগলের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সুষুপ্তিকালীন ঐ কারণ-জগতে তাঁর প্রিয়তমাকে নির্জ্জনে একাকিনী পাইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তখনও আপনা হইতে পৃথক্ বা পর করিয়া রাখার কল্পনাটি ঐ পুরুষে প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকায় তাঁর এই পৃথকত্বের কল্পনাটিই পুরুষ ও তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, এতদুভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের উভয়ের যথার্থ ও সম্পূর্ণ মহামিলনে বাধা দিতেছে, সেই জন্য "প্রাণে শুধু মিশে যাক্ প্রাণ" পুরুষের এই আন্তরিক ইচ্ছাটি তখনও ফলবতী হইতে পারিতেছে না—সাধ তখনও অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে।

"তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না যতই কেন কাছে।
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাব রহিয়াছে।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

সুষুপ্তাবস্থাতেও পুরুষের এই গূঢ় বিরহটি যাইতেছে না, তাঁর এই মূল অভাবটি মিটিতেছে না, তাঁর এই যথার্থ পিপাসাটির নিবৃত্তি হইতেছে না ; রংমহলের তিমির-দ্বারে দাঁড়াইয়া ইনি কত হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, সাধ্য-সাধনা ও অনুনয়-বিনয় করিতেছেন—

"খোল খোল দ্বার, রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, কও কথা কও,
এস দুই বাহু বাড়ায়ে।"

—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু অভিমানিনীর হৃদয়-কপাট মাত্র এতটুকু মুখের কথাতেই খুলে না। রোগের যাহা মূল কারণ, সেই পৃথকত্বের কল্পনাটি তখনও পুরুষ ছাড়িয়া দিতেছেন না—মানময়ীর মানও ঘুচিতেছে না, অবগুণ্ঠনও খসিতেছে না, রুদ্ধচক্ষের আঁধার-দুয়ারও খুলিতেছে না; তাই ঐ সুষুপ্তির দেশে বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া এই পুরুষটি পুনরায় স্বপ্ন-জাগৃতির জগতে ফিরিয়া আসিয়া দেশে-দেশে, দ্বারে-দ্বারে, ঘরে-ঘরে ভিখারীর বেশে ঘুরাফিরা করিতেছেন।

"আমি তব ধন করি' আশ,
পরিয়াছি দীনবাস,
শুধু তোমারি লাগিয়া গান রচিয়া
মরমের ব্যথা কহি গো।"
—রজনী সেন

স্বপ্নের ও জাগৃতির জগতে আসিয়া এই পুরুষটি মিলন হইতে দূরে—অতি দূরে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁর বিরহ-ব্যথাটিও তীব্র—অতি তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং তাঁর হাহাকার-ধ্বনিও বিশ্বময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু কোথাও তাঁর বাঞ্ছিত হারাধনের সন্ধান না পাইয়া নিরাশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় নিজের শূন্য ঘরের আঁধার-দুয়ারে ঐ সুষুপ্তাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতেছেন এবং করুণ মিনতির সুরে আবার গাহিতেছেন—

"মম সঞ্চিত যত পাপ-পুণ্য
আমি সকলি করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি' দিবে তাই
এ রিক্ত হৃদয় বহি গো।"
—রজনী সেন

কিন্তু অসীম দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুতেই কোন ফলোদয় হইতেছে না; এত যে সাধ্য-সাধনা, কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয়, সব ব্যর্থই হইয়া যাইতেছে—অভিমানিনীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই গলিতেছে না।

"আমি নিশিদিন কত সব অবিরত
রব আশাপথ চাহিয়ে তাঁর
পলে পলে পলে ফোঁটা ফোঁটা জলে
কাঁদিয়া শুধিব এ প্রেমধার।"
—দেবেন্দ্র বসু

নিরুপায় হইয়া এই উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষটি গভীর মনস্তাপে কখন বুক চাপড়াইতেছেন, কখন চুল ছিঁড়িতেছেন, কখন শিরে করাঘাত করিতেছেন, কখন বা গলায় দড়ি বাঁধিয়া মরিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

"হায়, হায়, অযতনে হারায়ু সকলি,
কারে বলি এ মনোবেদনা।
মাটী খেয়ে মত্ত হয়ে মনে
জীবনসম্পদে ফেলেছি অতল জলে—
মনে হ'লে জ্বলে উঠে প্রাণ।"
—দেবেন্দ্র বসু

কাঁদিতে কাঁদিতে পরিশ্রান্ত হইয়া আবার সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন এবং ঐ সুষুপ্তির জগতে প্রিয়তমার অতি নিকটে আসিতেই এই পুরুষটি যেন তাঁর চিরপরিচিতা প্রিয়তমার অঙ্গসৌরভ কিছু কিছু পাইতেছেন, মিলনের যেন একটা অস্পষ্ট ছায়াও দেখিতে পাইতেছেন—ব্যস্, অমনি ভোলানাথ পুরুষটি আহ্লাদে একেবারে আত্মহারা ও নিখিলবিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন।

"মিলনে নিখিল-হারা বিরহে নিখিলময়।"
—দ্বিজেন্দ্রলাল

পরক্ষণেই নিজের ভুলটিকে বুঝিতে পারিয়া শোকে ও নৈরাশ্যে একেবারে মাটীর সঙ্গে যেন মিশিয়া যাইতেছেন—আশা-নিরাশার টানাটানিতে এই পুরুষটি যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

কখন গুঞ্জন, কখন স্পন্দন,
কভু শিহরণ, কভু বা ক্রন্দন,
ক্ষণে অচেতন, ক্ষণে সচেতন
সুপ্তিতে, স্বপনে, কভু জাগরণে
জীবনে-মরণে জনমে জনমে
চলেছে নিঠুর খেলা।

"জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন"—পুরুষের এই যে বোধ, "নিত্য মিলনে নিত্যবিরহ"—পুরুষের এই যে ভাব, "আঁখি নাই, তবু ঝরে আঁখিজল"—পুরুষের এই যে প্রতীতি, "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি"—পুরুষের এই যে কল্পনা, "তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন প্রাণে লাগে"—পুরুষের এই যে অনুভূতি, এ সবের যথার্থ কারণ কি, এ সবের প্রকৃত অর্থ কি, এ সবের বাস্তবিক মর্ম্ম কি?

"স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়?"
—রবীন্দ্রনাথ

কোন্ অমরায় কোন্ স্বপনের দেশে কোন্ ছায়াময়ী এলোকেশীর সহিত চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া আমাদের এই রহস্যময় পুরুষটি এত সখের এই লুকোচুরি খেলা করিতেছেন? কে সে নিঠুরা, বধিরা, পাষাণপ্রাণা অভিমানিনী, যার মানের দায়ে আমাদের এই চিরবিরহী পুরুষটি উদাসী যোগীর বেশে সুষুপ্তি-কালীন ঐ বিজন কারণ-জগতে শূন্য হৃদয় ল'য়ে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন?

"কি লাগিয়া বসে' আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি'?
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন?
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চিরবিরহীর মত চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি?
অসীম, অতৃপ্তি ল'য়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিঃশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে ওঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাসি'।"
—রবীন্দ্রনাথ
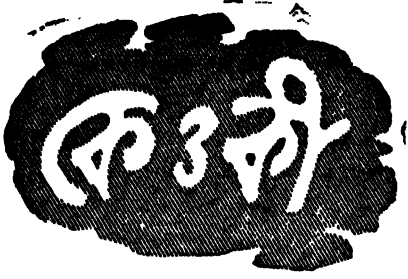
(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২

ফুল রিহার্সেলেই মৃগেনের নূতন পালাটির অভিনয় সাফল্যের যেরূপ সম্ভাবনা সূচিত করল, সর্বরসাশ্রিত গীতাভিনয়ের গুণবিচারে অভিজ্ঞ-মহলের সিদ্ধান্তে তা না কি অপ্রত্যাশিত। এর আগে মহলায় কোন নূতন গীতাভিনয় না কি এভাবে জমে ওঠেনি। দলশুদ্ধ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। বউরাণী সে দিন ভূরিভোজে সকলকে আপ্যায়িত করলেন।

রিহার্সেলের পর সীতা মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে বলল: কেমন, আমি যা বলেছিলুম তাই হোল ত? রিহার্সেলেই এই, এর পর দেখবেন আসরে কি ভাবে উৎরোয়।

মৃদু হেসে মৃগেন উত্তর করল: এর কৃতিত্ব আপনারই, সীতা দেবী!

রিহার্সেলের পর মাঝে একটা দিন, তার পরেই শ্রীপঞ্চমী-বাসর—রাজবাটীতে নূতন পালার উদ্বোধন উৎসব। ফুল রিহার্সেলের পরদিনে ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটিগুলো শোধরাবার ব্যবস্থা হয়েছে। একখানা কাগজে সীতা সেগুলো টুকে রেখেছিল।

কাজ শেষ হলে মৃগেন বলল: আজ একটু সকাল সকাল পালাই, একটা মাস ধরে এক নাগাড়ে খাটুনি গেছে—কাল একবারে রাজবাড়ীতেই হাজির হচ্ছি।

রাজবাড়ী থেকে বউরাণী, সীতা, অশোক চৌধুরী এবং নব নাট্যকার মৃগেন রায়—বিশেষ ভাবেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বউরাণী বললেন: তাহলে বাসা থেকেই আপনাকে যাতে রাজবাড়ীতে নিয়ে যায়, তারই ব্যবস্থা করা যাবে।

মৃগেনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বউরাণী বাড়ীর গাড়ী পাঠিয়ে তাকে রিহার্সালে আনাতেন, গাড়ী করেই পৌঁছে দিতেন। তার আপত্তি শুনে হাসিমুখে বলতেন: আপনি আমার দলের 'অথার'—আপনার মানে আমাদের মান। আমরা গাড়ী চড়ে বেড়াব আর আপনি পায়ে হেঁটে ট্যাংওস্ ট্যাংওস করতে করতে আসবেন—সে কি কখনো হয়? তা ছাড়া, দশ জনে যাঁদের নাম শুনলেই দেখতে চায়, তাঁদের উচিত নয় এমন সস্তা হওয়া।

ফুল রিহার্সেলের পরদিন খুঁটিনাটি কাজগুলি সব দেখে এবং পরদিনের সম্বন্ধে কথা স্থির করে মৃগেন বউরাণীর গাড়ীতে বাসায় ফিরছিল, তার পর বাড়ীর কাছেই চৌমাথার মোড়ে সেই বিভ্রাট—কেষ্টোর প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিত ভাবে মূর্ছিত পীতাম্বরের সংগে তার সাক্ষাৎ ঘটে।

গাঁয়ের লোক কেষ্টো যখন তার স্বভাবসিদ্ধ ধরণে মূর্ছাহত অপরিচিত মানুষটির শুশ্রূষায় মেতে ওঠে, স্থানীয় লোকগুলি তাতে বিস্মিতও হয়নি—আর এমন বৈচিত্র্যও কিছু দেখেনি—যাতে চিত্তে কোন রকম চাঞ্চল্য জাগে। কিন্তু ধনবতী বউরাণীর দলের 'পালা-লিখিয়ে' যাঁর নতুন পালা খুব ঘটা করে স্থানীয় রাজবাটীর পূজার আসরে খোলা হবে—সেই সম্মানী মানুষটিকেও জুড়ী-গাড়ী থেকে নেমে পথশায়ী আতুর মানুষটির সেবায় একেবারে ভেঙে পড়তে দেখে যেন তারা আকাশ থেকে পড়ল—এত বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝি এই প্রথম তারা প্রত্যক্ষ করল। ফলে, মৃগেনের দেখাদেখি, যে সংকোচটুকুর জন্যে এতক্ষণ তারা নির্লিপ্ত ছিল, এখন তার আবেষ্টন কাটিয়ে সকলেই হামরাই হয়ে ছুটে এল; এমন একটা দরদের ভাব প্রত্যেকের ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পথশায়ী আতুর মানুষটির সেবায় কোন রকম অংশ গ্রহণ করতে পারলেই যেন বর্তে যায়—কৃতার্থ হয়।

সুতরাং এতগুলি উৎসাহী লোকের সাহায্যে পীতাম্বরকে বাসায় নিয়ে যাওয়ায় মৃগেন ও কেষ্টোর পক্ষে এর পর আর কঠিন হোল না। অবশিষ্ট দিন ও সমস্ত রাত ধরেই পীতাম্বরের চিকিৎসা চলল তখন যত দূর সম্ভব ঘটা করে। নাম করা ডাক্তারকে ডেকে আনা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থা সব কিছুই সুশৃংখলে চলল। ছোটাছুটিতে কেষ্টোর জুড়ী নেই, কাজেই এ বিপদে তাকে পেয়ে মৃগেন যেন বর্তে গেল। রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারেও কেষ্টো ওস্তাদ ছেলে, সে যত দূর সম্ভব মৃগেনকে রেহাই দিয়ে নিজেই একা রোগীর সেবায় লেগে পড়তে চায়। মৃগেনকে বলল: আপনি সুখী মানুষ, চেহারা দেখেই ত বুঝি; রোগী নিয়ে রাত জাগা আপনার পোষাবে না। তার চেয়ে আপনি বরং ঘুমান গিয়ে, আমি ওঁকে নিয়ে রাত কাটাই—আমার অভ্যেস আছে।

মৃগেন বলল: আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি ভাই—তুমি একা রোগী নিয়ে পড়ে থাকবে! একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে, দু'জনেই জাগবো—কষ্ট গায়ে লাগবে না।

ডাক্তার দেখে বলে গেলেন: শরীরের ওপর খুব কষ্ট গেছে, তাতেই ভেঙে পড়েছেন, তার ওপর বয়েস হয়েছে। বলকারক ঔষধ ও পথ্য চাই—গোটা কয় মিক্স ইনজেকসান দিতে হবে, তাহলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

রিহার্সেলের মুখে বউরাণী জোর করে মৃগেনের হাতে শ'পাঁচেক টাকা দিয়েছিলেন। বাসার খরচ-পত্র বউরাণীর সেরেস্তা থেকেই নির্বাহ হয়—কাজেই সে টাকায় মৃগেনকে হাত দিতে হয়নি, এখন সেটা কাজে লাগে। মৃগেন যেন কৃতার্থ হয়ে ভাবে—তার প্রথম উপার্জনের টাকা সত্যি করে সার্থক হয়েছে, সেই সংগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানা হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

পরদিন বহু প্রত্যাশিত নাটকের অভিনয়-বাসর। কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যেও পীতাম্বরের সংজ্ঞা নেই। মধ্যে এক একবার যদিও চোখ মেলে চান, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন নিষ্প্রাণ। মৃগেন বার বার তাঁকে ডেকেছে, নিজের নাম বলেছে, কিন্তু কোন সাড়া পায়নি।

সকালে ডাক্তার এসে রোগীকে দেখে চমকে উঠলেন; বুঝলেন, তাঁর ইনজেকসনে কোন কাজ হয়নি রোগী সেই ভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। তিনি এবার নিজেই সন্ধান করে ইনজেকসনের ওষুধ-পত্র আনলেন। তাঁর নির্দেশে সহরের আর এক জন নামী ডাক্তারকে আনানো হোল—দু'জনের সংযোগে নতুন উদ্যমে চিকিৎসা চলতে লাগলো।

বউরাণীর দলে এবং রাজবাড়ীতে সারা দিন ধরে উদ্যোগ'

আয়োজন চলেছে। রাত দশটার পর অভিনয় সুরু হবে। কিন্তু মৃগেনের এখন তার সম্বন্ধে চিন্তারও অবসর নেই। দু'টি লোকই একই ভাবে রোগীর শিয়রে ব'সে—পালা করে উভয়ের স্নানাহার চলে।

রাত্রি আটটার সময় বউরাণীর গাড়ী এসে বাসার দেউড়ীতে থামল। মৃগেন উৎকর্ণ হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে কোচোয়ানকে বলল: তুমি গাড়ী নিয়ে যাও, আমি ঠিক সময় নিজেই যাব, তোমাকে আর আসতে হবে না। জিজ্ঞাসা করে মৃগেন জানল যে, দলের সকলেই রাজবাড়ীতে চলে গেছে।

পীতাম্বরের শয্যায় বসে মৃগেন ভাবতে থাকে—তাকে নিয়ে ভাগ্যদেবীর এ কি বিচিত্র খেলা চলেছে! তার বড় সাধের বই আজ হাজার লোকের সামনে রূপবন্ত হয়ে জেগে উঠবে। হাজার লোকের রসনা তাকে নিয়ে আলোচনা করবে, হাজার লোকের চক্ষু-কর্ণ তার সৃষ্ট জীবগুলির রূপ ও বাণী উপভোগ করবে, আর সে মূকের মত এইখানে বসে কল্পনার বস্তুকে কল্পনাই করবে। অথচ এই দিনটির দিকে দৃষ্টি রেখে কত আশাই করেছিল।

কেষ্টো বলল: মৃগেন দা, আমি বলছি আপনি রাজবাড়ীতে যান, সেখানে আপনি কত মান পাবেন—মহারাজা আপনাকে হয়ত পাশে বসিয়ে খাতির করবেন—এমন সুবিধে আপনি ছাড়বেন না। আমি থাকতে এঁর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটিই হবে না তা-ও বলে রাখছি।

কিন্তু মৃগেন একবারে অটল। তার সেই একই কথা: তা হয় না ভাই, জানছি, জীবনের একটা মাহেন্দ্রযোগ আজ—যাবার জন্যে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু এ লোভ আমাকে কাটাতেই হবে। একসঙ্গে দু'টো সাধ পুরাণো যায় না। এঁকে বাঁচিয়ে তোলাই আমার আজকের একান্ত সাধ, কাজেই ওদিককার সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ না করলে এ সাধ ত ভগবান পূর্ণ করবেন না ভাই! আমাদের যাত্রা আজ এখানেই।

আশ্চর্য! এই রাত্রেই ভোরের দিকে পীতাম্বর যখন তার দীর্ঘায়ত দু'টি চোখ মেলে তাকাল' একটানা কয়েক ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে কেষ্টো তখন মৃগেনের পীড়াপীড়িতে সবে মাত্র গড়াতে গেছে; রোগীর মাথার কাছে একখানা কেদারায় বসে মৃগেন তাঁর রোগশীর্ণ মুখখানার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে; নূতন বই, তার অভিনয়, খ্যাতি, নিন্দা—এ সব চিন্তার কোন বালাই আজ নেই, সব কিছু আচ্ছন্ন করে ভেসে উঠছে একখানা মুখ—শুধু একখানা অপরূপ মুখ। রোগীর মুখের সংগে সেই মুখের সাদৃশ্য কোন অংশে—চোখ, নাক, ভুরু, চিবুক—কোনটি আগেই বাঁ করে সেই মুখখানি মনে করিয়ে দেয়, সেই চিন্তাই এখন মৃগেনের সমস্ত মনটিকে ঘিরে রেখেছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে আর মনে মনে মিলাচ্ছে মৃগেন, এমন সময় রোগীর চোখের মুদ্রিত পাতাগুলি সহসা খুলে গেল—উভয়ের চোখে চোখে হোল সংযোগ। পরক্ষণে কেঁপে উঠল দু'টি শীর্ণ ঠোঁট, শুষ্ক কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল অতি ক্ষীণ স্বর: মৃগেন!

উল্লাসের সুরে মৃগেন বলল: হ্যাঁ অধিকারী মশাই, আমি মৃগেন।

মৃগেন লক্ষ্য করল, পীতাম্বরের দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন, অশ্রুর আবর্তে স্বর রুদ্ধ হয়েছে। তাড়াতাড়ি শিশি থেকে ঔষধ ঢেলে মৃগেন রোগীকে পান করাল, তার পর তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছাতে মুছাতে বলল: কি কষ্ট আপনার হোচ্ছে? ক'দিন ত কথাই বলতে পারেননি—আমরা কেবল অনুভব-চিকিৎসাই করে চলেছি।

আস্তে-আস্তে টেনে-টেনে পীতাম্বর বললেন: না বাবা, এখন আর কোন কষ্ট নেই। আমি একটা চৌমাথার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই মনে আছে। তুমি কি সেখানে ছিলে, বাবা? তার পর…

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলেই বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। মৃগেন তখনি উঠে তাঁর বুকে একটা মালিশ লাগিয়ে আস্তে-আস্তে ডলতে লাগল; সেই অবস্থায় বলল: আপনি এখন কথা বলবেন না অধিকারী মহাশয়, একটু বল পান আগে—তার পর সব কথা হবে।

মৃগেনের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে পীতাম্বর মৃদু স্বরে বললেন: বেশ।

মৃগেন বুঝল, কথা বলবার ও শোনবার একান্ত ইচ্ছা সত্বেও পীতাম্বরের কণ্ঠ তখন নিস্তেজ, স্বর বেরুচ্ছে না।

পরক্ষণেই তাঁর চোখের পাতাগুলি আবার জুড়ে গেল। কেষ্টো এই সময় সদ্য-ধৌত চোখ দু'টি মুছতে মুছতে এসে বলল: একটা ঘুম দিয়ে এলুম দাদা, এবার আপনি গিয়ে একটু গড়িয়ে নিন। তার পর, জ্ঞানটান কিছু হয়েছে কি—চোখ কি মেলেছেন?

মৃগেন বলল: হ্যাঁ, একটু আগেই চেয়েছিলেন, দু'-একটা কথাও বলেছেন। তার পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

কেষ্টোকে মৃগেন পীতাম্বরের সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানিয়েছে মাত্র—তারই গ্রামের লোক, স্বজাতি, সম্পর্কে গুরুজন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে—বউরাণীর যাত্রার দলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে, এ কথা যেন কেষ্টোর কাছ থেকে কিছুতেই পীতাম্বর না জানতে পারেন।

কেষ্টো উত্তর করে: আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরদারীতে কি দরকার দাদা! সেরে না ওঠা পর্যন্তই ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—উনি উঠে বসলেই আমি সরে পড়ব।

পরদিন সকালে পীতাম্বরকে বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ দেখা গেল। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন: সেরে গেছেন—আর চিন্তা নেই। এখন পথ্যই ভরসা।

মৃগেন তাঁর পথ্যের কোন ত্রুটিই রাখেনি। ডাক্তারের নির্দেশ মত প্রত্যেক জিনিষটি—তা সে যত ব্যয়সাধ্যই হোক, সংগ্রহ করে রোগীকেও অবাক করে দিয়েছে। প্রাতরাশের পর মৃগেনকে ডেকে পীতাম্বর বললেন: এ সব কি ব্যাপার বাবা? রাজারাজড়ার মত আমার চিকিৎসে চালিয়েছ যে! চোখেও যে সব ফল-পাকুড় দেখিনি, আমার জন্যে জড়ো করছ। আমি যে কিছু ভেবে পাচ্ছিনে বাবা, জিজ্ঞাসা করতেও জিভ্ সরছে না যে! কি করে তুমি এ সব……

বৃদ্ধের কথা এখানেই বন্ধ হয়ে গেল, আর বলতে পারলেন না। অবিশ্যি, যে ছেলেটিকে তিনি বেকার বলেই জানেন, তাকে দরাজ হাতে তাঁর জন্যে এত খরচ-পত্র করতে দেখে তিনি মনে মনে ভারি একটা অশান্তি বোধ করছিলেন। তার পর, ইমারতের মধ্যে বাসা ঘর, তার দামী সাজ-সজ্জা, আসবাব-পত্র, চাকর, পাচক—এ সব দেখে তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না—তাঁদের সেই মৃগেন এত ঐশ্বর্য কোথা থেকে পেল।

পীতাম্বরের মনের অবস্থা মনে মনে উপলব্ধি করে মৃগেনই তাঁর সংশয়টা কাটিয়ে দিল। বেশ একটু ভণিতা করেই সে জানাল—তার এক বন্ধুর এই বাড়ী; মৃগেন তাঁর কাছে ধন্বন্তরীর কাজ শিখছে।

তিনি একটা বড় অর্ডার পেয়ে বাইরে গেছেন। অতিথি-সজ্জন কিম্বা আতুর রোগীর ওপর তাঁর ভারি দরদ—তাঁদের জন্যে খরচের ঢালাও ব্যবস্থা। যেমন তিনি নেবার উপায় করেন, তেমনি দরাজ হাতে ব্যয় করতেও জানেন। কাজেই আপনার কুণ্ঠার কোন কারণ নেই।

পীতাম্বর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মৃগেনের কথাগুলি শুনেই যান—কিন্তু মনের মধ্যে তবুও কেমন যেন একটা খটকা লাগে। বন্ধুর টাকায় মৃগেনের খরচ-পত্রের এত বাড়াবাড়ি তাঁর দুর্বল চিত্তটি রীতিমত নাড়া দিতে থাকে।

একটু বেলা হতেই কেষ্টো বাজার থেকে ঘুরে এসে মৃগেনকে আড়ালে ডেকে বলল: দাদা, আপনার পালার যশে সারা সহর ভরে গেছে, লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। কলকাতার থিয়েটারকেও না কি হার মানিয়ে দিয়েছে।

মৃগেন কেষ্টোকে কথা দিয়েছে, পূজার হিড়িকটা কেটে গেলেই সে তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বউরাণীর দলে ঢুকিয়ে দেবে এবং ব'লে-ক'য়ে একটা মাইনের বন্দোবস্তও গোড়া থেকে যাতে হয়—তার ব্যবস্থাও করবে। সেই আশায় কেষ্টো এখন থেকেই এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যে, তার কাছে কিছুই যেন আর অসাধ্য বা দুর্বোধ্য নয়। মৃগেনের জন্যে এখন সে সব কিছুই করতে সমর্থ।

দুপুরের সময় বউরাণীর চিঠি নিয়ে এক পাইক এসে উপস্থিত। কম্পিত হাতে মৃগেন খামখানি খুলে চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করল। বউরাণী লিখেছেন: যাত্রার আসরে ভীড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন—দেখতে পেলাম না ত। সীতা বলে—পালার সুখ্যাতি শুনে লজ্জায় না কি লুকিয়েছিলেন। আপনার 'মানের' টাকাও নেননি শুনলাম। ম্যানেজার বাবু বললেন যে, আপনাকে না কি খুঁজেই পাননি তিনি। বাসায় ফিরলেন কখন? রাত জেগে ঘুমাচ্ছেন ভেবে সকালে আর গাড়ী পাঠাইনি—বিকেলে গাড়ী যাবে, অবিশ্যি আসবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা—সীতারা আজ এগারোটার ট্রেণে কলকাতায় গেলো। আপনার জন্যে না কি একটা সম্বর্দ্ধনা-সভা করবে ওরা—তাই দেখে-শুনে কিছু কেনা-কাটি করবার ইচ্ছা আর কি। তা ছাড়া, ওর মেস থেকেও নেমন্তন্নের চিঠি এসেছে—কোন্ এক বন্ধুর বিয়ে। কাজেই ফিরতে দু'-চার দিন দেরী হতে পারে।

বাহকের হাতেই মৃগেন চিঠিখানার এই মর্মে এক জবাব লিখল: আমার এক আত্মীয় এখানে মেলা দেখতে এসে অসুখে পড়েছেন, সে জন্য খুবই ব্যস্ত আছি। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। কাজেই দু-এক দিন বেরুতে পারব না, তার জন্যে ক্ষমা করবেন। তিনি একটু সামলালেই গিয়ে দেখা করব—আপাতত গাড়ী পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

সীতারা যে এ সময় সহসা কলকাতায় গেছেন—এ সংবাদে মৃগেন আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। সীতার ভয়েই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল—যদি হঠাৎ দমকা বাতাসের মত এই বাসায় এসে একটা অশোভন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বসে। নিজের ভাগ্যোদয়ের কথা সে যেমন পীতাম্বরের কাছে ব্যক্ত করতে নারাজ, পীতাম্বরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটাও সীতাদের কাছে প্রচ্ছন্ন রাখাই তার অভিপ্রায়। এ অবস্থায় সীতাদের কলিকাতা-যাত্রার সংবাদে নিরুদ্বেগ হওয়াই স্বাভাবিক।

৩৩

দিন কয়েকের মধ্যেই পীতাম্বর সুস্থ হয়ে উঠলেন, দেহে বলও পেলেন।

মৃগেন এ পর্যন্ত তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেনি—কোথায় এত দিন ছিলেন, কি করছিলেন, এখানেই বা কেন এসেছিলেন—এগুলি জানবার জন্যে স্বভাবতই কৌতূহল জাগ্রত হবার কথা, আর কথা-প্রসংগে জিজ্ঞাসা করাও উচিত, কিন্তু মৃগেন ছেলেটি এত চাপা এবং কৌতূহল দমন করতে এমনি অভ্যস্ত যে, প্রশ্নগুলি একবারেই এড়িয়ে গেল। কেবল পীতাম্বরই কথার পীঠে অসংলগ্ন ভাবে তাঁর পণ্ডশ্রম সম্বন্ধে যে দু'-চারটে কথা বলেছেন—তাই শুনেছে এ পর্য্যন্ত।

—জানো বাবাজী, কালটা হচ্ছে কলি; মানুষের মতি-গতি পালটে গেছে, মুখের কথার দাম আর নেই। এই দেখ না—পরেশ পাল কত আশা দিয়ে নিয়ে গেলো, দেশ-ভুঁই ঘর-সংসার ফেলে ছুটে গেলুম তার কথায় ভুলে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কি না বিল্বপত্র শুঁকিয়ে বিদেয় দিলে। এই হোল কালের ধর্ম। কিন্তু আমি তোমার বন্ধুর কথা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি নে—ভাবি, সত্য যুগের লোক এ যুগে এলো কি ক'রে।

মৃগেন শুধু মুখ বুজিয়ে শোনে, কোন কথাই বলে না—কোন প্রশ্নও তোলে না।

পীতাম্বর ভেবেছিলেন, মৃগেন হয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করবে, জানতে চাইবে, তিনিও তখন একটি একটি করে সব বলবেন। কিন্তু মৃগেনকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও গম্ভীর দেখে তিনিও শেষে মুখ বুজাতে বাধ্য হন, সেই সঙ্গে মনটিও ভার হয়ে ওঠে।

মৃগেন ইতিমধ্যে বউরাণীর সংগে দেখা করেছে, তাঁকে কেষ্টোর কথা বলে তাঁর দলে ঢুকিয়েও দিয়েছে। এ সব ব্যাপারে বউরাণীর সহৃদয়তার অন্ত নেই। বিশেষ করে, দলের ম্যানেজারের ওপর মৃগেনের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁর সিদ্ধান্তে কেষ্টোর সম্বন্ধে যে বেতন সাব্যস্ত হয়—কেষ্টোই তা শুনে চমকে ওঠে।

পীতাম্বরের গায়ের মাপে মৃগেন একটা দামী ফ্লানেলের জামা এনে দেয়—সেই নরম ও গরম জামাটি গায়ে দিয়ে পীতাম্বর বড় আরামই পেয়েছেন। মৃগেনের সামনে তা ছাড়া মনে মনে কত আশীর্বাদই করেন। এখন তাঁর মনে সাধ জেগেছে—মৃগেনকে সংগে করেই দেশে যাবেন, আর একটু বল দেহে এলেই হয়। তবে কথাটা এখনো মৃগেনকে বলা হয়নি।

সেদিন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মায়ার একখানা চিঠির কথা। চিঠিতে মায়া যেন মৃগেনের সম্বন্ধে কি লিখেছিল—কাজ করতে করতেই সে চিঠি তিনি পড়েছিলেন, সব কথা মনেই আসে না। চিঠিখানা তাঁর জামার পকেটেই ছিল। মলিন জামাটি ছাতির সঙ্গে জড়িয়ে তিনি এই ঘরের একটা কোণেই রেখেছিলেন। কি মনে করে সেটি খুলে চিঠিখানা বার করলেন।

মায়ার চিঠি—ডাকে পেয়েছিলেন তিনি, পরেশ পালের আট-চালায় যখন তিনি ঠাকুর গড়া নিয়ে ডুবেছিলেন। খাম থেকে খুলে চিঠিখানি আজ আবার পড়তে বসলেন। কিন্তু মায়ের কথাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল, বুকের ভিতরটা টন-টন করে উঠল, তিনি আবার পড়তে লাগলেন:

মৃগেনের সংগে আমার বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্ত পাবণ্ড কানাই সেদিন তালের বড়া লইয়া যে কাণ্ড বাধাইল তাহা আমার বুকে বিষের কাঁটার মতন বিঁধিয়া আছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, মৃগেন ব্রশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া চলিয়া গেলেন। যদি তাহার সহিত দেখা হয় কানায়ের বদমাইসির কথা যাহা উপরে লিখিয়াছি সব বলিও। আর······

পীতাম্বর আর পড়তে পারলেন না, তাঁর মাথার ভিতর তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। চিঠিখানা খামে ভরে পকেটে রেখে তিনি উঠে পড়লেন। কানাইকে উদ্দেশ করে খানিকটা খুব ঝাল ঝাড়লেন—শাপ-মন্যিও দিলেন, মাথার ঝাঁঝ বুঝি তাতে কিছু থামল। তার পর আপন মনে বলতে লাগলেন: আহাম্মখ আমার মত আর দু'টো নেই—কথাগুলো মেগাকে বলতেই ভুলে গেছি, চিঠিখানা দেখালেই ত' সব গোল চুকে যেত। এখন বুঝছি কেন সে সর্বক্ষণ মুখ ভার করে থাকে—কিছুই শুধোয় না। সে ফিরলেই এই চিঠি তাকে দেখাব—তখন বাবাজী বুঝবেন, কার ওপর অভিমান করে মিছিমিছি চলে এসেছেন। তবে এও বলি, ঈশ্বর যা করেন—ভালর জন্তেই করেন; দেশ ছেড়ে এসে মৃগেন ত সুখের মুখ দেখেছেন—একটা হিল্লে তার হয়েছে। যাই হোক, আজই তার ভুল ভেঙে দেব; তার পর তাকে সংগে করে দেশে গিয়ে ঐ কানাই হারামজাদার হেরাদ্দ পাকাব আগে—দেখাব বাছাধনকে কত ধানে কত চাল।

তখনও বেলা রয়েছে—বৈকালি-সূর্যের পাটে বসবার সময় হয়ে এসেছে। কি একটা কাজে অপরাহ্ণের অনেকটা আগেই মৃগেন বাইরে বেরিয়েছে। কিন্তু ঘরে বসে তার ফেরার প্রতীক্ষা করার মত ধৈর্যও বুঝি হারালেন পীতাম্বর, পায়ে পায়ে উপর থেকে নেমে নিচের তলায় এলেন, তার পর কি ভেবে ফটক দিয়ে রাস্তায় বেরুলেন। বাড়ীর কাছেই চৌমাথা—মেলার জের তখনও চলেছে, কত রকমের কত মানুষ চলেছে পথে। রাস্তাটি দেখে ঝাঁ করে মনে পড়ল সে দিনের কথা—অনাথার মত এইখানেই এসে পড়ে গিয়েছিলেন না? চিঠির বিবর-বস্তুর কথা আবার মনের তলে তলিয়ে গেল, হঠাৎ একটা মানুষের মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে মনটি তাঁর কৌতূহলী হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠির সামন্ত না? হ্যাঁ—সেই ত। পরেশ পালের আটচালায় এসে আড্ডা জমাত, তার কারিগরির সুখ্যাতি মুখে যেন ধরত না। পায়ের গতি দ্রুত করে পীতাম্বর এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্তে।

দু'জনে চোখোচোখী হতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল যুধিষ্ঠির। এক গাল হেসে বলল: আরে, অধিকারী মশাই যে! বড় ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল!

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন: এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল সামন্ত গো?

যুধিষ্ঠির বলল: কেষ্টনগরে মেলা দেখতে এসেছিনু গো। রাজবাড়ীতে যাত্রা শুনলু, কি গাওনাই গাইলে—এমন জবর পালা কখনো শুনিনি। হ্যাঁ, আপনি শোনেননি বুঝি অধিকারী—পিরতিমে-গুলো পালের-পো-ই কারসাজি করে সরিয়েছিল, কিন্তু পাপের মুক্তিকেয় মা ভয় করবেন কেন—তাই না বড় ভুলে ভরা ডুবিয়ে দিলেন। তোমার শ্রমও মিছে হোল, আর পরেশের ও-কূল ও-কূ দু'-কূল গেলো! কলি হলেও ধম্ম এখনো আছেন, বুঝলে অধিকারী?

পীতাম্বর স্তব্ধ-বিস্ময়ে এই কাহিনী শুনলেন—মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না—শুধু জোরে একটা নিশ্বাস পড়ল।

যুধিষ্ঠির বলল: এখন হয়েছে কি, তোমার এই নিশ্বাস, পালের-পোকে শেষ করে তবে ছাড়বে। হাঁ, ভাল কথা গো, যে দিন গেরাম থেকে বেরুচ্ছি, পিওন একখানা চিঠি আনে—তোমার নামের চিঠি গো! তুমি চলে গেছ, আর আমিও সদরে আসছি শুনে—চিঠিখানা আমার হাতেই দেয়। তোমার নামের চিঠি বরাবর আমার কাছেই দিত কি না! ভাগ্যিস্ এনেছিলুম চিঠিখানা—এই নাও।

পকেট থেকে খামে ভরা এক খানা পুরু চিঠি বা'র করে যুধিষ্ঠির পীতাম্বরের দিকে এগিয়ে দিল। খামের ওপরে পাকা হরফে পীতাম্বরের নাম লেখা। কিন্তু হস্তাক্ষর অপরিচিত—অন্তত মায়ার কাছ থেকে চিঠিখানা যে আসেনি, শিরোনামার লেখা দেখেই পীতাম্বর সেটা বুঝতে পারল। একবার চোখের সামনে ধরেই চিঠিখানা সে মুষ্টিবদ্ধ করল।

যুধিষ্ঠির আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল: কবে এখানে এসেছ, কোথায় আছ, কি করা হচ্ছে—এই সব। পীতাম্বর ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে শেষটা জানাল: আমার আর থাকা না থাকা সমান কথাই সামন্ত! পালের-পো যে ঘা'টা দিয়েছে সামলাতে পারিনি আজও।

এর পর বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির ষ্টেশনের দিকে রওনা হোল। পীতাম্বর চিঠিখানা নিয়ে বাসায় ফিরে এল।

উপরের ঘরে ঢুকেই পীতাম্বর চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘ চিঠি, বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই প্রেরক লিখেছে। পড়তে পড়তে পীতাম্বরের মাথা আবার গরম হয়ে উঠল। চিঠিখানা লিখেছে—সারদার ভাই এবং তার মহাজনীর বেনামদার নবীন সমদ্দার। চিঠির প্রথম ভাগটা টাকার তাগাদায় ভরা—বাধ্য হয়েই তাকে নালিশ করতে হয়েছে, অথচ এর কোন প্রয়োজনই ছিল না, অধিকারী যদি অবুঝ না হয়ে মায়াকে তার ভাগনে কানায়ের হাতে সঁপে দিতেন! তার পরেই মৃগেনের প্রসংগটা ফেনিয়ে এমন কায়দায় বানিয়ে বুনিয়ে লিখেছে যে প্রত্যয় না করে পারা যায় না। কি ভাবে এক যাত্রার আসরে খেমটাউলির সংগে তার ভাব হয়, তার পর তারই আঁচল ধরে সরে পড়ে, তার পর ষ্টেশনে হঠাৎ সমদ্দারের সংগে কি প্রকারে দেখা হয়ে যায়, আর তার টাকায় তারই ঘাড়ে চেপে লক্কা পায়রা সেজে বেড়াচ্ছে—দক্ষ কথা-শিল্পীর মত ভণিতা করে মাথা খেলিয়ে পাকা হাতে এমন করে চিঠির কাগজে কালের হরফে ফুটিয়েছে যে—পড়তে পড়তে পাঠকের মনেও তার সুস্পষ্ট ছাপ না উঠে পারে না।

একে ত' পীতাম্বর অধিকারী সাংঘাতিক রকমের রগচটা মানুষ, তার ওপরে চারিত্রিক নিষ্ঠার দিক দিয়ে তাঁর মত নির্দোষ মানুষ খুবই কম দেখা যায়; শুধু তাই নয়—তাঁর মতে চরিত্রহীনের ছায়া মাড়ানোও গুরুতর অধর্ম। সেই ব্যক্তির সম্মুখে এমন লোকের বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার এই গুরুতর অভিযোগ—জীবনের চরম সংকট-কালে যার আশ্রয়ে থেকেই তাঁকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে! অমনি তাঁর মস্তিষ্কে পুনরায় বিষের দাহ উপস্থিত হোল—যে মৃগেন তাঁকে

রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজার হালে আশ্রয় দিয়েছে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা করিয়েছে, যার জন্যে আজও তিনি বেঁচে আছেন—তার বিরুদ্ধে এ কি বিশ্রী অভিযোগ। সে একটা ফুলটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, তবে এই ঐশ্বর্য সব সেই···

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বাইরে ফটকের দিকে। ঘরের জানালা দিয়ে এই সময় তিনি দেখতে পেলেন—মৃগেন বাড়ীতে ঢুকছে, বাইরে একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। টাঙ্গা থেকে নেমে সে তার ভাড়া দিচ্ছে।

পীতাম্বর স্থির করিলেন, মৃগেন এলেই চিঠিখানা তাকে দেবেন, সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা এখনি হয়ে যাবে।

কিন্তু নিয়তির বিচিত্র লীলা—ঘটনাচক্রে পরক্ষণে আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে আবার সব ওলট-পালট করে দিল।

টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে মৃগেন উঠানে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে এমন সময় দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল বউরাণীর জুড়ী, গাড়ী থামতেই সহিস দরজা খুলে দিল, তার পরই রূপের আলোকে স্থানটি ঝলসিত করে নেমে এল সীতা। গাড়ীর শব্দে মৃগেনও তখন ফিরেছে, চোখোচোখী হতেই জিজ্ঞাসা করল: কখন এলেন?

সীতা বলল: বেশ মানুষ আপনি, দেখাই নেই। শীগ্‌গির আসুন, জরুরী কথা আছে—আপনাকে নিতেই এসেছি।

মৃগেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বলবার কোন অবসর না দিয়েই সীতা এগিয়ে এসে তার হাতখানা ধরে সহাস্যে বলল: প্লীকটি নট—লক্ষ্মী ছেলের মতন চলে আসুন, মস্ত খবর আছে।

এক রকম জোর করেই সীতা মৃগেনকে টেনে এনে গাড়ীতে তুলল—তার পরই তেজস্বী দুই ঘোড়া রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটল।

কিন্তু এদিকে—উপরের ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দু'টো পাকিয়ে এক ব্যক্তি যে এই দৃশ্যটি লক্ষ্য করছিল, সে দিকে কারো নজর পড়ল না!

[ক্রমশঃ।

সুধার খাণ্ডগীর

"যদা যদা হি ধর্মস্য"

লোকনাথ ভট্টাচার্য

দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত মিথ্যার মেঘ
আকাশে ছড়ায় কত মেকি রূপো-সোনা
কত লাল কত নীল কুহকের ফেনা—
চেয়ে চেয়ে দেখি আর দিন কেটে যায় ;
আমার শ্রান্ত চোখ পল্লবছায়
কখন্ দিনের শেষে সন্ধ্যা নামায়
ধূসর হাওয়ায়।

বাস্তবের রূঢ় বানে তবু ক্ষণে ক্ষণে ভাঙে
আমার এই বাঁধ
কেঁপে কেঁপে ওঠে এই সখের আবাদ ;
যেন দূর দুরান্তের বায়ুভাবী দিগন্তের
আচমকা নিশ্বাস
অকস্মাৎ বয়ে আনে কোথাকার মানুষের
অনাত্মীয় আর্তনাদ
অসহায় সকরুণ,
নির্ঝর এ-নীলার ফেনায় ফেনায় তোলে
প্রলয় দারুণ।
সে এক ভীষণ ভাষা শাণিত কোলাহল
বস্তুহীন কল্পনার মসৃণ জগতে আনে
বাস্তবের হলাহল।
আমি তো মানি নে তার সভ্যতার গর্ব
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি
কত বড় মিথ্যা তাকে করেছে অথব
গতিহীন স্থাণুর নেশায়,
তার নবজন্ম চেয়ে
কত লক্ষ ব্যর্থ উষা ফিরে ফিরে যায় ;
তবু কী অহংকার !
কত কত ছায়াবাজী আকাশে-বাতাসে তার
চকিত তড়িত-রাগে কাঁপায় বন-আঁধার।
আসলে বালুর চাষ শূন্য খামার—
সে কথা বোঝাই কাকে।
(মূর্খের আদালতে এমনি বিচার)
তবু এ কী চাতুরী—
দুর্বল চোখের কাছে ভেল্কি দেখিয়ে-কেনা
সস্তা বাহাদুরি !
আমাকেও দোষী করে 'অবাস্তব' ব'লে
নিজেদের সভ্যতায় নিঃসন্দেহ জুরি।

তাতে কিছু ক্ষুণ্ণ নই—আমি শুধু ভাবি
এ-দীর্ঘ অনুচ্ছেদের ছেদ নামে কবে
ওদের মদের পাত্র কবে শূন্য হবে !
সশস্ত্র বেচারা ওরা মরে পলে পলে
মরে লাখে লাখে—নিজেদের মারে—
সভ্যতার কিংখাবে ঢেকে আপন গলিত কুষ্ঠ
ছলে আপনারে।
ওদের পঙ্গু চরণ ওদের শাসায়—
তবু চলে যেতে হবে মিথ্যা মায়ায়
তবু খুন কোরে যাবে নিজেদের দেহ
নিজেদেরি ছোরা।
('ওরা যে পারে না আর—
বুঝতে অবুঝ ওরা)
কিছুই করার নেই—লক্ষ লোকের মাঝে
আমার প্রশ্ন শোনে—এমন কে আছে !
আমি তাই ব'সে আছি ঠুঁটো জগন্নাথ
দেখি দিন-রাত
গতায়ু পৃথিবী-পিঠে ধ্বংসের ছায়া।
আমার মায়াবী মেঘ সরে যদি—
ক্ষতি নেই—রাখি নে কো মায়া—
ওরাও তো আকাশের ভেল্কি শুধুই
স্বপ্ন-নামানো এই দুর্বল চোখের পরে
একটি ভঙ্গুর ক্ষণ !
(আজকের পৃথিবীর লোকেরা যেমন)

হাসো আর যা-ই কর পরিহাস কর
আজকের যত সব হে বৃদ্ধ-নাবালক,
তোমায় বলব আমি—তুমি ভুল তুমি ভুল!
ফুলের মাঝারে থেকে কীটকেই
চিনেছো তুমি,
চেনোনি কো ফুল !
অগাধ অবাধ ভিড়ে শুঁড়ির দোকান
ভরেছো ঠেসেছো আজ,
পরেছো ঠুলি—
বিবশ নেশায় ঐ আধো-চাওয়া চোখ নিয়ে
মিছেই ওড়াতে চাও প্রলয়-ধূলি,
আকাশের চির-নীল ঢাকবে না ওতে।

আমার সোনার ক্ষেতে তোমাদের
নাম-নেওয়া
'মিথ্যা আলোতে'
চিরকাল চিরদিন এম্‌নি রবে !

সে-কথায় কাজ নেই—তোমাদের
কী হবে

তোমাদের মিছিলের দুঃস্থ ধ্বনি
তোমাদের করেনি কো এখনো কাতর ;
এপারের এলাকায় একেলার বীণ
তাতে থরথর—
অনুখণ মূর্ছনায় থাক এ সাধের বীণ
সুর-জর্জর।

এমন তো কত ভাঙে স্বপ্ন-সাধের তন্দ্রা
এমন তো আসে যায় ঊর্মিমুখর সন্ধ্যা
তার যত ঢেউ এসে
আছাড়ি পিছাড়ি খায় আমার জীর্ণ কূলে
তাই ভয়ে উঠি দুলে'
হয়তো বা একদিন এ ভঙ্গুর হাট
দেবে জলাঞ্জলি ঐ প্লাবনের ভরা-পসরায়
মনের বেসাতি ভার—
এর চেয়ে নিদারুণ আর কী আমার ?

তবু আমি আশা রাখি তবু যেন শুনি
দূরাগত বাতাহত কাঁপে কার শঙ্খ
অচেনা উষায় কার বাজে জয়ডঙ্ক !
তবু যেন দেখি
কে মহান্ গরীয়ান্ আসে দণ্ড হাতে—
তারি পূর্বরাগে
আমার সোনার ক্ষেত রঙে রঙে মাতে
উঠে প'ড়ে লেগে যায় ফসল ফলাতে।
তবু যেন স্বাদে বুঝি
চাতকের তৃষ্ণার সহস্র বিন্দু
ভ'রে দিতে আসে কোন্ লক্ষ মরুর পায়।
হে অচিন্ অনাগত
বার বার
তোমারে নমস্কার॥

★

ধূপ

পাঁচুগোপাল বসু

কমলেশ জাগিয়া বসিয়া আছে।

রুগ্না সরমার শিয়রে বসিয়া কমলেশের ঘুম আসিতেছে না। অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, চারি দিক স্তব্ধ, শুধু পাশের কোন একটি বাড়ীর ট্যাঙ্কে অবিরত ধারায় জল পড়ার শব্দ একটানা শুনা যাইতেছে—ঝর-ঝর···ঝর-ঝর···

কমলেশ ভাবিতেছিল—এমন নিঝুম রাত্রে শয্যাশায়িনী প্রিয়তমার পার্শ্বে বসিয়া যাহা স্বাভাবিক তাহাই ভাবিতেছিল সে। অতীত দিনগুলির কথা, হারানো জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার টুকরা টুকরা কাহিনী। এলোমেলো ভাবে মনে আসিতেছিল বটে, কিন্তু রিক্ত প্রাণের বেদনার স্তূপে বেশ পর-পর আসিয়া সাড়া দিতেছিল তাহারা। বেদনাদীর্ণ প্রাণের সহিত স্মৃতির এ খেলা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নাই, যাহা আছে তাহা না থাকিলে বোধ করি কাহারও সংসার চলে না। একটি ছোট চৌকী, একটি আলনায় গুছান কয়েকটি কাপড়-চোপড়, একটি টুলে রাখা এক গ্লাশ জল ও কয়েকটি ওষুধ-পত্র, এক কোণে একটি রং-ওঠা তোরঙ্গ এবং শয্যায় শায়িতা একটি নারী। ঘরের প্রাণ ঐ নারীটিকে দুরন্ত ব্যাধি আজ বোধ করি আসবাবেই পরিণত করিয়াছে। সৌখীনতার মধ্যে মাত্র একটি ধূপদানী রোগীর শিয়রে রাখা। একটি ধূপ আধখানা পুড়িয়া গিয়াছে, এক টুকরা ছাই উড়িয়া সরমার চুলে আসিয়া পড়িয়াছে। কমলেশের দৃষ্টি ঐ ধূপ-মুখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গটির দিকে নিবদ্ধ, এক একবার অন্যমনস্ক ভাবে ধূপনির্গত ধোঁয়ার সূক্ষ্ম রেখার বক্র-গতিকে কিছু দূর অনুসরণ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

খুব সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে জন্মিয়াছিল কমলেশ। বাবা কোন এক মার্চেন্ট আফিসে কেরাণীর কাজ করিত। আরও তিন-চারিটি ভাই-বোনের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই মানুষ হইয়াছিল কমলেশ, লেখাপড়ায় মেধা তার ভালো ছিল না কোন দিন। কোনও রকমে ঘষিয়া মাজিয়া বি-এ পাশ করিয়াছিল সে—যেমন প্রতি বছর হাজারটি ছেলে করিয়া থাকে। তার পর বাবার মৃত্যুর পর তাঁহারই আফিসে কাজে ঢুকিয়াছিল এবং বিনা আড়ম্বরে সরমাকে ঘরে আনিয়া সংসার পাতিয়াছিল।

ধূপের অগ্নিকণা ছাইয়ে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। কমলেশ হাত বাড়াইয়া অল্প একটু নাড়া দিয়া ছাইটুকু ফেলিয়া দিল। আবার অগ্নি কিছু দেখা দিল।

উজ্জ্বল হইয়া উঠিল স্মৃতিপট। মনে পড়িল অজিতকে। বোটানীর প্রফেসর ডক্টর ঘোষের ছেলে অজিত।

দুই জনে তুমুল তর্ক বাধিয়াছে। অজিত বলিতেছে, 'তুমি যাই ব'ল না কেন, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকার সময় নয় এ যুগটা। এটা বিজ্ঞানের যুগ—সুতরাং এখন আমাদের সায়েন্স নিয়ে উঠে-পড়ে লাগা উচিত—ও আর্ট-ফার্ট এখন শিকেয় তুলে রাখ। আর তা ছাড়া, সে সুযোগই বা তুমি পাচ্ছ কোথায়? আর্টের জন্মদাতা হ'ল অবসর আর ধাত্রী হ'ল প্রকৃতি। অবসর ত' তোমার নেই-ই, আর যন্ত্রসভ্যতা ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে ফ্যাক্টরী করে তুলছে—নদী-তীরে বিজনে বিরলে বসে চাঁদের আলোয় যে কবিতা লিখবে সেদিনও থাকবে না। নদী থেকে এখন হাইডো-ইলেক্ট্রিক কারেন্টের ব্যবস্থা করা হবে যাতে চাঁদের আলোর আর কোন দাম থাকবে না—ছবি আঁকবে এমন সুন্দরী মেয়ে তুমি খুঁজে পাবে না—কারণ, নূতন ধরণের টয়লেটের কল্যাণে কুৎসিত আর কেউ থাকবে না—আর তা ছাড়া, তোমার কাছে সিটিং দেবার সময়ই বা তাদের কই? তাদেরও অফিস-আদালত আছে!'

কমলেশ হাসিয়া বলিল, 'তোমার এ কল্পনাই প্রমাণ করছে যে যন্ত্রযুগের মানুষ হয়েও তুমি স্বপ্ন দেখ এবং জেগেই। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা বড় কথা তোমার বিরুদ্ধে বলবার আছে। মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়, একটাও তার ক্ষমতা হারায়নি—কোন দিন হারাবেও না। সুতরাং মানুষের চোখ চিরদিনই সুন্দরকে খুঁজে বেড়াবে, নাক খুঁজবে সুগন্ধ, কাণ সাড়া দেবে সুরে আর মন চাইবে আনন্দ। আর্ট ত ভাই এই ইন্দ্রিয় ক'টিরই আদর্শ ব্যবহারের পরিচয়। সুতরাং আর্টের কদর চিরদিনই থাকবে সমান। তবে হ্যাঁ, যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে এবং তার জন্যে চেঁচামেচি করবার দরকার হবে না, মানুষ আপনিই ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নেবে।'

উত্তেজিত অজিত কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ঘরে আসিল সরমা। দু'হাতে দু'কাপ চা লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল সে। নীরবে অজিত ও কমলেশ যে যাহার কাপ টানিয়া লইল। চায়ে একটি চুমুক দিয়াই কমলেশ সরমার দিকে চাহিয়া কহিল, "চা'টা বুঝি আপনি করেছেন? চমৎকার হয়েছে কিন্তু।'

অজিত হাসিয়া বলিল, 'তুই ডোবালি কমল, ওর প্রশংসা করে যাচ্ছিস ত', ব্যাস, আর ওকে পায় কে এবার। এমনেই আমি না কি খালি ওর নিন্দে করি। সুতরাং এবার ত' আর কথাই রইল না। যদি বা বকে-ঝকে একটু-আধটু শেখাচ্ছিলুম—'

'যাও—যাও দাদা, তুমি বড় বাজে বকো, তুমি ত'সব জানো যে শেখাবে?'

কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সরমার মুখ।

ধূপ নিবিয়া গিয়াছে। কমলেশ আর একটি ধূপ জ্বালাইয়া দিল। সরমার গভীর শ্বাসের শব্দ পাইয়া কমলেশ তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিল—সে পাশ ফিরিয়াছে, কিন্তু ঘুম তাহার ভাঙ্গে নাই। ধূপের ধূম্ররেখা তাহার সুপ্ত মুখের উপর স্বপ্ন ছায়া ফেলিয়া ভাসিয়া চলিল।

সুপ্ত মুখ জাগিয়া উঠিয়াছে।

মৃদু হাসিয়া সরমা আগাইয়া আসিয়া কমলেশের চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল। ঘাড় হেলাইয়া কহিল, 'কি দেখছো বল-ত'?'

আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। কমলেশ হাসিয়া সরমার একটি হাত আপন হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, 'তোমাকে দেখছি রমা। জানো ত' তোমাদের দেখে আশ কোন দিন মেটে না আমাদের?'

'ইস, তা বই কি। সত্যি বল না। শুধু আজ তা' নয়, প্রায়ই দেখেছি তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক আর তখন তোমার মুখ-চোখ যেন অন্য রকম হয়ে যায়—'

'কি রকম হয়, বল ত'?' কমলেশ প্রশ্ন করিল।

'কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব জেগে ওঠে তোমার মুখ-চোখে। অত মন দিয়ে কি দেখ তুমি আমার মুখে, বল না?'

ধীরে ধীরে কমলেশ বলিল, 'জানো সরমা, যখন কলেজে পড়তুম, তখন শখ করে কয়েক দিন ছবি আঁকা শিখেছিলুম। শিখেছিলুম খুবই সামান্য, কিন্তু বড় ভালো লাগত, বড় ইচ্ছে হত ভালো করে শেখবার জন্যে। মনে তখন কত আশা হত। মস্ত বড়ো শিল্পী হবো আমি—দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাবে আমার নাম। এই সব বড়ো-বড়ো স্বপ্ন দেখতুম।'

কমলেশ থামিল। আগ্রহের সহিত সরমা বলিল, 'তার পর কি হোল? ছেড়ে দিলে কেন ছবি-আঁকা।'

ঈষৎ হাসিয়া কমলেশ কহিল, 'ছাড়লুম আর কই রমা, ছাড়িয়ে দিল আমায়?'

'কে ছাড়িয়ে দিল? কেন?'

ছোট একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কমলেশ বলিল, 'ছাড়িয়ে দিল সংসার। বাবা মারা গেলেন, চাকরী নিতে হ'ল—আর সেই সঙ্গে ও-শখও ছাড়তে হ'ল।'

'কেন ছাড়লে গো? আচ্ছা, তুমি এখনও ত' আঁকতে পারো? রাত্তিরে আফিস থেকে ফিরে রোজ একটু একটু করে আঁকলেও ত' আস্তে আস্তে অভ্যেসটা ফিরে আসবে তোমার। তাই কর না কেন?'

'আর হয় না রমা, সারা দিন আফিসে কলম পিষে বাড়ী এসে কি আর মনের সে অবস্থা থাকে রোজ? কোন দিন হয়ত মেজাজ ভালো থাকে, কোন দিন হয়ত থাকে না। ও-রকম আধাখেঁচড়া করে কি আর ঐ সব কাজ হয়? তার চেয়ে ও থাক্ গে, আরও দু'টো দিন গেলে আজকের এ দুঃখটাও থাকবে না, তখন মনে হবে, কি যে সব ছেলেমানুষী করতুম তখন।'

কমলেশ হাসিয়া উঠিল—কিন্তু সে হাসি সরমাকে আনন্দ দিল না মোটেই। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে কহিল, 'আচ্ছা যাক্ গে, কিন্তু তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দাও—যত দিন লাগে লাগুক। যেদিন যখন তোমার ইচ্ছে হবে তখন আঁকবে। বেশ হবে তাহলে, কি বল? না বললে আমি শুনব না কিন্তু।'

কমলেশ হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তাই হবে—তবে হয়ত এ জন্মে আর শেষই হবে না সে ছবি।'

'না হোক্ গে।'

'তবু আঁকতে হবে?'

'হ্যাঁ, আঁকতেই হবে।'

'তথাস্তু।'

কমলেশ ছবি আঁকিতেছে।

সরমা বিছানার উপর দেহভার এলাইয়া দিয়াছে। চূর্ণ-কুন্তল বিস্রস্ত ভাবে মুখখানির চারি দিকে ছড়ানো, হাত দুইটি বুকের উপর আলগোছে রাখা। মুখে জোর করিয়া ফুটাইয়া তোলা নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ভাব তাহার অন্তরের কৌতূহল মোটেই চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া সে ছবিটি দেখিতে যাইতেছে এবং কমলেশের মৃদু ভৎসনা শুনিয়া আবার শুইয়া পড়িতেছে।

কমলেশ তন্ময় হইয়া আঁকিতেছে। মাঝে-মাঝে ক্যান-ভাসের উপর হইতে চক্ষু সরাইয়া শায়িতা সরমার দিকে ক্ষণেক দৃষ্টি রাখিতেছে, আবার মগ্ন হইয়া যাইতেছে ছবির মাঝে। ধীরে ধীরে ক্যানভাসের উপর সরমার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাহার কমনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহার বিপর্য্যস্ত বেশবাস, আলু-লায়িত কেশরাশি।

সহসা সরমা কাশিয়া উঠিল।

চমক ভাঙ্গিয়া কমলেশ তাড়াতাড়ি শয্যার নীচ হইতে পিকদানী তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না, মৃদু কাশিয়া একটু নড়িয়া সরমা আবার ঘুমাইতে লাগিল। কমলেশ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া পিকদানী রাখিয়া দিল।

এক গুচ্ছ চুল সরমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কমলেশ হাত বাড়াইয়া সরাইয়া দিল।

মৃদু হাসিয়া সরমা দু'হাতে খোলা চুলগুলি পাকাইয়া এলো খোঁপা বাঁধিয়া ফেলিল।

কমলেশ হাসিয়া কহিল, 'থাক্ না চুলগুলো খোলা—বাঁধলে কেন আবার ?'

সলাজ হাসিতে মুখটি ভরাইয়া সরমা জবাব দিল, 'না বাপু, বার বার মুখের ওপর এসে পড়বে—বিচ্ছিরি লাগে।'

'বটে, এতক্ষণ খোলা ছিল তাতে কিছু বিচ্ছিরি লাগছিল না, আর এখন বাড়ীর দোর-গড়ায় এসে বুঝি খুব বিচ্ছিরি লাগতে আরম্ভ করল ?'

'তা কেন, এতক্ষণ যে বাপের বাড়ীতে ছিলাম গো, এবার শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছি কি না, তাই।'

দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।

গলির মুখে রিক্শা হইতে নামিয়া দুই জনে বাড়ীর পথে পা বাড়াইল। দূরে একটি বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক এক অব্যক্ত স্বরে পথচারীদের মনে দয়ার উদ্রেক করার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ কমলেশের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলেশ ভিক্ষুকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পর পর দু'-তিন জনের নিকট ব্যর্থ হইয়া ভিক্ষুকটির মুখে তখন হতাশার চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কমলেশকে দাঁড়াইতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্বাস্ত হইয়া সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগাইয়া আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, মুখ হইতে তাহার এক অস্পষ্ট গোঁঙানীর মত শব্দ বাহির হইয়া আসিল।

সরমা তাড়াতাড়ি আঁচল হইতে পয়সা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে যাইতেছিল, কমলেশ হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিল। দৃষ্টি তাহার তখনও লোকটির মুখের প্রতি নিবদ্ধ।

সরমা অবাক হইয়া গেল। কমলেশের এ অদ্ভুত আচরণের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না সে।

ভিক্ষুকটির আশান্বিত মুখে আবার ছাইয়া আসিল হতাশা। কমলেশের চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সরমার হাত ছাড়িয়া দিয়া সে কহিল, 'দাও রমা, কি দিচ্ছিলে ওকে।'

উজ্জ্বল মুখে সরমার দেওয়া সিকিটি হস্তগত করিয়া কমলেশের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুতপদে ভিক্ষুক বিদায় লইল।

কমলেশ সরমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'কি ভাবছো, রমা ? কেন ওকে পয়সা দিতে দিচ্ছিলুম না তোমায় ?'

বিমূঢ়া সরমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি দেখতে পাওনি রমা, এর আগের দু'জন লোকের কাছে কিছু না পেয়ে ওর মুখের ভাবটা কেমন হয়েছিল ? আমি শুধু সেইটে আর একবার দেখব বলেই তোমার হাত ধরেছিলুম। নিরাশা-মুখের এত স্পষ্ট ছবি এর আগে আমি কোন দিন দেখিনি রমা, তাই দেখতে চেয়েছিলুম একবার ভালো করে। তুমি দেখতে পেয়েছিলে ?'

সরমা আবার মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না।'

ক্ষণকাল নির্নিমেষে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কমলেশ আবার বলিল, 'তুমি ভাবছো আমি বড় নিষ্ঠুর, না ? কিন্তু জানো রমা, বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের মুখের নানা রকম ভাব ফুটে ওঠে, এই ভাবের সঙ্গে যার পরিচয় যত বেশী সে তত বড় শিল্পী—দরদী শিল্পী। আর এই সব শিল্পীদের কাছে মানুষের সত্যিকার সুখ-দুঃখের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় তার প্রকাশ। আর তাই শিল্পের সাধনা করতে গিয়ে জগতের সমস্ত দুঃখকে তুচ্ছ করতে পারে মানুষ। নিজের সমস্ত হারিয়েও সে শুধু রেখে যেতে চায় তার দান যা হয়ত এক দিন তাকে অমর করে তোলে।'

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ নাকে আসিতে কমলেশের চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধূপের অগ্নিমুখে যাইয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তে তাহার ক্ষুদ্র দেহের পরিবর্তে একটু ছাই ঝরিয়া পড়িল ধূপদানীর পাশে, কিন্তু দুর্গন্ধ ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল।

অস্বস্তিভরে সরমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়াইতেছে। কমলেশ ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'রমা, কি কষ্ট হচ্ছে ? মাথাটা সোজা করে দেব ?'

অস্ফুট শব্দ করিয়া সরমা চোখ মেলিল,—নিষ্প্রভ করুণ চোখ। ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু মুদিল সে। সযত্নে কমলেশ সরমার মাথাটি বালিশের উপর একটু তুলিয়া দিল।

সরমা আবার চক্ষু মেলিল। কমলেশ তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িল তাহার মুখের উপর।

ম্লান জ্যোতিহীন চক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া সরমা কি যেন খুঁজিতেছে।

কমলেশ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, 'কাকে খুঁজছ রমা ? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ?'

ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে সরমা এবার কথা কহিল, 'ছবিটা—সে ছবিটা কোথায় ?'

'ও-ঘরে আছে। দেখবে একটু ?'

মাথা হেলাইয়া সরমা কহিল, 'হ্যাঁ।'

'এক্ষুণি আনছি'—বলিয়া দ্রুতপদে কমলেশ বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে ছবিখানি লইয়া ফিরিয়া আসিল। ছবিটি সম্পূর্ণ হয় নাই। মুখটি আঁকতে তখনও বাকী রহিয়াছে। শেষ করিবার সুযোগ পায় নাই কমলেশ, তার পূর্ব্বেই সরমা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, সে অসুখ আজও সারে নাই।

কমলেশ ছবিখানি মেলিয়া ধরিল সরমার ক্ষীণ-দৃষ্টির সম্মুখে।

ক্ষণকাল ব্যাকুল চোখে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সরমা বলিল, 'শেষ হ'ল না ছবিটা?'

'হবে সরমা, তুমি সেরে উঠলেই আমি এবার ওটা শেষ করব। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।'

হতাশা ভরে সরমা মাথা নাড়াইল, কতকটা আত্মগত ভাবেই কহিল, 'আর সেরে উঠব না! আর হবে না!'

হঠাৎ সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া যেন শেষ বারের মত বিদ্রোহ করিয়া উঠিল সরমা—ব্যাকুল ভাবে কহিয়া উঠিল, 'ওগো, আমি কি সত্যিই বাঁচবো না আর? আমাকে কি তুমি বাঁচাতে পারো না কোনও রকমে? আমি মরতে চাই না,—আমি মরতে চাই না।'

ধীরে ধীরে আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল সরমা। কমলেশ বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া আছে তাহার মুখের দিকে। নিষ্ঠুর নিয়তি তাহার সুস্পষ্ট ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে ঐ মুখে—কিন্তু তার দু'টি চোখে জ্বলিয়া উঠিয়াছে ক্ষীণ আশার আলো—সে মরিতে চাহে না—সে বাঁচিতে চায়—সে ছাড়িতে চাহে না তাহার আলো-ছায়া ঘেরা জীবনকে। নিয়তির সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম আজ আসিয়াছে শেষ পর্য্যায়ে—তবু, তবু সরমা চায় তাহার ছবি সম্পূর্ণ করিতে, তবু সে বাঁচিতে চায়—

সহসা কমলেশ ঋজু হইয়া বসিল, সহসা তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভুলিয়া গেল সব কথা, শুধু তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল সরমার ঐ মুখ আর কাণে বাজিতে লাগিল সরমার দু'টি কথা 'আমার ছবি—আমার ছবি—'

ছুটিয়া গিয়া কমলেশ তাহার তুলি ও রংয়ের বাক্স লইয়া আসিল। তার পর ক্যানভাসের অসম্পূর্ণ স্থানটুকুর উপর দ্রুত তুলি বুলাইতে সুরু করিল। সরমা কি ভাবিল সেই জানে, বোধ করি, ভাবিবার ক্ষমতা তাহার আর ছিল না, শুধু তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি মেলিয়া সে চাহিয়া রহিল অর্থহীন ভাবে।

ধীরে ধীরে ক্যানভাসের পট হইয়া উঠিয়াছে জীবন্ত; অবিকল শয্যাশায়িনী সরমার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তুলির টানে, সারা মুখটি মৃত্যু-মলিন, কিন্তু চোখের কোণে জ্বলিতেছে শেষ আশার ক্ষীণ রশ্মি।

কমলেশের হাতে লাল রংয়ের তুলি, ধীরে ধীরে সে ছবির শাড়ীর পাড়ের রং গাঢ় করিয়া দিতেছে।

'ওগো—!!'

অকস্মাৎ সরমার কণ্ঠ চিরিয়া আর্ত্ত বেদনার তীব্র স্বরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল।

তন্ময় শিল্পী চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে তুলিটি খসিয়া পড়িল পটে-আঁকা সরমার গালের উপর,—সেখান হইতে মেঝেতে। কমলেশ লাফাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার অত যত্নে আঁকা ছবির ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে গাল বাহিয়া কাঁধ অবধি একটি গভীর লাল ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। কমলেশ ধৈর্য্য হারাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল সরমার দিকে।

সরমার প্রাণহীন দেহে আর এতটুকু কম্পন নাই। গালের কষ বাহিয়া এক ঝলক রক্ত তাহার সমস্ত গালটি রাঙাইয়া নামিয়া আসিয়াছে কাঁধ পর্য্যন্ত, বিন্দু বিন্দু রক্ত তখনও শাড়ীর পাড় ভিজাইয়া তুলিতেছিল। সরমা নাই··· ঐ রক্তটুকুই তাহার জীবনকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ক্ষণিক সুযোগ পাইয়া মৃত্যু আসিয়া ঐ পথেই প্রবেশ করিয়াছে।

বিস্ময়ে বেদনায় বিমূঢ় কমলেশ ফিরিয়া চাহিল তার ছবির দিকে। অপরূপ···সরমা মৃত্যু দিয়াও সম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছে তাহার ছবিকে। নিয়তির সহিত জীবনের সংগ্রাম সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া গিয়াছে দুইটি মুখে, মৃত্যুর পদচিহ্নও নিভুর্ল ভাবে আঁকা দু'টি মুখেই।

ধীরে ধীরে শয্যা-পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিল কমলেশ। কোমল হাতে সরমার দেহ নাড়া দিয়া কহিল সে, 'রমা, তোমার ছবি শেষ হয়েছে, দেখবে না···রমা···রমা···দেখ···'

সরমার চক্ষু দুইটি যেন তখনও জ্বলিতেছে—সে বাঁচিতে চায়—বাঁচতে চায়—

ধুপের ধুমরেখা এবার সরমার ছবির উপর সূক্ষ্ম ছায়া ফেলিয়া বক্রগতিতে ভাসিয়া চলিল।

রাখাল-জয়ন্তী

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

রাখাল মাষ্টারের খোড়ো ঘরের পাঠশালায় আজ মহোৎসব। এ একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার! কস্মিন্ কালে রাখাল মাষ্টার ভাবতে পারে নাই। আর মাধাইপুরের অধিবাসীদের কাছেও এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! রাখাল মাষ্টারের বয়স হয়েছে। মাথা-জোড়া টাক, সাদা ধপ্-ধপে রাজকীয় দাড়ি, ভুরু-গোঁপ সবই পাকা। লোল-চর্ম্ম বৃদ্ধ, বাতে একটি পা একেবারে পঙ্গু, মাজা নুয়ে পড়েছে। কপালে বলীরেখা, বহু দুঃখ-কষ্ট, বহু দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিতেছে। রাখাল মাষ্টার আজ বহু বৎসর হ'তে পাঠশালায় পণ্ডিতী করে আসছে। ময়লা লাল-পাড় ধুতি, তালি-দেওয়া হাত-কাটা একটা জামা, এই বেশেই রাখাল মাষ্টার বহু দিন থেকে পাঠশালায় ছেলে পড়িয়ে আসছে। ছোট ছেলেরা অ-আ শিখেছে, বড় হয়ে পাঠশালা ছেড়ে স্কুলে ঢুকেছে, স্কুল থেকে কলেজে গিয়েছে, শেষে তারা চাকরী করছে। বিদেশে অনেকে মোটা চাকরী করছে, বিয়ে করে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘোর সংসারী হয়েছে। কালে-ভদ্রে কেউ কেউ বা বাড়ী আসে। রাখাল মাষ্টারের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে, কেউ বা দু'-পাঁচ টাকা প্রণামী দেয়। বুড়ো রাখাল মাষ্টার, পাকা ভুরু কুঁচকে বলে, চিনতে তো পারছি নে বাবা?

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি স্মিত হাস্যে বলেন, আজ্ঞে, আমি হরিশ।

ও হরিশ! রমেশের ছেলে তুমি, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। মুখ উজ্জ্বল করেছ। দেশের দশের ভাল কর বাবা। রাখাল মাষ্টারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, গর্ব্বে বুক উঁচু হয়। ঐ হরিশ তার পাঠশালাতেই পড়েছে, তার কাছেই হাতে খড়ি। পাঠশালা ছেড়ে স্কুল, তার পর স্কুল হতে কলেজ। এখন সরকারী মস্ত চাকুরে। রাখাল মাষ্টার সেদিন পাঠশালার ছাত্রদের কাছে বলে, দেখছিস্, ঐ হরিশ আমার ছাত্র। ঐ হরিশ, পরেশ, ও-পাড়ার এনায়েৎ, আব্বাস সব আমার ছাত্র। এখন সব মস্ত চাকরে, ওরা সব বড় হয়েছে, বড় চাকরী করছে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। নে, সব পড়—পড়। হরিশ আজ প্রণাম করে পাঁচটা টাকা দিয়েছে। বুঝলি, ওরা গুরুর-মর্য্যাদা বোঝে, বড় ভাল ছেলে—বড় ভাল ছেলে। ছাত্র-গর্ব্বে বুড়ো রাখালের বুক ভরে ওঠে।

রাখাল মাষ্টার ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। অবশ্য না পারারই কথাই। রাখাল-জয়ন্তী এটা আবার কি?

খোড়ো পাঠশালা-ঘর সাজান হয়েছে। দরজায় পূর্ণ কলস, আম্রশাখা, সপত্র সবুজ কদলীবৃক্ষ। চার দিকে ফুলের মালা, আমপাতার মালা। ঘরে ধূপ-ধুনা ও ফুলের সৌরভে পূর্ণ। রাখাল মাষ্টারের প্রাক্তন বড় বড় চাকরে ছাত্ররা আজ রাখাল-জয়ন্তী উৎসব করছে।

বহু লোক এসেছে। গাঁয়ের চাষা-ভুষোর দল, হাড়ী-বাগ্দী হ'তে গ্রামস্থ সমুদয় ভদ্র ব্যক্তিরা আজ উপস্থিত। সভাগৃহ গম্-গম্ করছে। সঙ্গীত হ'বার পর সকলে মিলে রাখাল মাষ্টারকে সুসজ্জিত চেয়ারে বসিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিল। চট্পট্ হাততালিতে ও জয়ধ্বনিতে বহু দিনকার পুরানো খোড়ো-ঘর বুঝি ভেঙ্গে যায়! রাখাল মাষ্টার পাকা ভুরু কুঁচকে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাবতে পারে না—বুঝতে পারে না কিছুই। নূতন জামা, নূতন কাপড়, নূতন চাদর ও জুতোয় রাখাল মাষ্টারের চেহারা যেন ফিরে গেছে। গলায় প্রকাণ্ড মালা দিয়ে রাখাল মাষ্টার চারি দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারে না। একে একে অনেকেই বক্তৃতা দেয়, হাততালি আর জয়ধ্বনিতে কাণে তালা ধরে যায়। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ, হিন্দু মুসলমান ছাত্রগণ একযোগে রাখাল মাষ্টারের গুণগান করে—জয়ধ্বনি দেয়। ওরা বলে, উনি আমাদের গুরু! আমরা অযোগ্য, তাই এত দিন ওঁর সম্মান দিতে ভুলেছিলাম। আজ আমরা সবাই ওঁর দয়াতেই বড় হয়েছি, বড় চাকরী করছি, ঘর-সংসার করছি। আজ বৃদ্ধ মাষ্টার মহাশয়কে সামান্য সম্মান দেখাতে পেরে আমরা ধন্য।

এবার যেন রাখাল মাষ্টার আজকের উৎসবের কারণটা বুঝতে পারে। কিছু বলার জন্যে সকলে অনুরোধ করতেই রাখাল মাষ্টার এবরূপ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। গলায় ফুলের মালা দুলতে থাকে। একবার চার দিকে পাকা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে একটুখানি চোখ বিস্ফারিত করে রাখাল মাষ্টার বলতে থাকে। কিন্তু দেহ কাঁপতে থাকে, তাই সজোরে চেয়ারের দুই হাতল চেপে ধরে, গলা পরিষ্কার করে রাখাল মাষ্টার বলে, 'বাবারা, আজ বুড়ো মাষ্টারকে যে তোমরা মনে রেখেছ, এতেই আমার বড় আনন্দ। আমি আর কি বলব। শুধু বলি, তোমরা সৎ হও, সৎপথে থাক, ধর্ম্মে মতি থাক, দশের—দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক। ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে কর্ত্তব্য করে যাও।' কাঁপতে কাঁপতে রাখাল মাষ্টার বসে পড়ে। দুই চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়া ও উৎসবের মাঝে রাখাল-জয়ন্তী সমাধা হয়ে যায়।

সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে এসে রাখাল মাষ্টার তামাক টানতে টানতে আজকের উৎসব সম্বন্ধে স্ত্রীকে বলতে থাকে। রাখাল মাষ্টারের বুক গর্ব্বে ভরে উঠেছে, আজ এত দিন পরে তার ছাত্ররা তাকে সম্মান দেখিয়েছে। বড় বড় চাকরে সব ছাত্ররা, তার পায়ের ধুলো নিয়েছে, তাকে গুরু বলে মান্য করেছে। তামাক টানতে টানতে রাখাল মাষ্টার অনর্গল বলে যায়। রান্না করতে করতে রাখালের স্ত্রী বলতে থাকেন, আচ্ছা হ্যা গা, তোমার তো ছাত্ররা সব বড় লোক—বড় বড় চাকরে। এই আমাদের দু'টি প্রাণীর দুঃখ-কষ্টের কথা বল না। মাসান্তে ওরা যদি দশটা টাকা দেয়, তবে সংসার খরচ চলে যায়। হ্যা গা, বলবে?

হাঃ হাঃ করে বৃদ্ধ রাখাল হেসে ওঠে। প্রাণ-খোলা হাসি—অত্যন্ত সরল হাসি।

হাসতে হাসতে রাখাল মাষ্টার বলে, আমার ভাবার দুঃখ কি? ওরাই তো সব আমার ছেলে। আজ আমার কত আনন্দ হচ্ছে। ওরা সব মানুষ হয়েছে, দেশের—দশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই সব এতটুকু ছেলে, যাদের হাতে ধরে অ-আ শিখিয়েছি।—বুঝলে—আশ্চর্য্য নয়? আজ তারা বড় হয়েছে, সাহেবদের সঙ্গে গড়-গড় করে ইংরিজী বলে, অনেক টাকা মাইনে পায়, বুঝলে? কিন্তু ওরা আমায় ভোলেনি, মান্য করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। রাখাল মাষ্টার ধ্যানস্তিমিত নয়নে পাঠশালাটির পানে চেয়ে তামাক টানতে থাকে।

হঠাৎ রাখাল মাষ্টার বলে, বুঝেছ, আজ আমার আর কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। ওরা আমার বুঝেছে, আমায় সম্মান করেছে। এত দিন, এই দীর্ঘ আটাত্তর বছর বয়স হ'ল, সকলকে পড়িয়ে এলাম,—বুঝলে, মনে মনে একটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু আজ দেখছি, ওরা সুদ-শুদ্ধ আমায় সব ফিরিয়ে দিয়েছে। নিজের ছেলে-মেয়ে নেই, একটা দুঃখ ছিল। কিন্তু না, ওরাই আমার ছেলে।

দেওয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙানো সেই দিনকার উৎসবের সেই বড় গোলাপ ফুলের মালা-গাছটি হাওয়ায় মৃদু মৃদু দোলে, ফুলগুলি সা ন্য শুকিয়েছে, কিন্তু মৃদু সুগন্ধে ঘর পূর্ণ। ছাত্রদের দেওয়া ও গা ী নূতন জামা, কাপড়, গরদের চাদর, নূতন জুতায় ও অন্যান্য উপহারে ক্ষুদ্র ঘরটি পরিপূর্ণ। রাখাল মাষ্টার সেই দিকে চেয়ে যেন গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে যায়।

দিন চলতে থাকে। রাখাল মাষ্টারের পাঠশালা বেশ জম্-জমাট। ছোট ছোট ছেলেরা পড়তে থাকে। দুরূহ নামতা, জটিল গণিতের অঙ্ক, শুভঙ্করের আর্য্যা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প এই সব রাখাল মাষ্টার পড়াতে থাকে।

রাখাল মাষ্টার বলে, পড় বাবারা, সব মন দিয়ে পড়। দেখলে তো, ঐ সব বড় বড় মানুষরা সব আমার ছাত্র। ওদের হাতে করে অ-আ শিখিয়েছি। ফাঁকি দিও না কেউ। আজ আর রাখাল মাষ্টার হাতে বেত নেয় না। একটা মধুর মায়া, স্নেহরস-সিক্ত বাৎসল্য রসে রাখাল মাষ্টারের সমস্ত অন্তর প্লাবিত হয়ে যায়।

ছাত্ররা সুর করে দুলে দুলে পড়তে থাকে। কচি কচি আঙ্গুলে শ্লেট-পেনসিল ধরে ওরা শ্লেটে কড়াকিয়া, পণকিয়া লিখতে থাকে। রাখাল মাষ্টার ভাঙ্গা চেয়ারে বসে হাঁক দেয়। হ্যাঁ রে জগন্নাথ, আজ যে চাঁদুকে দেখছি নে? কি রে গোলাম, আজ আবিদ আসেনি কেন?

ছেঁড়া লুঙ্গি-পরা গোলাম মহম্মদ ভয়ে ভয়ে বলে, আবিদ তার বাবজীর সঙ্গে কলা নিয়ে হাটে বেচতে গিয়েছে।

—অ্যাঁ! কলা নিয়ে হাটে বেচতে গিয়েছে? দাঁড়া, আজ যাই ওর বাবজীর কাছে। ছেলেটাকে গণ্ডমুখ্যু করে রাখবে? কেমন আক্কেল তার?

গোলাম আবার উঠে বলে, মাষ্টার মশায়, আজকে আমাদের সকাল সকাল ছুটী দিতে হ'বে।

রাখাল মাষ্টার গর্জ্জন করে ওঠে—ছুটী? কেন—কেন? ডাং-গুলী খেলবার জন্যে?

—না, আমাদের পরব আছে যে।

—পরব? কি পরব রে? রাখাল মাষ্টার সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে।

—আজ্ঞে, কাজী সাহেবের পরব।

রাখাল মাষ্টার বলে, তবে নে, চট্‌পট্ পড়ে নে। যাস্—তা যাস্। কিন্তু পড়া দিয়ে যাবি—

ছেলেরা সুর করে পড়তে থাকে।

সন্ধ্যার পরও রাখাল মাষ্টারের নিষ্কৃতি নেই। স্কুল-ঘরটির উপর সব সময় সতর্ক খর দৃষ্টি। ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে আসে। রাখাল মাষ্টার হুঁকা টানতে টানতে, বৃষ্টির জল মাথায় করে স্কুল-ঘরে ঢোকে। চালায় কোথায় ফুটো হয়েছে, বৃষ্টির জল হড়-হড় করে এসে ভেতরে পড়ছে। নিজ

হাতে চেয়ার, বেঞ্চি, মাদুর টানাটানি করে সরিয়ে রাখে। দেওয়ালে টাঙান অতি-জীর্ণ বাংলাদেশের ম্যাপখানি সন্তর্পণে গুটিয়ে রেখে রাখাল মাষ্টারের তবে শান্তি। ভাঙ্গা জানালা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আর জলের ছাট্ আসে। রাখাল মাষ্টার হুঁকা টানতে টানতে প্রাণপণ শক্তিতে স্কুলের ঘর-দুয়ার, চেয়ার-বেঞ্চ বাঁচাতে চেষ্টা করে।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির ঘন-জমাট অন্ধকার গভীর হ'তে থাকে। বৃষ্টির তীব্রতাও বাড়তে থাকে। রাখাল মাষ্টার তবুও ঘুমুতে যেতে পারে না। নিজের জীবনের সবখানি এই পাঠশালাটি যেন ভরিয়ে রেখেছে। কত আশা-আনন্দ সবটাই যেন এই পাঠশালা-গৃহ পরিপূর্ণ ভাবে দান করেছে।

ছেলেদের বইয়ের বড় বড় মানুষের জীবনী, তাঁদের নীতিকথা, ধর্ম্মকথা, সবটাই রাখাল মাষ্টারের মাথায় দিন-রাত তোলপাড় করছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের মাতৃভক্তি, তাঁর অনন্ত দয়ার কথা, তাঁর শৈশব জীবনে দারিদ্র্যতার কথা, তাঁর তেজস্বিতা, নির্ভীকতা—সমস্তখানি যেন রাখাল মাষ্টার জীবন্ত দেখতে পায়।

তাই রাখাল মাষ্টার ছেলেদের বলে, বল দেখি, বিদ্যাসাগর সেই অন্ধকার রাত্রে নদীর ধারে কি করলেন?

ছেলেরা বলে গেল, বিদ্যাসাগর মশায়, সেই অন্ধকার রাত্রে মায়ের নাম স্মরণ করে বর্ষায় স্ফীত নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতার কেটে আড় পারে চলে গেলেন।

—ঠিক! রাখাল মাষ্টার বলে, দেখ, মায়ের প্রতি কি ভক্তি! এমনি ভক্তি না থাকলে কি কেউ অত বড় হ'তে পারে? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মশায়ের সমস্ত জীবনটাই পুণ্যের, বুঝলে? আচ্ছা, বল দেখি, সেই গল্পটা। ষ্টেশনে নেমে দেখলেন, এক বাবু কুলি কুলি বলে চীৎকার করছে। তখন বিদ্যাসাগর মশায় কি করলেন?

ছেলেরা গড়-গড় করে গল্পটা বলে যেতে লাগল।

শান্ত দিন—শান্ত গ্রাম। কোথাও কোন মালিন্য নেই, জীবন-যুদ্ধের জন্য তীব্রতা নেই, যেন সাদা পাল তুলে একখানি নৌকা অলস-মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে। কিন্তু নির্ম্মল নীল আকাশের কোণে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখা দিল। খবরের কাগজে খবর বের হয়েছে, নোয়াখালির কথা, কলকাতার দাঙ্গার কথা। দাঙ্গা—দাঙ্গা। মারামারি চলছে,—কাটাকাটি চলছে,—রক্তের সাগর বয়ে যাচ্ছে। পালাও—পালাও ভাই—এই রব উঠেছে। সেই ঝড়ের আভাষ শান্ত গ্রামে এসে আঘাত দিল। চার দিক থমথমে, হাট-বাজার বন্ধ, খালি কাণাকাণি, খালি ফিস্ ফাস্ কথা চলছে। নিশ্চিন্ত সদা হাস্যময় রাখাল মাষ্টারের মনেও যেন চিন্তার ছায়া পড়েছে। পাকা ভুরু কুঁচকে ছাত্রদের পানে তাকান। তাদের কচি মুখে শঙ্কার ছায়া।

রাখাল মাষ্টার সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ঠিক পূর্ব্বের মতন বলেন, এই, পড় সব। নামতা হাঁক—নামতা। অবিনাশ, পড়া নিয়ে আয়। কিন্তু ছেলেদের সেই হাসি-হুল্লোড় যেন মিইয়ে গেছে। ওদের আর জায়গা নিয়ে মারামারি নেই—সে চীৎকার নেই—হুল্লোড় নেই—লাফালাফি নেই। সব যেন কেমন নিস্তেজ।

রাখাল মাষ্টার এই সব দেখে আর চুপ করে রইল না। লাঠিখানা হাতে নিয়ে, সেই বেতো পায়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বেরিয়ে পড়ল।

গাঁয়ের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান মাতব্বরদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বলতে লাগল, বাবারা, যেখানে দাঙ্গা হচ্ছে হ'ক। কিন্তু তার ঢেউ এখানে কেন? এখানে কেন এত ফিস্‌ফিসানি—এত ঢাকাঢুকি। এত দিনে একসঙ্গে বাস করছ—এক বাতাসে—এক জলে—ভাই-দাদা-চাচা বলে গলাগলি করে রয়েছ, কিন্তু আজ বিবাদের কথা ওঠে কেন? জবাব দাও।—রাখাল মাষ্টার তাদের হাত চেপে ধরে। রাখাল মাষ্টার কাঁপতে কাঁপতে বলে, বাবারা, আমি তোদের গুরু—আজ এই বুড়ো গুরুর কথা শোন্—ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা লাগাস নে, ধ্বংস হবি। অত বড় কুরুকুল ঐ ভাবে ধ্বংস হ'ল। এ-পথে যাস নে, ও-পথ বড় সর্ব্বনেশে পথ!—রাখাল মাষ্টার সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাথার উপর গন্‌-গন করে রৌদ্র—কিন্তু কোন দৃক্‌পাত নেই।—কেউ কেউ বলে, আমরা করব কেন? কিন্তু ওরা যদি সুরু করে তখন—

রাখাল মাষ্টারের একটা কথা মনে পড়ে। তাঁর জয়ন্তীর দিনে যারা এসেছিল, সব শিক্ষিত। কিন্তু কেউ তারা গ্রামে থাকে না। রাখাল মাষ্টার ঠিক করল, তার শিক্ষিত ছাত্রদের খবর দিতে হবে। আসুক তারা, তাদের দেশ, তাদের গাঁ—আজ আসুক ওরা। ওদের দেশ, ওদের গাঁ, ওদের মা-বোন-ভাইদের ওরা রক্ষা করুক।

আব্বাস আর মোহিত চৌধুরীর নামে টেলিগ্রাম চলে যায়। আকাশের পানে তাকিয়ে রাখাল মাষ্টার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, নারায়ণ—নারায়ণ, তুমি এদের সুবুদ্ধি দাও—সুমতি দাও। এক তুমি ছাড়া প্রভু আর কে বাঁচাবে বল, ঠাকুর? বাঁচাও তুমি—বাঁচাও এদের। ঝর-ঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—রাখাল মাষ্টার হু-হু করে কেঁদে ওঠে!

কিন্তু বুঝি আর বাঁচে না। চার দিকে নানা গুজব রটতে লাগল। ছেলেরা পাঠশালা আসা বন্ধ করল। হিন্দু ছেলেরা আসে না—মুসলমান ছেলেরাও আসে না। পাঠশালা খাঁ-খাঁ করে। হু-হু করে উদাস হাওয়া বয়ে যায়। রাখাল মাষ্টার পাঠশালা-ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুজব চলছে—কাণাকাণ চলছে! অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঠিক বিষধর সাপের মত কারা যেন বিষ ঢালছে! ঐ বিষে আগুন বুঁঝি জ্বলে ওঠে! সন্ধ্যা-বেলা আর মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে না, সুর করে কেউ রামায়ণ পড়ে না। হাট-বাজার খাঁ-খাঁ করছে। চার দিকে থমথমে ভাব—রাস্তায় মানুষ-জন খুব অল্প।

আব্বাস আসেনি—মোহিতও আসতে পারেনি। রাখাল মাষ্টার পাগলের মত ছুটোছুটি করতে থাকে। হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে সেদিন চীৎকার করে বৃদ্ধ রাখাল বলতে লাগল, ভাই সব, দাঙ্গা বাধিও না। মনের ক্রোধ আক্রোশ বিদ্বেষ মুছে ফেল। ভারতমাতার দুই পুত্র তোমরা,—ভারতমাতার দুই চক্ষু তোমরা। ঝগড়া বাধিও না। মিলে যাও—এক হও। আবার পুরোনো দিনের মত একসঙ্গে হাসি-তামাসা কর, আমোদ-আহ্লাদ কর। আজ এই বুড়ো ব্রাহ্মণের—বুড়ো গুরুর কথা শোন।

সমবেত সকলে চুপ করে শোনে।

কিন্তু সন্দেহ যায় না—মেঘ কাটে না।

হঠাৎ কাল-বোশেখীর ঝড় সুরু হয়ে গেল। বেধে গেল দাঙ্গা! এক বাড়ীতে,—এক পাড়ায় লাগল আগুন! অন্য পাড়ায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল! চার দিকে হৈ-চৈ বেধে গেল! কান্না, চীৎকার, আর তর্জ্জন-গর্জ্জন! কার যেন সর্ব্বনাশ হচ্ছে—হু-হু করে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ-পথে উঠেছে।

রাখাল মাষ্টার কাণ পেতে শোনে। বাজারের দিক্‌টায় যেন খুব গোলমাল। রাখাল মাষ্টার খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে পড়ল।

বাজারের এক অংশ দখল করে রয়েছে সুসজ্জিত সশস্ত্র হিন্দুরা—আর অন্য অংশে সুসজ্জিত সশস্ত্র মুসলমানরা। রাখাল মাষ্টার দুই দলের মাঝে এসে, এক দোকান হ'তে একটা কাঠের বাক্স হিড়-হিড় করে টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে বলে যেতে লাগল, ওরে, তোরা থামা মারামারি। ভাইয়ের বুকে ছোরা মারিস্ নে। কেন এই ঝগড়া—কেন—কেন? এত দিন একসঙ্গে বড় হয়েছিস্, একই বাতাসে, একই জলে, একই দেশে আছিস্, আজ তোরা লড়তে এসেছিস্ কি নিয়ে? কি নিয়ে তোদের ঝগড়া? ওরে মুখ্যুরা, মারামারি করিস্ নে, বুড়ো গুরুর কথা শোন, ধ্বংস হবি সব—সব ধ্বংস হবি। হাতের অস্ত্র ফেলে দে—আয় সব, ভাই ভাইয়ের কাছে মাপ চা—ক্ষমা চা।

খালি গা—খালি পা—তীব্র রোদের ভেতর রাখাল মাষ্টার ভগ্ন কণ্ঠে, অশ্রু-সজল নেত্রে চীৎকার করে যাচ্ছে। বাতাসে পাকা দাড়ি উড়ছে—পরনের ছেঁড়া ময়লা কাপড় বুঝি খসে যায়। বহু লোক জমা হয়েছে। ওদের আস্ফালন থেমেছে—বুঝি বা দাঙ্গা থামে।

রাখাল মাষ্টার তখন বলছে, এ গাঁয়ে দাঙ্গা হ'তে দেব না। আমার চোখের সামনে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাবে, তা দেখব না। যদি দাঙ্গা করিস্, তবে আগে বুড়ো বামুনকে—আগে তোদের বুড়ো গুরুর বুকে ছুরি বসা—এই বুড়োর রক্তের উপর দিয়ে, আগে যেতে হবে! এই বুড়োর দেহ থেঁতলে, দলিয়ে যাবি!—রাখাল মাষ্টার হাঁপাতে হাঁপাতে দুই লোল হাত বিস্ফারিত করে চীৎকার করে বলতে থাকে।

কিন্তু হ'ল না কিছুই।—অন্ধকারে যে কাল সাপ বিষ ঢেলেছিল, তার ক্রিয়া সুরু হয়। হঠাৎ কোথা হ'তে একটা থান ইট এক দলের উপর এসে পড়ল। হৈ-হৈ করে উঠল আর এক দল। তার পর প্রবল বন্যার স্রোতের মত বাঁধ-ভাঙা জল তীরবেগে ছুটল। তলিয়ে গেল—ভেসে গেল—ডুবে গেল। মানব-জমিনে যত পাকা ফসল ছিল, সব গেল ডুবে—তলিয়ে।

ডুবে গেল রাখাল মাষ্টারের কণ্ঠস্বর!

রক্তের সমুদ্রের উপর ভাসছে রাখাল মাষ্টার। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের ঠাণ্ডা রক্তের উপর দিয়ে দুই মূর্খের দল উন্মাদ হয়ে ছুটলো।

অষ্টমীতে হ'ল বিজয়া—ভরা দুপুরে নেমে এ'ল সন্ধ্যা!

আজ পূর্ণ হ'ল রাখাল মাষ্টারের বিদ্যাদান। আজ পূর্ণ হ'ল—সত্যি হ'ল—আজ এত দিনে হ'ল সত্যিকারের রাখাল-জয়ন্তী!

ঐ

১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হইয়াছে। বৃটিশ-শক্তি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের ৬০ বৎসরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য সার্থক হইয়াছে। '৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী যে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতের জনগণ-মনের পরতে পরতে এক নূতন বৈপ্লবিক প্রেরণার বন্যাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে প্রবাহের মহঃপ্লাবনের মুখে বৃটিশ-শক্তি ভাসিয়া গিয়াছে,—"কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র সফল হইয়াছে। বৃটিশ-শক্তি "রাজনৈতিক ভাবে" ভারত ছাড়িয়াছে। হিটলার-টোজোর দানবীয় প্রহারের মুখে ডানকার্ক-মালয়-ব্রহ্মদেশ হইতে দানবীয় বেগে পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে দানবীয় নির্য্যাতনের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল—হিটলার-টোজোর পতনের পর তাহা এক অপূর্ব্ব অভিনব মায়া-বলে এমন এক ইঙ্গ-ভারত মৈত্রীতে রূপান্তরিত হইল,—যাহার ফলে বৃটিশ মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়া "রাজনৈতিক ভাবে" ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেল; মানব জাতির ইতিহাসে, পৃথিবীর ইতিহাসে, এই প্রথম এক পরাধীন জাতি এক অভিনব বিচিত্র বৈপ্লবিক উপায়ে এক অভিনব বিচিত্র স্বাধীনতা লাভ করিল। মহাত্মাজীর অতুলনীয় অহিংস শক্তি সত্যই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

লোকে বলে,—মাউণ্টব্যাটেনকে "ভারতের" বড়লাট করাটার কি প্রয়োজন ছিল? মহাত্মাজী বলিয়াছেন,—"আমরা স্বাধীন ভাবে যেমন চাপরাসী নিযুক্ত করিতে পারি, তেমনি স্বাধীন ভাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট করিয়া আমাদের প্রাক্তন শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়াছি মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন,—"বৃটেন যে ভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্য ত্যাগ করিল,—তাহা সকল জাতির অনুকরণীয়। একটা সাম্রাজ্য ত্যাগ সহজ ব্যাপার নয়। ভারতবাসী গদগদ চিত্তে সে কথা স্বীকার করে।" সত্য কথা। ঐ অপূর্ব্ব উদারতার পরিবর্ত্তে আমরা উদার ভাবে মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট করিয়াছি। শুধু তাই নয়, ঐটুকুতেই বৃটেনের উদারতার ঋণ পরিশোধ হয় না। তাই আমরা "কিং জর্জ্জ সিক্সথ"কে ভারতের রাজা করিয়াছি,—আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজা।

সত্য বটে, বিজয়লক্ষ্মী "কিং জর্জ্জ সিক্সথে"র প্রতিনিধি,—তাঁর ভারত ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি;—কিন্তু অ্যাটলী-চার্চ্চিল একযোগে আইন করিয়া আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়াছে,—আমাদের অভিনব বৈপ্লবিক অহিংস শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াই তাহা দিয়াছে;—সেই আইনের জোরেই আমরা শুধু মাউণ্টব্যাটেনকেই নয়,—"কিং জর্জ্জ সিক্সথ"কেও বরখাস্ত করিতে পারি। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে সেও আমাদের বৈপ্লবিক উদারতারই খাতিরে। "রাজনৈতিক ভাবে" যে বৃটেন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—ইংরেজের দুই শত বৎসরের সুগঠিত শোষণ-যন্ত্রের নাগপাশ সমেত,—আমাদের বৈপ্লবিক উদারতার দ্বারাই আমরা বৃটেনের সে উদারতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি, করিতেছি, এবং ভবিষ্যতেও করিব।

ইংরেজ তাহার সাম্রাজ্য বিলাইয়া দিতেছে;—আমাদের স্বাধীনতা দিয়া,—"রাজনৈতিক" স্বাধীনতা দিয়া,—ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যটা উড়াইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" অ্যাটলী প্রধান মন্ত্রী হইয়া সেই সাম্রাজ্য উড়াইয়া দিল, এবং সেই চার্চ্চিল আশীর্ব্বাদ করিল। কারণ, ইংরেজের ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াটা "রাজনৈতিক ভাবে,"—এবং আমাদের স্বাধীন হওয়াটাও "রাজনৈতিক ভাবে" হইয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এক জাতির উপর আর এক জাতির প্রভুত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। পরাধীন জাতির স্বাধীন হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে ভূরি ভূরি। কিন্তু এমন "রাজনৈতিক ভাবে" স্বাধীন হওয়া কোন পরাধীন জাতির ভাগ্যে অদ্যাবধি ঘটে নাই। কেহ কখনও বলে না, চীন-মাঞ্চু-সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া "রাজনৈতিক ভাবে" স্বাধীন হইয়াছিল;—কেহ বলে না,—ইটালীতে ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল "রাজনৈতিক ভাবে।" কারণ, ঐ সব দেশে প্রভু জাতির সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধনের চুক্তিতে,—রাজনীতির চিরন্তন ভিত্তি অর্থনীতিকে পৃথক্ করিয়া সরাইয়া রাখিয়া স্বাধীনতার বন্দোবস্ত হয় নাই। কাজেই সান ইয়াট-সেন-ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডীকে এ কথাটা বারংবার জনসাধারণকে শুনাইবার বা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই যে, স্বাধীনতাটা হইতেছে, "রাজনৈতিক ভাবে"। বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিব না, এই সর্ত্তে আমরা বৃটিশ পার্লামেন্টের আইনের জোরে যে স্বাধীনতা পাইয়াছি, তাহা যে "রাজনৈতিক" এ কথা আমাদের পদে পদে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে।

ভারত-ভূমিতে ইংরেজ বণিকের শুভ পদার্পণের পর হইতে দিল্লীর মোগল সম্রাটের উত্তর-ভারত সাম্রাজ্য,—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ বা অঞ্চলের বিভিন্ন স্বতন্ত্র যুযুৎসু রাজ্য,—ক্রমে ক্রমে তাহাদের জমিদারীতে পরিণত হইতে হইতে এক শত বৎসরে একটা বৃটিশ-ভারত গড়িয়া উঠিল। সুদূর বিদেশ ভারত-ভূমিতে নানা অর্দ্ধসভ্য বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করিয়াছিল, আমাদের অবিরাম গৃহযুদ্ধে তাহারা সেই সৈন্যদল ভাড়া খাটাইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহাদের ভাড়া করিয়া পরস্পরকে একে একে তাহাদের তাঁবেদারীতে পরিণত করিলাম, এবং শেষ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম আমরা নিখিল ভারত এক দেশ, এক জাতি,—এবং ইংরেজই বিধাতার বিধানে আমাদের এই এক-জাতীয়ত্ববোধ জাগ্রত করিয়াছে,—এবং তাহার জন্য তাহারা যত কূটনীতি, যত বিশ্বাসঘাতকতা, যত প্রবঞ্চনা এবং যত অত্যাচার করিয়াছে, তাহার একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সাপ যেমন জীবন থাকিতে সোজা হইয়া চলিতে পারে না,—আমরাও তেমনি সোজা হইলাম মরিবার পর।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের নানা জাতির অস্থি চূর্ণ করিয়া বৃটিশ যে নূতন বৃটিশ-ভারত রচনা করিয়াছিল, তাহার বাহিরে একটা "নেটিভ" ভারতও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মোটামুটি এই দুই ভারতের শেষ সংঘর্ষ সিপাহী বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ নির্মম হস্তে দমন করার পর "নেটিভ" ভারত ইংরেজের খাস জমিদারী বৃটিশ-ভারতের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণের সহায়ক পরোক্ষ শাসন-শোষণের ঘাঁটিতে পরিণত হইল, এবং বৃটিশ-ভারতের জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া ওঠার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম এক একটি "নেটিভ-প্রিন্স" বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। বৃটিশ-ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রগতির পথের একটা বিঘ্নরূপেই ইংরেজ এই মান্ধাতার আমলের ফিউড্যাল ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থার পিছনে বৃটিশ-ভারতের রাজপ্রতিনিধি ভাইসরয়ের পলিটিক্যাল এজেন্ট ইংরেজ রেসিডেন্টই প্রকৃত পক্ষে নেটিভ ভারতের রাজনৈতিক শাসক।

আমাদের অল ইণ্ডিয়া-ভারতমাতার আইন-বহির্ভূত রূপের সঙ্গে আমাদের অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের যে মিল নাই, এটা বুঝিতে আমাদের অনেক দিন লাগিল। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনগুলা যখন কেবলমাত্র বৃটিশ-ভারতের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখন নেটিভ ভারতের প্রজা আন্দোলন সুরু হইল,—এবং তাহার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই দুই আন্দোলনের ঐক্য-বোধই আমাদের অল ইণ্ডিয়া-ভারতমাতার কল্পনাকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিল। জাতীয় বৈপ্লবিক আদর্শবাদীদের চক্ষে এই দুই ভারতই ইংরেজের সাম্রাজ্যরূপে এক, এবং ইংরেজকে মারিয়া তাড়াইতে পারিলে দুই ভারতই এক এবং স্বাধীন হইবে;—সুতরাং তাহাদের ভারতমাতা নিখিল ভারতই বটে। কিন্তু সংস্কারপন্থী কংগ্রেস নেতাদের নিখিল ভারত বৃটিশ-ভারত ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন পরিণত অবস্থায় পৌঁছিবার পর এই কথাটা পরিষ্কার হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহাদের ঘোষণা করিতে হইল—নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভা শুধু বৃটিশ-ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই মালিক;—নেটিভ ভারতের প্রজা আন্দোলনকে তাহারা শুধু নৈতিক সমর্থনই দিতে পারে,—বাস্তব নেতৃত্ব দিতে পারে না। বৃটিশ-ভারতের সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যা, কিন্তু নেটিভ ভারতের প্রজাদের সমস্যা নাগরিকের অধিকার লাভের সমস্যা। তাহাদের সংগ্রাম তাহাদের নিজস্ব কংগ্রেসকেই চালাইতে হইবে।

অর্থাৎ এই বৃটিশ-ভারতই আমাদের অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের ভারতমাতা। ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে বহু কাল আগে,—কিন্তু আমরা বৃটিশ ভারতকেই অখণ্ড ভারতরূপে দেখিয়া আসিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে "অখণ্ড" ভারতের কোন কথাই কখনও উঠে নাই। মুসলমানদের পৃথক্ রাষ্ট্রগঠনের দাবী ওঠার পরই আমরা প্রথম হুঙ্কার ছাড়িয়াছি অখণ্ড ভারত চাই। কিন্তু সে-ও এই বৃটিশ-ভারতেরই কথা। অখণ্ড বৃটিশ-ভারতই অখণ্ড ভারত।

তার পর ৩রা জুনের ঘোষণায় যখন সেই বৃটিশ ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল তখন আমাদের ভারতমাতা বর্ত্তমান ভারত ডোমিনিয়নের রূপ ধারণ করিলেন। নেটিভ ভারত কয়েক শত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল; অল ইণ্ডিয়া-ভারতমাতা মিউজিয়ামের অতীত ইতিহাসের সেল্‌ফে গিয়া উঠিলেন। বৃটিশ-ভারতের আধখানা পাকিস্তান ডোমিনিয়ন হইল। বাকি আধখানা লইয়াই আমাদের "ভারতমাতা"র সখ মিটাইতে হইল। আজ পণ্ডিত জহরলাল যখন লিয়াকৎ আলির সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে হিন্দু-শিখদের "আওয়ার পিপ্‌ল্" বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার "হিন্দুস্থান অংশ"। যখন হিন্দু দেশীয় রাজ্যগুলা ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে সংযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখনও আমাদের চোখে ভাসিয়া উঠে একটা "হিন্দুস্থান ইউনিয়ন" ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু আমরা ভারত। কারণ ভারত না বলিলে মুসলমানদের কাছে রাজনৈতিক পরাজয়টা বড়ই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা বড়ই ঘোলা। যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিলের কল্যাণে ভারত ও পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়ন সৃষ্ট হইল,—পাকিস্তানটা সে বিলের বহির্ভূত হইতে পারে না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার হিন্দু অংশ ও মুসলমান অংশ পৃথক এবং পরস্পরের পক্ষে স্বাধীন হইয়াছে,—বাস্তব ব্যাপার এই মাত্র। কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায়। নিরাপত্তা পরিষদের নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন, যেহেতু ভারত মহাসাগর ও মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলের গুরুত্ব বর্ত্তমানে বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে অসামান্য, অতএব সেই অঞ্চল হইতেই কোন রাষ্ট্রকে নির্ব্বাচিত করা উচিত, এবং সেই জন্যই তিনি ভারতের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধি ভিশিনিস্কি তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—ভারত সম্বন্ধে ও-কথা খাটে না। কথাটা যথেষ্ট প্রচার হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ব্যাপার কি? ভিশিনিস্কি আমাদের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীন ভারতকে কি মনে করে?

আজ যদি আমেরিকার সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ বাধে, পূর্ব্ব-ইউরোপ ও বল্কানের দেশগুলি ছাড়া বাকি সমগ্র ধনবাদী দুনিয়া রুশিয়াকেই যে তাহার জন্য দায়ী করিবে, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভার মধ্যে ব্যূহরচনার নমুনা দেখিয়াই তো সে কথা বেশ বুঝা যায়। যে রুশিয়া প্রবল বন্যার বেগে পশ্চিমে বার্লিন এবং পূর্ব্বে দক্ষিণ শাখালীন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহার মিত্রশক্তি বৃটেন-আমেরিকার সৈন্যদলের সহিত মিলিয়া থামিয়া গিয়াছে, সেই রুশিয়া যে সেই ঝড়ের বেগ সম্বরণ করিয়া আজ আবার নূতন করিয়া সামরিক আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ বাধাইবে, ইহা একটা আজগুবী বেহিসাবী কথা। পক্ষান্তরে, জাপান চিৎ হইয়া পড়িয়াও আজ দক্ষিণ শাখালীন দাবী করিতে সাহস পায় কাহার প্ররোচনায়, তাহা কি বুঝিতে কষ্ট হয়?

তথাপি,—যে কোন প্রকারে যুদ্ধ বাধিলে কমিউনিজমের জুজুর ভয়ে সমস্ত ধনবাদী দুনিয়া তাহাকেই দায়ী করিবে। সেই রুশ-আমেরিকার যুদ্ধে বৃটেন কি নিরপেক্ষ থাকিতে পারে? এবং বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করিলে বিজয়লক্ষ্মীর ভারত ডোমিনিয়ন কি নিরপেক্ষ থাকিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিতে পারে?

আজ যদি ইন্দোচীন বা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারত ডোমিনিয়নের কংগ্রেসী সংগ্রামে রূপান্তরিত না হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্ত হইতে ফ্রান্স-হল্যাণ্ডের উপকূল পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করে, বিজয়লক্ষ্মীর ভারত ডোমিনিয়ন ঐ অঞ্চলে শান্তিরক্ষায়

জন্য কি করিতে পারে? যাহারা পাঞ্জাবে শান্তিরক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের ভারত মহাসাগরে শান্তিরক্ষার কি ক্ষমতা থাকিতে পারে?

সারা দুনিয়ায় সাড়ে চারি শত ঘাঁটী নির্ম্মাণ, এবং মার্শাল প্ল্যান অনুসারে পশ্চিম-ইউরোপকে ধারে মাল বিক্রয় করিয়া আজ আমেরিকা তাহার বিরাট উৎপাদন-যন্ত্রকে চালু রাখিয়াছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই কাজ কমিয়া গিয়া যখন তাহার উৎপাদন সঙ্কোচ করিতে হইবে, তখনকার সঙ্কট এড়াইবার জন্য তাহাকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সুরু করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে তুরস্কে তাহার ঘাঁটী হইয়াছে,—আরবে তাহার ঘাঁটী আছে,—পারস্যে ঘাঁটীর চেষ্টা চলিতেছে, এবং পাকিস্তানের শিল্প-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ চলিতেছে। এই সব অবস্থার সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত ডোমিনিয়নের যুদ্ধের কল্পনাটা যোগ করিয়া বিচার করিলে ইহাই মনে করা সঙ্গত যে, রুশ-আমেরিকার সংঘর্ষে পাকিস্তান আমেরিকার পক্ষে, এবং ভারত ডোমিনিয়ন তার বিপক্ষে থাকিবে। অথচ ভারত ডোমিনিয়নের কি সে ক্ষমতা আছে?

সত্য বটে, মুদালিয়রের ভারত ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীন, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মীর ভারত বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে যাইতেছে। কিন্তু সে কথাও আজ খাটে না। কারণ, আজও আমরা বৃটিশ পার্লামেন্টের' ৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির দ্বারাই শাসিত হইতেছি, যদিও সে শাসনবিধির কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ব্যবস্থাটা ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিলের দ্বারা সংশোধিত হইতেছে। নতুন শাসনবিধি গঠিত এবং প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনতা হইতে আমরা মুক্ত হইব। আজও ডোমিনিয়নটা "ইণ্টারিম" এবং আজও আমরা বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীন। এ কথা আমাদের মাথায় সহজে প্রবেশ করে না, কিন্তু ভিশিনিস্কি তো ভারত ডোমিনিয়নে "স্বাধীন" নাগরিক নয়,—সে এ সব কথা অবশ্যই বোঝে!

তার পর, মুদালিয়রের ভারত ছিল সমগ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়া, এবং তাহার মাথার উপর ছিল স্বয়ং অল-ইণ্ডিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মীর ভারত বৃটিশ ইণ্ডিয়ার কয়েকটা প্রদেশ মাত্র, আর ১৫ই আগষ্ট "ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে।" সুতরাং ভিশিনিস্কির চোখে বিজয়লক্ষ্মীর ভারত বৃটিশ ইণ্ডিয়ার আধখানা মাত্র, এবং "কিং জর্জ্জ সিক্সথ" ভারত ও পাকিস্তানের রাজা। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত ডোমিনিয়ন যুদ্ধ করিবার স্বাধীনতা পাইলেও সে যুদ্ধ নেহাৎ আন্তঃ-ডোমিনিয়ন গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ডোমিনিয়ন বহির্ভূত আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে কিং জর্জ্জ সিক্সথের দুই ডোমিনিয়নের নিয়তি এক সূত্রে গাঁথা থাকিতে বাধ্য।

কিন্তু বিজয়লক্ষ্মীর ভারত না কি বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া গিয়া স্বাধীন হইবে। প্রথমতঃ,—তাহা যদি হয়-ও,—তাহা হইলেও তাহাকে বৃটিশ কূটনীতির লেজুড় হইয়াই থাকিতে হইবে। সে বন্ধন কাটিবার কোন উপায়ই ইংরেজ রাখে নাই। ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্কশূন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাইতেছে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার জন্য আইন করা হইতেছে, এবং তাহার পূর্ব্বে ইঙ্গ-ব্রহ্ম আর্থিক ও সামরিক চুক্তি হইতেছে। সিংহল হইতেছে ভারতেরই এবং পাকিস্তানেরই মতন আর একটা ডোমিনিয়ন। তার পর দেশীয় রাজ্যগুলা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতার পরিকল্পনায় ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে যোগ দিবে না। ভারত ডোমিনিয়ন থাকিবে বলিয়াই তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছায়, সংযুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থায় ভারত ডোমিনিয়নে যোগ দিয়েছে মাত্র, এবং তাহার মধ্যেও এই সর্ত্ত রাখিতেছে যে, নূতন শাসন আইন মানিতে তাহারা বাধ্য থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—এই সকল কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব বলিয়াই আমাদের শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদ "স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র"রূপে ভারত ডোমিনিয়নকে গঠন করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াও সম্প্রতি সাব কমিটী করিয়া বিচার করিতেছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরেই যাওয়া হইবে, কিম্বা আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের মতন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই "স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র" গঠন করা হইবে (!)।

এই "সার্ব্বভৌম" কথাটি আমাদের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইবার আর একটি কল। সর্ব্বপ্রধান কল অবশ্য "স্বাধীনতা" কথাটি। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস যে স্বাধীনতা এবং আরও কিছু,—স্বাধীনতার চেয়ে লাভজনক,—এ কথা আজ-কাল প্রায়ই শোনা যায়। "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" হইয়াছে, কিন্তু ফ্রিডম এখনও বাকি আছে, এবং তাহার জন্য আমাদের এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে,—এ কথাও শোনা গিয়াছে।

যাহা হউক, সার্ব্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। "সভারেণটি"—এবং "প্যারামাউণ্ট" এই দুই অর্থেই আমরা কথাটার ব্যবহার করিয়া থাকি,—এবং এই দুই আকাশ-পাতাল তফাৎ ব্যাপারকে ঘোলাইয়া ফেলিয়া অনেক কেলেঙ্কারী করি। আমাদের দেশী এবং বিলাতী নেতারা এবং সংবাদপত্র-ওয়ালারা আমাদের এই অবুদ্ধির সুযোগ লইয়া অনেক রাজনৈতিক প্যাঁচ চালাইয়া থাকেন।

দেশীয় রাজ্যগুলা "সভারেণ পাওয়ার"—অর্থাৎ তাহাদের দেশের মধ্যেকার শাসন-ব্যবস্থায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আয়ার্ল্যাণ্ড "সভারেণ পাওয়ার"—তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায়ও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের "ভারত"ও সভারেণ পাওয়ার হইবে, এবং তাহারও উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এমন কি, ভারত এবং পাকিস্তান ডোমিনিয়নও সভারেণ পাওয়ার, কারণ তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনেও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সুতরাং "সার্ব্বভৌম" বলিয়া ঘটা করার অর্থ আমাদের চোখে ধূলা দেওয়া মাত্র।

দেশীয় রাজ্যের উপর বৃটিশ সরকারের যে কর্ত্তৃত্ব ছিল,—যাহার জোরে রেসিডেন্টের অভিযোগে ভাইসরয় রাজাদের গদীচ্যুত করিতে পারিতেন,—সেই চূড়ান্ত সার্ব্বভৌমত্ব ইংরেজ ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং ছাড়িবার সময় বলিয়া দিয়াছে,—আইন করিয়া বলিয়া দিয়াছে,—ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে,—ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়ন এই প্যারামাউণ্ট সার্ব্বভৌম শক্তির উত্তরাধিকারী হইবে না। আমাদের স্বাধীনতার অবতার নেতারা এই "কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া" চাপিয়া গিয়াছেন,—পাছে পাকিস্তানও এই ক্ষমতার ভাগ পায়,—এবং যেহেতু পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে ভিন্ন এই শক্তির সদ্ব্যবহার করা যাইবে না,—অতএব চাপিয়া যাওয়াই ভাল। স্বামী যমকে দেওয়া যায়,—কিন্তু সতীনকে দেওয়া যায় না।

জিন্নার সঙ্গে একযোগে একমত হইয়া কাজ করা মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া চলিতে পারে না। '৩৫ সালের শাসনবিধির সংশোধনের কাজটার জন্য মাউণ্টব্যাটেনকে চোখ-কাণ বুজিয়া বড়লাট করা চলিলেও, চির-কাল তো মাউণ্টব্যাটেনকে রাখা যায় না!

কিন্তু প্যারামাউণ্টির উত্তরাধিকারী না হইলেও "ভারত" নাম বজায় রাখিয়া আমরা অন্য অনেক কিছুর উত্তরাধিকারী হইয়াছি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় আমরা "অটোমেটিক মেম্বার,"—কিন্তু পাকিস্তানকে নূতন রাষ্ট্র হিসাবে দরখাস্ত করিয়া সেখানে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আমরা ভারি জিতিয়া গিয়াছি। দুই ডোমি-নিয়নের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা এক বলিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট যতই বলুক,—আমরা যে "ভারত", আর পাকিস্তান যে ভারত হইতে ঠিকরাইয়া পড়া একটা টুকরা মাত্র এ কথা তো বিশ্বসভায় প্রমাণ হইয়া গেল। পাকিস্তান কি জব্দই না হইয়াছে।

কিন্তু আমরাই যে "আদি ও অকৃত্রিম" ভারত, এবং পাকিস্তান যে পৃথক্ নূতন রাষ্ট্র,—এ আত্মপ্রসাদের কি মূল্য দিতে হইয়াছে, সে দিকে আজও আমাদের নজর পড়ে নাই। পাকিস্তানীরা আমাদের ভারত ডোমিনিয়নকে হিন্দুস্তান বলিলে আমাদের জাতীয়তার বড়াইয়ে আঘাত লাগে,—কাজেই আমরা স্বীকার করি না আমরা হিন্দুস্থান। —ইংরেজ আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র জানে,—ইংরেজও উৎসাহ দিয়া বলিল, "তাহা তো বটেই ;—একটা টুকরা খসিয়া গেলেই কি একটা রাষ্ট্র আর একটা হইয়া যায়? তোমরাই ভারত, এবং ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভার সভ্য ছিল, তোমরাই সেই ভারত, সুতরাং ১৫ই আগষ্টের আগে জাতিপুঞ্জের সভায় ভারতের যাহা কিছু অধিকার ছিল, ভারত যত. কিছু আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি, বন্দোবস্ত, বোঝাপড়া করিয়াছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে সবই তোমাদেরই প্রাপ্তব্য,—পাকিস্তান কিছুই পাইবে না, এবং তাহাকে গোড়া হইতে ঘর গুছাইতে হইবে।" আনন্দে আমরা ফুলিয়া উঠিলাম।

প্যারামাউণ্টি ছাড়া, আমরা আগেকার ভারত সরকারের সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি প্রভৃতির উত্তরাধিকারী ;—পাকিস্তান নয়। কিন্তু সমগ্র ষ্টার্লিং ব্যালেন্সেরও কি আমরাই উত্তরাধিকারী? তাহা অবশ্যই নহে। কারণ ষ্টার্লিং পাওনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্তানেরও বটে।

কিন্তু ১৫ই জুলাইএর "ষ্টার্লিং কনভার্টিবিলিটার" বিপদ এড়াইবার জন্য বৃটিশ সরকার তখনকার ভারত সরকারের সঙ্গে যে সাময়িক চুক্তি করিয়াছিল,—তাহার উত্তরাধিকারী আমরাই বটে। ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল—তাহারও উত্তরাধিকারী আমরাই,—পাকিস্তান নয়। পাকিস্তান নূতন করিয়া সে রকম চুক্তি করিতে পারে,—কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহা না করিতেও পারে। বৃটিশ ট্রেজারীর তরফ হইতে তদানীন্তন ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে ম্যাক আর্থারকে এক চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জাপান-অষ্ট্রেলিয়ার কারবারে জাপানের পাওনা হইলে জাপান সেই টাকায় ভারত হইতে মাল লইতে পারিবে। সে ব্যবস্থারও উত্তরাধিকারী আমরা। অর্থাৎ ১৫ই আগষ্টের আগেকার বৃটিশ তাঁবেদার ভারত সরকার বৃটেনের স্বার্থে ভারতের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিবার যত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, আমরাই তাহার উত্তরাধিকারী, কারণ আমরা "ভারত"!

"গড্ডলিকা"র "সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" কেস পড়ার সময় গাণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়া রায় বাহাদুরকে সব শেয়ার গছাইয়া বেচিয়া যেমন রায় বাহাদুরকে ডুবাইয়া গিয়াছিল,—বিলাতী গাণ্ডেরীরামও আমাদের সেই রায় বাহাদুর বানাইয়াছে!

পাণিহাটী তীর্থে

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১লা জুন রবিবার, ১১৪৭। সকালে বেলুড়-মঠ হইতে মোটর বাসে কোন্নগর যাইয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া পাণিহাটীতে উপস্থিত হই। সে দিন পাণিহাটীতে দণ্ড-মহোৎসব। স্থানীয় হিন্দুসংগঠন সমিতিতে বিশ্রামানন্তর দর্শনে বহির্গত হইলাম। পাণিহাটী কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত একটি বৃহৎ গ্রাম। এখানে একটি হাই স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি ও লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত এই গ্রামে এখন বহু শিক্ষিত লোকের বাস। ১১১১ খৃষ্টাব্দে উহার লোকসংখ্যা ছিল চারি হাজার মাত্র। রাস্তা বাদে গ্রামটির পরিমাণ ৫১৮ একর জমি। ইহার উপর দিয়া তিনটি রাস্তা গিয়াছে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মুর্শিদাবাদ রোড এবং রাজা চন্দ্রকেতু রোড। প্রথম রাস্তাটি সুপ্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। এই পথে কলিকাতা পর্য্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে। দ্বিতীয় রাস্তাটি পাণিহাটীর পূর্ব্ব দিক দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে। এই পথে নবাবের সৈন্যাদি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। তৃতীয় রাস্তাটি রাজা রামচন্দ্রের ঘাট হইতে যশোহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। যশোহর জেলায় যে 'পেনেটি ধানের' আবাদ হয় তাহা পাণিহাটী হইতে আমদানী। মুসলমান রাজত্ব-কালে পাণিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৶০ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন, হোসেন খাঁ 'সাহ' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলে পাণিহাটীতে এক জন কাজী রাখিলেন। ঐ কাজী সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। রাজা চন্দ্রকেতু কর্তৃক নির্ম্মিত হংসত্রিবক্রিত পয়ঃপ্রণালীর সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও এই গ্রামে দেখা যায়। পাণিহাটী একদা রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল।

—চিত্ত দাস

পাণিহাটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম তীর্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত আছে, শচীর মন্দির, নিত্যানন্দের নর্ত্তন, রাঘব-ভবন এবং শ্রীবাস কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সদা আবির্ভাব। শ্রীবাসের অঙ্গন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। শচী দেবী এবং নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট। একমাত্র রাঘব-ভবন পাণিহাটীর উত্তরাংশে অদ্যাপি বর্ত্তমান। পাণিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি। চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের লীলার দ্বারা পাণিহাটী বাংলার অন্যতম তীর্থে পরিণত। নিত্যানন্দ ১৪৩৮ শকে (১৫১৬ খৃঃ) পাণিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন গ্রামটি সমৃদ্ধ, শ্রীসম্পন্ন এবং পণ্ডিতগণের নিবাসস্থল ছিল। রাজা বল্লাল সেনের সময়ে ১১০২ খৃঃ উহা যে জনবহুল ও প্রসিদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেনযুগে পাণিহাটীর 'করবংশ' বিখ্যাত। 'কর' উপাধিধারী বহু কায়স্থ তখন পাণিহাটীতে বাস করিতেন। কর কায়স্থগণ 'পাণিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ সমাজের মেলবন্ধন বল্লাল সেনের সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাণিহাটীতে উক্ত করবংশজ মাত্র এক ঘর কায়স্থের বাস আছে। পাণিহাটীবাসী জনৈক মকরধ্বজ কর রাঘব পণ্ডিতের অনুরক্ত শিষ্য ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মধুর কণ্ঠের গান শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। ইঁহাদের বংশধরগণ 'পাণিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মকরধ্বজ কর রাঘব পণ্ডিতের 'আত্ম অনুচর'-রূপে বর্ণিত এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে তাঁহাকে 'চন্দ্রকী' বলা হইয়াছে। ইনিই রাঘব পণ্ডিতের 'ঝালি' প্রত্যেক বৎসর বহু বাহকের মস্তকে করিয়া পুরীধামে মহাপ্রভুর সন্নিধানে পৌঁছাইয়া দিতেন। পাণিহাটীর মধ্যস্থলে (মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের ফুল পুকুরের বাগান মধ্যে) 'বনদেবীর আস্তানা' আছে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিবসে আসিয়া হিংস্র পশ্বাদির উপদ্রব নিবারণার্থ ঐ স্থানে বনদেবীর পূজা দেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত

হয়, অতি প্রাচীন কালে গ্রামটি শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পাণিহাটীর ইতিবৃত্ত সংগ্রাহক শ্রীঅমূল্যধন রায় বলেন, পাণিহাটী সহস্র বৎসরাধিক প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ গ্রাম। বাংলায় এত প্রাচীন ও পুণ্য গ্রাম বিরল (১)। ইহার পূর্ব-নাম ছিল পণ্যহট্ট বা পুণ্যহট্ট। বিগত শতাব্দীতেও ইহা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

মহাপ্রভু পাণিহাটীতে দুই বার পদার্পণ করেন—একবার ১৫১৫ খৃঃ অব্দে পুরীধাম হইতে আসিবার পথে এবং আর একবার পুরীধাম যাইবার পথে। প্রথম বার আগমনের কথা 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় বারের কথা শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম বারে পিছলদা হইতে মহাপ্রভু নৌকাযোগে পাণিহাটীতে আসিয়া গঙ্গাতীরস্থ বটবৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টকনির্মিত ঘাটে অবতরণ করেন। তাঁহার পদরজপূত ঘাটটি এখনও ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। বটগাছটি নিত্যানন্দের লীলাস্থল এবং পাঁচ শত বৎসরাধিক প্রাচীন। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থিত ১২৫।১৫০ বৎসরের পুরাতন বটগাছ দেখিবার জন্য আমরা ছুটিয়া যাই; আর পাঁচ-ছয় শত বৎসর প্রাচীন পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত এই বটগাছ দেখিতে কয় জন আসেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইল। বটতলায় লোকারণ্য হইল। সমবেত দর্শনার্থিগণের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইল। মহাপ্রভু ভিড়ের জন্য উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকে ভিড়ের এইরূপ বর্ণনা আছে, "ধরণীর ধূলিরাশি বুঝি এই সব লোকে পরিণত হইল অথবা আকাশে যত তারকা ছিল তাহারা সব মানুষ হয়ে পৃথিবীতে নামিল।" রাঘব পণ্ডিত শশব্যস্ত হইয়া গললগ্নীকৃত-বাসে মহাপ্রভুর চরণে ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহাপ্রভু নাবিককে স্বীয় পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি রাঘবের সঙ্গে লোকারণ্যের মধ্য দিয়া রাঘবালয়ে গমন করিলেন। তখন তিনি জন-সমুদ্রের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। এতদঞ্চলের লোকে প্রেমাবতারকে প্রথম দর্শন করিয়া ধন্য হইল। মহাপ্রভু এক রাত্রি রাঘব-গৃহে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস কুমারহট্টে শ্রীনিবাস সমীপে গমন করিলেন। পুরীধামে প্রত্যাগমন কালে মহাপ্রভুর পাণিহাটীতে অবস্থানের কথা যাহা চৈতন্যভাগবতে বিবৃত আছে তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীবাস-গৃহে কিছু দিন থাকিয়া মহাপ্রভু পাণিহাটীতে রাঘব-মন্দিরে আগমন করেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমের ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে আলিঙ্গন ও কৃপা করিয়া কহিলেন, 'রাঘবকে দেখিয়া আমার সব দুঃখ দূর হইল। গঙ্গাস্নান করিলে যে সন্তোষ লাভ হয় তাহা রাঘব-আলয়ে পাইলাম।' মহাপ্রভু পণ্ডিতকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। রাঘব পরমানন্দে নানা ব্যঞ্জন রাঁধিলেন। নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু আহার করিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক বলিলেন, 'রাঘবের কি সুন্দর পাক! এমন সুস্বাদু শাক আমি কোথাও খাই নাই।' এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মহাপ্রভু-দর্শনে পাণিহাটীতে আসেন। মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "রাঘব, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। নিত্যানন্দ ব্যতীত আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। নিত্যানন্দ আমাকে যেরূপ করান আমি সেইরূপ করি। যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই। তোমার গৃহে সকলেই বিরাজমান। তুমি সাবধানে নিত্যানন্দের সেবা করিও।" ইহার পর রাঘবের প্রিয় শিষ্য মকরধ্বজ করকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদায় আমারই প্রতি করা হইবে, তাহা নিশ্চিত জানিও।"

শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গদেবের আদেশে নিত্যানন্দ নাম-প্রচারের জন্য বাংলা দেশে শুভাগমন করেন। তিনি পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে সর্ব্বপ্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন অভিরাম, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর পিপলাই, সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত, উদ্ধারণ দাস প্রভৃতি বহু ভক্ত। রাঘব পণ্ডিত মহা সমারোহে সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাঘব-গৃহে নিত্যানন্দ কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলেন। মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনের সুন্দর চিত্র চৈতন্যভাগবতে আছে। মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব—এই তিন ভ্রাতা ভজন গাহিলেন। নিতাই যাঁহাকে প্রেমদৃষ্টি করিলেন তিনিই প্রেমে অভিভূত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পাণিহাটী পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে অসংখ্য লোক রাঘব-ভবনে কীর্ত্তন দেখিতে আসিলেন। পাণিহাটীতে নিতাই এত প্রেমবিহ্বল থাকিতেন যে তাঁহার আদৌ বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে চৈতন্যদেব যেমন মহাভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দও তদ্রূপ পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এক দিন মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন সময় নিতাই মন্দিরস্থিত বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রতি আদেশ করিলেন, 'আজ আমার অভিষেক কর।' মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া রাঘব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত হইলেন। তাঁহারা অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল। বহু মৃৎকলসীতে বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যসহ পবিত্র গাঙ্গবারি পূর্ণ করা হইল। দামোদর পণ্ডিত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দের মস্তকে সুবাসিত গঙ্গাজল ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জলস্থল কম্পিত হইল। অভিষেকান্তে রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা নিতাইর শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। নরহরি কর্ত্তৃক শ্রীঅঙ্গ অগুরু-চন্দনচূয়াদিতে চর্চিত হইল। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা তাঁহার গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুসজ্জিত খট্টার দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে প্রভু উপবেশন করিলেন। রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভক্তগণ মহানন্দে বাহ্যজ্ঞানহীন। 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' গ্রন্থে আছে, "প্রভু বাহু ভাবানন্দে প্রেম দৃষ্টি করিয়া চারি দিকে চাহিলেন।" পাণিহাটীতে নিত্যানন্দের

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২২ সালে প্রকাশিত শ্রীঅমূল্যধন রায়ের 'পাণিহাটী মাহাত্ম্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অভিষেক সম্বন্ধে বহু পদ রচিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থে উক্ত অভিষেকের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ সিংহাসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন, 'রাঘব কদম্ব ফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।' রাঘব করযোড়ে কহিলেন, 'শ্রীপাদ, এ সময়ে তো কদম্ব ফুল ফোটে না, কিরূপে আপনার আজ্ঞা পালন করিব?' প্রভু বলিলেন, 'বাটীর মধ্যে যাইয়া একবার তোমার উদ্যান দেখ দেখি, পাইলেও পাইতে পার।' রাঘব বাটীর মধ্যে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া আছে। তদ্দর্শনে রাঘব অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব কদম্ব পুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কদম্বের মালা গাঁথিয়া রাঘব নিত্যানন্দের গলদেশে প্রদান করিলেন। তখন সকলে পরমানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। এইরূপ প্রেমানন্দে সকলে মগ্ন আছেন, এমন সময় ভক্তগণ অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহা সুগন্ধ অনুভব করিলেন। তখন নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও সুগন্ধ তোমরা নাসিকায় অনুভব করিতেছ?' ভক্তগণ বলিলেন, 'হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।' প্রভু—'ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি বুঝিতে পারিয়াছ?' ভক্তগণ—'আজ্ঞে না।' প্রভু—'শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার সুগন্ধ তোমরা পাইতেছ। অতএব সর্বকার্য্য পরিহার পূর্বক কৃষ্ণনাম কর।' এই বলিয়া হুঙ্কারান্তে সর্বলোকের উপর প্রেমদৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর দেহজ্ঞান লুপ্ত হইল। চৈতন্যভাগবতমতে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের কেহ বৃক্ষশাখায় উঠিলেন, কেহ পাতায় বেড়াইলেন কিন্তু পড়িলেন না, কেহ প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, কেহ গুবাকবনে যাইয়া প্রেমবলে ৫।৭ গাছ গুয়া একত্রে তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলিলেন। অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্যাদি প্রেমভাব তাঁহাদের শরীরে উপস্থিত হইল। তখন নিত্যানন্দ তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রচারকার্য্যের উপযুক্ত করিলেন। পারিষদগণের প্রত্যেকে তাঁহার করুণায় সর্বজ্ঞ, বাক্‌সিদ্ধ ও কন্দর্প-দেহ হইলেন। তাঁহারা যাকে স্পর্শ করিলেন সে-ও প্রেমবিহ্বল হইল! এইরূপে নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া নিত্যানন্দ তিন মাস পাণিহাটীতে অবস্থান করেন।

এক দিন নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের মূলে বেদীর উপরে ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া কোটি সূর্য্যের জ্যোতিঃ বিকাশ পূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস দণ্ডবৎ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। জনৈক ভক্ত প্রভুকে সুদর্শন যুবকের পরিচয় দিলেন। প্রভুর দৃষ্টি রঘুনাথের উপর পতিত হইল। তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এস, তোমাকে দণ্ড দিই।' প্রভু ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ ও সঙ্কুচিত ভাবে তিনি পূর্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং তাঁহার মস্তকে পদস্থাপন করিলেন। রঘুনাথ দাস ছিলেন একুশ লক্ষ টাকার মালিক রাজপুত্র। তাঁহার বিশাল জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল নয় লক্ষ টাকা। তাঁহার অপরূপ কান্তি, অতুল বৈভব এবং সুন্দরী স্ত্রী ছিল। তাঁহাকে নিত্যানন্দ দণ্ড দিলেন 'চিড়া দধি আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাও।' রঘুনাথের আদেশে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, কলা, ঘৃত, কর্পূরাদি দ্রব্য তথায় রাশীকৃত করা হইল। বড় বড় মাটির গামলায় গরম দুধ ও চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি, কলাদি দিয়া ভোগের উপযুক্ত করা হইল।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে নিত্যানন্দ মাল্যাদিতে সজ্জিত হইয়া বেদীর উপরে বসিলেন। তাঁহার পার্শ্বে ভক্তগণ ও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট। বৃক্ষতলে শত শত দর্শকের জনতা। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, 'তীরে স্থান না পাইয়া বহু ভক্ত জলে নামিয়া দধি চিপিটক আহার করিলেন।' প্রত্যেককে দুইটি মালসা দিবার জন্য নিত্যানন্দ আদেশ দিলেন, একটিতে দধি চিড়া, অপরটিতে দুগ্ধ চিড়া। বিশ জন পরিবেশক প্রসাদ বিতরণে ব্যস্ত হইলেন। পরিবেশন সমাপ্ত হইলে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে একটি দিব্য লীলা করিলেন। তিনি ধ্যানে আহ্বান করিয়া মহাপ্রভুকে তথায় আনিলেন। মহাপ্রভু আসিতেই নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলের চিড়া দেখিতে লাগিলেন। নিতাই পরিহাস পূর্বক প্রত্যেক গামলা হইতে এক এক গ্রাস চিড়া মহাপ্রভুর মুখে দিলেন। মহাপ্রভুও হাসিতে হাসিতে নিতাইর মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ মাত্র এই প্রেমলীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। নিতাই মহাপ্রভুকে ডান পাশে আসনে বসাইয়া দুই জনে চিড়া খাইলেন। তখন নিতাই সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দের কৃপায় ভক্তগণের গঙ্গাতে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন যমুনা-পুলিনে ভগবানের সঙ্গে আনন্দোৎসবে মগ্ন। পাণিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল। নিত্যানন্দের ভোজন সমাপ্ত হইলে এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বূলাদি যোগাইলেন। রঘুনাথ দাসকে নিতাই প্রসাদ দিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের 'দণ্ড-মহোৎসব।' এই উৎসব ১৪৩১ শকের (১৫১৭ খৃষ্টাব্দের) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি ৪৩০ বৎসর যাবৎ উক্ত তিথিতে প্রত্যেক বৎসর বটতলায় মহোৎসব হয়। আমরা উক্ত উৎসব দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

দিবাবসানে নিত্যানন্দ রঘুনাথাদি ভক্তগণ সঙ্গে রাঘব-ভবনে গমন করিলেন। তথায় কীর্ত্তনান্তে নিতাই প্রভু আহারে বসিলেন। তাঁহার ডান দিকে মহাপ্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন রক্ষিত হইল। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, 'রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, মহাপ্রভু আসিয়া সেই আসনে বসিলেন। রাঘব মহা ভাগ্যবান। তাঁহার গৃহে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজনে মহাপ্রভু বারে বারে আসিতেন।' ভক্তগণ রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিলে রাঘব রঘুনাথকে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'গৌরাঙ্গদেব প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। এখন তুমি আহার কর।' রঘুনাথ সেই রাত্রি রাঘব-ভবনে থাকিয়া পরদিন বটতলায় সপারিষদ নিত্যানন্দের সমীপে প্রণত হইয়া কহিলেন, 'আমি চৈতন্য-চরণপ্রার্থী। যত বার গৃহ ছেড়ে পালাই তত বার মাতা-পিতা আমাকে বাঁধিয়া রাখেন। তোমার কৃপা ব্যতীত চৈতন্য-চরণ অপ্রাপ্য। তুমি মম শিরে তব পাদপদ্ম ধরিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।' তাঁহার কাকুতি শ্রবণে নিতাই ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রের মত ইহার বিষয়সুখ

আছে। চৈতন্য-কৃপায় সেই বিষয়সুখ তুচ্ছ হইয়াছে। তোমরা আশীষ কর যেন সে মহাপ্রভুর কৃপা পায়। যে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের গন্ধ পায় তাহার নিকট ব্রহ্মলোকাদির সুখ তুচ্ছ হয়।' ইহা বলিয়া নিতাই রঘুনাথের মস্তকে চরণ স্থাপন পূর্বক বলিলেন, 'তুমি যে পুলিন-ভোজন করাইলে তাহাতে তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই মহাপ্রভু উৎসবে যোগদান ও দুধ চিড়া ভক্ষণ করিলেন। তুমি অচিরে মহাপ্রভুর কৃপা পাইবে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবে।' রঘুনাথ মহানন্দে গৃহে ফিরিলেন এবং কিছু কাল পরে বুদ্ধদেবের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া পুরীধামে মহাপ্রভু সন্নিধানে গমন করেন।

পাণিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-চরিতামৃত এবং চৈতন্য-ভগাবতাদি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে রাঘব পণ্ডিত এবং তাঁহার ভক্তিমতী ভগিনী দময়ন্তী দেবীর কথা আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় রাঘব পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ পুরীধামে শ্রীচৈতন্য দর্শনে যাইতেন। সেই সময় তিনি তিনটি বাহকের দ্বারা বিবিধ আহার্য্য মহাপ্রভুর জন্য লইয়া যাইতেন। এই জন্য দময়ন্তী দেবী প্রায় এক শত প্রকার আচার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী এই সকল দ্রব্য মকরধ্বজ করের তত্ত্বাবধানে পুরীধামে যাইত। মহাপ্রভু 'রাঘবের ঝালি' হইতে মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিতেন। রাঘবের ঝালির কথা নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত। রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভগবৎ-সেবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অতুলনীয়। রাঘব-গৃহে মদনমোহন দেবের মূর্তি বিরাজিত ও নিত্য পূজিত। তিনি গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ ৫।৭টি ডাব কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবার পর কাটিয়া মদনমোহনকে ভোগ দিতেন। রাঘবের ভক্তিতে সুপ্রসন্ন হইয়া ভগবান সেই নারিকেল-জল পান করিতেন। কখনো তিনি ডাবগুলি জল খাইয়া শূন্য রাখিতেন, কখনো অল্প জল ভরিয়া। ভগবান জল পান করিলে পর রাঘব মহানন্দে শাঁসগুলি কাটিয়া পুনরায় ভোগ দিতেন, এবং ভক্তের ভগবান সেই শাঁসগুলিও ভোজন করিতেন। জীবন্ত জাগ্রত ভগবানের সেবা করিয়া রাঘব কৃতার্থ হইয়াছিলেন। আমরা রাঘব-পূজিত মদনমোহনের মনোহর মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইলাম। আজও সেই মূর্তি রাঘবের জীর্ণ মন্দিরে শোভা পাইতেছেন। ভক্তের আন্তরিক সেবায় ভগবান বাঁধা পড়িয়াছিলেন। রাঘব যখন সজল নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি পুরীধামে বাহার ভোগ ছাড়িয়া রাঘব-মন্দিরে আসিতেন। মহাপ্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাঘব-মন্দিরে ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের কথা কয় জনেই বা জানেন?

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে পাণিহাটীর মহোৎসবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শেষ বার যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি তৎপূর্বে অনেক বার উক্ত উৎসব দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে তিনি বলিতেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে। তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল' কখনো ঐরূপ দেখিস নাই; চল, দেখিয়া আসিবি।" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরীশচন্দ্র, রামচন্দ্র, ও মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পঁচিশ জন ভক্ত সঙ্গে দুইখানি ভাড়া নৌকায় দক্ষিণেশ্বর হইতে পাণিহাটী যাত্রা করিলেন। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহারা পাণিহাটী পৌঁছিলেন। নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বরাবর শ্রীমণি সেনের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহার শুভাগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক বৈঠকখানায় বসাইলেন। তথায় ১০।১৫ মিনিট বিশ্রামানন্তর তিনি তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে রাধা-কান্তজীকে দর্শন করিতে যান। বৈঠকখানার পাশেই ঠাকুরবাড়ী। পাশের দরজা দিয়া তিনি মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে তিনি ভাবাবেশে প্রণাম করিলেন। তিনি যখন প্রণাম করিতেছিলেন, তখন একটি কীর্ত্তন দল উঠানে আসিয়া গান ধরিলেন। প্রণামান্তে ঠাকুর এক পাশে দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিতে-ছিলেন। একটু পরেই তিনি ভাবাবেশে চক্ষের নিমিষে কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞার লোপ পাইল। তিনি কখনো অর্দ্ধ-বাহ্য দশা লাভ পূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখনো সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ (২) বলেন, "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনো অগ্রসর হইতেন এবং কখনো পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতেছিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সাগরে' মীনের ন্যায় সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতে-ছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যমিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।......প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে; বুঝি আনন্দ-সাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ড বেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে, এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। রাঘব পণ্ডিতের গৃহে মদনমোহন দর্শনে যাওয়া স্থির হইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তবৃন্দসঙ্গে মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তন দল তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুই-চারি পদ চলিয়াই তিনি ভাবাবেশে স্থির হইলেন। অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া আবার দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন। এই ভাবে মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী হইতে রাঘব-গৃহে যাইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। ভাবাবেশে নৃত্যকালে ঠাকুরের দেহশ্রীর অপূর্ব শ্রী প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ (৩) এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"তাঁহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি, তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। তাঁহার শ্যাম বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়া-ছিল এবং মহিমা, করুণা, শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই হাসি দৃষ্টিপথে

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ২৭৮—২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ২৭৮।২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পতিত হইবা মাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের পরিধেয় গৈরিকখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।”

রাঘব পণ্ডিতের ভবনে পৌঁছিবার কিছু পূর্বে এক ভণ্ড বাবাজী আসিয়া জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের হাত হইতে এক মালসা ভোগ কাড়িয়া লইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে দিলেন। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবাজীর স্পর্শে তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং ভাবভঙ্গ হইল। তিনি বাবাজী প্রদত্ত প্রসাদ মুখ হইতে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইলেন এবং অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদ-কণিকা গ্রহণ করিলেন। রাঘব-মন্দিরে দেবতা দর্শন ও স্পর্শন এবং বিশ্রামাদিতে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া ঠাকুর নৌকায় উঠিলেন। এখানে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। কোন্নগরবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসবের ভিড়ে ঠাকুরকে দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি নৌকায় ঠাকুরকে একাকী দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহাকে স্পর্শ করাতেই তিনি অসীম উল্লাসে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য পূর্বক ঠাকুরকে স্তবস্তুতি এবং বার বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে ঠাকুর তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। ঠাকুরের কৃপালাভে নবচৈতন্যের এমন পরিবর্তন হইল যে তিনি সংসার হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক স্বগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণ কুটীরে অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। নিত্যানন্দের রঘুনাথকে কৃপা করার সঙ্গে ঠাকুরের নবচৈতন্যকে কৃপা করার তুলনা হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই অবতারের লীলায় পাণিহাটী তীর্থীকৃত।

সে দিনের মহোৎসবে বহু সহস্র নর-নারী এবং কয়েকটি কীর্তন দলের সমাগম হইয়াছিল। আমরা গৌরাঙ্গ প্রভু-মন্দির, মণি বাবুর কালী-মন্দির, গাঁদের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরাদিও দর্শন করিলাম। বরাহনগরে পাটবাড়ীতে গৌরাঙ্গ প্রভু মন্দিরের ন্যায় পাণিহাটীর প্রভু-মন্দিরে অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত আছে।

উৎসবানন্দে সমগ্র দিবস কাটাইয়া সন্ধ্যায় আমরা নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া মোটর বাসে বেলুড় মঠে ফিরিলাম। পাণিহাটী তীর্থের পূর্ণ স্মৃতি বহু দিন হৃদয়-মন পূত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছিল।
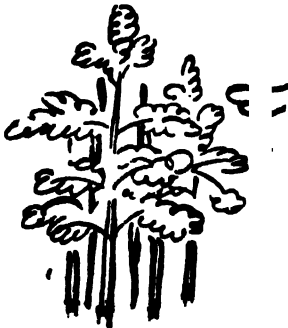
মিথ্যা হোক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মিথ্যা হোক মিথ্যা হোক
বন্দী রাত, ক্ষুব্ধ মন, এ-দুর্দিন, দুঃখ-শোক
মিথ্যা হোক।
বিদ্যুতের গাঢ়-শাণিত চোখ মেলুক, রাত পোহাক,
ছিন্ন হোক দুঃস্বপন, রুদ্ধশ্বাস মুক্তি পাক,
পৃথ্বীময় লুণ্ঠনের এ-নির্মোক
মিথ্যা হোক।

মাটিতে নীড় বেঁধেছিল যে-লক্ষ লোক
অচিরে তারা শঙ্কা থেকে মুক্ত হোক,
আত্মঘাতী আরক্তিম শাণিত চোখ
ক্ষান্ত হোক, শান্ত হোক।

মিথ্যা মানা বেদনা ভয় ভ্রান্তি আর শূন্যতায়
যৌবনের ঝড়েরা আসে ঝড়েরা যায়,
ঝরা পাতার মরা পাতার চৈত্রময়
বসন্তের বদলে নামে দুঃসময়।

মৃত্যুহিম কী নিঃসাড়
রাতের রোদ ছড়িয়ে গেল কালাপাহাড়!
ভস্ম ভিটে, ভগ্ন বুক, দীর্ণ এই দগ্ধ খাক্
শূন্য থাক?
কিছুতে না—
নিরাশ্রিত নিষ্পেষিত লক্ষ লোক
আমার ধন-ধান্যে-জনে পূর্ণ হোক।

অরণ্যের কৃষ্ণসার
বুকের নীচে ব্যাকুলতা কি ব্যর্থ তার?
সে নয় শুধু হিংস্রকেরি ভীরু শিকার;
আবার তার বন্য চোখ
হরিণীদের স্বপ্ন পেয়ে ধন্য হোক,
পাখিরা বয়ে আনুক গানে উদ্বেলিত সুখের দিন
ভীরুতাহীন।
বন্দী রাত, দুঃস্বপন, ভ্রান্তি, আর মৃত্যু-শোক
মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৯

ডাক্তারের অনুমান সত্য হ'লো না। মাধবের বয়স হয়েছিল, তা ছাড়া দেহে ও মনে···ও ছিল দুর্ব্বল। আঘাত ওর দেহের পক্ষে গুরুতর না হ'লেও মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভীষণ। মস্তিষ্কের কোন শিরা ছিঁড়ে গিয়ে ওর পা দু'টোকে অসাড় করে দিলে কিংবা ভয়েই ও স্বাভাবিক হ'তে পারলে না বোঝা কঠিন। যাই হোক, ডাক্তার বললেন, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। একবার কলকাতায় নিয়ে যাও ওকে। মাথার শির ছিঁড়লে হয় ও মারা যেত—না হয় পক্ষাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হতো। অতিরিক্ত নার্ভাসনেসের দরুণই হয়তো পা দু'টোর বল কমে গেছে।

কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য পুরন্দরের নেই। মাধব বসে বসে এ-ঘর ও-ঘর এ-উঠোন ও-উঠোন করতে লাগলো—খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারলে না।

বাসুর আঘাতটাও কম নয়। একে তো ওর স্মৃতিশক্তির ধারা সতেজ নয়। লেখাপড়া হ'লো না ওই কারণেই। নতুবা বাসু অবাধ্য নয়—দুষ্ট নয়। বলতে গেলে অমনোযোগীও নয়। কিন্তু স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে না বলেই ওর জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ইটের আঘাত ওর স্মৃতিকে আরও দুর্ব্বল করে দিলে।······ও সেরে উঠলো, কিন্তু এক ঘণ্টা আগের কথা এক ঘণ্টা পরে আর মনে করতে পারে না। সদা-সন্তুষ্ট স্বভাবে দেখা দিল খুঁৎখুঁতুনি। পেট ভরে খেয়ে—খানিক পরে বায়না ধরে খাবার জন্য।

যে দু'টি শক্তি সংসারের ভারকেন্দ্রে সংযুক্ত হ'য়ে মসৃণ গতির সহায়ক হয়ে পুরন্দরকে নিরুদ্বিগ্ন করে রেখেছিল এত দিন—তাই ভারস্বরূপ হ'য়ে উঠলো। ওরা প্রায় কাজের বাইরে চলে গেল। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের বায়না ফিরিয়ে দিতে হ'লো—ওদের দিয়ে ডাকের সাজ তৈরী চলবে না। একখানি প্রতিমার সাজ তৈরীর ভার সে নিজে নিলে শুধু। ফুল-বাগান অযত্নে হতশ্রী হ'তে লাগলো। আগাছারা তুললে মাথা—ফুলের গাছ তাদের আওতায় কোন রকমে প্রাণে বেঁচে রইলো। ফুলের জোগান দেওয়ার দায় নেই, কাজেই দু'-একটি গাছে যা ফুল ফোটে তাই যথেষ্ট। সেই দু'-একটি গাছকে মাধব অতি কষ্টে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে গিয়েও আগাছামুক্ত করে। না হ'লে বাগানের কোন চিহ্ন থাকতো না।

শরীরা আর আসে না—পাড়ার বেশির ভাগ লোকই এ বাড়ির সঙ্গে অসহযোগ করেছে মনে হয়। যে মাসে ক্যুনিষ্ট পার্টির একটা মিছিল বেরিয়েছিল। অপূর্ব্ব না কি সে মিছিলটি পরিচালনা করেছিল সুষ্ঠুভাবে। তাতে যোগ দিয়েছিল উত্তরপাড়া—দক্ষিণপাড়া। মাঝখানের পাড়া থেকেও গরীব ঘরামি মিস্ত্রিদের দল থেকেও কিছু লোক এসেছিল। মোট কথা, সর্ব্বজাতির সম্মেলনে কাস্তে-হাতুড়ি-আঁকা লাল ঝাণ্ডায় শোভিত মিছিলটি হয়েছিল দেখবার মতো। অপূর্ব্ব তাকে বলতে এসে ফিরে গিয়েছিল—সে দিন বাসুর জ্বর উঠেছিল একশো'-পাঁচ। তার পর আর কোন সভা বা শোভাযাত্রা এ গ্রামে হয়নি। পুরন্দর নিজের কাজে ডুব দিয়েছে গভীর ভাবে। একলা একলা—কাজের মাঝখানে ডুবে মনে হয়েছে আশ্চর্য্য এ পৃথিবী! জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে নতুন রূপে দেখতে পেলে জনতাকে—নতুন রূপে আবির্ভূত হ'লেন গ্রাম-লক্ষ্মী। দুপুরের নির্জ্জন আসর বা রাত্রির গভীর মুহূর্ত্ত—পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে কোন্ অলক্ষিত নির্দ্দেশে অজানার পানে। চলতে চলতে তারা থমকে দাঁড়িয়েছে পুরন্দরের অর্গলমুক্ত দুয়ারের সামনে। সেই গতিপথের উপর নিস্তব্ধ কয়েকটি ইঙ্গিত শুধু পড়ে রইলো। দুপুরে ঘুঘুর ক্লান্ত স্বর আর রাত্রির তারার আলোর কাঁপুনি তাকে উধাও করে নিয়ে যায় কল্পলোকে। দুঃখ-উদ্বেগহীন—শান্ত সুবিস্তীর্ণ এক অমৃত-সাগর মৃদু ঊর্ম্মি-মর্ম্মরে কানে বাজে। সে সমুদ্র-তটে জাতির পর জাতি শুভ্র ফেনপুষ্পের অঞ্জলি হ'য়ে পড়ে আছে। তাদের অন্তরের বিক্ষোভ কোন্ মহামন্ত্রে নির্ব্বাণলাভ করেছে কেউ জানে না। ঢেউ থেকে উদ্ভূত হ'য়ে ঢেউ থেকে কত বিভিন্ন তারা। এ সব তো কল্পনা—মন বাস্তব-বিমুখ হলে এমনি স্বপ্নজাল বুনতে ভালবাসে। কি মধুর স্বপ্ন সব! হাঁ, নির্ব্বিঘ্ন এক প্রশান্তি—এই সব স্তব্ধ মুহূর্ত্তের পালক থেকে খসে এই ঘরের মধ্যে জমা হতে থাকে দিনের পর দিন। নতুন জগৎ—নতুন অনুভূতি। কেউ নেই—না পাশে—না সম্মুখে—না পিছনে, কেউ আসবে না ভবিষ্যতে—হয় ত কেউ ছিলও না অতীতে—তবু অভাব বোধ হয় না। শক্তির জোয়ার আসচে কোথা থেকে। তিথি অনুযায়ী জোয়ার নয়—প্রতিনিয়ত তা আসচে—সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—জনতা থেকে মুক্ত হয়ে—কার্য্যে ও কর্ত্তব্যে মেশা জোয়ার। সে শূন্য নয়—শ্রান্ত নয়—নিরানন্দ নয়। আশ্চর্য্য এ পৃথিবী, আর বিচিত্র মানুষের জীবন!

এই অনুভূতি না থাকলে পুরন্দর পাগল হ'য়ে যেত।

এক দিন দুপুরে বিশ্বাসদের সেই ছেলেটি এলো। সেই অদ্ভুত নামের ছেলেটি—লেনিন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ত্রাতা এবং নিরীশ্বর দেশের ঈশ্বরও হয়তো। কিন্তু বাংলার মাটিতে কাশ্মীর পেয়ারার চারা।

একখানা কার্ড দিয়ে বললে, মিটিং হবে—বালিকা বিদ্যালয়ের উঠোনে। আসবেন নিশ্চয়।

পুরন্দর বললে, মিটিংএ গিয়ে করবো কি? আমার ভাল লাগে না।

সে কি! আপনি না গেলে চলে? বিদেশ থেকে সভাপতি হয়ে আসচেন অধ্যাপক ব্যানার্জ্জী। শুনেছি তিনি আপনার কলেজ-ফ্রেণ্ড।

. পুরন্দর বললে, মিটিং শেষ হ'লে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করবো। আর জানই তো বক্তৃতা দেবার ভার দেশের মান্যগণ্যদের।

লেনিন বিশ্বাস হেসে বললে, মান্যগণ্যদের আপনিও তো চেনেন। সভা সাজানো ছাড়া ওঁদের দ্বারা আর তো কিছু হয় না।

পুরন্দর বললে, সভার সজ্জাটাও দরকার।

লেনিন বিশ্বাস বললে, না—যেতে হবে আপনাকে। বলতেও হবে কিছু। জানেন তো এত বড় গ্রামে একটা হাই ইংলিস ইস্কুল নেই মেয়েদের। ওই এম-ই'টা যে আছে—ও'ই কি ভাল ভাবে চলে?···আর একটা ইস্কুল হবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে দক্ষিণপাড়ায়।

পুরন্দর কথা দিলে, যাবে। অনেক দিন বাইরে কোন সভা-সমিতিতে যোগ দেয়নি ও। তাই কৌতূহল হলো যাবার। সভা-সমিতিতে গেলে গ্রামের নাড়ীস্পন্দন বেশ বুঝতে পারা যায়। যারা

বলতে পারে না—তারা সহিষ্ণু শ্রোতার মত সব তাতেই ঘাড় নাড়ে, যারা বুঝতে পারে না তারা যে কোন বক্তৃতা শেষে হাততালি দেয়। আর যারা বলে—তারা নিজেদের কথাই বলে। গ্রামকে টানে না—সমাজকে টানে না—সাধারণের মঙ্গলকেও না। ঝগড়া হয় এই নিয়ে—মীমাংসা হয় না। কতকগুলি প্রস্তাব ভোটের জোরে মঞ্জুর হয়ে খাতার কালির হরফে থাকে লিপিবদ্ধ, কর্ম্মে সজীব হয় না কোন কালে। অনেক মিটিংই মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। এক জন দেশকামী ডাক্তারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটা মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কোন সাধারণ হলে অথবা তিন-মাথা কোন রাস্তার সংযোগ-স্থলে—এই প্রস্তাব পাঁচ বছর আগে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফল হ'য়েছে কি? গেল বারও কোন পরম বৈষ্ণবের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি রাস্তার নামান্তকরণ হবে কথা ছিল। হয়নি তা। মিটিংএর উৎসাহ ঘরে এলেই নিবে যায় এটি মিথ্যা নয়—কিন্তু তার চেয়ে সত্য হ'চ্ছে যে মানুষ মরে গেল—তাকে জীবিতদের মধ্যে এমন ভাবে জীইয়ে রাখার কি সার্থকতা! যারা বেঁচে আছে তারাই তো সব বড়—এর থেকে পরম সত্য আর কি আছে? তবে মিটিং ড'কা কেন? স্মৃতিরক্ষার এই আয়োজন করা কেন?—তারও কৈফিয়ৎ এক জন এক দিন কথা-প্রসঙ্গে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আর্থিক খরচ না করে মানুষ যদি মহত্ত্বকে বজায় রাখতে পারে সেই তো পরম লাভ। আমরা যা পারিনি অথচ করবার চেষ্টা করেছিলাম তা ঐ লিপিবদ্ধ প্রস্তাবগুলি থেকে আমাদের বংশধরেরা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। তাঁরাই করবেন সম্পূর্ণ আমাদের অসম্পূর্ণ কাজ।

কিন্তু বংশ-পরম্পরার ধারা এ গাঁয়ে একটু ব্যাহত হয়নি। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহরা আজ নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছেন গ্রাম থেকে—তাঁদের অনেক দান-ধ্যান-পুণ্য-পরোপকার সত্ত্বেও।

যথাসময়ে সভায় যাবার জন্য পুরন্দর বাড়ি থেকে বেরুলো। তামলিপাড়ার মধ্য দিয়ে দালালপাড়ায় পড়তে হবে। তার পর মোড় ঘুরে কলুপাড়া বাঁয়ে রেখে পৌছবে বিশ্বাসপাড়ায়।

বিশ্বাসপাড়ায় ঢুকবার মুখেই হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো সুপ্রসাধিতা নম্রতা। পায়ে হাই-হীল—পরনে চোদ্দ-হাতি জরিপাড়ের শাড়ীটা কুঁচিয়ে পরা—কানের দুলে ঝুলছে দাড়িম্ব-কোষের মত লাল টুকটুকে চুনি—এলো খোঁপায় গোঁজা আছে একটি আধ-ফুটন্ত অ্যামেরিকান বিউটি গোলাপ। মুখে ক্রীম-পাউডার আর ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষেছে কি না বলা যায় না—মোট কথা, মুখখানি লাবণ্য-প্রভায় উদ্ভাসিত। এই সাজে—ওর বয়স কৈশোর অতিক্রম করেছে মনে হয়।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নম্রতা বললে, এ কি, সেজে-গুজে চলেছেন কোথায়?

পুরন্দর বললে, বালিকা বিদ্যালয়ে একটা মিটিং আছে।

যাবেন আমাকে নিয়ে? টপ করে ও অনুরোধ করলে।

আপনি! কিন্তু—আপনি তো মিটিংএ যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরোননি? প্রশ্ন করলে পুরন্দর।

নেমন্তন্নে এসেছিলাম! তা মিটিং তো নেমন্তন্নের ব্যাপার নয়? বলে নম্রতা হাসলে।

পুরন্দর বললে, আপনার মেজ কাকা হয়তো—

নম্রতা বললে, মেজকা' আপত্তি করবেন? মোটেই না। ও হরি, আপনি বুঝি ভাবছেন,—আমি বিনা নেমন্তন্নে মিটিংএ যাচ্ছি? বলে হেসে সে ব্লাউজের মধ্য থেকে একখানা সাদা চিঠি বার করলে।

যদি রাত হয়—তাই বলছি। পুরন্দর ইতস্ততঃ করলে।

রাত হবে না। মেজ্‌কা' পারমিশন না দিলে কি এদের বাড়িই আসতে পারতাম ছাই! চলুন—চলুন। বলে এগিয়ে এসে পুরন্দরের পাশে দাঁড়ালে।

চলতে চলতে বললে, যদি রাত হয়—তাই তো যাব কি যাব না ভাবছিলাম। আপনাকে পেলাম—ব্যস।

একটু পরে শ্রীধরের বৈঠকখানার সামনে এরা এলো। বৈঠক-খানায় অনেক লোক রয়েছে মনে হ'লো। বাড়ির উঠানেও লোক জমেছে। একটা মিশ্র কোলাহল উঠছে। কেউ কেউ বাইরে আসছে হাসিমুখে। যারা এসেছে—অধিকাংশই দুঃস্থ গৃহস্থ। কিছু সাহায্য পাবার জন্য তারা এখানে এসেছে। কারো হাতে পুঁটুলি —কারও গায়ে নতুন গেঞ্জি দেখে পুরন্দর নিঃসংশয় হ'লো—এটা দাতব্য-গোছের একটা কিছু।

একটু দাঁড়ালো সে। ভেতরে ফটিক তখন হাঁকছে, ননী প্রামাণিক—ননী প্রামাণিক। দেখ দেখি—এ জামাটা গায়ে হয় কি না। বলে একটা গেঞ্জি তার কাঁধে ছুড়ে দিলে।

জামাটা গায়ে দিয়ে ননী বললে, চালের বরাদ্দটা আর কিছু যদি বাড়িয়ে দেন—

ফটিক বললে, বরাদ্দ বাড়বে! বলে—আসচে মাস থেকে পাও কি না সন্দেহ। দু'হাজার টাকা দিয়েছেন মাত্তর দু'জনে। তিন মাস ধরে চাল পেলে—কলাই পেলে—গেঞ্জি পেলে। আবার যদি কেউ কিছু দেয়—

শ্রীধর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—মিছে বক্‌-বক্ করো না ফটিক। পাঁচটায় ইস্কুলের মিটিং—যেতে হবে। চটপট্ বিদেয় কর ওদের। হঠাৎ জানলার দিকে নজর পড়াতে হাঁকলেন, কে? কে ওখানে?

ফটিক বললে, পুরন্দর।

শ্রীধর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, আরে—দাঁড়িয়ে কেন, এস, এস। এই গরিবদের চাল-কাপড় বিলি করেই—আমিও যাব।

পুরন্দর বললে,—আপনি আসুন—আমি এগোই।

ওঃ, সঙ্গে মহিলা রয়েছেন বুঝি? তা—আচ্ছা—এগোও—এগোও। বলে হাসলেন।

নম্রতা বললে, ভদ্রলোকের হাসিটা কি বিশ্রী!

পুরন্দর শুনলে শ্রীধর ফটিককে জিজ্ঞাসা করছেন, ও মেয়েটা কে রে ফটিক?

ফটিকের উত্তর ওরা শুনতে পেলে না। পথের এক জন লোককে পুরন্দর জিজ্ঞাসা করলে, এই সাহায্য কাদের দেয়া হয় জান?

লোকটি বললে, যারা খুব গরিব—উপায় করতে পারে না —তাদের।

তা এত কম লোক কেন?

আজ্ঞে বাবু—সব জাতকে তো দেয়া হয় না। ময়রা ছাড়া—

আরও এগিয়ে এলো দু'জনে।

পুরন্দর হেসে বললে, আচ্ছা বলুন তো—পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে না পিছিয়ে যাচ্ছে?

অবাক্ হয়ে নম্রতা ওর মুখের পানে চেয়ে এক মুহূর্ত্ত থেমে বললে, আপনার কথার ধরণে মনে হ'চ্ছে পৃথিবী পেছুচ্ছে।

ঠিক—ঠিক। শব্দ করে হেসে উঠলো পুরন্দর।

মিটিং শেষ হতে সন্ধ্যে উতরে গেল। নম্রতাকে বাড়ি পৌঁছে দিলে পুরন্দর।

৩০

পৃথিবী পিছিয়ে যাচ্ছে—এই গাঁয়ে বাস করে অনেক বার মনে হ'য়েছে পুরন্দরের। কেন মনে হয় তা জানে না। কিন্তু মনে হয়। এখানকার মাটি অত্যন্ত কঠিন—আবহাওয়া রুক্ষ। বাইরে থেকে তাজা বীজ আমদানি হলেও জমির গুণে ও হাওয়ার গুণে তা অঙ্কুরেই নষ্ট হ'য়ে যায়। তবু বাইরে থেকে বীজ আসে। দিন-কতকের জন্ত তা নিয়ে উৎসাহ ও শক্তির অপব্যয় হয়। মনে হয়, সমুদ্রের মাথায় চেপে এবার যে বড় তরঙ্গটি তীরের দিকে আসচে—সে বুঝি তটের সীমানা ছাড়িয়ে বহু আবর্জ্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঢেউ মাঝ-পথে ভেঙ্গে যায়—তটে এসে পৌঁছায় শান্ত জলের খানিকটা আবেগ—আবর্জ্জনার একাংশও যে স্পর্শ করতে পারে না।

উনিশশো-পাঁচ সালে এসেছিল ঢেউ। যারা জলে ভাসল—তারা কূলে উঠলো না কেউ। উনিশশো-একুশে তার চেয়ে বড় ঢেউ এলো। কূলে আর জলে একাকার হ'লো বুঝি। কিন্তু দেখা গেল কূলের থেকে জল অনেক দূরে; যারা ঝাঁপ দেবে বলে দাঁড়িয়েছিল—তারা ঝাঁপ না দিয়ে প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরে এলো। তার চেয়ে বড় ঢেউ এলো উনিশশো-ত্রিশে। সংশয়বিজ্ঞ জনেরা হিসাব করতে লাগলেন—এর পরিণামটা কি? পরিণাম প্রতীয়মান হ'তেই তাঁরা হেসে বললেন, কেমন—বলেছিলাম না? কি যে বলেছিলেন কারো স্মরণ হ'লো না অবশ্য. তবে তার চেয়েও সর্ব্বনাশা ঢেউ যা এসেছিল উনিশশো-বিয়াল্লিশের আগষ্টে—তাকে সবাই উপেক্ষা করলে চোখ বুজে। সবাই সহর্ষে বললে, খুব বেঁচে গেছি।

তার পর এলো দুর্ভিক্ষ। এ গাঁকে ছুঁতে পারলে না রাক্ষসী—শুধু ভয়-দেখানো গল্পের খোরাক রেখে পাশ কাটিয়ে গেল। তার পর মারী—সে-ও নেপথ্য থেকে হুঙ্কার দিয়ে চলে গেল। তখন কালো-বাজারের অথৈ জলে কমলার সোনার পদ্মটি ভেসে এসে লেগেছে এর তটে। সে পদ্ম আজও ফুটে আছে সেখানে। তার রূপেই এরা মুগ্ধ হয়ে উঠল। ছাব্বিশে জানুয়ারি—যে দিবস—আগষ্টের পুণ্য স্মৃতি এ সব উৎসবের মধ্যে ঠাঁই পেলে না, জার্ম্মাণীর পতন হ'লো—জাপান পরমাণবিক বোমার ঘায়ে ভেঙ্গে পড়লো—দুর্জ্জয় ফ্যাসিবাদ বিশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে মুছে গেল। গেল তো গেলই—এ গাঁয়ে তার উৎসবও কেউ করলে না। সোনার পদ্মের রূপে আর গন্ধে এদের ইন্দ্রিয়-দ্বার অবরুদ্ধ।

কে এদের বোঝাবে পৃথিবী চলছে কোন্ দিকে? আহ্নিক গতি এগিয়ে চলে বর্ষের দিকে। বর্ষের শাণিত চক্রে টুকরো টুকরো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয় যা কিছু পুরাতন—যা কিছু আবর্জ্জনা—তার সঙ্গে শুভ ও শান্তির অনেকখানি। এরা তা বোঝে না। এদের পৃথিবী চলছে পিছনের দিকে—কিংবা চলছেই না—থেমে আছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর শান্ত-শিষ্ট বশম্বদ ভারতবর্ষের প্রতিবিম্ব এর সর্ব্বত্র লেগে রয়েছে। এরা চোখ বুজে বিপদ এড়াবার কৌশল শিখেছে।

একটা নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ করে এ গাঁয়ে উত্তেজনা ও উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠলো। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির আয়ুষ্কাল আগামী মাসে শেষ হবে। নতুন নির্ব্বাচনের জোড়-জোড় চলেছে এখন থেকেই। সাব ডিভিসনের এস-ডি-ও হলেন প্রেসিডেন্ট; নির্ব্বাচনের দিন তিনি উপস্থিত থাকবেন। ইস্কুল কমিটিতে যাঁরা আছেন—তাঁরা বলতে গেলে বায়ত্তী স্থিতিবান স্বত্বের মতই স্বত্ববান। গতানুগতিকতার এক চুলও এ-দিক্ ও-দিক্ দিয়ে চলেন না কেউ। মিটিংএর সময় অনেকে পান চিবুতে চিবুতে গল্প করেন পাশের লোকের সঙ্গে—বয়সের দোষে কেউ কেউ ঝিমোন। যা করবার হেড মাষ্টারের নির্দ্দেশে সেক্রেটারিই করেন। খাতায় মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হয়—এঁরা সই করেন···নিজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করলেন ভেবে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হন। ফলে হোঁচট খেয়ে চলতে চলতে ইস্কুল এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সামনে তার প্রকাণ্ড গহ্বর। ও-ধারে নতুন একটা ইস্কুল খুলেছে। ওরা হাফ ফ্রীতে ছেলে নিচ্ছে বলে বহু ছেলে চলে গেছে এই ইস্কুল থেকে। পাঁচশো থেকে ছাত্র-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শো-দশ কি বারো। সরকারী সাহায্য হয়তো বন্ধ হ'য়ে যাবে এই আশঙ্কা মাষ্টারদের মনে জাগছে। গত ক'বছর থেকে ম্যাট্রিকের ফলও তেমন সন্তোষজনক হ'চ্ছে না। কেউ বুঝতে পারছে না—কার্য্যকরী সমিতির বায়ত্তী স্থিতিবান সভ্যদের জাড্য থেকে মাষ্টারদের শিক্ষাদান প্রণালীর ঢিলেমটা সংক্রামিত হয়েছে কি না। পাঠে অমনোযোগিতা—খেলায় উৎসাহ—অভিভাবকদের মুখের উপর উত্তর-প্রত্যুত্তর—এ-ও প্রায় সকল ছাত্রের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। তবু নতুন কিছু করবার আগ্রহ কারো দেখা যাচ্ছে না। খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড় এই বজায় থাকলেই সভ্যেরা ও মাষ্টারেরা এবং অভিভাবকরাও মনে করবেন যথেষ্ট হ'লো। টেনে হিঁচড়ে ম্যাট্রিকটা যদি পার হ'তে পারে—চাকরির বাজারের প্রবেশপত্র ওদের বাতিল করে কে? কিংবা পাস যদি না-ও করে—কিছু অঙ্ক ও ইংরেজি শিখেও ব্যবসায়ে বা দালালীতে কিংবা আর কিছুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে ওরা। মন্দকে ভাল করবার পন্থা তাঁদের না জানবারই কথা। তাই নির্ব্বাচনে এবারও বায়ত্তী স্থিতিবানদের স্থিতির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত অত্যন্ত গোপনেই চলছে।

সাধারণের জিনিষ—গোপনে কিছু করাও মুস্কিল। তরুণ দল দাঁড় করিয়েছে মেজ বাবুর ভাইপো অপূর্ব্বকে, পুরন্দরকে; মুসলমানদের পক্ষ থেকে সিরাজকে আর গোয়ালাপাড়ার সুরেনকে। দু'পক্ষেই প্রচার-কার্য্য চলছে জোর।

স্কুল-কমিটিতে ভূপেন সেন বহু দিন থেকে বায়ত্তী স্থিতিবান স্বত্বে স্বত্ববান। শ্রীধর, শশীকান্ত, রজনী, এঁরাও প্রাচীনতম সভ্য। এঁদের মধ্যে আঁতাত হয়েছে—আর কাউকে এ ব্যূহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। মুসলমানদের তরফ থেকে নূতন লোক আসবে ইব্রাহিম—কারণ, অতিবৃদ্ধ মহম্মদ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। সবাই বলছে—এ রোগ ওকে কবরের পানেই ঠেলছে—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। পক্ষান্তরে, ইব্রাহিম রেশনের গোটা কতক জিনিষ নিয়ে ইতিমধ্যে শাঁসে-জলে শরতের ডাবটি হ'য়েছে। ওর পূর্ব্ব-দুষ্কৃতি নুবজন

দৌলতের দৌলতে প্রায় ধুয়ে-মুছে গেছে। বাবা ডেকেছেন ঘরে—পড়সীরা দিয়েছে সম্মান। ওকে না নিলে কমিটি সম্পূর্ণ হবে না। তা ছাড়া, প্রত্যেক বারে যে পরিবর্ত্তন হয় তা-ও এই ভাবে। পরিবর্ত্তন কিছু হলে উপরওয়ালাও খুশী হন।

ভূপেন সেন বৃদ্ধ কাউকে দেখলেই আক্ষেপ করেন, এইবার ছোঁড়াগুলো খাবে ইস্কুলের মাথা। জানেন তো সেন মশাই, আজ পঁচিশ বছর বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে এলাম দেশের এই প্রতিষ্ঠানটিকে, আজ কতকগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে—

বৃদ্ধ সেনজা তাঁকে আশ্বস্ত করেন, ইস্কুল নষ্ট হতে দেব না, আমরা সবাই আপনাকে ভোট দেব।

ভূপেন সেন অমায়িক ভাবে হেসে বলেন, আপনাদের দয়া আর প্রভুর ইচ্ছের কোন গতিকে সংসার বলুন—সন্তান বলুন—সব বজায় আছে। দেখবেন, চ্যাংড়াদের ভাঁওতায় ভুলবেন না যেন।

পাগল হ'য়েছেন! বলে বৃদ্ধ সেনজা উচ্চ হাস্য করে ওঠেন।

হাবুল ময়রার দোকানে দু'পয়সার বাতাসা কিনতে গিয়ে এই ভাবে মনের দুঃখ প্রচার করলেন ভূপেন সেন। বললেন, হাবুল, দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে। দেব-দ্বিজে কারও ভক্তি নেই। এই আমরা যত দিন আছি তত দিনই হরির লুটের জন্যে তোর বাতাসা যা বিক্রী হবে, এর পর দেখিস্—কেউ কিনবে না; আর ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড তো জানিস্? স্লেচ্ছাচারের শেষ নেই। মুরগী খায়—মোছলমান বাড়ি যায়—মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্ত্তি করে—ওদের অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই। তা বাবা বুঝে-সুজে এবার ইস্কুল কমিটির ভোটটা দিবি। আমরাই আছি পুরানো—ইস্কুলের হাড়-হদ্দ সব জানি—

হাবুল ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, আজ্ঞে, বাপ-পিতমোর বয়সী আপনারা—আপনাদের ছেড়ে কাকে আবার ভোট দেব?

ভূপেন সেন চলে যেতেই যতীন এসে দাঁড়ালে দোকানে। বললে, ভণ্ডটা কি বলছিল রে?

হাবুল হেসে বললে, ইস্কুলের ভোট ওনাদের দিতে।

চোখ পাকিয়ে যতীন বললে, খবরদার! ওই ঘুঘুগুলোকে ভোট দেবে কি তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে ছাড়বো। দু'মাস বিছানায় শুয়ে ফেনে-ভাতে খাওয়াবো।

হাবুল হেসে বললে, আরে না—না, আমার কি আর জানের ভয় নেই?

যতীন বাজারে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, ওই ঘুঘুগুলোকে যদি জব্দ না করি তো—

তা এমন ভাবে জব্দ করবে—এ কল্পনা কেউ করতে পারেনি। আর শিষ্ট মানুষ জব্দ হলে দুষ্ট মানুষ প্রকাশ্যে এমন নির্লজ্জের মত হাসি-টিটকারি করতে পারে—এ ধারণাও কারো ছিল না।

বাতাসা-কেনার পরের দিন সকাল বেলা ভূপেন সেনের বাড়ির কাছে, লোকে লোকারণ্য। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটেছে—কৌতুকের খোরাকও এর মধ্যে যথেষ্ট আছে। বড় রাস্তার ধারেই ওঁর মাঝারি গোছের দোতলা বাড়ি। নীচে-ওপরে খান চারেক ঘর—তার কোলে চওড়া ঢাকা বারান্দা, ছোট্ট একটু উঠোন আছে পূব দিকে। তাতে ঝাঁঝাপুষ্ট একটি শিউলি গাছ—গোটাকতক গন্ধরাজ, করবী, জবা ফুলের গাছ—আর প্রাচীরের কোণে সুদৃশ্য মঞ্চে একটি কালো তুলসীর গাছ। তুলসী গাছে গ্রীষ্মকালে ঝারি দেবার জন্য লোহার শিখ পোঁতা আছে মঞ্চে; কার্ত্তিক মাসে তারই উপর জ্বলে আকাশ-প্রদীপ। একটি গৈরিক বর্ণের পতাকা সব কালেই পত্-পত্ করে উড়ছে তার উপর। এদিকে প্রাচীর তত উঁচু নয়—যদিও দরজাটা প্রকাণ্ড। যে দিক্‌টা বাড়ির পিছন অর্থাৎ পশ্চিম দিক্—সেই দিকের একতলা সমান উঁচু প্রাচীরের মাথায় ভাঙা কাচের টুকরো পোঁতা—চোর কিংবা বাঁদর ঠেকাবার জন্য—কে জানে? সেই দিকের একতলার ঘরের দেড় হাত চওড়া পাকা গাঁথুনির দেওয়াল—ডাকাত ঠেকানোর জন্যও হতে পারে। যে দু'টি ছোট জানলা সেই ঘরে আছে—তার লোহার শিকগুলি মোটা আর ঘন। জানলার বাইরে লোহার জালতি দিয়ে সেটিকে দুর্ভেদ্য করা হ'য়েছে। জনশ্রুতি—এইটে ভূপেন সেনের ভাঁড়ার ঘর। ঠিক এর উপরের ঘরেই সেন শয়ন করেন।

গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে বাড়ির পিছনের এই সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে। সেখানকার দৃশ্যও অপূর্ব্ব। ছোট জানলায় লোহার জালতিগুলো কেটে এক পাশে গুটিয়ে রয়েছে, জানলার কপাট খোলা। কিন্তু দেখবার ওখানেও কিছু নেই। সেই ঘরের নালা দিয়ে তরল যে পদার্থ গড়িয়ে এসে পথের ধারের পগারকে প্রায় ভর্ত্তি করে দিয়েছে—সেইখানে দাঁড়িয়ে লোকে হাসিমুখে হায় হায় করছে। প্রায়-দুষ্প্রাপ্য কেরোসিন তেলের এমন প্রাচুর্য্য যে গ্রামের লোকে দেখবে আশা করেনি। তেল দেখে ওদের ক্ষোভ আর আনন্দ দুই-ই হয়েছে অপর্য্যাপ্ত।···ভিন্ন পাড়া থেকে ছুটে এসেছে গরিব মুচি—মুসলমান—বাগ্‌দী ও কৈবর্ত্ত-গোয়ালাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি। হাতে তাদের নারকেল মালা, হাঁড়ি ভাঙা, টিন, চটা-ওটা কলাই বা তোবড়ানো এলুমিনিয়মের বাটি। সেই সব পাত্রে সংগ্রহ করছে কাদা-মাখা এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। পাত্র ভরে চলে যাচ্ছে ছুটে—আবার আসছে দল বাড়িয়ে। ওদের জমেছে খেলা—দর্শকদের জমেছে কৌতুক আর বাড়ির মধ্য থেকে ভেসে আসছে স্ত্রী-কণ্ঠের জোরালো অভিশাপ, গাল ও কান্নার শব্দ।

কেউ বলছে, সেন কি তেলের চোরা-কারবার ফেঁদেছিল? কেউ বলছে, না—নিজের জন্যে বোর্ড করেছিল।

কেউ বলছে, যাই হোক—বেচারার কি ক্ষতিটা বল তো?

কেউ বলছে, বেশ হ'য়েছে। আমাদের ঘর অন্ধকার—ওর ঘরে জ্বলবে আলো? বেশ হ'য়েছে।

বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন ভূপেন সেন—অনেকগুলি লোকের মধ্যবর্ত্তী হয়ে। শ্রীধর, শশীকান্ত, ফটিক এবং এ-পাড়া ও-পাড়ার আরও অনেক প্রবীণ আছেন।

শশীকান্ত বললেন, কি কি নষ্ট হ'য়েছে একটা লিষ্ট তৈরী কর তো ভূপেন।

ভূপেন সেনের কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখে মনে হ'লো, ক্ষতির আবর্ত্তে পড়ে ওর ভগবদ্ভক্তি কোথায় গুলিয়ে গেছে। সম্পদের শিখরে বসে যে প্রভুর মহিমা-কীর্ত্তনে ওঁর সুগৌর মুখে পরিতৃপ্তির জ্যোতিঃ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতো—কণ্ঠ হতো গদগদ—অঙ্গে জাগতো রোমাঞ্চ—এই আর্থিক ক্ষতির আঘাতে সেই স্বর্গচ্যুত হয়ে বুক ও গাল চাপড়ে ও মুখে হায় হায় রব করে যে আর্ত্তি প্রকাশ করছেন—তা যে কোন প্রাকৃত লোকের পক্ষেও লজ্জাকর।

মাথার চুল টেনে ভূপেন সেন করুণ কণ্ঠে বললেন, এক-ঘর

জিনিষ—এক বছরের ষ্টক সব নষ্ট করে দিয়েছে কেরোসিন তেল ঢেলে। ওই দেখুন, নর্দ্দমা দিয়ে গড়াচ্ছে তেল—এক টিন আধ টিন নয়—চার-চার টিন।

কটিক অলক্ষ্যে হেসে বললে, এত তেল কখনও ঘরে রাখে সেনজা?

ভূপেন সেন বললেন, এ কি এক দিনের জমা-করা তেল। যুদ্ধ বেধে অবধি প্রত্যেক বছর এক টিন করে তেল কিনে রিজার্ভ করে আসছি। মাসে মাসে যা বরাদ্দ পাই তাতে কোন রকমে চালাই—ওতে হাত দিই না। আমার এ সর্ব্বনাশ যে করেছে—পট্‌-পট্‌ করে হাতের আঙুল মট্‌কে তিনি কলহনিপুণা বর্ষীয়সীর মত গাল দিতে লাগলেন—সেই অমূর্দ্ধষ্ট ক্ষতিকারককে।

চার দিক্‌ থেকে ভেসে এলো হাসি-ঠাট্টার রোল।

শশীকান্ত তার হাত ধরে বললেন, বাড়ির মধ্যে চল।

ভূপেন সেন চারি দিকের কৌতুকে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। শশীকান্তর হাত ছাড়িয়ে বললেন, কারো সর্ব্বনাশ—কারো পৌষ মাস। আবার খাবলা খাবলা করে তেল নেয়া হচ্ছে। যেন সব বাবাকালীর তেল পেয়েছে।—বলে কোথাও কিছু না পেয়ে একখানা থান ইট তুলে নিয়ে তেল-সংগ্রহকারীদের দিকে তাড়া করে গেল।

ছেলে-মেয়েরা ছুটে পালালো।······জনতা হাততালি দিয়ে উঠলো, ওরে ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে!

শ্রীধর ও শশীকান্ত দু'দিক্‌ থেকে এসে ভূপেন সেনকে চেপে ধরলেন।

শশীকান্ত বললেন, ছিঃ ভূপেন, করছ কি? বাড়ীর মধ্যে চল।

শ্রীধর জনতার পানে চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, এর ব্যবস্থা এখনি হচ্ছে। থানায় খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—যারা করেছে এ কাজ তাদের হাতে দড়ি পড়তেও দেরি হবে না। আমরা তাদের জানি।

ভূপেনকে টেনে নিয়ে ওঁরা বাড়ির মধ্যে ফিরে এলেন। চাবি খোলা হ'লো ভাঁড়ারের। ঘরটায় কেরোসিনের দুর্গন্ধ, গ্যাসের মত নিশ্বাসকে ভারি করে তুলছে। চালের বস্তা—চিনির বস্তা—তেঁতুলের হাঁড়ি—আলুর রাশি—ঘি, সরষের তেল, মশলা-পাতি—সব টেনে এনে জড়ো করা হ'য়েছে ঘরের মাঝখানে।···সেই স্তূপের ওপর ঢালা হ'য়েছে ওই চার টিন কেরোসিন। যেমন চৈত্র মাসে নীলের পর্ব্বে মহাদেবের মাথায় ভক্তে ঢালে দুধ, গঙ্গাজল, ফল ও বেলপাতা। এ কার্য্য এক জনের বা দু' জনের নয়—দলবদ্ধ ভাবে সুশৃঙ্খলে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে—রাত্রির মধ্যযামে। দুর্ব্বৃত্তরা জানালার জাফরি ও গরাদে কেটে ঘরে ঢুকে কতক্ষণ ধরে ধীরে-সুস্থে এ কাজ করেছে—কে জানে? উপরের ঘরে শুয়ে সামান্য খুট-খাট শব্দ যদি কাণে এসেই থাকে, সেটা ইঁদুরের দৌরাত্ম্য ভেবে মানুষ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে কেন? কেরোসিনের গন্ধ? তা-ও বাতাসে তেমন উগ্র হ'য়ে ওপরে পৌঁছায়নি। কাল শরীরটা ভাল ছিল না বলে রাত বারোটার পর তবে ভূপেনের নিদ্রাকর্ষণ হয়। আর গলিটা হ'চ্ছে কয়েক সরিকের ঘরোয়া গলি। রাত দশটার পর এদিকে জন-প্রাণী আসে না।

শ্রীধর বললেন, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে খবর পাঠানো হ'য়েছে। যাদের সন্দেহ হয়—নির্ভয়ে তাদের নাম করবে।

ভূপেন সেন বিহ্বল ভাবে বললেন, কার নাম করবো?

শশীকান্ত বললেন, ন্যাকার মত কথা বলো না ভূপেন। তুমি কি জান না, কে বা কারা এই দলে রয়েছে?

ভূপেন মাথা নেড়ে বললেন, ওরা ডাকাত—ওদের নাম করলে আমায় আস্ত রাখবে না।

শ্রীধর বললেন, মানে? ইংরেজের রাজত্বে খুন করে কেউ পার পাবে?

ভূপেন বললেন, আমিই যদি খুন হ'লাম তো তাদের ফাঁসি দিয়ে কার লাভ?

শশীকান্ত বললেন, পাগলামী করো না ভূপেন। আমরা রয়েছি না?

ভূপেন হাত জোড় করে বললেন, আমাকে মাপ করো দাদা। কমিটি থেকে নাম আমি উইথড্র করে নেব।

দাঁতে দাঁত রেখে শ্রীধর বললেন, কাওয়ার্ড!

এক পক্ষের আক্ষেপ আর অন্য পক্ষের মজা দেখার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি পরিসমাপ্ত হ'লো।

দারোগা আক্ষেপ করে বললেন, আমরা কি করতে পারি বলুন? কোন জিনিষ চুরি গেলেও না হয়—

শ্রীধর দাঁতে দাঁত রেখে অস্ফুট স্বরে বললেন, ইন্‌এফিসিয়েন্ট!

পরের দিনে যে ব্যাপারটা ঘটলো তা আরও বিচিত্র। গ্রামের শেষে···কয়েকটা প্রকাণ্ড আম বাগান ছিল। বছর তিনেক হ'লো তারই গোটা দুই বাগান শ্রীধর কিনেছিলেন জলের দরে। এক কেতায় প্রায় বিঘে কুড়ি জমি—যদি ভাল ভাল আমের কলম বসিয়ে বাগান তৈরী করতে পারা যায়—ভবিষ্যতে মোটা আয় দাঁড়াবে এই সম্পত্তির। যুদ্ধের বাজারে কয়লা দুষ্প্রাপ্য,—জ্বালানী কাঠের দর চড়েছে চার-পাঁচ গুণ। তা ছাড়া মোটা মোটা গুঁড়িগুলো দরে বিক্রী হবে। নিজেকে কিছুই করতে হ'লো না। শহর থেকে গোলাদার এসে মোটা টাকায় কনট্রাক্ট করলে বাগান দু'টো। দু' মাসের মধ্যে আমগাছগুলো কেটে নৌকোয় আর রেলে চালান করে দিলে—জমি হ'য়ে গেল সাফ। শক্ত করে বেড়া দিয়ে ঘিরে—জমিতে দু'বার লাঙ্গল লাগিয়ে শ্রীধর কলা গাছের সঙ্গে পুঁতলেন—হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, সরিখাস, পেয়ারাফুলি, আলফানসো, ফজ্‌লি, কিষেণভোগ প্রভৃতি ভাল ভাল আমের কলম। ধারে-ধারে লাগালেন লিচু, পেয়ারা, গোলাপ-জাম আর জামরুলের গাছ। আর বেড়া ঘেঁষে বসালেন আনারস গাছ।

দু' বছরেই গাছগুলি স্বাস্থ্যে ঝাঁকড়া হ'য়ে উঠলো। এক জন বাগান জমা নেওয়া নিকিরী বললে, আর পাঁচটা বছর গেলে বাগান হবে বার নাম! হেসে-খেলে দেড়টি হাজার টাকা উঠে আসবে। সবই তো জাত আম।

কলমের নামগুলি শ্রীধর টুকে রাখলেন একটা খাতায়। সেই সঙ্গে একটা প্ল্যানও গাছের নম্বরের সঙ্গে পরিচয় মিলিয়ে সেই খাতায় আঁটা রইলো। নাম হলো বাগানের—আশ মশায়ের বাগান।

পরের দিন সকালে মাঠে যেতে যেতে লোকে দেখলে—কলমের গাছগুলি একটিও মাথা তুলে নেই। যেন নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে চাঁদ দেখে কোন দুর্নামভীত ব্যক্তি নিজের সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই প্রবাদ-প্রচলিত কার্য্যটি সুসমাধা করেছে নির্ব্বিঘ্নে। গাছ কেটেই সে ক্ষান্ত হয়নি—তিন-চার জায়গায় বেড়া ভেঙে গরু-ছাগলের প্রবেশ-পথ সুগম করে দিয়েছে। ক্ষুধার্ত্ত রাতচরা অনেকগুলি গরু কর্ত্তিত গাছ চর্ব্বণ করে এধার ওধার ঘুরছে।

খবর পেয়ে দল-বল নিয়ে শ্রীধর যখন এলেন—তখন কুড়ি বিঘে জমিটা বিরাট গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কর্ত্তিত শাখা নিঃশেষ

গর্বিতা

শ্রীনির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

তুমি বড় লোকের মেয়ে, জানি,
তবুও তোমার দেমাক-ভরা চালটা
একটু থামাও, গরবী।

তোমার যে চোখের তারায়
শ্রাবণঘন মেঘের সজল ছায়া,
তোমার জোড়া-ভ্রূর বঙ্কিম ভঙ্গে
বিছিয়ে আছে কৃষ্ণ-রাত্রির
গভীর শান্তি!

তোমার কি দেমাক সাজে?

তোমায় যখন দেখি,—
আমি আপনাকে ভুলে যাই,
ভুলে যাই,—
আমি পাইনি' শিক্ষার আলোক,
আভিজাত্যের ছোঁয়া
লাগে নি আমার দেহে-মনে।
রুক্ষ সহরের উগ্রতা
যেই আমার মাঝে।

বাংলা মায়ের শ্যামল পল্লীতে
দোয়েল শ্যামা ডাকের সাথে,
কোকিলের কুহু স্বরে স্বর মিলিয়ে
আমি বাঁশি বাজাই।
একতারাতে তার চড়িয়ে
আমার রাতের সভা মুখর করে তুলি।
তোমার কি তা ভাল লাগবে না!

তুমি জানো না,
তোমার চোখের কোণে
লুকিয়ে আছে সেই শ্যাম পল্লীর ছায়া,
প্রচুর অবসর, প্রচুর আলস্য,
কর্ম্মব্যস্ততা হারা বিশাল একটা
আবেশ-ঘন ছুটি।

যখন তুমি নাচ তে ওঠো
তোমাদের ওই সিংহ-সদনে,
ললাটে শুভ্র চন্দনের পত্রলেখা
সরস সুন্দর তনুদেহটি ঘিরে
সবুজ শাড়ীর বঙ্কিম ভঙ্গ।
সে এক অপূর্ব ব্যাপার।

গানের সাথে সাথে
সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভাষাকে তুমি মূর্ত্ত ক'রে তোল
নৃত্যের সাবলীল ছন্দে।

আমার মনে হয়
তোমাকে যেন ঘিরে আছে
একটা অপার মাধুর্য্য, শুভ্র চারুতা।
আমার মনটা রজনীগন্ধার গন্ধ হ'য়ে
জড়িয়ে থাকে তোমার কোমল তনুটিরে।

আমাদের পাশে এসে বোসো
প্রশান্ত সকালে,
আমরা সজীব হ'য়ে উঠি,
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শাল
তোমায় ছায়ায় ঢেকে রাখে,
অশোক তোমায় দেখে
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়।

শিল্পী তুমি,
তুমি কখনো কঠোর হ'তে পার না!
অনেক সময় ব্যাকুল হ'য়ে উঠি
ছুটে তোমার কাছে যেতে চাই
আবার থমকে দাঁড়াই।

তুমি বড় লোকের মেয়ে।
তোমায় মিনতি করি,—
তোমার দেমাক-ভরা চলনটা
ছাড়ো গরবী!

তোমার যে চোখের তারায়
শ্রাবণ-মেঘের সজল ছায়া,
তোমার জোড়া ভ্রূর বঙ্কিম ভঙ্গে,
উদাস আত্ম-ভোলা দৃষ্টিতে,
বিছিয়ে আছে কৃষ্ণ-রাত্রির গভীর শান্তি।

করে নূতন উৎসাহে প্রাণীগুলি কলাগাছে মনোনিবেশ করেছে। হায় হায় করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেনি।

ভূপেন সেনের মত শ্রীধর হায় হায় করলেন না। ফটিকের মুখ দিয়ে একবার 'উঃ!' ধ্বনি বার হবামাত্র কট্‌মট্‌ করে তার পানে চেয়ে ধমক দিলেন, চুপ।

বহু ক্ষণ চেয়ে রইলেন নিরাভরণ বাগানের পানে। ফাঁকা আকাশের মত ধূ-ধূ করছে বাগান। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমিতে। জমি নয় রণক্ষেত্র। ছিন্ন কাণ্ড, শাখা ও পত্র—গরুর খুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে—দীর্ণবক্ষ কলা গাছের ঝালর-শোভিত পত্র মনে হচ্ছে—উড়ো জাহাজ থেকে বোমা ফেলে কে বুঝি বিস্ফোরণের শক্তি পরীক্ষা করে গেছে এই কুড়ি বিঘে জমিটার ওপর। সকালে শিশির-ধোয়ানো রোদ অত্যন্ত কোমল প্রলেপের মত জমিটার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রীধরের চোখে জল এলো না—জ্বালা করতে লাগলো চোখ।

আর কারও পানে চাইলেন না শ্রীধর। সোজা বাড়ির পথ ধরলেন।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চানন ঘোষাল

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত জনতা এসে পড়েছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় খালি মানুষের মাথা আর মাথা। জনসমুদ্র যেন অবিরল ভাবে বয়ে চলেছে। কনুইএর গুঁতা দিতে দিতে জনতার সমুদ্র ভেদ করে অতি কষ্টে তাঁরা এগিয়ে চললেন। আশ্রম-গুরু সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকট তাঁরা যখন পৌছুলেন তখন তাঁদের বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেছে। সকলেই ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত, তাঁরা আর দাঁড়াতে পর্য্যন্তও পারেন না। দেহ ও মন একত্রে ক্লান্ত হলে মানুষের অবস্থা এমনিই হয়ে থাকে। আশ্রম-গুরু ইতিপূর্ব্বেই ঘটনাটি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করে নিয়েছেন। প্রণব এবং শৈলেশ বাবুকে সম্মুখের আসনে উপবেশন করতে বলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও সুকোমল সুরে আশ্রম-গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের পরিচয়? একটু পরিচয় দাও?"

আশ্রম-গুরুর সম্মুখে আসা একটা ভাগ্যের বিষয়ই ছিল। গুরুজীর এই প্রশ্নে তাঁরা কৃতার্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু, তাঁকে তারা নিজেদের সম্বন্ধে কি পরিচয় দেবে। কর্ম্মজীবনের পরিচয়ই তাদের সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। এ ছাড়াও তাদের আরও পরিচয় আছে। একটু আমতা আমতা করে প্রণব বাবু বললেন, "যে পরিচয়টা আজ আপনার কাছে আমাদের দিতে হবে সেইটেই কিন্তু আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়, তাই গুরুদেবের কাছে আমাদের পরিচয় দিতে একটু সঙ্কোচ আসছে।"

আশ্রম-গুরু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় দিতে লজ্জা করে এমন কি পরিচয় আছে?" উত্তরে প্রণব বাবু সলজ্জ ভাবে বললেন, "আজ্ঞে, গুরুদেব, আমরা পুলিশ অফিসার।"

"ওঃ, তাই।" গুরুদেব বললেন, "আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েই এখানে এসেছি গুরুদেব।" সলজ্জ ভাবে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করার জন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অধ্যাপক খোকন বাবুর খোঁজেই আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতো দূর পর্য্যন্ত গড়াবে তা আমরা কল্পনাও করিনি। আসলে লোকটা হচ্ছে এক জন দুর্দ্দান্ত খুনে গুণ্ডা এবং এক প্রখ্যাত দস্যুদলের সর্দ্দার।"

"লোকটা যে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, তা তো চাক্ষুসই দেখলাম।" আশ্রম-গুরু উত্তর করলেন, "কিন্তু যে লোকটি আমাদের বিশ্ব-ভারতী পত্রিকাতে প্রবন্ধ পাঠাতো, সে লোকটা তা হলে কে?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "সে-ও ঐ একই ব্যক্তি গুরুদেব। তবে ওর মতবাদ বা যুক্তিবাদটি আপনার কাগজে প্রবন্ধ লিখেছে বা

শৈলেশ এবং প্রণব বাবু বহুক্ষণ ধরে খোকা বাবুকে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোথাও আর তাঁরা খোকা বাবুর সন্ধান পেলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা সভাস্থলে ফিরে এসে দেখলেন, মূল সভা ভেঙ্গে গেছে, এবং তার বদলে ইতস্ততঃ অনেকগুলি ছোট ছোট উপসভা বসে গেছে। ছোট ছোট দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে এই দিনকার এই অদ্ভুত ঘটনা সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল। প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবুকে আরও অনেকের সঙ্গে ঐ স্থানে ফিরে আসতে দেখে জনতার লোকজন ছুটে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো। উভয়েই যেন এক একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ। জনতার লোক তাদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে দিতে থাকে। প্রণব এবং শৈলেশ বাবু প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী পান্থশালার ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবুকে দেখে ম্যানেজার বাবু বলে উঠলেন, "আরে, আপনারাই না—"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আমরাই চিঠি না লিখে এসেছি।"

ম্যানেজার বাবু এইবার ক্ষেপে উঠে বললেন, "হাঁ, তাই তো। চিঠি লিখে এলে তো বুঝতেই পারতাম আপনারা কে। কিন্তু—" সেক্রেটারী মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এই কথাই আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারাই বা কে এবং অধ্যাপক খোকনই বা কোথাকার লোক?"

"সব কথাই তো বলতে রাজী আছি, কিন্তু তা বলতে আপনারা দিচ্ছেন কৈ?" প্রণব বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর করলেন, "এখন এই জনতার হাত থেকে উদ্ধার করুন তো আমাদের, প্রাণটা আগে বাঁচুক তা'র পর সব কথা শুনবেন।"

"কিন্তু মশাই বড্ড বেঁচে গেছেন"—ম্যানেজার বাবু বললেন, "ছুরিটা তো আর একটু হলেই কর্ম্ম কতে করে দিয়েছিল।

"তা থাক এখন আপনার ও সব কথা" সেক্রেটারী মশাই বললেন, "এখন চলুন আপনি সর্ব্বাধ্যক্ষের কাছে। তিনি ডেকেছেন আপনাকে।"

যে ব্যক্তিটি এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করেছে, আসলে সে এক জন সংবাক্তিস্ট—পণ্ডিতও। প্রবন্ধগুলি আমিও পড়েছি এবং চমৎকৃতও হয়েছি। তাকে হয়তো আপনি আর ফিরে পাবেন না, কিন্তু তার ঐ লেখাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে অমূল্য রত্নরূপেই বিরাজ করবে। ঐ সব প্রবন্ধ লেখবার মত প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু যে ব্যক্তিটিকে আপনি ঐ ভাবে পালিয়ে যেতে দেখলেন, ঐ একই দেহে বাস করলেও সে এক জন সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিরই ব্যক্তি। খুন ডাকাতি অপরাধ করার পর মাঝে মাঝে সে নিরাময় হয়ে এক জন নিরপরাধ মানুষ হয়ে উঠছে। কিন্তু এই অপরাধ-বিরাম অবস্থাতেও সে তার কর্ম্ম-শক্তি হারায়নি। তার পূর্ব্বস্মৃতিগুলি সে এই অবস্থাতে প্রবন্ধাকারে লিখে তো রাখতোই, এমন কি এই সময়টুকুতে সে অনেক ভালো কাযও করেছে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন? খোকন বাবু শুধু লেখক বা দস্যু-সর্দ্দার নয়, সে বাঙ্গলার বাইরের দুই-তিনটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকও বটে।

সমবেত সকলে খোকা বাবুর এই কাহিনী মুগ্ধ হয়েই শুনছিলেন, এমন সময় একটা ব্যাগ হাতে আশ্রমের এক জন কর্ম্মচারী সেখানে এসে জানালেন, "অধ্যাপক খোকন পান্থশালাতে এই ব্যাগটা, কিছু কাপড়-চোপড় এবং দুইখানা চিঠি ফেলে গেছেন। চিঠি দু'খানা কাযে লাগতে পারে বলেই নিয়ে এলাম। এই চিঠির একখানি তো প্রণব বাবুকেই লিখেছেন মনে হয়।"

"বলেন কি মশাই, আমাকে লিখেছে?" প্রণব বাবু বললেন। উত্তরে কর্ম্মচারীটি বললেন, "আজ্ঞে হাঁ, এই নিন না চিঠি দু'টো।"

প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি কর্ম্মচারীটির হাত হ'তে চিঠি দুটো তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করলেন। প্রথম চিঠিটি খোকা বাবু হেনা দত্তকে লিখেছিলেন। তবে তখনও পর্য্যন্ত উহা ডাকঘরে দেওয়া হয়নি। চিঠিখানিতে এক স্থানে লেখা ছিল,—

"আমি বেশী দিন এখানে থাকবো না। অধ্যাপনা করা আমার ধাতে সইবে না। সে প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যানই করেছি। তবে এবার থেকে আমি সামাজিক জীবনই যাপন করবো। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দেওঘরে যাচ্ছি, বিলাসী টাউনে আমার নিজের বাড়ীতেই আমি থাকবো। তুমি কিন্তু আর মিথ্যা মরীচিকার পিছন পিছন ঘুরো না। আমার যদি মত চাও তো আমি বোলবো যে প্রণব বাবু আমার চেয়ে ঢের ভালো লোক। তাকে ভুল বুঝলে তুমিই কষ্ট পাবে।"

অপর চিঠিখানা খোকা বাবু প্রণব বাবুকেই লিখছিলো। অসমাপ্ত চিঠির এক স্থানে খোকা বাবু লিখেছে,—

"আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি সম্পূর্ণরূপেই নিরাময় হয়েছি। আমার জীবনের সকল গুপ্ত কথা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। তাই এ কথা আপনাকে লিখছি। অধস্তন পৃথিবীতে বোধ হয় আর আমি ফিরে যাব না। আজ বিদায়ের দিনে একটা কথা আপনাকে আমি বলে যেতে চাই। মিস্ হেনা দত্তকে আপনি ভুল বুঝবেন না। তিনি এখোন একটি সাময়িক উন্মাদনা রোগেই ভুগছেন। একমাত্র আপনিই তাঁকে বাঁচাতে পারেন। কোনও দিন যদি তাঁকে আপনি এতটুকুও স্নেহ করে থাকেন, তা হলে তাকে বিপথে যেতে দেওয়া আপনার উচিত হবে না। আমার মতে আপনার উচিত, হেনা দেবীর কাছে গিয়ে আমার আসল স্বরূপ সম্বন্ধে তাকে বুঝিয়ে বলে আমার প্রতি তার ঘৃণা এনে দেওয়া। আমার প্রকৃত স্বরূপ যদি আদালতকে বুঝাবার মত স্পর্দ্ধা রাখেন তা হলে আপনার সংগৃহীত তথ্যতালিকা দ্বারা সে কথা হেনা দেবীকেই বা বুঝাতে পারবেন না কেন?"

পত্রের পঠনকার্য্য শেষ হলে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে কি স্যার কলকাতাতেই এখোন ফিরে যাবেন, না অন্য কোথাও রওনা হবেন?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "না শৈলেশ, বেরিয়েছি যখন, তখন এর শেষ কোথায় তা দেখবো।"

"তা হলে স্যার", শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কি দেওঘরেই রওনা হবেন?"

প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "হাঁ ভাই, তাই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। ঐ দেওঘরেই আমরা যাত্রা করবো। তুমি চট করে কলকাতার হেড কোয়ার্টারে আমাদের বর্ত্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটা স্মারক-লিপি (ডায়েরী) পাঠিয়ে দাও। বাকি যা কিছু ব্যবস্থা করবার তা আমিই করবো।"

বাংলার বাহিরেও বাংলা দেশ আছে। এই বহির্ব্বাংলার মধ্যে দেওঘর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান। এইখানকার কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারও এক জন বাঙালী। দেখলে কিন্তু তাকে বাঙালী বলে আর চেনা যায় না, নামটা পর্য্যন্ত বিকৃত করে পুরাপুরি তিনি দেশবালীই সেজেছেন। সেই দিন কায-কর্ম্ম সেরে সন্ধ্যার দিকে তিনি একটু বাইরে বেরুচ্ছিলেন, এমন সময় এক জন পাহারা এসে খবর দিলে "হুজুর, কোলকাত্তা সে দো ইনিস্পেকটার বাবু আয়া হ্যায়। বহুৎ জরুরী কাম হ্যায়, মুলকাৎ মাঙতা। বাবু লোক আ গিয়া, হুজুর। আইয়ে বাবু সাব। বড়বাবু মজুত হ্যায়। বাত কি জিয়ে।"

শৈলেশ বাবুকে নিয়ে থানায় ঢুকে প্রণব বাবু বললেন, "ওঃ, আপনিই বড়বাবু বুঝি?"

উত্তরে বড়বাবু মহীন্দ্রনাথ বললেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা আসুন আসুন, বসুন।"

প্রণব বাবু বললেন, "এক বড় কেইসের ব্যাপার নিয়ে এসেছি। কোলকাতার এক প্রখ্যাত খুনে গুণ্ডা আপনাদের এখানে ডেরা বেঁধেছে। লোকটা কোলকাতার কুমুরটুলি অঞ্চলে থাকতো। শুনেছি, বিলাসী টাউনের দিকে তার একটা বাড়ীও আছে।"

উত্তরে বড়বাবু মহীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বললেন? কুমুরটুলির লোক? তা তাকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। ঐ অঞ্চলে কুমুরটুলির রাজা বাবুও তো থাকেন। আমাদের মহকুমা হাকিমের সঙ্গে ওঁর খাতির আছে। রাজবাড়ীর লোকেদের জিজ্ঞাসা করলে সহজেই লোকটার পাত্তা পাওয়া যাবে। রাজা বাবুও সম্প্রতি কোলকাতা থেকে এসেছেন।"

কুমুরটুলির এই রাজা বাবুটি যে কে হ'তে পারে, তা বুঝতে প্রণব বাবুর আর বাকি থাকেনি। শঙ্কিত হয়ে শৈলেশ বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এখোনই তার আর দরকার হবে না। তা' ছাড়া রাজবাড়ীর চাকর-বাকরদের সঙ্গে ওর

সত্ত্বও তো থাকতে পারে। আমরাই নয় চুপে-চুপে ঠিকানাটা খোঁজ করে নেবো এখন। তবে আপনাকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে, খবর পেলেই চলে আসবেন। ইতিমধ্যে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমি সশস্ত্র পুলিশের বন্দোবস্ত করে নেবো।"

"গুণ্ডাটাও তাহলে সশস্ত্র আছে। কি পিস্তলও একটা বাগিয়েছে বুঝি? সর্ব্বনাশ!" নগর-কোটাল মহীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে মশাই ওই ব্যবস্থাই ভালো। তা যাই হোক, ও-সব তো কাল সকালে হবে। এখোন আসুন, আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ও থাকার বন্দোবস্ত তো করে দিই। তা ছাড়া আপনারা বাঙ্গালী আ'ছেন। হামার দেশ এক কালে বাংলায় ছিলো মশাই।"

পুলিশদের অতিথি হতে হ'লে ত তাদের থানাতে তথা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বাসগৃহেই হতে হয়। পুলিশ পুলিশকে না দেখলে কে'ই বা আর তাদের দেখবে। এই ভদ্রতাটুকু অন্ততঃ গ্রাম্য পুলিশ-সমাজ এখনও হারায়নি. প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু সানন্দেই মহীন্দ্রনাথ বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

আহারের পর তাঁদের বিশ্রামের জন্ত একটা শয্যা প্রস্তুত করে দিয়ে মহীন্দ্র বাবু বললেন, "আজ আর কেইস কেইস না করে ভালো করে একটু ঘুমিয়ে নেন। বুঝলেন মশায়! আমি তা হলে আসি, কেমন?"

ধন্যবাদ জানিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও যে আ'ছে। এই হাতীয়ারগুলো এখোন রাখি কোথায়?"

উত্তরে মহীন্দ্র বাবু বললেন, "এতে আর কি মুস্কিল আছে বলেন, হামাকে দিন, হামি সে মালখানায় রাখিয়ে দিচ্ছি। হামাদের ভি পিস্তল-উস্তল ঐ মালখানামে রাখিয়ে দিই, হামাদের মালখানাতে আভি তিনটো খোকা আউর বহুৎ খাবার ভি আছে।"

অপরাধীরা সাধারণতঃ পিস্তলকে 'খোকা' বা 'ঘোড়া' বলে থাকে এবং গুলী-গোলাকে তারা বলে 'খাবার'। মহীন্দ্র বাবুর কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "আচ্ছা, তাহলে রেখে দেন এইগুলো সব।"

মহীন্দ্র বাবু চলে গেলে উভয়ে আরাম ক'রে শুয়ে পড়লেন। কষ্টার্জ্জিত সুখের মত আর সুখ নেই। তাই ঐ দিনকার খাতের স্তায় শয্যাও তাদের ভাল লেগেছে

ট্রেণের জার্ণিতে উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিছানার উপর শুয়ে পড়ে প্রণব বাবু বললেন, "দেখলে, এরা কি রকম অতিথি-পরায়ণ, জামাইএর চেয়ে এরা আমাদের আদর করে। এক বৌ এনে দেওয়া ছাড়া আর সবেরই তো বন্দোবস্ত করলে। কিন্তু এরা কোলকাতায় গেলে এদের সঙ্গে ভালো করে আমরা কথাই বলি না। এদের মেঠো পুলিশ বলে দূরেই সরে যাই।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "কিন্তু এ জন্ত স্তার আমরা দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছে কোলকাতা শহর। শহরে আবহাওয়া মানুষের স্তায় মানুষের মনকেও বদলে দিয়ে থাকে। এই জন্তই আমরা এইরূপ করে থাকি।"

প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "তা যা করেছো তা করেছো আর করো না। এই ভদ্রলোক কোলকাতায় গেলে অন্ততঃ একটু বায়স্কোপও দেখিয়ে দিতে হবে।"

"তা না হয় দেখানো যাবে এখন কিন্তু—" শৈলেশ বাবু বললেন, "আমাদের এখানে শুইয়ে রেখে নিজে বার হলেন কোথায়? রিওয়ার্ডের লোভে বা বাহাদুরী নেবার জন্তে আসামীর খোঁজে খোদ রাজা বাহাদুরের সঙ্গেই না আবার দেখা করে বসেন তা হলেই তো কর্ম্ম ফতে!"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "তা আর করা যাবে কি? ওদের হাতে যখন পড়েছি, তখন সব দিক্ সামলে নিয়েই চলতে হবে। ওরাই যদি ধরে ফেলে তাতেই বা ক্ষতি কি? তবে ধরতে পারলে হয়, ভদ্রলোক বেঘোরে না প্রাণটা আবার হারিয়ে ফেলেন। যাক্ গে যাক্। রাতটুকু কাটিয়ে নিয়ে ভোরে উঠেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। একটু অন্ধকার থাকতে থাকতেই রাজা বাহাদুরের বাড়িটি লোকেট্ করে আসতে হবে, বুঝলে?"

প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু মনে করেছিলেন, খুউ-ব ভোরে উঠেই তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন, ভোরে তাঁরা উঠেও ছিলেন, কিন্তু উঠি-উঠি করে কখন যে আবার তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন তা টেরও পাননি। বিদেশ বিভূঁই হলেও এদিন তাঁদের ঘুমটা ভালোই হয়েছিল।

হঠাৎ জেগে উঠে তাঁরা দেখলেন, ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। শৈলেশ বাবুকে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "এই, শীগ্‌গির উঠে পড়ো। আর দেরী নয়। এক্ষুণি আবার মহীন্দ্র বাবু এসে পড়বেন। ওঁরা আসবার আগেই বেরিয়ে পড়ি এসো।"

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবেন, বিলাসী টাউনের দিকে?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "আজ্ঞে হাঁ। কেন, ভয় করছে না কি?" তুমি তোমার গোল টুপিটা পরে ফেলো। আমিও আমার আচকানটা চাপিয়ে নেবো। বেমালুম দেশবালী সেজে নিতে হবে।"

প্রণব বাবুর নির্দ্দেশ মত বেশভূষা করতে করতে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন. "আচ্ছা স্তার, ও কি বিলাসী টাউনেই আছে বলে মনে হয়? আমার মনে হয়, ও থাকে তো য়ুরোপীয়ান কোয়ার্টারেই থাকবে।".

"কেন?" প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "চিঠিতাতে তো ও হেনা দত্তকে স্পষ্ট বিলাসী টাউনের কথাই লিখেছে।"

শৈলেশ বাবু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, "ঐ যাঃ স্তার, দীপ্তিকে তো আজও চিঠি লেখা হলো না। এতোক্ষণ হয় তো কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মাথার দিব্য দিয়ে বলেছিল ষ্টেশন হতেই চিঠি লিখতে, যাঃ।—"

"আচ্ছা, না হয় একটা টেলিগ্রাম করে দিও।" স্নেহের সঙ্গে প্রণব বাবু জানালেন। প্রণব বাবুর এই পরামর্শটি মন্দ ছিল না। শৈলেশ বাবু ভাবলেন, একটা টেলিই সে দীপ্তিকে পাঠাবে। খুসী হয়ে তিনি পকেট হ'তে একটা কাগজে মোড়া ফুল ও বিল্বপত্র বার করে সেটা ভক্তিভরে কপালে ঠেকালেন। দৃশ্যটি প্রণব বাবুর দৃষ্টি এড়ায়নি। হেসে ফেলে প্রণব বাবু বললেন, "আরে, এই সব সংস্কারও তোমার মধ্যে আছে না-কি? তুমি তা'হলে এই সবও বিশ্বাস করো, এ্যাঁ? এই সব বাই-ও আছে না-কি? তা তো জানতাম না।"

"এ সবে তো স্তার, কোনও কালেই বিশ্বাস করিনি, কিন্তু," অপ্রস্তুত হয়ে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন—"আজ কাল একটু-আধটু করি।

দীপ্তির মা এইগুলো কোথা থেকে এনে দিয়েছেন, আসবার সময় দীপ্তি এই সর্ব্ববিপদহরণ ঠাকুরের ফুলগুলি আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করেছে, আমি যেন বেরুবার আগে এইগুলো আমার মাথায় এক বার অতি অবশ্য করে ঠেকিয়ে নিই। ভারতী বিশ্ববিত্তালয়ে থাকার সময় এই কায আমি করিনি, কতকটা আপনার ভয়ে, কতকটা লজ্জাতে, তা' না হলে ঐ রকম বিপদে পড়েছিলাম। আমাদের বৌদি নয় আপনাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু ভগবান আমারটাকে এখনও দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই ওর কথা একটু-আধটু আমি শুনে থাকি। আপনার কপালেও একবার এই ফুলটা ঠেকিয়ে দেবো, স্যার?"

শৈলেশ বাবুর কথায় প্রণব বাবুর চোখ দুটো সজল হয়ে গেল। টস্‌-টস্‌ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। প্রণব বাবুকে কাঁদতে দেখে শৈলেশ বাবুও চোখে জল এনে অন্ত দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

প্রণব বাবুর মনে পড়তে লাগলো শান্তার কথা। কতো বিনিদ্র রজনীই না সে আতঙ্কে আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাটিয়েছে। কবে কখোন যে কে খোকার হাতে নিহত হবে তার কোনও স্থিরতা ছিল না। যে কোনও মুহূর্ত্তেই খবর এলেও আসতে পারতো যে তাদের কেউ না কেউ মারা গেছে। শান্তা এই সব ফুল-বিল্বপত্র আমদানী করেনি বটে, পিছন ফিরে প্রণব বাবু প্রায়ই দেখেছেন কপালে হাত ঠুকে শান্তাকে স্বামীর নিরাপত্তার জন্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে। তার সেই আকুল নিবেদন ঈশ্বর হয়তো শুনেছিলেন, তাই শান্তার জীবনের বিনিময়েও ঈশ্বর প্রণব বাবুকে বাঁচিয়ে রাখলেন। শান্তা হয়তো এইরূপ প্রার্থনাই ঈশ্বরের কাছে করে এসেছে, হয়তো সে এই কথাই ঈশ্বরকে বলেছিল, হে ঈশ্বর, তুমি আমার জীবন নিও, কিন্তু আমার স্বামীকে আততায়ীর হাত থেকে নিয়ত রক্ষা করে যেও। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলে প্রণব বাবু বললেন, "ওতে আর আমার দরকার হবে না, শৈলেশ বাবু। আমি জানি, কোনও এক অদৃশ্য হস্ত নিয়তই আমাকে রক্ষা করে আসছে। বিপদ আসা মাত্রই আমি যেন কার নিশ্বাস অনুভব করি। ফুলের চেয়ে শান্তার স্মৃতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাকে স্মরণ করে বেরুলেই আমাদের সকল বিপদ কেটে যাবে। আজ আর তো সে মানুষ নেই, সে ঈশ্বরেরই একটা অবিচ্ছেত্ত অংশ হয়ে গেছে।

শান্তা দেবীর কথা শৈলেশ বাবুরও যে মনে আসছিল না তা-ও নয়। কতো দিন কতো স্নেহভরে সস্নেহে তিনি শৈলেশ বাবুকে ডেকে এনে আহার করিয়েছেন। তাঁর ভগিনীপ্রতিম স্নেহ ও ভালবাসা কোনও দিনই ভুলবার নয়। প্রণব বাবুকে সে একবার সান্ত্বনা দিতে চাইলো, কিন্তু মুখে তার ভাষা এলো না। কোনওরূপে আত্মসংবরণ করে শৈলেশ বাবু বললেন, "চলুন এই বার স্যার, আর দেরী করা ঠিক নয়। এখুনি আবার মহীন্দ্র বাবুর আগমন হবে।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "হাঁ, যা বলেছো সে কথা ঠিকই। চলো, সরেই পড়ি।"

উভয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে রাজপথের উপর এসে পড়লেন। তার পর একটা একা ভাড়া করে তাঁরা বিলাসী টাউনের দিকে অগ্রসর হলেন।

বিলাসী টাউনের একটা বাড়ীর সামনে এসে উভয়ে লক্ষ্য করলেন, একটা বাড়ীর সামনে ভিখারীর ভীড় লেগে গেছে। বিস্মিত হয়ে উভয়ে লক্ষ্য করলেন, বাড়ীর গেটের এক পাশে পিতলের ফলকে লেখা রয়েছে—"রাজা অব কুমুরটুলি।"

ভীড়ের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এতো ভিখারী খাওয়াচ্ছে কে মশায়? এই রাজা সাহেব লোকটাই বা কে? জানেন কিছু?"

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, "বিস্তারিত কিছুই জানি না। তবে এইটুকু জানি যে তিনি এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁকে দয়ার অবতার বললেও চলে। এ ছাড়া তিনি এক জন শিল্পপতিও বটে। দেখা করবেন না কি তাঁর সঙ্গে? তা যান না, তবে মহকুমা হাকিম ওঁর ওখানে এখোন আছেন। তিনি ওঁর বন্ধুলোক কি না? তা না হয় একটু পরেই যাবেন। ঐ হাকিম সাহেব বেরিয়ে আসছেন, এইবার আপনি ঢুকে পড়ুন।"

সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী সঙ্গে না নিয়ে খোকার সম্মুখে আসা প্রণব এবং শৈলেশ বাবু নিরাপদ মনে করেননি। প্রণব বাবু বাড়ীটা ভালো করে দেখে নিয়ে শৈলেশ বাবুর সঙ্গে পিছিয়ে এসে বললেন, "থাক আজ, আর এক দিন নয় দেখা করা যাবে অখন।" উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, "অগত্যা, ঐ দেখুন না এক জন ভদ্রমহিলাও এসে গেলেন। আমারও মশাই একটু দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে, কিন্তু সকাল থেকে এতো লোকই ওঁর কাছে আজ আসতে লেগেছে যে ওঁকে একটু নিরিবিলিতে পাবার জো-ই নেই।"

বিস্মিত হয়ে উভয়ে চেয়ে দেখলেন, স্বয়ং মিস্‌ হেনা দত্ত একটা রিক্সা থেকে নামলেন, এবং তার পর গেটের নিকটে বসা দরোয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে রাজবাড়ীতে ঢুকে পড়লেন।

"ও স্যার," নিম্ন স্বরে শৈলেশ বাবু বললেন, "দেখছেন তো? এ তো উন্মাদই হয়েছে দেখছি। তা এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চলুন স্যার, এইবার আমরা সরে পড়ি।"

হেনা দত্তের এই ভাবে দেওঘরে এসে খোকার সহিত দেখা করাটা প্রণব বাবু একেবারেই পছন্দ করেননি। হেনা কি না শেষে এতো দূর অধঃপাতে গেলো? কোথায় কোলকাতা আর কোথায় দেওঘর? একটা খুনে গুণ্ডার পিছন পিছন সে এতো দূর ছুটে এলো, ছিঃ! প্রণব বাবুর হৃদয়ে হেনা দেবীর সম্বন্ধে এই প্রথম হিংসার উদ্রেক হলো—ক্রোধেরও। রুক্ষ মেজাজে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "না, সরে পড়বো না। এইখানেই আমি থাকবো। পিস্তলটা আনিনি, তা না হলে ঐ ছুটোকেই আমি এক গুলীতেই সাবড়ে দিতাম। এসো, এই পাঁচিলটার পাশে এসে দাঁড়াই। আমি দেখবো, হেনা কতক্ষণ খোকার এখানে থাকে। সব কথা জেনে-শুনে এক জন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাবে কিছুতেই আমি নষ্ট হ'তে দেবো না।"

প্রণব বাবু যে এই ভাবে মাথা খারাপ করতে পারেন তা শৈলেশ বাবুর কল্পনারও বাইরে ছিল। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে বচসা করাও সম্ভব ছিল না। নিরুপায় হয়ে তিনিও প্রণব বাবুর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁরা দেখতে পেলেন, হেনা দত্তের সঙ্গে খোকন বাবুও বার হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে তারা বাজারের দিকে এগিয়ে চললো। প্রণব এবং শৈলেশ বাবুর মেক্‌-আপ্‌ করা ছদ্মবেশ ছিল। সহজে তাঁদের চিনে ফেলা সম্ভবও ছিল না। মন্থর গতিতে তাঁরাও এদের পিছু নিতে দেরী করেননি।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে খোকন বাবু বললে, "আপনাকে আবার বলছি, মিস দত্ত, আপনি প্রণব বাবুকেই ভালোবাসুন। আজ পৃথিবীতে তিনি সত্যই একা, আপনাকে পেলে তিনি সুখীই হবেন। আর আমার নিজের সম্বন্ধে আপনাকে যা বলেছি, তা সম্পূর্ণরূপেই সত্য। আপনি না হয় প্রণব বাবুকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।"

"কিন্তু"—হেনা দেবী উত্তর করলেন. "ওদিকে ও'র যে আমার সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত খারাপ। যা একবার ভেঙেছে তা কি আর ঠিক আগেকার মতন করে জুড়বে? কক্ষনো তা আর জুড়বে না। এ চেষ্টা বৃথা, খোকন বাবু। বাবাও আমার সঙ্গে এসেছেন, চলুন না হয় তাঁর সঙ্গে একবার দেখাই করে আসবেন।"

"আবার ভুল করছেন হেনা দেবী।" খোকন বাবু বললে, "প্রণব বাবুর আপনার উপর দুর্ব্বলতা আছে এবং আবার তা আসবেও। কিন্তু আপনার উপর আমার কোনও দুর্ব্বলতাই নেই, এবং পূর্ব্বে কখনও তা ছিলও না। তা ছাড়া প্রণব বাবুর কৃপায় যে কোনও দিন আমার ফাঁসীও হয়ে যেতে পারে। আমি সে জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।"

উত্তরে হেনা দেবী বললেন, "না না, কখনও তা আমি হতে দেবো না। প্রণব বাবুর কাছে আপনাকে আমি ভিক্ষা করেই নেবো। আমি জানি, অন্তরে অন্তরে তিনি আমাকে ভালোই বাসেন। আমার কথা তিনি কক্ষনো ফেলবেন না।"

"কিন্তু"—খোকা বাবু বললে, "আমি যদি তাঁকে হত্যা করি? ও'কে শেষ করতে পারলে আমার আর একটি শত্রুও অবশিষ্ট থাকে না।"

চমকে উঠে হেনা দেবী বললেন, "না না, সে কি আবার একটা কথা না কি? কেন আপনি তাঁকে খুন করতে যাবেন? না, এ কাষ আপনাকে আমি কিছুতেই করতে দেবো না।"

হেসে ফেলে খোকন বাবু বললে, "এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, প্রণব বাবুকে আপনি সত্যই কতো ভালোবাসেন। শুনুন বলি, এইমাত্র আমার এক চর এসে খবর দিলে, প্রণব বাবু দেওঘরে এসেছেন। ঠিকানাটা আমি আজই সংগ্রহ করতে পারবো, আপনি আপনার বাবাকে আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তা হয় না খোকন বাবু, তা হয় না।" উত্তরে হেনা দেবী জানালেন, "তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রীর আমি নখের যোগ্যও নই, তা ছাড়া তাঁর স্ত্রী-অন্ত প্রাণ ছিল। নিজে পছন্দ করে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তার পক্ষে তাঁর বিগত স্ত্রীকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।"

"এ ভুলও তাঁর এক দিন ভাঙবে," খোকন বাবু উত্তর করলে, "এক দিন তিনি বুঝতে পারবেন, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। গাছ হতে যখন পাতা ঝরে পড়ে তখন সেই গাছ প্রাণপণে তার সেই আধ-খয়া পাতাটিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে তা পারে না। তাকে তা বিদায় দিতে হয় অনুরূপ অপর একটি পত্রের স্থান সন্ধান করে দেবার জন্যে। আমার যদি তার সঙ্গে কখনও চাক্ষুস পরিচয় হবার সুযোগ ঘটতো তা হলে তাকে আমি এই কথাই বুঝিয়ে বলতাম।"

মিস্ হেনা দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন "কিন্তু এ ভুল যদি তাঁর কোনও দিনই আর না ভাঙে, তা'হলে? তা'হলে আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

উত্তরে খোকন বাবু বললে, "ভুল কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ভুলের ফুল এক দিন না এক দিন ঝরে যাবেই। এ অবস্থায় আপনাকে আমি আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে বলবো। কিছু কাল পরে প্রণব বাবু নিজেই এক দিন আবিষ্কার করবেন, পৃথিবীতে তাঁর এই আত্মত্যাগের কোনও মূল্যই নেই। পৃথিবী যেমন এগিয়ে যাচ্ছিল তেমনিই সে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনিই শুধু পিছনে পড়ে রইলেন। কিন্তু, আপনি সেই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন কি? পারলে কিন্তু উভয়ের পক্ষেই ভালো হ'তো। আচ্ছা, এইবার তা'হলে আপনি এগুন, বাড়ীর কাছেই তো এসে গেছেন, আমি তা হলে ফিরি এইবার, কেমন?"

নমস্কার-বিনিময় করে হেনা দেবীকে বিদায় দিয়ে মুখ ফেরাতেই খোকন বাবু দেখতে পেলেন শৈলেশ এবং প্রণব বাবু তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। খোকা বাবুর শ্যেন-দৃষ্টি ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাদের চিনে নিতে অপারক হলো না। খোকা বাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে উভয়েই প্রমাদ গুণলেন। অস্ত্র-শস্ত্র যা কিছু নিকটে ছিল তা তাঁরা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় নিরাপত্তার জন্যে থানার মালখানাতে জমা দিয়ে এসেছেন। সকাল বেলা সেইগুলি পুনরায় বুকে না নিয়েই তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। উভয়েই বুঝলেন, ছদ্মবেশ একেবারেই কার্য্যকরী হয়নি। জীবনের বিনিময়ে বুঝি বা তাঁদের এই ভুলের মূল্য দিতে হয়। একমাত্র হেনা দত্তই তাদের রক্ষা করতে পারতো কিন্তু সে-ও তো এতক্ষণে বহু দূরই এগিয়ে গেলো। এখন উপায়? প্রণব বাবু বুঝেছিলেন যে তাঁরা এইবার নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। শৈলেশ বাবুর সম্মুখে এসে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে প্রণব বাবু প্রথম মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলেন। ভয়ের কারণ যখন এসেই গেলো, তখন ভয়কে আর ভয় না করলেও চলে। প্রণব বাবু ভাবতে থাকলেন, কোন দিকে মাথা বা দেহটা সরিয়ে এনে খোকন বাবুর পিস্তল হতে নিক্ষিপ্ত গুলীটা কৌশলে এড়ানো যেতে পারে। এ ছাড়া নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়ালে মানুষের মৃত্যুর ভয় এমনিই চলে যায়। মানুষের মনোবৃত্তি তখন যুদ্ধরত সৈনিকের মতই হয়ে থাকে।

শেষ চেষ্টাস্বরূপ পকেটের মধ্যে ডান হাতটি সেঁধিয়ে দিয়ে মিথ্যা করে প্রণব বাবু বললেন, "দেখ বেটা, আমি আর কেউ নই, আমি প্রণব। একটুও নড়েছিস্ তো তোকে এক গুলীতেই শেষ করে দেবো।"

সৌভাগ্যক্রমে খোকা বাবুও সেই দিন তার অস্ত্র-শস্ত্র বাড়ীতেই রেখে এসেছিলেন। তার চিরসাথী একমাত্র ধারালো ছুরিখানা ছাড়া তার কাছে আর কোনও অস্ত্রই ছিল না।

প্রণব বাবুকে দেখে এবং তাঁর মুখের এই গালি শুনে ধীরে ধীরে খোকা বাবুর পূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হতে সুরু হলো। নিমিষেই খোকন বাবু খোকা বাবু হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় তাকে রুখে রাখা অসম্ভব। এতক্ষণে তিনি বিবেক-বুদ্ধি বিবর্জ্জিত দানবীয় রূপ ধারণ করেছেন। প্রণব বাবু ত দূরের কথা, এই অবস্থায় সে হেনা দেবীকে পর্য্যন্তও হত্যা করতে পারে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খোকন বাবু বললে, "তা আমিও

কোনও এক দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়ও হচ্ছে না। শুনুন বলি, ভালো কথাই বলছি। আপনার কাছে যেমন একটা আছে আমার কাছেও তো তেমনি একটা আছে, তার চেয়ে আসুন উভয়েই আমরা সরে পড়ি। ব্যাপারটা না হয় চেপেই ফেলা যাবে।"

এর পর প্রণব বাবুর বুঝতে আর বাকি থাকেনি যে খোকা বাবুর কাছে সেদিন হাতিয়ার নেই। তার কাছে তা থাকলে সে দেখা মাত্রই সে তাঁকে সাবড়ে দিতো, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। সাহস পেয়ে প্রণব বাবু মরিয়া হয়ে নেকড়ে বাঘের মতই খোকন বাবুর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেন।

শুধু হাতে একমাত্র মানুষের সঙ্গেই লড়াই করা যায়, দানবের সঙ্গে তা পারা যায় না। খোকন বাবু এতক্ষণে মানব-দানব হয়ে উঠেছে। শরীরে তার তখন শতহস্তীর বল। বিকটরূপ একটা হুঙ্কার দিয়ে প্রণব বাবুর মুখে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে খোকন বাবু পরিকল্পনা মত মাটির উপর বসে পড়লো। প্রণব বাবুর ঠোঁট কেটে রক্ত বার হচ্ছিলো। কিন্তু তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। প্রত্যুত্তরে তিনিও শূন্যের দিকে একটা ঘুসি চালালেন কিন্তু ততক্ষণে খোকন বাবু মাটিতে বসে পড়েছে। প্রণব বাবুর প্রক্ষিপ্ত ঘুসি খোকন বাবুর গাত্র স্পর্শ না করে শূন্যপথেই ফিরে এলো।

খোকন বাবু এইবার পকেট থেকে তার ছুরিটা বার করতে যাচ্ছিলো, এমন সময় শৈলেশ বাবু পিছন থেকে এসে তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। খোকন বাবু একবার মাত্র পিছনে ফিরে লোকটা যে কে তা দেখে নিলে তার পর একটি মাত্র ঝটকান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এক হাতে শৈলেশ বাবুর ঘাড় এবং অপর হাতে তার পাছাটা ধরে তাঁকে শূন্যের উপর তুলে ধরে বার-তুই ঘুরিয়ে তাঁকে সজোরে পার্শ্বের একটা ড্রেণের মধ্যে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, "থাক তুই ঐখানে পড়ে। আমি মশা মেরে হাত গন্ধ করবো না, তা ছাড়া তুই ততো দুষী নস, যতো দুষী হচ্ছে এই শালা।"

ড্রেণের জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে শৈলেশ বাবু কাতরে উঠলেন —কোঁ-ও কোঁক্। শৈলেশ বাবুকে উদ্ধার করবার জন্যে প্রণব বাবু অধীর হয়ে ছুটে আসছিলেন। খোকন বাবু তাঁর পথ তো অবরোধ করলেই, তা ছাড়া তাঁর এই অন্যমনস্কতার সুযোগে ল্যাঙ্ দিয়ে তাঁকে মাটির উপর ফেলে দিলে এবং প্রণব বাবু সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠবার পূর্ব্বেই চকিত গতিতে ছুরিখানা বার করে বজ্র-মুঠিতে সেটা প্রণব বাবুর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলেন।

প্রণব বাবুর মনে হলো, তাঁর চতুর্দ্দিকের দর্শকের ভীড় এমন কি পায়ের নীচের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। খোকা বাবুর হাতের কিছুটা অংশ এবং ধারালো ছুরিখানা ছাড়া যেন আর সবই অন্ধকার।

এতোক্ষণে ছুরিখানা প্রণব বাবুর দেহের বুকের মধ্যে বসে যাবার কথা, কিন্তু মানুষ যা মনে করে সব সময় তা হয় না— এ ক্ষেত্রেও তা হলো না। খোকা বাবুর উত্তোলিত ছুরিকা তীরবেগে নীচে নামবার পূর্ব্বেই কে এক জন নারীকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, "ও কি-ই? ও কি-ই খোকন বাবু, ও কি করছেন আপনি? দু'জনার কি আপনাদের কিছুতেই আপোষ হবে না? তার চেয়ে ঐ ছুরি আমার বুকেই বসিয়ে দিন।"

খোকা বাবু চক্ষু উন্মীলিত করে দেখলেন, মিস হেনা দত্ত তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। চলে যেতে যেতে পিছন দিকে ভীড় জমতে দেখে এমনিই একটা সন্দেহ তাঁর মনে এসেছিল। প্রণব বাবুরও দেওঘরে আসার কথা তিনি শুনেছিলেন, সেই থেকে এইরূপ একটা দুর্ঘটনাই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। হঠাৎ পিছন দিকে ভীড় দেখে ও জনতার কলরব শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। জনতার নিকট আসা মাত্র খোকার পরিচিত কণ্ঠস্বর তার কানে গেলো, সেই সঙ্গে শৈলেশ বাবুরও কাতর ধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন। দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েই ভীড়ের মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন।

হেনা দেবীকে দর্শন মাত্র খোকার আবার ভাবান্তর উপস্থিত হলো, ধীরে ধীরে তাঁর দানবীয় ভাব অন্তর্হিত হয়ে গেলো, এবং সে স্থলে ফুটে উঠলো এক শান্ত মনুষ্যের মূর্ত্তি। পশুসুলভ হিংস্র ভাব তার আর নেই। ইতিমধ্যে খোকা সহজ ও সরল মানুষ হয়ে উঠেছে।

খোকন বাবুর মনে হলো, তার মুষ্টি যেন শিথিল হয়ে আসছে। প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবুর মত সেও যেন পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত। হঠাৎ ছুরিখানা খোকন বাবুর হাত থেকে খসে পড়তে দেখে প্রণব বাবু শেষ চেষ্টাস্বরূপ পুনরায় খোকন বাবুর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেন। খোকা বাবু এবারও প্রণব বাবুকে বাধা দিলে, কিন্তু এবার আর তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না। মানুষের দেহই শুধু লড়ে না, দেহের সঙ্গে তার মনও লড়ে থাকে। কিন্তু খোকা বাবুর নিরপরাধ ব্যক্তিত্বটির মন প্রণব বাবুর মনের মতো অতো সবল ছিল না। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর খোকা বাবুই পড়ে গেলো। পা'টা বোধ হয় তার পিছলে গিয়েছিল। এই সুযোগে প্রণব বাবু আবার তাকে চেপে ধরছিলেন, এমন সময় কোথা হ'তে কোতোয়ালীর এক জন টহলদারী সিপাই এসে প্রণব বাবুকে ধরে ফেলে বলে উঠলো, "আরে এ কেয়া করতা তুম? রাজা সাহেবকো বদন পর হাত উঠাতা? এ তো তাজ্জব কি বাত হ্যায়, চলো থানেমে তুম। আইয়ে রাজা সাহেব, আপভী আইয়ে।"

ভীড়ের লোকজন এতোক্ষণ কৌতূহলী হয়ে এঁদের মুষ্টিযুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁদের কেহ কাহাকেও এ বিষয়ে সাহায্য করেননি। কিন্তু, খোকা বাবুকে হঠাৎ ছুরি বার করতে দেখে এঁদের জন-কয়েক দৌড়ে গিয়ে মোড় হতে সিপাহীকে ডেকে এনেছে।

এতো পরিশ্রমের পর এই মূর্খ সিপাইএর অবিবেচনার ফলে শোল মাছ জালে পড়েও যে বেরিয়ে যাবে তা প্রণব বাবু কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। সিপাইজীর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। তিনি সজোরে খোকন বাবুর কোমরটা জাপটে ধরে নীচের দিকে ঝুলে পড়লেন।

বেগতিক বুঝে শৈলেশ বাবু আহত অবস্থাতেই সকলের অলক্ষ্যে ড্রেণ থেকে উঠে পড়ে খবর দেবার জন্যে থানায় দৌড়েছিলেন। সকল কথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সদলবলে ঘটনাস্থলে দৌড়ে এলেন। ভীড়ের মধ্যে ঢুকে সিপাহীকে একটা ধমক দিয়ে নগর-কোটাল মহীন্দ্র বাবু বললেন, "আরে আসামী বাবু নেহি হ্যায়, আসামী হ্যায় এই আদমী। কেয়া বোলতা? রাজা বাবু হ্যায়? বহুৎ পার্ব্বণী উনকো পাশসে মিলা। ওহিকো আন্তে, না? বাঁধো ইসকো ঠিকসে।"

মহীন্দ্র বাবুকে দেখে খোকন বাবু তার সহজসিদ্ধ ভদ্র ভাষায় বললে, "এই যে, মহীন্দ্র বাবু যে—আপনিও এসে গেছেন ?"

খোকা বাবু এতো দিন উচ্চতন অফিসারদেরই সঙ্গে দোস্তী করেছেন—মহীন্দ্র বাবুর মতন অফিসারদের তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। বাহিরে খাতির দেখালেও অধস্তন অফিসাররা এ জন্য মনে মনে তাঁর উপর চটেই ছিলেন। খেঁকিয়ে উঠে মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, "সে খুব ভোল বদলিয়ে তো বহুৎ দিন হেসে কাটিয়ে দিলেন। লেকেন হামি ঠিক সন্দিহ হাপনাকে করেছি। সকল আদমীর চ'খে ধূলা হাপনি দিতে পারেন, লেকেন হামাকে আপনি তা পারেননি।"

হাতী খাদে পড়লে ব্যেঙও তাকে চাট্ মেরে যায়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। মহীন্দ্র বাবু এতো দিন খোকন বাবুকে সেলাম ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন বলেই আজ তিনিই তাকে বেশী করে অপমান ক'রতে পারলেন।

খোকা বাবু একটু মাত্র হেসে মহীন্দ্র বাবুর কথার প্রত্যুত্তর করলে। এই দিকে তাঁর বন্ধনকার্য্যও শেষ হয়ে গেছে। ভীড়ের মধ্য থেকে কয় জন উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে সিপাইদের সাহায্য করলেন, এদের মধ্যে এক জন এইবার এগিয়ে এসে বললেন, "ভাই বলি বাবা, এতো দান-ধ্যান হয় কোথা থেকে। টাকার যেন আর গাছ-পাথর নেই। চুরি করা টাকা, দান করবেন না-ই বা কেন? ঠিক আছে, স্যার, নিয়ে চলুন এই বার।"

খোকাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এইবার সকলে থানার দিকে চললো। এবং তাদের সাথে সাথে চললো অন্ততঃ শ'পাঁচেক লোকের একটা ভীড়।

প্রণব বাবু হেনা দত্তকে যে সেখানে দেখেননি তা'ও নয়। একমাত্র হেনা দত্তের কল্যাণেই যে তাঁর প্রাণটা এ যাত্রায় রক্ষা পেলো, তা'ও তিনি বুঝেছিলেন। তাঁকে এ জন্য ধন্যবাদ দিই-দিই করেও কিন্তু এতোক্ষণ তা তিনি দিতে পারেননি। ঘটনার স্রোতে মানুষ যখন ভেসে চলে তখন অনেক জিনিষ সে দেখেও দেখতে পায় না। এ ছাড়া মৃত্যু-ভয় অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনাও এসে গিয়েছে। সাফল্যের উত্তেজনায় তিনি ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন, মানুষ উত্তেজিত হ'লে তার মনের মধ্যে থেকে অনেক জিনিষই হারিয়ে যায়। প্রণব বাবু হেনা দেবীর অবস্থিতির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলেন, হঠাৎ তিনি কাঁধের উপর কার কোমল স্পর্শ অনুভব করলেন, এবং তিনি এ-ও শুনতে পেলেন, কোমল-মধুর কণ্ঠে হেনা দত্ত বলছেন, "শুনুন, চলে যাচ্ছেন, আমার যে কিছু বলবার ছিল। আমার একটা অনুরোধ কিন্তু আজ আপনাকে রাখতেই হবে।"

"ওঃ আপনি? সত্যি ভুলেই গিয়েছিলাম" লজ্জিত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "সত্যি, আপনি না এসে পড়লে আজ কি-ই যে হতো। কি তা' হলেও এই খুনে গুণ্ডাটার সঙ্গে আপনার আর মেলামেশা করা উচিত নয়। আপনাকে আর ওর সঙ্গে আমি দেখা করতেও দেবো না। এতো দিন পর্য্যন্ত লোকটা যে আপনাকে ধাঁপ্পা দিয়ে এসেছে, তা কি আপনি আজও বুঝলেন না?"

"বেশ, তাই না হয় হবে, কিন্তু"—হেনা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি একটা জামীনের বন্দোবস্তও হতে পারে না? বিচারে যা হবার তা তো হবেই, তার আগে পর্য্যন্ত ওকে মিছামিছি কষ্ট না-ই বা দিলেন?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "এ সব আইনের কথা আপনি বুঝবেন না, মিস্ দত্ত। আপনি বাড়ী যান এখোন।"

অনুরোধ জানিয়ে মিস্ দত্ত বললেন, "না না, আরও একটুখানি আপনাদের সঙ্গে যেতে দিন।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "কী ছেলেমানুষী করছেন আপনি? যান, বাড়ী যান, যান শীগ্‌গির। আমি আপনাদের বাড়ীও চিনে এসেছি, বিকালের দিকে দেখা করবো, আজ এখোন বাড়ী যান।"

"পুলিশের লোকের কাছে যে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, তা আমি জানি, প্রণব বাবু! কিন্তু—" আকুল হয়ে মিস্ হেনা দত্ত বললেন, "আচ্ছা, তাই ভালো, বিকালেই আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন। যাবেন তো ঠিক? আপনাকে আমার বড্ড প্রয়োজন আছে।"

অনুযোগ সত্ত্বেও হেনা দত্তকে স্থান ত্যাগ করতে না দেখে প্রণব বাবু বিব্রত হয়ে উঠলেন। খোকনকে নিয়ে শান্ত্রীর দল এতোক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। এ অবস্থায় দু'জনাকে এইখানে দেখলে এখানকার অফিসাররাই বা কি মনে করবে। বিরক্ত হ'য়ে একটা এক্কা ডেকে প্রণব বাবু আদেশ করলেন, "আসুন, উঠে পড়ুন এইটেতে।"

প্রণব বাবুর আদেশ মত এক্কাটাতে উঠে পড়ে মিস্ হেনা দত্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "কিন্তু একটা কথা, ওরা ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে মার-ধর করবে না তো? যা হবার তা তো হবেই, মিছামিছি মার-ধর আর কেন? দেখবেন একটু, সত্যি।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তা দেখবো এখন, আপনি এখোন যান তো।"

মিস্ হেনা দত্তকে অতি কষ্টে বিদায় দিয়ে প্রণব বাবু এক রকম ছুটতে ছুটতে এসেই শান্ত্রী-দলের সহিত যোগ দিলেন। প্রণব বাবুকে না দেখতে পেয়ে শৈলেশ বাবু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে সহকারী শৈলেশ বাবু বললেন, "আপনি আবার পিছিয়ে পড়েছিলেন কেন? না না, এ ভালো নয়। খোকার দলের অনেকে এখনও ছাড়া রয়েছে, এমনি একলা আপনি থাকবেন না, সত্যি। বড্ড ভয় করে আমার।"

বিক্ষুব্ধ ভাবে প্রণব বাবু সহকারী শৈলেশ বাবুর দিকে তাকালেন, যার জন্যে ভাববার কেউ-ই নেই, তার জন্যে বহু লোকেই ভেবে থাকে। একটু চিন্তা ক'রে প্রণব বাবু বললেন, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু চলো তো এখোন, ডাক্তারখানাটা ঘুরে আসি। পড়েছিলে তো ট্রেনের মধ্যে, শেষে কি একটা টিটেনাস্ই হয়ে যাবে? আসামীকে ওরা ততোক্ষণে থানায় নিক্। আমরা ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে একটি করে পটি ধরিয়ে আসি বুঝলে? এসো।"

"একটা কথা বলবো স্যার," পথ চলতে চলতে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "কি?"

শৈলেশ বাবু পকেট থেকে একটা বিল্বপত্র ও ফুল বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা আপনার কপালে একবার ঠেকিয়ে দেবো, স্যার?

এরই একটু সকালে গোপনে আপনার পকেটে ফেলে দিয়েছিলাম, তাই না রক্ষে। দেখলেন না; তার ? আমার দিকেই তো ও প্রথমেই এগিয়ে আসছিল। আমার কাছে তো কোনও অস্ত্র ছিলো না। ড্রেণের ভেতর থেকে অগত্যা এই ফুলটাই আমি বাড়িয়ে দিলাম। ব্যাস, অমনি সে আমাকে ছেড়ে আপনাকে তেড়ে গেলো, কিন্তু তা হলে কি হয়, আপনার পকেটেও যে একটু ছিলো, তাই না আবার সে ফিরে এলো। আমি এ সব কোনও দিনই বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখোন তা করি।"

কথা কয়টা বলে শৈলেশ বাবু ফুলটা প্রণব বাবুর মাথার উপর ছুঁইয়ে দিয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে প্রণাম ঠুকতে লাগলো। প্রণব বাবুর নাস্তিক মন কিন্তু কিছুতেই এতে সায় দিলে না। আড়চোখে শৈলেশ বাবুর এই ভক্তির বহরটুকু দেখে নিয়ে প্রণব বাবু দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, সেখানে মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে তাঁর মনের সমস্ত আশা ও শান্তি বিলীন হয়ে গেছে।

হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পটি বেঁধে থানায় ফিরে প্রণব এবং শৈলেশ বাবু দেখলেন, আসামীকে কেইস লিখে হাজতে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে মহকুমা হাকিম এবং ডেপুটী পুলিশ সাহেবও এসেছেন, কিন্তু লজ্জায় তাঁরা আর খোকার সঙ্গে দেখাও করেননি। তাঁদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্তে খোকার চেয়ে তাঁদেরই যেন লজ্জা বেশী। এমনি ঠকানোই সে কি না তাঁদের ঠকালো। ইতিমধ্যে হাজত-ঘরে পাহারা দেবার জন্তে সশস্ত্র শান্ত্রীর দলও এসে গেছে। এ ছাড়া শহরশুদ্ধ লোক থানায় এসে জমা হয়েছে বাঙলা বিহার আসাম ও উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দস্যু-সর্দার খোকন বাবুকে দেখবার জন্তে। কেউ কেউ আবার এ-ও বলে গেলেন যে, লোকটা এই দিক্ দিয়ে অর্থাৎ কি না সাহসী দস্যু হিসাবে বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করেছে।

পটি ধরিয়ে প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু থানায় ফিরে দেখলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় খোকা বাবু হাজত-ঘরে পায়চারী করছেন। দূর হ'তে খোকা বাবুরই উপযুক্ত স্থানে খোকা বাবুকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "যাক্ স্যার, সব কায এইবার শেষ হয়ে গেলো।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "বল কি হে, কায তো এই সবে মাত্র শুরু হলো। শেষ আর হলো কোথায়? মনে রেখো, অপরাধ-নির্ণয় অপেক্ষা কেইস গঠন অধিক শক্ত এবং তদপেক্ষাও কঠিন হচ্ছে অপরাধ বা কেইস প্রমাণ। এক্ষণে আমরা অপরাধ নির্ণয় করেছি মাত্র। এখোনও অবশিষ্ট দুইটি করণীয় কার্য্যই বাকি আছে।"

খোকা বাবু খুনে বা ডাকাত হলেও ছিলো বীর। বীরের সম্মান বীর মাত্রেই চিরকাল পেয়ে থাকে। প্রণব বাবু সলজ্জ ভাবে হাজত-ঘরের রেলিঙ-দেওয়া দুয়ারের এপারে এসে দাঁড়ালেন। খোকা বাবু কিছুক্ষণ ধরে প্রণব বাবুর দিকে তাকিয়ে নিলেন এবং তার পর স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, "কি মশায়, এখোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন ?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "না।"

"তা হলে"—খোকা বাবু বললেন, "ঈশ্বরের উপর আপনার নিশ্চয়ই কোনও অভিযোগ আছে, তাই আপনি এই কথা বলছেন। আমিও এক দিন অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ছিলাম। তবে আপনার মতো লোমনা বা সখের নাস্তিক নয়। আমি এক জন মনে-প্রাণে একান্ত ভাবেই নাস্তিক ছিলাম। কিন্তু আজ আমার মনে হয় ঈশ্বর আছেন, তা না হলে আমার হাত থেকে আজ আপনি নিশ্চয়ই রেহাই পেতেন না।"

উত্তর প্রণব বাবু বললেন, "তা-ই যদি হয় তা' হলে আজ থেকেই অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকো। অনেক পাপই তো করেছো, দেখো প্রার্থনার দ্বারা যদি এই পাপের লাঘব হয়। আমার মতে কিন্তু একমাত্র অনুতাপের দ্বারাই পাপের লাঘব হতে পারে, প্রার্থনা বা পূজার দ্বারা নয়।"

প্রণব বাবুর দিকে একটা ক্রুর দৃষ্টি হেনে খোকন বাবু বললে, "দেখুন, একটা কথা; যদি আমি কখনও মুক্তি পাই তা হলে আমি একটা ধর্ম্মাশ্রম স্থাপন করবো, কিন্তু তা আমি স্থাপন করবো ঈশ্বরের নাম নেবার জন্তে নয়, শুধু সেখানে বসে বসে তাঁকে গাল পাড়বার জন্তে। আমি ভিন্ন-প্রকৃতির মানুষ হই এটাই যদি তাঁর ইচ্ছা ছিল, তা' হলে তিনি আমাকে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষরূপেই সৃষ্টি করেননি কেন? দেখুন, আমার প্রতি তাঁর কোনও অভিযোগই থাকতে পারে না, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট অভিযোগ আছে। আমার মতে তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র অপরাধী। তা যাকগে যাক্ এখোন ও-সব কথা। এখোন বিড়ি তো একটা খাওয়ান মশায়। সিগারেট টিগারেট একটা আছে, না নেই ?"

এতক্ষণে নগর-কোটাল মহীন্দ্র বাবু এবং ডেপুটী সুপার বিহারীলাল বাবুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যেই এরা খোকন বাবুর তথাকথিত রাজবাড়ীটা তল্লাস করে এসেছেন। একটা গুলীভরা পিস্তল, হাজার দশেক টাকা এবং কিছু গহনা ও কাপড়-চোপড় প্রণব বাবুর সামনে রেখে দিয়ে মহীন্দ্র বাবু বললেন, "এইগুলো মশাই ওর বাড়ী থেকে তল্লাস করে পাওয়া গেল।"

পিস্তল, গহনা বা টাকা-কড়ির ব্যাপারে কোনওরূপ ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রণব বাবু কেবল মাত্র খোকার কক্ষে প্রাপ্ত তার কাপড়-চোপড়গুলির জন্তই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কাপড়ের কোণগুলির উপর সুতো দিয়ে তোলা "S" অক্ষরটির প্রতি শৈলেশ বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রণব বাবু বললেন, "এই দেখো এখানেও "S", কোলকাতাতে প্রাপ্ত রক্তমাখা কাপড়েও এই "S" অক্ষরই লেখা ছিল। এই থেকে সহজেই প্রমাণ হবে সেই দিনকার সেই রক্ত-মাখা কাপড়গুলোও খোকারই।"

পুলিশের ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিহারীলাল বাবু এতোক্ষণ খোকার পিস্তলটি পরীক্ষা করছিলেন। পিস্তলটি মহীন্দ্র বাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে বিহারীলাল বাবু খোকা বাবুকে বললেন, "কেয়া বাবু সাহেব, এই একঠোই হ্যায় না দো চারঠো ভি হ্যায় আপকো পাশ?"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "হাঁ সাহেব, হ্যায়, লেকেন বাস্তি নেহি। পিস্তল আউর বিশটো আন্দাজ হোনে শেকতো, লেকেন বোমা-উমা মেরি পাশ বহুত হ্যায়।"

খোকা বাবুর এই বিদ্রূপ বিহারীলাল বাবু বুঝে উঠতে পারেননি। উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়া বোলতা, সাচ? কাঁহা হ্যায়, দেখলাও দেও।"

উত্তরে খোকন বাবু বললে, "চলিয়ে ভর, চিত্রকূট পাহাড়মে।"

দিশেহারা হয়ে বিহারীলাল বাবু এইবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই হাওয়ালদার, দুইঠো টাক্সী জলদি বোলাও, আউর বিশ সিপাহী ভী আভি মাঙ্গাও।"

বিহারীলাল বাবুর এই হাঁক-ডাকে হেসে ফেলে খোকা বাবু পাশে দণ্ডায়মান এক জন বাঙালী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কে মশায় আপনাদের?"

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের ডেপুটি সুপার। তা, হুজুর যা জিজ্ঞাসা করছেন, তা বলে ফেলো।

"এঁ্যা, বলেন কি মশাই?" খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বোকাটাকে আবার ডেপুটি সুপার বানালে কে? এঁ্যা! আপনাদের দেশে দেখছি সবই চলে। একবার চিত্রকূটের দিকে আমাকে নিয়ে গেলে হতো। তা হলে আমিও এক হাত দেখে নিতে পারতাম। তা প্রণব বাবু কি আর আমাকে সেখানে যেতে দেবেন? তা যাই বলুন, এই লোকটাকে কিন্তু আমাদের দেশ হলে জমাদারও বানানো হতে না। কি মশাই, কথা কইছেন না যে, সারা বেহার খুঁজে আমার মত একটা বড়ো দস্যুই বার করুন না দেখি। না মশাই, আপনাদের দেশটা সত্যই ব্যাকওয়ার্ড। যাক গে যাক, এখোন দিন। ওঁর কাছ হতেই না হয় আমাকে একটা সিগারেট চেয়ে দিন।"

বিচার শেষ হয়ে গেছে, যা কিছু বাকি এখোন রায় দানের।

গত নয় মাস যাবৎ প্রায় শত শত সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। আদালতে প্রদর্শিত মামলা সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সংখ্যাও হবে প্রায় তিন শতের কাছাকাছি। বহু অর্থব্যয়ে সরকার পক্ষ থেকে মামলা চালানো হয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে কেইস প্রমাণিত হয়েছেই বলে মনে হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো জুরী মহোদয়গণ তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে পরামর্শ করবার জন্ত চলে গেছেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ফেরেননি। জজ সাহেবও জুরীদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় তাঁর খাস-কামরায় চলে গিয়েছেন।

সারা আদালত-গৃহটি সেই দিন লোকে লোকারণ্য। কোথাও তিল ধারণের স্থান মাত্র নাই। আদালতে সমবেত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন জুরী এবং জজ সাহেবের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায়।

আদালত-কক্ষের ডান দিক্‌কার একটা বেঞ্চের উপর প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুর সহিত বসে আছেন। এবং তাঁদের আসনের একটু দূরেই একটা টুলের উপর বসে আছে রূপজীবিনী উজ্জলা। এই বিচার যেন কেবল মাত্র আসামীদের অপকার্য্যের জন্তে নয়, তদন্তকারী অফিসারদের সুষ্ঠু পরিশ্রমেরও যেন এঁরা বিচার করতে বসেছেন। বহু দিনব্যাপী এই বিচার একটু পরেই জানিয়ে দেবে তদন্তকারী অফিসারদের এতো দিনের জীবন-পণ পরিশ্রম সফল হলো কিংবা হয়নি।

দুরু-দুরু বক্ষে শৈলেশ বাবু মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, "হে ভগবান, বিচারে আসামীরা যেন দোষী সাব্যস্ত হয়।" বস্তুতঃ, মনে-প্রাণে শৈলেশ বাবু আসামীদের ফাঁসীই কামনা করছিলেন। এতো দিনের পরিশ্রম যে ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হবে শৈলেশ বাবু তা কল্পনাও করতে পারেন না। এতো বড়ো কেইসে ভীষমে এই প্রথম তিনি হাত দিয়েছেন। কর্ম্ম-জীবনের তাঁর উন্নতিও বহুলাংশে এই কেইসের সাফল্যের উপর নির্ভর করে। বিচারে আসামীদের চরম শাস্তি হ'লে তাঁর মত এক জন জুনিয়ার অফিসারের পক্ষে উহা ভবিষ্যতের জন্ত পাথেয় হয়ে থাকবে।

অপর দিকে প্রণব বাবু ভাবছিলেন, কর্ম্মজীবনে এইরূপ কত কেইসেই তো তিনি সাফল্য লাভ করেছেন।

[ক্রমশঃ।

-আগামী সংখ্যা হইতে-

রাহুর দৃষ্টি

(উপন্যাস)

অমলা দেবী

ঋগ্বেদের পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

হিন্দু-জেন্দ-ইউরোপীয় পুরাণ

৫। মিত্র ও বরুণ। ঋ বে ১।২ ৭ মন্ত্রে, "পবিত্র বল মিত্র ও হিংসক শত্রুনাশক বরুণের" উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয় ও ইরাণীরা উভয়েই ইঁহাদের উপাসনা করিতেন। ইরাণীরা 'মিথ্র'কে বলিতেন, 'আলোক বা সূর্য্য', আর হিন্দুরা 'মিত্র'কে বলিতেন, 'আলোক বা দিবা'। "মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতেঃ"—সায়ণ। বরুণ সপ্তসিন্ধু দেশে প্রথম আবরণকারী আকাশ, পরে নৈশাকাশ, পরে সমুদ্রপতি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। "শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রিঃ"—সায়ণ। ইরাণীরা ইঁহাকে 'বরণ' এবং গ্রীকরা Uranos শব্দের দ্বারা ইঁহাকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। Uranos এর স্ত্রীর নাম Gaia (সং-গো-পৃথিবী)। আবেস্তে এইরূপ আছে—"আমরা মিত্রকে যজ্ঞ-প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে, দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে; তিনি বলবান্ অনিদ্র চির জাগরুক।"—মিহির যাস্ত। "আমি অহুরোমজ্দ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চতুষ্কোণ বরণ তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। যে দেশের জন্য থ্রেতন (সং—ত্রৈতন বা তৃত, ঋ বে ১।৫২। ৫ ঋক্) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অহীদহকে (সং-অহি দাস ঋ বে ১।৩২ ১ ঋক্) হত করিয়াছিলেন"।—১ম ফর্গার্দ। বেদে বরুণের অবস্থান্তর প্রাপ্তির হেতুতে আলেকজেণ্ডার ভন হামবোল্ড বলেন, "জল এবং আকাশে অনেক সাদৃশ্য আছে, উভয়ই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, অতএব আকাশের বরুণই জলের বরুণ, হইলেন।" রোথ বলেন, "বেষ্টনকারী আকাশই বরুণ পৃথিবীর প্রান্তে আকাশই যেন সমুদ্র হইয়া আছে। আবার নদী সকল সমুদ্রে যাইতেছে; সুতরাং সমুদ্ররূপী আকাশই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুমিত হইল, সুতরাং বরুণ সমুদ্রের দেবতা হইলেন।" ওয়েষ্টগার্ড বলেন, "আকাশের দূর চক্রবালে আকাশ ও সমুদ্র যেন মিশ্রিত (তাহা ছাড়া আকাশ হইতেই বারি বর্ষিত হয় এবং নদীরা সমুদ্রে গমন করে), সুতরাং বরুণ ধীরে ধীরে ভারতীয় আর্য্যদের নিকট সমুদ্র-দেবতায় পরিণত হইলেন।" কিন্তু হিন্দু পুরাণে বরুণ মাত্র জলদেবতা।

৬। অশ্বিদ্বয়। (ঋগ্বেদ ১।৩ সূক্ত)। যাস্ক নিরুক্তে বলেন, "তৎ কৌ অশ্বিনৌ—দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি একে। অহোরাত্রৌ ইতি একে। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃ কাল ঊর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভাবস্যানুবিষ্টম্ভমনু।" ইহাতে নানা প্রাচীন মতের উল্লেখ করিয়া নিজ মত সম্বন্ধে তিনি বলেন, "অর্দ্ধ রাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্বে যে কাল (অর্থাৎ তদভিমানী দেবতা)। রশ্মিসমূহ বেদে অশ্বগতির সহিত তুলিত হইয়াছে এবং সেই হেতু উষা ও সূর্য্যকে অশ্বযুক্ত বলা হইয়াছে অশ্বিন্ শব্দও সেই অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ঋ বে ১০।১৭ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের জন্মকথা আছে—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন, এই শুনিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার (সন্ধ্যার) বিবাহ হওয়ার মহান বিবস্বানের (বর্তমান) স্ত্রীর (উষার) মৃত্যু (বলিয়া প্রচার) হইল। (বাস্তবিক কিন্তু) মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমরেরা ঐ উষা দেবীকে লুকাইয়া রাখিলেন। ত্বষ্টা তাঁহার ন্যায় আর এক জনকে (সন্ধ্যা বা ছায়াকে) সৃষ্টি করিয়া বিবস্বানকে দান করিলেন। এই ঘটনার সময় সরণ্যু (উষা) অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়া মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইলেন।" যাস্ক উক্ত ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর (১।২০।৬ ঋক্) বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ সন্তান হয়। (পুরাণে আছে, সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া) সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর এক জন দেবীকে (পৌরাণিক সন্ধ্যা বা ছায়াকে) রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু, বিবস্বান অশ্বরূপ ধরিয়া সরণ্যুর পশ্চাৎ ধাবিত হন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" কিন্তু পুরাণে আছে, সূর্য্য স্বীয় পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে, (উষায় জীবের সংজ্ঞালাভ হয় বলিয়া উষার এক নাম সংজ্ঞা) শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত মনু (১।৩১।৪ ঋক্) যম (১।৩৫।৬ ঋক্) ও যমী (পৌরাণিক যমুনা অর্থাৎ আয়ুর প্রতীক) —এই তিন সন্তান উৎপাদন করেন। সংজ্ঞা সূর্য্যতাপে ব্যথিত হইয়া নিজ ছায়াকে রাখিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনু, শনৈশ্চর ও তপতীর জন্ম হয়। যম ছায়াকে ক্রুদ্ধ হইয়া পদ প্রদর্শন করিলে, ছায়ার শাপে যমের পদ দুষ্ট হয়। মাতার আচরণ এরূপ হইতে পারে না ভাবিয়া সূর্য্য সংজ্ঞার সন্ধানে যান। সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপে নিজ শরীর লুক্কায়িত করেন, সূর্য্যও ঐরূপ অশ্বমূর্ত্তিতে তাঁহার অনুসরণ করেন এবং অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৬)

কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্তের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অথবা জীবন ও যৌবনের প্রতীক, যে জন্য পুরাণে ইঁহাদের দেববৈদ্য বলিয়া খ্যাতি। (১) গ্রীক্ দেবী Eri ys বৈদিক সরণ্যুর রূপান্তর।—Erinys Demeter সরণ্যুর মত Aricion এবং Desponia নামক মিথুন প্রসব করেন।

৭। মরুদ্গণ (ঋ বে ১।৬ সূ)। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইঁহারা রুদ্র ও পৃশ্নিপুত্র বলিয়া বর্ণিত আছেন। মৃ ধাতুর অর্থ আঘাত বা হনন করা, সেই জন্য ইঁহারা সর্বধ্বংসী ঝড়। লাটিন যুদ্ধদেবতা Mars এবং গ্রীক Ares (ম-লু প্ত) মরুতেরই রূপান্তর। অগ্নিপুরাণের গণভেদনামাধ্যায়ে মরুদ্গণের ৪৯টি নামোল্লেখ দেখা যায়—একজ্যোতিঃ, দ্বিজ্যোতিঃ, ত্রিজ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ, একশক্রঃ, দ্বিশক্রঃ, ত্রিশক্রঃ। ১ম গণ। বল, ইন্দ্র, গতি, অদৃশ্য, পতিসকৃৎপর, মিত, সংমিত্র। ২য় গণ। সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অনমিত্র। ৩য় গণ। পরুমিত্র, অপরাজিত, ঋত, ঋতবাহু, ধর্ত্তা, ধরুণ, ধ্রুব। ৪র্থ গণ। বিধারণ, দেব, ঈদৃক্ষ, অদৃক্ষ, প্রসদৃক্ষ, সভর, মহাযশা। ৫ম গণ। ধাতা, দুর্গ, ধৃতি, ভীম, অভিযুৎ, অপাৎ, সহঃ। ৬ষ্ঠ গণ। ঘৃতি, র্ষ, পুরনায়, বাস, কাম, জয়, বিরাট॥ ৭ম গণ। ঋগ্বেদ ১ ১১।৮ ঋকে বলা হইয়াছে যে মরুদ্গণ বারি মোচন করেন, তাঁহাদের বাসস্থান সূর্য্যোপরি এবং তাঁহারা সূর্য্যরশ্মির সহিত বিস্তৃত হন; মরুদ্গণের এই বারি মোচনের সহিত sun-spot এর কোনও সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যে কৃষ্ণবিন্দু দেখা দিলেই পৃথিবীতে বারিপাত অবশ্যম্ভাবী।

১। ম্যাক্সমূলার অশ্বিনদের দিবা রাত্রি মনে করেন—Origin and growth of Religion (1882) P. 219. গোল্ড ষ্টুকার যাস্ক মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—Notes on Muirs Sanskrit Texts vol v (1884) P 257.

মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩২১ অধ্যায়ে ৪৯ বায়ুর ৭ গণাধিপদের কার্য্য-সমুদয় বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণেতিহাসে বায়ু হইতে মরুদ্গণকে পৃথক্ করা কঠিন। আমাদের বোধ হয় একই বায়ু দেবতার বিভিন্ন বিকারই মরুদ্গণরূপে পুরাণে বর্ণিত। বেদে কিন্তু উভয় দেবতার ভেদ আছে। ১। প্রবহ নামক বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘজালকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আকাশ-পথে বিদ্যদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে অর্থাৎ মেঘ সংঘর্ষ। ২। আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয় ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থাৎ গ্রহগতি। ৩। উদ্বহ নামক বেগবান তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই সেই মেঘসমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের নিকট সমর্পণ করে অর্থাৎ জলকে বাষ্পীকরণ ও ঊর্দ্ধ আকর্ষণ। ৪। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ-সমুদয়কে পৃথক্‌রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বায়ুগতি। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারি বর্ষণ ও কখনও বা ঘনীভূত হইয়া জল বর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থির ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। ৫। বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ড বেগে বৃক্ষ-সমুদয়কে উৎপাটিত এবং প্রলয় কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশ সূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। ৬। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা (ছায়াপথ) মন্দাকিনীর জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ নীহারিকার আণবিক সংশ্লিষ্ট শক্তি। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎ-প্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য বিখণ্ডিত না হইয়া একরশ্মির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করে। ৭। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণসংহার করে। মৃত্যু ও জন্ম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট শক্তি। দেহীতে প্রথম পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান উদান, সমান ও ব্যানরূপে বর্ত্তমান।

৮। সূর্য্য। (ঋ বে ১।৬।১ ঋকের অর্থ সায়ণ করেছেন, "স্বর্গে সূর্য্যরূপে, পৃথিবীতে হিংসক রহিত অগ্নিরূপে সর্বচারী বায়ুরূপে অবস্থিত ইত্যাদি। মূলের 'ব্রধ্নম্' শব্দের অর্থ যদি সূর্য্য হয় তাহা হইলে ম্যাক্সমূলার বলেন, 'অরুষ' শব্দের অর্থ অগ্নি গ্রহণ না করিয়া যদি উহার আদিম অর্থ 'লোহিত বর্ণ' গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। 'অরুষ' বিশেষ্য হইলে সূর্য্যের একটি অশ্বের নাম হয়—লোহিতাশ্ব। (২) ইন্দ্রের অশ্বের নাম 'হরি' কিন্তু অগ্নির অশ্বের নাম 'রোহিত' বলিয়া ঋগ্বেদে প্রচার আছে। গ্রীক্ Eros এবং লাটিন Cupid (কামদেব) এই সূর্য্যের লোহিতাশ্ব 'অরুষের' রূপান্তর। কারণ লোহিত বর্ণ প্রেমেরই নিদর্শন। তিনি আরও বলেন, সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম 'হরিৎ,' সেইজন্য সূর্য্যের অপর নাম 'হরিদশ্ব'। গ্রীকদেশে ঐ রশ্মি রূপবতী Charites (The graees) রূপে পূজিত হইতেন (২নং বিবৃতি দ্রষ্টব্য)।

সংস্কৃত সূর্য্য, লাটিন Sol, সংস্কৃত হিরণ্যপাণি গ্রীক্ Helios, মিউটন Tyr সংস্কৃত সৌরি। ইরাণী খোর সেদ। ইরাণীরাও সূর্য্যরশ্মিকে অশ্বরূপে কল্পনা করিয়াছে। যেমন,—"অদৃশ্যভাবে আগন্তুক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যে মনুষ্য অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে যজ্ঞ প্রদান করে, সে অহুরো মজদ্‌কে যজ্ঞ প্রদান করে।" (জেন্দ আবেস্ত খোরসেদ যাস্ত)। আমাদের বেদে একটি গল্প আছে, সূর্য্য অন্যায় পূর্বক কোনও যজ্ঞে হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার হস্ত ছিন্ন হয়, পরে ঋত্বিকেরা তাঁহার স্বর্ণহস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (ঋ বে ১।২২।৫—সায়ণ ভাষ্য)। ইহারই প্রতিধ্বনি জার্ম্মাণ পুরাণেও দেখা যায়। তাঁহাদের Tyr (সূর্য্যদেব শীকার করিতে গিয়া ব্যাঘ্র-মুখে হস্ত দেওয়ায় হস্ত ছিন্ন হয়। আসল কথা, বৈদিক কবিরা সূর্য্যরশ্মিকে হিরণ্যপাণি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঋ বে ১।২২।৫ ঋকে হিরণ্যপাণি অর্থে সায়ণ বলেন, "যজমানকে দান করিবার জন্য যিনি হস্তে স্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন।"

আমরা অদিতির সন্তানকেই আদিত্য বলিয়া জানি। ঋ বে ২.৭৭ সূক্তে ছয় জন আদিত্যের উল্লেখ আছে—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। ঋ বে ৯।১১৪ সূক্তে সাত জনের, কিন্তু নাম নাই, ১০।৭২ সূক্তে আট জন আদিত্যের উল্লেখ আছে—ধাতা, অর্য্যমা, মৈত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৬।৩৮) দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য্য। পুরাণে বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম (বিষ্ণু) বিখ্যাত। সত্যব্রত সামাশ্রমী বলেন, প্রথম উষাভাগ বরুণ, তার পর ভগ এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অভ্যগ্র না হন, ততক্ষণ তিনি পুষা, পূর্ব্বাহ্ণ অর্য্যমা বা অর্ক এবং মধ্যাহ্ন বিষ্ণু এইরূপ আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন।

দিত্ ছেদনে, সেজন্য অদিতি—অখণ্ডা বা অচ্ছেদ্যা। যাস্ক বলেন, আদি দেবমাতা। ম্যাক্সমূলার ও রোথের মতে অদিতিই (aditi—Infinitude from dita bound & a—not) অনন্তের প্রথম আর্য্যনাম। "Aditi an ancient god or goddess, is in reality the earlist name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite. visible by the naked eye, the endless expanse." (৩)

কিন্তু আচার্য্য শংকর কঠোপনিষদের (২।১।৭) মন্ত্র "য প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী" পাদের অর্থ করিয়াছেন, "যা সর্ব্বদেবতাময়ী সর্ব্বদেবাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি, শব্দাদিনাম অদনাৎ অদিতিঃ।" আচার্য্যের ব্যাখ্যাটি মন-গড়া, নয়, কারণ বৃহদারণ্যকের ৩।৯।৫ ব্রাহ্মণে "আদিত্য" পদের

২। Chips from a German Workshop vol II (1867,) P 128—140. Science of Language (1882), vol II P. 405 to 412.

৩। Max Muller's Rig Veda Vol I, P. 230 Roth, translated by Muir's Sanskrit Texts Vol v. p. 37.

নির্বচন এইরূপ—"দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যাঃ এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি, তে যদিদম্ সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি"—সংবৎসরের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মাসই আদিত্য, কারণ ইহারা সমস্ত জগৎকে আদান করিয়া অর্থাৎ প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় করিয়া গমন করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা সমস্ত গ্রাস করিয়া চলিয়া যায় সেই হেতু তাহারা আদিত্য-পদবাচ্য।

৯। ঋভুগণ (ঋ বে ১।২০ সূক্ত) সায়ণ ১।১১০।৬ ঋকে "ঋভু" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভবো উচ্যন্তে।" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি। গ্রীকদের একটি প্রবাদ আছে যে Orpheus তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গীতের দ্বারা মৃত্যুরাজ Plutoকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পান। কিন্তু পথে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া চাওয়ায় শপথ ভঙ্গে তাঁহার স্ত্রী অন্তর্ধান হন। মোক্ষমূলর বলেন, Orpheus ঋভু বা অর্ভুর রূপান্তর মাত্র এবং ঐ গল্পের মূল আশয় হচ্ছে—উষার দিকে সূর্য্য তাকাইলেই (উদয় হইলে) উষা অদৃশ্য হন। তাহা ছাড়াও তিনি বলেন, "উর্ব্বশী ও পুরূরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দু সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহারও মূল ঐ প্রাকৃতিক তত্ত্বে, কারণ উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। কিন্তু পুরাণ মতে নারায়ণ ঋষির উরু হইতে জাত বলিয়া উর্ব্বশী।

১০। উষা। উষার গ্রীক রূপান্তর Eos এবং ল্যাটিন Aurora। তাহা ছাড়াও ঋগ্বেদের অর্জ্জুনী, বৃষয়, দহনা, উষস্, সরমা এবং সরণ্যু গ্রীকদিগের Argynories, Brisies, Daphane, Eos, Helen এবং Erinys শব্দে রূপান্তরিত। (৪) এই সংহিতায় উষাকে "অহনা" বলা হইয়াছে, উহা গ্রীক Athena ল্যাটিন Minerva, কক্সের মতে Argos এবং Arcadia উষার অর্জ্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন। (৫) সরণ্যু এবং Erinys (অশ্বিদ্বয় দেখুন) অথবা দহনা বা Daphne সম্বন্ধে আখ্যায়িকারও মিল আছে। গ্রীক পুরাণে আছে Appolo (সূর্য) Daphneকে (দহনাকে) ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবন করেন এবং Daphaneকে ধরিবামাত্র তিনি বিগত হন, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে উষার অবসান হয়।

১১। অর্য্যমা (ঋ বে ১।৪১।১ ঋক্)। আইরিশ Air man ইনি ইরাণীদেরও দেবতা। হিন্দুদের ন্যায় ইরাণীরাও ইঁহাকে প্রথম সূর্য্য বলিয়া উপাসনা করিতেন এবং ইনি ঔষধিজ্ঞ ছিলেন। যখন অহুরমৈন্যু (অঙ্গ) ৯৯,৯৯৯ প্রকার রোগের সৃষ্টি করিল, তখন অহুরমজদ প্রতিকারের জন্য নৈর্য্যসংঘক (বৈদিক নারশংস বা অগ্নি) দূতরূপে অর্য্যমনের নিকট পাঠাইলেন। আবেস্তায় আছে—"পরম রমণীয় অর্য্যমন সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু এবং যাতু (রাক্ষস) ও পৈরিকা (পীড়া) ও জৈনিদিগকে (অপযোনি) ধ্বংস করুন।" ২২ ফার্গার্দ।

১২। যমযমী (অশ্বিদ্বয় দেখুন)। ঋ বে ১।৩৫।৬ মন্ত্রে আছে, "দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটি লোক আছে,—দুইটি (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ এবং একটি (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।" ম্যাক্সমূলার বলেন, সরণ্যুর (উষার) সহিত বিবস্বানের বিবাহে যম (দিবা) ও যমীর (রাত্রির) উৎপত্তি। কিন্তু অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে তিনি একই কথা বলিয়াছেন। (৬) পরন্তু পুরাণ মতে যমী হলেন যমুনা, বা কালিন্দী অর্থাৎ কৃষ্ণশীলা আয়ুরূপা নদী এবং যম হলেন মৃত্যুর অধিপতি।

আমাদের বোধ হয় বিবস্বান্ প্রথম সন্ধ্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে উষাকে (সরণ্যু) বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহের ফলে যম যমীর জন্ম হয় এবং দ্বিতীয় বিবাহে সন্ধ্যা অপগতা হন। দেবতারা সন্ধ্যাকে লুকাইয়া রাখেন। পরে সরণ্যু সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারায় অশ্বরূপে পলায়ন করিলে পুনরায় (পৌরাণিক) সন্ধ্যা বা ছায়া আগমন করেন। পরে বিবস্বান পুনরায় অশ্বরূপে সরণ্যুর অনুগমন করেন এবং অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। বিবস্বান্ ও সন্ধ্যা হইতে প্রথম যমজ—যম ও যমী এবং বিবস্বান্ ও সরণ্যু হইতে দ্বিতীয় যমজ অশ্বিদ্বয় (অর্দ্ধরাত্রের পর ও আলোক প্রকাশের পূর্ব্বে অলোক ও অন্ধকারে জড়িত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত—যাস্ক) উৎপন্ন হয়। পুরাণে যে উষার "সংজ্ঞা" নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ উষার আগমনে লোকে সংজ্ঞা বা চেতনা লাভ করে। এই উষারই অপর দিক সন্ধ্যা বা ছায়া, সেই জন্য ইনিই যথার্থ যম-যমীর মাতা। কারণ যম মৃত্যু-অধিপতি। মৃত্যু সংজ্ঞাহীন অবস্থা সন্ধ্যা বা ছায়া যাঁর রূপ। বিবস্বান অর্থে আকাশও হয়। এই আকাশে কালের ক্রীড়ার একরূপ উষা যাঁহার সন্তান যৌবন ও বলরূপ দেব-বৈদ্য অশ্বিদ্বয়, আর একরূপ সন্ধ্যা বা ছায়া, যাঁহার সন্তান যম ও যমী।

ইরাণীয় সাহিত্যেও যম 'যিম' রূপে পরিচিত। সেখানে তিনি প্রথম রাজা, বর নামক পুরীর সৃষ্টিকর্ত্তা, পুণ্যাত্মারা এখানে তাঁহার দর্শন পান এবং ইনি আদি সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার পিতার নাম 'বিবনৃঘৎ' (বৈদিক 'বিবস্বানের' রূপান্তর)। আবেস্তায় নিম্নলিখিত একটি বর্ণনা আছে—"অহুর মজদ্ উত্তর দিলেন, হে জরাথুষ্ট্র! তোমার পূর্ব্বে শোভনীয় যিম নামক মর্ত্ত্যের সহিত আমি প্রথম কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকেই আমি অহুরের ধর্ম, জরাথুষ্ট্রের ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম। হে জরাথুষ্ট্র! আমি অহুর মজদ, তাহাকে বলিয়াছিলাম যে "হে বিবনৃঘতের পুত্র শোভনীয় যিম! তুমিই আমার ধর্মের বাহক ও প্রচারক হও।"—১ম ফার্গার্দ। কঠোপনিষদে এই যমকে আমরা প্রচারকরূপে দেখি।

ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি, ঋগ্বেদই আর্য্যজাতির যখন সর্ব্ব প্রাচীন সাহিত্য তখন ইহার ভাষাই আর্য্যজাতির বোধ হয় সর্ব্ব প্রাচীন ভাষা। (৭)

৪। The heroine of the stories must be the dawn, aptly represented as a charming maiden. And her names in the Rik Veda Arjuni Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama and Saranyu and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Brisies, Daphne, Eos, Helen and Erinys.—Rajendra Lal Mitra's Indo Aryans Vol II, Article Primitive Aryans.

৫। Mythology of Aryan Nations Vol I, Book I. Chap X.

৬। Science of Language (1882) Vol II, P 556 and 562.

৭। অনেকে বলেন, আর্য্যজাতির ভারতাগমনের পূর্ব্বে আর একটি ভাষা ছিল Nordic, যাহা বিকৃত হইয়া ঋগ্বেদীয়, ইরাণীয়

১৩। বিষ্ণু। ঋ বে ১।২২।১৭ মন্ত্রে আছে, "বিষ্ণু এই জগৎ ত্রিপাদে পরিক্রম কালে, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" যাস্ক ইহার ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন, "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয় শিরসি ইতি ঔর্ণনাভ" (১২।১৯)। দুর্গাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, "বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নি ভূত্ব পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে গয়শিরস্যস্ত গিরৌ ইতি ঔর্ণনাভ আচার্য্য মন্যতে।" অর্থাৎ শাকপূণি মতে—বিষ্ণুর ত্রিপাদ ক্ষেপ স্থল—পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দিবিতে সূর্য্যরূপে। ঔর্ণনাভ মতে প্রথম পাদ উদয়গিরিতে, দ্বিতীয় পাদ মধ্যাকাশে এবং তৃতীয় পাদ গয়শির অস্তগিরিতে। গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ পৌরাণিক উপাখ্যান এখান হইতেই উৎপত্তি। পুরাণে সূর্য্য-শরীরের অন্তর্বর্ত্তী পুরুষের নাম বিষ্ণু—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ। আবার দ্বাদশ আদিত্যের একজন বিষ্ণু। সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত "সুপর্ণো গরুত্মান্" (ঋ বে ১।১৬৪।২২) রূপ আদিত্য একত্রিত হইয়া নীলাকাশে আলোর পাখী বিষ্ণুবাহন পৌরাণিক গরুড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সায়ণ ঐ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান গরণবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।" (৮)

১৪। রুদ্র ও অম্বিকা। ১।২৭।১০ ঋকে 'রুদ্রায়' শব্দের অর্থ যাস্ক লিখিয়াছেন, "অগ্নিরপিরুদ্র উচ্যতে।" সায়ণ বলেন, "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে"। অগ্নিই পুরাণে কালাগ্নিরুদ্রে পরিণত হইয়াছেন এবং অগ্নিশিখা—কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি সপ্তজিহ্বা (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৪) তাঁর শক্তিতে রূপান্তরিত হন। রুদ্র শব্দের অর্থ বজ্রও হয় এবং ১।১৬৪।৪১ ঋকে আছে, "গৌরী বৃষ্টি জল সৃজন করতঃ শব্দ করিতেছেন।" এখানে সায়ণ "গৌরী" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মেঘ গর্জনরূপ বাক্ বা শব্দ।" সেই জন্য পুরাণে বজ্ররূপ রুদ্রের গৌরীরূপ শক্তিতে পরিণতি দেখা যায়। ৩।২৭।৯,১০ ঋকে আছে—"যে অগ্নি কর্মদ্বারা বরণীয়, ভূত সমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতা-স্বরূপ, দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন। হে বল-সম্পাদিত অগ্নি। তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের কন্যা ইলা (পৃথিবী) ধারণ করিতেছেন।" অর্থাৎ রুদ্ররূপ অগ্নি পৃথিবীরূপ বেদীতে স্থাপিত আছেন। শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট উৎপত্তির ইহাই মূল মন্ত্র। "জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।" (মহানারায়ণোপনিষৎ ২।১)—এখানে প্রথম মন্ত্রটি জাতবেদ নামক রুদ্রাগ্নি এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি তাঁর শক্তি অগ্নিবর্ণা দুর্গা। ১।৩১।১ ঋকে "অগ্নি দেবতা হইয়া দেবতাদের শিবস্বরূপ সখা হইয়াছেন"—এইরূপ আছে।

রুদ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ বজ্র এবং রুদ্র অগ্নির রূপ-বিশেষও বটে, ইহা আমরা পূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছি। সায়ণাচার্য্য ১।১১৪।১ ঋকের "কপর্দ্দী" অর্থ জটিল অথবা জটাধারী করিয়াছেন। এখানে কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ভব, গিরীশ, নীলগ্রীব, বিলোহিত প্রভৃতি রুদ্রের বিশেষণ আছে। (তৈত্তিঃ সংহিতা ৪।৫)। আবার দেখা যায়, বৃষ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ। মেঘই বারিবর্ষণ করে এবং মেঘই বজ্রের বাহক। সেই জন্য বৃষ রুদ্রের বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে। অপরে বলেন, অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত, সেই যজ্ঞ-কাষ্ঠ বৃষের পৃষ্ঠে আনয়ন করা হইত, সেই জন্য রুদ্রাগ্নির বাহক বৃষ। যজ্ঞাবশেষ ভস্ম হইতে রুদ্রের বিভূত্যঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডান্তর্গত বৈশ্বানরোৎপত্তিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় এই কথারই পরিপোষক। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে; এবং উক্ত স্তম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে প্রকারে যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি (নীললোহিত) ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপ স্কম্ভও শ্রীশংকরে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।" (ভাববার কথা—পারিপ্রদর্শনী, ৩৬ পৃঃ)। অথর্ব্ববেদোক্ত এই স্কম্ভই পুরাণোক্ত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জগৎ-কর্ত্তৃত্ব বিবাদের মধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভস্বরূপ। এবং যূপকাষ্ঠে (হাড়িকাঠে) যে পশুবন্ধন প্রথা এখনও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে, উহাই রুদ্রের পশুপতি নামের কারণ। যূপস্কম্ভ—ব্রহ্ম, বন্ধনরজ্জু—মায়া এবং পশু জীব। সেই জন্য শৈবসিদ্ধান্তচারীরা স্তম্ভস্বরূপ ব্রহ্মকে "পশুপতি" বলেন। আচার্য্য শংকর তাঁহাকেই "পশু পাশনাশিন্" বলিয়া স্তব করিয়াছেন।

প্রভৃতি প্রাচ্য এবং ইউরোপীয় গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য আর্য্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি ভারতীয় আর্য্যদের সপ্ত সিন্ধু তীর হইতে বিস্তার ছাড়া অন্য কোনও স্থান হইতে আগমন নিশ্চিত হয় নাই এবং ঋগ্বেদ অপেক্ষা অন্য কোনও প্রাচীন ভাষার নিদর্শনও পাওয়া যায় না। অতএব অমূলক কল্পনার উপর একটি Indo European Nordic ভাষার প্রতিষ্ঠা করিতে আমরা অনিচ্ছুক।

৮। বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধীয় বৈদিক কথা নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দেখুন—মৎস্যাবতার শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৮।১। বরাহাবতার তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১৫। কূর্ম্মাবতার শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৫।১।৫। হয়গ্রীবাবতার শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।১।১। বামনাবতার—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।১৫ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ১।২।৫।

"The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating, and setting of the Sun"—Max Muller's Translation of Rik. Veda vol I (1869) P. 117.

কেনোপনিষদের ৩।১২ ভাষ্যে আচার্য্য শংকর বলিতেছেন—"ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রঃ তাম্ উমাং বহুশোভমানাং সর্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমাং বিদ্যাং তদা বহুশোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্ন ভবতি। হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি (৩ ১২)"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্যে সায়ণ বলেন—"হিমবৎ পুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্ গৌরীবাচক উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যামুপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তি প্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তি পঠ্যতে, বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ ইতি তদ্বিষয়ঃ তয়া উময়া সহ বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।"

গুণ ও গুণীর সমান্তরাল অবস্থান হেতু শুক্লযজুর্বেদ (৩'৫৭)—"এষ তে রুদ্রভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা" তথা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।৮।৬।৬) অম্বিকাকে "রুদ্রভগিনী" বলা হইয়াছে। মহীধর বলিতেছেন—"অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যুক্তম্ (২।৬।২১)। অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি সোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি তদানয়া ভগিন্যা ক্রূর দেবতায়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি। সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুপ্রশমনেন হবিষা শান্তং ভবতি।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্টের ২২ অনুবাকে "অম্বিকাপতয়ে" (দ্রাবিড়ী পুঁথিতে "উমাপতয়ে)" শব্দের অর্থ সায়ণ করিয়াছেন—অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী তস্যা ভর্ত্তে।" মহীধর বাজসনেয় সংহিতার ভাষ্যে (৬।৩১) এবং ভট্ট ভাস্কর মিশ্র তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে "সোম" শব্দের "উময়া সহ" অর্থ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরম্" আছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (প্রপাঠক ১০। অনুবাক ১।২১ মন্ত্র) দুর্গাগায়ত্রী সায়ণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হেমপ্রখ্যামিন্দুখণ্ডাঙ্ক-মৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে ক্যাত্যায়নায় ইতি।" কৃত্তিং বস্তু (হস্তী বা ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত) ইতি কাত্যো রুদ্রঃ।...স এব অয়নমধিষ্ঠানং যস্যা সা কাত্যায়নী; অথবা কতস্য ঋষি-বিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।...কুৎসিতমানিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী। কন্যা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কন্যা—কুমারী। দুর্গিঃ দুর্গা।

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে আছে—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।" (তৈঃ আঃ ১০।১।৫৩)। মহা-নারায়ণে আছে—"দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু শং নো দেবীরভীষ্টয়ে।"

শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে এইটুকু পাওয়া যায়—দেবতারা পশুপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার 'বাস্তব্য' (বাস্তু বা যজ্ঞভূমি হইতে পরিত্যক্ত) নাম হইয়াছিল। পশুপতি দেবতাদের প্রতি অস্ত্র উদ্যত করিলে, দেবতারা তাঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দিতে চাহিলেন। তখন তিনি অস্ত্র সংবার করেন (১।৭।৩।৪ ১-৪) এখানে তাঁহার শর্ব, ভব, রুদ্র ও পশুপতি নাম পাওয়া যায় (১।৭। ৩।১,৮)।

শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র সম্বন্ধে আর একটি উপাখ্যান আছে—প্রজাপতি নিজ দুহিতা উষাতে কামাসক্ত হন। দেবতারা পশুপতিকে এই কথা বলিয়া দেন। পশুপতি প্রজাপতিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন। রুদ্রের ক্রোধ অপগত হইলে অতঃপর দেবতারা তাঁহার চিকিৎসা করেন (১।৭।৪।২।১-৪)।

১৫। সরস্বতী। ঋগ্বেদ ১।৩।১০-১২ মন্ত্রে সরস্বতীর উল্লেখ দেখা যায়। যাস্ক এবং সায়ণ উভয়েই সরস্বতীর দ্বিরূপতা স্বীকার করেন—নদী (সরঃ—জল) এবং বাক্। যাস্ক বলেন, "তত্র সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" কিন্তু নদী ও বাক্ এক দেবতা হইলেন কি করিয়া? মুইর বলেন, সরস্বতী তীরে যজ্ঞ ও মন্ত্রে সদাপূর্ণ থাকায় উভয়কে এক দেবতারূপে ঋষিরা গ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে আছে, নারায়ণের আদেশে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা জীবোদ্ধারের নিমিত্ত সলিলরূপা হন (১৬)।

১৬। পূষা, পৃশ্নি, ঋক্ষ। পূষা ও পৃশ্নি সম্বন্ধে (ঋ বে ১ ২৩। ৮,১০); নির্ঋতি, জার্মাণ Vergehen সম্বন্ধে (ঋ বে ১।৪৪।১); ঋক্ষ (সপ্তর্ষি), গ্রীক্ Arktos সম্বন্ধে (ঋ বে ১।২৪।১০) দ্রষ্টব্য।

হেনোথিজিম্

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঋক্-সংহিতার এই বহু দেব-দেবীর সহিত একেশ্বরবাদ অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। ঋক্-সংহিতার দর্শন বিভিন্ন দেবতা প্রতীকের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন "আকাশে সর্বতো বিসারী চক্ষুর দৃষ্টির ন্যায় বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরম পদ সর্বদা দৃষ্টি করেন" (ঋ বে ১ ২২ ২০)। "স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন" (ঋ বে ১।২২।২১)। "সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে ঋক্ দ্বারা সে কি করিবে? এ কথা যাহারা জানে তাহারা সুখে অবস্থান করে।" (ঋ বে ১।১৬৪।৩৯)। "সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ, তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। (ঋ বে ৬।৪৭।১৮)। "যখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ, স্বর্গের চন্দ্রাতপ ছিল না—কি সকলকে আবরণ করিয়াছিল? কিসে সব বিশ্রাম করিতেছিল?—সে কি জল না গহন গভীর অন্ধকার? তখন মৃত্যু ছিল না—দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না, তখন সেই 'একই' অবরুদ্ধ প্রাণ হইয়া নিজেতেই ছিলেন—তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন ছিল অন্ধকার অন্ধকারে লুকান—ছিল এক অপরিচ্ছিন্ন জল। অসতের দ্বারা আবৃত সেই শূন্য আকাশে ছিলেন সেই 'এক'—যিনি তপের দ্বারা বর্দ্ধিত হইলেন (ঋ বে ১০।১২৯ সূ)।

১৭। ত্বষ্টা।—(শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।১।১৪/ ১।৫।২/ ৫।৫।৬।২। তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৪।১২/২।৫।১ দ্রষ্টব্য।) তৈত্তিরীয় সংহিতায় ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের উপাখ্যান এইরূপে লিখিত আছে,—"ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন, ও সম্বন্ধে অসুরগণের ভাগিনেয় হইতেন। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল; একটির দ্বারা সোমপান, একটির দ্বারা সুরাপান ও অপর একটির দ্বারা অন্নভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বলিতেন যে হবির্ভাগ দেবগণের প্রাপ্য, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলিতেন যে তাহা অসুরেরা পাইবে। ইন্দ্র

তাহা জানিতে পারিয়া ও তাহার দ্বারা রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা আছে চিন্তা করিয়া বজ্রের দ্বারা তাঁহার মস্তকগুলি ছেদন করেন। সেই তিন মস্তকের মধ্যে, যাহার দ্বারা তিনি সোমপান করিতেন, তাহা কপিঞ্জল; যাহার দ্বারা তিনি সুরাপান করিতেন তাহা কলবিঙ্ক ও যাহার দ্বারা অন্নভোজন করিতেন তাহা তিত্তির নামক পক্ষী হইল। এ দিকে ইন্দ্র বিশ্বরূপের বধ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত বহন করেন। পরে লোকেরা 'ব্রহ্মঘাতী' বলিয়া তাঁহার অপবাদ কীর্ত্তন করিলে, পৃথিবী বনস্পতি ও স্ত্রী জাতিকে তাহাদের অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক এক এক জনকে স্বকীয় পাপের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া প্রদান করেন ও তাহাতে তাঁহার পাপমুক্তি হয়।

তার পর শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন (১।৫।২।১।৬—১০). "ত্বষ্টা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'সে আমার পুত্রকে বহুরূপে বধ করিয়াছে' এই বলিয়া তিনি ইন্দ্র-রহিত সোম আহরণ করিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, 'ইহারা (দেবতারা) আমাকে সোম হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে; তিনি আহূত না হইয়াই দ্রোণ কলসে যে শুক্র সোম ছিল, তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ঐ সোম তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে সৌত্রামণি ইষ্টির দ্বারা চিকিৎসা করিলেন। ত্বষ্টা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'সে আহূত না হইয়াই সোম ভক্ষণ করিল।' তখন তিনি নিজেই সে যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন ও দ্রোণ কলসে যে ধবল সোম অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই বলিয়া আহুতি দিলেন, 'ইন্দ্র শত্রু হইয়া বর্দ্ধিত হও।' ইহা অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াই পুরুষরূপে উৎপন্ন হইল। সে বর্দ্ধমান হইয়া সম্ভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বৃত্র এবং পাদহীন হইয়া সম্ভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 'অহি'। দনু ও দনায়ু পিতামাতার ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম দানব।"

মূলে "ইন্দ্র শত্রুর্বর্দ্ধস্ব" আছে। ত্বষ্টার অভিপ্রায় ছিল, 'ইন্দ্রের শত্রু বর্দ্ধিত হউক।' 'ইন্দ্রশত্রু' পদের এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিতে গেলে ঐ পদের অন্তোদাত্ত স্বর করিয়া উচ্চারণ করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি প্রমাদ বশতঃ ঐ পদের আদিতে উদাত্তস্বর করায় উহা বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়ে এবং উহার মানে হয়, 'ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যাহার'। (বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্"-পাণিনি ৬।২।১/৬।১। ২২০,২২৫)—"ইন্দ্রঃ শত্রুঃ শাতয়িতা অস্যেতি।" অতএব বৃত্র ইন্দ্রের বধ্য হইলেন।

অতঃপর তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৫।৩) এইরূপ আখ্যায়িকা দেখা যায়—"বৃত্রকে বধ করিবার পর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বীর্য্য পৃথিবীতে চলিয়া যায় ও ওষধিলত-গুল্মরূপে পরিণত হয়। ইন্দ্র এই সংবাদ প্রজাপতিকে প্রদান করিলে তিনি পশুসমূহকে বলিলেন যে তোমরা ইন্দ্রের নিকট তাঁহার ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যকে লইয়া যাও। পশুরা তাহা ওষধি প্রভৃতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের শরীরে রক্ষা করে ও দুগ্ধরূপে তাহা দোহন করাইয়া ইন্দ্রের নিকটে সম্যক্ ভাবে লইয়া যায়। কিন্তু ইন্দ্র প্রজাপতিকে বলিলেন যে 'ইহা আমাতে থাকিতেছে না' তখন তিনি বলিলেন যে 'ইহা শৃত (পক্ক) করিয়া দাও।' তাঁহারা তখন তাহাই করিলেন এবং তাহাতেই ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য তাঁহাতে স্থিত হইল, ইন্দ্র আবার প্রজাপতিকে বলিলেন, 'ইহা আমার প্রীতিপদ হইতেছে না' এবং তাহাতে প্রজাপতি বলিলেন, 'ইহার জন্ত তবে দধি কর।' অতঃপর দেবতারা তাঁহার জন্ত দধিই করিয়াছিলেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।৩।৪-৮ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীযুক্ত মধুশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শতপথ ব্রাহ্মণের ২৫১ পৃঃ "ত্বষ্টা সিক্ত রেতকে রূপান্তরিত করেন"—এই ব্রাহ্মণের টীকায় বলেন—"ত্বষ্টা যে রূপকর্ত্তা, ইহা বৈদিক সাহিত্যে অতি প্রসিদ্ধ"; পরে উক্ত হইয়াছে, "ত্বষ্টা রূপাণাং রূপকৃৎ রূপপতিঃ" (১১।৩।১।১৭) দ্রষ্টব্য—"ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু" (ঋ বে ১০।১৮৪।১), "ত্বষ্টা রূপাণি স হি প্রভুঃ" (ঋ বে ১।১৮৮।৯)। [বিভিন্ন স্থানে এতাদৃশ মন্ত্রের জন্য—A vedic concordance. Harvard Oriental Series, Lanman, p. 463 দ্রষ্টব্য]।

আর্য্যদের আদিম নিবাস (৯)

এক্ষণে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা "ঋগ্বেদের পরিচয়" শেষ করিব—(১) ঈশ্বর পুত্র আর্য্যদের (১) (যাস্ক ৬।৫।৩) নিবাস কোথায়? উত্তর মেরু (তিলক), স্কান্দেনেভিয়া, মধ্য আসিয়া প্রভৃতি (পাশ্চাত্য মত), পঞ্জাব হইতে অরল হ্রদ পর্য্যন্ত (অবিনাশ চন্দ্র), মস্তামিডিয়া (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি মত এখানে বিচার করিবার আমাদের অবসর নাই। তবে বৈদিক সাহিত্য পাঠে আমরা নিম্নলিখিত নদী ও স্থানগুলির উল্লেখ পাই, এবং ভারতীয়দের অন্য কোন দূর দেশ হইতে আগমনের বার্ত্তাও পাওয়া যায় না, পরন্তু এখান হইতেই বিস্তারের বহু নির্দ্দেশ আছে।

ঋ বে ৫।৫৩।৯ মন্ত্রে রসা (উড্ডিয়ান প্রদেশের উত্তরে), অনিতভা, কুভা (কাবুল), সিন্ধু ও জলমগ্নী সরযু (তক্ষশিলায়) নদীর উল্লেখ আছে। ঋ বে ১।১০৪।১ মন্ত্রে নিষদ পর্ব্বতের উল্লেখ পাই। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৩ ২ ১-২ ব্রাহ্মণে 'নড়ো নৈষিধঃ' পদের উল্লেখ আছে। ১।১০৪।৪ ঋকে অঞ্জসী (সুবাস্তুর ঈশান কোণে—যাস্ক ৪ ২।৭), কুলিশী (বায়ু কোণে) এবং বীরপত্নী (অগ্নি কোণে) উল্লেখ আছে। ঋ বে ৩ ৫৮ ৬ মন্ত্রে জাহ্নবীর উল্লেখ আছে। ঋ বে ৩।২৪।৪ মন্ত্রে দৃষদ্বতী হইতে সরস্বতী-তীরের উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন শাখার ১।৩।১০—১২/২।৩০ ৮/২।৩১ ১৬-১৮/৬.৬১/৭।৮৫.১—২, ৪—৬ /৭।৯৬।১-৩/১০।১৭ ৭ ৯ ঋক সকল আলোচনা করিয়া উহাই ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিয়া বোধ হয়। ৮.২১।১৮ মন্ত্রে সারস্বত প্রদেশের রাজা চিত্রের উল্লেখ আছে। ১০.৭৫।৫ মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী শুতুদ্রী (Sutlej), পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা, মেরুদ্বৃধা (কশ্যপপুর পাঞ্জাব), উহারই পূর্ব্বে আর্জিকিয়া [বিপাড়—য.স্ক এবং তাহার পূর্ব্বে উর্জ্জিয়া নামে খ্যাত (১।৩।৫)

১। ঋবে ১।৫১।৮/১ ১০৬।৫/১।১১৬ ২১/১।২৩০।৮/৩।৩৪। ৯/৪।২৬।২/৬।২২ ১০/৬ ৬৩।৩ মন্ত্রে সায়ণ আর্য্য শব্দের অর্থ ঋ ধাতু হইতে—বিজ্ঞযজ্ঞানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞস্তোতা, বিজ্ঞ, অরণীয় বা সর্ব্ব গন্তব্য, উত্তমবর্ণ, ত্রৈবর্ণিক, মনু, কর্ম্ম যুক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্ধাতু হইতে ভূমি কর্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীন লাটিন, গ্রীক্, এ্যাংগ্লো-স্যাকসন, ইংরেজী, রুষ, আইরিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্, নোর্স, লিথুয়েনিক, প্রভৃতি ভাষায় হল বা কৃষি অর্ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ আর্য্য শব্দের অর্থ যাঁহারা চাষবাসাদি করেন।

বর্ত্তমান বিপাশা], সুষোমা (তক্ষশিলার দক্ষিণে)। সিন্ধুর পশ্চিম দিকের নদী সকলের নাম ঋ বে ১০।৭৫।৬ মন্ত্রে দেখা যায়— তৃষ্টামা (চিত্রলে), সুসর্ত্তু (সুসাস্ত), রসা, শ্বেতী (অর্জুনী, দেরা ইস্মাইল খাঁ), কুভা (অপগা বা কাবুল), গোমতী (গোমল) এবং ক্রুমু (কুরম বর্ম্ম বা বুনারে)—ইহার পরবর্ত্তী কালে আফগান পঙ্কোর বলিয়া পরিচিত ছিল। ১।১২৬।৭ ঋকে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭'৫।৮ এবং পাণিনির ৪ ১'১৬৯ ও ৪ ২'১০৮ সূত্রেও শাল্ব, মদ্র ও গান্ধারের (ছান্দোগ্য উপনিষদে) উল্লেখ আছে। পাণিনির ৪'২।১০৮ সূত্রে পূর্ব্ব মদ্রের উল্লেখ আছে। ১০।৭৫।৭-৮ মন্ত্রে উর্ণাবতী (কৈলাস নিম্নে উর্ণা) হিরণ্ময়ী, বাজিনীবতী, সীলমাবতী (উত্তর কুরু), এনী (দক্ষিণ বেলুচিস্থান) নদীর উল্লেখ দেখা যায়। ঋ বে ১০'১০৮ ১ মন্ত্রে সরমা কুক্কুরী রসা নদী পার হইয়া দেবতাদের গাভীর অনুসন্ধানে পণিদের নিকট গমন করেন। ঋ বে ৮ ৭৯।২ এবং ১০।১২১'৪ মন্ত্রেও রসার উল্লেখ আছে। ঋ বে ১০।৭৫ ৬ মন্ত্রে রসা সিন্ধুসঙ্গতা। ১০।১২১।৪ মন্ত্রে আর একটি রসার উল্লেখ আছে, উহা বোধ হয় খোরাশানে। পারসীক আবেস্তায় ইহা রংহা বলিয়া পরিচিত। ঋ বে ৮'১৯।১৩ —১৫ মন্ত্রে যমুনা সংগতা অংশুমতীর এবং ১০'৫৩।৮ মন্ত্রে ঘর্ঘরার পশ্চিমে অশ্মন্বতী উল্লেখ দেখা যায়। ঋ বে ১।১০৪।১—৩ মন্ত্রে শিফা (শিফা) নদী নিষদ দেশে প্রবাহিত ছিল বুঝা যায়। ৫।২৭।৬ মন্ত্রে হরিয়ূপীয়া (Harappa ?), যব্যাবতী কোথায় বলা যায় না, তবে আফগানিস্থানে হরিরুদ নদী আছে। ১০।২৭।১৭ মন্ত্রে অক্ষ, বোধ হয় Oxns হইতে পারে। শ্বেতী শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪ ৮।৯) আছে। ঋ বে ৪ ৩০ ১৮/৫।৫৩।৯/১০।৬৪।৯ মন্ত্রের সরযূ অযোধ্যার সরযূ নয়, ইহা তক্ষশিলায়। বাজসনেয় সংহিতার (২৩৮) কাম্পিল্যবাসিনীর উল্লেখ আছে। উহার নিকটে বৃহদারণ্যকের (৩।৩ ১/৭ ১'৬/৭'৫'১) কপি প্রদেশ। অপর বৈদিক নদী যথা বক্ষু যক্ষু বা বক্ষু (Oxus), সীতা বা সীরা (১।১৭৪ ৯/১'১৬৪।৪১/১।১২।৩) (Syr Dari। Jaxartes) প্রভৃতি নদী উত্তর মেরু বা মধ্য এসিয়ায় বলিয়া বোধ হয় না। ঋ বে ১।৮৪।১৪ মন্ত্রে শর্য্যাণাবৎ সরোবর দেখা যায়—শাট্যায়নকে উদ্ধার করিয়া সায়ণ বলেন, 'কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে।' ১০।৩৪'১ মন্ত্রের ইরিন ও মূজবান্ বোধ হয় কৈলাসের নিকট মুজবান্ পর্বত ও আধুনিক ইরাণ জনপদ আছে। অথর্ববেদ সংহিতা ৫ম কাণ্ডকা, ১৪শ অর্চ্চা, ২২শ সূক্তের, ৩য় মন্ত্রে পুরুষ জনপদ (পুরুষপুর— পেশোয়ার), ৪ মন্ত্রে মহাবৃষ প্রদেশ, ৫ মন্ত্র ও ৭ মন্ত্রে মূজবৎ প্রদেশান্তর্গত বাহ্লীক (Bulk) দেশ, ৮ মন্ত্রে মহাবৃষ ও মূজবান, ৯ মন্ত্রে বাহ্লীক এবং ১৪ মন্ত্রে অঙ্গ মগধ, মূজবদ্, গান্ধার প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। শতপথ ব্রাঃ (১২।৬.৩'৩) বাহ্লীক দেশ আছে। ৩।৫৩:১৪ ঋকে কীকট (নিন্দনীয় দেশ যাস্ক ৬:৬:৪); বাজসনেয় সংহিতা ৬'৬১ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ২ ৬ ২'২।১৭তেও মূজবানের পারে রুদ্র নামক মৃত্যুকে যাইতে বলা হইতেছে। ঋবে ৭।১৮'১১ মন্ত্রে যমুনা তৃৎসব, অজাস, শিগ্রব (চন্দ্রভাগার তটে), যক্ষব প্রভৃতি প্রদেশীয় সামন্ত রাজগণের উল্লেখ আছে। পাণিনির ১।১.৭৫ সূত্রে প্রাচ্য ভূমে কান্যকুব্জ, অহিচ্ছত্রাদির (অহিচ্ছত্র কিছু দিন পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে) উল্লেখ বিদ্যমান। শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৪।৫।২১-শে সত্বৎ রাজ্য বা চক্রপুরী (দক্ষিণ দেশে) দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাঃ (৮'৪'৯) এ দৌষ্মন্তি ভরত এবং তাঁহার বংশধরদের উল্লেখ দেখা যায়। শতপথ ব্রাঃ (১'৩ ৩'১০— ১৯) বিদেঘ ও মাথব জনপদের উল্লেখ আছে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, আর্য্যেরা আগে সিন্ধুর উভয় কূলে বাস করিতেন, ক্রমে ব্রাহ্মণ ও সূত্র যুগে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন তাহারই একটি শাখা পারস্যে এবং অপর শাখা সকল ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করে। কেহ কেহ বলেন, ঋ বে ১ ৬০'৯ মন্ত্রে আর্য্যদের "পুরাতন আবাসের" উল্লেখ আছে। এবং শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণে আছে, "পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন······উত্তর দিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত······লোকেও উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়······লোকে ঐ দিক হইতেই আসে" ইত্যাদি (৭:৬)। ঋ বে ৫'৬১।১ মন্ত্রে আছে, "কে তোমরা দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ ?" এবং তাঁহারা শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ—"শতহিম পোষিত করি" (ঋ বে ১ ৬৪।১৪ ৫।৫৪।১৫-৬ ১০:৭)। পরে তাঁহারা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আগমন করেন। কিন্তু ১'৭২:৩ মন্ত্রে "তিন শরৎ," এবং ১'৮৬।৬ মন্ত্রে "বহু শরৎ," ২।১২'১১ মন্ত্রে "চল্লিশ শরৎ," ৭।৬৬।১৬ মন্ত্রে "শত শরৎ" এবং ১০'৯০.৬-১০।১৬১'৪ মন্ত্রে গ্রীষ্ম-বসন্তের উল্লেখ আছে। এবং প্রথম মণ্ডল হইতে যদি ১০ম মণ্ডল পর্য্যন্ত পর পর সাজান যায় তাহা হইলে দেখিতে পাই ১'৩ ১২-১অ।১১।৬। ৪ ১৪-১।৮৪.৩-১।১১২'১২-১ ১১৬।১৯-১ ১৬৪।৪১ মন্ত্রকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা বাস করিতেন সরস্বতী, সিন্ধু, শর্য্যাণাবৎ, অঞ্জসী, কুলিশ, বীরপত্নী, শিক্ষা, রসা, জাহ্নবী ও গৌরী নদীতটের উৎপত্তি স্থলে যাহা অত্যন্ত শীতপ্রধান কাশ্মীর হিমালয়। শাংখ্যায়ণের উক্ত ৭ ৬ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা কালে ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্য লোকে উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়। জেন্দ আবেস্তায় ঐর্যন বত্রজো। দেশে দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম লিখিত আছে।"

তার পর ৩।২৪।৪-৪।৩'৩৩ মন্ত্রে আপয়া ও শুতুদ্রীর, ৪।২১।৪-৫।৬১।১৯ মন্ত্রে সিন্ধু ও গোমতীর (গোমল) উল্লেখ আছে। তার পর অশ্মন্বতী তীরে আসিয়া বলিলেন, "হে সখাগণ উঠ, উৎসাহ কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অশান্ত ছিল, সকলি এইখানে রাখিয়া চলিলাম।" এই নদী পার হইয়া উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইবে। তার পর ৭'১০০ ৪ মন্ত্রে দেখা যায়, বিষ্ণু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তাঁহারা ক্রমেই পূর্বে অগ্রসর হইতেছেন। রাহুগণ অগ্নির নেতৃত্বে বিরূপে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১ ৪ ১'১০—১৭) পাই। অতএব আর্য্য জাতির গতি যাহা আমরা ঋক্-সংহিতায় পাই, তাহাও শীতাধিক সরস্বতী ও সিন্ধুর উৎপত্তি-স্থান হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে ও উভয় কূলে; পরে পূর্বে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে, সীতা বা সীর, বক্ষু বা চক্ষু বা ইক্ষু (অক্ষুস—Pliny and Strabo), সিন্ধু ও ভাগীরথী কোন্ কোন্ দেশ দিয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। অতএব স্বামী বিবেকানন্দের মত—সহিমাচল আর্য্যাবর্ত্তই, প্রাচীন আর্য্য নিবাস। (*প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* ৫ম সং পৃঃ ২৮—৩০)।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Indo Aryan গ্রন্থে (article xx

Primitive Aryan) ভারতীয় আর্য্যদের পর্বতনিবাসী, পশুপালক শীকারী দেবতা এবং ইরাণীয় আর্য্যদের কৃষিজীবী অসুর ঠিক করিয়াছেন। কারণ জেন্দ আবেস্তার তৃতীয় ফার্গার্দে এই কথাটি আছে, "যখন শস্য ভাল হয়, তখন দেবগণ যাতনায় চিৎকার করে, যখন যব উৎপন্ন হয় তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধের ফলে দেবতারা তাঁদের আদি দেশ আফগানিস্থান হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে (পৃঃ ১০১—৩) যে আর্য্য সভ্যতার ক্রম-বিকাশ দেখাইয়াছেন সেটি ঠিক ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, "সমাজ সৃষ্টি হতে লাগলো। দেশ ভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা করত; যারা সমতল জমিতে তাদের চাষ-বাস; যারা পার্বত্যদেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো।"

"দেবতারা ধান চাল খায়—সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম, নগর উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি বা সমুদ্রতট বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল, পরিধান ছাল; আর বুনো জিনিষ বা ভেড়া, ছাগল, গরু দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে যা ধান চাল। দেবতাদের শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্বল। অসুরের শরীর উপবাস কৃচ্ছ্র-কষ্ট সহনে বিশেষ পটু।

"অসুরের আহারাভাব হলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে, গ্রাম নগর লুঠতে এলো। কখনও বা ধন ধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহু জন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু। আর দেবতাদের বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানা প্রকার যন্ত্র-তন্ত্র নির্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না। চাষ-বাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায়, ত সে কিছু দিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি কৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায় তখন—হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দুদিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুরও একত্র হতে লাগলো। মহা সংঘর্ষ, মেশামিশি, জেতাজিতি চলতে লাগলো। এই সব রকমের মানুষ মিলে মিশে বর্ত্তমান সমাজ বর্ত্তমান প্রথা সকলের সৃষ্টি হতে লাগলো।"

আমাদের বোধ হয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-বর্ণিত অবস্থা ভারতীয় আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন কালে এবং স্বামীজী যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন উহা আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ স্থাপনের পর।

বৈদিক অক্ষর (২)

বেদ গুরুমুখী বিদ্যা, সেই জন্য উহার অপর নাম শ্রুতি। আচার্য্যেরা যাহাকে তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইতেন না, সেই জন্য এই বিদ্যার মৌখিক ভাবেই প্রচার চলিত। সর্বাপেক্ষা যে প্রাচীন বেদের পাণ্ডুলিপি যা আমরা পাই তাহা নাগরী অক্ষরে। নাগরী লিপির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়া G. Buhler নির্ণয় করিয়াছেন যে, ইহা উত্তর সেমেটিক লিপির অনুকরণ। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ফনিসিও মেসার (Mesa) প্রস্তরলিপি ৮৯০ খৃঃ-পূর্ব এবং বোধ হয় ভারতীয় বণিকেরা ৮০০ খৃঃ পূর্বে উহা ভারতে আনয়ন করে এবং সেমেটিক বাইশটি অক্ষরকে পরে ভারতীয় পণ্ডিতেরা চুয়াল্লিশটি অক্ষরে সম্পূর্ণ করেন। (১০) কেহ কেহ বলেন, বেদ গুরুমুখী বিদ্যা ছিল বলিয়া এতৎ সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ তখন ব্যবহৃত না হইলেও, তখনও বিদ্যার রক্ষণের জন্য পুঁথি ছিল এবং শিক্ষার জন্য তাহার নকলও চলিত। (১১)

[বর্ত্তমান প্রবন্ধটি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামতের সহিত বাংলায় যাঁহারা অতীতে বেদ-সংহিতাদি চর্চ্চা করিয়াছেন, যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রমানাথ সরস্বতী, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ, সেই সব মনস্বিবৃন্দেরা, যে সোপানাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত।]

১০। "Indische Paleographic" in the "Grandriss" 1, 2 and "on the Origin of the Indian Brahmi Alphabet" 2nd Edi Strasbury 1898.

১১। On the age of the Art of writing in India, see also Barth, Revue de l' histoire des Religious, Paris 41, 1900, 184 ff.—Oeuvres ii, 317 ff.

"The arguments brought forward by Shyamaji Krishna Varma, Transactions (Verha dlengen, actis) of Congress of Orientalists. vi, Lyden, 1883, PP.305 ff. For the knowledge and use of writing, even at the Vedic period, are well worthy of notice—Winternitz. A History of Indian Literature P. 34.

সমাপ্ত

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

ষোলো

কয়েক দিন পরেই মলিন কলিকাতার একটি মেসে গিয়া উঠিল—একটি সরু গলির ভিতর। বাড়ীখানা জরাজীর্ণ, প্রায় প্রত্যেক ঘরগুলির ছাদই অপটু—কড়ি-বড়গা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখে মোটা-মোটা বাঁশের খুঁটি। মেসের অধিবাসীদের ভিতর অধিকাংশই ট্রামের কণ্ডাক্টর, স্বর্ণকারের কারিগর, জামা-কাপড়ের দোকানের কর্ম্মচারী।

দ্বিতল গৃহ। নীচেতলার একাংশে দোকান-ঘর, বাহিরের দিকে তাহাদের মুখ—ভিতরের সঙ্গে কোনও সংস্রব নাই। ভিতরে ঘর আছে তিনটি—ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, রান্না ঘর।

ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ মলিনকে প্রশ্ন করিল, "কি রকম 'ছিট্' চান?"

মলিন কহিল, "ভাড়া একটু কম।"

বৈকুণ্ঠ এক ঢালাই কারখানার মিস্ত্রী। তাহাকে সব জিনিষই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে হয়। মলিনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাক দিল, "হরি, ও হরে—"

এক উচ্চকণ্ঠের সাড়া আসিল—"এস্‌ছি—"

অতঃপর বৈকুণ্ঠ মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ছিট্ খুব সরেস, তবে কি না—একটু যা অন্ধকার। আর, কলকেতার বাড়ী—সেঁতা একটু হবেই।"

মলিন চুপ করিয়া রহিল।

বৈকুণ্ঠ সুরু করিল, "আমাদের 'মেছের' আইন কি জানেন তো? এক মাসের ছিট্-ভাড়া, আর 'ফুডিন্' পনের টাকা আগাম দিতে হবে। ছিট্-ভাড়া—ও জমাই থাকবে, আর ফুডিন্—ওটা মাস কাবারে হিসাব হলেই ওই টাকা থেকে বাদ যাবে, গিয়ে যা বক্রী থাকবে তাই আর কর পনের—এই জমা দিতে হবে। বুঝলেন?"

মলিন জিজ্ঞাসা করিল, "সিট্-রেণ্ট কত?"

বৈকুণ্ঠ একমুখ হাসিয়া জবাব দিল, "জলের দর—তিন!"

এমন সময় মেসের ভৃত্য হরি আসিয়া দেখা দিতেই, বৈকুণ্ঠ মলিনকে দেখাইয়া নির্দ্দেশ দিল, "এঁকে ওই ঘরে নিয়ে যা তো! বুঝলি তো—ওই ঘরে। ইনি 'ছিট্' নিলেন।"

"কোন্ ঘর?"

"যে-ঘরে মা-লক্ষ্মী বিরাজ করছেন—চাল, ডাল, তেল, মসলা—"

হরি যেন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "ভাঁড়ার ঘর?"

বৈকুণ্ঠ চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "বলতে নেই—বলতে নেই। মা-লক্ষ্মীর ঘর।" বলিয়াই মলিনের দিকে হাত পাতিয়া কহিল, "তা হলে, জমার ট্যাকাটা—খাতায় আপনার নাম পত্তন করতে হবে কি না।"

মলিন হিসাব করিয়া অগ্রিম দেয় টাকা কয়টি বৈকুণ্ঠের হাতে ফেলিয়া দিয়া হরির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

ঠিক কলতলার উপরেই "মা-লক্ষ্মী'র" ঘরখানি—অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে। এক পাশে থাকে—চালের বস্তা, গুড়-তেলের টিন, ডাল-মসলার হাঁড়ি। হরি মলিনকে অপর পাশটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, "এই আপনার ছিট্—" বলিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া দুয়ারের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু, এই ঘরে আপনি থাকবেন?"

মলিন একটু হাসিয়া কহিল, "আমি 'বাবু' নই। আমাকে 'দাদাবাবু' বোলে ডেকো হরি।"

"তা' হলে, আমারও একটা নালিশ আছে, দাদাবাবু!"—হরি যেন আহ্লাদে গলিয়া গিয়াছে। কহিল, "তা হলে, হরিকেও আপনি 'তুমি-তুমি' করতে পারেন না—'তুই' বলতে হবে।"

মলিন তেমনিই হাসিমুখে জবাব দিল, "তুমি যে রাগ করবে।"

হরি হাসিয়া-হাসিয়া কহিল, "হরি মানুষ চেনে।" বলিয়াই বাহির হইতে একগাছা ঝাঁটা আনিয়া স্থানটুকু ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেল।

মলিনের জিনিষ-পত্র বেশী কিছু ছিল না—একটি টিনের সুট্‌কেস্, একখানি মাদুর ও একটি বালিশ। মলিন সেই মাদুরখানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া লইল। তার পর সুটকেস হইতে নিজের একখানি 'ফটো' বাহির করিয়া সম্মুখে দুয়ারের মাথায় টাঙাইল। সেই ফটোখানি ছিল তাহার অতি বড় আনন্দের দিনের উপহার। যখন সে বি-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করে, তখন তাহার সতীর্থরা তাহাকে অভিনন্দন দিয়া তুলিয়াছিল এই প্রতিকৃতি।

অতঃপর তাহার সমগ্র চেতনা বিদীর্ণ করিয়া মাত্র একটি চীৎকার উঠিল—চাকরী! মেসে যাহারা দশটার 'ব্যাচে' আহারে বসে, পরদিন হইতেই মলিনও তাহাদের সঙ্গে বসে এবং এক সুনিশ্চিত উৎসাহে আপিস অঞ্চলে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু—

হাতের দরখাস্ত হাতেই থাকে! সর্ব্বত্রই—"No vacancy!" কোথাও যদি বা খালি আছে সন্ধান পায়, সেখান হইতেও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসে। সাহেব বলেন—"তুমি কাজ জানো না।" কোন আপিস বা সাহেব সংশয় নেত্রে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলেন—"You are too big for the post!"

রাত্রে আফিস অঞ্চল বন্ধ থাকে, তাই রাত্রে তাহাকে ঘুরিতে হয় না। এই রাত্রির অবসরে মলিন একটি 'থিসিস' লিখিতে আরম্ভ করিল—রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য নাম দিল—"Poverty takes holiday."

কিন্তু, চাকরী আর মিলে না। প্রথম মাস গেল, দ্বিতীয় মাস গেল, তৃতীয় মাসও যায়-যায়, মায়ের নিকট হইতে পত্র আসিল—'নিবারণ টাকার জন্য তাগাদা করিতেছে, মিয়াদ অতীত-প্রায়, টাকা যদি সত্বর না আসে, তাহা হইলে—'

তাহা হইলে কি হইবে, তাহা সে জানে! চিঠিখানা তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেলিয়াই উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু আবার সেই—'No vacancy!'

এক দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছে, হরি আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু, আপনার জামা-কাপড়টা ছেড়ে দিন তো—"

মলিন হরির দিকে তাকাইতেই, সে মুখখানা ভারি করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই কালো-চিকুটি চায় কেউ কি পরে? দিন, সাবান দিয়ে দেব।" বলিয়াই দাদাবাবুর কাছ ঘেঁষিয়া সরিয়া আসিয়া ক্ষোভ-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "মেসের লোক গুলো ভদ্দর লোক নয়, তাই ভদ্দর লোকের মান-খাতির জানে না। ওরা আপনার 'ছিরি' দেখে হাসে,

শীর দেয়—যেন আপনি ক্যাপা নয় পাগল! কিন্তু, হরি এ-সব টিটকিরি সহ্য করবার পাত্তরই নয়—দিন্, দিন্, শীগ্‌গির দিন।"

সত্য কথা! মলিনের জামা-কাপড়ের ভিতর—কাপড় দুইখানি, সার্ট একটি—সার্টের বুকের দিক্‌টায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আর একটি জরাজীর্ণ তালি-দেওয়া গলা-বন্ধ কোট। সেগুলি সে প্রত্যহই ব্যবহার করিতেছে। প্রথম প্রথম সে নিজেই বার কয়েক সাবান দিয়াছিল, কিন্তু ইদানীং তাহার আগ্রহ বা উৎসাহ এদিকটায় যেন একেবারেই ছিল না। মলিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া কহিল, "সত্যিই বটে, হরি, জামা-কাপড়গুলো—সময়ও আর পাই নে।"

হরি রাগিয়াই ছিল। তপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকেও তো দিতে পারতেন।"

মলিন আর কথান্তর করিল না। নিঃশব্দে কাপড়-জামাগুলি ছাড়িয়া দিল।

অতঃপর যেমন ভাবে দিন যাইতেছিল, তেম্‌নি ভাবে আরও দুই-এক দিন কাটিয়া গেল। তার পর মেসে এক গোলযোগ উঠিল। মলিনের হাতের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-মাসে সে মেসে টাকা দিতে পারে নাই—মাস শেষ হইতে চলিয়াছে। মলিন আজ কাল করিয়া দুই-পাঁচ দিন কাটাইয়া দিল, কিন্তু আর চলে না। মেসে টাকার টান পড়িয়াছে, বাজার হয় না—অভ্যস্ত মেম্বররা ক্রোধে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যার পর ম্যানেজারের ঘরে 'মিটিঙ' বসিল—আজ একটা হেস্তনেস্ত হইবে। ডাক পড়িল মলিনের।

মলিন আসিয়া দাঁড়াইতেই, মেম্বরদের ভিতর এক বিলোড়ন উঠিল—কেহ বা কাসিল, কেহ বা হাঁচিল, কেহ বা বিড়ি ধরাইল। বৈকুণ্ঠ চট্ করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকায় এক জোর টান মারিয়াই মলিনকে প্রশ্ন করিল, "কি হে ছোক্‌রা, ট্যাকা এনেছ?"

মলিন চমকিয়া উঠিল। আজ তাহার আর সম্মান নাই। এত দিন সে ছিল—'মলিন বাবু।' কিন্তু আজ অভাবের আইন সে-সম্মান হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। সংসারে মানুষ বলিয়া যাহাদের পরিচয় আছে, সে আজ সে-দলের বাহিরে। এ কথা সে আজ বেশি করিয়াই বুঝিল। বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে দু'-এক দিনের ভেতরেই—"

"তার মানে? আজ বাদে কাল তো মাস-কাবার—আজ চলে কি কোরে?"—বৈকুণ্ঠ হুঁকায় আর এক টান মারিয়া মেম্বরদের দেখাইয়া গলা চড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "এনাদের ট্যাকায় এক মাস ধরে খেয়ে আস্‌ছ—একটু ভদ্দর লোকের মতন কথা কয়ো।"

বৈকুণ্ঠের প্রতি কথাটি সত্য, এ-বাক্যের প্রতিবাদ নাই। লজ্জায়, ঘৃণায় মলিনের মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল।

হরি এতক্ষণ দ্বারদেশে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, তাড়াতাড়ি একখানা হিসাবের খাতা আনিয়া বৈকুণ্ঠকে বলিয়া উঠিল, "ম্যানেজার বাবু, আজকের হিসেবটা—"

"হচ্ছে—" বৈকুণ্ঠ হরিকে এক তাড়া দিল। অতঃপর অগ্নিমূর্তি ধরিয়া মলিনকে বলিয়া উঠিল, "বলি, চুপ কোরে রৈলে যে? ট্যাকা না দিয়ে কারা মেসে খায় জানো—যারা জোচ্চোর।"

মলিনের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বুঝি বা আর তর্ক চলে না। মানুষের আইন, ধার্মিকের ধর্ম, জাতীর 'নজির', সাধকের 'দর্শন'—সকল শাস্ত্রের বিচারেই সে আজ প্রবঞ্চক। সত্য বলিয়া যে-বস্তু তাহার বুকের ভিতর এত দিন দর্পের জোর ধরিয়া অধিষ্ঠিত ছিল, তাহা সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অবসন্নের ন্যায় মুখ তুলিয়া কহিল, "তা' জানি—" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নীচে নামিয়া ঘরে ঢুকিতেই মলিন দেখিল, হরি চুপ করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে আলো জ্বালা ছিল না, হরি আলো জ্বালিয়া দাদাবাবুর দিকে একটি বার সকরুণ নেত্রে তাকাইল—কি যেন সে বলিতে চায়! কিন্তু মলিনের দৃষ্টি বা মন হরির দিকে পড়িল না—সে অন্যমনস্ক, উদাস, সব-কিছুতেই সে নির্লিপ্ত! কিন্তু হরিও ছাড়িবে না! দাদাবাবুর কাছে আর-একটু সরিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "দাদাবাবু, একটা কথা বল্‌বো, যদি মনে কিছু না করেন!"

মলিন সপ্রশ্ন হইয়া হরির দিকে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "ওঁনাদের ট্যাকাটা ফেলে দিন, দাদাবাবু! ওঁনারা মনিব, উঁচু বাক্যি বল্‌বো না—ওঁনাদের গায়ে মনিষ্যির চামড়া নেই!"

মলিন নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "ওঁদের আর অপরাধ কি, হরি!"

"অপরাধ কি—বলেন কি, দাদাবাবু?" হরির চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধ-দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলি, ট্যাকাই যেন ওঁনারা পাবেন, তা বোলে অম্‌নি ধারা ভদ্দর নোককে অপমান কর্‌চেন? আপনি যাই ভালো মানুষ তাই, অন্য কেউ হলে—" কি বলিতে যাইতেছিল, হরি থামিয়া গেল।

অপমান—এ বুঝি বা মলিনের ন্যায্য প্রাপ্য, নতুবা তাহার জীবন-চিত্রে কোনও রঙ্ ধরে না! সে হরির চোখের উপর চোখ রাখিয়া কহিল, "ওঁদের অধিকার আছে, তাই অপমান করেছেন। যার টাকা নেই, সে কি ভদ্রলোক হয়?—না।" অতঃপর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হাতে টাকা থাক্‌লে কি আর দিতাম না, হরি! তুইও কি তাই মনে করিস্?"

হরি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না, না—তা' কেন? সেই জন্যেই তো একটা কথা বল্‌তে এলাম, দাদাবাবু! কিন্তু, আপনি এম্‌নিই আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিলেন!" হরি যেন আর পারে না, এম্‌নিই ক্লান্তির ভাব দেখাইয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, "সব মাইনে আমার খরচ হয় না দাদাবাবু, কিছু-কিছু জমিয়ে রাখি, সেই থেকে যা দরকার আপনি নিন্—আন্‌বো?"

আবার এক ঋণ! মলিনের সমস্ত চেতনা যেন এক ঝড়ের আকস্মিক বেগে পৃথিবীর এক একান্তে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, সেখানে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া সে অবলোকন করিল যে এক নিষ্ঠুর মহাজন এক বৃদ্ধা খাতকের হাত ধরিয়া তাঁহার একমাত্র আশ্রয়-স্থল—এক জীর্ণ গৃহ হইতে টানিয়া-হিঁচড়িয়া বাহির করিয়া এইমাত্র রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছে। অনুমানে সে বুঝিল—তার মা!···মলিন শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "না হরি—না! ও-সব আমি নিতে পারব না!"

হরি অপ্রতিভ হইয়া গেল। কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তা' আমি জানি, দাদাবাবু! সেই জন্যেই তো ভরসা কোরে এত দিন আমি বলতে পারিনি! আমি ছোট জাত—আমার পয়সায় স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হবে—তা কি হয়, দাদাবাবু! তা আমি জানি!"

কথাটা বলিয়াই হরি বাহির হইয়া যাইবে, মলিন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "হরি, ছোট জাত তুই? তুই যদি ছোট জাত হোস্, সংসারে

বড় জাতের আর পরিচয় থাকে না। এ-কথাটা অন্ততঃ আমার মুখ থেকে তুই শুনে রাখ।"

হরি শিহরিয়া জিব কাটিল। তার পর দুই হাত বাড়াইয়া মলিনের পদতল স্পর্শ করিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে মলিনের 'থিসিস'টি লেখা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরদিন প্রভাতেই সে বাহির হইয়া গেল এবং যাইবার সময় উহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দাখিল করিবার জন্ত লইয়া গেল। যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন মেসে কেহই নাই—একমাত্র ছিল হরি! সে তখন দাদাবাবুর জন্ত উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করিতেছে!

মলিনকে দেখিয়াই সে কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, "আপনার কি কাণ্ড দাদাবাবু? সেই সকালে৷ বেরিয়েছেন! আপনার যদি বাপ-মা এখানে থাকৃতো, কি আজ হতো বলুন দিকিনি?"

মলিন জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তুই তো রয়েছিস্!" সহসা তার মুখের চেহারাটা কালো হইয়া গেল। নিম্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় কেউ আছে না কি?"

প্রশ্নটার অন্তরালে কি গোপন ছিল, হরির তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। এবং ইহাও তাহার নিকট গোপন রহিল না, দাদাবাবু কেন আজ সকালেই বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এই অসময়ে! কিন্তু এ কথা লইয়া আলোচনা করিলে দাদাবাবু পাছে লজ্জা পান, তাই সে সংক্ষেপে জবাব দিল, "না!" তার পর তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আর দেরি করবেন না, দাদাবাবু! 'চান' কোরে খেতে বসুন—ভাত ঢাকা আছে।"

আকাশে সূর্য্যদেব উঠিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণ মলিনের পেটে এক বিন্দু জলও যায় নাই—মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় দেহটা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি মাথায় একটু জল ঢালিয়া সে খাবার-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে—দুইটি ঝুড়ি ঢাকা দুই জনের ভাত। হরিকে প্রশ্ন করিল, "দু'জনের ভাত—কার, কার?"

"আপনার আর আমার।"

"তুই এখনো—"

"বাবুদের না হলে?"

"হুঁ!" বলিয়া মলিন তাড়াতাড়ি ভাত-তরকারি যেন নাকে-মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। তার পর পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে, ডাক-পিওন একখানা পত্র দিয়া গেল—তাহারই চিঠি। মা লিখিয়াছেন—"কাল সংক্রান্তি! এইবার আমি নিরাশ্রয়!"

মলিন যেন নিজের টুঁটিটা চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—"নির্ব্বোধ!" নিজেকেই করিল অপরাধী, নিজেকেই দিল—ধিক্কার!

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে এক সাধারণ পাঠাগারে সংবাদপত্রে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখিতে যাইত। আজও গেল এবং হঠাৎ 'বিবাহ-স্তম্ভে' একটি বিজ্ঞাপনের উপর তাহার চোখ পড়িল—

"কলিকাতার এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত এটর্ণীর একমাত্র কন্তার জন্ত একটি নিরক্ষর পাত্র চাই। পাত্রকে গৃহ-জামাতা হইয়া থাকিতে হইবে। আশ্রয়হীন, গৃহহীন, আত্মীয়-বন্ধুহীন দরিদ্র পাত্রেরই আবেদন সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। হাত-খরচ দেওয়া হইবে—মাসিক পঞ্চাশ টাকা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকাল ৮টা হইতে ১০টার ভিতর স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।"

'পঞ্চাশ টাকা!'—মলিনের চোখ দুইটা ক্রমশঃ বড় হইয়া বিজ্ঞাপনখানার উপর যেন আঁটিয়া গেল। অতঃপর কতক্ষণ যে সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল তাহা তার হুঁস্ ছিল না, হঠাৎ পাঠাগারের ভৃত্যের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙিল—'বাবু, আটটা বেজে গেছে।' মলিন চাহিয়া দেখিল, কেহই নাই—লাইব্রেরী-হল ফাঁকা। উঠিতে গিয়া দেখিল, হাতে কাগজ-পেন্সিল—কাগজে উপরি-উক্ত বিজ্ঞাপনটা কখন্ যে লিখিয়া লইয়াছে, তাহা সে টেরই পায় নাই! তাড়াতাড়ি কাগজটুকু পকেটে ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

পরদিনও সে তেম্নি ধারা অতি প্রত্যুষেই বহির্গত হইয়া গেল এবং ফিরিল তেমনিই অপরাহ্ণে। আজ মাসের প্রথম তারিখ—পয়লা!

স্নান সারিয়া খাবার-ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া মলিন দেখিল—আজ মাত্র একটি ঝুড়ি। সহাস্তে হরিকে কহিল, "আজ তুই আগেই খেয়ে নিয়েছিস্, নয়?"

হরি স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, "না নিলে কি কোরে চলে, দাদাবাবু! আপনি এখন এই রকম রোজ করবেন—পেটে কিল মেরে আমি সারা দিন শুকিয়ে থাকি কি কোরে?"

মলিন আর কিছু বলিল না। ভাতের ঢাকা খুলিয়া আহারে বসিল। ডাল মাখিয়া অর্দ্ধেক ভাত শেষ হইবার পরই হরি মৃৎপাত্র করিয়া একটু দই আনিয়া মলিনের থালার পাশে নামাইয়া দিল।

পাতের কাছে দই, ইহা এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা! মলিন বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার, হরি? মাস-পয়লা—তাই আজ না কি একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া? হ্যাঁ রে?"

হরি অন্তমনস্ক হইয়া জবাব দিল, "শুক্‌নো ভাত—তাই!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

মলিনও তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া বাসা হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

মেসের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে, রাত্রে অধিকক্ষণ বাহিরে থাকা চলে না—মলিন দশটার ভিতরই বাসায় ফিরিল। বৈকুণ্ঠ তখন কলতলায় ছিল, মলিনকে দেখিয়াই হরিকে ডাক দিল। হরি আসিতেই সে মলিনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, তথা হইতে মলিনের ঘরের মুখটা দেখা যায়।

মলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হরি?"

হরি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, তার পর মুখখানা নীচু করিয়া এক টুক্‌রা কাগজ মলিনের হাতে দিয়া কহিল, "আপনার নোটিস্!"

নূতন কিছু নয়। অগ্রিম টাকার জন্ত এরূপ নোটিস্ তাহার কাছে বহু বারই আসিয়াছে, কাজেই সেই ভাঁজ-করা কাগজখানা না খুলিয়াই পকেটে রাখিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুই যা—"

এমন সময় দ্বিতল হইতে এক বিকট হাস্ত উঠিল।

মলিন হরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মেসে এত্তো ফূর্ত্তি কেন, রে?"

কথা পড়িয়াছে, একটা জবাব দিতে হইবে। হরি কহিল, "আজ 'পোস্ত' হচ্ছে কি না!"

মলিন হাসিয়া কহিল, "তা হলে আজ—'ফীষ্ট'?"

প্রত্যুত্তরে একটা "হুঁ" দিয়াই, হরি বলিয়া উঠিল, "নোটিস্‌টা একবার পড়ে দেখুন, দাদাবাবু,—ও আর এক রকম!"

"কি নোটিস্ ?"—মলিনের মুখখানা এইবার শুকাইয়া গেল। আবার পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া পড়িল—"মিল টপ !"

মলিন চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে থেকে, হরি ?"

"আজ থেকে !"—কথাটা হরি কোনো রকমে মুখ দিয়া বাহির করিয়াই মুখ নীচু করিল।

মলিন চমকিয়া হরির দিকে তাকাইল, দেখিল—অস্পষ্ট আলোকে তাহার চোখ দুইটি চক্‌চক্ করিতেছে। এক গোপন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "একটা হাঁড়িতে ভাত ঢাকা ছিল—কেন, তা' বুঝলাম এখন ! কিন্তু—" হঠাৎ একটু ম্লান হাসিয়া সুরু করিল, "কিন্তু, এক দিন আমাকে বাঁচিয়ে তুই কি করবি, হরি ? আমাকে মারবার জন্তে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, ভগবান ! আচ্ছা—"

ম্যানেজার বাবু বলেছেন, "আজ আপনি—"

মলিন সপ্রশ্ন-সংশয়ে হরির দিকে তাকাইতেই হরি কহিল, "এক জন নতুন মেম্বর এসেছে—ওই দেখুন না—" বলিয়া ঘরের এক কোণে আঙুল বাড়াইল।

মলিন চাহিয়া দেখিল—চাবি-তালাহীন, দড়িবাঁধা একটা টিনের বাক্স, তার উপর ওয়াড়হীন একটা তোষক, একটা বালিশ, একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, তেলের শিশি, আর কাঠের একটা আলনা।

হরির কথাটা বুঝি শেষ হয় নাই, বলিয়া উঠিল, "ওনার নাম কামাখ্যা বাবু, চট্টগ্রামে বাড়ী—একেবারে নবাব বাদ !"

"আমার ওপর কি হুকুম ম্যানেজার বাবুর ?"

"ছাদে গিয়ে শুতে হবে !"

"আচ্ছা"—বলিয়াই মলিন মাদুর ও বালিশ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরি যেন দাদাবাবুর দিকে আর চাহিতে পারিতেছিল না, বাহিরের দিকে একবার তাকাইয়াই এক নিষ্ফল ক্ষোভে ও রোষে বলিয়া উঠিল, "ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই ! কিন্তু ম্যানেজারকে একটা কথা বলি—ভদ্দর লোককে তুমি যে নোটিশ দিলে—একটা দিনেরও টাইম দেবে তো ?"

এমন সময় ভিতরের বারান্দা হইতে বৈকুণ্ঠের বজ্রকণ্ঠের হাঁক আসিল—"এই হরে ! ও না যায়, মাদুর-বালিশ টেনে কলতলায় ফেলে দিয়ে তুই ব্যাটা চলে আয়—"

মলিন ছাদে উঠিয়া গেল। দেখিল—যেন 'ক্যাম্বেল হাসপাতাল !' ছাদময় মানুষ পড়িয়াছে। তার আর পা উঠিল না—বাড়তি স্থান আর তো নাই ! দাবী জানাইয়া এখানেও আশ্রয় রচনা করিবার তাহার তো মুখ নাই। এই 'মেস,' এই বাড়ী—ইহারই এক অংশ, এই ছাদ যে ! * * * তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এক জন বিকট হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "কে হে তুমি হরবর—"

পাশেই আর এক জন সুর ধরিল—"আছ সুখে দাঁড়াইয়ে—"

সেই লোকটার পার্শ্বেই ছিল এক বৃদ্ধ, সে যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি করো হে, তোমরা ভদ্দর লোককে একটু যায়গা দাও না ?"

পূর্ব্বোক্ত লোকটা মুখখানা বিশ্রী করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমিই দাও না হে, আমরা দেখি !"

বৃদ্ধ বিপদ বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মলিন এইবার অগ্রসর হইল। পায়ে-পায়ে জড়াইয়া, সকলকার বিছানা বাঁচাইয়া পা ফেলিয়া অনতিদূরে একটু খালি যায়গায় কাছাকাছি হইতেই এক জন হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; "উঁহুঁ-হুঁ—ও আমার বাঁশগাড়ি করা আছে !" বলিয়াই তাড়াতাড়ি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে আর একটু দূরে এক বিষম কোলাহল উঠিল। সকলকারই যুক্তকণ্ঠে এই চীৎকার—"বাবা-বিন্ত ছিরি, বাবা-বিন্ত ছিরি—"

মলিন তাকাইয়া দেখিল—তিন-চার জন লোক মিলিয়া একটা লোককে পা ধরিয়া টানিয়া মাদুর হইতে নামাইয়া দিয়েছে, আর সেই লোকটি—"বাবা বিন্ত ছিরি" তখন তাহার কোমরের কাপড়ের আলগা বাঁধনটা কোনওরূপে আঁটিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিতেছে—"না, মাইরি ! হ্যাঁ, না, মা—ই—"

কিন্তু, তাহার কথা কে শোনে ! ছাদের এক পাশে তাহাকে পুঁটুলি মত ফেলিয়া রাখিয়া, তাহারই মাদুরের উপর ওই লোকগুলা তাসের আসর পাতিল—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ !

ছাদের একান্তে, যেখানে ছাদ-ঝাঁটানো আবর্জ্জনা, তাহাই ঠেলিয়া একটু জায়গা করিয়া মলিন মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। নিকটেই তাসের আসর, বিন্তি-পঞ্চাশ, ছক্কা-পাঞ্জা—তাহারই হল্লা ! হঠাৎ 'পিঠ' খেলার পর এক জন এক জনকে প্রশ্ন করিল, "মেসের হিসেব আজ হলো না কি ?"

"হ্যাঁ। পনের পয়সা কোরে 'মিল,' আর দেড় টাকা কোরে 'ষ্ট্যাবলিশমেণ্ট' !"

সকলেই চমকিয়া উঠিল—"ষ্ট্যাবলিশমেণ্ট এতো ?"

"এতো হবে না ?"—লোকটি মলিনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ওই লোকটার সমস্ত চাঁদাই ষ্ট্যাবলিশমেণ্টে চাপলো যে !"

বৃদ্ধকণ্ঠের সক্রোধ প্রশ্ন উঠিল—"কেন ?"

লোকটা তখন হাতে তাস পাইয়াছে, হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও হে, বিন্তি হয়েছে কি না, দেখি—হ্যাঁ বিন্তি।" অতঃপর কথাটার জবাব দিল, "কেন—মানে কি !—ঠাকুর-বাড়ীর সদাব্রত—পাত পাতলেই ভাত ! ও মাসে উনি কি কিছু ঠেকিয়েছেন—কাণা-কড়ি ? তার মানে—দু'মাস !—ও মাসের 'ডিউজ,' আর গেল মাসের 'এ্যাডভ্যান্স' !"

"তাই বোলে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে না কি !"—সকলে ক্রোধে খাপ্পা হইয়া উঠিল।

ওদিককার সেই বৃদ্ধ লোকটি এতক্ষণ বসিয়া-বসিয়া ঝিমাইতেছিল, সহসা তাহার কাণ খাড়া হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"কে বাবা, ওদিকে কাঁঠাল ভাঙছ—দু'-এক কোয়া এদিকে দিয়ো, বাপধন !"

ছাদে এক-ছাদ জ্যোৎস্না ! সেই আলোকে দেখা গেল, মলিনের মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যদি অন্ধকার হইত ! .

এমন সময়ে উঠিয়া আসিল বৈকুণ্ঠ। তাহার পরনে ছয় হাত ধুতি, হাতে এক ডাবা-হুঁকা। তাহাকে দেখিয়াই লোকগুলা উত্তেজিত হইয়া ডাকিল—"আসুন তো, ম্যানেজার বাবু, এই দিকে একবার—"

বৈকুণ্ঠ সরিয়া আসিতেই, লোকগুলা হাতের তাস চাপিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, কারখানায় মিস্ত্রীগিরি আর 'মেসের' ম্যানেজারী—এক কাজ নয় !"

বৈকুণ্ঠ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "অত চটিতং কেন হে'.

এবার বৈকুণ্ঠর কথার জবাব দিল অন্য এক জন, সে একটু নরম-মেজাজের লোক। কহিল, "কাজটা হয়েছে আপনার নোংরা। বলি, সেই মিটিঙ্ করলেন—দশ দিন আগে করলেই পারতেন, আর মিটিঙই যদি করলেন—আর সময় দিলেন কেন, সেই দিনই 'মিল' বন্ধ করলেন না কেন? বলুন, এ কথা আমরা বলতে পারি কি না?"

"বটে, বটে।"—বলিয়া বৈকুণ্ঠ হুঁকায় এক জোর টান মারিল, মারিতেই কলিকাটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তার পর হুঁকাটা উক্ত লোকটির হাতে আগাইয়া দিয়া কহিল, "নাও তো হে, অবিনাশ, চোঙ্গলে জোর দিয়ে ভালো কোরে একটু ধরিয়ে দাও তো!" হুঁকাটা দিয়াই কহিল, "কৈ, কোথায় গেল লোকটা—ছাদে এলো না?" বলিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল।

অবিনাশ কহিল, "ওই যে—ওখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে—" বলিয়া মলিনকে দেখাইয়া দিল।

বৈকুণ্ঠ মলিনের কাছে সরিয়া গিয়া চোখ রাঙাইয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওহে ছোক্‌রা! কাল সকালেই রাস্তা দেখবে, বুঝেছ?"

এম্‌নিই সময়ে হরির উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ আসিল—"জায়গা হয়েছে—" এবং সেই আওয়াজ বাতাসে মিলাইতে-না-মিলাইতেই যেন এক মূর্ত্তিমান্ ভূমিকম্প সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া গেল। গেল সবাই—বৈকুণ্ঠ, অবিনাশ, রামবিষ্টু, নকাশী, ছুটু বোষ্টম, ছাদের সকলেই, মায়—'বাবা-বিছু ফ্রিব।' পড়িয়া রহিল, একমাত্র মলিন। নীচে খাবার হল ঘরে সারি-সারি বত্রিশখানা কাঠের পিঁড়ি পড়ে, প্রত্যেকটির মুখে হরি দিয়া যায় এনামেলের থালা, থালায় 'ঠাকুর' ঢালিয়া দেয়—গরম ভাত, বিউলির ডাল, পুঁই শাক আর কুচো চিংড়ির ঘণ্ট, আজ—পোস্ত বড়ার দিন! দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া এইরূপ একখানি কাষ্ঠাসনে এম্‌নিই সময়ে মলিনও গিয়া বসিত—সে-ও ছিল ইহাদের ভিতর এক জন! আর—আজ? আজ সে এই বাড়ীর এক মূর্ত্তিমান অট্টহাসি। এই সমস্ত কথা ভাবিতে গিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আকাশে চন্দ্রালোক, ঝিরঝিরে হাওয়া, আর এই অনুগ্রহ-আশ্রয়! এই সমস্ত—তবুও আজ মিলিয়াছে! কিন্তু, কাল সকালে? হঠাৎ জামার বুক-পকেটে তাহার নজর পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞাপনটি বাহির করিয়া চাঁদের দিকে একবার তাকাইল, তার পর কাগজখানার উপর চোখ রাখিয়া ঠিক দাঁড়াইল, যেন চাঁদের আর একটু কাছে পৌঁছিবে, আর-একটু স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবে অক্ষরগুলি—

"দাদাবাবু, শীগ্‌গির—"

মলিন চাহিয়া দেখিল—হরি, তাহার হাতে এক ঠোঙা খাবার আর এক গ্লাস জল।

"শীগ্‌গির দাদাবাবু, এইগুলো মুখে দিয়ে ফেলুন—" বলিয়াই হরি ঠোঙাটা আগাইয়া দিল।

মলিন কাগজখানাকে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার?"

হরি গলা চাপিয়া কহিল, "হ্যাঁ! দেরি করবেন না—ওঁনারা সব খেতে বসেছে।"

মলিন রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমি তো টাকা দিইনি?"

"আমি এনেছি। মেসের পয়সায় নয়—" বলিয়াই হরি ঠোঙাটা মলিনের হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

মলিন হাতটা গুটাইয়া লইয়া কহিল, "ও তুই নিয়ে যা—"

হরির মুখের চেহারাটা কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল, "বেশ। তা'হলে, হরিরও রাত্রে উপোস—" বলিয়াই হরি চলিয়া যাইবে, মলিন কহিল, "আচ্ছা, দে—"

হরি হাত ছড়াইয়া দিল, মলিন হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল—ভৃত্যের দান!

সকাল হইতেই মলিন উঠিয়া মাদুর-বালিশ লইয়া নিচে নামিয়া গেল, তখনো সকলের 'প্রভাত' হয় নাই—কতক মাদুর উঠিয়াছে, কতক উঠে নাই। মলিন ঘরে ঢুকিতেই হরি কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মলিন হরির প্রতি এক স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াই কহিল, "দেখ, আমার স্যুটকেস্‌টা তোর কাছেই রেখে দিস্, আর এক দিন এসে নিয়ে যাবো—"

"মাদুর-বালিশ?"

"ও-সব ফেলেই দিস্।"

হরি দেওয়ালে টাঙানো ফটোখানার দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, "আপনার ফটোগেরাফ্?"

মলিন ম্লান হাসিয়া কহিল, "ও আমার আর দরকার নেই।"

হরি আনন্দে বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমিই উটি রেখে দেব। মনটা যখন খরাপ হবে—বার কোরে-কোরে দেখবো!"

মলিন হরির দিকে একটি বার চাহিল, সে-চাহনি সজল অথচ স্নিগ্ধ। তার পর বাহিরের দিকে পা বাড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আর একটা কথা, হরি! আমার ঠিকানাটা এখানকারই রইলো, যদি চিঠি-পত্র আসে তুই রেখে দিস্—" বলিয়াই বাহির হইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

মলিনের আর কোনও দিকে কিছুই নাই, সবই যেন ভস্ম হইয়া গিয়াছে। মা!—হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, তাঁর সেই শেষ চিঠি! মা—মা! আজ মলিন এমনি নিরাশ্রয়, এম্‌নই দুইটি অন্নের জন্য—রাস্তায়! তাহার সমস্ত দেহটা টলিয়া উঠিল। কাছেই একটা আলোক-স্তম্ভ ছিল, তাহার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ যে এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না, হঠাৎ এক সময় চমকিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে সেই বিজ্ঞাপনটা বাহির করিয়া চোখের সামনে ধরিল। তার পরই তার কণ্ঠ দিয়া এক প্রকার বিকৃত-করুণ স্বর নির্গত হইল—'নিরক্ষর!' এই অনুভূতি, ইহার সঙ্গে যেন আজ তাহার অকস্মাৎ পরিচয় হইয়াছে, এই পরিচয়ই তাহার কাছে সত্য, ইহা ছাড়া আর সমস্তই এই পৃথিবীতে—বিদ্রূপ!

তার পর, বদলাইয়া গেল তাহার মনের রূপ—মনের চেহারা! এক উৎকট বিষ, তাহারই মহাসাগর যেন অস্থির তরঙ্গে এই চলন্তি চরাচরকে নিশ্চিহ্ন করিতে যাইতেছিল, তাহাকেই সে যেন এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়াছে—এইমাত্র! তার পর—

তার পর, তাহার যে-পরিচয় আজন্মের সিদ্ধি, কলেজের নিষ্ঠা, সতীর্থের গর্ব্ব, আত্মীয়ের আইন, শত্রুর সম্মতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌতুক—সমস্তই এত দিন ধরিয়া একযোগে তাহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই আজ এক অন্তঃসার-হীন, ক্ষণস্থায়ী জলে-ডোবা মাটির প্রতিমার মত বিকৃত হইয়া গলিয়া গেল। পরিচয়ে আজ সে—'নিরক্ষর'! [ক্রমশঃ

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৭

বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত গেল পলাশী-প্রাঙ্গণে। গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে সিরাজ নিহত—কর্ম্মফলে। প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া মীরজাফর সতর্ক হয় নাই। মীরন্ মরিল বজ্রাঘাতে। মীরজাফরের নবাবী শেষ হইল ক্লাইভের কূটবুদ্ধিতে। নবাবী তক্ত-তাউসে স্থান হইল মীর কাশেমের। ১৭৬২ সালের একটা ঘটনা বলি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু-সংখ্যা অল্প ছিল না, কিন্তু শত্রুর অভাবও হয় না মানুষ বড় হইলে। মহারাজা বড় হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আরও বড় হইলেন কর্ম্মগুণে। সেই বড় হওয়াটা সহ্য করিতে পারিল না তাহারাই, যাহারা মহারাজার উদারতা ও মহানুভবতায় পাঁচ জনের এক জন হইয়া কিছুটা মাতব্বর হইয়াছিল। উপকারী জনকে দংশন .করার প্রবৃত্তি উপকৃতকে কি আনন্দ দেয়, তাহার হিসাব দিতে পারে কৃতঘ্ন-বাহিনী। যাহার জন্য যত বেশী করা যায়, ততই সে করে দংশন অহিধর্মীর মত। আপোষ করার চেষ্টা নিষ্ফল। সমাজে সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিও স্বার্থের দায়ে পুত্র, পত্নী, আত্মীয় স্বজন ও সহোদরাধিক অভিন্ন-হৃদয় অশেষ উপকারী বন্ধুর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যে চণ্ডালাধম ব্যবহার করে, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও তেমন বন্ধুর ঐন্দ্রজালিক পাশ হইতে দুরদৃষ্টক্রমে মুক্তি পান নাই। তেমন স্বার্থান্ধ বন্ধুর দল নবাবের গুপ্তচরদেরও পরাস্ত করিল—নবাব-দরবারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে সংবাদ বেচিয়া। নবাবের দরবারে সর্ব্বসমক্ষে বিঘোষিত হইল—নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র বড় বিদ্রোহী, এবং গোপনে গোপনে ইংরাজ বণিক্‌দের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। কথাটা অবিশ্বাস্য ছিল না। তাঁহার চাল-চলন ও রাণী ভবানীর গুণকীর্ত্তন নবাবের শ্যেন-দৃষ্টি এড়ায় নাই এতটুকুও। "শাদা বেনিয়াদের" জাঁতিকলে ফেলিয়া তাহাদের ইঁদুরের মত চাপিয়া মারিবার উপায় উদ্ভাবনে নবাব খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সেই কারণে নদীয়াধিপতির কথা তাঁহার মনে এত দিন তেমন ভাবে স্থান পায় নাই। কিন্তু যখন দিনের পর দিন মহারাজার বন্ধুবেশী গুপ্তচরেরা ভাগীরথীর পুণ্য সলিলেও আগুন লাগাইতে আরম্ভ করিল তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ ভয়াবহ গল্প-গুজব সৃষ্টি করিয়া তখন নবাব বাহাদুরের টনক নড়িল সহসা হয়ত শাদা বেনিয়ার উপর ঝাল ঝাড়িবার বুদ্ধিতে। কূটনীতিবিশারদ ক্লাইভের সঙ্গে নবাব বাহাদুরের মনোমালিন্য তখন বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। বেনিয়া কোম্পানীর স্বার্থে নবাব-নাজিমের হস্তক্ষেপ করাই এই মনোমালিন্য ও বিবাদের কারণ।

ব্যাপারটার গভীরতা মহারাজাকে বুঝাইবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন গোপালচন্দ্র। তাহাতে তিনি তিরস্কৃতই হ'ন। অজুহাত—গোপাল রাজনীতিতে 'অনধিকারী'। তিরস্কৃত হইয়াও প্রভুপরায়ণ গোপালের চেষ্টা থাকিল—প্রভুকে যে কোনো প্রকারে সতর্ক করিতে। কিন্তু সতর্কতার বাণী বাতাসে মিলাইয়া গেল স্বার্থান্বেষী বন্ধুগণ মহারাজার কর্ণে সীসা ঢালিয়া দিয়াছিল বলিয়া। তাহার ফলে মহারাজা ও মহারাজকুমার শিবচন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল গোপনে গোপনে। "লীলামুকুরের" কাব্য সার্থক। কাব্যের ভাষা—

'গোকুলে জান্‌ল না কেউ
কি হ'ল যে কিসের তরে,
লীলাময়ের লীলা শুধুই
নিত্য লীলা প্রকট করে।'

যে বাহিনী মহারাজা ও মহারাজকুমারকে ধৃত করিতে আসিয়াছিল তাহাদের প্রথম দেখা গোপালের সঙ্গে। পদবিনিময়ের চেষ্টায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার ভুঁড়ী ও মুড়ী তাঁহাকে ধরাইয়া দিল গোপাল ভাঁড় বলিয়া। False personification হইতে গোপাল বাঁচিয়া গেলেন, তখনো ওপারের criminal code প্রাচ্যের প্রভুভক্তির আদর্শটাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই বলিয়া।

গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কুমার শিবচন্দ্রের নামে। এ কালের অনেক পুত্ররত্নের যেমন বাপ-মা, ভাই-বোন্, আত্মীয়-স্বজন, গুরুজনদের অনাত্মীয় ও অমর্য্যাদা করার বাহাদুরী অশান্তি প্রতীক দারার পরামর্শ ও জোর-জবরদস্তিতে, সেকালে ছিল ঠিক্ তাহার বিপরীত শিক্ষা ও বিপরীত ব্যবস্থা। গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কথা শুনিয়া শিবচন্দ্রের পত্নী পতিদেবতাকে বলিলেন—"তুমি বন্দী হ'য়ে মুঙ্গেরে গেলে মা-ঠাকুরাণী ও আমার খুবই কষ্ট হ'বে সত্য, কিন্তু একটা সান্ত্বনা, বাবার সঙ্গে তুমি থাক্‌লে তিনি অনেকটা শান্তি পাবেন। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, দেবতা যদি সত্য হ'ন, আমি যদি সতী হই, পিতৃকুল শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা আমি যদি রক্ষা ক'রে থাকি, তা হ'লে বাবার ও তোমার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না। নবাব ত তুচ্ছ কথা, দিল্লীর বাদশাহও তোমাদের আটকে রাখতে পারবেন না; কারণ, সতীকুলেশ্বরী সতীর মান ও প্রাণ রক্ষা করেন চিরদিনই।"

বধূরাণী শ্বশুর ও শাশুড়ীর মনেও বল আনিয়া দিলেন অপূর্ব্ব প্রেরণা-বশে। তাহার পর যাত্রীদের যাত্রা করাইলেন এই বধূরাণীই। যাত্রীদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন গোপালচন্দ্র। কিন্তু তাঁহাকে রাজবন্দীদের সাথী হইতে দিবে কে? তাঁহার নামে ত পরওয়ানা নাই। গোপাল মুখ ভেঙাইয়া বলিলেন—"থাকো ছুঁচোর দল, মহারাজকে আটক রাখা ছুঁচোর কাজ নয়!"

প্রহরিবেষ্টিত রাজবন্দিদ্বয় সসম্মানে মুঙ্গের দুর্গে আনীত হইলেন। বাংলার বিক্রমাদিত্য মুঙ্গের-কারাগারে বন্দী বাংলার নবাব-নাজিমের আদেশ-নির্দ্দেশে। সারা দেশে চাঞ্চল্য বিক্ষোভের সীমা রহিল না। সে চাঞ্চল্য সে বিক্ষোভ গোপনে গোপনে ধূমায়িত হইতে লাগিল। পর্ব্বত যে বহ্নিমান, ধূম দেখিয়া মোহান্ধ নবাব তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নদীয়ার বহু পণ্ডিত নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা সে কথা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার ফল হইল বিপরীত। পণ্ডিতমণ্ডলীও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পণ্ডিতের দেশ পূর্ণ হইল হাহাকারে। কৃষ্ণনগর কৃষ্ণবিহনে অন্ধকার।

ম্রিয়মাণা মহারাণী অন্ন-জল ত্যাগ করিলেন দয়িতের ও জীবন-সর্ব্বস্ব পুত্রের জীবনাশঙ্কায়। দুঃস্বপ্ন দুঃখ দিতে লাগিল রাধুরাণীকে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার সাধনা বুঝি বিফল হইল। জানু পাতিয়া সজল নয়নে কাতর প্রাণে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন সতীকুলরাণীর উদ্দেশে।

কৃষ্ণচন্দ্রের ও শিবচন্দ্রের কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া যাওয়ার পরক্ষণ হইতে অগণ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অন্যান্য বহু ব্যক্তিই ভাগীরথী-গর্ভে দাঁড়াইয়া সূর্য্যদেবের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে সূর্য্য, সহস্রাক্ষ, তুমি সাক্ষ্য, তোমার ভক্ত-উপাসক দীনপালক, সমাজরক্ষক, বিত্তাবুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কুমার বাহাদুর অবিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন। তোমার তেজ তাঁদের রক্ষা করুক অমর্য্যাদা থেকে।"

"ভগবন্, রক্ষা কর, ভগবন্ রক্ষা কর"—এই ধ্বনি নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি চৈতন্যদেবের আসন কম্পিত করিয়াছিল কি না, ভাবের ভাবীই তাহা বলিতে পারেন। কৃষ্ণনগরের ঘরে ঘরে মহারাজা ও কুমার বাহাদুরের মঙ্গল কামনায় পূজাপাঠ চলিতে লাগিল প্রত্যহ খুব ঘটা করিয়া। মুঙ্গেরের সংবাদ কিন্তু আসিতে লাগিল অমঙ্গলেরই।

ব্যাকুলা রাণী অষ্টম দিনে বৃদ্ধ দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রঘুনন্দন সিংহকে ডাকাইয়া পঞ্চরত্নের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের লইয়া এ বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে স্থির হয়, ছয় জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাইবেন মুঙ্গেরে মহারাজা ও কুমার বাহাদুরের মুক্তি-প্রার্থনা করিতে নবাব সমীপে। পণ্ডিতগণ গিয়াছিলেন ঠিকই, আর নবাবের কাছে মুক্তি-প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বেচারা পণ্ডিতেরা হইলেন কারারুদ্ধ। সুতরাং দেশে আর তাঁহাদের ফিরিয়া আসা ঘটিল না। ইহার পরে দলে ভারী হইয়া দ্বাদশ জন পণ্ডিত মহারাজা-উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন মুঙ্গের অভিমুখে। তাঁহাদেরও অবস্থা হইল পূর্ব্বগামিগণের মত। মহারাণী প্রমাদ গণিলেন। আশা-পথে নিরাশার ঘনান্ধকার দেখিয়া তিনি ভাঙিয়া পড়িলেন সম্পূর্ণরূপে। ভাবিলেন—দেবতা নাই কলি-যুগে। থাকিলে তাঁহার কাতর নিবেদন নিশ্চয়ই পৌঁছাইত দেবতার চরণে।

কিন্তু মহারাণী প্রেরণা পাইলেন দেব-কৃপায়। প্রেরণা-বশেই গোপালকে ডাকাইয়া আনিলেন পরামর্শের জন্য. কোন বিষয়ে "না" বলা গোপালের ছিল স্বভাববিরুদ্ধ। স্বভাবধর্ম্মেই গোপাল আশ্বাস দিলেন, সাহস দিলেন মহারাণীকে। তবে সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে ভুলিলেন না—গোপালকে স্মরণ করা উচিত ছিল প্রথমেই।

এই কথাটুকুর অর্থ খুব গভীর। কিন্তু সে গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করার সময় ও সুযোগ ঘটে নাই তখন কাহারও। সকলের ব্যস্ত মহারাজার জন্য।

ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল অচিন্তনীয় ভাবে। দেওয়ান রঘুনন্দন গোপনে গোপনে মুরশিদাবাদের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট কৃষ্ণনগরের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সে সমাচার প্রেরণ করেন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মে ক্লাইবের নিকট। ক্লাইব-প্রদত্ত সংবাদে কৃষ্ণনগরের মহারাণী জানিতে পারেন, কৃষ্ণনগরাধিপ ও কুমার বাহাদুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং সাত দিনের মধ্যেই দুই জনেই দণ্ডিত হইবেন। এই সাত দিন যদি কোন প্রকারে তাঁহাদের দুই জনকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ক্লাইব তাঁহাদের মুক্ত করিবেন।

—সংবাদ শুনিয়া মহারাণীর চিন্তার আর অবধি রহিল না। কেমন করিয়া কি করা সম্ভব, তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। যখনই কোনো বড় রকমের গণ্ডগোল বাধিত, তখনই তাহার মীমাংসার ভার পড়িত গোপালের উপর। সানন্দেই তিনি সে ভার গ্রহণ করিতেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল তাঁহার অসাধারণ। রসের হজমায় তিনি সেইটাকে করিতেন সহজপাচ্য এবং মধুময়। আপামর সাধারণ তাহা গ্রহণ করিত অমৃতবোধে। সেইটাই ছিল গোপাল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

মহারাণীর নির্দ্দেশ ও আদেশে গোপাল মুঙ্গের যাত্রা করিতে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁহার কথা ও কায যে এতটুকুও এদিক-ওদিক হইত না, তাহা মহারাণী ভালই জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তবু দোলে মন সন্দেহ-দোলায়! কি-হয়—কি-হয়! বাড়ী ফিরিয়া বাড়ীর লোকের পরামর্শ-প্রভাবে গোপাল যদি বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইতে না চায়, যাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ত সমূহ বিপদ! মহারাণীর কেমন বিশ্বাস, গোপাল মুঙ্গের পৌঁছাইয়া বুদ্ধিবলে বড়ের চাল দিবা মাত্রই কিস্তী মাৎ হইবে। কিস্তী মাতের জন্যই সাধ্বী মহারাণীর আকুতি। অবস্থার গুরুত্বে রাজভক্ত গোপাল মহারাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুঙ্গের যাত্রার বন্দোবস্ত রাজবাটীতে বসিয়াই করিতে লাগিলেন। মহারাণীর স্বস্তি বোধ হইল তাহাতে—সংশয়ের উচ্ছেদে।

যাত্রার পূর্ব্বে মালিকানীর আদেশ লইয়া দেওয়ানের নিকট হইতে গোপাল পঞ্চাশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিলেন। আর সংগ্রহ করিলেন বিরাট পরিমাণ ঘৃত, আটা, ময়দা, শর্করা, খোয়া ক্ষীর, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্, আলুবোখরা প্রভৃতি ও শতাধিক হালুইকর ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ ময়রা। দ্বারবান ও ভৃত্যাদির সংখ্যাও অল্প ছিল না। ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই কৌতূহলী হইল ও কৌতুকানুভব করিতে লাগিল ; কিন্তু কেহই কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। গোপালের ব্যক্তিত্বকে ইহার কারণ মনে করা যাইতে পারে।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাংলা

শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রচলিত গণমতের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার মধ্যে একটা ব্যর্থতার আশঙ্কা আছে ; আবার এই গণমত যদি রাষ্ট্রশক্তি পরিপুষ্ট মত হয়, তাহা হইলে সেই মতের বিরুদ্ধে কিছু বলার মধ্যে ব্যর্থতা ছাড়া বিপদ—নির্য্যাতনের ভয়ও আছে।

হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানীকে যে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে অধিকাংশ কংগ্রেস-রথীদের মত। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করার মধ্যে বিপদ আছে।

তবু আমরা এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষার হয়েই দুই-একটি কথা বলিতে চাই।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার যুক্তির কথা উত্থাপিত হইলেই যাঁহারা কানে আঙ্গুল দিয়া গালাগালি আরম্ভ করিবেন,—তাঁহাদের সংখ্যা বাঙ্গালীদের মধ্যেও কম নহে—

প্রথমতঃ আছেন সুবিধাবাদীর দল,—যাঁহারা অনিশ্চিত সংগ্রামে অকারণ শক্তি ক্ষয় করিতে চাহেন না।

দ্বিতীয়তঃ আছেন অতি-উদারনৈতিক দল—যাঁহারা বলেন, নিজের মাতৃভাষার হইয়া ওকালতি করাটা হইতেছে মনের সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তির দ্যোতক।

তৃতীয়তঃ আছেন ঘোরতর গান্ধী-বাদী দক্ষিণ পন্থীর দল,—যাঁহারা এ জাতীয় দাবীটাকে মহাপাপ বলিয়াই ধারণা করেন।

চতুর্থতঃ আছেন ঘোরতর শৃঙ্খলা-বিলাসীর দল,—যাঁহারা বলেন, "এখন নবজাত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি করাই দেশ-দ্রোহিতা। গভর্ণমেণ্ট এখন যাহাই করিতে চায় তাহাই করিতে দেওয়া উচিত, তাহা না করিলে রাষ্ট্রের সংগঠন-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।"

পঞ্চমতঃ আছেন ঘোর সংসারীর দল,—যাঁহারা তেল-নুণ-লকড়ি সমস্যায় এত ব্যস্ত যে, অন্য কোনও নূতন সমস্যা তাহাদের সুমুখে আনয়ন করিলে তাঁহারা দিশেহারা হইয়া পড়েন।

এই পাঁচটি দলের লোক ছাড়াও আরও দু'চার জন লোক থাকিতে পারেন, তাঁহাদের জন্য আমরা দুই-একটি কথা বলিতে চাই।

আমাদের প্রথম বিচার্য্য বিষয় হইতেছে—হিন্দী ভাষার উপর আজ যে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে ইহার কারণ কি?

হিন্দী ভাষার প্রচারকে পুষ্ট করিয়াছে কাহারা?

প্রথমতঃ করিয়াছে ইংরাজ; অবশ্য বাঙ্গালীই ইংরাজের সঙ্গে মিলামিশা প্রথম করিয়াছে, কিন্তু প্রথম হইতেই তাহারা ইংরাজের অফিসে, আদালতে ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা কহিয়াছে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোটো কাজ করিবার জন্য যে সমস্ত অবাঙ্গালী ইংরাজের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই সব লোকেরা অত সহজে ইংরাজী শিখিতে পারে নাই। ফলে ইংরাজ নিজের প্রয়োজনে সেই সব চাকর, বাকর, আয়া, বেয়ারা প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা কহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সব বাঙ্গালী ইংরাজের সঙ্গে মিশিয়া আধা-ইংরাজ হইয়াছে, তাহারাও সাহেবিয়ানার আভিজাত্যের জন্য হিন্দী শিখিয়াছে। ফলে নিজেদের দেশে বসিয়াও তাহারা ইংরাজের অনুকরণে অবাঙ্গালীর সঙ্গে হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাদের ভর্ৎসনার ভাষা, আদেশের ভাষা, অহঙ্কারের ভাষা হিন্দীই রহিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, হিন্দীকে পুষ্ট করিয়াছে হিন্দী-প্রচারিণী সভার মত নানা প্রতিষ্ঠান। বড় বড় ধনী অর্থ সাহায্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে এবং বহু দিন হইতেই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে হিন্দী ভাষাই ভারতের একমাত্র সম্ভাব্য রাষ্ট্র-ভাষা। ফলে ছ'-সাত বৎসর পূর্ব্বের হিন্দী দৈনিক বা সাপ্তাহিক 'বিশ্বমিত্র' প্রভৃতি পত্রিকা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে হিন্দীর অন্য একটি নামই রাখা হইয়াছে "রাষ্ট্র-ভাষা"—অথচ তখন ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র জিনিষটা একটা অবাস্তব কল্পনার জিনিষ মাত্রই ছিল!

দাবী যতই অসঙ্গত হউক, জোর গলায় তাহা প্রচার করিতে পারিলে তাহার খানিকটা টিকিয়া যায়, হিন্দীর পক্ষেও তাহাই হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে,—বর্ত্তমানে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রভাব অতি অল্প। অবাঙ্গালী নেতাদের দল যখন হিন্দীর হইয়া জোর গলায় প্রচার করিতেছেন তখন বাঙ্গালী নেতাদের দল অতি ভদ্রতার জন্যই হউক, অথবা অতি উদারতার জন্যই হউক, বাংলার হইয়া কিছু বলাটাকে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর হইয়া যখন এত লোকে এত কথা বলিতেছেন তখন তাঁহাদের যুক্তি কি আছে?

হিন্দীর পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে হিন্দীর গণ-বোধ্যতা

সাধারণ লোকে বলে হিন্দী হইতেছে ভারতের সর্ব্বজন-বোধ্য ভাষা। কিন্তু যে ভারতবর্ষে ২২৫টি ভাষা প্রচলিত আছে, সেখানে সর্ব্বজন-বোধ্য কোনও ভাষা থাকিতে পারে কি? গত ১১১১ সালের লোক গণনায় দেখা গিয়াছে, মাতৃভাষা হিসাবে যাহারা হিন্দী ভাষায় কথা কয়, তাহাদের সংখ্যা ৪ কোটি পনেরো লক্ষ মাত্র।

তাহা হইলে হিন্দীর হইয়া এত ওকালতি শুনিতে পাওয়া যায় কেন? ইহার একটা কারণ আছে। যাহারা মাতৃভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষায় কথা কয়, তাহারা ছাড়াও প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোক হাট-বাজার হইতে, স্কুল-পাঠশালা হইতে মাতৃভাষার পরিপূরক ভাষা হিসাবে হিন্দীটিকে সহজে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে; ফলে ভারতের প্রায় ১১ কোটি লোকের কাছে হিন্দী খানিকটা পরিচিত ভাষা।

এই বহু-জন-বোধ্যতাই হইতেছে হিন্দীর পক্ষে প্রবলতম যুক্তি। এই হিসাবে হিন্দীর সঙ্গে বাংলা ভাষার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষায় কথা কয় প্রায় ছয় কোটি লোক এবং মাতৃভাষা হিসাবে ইহাই হইতেছে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোকের ভাষা। এই হিসাবে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম ভাষা;—উত্তর-চীনা, ইংরাজী, রাশিয়ান, জার্ম্মাণ, স্প্যানিস এবং জাপানীর পরই ইহার স্থান। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রবলতম যুক্তি

হইতেছে এই ভাষা ভারতের আর অন্য কোনও প্রদেশে পোষাকী ভাষা হিসাবেও চলতি নাই (যেরূপ হিন্দী ভাষা আছে); সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, হিন্দী ভাষা বাংলা ভাষা অপেক্ষা অধিকতর লোকের কাছে পরিচিত।

কিন্তু "অধিকতর লোকের কাছে পরিচিত"—এই যুক্তি দিয়া আমরা কতটুকু দাবী করিতে পারি? যতগুলি লোকের কাছে হিন্দীটা পরিচিত ভাষা, তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোকের নিকটই হিন্দী পরিচিত নয় এবং হয়ত বহু বাঞ্ছিতও নয়। সমগ্র দাক্ষিণাত্য, সমগ্র বাংলা, সমগ্র উড়িষ্যা, সমগ্র আসাম, এই সমস্ত অঞ্চলেই হিন্দী একটি নূতন অপরিচিত ভাষার মতই মনে হইবে। এই সমস্ত অঞ্চলে জোর করিয়া হিন্দীকে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে সেটা কি একটা ভাষাতাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদের মতই জুলুমের ব্যাপার হইবে না? স্যার রাধাকৃষ্ণনের মত লোকও এই চেষ্টাকে "linguistic imperialism" বলিয়া আখ্যা দিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিতে পারেন, বাঙ্গালী বা দাক্ষিণাত্যের লোকেরা যদি হিন্দী ভাষা শিখিতে না চায়, তাহা হইলে কোন্ যুক্তিতে বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষার মত একটা প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার জন্য দাবী করিবে? অবাঙ্গালীরা কেন বাংলা ভাষা শিখিতে রাজী হইবে?

আমাদের উত্তর হইতেছে—আমরা যুক্তি দিয়াই তাহাদের রাজী করাইতে চাই: আমরা জানি, গণ-ভোটে আমরা জয়ী হইতে পারিব না; আমরা জানি, রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে নাই; আমরা জানি, রাষ্ট্র-নায়করা আমাদের দলে নাই: আমরা জানি, অধিকাংশ কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার যুবকবৃন্দ আমাদের দাবীর যুক্তি শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের দাবীটিকে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিবে; আমরা জানি, ঘরে-বাহিরে সকলেই আমাদের প্রতিপক্ষতাই করিবে। সেই জন্যই যুক্তি ব্যতীত আমাদের দাবীর অন্য কোনও সহায়-সম্বল নাই। আমরা যুক্তি দিয়াই অবাঙ্গালীদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি তাহাদের মধ্যে গোঁড়ামি না থাকে এবং যদি আমরা ভাল করিয়া আমাদের কথা শুনাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দাবী একান্ত ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাক, আমাদের দাবীর যুক্তি কি?

আমরা দেখিয়াছি, অধিক জন-বোধ্যতা এত বড় যুক্তি নয় যাহার জন্য অধিক জন-বোধ্য একটি ভাষাকে ততোধিক সংখ্যক লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য অথবা অবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বজন-বোধ্য কোনও ভাষা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি বিশিষ্ট ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে হইলে এমন একটি ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে হইবে, যাহা "সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধ"। গণ-বোধ্যতার যুক্তি যখন টিকিল না তখন সহজ-বোধ্যতার ও সমৃদ্ধির যুক্তি দিয়া বাংলা ভাষাকেই আমরা ভারতের সর্ব্বোত্তম ভাষা হিসাবে উপস্থাপিত করিতে পারি।

বাংলা ভাষা যে হিন্দী ভাষা অপেক্ষা অনেক সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে হইলে এই দুইটি ভাষার ব্যাকরণ ও ইতিহাস একটু আলোচনা করিলেই হইবে।

আমরা প্রথমেই এই দুইটি ভাষার Rules of concord অর্থাৎ বাক্যস্থিত শব্দ-সমূহের সামঞ্জস্যের নিয়মগুলির আলোচনা করিতেছি।

(১) কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্ম

হিন্দীতে কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার যদি "নে" বিভক্তি না থাকে, তাহা হইলে ক্রিয়া সব সময়েই পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের দিক দিয়া কর্ত্তার অনুকূল হইবে; যথা—"মৈঁ জাতা হুঁ"—"হম্ জাতে হৈঁ"—"মৈঁ জাতী হুঁ" "হম্ জাতী হৈঁ" ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাতে এই জাতীয় 'হুঁ' 'হৈঁ' 'জাতা' 'জাতে' 'জাতী' প্রভৃতির গোলমাল নাই, অবশ্য প্রাচীন ছয়-সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাংলায় কিছু কিছু এ জাতীয় জিনিষ ছিল; যথা—"চলী গেলী রাহী"—রাধিকা চলিয়া গেলেন (শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন) "রোষিলী রাহী"—রাধিকা রুষ্ট হইলেন, ইত্যাদি।

হিন্দীতে কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের নিয়মের জটিলতা এইখানেই শেষ হইল না। কর্ত্তৃবাচ্যে যদি কর্ত্তার সঙ্গে "নে" বিভক্তিটি থাকে এবং কর্ম্মের সঙ্গে "কো" বিভক্তি না থাকে, তাহা হইলে সকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ত্তার অনুসারে না হইয়া পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনে কর্ম্মের অনুসারে হইবে। যেমন—এক জন পুরুষকেও বলিতে হইবে "মৈঁনে যহ পুস্তক পড়ী হৈ," কারণ পুস্তক কথাটি হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ।

আবার এই 'নে' বিভক্তির সঙ্গে যদি 'কো' বিভক্তি থাকে, তাহা হইলে কিন্তু ক্রিয়াটি হয় কর্ত্তার অনুসারে হইবে, অথবা সব সময় প্রথম পুরুষ এক বচন পুংলিঙ্গ হইবে; যথা—"মৈঁনে ইস্ পুস্তককো পড়া হৈ"

এ সমস্ত জটিলতা ছাড়া ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে বিশেষ বিশেষ অনুশাসন আছে। বলা বাহুল্য, বাংলায় সে জাতীয় জটিলতা কিছুই নাই।

(২) সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ কারক

হিন্দীতে সংজ্ঞার (বিশেষ্য) লিঙ্গ-বচন অনুসারে উহার সম্বন্ধ পদের লিঙ্গ বচন হয়, যথা—"রামকী স্ত্রী" কিন্তু "সীতাকা স্বামী" "রামকা লড়কা" "রামকী লড়কী" "হামারা দেশ" কিন্তু "হামারী ভাষা"। হাজার বছরের পূর্ব্বের বাংলা ভাষায় এরূপ ছিল; যথা—"হাড়েরি মালী" (হাড়ের মালা)।—বৌদ্ধগান ও দোঁহা।

(৩) বিশেষ্য ও বিশেষণ

হিন্দীতে বিশেষণের লিঙ্গ-বচন বিশেষ্যের অনুযায়ী হয়; যথা—"আচ্ছা লড়কা" "আচ্ছী লড়কী" "আচ্ছী বাত" "আচ্ছা মতলব" "আচ্ছা প্রশ্ন"। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান খাঁটি বাংলায় এ জাতীয় জটিলতা নাই। ভাল ছেলে আমরা যেমন বলি, তেমনই বলি "ভাল মেয়ে"; "ভালা মেয়ে" বা "ভালী মেয়ে" বলি না। অবশ্য সংস্কৃতমূলক তৎভব শব্দগুলির কথা আমরা বাদ দিতেছি।

(৪) লিঙ্গ-প্রকরণ

হিন্দীর লিঙ্গ-প্রকরণ একটি সমস্যার বিষয়। হিন্দীতে ক্লীব-লিঙ্গ নাই; ফলে অপ্রাণী-বাচক শব্দগুলি হয় পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রী-লিঙ্গ হইবে। অতি সাধারণ ঘরোয়া কথাগুলির মধ্যেও এই লিঙ্গ-ভেদ সমস্যা আছে। বাংলায় এ সমস্যা নাই। এই জন্য হিন্দী ভাষায় কথা, কহিতে হইলে বাংলা ভাষা-ভাষীদের পদে পদে ভুল হয়। আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি—"ভাল কথা" কিন্তু হিন্দীতে তার অনুবাদ করিতে হইলে বলিতে হইবে—"আচ্ছী বাত"; কারণ

'বাত' কথাটি হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ। এই জাতীয় অসুবিধা পদে পদে হইবে। ধরুন, চায়ের টেবিলে বসিয়া বসিয়া গল্প চলিতেছে, আমার বলিতে ইচ্ছা হইল, বলি—"চা-টি বেশ ভাল হইয়াছে"। তখন আমাকে থমকিয়া ভাবিতে হইবে—চা কথাটি কোন্ লিঙ্গ? কারণ তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারিব না—"চা অচ্ছা হৈ" হইবে, না "চা আচ্ছী হৈ"। না হয় কষ্ট করিয়া শিখা গেল চা কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ, ইহার বেলায় "আচ্ছী হৈ" বলিতে হইবে; কিন্তু নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে দৈটি খাইতে ভাল লাগিলে আমি যদি বলি—"দহী বহুত আচ্ছী হৈ" তাহা হইলে সকলে হাসিতে থাকিবেন, কারণ 'দৈ' কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়, পুংলিঙ্গ।

এই হিন্দী ভাষা যদি রাষ্ট্র-ভাষা হয়, তাহা হইলে ব্যাকরণের প্যাঁচে পড়িয়া আমরা এবং অনেকেই আমাদের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না, অথবা ভুল ভাবে প্রকাশ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইব।

কিন্তু এতখানি ব্যাকরণগত জটিলতা পার হইয়া আমরা হিন্দী ভাষার মধ্যে পাইব কতটুকু সম্পদ্?

হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত তুলনা করিয়া আমরা আমাদের বিষয়বস্তুক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে চাহি না; তবে প্রসঙ্গছলে এইটুকু বলিতে পারি যে, যে যুগে প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরদের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া হিন্দী কবিগণ তাঁহাদের "প্রশস্তি কাব্য" "রীতি ধারার" কাব্য বা "নখ শিখ" (নায়ক-নায়িকাদের রূপবর্ণনার জন্য 'নখ' হইতে 'শিখা' বা কেশ পর্য্যন্ত উপমার অভিধান জাতীয় কাব্য) লিখিতেছিলেন, সেই যুগে বাংলা দেশে দারুণ দুঃখ-কষ্ট ও রাজনৈতিক নির্যাতন প্রভৃতির মধ্যেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতির মত মহাকবির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

যদি প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমান যুগে আসি, তাহা হইলে বাংলার সমৃদ্ধি বিপুল ভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।

আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি, ভারতের আর কোনও প্রাদেশিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিস্পর্দ্ধী সাহিত্যিক সৃষ্ট হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বেও আমরা হিন্দীর "প্রভাকর" (Honours in Hindi) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এরূপ প্রশ্নও দেখিয়াছি "স্ত্রী চরিত্র কো জিতনা আচ্ছা দ্বিজেন্দ্র বাবু অংকিত কর সকে হৈঁ, উতনা কদাচিত্‌, হী কোই নাটক করসকা হো"—"ইস দৃষ্টিসে দ্বিজেন্দ্র তথা প্রেমচন্দকী তুলনা কীজিয়ে।" বলা বাহুল্য, এই দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদেরই বাঙ্গালী ডি, এল্, রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতির পঠন-পাঠনও অনেক পরীক্ষাতেই হয়। মধ্যযুগীয় ব্যাকরণের জটিলতা পার হইয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যদি আমাদেরই পূর্ব্ব-পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদনকে নূতন করিয়া পাঠ করিতে হয় তাহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? আমরা ছেলেবেলায় পড়িয়াছি—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীর চূড়ামণি" ইত্যাদি তাহাই আবার হিন্দীর মধ্যে নূতন করিয়া পড়িব—

"সম্মুখ সমরমেঁ অকালমে নিহত হো—
শূর শিরোরত্ন বীরবাহু, যমপুর কো
গয়া জব, কহো তব দেবি, সুধাভাষিণী!
কিস্ কর বীর কো নিশাচর নরেন্দ্র নে,
ভেজা রণ মে থা উস রাঘব যে বৈরী নে?"

পরের ভাষা ইংরাজী পড়িয়া আমরা পাইয়াছি অনেক, কিন্তু হিন্দী আমাদের কি দিবে?

প্রতিপক্ষের যুক্তি—হিন্দীকে যাঁহারা রাষ্ট্র-ভাষা করিতে চাহেন তাঁহারা হয়ত বলিবেন—"বাংলা ভাষার সাহিত্যিক সম্পদ বেশী বটে কিন্তু ইহাই কি রাষ্ট্র-ভাষা হইবার একমাত্র যুক্তি?"

আমরা বলিব—একমাত্র যুক্তি না হইলেও প্রবল যুক্তি বটে। যে ভাষায় সম্পদ বেশী তার ভাব-বহনের শক্তি যে বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র ভাষায় বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ হওয়া উচিত—ভাববাহকত্ব ও সহজবোধ্যতা। রাজনৈতিক সংগ্রামের বাক্-বিতণ্ডার জন্য, জাতীয় বৃহত্তর জাতীয়-জীবনের নানা-প্রকার প্রশ্নের আলোচনার জন্য যে ভাষার প্রয়োজন, তাহা ভাব-বহনের উপযুক্ত বাহক হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। বাংলা ভাষায় তাহার সরলায়িত ব্যাকরণ-যন্ত্রের জন্য, তাহার সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের জন্য, তাহার সম্ভাব্যতার বিরাটত্বের জন্য, বাংলা ভাষা যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ভাষা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

এই বিষয়ে বাংলার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ ভাষার তুলনা করা যাইতে পারে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইংরেজী সাহিত্যে Milton প্রভৃতির হাতে যখন একটি অপূর্ব্ব সম্পদে পরিণত হইল, তখন তাহার অনুকরণে ফরাসী ভাষাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা ফরাসী ভাষায় সার্থক হয় নাই; কিন্তু মাইকেল প্রভৃতির হাতে বাংলা ভাষায় সে চেষ্টা সার্থক নিশ্চয়ই হইয়াছে।

অনেকে হয়ত বলিবেন—বাংলা দেশ যখন খণ্ডিত হইয়া গেল এবং তাহার অর্দ্ধেক অংশ যখন পাকিস্তানে চলিয়াই গেল, তখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবী অনেকখানি শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

গণ-ভোটের যুক্তি দিয়া বিচার করিলে কথাটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দাবী শক্তিহীন হয় না। কারণ, গণ-ভোট আমাদের যুক্তির আসল কথা নয়। অবশ্য গণ-ভোটকে যদি যুক্তি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্র-ভাষা হওয়া অনিবার্য্য। কারণ, সমগ্র পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ লোকে বাংলা ভাষায় কথা কয়, এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ লোকে কথা কয় পাঞ্জাবী, উর্দ্দু, হিন্দী, গুরুমুখী, গুজরাটী, সিন্ধি, বেলুচি ও পুস্তুতে।

কিন্তু ভোটের যুক্তি দিয়া আমরা ভারত অথবা পাকিস্তান কোনও জায়গাতেই বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে চাহিতেছি না। ভাষার সম্পদ, সম্ভবনা, সহজবোধ্যতা, ভাববাহকত্ব, এইগুলিই হইতেছে আমাদের যুক্তি।

আমরা প্রাদেশিকার মনোবৃত্তি লইয়া প্রাদেশিক গৌরব বৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে চাহিতেছি না; ইহাতে ভারতের গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে; ভারত ইউনিয়ন বলিতে পারিবে, আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা এত সমৃদ্ধ। যে ভাষায় বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, যে ভাষার আলোচনার জন্য ভারতের বাহিরে ইউরোপ ও আমেরিকার ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে, সেই ভাব-সমৃদ্ধ, জ্ঞান-গরিষ্ঠ, সুসংস্কৃত, সুললিত, শক্তিশালী বাংলা ভাষাকে—বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের বাংলা ভাষাকে আমরা ভারত ইউনিয়নের কাছে উপহার দিতে চাহিতেছি। লাঠির জোরে যাঁহা

অবাঙ্গালীদের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেছি না, সাধু Salesman এর ভঙ্গীতে শুধু বলিতে চাহিতেছি—অন্য ভাষাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একবার বাংলা ভাষার কথা ভাবিয়া দেখুন। আপনাদের ইহাতে এই এই সুবিধা হইবে।

আমাদের অভিযান নিছক যুক্তির অভিযান। এ অভিযানের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে আমাদের পক্ষ হইতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে এবং প্রতিপক্ষের পক্ষ হইতে সংস্কার-মুক্ত বিচার-শক্তির উপর। আমাদের যা যুক্তি আছে, তাহা যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি এবং প্রতিপক্ষ যদি গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া তাহা শুনিতে প্রস্তুত থাকে, তবেই আমাদের জয় হইবে।

এ অভিযানে যুক্তিই যখন আমাদের একমাত্র সম্বল, তখন অপরের যুক্তিগুলিও আমরা শুনিতে প্রস্তুত আছি। কাজেই রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈকল্পিক যুক্তিগুলি আছে, তাহাদেরও আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিব।

বৈকল্পিক যুক্তি

(১) হিন্দুস্থানী—

গান্ধীজির মতে ভারতের মধ্যে হিন্দুস্থানীর রাষ্ট্র-ভাষা হওয়া উচিত। এই হিন্দুস্থানী ভাষাটির সহিত খাঁটি হিন্দীর পার্থক্য কি, এই লইয়া অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে মোটামুটি ভাবে আমরা বলিতে পারি যে, আরবী ফার্সী শব্দবহুল হিন্দী ভাষার নামই হইতেছে হিন্দুস্থানী। মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানে মিলনের জন্য ব্যাকুল; সেই জন্যই তিনি ভারতের রাষ্ট্র ভাষার মধ্যেও একটা "হিন্দী-উর্দ্দু-প্যাক্ট"এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। —গান্ধীজির নিজের মাতৃ-ভাষা হইতেছে গুজরাটী, তাহা সত্ত্বেও তিনি যে এই হিন্দুস্থানীর জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ঔদার্য্যই প্রকাশ পায়। ইহাতে হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়েরই দাবীর প্রতি খানিকটা সুবিচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজি-পরিকল্পিত হিন্দুস্থানী ভাষাটাকে গোঁড়া হিন্দুস্থানীর দল মোটেই গ্রহণ করিতে রাজী নন; তাঁহারা বিশুদ্ধ হিন্দী অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার দিক-ঘেঁষা হিন্দীর পক্ষপাতী। আর্য্য-সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-এই দলে।

আমাদের তরফ হইতে বক্তব্য হইতেছে- বাঙ্গালী হিসাবে আমরা হিন্দুস্থানী অপেক্ষা আর্য্যসমাজী হিন্দী বেশী বুঝিতে পারি; কারণ, সংস্কৃতমূলক হিন্দীর সঙ্গে ভারতের প্রাদেশিক আর্য্যভাষা-সম্ভূত ভাষাগুলির খানিকটা মিল আছে। হিন্দুস্থানী-ত যদি কেহ বলে—"লেকিন্ যাদ্ রাখ্না চাহিয়ে" তাহা হইলে আমরা সেটা ততটা বুঝিতে পারিব না যতটা পারিব, যদি কেহ বলে—"কিন্তু স্মরণ-রাখ্না চাহিয়ে।" কারণ "লেকিন্" কথাটির চেয়ে "কিন্তু" কথাটি এবং "যাদ" কথাটি অপেক্ষা "স্মরণ" কথাটি আমাদের কাছে বেশী পরিচিত।

অনার্য্য ভাষা-ভাষী দ্রাবিড়দিগের নিকটেও এই খাঁটি হিন্দী বেশী সুবোধ্য। কারণ, তামিল্, তেলেগু, মালয়ালাম্ প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার কাঠামো যাহাই হউক, ইহাদের মধ্যে যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ঢলিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন ভারতে হিন্দী প্রচারিত হইবে অথবা হিন্দুস্থানীর প্রচার হইবে তাহার মীমাংসা হইবে, আমরা যাহাদের প্রতি বেশী সহানুভূতি-শীল হইব—এই প্রশ্নের উপর। ভারতের মাতৃভাষা হিসাবে উর্দ্দু বা পারসীতে তত লোক কথা কয় না। হিন্দীর মধ্যে ইতিমধ্যেই যে পারসী প্রভাব আসিয়া গিয়াছে তাহাতে সাধারণ চলতি হিন্দী ভারতের মুসলমানদের পক্ষেও দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু খাঁটি হিন্দুস্থানী দাক্ষিণাত্য, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে কিছুতেই সহজ-বোধ্য হইবে না।

(২) সংস্কৃত—

সংস্কৃত এক কালে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা ছিল এবং এখনও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি হয় সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত, অথবা সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবান্বিত। সেই জন্য কামাৎ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃতকেই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিতে চাহেন।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতের দাবী যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন, যেহেতু সংস্কৃত হইতেছে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভাষা; এই অপরাধেই সংস্কৃত সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি আসিবে মুসলমানদের পক্ষ হইতে।

(৩) রোমান হিন্দী—

অনেকে বলেন—রোমান হরফে Basic হিন্দীই হইবে ভারতের উপযুক্ত রাষ্ট্র-ভাষা। রোমান হরফের সুবিধা হইতেছে—ইহা লেখা সহজ, ইহাতে আক্ষরিক জটিলতা এবং ণত্ব-ষত্ব হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভৃতির হাঙ্গামা অল্প Type writing প্রভৃতিতে ইহার সুবিধা বেশী।

"বেশিক" (Basic) হিন্দীর সুবিধা হইতেছে—ইহাতে ব্যাকরণের জটিলতা থাকিবে না এবং ইহা শব্দ-সম্পদের দিক্ দিয়াও সহজ ও সুবোধ্য।

Roman Hindi সম্বন্ধে প্রবলতম আপত্তি হইবে হিন্দী ভাষা-ভাষীদের তরফ হইতে। তাঁহারা বলিবেন—ইহা একটা ভাষাই হইবে না। ভাষার লিপিটাই যদি বিদেশী হইল তাহা হইলে ভাষার ভাষাত্ব রহিল কি?

যাঁহারা হিন্দী ভাষা জানে না তাহাদের পক্ষে Roman হিন্দী নিশ্চয়ই বেশী গ্রহণযোগ্য হইবে। তাহারা চাহে না যে কতক লোক তাহাদের মাতৃভাষার লিপি হইতে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া নিজের অহঙ্কারে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়া থাকিবে আর বাকী সকলে তাহাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এক পক্ষ যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা হইলে অপর পক্ষকেও কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া একটা সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হয়। Roman Hindi হইতেছে এই জাতীয় মিলন-ক্ষেত্র। সুভাষচন্দ্র তাঁহার I. N. A.তে না কি এই জাতীয় একটা ভাষা চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহাতে কোনও ভাষার শুদ্ধ অবিকৃত রূপটি পাওয়া যায় না বটে। কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্র-ভাষায় যদি ভাষার অবিকৃত রূপটি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে আপত্তি কি থাকিতে পারে?

(৪) আঞ্চলিক রাষ্ট্র ভাষা—

ভারতে যদিও ২২৫টি ভাষার প্রচলন আছে, তাহা হইলেও দেখা যায়, মূল ভাষা হিসাবে ভারতে মোট ১'৮টি ভাষা আছে এবং অন্যান্য ভাষাগুলি এই মূল ভাষাগুলির একটি বা অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় এবং এক-একটি অঞ্চলের জন্য এক-একটি রাষ্ট্র ভাষার ব্যবস্থা করা যায়। উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা, আসাম, বিহারের অংশবিশেষ এবং উড়িষ্যার জন্য বাংলা ভাষা; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য উর্দ্দু; দাক্ষিণাত্যের জন্য তামিল, তেলেগু এবং মারাঠী; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য গুজরাটী এবং মধ্য-অঞ্চলের জন্য বিশুদ্ধ হিন্দীর ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক ভাষা-ভাষী জাতিই তাহার মাতৃভাষা এবং সেই মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি রাষ্ট্র ভাষা শিখিয়া লইবে। এক জন আসামীর পক্ষে বা এক জন উড়িষ্যাবাসীর পক্ষে হিন্দুস্থানী যতটা কঠিন বাংলা শেখা ততটা কঠিন হইবে না; তেমনই এক জন দাক্ষিণাত্যবাসী মালয়ালাম্ ভাষাভাষীর কাছে তামিল, তেলেগু শিক্ষা করা যতটা সহজ, হিন্দুস্থানী শিক্ষা করা ততটা সহজ হইবে না। ইহাতে যে কোনও একটি ভাষার উপর একটা অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপরও বেশী অবিচার করা হয় না। রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে এই আঞ্চলিক রাষ্ট্র-ভাষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে স্যার রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতিও এই আঞ্চলিক রাষ্ট্র-ভাষার পোষকতা করেন।

(৫) ইংরাজী—

অনেকের মতে আবার ইংরাজী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা থাকা উচিত। তাঁহারা বলেন—ইংরাজী এখন আর বাধ্যতামূলক ভাবে আমাদের শিখিতে হইবে না এবং প্রদেশে প্রদেশে যখন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক মিলনের জন্য আমাদের এত দিনের পরিচিত ইংরাজী ভাষাটা ব্যবহার করিতে আপত্তি কি থাকিতে পারে? তা ছাড়া, ইংরাজীর মত একটা সুসমৃদ্ধ ভাষার সহিত হঠাৎ সম্পর্ক ছিন্ন হইলে আমাদের ক্ষতিই হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত মত হইতেছে, বাংলা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার উপযুক্ত। অবশ্য যে যুগে ভোটের সংখ্যাধিক্যেই সব জিনিষের গুরুত্ব নির্ণীত হয়, সে যুগে নিছক যুক্তি দিয়া জয়লাভের আশা আমরা রাখি না। এবং এক পক্ষ যদি অতি ভদ্রতায় নিজেদের অধিকারের কথা প্রচার করিতে ইতস্ততঃ করে এবং প্রতিপক্ষ স্পর্দ্ধার সহিত নিজেদের দাবী প্রচার করে, তখন যুযুৎসু দলেরই জয় হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের যুক্তিগুলি ধীর ও স্থির ভাবে এবং নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সে কথা শুনিবার মত শ্রোতা আমরা নিশ্চয়ই পাইব. আমাদের উচিত, বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবী করিয়া সভা-সমিতি করা, এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাব বিধান পরিষদ (Constituent Assembly) এর সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা।

সাধারণ বাঙ্গালীরা একটু বেশী হিসাবী, তাই তাহারা অনিশ্চিত যুদ্ধে শক্তিক্ষয় করিতে চাহেন না। আমরা বলি, যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত হইলেও ক্ষতি নাই, আমাদের যুক্তির যদি সারবত্তা থাকে তাহা হইলে জয় অনিবার্য্য। আজ যাহা ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, কালই হয়ত তাহা জাতিগত বিজয়ে রূপান্তরিত হইবে। যে যুগে ক্ষুদিরাম, সত্যেন্দ্র বাঘা যতীন প্রভৃতি শহীদ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার অনিশ্চিত রণে তাঁহারা যদি অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতাম না।

আজ যদি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার দাবী উঠিতে থাকে, তাহা হইলে হয়ত কাল কেন্দ্রীয় সরকারের আসন টলিবে এবং তখন আমাদের দাবী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার আগ্রহও তাঁহাদের আসিবে।

এখন প্রয়োজন হইতেছে গণ-মত গঠনের—প্রয়োজন হইতেছে আন্দোলনের। আজ হঠাৎ যদি শুনিতে পাই, ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীই স্থির হইয়া গিয়াছে, তখনও আমাদের আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া উচিত; ন্যায্য আন্দোলন settled factকে ও unsettled করিতে পারে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

জয় হিন্দ্।

দুইটি কবিতা

অমিতাভ চৌধুরী

১

"ধা ধিন ধিন না"
তবলায় চাটি
সাবাস জিয়া!
তুমিই খাঁটি।

২

"তেরে কেটে তেরে তাক"
সবাই অবাক
দুলিয়া কাঁক
প্রেমে পড়া সত্যিই Luck।

রাশিয়ান ছেলেমেয়ের অদ্ভুত কীর্ত্তি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত
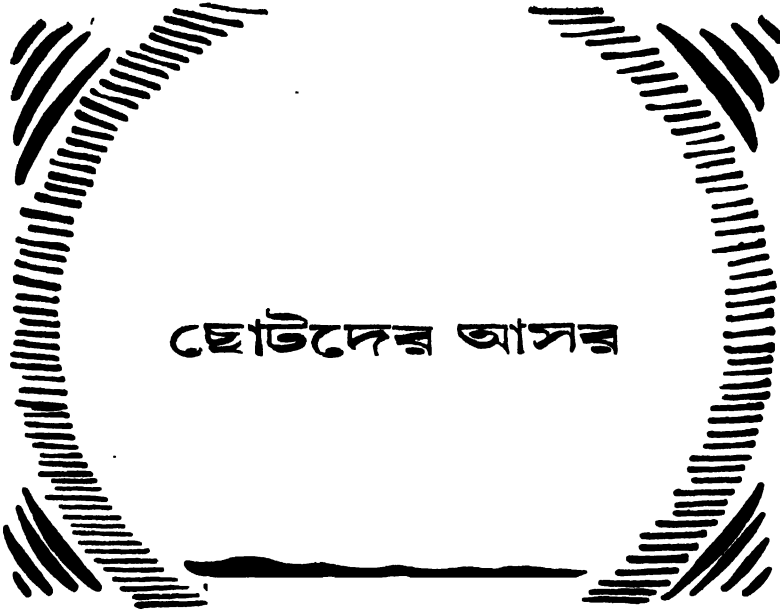
রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা জার্ম্মাণদের হাত থেকে নিজেদের দেশকে রক্ষা করবার জন্য যে সকল অদ্ভুত বীরত্বের কাজ করেছে, তা শুনলে তোমাদের হয়তো মনে হবে আমি বানানো গল্পই বলছি ; কিন্তু মোটেই তা ভেবো না। দেশকে বাঁচাবার জন্য শুধু যে বীরত্বপূর্ণ কাজই করেছে তা নয়, দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। তোমাদিগকে আজ তাদেরই কয়েক জনের অপূর্ব কীর্ত্তি-কথা শোনাব।

মেয়েটির নাম পেত্রোবা। বাড়ী তার উত্তর-রাশিয়ায়। তাদের বাড়ীর কাছেই ছিল একটি রেলওয়ে ষ্টেশন।

জার্ম্মাণরা আগুনে-বোমা ফেলে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, গাছ-পালা পুড়িয়ে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে দিন গুণছে সকলেই। এক দিন দেখা গেল, পেত্রোবাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনটিতে জার্ম্মাণরা ফেলেছে আগুনে-বোমা। দাউ-দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে ষ্টেশনের ঘর-দোর ; শুধু তাই নয়, আগুনের লেলিহান জিহ্বা এগিয়ে চলেছে নিকটবর্ত্তী কতকগুলি তেল-বোঝাই গাড়ির দিকে। আগুনের এই পৈশাচিক কাণ্ড দেখতে পেলো পেত্রোবা তার বাড়ী থেকে। সে ভাবলে, এ আগুন না নেবালে তেল-বোঝাই গাড়িগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। পেত্রোবা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে আগুন নিবোবার জন্যে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর গড়াগড়ি দিতে লাগলো আগুনের মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত আগুন সত্যিই নিবে গেলো। কিন্তু পেত্রোবা? সে মরেনি। আগুনে ঝাঁপ দিলে যে তার মৃত্যু হতে পারে, সে-কথা সে কিছু ভাবেইনি। তার মনে ছিল, কি করে রক্ষা করবে তেল-বোঝাই গাড়িগুলো।

ক্যাপ্টেন গ্যাষ্টেলোর নাম রাশিয়ার শিশুরাও আজ জানে। তার অদ্ভুত কীর্ত্তির জন্যে সে মরেও আজ অমর।

গ্যাষ্টেলো কাজ করতো মস্কোর কোনও এক কারখানায়। যুদ্ধে পাইলট হিসেবে যোগ দেয় এবং পরে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়।

সেদিন ১৯৪১ সালের ৩রা জুলাই। গ্যাষ্টেলো আকাশে উড়েছে শত্রুদের বাধা দেবার জন্য। মেসিন গানে শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেনকে ঘায়েল করবার চেষ্টা চলেছে নীচের থেকে। হঠাৎ মেসিন গানের একখানা শেল গ্যাষ্টেলোর এরোপ্লেনে গিয়ে লাগে। সংগে সংগে এরোপ্লেনে যায় আগুন ধরে। আর রক্ষা নেই। আকাশে থেকে যুদ্ধ চালানো ক্রমেই অসম্ভব হচ্ছে গ্যাষ্টেলোর। ইচ্ছে করলে সে প্যারাসুটের সাহায্যে নিজের জীবন নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু সে চেষ্টা গ্যাষ্টেলো আদৌ করলে না। সে ভাবলে, যতক্ষণ আকাশে উড়ে থাকতে পারবে, ততক্ষণই নীচের যুদ্ধরত লাল ফৌজের সাহায্য করা হবে। করলেও তাই। এদিকে আগুন ক্রমেই তাকে ঘিরে ধরছে। এরোপ্লেনখানাও আর আকাশে উড়ন্ত থা রাচ্ছে না ; নীচের দিকে নেমে আসছে। গ্যাষ্টেলো চেষ্টা করছে উপরে উঠবার, কিন্তু পারছে না। অথচ আর কয়েক মিনিট মাত্র আকাশে থাকা চলবে। তার পরেই এরোপ্লেনখানা নীচে পড়ে ভেঙ্গে যাবে। হঠাৎ গ্যাষ্টেলো উপর থেকে লক্ষ্য করলো, সারি সারি তেল-বোঝাই জার্ম্মাণ ট্রাক চলেছে জার্ম্মাণ-লাইনের দিকে। এক নিমেষে এরোপ্লেনখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভীষণ বেগে গ্যাষ্টেলো জার্ম্মাণ তেল-বোঝাই ট্রাকগুলোর উপরে পড়লো। ভীষণ শব্দ করে ট্রাকগুলোতে আগুন ধরে গেল। ট্রাকের পর ট্রাক পুড়ে ছাই হতে লাগলো। সংগে সংগে গ্যাষ্টেলোর হলো মৃত্যু। কিন্তু যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সে করে গেল তার জন্য সমস্ত পাইলটগণ আজও তাকে স্মরণ করছেন।

তার পর শোন আর একটি ছেলের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কথা! ছেলেটির নাম অল্লান সাব্বাটোব। বয়েস তেরোও হয়নি। এটুকু বয়েসেই দেশের জন্যে তার অসীম টান।

জার্ম্মাণরা তার দেশ আক্রমণ করেছে। অল্লান কিছু মাত্র দ্বিধা না করে লাল ফৌজের সাহায্যের জন্য যোগ দিলে।

এক দিন অল্লান এক গভীর বনে চুপটি করে শুয়ে আছে গাছের তলায়। এমনি করেই লুকিয়ে থেকে শত্রুদের সম্পর্কে গোপন খবর লাল ফৌজীদের কাছে পৌঁছে দিত। হঠাৎ সে চমকে উঠলো একখানা এরোপ্লেনের ভীষণ শব্দ শুনে। শব্দ শুনেই ধরে ফেললে ওটা জার্ম্মাণ এরোপ্লেন। উৎসুক সংকারে সে এরোপ্লেনখানার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। সে লক্ষ্য করলো, কিছু দূর গিয়েই চারটে ছোট কালো বাণ্ডিলের মত কি যেন সেই এরোপ্লেন থেকে ফেলে দেওয়া হলো। সেই বাণ্ডিলগুলো ক্রমেই বড়ো দেখাচ্ছে এবং দ্রুতবেগে মাটির দিকে নেবে আসছে। এর পর আরও কালো বাণ্ডিল ফেলা হলো। অল্লান গুণলো সব শুদ্ধ তেরোটা। সে বুঝতে পারলো, এরা জার্ম্মাণ প্যারাশুট সৈন্য। সে কিন্তু দৌড়ে পালালো না। লক্ষ্য করতে লাগলো আর ক'টা নাবে এবং কোথায় তারা নাবে। সে ক্রমশঃ এগুতে লাগলো। মোট আঠার জন জার্ম্মাণ সৈন্য নেবেছে

সে দেখতে পেলো এবং প্রত্যেকের কাছে একটি করে ছোট্ট কালো রাইফেল। অম্লান দেখতে পেলো, জার্মাণ সৈন্তরা এক পর্বতের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

এবার অম্লান দৌড়তে লাগলো, লাল ফৌজকে খবরটা দেওয়ার জন্ত। ভীষণ ঘন বন; তার মধ্য দিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। হাত-পা ও মুখ ছিঁড়ে যাচ্ছে নানান কাঁটা গাছের আঁচড়ে। তবু সে দৌড়চ্ছে। খবরটা লাল ফৌজের কাছে পৌঁছতেই হবে। দৌড়তে দৌড়তে মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে দেখছে জার্মাণরা তাকে তাড়া করছে কি না। দূর থেকে এক দল রাশিয়ান সশস্ত্র গরিলা বাহিনীকে দেখতে পেল। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে তাদের জার্মাণ প্যারাস্যুট সৈন্তদের সম্বন্ধে সব কথা বললে। ঐ গরিলা বাহিনীর নেতা বেলোবরোডভ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অম্লানকে জিজ্ঞেস করলে, যেখানে জার্মাণ সৈন্তেরা আশ্রয় নিয়েছে, নিয়ে সেখানে যেতে পারবে কি না? অম্লান বললে,—পাহাড়ের এমন কোনও পথ নেই যেটা আমি জানি না। এই বলে সে গরিলা সৈন্তদের নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। তেরো বৎসরের অম্লান পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো গরিলা সৈন্যদের। পাহাড় বেয়ে অনেকটাই উঠতে হয়েছিল। আশ্রয়-স্থানের কাছে পৌঁছে তারা শুনতে পেলো, জার্মাণ সৈন্তরা কথা বলছে। গরিলা সৈন্তরা 'হুররে' 'হুররে' শব্দ করতে করতে জার্মাণদের আক্রমণ করলো এবং তাদের আত্মসমর্পণ দাবী করলো। টের পেয়ে জার্মাণরা প্রথম প্রথম গুলী চালাতে লাগলো, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ছয় জন মরে গেল। আস্তে আস্তে অন্যান্তরা বাধ্য হলো আত্মসমর্পণ করতে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অম্লান পুনরায় চলে গেলো তার নিজের কাজে।

ছবির কথা

প্রভাত বসু

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ গুহায় বাস করত। আমাদের মত সভ্যতা তাদের ছিল না বটে, কিন্তু সুন্দর জিনিষকে তারাও ভালবাসতে জানত। পাথরের গায়ে রং দিয়ে পশু-পাখীর ছবি এঁকে তারা আনন্দ পেত। তার পর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশে শিল্পের নানা ধারা ফুটে উঠল। এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, মেক্সিকো, ভারতবর্ষ, গ্রীসে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারু ও কারু-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হতে লাগল মহেঞ্জোদারো-হরপ্পায় ভারতের প্রাচীনতম শিল্প-প্রচেষ্টার আভাষ পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস নিয়ে আমরা জগৎ-সভায় গর্ব করতে পারি। বৌদ্ধযুগ, গুপ্তযুগ, মধ্য-যুগ বিচিত্র শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ। রাজপুত-ধারা, কাংড়া-রীতি, মুঘল শিল্পাদর্শ, হিন্দু ও জৈনদের মন্দির-গঠনের কৌশল, অপূর্ব স্থাপত্য-ভাস্কর্য—সব জড়িয়ে আমাদের সৃষ্টিকে অতুলনীয় বলা চলে। আজ শুধু তোমাদের বাঙালীর শিল্প-সাধনার কথা শোনাব।

মাটির দেয়ালে রং-বেরং-এর আল্পনা কেটে বা ছবি এঁকে পল্লী-বাসীরা ঘরকে সুন্দর করে তোলে—তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। কোনো-কোনোটি সত্যিই উঁচু দরের শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। মাটির পাত্রের ওপর ছবি আঁকার রেওয়াজও আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পটুয়ার আদর কমে গিয়েছিল। এমন কি, 'তাজমহল'প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুঘল-শিল্পকেও শিক্ষিত বাঙালী উপহাস করতে শুরু করেছিল। ভারতীয় শিল্পের এমন অবনতি এর আগে আর ঘটেনি। রবি বর্মা বিলিতি ছবির অনুকরণ করে দেশবাসীর মনকে য়ুরোপীয় শিল্পের প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছিলেন। শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছবি আঁকেন। তার পর হ্যাভেল সাহেব কলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। খাঁটি ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তাঁরই প্রেরণায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে পুরানো আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনলেন তা নয়, তাঁর চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলার এক নতুন যুগ প্রবর্তিত হল। অবনীন্দ্র-নাথের শিষ্য প্রশিষ্য আজও ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পি-গোষ্ঠীরূপে পরিগণিত। ৺সুরেন গাঙ্গুলি, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রভৃতি আরো অনেকে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এঁদের সঙ্গে ৺সারদা উকীল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যামিনী রায়-প্রমুখ শিল্পীদেরও নাম করা যেতে পারে। যাঁরা বিলিতি ঢং-এ ছবি আঁকেন তাঁদের মধ্যে যামিনী গাঙ্গুলি, অতুল বসু, সতীশ সিংহ, হেমেন মজুমদার, রমেন চক্রবর্তী এবং অন্যান্য আর্টিষ্টরা শীর্ষস্থানীয়। ব্যঙ্গচিত্র, রেখাচিত্র, বিজ্ঞাপনী, মৃৎ-শিল্প—নানা বিভাগে আরো কত শিল্পী সিদ্ধিলাভ করেছেন।

কলকাতা ভারতীয় চিত্রশিল্প-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র। এই শহর এ যুগের প্রায় সব বড় বড় বাঙালী শিল্পীরই সাধন-তীর্থ। তাই কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন—

"একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরী আলে,
পঞ্চপ্রদীপ—অবনী, গগন, অসিত, মুকুল, নন্দলালে।"

তোমরা বড় হয়ে এই ভারতীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য আরো ভাল করে বুঝতে পারবে। প্রাচীন কালের অজন্তা, ইলোরা, কোণার্কের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছে এই সুন্দরের পূজা। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হোক্!

ছুটির দিনে

শ্রীশান্তি পাল

চল্ ভাই ছুটে চল্ বাগানেতে যাই রে,
জামরুল-টামরুল পেট ভ'রে খাই রে।
বই-টই তুলে রাখ্, লেখা-পড়া থাক্ গে,
ইস্কুল ছুটি আজ, পোড়োদের ডাক্ গে।
দিন-রাত ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান ভাল না,
ছুটোছুটি করা চাই—দেহটারে চাল্ না।
আলসেমি ছাড় সব—ভাঙবে যে স্বাস্থ্য,
চটপট চ'লে আয় যেতে যদি চাস্ তো!
ওই শোন্ মেঘ ডাকে কড়্‌কড়্ শব্দে,
বিদ্যুৎ চম্‌কায় প'ড়ে যাবো জব্দে।
ওই যে যাঃ—ঝম্‌ঝম্ জল এসে পড়লো,
টুপ্‌টাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্ ফল সব ঝরলো!
আয় ভাই ছুটে যাই ভয় আর সয় না,
আমি শুধু ডেকে মরি—কেউ কথা কয় না!

পাখীস্থানের কথা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনেক কবি পাখীদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখে গিয়েছেন, তোমরা সেগুলো পড়েছ এবং হয়ত সেগুলো তোমাদের ভালোও লেগেছে। কিন্তু এই পাখীস্থানের সব খুঁটি-নাটি খবর তোমরা জান কি? এই পাখীস্থানের কয়েকটি কথাই আজ তোমাদের বলতে বসেছি।

পাখীদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট পাখীর নাম হচ্ছে 'হামিং বার্ড'। এরা ভোমরার চেয়ে বেশী বড় হয় না। লাল রঙ এরা খুব পছন্দ করে। কোথাও লাল রঙ দেখতে পেলেই এরা এদের সরু লম্বা ঠোঁট দিয়ে সেই লাল জিনিষটা ঠোকরাতে সুরু করে।

দৌড়ের পাল্লায় Duck Hawk প্রথম হয়েছে। এরা ঘণ্টায় ১৮০ মাইল বেগে ওড়ে। তার পরেই বেশী জোরে উড়তে পারে স্বর্ণ ঈগল। এদের গতি কত জান কি? ঘণ্টায় একশো কুড়ি মাইল।

কণ্ডর পাখী অন্য সব পাখীদের চেয়ে বেশী উঁচুতে উঠতে পারে। এ পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাতে জানা যায় যে, তারা আকাশে পাঁচ মাইল উঁচুতে উঠতে পারে।

পাখীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাখী হচ্ছে অষ্ট্রীচ বা উট পাখী। যদিও এরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাখী কিন্তু এরা উড়তে পারে না মোটেই। পেঙ্গুইনও পাখী জাতেরই অন্তর্গত। এরাও উড়তে পারে না। দক্ষিণ-মেরুর বাসিন্দা এরা, গোলমাল এরা মোটেই পছন্দ করে না। গোলমাল শুনলেই এরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাই এক আইন করে এরা যেখানে থাকে তার কাছ দিয়ে যে সব জাহাজ যায় সেগুলোর হুইসল দেওয়া মানা করে দেওয়া হয়েছে। এরা খেলাধুলা খুব পছন্দ করে। মেরু প্রদেশের বড় বড় বরফের চাঙড় প্রায়ই স্রোতে ভেসে যায়। পেঙ্গুইনরা সেই সব চাঙড়ের উপর চড়ে ভাসতে খুব ভালোবাসে। এক একটা বরফের চাঙড়ের উপর বসে এরা অনেক দূর ভেসে যায়। তার পর সাঁতার দিয়ে এরা আবার ফিরে আসে নিজেদের বাসায়। পেঙ্গুইনরা রঙীন জিনিষও পছন্দ করে খুব। একবার মিঃ লেভিক কতকগুলো রঙীন পাথর পেঙ্গুইনদের বাসার কাছে রেখে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরগুলো পেঙ্গুইনদের সব বাসায় ছড়িয়ে পড়ল। শুধু তাই-ই নয়। একটি পাখী আরেক পাখীর বাসা থেকে রঙীন পাথরগুলো চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল নিজেদের বাসায়।

পায়রা বার্ত্তাবহের কাজে খুব পারদর্শী। এদের পায়ে চিঠি বেঁধে দেওয়া হয়। এরা সেই চিঠি নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়। যুদ্ধের সময় তাই এদের প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল খুব।

এমন অনেক পাখী আছে যারা সাইবেরিয়ার অধিবাসী। কিন্তু শীতকালে যখন বরফ পড়তে সুরু করে তখন সেখানে কোন প্রাণীর পক্ষে বাস করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এরা তাই তখন হাজার হাজার মাইল উড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, এরা কি করে এত অল্প সময়ে এত মাইল উড়ে যেতে পারে।

পানকৌড়ী উভচর পাখীদের অন্তর্গত। এরা জলেও ভাসতে পারে, আবার আকাশেও উড়তে পারে। অদ্ভুত নয় কি?

গল্প নয় সত্যি!

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু

...তিনি নব্বুই-এর কোঠায়। কিন্তু হলে কী হয়! এত বয়সেও চোখে-মুখে তাঁর আশ্চর্য্য দীপ্তি। তাঁর কথাগুলোও সর্ব্বদা সতেজ। পৃথিবীর কাউকে তিনি পরোয়া করেন না। শরীররক্ষার্থে এ বয়সেও তিনি নিয়মিত বুক-ডন্ দিয়ে থাকেন। এই মানুষ হঠাৎ এক দিন ঠিক করলেন, দিন কয়েক বাইরের কারো সাথে দেখা করবেন না। রাস্তার দিকের জানলা-দরজা বন্ধ করে কাজেই রইলেন তিনি ভেতরে।

এদিকে এক জন আমেরিকান যুবকের বাসনা হয়েছে তাঁকে দেখার,—তাঁর সঙ্গে কথা বলার। মনে তার সংশয় জাগছে—কী করে তাঁকে দেখে? দু-এক দিনের মধ্যেই যুবকটি আমেরিকা রওনা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই এ যাত্রা তাঁকে না দেখলেই নয়। কিন্তু...অনেক ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলে না সে। বেপরোয়া হয়ে সে এক দিন জানলার কাচের সার্সী ভেঙেই ঢুকে পড়ল। ঢুকেই সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। কী আছে কপালে এখন কে জানে? নব্বুই বছরের বুড়ো শব্দ শুনে দৌড়ে এলেন। এসে শুধালেন যুবককে ব্যাপার-খানা। ভয়ে ভয়ে যুবক সব জানালো। তিনি যুবকের পিঠ চাপড়ে বললেন,—'বা, বেশ করেছ, সাবাস্!' যুবকের সাথে তিনি গল্প জুড়ে দিলেন।

এই মজার মানুষটি কে জান? ইনি হচ্ছেন জগদ্বরেণ্য জর্জ বার্ণাড শ।

মাসীমা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু

—'মামা' এবং 'মা'য়ের নামেতে কবিতা র'য়েছে মেলা,
'মাসীমা'র নামে কবিতা লিখতে ক'রেছে সবাই হেলা;
—সেই তরে আমি আজ,
মাসীমা'র নামে লিখছি কবিতা, ফেলে রেখে সব কাজ।
পর-পর দু'টি 'মা' থাক্‌লেই 'মাসীমা' যে হয় নাকো,
একটি 'মা'-তে মাসীমাকে যদি পাও,—তা, ডেকেই ত্যাখো!
—তাই 'মাসীমা'র জন্ম
'মামা' নয়, তবু 'মা'-ও নয় সে যে,—তবু দেখে জাগে ভয়!
—ঘরে ও বাইরে আদুরে ছেলেরা আশ্রয় না-ও পেলে,—
নির্ভয়ে তারা কার ঘরে গিয়ে, খায়, দায়, হাসে, খেলে—
বাবা না রাগতে পারে,
'মা'র কাছে বাবা কড়া হতে পারে, কেঁচো 'মাসীমা'র দ্বারে!
প্রবাসে যখন দৈবের বশে, কেউ না দেখে, বা শুনে,—
উনুন ধরাতে হাতটি পোড়াই, মেশাই তেলে ও নুনে;
—সে-সময়ে কে বা আসি,
গুছান সকলি,—জানেন কি তাঁরে?—'পাশের বাড়ীর মাসী!'
'বরের ঘরেতে পিসী' তো বটেই,—'কনের ঘরেতে মাসী'—
—দেখাটি হলেই, আর কিছু নয়, শুধু একগালি হাসি;
—সেই 'হাসি'টুকু দিয়ে,
যাঁরে পাই, তাঁরে জানাই প্রণাম, গুণ তাঁর গাই গেয়ে।

এ্যাটমের বিচিত্র কথা

[মৌলিক আর যৌগিক]

এ, সি, সরকার

এ্যাটম কা'কে বলে জানো ?—সেই এ্যাটম, যা'র বাহন আজ কাঁপিয়ে তু'লছে গোটা দুনিয়াটাকে। 'এ্যাটম-বোমা'র কথা তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ :—কি মারাত্মক অস্ত্র রে বাবা ! যেখানে কাটে তা'র ত্রিসীমানায় জীবন্ত প্রাণী এমন কি কোন কিছুরই অস্তিত্ব বজায় থাকে না —সবই নিঃশেষ হ'য়ে যায় তা'র প্রলয় তাণ্ডবের ফলে। যা'র এমন শক্তি তা'র দেহ না' যেন কত বিরাট হ'বে !—শক্তির অনুপাতে যদি তুমি তা'র দেহের আয়তনের পরিমাপ ক'রতে যাও তবেই হ'বে ভুল। কারণ, এ্যাটমের দেহ যে কতটুকুন হ'তে পারে তা'র আঁচ তোমরা ক'রে উঠতে কিছুতেই পারবে না। কারণ, এ হ'চ্ছে 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র'। এত ক্ষুদ্র যে শুধু চোখে তো নয়ই এমন কি বড় বড় শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব হয়নি একে। তবে এর সমষ্টি-বদ্ধ রূপ তোমরা সকলেই দেখেছ।

কোনও একটা মৌলিক পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ ক'রে ক'রে যদি এমন 'ক্ষুদ্র টুকরো' ক'রে ফেলা সম্ভব হয়, যা'তে ক'রে ঐ 'ক্ষুদ্র টুকরো'-গুলোকে আর ভাগ করা কোন মতেই সম্ভব নয়, তবে ঐ 'ক্ষুদ্র টুকরো'গুলোর নামই হ'বে এ্যাটম। কিন্তু মৌলিক পদার্থ আবার কি ?

আমার ভাইপো প্রথম প্রথম এ, বি, সি, ডি শিখেই বড় বড় ইংরেজী বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যেত কেমন ক'রে জানো ? শোন তা'র পড়ার নমুনা। "ও-এন-ই—ডি-এ-ওয়াই"—তার ধারণা সে পড়ছে ঠিকই, তোমরাই বল তো তা'র পাঠ নির্ভুল কি না ? আপাতত ভুল মনে হ'লেও সে যা পড়ছে তা'র এক বর্ণও ভুল নয়। তবে-হাঁ, সে অক্ষরগুলোকে ভাগ ভাগ করে উচ্চারণ ক'রেছে। তোমাদের হাতে যদি বইটা দিয়ে পড়তে বলতুম, তবে তোমরা অক্ষর-গুলোকে পৃথক পৃথক উচ্চারণ না ক'রে বরং কথাগুলোকে উচ্চারণ ক'রতে,—এই তো ?

আচ্ছা, তোমরা একটু চিন্তা ক'রে বল তো আমার ঐ বইটার মধ্যে মোটমাট কি কি আছে ?—থাকার মধ্যে আছে 'এ' (A) থেকে 'জেড' (Z) পর্য্যন্ত ছাব্বিশ রকমের অক্ষর। ঐ ছাব্বিশ রকমের অক্ষর থেকেই বেছে বেছে দু'চারটি ক'রে যোগ ক'রেই তৈরী করা হয়েছে এক একটি কথা। যেমন ধরো, ও-এন-ই এই তিনটা অক্ষর একত্র যোগ ক'রে হয়েছে 'ওয়ান' কথাটা। কাজেই কথাগুলোকে অক্ষরের যোগফলও তো আমরা ব'লতে পারি ! কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভাষা সাধারণ লোকের ভাষার চেয়ে একটু ভিন্ন ধরণের। যে সব জিনিষকে এমনি ধারা অন্যান্য ভিন্ন জিনিষ একত্র যোগ ক'রে তৈরি করা হয়, সেগুলোকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'যৌগিক পদার্থ'। যে সব জিনিষ একত্র যোগ করা হয়, সেগুলোকে তাঁরা বলেন 'মৌলিক পদার্থ'। কতকগুলো অক্ষর যোগ ক'রেই তো পাওয়া যায় এক একটা কথা, কাজেই অক্ষরকে আমরা ধরে নিতে পারি মৌলিক ব'লে। তাহ'লে তো বুঝতেই পাচ্ছ, বই খুলে ধরে তা'র মধ্যে নানা রকমের কথা দেখা গেলেও তা'র মূলে রয়েছে মাত্র ছাব্বিশটা মৌলিক অক্ষর। তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বলে এমনি ধারা অক্ষর আর কথা দিয়ে মৌলিক আর যৌগিক পদার্থের পরিচয় দিলেও আসলে অক্ষর আর কথাকে বিজ্ঞানীদের মতে মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ বলা হয় না। তাঁরা এই বিশাল জগৎটাকেই একটা বড় বই বলে ধরে নিয়েছেন আর এই বিরাট বইয়ের কথাগুলো (বিভিন্ন পদার্থ) যে সব অক্ষর দিয়ে গড়ে উঠেছে সেগুলোকেই তাঁরা বলেন মৌলিক।

যেমন ধারা একটা বই খুলে ধ'রলে তা'র মধ্যে নানা রকমের নানা আকারের অসংখ্য কথা বা শব্দ দেখতে পাওয়া যায় : ঠিক তেমনি জগতের চার দিকে দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার রকমের পদার্থ। কিন্তু ভাল করে ভেঙ্গে-চুরে দেখলে দেখা যাবে যে, বইয়ের অক্ষরের মতনই কতকগুলো সামান্য সংখ্যক মৌলিক পদার্থ থেকেই তারা গড়ে উঠেছে।

প্রত্যেক জিনিষকে ভেঙ্গে ফেলে তার মূলের জিনিষটি কি—এই বিষয় লক্ষ্য করা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের নেশা। তাঁরা দেখতে চান প্রত্যেক পদার্থেরই সরল রূপ। কোনও এক বিখ্যাত ইংরেজ বলেছেন, "সরলতা সম্পাদনই বিজ্ঞানের কাজ"। আমাদের চার পাশে আমরা দেখি কত কি জিনিষ। এই সব জিনিষের মূলের উপাদানটি যে কি, সেই বিষয় নিয়ে স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে এসেছে নানা রকমের গবেষণা। আমাদের বিখ্যাত আর্য্য ঋষিগণ মনে করতেন যে, জগতের মূল উপাদান হচ্ছে পাঁচটি : যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আরও অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়ে ঐ তথ্যকে বাতিল ক'রে দিয়েছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মোটমাট বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থ দিয়ে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিষ তৈরী। এই সব মৌলিক পদার্থগুলো যে একবারে আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা ঐ সমস্ত মৌলিক পদার্থের কথা আবিষ্কার ক'রেছেন। বিখ্যাত রুশ-বিজ্ঞানী মেনডেলিফ ১৮৬৯ সালে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে পর-পর সাজিয়ে একটা তালিকা তৈরী ক'রলেন। ঐ তালিকার নাম পিরিয়ডিক টেবল। ঐ তালিকাতে মোটমাট বিরানব্বইটা মৌলিকের গুণ আর পরিচয় আছে।

মৌলিক আর যৌগিক পদার্থের কথা তো তোমরা শুনলে। এইবার তোমাদের বলত জল যৌগিক না মৌলিক। যে জিনিষকে ভেঙ্গে তার ভেতর থেকে ঐ বিশেষ জিনিষ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তাকেই তো বলা হবে মৌলিক ? কোন জিনিষ মৌলিক কি যৌগিক তা দেখতে হ'লে প্রথমেই সেই জিনিষকে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে ? ছাত থেকে ফেলে দিয়ে ? না না, তা নয়। কতকগুলো বৈজ্ঞানিক কায়দা আছে এই সমস্ত ভাঙা-গড়া কাজের জন্য। আমি ব'লছিলুম জলের কথা। নয় কি ?

জলকে ভাঙা হয় বিদ্যুতের সাহায্যে। এই ভাবে বিদ্যুতের সাহায্যে ভাঙাকে ইংরেজিতে বলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস। কি হয় কি জানো ? একটা কাচের বাসনে জল নিয়ে তাতে দে'য়া হয় কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড ঢেলে। এইবার দু'টো ধাতুর টুকরোর সাথে বিদ্যুতের দু'টো তার জুড়ে দিয়ে তার পরে ঐ ধাতুর টুকরো দু'টোকে ডুবিয়ে দে'য়া হয় ঐ পাত্রে। এইবার শুরু হয় জল ভাঙার কাজ। ধাতুর টুকরো দু'টোর গা ঘেঁসে বুদ্‌বুদ উঠতে থাকে। ঐ বুদ্‌বুদ কিসের জানো ?—ওগুলো হ'চ্ছে দু'রকমের বাতাসের। ওদের একটির নাম হাইড্রোজেন আর একটির নাম অক্সিজেন। তবে তো বোঝাই যাচ্ছে, জল মৌলিক পদার্থ নয়। কারণ, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এই দুই জাতের গ্যাস মিলে তৈরী হয় জল।

চার্লস্ ডিকেন্স

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দারিদ্র্যের কশাঘাতে এবং চরমতম দুঃখ ও দৈন্যের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগতে যে স্মরণীয় প্রতিভার বিকাশ হয়েছিলো, তার দানে আজ ইংরাজী সাহিত্য বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। তাঁর নাম আজ ইংরাজী সাহিত্যে, তথা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌরবের সংগে স্মরণীয়।

প্রথম জীবনে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের যে সত্য রূপের ছবি দেখেছিলেন, তা তাঁর প্রত্যেকটি সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গভীর বেদনার তুলিকায় আঁকা আছে। তাঁর সেই জীবনের সত্য কাহিনীর গভীর বেদনাময় ছবি প্রত্যেক পাঠকের অন্তরে বেদনা ও দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস সৃষ্টি করে।…

নিছক কবি-কল্পনা নয়, অবাস্তব রোমান্স নয়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের সত্যিকারের জীবনের সুখ-দুঃখময় কাহিনী,—যার মধ্যে সে যুগের ইংলণ্ড, সে যুগের অধিবাসীদের বেদনা, ব্যর্থতা, আশা ও নিরাশার পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়।

তিনি ছিলেন জীবন শিল্পী। তাই নিত্যজীবনের সত্য ছবিই তিনি সাহিত্যের অমৃতের তুলিকায় এঁকে গেছেন। কে সেই অবিনশ্বর জীবন-শিল্পী? কে সে প্রতিভাধর স্রষ্টা? জান তাঁকে? জান তাঁর নাম?

তাঁর নাম চার্লস্ ডিকেন্স। ১৮১২ সালে পোর্টস্ মাউথে এই স্মরণীয় সাহিত্য স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করেন। চার্লস্ ডিকেন্সের পিতার নাম ছিল জন ডিকেন্স।

সাংসারিক অবস্থা কোন দিনই তাঁর ভাল ছিল না। অভাব ও দারিদ্র্য ডিকেন্স-পরিবারকে সর্ব্ব সময়ই আচ্ছন্ন করে রাখত। সংসারের দারিদ্র্য ও দুঃখ শিশু ডিকেন্সের মনের উপর গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিলো। তিনি সব সময়েই এই দুঃখের কথাই চিন্তা করতেন… দুঃখ ও বেদনা ছাড়া শিশুকাল থেকে ডিকেন্স অন্ত কিছুই স্পর্শ অনুভব করেননি।

ডিকেন্স ছিলেন ভাল গল্প-বলিয়ে। স্কুলের মাঠে সহপাঠীদের কাছে তিনি সুন্দর ভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে এবং সরস করে কত রকম গল্প বলতেন। তাঁর সহপাঠীরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে ডিকেন্সের গল্প বলার ভঙ্গিমা ও নৈপুণ্যের প্রশংসা করত। উত্তরকালে ডিকেন্সের এই গল্প বলার শক্তিই তাঁকে শক্তিমান্ ও দরদী লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

সংসারের অবস্থা অত্যন্ত হীন, কোন মতে দিন চলে মাত্র। ডিকেন্সের বয়স তখন দশ বৎসর, সেই সময় তাঁর পিতা জন ডিকেন্স দেনার দায়ে জেলে যান। দশ বছরের বালক ডিকেন্সকে বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করে একটা ডিসপেন্সারীতে শিশি-বোতল ধোবার কাজ করতে হয়। কেন না, তা না হলে তারা খেতে পাবে না, সংসারে আর কোন উপায় নেই।

এই ভাবে কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর Dickens "Old Monthly Magazine"এ Reporter এর কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর গল্প বলার শক্তি এই সময় লেখার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম গল্প "A Dinner at Poppler Walk" এই কাগজে প্রকাশিত হয়। ডিকেন্সের বয়স তখন ২৩ বছর।… তার পর এই কাগজে "Pickwick Papers Ske' chs by Boz" এই নামে তিনি ধারাবাহিক ভাবে নানা ঘটনার চিত্র পাঠকদের উপহার দিতে থাকেন। ডিকেন্সের রচনার প্রাঞ্জল নৈপুণ্যে এবং বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে এবং সর্ব্বোপরি গভীর সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাঁর রচনা সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকদের চিত্তাকর্ষণ করে।

দরদী লেখক হিসাবে ডিকেন্সের নাম চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গভীরতর আবেগে ডিকেন্সের কলম চলে, হৃদয় হয়ে উঠে উন্মুক্ত এবং প্রসারিত। নির্যাতিত, ব্যর্থ ও সর্ব্বহারা জীবনের ছবি তাঁর লেখনীর তুলিকায় অশ্রু-সজল হয়ে উঠে। "David Copperfield" "A Tale of Two Cities," "Aliver Twist," "Bleak House" প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপন্যাসে এবং গল্পে জীবনের ছবি বহু বিস্তৃত এবং প্রসারিত হয়ে উঠে। গভীরতর সমবেদনা, আবেগ-দরদের তুলিকায় ডিকেন্সের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসাবে জীবনের সত্যিকারের রূপকার হিসাবে ডিকেন্স স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠেন। ইংরাজী সাহিত্য-জগতে ডিকেন্স অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই দরদী কথাশিল্পী মারা যান। চার্লস ডিকেন্সের মত দরদী ও মরমী কথা-শিল্পী আজও পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য-জগতে দেখা যায়নি।

হাসাহাসির গল্প

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

পাড়াতক সে এক হাসাহাসির ব্যাপার—বাস্তবিকই হাঁসা ও হাঁসীর ব্যাপার! অর্থাৎ পাড়াশুদ্ধ সব বাড়িতে হাঁস কিনিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন করিবার সহজতম পন্থা? না, ঠিক তা-ও নয়।

আনুরাই প্রথম। ওরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে আসিবার সময়ই এক জোড়া হাঁসী ও একটা হাঁসা আনিয়াছিল। নূতন পাড়া। ভিতরে বাহিরে পুষ্করিণী—হাঁস পালিতে অসুবিধা নাই। সকালে ভাত খাইয়া হাঁস বাহির হইয়া যায়। দুপুরে একবার খাওয়া-দাওয়ার পর পাতের এঁটো ভাত খাইয়া যায়। সন্ধ্যায় আবার ফিরিয়া আসিয়া নিজ ঘরে নিজেরাই ঢোকে। দেরী হইলে আনু পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া ডাকে—"আয় চৈ চৈ চৈ চৈ চৈ!" হেলিতে দুলিতে হাঁসগুলি আসিয়া হাজির হয়।

আনুদের দেখাদেখি পুতুলরাও এক জোড়া হাঁসী কিনিল। প্রথম ক'দিন লম্বা দড়ি দিয়া ঘাটে বাঁধিয়া রাখিল। দু'দিনেই পোষ মানিয়া গেল—সন্ধ্যায় দিব্যি নিজেরাই ঘরে ফিরে।

এবার অশোক আর সুমিত্রা বাবাকে ধরিয়া পড়িল—হাঁস কিনতেই হইবে। বিভাস বাবু ক'দিন ফাঁকি দিয়া এড়াইলেন। কিন্তু এক দিন দুপুরে একটা লোক এক জোড়া হাঁসা বাসায় বেচিতে নিয়া আসিল। মায়ের কাছ হইতে টাকা নিয়া অশোক সুমিত্রা হাঁস কিনিল। সে কী উৎসাহ! দশ মিনিট অন্তর অন্তর মুঠি ভরিয়া চাল নিয়া অশোক আর সুমিত্রা হাঁসকে খাওয়াইতে লাগিল।

বিভাস বাবু বাসায় ফিরিয়া সব শুনিলেন। বাড়ীতে মাংস খাওয়া হয় না—ডিম খাওয়া হয়, তাই বিভাস বাবু ভাবিয়া দেখিলেন, শুধু হাঁসা কিনিয়া লাভ নাই। ঠিক করিলেন, হাঁসীও চাই।

বিভাস বাবু হাঁসী চিনেন না, কাজেই সুধীর বাবুকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন। সুধীর বাবু বুঝাইয়া দিলেন, হাঁসীর ডাক তীক্ষ্ণ—প্যাঁক—প্যাঁক—দীর্ঘ ও কর্কশ। হাঁসার ডাক ভাঙা-ভাঙা, দুখ ও মোলায়েম। পেট টিপিয়া ডাকাইয়া এক-জোড়া হাঁসী কেনা হইল।

এর পর কিনিল মঞ্জুরা। তার পর শঙ্কর-মোনাদের বাসায়। সকলের শেষ কিনিল, অপর্ণা-বীণা ওরা। পুকুর ভরিয়া আর উঠান ভরিয়া শুধু হাঁসা আর হাঁসী।

হাঁসাহাসি, উত্তেজিত আলোচনা—চীৎকারও বটে। পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে সারা দিন ওই পুকুর-ধারে। ওই কালো-মাথা গুণ্ডা হাঁসাটা অপর্ণাদের, আর ওই হাঁসীটা অশোক ও সুমিত্রার। নাঃ, ওটা তো মঞ্জুদের—অশোকদেরটার পেছনে লেজের পাশে নীল পালক নাই বুঝি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু হাসাহাসির আর রহিল না। মঞ্জুর দাদা ওদের দুই হাঁসার নামকরণ করিয়াছে—"সুভাষ-গান্ধী"—ব্যাকরণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া। সুভাষ না কি সাঁতার কাটে ঘাড় সিধা করিয়া, আর গান্ধী ঘাড় নীচু করিয়া।

অশোক সুমিত্রাই বা তাহা মানিবে কেন? তাহারাও দাদাকে ধরিল। দাদা সদ্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। ছাত্র-কংগ্রেসের এক জন ক্ষুদে নেতা বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী দলের কোন এক শাখার এক জন দুর্দান্ত সভ্য। রাশিয়া আর সোস্তালিজম তাহার মগজে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। সে দুই হাঁসার নামকরণ করিল "ষ্টালিন-লেনিন"—ব্যাকরণ এবার ঠিক রহিল।

এর পর নামকরণের একটা competition চলিল। কেহ নাম রাখিল "হিট্লার-মুসোলিনী", কেহ লজভক্তি-টিমোসেঙ্কো; অপর্ণার বাবা বড় সরকারী চাকুরে, সুতরাং সে-বাড়ীর হাঁসের নামকরণ হইল "চার্চ্চিল-রুজভেল্ট।"

কিন্তু এই নামকরণ লইয়াই লাগিয়া গেল। মঞ্জু বলিল, সুভাষ-গান্ধীর চেয়ে বড় কেউ নাই। শঙ্কর বলিল, হিটলার-মুসোলিনী পৃথিবী কাঁপাইয়া দিয়াছে। অপর্ণা বলিল, ইংরেজ এবং আমেরিকার কাছে চালাকী খাটে না, সব পিটাইয়া ঠিট করিয়া দিয়াছে। অশোক সুমিত্রা দাদার কাছে জানিয়া আসিয়া বলিল, রাশিয়াই পৃথিবী জয় করিবে। প্রথমে তর্ক, কথা-কাটাকাটি শেষে পাকিস্তানী পদ্ধতিতে "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।" অর্থাৎ অশোক ধাক্কা মারিয়া মঞ্জুর ভাই কালুকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। কালু উঠিয়া ঢিল মারিয়া অশোকের কপাল ফুটা করিয়া দিল। বিষম ব্যাপার।

ছোটদের মায়েরা যুদ্ধে নামিলেন, শেষে বাপেরাও বাদ রহিলেন না। ছোটদের general knowledge এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের কদর কেহ বুঝিল না। হুকুম হইয়া গেল ছোটদের উপর "পরের বাড়ীর অসভ্য ছেলে-পিলের সঙ্গে মেশা নিষেধ।"

পুকুর-পাড়ে ছোটদের আড্ডা ভাঙিয়া গেল। হাসাহাসি হৈ-হল্লা আর শোনা যায় না। পাড়াটা অস্বাভাবিক রকম "ভদ্র" হইয়া গেল।

তবে ইহার মধ্যেই গোপন নীরব যুদ্ধ চলিতে থাকিল। "গেরিলা যুদ্ধ"র কথা ছোটরা জানে না মনে করিয়াছেন? মঞ্জু নিজেদের জানালাতে দাঁড়াইয়া সুমিত্রাকে মুখ ভেংচাইয়া দিল। সুমিত্রা বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাঁচকলা দেখাইয়া শোধ তুলিল। মোনা মিত্রার বন্ধু। সে মঞ্জুকে দেখিয়া চিবুকে দ্রুত তিন বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চালনা করিয়া বলিল, "আড়ি, আড়ি—জন্মের আড়ি।" কালু মোনাকে দূর হইতে লাথি দেখাইল। ভীষণ কাণ্ড!

কিন্তু দু'দিন পর অশোক-সুমিত্রার উত্তেজিত কলরবে বিভাস বাবুর ঘুম ভাঙিল। উঠানে আবার দৌড়াদৌড়ি, ফিস্‌ফিস্ কথা, কচি মুখের হাসাহাসি! ব্যাপারখানা কি!

দরজা খুলিয়া বিভাস বাবু দেখিলেন, উঠানে চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে। অশোক কালুর হাত ধরিয়া, মঞ্জু আর সুমিত্রা গলাগলি করিয়া, অপর্ণা, শঙ্কর, বীণা, আন্নু, মোনা সবাই গোল হইয়া হাঁসের কাঠের বাক্স ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সবাই ঘাড় নীচু করিয়া দেখিতেছে। বিভাস বাবুকে দেখিয়া অশোক ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সগর্ব্বে বলিল—"ভাখো বাবা।"

সত্যই আশ্চর্য্য ব্যাপার! অশোকের একটি হাঁসী ডিম পাড়িয়াছে। সাদা, লালচে সুন্দর ডিম। বিভাস বাবু খুসীই হইলেন। সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হাঁসীটাকে এখন তুলো না—ডিমে তা দিচ্ছে—দেখো, বাচ্চা হবে।" আন্নু সব চেয়ে অভিজ্ঞ, সে জানাইল, হাঁসের ডিমে মুরগীতে তা দেয়, তা থেকে বাচ্চা হয়। অশোকের আর তর সহিল না। সে হাত বাড়াইয়া ডিমটা তুলিল। কেমন গরম! সবাই হাতে হাতে ডিমটা নিয়া পরীক্ষা করিল। কালু বলিল, "আমায় ডিমটা দিবি? আমি তোকে লাল টিনের কৌটাটা দেব।" ওই লাল কৌটাটার উপরে অশোকের অনেক দিন যাবৎই লোভ। সে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ডিমটা কালুকে দিয়া বীণার দিকে চাহিয়া বলিল, "কাল আবার ডিম দেবে না রে?" বীণা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। অপর্ণা সুমিত্রার হাত ধরিয়া বলিল, "আজ আমাদের বাড়ী খেলতে যাবি না ভাই?" সুমিত্রা, মঞ্জু, মোনা, শঙ্কর সবাই রাজী হইল।

ছোটদের অশান্ত কলরবে পাড়ায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল।

এক মিনিটের গল্প

বিয়ের পোষাক

মনোজিৎ বসু

এলাহাবাদ শহর।

ভারতবর্ষের একজন নামজাদা লোকের মেয়ের বিয়ে। যশ, মান ও অর্থের দিক্ দিয়ে সারা ভারতে এই পরিবারের নাম। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে এই পরিবারের প্রত্যেকটি লোক কত যে ত্যাগ স্বীকার ক'রেছেন, তার ঠিক নেই। যে-মেয়েটির আজ বিয়ে, তার ঠাকুরদাদাও ছিলেন এক জন সুবিখ্যাত দেশ-নেতা। এলাহাবাদ শহরে তাঁর মতো ধনী আর ছিল না বললেই চলে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। এক মহল। দু' মহল। তিন মহল। বাগ-বাগিচা। গাড়ি-ঘুড়ি দাস-দাসী কত যে তার ঠিক নাই। সেই বাড়ির মেয়ের বিয়ে। কাজেই, চতুর্দিকেই আনন্দ-কলরব, লোক-জনের আনা-গোনা, খাওয়া-দাওয়া—মহা হুলুস্থুল কাণ্ড।

ষ্টেশন থেকে সোজা একখানা গাড়ি এসে থামলো বিয়ে-বাড়ির সামনে। সেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন ক'নের পিসিমা। বম্বে থেকে ভাইঝি'র বিয়ে দেখতে এসেছেন। ক'নে কোথায়? কোন্ ঘরে? পিসিমা ছুটলেন সবার আগে সেই ঘরের দিকে।

ওদিকে সঙ্গি-সাথীদের নিয়ে ক'নে একটা ঘরে ব'সে আছে। বিশেষ কথাবার্তা নেই সেখানে। কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। কিছু দিন আগে ক'নের মা মারা গেছেন। বিয়ের দিনে সেই মা'র কথাই বার বার মনে হচ্ছে। তাই, কোনো আনন্দোচ্ছ্বাস নেই। সঙ্গি-সাথীরাও তার মনের অবস্থা বুঝে তাকে যেন সান্ত্বনা দিতেই ঘিরে ব'সে আছে। দু'-একটা টুক্‌রো কথা শোনা যাচ্ছে বারান্দা থেকে।

পিসিমা ঘরে ঢুকেই অবাক্। ও মা, বিয়ের ক'নের এ কি সাজ! এত বড় পরিবারের মেয়ে, বিখ্যাত ধনী দেশ-নেতার নাতনী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতার একমাত্র মেয়ে—তার কপালে কি একখানা বেনারসী শাড়ীও জুটলো না। বাড়ির সকলের কাণ্ড-কারখানা কি! বলিহারি আক্কেল বাপু!

পিসিমার হাব-ভাব দেখে ও কথা শুনে ভাইঝি তখন মৃদু হেসে জবাব দিল—"বেনারসী শাড়ীর জন্তে আমার আফ্‌শোষ নেই পিসিমা। আজ আমার পরনে যে খদ্দরের শাড়ীখানা দেখছ, এই হ'লো বিয়ের সব চাইতে দামী যৌতুক। বাবা যখন জেলে ছিলেন, তখন নিজের হাতে রোজ যে সূতো কেটেছিলেন, তাই দিয়ে তৈরী হয়েছে আমার বিয়ের এই শাড়ী। এর দাম যে-কোনো দামী শাড়ীর চেয়ে অনেক গুণে বেশী।"

সত্যি তাই। মেয়ের কাছে বাপের হাতে-কাটা সূতো দিয়ে তৈরী শাড়ীর চেয়ে আর কি মূল্যবান্ পোষাক হ'তে পারে বলো?

এই বাপ্‌টি কে জানো? স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। আর মেয়েটির নাম—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তার পিসিমার নাম—শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতিসিং।

সোণা-রূপার গান

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সোণার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই
সোণার সকাল আসে।
সোণার বরণ বনের কোলে
সোণার ফুলটি হাসে।
সোণার হাসি ছড়িয়ে পড়ে
সোণার ভুবন ভরি।
সোণা গাঁয়ের কূলে ভেড়ে—
কার সে সোণার তরী!
খোকা বলে—ঘণ্টা বাজায় কে?—
মায়ের মুখের রূপ-কথাটি
সে কি শুনেছে?

রূপোর ঘণ্টা বাজায় যখন
রূপাই নিঝুম রাতে
হাসে উজল রূপালি চাঁদ
রূপার গগন-পাতে।
রূপার বরণ গাছে গাছে
রূপার ফলটি দোলে।
রূপোলি মুখ নেমে আসে
খুকুর আঁখির কোণে।
খুকু বলে—ঘণ্টা বাজায় কে?
মায়ের মুখের চাঁদের ছড়া
সে কি শুনেছে?

উত্তর

সেবাগ্রাম আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধী যখন একদা রৌদ্র সেবনে রত তখনই এই আলোক-চিত্রটি গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধীকে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পাওয়া না যাইলেও কম্বলাবৃত অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যাইতেছে এবং তিনি নেতাজী সুভাষ, রাজকুমারী অমৃত কাউর ও শঙ্কর রাও দেওএর সহিত সহাস্তে কথা বলিতেছেন।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'প্রবাসী' সময়োচিত তথ্য প্রকাশ করিতেছেন :—"বাংলা দেশে মধুবিন্দু পেঁপের চাষ প্রচলিত নাই; ইহার নামও হয়ত অনেকে শোনেন নাই। বাংলা দেশের মাটি ও জলবায়ুতে এই পেঁপের চাষ হইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যাঁহারা পরীক্ষা করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমে অল্প পরীক্ষা করাই ভাল। কাথিয়াবার পল্লী সংগঠন সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত মারতী হংসরাজ অনেক প্রকারের পেঁপের চাষের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মধুবিন্দু পেঁপেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; ইহা খাইতে খুবই মিষ্ট এবং ইহার গন্ধও খুব ভাল; ইহার আকারও খুব বড়, ফলনও খুব বেশী। ইহার চাষের খরচও খুব কম। মধুবিন্দু পেঁপের চারা আসল জমিতে রোপণ করিবার তিন মাস পরেই উহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে এবং ছয় মাসের মধ্যেই মাটির কিছু উপরেই ১ ফুট হইতে দেড় ফুটের মধ্যে গাছের গোড়া হইতে ডগা পর্য্যন্ত ফুলে ভরিয়া যায়। অন্যান্য জাতীয় পেঁপে অপেক্ষা মধুবিন্দু পেঁপে গাছে অধিক পরিমাণে ফুল হয় এবং ইহার গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে। এই পেঁপে গাছের পাতার আকার ও পরিমাণ সকল প্রকার পেঁপে গাছের পাতার আকার ও পরিমাণ অপেক্ষা বড় ও বেশী। এই পেঁপেতে শাঁসের পরিমাণ খুব বেশী এবং বীজের সংখ্যা খুবই কম; কিন্তু বীজগুলি আকারে বেশ বড়। ইহা ছাড়া আরও একটি প্রধান কথা এই যে, ইহার বীজ হইতে যে সকল চারা উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে পুরুষ-গাছের সংখ্যা খুবই কম; অন্যান্য জাতীয় পেঁপে গাছের বীজ হইতে শতকরা অন্ততঃ ৫০টি পুরুষ-গাছ জন্মায়। মধুবিন্দু পেঁপের চাষের প্রণালী এইরূপ—আলগা উর্ব্বরা মাটিই উহার পক্ষে উপযুক্ত; এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মায় না। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত চারা উৎপাদন করিবার প্রশস্ত সময়; আধ সের বীজের চারা তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে লাগান যায়; চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়; বীজতলার মাটির সঙ্গে পচা গোবর সার উত্তমরূপে মিশানো বিশেষ দরকার; এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যেক দিন বীজতলায় জল সেচন করিতে হইবে; ইহার পর এক দিন অন্তর জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হয়। ১৫ দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চারা বাহির হয়।

• • • • • •

'নবসঙ্ঘ' বলিতেছেন :—"একটা কথা বাঙ্গালী জাতিকে স্মরণ রাখিতে বলি—ব্যক্তিদের অলৌকিকতা প্রচারে আমরা যেন কিছু দিন নিরস্ত থাকি। অসাধারণ ব্যক্তিগণের প্রভাব তদীয় ভক্তগণের মনে স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করে, জনসাধারণের প্রকৃতি এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না—ইহা বুঝিয়াই আমরা হিসাবের সহিত শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইব। বাস্তবতার ক্ষেত্রে অসাধারণ মানুষের নৈতিক প্রভাব কতটুকু কার্য্যকরী হয়—হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের আগুন পুনঃ প্রজ্বলিত হওয়ায় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। মনে রাখা দরকার—সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আফগানিস্থানের মতই আর আমরা ফিরিয়া পাইব না। পাঞ্জাব ও বাংলার অখণ্ডত্ব-রক্ষার দাবী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে উঠিলে উভয় সম্প্রদায়ই সুখী হইবে। ইহার অন্যথায় বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান চিরনীতি হইয়া ভারতের বিশাল হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রাখিবে। আমরা অন্ততঃ আজও বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে এই দিকে অবহিত হইতে বলি।" কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবার মত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে, যখন দেশে 'সাম্প্রদায়িক তাপ' প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

• • • • •

'ত্রিস্রোতা'র কথা :—"ধান ও চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। হাটে ও বাজারে ধান ও চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। চোরা-কারবারীদের এই এক মহা সুলক্ষণ উপস্থিত। আমরা তাই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। ধান ও চাউল লইয়া চোরা-বাজারের লেন-দেন এখন মহা সমারোহে সুরু হইবে। পূর্ব্বের শাসন-ব্যবস্থায় এই কালোবাজার ধ্বংস হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন ইহা বেশ একটা সহজ রূপ লইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, কালোবাজারের দুই-চার জন আইনের কবলে পড়িয়াছে, কিন্তু মহারথিগণ বুড়াঙ্গুল দেখাইয়া নির্ব্বিবাদে ও পরম নিশ্চিন্তে কালো-বাজার চালাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে এখনও তাহাই হইতে দিলে মানুষের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তাই আমাদের অনুরোধ, যে করিয়া হউক, খাদ্য-শস্যকে কালোবাজারের কবল হইতে সকলে মিলিয়া রক্ষা করুন। মন্বন্তর মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে কালোবাজার অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ সমাজ ও দেশকে বাঁচাইবার দায়িত্ব সকলের সমভাবে রহিয়াছে। দিনের পর দিন হাটে ও বাজারে চাউলের দর যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার কারণ কি এবং ইহা প্রতিরোধ করা যায় কি না, তাহা কয় জনে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?" মন্তব্য করিবার কোন অবকাশ নাই। সমস্যা যখন সকলের, তখন ইহার সমাধান সমবেত ভাবে করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

• • • • • •

'ঢাকা-প্রকাশে' প্রকাশ :—"কয়েক দিন পূর্ব্বে এক দিন অধিকাংশ রেশনের দোকানে চাউল সম্পূর্ণরূপে ফুরাইয়া যায়। ঐ দিন সকালে কোন কোন দোকান হইতে কেহ কেহ কিছু চাউল নিতে পারিয়াছিল। বৈকালের দিক হইতে পরদিন সকাল পর্য্যন্ত কেহ কিছু পায় নাই। এই দিন দুপুরে কিছু চাউল গম দোকানে আসে এবং বৈকালের দিকে জন-প্রতি সপ্তাহে চৌদ্দ ছটাক চাউল ও

সের পাঁচ ছটাক গম দেওয়া হয়। বুধবার প্রাপ্তেও গম দেওয়া হয়। বৈকালের দিকে রেশনের দোকান হইতে ধান বিতরণ করা হয়। রেশনের বরাদ্দ অর্দ্ধাংশ করা সত্ত্বেও সদরে রেশন ব্যবস্থা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। ওয়াকেবহাল মহল মনে করে যে, শীঘ্রই চাউলের কতকটা সুব্যবস্থা হইবে। অনতিবিলম্বে চাউল পাওয়ার ব্যবস্থা না হইলে সদরের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। পল্লী অঞ্চল হইতেও চাউলের ভীষণ অভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দোহার থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে বিতরণের জন্য শীঘ্রই কিছু চাউলের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সদর মহকুমার এবং নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব জন্য বিশেষ অসুবিধা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের বাজারে চাউলের দর মণ-প্রতি ৩৫৲ হইতে ৪০৲ চলিতেছে।" আগামী দুই মাসে যেমন শোনা যাইতেছে, হয়ত অবস্থার পরিবর্ত্তন আরো মন্দের দিকেই যাইবে। তবে একমাত্র আশার কথা—পশ্চিম পাকিস্তানে বসিয়া কায়েদে আজাম সাহেব ভরসার কথা বলিতেছেন। কাজের চাপ এতই যে—দুর্গত পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা চোখে দেখিবার সময় তাঁহার নাই। 'তপশীলী' বাঙালী মুসলমান এই পাকিস্তানের জন্যই এত রক্তপাত করিয়াছেন।

•　　•　　•　　•　　•

'ঢাকা-প্রকাশে' শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী লিখিতেছেন :—"আভিজাত্য গৌরবে অন্ধ বাংলার হিন্দু সমাজ মেয়েদের প্রতি যে নিদারুণ অবিচার করিতেছে, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সাধারণ গুণ্ডাদের উপর নারী জাতির লাঞ্ছনার বহু দোষ চাপাইয়া অবিরত নানারূপ আলোচনা ও খবরের কাগজে নানা ভাবে এ সম্বন্ধে খবরাদি প্রকাশ করিয়া অনেকেই বাহাদুরী করিতেছে। (অবশ্যই ইহার প্রতিকার ক্ষেত্রে কয় জন অগ্রসর হইয়াছেন জানি না) কিন্তু পরোপকারের ধুয়া তুলিয়া এবং বাহ্যিক ভাবে সমাজ-হিতৈষী সাজিয়া যেরূপ ভাবে অবলা নারী জাতির উপর ভদ্র ভাবে (?) অবাধ অত্যাচার চলিতেছে, তৎপ্রতি তথাকথিত ভদ্রসমাজের কোন লক্ষ্য করিবার প্রয়োজনই দেখা যায় না। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে নিয়া পিতামাতার দুশ্চিন্তার সীমা নাই। মেয়ে শিক্ষিতা ও গুণবতী হইলেও অর্থদানের অসমর্থতার দরুণ তাহার বিবাহ দেওয়া অসম্ভব। গরীবের ঘরে মেয়ের জন্ম বিধাতার এক নিদারুণ অভিশাপ। মেয়ে বিবাহের সমস্যায় পড়িয়া কত সংসার ভিটামাটি শূন্য হইয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে, দাবী পূরণের অপ্রচুরতার দরুণ কত মেয়ের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছে, কত মেয়ে এই সকল নিদারুণ অবস্থায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সমাজকর্ত্তাগণ সেই সকল খবর রাখেন কি না তাঁহারাই জানেন। দেশের যুবক সম্প্রদায় দেশকর্মী সাজিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু ঘরের ভিতরে যে চাপা আগুনে সংসার দগ্ধ হইতেছে, তাহার প্রতি কেহ তাকায় না। ছেলের বিবাহে মোটা টাকার অঙ্ক গণিতে পিতামাতার উল্লাসের অন্ত নাই, কিন্তু মেয়ের পিতার বিপন্ন শুষ্ক মুখের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না বা তাহাদের বুককাটা দীর্ঘনিশ্বাস কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। পণপ্রথারূপ গুণ্ডামী আজ বাঙালার অভিজাত সমাজে যে অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হইবে না।" কি মন্তব্য করিব? লেখিকা যাহা বলিতেছেন, তাহার বেশী কিছু বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

এখানেই শেষ নয়। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী তাহার পর কি বলিতেছেন দেখুন :—"ছেলের পড়ার খরচ, তাহার ভরণ-পোষণ ও বেকার জীবনের বাবুগিরীর খরচ মেয়ের পিতাকে বহন করিতে হইবে, বিশেষতঃ, এতদুপলক্ষে ছেলের পিতার পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ ও আমোদ-প্রমোদের বাহাদুরীর ব্যবস্থাও মেয়ের পিতার প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার পরেও মেয়ের পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন ক্রমাগত দাবীর বহর মিটাইতে অসমর্থ হয়, তখনই প্রতিশোধ-পরায়ণ ছেলের পিতা, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের আক্রোশ-বহ্নিতে মেয়ের সংসার-জীবন ভারবহ হইয়া উঠে। অবিরত এই সকল নির্য্যাতনের ফলে মেয়ের মনে শ্বশুরকুলের প্রতি চিরদিনের জন্য একটা বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহার মানসিক অবস্থা বিষাক্ত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে।" সবই বুঝিলাম, কিন্তু লেখিকা কাহাকে বা কাহাদের লজ্জা দিবার চেষ্টা করিতেছেন? আবেদনই বা কাহার কাছে কি কারণে করিতেছেন? বাঙলা দেশে মানুষের "হৃদয়" এবং "কানের" সংখ্যা বর্ত্তমানে অত্যন্ত কম!

•　　•　　•　　•　　•

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্যের' অভিযোগ :—"পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফ বিভাগ এত কাল বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে জনসেবা করিয়া আসিয়াছেন। একান্ত দুঃখের বিষয়, এই এক বৎসর কাল ধরিয়া এই সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানটিও উহার পূর্ব্ব-খ্যাতি বজায় রাখিতে সক্ষম হন নাই। পোষ্টাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পোষ্টাফিসগুলিতে কার্ড পাওয়া যাইতেছে না, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পগুলি চোরাবাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দেশে স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই জনপ্রিয় বিভাগটিরও এই দুরবস্থা হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা কি বর না হইয়া অভিশাপে পরিণত হইবে না? কেন যে এই সমস্ত অব্যবস্থা ঘটিতেছে, তাহা আমরা অবগত নহি এবং অবগত হইতেও চাহি না।" 'পাঞ্চজন্য' এত সহজে বিচলিত হইতেছেন কেন? ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। এই ত সুরু! কিন্তু কেবল মাত্র পাকিস্তানী ডাক-বিভাগকে গালি দিয়া কি লাভ হইবে?

•　　•　　•　　•　　•　　•

'সাপ্তাহিক বিক্রমপুর' বলিতেছেন :—"পাকিস্তানের ভীতিতে আজ বিক্রমপুরের হিন্দুরা সন্ত্রস্ত—অনেকে তাই বিক্রমপুর ছেড়ে পালিয়ে গেছে—অনেকে যাচ্ছে ও অনেকে যাবে যাবে ভাবছে। বিক্রমপুরের মত শিক্ষায় ও সভ্যতায় সেরা লোকদের পক্ষে এ

ধরণের ভীতি-বিহ্বলতা আত্মহত্যারই নামান্তর। বিক্রমপুরের সন্তানেরা কোন দিনও ভীরুতার প্রশ্রয় দেয়নি—তারা পালিয়ে বাঁচতে শেখেনি; তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই-ই করেছে চিরদিন—অন্যায়কে তারা প্রশ্রয় দেয়নি, আজও দিবে না। অবশ্য যারা বিক্রমপুরেরই সন্তান অথচ মুসলমান ভাইদের দুষমণ ভাবে, তাদের পক্ষে বিক্রমপুরের সন্তান বলে পরিচয় না দিলেই বিক্রমপুরের গৌরব বাড়বে। যারা আজও অনাগত আশঙ্কায় প্রতিবেশীদের ফেলে আপন আপন প্রাণ নিয়ে বাঁচতে চাইছে তাদের মতিভ্রম হয়েছে, দুর্ব্বলতা আজ তাদের জয় করেছে বলতে হবে। দুর্ব্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চিরদিনের ঐতিহ্য বজায় রাখায়ই কি পৌরুষ নয়? ঐ ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে চাই হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতি ও পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের মত বিশ্বাস স্থাপন। পরস্পরকে একটি সূত্রে আবার বাঁধতে হবে।" আমরা বাহির হইতে উৎসাহ মাত্র দিতে পারি। তাহার বেশী কিছু সম্ভব নহে। 'বিক্রমপুর' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পালানপুর' রাখাও যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়া মনে করি।

* * * * * *

'বীরভূম বাণীর' দুঃখ—"চিনি লোকে পায় না, কিন্তু শুনিতেছি, জেলাবাসীকে মিছরী খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই মিছরী প্রস্তুতকারককে সপ্তাহে সপ্তাহে বহু চিনি দেওয়া হয়। দশ আনা সেরের চিনি গলাইয়া আড়াই টাকা সেরের মিছরী কিছু রাখা হয় এবং বাই-প্রোডাক্ট দ্বারা বাতাসা তৈয়ারী হয়। সহরের লোক মিছরী খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছে। এ সব কারবার বন্ধ করাই কি শ্রেয়ঃ নয়? আবার শুধু মিছরী নয়—তাল মিছরী! ষ্টেশনে সংবাদ লইলে জানা যায়, তালের গুড় মাসে দুই টিনও সহরে আমদানি হয় না। এই ভাগ্যবান মিছরীর কারবারীটি কে? সরবরাহ বিভাগের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ আছে কি? মিষ্টির সের সহরে ৩॥০ হইতে ৪৲ টাকা; মাসে না কি ৭০।৮০ মণ চিনি এই বাবদে ফুড কমিটি দেন, এ চিনি বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে দিলে উপকার হয় না কি?" উপকার জনসাধারণের অনেক কিছুতেই হয়, কিন্তু উপকার করিবে কে? আত্মরক্ষার চেষ্টা নিজেরা না করিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

* * * * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' পাঠে জানিতে পারি :—"কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত পলসনা গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক 'উদারনৈতিক সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে গ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করা। ইঁহাদের চেষ্টায় ইতিমধ্যে গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় (night school) স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে ঝগড়া-বিবাদ বর্ত্তমানে নাই বলিলেই হয়। এই নৈশ বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ৪০ হইতে ৫০ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের দরিদ্র ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রদিগকে বিনা খরচায় পুস্তক ও শ্লেট প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। আরও অনেক ছাত্র বর্ত্তমানে ভর্ত্তি হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সমিতি কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামে নিরক্ষরতা দূর করিতে পারিবে। কয়েক জন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বিনা বেতনে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর সেন ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দের অক্লান্ত চেষ্টায় কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।" সাধু প্রচেষ্টা! বাঙ্গলার সকল গ্রামে এবং সহরে এই প্রকার কার্য্য যদি আমাদের যুবকগণ করেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ আশাময়, এ কথা বলা যায়।

* * * * * *

রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রে প্রকাশ :—"রাজসাহীর কথাই বলিতেছি। এ সহর এক অদ্ভুত সহর। এখানে সু এবং কু, সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতা এক সাথে বাস করে। ইহার পৌরসভা চমৎকার! বহু বার বহু ভাবে তাহার গুণকীর্ত্তন হইয়া থাকিলেও আমি আর একবার করি। রাস্তা জঘন্য, পয়ঃপ্রণালীগুলিতে এমন দুর্গন্ধ সর্ব্বদাই উত্থিত হয় যে বমনোদ্রেক হয়। বাড়ী-ঘর শ্রীহীন, ভাঙ্গা-চোরা। রাস্তার পরিধি এত ছোট যে দম আটকাইয়া আসে। লোকগুলি পরশ্রীকাতর, অবশ্য নিজেকে তাহা হইতে বাদ দিতে চাই না। এখানে কোন লোকের কোন ভাল কাজ করার উপায় নাই। সমস্ত সহরটা মাড়োয়ারী ও সেই মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকগুলির কবলায়িত। রাজনৈতিক দলগুলির সেই একই অবস্থা। ক.জ করেন কি না জানি না, কিন্তু যেহেতু অমুকে অমুক পার্টির লোক, সেহেতু সে অস্পৃশ্য, এ-মনোভাবের এখানে অপ্রতুলতা নাই। বিশেষ পাড়ায় যেহেতু জন্মিয়াছি, যেহেতু সে পাড়ায় স্মরণাতীত কোন্ যুগে কে এক জন I. A. C. C.-এর সভ্য ছিল, সেহেতু রাজনীতি আমার জন্মগত অধিকার, এ মনোভাবও অনেকেই পোষণ করেন। সহরে কতকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক আছেন, যাঁহাদের পদলেহন করাই একমাত্র কর্ম্ম। আগে পদগুলি শ্বেত এবং শ্বেতাশ্রিত পাটকিলে রঙ্গের ছিল, নতুন প্রভু হওয়াতে এখন তাঁহারা একটু off-colour হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা গত কয়েক মাস ধরিয়া রাজকর্ম্মচারীদের চ্যারিটী-শোর টিকিট বিক্রয়, প্রকাশ্য মঞ্চে কন্যাদের নাচাইতে প্রেরণ ইত্যাদি সদ্ধর্ম্মাশ্রিত নিষ্কাম কর্ম্মগুলি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। এখানকার শিল্পীরাও কম যান না। চারিটী-শোর হিড়িকে তাঁহারা এই বাজারে দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন। রাজসাহীতে কৃষ্টি আগে ছিল কি না দেখি নাই, তবু বিশ্বাস যে সে কৃষ্টি, তাহা যতটুকুই থাক, দেশদ্রোহী কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাহেবের বেশী সায়েবের স্ত্রীর কাছে বন্ধক ছিল না। সে-গৌরব ইঁহারা অর্জ্জন করিয়া দিলেন। আমাদের সে দুঃখ আর রহিল না। রাজনৈতিক বহু প্রাতঃস্মরণীয় নেতারা মিলিয়া একটি দোকান খুলিয়াছেন, দোকানটি এ সহরের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে সংস্থাপিত। দোকানে স্বদেশী গন্ধ সাইনবোর্ড হইতে বিক্রেতার জামা-কাপড়ে পর্য্যন্ত বিদ্যমান। মালগুলি কিন্তু আদি এবং অকৃত্রিম অষ্ট্রেলিয়ান এবং ইংলিশ। ধনী ভদ্রলোকটি এ দোকানের পেট্রন। এ না হইলে রাজসাহী! ইহা এখানেই সম্ভব। [with apolegies] লেখক এ দেশের লোক নন। তাঁহার চোখে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন,—কিন্তু এ ত গেল বর্ত্তমান সহরের Drain-sweepers

Report. যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা কই ? অক্ষয়কুমারের রাজসাহী, কান্তকবির রাজসাহী, যদুনাথের রাজসাহী, ইতিহাসের ভারে সমৃদ্ধ বরেন্দ্রভূম-গৌরব রোমান্টিক রাজসাহী, তাহা কোথায় গেল ?" রাজসাহীবাসীরাই এ-প্রশ্নের জবাব দিবেন। আমরা কলিকাতাবাসীরা, 'সেই কলিকাতা কোথায় গেল'—তাহাই বর্ত্তমানে চিন্তা করিতেছি।

* * * * * *

রাঢ়-বঙ্গের নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্র, বর্দ্ধমানের 'আর্য্য' হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করিলাম :—"স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ পি, আর মুখার্জীর এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। মামলায় প্রকাশ যে, ১১ই জুন রাত্রে মৌঃ আবদুল হাকিম (জামুরিয়া থানার দারোগা) তথাকার বাজারের ব্যবসায়ী হরদেও মাড়োয়ারীকে গুরুতর অপরাধের অপরাধী করিয়া গ্রেপ্তার করেন ও জামিন দেওয়া হইবে না বলেন। উক্ত ব্যবসায়ীর গ্রেপ্তারে তথাকার অন্যান্য ব্যবসায়ী ও মাড়োয়ারীরা থানায় গিয়া জামিন দিতে অনুরোধ করিলে দারোগাটি ১০০০৲ টাকা না কি ঘুষ চান। বহু দরদস্তুর পর রাত্রে অনেক মাড়োয়ারীর সম্মুখে ৭০০৲ টাকা ঘুষ দিলে ব্যবসায়ীটি খালাস পান। হরদেও আসানসোল মহকুমা হাকিমের এজলাসে ঐ দারোগার নামে অবৈধ আটক, জুলুম-বাজী করিয়া টাকা আদায় ও সরকারী কর্ম্মচারিরূপে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ করেন। স্থানীয় হাকিম মৌঃ শোভান সফরে থাকায় মিঃ জে, কে, ঘোষ ঐ অভিযোগ শুনিয়া বিচারের তদন্তের জন্য ১ম শ্রেণীর হাকিম মিঃ নস্করের কাছে পাঠান। তিনি ৫।৭।৪৭ তারিখে বাদীকে মামলা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্য আনিয়া দিন ধার্য্য করেন। ইতিমধ্যে হাকিম মৌঃ শোভান সমস্ত কাগজ পত্রসহ মামলাটি নিজ নথিভুক্ত করিয়া ২৩।৭।৪৭ তারিখে তদন্তের দিন ধার্য্য করিলেন। এবং স্থানীয় তদন্তের পর মামলাটি ডিসমিস করিয়া দেন। তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে জজ-আদালতে মোশন করিলে অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ পি আর মুখার্জীর কোর্টে শুনানী হয়। মহকুমা হাকিমের আদেশ বাতিল করিয়া জজ সাহেব যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এক শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী লীগ শাসন আমলে এত দূর স্বজাতি-প্রেমে ডগমগ হইয়াছিল যে আইন ও বিচার-বুদ্ধির মর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়াই তা সম্ভব হইয়াছিল।" ভাল কথা। কাৎলা মাছ জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারে, এবং হইতেছেও কিন্তু নেহায়েৎ চিংড়িদের কি অবস্থা হইতেছে সে খবর 'আর্য্য' রাখেন কি ? কোন ক্ষেত্রেই বিচার 'সাম্প্রদায়িকতার' দিক হইতে করার পক্ষপাতী আমরা নহি। কিন্তু আমাদের কথা কে শুনিবে ?

* * * * * *

বর্দ্ধমানের "রূপান্তর" বলিতেছেন :—"গত সংখ্যায় আমরা দুর্নীতি দমনের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। গত সপ্তাহে তিনি কোন চোরাবাজারীকে সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ ও অপমান করিয়াছেন শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তাঁহাকে সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের পুকুরচুরি সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে যাহারা নিজেদের ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক লক্ষের কোটায় তুলিল, আজ খদ্দর পরিয়া সিল্কের বড় জাতীয় পতাকা তুলিয়া ও কোন কোন ফাণ্ডে দুই-এক শত দান করিয়া তাহারা যেন নিষ্কৃতি না পায়, তাহাদের শাস্তি চাই। তাহাদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হউক, কিরূপে রাতারাতি তাহাদের বাড়ী উঠিল, ব্যাঙ্কের অঙ্ক শত গুণ বাড়িয়া গেল। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারিলে তাহাদের বিচার করা হউক, তাহাদের রক্তশোষা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হউক।" হউক, আপত্তি নাই। কিন্তু সত্যই হইবে কি ? আমরা গরীব, কাজেই কালোবাজারী বড়লোকের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে দুঃখিত হইব না। এমন কি ভাগ না পাইলেও নহে।

* * * *

বর্দ্ধমানের 'বর্দ্ধমানের কথা' একই কথা বলিতেছেন :—"দেশের চোরাবাজার অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে, এই অভিযোগ আমরা শুনিয়া আসিতেছি। সংগে সংগে ইহাও শুনিতেছি, তবে কংগ্রেস কি করিল, জাতীয় সরকারের কর্ম্মচারিগণই বা কি করিতেছে ? কথাগুলি ঠিকই। এক কালে জলপড়া দিয়া ভেড়াকে ঘোড়া করিতে পারা যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানে তেমন কোন জলপড়া কংগ্রেসের জানা নাই, দেশের লোকের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে। দুর্নীতি, অনাচার বন্ধের জন্য আইন ও সরকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রয়োজন, তাহার জন্য আরও প্রয়োজন অনাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত। ঘুষের বিরুদ্ধে, চোরাবাজারের বিরুদ্ধে সেই জনমত জাগ্রত হয় নাই ; ব্যবসায়ী-সমাজ পরাধীন ভারতে অর্জিত অভ্যাস অতিরিক্ত মুনাফা করিবার অন্যায় আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছায় মুনাফাখোরি ত্যাগ না করিলে তাঁহাদিগকে তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে হইবে, জনমতকে জাগ্রত করিতে হইবে। সমাজের, দেশের কল্যাণকামী প্রত্যেকের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ হউক, ইহাই আমাদের আবেদন।" আমাদেরও। তবে সাধারণ নীতিবাক্য, 'অর্থনীতির' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না জানি না।

* * * * *

'বীরভূমবার্ত্তা'র অভাব অভিযোগ :—"ইলামবাজার হেতমপুর এই প্রধান এবং খাগড়া জয়দেব এই শাখা কাঁচা রাস্তা দুইটির দুরবস্থা ও দুর্দ্দশা বর্ত্তমানে যে চরমে উঠিয়াছে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মতানৈক্যের অবকাশ নাই। দুবরাজপুর অঞ্চলের (ইলামবাজার ও দুবরাজপুর থানার এলাকাধীন থানার ৩০।৪০খানি গ্রামের) নিকটতম বাজার ও ষ্টেশন এবং হেতমপুর নিকটতম শিক্ষা কেন্দ্র। দুবরাজপুর বা হেতমপুর যাইবার এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রাস্তা না থাকায় রাস্তা দুইটির প্রয়োজনীয়তা ও সংস্কারের দাবী যে অগ্রগণ্য নিতান্ত বাতুল ব্যতীত সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট কোন লোক এ সম্বন্ধে দ্বিধা বা সন্দেহ করিতে প্রয়াস পাইবেন না। তবুও কেন যে জেলা বোর্ড এই রাস্তা দুইটি সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নহেন তাহা বুঝিতে পারি না।" কলিকাতায় বাস করিয়া এবং কলিকাতার পথে-ঘাটে হাটিয়া 'বীরভূমবার্ত্তার দুঃখে সমবেদনা জানাইতেছি। আমাদের দুঃখ এবং অভিযোগ প্রায় একই প্রকার।

'পাঞ্চজন্য' বলিতেছেন :—"১৫ই আগষ্ট হইতে বাংলা বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টদ্বয় ঐ তারিখ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উভয়াঞ্চলের অধিবাসিগণই নিজ নিজ এলেকার গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য। সরকারী কর্ম্মচারিগণ যে এই আনুগত্য জ্ঞাপনে অধিকতর বাধ্য তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি কেন যে কর্ম্মচারিগণকে কোন্ রাষ্ট্রে চাকরী করিবে তাহা বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা প্রদান করা হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। পূর্ব্বে কোন সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়াই, উভয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ চাকুরীয়াগণকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। অফিস নাই অথচ অফিসারগণ আছেন। এই অফিসারগণ ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের আবাস-স্থানের সুবন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের যে কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ জন্য তাঁহারা ঘর দখল করিতেছেন। কিন্তু ইহার ফলে চট্টগ্রামবাসীদের যে দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহা উপেক্ষা করাও পূর্ব্ব পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইতে পারে না।" নিশ্চয়ই না। কিন্তু তাহাতে কি? 'অতিথি'র দাবী সর্ব্বপ্রথম। বিশেষ করিয়া সেই 'অতিথি' যদি বিদেশ হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তান উদ্ধার করিতে আসিয়া থাকেন!

* * * * * *

'জনশক্তিতে' প্রকাশ :—"আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। অসমীয়াদের বাঙ্গালী বিদ্বেষের সংবাদ প্রায় সকল স্থান হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যোড়হাট হইতে জনৈক ভদ্রলোক জানাইতেছেন যে, বাঙ্গালীদের আসাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া ইস্তাহার বিলি করা হইতেছে। নিম্নে একটি ইস্তাহারের নকল প্রদত্ত হইল—ফিরে যাও, ফিরে যাও, তোমাদের সোনার বাঙ্গালায় ফিরে যাও। আসামের জঙ্গলে তোমাদের মানায় না, আসামে তোমাদের স্থান হবে না। আসাম তোমাদের নয়, তোমাদের কি মিষ্টি কথা! প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা—বেশ মজার কথা বলেছ। তবে কি জন্য আসামের অন্নজলে জীবনধারণ করে অসমীয়া বলে পরিচয় দিতে চাও না, কেন তোমাদের দরকার হয় বাঙ্গালা স্কুলের? এটা কি তোমাদের উদারতা না অভিসন্ধি? তোমাদের চাতুরী আর টিকবে না। তোমাদের আজ তাড়াতে অসমীয়ারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যদি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তা হলে যেমন করে এখানে এসেছিলে, তেমনি করে ফিরে যাও। জঙ্গল থেকে বিদায় হও, সোনার বাঙ্গালায় গিয়ে সোনার চাষ ক'র" ইত্যাদি।

আরো আছে :—"জুবিলী পার্কে এক সভায় যোগদানের পর ফিরিবার পথে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত অদ্য সন্ধ্যায় গৌহাটীতে কয়েকটি দোকানের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। সহরের প্রধান রাস্তা দিয়া যখন জনতা আসামের অপর প্রদেশাগত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন দুর্ব্বৃত্তগণ অপর প্রদেশাগতদের দোকানের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। কতকগুলি দোকানের জানালা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অপ্রীতিকর ঘটনা বন্ধ করিবার জন্য ঐ অঞ্চলে পাহারা দিতে থাকে। কেহই আহত হয় নাই।" হায়! আমরাই এককালে, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে, অসমীয়াদের বহিরাগত বিতাড়ন কার্য্যে সাহায্য এবং সমর্থন দান করিয়াছিলাম। আজ অসমীয়ারা সেই ঋণ ভাল করিয়া শোধ দিতেছে। কিন্তু অসমীয়াদের চোটটা কেবল মাত্র বাঙ্গালী 'বঙ্গাল'এর প্রতি কেন? মাড়োয়ারী 'বঙ্গাল'রা কোন্ মন্ত্রে তাহাদের এমন আত্মীয় হইল? আসামী প্রধান মন্ত্রী বরদলোই সাহেব এ-প্রশ্নের জবাব দিবেন কি? বোধ হয় না!

* * * * * *

'বর্দ্ধমানের কথার' প্রস্তাব :—"মাছ বাঙ্গালীর একটি প্রিয় খাদ্য। শুধু প্রিয়ই নহে শরীররক্ষার জন্য মাছ খাওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে তেমন নদী খাল বিল নাই। পুষ্করিণীতেই মাছ জন্মাইতে হইবে। বর্দ্ধমান জেলায় বহু পুষ্করিণী অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে বুজিয়া যাইতেছে। এই সব মেঠো পুকুরগুলি সংস্কার হইলে তিনটি কাজ ইহাতে হইতে পারে, জল সরবরাহ, সেচ ও মাছের চাষ। সরকারের এই সম্পর্কে ব্যবস্থা আছে। পুকুর-সংস্কার ও মাছের চাষ দুটি বিভাগই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিয়া থাকেন; অর্থ ব্যয় যথেষ্টই হইয়া থাকে। এত দিন কর্ম্মচারিগণ গতানুগতিক ভাবে চাকরী রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন এখন যাহাতে এই জনহিতকর কার্য্যগুলি ঠিক ঠিক ভাবে বর্দ্ধমান জেলায় হয় সেই দিকে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেই সংগে দেশের ধনী যাঁহারা তাঁহাদিগকে পল্লীমুখী হইয়া পুষ্করিণী খনন ও পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া পুণ্যের ভাগী হইবার ও সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।" মৎস্যবিদ্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর কি বলেন?

* * * * * *

'বর্দ্ধমানের কথা'র মন্তব্য :—"এখানকার সুখ-সুবিধা যদি অন্য প্রদেশের লোকেরা সবই ভোগ করে তাহা হইলে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করাই হইবে। আমরা প্রাদেশিকতার প্রাচীর তুলিয়া কাহারও পথ রুদ্ধ করিতে চাহি না, কিন্তু নিজ বাসে পশ্চিমবঙ্গ পরবাসী হইয়া থাকিবে ইহাও আমরা চাই না। সম্মানের, গৌরবের আসনে পশ্চিমবঙ্গ তাহার যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া থাকুক ইহা আমরা চাহিব, ইহার জন্য প্রচার করিব, জনমত গড়িব। বর্দ্ধমানের ছেলে বেকার হইয়া পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা ত ন্যায় বিচার নহে, তাহাকে কাজ দিতেই হইবে। অবশ্য যেখানে বিশেষজ্ঞের কথা সেখানে আমরা যোগ্য লোককেই কাজ দিব, পূর্ব, পশ্চিম কোন কথাই তুলিব না, কিন্তু সাধারণ ভাবে ঘরের ছেলেকেই আমরা সর্বত্র দেখিবার ইচ্ছা পোষণ করিব। কয় দিনই বা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের লোক হতাশ প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, আমাদেরই কি হইল, আমাদের আশা ভরসা কই, আমরাও ত নব ভারত গঠনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে চাই, আমাদের সে সুযোগ কোথায়? ইহাদের সে সুযোগ দিতেই হইবে। আমরা এই জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। হতাশ হইবার কারণ নাই, জাতিগঠনে আমাদিগকে আমাদিগের যোগ্য স্থান অর্জ্জন করিতে হইবে এবং আমরা ইহা অর্জ্জন করিবই।" ইহাতে আপত্তি করিবার কি থাকিতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাইলাম না। বর্ত্তমান অবস্থায়—আমাদের বাঁচিবার জন্য ইহা করিতেই হইবে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জাতীয় জীবন সংগঠনে নারী

শ্রীশেফালী গুপ্ত

স্ত্রী ও পুরুষ, নর ও নারী, এই লইয়া সৃষ্ট জগৎ—এই লইয়া সৃষ্টি-রহস্য। একটি ব্যতীত অপরটি চলিতে পারে না—চলে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্বর্গীয় সম্বন্ধ—অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উপর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। যে দিন ঐ অপূর্ব্ব সমন্বয় অন্তর্হিত হইবে—যে দিন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিলন না থাকিয়া শত্রুতা আত্মপ্রকাশ করিবে, সেই দিন সৃষ্ট জগতের শেষ দিন। কোনও আন্দোলনের মূল মন্ত্র যদি হয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন করা—যদি হয় স্ত্রী ও পুরুষকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা, স্ত্রী ও পুরুষের জন্য দুইটি বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা—তাহা হইলে সে আন্দোলন হইবে বিপথগামী। সে আন্দোলনের কার্য্যকরী সত্তা নাই।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, মানিলাম স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সদ্ভাবের সম্পর্ক না থাকিলে কোনও সমাজ আদর্শ সমাজ হইতে পারে না—কোনও সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না—তাহা হইলেও স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বহির্জ্জগৎ পুরুষের জন্য কিন্তু অন্তঃপুর থাকিবে স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোক যদি সেই অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বহির্জ্জগতের কর্ম্মিরূপে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রত্যেক কার্য্যে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে স্ত্রীলোকের সেই প্রচেষ্টা তাহার পক্ষে ও সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে। নারীর প্রকৃতি অন্তঃপুরের উপযোগী—তাহার পক্ষে বহির্জ্জগতের কঠোর পরিশ্রম ও বহির্জ্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিগত স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া নারী যদি কেবলমাত্র পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য তাহার অন্তঃপুর ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতিগত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত দুর্ব্বলতা তাহাকে বাধা দিবে—সে তাহার কর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারিবে না। উপরন্তু, নারীর পক্ষে সর্ব্ব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিবে—সমাজ হইয়া উঠিবে আপত্তির ক্রীড়া-ভূমি। নারী বহির্জ্জগতের কর্ম্মিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে অযথা কতকগুলি কর্ম্মশক্তির অপব্যয় হইবে—কতকগুলি কর্ম্মশক্তিকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তোলা হইবে। নারীর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ—তাহার প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান লালন-পালন করা—পরিশ্রান্ত পুরুষের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা।

উপরে নারীর প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করা হইয়াছে—তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সত্যই যদি নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র একই হয়, তাহা হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা আছে। কর্ম্মের বিভাগ প্রত্যেক সমাজে প্রয়োজন। যদি কোনও সমাজে কর্ম্মক্ষমতানুযায়ী কর্ম্মের বিভাগ না হয় তাহা হইলে অপাত্রে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইবে ও কোনও কার্য্য আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারিবে না। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, বহির্জ্জগৎ ও অন্তঃপুরকে কি একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব? বহির্জ্জগতের কোনও অংশ গ্রহণ না করিয়া—বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কি করিয়া নারী অন্তঃপুরকে আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবে? গৃহ হইতেই ভবিষ্যৎ সমাজের কর্ম্মীর উদ্ভব হয়—গৃহের প্রভাব কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই গৃহের যিনি নিয়ন্ত্রণকারিণী, তিনি যদি বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানার্জ্জন না করেন—সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন না হন—তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব, তাঁহার অজ্ঞতা, তাঁহার সন্তান-সন্ততির উপর রেখাপাত করিবে। উপরন্তু, তাঁহার অজ্ঞতার ফলে যে পন্থা অনুসরণ করিলে আদর্শ নাগরিক ও সমাজের আদর্শ কর্ম্মী গড়িয়া তোলা যায়, সে পন্থা অনুসৃত হইবে না। এইরূপে বহির্জ্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নারী তাহার অন্তঃপুরের গুরু ভার গ্রহণের অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে।

বস্তুতঃ, গৃহ ও বহির্জ্জগৎকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা অসম্ভব। গৃহকে আদর্শস্থানীয় করিতে হইলে নারীকে বহির্জ্জগতের সক্রিয় কর্ম্মী হইতে হইবে। বহির্জ্জগতের সম্পূর্ণ ভার পুরুষের উপর দিয়া গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলে ক্রমে ক্রমে সে গৃহ হইয়া উঠিবে সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। নারীকে ভুলিলে চলিবে না যে, তাহাকে গৃহ ও বহির্জ্জগৎ উভয়কেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার কর্ত্তব্য, তাহার দায়িত্ব, পুরুষের অপেক্ষা অধিক। তাহাকে কর্ম্মক্লান্ত পুরুষকে দিতে হইবে বিশ্রাম; উপরন্তু, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে সক্রিয় সাহায্য করিতে হইবে। নারীকে মনে রাখিতে হইবে যে, সে পুরুষের অপেক্ষা কোনও অংশে অক্ষম নয়। সাধারণতঃ দৈহিক অক্ষমতা তাহাকে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য

করে—কিন্তু নারীর এ অক্ষমতাও প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা দূর করিতে পারা যায়। সমস্ত কর্ম্মে নারী আগাইয়া আসিবে পুরুষের পার্শ্বে কিন্তু তাহাকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাহার আদর্শ পুরুষের সহিত ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতা নয়—তাহার আদর্শ পুরুষের সহিত সহযোগিতা। যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে সে দেহের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ নারী ও পুরুষের মধ্যে ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে বা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলে কোনও মনুষ্য-সমাজ চলিতে পারে না।

নারী ও পুরুষের কর্ত্তব্যের ভার একই—একই প্রকারের কার্য্যে তাহারা আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম—কিন্তু এই সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্যের ভার পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক। কারণ, নারীর হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্যকে যত দিন না এই আদর্শে পুনর্গঠিত করা হইতেছে—যত দিন না নারীর বহির্জগতে আত্মনিয়োগ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করা হইতেছে—যত দিন না নারীর সামাজিক ও পারিবারিক স্বাধীনতা ও দাবী স্বীকার করা হইতেছে—তত দিন কোনও সমাজের, কোনও জাতির উন্নতি আশা করা যায় না।

স্মৃতি

প্রতিমা বসু

নূতন সূর্য্যের আলো পড়েছে কি জীবনের জটিল পথেতে
অতীতের তিমির ভেদিয়া
দেখায় নূতন পথ
তির্য্যক্ আলোর শিখা
কিন্তু যারা লুপ্ত হল ব্যর্থতার গহন আঁধারে
তারা কি মুছিয়া গেল ধরণীর ক্রোড়-পথ হতে ?
তাদের সে ব্যর্থতার ব্যথা
ফেলেনি কি রেখা
জ্বালেনি কি আলো
বিদ্যুৎ চমক সম আঁধার সে পথে ?
যদিও তা' ক্ষণতরে—তবু সে তো আলো !
আঁধার পথের যাত্রী তারা
পথ খুঁজে ফিরিয়াছে
হৃদয়ের গভীর আবেগে
যেখানে সত্যের আলো আছে
যেখানে বেদনা নাই আছে শুধু আনন্দের বাণী
হৃদয়ের সুরে আর আলোকের বেশে !
মনে হয় সেই যাত্রীদল
অবলুপ্ত হয় নাই ব্যর্থতার মাঝে
নির্ভীক হৃদয়ে
জীবনেরে করেছিল জলন্ত মশাল !
তারা নিয়ে গেছে
তবু জয় আছে স্মৃতি-বিজড়িত
সকরুণ মহিমা-মণ্ডিত।

বন্ধুর পুনর্দর্শন

কৃষ্ণসুচিত্রা দেব

কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় চলেছি। সখ করে হাওয়া খেতে নয়, (পেট চালাবার জন্য) চাকরীস্থল ফিরতি। সন্ধ্যা এখন ঘনায়ে এল বটে কিন্তু ওপারের ফুটপাথে সান্ধ্য আইন জারী করে রাস্তাটিকে নিশাচর পক্ষী-বিশেষের মুখের মত বিষণ্ণ ও থমথমে করে তুলেছে।

পথ চলেছি ভীষণ সন্তর্পণে। পাশে কেউ এলে সভয়ে নিজেকে তার ব্যবধানে এনে ফেলি। কাজ কি বাপু, কার মনে কী আছে তা ত আজ-কাল চোখ-বোজা আর কানে তুলো-গুঁজা ঈশ্বরেরও অজ্ঞাত; সে ক্ষেত্রে আমরা ত ছার মানুষ মাত্র।

হাসতে হাসতে কথার ছলে বন্ধুরা (অবশ্য বিশেষ-সম্প্রদায়) জীবন হানি করেছেন, যদিও কাগজের ওপর আইন বলবৎ আছে তবু টের পাই, এ ঘটনা বিরল ত নয়-ই, পথে-ঘাটে।

পৈতৃক প্রাণটাকে আর অপঘাতে কেন বিসর্জ্জন দিই, তাই চলেছি সাবধানে সন্তর্পণে। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এক জন পথচারীর সঙ্গে লেগে গেলো ধাক্কা।

দোষটা যদিচ তারই ছিল কিন্তু তবু প্রতিবাদ না করে তাকে যাবার জন্তে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—মাপ করবেন, ভারী দুঃখিত।

তার পর আমার দেখে এক গাল হেসে বললে—আরে তুমি যে! অনেক দিন বাদে দেখা, আমি ভেবেছিলুম বুঝি মরে-টরে গেছ।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল বন্ধুর মিষ্ট আলাপে। মনে মনে বললুম বালাই, আমি মরব কেন? আমার শত্রু মরুক।

আমায় নীরব দেখে বন্ধু হেসে বললে—কি হে চিনতে পারছ না আমায়?

আমি বললুম, বিলক্ষণ, তোমায় কি এত শীঘ্র ভোলা যায়, না চলে? যা প্রেমের ঝড় বইয়েছিলে। তা আছ কেমন?

বন্ধু তাচ্ছীল্য-ভরা স্বরে বললে—আর কেমন? যেন তেন প্রকারেণ করে চলেছে। চিত্রগুপ্তের খাতায় দস্তখত দিয়ে এসেছি, বলেছি, ডাকের আগে পরওয়ানা জারী করতে হবে না, শুধু দূতটিকে পাঠালেই চলে আসব।

প্রশ্ন করলুম—তার মানেটা কি হল?

উত্তর এলো—তুমি একটা Dull দেখছি।

বললুম—ছিলুম না কিন্তু চারি দিকের এই বিপর্য্যয় দেখে মাথাটায় চাল-ডাল মিশিয়ে একটা জগা খিচুড়ী হয়ে আছে বলে যেন মনে হচ্ছে, তা কথাটার অর্থটা না হয় একটু খোলসা করেই বল।

বন্ধু বললে—ডাক অর্থ মরণ, আর পরওয়ানা হোল গিয়ে তোমার অসুখ, জ্বর বিকার ম্যালেরিয়া, মরণ লোকের অসুখ থেকেই হয়, আজকাল ত আর সে পাট নেই একটা গুলী কিংবা একটা ছোরা, ব্যস আর দেখতে হবে না, কেল্লা ফতে। তা মন্দ নয়, ওষুধ-বিষুধ খেয়ে ত আর অসুখ ভাল হয় না, অথচ টাকা খরচা হয়; ভিজিট দাও, এ-দোকান-সে দোকান ঘোর, সকলের পায়ে ধর, যত সে ঝামেলায় আর পড়তে হবে না। ডাক্তারদের প্র্যাকটিশ বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়, না, কি বল?

বললুম—তা গেছে বোধ হয়, ডাকবে কে?

বন্ধু হাসল। কথাটা তার মনের মত হয়েছে বুঝলুম কিন্তু মেজাজটা "সে দিনের" চেয়েও ভাল (এত) হল কি করে সেটা বুঝতে অসমর্থ হলুম।

বন্ধু বললে—সত্যি, এই দেখ না আজ কোন গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এতক্ষণে নইলে চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপ-পুণ্যের হিসেবে জমা-খরচের ধাক্কা সামলাতে হত।

শঙ্কিত চিত্তে বললুম—কি ব্যাপার?

তাচ্ছিল্য-ভরা উত্তর এল—ব্যাপার নতুন কিছুই নয়, নিত্যি পরোক্ষে ঘটে, আজ একেবারে প্রত্যক্ষে। বাসে চড়েছিলুম S fe মনে করে, দু'বারব এ্যাসিড আর গোটা কয়েক দিশী জিনিষ বাসের ছাদে পড়ল। কিছু নয় কিছু নয়, করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বেশ ভোগালুম কিন্তু শনিবারের শেষবেলা যে, কিছু দূর যেতে না যেতেই বিশ পাউণ্ড ওজনের এক বোম—

(এতক্ষণ বেশ শুনছিলুম। কিন্তু সংশয় দেখা দিল বিশ পাউণ্ড হবেও বা, উনি ত নিজের চোখেই দেখেছেন।)

···পড়ল, প্রাণ নিয়ে আবার দৌড়। চড়লুম ট্রামে, 'দুর্গা দুর্গা' বলে স্বস্তির শ্বাস ফেললুম কিন্তু হরি হরি! এবার সাক্ষাৎ দাঙ্গাবাজ হাজির, নিস্তার নেই, বলব কি মশাই, অমন গুলীর ঝড়াঝড় ঝড় জীবনে দেখিনি, বাস্ আর কি? দু'জায়গায় পয়সা দিয়ে শেষে এখন হণ্টন। কী সাংঘাতিক দিন কাল, এ যুগের মানুষগুলি আবার আরও সাংঘাতিক। প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত। বন্ধু মন-প্রাণ খুলে তার প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা সাড়ম্বরে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমি শুনছি কি না শুনছি সে বিষয় তার কোন প্রয়োজন নেই। কোথা থেকে আর শুনি বলুন ত? প্রাণের ভেতর পাখী বলছে ঘর চল জলদি করদি। বন্ধু আমার সাক্ষাতে সাহস পেয়েছেন আমি পাইনি, এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়, কিন্তু অমন প্রাণ খুলে বর্ত্তমান যুগের সমালোচনার মত নয়।

বন্ধু বললে—আজকে চোখে সরষে ফুল দেখলুম—

কঁহাতক আর চুপ চাপ থাকি।

বললুম অত ভাবছ কেন? সময় এলে রাখতে পারবে না কেউ, আর যদি সময় না হয় তবে নিয়ে যাওয়া কারু সাধ্য হবে না। (মনটা যেন ভারী দমে যাচ্ছিল তাই নিজেকেই একটু সাহস দিলুম)

বন্ধু এই বার স্বরূপ ধরলে। খিঁচিয়ে উঠল, তবে বেশী নয়, একটুখানি; বললে, আরে রেখে দাও তোমার তত্ত্ব কথা, দৈবের ওপর নির্ভর করে থাকার দিন আর নেই হে। দিনকে রাত বানিয়ে দিচ্ছে এ যুগ, তা ত চোখেই দেখছ।

চুপ করে রইলুম। কি বলব?

বন্ধু কথা ঘুরিয়ে বললে, জান ত সেই কে এক জন দৈবিজ্ঞ সম্রাট্ আকবর না ঔরঙ্গজেবের কাছে বলেছিল আপনার পরমায়ু আর নেই। সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি বাঁচবে কত দিন? সে বললে, বহু বৎসর। সম্রাট্ কথা না শুনে একটা জল্লাদকে ডেকে তার শিরশ্ছেদ করিয়ে দিলেন। ব্যস্, হয়ে গেল তার বাঁচা।

অনর্থক তর্ক করে মনকে উত্তেজিত আর অন্যমনস্ক করবার ইচ্ছে ছিল না। তাই বললুম—তাই বটে।

বন্ধুর কথা সমর্থন করলেও সে খুশী হোল না, বিরক্ত চিত্তে বললে, দেখ, তুমি সব কথাই স্বীকার করছ বটে কিন্তু মনে মনে তা অস্বীকার করে বাইরে তাচ্ছিল্য করছ।

আমি বিস্ময়ের ভাণ করে বললুম—কই না ত?

বন্ধু একটু নরম সুরে বললে, আজ-কাল দেশের গরম আবহাওয়ায় সঙ্গে মানুষের মন-মেজাজও গরম হয়ে উঠেছে।

মনে মনে বললুম—সামনেই তুমি এক জন সশরীরে জলন্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে সে কথা অস্বীকার করে কি করি?

বন্ধু প্রশ্ন করলে—আচ্ছা তুমি নিয়মিত রেশন পাচ্ছ ত?

আবার বুঝি সেই প্রসঙ্গ এসে পড়ল। কিন্তু সহানুভূতির স্বর দুঃখ বাড়িয়ে তুললে, তাই বললুম—লাইনে হাজির হই নিয়মিত, কিন্তু সব জিনিষ পাই না, আটা ময়দা গম অনেক দিন চোখে দেখিনি, চিনি কমতে কমতে এমন অবস্থা যে তা খেলে আর মুখ দিয়ে মিষ্টি কথা বার হয় না। চালটা পাই, এ ক্লাসের চাল বলে সি ক্লাসে, চাল দেয় দয়া করে···(হঠাৎ মনে পড়ে গেল দুঃখের কথা বলতে গিয়ে অন্যমনা হয়ে যাচ্ছি, সামলে নিয়ে বললুম) কিন্তু এ সব আলোচনা সমালোচনা করবার মত উপযুক্ত স্থান নয় এটা, একটু দেখে-শুনে পথ চল, কোথায় যমরাজের অনুচর অপেক্ষা করছে তা কে জানে?

বন্ধু তীব্র বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে বললে—কি হে, বড্ড না বলছিলে যে সে সময় না এলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না?

এ হেন জবাব, নিতান্তই অপ্রীতিকর নয় কি? তাই মেজাজ গেল বিগড়ে, কি জবাব দোব? খুঁজলে হয়ত এর জবাব পাব বিস্তর। কিন্তু থাক কথায় কথা বাড়ছে।

—কোন্ দিকে যাবেন মশয়রা?

প্রশ্নটা কাণের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পঁহুছিয়া বেশ শিহরণ জাগালে দেহে-মনে। সচকিত দৃষ্টি আগন্তুকের পরিচ্ছদের দিকে নিবদ্ধ হোল। ধুতি পাঞ্জাবী, তা হলে ভয় নেই। আমাদের স্বজাতিই বটে। আবার বন্ধুটি একটু খিঁচিয়ে বললে—কেন মশাই সে খোঁজে আপনার কি দরকার?

আমি জানতুম, এবা আমার প্রেস্টিই বন্ধুবর দন্তকৌমুদী বিকাশ করে কিন্তু এ যে দেখছি অপরিচিতের ভাগ্যেও ঐ শুভ্র দন্তরুচি দেখতে বাধ্য হল। কিন্তু ভদ্রলোকটি নিতান্তই ভদ্র।

—খোঁজ নিয়ে কোন দরকার আমার নেই, তবে আমিও ঐ ও দিক ফেরত কি না, বড্ড গোলমাল হচ্ছে মশাই···আচ্ছা নমস্কার! ভদ্রলোক চলে গেলেন। বন্ধু রেগে বললে কি ফেরো! আর দুটো মোড় পেরিয়ে বাড়ীর রাস্তা, এতখানি পথ হেঁটে কি না আবার ফিরবো? হায় রে দিন-কাল।

তার কথা শেষ না হতেই পুলিশ ভ্যানের আসার আওয়াজ, গুলী বোমা আর মানুষের আর্ত্তধ্বনি কাণে এলো।

আমি বললুম—তোমার আক্ষেপ শিকেয় তোলো, বাঁচবার সখ যদি থাক তবে আমার সঙ্গে ছোট।

দু'জনে এক রকম রেসের ঘোড়ার মত ছুট দিলুম (হাসছেন? ভাবছেন রেসের ঘোড়া? সত্যি বলছি আমাদের মনে হচ্ছে তার চেয়েও জোরে ছুটছি, কারণ, তারা ছোটে টাকার প্রতিযোগিতায়, আর আমরা প্রাণের প্রতিযোগিতায়, অন্ততঃ এই হিসেবেই জোর ছুট দিলুম)।

কিছু দূর গেছি।

অন্ধকার গলির ভেতর থেকে কালো দুটো হাত বেরুল, হাত দুটিতে অতি-পরিচিত দুটি শাণিত অস্ত্র ঝকঝকিয়ে আমাদের হকচকিয়ে দিলে। তার পর চকিতে আমার আর বন্ধুর পেটে আমূল বসে গেল সেই শাণিত অস্ত্র। আর্তনাদ করে উঠলুম ভয়ে ও যন্ত্রণায়। কিন্তু সহজ পাত্র নই আমিও। অস্ত্রের মালিকের কণ্ঠ দু'হাতে চেপে ধরলুম। লোকটা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।...

আর্তনাদ বড় জোরেই করলে সে। আমি চমকে উঠলুম। কই অন্ধকার রাস্তা? কই ছোরা? আমি বিছানায়। তবে কি হাসপাতাল?

না তা-ও ত নয়? এ-যে আমার বিছানা। পাশে শায়িত নন্দিনীর গলা টিপে ধরেছি শত্রু ভ্রমে। আর্তস্বর তারই। লজ্জায় তার গলা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

নন্দিনী গলায় হাত বুলাতে বুলাতে রাগ, বিদ্রূপমিশ্রিত কণ্ঠ তীক্ষ্ণ করে বললে—

—পথে-ঘাটে ত মৃত্যুদূত ওৎ পেতে আছে জানতুম, কিন্তু বিছানায় শুয়েও যে তার হাত থেকে নিস্তার নেই বুঝলুম এবার, হায় ভগবান! কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। শেষে তুমিও! তা কোন্ বলবানের ওপর এত বিক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছিল? তোমার যা সাহস তাতে শীর্ণ না হলে ডুয়েল লড়তে পারবে বলে ত মনে হয় না।

কি বলি বলুন ত?

চুপ করে রইলুম প্রকাশ্যে।

মনে মনে বললুম, হে ভগবান! এ মিছরির ছুরির চেয়ে সেই বিষাক্ত ছুরি দিলে না কেন? বিষের ছুরি পেটে ঢুকত কিন্তু এ ছুরি প্রাণে। বিষের ছুরিতে প্রাণ দিলে বাঁচতুম অন্ততঃ লজ্জার হাত থেকে। হায় রে দিন-কাল, নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়েও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব না?

জিন্দাবাদ

সাগরিকা বসু

দুঃশাসনের জতু-গৃহই পুড়ে গেলো
মানুষ মরেনি—মানবাত্মা যে চির অমর
পূর্ব্বাচলের পানে একবার আঁখি মেলো
বিজয়ী কে হবে? সুর ও অসুরে বাধে সমর—।
পথ কোথা আজ—তবুও হোয়ো না দিশাহারা
গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে নব-দানব,
কুজ্ঝটিকাতে অবলুপ্ত যে ধ্রুব তারা,
তৃতীয় নয়নে আলোক আনিবে যুগ-মানব।
মুখ তোলো—বলো মানুষের নীতি জিন্দাবাদ—
ভ্রান্তি তমিস্রা হাসিবে আকাশে পূর্ণ চাঁদ।
সময় হয়নি—তবুও রেখো না ক্ষোভ কোনো—
থামেনি এখনো সব্যসাচীর বিজয় রথ!
অস্ত যায়নি সূর্য্য এখনো—শোনো শোনো
নিশ্চিত জানি হবে হবে, বধ জয়দ্রথ।

মোককচাং-এ ১৫ই আগষ্ট

শ্রীমতী প্রমীলা ভট্টাচার্য্য

১৫ই আগষ্ট, সকালে জাতীয় পতাকা তোলার পর মনে গর্ব্ব হ'ল, নাগা পাহাড়ে এত সকালে কারও পতাকা তোলা হয়নি, অর্থাৎ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পর আমরাই প্রথম নাগা-রাজ্যে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করলাম। তার পর পতাকা উঠল পোষ্টাফিসে, একটি নাগা ছেলে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলে গেল। নাগাদের "স্বাধীন নাগাস্থানের" দাবী কারও অজানা নয়। তাদের কাছে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলা শুধু অন্যায় নয়, অনধিকার-চর্চ্চাও। তাই তারা এত বড় উৎসবে অসহযোগ করে রইল। নাগাদের এই রকম বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যেই প্লেনের লোকেরা সাধ্য মত উৎসব করল। তবু তার ভিতরে সর্ব্বক্ষণ একটা অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা জেগে রইল। ১৫ই আগষ্ট রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটল, সকালে দেখা গেল, পোষ্টাফিসের পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। জাতীয় পতাকাকে এ ভাবে লাঞ্ছিত করায় প্লেনের সমস্ত লোক অপমানে ও ব্যথায় কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। সকলে নিরুপায়, কারণ, এখানকার এস, ডি, ও ইংরেজ, সস্ত্রীক টুরে গিয়েছেন। ১৫ই আগষ্ট সম্রাটের জন্মতিথি বা জুবিলী উৎসব নয়, তাই এস, ডি, ও উপস্থিত থাকার প্রয়োজন মনে করেননি! নাগাদের অসন্তোষ সর্ব্বজনবিদিত, এমন কি "লড়কে লেঙ্গে নাগাস্থান" এমন গুজবও শোনা গিয়েছে; তবু এস, ডি, ও এর জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করেননি। অবশ্য এটাও ঠিক, বহু দিন ইংরেজ এস, ডি, ও ও ডি, সির একচ্ছত্র শাসনাধীনে থাকার ফলে নাগারা যেমন নিজেদের ভারতীয় ভাবতে শেখেনি তেমনি শেখেনি একতা। প্লেনের লোকদের যেমন করে বিদ্বেষ, তেমনি নিজের লোকদের ওপর নেই আস্থা। এই মনোভাব নিয়ে ওদের পক্ষে দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করা অসম্ভব। নিজেরা কখনও কোনও আলোচনায় একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, সব সময়ে তা ব্যর্থ হয়।

রবিবার অর্থাৎ ১৭ই আগষ্টে কোর্টের পতাকা এসে পৌঁছল। সোমবার বেলা দশটায় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা হ'ল। প্লেনের লোক উৎসাহের সঙ্গে এবার কয়েক জন নাগা কর্ম্মচারী দায়ে পড়ে উৎসবে যোগ দিলেন, দু'-একটি স্কুলের ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনে প্রথম শুনল, "গান্ধীজী কি জয়," "বন্দে মাতরম্"। ১৫ই আগষ্টের আগে কখনও এই কথাগুলি মোককচাং সাবডিভিসনে ধ্বনিত হয়নি। গান্ধী, জহরলাল ইত্যাদিকে ওরা এই ভাবে শ্রদ্ধা করে, যেমন আমরা করি থাইল্যাণ্ড বা ইন্দোচীনের দেশপ্রেমিকদের। আর 'বন্দে মাতরমের' মানেই জানে না। ওরা আনন্দ হলে চীৎকার করে, 'হিপ হিপ, হুররে'। বন্দে মাতরম্ তো ভারতবাসীদের।

নাগারা নিজেদের অভারতীয় বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। গেল যুদ্ধে ওরা কৃতিত্বের সঙ্গে করেছে ব্রিটিশের গুপ্তচরের কাজ, এবার সাফল্যের সঙ্গে করেছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা নাগা-রাজ্যের বাইরের জনসাধারণের জানা তো দূরের কথা, উল্টেই জানে। যেমন জানে ১৫ই আগষ্টে নাগাদের ঘরে ঘরে উৎসব, রাণী গুইডালোকে নিয়ে শোভাযাত্রা ইত্যাদি আরও কত কি। রাণী গুইডালোকে যেখানে

অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল সে গ্রাম এখান থেকে দশ-বারো মাইলের মধ্যে, রাণীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কাগজে দেখেছি, কিন্তু শোভাযাত্রা তো দূরের কথা, নাম উল্লেখ করতে কখনও শোনা যায়নি। ভারতীয়রা পেল স্বাধীনতা আর ওরা পেল প্রতারণা! এখন থেকে ওদের ভারতের অধীনে থাকতে হবে এই চিন্তায় ওরা অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজেদের অভারতীয় ভাবার জন্যে এই অশান্তি। এই জন্যে ওদের সভা-সমিতিতে প্লেনের লোকেদের স্থান নেই। তাই ওদের বৈঠকে ইংরেজ এস, ডি, ও বা ডি, সি ছাড়া অনাগা মাত্রই অপাংক্তেয়।

কোহিমাতেও স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে নাগারা যোগ দেয়নি, পতাকা উত্তোলনের সময়ে কোনও বেসরকারী নাগা উপস্থিত হয়নি। নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের কয়েক জন প্রতিনিধি স্বাধীনতার দাবী নিয়ে জহরলালের কাছে গিয়েছিল এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

বিজ্ঞানের ধাঁধা

শ্রীবীণা সরকার

তোমাদের কাছে যদি এবার নূতন করে বলি যে, তোমরা এত দিন যা পড়েছ যে সূর্য্যরশ্মি সরল রেখায় যায় তা ভুল। শুধু সূর্য্যরশ্মি কেন, সব রশ্মির বেলায়ই একই কথা, একই যুক্তি। তবে কী তোমরা হটগোল করবে না? যা বলি তাই মেনে নেবে? তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, জানলা কিংবা কোনও ছিদ্র দিয়ে আলো ঘরে ঢুকলে তা সরল রেখায় যায়। কিন্তু এখানে আমি বলবো, আলো সরল রেখায় যায় না—লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, তবে সেই লাফানোটার আইন-কানুন রয়েছে। কোনও জায়গায় বেশী, কোনও জায়গায় কম নয়। ঠেটু একই। সূর্য্য থেকে যে উত্তমে বেরিয়ে আসে তার পর এত লক্ষ মাইল হেঁটে পৃথিবীতে এসেও সেই উত্তমই বজায় রাখে। এই যে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে আলোর গতি।

জলে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটা যেখানে জলের সাথে মিশবে, সেখান থেকে ঢেউর উৎপত্তি হয়ে বৃত্তাকারে দূর হতে দূরে, আরো দূরে চলে যায়। জলে ভাসমান ফুটবল কিংবা টয় বোটকে সরিয়ে অন্য পারে পৌঁছানো যায় যদি অনবরত ওদের গায়ে ঢিল ছোড়া হয় নয় ত পারে বসে বুদ্ধিমানের মত জল নেড়ে ঢেউ তোলা যায়।

সূর্য্য যে আলো দেয় তা'তেই এমন একটা জিনিষ রয়েছে যা অনবরত একই জায়গায় লাফাচ্ছে বা কাঁপছে। আর সেই কাঁপুনি বাতাসে যে অণু রয়েছে তা'তে হাত ধরাধরি করে নীচে পৃথিবীতে নেমে আসে। আমরা জানি, আলোর উৎস ঠিক একই জায়গায় স্থির শান্ত। কিন্তু আলোক-কণাগুলিও শান্ত নয়, যেন এক একটি মণি-হারা ফণী। তারা এমন ভাবে সেখানে বাঁধা কোনও দিকে ছুটে দিতে পারে না। তাই কেবল সেখানেই লাফালাফি করে ক্রোধ মেটাচ্ছে। তাদের রাগারাগি দেখে প্রতিবেশী বায়ু-কণাগুলিও ভাইদের জন্য অনুকম্পা দেখায়, তাই তারাও নাচতে থাকে। এ ভাবে শেষ পর্য্যন্ত একটা ঢেউ সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে আসে আলো—ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে।

ধর, ক্লাসে বসে আছ। ভাল ছেলে তাই বসবে প্রথম বেঞ্চির পয়লা। শেষ ঘণ্টা মানে ছুটির ঘণ্টা বাজতে ১০ মিনিট। বাড়ীর জন্য মন আন-চান! নোটিশ এল কালকে স্কুল বন্ধ। তখন ফ.র্ত্তিতে লাফিয়ে উঠবে, পাশেই কেষ্টাকে বলবে, 'হা রে কেষ্টা, কাল যে আমাদের ছুটি।' সে তোমার বলবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠবে, তার পরটি ইত্যাদি। তখন মাষ্টার মশাই—কেবল মাষ্টার মশাই কেন—দপ্তরীও দেখতে পাবে লক্ষ্য করলে যে তোমরা এক জন আর এক জনের জায়গায় উঠে যাও না তবুও কী যেন একটা ঢেউএর মত চলছে। সেটা ঢেউই, যদিও এ ঢেউ জলের ঢেউ নয়। ইংরেজী ভাষায় তাকে আমরা বলি ফেজ (phase)। তারের বেলায়ও ঠিক তাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রথমটাতে তার অবলম্বন আর দ্বিতীয়টাতে হয়েছো তুমি ও তোমার ক্লাসের বন্ধুরা। আলোর বেলায়ও আলো-কণা আর বায়ুকণা আর তাদের প্রত্যেকের বন্ধুদের সহযোগিতা। এখন বুঝতে পারলে যে অণুগুলি স্ব স্ব স্থানেই রয়েছে প্রতিষ্ঠিত, চলছে কেবল তাদের অবলম্বন করে একটা আলোর ঢেউ। কেউ কেউ যারা বেশী বুদ্ধিমান, প্রশ্ন করে বসবে যে সূর্য্য থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত পথটুকুতে তো বায়ু নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, আলো ভেকুয়ামেও আসতে পারে তবে সেখানেও কোন একটা মিডিয়ম রয়েছে যাকে তাঁরা বলেন ঈথর (Ether)। আর সে জায়গায় বায়ুকণা হলো ঈথর-কণা।

আলোর গতির যে ঢেউ দেখেছ এদের একটির শীর্ষ থেকে আর একটি শীর্ষের দূরত্বকে বলে ওয়েভ লেংথ (wave length)। এই দূরত্বটুকু এত ছোট যে চোখে ধরা পড়ে না। তাই আলোর সরল গতি বললে বেয়াদপি হবে তা নয়, তবে ভুল হবে।

চিন্তা

শ্রীমতী প্রীতি নস্কর

পিছনের দিনগুলি অন্ধকারে কুয়াসার মতো
মনের গভীরে ফেরে নিরুদ্বেগে দৃষ্টি-অগোচরে,
ধীরে ধীরে মুছে যায় বাসনার কালো কালি যতো,
পুঞ্জ-পুঞ্জ ক্লান্তি জমে রজনীর তুষ্ট স্বপ্ন ভ'রে।

জীবনের মতো চাওয়া কি জানি কি অর্থ ছিল তার,
কি এসেছে কি আসেনি সে হিসাব হয়নি তো ঠিক,
আজিও সে রচিতেছে নিজ হাতে নিজ কারাগার
পথে পথে জমে রাত্রি, ঊর্দ্ধশ্বাসে ফেরে দিগ্বিদিক্।

চপল চোখের দিঠি যৌবনের উচ্ছ্বসিত হিয়া
অ-ধরার যাদুমন্ত্রে অকারণে জাগে ও ঘুমায়,
নিভৃতের পুষ্পগুলি ঘ্রাণ-বাষ্পে পড়ে মুরছিয়া
দিগন্তের নীল প্রান্তে অতন্দ্রিত পলক হারায়।

চাহিতেছে অর্থশূন্য বিড়ম্বিত ক্ষুব্ধ ক্ষণগুলি
রেখাপাত করিবারে অসীমের পটভূমিকায়।
বিফল সঞ্চয় যত স্মৃতির পসরা পরে তুলি,
স্তূপ বাঁধে মন্থরতা সায়াহ্নের অস্পষ্ট ছায়ায়।

এম, ডি, ডি,

আই, এফ, এ, শীল্ড-প্রতিযোগিতা :—

বহু টাল-বাহনার পরে শেষ পর্য্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেও এবং ফুটবল মরশুমের প্রান্তসীমায় আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ শীল্ড চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরভ্যুত্থানে শীল্ড-প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়। প্রথম প্রচেষ্টায় না কি ২৪টি স্থানীয় দল, অবিভক্ত বাঙলা আমলের ১৪টি জেলা এসোসিয়েশন এবং ১০টি বহিরাগত দলের আবেদন-পত্র দাখিল হয়। এই সময়ে সহরে অশান্তি দেখা দেওয়ায় সমষ্টিভাবে এবং আগন্তুক অতিথিদের পর্য্যাপ্ত আহার ও উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার অসুবিধার জন্য আই, এফ, এ, এই সমস্ত আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯টি স্থানীয় ও নিখিল বঙ্গ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজিত জেলা দল দুইটিকে লইয়া আই, এফ, এ-শীল্ডের ক্রীড়ানুষ্ঠি প্রস্তুত হয়।

যথারীতি অনুষ্ঠানের পরে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ফাইন্যালে পৌঁছে। ফাইন্যাল খেলার দিন এক অভূত-পূর্ব্ব ঘটনার উদ্ভব হয়। বাঙলার ক্রীড়া-পরিচালক ও দর্শকদের এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। খেলার বহু পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খল জনতার একাংশ মাঠের বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে; ফলে নির্দ্দিষ্ট আসনে অবাঞ্ছিত লোক বসায় মাঠে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ খেলা বন্ধ রাখার সংবাদ মাইক মারফৎ প্রচারিত করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার চরম হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বহু বিলম্বিত ষ্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হইলে ফুটবল-পাগল দর্শকদের দুর্দ্দশার শেষ হইবে না। শুধু তাহাই নহে, এ বিষয়ে আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষকেও অবহিত হইতে হইবে। তাহাদের টিকিট বিক্রয় ও বণ্টন-ব্যবস্থা অতীতেও বহু তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছে। খেলার মাঠের পবিত্রতা অটুট রাখিতে হইলে দর্শক ও প্রদর্শক উভয়কেই নির্ভরশীল, সহিষ্ণু এবং নিষ্কলুষ হইতে হইবে। আর ক্লাব-প্রীতির উৎকট আবেগ অথবা খেলা দেখার অদম্য আগ্রহ—কোন কিছুই যেন নাগরিক জীবনকে বিপন্ন করিবার সুযোগ না পায়। ১৫ই নভেম্বর ফাইন্যাল খেলা হইবার কথা আছে। আশা করি সেই দিন কোনরূপ গণ্ডগোল হইবে না।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা :—

আই, এফ, এ, শীল্ডের ন্যায় নিখিল ভারত ও আন্তঃ-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান লইয়াও গণ্ডগোল বাধে। আসর নির্ব্বাচন একটি প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়, শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রতি-যোগিতা কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর মোট ১১টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিব্যাপ্তির ফলে এবং স্থানীয় অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য হায়দ্রাবাদ ও দিল্লী শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিতে পারে নাই। এ বৎসর শেষ পর্য্যায় মিলিত হয় বাঙলা (আই, এফ, এ), বোম্বাই (ডব্লিউ, আই, এফ, এ)। সূচনা হইতে অনুষ্ঠিত এ যাবৎ পাঁচ বৎসরেই বাঙলা শেষ পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা যথাক্রমে ১৯৪১ সালে দিল্লীকে ও ১৯৪[illegible] সালে বোম্বাইকে পরাজিত করে। ১৯৪৪ সালে [illegible]র নিকট ও ১৯৪৬ সালে মহীশূরের নিকট পরাভব [illegible] লইতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ ও ৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের বিশৃঙ্খলার জন্য এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। বোম্বাই দল এ বৎসর ভাল খেলিয়াও বাঙলার নিকট সন্দেহজনক গোলে পরাজিত হয়। প্রথম দিনের খেলায় কোন পক্ষ গোল করিতে না পারায় খেলা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনে প্রতীয়মান অফসাইড হইতে দেওয়া গোলে বাঙলা কোন ক্রমে জয়লাভ করে। খেলার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বোম্বাই দল অধিকতর কৃতিত্বের সন্ধান দেয়। তাহাদের খেলায় সরাসরি আক্রমণাত্মক প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। শারীরিক শক্তি ও দৈহিক যোগ্যতা যে ফুটবল খেলায় কতখানি প্রয়োজন তাহা বাঙলার খেলোয়াড়গণ বোম্বায়ের বিরুদ্ধে খেলিয়াই আশা করা যায়, কিছুটা উপলব্ধি করিয়াছেন। অবশ্য বাঙলা ফাইন্যালে তাহার পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করিতে পারে নাই। আপ্পা রাওএর শারীরিক অসুস্থতা এবং ইষ্টবেঙ্গলের অন্যান্য কয়েক জন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের আকস্মিক অসুস্থতা-জনিত অসহযোগে বাঙলা দল যথেষ্ট হীনবল হইয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা অনুতাপের বিষয় যে, যেখানে প্রদেশগত মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা বিপন্ন হয় সেখানেও আমাদের দলাদলির শেষ নাই। আর আমাদের খেলার ব্যাপারে দল-নির্ব্বাচন ব্যাপার একটা বিরাট সমস্যা। দলবিশেষের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হীন প্রচেষ্টাও অনেক সময় এই সকল ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত করে।

এ বৎসরের প্রতিযোগিতার ফলাফল :—প্রথম রাউণ্ড—বিহার (১) উড়িষ্যা (০), দ্বিতীয় রাউণ্ড—মহীশূর (২), আসাম (১), বোম্বাই (৫), বিহার (১), বাঙলা (৭), মাদ্রাজ (০), যুক্তপ্রদেশ (৬) ত্রিবাঙ্কুর (০)।

সেমি ফাইন্যাল :—বোম্বাই (১), মহীশূর (০), বাঙলা (৫), যুক্ত-প্রদেশ (১)।

ফাইন্যাল :—বাঙলা (১), বোম্বাই (০)।

উপরোক্ত তালিকা হইতে ফুটবলে বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা কতকটা আন্দাজ করা যায়। বাঙলা, বোম্বাই এবং মহীশূর ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশের ফুটবল সম্বন্ধে আশা করিবার কিছু নাই। বস্তুতঃ, নিখিল ভারতীয় ফুটবল দরবারের যে চিত্র এবার আমাদের দেখানো হইয়াছে, তাহাতে নিখিল বিশ্ব অলিম্পিকে দল প্রেরণের পরিকল্পনা বাতুলতার নামান্তর মাত্র। অবশ্য কর্তৃপক্ষ বলিবেন যে, এই জাতীয় সফর ভারতীয় খেলোয়াড়গণের জন্য শিক্ষার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু যাহাদের দেশীয় নিজস্ব শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক ভাবধারায় পুষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টায় কি লাভ হইবে?

নিখিল ভারত ফুটবল কর্তৃপক্ষ এই উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ দল গঠনের জন্য একটি বাছাই দলের ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সফরকামী দলের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গোল—বরদরাজ (মহীশূর), সজীব (বোম্বাই), ভি সেন (বাঙলা), ও পি মুস্তফী (বাঙলা)।

ব্যাক—এস মান্না (বাঙলা), এক আমেদ (বাঙলা), প্যাপেন (বোম্বাই), ব্যানার্জী (বিহার), চন্দ্রশেখরম্ (ত্রিবান্দ্রম), কাজিম (যুক্তপ্রদেশ) ও ম্যাম্বুয়েল (বোম্বাই)।

হাফ-ব্যাক—মহাবীর (বাঙলা), টি আও (বাঙলা), ডি চন্দ্র (বাঙলা), আজিজ (যুক্তপ্রদেশ), গোবিন্দ (বোম্বাই), সম্মুখম (মহীশূর), বসির (মহীশূর) ও এস ব্যানার্জী (আসাম)।

ফরোয়ার্ড—আর দাস (বাঙলা), সেওয়ালাল (বাঙলা), সুনীল ঘোষ (বাঙলা), এস নন্দী (বাঙলা), আবিদ (যুক্তপ্রদেশ), বেচান (উড়িষ্যা), পরব (বোম্বাই), ভনমন্ত রাও (মাদ্রাজ), রমন (মহীশূর), ভেঙ্কটেশ (মহীশূর) ও ভীমরাও (বোম্বাই)।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর :—

ভারতীয় ক্রিকেট দল ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্র অষ্ট্রেলিয়ার পথে বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে যাত্রা করিয়াছে। ভারতীয় দল নির্ব্বাচিত হওয়ার পরে শোনা যায় যে, মার্চেন্ট রোগে কাতর। তাঁহার পক্ষে এই প্রথম অভিযানে স্বদেশী ক্রিকেট দলকে সহায়তা করা অসম্ভব। যাত্রার অব্যবহিত প্রাক্কালে জানা গেল, ব্রাসী মোদী মুস্তাক আলী এবং গোলাম আমেদ ও যাইতে পারিবেন না বোর্ডের সভাপতি ও সেক্রেটারী মিলিয়া দলপতির সম্মতিক্রমে রঙ্গাচারী (মাদ্রাজ), রণবীর সিংজী (নবনগর), সর্ব্বাতে (ইন্দোর) ও রায়সিং (পাতিয়ালা)—এই চার জন খেলোয়াড়কে শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য নির্ব্বাচিত করেন। এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ক্রিকেট-বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডিমেলোর এইরূপ ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়া বহুদর্শী ক্রিকেট খেলোয়াড় ও বহু ক্রিকেটারের গুরু অধ্যাপক দেওধর সহসভাপতির পদে ইস্তাফা দেন।

ভারতীয় দল ৮ই অক্টোবর বিমান-যোগে কলিকাতা ত্যাগ করে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত তিনটি খেলাই অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানগণের মধ্যে অমরনাথ, হাজারী ও মানকড় ব্যতীত সকলেই চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। মানকড় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'চৌকষ' খেলোয়াড়ের প্রতিষ্ঠা লাভের যে যোগ্য, তাহার প্রমাণ এই সফরে ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অমরনাথ একটি সেঞ্চুরী ও একবার ডবল সেঞ্চুরী করিয়া দৃঢ় ব্যাটিংয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলায় তাহার জয়-জয়কার। অমরনাথকে ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার সমালোচকগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য তাহার অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা গেলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাকে 'ভাঙা হাটে বাজার' বসাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম খেলা :—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিন দিন-ব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। প্রথম দিনে বৃষ্টির জন্য মাত্র ৩৩ মিনিট খেলা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় দিনে খেলা সম্পূর্ণ ভাবে স্থগিত থাকে। তৃতীয় দিনে উভয় দলের বোলারগণ প্রাধান্য বিস্তার করে। অষ্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয়গণের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

রাণ-সংখ্যা—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১৭১ (এডওয়ার্ডস ৪১, বার্ড ৩৪, মানকড় ৬৮ রাণে ৫টি)।

২য় ইনিংস—৪ উইকেটে ৭০ (ওয়াট নট-আউট ৩৪, অমরনাথ ১১ রাণে ২টি)।

ভারতীয় ক্রিকেট দল—১ম ইনিংস—১৭১ (এডওয়ার্ডস হার্কার্ট ৪৫ রাণে ৭টি)।

দ্বিতীয় খেলা :—অষ্ট্রেলিয়া সফরকামী ভারতীয় দলের দ্বিতীয় খেলাটি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পতন হয় মোট ২২৬ রাণে। প্রথম তিন জন খেলোয়াড় প্রত্যেকে শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হয়। ব্র্যাডম্যান মোট ৮ উইকেটে ৫১৮ রাণে ইনিংস ঘোষণা করে। বিপর্য্যয়মূলক সূচনার পরেও ভারতীয় দল হাজারী (১৫), অমরনাথ (১৪৪) ও সর্ব্বাতের (৪৭) সাহচর্য্যে অবস্থার প্রভূত উন্নতি করে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ ও মানকড় নট আউট থাকিয়া যথাক্রমে ১৪ ও ১১৬ রাণ করে। পঞ্চম উইকেটে জুটিতে ইহারা ১৭৫ রাণ সংগ্রহ করে।

রাণ-সংখ্যা :—

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৮ উইকেটে ৫১৮ (নীহাস ১৩৭, ক্রেগ ১০০, ব্র্যাডম্যান ১৫৬, মানকড় ১২৭ রাণে ৪টি, সর্ব্বাতে ৮৩ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২১১ (নীহাস ৪১, নোবলেট নট আউট ৫০, ফাডকার ৫১ রাণে ৪টি, মানকড় ৫১ রাণে ৩টি)।

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—৪১৫ (অমরনাথ ১৪৪, হাজারী ১৫, সর্ব্বাতে ৪৭, নোবলেট ৬৫ রাণে ৩টি, অসওয়াল্ড ৭০ রাণে ২টি)।

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ২৩৫ (মানকড় নট আউট ১১৬, অমরনাথ নট আউট ১৪, অনিল ৪০ রাণে ২টি, নোবলেট ৪৮ রাণে ২টি)।

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ভিক্টোরিয়ার চারি দিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর আন্তঃপ্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পরিচয় মোটের উপর নৈরাশ্যজনক হয় নাই। ভারতীয় দল প্রথমে খেলিয়া সর্ব্বসমেত ৪০ রাণ করে। অমরনাথ শেষ পর্য্যন্ত অপরাজিত থাকিয়া ব্যক্তিগত ২২৮ রাণ করে। অষ্ট্রেলিয়াতে অমরনাথ প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট-সফরে সেঞ্চুরী ও ডবল সেঞ্চুরী সম্পাদন করিয়া দলপতির যোগ্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সর্ব্বাতে, আমীর এলাহী ও নাইডু তাহার সহযোগিতা করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৩ রাণে অগ্রগামী থাকিয়াও ভারতীয় দল সুবিধা করিতে পারে নাই। চতুর্থ দিনে আলোর অভাবে ও বৃষ্টির জন্য চা-পানের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে খেলা বন্ধ করিতে হয়।

রাণ সংখ্যা :—ভারতীয় দল—১ম ইনিংস ৪০৩ (অমরনাথ নট আউট ২২৮, নাইডু ৫৮, আমীর এলাহী ৪৬, জনষ্টন ৫৬ রাণে ৩টি, জনসন ১০৮ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—২০৩ (হাজারী ৮৩, মানকড় ৫১, জনষ্টন ১৪০ রাণে ৩টি, জনসন ৫৭ রাণে ৩টি)।

ভিক্টোরিয়া—১ম ইনিংস—২৭৩ (নীল হার্ভে ৮৭, লক্সটন ৭৭, কাদার গিল ৫৪, মানকড় ৫৫ রাণে ৪টি, রঙ্গচারী ৫৪ রাণে ২টি)।

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ১২৮ (হ্যাসেট নট আউট ৩৭, লক্সটন নট আউট ৩৫)।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে—

যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, গত দুই বৎসরে সেই উদ্দেশ্যের পথে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনের ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। দুই মাস হইল সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব হয় নাই। 'ক্ষুদ্র পরিষদ' গঠন শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। অধীন দেশগুলি সম্পর্কে ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিলের জন্য অনুরোধ করিয়া ভারত যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং কানাডা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায়, এই প্রস্তাবের কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাশিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি নূতন বলকান তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং গ্রীস হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের জন্য পোল্যাণ্ড যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা ৩৪—৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে ট্রাষ্টিশিপ চুক্তি দাখিলের প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, দক্ষিণ-আফ্রিকা যে তাহা মানিয়া লইবে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকা বিরোধের মীমাংসার জন্য গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার প্রস্তাবেও দক্ষিণ-আফ্রিকা রাজী নয়। ডাচ-ইন্দোনেশিয়া বিরোধের মীমাংসার কোন সূত্রও এখন পর্য্যন্ত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ বাহির করিতে পারে নাই। আয়ার, পর্ত্তুগাল, ট্রান্সজর্ডান, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরীকে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সদস্য করা সম্পর্কে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি, তাহারও কোন মীমাংসা সম্ভব হইতেছে না। যুদ্ধের প্রচার-কার্য্যের নিন্দা করিয়া এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী-সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস ও তুরস্ক যুদ্ধের প্ররোচনা দিতেছে বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল বিপুল ভোটাধিক্যে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কা নির্ম্মূল হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আমেরিকা যে গোপনে সমর আয়োজন করিতেছে তাহা একেবারে গোপন রাখা সম্ভব হয় নাই। জাপানে যে পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাও ৫০ গুণ অধিক শক্তিশালী পরমাণু বোমা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র তৈয়ার করিয়াছে। রোগ-বীজাণু ছড়াইয়া দিবার একটি গোপন অস্ত্রও আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে। এই অস্ত্র যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হইবে, সেই অঞ্চলে না কি এক হাজার বৎসর কোন জীবজন্তু বাস করিতে পারিবে না। মার্কিণ নৌবহরের রিয়ার এডমিরাল এলিস জাকারিয়াস এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কসমিক রশ্মি ব্যবহারের উপায় খুঁজিতেছে এবং রকেট অস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতেছে। রাশিয়া পরমাণু বোমা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কি না, এই প্রশ্ন অনেকেরই শিরঃপীড়া সৃষ্টি করিয়াছে। গত ৭ই নভেম্বর রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলটভ বলেন যে, পরমাণু বোমা রহস্য আর গোপন বিষয় নহে। ইহা সত্য কি না মঃ ভিসিনাস্কিকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি একটু হাসিয়া উত্তর দেন, 'বোধ হয় তাই।' লণ্ডনের সমর বিভাগ বলেন যে, রাশিয়া যে পরমাণু বোমার পরীক্ষা করে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, পৃথিবীর যে কোন স্থানেই পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ হউক না কেন তাহা টের পাওয়ার মত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্যারীর সান্ধ্য সংবাদপত্র 'L' Intransigcant'-এর মস্কোস্থিত সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, গত ১৫ই জুন রাশিয়া সাইবেরিয়ার সুদূর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করিয়াছে।

জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন আরম্ভ হইবার দিন আগাইয়া আসিতেছে। ইতি মধ্যেই পররাষ্ট্র সচিবদের ডেপুটীরা লণ্ডনে সমবেত হইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনের ভবিষ্যৎ কেহই বড় আশাপ্রদ বলিয়া মনে করেন না। লণ্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হইলে তাহার পরিণাম পৃথিবীর শান্তিরক্ষার পক্ষে অনুকূল হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইটালীর উপনিবেশ লইয়াও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। ইটালীর উপনিবেশগুলি সম্পর্কে চারি শক্তির তদন্ত কমিশন 'সরেজমিনে' তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাথমিক তদন্ত-কার্য্য ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে সম্পন্ন হইবে না। কমিশনারগণ সকলে একমত হইতে পারিবেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ ইটালীর উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে কতটুকু সাহায্য করিবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কোরিয়ার ভাগ্য এবং জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্তের আলোচনা লইয়া যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধানের সম্ভাবনাও অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইতেছে না। সমস্ত বিষয়েই পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের রাশিয়ার সঙ্গে মতভেদ পূর্ব্বের মতই গভীর ও ব্যাপক হইয়াই রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র পরিষদ—

গত ৭ই নবেম্বর জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আনীত 'অন্তর্বর্ত্তী কমিটি' বা 'ক্ষুদ্র পরিষদ' (Little Assembly) গঠনের প্রস্তাব ৪৩—৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান, সৌদী আরব এবং এল স্যালভেডোর এই ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন। রাশিয়া, ইউক্রেন, বাইলো রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, এই ছয়টি রাষ্ট্র বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ভোট গ্রহণের পর মঃ ভিসিনস্কী ঘোষণা করেন যে, অন্তর্বর্ত্তী কমিটি গঠন জাতিপুঞ্জ-সনদকেই অগ্রাহ্য করা। রাশিয়া এই কমিটির কার্য্যে যোগদান করিবে না। রুশ-প্রতিনিধির এই ঘোষণার পরেই ইউক্রেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বাইলো রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া অন্তর্বর্ত্তী কমিটি বর্জ্জনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ৫৫টি রাষ্ট্রের 'ক্ষুদ্র পরিষদ' রাশিয়া ও অপর পাঁচটি রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও গঠিত হইল বটে, কিন্তু এই 'ক্ষুদ্র পরিষদ' সত্যিকার কোন কাজে লাগিবে এরূপ ভরসা করা কঠিন। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ক্ষমতাকে খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 'ক্ষুদ্র পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন দল-বল লইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতার সম্মুখে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা একেবারেই শক্তিহীন। গত ১৩ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদ ক্ষুদ্র পরিষদ গঠন অনুমোদন করিয়াছেন।

অন্তর্বর্ত্তী কমিটি আসলে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। জাতিপুঞ্জ-সনদের ৫২ ধারা অনুসারে এই কমিটির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। উহার অধিবেশন বরাবরই চলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে-সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বেই নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয় নাই, সেইগুলিই শুধু অন্তর্বর্ত্তী কমিটিতে উত্থাপন করা চলিবে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা নির্দ্দেশ দেওয়ার কোন ক্ষমতা উহার থাকিবে না। এই কমিটি সাধারণ পরিষদের নিকট শুধু সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারিবে। এই অবস্থায় অন্তর্বর্ত্তী কমিটি পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে কতটুকু সমর্থ হইবে তাহা কি সত্যই সন্দেহের বিষয় নহে? এইরূপ কমিটী গঠন জাতিপুঞ্জ-সনদের বিধি-বহির্ভূত, এই অতি ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতে রাশিয়া 'ক্ষুদ্র পরিষদ' বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করায় উহা কি আরও অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই? রাশিয়া ইচ্ছা করিয়া জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ হইতে সরিয়া না দাঁড়াইলে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ হইতে রাশিয়াকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, রাশিয়াকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও রাশিয়া ভেটো দিয়া এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারিবে।

নিরাপত্তা পরিষদ তাহার অনেক দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু শুধু রাশিয়ার জন্যই নিরাপত্তা পরিষদ তাহার দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়াছে এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নাই। অথচ তাহারাই বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের ভেটো ক্ষমতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী। ইহা কি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে? বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মতৈক্য ব্যতীত যে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়, লীগ অব নেশানসের ব্যর্থতার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যর্থতার শিক্ষা হইতেই ভেটো ক্ষমতার সৃষ্টি, যদিও ইহা নেতি-বোধক ঐক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে তথা নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই দলে ভারী। কিন্তু রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতার জন্যই তাহারা যাহা খুশী তাহা করিতে পারিতেছে না। কাজেই বৃটেন ও আমেরিকার অনুপ্রেরণাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ভেটো ক্ষমতা তুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মধ্যে মতৈক্য ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করিতে গেলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নামে আবার আর একটি বিশ্বসংগ্রামকেই ডাকিয়া আনা হইবে মাত্র। রাশিয়া অনেক বার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছে সত্য, কিন্তু বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার অবস্থায় পড়িলে কি ঠিক রাশিয়ার মতই ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার করিত না, এবং ভবিষ্যতে করিবে না? পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নয়, রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করার জন্যই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠন করা হইল। এই উদ্দেশ্যও যে ক্ষুদ্র পরিষদ সিদ্ধ করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনাও কম। ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরোধের তীব্রতাই শুধু বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

শূন্যগর্ভ মার্শাল পরিকল্পনা—

মার্শাল পরিকল্পনা যে ভাবে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈষ্ণব কবির একটি উক্তি আমাদের মনে পড়িতেছে: 'উঁচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।' বস্তুতঃ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বৈদেশিক সাহায্য কমিটি (Committee on Foreign Aid) বা হ্যারিম্যান কমিটির রিপোর্ট পড়িয়া মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ১৬টি রাষ্ট্রের মনে এইরূপ আশঙ্কাই জাগিয়াছে। প্যারী-সম্মেলন ষ্ট্যাবিলিজেশন ফাণ্ডের জন্য ৩ শত কোটি ডলারের যে প্রস্তাব করিয়াছিল, হ্যারিম্যান কমিটি নিষ্প্রয়োজন বোধে তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। মার্শাল পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য এই কমিটি ৫৭৫ কোটি ডলার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। চারি বৎসরে এই পরিকল্পনা বাবদ হ্যারিম্যান কমিটি বরাদ্দ করিয়াছেন ১২০০ কোটি ডলার হইতে ১৭০০ কোটি ডলার। এই চারি বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। এই জন্যই বরাদ্দের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে ৫০০ কোটি ডলার। যে-সকল দেশ মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য পাইবে, তাহাদিগকে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, কমিটি এইরূপ সর্ত্ত আরোপের বিরোধিতা করিয়াছেন। মার্শাল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য কমিটি সম্পূর্ণ নূতন একটি এজেন্সী গঠনেরও প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্যারী-সম্মেলনে যে পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছিল, হ্যারিম্যান কমিটি তাহা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন। মার্কিণ কংগ্রেস যে আরও হ্রাস করিবে না, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। প্রথমতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য হ্যারিম্যান রিপোর্টে কোন ডলার বরাদ্দ করা হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে—বিশেষ করিয়া কানাডা ও আর্জ্জেণ্টিনা হইতে পণ্য ক্রয়ের অর্থের জন্য কোন পরিকল্পনাও

হ্যারিম্যান রিপোর্টে নাই। ইউরোপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন ব্যয়ের ব্যবস্থা না করিলে ১৯৩৮ সালের মানে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু হ্যারিমান রিপোর্ট এইরূপ মূলধন ব্যয় সমর্থিত হয় নাই। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা ইউরোপের ১৬টি দেশের আর্থিক উন্নতির তো সম্ভাবনা না-ই, অধিকন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব এই দেশগুলিকে দুর্গতির চরম সীমায় টানিয়া লইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিণ শিল্পের জন্ত যে সকল গুরুত্বপূর্ণ জরুরী উপাদান প্রয়োজন হইবে, এই দেশগুলিকে শুধু সেই সকল দ্রব্য উৎপাদন ও আমেরিকাকে সরবরাহ করিতে হইবে। সর্কোপরি মার্কিণ কংগ্রেস যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বর্জ্জনের সর্ত্তও আরোপ করিবে না, সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত মার্শাল পরিকল্পনা একটা শূন্যগর্ভ আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই হইবে না। মার্শাল পরিকল্পনা সম্বন্ধে রাশিয়ার আশঙ্কা যে অমূলক হ্যারিম্যান রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়াকে অন্তর্বর্ত্তী কালীন সাহায্য ৫৯ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিবার জন্ত কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে পরিমাণ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা তাহা অপেক্ষা কম। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৬৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দীর্ঘ-মেয়াদী যে সাহায্য দেওয়া হইবে তাহার জন্ত মিঃ মার্শাল ১৬০০ কোটি ডলার হইতে ২০০০ কোটি ডলার মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইউরোপের যাহা সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজন তাহার তিন-চতুর্থাংশেরও কম সাহায্য দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম যদি আরও বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কার্য্যতঃ সাহায্যের পরিমাণ আরও কম হইবে। যে-পরিমাণ সাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে, কংগ্রেস যে তাহাই মঞ্জুর করিবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়, মার্কিণ পুঁজিপতিরা তাহা চান না। আবার ইউরোপে কম্যুনিজম প্রসারের ভয়ও আছে। মার্কিণ পুঁজিপতিরা চান, কিছু কিছু ডলারের 'চার' ফেলিয়া ইউরোপকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বড়শীতে গাঁথিয়া তুলিতে। রাশিয়া যে মার্শাল পরিকল্পনাকে 'সাম্রাজ্যবাদের বীমাপত্র' (Insurance Policy for Imperialism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাহার সত্যতা ক্রমেই প্রমাণিত হইতেছে।

ফ্রান্স ও বৃটেনের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন—

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে ফ্রান্সে এবং নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে বৃটেনে যে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন হইয়া গেল, এই নির্ব্বাচনের ফল হইতে ফ্রান্স ও বৃটেন উভয় দেশেই রাজনৈতিক গতি-ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতে সুরু হইয়াছে তাহা কতকটা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। ফ্রান্সের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের প্রথম ভোটিংএ জেনারেল দ গল এবং তাঁহার দল Rassemblement du Peuple Francais (ফরাসী জনগণের সমাবেশ) শতকরা ৩৬টি ভোট পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভোটিংএর সময় তাঁহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৫০টি হইয়াছে। প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে জেনারেল দ গলের এই প্রথম যোগদান। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের সময় ইউনিয়ন গলিষ্ট দল নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া শতকরা ১৮টি ভোট মাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন এই দল জেনারেল দ গলের নেতৃত্বাধীনে নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন নাই। পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয়ের মস্কো সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর এপ্রিল মাসের (১৯৪৭) শেষ ভাগে Rassemblement du Peuple Francais গঠন করিয়া দ গল পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সোপান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এখানে ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম ভাগে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে বৃটেন যখন স্বাধীন ফ্রান্স আন্দোলনকে স্বীকার করিয়া লইল, তখন হইতেই বিশ্ববাসীর কাছে জেনারেল দ গলের নাম পরিচিত হইয়া উঠে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু প্রথমে এই হঠাৎ গজিয়ে-উঠা ফরাসী নেতাকে তেমন আমল দিতে চাহে নাই। বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ফরাসী দেশ নাৎসী কবল হইতে মুক্ত হওয়ার পর জেনারেল দ গলই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের প্রথমেই তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাঁহার পুনরভ্যুদয়ের মূলে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সমর্থন রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ফরাসী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়া তাঁহার নূতন দল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। গত মে মাসে বিলাতের কম্যুনিষ্ট পত্রিকা 'ডেইলী ওয়ার্কারে' এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আমেরিকার রাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারীরা 'ফ্রান্সের ভাবী ডিক্টেটর' জেনারেল দ গলের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। সংবাদে আরও বলা হইয়াছিল যে, ফ্রান্সকে নূতন ঋণ দেওয়া সম্পর্কে আমেরিকার আলোচনা যেমন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত চলিতেছিল, তেমনি পৃথক্ ভাবে আর একটি আলোচনা চলিতেছিল জেনারেল দ গলের সহিত।

ফ্রান্সের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে বিপুল ভাবেই হারিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই বিপুল হারটা হইয়াছে দ্বিতীয় ভোটিংএর সময়। এম-আর-পি এবং অন্যান্য প্রার্থীরা কম্যুনিষ্টদিগকে হারাইবার জন্ত আর-পি-এফএর অনুকূলে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করায় জেনারেল দ গলের দল অধিক সংখ্যক সদস্যপদ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফ্রান্সের বড় বড় সহরের মিউনিসিপালিটিতে মেয়রের পদ দখল করা কম্যুনিষ্ট সদস্যদের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের শেষে জেনারেল দ গল ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি জাতীয় পরিষদ (National Assembly) ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের দাবী করিবেন। নূতন নির্ব্বাচনের পক্ষে জাতীয় পরিষদে শতকরা ৫০টি ভোটের অধিক হইলেই নূতন নির্ব্বাচন হইতে পারে। কিন্তু গত ৩০শে অক্টোবর জাতীয় পরিষদ রামাদিয়েরের গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে আস্থাজ্ঞাপক ভোট গৃহীত হওয়ায়, শীঘ্র নূতন নির্ব্বাচন হওয়ার কোন ভরসা নাই। দ্বিতীয় ভোটিং-এ আর-পি-এফ বিপুল জয়লাভ করিলেও বিভিন্ন দলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতার ভিত্তিতে ভোট সম্বন্ধে চুক্তি

হওয়ার ফলেই শুধু এই জয় সম্ভব হইয়াছে। প্রথম ভোটিংএর ফল আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রতি ১০ জন ভোটদাতার মধ্যে তিন জন কম্যুনিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্ট-সমর্থক এবং দুই জন সোস্যালিষ্ট। উভয় দলেরই শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উভয় দল মিলিয়াই ফরাসী জাতির অর্দ্ধেক। কিন্তু সোস্যালিষ্টদের কম্যুনিষ্ট বিরোধিতাও সর্ব্বজনবিদিত। দস্যু রত্নাকরই শেষে বাল্মীকি হইয়াছিলেন, সল (Saul) হইয়াছিলেন সেণ্ট পল। সোস্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদীরাও শেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীতে পরিণত হইয়া থাকেন। সোস্যালিষ্ট দলের এই অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার জন্য এবং মার্কিণ ডলার তথা মার্শাল পরিকল্পনার চাপে সোস্যালিষ্ট দলে ভাঙ্গন ধরিয়া কতক যদি দ্য গলের দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ব্বাচন হওয়া অসম্ভব কিছু হইবে না। নূতন নির্ব্বাচন হইলে দ্য গল শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের দাবী লইয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন এবং জয়লাভ করিলে গোঁড়া দক্ষিণ-পন্থীদের একনায়কত্ব মূলক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে দেখা যায়, রক্ষণশীল দল ১৭টি আসন হারাইয়াছে, কিন্তু লাভ করিয়াছে ৬৩১টি আসন। শ্রমিকদল লাভ করিয়াছে মাত্র ৪২টি আসন, কিন্তু ৬৩৮টি আসন হারাইয়াছে। উদারনৈতিক দল ৪৬টি আসন লাভ করিয়াছে এবং ৪৬টি আসন হারাইয়াছে। স্বতন্ত্র দল ১৩৪টি আসন হারাইয়াছে এবং লাভ করিয়াছে ১৭০টি আসন। কম্যুনিষ্ট দল একটি আসনও লাভ করেন নাই, অধিকন্তু ১টি আসন হারাইয়াছেন। বৃটেনের বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের অভূতপূর্ব্ব জয়লাভ অপেক্ষাও এই মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের এইরূপ বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ অধিকতর অপ্রত্যাশিত বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছে। এমন কি টোরী দলও এত বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করার আশা করেন নাই। প্রতি বৎসর বৃটেনের মিউনিসিপাল ও বোরো (Borough) কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ খালি হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল ও বোরো কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সত্ত্বেও শ্রমিক দলের পক্ষে ৬৩৮টি আসন হারাণ কি সূচনা করে, তাহা শ্রমিক দলের পক্ষে বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করিবার বিষয়। গত দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিক দল গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে পার্লামেণ্টের একটি আসনও তাঁহারা হারাণ নাই, এ কথা খুবই সত্য। এবং এ কথাও সত্য যে, মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনটা শুধু স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ঘটিত ব্যাপার। তথাপি এই মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের মধ্যে বৃটেনের জনমত দক্ষিণপন্থীর দিকে ঝুঁকিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি? শ্রমিক দলের ক্ষমতা লাভকে অধ্যাপক লাস্কী 'revolution by consent'—সম্মতি দ্বারা বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন কি এই বিপ্লবকে ম্লান করিয়া দেয় নাই? কেন এমন হইল, এই প্রশ্ন আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে।

মিউনিসিপাল অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোটারের সংখ্যাই বেশী। তাঁহাদের ভোটের ফলেই মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ইহাই বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার অভিমত। ইহা সত্য হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। টোরী দল এই মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন, ইহাও খুব স্বাভাবিক। তাঁহারা শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। টোরী দলের চেয়ারম্যান লর্ড উল্টন বলিয়াছেন, "I believe that the Government should recognize that the House of Commons no longer represent the political conviction of the democracy and should seek another mandate." অর্থাৎ 'আমার বিশ্বাস, কমন্স সভা বর্ত্তমানে আর জনগণের রাজনৈতিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে না। সুতরাং এখন নূতন নির্দ্দেশ গ্রহণ করা প্রয়োজন।' মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকল দেশেই দোদুল্যচিত্ততার জন্য বিখ্যাত। টোরী পার্টির প্রচারকার্য্য এবং গত শীতকালে জ্বালানীর অভাবের জন্য তাহাদের মনোভাব শ্রমিক দল-বিরোধী হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় নহে। অবশ্য ইহার জন্য শ্রমিক দলের নীতিও যে কতক পরিমাণে দায়ী তাহাতেও সন্দেহ নাই। শ্রমিক দল যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা প্রায় টোরী দলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়ায় বিপদ এইখানেই। শ্রমিক দল বৃটেনের জনগণের দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে পারেন নাই, এদিকে সাম্রাজ্যও হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোটারদের কাছে টোরী দলের এই যুক্তি অকাট্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। বৃটেনে শীঘ্রই সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, তাহা মনে হয় না। তবে আসন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কট আগামী মাসেই প্রবল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা। এই সঙ্কট শ্রমিক দল কি ভাবে পাড়ি দেন তাহার উপরেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিবে। সম্মুখে যে পাঁচটি উপ-নির্ব্বাচন হইবে তাহার মধ্যেও শ্রমিক দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

লর্ড সভার ক্ষমতা—

বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভা লর্ড সভার ক্ষমতা আরও হ্রাস করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে সিদ্ধান্ত করায় কমন্স সভা ও লর্ড সভার মধ্যে বহু পুরাতন ঝগড়ারই শুধু পুনরুজ্জীবন হয় নাই, বৃটেনের অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যও সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৪৫ সাল নূতন নির্ব্বাচনের পর বৃটিশ পার্লামেণ্টের তৃতীয় বার্ষিক উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২১শে অক্টোবর ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার বক্তৃতায় অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "Legislation will be introduced to amend the Parliament Act, 1911." অর্থাৎ '১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন সংশোধন করিবার জন্য বিল উত্থাপন করা হইবে।' ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্যান্য বিলকে আইনে পরিণত করার ব্যাপারে লর্ড সভা দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটাইতে পারেন। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট লর্ড সভা বিলোপের কোন অভিপ্রায় করেন নাই। কেবল কোন বিল পাশের ব্যাপারে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিলম্ব করাইতে লর্ড সভার যে ক্ষমতা আছে তাহা সঙ্কোচ করিয়া এক বৎসর করাই শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনও পার্লামেণ্টের বৃটিশ জনগণের প্রতিনিধি ও কায়েমী স্বার্থবাদী স্থায়ী সদস্য লর্ডদের মধ্যে সুদীর্ঘ

বিরোধের পরিণতি স্বরূপেই প্রণীত হইয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা মোটামুটি কয়েকটি বিষয় মাত্র এখানে উল্লেখ করিব।

চলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণ ব্যাপারে লর্ড সভা বিলম্ব ঘটাইবার চেষ্টা করিবার পর শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ছুইটি পথ মাত্র খোলা আছে। হয় লর্ড সভায় শ্রমিক লর্ডের সংখ্যা এই পরিমাণ বর্দ্ধিত করা আবশ্যক যে, টোরী ও উদারনৈতিক লর্ডরা বাধা দিয়া আইন পাশ করা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না, না হয় লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করিতে হয়। প্রথম পথটি গ্রহণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বর্ত্তমানে লর্ড সভার সদস্য-সংখ্যা ৮৪০ জন। তন্মধ্যে ৮ শত জনই বিরোধী দলভুক্ত। কাজেই অন্ততঃ ৭ শতের অধিক নূতন শ্রমিক লর্ড সৃষ্টি করিতে না পারিলে লর্ড সভায় শ্রমিক দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। এক সময়ে নূতন লর্ড সৃষ্টির হুমকীতেই লর্ড সভা অনেকটা সংযত হইয়া চলিতেন। কিন্তু ৭ শত শ্রমিক লর্ড সৃষ্টি তাঁহারা হয়ত অবাস্তব ব্যাপার বলিয়াই মনে করিবেন, যদিও নূতন লর্ড সৃষ্টি নূতন কথা কিছু নয়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে টোরী গবর্ণমেণ্ট যখন বৃটেনের কর্ণধার তখন ইউট্রেচ্টের সন্ধিসর্ত্ত পাশ করাইয়া লইবার উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত রাজ্ঞী অ্যানে ১২ জন নূতন টোরী লর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লর্ড সভার সঙ্গে কমন্স সভার বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে ১৮৩২ সালে রিফরম্ বিলের সময়। বৃটেনে তখন উদারনৈতিক দলের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। নূতন লর্ড-সৃষ্টির হুমকীতেই লর্ড সভা সংযত হইয়াছিলেন এবং এই বিল পাশের ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করেন নাই। তার পর দীর্ঘ ৬০ বৎসর পরে আবার এই বিরোধ মাথা চাড়া দিয়া উঠে ১৮৯৩ সালে গ্ল্যাডষ্টোনের আইরিশ হোমরুল বিলের ব্যাপারে। কমন্স সভার সমস্ত স্তরেই এই বিলটি পাশ হইলেও লর্ড সভা বিলটি বাতিল করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৪ সাল হইতে উদারনৈতিক দল আর গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারেন নাই। কাজেই লর্ড সভা ও কমন্স সভার বিরোধটাও ধামাচাপা ছিল। উদারনৈতিক দল আবার ক্ষমতা পান ১৯০৬ সালে। ঐ সময় হইতে লর্ড সভা ও কমন্স সভার বিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীব্র হইয়া উঠে। ১৯০৬ সালে লর্ড সভা শিক্ষা বিল এবং প্লুরেল (Plural Voting) ভোটিং বাতিল করিয়া দেন। ১৯০৭ সালে ভূমি-সংক্রান্ত কয়েকটি বিল লর্ড সভা কর্ত্তৃক নাকচ হয়। ১৯০৮ সালে লর্ড সভা লাইসেন্সিং বিল বাতিল করেন। অবশেষে উহা চরমে উঠিল ১৯০৯ সালে লর্ড সভা যখন লয়েড জর্জের বাজেট পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দিলেন। কমন্স সভা ও লর্ড সভার মধ্যে একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি' ছিল যে, লর্ড সভা অর্থসংক্রান্ত কোন বিলে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বাজেট অগ্রাহ্য করার এই ভদ্রলোকের চুক্তি লঙ্ঘন করা হইল। এই অবস্থায় লর্ড সভার ক্ষমতার প্রশ্ন লইয়া উদারনৈতিক দল ১৯১০ সালে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, অর্থাৎ এই প্রশ্ন লইয়াই ১৯১০ সালে নূতন নির্ব্বাচন হইল। নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে উদারনৈতিক দল ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন যে, যদি উদারনৈতিকরা ক্ষমতা পান এবং লর্ড সভা-সংস্কার আইনে ভেটো দেন, তাহা হইলে বিল পাশ করাইবার জন্ত রাজা উপযুক্ত সংখ্যক লর্ড সৃষ্টি করিবেন। নির্ব্বাচনের পর উদারনৈতিক দলই মন্ত্রিসভা গঠন করেন, জনগণের দাবীর সম্মুখে লর্ড সভাকে মাথা নত করিতে হয় এবং ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিতে লর্ড সভা কোন আপত্তি করেন নাই। এই আইন অনুসারে লর্ড সভা অর্থসংক্রান্ত কোন বিলকে ব্যাহত করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হন। অন্যান্য বিলও স্থায়ী ভাবে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা হইতে লর্ড সভাকে বঞ্চিত করা হয়। তবে অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্যান্য বিলকে লর্ড সভা ছুই বৎসর পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু কমন্স সভার পর পর তিন অধিবেশনে বিলটি যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে লর্ড সভা আর ঐ বিলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন না, বিলটি তাঁহাদিগকে পাশ করিতেই হয়।

নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিক দল যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা অন্যতম। খনি, চলাচল ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয়করণ সম্পর্কে আপত্তি সত্ত্বেও রক্ষণশীল দল ঐগুলির জাতীয়করণ মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হইল লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইলে বৃটেনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইবে। কাজেই লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা বানচাল করিতে রক্ষণশীল দল যে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছুই বৎসর পার হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংক্রান্ত বিলটি এই সেশনে উত্থাপন করিলে কমন্স সভায় পর পর তিন সেশনে বিল পাশ করাইয়া লওয়া কিছুই কঠিন নয়। কারণ, কমন্স সভায় শ্রমিক দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বৃটেনের অর্থ নৈতিক সঙ্কটের জন্ত মন্ত্রী সভার কয়েক জন প্রভাবশালী সদস্য এই সেশনে ঐ বিল উপস্থিত করা সঙ্গত মনে করেন না। আগামী বৎসর অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাইয়া উঠা যাইবে, সকলেই এইরূপ আশা করেন। কিন্তু আগামী বৎসর হইবে পার্লামেণ্টের চতুর্থ বৎসর এবং লর্ড সভা বিলটিকে ছুই বৎসর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন। ফলে এই পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কালের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব হইবে না এবং ভাবী নির্ব্বাচনের ফল অনিশ্চিত। এই জন্ত বিল পাশ করার ব্যাপারে ছুই বৎসর বিলম্ব করার যে ক্ষমতা লর্ড সভার আছে, শ্রমিক মন্ত্রী সভা তাহা কমাইয়া এক বৎসর করিতে চান।

লর্ড সভার ক্ষমতা সঙ্কোচের এই সিদ্ধান্তকে মিঃ চার্চ্চিল 'delibarate act of social aggression' অর্থাৎ 'স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক আক্রমণ' (লর্ড সভা ও বিরোধী টোরী দলের অধিকারের উপরে) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলিয়াছেন যে, লর্ড সভা যদি বিলটির বিলম্ব ঘটাইতে না চান, তবে এই বিল সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু তাঁহাদের থাকিতে পারে না। আর বিলম্ব ঘটাইতে যদি তাঁহারা কৃত-সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস করাই অধিকতর ও।

রুশ-পারস্য তৈলচুক্তি অগ্রাহ্য—

গত ২২শে অক্টোবর পারস্যের মজলিস (আইন সভা) ১৯৪৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পারস্যের যে তৈলচুক্তি হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তেহরাণস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের আশ্বাসের পর রুশ-পারস্য তৈলচুক্তির যে এই দশাই ঘটিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কাহারও ছিল না। মজলিস যে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে এই তৈলচুক্তিকে বিবেচনা করেন নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। যৌথ সোভিয়েট ইরানিয়ান তৈল কোম্পানী গঠনের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার সর্ত্ত ছিল এই যে, প্রথম ২৫ বৎসর এই কোম্পানীর শতকরা ৪৯টি শেয়ার থাকিবে ইরাণের এবং শতকরা ৫১টি শেয়ার থাকিবে রাশিয়ার এবং অতঃপর শেয়ার উভয় দেশের মধ্যে তুল্যাংশে বণ্টন করা হইবে। লভ্যাংশ বণ্টন করা হইবে শেয়ার পরিমাণ অনুযায়ী। রাশিয়া যন্ত্রপাতি এবং টেক্‌নিশিয়ান বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করিবে। পঞ্চাশ বৎসর পর পারস্য রাশিয়ার শেয়ারগুলি ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে অথবা ইচ্ছা করিলে এই যৌথ কোম্পানীকেই চালু রাখিতে পারিবে। এই সঙ্গে অবশ্য আরও একটি সর্ত্ত ছিল যে, উত্তর-ইরাণে অন্য কোন দেশকে পারস্য তৈলের ইজারা দিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে এই তৈলচুক্তি অগ্রাহ্য করার কোনই কারণ নাই। 'রাশিয়াকে অগ্রসর' হইতে না দেওয়ার যে নীতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে তাহারই চাপে পড়িয়া ইরাণের মজলিস এই চুক্তি অগ্রাহ্য না করিয়া পারে নাই। ইরাণের নিকট হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন তৈলের খনি ইজারা লয় নাই। ভবিষ্যতে লইবে কি না তাহা এখনও কিছু বলা যায় না। কিন্তু ইঙ্গ-ইরানিয়ান অয়েল কনশেসনের প্রায় অর্দ্ধেক শেয়ার আমেরিকানদের হস্তগত। কিছু দিন পূর্ব্বে ইরাণ আমেরিকার নিকট হইতে ৩ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। সৌদী আরবের তৈলখনি ইজারা লইয়াছে আমেরিকা। মধ্য-প্রাচ্যের তৈলখনিগুলি যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইউরোপ-এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি থাকিবে তাহাদেরই তাঁবে। এই ঘাঁটিগুলি দখল করিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন রাশিয়া যাহাতে ইরাণের তৈলখনি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা। মজলিস রুশ-পারস্য তৈলচুক্তি অগ্রাহ্য করায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইরাণের সৈন্যবাহিনী মার্কিণ সামরিক মিশন কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইতেছে, এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উত্তর-ইরাণের তৈলখনি লইয়া প্রকৃত পক্ষে কূটনৈতিক যুদ্ধ চলিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে। জয়লাভ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হয় নাই। ভবিষ্যৎ অনুমান করা কঠিন।

স্বাধীন ব্রহ্মদেশ—

গত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনে ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্যকরী হইবে এবং ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করিবে। গত ২১শে অক্টোবর ব্রহ্ম-স্বাধীনতা বিল ও চুক্তিপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে। এই বিল অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৬ই জানুয়ারী বৃটেন ব্রহ্ম-যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করিবেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এবং ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু'র মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্ত্তগুলি সংক্ষেপে এবং মোটামুটি ভাবে এখানে উল্লেখ করা হইল। ব্রহ্মদেশে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেন যে খরচ বহন করিয়াছে, তাহার জন্য বৃটেন কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিবে না। অধিকন্তু, ব্রহ্মদেশকে বৃটেন যে দেড় কোটি পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে বৃটেন তাহারও দাবী ছাড়িয়া দিবে, ব্রহ্মদেশকে ঐ ঋণ আর পরিশোধ করিতে হইবে না। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশের নিকট বৃটেনের আর যাহা পাওনা আছে তাহা ব্রহ্ম দেশ ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবে এবং এই ঋণের জন্য কোন সুদ দিতে হইবে না। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশকে বৃটেনের নিম্নলিখিত প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করিতে হইবে: (১) চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর ব্রহ্মের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মপ্রবাসী বৃটিশ প্রজাদের প্রাপ্য পেন্‌সন ও বেতন মিটাইয়া দিবেন, (২) বৃটিশ সেনা-বিভাগীয় জিনিষপত্র বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট পরিশোধ করিবেন, (৩) বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র উভয় গবর্ণমেণ্ট চুক্তি সম্পাদন করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যথাসম্ভব সত্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরাজ সৈন্য সরাইয়া লইবেন এবং ইহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট বৃটেন হইতে নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী সংক্রান্ত একটি মিশন আমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে এইরূপ আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া উভয় দেশের জাহাজই উভয় দেশের বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ভাবে উভয় দেশের বিমানই উভয় দেশের আকাশ-পথে চলাচল করিতে পারিবে। বৃটেন সম্প্রতি ব্রহ্মদেশকে ৩৭টি জাহাজ ধারে প্রদান করিবে। দেশরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং অতঃপর এক বৎসরের নোটিশে উভয় পক্ষই এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন। চুক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন মতভেদ হইলে এবং আপোষ-আলোচনায় কোন মীমাংসা না হইলে বিরোধীয় বিষয়টি মীমাংসার জন্য আন্তর্জ্জাতিক আদালতে পেশ করা হইবে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা বিল উত্থাপিত হইবার তিন মাস পর এবং ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দুই মাসের মধ্যে ব্রহ্ম-স্বাধীনতা বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মদেশই সর্ব্ব-প্রথম বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে যাইয়া সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করিবে। ব্রহ্ম-স্বাধীনতা বিল পাশ হওয়ার পর ব্রহ্মদেশ আর বৃটিশ উপনিবেশ থাকিবে না, আগামী ৬ই জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ হইবে। ব্রহ্ম-দেশকে এইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান বৃটেনের পক্ষে উদারতা বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের স্বাধীনতা বিল মিঃ চার্চ্চিলের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেও টোরী দল ব্রহ্ম-স্বাধীনতা বিলের বিরোধিতা প্রবল ভাবেই করিতেছেন। হয়ত এই বিরোধিতা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টে উভয় সভাতেই এই বিল গৃহীত হইবে। কিন্তু ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দানের উদারতার পিছনে যে সকল বিচার-বিবেচনা কার্য্য করিয়াছে তাহা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে। বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম বৃটেনকে যে অনেক অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাহার আভ্যন্তরীণ সমস্যা, তাহার ঔপনিবেশিক সমস্যা, তাহার পররাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যা এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বৃটেনের তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' জাপান এই যে ধ্বনি তুলিয়াছিল, জাপানের পরাজয়ের পর উহা প্রত্যেক দেশেই যে সংক্রামিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে নূতন যে-সকল শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ তাহার খোলস বদলাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বৃটেন ব্রহ্মদেশ হইতে স্বেচ্ছায় সরিয়া আসিতেছে এ কথা যেমন সত্য নয়, তেমনি বৃটেন সত্যই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করাও অসম্ভব।

ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তির যে সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা কাহারও দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। ব্রহ্মদেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—ব্রহ্মের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই যে বৃটিশ মূলধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বৃটিশ মূলধনের একচেটিয়া আধিপত্য সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তির প্রকাশিত সর্ত্তাবলীর মধ্যে তাহার কোন পরিচয় আমরা পাইলাম না। ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তিতে এ সম্বন্ধে কোন গোপন সর্ত্ত সন্নিবেশিত হইয়া থাকিলে তাহা অবশ্য আমাদের জানিবার কথা নয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে বৃটিশ মূলধনের শোষণ যদি অব্যাহতই থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা একান্তই অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী অপসারিত হইলেও শোষক-বাহিনী যত দিন ব্রহ্মদেশে উপস্থিত থাকিবে, তত দিন ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা মরীচিকা হইয়াই থাকিবে।

প্যালেষ্টাইন বিভাগের সমস্যা—

প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য এবং প্যালেষ্টাইন বিভাগে আরবদের বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ দুইটি সাব-কমিটি গঠন করিয়াছেন। কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, উরুগুয়ে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা এবং রাশিয়া এই নয়টি রাষ্ট্র লইয়া বিভাগ সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। আর্ব-নেশন্যাল সাব-কমিটিতে আছে আফগানিস্থান, কলম্বিয়া, মিশর, ইরাক, পাকিস্থান, লেবানন, সৌদী আরব, সিরিয়া এবং ইয়েমেন। এই শেষোক্ত সাব-কমিটি আরব বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা এবং সৌদী আরব, সিরিয়া এবং ইরাকের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া প্যালেষ্টাইনের ভাবী গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিবেন।

প্যালেষ্টাইন বিভাগ সাব-কমিটিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বৃটেনকে ছয় মাসের মধ্যে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিতে হইবে এবং প্যালেষ্টাইন ইহুদী ও আরব এই দুইটি পৃথক্ রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী ছয় মাস কালের জন্য প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত ইহুদী ও আরব রাষ্ট্রকে স্ব স্ব এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই প্যালেষ্টাইনে পৃথক্ ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াও প্যালেষ্টাইন বিভাগ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু মার্কিণ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়া রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, মার্কিণ পরিকল্পনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ সায়ারাপ্কিন প্যালেষ্টাইন বিভাগ সাব-কমিটিতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, (১) ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হইবে, (২) উহার তিন-চারি মাস পরে প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইবে, (৩) নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিশন অবিলম্বে প্যালেষ্টাইনে যাইবে, (৪) আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য এই কমিশন অবিলম্বে অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করিবে এবং (৫) মধ্যবর্ত্তী কালের অবস্থা এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হইবে না। মার্কিণ পরিকল্পনা ও রুশ পরিকল্পনা উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই প্যালেষ্টাইন বিভাগ কার্য্যকরী হইবে এবং ঐ তারিখে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটেরও অবসান হইবে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে শাসন পরিচালন ব্যাপারে খবরদারী করিবার ভার থাকিবে কাহার উপর? এই ভারটা নিরাপত্তা পরিষদের উপর থাকা মার্কিণ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, প্যালেষ্টাইনের শাসন পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপারে খবরদারী করিবার ভার জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। প্যালেষ্টাইন বিভাগে আরবদের বিরোধিতা এবং প্যালেষ্টাইনে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বিপজ্জনক অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে প্রাত্যহিকই খবরদারী করিবার প্রয়োজন হইবে। আরব রাষ্ট্র-সমূহও সাধারণ পরিষদের সদস্য, এই প্রশ্ন বাদ দিলেও সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সর্ব্বদা চালু না রাখিয়া প্যালেষ্টাইনের শাসন পরিচালন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অবিচ্ছেদেই চলিতে থাকিবে, ইহা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার। যদি বলা যায় যে, সাধারণ পরিষদ এ জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিবে, তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইবে না। এই বিশেষ কমিটি যে নিরাপত্তা পরিষদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর দক্ষ কেন হইবে তাহাও বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবর্ত্তী ছয় মাস কালে প্যালেষ্টাইনে শান্তিরক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিলে শান্তিরক্ষার কাজ সুসম্পন্ন হইবে কিরূপে? শান্তিরক্ষার জন্য প্যালেষ্টাইনে রুশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি এড়াইবার জন্যই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এরূপ প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে মার্কিণ-প্রস্তাব ও রুশ-প্রস্তাব লইয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল অবশেষে তাহার মীমাংসা হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। গত ১০ই নবেম্বর প্যালেষ্টাইন সাব-কমিটিতে রাশিয়ার পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে (১) প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসান হইবে ১৯৪৮ সালের ১লা মে, (২) প্যালেষ্টাইন হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে, (৩) সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত সুপারিশ গ্রহণ এবং ইহুদী ও আরব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণায় মধ্যবর্ত্তী সময় অন্তর্ব্বর্ত্তী

কাল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই উহার অবসান হইবে, (৪) অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে একটি বিশেষ কমিশন দ্বারা প্যালেষ্টাইন শাসিত হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্য হইতে তিন হইতে পাঁচ জন সদস্য লইয়া সাধারণ পরিষদ এই কমিটি গঠন করিবেন, (৫) এই কমিশনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন নিরাপত্তা পরিষদ এবং কমিশন পরিচালিত হইবেন সাধারণ পরিষদের পরামর্শ অনুসারে, (৬) ম্যাণ্ডেট অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ শাসন বলবৎ থাকিবে এবং বৃটিশ সৈন্য প্যালেষ্টাইনে থাকিবে এবং বৃটেনই শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। ম্যাণ্ডেটের অবসান সম্পর্কে রাশিয়ার এই প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করিয়াছে। তিন হইতে পাঁচ জন সদস্য লইয়া বিশেষ কমিশন গঠনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকা প্রস্তাব করিয়াছে, ১লা মে তারিখে উভয় রাষ্ট্রকেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে অথবা প্রয়োজন হইলে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ কমিশন স্বাধীনতার জন্য অন্য কোন তারিখ ধার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই তারিখ ১লা মে'র পূর্ব্বে অথবা ১লা জুলাইয়ের পরে ধার্য্য হইতে পারিবে না। স্বাধীনতা সম্বন্ধে তারিখের এই পরিবর্ত্তনে রাশিয়ার হয়ত কোনও আপত্তি হইবে না। কিন্তু প্রধান সমস্যা রহিয়াছে প্যালেষ্টাইন বিভাগ কার্য্যকরী করার ভার নিরাপত্তা পরিষদের উপর অর্পণ সম্বন্ধে। এইরূপ ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি। এদিকে প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার পরই প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য সিরিয়া, লেবানন, মিশর এব টান্সজর্ডনের সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন সীমান্তে সমবেত হইয়াছে বলিয়া আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল রহমান আজম জানাইয়াছেন। ইরাক ও সৌদী আরবের সৈন্য-বাহিনীও না কি ইহাদের সহিত যোগদান করিবে। বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন রক্ষার ভার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনে এক বিপুল রক্তক্ষয়কারী সংঘর্ষ ঘটিবে। ইহুদী এজেন্সীরও একটি সৈন্যবাহিনী আছে। উহা হাগানা (Hagana) নামে পরিচিত। Irgun Zuai Leumi নামে ইহুদীদের আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান বিদ্রোহে ইহারাই গরিলা যুদ্ধ করিতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ইহুদী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া এক লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠনের পরিকল্পনার কথাও শোনা যাইতেছে। সুতরাং সুশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর হাতে শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত না হইলে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের পক্ষে প্যালেষ্টাইনে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

নিরাপত্তা পরিষদ ও ভারত—

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদের জন্য ইউক্রেণের সহিত ভারতের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত সরকারী ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হইয়াছে। তবে নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এক জন প্রতিনিধি থাকা উপেক্ষার বিষয় নহে।

শ্যামে বলপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট দখল—

মার্শাল ফি বুনের নেতৃত্বে শ্যামদেশের সৈন্য-বাহিনী গত ৯ই নবেম্বর অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া শ্যাম দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত লুং আং ধমরং-এর নেতৃত্বে শ্যামের গবর্ণমেণ্ট গঠিত ছিল। গত যুদ্ধের সময় তিনি জাপবিরোধী ছিলেন, কিন্তু মার্শাল ফি বুন ছিলেন জাপানের অনুকূলে। আকস্মিক ভাবে সামরিক আক্রমণ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অধিকারের মূলে কি রহস্য আছে, প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

অনন্ত-বিলাপ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমারে হেরিলে সিন্ধু হয় মোর মনে
বাঁধা তুমি রহিয়াছো রোদন-বন্ধনে
যেন বহু কাল ধরি' তব দীর্ঘশ্বাস,
নিত্য সকরুণ সুরে সুনীল আকাশ

কাঁপায়ে তুলিছ তরঙ্গের কলরবে।
নাহি জানি কোন্ ব্যথা বহিয়া নীরবে
চলিয়াছো বালু-তটে তুমি—সারা বেলা
বিসর্জিয়া অশ্রুসম বিন্দুকের মেলা

অনন্ত বিলাপ করি ; যাও আছাড়িয়া
তব প্রতি তটে তুমি আসিয়া আসিয়া
দুঃসহ বেদনা ভরে, প্রশ্ন করি যত
"কার লাগি বিশ্বে তুমি কাঁদিছ নিয়ত !"

তত ব্যর্থ হয় মোর জানিবার আশা,
তুমি বহ বেদনায় অব্যক্ত সে ভাষা।

বিজয়া

পরাধীন দেশে শক্তিপূজা কষ্টসাধ্য। পরপদসেবী দাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হয় না। সেই জন্যই আমরা সকলে মিলিয়া শরৎকালে যে শক্তিপূজার অভিনয় করিতেছিলাম, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতেছিল মাত্র। মহাশক্তির যে সমস্ত সাধক মায়ের পদপ্রান্তে আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারেন, মাতৃপূজায় তাঁহারাই অধিকারী।

এত দিন দেশ ছিল নিরানন্দ, পরপদাবনত। আজ জাগ্রতা জননীর পদাঘাতে অসুর ধূল্যবলুণ্ঠিত; মায়ের শাণিত কৃপাণে বক্ষ তাহার বিদীর্ণ! আমাদের বিজয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের আকাশ আজ নবার্জিত স্বাধীনতার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মা আজ আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। রুগ্ন, ক্লিষ্ট, অনশন-পীড়িত ভারতবাসীর মনে আজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের অর্দ্ধেক আকাশ আজও মেঘাচ্ছন্ন। আমাদের পূজা যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে অচিরে সে মেঘও কাটিয়া যাইবে। আমাদের বিজয়যাত্রা সেই দিন সম্পূর্ণ হইবে।

তিন দিন ধরিয়া আমরা মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তির আরাধনা করিয়াছি। সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইয়া আজ চিন্ময়ীরূপে আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা যদি আবার আত্মবিস্মৃত না হই, তাহা হইলে বিজয় গৌরব আমাদের করায়ত্ত হইবেই হইবে। ভবিষ্যতের সেই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আমরা মাসিক বসুমতীর গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের প্রীতি-নিবেদন গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বিজয়োৎসবের জন্য প্রস্তুত হউন—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সামাজিক নিরাপত্তা

এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনের অধিবেশনে ভারত গভর্ণমেণ্ট সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে খসড়া প্রস্তাব উপাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' কথাটি প্রচলিত হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে প্রচলিত হয় 'সামাজিক নিরাপত্তা' কথাটি। বোধ হয়, আটলাণ্টিক সনদেই সর্ব্বপ্রথম 'সামাজিক নিরাপত্তা'র কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল। আটলাণ্টিক সনদ তো আটলাণ্টিক মহাসাগরের অতল তলেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। 'সামাজিক নিরাপত্তা' কথাটি রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উপায় কি, তাহার সন্ধান এখন পর্য্যন্তও পাওয়া গিয়াছে কি? ভারত গভর্ণমেণ্ট সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাহাতে কল্যাণকর ও কার্য্যকরী হয় তাহার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরী, উপযুক্ত বাসগৃহ এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে এইগুলিকে মৌলিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং এইগুলিকেই দেওয়া হইয়াছে মুখ্য স্থান। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সকল মৌলিক ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলপ্রসূ হইলেই সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে। এই সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাটির স্বরূপ কি?

সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান কথাই হইল নিরাপদ জীবিকা। সকলেই জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ পাইবে, কেহই বেকার থাকিবে না এবং প্রত্যেকেই তাহার এবং তাহার পরিবারবর্গের খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যয়নির্ব্বাহের উপযোগী বেতন পাইবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন তাহার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাহার জন্যও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত হইলে যত দিন পর্য্যন্ত নূতন কর্ম্ম সংগৃহীত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বাসগৃহের সমস্যা মানুষের জীবিকার মতই প্রধান সমস্যা। প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং বাসোপযোগী বাসগৃহের ব্যবস্থা না হইলে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব নয়। ভারতীয় শিল্পপতিদের রচিত বোম্বাই পরিকল্পনাতে সকলের কাজ জুটাবার মত পরিকল্পনার অভাব রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, যাহাদের কাজ জুটিবে, তাহারাই যে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরী পাইবে, এমন আশ্বাসও বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা দিতে পারেন নাই। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রথম সোপান হিসাবে ভারত গভর্ণমেণ্টের খসড়া প্রস্তাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরীর ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরীর ব্যবস্থা করা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সম্ভব নয়, আমাদের দেশেই কি তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি না? আজ যে দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তার কারণ যে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরীর দাবী, এ কথা অস্বীকার করিয়া শ্রমিকদের জন্য পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার্য্য, ভদ্রোচিত পরিধেয় এবং স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি? উৎপাদন কম হওয়ার জন্য দায়ী করা হইতেছে শ্রমিকদিগকে, কিন্তু শ্রমিকরা যদি পর্য্যাপ্ত আহার্য্য না পায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা বহাল থাকিবে কিরূপে? সে কথা কেহই ভাবিয়া দেখেন না।

খাদ্য-সমস্যা

রেশন-ব্যবস্থায় চাউল ও আটা বা গমজাত দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করার ফলে যে-অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে

জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আবার খাদ্যশস্যের সরবরাহ যেরূপ, তাহাতে রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হইতেছে না। রেশন-ব্যবস্থা কতকগুলি সহরে মাত্র প্রবর্ত্তিত আছে, কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেশের সর্ব্বত্র। অথচ ঘাটতি অঞ্চলে তো দূরের কথা, উদ্বৃত্ত অঞ্চলেও নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল ও আটা কিনিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় অনেকে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একেবারে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও এই অভিমতই পোষণ করেন। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হঠাৎ তুলিয়া দেওয়ার বিপদও উপেক্ষার বিষয় নহে। ভারত গভর্ণমেণ্ট যে খাদ্যশস্য নীতি নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করিয়াছেন, এই কমিটি ১৯৪৮ সালের খাদ্যনীতি সম্পর্কে এক অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্রধানত: গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখিয়া খাদ্যশস্যের আমদানী হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সুপারিশ করিয়াছেন। যুদ্ধের ও দুর্ভিক্ষের জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুই বৎসরেরও অধিক কাল হইল যুদ্ধ শেষ হইলেও পৃথিবী তথা ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতির কোন উন্নতি আজও হয় নাই। ১৯৪২ সাল হইতে ভারতে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন চলিতে থাকিলেও এই আন্দোলনের ফলে এক ছটাক খাদ্য-শস্যও বেশী উৎপন্ন হয় নাই।

আমাদের যেখানে প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হয়, সেখানে এবারের আমনের ফসল উঠিলেই যে ১৯৪৮ সালে আমাদের খাদ্যাভাব দূর হইবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রেশন-ব্যবস্থায় ১২ আউন্স করিয়া যে খাদ্য-বরাদ্দ আছে, তাহা বজায় রাখিতে হইলে বিদেশ হইতে ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করা প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিমাণ খাদ্য আগামী বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী করা সম্ভব বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। গত বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে ২৩ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য দাম দিতে হইয়াছে ১০০ কোটি টাকা। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, গত বৎসর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে, চলতি বৎসরেও ঐ পরিমাণ আমদানী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়; কিন্তু দাম পড়িবে ১৯৪৬ সালের দাম অপেক্ষা বেশী। ১৯৪৮ সালে যে খাদ্যশস্য আমদানী করা যাইবে, তাহার দাম আরও বেশী পড়িবে। ভারতের পক্ষে এত বিপুল ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

দেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের কি পরিমাণ গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, গভর্ণমেণ্ট যে দামে কিনিতেছেন, তাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে। সংগ্রহের জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি করার অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক। খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ যদি ৫০ লক্ষ টন হয়, তাহা হইলে মণ-প্রতি এক টাকা দাম বৃদ্ধি করিলে খাদ্য সংগ্রহের ব্যয় বাড়িবে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব দেখাইয়াছেন যে, ইহার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় ২০ মাত্রা বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার জন্য শুধু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকেই মাগগী ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে ৬ কোটি টাকা। ইহার উপর মাগ্‌গী ভাতার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি আছেই। কাজেই হঠাৎ এবং অবিলম্বেই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার কাজে এখন হইতেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রথম কাজ হইবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভারতের মুসলমান ও লীগ-নেতৃত্ব

ভারতের মুসলমানরা যে সকলে একমত হইয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই যে এখনও মুসলিম লীগের বৃহৎ নেতৃত্বের দিকেই তাকাইয়া আছেন, লক্ষ্ণৌর অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত মিঃ সুরাবর্দ্দীর আহুত সম্মেলন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। যে সকল প্রস্তাব ঐ সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে তাঁহারা ছাপাইতে দিয়াছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু না কিছু অনুমান করিতে পারা যায়। এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "মুসলমানদের সংহতি নষ্ট না করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।" মুসলমানদের এই সংহতি রক্ষার আয়োজন যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীনে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মিঃ সুরাবর্দ্দীর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত ভারত ডোমিনিয়নের লীগপন্থী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াও আবার মুসলিম লীগের বৃহৎ নেতৃত্বের প্রতিও আনুগত্য রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। ভারতের যে সকল মুসলমান মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, কংগ্রেস নেতৃবর্গ যদি তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সচেতন না হন, তাহা হইলে এক দিন অতর্কিতে সমগ্র ভারত ডোমিনিয়নকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গ মুসলিম লীগের সহিত আপোষে মীমাংসা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ আপোষ-মীমাংসা চায় না এবং ভারতের লীগপন্থী মুসলমানগণও লীগ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে থাকিতেই ইচ্ছুক।

বস্তুতঃ, ইতিমধ্যেই ভারতের লীগপন্থী মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ এমন সুর ধরিয়াছেন যাহাতে লীগ নেতাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে লীগ সদস্য মিঃ মহম্মদ ইসাক সে দিন ধুয়া তুলিয়াছেন যে, ঐ প্রদেশের কংগ্রেসসেবিগণ এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে মুসলমানরা ঐ প্রদেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কংগ্রেস মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই এত অধিক ব্যগ্র যে, তাহা করিতে যাইয়া সংখ্যাগুরুদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তথাপি লীগ-পন্থী মুসলমানদের মন তাঁহারা পান নাই। পাকিস্তানী সরকারী গুপ্তচর বিভাগ হিন্দুদের হাঁড়ীর খবর পর্য্যন্ত রাখিতেছেন। কাশ্মীর ও ত্রিপুরায় পরে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত।

দেশীয় রাজ্য সমস্যা

কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় লইয়া যে-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে কাশ্মীরের সমস্যা। এই তিনটি দেশীয় রাজ্যের সমস্যাকে হয়ত পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু যে-ভাবে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই তিনটি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের নীতি এবং এই তিনটি দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদের নীতি বিশ্লেষণ করিলে সমস্যা সৃষ্টির কারণের সন্ধান পাওয়া কঠিন হয় না। জুনাগড়ের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু বলিয়া জুনাগড় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিবে ভাবিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তখন জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা মুসলমান হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জুনাগড়কে পাকিস্তান ইউনিয়নে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। জুনাগড়ে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের দাবীতে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট রাজী হন না। শ্যামলদাস গান্ধীর নেতৃত্বে অস্থায়ী জুনাগড় সরকার গঠিত হইল এবং এই অস্থায়ী সরকার জুনাগড়ের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করিয়া লইল। পাকিস্তানের সহিত স্থলপথে জুনাগড়ের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নাই। কাজেই পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী জুনাগড়ে প্রেরণ করা বোধ হয় সহজ নহে। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে জুনাগড়ে হঠাৎ আট শত দর্শকের উপস্থিতি এবং জুনাগড় সরকার কর্ত্তৃক তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করণের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল দর্শকের অধিকাংশই ভূতপূর্ব্ব সৈনিক। জুনাগড়ের জেলখানা হইতে অধিকাংশ দুর্ব্বৃত্তকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কি গণভোট যাহাতে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ না হয় তাহারই জন্যই? শেষ অবধি অবশ্য জুনাগড় ভারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করিয়াছে শ্যামলদাসের জনপ্রিয় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায়। অনেকটা 'মরি তো বাঘের হাতেই মরিব, রাবণের হাতে কেন?'

হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে গণভোটের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। নিজাম তাঁহার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থির করিতে চান। ভারত ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু মজলিস ইত্তেহাদ-উল-মুসলিম দলের সমর্থকরা হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় চুক্তি আর সম্পাদন করা হয় নাই। ভারত ডোমিনিয়নের সহিত আলোচনার জন্য নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী ছত্রীর নবাব কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে হায়দ্রাবাদ সরকারের জন্য হায়দ্রাবাদের প্রধান সেনাপতি ইংলণ্ডে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতেছেন।

দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হিন্দু হইলে কি হয় এবং মুসলমান হইলে বা কি হয়, তাহা কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কাশ্মীরের মহারাজা অবশেষে নিরুপায় হইয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন এবং শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে জনপ্রিয় সরকার গঠনে স্বীকৃত না হইয়া পারেন নাই। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং কাশ্মীরের জনসাধারণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহাও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার অবসান হইলে কাশ্মীর কোন্ ইউনিয়নে যোগদান করিবে তাহা গণভোট দ্বারা চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। গত ৩০শে অক্টোবর পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট এক প্রেসনোট জারী করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরকে প্রতারণা ও বলপূর্ব্বক ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করান হইয়াছে, ইহাই পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের ধারণা এবং পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট উহা মানিয়া লইতে পারেন না। কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হইবে, এই ঘোষণা সত্ত্বেও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, গণভোট গ্রহণটা আপাত দৃষ্টিতে মানাবার বলিয়া কাশ্মীরের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য গণভোটের লোভ দেখান হইয়াছে।

বহিরাগতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই কাশ্মীরের মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন। কারণ, আক্রমণকারী পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিবার আর কোন উপায়ই ছিল না। কাজেই একটা বিশেষ অবস্থায় কাশ্মীরের মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীরের মহারাজার এই যুক্তি স্বীকার করিতে রাজী নহেন। উপজাতীয়দের কাশ্মীর আক্রমণের যে কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা সত্যই অদ্ভুত বলিয়াই সকলের মনে হইবে। জম্মুর মুসলমানদিগকেই কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনী প্রথম আক্রমণ করে, জম্মুর মুসলমানদিগকে হত্যা করে এবং সীমান্তবর্ত্তী পাকিস্তানের গ্রামগুলিকে আক্রমণ করা হয়। ইহাতেই পাঠানরা ক্ষিপ্ত হইয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, ইহাই পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের অভিমত। পুঞ্চ কাশ্মীরের একটি সীমান্ত রাজ্য। পুঞ্চের মুসলমান অধিবাসীরা স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল কি-না, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিজাম যে দৃঢ় হস্তে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত সত্যাগ্রহীদিগকে দমন করিতেছেন, তাহা সকলেরই জানা কথা। ইহার কারণ ইহারা হায়দ্রাবাদের হিন্দু প্রজা। কিন্তু তাই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের হিন্দুরা তো পাঠানদের পন্থা গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাশ্মীরে যাহারা হানা দিয়াছে, তাহারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রীতিমত সৈন্যবাহিনী। কাশ্মীরের সংবাদ পড়িয়া বুঝা যায়, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করা বড় সহজ হইতেছে না। ইহা দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ প্রভৃতির নিয়মিত যোগান এই সকল আক্রমণকারীরা পাইতেছে। কাহারা যোগান দিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং কাশ্মীর আক্রমণ যে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। হায়দ্রাবাদের নীতিও যে একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীর

মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাশ্মীরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা জনগণের বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এই বিদ্রোহে বহিরাগত লোকদের কার্য্যকরী সহানুভূতি থাকা তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু বিদ্রোহী জনতা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাইল? অস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষাই বা তাহারা কাহার নিকট এবং কবে লাভ করিল? মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের সহিত যাহারা লড়াই করিতেছে, তাহারা পুঞ্চের ভূতপূর্ব্ব সৈন্য। তাঁহার হিসাব মত পুঞ্চে ভূতপূর্ব্ব সৈন্যের সংখ্যা ৬০ হাজার এবং এই সকল প্রাক্তন সৈন্যরা শত্রুদের অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। কাশ্মীরের মহারাজাকে প্রথমে পাকিস্তানে যোগদান করাইবার চেষ্টা যে চলিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কি করিতে হইবে তাহারও আয়োজন সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। বোধ হয় ঐ সময় বাহির হইতে কতক লোক কাশ্মীরে পাঠাইয়া লীগপন্থী মুসলমানদের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর শ্রীনগরস্থ বিশেষ সংবাদদাতা ২রা নভেম্বর তারিখে সংবাদ দিয়াছেন যে, মিঃ জিন্নার প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরশীদ আহমদকে ২রা নভেম্বর প্রাতে শ্রীনগরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি সেখানে কি করিতে গিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন কি মনে জাগে না?

"হিন্দুস্থান টাইমস" এর শ্রীনগরস্থ উক্ত বিশেষ সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, খুরশীদ আহমদের নিকট কতকগুলি নক্সা ও দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, মিঃ জিন্নার প্রাইভেট সেক্রেটারী উক্ত খুরশীদ আহমদ কিছু দিন পূর্ব্বে কাশ্মীরে যান এবং গোপনে অবস্থান করিয়া শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করিতেছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহাকে তাঁহার গোপন আবাস হইতে গ্রেপ্তার করে। ইহা হইতেই কাশ্মীরের বিরুদ্ধে কিরূপ গভীর ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্মীরের লীগপন্থীদের সহিত বহিরাগতদের ষড়যন্ত্রটা পাকিয়া উঠিবার পর যে ২০ হাজার লোকের সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, শ্রীনগরকে যে ভাবে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে গভীর সামরিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী অভিযানকারীদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছে বটে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স ভলাণ্টিয়ারগণ শ্রীনগর এবং উহার উপকণ্ঠে তন্ন তন্ন করিয়া পঞ্চম বাহিনীর সন্ধান করিতেছে, কিন্তু সঙ্ঘর্ষের শেষ এখনও হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতি এবং কাশ্মীর আক্রমণের কৌশল হইতে আমাদের নেতৃবৃন্দের অনেক শিক্ষা করিবার এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। সরকারী ভাবে কাশ্মীরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী কতকগুলি আক্রমণকারী লোককে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাকিস্তানের নিকট হইতে এই আক্রমণকারীরা সহানুভূতিই পাইতেছে। কিন্তু কাশ্মীর রক্ষায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যদি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে কাশ্মীরে পাকিস্তান যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে ঐ নীতি অনুসরণ করিতে পাকিস্তান আরও অধিকতর উৎসাহ পাইবে। মহাত্মা গান্ধী একটা কথা খুবই ঠিক বলিয়াছেন যে, সমগ্র দেশ সম্পর্কে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কাশ্মীরকে রক্ষা করিতে হইবে।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা কুমিল্লায় এ-পর্য্যন্ত লীগপন্থীদের তিনটি জনসভায় ত্রিপুরা রাজ্যের পাকিস্তানে যোগদান করার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে রীতিমত হুমকী দেওয়া হইয়াছে যে, ১৫ দিনের মধ্যে পাকিস্তানে যোগদান না করিলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছি। তাহাতে এইরূপ আক্রমণের আভাষ শুধু দেওয়া হয় নাই, আক্রমণের উদ্যোগ-পর্ব্ব হিসাবে বহু লীগপন্থী ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করার (infiltered) হুমকীও দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য দখলের পর আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করার অভিপ্রায়ের কথাও উহাতে আছে। ইহাকে শুধু দুষ্ট লোকের মিথ্যা ভয় প্রদর্শন বলিয়া উপেক্ষা করা হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু দেশরক্ষায় নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না।

আত্মরক্ষার আহ্বান

কাশ্মীরের উপর আঘাত হানিবার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হইয়াছিল। জুনাগড়কে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তান সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধু কাশ্মীরের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দিক্ হইতে ভারত সরকারের দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ রাখা। কাশ্মীর আক্রমণের দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের কর্ত্তারা প্রথমে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর রণহুঙ্কার, আক্রমণকারীদের নিকট হইতে মর্টার, ব্রেণগান, কলের কামান প্রভৃতি অস্ত্র প্রাপ্তি এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নায়কদের উপস্থিত হইতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, আক্রমণকারীদের প্রধান ঘাঁটী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এবং সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী আবদুল কায়ুম খান স্বয়ং এই সংগ্রামের পরিচালক।

কিন্তু পাকিস্তানের এই আক্রমণ কেবল মাত্র কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ নহে, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী বেরার, পূর্ব্ব-পাকিস্তান—সর্ব্বত্রই একই ধরণের আক্রমণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে। ভারতীয় ইউনিয়ন আজ এক গুরুতর বিপদের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অত্যাসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হওয়াই যে আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। বিলম্ব হইলেও শেষ অবধি পণ্ডিত নেহরু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিকে প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তাদের উৎসাহ বা উদ্যোগ কোথায়? ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব একেবারেই অস্বীকার করিয়া তাহাদের খাজা নাজিমুদ্দীনের দুয়ারে ধর্ণা দিতে উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কি তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে? শুনিতে পাওয়া যায়,

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন নেতা বাঙ্গালার ন্যায় সীমান্ত প্রদেশে অবিলম্বে দেশরক্ষী দল গঠনের পক্ষপাতী, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কর্ণধারদের উৎসাহের অভাবে তাঁহারা এই বিষয়ে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী কি নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব এবং দলগত কলহ লইয়া এত ব্যস্ত যে, ত্রিপুরার উপর পাকিস্তানী অভিযানের আয়োজন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জুনাগড় যেমন কাশ্মীর আক্রমণের কেবল পটভূমি তৈয়ারী করিয়াছিল, ত্রিপুরা তেমনি কেবল উপলক্ষ মাত্র—আসল লক্ষ্য হয় পশ্চিমবঙ্গ নতুবা আসাম। এই বিপদের মুখোমুখী আসিয়াও যাঁহারা দেশরক্ষার দায়িত্ব বুঝিতে নারাজ, তাঁহারা আজও কি করিয়া শাসন-কর্তৃত্ব আঁকড়াইয়া থাকিতে সাহস করেন তাহা জানি না। অবিলম্বে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত না হইলে দেশের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে আহ্বান জানাইয়াছেন, অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। সুতরাং অবিলম্বে দেশরক্ষী বাহিনী গঠনের দাবীতে ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্তবাসী বাঙ্গালীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

—

বাঙ্গালী সেনা বাহিনী

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর ভিতর বর্ত্তমানে সব প্রদেশেরই কোন না কোন রেজিমেণ্ট আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন রেজিমেণ্টই নাই। বিদেশী শাসকবর্গ বাঙ্গালীদের সেনা-বাহিনীর নিকট হইতে শত হস্ত দূরে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার কোন ত্রুটি কোন দিনই রাখেন নাই এবং নিজেদের সেই অপচেষ্টার কৈফিয়ৎ হিসাবে প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে, বাঙ্গালীরা যোদ্ধার জাত নহে। তাহাদের কার্য্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য আমরা ভাল করিয়াই বুঝি। ভারতের যে সব অঞ্চল স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়াচ হইতে বহু দূরে ছিল, সেই স্থান হইতে প্রধানতঃ বৃটিশ কর্ত্তারা সেনা সংগ্রহ করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী চিরদিনই ছিল পুরোভাগে; ভারতীয় সেনা-বাহিনীর ভিতর যাহাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন ছোঁয়াচ না লাগে, সেই উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালীকে লইয়া কোন সেনা-বাহিনী গড়া বৃটিশ শাসকেরা পছন্দ করিতেন না।

তবু একেবারে যে বাঙ্গালীকে দূরে রাখা পূরোপূরি ভাবে সম্ভব হইত, তাহা নয়। বিশেষ করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী সেনা-বাহিনী গড়িবার উদ্যোগ হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের লইয়া এক উপকূল রক্ষী-বাহিনী তৈয়ারী হইয়াছিল; কিন্তু কিছু দিন পরে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের খেয়ালে সে বাহিনী ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯৪০ সালেও ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালীদের লইয়া ষোড়শ বঙ্গীয় বাহিনী গঠিত হইয়াছিল; এবারও ঠিক কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বেই এই বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকরা যাহাই করিয়া থাকুক না, ১৫ই আগষ্টের পর এই ধরণের অপযুক্তি দিয়া বাঙ্গালীকে সৈন্যবাহিনী হইতে দূরে রাখিবার কোন কারণই নাই। বাঙ্গালী যুবকেরা যে আজ সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী হইবার জন্য যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব। বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চল হইতে সিপাহী সংগ্রহের কোন অসুবিধা হইবারই কারণ নাই। বাঙ্গালার বাগদী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীর সংগ্রামী ঐতিহ্য একেবারে মরে নাই—অনুকূল অবস্থায় তাহা আবার স্ফুরিত হইবে। সেনা-বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত ও নদীর কোন অভাব পশ্চিম-বঙ্গে নাই। আজাদ হিন্দ নায়ক এবং ভারতীয় সেনা-বাহিনী হইতে যাঁহারা আজ কর্ম্মচ্যুত, তাঁহারা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স ট্রেনিং কোরের অফিসারগণ সকলেই যে সানন্দে এই বাঙ্গালী সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত করিতে সম্মত হইবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামেরও যে কোন অভাব হইবে না, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা জানেন। গত ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় অক্সিলিয়ারী ফোর্সের বাঙ্গালা শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে।

আশ্চর্য্যের কথা, ১৫ই আগষ্টের পরও এ দিকে বিশেষ কোন চেষ্টা বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে হয় নাই। দেশরক্ষা ও সেনা-বাহিনী অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বাঙ্গালা সরকার এই সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া চাপ দিলে নূতন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তাহা উপেক্ষা করা নিশ্চয় সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালী সেনা-বাহিনী গঠন শুধু বাঙ্গালার বেকার-সমস্যা লাঘব করিবে তাহাই নয়, বাঙ্গালীর মনেও এক নব চেতনা সঞ্চার করিবে।

—

শান্তির অবতার

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এ কথা গত কয়েক মাস ধরিয়াই আমরা শুনিতেছি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়েছেন, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের হাতে তাঁহাদের নানারূপ নিগ্রহ ভোগের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা দেশ বিভক্ত হইবার পর যে সমস্ত পাঞ্জাবী মুসলমান পুলিশকে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহাদের কীর্ত্তি-কাহিনীও চার দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে শান্তিরক্ষার জন্য কেন যে পাঞ্জাবী পুলিশের প্রয়োজন, আর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সাহায্য ভিন্ন পূর্ব্ব-বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট কেন যে শান্তিরক্ষা করিতে অক্ষম, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিবৃতি দেওয়াই নাজিমুদ্দীন সাহেব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন নাই। কাজেই তাঁহার নানাবিধ মধুর বিবৃতি সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। যাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে শাসন করিবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য যে পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের নাই, এ কথা আজ সকলেই বুঝিয়াছেন।

সম্প্রতি তাঁহার আর এক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে হিন্দুস্থান বা পশ্চিমবঙ্গের সহিত পুনর্মিলনের জন্য কোন প্রচারকার্য্য বা কোন আন্দোলন করা অথবা বিবৃতি দেওয়া চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, এইরূপ মিলনের চেষ্টা কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না। তাঁহার এই হুমকীর উত্তরে সৈয়দ নৌশের আলি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান

অঞ্চলের জনগণের ভোটে পাকিস্তান সৃষ্টি হয় নাই। পাকিস্তান বিভাগ সংক্রান্ত বৃটিশ-রোয়েদাদের সন্তান। বৃটিশ-রোয়েদাদে যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে অসঙ্গত কিছুই থাকিতে পারে না। বিভক্ত ভারতকে পুনরায় অখণ্ড ভারতে পরিণত করিবার পূর্ণ অধিকার জনগণের রহিয়াছে। সৈয়দ নৌশের আলির যুক্তি জানিয়া খাজা নাজিমুদ্দীনের ভ্রম দূর হইবে, উভয় বঙ্গের পুনর্মিলনের আন্দোলনকে দমন করিতে তিনি বিরত থাকিবেন, এতখানি ভরসা করা অবশ্য সম্ভব নয়। মুসলিম লীগই সর্ব্বপ্রথম ভারত বিভাগের দাবী উত্থাপন করে। খাজা নাজিমুদ্দীনের যে মাপকাঠিতে উভয় বঙ্গের পুনর্মিলনের আন্দোলন চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সেই মাপকাঠিতে ভারত বিভাগের আন্দোলন এবং ভারত বিভাগ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জনগণের মতামত গ্রহণ না করিয়াই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রশ্রয়প্রাপ্ত লীগপন্থীরা চরম দেশদ্রোহিতা করিয়া যে পাকিস্তান অর্জ্জন করিয়াছেন, আজ সেই দেশদ্রোহিতা-লব্ধ পাকিস্তানকে হিন্দুস্থানের সহিত মিলনের চেষ্টাই খাজা নাজিমুদ্দীনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

তিনি কি ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারত অখণ্ড থাকিলেও বাঙ্গালাকে বিভক্ত করা একান্ত। বেই প্রয়োজন? খাজা নাজিমুদ্দীনকে এ কথাও আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, বিভক্ত বাঙ্গালা আবার অখণ্ড বাঙ্গলায় পরিণত হউক, ইহা আমরাও চাহি না। আমরা গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে এইরূপ প্রচেষ্টার বিরোধিতা অবশ্যই করিব। কিন্তু কেহ বা কোন দল যদি নিয়মানুগ পন্থায় উভয় বাঙ্গালার পুনর্মিলনের জন্য আন্দোলন করে, তাহা হইলে উহা চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইবে, এ কথা গণতন্ত্রে বিশ্বাসীর কাছে স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শুধু উভয় বাঙ্গালার মিলনের কথা কেন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই রাষ্ট্র মিলিত হওয়ার চেষ্টাও দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ, গণতন্ত্রের মূল সূত্রই হইল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রচার, আন্দোলন, দল গঠন প্রভৃতি দ্বারা জনমতকে গঠন করা। উভয় বঙ্গকে পুনর্ম্মিলিত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন দমন করিবার অধিকার কোন গভর্ণমেন্টের, কোন মন্ত্রিসভার থাকিতে পারে না। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে অন্যায় করা হইতেছে, খাজা নাজিমুদ্দীন তাহা প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। পূজার সময় পূর্ব্ববঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তিনি গর্ব্বও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পূজার সময় পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিসর্জ্জন দেওয়ার ফলে কি এই শান্তি রক্ষিত হয় নাই? অমুসলমানদের নিকট হইতে যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে তিনি সাধারণ চুরি-ডাকাতি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রিসভা সাধারণ চুরি-ডাকাতি বন্ধ করিতে পারেন নাই। যাত্রীদের উপর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নিপীড়নকে তিনি দেখিয়াও দেখেন না। কিন্তু বৈধ আন্দোলন দমন করিতে তিনি ব্যাঘ্রবৎ হইয়া উঠিবার হুমকী দিয়াছেন। ইহাই কি পাকিস্তানী গণতন্ত্রের নমুনা?

ডাঃ এন দাস

বাঙ্গালা ও আসামের পুনর্ব্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের আঞ্চলিক ডিরেক্টর ডাঃ নবগোপাল দাস, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), আই-সি-এস ভারত সরকারের শ্রমিক দপ্তরে পুনর্ব্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ দাস ১৯৩২ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার কার্য্য করিবার পর তিনি বাঙ্গালা সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শদাতার কার্য্য করেন। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে বাঙ্গালা ও আসামের পুনর্ব্বসতি ও নিয়োগ বিভাগ সৃষ্টির সময় হইতেই তিনি এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডাঃ দাস এক জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ এবং এই বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনায় করিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

—

মিঃ আর, জি, মুখার্জ্জি

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মিঃ আর, জি, মুখার্জ্জী এম-এস-সি, এ-এম-আই-আই-ই-ই (লণ্ডন) সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের "আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার্সের" সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সরকারের ওয়ার্কস এবং বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের ইলেকট্রিক্যাল এক্জেকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিদেশে বহু বড় বড় বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠানে অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, স্বাধীন ভারতে বৈদ্যুতিক উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি বহু ভাবে সরকারকে এবং জনসাধারণকে সাহায্য করিবেন।

—

মিঃ জি, এল, মেটা

মিঃ গগনবিহারী লালুভাই মেটার নাম অর্থনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বজনবিদিত। তিনি কলিকাতার ভারতীয় বণিক্ সভা প্রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতা কোর্টের কমিশনার ছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক কনফারেন্সে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধি ছিলেন। বিড়লা ব্রাদার্স, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ইত্যাদির তিনি এক জন ডিরেক্টর। গণ-পরিষদে তিনি কাথিয়াওয়াড় এবং পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যের প্রতিনিধি।

সম্প্রতি তিনি ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

—

বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর

মিঃ সি রাজা গোপালাচারী ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ায় তাহার স্থলে সার বি, এল, মিত্র পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ই নভেম্বর সকালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ আর, কে, মিত্র, সার বি, এলকে শপথ গ্রহণ করান।

অশ্বিনীকুমার

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ৭ই নভেম্বর বরিশালের বুকভরা ধন, সত্য-প্রেম-পবিত্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহ অশ্বিনীকুমার মহাপ্রয়াণ করেন। বাঙ্গালার ছাত্র-জাগরণের ইতিহাসে, শিক্ষা-প্রচারের ইতিহাসে অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ একটি বিরাট এবং অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার নিজের হাতের তৈরী, তাঁহার মানস-সন্তান চারণ-সম্রাট্ মুকুন্দ দাস। তখনকার দিনে এই সমিতিকে বৃটিশ ও ভারত সরকার বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলিতেন। যাত্রার মাধ্যমে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা যায়, এ কথা তিনিই প্রথম ভাবিয়াছিলেন। সুযোগ্য মুকুন্দ দাস তাঁহারই আশীর্ব্বাদ লইয়া বাঙ্গালার জেলায় জেলায় যাত্রার মধ্য দিয়া উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পর বরিশালের এক জন বলিয়াছিলেন—'যায় রে যায় ঐ সোণার মানুষ চলে যায়।' সত্যই তিনি সোণার মানুষ ছিলেন।

——

সুকুমার রায়

আজ থেকে ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৩ই কার্ত্তিক ১২৯৪ সালে বাঙ্গালা দেশের এক আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী পরিবারে সুকুমার রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশু-সাহিত্যে তখন একচ্ছত্র সম্রাট্। শুধু শিশু-সাহিত্য নয় সঙ্গীত ও চিত্রেও উপেন্দ্রকিশোরের ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। হাফটোন ব্লক তৈরী করিবার প্রথা তিনিই প্রথম এ দেশে প্রবর্ত্তন করেন।

'এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের' লেখক রেভারেণ্ড গুপ্তের মত সুকুমার রায়ও ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। কিন্তু 'আবোল-তাবোল' অথবা 'হ-য-ব-র-ল' পড়ে কি তাহা বুঝা যায়? তাঁহার মৃত্যুর পর স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"সুকুমার বাবু হাস্য-কৌতুককর অভিনয় ও গান করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; হাস্যকর ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ। এই সব কবিতা, গান, অভিনয়, ছবিতে হাসি থাকিত, কৌতুক থাকিত, কিন্তু কাহাকেও বিদ্রূপ থাকিত না; উহা পড়িয়া শুনিয়া দেখিয়া সকলে আনন্দ পাইত, কেহ আঘাত পাইত না।"

সুকুমার রায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলিয়াই যেন তৃপ্তি হয় না, কোনো সুখ্যাতিই যেন তাঁহার যোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার তুলনা তিনিই। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একমাত্র সুকুমার বাবুর সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা গর্ব্ব করে বলিতে পারি—'এমনটি আর কোথাও নেই।'

সুরেন্দ্রনাথ

১০ই নভেম্বর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী। তাঁহার রাজনীতি সম্পর্কে অনেক মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু তিনিই যে আধুনিক রাজনীতির জন্মদাতা, এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রাষ্ট্র সাধনায় স্বাধীন ভারত অঙ্কুররূপে প্রচ্ছন্ন ছিল। আজ সেই অঙ্কুর বিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। তাহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখায় পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের আশা ও আশ্রয়স্থল হইয়াছে। শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথ বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন এই ক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বলিতে গেলে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রায় তাঁহারই হাতে গড়া। শেষের দিকে তিনি রাজনীতি-প্রবাহ হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তবু আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার জীবন-কাহিনীই নব্য ভারতের জীবন-প্রভাতের কাহিনী। জাতীয় জীবনে তিনি অমর।

——

পরলোকে অমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমুজনাথ উত্তর পাড়ার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রমাতামহ, ঋষি-প্রতিম মুকুন্দদেব তাঁহার মাতামহ, বাঙ্গালার অদ্বিতীয়া লেখিকা অনুরূপা দেবী তাঁহার মাতা।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম·এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয়
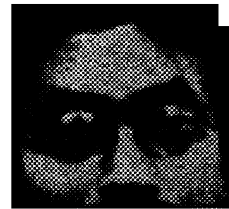
অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি লাভ করেন। অধ্যাপনাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ, কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। বঙ্গ বিভাগের সময় সীমা নির্দ্ধারণ সমিতির সদস্য রূপে বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে অক্লান্ত ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। আপন আদর্শে অবিচলিত থাকিয়া মাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শোক-ক্লিষ্ট পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ত্রিপুরা

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক
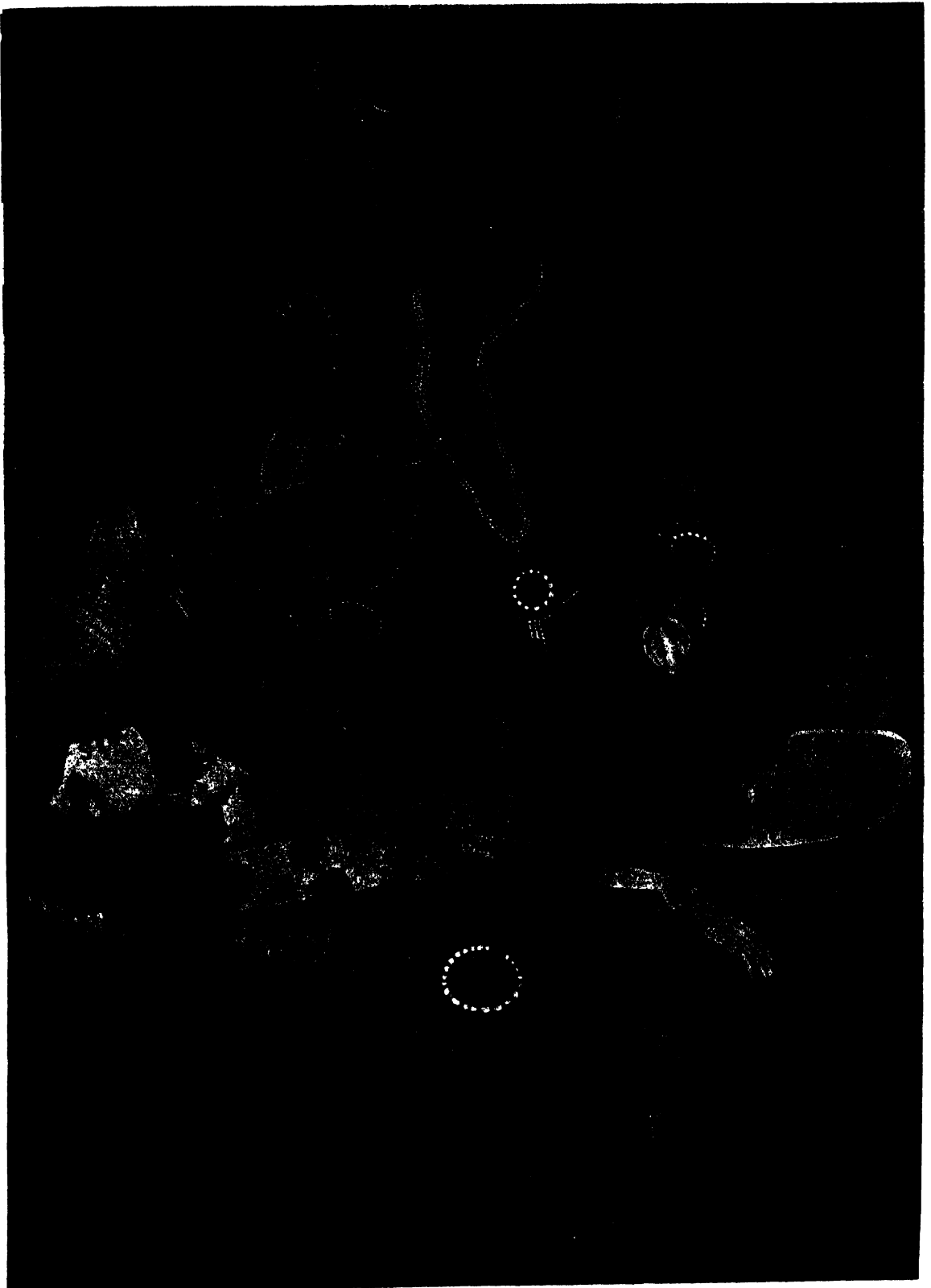
মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ দ্বিতীয় সংখ্যা

মানুষ আপনাকে চিন্‌তে পারলে ভগবান্‌কে চিন্‌তে পারে। "আমি কে" ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিষ নাই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, সেই আত্মা—চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান্‌ দেখা দেন।"

* * * *

"যাঁকে বেদে বলেছে ব্রহ্ম, তাঁকেই যোগীরা বলেন আত্মা, আর পুরাণে বলে ভগবান্‌।"

"যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে থাকলেও যে সাপ, এঁকে বেঁকে চললেও সেই সাপ। কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে থাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এঁকে বেঁকে চলা সক্রিয় অবস্থা।"

শাক্তরা বলে সচ্চিদানন্দ কালী, শৈবরা বলে সচ্চিদানন্দ শিব, বৈষ্ণবরা বলে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ।"

"যার চল আছে তার অচল আছে।"

—কথামৃত

ভবঘুরের চিঠি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভায়া, বাড়ীতে ফিরে এসে তোমার তিনখানা চিঠি এক সঙ্গে পেলুম। উত্তর না পেয়ে তুমি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছ, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু ভয় নেই, কাশীর এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আমার হস্তরেখা দেখে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এখনও বারো বৎসর আমাকে সনাতন ভবঘুরে-বৃত্তি অবলম্বন করে এই ধরাধামেই থাকতে হবে। তথাস্তু। বেঁধে মারলে আর উপায় কি ?

কাশীতে একটা বড় মজার খপর শুনে এলুম। এখানে কয়েক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভৃগুসংহিতা অনুসারে কোষ্ঠী বিচার ক'রে পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মের কথা বলে দেন জান তো ? এক দিন তাঁদের এক জনের কাছে গিয়ে দেখলুম যে, মহাত্মাজী থেকে আরম্ভ করে নেতাজী পর্য্যন্ত—দেশের সমস্ত বড়লোকের কোষ্ঠীই তাঁর কাছে রয়েছে। নেতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হলো না—কি জানি, যদি তিনি বলে বসেন যে নেতাজী ইহলোক ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন তা' হলে তো আমাদের ফরওয়াড ব্লকের একেবারে ভরাডুবি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম মহাত্মাজীর কথা। জ্যোতিষী বল্লেন—"মহাত্মাজীর কোষ্ঠী বিচার তিনি অনেক আগেই করে রেখেছেন, আর এ বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই নেই পূর্ব্বজন্মে মহাত্মাজী ছিলেন এক জন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশা। সে সময় তিনি যে ব্রত নিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তা' উদ্‌যাপন করতে পারেননি। সেই অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করতেই তিনি এবার জন্মেছেন।" কথাটা শুনে ভক্তি ও বিস্ময়ে আমার চোখ দু'টো ঠেলে বেরুবার উপক্রম করতে লাগলো। একটু সামলে নিয়ে আমি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"মহারাজ! এত দয়াই যখন করলেন, তখন খুলে একবার বলে দিন, মহাত্মাজী পূর্ব্বজন্মে কোন্ বাদশা ছিলেন।" জ্যোতিষী একটু হেসে উত্তর দিলেন—"বল্লে বিশ্বাস করবে না, বাবা; কিন্তু মহর্ষি ভৃগু ছিলেন ত্রিকালদর্শী অভ্রান্ত ঋষি। তাঁর ইঙ্গিত মিথ্যা হবার নয়; আর সেই ইঙ্গিত অনুসারে গণনা ক'রে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, মহাত্মাজী ছিলেন পূর্ব্বজন্মে মোগলকুলতিলক আলমগীর বাদশা। হিন্দুনিধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, আর হিন্দুস্থানকে ইসলামিস্থানে পরিণত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বল-প্রয়োগ করেও যখন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না, তখন বল-প্রয়োগের উপর হলেন তিনি বীতরাগ। প্রবল বৈরাগ্যগ্রস্ত হয়ে তিনি মক্কা যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হলো। হিন্দুদের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ব'লে হিন্দুকুলেই তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হোলো; এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান-বলে তিনি দেখতে পেলেন যে, যে কাজ বল-প্রয়োগের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি, ছলে ও কৌশলে তা' সুসম্পন্ন হতে পারে। পূর্ব্ব-সংস্কারবশে এবার তিনি হয়েছেন অহিংস মুসলিম-দরদী।"

জ্যোতিষীর কথা শুনে আমার হাড় জ্বলে গেলো। আমি বললুম—"রেখে দিন মশাই, আপনার ভৃগুসংহিতা। যিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা করে আসছেন, প্রেমের দ্বারা যিনি চিরদিন মুসলমানদের প্রাণে হিন্দুপ্রীতি জাগাবার চেষ্টা করে আসছেন, তিনি হলেন কি না আলমগীর বাদশার অবতার! কাশীতে গাঁজার দর কত মশাই ?"

রেগে আমি উঠে পড়ছিলুম—জ্যোতিষী আমাকে হাত ধরে বসালেন। হেসে বল্লেন—"কাশীতে গাঁজার দর যা-ই হোক, বাবা, দিল্লীতে আফিম যত সস্তা, কাশীতে গাঁজা তত সস্তা নয়। দেখছো না, দিল্লীতে মহাত্মাজীর প্রেমের বাণী শুনতে শুনতে সবাইকার চক্ষু কেমন ঢুলু-ঢুলু করছে! পাকিস্থানী কর্ত্তারা কাশ্মীরে ঢুকে দেশটাকে ছারখার করছে ? মদ্দদের মারছে আর মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে; আর এ দিকে পাকিস্থানী কর্ত্তাদের সঙ্গে দিল্লীর অমুসলমান কর্ত্তাদের অতি প্রীতিপূর্ণ উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলছে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, অবস্থা না কি খুবই আশাপ্রদ! কাশ্মীর আক্রমণের নিন্দা করা চুলোয় যাক, বিলাতের ওয়াকিবহাল খবরের কাগজ-ওয়ালারা উপদেশ দিচ্ছেন—যাক্ গে আর গণ্ডগোলে কাজ নেই; কাশ্মীরকে পাকিস্থান আর হিন্দুস্থানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দাও। শান্তিরক্ষা করবার অছিলায় যাঁরা ভারতবর্ষের খানিকটা ভেঙ্গে পাকিস্থান গড়তে রাজী হয়েছিলেন, তাঁরা যদি আবার ঐ শান্তিরক্ষার অছিলায় কাশ্মীরকে দু'টুকরো করতে রাজী হন, তা' হলে তোমরা যে সবাই সেই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে কংগ্রেসের জয়ধ্বনি করবে তা'তে সন্দেহ নেই; কিন্তু দু'দিন পরে দেখতে পাবে যে, কাশ্মীরের

যে অংশ পাকিস্থানে গেল তাতে আর এক জন হিন্দুরও স্থান হবে না।"

আমি বললুম—"ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন? দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে কি করবেন বা না করবেন, তার সঙ্গে মহাত্মাজীর সম্বন্ধ কি?"

জ্যোতিষী বল্‌লেন—"বাপধন! চোটো না। মহাত্মাজী নির্লিপ্ত পুরুষ, তাঁর সঙ্গে জগতের কোন কিছুরই সম্বন্ধ নেই। তিনি কংগ্রেসের চার আনার মেম্বারও নন; অথচ দেখ, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে গিয়ে তিনি বক্তৃতা করছেন। তাঁর ইঙ্গিতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকেও গদি ছাড়তে হচ্ছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই; অথচ ছোরাউদ্দি সাহেব তাঁর আজকাল একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। হিন্দু-মুসলমানকে মিলিয়ে দেবার জন্যে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই; কিন্তু মুসলিম লীগ সেই মিলনের বিরোধী জেনেও তিনি কলকাতায় এসে তাঁর অনুগত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুসলিম লীগে যোগ দিতে উপদেশ দিয়ে গেলেন। কাশ্মীরের তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু তবুও যখন পাকিস্থানী কর্ত্তাদের সাহায্যে পাঠানেরা কাশ্মীর আক্রমণ করলো, তখন মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট যদি সেখানে সৈন্যসামন্ত না পাঠিয়ে অহিংস যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন, তা হলেই কাজটা হতো ভাল। সহিংস যুদ্ধেই যখন পাঠানদের ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে, তখন অহিংস যুদ্ধ করলে যে এত দিনে পাঠানেরা কাশ্মীর দখল করে দিল্লীতে এসে পৌঁছুতো, তা মহাত্মাজী ভিন্ন আর সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। পাঠানদের সহিংস আক্রমণ আর ভারত-গবর্ণমেণ্টের অহিংস প্রতিরোধ—এই দু'য়ের সংঘর্ষে যদি পাকিস্থানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে যায়, তাতে মহাত্মাজী আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং প্রীতই হবেন—লোকে যদি এ কথা মনে করে তা হলে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়?"

কথাগুলো আমার ঠিক ভাল লাগছিল না; কিন্তু জ্যোতিষীর মুখ বন্ধ করবার পথও খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যোতিষী যেন একটু উৎসাহিত হয়েই আবার বল্‌তে লাগলেন—"আর এই আশ্রয়-প্রার্থীদের ব্যাপারটাই দেখ না! পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ হিন্দু আর শিখ সর্ব্বহারা হয়ে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে এসে পড়েছে; আর প্রায় সমান-সংখ্যক মুসলমান দিল্লী আর পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ছেড়ে পাকিস্থানে চলে যেতে চাইছে। মহাত্মাজী হিন্দু আর শিখদের উপদেশ দিচ্ছেন—'তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ফিরে যাও, আর মুসলমানদের মধ্যে বন্ধু ভাবে বাস করো গে। মুসলমানেরা যদি তোমাদের খুন করতেও চায়, তাহলেও ভয় পেও না। যেহেতু আত্মা অমর।' দিল্লী আর পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের মুসলমানদের তিনি বলছেন—'তোমরা দেশ ছেড়ে যেও না। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণে তোমাদের রক্ষা করবে।' এর ফল হচ্ছে এই যে, যে সব হিন্দু আর শিখ পাকিস্থান থেকে এসেছে, তারা মহাত্মাজীর উপদেশ সত্ত্বেও পাকিস্থানে ফিরে যেতে চাইছে না। তাদের বিষয়-সম্পত্তি যে তারা ফিরে পাবে সে আশা তাদের নেই; আর এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পাকিস্থানে ফিরে গিয়ে বাস করতে হলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের কলমা পড়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। মহাত্মাজী আশ্বাস দিচ্ছেন যে, ভারতবর্ষে যদি মুসলমানদের উপর কোন রকম অত্যাচার না হয়, তা হলে পাকিস্থানেও হিন্দু আর শিখদের উপর সব অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে—'আজ পঁচিশ বৎসর ধরে মহাত্মাজী মুসলিম লীগকে তুষ্ট করবার জন্যে তাদের সব আবদার মেনে নিয়েছেন; ভারতবর্ষে মুসলমানদের উপর কোন অত্যাচারই হয়নি; কিন্তু তবু পাকিস্থানী লড়াই সুরু হলো কেন? হিন্দু আর শিখ শান্ত হয়ে থাকলেই যে মুসলমানেরা শান্ত হয়ে থাকবে, তার তো কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না! বরং তারা যে উৎসাহিত হয়ে আরও বেশী অশান্ত হয়ে উঠবে, অতীত ঘটনা থেকে তাই মনে হয়। মহাত্মাজীর পন্থা অনুসরণ করে যদি হিন্দু-মুসলমানে মিলন করাতে হয়, তা' হলে শেষ পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে; অতীত ইতিহাস অনুসরণ করে কতক হিন্দু কলমা পড়ে প্রাণ বাঁচাবে; আর যারা তা করবে না, তাদের অমর আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে পিতৃলোকে বিচরণ করতে থাকবে। শ্রাদ্ধ-তর্পণের সময় এক গণ্ডুষ জলের আশায় তারা হাঁ করে বসে থাকবে; কিন্তু তাদের বংশধরদের ভিতর সেই জল-গণ্ডুষ দেবার লোক আর কেউ থাকবে না!"

পিতৃলোকে গিয়ে হিন্দুদের অমর আত্মার কি অবস্থা হবে, তার জন্যে আমার বেশী দুর্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মহাত্মাজী নিজেই অমর আত্মার কথা তুলেছিলেন; কাজেই সেই অমর আত্মাকে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, তর্ক-যুদ্ধও

[১২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লজ্জা

—চিত্ত দাস

—বীরেন দে
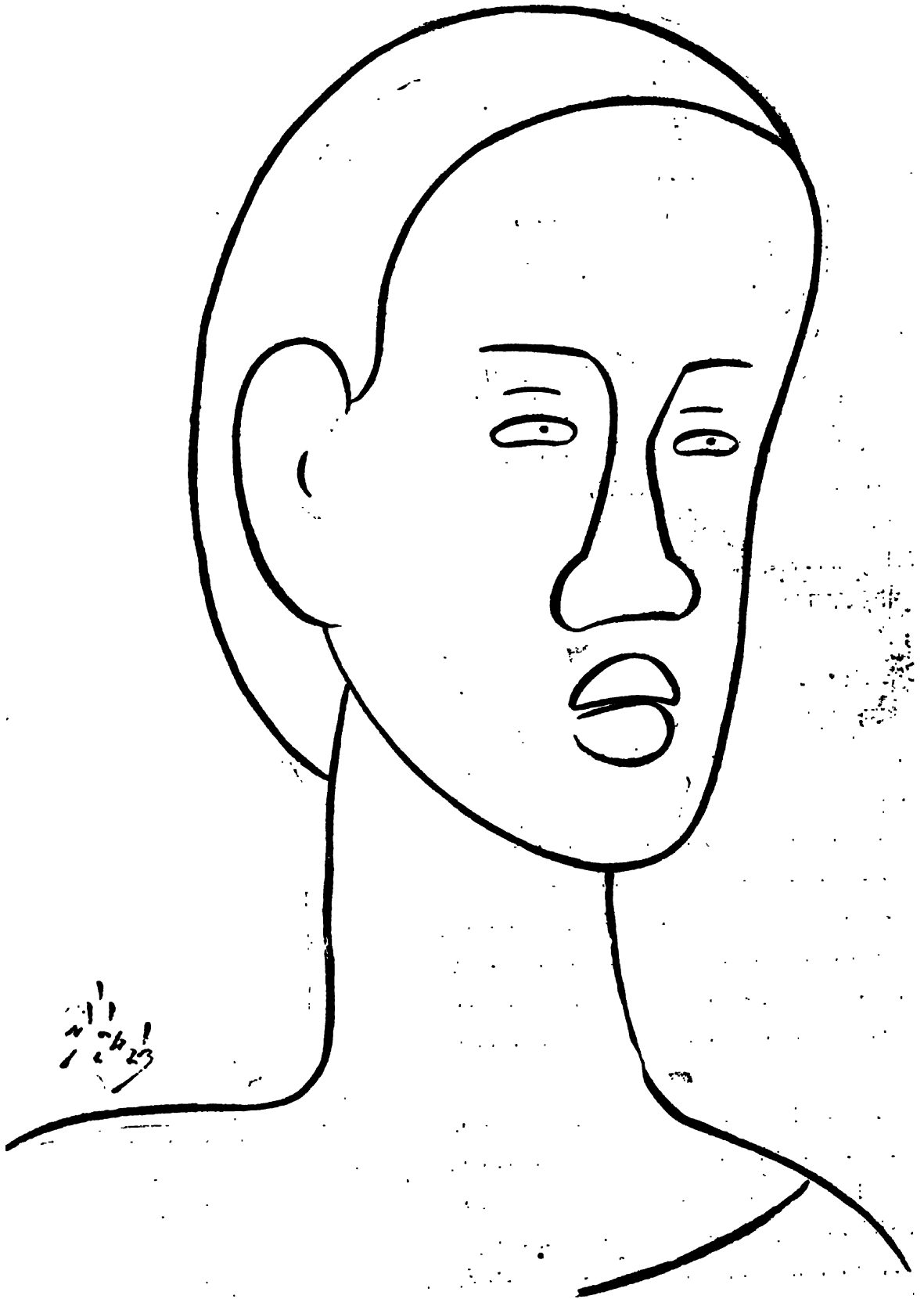
-প্রাণকৃষ্ণ পাল

[১২৩ পৃষ্ঠার পর]

aggression is the best form of defence। আমি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে জ্যোতিষীকে বললুম—"মহাত্মাজী না হয় হিন্দুদের শান্ত ভাবে সব অত্যাচার সহ্য করতে বলে মহা অপরাধ করেছেন। কিন্তু আপনি তাদের কি করতে বলেন? একে তো দেশে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব—তার উপর মারামারি কাটাকাটি যদি লেগে থাকে, তা হলে আমাদের দুর্দ্দশা বাড়বে বই তো কমবে না! অন্নাভাব, বস্ত্রাভাবের উপর আবার খুনোখুনি চড়িয়ে দেওয়া কি ভাল?"

জ্যোতিষী বল্লেন—"আরে কি বিপদ! উপদেশ দেওয়া কি আমার ব্যবসা? মানুষের কর্ম্মফলে যা ঘটছে আর যা ঘটবে তাই ঠিক করে নির্ণয় করাই জ্যোতীষের কাজ। যে কর্ম্ম আমরা করেছি তার ফল কি হয়েছে, আর যা করতে যাচ্ছি তার ফল কি হবে—এই সব কথা নিয়েই আমার কারবার। লোককে সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি দেবার কর্ত্তা তো আমি নই। যারা যেমন বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে তারা সেই অনুসারেই চলবে; আর যার উপদেশ শুনলে তাদের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, তার উপদেশই শুনবে। মহাত্মাজী জন্মেছেন নিজের কর্ম্মফলে মহাত্মা হয়ে, আর এ দেশের হিন্দুরাও জন্মেছে নিজেদের কর্ম্মফলে এ দেশের হিন্দু হয়ে। এই দু'য়ের সংস্পর্শে হিন্দুস্থান যদি পাকিস্থানে পরিণত হয়, তা হলে রোধ করবার আমি কে? মহাত্মাজী সফল হবেন, কি নিস্ফল হবেন, তা নির্ভর করছে এ দেশের লোকের উপর। তারা কি করবে তা নির্ভর করছে তাদের অতীত কর্ম্মফল-প্রসূত বুদ্ধি-বিবেচনার উপর। মহাত্মাজী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন্ পথে চলছেন, মহর্ষি ভৃগুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তা দেখিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। বিশ্বাস করা না করা তোমার খুসি।"

বা রে জ্যোতিষী! মহাত্মাজীকে উরঙ্গ-বাদশার অবতার বানিয়ে দিয়ে একেবারে পাকাল মাছটির মতো পিছলে পড়বার চেষ্টা করছেন! আমি বললুম—"দেখুন, জ্যোতিষী ঠাকুর, মহাত্মাজী সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপুরুষ। হিন্দু মুসলমান প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বাস করুক—এই তাঁর আন্তরিক কামনা।"

জ্যোতিষী একটু হেসে বল্লেন—"এই কথাই তিনি বলেন বটে; কিন্তু কোথাও দেখেছ, তিনি মুসলমানদের কাছে অমর আত্মা সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছেন? কোথাও তাদের তিনি বলেছেন, শত্রুর ছুরির সামনে বুক পেতে দিতে? কোথাও কি তাদের মেয়েদের তিনি বিষ খেয়ে মরতে উপদেশ দিয়েছেন? শুধু হিন্দুর আত্মাই কি অমর? শুনতে পাই, মুসলমানদের জন্যে বেহেস্তে না কি রকম-বেরকমের মোগলাই কালিয়া-পোলাও, আর হুরি-পরির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং হিন্দুরা পিতৃলোকে গিয়ে যে অবস্থায় থাকবে, মুসলমানেরা বেহেস্তে গিয়ে তার চেয়ে ভালই থাকবে বলে মনে হয়। কিন্তু তবুও মহাত্মাজী কোথাও তো মুসলমানদের বিনা বাক্যব্যয়ে বেহেস্তে চলে যাবার উপদেশ দেননি? কেন বল দেখি?"

নাঃ, এ জ্যোতিষীকে নিয়ে আর পারা গেল না। হঠাৎ আমার মনে হলো, বেটা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের গুপ্তচর নয় তো? বাংলা দেশে হলে আমাদের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী অতি সহিংস ভাবে বেটাকে জেলে পুরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন। কিন্তু কাশীতে তো তা হবার উপায় নাই! ঠিক করলুম, দেশে ফিরেই ব্যাপারটা আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রি-মণ্ডলীকে জানিয়ে দেবো। মহাত্মাজীর কাছে খপর পাঠিয়ে তাঁরা এই পাষণ্ড-দলনের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবেন।

—রমা চক্রবর্ত্তী

নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী আঁদ্রে জিদ্

মণি বাগচি

তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে আঁদ্রে জিদের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে এবং এই ঝড়ের কেন্দ্র হচ্ছে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-গোষ্ঠী। আর সেই ক্ষোভ, অন্ততঃ জিদের মত এক জন চরম দুর্নীতিবাদী লেখক যে এই দুর্লভ সম্মানের যোগ্য পাত্র নন—এই কথাটাই উচ্চ-কণ্ঠে বলা হয়েছে এঁদের তরফ থেকে। সমবেত প্রতিবাদ জানিয়ে এক স্মারক-লিপি পর্য্যন্ত পাঠানো হয়েছে নোবেল কমিটির কাছে। খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক লেখকই সই করেছেন এই স্মারক-লিপিতে। স্বাক্ষর নেই এতে শুধু এক জনের। তিনি বার্ণার্ড শ'। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথম যে পুরস্কার দেবার পর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হোলো। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা আঁদ্রে জিদের এই সম্মান লাভে খুসী তো হয় নি, বরং যে ভাবে, যে ভাষায় মন্তব্য করেছে তা অসৌজন্যেরই পরিচায়ক। 'টাইমস্'-এর এক জন প্রতিনিধি এই সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'য়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর অভিমত জানতে চান, তখন শ' তাঁকে এই কথা বলেন: "স্বীকার করি, আঁদ্রে নিজে এক জন নোংরা লেখক, কিন্তু তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব এই যে, সেই নোংরামির ভেতর দিয়ে যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্তাও তেমন জিনিষের কল্পনা করতে পারেন কি না সন্দেহ। আমি এক জন কটুভাষী এবং স্পষ্টবক্তা; কিন্তু এ কথা আমি অকপটেই স্বীকার করবো যে, আমার মতো দুঃসাহসী লেখকের চিন্তা যেখানে এসে থেমে গেছে, জিদ্ সুরু করেছেন সেইখান থেকে।"

এই জিদ্ যখন তাঁর নিজের দেশে ১৯২৩ সালে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন, তখন ফরাসী সমালোচকেরা তাঁকে নির্মম ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। বিজ্ঞানে একটা কথা আছে 'Nature abhors a Vacuum' এই সমালোচকেরা এই কথাটাই ঘুরিয়ে সেদিন বলতে ইতস্ততঃ করেননি—'Nature abhors a Guide—পৃথিবীর কোনো লেখক সম্বন্ধে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য আর কখনো শোনা যায়নি। এক-আধ বছর নয়, ত্রিশ বছর ধরে ফরাসী সমালোচকদের হাতে এই ভাবে নিগৃহীত হবার পর আজ, সাতাত্তর বছর বয়সে, জিদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে যে, সেই সব নিন্দুক সমালোচকদের অনেকেই এখন তাঁর সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এখন ফরাসীর জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লেই স্বীকৃত ও সম্পূজিত। জয়েস এবং প্রুস্তের পর সমসাময়িক যুগে আর কোনো লেখকই সমগ্র ইউরোপে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হননি যেমন পেরেছেন জিদ্। বিংশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে যত রকম 'ism' দেখা গিয়েছে, তার প্রত্যেকটার প্রেরণার উৎসমূল হোলো জিদের intellectual adventure-এর অভিনব আদর্শ, ফরাসী ভাষায় যে জিনিষটাকে এখন বলা হয়—"L'Inquietude Guidienne".

কাজেই এমন লোক যদি আজ নোবেল পুরস্কার পান, প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই তাতে গর্ব্ব বোধ করা উচিত এই ভেবে যে, ইউরোপের চিন্তালোকের হাওয়া এখন বদলে গেছে। নৈতিক আদর্শবাদীদের বৈধব্য-সুলভ বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে প্রতিভার মূল্য যে আজ সেখানে যাচাই হয় না—যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানসলোকের এই চেতনা সত্যিই একটা বিস্ময়ের জিনিষ। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে জিদ্ যখন ঘোষণা করলেন—"To disturb, that is my role—" তখন অনেকেই চমকে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, নবাগত এই ঔপন্যাসিক হয়ত চাঞ্চল্যকর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে একটা সুলভ খ্যাতি অর্জ্জন করতে আগ্রহান্বিত। সাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়নের ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রেছেন এমন ঔপন্যাসিক বিরল নন, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যে, কিন্তু ব্রিওর মতো নাট্যকার যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নাটকের ভেতর দিয়ে, তাতে করে ফরাসীর সমাজ-দেহ থেকে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি অপসারিত হয়েছে—তবে ব্রিওর সৃষ্টি ছিলো নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক এবং যে সংস্কারকের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে তিনি সফলতা অর্জ্জন করেছিলেন। সাবেক যুগে মোপাসাঁও এক জন আলোড়নকারী লেখক ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী লেখক। আজকের দিনের সাহিত্যে এঁরা অচল এবং অপ্রয়োজনীয়। আঁদ্রে জিদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এইখানে যে, সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তিবাদের মাধ্যমে তিনি আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছেন মানুষকে তার পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তাঁর জীবনীকার ব'লেছেন, সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে এমন লেখক আর জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর সঙ্গে আঁদ্রে জিদের তুলনা করা যেতে পারে। অনেকে হয়ত এই উক্তি অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন। করা স্বাভাবিক—কারণ, আনাতোল ফ্রাঁস বা রোমা রোঁলার পাশে জিদ্‌কে মানায় না। তথাপি তাঁর সুদুর্গম সাহিত্য-জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলে পাঠক এই সৃজনীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভার যে পরিচয় পাবেন তা তাঁকে বিস্মিত করবেই। জীবনকে, প্রকৃতিকে তিনি কি ভাবে, কি নিবিড় ও ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, ভাবলে পরে তাঁর জীবনীকারের উক্তিকে আর অত্যুক্তি বলে মনে হবে না।

ইউরোপীয় সাহিত্যের ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে আজ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস তার বিভিন্ন পর্ব্বে একাধিক প্রতিভা, একাধিক চিন্তানায়কের সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং তাঁদের প্রত্যেকেই সমসাময়িক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন—জয়েস, ইবসেন, শ, লরেন্স—প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে অসামান্য প্রতিভার আলোকে দীপ্যমান হলেন আঁদ্রে জিদ্। তিনি জনপ্রিয় লেখক নন, জনগণেরও লেখক নন, প্রকৃত পক্ষে তাঁর পাঠকগোষ্ঠীর সংখ্যার স্বল্পতাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। অস্কার ওয়াইল্ড একবার জিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সাহিত্যে আপনার আদর্শ কি?" উত্তরে জিদ্ বলেছিলেন—"ও সব আদর্শ টাদর্শ আমি বুঝি না, মানি না···To me literature is the all seeing eye of the world; an eye whose glimpse pierces the deepest secrets of the human spirit."—এবং এই কথার মধ্যেই রয়েছে জিদের জীবন দর্শনের সার কথা। ওয়াল্টার পেটার ও নীট্‌শে—এই দু'জনকেই জিদ্ শ্রদ্ধা করেন বিশেষ ভাবে এবং তাঁর চিন্তার ওপর নীট্‌শেরই পরোক্ষ প্রভাব বেশী। তবুও নীট্‌শের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি মিল নেই। তাঁরাই মহৎ শিল্পী, তাঁরাই বড়ো লেখক, যাঁরা প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশরাশিকে বেছে-

গুছিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে মনের সচেতন স্তরে তুলে ধরেন। তাঁরাই সৃষ্টি-ধর্ম্মী লেখক, যাঁরা আপন দেশ-কালের পরিবেষ্টনীতে বিশ্বমানবের প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত করেন। আঁদ্রে জিদ এমনি এক জন মহৎ শিল্পী।

জিদের সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করতে হলে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, লঘুচিত্ত এবং চিন্তার দৈন্যে পঙ্গু পাঠকদের পক্ষে তা সহজসাধ্য নয়। পাঠকের চিন্তার যদি এতটুকু নীতিগত সংস্কার বা চারিত্রিক জড়তা থাকে, তাহলে জিদকে বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা। যে সব নরনারী তাঁর সাহিত্য-জগতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেউ-ই কোন রকম নীতির ধার ধ'রে না, এমন কি তাদের কাছে পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্মাধর্ম্মের, ভালো-মন্দের কোনো বালাই নেই। এরা প্রত্যেকেই চরিত্রহীন, চোর, লম্পট, মাতাল, খুনে এবং অতি মাত্রায় perverse—পৃথিবীতে এমন কোনো জঘন্য দুষ্কার্য্য নেই যা নিঃসংকোচে এরা না করেছে। অথচ ভ্রষ্ট মানুষের এই ভগ্নাংশ থেকেই জিদ সৃষ্টি করেছেন এক অপূর্ব্ব সাহিত্য, এদের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন মানুষের দুর্লভ মহত্ত্ব এবং তাকেই ভাষা দিয়েছেন এক অনন্যসাধারণ ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী আজও অননুকরণীয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—'Immoralist' যখন প্রথম বেরুলো তখন ফরাসীর প্রাচীন ও নবীন-পন্থী লেখক ও সমালোচক রীতিমতো নাসিকা কুঞ্চন করে বলেছিলেন—"এমন ঘোরতর দুর্নীতি-মূলক উপন্যাসের প্রচার আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।" পরবর্ত্তী কালে অবশ্য তাঁরা তাঁদের এই মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাহিত্য-জগতে জিদ এক জন নিঃসঙ্গ বিপ্লবী—"A solitary Rebel"—এই তাঁর সব চেয়ে বড় গৌরব। এর কারণ দু'টি। এক তাঁর চারিত্রিক দুর্নাম (যে দুর্নাম অস্কার ওয়াইল্ডের সমগোত্রীয়) এবং এই জন্যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও অপাংক্তেয় হয়েই আছেন। কিন্তু এইখানেই জিদ্ একটি মস্ত বড় প্রহেলিকা। চারিত্রিক নিষ্ঠার ওপরে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতা। তাই অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন—"জিদ্ এমন একটি মানুষ, যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি—"He is a man who has never told a lie"—এবং সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তথাকথিত লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করবার খাতিরে জিদ্ মিথ্যা বলবার আর্ট আয়ত্ত করতে পারেননি বলেই সাহিত্য-সমাজে এই নির্ভীক প্রতিভাকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না; পারে না বলেই তিনি অপাংক্তেয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যা সাধারণ পাঠক ত বটেই, এমন কি চিন্তাশীল পাঠকও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে না। তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা আমাদের কাছে খুব হৃদ্য বা মুখরোচক বলে মনে হবে না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, আঁদ্রে জিদের অনন্যসাধারণতা কোথায়? সমগ্র ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখলে পরে এই কথাই স্পষ্ট হবে যে, নোংরামির আবরণে তাঁর রচনার ভেতর এমন একটা রূঢ় সত্য আছে, যাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—আছে এমন একটা ঐক্যতান যা মানুষের মর্ম্মে গিয়ে এক আশ্চর্য্য অনাস্বাদিত প্রতিধ্বনি তোলে, তার বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, তাকে সন্ধান দেয় এমন একটা পৃথিবীর, যা আজও তার কল্পনায় অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছে। সস্তা ভাবালুতা, রোমাঞ্চকর উচ্ছ্বাস, যৌন উত্তেজনাকারী মদির কল্পনা কিম্বা নৈতিক পবিত্রতার ত্রিসীমানায় কখনো প্রবেশ করেননি তিনি। তা যদি করতেন, তাহলে কথা-সাহিত্যিক হিসেবে প্রথম জীবনেই তিনি সকলের চিত্ত জয় করতে পারতেন, একটা সহজ প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করতে পারতেন। কিন্তু কথা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁর আবির্ভাব এবং যিনি তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, সেই আঁদ্রে জিদ্ তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভেই যখন ঘোষণা করলেন—"To cultivate the art of being disagreeable, unpala-table to the reader and what is more, to disturb—that is my role…I write only to be reread…My value lies in my complexity—" তখনই বোঝা গিয়েছিলো যে, ইনটেলেক্‌টের ক্ষেত্রে এক পরম দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর আবির্ভাব হয়েছে। কথা-সাহিত্যে তিনি সেই নির্মম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন যা চিরদিন ছিল উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত এবং অনালোচিত। অনেকে বলে থাকেন, "জিদের এই সত্যনিষ্ঠা কখনো বস্তুনিষ্ঠা হয়ে উঠতে পারলো না। তাঁর সত্য-সন্ধান কেবল বিকৃত অসুস্থ উত্তেজনার ক্ষেত্রে। জিদের শিল্পধর্ম্মে সুস্থ জীবনের স্থান সঙ্কীর্ণ।" কিন্তু এ অনুযোগ বৃথাই! কারণ, উদ্দেশ্যমূলক আর্ট-সৃষ্টির কাছে জিদ কখনো হাত দেননি কিম্বা জোলা বা বালজাকের মত জীবনের খণ্ডিত রূপকেও তিনি গ্রহণ করেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের এক দিনের একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি। এ্যালজিয়ার্স ভ্রমণে গিয়াছেন অস্কার ওয়াইল্ড ও আঁদ্রে জিদ্। সেইখানে এক দিন এক পানশালায় ওয়াইল্ড জিদ্‌কে বললেন—"তুমি এক জন অতিমাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক লেখক; কিন্তু শিল্পে প্রথম পুরুষের স্থান কোথায়?" এই প্রশ্নের যে উত্তর জিদ্ সেদিন দিয়েছিলেন ফেনায়িত মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে, তা তাঁর অনুবর্ত্তী লেখকেরা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছেন। জিদ্ বললেন—"শিল্পসৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটাই তোলো প্রথম পুরুষেরই কাজ, এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষের স্থান নেই—There is only first person singular in art—এইখানেই আর্টের সার্থকতা।" ওয়াইল্ড আবার প্রশ্ন করলেন—"তাহলে তুমি বিশৃঙ্খলতার, বন্ধনহীনতার পক্ষপাতী?" জিদ হেসে উত্তর দিলেন—"তোমরা যাকে বিশুদ্ধ শিল্প বলো, তা'তে প্রাচীন রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন মাত্র, সেখানে শিল্পি-সত্তার শৃঙ্খলা-বোধটাই বড় কথা। কিন্তু ভেবে ছাখো, নিয়মানুবর্ত্তিতা কোনো শিল্পীরই স্বধর্ম্ম হতে পারে না। বিদ্রোহের পথই তার একমাত্র পথ—পীড়িত আত্মচেতনা, সংশয়পূর্ণ চিন্তা নিয়ে সেখানে যাওয়া চলে না। তা যদি চোতো, তবে দেখতে পেতে, আঁদ্রে জিদের জয়ধ্বনিতে সমগ্র সাহিত্য জগৎ মুখর হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে।"

এই আলোচনার পরই সৃষ্টি হলো জিদের বহু আলোচিত উপন্যাস—'মেকী মানুষ'—The counterfeiters—।" সমসাময়িক ফরাসীর রাজনীতি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার আভিজাত্য, তার ধর্ম্ম, সাহিত্য—সবই যে একটা বিরাট ফাঁকা ও ধাপ্পাবাজী, তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। সমাজের নীতি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এলো এর মূল সুর। অসাধারণ শিল্পনিপুণতা,

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এই বইখানির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বহু ও বিচিত্র টাইপের অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ এই উপন্যাসে। প্রত্যেকটি চরিত্রের দ্বৈত মানসিকতার, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সুনিপুণ অভিব্যক্তি আছে এর মধ্যে। মানুষ দেখতে এক রকম, কিন্তু সে হতে চায় আর এক রকম। ঘটনার বিশ্লেষণ ও চরিত্র-চিত্রণের সূক্ষ্মতায় আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে এই উপন্যাসের সমকক্ষ আর দ্বিতীয় কোনো উপন্যাস নেই। হয়ত এর মধ্যে কোনো বাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পাওয়া যাবে সে বাণীর চেয়েও বড়ো—অখণ্ডিত জীবনের নেপথ্য রূপ। সভ্যতার সর্ব্বব্যাপী প্রসারের মধ্যে যদি কোনো জিনিষ মূল্যহীন থাকে, জিদের মতে, তা হোলো মানুষ। কেন? উত্তর খুব স্পষ্ট: রুচি, সংস্কৃতি, প্রগতির নামে মানুষ আজ নিজেকে এতখানি নকলনবীশ করে তুলেছে যে, যাকে সে বলে থাকে তার আসল ব্যক্তিত্ব তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না তার চিন্তায়, চরিত্রে, বাক্যে এবং কার্য্যে। জিদের নিজের ভাষায়: "I feel that the true structure of personality has been falsified by our emphasis on the rational forces of man—" এই কথা তাঁর আগে এবং তাঁর পরের কোনও সাহিত্যিককে আমরা বলতে শুনিনি।

আঁদ্রে জিদের সমগ্র রচনার সংখ্যা হবে প্রায় পঞ্চাশ—এই পঞ্চাশখানির মধ্যে মৌলিক রচনাই বেশী,—অনুবাদও কিছু কিছু আছে। জিদের আত্মজীবনী—"If its die" কবিগুরু গ্যেটেএর আত্মজীবনীর সমপর্য্যায়ভুক্ত এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। কিন্তু জিদের সাহিত্য-প্রতিভার বড় পরিচয় হোলো তাঁর "জার্নাল" নামক বিরাট গ্রন্থ। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এই 'জার্নালের' তুলনা ফরাসী সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। নীট্শে, ডস্টয়ভস্কি, গ্যেটে, হুইটম্যান প্রভৃতি যে সব প্রতিভাবান্ লেখক ও কবিদের সম্বন্ধে ফরাসী পাঠকদের সংকীর্ণ পরিচয় আছে, তাঁদের কথাই জিদ্ আলোচনা করেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে এই বইতে। পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক আজ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা করেননি যেমন করেছেন জিদ্। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন, স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টি এই সব সৃজনীশক্তিসম্পন্ন কবি ও ঔপন্যাসিকদের ভেতর এমন জিনিষ দেখতে পেয়েছে যা অতি-সাবধানী পাঠকের ও সমালোচকদের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায়। আর কিছুর জন্যে না হোক, সাহিত্যে তাঁর এই মহৎ প্রয়াসের জন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত।

নীট্শে যে জীবন-দর্শনের পূজারী ছিলেন—"Live dangerously"—আঁদ্রে জিদ সেই একই জীবন-দর্শনের পূজারী। কিন্তু নীট্সের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে যে, দুঃসাহসিক অভিযানটাই জীবনের সব নয়, নিছক বিদ্রোহই এর সব নয়, জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে সমগ্রতার ভেতর দিয়ে—পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-মিথ্যা—এই সবের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হবে এক প্রচণ্ড দুর্নিবার গতিবেগ নিয়ে। তার গতিপথে থাকবে ঘূর্ণি, থাকবে প্রচণ্ড ঝড়, উদ্দাম তুফান, পঙ্কিল আবর্ত্ত আর অবিরাম সঙ্গীতময় তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ-শীর্ষে আত্মার যে প্রকাশ সেইখানেই মানুষের চরিতার্থতা। হয়ত তাকে নরকে নামতে হবে, কিন্তু তাই বলে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ সেইখানে নয়—ঊর্দ্ধ্বের আলোর দিকে প্রসারিত হবে তার ঈগল-দৃষ্টি—তবেই তো সে মানুষ। এমনি মানুষেরই সাক্ষাৎ আমরা পাই আঁদ্রে জিদের সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে।

●

উত্তর —————————— প্রচ্ছদপট

হাঁ, আপনি ভুল দেখিতেছেন। বনস্পতির দুইটি কাণ্ড উপরে উঠিয়া একত্রিত হয় নাই, এক হইয়া উপরে উঠিয়াছে। ছবিটিকে বেমালুম উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদের চিত্রটি হইতেছে শ্রীশ্রীশ্যামা-মাতার মহাপীঠস্থান দক্ষিণেশ্বরস্থ মন্দির ও সংলগ্ন প্রাঙ্গণ।

●

ভূপতি রায়ের বন

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এ অঞ্চলে ইতিহাস নাই, প্রবাদ আছে। ঘটনা সংঘটনের সন-তারিখের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে অনন্ত কাল-প্রবাহে এখানকার মানুষেরা তাদের সমগ্র অতীতকে নিক্ষেপ করেছে। মানুষটি যত দিন বেঁচে থাকল, তত দিন সে চলমান কালের সঙ্গে এক। যেমনি তার জীবনান্ত হল অমনি স্বল্প দিনের মধ্যে সত্ত-অতীতের স্রোত থেকে উজান বেয়ে কাল-প্রবাহের উৎস-মূলে গিয়ে জমা হল সৃষ্টি-গণনার আদি প্রত্যুষে। শুধু কি তাই? জীবিত কালের মধ্যেই এরা মরতে আরম্ভ করে। চুলে সামান্য পাক ধরলেই, সন্তান-সন্ততি একটু বয়স্ক হয়ে যেই নূতন পুরুষের আবির্ভাবের কাল আসে, তখন থেকেই আর বয়সের হিসাব থাকে না। এমনি মানুষ এরা। আর তাদের পরিবেশকেও তারা ঠিক এমনি ভাবেই গড়ে নিয়েছে।

হবে না-ই বা কেন? প্রত্যক্ষ ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে পৃথক্ হয়ে এদের বসবাস। আধুনিক জীবনযাত্রা এখান থেকে আট মাইল দূরে এসে থেমে গেছে। থানা, ইংরেজী ইস্কুল, রেল ষ্টেশন সব এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। আধুনিক কালের শাসন, শিক্ষা আর গতি সব-কিছুর কেন্দ্র-বিন্দু থেকে অনেক দূরে। তার উপর আছে নদী, আগেয়া নদী। একা নদী বিশ ক্রোশ। তাই নদীর পূর্ব্ব তীরে মহুলা, হিজল, বনগাঁ আর দাসপাড়া নিয়ে এই ভূতো রায়ের অঞ্চল ইতিহাস থেকে অনেক অনেক দূরে, প্রবাদের রাজ্যে পড়ে আছে।

আগেয়া নদীর কল্যাণে কিছুটা উর্ব্বর কালো বালি মাটি আর বাকীটা অনুর্ব্বর রাঙা শক্ত মাটি দিয়ে গড়া এ-অঞ্চল। আগেয়ার কোলে সামান্য কিছু জমি আর বালি-কাদা-ভরা জলা ছাড়া বিস্তীর্ণ রক্তিম প্রান্তর ধূ-ধূ করছে। তারই বুকে যেখানে আবার মাটি জেগেছে ঢালের মুখে, সেখানে চারখানি গ্রাম চার কোণে কোন মতে তাদের অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে আদিম অভিজ্ঞতা ও জীর্ণতায় কোন মতে টিঁকে আছে যেন। আর এই প্রান্তরের এক পাশে নদীর কোলে জলার ঠিক উপরে বিস্তৃত অংশ জুড়ে বিশাল কৃষ্ণকায় অরণ্য এক চাপ কালো কালি আর অন্ধকারের মত এ অঞ্চলের সকল বিভীষিকা আর রহস্য, সকল প্রবাদ আর অলৌকিকতার উৎস-মূল হয়ে দাঁড়িয়ে এই ভূতো রায়ের বন।

গ্রাম চারখানির মানুষদের জিজ্ঞাসা কর এই বন সম্পর্কে, তারা কোন কথা বলবে না, চোখে তাদের অস্পষ্ট ভয়ের ছায়া নেমে আসবে। রেখা-বহুল মুখে রেখার সংখ্যা বেড়ে উঠবে, তার পর দুই হাত জোড় করে জানাবে সসম্ভ্রম ভয়ার্ত্ত নমস্কার ঐ বনের উদ্দেশে। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে আছে ঐ বনের দিক্ থেকে বিপরীত মুখে। সব দিক্ পানে তাকায় তারা, কেবল ঐ বনের দিকে চায় না। তবু যখন নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে সারা পৃথিবী তার ছেলেদের নিয়ে ঘুমে এলিয়ে পড়ে, তখন আধো ঘুমের মধ্যে এ অঞ্চলের মানুষরা শুনতে পায় তীব্র আর্ত্ত কান্নার তীক্ষ্ণ চীৎকার, অতি দীর্ঘ—দীর্ঘতম নিশ্বাস ভেসে আসছে ঐ বনের মাথা থেকে, বুক থেকে, বনের ভিতর থেকে। তন্দ্রার মধ্যেই এ অঞ্চলের মানুষরা ঐ অশুভ ধ্বনি না শুনবার জন্যে কানে হাত চাপা দেয়। যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে তখন এই পৃথিবীর যারা মরে অথচ ঐ বনকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতেই রয়ে গেছে তারা জেগে উঠে উল্লসিত আনন্দে আর বুক-ভাঙা বেদনায় তাদের সুপ্রাচীন অপার্থিব আনন্দের নিত্য পুনরভিনয় করে চলে। যদি মোহগ্রস্ত আকর্ষণে কেউ জানালা খুলে অন্ধকারের মধ্যেও ঐ বনের দিকে তাকায় তবে দেখতে পায়, বনের মাথায়, গাছের পাতায় পাতায় তাদের অবয়বহীন চোখের দৃষ্টি দপ্-দপ্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে আর কোন্ অজ্ঞাত ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে জানালা বন্ধ হয়ে যায়।

এমনি ধারা ঘটছে শুধু আজ নয়, এই পুরুষেই নয়। বংশানুক্রমিক ভাবে সেই কোন্ আদি দিন থেকে এমনি ধারা ঘটে আসছে। সে কি আজকের কথা! তখন মানুষের জন্ম হয় নাই। কৈলাসে একদা পার্ব্বতীর সঙ্গে কলহ করে রুষ্ট মহেশ্বর নন্দীকে আর তাঁর যত সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে কল্যাণময় আনন্দময় আশ্রম ত্যাগ করে নেমে এলেন পৃথিবীতে। রোষক্ষুব্ধ রুদ্র তাঁর অন্তরের রোষাগ্নি দিয়ে নির্ম্মাণ করলেন এই কুটিল অন্ধকার অরণ্য। তার পর তিক্ত অন্তরেই বাস করতে লাগলেন এই অরণ্যে। তাঁর জপ গেল, তপ গেল, ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্তি গেল, শুধু এই অরণ্যের দিকে দিকে তিনি অবিরাম অস্থির পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর চণ্ড সঙ্গীরাও ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর ক্রমাগত রুদ্রের রুষ্ট পদপাতে শূন্য প্রান্তরের মধ্যে জন্মলাভ করতে লাগল জটিলকাণ্ড বৃক্ষরাজি অতি ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে।

এ কথা, এ ভাষ্য কোন আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক মানুষের নয়। এ কথা অলৌকিকত্বের দীক্ষায় দীক্ষিত এ অঞ্চলেরই মানুষের কথা। এর মুখপাত্র হলেন তারিণী চক্রবর্ত্তী। সত্তরের উপর বয়স, মাথায় একমাথা লম্বা-লম্বা সাদা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ী, বড় বড় চোখ, আধুলির মত বড় সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে লাল চেলি। জগৎপিতা পরমেশ্বর শিব তাঁর দেবতা, পিতা; পার্ব্বতী তাঁর আরাধ্যা জননী। রুদ্রের লীলা-সহচর রক্ত-ভূত-পিশাচেরা তাঁর

ভ্রাতৃতুল্য। চক্রবর্ত্তী তান্ত্রিক। আজও তিনি খাড়া সোজা আছেন। কণ্ঠস্বর আজও ভরাট, দৃষ্টি আজও উজ্জ্বল। তিনি বলেন, শিবের সেবক আর সন্তান তিনি, তাঁদের দয়ায় আজও তাঁর দেহ অম্লান। তাঁদের দয়ায় আরও এক শতাব্দী বাঁচবার আশা রাখেন।

চক্রবর্ত্তী যে তান্ত্রিক, সে কথা কোন দিন তিনি মুখে প্রকাশ করেন না। তবু তিনি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন, এ কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানে। আজও তাঁর সাধনা সমানে চলেছে লোক-চক্ষুর অন্তরাল দিয়ে। রাত্রি এক যাম অতীত হলে চক্রবর্ত্তী গৃহের পূজা সাঙ্গ করে পূজার উপকরণ আর নানান্ ভোজ্য নিয়ে বাড়ী পরিত্যাগ করে ভূতো রায়ের বনের ধারে নদীর কোলে জলায় যেখানে শ্মশান সেইখানে চলে যান পূজার উদ্দেশ্যে। মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর কৃষ্ণ-ভূত-পিশাচ বন্ধুদের তুষ্ট করে তাদের আহ্বান করেন আহার্য্য গ্রহণ করতে। তারা সানন্দ চিত্তে তাঁর দেওয়া আহার্য্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত অন্তরে শৃগালের মত উল্লাসধ্বনি করতে করতে বনে তাদের ঘনান্ধকার অধিষ্ঠান-ভূমিতে ফিরে যায়। এ কথা চক্রবর্ত্তী কখনও প্রকাশ করেন না। তবে একান্ত ভক্তজন বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলে এবং অপর কাউকে না জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলে তবে সেই অলৌকিক ইতিহাসের স্বল্প ভগ্নাংশ ব্যক্ত করেন।

এ ছাড়াও তারিণী চক্রবর্ত্তীর আর একটা পরিচয় আছে। তিনি এই অঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব জমিদার রায়দের নায়েব। যত কাল তিনি তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন তত কাল তিনি রায়দের নায়েব-পদে বহাল আছেন। রায়দের প্রথম পুরুষ ভূপতি রায় মাতামহের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে বনগাঁতে এসে বসবাস করেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন বনগাঁর জমিদার। আর বনগাঁয়ের সংলগ্ন বলে এই ঘন বনও ছিল তাঁরই সম্পত্তি। বন আজও যেমন ঘন, তখনও তেমনি ঘন ছিল। তখনও বনের মধ্যে ঢুকতে কারও সাহস হত না ভূতের ভয় তখনও ছিল, তবে অত বেশী ছিল না। তবে জঙ্গল ঘন বলে সাপ-খোপের ভয়ে এবং বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত বহু-বিস্তৃত জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ বনের ভিতরে ঢুকত না। তবে আশ পাশের গ্রামের বাউরী, বাগ্দী, কৈবর্ত্ত শ্রেণীর ছেলেরা আর মেয়েরা দ্বিপ্রহরের দিকে শুকনো কাঠ-কুটো সংগ্রহের চেষ্টায় বনের আশে-পাশে ঘুরত এবং অপরাহ্ণের দিকে ঝুড়ি বোঝাই করে শুকনো ডালপালা, তালপাতা নিয়ে বাড়ী ফিরত। এ ছাড়া নানান্ রকম ফলের প্রত্যাশায়ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন-সমাগমের অভাব হত না কাঁচা আম, কাঁচা পেয়ারা, পাকা জাম, আতা, বৈঁচ সংগ্রহ করবার মত লোভী বা দরিদ্রের অভাব নাই এ অঞ্চলে। তা ছাড়া, ইঁচড় ও পাকা কাঁটালের মিষ্ট গন্ধ বনের কোথা হতে ভেসে আসে এ কেউ জানে না।

ভূপতি রায় মাতামহের সম্পত্তির মালিক হয়েই সর্ব্বপ্রথমে কাঠ কুটো এবং ফল-পাকড় এই দুই-ই অবৈধ ভাবে সংগ্রহ নিষেধ করে দিলেন। লোকে এমন অলিখিত অথচ ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ হল বটে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না। কারণ, রায় মশায় একে জমিদার তার উপর অত্যন্ত রাগী মানুষ ছিলেন। অকারণে বা অতি অল্প কারণে লোক-জনকে মার-পিট করতে তাঁর বাধত না। এ সত্ত্বেও অভাবীরা অভাবের জ্বালায় এবং লোভীরা লোভের তাড়নায় রায় মশায়ের এই আরণ্য সম্পদে তাদের অবৈধ দাবী সংগুপ্ত ভাবেই বজায় রেখে চলেছিল। কিন্তু অন্ত দিক্ দিয়ে অকস্মাৎ কিছু মধ্যে তাতে ছেদ পড়ল। বাউরীদের একটা মেয়ে লুকিয়ে পাকা জাম পাড়তে গিয়ে আর ফিরল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একেবারে হাড়গোড়-ভাঙা অবস্থায় তাকে জাম গাছের তলাতেই পাওয়া গেল। সমস্ত দেহের মধ্যে মানবীয় অবয়বের কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই, তার উপর সমস্ত শরীর দংশন-জর্জ্জর। বোঝা গেল, বড় পাহাড়ে চিতিতে তার জীবনান্ত ঘটিয়েছে। কিছু দিন পরেই শোনা গেল, মেয়েটা ভূত হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে বনের চারি ধারে তার দেহের জ্বালার কথা আর বেদনার কথা ব্যাকুল আর্ত্ত ভাষায় ব্যক্ত করে। অল্প দিনের মধ্যেই ভূতের উপদ্রব বেড়ে গেল। এমন বেড়ে গেল যে, লোকে দিনমানেও বনের কাছ দিয়ে চলাফেরা করা বন্ধ করলে।

এই সময়েই ভূপতি রায়ের ঘরে লক্ষ্মী আপনি এসে ঢুকলেন। বনের ধারে দলদলির জলায় না কি এক দিন কাদা আর শেওলার মধ্যে মা ভগবতীর রথের সোনার ধ্বজা ভূপতি রায় দেখতে পান এবং রাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঘুমের ঘোরেই না কি জহরতে ভরা সোনার কলসী তুলে নিয়ে আসেন। সেই থেকেই রায়দের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। দুই জনে অবশ্য কিছু দিন মন্দ কথা বলেছিল। দু' চার জন না কি কানা-ঘুঁষো করেছিল যে, একটি অল্প-বয়সী মেয়ে সারা অঙ্গে সোনার গয়না পরে শ্বশুর-বাড়ী থেকে রাগারাগি করে বাপের বাড়ী চলেছিল হাঁটা-পথে। পথে বনের ধারে সন্ধ্যা হয়ে গেলে সে পড়ে ভূপতি রায়ের হাতে। ভূপতি রায় না কি তাকে খুন করে তার দেহ দলদলির পাঁকের মধ্যে পুঁতে দিয়ে তারই এক-গা গহনায় ধনী হয়ে উঠলেন। সেই থেকেই

না কি রায়-বংশের নীতিবোধ বিদূরিত হয়ে অসংযত লোভের আগুন জলে উঠল। সেই থেকেই না কি ভূপতি রায় ঠ্যাঙাড়ে হয়ে উঠলেন। এই বনের ধার দিয়ে রাঙা মাটির উপর দিয়ে রাঙা চুলের মাঝখানে সরু সীঁথির মত পথ ছিল বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে পথচারী পথিক সন্ধ্যার পর এই বনের ধার দিয়ে হাঁটলে কখনও তার গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছুত না। এই অঞ্চলে এই পথ দিয়ে যাবার সময় কোন পথচারী নিখোঁজ হলে লোকে গোপনে বলাবলি করত যে, দলদলির পাঁক, কি বনের ভিতরে যে পুকুর আছে তার পাঁকের মধ্যে তার দেহ খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কখনও কখনও না কি মধ্য-রাত্রিতে একবার কি দু'বার অতি ভয়ার্ত্ত চীৎকারও শুনতে পেত এ অঞ্চলের মানুষরা।

তবে এ সকলই দুষ্ট লোকের রটনা। অন্ততঃ তারিণী চক্রবর্ত্তী তাই বলেন। তিনি বলেন, রায় মশায় ছিলেন লক্ষ্মী-আশ্রিত পুরুষ। তিনি কোন দিন কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন নাই, মানুষ খুন করা তো দূরের কথা। চক্রবর্ত্তীর পিতা ভূপতি রায়ের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন। তিনিই বলতেন এ কথা। কাজেই অবিশ্বাসের প্রশ্ন কোথায়? লক্ষ্মী-আশ্রিত পুরুষ ছিলেন রায়। তিনি লক্ষ্মীর ও ভগবতীর আশীর্ব্বাদে বনগাঁ ছাড়াও কিনে ফেললেন মহুলা আর হিজল। সেই থেকে এই বনের নাম হল ভূপতি রায়ের বন। এই বনকে কেন্দ্র করে যে গ্রাম-মণ্ডলী তার মধ্যে তাঁর আয়ত্তে আসতে বাকী থাকল কেবল দাসপাড়া। অনেক চেষ্টা করেও ভূপতি রায় দাসপাড়া করায়ত্ত করতে পারেন নাই। তবে চক্রবর্ত্তী বলেন, তখন থেকেই ভূপতি রায়ের বনের ধারে লোক-জন যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কে জানে, কেমন করে সেই পূর্ব্বকালের প্রেত-পিশাচরা, রুদ্র যাদের পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন তাঁর পরিত্যক্ত বিচরণ-ক্ষেত্রে, তারা কেমন করে আবার নূতন করে বেঁচে উঠল। যারা এই অরণ্যের ঘন অন্ধকারের মধ্যে গুল্ম-লতা-জালে বেষ্টিত বিশাল স্থূলদেহ স্থবির গাছের কাণ্ডে, শাখায়, পাতার অভ্যন্তরে এত কাল প্রেত-নিদ্রায় সুষুপ্ত ছিল তারা অকস্মাৎ জেগে উঠল! প্রতি রাত্রে সেই অশরীরী প্রেত আর পিশাচের দল বিকট উল্লাসে অশুভ চীৎকার করতে করতে হাজার আলেয়ার আলো জ্বেলে ঘন বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্নান করতে নামত দলদলির পঙ্ককুণ্ডে। আলো নিয়ে লোফালুফি খেলত, ছুটোছুটি করত। তাদের খেলা দেখতে জলের ধারে ভীড় জমাত উল্কামুখী শিবার দল। তাল গাছের মাথায় জাগ্রত পেঁচা, বাদুড় পাখার ফটফটানি দিয়ে হাততালি দিত। তার পর আবার শোভা-যাত্রা করে আলো নিয়ে তারা উঠে গিয়ে ঢুকত তাদের চিরান্ধকার বনভূমিতে। তাদের সঙ্গচ্যুত হয়ে উল্কামুখী শিবার দল তারস্বরে চীৎকার করে আক্ষেপ জানাত, বাদুড় আর পেঁচারা আকাশে পাক দিয়ে তাদের সঙ্গ নেবার চেষ্টা করত।

ভূপতি রায়কে তারিণী চক্রবর্ত্তী চোখে দেখেন নাই। তবে তাঁর ছেলে নৃপতি রায়কে তিনি বাল্য বয়সে দেখেছেন দূর থেকে সসম্ভ্রমে। কাছে যাবার সাহস হত না। তার পর একদা তরুণ বয়সে এক দিন সেই বিশাল পুরুষ তাঁকে নিজে থেকে সস্নেহে কাছে ডেকে নিলেন, কোলে টেনে নিলেন। সেই থেকেই রায়-বংশের সঙ্গে তিনি। নৃপতি রায় গেলেন, অসৎ চরিত্র ও মদ্যপ শ্রীপতিকে আজীবন চালনা করলেন চক্রবর্ত্তী। সে গেল, তার বড় ছেলে ধনপতি গেল অল্প দিনের মধ্যে। তার পর বাকী ছিল ধনপতির কনিষ্ঠ গণপতি। দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী, কামনোন্মাদ গণপতি গেল এই বৎসর চারেক আগে। এখানে রায় বংশের আর কেউ বাকী নাই। বংশে বাতি দিতে আছে এক মাত্র ধনপতির আঠার-উনিশ বৎসরের সন্তান নরপতি। সে-ও আছে তার মাতুলালয়ে। ধনপতির মৃত্যুর পরই দু' বৎসরের ছেলে নিয়ে ধনপতির বিধবা সেই যে বনগাঁ ছেড়ে গিয়েছেন আর আসেননি। একবার এসেছিলেন দেবর গণপতির রহস্যজনক অন্তর্দ্ধান ও মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। তা-ও এসেছিলেন চক্রবর্ত্তীর আগ্রহাতিশয্যে। আর চক্রবর্ত্তী আজও যক্ষের মত রায়েদের শেষ সম্পত্তিটুকু পাহারা দিচ্ছেন।

রায়রা তাই আজ আর কেউ বর্ত্তমান নাই বনগাঁয়ে। রায়দের সকল কীর্ত্তির পটভূমি ঐ ভূপতি রায়ের বন, আর সকল কীর্ত্তির সাক্ষ্য তারিণী চক্রবর্ত্তী, এই দুই বর্ত্তমান! বালক কাল থেকে চক্রবর্ত্তী দেখে এসেছেন রায়দের, আর তারই সঙ্গে দেখেছেন ঐ দুর্ভেদ্য ঘন অরণ্যকে। রায়রা আর এই অরণ্য, তাঁর মস্তিষ্কে অতি বাল্যকাল থেকেই একই কঠিন লৌহসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। দুইকেই বাল্যকাল থেকে সসম্ভ্রমে দূরে রেখে এসেছেন। কিন্তু দু'য়ের জন্যই কিশোর হৃদয়ে তীব্র কৌতূহল ছিল সদা-জাগ্রত। আর অকস্মাৎ এক দিন দু'য়েরই সঙ্গে হৃদ্য পরিচয় হল আকস্মিক ভাবে।

তখন ভূপতি রায় লোকান্তরিত হয়েছেন। নৃপতি রায়ের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। নৃপতির এক মাত্র সন্তান শ্রীপতিও তখন বিবাহিত। বছর বিশেক বয়স তখন তার। তারিণী চক্রবর্ত্তীও একই বয়সী। শ্রীপতির সঙ্গে তখন তাঁর সত্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছে। যখন তখন শ্রীপতির কাছে গেলেও নৃপতিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে দূরে রেখে যাতায়াত করেন। বিশাল পুরুষ ছিলেন নৃপতি রায়। বিশাল দেহ, বর্ষার মেঘধ্বনির মত গুরু-গম্ভীর গলার আওয়াজ, আর তেমনি বলশালী ক্ষিপ্রতা সর্ব্বাঙ্গে। ভূপতি রায়ের চেয়েও নৃপতি রায় গভীরতর রহস্যের বস্তু ছিলেন। ভূপতি রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ধারে পথচারীর তীব্র আর্ত্ত চীৎকার থেমে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে অন্য কথা বলতে লাগল গোপনে। নৃপতি মাঝে মাঝে বনগাঁ থেকে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে যেতেন, আবার ফিরতেন দু'-তিন দিন পর। আর তাঁর এই অনুপস্থিতির কালের সঙ্গে দূর-দূরান্তরের গ্রামে নিশীথ রাত্রে অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন আর হত্যার বিচিত্র এবং গূঢ় সংযোগ আবিষ্কার করে লোকে তাঁকে গোপনে সেই সব কিছুর জন্যে দায়ী করত। তা করুক, তা'তে নৃপতি রায়ের কিছু যেত-আসত না। চক্রবর্ত্তীও তাই বলেন। লক্ষ্মীবন্তকে লোকে স্বভাবতই ঈর্ষার চক্ষে দেখে। তবে নৃপতি রায় কোথায় যেতেন, সে গুপ্ত কথা একমাত্র চক্রবর্ত্তীই জানতেন। চক্রবর্ত্তী বলেন, রায়-কর্ত্তার এক রক্ষিতা ছিল কয়েক ক্রোশ দূরে এক গ্রামে। গোয়ালার মেয়ে। বনগাঁতে তাঁর অনুপস্থিতির কালটুকু তিনি কাটিয়ে আসতেন সেইখানে। কিন্তু তার পরেই লোকে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করত যে, তবে রায়-কর্ত্তাকে মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিতির পর গ্রামে ফিরবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ভূপতি

উত্তর দিতেন না। বড় বড় চোখের কঠিন দৃষ্টিতে বক্তাকে বিদ্ধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থেকে বলতেন, মিথ্যা কথা। তার পর জিজ্ঞাসা করতেন, স্বচক্ষে কে দেখেছে তাঁকে। কেউ দেখে নাই তাঁকে। কে দেখবে? ভূতের ভয়ে মধ্য-রাত্রিতে কে যাবে ঐ বিভীষিকাময় অরণ্যস্থলীতে। আর দেখলেই বা কার বলবার সাহস ছিল! তবু চক্রবর্ত্তী বলেন, সব মিথ্যা কথা।

সত্য-মিথ্যা একমাত্র চক্রবর্ত্তীই জানেন আর জানে তাঁর মন। যে-দিন নৃপতি রায় আর ঐ ভূপতি রায়ের বনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, সে দিনের কথা আজও চক্রবর্ত্তীর স্পষ্ট মনে পড়ে। বেলা তখন প্রহর খানেক হয়েছে। সকাল বেলায় শৌচ আর ব্যায়াম সেরে প্রাতঃসন্ধ্যা করে জলখাবার খেয়ে ভাল করে দু'বার তামাক খেয়ে চক্রবর্ত্তী গিয়েছেন শ্রীপতির কাছে। শ্রীপতি কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। তার বদলে চক্রবর্ত্তী পড়লেন একেবারে গিয়ে রায়-কর্ত্তার সামনে। রায়-কর্ত্তা ছিলেন পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক। সকালের পূজা সাঙ্গ করে বৈঠকখানায় পট্টবস্ত্র পরেই তামাক খাচ্ছিলেন তিনি। চক্রবর্ত্তী শ্রীপতিকে না পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ রায়-কর্ত্তা ডাকলেন—ওখানে কে?

চক্রবর্ত্তীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল মেঘের ডাকে শুকনো বাঁশ পাতার মত। কাঁপা-গলায় তিনি কোন মতে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, আমি তারিণী।

স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে রায়-কর্ত্তা ডাকলেন—কে তারিণী? ছিপেকে খুঁজছিলি বুঝি? পেলি না তাকে? তা আয়, এইখানে আয়।

চক্রবর্ত্তীর দেহ আবার কেঁপে উঠল, এবার অহেতুক ভয়ে নয়, অহেতুক আনন্দে। তিনি বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরে কেউ নাই। ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে রায়-কর্ত্তা তামাক খাচ্ছেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই রায়-কর্ত্তা বললেন—বস্।

চক্রবর্ত্তী বসতে পারলেন না তবু। রায়-কর্ত্তা একবার তারিণীকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ভাল করে দেখে বললেন—বাঃ, খাসা জোয়ান হয়েছিস্ ত?

চক্রবর্ত্তীর তখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। কাঁচা সরল বাঁশের মত শক্ত সমর্থ সতেজ তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। তার উপর নিয়মিত লাঠি, ডন-বৈঠক করেন তিনি। তবু রায়-কর্ত্তার প্রশংসাবাদে তাঁর চওড়া ছাতি আরও ফুলে উঠল। রায়-কর্ত্তা হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে অকস্মাৎ তার দিকে ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে বললেন—কই, টেপ দেখি, কেমন জোর তোর পরখ করি?

প্রাণপণে টিপতে লাগলেন চক্রবর্ত্তী। তবু রায়ের হাত একটু নরম হল না। লোহায় গড়া যেন।

রায় বললেন—হুঁ! ছাড়। তোর গায়ে শক্তি আছে। তুই পারবি। কিন্তু কেমন সাহস আছে তোর?

চক্রবর্ত্তী বুঝতে পারলেন না, কি পারবার কথা বললেন রায়-কর্ত্তা। কিন্তু সাহসের কথায় তিনি চুপ করে থাকলেন। কি বলবেন তিনি।

রায় আবার বললেন—কেমন সাহস আছে রে তোর? আচ্ছা, এখন তো দিনের বেলা! পারিস্, এখন ভুতো রায়ের বনের মধ্যে যেতে পারিস্?

বলতেই রায়-কর্ত্তা বললেন—কৈ, যা দেখি ঐ রূপো-বাঁধা হুঁকোটা বনের মাঝখানে যে পুকুর আছে তার পূর্ব্ব পাড়ে একটা বেঁটে কাঁটাল গাছ আছে, তার ডালে বেঁধে দিয়ে আয় দেখি। বলেই সঙ্গে সঙ্গে কলকেটা তুলে নিয়ে, রূপো-বাঁধানো হুঁকোটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

হুঁকোটি হাতে নিয়ে চক্রবর্ত্তী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন, শুষ্ক-দৃষ্টিতে বোধ হয় তিনি চেয়েছিলেন নৃপতি রায়ের মুখের দিকে। রায়-কর্ত্তা সস্নেহে হেসে বললেন—কি রে, ভয় লাগছে বুঝি? তবে কাজ কি গিয়ে? দে, হুঁকো দে। তোর মুরোদ বুঝেছি। বলে তিনি হুঁকোটা নেবার জন্তে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলেন হাত। পরমুহূর্ত্তে আর কোন কথা না বলে একেবারে হন্-হন্ করে নেমে দ্রুত পথ চলতে সুরু করলেন। মারাত্মক সাহসে ভর করে একেবারে এসে দাঁড়ালেন বনের প্রান্তদেশে, বিশাল দীর্ঘ দেহ শিমুল গাছটার তলায়। সেই পর্য্যন্ত এসে তার সমস্ত সাহস কোথায় মিশিয়ে গেল। দুরন্ত ভয়ে ছেয়ে গেল সারা মন। তিনি চাইলেন একবার বনের অপর দিকে।

বনের প্রান্তভাগ থেকে জমি একেবারে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে দলদলির কোল পর্য্যন্ত। তার ওপারে আবার খানিকটা ডাঙ্গা, তার পর ধানের জমি। শরতের শেষাশেষি। বেলা এক প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। আকাশ উজ্জ্বল নীল। মাঝে মাঝে পেঁজা তুলার মত হালকা মেঘ ভেসে ভেসে চলেছে। তার কোলে-কোলে মাঝে মাঝে সাদা বকের সারি চলমান ছেঁড়া সাদা হারের ছড়ার মত কক্-কক্ করতে করতে ভেসে চলেছে। নীচে সাদা রূপোলী জলভরা নদীর পাশে সবুজ ধানে ভরা মাঠ। চক্রবর্ত্তী একবার সব দেখে নিলেন। সে-দিনের সেই মুহূর্ত্তের দেখা ছবি অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক বার তাঁর মনে হল, ফিরে যাই। আবার মনে হল, তা হলে এই ভীরুতা নিয়ে রায়-কর্ত্তা চিরকাল তাঁকে শ্লেষ আর ব্যঙ্গ করবেন। তিনি বনের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু আবার ভয় লাগতে লাগল। সামনেই সেই শিমুল গাছ, যেখানে এই অরণ্য ভূমির প্রহরী প্রেত বাস করে। বহু বার বহু জন দূর-দূরান্তর থেকে দেখেছে জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাঁদের আলোয় এক সুদীর্ঘ দেহধারী শিমুল গাছ থেকে নেমে সাদা জ্যোৎস্নার চাদরে নিজের অবয়বহীন দেহকে আবৃত করে সমগ্র অরণ্যভূমি আগলিয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে তার সগোত্রদের সানন্দ নিশীথ-লীলায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে মনে হল রায়-কর্ত্তার মুখ। ফিরে গেলে বেঁচে থাকা চক্রবর্ত্তীর পক্ষে অসহ্য অপমানের বোঝা হয়ে উঠবে। তিনি তাঁর সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পর-মুহূর্ত্তেই বিপুল অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে ফেললে। প্রথমে গাছের মাথা থেকে চোয়ানো অল্প আলোয় গাছের তলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে তিনি কিছুটা দেখতে পাচ্ছিলেন, আর সামান্ত দূর গিয়ে তিনি তাও পেলেন না। রায়-কর্ত্তার কথা-মত একটা লণ্ঠনও সঙ্গে এনেছিলেন তিনি। এইবার সেই চৌকো কাঁচের পাত্রের মধ্যে ডিবরিটা জেলে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন চক্রবর্ত্তী।

চারি দিকে চাইলেন একবার। এতক্ষণে চোখে তাঁর অন্ধকার সয়ে এসেছে। চারি দিকে অস্পষ্ট অন্ধকারে নানা বিচিত্র

সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের পশ্চাদ্ভাগ থেকে লক্ষ কোটি অজানিত কীটের কণ্ঠোচ্চারিত একটানা শব্দ-ঝঙ্কারে তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে। পায়ের তলার মাটি কোথায় বুঝা যায় না। বর্ষার অনেক পরেও মাটি স্যাঁৎসেঁতে, তার উপর সুদীর্ঘ কালের পাতা আর ডালপালা পচে নরম হয়ে উঠেছে। তারই সঙ্গে নবজাত কত অজ্ঞাত লতা আর অঙ্কুরের প্রাণবান নরম দেহের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটছে তাঁর পায়ের। বার বার অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করে চলতে চলতে তাঁর ভয় হতে লাগল, কোন তৃণখণ্ডের গায়ে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ সরীসৃপের অঙ্গে তিনি পদপাত করবেন। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে তাঁর হাতের বাতিটা জ্বলছে যেন অতি ভয়ার্ত হয়ে ম্লান ভাবে। চারি দিকে নানান আকারের বৃক্ষকাণ্ড পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। চক্রবর্তীর মনে পড়ল কোন্ আদিকাল থেকে শিবের চণ্ড লীলা-সহচররা এখানে তাদের আবাস-স্থল করে নিয়েছে। হয়ত তারা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাণ্ডের মধ্য দিয়েই চক্ষুহীন দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, এখনই হয়ত কোন একটা কাণ্ড অকস্মাৎ সজীব গতিশীল হয়ে উঠে তাঁকে জড়িয়ে আত্মসাৎ করে নিয়ে তাদের অহেতুক আনন্দলীলা সুরু করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কোটি বৃক্ষরূপী প্রেত সজীব চঞ্চল হয়ে উঠবে, আর প্রতিটি গাছের ডাল-পাতাগুলি সাপের মত অস্থির বিক্ষেপে বনভূমিকে আলোড়িত করে তুলবে। তিনি এই সময় দেখতে পেলেন, অতি নিকটে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন বিচিত্র উজ্জ্বলতায় ঝকমক করছে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। পর-মুহূর্তে বুঝতে পারলেন সূর্য্যের আলো! পুকুরের মাথায় লতা-পত্রহীনতার সুযোগে সূর্য্যের আলোক-ধারা এসে পড়েছে পুকুরের-জলের উপর! অকস্মাৎ এক মুহূর্তে চক্রবর্তী নির্ভয় হয়ে উঠলেন! হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন তিনি। তাঁর সেই হাসিতে বনভূমি শিউরিয়ে উঠল। তিনি পুকুরের পাড়ে উঠলেন কাঁটাল গাছের খোঁজে।

অতি লঘু প্রসন্ন মন নিয়ে বাড়ী ফিরলেন তিনি। ফিরবার পথে বনের এদিক ওদিক ঘুরে, তার সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে তিনি ফিরলেন। যেখানে ভয় লেগেছে সেইখানেই ভয়ের বস্তুকে বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন। লঘু পদক্ষেপে তিনি একেবারে সোজা চলে এলেন রায়-কর্ত্তার কাছে। যে রায়কর্ত্তাকে এত কাল যমের মত ভয় করে এসেছেন এক মুহূর্তে তিনি একান্ত আপনার জন হয়ে উঠলেন। আর যে বন, তাঁর এবং এই সমগ্র অঞ্চলের মানুষের বিভীষিকার কেন্দ্রস্থল ছিল, তাকে জয় করে সেও একান্ত আপনার হয়ে উঠল।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে চক্রবর্তী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যে রূপো-বাঁধানো হুঁকো সে কাটাল গাছে বেঁধে দিয়ে এসেছিল সেই হুঁকোতেই রায়কর্ত্তা তামাক খাচ্ছেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই রায়কর্ত্তা সস্নেহে সহজ ভাবে বললেন—আয়, বস্। আচ্ছা, আর একবার সন্ধ্যের পর গিয়ে হুঁকোটা খুলে নিয়ে আসবি।

এবার চক্রবর্তী হেসে উঠলেন, বললেন—যেতে বলেন যাব সন্ধ্যের পর। কিন্তু গিয়ে কি হুঁকো ফিরে পাব? হুঁকো তো আপনার হাতে। বলে আবার হেসে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর হাসিতে রায়কর্ত্তা রাগ করেছিলেন, কি খুসী হয়েছিলেন তা চক্রবর্তী বুঝতে পারেন নাই সে দিন।

তার পর কত বার কত বিচিত্র অভিযানের পর তিনি ঢুকেছেন এই বনের মধ্যে রায়কর্ত্তার সঙ্গে। রায়কর্ত্তার সঙ্গে থাকত অনেক কিছু। তাঁর হাতে থাকত মশাল। রাত্রির ঘনান্ধকারের মধ্যে মশাল হাতে তিনি যেতেন আগে আগে, রায়কর্ত্তা তাঁর পিছনে পিছনে। কিছু দূর গিয়ে রায়কর্ত্তার হুকুমে তিনি মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রায়কর্ত্তা চলে যেতেন অতি দ্রুত লঘু-পদক্ষেপে সরীসৃপের মত, আবার ফিরে আসতেন অল্প সময়ের মধ্যেই।

তার পর শেষের দিকে রায়কর্ত্তা তাকে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যেতেন। হাতের স্বর্ণ-রৌপ্যের সম্ভার কোথায় রাখতেন লুকিয়ে, তা দেখিয়েছিলেন। সেই কাঁটাল গাছের পাশে কাঁটা-ঝোড়ের গায়ে একখানা পাথর সরিয়ে ফেলতেই পাওয়া যেত এক জালার মুখ। সেইখানে দুই হাতের বস্তুগুলি নিক্ষেপ করে রায়কর্ত্তা পরম বিশ্বাসে ফিরে আসতেন।

এই বিশ্বাস করবার পূর্ব্বে রায়কর্ত্তা তাঁকে আরও কাছে টেনে নিলেন। এক দিন রাত্রিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রায়কর্ত্তা তাঁকে অকস্মাৎ বললেন—এক কাজ করবি চক্রবর্তী? তুই দীক্ষা নিবি? তান্ত্রিক দীক্ষা?

চক্রবর্তী তাঁর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন শুধু। রায়কর্ত্তা বললেন—কি রে ভয় করছে না কি দীক্ষার কথা শুনে?

পাঁচ বৎসর আগে হলে হয়ত চক্রবর্তী মনে মনে চটে উঠতেন, সে-দিন কিন্তু চটলেন না, শুধু বললেন—ভেবে দেখি।

কিছু দিনের মধ্যেই রায়কর্ত্তা নৃপতি রায়ের কাছে তিনি দীক্ষা নিলেন। সেই দিনই গুরু তাঁকে মনের কথা খুলে বললেন—দেখ্, তোকে দীক্ষা দিলাম কেন শোন্। আমি তোর গুরু না হলে তুই আমার ছেলের মত হবি না। তুই তো জানিস্ না, তুই আমার কাছে আমার সন্তানের চেয়ে বড়। আমার তো ঐ এক ছেলে ছিপে। ঐ কি ছেলে? দুশ্চরিত্র, মাতাল। তার ওপর অপদার্থ। ওর ওপরে কি ভরসা করব? তার চেয়ে তুই ভাল, তুই বড় আমার কাছে। তবে তুই এক প্রতিজ্ঞা কর যে, কোন দিন সংসার করবি না, আর রায়বংশকে নিজের বংশ বলে মনে করবি।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ-পঁচিশ। আর আজ তিনি সত্তর পার হয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ কাল নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুল নড়েন নাই চক্রবর্তী। সংসার তিনি করেন নাই। আর রায়বংশকে আজও নিজের বংশের মত মনে করে বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছেন।

আরও দশ বছর কাটল রায়কর্ত্তার আর চক্রবর্তীর একীভূত জীবন। এই দশ বছর রায়কর্ত্তার, তাঁর নিজের এবং রায়বংশের সব চেয়ে গৌরবের কাল। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে চক্রবর্তীর মনের গতির কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। পূজা-অর্চ্চনা আর জপ-তপ নিয়েই কাটাতেন দিনের অধিকাংশ সময়। তার ফলে কোন বিভূতি তিনি পেয়েছিলেন কি না কে জানে, তবে অন্তরে শান্তি পেয়েছিলেন। আর তাঁরই নীরব আগ্রহাতিশয্য অনুভব এবং অনুমান করেই রায়কর্ত্তাও সমস্ত অপকর্ম ত্যাগ করেছিলেন। সেই কয়েক বছর চক্রবর্তীর সাহচর্য্যে যত যত্ন করে জমিদারী চালিয়েছিলেন, তত নিষ্ঠার

সহিত শিষ্যের সঙ্গে পূজা-অর্চনা করেছিলেন। চক্রবর্ত্তী যে রায়-কর্ত্তার দিকে একদা জীবনারম্ভে মুখ তুলে তাকাতে পারতেন না, তার পর কাছাকাছি এলেও তখনকার দৃষ্টিতে অনন্ত শক্তি আর রহস্যের আধার-স্বরূপ যে রায়কর্ত্তাকে যথাসম্ভব সমীহ করে চলতেন, সেই রায়কর্ত্তা তাঁর পিতা, গুরু ও বন্ধু হয়ে উঠলেন। আজও রায়কর্ত্তার কথা মনে হলে তাঁর চোখ জলসিক্ত হয়ে ওঠে।

দীর্ঘকাল নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনা করার ফলে রায়কর্ত্তার হাতে অর্থ যখন বেশ স্বচ্ছল হয়ে উঠল, তখন আবার তাঁর মাথায় প্রাচীন দিনের জেদ চাপল। ভূপতি রায়ের জঙ্গলকে কেন্দ্র করে চার মৌজার মধ্যে হিজল, মহুলা আর বনগাঁ রায়কর্ত্তারই ষোল আনা সম্পত্তি। তাঁর চোখ ছিল বরাবর চতুর্থ মৌজা দাসপাড়ার দিকে। কোন দিন আর মুখ ফুটে কিছু না বললেও চক্রবর্ত্তী বুঝতে পারতেন রায়কর্ত্তার মনোগত ইচ্ছা। দশ বৎসর পর রায়কর্ত্তা জিদ ধরলেন—তাঁর দাসপাড়া চাই-ই চাই। কিন্তু দাসপাড়ার জমিদাররা লক্ষপতি ধনী। তাঁরা রায়কর্ত্তার মত স্বচ্ছল গৃহস্থ তালুকদার নন। তাঁরা জমিদারী ছাড়বেন কেন? চক্রবর্ত্তী রায়কর্ত্তাকে বার বার নিষেধ করেছিলেন দাসপাড়ার দিকে দৃষ্টি দিতে। কিন্তু রায়কর্ত্তার জেদ চড়ে গেল। প্রথমে গোপনে গোপনে নানান্ লোক-জন লাগিয়েও যখন দাসপাড়ার জমিদারদের দাসপাড়া বিক্রীর জন্য রাজী করাতে পরলেন না, তখন তিনি চক্রবর্ত্তীকে পাঠালেন একেবারে দূত করে। যত টাকা লাগে তিনি দেবেন। দাসপাড়া তাঁর চাই-ই। চক্রবর্ত্তী অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলেন বার্ত্তা নিয়ে। ফিরে এলেন অপমানিত হয়ে। জমিদার তো তাঁর সঙ্গে দেখাই করেন নাই, উপরন্তু নায়েব তাঁকে না কি বলেছিলেন—যত খুসী টাকা দিতে নৃপতি রায়ের গায়ে লাগবার কথা নয়, অসৎ উপায়ে তো এক কালে অনেকই সঞ্চয় করেছেন। তবে তিনি যদি ভূপতি রায়ের বন আর তার সংলগ্ন বনগাঁর সঙ্গে দাসপাড়া বদল করে নিতে রাজী থাকেন, তবে একবার তবে কর্ত্তার কাছে কথাটা পেড়ে দেখতে পারি। শুনেই চক্রবর্ত্তী মুখ কালো করে উঠে এলেন। আর তাই শুনে রায়কর্ত্তার মুখ হয়ে উঠল আষাঢ়ে মেঘের মত থমথমে। দু'দিন রায়কর্ত্তা কারো সঙ্গে কথাই বললেন না, এমন কি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও না। তিন দিনের দিন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আরম্ভ হল গোপন মন্ত্রণা। তার পর অঘটন ঘটে গেল। দাসপাড়া কাছারীতে এক দিন আগুন জ্বলে উঠল। আগুন লাগার পরদিনই ভোরে লোকে দেখলে—রায়কর্ত্তার মুখে তাঁর অত সখের পাকা গোঁফ-জোড়া নাই। লোকে গোপনে বললে, গোঁফের একধার না কি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, তাই রায়কর্ত্তা রাতারাতি গোঁফ মুড়িয়ে ফেলেছেন।

লোকে গোপনে যাই বলুক, এবার আর পুলিশ ছাড়লে না। অনেক টানাটানির পরে রায়কর্ত্তা আর চক্রবর্ত্তী বাঁচলেন বটে কিন্তু সঞ্চিত বিত্ত এবং অলঙ্কারের প্রায় সবই আত্মরক্ষা করিতে বেরিয়ে গেল। সে আঘাত আর রায়কর্ত্তা সামলাতে পারলেন না। সেই থেকে রায়কর্ত্তা অসুখে পড়লেন। আর উঠলেন না।

ওদিকে শ্রীপতি তখন দুরন্ত মাত্রায় মত্তপ ও কুক্রিয়াসক্ত হয়ে উঠেছে। তাকে আর শাসনে রাখার উপায় ছিল না! রায়কর্ত্তা রোগশয্যা থেকেই ছেলেকে ধমক দিতেন, চক্রবর্ত্তী বন্ধুকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শ্রীপতির তখন বড় ছেলে ধনপতির বয়স বারো আর ছোট গণপতি তখন সত্ত জন্মেছে। ধনপতি শান্ত সুস্থ ছেলে। সে চক্রবর্ত্তীর কাছে বসে থাকত, ভূপতি রায়ের গল্প শুনত, ঐ গভীর রহস্যাবৃত অরণ্যের গল্প শুনত। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে শিখত তন্ত্রোক্ত নানান্ দেবীর ধ্যান আর পূজা-মন্ত্র।

রায়কর্ত্তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে আসতে লাগল। চক্রবর্ত্তী দিবারাত্র তাঁর শিয়রে বসে সেবা করলেন। কেবল সকালে কিছুক্ষণ পূজা আর সেরেস্তার জন্য ব্যয় করতেন। সে-দিন রায়কর্ত্তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে এল। কবিরাজ হতাশ হয়ে নাড়ী ছেড়ে উঠে গেলেন। চক্রবর্ত্তী পূজার পর সে-দিন আর সেরেস্তায় বসলেন না। সোজা চলে গেলেন ভূপতি রায়ের জঙ্গলে। পরিচিত পথ। তিনি সরলতম পথে গিয়ে উঠলেন বনের মধ্যে পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে। কাঁটাল তলার কাছে পাথর সরিয়ে ফেললেন। তখনও জালার মধ্যে যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত ছিল তার পরিমাণও কম নয়। ইচ্ছা ছিল, সেগুলি রায়কর্ত্তার অন্তিম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তাঁর হাতে দিয়ে যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া। হেঁট হয়ে সেই জালার মধ্যে হাত দিতে যাবেন, অমনি মনে হল যেন তাঁর পৃষ্ঠদেশে হিমশীতল নিশ্বাস বার বার ঝরে পড়ছে। তিনি চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোথাও কিছু নাই। তাঁর ভয় হল। তিনি আবার হেঁট হয়ে জালার ভিতরে নিঃসঙ্কোচে হাত দিলেন। কিন্তু শূন্য, তার গর্ভ শূন্য। এ কি হল? তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে বার বার অতি শীতল হিমানীস্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। অবর্ণনীয় ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথম প্রবেশ-মুখে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ভয় পেয়েছিলেন, আবার তেমনি ভয়-ভীত হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন বন থেকে বেরিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে। তাঁর মনে হল, লক্ষ কোটি প্রেত, রক্ষ, পিশাচের সঙ্গে ভূপতি রায়ের হাতে হত বহু বহু কবন্ধ আজ গলিত দেহে আবার তাঁকে চারি পাশে ঘিরে ধরেছে। ছুটতে গিয়ে বার বার তৃণগুল্মে সর্ব্বাঙ্গ ছড়ে যেতে লাগল, লতায় পা আটকে গেল। তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহে বন থেকে ভয়ার্ত্ত শিশুর মত বেরিয়ে এলেন। আর বনের মধ্যে তিনি ঢোকেন নাই।

রায়কর্ত্তার শয্যাপার্শ্বে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন রায়কর্ত্তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি জীবন্ত মানুষের মধ্যে থেকেও আবার অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। আজ যে রায়কর্ত্তার দেহান্ত হবে এটা তিনি অনুমান করেছিলেন পূর্ব্বেই। অরণ্যের মধ্যকার ব্যাপার তারই পূর্ব্বাভাস। ঘর একটু নিরিবিলি হতেই তিনি চীৎকার করে বললেন—কাঁটাল তলায় জালা যে খালি দেখলাম কর্ত্তা! কি হল জানেন আপনি?

রায়কর্ত্তার বড় বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল, চোখ জলে ভরে গেল। কি বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না, ঠোঁট দুটো পড়ল খালি। ঘরের মধ্যে চোখ দিয়ে কাকে খুঁজলেন যেন। পেলেন না। হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

সেই দিন অপরাহ্নেই নৃপতি রায় মারা গেলেন। মরবার পূর্ব্বে তের বছরের ধনপতিকে আর দু'বছরের গণপতিকে ইঙ্গিতে চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলে দিয়ে গেলেন।

নৃপতি রায়ের মৃত্যুর পর লোকে বলতে লাগল নৃপতি রায় প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনে

আজীবন-সঞ্চিত স্বর্ণ আর রৌপ্যের অন্তর্ধানে বেদনাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। যে ধন তিনি আজীবন যক্ষের মত সঞ্চয় করেছিলেন, সে-দিন মৃত্যুর পর খুঁজে বের করবার জন্ত যক্ষ হয়ে ভূপতি রায়ের জঙ্গলের চারি দিকে কেঁদে কেঁদে সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

চক্রবর্ত্তী কিছুই বললেন না। কি ভাবলেন তিনিই জানেন। তাঁর ঘাড়ে তখন রায়-বাড়ীর সমস্ত সংসার। তিনি কর্ত্তাহীন সংসারের ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু সুস্থ ভাবে কাজ করতে দিত না শ্রীপতি। পিতার অগাধ ধনের একমাত্র কর্ত্তা চক্রবর্ত্তীকে তিনি বার বার বিরক্ত ও বিব্রত করতে লাগলেন, সে সব কিছু তাঁকে ফেরৎ দেবার জন্তে। একবার চক্রবর্ত্তী তাকে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীপতি তাতে কাণও দেয় নাই—বিশ্বাসও করে নাই। সেই থেকে চক্রবর্ত্তী তাকে বুঝাবার চেষ্টা ত্যাগ করে তার কথায় কাণ দেওয়া বন্ধ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাকে ভয় দেখালেন যে, যদি শ্রীপতি তাঁকে বিরক্ত করা থেকে বিরত না হয় তা হ'লে তিনি তার পিছনে পিশাচ লাগিয়ে দেবেন। মগ্তপ, দুর্ব্বল চরিত্র, সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রীপতির ভূতের ভয় ছিল অপরিসীম। সেই ভয়ে সে চক্রবর্ত্তীকে আর তার পর বিব্রত করে নাই। শ্রীপতির স্ত্রীকে চক্রবর্ত্তী ভগিনীর মতই দেখতেন। তাকে চক্রবর্ত্তী বুঝিয়ে বলায় সে সব বিশ্বাস করে।

কিছু দিনের মধ্যেই শ্রীপতি মারা গেল। লোকে বলতে লাগল, পিশাচসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী তার পিছনে পিশাচ লাগিয়ে তার অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন। তবে চক্রবর্ত্তী কোন কথায় কাণও দিলেন না। তিনি শ্রীপতির বিধবা পত্নীকে সসম্মানে সম্মুখে রেখে কিশোর ধনপতি আর বালক গণপতিকে কোলে নিয়ে ভাঙা রায়বাড়ী আবার সরগরম করে তুলবার আশায় সম্পত্তি চালনা করতে লাগলেন। তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল, ধনপতি বড় হয়ে উঠলে তাকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে নিজে কাশীবাস করবেন।

কিন্তু তাঁর সে অভিপ্রায় পূর্ণ হল না। ধনপতি অবশ্য ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল, ইংরেজী স্কুলে সে কিছু দূর লেখাপড়াও শিখল। সে বেশ শান্ত সুস্থ প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে সম্পত্তি দেখাশুনা করতেও আরম্ভ করলে। তবে বিপদ বাধল গণপতিকে নিয়ে। সে যত বড় হয়ে উঠতে লাগল তত দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠতে লাগল। চক্রবর্ত্তী তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিন্তু স্কুল আর লেখাপড়ার ধার দিয়েও সে গেল না। অল্প বয়সেই সে গাঁজা মদ পর্য্যন্ত খেতে শিখলে। চক্রবর্ত্তীর জীবনে সে মূর্ত্তিমান্ অশান্তির মত হয়ে উঠল। তবু চক্রবর্ত্তীর ভরসা ছিল, হয়ত বিয়ে দিলে সে আবার সুস্থ ও শান্ত হবে। সেই ভরসায় তিনি প্রথমেই ধনপতির বিবাহ দিলেন। গ্রামকে সযত্নে এড়িয়ে বিশ ক্রোশ দূরে জেলার সদর সহরের এক উকিলের কন্তার সঙ্গে ধনপতির বিবাহ দিলেন। ইচ্ছা ছিল, পর-বৎসরই গণপতির বিবাহ দিবেন।

কিন্তু একসঙ্গে আবার দু'টি বজ্রপাত হল। প্রথমেই মারা গেল ধনপতি। হঠাৎ দু'দিনের জ্বরে তার দেহান্ত ঘটল। আবার অল্পকালের ব্যবধানে মারা গেলেন শ্রীপতির স্ত্রী। চক্রবর্ত্তীর তখন অনেকটা বয়স হয়েছে। মাথায় চুল পাক ধরেছে। রায়দের সংসারে বিপর্য্যয় ঘটে গেল। কিছু দিনের মধ্যে যখন রায়কর্ত্তা নৃপতি রায় আর শ্রীপতি মারা যায়, তখন চক্রবর্ত্তী সাগ্রহে রায়দের সংসার-তরণীর হাল ধরেছিলেন। আজ দীর্ঘ দিনের পর আবার ধনপতি আর তার মা লোকান্তরিত হল, তখন চক্রবর্ত্তী প্রায় ভেঙে পড়লেন। তবে তিনিই আবার খাড়া হয়ে উঠে ভাঙা সংসার জোড়া দিতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু ভাঙা সংসার আর জোড়া লাগল না। চক্রবর্ত্তী ধনপতির বিধবা স্ত্রী আর তার সদ্যোজাত সন্তান এবং দুর্দ্দান্ত গণপতিকে নিয়ে নূতন করে সংসার পাতবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধনপতির স্ত্রী বেঁকে বসল। সে স্পষ্ট বলে দিলে যে, সে এই ভাঙা ভগ্ন পুরীতে, এই ভীষণ অরণ্য-কলঙ্কিত পল্লীগ্রামে বাস করবে না। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের সময় তার ভাই এসেছিল। তারই সঙ্গে প্রকাণ্ড দু'টো বাক্স আর ছেলেকে নিয়ে সে চলে গেল।

এইবার চক্রবর্ত্তী একেবারে ভেঙে পড়লেন। আজ সর্ব্বপ্রথম তিনি আফশোষ করলেন, কেন নৃপতি রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অলঙ্কার সরিয়ে রাখেন নাই। আজ যদি তাঁর হাতে সেই সম্পদ থাকত তাহ'লে যাকে আজ মমতার অতি সূক্ষ্ম সূত্র দিয়ে ধরে রাখতে পারলেন না, তাকে হয়ত সম্পদের বেড়াজালের ফাঁস দিয়ে বেঁধে রাখতে পারতেন। একটা প্রশ্ন তাঁর মনে হল। বার বারই সেটা মনে হয়। নৃপতি রায়ের যে সম্পদ বাকী ছিল সে কোথায় গেল, কার হাতে গেল?

চক্রবর্ত্তী দু'জোড়া মৃত্যু সহ্য করেছিলেন। কিন্তু রায়বংশের বংশধর ও অবশিষ্ট তিনটি মানুষের মধ্যে দু'টি মানুষের সম্পর্কচ্ছেদে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেলেন। অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। প্রথম যৌবনের দুর্দ্দান্ত উন্মাদনা কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, পরিণত যৌবনের প্রশান্তিও অবলুপ্ত, আজ বার্দ্ধক্যে শুধু গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজে বিবাহ করেন নাই; স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, তাঁহার আপনার রক্ত আর কাহারও মধ্যে প্রবাহিত নাই। একান্ত পরকে নিয়ে সংসার গড়েছিলেন। তারাও একে একে সব বিদায় নিয়ে গেল। তিনি আর কত সহ্য করবেন! মানুষ ত তিনিও!

তবু তাঁর মৃত্যু হল না। মৃত্যু হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। প্রায় দু'মাস ধরে প্রচণ্ড কঠিন রোগে ভুগেও তিনি আবার বাঁচলেন। শুধু তাই নয়। আবার নূতন করে সংসার রচনার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবারকার নায়ক গণপতি। তিন পুরুষকে নায়ক করে রায়-বাড়ীর নাটক তিনি চালনা করলেন। নৃপতি গেলেন, শ্রীপতি গেল, ধনপতি গেল, এবার গণপতি।

কিন্তু এবার আর নাটক জমল না। প্রথম দৃশ্যের দৃশ্যপটের যবনিকাই আর উত্তোলিত হল না। গণপতিই যখন চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, এই বিপুল সংসারের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা-স্থল, তখন গণপতি বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। চক্রবর্ত্তীর প্রজোযনায় সে তখন আর রায়-বাড়ীর ভাঙা রঙ্গমঞ্চে নায়কত্ব করতে রাজী নয়। সে তখন একেবারে বাড়ী ছেড়েছে। গাঁজা এবং মদে অনবরত ডুবে আছে। যত নিম্নশ্রেণীর কুৎসিত চরিত্রের নারীদের নিয়ে সে তখন মত্ত। রায়বংশের সমস্ত তামসিকতার সে তখন উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। চক্রবর্ত্তী আবার নূতন করে সংসার করার চেষ্টায় তাকে নিয়ে পড়লেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে সংসার, তার নাগালই পান না চক্রবর্ত্তী কোন ক্রমে। বাড়ীতে সে থাকে কখন্ যে তাকে ধরবেন? গ্রামের যত আবর্জ্জনাকীর্ণ পূতিগন্ধময় স্থান তার আবাস ও বিহার-স্থল। সারা দিন এখান-ওখান করে ফেরে, রাত্রেও বাড়ীতে থাকে না। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে তার গতায়াত, সেইখানেই সে নিশি যাপন করে। কোন কোন দিন খাবার জন্য দিনের বেলা বাড়ী আসে, কোন দিন আসে না। এরই মধ্যে এক দিন চক্রবর্ত্তী তাকে ধরে ফেললেন।

তাকে পরম স্নেহে বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে এলেন। সে খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, চক্রবর্ত্তী ডাকতেই সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল। চক্রবর্ত্তী সস্নেহে তাকে বললেন—বস,. ভূতনাথ বস।

গণপতি যে রায়দের বাড়ীর ছেলে সে কথা সে ভুলেই গেছে। এ-অঞ্চলে তার একাধারে রুদ্র ও শিব এই দুই স্বভাবের জন্য লোকে বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর লোকে তাকে বলে ভূতনাথ, ভূতু বাবু! আসলে তার বুদ্ধিহীন স্বভাবের জন্যই এই সস্নেহ নামকরণ।

গণপতি বসল, বললে—বল, কি বলছ বল। আজ আবার দাসপাড়ায় ঝুমুর গান আছে, শুনতে যাব।

চক্রবর্ত্তীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল নৃপতি রায়ের নাতির এই কথা শুনে। ইচ্ছে হল—যেমন করে প্রথম যৌবনে নৈশ অভিযানে নৃপতি রায়ের সঙ্গী হয়ে মানুষ-জনদের জ্বলন্ত মশালের আঘাত করতেন, তেমনি নিষ্ঠুর ভাবে এই অধঃপতিত হতভাগ্যকে প্রহার করতে।

ভূতনাথের দিকে ভাল করে চাইলেন চক্রবর্ত্তী। রাগ তাঁর জল হয়ে গেল। কি দেহ! রায়-বংশে এত দীর্ঘ দেহ মানুষ আর জন্মায় নাই। অতি দীর্ঘ চেহারা, বলিষ্ঠ, অথচ বেতের মত পাতলা লঘু। এই দেবদুর্লভ দেহ! কিন্তু কি ময়লা, কি দুর্গন্ধ সমস্ত দেহে! অজস্র অনাচারের সাক্ষী বহন করছে ঐ দেহ। তিনি বললেন—ভূতু বাবু, এক কাজ কর তুমি। এমন করে আর ঘুরে-ঘুরে বেড়িও না, বিয়ে-থা কর, ঘর-সংসার কর, সম্পত্তি দেখাশুনা কর। আমি তো বুড়ো হয়েছি—আমি আর ক'দিন? এইবার তুমি তোমার সব সম্পত্তি বুঝে নাও।

গণপতি হাত নাড়তে লাগল, বললে—উ-সব আমি পারব না বাপু। ডাকলে তুমি, এলাম। কৈ, পাঁচটা টাকা খসাও দেখি? ই-দিকে তো টাকার গাদ নিয়ে বসে আছ।

চক্রবর্ত্তী ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। তবু রাগকে যথাসম্ভব শান্ত করে বললেন—দেখ ভূতু, তুমি যত টাকা চাও আমি দেব। তুমি বদখেয়ালগুলো সব ছাড়।

গণপতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে বললে—বদখেয়াল? আমার বাপুতি সম্পত্তি ভেঙে খাচ্ছ, আবার আমাকে টাকা দেবে না? আমার ঠাকুরদা যে গয়না রেখে গিয়েছিল, তার কি হল? মহালের আয় কি হয়? আমার সম্পত্তি, আর আমাকে টাকা দেবে না?

—না, টাকা দোব না। ক্রোধগম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন চক্রবর্ত্তী।

আচ্ছা, টাকা তুমি কি করে না দাও দেখছি। মূর্ত্তিমান্ পাষণ্ড দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নূতন কোন অনাচারের চেষ্টায়। চক্রবর্ত্তী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—পাপ, মূর্ত্তিমান্ পাপ! রায়-বংশের সমস্ত অনাচারের ফল!

কয়েক দিন পরেই চক্রবর্ত্তীর কাছে সংবাদ এল, গণপতি দাসপাড়ার জমিজারদের কাছে হিজল আর মহুলার আপনার অর্দ্ধেক অংশ বিক্রী করে কোথায় চলে গেছে। চক্রবর্ত্তী শুনে বিচলিত হলেন। তবু মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিলেন যে, হতভাগা বনগাঁর অংশ বিক্রী করেনি। তিনি চিঠি লিখলেন ধনপতির স্ত্রীকে সব জানিয়ে। পত্রে অনুরোধ করলেন, এসে এখানে থাকবার জন্য এবং সম্পত্তি ভোগ-দখল করবার জন্য। উত্তরে ধনপতির স্ত্রী লিখলেন—সবিনয়ে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই লিখলেন যে, ছেলে তাঁর সহরে লেখাপড়া করছে। তাকে নিয়ে যেতে গেলে তার লেখাপড়া নষ্ট হবে। আর স্বয়ং চক্রবর্ত্তী যখন রয়েছেন তখন রায়-বংশের বংশধর সম্পত্তি থেকে অন্যায় ভাবে ফাঁকি পড়বে না। পত্র পড়ে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল দীর্ঘ দিনের পর।

গণপতি না থাকায় তিনি শান্তিতেই ছিলেন। কিন্তু আবার গণপতি ফিরে এল। এসে সোজা দাঁড়াল তাঁর সামনে। একেবারে বললে—আমার দাদুর জমানো সোনা-দানা সব আমাকে দিয়ে দাও। নইলে ভাল হবে না বলে দিলাম।

চক্রবর্ত্তী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—যাও, বেরিয়ে যাও। তুমি আমাকে জান, আমি তোমার পিছনে পিশাচ লাগিয়ে দেব।

গণপতিও উঠে দাঁড়াল, অট্টহাস্য করে বললে—পিশাচ লাগাবে? আরে আমিই তো পিশাচ! আমিই দোব তোমার ঘাড় ভেঙে! দাঁড়াও তুমি। সে আবার বেরিয়ে গেল। আর সে ফেরেনি।

গণপতি গিয়ে আস্তানা গাড়লে দাসপাড়ায়। চক্রবর্ত্তী সবই শুনতে পান। দাসপাড়ার এক কৈবর্ত্তদের বিধবা মেয়ে তাকে পাগল করে তুলেছে, তারই জন্য তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থের খোঁজে সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে। চক্রবর্ত্তী নিজ চোখে দেখলেনও দু'দিন। সন্ধান করে করে দলদলির পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেন অপরাহ্নের দিকে। দেখতে পেতেন, দৈত্যের মত দীর্ঘ-দেহ গণপতি হন্-হন্ করে গিয়ে ঢুকল ভূতো রায়ের বনে। আবার বেলা পড়ে আসবার মুখে অন্ধকার হতে না হতে সে বেরিয়ে গেল বন থেকে। চক্রবর্ত্তী বুঝলেন, গণপতির এ অভিযান কেন? পিতামহের হারানো সম্পত্তি সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। হায় রে, তিনি যদি জানতেন তা'হলে নৃপতি রায়ের পৌত্রকে কি তিনি বঞ্চিত করতেন? নিদারুণ মমতায় তাঁর বুকটা টন-টন করে উঠে। যদি তিনি জানতেন, তা হলে তার অধঃপতনের পথেও অশান্তি ঘটবার অবকাশ দিতেন না।

এমনি করেই কয়েক দিন চলার পরই অঘটন ঘটে গেল। চক্রবর্ত্তী শুনলেন, রায়-বংশের বংশধর গণপতি দাসপাড়ার সেই যুবতী মেয়েটিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। চক্রবর্ত্তী পরম বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু স্বস্তি চক্রবর্ত্তীর ললাটলিপি নয়। কয়েক দিন পরেই ভূপতি রায়ের বনের প্রান্তে দলদলির জলার কাছে সেই যুবতী মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেল। কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। কেউ আর কে? এ নিশ্চয়ই গণপতি। কিন্তু সে কোথায় গেল?

সমস্ত অঞ্চলটা রায়-বংশের সন্তানের কলঙ্কে মুখর হয়ে উঠল।

পুলিশ এল। চক্রবর্ত্তীও ছুটে এলেন। না এসে উপায় কি তাঁর? মমতার আর মোহের বন্ধন! এসে নানান্ প্রমাণ প্রয়োগ করে তিনি পুলিশকে বুঝিয়ে দিলেন যে, হতভাগা দুশ্চরিত্র দলদলির পঙ্ক-কুণ্ডে আত্মহত্যা করে বেঁচে গেছে।

ঘটা করে গণপতির শ্রাদ্ধও করলেন তিনি। সে সময় নরপতি আর তার মা আপনা হতেই এসেছিলেন। কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাননি তাঁরা। চক্রবর্ত্তী ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাদের। কিন্তু তারা থাকেনি।

এর পর থেকে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চক্রবর্ত্তী পূজা-অর্চনায় মনোনিবেশ করলেন। রাত্রির এক যাম অতীত হলে ভোজ্য নিয়ে গিয়ে দলদলি আর ভূপতি রায়ের বনের মাঝখানে শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হন আর দূর থেকে করুণ আহ্বান জানান তাঁর দীর্ঘজীবনের সাধনায় সঙ্গীদের। মহেশ্বরের পরিত্যক্ত প্রেত-পিশাচদের প্রথমেই আহ্বান করেন, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান জানান ভূপতি রায় আর নৃপতি রায়ের হাতে মারাত্মক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ ক'রে ইহ-জীবনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা, ও বেদনা নিয়ে যারা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণায় আজও প্রেত-জীবন যাপন করছে, তাদের। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করেন হিজল, মহুলা, বনগাঁ আর দাসপাড়ার যত জন আজও গতির অভাবে প্রেত-পিশাচ হয়ে এখানকার আকাশে, বাতাসে, গাছে, মাটিতে, তৃণে যারা অবস্থান করছে তাদের। সব শেষে পরম মমতার সঙ্গে আহ্বান জানান ভূপতি রায়, নৃপতি রায়, শ্রীপতি রায়, আর তার পত্নীকে, ধনপতি আর তার স্ত্রীকে। আর ডাকেন হতভাগ্য গণপতিকে। তাঁর পূজা, প্রীতি ও ভোজ্য গ্রহণ করবার জন্যে তিনি সকলকে ডাক দেন—তোমরা এস বন থেকে বেরিয়ে, দলদলির পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে, শ্মশানের চুর্ণীর মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে।

লোকে বলে, পিশাচসিদ্ধ চক্রবর্ত্তীর আন্তরিক ডাকে প্রসন্ন চিত্তে বেরিয়ে আসে বনের ঘনান্ধকারে, বৃক্ষের ছায়ায়, বৃক্ষের মজ্জায় মজ্জায় যারা বাস করে, দলদলির বুক থেকে শেওলা আর পাঁক সারা গায়ে মেখে তারা আসে, ভোজন সমাধা করে আবার ফিরে যায়।

চক্রবর্ত্তী পূজা শেষ করে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসেন।

অকস্মাৎ পট পরিবর্ত্তিত হল। ভূপতি রায়ের বনের এই অঞ্চলের সকল চিহ্নহীন কালের বুকে সংখ্যা-গণনার অঙ্কপাত হল।

১৯৪৩ সাল। এ অঞ্চলের লোকেরাও শুনেছে যুদ্ধ লাগার কথা। এরাও শুনছে কয়েক মাস পূর্ব্বে দেশের ওপর দিয়ে একটা নিদারুণ বিক্ষোভ আর বিপ্লবের ঝড় বয়ে যাবার কথা। এখানকারই রায়-বংশের শেষ পুরুষ নরপতি রায় সেই বিক্ষোভের এক অংশে নায়কত্ব করেছে এবং সে এখন লোক-লোচনের অন্তরালে এও শুনেছে তারা। চক্রবর্ত্তীও শুনেছেন। চক্রবর্ত্তী কেমন যেন মুসড়ে পড়ছেন দিন দিন।

শরতের শেষ। শীত পড়ি-পড়ি করছে। অকস্মাৎ এক দিন একখানা বিচিত্র চেহারার মোটর গাড়ী দাসপাড়াকে ডাইনে রেখে, হিজলকে পাশে ফেলে, বনগাঁ আর ভূপতি রায়ের বনের মাঝখান দিয়ে গিয়ে মহুলাকে পাশে ফেলে যেন উড়ে চলে গেল। সেই আরম্ভ হল। এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ গাড়ী দিন যাওয়া-আসা করতে লাগল। গাড়ীতে যারা যায় সাদা ধব-ধবে কিম্বা রাঙা টকটকে মুখ তাদের। নীল চোখে বিচিত্র চাউনি।

এক দিন শোনা গেল, এখানে রেলের লাইন পড়বে। তার পর এক দিন পরওয়ানা পেলেন চক্রবর্ত্তী জেলার সদর সহরে সায়েবের সঙ্গে দেখা করবার। দেখা করলেন। হুকুম পেলেন—রেলের লাইন পড়বে, তাই কেটে ফেলতে হবে ঐ ভূপতি রায়ের জঙ্গল।

অসংখ্য প্রেতের আবাস-স্থল এই বন—এই কথাটা সবিনয়ে বোঝাতে গিয়ে ধমক খেলেন একটা। ধমক খেয়ে ফিরে এলেন। পূজায় তাঁর ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

তার পর কয়েক দিনের মধ্যে এল নানান্ মানুষ, নানান্ তর যন্ত্রপাতি। বনের পাশে ফাঁকা ডাঙায় ছাউনী পড়ল তাদের। দাসপাড়া, হিজল, মহুলা আর বনগাঁর মানুষেরা সন্ধ্যা বেলায় দেখলে, লাখো বাতিতে আলোময় হয়ে উঠেছে বনের উত্তর প্রান্ত। আগের দিনে যেমন রাত্রে এ অঞ্চলের মানুষেরা শুনতে পেত প্রেত আর পিশাচের উল্লাস-ধ্বনি যেমন দেখত তাদের দেহহীন অবয়বহীন দৃষ্টির ভৌতিক দীপ্তি; আজ তেমনি এ অঞ্চলের মানুষেরা দূর থেকে তাদের জীর্ণ গৃহাঙ্গন থেকে দেখছে—পরিত্যক্ত ফাঁকা প্রান্তরে লক্ষ আলোর স্থির দীপ্তি, আর শুনছে—হাজারো মানুষের কলরোল। চক্রবর্ত্তীও দেখলেন। তাঁর শ্মশানে আরাধনা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের সদম্ভ পদক্ষেপে প্রেত-পিশাচের দল সভয়ে মুখ লুকিয়েছে।

পরদিন আরম্ভ হল কাজ। অতিকায় বুলডোজার ট্যাঙ্ক এসেছে। তারা বনের দক্ষিণ প্রান্তের অতি দীর্ঘজীবী স্থবির বৃক্ষের কাণ্ডে সশব্দে আঘাত করতে আরম্ভ করলে। এক, দুই, তিন, চার। অতিকায় বনস্পতি তার লক্ষ-কোটি প্রেতসঙ্গীকে নিয়ে আর্ত্ত চীৎকার করে তার ডালপালার অন্তিম আস্ফালন তুলে সশব্দে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। একের পর এক। দূর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষেরা সবিস্ময়ে সভয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। একটু পরেই শিমুল গাছটা পড়ল মড়-মড় করে। হাজার-হাজার টিয়া আর চন্দনা ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল আর্ত্ত চীৎকার করতে করতে। সে দিনের মত কাজ সাঙ্গ হল। চক্রবর্ত্তী লোক-মুখে শুনলেন শুধু। দেখার অবকাশ আর তাঁর হল না। তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছেন।

পরদিন আবার চলল কাজ। কাজ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। এক জন দীর্ঘ দেহ, উলঙ্গ, মানুষ ক্রুদ্ধ চীৎকার করতে করতে কর্ম্মরত কুলিদের দিকে ছুটে আসছে। দাড়িতে গোঁফে সারা মুখ সমাচ্ছন্ন। কুলিরা নিদারুণ ভয়ে ভীত হয়ে আর্ত্ত চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাতে লাগল। বলতে লাগল, পিশাচ বেরিয়েছে বন থেকে। ভয়ার্ত্ত কুলিরা এক জন আমেরিকান অফিসারের সামনে পড়তেই দাঁড়াল। তিনি তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই সেই মূর্ত্তি তাঁর সামনে এসে পড়ল। তার পর এক মুহূর্ত্ত। কঠিন ধ্বনিতে চারি দিক ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হল সে মূর্ত্তি। সায়েব শুধু দাঁতে দাঁত চিপে বললেন—ইউ ক্যানিবল্! পুলিশ এসে বহু কষ্টে সনাক্ত করলে গণপতি রায়ের দেহ বলে।

চক্রবর্ত্তীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে চলেছে। ধনপতির স্ত্রী, নরপতির মা সংবাদ পেয়ে দেখতে এসেছেন তাঁকে। চক্রবর্ত্তীর চোখের দৃষ্টি স্তিমিত, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, হাত-পায়ের সঞ্চালন অতি মৃদু হয়ে এসেছে। তবু ধনপতির স্ত্রীকে দেখে তিনি বড় খুসী হলেন। অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন—যেটুকু থাকল সেটুকু নিও তোমরা বৌমা! নরুকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। আমরা সে কালের মানুষ। নরুদের তো বুঝতে পারি না, মা! তবু তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

নরপতির মা বললেন—আপনাকে একটা কথা বলি। সেই বলতেই এসেছি আমি। আমার দাদা-শ্বশুরের, আপনার রায়কর্ত্তার যে জমানো সোনা-দানা ছিল সে আমার কাছে আছে। কর্ত্তা মরবার সময় শাশুড়ীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। শাশুড়ীর কাছ থেকে আমি নিয়েছিলাম। সে অধর্ম্মের টাকা আমি সৎকাজে ব্যয় করেছি। নরু খরচ করেছে সে টাকা।

এত দিনে শেষ সমস্যার সমাধান হল চক্রবর্ত্তীর। তিনি পুত্র-বধূর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে চোখ বুজলেন। সেই দিন সন্ধ্যাতেই তাঁর স্নেহ-পিপাসু, চির-আশাবাদী জীবনের অবসান ঘটল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। যেখানে অতি ঘন বৃক্ষসমৃদ্ধ অরণ্য ছিল, সে স্থান আজ প্রান্তরের অপর অংশের মতই ধূ ধূ করছে। শুধু এখনও কতকগুলো গাছের কাণ্ডের অতি স্থুল সাদা রঙের অভ্যন্তর ভাগ খণ্ডিত অবস্থায় অতিকায় জন্তুর হাড়ের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ভূপতি রায়ের ঘনান্ধকার বিপদ-সঙ্কুল অরণ্য আপনার প্রেত-পিশাচের দল নিয়ে আপনার কালের চক্রবর্ত্তীকে আর গণপতিকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। যেখানে ভূপতি রায়ের বন ছিল সেখানে আজ রুক্ষ প্রান্তর ধূ-ধূ করছে। তবু বর্ষার সময় ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আবার নূতন অঙ্কুরের সবুজ অগ্রভাগ মাটির ভিতর থেকে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে, নূতন লতা উদগ্র হয়ে আছে একটি পত্র-বিকাশের কামনায়।

ডিমবিক্রেতা —পূর্ণেন্দু পাল

সহধর্ম্মিণী

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

সান্ধ্য সম্মিলনে এসেই বন্ধুর দল জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে, কালকের আরম্ভ করা গল্পটা শেষ হলো?'

আমি বললাম, 'এই মাত্র শেষ করলাম।'

বন্ধুরা বলল, 'ব্যস, তবে আর কোন্ কথা নয়। পড়তে আরম্ভ করে দে, আমরা শুনি।'

আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

সাহিত্যিক প্রেমরঞ্জন তন্দ্রাচ্ছন্ন অলস দেহ এলাইয়া দিয়া শুইয়াছিল সাদা ধবধবে একটি চাদর দিয়া ঢাকা বিছানায়। এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি মিষ্টি শব্দ তাহার কাণে আসিল ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্। শব্দ তাহার কাণের ভিতর দিয়া একেবারে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শরীরে-মনে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। যুবকের তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল। সে উৎসুক নয়নে উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল কাহারও আগমন প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষা তাহাকে বেশী ক্ষণ করিতে হইল না। যাহার জন্ত প্রেমরঞ্জনের আগ্রহ, সে আসিয়া ধীর-পদে ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু এ তাহার হস্তে কঙ্কণ-শোভিতা নব বিবাহিতা যৌবনোচ্ছলা অষ্টাদশী প্রিয়া নহে। প্রেমরঞ্জন এখনও বিবাহ করে নাই। প্রবেশ করিল তাহার ভৃত্য দীননাথ, হাতে তাহার এক পেয়ালা চা। এই চা তৈয়ারির সময়ে পেয়ালা ও চামচের সংঘর্ষের শব্দই তাহার কাণে আসিয়া তন্দ্রা ভাঙিয়া দিয়াছিল। প্রেমরঞ্জন শায়িত অবস্থায়ই হাত বাড়াইয়া দীননাথের হাত হইতে পেয়ালা-শুদ্ধ পিরিচ টানিয়া লইল। এক চুমুক চা পান করিয়া আরামের শব্দ করিয়া কহিল, 'বেঁচে থাক্ বাবা দীননাথ, দীর্ঘায়ু হ।'

কোন্ বিস্মৃত অতীত কাল হইতে যে প্রেমরঞ্জন চা পান করিয়া আসিতেছে তাহা তাহার ভাল মনেই পড়ে না। তাহার এক এক সময়ে মনে হয়, সে আর সকলের মত মাতৃস্তন্যে পুষ্ট হয় নাই। তাহার মাতৃ-বক্ষে এই চা-ই দুধের বদলে সঞ্চিত থাকিত। জন্মাবধি তাহার ধারা পান করিয়াই সে এত বড় হইয়াছে। এমন কি, তাহারও আগের কথাও যেন তাহার কিছুটা মনে পড়িতেছে। সে তখন স্বর্গের দেবতা ছিল। তখনও সে সোমরস নামধারী এই চা-ই পান করিত।

বাঙলা দেশে জন্ম প্রেমরঞ্জনের, ভাবপ্রবণতা তাহার মজ্জাগত। তাহাতে আবার যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে তাহার জীবনে। রঙিন হইয়া উঠিয়াছে তাহার শরীর-মন টুকটুকে গোপালখাস আমের মত। তাই বাবা-মা যখন কর্ত্তব্যবোধে তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অন্তরে আগ্রহের আতিশয্য লইয়াও পুত্রোচিত ভব্যতার খাতিরে একবার বাহ্যিক অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই হিন্দু-সন্তানের আদর্শ 'জননী জন্মভূমিশ্চ—ও পিতরি প্রীতিমাপন্নে—' তাহার অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে ফুটিয়া উঠিল। তাই তাহার আর দেরী সহিল না। ছোট ভাইয়ের মারফত জানাইয়া দিল যে বাপ-মায়ের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া সে তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে চায় না।

কাজেই বাবা-মা পাত্রী দেখিতে লাগিলেন আর প্রেমরঞ্জন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—'পাশের ঘরে ঠুন্-ঠুন্ শব্দ আরও দীর্ঘতর আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে পেয়ালা ও চামচের শব্দের সঙ্গে কাঁকন ও চুড়ির শব্দ মিলিত হইয়া। পর-মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল চায়ের পেয়ালা হাতে এক তরুণী। চেনা বলিয়া যেন মনে হইতেছে। তাই তো, এ যে উর্ব্বশী। অ্যাঁ, সেই তবে পুরূরবা এ জন্মে প্রেমরঞ্জন-রূপে জন্ম নিয়াছে? তাহা হইবেও বা। আশ্চর্য্য

হ? প্রেমরঞ্জন উর্বশীর হাত হইতে চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইল। উর্বশীর নয়নে মদির কটাক্ষ, অধর-কোণে মৃদু হাসির আকারে অমৃত-নির্যাস। হাত খালি হওয়া মাত্র উর্বশী দুইটি চাঁপার কলি প্রেমরঞ্জনের গালে বুলাইয়া দিল। অর্থাৎ দুইটি পেলব আঙুল দিয়া গাল টিপিয়া দিল। প্রেমরঞ্জন চায়ে চুমুক দিল। বাঃ, তোফা! দীনে বেটার তৈয়ারি চা ইহার কাছে কোথায় লাগে! এ যে অনেক বেশী মিষ্টি, অনেক বেশী মদির। উর্বশী কি চা'য়ে আঙুল নিংড়াইয়া দিয়াছে? উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া এক ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল। কি বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহাকে? উর্বশী বলিয়া ডাকিতে বাধিতেছে। নাম সংক্ষেপ করিয়া না ডাকিলে যেন পুরোপুরি আদর প্রকাশ পায় না। এ বিষয়ে সে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছে, নাম যত বড়ই হউক আদরের চাপে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া সাধারণতঃ দ্বি-আক্ষরিক নামে পরিণত হয়। এমন কি, দুই অক্ষরের 'রাধা' নামও প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের আদরে আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 'রাই' রূপ নিয়াছিল। তবে সে কী ডাকিবে? উরো? সংস্কৃত 'উরস্' হইতে উরো অর্থাৎ বক্ষ—বুক, অর্থাৎ কি না বুকের নিধি। অর্থটা মিষ্টি বটে, কিন্তু শব্দটা ঠিক মনের মত নহে। থাক্ গে, নামের দরকার নাই। ডাকিল, 'ও গো!'

উত্তর হইল, 'কি গো?'

'চায়ের এমন অপূর্ব স্বাদ কি করে হলো? আঙুরের রস দিয়েছ না কি এতে?'

উত্তর হইল, 'না গো না। আঙুর কোথায় পাব গো?'

'তবে কি ক'রে হলো?'

'বল তো তুমি?'

'আমি হার মানছি, তুমিই বল না?'

উর্বশী মুচকি হাসিয়া বলিল, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে চায়ের স্বাদটা কেমন হলো দেখবার জন্য একবার ঠোঁটে ছুঁইয়েছিলাম।'

প্রেমরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, এ তো উর্বশীর ওষ্ঠাধর নহে। এ যেন দুইটি গাছ-পাকা টসটসে আঙুর। প্রেমরঞ্জন অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'চমৎকার, এমন না হ'লে তুমি আমার প্রেয়সী! এসো, তাহ'লে চা টা আরো মিষ্টি, আরো মদির ক'রে নিই।'

এই বলিয়া প্রেমরঞ্জন উর্বশীকে বুকে টানিয়া লইল। বিহ্বলা উর্বশী মদির আবেশে বলিল, 'আঃ, কি যে কর তুমি, কেউ দেখতে পাবে। ভারী দুষ্টু তুমি!'—ইত্যাদি।

পরের ঘটনা জাগ্রত-স্বপ্ন নহে, একেবারে বাস্তব। বাঙলা দেশে পাত্রী পাইতে দেরী হয় না। তাই অল্প কালের মধ্যে প্রেমরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানও যথারীতি হইল। বাড়ীতে মাসাধিক ব্যাপিয়া কল-কোলাহলের পরে আবার পূর্বের শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল। বাস্তব জীবনে উর্বশী ঘরে আসে নাই বটে, কিন্তু প্রেমরঞ্জনের নব পরিণীতা ভার্য্যা মানসী একেবারে অপাংক্তেয় হয় নাই। মোটের উপর সুন্দরী বলিলে একেবারে মিথ্যা বলা হয় না। তাহার উপরে মানসী বিদুষী

এক দিন প্রেমরঞ্জন শুনিতে পাইল, তাহার পেয়ারের দীননাথ চায়ের ব্যাপারে 'এক্সুট' হইয়া পড়িয়াছে। বেচারা দীননাথের জন্য অনুকম্পা হয়। কিন্তু লজ্জা বলিতে কী, এই সংবাদটির জন্য প্রেমরঞ্জন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সত্য সত্যই এক দিন পাশের ঘরে পেয়ালার শব্দের সঙ্গে তরুণী মানসীর কঙ্কন-ঝঙ্কার মিশিয়া তাহার মনটাকে দোলা দিল। পরক্ষণেই পেয়ালা হাতে মানসী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রেমরঞ্জন উৎসাহিত হইয়া হাত বাড়াইয়া পেয়ালা গ্রহণ করিল। বলিল, 'আজকের চা-টা নিশ্চয় একটা পরম উপাদেয় জিনিষ হবে।' কিন্তু পেয়ালায় চুমুক দিবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করিল। বলিল, 'এটা কি পদার্থ হলো?'

মানসী বলিল, 'এটা ওভালটিন মিশ্রিত খাঁটি দুধ।'

'কেন? চা কোথায় গেল?'

'ওটাতে জলের দরকার হয়। কাজেই খাঁটি বলা চলে না। আর যা খাঁটি নয় তা' অস্বাস্থ্যকর।'

'দেখ, এ ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ভাঁড়ারে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি চা বাড়ন্ত হয়ে গেল না কি? খুব পয়মন্ত বৌ ঘরে এসেছ দেখছি।'

মানসী বলিল, 'মশাই গো, ঠিকুজি মিলিয়ে রাজ-যোটক হয়েছিল বলেই আমাকে আনা হয়েছে, জান? এখন অপরা বললে শুনছে কে? আর আমি এ-বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মশায়ের দশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল সেটা কি মশায়ের পয়াতে? তা' হ'লে দু'দিন আগেও তো বাড়তে পারত? যাও না, মাকে গিয়েই জিজ্ঞাসা কর না আমি অপয়া কি সুপয়া?'

ইহার প্রতিবাদ চলে না। আর প্রতিবাদ করিলে মুখরা জাতির মুখ বন্ধ তো হয়ই না বরং বেশী খুলিয়া যায়। তাই নিরুপায় হইয়া প্রেমরঞ্জন অন্য পথ ধরিল। অনুনয় করিয়া বলিল, 'লক্ষীটি, ঠাট্টা করবার সময় ঢের পাবে। এখন চট ক'রে এক পেয়ালা চা ক'রে দাও। নইলে আমি বাঁচব না।'

মানসী শ্লেষ-মিশ্রিত হাসির ভঙ্গিতে বলিল, 'তাই না কি? তা'হলে তো আমাদের পরিবারের সকলেই কবে মরে গিয়ে ভূত হয়ে যেতাম। দেখ, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নারায়ণ সাক্ষী করে যখন তোমার জীবনের দায়িত্ব আমি নিয়েছি তখন তোমার ভাল-মন্দও আমাকেই দেখতে হবে। আর আমার নিজের ভাল-মন্দও তোমার ভাল-মন্দের উপর নির্ভর করে। কাজেই এত বড় দায়িত্ব নিয়ে আমি নিজে হাতে করে তোমার হাতে বিষের ভাণ্ড তুলে দেবো, এই কি তুমি আশা কর?'

'বিষ? চা বিষ? পাগল না ক্ষ্যাপা। এ যে অমৃত!'

'বিষ না তো কি? দেশ জুড়ে লোক যাকে শ্রদ্ধা করে, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলে গেছেন!'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'তবে তো একেবারে আপ্তবাক্য। কে সেই ঋষিটি শুনি?'

মানসী বলিল, 'কেন? তুমি কি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "চা পান না বিষ পান' প্রবন্ধ পড়নি?"

প্রেমরঞ্জন প্রমাদ গণিল। সর্বনাশ! পি সি রায়ের আদর্শে দীক্ষিত এক নারীকে লইয়া তাহার বাকী জীবন কাটাইতে হইবে? তাহা হইলে জীবনে আর সম্ভোগের আশা কোথায়? সারা জীবনটাই তো কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া কাটাইতে হইবে। হায় রে অদৃষ্ট! তাহার স্বপ্নময় যৌবনের এই পরিণাম? আর যে নারী রঙিন বয়সেই কবির 'সোমরসবাহী সাকী'-মূর্তিতে আবির্ভূত না হইয়া কঠোর শাসিকা মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে পারে, সে যে উত্তর কালে শাসনের

প্রয়োজনে তাহার গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বল-পরীক্ষার অছিলায় স্বামীর উপর ঘুসি চালাইবে না, তাহারই বা স্থিরতা কি? প্রেমরঞ্জন দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'চা যদি বিষই হয় তবে আমিও নীলকণ্ঠ। বিষ খেলে আমার কিছুই হয় না। যাও, চা নিয়ে এস শীগ্‌গির ক'রে।'

মানসীর চোখে করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, 'ওগো, নাই বা খেলে চা। সত্যি তো আর ম'রে যাবে না।'

প্রেমরঞ্জন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'না, না, না। কত বার বলব আমার চা চাই-ই, আর এক্ষুনি চাই।'

মানসী বলিল, 'খ'বেই? আচ্ছা এনে দিচ্ছি।' মানসী চলিয়া গেল।

আবার পাশের ঘরে ঠং-ঠাং শব্দ, আবার কঙ্কণ-ঝঙ্কার। সম্ভব মত সময়ে দুই পেয়ালা চা হাতে নিয়া মানসী ঘরে ঢুকিল। ডান হাতের পেয়ালা প্রেমরঞ্জনকে দিয়া বাম হাতের পেয়ালা ডান হাতে নিয়া প্রেমরঞ্জনের মুখামুখী হইয়া মেজেতে বসিল। প্রেমরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কার চা?'

মানসী উত্তর করিল, 'আমার।'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'কোন দিন খাওনি, আজকে হঠাৎ চা খাবে কি রকম? ও কি?'

মানসী পেয়ালা মুখের কাছে আনিয়াছে এমন সময়ে প্রেমরঞ্জন বিছানা হইতে লাফাইয়া পেয়ালা-শুদ্ধ মানসীর হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'এ করেছ কি? তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যে তোমার পেয়ালায় দুধ দিতে ভুলে গেছ।'

মানসী বলিল, ওটা ভুল নয়, ইচ্ছাকৃত। আমি দুধ খাই না, তাই আমার চায়ে দুধ দিইনি।'

—'অ্যা, দুধ ছাড়া এই কড়া চা তুমি খাবে—যে কোন দিন চা খায়নি?'

দুধের অভাবে এক দিন মাত্র প্রেমরঞ্জনকে দুধ ছাড়া চা খাইতে হইয়াছিল এবং তাহার মত চা-খোরেরও মাথা সে-দিন ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিয়াছিল।

মানসী বলিল, 'দেখ, আমি হিন্দু স্ত্রী, তোমার সহধর্মিণী। দু'জনার আলাদা রকম তো হতে পারে না! তোমাকে যখন চা ছাড়াতে পারলাব না তখন আমাকেই চা ধরতে হবে। আর দুধ যখন আমি খাই না, তখন এই রকম দুধ ছাড়া চা-ই আমাকে খেতে হবে?'

—'পাগল আর কি?' প্রেমরঞ্জন মানসীর পেয়ালা কাড়িয়া নিয়া জানালা দিয়া চা ঢালিয়া ফেলিল।

মানসী বলিল, কয় পেয়ালা চা তুমি ঢেলে ফেলবে জিজ্ঞাসা করি? তুমি বেরুবে না? তখন আমি কেট্‌লি ভরতি এর চেয়েও কড়া চা ঢক্‌-ঢক্‌ করে গিলে ফেলবো। এ আমি তিন সত্যি ক'রে ... রাখলাম।'

অভিমানাহত মানসীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হইল। প্রেমরঞ্জন চট্‌ করিয়া মানসীর পথ রোধ করিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'ছিঃ মানী, অমন ক'রে চোখের জল ফেলতে নেই। কে জানে ওতে হয় তো চায়ের চেয়েও বেশী অকল্যাণ হবে। যাক্‌ গে, তোমারই জয় হোক্‌। তোমার জয়েই আমারও জয়। ছেড়ে দিলাম আমি আজ থেকে চা। এসো।'

মানসী স্বামীর অকল্যাণ ভয়ে উদ্গত অশ্রু চাপিবার চেষ্টা করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। প্রেমরঞ্জন তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেল নিজের পূর্ণ পেয়ালার কাছে। তাহার হাতে পেয়ালাটি উঠাইয়া দিয়া আবার তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল জানালার কাছে। 'নাও, ঢেলে ফেল' বলিয়া প্রেমরঞ্জন নিজেই মানসীর হাত সমেত পেয়ালা উল্টাইয়া চা ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

মানসী আবার প্রেমরঞ্জনের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার নয়ন-কোণে অশ্রু, অধরপ্রান্তে হাসির রেখা। আর সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়িয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্তরের কৃতজ্ঞতার মাখা অনাবিল শান্তির ছাপ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

এইখানেই ঘটনার শেষ হইলে, গল্প হিসাবে এটা Marvellous dramatic end অর্থাৎ খাসা নাটকীয় পরিসমাপ্তি হইত। কিন্তু গল্প এক, বাস্তব অন্য জিনিষ। তাই ঘটনা অগ্রসর হইয়া চলিল। প্রেমরঞ্জন বলিল, 'দেখ মানসী, এই যে সহধর্মিণীর দোহাই দিলে—তোমরা স্ত্রীজাতিরা কি সব সময়েই সহধর্মিণী হয়ে চল? আইন-প্রণেতা পুরুষেরা সে-যুগে তাদের সুবিধার জন্য শব্দটা সৃষ্টি করে' তাই দিয়ে তোমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তোমরাও তো তেমনি এ-যুগে তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইচ্ছামত নিজধর্ম ই মেনে চল্‌ছে। অবশ্য তোমার কথা আমি বলছি না।'

মানসী বলিল, 'না গো, না। এ তুমি ভুল কথা বললে। সহধর্মিণী আমরা চিরকালই। কেউ স্বামীর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সহধর্মিণী আর কেউ বা স্বামীকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে নিয়ে সহধর্মিণী।'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ। তুমি যেমন পাত্র-বিশেষের কথা বললে, তেমনি আবার এর ক্ষেত্রবিশেষও আছে। আমি তার এক উদাহরণ জানি? বৈষ্ণব-পরিবারের ছেলে। মাছ-মাংস-পেঁয়াজ তাদের বাড়িতে অচল। তার বৌ এল এক শাক্ত-পরিবার থেকে। ফলে স্ত্রীকে স্বামীর বাড়ীতে সহধর্মিণী হবার জন্য বাধ্য হয়ে নিরামিষাশী হ'তে হলো। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে যখন বাপের বাড়ী যেত, তখন স্ত্রী সেটা পুষিয়ে নিত।'

মানসী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, 'তুমি কি বলতে চাও, স্বামী শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে মাছ-মাংস খেত? যাও, তুমি ঠাট্টা করছ!'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'ওটা আমার সিদ্ধান্ত। তা' নইলে সে স্ত্রী সহধর্মিণী হতে পারত না। কারণ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মে বর্ত্তমান প্রৌঢ়া বয়সেও এই মহিলা তার স্বামীর ঘর করবার সময়ে কায়স্থের বাড়ী বসে রাঁধা মাছ খেয়ে আসে। যাক্‌, তোমার বেলা দেখা যাচ্ছে নিজধর্মে দীক্ষিত করে' নিয়ে তুমি সহধর্মিণী হলে। আর আজীবন এ ভাবেই চলবে।'

মানসী বলিল, 'ওগো, এখন কথা বলো না। তুমি দেখে নিও আমি জীবনে আর কোন বিষয়ে তোমার অমতে চলব না। তোমার ধর্ম মেনে নিয়েই সহধর্মিণী হবো।'

—'এ তুমি ঠিক বলছ মানী?'

—'হ্যাঁ, ঠিক বলছি। এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'থাক্ থাক্, তোমাকে দিব্যি করতে হবে না। যেখানে আমার মতে চলতে তোমার অসুবিধা হবে, সেখানে আমিই তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব। তার জন্য তুমি ভেবো না। আচ্ছা, এসো এক কাজ করা যাক্। আমরা দু'জনে কি ভালবাসি আর কি বাসি না তার একটা তালিকা করা যাক্। প্রথমে খাওয়ার দিক্‌টাই ধরা যাক্। প্রথম দফা, চায়ের তো নিষ্পত্তি হয়েই গেল। আচ্ছা, দ্বিতীয় দফা ধরা যাক্ দুধ। আমার মতে চলতে হ'লে তো তোমাকে দুধ খেতে হয় এখন থেকে।'

এবারে মানসী বিপদে পড়িল। এই মাত্র সে যে কথা দিয়াছে, আর কোন বিষয়ে সে স্বামীর অমতে চলবে না। সে কাচু-মাচু করিয়া বলিল, 'ওগো, দুধ যে আমি মোটেই খেতে পারি না। বাবা-মা কত দিন আমাকে জোর ক'রে খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খেলেই আমার বমি হয়ে যায়।'

—'তখন খেতে পারনি ব'লে কি আর এখন খেতে পারবে না? সেটা ছিল তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের স্নেহের অত্যাচার। আর এখন যদি খাও, তবে সেটা খাবে আমাকে ভালবাসার খাতিরে তোমার নিজের ইচ্ছায়। এতে আমি জোর করব না। কি বল?'

মানসীর মুখে কোন কথা জোগাইল না। প্রেমরঞ্জন বলিল, 'যাক্ গে, এ বিষয়েও না হয় আমিই তোমার পথে চলব। দুধ ছেড়ে দেবো।'

মানসী বলিয়া উঠিল, 'দুধ ছেড়ে দেবে কি রকম? তা' কি হয়?'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'তা হতে যে হবেই। নইলে এ বিষয়ে তুমি আমার সহধর্মিণী থাকবে কি ক'রে?'

—'বাঃ রে! দুধ ছাড়লে তোমার শরীর টিকবে কি করে? দু'দিনেই যে ভেঙে যাবে।'

'তোমার শরীর যদি একদম দুধ না খেয়ে এত দিন টিকে থাকতে পারল এবং এর পরও টিকে থাকবে ব'লে মনে কর, তবে আমার এত দিনের দুধ-খাওয়া শরীর দু'দিনেই ভেঙে যাবে, এ কি একটা কথা হলো?'

—'আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের শরীর আর তোমাদের পুরুষদের শরীরে অনেক তফাৎ।'

—'কোন্ শাস্ত্রে এটা লেখা আছে শুনি? যাক্ গে, কি করা যাবে তাহলে? হয় এক জনকে দু'ধ ধরতে হবে নয় আর এক জনকে দুধ ছাড়তে হবে। এ ছাড়া আর তো কোন তৃতীয় পথ দেখছি না।'

মানসী নিরুপায় হইয়া বলিল, 'তোমাকে দুধ ছাড়তে হবে না। আমিই দুধ খাব। কিন্তু এক দিনেই অনেকটা খেতে বলো না। আমি একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে অভ্যাস করব।'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'তা' তুমি করো।'

মানসী সত্য সত্যই দুধ খাওয়া অভ্যাস করিতে লাগিল। কিন্তু এ তো অভ্যাস নহে। ইহাকে কঠোর সাধনা বলা উচিত। মানসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দুধ খাওয়া দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়!

Every thing is fair in love and war, এদিকে প্রেমরঞ্জন প্রথম প্রণয়ের রঙিন নেশা অটুট রাখিতে গিয়া চা ছাড়িবে বলিয়া কথা দিল বটে, কিন্তু তাহার মত চা-খোর কথা দিলেই চা ছাড়িতে পারিবে কেন? আর সাহিত্যিক সে, চা না খেলে লেখাই বা আসবে কেন? তাই বাড়ীর বাহিরে তাহার চা-পানের মাত্রা বাড়িয়া গেল। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা না থাকাতে তাহার বড় অস্বস্তিতে দিন কাটিতেছিল। তাই দুই দিন যাইতে না যাইতেই প্রেমরঞ্জনের মাথা ধরিতে লাগিল অর্থাৎ সে মাথা ধরিবার ভাণ করিতে লাগিল। মানসী ঔষধ খাইতে বলিলে সে বলিল, 'এ তো কোন অসুখ নয় যে অষুদে সারবে? এত দিনের চা'য়ের অভ্যাস হঠাৎ ছেড়ে দেওয়াতে এ রকম হচ্ছে। ও আস্তে আস্তে আপনি কমে যাবে।'

মানসীর মনে অস্বস্তি থাকিলেও সে প্রেমরঞ্জনের কথা মানিয়া লইল। কারণ, স্বামীর দেহে চায়ের যে বিষ-ক্রিয়া সে একবার বন্ধ করিয়াছে তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটাইতে তাহার মন সরিতেছিল না।

এক মাস পরেও প্রেমরঞ্জনের মাথা-ধরা কমিল না। সে তখন মানসীর নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিল। বলিল, 'মানী, একটা কথা বলতে চাই, রাগ করবে না তো?'

মানসী বলিল, 'শোন কথা, রাগ করব কেন?'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'এক মাসের ওপর হয়ে গেল, কিন্তু মাথা-ধরা কমবার তো কোন নমুনা দেখছি না। ডাক্তাররা তো দরকার মত রোগীকে দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডিও খেতে দেয়। দু'-এক দিন এক বার ক'রে আমার দুধের মধ্যে কয়েক ফোঁটা চা মিশিয়ে দেখি না কেন মাথা-ধরা তা'তে সারে কি না? মাত্র কয়েক ফোঁটা। এতগুলি দুধের মধ্যে মিশে তা' কোন অপকারই করবে না। যদি তা'তেও মাথা-ধরা না সারে, তবে তো বুঝবই এ মাথা-ধরা চায়ের জন্য নয়। তখন তো আর চা মেশাবার দরকারই হবে না। তখন অন্য অষুদের ব্যবস্থা করব। কি বল তুমি?'

স্বামীর অসুখ সারে তাহা কোন্ স্ত্রী না চায়। আর মানসীর ধারণা হইয়াছিল, চা'য়ে প্রেমরঞ্জনের মাথা-ধরা সারিবে না, কাজেই অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাই ঔষধের ব্যবস্থা হইবে শুনিয়া মানসী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ তো, তোমার যদি দুধে চা মেশালে মাথা-ধরা সারে তা'তে আমি আপত্তি করব কেন?'

বলা বাহুল্য, প্রথম দিনের কয়েক ফোঁটা চা'তেই মাথা ধরা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল এবং দ্বিতীয় দিন মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া দেওয়াতে একেবারেই সারিয়া গেল। তৃতীয় দিন মানসী প্রেমরঞ্জনের দুধে চা মিশাইবার সময়ে তাহার সামনেই নিজের দুধের বাটিতেও কয়েক ফোঁটা মিশাইল।

প্রেমরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ও কি করলে?'

মানসী মুখ টিপিয়া হাসিল। বলিল, 'সহধর্মিণী যে!'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'অষুদের বেলা সহধর্মিণী কি রকম? আজ আমার যদি ইন্‌জেকসন্ নেবার মত কোন অসুখ হয় তা'হলে তুমিও ইন্‌জেকসন্ নেবে না কি?'

—কি যে অলক্ষণে কথা বল। আমার নিজের প্রয়োজনও তো হতে পারে?'

—'কেন তোমারও মাথা ধরল না কি? আর তা'হলেও সব রকম মাথা-ধরার কি একই অষুদ না-কি? ডাক্তারি শাস্ত্রে যে পণ্ডিত হয়ে উঠেছ দেখছি।'

মানসী বলিল, 'তবে শোন। কাল পরশুও তোমাকে না জানিয়ে আমার দুধে কয়েক ফোঁটা চা মিশিয়েছিলাম। তা'তে কোন রকম অস্বস্তি বোধ করিনি, বরং একটা সুবিধা হয়ে গেছে। দু'দিনই ঐ কয় ফোঁটা মেশানতে দুধের বিস্বাদটা দূর হয়ে গিয়েছিল। দুধ খেতে অন্য দিনের মত কোন রকম কষ্টই হয়নি।'

প্রেমরঞ্জন উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'তাই না কি? এ তো বড় খাসা আবিষ্কার করেছ মানী!'

ইহার পরে ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মানসী দুই মাসেই চায়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এক দিন মানসী বলিল, 'ওগো, তুমি যে দুদিন থেকে আমার কথা গ্রাহ্যই কর না। কাল খাবে কি শুনি?'

প্রেমরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কই? চা'ল ফুরিয়ে গেছে তা' তো এক দিনও আমাকে বলনি?

—'চা'ল নয় গো, চা। আজ নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। কাল খাব কি?'

—'থাক্ গে, ও বিষ আর না-ই বা আনলাম ঘরে। ও খেয়ে কোন্ দিন হয় তো বিষের জ্বালায় অক্কাই পেতে হবে।'

মানসী হাসিয়া বলিল, 'তোমার ভয় কি গো? তুমি তো হ'লে নীলকণ্ঠ!'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'আমার জন্ম ভয় করছি না গো—ভয় হচ্ছে তোমার জন্ম। তুমি যে আমার সহধর্মিণী প্রেয়সী। কিন্তু তুমি তো আর নীলকণ্ঠ নও।'

মানসী বলিল, 'এত কাল নীলকণ্ঠের সহবাস ও সাকরেদি করেও যদি অমর না হতে পারলাম, তবে আর তার বাহাদুরি রইল কোন্খানটায়? আর তা না হ'লেও তুমি একটু দয়া করলেই তো আমি অমর হতে পারি।'

প্রেমরঞ্জন বলিল, 'কি রকম?'

মানসী বলিল, 'চায়ের বিষে যদি আমার দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়-ই, তখন নীলকণ্ঠ যেমন সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেরিয়েছিল, তুমিও তেমনি ক'রে আমার দেহটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িও। ফলে আরো একান্নটি পীঠস্থান তৈরি হবে। আমিও তা'হলে পুণ্য-লোভাতুর তীর্থকামী কোটি কোটি হিন্দু ভারতবাসীর হৃদয়ে অনন্ত কাল ধরে অমর হয়ে থাকব। আর তা'রা তোমারও যশ কীর্ত্তন করতে করতে পরম উৎসাহে তীর্থে-তীর্থে ছুটে বেড়াবে। বুঝলে?'

—'বুঝলাম!'

—'কি বুঝলে?'

—'বুঝলাম, নিখিল জগৎ-নারী জাতির মধ্যে তুমিই এক মাত্র প্রকৃত সহধর্মিণী। তুমিই ধন্য। সতীও তো কই তোমার মত এমন করে' নীলকণ্ঠের বিষের ভাগ নিয়ে সহধর্মিণী হতে পারেনি। তুমি ভেবোনা মানী? আমিই তোমাকে অমরতা দান করব বিশ্ববাসীর হৃদয়ে তোমার পুণ্যময় জীবন-কাহিনী লিখে। এখন আমি চা নিয়ে আসতে চললাম।'

গল্প শেষ হতেই নিশীথ বলে' উঠল, 'চমৎকার! বেড়ে চায়ের বিজ্ঞাপন হয়েছে। তুমি আর দেরী করো না। এটাকে কাল্‌কেই পাঠিয়ে দাও 'টি অ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্ট বুরোতে। বেশ কিছু টাকা পেয়ে যাবে হে।'

অন্যান্য বন্ধুরাও সমস্বরে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ নিশীথ।'

আমি বড় দুঃখে গল্পটাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেললাম। কি বকুমারিই করেছি কালিদাসের দোহাই না শুনে'। সাধে কি কালিদাস বলে গেছেন 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদন—'। এই অমৃতময় গল্প-কাব্যখানি এদের কাছে চায়ের বিজ্ঞাপন বলে' সাব্যস্ত হ'লো! আর তা'র মূল্য নির্ণয় হবে পয়সা দিয়ে! আর তাও কি না নির্ণয় করবে চা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনদাতাগণ! এই নাকে খৎ! আর কোন দিন বন্ধুদের গল্প পড়ে শোনার কোন্ ইয়ে!'

রস

···অজ্ঞাতনামা

(প্রথম পুরস্কার)

—রেবা চক্রবর্তী

কনভয়

আলোকচিত্র সম্বন্ধে ঃ আমাদের বাঙলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন বাঙলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি যাতে মাসিক বসুমতীর মত আলোকচিত্রের দেখা মিলেছে। বসুমতীই একমাত্র আমাদের চোখের সামনে হাজির করে দিয়েছে আমাদের দেশের সমাজের নানান দিক্‌-বিদিক্‌—পরশমণির মত যার অনুসন্ধানে হাতড়ে ফিরলেও সহজে তা ধরা পড়বে না চোখে। কিন্তু আমাদের দেশের এই কাগজ, কালি আর ছাপা-বিভ্রাটের দুর্য্যোগ বহন করেও এক মাত্র মাসিক বসুমতীই বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের মুখের কাছে এগিয়ে দিয়েছে বাঙলা দেশকে। মাফ করবেন, চেটে খাওয়ার জন্য নয়, চোখ তুলে যাতে আপনারা যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করেন। সত্যিই, মাসিক বসুমতীর পাঠক-সম্প্রদায় (হারে পাঠিকা কম) এ বিষয়ে আমাদের যে উৎসাহ ও সহযোগিতায় কৃতার্থ করেছেন তা আর ভাষায় প্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই। প্রতি মাসেই আমরা সকলেই তার নমুনা দেখছি স্বচক্ষে।

আমাদের এই অভিনব প্রচেষ্টায় আমরা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাই। যেগুলি আপনাদের স্মরণীয় কর্ত্তব্য। যথা :—

১। এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিই ছবি হয়। অর্থাৎ এমন ছবি আমাদের দপ্তরে আসে যা চোখের পক্ষেই পীড়াদায়ক। দেখলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়। তাই আমরা জানাই, এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিকার ছবি হয়। তা দেখে যেন

ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী

সকলের চোখ ও মন পরিতৃপ্ত হয়—এই কথা।

২। ছবি পাঠাবার সময় ছবির পিছনে যদি আপনার নাম না দেন তা হ'লে আর কথাই নেই! আপনার ছবি অনাথ শিশুর মত আমাদের 'বিবেচনাধীন' ফাইলে পড়ে অরণ্য-রোদন করতে থাকবে। তার পর যদি আমাদের এই ধরণের কোন একটি ছবি সত্যিই ভাল লাগে সেগুলি অজ্ঞাতনামা নাম দিয়ে এক দিন প্রকাশ করে দেব।

এই ছবির পিছনে নাম না থাকার একমাত্র প্রতিকার হিসাবে স্থির করেছি যে, এই অজ্ঞাতনামাদের নাম আমরা প্রকাশ করতে চাই। ছবি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনি উক্ত দলের এক জন হয়েছেন দেখেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাদের জানালেই আমরা এর প্রতিকার করব।

৩। ৬"×৮" ইঞ্চি মাপের ছবি পাঠালে আমাদের সুবিধা হয়।

৪। ছবিতে যেন কোন নাম না থাকে, অর্থাৎ ছবির নাম আমরাই দিয়ে থাকি। অবশ্য, কোন বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীদের নাম হলে নিশ্চয়ই জানাবেন।

৫। প্রকৃতি ও সমাজের সাম্প্রতিক বিষয়ের ছবি হলে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে ছবি কোথাও প্রকাশিত হয়ে গেছে তা যেন আর পাঠাবেন না। আলোকচিত্র সম্বন্ধে ভাল রচনা সাদরে গৃহীত হবে। এই বিষয়ে আমরা আমাদের দেশের আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান বা 'ষ্টুডিও' যাঁদের আছে তাঁদের সহযোগিতা চাই।

গজের ফাকে

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কাজে ফাঁকি দিয়ে

শি, সু, বসু

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আপনি কি ভুল দেখছেন

উঃ

অমলা দেবী

১

রাত দুপুরে হাঁকা-হাঁকি, চেঁচামেচি, কান্নাকাটী নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার ছোট দোতলা বাড়ীর পাশেই গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড, প্রাচীন দোতলা বাড়ী। বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক অন্নদা নৈশ আড্ডা সারিয়া বাড়ী ফিরে রাত্রি একটায়। ঘুমন্ত পাড়ার অর্দ্ধেক লোকের ঘুম ভাঙাইয়া, দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে হাঁকিতে থাকে—দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও-না—। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী হয়তো ঘুমাইয়া পড়ে; সহজে ঘুম ভাঙে না তার। আধ ঘণ্টা পরে দরজা খুলে। তার পরেই শুরু হয় দুই পক্ষ হইতে মোটা ও মিহি সুরে তর্জ্জন-গর্জ্জন; কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে। কোনও দিন অন্নদার পৌরুষ যদি চাগাইয়া উঠে তো মার-ধর চলে; নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্ত্তনাদ জমাট নৈশ স্তব্ধতাকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

কিন্তু বৎসর কয়েক পূর্ব্বে, নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে মিহি ও মোটা সুরের চাপা-সতর্ক গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হইতে শুনিয়াছি। অন্নদার বিবাহের অনতিকাল পরে। অন্নদার বৌ তখন দ্বিরাগমনে ঘর-বসত করিতে আসিয়াছে। তার বুড়া বাপ-মা নীচের ঘরে শুইতেন। অন্নদা নব-বধূকে লইয়া দুপুর-নিশি যাপন করিত দোতলার একটা ঘরে। সারা রাত্রি কত গল্প! মাঝে মাঝে মিহি ও মোটা সুরের চাপা উচ্ছ্বসিত হাসি। সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে সতর্ক করা। কখনও কোমল তরুণী-কণ্ঠের মধুর তর্জ্জন—আঃ—কি হচ্ছে! চলে যাচ্ছি তা' হলে! সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠের সাধনের মিনতি—তার পরেই বোধ হয়—অপর পক্ষের আত্ম-সমর্পণ।

ঠিক পাশেই আমার দোতলার শোবার ঘরে শুইয়া-শুইয়া কান খাড়া করিয়া শুনিতাম। পাশে—বিস্তৃত শয্যায় ছেলে-মেয়েদের লইয়া পত্নী নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেন। আমি অন্ধকারে তাকাইয়া থাকিয়া, শ্রুতিশক্তি তীক্ষ্ণতম করিয়া, নব-বিবাহিত তরুণ-তরুণীর হাসি ও গল্প শুনিতে শুনিতে নিজেদের অতীত সদ্য-বিবাহিত মধুময় রাত্রিগুলির কথা ভাবিতাম, চোখে ঘুম আসিত না।

কিন্তু সে কথা যাক্। কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অতীতের শ্মশানভূমির উপরে মৃত মুহূর্ত্ত-পুঞ্জের ভস্ম-স্তর জমিয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে অন্নদার বুড়া বাপ, ও বুড়ী মা মারা গিয়াছেন। অন্নদাই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। অভিভাবক—রায়-সাহেব গদাধর গাঙ্গুলী। জেলা-কোর্টের উকীল। ওকালতী করিয়া এবং আরও নানা উপায়ে বিস্তর টাকা রোজগার করেন। অন্নদার নিকট-আত্মীয় তিনি; সম্পর্কে খুড়া। মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্নদার বাবা গদাধরের হাতে ধরিয়া আমার অভিভাবকত্বের ভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার স্কন্ধে। গদাধর [illegible] সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহারই [illegible] করে অন্নদা। [illegible] [illegible] [illegible]

তাহারই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গেল, খুড়া [illegible] এক হইয়া গেল। [illegible] অন্নদার মা, মারা গেলেন। এবারও আত্মীয়-স্বজন [illegible] দিল—বাপের শ্রাদ্ধ যে ভাবে করিয়াছে, সেই ভাবেই [illegible] শ্রাদ্ধ করা উচিত অন্নদার। বাবা ও মা—এ জোড় [illegible]। [illegible] গেলে বাপের উপরে মা। দশ মাস, দশ দিন গর্ভ-ধারণের [illegible] মা'কেই সহ্য করিতে হয়। শাস্ত্র-বাক্য হইতে নজীর দেওয়া [illegible]—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'; মুনি-ঋষিদের কথা [illegible] নয়। রায়-সাহেব আসিলেন। তিনিও উৎসাহিত করিলেন। [illegible] শ্বশুরও আসিয়াছিলেন। পাড়াগেঁয়ে ছোট-খাটো জমিদার। [illegible] বলিতে মাত্র দুইটি কন্যা। অন্নদার স্ত্রী তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। [illegible] অন্নদাকে পুত্রের মতই স্নেহ করেন। অন্নদার আর্থিক সঙ্গতি [illegible] করিয়া তিনি আপত্তি করিলেন। কিন্তু সে আপত্তি আত্মীয়-স্বজনের [illegible] বাগাড়ম্বর ও জেলা-কোর্টের উকীল রায়-সাহেবের ব্যক্তিত্বের [illegible] দাঁড়াইতে পারিল না। অন্নদা নিজেও একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল [illegible] হাতে টাকা নাই বলিয়া। রায়-সাহেব সাহস দিলেন। তিনি [illegible] থাকিতে বংশের কাহারও কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে—[illegible] দেখিতে পারিবেন না। অন্নদার কোন চিন্তা নাই; যত [illegible] লাগিবে, তিনি দিবেন। অন্নদা শুধু বৈষয়িক নিয়মের [illegible] একটা হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়া দিবে মাত্র। মায়ের শ্রাদ্ধ [illegible] ধাম করিয়া করিল অন্নদা। কর্ম্ম-কর্ত্তা হইলেন স্বয়ং [illegible] কি-কি বাবদে কত টাকা খরচ হইল, অন্নদা দেখিল [illegible] শ্রাদ্ধের পরে হাজার দুই টাকার খত লিখিয়া দিল।

বৎসর খানেক পরে রায়-সাহেবের পরামর্শ [illegible] অন্নদা। রায়-সাহেবের বড় ছেলে সতীশ বি-এ [illegible] বেকার বসিয়াছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর সারা জেলায় [illegible] তৈয়ারী হইতেছিল। রায়-সাহেব কর্ত্তাদের ধরিয়া [illegible] একটি রাস্তা তৈয়ারীর বড় কাজ সংগ্রহ করিলেন। [illegible] অংশীদার হিসাবে কাজে নামিতে পরামর্শ দিলেন। [illegible] কাজ এমনই অত্যন্ত লাভজনক। কাজ যেমনই হোক, [illegible] খুসী থাকিলে কোন ভাবনা নাই। তার উপর, মিলিটারীর [illegible] তো মা-লক্ষ্মীর মন্দিরে পৌঁছিবার পাকা সড়ক। পঞ্চাশ টাকার [illegible] কম, পাঁচ শ' টাকার বিল দাও, অর্দ্ধেক টাকা [illegible] হাতে তুলিয়া দিয়াও, যাহা খরচ করিয়াছ তাহার পাঁচ গুণ [illegible] ঘরে আনিয়া সিন্দুকে তোল। বৎসর দুই কাজ করিতে [illegible]—রায়-সাহেব ভাবাকুল নেত্রে তাকাইয়া, হাসিয়া জানাইলেন—[illegible] চেহারা বদলাইয়া যাইবে, পাড়াগাঁয়ে ভাঙা খড়ের বাড়ীতে [illegible] করিতে হইবে না, সহরে বাড়ী হইবে, গাড়ী হইবে; অন্নদার বৌয়ের দেহ সোণায় মোড়া হইবে এবং সিন্দুকে টাকা ধরিবে না।

অন্নদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে রায়-সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া [illegible] ভবিষ্যতের সৌভাগ্যময় সম্ভাবনার কথা শুনিতে লাগিল। [illegible] মানস-চক্ষের সামনে, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট ভবিষ্যতের [illegible] স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি ভাসিতে লাগিল। রায়-সাহেব বিবিধ ও বিচিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া কহিলেন—কিন্তু, বাবাজী, টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চালবে, তেমনই টাকা আসবে।
[illegible]
[illegible]

ব্যবহার। উপরওয়ালাদের কথার উপর কথা কইবে না। ভাল বলুক, মন্দ বলুক, সব কথাতেই হুঁ। চেটে জুতোর ধূলো পরিষ্কারও করতে বললে তাই করতে হবে, সে জাতে চাঁড়াল হলেও। টাকা রোজগার করতে গেলে অত জাত, ধর্ম্ম বিচার করলে চলে না। মুচকি হাসিয়া, চোখ মটকাইয়া কহিলেন—তবে কি জানিস্, বাবা, কিছুই করতে হবে না, এখানেও যদি টাকা ঢালতে পারিস্। হুঁকিতে হাজার টাকার নোট হু'পকেটে গুঁজে দিতে পারলে, যত বড় জঁাদরেল ধর্ম্মাবতার উপরওয়ালা হোক, পোষ মেনে যাবে।

টাকা চাই! বৌএর সঙ্গে পরামর্শ করিল অন্নদা। রায়-সাহেব ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি তাহার চোখের সামনে আঁকিয়াছিলেন, তাহারই উপর অরেও কয়েক পোঁচ রং চড়াইয়া, আরও জাঁকালো করিয়া তুলিয়া বৌএর সামনে ধরিল। বৌ পাশে শুইয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ ডাগর করিয়া কহিল—সত্যি? অন্নদা কহিল—সব সত্যি। রায়-সাহেব কাকা মিথ্যে বলবার লোক নন। নিজের ছেলের জন্তেই কাজ ঠিক করেছেন; আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন বলেই সঙ্গে নিতে চাইছেন। তবু বৌ কহিল—বাবার পরামর্শ নেবে না একবার?

ঐখানেই মুস্কিল। পাড়াগেঁয়ে বিষয়ী লোকের পরামর্শ চাহিতে গেলে অনেক বাগড়ায় পড়িয়া যাইতে হইবে। কত খুঁৎ বাহির করিবে, নানা রকম বিপত্তির সম্ভাবনার দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া ভয় দেখাইবে, আইনের মার-প্যাঁচ তুলিয়া ব্যাপারটা ঘোরালো করিয়া তুলিবে। যে ব্যাপারের সোজা একটা কথায় মীমাংসা হইয়া যায়, তাহারই জন্ত চিবাইয়া-চিবাইয়া হাজার কথা বলিবে। ওদিকে রায়-সাহেব বিরক্ত হইয়া হয়তো বাদ দিয়া বসিবেন তাহাকে। অন্নদা কহিল—শ্বশুর মশায়কে খবর দিলে তো আসতে পারবেন না। কাজের মানুষ। অথচ আমার যাবার উপায় নাই। রায়-সাহেব তাড়া দিয়েছেন বেজায়। তাড়াতাড়ি টাকার দরকার। এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ সুরু করতে হবে। চিন্তাকুল মুখে বৌ কহিল—কোথায় পাবে এত টাকা? অন্নদা ঢোক গিলিয়া কহিল—কোটাল পুকুরের চকটা বিক্রী করে দেব ভাবছি। আতঙ্কে বৌ কহিল—সে কি কথা গো? ও-জমি বিক্রী করলে খাবে কি? ভাত-ঘর যে! ঠাকুরের কত সাধের জমি! ডাকলে সাড়া দেয়। বিঘের চার মাপ করে ধান! অন্নদা কহিল—ওর দশ বিঘে তো আগেই গেছে—খতের দায়ে। বৌ চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—সত্যি! আমাকে বলনি তো? অন্নদা কহিল—কি আর বলব। রায়-সাহেব কাকা টাকার তাগাদা করতে লাগলেন। দোষ নাই বেচারার। একটা দায়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ও-টাকা না পেলে, ওঁকেই ধার করতে হ'ত। বৌ বিবর্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্নদা সাহস দিয়া কহিল—আর জমি-যায়গা নিয়ে কি হবে? পাড়াগাঁয়ে তো থাকব না। সহরে বাড়ী করব বছর হুই-এর মধ্যেই। পাড়াগাঁয়ে কে আর আসবে বল? সবই তো বিক্রী করে দিতে হবে এক দিন। তা' ছাড়া, জমির যা' দাম, তার চার গুণ ফিরে আসবে হু'বছরেই। জমি যদি কিনতেই চাও তো সহরের আশে-পাশে কিনলেই হবে।

কোটাল পুকুরের এক কিত্তেয় পঞ্চাশ বিঘা জমি রায়-সাহেবের হাতে তুলিয়া দিয়া, দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া বংশীধরের সঙ্গে কন্ট্রাক্টারীর কাজ সুরু করিল অন্নদা। হু-হু করিয়া কাজ চলিতে লাগিল। মাস কয়েক পরে অন্নদা বাড়ী আসিল একবার। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল—চেহারা, পোষাক, পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, চালচলন এক দম বদলাইয়া গেছে তাহার। মেদবহুল, থল-থলে দেহ কঠিন, আঁটসাঁট হইয়াছে; মুখের চেহারায় মেয়েলি মোলায়েম ভাবটা কাটিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে পুরুষ-সুলভ রুক্ষতা; চাল-চলন বেশ সপ্রতিভ। পরিধানে, খাঁকী রং-এর হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-হাতা সার্ট; পায়ে মোজা ও বুট জুতা; মাথায় সোলার হ্যাট। চুলে ব্যাক ব্রাশ, নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। দিবা-রাত্রি চোখে পাশুটে রং-এর চশমা আঁটা। মুখে হরদম সিগারেট ও ইংরেজী-মেশানো বুলি। আমাদের স্কুলে পড়িত অন্নদা। ওর বাবার অনুরোধে উপরোধে কোন রকমে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছিলাম; ম্যাট্রিকুলেশানের দরজাটা পার হইতে পারে নাই। আগে দেখা হইলে—শিক্ষকের সম্মানটুকু দেখাইতে কার্পণ্য করিত না। সামনে সিগারেট খাইত না, দেখিবা মাত্র সদ্য-ধরানো সিগারেট ও ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত। এবার তা করিল না। চোখের সামনে দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মাথা উঁচু করিয়া গটগট করিয়া পার হইয়া গেল। দেখিতে পাইয়াও একবার মাথা নামাইয়া পূর্ব্বের সম্পর্কটা স্বীকার করিল না। দিন দুই থাকিয়া বৌকে লইয়া সহরে চলিয়া গেল। সেখানে বাড়ী ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিল। এখানের বাড়ী পাহারা দিতে লাগিল—বুড়ী ঝি।

অন্নদা যেমনই ব্যবহার করুক, মনে-মনে খুসীই হইলাম। আমাদের পাড়ার অধিকাংশ লোকেরই বৈষয়িক অবস্থা সম্প্রতি ভাল নয়। গদাধর বাবু তো দরিদ্রের সন্তান। লেখাপড়া শিখিয়া, রোজগার করিয়া অবস্থা ফিরাইয়াছেন। এবং ওকালতীর কূট-বুদ্ধির জাল ফেলিয়া, পাড়ার অন্যান্য সকলের বিষয়-আশয় ক্রমে ক্রমে টানিয়া তুলিয়া, বেশ ভরাট হইয়া উঠিয়াছেন। পাড়ার মধ্যে অন্নদাদের অবস্থা কিন্তু বরাবরই স্বচ্ছল। অন্নদার প্রপিতামহ নীলকুঠীর সাহেবদের অধীনে নায়েবী করিয়া বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। এ তল্লাটের এক জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। গ্রামের সকলে জমিদারের সম্মান দিত তাঁকে। অন্নদার পিতামহ অনেক সম্পত্তি বিলাস-ব্যসনে নষ্ট করিলেও পুত্রের জন্ত যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে কম নয়। অন্নদার বাবা পৈতৃক সম্পত্তি তো নষ্ট করেন নাই বরং বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, বংশের সম্মানও বজায় রাখিয়াছিলেন। গদাধর নবীন শাল তরুর মত মাথায় উঁচু হইয়া উঠিলেও বৃদ্ধ বনস্পতির প্রাচীন মর্য্যাদাকে ম্লান করিতে পারেন নাই। অন্নদাও যে মানুষ হইয়া উঠিয়া পূর্ব্ব-পুরুষদের মুখ-রক্ষা করিতে পারিল—ইহা সুখের কথা বৈ কি!

তা' ছাড়া, গদাধর বাবুর সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলাইয়া গেল। বরাবরই ভাবিতাম—ভদ্রলোক অন্নদাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিবার জন্ত বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু, তা' সত্য হইলে—নিজের হাতে অন্নদাকে সৌভাগ্য-সৌধের সিঁড়ির উপরে চড়াইয়া দিবেন কেন?

বৎসর খানেক কাটিয়া গেল। মাঝে বার দুই অন্নদা বংশীধরের সঙ্গে গ্রামে আসিয়াছিল। কাহারও সহিত দেখা করে নাই। লোক-মুখে শুনিলাম—অন্নদা এখন নিজের নামেই কাজ পাইয়াছে। ইহাও না কি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গদাধর বাবুর তদ্বিরের ফল। আত্মীয় হইয়াও এতখানি শুভেচ্ছা দেখা যায় না আজকাল। গদাধর বাবুর উপর

শ্রদ্ধা হইল। মানুষকে চেনা কত শক্ত, এবং সাধারণ ব্যবহার দেখিয়া মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা কত অন্যায়—বুঝিতে পারিলাম।

মাস কয়েক পরে খবর পাইলাম—অন্নদার অবস্থা সঙ্গীন। যে কাজ করিতেছিল, কর্তৃপক্ষ তাহা অপছন্দ করিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তা' ছাড়া, এমন গলদ বাহির হইয়াছে যে হাতে কড়ি আসিবে কি, হাত-কড়ি পড়িবার উপক্রম। গদাধর বাবু, কর্তৃপক্ষদের ধরাধরি করিয়া সেটা বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষতি বিস্তর। মূলধন সব তো গিয়াছেই, উপরন্তু বিস্তর দেনা হইয়া গিয়াছে। দেনার দায়ে অন্নদার পৈতৃক সম্পত্তি যা' ছিল, গিয়াছে, অন্নদার বৌ-এর নূতন-পুরাতন যা' অলঙ্কার ছিল, গিয়াছে। এবং বাকী দেনার দায়ে পৈতৃক বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছে। তবে সুরাহা এইটুকু যে, পরের হাতে কিছুই যায় নাই। রায়-সাহেব নিজে টাকা দিয়া সব নিজের কাছে রাখিয়াছেন।

সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল রায়-সাহেবকে। অন্নদার মত অপদার্থ ছেলের হাতে অত-বড় গুরুতর কাজের ভার দেওয়া উচিত হয় নাই। কাজে যে গলদ বাহির হইবে, তা' তো সকলেই আগে জানিত। রায়-সাহেবও জানিতেন। শুধু অন্নদাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য এই ঝুঁকি কাঁধে লইয়াছিলেন। এর জন্য দণ্ডও দিতে হইল তাঁহাকে। দণ্ড বৈ কি! ঐ তো মেঠো সম্পত্তি, আর ভাঙ্গা বাড়ী! ওর মূল্য কি আজ-কালকার বাজারে? ঐ টাকা বংশীর কাজে লাগাইলে দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিত। কলিকালে কে কাহার জন্য এতখানি স্বার্থত্যাগ করে?

অন্নদা বৌকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রথম কয়েক দিন লজ্জায় বাড়ীর বাহির হইল না। পাড়ার সকলে তাহার বাড়ী গিয়া খবর লইয়া আসিল। আমার সঙ্গে এক দিন দেখা হইল রাস্তায়। কোন কথা বলিল না, মুখ নীচু করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; মুখের ভাব—বিষণ্ণ, বিহ্বল। যেন সমতল রাস্তায় নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত মনে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ গভীর গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। যাহার সঙ্গে চলিতেছিল, সে নির্বিঘ্নে পার হইয়া গেল, অথচ সে কি করিয়া পড়িয়া গেল—এ রহস্য এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

গদাধর বাবুর করুণার শেষ নাই। অন্নদাকে অকর্মণ্য ও অপদার্থ জানিয়াও ত্যাগ করিলেন না। আমাদের গ্রামের কাছেই একটা নূতন রাস্তা তৈয়ারীর কাজ পাইল বংশীধর। অন্নদাকে মাস মাহিনায় সরকারের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

মাহিনা মন্দ নয়। মাসে পঞ্চাশ টাকা। অন্নদার বিদ্যা-বুদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী। এক জন বি-এ পাশ গ্র্যাজুয়েট এর চেয়ে কম মাহিনায় কাজ করে। অবশ্য সব মাহিনাটা পায় না অন্নদা। মাসে পঁচিশ টাকা সুদের জন্য কাটা যায়। বাকী টাকা অন্নদা বৌএর হাতে আনিয়া দেয়। যুদ্ধের বাজারে ঐ টাকাতে দু'জনের পেট চলে না—বিশেষ করিয়া চাল পর্য্যন্ত যাদের কিনিতে হয়। স্বামি-স্ত্রীতে খটাখটি বাধে মাঝে-মাঝে। তা' ছাড়া, অন্নদা ব্যবসা করিতে গিয়া অন্য কোন বিষয়ে উন্নতি করিতে না পারিলেও নেশায় উন্নতি করিয়াছে। আগে বিড়ি-সিগারেট খাইত, আজকাল মদ খাইতে শিখিয়াছে। অবশ্য সব দিন নয়; বংশীধর আসিলে তাহার সঙ্গে খায়। তাহার নিজের পয়সা খরচ হয় না, কিন্তু বৌ তাহা শুনে না। ঝগড়া করে, গড়ায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে কান্নাকাটি করে।

গ্রাম হইতে মাইল তিন দূরে কাজ। সেখানেই তাঁবু পড়িয়াছে। দুই জন কর্মচারী থাকে সেখানে। অন্নদা বাড়ী হইতে আনা-গোনা করে। সকালে আলু-ভাতে ভাত খাইয়া রওনা হয়, সারা দিন সেখানে থাকে। সন্ধ্যার পরেই বাড়ী আসা উচিত, কিন্তু আসে রাত্রি এগারোটায়, কোন কোন দিন বারটা-একটা হইয়া যায়। এত রাত পর্য্যন্ত সেখানে থাকার কি দরকার—বৌ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সহরে থাকিতেও বাড়ী ফিরিতে দেরী হইত অন্নদার। কিন্তু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজে ইহা অনিবার্য্য বুঝিয়া আপত্তি করিত না। তা'ছাড়া, বাড়ীতে বেশী লোক-জন থাকিত—তাহার ভয়ও করিত না। কিন্তু এখানে একলা থাকিতে তাহার ভয় করে। বুড়ি ঝিটা সন্ধ্যার পর হইতে পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমায়। ঘরের ভিতরে একলাটি লণ্ঠন জ্বালিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ঘুম পাইলেও ঘুমায় না। পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পরেই সকলে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়ে। রাত্রি ন'টা হইতে না হইতেই সারা পাড়াটা নিঃঝুম হইয়া যায়। চারি দিকে স্তব্ধতা থম-থম করিতে থাকে। রাত্রি গভীর হইতে থাকে। খিড়কীর পুকুরের ধারে তেঁতুল গাছে পেঁচারা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠে, হাওয়ায় তাল গাছের পাতাগুলা খড়-খড় শব্দ করে, গ্রাম-প্রান্তে শৃগালেরা ডাকিয়া উঠে, প্রাচীন বাড়ীটার এখানে-সেখানে নানা রকমের শব্দ উঠিতে থাকে। একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বৌ কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। কখনও মনে হয়—এই বাড়ীটা কত দিন ধরিয়া কত জনের দুঃখ-সুখ, ব্যথা-আনন্দ, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যু, উৎসবের উল্লাস ও শোকের আর্ত্তনাদ চোখ মেলিয়া দেখিয়াছে; এখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত জড়-সড় হইয়া বসিয়া ঘোলাটে চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে; এখানে-ওখানে তাহারই আন্দোলিত বক্ষের পঞ্জরাস্থির শব্দ। কখনও শ্বশুর শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে; তাঁহাদের মৃত্যুর দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে; দুই দিন ধরিয়া একটানা গোঙাইয়াছিলেন তাহার শ্বশুর, সেই শব্দ যেন স্পষ্ট শুনা যায়; মৃত্যুর পরে শাশুড়ীর মুখের বিশ্রী চেহারাটা অন্ধকারের যবনিকার উপরে ছবির মত ফুটিয়া উঠে। গা' ছম-ছম করিতে থাকে বৌএর, বুকের ভিতরটা ভয়ে হিম হইয়া আসে। স্বামীর উপরে রাগ হয়, রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কি কাজ? ঐ তো সামান্য টাকা! কোন মতে ডাল-ভাত খাওয়া চলে মাত্র। কাপড় ছিঁড়িয়াছে, কিনিবার পয়সা নাই। মাথায় তেল যে কত দিন পড়ে নাই—তার ঠিক নাই। যে চাকরীতে, ছেলে-মেয়ে নয়, মাত্র স্ত্রীর খাওয়া-পরা চালানো যায় না, সে চাকরীর জন্য প্রাণপাত করিয়া খাটিবার প্রয়োজন?

অন্নদা ফিরিয়া আসিয়া ডাকাডাকি করিলে রাগে-অভিমানে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে বৌ। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে; সাপিনীর মত গর্জ্জাইয়া বলে—পারব না এমন করে একা এত রাত পর্য্যন্ত বসে থাকতে—দিনের পর দিন; এত রাত কিসের জন্যে শুনি?

অন্নদা জবাব দেয়—কাজ না শেষ হ'লে আসব কি করে? হাজার লোকের হাজরী দেওয়া—

—এ রকম কাজ করতে হবে না।

—না করলে খাবে কি? এই জুটেছে কত ভাগ্যে।

—দু' বেলা দু' মুঠো ভাত—ভিক্ষে করলেও জুটবে।

—আমি মরে গেলে কোরো—অন্নদা জবাব দেয়।

ক্রন্দন-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠে বৌ—ও-সব অলক্ষুণে কথা বোলো না বলছি। স্বামী হয়ে ও-কথা বলতে লজ্জা করে না?

যে দিন অন্নদা মদ খাইয়া আসে, তাহার শ্লথ কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারে বৌ। গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে; রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে থাকে তার, মনে হয়—গলায় কলসী বাঁধিয়া খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া মরে, কিংবা নোড়া দিয়া মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলে। দরজায় বারংবার করাঘাত হইতে থাকে, ঘন ঘন কর্কশ কণ্ঠের ডাক আসে—বৌ—এ্যাই বৌ, দরজা খুলে দে;—মাঝে-মাঝে কুৎসিত গালাগালি। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে বৌ। টলিতে-টলিতে ঘরে ঢোকে অন্নদা। আর্ত্ত কণ্ঠে বৌ বলে—আবার ঐ বিষ খেয়েছ?

অন্নদা বেপরোয়া জবাব দেয়—বেশ করেছি। তোর বাপের পয়সায় তো খাইনি?

কটু কণ্ঠে বৌ বলে—নিজের বাপের পয়সায় তো খাওনি?

মার-মূর্ত্তি হইয়া অন্নদা বলিয়া উঠে—চুপ রও হারামজাদী! বাপ তুলেছিস তো জিব টেনে বার করে দেব।

ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠে বৌএর; তবু জবাব দিতে ছাড়ে না—করলেই হোলো। মগের মুলুক পেয়েছ না কি? ভাত-কাপড়ের ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই! ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।—কি বললি? বলিয়া একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়ে বৌএর উপর; চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বৌএর পিঠে গুম্-গুম্ করিয়া কিল মারিতে থাকে; আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে বৌ; নিশীথের জমাট স্তব্ধতা খান-খান হইয়া যায়।

দিনের পর দিন এই ব্যাপার চলিতে থাকে। প্রথম প্রথম পাড়ার লোকে বিরক্ত হইত, প্রতিবাদ করিত, মুরুব্বিরা অন্নদাকে শাসন করিত, উপদেশ দিত। পুকুরের ঘাটে—বৈকালিক আড্ডায় মেয়েদের মধ্যে আলোচনা হইত; ক্রমে ব্যাপারটা সকলের গা-সহা হইয়া উঠিল। কোন দিন না ঘটিলে সকলে বলিত—আজ যে ওদের কিছু হ'ল না বড়?

এক দিন স্ত্রীর সঙ্গে এই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কহিলাম—আগে ওদের কত ভাব ছিল; একেবারে গলায়-গলায়; হঠাৎ এত চটে গেল কি করে?

স্ত্রী পাড়ের সুতা দিয়া কাঁথায় ফুল তুলিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া কহিলেন—তুমি জানলে কি করে?

প্রশ্নটাকে পাশ কাটাইয়া কহিলাম—ছিল না?

স্ত্রী কহিলেন—ছিল বৈ কি! কাদেরই বা না থাকে, কাদেরই বা থাকে শেষ পর্য্যন্ত? পুরুষ মানুষদের ওই তো রীত!—বলিয়া বাঁকা হাসিয়া, আবার মুখ নামাইয়া সুচের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

কহিলাম—বড় লোক হতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেছে অন্নদা।

স্ত্রী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—ওর আর বিপদ কি? বিপদ বৌটার। ঐ এক ফোঁটা মেয়ের উপর কি যে ঝড় যাচ্ছে, ওই জানে!

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় না কি?

—হয়। যাই বিকেলে এক-আধ দিন। ভারী চাপা মেয়ে তো, কিছু ফুটতে চাইত না প্রথমে। এখন সব বলে। অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পড়েছে। জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান, যা ছিল সব গেছে; গা-ভর্ত্তি গয়না দিয়েছিল ওর বাবা, অন্নদাও গড়িয়ে দিয়েছিল ক'খান, একটিও নাই; বাড়ীতে লক্ষ্মী পাতবার মত ধান পর্য্যন্ত নাই। অন্নদা মাসে পঁচিশটি টাকা এনে দিয়ে খালাস। একবার জিজ্ঞেসও করে না চলবে কি না, উল্টে খাবার সময় তম্বি। ঐ বুড়ি ঝি'টাকে দিয়ে বৌ বাজার-হাট করায়; টাকার অভাব হলে ওকে দিয়েই জিনিস-পত্র বাঁধা দেওয়ায়, বিক্রী করায়। সিন্দুক-ভর্ত্তি বাসন ছিল, বাক্স-ভর্ত্তি ভাল-ভাল শাড়ী ছিল, সব গেছে একে একে। আমার কাছেই সে দিন বুড়ি ঝিটা একটা নাক-চাবি বাঁধা রেখে দু'টো টাকা চাইতে এসেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বৌএর কাছে গিয়ে বললাম—ওটা রাখ, আমি দিচ্ছি টাকা। কিছুতেই নেবে না। অনেক বুঝিয়ে রাজী করালাম। আত্ম-সম্মানী মেয়ে তো! মুখ বুজে উপোস করবে, তবু কারও কাছে কিছু সাহায্য নেবে না। না হ'লে বাবা তো এত বড়লোক, মেয়ে-অন্ত প্রাণ, তাঁকেও একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখে জানায় না কিছু। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—অন্নদাটা ভারী পাষাণ! সোণার প্রতিমার বৌ, কত হেনস্থা করছে। এই সময়ে কত যত্ন করা দরকার, কত সাবধানে রাখা দরকার। কত ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে হয় এখন মেয়েদের।

স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম।

স্ত্রী কহিলেন—ছেলে হবে তো! সাত মাস, শরীরে কিছুই নাই বৌটার; এমন ঢলঢলে চেহারা ছিল, শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। চলতে-ফিরতে কষ্ট হয় বেচারার। তার উপর স্বামীর ঐ অত্যাচার!

কহিলাম—ব'বা তো নিয়ে যেতে পারে?

স্ত্রী কহিলেন—যেতে চায় না যে! বাপের না কি অসুখ, বিছানায় পড়ে আছে। তা'ও চিঠি লিখছে বার বার। দু'বার লোকও পাঠিয়েছে—ফিরিয়ে দিয়েছে বৌ। আমিও সে দিন বুঝিয়ে বললাম বৌকে। বলল—ওর খাওয়ার কি হবে? কে রেঁধে দেবে দু' বেলা? তা'ছাড়া, আসল কথা কি জান, অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে যেতে লজ্জা করছে ওর। দেখ না, বাড়ী থেকে এক-পা বেরোয় না, কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—গোদের উপর আবার এক বিষ-ফোড়া! অন্নদার গুণের সীমা-পরিসীমা নাই কি না—

সোৎসুক কণ্ঠে কহিলাম—কি ব্যাপার?

—"তুমি আর কাউকে বোলো না যেন; কেউ জানে না; বুড়ি ঝিটা চুপি-চুপি বলে গেল সে দিন; অনেক করে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গেছে—বৌএর কাণে কথাটা যেন না যায়। গেলে বিষ খেয়ে মরবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম—কি?

—অন্নদা একটা বাউরী মেয়েকে রেখেছে; তার কাছেই রাত বারটা পর্য্যন্ত কাটায়। তাকে না কি দামী শাড়ী কিনে দিয়েছে।

কহিলাম—বুড়ি ঝি জানল কি করে?

—ওর নাতনীর কাছে। নাতনীটা আর সেই মেয়েটা দু'জনেই অন্নদাদের ওখানে কাজ করে। আর—নাতনীটাও ঐ ধরণের মেয়ে তো?

চুপ করিয়া রহিলাম। অন্নদার বৌকে কোন দিন ভাল করিয়া দেখি নাই। দোতলার ঘর হইতে মেয়েটির কর্ম্ম-নিরত মূর্ত্তি মাঝে-মাঝে চোখে পড়িয়াছে। অবগুণ্ঠন-মুক্ত মুখখানিও একবার চকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়া মনে হইয়াছে—দুর্দ্দিনের ঝড়ে লতার-মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার মত মেয়ে ও নয়। ও বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তবু মাথা নীচু করিয়া কাহারও কাছে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিবে না।

স্ত্রী বলিলেন—বৌকে এক দিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব ভাবছি। এমনই বাড়ীতে কিছু পাঠিয়ে দিলে তো নেবে না?

কহিলাম—বেশ তো। [ক্রমশঃ

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

১

ক্যালিফরনিয়া আমেরিকার নন্দন-কানন। নিউ ইয়র্কে যখন তাপমান যন্ত্রে পারা শূন্যের নীচে চুয়াল্ল ডিগ্রী নেমে আসে, তখন লস্‌এঞ্জেলের তাপমান যন্ত্রে আবহাওয়ার পরিমাপ আশী ডিগ্রি উপরে থাকে। নিউ ইয়র্কে যখন লোক গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন প্রশান্ত মহাসাগরের ঝড়ো হাওয়া এসে ক্যালিফরনিয়াকে শীতল করে দেয়। আমেরিকাবাসীর কাছে ক্যালিফরনিয়ার আদর সেই জন্তই।

এই নন্দন-কানন দেখার প্রবৃত্তি তখনও আমার জেগে ওঠেনি। ছিলাম চিকাগোতে, সে জন্ত চিকাগোর কথাই বারংবার ভাবছিলাম। চিকাগোর লোকের সংগে মেলামেশা করার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম। অনেকের সংগে পরিচিত হয়েছিলাম। অনেকে অনেক কিছু দেখাবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন মোহিত বাবু এসে বললেন, কালই রওয়ানা হতে হবে। মোহিত বাবুর কথা শুনে অবাক্ হলাম। প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। যেতে হবেই, সে জন্তে অসময়ে চিকাগো ছাড়বার জন্ত প্রস্তুত হলাম।

পরের দিন মোহিত বাবু আসলেন। গাড়ীতে গিয়ে বসা মাত্র পবন-বেগে গাড়ী ছেড়ে দিলে। চিকাগোর কথা ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়লাম। চিকাগো ছেড়ে আইওয়া (Iowa), নেবরাস্‌কা (Nebroaska), ওয়াওমিং (Wyoming) উতা (Utha), প্রদেশ অতিক্রম করে যখন আমরা নেভাদা প্রদেশে আসলাম তখনই মনের পরিবর্ত্তন হল। অবশ্য কি করে এত তাড়াতাড়ি মনের পরিবর্ত্তন হল তা মোহিত বাবুকে বললাম না। শুধু ঠিক করে নিলাম, ক্যালিফরনিয়াতে পৌঁছে আর কারো সংগে চলব না। আপন মনে দেখব এবং জানব।

নেভাদা প্রদেশের রেণো (Reno) সহরে পৌঁছার পরই মনে হল, আমরা ক্রমাগতই নামছি। রকি পর্বতের পিঠ যেন একটা খোলের মত সাগরের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দু'দিকের দৃশ্যাবলী সৌন্দর্য্যে ভরা। সেই দৃশ্য দেখতেই চলছিলাম। হঠাৎ মোহিত বাবু বললেন, এবার আমরা স্যানফ্রান্সিস্কো বে (Sunfranscisco Bay) কাছে এসে পৌঁছেছি। নয়ন ভরে এবার পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পোলটি দেখে নিন্। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের উপর দিয়ে সে পোল চলে গেছে। চোথ খুলেই রাখলাম, দেখলামও আনন্দের সহিত।

তার পরই চিন্তা হল, কোথায় গিয়ে উঠব। গত পনর দিন যাবৎ পথে শুয়েছি আর রেস্তোঁরায় খেয়েছি। এবার হাত-পা ছড়িয়ে মানুষের মত ঘুমুতে হবে। মানুষের মত যদি ঘুমাতে হয় তবে হোটেলে স্থান পেতে হবেই, কিন্তু আমার মত মানুষকে কোন্ হোটেলে স্থান দেবে? আমার শরীরের রং যে সাদা নয়, এই রকমের চিন্তায় যখন আমি মগ্ন ছিলাম, তখন মোহিত বাবু জোন্‌স ষ্ট্রীট এবং ওয়াশিংটন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে গাড়ী থামালেন। বুঝলাম, এখানেই আমাকে নামতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ী হতে নামতে হল। গাড়ী হতে নেমে সাইকেলটা খুললাম, পিঠ-ঝোলাটা নামালাম। তার পর আমেরিকান ধরণে মোহিত বাবুকে বিদায় দিয়ে একটা বাড়ীর দেওয়ালে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—এখন কোন দিকে যাই? শরীরে তখন তত শক্তি ছিল না যাতে পিঠ-ঝোলাটা সাইকেলের উপর রেখে উঁচু-নিচু পথ ধরে শহরের সর্বত্র থাকবার যায়গা খুঁজে বেড়াই।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দেখতে পেলাম, একটু দূরে আমারই মত অন্ত আর এক জন লোক দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশাই, বলতে পারেন এখানে কোথাও হোটেলে স্থান পাওয়া যাবে কি না?" লোকটি আমার দিকে একটু তাকালে, তার পর বললে, "চলুন হোটেলে নিয়ে যাই।" আমার সামনেই ছিল ইণ্টার ন্তাশনেল হোটেল। এখানে নিগ্রোরাও থাকতে পারে। সে কথা কিন্তু আমি জানতাম না। হোটেলের মালিক যদি এক জন ফ্রেন্‌চম্যান্, কর্মচারীগুলি কিন্তু সকলেই আমেরিকান্। সৌভাগ্যের বিষয়, হোটেলের মালিক উপস্থিত ছিলেন, আমার পরিচয় পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে এসে সাইকেলটা দেখলেন এবং এক জন পোর্টারের সাহায্যে সাইকেলখানা গুদামে রাখিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন আপনার রুমে চলুন।"

রুমটা দেখার জন্ত প্রাণটা আইঢাই করছিল। যখন আমরা রুমের দিকে যাচ্ছিলাম তখন কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কত দিন থাকবেন?" বললাম, "দুই সপ্তাহের মত থাকতে ইচ্ছা করি।" কর্ত্তা এতে আরও সুখী হলেন এবং ম্যানেজারের রুমে নিয়ে গিয়ে দুই সপ্তাহের ভাড়া বাবদ পাঁচ ডলার নিয়ে আমায় রুম দেখাতে চললেন। ভাবলাম, বাঁচা গেল। অন্তত দুই সপ্তাহ আরাম করে শোয়া যাবে। চিকাগো হতে চলার পর পথে কোথাও আরাম করে শুইবার স্থান মেলেনি। ভাল করে ঘুমাতে পারলে শরীর ভাল হবে এবং মনেও আনন্দ পাব।

রুমটি দেখে বড়ই আনন্দ হয়েছিল। নরম বিছানাতে শুলেই শরীরের অর্দ্ধেকটা বিছানার ভেতরে ডুবে যায়। এমন বিছানায় শুতেও আরাম, অথচ দৈনিক ভাড়া মাত্র পঁচিশ সেণ্ট। পঁচিশ সেণ্ট আমাদের এক টাকার মত। রুমের ভেতরেই শীতল জল এবং গরম জলের সুবন্দোবস্ত ছিল। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে এরূপ রুমের ভাড়া দৈনিক বত্রিশ টাকার কম হবে না!

রুমে বসে একটু বিশ্রাম করার পর স্নান করে নিলাম। তার পর নিকটস্থ একটা জাপানী হোটেলেতে গিয়ে মাছ-ভাত খেয়ে যখন তৃপ্ত হলাম তখন মনে হল, এখনও কাজের শেষ হয়নি। আমাকে প্রশান্ত মহাসাগরের জল স্পর্শ করে আসতে হবে। তবে হবে পৃথিবী ভ্রমণের শেষ। কথার সংগে সংগেই কাজের আরম্ভ। হাঁটতে হাঁটতে সাগরের দিকে রওয়ানা হলাম। বেশী দূর যেতে হল না। গোল্ডেন ব্রিজের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন ক'খানা ডিস্‌ট্রয়ার প্রবলবেগে স্যান্‌ফ্রানসিস্‌কোর মধ্যে প্রবেশ করছিল। দৃশ্যটা বেশ ভালই লাগছিল, তার পর সাগর জলে পা দু'খানা ডুবিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম—যা আমার দ্বারা সম্ভব হবে বলে কল্পনাও করতে পারিনি তা আজ সম্ভব হল। মনে হল, আমার মত লোকের দ্বারা যদি পৃথিবী প্রদক্ষিণ

করা সম্ভব হয় তবে আমার দেশ ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। তার পরই চিন্তাশক্তি যেন লুপ্ত পেতে লাগল। কতক্ষণ সমুদ্রতীরে বসে হোটেলে ফিরে এলাম। মন তখন একদম উদাসী। কাজ শেষ হয়ে গেলে এরূপ ভাবই হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। যখন উঠলাম তখন আবার নূতন কাজের তাগিদ এল। কি দেখতে হবে, কাদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে, তাই মনে মনে চিন্তা করছিলাম। শরীর তখনও অবসন্ন ছিল, সে জন্ত পাশের একটি আমেরিকান রেস্তোঁরায় রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত বসে থেকে রুমে এসে শুয়ে থাকলাম। এমন সময় দরজায় কে যেন টোকা দিল। সেদিন আমার পকেটে আমাদের দেশের অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা ছিল। দরজা না খুলেই আগন্তুক ব্যক্তিকে দাঁড়াতে বললাম। দাঁড়াতে বলার অর্থ হচ্ছে কাপড় বদলাবার সময় চাওয়া। আমেরিকান্ লোকটি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি ছিল। কাপড় পরাই ছিল, শুধু নোটগুলি লুকিয়ে রেখে দরজা খুলতে হবে। নোটগুলি ভাল করে লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিলাম।

সামনে এক জন আমেরিকান যুবক। তার পরিষ্কার জমকালো পোষাক। রুমাল হতে সেন্টের গন্ধ বের হয়ে আসছে। চুলগুলি পরিপাটিরূপে আঁচড়ানো। ঠোঁট দু'টো দেখলেই মনে হয়, তার শরীরে নরডিক্ রক্ত রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাই মশাই?" যুবকটি বললেন, "একটু বসতে চাই, তার পর কথা হবে।" তাকে বললাম, "তাতে দোষ কি, আসুন—বসুন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, একটি সিগারেটও দিতে পারব না। এই আজই সকালে এক ভদ্রলোক একটি ডলার দিয়েছিলেন। খাওয়া খেয়ে এবং ঘরের ভাড়া দিয়ে সিগারেট কেনার মত আর কিছুই নেই।" যুবক হেসে বললেন, "তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, ডাকাত নই, ভয় পাবেন না।" বললাম, "ভয় কিসের, যার কিছু নাই তার কোন ভয় নাই। বেঁচে থাকাটাই যা কষ্টকর। অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পিস্তল এবং একটি মাত্র বুলেটের পয়সাও হাতে নেই বলেই ত বেঁচে আছি।" যুবকটি আবার বললে, "পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক আছেন তিনি কাল সকালেই আপনার সংগে সাক্ষাৎ করবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আপনাকে কি প্রকারে সাহায্য করতে পারেন এখন তাই বলুন।" আমি দেখলাম, এই সুযোগ। ফস করে বলে ফেললাম "যদি কয়েক দিনের ভেতর আমার জন্ত একটি Light house keeping house বের করে দিতে পারেন তবেই বাধিত হব। লাইট হাউস-কিপিং হাউসের কথা পূর্বে অনেক বার—আজকের আমেরিকায় বলা হয়েছে, সে জন্ত, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না। যুবকটি বললেন "সেজন্তই ত এসেছিলাম, কাল বিকালেই তার বন্দোবস্ত হবে, তিনটার সময় আসব, আমার জন্ত অপেক্ষা করবেন।" এই বলেই যুবকটি বিদায় নিলেন।

এই যুবক কে? কি করে আমার আসার সংবাদ পেল? সে কি বৃটিশের গোয়েন্দা? এখানে একটা গদর পার্টি আছে, তাদের পেছনে বৃটিশ স্পাই লেগেই আছে। এ লোকটাও বোধ হয় তাই হবে, নতুবা গায়ে পড়ে এত সাহায্য করবার আগ্রহ কেন? যা হউক, আবার ভাল করে কাপড় পরে, হোটেলের ম্যানেজারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর কাছে কেউ আমার সংবাদ নিয়েছে কি না?

ম্যানেজার বললেন, "হাঁ, নিয়েছে। যে লোকটি আমার সংবাদ তার কাছ থেকে নিয়েছে সে এক জন ব্রোকার। কোনও বিদেশী যদি তাদের হোটেলে আসেন এবং সেই বিদেশী যদি লেক্চার দিতে সক্ষম হন, তবে তিনি লেক্চারের বন্দোবস্ত করেন এবং তা থেকেই দু'পয়সা রোজগার করেন। ইনি রোজই হোটেলে এসে নবাগত জনসমাগমনের সংবাদ নিয়ে যান।"

কথাটা শুনে মনের আতঙ্ক দূর হল, ফের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকাল বেলা ব্রোকার মহাশয় আসলেন এবং আমার সংগে নানা বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ব্রোকারের কথায় ধাঁচ বুঝেই মনে হল, লোকটি অনেক সংবাদ রাখে। অবশেষে ব্যবসায়ের কথায় আসবার পর ব্রোকার আমাকে কোনও সংবাদপত্র অফিসে যেতে নিষেধ করলেন। আমিও তার কথা মেনে লই। সেদিনই বিকাল বেলা তিনখানা সংবাদপত্র অফিসের রিপোর্টার আমার ভ্রমণের একটা চুম্বক কাহিনী লিখে নেবার জন্ত আসেন এবং প্রত্যেকে চল্লিশ ডলার করে আমায় দিয়ে যান। টাকাটা পেয়ে মোটেই সুখী হলাম না, কারণ এত টাকা নিয়ে কি করব, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। অন্তরে যখন অন্ত কিছুর ভয় থাকে তখন টাকার দিকে মোটেই দৃষ্টি থাকে না। ভয় আমার যথেষ্টই ছিল। সেই ভয়গুলার স্বরূপ ক্রমেই বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাবে।

ব্রোকার চলে যাবার পর পাশের ঘরের ভদ্রলোক এসে আবার দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দেখি, তিনি এক জন নিগ্রো। নিগ্রো ভদ্রলোক নিজেই তার পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি এখানকার নাবিক-সভার এক জন সভ্য এবং আমার কথা হোটেল-ম্যানেজারের কাছ থেকে শুনতে পেয়ে সুখী হয়েছেন। তিনি এই হোটেলের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যখনই দরকার হবে তখনই তিনি আমাকে সকল রকমে সাহায্য করবেন। বিদায়ের সময় তিনি তার নাম বলে গেলেন, "পল জ্যানী"। ভবিষ্যতে তাকে জ্যানী বলেই বলা হবে।

তখন বেলা হয়েছিল। রুমে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। হোটেল থেকে বের হয়ে শহরের মেইন রাস্তা মারকেট ষ্ট্রীটে এসে পড়লাম। পথের দু'দিকে বড় বড় অট্টালিকা। তাই দেখতে দেখতে ওয়াই, এম, সি, এ'র দিকে অগ্রসর হলাম। পথ চলতে বেশ আরাম বোধ করছিলাম। অবশেষে যখন পথের শেষ ভাগে এসে পড়লাম, তখন দেখলাম আমার ডান দিকে মস্ত বড় একটা অট্টালিকা, আর বাঁ'দিকে সাগর-তীর ধরে একটা রাস্তা। রাস্তাটা নীরব এবং তার দু'দিকে বিয়ার এবং কাফির দোকান।

পথে দেখা হল এক জন নাবিকের সংগে। লোকটা ছিল মাতাল। আমাকে দেখা মাত্র হাত পেতে বসল। তাকে কিছু দিতে হবেই। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে হাওয়ার্ড ষ্ট্রীটেই মদের বেচা কেনা বেশী হয়। হাওয়ার্ড ষ্ট্রীটের সংগে আমার বেশ পরিচয় হয়। কিন্তু তখন মন ছিল চঞ্চল। তৎক্ষণাৎ হাওয়ার্ড ষ্ট্রীটের দিকে চললাম। ষ্ট্রীটটা দেখতেই হবে। হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা হেঁটে গিয়ে হাওয়ার্ড ষ্ট্রীটে পৌঁছলাম। দুদিকে মদের দোকান। দোকানে লোক ভিড় করে বসেছিল। তাইই একটি দোকান আমাকে বেশ আকর্ষণ করছিল। এক জন বাংগালী ভদ্রলোক সেখানে সন্ন্যাসী বেশে গাইছিলেন—"বাছু কহে

রাই।" অন্য এক জন বাংগালী হারমনিয়াম বাজাচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, বাংগালী ভদ্রলোককে কেউ কিছু দিচ্ছে না। অথচ তিনি আপ্রাণ গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে সেখানে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হ'ল না। হোটেলে ফিরে এসে সেদিনই সেই মদের দোকানে অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম, দু'ঘণ্টা গান করে বাংগালী ভদ্রলোক দশ ডলার পেয়েছিলেন। হায় রে সন্ন্যাসি! তোমার কাছে ধর্মের স্থান নেই। তিনি ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার এক জন মুসলমান, অথচ তার কীর্তন গাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব হবেন।

দ্বিপ্রহরে জ্ঞানীর সংগে দেখা হয়। তিনি বললেন, যদি আমি নিগ্রো গীর্জাগুলিতে গিয়ে আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্বন্ধে লেকচার দেই, তবে এক দিকে যেমন অর্থাগম হবে অন্য দিকে তেমনি জ্ঞানার্জনও হবে। জ্ঞানীকে জানিয়ে দিলাম, দু'সপ্তাহ কিছুই করব না। তার পর যদি মন সুস্থ থাকে তবে হয়ত তার প্রস্তাব মতে কাজ করতে রাজি হব। এর পর থেকেই জ্ঞানী আমার সংগ পরিত্যাগ করেন এবং যে লোকটি আমাকে হোটেলের সন্ধান দেন, তিনি এসে আমার সংগ গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হল আর্থার। আমিও তাকে আর্থার বলেই ডাকতাম। আর্থারকে নিয়েই বেড়াতে বাহির হতাম এবং এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে সময় কাটাতাম।

এক দিন আমরা একটা পার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করতে বসি। দেখতে পাই, অনেকগুলি লোক—কেউ বা চেয়ারে বসে আছে আর কেউ বা ঘাসের উপর শুয়ে আছে। কেহই কিন্তু উচ্চস্বরে কথা বলছিল না। এতগুলি লোক যদি আমাদের দেশে কোন পার্কে বসে বিশ্রাম করত তবে হট্টগোল ত হতই, উপরন্তু মারামারি, কাটাকাটি যে হত না তা'ও বলার উপায় নেই। এদের নীরবতা এবং একে অন্যে সদ্ভাবের সহিত কথা বলতে দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম এবং আর্থারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এরা কি সবাই বেকার?" আর্থার বলেছিলেন "হাঁ, প্রায় সবাই বেকার কিন্তু সপ্তাহের মধ্যেই এরা কাজ পেয়ে যাবে। যুদ্ধের কাজের জন্য লোকের দরকার হয়ে পড়েছে, সে জন্য এই বেকারদের কপাল খুলবে। ফিনদের সংগে তখন সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধ চলছিল। আমেরিকান্ সংবাদপত্রগুলি তখন ফিনদের পক্ষ নিয়ে এমন প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করেছিল যে অনেকেই ভাবছিল, হয়ত ফিনরা রুশিয়া জয় করে নেবে। আমিও দিনের মধ্যে অন্তত পক্ষে দশখানা সংবাদপত্র কিনে "ফিন-রুশ" যুদ্ধের সংবাদ বুঝবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। আর্থারের সংগ লাভ করার পর এক দিন এক জন সত্তর বৎসর বয়সের গ্রীক্ ভদ্রলোকের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এবং আর্থার নিজেই গ্রীক ভদ্রলোককে "ফিন্-রুশ" যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

গ্রীক ভদ্রলোক বললেন, সংবাদপত্রের কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না। এখন রুশ-ফিন্ যুদ্ধ মোটেই হতে পারে না। বরফ জমে যাক তার পর হবে যুদ্ধের আরম্ভ। তখন বুঝবেন কে হারছে, আর কে জয়ী হচ্ছে! আমেরিকার সংবাদপত্রসেবীরা এরূপ ভাবেই কথার মালা গেঁথে অপরের গলায় দিয়ে সুখী হয়, কিন্তু তারা জানে না, এতে দেশের কত ক্ষতি হয়।

[ক্রমশঃ

টুকরি

শ্রীবাণীপ্রসাদ মজুমদার

কোথায় জানি না

তুমি চেয়েছিলে কিন্তু
আমি পারিনি দিতে
আজ তাই ধরেছি হাল
নদীর শেষে সাগরের শেষে
চলে যাব, কোথায় জানি না।

সৃষ্টি

পুরানো বাড়ির দেওয়াল
কি যেন সে করেছে রচনা
তার ফাটা-ফাটা চটা-ওঠা গায়ে
হিজিবিজি লেখা,
জীবন ও মৃত্যুর নিঃশব্দ
আনাগোনা।

দুপুরে

সিঁড়ির ধাপে-ধাপে উঠা-নামা রোদ্দুর
তার আপিস যাওয়ার পথে
চেয়ে-থাকা ছোট্ট দু'টো চোখ ঘোমটার ফাঁকে
কল থেকে অবিরত ঝরে যাওয়া জল ঝির-ঝির শব্দে।

দুপুরের গান

ঘন দুপুর রোদ্দুরে
রিক্সার ঠুন্-ঠুন শব্দ
ছেলেদের ঘুম-পাড়ানি
গানের মত আমেজ লাগায়
মালতী-ঝোঁপের ফাঁকে ফাঁকে
চড়ুই পাখী তার উড়ন্ত ডানার
শিহরণ দিয়ে যায়।

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্যাটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু নাম-করা এক দল সমালোচক যখন সাহিত্যিক ছুৎমার্গের আমদানী করে বলেন, সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্য-চর্চ্চা ছেড়ে, পলিটিক্সের আলোচনা মস্ত বড় অপরাধ, তখন বুঝতে পারি, সমস্যা পুরোনো হলেও, এ নিয়ে আলোচনার সময় ফুরোয়নি,—আলোচনা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না। বস্তুত পক্ষে এক সময় শিল্প ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে তর্কের যে ঝড় উঠেছিল, আজকের এই সাহিত্য ও পলিটিক্সের সম্বন্ধ নির্ণয়টা তারই রকম-ফের মাত্র। সেদিনের এক শ্রেণীর 'রসিক' ব্যক্তি আওয়াজ তুলেছিলেন —art for arts sake—শিল্পের জন্যই শিল্প—তার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই—থাকতে পারে না। আজ অবশ্য জিগিরটা বড়ই অচল হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা রবটাকে কিঞ্চিৎ 'মডার্ণাইজ' করে বলছেন, সাহিত্যের মধ্যে পলিটিক্সের ছোঁয়াচ লাগলে তার জাতচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। এই ধারণাটাকেই কিঞ্চিৎ উগ্র আকারে ব্যক্ত করতে গিয়ে কিছু দিন আগে শ্রীবুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করেছিলেন—বাঙলা সাহিত্যের বৃহৎ দুর্ভাগ্য আজ এইটেই যে এর অনেকটা অংশই হয়ে উঠেছে বিভিন্ন শিবিরবাসী সৈনিকদের কুচকাওয়াজ মাত্র। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থকদেরই বুদ্ধদেব বাবু শিবিরবাসী বলে কল্পনা করেছেন এবং এর ফলে তিনি কেবল প্রতিভার অপমৃত্যু, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অধোগতি ভিন্ন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

সমস্যাটা আসলে কি?

কিন্তু এই অতি-আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য হা-হুতাশ, সমাজ-চেতনার বিরুদ্ধে জেহাদ—এর সঙ্গে সত্যই কি সাহিত্য-চর্চ্চার সম্পর্ক একেবারে অবিচ্ছেদ্য? বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই কি রাজনীতির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছে চিরকাল? তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার; কারণ pure artএর বাতিকগ্রস্ত দল বলে বসতে পারেন—সমাজ সচেতন হলেই যে সাহিত্যকে রাজনীতি নিয়ে মাথা-ব্যথা করতে হবে তার কি কোন মানে আছে? উত্তরে এই কথাই বলা চলে যে, রাজনীতি সমাজ-নীতিরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—রাজনীতি-চেতনা সমাজ-চেতনারই উচ্চ স্তর মাত্র। মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ যে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চলে না তা নয়—সাধারণ সময়ে দৃশ্যতঃ তা-ই চলে। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির পথে এক এক সময় আসে যখন রাজনীতি আর সামাজিক কার্য্য-কলাপ একেবারে হয়ে পড়ে অবিভাজ্য। বাঙলা দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে সেই কালই চলেছে;—জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই—যেখানে রাজনীতির ছোঁয়াচ সরাসরি বা বাঁকা পথে এসে লাগেনি। এই অবস্থায় রাজনীতিকে জোর করে দূরে ঠেলে রেখে সমাজ-চেতনার বড়াই করা চলে না;—সাহিত্য থেকে রাজনীতিকে বিসর্জ্জন দেওয়া সাহিত্যক্ষেত্রে "ইকনমিজম্" আমদানীর চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়!

প্রশ্নটা তাহলে এই রাজনীতির বিরুদ্ধে এত আক্ষেপের কারণ আসলেই কতটুকু? ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে বিচার করলে এই তথাকথিত রাজনীতি-বিমুখতার কারণ সত্যই খুঁজে পাওয়া কিঞ্চিৎ বিশেষ করে রাজনীতিকেও বাদ দিয়ে জাত বাচাবার চেষ্টা কল্যাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ"; রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"; শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"; গোর্কির "মাদার"; টলষ্টয়ের "ওয়ার এণ্ড পিস"; শোলোকভের "ডন নদীর গভিপথে"; "ভার্জিন সয়েল আপটার্ণ্ড"; রেমার্কের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট", "রোড ব্যাক;" আপ্টন সিন ক্লেয়ারের "বোষ্টন", "ওয়ার্লডস এণ্ড" সিরিজ কি সাহিত্য হিসাবেও সার্থক হয়ে ওঠেনি? অথচ এইগুলির মধ্যে রাজনীতির ছোঁয়াচ এত প্রবল যে সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে তত রাজনীতি-সচেতন সাহিত্য খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের এই সব দিক্পালেরা যদি রাজনীতিকে সাহিত্য থেকে দূরে রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না থাকেন, তবে আজই বা সে প্রয়োজন নিয়ে জোর করে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে কেন? জানি, যে সব গ্রন্থের নাম করেছি তার মধ্যে কয়েকটিকে, বিশেষ করে—"চার অধ্যায়", "আনন্দ মঠকে" সাহিত্য ও পলিটিক্সের যোগসূত্রের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করতে অনেকেই চাইবেন না। তাঁরা একটা বিরাট বিজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞার হাসি হেসে বলবেন, ওগুলো আসলে উপন্যাস মাত্র—রাজনীতিটা তার লক্ষ্য নয়। কিন্তু এ হল আত্ম-প্রতারণারই নামান্তর; এক রাশি প্রমাণের সামনে আলোচনার খেই হারিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা।

প্রকৃত পক্ষে, মহাভারত-রামায়ণের কাল থেকে সুরু করে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র এবং তৎপরবর্ত্তী কাল অবধি বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাব, সত্যকার সাহিত্য-পদবাচ্য হওয়ার সঙ্গে রাজনীতি-বিমুখতার কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। অবশ্য কতটা কাব্য-রসের সঙ্গে রাজনীতির খাদ মিশিয়ে খাঁটি সাহিত্যিক সোণা পাওয়া যাবে সেটা হল অন্য প্রশ্ন। এবং সে বিষয় আলোচনা-মতান্তরেরও স্থান আছে। এ ছাড়া রাজনীতিটা সোজাসুজি সাহিত্যের আঙিনায় আসর জমাবে কিংবা কিঞ্চিৎ পালিস করে তাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হবে তা নিয়ে গবেষণাও চলতে পারে। কিন্তু মূল সমস্যা নিয়ে মতভেদের কোন অবকাশ তাতে থাকে না।

রাজনীতি-বিমুখতার হেতু

কিন্তু এ কথা স্বীকার করার পরও জিজ্ঞাস্য থেকে যায়: "তবে নাম-করা সাহিত্যকেরা এত জোর-গলায় আজ রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার পরামর্শ দিচ্ছেন কেন? আসলে এর মূলে কি আছে লুকোনো অজ্ঞতা?" কথাটা ভেবে দেখবার মত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমেই বলা ভাল, এই প্রতিবাদকারীদের পাণ্ডিত্যের অভাবকে এর জন্য দায়ী করার মত হাস্যকর কিছুই থাকতে পারে না। আজ যাঁরা সাহিত্য ও রাজনীতির মধ্যে একটা 'চীনের মহাপ্রাচীর' তোলার সব চেয়ে বড় প্রচারক, তাঁরা অজ্ঞ তো ননই, বরং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের পাণ্ডিত্য সত্যই অনস্বীকার্য্য। সুতরাং সমস্যার সমাধান এত সহজে হবার আশা নেই; এর জন্যে আমাদের আরো গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতে হবে।

আসলে রাজনীতির সাহিত্যে প্রবেশের বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিকবৃন্দের জেহাদ প্রথমে দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়ুরোপে;—তার পর আমাদের দেশেও সে ঢেউ এসে লেগেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক দুর্নীতি, নীচতা, ক্রূরতা সব কিছুই বীভৎস ভাবে

আত্মপ্রকাশ করেছিল। এত দিন ধরে যে ধ্যান-ধারণা সাহিত্যিকেরা লালন-পালন করে এসেছিলেন, যুদ্ধের মধ্যে সে সব ধারণা নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কেউ কেউ এই অবস্থায় দেখলেন সভ্যতার অপমৃত্যু, কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন The Decline of the West. প্রকৃত পক্ষে যা ঘটল, তা কিন্তু সভ্যতার অপমৃত্যু নয়—ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মৃত্যুর সূত্রপাত। সভ্যতার মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শোভন ও মানবের মঙ্গলকর, তারই ধারক ও বাহকরূপে ঠিক একই সময়ে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে নিপীড়িত মানুষের জয়যাত্রা যে সুরু হয়ে গেছে—এই বৃহত্তর সত্য বুর্জোয়া লেখকদের চোখে পড়ল না। ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙনকেই তাঁরা সমগ্র সভ্য সমাজের মৃত্যুর সঙ্গে এক করে ফেললেন।

ফল হল এই যে, এদের মধ্যে এক দল সর্ব প্রথম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চায় মন দিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা যাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ ভুল তাঁরা যে করেননি বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রলাঁই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাহিত্যের আসরে এক হিসেবে সাহিত্যিক মাত্রেই শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কারণ তাঁরাই হলেন সংস্কৃতির সংগঠক ও উৎপাদক—কিন্তু প্রকাশের যন্ত্রের উপর তাঁদের কোন কর্তৃত্ব নেই। পুঁজিবাদীরা এ ক্ষেত্রেও মালিক—সংস্কৃতির উৎপাদনের ব্যাপারে তারা কোন অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু তা সত্বেও মধ্যবিত্ত সুলভ সংস্কারের টানে অনেক সাহিত্যিকই নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন বাহন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মবোধ স্থাপন করতে পারেননি। রাজনীতি এবং সমাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবার এই ছিল একমাত্র পথ;—এ পথ পরিত্যাগ করার দরুণ তাঁদের সাহিত্যের আসর থেকেও রাজনীতি বহিষ্কৃত হল চিরদিনের মত।

এ দেশের সাহিত্যে

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে এ দেশে আধুনিক সাহিত্যে যে রাজনীতি-বিমুখতা দেখা গিয়েছে, তার মূল কারণ অবশ্য ইয়ুরোপের সঙ্গে একই অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার অবসান। তবে অনেকে অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই ঝোঁককে বিদেশের নিছক অনুকরণ বলে যে ধারণা করেছেন তা ঠিক বলে মনে হয় না। এ দেশে সাহিত্যের এই ঝোঁকের একটা বিশেষ হেতু ছিল। অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা বস্তুত পক্ষে সাহিত্যিকদের রাজনীতি-বিমুখতার ইন্ধন যুগিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন গোড়ার দিকে দেশে একটা আশার জোয়ার বইয়েছিল—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করেছিলেন, বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার পক্ষের এই আন্দোলনই যথেষ্ট। ভারতীয় সমাজের উপরতলা যে এক দফা আপোষ-রফার জন্যই এই চাল চেলেছিলেন, এ সত্য তখনো মধ্যবিত্তের চোখে পড়েনি। ফলে আন্দোলন যখন অবশ্যম্ভাবিরূপে ব্যর্থ হল, তখন দেশের সর্বত্র দেখা দিল একটা হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব। কিছু আর হবে না—এই ভাবটাই হল প্রবল। মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকেরাও এই নৈরাশ্য ও রাজনীতি-বৈরাগ্যের সঙ্গে তাল রেখে চললেন। কি বিশেষ কারণে আন্দোলন এ রকম মাঝ-পথে ভেঙে পড়ল সে দিকে নজর-দেবার ফুরসৎ তাঁদেরছিল না।

তবু তখনো সেটা ছিল অঙ্কুর—আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সেই অঙ্কুরই পরিণত হল মহীরুহে। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমশঃ যে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এ সত্য স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া হল। কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে তখন রাজনৈতিক অগ্রগমন আর লাভের ব্যবসা নয়। সাহিত্যিকেরা অতঃপর মনোযোগ দিলেন ফ্রয়েডিয় মনঃসমীক্ষণ, আর যৌনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণে। তাঁদের বক্তব্যের মূল কথাই হল সাহিত্যের জন্য সাহিত্য;—রাজনীতির কথা উঠলেই পিঠ-চাপড়ানো মৃদু হাস্যে তাঁরা বোঝাতে চাইতেন, ও সব তুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারের মালিন্যের স্পর্শে সাহিত্য সরস্বতীকে তাঁরা কলঙ্কিত করতে চান না। "প্রচার সাহিত্যের" প্রতি তাঁদের সে কি গভীর অভক্তি!

সাহিত্যের আসরে জনগণ

অথচ যত দিন বুর্জোয়া শ্রেণী প্রগতিশীল ছিল, যত দিন তাদের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল প্রধান কাজ, তত দিন মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকদের দিক থেকে এ অভক্তি প্রকাশ পায়নি। সাহিত্যকে কি রকম মারাত্মক নিপুণতার সঙ্গে শ্রেণি-শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, নবজাত বুর্জোয়াদের মুখপাত্র হিসাবে সার্ভেন্টিস তাঁর "ডন কুইক্সোট" গ্রন্থে দেখিয়ে গেছেন। প্রাচীন সামন্ত নাইটদের বিরুদ্ধে এ এক অনবদ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু আজকে বিশ্বের প্রধান প্রধান রঙ্গমঞ্চে সেই বুর্জোয়া শ্রেণীই দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। সামন্ততন্ত্রকে এক সময় তারা যে কশাঘাত করেছিল আজ সেটা তাদেরই প্রাপ্য। বিশ্বের জনগণ আজ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ-দাবী নিয়ে। এই জিনিষটাই আজ বুর্জোয়া সাহিত্যিক philistineদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তাঁরা তাই রব তুলেছেন,—খবরদার, সাহিত্যের পবিত্রতা যেন ক্ষুণ্ণ করা না হয়। অর্থাৎ হে জনগণ, এত দিন যখন সাহিত্যের আসরে আমরাই ছিলাম একচ্ছত্র অধিপতি, তখন যা করেছি, করেছি; কিন্তু তোমরা খুব সাবধান! সাহিত্যের মধ্যে যদি রাজনীতি ঢোকাও—অর্থাৎ কি না এই পুঁজিবাদী সমাজের নির্লজ্জ শোষণ-শাসন, অত্যাচার-নিপীড়ন, জোচ্চুরি-ধাপ্পাবাজীর স্বরূপ ফাঁস করে দাও তো আমরা সাহিত্যের ধ্বজাধারীরা ফতোয়া জারী করব—এ সাহিত্য—সাহিত্যই নয়।

কিন্তু এ ধরণের রাজনীতি-নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে সাহিত্য-চর্চা চালানো যে বেশী দিন সম্ভব নয়, ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের ফলে সেটা বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল। নয়া বর্বর এই প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না—সরাসরি নাম-করা সাহিত্যিকদের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির উপর তারা হানল একটার পর একটা আঘাত। মানব-সংস্কৃতি ধ্বংস করে, মানুষকে আবার পশুদের স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে ফ্যাশিজমের বনিয়াদ পাকা হবার আশা ছিল না। খাস সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণ থেকে বোঝা গেল—নিরপেক্ষতার নামে বসে থাকলে আর যা চলুক, সাহিত্য ও শিল্পকলা-চর্চা চলতে পারে না। কারণ, ফ্যাশিষ্ট আক্রমণে সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্নই যদি মুছে যায়, তবে সাহিত্য-চর্চার স্থান হবে কোথায়? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা

সমস্যা দেখা দিল। ইতিমধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙন আরো পাকা হয়েছে—বুর্জোয়া সাহিত্য আর শিল্প-কলারও বন্ধ্যাত্ব সুপরিস্ফুট হয়েছে। এদিকে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা চলেছে অপ্রতিহত বেগে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযানে প্রধান শক্তি তাই হল সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক এবং মতবাদের অভিযানেও যাঁরা অগ্রসর হবেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সাহচর্য্য অপরিহার্য্য। যাঁরা এত দিন ধনতন্ত্রের বীভৎস তাণ্ডবে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন অথচ মতবাদের সুস্পষ্টতার অভাবে পথ খুঁজে না পেয়ে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে "হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুর" অবস্থায় ছিলেন, তাঁদের অনেকে নিজেদের ভুল বুঝে এগিয়ে এলেন নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির ভূমিকা রচনা করতে। স্পেনের রণক্ষেত্রে, ইউরোপের মুক্তি-সেনাদের মধ্যে, চীনের মুক্ত অঞ্চলে কত সাহিত্যিক যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য সকলেই যে এই গৌরবময় পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তা নয়। আলডুস হাক্সলির মত কেউ কেউ বাস্তব প্রয়োজন এবং সযত্নরক্ষিত ধারণার সংযোগ স্থাপন করতে না পেরে, প্রায় সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে এক প্রকার সরেই দাঁড়াইলেন। হাক্সলি এখন তান্ত্রিক দর্শন এবং মেক্সিকোর প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রেমেই মশগুল। ইয়ুরোপীয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সৃজনী-শক্তির এমন দৈন্য আর দেখা যায়নি আগে। কিন্তু এই সব নয়। যাঁরা সাহিত্যিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নামে খুবই হৈ-হল্লা করতেন, তাঁদের কেউ কেউ হয় সোজাসুজি ফ্যাসিষ্ট হলেন (যেমন নুট হামসুন) কিংবা সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্য্যের হলেন অগ্রদূত (যেমন আর্থার কোয়েষ্টলার)।

প্রতিক্রিয়াশীলদের অস্ত্র

সুতরাং এই সব কঠোর অভিজ্ঞতার পরও যাঁরা আজ সাহিত্য থেকে পলিটিক্সকে দূরে জোর করে রাখার নামে প্রচারকার্য্য চালান, তাঁদের শুধু অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না—তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয়। একটা উদাহরণ দিলেই বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে মনে করি। বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাঙলা দেশের এক জন মুখপাত্র তাঁদের পত্রিকায় সম্প্রতি লিখেছেন—"বঙ্গদর্শন মুখ্যত: সাহিত্য ও সংচিন্তার চর্চ্চা করে, পলিটিক্সের সঙ্গে তাহার দূরতম সম্পর্কও নাই। তথাপি আমরা যে পলিটিক্স না হউক—তৎসম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করি, তাহা কেবল নিতান্তই প্রাণের তাড়নায়"—(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত—'বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১৩৫৪)। এ স্বীকারোক্তি সত্যই মূল্যবান। Pure artএর এক জন মুখপাত্র বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, আজকের সঙ্কটপূর্ণ জীবন-সংগ্রামের দিনে রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে চলবার কোন উপায় নেই। কিন্তু মজার এইখানেই শেষ নয়। নিজেরা সাহিত্যের আসরে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি চালালেও অপরে প্রগতির সহায়তার কাজে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে এঁদের আপত্তির আর শেষ নেই। বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সুযোগে কায়েমী স্বার্থ যখন সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিল, যখন তাদের আঘাতে বাঙলার সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প সবই ধ্বংস হতে বসেছিল, তখন এক দল সাহিত্যিক নীরবে জাতির এই আত্মহত্যা দেখতে রাজী হননি। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ চেষ্টা করায় ঐ একই সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে—"বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বুঝি একটা বিরাট দল গঠিত হইয়াছে? বাঙলা সাহিত্যিকের কি গৌরবকর ব্রত। সাহিত্যও একণে রীতিমত পলিটিক্স হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—('বঙ্গদর্শন'—ঐ—পৃ: ১১৫)। সত্যই তো! Pure artএর প্রচারকেরা দরকার মত তাঁদের থিওরী শিকেয় তুলে রেখে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি চর্চ্চা করবেন। তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাই বলে, প্রগতিশীল উদ্দেশ্যে সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয় কোন সাহসে?

কিন্তু এই পণ্ডিতী-ক্রোধের মধ্যে দিয়ে যে সত্য ফাঁস হয়ে গেছে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তা আর ঢাকবার উপায় নেই। যাঁরা সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে অচলায়তন তোলার কথা তারস্বরে প্রচার করেন, তাঁরা নিজেরাই এই প্রচারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী সচেতন। এই নীতি নিজেরা তাঁরা তাই মানেন না—নিজেরা কায়েমী স্বার্থের সেবায় রাজনীতিকে সাহিত্যে ব্যবহারে কিছুমাত্র কার্পণ্যও করেন না। আপত্তিটা প্রকৃত পক্ষে এঁদের রাজনীতি আমদানীর বিরুদ্ধে নয়—জনগণের স্বার্থে রাজনীতি আমদানীতে। তাই শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই উপসংহারেই আসতে বাধ্য যে, পলিটিক্সও সাহিত্যের মধ্যে একটা মূলতঃ 'অহি-নকুলের' সম্পর্ক মোটেই নেই। Pure artএর জয়ধ্বনি—প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শেষ অস্ত্র।

গুপ্ত-কবির কদলী-কবিতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন নতুন বাংলার প্রথম কবি। পুরাতন বাংলার কোন কবির কাব্যেই স্বদেশ-প্রেমের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জন্মভূমিকে মা ব'লে ডাকতে পেরেছিলেন সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রই। সেই জন্যেই তাঁকে নতুন বাংলার প্রথম কবি ব'লে ডাকতে পারি।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১

"জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি।"

২

"ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়।"

৩

"জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে,
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে।"

৪

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি,
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে?"

বহু-ব্যবহারের ফলে এ-সব ভাব ও কথা আজকাল এত সাধারণ হয়ে পড়েছে যে, আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলবার ক্ষমতা হয়তো আর ওদের নেই। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে ঐ সব ভাব এবং "জননী জনমভূমি" ও "জননী ভারতভূমি" প্রভৃতি কথা যে বাঙালীদের মনে কতখানি অপ্রত্যাশিত বিস্ময় জাগিয়ে তুলত সেটুকু কল্পনা করা কঠিন নয়।

তবে নীচের এই কয়েকটি পংক্তি লিখতে পারলে এ কালেরও যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবি গৌরব অনুভব করতেন :

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,

ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য সমালোচনা করতে ব'সে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "দেশবাৎসল্য! বাৎসল্য পরমধর্ম্ম; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী।"

এই তো গেল ঈশ্বরচন্দ্রের একটা দিক্। আর এক দিক দিয়ে তাঁকে দেখি সাহিত্য-গুরুরূপে। নূতন নূতন লেখক তৈরী করবার জন্যে তিনি প্রকাশ করতেন বিপুল উৎসাহ। সে-কালের অনেক লেখকেরই হাতে-খড়ি হয়েছিল তাঁর সাহিত্য-পাঠশালায়। রচনা-শক্তি প্রকাশ করলে ছাত্রদের জন্যে তিনি নগদ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থাও করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্তত দুই জনের নাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে—বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু।

পুরাতন 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রদের কবিতা পাঠ করবার সুযোগ হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল নতুন কবিদের কবিতাই প্রকাশ করতেন না, সেই সঙ্গে প্রকাশ করতেন ছাত্রদের দোষ ও গুণ সম্বন্ধে নিজের মতামতও। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন : "বঙ্কিমের ভাষা কিঞ্চিৎ বঙ্কিম।" তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সরল ভাষায় লিখতে। পদ্যের চেয়ে গদ্যই বঙ্কিমের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, এমন কথাও বলেছিলেন!

সাহিত্যই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের একমাত্র সাধনা এবং সেই জন্যেই বাংলা দেশে যাতে সাহিত্য-সাধকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তিনি বরাবরই সেই চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর এই উক্তিটির তুলনা নেই :

"যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ-গুণ-গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ-সম মাতৃ-ভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

আর এক দিক্ দিয়েও দেখা যাক্ কবি ঈশ্বরচন্দ্রকে। প্রথমে তাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উদ্ধার করি : "তিনি সদাই

মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন।......তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রসের কবিতা অনেক আছে, তা নিয়ে আমার নাড়াচাড়া করবার দরকার নেই, পাঠকরা অনায়াসেই সেগুলির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি খাবার জিনিষ নিয়ে কতকগুলি কবিতা লিখেছেন, যেমন "পাটা", "এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ" ও "আনারস" প্রভৃতি কিন্তু তাঁর কদলী-কবিতা রচনার কথা কি আপনাদের জানা আছে ?

বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে জানতেপারি: "ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপরে গালি-গালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা 'নস্য-লোসা দধি-চোসা'র দল গালি খাইতেন।"

ঠিক কারণ জানি না, তবে অনুমানে বোধ হয়, 'সংবাদ-প্রভাকরে' ঈশ্বর চন্দ্রের কোন মন্তব্য পাঠ করে এক দল ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুণ্ডিত মস্তকের শিখাগুলো অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তাঁরা মারমুখো হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কাঁচড়াপাড়ার বাস-ভবনের দিকে ধাবমান হলেন।

তখন বেলা দুপুর। কবি বসেছেন মধ্যাহ্ন-ভোজনে এবং খাদ্য পরিবেশন করছেন কবিজায়া দুর্গামণি দেবী ।

এমন সময়ে বাড়ীর সদর দরজায় এসে হানা দিলেন দুর্ব্বাসার আধুনিক অবতারের দল সে এক বিষম গণ্ডগোল !

কেউ চীৎকার করছেন, "ওরে পাষণ্ড ঈশ্বর গুপ্ত, বেরিয়ে আয় তুই ভিতর থেকে, আমরা আজ তোর শাস্তিবিধান করব !"

কেউ বলছেন, "আজ তোকে পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ দেব !"

কেউ বলছেন, "আজ তোকে ভস্ম ক'রে ফেলব !"

দুর্গামণি দেবী তো ভয়ে তটস্থ ! ঈশ্বরচন্দ্র তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ও হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তার পর কথাবার্ত্তার ধরণটা হ'ল বোধ করি এই রকম :

মনে মনে সব বুঝে, কিন্তু মুখে হেসে ঈশ্বরচন্দ্র সুধোলেন, "দেবতারা হঠাৎ এখানে পায়ের ধুলো দিতে এলেন কেন ?"

ও-তরফ থেকে জবাব এল, "জেনে-শুনে আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে ? 'সংবাদ-প্রভাকরে' তুই আমাদের নামে কি দোষারোপ করেছিস্ ?"

কবি বললেন, "প্রভুরা যখন 'প্রভাকর' পাঠ করেছেন, তখন আমাকে আর জিজ্ঞাসা ক'রে মুখ-ব্যথা করছেন কেন ?"

প্রভুরা সগর্জ্জনে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "সর্ব্বনাশ হবে, তোর সর্ব্বনাশ হবে !"

বাড়ীর কাছেই ছিল কলাগাছের ঝাড়। সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় জাগল দুষ্ট-বুদ্ধি। ব্যঙ্গের স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "ওঃ, ভারি তো কবি ! ফরমাজ করলে এখনি তুই মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারবি ?"

কবি যুক্তকরে বললেন, "আজ্ঞে, হুকুম দিলেই পারি।"

—"উত্তম। এখনি কদলী নিয়ে একটা কবিতা রচনা কর্ দেখি !"

—"যথা আজ্ঞা। কিন্তু কবিতা শুনে প্রভুরা আরো বেশী ক্রুদ্ধ হবেন না তো ?"

— "না, না, আমরা অভয় দিচ্ছি !"

কবি বললেন :

"গোলকবিহারী হরি,
ভৃগুপদ বক্ষে ধরি
তোদের মান বাড়িয়েছে।
শোন্ রে শোন্ নেড়ে নেড়ে,
গলার দড়ি ভেড়ে ভেড়ে,
তাইতে তোদের প্রণাম করি,
(দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে)
নইলে কলা কেঁদেছে !"

অবশ্য গাছের কলার বদলে কবি দেখালেন হাতের কলা, তবে সে-কালকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাও নিতান্ত বেরসিক ছিলেন না, গুপ্ত কবির অভিনব কদলী-কবিতা শ্রবণ ক'রে সম্ভবত তাঁরা মুখবন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঘটনাটি বললুম আমার নিজের ভাষায়। গল্পটি শুনেছিলুম আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখে।

অ্যান্টি-রোমান্টিক

নিখিল সেন

জুনিয়র উকিল। সকালটা আমার সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে মক্কেল নিয়ে কাটে না। কাটে টিউশনিতে। বাড়ী ফিরে তার পর কালো টাইটা গলায় বেঁধে ছুটি কোর্টে।

রুটিন মাফিক কাজ সেরে বাড়ী ফিরছিলাম। দেখলাম, মণিভূষণ বসে আছে বাইরের রোয়াকে। ব্যাক্-ব্রাশ তার দীর্ঘ চুল আজ রুক্ষ। অসতর্ক কয়েক গোছা এসে পড়েছে মুখের উপর। পায়ের শুঁড়-তোলা নাগরা-জোড়াটিও জৌলুস-হীন, বিবর্ণ। আর চোখে-মুখে উদাসীন এক অপলক দৃষ্টি।

বিস্মিত হলাম রীতিমত। রায় বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মণিভূষণ। যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে তিনি বিস্তর পয়সা করেছেন গত যুদ্ধে। মণিভূষণ তাঁরই ভাবী উত্তরাধিকারী। হোল কি হঠাৎ?

ছেলেটাকে আমার ভালো লাগত। বয়সের দিক থেকে রেখে চলে থাকি আমি। তাদের সভা-সমিতিতে আমার ডাকটা তাই সর্বাগ্রে। এমন এক সাহিত্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলাম। আলাপ হোল মণিভূষণের সঙ্গে। সে এক প্রবন্ধ পাঠ করছিল: কবিতার বিবর্তনবাদ। লেখাটি ভালোই হয়েছিল। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক সমাজ ও সাহিত্যকে দেখেছেন। মামুলি নয়।

অধিবেশনের পর আমি নিজে যেচেই আলাপ করলাম। তারিফ করলাম খুব ওর নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির। বড় লাজুক মণিভূষণ। আমার সঙ্গে আলোচনায় তেমন যোগ দিতে পারল না মুখ ফুটে। তার পর থেকে সে প্রায় আসত কিছু-না-কিছু একটা পড়ে শোনাতে।

এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলাম মণি-ভূষণের কাঁধে। চমকে উঠল সে। বলল: 'দাদা, বড়ো দরকারে এলাম আপনার কাছে।'

'নতুন কিছু লিখলে না কি? শোনাবে?'

'না—না!' সহসা খেঁকিয়ে উঠল মণিভূষণ। হাত ধরে হিড়-হিড় করে সে টেনে নিয়ে এল আমাকে বৈঠকখানা ঘরে। বলল: 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে অতো লোকের সামনে আমি তা বলতে পারব না, দাদা।'

সামনের একখানা চেয়ার অধিকার করে বসল সে নিজে। আমাকেও দিল একখানা এগিয়ে।

'বসুন, বলছি।' সে তাকাল আমার চোখের মধ্যে। 'কোর্টের কী দেরী হচ্ছে?'

প্রফেশানেল সিক্রেট্। বলে ফেললাম: 'হ্যা ভাই, আজ আবার জরুরি একটা কেস্ ছিল।'

'কেস্ না হাতী!' জবাবটা সে ছুড়ে মারল আমার মুখের উপর—'হোক দেরী! আমার কেস্ও কম দরকারী নয়। শুনতে হবে।'

'বেশ তো, বলো।'

আমার অনুমতির পূর্বেই কিন্তু সে বলে ফেললে: 'আচ্ছা, আপনি মণিকুন্তলাকে চেনেন?'

'মণিকুন্তলা!'

'হ্যা। মিস্ মণিকুন্তলা ঘোষ। গান শোনেননি তাঁর অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওতে? ফটো দেখেননি কাগজে?'

এক মিস্ কুন্তল ঘোষকে জানতাম। সেদিনও আমাদের "ছন্দা" ক্লাবের বসন্ত-উৎসবে যোগদান করেছিলেন। বললাম:

সে মাথা নাড়লে, মুখে বললে: 'জানেন দাদা, য়্যাম্ ম্যাড্‌লি ইন্ লভ্ উইথ্ হার।'

'তাই না কি? সে তো সুসংবাদ! কিন্তু ভাই, উনি মণিকুন্তলা হলেন কবে থেকে?'

প্রশ্ন শুনে বিষম খাপ্পা হয়ে উঠল সে। বললে: 'সাধে কি বলি আপনাকে পুলিশ কোর্টের উকিল? রসবোধটা আপনার একটু কম। দেখছেন না আমার নামের সঙ্গে সিমিট্রিটা বজায় রাখতে কুন্তল তার নাম পর্য্যন্ত নিয়েছে বদলে?'

'তাই বলো! কিন্তু আমায় এখন কি করতে হবে, ভাই?'

'সে জন্যেই তো ছুটে এলাম, দাদা। কিন্তু আপনি আর বলতে দিলেন কই?'

'বেশ তো, বলো না।'

'জানেন দাদা, য়্যাম্ ম্যাড্‌লি ইন্ লভ্ উইথ্ হার।'

'সে তো শুনলাম। কিন্তু আমায় কি করতে হবে?'

'সে কথাই তো বলছি। অমন তাড়া-হুড়ো করলে কি গুছিয়ে কিছু বলা যায় ছাই?'

মণিভূষণ এমন করে বললে, সে যেন কান্নায় এক্ষুণি ফেটে পড়বে। সে এক গ্লাস জল চাইলে। বললাম: 'বেশ তো, গুছিয়েই বলো না। তাড়া-হুড়ো কিসের? মিস্ কুন্তল ঘোষকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ, কেমন এই তো?'

ফ্যাল-ফ্যাল করে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বলল: 'বাঃ, আপনি তা জানলেন কি করে? আড়ি পেতে শুনেছিলেন বুঝি?'

'কি?'

'এই কুন্তলকে আমি যে বিয়ে করতে চাই। পিছু-পিছু আমাদের লেকে গিয়ে শুনেছিলেন বুঝি সব আড়ি পেতে?'

একটু হাসলাম। বললাম: 'তা ভাই, আমাদের কি আর আড়ি পেতে শুনতে হয়?'

কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার পর বলল: 'হুঁ, আই সি। ইউ আর্ এ ম্যারেড্ ম্যান। উঃ, য়্যাম্ জ্যালাস্ অব্ ইউ। সত্যি, আপনারা কত সুখী!'

মণিভূষণ সিগারেট ধরালে। কেস্‌টা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে: 'হাভ্ ওয়ান।'

খরচা পোষায় না। ওটা তাই ছেড়ে দিয়েছিলাম আজ-কাল। তবু স্নেহের দান। একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে মণিভূষণ আগেকার কথার জের টেনে চলল: 'জানেন দাদা, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে কুন্তলকে আমি—কুন্তলকে আমি কামনা করে এসেছি। তাই তো এবার পেয়েছি ওকে। ওর কথা ভাবতেও সর্বাঙ্গ আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে কেমন যেনো—পুলক জাগে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আমরা যখন যাই মেঘ-বরণ কালো এক রাশ চুল তখন পড়ে ওর পিঠের উপর বিস্রস্ত হয়ে। ভারী মিষ্টিক বলে মনে হয় তখন কুন্তলকে। মনে হয়, ওর দীর্ঘ চুলের নিবিড় অরণ্যে আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি পথ স্বপ্ন-লোকের, সেই পথ আমি যেন আর খুঁজেই পাই না! গুমরি উঠি আমি তখন ব্যথায়! ওঃ, হাউ সুইট—হাউ সুইট ইউ আর, মাই লভ্!'

চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে কয়েক মুহূর্ত সে বিভোর হয়ে রইল চোখ বুঁজে। হস্তচ্যুত হয়ে অর্দ্ধ-দগ্ধ হাতের সিগারেটটা ধূম উদ্‌গিরণ করতে লাগল মেজের উপর।

কবি-মানুষ মণিভূষণ। কাঠখোট্টা একটা গলাখাঁকরি দিয়ে শুদ্ধ সমাহিত ওর ভাবালুতাকে ভেঙে খান-খান করে দিতে কেন যেন মন সরলো না। সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম নীরবে।

খাড়া হয়ে বসল সে সহসা। বুক-পকেটে হাত গলিয়ে ছোট একখানা ফটো বার করলে সে। ফটোখানা সে তার চোখ, মুখ, কপোলের উপর নিয়ে বার কয়েক বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সহসা: 'ফটো দেখবেন দাদা? জন্মদিনে ওর পাঠিয়ে দিলে।'

'ছিঃ, ছিঃ, রাধা-কেষ্টো, রাধা-কেষ্টো! তা কি কখন দেখতে আছে ভায়া?'

'কেনো নয়? ডাউন্ উইথ্ ইয়োর ও রোণ-আউট্ ট্র্যাডিশনস্!'

ফটোখানা সে তুলে ধরল আমার চোখের উপর। দীর্ঘ ছিপ্‌ছিপে একটি মেয়ে। হাতে একটা ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগ্। ব্রীড়াশীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে—সহাস্যে।

বললাম: 'তা আমায় কি করতে হবে, ভাই?'

'আপনাকেই যে সব কিছু করতে হবে, দাদা! উইট্‌নেস সাজতে হবে আপনাকে।'

'উইট্‌নেস?'

'হ্যাঁ, আপনাকে উইট্‌নেস সাজতে হবে আমাদের এই বিয়েতে।'

'বেশ, আমি না হয় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিন হলফ করে বললাম যে, আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাদের এই শুভ—'

'না, ঠাট্টা নয় দাদা, বিয়েটাকে তো আর ছেলে-খেলা পাননি। যে উড়িয়ে দেবেন ঠাট্টা করে। জানেন তো, হিন্দু-মতে আমাদের বিয়ে হতে পারে না। তাই—'

'আচ্ছা, সে না হয় হোল। কিন্তু কবে থেকে ভূতটা—'

টেবিলের উপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সহসা চেঁচিয়ে উঠল মণিভূষণ: 'হোয়াট্ ডু য়ু মিন্ বাই দ্যাট্? জানেন, কুন্তলকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি শীগ্‌গির। একটি ভদ্র-মহিলার নামে অমন রিমার্ক পাশ করা মোষ্ট অব্‌জেকসানেবল্। আমি ষ্ট্রং প্রোটেষ্ট জানাচ্ছি।'

'আহা, চটছো কেনো ভায়া? আমি তো তেমন কিছু বলিনি—উইথ্ য়্যাপলজি না হয় উইথ্-ড্রই করে নিলাম।

'সে কি আজকের দাদা? কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে—'

'তবু এ জন্মের?'

'বাঃ, আমরা যে একসঙ্গে পড়তাম।'

'তোমাদের কলেজে আবার কো-এজুকেশন ছিল না কি?'

'না-ই বা থাকল। সকালে তো মেয়েরা পড়ত। একই কলেজ—একই ক্লাশ—একই প্রফেসর—সব তো একই। যে বেঞ্চিতে বসে সকালে সে যে প্রফেসরের নোট টুকেছে, সে বেঞ্চিতে বসে আমিও যে নোট টুকিনি, তারই বা কি প্রমাণ?'

'তার পর?'

'তার পর আবার কি? ফাল্গুনী রায়ের ডিনার পার্টি থেকে বেরিয়ে আসছি একটি কবিতা পাঠ করে, গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে যাবো—দেখি কি না, হাল্‌কা এক টুকরো মেঘের মত সে ভেসে এল আমার কাছে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে আমার কবিতাটির।'

'তুমি বুঝি তার পর ওঁকে লিফ্‌ট দিয়ে এলে?'

'দিলামই তো। হ্যাঁ, তার পর এক দিন দেখি একেবারে আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলাম, ঠিকানা পেলেন কোথায়? উনি একটু হাসলেন: 'আপনার আবার ঠিকানা! পাবলিশারের কাছ থেকেই নিলাম।'

জমে উঠেছিল। শুধালাম: 'তার পর?'

'তার পর চাকা গড়িয়ে চলল আপনা হতে। একেবারে লভ্‌ য়্যাট্‌ ফার্ষ্ট সাইট্‌ কি না।'

মণিভূষণ আবার সিগারেট ধরালে। বললে: 'কিছু মনে করবেন না দাদা, অভ্যেসটা বড়ো বিশ্রী হয়ে গেছে। আমার মুখের সিগারেট্‌টাও ধরিয়ে দেয় কি না। বলে: ট্যাক্‌ লাইট ফ্রম্‌ মি!'

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলে মণিভূষণ। তার পর বাকি অংশটুকু ছুড়ে দিলে জানলা দিয়ে বাইরে তাক করে। দাঁড়িয়ে বললে: 'এবার উঠি দাদা। তারিখটা পরে জানিয়ে যাবো।'

দরজার কাছ থেকে সে আবার ফিরে এল। বলল: 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। দাদা, কিছু টাকা দিতে পারেন? এই গোটা কয়েক। ষ্টোন-বসান একটা রিং গড়িয়ে দিতে হয়েছে ওকে। কিছুটা ধার হয়েছিল সেক্‌রার দোকানে। ধারটা শোধ করে দিতাম।'

ফ্যাল-ফ্যাল করে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কাছে টাকা চাইবে মণিভূষণ?

আপনি নিশ্চয় আশ্চর্য হচ্ছেন খুব। হবারই কথা। আমি কিন্তু বাড়ীর সব সম্পর্ক এসেছি কাট্‌আপ করে।'

'বলো কি?'

'হ্যাঁ, সত্যি দাদা। বাড়ীর ওল্ড-ফুলরা দাঁড়িয়েছিল পথের কাঁটা হয়ে। ভেবেছিল, শাসিয়ে পথ রোধ করবে আমাদের। কেমন পারল?'

গলাটা খাদে নামিয়ে মণিভূষণ এবার বললে: 'দিন দাদা, গোটা কয়েক টাকা দিন।'

কাকুতি-ভরা দৃষ্টি মণিভূষণের চোখে। টিউশনির টাকাটা পেয়েছিলাম। পকেটের মধ্যে করকরে আনকোরা দশ টাকার নোট ক'খানা গোঙিয়ে উঠল একবার আর্তস্বরে। মনটাও উঠল টন-টন করে। তবু নোট তিনখানা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

'কাজটা কিন্তু ভালো করোনি ভায়া, তোমার কুন্তল ঘোষকে জানিয়েছ না কি ব্যাপারখানা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, কেনো বলুন তো?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সে।

'না, ইয়ে—এমনিই বলছিলাম।'

'হুঁ, ভেবেছেন, চোখে ধুলো দেবেন আমার? অতো বোকাটি পাননি দাদা। আপনি হয়ত ভাবছেন, আমার এই আর্থিক অসঙ্গতিতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কুন্তলের। কিন্তু কথ্‌খনো তা হতে পারে না। সে যে আমার 'হাইয়ার লভ্‌'—আমার মানস-প্রতিমা—আমার 'হিরোইন্‌'। সাধারণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই আমাদের প্রেম।'

সে বেরিয়ে গেল হন্‌-হন্‌ করে। শুনলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবৃত্তি করছে সে: 'দাও আর্ট মাই হোম অব্‌ লভ্‌ এ্যাণ্ড উই নেভর রিপাইন্‌!...'

তার পর কিছু দিন আর পাত্তা নেই মণিভূষণের, ভাবলাম, এখন হয়ত সে বড় ব্যস্ত। কুন্তলকে নিয়ে বড় উদ্ব্যস্তই আছে নিশ্চয়। পুরীর চক্রতীর্থে ওদের হনিমুনটা যাপন করবার কথা ছিল। পুরীই গেছে হয়ত।

সকাল বেলাটা বৃষ্টি পড়ছিল গুড়ি-গুড়ি। টিউশনিতেই যাচ্ছিলাম। পথে হঠাৎ দেখা হোল মণিভূষণের সঙ্গে। ডাকলাম: 'ঘোষাল না? কি ব্যাপার, চেনা যায় না তোমাকে যে একেবারে? ফিরলে কবে?'

'কোত্থেকে?' ফিরে দাঁড়াল মণিভূষণ।

'সে কি? পুরী যাওনি তাহোলে?'

'পুরী!'

'হ্যাঁ গো; হনিমুনটা এখানেই সারলে?'

'হনিমুন?'

'হনিমুন—হনিমুন, ভায়া, মধুচন্দ্রিকা যাকে বলো তোমরা। তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে? বলি, বিয়ের পর এখানেই আছ?'

তার কোন জবাবই দিলে না মণিভূষণ। বগলের নীচ থেকে মরক্কো লেদারের ছোট্ট একটা ব্যাগ হ'তে ভাঁজ করা এক ফর্দ কাগজ বার করলে সে। কাগজখানা ছুঁড়ে দিল সে একরূপ আমার দিকে। যুগ্ম এক ফটোর নীচে লেখা রয়েছে দেখলাম, বড় বাজারের শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা আর নব-পরিণীতা তার স্ত্রী মিসেস্‌—

'শেঠ, পয়লা নম্বরের—' মণিভূষণ থেমে গেল সহসা।

মোড় ফিরিয়ে বললে : 'এদ্দিন ছিলাম দাদা, নভোচারী—ধূলির ধরণীতে আজ আবার ফিরে এলাম।'

মণিভূষণ চলে যাচ্ছিল। ডাকলাম : 'চল্লে কোথায় ?'

'লেকের দিকে।'

দুঃখ হোল। আহা, কি জানি বেচারী বুঝি হতাশায় মুষড়ে পড়ে আত্মহত্যার পথটাই বেছে নিল অবশেষে! বললাম : 'না—না; খামকা কেনো ভাই সুইসাইড করে বসবে ?'

'সুইসাইড করতে নয়, দাদা।' মণিভূষণ ফিরে একটু হাসলে—'বিসর্জন দিতে এটাকে।'

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা সে তুলে ধরলে। ভিজতে ভিজতে তার পরে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

বৌদ্ধ পথিক —চিত্তরঞ্জন দাস

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

ভগবান করুন, এর ফাঁসী না হয়ে কেবল মাত্র দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। যা হয় একটা সাজা হলেই তো হলো। আদালতে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এমনি এক এক প্রকার ভাবনা নিয়ে বসে আছেন। কেউ ভাবছেন হয় তো বা আসামীরা ছেড়েই যাবে, কেউ বা ভাবছেন এইবার আর তাদের রক্ষা নেই। আইন-জীবিগণ ভাবছেন খালাস পেলেই বা কি, না পেলেই বা কি? তাঁরা তো তাঁদের কর্ত্তব্য কার্য্য সুষ্ঠু ভাবেই শেষ করেছেন, ভুল-চুক যা হয়েছে তা সামান্তই; তা হলেই হলো, আবার কি? রূপজীবিনী উজ্জলাও এই ভাবনা থেকে বাদ পড়েনি। বসে বসে সে ক্ষণ গুণছিল আর ভাবছিল, তা ছাড়া পায় পাক্ না। ছাড়া পেলেই তো ভালো, কিন্তু। কিন্তু বেরিয়ে এসে সে কি আর তাকে ক্ষমা করবে, কিংবা ক্ষমা করলেও সে কি আর তাকে পূর্ব্বের মত সুচক্ষে দেখবে?

আসামীদের মধ্যে অনেকেই চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরের কাছে মুক্তির জন্ত প্রার্থনা জানাচ্ছে, এদের কেউ কেউ আবার চিন্তা করছে, ঈশ্বর করুন, ফাঁসী না হয়ে তাদের যেন দ্বীপান্তরই হয়। তা'হলে বিশ বছর পরও তো তারা ফিরতে পারবে। খোকন বাবুও ভাবছিল, কিন্তু তার চিন্তাধারার সহিত অন্ত কারোই ভাবনা-চিন্তার সহিত কোনরূপ মিল ছিল না। খোকা বাবু জন্ম-কয়েদের চেয়ে মৃত্যুই কামনা করে। মুক্ত অবস্থায় মানুষের মতই যদি বেঁচে থাকা না গেল তা হলে বাঁচা বা না বাঁচা তার কাছে সমান কথা।

আরও কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। উচ্চ আদালতের বিস্তীর্ণ কক্ষ নিঃঝুম ও নিঃশব্দ। বৈদ্যুতিক পাখার খন্‌খনে আওয়াজ, পেপার-ওয়েটের তলায় চেপে রাখা কাগজের পত-পত শব্দ এবং সমবেত উকিল ব্যারিষ্টার পেস্কার ক্লার্ক ও দর্শকমণ্ডলীর নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই শোনা সেখানে যায় না।

হঠাৎ কান খাড়া করে সকলে শুনলো দুয়ারের উপর একটা খট্-খট্ শব্দ। জুরী মহোদয়েরা বন্ধ-দরজার উপর টোকা দিয়ে জানাচ্ছিলেন, তাঁদের পরামর্শের কার্য্য শেষ হয়ে গেছে এবং এইবার তাঁরা বার হয়ে আসবেন। খট্-খট্ আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র এক জন কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলেন এবং অপর আর এক জন কর্ম্মচারী জজ সাহেবকে খবর দিতে ছুটলেন।

জুরী মহোদয়গণ ধীর পদবিক্ষেপে বেরিয়ে এসে একে একে আসন গ্রহণ করবার সামান্ত ক্ষণ পরেই জজ সাহেবও মঞ্চোপরি তাঁর জন্ত নির্দ্দিষ্ট উচ্চাসনে এসে উপবেশন করলেন।

জজ সাহেবের নির্দেশ মত ক্লার্ক অব ক্রাউন উঠে দাঁড়িয়ে কি একমত?" জুরাসনের মুখপাত্র ফোরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ্ঞে না।" ক্লার্ক অব ক্রাউন সমবেত জনমণ্ডলী ও আসামীদের হৃদয়ের সকল উদ্বেগ উপেক্ষা করে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা তা'হলে দ্বিমত?" ফোরম্যান মহোদয় উত্তরে জানালেন, "হাঁ, কিন্তু মাত্র এক জন ছাড়া তাঁদের অপর সকলেই একমত।"

"বেশ, ভালো কথা, তাহলে···" গম্ভীর স্বরে ক্লার্ক অব ক্রাউন বললেন, "আপনাদের অধিকাংশ সভ্যের সম্মিলিত অভিমত কি, তা আমাদের জানিয়ে দিন।"

এই জানিয়ে দেবার ভার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জুরিগণের মুখপাত্র হিসাবে ফোরম্যান মহোদয়ের উপরই অর্পিত হয়েছে। কিন্তু আজ যা তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে তা তাঁর নিজের অভিমত নয়। জুরিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই খোকন বাবুর প্রাণদণ্ডের বিরোধী ছিলেন। থেকে থেকে তাঁর মনে আসছিল খোকন বাবুর ব্যরিষ্টার মিঃ সেন রায়ের আবেগময়ী ভাষা:

"জুরী মহোদয়গণ, আজ আপনাদের একটা মাত্র কথার উপর এই কয় জন হতভাগ্য বীর বাঙ্গালীর জীবন নির্ভর করছে। ঐ দেখুন দূরের ঐ বেঞ্চিটার উপর আসামী কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী বসে রয়েছে। আপনাদের একটা মাত্র কথার উপর নির্ভর করছে, ঐ সতী সাধ্বী বঙ্গললনার মাথায় ঐ টকটকে লাল সিঁদুর থাকবে কিংবা মুছে যাবে। ভেবে দেখুন—আপনার কন্তার কথা; ভেবে দেখুন আপনার সদ্য-বিবাহিত পুত্রবধূর কথা; ভাবুন আপনারা, বাঙ্গালী বধূর দুর্ভাগ্য বৈধব্য জীবনের কথা। আপনারা কি এই অসহায় নির্দোষ নারীটিকেও এদের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুরূপ দণ্ড দেবেন? আরও মনে রাখবেন, আপনাদের 'দোষী বা নির্দ্দোষী' বলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে এদের মুক্তি কিংবা প্রাণদণ্ড। মনে রাখবেন, বিচার্য্য অপরাধে প্রাণদণ্ড ছাড়া আর অন্ত কোনওরূপ দণ্ডই নেই।"

নিজের রুগ্না স্ত্রী ও বিধবা কন্তার কথা ভেবে ফোরম্যান ভদ্রলোক ভীত হয়ে উঠছিলেন। কে জানে, এই সব সাক্ষীগুলি সত্য কথা বলেছে কি না। হয়ত বলেছে, কিংবা বলে নাই। মিথ্যা কথা তো লোকে বলে থাকে। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান বাঙ্গালী যুবকের দ্বারা এই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কি সমাধিত হওয়া সম্ভব? শেষে কি তিনি একেবারে নরহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়বেন?

একটু আমতা আমতা করে জুরী মহোদয়গণের মুখপাত্র ফোরম্যান ভদ্রলোক কম্পিত কণ্ঠে তাঁদের অধিকাংশ সভ্যের মতামত সম্বন্ধে জজ সাহেবকে জানালেন, "আমাদের অধিকাংশ সভ্যেরই মতে প্রত্যেক আসামীই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এ ছাড়া, খোকন বাবুকে আমরা দলের নেতারূপে মনে করি। এবং এ-ও মনে করি যে তিনি···প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডেই সাক্ষাৎ ভাবে লিপ্ত ছিলেন।"

জজ সাহেব চক্ষু মুদ্রিত করে জুরিগণের এই অভিমত শুনলেন এবং তার পর চাপরাশীকে তাঁর মাথার উপরকার ফ্যানটা কিছুক্ষণের জন্ত বন্ধ করে দিতে বলে একটু নড়ে বসলেন, ফ্যান বন্ধ করে দেবার হুকুম শুনা মাত্র সমবেত সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। জজ সাহেব তাঁর লাল কোর্ত্তার আস্তিনের ভিতর থেকে এক

কালো পাতলা টুপি বার করে সেটি মাথায় পরে জলদ-গম্ভীর স্বরে তাঁর বিচারের রায় বা হুকুম জানাতে শুরু করলেন।

"আসামিগণ, তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ তোমাদের সম্মুখেই আমি গ্রহণ করেছি। তোমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনেরও আমি প্রচুর সুযোগ দিয়েছি। জুরী মহোদয়গণও তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এখোন আমি এক খোকা বাবু ছাড়া সকলকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আর তুমি খোকন বাবু, তোমার অপরাধের আর সীমা নেই। আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছি। আজ হতে সপ্ত দিন পরে ভোর ছয়টার সময় তোমাকে সুযোগ্য ঘাতকগণ আমার আদেশ মত ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে এবং তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবেই তোমাকে ঝুলিয়ে রাখা হবে। ভগবান তোমার আত্মার কল্যাণ করুন। তোমার কিছু বলবার আছে?"

ঘাড় উঁচু করে জজ সাহেবকে অভিবাদন করে খোকন বাবু বললে, "আজ্ঞে তা আছে, কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই।"

ম্লান হাসি হেসে জজ সাহেব বললেন, "কি বলবে, বলো? সাধ্য থাকলে তোমার আশা পূরণও করতে পারি।"

"না, আপনি তা পারেন না। কারণ, আপনি হচ্ছেন আমার চেয়েও অসহায়!" খোকন বাবু বললে, "পারেন আপনি হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠে আমাকে জীবন বিপন্ন করতে দিতে? বেঁচে ফিরতে পারলে না হয় আমার ফাঁসী হতো কিংবা কোনও বিজ্ঞান বা জনহিতকর কার্য্যের জন্যও তো আমাকে জীবনপাতের সুযোগ দিতে পারেন? এমন কতো কার্য্যই তো আছে, যাতে রাষ্ট্র, সমাজ বা বিজ্ঞানের জন্য জীবনদানের প্রয়োজন হয়।"

বিক্ষুব্ধ ভাবে জজ সাহেব বললেন, "আমি দুঃখিত। এ আমার ক্ষমতার বাইরে।"

খোকন বাবু উত্তর করলে, "তাহলে আমায় বীরের মত গুলী করে মারা হোক্।"

উত্তরে জজ সাহেব বললেন, "আমি নিরুপায়, আইনে এ ব্যবস্থা নেই।"

খোকন বাবু উত্তর করলে, "তাহলে আমার আর কোনও প্রার্থনাই নেই। আমি আমার বুদ্ধির দোষেই ধরা পড়েছি, এ জন্য এই শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। এ জন্য কাউকেই আমি দোষী করি না, নমস্কার!"

জজ সাহেবের আদেশে প্রহরিগণ একে একে আসামীদের নীচের হাজত-ঘরে নামিয়ে নিলে। উৎফুল্ল হয়ে শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "খুব ভালো হলো, স্যার। আমার তো ভয়ই করছিল, এই বুঝি জুরীরা এসে বলে ফেলেন এরা সবাই নির্দ্দোষ। বড় সাহেবকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবো, স্যার, খোকন বাবুর ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে। চলুন স্যার, চলুন। বেঙ্গল রেস্তোরাঁতে ঢুকে বেশ কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্। বাবাঃ, ক'মাস কি খাটুনিটাই না খাটতে হয়েছে।"

প্রথম যৌবনে অপরাধীদের দণ্ডাদেশ শুনে প্রণব বাবুও এমনি ভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, কিন্তু আজ আর তিনি এই সাফল্যের আনন্দে যোগ দিতে পারলেন না। এই কয় মাসের ঘটনার সঙ্গে তাঁর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা এক করুণ ঘটনাও ওতঃপ্রোত ভাবেই জড়ানো রয়েছে। তার চোখ এমনিই সজল হয়ে উঠলো। লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হবার উদ্দেশ্যে প্রণব বাবু তাঁর মুখটা দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়লো উজ্জ্বলার দিকে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে উজ্জ্বলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। শৈলেশ বাবুও উজ্জ্বলাকে কাঁদতে দেখেছিলেন। বিস্মিত হয়ে শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "দেখেছেন—দেখেছেন স্যার, বেটীর কাণ্ড। সরকারী তরফে সাক্ষ্য দিয়ে এখোন আবার কাঁদতে শুরু করলে!"

শৈলেশ বাবু বিস্মিত হলেও প্রণব বাবু এই ব্যাপারে একেবারেই বিস্মিত হননি। হেসে তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে কি, বিচারের প্রথম দিকে এক দিন তুমি ওর সম্বন্ধে একটা অভিযোগ করেছিলে?

শৈলেশ বাবু বললেন, "হাঁ স্যার, মনে পড়ে। আমি বলেছিলাম, এক দিকে খোকার বিরুদ্ধেই আমাদের কথা মত সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে, আবার অপর দিকে বহু অর্থব্যয় করে খোকার পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে এক ব্যারিষ্টারও নিযুক্ত করেছে।"

"তোমার বোধ হয় এ-ও মনে পড়ে"—প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে উজ্জ্বলাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলে?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "হাঁ স্যার, খুব মনে আছে।"

প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তখন কি বলেছিলাম?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "আপনি বলেছিলেন, খবরদার খবরদার, এমন কাযও করো না। আমাদের পাল্লায় পড়ে ও সত্য সাক্ষ্যই দেবে, কিন্তু ওকে যদি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহলে ও তৎক্ষণাৎ হিষ্টিরিক হয়ে উঠে আমাদের কেইসটা একেবারে মাটি করে দেবে।"

মৃদু হেসে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এইবার বুঝতে পারছো তো তুমি, কেন আমি সেই দিন তোমায় বারণ করেছিলাম?"

বিস্মিত হয়ে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "ওঃ, এই জন্যে? হাঁ, স্যার, এইবার বুঝেছি। এও কি স্যার সেই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের খেলা?"

"হাঁ ভাই, ঠিক তাই-ই।" প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব কম-বেশী প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে। কারো কারো মধ্যে আবার বহু ব্যক্তিত্বও দেখা যায়। এই দ্বৈত বা বহু ব্যক্তিত্ব অত্যুগ্র না হওয়া পর্য্যন্ত তা আমরা বুঝতে পারি না। খোকা বাবুর মধ্যে এই বহুব্যক্তিত্ব অত্যুগ্র ভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে; যা কি না আমরা মাঝে মাঝে মাত্র ক্ষণিকের জন্য স্বল্পমাত্রায় অনুভব করে থাকি, এই যা তফাৎ। আসলে উজ্জ্বলার অন্তর্নিহিত একটি মাত্র ব্যক্তিত্ব খোকাকে ভালবেসেছে, উজ্জ্বলার অপর ব্যক্তিত্বটি কিন্তু তাকে না ভালবেসে ভালবেসেছে নিহত পাগলা ওরফে প্রতুলানন্দকে।"

খোকা বাবুর ব্যারিষ্টার মিঃ সেন রায় এতোক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে প্রণব বাবুর এই বৈজ্ঞানিক ভাষণ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন, এইবার তিনি এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, "বেশ তো মশাই, আপনারা, উজ্জ্বলার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাকে দিয়ে যা তা বলিয়ে মক্কেলের আমার ফাঁসীর ব্যবস্থা করে দিলেন, বাবাঃ, আপনারা দেখছি সবই পারেন। তা' যাই হোক, যা হবার তা তো

হয়েই গেলো। এখোন আমার মক্কেল যে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।"

বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "কি বললেন, খোকা দেখা করতে চায়, আমার সঙ্গে?"

উত্তরে মিঃ সেন রায় বললেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনারই সঙ্গে।"

প্রণব বাবু বললেন, "না মশাই, পারবো না আমি তা। ভয় করে আমার, তা ছাড়া লজ্জাও তো করে?"

"খোকা তা'হলে তো দেখছি ঠিকই অনুমান করেছে যে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হবেন।" ব্যারিষ্টার মিঃ সেন রায় বললেন, "এই জন্যে সে এর উত্তরও দিয়ে রেখেছে। সে বলেছে কি জানেন? সে বলেছে, আপনি যদি না আসেন তা'হলে পরে যেন আপনি একটা লোহার চাবি নিয়ে শোন। কারণ চিরদিনই সে আর চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। তার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।"

লৌহ-নির্ম্মিত একটি চাবি বা ঐরূপ আর কিছু কাছে নিয়ে শুলে না কি মানুষকে ভূতে ধরে না, প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী লোকেরা এই কথা প্রায়ই বলে থাকে। মরণ-পথের যাত্রীদের এইরূপ শাসানি একেবারেই অগ্রাহ্য করা প্রণব বাবু উচিত বলে মনে করলেন না। হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, চলুন তাহলে। কি বলে শুনেই আসা যাক।"

নীচের হাজত-ঘরে এসে প্রণব বাবু দেখলেন, খোকন বাবু বেশ খুসী-মনেই পায়চারী করছে। প্রণব বাবুকে দেখে অট্টহাসি হেসে খোকা বাবু বললে, "প্রেতাত্মার ভয় দেখছি তা'হলে আপনিও করেন? আরে মশাই, এ লাইফটা হচ্ছে একটা মোটর কার, পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই থেমে যাবে। আসলে এপারেও কিছু নেই, ওপারেও না। বেঁচে থেকে যে আপনাকে সাবড়াতে পারেনি, মরে আর সে আপনার কি-ই বা করতে পারে?"

খোকাকে এই ভাবে হেসে উঠতে দেখে প্রণব বাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি একটু ভয়ও করে না খোকা বাবু? আর ক'দিন পরই আপনার ফাঁসী হবে এ কথা জেনেও আপনি হাসতে পারছেন? হাসি আপনার আসছে, খোকা বাবু? একটুও আপনার এ জন্যে ভয় করছে না?"

"ভয়? কেন, ভয় করবে কেন?" খোকা বাবু উত্তর করলে, "আমি মরবো, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানরূপ এক বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে মিশিয়ে যাবো।"

অধিকতর বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি এমন পুণ্য করেছেন, যার জন্যে আপনি মরার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিশিয়ে যাবেন?"

"কি, পুণ্যের কথা বলছেন?" খোকন বাবু উত্তর করলে, "তা আমি কিছু করেছি বৈ কি? তা ছাড়া আত্মাকে আমি কখনও কষ্ট দিইনি, লাইফের ইন্‌চি টু ইন্‌চি আমি ভোগ করেছি। মন যা চেয়েছে, তাই তাকে আমি দিয়েছি, তাই আজ আর আমার ভয় নেই, দুঃখও না। কিন্তু আপনারা যখন মরবেন, কষ্টের মধ্যেই মরবেন। মনে হবে, ওটা হলো না, ওটা করলাম না, অনেক অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই আপনারা মরবেন। হয় তো এ জন্য আবার আপনাদের জন্মাতে হবে, আত্মাকে বঞ্চিত করে সাধু-জীবন যাপনের উচিত মূল্য আপনাদের দিতেই হবে, কিন্তু আমাকে তা দিতে হবে না।"

"তা না হয় বুঝলাম," প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আমাকে কি জন্যে ডাকলেন আপনি?"

উত্তরে খোকা বাবু বললেন "হাঁ, সেই কথাই বলবো এবার। শুনুন তবে, আমি একটা অন্যায় কায করে ফেলেছি তার জন্যে যদি আবার আমাকে জন্মাতে হয়। আমার জীবনের একটা মাত্র সখ বাকি ছিল সেটি হচ্ছে বিবাহ করা। তাই ইতিমধ্যে গোপনে চন্দননগর গিয়ে আমি একটা বিয়ে করে ফেলেছি। তবে তাকে আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে এসেছি আর বলে এসেছি, দেখ বাপু, আমি যখন মরবো, তুমি তখন ওই টাকা দিয়ে এন্তার ফুর্ত্তি করবে, এমন কি ভালো লাগলে মদও খাবে। সে যদি আমার কথা মত কায করে, তা'হলে আমার আত্মা স্বর্গে যাবে, অবশ্য স্বর্গ যদি কোথাও থাকে। কিন্তু তিনি যদি হিন্দুর ঘরের বিধবার মত তুলসী পাতার রস দিয়ে ভাত খায় এবং নিরামিষ খেতে থাকে, কিংবা উপসী ছারপোকার মত জীবন যাপন করে, তা হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে না।"

খোকা বাবুর এই পত্নী-প্রীতি প্রণব বাবুকে মুগ্ধই করলো। এই প্রীতির মধ্যে পত্নীপরায়ণা বা একনিষ্ঠা নেই, কিন্তু পত্নী-প্রীতি আছে। বাকী ছিল শুধু একটা বিয়ে। খোকা বাবু তা'হলে তা'-ও শেষ করেছেন। প্রণব বাবু ভাবছিলেন, এই কার্য্য সে কখন সমাধা করলো, নিরপরাধ অবস্থায় না অপরাধী অবস্থায়, না উভয় জীবনের মধ্যস্থলের কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে?

"তা না হয় বুঝলাম" প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এ বিষয়ে আমি আপনাকে কিরূপ সাহায্য করতে পারি?"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "সেই কথা বলবার জন্যেই তো ডেকেছি। শুনুন তা'হলে বলি। আমি জানি, আপনি আমার উভয় জীবনেরই খবর রাখেন। উর্দ্ধতন জীবনে আমি যে সকল সম্পত্তি আহরণ করেছি, তার সমুদয়েরই আমি দানপত্র লিখে দিয়েছি। যাতে করে উর্দ্ধতন পৃথিবীর নিঃস্ব ব্যক্তিদের অন্ততঃ জন কয়েকও পেটের দায়ে অধস্তন পৃথিবীতে না এসে পড়ে। এ ছাড়া অধস্তন পৃথিবীতে থাকার সময়ও আহরণ দ্বারা অনেকগুলি বস্তী-বাড়ীরও আমি মালিক হয়েছি, এই সম্পত্তির জন্যেও একটা উইল লিখে এ্যাটর্ণির হাতে দিয়ে এসেছি। এই সব সম্পত্তির আয় থেকে এমন এক প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই গ'ড়ে উঠবে, যার সাহায্যে অধস্তন পৃথিবীর লোকেরা প্রচেষ্টা দ্বারা উর্দ্ধতন পৃথিবীতে উঠে আসতে পারে। এখোন আমার বলতে এমন কিছুই আর নেই যা কি না আমি আমার বিবাহিত স্ত্রীকে দিয়ে যেতে পারি। আমার নির্দ্দেশিত পন্থায় আমার স্ত্রী যদি সত্য সত্যই চলতে চায় তা হলে আমি যা তাকে দিয়েছি তা একেবারেই পর্য্যাপ্ত হবে না। আপনাকে এখোন এক কায করতে হবে, আমি হুগলি জেলার এক গ্রামের এক নির্জ্জন স্থানে কৌটায় ভ'রে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা পুঁতে রেখে এসেছি। একটা প্ল্যান এঁকে দেবো, দয়া করে যদি তুলে এনে সেগুলি আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন, কিংবা যদি দয়া করে আমার স্ত্রীকে একটা খবর পাঠিয়ে দেন, যাতে করে সে নিজেই সেগুলো উঠিয়ে আনতে পারে। মনে করেছিলাম, এই সব পাপের টাকা অন্ততঃ বিবাহিত স্ত্রীকে

দেবো না, কিন্তু টাকা অপরাধীদেরই হোক, কিংবা নিরপরাধীদের হউক, এ জন্ত তার চাকচিক্য বা মূল্য কোনও অংশে কমে যায় বলে এখোন আর আমি মনে করি না। অপনাকে এই অনুরোধ করার অপর একটা কারণ, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।"

অন্ত সময় হ'লে প্রণব বাবু খোকার এইরূপ অনুরোধকে স্পর্দ্ধারই সামিল মনে করতেন, কিন্তু এখোন সে মৃত ব্যক্তিরই সামিল, তাই প্রণব বাবু খোকার এই অহেতুক অনুরোধ চুপ করেই শুনে গেলেন। প্রণব বাবু বুঝতে পারছিলেন যে, জীবনের শেষ দিনে খোকা এমন এক বন্ধনে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে, যার জন্তে সে মৃত্যুর সময়ও শান্তি পাচ্ছে না।

"কিন্তু, একটা কথা," প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এতো দিন ধরে আপনি ব্যারিষ্টারের ফি যোগালেন কি করে? এদিকে তো বলছেন আপনার আর কিছুই নেই।"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "সত্যি বলছি, আমি তা জানি না। ব্যারিষ্টার সাহেবকে আমি এ সম্বন্ধে বহু বার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তিনি উত্তর করেছেন যে, আমাকে তা বলতে বারণ আছে। বোধ হয় আমার দলেরই কোনও ব্যক্তি আমাকে না জানিয়েই এই ব্যারিষ্টার সাহেবকে নিযুক্ত করেছেন।"

খোকার এই উত্তরে প্রণব বাবু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। খোকার এই উত্তর যেন রূপজীবিনীদের সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব্ব ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন এনেছিল। রূপজীবিনীরাও তা'হলে মানুষ, তাদেরও তা'হলে অনুভূতি আছে। একবার তাঁর মনে হলো, সব কথা তিনি ফাঁস করেই দেবেন, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তা না করে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা খোকন বাবু, বিয়ে করে কি সত্য সত্যই আপনি সুখী হয়েছিলেন? আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, এতো দিন পরে আপনি আবার বিয়ে করতে গেলেন কেন?"

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম খোকা বাবুর চোখে জল এলো। দুই হাতে চোখের জল মুছে খোকন বাবু উত্তর দিলে, "দেখুন, আমার মনে হয় আমার ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন—এই উভয় জীবনই ছিল অস্বাভাবিক, হঠাৎ এক দিন আমি উপলব্ধি করি, এই দুই জীবনের মাঝখানে আরও একটা জীবন আছে, যাকে বলে গার্হস্থ্য জীবন। এই গার্হস্থ্য জীবনকেই একমাত্র স্বাভাবিক জীবন বলা যেতে পারে। বিবাহিত স্ত্রীর কাছ হ'তে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, বেশ্যা-সম্ভোগ দ্বারা বা বড়ঘরের মেয়েদের সহিত ফ্লার্ট করে তার শতাংশের একাংশও আমি পাইনি। কিন্তু এতো সুখ আমার ভাগ্যে বিধাতা লিখেননি। বিবাহের মাস তিন পরেই নিম্নতন পৃথিবী আমাকে ডাক দিতে থাকে। সেই ডাক প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল। আমি সব ভুলে পুনরায় উজ্জ্বলার ঘরে ফিরে আসি। সেই দিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত তার আমি আর কোনও খবরই রাখিনি।"

"কেন তা আপনি রাখেননি?" প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বিবাহটা তা'হলে আপনি একটা সাময়িক খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়েই করেছেন?"

"জানি না, তাই কি না?" খোকা বাবু উত্তর করলে, তবে ভালবেসে যে তা করিনি, এ কথাও ঠিক। এই জন্তেই বোধ হয় একমাত্র তার জন্তেই চিন্তা আসছে। সত্যি, সে যদি আমাকে আরও কিছু দিন ধরে রাখতে পারতো! আচ্ছা, কেন সে তা পারলো না?"

কথা বলতে বলতে খোকা বাবু দুই হাতে তার মাথাটা টিপে ধরে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসে থেকে খোকা বাবু বলে উঠলো, "প্রণব বাবু, আজ আর নয়। পারেন তো পরে আর এক দিন দেখা করবেন। অনেক দিন পরে আমার আবার সেই রোগ আসছে। আমার মূর্ত্তি শান্ত থাকতে থাকতে আপনারা সরে পড়ুন, নইলে খামকা আমি গাল দিয়ে উঠবো। যান, চলে যান—শীগ্‌গির চলে যান।"

খোকার উৎকট অনুরোধের দায় থেকে এতো সহজে রেহাই পেয়ে প্রণব বাবু খুসী হয়েই বেরিয়ে এলেন।

রাত্রি তখন নয়টা হবে।

খোকা বাবু ফাঁসীর খাওয়াই খাচ্ছিলো। অন্তমনস্ক ভাবে খোকা বাবু খেয়েই চলেছে। খোকার কারা-কক্ষের অর্ডারলি ওয়ার্ডার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো, "কি করছেন বাবু সাব? আর খাবেন না, অসুখ করবে।"

ওয়ার্ডারের কথায় খোকা বাবু উচ্চহাস্য করে উঠলো। কয়েদী-ওয়ার্ডার ভুলে গিয়েছিল প্রত্যুষেই খোকা বাবুর ফাঁসী হবে। অপ্রস্তুত হয়ে কয়েদী-ওয়ার্ডার খোকা বাবুর পদধুলি নিয়ে বলে উঠলো, "মাপ করবেন, কর্ত্তা, আমি ভুইল্যা গ্যাছলাম। খোদা আপনাকে দেখবেন, কর্ত্তা, কিছু ভয় করবেন না।"

অপরাধী-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পেয়ে থাকে খুনী আসামী এবং তাদের পরই সম্মান পায় ডাকাতরা। খোকা বাবু ছিলেন এক জন খুনি ডাকাত! ইতিমধ্যে বহু কয়েদীই এসে তার পদধুলি নিয়ে গেছে।

"যা রে যা, এইবার শুগে যা।" কয়েদী-ওয়ার্ডারকে উদ্দেশ করে খোকা বাবু বললে, "খাওয়া তো আমার হয়েই গেছে। তুই আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকবি?"

উত্তরে কয়েদী-ওয়ার্ডার বললে, "তা'ও কি কখনও হয় কর্ত্তা। আপনার পা'টা টিপে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই, তবে তো?"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খোকা বাবু শুয়েই পড়লো, খাওয়ার মত একটা বড় গোছের ঘুমও তো দিতে হবে। কয়েদী-ওয়ার্ডার সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা খোকা বাবুকে ঘুম পাড়াবার জন্তে অনেক চেষ্টা করেও অপারগ হলে খোকা বাবু দয়া-পরবশ হয়েই যেন চোখ বুজলেন।

কয়েদী-ওয়ার্ডার নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গেলো কক্ষের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এবং আলোটা নিবিয়ে দিয়ে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার মতো ঘুমানোটা অত সহজ ব্যাপার নয়। খোকা বাবু কিছুতেই ঘুমাতে পারলে না। বহু কথাই তার মনে আসছিল। তার ঘটনা-বহুল জীবনের বহু কাহিনীই থেকে থেকে তাকে উত্যক্ত করে দিচ্ছে তার অন্নপ্রাশনের দিন হতে এই দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা ছবির মত একে একে তার চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠছিল, কতো বন্ধু-বান্ধবকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে এসেছে। কেষ্টা, গোপী, সুধীর, বরুণা, হেনা দত্ত—এমনি কতো লোক তার জীবনের পথে এলো এবং চলে গেলো। প্রয়োজনে এবং নিষ্প্রয়োজনে

কতো লোক এসেছে, চলেও গিয়েছে। যাদের তিনি ইহলোক থেকে সরিয়ে দিলেন, তাদের কারও কারও সঙ্গে পরলোকের পথে দেখা হবে কি-না, তাই বা কে জানে?

খোকা বাবু শুয়ে শুয়ে পল এবং ক্ষণ গুণতে থাকে। টিক-টিক-টিক। ঘড়ীর কাঁটা ঘুরেই চলেছে।

খোকা বাবুর পরমায়ুর মেয়াদ ফুরিয়েই এলো। ভোর! ভোর হতে আর কতো বাকি? না-ই বা হলো ভোর। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তো তার জীবন-প্রদীপ নিবে যাবে। শেষে সত্য সত্যই ভোর এসে গেল। সারা রাত জেগে থেকেও খোকা বাবু ভোরের আগমন আটকাতে পারলে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে খোকা বাবু দেখলে, তার নির্দ্দেশ মত কিছু তাজা ফুল প্রত্যুষেই কে টেবিলের উপর এনে রেখেছে। তার লেপের মধ্যে ঢুকে জেলের অসংখ্য বিড়ালের একটি বিড়াল তখনও পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছিল, খোকা বাবু আদর করে লেপটা তার গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে শয্যা থেকে নীচে নামলো। তার পর শৌচ-কার্য্য সেরে দাড়ী কামিয়ে পাট-করা ধুতি এবং একটি চুড়ীদার পাঞ্জাবী পরে নিয়ে নিজে হাতে ফুলের মালা গাঁথতে বসলো। ফুলের সঙ্গে তার শেষের দিনের ইচ্ছামত একটা দামী সেন্টও আনা ছিল। ফুলের মালা প'রে সেন্ট মেখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে খোকা বাবু দেখলে, জেলের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রণব বাবু তার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

উৎফুল্ল হয়ে খোকা বাবু ছুটে এসে প্রণব বাবুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রণব বাবু! আমি মনে-প্রাণে এতক্ষণ আপনাকেই যে চাইছিলাম।"

"সত্যি?" প্রণব বাবু বললেন, "আমার কিন্তু বড্ড লজ্জা করছে। আপনার মত এত বড় একটা বীর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে হয়তো ভালোই হতো। চিরদিনই কি আপনি দস্যুবৃত্তি করতেন?"

"তাতে কোনও লাভই হতো না, প্রণব বাবু!" খোকা বাবু উত্তর করলেন, "পাগলের এবং অপরাধীদের বংশ পৃথিবীতে না বাড়াই ভালো। আসলে অপরাধী মাত্রেই রুগী মানুষ। রুগী মানুষের দ্বারা দেশের আর কি-ই বা উপকার হতো বলুন?"

"কিন্তু একটা কথা" প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেউ কেউ মনে করতেন, আপনি একটা বিপ্লবী দল গঠনেরও মতলবে ছিলেন, এ কথা কি সত্যি?"

বিষণ্ণ মনে খোকা বাবু উত্তর করলে, "নিরপরাধী অবস্থায় এ কথা যে আমি ভাবিনি, তা-ও না। এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেও কতো বার আমি নিরঞ্জন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি, কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও দেশ-মাতৃকার কাযে আত্মনিয়োগ করতে পারিনি। আমাদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা একমাত্র আদর্শবিহীন অসৎ কার্য্যের জন্তেই আমাদের মধ্যে প্রেরণা যুগিয়েছে, সৎকার্য্যের জন্ত নয়। অপরাধীদের দ্বারা কোনও প্রকার সৎকার্য্য সমাধিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তা সে যাই হোক, আপনার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে।"

"বেশ তো, বলুন না, কি অনুরোধ?" প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার শেষ অনুরোধ আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করবো। বলুন, আপনার জন্তে আমি কি করতে পারি?"

খুসী হয়ে খোকা বাবু বলে উঠলো, "শুনেছি, আপনি কেবল মাত্র শান্তিরক্ষক নন, এক জন ভালো লেখকও বটে। আমি চাই, অন্ততঃ অপরাধীদের ইতিহাসেও আমার নামটি যেন থেকে যায়, আপনি কি পারবেন আমার জীবন-ইতিহাস লিখে রাখতে?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "তা আমি পারবো।"

"পারবেন? সত্যি, পারবেন?"—দুই হাতে প্রণব বাবুকে জড়িয়ে ধরে খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলে।

প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আপনার জীবনী অবলম্বন করে আমি এক অপূর্ব্ব উপন্যাস রচনা করবো। এবং সেই উপন্যাসের মধ্যে আপনার ঘটনা-বহুল জীবনীর সঙ্গে লিখে রাখবো আমারও জীবনের দুই-একটি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কাহিনী। হয়তো বইখানাকে জনপ্রিয় করবার জন্তে স্থানে স্থানে আপনাকে অতিরঞ্জিত করেই দেখাতে হবে, কিন্তু তা সত্বেও এমন ভাবে এটা লেখা হবে যাতে করে কি না বইখানির মধ্যে কতোটা সত্যি আছে এবং কতোটাই বা মিথ্যা, তা পাঠকবর্গ সহজেই বেছে নিতে পারবে। আমি আপনাকে জোর-গলাতেই বলে দিতে পারি যে, এক দিন জনসাধারণ আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে, কিন্তু আপনাকে তারা কোনও কালেই ভুলতে পারবে না। বলতে পারেন, তার কারণ কি?"

"পারি বই কি।" খোকা বাবু বললে, "শুনুন তবে বলি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই স্বভাবজাত অপস্পৃহা আছে, সাহসের অভাব ও শিষ্টতার প্রাচুর্য্য এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে মাত্র। মানুষ ইচ্ছা সত্বেও নানা কারণে যে কার্য্য করতে পারে না সেই কার্য্য সে অপর কাউকে করতে দেখলে কিংবা ঐরূপ কার্য্য কেউ করেছে বলে শুনলে সে খুসীই হয়ে থাকে। চোর-ডাকাতের গল্প শুনতে এই জন্তেই লোকে অধিক ভালবাসে। এই জন্তেই হয়তো তারা আমাকে পছন্দ করবে। কিন্তু চোরই হই, ডাকাতই হই, মৃত্যুর পরও তো আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই, তা যে ভাবেই হোক না কেন।"

হঠাৎ ঢং-ঢং করে জেলের পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। জেলার সুরেন বাবু এসে জানালেন, "আর নয় প্রণব বাবু, থামুন এইবার। সময় হয়ে এসেছে, এইবার একে নিয়ে যাবো।"

জেলার স্বয়ং এসে আদর করে খোকা বাবুকে বধ্যমঞ্চে নিয়ে এলেন। একটা গভীর পাতকুয়ার উপর এই মঞ্চ তৈরী হয়েছে। পাতকুয়ার দুই পাশে দুইটি লম্বা লম্বা কাঠের স্থূল খুঁটি। খুঁটির মাথা দুইটি একটি স্থূল দণ্ড দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে। এবং এই দণ্ডের মধ্যস্থল হতে তলা পর্য্যন্ত ঝুলানো রয়েছে এক গাছা লম্বা দামী দড়ি বা রশি। পাতকোর উপর সংলগ্ন রয়েছে একটি অপরিসর তক্তা। এই তক্তার সহিত সংযুক্ত রয়েছে একটা স্প্রিঙের হ্যাণ্ডেল। সিঁড়ি ব'য়ে নিজেই উপরে উঠে খোকা বাবু পাতকুয়ার উপরকার তক্তার উপর দাঁড়িয়ে বললে, "ইয়েস, রেডি! আমি প্রস্তুত।"

এক দল শাস্ত্রীর সম্মুখে জেল-সুপারইনটেণ্ডেণ্ট স্বয়ং ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবং তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, জেলের ডাক্তার এবং এক জন হাকিম। নির্দ্ধারিত সময়ের শেষ ক্ষণটি শেষ হতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। অফিসারদের মধ্য হতে এক জন এগিয়ে এসে খোকা বাবুকে বললেন, "প্রার্থনা করবার জন্তে কি

আপনার পুরোহিতের প্রয়োজন আছে? পুরোহিত মশাই এখানেই আছেন, বলেন তো ডেকে আনি।"

উত্তরে খোকন বাবু বললে, "ঈশ্বরের কাছে নিবেদন পেশ করবার জন্যে আমার কোনও উকিল বা পেশকারের প্রয়োজন নেই। যদি কিছু তাঁর কাছে জানাবার থাকে তা আমি নিজেই জানাতে পারবো।"

জেলার সুরেন বাবু এইবার এগিয়ে এসে বললেন, "বেশ, তাই ভালো। এক্সিকিউটার, ঘাতক।"

এক্সিকিউটার বা ঘাতক নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। এইবার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সে একটা কালো টুপি দিয়ে খোকার চোখ-মুখ ঢেকে দিয়ে গেলো। অপর আর এক জন এসে তার হাত দু'টো পিছন দিক থেকে বেঁধে দিয়ে গলায় দড়ির ফাঁসটা গলিয়ে দিয়ে বেঁধে দিলে।

হঠাৎ এক জন অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, "রেডিই, ওয়ান টু থ্রি।" ঘড়াং, খট্-খট্-খটাস্। স-র-র ঝপ্। "থ্রি" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক সংলগ্ন হ্যাণ্ডেলটা টেনে দিলে। খট্-খট্-খটাস করে প্ল্যাটফর্মের তক্তাটা নেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে স-র-র করে খোকা তার গলার দড়ি সমেত পাতালের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আওয়াজ হলো—ঝপ্, ঝপ, ঝি-র-র।

দূর থেকে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, দড়িটা কিছুক্ষণ নড়ে নড়ে সোজা হয়ে থেমে গেল! দড়ির কম্পনের গতি লক্ষ্য করে প্রণব বাবু বুঝলেন, সবই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কানুন মত আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করা দরকার। প্রণব বাবু চোখ বুজিয়ে খোকার জন্যে বহুক্ষণ ধরেই প্রার্থনা করলেন। এরও কিছু পরে আদেশ পেয়ে কপিকলের সাহায্যে ঘাতক খোকার দেহটা উপরে তুলে আনলে দেখা গেল খোকার গলাটা প্রায় আধ হাত-টাক লম্বা হয়ে গেছে।

প্রণব বাবু তাঁর প্রিয় বন্ধুটির দিকে আর তাকাতে পারছিলেন না। দেহটা ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে শবাগারে পাঠাবার পূর্ব্বেই প্রণব বাবু স্খলিত পদে জেলের পাঁচিলের এপারে এসে দাঁড়ালেন।

প্রণব বাবুর জীপ গাড়ীখানা ড্রাইভার কোন জায়গায় দাঁড় করিয়েছে তা খুঁজে নেবার জন্যে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর পুরাতন বন্ধু ব্যারিষ্টার সেইন এক জন ভদ্র-মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ট্যাক্সি থেকে নেমে আসছেন। অবাক হয়ে প্রণব বাবু ভদ্র-মহিলার দিকে চেয়ে দেখলেন। ব্যারিষ্টার সেইন প্রণব বাবুকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যালো, প্রণভ, হ্যালো। আরে এসো এসো আমার বাল্যবন্ধু প্রণভের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বাল্যবন্ধু প্রণভ, পুলিশ ইন্সপেক্টার। আর ইনি হচ্ছেন আমার বাগদত্তা মিস্ হেনা দত্ত। শীঘ্রই আমাদের বিবাহ হচ্ছে হে! আমরা এনগেজ্‌ড্।"

প্রায় দেড় বৎসর হলো, হেনা দত্তর সঙ্গে প্রণব বাবুর দেখা হয়নি। এই দেড় বৎসর যাবৎ এই মামলা নিয়ে প্রণব বাবু এমনই ব্যস্ত ছিলেন যে কারও সঙ্গে দেখা করবার মতো তাঁর ফুরসৎই ছিল না। হেনাকে এই ভাবে এখানে দেখবেন প্রণব বাবু তা কল্পনাই করেননি।

হৃৎকম্পন থামিয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তা বেশ বেশ। খু-উব ভালো কথা, কিন্তু এখানে কেন?"

উত্তরে সেইন সাহেব বললেন, "আর বল কেন ভাই, ইনি কখনও ফাঁসী দেখেননি, কেই বা আর তা দেখেছে। এখান এঁর সখ মেটানই চাই। তা এখানকার জেলার হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু, তাই তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেই এঁকে এনেছি।"

হেনা দত্তর দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল যে! ফাঁসীর আসামী তো মাত্র একটাই, আর ফাঁসীও তার হয়ে গেল। কি-ই বা আর দেখবে? যাও যাও, ওঁকে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।"

প্রণব বাবুকে এখানে এসে দেখতে পাবেন, হেনা দত্তও তা আশঙ্কা করেননি। এক রকম আড়ষ্ট হয়েই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ দিয়ে তাঁর একটি কথাও বার হয় না।

প্রণব বাবুর কথা শুনে সেইন সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, "আরে, এতো শীগ্‌গির, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তা হলে? আচ্ছা, প্রণভ ভাই, তুমি হেনার কাছে একটু দাঁড়াও, আমি ততক্ষণে জেলর বন্ধুটিকে বলে আসি, আমরা এসেছিলাম, কিন্তু চলে যাচ্ছি। ডোণ্ট মাইণ্ড।"

সেইন সাহেব জেলের পাঁচিলের ওপারে অন্তর্হিত হলে হেনা দেবী ধীরে ধীরে মুখ তুলে প্রণব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালো আছেন?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "ভালো আছি। আর আপনি? খবরটা শুনে আমি সুখীই হলাম। কিন্তু, আমাকে তো একটা খবরও দিতে পারতে?"

একটু 'কিন্তু কিন্তু' করে হেনা দেবী উত্তর করলেন, "ওঃ, কিছু নয়। এমনি একটা কথা উঠেছে মাত্র। শুনুন, সন্ধ্যার দিকে যাবেন না একবার আমাদের বাড়ীতে, বাবা আপনাকে দেখলে খুব খুসী হবেন, সত্যি যাবেন! যাবেন তো? না না, যেতে হবেই আপনাকে। না গেলে, কিন্তু—"

প্রণব বাবু হাঁ বা না, কোনও কিছুই বললেন না। দূর হতে সেইন সাহেবকে ফিরে আসতে দেখে প্রণব বাবু বললেন, "আচ্ছা, চললাম আমি।" তার পর আর কোনও দিকে দৃকপাত না করে জীপে উঠে প্রণব বাবু হুকুম করলেন, "চলো জলদী, ডিস্ট্রিক্ট অফিস।"

প্রণব বাবুর আর থানায় ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। অবসাদগ্রস্ত দেহ ও মন নিয়ে আর কাজ করাও সম্ভব ছিল না। তিনি এইবার ছুটি চান। ছুটি নেবার জন্যে সোজা তিনি হেড্ কোয়ার্টারে চলে এলেন। এতো দিন পর সত্যই আজ প্রণব বাবুর ছুটি নেবার সময় হলো।

এর পরও কতো বছর কেটে গেছে। খোকা বাবু আজ নেই। সুন্দরী উজ্জ্বলাও কয়েক বৎসর হলো গত হয়েছে। কিন্তু উত্তর-কোলকাতার ঘরে ঘরে এদের কাহিনী আজও আলোচিত হয়। যে গলিটায় পাগলাকে হত্যা করা হয়েছিল, জনসাধারণ আদর করে তার নাম দিয়েছে, গলা-কাটা গলি।

কেউ কেউ এ-ও বলে থাকেন যে, পাগলার বিগত আত্মা এখানও সেখানে ঘোরা-ফিরা করে। এমন লোকও আছেন যাঁরা স্বচক্ষে তার গলাখোলা মূর্ত্তি দেখেছেন। এই মূর্ত্তি দেখে কেউ কেউ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়েও পড়েছেন। পুলিশের সিপাইরাও না কি এই জন্যে এক জন জুড়ীদার সঙ্গে না নিয়ে ঐ জায়গায় রাতে ডিউটিতে যেতে আজও সাহসী হয় না।

নিহত পাগলাকে ঐ জায়গায় দেখা গেলেও, খোকা বাবুকে কিন্তু কেহ কখনও ঐ স্থানে আর দেখেনি। অথচ উভয়েরই অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই কথার কি কোনও উত্তর দিতে পারেন?

সমাপ্ত

সন্ধান

চিত্রগুপ্ত

ছোটো বড়ো মুখে ছোটো বড়ো কথা
অনেক শুনেছি কাণে
অর্থ কি বুঝিয়াছি ?
কে বলিয়া দিবে মোরে ?

কত মনীষীর কত বিভিন্ন মত
খুঁটিয়া খুঁটিয়া মগজেতে জড়ো করি'
সত্যেরে তার মাঝখান হ'তে
চিনিয়া বাহির করা—
সম্ভব কভু তাহা ?

পেয়েছি জানিতে সত্য সে কোন্‌খানে ?
মুখে যতো কথা বলি সে কি মোর মত ?
সত্যের সাথে হিসাব মিলায়ে
ব'লে থাকি সেই কথা ?
সত্যের কোথা খোঁজ ?

নানা মানুষের নানা মতবাদ
মগজেতে ভিড় করি'
'তারস্বরেতে' করিতেছে কোলাহল ;
সকলেরই দাবী একটা কিছুর
খবর বলিতে পারে,—
চরম সত্য কোথায় লুকানো থাকে—
সে-কথা সে-শুধু—শুধু না কি সেই জানে।

যে যার কথায় নিজে মশ্‌গুল্—
প্রচারিতে নিজ মত ;
যুক্তি-বর্ম 'আষ্টে-পৃষ্ঠে' মুড়ি'
ক'সে পাঁয়তারা যে-যাহার মত
নামাইছে চিরকাল
মল্লভূমির পরে।

মতে মতে শুধু ধাক্কা লাগিয়া
জন্মিছে মত্ততা।
দুই মতে যবে দ্বন্দ্ব-মাতনে
মল্ল-যুদ্ধ চলে
আমি বিহ্বল দর্শক শুধু
দুয়েরে তারিফ করি
সত্য, সে রয় দূরে ;
চারি পাশে নিজ টানি অভেদ্য
রহস্য-যবনিকা
আড়ালে আড়ালে সত্য থাকিয়া যায় ;
নাগাল-বাহিরে আত্ম-গোপন করি'
হাসে শুধু খল্ খল্
কৌতুক-ভরা হাসি।

'সবার উপরে মানুষ সত্য'
ভারী জমকালো কথা—
বলে গেছে মহাকবি—
কথাটা লেগেছে মনে !
বিচারিয়া দেখি জীবযাত্রার
নাহি শেষ কোন দিন
যুগের পরেতে যুগ চলিয়াছে
একের পরেতে আর
সকল যুগেই মানুষ ছিল ও রবে।
কত ধ্বংসের কত মৃত্যুর সংঘাত
সহি' আজো
ধরণীর পিঠে মানুষ বাঁচিয়া আছে ;—
সবার উপরে মানুষ সত্য
কথাটা লেগেছে মনে।

তবু সন্দেহ মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে
মানুষ টিঁকিয়া আছে
শুধু সেই গুণে সবার উপরে
মানুষ সত্য হোলো ?
আর সবি তবে অলীক জগতে
বাষ্প ও কল্পনা ?
এক শতকও টিঁকে না যাহার
নশ্বর দেহখানা
সে কিসে সত্য হোলো ?
"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"—
কথাটার আছে অর্থ গভীরতর !
মানুষ সত্য বলিতে অন্য আর যত সম্পদে
সমৃদ্ধ ধরা—সে সব তুচ্ছ
করিতে চাহেনি কবি।
সমাজ-শাসন, জাত্যাভিমান
এই সবে মিলে শেষে—
ছোটো করে মানুষেরে
অবমান করে মনুষ্যত্ব তার ;—
গভীর ব্যথার সমবেদনায়
তাই কবি কহিয়াছে—
সমাজের চেয়ে, সমাজ গড়েছে যে
মানুষ সেই বড়ো।

তা'হলেও তবু এ কথা ভোলা না চলে—
কেবল মানুষে এ ধরা পূর্ণ নহে।
মানুষ যখনো আসে নাই পৃথিবীতে
আদিম কালের সেই সে প্রভাত হ'তে·
বিহগ-কাকলী ধ্বনিতেছে অহরহ—
মোমাছি আর পিপীলিকা-কুল
এরাও প্রাচীন অতি
এরা নহে মিছা মায়া।
মিছা মায়া নয় আর যত জীবকুল
আছে যারা পৃথিবীতে,
খেচর ভূচর জলচর প্রাণী অচর বৃক্ষলতা
ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জীব, আর—
কীটাণু জীবাণু দল।
লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া জীবন টিকিয়া আছে
কোটি কোটি জীবদেহে—
জীবন হেলার নহে—
মৃত্যুর সাথে 'পাল্লা' করিয়া জীবন
জিতিয়া যায়
মরণে জিনিয়া জীবন আজিও টিকে
রহে গৌরবে
কোটি কোটি জীবদেহে—
কে করে অস্বীকার ?
এমন জীবন, সেও তো সত্য তবে।
'সবার উপরে মানুষ সত্য' কথাটার
পরিধিরে—
আরো কিছু তবে বাড়াইয়া নিয়া যেন
নাহি বলা যাবে
সবার উপরে জীবন সত্য
তাহার উপরে নাই ?

জীবন কাহারে কহি ?—
হাঁড়ির ভিতরে শুক্‌নো ছোলা তো
জড় ছাড়া কিছু নয়—
বছর বছর রোদে ফেলে রেখে, পরে,—
একদা তাহারে জলেতে ফেলিয়া দাও
জীবন তাহার প্রকাশিবে খোলা ফেটে
জড়ের মাঝারে সমাহিত ছিল প্রাণ !
প্রকাশিত হোলো কি দারুণ বেগে
স্পন্দিত মহিমায়
অঙ্কুর আশ্রয়ে !
নানা ধাতু আর জড় প্রস্তর যত
গবেষণাগারে পরীক্ষা দিয়া
প্রমাণ করিল যারা—
স্পন্দন জাগে তাদেরো শরীরে
তারা কিসে ছোটো হবে ?

জড় বা কাহারে কহি ?
রাসায়নিকের গবেষণাগারে আজন্ম
পরিহরি'—
নিয়তই দেখি ক্রিয়াশীল যারা সবে
জড় কেন তারা হবে ?

যোগনিদ্রায় স্তম্ভিত ঋষি সমাহিত
রহে যবে—
সে কভু তো নহে জড় ?

কাঠের মাঝারে অগ্নি লুকায়ে রহে ;
সূর্য্যের তেজ বন্দী কাঠের মাঝে—
পুড়িয়া যখন ক্ষয় হবে শুধু
তখনই মানিব তারে
অন্য সময়ে নহে ?
সংযমডোরে পুঞ্জ পুঞ্জ শক্তিরে
বেঁধে বেঁধে,
কেন্দ্রিত করি' তীক্ষ্ণ তীব্র তেজ,—
সঞ্চিত রাখে যারা—
তাহারা সবাই জড় ?

বাঁধন ছিঁড়িয়া যবে
ব্যয়ে আর ক্ষয়ে প্রতিভাত
হয় তেজ—
তখনই কি শুধু তেজ বলি তারে
স্বীকার করিব মোরা ?
অন্য সময়ে নহে ?
ক্ষয়িষ্ণু হ'লে তবে সেই তেজ ?
সঞ্চিতরূপে নহে ?

পুনঃ বেধে যায় গোল—
জড়ে ও জীবনে তফাৎ কোথায়
নির্ণীত করিবার—
শক্তি থাকে না মোর।
সঞ্চয়-সাধনায়—
মাটীর ভিতরে আত্ম-গোপন করি'
হাজার হাজার বছর ধরিয়া তপস্যা
করে কাঠ—
কত উত্তাপ কত না চাপের তীব্র
বেদনা সহি'
অঙ্গার-রূপ লভে—
তারো পরে তার সাধনা চালায়
কঠিন সমাধি মাঝে—
আরো সুতীব্র চাপে উত্তাপে সাধনা
নিবিড়তর—
লভে সে হীরক-রূপ।
বহু-বেদনায় লব্ধ সিদ্ধি-সঞ্চয়-সাধনায়
পুঞ্জিত তার তেজেরে তখন টুটাতে
পারেনা কেহ
ভারী হাতুড়ির প্রচণ্ডাঘাত ব্যর্থ
তাহার কাছে।
সঞ্চিত তেজ হের ?

পুনঃ বেধে যায় গোল—
জড়ে ও জীবনে তফাৎ কোথায়
নির্ণয় করিবার
শক্তি থাকে না মোর।
জীবের জীবনে প্রকাশিত যেই তেজ
জড়ে সঞ্চিত সেই
তফাৎ কোথায় তবে ?
'সবার উপরে জীবন সত্য'
বলিতে বাধিয়া যায়,—
জড়ে ও জীবনে তফাৎ করেছি ব'লে।

জড়ে ও জীবনে তফাৎ বিশেষ নাই
তেজ সে আধেয়, উভয় আধার তার।
সংহত কিবা বাঁধন-মুক্ত শক্তির পরকাশ
জড়ে ও জীবনে উভয়েরি মাঝে দেখি
গতি আর স্থিতিরূপে ;
উদ্দীপনা ও উৎসাহ যাহা জড়ে ও
জীবনে রহে
জড়ের দেহে যে বস্তু-কণিকা দৃঢ়-নিবদ্ধ, আর
জীবকোষগুলি জীবদেহে ক্রিয়াশীল।
তাদের শক্তি-রহস্য যে বা জানে
তার কাছে এর অর্থ পরিষ্কার
তেজের প্রকাশ ইহা
তেজ ছাড়া কভু সম্ভব নাহি হোতো।
তাই মোর মন বলিয়া উঠিতে চাহে,
"সবার উপরে তেজ সে সত্য
তাহার উপরে নাই!'

এখানেই তবে শেষ ?
তেজের উপরে আর কিছু নাই, ঠিক ?
অনন্ত মহাব্যোম ?
তেজের উপরে কিছু না রহিলে
ব্যোম সে কোথায় রবে ?
তেজেরে আবরি প্রকট সত্য ব্যোম—
ব্যোমেরে পৃথক করিয়া কেন বা দেখি ?
তেজের পরেও ব্যোম সে সত্য
এ কথা কেন না মানি ?

প্রজ্ঞা-আলোকে দেখেছিল ঋষিকুল,
জগৎ ব্রহ্মময়।
এ কথা বুঝিতে অসুবিধা কেন আর—
সবার উপরে ব্রহ্ম সত্য তাহার
উপরে নাই ?
ব্রহ্ম সত্য, আর সবি মায়া
এ বিশ্ব-চরাচরে

দর্শনে ঘ্রাণে স্পর্শে শব্দে স্বাদে—
পাঁচ ইন্দ্রিয়ে যাহা কিছু অনুভূত
তাহারা সত্য নহে—
মায়াবাদী জ্ঞানী—বলেছে দার্শনিক
এ কথাই তবে ঠিক ?

এ কথা মানে না মন ;
জগৎ ব্রহ্মময় !
ব্রহ্ম সত্য হইলে জগৎ ?
সেও ত সত্য তবে !
এক তিনি, তাঁর বহুতে প্রকাশ—
সত্য এ চরাচর
এ বিশ্বে তবে সকলি সত্য ;
মিথ্যা কিছুই নহে।

সকলি সত্য যদি—
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তাহ'লে কিসের তরে ?
হিংসায় প্রেমে ভালোয় মন্দে
পাপে ও পুণ্যে তবে
তফাৎ কোথায় রবে ?
বহু মনীষীর বিভিন্ন মত শেষে
ব্রহ্মে পেয়েছে লয়।

কারো কথা টিকিল না।
জগৎ আপন প্রবাহে বহিয়া চলে।
যুগে যুগে যত দার্শনিকে ও
চিন্তা-বীরেরা মিলি
নিজেদের কথা শুনাইল বারে বারে
বিশ্বের যত মানব-শাবকে ডাকি,
সকলি ব্যর্থ তাই।
অহিংসা আর বিশ্ব-প্রেমের
মাধুরীর স্রোতোধারা
মধুর করিতে পারিল না সংসার।

মহাকাল নহে তৃপ্ত মাধুরী রসে—
সকল রসের সব আস্বাদ
তাহার রসনা মাগে।
তাই সংসার বিচিত্র রূপে রচা।
বহু-ব্যঞ্জনে রচিত বিশ্ব তাই।
চিরকাল ধ'রে দেবে ও দানবে মিলে—
মথিয়া চলিবে সৃষ্টির পারাবার।
চিরকাল ধ'রে উঠিবে তা' হ'তে ভেসে
অমৃত ও বিষ একই সাথে বারে বারে—
দেবতারা লবে অমৃত-ভাণ্ড টানি'
মহাকাল শুধু বিষপান করি
করিবে কণ্ঠ নীল।

শুনেছি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিছে শুধু
বিষ্ণু তাদের পালন করিছে স্নেহে
সে না কি শুধুই মহাকাল-মুখে
আহুত হবার তরে।
সৃষ্টি লয়ের মাঝখানে রয় স্থিতি?
স্থিতি সে কোথায়? জগৎ যে গতিশীল!
সৃষ্টি হইতে লয়ের কবল পথে
যে-গতি তাহার স্থিতি তো তাহারি নাম!
এ জগৎ মাঝে জীব-প্রবাহের
অদ্ভুত ইতিহাস!
পাতায় পাতায় মৃত্যুর জয়গান!
গ্রাসিতে সকলি মহাকাল শুধু—
নিত্য জাগিয়া রহে

বিস্তৃত করি' মুখ—
সে মুখের মাঝে অন্ধ গুহায়
গোপন বিশ্বরূপ
অন্ধকারেতে নিজেরে ঢাকিয়া রাখে;
যুগে যুগে যত যোগী-তপস্বী—
রহস্য-সন্ধানী—
নয়ন মুদিয়া সে আঁধার পানে চাহি'
পেল কিছু সন্ধান?
অব্যক্ত সে বিশ্ব-রূপের ধারা?
বাঁচিবার তরে পরস্পরেতে
চলে যতো হানাহানি
সে বাঁচার শেষ পরিণাম শুধু
আঁধারে বিলীন হওয়া!

সূর্য্যের চেয়ে কোটি গুণ আলো
করিয়াও বিকিরণ
কোটি জ্যোতিষ্কে যে তমঃ
নাশিতে নারে,
সে নিবিড় কালো—সে মহা কৃষ্ণ
রহস্যে ঢাকা রবে
ধরা সে দিবে না কভু!
চেষ্টা ছাড়িয়া তাঁরে তাই করি
আত্ম-সমর্পণ।
তাঁরই মাঝে লয় হোক্
আজি মোর
সত্যের সন্ধান—
বহু মনীষীর বহু মতবাদ-সহ।

বাস্তুত্যাগী সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গ বহু কাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদেরও তীর্থস্থান। চৈতন্যদেবের লীলাভূমি; কালীঘাটের কালী; তমলুকের বর্গভীমা ছাড়াও বীরভূমের চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি কবিগণের বাসভূমি বহু আদৃত। পবিত্র গঙ্গাস্নান যে কোনও হিন্দুর একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই অন্ততঃ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একবার কলিকাতা আসিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কলিকাতা কালীঘাটে অথবা নৈহাটিতে সম্পন্ন করা প্রচলন আছে। অস্থি বিসর্জ্জনও কম কথা নহে, তবে সেই উপলক্ষে অন্ত কাহারও সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দু মাত্রেরই ভিন্ন প্রদেশ বা বিদেশ নহে। যে কোনও দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, প্রকৃত ব্যবধান উভয় বঙ্গে নাই বলিলেই চলে, কিন্তু অর্থ নৈতিক কারণে উভয়কে পৃথক্ রাখিতে ব্যর্থপ্রয়াস চলিতেছে। সমাধান কোথায় এবং সূত্র কি, তাহা অজ্ঞাত। গ্রাম্য জীবনধারার সহিত পরিচয় থাকায় যতটা সম্ভব কাঠামো নির্ম্মাণ করিয়াছি, সমর্থন পাইলে শাখা-প্রশাখা বিস্তারে পূর্ণ চিত্র পরিবেশন করিতে প্রয়াস পাইব।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সাধারণতঃ ভাষার দিক্ দিয়া উন্নত এবং নবদ্বীপ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্থানের ভাষা—যেমন ২৪ পরগণা; মেদিনীপুর; হাওড়া; হুগলী; বীরভূম; বর্দ্ধমান: অথবা বাঁকুড়া বহুলাংশে পৃথক্ এবং নিকৃষ্টতর। কথার মধ্য দিয়া এইরূপ আঞ্চলিক ব্যবধান নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর। উচ্চারণে শুদ্ধ ভাষার বহু ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও শ্রুতিমধুর বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণ-বিভিন্নতা তীব্রতর। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার সহিত মেদিনীপুর কাঁথি অঞ্চলের ভাষায় উচ্চারণ-পার্থক্য খুব বেশী, কিন্তু ঢাকা অঞ্চল হইতে বরিশালের ভাষা উচ্চারণ-পার্থক্য ততোধিক। ঢাকা চট্টগ্রাম বিভিন্নতা কি ঢাকা ময়মনসিংহ বিভিন্নতাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশেষ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভাষাতে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্যে শুদ্ধ ভাষাকে কথ্য ভাষায় রূপান্তর পশ্চিমবঙ্গেই অধিক। কি কারণে এরূপ ভাষার পার্থক্য হইয়াছে তাহা আলোচ্য বিষয় নহে বা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা প্রকাশ করাও সম্ভব নহে। উচ্চারণ-বৈষম্য পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর হওয়ার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নদ-নদী দ্বারা বহুধা বিভক্ত। ভাষার দিক দিয়াই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যবধান অধিকতর। উভয় ভাষাই বাংলা ভাষা কিন্তু উচ্চারণ-বৈষম্যে তীব্র পার্থক্য লক্ষিত হয়। বহু কাল যাবৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত চলিতেছে কিন্তু ভাষার পার্থক্য এক ভাবেই চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে লোকসংখ্যা ও যাতায়াত পশ্চিমবঙ্গ হইতে অধিক। পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও স্থানে পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক দৃষ্ট হইবে কিন্তু ভাষা-বৈষম্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বহু পরিবারে উভয় বঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিলেও ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বিশেষত্ব এই, কোনও পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক পশ্চিমবঙ্গের লোকের নিকট মনোভাব প্রকাশ করার সময় সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু কোনও পশ্চিমবঙ্গীয় লোকের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাষা পূর্ব্ববঙ্গীয় জন-সাধারণের সহজবোধ্য।

আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এ কথা দৃঢ় ভাবে বলা চলে যে, সুদূর পল্লীগ্রামে কি পশ্চিমবঙ্গ কি পূর্ব্ববঙ্গ উভয় স্থানে একই রূপ। ভাতে ভাত কি সিদ্ধ ভাত শব্দের পারিপাট্য মাত্র। রূপান্তর বৈষম্যশূন্য। পান্তা ভাত পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন। অনুকরণের তারতম্য ভেদে লোক-বিশেষের প্রিয় অপ্রিয় হইয়া থাকে। হরি-সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যাদীপ, শিশুদের হাঁক-ডাক, চীৎকার, খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ, পূজা-পার্ব্বণ, উপবাস উভয় বঙ্গে পার্থক্যহীন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের চাল-চলন আচার-ব্যবহার পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক্। হিন্দু ও মুসলমান চিহ্নিত করা পূর্ব্ববঙ্গে কেবল মাত্র

মুখাবয়ব ও পরিচ্ছদেই নিশ্চিতরূপে, নির্ভুল ভাবে এবং অনায়াসে সম্ভব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অতীব কষ্টসাধ্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ হইতে অধিক এবং শিক্ষার প্রসার পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর। এই কারণেই বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-জাগরণ পূর্ব্ববঙ্গে অধিক (ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের নিকট ভূতপূর্ব্ব লাট কেসীর চিঠি—স্বাধীনতা পত্রিকা পূজা-সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শিক্ষার ধারা উভয় বঙ্গে অভিন্ন। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারাই শিক্ষা পরিচালিত হইত। পাঠ্য পুস্তক কি পরীক্ষা, সকলই একই ধারায় চালিত হইত, তথাপি বহু ছাত্র পশ্চিমবঙ্গে কলেজে এবং হোষ্টেলে স্থান লইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। মোটের উপর ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে, বহু সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্বান্ মনীষীর সংখ্যা নগণ্য। সংখ্যা নগণ্য হইলেও শিক্ষাদান পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক। যে কয়েক জন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের একক দান বিরাট স্তম্ভস্বরূপ বিরাজমান। চতুষ্পার্শ্বের সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া তাঁহারা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। প্রদীপের আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থান নিতান্ত নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষার দিক দিয়া উভয় বঙ্গের পার্থক্য ধর্ত্তব্য নহে।

আর্থিক অবস্থাতে উভয় বঙ্গের মধ্যে কতক পার্থক্য রহিয়াছে সত্য কিন্তু ধর্ত্তব্য নহে। কলিকাতা মহানগরী এই জন্ম দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের ম্যালেরিয়া, জমির অনুর্ব্বরতা একই কারণ হইতে উদ্ভূত। লোকসংখ্যা গ্রামে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনো পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম অঞ্চলে বহু জমি রহিয়াছে, যাহার বাজার-মূল্য ২০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে সম-পরিমাণ ভূমির মূল্য অন্ততঃ দশ গুণ হইবে। ইহার কারণ, জমির চাহিদা। গ্রামে বাস করিতে হইলে যে সকল অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহার অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গে অভাব রহিয়াছে। অনাদৃত পল্লীগ্রামে একমাত্র ম্যালেরিয়া যে কোনও পরিবারকে দেশত্যাগী করিতে অতীব অল্প সময়ের মধ্যেই সক্ষম। সমাজ-শৃঙ্খলা অল্পই দৃষ্ট হয়, ফলে একতার অভাব অধিকতর বিস্তৃত। এই সকল কারণে সমৃদ্ধিশালী কলিকাতা শহর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, একটি নূতন পল্লী সৃজন ভিন্ন পশ্চিম-বঙ্গে বাস করা সম্ভব নহে। এক কালে যে স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল, একমাত্র ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে তাহা বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়া দেশের ও সমাজের অঙ্গে বিষ ছড়াইতেছে। ইহাতে কেবল মানবিক ও মনোবৃত্তির পরিণতি লাভ, বা শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই তাহা নহে, আর্থিক অবনতিও বহু পরিমাণে ঘটাইয়াছে। গ্রামে চাষী না থাকিলে চাষ করিবে কে? বন-জঙ্গল সাফ করিবে কে? শেষ পর্য্যন্ত চাষীর সঙ্গে আমাকেও দেশত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, ম্যালেরিয়া রাজা প্রজা ব্যবধান করিতে সক্ষম নহে। পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া যথেষ্টই আছে কিন্তু লোক-সংখ্যা ও জমির উর্ব্বরতা ও চাহিদা থাকায় গ্রামের লোকসংখ্যা অধিক এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ী—যেমন ডাক্তার, কবিরাজ ইত্যাদির সংখ্যাও অধিক। স্কুল, হাট-বাজারের সংখ্যাও অল্প নহে। নদীবহুল স্থান বিধায় প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক আবর্জ্জনা দূরীভূত হইতেছে ও সাধারণ স্বাস্থ্যও অধিকতর ভাল। ফলে পূর্ব্ববঙ্গীয় কৃষকের আর্থিক অবস্থা পশ্চিমবঙ্গীয় কৃষক হইতে তুলনায় অধিকতর উন্নত। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর কি ২৪ পরগণা ডায়মণ্ড-হারবার সাব ডিভিশন অঞ্চলের মথুরাপুর ইত্যাদি আবাদি অঞ্চলে ধান্য প্রচুর হয় বটে, কিন্তু বৎসরে একবার এবং একই জমিতে বিভিন্ন ফসল করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু, বীরভূম অঞ্চল বালুকাপ্রধান স্থান তথায় ফালা ব্যবহার করা ভিন্ন উৎপাদন অসম্ভব। হাওড়া, হুগলী কি কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ অঞ্চলের মাটি কি নবদ্বীপ জেলার মাটি যে কোনও পূর্ব্ববঙ্গীয় মাটি হইতে তুলনায় ভাল না হইলেও খারাপ হইবে না, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু স্থান অনাদৃত, অনাবাদী ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। হয়ত জমির মালিক শহরবাসী। গ্রামের লোকের শহরবাসী হওয়াতে ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না যদি গ্রামের বাড়ীটি উপযুক্তরূপে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিত। আমার বাড়ীর জঙ্গলাতে যে প্রতিবেশীর ক্ষতি হইতে পারে তাহা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিলে বিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ নিজেকে বাঁচাইবার জন্যও পূর্ব্ববঙ্গীয় লোক বসতি করাইতে হইবে, তাহা না হইলে অদূর ভবিষ্যতে জনবিরল পল্লীগ্রাম জনশূন্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পল্লীর কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠে শহরগুলির অবস্থাই শোচনীয় হইতেছে। বারুইপুর শহর বর্ত্তমানে অর্দ্ধেকের বেশী জনশূন্য। পশ্চিমবঙ্গের দাবী হিন্দু তীর্থস্থানে সম ভাবে বিদ্যমান। তাহাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অভিন্ন, তথাপি ঘটি-বাঙ্গাল বোধ কেন? এরূপ মনোভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের লোক ঘরে বসিয়া থাকিবে আর পূর্ব্ববঙ্গের লোক পৃথিবী ঘুরিয়াও বোকা বা বাঙ্গাল আখ্যা লাভ করিবে কেন? কলিকাতা শহরের লোক-গণনা হউক, দেখা যাইবে শতকরা ৭০ জন লোক পূর্ব্ববঙ্গীয়। কেহ বাড়ী ছাড়িয়া আছেন, কতক চাকুরী-স্থলে আছেন, কতক ব্যবসা-স্থলে আছেন, আর কতক ভ্রমণবিলাসী, তবু তাহাদের বাঙ্গাল বলে কেন? যে কোনও প্রতিযোগিতায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিভা উৎকৃষ্টতর। পূর্ব্ববঙ্গের লোক পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি বাঙ্গাল ইহাদিগকে বলিবেই। পূর্ব্ববঙ্গের লোকও ঘৃণাচ্ছলে 'ঘটি' ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ করে। এই দুইটি কথার সৃষ্টি কেন, আর তাৎপর্য্য কি? শব্দ দুইটি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে ব্যবহার করা হইতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এক-প্রকার সংক্ষিপ্ত নামকরণে দাঁড়াইয়াছে। 'ঘটি' অর্থে পশ্চিমবঙ্গীয় লোক আর 'বাঙ্গাল' অর্থে পূর্ব্ববঙ্গীয়। লোকের আলোচনা কালেও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে জন্মস্থান নির্দ্দেশে 'ঘটি' কি 'বাঙ্গাল' প্রশ্নাদি উত্থাপিত হয়। মোট কথা, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শব্দদ্বয় গৃহীত হইতেছে। শ্লেষের ভাব কিন্তু তিরোহিত হয় নাই। গালাগালিতে কি উত্তপ্ত আলোচনায় যেরূপ পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ সামাজিক চাল-চলনে কি চায়ের বৈঠকে উহা সম ভাবে উচ্চারিত হইতে দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঘটি শব্দ বাঙ্গাল শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। 'বাঙ্গাল' অর্থে যেমন বোকা, তেমন 'ঘটি' অর্থে স্থবির। পশ্চিমবঙ্গীয় লোক পূর্ব্ব-বঙ্গের লোককে এক কথায় বলিবে বাঙ্গাল—অর্থ ওহে

অর্ব্বাচীন! তোমার বুদ্ধি কিছু মাত্র নাই। তুমি দেশত্যাগ করিতেছ, বিদেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা তোমার গ্রাহ্য নহে। তুমি ভুল বুঝিয়া হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছ। পূর্ব্ববঙ্গের লোক তদ্রূপ প্রত্যুত্তর করিতেছে যে, তুমি কি বুঝিবে? তোমার পেটে বুদ্ধি মাত্র নাই—তুমি ঠন্ ঠন্ কর আবার সময় সময় জলঘটি সাজিয়া মঙ্গল-ঘটের নামে অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া থাক। পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হইলে উভয় পক্ষের উপদেশ মূলতঃ এক। বর্ত্তমান সমস্যার দিনে শব্দদ্বয় ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। উভয় বঙ্গই বাঙ্গাল সাজিয়া বসিয়া আছেন, আবার উভয়ই অমঙ্গলের ঘটি। কে কাহাকে দোষারোপ করিবে? বুদ্ধির কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও উভয়ই ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছে, এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ঘৃণ্য উপায়ে একতা সৃষ্টির জন্য অথবা ঘৃণা উদ্রেক করার জন্য শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দার্থের যথার্থ রূপ মিলনসূচক।

অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা কি সংস্কৃতি সম্পূর্ণ উভয় বঙ্গে সমস্যা সম ভাবে বিদ্যমান। একই উপায়ে খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হইতেছে আর সম ভাবেই জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরিবেশন চলিতেছে, তথাপি এক অপরের উপর শ্লেষপূর্ণ ইঙ্গিত কেন? যে কারণে পূর্ব্বে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা বিদ্যমান নাই। আমার যখন অশান্তি থাকে তখন তোমাকে শান্তি পাইতে বিঘ্ন ঘটাইব, ইহাই স্বাভাবিক মানব-প্রকৃতি। মানুষ ভাল মন্দ বিচারে দেখা যায় তিনিই ভাল মানুষ অর্থাৎ যিনি শান্ত ধীর স্থির, যাহার অভাবের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম। আমার যতক্ষণ অভাব থাকিবে আমি ভাল মানুষ কখনই হইতে পারি। আমার চাকুরী নাই, তুমি চাকুরী কর—পয়সা উপার্জ্জন কর—সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক—তোমাকে আমি ভাল বাসিব না, তাহা ধরিয়া লইতে পার! তোমাকে গালি দিব, তোমাকে গোলাম বলিব, তোমার কি করিব, তাহা নিয়াই আমি রাত্রি জাগরণ করিব। কিন্তু সমস্যা যখন এক, তোমারও নাই, আমারও নাই, তখন আর এই দ্বন্দ্ব কেন? সমস্যা লোককে নিকটে টানিয়া লয়, আবার অজ্ঞতা দূরে ঠেলিয়া দেয়। একটা সমস্যা সম্মুখে ফেলিয়া দাও—দেখিবে সমান ভাবে যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা একতাবদ্ধ হইতেছে সমস্যা দূর করার জন্য। সেইক্ষণে শত্রুতাবোধ নাই, স্বজাতি-বিরোধ নাই। যখন দেখিব, তোমাকে এক দল লোক মারিতে আসিবে আর সে আমাকে পাইলেও ছাড়িয়া দিবে না, তখন তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, অভিন্ন। অবশ্য নেহাৎ গায়ের জোরে মিলন ঘটাইলে এটুকু বিকার থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বে তুমি মর, পরে আমি অগত্যা মরিব। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যোগদান কেবল সমান অভাবেরই জন্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তুমি সক্রিয় ভাবে যোগদান কর আমি না হয় সমর্থন করি, প্রভেদ এই মাত্রই। জীবন বাঁচাইবার জন্য নানা ভাবে নানা দেশ হইতে কতই না কারণে মানব-স্রোত চলিতেছে। সর্ব্বহারাদের মিলন ঘটাইয়াছে সেই একমাত্র কারণে যাহা সম ভাবে বিদ্যমান। মিলন যেখানে ঘটে না সেখানে দেখিতে হইবে যে, সমস্যার কোনও যোগসূত্র আছে কি নাই। এমনও হইতে পারে যে, আমার অভাব আমি বুঝিতে পারি না—অপরে আমার চক্ষু খুলিয়া ধরিলে আমি চাহিয়া দেখিব, নচেৎ নয়। ভয় এবং বিশ্বাসও কম কথা নয়। তুমি আসিয়া আমার চৈতন্যোদয় করিলে কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি কেন আসিয়াছ নিঃস্বার্থ ভাবে নেহাৎ পরোপকার লইয়া? তোমার কথায় আমাকে নূতন পথে চালিত করিব কেন? এই বিশ্বাসই বা কে আনিবে আর ভয়ই বা কে দূর করিবে?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্য-সংখ্যা বিভিন্ন। সমস্যা যদিও এক এবং অভিন্ন, সমাধানের সূত্র পৃথক্। যেই তুমি আসিয়া বলিলে, যে স্বর্গের ছবি আমার চক্ষুর সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিলে, তাহা যতই মধুর হউক না কেন, আমার নিকট প্রত্যেকটির মূল্যই সমান, যতক্ষণ না আমি কোন্ পথে চলিব তার নির্দ্দেশ তুমি আমাকে দিতে পার আর আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া যায়। তোমাকে তখনই আমি বিশ্বাস করিব, যখন দেখিতে পাইব তুমি আমার সমস্যার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়া পথ নির্দ্দেশ দিয়াছ, তখন তোমার সেই শক্তির উপর নির্ভর করা চলিবে। তুমি দিল্লীতে আছ, আমি নোয়াখালিতে আছি, তুমি আমাকে পরামর্শ দিতেছ, আমার বিশ্বাস, তুমি কি করিয়া উৎপাদন করিতে পার? তোমাকে আমি সারা দিন বসিয়া একখানা পুস্তকপ্রমাণ সংবাদ প্রেরণ করিলাম কিন্তু তুমি তাহার কি বুঝিলে? আমার অনেক কথা বলাই ত হইল না। রামসুন্দর যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া গেল, পরাণ মাঝি যে শিষ দিয়া গেল তাহার অনেকখানি ত লেখাই হইল না। রামসুন্দর, পরাণ মাঝির ইতিহাস কি এবং তাহাদের কার্য্যাবলীর তাৎপর্য্য কি, বা তাহাতে কতটা মূল্য দেওয়া যাইতে পারে তাহার তুমি কি জান? আমাকে আমার প্রতিবেশী ভাল বুদ্ধি দিতে পারিবে, আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিবে, আমার পথ বলিতে পারিবে কিন্তু তুমি পারিবে না; পারিলেও আমার বিশ্বাস তুমি গড়িতে পারিবে না। তোমাকে দূর হইতে শ্রদ্ধা করিতে পারি কিন্তু মনের ভিতর বসাইয়া পূজা করিতে পারি না। তুমি আমার চক্ষু খুলিয়া আমার বিপদকে আরও প্রখর, প্রবল ভাবে বুঝাইয়া দিতে পার কিন্তু আমার কি কর্ত্তব্য, তাহার নির্দ্দেশ দিতে পার না।

তুমি হয়ত বলিবে, আমাকে হাল-চাষ করিতে—সংসারের এতগুলি প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্য, কিন্তু তাহাতে এতগুলি প্রাণী যে আমার মুখাপেক্ষী, তাহাই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছ মাত্র; সমস্যার সমাধান তুমি কি করিলে? আমার নাই হাল, নাই বলদ, নাই স্বাস্থ্য, তাহার কতখানি খবর তুমি রাখ? আমার রহিম ভাই আমাকে বলিবে, কাল রামপুর হাটে একবার যাও বাঁশ-ঝাড়টা বিক্রি করিয়া দুইটা গরু সংগ্রহ করিয়া আন। তোমার বীজের আবশ্যক হইলে আমি দিতে পারিব, পরে পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। যতক্ষণ না তুমি হাল করিতে পার তোমার ক্ষুদিরামের মাঠের জমিটা আমার হাল দিয়াই ভাঙ্গিয়া রাখ, না হইলে পরে মুস্কিল হইবে, ভাল ফসল হইবে না। খুব সকালে উঠিয়া চাষ করিয়া বেলা ১০টার ভিতরেই খাওয়া-দাওয়া করিও, নহিলে তোমার ম্যালেরিয়া জ্বর সারিবে না। আমি তখন বিশ্বাস করিব কাহাকে? যত ভুল পথই হউক, আমার দুঃখ যাহার জানা আছে তাহার নির্দ্দেশ আমাকে মানিয়া লইতেই হইবে। নোয়াখালী ছাড়া ভাল কি মন্দ, আমার নিকট তুমি বুঝাইতে আসিবে এই হাস্যকর অভিনয় তোমার করা নিষ্প্রয়োজন। আমার বাপের

ভিটার প্রতি তোমার যতই মমত্ববোধ থাকুক না কেন, আমি জানিতে পারি না। আমার আম গাছে কাঁটাল গাছে আম কাঁটাল হইলে তুমি দুই-একটা খাইয়া উপভোগ করিতে পার মাত্র কিন্তু আমি আম-কাঁটাল না হইলেও তাহাকে ভালবাসিব। তাহার সুখ-স্মৃতি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে অনেক সুখ-দুঃখের ইতিহাস, তাহা তুমি কি বুঝিবে? আম গাছটির একটি ভাল বাঁকা, তাহার খবর রাখ কি? কতগুলি দিন ডালটাতে কাটিয়াছে তাহার কোন খবরই তুমি জান না। বহু কাল পরেও একবার দর্শন পাব, এই আশাতেও আমার মনে চাঞ্চল্য আসিবে। কেবল আম-কাঁটাল গাছ নহে, এরূপ শত-সহস্র বন্ধন আমাকে ছিন্ন করিতে হইতেছে তাহা কে বুঝিবে? কতখানি আমি বুঝাইতেই বা পারিব? এরূপ মমত্ববোধ কত নিকটতম সম্পর্ক আমার প্রতিবেশীরও জানা থাকিতে পারে না, থাকিলে তাহা নিছক ভণ্ডামী; আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না, কখনো না, কিছুতেই না।

বাড়ী ছাড়িয়া আসিব কিন্তু যাইব কোথায়? কেহ আমাকে আশ্রয় না দিলে আমার উপায় কি হইবে, এইরূপ ভাবনা হইলেই বা আমি থাকিব কি করিয়া? আমার গ্রামে হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল, আমার কত ভালবাসার বন্ধু নিহত হইল, আমার জীবনের ভরসা দিবে কে? আমার পরিবারের কাহারও অঘটন ঘটিলে সেই ব্যথা সহ্য করিব কেমন করিয়া? নির্ভর করিবে কে, বিশ্বাস লওয়াইবে কে? তুমি দূর হইতে অভয় দিবে; বলিবে, কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েক হাজার মরিলে দেশের কি যায়-আসে? কিন্তু আমি সেই কথা ভাল বুঝিতে পারি না। আমার বাড়ীর বিড়ালটাও যে মরিলে চলিবে না তাহার কতখানি সন্ধান তুমি জান? আমি খাইয়া-পরিয়া বাঁচিব কি না পরে বিবেচ্য। প্রথমতঃ, আমায় প্রাণে বাঁচিবার উপায় উদ্ভাবন ও চেষ্টা করিতে হইবে। আমাকে তুমি যদি বিশ্বাস লওয়াইতে পার যে, আমাকে জুজুতে ধরিবে না, আমার এমন সহায়-সম্পদ্ রহিয়াছে, যাহার উপর আমি নির্ভর করিতে পারি এবং যদি বুঝিতে পারি, প্রমাণ পাই, আমার পরিবারের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, তবেই আমি বিশ্বাস করিব; নচেৎ তোমার শত-সহস্র জ্ঞানোপদেশ কেবল রুদ্ধ কর্ণ-কোটরে আঘাত হানিয়া চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িবে, আমি বুঝিব না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিব না। সেই বিশ্বাস বড় সহজ নয়।

যখনই চিন্তা করিব, যোগেশ, বরদা কত সম্মানই না পাইত, কত লোক রাত্রিদিন নমস্কার করিয়া পথ বাড়িয়া চলিত, তাহাদের অস্তিত্ব আজ নাই—কতই না হৃদয়-বিদারক দৃশ্য, সম্ভাব্য হত্যার উপায় আমার চক্ষুর সম্মুখে নানা রং-বেরংএ চিত্রিত হইয়া ভাসিয়া উঠিবে, তাহাতে কতখানি রং প্রয়োজন হইবে—এক রংএ রঞ্জিত করিয়া তুলিতে—তাহার হিসাব তোমায় জানিতে হইবে, নহিলে তোমাকে বিশ্বাস করিব কি করিয়া? রহিম সেখ, কাসেম সেখ, নবি বক্স, দুলালি হইতে আমার নিষ্কৃতি আছে কি না তাহা তোমার কথায় কাজে আমাকে বিশ্বাস লওয়াইতে হইবে এবং যখন বুঝিতে পারিব, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব, একমাত্র তখনই তোমার নির্দেশ মানিয়া চলা আমার পক্ষে সম্ভব। আমাকে আমার গৃহপাশে শত-সহস্র বন্ধন ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার একটাও আমার ছিঁড়িয়া আসা সম্ভব নহে। তুমি আমাকে জ্ঞান দাও, অভয় দাও, সাহস দাও ও বিশ্বাস দাও, আমাকে তুমি আর কিছুতেই আনিতে পারিবে না। আমার পক্ষে কাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রলোভন থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বাস্তুভিটার সম্পর্কচ্ছেদ করার উপযুক্ত আকর্ষণ তথায় নাই। সুদূর পাড়াগাঁয়ে আমি অধিক মূল্যেও জমি সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু সেখানে আমি অল্প মূল্যেও সম্পত্তি করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি চিৎকার করিয়া আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেল আর বক্তৃতা দেও—আসিও না, আসিও না, আসিলে ভাল হইবে না, সম্মুখে ভীষণ সমস্যা! কিন্তু তাহার কতখানি আমি গ্রাহ্য করিব? তোমার বিশ্বব্যাপী সুনামের জন্য তোমার কথা না হয় একবার ভাবিয়া দেখিব কিন্তু সমস্যার সমাধান হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিব না। রেলগাড়িতে যতই ভীড় বৃদ্ধি পাইবে আমাকে ততই অধিক চঞ্চল করিয়া তুলিবে মাত্র।

তোমার অভয় বাণী শুনিবা মাত্র আমি তোমাকে পরখ করিতে থাকিব। তোমার জ্ঞান আমার বিশ্বাস হইবে না, প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস হইবে না, মমত্ববোধ বিশ্বাস হইবে না—যতক্ষণ না দেখিব আমার স্ত্রী-কন্যার দুর্ভোগ তোমারও স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সমান ভাবেই জড়িত; আমার বিষয়-সম্পত্তি তোমার বিষয়-সম্পত্তির সহিত একই ভাবে জড়িত রহিয়াছে, ততক্ষণ আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না। যতক্ষণ না তুমি বলিবে—দেখ, যদি এই ভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করিতে আসে আমরা এই পথে তাহার সমাধান করিব। আমার স্ত্রী-কন্যা তোমার স্ত্রী-কন্যাকে এই ভাবে নিরাপদ করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনে বিশ্বাস তুমি কিছুতেই লওয়াইতে পারিবে না। একবার তুমি আমার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেও, দেখিবে শত চিৎকারে শত সহস্র প্রলোভনেও আমার মন গলাইতে পারিবে না—আমি আসিব না। তোমার শত শত বক্তৃতা তোমার শত শত ভবিষ্যৎ চিত্র মরীচিকা পরিবেশনেও কোনও আবশ্যকতা থাকিবে না।

পশ্চিমবঙ্গে আসিলেই যে সকল সমস্যার সমাধান হইবে ইহা অত্যন্ত ভুল, তবে আন্দোলন ও আলোড়ন লইয়া একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে মাত্র। যাহারা টাকা খরচ করিতে পারিবে তাহাদের প্রাসাদোপম খালি বাড়ীগুলি হইতে সহরের বস্তি-বাড়ী পর্য্যন্ত স্থান সঙ্কুলান করিবে আর যাহারা তাহা পারিবে না, হয় নিরাশ্রয় পথিক জীবন যাপন করিবে, না হয় আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের ঘাড় মটকাইবে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান সেইখানেই হইবে না, আরও স্তর ও শ্রেণী রহিয়াছে। যাহাদের সংখ্যা এতদুভয় সংখ্যা হইতে গরিষ্ঠ, কিন্তু তাহারা আসিতে পারিবে না। তাহাদিগকে রক্ষা করার হাত তাহাদের নিজেদের নাই, অপরে রক্ষা করিলে তাহাদের রক্ষা হইবে, নচেৎ নহে। তাহাদিগকে আনিতে হইলে তোমার আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, সমাজগত সমষ্টিগত ব্যাপার। তাহারা সমাজের প্রাণ কিন্তু আমরা একমাত্র বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করি—প্রাণের সহিত তাহা সম্পর্কশূন্য। কৃষকের জন্য কবির মন চঞ্চল, দার্শনিকের মন ততোধিক, রাজনৈতিক তাহাকে লইয়া একটি দলই গঠন করিয়া ফেলিল। বাস্তবজীবী বলিতেছে, বাপু হে, বাজারে তরকারীর দর হইতে প্রধান খাদ্য পর্য্যন্ত কোনটাই অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া সহযোগিতা কর না। শস্য সৃজন কর বলিয়া সুখ

আছ—একটা কাজ আছে—বাঁচিয়া আছ! নহিলে যা অন্ন করিয়া মাথার ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিতে হইত, কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইতে না, বড় বাবু হইতে বড় সাহেবের পর্য্যন্ত তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে কপালের চর্ম্ম পৃথক্ বর্ণ ধারণ করিত। অন্ন কি আর সাধে যোগাইতেছ? নিজের প্রয়োজনে, পাওয়ার লোভে—দানের জন্ম নয়। তাহাদিগকে যাহাই বল না কেন, একটা পথ করিয়া দিতেই হইবে কিন্তু করিবে কে? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান? তাহারা করে ভালই, তবে কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহাদিগকে না ঘাঁটাইলেই যেন ভাল হয়। একটি সভাতে বক্তৃতা দিলে দশটা পত্রিকায় নাম প্রকাশ করিলে মন্দ হয় না—এই সকল ঝঞ্ঝাট আবার কেন? তাহাদের অবস্থা বড় উকিলদের মত, পয়সা পাইয়া কাছারিতে গিয়া মোকদ্দমা মুলতুবি হইলেই যেন ভাল হয়। কোনও গ্রামের তদারকের ভার পড়িল, সেই গ্রামে যাইয়া কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না কিন্তু ঘটনাক্রমে যে কার্য্য সম্পন্ন করার কথা ছিল তাহা হইয়া গেল—পত্রিকাগুলি সাফল্য সহকারে কৃতকার্য্যের জন্য মুখর হইয়া উঠিল। তাহারা করে নাই কী? যাহা হইয়াছে তাহাই তাহারা করিয়াছে আর যাহা হয় নাই তাহাই তাহারা করে নাই!

'উন্নততর বাসস্থান নির্ম্মাণ' ও 'সমস্যা সমাধানে'র বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্যা সমাধানের নামকরণে গুরুতর করিয়া তুলিবে। যতই স্বার্থহীন মতবাদ সৃষ্টি করুক না কেন, আর 'রাম কলোনি' 'শ্যাম কলোনি' দ্বারা চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করার প্রয়াস পাউক না কেন সমস্যার সমাধান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিলে কম করিয়া বলা হইবে—ধৃষ্টতা মাত্র। আমি শত-সহস্র বিঘা জমি কম দরে ক্রয় করিয়া বেশী দরে বিক্রয় করিতে পারিব কিন্তু তাহাতে সমস্যা গুরুতর হইবে মাত্র—লাঘব হইবে না বিন্দুমাত্রও। গ্রামের কৃষককুল যে পর্য্যন্ত কৃষি উপযোগী জমি না পাইবে তাহারা কখনও বাসস্থান পরিত্যাগ করিবে না। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী করিতে পারিবে না, যে ব্যবসা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছে তাহাই তাহারা করিবে, তাহাকেই তাহারা জীবন-মরণের সাথী করিবে। এই ব্যবসাতে লাভবান হইয়া দশটা পূজা-পার্ব্বণ করিতে পারিবে—না হয় জায়গা জমি, ঘর-বাড়ী, থালা-ঘটা-বাটি বিক্রয় হইয়া যাইবে এবং পরের বাড়ীতে দাসত্ব করিবে, ইহা ছাড়া অন্ত গত্যন্তর নাই। সম্পত্তিহীন কৃষক কর্ম্মচারীর বিক্রম বহু বার পরীক্ষা হইয়াছে এবং কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। অশিক্ষাতে, কুশিক্ষাতে তাহারা জন্মান্ধ; তোমার হিতোপদেশের বাণী তাহারা গ্রাহ্য করিবে কেন? তুমি টাকা ধার দিয়াছ, তাহার জায়গা-জমি-বাড়ী নিলাম ক্রয় করিয়া নিয়া উৎখাত করিয়াছ, আবার হয়ত সে তোমার বাড়ীতে না হউক অন্ত বাড়ীতে চাকুরী করিয়া দিন যাপন করিতেছে। তুমি বহু জমির মালিক, ঘরে বসিয়া বৎসর বৎসর খাদ্য পাইতেছ, আর আমি তোমার বাড়ীতে কাজ করিয়া নিজ হাতে করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়াও দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। এই ভাবে কত কালের মর্ম্মবেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কত কাল করিবে তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যদি তাহাদিগের সংস্থান করিতে পার তোমার পরিবার সুখের হইবে, নহিলে যে আগুন ফুটিয়া বাহির হইবে তাহার শেষ অধ্যায় এখনো রচিত হয় নাই। সমস্যাকে সমাধান করিতে হইলে প্রকৃত বেদনার উপশম করা আবশ্যক। স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা কি ভিন্ন ভাবে অন্যত্র বসতি নির্ম্মাণ করার পদ্ধতি মূলতঃ এক?

প্রতিটি গ্রামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া আদর্শ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গ্রামের কোথায় কি কি সুবিধা-অসুবিধা আছে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। যে সকল পরিত্যক্ত জমি বা বাড়ী রহিয়াছে তাহা হস্তগত করিয়া পতিত জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং কোথায় কত ঘর গৃহস্থকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহার একখানা তালিকা প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে দাখিল করিতে হইবে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ পতিত জমি বিলি-বন্দোবস্ত হয়, এইরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঐরূপ কার্য্য করিতেই হইবে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কল-কারখানাও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে কতক শিক্ষিত লোক সর্ব্ব সময়ের জন্য গ্রামবাসী হইয়া জীবন যাপন করেন। দেখিতে দেখিতে সমাজ এবং রামরাজ্য গড়িয়া উঠিবে। আদর্শ গৃহ কিরূপ হইবে তাহার নক্সা আঁকিয়া ধরিতে হইবে না। সেই গ্রামের সেই আদর্শ গৃহ যাহা ঐ গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ লোক বলিয়া বুঝাইবে। আমি আদর্শ ততক্ষণ স্থাপন করিতে পারিব না—যতক্ষণ আমি তাহাদেরই এক জন বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিব। আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমান সুখ-দুঃখের ভাগী হইতে পারিলেই আমার গৃহ আদর্শ গৃহ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। আমাকে বুঝাইতে হইবে, বিপদে-সম্পদে সাথী হইতে হইবে। গ্রামের ম্যালেরিয়া কেবল গ্রামবাসীরই ক্ষতি করিবে না, আমারও করিবে এবং ম্যালেরিয়া দূর করা প্রত্যেকের নিজ নিজ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই কার্য্যে ঘটি-বাঙ্গাল পার্থক্য নাই। যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহা প্রকৃত সমাজ—মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিবে। তাহাতে হিন্দুস্থান পাকিস্থান ভেদাভেদ থাকিবে না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি সকলই গড়িয়া উঠিবে। অন্যথায় মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, দিনমজুর, ভূমিহীন কৃষক প্রজাদলের কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিবে। খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য রাজকোষ শূন্য হইবে কিন্তু মীমাংসা কোন কালেই সম্ভব হইবে না।

আদর্শ গৃহ কে স্থাপন করিবে? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সম্ভবই হইত তবে যত দিন যাবৎ 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' কলরব চলিয়াছে তত দিনের ভিতর কতক গ্রাম অবশ্য নির্ম্মিত হইতে পারিত। যদি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহার আদর্শ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে গ্রাম্য অঞ্চলে প্রচার করিতে পারিত তাহা হইলে ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করা দূরের কথা, বহু পূর্ব্বেই ভারত স্বাধীন হইত। কাহারও সাহায্যে নহে, নিজের দাবীতে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বক্তৃতার কাজ, স্বাস্থ্যরক্ষার যথাবিহিত নিয়মাদি প্রচার-কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, অথবা দুই-চারিটি নিম্ন বিদ্যালয় পরিচালনা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদের দ্বারা গৃহী পরিবার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

অন্য যে প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় তাহা সরকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাহা হইতেই বা আমরা কি আশা করিতে পারি? সরকার বীজাগার স্থাপন করিয়া কম মূল্যে বীজ বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত যাহার আবশ্যক আছে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া গুদামপূর্ণ জিনিষ

পঞ্চনদীর ঢেউ

নরেন সেনগুপ্ত

একদা আবার এলো ঊনত্রিশে শ্রাবণ,
তৃষার্ত্ত মাটির বুকে আনো বারি অমৃত-সিঞ্চনী,
মরুময় এ-হৃদয়ে ছায়া এলো কালো মেঘে মেঘে সারা
বৈশাখী গগন :
তৃপ্ত হ'লো বসুমতী, কান পেতে শুনি তার নূপুর-কিঙ্কিণী।

হায় গো জননি বসুন্ধরা, ব্যথাতুরা ক্ষুব্ধা বসুন্ধরা,
পনেরো দিনের শান্তি, তার বেশি ভাগ্যে তার লেখেনি বিধাতা ;
হনুমান গান্ধীজির আজীবন ব্রতের প্রহরা :
চাঁদিপর্ট্টি-মৌলালীতে পুনরায় সন্ধ্যা আনে রজনীর
স্তব্ধ নীরবতা।

লাহোর, লাহোর, নেবাও আগুন
নেবাও আগুন,
সে-আগুনে পুড়ে নিজেও তো হবে ছাই,
শিয়ালকোট আর ওয়াজিরাবাদের অস্থির মালা তাই
দধীচি-বজ্র হয়ে
হানবে একদা তোমারো বক্ষে শেল।
অন্ধ লাহোর, বন্ধ ক'রো না চিরতরে তব আঁখি,—
বুকের রক্তে রাঙা করে কলকাতা
পরালো মিলন-রাখী,

ব্যর্থ ক'রো না, ব্যর্থ ক'রো না, ব্যর্থ ক'রো না
প্রাণ নিঙড়ানো ত্যাগ
যতোটুকু আছে বাকি।
রাওলপিণ্ডি, এই কি বীর্য্য তোর,
নোয়াখালী-জলে আজও কি মেটেনি তৃষা ?
বিহার করেছে প্রায়শ্চিত্ত তার
তবুও টুটেনি মারণের এই নেশা ?

স্বরাজ্যের অভিষেক ভ্রাতৃ-রক্তজলে
হে ভারত, সোনার ভারত,
অশোক কি আকবর কখনও কি শোনো নাই নাম তুমি তার?
পুণা কি ফেলেনি অশ্রু দেখে দুঃখ হতভাগ্য ত্রিচিনাপল্লীর,
মদন-মোহনলাল করেনি কি উচ্চারণ শেষ বার এক সাথে
আল্লা ও নারায়ণ নাম ?

হায় ক্লীব! রাজনীতি কে শেখালো তোরে ?
অন্তরের নীতি যদি না মানিস্ তুই
বৃথা তোর রাজনীতি খেলা!
কপট নায়ক খেলে মরা-হাড়ে পাশা
পণ তার জন্মভূমি আর দেশবাসী।
: লণ্ডন-ম্যু-অর্ক হাসে হায়েনার হাসি :
সূচাগ্র মেদিনী লোভে কুরুক্ষেত্র-রণে পান ভাইয়ের শোণিত।

অনেক হাড়ের সারে কলকাতা যে ফলালো ফসল।
লাহোর, রক্তের বানে পুনঃ তারে কোরো না বিফল।

পুকুরে-ডোবায় ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনমিটাইতে পারে না। সরকারকে আদর্শ পরিবার গঠন করার ভার দাও, দেখিবে অলস পরিবার গড়িয়া উঠিবে। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দেও, পয়সা ছাড়া চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রূষা হইয়া উঠিবে না, তবে কে করিবে ?

কে করিবে, তাহা আর বিশদ ভাবে বলিতে হইবে না। প্রয়োজন যাহাদের তাহারাই করিবে এবং করিতে বাধ্য। দেশ যদি স্বাধীনই হইয়াছে মনে করার মত জ্ঞান আমাদের লাভ হইয়া থাকে তবে আমাদের দেশের আবর্জ্জনা আমাদিগকেই পরিষ্কার করিতে হইবে। এই বিষয়ে যে কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইবে তাহার সভ্য প্রত্যেক গ্রামবাসী আর সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুর ও তাঁহার কর্মচারী। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, গ্রামে গ্রামে সভা আহ্বান দ্বারা কর্ম্মপরিষদ স্থাপন করা এবং আদর্শ পরিবারকে কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করা। আবশ্যক হইলে আইন প্রণয়ন দ্বারা পতিত জঙ্গলা ভূমি বাজেয়াপ্ত করা এবং কৃষির সুবিধার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করা। সহর হইতে গ্রামের দিকে দৃষ্টি যত দিন পড়িবে না, অশান্তির জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া দেশ ততই ছারখার হইয়া যাইবে। সহরের প্রতি দৃষ্টি দিলে যথার্থ শান্তির নির্দ্দেশ দান করিবে না। গ্রাম যত দিন সমৃদ্ধ ছিল খুব বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নহে—শান্তিও ছিল, স্বাস্থ্যও ছিল, বৃহৎ পরিবারও ছিল, বিদ্বান্ পণ্ডিত আর মূর্খ কবিরাজেরও অভাব ছিল না। পূজা-পার্ব্বণে নগরবাসীদের সুখ-নীড় রচনা করিত সুদূর পল্লীগ্রামে।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩১

গোপন জিনিষ প্রকাশ হয়ে গেলে যা হয়—ভোট সংগ্রহ প্রকাশ্যেই আরম্ভ হ'লো। আজ ত বারোয়ারি-তলায়—কাল ইস্কুলের মাঠে—পরশু চড়কতলায় মিটিং হতে লাগলো। একে মিটিং ঠিক বলা যায় না, কতকগুলি লোককে জড়ো করে বিপক্ষ পক্ষের কুৎসা-কীর্ত্তন করাকে মিটিং বলা সঙ্গত নয়। যারা ভোট দেবে তারা সবাই জানে সকলের হাঁড়ির খবর। তবু প্রকাশ্য রাস্তায় কুৎসাটা রটিত হলে মুখরোচক জিনিষের মত সকলেই আর একবার সেটা চেখে দেখে আনন্দ পায়। মন্তব্য যা করে—তা এই আনন্দ-সঞ্জাত। সেই আনন্দে দিন-কতক মশগুল রইলো গ্রাম।

মিত্রদের বাড়ীর সামনে যে মাঠ আছে—এক দিন সেইখানে একটা সভা আহ্বান করলেন গ্রামের কয়েক জন লোক মিলে। আলোচনা জাতীয় সভা। এ যাবৎ বস্ত্র-বণ্টনের সুব্যবস্থা হয়নি গ্রামে। এস-ডি-ও বলে পাঠিয়েছেন—বিভিন্ন পাড়ায় ব্লক-কমিটি তৈরী করতে। কমিটি যেন পাড়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাঁদের মারফৎ গৃহস্থের অবস্থা বুঝে ন্যায়-নীতি অনুসারে খাদ্য ও বস্ত্র বণ্টিত হবে। পুরাতন যে ফুড-কমিটি আছে—তা-ও বাতিল হয়ে যাবে এই ব্লক-কমিটি গঠিত হ'লে।

সাধারণতঃ শোক-সভায় বা সাহিত্য-সভায় কিংবা করদাতা-সম্মেলনে লোকের অভাব ঘটলেও এ-সভায় যথেষ্ট লোক সমাগম হ'লো। যাঁরা পুরাতন ফুড-কমিটিতে ছিলেন তাঁরা উঠে-পড়ে লাগলেন—যেন নতুন কমিটিতে স্থান পান। যাঁরা নতুন আসচেন তাঁদের উৎসাহও কম নয়। কারণ, বণ্টনের ব্যবস্থা আয়ত্তে থাকলে এই বস্ত্র দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য-সঙ্কটের দিনে কম লাভ নয়। আইন বাঁচিয়ে নিজের অভাব মোচন করতে এর তুল্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আজকের দিনে কোথাও নেই।

উত্তর-দক্ষিণ-মাঝের পাড়ার হিন্দু-মুসলমান সবাই এসেছেন। প্রবীণ নবীন কোন দলই বাদ নেই। শশীকান্ত কলকাতায় গেছেন বলে অনুপস্থিত। ভূপেন সেনের রক্ত-চাপ বৃদ্ধি হ'য়েছে সেই কতির দিন থেকে। তিনি শয্যাশায়ী। তাছাড়া শ্রীধর, রজনী, মহম্মদ, ইব্রাহিম, পুরন্দর, আশু গোঁসাই, ভজহরি সবাই এসেছে। সর্ব্ব-সম্মিতক্রমে বয়োবৃদ্ধ এক জন মুসলমানকে সভাপতি করা হ'লো। মিত্রদের বাড়ির সামনে হ'লেও মেজ বাবুকে পাওয়া গেল না কোথাও। অপূর্ব্ব ক'লকাতায় গেছে—অন্য পুরুষ মানুষ বাড়িতে নেই।

মুসলমানদের এক জন বললে, কেউ ডেকে আন না বাবুকে। তিনি না হলে সভা হয়?

অবশেষে ফটিক তাঁকে ডাকতে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে জানালে, মেজ বাবু বাড়ি নেই। চাকরটাকে নিয়ে পাখী-শিকার করতে গেছেন বিলের ধারে।

সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়েই সভা আরম্ভ হ'লো। বক্তৃতার সভা নয়। পাঁচ জন লোক নিয়ে এক-একটি ব্লক তৈরী হবে। এমনি তিনটি ব্লকেই গ্রামের তিন পাড়ার লোক থাকবে। নামগুলি চটপট্ প্রস্তাবে এনে নির্ব্বাচিত করে নেওয়া মাত্র। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ার নামগুলি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৃহীত হ'লো। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধলো মাঝের পাড়ায়। পাড়ার গণ্যমান্য লোক অনেকগুলি। সব জড়িয়ে নাম হ'লো দশটি।

সভাপতি বললেন, এই সামান্য ব্যাপারে ভোটাভুটি ঠিক নয়। আপনারা কেউ কেউ নাম উঠিয়ে নিন

কেউ খাড় নিষ্পত্তি করলে না।

সভাপতি বললেন, তা'হলে ভোট নিতে হয়।

এমন সময় মিত্রদের মেজ বাবু শিকার করে ফিরে এলেন। চাকরটা বন্দুক ও পাখী ক'টা ঝুলিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালো। মেজ বাবু বললেন, কিসের ভোট?

গণি মিঞা ব্যাপারটা খুলে বললেন।

মেজ বাবু হেসে বললেন, আচ্ছা, আমার নাম আমি উইথ-ড্র করে নিচ্ছি।

পুরন্দর উঠে বললে, সে কি? আপনি উইথ-ড্র করে নিলে ব্লক উইক হ'য়ে যাবে যে?

গণি মিঞা বাধা দিয়ে বললেন, আপনাকে থাকতেই হবে। পরে শিকারের পানে চেয়ে বললেন, সব ক'টাই যে হরিয়াল, কোথায় পেলেন?

বিলের ধারে। একটা সামকুড় আছে। মাংস বাড়বে বলে ওটাও নিলাম। বলে চাকরটাকে বাড়ি যেতে ইসারা করলেন।

সে চলে যেতেই চেয়ারে বসে বন্দুকটা ঠেসিয়ে রাখলেন চেয়ারের হাতলে।

শ্রীধর উঠে বললেন, আমার মনে হয়, এমন কতকগুলি নাম প্রস্তাবিত হ'য়েছে যেগুলি উইথ-ড্র না করলেও কেটে দেওয়া উচিত। অবশ্য গ্রামের সুনাম রক্ষার জন্যই আমার এ প্রস্তাব।

সভাপতি বললেন, সাধারণ সভায় নিজে থেকে উইথ-ড্র না করলে কেটে দেবার নিয়ম নেই। আমি অনুরোধ করছি—

শ্রীধর বললেন, দশ জনকে নিয়েই সভা—দশের মত হ'লে অবশ্য নাম কেটে দেওয়া চলবে। একটু থেমে বললেন, যাদের অভিজ্ঞতা নেই, যারা লম্পট, চরিত্রহীন, চোর, ডাকাত—তাদের নামের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকই নিজেদের নাম যোগ করবেন না।

ভজহরি বললে, তাদের নামগুলো না জানলে—

শ্রীধর উচ্চকণ্ঠে বললেন, তাদের চরিত্রের কথা গ্রামে কে না জানে? তবে তাদের নাম কেউ করতে পারছে না।

আশু গোঁসাই বললেন, কি জালা! নামগুলো বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

শ্রীধর বললেন, প্রস্তাবিত নামের মধ্যে তাদের নাম রয়েছে। অনুগ্রহ করে সভাপতি মহাশয় নামগুলি আর একবার পড়ে শোনান। তার পর আপনারাই ঠিক করুন ওর মধ্যে কাকে রাখা উচিত—কাকে বাদ দেওয়া দরকার।

সভাপতি প্রস্তাবিত নামগুলি উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনালেন।

জনতা থেকে কেউ আপত্তি করলে না। মেজ বাবু দাঁড়িয়ে বললেন, না, এর মধ্যে আপত্তিজনক নাম একটিও নেই।

শ্রীধর উঠে বললেন, একটিও নেই? যথার্থ বলছেন?

গম্ভীর কণ্ঠে মেজ বাবু বললেন, ব্লাক মার্কেট করি না যে সত্য বলতে ভয় পাব।

শ্রীধরের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। শ্লেষ মাখানো স্বরে বললেন, না, আপনাদের ব্লাক মার্কেট চাল চিনি আটা ময়দার নয়—সে অন্য রকম।

মেজ বাবুর চোখ জ্বলে উঠলো। কিন্তু অন্তরে যথেষ্ট উত্তপ্ত হলেও কণ্ঠের সংযম তিনি হারালেন না। শান্ত-গম্ভীর স্বরে বললেন, আশা করি, রকমটা শুনতে পাব।

শ্রীধর বললেন, না, সে কথা প্রকাশ্য সভায় বলবার নয়।··· কিন্তু কার কথা আমি বলছি—আপনি জেনেও না-জানার ভাণ করছেন।

মেজ বাবু কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, তোমার অন্ত রকমটা কি আমি শুনতে চাই।

সভাপতি বুঝলেন, এ ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ। সভাটা বুঝি ব্যক্তিগত কলহে পণ্ড হয়ে যায়। তিনি দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করে বললেন, আমি অনুরোধ করছি—আপনারা শান্ত হোন।

মেজ বাবু উত্তাপহীন স্বরে বললেন, আপনি বসুন, আমাদের ব্যক্তিগত বোঝা-পড়াতে বড় জোর এক মিনিট সময় লাগবে, সভার কোন ক্ষতি হবে না তাতে। কালো-বাজারে যাঁদের গায়ের রক্ত অত্যন্ত বেশি হ'য়েছে, তাঁদের এটুকু অন্ততঃ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে রক্ত বাড়লেই স্বাস্থ্য ভাল হয় না।

কি—কি বললে? ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে শ্রীধর চীৎকার করে উঠলেন।

মেজ বাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, স্বাস্থ্য মানে ক্ষমতা, মানে সম্মান।

শ্রীধর বললেন, তা তুমি বলবে বই কি। নিজের সর্ব্বস্ব গেছে, তাই পরের ঐশ্বর্য্যে বুক জ্বলচে। কিন্তু জেনো, সন্ধ্যে বেলায় নষ্ট-চরিত্র ছেলের সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের বেড়াতে দিলে স্বাস্থ্যের পরিচয় দেওয়া হয় না।

হোয়াট—হোয়াট? মেজ বাবুর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বন্দুক উঁচিয়ে বললেন, এ কথা প্রমাণ করতে হবে, না হলে তোমায় আমি কুকুরের মত গুলী করে মারবো। বাঘের মত তাঁর চোখ জ্বলতে লাগলো।

ফটিক শ্রীধরকে টেনে বসাবার চেষ্টা করে বললে, বসুন না জামাই বাবু! আর—

পুরন্দর মেজ বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বললে, কাকা বাবু, আপনি দয়া করে—

মাথা ঝাঁকিয়ে মেজ বাবু বললেন, না—না, কোন কথা নয়। হয় প্রমাণ কর—না হয়—। বলে বন্দুকটা আর একটু তুলে ধরলেন।

শ্রীধর প্রথমটা ভাবলেন, দাম্ভিক মিত্র সব করতে পারে। ওদের পূর্ব্বপুরুষরা ডাকাত ছিল—সেই রক্ত ওর দেহেও বইছে তো! পরে এক-সভা লোক দেখে তাঁর সাহস ফিরে এলো। ভাবলেন, নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের আস্ফালনে যদি পিছিয়ে যান তো কোন কালে আর মাথা তুলতে পারবেন না গাঁয়ে। যার অর্থ নেই তাকেও যদি ভয় করে চলতে হয়, তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো দিন কয়েক আগের দৃশ্য। নিজের হাতে-গড়া অত সাধের আমবাগান—সেখানে অতি প্রিয়জনের চিতা-শয্যা রচনা করে দিয়েছে যারা—তাদের পিছনে এই দম্ভ-সর্ব্বস্ব লোকটা যে নেই কে বলবে? এ না থাকলে কার এত সাধ্য যে—

দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন, একটা সেকেলে বন্দুক নিয়ে ভয় দেখাচ্ছ কাকে? আমরা বাড়ির মেয়েদের দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করি না।

ট্রিগারটা নড়ে উঠলো খট্ করে,—দুম্ করে শব্দ হ'লো সঙ্গে সঙ্গে। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে কে কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নেই। সভাপতি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। শ্রীধরের কি হ'লো কেউ চেয়েও দেখলে না। এক জায়গায় জনতা চাপ বেঁধে রইলো—সম্ভবতঃ আহত শ্রীধরকে ওরা প্রাথমিক শুশ্রূষা করছে।

ধোঁয়াটা পাক খেয়ে বায়ুস্তরে ভাসতে ভাসতে উপরে উঠলো। মেজ বাবু বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, পুলিশ ইনস্পেক্টর এলে খবর দিয়ো—আমি তৈরী হয়ে বৈঠকখানায় রইলাম।

ধাই-পাড়ার কাঁচা রাস্তা দিয়ে ইব্রাহিম ছুটে পালাচ্ছিল। ওর প্রাণেও ভয় জেগেছে। ভূপেন সেনের ভাঁড়ার লুঠ—শ্রীধরের বাগান নষ্ট—তার পর এই গুলী মারার ব্যাপার—সব ক'টি ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য্য আছে। এর মূলে রয়েছে একটি দল যারা চিরকাল প্রকাশ্যে বড়লোকের খোসামোদ করে—গোপনে করে তাদের হিংসা। এ দলের কার্য্য-কলাপ কিছু কিছু তার কানেও এসেছে আগে। কিন্তু কানে শুনলেও মন দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারেনি। সক্ষম প্রতিবেশীকে অক্ষমেরা চিরদিনই ভাল নজরে দেখে না। মন্ত্রের গুণে সাপ যেমন মাথা নামিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে, এরাও তেমনি সম্পদ-ক্ষমতার গুণে বশীভূত। যত দিন সম্পদ আছে তত দিন ওদের গ্রাহ্য করে কে?···ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে, ধনীর ক্ষমতাকে নষ্ট করবার জন্ম গরিবরা যেন জোট পাকিয়েছে। অবশ্য থানা-পুলিশের ঠেলায় পড়লে এই আস্ফালন ওদের টিকবে না; তবু যে পর্য্যন্ত তা না হচ্ছে তত দিন হয়তো ক্ষতিটা ভোগ করতেই হবে। যাই হোক, আর উদাসীন থাকলে হবে না, সদরে খবর পাঠাতে হবে। তার আগে থানায় একটা ডায়েরি অবশ্য করে রেখেছে সে। কেরোসিনের রেশনটা হাতে নেওয়ার কিছু দিন পরেই বরাদ্দর তেল কম দেওয়ায় কথা-কাটাকাটি ছুট-বেছুট বহু শুনতে হয়েছে গ্রহীতাদের কাছ থেকে। তেল কম না দিলে এতটা মেহন্নৎ ওর পোষাতো কি করে? ইব্রাহিম সে সব গ্রাহ্য করেনি—থানায় একটা ডায়েরিও করে রেখেছে।

গলিটা এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়েছে। পথ অসমতল আর আঁকা-বাঁকা। এখন ছুটবার দরকার নেই—ধীরে ধীরে পার হওয়া যাক ভেবে সে পায়ের গতি কমিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, দু'টো অন্ধকার-মূর্ত্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে। রাত বেশি হয়নি, ভূতের ভয় ওর কোন দিন নেই। কিন্তু এই গলিটার মনে হচ্ছে রাত নিশুতি। একটা বাড়িতেও আলোর রেখা চোখে পড়ছে না—একটুও কথা-বার্ত্তার শব্দ কানে আসছে না। ভুল করে ও কি কারখানার পথে এসে পড়লো?

না, অন্ধকার-মূর্ত্তি দু'টো যেন. পরীর নয়—মানুষেরই। মানুষের ভাষায় তারা বললে, সালাম মিঞা।

ইব্রাহিম প্রত্যভিবাদন না করে বললে, কি চাও?

কেরাচিন তেল। উত্তর এলো।

কেরাচিন তো এখানে কেন—দোকানে যেও কাল।

দোকান! প্রেতের মত মূর্ত্তি দু'টো হেসে উঠলো। বললে, দোকান তো ক'মাস ধরে দেখছি, একটা ঢেমি জ্বালাবার মত তেল দাও কি?

যা বরাদ্দ তার বেশী দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

বটে রে সুমুন্দির ভাই—তাই দাও? ঠাস্ করে একটা চড় এসে পড়লো ইব্রাহিমের গালে। সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য।

ইব্রাহিম রুখে উঠলো, খবরদার বেইমান—বেতমিজের দল।

আবার রোক্? বলে ঠাস্ করে আর একটা চড় এসে পড়লো ইব্রাহিমের গালে।

ইব্রাহিম ক্রুদ্ধ হ'য়ে সে চড় ফিরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো, মাটি ফুঁড়ে কালো প্রেতের দল এগিয়ে আসছে ইব্রাহিমের দিকে। হিস্-হিস্ একটা শব্দ কানে এলো। ঢোঁড়া সাপেরা বুঝি গর্জ্জন করছে, সমাধি-ভূমির অটল গাম্ভীর্য্য বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো। তার পর আর কিছু মনে ছিল না ইব্রাহিমের। সর্ব্বাঙ্গে আড়ষ্ট বেদনা, চোখ চাইতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হ'চ্ছে···কফিনের মধ্যে নরম বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে বেহেস্তের স্বপ্ন দেখছে। ঘুম চোখের পাতা ছাড়তে চাইছে না। সারা রাত মদ খেয়ে ফিষ্টি করে কসবী নিয়ে হল্লা-আমোদ করে আগে আগে যে অবসাদে ঘুম লেপটে থাকতো চোখের পাতায়, দেহ ছাড়তে চাইতো না বিছানা—তেমন ঘুম আর অবসাদে সে নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়েছে।

বেলা হ'লে সে উঠে বসলো বিছানায়। গোসল করবার জন্ম জল নিয়ে এলো তার মা। ভাই-বোনেরা ভিড় করে দাঁড়ালো তার বিছানা ঘিরে।

ইব্রাহিম বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে মা! নাস্তা করে বেরুতে হবে এখনই—আজ কেরাসিন বিক্রির দিন।

তার মা কপালে করাঘাত করে বললেন, হায় রে নসীব! তেল কি আর দোকানে আছে এক রত্তি! কাল রাত্তিরে লুঠ হ'য়ে গেছে দোকান।

ইব্রাহিম বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। ঘাড়ে-পিঠে আড়ষ্ট ব্যথা—পা নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে সে বিছানায় বসে পড়ে ভাঙ্গা গলায় বললে, পুলিশ—পুলিশে খবর দেয়া হয়নি?

মা বললেন, দোকানে দারোগা পুলিশ এসেছে—উনিও গেছেন। তুই গোসল করে নে বাবাজান।

ইব্রাহিম হাঁপাতে লাগলো—কোন উত্তর দিলে না।

৩২

মিটিং ভেঙ্গে যাবার পর অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরলে পুরন্দর। অত রাত্রিতেও—দূর থেকে সে দেখলে, তাদের দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলছে আর দু'-তিন জন বসে বসে গল্প করছে। বাইরের উঠোনে এসে সে সাড়া দিতেই দাওয়া থেকে নেমে এলেন পিসিমা—পিছনে তাঁর লণ্ঠন হাতে মা।

পিসিমা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন, ওরে কালো, এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুনছি বাবা! ছিধরকে না কি খুন করেছে মেজ বাবু?

পুরন্দর বললে, না, খুন করেননি।

পিসিমা হাউ-হাউ করে বললেন, এত রাত অবধি কোথায় ছিলি বাবা, আমরা দু'জন মেয়েমানুষ ভয়ে আকাট হয়ে ভেবে মরছি। এত যন্ত্রণা দিয়েও কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি বাবা?

কাঁদছ কেন পিসিমা? গোলমাল মিটিয়ে আসতে দেরি হ'লো একটু। যা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হ'য়েছিল রে?

পুরন্দর দাওয়ায় উঠে মাদুরের ওপর বসে বললে, সে অনেক ব্যাপার। একটা মিটিং ছিল। তাতে মেজ বাবুতে আর শ্রীধর বাবুতে কথা-কাটাকাটি হতে হতে এই ব্যাপার হলো।

বাসু বললে, শ্রীধর কি মারা গেছে?

পুরন্দর বললে, না। বন্দুকে টোটা ভরা ছিল না—পাখী-মারা ছটরা ছিল। রাগের মাথায় তাই ফায়ার করেছিলেন মেজ বাবু।

পিসিমা বললেন, সর্ব্বরক্ষে! তা তুই কেন গিয়েছিলি ওর মধ্যে? এই আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর আর যাবি নে ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে?

পুরন্দর ওঁর উদ্বেগ দেখে হাসলে। মা তাড়াতাড়ি বললেন, দিব্যি-দিলাস্তরে কাজ নেই বাপু! খাবি আয়।

বাসু জিজ্ঞাসা করলে, পুলিশ-হাঙ্গামা হবে তো?

পুরন্দর বললে, সম্ভব। পাখী-মারা ছটরা হ'লেও জখম হয়েছেন শ্রীধর বাবু। হাতে কপালে গলার কাছে গুলী লেগে রক্তপাত হ'য়েছে। ওরা অমনি ছাড়বে না।

অপূর্ব্ব বা, কি বললেন?

তিনি তো কলকাতায়। বাড়িতে সব মেয়ে-ছেলে। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে আসছি।

পিসিমা বললেন, ভারি বোঝানদার আমার! তোর অত-শত্তর দরকার কি বাবু! খা—দা—সাজের কাজ কর, বাগান দেখ—

পুরন্দর হেসে বললে, তুমিই তো বল, মেজ বাবু আমাদের ভরসা—অভিভাবক। এই বিপদের সময় ওঁকে ত্যাগ করা আমার উচিত হবে?

পিসিমা বললেন, জানি না বাবু উচিত-অনুচিত। তাই বলে থানা-পুলিশের হাঙ্গামা—ও-সবে আমি কিছুতেই যেতে দেব না তোকে। ওই থানা-পুলিশ সর্ব্বনাশ করেছে আমাদের। সত্যসুন্দরের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল এল।

মা তাড়াতাড়ি বললেন, খাবি আয়। বলে লণ্ঠন নিয়ে তিনি উঠোনে নেমে এলেন।

অনেক রাত অবধি জেগে রইলো পুরন্দর। আম গাছের মাথায় পাখা ঝাপটাচ্ছে কয়েকটা পাখী—মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদ ছুটেছে তীব্র বেগে। কাক-জ্যোৎস্নায় পাখীরা হয়তো মনে করছে ভোর হয়ে এলো।

ক'দিনের ঘটনাগুলো সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। একেই কি বলবে সে জাগরণ? দলান্ধ ভাবে এই ক্ষতি করার আনন্দ। প্রতিবেশীকে জব্দ করার উৎসাহ···হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করার নীতি—এরই নাম জীবন-প্রবাহ? প্রবল বর্ষায় পাহাড়ে ঢল নেমে সমতল ভূমিতে জলের যে বেগ বন্যার ভ্রুকুটি দেখায়—এ সেই অস্বাভাবিক প্রমত্ত-প্রবাহ, স্বাভাবিক খাতে এ ভাবে নদী বয় না। এ ভাবে জনস্রোতের দু'ধারে গড়ে ওঠে না সমৃদ্ধ বন্দর—জনপদ—শস্য-সম্পদ-ভরা উর্ব্বরা ভূমি—শ্রী ও কল্যাণদায়িনী পল্লী।··· এই জোর-জবরদস্তি, পীড়ন, ভয় দেখানো যত ভাল শাসন-ব্যবস্থার আশ্বাস দিক না, মানুষের মন এতে বিমুখ হবেই। সর্ব্ব রকমের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসই হ'চ্ছে মানুষের আদি শক্তি। এই শক্তি কোন কিছুতে ব্যাহত হবার নয়।

সকালে উঠেই সে কাজে লাগলো। আজ ডাকের কাজ শেষ করতেই হবে। বন্ধু লিখেছে—কাল দুপুরে এসে সে জিনিষ

নিয়ে যাবে, জগদ্ধাত্রী পুজোর মাত্র তিন দিন দেরি। বেশ, তাই হবে, আজই সে শেষ করবে কাজ।

খানিকটা কাজ করার পর পিসিমা এসে বললেন, ওরে, মেজ বাবুদের বাড়ি থেকে তোকে ডেকেছে। বিশেষ দরকার বললে।

সাজ গুছিয়ে পুরন্দর উঠছে—পিসিমা বললেন, নাড়া শুনলে সাড়া, তো নিলে পাড়া। জল-টল খেয়ে তবে বার হোস্, বাবা।

তুমি যে বললে বিশেষ দরকার! কে ডাকছেন?

নন্তি, বড় বাবুর মেয়ে, সেই তো বললে—দেখ পিসিমা, পুরন্দর বাবুকে অতি অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিও একবার। হাঁ রে, তোকে ওরা পুরন্দর বাবু বলে, না? বলে ভাইপোর গৌরবে হাসলেন।

পুরন্দর বললে, দাও, যা-হয় কিছু জলখাবার।

একটি নারকেল নাড়ু মুখে দিয়ে এক ঘটী জল খেয়ে সে ছুটলে। পথে এসে মনে হ'লো, খালি পায়ে না এসে চটি জুতোটা পরে এলে কি আর এমন দেরি হ'তো!

কিন্তু নম্রতা ডাকলে কেন এই সকালে? মেজ বাবু কি গ্রেপ্তার হ'য়েছেন?

বৈঠকখানার পাশে ছোট্ট ঘরে নম্রতা ছিল আর ছিল অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব বোধ হয় এই মাত্র কলকাতা থেকে এসেচে—সেই রকম ওর সাজসজ্জা। ভর্ত্তি সুটকেসটা চৌকির ওপর নামানো।

নমস্কার করে পুরন্দর বললে, এই মাত্র আসছেন বুঝি?

অপূর্ব্ব হেসে নমস্কার করে বললে, না, যাচ্ছি।

যাচ্ছেন? কোথায়? বিস্ময়ে সে অপূর্ব্বর পানে চাইলে। অপূর্ব্ব উত্তর না দিয়ে নম্রতার পানে চাইলে। নম্রতা যেমন মাটির পানে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল—তেমনি ভাবেই চেয়ে উত্তর দিলে, অপূর্ব্বকে ধরবার জন্য পুলিশ ইন্‌সপেক্টর হুকুম দিয়েছেন। দেখলেন না, বাইরের অশ্বত্থতলায় দু'জন লাল-পাগড়ী দাঁড়িয়ে আছে?

পুরন্দর জানালা-পথে চাইলে। সেখান থেকে মাঠটা নজরে পড়লো না।

অপূর্ব্ব বললে, মেজকা'কে যে করে হোক বাঁচাতেই হবে। যা বলবার নন্তিকে বলেছি, যা লেখবার চিঠিতে লিখেছি। আজকের ডাকে রেজেষ্ট্রী করে চিঠিগুলো ছেড়ে দেবেন। কাল রাত সাড়ে দশটায় এসে সারা রাত এই ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু আপনাকে ওরা গ্রেপ্তার করবে কেন?

অপূর্ব্ব হেসে বললে, সাম্রাজ্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করবার চেষ্টা করে যারা, তাদের সাম্রাজ্যবাদীর আইন ক্ষমা করে না। হ'য়তো আরও কিছু দিন জেলের বাইরে থাকতে পারতাম, কিন্তু—একটু থেমে গম্ভীর হ'য়ে বললে, ফায়ার ইজ এ গুড সার্ভাণ্ট, বাট এ ব্যাড মাষ্টার।

পুরন্দর যেন কতক কতক বুঝলে ওর কথা। বললে, মাস্-মুভ্‌মেণ্ট সোজা কথা নয়। হঠাৎ ও জিনিষ হয় না। কত বছর ধরে, জমি তৈরী করে—

অপূর্ব্ব বললে, অগ্নিযুগের ইতিহাস আমি পড়েছি। থাক সে কথা।···আমাদের পথ অহিংসার পথ নয়, তবু হিংসাকে এমন মারাত্মক ভাবে কল্পনা করিনি কোন দিন। লাঠি দেখলে এগুবো, বন্দুক দেখলে হাঁটু গেড়ে বসবো—মাত্র এইটুকু শক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের স্বপ্ন দেখা—ঘুমের ঘোরেই মানায়।···কাল ধাইপাড়ার গলিতে ওরা ইব্রাহিমকে ঠেঙিয়েছে, রাত্রিতে ওর দোকান লুঠ করেছে। আজ পুলিশ দেখেই হাঁটু গেড়ে বসেছে ওর পায়ের তলায়। বলছে, এ কাজ তারা না বুঝে কুলোকের মন্ত্রণা শুনে করেছে। নইলে তাদের মত ধর্ম্মভীরু নিরীহ প্রজা মহারাণীর রাজত্বের আর কোথাও নেই।

সর্ব্বনাশ! তোমার নাম করেছে বুঝি?

করুক—তাতে ভাবনা কি? বলে অপূর্ব্ব হাসলে। তার পর বললে, আমি ওদের যে পুঁজিবাদ ধ্বংসের কথা শুনিয়েছি, তা ওদের ভাল লেগেছে কেন জান? মনের অক্ষম হিংসাকে এই পথে মুক্ত করে দিয়ে ওরাও ধনী হবে ভেবেছিল।

ডাকাতি করে বড়লোক হওয়ার মত এই আন্দোলনকে ওরা সুযোগ বলে আঁকড়ে ধরেছিল। সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ বোঝ।—হাঁ, তার জন্য জমি তৈরী করার দরকার। জমিতে সার না দিলে ভাল ফসল ফলবে কেন?

টুপিটা ও মাথায় দিয়ে সুটকেসটা উঠিয়ে নিলে।

চললেন?

পুরন্দরের ডান হাতখানি নিজের ডান হাতে টেনে নিয়ে বললে, হাঁ। সত্যাগ্রহী আমরা নই। আমাদের জন্য এত বড় জেলখানা থাকতে ছোট জেলখানায় ঢুকবো কোন্ দুঃখে?

পুরন্দর বললে,—পালিয়ে কত দিন বেড়াবেন?

অপূর্ব্ব বললে, সেটা পুলিশের কার্য্যপটুতার ওপর নির্ভর করে না—নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। হাতটা নেড়ে সে পিছনের দুয়োর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পুরন্দর যেন স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন ভাঙতেই সে বাস্তবে ফিরে এলো। চৌকির ওপর বসে নম্রতা দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কি সান্ত্বনা সে দেবে নম্রতাকে!

ক্রন্দনের বেগ কমলে নম্রতা মুখ তুললে। পুরন্দরকে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, চিঠিগুলো নিয়ে যান, আজই ডাকে দেবেন।

চিঠির গোছা জামার পকেটে ফেলে পুরন্দর বললে, মেজ কাকা বাবুকে কখন নিয়ে গেল?

কাল রাত্তিরে, খুব সম্ভব জামিনে উনি খালাস হ'য়ে আসবেন।

জামিন হবেন কে?

আমাদের উকিল মহিম বাবু। তা ছাড়া দাদা, বাবার নাম করে হাইকোর্টের বড় উকিল ব্যানার্জ্জি সাহেবের নামে চিঠি দিয়েছেন। তিনি এসে পড়বেন।

আপনার দাদার কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না। পুরন্দর ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে।

দাদার কথা আমি একটুও ভাবছি না। দাদা যে এক দিন ফাঁসি যাবে, সে আমি জানি।

না—না, আপনার দাদা—

ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখছি, ওর বন্ধু-বান্ধবদেরও জানি। বাবা বলতেন, ও ছেলেকে আমি দেশের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছি, তোরা কেউ যেন ওর ওপর দাবি-দাওয়া রাখিস্ না।

আপনার মা—

আমি যখন তিন বছরের তখন মা মারা যান।

নম্রতা অকস্মাৎ চুপ করলে। ঘরে নামলো গম্ভীর নিস্তব্ধতা। এর পর সান্ত্বনা দেওয়ার দুশ্চেষ্টা পুরন্দরের মানায় না। নম্রতাকে সে যত ছেলেমানুষ মনে করেছিল, সে তা নয়। বালিকা বয়স থেকেই বেদনা ওর সহিষ্ণুতাকে অটল করে গড়েছে।

নম্রতা বললে, মেজকা'র কথা ভাবছি আমি। এই বুড়ো বয়সে, কি আঘাতটা না পেলেন উনি। জীবনের চেয়ে মান-সম্মানকে উনি বড় করে দেখে এসেছেন চিরকাল। একটু থেমে বললে, আপনি দেখবেন, ফিরে এসে উনি বেশি দিন বাঁচবেন না।

সে কথা পুরন্দরের মনেও হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবেছে, এ-বংশের আভিজাত্য মেজ বাবুর সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। অপূর্ব্বরা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। সেখানকার মান-সম্মান বুর্জ্জোয়া-প্রভাবিত নীতি-ধর্ম্মের মানদণ্ডে স্থিত নয়। বংশগত দাবী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সূর্য্যরশ্মিতে কুয়াশা-লুপ্তির মতো। তবু অপূর্ব্বর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে ওই নীল রক্ত কি ক্রিয়া করছে না? শাসন করার মর্য্যাদা ও কোথা থেকে পেলে? জনগণকে জাগাবার জন্য শ্লোগানের পর শ্লোগান কঠিন তীক্ষ্ণ তীরের মত ওর কণ্ঠচ্যুত হ'য়ে জনতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে—তার উৎস কোথায়? দারিদ্র্যের কঠোরতম আঘাত ওকে সইতে হয়নি। অন্নাভাবে নয়—বস্ত্রাভাবে নয়—কোন অভাবই কোন দিন কি ওকে কশা-জর্জ্জরিত অশ্বের মত ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল? তবু ও কক্ষচ্যুত উল্কা'র মত কেন খসে পড়লো সাম্যবাদের শুকনো মাটিতে? ও এ-পথ নিয়েছে একটি কারণে। তীব্র সংবেদনশীল মনের অন্তরালে ভবিষ্যৎ-সন্ধানী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তড়িৎ-প্রবাহ ওকে ম্লান আকাশের কোল থেকে নামিয়ে ছুটিয়েছে লাল পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য সন্ধানে। সে ঐশ্বর্য্য ও নিজের জন্ম সংগ্রহ করবে না। দুর্গম পথ আবিষ্কারের মধ্যে এই যে জীবন পণের নেশা? এর মধ্যেই রয়েছে নীল রক্তের সূক্ষ্ম ক্রিয়া—অনুপ্রাণনা। সর্ব্বহারারা এ-ভাবে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে কি? আর করলেও সে ত্যাগের মাহাত্ম্য স্বীকার করবে কেন আজকের পৃথিবী? নীল রক্ত-অধ্যুষিত পৃথিবী?

উত্তেজনায় গ্রাম ধূ-ধূ করে জ্বলছে। এর একাংশও স্বাধীনতা দিবসে ও প্রত্যক্ষ করেনি! এরা বেঁচে নেই কে বলবে? যে চিলে তারে এদের জীবন-বীণা বাঁধা—তাতে পর্দ্দা না চড়িয়ে উঁচু সুর বাজাতে যাওয়া ভুল। হাঙ্গামা এরা ভালবাসে—যদি পায়ের নীচে দিয়ে কি পাশ দিয়ে তার ঢেউ চলে যায়। তাতে যে দোলা লাগে—যে ধ্বনি ওঠে, তা সমস্ত বৃত্তি দিয়ে উপভোগ করতে পারে এরা। সামনের ঢেউ যত ছোটই হোক, এরা মেনে নিতে পারবে না। গভীর থেকে উঠে, তীরে এগিয়ে এসে ডাকে যে তরঙ্গ-গভীরে ফিরে যাবার জন্য—তাকেই ভয় বেশি। কেন না, গভীরের সেই ধ্বনি সংসারের দিনানুদিন ধ্বনির মত তরল নয়—মধুর নয়—নিশ্চিন্তের নয়। জন্মোৎসব থেকে মৃত্যু উৎসব পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষের পায়ের দাগে পা মিলিয়ে—আচার-অনুষ্ঠানের হাত ধরে চোখ বুজে যে চলাটি শাস্ত্র-শাসনের মত নির্ব্বিঘ্ন, তারই নাম সাত্ত্বিকতা। এর বাঁ ধারে আছে তামসিকতা—ঋষি বলছেন, ও-ধার হেলবে না। ডান ধারে রাজসিকতা—সংসারী বলছেন, ও-ধারও তোমার নয়। তোমার পথ সামনে। কিন্তু এরই নাম কি সাত্ত্বিকতা?

[ক্রমশঃ

যাত্রাপথের আলো

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

ওগো আমার যাত্রাপথের আলো
অচিন্-লোকের যাত্রাপথে
দীপ্ত তোমার দীপ্তি ঢালো!
পথের ধূলি যত নাই বা হল রাঙা-বরণ,
তোমার আলোয় চলবে তবু ক্লান্ত চরণ—
বেল-চামেলী ওড়্‌না তাদের চম্‌কা খুলি
চুম্ দিয়ে হায় নাই বা দিল রক্ত-জবার তুলি!
এ পথ দিয়ে গেছে যারা সর্ব্বনাশার টানে
কেউ ফেরেনি মর্ম্ম-পুরীর স্বপ্ন-ঝরা গানে—
শিউলিগুলো ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌লো তালে তালে,
লাগলো দোলা কুন্দ-কুঁড়ির সুপ্ত ডালে ডালে।
সুর-পরীরা সুর দিয়ে হায় দেয়নি জগৎ ছাপি
গাইতে গিয়ে সুর জাগে না—কণ্ঠ যে যায় কাঁপি:
পিছন্-চাওয়া রিক্ত-বুকের বেদন নিয়ে
পথিক যারা আমার আগে গেছে এ পথ দিয়ে—
সবাই তারা ফেল্‌লে নিশাস্ দীর্ঘ পথের টানে:
সেই যে নিশাস্-স্তূপ: কত কালের কেউ-ই বা জানে!
আজকে কেন জাগায় প্রাণে শঙ্কা-ভীতির নাড়্‌না?
তোমার আলোয় পথ দেখিয়ো এইটুকু মোর যাচ্‌না!
হয়তো দোষী হাজার দোষে; করিস্ তোরা ক্ষমা—
বিকিয়ে দিলুম্ মানের বালাই
ছিল যে সব বহুৎ জমা।
তরুণ বুকে হয়তো কারো একটু ছিল স্থান,
বিদায়-বেলার বিষম ভুলে দিইনি তারে দান:
একটি শুধু নয়ন-পাতে বুকটি দিল আমার হাতে,
তারেই কি না গেলুন ভুলে যাত্রাপথের আব্‌ছাতে!
একটি শুধু প্রার্থনা মোর, বেজায় কি না তাড়া:
রক্ত-কমল চিত্ত-সরের হয় না যেন জ্যোৎস্না-হারা!
ওগো আমার যাত্রাপথের আলো
শরৎ-প্রাতের কোন্ শেফালি এমনি ধারা সুর ছড়ালো?

কবির বাসবদত্তা

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন-বিলাসী প্যারিসের সামান্ত এক জন অপেরা-গায়িকা। সংখ্যাহীন রসিকচিত্তে আবেদন সঞ্চার এবং অপেরা-মালিকের কাছে নিজের মূল্য ও চাহিদা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ও কর্ম্মে তিনি বিভোর হ'য়ে থাকেন। গান গেয়ে নামও হয়েছে বেশ! দেখে-শুনে মালিক একসঙ্গে চুক্তি পাকাপাকি করেছেন তিন বছরের জন্তে। অপেরা-গায়িকার অবসর সময় অবশ্য অফুরন্ত নয়। তবু এক দিন এমনি এক নিরালা অবসরে তিনি পড়ছেন এমার্সনের একখানা দর্শনের বই যা' কোনো দেশের সাধারণ অভিনেত্রী ত' দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও বিশেষ পড়ে কি না সন্দেহ। বইখানির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন ইউরোপীয় নাট্য ও কাব্যসাহিত্যের যুগন্ধর কর্ণধার মরিস মেটারলিংক। বইখানি খুলেই প্রথমে চোখে পড়ে সম্পাদকের লেখা ভূমিকাটি—ভাব আর ভাষা, বুদ্ধি আর দর্শন, কবিত্ব ও ব্যঞ্জনা যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে মধুর সমন্বয়ে। আসল বইয়ের মূল বক্তব্যকে ছাড়িয়ে ভূমিকাটি হ'য়ে উঠেছে যেমন উপাদেয় তেমনি অন্তরস্পর্শী। গায়িকা প'ড়ে চলেছেন সেই ভূমিকাটি বারবার। ভূমিকা-লেখকের মূর্ত্তি-কল্পনার অন্তহীন প্রচেষ্টায় সে-নিশীথে গায়িকার নিদ্রাহীন চোখের পাতা দু'টি ক্লান্তিতে ভারী হ'য়ে ওঠে তবু আসে না ঘুম।

উপন্তাস নয়, রোমান্স নয়, কাহিনী নয়। সেদিন তিনি হঠাৎ মনে মনে অনুরাগের ভারে অবনত হ'য়ে পড়েন এই কবি-পুরুষটির কল্পিত মূর্ত্তির সামনে! জীবনেও এই পুরুষটিকে দেবতা ব'লে বরণ ক'রে নেবার সুপ্ত ও একান্ত কামনা উন্মনা ক'রে তোলে লীলাময়ী এই গায়িকাকে। প্রাণ দিয়ে, হৃদয়ের সঞ্চিত অনুরাগের সমস্ত উত্তাপটুকু দিয়ে সেই বুদ্ধিদীপ্ত বিখ্যাত প্রতিভাকে ভালোবাসার প্রতিদান বিফল হ'তে পারে না, এই দৃঢ় বিশ্বাসে পরের দিনই তিনি খোঁজ নিয়ে মেটারলিংকের সঙ্গে দেখা করার আশায় ব্রুসেলস্‌এ গিয়ে হাজির হলেন। কবি ও নাট্যকার মেটারলিংক, প্রতিভার যশে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, আর প্যারিসের সামান্ত অপেরা-গায়িকাকে সেখানে চেনেই বা কে? সেখানে বসে বসে এদিকে ছুটি ফুরিয়ে আসার উপক্রম, অথচ পরিচয় ত দূরের কথা, এমন কি, দেখা করার সুযোগ পর্য্যন্ত মেলে না তাঁর প্রাণ-পুরুষের সঙ্গে। মেটারলিংকেরই বিশেষ পরিচিত এক জনের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর এক দিন। তাঁর মনের কামনা ও বাসনার খোঁজ-খবর পেয়ে লোকটি ব'লে বসে: কিন্তু আপনি ভুল করছেন, মেটারলিংক সে ধাতের লোক নন, যেমন অসভ্য, তেমনি অসামাজিক আর বিশেষ ক'রে মানুষের প্রতি তাঁর যেন অপরিসীম ঘৃণা, রঙ্গমঞ্চের এই দু'-মুখো লোকদের জন্তে ত তাঁর মনের কোণেও কোন ঠাঁই নেই, কৃত্রিম মানুষগুলির জন্তে তাঁর নেই কোনো স্নেহ, মায়া, সহানুভূতি, এ আমি আপনাকে হলফ ক'রে বলতে পারি।

—কিন্তু আপনিও বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম মানুষদের দলে হ'লেও তাঁর প্রতি এই যে আমার প্রেমের বিকাশ তা' সাগরের পানে ছুটে-চলা আলো-ঝলমল নদীর মতন, তা' বিকার-হীন সূর্য্যের আলোর মতন—। গায়িকা নায়িকার আবেগময় কণ্ঠস্বর।

—তা' ছাড়া, আপনি মনে মনে মেটারলিংককে যে ভাবে কল্পনা করেছেন তা' আপনার মনের ভুল। তাঁর বয়সও অনেক, চেহারা বুড়োর মত, আর গালভরা দাড়ি।

—উপন্তাসের নায়িকা আমি নই ত, স্বামিরূপে যদি তাঁকে না-ও পাই, পিতার মত গ্রহণ করবো তাঁকে, কন্তার মতই স্নেহে-শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্যকে ধন্ত ক'রে তুলব। নায়িকার অবিচলিত উত্তরে লোকটি এবারে অপ্রতিভ হ'তে বাধ্য হয়।

সেদিনের পার্টিতে আছেন প্রধান অতিথি কবি-নাট্যকার মেটারলিংক আর আছেন নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে প্যারিসের সামান্তা অপেরা-গায়িকাও। ব্লু-বার্ড ও মেরী ম্যাগডেলেনের নাট্যকার যখন স্পন্দিত অভিনন্দনের মধ্যে প্রবেশ করলেন নায়িকা চমকে উঠে তাকালেন তাঁর দিকে। গায়িকার চোখে নেমে এসেছে স্বপ্নলোকের ছায়া, মিল হয়েছে স্বপ্নে আর জাগরণে, তফাৎ নেইকো কল্পনায় আর বাস্তবে। তাঁর সাধনার ধন কল্প-লোকের মানস-সুন্দর মেটারলিংক সুশ্রী সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় ভাস্বর পুরুষ। স্বপ্নে-ঘেরা মূর্ত্তির নিখুঁত প্রতিকৃতি। উচ্ছ্বাসের স্রোতে গায়িকা সেদিন তাঁর জীবনের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বেদনার কাহিনী অকপটে উজাড় ক'রে নিবেদন করলেন এই ব'লে: আমি শুনেছি, মঞ্চের মানুষদের আপনি ঘৃণা করেন। আমিও সেই কৃত্রিম রমণীদের মধ্যে এক জন, কিন্তু ভেবে দেখুন, মঞ্চের খেয়ালী বিলাসী সৌখীন প্রকৃতি ছাড়াও আমার মধ্যে নারীর সংসারী গভীর প্রকৃতিও আর একটি আছে যা' ত্যাগের মহত্বে গরীয়সী, সহিষ্ণুতার আলোয় মহীয়সী। আমার জীবনের এই বাস্তব প্রকৃতির চরম সার্থকতা, শ্রদ্ধায় আনত হ'য়ে ঐ দু'টি পায়ের তলায় আসন পাতার অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য—এ কি আমি চাইতে পারি না, এ কি আমার অন্তায়, এ কি পাপ?

গায়িকা নায়িকার মহিমময়ী মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে কবি-নাট্যকার সেদিন নীরব, নির্ব্বিকার। তাঁর আবেগ-কম্পিত জলভরা চোখের দিকে তাকাতে পারেননি সেদিন মেটারলিংক। ভাবেন, প্যারিসের অপেরা-গায়িকার বুঝি এ এক ক্ষণিক উত্তেজনা, অভিনেত্রী-জীবনের রোমাঞ্চকর রঙ্গ-বিলাস—না আরো কিছু?

নায়িকা ফিরে গেলেন স্বস্থানে কিন্তু ধৈর্য্য তাঁর অবিচলিত। স্থির বিশ্বাস আর বুক-ভরা ভালোবাসা কখনো ব্যর্থ হয় না, হবার নয়, এই সযত্ন সঞ্চিত আশায় তিনি প্রতিদিন প্রাণের বঁধুকে, ইন্দ্রলোকের নায়ককে একখানি ক'রে চিঠি লিখে চলেছেন অবিশ্রান্ত ভাবে। উত্তর আসে না, তবু পত্রাঘাতে ক্লান্তি নেই। দীর্ঘ তিন মাস পরে অভিসারী নায়িকার মিলন-কুঞ্জে ফুল ফুটল। কবি-নাট্যকার, ইউরোপীয় সাহিত্যের অবিনশ্বর রচয়িতা অপেরা-গায়িকাকে তাঁর জীবনের নায়িকারূপে গ্রহণ করলেন। সেদিনের উপেক্ষিতা নারী কিন্তু সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্ত্তটিকে ভুলতে পারেনি কোনো দিন। উপেক্ষার বেদনা, অপেক্ষার সহিষ্ণুতা ও মিলনের আনন্দ—সবের মাঝেই তিনি সেদিনের পার্টির স্মৃতিকে অম্লান ক'রে রেখেছেন। গাছের সঙ্গে যেমন ছায়ার সম্পর্ক, সেই মুহূর্ত্তটির সঙ্গে তাঁর জীবনেরও তেমনি অচ্ছেদ্য বন্ধন।

যে দৃষ্টির সামনে মানুষের আত্মা তার অনাবৃত রূপ নিয়ে নিজস্ব মহিমায় ওঠে উদ্ভাসিত হ'য়ে, সেই দৃষ্টি সেই প্রেমের আলো দিয়েই কবি-নাট্যকার দেখেছিলেন সামান্তা সেই অপেরা-গায়িকাকে। সামান্তকে অসামান্ত ক'রে দেখা, রূপকে অপরূপ ভাবে অনুভব করা এইখানেই মেটারলিংকের বৈশিষ্ট্য। তার নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই আমরা তাঁর অমর নাটক মেরী ম্যাগডেলেনের মধ্যে। তাঁর কাব্য-নাটকের মূল সুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁরই অন্ত একটি উক্তিতে—"To learn to love one must learn to see."

বাঙালী মেয়েদের স্বাধিকার আন্দোলন

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

জগৎ পরিবর্তনশীল। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রচিত। পরিবর্তনের এই চিরন্তন ধারা সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে এক বিরাট চাঞ্চল্যের অবতারণা করেছে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) পরিসমাপ্ত। ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর মধ্য-ইউরোপে জেগে উঠছে গণ-স্বাধীনতার আদর্শ। পূর্ব-এশিয়ায় চীন দেশে বেধেছে আধা-ফ্যাশিষ্ট সরকারের সংগে কমিউনিষ্টদের বিরোধ। ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, প্যালেষ্টাইন, মিশর ইত্যাদি দেশও সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ শৃঙ্খলটুকু চূর্ণ ক'রে স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের আগ্রহে চঞ্চল। ভারতবর্ষও বিশ্বজোড়া এই মুক্তি-অভিযানে এক বৃহৎ অংশ গ্রহণ করেছে। বিগত ১৫ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট। গণ-পরিষদে স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র গড়ে তুলবার দিনও প্রায় আগত। নতুন সৃষ্টির বেদনায় দেশবাসীর অন্তর আজ স্পন্দিত। যুগ-সন্ধিক্ষণের অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য বাঙালী নারী-সমাজকেও স্পর্শ করেছে। সমাজের ও পরিবারের সকল মিথ্যা বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে আপনাকে প্রকাশ করবার আগ্রহে সে-ও আজ ব্যাকুল। সে আর ঘরের কোণে অবগুণ্ঠিত বধূ হ'য়ে জীবন কাটাতে রাজী নয়। সে আজ চায় পুরুষের সংগে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে সম-মর্যাদা ও সম-সমান অধিকার। বাঙালী নারী জাতির সেই স্বাধিকার-বোধের উন্মেষ ও বিবর্তন লিপিবদ্ধ করাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে নারী-স্বাধীনতার উদ্বোধন অত্যন্ত আধুনিক ; তদনুরূপ আন্দোলন তার চেয়েও নতুন। ইংল্যাণ্ড, জার্মাণী, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদির মতো পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশগুলির পক্ষেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ঐ সকল দেশের সমাজ-জীবনেও নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বৎসরের চেয়ে বেশী পুরানো নয়। মধ্যযুগে ইউরোপে নারীদের অবস্থা ছিল ভারতীয় নারীদের মতোই অসহায় ও শোচনীয়। সম্পত্তিগত অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত এবং আর্থিক বিষয়ে স্বামীর উপর ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। চার্চের প্রাধান্য তাদের জীবনে ছিল অত্যন্ত বেশী এবং পরলোকের গৌরব ছিল সব চেয়ে উঁচু দরের। তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষের মেয়েদের মতোই পর্দার আড়ালে একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ। মাতা-কন্যা-ভগিনী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মূর্তিতে সমাজ-জীবনে নারী-সত্তা প্রায় অকল্পনীয়ই ছিল। তার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস বা নব জন্মের যুগে মুষ্টিমেয় নারীর মধ্যে বিদ্যার্জনের স্পৃহা লক্ষিত হলেও, নারী-স্বাতন্ত্র্য ও নারী-স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল না। এমন কি গৌরবময় ফরাসী বিপ্লবের (১৭৯০-১৭৯৯) আবহাওয়ায়ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ স্থান লাভ করেনি। ফরাসী বিপ্লব ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র এবং ক্যাথলিক ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সজ্ঞান ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের আবহাওয়ায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহিমা-কীর্তন থাকলেও সে আদর্শ একান্ত ভাবে পুরুষশ্রেণীর ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক রাইকার এই এই প্রসংগে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে: "The French Revolution, a Part from its stress on lofty abstractions, liberty and equality, did nothing for the advancement of woman" (১)।

ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা দিল শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ। তার ধাক্কা ইংল্যাণ্ডেই এসে পড়লো সকলের আগে। শিল্প-বিপ্লবের আঘাতে পুরানো আর্থিক গড়ন দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগলো। মিল-ফ্যাক্টরি-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে নতুন নতুন দিক থেকে চাকরীর রাস্তাও হলো উন্মুক্ত। মেয়েদেরও অনেকে খুঁজে পেলো জীবিকা উপার্জনের স্বাধীন পথ। আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মেলা-মেশার ফলে তাদের মানস-লোকে এলো পরিবর্তন—দেখা দিল আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাদের সেই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধই পরে একদিন সজ্ঞান ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নারী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গোড়া পত্তন করলো। শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সংগে সংগে ধনতন্ত্রবাদের বিজয় ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ; ইংল্যাণ্ডেই অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে সকলের আগে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সার্বজনীন ভোট-প্রদানের ক্ষমতা প্রথমে পুরুষশ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা সম্প্রসারিত হ'তে লাগলো নারীদের সামনেও। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হলো নারী-পুরুষের অধিকার-সাম্যের দর্শন। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপন্থী দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল লিখলেন তাঁর সুবিখ্যাত "Subjection of Women" বইখানি। নারী জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ভবিষ্যতে এই বই হয়ে দাঁড়া'লা উন্নতিকামীদের নিকট বেদ-বাইবেল-কোরাণ-স্বরূপ। এই বইখানির ভিতর মিল নারী জাতির আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র এবং সামাজিক-রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে পুরুষদের সংগে অধিকার-সাম্যের জয়গান অতি জোরের সংগে প্রচার করেন। নারী জাতির স্বাধিকার আন্দোলন ইংল্যাণ্ডের মতো প্রগতিশীল দেশেও গড়ে উঠে ১৮৬৭ সনেরও পরবর্তী কালে। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই আন্দোলন ছিল নিতান্ত দুর্বল। প্রকৃত পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী কালেই কেবল পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল রাষ্ট্রের মেয়েরা উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অর্জন করে। সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বাদ দিলে আজও সেই আন্দোলন পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশগুলিতে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেনি (২)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নারী জাতির স্বাধিকার আন্দোলন বর্তমান জগতের অত্যন্ত আধুনিক ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

এবার বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) যুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) মধ্য-কালীন সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরেই বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে

---

(১) Riker: "A Short History of Modern Europe" (New York 1935, p 746)

(২) সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েদের অধিকার ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিক থেকে কল্যাণী রায়-প্রণীত "সোভিয়েট মেয়েরা" (কলিকাতা, ১৯৪৬) পুস্তকখানি পঠিতব্য।

স্ত্রী-স্বাধীনতার বিকাশ ও বিবর্তন (৩)। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-বিপ্লবের (১৯০৫-১৪) আবহাওয়ায় নারী-স্বাধীনতার চিন্তা তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। বঙ্গ-বিপ্লব ছিল মোটের উপর পুরুষের আন্দোলন। নারীদের কৃতিত্ব এর ইতিহাসে অল্প-বিস্তর থাকলেও, নারী-স্বাধীনতার স্বপ্ন এর অন্তরে ঝংকৃত হয়নি। নারী-স্বাধীনতার অর্থ হলো, পুরুষ শাসিত সমাজের সর্বপ্রকার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। আইনের দ্বারা সাম্য অর্জন এবং পুরুষের সংগে আর্থিক-রাষ্ট্রীক-পারিবারিক ক্ষেত্রে সম-সমান অধিকার গ্রহণ। একেই ইংরেজী পরিভাষায় "Feminism" নামে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে এই স্ত্রী-স্বাধীনতার সুর ১৯০৫-১৪ সনের স্বদেশী আন্দোলনে ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে জাতীয়তার মন্ত্রই উদ্ঘোষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার অধীর চঞ্চলতাও এর হৃদয়ে বর্তমান ছিল; কিন্তু ছিল না পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে আত্ম-সচেতন নারীর বিদ্রোহ। সুবিখ্যাত জীবনী-লেখক ও ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বদেশী যুগের চিন্তাধারা ও কর্মস্রোত আলোচনা প্রসংগে নিম্নরূপ লিখেছেন: "নারী বলিতে স্বদেশী যুগে আমরা যাহাদের নিয়া ঘর করিতাম তাহাদের তো তখনো বাহির করি নাই। সময় আসে নাই। বাহির করিলে জনতার পুরুষভীতি তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। সরলা দেবী? তিনি একা, তিনিও তো নারী-কর্মী বা নারী-সংঘ সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ব্যায়াম সমিতিতে তরুণ ছোকরারাই লাঠি খেলিত, তলোয়ার ভাঁজিত বীরাষ্টমী করিত। স্বদেশী যুগে নারী-কর্মী ছিল না। যা ছিল ছিটে-ফোঁটা, ধর্তব্য নয়। ব্রাহ্মমহিলারা সম্ভবত বেজায় হিন্দুয়ানীর চোটে আর ব্রাহ্ম নেতাদের বিনা অনুমতিতে, কাছে আসিয়া ভিড়িতে ভরসা পান নাই। সরলা দেবীর প্রভাব এই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মমহিলাদের উপর বিস্তার লাভ করে নাই। তাহারা 'সোসাইটিতে'ও নাই, 'ক্লাবে'ও নাই, যা আছেন ঐ শুধু রবিবারের 'সমাজে', 'ব্রাহ্মমন্দিরে'" (উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৫০)।

তা'হলে এখন সমীচীন প্রশ্ন হ'লো, বাংলাদেশে স্ত্রী স্বাধীনতার জন্ম কবে থেকে এবং কোন্ কোন্ কারণেই বা এর বর্তমান বিকাশ ও বিবর্তন? ঐতিহাসিক বিচারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী যুগ থেকেই বাঙালী মেয়েদের এই অভিনব জীবন বিকাশের সাধনা লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তিগত মহানুভবতার পরিণতিতে বা বিশিষ্ট নারীর খামখেয়ালী খুশীতে এর উৎপত্তি নয়। এর উৎপত্তির মূলে আছে বাস্তব পৃথিবীর বিপুল সংঘাত—অর্থনৈতিক পটভূমিকায় নিদারুণ অসংগতি। আর্থিক অসংগতি ও বিশৃঙ্খলা সমাজ-জীবনে সৃষ্টি করেছে এক প্রচণ্ড অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য। এই অসন্তোষ বাংলাদেশের পরিবারগুলিকে যুদ্ধোত্তর যুগে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের চাপে বাঙালী মেয়েদেরও অনেকে তাদের পুরানো জীবনযাত্রা-প্রণালী ছাড়তে বাধ্য হয়। গৃহের কোণে সর্ববিষয়ে স্বামি-পিতা-পুত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকলে আর চলবে না। তাই যুগের দাবিতে সাড়া দিতে গিয়ে তারাও আর্থিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবার জন্ম ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো। অবশ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সংগে অনেক সময়ই অল্প বিস্তর অবদমিত যৌনশক্তির প্রভাবও এই অগ্রগমনের পশ্চাতে ছিল। তাছাড়া, আর্থিক বোঝা হাল্কা করার অভিপ্রায়ে পুরুষেরাও অনেক ক্ষেত্রে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে মেয়েদের এই অগ্রগমনের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। আর্থিক অভাব ও অনটন যুদ্ধোত্তর যুগে অর্থাৎ ১৯১৪-১৮-র পরবর্তী কালে যতই এ দেশের পরিবার-জীবনকে বিধ্বস্ত করতে সুরু করে, মেয়েরাও ততই গৃহের সীমানা পার হ'য়ে বাহর্জগতে পদার্পণ করতে থাকে। তাদের শিক্ষার জন্ম নতুন নতুন স্কুল-কলেজের পত্তন হ'লো এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অংশও গ্রহণ করলো তাদের অনেকেই। এই সকল মেয়ের কাজ-কর্ম সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্পর্শ করলো, সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির (১৯২৫) মতো বহু নারী-সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত হলো। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের কাজকর্ম সুরু হলো এবং ধীরে-ধীরে তারাও পুরুষদের মতো ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপন করলো। কালক্রমে সেই দাবী আংশিক ভাবে স্বীকৃতও হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর মাত্র দু'-এক বছর যেতে না যেতেই দেশের নানা প্রান্তে দেখা দিল বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীদের অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলনের সর্বপ্রধান অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। তাঁর বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দিল ভারতের জনসাধারণ। পুরুষদের সংগে সংগে নারীদেরও সংযোগিতা পাওয়া গেল। বাঙালী মেয়েরাও সেদিন নিশ্চল হয়ে থাকেনি। তারাও ঐ দেশজোড়া আন্দোলনের ধারায় দান করে নিজেদের শক্তি, সাধনা, কর্ম ও আদর্শনিষ্ঠা। পুরুষের সংগে তারাও দলে দলে স্বীকার করে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ, হাসিমুখে বরণ করে কারাগারের দুঃখময় জীবন। রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের এই গৌরবময় অংশ গ্রহণ তাদের স্বাধিকার দাবীকে নতুন ভাবে এক বিরাট মর্যাদা দান করে। ১৯১৯ সনে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে ভারতীয় নারী জাতির সম্মুখে ভোটাধিকারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে ১৯২১ সনে এবং যুক্তপ্রদেশে ১৯২৩ সনে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মেয়েদের সামনে ভোটদানের অধিকার প্রসারিত হয়। বাঙালী মেয়েরাও তাদের কৃতিত্ববলে ১৯২৬ সনে সম্পত্তিগত ভিত্তিতে ভোটাধিকার লাভ করে। তার পর ১৯৩৫ সনের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ-কর্ম আরও বেড়ে চলে। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে তাদের সম্মুখে ভোটাধিকার বিস্তৃত হলো আরও ব্যাপক ভাবে। সম্পত্তিগত অধিকার-ভিত্তির পরিবর্তে এই নতুন আইনে "wifehood qualification" এবং lower educational qualification'এর ভিত্তিতে নারীদের নিকট ভোটাধিকার প্রসারিত হলো। ফলে ভোটদাত্রীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেলো পূর্বেকার চেয়ে অনেক বেশী। এই আইনের বলে তারা শুধু আইন-পরিষদে প্রবেশাধিকারই লাভ করলো তা নয়, অনুকূল অবস্থায় মন্ত্রিত্বের, এমন কি, প্রধান মন্ত্রিত্বের

(৩) এই প্রসংগে হরিদাস মুখোপাধ্যায়প্রণীত "বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী" (কলিকাতা, ১৯৪৫) গ্রন্থখানি পঠিতব্য। বাঙালী মেয়েদের আত্ম-জাগরণ ও স্বাধিকার আন্দোলনের আদর্শ ও ইতিহাসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে বইখানিতে!

সেই সুর

প্রভাকর সেন

সারসের ঝাঁক হয়ে কোন কোন সাদা মেঘ জানে
বুনো আমলকীর স্বাদ আশ্বিনের বাতাসের গানে,
কোন শিশু শঙ্খচিল নীড় হতে নিরুদ্দেশ হয়ে
নীলাকাশ আঁচড়ায় : সোনা-ঝলসানো এ সময়ে
ছোট ছোট নীল ঢেউয়ে ক্ষণিক সূর্য্যের মত জ্বলে
যদি পরিচিত চোখ সেই জলে-যাওয়া সুর তোলে!

সেই সুর গুঁড়ো ধোঁয়া নীল ঘুম ঘুমানোর তরে
গ্রাম ছেড়ে জমবে না কোন সোনা ক্ষেতের উপরে,
ক্যাথিড্রাল'র চোখে লুকোচুরি খেলবে না জানি
ঘুমে ঢল-পড়া রোদ, করবে না মৃদু কানাকানি
ছিপ্তের ঋজু ছায়া সেই জলে-যাওয়া সুর শুনে :
কোন চুলে সন্ধ্যা হবে আঁধারের ঝড় বৃথা বুনে।

সাঁঝের পাহাড়-ঘেরা কোন নীল নিস্তরঙ্গ হ্রদে
পাহাড় পেরিয়ে যেতে আশ্বিনের শ্রান্ত পাখা রোদে
সেই সুর নিয়ে গেলে পথ খুঁজবে না ঘন মোহে
নীলকৃষ্ণ ছায়াজল শাল সেগুনের সমারোহে :
ক্ষমাহীন শুকতারা উঠবে না অকরুণ হেসে
সেই জলে-যাওয়া সুর জ্বলে যদি ওঠে অবশেষে।

শুধু জানি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কোন গ্রাম দূরে
সারা রাত তুষারেতে সাদা হয়ে যাবে সেই সুরে।

আসন লাভের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত হলো (৪)। ১৯৩৭ সনে এই আইন কার্যকরী করা হয়। সেই সময় থেকে বাঙালী মেয়েদের স্বাধিকার আন্দোলন আরও শক্তি অর্জন করে এবং সাহিত্য ও সমাজ-দর্শনেও এর প্রভাব ক্রমশ লক্ষণীয় হতে থাকে। ১৯৪০ সনে প্রকাশিত হয় অধ্যাপিকা শান্তিসুধা ঘোষের "নারী"। বইখানির ভিতর আত্ম-সচেতন বাঙালী নারীর পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ হিসাবে ভবিষ্যৎ যাত্রীদের কাছে সম্বর্ধনা পাবে। এই সকল লেখালেখি ও সাহিত্যের মারফৎ নারী-আন্দোলন আবার নতুন করে শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়।

তার পর এলো ১৯৩৯ সনের স্মরণীয় সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আগুন প্রজ্বলিত হলো। যুদ্ধ আসার সংগে সংগে সম্পদ-উৎপাদনের গতিও বৃদ্ধি পেলো ব্যাপক ভাবে। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এর ব্যতিক্রম হলো না। সম্পদ-উৎপাদনের গতি-বৃদ্ধির সংগে সংগে নানা মহলে উন্মুক্ত হলো নতুন নতুন চাকুরীর দুয়ার, পুরুষদের সম্মুখে যেমন, তেমনি মেয়েদের সম্মুখেও। এদিকে যুদ্ধের আবহাওয়ায় টাকার মূল্য হ্রাস পেলো শোচনীয়রূপে। ঘরে-ঘরে দেখা দিল অভূতপূর্ব আর্থিক দুর্যোগ, অভাব ও অনটন। আর্থিক চাপে বিব্রত হয়ে বাঙালী মেয়েরাও অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের মতো এবার ব্যাপক ভাবে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করে। যারা এত দিন ছিল আর্থিক ভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, আজ তাদেরই অনেকে এখন দেখা দিল পরিবার-পালকের মূর্ত্তিতে। বহির্জগতে অহর্নিশ চলা-ফেরা ও বাস্তব প্রয়োজনে সামাজিক মেলা-মেশার অনিবার্য পরিণতিতে তাদের জীবন-দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হতে লাগলো। সেই বিবর্তিত চেতনায় নারীরা উপলব্ধি করলো তাদের উপর সমাজের কত নিষ্পেষণ, পরিবার-জীবনে তাদের কত অবমাননা। এই সকল নতুন আলোকপ্রাপ্ত ও জাগ্রত মেয়েরা পুরুষের রচিত ধর্ম, শাস্ত্র ও বিধানকেও শ্রেণিস্বার্থদুষ্ট বলে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করছে। পতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও পদে-পদে বিড়ম্বিত জীবন বহন করতে তারা আজ নারাজ। তারা চায় নতুন বেদ, নতুন সমাজ-দর্শন, যার অন্তরে ঝংকৃত হবে পুরুষের সংগে নারীর অধিকার-সাম্যের জয়গান। বিক্ষুব্ধ নারীদের এই অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ফলে পুরাতন পরিবার-জীবন দ্রুত ভেঙে পড়ছে। আজও যাদের জীবন মোটের উপর গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাদের চেতনায়ও যুগ-চাঞ্চল্য স্পর্শ করেছে। বিশেষত, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাকিস্তানী দক্ষযজ্ঞের ফলে এ চাঞ্চল্য আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সকল দিক বিবেচনা করে তাই বলা যায়, বাঙালী মেয়েরা বর্তমানে বিপ্লবের পথে পদার্পণ করেছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ সকল শ্রেণীর নারীর অন্তরে আজও জেগে উঠেনি। মোটের উপর বর্তমানের স্বাধিকার আন্দোলন হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এ কথাও সত্য যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল মেয়েও আবার বিপ্লবের পথে সচেতন যাত্রী নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জীবনের বর্তমান চাঞ্চল্য একটা অন্ধ আবেগ মাত্র। তাদের ভিতরে সৃষ্টিমূলক আদর্শের সজ্ঞান প্রেরণা অনেক সময় নেই বললেই চলে। তবে অন্ধ চাঞ্চল্য ও পুরাতনের প্রতি নিছক অসন্তোষও এক দিক থেকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সহজ করে। তাছাড়া, আত্ম-সচেতন নারীদের সৃষ্টিমূলক আদর্শের শক্তিকেও বর্তমানে আর উপেক্ষা করা চলে না।

---

(৪) নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের অন্যতম নেত্রী মিস্ লক্ষ্মী মেননের "The Position of Woman" (India, Oxford Pamphlet, 1944) পুস্তিকাখানি দ্রষ্টব্য।

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

(বিশ্বভারতী "শিক্ষাসত্র"র ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক লিখিত নাটিকা)

ভূমিকা

"শিক্ষাসত্র" রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পাঠভবন। ১৯২৪ সালে ছয়টি পল্লী-বালক লইয়া প্রথম আরম্ভ হয়। বহু বিরোধিতা, অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভিতর দিয়া শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে একুশটি ছাত্রের দিন-রাত্রি থাকিয়া প্রায় বিনা অর্থব্যয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে সামান্য কিছু দিতে বলা হয়—গৃহ হইতে নিজ ক্ষেত্রের উৎপন্ন চাউলের সামান্য অংশ তাহারা দিয়া থাকে।

প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে। পল্লীবাসীর সহানুভূতি জাগিয়াছে, শিক্ষাসত্রের উপর নির্ভরতা দেখা দিতেছে। শ্রীনিকেতনে অবস্থিত এই পাঠভবনটি শ্রীনিকেতনের তথা সমগ্র বিশ্বভারতীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিই বনিয়াদী শিক্ষা বা তদনুরূপ শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি। শিক্ষাসত্রের মূলমন্ত্র "আনন্দ।" আনন্দই শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের দৈনিক জীবনে শক্তির উৎস—তাহাদের বিভিন্ন কর্মে এই আনন্দেরই প্রকাশ, তাহাদের জীবনের বিকাশ। মুহূর্তময় জীবনের প্রতি মুহূর্তে শিশুমন সমস্যা আবিষ্কার করে, প্রতিক্ষণে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। আনন্দ তাহাদিগকে রহস্যের সম্মুখীন করিয়া দেয়, আনন্দই রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে প্রেরণা জোগায়। এই সত্যের উপর শিক্ষাসত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাসত্রে শিক্ষারম্ভ পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া নহে; শিক্ষারম্ভ শিক্ষাসত্রের কার্যসূচীর অন্তর্গত পাত্রাদি মার্জনে, বস্ত্রাদি প্রক্ষালনে, রন্ধনে, উদ্যান রচনায়, গানে, আলিম্পনে সেবায়, সাহিত্য-সভায়, অভিনয়ে, ভ্রমণে। তাহাদের জন্য মাটি রহিয়াছে, কুমোরের চাকও রহিয়াছে; কাঠ আছে, করাতও আছে; রং আছে, কাগজ তৈয়ারীর সরঞ্জামও প্রস্তুত। ছাত্রগণ প্রশ্ন করিবে, শুনিবে, পড়িবে, সৃষ্টি করিবে। জাতিভেদের জঞ্জাল নাই, দেশী-বিদেশীর প্রশ্ন নাই, ধর্মের সমস্যা নাই। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ছাত্র গ্রহণ শিক্ষাসত্রে স্বাভাবিক।

শিক্ষাসত্রের আরও একটা দিক্ আছে—তাহা শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন নূতন পরীক্ষা। শিক্ষাসত্রের মৌলিক তত্ত্বটিকে ব্যাপক ভাবে বাস্তব রূপ দান করিতে হইলে পরীক্ষামূলক কার্য কঠিন হইলেও অপরিহার্য। নিম্নলিখিত নাটিকাটি তাহার একটি নিদর্শন। নাটিকাটির গল্পটি শিক্ষাসত্রের কয়েক জন ছাত্রকে এক দিন বলা হইয়াছিল। গল্পটি তাহাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইল, গল্পটিকে নাটকাকারে লিখিয়া অভিনয় করিলে কেমন হয়? তন্মুহূর্তে ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে উৎসাহ প্রকাশ করিল। তখন তাহাদের উপর নাটক রচনার ভার দেওয়া হইল। প্রাথমিক আলোচনায় কয়টি কীরূপ দৃশ্য হইবে স্থির হইল এবং ছাত্রদিগের ভিতর দৃশ্যগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল, ছাত্ররা রচিত দৃশ্যগুলি একত্রে মিলাইয়া একটি সুসংলগ্ন নাটিকা হইতেছে কি না দেখিয়া লইবে। বলা বাহুল্য, ছাত্র-রচিত সকল দৃশ্যগুলিই অল্পবিস্তর সংশোধিত হইয়াছে; তবে ছাত্রদের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের দ্বারাই যথাসম্ভব পরিশোধন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। নাটিকা সমাপ্ত হইল; অভিনয়ের জন্য ছাত্ররা প্রস্তুত হইতে লাগিল। মহলা চলিল; আবশ্যক পোষাক, অস্ত্র-শস্ত্র ছাত্ররা তৈয়ারী করিতে লাগিল; তাহারাই রঙ্গমঞ্চ সাজাইল, অভিনয় করিল।

এই নাটিকা রচনায় এবং ইহার অভিনয়ে শিক্ষাদানের যে সকল সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহা সুযোগ মতো আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথম দৃশ্য

(রাজা চিন্তাবিষ্ট। মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। আসুন মন্ত্রিবর। রাজ্যের উত্তরাংশের বিদ্রোহের খবর কী?

মন্ত্রী। বিদ্রোহ থেমে গেছে মহারাজ। সেনাপতি মাত্র তিন শত সৈন্য নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছেন এবং প্রায় এক শত শত্রু-সর্দারকে বন্দী করে এনেছেন। তারা এখন কারাগারে বন্দী। কাল সকালে রাজসভায় তাদের বিচার হবে।

রাজা। বিদ্রোহ থেমে গেছে? কি আশ্চর্য! সেনাপতির কি অদ্ভুত ক্ষমতা। মাত্র তিন শত সৈন্য নিয়ে গিয়ে অতগুলো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, তাদের হারিয়ে এক শত শত্রুকে বন্দী করে এনেছেন? কি আশ্চর্য! বীর বটে!

মন্ত্রী। শুধু বীর নয়, মহারাজ! সেনাপতি বুদ্ধিমান। কারণ, বুদ্ধি না থাকলে জয় তো দূরের কথা, সেনাপতি অতগুলো শত্রুর কাছে টিঁকতেই পারতেন না। বুদ্ধি আছে বলেই অতগুলো শত্রুকে যুদ্ধে হারিয়ে এক শত শত্রুকে বন্দী করে আনতে পেরেছেন।

রাজা। কিন্তু তা হ'লে এ জয়ে আপনার কৃতিত্বও আছে যথেষ্ট। আপনি অতগুলি সেনাপতির মধ্যে ঐ সেনাপতিকেই যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন—এতেই বোঝা যায়, আপনার লোক চেনার ক্ষমতা অদ্ভুত।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি আমাকে যে ভাবে প্রশংসিত করলেন, তাতে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল।

রাজা। মন্ত্রিবর, তবে রাজপ্রাসাদে বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করতে আদেশ দিন।

মন্ত্রী। কী কী আয়োজন হবে আদেশ করুন।

রাজা। আজ সমস্ত রাজপ্রাসাদ খুব সুশোভিত হোক্। গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা হোক্। রাজসভা হীরা-জহরতে ঝকমক করুক। যে সব সৈন্য বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এসেছে, রাজসভায় বন্দী শত্রুদের সামনে তাদের পুরস্কার দিন। সেনাপতিকে আজ যথাযোগ্য সম্মান দেখান এবং উপযুক্ত পুরস্কার দিন।

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তবে আমি রাজপ্রাসাদে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করছি এবং সেনাপতিকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত।

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। কী সংবাদ দূত ?

দূত। আমাদের সেনাপতি মহাশয় অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই আসতে পারলেন না। সেনাপতি মহাশয় দিন কতক বিশ্রামের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।

রাজা। সেনাপতিকে বলে দিও, যত দিন তাঁর ইচ্ছা তত দিন তাঁকে বিশ্রাম নেবার অনুমতি দেওয়া হোল।

[দূতের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমিও যাই, উৎসবের ব্যবস্থা করি।

রাজা। হ্যাঁ—যান,—কিন্তু—

মন্ত্রী। কিন্তু কি মহারাজ ?

রাজা। আজ উৎসব বন্ধ থাকাই ভাল। আমি আজ বিশেষ চিন্তায় পীড়িত। এতক্ষণ বিদ্রোহ-জয়ের আনন্দে সে দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখনি আমার সে দুশ্চিন্তা মনের ভিতর জেগে উঠেছে। আজ আমি বড় পীড়িত।

মন্ত্রী। মহারাজ কী চিন্তা করছেন আমি কি তা' শুনতে পারি ?

রাজা। আপনি শুনতে পারেন না এমন কোনো কথা আমার নেই। রাজকন্যা এখন বড় হয়েছেন। আমি তাকে এখন বিবাহিতা দেখতে চাই। তার মা এখন স্বর্গে। এ দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হবে। তাই বিচলিত হয়েছি। কন্যা আমার রূপে গুণে অসামান্যা হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তার উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না।

মন্ত্রী। কথা সত্য মহারাজ। রাজকুমারীর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া কঠিন বটে। তার উপর আপনি তো কন্যার পিতা। আপনার তো কোন পাত্রই পছন্দ হবে না।

রাজা। মন্ত্রী, তবে আপনি এর একটা উপায় করে দিন। রাজকন্যার বিবাহ না হলে রাজবংশের অপমান, অমঙ্গল,—তা'তো আপনি জানেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, তবে আপনি রাজকুমারীকে স্বয়ম্বরা হ'তে বলুন। স্বয়ম্বর-সভায় আপনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ করুন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে রাজকুমারীর পছন্দ হবে, তাঁকেই তিনি বরমাল্য দেবেন।

রাজা। আচ্ছা, তবে তাই হবে। ঐ যে কন্যা আমার এদিকেই আসছেন। আপনি নিজেই ওকে ঐ কথা বলুন। কারণ সে আপনাকে পিতার মতো ভক্তি করে, বন্ধুর মতো মনের কথা বলে। আর, আপনিও তাকে খুব আদর করেন। আমি চললাম, আপনি যা করবার করুন।

[প্রস্থান।

(রাজকুমারী ও একটি বালিকার প্রবেশ)

বালিকা। দেখ দাদু, নন্দিনী কেমন ছবি এঁকেছে।

মন্ত্রী। কই দেখি। বাঃ সুন্দর! তুমি এঁকেছ ? তবে তো তোমার শিল্পী বর চাই। সাধারণ পাত্র হ'লে তো হবে না দেখছি! তাই বুঝি মহারাজ কোন রাজপুত্র'কই তোমার উপযুক্ত বলে মনে করেন না। তুমি বুঝি বাবাকে বলেছ ?

বালিকা। না দাদু, তা' বলেনি তো। সে বলেছে তা'র বাবাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

মন্ত্রী। তা হয় না মা। এ রাজবংশে কন্যা অবিবাহিত থাকলে বংশের গৌরব নষ্ট হয়, অপমান হয়, অমঙ্গল হয়। তাই তো মহারাজ অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কুমারী। বাবাকে ছেড়ে আমি যাব না।

মন্ত্রী। না মা, তা' হয় না। রাজবংশের দিকে চেয়ে, ধর্মের দিকে চেয়ে, রাজ্যের দিকে চেয়ে তোমায় কাজ করতে হবে। তুমি রাজকুমারী—এ ছাড়া তোমার তো উপায় নেই। তোমাকে স্বয়ম্বরা হ'তে হবে—বুড়ো মন্ত্রীর এই উপদেশ। অবাধ্য হোয়ো না মা; রাজী তো ?

কুমারী। (চিন্তান্তে) এ ছাড়া উপায় নেই ?

মন্ত্রী। না, রাজকুমারী নেই।

কুমারী। (চিন্তান্তে) তবে তাই হোক্, আপনার কথাই হোক্! যে শিল্পী আমাকে দেখে আমার একটি জীবন্ত ছবি আঁকতে পারবেন, আমি তাঁকেই বরমাল্য দেব। ছবির বিচারক আমি নিজে। যে শিল্পী সফল হবেন, তিনি রাজপুত্র হ'ন, কাণা, খোঁড়া, ভিখারী, পাগল যা'ই হ'ন তাঁকেই মালাদান কোরব।

মন্ত্রী। তোমার যখন শিল্পী পছন্দ তখন তাই খুঁজছি।

কুমারী। কিন্তু মন্ত্রী মশাই, আমার পছন্দ মতো ছবি আঁকতে হবে। জীবন্ত ছবি আঁকা যে কোনো শিল্পীর কাজ নয়, কাজটি বড় সহজ নয়।

মন্ত্রী। তা' হোক, তবু মিলবে। আমাদের রাজ্যে যদি না মেলে, তাহ'লে আরও অনেক রাজ্য আছে, সেই সব রাজ্যেও শিল্পী আছে। তাদের মধ্যে কি কেউ পারবে না ?

কুমারী। যা' ইচ্ছা আপনার। আমি আপনার অবাধ্য হইনি তো, আমার উপর রাগ করতে পারবেন না।

মন্ত্রী। আশীর্বাদ করি, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্। আমি আজই প্রচার করে দিচ্ছি তোমার সর্ত, মহারাজকেও সুসংবাদটা দিয়ে আসি।

[প্রস্থানোদ্যত।

বালিকা। আগে আমাদের আঁকা ছবিগুলি দেখবে চল, অনেক ছবি।

মন্ত্রী। তাই চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রথম ব্রাহ্মণ পূজা করিতেছে, দ্বিতীয় তাহার জোগাড় দিতেছে। পূজা করিতে করিতেই কথাবার্তা কহিতেছে)

২য়। মুখুজ্যে মশাই, আমাদের একটি কলার পেকেছে যে।

১ম। অ্যাঁ, বল কি ? ছাঁদ বোধ হয় ? বেশ বড়লোকের ছাঁদ ?

২য়। ছাদ্দ নয়, ছাদ্দ নয়। বিয়ে। আমাদের রাজকন্যার বিয়ে।

১ম। রাজকন্যার বিয়ে? সে তো এখন হবে না বাপু!

২য়। কেন হবে না?

১ম। আরে গাঙ্গুলী মশাই, এতো আমাদের বিয়ে নয়; এ রাজকুমারীর বিয়ে।

২য়। সে আবার কী রকম?

১ম। ধর, তোমার ছেলের বিয়ে; তুমি—

২য়। আমার ছেলে তো নেই।

১ম। আহা, তা' নয়। ধর, যদি কারো বিয়ে দিতে হয়, আগে দেখব ভাল শরীর, তার পর দেখব বাড়ী, তার পর দেখব টাকাকড়ি—বটে তো?

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই তো, বটেই তো।

১ম। রাজা-উজীর লোকেরা আর আমরা বহুত তফাৎ। রাজকন্তে বলেছেন আমার মতো যে ছবি আঁকতে পারবে, আমি তাকেই বিয়ে কোরব, তা' সে কাণাই হোক, খোঁড়াই হোক, আর পাগলই হোক্।

২য়। ও, তাই বুঝি কত বড় বড় ছবি-আঁকিয়ে ঐ রাজার বাড়ী যাতায়াত করছে। আর আমাদের পচা মোড়লের ছেলে, সেই যে ডইং কেলাসে ফাষ্ট হয়েছিল, সে তো রাত-দিন টেবিল চৌকি আঁকছে। সেই বুঝি রাজকন্যার ছবি আঁকবে? আচ্ছা মুখুজ্যে মশাই, চক্কোত্তি মশাই যে বললেন পাত্র ঠিক হয়ে গেছে; মন্ত্রী মশাই না কি ছয় মাসের মধ্যে পাত্র ঠিক করবেন বলেছেন? পাঁচ মাস তো হয়েই গেছে। শুনছি মিষ্টান্নের ফরমাস যাচ্ছে—চক্কোত্তি মশাইকে মহারাজের বাজার-সরকার ডেকেছিল কি না।

১ম। তাই না কি? চক্রবর্তী মশাই বলেছেন? তবে তো কথাটা মিথ্যে নয়। তা'হলে তো খোঁজ নিতে হচ্ছে। পুজোটা সেরেই তাহ'লে চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে একবার যেতে হবে—তুমিও চল না হে।

[তাড়াতাড়ি পূজা করিতে লাগিল।

২য়। তাই চল।

(এক বৈরাগীর প্রবেশ—খঞ্জনী বাজাইয়া গান)

১ম। আরে কী আপদ! কী চাও এখানে?

২য়। কী চাও এখানে?

বৈরাগী। হরে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও বাবা।

২য়। ভিক্ষে-টিক্ষে নেই, যাও।

১ম। পুজোর সময় যত ব্যাঘাত!

২য়। ধর্ম্মে-কর্ম্মে কেবল বাধা।

বৈরাগী। ভিক্ষে না দাও না দেবে। অত রাগ দেখাচ্ছ কেন? বলি, হাঁ ঠাকুর, পুজো-মুজো করলে আর কী হবে? ভোজ তো ফসকে গেল।

১ম, ২য়। (লাফাইয়া উঠিয়া) কেন, কেন?

বৈরাগী। পুজো-মুজো করে তো ধর্ম্মে-কর্ম্মে ছড়াছড়ি; তা'তেই তো রাজকন্তের বিয়েটা হোলো না। রাজা কী জন্তে যে বামুন-গুলোকে পুষছে কিছু বুঝি না।

১ম, ২য়। কী বললে, বিয়ে হবে না? কী হোলো বল তো?

বৈরাগী। কী হোলো তা' বলব না। ভিক্ষে দেবার বেলায় নেই, আবার ভোজের কথা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে না? আমি চললাম।

১ম। না, না, ভিক্ষে নেবে বই কি; এই নাও।

২য়। বিয়েটার কী হোলো বল না ভাই।

বৈরাগী। নৈবেদ্যর ঐ কলাটি দাও।

২য়। এই নাও কলা।

১ম। আরে, আরে, নৈবেদ্য থেকে নয়, নৈবেদ্য থেকে নয়।

২য়। আঃ, থামো না মুখুজ্যে মশাই। তার পর ভাই, কী হলো?

বৈরাগী। (কলা খাইতে খাইতে) হবে আর কী? মন্ত্রী মশাই রাজপুত্র খুঁজে খুঁজে আলাদারা হ'য়ে গিয়েছে। কন্যার বিয়ে হোলো না বলে রাজা তো চুপ করে বসে আছেন। সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম উঠিয়ে দেবেন। হরে-কৃষ্ণ।

[প্রস্থান।

২য়। চক্কোত্তি মশাইয়ের কাছে যাওয়া যাক এখুনি।

১ম। তাই চল, তাই চল। কী অমঙ্গল, দুর্গা-দুর্গা।

[নৈবেদ্য প্রভৃতি তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রিবর, অনেক দিন হ'ল, কিন্তু কন্যার বিবাহ হ'ল না। আমি ম'নে করেছিলাম, মেয়ে আমার যে সর্ত দিয়েছে এতে বিবাহ হবেই এবং পাত্রও ভাল হবে। কিন্তু বিবাহ তো হোল না। এখন তো আর কোন পাত্রই আসে না। মন্ত্রিবর, এখন কী করা যেতে পারে, বলতে পারেন? আপনি তো জানেন, মেয়ের বিবাহ না হ'লে আমাদের বংশের অপমান।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, এখন আর কী উপায় বলুন? এখন যদি আপনি আপনার কন্যার সর্ত-ভঙ্গ করতে পারেন, তবেই তার বিবাহ হবে। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখি না।

রাজা। কিন্তু মন্ত্রী, সে যখন ও-রকম প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন কি আর ভঙ্গ করবে?

(রাজকুমারীর প্রবেশ)

কুমারী। বাবা, আজ আমরা সহরের মধ্য দিয়ে বেড়াতে যাব।

রাজা। বেড়াতে যাবে? তা'—তা'—আচ্ছা।

কুমারী। কেন বাবা, আমরা বেড়াতে যাব বলে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?

রাজা। না মা, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে যেও।

কুমারী। তবে আমাদের বেড়াতে যাবার আয়োজন কর।

রাজা। মন্ত্রিবর!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। তা'হ'লে আজ আমরা সহরের মধ্য দিয়ে বেড়াতে যাব, তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে রাখতে আদেশ দিন এবং সৈন্য-সামন্তকে প্রস্তুত হ'তে বলে দিন।

কুমারী। বাবা, আমরা বেড়াতে যাব বলে প্রজাদের কাজের ক্ষতি করে রাস্তা পরিষ্কার করার দরকার নেই। প্রজারা যে ভাবে

তাদের গাড়ী-গরু রাস্তার ভিড় ঠেলে পার করে নিয়ে যায়, আমরা সেই ভাবে যাব।

রাজা। তাই হ'ক্ মন্ত্রী। প্রজাদের এ কথা জানিয়ে দরকার নেই। কেবল সারথিকে আর দেহরক্ষীকে প্রস্তুত হতে বলুন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। যথা আদেশ মহারাজ! কে আছ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। কী আদেশ?

মন্ত্রী। সারথিকে রথ প্রস্তুত করতে বল। দেহরক্ষীকে বল, মহারাজ আজ নগর-পরিভ্রমণ করবেন।

দূত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কুমারী। মন্ত্রী মশাই, বাবা এত চিন্তিত কেন? রাজ্যমধ্যে কি কোনো গোলমাল হয়েছে? না, বাইরের কোন শত্রু আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে? বলুন, বাবা কী জন্ম এত বিচলিত?

মন্ত্রী। না রাজকুমারি, তোমার বাবা বাইরের কোনো কারণে চিন্তিত নন। কেবল চিন্তিত অন্তঃপুরের গোলমালের জন্ম।

কুমারী। অন্তঃপুরের গোলমাল? বলেন কি মন্ত্রী মশাই? তবে অন্তঃপুরে কী হয়েছে বলুন।

মন্ত্রী। বিশেষ কিছুই হয়নি বটে, তবু তুমিই এই সব গোলমালের মূল কারণ। তোমার বিবাহ না হওয়ার জন্মই তোমার বাবা আজ এত চিন্তিত। তুমি জান, এ রাজবংশে কারও বিবাহ না হ'লে বংশের মান-মর্যাদা নষ্ট হ'য়ে যায়! তোমার দ্বারা তোমার বাবার অপমান। কী রাজকুমারি, চুপ করে রইলে? কোনো উত্তর দাও।

কুমারী। মন্ত্রী মশাই, আমার মনে হয়, আমি যদি এ বংশে না জন্মাতাম, তাহ'লে বোধ হয় এ বংশের এবং বাবার সম্মান রক্ষা হ'ত। এখন এই সব সম্মান রক্ষা করতে হলে আমার মৃত্যু অথবা নির্বাসন ছাড়া গতি নেই।

মন্ত্রী। রাজকুমারি, তুমি এ সব কী বলছ? এ সব তোমার বাবা শুনতে পেলে স্থির থাকতে পারবেন না। তুমি এ সব কথা তোমার বাবার কাছে কখন বোলো না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ সংবাদ দিতে বললেন—মহারাজ প্রস্তুত হয়েছেন।

মন্ত্রী। আচ্ছা।

[দূতের প্রস্থান।

মন্ত্রী। চল রাজকুমারি, দেখি রথ প্রস্তুত কি না! মহারাজ আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(সারথি নাক ডাকাইতেছে, দেহরক্ষী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে)

(২য় রক্ষীর প্রবেশ)

২য়। বলি ও সারথি মশাই, ওঠ, বেলা যে প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আর কত ঘুমবে—কাজ আছে।

সারথি। মাছ আছে? মাছ ভাজা ভাল হয়নি, খাব না।

২য়। মাছ নয়, মাছ নয়, কাজ। কাজ আছে, ওঠ। আঃ, কী বিপদ!

১ম রক্ষী। কী, হ'ল কী—এত চেঁচাচ্ছ কেন?

২য়। সাধে কি চেঁচাচ্ছি। রাজা মশাই তোমাদের—

সারথি। খাজা এনেছ? মাথার কাছে রেখে দাও।

২য়। রাজা মশাই তোমাদের ডেকেছেন,—এক্ষুণি।

সারথি। গাঁজা আমি খাই না।

২য়। আরে বাঃ! গাঁজা, গাঁজা, গাঁজা! তোমার মুণ্ড। রাজা মশাইকে বলে দিচ্ছি, চল্লুম।

১ম। অ্যাঁ, মহারাজ ডেকেছেন?

সারথি। রাগছ কন দাদা, যখন এনেছ, তখন দাও।

১ম। আবার ঘুমোয়, শীগ্‌গির ওঠ—মহারাজের হুকুম।

২য়। ওঠ ওঠ, ওঠ।

সারথি। (উঠিয়া পড়িয়া, হাই তুলিতে তুলিতে) কে রে আবার বিশ্রামের সময় ব্যাঘাত ঘটায়? এখনি এক তলোয়ারের ঘায়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ কোরব।

১ম। কী হ'ল, কী হ'ল?

২য়। আরে ভাই, ব্যাপারটা শোন। আমাকে মন্ত্রী মশাই বললেন, মহারাজ আর রাজকুমারী আজ বিকালে নগর পরিদর্শন করতে যাবেন, তাই সারথিকে আর দেহরক্ষীকে প্রস্তুত হ'তে বললেন।

১ম। তাই না কি, তাহ'লে আমাকেও যেতে হ'বে। যাই, হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

(তাড়াতাড়ি যাইতে উদ্যত, ২য় রক্ষী বাধা দেয়, বলে "শোন" "শোন।" তাহার পর "ছাড়" "ছাড়", "না না, শুনে যাও না" ইত্যাদি।)

২য়। আমার কথাগুলো আগে শোন। আমি এসে দেখি সারথি মশাই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

১ম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছিল।

সারথি। কী, আমি ঘুমিয়েছিলুম? এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে? এত সাহস?

১ম। না, না, ঘুমোওনি তো।

সারথি। নিয়ে আয় তো তলোয়ারটা, ওর মুণ্ডচ্ছেদ করি।

২য়। বটে? দাও তো ভাই ঐ তলোয়ারটা ওকে, দেখি। ঐ কোণ থেকে তলোয়ারটা এনে সারথি মশাইকে দাও। আমাদের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা হ'য়ে যাক্।

(১ম রক্ষী তলোয়ার আনিয়া দিল)

সারথি। ও রকম মরচে-ধরা তলোয়ারে আমি যুদ্ধ করি না।

২য়। বেশ, ঐ তলোয়ারটা আমাকে দাও, আমারটা তুমি নাও।

(উভয়ের তথাকরণ)

২য়। কই, এসো।

সারথি। আরে থামো; কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিই।

২য়। সারথি মহারাজ, অত দেরী করছেন কেন? ভয় পেয়েছেন তো বলুন।

সারথি। তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে আমি ভয় পাব? ব্যাঙের সঙ্গে সাপ ভয় পাবে? হরিণের কাছে বাঘ ভয় পাবে? এ বলে কি?

২য়। বাজে বকছ কেন? যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নেই বুঝি?

সারথি। আজ কী বার বল দেখি ?

১ম। আজ বুধবার।

সারথি। এই রে সেরেছে। আজ অস্ত্র ধরতে গুরুদেবের নিষেধ। তাহ'লে তো ওকে শাস্তি দেওয়া গেল না ?

২য়। ওহে, তোমার দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। আজ হ'ল বৃহস্পতিবার।

সারথি। আজ বৃহস্পতিবার! আজ বৃহস্পতিবার জানলে তলোয়ার আমি ছুঁতামই না।

(তলোয়ার ফেলিয়া দিল)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আপনাদের বিলম্বে মন্ত্রী মশাই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আর দেরী হ'লে আপনাদের শাস্তি দেবেন।

সারথি। সর্ব্বনাশ! এই ওর জন্যই দেরী হ'ল। আমি এখনি যাচ্ছি, আমি এলাম বলে।

(সারথি ও ১ম রক্ষী একই পাগড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া তাড়াতাড়ি নিজ নিজ মস্তকে জড়াইতে লাগিল)

সারথি। এই, আমার পাগড়ি তুমি পরছ কেন ?

১ম। এ-তো আমার পাগড়ি, তুমি পরছ কেন ?

সারথি। কের ? কেটে ফেলব। ছাড়, বলছি।

১ম। তুই ছাড়, বলছি।

(উভয়ে টানাটানি)

২য় রক্ষী ও দূত। দেরী হচ্ছে।

সারথি। আঃ, ছাড়, না।

১ম। তুই ছাড় না।

দূত। মন্ত্রী মশাই আসছেন. এই রে!

২য় রক্ষী। তাই তো, এই রে! আমরা এই পথে সরে পড়ি।

দূত। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরে পড়ি।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

সারথি। দাঁড়াও ভাই তোমরা।

১ম রক্ষী। আমরাও যাব ভাই—দাঁড়া।

[টানাটানি করিতে করিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

(রাজপথ। এক পার্শ্বে বৃক্ষতলে এক কাষ্ঠখণ্ডের উপর এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট। গায়ে বহু তালি দেওয়া আলখাল্লা. হাতে বাঁকা এক লাঠি। অদূরে এক পার্শ্বে (দৃশ্যের অন্তরালে) দৃষ্টি নিবদ্ধ। দুই পথিকের প্রবেশ)

১ম পথিক। কি রে ভোলা, কোথা গিয়েছিলি ? খবর কী ?

২য়। আর খবর!

১ম। কেন, কী হ'ল রে ?

২য়। আর কী হবে ভাই। আমাদের যা' দুই-এক বিঘে জমি-টমি আছে, তা' নিয়ে এক মুশকিলেই পড়েছি। এবারে ধান তো একেবারেই হয়নি; যা' হয়েছে সেটা তো রাজার খাজনা দিতেই চলে যাবে। এ-বারে আবার রাজা আমাদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজা বলেছে যে, মজুরদের খাজনা খুব অল্প; বাড়ালে ক্ষতি কী ?

১ম। অ্যাঁ, বলিস্ কি! খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছে ? যত বদমায়েসের গোড়া ঐ বুড়ো দেওয়ানটা। বেটার বড়লোকদের খাজনা বাড়াবার ক্ষমতা নেই, কেবল যারা খেতে পায় না, যাদের থাকবার জায়গা নেই, শুধু তাদেরই খাজনা বাড়িয়েছে।

২য়। দেওয়ানের কী দোষ ভাই ? রাজা তাকে যা' হুকুম করবে তাই তো সে করবে। দেওয়ানের দোষ না দিয়ে রাজাকে দোষ দেওয়াই ভাল। রাজার দোষে দেওয়ানের কেন বদনাম হয়।

১ম। আরে, ঐ দেখ রে, আমাদের সেই পাগলা ঠাকুর ওখানে বসে রয়েছে।

২য়। ও ওখানে কী করছে ? ওর সামনে দেখি একটা মরা কুকুর পড়ে রয়েছে।

১ম। তাই তো ওটা চক্কোত্তি মশাইয়ের কুকুর। কাল রাত্রে মরে গিয়েছে। পাগলা ঠাকুর সেটাকে তুলে এনেছে দেখছি।

২য়। বোধ হয় মনে দুঃখ-টুঃখ হয়েছে, পাগল আর কাকে বলে।

১ম। চল ভাই, কাছে যাই।

(পাগলা ঠাকুরের নিকটে গমন)

২য়। কী পাগলা ঠাকুর, কী দেখছ অত করে ?

পাগল। দেখছি, যা তোমরা দেখছ।

১ম। কুকুর, তার আবার দেখবার কী আছে ?

পাগল। চোখ থাকলেই দেখা যায়।

১ম। চোখ আছে বলেই তো বলছি। একটা মরা কুকুরে তোমার এত ভক্তি হ'ল কেন ?

পাগল। চোখ নেই, তাই দেখতে পাচ্ছ না।

২য়। কী দেখতে পাচ্ছি না ?

পাগল। দেখতে পাচ্ছ না তোমরা নিজেদের ?

২য়। ওটা কি আরসি, যে নিজেদের দেখতে পাব ?

পাগল। ও তো তোমাদেরই এক জন।

১ম ও ২য়। কী, কী!

পাগল। তোমরা ওরই দলের। দেখে দুঃখ হবে না ?

২য়। সাবধান পাগলা, মুখ সামলে। আমরা কুকুর, এত বড় কথা ?

১ম। পাগলামির আর জায়গা পাওনি ?

২য়। বুড়ো মানুষ বলে ছেড়ে দিলাম।

পাগল। কুকুরটা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। দু'দিন পরে তোমরাও না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

২য়। বেশ করব, না খেয়ে মরব। বেটা যেন নিজে মহারাজ আর কি—অ্যাঁঃ! বড় লম্বা লম্বা কথা বলা হচ্ছে।

(এক ধনী ভদ্রলোকের প্রবেশ: হাতে একটি বড় মাছ)

ভদ্রলোক। কী হে, অত গোলমাল কিসের ?

১ম। ওঃ, রায় মশায় ? (নমস্কার করিল)

২য়। (পায়ের ধূলা লইয়া) আজ্ঞে দেখুন না, আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঐ পাগলাটা আমাদের যা'-তা' বলে গালাগাল দিচ্ছিল। ওটাকে আপনি একটু সায়েস্তা করে' দিন বাবু।

ভদ্রলোক। ওঃ পাগলা ঠাকুর। ওটা কী ? কুকুর ? মরে গেছে বুঝি ?

২য়। হাঁ বাবু, ঐ নিয়েই তো গোলমাল হাঙ্গামা।

ভদ্রলোক। আচ্ছা দেখা যাবে। কিন্তু, ভোলা, তুই যে গত বছরের

টাকা নিলি, তার সুদ কই? আসল কই? কি রে, কিছু বলি না বলে বুঝি?

১ম। রায় মশায়, মাছটা কত হ'ল?

ভদ্রলোক। সে খোঁজে তোমার দরকার কী বাপু? কিনতে পারবে? মাছ খেয়েছ কোন দিন? যত সব ছোটলোকের কারবার। এই ভোলা, তোকে যে বললাম তোর ক্ষেত থেকে আধ মণ সরু ধানের চা'ল পাঠিয়ে দিতে, পায়েস রাঁধবার জন্যে—কী করলি?

২য়। আজ্ঞে, এবার তো সরু চা'ল আমার ক্ষেতে হয়নি।

ভদ্রলোক। হয়নি কী রকম? চক্রবর্তীকে তুমি সরু ধান দাওনি?

২য়। তিনি আমার গুরুদেব, তিনি জোর ক'রে বললেন, কী আর করি।

ভদ্রলোক। টাকা ধার নেবার সময় আবার আমার কাছে যেও। ছোটলোক, পাজী, লক্ষীছাড়া। (চলিয়া যাইতে যাইতে) উঃ, একটা পচা কুকুর নিয়ে আবার রাস্তায় বসে আছে। দেওয়ানজীকে দরখাস্ত দিতে হবে এই সব পাগলাগুলোকে দূর করে দেবার জন্যে।

২য়। দেখলে, রায় মশায়ের ব্যাভারখানা।

১ম। মাছটা বেশ স্বাদী হবে বোধ হয়।

২য়। আমরা গরীব বলে যা' তা' বলে গেল, কিছু হ'ল না।

১ম। বড়লোক না হ'লে কি অত বড় মাছ কেনে?

(পাগলের উচ্চহাস্য)

১ম। কি হে, হাসছ যে বড়?

পাগল। কুকুরটা যার বাড়ী পাহারা দিত, সে একে খেতে দিত না। এটা না খেয়ে মরল, তবু হাঁড়ি খেল না। একেই বলে ধার্মিক; কুকুরটা খুব ভাল লোক।

২য়। দেখ পাগলা ঠাকুর!

১ম। এ কি! মহারাজ এদিকে আসছেন। ব্যাপারখানা কী?

২য়। অ্যাঁ, তাই তো; সর্বনাশ। রায় মশায় কিছু করল না কি?

১ম। এখানে থাকা উচিত নয়—চল হে।

২য়। চল চল; দুর্গা, দুর্গা, হায় ভগবান্!

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা, মন্ত্রী, রক্ষী, রাজকুমারী, বালিকা প্রবেশ করিল)

কুমারী। বাবা, ঐ লোক দু'টি ছুটে চলে গেল কেন?

বালিকা। ভয়ে পালাল বোধ হয়।

কুমারী। কিসের ভয়?

বালিকা। মহারাজকে দেখে।

কুমারী। কেন?

মন্ত্রী। তবে আর মহারাজ বলবে কেন? মহারাজকে যদি ভয়ই না করবে, তো মহারাজ হলেন কী করে?

কুমারী। মহারাজকে সবাই ভয় করে?

মন্ত্রী। চিরকাল তো তাই দেখে আসছি—এটা প্রজার ধর্ম।

কুমারী। কিন্তু ঐ যে বুড়ো বসে রয়েছে, ও তো বাবাকে ভয় পেল না?

বালিকা। ঐ লোকটা? একটা মরা কুকুর নিয়ে বসে আছে? একটা পাগল বোধ হয়।

মন্ত্রী। ওটা পাগল। ওর বুদ্ধি নেই, তাই ভয় নেই।

কুমারী। চল না বাবা, ঐ পাগলের কাছে।

রাজা। না, মা, আর নয়। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না? তোমার সখ হ'ল দূরে রথ রেখে হেঁটে চলবে; তাই তো এত ক্লেশ পাচ্ছ মা। রথ এনে নিই?

কুমারী। না বাবা, চলতে পারব। হাঁটতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

মন্ত্রী। আনন্দ হচ্ছে, মানি। কিন্তু তুমি লজ্জায় বলছ না—তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি তো কোন দিন রাস্তায় বা'র হওনি। আজ কি এত রাস্তা হাঁটতে পারবে? আজ ফিরে চল না হয়।

কুমারী। সত্যি বলছি মন্ত্রী মশাই, আমার কষ্ট হচ্ছে না। (পাগলের প্রতি) তুমি কী দেখছ?

(পাগল নীরব)

কুমারী। তোমার নাম কী?

পাগল। যে যা বলে ডাকে।

কুমারী। তুমি কুকুরটার দিকে চেয়ে কী ভাবছ?

পাগল। ভাবছি, কুকুরটাকে রাজা করে দিলে কেমন হয়—ভাল, না, খারাপ!

বালিকা। পাগলটা কী বকছে ভাই?

মন্ত্রী। রাজকুমারি, সন্ধ্যা হ'য়ে এ'ল।

রাজা। আর দেরী করা উচিত নয়।

কুমারী। এইবার যাব, বাবা। পাগল, তোমার সামনে কে দেখেছ?

পাগল। রাজা, মন্ত্রী, দেহরক্ষী। সঙ্গে তুমি কেন?

কুমারী। সবাই মহারাজকে ভয় করে, তুমি তো কর না?

(পাগল নীরবে হাসিতে লাগিল)

কুমারী। তুমি এর আগে রাজাকে দেখেছ?

পাগল। না।

কুমারী। দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না?

পাগল। তা'র চেয়ে বড় জিনিষ দেখছি—ঐ কুকুরটা।

রাজা। আমি ফিরি। মন্ত্রিবর, রাজকুমারীকে নিয়ে আসুন আপনি।

[রাজা ও রক্ষীদের প্রস্থান।

কুমারী। এখনই আসছি বাবা। পাগল, তোমার কথা বুঝিয়ে দাও।

পাগল। সিংহাসনে ঐ কুকুরটাকেই বেশ মানাত।

মন্ত্রী। রাজকুমারি, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

পাগল। ওর কাজের কেউ নিন্দা করতে পারবে না। ও বিশ্বাসী। ওর খোরাকও কম—তা'ও শুধু চারটি ভাত হ'লেই চলত। মরেও উপকার। দেখছ, কত পিঁপড়ে? অতগুলো প্রাণীর খাবার দিয়ে যাচ্ছে।

কুমারী। আমার বাবা!

পাগল। গরীব প্রজার সিংহাসনে মানায় না। মরেও শান্তি দিয়ে যাবে। অন্য রাজত্বের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে রাজার নামে বাড়ী উঠবে—প্রজারা বাড়ীর তলায় চাপা মরবে।

মন্ত্রী। রাজকুমারি, আমি একাই ফিরি তা'হলে?

বালিকা। চল না, ভাই, মিছামিছি কেন দেরী করছ?

কুমারী। পাগল বুঝি এই রকমই হয়।

[মন্ত্রীর পশ্চাতে কুমারী ও বালিকার প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(ছবি আঁকার সরঞ্জাম রহিয়াছে। রাজকুমারী কোথাও গিয়াছে। বালিকাদের প্রবেশ)

১ম বালিকা। নন্দিনী কই ভাই ?

২য়। সে তো এই দিকেই এসেছিল ; কিন্তু কোথায় গেল ?

৩য়। সে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও গেছে। দেখছিস্ না ছবি, তুলি, রং, সব পড়ে রয়েছে। সে এখনই আসবে।

১ম। ওর তুলিগুলি লুকিয়ে রাখি, বেশ মজা হবে।

২য়। না ভাই, ও মজা ভাল না। ও-রকম করলে ভারী রাগ হয়।

৩য়। সত্যি, নন্দিনী যখন ছবি আঁকে তখন এমন একমনে আঁকে যে ওর কাছে যেতে কেমন লাগে।

১ম। তাহলে আমরাও সবাই একমনে ছবি আঁকতে বসি।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল, সেই ভাল।

(সকলে ছবি আঁকতে বসিল)

(রাজকুমারীর প্রবেশ : চুপি চুপি ছবি আঁকা দেখিতে লাগিল)

কুমারী। তোমরা তো বেশ ছবি আঁকতে পার ?

বালিকাগণ। এই যে, ভাই, আমাদের ছবি নন্দিনী দেখে ফেলেছে !

৩য়। তুমি, ভাই, আমাদের ছবি আঁকা দেখে নিলে কেন ?

১ম ও ২য়। তুমি দেখলে কেন ?

কুমারী। দেখলেই বা, দোষ কী ?

৩য়। বা রে, তুমি তো লুকিয়ে ছবি আঁক।

কুমারী। আমি যে বড় হয়েছি, তাই।

১ম। ওঃ, ভারী বড় হয়েছে ?

৩য়। না রে, না। ভাল ছবি আঁকতে হ'লে লুকিয়ে লুকিয়ে আঁকতে হয়।

২য়। আচ্ছা এ কথা কি সত্যি—কেউ না কি ছবি এঁকে তোমাকে খুশী করতে পারেনি ?

কুমারী। না, পারেনি।

৩য়। কেন ? কত সুন্দর সুন্দর ছবি তাঁরা আঁকলেন, কী সুন্দর রং। তোমার কোনওটাই মনে ধরে না ?

কুমারী। শুধু রং হলেই বুঝি ছবি ভাল হয় ?

৩য়। তবে কী হলে ভাল হয় ?

কুমারী। কী করে বলব। বড় হলে বুঝতে পারবে।

১ম ও ২য়। ঐ যে মহারাজ আসছেন। আমরা ভাই যাই।

কুমারী। কেন চলে যাবে ?

৩য়। সেদিন শোননি, মহারাজকে সবাই ভয় করে। আমরা যাই।

বালিকাগণ। আমরা ভাই যাই।

[বালিকাদের প্রস্থান।

(মহারাজের প্রবেশ)

কুমারী। বাবা, এই ছবিটি কেমন হয়েছে ?

রাজা। এ ছবি তুমি এঁকেছ ? বাঃ, এ ত খুব ভাল হয়েছে। এ ছবিটি আমাদের সারথির বুঝি ?

কুমারী। হ্যাঁ বাবা, এটা সারথির ছবি। তুমি তো ঠিক বলেছ ?

রাজা। ঠিক সারথির মতোই হয়েছে যে ছবিটি। সুতরাং চিনতে পারা তো কঠিন নয়, মা।

কুমারী। এটা কার ছবি বল তো, বাবা ?

রাজা। এ ছবি তুমি কেমন করে আঁকলে ? এতটুকু মেয়ে এত ভাল ছবি আঁকতে পারে !

কুমারী। আমি তো আর ছোটটি নেই। পিতা তাঁর কন্যাকে চিরকালই ছোট দেখে, বিশেষ করে যদি কন্যার মা না থাকে।

রাজা। এ কথা কার কাছে শুনেছ বল দেখি ?

কুমারী। মন্ত্রী মশাই বলেছেন। কিন্তু এটা কার ছবি তো বল্লে না ?

রাজা। সেটা বলতে তো কোন কষ্টই হয় না। এটা আমাদের হস্তীশালায় ঝাঁট দেয় যে লোকটি, তার ছবি—না ? তাঁর হাসির মতো হাসিটিও এঁকেছ।

কুমারী। হ্যাঁ, ঠিক্ হয়েছে। আচ্ছা, এইবার বল তো কী দেখে এঁকেছি ?

রাজা। এটা আমাদের বাগানের নূতন গাছের ফুল, না ? নিশ্চয়ই সেই ফুল।

কুমারী। এবারও ঠিক্ বলেছ বাবা।

রাজা। ওটা আবার কার ?—ঐ যে দাড়ি-গোঁপ ওয়ালা এক বুড়োর ছবি ?

কুমারী। এটা সেই পাগলের ছবি—ঠিক্ হয়নি। শুধু মনে করে করে এঁকেছি কি না। তাকে আর একবার দেখতে পেলে বাকিটুকু ঠিক্ করে নেব।

রাজা। পাগল-টাগল লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলা ভাল নয়। তারা পাগল কি না।

(পাগলের প্রবেশ ; কুমারীর প্রতি নীরবে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

রাজা। কী চাও ?—কে আছে ?

কুমারী। কেন বাবা, দোষ কী ? এসেছে, একটু থাক্ না। আমার বাকিটুকু শেষ হয়ে যাবে।

রাজা। প্রহরীগুলো তাদের কাজে অবহেলা করছে—এত সাহস কী করে হ'ল ?

কুমারী। বাবা, প্রহরীদের কোন দোষ নেই। আমি প্রহরীদের বলে এসেছিলাম, পাগল যখনই আসতে চাইবে, তখনই আসতে দেবে।

রাজা। তা হ'লে তুমি তোমার ছবি শেষ করে নাও। বেশীক্ষণ ওটাকে এখানে রাখার দরকার নেই।

(অদূরে উপবেশন)

কুমারী। পাগল, তুমি কী চাও ?

(পাগল নীরবে চাহিয়াই রহিল)

কুমারী। তুমি কী দেখছ আমার মুখে ?

পাগল। দেখছি তোমাকে।

কুমারী। কী লাভ দেখে ?

পাগল। তোমার ছবি আঁকব। তুমি বলেছ, তোমার জীবন্ত ছবি চাই। কেউ পারেনি—তাই আমি এসেছি। আঁকব তোমাকে।

রাজা। হাসিও পায়, রাগও হয়। ও পাগল, তবু যেন পাগলামি নেই। কথাগুলো সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। জানি, ও পাগল, তবু যেন ওকে সহ্য করতে পারি না।

কুমারী। তুমি জান, পুরস্কার কী ? যদি তুমি আমার মনোমত ছবি আঁকতে না পার, ক্ষতি নেই। কিন্তু পারলে তোমার লাভ কী, জান ? (পাগল নীরবে চাহিয়া রহিল)

কুমারী। তুমি পারবে আমার ছবি আঁকতে ?

পাগল। তারা এসেছিল লোভে—তা'রা পারেনি। আমি এসেছি ছবি আঁকতে—আমি পারব। আমি বুড়ো, পাগল, গরীব। ঘর-বাড়ী—যখন যেখানে থাকি। আমি যদি পারি, আমাকে কী পুরস্কার দেবে ?

রাজা। স্পর্দ্ধার মতো শোনাচ্ছে যেন।

কুমারী। সকলের জন্ত যে পুরস্কার ছিল, তোমার জন্তও তাই। কিন্তু তোমার কী চাই, পাগল ?

পাগল। পুরস্কার আগেই নেব, দেবে ? এইটা নিলাম।

[কুমারী-অঙ্কিত পাগলের অসম্পূর্ণ ছবি বইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

কুমারী। বড় অদ্ভুত মানুষ, নয় বাবা ?

রাজা। তুমিও না ঐ রকম অদ্ভুত হয়ে যাও।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। আসুন মন্ত্রিবর। পাগলের পাল্লায় পড়েছি মন্ত্রি! ভয় হচ্ছে, পাছে সেই পাগল আমার মেয়েকে তার শিষ্যা করে নেয়।

মন্ত্রী। তার বিশেষ বাকি নেই মহারাজ।

রাজা। পাগলাটা এখানে এসেছিল। বলে, সে-ও ছবি আঁকবে। পুরস্কার চাচ্ছিল।

মন্ত্রী। পাগল হলেও অপমান করতে দেওয়া উচিত নয়, মহারাজ! সে কী বলল ?

কুমারী। সে তার পুরস্কার আগেই নিয়ে গেল ; বোধ হয় আর তার চাইবার কিছু নেই।

রাজা। সে একখানা ছবি নিয়ে চলে গেছে।

মন্ত্রী। কিন্তু ঐ যে আবার আসছে!

(পাগলের পুনঃ প্রবেশ)

পাগল। হয়নি, হয়নি, এখনও হয়নি।

কুমারী। কী হয়নি তোমার ?

(পাগল কুমারীর প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল)

কুমারী। পাগল!

পাগল। হয়েছে, আর ভুল হবে না। এঁকে ফেলেছি, হয়েছে, হয়েছে।

(চলিয়া যাইতে লাগিল)

কুমারী। পাগল।

(পাগল ফিরিয়া আসিল)

পাগল। পনের দিন পরে, হস্তীশালার পিছনে, একটি চালা-ঘরে তোমার ছবি পাবে। নিজে যেও। হেঁটে যেও। হয়েছে, ঠিক হয়েছে, এঁকে ফেলেছি, হয়েছে...।

[প্রস্থান।

রাজা। আশ্চর্য!

মন্ত্রী। যাদুকর!

৭ম দৃশ্য

(রাজা উপবিষ্ট মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। আসুন মন্ত্রিবর! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

মন্ত্রী। আপনার দয়া অসীম। কিন্তু মহারাজের ধন্যবাদের পাত্র কী জন্তে হলাম বুঝতে পাচ্ছি না।

রাজা। আপনার জীবনে যে কাজেই আপনি হাত দিয়েছেন সে কাজেই কৃতকার্য হয়েছেন। ভেবেছিলাম, আমার কন্তার উপযুক্ত পাত্র-নির্বাচনে আপনার বুঝি হার হ'ল ; কিন্তু এখন তো দেখছি তা'তেও আপনার জিত।

মন্ত্রী। ও, মহারাজ, সীমান্ত রাজ্যের যুবরাজের কথা বলছেন ?

রাজা। হাঁ, মন্ত্রি, আমি তাঁর কথাই বলছি। তিনি আমাকে যে ছবি উপহার দিয়েছেন তা দেখে তাঁকে খুব বড়দরের শিল্পী বলেই মনে হয়। আমার কন্তার মনোমত হবে বলে ভরসা করছি।

মন্ত্রী। রাজকুমারী সে ছবি দেখে খুব খুশী হয়েছেন। তিনি বললেন, খুব খাঁটি শিল্পী না হলে ও-রকম ছবি হতে পারে না। এমন কি, রাজকুমারী সীমান্ত রাজ্যের যুবরাজ শিল্পীকে দেখতে চান।

রাজা। সুসংবাদ, সুসংবাদ। কন্তার পছন্দ তা হলে হয়েছে। যাক, আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও ঘুচে গেল।

মন্ত্রী। হয়তো আপনার শান্তি লাভ হবে এবার।

রাজা। নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মন্ত্রি, সীমান্তরাজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তাঁর সঙ্গে এই আত্মীয়তা আমাদের রাজ্যকে বাহিরের শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করবে। আর যে সব ছোট-ছোট রাজা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পর্যন্ত করতে সাহসী হয়, এবার তাদের পিঁপড়ের মতো করে পিষে ফেলব।

মন্ত্রী। এ সম্বন্ধ যে শুভ, তা'র আর সন্দেহ কী ?

রাজা। তবে মন্ত্রি, এখন থেকেই আনন্দোৎসবের আয়োজন চলুক। বাঁশী এখন থেকেই বাজুক, অসংখ্য আলো এখনই জ্বলতে সুরু করুক, চতুর্দিকে হাসির ফোয়ারা ছুটুক।

(রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজা। এস মা, এস।

কুমারী। বাবা, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তো আমাদের যাবার সময় হবে।

রাজা। কোথায় মা ?

কুমারী। হস্তীশালার পিছনে সেই পাগলের বাড়ী।

রাজা। আবার সেই পাগল!

মন্ত্রী। রাজকুমারী, সীমান্ত রাজ্যের যুবরাজের আঁকা ছবি তোমার কেমন লাগল, তা তো মহারাজকে বলনি ?

কুমারী। খুব সুন্দর ছবি। যুবরাজকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে বাবা!

রাজা। বেশ তো মা, কালই তাঁকে নিমন্ত্রণ করবার জন্ত দূত পাঠাচ্ছি।

কুমারী। বেশী দেরী তো নেই,—মন্ত্রী মশাই, আপনারা প্রস্তুত হয়ে নেবেন না ?

মন্ত্রী। পাগলে কি ছবি আঁকতে পারে ?

কুমারী। সে যে বলেছে, সে আঁকতে পারবে। সন্ধ্যার সময় তা'র কুটীরে আমাদের যাবার কথা আছে যে।

রাজা। সন্ধ্যার তো এখনও অনেক দেরী। বিকেল হ'তেও যে দেরী আছে মা!

মন্ত্রী। পাগল এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না, তারই ঠিক নেই।

কুমারী। কেন? কী হয়েছে তার? কবে থেকে?

মন্ত্রী। এই পনের দিন সে ঘর থেকে বাইরে আসেনি। লোকে সর্বদাই তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখেছে। কেউ কেউ ডেকে খাবার দিতে গেছে। খাবার নেয়নি—বিরক্ত হয়েছে শুধু। শেষে ডাকলেও সাড়া দেয় না। সেই যে দরজা বন্ধ করেছে আর খোলে না। বোধ হয়, উপবাসেই মরে গেছে। পাগলের মৃত্যু ঐ রকমই হয়।

কুমারী। বাবা—!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সীমান্ত রাজ্যের যুবরাজ মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজা। যুবরাজ! হঠাৎ?

মন্ত্রী। বিনা নিমন্ত্রণে!

কুমারী। বাবা, সন্ধ্যার সময় তোমাদের ডাকব।

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী বিস্ময় বোধ হচ্ছে। যাই হোক, আমি যাচ্ছি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। আপনি অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করুন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। যে আদেশ!

৮ম দৃশ্য

(পাগলের কুটীর। পাগল অৰ্দ্ধশায়িত। অন্তরালে যেন কিছু আছে, দেখিতেছে)

(দরজায় ধাক্কা মারিতে মারিতে)

নেপথ্যে। কে আছ, দরজা খোল।

পাগল। (ক্ষীণকণ্ঠে) দরকার নেই। ফিরে যাও।

নেপথ্যে। মহারাজ উপস্থিত। দরজা খোল।

পাগল। ভেঙ্গে ফেল।

(দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল)

(মহারাজ, মন্ত্রী, রক্ষী, রাজকুমারীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (অপর দিকে, দৃশ্যের অন্তরালে পাগল-অঙ্কিত রাজকুমারীর ছবি দেখিয়া) এ কি রাজকুমারীর! ছবি!—কি আশ্চর্য, যেন রাজকুমারী নিজে দাঁড়িয়ে আছেন!

রাজা। এ কি মন্ত্র?

কুমারী। মন্ত্র নয় বাবা। পাগলেই পারে, আর কেউ নয়। (পাগলের কাছে গিয়া পায়ের গোড়ায় দাঁড়াইল) শিল্পি, তুমি উপবাসী, ক্লান্ত আগে কিছু খাও।

পাগল। রাজকুমারি, তোমার—ছবি তো শেষ হয়নি। কিছু—বাকী থেকে গেল। রংও নেই—সময়ও নেই।

(সিধা হইবার চেষ্টা করিল)

কুমারী। এ কি, তোমার বুকে রক্ত কেন? ক্ষত কিসের? ছুরিকা কেন?

পাগল। প্রাণ না দিলে—ছবি তো বাঁচে না। আমার—রক্তের রঙে—তোমার ঐ ছবি—বেঁচে উঠেছে। পাগলের—কাজই ঐ রকম!

(হাসিবার চেষ্টা; শুইয়া পড়িল)

কুমারী। (ক্রন্দনজড়িত স্বরে) শিল্পি!

পাগল। তোমার আঁকা—আমার ছবিও—বাকি—রইল!

কুমারী। শিল্পি!

পাগল। মহারাজ, রাজ-জামাতাকে—এই ছবিটা—দেবেন—বলবেন, পাগলা ঠাকুর—দিয়েছে। রাজকুমারী,—আনন্দে—থেকো, আমার—আশীর্বাদ। আনন্দে—বিদায়—নিই, আনন্দে—।

(মৃত্যু)

কুমারী। (আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে) শিল্পি! (মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিলেন; মন্ত্রী চোখ মুছিলেন; রক্ষীরা চোখ মুছিল)।

ধীরে ধীরে যবনিকা পতন।

সবিনয় নিবেদন

বিগত এক বৎসর যাবৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর হইতে যে বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্য আমাদের বহু গ্রাহক ও গ্রাহিকাকে বিপদের সম্মুখীন হইয়া বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। মাসিক বসুমতীর নিবেদন, গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ সত্বর যেন পরিবর্ত্তিত ঠিকানা আমাদের জানাইয়া দেন। নতুবা একটি মাসিক বসুমতী পুনরায় প্রেরণের অর্থ আমাদের আরও এক জন পাঠক বা পাঠিকাকে বঞ্চিত করা। এই বিষয়ে মাসিক বসুমতী আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

অন্তর্বর্ত্তী ভারত সরকারের অর্থ-সচিব লিয়াকত আলি খান সাহেব ভারত সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সনের বাজেট দাখিল করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ বর্ত্তমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ইহাতে অসুবিধা হইতে অধিকতর সুবিধা হইবে। সুতরাং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই বাঞ্ছনীয় এবং উহা কখন ও কি ভাবে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহা আমাদিগকে অল্প সময়ে স্থির করিতে হইবে।"

মাস তিন যাইতে না যাইতে দক্ষিণ-ভারতের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী মিঃ চিদাম্বরম্ চেট্টিয়ার "ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ্ ব্যাঙ্কের" বাৎসরিক সভায় (১৯৪৭) বলিয়াছিলেন যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককেও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুরূপে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রয়োজনীয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সমৃদ্ধিতে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির অগ্রগণ্য, কিন্তু বিদেশীয় পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি এত দিন ভারতীয় অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সহিত কেবল প্রতিযোগিতাই করিয়া আসিতেছে—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সহযোগিতা করে নাই।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল শুধু একটি মাত্র ব্যাঙ্ক নয়, সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসাটিকে জাতীয় করণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-বড় সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার পক্ষে দেশের কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বা সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে কি না তাহা ভাবিবার সময়, মনে হয় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অন্তর্বর্ত্তী সরকারের অর্থ-সচিবের অভিমত যে জনসাধারণের মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ প্রসঙ্গ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন :

(ক) বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের অক্ষমতা কি?

(খ) জাতীয় করণ বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই প্রয়োজন কি না?

(গ) জাতীয় করণের ফলে কি পরিমাণ অধিকতর সুবিধা জনসাধারণ ভোগ করিবে?

কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, সত্য সত্যই সেইরূপ পরিবর্ত্তনের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। অন্য কোন দেশকে অনুকরণ করিবার পরিবর্ত্তে আমাদের ভাবা উচিত জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ। সেই স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যদি প্রবর্ত্তন করিতে হয় কোন নূতন বিধি-ব্যবস্থা, তাহাতে থাকিবে না কোন ওজর বা আপত্তি। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে সংশোধন অথবা যথারীতি পরিবর্ত্তন করিয়া কাজ চালান গেলে তাহাতেই বা আমরা আপত্তি করিব কেন?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল অনুযোগ বা অভিযোগ আনা হয়, অল্প কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, ব্যাঙ্ক তাহার কার্য্যকলাপে উহার ন্যায্য দাবী প্রয়োগ করে নাই। জনসাধারণের প্রতি উহার যে বিরাট কর্ত্তব্য আছে তাহাও যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করে নাই। ১৯৩৪ সালের আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্কটিকে অনেকাংশে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ ১৯৩৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা ব্যাঙ্কের এমন কোনো কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাই নাই, যাহাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে, ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা ষোল কলায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল এবং কুইলন ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হইবার সময় আমরা ব্যাঙ্কের যে নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়াছি, ১৯৪৬ সালে বাংলায় যখন একাধিক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান কারবার বন্ধ করিল তখনও লক্ষ্য করিয়াছি ব্যাঙ্কের সেই একই নিষ্ক্রিয়তা। যে সব ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইয়াছে তাহাদের অমিতব্যয়িতা, অদূরদর্শিতা, শেয়ার বাজারের ফট্‌কা-বাজীর জন্য তাহারাই দায়ী। এই সকল প্রতিষ্ঠান পরের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে, নিজেদের কর্ম্মচারিবৃন্দ বা কর্ম্মচারি-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে টাকা চালিয়াছে। অভিযোগ সবই সত্য, কিন্তু অভিযোগ এক জিনিষ—প্রতিকার অন্য। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অমিতব্যয়ীর ন্যায় কাজ যে করিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে প্রতিকারের জন্য ইহারা চাহিয়া ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দিকে, কিন্তু ইহাদের আশা সফল হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূক-বধিরের ভূমিকা ভিন্ন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের এই দুর্দ্দিনে অন্য কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। ব্যাঙ্কের উপরোক্ত নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিতে গিয়া ভারতীয় পরিষদের জনৈক সদস্য বলিয়াছিলেন :—সব কিছু বলা হইলেও ইহা সত্য যে, সরকারের উচিত ভালো-মন্দ উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা। শুধু মাত্র ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকা সরকারের কর্ত্তব্যের মাপকাঠি নয়। সরকারের উচিত, যাহারা মন্দ সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে ভাল করিয়া তোলা, আর যাহারা ভাল তাহাদিগকে অধিকতর উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া।

আর এক দিক্ হইতেও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমালোচনা করা হয়। ১৯৩৪ সালের আইনানুযায়ী যাহাতে ভারতীয় কৃষকবৃন্দকে সুবিধা-সর্ত্তে ঋণদান করা যায়, তাহার গবেষণার জন্য একটি "কৃষি-ঋণ বিভাগ" খোলা হয় এক যুগ পূর্ব্বে। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত এই বিভাগটি এমন কিছু করিতে পারে নাই যাহা দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক্, ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে। "স্থির সমুদ্রে সকলেই কর্ণধার।" উত্তাল তরঙ্গে তরণী যখন টলমল করিতে থাকে তখনই পরীক্ষা হয় নাবিকের। তেমনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য সচল থাকে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত কাজ-কারবার করে ততক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা তত বেশী অনুভূত হয় না। কিন্তু চাকা যখন বিপরীত দিকে ঘুরিতে থাকে, যখন ব্যবসায়-বাজারে মন্দা দেখা দেয় ব্যাঙ্ক পরিচালনার গলদ উদ্‌ঘাটিন হয় তখনই প্রয়োজন হয়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের—পরামর্শের এবং পথ-প্রদর্শনের। এই সঙ্কটে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহচর্য্য না পাওয়া যায় তবে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা কি? বস্তুতঃ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিশয় সাবধানী নীতি অনুসরণ করিতেছে। শুধু মাত্র ইহারই জন্য সময় সময় ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাময়িক ভাবে ঋণ দেওয়া ভিন্ন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পারে না। এই অজুহাতে বিপদের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার দায়িত্ব কাটাইতে চাহে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ ধারার (২ ক) উপধারায় ব্যাঙ্ককে হুণ্ডির উপর দাদন দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অবিশ্যি এই সকল ক্ষেত্রে হুণ্ডিগুলি প্রকৃত কাজ-কারবারজাত হওয়া চাই, ইহাতে দুই জন ভাল স্বাক্ষরকারী থাকা চাই এবং উহার মধ্যে এক জন স্বাক্ষরকারী হওয়া চাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত একটি যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান। সর্ব্বোপরি প্রয়োজন, এই সকল হুণ্ডির মেয়াদ ৯০ দিনের বেশী না হয়। এই সব বাধা-নিষেধের জন্য "চাহিবা মাত্র দেয়" হুণ্ডির উপর নির্ভর করিয়া তালিকাভুক্ত যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না—কেন না, এই সব "চাহিবা মাত্র দেয়" হুণ্ডিকে মেয়াদী হুণ্ডি বলা চলে না।

১৭ ধারার (৪ ডি) উপধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পণ্য-দ্রব্যের মালিকানী স্বত্বের দলিলের উপর দাদন দিতে পারে। কিন্তু কোন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট পণ্য-দ্রব্য গচ্ছিত রাখিতে পারে না। মালিকানা স্বত্বের দলিল বলিতে আমরা বুঝিয়া থাকি—রেলওয়ে রসিদ, জাহাজের বিলটি, ডক্ ওয়ারেণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি যে প্রথায় কাজ-কারবার করিয়া থাকে, তাহাতে উপরি-উক্ত দলিলের উপর দাদনের পরিমাণ যৎসামান্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী তাহার গুদামজাত মাল ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দাদন লইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তাহার নিজের গুদামেই ঐ সব মাল জমা রাখিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা থাকে ব্যবসায়ীর নিজের গুদামে—অবিশ্যি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বাধীনে। আমাদের দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদামের একান্ত অভাব, যাহার রসিদের উপর নির্ভর করিয়া ঋণ দেওয়া চলে। রেল রসিদ ও জাহাজের বিলটির উপর যে সামান্য কাজ হইয়া থাকে তাহাও উল্লেখযোগ্য নহে। এই সকল কারণে প্রয়োজনের সময় মালিকানা স্বত্বের দলিল গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার করার ব্যবস্থা নিতান্ত কাল্পনিক। কলিকাতায় এক প্রকারের মালিকানা স্বত্বের দলিলের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়—উহা চটকলের ছাড়পত্র। চটকলের পরিচালকেরা মিল-ম্যানেজারের উপর ছাড়পত্র দিয়া থাকেন। ইহা পেশ করিলে উপযুক্ত পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য পত্রবাহককে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই সব ছাড়পত্র মালিকের স্বাক্ষরিত হইয়া হাতে-হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন বোধে ব্যবসায়ীরা এই সব ছাড়পত্র ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মাল বিক্রয় হইলে বা রপ্তানীর জন্য উহা জাহাজ বোঝাই হইলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের দেনা মিটাইয়া দেয়। কলিকাতায় যে সব ব্যাঙ্কের শাখা আছে তাহাদের মোট লগ্নি কারবারের মোটা অর্থ এই প্রকারের ছাড়পত্রে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এই ধরণের কারবার ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরে বা বন্দরে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় উহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন হইবে না। মোটের উপর বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৭ (৪ডি) ধারায় যে সব নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার ফলে পণ্য-দ্রব্যের উপর দাদন দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। ফলে সত্য সত্যই যখন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তখন যৌথ ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে একমাত্র সরকারী ঋণে নিয়োজিত অর্থ ছাড়া অন্য কোনও সম্পত্তির উপর নির্ভর করা চলে না। সরকারী ঋণে নিয়োজিত অর্থ খুব বেশী থাকে না। সাধারণতঃ উহা আমানতের শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে অন্যান্য কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আমানতী অর্থের তুলনায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর (১)।

১৯৪৭ সনে বম্বের এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কঃ করপোরেশন লিঃ ও শ্রফম্ ব্যাঙ্ক লিঃ তাহাদের কারবার গুটাইতে বাধ্য হইল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি সাহায্য করিতে পারিল? ১৯৪৬ সনে বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল তাহাতেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিরপেক্ষ দর্শক ভিন্ন অন্য কোনও ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। স্থানীয় ম্যানেজারের এক গতানুগতিক ইস্তাহার ও বম্বে হইতে এক জন ডেপুটি গর্ভণরের পদার্পণ ভিন্ন ইহার কর্ম্মকুশলতা অন্য কোনও রূপে প্রকাশ পায় নাই।

১৯৪৬ সনে বাংলা দেশে প্রথমতঃ দুই-একটি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক, যাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকার বাইরে ছিল কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; পরে কোন কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কও বেগ পাইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে হুগলি ব্যাঙ্কের কথা। বাঙ্গালী পরিচালিত ইহা একটি তালিকাভুক্ত ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক। গুজবে বিশ্বাস করিয়া এই ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা আমানতী টাকা উঠাইতে আরম্ভ করে। টাকা উঠাইবার চাপ কোন এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া থাকে যে, এই ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানটিকে ভারত ব্যাঙ্কের সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। খবরে প্রকাশ, হুগলি ব্যাঙ্ক প্রয়োজন বোধে ভারত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ২৫ লক্ষ বা তাহারও বেশী মুদ্রা ধার করিতে পারিত। শুনিয়াছি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা হুগলি ব্যাঙ্কের প্রতি সবিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন; কিন্তু আইনের মারপ্যাচের জন্য কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। চমৎকার যুক্তি! প্রবাদ আছে যে, "মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না," ইহাও ঠিক তাই। ভারত ব্যাঙ্ক সেদিনকার শিশু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহার জন্ম। এমন একটি ব্যাঙ্ক যে সাহায্য করিতে পারিল, সে সাহায্যটুকুও কি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আশা করা অন্যায় বা অপ্রাসঙ্গিক? ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও কুইলন ব্যাঙ্ক যখন দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই প্রকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দক্ষিণ-ভারতের বণিক-সম্প্রদায় রিজার্ভ

---

(১) এই প্রসঙ্গে লেখকের "ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধকালীন ভাবধারা" প্রবন্ধ দেখুন।—মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৫২।

ব্যাঙ্কের নিকট বিনা সুদে চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৫৲ ও ২৲ টাকা হিসাবে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে কুণ্ঠা বোধ করে। কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এই ভাবে তাহার আমানতের কিয়দংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে না পারিলে বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঘাটতির উপর শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ আদায় করিতে পারে। কিন্তু ইহা মনে করা সমীচীন হইবে না যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার নিকট যে টাকা গচ্ছিত থাকে তাহা দ্বারা আমানতকারীদের কোনো প্রকার ভরসা দিতে পারে, কারণ ঐ টাকা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সমগ্র আমানতের কিঞ্চিৎ মাত্র। এ কথা সত্য যে, কোনো একটি জিনিষের অংশ-বিশেষের দ্বারা সমগ্র জিনিষের গতিবিধি নির্দ্দেশ করা যায় না। সেইরূপ শতকরা ৭৲ টাকা মাত্র জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নহে যে, আমানতকারীদের সম্পূর্ণ আমানতই নিরাপদ রহিয়াছে। পন্থা যে নাই তাহা নহে, তবে তাহা অন্য ধরণের।

১৯৩৪ সনের আইনের ৪২ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে সাপ্তাহিক হিসাব দাখিল করিতে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট। ঐ হিসাব দেখাইতে হয় প্রতিষ্ঠানের মূলধন, আমানত ও সেই সঙ্গে দেখাইতে হয় যে ঐ সব অর্থ কি ভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। এই সকল হিসাব পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে, কোন্ প্রতিষ্ঠানের আমানত কি ভাবে নিয়োজিত হইতেছে। দু'-চার সপ্তাহের বা মাসের ক্রমান্বয়িক হিসাবে এও দেখা যাইতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের আমানতী টাকা আটকাইয়া পড়িতেছে কি না? কোন প্রতিষ্ঠানের আমানতের তুলনায় নগদ টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে কি না? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সন্দেহ হইলে সময় থাকিতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা না করিয়া শুধু মাত্র গতানুগতিক ভাবে এই সব সাপ্তাহিক হিসাব হইতে আইনের ৪৩ ধারা অনুযায়ী সমগ্র তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য সমাধান হইবে না। ১৯৪০ সনে আইনের আংশিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে কোনো ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে নূতন আমানত গ্রহণ করিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারণ করিতে পারে। দোষী বলিয়া সন্দেহ করিলে ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দকে অভিযুক্ত করিতে পারে। শুধু আইনে কি হয়? চাই তাহার যথোপযুক্ত প্রয়োগ। সে প্রয়োগ করিতে হইলে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছিল না। আশা করি, আগামী দিনে নূতন দৃষ্টিশক্তি সে অর্জ্জন করিতে পারিবে।

১৯৩৪ সনের আইনের ১৭ ধারা ও তাহার বিভিন্ন উপধারার প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিলে অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৭ ধারার ৪ডি উপধারার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে গুদামজাত মালের উপর ধার দেওয়া চলে অবিলম্বে এমন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যাহাতে রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির গায়ে গায়ে ছোট-বড় গুদাম গড়িয়া উঠিতে পারে, রেলওয়ে বোর্ডের মারফৎ সে ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতার চা বিক্রয় সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার বাজারে যে সমস্ত চা বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার নিলাম হয় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা—

(ক) এ ডব্লিউ ফিগিজ এণ্ড কোং লিঃ
(খ) ক্যারিট মোরান এণ্ড কোং
(গ) ডব্লিউ এস্ ক্রেস্ওয়েল, এণ্ড কোং লিঃ
(ঘ) জে টমাস্ এণ্ড কোম্পানী।

ইহারা চা নিজের কাছে জমা রাখে না। উহা থাকে বামার লরী এণ্ড কোম্পানীর খিদিরপুরস্থিত গুদামে। নিলামে চা বিক্রয় হইলে পর নিলামকারী কোম্পানীগুলি টাকা জমা পাইলে বামার লরী এণ্ড কোম্পানীর উপর ছাড়পত্র লিখিয়া থাকে। ঐ ছাড়পত্র গুদামে দাখিল করিলে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী মাল পাওয়া যায়। পাট-কলের ছাড়পত্রের যেমন বাঁধা-ধরা সুন্দর ব্যবস্থা আছে, চায়ের ছাড়পত্র সম্বন্ধে তেমন কোন বনেদী বন্দোবস্ত নাই। চা ছাড়পত্রের গায়ে বামার লরী এণ্ড কোং কাহারও মালিকানা স্বত্ব লিখিয়া দেন না। যদিও ভিন্ন কাগজে মালিকানা স্বত্বের হস্তান্তর স্বীকার করা হয়, তবুও ব্যবসায় ক্ষেত্রে মালিকানা স্বত্ব ছাড়পত্রের গায়েই লেখা থাকা উচিত, যেমন থাকে চটকলের ছাড়পত্রের গায়ে। ইহার ফলে চায়ের ছাড়পত্রের উপর দাদনের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না। প্রথমতঃ, এই প্রকারের ব্যবসায় ছোট ছোট দুই-একটি ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান বছরে (১৯৪৭) কলিকাতার দু'-একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োজিত করিতেছে।

চা নিলামের ব্যবসায় কলিকাতায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষে যত রকম চা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার বেশীর ভাগ চা ই, নীলগিরির চা ছাড়া, উৎপন্ন হয় দার্জ্জিলিং ও আসামে; এবং এই সকল চা ভারতবর্ষে বিক্রয়ের জন্য ও বিদেশে চালান দিবার জন্য আনীত হয় কলিকাতা বন্দরে। মালিকানা স্বত্ব পাকাপাকি করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল নেতাজী সুভাষ রোডে কোম্পানীর একটি কার্য্যালয় স্থাপিত হইলে খুব সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

শুনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার বর্ত্তমানের চা নিলামের কেন্দ্র-স্থল লণ্ডন সহর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সুখের কথা নিশ্চয়ই। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে এই ব্যবসায়ের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য থাকা উচিত। বর্ত্তমানে খিদিরপুরে যে গুদাম আছে তাহাতে সর্ব্বসমেত ৫,৫০,০০০ চায়ের বাক্স রাখা চলে, ভারতের সমস্ত চায়ের বিক্রয় কলিকাতা হইতে করিতে হইলে প্রায় ৮,০০,০০০ বাক্স জমা রাখিবার উপযুক্ত গুদামের প্রয়োজন হইবে। অতিরিক্ত জায়গার সংস্থান করিতে হইলে প্রায় ১ কোটি টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। তাহার জন্য উপযুক্ত ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে উপরোক্ত ধারায়। কেবল মাত্র জাতীয় করণ বর্ত্তমানের অসুবিধা দূর করিয়া নূতন যুগের সূচনা করিবে না।

এবার দেখা যাউক কৃষি-ঋণের কথা। অর্থনৈতিকেরা এ বিষয়ে

একমত যে কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যথেষ্ট করণীয় আছে। ১৯৩০ সনের জুন মাসে হেগ, সহরে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়াছিল সেদিন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বার এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য একটি দপ্তর খোলা হয়। এই দপ্তরের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দান করা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় পরিচালনা কার্য্যে সাহায্য করা ও কি ভাবে উন্নত ধরণের কৃষি-ঋণ দেওয়া যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে কোন কিছু করিয়া উঠার পথে অনতিক্রম্য বাধা আছে। আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল পরামর্শই দান করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ঋণ দান করা ইহার ক্ষমতার বাহিরে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরেই ব্যাঙ্ক এক বিবরণী প্রকাশ করে। এই বিবরণীতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-ঋণের উৎস ভারতের অগণিত কুসীদজীবী। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ক্ষেত্রবিশেষে টাকায় চার পয়সা পর্য্যন্ত সুদ গ্রহণ করিতে কসুর করে না। কিন্তু টাকার মুনাফা ভিন্ন কৃষকের সুখ-দুঃখের সহিত তাহারা কোনও সম্পর্ক রাখিতে চাহে না—চায় না তাহারা জমির উন্নতি বিধান করিতে। সমবায় সমিতির দ্বারা যদি কৃষকের আর্থিক অভাব মেটান যায়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থ—এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ এক মত, কিন্তু বর্ত্তমান আইনের বিধি-নিষেধের জন্য সে পথও রুদ্ধ। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতে পারে, কিন্তু তাহা সাময়িক ভাবে। বেশী দিনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেকেই গ্রহণ করিতে হইবে; ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ গ্রহণ করা কার্য্যতঃ হইয়া উঠে না। সমবায় সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। আমানতের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ তাহাদিগকে নিয়োজিত করিতে হইবে নগদ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত অর্থ ও কোম্পানীর কাগজে। এই সমস্ত নিয়ম-কানুন মানিয়া সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহচর্য্য গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কয়েকটি সর্ত্তে কুসীদজীবীদের ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ভারতীয় কোম্পানী আইনের নিয়মানুযায়ী তাহাদিগকে খাতাপত্র রাখিতে হইবে; প্রয়োজন বোধে ঐ সব খাতাপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ পরিদর্শন করিতে পারিবেন। সর্ব্বোপরি তাহাদের কাজ-কারবার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। উপরোক্ত সর্ত্তগুলির কিছু কিছু মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেও শুধু মাত্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অন্য কাজ-কারবার বন্ধ করিতে কুসীদজীবীরা রাজী হয় নাই। ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোনো কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয় নাই।

বোম্বাইয়ের কুসীদজীবী সমিতির সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিল। অন্ততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে যাহাতে কুসীদজীবী সম্প্রদায় অন্যান্য ব্যবসায় ছাড়িয়া শুধু মাত্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে সে চেষ্টা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সন্দেহই আমাদের মনে জাগে যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চাষীদের কোন উপকারেই আসিতে পারিবে কি না? ঋণদান করা এক জিনিষ এবং সেই সব অর্থ যথোচিত ভাবে নিয়োজিত হইতেছে কি না তাহার তদারক করা অন্য জিনিষ। স্বাভাবিক অবস্থায় আশা করা যায় যে, চাষী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ আবাদে নিয়োজিত করিবে। ফসল উঠিলে উহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে দেনা সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু সময় সময় চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তখন তাহার পক্ষে ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য; এমন কি, অসাধ্যও হইতে পারে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এই সব ক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতির অংশ কে গ্রহণ করিবে?

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের নূতন এক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে গবেষণার ভার থাক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর। তাহার প্রয়োগ-প্রণালী থাক প্রাদেশিক সরকারের হাতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক সর্ত্তে অথবা অল্প সুদে প্রাদেশিক সরকারকে টাকা ধার দিবে। প্রাদেশিক সরকার সমবায় সমিতি আইনে বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ ঐ অর্থ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। প্রথম প্রথম এই সকল ঋণ অল্প-মেয়াদী হইবে, ক্ষেত্রবিশেষে উহার মেয়াদ ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। প্রাদেশিক সরকার তাহার সমবায় সমিতির কর্ম্মচারী দ্বারা প্রত্যেক চাষীর আর্থিক সঙ্গতির খবরাখবর করিবে। যে সব ক্ষেত্রে যথাযথ যত্ন লইয়াও লগ্নী টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহা সরকারী খরচ-খাতায় লিখিতে হইবে। প্রাদেশিক সরকার এই সব অনাদায়ী অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ফিরিয়া পাইবে। কার্য্যতঃ তখন দেখা যাইবে যে, কৃষি-ঋণে যে অর্থ নষ্ট হইবে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের লোকসান বলিয়া হিসাবে দেখান হইবে। সন্দেহ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারিবে। ইহাতে প্রাদেশিক সরকারের লক্ষ্য থাকিবে যেন কানা কাড়িটি অবধি ন্যায্য ভাবে ব্যয়িত হয়। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না।

এ যাবৎ কৃষি-ঋণের প্রশ্ন উঠিলেই ব্যাঙ্কের তরফ হইতে দেখান হইত, কৃষি-ঋণের সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি—চিরাচরিত সেই স্তোক বাক্য—কৃষকের অমিতব্যয়িতা, উচ্চ সুদে ঋণগ্রহণ, পরিশেষে ঋণ পরিশোধ করায় অক্ষমতা, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

ভারত ব্যবচ্ছেদ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ দিনে ভারতবর্ষে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৬৮ কোটি মুদ্রা। ঐ নোটের পিছনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ছিল—সোনা ৪৪ কোটি টাকার; কোম্পানীর কাগজ ১১১৩ কোটি টাকার; রৌপ্যমুদ্রা ৬১ কোটি টাকার। (ভারত ও ইংরেজ সরকারের) সুতরাং বলা চলে যে, মোট চলতি নোটের শতকরা ৫·১১ ভাগ মাত্র রাখা হয় সোনা-রূপায়; বাদ বাকী ৯৪·০৯ ভাগ নোটের পিছনে। ভারত ও ইংরেজ সরকারের অঙ্গীকার ভিন্ন অন্য কিছুই রাখা হয় নাই। আমাদের দেশের চাষী-মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনী সম্প্রদায় পর্য্যন্ত তাঁহাদের লেন-দেন, দেনা পাওনার হিসাব নিষ্পত্তি করেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট দ্বারা। চাষীরা যদি ব্যাঙ্কের

নোটের উপর এমন ভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারে, ব্যাঙ্কের কি উচিত নয় চাষীদের আর্থিক উন্নয়নের প্রতি একটু নজর দেওয়া? চাষীরা ব্যাঙ্কের অঙ্গীকারকে টাকা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার ফলে ব্যাঙ্কের প্রভূত মুনাফা হইয়া থাকে; সেই মুনাফা হইতে যৎসামান্য দান করিলে চাষীর আর্থিক অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ঋণদানের কর্ত্তব্য ব্যাঙ্কের, তাহার যথাযথ প্রয়োগ-ব্যবস্থা করিতে হইবে প্রাদেশিক সরকারকে। কর্ত্তব্যের এই বিভাগ দ্বারাই হইবে সমস্যার সমাধান। কেবল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই সর্ব্বদোষে দোষী করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। ঋণের অর্থ যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যোগাইয়া থাকে আর সেই অর্থ যদি প্রাদেশিক সরকারের নির্দ্দেশে প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আর দোষী করা উচিত হইবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগ একটি গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই নিয়ম প্রবর্ত্তন বা উদ্ভাবনের ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দান তাহাকেই করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয় করণের প্রস্তাব অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছে ইংলণ্ডের এটিলি সরকারের কার্য্য-কলাপ দ্বারা। কিন্তু ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও অর্থনৈতিক বিষয়ে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারি নাই বা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেও তাহার স্বাধীন প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। ইংরেজ সরকারের বা জনসাধারণের যাহা সুবিধার হইয়াছে, তাহাই যে ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণজনক হইবে, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। তাই যদি না হয় তবে আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সত্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ প্রয়োজনীয় কি না?

ইংলণ্ড তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড অর্থ বা বাণিজ্য বিভাগের অনুরূপ কোনো সরকারী দপ্তরে পরিণত হয় নাই। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিবৃন্দও সরকারী চাকুরে হয় নাই। ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম্ম বিধি ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণের জন্য আজও তাহার নিজস্ব আইনই বলবৎ রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি ব্যাঙ্কের নোটের দায়িত্ব আজও রহিয়াছে ব্যাঙ্কের উপর, উহা শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের উপর বর্ত্তায় নাই।

১৯১৪-১৯১৮ সনের মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পত্তন হইয়াছে। বৃটিশ-প্রভাবান্বিত দেশগুলিতে যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড ক্যানাডা প্রভৃতি, ইংলণ্ডের অনুকরণে অংশীদারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেখানে প্রথম হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাসুজি সরকারী ব্যাঙ্করূপে গড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষও খুব বেশী পশ্চাতে পড়িয়া থাকে না। ১৯৩৫ সনের এপ্রিল মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে অংশীদারী ব্যাঙ্করূপে।

পরবর্ত্তী যুগে হাওয়া বিপরীত দিকে বহিতে সুরু করে। নিউজিল্যাণ্ড তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটিকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করে। আর্জেণ্টাইনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসী ও নেদারল্যাণ্ড দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সম্পত্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। হল্যাণ্ডে যে ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ সম্পন্ন হইল, তাহাতে অনুভব করা যায় যে, ইউরোপের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। নেদারল্যাণ্ডে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ বিল উপস্থাপিত হয়, তখন কোনোরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই। অতি আয়াসে, বিনা প্রতিযোগিতায় নিতান্ত মামুলি ভাবে ঐ বিল আইনে রূপান্তরিত হয়। দশ বছর পূর্ব্বে হইলে হয়তো এই বিল প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিত। সময়ের কি পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন শুধু ইংল্যাণ্ডেই আবদ্ধ হয় নাই বা ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের প্রভাব বিরাট। উহা শুধু ইংল্যাণ্ড ভূখণ্ডেই আবদ্ধ নহে—সমগ্র পৃথিবীময় ইহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড জাতীয় সম্পত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওয়ার সাথে সাথে অংশীদারী ব্যাঙ্করূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধুর্য্য যেন বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে (২)।

এখন আলোচনা করা যাক, জাতীয় করণ দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ইতর-বিশেষ কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারের ঘাটতি পূরণ করিবার নিমিত্ত যতক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত না হয় ততক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হউক বা অংশীদারী হউক উহাতে কিছু যায়-আসে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হইলেও সরকারী ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে চালাইতে পারে না। সরকারী দপ্তর ও ব্যাঙ্কের পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে এমন মতৈক্য কার্য্যতঃ দেখা যায় যে কোনো সময়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে না, শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কার্য্য কাহার দায়িত্বে চালিয়া থাকে—সরকারের না অংশীদারের প্রতিনিধিমণ্ডলীর। এ সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্ আর. এস্. সিয়ার্স প্রকৃতই বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের জাতীয় করণ প্রকারান্তরে উহার এক প্রকার নমাকরণ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বস্তুতঃ উহা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-পদ্ধতির কোনোই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না।

জাতীয় করণের ফলে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের অংশীদারবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ শেয়ারের স্থলে শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের কোম্পানীর কাগজ পাইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থা বিধান করিতে সরকার গত ২০ বছরে ব্যাঙ্ক যে শতকরা ১২ পাউণ্ড হিসাবে মুনাফা ঘোষণা করিত তাহার একটা গড়পড়তা হিসাব করিয়াছেন। জাতীয় করণের ফলে ব্যাঙ্ক যাহাতে সরকারের খেয়াল মত অন্যান্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জনসাধারণের অর্থের হিসাব-নিকাশের বিবরণী হস্তগত করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা আইনে প্রণয়ন করা হইয়াছে। সমস্ত দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের জাতীয় করণ কো না অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সাধিত হয় নাই, যতটা হইয়াছে রাজনৈতিক দলীয় নীতির চাপে। তাই উপহাসচ্ছলে বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ইকনমিষ্ট' মন্তব্য করিয়াছিলেন—"যেখানে এত অদল-বদল সত্ত্বেও আসলে কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না, সেখানে এমন প্রহসনের

(২) ২১-৬-৪৭ তারিখের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার মতাবলম্বনে।

কি প্রয়োজন ছিল? যাহাতে পূর্ব্বের ব্যবস্থার কোনো সত্যকারের অদল-বদল না হয় তাহার জন্য কোনো চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। সুতরাং ইহাই কি প্রমাণিত হয় না যে, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হইল তাহা সম্পূর্ণ অলীক? পরন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দ্বারা অর্থনৈতিক রীতি-নীতি রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইয়াছে (৩)।"

আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার স্বল্প কালের মধ্যে ইহাকে কত সমস্যারই না সম্মুখীন হইতে হইয়াছে৷ প্রায় ছয় বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে ইহাকে যুদ্ধের প্রয়োজন ও তাহার আনুসঙ্গিক অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও পরিচালন করিতে। যুদ্ধের তাগিদ কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে হইল ভারতচ্ছেদ, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদ ভাগাভাগি। ভারত বিচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদের জের টানিতে টানিতে আরও বেশ কিছু কালক্ষেপ হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গঠনমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিবার অবকাশ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ পাইল না। তবুও তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি করেন নাই।

১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি বিশ্বের রণ-দামামা থামিলে এক বিরাট ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ তৈয়ার করেন এবং জনসাধারণের মত জ্ঞাপনার্থ উহার বহুল প্রচার করা হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এমন গজকচ্ছপ গতিতে চলিতেছে যে, উহার মধ্যে বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বিরাট সঙ্কট দেখা দিল। আজও পর্য্যন্ত সেই বিল আইনে পরিণত হইল না। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেই বিল পাশ হইতে যে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হইবে সে বিষয় নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। বিলের খসড়া যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ভালো-মন্দ মতামত প্রকাশের অবকাশ জনসাধারণ বিশেষ ভাবে পাইয়াছে। আশা করা যায়, সরকার বিলে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাহাই আইনে পরিণত করিবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিলটি ব্যবস্থা পরিষদের আওতায় রহিয়াছে ততক্ষণ ইহার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না (৪)। বিলটি আইনে পরিণত হইলে সে আইন যাহাতে কার্য্যকরী হইয়া দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কল্যাণ সাধন করিতে পারে তাহাকে সে সুযোগ দিতে হইবে। জাতীয় করণের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া আলাদীনের প্রদীপ সংগ্রহ করা আজ-কাল সম্ভব হইবে না।

বিলে যে দু'-একটি প্রশ্নের আলোচনা করা হয় নাই, তাহার বিষয়ে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ বলা যাক, ব্যাঙ্ক-বাজারের কথা। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ কোনো ব্যাঙ্ক-বাজার নাই। এমন সুষ্ঠু বাজার গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন আলোচনা ছাড়া কার্য্যকরী কোনো পন্থাই এ যাবৎ অবলম্বিত হয় নাই। ব্যাঙ্ক-বাজার গড়িয়া তুলিতে প্রয়োজন বিলটির; দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকারের। দেশীয় বিলটির অবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু বৈদেশিক বিলটির অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। বিদেশের সহিত আমদানী ও রপ্তানী কারবার হইতে বৈদেশিক বিলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে গুটিকয়েক বৈদেশিক বিনিময়-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দ্বারা। ভারতের বিশিষ্ট বন্দরে যথা—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে শাখা স্থাপন করিয়া এই শ্রেণীর বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ভারতের সর্ব্বত্র সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের ছিল না কোনো অস্তিত্ব, তাই বিদেশেও ছিল না তাহার কোনো অর্থ-বিনিময় প্রতিষ্ঠান। আজ রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হইয়াছে অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন।

১৯৩১ সনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদারক কমিটি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বাজার গঠন করিবার উদ্দেশ্যে গোড়ায় প্রয়োজন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনে স্থাপন করা একটি ভারতীয় বিনিময়-ব্যাঙ্ক। এ প্রস্তাব তখনকার দিনে ভারতবাসী গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই। আজ ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি নাবালকত্ব কাটাইয়া যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান, যথা—ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি সাগর পারে, লণ্ডনে স্থাপন করিয়াছে তাহাদের শাখা ও চালাইতেছে তাহাদের ব্যবসায়। এখন আমাদের আশা করা অসঙ্গত হইবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে কোনো কোনো ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারী ও টোকিয়ো প্রভৃতি জগতের বড় বড় ব্যবসায়-কেন্দ্রে শাখা স্থাপন করিয়া ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের সহায়করূপে আগাইয়া আসিবে।

এখন দেখা যাক, এই বিষয়ে কি কি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। ভারতীয় পণ্য বিদেশে চালান হইলে ভারতীয় চালানকারীরা ভারতীয় ব্যাঙ্কের মারফৎ চালানী কাগজ-পত্র, যথা—বিল অফ্ লেডিং, ইন্সিওরেন্স পলিসি, ইন্‌ভয়েস্ প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইতে পারিবে। বিদেশে ভারতীয় পণ্য-ক্রয়কারী সেখানে অবস্থিত ভারতীয় ব্যাঙ্কে উপযুক্ত অর্থ জমা রাখিয়া সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র হস্তগত করিয়া উহার বিনিময়ে মাল খালাস করিয়া লইবে। ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই-চারিটি জিনিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিদেশী বাজারেও উহার তেমন কোনো প্রতিযোগিতা নাই, যেমন—পাট, চা, চামড়া, প্রভৃতি। ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিতে হইলে ভারতীয় বিক্রেতার কথানুযায়ী কারবার করিতে হইবে। সেই জন্য রপ্তানী উদ্ভূত বিলের কাজ ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে সে কথা না-ও টিকিতে পারে। পরন্তু ইংরেজ বা মার্কিণ ব্যবসায়ী স্বভাবতঃই পছন্দ করিবে ইংরেজ বা মার্কিণ ব্যাঙ্কের মারফৎ কার্য্য করিতে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমন ইংরেজ সরকার যে ভাবে অধুনালুপ্ত ইউনাইটেড কিংডম্ কমার্শিয়াল কর্পোরেশন স্থাপন করিয়াছিলেন, অনুরূপ ভাবে এ দেশেও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় কি না? এই প্রতিষ্ঠানের এক-একটি শাখা স্থাপন করিতে হইবে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক

---

(৩) 'ইকনমিষ্ট' ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৫

(৪) বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের ১লা মাঘ, ১৩৫১ সনের (রবিবার) দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ "ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর বিল ও বাংলা" দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি সহরে। ভারতের জন্ত সমুদয় পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ। এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য অল্প হইবে না। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা ঐ সকল বিদেশী বণিকের পক্ষে সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। প্রথমতঃ, যদি আমদানীর শতকরা ৫০ ভাগ বিলও ভারতীয় ব্যাঙ্কের মারফৎ প্রেরিত হয় তবে তাহাতেই ঐ সকল ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির খরচ পোষাইয়া কিছু কিছু মুনাফা হইতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদানে যদি বিদেশী বণিকমণ্ডলী সন্তুষ্টি লাভ করিতে থাকে, তখন তাহারা স্ব-ইচ্ছায় ভারতীয় ব্যাঙ্কের সহিত কারবার চালাইতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। তখন এই প্রতিষ্ঠানের আর কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপরোক্ত ধারণা একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিদেশী প্রথায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করেন ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলি; ভারতবাসীও এই সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখিতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় পরিচালনায় যখন ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তখন ভারতবাসীর নিকট হইতে আমানত লাভ করিতে তাহাদের প্রথম প্রথম বেগ পাইতে হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা অসম্ভব হয় নাই। এই তো সেদিন বর্ত্তমান বৎসরের (১১৪৭) প্রথম দিকে কোনো কোনো ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যাঙ্কগুলির অনুরূপ চলতি আমানতের উপর সুদের হার হ্রাস করে কিন্তু তাহার জন্য এই সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের আমানতের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে, বহুলাংশে তাহার কর্ম্মদক্ষতার উপর, জাতীয়তাবাদ সেখানে গৌণ।

আমদানী বিলের কারবার ভারতীয়দের হস্তগত হইলে ব্যাঙ্ক-বাজারের গঠনে অনেকাংশে সহায়তা করিবে। বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাহারা ব্যাঙ্ক-বাজারের গঠনে প্রতিবন্ধকরূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে ব্যাঙ্ক-বাজারের বণিকেরা আমদানী বিলগুলি ক্রয় করিয়া লয়, উহাতে যে ব্যাঙ্কের উৎপত্তি হয় তাহাই হয় এই সব বণিকদের মুনাফা। ভারতবর্ষে কিন্তু বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি আমদানী বিলগুলির মেয়াদ অনুযায়ী নিজের কাছে ধরিয়া রাখিত এবং এখনও রাখে—ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ মুনাফাই এই সব ব্যাঙ্কগুলি আত্মসাৎ করে। বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি এ দেশে তাহাদের সাধুতার জন্ত প্রখ্যাত। এই সব প্রতিষ্ঠানে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কোনো ভারতবাসীরই এক কানা কড়ি খোয়া যায় নাই, ফলে ইহাদের কাছে আমানতী টাকার অভাব হয় নাই কোনো দিন। অর্থের প্রাচুর্য্যের ফলে আমদানী বিলে টাকা খাটাইতে ইহাদের বেগ পাইতে হয় নাই কোনো দিন। সুতরাং তাহাদের লাভের অংশে অন্ত কাহাকেও ভাগ বসাইতে দিতে তাহারা রাজী হয় নাই। ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা দিয়াছে সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মপন্থার এক নূতন সমাবেশ। সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সরকারী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়া থাকে, এ বিষয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও কোনো ত্রুটি করে নাই। সরকারী স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া জনসাধারণের স্বার্থের দিকে নজর দিবার অবসর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে দেশের ও দশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

বর্ত্তমান আইনানুযায়ী ব্যাঙ্কের ১৬ জন পরিচালকের মধ্যে গভর্ণর ও ২ জন ডেপুটি গভর্ণর সরকারের মনোনীত প্রার্থী, বাকী ৫ জনও সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হ'ন; ৮ জন হ'ন অংশীদার কর্ত্তৃক নিয়োজিত। বেসরকারী পরিচালকবৃন্দ অধিকাংশ স্থলেই শিল্প-বাণিজ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ইঁহাদের পরামর্শ হয় সময়োপযোগী ও কার্য্যকরী। প্রয়োজন বোধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেও ইঁহারা পশ্চাৎপদ হ'ন না। বর্ত্তমান (১১৪৭) বৎসরের ৩০শে জুনের বর্ষশেষ কার্য্য-বিবরণীতে ইঁহারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন দেশের সকল স্তরের দুর্নীতির দিকে। ইঁহারা বলিতে শঙ্কিত হ'ন নাই যে এই দুর্নীতির পথ যথাসময়ে বন্ধ না হইলে যে কোনো প্রকারের পরিচালনাকে ইহা বানচাল করিয়া দিবে। দেশের অর্থনৈতিক এই প্রকারের আলোচনা, সরকারী নীতির অনুরূপ সমালোচনা করিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। অধিকতর উন্নতি-বিধানকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও রেঙ্গুন কেন্দ্র হইতে ৮ জন পরিচালক নির্ব্বাচিত হইত। রেঙ্গুন কেন্দ্র মাদ্রাজ কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হওয়ায় অংশীদারবৃন্দ ৪টি কেন্দ্র হইতে ৬ জন পরিচালক নিয়োজিত করিতে পারেন। সরকার ৪ জন পরিচালক মনোনীত না করিয়া ৩ জন পাঠাইতে পারেন, পরিবর্ত্তে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরের বণিক-সমিতি দ্বারা মনোনীত এক-একটি পরিচালক গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্নে বর্ত্তমান ও প্রস্তাবিত পরিচালকমণ্ডলীর বিবরণ দেওয়া গেল—

বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলী			প্রস্তাবিত পরিচালকমণ্ডলী		
গভর্ণর	—	১	গভর্ণর	—	১
ডেপুটি গভর্ণর	—	২	ডেপুটি গভর্ণর	—	২
সরকারী অফিসার	—	১	সরকারী অফিসার	—	১
সরকার মনোনীত	—	৪	সরকার মনোনীত	—	৩
অংশীদার দ্বারা নির্ব্বাচিত	—	৮	বণিক সম্প্রদায় মনোনীত		৩
			অংশীদার নির্ব্বাচিত		৬
		১৬			১৬

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর এই ধরণের কিছুটা অদল-বদল করিলে দেশের শিল্পপতিরা ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনায় আরও বেশী সুযোগ-সুবিধা পাইবে। বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্বারা দেশের সকল প্রকার ব্যবসায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। অংশীদার দ্বারা নির্ব্বাচিত পরিচালক-সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পাইলে অংশীদারের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশঙ্কা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদার ও অন্যান্ত যৌথ কারবারী ব্যাঙ্কের অংশীদারদের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার ফলে লোকসানের ভয় এই প্রতিষ্ঠানে যৎসামান্ত—এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। সুতরাং চিরাচরিত প্রথায় শতকরা ৩৲ টাকা বা ৪৲ টাকা মুনাফা লওয়া ভিন্ন সাধারণ অংশীদারবৃন্দ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যাপারে মাথা-ঘামায় না—ঘামাইয়াও কিছু করিতে পারে না। তাই এই শ্রেণীর নির্ব্বাচিত পরিচালকবৃন্দের সংখ্যা কমিয়া গেলে কিছু ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা নাই।

ভুল ভেঙ্গে যায়

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"তোমায় চিনি···তোমায় চিনি···তোমায় চিনি"— এই কথা,
বেড়াই বলে মিথ্যা গরব ভরে।
বুঝতে নারি, কল্পনারি চিত্তহারী স্বপ্ন-তা,
মরশুমী ফুল—রাত পোহালেই ঝরে।
বুঝতে বাকি মস্ত ফাঁকি তোমার পরিচয়ে;
দিবস-নিশি কাটাই প্রতিবিম্বেরি সঞ্চয়ে।

"তোমায় পাবো···তোমায় পাবো···তোমায় পাবো"— এই আশা,
পোষণ করি ক্ষুদ্র হৃদয়েতে।
সেই দুরাশার—নীল কুয়াশার—মরীচিকার ভুল ভাবা,
জাহির করি অক্ষম ছন্দেতে।
অবাস্তবের প্রান্তরে মোর আশার ফসল বোনা;
আবির্ভাবের মিথ্যা আশার জলছবি—আলপনা।

"আমার তুমি···আমার তুমি···আমার তুমি"— এই বলে,
আঁকড়াতে চাই সর্ব্বদা প্রাণপণে।
স্বপ্ন যারে ব্যর্থ ক'রে ব্যঙ্গভরে যায় ছ'লে;
স্বর্ণ-মৃগী দেয় ধরা বন্ধনে?
মিথ্যা দাবী মূর্ত্ত হ'য়ে আমায় উপহাসে,
স্বপ্ন ভাঙ্গার যন্ত্রণাতে ঘুম ভাঙ্গে সন্ত্রাসে।

"কোথায় গেলে···কোথায় গেলে···কোথায় গেলে"— ডাক দিয়ে,
ছন্নছাড়া ডুকরে কেঁদে মরে।
ব্যর্থ আশার—ভুখ-পিয়াসার—যন্ত্রণা সার; যাক্ নিয়ে,
সব ঝরা-ফুল কাল-বোশেখীর ঝড়ে!
ভুলের বোঝা নামিয়ে দিয়ে পথের ধারে বসি'
বেদন-পারাবারের তীরে—ক্রন্দনে উচ্ছ্বসি।

এখন দেখা যাক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইলে কি কি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম তখনও দুই জন সহকারিযোগে এক জন গভর্ণর দ্বারা পরিচালিত হইবে। কাজ-কর্ম্মের পদ্ধতি প্রায় একরূপই থাকিয়া যাইবে। শুধু মাত্র বদ্‌লাইয়া যাইবে চাকুরেদের পদ-মর্য্যাদা, তখন তাঁহারা হইবেন সরকারী চাকুরে। বর্ত্তমানের পরিচালকমণ্ডলী একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইতে পারে অথবা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের ধরণে এক নূতন ধরণের পরিচালক-মণ্ডলী স্থাপন করা যাইতে পারে।

পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে নানা রকমে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃত উপকার কতখানি হইবে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। এ যাবৎ সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশান্বিত হইবার কিছু দেখা যায় না। ডাক ও তার বিভাগ, বিশেষ ভাবে টেলিফোন, রেল প্রভৃতি সরকার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ উপযুক্ত অর্থ-বিনিময়ে যে প্রকারের সেবা পাইয়া থাকে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বাঁধা-ধরা নিয়মে কাজ করিবার সময় আজ আর নাই, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যদি জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তবে চাই তার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের দূরত্ব ১২৫০ মাইল কিম্বা কিছু বেশী। অর্থনৈতিক সমস্যা সকল সময় সমান ভাবে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় না। ব্যাঙ্কের স্থানীয় ম্যানেজারবৃন্দ যাহাতে আরও বেশী কর্ম্মতৎপর হইতে পারে, সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে যাহাতে অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ডের স্থলে একাধিক স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা যাইতে পারে, বিশেষ ভাবে কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি স্থলে। ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিস বোম্বাই শহরে অবস্থিত, সুতরাং সেখানকার কথা ভিন্ন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা যথা-সময় অবলম্বিত না হইলে উহার কার্য্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসের খবরে প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ও বহির্ভুক্ত উভয় প্রকারের ব্যাঙ্ককে মনোনীত শেয়ারের উপর ঋণ দিতে প্রস্তুত। এই প্রস্তাবনা যদি এক বৎসর পূর্ব্বে গ্রহণ করা যাইত, তবে বোম্বাই ও বাংলা দেশের অনেকগুলি অধুনালুপ্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকিতে পারিত। আমানতকারীদের অর্থও নষ্ট হইত না।

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) হইতে ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে নানান্ রকমে নূতন নূতন অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বোপরি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বাঁটোয়ারা সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইলে পাকিস্তানের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। সেই পাকিস্তান ব্যাঙ্ক তখন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবে। উহার পরেও যে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিবে না তাহা বলা চলে না, রাজনৈতিক আবহাওয়া আজ কুজ্‌ঝটিকাময়। এই কুয়াসা কাটিয়া গেলে স্বাধীন ভারতে কি ধরণের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উপযোগী তাহা তখন জনসাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া ঠিক করা যাইবে।

আজ জাতীয় করণে অযথা উৎসাহ বা উদ্দীপনা দেখান নিতান্ত অনুচিত—অনাবশ্যক।

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সতেরো

নিরক্ষর!

এত বড় এটর্ণি, শিক্ষিত, বড়লোক—তাঁহার কন্যা, একমাত্র সন্তান, তাহার পাত্র নির্ব্বাচনে এক নিরক্ষরের ডাক পড়ে কেন? কেন, তাহাই বলি—

মেয়েটি যখন ছোট্টটি, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধিই সে পিতার স্নেহে, জনকের বুকে 'মানুষ' হইতে থাকে। প্রিয়ার একমাত্র উপহার, শোক-সাগরে প্রস্ফুটিত এক স্বর্ণ-পদ্ম—ঝরণা! সে যেন ক্রমশঃই হইয়া দাঁড়াইল জনকের এক বিস্ময়। কি বা গৃহে, কি বা আপিসে—সর্ব্বত্রই তিনি এই ছোট্ট মেয়েটিকে রাখিতেন কাছাকাছি। ফলে, ঝরণা অনুক্ষণই অনুভব করিত—পুরুষেরই মাতামাতি, পুরুষেরই দাপাদাপি—উকিল-ব্যারিষ্টার মক্কেল-দালাল, কেরাণী-কর্ম্মচারী। এই উৎকট পুরুষ-মহলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়াই তাহার জীবনের প্রথম অংশটা সম্পাদিত হইয়াছিল।

অতঃপর, তাহার জীবনের দ্বারদেশে আসিয়া ঠেকিল—স্কুল ও কলেজ। মিষ্টার বোস, তিনি ছিলেন—বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের এক জন একনিষ্ঠ ভক্ত। মেয়েটিকেও সেই আদর্শে গড়িয়া হাত-নাগাদ আধুনিকা করিয়া তুলিবার ত্রুটি তিনি এতটুকুও রাখেন নাই।

ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত ঝরণার গৃহশিক্ষক ছিল এক জন প্রবীণ স্কুল-মাষ্টার। তার পর মিষ্টার বোস সহসা আবিষ্কার করিয়া বসিলেন যে, বর্ত্তমানের মন্ত্র-তন্ত্র না কি থাকে তাহাদেরই হাতে, যাহাদের জীবন রচিত হইয়াছে আধুনিক প্রথায়। বিশেষ করিয়া, যাহার হাতে আদর্শ, শিক্ষকের আসনে যাহার স্থান, তাহার অন্তর-বাহির তারুণ্যের সবুজ রঙে যদি রঞ্জিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তর-নিঃসৃত শিক্ষা ও উপদেশ আদৌ শিক্ষার্থীর কাজে লাগে না। এতদর্থে, ঝরণার কলেজ-জীবন সুরু হইতেই, তাহার গৃহ-শিক্ষকের পদে ব্রতী হইল—তাহাদেরই কলেজের এক জন তরুণ অধ্যাপক—নরেশ।

প্রথম প্রথম নরেশের 'টিউশনির' সময়ের নির্দ্দেশ ছিল। কয়েক মাস পরেই সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা—যখন-তখন তাহার আবির্ভাব হইতে লাগিল এই বাড়ীতে। অবশেষে এমনিই হইয়া দাঁড়াইল যে, সে যেন এই বাড়ীরই এক জন। শুধু তাহাই নহে, নরেশ হইল একাধারে ঝরণার গৃহশিক্ষক ও সহচর। নরেশেরই হাতে রহিল ঝরণার আলোক-বর্ত্মের সন্ধান—তাহার সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানালোকের বাতি ধরিয়া রহিল নরেশ। ক্লাব, মিটিং, সিনেমা, থিয়েটার—সর্ব্বত্রই ঝরণার পাশে বসিয়া থাকিত সে।

এদিক্‌টায় মিষ্টার বোসেরও যেন কর্ত্তব্যের শেষ হইয়া গেল। 'সুযোগ্য' গৃহশিক্ষকের হস্তে কন্যার শিক্ষা-দীক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াই বাহিরে-বাহিরে মক্কেল আর 'ব্রীফ' লইয়াই ভোর হইয়া রহিলেন।

কিন্তু, এক দিন তাঁহার চল্‌তি চেতনায় এক কঠিন আঘাত পড়িল। ঝরণা তখন বি-এ পড়ে। প্রতিদিনই রাত্রে পিতা ও কন্যা উভয়ে একসঙ্গে এক টেবিলে আহারে বসিত। সেদিন ঝরণা নরেশের সঙ্গে 'মেট্রোর' বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ প্রায়ই যায় এবং ফিরিয়া আসে রাত্রি দশটা কি সাড়ে দশটায়। আজ এগারোটা বাজিল, বারোটা বাজিল, একটা বাজে, তথাপি ঝরণার দেখা নাই। মিষ্টার বোস্ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাস্তায় কোনো মোটরের হর্ণ বাজে আর অমনি তিনি বারান্দায় গিয়া দাঁড়ান; কিন্তু, মোটরখানি তাঁহার সিংহদ্বারে আর দাঁড়ায় না। একবার মনে করিলেন, 'মেডিক্যাল কলেজে 'ফোন' করি, হয়তো—না থাক্!' পরক্ষণেই থানার কথা মনে আসে, কিন্তু 'টেলিফোন' হাতে করিয়াই আবার রাখিয়া দেন—কি ভাবিয়া! অতঃপর রাত্রি যখন দেড়টা বাজিল, তখন ঝরণার মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টার বোস্ তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া দেখিলেন—পাশাপাশি বসিয়া ঝরণা ও নরেশ। ঝরণা নামিয়া একটা আঙুল তুলিয়া কহিল—"গুড্ নাইট্!" নরেশও তৎক্ষণাৎ বিদায়-বাণী জানাইল—"গুড্ নাইট্!" মোটর ছাড়িয়া দিল—নরেশকে পৌঁছিয়া দিতে। অতঃপর ঝরণা জুতার শব্দ করিতে করিতে সটান জনকের ঘরে প্রবেশ করিল, করিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাবা, তুমি কি 'আন্‌ফরচিউনেট্'! আজ অমন একখানা ছবি ছিল, দেখ্‌তে গেলে না!"

মিষ্টার বোস্ আপাততঃ ও-কথার জবাবটা মুলতুবি রাখিয়াই কহিলেন, "আচ্ছা, এখন খাবে এসো—"

ঝরণা একমুখ হাসিয়া কহিল, "গুড্ গড্! এখনো কি না খেয়ে আছি—'ফুল্ ডিস্'!"

"কোথায়?"

"রেষ্টুরেন্টে।"

মিষ্টার বোস্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বেশ করেছ! আমি ভাবছিলাম, এত রাত পর্য্যন্ত—"

"রাত কেন হবে না! 'ইভনিঙ্-শো' 'মিস্' করলাম—তার পর একেবারে সেই সাড়ে ন'টা! তার পর, গঙ্গার ধারে এক লম্বা ড্রাইভ—সত্যি, বাবা, এ্যানার পার্ট কি 'ওয়ান্ডারফুল প্লে' করেছে গার্বো! কি চমৎকারই না ফুটিয়ে তুলেছে তার—'লভ্'!"—বৈদ্যুতিক আলোকে ঝরণার চক্ষু দ্বয় চক্‌চক্ করিতে লাগিল।

'লভ্?'—মিষ্টার বোস্ চম্‌কিয়া উঠিলেন। পুরুষমানুষ, তাহার প্রতি মেয়েমানুষের আসক্তি, তার অনুভূতি ঝরণারও মনে যে এক দিন জাগ্রত হইতে পারে, তাহা তাঁহার আইনী-চৈতন্যে এত দিন আঘাত করে নাই—করিল যেন অকস্মাৎ আজ! একটু বিমনা হইয়া পড়িলেন, সেই ফাঁকে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাঁহারই গৃহের দ্বার-দেশে আসিয়া দাঁড়াইল একখানি মোটর, মোটরে বসিয়া ঝরণা ও নরেশ, গায়ে-গায়ে—পাশাপাশি। * * * মিষ্টার বোস্ চম্‌কিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই, আবার যেন তিনি সহসা খবর পাইলেন—সন্ধ্যার পর রাত্রি নামে, সেই রাত্রে এক হোটেলের নির্জ্জন এক কোণে একই টেবিলে বসিয়া ঝরণা ও নরেশ, নরেশ ও ঝরণা!—তার পর সিনেমায় উপরের নিভৃত আসন, তার পর গঙ্গার ধারে বায়ু-তরঙ্গে অঙ্গ মেলিয়া দুইটি সম্পর্কহীন তরুণ-তরুণী। অতঃপর, ঝরণার উচ্ছ্বাস—'লভ!'

মিষ্টার বোস্‌কে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ঝরণা এক ঝলক হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় তোমার লোভ হয়েছে, নয় বাবা?'

স্বচ্ছন্দ, সরল, অপ্রতিভ কথাবার্তা! মিষ্টার বোসের মনের গতিটা মুহূর্ত্তেই যেন এক দমকা হাওয়ায় আবার ফিরিয়া গেল। স্মিতমুখে কহিলেন, "রাত হয়েছে, মা! এইবার শোওগে—"

ঝরণা হাত-ঘড়িটা একবার দেখিয়াই কহিল, "যাচ্ছি। কিন্তু, পার তো—তুমিও ছবিখানা কাল একবার দেখে এসো, বাবা। চোখে দেখো—শোন্‌বার নয়। Demonstration of pure love।"

মিষ্টার বোস্ হাসিয়া কহিলেন, "বটে, বটে! কিন্তু আমি এখন বুড়ো হয়েছি। ও-সব 'লভ-টব'—দূর, কি যে বলিস্।"

ঝরণার মুখে-চোখে এইবার যেন এক ঝড় উঠিল। দৃঢ় ও সতেজ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও-কথা যদি বলো, বাবা, তা' হলে—" দেওয়াল-গাত্রে ঝরণার মায়ের একখানা তৈলচিত্র টাঙানো ছিল, সেই দিকে আঙুল বাড়াইয়া সুরু করিল, "তা' হলে, ওই ছবিখানা ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো কোরে ফেলো। যদি তোমার ভেতর প্রেমের জ্যোতিঃ নিবে গিয়ে থাকে, তা'হলে, ওই ছবিখানারও তোমার কাছে কোন মূল্য নেই। মানুষ বুড়ো হতে পারে, কিন্তু তার ভেতরকার প্রেম-বস্তুটা কোনো দিনই বুড়ো হয় না।" একটু থামিয়াই আবার আরম্ভ করিল, "প্রেম-ভালোবাসা, এ-সামগ্রী এক কালের জন্তে নয়—চিরকালের। দেহের ভেতর জীবন-বস্তুটি যেমন সব বয়সেই সমান, জীবনের ভেতর প্রেম-বস্তুটিও ঠিক তেমনটি। বাবা, পাকা চুল আর কাঁচা চুল—ওরা এ-অঞ্চলে আইন তৈরী করতে পারে না।" বলিয়াই ত্রিতলে—তাহার শয়নকক্ষে উঠিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার বোসের সম্মুখে যেন এক নবীন পৃথিবীর আবরণ উন্মোচন হইয়া গেল। ঝরণা, তাহাকে তিনি এত দিন ছোট্ট শিশুর মতই দেখিয়া আসিয়াছেন—তাহার ভিতরে প্রেম বলিয়া যে-বস্তুটি, তাহার যে কোনও দিন উন্মেষ হইতে পারে, তাহা তাঁহার আইন-আদালতগত মস্তিষ্কে এ-তাবৎ আসে নাই। আসিল—আজ। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কি-এক বিশেষ চিন্তায় একমন হইয়া। তার পর সুইচ্ টিপিয়া শুইয়া পড়িলেন, সেদিনকার মত ডাইনিঙরুমে 'ডিনারের' আর তাঁর ডাক পড়িল না।

* * * *

পরদিন—রবিবার।

আজ নরেশের 'ডবল-ডিউটি'। সকালে একবার 'ডিউটি' দিয়া গিয়াছে, পুনরায় ঘড়িতে বেলা চারিটার ঘা পড়িতেই আসিয়া হাজির। ঝরণা 'ফিলজফিখানা' একবার হাতে করিয়াই বলিয়া উঠিল, "দূর, আজ আবার কেউ পড়ে—রবিবার।"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "তবে কি করবে, শুনি?"

"কেন, গান?"

"কি গান?"

ঝরণা আড়-চোখে নরেশের দিকে একবার তাকাইয়াই জবাব দিল, "যে গান মানুষের মিষ্টি লাগে—" বলিয়াই ও-ঘরে গিয়া অর্গানে বসিল। নরেশও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাহার পাশে বসিল।

গান শেষ হইতেই নরেশ সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "সত্যিই, তোমার গলাও যেমন মিষ্টি, গানখানিও তেমনি মিষ্টি।"

"হবে না কেন—বাঙালী এ্যানাকারিনা, তারই গান।"—ঝরণা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পুনরায় পড়িবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

নরেশ প্রকাশ্যে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তার পর—"

"তার পর—'ধীরে সমীরে, ভাগীরথী-তীরে'—"

নরেশ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "আজ তোমাকে একলাই যেতে হবে।"

ঝরণা প্রশ্নের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া আকস্মিক ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তার মানে?"

"আমাকে এখখুনি বাসায় ফিরতে হবে।"

"বাসায়? আইবুড়ো মানুষ, তার আবার বাসা?"

নরেশ একবার চোখ বাঁকাইয়া ঝরণার দিকে কটাক্ষ করিল, তার পর দুর্দ্দান্ত এক অভিমানের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দুর্ণাম দিচ্ছ, দাও। কিন্তু, ইচ্ছে করলে—"

"সুনাম কিনতে পারেন—এই ত?"—বলিয়া ঝরণা একমুখ হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, "তাই কিনুন না, কিন্‌বেন? আপনার হবে বউ, আমার হবে বউদি।"

"আচ্ছা, তাই যখন হবে, নিমন্ত্রণের তুমি চিঠি পাবে নিশ্চয়ই।" বলিয়া নরেশ গম্ভীর ভাবে উঠিয়া ড্রেসিঙ্ টেবিলের কাছে আসিয়া আয়নার মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তার পর চিরুণীখানা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিতেই ঝরণা যেন উড়িয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া চিরুণীখানাকে কাড়িয়া লইয়াই নরেশের চুলগুলা এলোমেলো করিয়া দিল।

নরেশ রোষের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চুলগুলো কি করলে বলো দিকিনি?"

"আর আপনি? আমার চিরুণী, তার যে জাত মারলেন?" বলিয়াই ঝরণা মুখে কাপড় তুলিয়া চিরুণীখানা ফেলিয়া দিল। এইবার নরেশের মুখে হাসি বাহির হইল এবং চিরুণীখানা উঠাইয়া লইয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যে এই রকম করো, চাকর-বাকর যদি দেখ্‌তে পায়?"

ঝরণা নিঃশঙ্ক চিত্তে জবাব দিল—"পেলেই বা। ওরা মনে করবে—বড়ঘরের বড় কাণ্ড।"

"তোমার বাবার কাণে যদি ওঠে?"

"বাবার কাণে?"—ঝরণা এক অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবার কাছে লাইসেন্স পেয়েছি।" বলিয়াই এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল, করিয়াই সুরু করিল, "এই সাহস আমার নয়—বাবার। বাপ-মা 'মডার্ণ' না হলে, ছেলে-মেয়ে 'মডার্ণ' হয় না।"

এইরূপ সম্পর্ক লইয়াই ইহারা এত দিন চলিয়া আসিয়াছে। এই স্রোত, ইহাতে কোন বাঁধও নাই, বাঁধনও নাই—নিষেধও নাই, আপত্তিও নাই। ঝরণা কলেজে যায় সত্য, ভালো ছাত্রী বলিয়া কলেজে তাহার সুনামও আছে, কিন্তু নরেশের নিকট ছাত্রী হিসাবে পাঠ্য-পুস্তকের কতটুকু যে সে পাঠ গ্রহণ করে তাহা ঝরণাও যেমন জানে, নরেশও তেমন জানে। নরেশ আসে, শিক্ষকতার ভাণ করে, কিন্তু মুখোমুখী হইয়া ছাত্রীর মুখের দিকে অনুক্ষণ চাহিয়াই থাকে। ঝরণা হাসিয়া উঠিয়া বই বন্ধ করে।

নরেশ মুখটা একবার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া কহিল, "কাল অত রাত হলো—আজও যদি আবার রাত হয়? সত্যি, আমার লজ্জা করে ঝরণা, তোমার বাবা যদি কিছু মনে করেন।"

ঝরণা নরেশের প্রতি একবার চাহিল, সে-চাহনির অর্থ যে কি, তাহা সে-ই জানে। তার পর কহিল, "বাবা যদি কিছু মনেই করেন, তবে বড় জোর না-হয় ভাববেন—মেয়েটা একেবারে 'বয়ে' গেছে। কিন্তু, মুখে বল্‌বেন—একটু সাবধানে চোলো—চারি দিকেই গোয়া-পল্টন'।"

অতঃপর মুখ ফিরাইয়া যেমন সে এদিক্‌টায় চলিয়া আসিবে,

মিষ্টার বোসের খাস ভৃত্য হরিশ আসিয়া নরেশকে কহিল, "আপনাকে কর্ত্তা বাবু ডাকছেন—"

"আমাকে ?"

"আজ্ঞে—"

এমন অসময়ে মিষ্টার বোসের বড়-একটা ডাক আসে না। এই আকস্মিক ডাকে নরেশের বুকের ভিতর এক অহেতুক আতঙ্ক যেন মূর্ত্ত হইয়া উঁকি মারিয়া গেল। ঝরণার সহিত তাহার কি সঠিক সম্পর্ক তাহা সে জানে এবং সেই সম্পর্কের গণ্ডী টপকিয়া কত দূরে, কোথায় সে আসিয়াছে তাহাও তার অবিদিত নাই। মুখখানা বিবর্ণ করিয়া ঝরণার দিকে চাহিতেই সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "যান—"

"তুমি ?"

"দিদি বাবু নয়, আপনি—আপনি—" হরিশ চলিয়া গেল।

মিষ্টার বোস্ অস্থির পদে ঘর-বার করিতেছিলেন—তাঁর মুখে-চোখে এক দারুণ উৎকণ্ঠা। নরেশ দেখা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসো হে প্রফেসর, এসো—এসো—আহা-হা, জুতো, জুতো—জুতো বাইরে রেখে এসো—" বলিতে-বলিতে তিনি যেন দ্বারদেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

নরেশ থতমত খাইয়া গেল। কত দিন সে এই কক্ষে আসিয়াছে, কিন্তু কোনোও দিন সে জুতা খুলিয়া আসে নাই। মূঢ়ের ন্যায় মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইতেই, তিনি তাঁহার স্ত্রীর ছবিখানার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই দেখো! এই ঘর—ওঁর মন্দির!"

নরেশ জুতা খুলিয়াই নিঃশব্দে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিষ্টার বোস্ নরেশের দিকে একটা আঙুল তুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রেম! কাল ঝরণা কি বলেছে, জানো প্রফেসর?—কালো চুল, আর পাকা চুল—উভয়েরই কাছে প্রেম-বস্তু এক! প্রেম কোনও দিন কারুর ভেতর নিস্তেজ হয় না, যার ভেতর হয়—সে ভণ্ড! আমি বুড়ো হয়েছি, আমার বুকে প্রেমের জ্যোতি যদি নিবে গিয়ে থাকে, তা'হলে আমি যেন ওই ছবিখানাকে টুকরো-টুকরো কোরে ভেঙ্গে ফেলি! কিন্তু—" সহসা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কিন্তু, তা তো আমি পারি না, তাই যদি না পারলাম, তা'হলে প্রেমও আমার বুকে নিস্তেজ হয়নি, আর তাই যদি না হয়ে থাকে, তা'হলে ওই ছবিখানি—ওঁরও ওই আত্মা এই ঘরে চির-বিরাজমান। অতএব, এই ঘর—ওঁর মন্দির! মন্দিরের ভেতর জুতো পায়ে দিয়ে ঢোকবার অধিকার তোমার নেই!"

নরেশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইবার কোনো প্রকারে পিঠটান দিতে পারিলেই বাঁচে! একখানা চেয়ারে হাত দিয়া কহিল, "আমাকে ডেকেছেন, স্যার?"

"হ্যাঁ।"

মিষ্টার বোস্ নরেশকে বসিতে বলিয়া নিজেও একখানা চেয়ারে বসিলেন। তার পর নরেশের দিকে এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রেম!—আচ্ছা, প্রফেসর, প্রেম—এ-বস্তুটার কিছু কি তুমি বোঝো?"

মিষ্টার বোস্ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলিয়াছেন! নরেশ যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা তাহার মন হইতে দূরীভূত হইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, ওই বিষয় নিয়ে একটা 'থিসিস্' সম্বন্ধে, মনে করছি—"

মিষ্টার বোস্ হর্ষে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বেশ, বেশ! তা'হলে, তুমি 'লভ্' 'সাবজেক্ট' নিয়ে 'রিসার্চ' করছ, বলো?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ—এই পশু-পক্ষীর, কীট-পতঙ্গের, গাছ-পালার—"

"আসল কথা বলো! মেয়েদের সঙ্গে 'লভ্'—এ-বিষয়ের 'রিসার্চ', কিছু করেছ?"

আবার সেই পুরাতন আতঙ্ক! নরেশের মুখখানা আবার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

মিষ্টার বোস্ অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কোরে রইলে কেন, হে? এতে লজ্জার কিছু নেই! 'পেনাল-কোডে'—'লভ্' is not a crime!"

নরেশ আবার সাহস পাইল। কহিল, "আজ্ঞে, আমার 'সাব্-জেক্টের' 'woman's love'—এও একটা 'পার্ট', কাজেই—"

"কাজেই, মেয়েদের সঙ্গে 'প্র্যাক্টিক্যাল 'লভ্'—তারও 'রিসার্চ' তোমাকে করতে হচ্ছে—উত্তম! আচ্ছা, তুমি তো 'ব্যাচিলার'—তা' এর আস্বাদন তুমি কিছু পেয়েছ?" মিষ্টার বোস্ সপ্রশ্ন নেত্রে তাকাইলেন। পরক্ষণেই, কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে গিয়া কহিলেন, "যেমন ডাক্তারী-পড়া! ছেলেরা Anatomy পড়ে, কিন্তু dissection না করলে ও-বিদ্যেটা আয়ত্তই হয় না—Practical Anatomy!"

ঠিক এমনিই সময়ে প্রবেশ করিল ঝরণা, বিচিত্র বেশভূষায় সাজিয়া। সটান নরেশের কাছে গিয়া হাত উল্টাইয়া ঘড়ি দেখাইয়া দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ক'টা বাজলো হুঁস্ আছে—সাড়ে সাত!"

মিষ্টার বোস্ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহো! তোমাদের বুঝি বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে?"

"সময় বয়ে যায়—" বলিয়াই ঝরণা নরেশের হাত ধরিয়া একটা টান দিল।

মিষ্টার বোস্ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তবে, আর দেরি করো না!"

নরেশ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, আড়ালে চলিয়া যায়—মিষ্টার বোস্ বলিয়া উঠিলেন, "তা' হলে, কাল—কাল আর একবার এসো, এর চেয়ে একটু সকালে, বুঝলে, একটু সকালে কোরে—"

"আজ্ঞে, আচ্ছা—" বলিয়াই নরেশ ঝরণার গায়ে গা দিয়া পাশা-পাশি জোরে-জোরে পা বাড়াইতে লাগিল।

মিষ্টার বোসের আবার কি মনে পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া জোর-গলায় বলিয়া উঠিলেন, "অন্ধকার হয়ে আসছে! মোটর থেকে নেমে একটু দেখে-শুনে রাস্তা চোলো—"

ঝরণা হাসিয়া কথাটা যেন উড়াইয়া দিয়াই উত্তর দিল—"গোরা পল্টন তো?—তা' আমরা জানি!" বলিয়াই উভয়ে দ্রুত পদে নীচে নামিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

মিষ্টার বোস্ বারান্দার রেলিঙ্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখ দিয়া অস্ফুট নির্গত হইল—'Practical Anatomy!'

• • • • • •

পরের দিন আর ডাকিতে হয় নাই। অপরাহ্নে সকাল করিয়াই নরেশ মিষ্টার বোসের কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আজ সে একা নয়, সঙ্গে ঝরণা।

মিষ্টার বোস্ আজ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই স্বাচ্ছন্দ, সহজ ও নিশ্চিন্ত। সাদর আগ্রহে নরেশকে অভ্যর্থনা করিয়াই ঝরণাকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "এই যে মা, তুমিও এসেছ! বেশ বেশ!—না, তুমি এখন যাও—তুমি নয়! আমাদের একটা গোপনীয় কথা আছে, বুঝলে মা, private!"

ঝরণা বিস্মিত নেত্রে একবার জনকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। এই ঘরে অনেক বিষয়ের অনেকই গোপন আলোচনা অনেক বারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অসাক্ষাতে নয়। কাজেই, সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের এই ব্যতিক্রমটা তাহার মনের ভিতর যুগপৎ এক কৌতুক ও কৌতুহলের আলোড়ন তুলিল—এমন কি গোপন-কথা থাকিতে পারে, যাহা তাহার শুনিবার নয়? সে ভিতরকার ভাবটা চাপিয়া সহাস্যে কহিল, "Excuse me" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল, গিয়া আড়ালে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার বোসের চারি দিকের পৃথিবীটাও যেন এক দুর্দান্ত আনন্দে দুলিয়া উঠিল। হাসিমুখে নরেশের পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিলেন, "Well, my boy, sit down,—" বলিয়া নরেশকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে বিপরীত দিকে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন। তার পর নাকে এক টিপ নস্য দিয়া নরেশের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সঙ্গে ঝরণার বিয়ে দেব, ঠিক করেছি!"

নরেশ চম্‌কিয়া উঠিল—যেন আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ একসঙ্গে কক্ষচ্যুত হইয়া তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, যেন পৃথিবীর বিস্ময়, ধরিত্রীর হর্ষ, চরাচরের সংশয় একযোগে রণবাদ্য তুলিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। স্বর্গের অপ্সরা, তাহাকে সে চাক্ষুষ করে নাই, কিন্তু ঝরণাকে দেখিয়া সে প্রতিক্ষণই ভাবিয়াছে—এই মেয়েটি এই মর্ত্ত্যের নয়! এক পরমাশ্চর্য্য মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিটির প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া সে চক্ষুর্দ্বয় দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে সত্য, তাহার অস্থির আত্মার চারি পাশ ঘিরিয়া এই ভুবন-বিজয়ী রূপসী মুহুর্মুহুঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—এ কথাও ঠিক, কিন্তু কোনোও দিন সে ভাবিতে পারে নাই, এই দুর্লভ আবার তাহারই অঙ্কশায়িনী হইতে পারে? শিক্ষকের সংযম-কঠিন দুর্গ হইতে আসক্তির পাপ-পঙ্কে সে অনেক দিনই অবতরণ করিয়াছে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া ওই প্রস্ফুটিত পদ্মটিকে কলঙ্কিত করিবার স্পর্দ্ধা সে কোনো দিনই রাখে নাই। * * * ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ! আইনে—তুমিই ওর উপযুক্ত পাত্র।" বলিয়াই মিষ্টার বোস্ চেয়ারে ঠেস্ দিলেন, যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরে আর একখানি মুখ—সে-মুখটিও হর্ষে ও আনন্দে আরক্ত হইয়া উঠিল।

নরেশ আড়-চোখে একবার মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইয়া কহিল "কিন্তু, আমি এক জন সামান্য লোক—দরিদ্র!"

"বড়লোক আমি চাই না!" সহসা মিষ্টার বোসের দুই চোখ আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্ত্রীর ছবিখানার দিকে নরেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মৃত্যুকালে ওঁর কি নির্দ্দেশ ছিল, জানো?—'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র!'—সহসা একটু দমিয়া গেলেন। পরক্ষণেই আবার এক আকস্মিক উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তা তুমি ত এম-এ পাশ করেছ—থার্ড ক্লাস, তা হলেই বা, এম-এ তো!—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের ভিতর দুই-এক বার এদিক-ওদিক করিয়াই কহিলেন, "কালই বিয়ের একটা দিন স্থির করবো মনে করছি! তোমরা কিন্তু নিমন্ত্রণের চিঠি, 'হাউস্-ডেকোরেশন,' জিনিষ-পত্রের ফর্দ্দ—এই সব ঠিক করে ফেলো! যাও—"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মিষ্টার বোস্ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ভালো কথা! তোমার তো মা-বাপও নেই, আত্মীয়-স্বজনও নেই—এ-সব কথা অবশ্য আগেই বলেছ! তবে বন্ধু-বান্ধব—তাদের কারুর মত নেবার প্রয়োজন হবে তোমার?"

"না!"—নরেশ যেন একটু অন্যমনস্ক।

মিষ্টার বোসের পুনশ্চ কি মনে পড়িয়াছে। বলিয়া উঠিলেন, "Wait, wait—ঝরণা! তার একটা consent দরকার!"

নরেশ মুহূর্ত্তেই তার অন্যমনস্ক ভাবটা যেন সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত বলিয়া উঠিল, "ঝরণার সম্মতি!—সে আমিই দিচ্ছি, স্যার!

মিষ্টার বোস্ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উহু-হু! তা হয় না! আইন—আইন বড় শক্ত জিনিষ, প্রফেসর! Consent proxyতে চলে না!"

নরেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তা' হলে, ওর মতামত আপনি নেবেন!"

মিষ্টার বোস্ একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কেবল কতকগুলো পাশই করেছ, বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই হয়নি! মেয়েদের মনে-মনে ইচ্ছে থাক্‌লেও, ওরা কি বাপ-মার কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে—অমুককে আমার পছন্দ হয়েছে, অমুককে আমি বিয়ে করবো?"

নরেশ সলজ্জ ভাবে কহিল, "তবে?"

"সমাধান সোজা! ওর একটু হাতের লেখা পেলেই আমি নিশ্চিন্ত! কিন্তু সে-লেখা, ওর কাছ থেকে তোমার আনাই সহজ।"

নরেশের ঘাড়টা যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। কহিল, "তা বটে!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "ধরুন—ও যদি 'না' করে, আর আমি যদি রাগ করি, তা'হলে একখানা ছেড়ে দশখানা লিখে দেবে!

"দেবেই তো!"—মিষ্টার বোসের চোখে-মুখে যেন আনন্দ আর ধরে না। একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "তা' আমি বুঝেছি! বুঝেছি বোলেই আমি তোমাকে নির্ব্বাচন করেছি! ওর মন, ওর অন্তর—আমার চোখে ঠিক দর্পণের মতই পড়েছে! আমি আজ বুঝেছি, প্রফেসর, প্রেম কত বড় সামগ্রী! সেই প্রেম, তারই জন্ম হয়েছে ওর সারা বুকখানি জুড়ে, যার মালিক, আইনতঃ—তুমি!"

অসহ্য হর্ষে ও লজ্জায় ঝরণার সর্ব্ব শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, কোনোওরূপে পা টিপিয়া-টিপিয়া ত্রিতলে উঠিয়া গেল।

নরেশও মুখ ফিরাইয়া মাথা নোয়াইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার দেহটা যেন টলিতেছে। বারান্দায় রেলিঙ্ ধরিয়া মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঝরণার কাছে চলিয়া গেল।

ঝরণা উঠিয়া আসিয়াই পাঠ-কক্ষে ঢুকিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছে; কত না তন্ময়! তাহার কেশপাশ মুক্ত, অঙ্গের আবরণও অসংযত। নরেশ দ্বারদেশে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঝরণার নম্রশ্রী, তাহার প্রহেলিকা নরেশকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। একবার মনে করিল, গলার আওয়াজ করে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—'প্রয়োজন নেই—এই সম্পত্তি আমার।' তার পর নির্ভয়ে ঘরে ঢুকিয়া ছোঁ মারিয়া ঝরণার হাতের বইখানা কাড়িয়া লইল।

ঝরণা চমকিয়া উঠিয়া এক হাত জিব বাহির করিয়া দাঁতে কাটিল, যেন সরমে সারা হইয়া গিয়াছে! তার পর গায়ের কাপড়-চোপড় সাম্‌লাইয়া রোষের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি!" তার পর হঠাৎ মাথায় কাপড় উঠাইয়া কহিল, "বই কেড়ে নিলেন যে বড়?"

নরেশ ঝরণার সুমুখকার টেবিলের উপর বসিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "জবাব পরে পাবে। কিন্তু, ও কি হলো—মাথায় কাপড়?"

"আপনার সাজা!"—সলজ্জ ভাবে কথাটা বলিয়াই ঝরণা ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া মুখ নামাইয়া লইল।

সঙ্গে সঙ্গে নরেশের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ক্ষণকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে সুমুখের ওই সুন্দর, সুপুষ্ট, সুগঠিত নারীদেহটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "আমি বলি—না! এ পুরস্কার!" বলিয়াই সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার লেটার-প্যাড?"

ঝরণা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কেন? চাকরীতে ইস্তফা দেবেন না কি?"

নরেশ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আর এক জনার কাছে 'I am at your service' লিখতে হবে!" বলিয়া নিজেই নিঃসঙ্কোচে ঝরণার শয়নকক্ষে গিয়া তাহার চিঠির কাগজ আনিয়া কহিল, "লেখো দিকিনি—"

"কি লিখবো?"

"একখানা সম্মতি-পত্র—"

ঝরণা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "সম্মতি-পত্র—তার মানে?"

যাহারা প্রেমিক, তাহাদের না কি চোখ দিয়াই বহু গোপন বাক্য নির্গত হয়, তাই বুঝিবা নরেশেরও চোখ দুইটা হঠাৎ আবেগে মুখর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার বাবা, তিনি তোমার বিয়ের ঠিক করেছেন—আমার সঙ্গে!"

"যান্—" ঝরণা মুখখানা লাল করিয়া স্প্রিংয়ের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল, যেন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া এখনই পৃথিবীর অপর প্রান্তে ছুট্ দিবে।

নরেশ হাতটা ধরিয়া ফেলিল এবং জোর করিয়া পুনরায় বসাইয়া সাংখ্য-দর্শন পাতঞ্জলের সূত্রের ন্যায় নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, "এতে তোমারও হাত নেই, আমারও হাত নেই। বিয়ের ঠিক করেছেন আমাদের অভিভাবক!"

ঝরণা কথার কোন জবাব দিল না—মুখ নামাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নরেশ নিজের মুখটা আর-একটু ঝরণার দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "আমাদের কর্ত্তব্য শুধু অভিভাবকের আদেশ শিরোধার্য্য করা। আমাকে উনি আদেশ দিয়েছেন—'যাও, তুমি ঝরণার একটু 'সম্মতি' নিয়ে এসো'!"

ঝরণা থাম্‌কা একবার মুখটা তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল। তার পর যেন নির্লিপ্ত ভাবেই কহিল, "অভিভাবক যখন নিজেই সব ঠিক-ঠাক করেছেন, তখন আমার আর সম্মতির কি দরকার?"

"তোমার স্বাধীনতা, তারই সম্মান!"

"তাই না কি?"—ঝরণা মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নরেশ বুঝিতে পারিল—অর্দ্ধেকটা পৃথিবী সে জয় করিয়া ফেলিয়াছে, আর খানিক করিলেই সবটা হয়! সে চট্ করিয়া ঝরণার হাতে নিজের ফাউন্টেন-পেন্‌টা গুঁজিয়া দিতে গেল।

ঝরণা তাড়াতাড়ি হাতটা টানিয়া লইয়া গলা চাপিয়া বলিয়া উঠিল; "আঃ, কি করেন!" যেন সে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়াছে।

নরেশও এইবার নিরস্ত হইবার ভাণ করিল, যেন আর তাহার উদ্যমও নাই, জেদও নাই। আসক্তিহীন কণ্ঠে কহিল, "তবে যাই, বাবাকে গিয়ে বলিগে—ঝরণার মত্ নেই"!

"ছাই-ভস্ম কি লিখতে হবে, তা' বল্‌বেন তো?"—ঝরণা রোষ-তীক্ষ্ণ চক্ষে এক কটাক্ষ করিল, যেন ওই অভিযোগ সে কোন প্রকারেই বরদাস্ত করিবে না।

নরেশের চোখ দুইটা এইবার এক আসুরিক উল্লাসে দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল। ভিতরকার ভাবটা চাপিয়া কহিল, "লেখো—হ্যাঁ, আমার সম্মতি আছে!"

আর কথান্তর হইল না। নরেশের নির্দ্দেশ মত প্রত্যেক কথাটি নিঃশব্দে লিখিয়া দিয়া ঝরণা মুখ গুঁজিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। নরেশও আর কালবিলম্ব করিল না, বিজয়-হর্ষে পত্রখানাকে হস্তগত করিয়া তৎক্ষণাৎ মিষ্টার বোসের কাছে দ্বিতলে নামিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

ছেলেমানুষ

নারায়ণদাস সান্যাল

হারিয়ে গেলে খুকুর পুতুল বলেছিলেন তারে
"বাজার-ভরা অত পুতুল যেটাই খুসী নে না···"
হারানোটাই চাই যে তাহার, অবোধ একগুঁয়ে সে,
সয় সে প্রহার, হয় না তবু নোতুন পুতুল কেনা!

ওগো নিঠুর বিশ্বপিতা! কোথায় আমার খুকু,
যম-যাড়ালের পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে বুঝি!
বিশ্বভরা লক্ষ শিশু হাস্‌ছে পিতার কোলে,
স্মৃতির পথে আজও আমার হারানোটিই খুঁজি।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বিদায়

শীতারাণী

তপ্ত প্রখর দ্বিপ্রহর। মধ্য গগনে ভাস্বর সূর্য্য প্রখর কিরণ-সম্পাতে সমস্ত স্থান যেন একেবারে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। ছোট ষ্টেশন। সীমান্ত-যাত্রী গাড়ীর ইহা একটি জংশন ষ্টেশন। চারি দিকে মিলিটারী ছাউনী। এখানে ওখানে বন্দুকধারী সৈন্যেরা টহল দিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের সামরিক কায়দা আসন্ন যুদ্ধেরই ইঙ্গিত দেয়।

ষ্টেশনের চারি দিকে পাহাড়। সমস্ত স্থান ঘিরিয়া যেন শ্বাসরুদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই মাঝ দিয়া লাল আর কালো কাঁকরের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের সাথে লুকোচুরী খেলিতে খেলিতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারই উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন পাতা।

যাত্রিবাহী একটি ট্রেণ, ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্ত ষ্টেশনের মাঝে আবার কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। কোলাহল করিতে করিতে অধিক সংখ্যক সৈনিক ও অল্পসংখ্যক যাত্রী ষ্টেশনে বিছান লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। ইঞ্জিনটি বিশ্রামের অবকাশে প্রচুর পরিমাণে ধূম উদ্গিরণ করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়া লইল।

অতঃপর গাড়ীর একটি দরজা খুলিয়া গেল। এক জন সুবেশধারী পাঠান যুবক ট্রেণের হাতল ধরিয়া নামিয়া পড়িয়া ইঙ্গিত করিল। তার পর তাহারই মত অপর একটি পাঠান কামরা হইতে নামিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী যেমন ভাবে আসিয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল। ট্রেণের কর্ম্মস্রোতে আবার একটু অবকাশ মিলিল।

পাঠান যুবকদ্বয় চলিয়া গেল—দূরে দৃষ্টিপথের বাহিরে। ষ্টেশনের বাহিরে একটি কাফিখানার ভিতর একটি লোক যুবকদ্বয়ের রহস্যময় গতিবিধির কথা সঙ্গের লোকটিকে বলিতেছিল। কিন্তু কথোপকথন বেশীক্ষণ চলিল না। একটা স্পেশাল ট্রেণ আসিয়া পড়ায় তাহাদের চিন্তাজাল ঐখানেই ছিন্ন হইল। তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যুবকদ্বয় এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া জনবিরল পথের ধার দিয়া চলিল। তাহাদের প্রতি পাদক্ষেপে ক্ষিপ্রতা বেশ পরিলক্ষিত হয়। তাহারা যেন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে পারিলেই নিষ্কৃতি পায়। কিয়দ্দূর যাইয়া তাহারা একটি গলির মোড় ঘুরিয়া প্রধান রাজপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গলির ভিতর কিছু দূর যাইয়া একটি গৃহ-দ্বারে করাঘাত করিল। গৃহস্বামী আসিয়া সমাদরে গৃহে লইয়া গেল। গৃহস্বামী যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল।

• • • ৪

অপরাহ্ণ কাল সমাগত। কিন্তু সূর্য্য এখনও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত খর প্রখর। পাহাড়ের গাত্র হইতে তাপ বিকীরিত হইয়া তাপ সৃষ্ট করিতেছে। যুবকদ্বয় চলিয়াছে রাজপথ দিয়া। পাহাড়ের মাটি দিয়া তৈয়ারী মেটো রাস্তা। ইতস্ততঃ ধূলি উড়িতেছে। এই রাস্তা লণ্ডিখানার দিকে গিয়াছে। যুবকদ্বয় সেই রাস্তা দিয়াই চলিল। কিছু দূরে যাইয়া তাহারা একটি চৌমাথার নিকট উপস্থিত হইল।

তাহারই এক ধারে একটি সরাইখানা। লণ্ডিখানা-যাত্রী সমস্ত বাস এইখানেই দাঁড়ায়। যাত্রীরা এখানে বাস হইতে নামিয়া সরাই-খানায় বিশ্রাম করিয়া লয়। যুবকদ্বয় সেই সরাইখানারই এক ধারে যাইয়া উপবেশন করিল। দোকানে নানা রকম যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক আসিয়া বিভিন্ন ভাষায় আলাপ করিতেছে। দোকানের অপর পার্শ্ব দিয়া একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এ রাস্তায় কেহ যায় না। কিয়দ্দূরে যাইয়া রাস্তা পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়াছে।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পরেই লণ্ডিখানা-যাত্রী বাসটি তাহার সমস্ত আরোহী লইয়া প্রস্থান করিল। সরাইখানা আবার নীরব হইল। সরাইখানার মালিক এইবার আগাইয়া আসিয়া যুবকদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিল। সঙ্গের পাঠান যুবকটি তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে অপর ব্যক্তি তাহার ভাই। তাহারা কাবুলে যাইবে। তাহার ভাই বোবা। সুতরাং মালিক বোবা লোকটির সহিত আলাপ করিবার আগ্রহ ছাড়িয়া একবার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল। সঙ্গের পাঠান যুবকটি মালিকের সহিত আলাপ করিয়া সমস্ত ইতিবৃত্ত জানিয়া উঠিয়া পড়িল। মালিক তাহাদের পুনরাগমনের সময় সেই দোকানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিল।

তাহারা আবার চলিল সেই পার্ব্বত্য পথ দিয়া। সেই কঠিন রুক্ষ পাথুরে পথ। কিছু দূর যাইয়া পাহাড়ের কোলে একটা সরু রাস্তা দৃষ্টিগোচর হইল। এবং সেই পথে একটা ছোট মোটর গাড়ীও দৃষ্টিগোচর হইল। মোটরে মাত্র এক জন ড্রাইভার। তাহারা

নিকটবর্ত্তী হইলে লোকটা মোটর হইতে বাহির হইয়া আসিল। যুবকদ্বয় তাহাদের গোপন পরিচয়-পত্র ড্রাইভারকে দিল। তার পর উভয়ে গাড়ীতে আরোহণ করিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী পূর্ণোদ্যমে সেই পাহাড়ী পথ দিয়া ধূলা উড়াইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া চলিল। দু'ধারে বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। দূরের পাহাড়শ্রেণী ক্রমশঃ দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল আর পশ্চাতের পাহাড়শ্রেণী ক্রমশঃ বিলীন হইতে লাগিল। এইরূপে পূর্ণোদ্যমে গাড়ী প্রকৃতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিল। কত ছোট গ্রাম আর টিলা দৃষ্টিপথে আসিয়া আবার পুনরায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

এইরূপে কিছু দূর যাইবার পর গাড়ী সহসা ব্রেক কসিয়া থামিয়া গেল। সম্মুখেই এক জন আফ্রিদী বন্দুক লইয়া দণ্ডায়মান। গাড়ী থামিতে আফ্রিদী আগাইয়া আসিয়া সকলকে মোটর হইতে নামিতে বলিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। সৈনিকটি সকলকে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসে বিশেষ কিছুই পাইল না। তার পর তাহাদের গমনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া লইল। যুবকের সঙ্গী পাঠানটার সহিত তাহার কিঞ্চিৎ বচসা হইল। কিন্তু মোটর-চালকটার মধ্যস্থতায় তাহা মিটিয়া গেল। তাহাদের বেশী দূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া আফ্রিদীটি পাহাড় অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মোটর-চালক একটু হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—মোটর আর যাইবে না; পাহাড় ধ্বসিয়া রাস্তা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মোটর-চালক বিদায় নিল এবং তাহাদের যে আর কিছু দূর পৌঁছাইয়া দিতে পারিল না তাহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল। যুবকদ্বয় পায়ে হাটিয়াই চলিল। এবারে তাদের পায়ে হাঁটিয়াই ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করিতে হইবে। তাহারা চলিল তৃষিত ভারতের ৪০ কোটি নর-নারীর মুক্তির দাবী লইয়া। নব আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা মুক্তির বাণী লইয়া চলিল!

পাহাড়ী রাস্তা দিয়া চড়াই-উৎরাই পার হইয়া তাহারা চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী যেন রুক্ষ কেশভার লইয়া গৈরিক বসন পরিয়া ধ্যান-মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে অনাদি কাল হইতে। তাহারই মাঝ দিয়া পথ। পর্ব্বতের সানুদেশে একটু একটু সমতল জায়গা। সেইখানেই গ্রাম। সীমান্তের স্বাধীন জাতি আফ্রিদীর গ্রাম।

প্রকৃতির আবহাওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। অনাদি কাল হইতে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া তাহারা কাহারও পরাধীনতা মানিতে প্রস্তুত নয়। ইহারা বড়ই সাহসিক। ইতস্ততঃ মাটীর কেল্লা করিয়া তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

কিয়ৎ দূরে আসিবার পর তাহারা একটা ছোট সরাইখানা প্রাপ্ত হইল। নিদাঘ-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম মানসে তাহারা তথায় উপবেশন করিল। সরাইখানার মালিক নিকটেই থাকেন। তিনি অতি বৃদ্ধ। নিকটে আসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাহার বিগত দিনের ইতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার দুঃখময় সংঘাতের কথা। লাহোর দুর্গের অন্ধকার কারাকক্ষে নির্য্যাতনের দিনগুলির কথা। সমস্ত শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মনে হয়, সমস্ত মানবের আত্মার রোষানল যদি এ অন্যায়ের—এ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য প্রয়োগ করা যায় তবেই এর বিচার মিলিতে পারে। কথা-প্রসঙ্গে আরও জানা গেল, বৃদ্ধের পূর্ব্বপুরুষ সৈনিক ছিলেন। তাঁহারা পার্ব্বত্য অভিযানে দেশের মান রক্ষা করিবার জন্য বিদেশীদের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন। সমস্ত কথা শুনিলে মনে পড়িয়া যায়, শেরের বাচ্ছা শের না হইয়া অন্য কি হইতে পারে? সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় বৃদ্ধের কাছে বিদায় লইয়া তাহারা প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহারা চলিয়াছে ত চলিয়াছে—চলার যেন আর শেষ নাই। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। পথ যেন অনন্ত বিস্তৃত। দূরে—বহু দূরে কালো মেঘের আড়ালে ধবল-শুভ্র কিরীট-রাশি সূর্য্যরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া সম্মুখে ধূম্রজাল উৎপাদন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিমালয়ের পর্ব্বতশ্রেণী সারি সারি চলিয়াছে। পাহাড় আর পাহাড়। এরও বুঝি বা শেষ নাই। পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎকে দেখিয়া লওয়া যায় আবার পরক্ষণেই পর্ব্বতের সানুদেশে অবতরণ করিলে দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হইয়া আসে। রাস্তা নাই। পাহাড়ের মাঝ দিয়া রাস্তা করিয়া লইতে হইবে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগুহা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পথযাত্রীকে যেন গিলিয়া ফেলিতে চায়।

মনে পড়িয়া যায় অতীত স্মৃতির কথা। মনে পড়ে প্রাচীন আর্য্যের কথা—যাহারা এক দিন মধ্য-এসিয়া হইতে এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। মনে পড়ে গ্রীকদের কথা আর তার গান্ধার শিল্পের কথা। তার পর শক-হূণ দল একে একে অসির ঝনঝনে পাহাড় প্রান্তর কাঁপাইয়া এই পথ দিয়া ভারতের উপর তাহাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিল। তার পর মনে পড়ে মোঘলের কথা—কত বীর এই পথে আসিয়া রক্তের বন্যা ছুটাইয়া দিয়াছে। তাহাদের অশ্ব-খুরের অগ্নুদ্গারে, ধূলির বন্যা উৎপাদনে কত বীরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। অনাদি কাল হইতে এই পথ জয়ের তিলক পরিয়া বীরের মত জাগিয়া আছে। এক দিন কত বীরের রক্তে এর প্রতিটি ধূলিকণা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য আজ এর প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। যুবকদ্বয় প্রাণ ভরিয়া সেই পথের দিকে চাইয়া রহিল—বিজয়ীর মত জয়ের আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে আকাশে বাতাসে রঙ্গের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাগমে কখন যে সূর্য্যদেব অস্তাচল পর্ব্বতে ধীরে ধীরে অস্তগমনের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা যুবকদ্বয় কেহই দেখিতে পায় নাই। যখন তাহারা দেখিতে পাইল তখন আকাশে মাটীতে লাল আলোর রেখা পড়িয়া সমস্ত রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। মনে হয়, কে যেন বসন্ত সমাগমে হোলীর আয়োজন করিয়াছে। পাহাড়ের উপর লাল আভা পড়িয়া তাহার গৈরিক বেশ আরও গৈরিক করিয়া তুলিয়াছে। সূর্য্য আরও পাহাড় অন্তরালে নামিয়া পড়িল। দূরের পাহাড়ে আর আলোক নাই। একটু একটু কালো আবছায়া ভাব সর্ব্বত্র চক্ষুর সম্মুখে দৃশ্য-জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিল। পাহাড়ে জায়গায় সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি ঘনাইয়া আসে। সন্ধ্যাগমে মানুষের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু যুবকদ্বয়ের আজ আর চিত্ত-চাঞ্চল্য নাই।

বাহিরে বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটু একটু করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। পথিকদ্বয় তাহাদের শীতবস্ত্র পরিধান

করিয়া লইল। তার পর সম্মুখেই অবস্থিত একটা পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিতে লাগিল। অপর একটি যুবক তাহাকে জানাইয়া দিল, ইহাই শেষ সীমান্ত। পরপারেই আফগানিস্থান।

যুবকদ্বয় পূর্ব্বোত্তমে চলিল। মুক্তির সন্ধানে তাহারা চলিয়াছে। মুক্তি শুধু তাদের মুক্তি নয়—৪০ কোটি নর-নারীর মুক্তি। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। মুক্তিকামী যুবক মুক্তির আস্বাদে সেই শৃঙ্গোপরি দাঁড়াইয়া কুয়াসাচ্ছন্ন ধূম্রজাল ভেদ করিয়া ভারতের বন্ধন-দশা একবার দেখিয়া লইল। নয়নে একটু মাত্র বারি আসিল—কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সেই বিষাদ মন হইতে মুছিয়া গেল। আবেগে কিছুই বলিতে পারিল না। যুক্তকরে প্রণাম করিল। আপনার অজ্ঞাতেই বাণী কণ্ঠ নিঃসৃত হইল —"হে মাতঃ জননি! বিদায়! অস্তাচল হতে আজ শুধু বিদায় চাইছি মা! হাসিমুখে বিদায় দাও। আবার নবীন প্রভাতে পূর্ব্ব-গগনের দিক্‌চক্রবালে জয়ের নিশান লইয়া উদিত হব মা!"

তার পর পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াইল এবং উৎরাই বাহিয়া নামিতে লাগিল। পশ্চাতে দেখিবার আর অবসর নাই। এখন সম্মুখে পথ—কর্ম্মপথ। এদিকে সন্ধ্যারাগে পথ ভাল করিয়া দেখা যায় না। তবুও অতি কষ্টে পদস্খলনের পর তাহারা পরপারে আফগান-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিয়া সমস্ত জগৎ হইতে তাহাদের ছিন্ন করিয়া দিল।

অভিশপ্ত

ইলা দাস

মহা অষ্টমীর রাত্রি। আমরা সকলে মিলে সেজে-গুজে প্রতিমা দেখতে যাবার জন্য আয়োজন করছি, এমন সময় মা'র সাথে ঘরে ঢুকলেন এক অপরিচিতা মহিলা। বয়স আন্দাজ চল্লিশের কাছাকাছি হবে, ফর্সা, দেখতে বেশ সুন্দর। মা বললেন—ইনি তোমাদের পিসীমা হন, প্রণাম কর। আমরা সকলেই তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে আমাদের কাছে টেনে নিলেন। মা'র কাছে শুনলাম, ইনি বাবার মামাতো বোন, নাম সবিতা, দুই মাস হলো বিধবা হয়েছেন। এখন থেকে ইনি আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন। আমরা খুব খুসী হলাম। এক জন পিসীমা ঠাকুমা না থাকলে চলে? রূপকথার অমন সুন্দর সুন্দর গল্প শুনবো কার কাছে? কিন্তু বিপদ হলো কাকাকে নিয়ে। মা'র কাছে গিয়ে কাকা বারে বারে বলতে লাগলো—"ত্যাখো বৌদি, সবিতাদি'র চোখ দু'টো যেন গিলে খেতে আসছে। ওকে এ-বাড়ীতে থাকতে দিয়ো না। বাবা! দেখলেই ভয় লাগে!" মা হেসে বললেন—"চুপ কর, শুনতে পেলে উনি কি ভাববেন বল তো?"

লাহোরে আমার ছোট পিসীমা থাকেন। দুর্গা পূজোয় তিনি আসতে না পারায় বাবা তাঁকে কালী পূজোয় আসবার জন্য লিখলেন।

কালী পূজার দিন। বাবা ছোট পিসীমাকে আলো দিয়ে ছাদ সাজাতে বললেন। রাস্তায় বাজী নিয়ে আমরা খুব মেতে উঠেছি, সেই সময় ব্যস্ত ভাবে দিদি এসে বললো, "মণ্টু, দেখবি চল, ছোট পিসীর কি হয়েছে!" বাজী পোড়ান ফেলে বাড়ী এসে দেখি, বাইরের ঘরে কাকা বসে কাঁদছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছোট পিসীর কি হয়েছে কাকা?" লজ্জা পেয়ে কাকা তাড়াতাড়ি চোখ দু'টো ভালো করে মুছে নিয়ে বললো—"বৌদিকে তখনই বলেছিলাম, শুনলো না যেমন; দেখ গিয়ে ছোড়দি প্রদীপ দিয়ে ছাদ সাজাতে সাজাতে কাপড়ে আগুন ধরে পুড়ে গিয়েছে। ছোড়দি যদি মরে যায় রে?" এবার কাকা লজ্জা ভুলে আমার সামনেই কেঁদে ফেললে।

ছোট পিসীমাকে বাঁচানো গেল না। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পরের দিন সকালে তিনি মারা গেলেন।

কিছু দিন কেটে গিয়েছে। মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে আমরা মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছি। বিয়ের দিন টেলিগ্রাম এলো, বাবা লিখেছেন, কাকার ভয়ানক অসুখ, শীঘ্র চলে যাবার জন্য। আমরা যখন বাড়ী এসে পৌছলাম, কাকার তখন শেষ অবস্থা। আমার দিকে চেয়ে কাকা একটু হাসলো, তার পর মাকে বললো— "বৌদি, বিশ্বাস করলে না তো আমার কথা, এখনও বলছি সবিতাদি'কে আর এ-বাড়ীতে থাকতে দিও না।" মা বললেন, "ছিঃ ভাই, অমন কথা বলতে নেই।"

অনুযোগের স্বরে কাকা বললো—"তুমি ভয়ানক অবিশ্বাসী। জান না, ওর জন্যই তো ছোড়দি মারা গেল। আমিও বোধ হয় বাঁচবো না।" সেই দিন রাত্রেই কাকা মারা গেল—বোধ হয় নিজের কথাটাকে প্রমাণ করার জন্যে।

কাকার মৃত্যুর পর মা আর পিসীমাকে এ-বাড়ীতে থাকতে দিতে রাজী হলেন না। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হলো, পিসীমা দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে চোখের জলে পিসীমা এ-বাড়ী থেকে বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার ছ' বছর পরে। আমি এখন কলেজে পড়ি। পিসীমার কথা প্রায় ভুলে গেছি; ফুটবল, সিনেমা ও কলেজ নিয়ে এখন আমি রাত-দিনই ব্যস্ত। বাড়ীর সঙ্গে আমার শুধু সম্বন্ধ খাওয়া আর শোওয়ার। সে দিন খেতে বসেছি, মা বললেন, "মণ্টু, তোর সেই সবিতা পিসীমাকে মনে আছে রে? কাল তিনি এখানে আসছেন।" চকিতে আমার মনের মধ্যে কাকার মৃত্যুশয্যার ছবি ভেসে উঠলো। বললাম—"মা, তাঁকে তুমি এ-বাড়ীতে আসতে দিও না।"

মা হেসে বললেন—"দূর পাগল, তা কি হয়? বেচারী কত দিন তোদের দেখেননি। অনেক মিনতি করে চিঠি লিখেছেন। সে চিঠি পড়লে চোখে জল আসে। দেখিস্, তোরা যেন তাঁকে কিছু বলিস্ না। তোদের তিনি খুব ভালবাসেন।"

কেন জানি না, মা'র এই কথা আমি ঠিক সমর্থন করতে পারলাম না। চুপ করে খেয়ে উঠে চলে গেলাম। শুধু একটা কথা বারে বারে মনে হতে লাগলো—আজ তিন দন হলো দিদির জ্বর।

পিসীমা এসে আমাদের সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ, এমন কি রুগীর সেবা করা পর্য্যন্ত নিজ হাতে তুলে নিলেন। পিসীমার ব্যবহারে সকলেই খুসী। শুধু আমি তাঁর আগমন সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারলাম না।

দিন পনেরো পরে, সকলের অনুরোধ এড়িয়ে পিসীমা নিজের থেকেই দেশে ফিরে গেলেন। মা কাঁদতে লাগলেন দিদির শোকে। আজ তিন দিন হলো দিদি মারা গেছে।

কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে গিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে আজ ফিরছি। কাল রাত্রে ট্রেণে চড়েছি। বাড়ী পৌছবো কাল দুপুরে

ছেলেটার জন্য মন ভয়ানক খারাপ। একটি মাত্র সন্তান, তাকে খুসী করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। লজেন্স থেকে আরম্ভ করে এটা-সেটা সবই সাধ্য মত কিছু-কিছু কিনেছি। তাই মন এখন বাড়ী পৌঁছবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ট্রেণের দোলায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। স্বপ্ন দেখলাম, পিসীমা আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নে পিসীমার দেখা পেয়ে অজানা আশঙ্কায় বাড়ী ফেরার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলাম। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে অন্য বারের মতন বাসের অপেক্ষা না করে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ী এসে পৌঁছলাম। চাকর এসে দরজা খুলে দিল। তাড়াতাড়ি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম —"তোর দাদা-ভাই কোথায় রে?" সে দুই হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল, চমকে উঠলাম। আমার আগমনের সাড়া পেয়ে জয়ন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, "জান, খোকা কাল আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।" তার দু' চোখে জল। বুঝলাম জয়ন্তী সুস্থ নয়। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। জানলাম, আমি চলে যাবার দুই-তিন দিন পরে দেশ থেকে একটা চিঠি আসে পিসীমার ভয়ানক অসুখ। ওখানে চিকিৎসা হচ্ছে না, সেই জন্য পিসীমা কলিকাতায় আসতে চান। আমি না থাকায় জয়ন্তী তাঁকে আসতে লিখে দেয়। খোকা আগে আমার জন্য খুব কাঁদতো, কিন্তু পিসীমা আসার পর থেকে সে আর তেমন কাঁদতো না। কাল সে পিসীমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ঘুড়ি কিনতে যাবার সময় রাস্তায় গাড়ী-চাপা পড়ে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়।

এক বছর কেটে গেছে। আমি ইচ্ছা করেই আর পিসীমার কোন খবর রাখি না। সে দিন দুপুরের ডাকে একখানা চিঠি এলো আমার নামে। দেশ থেকে কোন এক ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে, আমার পিসীমা আজ ছয় দিন হলো মারা গেছেন; মারা যাবার সময় তিনি বলে গিয়েছেন, 'আমি যেন তাঁকে ক্ষমা করি'। জয়ন্তী আমার পার্শ্বে বসেছিল, হঠাৎ কি খেয়াল হলো জানি না, তাকে বললাম—আমাদের বাড়ী পিসীমার আগমন থেকে আরম্ভ করে আজকের এই চিঠির কথা পর্য্যন্ত। সব কথা শুনে সে আর্ত্ত স্বরে বলে উঠলো—"এ কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন? তাহলে বোধ হয় খোকা মরতো না।"

নূতন উষায়

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

দূর দিগন্তে ওই উষার আলোক-রেখা,
মেঘাচ্ছন্ন তবু মৃদু মৃদু যায় দেখা।
সংগ্রাম করো মহা উল্লাসে ভাই,
অন্যায় হক হত এর বাড়া নীতি নাই।
দেশে নিয়ে এস নূতন বহ্নি-শিখা—
যার তেজে ভীত পাপের রক্ত-লিখা।
শিরা-ধমনীতে বিদ্যুৎ শিহরণ,
খেলুক সবার চলুক ধর্ম্ম-রণ।
কে হারে কে জেতে পাপ-পুণ্যের খেলা,
নূতন উষায় নব সৃজনের মেলা।
মনুষ্যত্বে সবে উন্নীত হও ভাই,
মানুষ তোমার আর অন্য ধর্ম্ম নাই।

সামাজিক জীবনে সিনেমা

সিনা মুখোপাধ্যায়

সামাজিক জীবনে মানুষের আনন্দ উপভোগের জন্যই সিনেমার প্রচলন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সিনেমার প্রচলন ছিল না। প্রাচীন কালে যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার আমাদের আনন্দ আহরণের উপচাররূপে পরিগণিত হতো। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ও বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের দেশে সিনেমার পর্দা আলোকিত হয়ে উঠলো। ভারতের মাটিতে এর প্রচারও অনেকখানি বিদেশীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিদেশী ও বিজাতীয় প্রভাব, প্রচেষ্টা ও উদ্যমের কাছে ভারতের আজকের ছায়া-জগৎ অনেকখানি ঋণী। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতে আসার সঙ্গেই আমরা সব প্রথম বিদেশী সিনেমা-বিশেষজ্ঞদের দেখি দিল্লী দরবারের ছবি তুলতে—প্রথম ছবি রচনা বিদেশী মূলধনে, বিদেশী চিন্তা-পদ্ধতিতে। কিন্তু তবুও এই বিদেশী ভাব বেশী দিন আমাদের দেশী মনের ওপর স্থান সংগ্রহ করে রাখতে পারেনি। আমাদের জাগ্রত চেতনা সৃষ্টির কাজে হাত প্রসারিত করলে। সাফল্যের প্রথম সোপানে আমরা উঠলাম মূক ছবি রচনার দ্বারা। তার কয়েক বছর পরেই আমরা বাণী-চিত্র রচনায় সক্ষম হয়েছি। মূক থেকে মুখর অবস্থায় উন্নীত হলেও শিল্প হিসেবে আমাদের ছবি বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করতে পারল না। তার কারণ, আমাদের ছায়া-ছবির এই বত্রিশ বছরের ইতিহাস চিত্র-বিধাতার নজর বিশেষ ভাবে লাভের অঙ্কের দিকে যতটা ছিল, ছবির উৎকর্ষের দিকে ছিল তার অনেক কম। প্রথম যুগের চিত্র ছিল চণ্ডীদাস, দেবদাস ইত্যাদি। কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ চিত্রশিল্প ধারণাতীত অবনতির ধাপে উপস্থিত হচ্ছে। বর্ত্তমান কালের চিত্র রচনায় না আছে রসের মাধুর্য্য, অভিনয়ের চাতুর্য্য, না গল্প-রচনার উৎকর্ষতা। আজ পৃথিবীর চারি দিকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের জন্য সমাজগত, রাষ্ট্রগত ও রাজনীতিগত জীবনের সুস্পষ্ট পথ ধরিয়ে দেবার জন্য বা আদর্শমূলক কোন বার্ত্তা-প্রচারের জন্য সেরূপ কোন বিষয়-বস্তু ছায়া-ছবির মধ্যে পরিবেশিত হয় না।

স্বাধীন জাতগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাই, সেখানকার রাষ্ট্রগত, সমাজগত ও রাজনীতিগত জীবনের প্রকৃত বিষয়গুলিই তাদের চিত্রে বহুলাংশ জুড়ে আছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের ভাবী জাতি কিশোর-কিশোরীদের জন্যেও কোন প্রেক্ষা-গৃহই নেই। তাদের উপযোগী ছবি তোলা হয় না।

বর্ত্তমানে 'মৌমাছি'-পরিচালিত "পুতুলের দেশ" ও স্বপন বুড়ো-রচিত "বিষ্ণুশর্ম্মা" নাটক দু'টি কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা অভিনীত হচ্ছে। এই দু'টি শিশু-মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রথমে আশা ছিল, নতুন আশা ছিল, নতুন প্রাণশক্তি। তাদের নতুন পরিকল্পনা ও নতুন মন নিয়ে চিত্রশিল্প জগতে প্রবেশ করলে ছায়া-চিত্রের উন্নতি হবে, কিন্তু আমাদের আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে।

স্বাধীন ভারতের শিল্প, শিক্ষা, সমাজ, চিত্র—জীবনকে উন্নততর সোপানে টেনে তুলতে না পারলে স্বাধীন দেশের মর্য্যাদা কোথায়?

এ ভার রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত। আজ স্বাধীন ভারতের নবারুণ প্রত্যুষে আমরা জাতির অগ্রগামীদের নিকট হতে আশা করি, তাঁরা যেন চিত্র ও মঞ্চ-শিল্পকে বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলবার দিকে দৃষ্টি দেন। জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু সংগঠন কিছুই হয়নি। এই জাতির সংগঠনের কাজে চিত্র ও মঞ্চশিল্পকে প্রধান অংশ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, চিত্র ও রঙ্গালয়গুলি জাতীয় জীবনের প্রধান ও প্রয়োজনীয় বস্তু। আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যমে জাতিকে শিক্ষা দেওয়া ও সচেতন করে তোলার মত সহজ এবং প্রকৃষ্ট উপায় আর কি আছে?

প্রবাসে পনেরই আগষ্ট

শ্রীমতী সুপ্রভা কর

আমাদের প্রবাসের ভারতীয়দের অতি বড় দুর্ভাগ্য যে, ১৫ আগষ্ট—ঐ দিনটিতে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়া হয়ে রইলুম। ঐ দিনটি আমাদের কত আকাঙ্ক্ষিত দিন। বহু বছরের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই দিনটিতে আজ আমরা এসে পৌঁছেছি। যাঁরা বিনা দোষে অজান্তে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের জন্যে রইলো ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। আত্মা তাঁদের তৃপ্ত হবে আজকের এই শুভ দিনটিতে। কিন্তু এই যে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হলো, ভারত খণ্ডিত হলো, এই জন্যেই মন আজ ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ভারতও আজ চীন-জাপানের মত হবে? ভবিষ্যৎ যে আমাদের এমনি হয়ে এসে দেখা দিবে এ যেন ভাবতেও কষ্ট হয়।

তবুও মনে আজ আনন্দ জেগে উঠেছে ভারত স্বাধীন, যে পতাকা নিয়ে ভারতবাসী কত লাঞ্ছিত হয়েছে সেই-ই পতাকা আজ সগৌরবে ভারতের আকাশে উঠেছে। সকল স্বাধীন দেশের সাথে ভারতের পতাকাও সগৌরবে উঠবে। এ কথা ভাবলে আনন্দে গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে আসে।

ঐ আনন্দের দিনটিতে আমরা এ দেশে সকল ভারতীয় মিলে একটু আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলুম। মালয় দেশে আমরা বাঙ্গালী খুবই কম আছি; তবুও কাছে কাছে যে কয়েক জন আছি সবাই মিলে ঐ দিনটিতে এক সাথে হয়েছিলুম। আমি যে এষ্টেটে থাকি, এই এষ্টেটে মাত্র আমরা তিন ঘর বাঙ্গালী-পরিবার আছি।

ঐ দিনটিতে আমরা সকল ভারতবাসীদের ছোট-বড় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রায় আধ মাইলের মত প্রসেশন করেছিলুম, হাতে ছিল ভারতীয় পতাকা, ছেলে-মেয়েদের মুখে ছিল "কদম কদম" এই গানটি, আর "সবসে উচ্চা হ্যায় দুনিয়ামে ঝাণ্ডা হামারা নেতাজী" এই দু'টি গান। প্রত্যেকের মুখেই ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'—'জয় হিন্দ্।' তার পর সন্ধ্যার সময় একটু খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আমাদের ঐ দিনটিতে মালয় দেশের প্রায় প্রত্যেক এষ্টেটেই সকল ভারতীয়রা ঐ রকম আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেছিল। গরীব, বড়লোক, ছোট জাত কি, বড় জাত কি—মালয় দেশে আমরা সেটা গ্রাহ্য করি না। সেদিনে আমরা সকল ভারতীয়রা এই সুদূর হতেই আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষকে—মাতৃভূমিকে প্রণাম জানিয়েছি। সকল ভারতবাসী মিলে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি—ভারতের সেবায় আমরা জীবন উৎসর্গ করব।

ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস্

শ্রীলতিকা গোস্বামী

১৫ই আগষ্টের কলকাতা। দু'শ বছরের পরাধীনতার কলঙ্ক ১৪ই আগষ্টের রাত্রির অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, স্বাধীনতার প্রতীক ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে গোটা সহরটা শুচি-শুভ্রবেশে স্বাধীনতার সুধা-রস আজ প্রথম আকণ্ঠ পান করছে। পরাধীন জাতির জীবনে এত বড় মাহেন্দ্র ক্ষণ আর কি হতে পারে? হিন্দু, মুসলিম, ধনী, গরীব কোন যাদুমন্ত্র বলে আজ সব এক হয়ে গেছে—আজ সব হরিহর আত্মা! এই অভাবনীয় পরিবর্তন যে সম্ভব হতে পারে, ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত তা' কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধান—কিন্তু কোন সোণার কাঠির স্পর্শে এক রাত্রির মধ্যেই যেন কলকাতা সহরে বহু-আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

'ভগলু' করপোরেশানের একটি বাজারের ঝাড়ুদার। তার দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়ে সহরের এই মহোৎসবে আজ সে-ও যোগ দিয়েছে। উৎসবের উপযোগী সামান্য কিছু সাজগোজ জোগাড় করতে তাকে অবশ্য কাবুলীওয়ালার শরণাপন্ন হতে হয়েছে। টাকায় দু'আনা সুদে সে দশ টাকা ধার নিয়েছে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে। মাইনে পাওয়ার প্রথম দিনেই মাইনের প্রায় অর্দ্ধেক কাবুলীওয়ালাকে সুদ দিতেই ফুরিয়ে যায়। বাকী মাসটা আবার তার ধার করে চালাতে হয়। আজকের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তাকে আবার এই বাড়তি দশ টাকা ধার নিতে হয়েছে। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত সে এ দেনার ভারও সহ্য করবে। কাবুলীওয়ালার গাল-মন্দ তো সে সারা জীবন ধরেই শুনে আসছে, এবার না-হয় মাত্রাটা একটু চড়া হবে, এই যা তফাৎ। হোক্ দেনার বোঝা ভারী—কিন্তু তবুও আজকের দিনটিকে সে সার্থক করে তুলতে চায়। বিশেষ করে তার আট বছরের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে এই বাড়তি দেনার ঝুঁকি সে মেনে নিয়েছে। ঐ দশটি টাকা ভাঙিয়ে সে নিজের ও ছেলের পোষাক কিনেছে—ছেলেকে 'ফ্ল্যাগ' কিনে দিয়েছে। ঐ সামান্য টাকায় কি বা পোষাক হয়! কিছু নতুন পোষাকের সঙ্গে কিছু পুরানো পোষাক ঘসে-মেজে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে কোন প্রকারে।

রোজ ভোরে চারটায় উঠে তাকে বাজার ধোলাই করতে হয়। কিন্তু আজকের দিনটি সে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে ছুটি করিয়ে নিয়েছে। তা-ও পুরো দিনটি ছুটি মেলেনি। তিন দিন ধরে খোসামোদের পরে আজ বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ছুটি মিলেছে। তা'তেই আজ সে খুসী। স্বাধীনতার অর্থ সে হয়তো ভাল করে বোঝে না, কিন্তু আজ যে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটবে এটা সে বুঝতে পেরেছে। ১৫ই আগষ্ট প্রায় সারারাত্রি ধরে সে অদম্য উৎসাহে বাজার সাজানর কাজে যোগান দিয়েছে। পরের দিন ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি সাজ-গোজ করে ঘরের বাক্স-বিছানা, এ-কোণ-সে-কোণ সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব জায়গা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে-পেতে যেখানে যা' কিছু দু'-একটা পয়সা ছিল সব ট্যাঁকে গুঁজে

ছেলেটির হাত ধরে সে বেরিয়ে পড়লো বাজারের বাইরে। রাস্তায় রাস্তায় তখন জনসমুদ্রের সম্মিলিত কণ্ঠের "জয় হিন্দ," আর "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে।

জন-সমুদ্রের গতি লাট সাহেবের বাড়ীর দিকে। সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! লাট সাহেব আর সাধারণ লোকের মধ্যে যে কৃত্রিম আভিজাত্যের প্রাচীর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, সেটা যেন আজ এক ফুৎকারে কর্পূরের মত উড়ে গেছে। দলে দলে জনসমুদ্র বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত লাট-প্রসাদে ঢুকে পড়ছে। ভগলু আর তার ছেলেও লাট-প্রাসাদে ঢুকে পড়লো। লাট-প্রাসাদ! যা' নাকি কাল পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে তো দূরের কথা—রাজা মহারাজাদেরও হাজার রকমের বাধা-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে তবে হয়তো "ড্রইং-রুম" পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার মিলতো! আর আজ? আজ যেন ইহা জনগণের নিজস্ব সম্পত্তি। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ আজ "জয় হিন্দ," আর "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে যেন ফেটে পড়ছে। এইরূপ জয়োল্লাসের নজীর বোধ হয় একমাত্র "ব্যাষ্টাইলের" পতনেই মেলে। দুশো বছর ধরে তিলে তিলে আমাদেরই রক্ত-মাংসের বিনিময়ে এই ইমারৎ গড়ে উঠেছে! এ ইমারতের প্রত্যেকটি ইটে কত পুত্রহারা জননীর দীর্ঘশ্বাস চিরকালের জন্যে জমাট বেঁধে আছে। আমাদেরই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অর্থ লুণ্ঠন করে ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপকরণ থরে থরে সাজানো হয়েছে। যে দিকে তাকানো যায়—চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগে। মনে হয়, এখানে বসে যে শাসন করে, তার পক্ষে কি গরীবের দুঃখ বোঝা সম্ভব? শাসক আর শাসিতের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল এত দিন, তা' আজ ভেঙ্গে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেছে। আজ যেন জনগণ তাদের লুণ্ঠিত সম্পত্তি তস্করের হাত থেকে আবার উদ্ধার করেছে!

অন্যান্য আর সবারই মত ভগলু ও তার ছেলে প্রত্যেকটি কক্ষের আসবাব-পত্র স্পর্শ করে দেখছে যে এ সমস্ত কি বাস্তব না মায়া! একটা আরাম-কেদারায় ভগলু ও তার ছেলে বসে পড়লো। প্রায় এক হাত পুরু স্প্রিং-এর গদী যেন তাদের সমস্ত দেহটা গিলে ফেললো। হেঁটে তারা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ভগলু আস্তে আস্তে সামনের মেহগনি কাঠের টেবিলের উপর পা দু'খানি তুলে দিল। কাঁধের উপর থেকে গামছাখানা নিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল। তার পর কান থেকে একটা পোড়া বিড়ি নিয়ে ধরালো আর পকেট থেকে আর একটা বিড়ি বের করে ছেলের হাতে তুলে দিল। হোক না কেন সে ঝাড়ুদার—সারা জীবন তো আবর্জ্জনা ঘেঁটেই কেটে গেছে। তবুও আজকের এই ক্ষণিকের স্বর্গসুখ তাকে চির-অভ্যস্ত ঘৃণিত জীবনের রূঢ় সত্যকে ভুলিয়ে দিয়ে কোন্ কল্পলোকে যেন নিয়ে গেছে।

ভগলু ছেলেকে নিয়ে যখন লাট-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো, তখন বেলা ১২টা বেজে গেছে, সে ভুলেই গেছে যে সাহেব তাকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করেছিল। মুহূর্ত্তে তার হাসিমুখ আবার অন্ধকার হয়ে উঠলো। সময় মত হাজিরা দিতে না পারলে সাহেব তো চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করবেই, উপরন্তু, এক দিনের মাইনে কাটা যাবে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সে মনে মনে উপায় চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, সাহেবের ছেলে দু'টো তো খুব কেক্ ভালবাসে! সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায়ই বাজারে এসে অনেকগুলো করে কেক্ খায়—অবশ্য বিনা পয়সায়। ভক্তিতে না হোক—ভয়ে অনেক দোকানদার ছেলে দু'টিকে কেক্ ঘুষ দেয়। ফিরবার পথে সে নতুন বাজার থেকে তার শেষ সম্বল একটি টাকা দিয়ে দু'টি কেক্ কিনে নিয়ে একেবারে সটান সাহেবের কুঠিতে গিয়ে হাজির হলো। উদ্দেশ্য—ছেলে দু'টির হাতে কেক্ দিয়ে সাহেবকে খুসী করে আজকের সম্পূর্ণ দিনটাই ছুটি করিয়ে নেবে।

সাহেবের কুঠিতে যখন তারা ঢুকলো বেলা তখন প্রায় ১টা। সাহেব ছেলেদের নিয়ে গল্প করছিলেন আর মেমসাহেব ডিনারের বন্দোবস্ত করছিলেন। ভগলুর সৌভাগ্য ক্রমে সাহেবের মন-মেজাজ আজ ভাল ছিল। কারণ, আজ সকালে বাজারে একটা ভাল শীকার মিলে গিয়েছিল, অর্থাৎ একটা "ব্ল্যাক মার্কেট কেস" ধরে টাকা পঞ্চাশেক পকেটে এসেছে। ভগলুকে দেখে তিনি নরম সুরেই বললেন, "এই শালা, তোম্ বারো বাজে হাজিরা দিয়া নেই কাহে?" এই সম্বোধন শুনে ভগলুর সমস্ত শরীরে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় পুলক-শিহরণ খেলে গেল। সে যেন তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আহ্লাদে গলে গিয়ে সাহেবের পায়ে কয়েক বার চুমু খেয়ে ফেললো আর সবিনয়ে তার দেরী হওয়ার কারণ সাহেবের কাছে বর্ণনা করলো। ইতিমধ্যে ভগলুর হাতে কেক দেখে সাহেবের ছেলে দু'টি এগিয়ে এসেছে। ভগলু অতি সন্তর্পণে তাদের হাতে কেক্ দু'টি দিয়ে হুজুরের কাছে আজকের গোটা দিনটার জন্যেই ছুটি চাইল। হুজুর একবার অপাঙ্গে উপহারের উপকরণের দিকে চেয়ে নিয়ে জবাব দিলেন—"যা শালা—জল্‌দি ভাগ হিঁয়াসে।"

ভগলু সাহেবের কাছে এতখানি দয়া আশা করেনি। "জল্‌দি ভাগ হিঁয়াসে" মানেই যে তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে, এটুকু বুঝবার বুদ্ধি তার আছে। সব চেয়ে আজ সে খুসী হয়েছে সাহেবের সম্বোধন শুনে। সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে তার ছেলেটিকে একেবারে কোলে তুলে নিল এবং তার গালে অজস্র স্নেহচুম্বন এঁকে দিল। সাহেবের সম্বোধনটাই আজ যেন সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে বার বার তার কানে গুঞ্জরণ করে ফিরতে লাগলো। সাহেব আজ তাকে শুধু "শালা" বলেছে—সেই সঙ্গে "শূয়ারকা বাচ্চা" বলেনি। গালাগাল দিয়েছে সত্যি—কিন্তু বাপ তুলে তো গালাগাল দেয়নি, যা' শুনে সে চিরকাল অভ্যস্ত! সাহেব যেন তাকে আজ একটা বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছে। আজ যেন তার মানুষ বলে পরিচয় দেবার খানিকটা অধিকার মিলেছে। একটা নতুন অনুভূতি যেন সে সাহেবের গালাগালির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্য সে সম্পূর্ণ বোঝে না—কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যেন সে আজ 'ডোমিনিয়ান 'ষ্ট্যাটাস' পেয়েছে—কারণ, সাহেবের গালাগালির ভাষা থেকে "শূয়ারের বাচ্চা" শব্দ দু'টি আজ খসে পড়েছে—এখন বাকী শব্দ "শালা"টি যেদিন খসে পড়বে, সেই দিন বুঝি হবে ওর ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতার দিন!

স্বাধীনতা (?)

রেখা আচার্য্য

'পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস!' সুব্রতা ভাবে ওর ময়লা শাড়ীর আঁচলটা হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে। রোজ ঘুম থেকে ওঠে ও ভোর পাঁচটায়, কিন্তু আজ উঠেছে ও চারটায়—এক ঘণ্টা আগে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ও জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় 'প্রভাত ফেরী' দেখবে বলে। 'আজ স্বাধীনতা দিবস'! সবই যেন সুব্রতার চোখে হয়ে উঠেছে অদ্ভুত রঙীণ! সেই ঘর, সেই বিছানা, তবু ওর চোখে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ঐ আকাশ, ঐ গাছপালা আরও নীল আরও সবুজ মনে হয় ওর। কাল রাত্রের কথা মনে হয় সুব্রতার, কি উদ্বেগে কেটেছে সারা রাত! চারি দিকে বিউগল বাজছে, ঘরে-ঘরে বাজছে শাঁখ, আর দূরে কোথায় যেন সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।" তারই প্রতিধ্বনি উঠছে আকাশে, বাতাসে, মাঠে, ঘাটে আর সুব্রতার মনে। সেই সময় ও একবার উঠেছিল শাঁখ বাজাবে বলে, কিন্তু স্বামী কমলাক্ষ বললেন, "কোথায় চললে রাত দুপুরে?"

—"শাঁখ বাজাব।"—ধরা-গলায় ভয়ে ভয়ে সুব্রতা বললে।

—"শাঁখ বাজাবে? যত সব পাগলামি! রাত দুপুরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিও না।" আদেশের সুরে কথা কয়টি বলে কমলাক্ষ পাশ ফিরে শুলেন। ছোট থেকে সুব্রতা স্বামীকে বড্ডো ভয় করে। তাই আর কিছু বলতে সাহস করলো না সুব্রতা। চুপচাপ শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম হয় না।

অন্য দিন হ'লে রাত্রি-জাগরণের পর সকালের গৃহকর্ম্মে আসতো অবসাদ। আজ কিন্তু সমস্ত কাজেই কি-উৎসাহ তার। ছুটোছুটি করে কাজ করে সুব্রতা। কমলাক্ষ বেলা ন'টা-দশটার মধ্যেই খাওয়া-নাওয়া সেরে নেন্। ওঁদের ক্লাবে আবার পতাকা তুলতে হ'বে। পান-মশলা দিতে গিয়ে সুব্রতা বিনীত ভাবে স্বামীকে বলে—"ও-পাড়ার কমলদি বলছিল, আজ পাড়ার সব মেয়েরা মিলে সুলেখাদের বাগান-বাড়ীতে পিক্‌নিক্ করবে, আমিও যাব?"

—"কেন বাড়ীতেই ওঁদের নিয়ে এসো না কেন?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুব্রতার পানে চা'ন কমলাক্ষ।

—"তা কেমন করে হবে? ওঁরা এখানে আসবে না। তাছাড়া সুলেখাদের বাগানটাও চমৎকার!"

—"না না, আমার স্ত্রী হয়ে বাইরে কোথাও হৈ-হৈ করা তোমার চলবে না।" বলতে বলতে কমলাক্ষ দ্রুতপদে বেরিয়ে যান। সুব্রতা খানিকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তার পর সম্বিত ফিরে এলে আবার এসে কাজে মন দেয়। কাজ সারা হ'লে নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসে ও। ঠিক এই সময় বাইরে কারা যেন গাইছে, শুনতে পায় সুব্রতা "সুজলাং, সুফলাং মলয়জশীতলাং।" এঁটো হাতেই ছুটে আসে সুব্রতা জানলার ধারে। লাল-পাড় শাড়ী পরা স্নিগ্ধ এক-একটি ভাবী মাতৃমূর্ত্তি ভারত-মাতার গুণগান করতে করতে এগিয়ে চলেছে। হাতে ওদের পতাকা। ওদের মাঝেই স্বাধীন ভারতকে দেখতে পায় সুব্রতা। নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে ও। ওরও ইচ্ছে হয়, ওদেরই মত একটা পতাকা হাতে বেরিয়ে পড়ে ওদের সঙ্গে। বিকেলে স্বামী ফিরে এলে জলখাবার দিতে গিয়ে বলে সুব্রতা—"চল না, কাছারির মাঠে কি সব খেলাধূলা হবে, দেখে আসি!"

—"ও বাবা, আমার অনেক কাজ আছে।" ব্যস্ত হয়ে বলেন কমলাক্ষ।

এমনি সময় কমলাক্ষ'র বন্ধু-বান্ধবরা হৈ-হৈ করতে করতে ঘরে ঢোকে। সুব্রতা আড়ালে চলে আসে। এক জন বন্ধু কমলাক্ষকে বলে ওঠেন—"কাল কিন্তু সুবোধের বাড়ী পার্টি আছে রে, যাবি ত'?"

—"নিশ্চয়ই যাব।" বলেন কমলাক্ষ, "স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ কোরবো না?"

তার পর হৈ-হৈ করতে করতে ওরা কমলাক্ষকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সবই শোনে সুব্রতা। মনে ভাবে, স্বাধীনতা দিবসে বাইরে না হোক বাড়ীতেই আনন্দ করবে ও। সন্ধ্যে বেলা প্রদীপ জ্বেলে বাইরের রকের ওপর নিপুণ-হস্তে একটার পর একটা প্রদীপ সাজাতে থাকে ও। এমন সময় কমলাক্ষ বাড়ী ফেরেন।

—"ভেতরে এস।" গুরু-গম্ভীর স্বরে বলেন কমলাক্ষ, "মেয়েমানুষ হ'য়ে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়, বুঝলে? পাশের বাড়ীর ছেলেটা 'হাঁ' করে চেয়ে রয়েছে, তাছাড়া, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো কি না দিলেই নয়? সত্যি! তোমার মত চরিত্রহীনা স্ত্রী খুব কম লোকের ভাগ্যেই হয়।"

এই বাক্যটিকেই সব চেয়ে ভয় করে সুব্রতা; "চরিত্রহীনা!" সত্যিই ও পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দেখতে পায়নি! আর তাছাড়া সুব্রতার যদি ছেলে থাকতো, ঐ রকমটাই ত' হতে পারত।

সমস্ত শরীরটা ওর ভেঙে পড়তে চায় কান্নায়। কিছুই বলতে পারে না এর পর। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে ও কমলাক্ষ গর্জ্জন করে ওঠেন,—"চুপ করো! নয়ত; বেরিয়ে যাব এক্ষুণি।"

প্রাণপণে কান্না দমন করে সুব্রতা। বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফলে স্বামীর রাগ সে ভালো রকমেই জানে।

পরের দিন পাড়ার মেয়েরা এসে বললো, "ভাই, কাছারীতে খুব সুন্দর খেলা-ধুলো হ'লো। তোর স্বামী গিয়েছিলেন দেখলাম, তুই গেলি না কেন?"

হতভম্বের মত সুব্রতা বললো, "বড্ডো, মাথা ধরেছিল।" তার পর ওরা সব চলে গেলে—মুহ্যমানের মত সুব্রতা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো। সামনের বাড়ীর ফ্ল্যাগটা পত পত শব্দে মায়ের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রছিল। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রতা ভাবতে লাগলো, 'ভারত-মাতা' ত স্বাধীন হলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ, তথা বাংলা দেশ, তথা মাতৃজাতি সুব্রতাদের স্বাধীনতা কি হ'ল এই সঙ্গে? ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচন কোরলো ভারত সন্তান! কিন্তু সে যে নিঃসন্তান। তার শৃঙ্খল মোচন করবে কে? পাশের বাড়ীর মেয়েটা তখনও গেয়ে চলেছে একটানা—

"পনেরই আগষ্ট পুণ্য দিন,
প্রাচীন ভারতে জাগে নবীন।
গাও তিন-রঙা পতাকার তলে, নব ভারতের ঐক্যতান।
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।"

খেলা-ধুলা নয় ধুলা-খেলা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

খেলা-ধূলা তোমরা অনেকেই কর, কিন্তু খেলা-ধুলা যে শুধু খেলা-ধূলা নয়, আজকে সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে একটা ভারি মজার গল্প ব'লব।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। কালীপ্রসন্ন ঘোষের বৈঠকখানা ঘরে বহু লোক জড়ো হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই লেখক। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। এক জন বললেন, আজ-কালকার ছেলেরা মশায়, বই আর ছুঁতে চায় না, শুধুই খেলা আর খেলা! আর এক জন বললেন, তাই বা কই? আজ-কালকার ছেলেরা পড়তেও চায় না, তারা খেলতেও পারে না। বিস্মিত হয়ে অনেকেই প্রশ্ন করলেন, সে কি রকম? বক্তা বললেন, এ আর বুঝলেন না? তাদের পাঠের ঘর হয় খেলার মাঠ, আর খেলার মাঠ হয় পাঠের ঘর। তারা পড়ার সময় খেলার কথা ভেবে কাটিয়ে দেয় এবং খেলার সময় পরের দিনের পাঠের তাগিদে অস্থির হয়। তার পর বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে এক জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে মাষ্টার, তুমি কি বল?

—আজ্ঞে, তা ঠিকই।

এমন সময় ঘোষ মশায় বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি একবার চারি দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দেখছি সকলেই এসেছ। তা বেশ।

এই বলে ঘোষ মশায় তার তাকিয়াতে হেলান দিয়ে বসলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি আলোচনা চলছিল?

এক জন বললেন, আজ্ঞে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

দেশের ভবিষ্যৎ! ঘোষ মশায় বেশ একটু গম্ভীর হয়ে খাড়া হয়ে উঠে বসে বললেন, আচ্ছা বল ত, আঠার হাজার শকে বাংলায় কি ঘটবে?

অদ্ভুত প্রশ্ন! সকলেই নির্ব্বাক্। কেউ কিছু বলেন না দেখে ঘোষ মশায় নিজেই বললেন, আচ্ছা মাষ্টার, তুমিই আরম্ভ কর।

—আজ্ঞে আমি ত জ্যোতিষী নই?

—ঠিক কথা, তুমি জ্যোতিষী নও, কিন্তু লেখক ত বটে। লেখকরাই ত দেশের ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকর্ত্তা হে? বল বল, তোমার ধারণাটাই বা কি, দেখি না?

—আজ্ঞে, বলতে হয় ত একটা পারি, তবে মিলবে কি না তা বলতে পারি না।

—মিললো কি না তা দেখবার জন্ত আমিও আসবো না। সে চিন্তা তোমার নাই।

—আজ্ঞে, তবে বলি। মাষ্টার মশায় আরম্ভ করলেন। আঠার হাজার শকের একটা দিন; বেলা ১০টা। ছেলেরা সব খেলার সাজ-সরঞ্জাম হাতে নিয়ে প্রায় ছুটে চলেছে খেলা ঘরে। এই খেলা-ঘরে বেলা ১০টা হতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় কি করে খেলতে হয় এবং ৫টা হতে ৭টা পর্য্যন্ত মাঠে লেখা-পড়া শিখান হয়। খেলা ঘরে বড় বড় খেলোয়াড় ছেলেদের খেলার নানাবিধ কৌশল হাতে-কলমে শিক্ষা দেন।

বৈকালে পড়ার ক্লাসেও মাষ্টার মশায়রা ছেলেদের বইয়ের পড়া বেশি না পড়িয়ে বলেন, খেলা ঘরে তোমরা যা শিখেছ এখানেই হবে তার পরীক্ষা। আমরা শুধু দেখবো, তোমরা কেমন করে নিত্য-নূতন কৌশল বের করে একে অপরকে পরাজিত করতে পার এবং সেই অনুসারে আমরা তোমাদিগকে পুরস্কার ভাগ করে দিব। তোমরা জান, অতি প্রাচীন কালে এই বাংলা দেশে বাঙালী বলে একটি জাতি ছিল, কিন্তু আজ আর সেই জাতির কোন অস্তিত্ব নাই। প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ অতিকায় বৃহৎকায় জন্তুগুলি যেমন করে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক থেকে সরে পড়েছে, বিলাসী বাঙালী জাতিও ঠিক তেমনি করে এই প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ হয়েই নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অনেকের বিশ্বাস, আসাম, আরাকান প্রভৃতি প্রদেশের গভীর জঙ্গলগুলি অনুসন্ধান করলে হয় ত আজও তাদের দুই-একটি বংশধরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বাঙালী জাতি অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন জাতি ছিল। সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত প্রদেশের জঙ্গল কাটাইয়া সহর বসাইয়া ইহাদের শেষ বংশধরকে পৃথিবীর বুক থেকে বিতাড়িত করতে চান না।

অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীতে একটি কবিতা পড়ান হচ্ছিল। কবিতাটি এইরূপ:—

মানুষ হইতে যদি থাকে তব মন,
খেলা-ধুলা শিখ তবে করিয়া যতন।
খেলা-ধুলা করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই—
এ কথা কি কারো বাছে শুন নাই কানে?
খেলা-ধুলা না শিখিলে,
কোন সুখ নাহি মিলে,
মানুষ বলিয়া তারে কেহ নাহি মানে।
খেলা-ধুলা শুধু নয় ধুলা-মাখা খেলা,
জয় আশা মনে রেখো খেলিবার বেলা।
জিতিবারে যদি চাও
মন-প্রাণ সঁপে দাও
মন বিনা কোন কাজ না হয় সাধন।

মনে প্রাণে হও দড়,
মন দিয়া খেলা কর,
সফল হইবে আশা, মিলিবে রতন।

সকলেই অবাক্ হয়ে শুনছিলেন। এইবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেহ বললেন, বাঃ, বেশ মজা! কেহ বা বললেন, শুধুই গাঁজা। ঘোষ মশায় কেবল বললেন, হুঁ! কি ভেবে যে তিনি 'হুঁ' বললেন, তা তিনিই জানেন।

এক মজার ঘটনা

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

মাঝে মাঝে বাস্তবে এমন অনেক মজার ঘটনা ঘটে থাকে, যা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই ধরণের এক মজার ঘটনা তোমাদের আজ শোনাতে বসেছি। এখন তবে সকলে মন দিয়ে শোন।

দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাই বলছি। বোনাপার্টের সৈন্যের তখন খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যখনই কাউকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করতেন, তখনই তাকে তিনটি প্রশ্ন করতেন, 'কত দিন থেকে সে এ দেশে আছে, তার বয়স কত ও সে শুধু খোরাক না বেতন চায়।'

এদিকে এক বিদেশী সেই সময়ে ফ্রান্সে বাস করত। খুব গরীব ছিল সে। অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটত তার, অনেক দিন না খেয়েই কাটাতে হোত তাকে। এক দিন এক ভদ্রলোক তার কষ্ট দেখে বললেন, "তুমি মিছামিছি এত কষ্ট না করে রাজার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে যাও না কেন?"

সে উত্তর দিল, "তা হলে ত আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম। কিন্তু একটা খুব বড় অসুবিধা রয়েছে যে!"

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "কি অসুবিধা?"

বিদেশী বললে, "আমি ফ্রেঞ্চ ভাষা ভাল ভাবে জানি নে যে মোটেই।"

ভদ্রলোক পরামর্শ দিয়ে বললেন, "তাতে কোন ক্ষতি হবে না। রাজা তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তুমি বোলো, 'চার বছর', দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বোলো, 'ত্রিশ বছর' আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে, 'উভয়ই'।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে খুব খুসী হয়ে বিদেশী গেল নেপোলিয়নের কাছে। কিন্তু সেদিন বোনাপার্ট প্রথম প্রশ্নের আগে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। বললেন, "তোমার বয়স কত?"

বিদেশী চটপট উত্তর দিল, "চার বছর।"

"তুমি কত দিন থেকে এ দেশে আছ?" দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলেন বোনাপার্ট।

"ত্রিশ বছর।" বিদেশীর কাছ থেকে উত্তর এল।

বিদেশীর উত্তর শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন নেপোলিয়ন। বেশী কথা বলতে পারলেন না তিনি। শুধু বললেন, "জানি নে, তুমি পাগল না আমি পাগল?"

বিদেশী এবারও উত্তর দিতে পেছ-পা হয় না। সে উত্তর দেয়, "উভয়ই।"

এক মিনিটের গল্প

জীবে দয়া

মনোজিৎ বসু

সর্ব জীবে দয়া প্রদর্শন শুধু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মেরই কথা নয়, হিন্দু ধর্মেরও সেই বাণী। ঈশ্বর যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সকল প্রাণীই সমান। তাই, বিশ্ব-সৃষ্টিকর্ত্তার এই সুন্দর রাজ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সর্বপ্রধান কাজই হ'লো, নিজেদের আত্মতুষ্টির জন্যে মনুষ্যেতর (অর্থাৎ, পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি) জীবের প্রতি হিংসা প্রদর্শন না করা। এই অহিংসার বাণীই শুনিয়ে গেছেন—বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য; আজও শোনাচ্ছেন এ-যুগের ঋষি মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু 'সর্ব জীবে দয়া বা অহিংসা' প্রদর্শনের মূল কথা আমাদের ক'জন লোকের অন্তর সত্যি সত্যি নাড়া দিয়েছে?

কিন্তু বহু দিন আগে নাড়া দিয়েছিল একটি কিশোর বালকের কিশোর মনকে। তার নাম খুব বিখ্যাত নয়, তার ছবিও ছাপা হয়নি কাগজে। কিন্তু একটি দিনের, ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে, তার কিশোর মনের যে সুন্দর ছবিখানি ফুটে উঠেছে, কোন দিনই তা অম্লান হবে না। ছেলেটির নাম গোবিন্দচন্দ্র রায়।

তার বয়স তখন দশ কি এগারো। এক দিন সে তার বাবা ও এক কাকার সঙ্গে নৌকোয় ক'রে পাবনা যাচ্ছিল। নদীতে তখন ছোট ছোট নতুন মাছ ওঠবার সময়। জেলেরা তাই মাছের ডিঙি বেয়ে জাল ফেলে মাছ ধরছে। গোবিন্দের বাবা মাছ খেতে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু ছোট মাছের চেয়ে বড় মাছই ছিল তাঁর প্রিয়। ভাগ্যক্রমে এক জেলের কাছ থেকে তিনি একটা মাঝারী আকারের বড় মাছ পেয়ে গেলেন। মাছটা নৌকোয় তুলতে দেখা গেল, তখনও তার প্রাণ আছে, দিব্যি ছটফট ক'রে লাফাচ্ছে। গোবিন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই মাছের দিকে। তার প্রাণে বড় লাগলো। সে ভাবলো, এই তাজা মাছটিকে তো এখুনি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাটা হবে, রান্না ক'রে খাওয়া হবে। আহা, মাছটির কি দোষ! মনের সুখে সে তার জলরাজ্যে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। মানুষই তো নিজেদের লোভ মেটাতে জাল ফেলে সেই মাছ ধরলো। এ ভারী অন্যায়। না না, যেমন ক'রেই হোক মাছটিকে বাঁচাতে হবে।

সে তখন তার মনের ভাব গোপন ক'রে তার বাবার কাছে গিয়ে বললে—"বাবা, মাছটিকে আমার হাতে দাও না! ওটি আমার মাছ।"

ছেলের এই আবদার শুনে বাপ মৃদু হেসে বললেন—"হাঁ বাবা, ওটি তো তোমারই মাছ। তুমি তুলে নাও। কিন্তু সাবধান, দেখো, হাত থেকে যেন জলে ফস্কে না যায়। একবার পিছলে গেলেই পালাবে, তখন আর ধরা যাবে না।"

গোবিন্দ বললে—"বা রে, আমি তো ওকে জলে ছেড়ে দেবার জন্যেই চাইছি।" এই বলেই সে এক পলকে সেই মাছটি তুলে নিয়ে জলে ছেড়ে দিল। প্রাণ পেয়ে মাছটি জলের অতল তলায় তলিয়ে গেল। গোবিন্দের চোখে-মুখে তখন গর্ব ও খুশির আনন্দ।

বাবার দিকে তাকিয়ে সে বিজয়ীর মতো ব'লে উঠলো—"যাকে তোমরা মারতে যাচ্ছিলে, আমি তাকেই বাঁচিয়ে দিলাম বাবা।"

গোবিন্দের বাবা ও কাকা অবাক্ হ'য়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক

মরণের হিম-পরশ

এই অল্পক্ষণ হলো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যার জলকণাবাহী উত্তুরে হাওয়া, সর্বাংগে যেন হিম-পরশ বুলিয়ে যায়।

সুজিতের বোনের বিয়ে।

যেতেই হবে, বার বার করে সুজিত বলে গেছে। তাছাড়া বিকালেও আর একবার কলকাতায় তাদের দোকান থেকে ফোন করেছিল: আসিস্ কিন্তু সুব্রত। তোর আবার যা ভোলা মন। না এলে মা-বাবা দুঃখ পাবেন, বিশেষ করে তাঁরা বলেছেন।

অতএব যেতেই হবে।

শীতের সন্ধ্যা! এর মধ্যেই কলকাতা সহরের বুকে ধোঁয়ার যবনিকা ঘন হয়ে উঠেছে। সুব্রত কোন মতে বেশ-ভূষা সেরে নিয়ে, গ্যারাজ থেকে গাড়ীটা বের করে, গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

যেতে হবে কোন্নগর।

ট্রেণেও অবিশ্যি যাওয়া চলত; কিন্তু কলকাতা হতে কোন্নগর মোটোর-ট্রিপটাও একেবারে নেহাৎ মন্দ হবে না।

সুজিতের বাবা আদিনাথ চক্রবর্ত্তী দীর্ঘকাল সরকার বাহাদুরের দপ্তরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি করে বছর পাঁচেক হলো অবসর গ্রহণ করেছেন।

আদিনাথের পৈতৃক ভিটা ছিল কোন্নগরে।

পূর্ব-পুরুষের একটা বহু কালের ভাংগা বাড়ী পৈতৃক ভিটার 'পরে অতীতের স্বাক্ষিস্বরূপ বহু কাল দাঁড়িয়েছিল; আদিনাথকে চিরটা কাল চাকুরীর খাতিরে এ দেশ ও দেশ করে বেড়াতে হয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও দেশের ভাংগা বাড়ীর দিকে নজর দিতে পারেননি, যদিচ পৈতৃক ভাংগা ভিটার সংগে অন্তরের একটা সূক্ষ্ম নাড়ীর টান বরাবরই অনুভব করে এসেছেন।

চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে জায়গা কিনে একটা ভাল রকম বাড়ী করবার জন্য।

আদিনাথ কিন্তু কারো কথাতেই কাণ দিলেন না, পৈতৃক ভিটার ভাংগা বাড়ীটা ভেংগে-চুরে বহু অর্থব্যয় করে অতি আধুনিক কেতায় কন্‌ক্রিটের এক ইমারত গড়ে তুললেন এবং বসবাস সুরু করলেন।

সংসারে তাঁর আপনার জনের মধ্যে স্ত্রী ভগবতী দেবী, পুত্র সুজিত ও একটি মাত্র মেয়ে সুজাতা।

ঐ সুজাতারই আজ বিয়ে।

সুজিত সুব্রতর সংগে বাঁকুড়া কলেজে এক বছর পড়েছিল, সেই হতেই দু'জনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে।

সুজিত বি, এস্-সি পাশ করে কলকাতার গড়িহাটা অঞ্চলে এক মস্ত ঔষধের দোকান খুলেছে। তার মতে বাণিজ্যের দ্বারাই না কি আবার অভাগা বাংলার ঘরে লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব হবে।

সহরের একেবারে একটেরে ষ্টেশনেরও ওধারে আদিনাথের বাড়ী। ওদিকে যাওয়ার দু'টো রাস্তা আছে। একটা কাঁচা অপ্রশস্ত সড়ক ষ্টেশনের ওভার-ব্রীজটার নীচ দিয়ে বরাবর চলে গেছে। সর্টকাট।

এদিকে মানুষের বসতি খুবই কম। গরীব গৃহস্থ দু'-পাঁচ ঘর আছে, আর আছে কোন্নগরের প্রাচীন জমিদার শ্রীবিলাস রায়-চৌধুরীদের চক-মিলান বাড়ী।

প্রথমেই পড়ে আদিনাথের বাড়ী, সেখান হতে পোয়াটেক মাইল দূরে জমিদার-বাড়ী। কাঁচা মাটির সড়কটা, তার দু'পাশে পোড়ো মাঠ ও ধানের ক্ষেত। রাস্তায় কোন আলোর সুব্যবস্থা নেই, তবে হাত দশ-বার তফাৎ তফাৎ কেরোসিনের বাতী আছে, সে'ও জমিদারেরই ব্যবস্থা। রাস্তায় বেশ একটু কাদা হয়েছে। রাত্রি তখন বোধ করি আটটা হবে।

আশে-পাশে চারি দিক্ ভয়ঙ্কর স্তব্ধ। মাথার 'পরে রাত্রির সদ্য মেঘ-মুক্ত নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ। সুব্রত আপন মনে সাবধানতার সংগে কাঁচা সড়কের 'পর দিয়ে খানা-গর্ত বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে চলেছে। সর্টকাটই চিরকাল সে পছন্দ করে।

সহসা ওর গাড়ীর সুতীব্র ফ্রন্ট লাইটের আলোয় ও দেখতে পেলে, রাস্তার দক্ষিণ ধার ঘেঁষে একটা সিডিন্-বডি গাড়ী দাঁড়িয়ে, সামনের আলো দু'টো তার জ্বলছে, এবং গাড়ীর ঠিক দরজার সামনেই এক জন অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত যেন দাঁড়িয়ে আছে।

সুব্রত গাড়িটার কাছাকাছি এসে ব্রেক কষে নিজের গাড়িটা থামাল। সুব্রতর গাড়ীর হেড-লাইট দু'টো তখনও জ্বলছে। রাস্তার বহু দূর পর্য্যন্ত দিনের মত স্পষ্ট আলোকিত হয়ে উঠেছে সেই আলোয়।

সুব্রত অন্য গাড়ীটার পাশে দণ্ডায়মান লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটি বয়সে যুবা।

মাথায় বড় বড় চুল, দেখলেই মনে হয় চিরুণীর সংস্পর্শ তাতে কোন দিন বড় একটা পড়ে না, চোখে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা।

সমগ্র মুখখানিব্যাপী একটা সমস্ত কষ্টলব্ধ আত্মসংযমের প্রচেষ্টা।

গায়ে একটা কালো রংয়ের পুরাতন ওভারকোট। হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত তার ঝুল, ভারী কলারটা উল্টান। দু'টো হাত ওভারকোটের দু'পাশের পকেটে প্রবিষ্ট।

স্থির নিশ্চল চিত্রার্পিতের মত যুবক দাঁড়িয়ে। পায়ে একটা কাবুলী স্যাণ্ডেল।

সুব্রতই গায়ে পড়ে প্রশ্ন করলে, আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি কি? গাড়ীর কল-কব্জা সম্পর্ক আমার সামান্য একটু-আধটু জ্ঞান আছে।

কিন্তু যুবক নিরুত্তর। যেন সুব্রতর কথা শুনতেই পায়নি।

হঠাৎ সুব্রতর দণ্ডায়মান গাড়ীটার সামনের উইণ্ড স্ক্রীনের 'পরে নজর পড়তেই ও যেন চমকে উঠে। গাড়ীর সামনের কাচটায় একটা বড় ফুটো এবং কাচটায় অসংখ্য চিড় খেয়ে গেছে। ওর অনুসন্ধিৎসু মনের গোড়াতে যেন একটা নাড়া লাগে। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করে।

বিস্ময় ওর ক্রমেই বেড়ে চলে।

কে এক জন গাড়ীর সামনের সিটে বসে আছে, তার মাথাটা গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলের 'পরে যেন ঝুলে পড়েছে।

সুব্রত আরো একটু গাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসে। এবং দণ্ডায়মান যুবকটির পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পকেট হতে শক্তিশালী টর্চ্চ বাতিটা বের করে গাড়ীর মধ্যে আলো ফেলে : একটু ভাল করে দৃষ্টিপাত করতেই ওর চোখে পড়ে, গাড়ীর সামনের সিটে উপবিষ্ট লোকটির ডান দিক্‌কার কপাল হতে একটা রক্তধারা নেমে এসে ডান দিক্‌কার সমস্ত মুখখানি রক্ত-রাংগা করে তুলেছে।

সুব্রত ডান হাত দিয়ে পাশের দণ্ডায়মান যুবকটিকে একটু ঠেলেই গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেলল এবং উপবিষ্ট লোকটির নাকের কাছে ও বুকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে পারলে লোকটি অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে।

মৃত লোকটির বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে হবে। মাথার অধিকাংশ চুলই প্রায় পেকে গেছে। গায়ে একটি পুরাতন ভায়লার বাদামী রংয়ের পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি।

সুব্রত যুবকটির দিকে এবারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। যুবক তখনও একই ভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। মৃত ব্যক্তির বাঁ হাতটা তখনও ষ্টিয়ারিং হুইলের 'পরে রক্ষিত, সেই হাতের কব্জীতে একটা সোণার ব্যাণ্ডে সোণার রিষ্টওয়াচ, ঘড়িটা তখনও চলছে, ঘড়িতে তখন ৮টা বেজে ১৫ মিঃ।

সুব্রত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলো, 'আপনার নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?'

'আপনার কি তাতে কোন প্রয়োজন আছে ?' যুবকটি এতক্ষণ পরে প্রথম রূঢ় স্বরে জবাব দিল।

'জানেন, আপনি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন ?'

'অপরাধ ?'

'অপরাধ আপনার সত্যিই কিছু আছে কি না, তার বিচার পুলিশের কর্তৃপক্ষই করবেন, কিন্তু এই লোকটির মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?'

'আমি কিছুই জানি না। আমি ওকে খুন করিনি।'

'খুন করেননি, কিন্তু এখানে তবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? পুলিশের সন্দেহ ত' আপনার 'পরেই প্রথমে পড়বে। আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন ?'

'পনের মিনিট হবে।'

'আপনি এখানে আসবার আগেই ইনি খুন হয়েছেন ?'

'হ্যাঁ'...যুবকের কণ্ঠস্বরে যেন দ্বিধার সংকোচ।

'আপনি এসে দেখেছেন উনি মরে আছেন ?'

'এ্যাঁ...না...হ্যাঁ!'...আবার কণ্ঠে সেই দ্বিধা।

'আপনি লোকটিকে চেনেন ?'

'চিনতাম।'...

'নাম কি জানেন ?'

'শংকর ঘোষ!' বলতে বলতে যুবকটি যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে যাবার জন্ত পা বাড়াল।

'কোথায় যাচ্ছেন ?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'আমার বাসায়।'

'আপনার পকেটে উঁচু হয়ে আছে ওটা কি ?...দেখি।'

যুবক সুব্রতর কথায় রীতিমত চঞ্চল হয়ে ওঠে: 'না, কিছুই না।...'

'দেখি' : সুব্রত এগিয়ে এসে যুবকের ডান হাতটা সজোরে চেপে ধরে এবং আকর্ষণ করতেই ওভারকোটের পকেট হতে হাতটা বের হয়ে আসে। যুবকের হস্তধৃত একটি ছোট্ট অটোমেটিক আমেরিকান পিস্তল। সুব্রত যুবকের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে, তার মুষ্টি হতে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল, 'এটা কার ? আপনারই বোধ হয় ?'

পিস্তলটি ছয় গুলীর, সুব্রত পিস্তলের চেম্বার খুলে দেখল, গুলী একটিও ছোড়া হয়নি, ছয়টি খোপে ছয়টি গুলীই মজুত আছে তখনো।

সুব্রত পিস্তলের খোপ হ'তে গুলীগুলো বের করে নিয়ে পকেটের মধ্যে রেখে দিল। এবং পরে যুবকের হাতে গুলীশূন্য পিস্তলটা ফেরত দিয়ে বললে, 'যান। এখন আপনি যেতে পারেন।'

যুবক আর দ্বিধা মাত্র না করে পিস্তলটা নিজের ওভারকোটের পকেটে ফেলে দ্রুতপদে মাঠের মধ্যে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

সুব্রতর চিন্তা

যুবক অন্ধকারে অদৃশ্য হবার পরও সুব্রত পাঁচ-সাত মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

সমগ্র ব্যাপারটাই যেন আগাগোড়া কেমন একটা রহস্যে মোড়া বলে সুব্রতর কাছে মনে হলো। অনেকগুলো প্রশ্ন ততক্ষণে তার মাথার মধ্যে ভিড় করে একসংগে এসে ঠেলাঠেলি সুরু করেছে।

যুবকটি কে ?

আর যে লোকটি খুন হয়েছে, সেই বা কে ? কে-ই বা এই নির্জ্জন রাস্তায় এমন সন্ধ্যায় তাকে খুন করে গেল ? যুবকটি যে খুন করেনি সুব্রতর এত দিনকার গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতা থেকেই সুস্পষ্ট বুঝেছে। কিন্তু যুবকটি এখানে কি করছিল ? পকেটে তার পিস্তলই বা ছিল কেন ? যুবক নিশ্চয়ই লোকটার সংগে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু পিস্তলই বা সংগে করে সে এনেছিল কেন ? আশ্চর্য্য ! যুবকটিকে সে যেতেই বা দিল কেন ? উচিত ছিল না কি তার যুবকটিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া ?

সুব্রত আবার কি ভেবে গাড়ীর মধ্যস্থিত মৃত লোকটির জামার পকেটগুলি ভাল করে খুঁজেও দেখলে, না বিশেষ কিছু নেই। কেবল নীচের একটা পকেটে গোটা দশেক টাকা—নোটে ও খুচরায় মিলিয়ে। একটা সাধারণ কেলিকো মিলের রুমাল, আর একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। লোকটার নাম শংকর ঘোষ।

সুব্রত জানত, এ রাস্তাটা একটু নির্জ্জন, তবে সুজিতদের বাড়ীতে যেতে হলে আরো একটা ভাল রাস্তা আছে, যদিচ সেটা একটু ঘুরে, তবু লোক-জন সেই রাস্তা ধরেই বেশী চলাচল করে। এ রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার পর বড় কেউ একটা আসা-যাওয়া করে না। তবু এ রাস্তাটা শর্টকার্ট বলে সুব্রত এ রাস্তা দিয়েই আসছিল। সুব্রত চিন্তিত মনে আবার গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। কি এখন সে করবে ? কি তার এখন করা উচিত ? গোয়েন্দাগিরি সে এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছে বটে, পুলিশের চাকুরী ত আগেই ছেড়েছে। তবুও পুরাতন নেশার মত মাঝে মাঝে মনটা যেন কেমন আনচান্ করে উঠে। খুনের গন্ধ পেয়েই মনটা তার চনচন হয়ে উঠেছে।

না। পুলিশে একটা সংবাদ দেওয়া কর্তব্য।···কোন্নগরের থানা-ইনচার্জ সুশান্ত সেনকে সে চেনে। তার অনেক জুনীয়ার।

সুব্রত গাড়ী ফিরিয়ে আবার সহরের দিকে গাড়ী চালাল।

ট্রাংক রোডের কাছেই কোন্নগর পুলিশ আউটপোষ্ট।

সুশান্ত তখন থানাতেই ছিল, সুব্রতকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সে মুখ তুলল: 'আরে, মিঃ রায় যে। কি সংবাদ? হঠাৎ পথ ভুলে না কি?'

'পথ আর ভুলতে পারলাম কোথায়, ভাই। অনেক দিনের অভ্যস্ত নেশা, আমি ছাড়লেও কমলী ছোড়তা নেহি।'

'বসুন মিঃ রায়, আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন।'

'না, আর বসবো না ভাই, এসেছিলাম এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে, পথে একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় আপনাকে বলতে এলাম। এখনো I remain yours most obediant servantএর নেশাটা ভাগ করে কাটাতে পারিনি। শুনুন, ষ্টেশনের ও-পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বরাবর গ্রামের মধ্যে চলে গেছে, সেই রাস্তায় একটা সিডন-বডি মরিশ গাড়ীর মধ্যে একটি বয়স্ক লোক খুন হয়ে আছে।'

'ওয়াট!···খুন!···' সুশান্ত বাবু এক প্রকার যেন লাফিয়েই উঠেন।

'হাঁ, খুন।···আপনার উচিত এখনি একবার গিয়ে দেখে আসা।'

'ঠাট্টা করছেন না ত স্যার? এই শীতের রাত্রে।'

'ঠাট্টাই বটে, তবে আর দেরী না করাই ভাল। আচ্ছা, আসি ভাই। গুড্ নাইট।'

রাত্রি প্রায় সোয়া নয়টা হয়ে গেল, বিয়ে-বাড়ীতে যেতে হবে। সুব্রত ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে গেল।

* * * *

এবার আর সুব্রত সেই পথ দিয়ে না গিয়ে, ঘোরা পথ দিয়েই সুজিতদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

এ পথেও লোক-চলাচল যে খুব বেশী তা নয়, তবে আগের পথটার তুলনায় এ পথটায় লোক-চলাচল ঢের বেশীই বলতে হবে।

বিশেষ করে ঐ দিন ধনী আদিনাথের বাড়ীর বিবাহ উপলক্ষে চলাচলটা যেন আরো একটু বেশীই মনে হয়।

রাস্তাটাও খুব বেশী প্রশস্ত নয়। তবে আগের রাস্তাটার মত এটা কাঁচা নয়, ইট-খোয়া দিয়ে মিউনিসিপালিটির পক্ষ হতে কতকটা চলনসই।

রাস্তার দু'পাশে দোকান-পাটও কিছু আছে।

গোটা দুই ডাক্তারখানা, একটা ছোট-খাটো বাজার, একটা রেঁস্তোরা। একটা এম, ই, স্কুল।

রাস্তার দু'ধারে হাত সাত-আট দূরে দূরে কেরোসিনের বাতী।

সুব্রত একটু সাবধান হয়েই গাড়ী চালাচ্ছিল।

মনটা কিন্তু তখনও নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে ঘূরপাক খেয়ে ফিরছিল।

যে ব্যাপারটা সে সুশান্তর হাতে তুলে দিয়ে ভেবেছিল সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, সেই শেষ হওয়ার পরেও যেন একটা কি ধোঁয়ার মত ক্রমেই মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল।

যুবকটি কে? নামটা সে বললে না। সুব্রতও তাকে পেড়াপীড়ি করলে না।

শংকর ঘোষই বা কে?

সুশান্তকে ঘটনাটা বিবৃত করবার সময় কতকটা ইচ্ছা করেই অবিশ্যি সুব্রত ঐ যুবকটির সেখানে উপস্থিতি সম্পর্কে কোন আভাষই দেয়নি।

সে নিজেও বুঝতে পারছিল না, কেন ও-যুবকটির কথা সুশান্তর কাছে এমন ভাবে গোপন করে গেল।

বলা হয়ত তার উচিত ছিল।

যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই সুব্রত বুঝেছিল, এমন একটা কিছু ঘটেছে যা অন্ততঃ সে মোটেই আশা করেনি। সে যেন আচমকা একটা অভাবিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে। সুশান্ত কি ব্যাপারটার কিনারা করতে পারবে? আর না পারলেই বা তার কি? বলা তার কর্তব্য, তা সে সুশান্তকে বলেছে।

সুব্রত আদিনাথের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে নামল।

মস্ত বড় বাড়ীটা যেন আলোর মালা গলায় ঝুলিয়ে নববধূর মত সেজেছে।

লোহার গেটের সামনে, কদলী বৃক্ষ ও সিন্দুর-চর্চিত মাটির মঙ্গল কলস।

সানাইয়ের সুমধুর আলাপে, অভ্যাগতদের কলহাস্যে সমগ্র বাড়ীটা যেন সরগরম।

আনন্দের যেন একটা অখণ্ড সুর! এরই সংগে মিলিয়ে চকিতে সুব্রতের মনে ভেসে ওঠে কিছুক্ষণ আগে দেখা রাস্তার 'পরে নিষ্ঠুর মৃত্যুর সেই ভয়ংকর স্তব্ধতা।

কেন মানুষের এই ইচ্ছাকৃত মরণ-বিলাস?

এই পৃথিবীর বুকেই দুঃখের অন্ত নেই, নানা রূপে নানা ভংগীতে নিত্য মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করছেই, তবে সাধ করে কেন আবার তার মধ্যে টেনে আনা মৃত্যুর ভয়ংকরতাকে?

কেন এ লোভ! কেন এ অশান্তি!

দরজায় গোড়াতেই সুজিতের সংগে দেখা হয়ে গেল: 'এই যে সু! এত দেরী হলো যে? নিশ্চই ভুলে গেছিলি?'

'সব সময় ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তাছাড়া, তোর ঘন ঘন তাগিদ।'

'চল চল, উপরে চল। বাবার সংগে দেখা হয়েছে?'

'না, শোন সুজিত, তোর সংগে একটা কথা আছে। তোর ঘরে চল।'

সুজিত বিস্মিত হয়ে সুব্রতের মুখের দিকে তাকায়: 'কি ব্যাপার?'

'বিশেষ কিছুই না। চল না।'

'চল।'

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় সুজিতের ঘরের দিকে চলল।

তেতলায় ঐ মাত্র একখানিই ঘর।

নির্জনতাপ্রিয় সুজিতের মন ঐ ঘরটাকেই বেছে নিয়েছিল।

দু'জনে এসে তালা খুলে ঘরে প্রবেশ করল।

সুজিত সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাতে যাচ্ছিল, বাধা দিলে সুব্রত, 'থাক, আলো জ্বালাস্ নে। অন্ধকারই বেশ ভাল।'

তিন

অসীম ও সুসীম

যুবকটি অন্ধকারে মাঠের মধ্যে নেমে যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে চলতে লাগল।

কিছু দিন আগে হৈমন্তিকের ফসল কাটা হয়েছে, পায়ের নীচে ফসলের গোড়াগুলো লাগে, তাছাড়া মাটি এবড়ো-খেবড়ো, শক্ত।

যুবক মাঝে মাঝে হোঁচট্‌ও খাচ্ছিল, কিন্তু কোন দিকেই তার যেন আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

পিছন হতে কে যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

মাঠের মধ্য দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ এঁকে-বেঁকে অনেক দূর চলে গেছে, একেবারে সহরের শেষ সীমান্তে।

সেখানে কয়েক ঘর গরীব দুঃস্থ গৃহস্থের বাড়ী।

যুবক তারই একটা ছোট একতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়ীর দরজাটা খোলাই ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল।

অন্ধকার একটু গলি-পথ, তার পরই পাশাপাশি তিনখানা ঘর। সামনে একটু আংগিনা, আংগিনার ও-ধারে টালীর ছাওয়া একটি ছোট রান্না-ঘর ও তার পাশে স্নানের জায়গা ও কুয়া-তলা।

যুবক একটি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে একটা ময়লা হ্যারিকেন বাতী আলোর চাইতে ধূম্রোদ্গিরণই করছে বেশী।

ঘরটা মাঝারী আকারের।

ঘরের দুই দিকে দু'টি তক্তাপোষ পাতা। একটা দড়ির আলনায় খানকতক জামা-কাপড় ঝুলছে, ঘরের মধ্যিখানে একটা ক্যাম্বিসের 'ইজি চেয়ারের' 'পরে বসেছিল আর একটি যুবক। যুবকের বেশ-ভূষা অতি সাধারণ, প্রথম যুবকটি ঘরে ঢুকতেই, উপবিষ্ট যুবকটি লাফিয়ে উঠলো, 'দেখা হলো দাদা?'

দাদা অসীম, ছোট ভাই সুসীমের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাই সুসীমের দিকে তাকাল, 'আজ আবার কোথায় বের হয়েছিলে সুসীম? সারাটা দিন তুমি কেন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও? কত বার না তোমাকে নিষেধ করে দিয়েছি অমনি করে যেখানে-সেখানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে না?'

'কোথায় আর ঘুরে বেড়ালাম দাদা, যাওয়ার মধ্যে ত এক কালীতারা রেষ্টুরেন্টে যাই।'

'আবার সেই 'কালীতারা' রেষ্টুরেন্টে গেছিলে? সবার সংগে খানিকটা আবোল-তাবোল বকর-বকর করে বকে এসেছ ত?'

'আবোল-তাবোল কেন বকতে যাবো আমি? হুঁ। আমাকে তেমনি ছেলেই পেয়েছো কি না? একেবারে 'স্পিক্‌টি নট্‌'। সর্ব্বদাই ত মুখ বুজে আছি, হুঁ হুঁ বাবা, কেন যে আমরা এখানে এসেছি সে আমি কাউকেই বলছি না। হ্যাঁ, সে তুমি দেখে নিও দাদা। এই] আজও 'কালীতারায়' সুরেশ বাবু শুধোচ্ছিলেন, আমরা কেন এখানে এসেছি। আমাদের বাড়ীতে কে কে আছে। তুমি শ্রীরামপুর জুট মিলে চাকরী ক'দিন করছো? তা আমি একটা কথারও জবাব দিয়েছি কি? হাঁ দাদা, শংকর বাবু এলেন না কেন?'

সুসীমের কথায় অসীম ক্রমেই বিরক্ত হচ্ছিল, গম্ভীর কণ্ঠে বলে জবাব দিল, 'তাতে তোমার কি প্রয়োজন? ও-সব ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। সুসীম, আবার তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি, তোমার ঐ গায়ে-পড়া আলাপের বাতিক যদি না ছাড়, সব ভেস্তে যাবে, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তোমার বাড়ী থেকে বেরুনর কি দরকার শুনি?'

'তোমার এই খাঁচার মত অন্ধকার ঘরে আমি সারা দিন ভূতের মত বসে থাকতে পারি না দাদা। ও কি দাদা, তোমার রুমালে লাল রং কিসের?···ইঃ দেখি, দেখি?'

অসীম পকেট হতে রুমালটা বের করে মুখ মুছছিল, ছোট ভাই সুসীমের কথায় চমকে উঠে বললে, 'কই?'

সমস্ত সাদা রুমালটাই রক্তের দাগে ভর্ত্তি!

'এ কি! এ যে রক্ত! এত রক্ত এল কোথা হতে তোমার রুমালে দাদা?'

- 'ও কিছু না!···চেঁচাস্‌নে চুপ কর।'

অসীম রুমালটা ছোট ভাইয়ের চোখের আড়াল করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে।

-সুসীমের মনের কোণে যেন কিসের একটা অস্পষ্ট সন্দেহ কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ে। সে ভাল করে তার দাদার মুখের দিকে তাকায়।

'দাদা, রুমালে তোমার অত রক্ত কিসের?'

'আঃ! চেঁচাস্‌ নে সুসীম, চুপ কর!···' অসীম ভীত-ত্রস্ত ভাবে ভাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে; 'শংকর বাবুকে যেন কে খুন করে গেছে, আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই।'

'খুন! সে কি?···'

'হুঁ, খুন! কিন্তু এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।'

'আমার যেন কেমন ভয় করছে দাদা!'

'তোমার ভয়টা কিসের এত শুনি?···'

'ভয় নয়, দাদা? পুলিশ আসবে, ধর-পাকড় সুরু হবে।'

'তাতে তোমার-আমার কি?'

'চল দাদা, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।'

'না, যে কাজে নেমেছি, সে কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এক পা-ও নড়ব না। না না, এ কিছুতেই হতে দেবো না।'

'কিন্তু দাদা, তোমাকে যদি ওরা ধরে নিয়ে যায়?'

'কী পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছো সুসীম! কে আমাদের ধরবে, কেনই বা আমাদের ধরবে?···দু'টো দিন তুমি কোথায়ও বেরুবে না সুসীম।'

সুসীমের জন্য অসীমের চিন্তার কারণ আছে বৈ কি। সুসীমকে লেখা-পড়া শেখানর জন্য অসীম কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বুদ্ধিটা তার চিরকালই বেশ মোটা। কোন দিনই সে লেখা-পড়ার ধার দিয়েও যায়নি। বন্ধু-বান্ধবের সংগে আড্ডা দিয়ে হাসি-গল্পে জীবন কাটিয়েছে। তাছাড়া তার প্রধান একটা দোষ, বড় বেশী রকম আবোল-তাবোল কথা বলে। এবং কথায় কথায় ভীষণ চটে উঠে। রাগের মাথায় সে করতে পারে না, এমন কোন কাজই নেই। তাছাড়া তার আর একটা বিশ্রী অভ্যাস—সিদ্ধি খাওয়া। হাজার বলেও অসীম সুসীমকে সিদ্ধির নেশা ছাড়াতে পারেনি।

চার

পরের দিন

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সুব্রত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলে, তার পর বললে, 'শংকর ঘোষ বলে কাউকে তুমি চেন সুজিত? এই আশেপাশে ঐ নামের কোন লোক আছে বলে জান?'

'শংকর ঘোষ!...'

'হাঁ। বয়েস তার পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে হবে, মাথার চুল অর্দ্ধেক কাঁচা-পাকা। রোগা রোগা চেহারা। গায়ের রং কালো।'

'হাঁ। এক শংকর ঘোষ আছে ঐ জমিদার-বাড়ীতে। তারও ঐ রকমই চেহারা ও বয়স।'

'জমিদার-বাড়ীতে?'

'হাঁ, এখানকার ভূতপূর্ব্ব জমিদার শ্রীযুক্ত চৌধুরীর খাস্তের শংকর ঘোষ।'

'জমিদার-বাড়ী এখান থেকে কত দূর?'

'এখান থেকে আধ মাইল-টাক হবে।'

'জমিদারের গাড়ী আছে?'

'হাঁ, বেশ অবস্থাপন্ন জমিদার। দু'টো গাড়ী আছে, একটা পুরাতন মিনার্ভা গাড়ী, আর একটা তার ভাগ্নে আশুতোষ বাবু কিনেছেন, মরিশ গাড়ী।'

'হুঁ!'...

'ব্যাপার কি বল ত? তোমার কথার ভাবে মনে হচ্ছে, যেন কি একটা ঘটেছে।'

'আমার আসবার দেরী দেখে তুমি ভেবেছিলে আমি পথ ভুলে গেছি সুজিত! কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ঠিক সময়ের কিছু আগেই এখানে এসে হয়ত পৌঁছাতাম। এবং সেই জন্য যে রাস্তাটায় এলে 'শর্টকাট' হয়, সেই রাস্তাটা দিয়েই আসছিলাম। পথের মাঝখানে দেখি এক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এবং অমন সময় ঐ রকম জায়গায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগে; তাই গাড়ী থেকে নেমে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি, গাড়ীর মধ্যে এক জন বসে আছে, তার কপালে গুলী লেগেছে, সমস্ত মুখটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।'

'মানে?'...বিস্ময়ে সুজিতের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠে।

'হাঁ, লোকটা মৃত। তার পকেটে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল, তাই থেকে জানতে পেরেছি, লোকটার নাম শংকর ঘোষ। এবং সেই জন্যই তোমাকে একটু আগে প্রশ্ন করছিলাম, শংকর ঘোষ বলে কাউকে তুমি চেন কি না? মানে, লোকটা আশে-পাশেরই কেউ কি না? তোমরা ত অনেক দিনই এখানে আছ।'

'কি সর্বনাশ!...খুন?'

'হাঁ, খুনই করা হয়েছে লোকটাকে।'

'তার পর তুমি কি করলে?'

'কি আর করবো, তোমাদের কোন্নগর থানার ও, সি, সুকান্ত সেনকে আমি চিনি, তাকে ইনফর্ম করে এসেছি, এতক্ষণে সে হয়ত অকুস্থানে পৌঁছে তদন্তও শুরু করে দিয়েছে।'

'তোমার মতে তাহলে-লোকটা খুনই হয়েছে, সুব্রত?'

'হাঁ। সে বিষয়ে আমি স্থির-সিদ্ধান্ত। লোকটাকে খুব কাছের থেকে গুলী করা হয়েছে, যাতে গাড়ীর সামনের উইণ্ড স্ক্রিনের কাচটার গায়ে অনেক চিড় খেয়ে একটা ফুটো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা, লোকটা যদি 'সুইসাইড' ই করতো, অমন করে কপালে গুলী করতো না, এবং করলেও, গুলীর entrance ও exit দু'টো ঠিক সোজাসুজি স্ট্রেট লাইনে হতো না। হওয়া লজিক্যালি সম্ভব নয়। তৃতীয় কথা, সে যদি নিজেকে নিজে গুলী করেই থাকবে, তবে পিস্তলটা তার কোথায় গেল। চতুর্থ কথা, wound-এর entranceএ কোনও charring নেই। লোকটাকে খুনই করা হয়েছে। এবং খুব নিকট থেকেই গুলী করা হয়েছে। কিন্তু যাক্ গে ও-সব কথা, ইচ্ছা না থাকলেও সুশান্ত আমাকে রেহাই দেবে না। এখন চল, নীচে নেমে উৎসবে যোগদান করা যা'ক্।'

খোলা জানালা-পথে সানাইয়ে সুমধুর টোড়ীর আলাপ ভেসে আসছে।

নিমন্ত্রিতদের কলহাসির শব্দ!

দু'জনে নীচে নেমে গেল।

সে রাত্রে বিবাহ শেষ হয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতেই রাত্রি সাড়ে তিনটা গেল বেজে। সুজিত আর অত রাত্রে সুব্রতকে যেতে দিতে চাইল না কিছুতেই।

ভোর বেলা হাত-মুখ ধুয়ে চা ও জল-খাবার খেয়ে সুব্রত সুজিতদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল।

একবার সুশান্তর সংগে দেখা করে যেতে হবে।

সুশান্ত সুব্রতকে দেখে অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন, আসুন মিঃ রায়! আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, না এলেও আমি যেতাম আপনার কলিকাতার বাসায়। ভেবেছিলাম আপনি হয়ত রাত্রেই ফিরে গেছেন। আপনিই বলতে গেলে প্রথম আবিষ্কারক, চা খাবেন ত?'

'আপত্তি নেই।'

'রঘুবীর,বাড়ীর মধ্যে বলে পাঠাও দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।'

কাল সারাটা রাত ভাল ঘুম হয়নি, সুব্রতর ঘুম পাচ্ছিল, সে হাই তুলল একটা।

'কাল ফিরেছি প্রায় রাত্রি দুইটায়', সুশান্ত বললে।

'কিছু materials পেলেন?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'যা পেয়েছি, সেটা খুব আশাপ্রদ বলে মনে হয় না, মিঃ রায়! আপনি ত আমাকে সংবাদ দিয়ে চলে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটায় আপনার কথাটা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। হাঁ, একটা কথা কাল আপনাকে একেবারেই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছিলাম, সুব্রত বাবু।'

'কি?'

'আচ্ছা, কাল রাত্রে রাস্তার ধারে গাড়ীতে যখন শংকর ঘোষের মৃতদেহ আপনি দেখেছিলেন, তখন কাউকে কি আর সেখানে, মানে, আশে-পাশে দেখতে পাননি?'

'না, খুনীকে দেখতে পাইনি!' সুব্রত মৃদু হেসে বললে।

'খুনী মানে, আপনারও কি ধারণা, এটা একটা মার্ডার কেস?'

'কেন আপনার তাতে আপত্তি আছে না কি সুশান্ত বাবু?' মৃদু ভাবে সুব্রত প্রশ্ন করে।

'না, তবে...'

'তবে কি ?···মৃতদেহ পর্য্যবেক্ষণ করলেই ত' সে conclusionএ আসা যায়।'

একটি অল্প-বয়েসী উড়িয়া ভৃত্য ট্রের 'পরে বসিয়ে ধূমায়িত দু'কাপ চা নিয়ে এল। সুব্রত হাত বাড়িয়ে একটা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল, 'আঃ! এখন বলুন দেখি, আপনি কি জেনেছেন? লোকটার পরিচয় কিছু পেলেন?'

'হাঁ। লোকটার নাম শংকর ঘোষ। এখানকার ভূতপূর্ব ধনী জমিদার শ্রীবিলাস চৌধুরীর নায়েব ছিলেন। শ্রীবিলাস চৌধুরী আজ বছর আড়াই হলো মারা গেছেন। তাঁর সম্পত্তির এখন উত্তরাধিকারী, মানে, বর্ত্তমান জমিদার অমুতোষ রায় তাঁর ভাগ্নে।'

'শ্রীবিলাস চৌধুরীর আর কোন ওয়ারিশন নেই? ভদ্রলোকের ছেলে-পেলে কিছু ছিল না?'

'সে-ও এক ইতিহাস। সে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হবে, শ্রীবিলাস চৌধুরীর সন্তোষ নামে এক পুত্র ছিল। বাপের সংগে ছেলের কোন কারণে গোলমাল হওয়ায় হঠাৎ এক দিন রাত্রে সন্তোষ চৌধুরী বাড়ী ছেড়ে উধাও হয়ে যান। সন্তোষের বয়েস তখন ২৮।২৯ হবে।'

'কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল বাপ-ছেলেতে, কিছু শুনেছেন?'

'না।···অমুতোষ বাবু সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারলেন না।'

'তার পর?'

'তার পর, বছর দুই-তিন শ্রীবিলাস বাবুও ছেলের 'পরে রাগ করে নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কোন খোঁজ-খবরই নেন্‌নি। তার পর আবার না কি ছেলের খোঁজ-খবর করা সুরু করেন। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, পুলিশেও সংবাদ দেন। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট ছেলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। এবংসরবার কিছু দিন আগে একটা সংবাদ পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে না কি সন্তোষ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক হোটেলে হঠাৎ খুন হয়েছেন, তাঁর ছবি হতে এবং অন্যান্য সংবাদ হতে প্রমাণ হয়, সেই সন্তোষই শ্রীবিলাস বাবুর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র। এই সংবাদের পর বৃদ্ধ শ্রীবিলাস যেন আরো ভেংগে পড়লেন, এবং এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি সন্তোষের মৃত্যুর পর সংবাদ নিয়ে জেনেছিলেন, সন্তোষ অবিবাহিত ছিল, সেই জন্যই শেষ সময়ে একমাত্র মৃতা বোনের একমাত্র ছেলে অমুতোষ বাবুকে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান। সেই উইল অনুসারেই শ্রীবিলাস চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্নে অমুতোষ রায়ের হাতেই অত বড় সম্পত্তি এসে যায়।'

'সম্পত্তির আয় কত হবে জানেন কিছু?'

'শ্রীবিলাস বাবুর শুধু যে জমি-জমাই আছে বিস্তর, তা নয়; শ্রীরামপুরে একটা কাপড়ের ও একটা জুট মিলও আছে। সম্পত্তির ও মিলের আয় নিয়ে তা বাৎসরিক প্রায় ২০।২৫ লক্ষ টাকা ত হবেই।'

'হুঁ, বেশ বড় শিকার!···শ্রীবিলাস বাবুর মৃত্যু হয়েছিল কিসে?'

'প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়েস হয়েছিল, নিমুনিয়ায় ভুগে মরেন শোনা গেল।'

'এই অমুতোষ বাবু লোকটি কেমন?'

'যেমন ভদ্র তেমনি অমায়িক। সম্পত্তি পাওয়ার আগে পাকশী স্কুলে হেড-মাষ্টারী করতেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী, বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। সংসারে আপনার বলতে একটি ২৪।২৫ বছরের বোন আছে। সে-ও কোন এক স্কুলে টিচারী করছিল, অর্থের অভাবে এত দিন বিবাহ দিতে পারেননি। এখন চেষ্টা-চরিত্তির করছেন।'

'তা, এত বড়লোক মামা থাকতে ভগ্নীর বিবাহ হলো না কেন এত দিন?

'মামার সংগে না কি শুনেছি একেবারেই সদ্ভাব ছিল না।'

'আশ্চর্য্য! তবু তাকেই তিনি সমস্ত সম্পত্তিটা দিয়ে গেলেন।'

'হাঁ। আশ্চর্য্যই বটে! তবু অমুতোষ বাবু লোকটাকে যেন কেমন লাগল?'

'কেন?'

'যদিও ভদ্র এবং অমায়িক, তবু যেন কি এক রকমের।'

'মানে?'

তার এক খুড়তোত ভাই মা-বাপ মরা ছেলে, ওর কাছে থেকেই মানুষ। ছেলেটির নাম সুবিমল। বেশ ছেলেটি। তাকে এবার ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে বাড়ীতে বসিয়ে রেখেছেন। আর পড়তে দেননি। অথচ শুনলাম ছেলেটির পড়বার না কি খুব সখ। লেখা পড়াতেও মন্দ নয়। সে তার দাদাকে পড়বার কথা বললেই, অমুতোষ বাবু না কি বলেন, আমি শ্রীঅমুতোষ রায়। তখনকার কালের বি-এ, বি, টি, আমি এত দিন কি করেছি না, পাকশীর ভাগাড়ে পড়েছিলাম। এই ত লেখা-পড়া শিখে আর কি হবে?···ভদ্রলোক এত বড় ধনী হয়েছেন মামার সম্পত্তি পেয়ে, তবু পরিধানে এক জিনের হাফ-প্যাণ্ট। এক সার্ট গায়ে। মাথার চুল ছোট ছোট করে কদম-ছাঁটা।···চোখে পুরু কাচের চশমা।'

সুব্রত সোজা হয়ে বসে, 'হুঁ, চলুন একবার শ্রীঅমুতোষ রায় তখনকার কালের বি-এ, বি-টিকে স্বচক্ষে দেখে আসি। Worth seeing।···'

[ক্রমশঃ।

গল্প হোলেও সত্যি!

শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায়

এমন কেউ নামজাদা নয়। অশ্বিনী দত্ত-প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃত-শিক্ষক। নাম: কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। সংক্ষেপে কালীশ পণ্ডিত। সংক্ষিপ্ত নামে অবশ্যি ও অঞ্চলের অনেকেই তাঁকে চেনে। তাঁরই জীবনের একটা ঘটনা ব'লছি।

বরিশাল শহরে এবং আশে-পাশের গ্রামে তখন ভীষণ কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে। রোজই বিশ-পঁচিশ জন মারা যাচ্ছে কলেরায়। রাস্তায়-ঘাটে অনাবশ্যক লোক খুব কম চোখে পড়ে। আফিস-কাচারীর বাবুরা যে কয় জন চ'লেছেন সবাই ভয়ে ভয়ে—সংকোচে। সমস্ত শহরটায় একটা থম্‌থমে ভাব। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পাণ্ডুর। আতংকের মোহে মুহ্যমান।

পণ্ডিত মশাইর কিন্তু আহার-নিদ্রা কিছুর খেয়াল নেই। রাত-দিন এখানে-সেখানে রোগীর সেবা ক'রে চল্‌ছেন। ডাক্‌বার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বার লোক তিনি নন। শহরে-শহরতলীতে যেখানেই লোকের অভাব—সেবার প্রয়োজন, সেখানেই তিনি আছেন। হাসিমুখে অক্লান্ত সেবা ক'রে চলেন তিনি। স্কুল ছুটি হ'য়ে গেছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কাজেই সে-ভাবনাও নেই।

মহা উল্লাসে তিনি মেতে থাকেন সেবা-কার্য্যে। ভোরে বের হন আর ফেরেন দুপুর রাত্তিরে। কোন কোনও দিন মোটেই ফেরেন না।

এক দিন। রাত্রি প্রায় দু'টোর সময় বাড়ী ফির্‌লেন অভুক্ত—অস্নাত অবস্থায়। আগের দিন বাড়ী ফেরেননি। স্ত্রী জেগেই ছিলেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে। উঠে এসে তাঁর এই অনাহার-ক্লান্ত রুক্ষ মূর্ত্তি দেখে কেঁদে ফেল্‌লেন। পণ্ডিত-মশাই মনে ক'রলেন, বাড়ীতে বুঝি-বা কারুর কলেরা হ'য়েছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন: কার?

চোখ মুছে গলা পরিষ্কার ক'রে স্ত্রী ব'ল্‌লেন: কারুর কিছু হয়নি। নিজের কী চেহারা হ'য়েছে দেখেছ? এস, এখন হাত-মুখ ধুয়ে খাবে চল।

—ওঃ, এই! হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলেন পণ্ডিত মশাই।

এক থালা লাল মোটা চালের ভাত। শুক্‌নো কড়কড়ে। আর ভরা এক বাটি কলাইয়ের ডাল। নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘরে রাত দু'টোর সময় এর বেশী আর কী-ই বা অবশিষ্ট থাক্‌বে? বেশ ক'রে ডাল দিয়ে মেখে এক গ্রাস ভাত মুখের কাছে ধরতে গিয়ে চম্‌কে উঠলেন পণ্ডিত মশাই।

স্ত্রী লক্ষ্য ক'রলেন: ও কী, অমন ক'রে উঠলে যে?

—শোন, আমার মনে হোল, আশে-পাশে কেউ যেন উপোষ ক'রে আছে। যাই, আমি দেখে আসি। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ডাল-মাখা ভাতের থালা নিয়ে উঠে প'ড়লেন তিনি। খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌তে পেলেন, একটা মাঠের মধ্যে শুয়ে ক্ষিধের জ্বালায় কাৎরাচ্ছে একটা ঘোড়া। থালার শেষ ভাতটি পর্য্যন্ত ঘোড়াটাকে খাইয়ে থালায় ক'রে জল এনে ধ'রলে ঘোড়াটার মুখের কাছে।

* * *

তোমরা হয়ত ব'ল্‌বে: এমন যাঁর মহত্ত্ব, নামজাদা হোলেন না কেন তিনি মহাত্মা হিসেবে? বিশাল এই বাংলা দেশ। অগণ্‌তি তার লোকসংখ্যা। তোমরা গণা-গুণতি যে কয় জন মহাত্মার নাম জান বাংলা দেশে, তার বাইরেও আছেন অনেক মহাত্মা। আছে অনেক মহত্ত্বের কাহিনী। কে তার খোঁজ রাখে বল?

রাশি রাশি হাসি

শ্রীসুহাসচন্দ্র মল্লিক

রাশি রাশি হাসির খবর বলতে পারি আমি
হরেক রকম মজার হাসি রকম রকম নামই।
নানান্ লোকের সঙ্গে থেকে
তাদের হাসি তাকিয়ে দেখে
হাস্যগুলো হাস্য-খাতে নোট করে নি আমি।
হাসির কথা ভাবতে গিয়ে হাসছি অবিরামই।

তোমরা জানো অডিনারী সহজ হাসি যত
সবার মুখে দেখতে পাবে—দেখছ অবিরত—
সরল হাসি তরল হাসি
ব্যঙ্গ হাসি রঙ্গ হাসি
ঠাট্টা হাসি অট্টহাসি হয়তো আরো কত
এ সব হাসির কথা এখন থাকুক আপাতত।

মজার হাসি শোন
ও ভাই মজার হাসি শোন।
সে সব হাসি হাসতে মজা
দেখতে মজা শিখতে মজা
শুনতে মজা চাখতে মজা
সন্দেহ নেই কোন,
মজার হাসি শোন।

মজাদারি মুখের হাসি　　গোঁফের হাসি নাকের হাসি
জটুলা দাড়ির ঝাঁকের হাসি
মজার হাসি নানা
হাত দিয়ে দাঁত ঢেকে হাসি　　ভুঁড়ির ভেতর থেকে হাসি
ঠকে হাসি ঠেকে হাসি
অনেক আছে জানা।

গোব্‌দা-মুখো গোম্‌ড়া হাসি　　হোমরা হাসি চোমরা হাসি
ছাই দেখতে নোংরা হাসি
হাসতে কি কেউ পারো?

ভড়কে গিয়ে ভ্যাব্‌লা হাসি　　অকাজ করে ক্যাব্‌লা হাসি
আলটপ্‌কা ছ্যাব্‌লা হাসি
জানা আছে কারো?

না-বুঝে ঘাড়-নাড়া হাসি　　কাঁকতালে কাজ-সারা হাসি
ভেড়া হাসি মেড়া হাসি
হাসতে পারো ভাই?
থাম্‌কা বিকট চড়া হাসি　　কানে তালাধরা হাসি
পা-পিছলে পড়া হাসি
হাসো দেখ তাই।

মুখ্যু লোকের বিজ্ঞ হাসি　　চোর-ছেঁচড়ের অজ্ঞ হাসি
কেউ যদি ভাই হাসতে থাকে
চিনতে পারো দেখে?

ঘুষখোরদের চোখের হাসি　　কাবলীওয়ালা-লোকের হাসি
মে'সাহেবী মুখের হাসি
চিনতে পারো কে কে?

হাসিটা না পেলেও হাসি　　বেদম প্রহার খেলেও হাসি
কান্না পেয়ে গেলেও হাসি
হাসতে পারো না কি?
রাগতে গিয়ে দম্‌কা হাসি　　বেকাঁস ভাবে থাম্‌কা হাসি
থম্‌কা হাসি দম্‌কা হাসি
কেউ জানো ভাই তা কি?

এ সব হাসি হ'সতে জানা নেহাত সহজ না কি?
হাসির কথা শিখতে যদি ইচ্ছে কারো জাগে
মনটাকে ভাই ফূর্ত্তি দিয়ে ভর্ত্তি করো আগে।
দুখ্যু হলে আচ্ছা কষে
হাসির কথা ভাববে বসে।
কান্না যদি বেরিয়ে আসে আটকাতে না পারো—
কাতুকুতু খাও—সুড়সুড়ি দাও হাসো আরো আরও।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নোয়াখালীর 'দেশের বাণী' বলিতেছেন :—"চট্টগ্রাম ও ফেণীর বন্যায় বীভৎস ধ্বংসলীলার সংবাদ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে, চট্টগ্রাম জিলার পাঁচ ভাগের চার ভাগ অংশ ও নোয়াখালী জিলার ফেণী মহকুমা সম্পূর্ণ বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। বাঙলার পল্লী অঞ্চলের লোক সাধারণতঃ দরিদ্র, বড় বড় দালান ইমারত ইহাদের নাই, সমস্ত কুঁড়ে ঘর ও মাটির দেওয়াল দেওয়া কুটীরখানিই তাহাদের আবাসস্থল। বন্যার জলোচ্ছ্বাসে কুঁড়ে ঘরগুলি ভাসাইয়া নিয়াছে, গলিয়া পড়িয়াছে। মাটীর প্রাচীরগুলিও। মানুষ ও গৃহপালিত পশু প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। অতি বৃহৎ জনপদকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সেই মহাশ্মশানের মাঝখানে এখানে সেখানে দুই একটি অসহায় মানুষ প্রেতের মত বিচরণ করিতেছে। এক দিন তার হয়ত সব ছিল, পুত্র পরিজন লইয়া সুখে দিনযাপন করিত—এক রাত্রের জলোচ্ছ্বাসে সব কিছুই ভাসাইয়া নিয়াছে। যার গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালে ছিল হালের বলদ, দুধালো গাভী ছিল, ছিল জমি, পুকুরভরা মাছ, সে আজ আধ হাত বস্ত্রের কাঙাল, এক মুঠা অন্ন তার কাছে মণি-মুক্তার ন্যায় মূল্যবান। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী নতশিরে আজাদ পাকিস্তান, ইউনিয়ান সরকার ও দেশবাসীর কাছে ভিক্ষার ভাণ্ড আগাইয়া ধরিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, কায়দে আজম মিঃ জিন্নার নিকট স্থানীয় জনসাধারণ আবেদন পাঠাইয়াছে। হাজার হাজার মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু সভা, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী সমিতির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানান হইয়াছে।" আশা করি, এ আবেদনে সকলে সাড়া দিবেন।

বন্যায় ফেণীর অবস্থা সম্বন্ধে—বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ হবিবুল্লা বাহার এক বিবৃতিতে ফেণীর বন্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন—"বন্যায় ফেণীর যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে উপযুক্ত প্রচারের অভাবে সে সম্বন্ধে বাহিরের লোকের কোন ধারণাই নাই। ফেণীর আড়াই শত বর্গ মাইল সম্পূর্ণ বন্যাবিধ্বস্ত হওয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে, ত্রিশ হাজার একর পরিমাণ জমির শস্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। ছয় হাজার গৃহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে ; প্রায় পাঁচ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে অথবা পঙ্গু হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।"—দেশের বাণী।

* * * * * *

'মিলনী' যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে নূতন কথা না হইলেও, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় চিন্তা করিবার মত :—"দাঙ্গা ও সীমানার লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সামরিক অফিসাররা শুধু পাকিস্তানে নয়, ভারতীয় ইউনিয়নেও দাঙ্গায় সরাসরি উসকানি দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সমস্ত দেশীয় রাজা, বৃটিশ দালাল, রাজভক্ত নেতা, জমিদার-জায়গীরদার, উগ্র সাম্প্রদায়িকপন্থী এবং বড় বড় দেশীয় শিল্পপতিরা জাতীয় সরকারের গণতান্ত্রিক নীতিকে আক্রমণ করছে। এরা ভারত ও পাকিস্তানের উপর আরো দীর্ঘদিন বৃটিশ-মার্কিণ রাষ্ট্রীক ও আর্থিক প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চায়। ভারত ও পাকিস্তানকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখতে চায়। বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে বৃটিশ সামরিক অফিসার মোতায়েন করতে চায়। জাতীয় সরকারের সমস্ত গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বানচাল করতে চায়। জাতীয় সরকারকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই সর্ব্বনাশা চক্রান্তকে ব্যর্থ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্য আজই দেশ ও জাতি-গঠনের কাজে হাত দিতে হবে। তার জন্য অবিলম্বে জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করে কৃষককে জমির মালিক করতে হবে। দেশীয় রাজাদের ধ্বংস করে প্রজারাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বৃটিশ মার্কিণ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্র-সম্পত্তি করতে হবে। বড় বড় শিল্পের জাতীয়করণ করে শিল্পের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার করতে হবে। মালিকের অবাধ শোষণ বন্ধ করে শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরি দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে। পুরোনো শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করে সর্ব্বসাধারণের গণতান্ত্রিক জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। উগ্র সাম্প্রদায়িকপন্থীদের শাস্তি দিয়ে দাঙ্গার আগুন নিবিয়ে ফেলতে হবে। নতুবা চার্চিল-ট্রুম্যানের সর্ব্বগ্রাসী স্বপ্ন বাস্তব রূপ গ্রহণ করবে। সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বন্যা বয়ে যাবে। দেশের সমস্ত সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ভারত ও পাকিস্তানকে শত্রু-রাষ্ট্রে পরিণত করে পূর্ণ স্বাধীনতার শুভদিন পিছিয়ে দেবে। আমাদের সংগ্রাম প্রতিক্রিয়ার এই অশুভ সমাবেশের বিরুদ্ধে। পনেরোই আগষ্ট আমরা যেটুকু স্বাধীনতা পেয়েছি, সেইটুকু পূর্ণ স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করবে। প্রতিক্রিয়ার ধ্বংসাবশেষের উপর স্বাধীন জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।" কথাগুলি কেবলমাত্র নেতাদেরই নহে, সর্ব্বসাধারণেও ভাবিবার মত। হঠাৎ কিছু কাল হইতে দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরে নূতন এক প্রকার হাঙ্গামাকারীর উদ্ভব হইয়াছে। এই বিশেষ একটি দল বা উপদল কাহাদের প্ররোচনাতে নানা প্রকার অসামাজিক কার্য্য করিতেছে, তাহাও বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সাধারণ দায়িত্ব এ বিষয়ে কম নহে।

* * * *

পল্লী-বাঙলার উন্নতি সম্পর্কে 'মিলনীর' কথা অবহেলার নহে :—"বর্ত্তমানে গ্রামের লোকের স্বাস্থ্য পচা ডোবা আর খানার দৌলতে ত মারা পড়লো। স্বাস্থ্যটা ত একেবারে মূলের কথা—প্রায় গাছের মূলের মতই। স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। সারা গ্রাম ত প্রায় জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে, নদীতে যে জল পাওয়া যায় তা-ও [illegible] 'আকণ্ঠে না গেলে [illegible] হয় না—

কচুরীপানায় সারা নদী চাপা পড়েছে। জঙ্গল কেটে সাফ করা, কচুরীপানা সমূলে ধ্বংস করা আর পচা ডোবা খানা বোজান এই মোটামুটি কাজ। নির্বাসিত স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে গেলে এগুলো করতে হবে। অনেক গ্রামেই আবার ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। তার ফলে অসুখ-বিসুখ ত লেগেই আছে। পৃথিবীর বুকে নল চালিয়ে কিংবা Reserved Tank অর্থাৎ যে পুকুরে শুধু পানীয় জল পাওয়া যাবে এমন পুকুর করে এই অভাব মেটান যায়। গ্রামে যেমন রোগ-শোকের প্রাচুর্য্য, ভাল ডাক্তার-বদ্যির তেমনি ভীষণ ঘাটতি। কত সহস্র সহস্র লোক যে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক'টা লোকই বা মরলো; কিন্তু তাকে দমন করার জন্য আমাদের দেশের লোকেরা কিছুই করতে বাকী রাখেনি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যে নীরবে হত্যার লীলা চলছে তার প্রতিকার কি সত্যিই সম্ভব নয়?" প্রতিকার অবশ্যই সম্ভব এবং তাহার চেষ্টাও সামান্য পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কেবল সমালোচনা বা পথ-নির্দ্দেশ করিয়া কি লাভ হইবে? দেশের ভবিষ্যৎ আশা এবং ভরসা যাহারা, সেই যুবশক্তি আজ কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এখন মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভাঙ্গার পালা শেষ হইয়াছে—গড়ার কাজে মন দিবার সময়। কিন্তু কয় জন তাহা করিতেছে? শহর-মুখী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বোধ করা দরকার।

* * * * * *

এই সম্পর্কে 'নীহার' যাহা মন্তব্য করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—"অহিংসা, শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, শৌর্য্য, বিক্রম প্রতিষ্ঠা, মাদকতা বর্জ্জনাদি সন্নীতি ও সুশিক্ষা বিস্তারাদির বড় বড় বুলীর কপচানীতে জনমণ্ডলীকে তাক্ লাগাইয়া না দিয়া আপনাপন আদর্শ কর্ম্মধারার দ্বারা "আপনি আচরি ধর্ম্ম, অন্যেরে শিখাইতে" না পারিলে আমাদের আর মুক্তির পথ কোথায়? সমাজসেবক ও দেশকর্ম্মী আত্ম-জাহিরের সঙ্গে সঙ্গে মাদকতা বর্জ্জন উপদেশে পঞ্চমুখ হইয়া কার্য্যতঃ বিড়ি-সিগারেটের আড্ডাখানা করিতে উৎমুখীদের তাণ্ডবলীলাকে পরাভূত করিলে বা অগণিত জনসমুদ্রের সমক্ষে সদম্ভে "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা"—বীর গীতিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া শান্তি শৃঙ্খলা ও সাম্য মৈত্রীর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে "দক্ষযজ্ঞ" পর্য্যন্তকেও হার মানাইলে চলিবে কেন?—এটা প্রকৃত সমাজসেবক কি দেশকর্ম্মীর কাজ নয়, এ জ্ঞানটা সকলেরই সুদৃঢ় থাকা আবশ্যক। বাক্যযুগের অবসানান্তে আজ কর্ম্মযুগ সমুপস্থিত। সুতরাং এ যুগে তথাবিধ যশাকাঙ্ক্ষায় কখনই অকৃত পুনায় অর্জ্জন করিতে পারা যায় না। তাই বর্ত্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে, দিকে দিকে প্রতিক্রিয়াশীল বিভ্রান্তকারীদের নানা কূট চক্রান্তের উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত রাষ্ট্র-তরণীকে বানচাল করিবার অপকৌশল অবলম্বন না করিয়া সকল দিকে সম্যক্ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সঙ্ঘশক্তি ও একপ্রাণতার দ্বারা কর্ত্তব্যসাধন পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্য করা আমাদের সকলেরই পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।" দুঃখের কথা, বাঙ্গলা দেশের এক দল শিক্ষিত, সুপণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান অথচ 'অপ'-নেতার দল দেশের বর্ত্তমান স্বাধীন রাষ্ট্র তরণীকে বানচাল করিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করিয়াছেন, বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সরকার ইংরেজ রাষ্ট্রেরই মাসতুতো ভাই। প্রয়োজন যখন ছিল, তখন এই সব অপনেতার দল কোথায় ছিলেন? দেশের এবং দশের হিতে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ কতখানি ত্যাগ করিয়াছেন? স্বাধীনতা-সংগ্রামে কি দুঃখ তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন?

* * * * *

'আর্য্য' সংবাদ দিতেছেন যে :—"পালিশ্যগ্রাম; মঙ্গলকোটের পালিশ্যগ্রামের দক্ষিণে 'বড় পুকুর' নামে যে পুকুরটি আছে তাহার বাবুরা না কি এ বছর মাত্র ১০।১২ বিঘা জমিতে জলের সেচ দিয়া পরিপূর্ণ জল থাকা সত্বেও পুকুরের জল সেচ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বহু বিঘা জমির ধান মরিয়া যাইতেছে। এই জলাভাবে এ বছর অন্যান্য চাষও বন্ধ হইবে। এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত।" সংবাদটি সামান্য হইলেও ইহা গুরুতর ব্যাপার। এই ভাবে প্রতি বৎসর 'বাবুদের' দয়াতে যে কত গ্রামে কত হাজার হাজার বিঘা জমির ধান্যাদি শস্য নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের সমস্ত জলাশয় অবিলম্বে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। দেশকে বাঁচাইতে হইলে, দেশবাসীকে অন্নদান করিতে হইলে—'বাবু' এবং 'বড়-বাবু' শ্রেণীর এবং বিকৃত মনোভাবাপন্ন জমিদারদের অচিরেই দমন করা কর্ত্তব্য। আশা করি, ঘোষ-মন্ত্রিসভা এ-বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

* * * * * *

সাপ্তাহিক 'নীহার' বলিতেছেন :—"সরিষার চাষ—সরিষা তৈলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ও খাঁটী সরিষা তৈলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ভেজাল তৈল ব্যবহারে দেশবাসীর শরীর ব্যাধি-মন্দির হইয়া দাঁড়াইতেছে। এজন্য দেশে অধিক পরিমাণে সরিষার চাষ করিয়া খাঁটী তৈল পাইবার জন্য সকলেরই বিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সরিষা চাষের সময় আসিয়াছে, এই কার্য্যে সকলের তৎপর হওয়া উচিত।" এ-বিষয় পূর্ব্বেও আমরা মন্তব্য করিয়াছি। বাঙ্গলা দেশে সরিষার চাষের জমি কম নাই। সামান্য একটু পরিশ্রম এবং সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিলে বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার বহু আপাত-পতিত জমিতে বোধ হয় সরিষার সোনার ফসল ফলাইতে পারা যায়। বাঙ্গলা আর কত কাল সরিষার জন্য যুক্ত-প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থানের উপর ভরসা করিয়া থাকিবে? সরিষার তৈল নাকে দিয়া ঘুমাইবার সখ আছে, কিন্তু সরিষার চাষে মন নাই—ইহা ভাল কথা নহে।

* * * * * *

'পাঞ্চজন্যে' প্রকাশিত আশার কথা :—"গত বিশ্বযুদ্ধের সময় পরলোকগত মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষিবাহিনী গঠন করেন। বর্ত্তমান অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য উহা নূতন করিয়া গঠন করা হইয়াছে। কুকী, নাগা, লুসাই, ত্রিপুরী ও মণিপুরীদের লইয়া গঠিত আনুমানিক দশ হাজার বলিষ্ঠ যুবক মাতৃভূমির রক্ষাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহিনীতে যোগ দিয়াছে। অপর কয়েকটি উপজাতিও ত্রিপুরা [illegible] প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন করিলে তাহারা আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে।

মুসলিম প্রজা মজলিস ও আঞ্জুমান ইসলামিয়া জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে লড়িবে বলিয়া জানাইয়াছে। রাজ্যের শতকরা ৭৭ জন প্রজা হিন্দু এবং শতকরা ২০ জন মুসলমান।" বাঙ্গলা সরকার উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে কি কিছু শিক্ষা করিবেন না? পূর্ব্ব-পাকিস্তান সংলগ্ন পশ্চিম বাঙ্গলার জেলাগুলিকে ভাল করিয়া রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জানা উচিত বলিয়া মনে হয়। হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক সামরিক শিক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ না চাহিয়া এ বিষয় কিছু করিতে পারেন না কি?

● ● ● ● ● ●

'মেদিনীপুর হিতৈষী' মন্তব্য করিতেছেন :—"যে কংগ্রেসের নামে দেশ শুদ্ধ লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল, যাহাদের সহানুভূতির বলে কংগ্রেস জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, এখন এমন কতকগুলি কংগ্রেসকর্ম্মী সেই নামের ব্যত্যয় ঘটাইতেছে, তজ্জন্য কংগ্রেস সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইতেছে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা পল্লী অঞ্চলে এমন সব অনাচার করিতেছে যে তজ্জন্য জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসের নামে অনাচারকেও সদাচার নামে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এজন্য প্রত্যেক গ্রামবাসী ইহা লক্ষ্য করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করুন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সত্বর প্রতিকার ব্যবস্থা হইবে। তথাকথিত কংগ্রেসীর অত্যাচারে ভীত হইও না। কংগ্রেসী দেশের রাজা নহে; রাজা জনসাধারণ, কংগ্রেস জনসাধারণের সেবক। সেবক হিসাবেই কংগ্রেসের মর্য্যাদা। কংগ্রেসকে যাহারা ভালবাসে তাহারা তথাকথিত কংগ্রেসীর অত্যাচার সহ্য করিবে না, তাহারা কংগ্রেসের যশ বিস্তারেরই চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যে তথাকথিত কংগ্রেসীর মধ্যে রেষারেষী ও দ্বেষাদ্বেষী চলিতেছে। কেহ কেহ চোরাকারবারী বলিয়াও ধৃত হইয়েছে। মফঃস্বলে তথাকথিত কংগ্রেস নামধারী ধান কেনার নামে বলপূর্ব্বক লোকের খোরাকী ধান কাড়িয়া লইয়া সংগ্রহ করিতেছে। টাকা চাহিলে বলে যে, কংগ্রেসে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এক সঙ্গে সকলের টাকা দেওয়া হইবে। এই প্রকারে না কি হাজার হাজার মণ ধান সংগৃহীত হইয়েছে। এইরূপে ইহারা মণ-প্রতি ১৲ টাকা হিসাবে আড়তদারী আদায়ের লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। সরকার মণ-প্রতি ১৲ টাকার লোভ দেখানয় পল্লীতে জুলুম চলিতেছে। সরকারের ভয়ে কেহ কিছু বলে না। সরকারী তকমার এমনই গুণ। আশা করি, সরকার অবহিত হইবেন।" অতি বিশেষ ভাবেই অবহিত হওয়া অবিলম্বে এবং একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেস-মহল হইতে পাপ এবং পাপী—দুই-ই তাড়াইতে হইবে!

● ● ● ● ● ●

'প্রদীপ' পাঠে জানিতে পারা গেল :—"গত ৮।১০।৪৭ তারিখে মহিষাদল রাজ-কলেজের ছাত্রবৃন্দ এক সভা করিয়া কাঁথি ছাত্র-সমাজের উপর কাঁথির আইনজীবিদের ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯শে ও ২০শে মে কাঁথির উকিল বাবুরা কণ্টাই বার ড্রামেটিক ক্লাবের পরিচালনায় এক নৃত্যানুষ্ঠান ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বাহির হইতে নর্ত্তকী ও অভিনেত্রী আমদানী করা হয়! উকিল বাবুরা হইতেন অভিনেতা আর ওই মেয়েরা হইতেন অভিনেত্রী। টিকিট বিক্রয় করিয়া এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল ক্লাবের অর্থ বৃদ্ধি। ইহাতে কাঁথির ছাত্র-সমাজ বাধা দেয় কিন্তু উকিল বাবুরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে থিয়েটার আরম্ভ করেন এবং তখন ছাত্ররা পিকেটিং আরম্ভ করে। দ্বারে শুইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির হইতে আমদানী মেয়েরা পথ-বন্ধক শয়নকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দিয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন উকিল বাবুরা উদাহরণ-স্বরূপ নিজেদের বাড়ীর মেয়েদিগকে আনিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহদের পায়ের আঘাতে কয়েক জন ছাত্রী আহত হইলেন কিন্তু বাহির হইতে আমদানী মেয়েরা এই নির্দ্দয় কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া গেলেন। তখন উকিল বাবুরা পুলিশের সাহায্য লইয়া ১৪৪ ধারা জারি করেন, তবু ছাত্রগণ অচল অটল। ক্রমে পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাত দিন থিয়েটার বন্ধ করিবার আদেশ দেন। ইহাতে উকিল বাবুরা পিকেটিংকারী ছাত্রদের উপর ৯১৮ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা করিয়াছেন। নিঃসহায় ছাত্রগণ এই মোকর্দ্দমা মেদিনীপুর পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন এই ব্যাপার আর বেশী দূর গড়াইতে দিলে উকিল বাবুদেরই দুর্নাম হইবে বলিয়া মনে হয়।" এই উকিল বাবুদের দুর্নাম হইবে? কতটুকু বাকী আছে বলিয়া মনে হয়? মহিষাদলে খেলো এবং আড়ীর দর কি কম?

● ● ● ● ● ●

'ত্রিস্রোতায়' প্রকাশ :—"মৌলানী (মাল) কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার মতিরাম রায় খাদ্য অভিযানে গিয়া সন্ধ্যার সময় বিষধর সর্পের দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৌলানীর টুনিয়া সেনের নেতৃত্বে ইনি ও অন্যান্য কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারদের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্রান্তি, মৌলানী ও লাটাগুড়ি অঞ্চলে খাদ্য অভিযান অসামান্য সাফল্য লাভ করে। মতিরাম রায়ের মত নিঃস্বার্থ কংগ্রেসকর্ম্মীর মৃত্যুতে মৌলানী কংগ্রেসের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ অনুভব করিতেছি। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। গভর্ণমেণ্টের খাদ্য অভিযান সফল করিতে গিয়াই তাঁহার এই অকাল মৃত্যু হইল। কাজেই তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব কতকটা গভর্ণমেণ্টের উপর পড়ে বৈ কি? এ সম্পর্কে আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।" আশা করি, বাঙ্গলা সরকার মতিরাম রায়ের পরিবারবর্গের জন্য অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা করিবেন। অন্য দেশে এমন অবস্থায় সরকার হইতে যথেষ্ট কিছু করা হইয়া থাকে—এ কথা জানি।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

লণ্ডন-সম্মেলন—

জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২৫শে নবেম্বর হইতে লণ্ডনে পুনরায় বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয়ের অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিবের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুই সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনার পরও সম্মেলনে কোন বিষয়েরই কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই,—অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা যেমন একটুও অগ্রসর হয় নাই, তেমনি জার্ম্মাণীর সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধেও পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয় একমত হইতে অসমর্থ হইয়াছেন। গত মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে মস্কো সহরে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন একটি বিষয়েও তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। জার্ম্মাণীর উপগ্রহ রাষ্ট্র-সমূহের সহিত সন্ধিসর্ত্ত সম্বন্ধে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয় একমত হওয়ার পর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির একটা আশাপূর্ণ মনোভাবের মধ্যে মস্কো সম্মেলন আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও উহা ব্যর্থ হয়। সম্মেলন হইতে দেশে ফিরিয়া মিঃ বেভিন এবং মিঃ মার্শাল উভয়েই তাঁহাদের বিবৃতিতে এই ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপাইয়াছিলেন রাশিয়ার উপর। অতঃপর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই সুদূরতর হইয়া উঠিতেছে। মার্শাল-পরিকল্পনা', ক্ষুদ্র পরিষদ ও কোরিয়া কমিশন গঠনের পর লণ্ডন সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার আশা অনেকেই করেন না।

মস্কো সম্মেলনে পাঁচটি মূল বিষয় লইয়া বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাশিয়ার মতভেদ হইয়াছিল: (১) জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত চারি শক্তির চুক্তি, (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য, (৩) জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সাধিত হওয়ার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাব, (৪) চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাব এবং (৫) অষ্ট্রিয়াস্থিত জার্ম্মাণ-সম্পদ্। লণ্ডন সম্মেলনে প্রধান ও প্রথম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আলোচনার পদ্ধতি লইয়া। পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রথম সমস্যা হইল, জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনের ব্যাপারে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র আমন্ত্রিত হইবে। রাশিয়ার দাবী এই যে, বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ই প্রথমে সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবে এবং তার পর অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গকে সন্ধিসর্ত্ত আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা চায় যে, সমস্ত মিত্রশক্তিই সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের আলোচনায় যোগদান করুক। পদ্ধতি সম্পর্কে মতৈক্য হইলে পর, জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্রকরণ, জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিবার সমস্যা দেখা দিবে। নিরস্ত্রকরণ ও অর্থনৈতিক ঐক্য মীমাংসা হইলেও জার্ম্মাণীর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন ও ক্ষতিপূরণ সমস্যা প্রধান ও দুরূহ সমস্যা হইয়াই থাকিবে।

রাশিয়া জার্ম্মাণীতে যেরূপ সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চায়, এইরূপ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে কম্যুনিষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কায় বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে রাজী হইবে না। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণীতে অত্যন্ত দুর্ব্বল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। এইরূপ ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ অধিকৃত অঞ্চলে প্রবল রুশবিরোধী স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। রাশিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইবে, ইহা আশা করা কঠিন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের মতই ক্ষতিপূরণ সমস্যাও অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা। রাশিয়া চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী ছাড়িতে পারে না। আবার বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ইহাতে রাজী হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত এই দুইটি সমস্যার সমাধান না হওয়ায় জন্যই লণ্ডন সম্মেলনও ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা। মস্কো সম্মেলন অপেক্ষা লণ্ডন সম্মেলন অধিকতর আশার সূচনা করিতেছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। লণ্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হইলে নূতন চেষ্টা করিবার জন্য আবার বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে যে অনুকূল হইবে না, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফ্রান্সের সঙ্কট—

১লা ডিসেম্বর মার্কিণ সিনেট ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়াকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্য দানের পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছে। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্য দানের পরিকল্পনা মঞ্জুর করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসও অতিদ্রুত এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করিতে দ্বিধা করে নাই। ফ্রান্স ও ইটালীর আভ্যন্তরীণ গুরুতর অবস্থাই যে ইহার কারণ, তাহা অনস্বীকার্য্য। পশ্চিম-ইউরোপকে কম্যুনিজমের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মার্শাল-পরিকল্পনা। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইতে যে বিলম্ব হইবে তাহার মধ্যেই ফ্রান্স এবং ইটালী সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিজমের প্রভাবাধীন হওয়ার আশঙ্কা গত তিন সপ্তাহের

মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ইটালী অপেক্ষা ফ্রান্সের অবস্থাই অধিকতর গুরুতর। কাজেই আগামী মার্চ্চ মাসে মার্শাল-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির হাত হইতে ফ্রান্স ও ইটালীকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য দানের প্রস্তাব মার্কিণ কংগ্রেস অত্যন্ত দ্রুততায় মঞ্জুর করিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

ফ্রান্সের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে দ গলের দল শক্তিশালী হইয়া উঠিবার পর জাতীয় পরিষদে রামাদিয়ের গবর্ণমেণ্টের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, রামাদিয়ের গবর্ণমেণ্টকে পতন হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ফ্রান্সের ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ এবং ধর্ম্মঘটের ক্রমবিস্তৃতির মধ্যে এম-আর-পি দলের মঃ রবার্ট সুম্যানের প্রধান মন্ত্রিত্বে গত নবেম্বর মাসে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সের শ্রমিক ধর্ম্মঘট সমগ্র দেশব্যাপী হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের ফলে অধিকাংশ বন্দরেই অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। রেলকর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করায় চলাচল ব্যবস্থা অচলপ্রায়। ডাক ও তার বিভাগও বিপর্য্যস্ত। প্যারীর ধর্ম্মঘটীরা প্যারীর পাওয়ার হাউস দখল করিয়া বসে। প্যারীর আলো ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থা-কার্য্য আংশিক ভাবে ব্যাহত হয়। প্যারীর খাদ্যদ্রব্যের প্রধান বাজারটির শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘট করে। ২০ লক্ষ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট যে কিরূপ ব্যাপক, উহার প্রতিক্রিয়া যে কিরূপ গভীর তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সমস্তই কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত। কাজে যোগদান করিবার জন্য সোশ্যালিষ্টদের আহ্বানে শ্রমিকরা আদৌ কর্ণপাত করিতেছে না! শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মজুরি বৃদ্ধির যে দাবী কম্যুনিষ্টরা করিয়াছিল, প্রধান মন্ত্রী মঃ সুম্যান (M. Schuman) তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রমিক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য জাতীয় পরিষদ সুম্যান মন্ত্রিসভাকে জরুরী ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। শ্রমিক ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য মঃ রামাদিয়ের যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন মঃ সুম্যানও সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট দলভুক্ত আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী মঃ মক ঘোষণা করেন, The battle is won. I am master of the situation. অর্থাৎ 'যুদ্ধ জয় হইয়াছে। অবস্থা এখন আমার অধীনে আসিয়াছে।' কিন্তু ফ্রান্সের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত সংবাদ যে প্রকাশিত হইতেছে না, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শ্রমিকরা কাজে যোগদান করিতেছে, ধর্ম্মঘটের অবসান নিকটবর্ত্তী, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ধর্ম্মঘট সম্পর্কে মীমাংসার আশা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটি একটি ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়। শ্রমিকদিগকে তাহাদের অবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এবং জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। জরুরী ক্ষমতা-বলে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টা কত দূর সফল হইবে তাহা বলা কঠিন। ইতিমধ্যে আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও অনুমান করা সহজ নয়। সমগ্র ফ্রান্স আজ কম্যুনিষ্টপন্থী এবং কম্যুনিষ্টবিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমিকরা যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাহা হইলে শুধু অন্তর্বর্ত্তী ডলার সাহায্য দ্বারা শ্রমিকদিগকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে মঃ সুম্যানকেই যে শুধু বিদায় লইতে হইবে তাহা নয়, গ্রীসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে ফ্রান্সেও সেই নীতিই গ্রহণ করিবে। সেই জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা রিপাবলিকান দলভুক্ত মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ফ্রান্সের শাসন-কর্তৃত্ব দ গলের হস্তগত হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমান ইটালী—

ইটালীর বর্ত্তমান অবস্থা ফ্রান্সের মত গুরুতর আকার ধারণ করে নাই বটে, কিন্তু স্বরূপের দিক্ হইতে উভয়ের মধ্যে খুব বিশেষ পার্থক্য নাই। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং শ্রমিক ধর্ম্মঘটের বাহুল্য ইটালীতে ফ্রান্সেরই অনুরূপ। হাজার হাজার লোক বেকার। সরকারী সামান্য সাহায্য ছাড়া পরিবার প্রতিপালনের আর কোন সংস্থান তাহাদের নাই। ইটালীর খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দলকে ফ্রান্সের এম-আর-পি'র সহিত কতকটা তুলনা করে চলে। কিন্তু ফ্রান্সের এম-আর-পি অপেক্ষা ইটালীর খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দল অধিকতর শক্তিশালী। বর্ত্তমানে এই দলই ইটালীর গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছে। গত জুন মাসে ইটালীর গণ-পরিষদের জন্য নির্ব্বাচনে এই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় সোশ্যালিষ্ট পার্টি। নির্ব্বাচনের সময় খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দল ছিল রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থীদের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। এখন এই দলের উপর দক্ষিণ-পন্থীদেরই একাধিপত্য। এদিকে কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করার প্রশ্ন লইয়া সোশ্যালিষ্ট পার্টি হইয়া পড়িয়াছে দ্বিধা-বিভক্ত। ইউরোপের বৃহত্তম কম্যুনিষ্ট দলগুলির মধ্যে ইটালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যতম। ইহার সদস্য-সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। ফ্যাসিষ্ট ও মনার্কিষ্ট দলও ইটালীতে আছে বটে, কিন্তু এই দুইটি দল অত্যন্ত দুর্ব্বল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে আগামী মার্চ্চ মাসে ইটালীতে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে।

ফ্যাসিষ্ট ও জার্ম্মাণদের প্রতিরোধে ইটালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-ইটালীতে সঙ্ঘবদ্ধ ফ্যাসিষ্ট, গেষ্টাপো এবং ঝটিকা-বাহিনীর পরাজয়ে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অর্দ্ধেক ছিল কম্যুনিষ্ট। খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দলকে ইটালীর জনসাধারণ অগ্রগতির পরিপন্থী বলিয়াই মনে করে। অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য ও মার্শাল-পরিকল্পনা আগামী নির্ব্বাচনে এই দলকে জয়ী করিতে পারিবে কি না, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় নহে।

বৃটিশ রাজস্ব-সচিবের পদত্যাগ—

কমন্স সভায় বাজেট-বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে বাজেটের কিছু কিছু তথ্য লণ্ডনের সান্ধ্য-দৈনিক 'ষ্টার' পত্রিকার সংবাদদাতার নিকট প্রকাশ করায় বৃটেনের রাজস্ব-সচিব ডক্টর হিউ ডাল্টনকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। 'ষ্টার' পত্রিকায় বাজেটের সঠিক আভাষ কিরূপে প্রকাশিত হইল, কমন্স সভায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে রাজস্ব-সচিব ডাঃ ডাল্টন ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলেন যে, অসতর্কতা বশতঃ

তাঁহার বাজেট-বক্তৃতার সার-মর্ম্ম 'ষ্টার' পত্রিকার সংবাদদাতাকে তিনি জানাইয়াছিলেন। এই বিবৃতি দেওয়ার পর তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়াছে। বাজেট-বক্তৃতার পূর্ব্বে বাজেটের কয়েকটি তথ্য কিরূপে প্রকাশিত হইল তৎসম্পর্কে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক তদন্ত করা হইবে।

১১৩৬ সালেও একবার বাজেটের তথ্য বেফাঁস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহার সহিত ডাঃ ডালটনের অসতর্ক ভাবে বাজেটের কথা প্রকাশ করার তুলনা করা চলে না। ডাঃ ডালটন কাহারও ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে বাজেট ফাঁস করেন নাই। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশেও বাজেট ফাঁস করা হয় নাই। যদিও লণ্ডন ষ্টক-এক্সচেঞ্জ বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই বাজেটের সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি উহার ফলে জনগণের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তথাপি বিষয়টির গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে। ডাঃ ডালটনের মত প্রবীণ এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি অসতর্ক ভাবেও কেন বাজেটের কিছু কিছু তথ্য সাংবাদিকের নিকট প্রকাশ করিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, বাজেটের তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়ার জন্যই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু পদত্যাগ করিবার জন্যই বাজেটের তথ্য ফাঁস করা হইয়াছে কি না তাহা কে বলিবে? ইংলণ্ডের সঙ্কট পাড়ি দেওয়ার নীতি সম্পর্কে ডাঃ ডালটন তাঁহার সহযোগীদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী ডাঃ ডালটনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, মিঃ এটলী পদত্যাগ করিলে ডাঃ ডালটন এবং স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন, এরূপ ধারণাও সকলের মধ্যেই বদ্ধমূল।

ডাঃ ডালটন শ্রমিক দলের সাধারণ সদস্যদের বিশেষ আস্থা-ভাজন। তাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়াও শোনা যায়। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স রাজস্ব-সচিবের দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেমন অতিমানব নহেন, তেমনি ডাঃ ডালটনের কর্ম্মদক্ষতা হইতে বঞ্চিত হওয়া শ্রমিক মন্ত্রিসভার পক্ষেও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মিঃ এটলী তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে ডাঃ ডালটনের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে 'সাময়িক ছেদে'র (interruption) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বৃটিশ মন্ত্রিসভার যখন আবার রদ-বদল হইবে তখন ডাঃ ডালটন পুনরায় মন্ত্রিসভায় স্থান পাইবেন। কিন্তু রাজস্ব-সচিবের পরিবর্ত্তন যে শ্রমিক গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে মৌলিক পরিবর্ত্তনের আভাষ সূচনা করিতেছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ—

গত ২০শে নবেম্বর ইংলণ্ডের রাজকুমারী এলিজাবেথ এবং ডিউক অব এডিনবরা ফিলিপ মাউন্টব্যাটেন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জ্জ লেঃ ফিলিপ মাউন্টব্যাটেনকে ডিউক অব এডিনবরা পদবীতে বিভূষিত করেন। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে বহু আমন্ত্রিত ব্যক্তি রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ উৎসবে যোগদান করেন। রাজপ্রাসাদ, ও ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবির নিকটে এবং রাজপথে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের ভীড় জমিয়াছিল।

ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষ হইতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই বিবাহ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ভারত ও পাকিস্থান উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষ হইতেই রাজকুমারীর বিবাহে মূল্যবান প্রীতি উপহার প্রেরিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্যক্তিগত ভাবেও রাজকুমারীকে তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ও প্যালেষ্টাইন—

প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে মতভেদ হইয়াছিল অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে। গত ২৯শে নবেম্বর জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেষ্টাইন বিভাগ অনুমোদন করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন বিভাগের অনুকূলে ৩৩ ভোট এবং বিরুদ্ধে ১৩ ভোট হইয়াছিল। ১০টি রাষ্ট্র ভোট প্রদান করে নাই এবং একটি রাষ্ট্র ছিল অনুপস্থিত। আফগানিস্থান, কিউবা, মিশর, গ্রীস, ভারত, পারস্য, ইরাক, লেবানন, পাকিস্থান, সৌদী আরব, সিরিয়া, তুরস্ক এবং ইয়েমেন প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। আর্জেন্টিনা, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, সেলভাড়র, ইথিওপিয়া, হণ্ডুরাস, মেক্সিকো, বৃটেন এবং যুগোশ্লাভিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। শ্যাম ছিল অনুপস্থিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৃটেন ভোটদানে বিরত থাকিলেও বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং নিউজীল্যাণ্ড প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়াছে। বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারত, পাকিস্থান ও আরব প্রতিনিধিমণ্ডলী ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন না। প্যালেষ্টাইন বিভাগের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ছোট ছোট যে পাঁচটি দেশ লইয়া কমিশন গঠন করা হয়, তাহাদের মধ্যে সিরিয়া এই কমিশনের সদস্য হইতে অস্বীকৃত হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পানামা এবং ফিলিপাইন এই চারিটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া গঠিত কমিশন কি ভাবে প্রবল আরব-বিরোধিতার মধ্যে বিভাগকার্য্য সম্পন্ন করিবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব ইহুদিগণ কর্ত্তৃক সাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১,৮৭৭ বৎসর পরে আবার ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হইতে যাইতেছে। ইহুদী রাষ্ট্র প্রথম ধ্বংস হয় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে। দ্বিতীয় বার ইহুদী রাষ্ট্র ধ্বংস করেন টিটাস খৃষ্টীয় ৭০ অব্দে। এবার তৃতীয় ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হইবে। কাজেই ইহুদীদের আনন্দ হইবার তো কথাই। কিন্তু সম্মুখের এক বৎসরে কি বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আজম পাশা বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভাগ নিকট প্রাচ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। লেবাননের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিরিয়া ও লেবাননের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে! জেরুজালেমের মুফতিও শুধু ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ অপসারণের শেষ তারিখ ধার্য্য হইয়াছে ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট। অতঃপর দুই মাসের মধ্যে অস্থায়ী আরব ও ইহুদী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। অন্তর্বর্ত্তী সময়ে কমিশনের হাতে প্যালেষ্টাইনের শাসন-ভার অর্পিত থাকিবে। জেরুজালেম ১

বৎসরের জন্য জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের ট্রাষ্টিসিপের অধীনে থাকিবে। অতঃপর উহার অধিবাসীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে। ২৫ বৎসর পর প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হইতে যাইতেছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাব বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। বৃটিশই সর্ব্বপ্রথম প্যালেষ্টাইন বিভাগের ধূয়া তোলে—পীল কমিশনই সর্ব্বপ্রথম প্যালেষ্টাইন বিভাগের সুপারিশ করেন। কাজেই প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে বৃটিশের নিরপেক্ষতা কি সূচনা করে তাহা অনুমান করা কঠিন কি?

প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাবের প্রধান ক্রটি এই যে, এই বিভাগ সম্পন্ন করিবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন বটে, তাঁহাদের হাতে কোন সৈন্যবাহিনী নাই। যে কয়েকটি রাষ্ট্র লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহাদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে। বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্য্যাদাও তাহাদের নাই। বৃটেন বিভাগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার দায়িত্বের কোন অংশ গ্রহণ করিতে রাজী নয়। তাহার পর আরবদিগের অনুকূল মনোভাব বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট। মধ্য-প্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈলস্বার্থের কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। আরব রাষ্ট্র-সমূহের অসন্তোষ অর্জ্জন করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গত মনে করিবে কি? আবার প্যালেষ্টাইন বিভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল আগ্রহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই তাহার ইচ্ছা। ইতিমধ্যেই প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আরব রাষ্ট্র-সমূহের সৈন্যবাহিনী যদি প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি হইবে? আরব রাষ্ট্র-সমূহ এ কথা অবশ্যই জানে যে, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের বিরোধিতা করার অর্থ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতা করা। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রবর্গকে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। বৃটিশ ও মার্কিণ অফিসারগণ আরব রাষ্ট্র-সমূহের সৈন্যদের শিক্ষা দিয়া থাকে। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আভ্যন্তরিক বিবাদও আছে। আবার প্যালেষ্টাইনের বৃটিশ অফিসারেরা ব্যক্তিগত ভাবে আরবদিগকে সাহায্য করিতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে প্যালেষ্টাইনে আসন্ন সংঘর্ষের স্বরূপটা ঠিক সুস্পষ্ট ভাবে অনুমান করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহুদীরা মার্কিণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মার্কিণ ও বৃটিশ-প্রভাবিত আরব রাষ্ট্র-সমূহের সহিত সংগ্রাম করিবে, ইহা ছাড়া প্যালেষ্টাইনের ভাবী সংঘর্ষ সম্বন্ধে আর কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। আরব-বিরোধিতার সম্মুখে কমিশনের প্রচেষ্টা যদি বানচাল হইয়া যায়, তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে কি? আবার আমেরিকা প্রত্যক্ষ ভাবে প্যালেষ্টাইনের আসরে অবতীর্ণ হইলে রাশিয়া কি করিবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

জাতিপুঞ্জ ও ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকা বিরোধ—

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, গত ২০শে নবেম্বর জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তৎসম্পর্কে ভোট গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩১টি, বিপক্ষে ১৯টি ভোট হয়। ৬টি দেশ ভোটদানে বিরত এবং একটি দেশ অনুপস্থিত ছিল। প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কথা ছিল, কিন্তু ২১শে নবেম্বর ভারতীয় প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন না করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত দেশগুলি ভারতের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল: আর্জ্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, ব্রাজিল, কানাডা, কোষ্টারিকা, ডেনমার্ক, শালভাডর, গ্রীস, লক্সামবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পেরাগুয়ে সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজীল্যাণ্ড। ভারতের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ার পর ডেনমার্ক-বেলজিয়ম-ব্রাজিলের যৌথ প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবটির পক্ষে ২৪, বিপক্ষে ২১ ভোট হওয়ায় উহাও অগ্রাহ্য হয়। তিনটি দেশ ভোট দেয় নাই।

ভারতের প্রস্তাব সংক্রান্ত ভোটের ব্যাপারে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড যদি কোন পক্ষেই ভোট না দিয়া নিরপেক্ষ থাকিত, তাহা হইলেও প্রস্তাবটি গৃহীত হইত। ভারতের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পর প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে যে, গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা এখনও বলবৎ আছে কি না? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের আইন বিভাগের ইহা আলোচনার বিষয়। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বহাল থাকিয়া থাকিলেও ঐ বন্ধ্যা প্রস্তাবের কোন মূল্য নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়াছে, ইহাই সত্য কথা।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ও কোরিয়া—

গত ১৪ই নবেম্বর জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে কোরিয়া হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া কোরিয়াকে স্বাধীনতা দানের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য কমিশন গঠনের প্রস্তাব ৪৩ ভোট গৃহীত হইয়াছে। বিপক্ষে কোন ভোট হয় নাই, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভোটদানে বিরত ছিল। ভারত, চীন, সিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ফিলিপাইন এবং শালভাডর এই কমিশনের সদস্য হইবে। কোরিয়া সংক্রান্ত উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র; কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এই প্রস্তাবের সহিত সহযোগিতা করে নাই। কেন করে নাই, তাহা বুঝিতে হইলে কোরিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মতভেদ কোথায়, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কোরিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তাও উভয় রাষ্ট্রই স্বীকার করে। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনের পদ্ধতি লইয়া উভয়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

রাশিয়ার দাবী এই যে, কোরিয়া হইতে রুশ এবং মার্কিণ সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় যে, সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পর সৈন্য অপসারণ করা হইবে। রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক্ পৃথক্ দাবীর মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। রাশিয়ার ধারণা

বিদেশী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর যে নির্বাচন হইবে তাহাতেই কোরিয়ার খাঁটি জনমত অভিব্যক্ত হইবে এবং এইরূপ নির্বাচনের ফলে যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, সেই গবর্ণমেণ্ট হইবে রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, কোরিয়ায় আমেরিকার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন গভর্ণমেণ্ট গঠিত করিতে হইলে নির্বাচনের সময় মার্কিণ সৈন্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ইহাই মতভেদের মূল কথা। কিন্তু মার্কিণ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কোরিয়া সংক্রান্ত অচল অবস্থা অচল হইয়াই থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিক সভা-সম্মেলন—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিলের' (Bill of Human Rights) একটি চূড়ান্ত খসড়া রচনার জন্য গত ২৪শে নবেম্বর হইতে জেনেভা সহরে একুশটি জাতির প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই যে বিল রচিত হইবে তাহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সদস্যদের সম্পর্কে বাধ্যকর হইবে কি না অথবা উহা সাধারণ পরিষদের একটি শুভেচ্ছার ঘোষণায় পর্য্যবসিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার রক্ষায় যে-ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে তাহাতে এসিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেতকায় অধিবাসীদের এই মানুষের অধিকার বিল সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করিবার কারণ নাই। পৃথিবীর শিল্পপ্রধান ক্ষমতা-দৃপ্ত দেশগুলি অশ্বেতকায় অধীন দেশের অধিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে এখনও সচেতন হয় নাই। কাজেই মানুষের অধিকারের সনদ রচনার ভাণ করিবার জন্য সময়, অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করিবার সার্থকতা উপলব্ধি করা কঠিন।

গত ২৪শে নবেম্বর ফিলিপাইনের রাজধানী মেনিলা সহরে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক কমিশনের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। যে-সকল দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে ভারত, চীন, বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, শ্যাম, নেদারল্যাণ্ডস্, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স এবং ফিলিপাইন। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন যে-পর্য্যন্ত পরাধীনতা হইতে মুক্ত না হইতেছে, চীনের গৃহযুদ্ধের অবসান যত দিন না হইবে, কোরিয়ার সমস্যা যত দিন অমীমাংসিত থাকিবে, জাপানের সহিত সন্ধিসর্ত্ত যত দিন সম্পাদিত না হইতেছে, তত দিন এইরূপ সম্মেলনের কার্য্যতঃ কোন সার্থকতা নাই।

গত ২৬শে নবেম্বর হাভানা সহরে ট্রেড কনফারেন্স আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর ৬১টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। জেনেভা সম্মেলনে যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সনদের খসড়া রচিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এত দিন ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা অবশ্যই আবশ্যক। কিন্তু এই পরিবর্তন শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নতির যদি প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা আদৌ সম্ভব হইবে না।

বাণিজ্য-বিমান পরিচালন সম্পর্কে একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি করিবার জন্য জেনেভায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পরও এই সম্মেলন চুক্তির কোন খসড়া তৈয়ার করিতে পারে নাই। বৃটেন ও আমেরিকা তাহাদের নিজেদের দাবী একটুকুও ছাড়িতে রাজী নয় বলিয়াই এই সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে। দূরপ্রসারী বিমান লাইনগুলি স্থানীয় বিমান লাইনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, এমন কোন ব্যবস্থা তাহারা মানিয়া লইতে রাজী নহে। গত তিন বৎসরের চেষ্টায়ও কোন চুক্তিতে আসা সম্ভব হইল না।

চীনের গৃহযুদ্ধ—

চীনের সরকারী সৈন্যবাহিনীর হাতে চীনা কম্যুনিষ্ট-বাহিনী পরাজিত হইতেছে বলিয়া চীন সরকার মাঝে মাঝে দাবী করিলেও কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, কম্যুনিষ্টরাই জয়লাভ করিতেছে। দক্ষিণে হুপে এবং আনহুইতে, পূর্ব্বে সাণ্টুংএ এবং উত্তরে হুপেই-এ যুদ্ধ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। চীন-প্রাচীরের দক্ষিণ অংশে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মাঞ্চুরিয়া হইতে বহু সরকারী সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইয়াছে। কাজেই উত্তর দিক হইতে কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। গৃহবিবাদ প্রবল হইয়া উঠা সত্ত্বেও চীনে সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু শতকরা ১০ জন মাত্র ভোটার ভোট দিয়াছে। ২৫শে ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার তারিখ ধার্য্য হইলেও শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দিন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

চীনের গৃহবিবাদের শেষ এখনও বহু দূরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হইতেছে। কুয়োমিণ্টাং দল যত দিন মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট হইতে থাকিবে, তত দিন চীনের গৃহবিবাদের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ব্রহ্মের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ আর এক আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এ-এফ-পি-এফ-এল ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরেই এই সমস্যা দেখা দেয়। সংবাদে প্রকাশ, মধ্য-ব্রহ্মের কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত তিনটি জেলায় বিরোধী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা কম্যুনিষ্টদের কাজ বলিয়াই অভিহিত করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী থাকিন থান তুন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, এই বিরোধী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সহিত কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহাতে ঐ তিনটি জেলায় বিরোধী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা অপ্রমাণিত হয় না। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। আরাকানের বর্ত্তমান অবস্থাও কিছু প্রকাশ নাই। মাস্কিষ্ট লীগ গঠন সম্পর্কে থাকিন মু এবং পি-ভি-ওর নেতাদের একটা মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ১৯৪৮ সালের ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে ম্যাক্সিষ্ট লীগ গঠন সম্পূর্ণ করা হইবে এবং ৪ঠা জানুয়ারীর পূর্ব্বে পি-ভি-ও সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে, বিদেশী সৈন্য যখন ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তখন ব্রহ্মদেশে এই আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল কাহার তর্জ্জনী হেলনে হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ভারতের অভিজ্ঞতা আদৌ আশাপ্রদ নয়।

বর্ত্তমান শ্যাম—

মার্শাল ফিবুল শ্যামের গর্বণমেন্ট দখল করায় শ্যামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা কিছুই আর জানা যাইতেছে না। বিনা রক্তপাতেই ফিবুল কর্ত্তৃক গবর্ণমেন্ট অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ঘটনায় শ্যামে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের অস্তিত্ব আর রহিল না। ফিবুলের প্রতিনিধি মার্কিণ রাষ্ট্র-দূতের নিকট এই আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা গবর্ণমেন্ট দখলকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতার মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে সমর্থন পাওয়া খুবই সহজ। নতুবা যুদ্ধের সময় মার্শাল ফিবুলের কার্য্য-কলাপকে অত সহজে বিস্মৃত হওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছুই সম্ভব হইত না।

১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত মার্শাল ফিবুল সংক্রাম ছিলেন শ্যামের প্রধান মন্ত্রী শুধু নয়—সামরিক ডিক্টেটারও। বাহিরে গণতন্ত্রের ঠাট কিছুটা বজায় রাখা হইলেও আসলে তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা সামরিক একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শ্যাম যে জাপানের প্রধান ঘাঁটি হইয়াছিল তাহাও কাহারও অজানা নাই। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর শ্যাম ইন্দোচীন আক্রমণ করে। ফ্রান্স শ্যামের যে অংশ ১৯০৭ সালে দখল করিয়া লইয়াছিল, এই আক্রমণের পর জাপানের মধ্যবর্ত্তিতায় শ্যাম তাহার কতকটা ফিরিয়া পায়। জাপ আক্রমণ সুরু হইলে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে শ্যাম বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শ্যাম জাপানের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অতঃপর জাপান মার্শাল ফিবুলকে ১৯৪৪ সালে শ্যামের শাসন-কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করে। নাইপ্রিডি ফনোমঙ্গ সমাজতন্ত্রবাদী রাজনীতিক। ১৯৩২ সালের বিদ্রোহে তিনিই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি আত্মগোপন করিয়া স্বাধীন থাই গঠন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। এই জন্য যুদ্ধের পর মার্কিণ-হস্তক্ষেপের জন্যই শ্যামকে ক্ষতিপূরণের দায় হইতে বৃটেন অনেকখানি মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে নাইপ্রিডি ফানোমঙ্গ-এর দল শ্যাম ব্যবস্থা পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে এবং নাইপ্রিডি প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু শ্যামের বালক রাজার রহস্যজনক মৃত্যুর দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে রেহাই দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হয় এবং এডমিরাল ধমং প্রধান মন্ত্রী হন। এক দল দুর্নীতিপরায়ণ সুবিধাবাদীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত থাকায় শ্যামে গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। প্রচুর পরিমাণে চাউল শ্যাম হইতে গোপনে রপ্তানি হইয়া যাওয়ায় জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১২ হইতে ১৪ গুণ বাড়িয়া যায়। জনসাধারণের দিক হইতে কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও কোন প্রতিবিধান হয় নাই। এই অবস্থায় মার্শাল ফিবুল ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি শ্যামে এক জন দক্ষিণপন্থী ডিক্টেটরের অভ্যুত্থানে নিরাশ না হইয়া পারিবে না।

রূঢ় অঞ্চলের সমস্যা—

জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চল ইউরোপের শক্তিকেন্দ্র এবং জার্ম্মাণীর অস্ত্রাগার বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলটি দৈর্ঘ্যে ৮০ মাইল, প্রস্থে ৪০ মাইল। রাশিয়া রূঢ় অঞ্চলকে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনিবার দাবী করিয়া আসিতেছে। রাশিয়ার দাবী কার্য্যে পরিণত হইলে রূঢ় অঞ্চলের হিটলারপন্থী শিল্পপতিদের অস্তিত্ব থাকিবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে উহার সামর্থ্যও বিনষ্ট করা হইবে। কিন্তু তাহার স্থানে গড়িয়া উঠিবে শান্তি সময়ের উপযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ। রূঢ় অঞ্চলের শিল্পগুলিকে সোস্যালাইজড করিবার একটা পরিকল্পনা বৃটেনের ছিল বটে। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে যে ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পনার কোন অস্তিত্ব আর নাই। রূঢ় অঞ্চলে এখন ইঙ্গ-মার্কিণ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার। পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নয় শতের কম হইবে না। কতগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে, সে সম্বন্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয় এখনও একমত হইতে পারেন নাই। ২১৪টি ফ্যাক্টরীকে ভাঙ্গিয়া ফেলা না কি স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৮টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী। জার্ম্মাণ ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষকে (Allied Control Authorities) জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী ভাঙ্গার কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে না। ব্যাপক ধর্ম্মঘট হওয়ার আশঙ্কা করা হইয়াছে। মার্কিণ জেনারেল ক্লে উত্তরে জানাইয়াছেন যে, মার্কিণ করদাতারা জার্ম্মাণীতে খাদ্য প্রেরণ করিতে রাজী না-ও হইতে পারে। তাঁহার এই হুমকী খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু রূঢ় অঞ্চলের ফ্যাক্টরীগুলির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে যে বেকার-সমস্যা দেখা দিবে, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে!

যে সকল ফ্যাক্টরী ভাঙ্গিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭টি ফ্যাক্টরীতে কয়লা-খনির জন্য ইঞ্জিন, পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয়। ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন হইলে রূঢ় অঞ্চলে স্প্রীং-এর উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়া যাইবে। স্প্রীং ছাড়া মোটর লরী প্রভৃতি চলিবে কি করিয়া? শ্রেষ্ঠ সাবানের কারখানাগুলিও ভাঙ্গিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শান্তি সময়ের উপযোগী এই সকল ফ্যাক্টরী ধ্বংস করার অর্থ জার্ম্মাণীকে মার্কিণ-শিল্পের বাজারে পরিণত করা। কিন্তু জার্ম্মাণীর জনসাধারণ মার্কিণ শিল্পজাত জিনিষ কিনিবে কি দিয়া?

এম, ডি, ডি

আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইন্যাল :—

শেষ পর্য্যন্ত গত ১৫ই নভেম্বর নিরুপদ্রবে এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে শীল্ড ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের ন্যায় জনপ্রিয় ও বহু সমর্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের খেলা ইতিপূর্ব্বে বস্তুত: আর কখনও এত চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সঙ্গে এ কথাও না বলিয়া পারা যায় না যে, এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনও বোধ হয় এত নিম্নস্তরের খেলা হয় নাই। অসময়ে অনুষ্ঠিত শীল্ড ফাইন্যালে মরশুমী আবহাওয়ার অভাব অনুভূত হয়। শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান একমাত্র গোলে জয়লাভ করে। প্রথমার্দ্ধের খেলাতেই সেলিম এই প্রয়োজনীয় গোলটি করে। ১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ের দীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে মোহনবাগান এই দ্বিতীয় বার উক্ত গৌরব অধিকার করে। ১৯১১ সালে নগ্নপদ ভারতীয়দের প্রথম দিগ্বিজয়ের কথা না কি বিলাতী পার্লামেণ্টে আলোচিত হয়। এই প্রাচীনতম-জনপ্রিয় দলের পরবর্ত্তী ইতিহাস ব্যর্থতায় ভরা। ১৯২৩ সালে ক্যালকাটা, ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স ও ১৯৪৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ফাইন্যালে তাহাদের পরাজিত করে। শৃঙ্খলমুক্ত ও সদা-জাগ্রত ভারতে শীল্ড-বিজয়ী হইয়া মোহনবাগান প্রথম শীল্ড জয়ের ন্যায় ফুটবল-ইতিহাসে আর এক দফা নূতন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাবের বিজয়ী খেলোয়াড়গণকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ফুটবল দল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে। বিজিত ইষ্টবেঙ্গল দল তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া যোগ্য খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প জীবনে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব নগণ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয় নাই। শীল্ড ফাইন্যালে তাহাদের এ বৎসর উপর্য্যুপরি পঞ্চম আত্মপ্রকাশ। ইতিপূর্ব্বে তাহারা আরও দুই বার পরাজিত হইলেও ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ সালে যথাক্রমে পুলিশ ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা :—

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা এ বৎসর বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মহিলা বিভাগে ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বুক ও চিৎ সাঁতারে তিনটি ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষ বিভাগে প্রফুল্ল মল্লিক যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ মিটার বুক সাঁতারে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ২০০ মিটারে প্রফুল্ল ১৯৪১ সালে বাঙালী সাঁতারু হরিহর ব্যানার্জীর প্রাক্তন রেকর্ড ভঙ্গ করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা দলগত ভাবে বোম্বায়ের নিকট পরাভব মানিতে বাধ্য হয়। বাঙলার নির্ব্বাচিত দল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে, সেণ্ট্রাল ক্লাবের বহু যোগ্য প্রতিযোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। শোনা যায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের উপর নিয়মতন্ত্রসম্মত শাস্তি বিধান করিয়া তাহাদের প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী উপেক্ষা করেন। প্রতিষ্ঠান বা প্রদেশের আইন-কানুনের মর্য্যাদা অপেক্ষা প্রদেশের নিজস্ব প্রতিষ্ঠা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য থাকাই বিধেয়।

ভারতীয় দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর :—

চতুর্থ খেলা :—নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে খেলায় ভারতীয় দল আলোচ্য সফরে প্রথম পরাজয় বরণ করে। অমরনাথ দলভুক্ত হইয়াও প্রথম দিনের পরে আর খেলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। শারীরিক অসুস্থতা তাহাকে কাতর করে। হাজারী দলের নেতৃত্ব লইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলকে ফলো অন এবং এক ইনিংস ও ৪৮ রাণে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

রাণ-সংখ্যা :—নিউ সাউথ ওয়েলস—১ম ইনিংস ৮ উইকেটে ৫৬১ (মরিস ১৬২, মরেনী ১৬, মিলার ৭২, লুকম্যান ৫৮, হাজারী ৪২ রাণে ৩টি, মানকড় ১৫৬ রাণে ৩টি)

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস—২৯৮ (হাজারী ১৪২, মানকড় ৬৭, অধিকারী ৪৭, মিলার ৩১ রাণে ৪টি)। ২য় ইনিংস—২১৫ (অধিকারী ৬৫, টোস্যাক ৬৫ রাণে ৫টি, জনষ্টন ৮৭ রাণে ৩টি)।

ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৪৮ রাণে পরাজিত।

পঞ্চম খেলা :—সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া দলকে ৪৭ রাণে পরাজিত করিয়া ভারতীয় দল অভাবনীয় কৃতিত্বের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ এই খেলাটিকে টেষ্ট খেলার মহড়া বলা হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অধিকাংশ টেষ্ট খেলোয়াড় যোগদান করে। ব্র্যাডম্যান প্রথম ইনিংসে ১৭২ রাণ করিয়া ও দ্বিতীয় ইনিংসে মানকড় ৮৪ রাণে ৮টি উইকেট দখল করিয়া বোলিংয়ে পারদর্শিতা দেখায়।

রাণ-সংখ্যা—ভারতীয় দল, ১ম ইনিংস—৩২৬ (গুল মহম্মদ ৮৫, কিষেণচাঁদ নট আউট ৭৫, ইরাণী ৪৩, জনষ্টন ৭০ রাণে ৩টি)। ২য় ইনিংস—৯ উইকেটে ৩০৪ (সর্বাতে ৫৮, অধিকারী ৪৬, কিষেণচাঁদ নট আউট ৬৩, জনষ্টন ৭১ রাণে ৪টি)।

সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৮০ (ব্র্যাডম্যান ১৭২, মিলার ৮৬, সোহনী ৮১ রাণে ৪টি)। ২য় ইনিংস—২০৩ (হার্ভে নট আউট ৫৬, মানকড ৮৪ রাণে ৮টি)। ভারতীয় দল ৪৭ রাণে জয়ী।

ষষ্ঠ খেলা :—কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় ভারতীয় দল মাত্র ২৭ রাণে পরাজিত হয়। এই খেলায় সময়ের বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভারতীয় দল অপর্য্যাপ্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জয়-নির্দ্ধারক রাণ তুলিতে চেষ্টা করে। বস্তুতঃ, খেলার শেষ মিনিটে তাহাদের দশম উইকেট পড়িয়া যায়। শেষ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে ভারতীয় দল দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং সুরু করে।

রাণ-সংখ্যা :—কুইন্সল্যাণ্ড, ১ম ইনিংস—৩৪১ (মরিস ১১৫, রেমার ৮২, ব্রাউন ৪২, ম্যাককুল ৪৫, মানকড় ৭৭ রাণে ৬টি)।

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ২৬৯ (ম্যাককুল নট আউট ১০১, রেমার ৫২, ক্যারীগান ৪৬, মানকড় ৬২ রাণে ৩টি)।

ভারতীয় দল, ১ম ইনিংস—৩৮৯ (অমরনাথ নট আউট ১৭২, মানকড় ৬৫, কিষেণচাঁদ ৩৪, জনষ্টন ৮৩ রাণে ৬টি, ম্যাককুল ১৪৩ রাণে ৩টি)। ২য় ইনিংস—২১৭ (আমীর এলাহী ৪৪, মানকড় ৩৮, ম্যাককুল ৬৮ রাণে ৫টি ইয়ং ৪৭ রাণে ৩টি)।

কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কলিকাতায় তাঁহার এই প্রথম আগমন। তাঁহাকে দেখিবার জন্ম কলিকাতার ময়দানে যে বিপুল জনসমুদ্র জমা হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। বিরাট জনসমাগমকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুব্যবস্থার অভাবে এবং মাইক্রোফোন অকার্য্যকরী হওয়াতে তিনি ময়দানে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার সময় রেডিও বক্তৃতায় সে কথার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, কলিকাতাবাসীর এই স্নেহ ও শ্রদ্ধা তিনি বহু দিন মনে রাখিবেন। বিগত হাঙ্গামার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ করিয়া বাঙ্গালা অন্য সকল প্রদেশের শিক্ষাস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জন্য বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীকে ধন্যবাদ এবং প্রশংসা জানাইয়াছেন। বিশেষ ক্ষমতা বিল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিলের বিরোধিতা করা চলে। কিন্তু যাহাতে কোনরূপ হাঙ্গামার সৃষ্টি না হয় সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য আমরা বুঝিলাম না। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে জনমতের প্রতিবাদ যত প্রবলই হউক না কেন, আইন-সভায় বিল পাশ হওয়া ঠেকান যাইবে না। সুতরাং গণতন্ত্র এবং নিয়মতন্ত্র কোন কিছুরই মূল্য নাই।

প্রথম স্বাধীন জাতীয় সভা

১৭ই নভেম্বর নয়া দিল্লীতে ভারতীয় গণ-পরিষদের যে অধিবেশন হয় তাহাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বলা চলে। এই অধিবেশনে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় বিরোধী দলের অভাব। সুতরাং কোন বিতর্কই জমিয়া উঠে না। সবই হইয়াছে নিয়মরক্ষার খাতিরে। পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জি ডি মাবলঙ্কর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই অধিবেশনে অনেকগুলি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে, কতক গৃহীত হইয়াছে, কতক সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল বিল গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ সমূহে অনভিপ্রেত সংবাদ নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন সংশোধন বিল প্রধান। শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন, শ্রমিক বীমা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল বিষয় আলোচনা হইয়াছে তন্মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন, যন্ত্র ও দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি, সৈন্যবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের গ্রহণ এবং ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এই আক্রমণ পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ ছিল যে, হায়দ্রাবাদ ইহার জন্য দায়ী, তাহা ভিত্তিহীন। ডিসপোজ্যাল বিভাগের মাল বিক্রয় সম্পর্কে নূতন সরকারী নীতি ঘোষণা করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বলেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা বিক্রয় করা হইবে না। ডিসপোজ্যাল বিভাগের অপকার্য্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সকল সদস্যই একমতাবলম্বী বলিয়া বিল আসিলেই পাশ হইয়া যায়। জনসাধারণ বিলের দোষগুণ সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারে না। অবিলম্বে বিরোধী দল সৃষ্টি না হইলে পার্লামেণ্ট প্রহসনে পরিণত হইবে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাড়ে সাত মাসে রাজস্ব খাতে মোট আয় ১৭১·১৫ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১৯৭·৩৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ভারত ডোমিনিয়নের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত আর কে সন্মুখম চেটি বরাদ্দ করিয়াছেন। এই হিসাব অনুযায়ী ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৬·২৪ কোটি টাকা। সূতী কাপড় এবং সূতা রপ্তানীর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে এই সাড়ে সাত মাসে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান, কাজেই নিট ঘাটতি দাঁড়াইবে ২৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য রাজস্ব খাতে ২২ কোটি টাকা এবং আমদানীকৃত খাদ্য-শস্যের জন্য অর্থসাহায্য বাবদ ২২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকাই এ ঘাটতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কংগ্রেস যখন ভারত বিভাগ স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন যদি লোক-বিনিময় প্রথাও স্বীকার করিতেন তবে এত প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসও হইত না, আর এই আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাও দেখা দিত না। সেই সঙ্গে কৃষিকার্য্যের অভাবজনিত শস্য আমদানীও করিতে হইত না। প্রকাশ যে, ইহা ব্যতীত ৫ কোটি টাকা পাঞ্জাবকে দেওয়া হইবে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য। সুতরাং ঘাটতি আরও বাড়িয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত দেশরক্ষার জন্য ব্যয় করা অত্যাবশ্যক। সামরিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ৯২·৭৪ কোটি টাকা মাত্র। ইহাকে অত্যধিক ব্যয় বলা চলে না।

দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই এই ব্যয়বৃদ্ধি, কাজেই কাপড় ও তাহার উপর রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি ব্যতীত আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থসচিব আর নূতন কোন ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব করেন নাই। এই ঘাটতির জন্য গভর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হইবে। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, যত কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। অবশ্য শিল্প-বাণিজ্যের জন্য অর্থের অনটন যাহাতে না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানের মত অর্থের এত অধিক জরুরী প্রয়োজন

এক যুদ্ধের সময় ছাড়া আয় হয় না। স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনকেও একটা স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করিবার ইচ্ছাও গভর্ণমেণ্টের আছে।

ভারতের প্রকৃত সম্পদ আছে সে কথা সত্য, কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে দেশের অবস্থা অনিশ্চিত। আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে অথচ বেতন বৃদ্ধির ফলে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে। কিন্তু ক্রয়শক্তির চেয়ে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়াছে অনেক বেশী। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করিবার মত ব্যাপক ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ত এখনই সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুটা অবশ্যই করা উচিত ছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেটে তাহার কোন আভাষই আমরা পাইলাম না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু বলা কঠিন। কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্পদের পরিমাণ কিরূপ হইবে, প্রদেশ সমূহকে কি পরিমাণে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন বর্ত্তমানে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থা স্বাভাবিক হইতে অন্ততঃ দু'-চার বছর লাগিবে। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দৃষ্টিতে বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না।

রেলওয়ে বাজেট

ভারত ডোমিনিয়নের যান-বাহন সচিব মিঃ মাথাই ১৫ই আগষ্ট হইতে সাড়ে সাত মাসের বাজেট পেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যাত্রীর ও মালের ভাড়া বাবদ ১০৭ কোটি টাকা এবং বিবিধ খাতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, মোট ১০৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আয় হইবে। কিন্তু ব্যয় হইবে পরিচালনের জন্ম ১০৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং সুদ বাবদ ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, মোট ১২০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি হইবে ১৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। ঘাটতি পূরণের জন্ম যাত্রী ও মালের ভাড়া যাহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহাতে আয় হইবে মাত্র ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। বেতন বৃদ্ধি ও স্বল্প ভাড়ায় খাদ্যশস্য সরবরাহ এই ঘাটতির কারণ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ম কোন কোন স্থানে যান চলাচলের বিঘ্ন হইলেও যাত্রীর ভাড়া বাবদ আয় কমে নাই। পার্শ্বেল প্রভৃতির আয়ও যতটা কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল ততটা কম হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেতন বৃদ্ধির যে ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং শস্য সরবরাহের জন্য ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, তাহার জন্ম ঘাটতি, ফলে ভাড়া বৃদ্ধি। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া সাধারণ ট্রেণে মাইল-প্রতি ৪ পাই এবং মেল ট্রেণে মাইল-প্রতি ৫ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ চাপটা দরিদ্র শ্রেণীর উপরই পড়িয়াছে, কারণ আসল আয় তাহাদের নিকট হইতেই আসে। আয় যাহা বাড়িয়াছে, তাহার উপর ব্যয় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে, অধিকন্তু আবার রেল ভাড়া বাড়িল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভোগ অথবা নিগ্রহ কমাইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে যানবাহন সচিব উল্লেখ করেন নাই।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি

কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি শেষ পর্য্যন্ত অর্থনীতির দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিগুলি আজ পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে এই দলাদলি হইতে দূরে রাখিতে হইবে। পণ্ডিত জহরলালের এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিতে ভাল, কিন্তু ইহা কার্য্যকরী হইবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। দক্ষিণআফ্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরোধিতা এবং সোভিয়েট রাশিয়া সহযোগিতা করিয়াছে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বৃটিশ ও মার্কিণ সাহায্য-পুষ্ট হইয়া নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদের জন্ম ভারত ইউক্রেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। কোরিয়ার ব্যাপারেও কি ভারত বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের দলাদলির ঊর্দ্ধে ছিল? অবশ্য প্যালেষ্টাইন বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভারত কোন পক্ষেই ভোট দেয় নাই, কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? বৃটেন নিরপেক্ষ, অতএব ভারতও নিরপেক্ষ! কিন্তু ভারত বিভাগ পণ্ডিতজী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যদি আজ তৃতীয় যুদ্ধ বাধিয়া যায়, ভারত কি দল ছাড়া হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে? যে দেশের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং সামরিক শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী, তাহার পক্ষেই নিরপেক্ষতা অথবা দল নির্ব্বাচন সম্ভব। অন্যকে প্রায় বাধ্য হইয়াই দলে ভিড়িতে হয়। বর্ত্তমান যুগে নিরপেক্ষতা বলিতে সশস্ত্র নিরপেক্ষতাই বুঝায়। ভারত স্বাধীন হইয়াছে বলিয়াই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে নাই। পররাষ্ট্রনীতি সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে আত্মরক্ষার জন্ম সুদৃঢ় সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন।

খাদ্যশস্য-নীতি

খাদ্যশস্য-নীতি নির্দ্ধারণ কমিটির সুপারিশকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব হ্রাস, (২) নিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, (৩) বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী ও মৌলিক পরিকল্পনা, (৪) উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইতে রপ্তানীর এবং ঘাটতি প্রদেশে আমদানীর পরিমাণ নির্ণয়, এবং (৫) যে সকল খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, তাহাদের তালিকা এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ। চাউল (ধান সহ) গম (ময়দা ও আটা সহ), বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা এবং বার্লির উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। ছোলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এখন হয় নাই। অন্যান্য খাদ্যশস্যে অবাধ বাণিজ্য চলিবে। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য-দ্রব্যের সংগ্রহ-মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে—চাউলের মণ-প্রতি ১।০ টাকা, ধান মণ-প্রতি ১৲ টাকা, অন্যান্য মণ-প্রতি ৮০ আনা। কিন্তু এই বর্দ্ধিত মূল্য খাদ্য-শস্য ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে না। বর্দ্ধিত ব্যয়ভার বহন করিবেন প্রাদেশিক সরকার এবং তাঁহারা কেন্দ্র হইতে পাইবেন খাদ্য-বোনাস। নিয়ন্ত্রণ-১৯৪৮ সালেও শিথিল না করিবার সুপারিশও করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার প্রবল দাবী করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও বিপদ আছে। মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, চোরা-বাজারে দেশ ছাইয়া যাইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। প্রকারান্তরে চোরা-কারবারকেই সমর্থন করা হইতেছে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের অবস্থা শোচনীয়। বরাদ্দ বাড়াইবেন তাহারও না কি উপায় নেই। দেশব্যাপী খাদ্য-দুর্ভিক্ষ। রেশন-ব্যবস্থা রাখিতে হইলে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। সারা বৎসর ধরিয়া জন-প্রতি ১২ আউন্স খাদ্য রেশন-ব্যবস্থা মারফৎ দেওয়ার উপযোগী পর্য্যাপ্ত সরবরাহ এবং জরুরী অবস্থার জন্ম সঞ্চয় থাকার মত ব্যবস্থা হইলেই শুধু খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা শিথিল করা সম্ভব। কিন্তু ব্যবসায়ীদের গোপন মজুত করা যত দিন বন্ধ না

হইবে, তত দিন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দূর করা অসম্ভব। আমদানী শস্যের উপর নির্ভরতা দূর করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ দুইটির কোন দিকেই বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় নাই। সরকারী এজেন্টরা যে দামে কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করেন, তাহা অপেক্ষা কত বেশী দামে সরকারকে বেচেন, এই প্রশ্ন বাদ দিয়া সংগ্রহ-মূল্য বৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়। কারণ, তাহা হইলে ব্যয়ই বাড়িবে কিন্তু কৃষকদের কোন সুবিধাই হইবে না। এই ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে (যদি রেশন কার্ডধারীদের বেশী মূল্য না দিতে হয়) হয় ট্যাক্স বৃদ্ধি, না হয় নূতন কর ধার্য্য করা হইবে। ফলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা আরও বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। কাজেই আমাদের মনে হয়, ১৯৪৮ সালে খাদ্য-শস্যের রেশন-ব্যবস্থা বহাল থাকাই সমর্থনযোগ্য। কারণ, এই সালে অনেক ব্যয়সাধ্য গঠনমূলক কার্য্য করিতে হইবে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আরও কঠোর দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইতে হইবে।

বিশেষ ক্ষমতা বিল

পশ্চিম-বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ ক্ষমতা বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা চলিবে, সংবাদ প্রকাশ, শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে। যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া দুই মাসের অনধিক কাল আটক রাখা চলিবে। সরকারী অনুমতি ব্যতীত কুচকাওয়াজ করিলে তাহা বন্ধ করা চলিবে এবং আরও অনেক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে। বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধন) এন্‌-অ্যাক্টমেণ্ট বিল দ্বারা পুলিশকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতীত সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যে কি বিপুল ক্ষমতা হাতে রাখিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বৃটিশ শাসনে যে সকল বিধানের নিন্দা আমাদের নেতারা তীব্র ভাষায় করিয়াছেন আজ তাঁহারাই সেই সকল নিন্দনীয় বিধান জারী করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কোন কারণ এখন পশ্চিম-বঙ্গে নাই, তবু এই সময়কে কেন তাঁহারা সঙ্কটক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন? অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, জীবিকার নিরাপত্তার অভাবে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার আশঙ্কাই কি ইহার কারণ? ব্যবস্থা পরিবর্ত্তে দমনই কি সরকারের নীতি?

বিশেষ ক্ষমতা বিলটি জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করিতে অস্বীকার করিয়া সরকারী দল প্রমাণ করিলেন যে, জনমতের কোন তোয়াক্কাই তাঁহারা করেন না। স্বাধীন ভারতে বৃটিশ অত্যাচারের অনুকরণ, অথচ প্রধান সচিব তাঁহার সহিংস কার্য্যাবলীর অহিংস উপায় ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, "অনেকেই আজ স্বাধীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রভেদ রাখিতে চাহিতেছেন না, কিন্তু আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই, উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করা হইবে না।" ইহা বৃটিশ-যুগের উক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র। জাতীয় সংগ্রামকে যে আই-সি-এস, আই-পি-এস গোষ্ঠী এবং পুলিশ-পুঙ্গবরা নির্ম্মম ভাবে বাধা দিয়াছিল, জাতীয় সরকারের আজ তাহারাই পাণ্ডা। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা এবং তাহাদের প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"যাহাই করা হউক না কেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকে এবং আই-সি-এসরা গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিয়া থাকে। সুতরাং যদি কোন আই-সি-এস কর্ম্মচারী কোন অন্যায় কাজ করে, তবে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।" তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, ছাত্র এবং কৃষকদের শোভাযাত্রায় উপর পুলিশ আক্রমণ, শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অপর দুই জনকে গ্রেপ্তার, এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশ পালকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য বরখাস্ত, এই সকল দুষ্কর্মই আমাদের জাতীয় সরকার করিয়াছেন?

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিবারণের জন্য বিশেষ ক্ষমতার কোন প্রয়োজনই হয় না। যে নেতারা আজ এই ক্ষমতা বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন, সুরাবর্দ্দীর গভর্ণমেণ্টকে ঠিক এই কারণেই তাঁহারা গালি পাড়িয়াছিলেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা একটা অজুহাত মাত্র। গত দাঙ্গায় দেখা গিয়াছে, দমনে অক্ষমতা অনিচ্ছা-প্রসূত, বিশেষ ক্ষমতার অভাবে নয়।

এই বিল সম্পর্কে জনমতের যে অভিব্যক্তি ইতিমধ্যে হইয়াছে তাহা মন্ত্রিসভা নিশ্চয়ই অবগত। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি দাখিল করিয়াই আইনে রূপান্তরিত করিবার অশোভন আগ্রহ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আমাদেরই নেতা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের মত বিশেষ ক্ষমতার জন্য ব্যাকুল! তবে কি তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন, অথবা হারাইতে পারেন এমন কোন কার্য্য করিয়াছেন অথবা ভবিষ্যতে করিবেন? ইহার জন্যই কি দেশবাসী গত ৬০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়াছে? বর্ত্তমানে ভারত ডোমিনিয়ন কোন যুদ্ধে লিপ্ত নহে। আত্মপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া পাকিস্থানকে আশঙ্কা করে না বলিয়াই মনে হয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কাও নাই বলিয়াই প্রকাশ। তবে "উপদ্রুত" অঞ্চলের মত বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন কোথায়? দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব যদি বিদেশী শাসকের হাত হইতে জনগণের হাতে না আসিয়া দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়ে, তবে কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য এই ধরণের আইন প্রয়োজন হইতে পারে। কৃষক-শ্রমিক-প্রজারাজ যে ভূয়া আশ্বাস, ইহা তারই প্রমাণ। আজ শাসন ক্ষমতা যে মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহাতে হস্তচ্যুত না হয়, তাহার পাকা ব্যবস্থার জন্যই এই বিল। ডাঃ পট্টাভি সীতারামিয়া ঠিকই বলিয়াছেন—"এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস জমিদার, বড় বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই চলিয়াছে। কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের সম্বন্ধে এ কথা খাটুক আর নাই খাটুক, কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা যে ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারা যায়।" ডাঃ সীতারামিয়া একেবারে গোঁড়া গান্ধীপন্থী কংগ্রেস-ভক্ত। "তাঁহার পরাজয় আমার পরাজয়।"—মহাত্মাজীর উক্তি। এ হেন ব্যক্তির কথা বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যে বৃটিশ শাসন-প্রণালী প্রায় হুবহু নকল করিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তারা স্বাধীন ভারতের জন্য শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার গোড়ার কথা—"বিনা বিচারে কাহাকেও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।" অথচ বাঙ্গালার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ঠিক তাহার বিপরীতটি করিবার জন্য উদ্যত। এই অসামঞ্জস্যের সাফাই হিসাবে

প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষা ও বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ বন্ধ করিতে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা শাসন, গুণ্ডাদমন এবং বে-আইনী ভাবে প্রদেশের বাহিরে দ্রব্যাদি চালান নিষিদ্ধ করিতে সরকারের হাতে না কি বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলেই নয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ যে কত বে-বুনিয়াদ যুক্তির অবতারণা করিতে পারে ইহা তাহারই নিদর্শন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অর্থে কি তাঁহার এবং তাঁহার দলের নিরাপত্তা। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনা বিচারে কারাগারে প্রেরণের সুবিধার জন্য এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন, এই কথা মনে করিলে কি ভুল হইবে? তাহা হইলে নূতন নির্ব্বাচনে তাঁহার দল ব্যতীত অপর কেহ পরিষদের চৌকাঠ পার হইতে পারিবেন না।

অশ্রু-অর্ঘ্য

ন্যাশন্যাল এজেন্সী কোম্পানী এবং ডি, এম, দাশ এণ্ড সন্স লিমিটেডের সর্ব্বাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র সেন গত ১৬ই নভেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন, প্রথম জীবনে আসাম গভর্ণমেণ্টের সেটেলমেণ্ট বিভাগের অধীনে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী চাকুরীর সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না—আরম্ভ হইল তাঁহার ব্যবসায়ি-জীবন। ভগবৎ-বিশ্বাস, সততা, সংযম ও কঠোর পরিশ্রম—ইহাই ছিল অবিনাশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মভীরু কর্ত্তব্যপরায়ণ, সততাসম্পন্ন ও স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি আমরা খুব কমই খুঁজিয়া পাই। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

২৪শে অগ্রহায়ণ ব্যবস্থা পরিষদ ভবনের সম্মুখে পুলিশের গুলী-বর্ষণের ফলে আর, ডবলিউ, এ, সি'র ক্যাডেট শিশিরকুমার মণ্ডল নিহত হন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁহার মৃতদেহ লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শবযাত্রায় যোগদান করিয়া শহীদের আত্মার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

* * *

দৈনিক বসুমতীর প্রাক্তন ক্রীড়া-সম্পাদক মণিমোহন মিত্র ১৬ই অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। বসুমতী যখন খেলাধূলার সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে, তখন মণি বাবু এই ভার গ্রহণ করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বসুমতীর সেবা করিয়াছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন এক জন চৌকস খেলোয়াড়। ময়দানে সর্ব্বজনপ্রিয় 'মণিদা'। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

'দৈনিক বসুমতীর' প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক জ্ঞানদাচরণ দাস ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি নানা রোগে-কষ্ট পাইতেছিলেন।

প্রায় ২৫ বৎসর আগে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাঁহার সাংবাদিক-জীবন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। তিনি সাপ্তাহিক 'আজকাল' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।

তিনি তাঁহার স্ত্রী, একটি নাবালক পুত্র, দুইটি কন্যা ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

* * *

২২শে অগ্রহায়ণ হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভাই পরমানন্দ বহু দিন ধরিয়া রোগভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন।

* * *

১০ই অগ্রহায়ণ রামকৃষ্ণ-ভক্ত স্বামী মহেন্দ্রনাথ পুরীর তিরোভাব হইয়াছে। সাংসারিক জীবনে তিনি ছিলেন সার চার্লস টেগার্টের সহকর্ম্মী সহকারী পুলিশ কমিশনার মহেন্দ্রনাথ। তাঁহার কর্ম্মজীবন সাধুতায়, সত্যনিষ্ঠায়, সাহসিকতায় এবং তৎপরতায় পূর্ণ ছিল। এ জন্য তৎকালীন সরকার তাঁহাকে King's Medal প্রদান করেন। বিপুল পৌরুষের অন্তরালে সহানুভূতি এবং সমবেদনা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার তিরোধানে আমরা এক জন প্রকৃত ভক্ত এবং কর্ম্মী হারাইলাম।
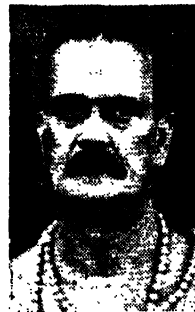
* * *

ভারতের খ্যাতনামা উদারনৈতিক নেতা সার চিমনলাল শীতলবাদ বিগত কিছু দিন যাবৎ রোগ-ভোগের পর ২৪শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন এবং গোল টেবিল বৈঠক সমূহে ভারতের এক জন প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের অসহযোগিতা নীতির তীব্র বিরুদ্ধ-মতবাদী ছিলেন। মণ্টেগু শাসন-সংস্কারের প্রথম অবস্থায় তিনি বোম্বাই গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার হিসাবে তিনি এক গৌরবময় কর্ম্মজীবন রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

... ত্বকের জন্যে কি ধরণের স্নিগ্ধ জিনিস আপনি বেশী পছন্দ করেন? নিশ্চয়ই প্রকৃতিজাত স্নিগ্ধ জিনিস! পালকের মতো কোমল, রেশমের মতো মসৃণ, সুগন্ধি পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ও পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে দেখুন—মুখখানি পরিচ্ছন্ন, সজীব ও জলজ্বলে থাকবে। সর্ব্বত্রই সুন্দরী রমণীগণ পণ্ডস ব্যবহার করেন।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম: রোজ দুবার মুখের ওপর পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মেখে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করুন; আঙুলের ডগা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাখবেন। তারপর পণ্ডস টিস্যু দিয়ে তুলে ফেলবেন।

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম: কোল্ড ক্রীম মুছে দিয়ে আঙুলের ডগায় ক'রে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম লাগান। লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে কিন্তু ত্বক সুরক্ষিত থাকবে।

পণ্ডস পাউডার: ইচ্ছে করেন তো এর পরে পণ্ডস পাউডার লাগিয়ে নেবেন—ফুলের পাপড়ির মতো হবে মুখখানি।

ব্যবসা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য:

এল, ডি, সিমুর এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ। বোম্বাই—কলিকাতা—করাচী—মাদ্রাজ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী —সুভো ঠাকুর

বাউল — নন্দলাল বসু

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৪ তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর—তুমি ঘরণী; আমি রথ—তুমি রথী; যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি; নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু'। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্র ধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা ক'রতে লাগল; বলে এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী ব'ল্লেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়! আমি তাঁর দাসী মাত্র'। আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি।

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হ'য়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'রলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু করতে পারি?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার Science সায়েন্স সব ছাই প'ড়েছে।

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা ধ'রে থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে ব'লেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মানছো ব'লে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম? তা তুমি মানো আর নাই মানো! তবে একটী কথা আছে—মানুষ কি ক'রবে, তিনিই মানাবেন! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো।

ডাক্তার। তুমি কি মনে ক'রেছ অমুক তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানবো? * * * * তবে তোমার সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মানতে বলছি গা?

—কথামৃত

স্বামিজী ও নেতাজী

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সাধনধারার দুইটি প্রতীক। রজঃ হইতে সত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় স্বামিজীর অপূর্ব জীবনে; সত্ত্ব হইতে রজোগুণের পূর্ণ পরিণতি হয় নেতাজীর বিচিত্র জীবনে। তার্কিক শুষ্ক দর্শনবাদী নরেন্দ্রনাথ দত্ত অবিশ্বাসের ভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ভগবানের দর্শন আমায় করাইতে পারেন? আপনি ভগবান দেখিয়াছেন? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন,— হ্যাঁ, আমি ভগবান দেখিয়াছি এবং তোমাকেও দেখাইতে পারি। এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন এবং গুরুকৃপায় সত্যই ভগবদ্‌লাভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দরূপে জগতে পরিচিত হইলেন। আমেরিকার চিকাগো সহরে পৃথিবীর ধর্মসভায় এই সুপুরুষ তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর মুখে ভারতের ধর্মবাণী শুনিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। গান্ধী—রবীন্দ্র—জহরলালের পূর্ব-যুগে এমন করিয়া ভারতের বাণী আর কেহ জগৎকে শুনাইতে পারেন নাই। বাঙালী কবি তাই গাহিলেন—

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

রবীন্দ্রোত্তর যুগে আর একটি বাঙালীর ছেলে রাজনৈতিক জগতে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। হিন্দু-মুসলমান বিভিন্ন জাতির মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি জগতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাইয়াছিলেন।

এই ত্যাগ এবং দুঃখব্রতী সৈনিকের প্রথম জীবন আরম্ভ হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তরূপে। তিনি ইউরোপীয় প্রথায় মানুষ হইলেও ধর্মপ্রাণা মাতার নিকট কৈশোরে রামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতেন। প্রথম যৌবনে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। এই সময়ে (৩০-১০-১৪) আমার নিকট লিখিত একখানি পত্রের উদ্ধৃতি হইতে তাঁহার মনোভাব বুঝা যায়:—

"মনে পড়ে একটা চিত্র। কালী মন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তাঁর সম্মুখে একটি বালক—বালক হইলেও বাল-প্রকৃতি—আধ আধ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কা'কে যেন ডেকে ডেকে বলিতেছে,—মা, এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য।"

"করাল-মুখী ভীষণ দংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়, সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই, মন্দও চাই, পুণ্যও চাই, পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে। না দিলে শান্তি নাই— মাও ছাড়িবেন না।

"বড় কষ্ট, মাকে সবই দিতে হইবে, মা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, তাই কাঁদিতেছে ও বলিতেছে—এই নাও, এই নাও। দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল, গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল, হৃদয় জুড়াইল। হৃদয়ে আর কিছু নাই,

যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল, তার চিহ্নও নাই, সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল, বালক উঠিল, আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। বালকটি রামকৃষ্ণ!"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্ব্বস্বদানের সাধনায় সুভাষচন্দ্রও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনার বলিয়া তারও আর কিছু ছিল না। পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য সে কি আত্মদান না করিয়াছিল! সাধক সুভাষ ত্যাগের বিভূতি মাখিয়া সৈনিক সুভাষে পরিণত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে শুধু নেতা ছিল না—নেতাজী হইয়াছিল।

স্বামিজী ও নেতাজী উভয়েই ছিলেন দর্শনের ছাত্র—উভয়েই হইয়াছিলেন সন্ন্যাসী। সুগভীর স্বদেশপ্রেম দু'জনের প্রাণেই জোয়ার বহাইত। বাঙালীর ঘরে এমন সুদর্শন পুরুষ কয়টি হয়? এমন ব্রহ্মচারী ক'জন হইয়াছে? শুধু দু'জনেরই অকালমৃত্যু আজিও সকলের হৃদয়ে দুঃখ সঞ্চার করে। কিন্তু দেহাতীত তাঁদের অমর কীর্ত্তি, অপূর্ব সাধনা যুগে যুগে যথাক্রমে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ও স্বাধীনতার যুদ্ধে চিরকাল ভাস্বররূপে দীপ্তি পাইবে।

(প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)

পাঠ

—রামকৃষ্ণ বসু

স্নান

অপেক্ষা

—চিত্তরঞ্জন দাস

ভিক্ষা

-বাণীকুমার
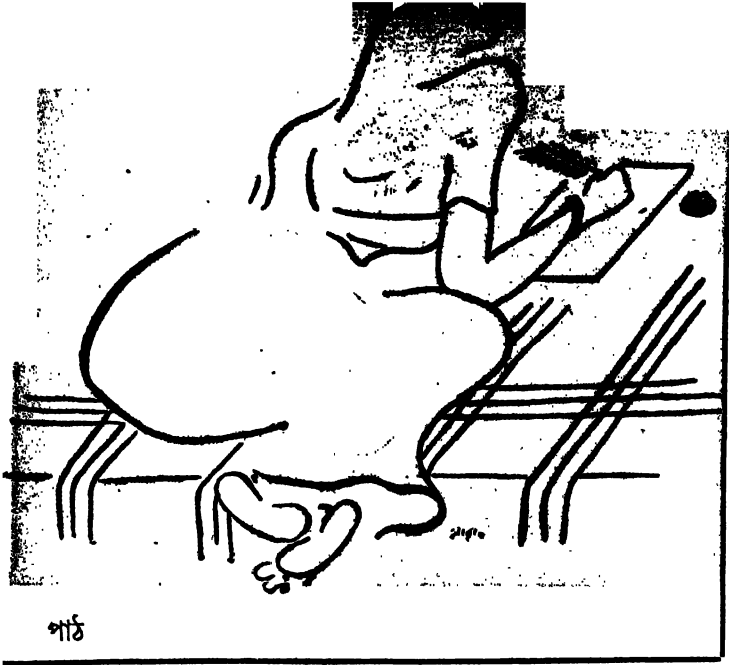
সোণার দর কেন কমে না?

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

সেদিনের সান্ধ্য-মজলিস তেমন জমে নাই, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াও বৃষ্টি থামে নাই। যাদের আসবার কথা ছিল তারা অনুপস্থিত, শুধু একটি মাত্র বন্ধু লইয়া বাসর জাগাইয়া চলিয়াছি। বন্ধু নীরব। জিজ্ঞাসা করিলাম, অত চুপ-চাপ কেন? কিছু শোনাও। বন্ধু প্রশ্ন করিল—বলতে পার, সোণার দর কেন কমে না?

একটু চমকিত হইলাম। তখনকার আবেষ্টনীতে সোণার দর কেন কমে না, এ প্রশ্ন কারও মাথায় খেলিতে পারে তাহা ভাবিতে পারি নাই। কত সমস্যা, হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, জুনাগড়, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, এলিজাবেথের বিবাহ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব ছাড়িয়া সোণার দর কেন কমে না—এ প্রশ্ন লইয়া কে আবার মাথা ঘামায়? বন্ধু আমার সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক। হাসিয়া উত্তর দিলাম, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কি প্রয়োজন? কয় তো কালিদাস-ভবভূতি লইয়া কবিতালোচনা। সোণার দরের সহিত তার কি কোন সম্বন্ধ আছে? বন্ধুবর রসিক, তাই জবাব দিলেন, ব্যঙ্গ করো না, শুনিয়াছি, তোমাদের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলায় মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না কোন দিন, কর্ত্তারা ব'লতেন, টাকায় চার মণ চাল এদেশে পাওয়া যেত। আজ সে স্থলে চার সেরও মিলে না, তার জন্ত ভিক্ষে চাইতে হয় বিদেশীর কাছে। চালের যদি এ অবস্থা, তবে আদাও যে কোন দিন এড্রিয়াটিক্ উপকূল হইতে এ দেশে আসিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? কাগজে দেখনি, পশ্চিম-বাংলা সরকার ব্রহ্মদেশ হইতে হাজার হাজার মণ আলুর বীজ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন?

যুক্তি বিলক্ষণ, তাই বন্ধুবরকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চাহিব, তাহার মীমাংসা তো তুমিই করিয়া দিলে, তবে কথা বাড়াইয়া লাভ কি? চাল, চিনি, কাপড়-জামার দাম যদি না কমে তবে সোণার দরটাই বা কমিবে কি করিয়া? বন্ধু নাছোড়বান্দা, স্মরণ হইল, বিবাহযোগ্যা তাহার একটি কন্যা আছে, তাই বর-ক'নের যৌতুকের ভাবনা তাহাকে ভাবাইয়া থাকে। তাই কিছুক্ষণ বকিতে রাজি হইলাম।

হলদে রংয়ের এই ধাতব পদার্থটির উপর মানুষের দুর্ব্বলতা যাবহমান কালের। রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হারাইয়া স্বর্ণসীতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ যুগেও আমরা স্বর্ণমন্দির গড়িয়া তুলি দেবতার উপাসনার উদ্দেশ্যে। আদর করিয়া ছেলে-মেয়েদের নাম রাখি সোণা, স্নেহান্ধ প্রতিপালক স্নেহাস্পদকে ভর্ৎসনা করেন, সোণার-পাথা বলিয়া। কৃতী সন্তানের পারিতোষিক দেই সোণার পদকে, কন্যাদায়ের উদ্ধারের প্রতিকার করি সোণার উপঢৌকনে, তাই দেখা যায়, আদর-আপ্যায়ণে, তিরস্কার-পুরস্কারে পূজা-অর্চনায় সর্ব্ব ক্ষেত্রে আমরা করি ইহার ব্যবহার, তদুপরি আছে ইহার চাহিদা নানাবিধ শিল্পে। অর্থনৈতিক মীমাংসার মান হিসাবে অন্য কোন ধাতুর চেয়ে ইহার প্রাধান্য ছিল বেশী। কিন্তু এ সমুদ্র-হিমাচল চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদন যৎসামান্য, তাই আমাদের প্রয়োজনেই দিতে হয় ইহাকে বিসর্জ্জন। তবুও ছাড়িয়াও যেন ইহাকে ছাড়া যায় না—এমনি ইহার আকর্ষণ!

বাদশাহী আমলের মোহরের মোহ আজ আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। বর্ত্তমানের আলী সাহেবের বিবিকে তুলাদণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় ওজন করিতে হয় না। স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অনেক কাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, খাঁটি রূপার টাকাও আজ সরকারের কৃপায় অদৃশ্য, পরিবর্ত্তে আমরা ব্যবহার করি নানা হীনজাতীয় ধাতুর মুদ্রা আর কাগজের টাকা। মহম্মদ তোগলক চামড়ার টাকা প্রচলন করিতে গিয়া কি বিড়ম্বনায়ই না পড়িয়াছিলেন। তবুও সে ত ছিল চামড়ার টাকা, কাগজের তুলনায় কিছুটা মূল্যবান, সেই কাগজের টাকা গ্রহণ করিতে এখন আর আমরা আপত্তি করি না,—কালের কি পরিবর্ত্তন!

খাঁটি স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর ক্রমান্বয়ে আমরা ইহার কতই না রূপান্তর লক্ষ্য করিলাম। পরিশেষে মুদ্রার মানদণ্ড হিসাবে আজ আমরা কাগজকেই গ্রহণ করিয়াছি। শিল্প, বাণিজ্য ও ভেষজ দ্রব্যে ব্যবহৃত হইয়া স্ত্রীজাতির অলঙ্কারের স্পৃহা মিটাইয়া যে পরিমাণ স্বর্ণ অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা সারা দুনিয়ার মুদ্রার মান বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার, তাই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে মানুষ বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সোণা তাহার মাধুর্য্য, আধিপত্য বা আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হারায় নাই, বৈদেশিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিতে আজও ইহাই একমাত্র মান বলিয়া স্বীকৃত। বৃটন-উড্সে যে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পরিকল্পনা হয়, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্বর্ণ রপ্তানীর প্রয়োজন না হয়। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এই প্রসঙ্গে ইহাও সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বোঝা-পড়া করিতে স্বর্ণই সর্বতোভাবে উপযোগী। স্বদেশে অর্থ-নৈতিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে কাগজের মুদ্রার কার্য্যকারিতা বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহা অচল, তাই বর্ত্তমান শতাব্দীতেও স্বর্ণের আসন অপর কোন ধাতু বা পদার্থ অধিকার করিতে পারে নাই। উপরোক্ত কারণে ভাণ্ডারে যোগদানকারী প্রত্যেক সভ্যকে তাহার দেয় টাকার শতকরা ২৫ ভাগ অথবা তাহার মোট সঞ্চিত স্বর্ণ ও ডলারের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ (এ দু'য়ের যাহা লঘু হয়) জমা দিতে হইবে স্বর্ণে। ফলে ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৩৪ জন সভ্যের মধ্যে যে ২৯ জন সভ্য ভাণ্ডারে চাঁদা জমা দিয়াছিল, তাহার মোট ৬৫৩,৫০,০০,০০০ ডলারের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১৩৪,৪০,০০,০০০ ডলার, ২০৬,৩০,০০,০০০ ডলার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায়, আর বাদ-বাকী ৩১২,৪০,০০,০০০ ডলার ছিল অন্যান্য দেশীয় মুদ্রায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐ দিনে ভাণ্ডারের শতকরা ২০'৫৭ ভাগ ছিল স্বর্ণে, ৩৭'৫৭ ভাগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায়, আর ৪১'৮৬ ভাগ ছিল বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রায়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র রাশিয়া ভিন্ন বর্ত্তমানে জগতের প্রায় সকল দেশগুলিই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাল রাখিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। সোণার মূল্য নির্দ্ধারণ-কার্য্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৯৩৫ সালে সোণার মূল্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আউন্স প্রতি ৩৫ ডলারে স্থিরীকৃত হয়, অর্থাৎ তোলা-প্রতি ৪৩॥৴৩ পাই—ঐ মূল্যে মার্কিণ সরকার বিক্রেতার নিকট হইতে সোণা কিনিতে আইনতঃ রাজি হয়। আজ পর্য্যন্তও সে আইনের কোন অদল-বদল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে হয় নাই।

যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপে সকল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের হাতে অধিকতর অর্থের আমদানী হয়। পণ্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্ম চাকুরে, পেনসন্‌ধারী শ্রেণীর জনসাধারণ—যাহাদের আয়ের অঙ্ক সীমাবদ্ধ, সেই অতিরিক্ত অর্থের কার্য্যকারিতা কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দেয়,—এরা চোরা-কারবারীর দল। সময় থাকিতে দু'পয়সা কামাইয়া লইবার জন্ম সর্ব প্রকারের নীতির বিসর্জ্জন দেয় এরা। যুদ্ধান্তে ধরা পড়িবার ভয় এদের ছিল, তাই এরা খোঁজ করিয়াছিল এমন একটি জিনিষের—যাহাতে উপার্জ্জিত অর্থ রূপান্তরিত করিয়া সরকারকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে। সে আশ্রয় তাহারা পাইয়াছিল সোণার ভিতর। তাই ত সোণার জন্ম এত কাড়াকাড়ি, তার এত দাম। নিজের দেশকে শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ম যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিল যুদ্ধে, সেই সকল দেশে চোরা-কারবারীদের উৎপত্তি যতটা হইয়াছিল তাহার চেয়ে অধিকাংশ এদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সেই সকল দেশে যাহাদের উপর চাপান হয় যুদ্ধবিগ্রহ। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সরকারের কর্ম্মতৎপরতার জন্ম উৎপাদন-শক্তি প্রয়োজন অনুপাতে অব্যাহত থাকে ; দ্রব্য-মূল্য কিছু-কিছু বৃদ্ধি পাইলেও গগনচুম্বী হইতে পারে নাই। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইতে সাধারণের অসুবিধা হইত না বলিয়া চোরা-কারবারীরা এই সব দেশে সুবিধা করিতে পারে নাই। সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিল ইহারা ভারতবর্ষ, ইরাক, ইরাণ, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে। এই সব ঘৃণ্য ব্যবসায়ীর দল চোরা-কারবারে কি বিরাট অর্থ রোজগার করিয়াছিল, তাহার হিসাব-নিকাশ কখনও হইবে না। তবে ইহাদের হাজার টাকা মুনাফা-পিছু বাংলা দেশে ১৯৪৩ সনে এক জন করিয়া মানুষের জীবন বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।*

রণ-দেবতার রথচক্রের আবর্ত্তের সাথে সাথে ও মুদ্রাস্ফীতির চাপে দ্রব্য-মূল্য যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল চোরা-কারবারীদের স্বর্ণ-লোলুপতা, কিন্তু এ চাহিদা মিটাইবার মত স্বর্ণসম্ভার কি পৃথিবীতে ছিল ?

১৯৪৬ সন বাদে পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত স্বর্ণের পরিমাণ ক্রমাগত নিম্নগামী হইতে থাকে। ১৯৩১ সনে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলে প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলি তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে এই সকল দেশগুলি পুনরায় স্বর্ণ-বাজারে ক্রেতারূপে দেখা দেয়। ফলে শিল্পের চাহিদা যোগাইয়া স্ত্রীজাতির অলঙ্কার-স্পৃহা মিটাইয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিত, তাহা জাগতিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত অল্প। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৬-৪৭ সালের অর্থনৈতিক বিবরণ অনুযায়ী স্বর্ণের উৎপাদন ও বণ্টন নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(দশ লক্ষ আউন্স হিসাবে)

	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬
শিল্পে ব্যবহৃত সোণার পরিমাণ	১·০০	২·০০	২·৮০	৪·৪০	৫·৮০	৭·৫০	৯·৩০
প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলি হইতে গৃহীত সোণার মাপ	—২·২০	০·১০	০·৪০	১·১০	১·৭০	১·৮০	১·১০
অর্থনৈতিক ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য ভাবে সোণার ব্যবহারের মাপ	—১·২০	১·১০	৩·২০	৫·৫০	৭·৫০	৯·৩০	১০·৪০
নূতন সোণা উৎপাদনের হার	৪০·৭০	৩৯·৬০	৩৪·২০	২৭·৫০	২৪·৯০	২৪·৩০	২৫·০০
অর্থনৈতিক ব্যবহারের নিমিত্ত সোণার পরিমাণ	৪১·৯০	৩৭·৭০	৩১·০০	২২·০০	১৭·৪০	১৫·০০	১৪·৬০

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৬ সনে অর্থনৈতিক ব্যবহারের জন্ম পৃথিবীতে যে পরিমাণ সোণা মজুত ছিল উহা ১৯৪০ সনের তুলনায় শতকরা ৬৫ ভাগ কম। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার তুলনায় সরবরাহ না থাকার জন্ম সোণার দর যে বাড়িয়াই চলিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ? থাক না উহার দর ইংলণ্ড বা আমেরিকায় সরকারী খাতাপত্রে ধরা-বাঁধা।

তবুও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সময়ে প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানীর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়—যাহার জন্ম দেশ-দেশান্তরে ইহার চালান বিরাট আকারে হইতে পারিত না। এই ব্যবস্থার একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারী খাতে প্রাচ্যে ও মধ্য-প্রাচ্যে স্বর্ণ বিক্রয়ের প্রচেষ্টা। ১৯৪৪ সনের ১৮ই ডিসেম্বর রয়টারের খবরে প্রকাশ যে, স্থানীয় মুদ্রাস্ফীতি দমনের নিমিত্ত ও যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্য-সামন্তের ব্যয়ভার বহনের জন্ম ইঙ্গ-মার্কিণ সরকার মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, আরব, ইরাণ, ভারতবর্ষ ও চীনে মার্কিণ সরকারের বাঁধা দরের বহু ঊর্দ্ধে সোণা বিক্রয় করিয়াছে। ১৯৪৩ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত একা ভারতবর্ষেই ৭৫ লক্ষ আউন্স সোণা বিক্রয় হইয়াছে।†

* দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্ট।

† এই প্রসঙ্গে লেখকের ১৩৫১ সনের চৈত্র মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত 'স্বর্ণযুগ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

—নন্দলাল বসু

যুদ্ধ শেষ হইবার পরে ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসের কাছাকাছি দেশ-বিদেশে সোণার আমদানী-রপ্তানী আবার দেখা দেয়। ঐ সময় মেক্সিকো দেশে আউন্স-প্রতি ৪০'৫৩ ডলার হিসাবে সোণা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা আরম্ভ হয়। সুতরাং এই সোণার দর সরকারী দরের চেয়ে আউন্স-প্রতি ৫'৫৩ ডলার বেশী ছিল। তুরস্ক ও সুইজারল্যাণ্ড এই ধরণের স্বর্ণ বিক্রয়ে মনোনিবেশ করে। কিছু দিন যাইতে না যাইতে অসুবিধা দেখা দিল। ক্রয়কারী দেশগুলিকে এই সকল সোণার দাম মার্কিণ ডলারে অথবা ক্যানাডা, সুইটজারল্যাণ্ড, সুইডেন, আরজেনটাইন, তুরস্ক বা মেক্সিকো দেশীয় মুদ্রায় দিতে হইত—যাহার সংস্থান করিতে ইহারা সমর্থ ছিল না। বিক্রয়কারী দেশগুলিও অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল। সাধারণতঃ বিক্রয়কারী দেশগুলি তাহাদের বহির্বাণিজ্য-লব্ধ ডলার দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সোণা ক্রয় করিত। পরে ঐ সোণাই চড়া দামে বিক্রয় করিয়া মোটা মুনাফা লাভ করিত। এই সকল দেশগুলি তাহাদের স্বল্পপরিসর স্বর্ণ-ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু সোণা বিক্রয় করিল কিন্তু নিজেদের ঘাটতি মিটাইবার জন্ম ইহাদের চাহিতে হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। নিম্নে কয়েকটি দেশের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের আয়তন দেওয়া গেল :—

(১০ লক্ষ ডলারের হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৭৬৪৪	২১৯৯৫	২২৭৩৭	২২৭২৬	২১৯৩৮	২০৬১৯	২০০৬৫	২০৫২:
ফরাসী দেশ	২৭০৯	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	১৭৭৭	১০৯০	৭৯৬
সুইজারল্যাণ্ড	৫৪৯	৫০২	৬৬৫	৮২৪	৯৬৫	১১৫৮	১৩৪২	১১৪৪
দক্ষিণ-আফ্রিকা	২৪৯	৩৬৭	৩৬৬	৬৩৪	৭০৬	৮১৪	৯১৪	৯৪১
মেক্সিকো	৩২	৪৭	৪৭	৩৯	২০৩	২২২	২৯৪	১৮১
তুরস্ক	২৯	৮৮	৯২	১১৪	১৬১	২২১	২৪১	২৩৫
ভারতবর্ষ	২৭৪	২৭৪	২৭৪	২৭৪	২৭৪	২৭৪	২৭৪	২৭৪
ব্রিটেন	•••							

১৯৩৯ সনে ব্রিটেনের স্বর্ণ-ভাণ্ডার ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট হইতে সরকারী বিনিময় সমতা ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত হয়। যদিও উহার সঠিক পরিমাণ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ না করিয়া সরকারী খাতাপত্রে গুপ্ত রাখা হয়—তবুও অনুমান, বর্তমানে (ডিসেম্বর ১৯৪৭) ঐ ভাণ্ডারে গচ্ছিত স্বর্ণের মূল্য প্রায় ২২৪,০০,০০,০০০ ডলার।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা "ডলার" ও স্বর্ণ সরবরাহের অপ্রতুলতা ছাড়াও আর এক প্রতিবন্ধক এই প্রকারের স্বর্ণ বিক্রয়ের পথ রোধ করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্যবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানায়। অর্থভাণ্ডারের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সভ্যবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানায়, যেন তাহারা সরকারী বাঁধা দামের উপর স্বর্ণবিক্রয়ের প্রচেষ্টায় সহায়তা না করেন ; কেন না, এই প্রকারের বিক্রয় দ্বারা কোন কোন দেশ সাময়িক সুবিধা উপভোগ করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে ইহাতে আন্তর্জাতিক বিনিময়-ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার স্থিরতা নষ্ট হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্ণর ডাঃ ডিকস্‌-প্রমুখ একাধিক অর্থনীতিবিদ একই প্রকারের মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অগত্যা মেক্সিকো স্বর্ণ-বিক্রয় বন্ধ করে। তুরস্ক ও সুইজারল্যাণ্ডও অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেবল শিল্পজাত স্বর্ণ ছাড়া অন্য সকল প্রকারের সোণার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেয়। বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সরকারী নির্দ্দিষ্ট দরের উপরে সোণা বেচা-কেনার কারবার বন্ধ করে। ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে তোলা-প্রতি আমদানী সোণার উপর ২৫৲ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য করা হয়। ঐ বৎসরের ১২ই আগষ্ট হইতে শুল্ক-হার শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। সোণা আমদানী ইহাতে বন্ধ হইয়া না যাওয়ায় ভারত সরকার বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৭ সন) ৬ই মার্চ্চ হইতে সোনা আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাই সমসাময়িক কালের স্বর্ণ-মৃগয়ার ইতিবৃত্ত।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কর্ম্মকর্তাদের চেষ্টায় খোলাখুলি ভাবে সরকারী বাঁধা-ধরা দামের উপরে সোণা বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সোণার চোরা-বাজার বন্ধ করিতে তাহাদের প্রচেষ্টা কি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে ? হয়তো তা হয় নাই। আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে সহজ ভাবে চড়া দরে খোলাখুলি ভাবে সোণা ক্রয় করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু গোপনে অসৎ উপায়ে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক সহরে প্রয়োজন মত সোণার যোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। সরকারী ভাবে চোরাবাজার বন্ধ হওয়ায় সোণার লেন-দেন এই সব স্থানে কি দরে হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকাশ যে, চোরাবাজারে সোণার দর আউন্স-প্রতি ৪০ হইতে ৪৩ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রামানের তোলা-প্রতি ৪১৷৶৩ পাই। ঐ সময়ে অবিশ্যি ভারতে সোণার দাম গড়-পড়তায় ভরি-প্রতি ছিল ১০১ টাকা মাত্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়ও সোণার দর রুখিতে পারা যাইতেছে না—চোরাবাজার বন্ধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সহসা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, ব্যাপারটা তেমন কিছু আশ্চর্য্যজনক নয়। এ দেশে ও বিদেশে সকল দেশের সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার মানসে চেষ্টায় কসুর করিতেছেন না। কিন্তু কৈ—ধান, চাল, চিনি, কাপড় প্রভৃতির মূল্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর খাদ্যদ্রব্যের বেলায়—যাহা বেশী দিন ধরিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—যদি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর না হয় তবে স্বর্ণের বেলায় নিয়ন্ত্রণ কি করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারে ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ হইবার সাথে সাথে সারা দুনিয়া ব্যাপিয়া একটা অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের

ছায়া ঘনাইয়া পড়িয়াছে। পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির দরুণ উৎপাদন খরচ বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি শ্রমিকেরা তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন পাইতেছে না। ফলে দেখা দিতেছে ধর্ম্মঘট। বেতন কিছুটা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের পরিমাণ তেমন না বাড়ায় অধিক টাকা-পয়সার আমদানীর ফলে পণ্যমূল্য আবার উঁচু হইয়া উঠে। বেতন আর দ্রব্য-মূল্যে পাল্লা চলে। কখনও এ ওকে ছাড়াইয়া চলে, আবার পরক্ষণেই ও একে পিছু হটাইয়া দেয়। এ-হেন অবস্থায় আমাদের কর্ণধারেরা চাহেন, সোণার দর পূর্ব্বাপর যেন একই থাকে। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হইবে, জিনিষ-পত্রের দাম অচিরেই স্থিরতা লাভ করিবে, হয়তো হইবেও; কিন্তু কবে? অর্থনীতিবিদ্‌রা জ্যোতিষী নন। তবে অতীত ও বর্ত্তমানের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ইঁহারা করিতে পারেন। সেই সূত্রে বলা চলে যে, আগামী দিনে পণ্যমূল্যের কিয়ৎ পরিমাণ হ্রাস হইলেও 'রাম-রাজত্ব' আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু কবে যে সে দিন উপস্থিত হইবে, তাহা আজ অনিশ্চিত। আগামী কিছু কাল যাবৎ যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহার আভাষই পাওয়া যাইতেছে।

যত দিন যুদ্ধ চলিতেছিল, তত দিন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের ফলে দ্রব্য-মূল্য বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে তেমন চড়িতে পারে নাই। যুদ্ধান্তে প্রায় সকল দেশেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ক্যানাডায় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চিনি, চাউল, বাড়ীভাড়া প্রভৃতি দুই-একটা জিনিষ বাদে অন্যান্য সকল জিনিষের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সরকারী বিধি-নিষেধ নাই। বৃটেনে অবিশ্যি নিয়ন্ত্রণ-প্রথা আরও কিছু দিন চলিবে বলিয়া মনে হয়। সেখানে খাদ্য-দ্রব্য, পরিধেয়—সর্ব্বোপরি অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ-প্রথার অপসারণ যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তথাপি সেখানেও শিল্পজাত দ্রব্যের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব ধীরে ধীরে তুলিয়া নেওয়া হইতেছে। শাক-সবজী বিশেষ ভাবে বিলাতী বেগুন ও মাছের ব্যবসায়ের উপর (যাহাতে দুর্নীতির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসার হইয়াছিল) হইতেও সরকারী প্রভাব ক্রমশঃ কমান হইতেছে। আমাদের দেশেও জনমত নিয়ন্ত্রণ-প্রথার বিরুদ্ধে। মনে হয়, এখানেও খাদ্যদ্রব্য, যথা,—চাউল, গম বাদে অগোণে অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব তুলিয়া লওয়া হইবে।

নিয়ন্ত্রণ-প্রথা তুলিয়া লওয়ায় কি ফল দাঁড়াইয়াছে? পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সনে পাইকারী ও খুচরা জিনিষ-পত্রের দরের ক্রমিক সংজ্ঞা যথাক্রমে ছিল ১৪৩ ও ১৩১ ডলার। উহাই ১৯৪৭এর মার্চ মাসে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৯৬ ও ১৫৭ ডলারে। বৃটেনে পাইকারী দর প্রায় একই রহিয়াছে। তবে খুচরা দর শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যানাডায় ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে (মার্চ মাস) দ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর শতকরা ২০ ভাগ ও ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি আরও বেশী হইয়াছে। গত বছরের তুলনায় পাইকারী ও খুচরা জিনিষের দাম যথাক্রমে ৬৮ ও ২২ ভাগ বাড়িয়াছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল :—

(১৯৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্যের মান ১০০ হিসাবে ধরিয়া)

	পাইকারী দর			খুচরা দর		
	১৯৩৯	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৩৯	১৯৪৬	১৯৪৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১০১	১৪৩	১৯৬	১০০	১৩১	১৫৭
বৃটেন	১০৬	১৭৭	১৮৯	১০৫	১৩২	১৩৩
ক্যানাডা	১০৩	১৪৪	১৬৪	১০১	১১৯	১২৮
ভারতবর্ষ	১০৯	৩০৬	৩৭৪	১০২	২৫৮	২৬০

বস্তুতঃ, মুদ্রাস্ফীতির চাপে ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের অন্যান্য মাল-মসলার সহিত শ্রমিকের খরচ খাতেও উৎপাদনকারীদের প্রভূত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উভয়বিধ ব্যয়ভারের মধ্যে আবার শ্রমিক খাতে ব্যয় হইতেছে বেশী। যুদ্ধান্তে নানাবিধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ধর্ম্মঘটের হিড়িক সর্ব্বত্রই লাগিয়া আছে। ফলে উৎপাদনের হার যেমন কমিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছে উৎপাদনের খরচ, জিনিষ-পত্রের দর যে বাড়িবে তাহাতে আর কথা কি? অনুরূপ কারণেই যে সোণার দর বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আপত্তি কি? জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান সকল ক্ষেত্রেই কম-বেশী বাড়িয়াছে। স্বর্ণখনির শ্রমিকেরাও ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বেতন বৃদ্ধি তাহাদের বেলাও কম হয় নাই, কিন্তু উৎপাদিত স্বর্ণের দর বাঁধা থাকায় উহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা উৎপাদনকারীর পোষাইতেছে না, সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণখনির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণে ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, নিউগোয়েনা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে অনেকগুলি স্বর্ণখনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। খনিতে স্বর্ণের মূল্য আশানুরূপ বৰ্দ্ধিত না হইলে এই সকল খনিগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইতেছে না।

তথাপি স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধির স্বপক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন কথাই বলিতেছে না। আর এই দুই প্রধান রাষ্ট্র যদি স্বপক্ষে রায় না দেয়, তবে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের অন্যান্য সভ্যদের যুক্ত-চেষ্টা দ্বারাও যে কিছু ঘটিবে তাহা অসম্ভব; কেন না, অর্থ-ভাণ্ডারের আইন অনুযায়ী ইংলণ্ড বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একাকী অন্যান্য সকল সদস্যের সম্মিলিত যে কোন প্রস্তাবকে নাকচ করিয়া দিতে পারে। ইঙ্গ-মার্কিণ দলীয় অর্থনৈতিকেরা বলেন যে, স্বর্ণ-মূল্য বৰ্দ্ধিত হইলে জগতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সম্মিলিত স্বর্ণের দর বর্ত্তমান উচ্চ হারে কষিবে। ফলে সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত নোট চালু হইবে; পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ঘটিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও ঐ একই পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রজাত দ্রব্যের ক্রেতাদের উহার জন্য আরও বেশী অর্থ খরচ করিতে হইবে; অধিকাংশ দেশেই যে যৎসামান্য অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত হইবে, উহা সম্পূর্ণই যুক্তরাষ্ট্র-জাত দ্রব্য আমদানীতে ব্যয়িত হইবে। পরিপন্থীরা কিন্তু বলেন যে, সোণার দর আউন্স-প্রতি ৪০ ডলার নির্দ্ধারিত হইলেও যে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য আরও বৰ্দ্ধিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, সোণার দর তো এক যুগ ধরিয়া আউন্স-প্রতি ৩৫ ডলারই আছে, কিন্তু সেই ব্যবস্থা কি চালের দর চার টাকায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে? তাহা যখন হয় নাই, তখন সোণার দর বাড়িলেও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য তদনুরূপ বাড়িবে না; এমন আশা করা অন্যায় হইবে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন-প্রমুখ আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা সোনার দর বাড়াইবার বিপক্ষে মত দিয়াছেন, তবুও স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধির একটা জোর গুজব শুনা যাইতেছে। ইংরেজ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। বিখ্যাত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী ডাঃ ডিকক্ বলেন যে বর্ত্তমানে স্বর্ণের বর্দ্ধিত মূল্যের হার মুদ্রাস্ফীতির জটিলতাই সৃষ্টি করিবে; কিন্তু ভবিষ্যতে মন্দা-বাজার যখন দেখা দিবে, তখন স্বর্ণমূল্য বৰ্দ্ধিত করিয়া টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াইয়া তুলিলে মন্দা-বাজারের সমস্যার সমাধানে বহুলাংশে সহায়তা করিবে। ডাঃ ডিকক্ মনে করেন যে, এক বছরের মধ্যেই স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে।* আর সে কার্য্যের ভার হয়তো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই গ্রহণ করিবে। মন্দা-বাজারে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি না করিয়া স্বর্ণমূল্য কিছু বাড়াইয়া, ডলারের স্বর্ণ পরিমাণ কিছু কমাইয়া যদি ব্যবসায়ের বাজার তেজী রাখা যায়, তবে সেই পন্থাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে।

কোন কোন অর্থনৈতিক মহল মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে সঞ্চিত স্বর্ণের কিয়দংশ যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিতরণ করা যায় তবে স্বর্ণ-সঙ্কট অনেকাংশে প্রশমিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের মিঃ বেভিন অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রভাবশালী দল স্বর্ণ বিতরণের পক্ষপাতী। নকস্ দুর্গে সঞ্চিত স্বর্ণ হইতে দুই বা তিন লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের সোণা দেশে দেশে মার্শাল পরিকল্পনার সহকারিরূপে বিতরণ করিবার স্বপক্ষে জনমত গ্রহণের জন্য তাঁহারা প্রচেষ্ট হইয়াছেন এবং অগোণে যথোপযুক্ত প্রস্তাব মার্কিণ সিনেটে উত্থাপন করা হইবে।†

কিন্তু এত সব আড়ম্বরের সার্থকতা কি? আজ পৃথিবী চায় আহারে অন্ন, পরিধানে বস্ত্র, বাস করিবার গৃহ এবং দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার উপকরণরূপে মার্কিণ ডলার। সেই ডলারের যোগানের পথ রুদ্ধ করিয়া সোণার খনি দান করিলেও বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী হাহাকার প্রশমিত হইবে না। এই তো সেদিন নাৎসী জার্ম্মাণীর কবলমুক্ত ১৭'৮২'৬৬,০০০ ডলার মূল্যের সোণা ফরাসী নেদারল্যাণ্ড ও ইটালীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী দেশ পণ্যদ্রব্যের আমদানী বাবদ যুক্তরাষ্ট্রে ১'১০,০০,০০০ ডলার মূল্যের সোণা পাঠাইল, বৃটেন পাঠাইল ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সোণা। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মাত্র সোণার রদবদল করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না; কেন না, যুক্তরাষ্ট্র যতটুকু সোণা অন্য দেশকে দান করিবে বা ঋণ দিবে, ততটুকু বা তাহারও বেশী সোণা পুনরায় তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিবে। বহু বছরের পরীক্ষার ফলে মানুষ অর্থনৈতিক মুদ্রামান নির্দ্ধারণ ব্যাপারে যে স্বর্ণ-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছিল, ব্রিটন উড্‌সের পরামর্শ সভায় যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা হয়তো আমরা আবার সাধিয়া সেই শৃঙ্খলই পরিতে যাইতেছি। মুদ্রামানের স্বর্ণবন্ধ উহার প্রবর্ত্তনের প্রথম কয়েক বৎসর বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। তখন পৃথিবী বর্ত্তমানের মত জল-সমুদ্রে হাবুডুবু খায় নাই। আমাদের সমস্যাও এত জটিল ছিল না; বহির্বাণিজ্যে খুব সামান্য জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদান হইত। পরবর্ত্তী কালে আমাদের জীবনে ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার সাথে সাথে স্বর্ণরজ্জুতে ফাঁস লাগিল; সে পথে তাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সহজ সাধারণ ভাবে চলিতে পারিল না। পরিবর্ত্তে আমরা প্রবর্ত্তন করিলাম কাগজে মুদ্রার মান; সোণার সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর সে মানকে নির্ভর করিতে হইত না। কর্ম্মক্ষমতাও তার মন্দ ছিল না; তবুও তাহাকে দূরে সরাইয়া আজ আবার আমরা সোণার উপরই ভর করিতে যাইতেছি। কিন্তু কি আশায়?

ঘটনাচক্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মোট সঞ্চিত স্বর্ণের সর্ব্বপ্রধান অধিকারী, আর সেই একমাত্র রাষ্ট্র—যে নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া অন্যকে কিছু দান বা বিক্রয় করিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, তবে অচিরে এমন এক অচল অবস্থার উদ্ভব হইবে, তখন সারা দুনিয়ার পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে; কেন না, বিনিময়ে উপযুক্ত স্বর্ণ রপ্তানীর ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না। এই প্রকারের পরিস্থিতিতে হয় এশিয়া ও ইউরোপীয় প্রভৃতি দেশগুলিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। এই ধরণের সঙ্কটের সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়াইয়াছি। সমগ্র পৃথিবী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আজ হৃতসর্ব্বস্ব। যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপে এই সকল দেশের উৎপাদন-শক্তি আজ পঙ্গু। এই সব পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রস্থিতে জীবনসঞ্চার করিতে হইলে ঋণ বা ভিক্ষা দান করিলেই চলিবে না, এদের নির্জ্জীব দেহে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। ইহারা যাহা চায় তাহা দিতে হইবে ও যাহা দেয় তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অন্যের কাছ হইতে কিছু কিছু পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবার নীতি অবলম্বন না করে, তবে তাহার মার্শাল সাহেব কর্ত্তৃক রচিত সকল পরিকল্পনা "বুমরাং"এর মত এক দিন তাহাকেই আঘাত করিবে।

অপর পক্ষে যদি যুক্তরাষ্ট্রে সুবুদ্ধি উদয় হয়, যদি তাহারা এশিয়া, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশগুলির নিকট হইতে কল-কব্জা, খাদ্য-দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে কিছু কিছু অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করে, তবে ঐ সকল দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো আবার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইবে। এই সকল দেশগুলির শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ইহাদের ক্রয়-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। সোণার চাহিদা কম হইবে; ইহাদের মূল্যও কমিবে; অন্যথায় নয়।

সজল-ঘন বরষার দিনটিতে অরসিক বন্ধুটির বেরসিক প্রশ্নের উত্তর দিতে কতক্ষণ যে কাটিয়াছে, তাহার খেয়াল করিতে পারি নাই। ভূতুড়ে গল্প, গান-বাজনা, তাস-পাশা, কাব্যকলা, যাহা কিছু বর্ষার সঙ্গী তাহাদের অকারণে নির্ব্বাসন দিয়া নীরস শুষ্ক অর্থনৈতিক আলোচনায় যে বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই; তবু বন্ধুত্বের খাতিরে যে সময়টুকুর বৃথা অপব্যয় করিলাম, তাহার জন্য আজ আর আফশোষ করিয়া লাভ নাই। কারণ, তাহা বিগত। তবে পাঠকবর্গ যেন আমাকে নিতান্তই নীরস মনে না করেন; আমার রসিক মনটির পরিচয় আমি দিয়াছিলাম যখন আলোচনা শেষে আমার চির-পুরাতন ভৃত্যটিকে চায়ের ট্রে হস্তে আসিতে দেখিলাম।

---

* 'ষ্টেটস্‌ম্যান', ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ † 'ষ্টেটস্‌ম্যান', ৯-১১-৪৭।

গণতন্ত্র না ডলারতন্ত্র ?

ললিত হাজরা

"গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তর্কক্ষেত্র জাতিসংঘে মার্কিণ প্রতিনিধি এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিতগণের বক্তৃতায় পাওয়া গিয়াছে। বাকী যাহা ছিল "মার্শাল পরিকল্পনা"র উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি টুম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত অখ্যাতনামা সিনেটর পর্য্যন্ত সকলেই যে সব বক্তৃতা ও বিবৃতি দিতেছেন, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা যুদ্ধান্তে গৃহীত হয় নাই। প্রাক্-যুদ্ধ আমল হইতেই এই প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের বাস্তুঘুঘু চার্চিল-পরিচালিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও তাহার দোসর ব্যবসায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে সত্য কথা ; কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মুখে বড় বড় ফ্যাসিষ্টবিরোধী বুলি আওড়াইলেও তাহারই মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধান্তে একটি প্রাচীর খাড়া করিবার মতলব ভাঁজিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হয়। তিনি মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন : "সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন একযোগে সাধারণ শত্রু বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেও তাহাদের মধ্যে যে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যান্য পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহা অতি গভীর। একত্রে সমর-প্রবৃত্তিতে মনোনিবেশ করিয়াও পরস্পরের প্রতি যে গভীর অবিশ্বাস ছিল তাহা দূরীভূত হয় নাই। এই মতদ্বৈধতা যদি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একত্রিত হইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি দল খাড়া করিবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিবে। ("The Discovery of India—Pt, Nehru, p-483.) বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিলেই পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হইবে না।

ফ্যাসিজমের বর্ব্বরতা হইতে সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রের প্রগতিশীল নরনারী যখন ভয়াবহ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেছিল, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত নায়কগণ অর্থাৎ মর্গ্যান, রকফেলার, ডুপণ্ট, মেলন প্রভৃতি বিরাটকায় ব্যবসায়িগণ যুদ্ধান্তে সমগ্র জগতে ব্যবসায় ফাঁদিয়া কি ভাবে সমগ্র জগৎকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পদানত করা যায়, তাহার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা রচনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের যে হাত ছিল না, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। উল্লিখিত ব্যবসায়ীদের হস্তে ছিল জাহাজ কোম্পানী, রেলওয়ে, কল, কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, কয়লা, লৌহ, তৈলের খনি। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য যাবতীয় উপাদানগুলিই উল্লিখিত ব্যবসায়ীদের হস্তে রহিয়াছে। মানবতা রক্ষার্থে লক্ষ লক্ষ নরনারী রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং উল্লিখিত ব্যবসায়িগণ যুদ্ধ আরও দীর্ঘ দিনব্যাপী জিয়াইয়া রাখিয়া কি ভাবে মুনাফা লুণ্ঠন করা যাইতে পারে, তাহারই মতলব ভাঁজিয়াছে এবং মুনাফাও লুঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় উক্ত ব্যবসায়িগণ কি হারে মুনাফা শিকার করিয়াছে, তাহার হিসাবও আমরা পাইয়াছি। গত ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ্‌ যুদ্ধের বৎসরে মার্কিণ ব্যবসায়িগণ কি হারে মুনাফা লুঠিয়াছে, তাহার তদন্ত করিবার জন্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিলেন। এই কমিটি বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের খাতা-পত্র তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে দেখা গেল যে, ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তায় লাভ ছিল ৫ শত ৩০ কোটি ডলার, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার দুই বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৩ সালেই উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির গড়পড়তায় লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ হাজার ৫ শত কোটি ডলার, অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার দুই বৎসরের মধ্যেই লাভের পরিমাণ ঘোড়-দৌড়ের ন্যায় তীব্র বেগে ছুটিয়া গিয়া ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন আয়-কর ধার্য্য করা হইয়াছিল, কিন্তু আয়-কর কাটিয়া লইয়াও দেখা গেল যে, ১৯৩৬—৩৯ সালের লাভ অপেক্ষাও ১৯৪৩ সালে নীট্ লাভ হইয়াছে দ্বিগুণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি জাহাজ কোম্পানী আছে। এই কোম্পানীগুলি ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে নামিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এই কোম্পানীগুলি লাভ করিয়াছে ৩৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র ও সামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্ত মাত্র এক শতটি প্রতিষ্ঠান মোট কনট্রাক্টের শতকরা ৬৭'২ ভাগ লাভ করিয়াছিল। এই কন্ট্রাক্টের মূল্য ছিল ১৭ হাজার ৩ শত কোটি ডলার। ইহাতে যে প্রচুর মুনাফা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদের মধ্যে মর্গ্যান-ডুপণ্টের (Morgan-Du Pont)এর মিলিত প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস কোম্পানী একাই পাইয়াছিল ১ হাজার ৪ শত কোটির কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ শতকরা ৮ ভাগ। এক দিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী মানবতা রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং অন্য দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে মুনাফা লুঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রতিনিধি টুম্যান রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হইলেন। প্রতিক্রিয়াশীল দলের সে কি উল্লাস! গণতন্ত্রের গাল-ভরা চোখা চোখা কয়েকটি বুলি আওড়াইয়া রাষ্ট্রপতি টুম্যান কালবিলম্ব না করিয়াই "লাল জুজুর" দোহাই দিয়া দেখা দিলেন—রাষ্ট্রপতি ডলারম্যানরূপে।

১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপতি টুম্যানের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স ফরেন ট্রেড্‌ কাউন্সিল, (United States Foreign Trade Council), দি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স চেম্বার অব কমার্স (United States Chamber of Commerce), দি চাইনিজ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স (Chinese American Chamber of Commerce) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ একটি সভায় মিলিত হইয়া, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মার্কিণ আধিপত্য কি ভাবে বিস্তার করা যায়, তাহার একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় সমগ্র জগতের বাজারে মার্কিণ মালের একচেটিয়া অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইল না। তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, সমগ্র জগতের প্রত্যেকটি

দেশে তাঁহারা অফুরন্ত মূলধন নিয়োগ করিয়া তথাকার শিল্প বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন। তাঁহারা আরও প্রকাশ করিলেন যে, তৈল, টিন, ম্যাঙ্গানিজ, রেলপথ, বিমানপথ, গ্যাস কারখানা, বৈদ্যুতিক সরবরাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশে মূলধন নিয়োগ করিবেন। এই পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সরকারের অভ্যন্তরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবান্দের প্রতিনিধিগণ আসন্ন সমরের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। এমন কি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইকনমিক অ্যাফায়ার্স (Under Secretary of Stat for Economic Affairs) মিঃ উইলিয়াম ক্লেটন (William Clayton) পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন, "...সমরাস্ত্র প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় কতকগুলি বিশিষ্ট কাঁচা মালের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংগঠন নির্ভর করিতেছে, বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানীর উপর। সুতরাং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই বিদেশে মার্কিণ মূলধন নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।..." এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিঃ ক্লেটনের দপ্তর স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই একটি অংশ। বিদেশের যে কোন একটি রাষ্ট্রে মার্কিণ ব্যবসায়িগণ একবার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে, সেই রাষ্ট্রের শিল্পের অগ্রগতি পুরাপুরি ভাবে ব্যাহত করিবেই। উপরন্তু, সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি আপন ইচ্ছানত নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই ভাবে মার্কিণ শিল্পপতিগণ এই সব দুর্ব্বল দেশের মৌলিক শিল্প সংগঠনে বাধা দিবে এবং দুর্ব্বল দেশগুলিতে আপনাদের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করিবে। এই উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন ল্যাটিন, আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে নিয়োজিত হইতেছে।

এই ব্যবসায়িগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকারের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া প্রথমেই নামিয়াছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ হিসাবে টিকিয়া আছে। কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মুক্তি-যোদ্ধৃগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ফিলিপাইনের স্বাধীনতা দাবী উত্থাপিত করিয়া আসিতেছে। গত যুদ্ধের সময়ে এই দাবীর তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ফিলিপাইনের নেতৃবৃন্দের নিকট জাপানের পরাজয়ের পরই ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই স্বাধীনতা নাম মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইবে না—ফিলিপাইন সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ করিবে। এই ঘোষণা এত ব্যাপকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল যে, মার্কিণী ব্যবসায়ীদের পক্ষে এটা পুরাপুরি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হইতে পারে নাই। ১৯৪৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ফিলিপাইনকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "বেল্ ট্রেড এ্যাক্ট" (Bell Trade Act) নামে একটি আইন পাশ করাইয়া ঘোষণা করা হইল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী দ্বীপপুঞ্জে থাকিবে (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা হইল মাত্র ২ কোটি। ১৯৪৬ সালের যে হিসাব হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই অতি ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে ১০ হাজার মার্কিণী সশস্ত্র বাহিনী রহিয়াছে।) ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ সরকারী কার্য্যালয় ও সামরিক ঘাঁটি রক্ষা করিবার জন্য, ফিলিপাইনে মার্কিণী শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এবং ফিলিপাইনের প্রাকৃতিক সম্পদ যাহাতে মার্কিণ নাগরিক ও ফিলিপাইনের অধিবাসিগণ সম ভাবে উপভোগ করিতে পারে ও মার্কিণ ব্যবসায়ীদের নূতন পুঁজি নিয়োগে যাহাতে ব্যাঘাত ঘটিতে না পারে, তজ্জন্যই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ সশস্ত্র বাহিনী উভয় রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যই থাকিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শাসন-বিধির পরিবর্ত্তন যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য "বেল ট্রেড এ্যাক্ট" পাশ করা হয়। বহু বিঘোষিত "মার্শাল পরিকল্পনা"র প্রাথমিক সংস্করণ যে এই "বেল্ ট্রেড এ্যাক্ট" তাহা বুঝিতে বোধ করি বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের প্রতিশ্রুতির অপমৃত্যু লক্ষ্য করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেল পত্রিকা 'ফার ইষ্টার্ণ সার্ভে' (Far Eastern Survey) "বেল ট্রেড এ্যাক্টের" সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিলেন: "১৯৪৬ সালে ৪ঠা জুলাই সরকারী ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনে তাহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘোষণা করিবে। কিন্তু বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব ও সর্ত্তাবলীর সাহায্যে ফিলিপাইন গণতন্ত্রের জন্মোৎসব রহস্যাবৃত করা হইয়াছে যে, এশিয়ায় নূতন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের এমন সম্ভাবনা নাই। প্রাক্-যুদ্ধ আমলের ঔপনিবেশিক লোলুপতাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে নূতন আকারে প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।"

চীনকে কেন্দ্র করিয়া ডলারের ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মস্কো সম্মেলনে তদানীন্তন মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব বার্ণস প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, অনতিবিলম্ব দ্রুতগতিতে চীন হইতে মার্কিণ সৈন্যবাহিনী অপসারণ করা হইবে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সদর কার্য্যালয় (United States Army Headquarters) এবং ১২ হাজার সৈন্য থাকিবে। ১৯৪৬ সালে ৩রা আগষ্ট তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লিবারেল পত্রিকা 'দি নেশন' (The Nation) সম্পাদকীয় মন্তব্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল চিয়াং কাইশেকের প্রতি অহেতুক প্রীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিল: "১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট "লেণ্ড লিজের" (Lend Lease) মারফতে চীনের গৃহযুদ্ধ জিয়াইয়া রাখিবার জন্য চিয়াংকে ২ শত ৭১ খানি যুদ্ধ জাহাজ এবং ৪ শত কোটি ডলার মূল্যের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম উপঢৌকন দিয়াছে।" কুয়োমিনটাঙ বাহিনীকে আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব মার্কিণ সমরবিদেরা গ্রহণ করিয়াছে। ফলে কুয়োমিনটাঙ বাহিনী পুরাপুরি মার্কিণ সামরিক বিভাগের তাঁবেদার বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। টিঙটাওতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজ প্রয়োজনে একটি নৌঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দান-খয়রাতীর জন্য যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেকের জন্য অর্থব্যয় করিতেছে, তাহা নহে। সুদে-আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই অর্থ আদায় করিয়া লইতেছে। ১৯৪৬ সালে নভেম্বর মাসের চীন-মার্কিণ বাণিজ্য-চুক্তি (Chinese American Commercial Treaty) অনুসারে চিয়াং কাইশেক্ তাঁহার সহকর্ম্মিগণ চীনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের

নিকট বিকাইয়া দেন। এই চুক্তির বলে চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার সরকার মার্কিণী মাল সম্পর্কে শুল্ক-প্রাচীর (Tariff wall), কোটা (quota) নিয়ন্ত্রণ, এবং সরকারী ট্রেডিং এজেন্সী কর্ত্তৃক ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্পর্কে মার্কিণের নিজস্ব নীতির নিকট চীন আবদ্ধ হইল। কাঁচা মাল খননে এবং আভ্যন্তরীণ ও উপকূল সমূহের বন্দরে জাহাজে মাল খালাস করিবার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ব্যবসায়, শিল্প-সংগঠন এবং অন্যান্য বিষয়ে সমগ্র চীনে মার্কিণী ব্যবসায়িগণ যাহাতে নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে, তাহাও এই চুক্তি দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। চীনা-ভূমিতে কল-কারখানা খুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইজারা লাভ এবং চীনা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও চীনা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ স্বার্থরক্ষার্থে যে ভাবেই হউক না কেন নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার মার্কিণ ব্যবসায়িগণ লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, চীনা নাগরিকদের ন্যায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের চীনে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার, জমি-জায়গা ক্রয় করিবার, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করিবার, ধর্ম্ম সম্পর্কীয় প্রচারকার্য্য চালাইবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার এবং এই উদ্দেশ্যে যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিককে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দিবার অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের থাকিবে। এমন কোন রাষ্ট্র চীনের ক্ষতি সাধন করিতেছে, অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে, তাহার নাগরিকও চীনে কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করিবে। চীনের ক্ষতি হউক আর না-ই হউক, তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কিছু আসিয়া যায় না। চীনের আর্থিক সঙ্গতির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতির তুলনা করিলে এই কথাই বালক পর্য্যন্ত স্বীকার করিবে যে, চীনের জনসাধারণকে নির্ম্মম ভাবে শোষণ করিবার একচেটিয়া অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। ঠিক এই কারণেই বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী হাউস অব কমন্সে এই চুক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "ইহা সাধারণ বাণিজ্য-চুক্তি নহে।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগও সরকারী ভাবে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চলতি বাণিজ্য চুক্তি-সমূহ অপেক্ষাও ইহার ব্যাপকতা বিরাট।" যাহা হউক, উক্ত বাণিজ্য-চুক্তির ফলে চীনের শিল্পের কি দুর্গতি হইয়াছে তাহারও হিসাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হইবার ছয় মাসের মধ্যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাল চীনের বাজার এমন ভাবে অধিকার করিয়াছে যে সাংহাই, ক্যাণ্টন, উহান প্রভৃতি নগরীতে চীনা-শিল্পপতিদের ছোট-বড়-মাঝারি ধরণের ২৭ হাজার কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং একমাত্র সাংহাই নগরীতে ২০ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে চীন কেবল মাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই শতকরা ১০ ভাগ মাল আমদানী করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়াতে ডলারের আধিপত্য বেশ কায়েম করিবার ব্যবস্থা পাকা করা হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রী বাহিনীর সহিত ওলন্দাজ বাহিনীর সংগ্রামের সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা ভাবি যে, সত্য সত্যই ওলন্দাজ সরকার তথায় সংগ্রাম করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ওলন্দাজ সরকারকে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার যে ঋণ দেওয়া হয়, তাহা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হল্যাণ্ড পুনর্গঠনের নামে ওলন্দাজ বাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এই বাহিনীই বর্ত্তমানে ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। গত জুলাই মাসে বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন, বৃটিশ সামরিক বিভাগ ওলন্দাজ বাহিনীকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার তাঁবেদার বৃটেনের ভূমিকা এইখানেই শেষ হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার রণক্ষেত্রে ওলন্দাজের পক্ষে যুদ্ধ ত' করিতেছে, উপরন্তু তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ সরকারের অবৈধ ক্রিয়া-কলাপ ন্যায়সঙ্গত হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

ভিয়েৎনামেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দালাল সমাজতন্ত্রী রামাদিয়ের মারফতে এই খেলা খেলিতেছে। সম্প্রতি শ্যামেও মার্কিণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্যাঙ্ককে যে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া লীগ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্যামের বহু রাজকর্ম্মচারী বর্ত্তমানে মার্কিণ বেতনভুক্ গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘ দিন মার্কিণ-প্রবাসী এবং রাজতন্ত্রী নাই-সেনি প্রামোজ নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করিয়াছেন। শ্যামের বর্ত্তমান কর্ণধার লুয়াঙ, ফিবুন সনগ্রাম শ্যামের ফ্যাসিষ্ট-চক্রের বর্ত্তমান নায়ক এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন নাই-কুয়াঙ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, উভয়েই প্রাক্তন জাপ-দালাল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকদের মুখ হইতে ইহাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা বাহির হয় নাই। অবশ্য ইহা একেবারেই আকস্মিক নয়। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ শ্যামের এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-চক্রকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মার্কিণ-প্রভুত্ব বিস্তারের অভিযানে বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসাবে যে ব্যবহার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম, ভিয়েৎনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার গণ-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে শ্যাম সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে শ্যামের প্রতিনিধি প্রিন্স সুকাম্বং মার্কিণী চাপে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রিন্স সুকাম্বং জাতিসঙ্ঘে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনগণের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল।

মধ্য-প্রাচ্যের আরব-জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য মার্কিণ ডলার বৃটিশ পাউণ্ডের সহিত মিতালী করিয়াছে। ডলার ও পাউণ্ড তৈলখনির মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া, তথাকার যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে আরব-জগতে সেই অতি ঘৃণ্য সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-প্রথা কায়েম করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজ-ক্ষমতা দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালে ২৫শে আগষ্ট 'রেনল্ড্‌স্ নিউজ' (Reynolds News) এক

চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলিলেন : "সৌদি আরবের কুখ্যাত ইবন সৌদ ইঙ্গ-মার্কিণ বন্ধুত্বের জন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারের নিকট হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার পাইয়া থাকেন।"

মিশরের জনসাধারণ মিশর-ভূমি হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণের জন্ত তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ একযোগে ষড়যন্ত্র করিতেছেন চিরকালের জন্ত মিশরকে উপনিবেশ হিসাবে রাখিতে।

জাতিসঙ্ঘে উপনিবেশ সমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলিলে মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিগণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উপনিবেশ-সমূহে অছিগিরি প্রথা প্রবর্তন করিবার কথা উত্থাপিত হইলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ডুলে (Dulles) চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন : "অছিগিরি প্রথা হইল জনগণের কারাগার—এখানে প্রবেশ করা সহজ কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা বড়ই কষ্টসাধ্য।" কারাগার সত্যই বটে, কিন্তু ইহা হইল সাম্রাজ্যবাদীদের কারাগার—জনগণের নহে।

জাপানে ডলারের খেল্ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বড় একটা সংবাদ পাওয়া যায় না। মার্কিণ প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখপত্র 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালে ৫ই মে তারিখে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে মার্কিণী ষড়যন্ত্রের বেশ পরিষ্কার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। এই পত্রিকায় পরিষ্কার করিয়া বলা হয় : "জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের বর্তমান ক্রিয়া-কলাপে প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি জাপানকে এমন ভাবে সংগঠন করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইলে জাপান রক্ষণশীল আমেরিকার মিত্ররূপে দেখা দিবে।" এত বড় নির্লজ্জ স্বীকারোক্তির পরে জাপানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কথা আর নূতন করিয়া বলিতে হয় না।

আফগানিস্তানের বিমান-ঘাঁটিগুলির উপর মার্কিণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাকিস্তান ও নেপালে মার্কিণের শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৩ই অক্টোবর 'নিউইয়র্ক টাইমস্' (New York Times) পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় : "পৃথিবীর মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটি (পাকিস্তান) পশ্চিমী গণতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তাহার স্বাধীনতা লাভের জন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। ২ টার সরকারী মহল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণমাত্রায় মিত্র ভাবাপন্ন..." এই পত্রিকায় আরও প্রকাশিত হইয়াছে যে বালুচিস্তান তৈল উত্তোলনের জন্ত যথেষ্ট সুবিধা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পূর্ত্তকার্য্যের এবং খনি ইত্যাদি ব্যাপারের যাবতীয় পরিকল্পনাগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কার্য্যকরী করা হইবে। শুধু তাহাই নয়—চট্টগ্রামের বন্দরটিকে প্রথম শ্রেণী বন্দরে রূপান্তরিত করিবার দায়িত্বও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইবে। এই পত্রিকায় চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে বলা হইয়াছে : "চট্টগ্রামের বন্দর মিত্র-নৌঘাঁটি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রভাবশালী পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের অত্যাবধি পাকিস্তান সরকার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ফজলুর রহমান প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন : "...মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী বহু ক্ষেত্রে একই। সুতরাং উভয় রাষ্ট্রই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবে।" এক জন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর এই প্রকার ঘোষণার পর আর পাকিস্তানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

ইরাণে ইঙ্গ-মার্কিণ আধিপত্য বিস্তারের কথা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

ইউরোপে ডলারের প্রভাব বিস্তারের কাহিনী আরও চমকপ্রদ। ১৯৪৪ সালেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হইয়াছে। এক দিকে ফ্যাসিজম ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে ও গণতন্ত্র স্থাপনের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তলে তলে সাম্রাজ্যবাদ পাকা-পোক্ত করিবার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে গ্রীসে। ১৯৪৪ সালেই দেখা গেল, পশ্চিমী গণতন্ত্রীর দল ফ্যাসিষ্ট তথা হিটলার-বিরোধী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। গ্রীসের প্রগতিশীল জনমতকে ও গণ-ফৌজকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্ত পশ্চিমী গণতন্ত্রের পাণ্ডারা হিটলারের অনুরক্ত দালালদের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কম্যুনিজমের ধূয়া তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রীসে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার ঢালিয়াছে এবং যোগান দিয়াছে প্রতিক্রিয়াশীলদের হস্তে সমরাস্ত্র প্রগতিশীল গণ-অভ্যুত্থান ধ্বংস করিবার জন্ত। মহাসমরের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রগতিশীল শক্তিকে অস্ত্রের বলে হটাইয়া দিয়া মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ, তথা ডলার নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে গ্রীসের শাসন-ভার দিয়াছে। কিসের জন্ত ? এই প্রশ্নের উত্তর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সমর্থক এবং প্রচারকার্য্যে দক্ষ মার্কিণ সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান্ (Walter Lippman) দিয়াছেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : "আমরা গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্য করিতেছি তাহাদের পুনর্গঠনের জন্ত অথবা তথায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলিয়া অথবা তথায় চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিব বলিয়া নয়—আমরা তথায় কোটি কোটি ডলার ঢালিতেছি সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ কৃষ্ণসাগরের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্ত।"

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে "মার্শাল পরিকল্পনা" মতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ হস্তগত করিয়াছে এবং তাহাদের শিল্প-সংহতির নিয়ামকরূপে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে ডলার কি ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে তাহার আলোচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কারণ, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হইল এই জার্ম্মাণ-সমস্যা। এই সমস্যার গণ-তান্ত্রিক সমাধানের উপর ইউরোপের গণ-তান্ত্রিক ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎও বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পটসডামে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও পরাজিত জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধান লইয়া আলোচনা করেন। পরে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ষ্ট্যালিন, ট্রুম্যান এবং এ্যাটলী।

১৯৪৫ সালে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিপত্রে স্থির হইয়াছিল, জার্ম্মাণীর বুক হইতে নাৎসীবাদ ও সমরবাদ উৎখাত করিতে হইবে এবং সমগ্র জার্ম্মাণীতে একটি কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে। মার্কিণ-শাসিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে পটসডাম-চুক্তির সর্ত্তাবলী নির্লজ্জ ভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করা ত দূরের কথা, সোভিয়েট শাসিত পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী হইতে জমিদারগণ পলায়ন করিয়া মার্কিণ-শাসিত জার্ম্মাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিণ-শাসিত জার্ম্মাণীতে অদ্যাবধি জমিদারদের কবলে ১০ লক্ষ বিঘা জমি রহিয়াছে। প্রত্যেক জমিদারের এষ্টেটে নাৎসী সমর-নায়কগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাহারা ছোট ছোট অফিসার-গ্রুপ ও সৈন্যদল গঠন করিতেছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার পরিবর্ত্তে হের্ম্যান ভিল্কেলবাক্ রোয়েলেনের (উভয়েই সমরাস্ত্র উৎপাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হিটলার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন) নেতৃত্বে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর লৌহ, ইস্পাত এবং কয়লা-শিল্পের আরও কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। মার্কিণ পুঁজিপতিরা জার্ম্মাণ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ছোট অংশীদার করিয়া লইয়াছেন। নাৎসী নায়কদের শাস্তি দিবার পরিবর্ত্তে হিটলারের চীফ অব ষ্টাফ কর্ণেল জেনারেল হল্ডারকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মার্কিণ সমর বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন। হিমলারের সহযোগী অটো স্কোরজেনিকে পর্য্যন্ত মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ অব্যাহতি দিয়াছেন। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর শাসন-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে কুখ্যাত নাৎসীরা নিরাপদেই রহিয়াছেন। সমগ্র জার্ম্মাণীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি পরিহার করিয়া মার্কিণ, বৃটেন এবং ফ্রান্স-শাসিত অঞ্চল তিনটি বর্ত্তমানে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে কার্য্য করিতেছে।

"মার্শাল পরিকল্পনা" এবং "আণবিক বোমা"র কথা প্রচার করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন। গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইয়া কার্য্যতঃ সাম্রাজ্যবাদের মহিমা কীর্ত্তন করা হইতেছে। গণতন্ত্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। শুধু তাহাই নয়, কম্যুনিজমের ধুয়া তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আপন সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় হিটলারী পন্থা অনুসরণ করিতেছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নীতি যে পৃথিবীর শান্তি অভিযানের ও জনগণের উন্নতির অন্তরায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নীতি যে মারাত্মক, সে সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন: "...কম্যুনিজমের ধুয়া তুলিয়া মুসোলিনী, হিটলার ও ফ্রাঙ্কো—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা। আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যদি তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলে আমেরিকার গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইবে।" এই মন্তব্যের উপর টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। তাই বলিতেছি—গণতন্ত্র, না, ডলারতন্ত্র ?

বিবেকানন্দ

প্রভাত বসু

বাংলার ছেলে 'বিবেকানন্দ' সিংহের মত বীর—
গর্জ্জনে তার কাঁপে হিমালয়, দোলে সমুদ্রতীর!
ভারতের স্থান সবার উপরে জগতের দরবারে,
প্রচার করিল বীর সন্ন্যাসী সুগভীর ঝংকারে!
নারায়ণ জ্ঞানে সেবিল রুগ্ন, দরিদ্র জনগণে,
মানুষে-মানুষে কোনো ভেদ নাই—জানালো জগৎজনে।
রামকৃষ্ণের বাণী যাঁর মুখে, অন্তরে ভগবান,
দুর্জ্জয় সেই বাংলার ছেলে, নির্ভীক তাঁর প্রাণ।
এস, আজি মোরা জন্ম-লগনে সে মহাপুরুষে স্মরি—
কিশোর-কিশোরী সবে মিলে তাঁর চরণে প্রণাম করি!

প্রবাহণ

স্থান—পঞ্চাল (যুক্তপ্রদেশ)

কাল—৭০০ খৃঃ পূঃ

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ

"এক দিকে ঘন নিবিড় সবুজ বন, মহুয়ার মাদক গন্ধ, পাখীর মধুর কূজন। অন্য দিকে গঙ্গার প্রবাহিত স্বচ্ছ ধারা, আর তীরভূমিতে আমাদের হাজার হাজার কপিলা-শ্যামা গাই চরে বেড়াচ্ছে—তার মধ্যে একটি বড় বলিষ্ঠ বৃষভ হুঙ্কার করছে। কখন কখনও এ দৃশ্য দেখেও চোখ তৃপ্ত করা উচিত, প্রবাহণ! তুমি তো সর্ব্বদা উদ্গীথ (সাম) সঙ্গীতে মেতে থাক নতুবা বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্রের মন্ত্র আবৃত্তিতে।"

"লোপা, তুমি চোখ দিয়ে সে দৃশ্য দেখ আর আমি তোমার চোখ দেখে তৃপ্তি পাই।"

"হম্, তুমি কথাতেও চতুর। তোমাকে পুরানো গান খাপ-স্বরে তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে বার বার গাইতে দেখে আমার মনে হয় যে চির দিনই আমার প্রবাহণ স্তনপায়ী শিশু থাকবে।"

"লোপা! সত্যিই কি প্রবাহণ সম্বন্ধে তোমার এই অভিমত?"

"অভিমত যা-ই হউক, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমার এ-ও পাকা অভিমত যে প্রবাহণ সব সময়ের জন্য আমার।"

"এই আশা ও বিশ্বাসেই আমি পরিশ্রম করতে এবং বিদ্যার্জনের শক্তির সন্ধান পাই, লোপা! আমি নিজের মনকে জোর করে সংযত করতে অভ্যস্ত, তা' না হ'লে কত বার আমার মন পুরানো গাথা, পুরানো মন্ত্র এবং পুরানো উদ্গীথগুলি বার বার মুখস্থ করার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। মন যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সব কিছু পরিত্যাগ ক'রে একান্তে বিরাজ করতে চায়, আমার আর তখন কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। এ ক্ষণিক সময়টুকু ছাড়া লোপার সঙ্গে কাটাবার অবসর আমার মেলে না।"

"আর এ সময়টুকুর জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকি।"

লোপার পিঙ্গল চোখ দুটি দূরে কি দেখছিল। উষার মৃদু-মন্দ বাতাসে তার পিঙ্গল কোমল চুলগুলি দুলছিল। যেন মনে হচ্ছিল, লোপা সেখানে নেই। প্রবাহণ আঙুল দিয়ে লোপার চুলগুলি স্পর্শ করে বললো, "লোপা, আমি নিজকে তোমার নিকট খর্ব বলে মনে করি।"

"খর্ব! তা মনে কর না প্রবাহণ"—তার গালে গাল মিলিয়ে লোপা বললো, "এক দিন আমি তোমার সঙ্গে অভিমান করেছিলাম তা আমার আজ মনে পড়ছে। তখন আমি পিসিমার সঙ্গে এসে আট বছরের শিশুকে আমার শিশু-চোখে দেখেছিলাম। তখন আমি তিন কি চার বছরের শিশু, কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি সেই বাল-চিত্তকে অঙ্কিত করতে এতটুকু ভুল করছে না। আজও মনে পড়ছে আমার, সেই পীত কুঞ্চিত চুল, সরু নাক, পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁট, উজ্জ্বল নীল বড় বড় চোখ, উষ্ণ-সুবর্ণ দেহ। এ ছাড়াও মনে আছে, মা আমাকে বলেছিল—বৎস লোপা, এই তোমার মা। আমি লজ্জা বোধ করছিলাম, কিন্তু মা তোমার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—পুত্র প্রবাহণ, এই তোর মামাত বোন লোপা, লজ্জা করছে। এর লজ্জা দূর কর।"

"আমি তোমার কাছে গেলাম। তুমি মামীমার সুগন্ধিত কোমল চুলগুলির পেছনে তখন মুখ লুকিয়ে ফেললে।"

"কিন্তু লুকালেও আমি দৃষ্টি-পথ খোলা রেখেছিলাম। আমি দেখছিলাম তুমি কি কর। শুধু মায়ের কোল, দাসী ও দাসীর বাচ্চা ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। পিতার আচার্য্য-কুল তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। এই ঘর আমার একলা মনে হ'ত। তাই তোমাকে দেখতে পেলে আমার মনে খুব আনন্দ হ'ত।"

"খেলার সময়ও তুমি আমার থেকে লুকাতে। আমি তোমার মগ্ন সাদা শরীর এবং গোলগাল সুন্দর চেহারা দেখতাম। আর আমার শিশু-চোখে তা খুবই ভাল লাগত। কাছে গিয়ে আমি তোমার কাঁধের ওপর হাত দিতাম। মা এবং মামীমা কি করত তোমার মনে পড়ে? দু'জনই মুচকি হাসত এবং বলতো—ব্রহ্মা আমাদের সাধ পূর্ণ করুন। তখন আমি এর অর্থ বুঝতাম না।"

"আমার তা মনে নেই, প্রবাহণ! আমার পক্ষে এটুকু যথেষ্ট ছিল যে আমি কাঁধের ওপরে তোমার কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করতাম।"

"আর তুমি সংকোচে একেবারে জড়োসড় হয়ে গেলে।"

"তুমি আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলে কিন্তু তুমি মুখ বুজেই থাকতে, তখন মা কি বলতেন জান?"

"মামীমার এক-আধটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে। মামীমাকে কি আমি কখনও ভুলতে পারি? মা আমাকে গার্গ্য মামার নিকট রেখে ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু মামীমার স্নেহে আমি মাকে ভুলে গেলাম। মামীমাকে আমি কেমন করে ভুলব?" প্রবাহণের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল, সে লোপার ঠোঁটে চুম্বন করে বললো—"মামীমার মুখ এ রকমই ছিল, লোপা! আমরা দু'জনে একত্রে শুতাম। তোমার নয়, আমার চোখ কত বারই না খুলে যেত কিন্তু যখনই আমি দেখতাম যে মামীমা আসছেন, তখনই চোখ বন্ধ করতাম। আবার যখন তার মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঠোঁটের স্পর্শ আমার গালে অনুভব করতাম, তখনই আমি চোখ মেলতাম। মামীমা বলত—বৎস, জেগে আছ!' এই বলে সে তোমার মুখে চুমু খেতে। কিন্তু তুমি বেহুঁস হ'য়ে ঘুমাতে।" লোপা অশ্রুপূর্ণ চোখে উদাস ভাবে বললো।

"মাকে আমি খুবই কম দেখেছি।"

"হ্যাঁ, তখন আমাকে তোমার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াতে দেখে মামীমা বলত—এই তোমার বোন, বৎস! ওর ঠোঁটে চুম্বন কর এবং ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বলো।"

"হ্যাঁ, তখন তুমি আমার ঠোঁটে চুম্বন ক'রে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বলতে। আর আমি তখন মায়ের চুলের ভেতর থেকে আমার মুখ বের করতাম। তুমি তখন তথায় ঘোড়া হ'তে আর আমি তোমার পিঠে চড়তাম;"

"আমি তখন তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতাম।"

"আমি খুব দুষ্ট ছিলাম।"

"তুমি সব সময়-ই নির্ভীক ছিলে, লোপা! আর বিশেষ ক'রে আমার জন্য তো তুমি সব কিছুই ছিলে। মামার ভয়ে আমি নিজের পড়াশুনায় লেগে থাকতাম এবং যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়তাম তখন তোমার নিকট আসতাম।"

"আর তোমারই জন্য আমি তোমার কাছে বসতে লাগলাম।"

"আমার মনে হচ্ছে, লোপা! তুমি যদি আমার অর্দ্ধেক পরিশ্রম করতে, তাহলে মামার অন্তঃপুরবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হ'তে পারতে।"

"কিন্তু তোমার থেকে আগে নয়।" লোপা প্রবাহণের চোখ দু'টিকে একবার একান্তে দেখে বললো—"আমি তোমার চেয়ে অগ্রণী হ'তে চাই না।"

"কিন্তু তাতে আমার আনন্দ হ'ত।"

"কেন না, আমাদের দু'জনার মধ্যে স্বতন্ত্র স্বার্থ বলে কিছু নেই।"

"লোপা, তুমি যে শুধু আমার মনে উৎসাহই দিয়েছ তা নয়, আমার শরীরে শক্তিও দিয়েছ। রাতে আমি কত কম ঘুমাতাম! পড়া মুখস্থ করতে এবং অন্যকে দিয়ে মুখস্থ করাতে এমন কি খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যেতাম। তুমি আমাকে স্বাধ্যায় সেই গৃহের অন্ধকার হ'তে জোর করে কখন বা বনে, কখন বা উদ্যানে এবং কখন বা গঙ্গার ধারা দেখতে নিয়ে যেতে। এ সব আমার খুবই ভাল লাগতো। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমি তিনখানি বেদ ও ব্রাহ্মণের সবগুলি বিদ্যা অর্জন তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই।"

"কিন্তু এখন তো তুমি সমাপ্তির শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেচ। বাবা বলেন যে প্রবাহণ তার সমতুল্য।"

"তা আমিও বুঝতে পাচ্ছি। ব্রাহ্মণদের বিদ্যা আয়ত্ত করতে আর সামান্যই বাকী কিন্তু বিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণগুলিতেই শেষ নয়।"

"আমার তোমার নিকট একটি প্রশ্ন আছে,—আচ্ছা, এখনও কি তুমি পলাশদণ্ড এবং রুক্ষ কেশ নিয়ে চলবে?"

"এ নিয়ে তুমি চিন্তা ক'র না, লোপা! পলাশ-দণ্ড এখন চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর পর ষোল বছরের এ রুক্ষ চুলগুলিতে তুমি সুগন্ধিত তেল দিতে পারবে।"

"প্রবাহণ, তুমি রুক্ষ চুলের ওপর এতো বেশী জোর দিচ্ছ কেন, আমি তা বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি তো আমার এ ঠোঁটে চুম্বন করতে কখনও ছাড়নি।"

"তার কারণ ছোট বেলার অভ্যাস।"

"তাহলে কেন আচার্য্যকুলের অন্তেবাসীরা এ কঠোর ব্রত পালন করে?"

"লোপা, তা না করে কোন উপায় নেই বলে করে। এ সব হল সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য। মানুষ একে ব্রহ্ম-কুমারদের কঠিন তপস্যা বলে মনে করে।"

"আবার কুরুরাজ বাবাকে গ্রাম, হিরণ্য,—সুবর্ণ, দাস-দাসী এবং বড়বীর (ঘোটকীর) রথও দেন। আমার ঘরে প্রথম দিকে অনেক দাসী ছিল। আবার কিছু দিন আগে কুরুরাজ আরও তিন জন দাসী পাঠিয়েছেন, তাদের জন্য কোন কাজই নেই।"

"তাদের বেচে দাও, লোপা! ওরা তরুণী। এক-এক জনের জন্য তিরিশ নিষ্ক ক'রে পেয়ে যাবে।"

"দুঃখ করে। আমরা ব্রাহ্মণ, বেশী শিক্ষিত এবং বেশী জ্ঞানী, কেন না, আমাদের জ্ঞানার্জনের সুযোগ আছে। কিন্তু যখন আমি এ সব দাসদের জীবন দেখি তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, এমন কি স্বীয় দেবকুল, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অংগিরা সমস্ত ঋষিদের এবং বাবার মত আজকের সমস্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাশাল (ধনীক)দের প্রতি ঘৃণা হয়। সর্বত্রই দেখি ব্যবসায়, লাভ, লোভ ইত্যাদি। সে দিন কালী দাসীর স্বামীকে বাবা কোশল-দেশীয় সেই বণিকের নিকট পঞ্চাশ নিষ্কে বেচে দিলেন। কালী আমার নিকট কান্নাকাটি করায় আমি বাবাকে অনেক বললাম, কিন্তু তিনি বললেন—'সমস্ত দাস-ধর্মের পথ বন্ধ করে দিলে স্থান আর থাকবে না। আর সত্যিই যদি দাস-বৃত্তির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে ঐ ধনই বা কিসের?' বিদায়ের দিনের আগেকার রাতে দু'জনার কি কান্না! তাদের দু' বছরের সেই ছোট মেয়েটি—সকলেই বলত যে তাঁর চেহারার সহিত বাবার চেহারার সাদৃশ্য আছে,—তারা ভোরে উঠে কতই না কাঁদল! কিন্তু কালীর স্বামীকে বেচে দেওয়া হল। যেন সে মানুষ নয়, পশু। ব্রহ্মা যেন তার শত শত পুরুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমি তা স্বীকার করতে রাজী নয়, প্রবাহণ! আমি তোমার মত তিনখানি বেদ মুখস্থ করিনি সত্যি, কিন্তু উহা শুনে বুঝেছি। শুধু যুক্তির বহির্ভূত বস্তু, লোক এবং শক্তির প্রলোভন ও অভয় দেখান হয়েছে।"

প্রবাহণ লোপার আরক্ত মুখ নিজের চোখের সঙ্গে চেপে বললো, "আমাদের প্রেম, মতভেদ রাখার জন্যই হ'য়েছে।"

"মতভেদ আমাদের প্রেমকে আরও গাঢ় করেছে।"

"ঠিক বলেছ, লোপা! অন্যে যদি এ কথাই বলত তাহলে আমি কতই না রাগ করতাম, কিন্তু সেই কথাগুলিই যখন দেখি যে তোমার মুখ দিয়ে আমার সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং আচার্যদের ওপর তীব্র বাণের মত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন তোমার ওই অধরে চুম্বন করতে বার বার ইচ্ছা হয়। কেন?"

"তার কারণ হল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই দু'টা মতের দ্বন্দ্ব প্রায়ই চলছে। আমরা এ দ্বন্দ্বের প্রতি সহিষ্ণু, কেন না আমরা একে অপরকে আমাদের অভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করি।"

"তুমিও আমার অভিন্ন অঙ্গ, লোপা!"

২

"প্রিয়তমে, তুমি শিবিরে এগুলগুলি কখনও গায় দেও না এবং কাশীর চন্দন ও সাগরের মুক্তা দিয়ে নিজকে বিভূষিতও কর না। প্রিয়ে, এগুলির ওপর তুমি এতো উদাসীন কেন?"

"এতে কি আমাকে বেশী সুন্দর দেখাবে?"

"আমার কাছে তুমি সব সময়ই সুন্দর।"

"তাহলে এ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সত্যি বলছি প্রিয়! তুমি যখন ওই ভার বোঝাকে মুকুট বলে নিজের মাথায় পর, তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।"

"কিন্তু অন্য সব মেয়েরা তো কাপড়, বেশ-ভূষার জন্য ঝগড়া করে ?"

"আমি সে রকম মেয়ে নই।"

"তুমি পঞ্চাল-রাজার হৃদয়-শাসনকারী রমণী।"

"আমি প্রবাহণের স্ত্রী। পঞ্চালের রাণী নই।"

"হ্যাঁ, প্রিয়তমে! আমরা কবে এ দিনটির কল্পনা করেছি। আমি যে পঞ্চাল-রাজপুত্র সে কথা মামা এতো দিন আমার নিকট গোপন রেখেছিলেন।"

"সে সময় পিতা আর কি করতেন? পঞ্চাল-রাজার শত শত রাণীর মধ্যে আমার পিসিমা ছিলেন এক জন এবং পঞ্চাল-রাজার দশ পুত্র তোমার থেকেও বয়সে বড় ছিল। তাই কে এমনি ভেবেছিল যে, তুমি এক দিন পঞ্চাল-রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হবে?"

"আচ্ছা, কিন্তু এ রাজপ্রাসাদ কেন তোমার পছন্দ হয় না, লোপা?"

"কেন না, আমি গার্গ্য ব্রাহ্মণ, মহাশালের প্রাসাদ হ'তে আমার বিরক্তি এসেছে। ওই প্রাসাদ আমাদের জন্য ছিল। কিন্তু সেখানকার দাস-দাসীদের জন্য? আর, এ রাজপ্রাসাদ তো সে মহাশালের প্রাসাদ থেকেও সহস্র গুণ বড়। এখানে তুমি-আমি ছাড়াও সব দাস-দাসীরা আছে। দু'জন অ-দাসের জন্য দাস-দাসী ভরা এ ভবন কখনও অ-দাস-ভবন হ'তে পারে না। কিন্তু প্রবাহণ, আমি তোমার এতো কঠিন হৃদয় দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি।"

"তাই তো কঠিন বাক্যবাণ সহ্য করতে পারছি।"

"না, মানুষের ও-রকম কঠিন হওয়া উচিত নয়।"

"আমার মানুষ হওয়ার ইচ্ছা নেই, যোগ্য হওয়ার ইচ্ছা, প্রিয়তমে। যদিও ওই যোগ্যতা অর্জন করবার সময় এ কথা কখনও ভাবিনি যে, একদিন আমাকে এ রাজ-ভবনে আসতে হবে।"

"প্রবাহণ! আমার সঙ্গে প্রেম করে তুমি অনুশোচনা তো করছ না?"

"আমি তোমার প্রেমকে মাতৃ-ক্ষীরের মত অপ্রয়াসে লাভ করেছি এবং তা আমার শরীরেরই একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সংসারী পুরুষ, লোপা! তাহলেও তোমার প্রেমের কদর বুঝি। মনের ভাব সব সময় এক রকম থাকে না। কখনও যদি মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন জীবনটা আমার কাছে দুর্বিবহ হয়ে দাঁড়ায়। তখন তোমার প্রেম ও সুবিচারই আমার একমাত্র অবলম্বন।"

"কিন্তু প্রবাহণ! আমি যতটা তোমার অবলম্বন হ'তে চাই ততটা হ'তে পাচ্ছি না। এ জন্য আমি খুবই দুঃখিত।"

"কেন না আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে রাজকার্য পরিচালনা করতে।"

"কিন্তু একদিন তো তুমি মহাব্রাহ্মণ হ'তে চেষ্টা করেছিলে?"

"আমি তখন জানতাম না যে পঞ্চালপুরের (কনৌজ) রাজ-প্রাসাদের উত্তরাধিকারী হব।"

"কিন্তু রাজকার্যের বাইরেও যে তুমি হাত দিচ্ছ—এতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মের কল্পনা? কিন্তু লোপা, এ সব তো রাজকার্য থেকে আলাদা বস্তু নয়। রাজ্যকে অবলম্বন দেওয়ার জন্যই আমাদের পূর্ববর্তী রাজারা বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রকে অত সম্মান করতেন। অনেক ঋষি ইন্দ্র, অগ্নি এবং বরুণের নামে রাজ-আজ্ঞা পালন করবার জন্য লোক পাঠাতেন। তখনকার দিনে রাজারা সর্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য বড় বড় ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ করতেন। এখনও আমরা এ যজ্ঞ করি এবং ব্রাহ্মণগণকে দান দক্ষিণা দি। এরি জন্য করা হয় যে মানুষ দিব্য শক্তি বিশ্বাস ক'রে এবং মনে করে যে আমরা যে এ সুগন্ধিত চালের ভাত, গো-বৎসের সুমিষ্ট মাংসের সূপ, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং মণি-মুক্তাময় আভূষণের ব্যবহার করি—তা সকলই দেবতার কৃপায়।"

"আগে অসংখ্য দেবতাই ছিল, তাহলে এখন আবার এ নতুন ব্রহ্মের প্রয়োজন কি?"

"যুগ যুগ ধরেও কেউ ইন্দ্র, বরুণ ও ব্রহ্মকে দেখেনি। তাই এখন অনেক লোকের মনেই সন্দেহ হ'তে আরম্ভ করেছে।"

"তাহলে কেন ব্রহ্মের ওপর সন্দেহ হবে না?"

"ব্রহ্মের স্বরূপ আমি যে ভাবে বর্ণনা করেছি, তাতে ক'রে কেউ ব্রহ্মকে দেখবার দাবী পেশ করবে না। যেমন আকাশের রূপ দেখা-শুনার বিষয়-বস্তু নয়; কারণ এখানে সেখানে সর্বত্রই ত বিরাজ করছে। কাজেই উহা দেখার প্রশ্ন কেমন ক'রে উঠবে? প্রশ্ন তো উঠতে পারে ওই সব সাকার দেবতাদের বিষয়।"

"তুমি যে আকাশ-আকাশ করছ তাও সাধারণ নয়, বরঞ্চ উদ্দালক-আরুণির মত ব্রাহ্মণদেরও মতিভ্রম ঘটায়। এ সব কি প্রজাদের ভ্রমাচ্ছন্ন রাখার জন্য?"

"লোপা! তুমি আমাকে জান। তোমার নিকট কি কিছু গোপন করতে পারি? এ রাজভোগ হাতে রাখার জন্য এও প্রয়োজন। যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করবে, তাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে এ দিয়ে কুণ্ঠিত করা যাবে। কেন না আমাদের সব থেকে ঘোরতর শত্রু হল তারা যারা দেবতার যজ্ঞ এবং পূজার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছে।"

"কিন্তু তুমি ব্রহ্মার সত্তা এবং দর্শনের কথাও তো বল?"

"সত্তা আছে, কাজেই দেখাও চাই। হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় সাহায্যে নয়, কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখবার কথা বললে সন্দেহকারিগণ আবার উহা দেখাতে বলবে। কাজেই আমি বলি যে উহা দেখবার জন্য আলাদা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে এবং সে ইন্দ্রিয় লাভ করার জন্য এ সব সাধনার প্রয়োজন। এতে মানুষ হাপ্পায় পুরুষ পর্যন্ত ভ্রমাচ্ছন্ন থাকবে ও বিশ্বাস হারাবে না। আমি পুরোহিতদের স্থূল হাতিয়ার নিষ্ফল মনে ক'রেই এ সূক্ষ্ম হাতিয়ার আবিষ্কার করেছি। লোপা, তুমি শবরের (প্রাচীন ভারতের একটি আদিম জাতি) নিকট পাথর এবং তামার হাতিয়ার দেখেছ কি?"

"হ্যাঁ, আমি যখন দক্ষিণ জঙ্গলে তোমার নিকট গিয়েছিলাম তখন দেখেছি।"

"হ্যাঁ, যমুনার ও-পার। আচ্ছা, শবরদের পাথরের এবং তামার হাতিয়ার আমাদের কৃষ্ণ-লৌহের এই হাতিয়ারের মুকাবেলা করতে পারে কি?"

"এ রকম ভাবে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের পুরোন দেবতা এবং যজ্ঞ দিয়ে শবর বুদ্ধিমান লোকদের যতটা বা সন্তুষ্ট করাতে পারত তাও আবার এ সন্দিগ্ধ জ্ঞানী লোকগুলির কাছে সব ব্যর্থ হ'য়ে যেত।"

"তাদের কাছে তোমার এ ব্রহ্মও কিছু না। তুমি ব্রাহ্মণ জ্ঞানীদের শিষ্য কর এবং ব্রহ্মজ্ঞান শিখিয়ে বেড়াও। আর আমি তোমার ঘরেই তোমার কথাকে একেবারে সরাসরি মিথ্যা বলে মনে করি।"

"কারণ তুমি খাঁটি রহস্য (উপনিষদ্) জান।"

"ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানীই হবে তবে কেন তোমার রহস্য তারা জানবে না?"

"তাও তো তুমি দেখতে পাচ্ছো। কোন কোন ব্রাহ্মণ হাতিয়ার পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কিন্তু তারাও আমার এ রহস্য (উপনিষদ্)কে নিজেদের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার বলে মনে করে। ওদের পুরোহিতী ও গুরুগিরীর ওপর মানুষের অবিশ্বাস হ'তে আরম্ভ করছিল, যার পরিণাম হ'ত সব রকম দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত হওয়া; যেমন চড়ার জন্য বড়বা রথ, খাবার জন্য উত্তম খাদ্য, থাকার সুন্দর প্রাসাদ এবং ভোগের জন্য সুন্দরী দাসী।"

"এ তো ব্যবসায়?"

"ব্যবসায় তো নিশ্চয়ই। আর এমনি ব্যবসা যে এতে লোকসানের ভয় নেই। এ জন্যই উদ্দালকের মত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সমিধা হাতে আমার কাছে শিষ্য হ'তে আসে। আর আমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উপনয়ন ছাড়াই—বিধিমত গুরু না হ'য়েও তাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করি।"

"এ অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিন্তা, প্রবাহণ!"

"তা স্বীকার করি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এ সব থেকে উপযোগী পন্থা। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের নৌকা হাজার বছরও কাজ দেয়নি কিন্তু প্রবাহণের নির্মিত নৌকায় দু' হাজার বছর পরেও পরধন-ভোগী রাজা ও সামন্তরা পার হ'তে পারবে। যজ্ঞরূপী নৌকাকে আমি অদৃঢ় বলে মনে করি, লোপা! তাই আমি এ দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করেছি। এর সাহায্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মিলিত ভাবে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারবে। কিন্তু এ আকাশ যে ব্রহ্মের থেকেও বড়, তাই হ'ল আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার, লোপা!"

"কোন্ আবিষ্কার?"

"মরে গিয়ে আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসা—পুনর্জন্ম।"

"এ সব থেকে বড় জাল।"

"আর সব থেকে কার্যকরীও। এরি ফলে এক দিকে সামন্ত, ব্রাহ্মণদের এবং ব্যবসায়ীদের নিকট অপার ভোগ-রাশি একত্রিত হয়েছে, অন্য দিকে সাধারণ প্রজা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আবার এ সব নির্ধনী যেমন শিল্পী, কৃষক এবং দাস-দাসীদের ভড়কাবার লোক সৃষ্টি হতে আরম্ভ করছে। তারা বলে—'তুমি তোমার কামাই অন্যকে দিয়ে কষ্ট করছ। ওরা তোমাকে মিথ্যাই বিশ্বাস করাতে চায় যে তুমি কষ্ট, ত্যাগ ও দান করলে মরে স্বর্গে যাবে। কিন্তু কেউ স্বর্গে মৃত-জীবকে সেই ভোগ করতে দেখেনি।' এরি জবাব হল যে, এ সংসারে উঁচু-নীচু ভাব, ছোট-বড় জাতি, ধনি-নির্ধনীর যে প্রভেদ তা' হল পূর্বজন্মকৃত ফল। আমি এ ভাবে পূর্বকার সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়ে দেই।"

"এ রকম তো চোরও তার চুরি করা জিনিষকে পূর্বজন্মের রোজগার বলতে পারে?"

"কিন্তু তার জন্য আমরা প্রথম থেকেই দেবতা, ঋষি এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের সহায়তা গ্রহণে কৃতকার্য হয়েছি। যার জন্য অপহৃত জিনিষকে পূর্ব-জন্মের রোজগার বলে স্বীকার করা হবে না। এ জন্যে বিনা পরিশ্রমলব্ধ ধনকে আমরা প্রথমে দেবতার কৃপায় পাওয়া বস্তু বলে বলতাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, দেবতা এবং দেব-কৃপার ওপর সন্দেহ করা সুরু হয়েছে, তখন আমাদের কোন নতুন উপায়ের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণদের কথা চিন্তা করার শক্তিও লোপ পেয়েছে। প্রাচীন ঋষিদের মন্ত্র এবং বাক্য মুখস্থ করতেই তাঁরা চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর কাটিয়ে দেয়। তাঁরা এছাড়া অন্য কোন গভীর বচন কোত্থেকে তার চিন্তা করবে?"

"প্রবাহণ! তুমি কি মুখস্থ করতে অনেক সময় এ ভাবে কাটিয়ে দাওনি?"

"মাত্র ষোল বছর। চব্বিশ বছর বয়সের পর আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যা শেষ করে বাইরের সংসারে প্রবেশ করেছিলাম। এখানে আমি পড়া-শুনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। রাজ-শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানার পথ আমি দেখলাম, ব্রাহ্মণদের নির্মিত পুরানো নৌকা বর্তমানের জন্য অদৃঢ়।"

"তাই তুমি দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করেছ?"

"সত্যি কি মিথ্যা তা নিয়ে আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল, ওগুলির কার্যোপযোগিতা নিয়ে লোপা! সংসারে ফিরে এসে জন্মের কথা আজ নতুন বলে মনে হচ্ছে এবং তুমি এর মধ্যকার লুকান স্বার্থও জান। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ শিষ্যরা তা নিয়ে বিশেষ মাতামাতি করছে। পিতৃদের এবং দেবতাদের (পিতৃ-যান, দেব-যান) পথ বুঝবার জন্য এখুনি মানুষ বার বছর গরু চরাতে প্রস্তুত। তুমি আমি থাকব না, কিন্তু এমন সময় আসবে যখন সমস্ত দরিদ্র প্রজা এর পুনরাগমনের আশায় সারা জীবনের তিক্ততা, কষ্ট এবং অন্যায়কে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে। স্বর্গ ও নরক বুঝাবার এ কেমন সোজা উপায় আবিষ্কার করেছি, লোপা?"

"কিন্তু এ নিজের পেটের জন্য শত শত কোটি মানুষকে সর্বনাশের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছ।"

"বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রও পেটের দায়ে বেদ রচনা করেছিলেন, উত্তর পাঞ্চালে (রোহিলখণ্ড) রাজা দিবোদাসের শবর দুর্গে কিছুটা অধিকার করার পর কবিতার পর কবিতা রচনা করেছিলেন। পেটের সংস্থান করা অন্যায় নয়। আমরা যখন নিজেদের পেটের সঙ্গে হাজার হাজার বছরের জন্য আপন পুত্র-পৌত্রাদি, ভাই-বন্ধুদের পেটেরও সংস্থান (১) করি, তখন শাশ্বত যশের ভাগী হই। প্রবাহণ এমনি কাজ করছে, যা পূর্বগামী ঋষিগণও করতে পারেননি—যা ধর্মের রুটি ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণও করতে পারেনি।"

"তুমি অতি নিষ্ঠুর, প্রবাহণ!"

"কিন্তু আমি আমার কাজ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করছি।"

৩

প্রবাহণ মরে গেছে। তার ব্রহ্মবাদ পুনর্জন্ম অথবা পিতৃযানবাদের বিজয়-দুন্দুভি সিন্ধু থেকে আরম্ভ ক'রে সদানীরার (গংডক)এর পরপার পর্যন্ত বেজে উঠেছিল। যজ্ঞের প্রচার তখনও কমেনি, কারণ ব্রহ্মবাদীরা ওগুলি করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করছিলেন। ক্ষত্রিয় প্রবাহণের আবিষ্কৃত ব্রহ্মবাদে ব্রাহ্মণরা সুদক্ষ হয়েছিল এবং

---

(১) যং তত্ত্বকথমিত্রা বর্হণাকঃ প্রবচ্ছতা সহসা শূর-দর্ষি।
অব গিরদাসং শম্বরং হন্ প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী॥

এতে কুরুর যাজ্ঞবল্ক্যের খুব খ্যাতি ছিল। কুরু-পাঞ্চাল—যারা কোন এক সময় মন্ত্রের কর্ত্ত এবং যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজের জন্ম দিয়েছিল।—যাজ্ঞবল্ক্য এবং তার সঙ্গী ব্রহ্মবাদী-ব্রহ্মবাদিনীদের জয়-জয়কার ছিল। ব্রহ্মবাদীদের পরিষদ গঠনেও যাজ্ঞের থেকে বেশী নাম হয়েছিল। এরি জন্ম রাজা রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞের সঙ্গে ও পৃথক্ রকম পরিষদ রচনা করত। তাতে হাজার হাজার গরু-ঘোড়া এবং দাস-দাসী (বিশেষ ক'রে দাসী কেন না রাজাদের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত দাসীদের ব্রহ্মবাদীরা বেশী পছন্দ করত) বাদ-বিজেতারা পুরস্কার পেতেন।

যাজ্ঞবল্ক্য অনেকগুলি পরিষদে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবার তিনি বিদেহ (তিহু´ত)এর পিত'র পরিষদে খুব বড় রকমের একটা বিজয় লাভ করলেন এবং তার শিষ্য সোমশ্রবা হাজার গরু তাকে দান করল। যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ থেকে আরম্ভ ক'রে কুরু পর্যন্ত সেই গরুগুলিকে হাঁকিয়ে আনার কষ্ট কেন স্বীকার করবেন? সে গুগুলকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন। এ জন্ম ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর খ্যাতি হল। হ্যাঁ, হিরণ্য-সুবর্ণ, দাস-দাসী এবং অশ্বতরী-রথ, তিনি নিজের সঙ্গে নৌকা ভরে কুরু-দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

যাট্ বছর হল প্রবাহণের মৃত্যু হয়েছে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জন্ম গ্রহণ করেননি, কিন্তু একশ' বছরের ওপর পৌঁছেও লোপা পঞ্চাস-পুরের (কনৌজ) বাইরে রাজ-উদ্যানে তখন বাস করছিল। বাগানের আম, কাঁটাল, জাম গাছগুলির ছায়ায় থাকতে সে বেশী পছন্দ করত। জীবন-ভর সে প্রবাহণের কথায় বার বার বিরোধিতা ক'রে এসেছিল, কিন্তু আজ এ সুদীর্ঘ যাট বছরে সে প্রবাহণের দোষগুলি ভুলে গেছে। শুধু আজ তার স্মৃতিপটে জেগে রয়েছে সারা জীবনের প্রেম। আজও বৃদ্ধার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়নি কিংবা প্রতিভা বেশী ম্লান হয়নি। ব্রহ্মবাদীদের ওপর আজও সে খাপ্পা। একদিন পঞ্চালপুরে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বাচক্নবী এসে উঠলেন। রাজোদ্যানের পাশেই একটি বাগানে গার্গীকে বিশেষ সম্মানের সহিত থাকতে দেওয়া হল। জনকের পরিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে ধোঁকা দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিলেন গার্গী তা কখনও ভুলতে পারেননি।

“যদি আর কোন প্রশ্ন কর তবে তোর মাথা পড়ে যাবে গার্গী!” —গার্গী ভেবেছিলেন যে, ও-কোন কথাই নয়। ও-রকম কাজ শুধু উগ্রপাণিই (অপরের রক্তে যে হাত রাঙায়) করতে পারে।

গার্গী লোপার পিতৃ-কুলের মেয়ে। লোপা তার বিশেষ পরিচিতা ছিল। যদিও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তার মতামত উল্টো ছিল। এবার যাজ্ঞবল্ক্য তার বিরুদ্ধে যে রকম নীচ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন তাতে গার্গী একেবারে রেগে আগুন হলেন। তাই যখন তার প্রপিতামহী পিসিমার নিকট গেলেন, তখন নিশ্চয়ই তার ভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। লোপার কাছে গেলে গার্গী তার কপাল এবং চোখ চুম্বন ক'রে আলিঙ্গন করলেন, এবং শরীর কি রকম আছে জিজ্ঞাসা করলেন।

গার্গী বললে, “পিসিমা! আমি বিদেহ থেকে এসেছি।”

“মল্ল-যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে মা?”

“হ্যাঁ, মল্ল-যুদ্ধই হয়েছে পিসিমা! এ ব্রহ্মবাদী পরিষদ মল্ল-যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। মল্ল-যুদ্ধের মতই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে [illegible] করার চেষ্টা হয়।”

“তাহলে কুরু-পঞ্চালের অনেকেই বুঝি ব্রহ্মবাদী আখড়ায় এসে থাকবে।”

“কুরু-পঞ্চাল তো এখন ব্রহ্মবাদীদের দুর্গ।”

“আমার সামনেই প্রবাহণ অসৎ উদ্দেশ্যে এই ব্রহ্মবাদীদের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেছিল। আর তা বনের আগুন হ'য়ে সমস্ত কুরু-পঞ্চালদের জ্বালিয়ে এখন বিদেহ পর্যন্ত পৌঁছেচে।”

“পিসিমা আমি তোমার কথার সত্যতা এখন কিছুটা বুঝতে পাচ্ছি। বস্তুত, এটা ভোগ-অর্জনের একটা প্রশস্ত পথ। বিদেহে যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পেয়েছেন; অন্য সব ব্রাহ্মণরাও প্রচুর ধন-রত্ন পেয়েছেন।”

“এ যজ্ঞের থেকেও বেশী লাভের ব্যবসা, মা! আমার স্বামী একে রাজাদের ও ব্রাহ্মণদের মজবুত নৌকা বলতেন। তাহলে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের পরিষদে বিজয়ী হ'লো, আর তুমি কিছুই বললে না?”

“যদি বলারই কিছু না থাকত তবে এতো দূর নৌকায় করে যাওয়ার কোন্ প্রয়োজন ছিল?”

“না, পিসিমা! ব্যবসায়ীদের বড় বড় স্বার্থগুলিতে (ক্যারাভান) যোদ্ধারা সঙ্গে থাকে। আমরা ব্রহ্মবাদীরা এতো মূর্খ নয় যে একলা দোকলা নিজেদের প্রাণ সংকটময় করে চলব।”

“যাজ্ঞবল্ক্য তাহলে সকলকেই পরাস্ত করেছিল?”

“তাঁর পরাস্ত করার কথা আর বলা উচিত নয়।”

“কেন?”

“কেন না, প্রশ্নকর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্যের জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল।”

“তুমিও?”

“হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু তার কথায় নয়, ঝগড়াই আমাকে চুপ করে দিয়েছে।”

“ঝগড়ায়?”

“হ্যাঁ, আমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যকে এ রকম ভাবে ঘেরাও করেছিলাম যে, তাঁর বেরোবার পথ ছিল না। তখন তিনি আমাকে এমন কথা বললেন, যা আমি কখনও তাঁর নিকট শুনবো বলে আশা করিনি।”

“কি কথা মা?”

“তিনি আমাকে এই বলে প্রশ্নের উত্তর দাবী করতে বিরত করলেন —“গার্গী আবার যদি কোন প্রশ্ন কর—তাহলে আর তোমার মাথা থাকবে না।”

“তুমি ও-রকম করতে আশা করনি মা, কিন্তু আমি সব কিছুরই আশা করেছিলাম, গার্গী! যাজ্ঞবল্ক্য প্রবাহণের উপযুক্ত প্রশিষ্য প্রমাণিত হলো। প্রবাহণের মিথ্যাবাদকে সে ষোল কলায় পূর্ণ করেছে। তুমি যে আর কোন প্রশ্ন করনি, ভালই করেছ।”

“তুমি কি করে জানলে পিসিমা!”

“আমি এ জন্ত জানতে পারলাম যে, নিজ চোখে তোমার কাঁধের ওপর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি।”

“তাহলে পিসিমা, তুমি বিশ্বাস করছ যে, আমি যদি আর কোন প্রশ্ন করতাম, তবে আমার মাথ পড়ে যেত?”

“নিশ্চয়ই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-বলে নয়। তবে অন্য লোকের মাথা যে ভাবে পড়তে দেখা যায়, সে ভাবে।”

"না, পিসিমা।"

"গার্গী, তুমি এখন শিশু। ব্রহ্মবাদ যে মনের কল্পনা, মনের কল্পনা-বিলাসএর পেছনে রাজা ও ব্রাহ্মণদের স্বার্থ লুকান আছে তা তুমি জান না। যখন এ ব্রহ্মবাদ জন্মলাভ করে তখন এর জন্মদাতা আমার পাশে শয়ন করত। এ রাজ-সত্তা এবং ব্রাহ্মণ-সত্তাকে দৃঢ় করবার খুব বড় উপায়। এ যেন ঠিক কৃষ্ণ-লৌহের খড়গ হাতে উগ্র লোহিত-পাণি (ভট) যোদ্ধা।

'পিসিমা, আমি তা মনে করিনি।"

"অনেকেই এ রকম বুঝতে পারে না। আমি এ কথা বলি না যে, জনক, বৈদেহও এর রহস্য (উপনিষদ্) বোঝে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য আমার স্বামী প্রবাহণের মতই বোঝেন। প্রবাহণের কোন দেবতা, দেবলোক, পিতৃলোক, যক্ষ এবং ব্রহ্মবাদে বিশ্বাস ছিল না। তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল ভোগে এবং সে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই ভোগের জন্ম অতিবাহিত করেছিল। মরবার তিন দিন আগেও বিশ্বামিত্র-কুলীন পুরোহিতের সুবর্ণ-কেশী কন্যা তাঁর অন্তঃপুরে এসেছিল। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, তবুও সে সেই বিশ বছরের সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম করত।"

"গরুগুলিকে দান ক'রে বিদেহরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সুন্দরী দাসী-দিগকে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, পিসিমা।"

"তাই তো আমি এইমাত্র বললাম যে, সে প্রবাহণের পাকা চেলা। দেখছ না তার ব্রহ্মবাদ? আর তুমি তো দূর থেকে দেখছ। যদি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেতে মা, তাহলে তুমি সবই দেখতে পেতে।"

"তবে কি পিসিমা, তুমি সত্য সত্যই মনে কর যে, আমি যদি আর কোন প্রশ্ন করতাম তাহলে আমার মাথা পড়ে যেত?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতেজে নয়। দুনিয়ার অনেক লোকের মাথাই নিঃশব্দে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, মা।"

"আমার মাথা ঘুরছে পিসিমা।"

"তোমার মাথা ঘুরছে আজকে? আমার মাথা ঘুরছে তখন থেকে, যখন আমার জ্ঞান হয়েছে। সমস্ত ছলনা, সব কথাই। প্রজাদের পরিশ্রমার্জিত ফল বিনা পরিশ্রমে চুপচাপ করে ভোগের পথই হল এই রাজবাদ, ব্রহ্মবাদ এবং যজ্ঞবাদের মূল কথা। প্রজাদের কেউ এ জাল থেকে বাঁচাতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হচ্ছে। তাদের সচেতন হতে দেওয়া এ স্বার্থবাদীরা মোটেই পছন্দ করে না।"

"মানব-হৃদয় কি আমাদের এ প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করতে প্রেরণা দেবে না?"

"দেবে মা। আমি একমাত্র সেই আশায়ই বেঁচে আছি।" (২)

অনুবাদক—সুধীর দাস ও মহাদেবপ্রসাদ সাহা

(২) আজ থেকে ১০৮ পুরুষ পূর্বের কাহিনী। যখন অথর্ববেদের উপরিভাগে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের রচনা আরম্ভ হয়েছিল। সে যুগে ভারতে লোহার প্রচলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

গৌতমবুদ্ধ —রথীন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন গোঁসাইয়ের হত্যারহস্য

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী-পরিবারে নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করে। আমাদের 'যুগান্তর' অফিস যখন ২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে ছিল, তখন নরেন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। সে বেশ সুপুরুষ, ক্রীড়ামোদী ও হাস্য-পরিহাসে মুখর ছিল—সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করতো; আমরাও তাকে ভালবাসতাম। তার শারীরিক শক্তিও ছিল অসাধারণ। তবে একটু তরল প্রকৃতির ছিল বলে, আমরা তাকে গুপ্ত সমিতির গণ্ডীর মধ্যে লই নাই—বাহিরে বাহিরে যতটুকু কাজ তাকে দিয়ে করানো সম্ভব হ'তো তাই সে করতো। আমাদের প্রচার বিভাগের ও রাঁচি কেন্দ্রের কর্ম্মী গণেশচন্দ্র ঘোষ নরেনের সম্বন্ধে একটু সতর্ক করে' দিয়েছিলেন, কারণ, তিনি বহু পূর্ব হতেই নরেনকে ভাল ভাবেই জানতেন।

আমরা ধরা পড়বার কয়েক দিন পরে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে নরেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জেলে এসে নরেন একটুও ভীত বা নিরুৎসাহ হয় নাই। আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে আমাদের সকলকেই রাখা হয়। প্রথম প্রথম এক একটা ছোট-ছোট কুঠ্‌রিতে আমাদের তিন জন, চার জন, পাঁচ জন করে রেখেছিল। কিছু দিন পরে সকলকেই একটি বড় হল-ঘরে একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। প্রতি রবিবারে এবং ছুটির দিনে আমাদের সকলেরই আত্মীয়-বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে জেলে আসতেন। জেলের গেটের কাছে রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের ভিতর কথাবার্ত্তা চলতো। ছুটির দিন এবং রবিবার দ্বিপ্রহর থেকে গোয়েন্দা পুলিশরা আমাদের কাছে আনাগোনা করতো—একে ওকে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে কথা বের করে' নেবার জন্য নানা প্রলোভন ও ভয় দেখাতো। এইরূপে নরেনকেও ডাকা হতো। নরেন গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে দেখা করে এসে প্রথম প্রথম সমস্ত কথাই আমাদের কাছে বলতো। তাকে রাজসাক্ষী করবার জন্য কতো প্রলোভন ও ভয় দেখাতো। সে সমস্তই খোলাখুলি ভাবে আমাদের কাছে বলতো। নরেন কিছুতেই রাজসাক্ষী হ'তে রাজী হয় না। পুলিশ শেষে এক ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো—নরেনের উকিলকে পুলিশ হাত করে নিলো। সেই উকিলকে দিয়ে নরেনের বাপ-মাকে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলো—নরেনের ফাঁসি হবে, দ্বীপান্তর হবে, কোন রকমেই বাঁচানো যাবে না। সেই উকিল সহ গোয়েন্দা পুলিশ তার বাবা ও মাকে নিয়ে বার বার তার সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। নরেন তখনও কিন্তু টলে নাই—এ সমস্ত কথাও সে আমাদের কাছে বলতো। শেষে পুলিশ তার মা, বাবা, স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে নিয়ে বার বার তার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলো। নরেনের মা, বাবা ও স্ত্রী অত্যন্ত ভীত ও শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। মা, বাবা ও স্ত্রীর কান্না-কাটিতে নরেনের মন ধীরে ধীরে গলতে আরম্ভ করলো।

আমাদের তুলনায় নরেনের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ ছিল না যাতে তার দীর্ঘ মেয়াদ, দ্বীপান্তর বা ফাঁসি হতে পারতো। পুলিশের তাড়না ও তার বাপ-মায়ের দৌর্বল্যই শেষে নরেনের মৃত্যুর কারণ হলো।

সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' মুক্তিকামী ভারতের প্রথম মুখপত্র। প্রথম প্রকাশ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ বা এপ্রিলে। বারীন ঘোষ এর প্রবর্ত্তক। 'অবি-দা' তাহার কর্ম্মকর্ত্তা। চাঁপাতলা লেনের এক ছোট্ট বাড়ীতে অফিস—মাত্র অফিস নয়, গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির আখড়াও; লেখকরা ইংরেজী-বাঙ্গলা মিশিয়ে লিখতেন। দেবব্রত বসু, সখারাম-গণেশ দেউস্কর, ভূপেন দত্ত, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, প্রভৃতি ইহাতে লিখতেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর গীতার এক শ্লোক থাকত। প্রচ্ছদে একটা পতাকা, তাতে ত্রিশূল, কোষমুক্ত অসি, চক্র ও অর্দ্ধ-চন্দ্র অঙ্কিত ছিল। ইংল্যাণ্ডের সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক ফেডারেশনের নেতা এবং ইটালীর রাষ্ট্রগুরু ম্যাৎসিনির বন্ধু মিঃ এইচ, এম, হাইন্ডম্যানের 'জাষ্টিস' পত্র, বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মার 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী' এবং আমেরিকার 'গেলিক আমেরিকা' পত্রের সঙ্গে 'যুগান্তরের' যোগাযোগ ছিল।

মাণিকতলার বোমার আড্ডা থেকে যারা ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে নলিনী গুপ্ত, শচীন সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্সী, কুঞ্জ সাহা, বিজয় নাগ, বীরেন ঘোষ, পূর্ণ সেন, পরেশ মৌলিক প্রভৃতি একেবারে ছাড়া পেয়েছিল।

নরেনের বাপ, মা ও স্ত্রী যখন পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তখনও নরেন আমাদের কাছে সব কথা বলতো। তার পর নরেনের হাসিখুসি ভাব অন্তর্হিত হলো—সে গম্ভীর হয়ে পড়লো; তার সুন্দর চেহারা মলিন হয়ে গেলো। তার এই পরিবর্ত্তন দেখে আমরা বুঝতে পারলাম, নরেন সত্যই রাজসাক্ষী হতে চলেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লী সাহেবের কোর্টে আমাদের মামলা চলছে। আমরা সকলেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে; সহসা নরেনের ডাক পড়লো; নরেনকে আমাদের ভিতর থেকে নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো; নরেন রাজসাক্ষী হয়ে জবানবন্দি দিলো। সে সাক্ষ্য দিয়ে যাবার সময় আমাদের ভিতর থেকে ইন্দ্রভূষণ তার মুখে থুতু দিল। নরেন ফিরে দাঁড়িয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললো, "হুজুর, এরা আমার মুখে থুতু দিচ্ছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি কোর্ট শুদ্ধ সমস্ত লোক হো-হো করে' হেসে উঠলো। নরেন মাথা নিচু করে পুলিশের সঙ্গে কোর্টঘর পরিত্যাগ করবার সময় এক জন পুলিশ অফিসার নিম্নস্বরে বললেন, "আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়ে গেলে তোমাকে—লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবো।" সেই দিন থেকে নরেনকে আর আমাদের সঙ্গে রাখা হতো না। তাকে ইউরোপীয় কয়েদী কোয়ার্টারে রাখা হলো। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় কয়েদী কোয়ার্টার ও আমাদের কোয়ার্টার স্বর্গ-নরক তফাৎ।

বার্লী সাহেবের কোর্টে আমাদের মামলা যথারীতি চলতে লাগলো। গোয়েন্দা পুলিশের সাক্ষ্য ও সনাক্ত করণ এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রভৃতি শেষ হবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লী সাহেব বললেন, "যেহেতু বারীন বাবুর জন্ম বিলাতে, সে জন্য এ মামলার বিচার আমি করতে পারি না। এই মামলার বিচার হাইকোর্টে সাত জন ইউরোপীয় জুরীর সাহায্যে, ইউরোপীয় বিচারপতি দ্বারা হবে। তবে যদি বারীন বাবু জন্ম-স্বত্ব (Birth-right) দাবী না করেন তবে ভারতীয় আইন অনুসারে আমি এই মামলা দায়রা সোপর্দ করতে পারি। আপনারা যুক্তি-পরামর্শ করে এই কোর্টে আমাকে জানাবেন।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর ইতিকর্তব্য স্থির করবার জন্য আমাদের বৈঠক বসলো। বারীন বললো, "তোমরা সকলে পরামর্শ করে যা স্থির করবে তাই হবে।" অতঃপর গভীর ভাবে আলোচনা চলতে লাগলো। আমাদের মধ্যে এক জন জন্ম-স্বত্ব দাবী করার পক্ষে বললেন। তাঁর যুক্তি এই যে, হাইকোর্টে ইংরেজ বিচারপতি ও ইংরেজ জুরী দ্বারা বিচার হলে হয়তো আমাদের অনেক সুবিধা হ'তে পারে। তারা স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি; আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তারা দোষের বলে মনে না-ও করতে পারে। সাধারণ ইংরেজ হয়তো দোষ ধরবে; কিন্তু বিচারপতি, বিশেষতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি নিশ্চয়ই পক্ষপাতশূন্য ও উদার-প্রকৃতির হবেন। আর যদি তা না-ও হয়—আমাদের শাস্তি হয়, আমরা ইউরোপীয় কয়েদীর ন্যায় সুখে থাকতে পাবো, সেটাও বড় কম সুবিধা নয়। হেমদা প্রতিবাদে বললেন, "Birth-right দাবী করা উচিত হয় না। যাদের তাড়াবার জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত পণ করেছি, যে স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য আমরা এতো দূর অগ্রসর হয়েছি, যাদের উৎখাত করবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের কাছে Birth-right এর সুবিধা ভিক্ষা করা যায় না। সুবিচার আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সেশন্স কোর্টে বিচার হলে সেশন জজ, ইংরেজ হলেও, বাঙালী জুরী থাকবে; তাঁদের কাছে বরং আমরা সুবিচার আশা করতে পারি। হাইকোর্টে মামলা গেলে এখনই আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে রাখবে ও আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করবার যে সুযোগ ও সুবিধা এখানে আছে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো; আর জেলে সুখে থাকার কথা—আমরা কি জেলে সুখে থাকতে পাব, কোন কষ্ট হবে না—এই মনে করে এ কাজে নেমেছি? দুঃখ যে আমাদের পেতেই হবে—দুঃখকে বরণ করে নিয়েই ত আমরা এ কাজে নেমেছি।—সুতরাং জন্ম-স্বত্ব দাবী করার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি।" বারীন বললো, "তর্কাতর্কির আবশ্যক নাই, ভোট গ্রহণ করে এ বিষয়ের মীমাংসা করা হোক্।" তাই হ'লো। ভোট গ্রহণে Birth-right দাবী করা নাকচ হয়ে গেল। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানিয়ে দেওয়া হলো—Birth-right দাবী করা হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মামলা দায়রা সোপর্দ করলেন।

এই মামলার বিচার সম্বন্ধে আমাদের কারও কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। আমরা মৃত্যু-পণ করে দেশের স্বাধীনতা আনবার কাজে বহুবিধ ত্যাগ, বাধা, বিঘ্ন ও অসুবিধার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সেখানে সুবিচার বা কুবিচারের কোন কথাই আমরা ভাবি নাই। নরেন গোঁসাইয়ের রাজসাক্ষী হবার পর তাকে হত্যা করার কথা ভিতরে ভিতরে যে চলছিল তা আমাদের প্রায় সকলেই কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু কি ভাবে সে চেষ্টা চলছে তা অনেকেই জানতে পারে নাই।

নরেন গোঁসাই পুলিশের কাছে যে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিল, তার ফলে বাঙলার বহু ধনী, ব্যবসায়ী, জমিদার ও বড় অফিসার প্রভৃতি জড়িয়ে পড়তেন, যাতে তাঁদের সর্বনাশ হয়ে যেতো। তার বিবৃতিতে আমাদের আর অধিক কি ক্ষতি করতে পারতো। সমুদ্রে যাঁদের শয্যা, শিশিরে তাদের কি শঙ্কা! যাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাঁদের কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিলাম, তাঁদের এবং আমাদের দলের যাঁরা ধরা পড়েন নাই, তাঁদের নিরাপত্তার জন্য নরেনকে হত্যা করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে আর কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হতে সাহসী না হয়, নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে সেই শিক্ষা দেবারও একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। Birth-right দাবী না করার মূলে যে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তা বলাই বাহুল্য।

নরেনকে ইউরোপীয় কোয়ার্টারে রাখা হয়। সেটা হাসপাতালের নিকটে। আমরা অনেকেই কারণে অকারণে জেলের হাসপাতালে যাওয়া-আসা করতাম। এক জন মহাশয় বিদেশী ডাক্তার জেলের রোগীদের দেখা-শুনা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করতেন। তাঁর কাছে আমরা বেশ ভাল ব্যবহার পেতাম। ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকারী ছিলেন। সত্যেন বসু অস্ত্র আইনে দণ্ডিত হয়ে আগে থেকেই এই জেলে ছিল। অসুস্থতার জন্য সে হাসপাতালেই ছিল। সত্যেন নরেনের কাছে খবর পাঠায় যে, সে-ও রাজসাক্ষী হতে চায়। এই খবর পাবার পর থেকে নরেন গোঁসাই প্রায় প্রত্যহই সত্যেনের কাছে আসতো। কারণ, সত্যেনকে তার দলে আনতে পারলে তার সাক্ষ্য সত্যেনকে দিয়ে সমর্থন করানো যাবে। বলা বাহুল্য, সত্যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। সত্যেন ও নরেন হাসপাতালের এক বারান্দায় নিভৃতে কথাবার্তা করতো। ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবু উভয়ের এইরূপ গোপন আলাপ-আলোচনা দেখে খুবই শংকিত হয়ে ওঠেন এবং এই গোপন আলোচনার কথা আমাদের জানিয়ে দেন। তিনি জানতেন না যে, ইহা সত্যেনের ভান মাত্র। ডাক্তার বাবুকে আমরা অনুরোধ করি তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে। আমাদের এই উদ্বেগ দেখে হেমদা ও উপেন একটু মুচকি হাসলেন। কিন্তু আমরা স্থির থাকতে না পেরে, কয়েক জন মিলে ঠিক করলাম, প্রত্যহ আমাদের মধ্যে এক জন করে হাসপাতালে যাবে ও তাদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের কথাবার্তায় যত দূর সম্ভব বাধা দেবে। হত্যার ঠিক পূর্বদিন আমার পালা পড়লো। সত্যেন ও আমি হাসপাতালের বিছানায় বসে কথা বলছি এমন সময় নরেন এসে হাজির হলো। দুই জন ইউরোপীয় কয়েদীও তার সঙ্গে ছিল। নরেন আসবা মাত্র আমাকে বসতে বলে সত্যেন চট করে তার বিছানার তলা থেকে কাগজে মোড়া কি একটা গায়ের চাদরের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে গেল। আমার সন্দেহ তাতে আরও বেড়ে গেলো; কারণ আমি মনে করেছিলাম, সত্যেন বোধ হয় একটা বিবরণী তৈরী করে রেখেছিল তাই তাকে দিতে গেল। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। তফাৎ থেকে দেখলাম, বারান্দার এক বেঞ্চিতে বসে উভয়ের খুব হাসাহাসি ও বাক্যালাপ চলছে। ইহাতে বাধা দিবার জন্য আমি সেখানে গেলাম। আমার

উপস্থিতিতে তারা অবান্তর কথা পাড়লো, বেশ বুঝলাম। একটু পরেই নরেন উঠে পড়লো ও বললো, "আজ আর বেশী কথা হলো না; কাল ঠিক আটটার সময় আসবো।" সত্যেন বললো, "হাঁ, আজ অবিনাশ এসে পড়েই সব ভণ্ডুল করে দিলো।" সত্যেন ও আমি তার ঘরে ফিরে এলাম। সত্যেনকে তখন আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, যাতে সে-ও যেন রাজসাক্ষী না হয়। সত্যেন আমার কথা সমস্তই চুপটি করে শুনলো ও মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। এতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলাম।

দুপুর বেলা আমাদের কাছে খবর এলো, যারা হাসপাতালে আছে তাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে এবং আর কেহ আজ হাসপাতালে যাবে না—শ্রীঅরবিন্দের হুকুম। হাসপাতাল থেকে সকলে চলে এলাম। ফিরে এসে সত্যেন ও নরেনের আচরণের কথা আমি সকলকে বললাম। পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, আমি যে দিন সত্যেনের কাছে যাই, সেই দিনই সত্যেনের নরেনকে হত্যা করার কথা ছিল; কিন্তু আমার উপস্থিতি তাতে বাধা হয়; কারণ আমাকে তাতে অকারণে জড়িয়ে পড়তে হ'তো। কোন কাজ উদ্ধারের জন্য যতটুকু ত্যাগের দরকার, তার বেশী ত্যাগ করা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় সত্যেন তা বুঝতো।

নরেনের সঙ্গে দু'জন সাহেব কয়েদী প্রায়ই আসতো; সে জন্য একা সত্যেনের পক্ষে তিন জনকে শেষ করা সম্ভব না-ও হ'তে পারে—হত্যাটা যাতে শেষে হত্যার চেষ্টায় পরিণত না হয়, এই বিবেচনা করে আর এক জন বিশ্বস্ত সৈনিককে পাঠানো দরকার বুঝে, কানাইকেই পাঠানো হয়, যাতে দু'জনে মিলে নিশ্চিত ভাবে কার্য উদ্ধার করতে পারে।

বেলা প্রায় তিনটার সময় দেখি, কানাই আগাগোড়া এক চাদর ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর দুই হাত রেখে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। কানাইকে সকলেই ভালবাসতো তার অমায়িক স্বভাবের জন্য। সে বেশী কথা বলতো না, সর্ব্বদাই হাসি-খুশী থাকতো। এই ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাই কানাই, তোমার কি হয়েছে? তুমি এরূপ ভাবে শুয়ে আছ কেন?" কানাই বললো. "অবি-দা, আমি শব-সাধনা করছি।" আমি তাতে মোটেই বিস্মিত হলাম না; কারণ, আমরা অনেকেই ঐরূপে শব-সাধনা করতাম। শব-সাধনা কি, সে সম্বন্ধে এখানে একটু বলা অবান্তর হলেও এ সম্বন্ধে একটু আভাষ দিচ্ছি।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প-বিস্তর সাধনা করতো। শ্রীঅরবিন্দের নিকট হতে সাধনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পেতাম। তিনি বলতেন, চিত্ত স্থির করাই সাধনার বড় কথা। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাই নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মন শুদ্ধ করা, মন, বুদ্ধি ও আত্মার বিভেদ উপলব্ধি করা দরকার। নানা উপায়ে চেষ্টা করতে হয়। অনেক রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে শব-সাধনা একটি পন্থা। নিজেকে মৃত—শব বলে মনে করতে হবে। আমি শব হলে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমার শবকে ঘিরে বুক-ফাটা কান্না কাঁদছে, হা-হুতাশ করছে, ছোটদের কাছে আসতে দিচ্ছে না, শব বলে সকলে দূরে দূরে থাকছে—ছুঁচ্ছে না; তার পর আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলে মিলে আমি-শবকে শ্মশানে নিয়ে গেল, চিতায় তুলে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো; তার পর সকলে বাড়ী ফিরে এলো; কান্না-কাটি ক্রমশঃ কমে গেল; আবার সংসারে হাসি দেখা দিল; আমি বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেলাম; আমার অভাব সংসারে আর অনুভূত হয় না। এইরূপ ভাবে ভাবনা করাই ছিল আমাদের শব-সাধনা।

কানাই শব-সাধনা করছে বলায় আমি আর তাকে কিছু বললাম না। বেলা প্রায় সাড়ে চার টার সময় কানাই উঠে ধীরে ধীরে হাসপাতাল অভিমুখে যাচ্ছে দেখে, আমি তাকে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করি। বললাম, "শ্রীঅরবিন্দের আদেশ—কেউ যেন হাসপাতালে না যায়।" কানাই বললো, "আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে; বড্ড পেট কামড়াচ্ছে; না গেলেই নয় অবি-দা।" আমি আর বাধা দিলাম না। কানাই গিয়ে হাসপাতালেই রইলো। সন্ধ্যার পর আমি শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, হাসপাতালে যাওয়া-আসা সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ দেন নাই। বারীনও কিছু জানে না। শেষে বুঝলাম, ইহা হেমদা ও উপেনের কারসাজি।

পরদিন সকাল প্রায় আট টার সময় নরেন হাসপাতালে এসে সত্যেনকে ডেকে নিয়ে, দোতলার বারান্দায় বেঞ্চে গিয়ে বসলো। সাহেব দু'জন সে দিনও নরেনের সঙ্গে এসেছিল। তারা বারান্দার এক দিকে বেড়াতে লাগলো। নরেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সত্যেন তার গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে পিস্তল নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। সত্যেনের হাতে পিস্তল দেখে, নরেন চিৎকার করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। সত্যেন পিস্তল চালালো। পিস্তলের গুলী নরেনের উরুদেশ বিদ্ধ করলো। কানাইও প্রস্তুত হয়ে নিকটেই ছিল। নরেনের চিৎকার ও পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই কানাই ছুটে এসে নরেনকে লক্ষ্য করে গুলী করে। গুলী ব্যর্থ হয়ে দেওয়ালের গায়ে বিদ্ধ হয়। নরেন সিঁড়ি দিয়ে পালাতে লাগলো। সাহেব দু'জনও এই সময়ে ছুটে এসে সত্যেন ও কানাইকে ধরবার চেষ্টা করে। তখন কানাই ও সত্যেন তাদের উভয়কেই গুলী দ্বারা আহত করে। তারা আহত হয়েও কানাই ও সত্যেনের সহিত ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। [illegible] সত্যেনের গুলীতে এক জন সাহেব পড়ে গেল। তার ফলে কানাইয়ের পথ উন্মুক্ত হলো। সে ছুটে নরেনের পশ্চাদ্ধাবন করলো। সত্যেনের সঙ্গে তখন আর এক জন সাহেবের ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো। এদিকে নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি নেমে উঠান পার হয়ে হাসপাতালের গেটের বাইরে চলে যায়। গেট-কিপার তখনই তালা দিয়ে গেট বন্ধ করে দেয়। কানাই ছুটে এসে দেখে গেট তালাবন্ধ।

তখন কানাই গেট-কিপারের বুকের ওপর রিভলভার ধরে গেট খুলে দিতে আদেশ করে। গেট-কিপার কানাইএর রুদ্রমূর্তি দেখে ভীত হয় ও তখনই গেট খুলে দেয়। নরেন বেশী দূর যেতে পারে নি। কানাই ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ও পর পর তিনটি গুলী দ্বারা তাকে বিদ্ধ করে। নরেন "তিনটে বাবা, তিনটে বাবা" বলতে বলতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়—আর কোন কথা সে বলতে পারেনি।

বাঙালী জেলার তখন জেল পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। তিনি কিছু দূর থেকে এই কাণ্ড দেখে কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। কানাই জেলার বাবুর এই অবস্থা দেখে হেসে উঠলো—হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে জেলার বাবুকে ডেকে বললো, "আপনার ভয় নাই, আমি রিভলভার ফেলে দিয়েছি; নির্ভয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করুন; আমার কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে।"

তার পর জেলের ভিতর হৈ-হৈ পড়ে গেল; কয়েদীরা চারি দিকে ছুটা-ছুটি করতে লাগলো; যথারীতি পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো;

সিপাহিরা বন্দুক ঘাড়ে করে ছুটে আসতে লাগলো, গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজে জেলখানা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো; কানাই ও সত্যেন ধীর ভাবে দাঁড়িয়ে এই সব তামাসা দেখতে লাগলো। নির্বিবাদে তাদের গ্রেপ্তার-পর্ব সমাপ্ত হলো। ৪৪ ডিগ্রির প্রথম ছ'টি সেলে তাদের বন্ধ করে রাখা হলো। Birth-right দাবী না করার রহস্য এখন প্রকাশ হয়ে পড়লো।

এদিকে আমাদের কাছে যা কিছু ছিল, এই গোলমালের মধ্যে সে সব সরিয়ে ফেলা হলো; কারণ, আমরা ঠিক বুঝেছিলাম, আর আমাদের একসঙ্গে রাখবে না। কিছুক্ষণ পরে আমাদেরও ৪৪ ডিগ্রিতে নিয়ে গিয়ে এক এক জনকে এক এক সেলে পুরলো। ৪৪ ডিগ্রি মানে সেখানে একটানা ৪৪টি সেল আছে এবং ঐ ডিগ্রিটা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। ইহার প্রথম ছ'টি সেলে শুধু ফাঁসির আসামীদেরই রাখা হয়; বাকিগুলিতে দুর্ধর্ষ কয়েদীদের রাখা হয়। আমাদের ৪৪ ডিগ্রিতে নিয়ে গিয়ে মিলিটারি ও ল্যাংটা গোরার পাহারায় রাখা হলো।

কানাইএর বিচার-প্রহসন শেষ হলো, কানাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি। কানাইএর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

জেলের ভিতর এইরূপে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যায় দেশের জনসাধারণ ভীত ও বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল; আমাদের সহকর্মিগণ, যারা ধরা পড়ে নাই, তারা আনন্দে উৎসাহে মেতে উঠেছিল। ভারতের আমলাতন্ত্র পাগলা হ'য়ে গেল, ব্রিটেনবাসীর হৃদয় কেঁপে উঠলো ও সারা দুনিয়া বিস্ময়-বিহ্বল মুখ তুলে বাঙলার দিকে তাকাল।

কানাই ও সত্যেন ৪৪ ডিগ্রির প্রথম ছ'টি সেলে ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। আমাদের বিচার তখনও চলছে। প্রত্যহ কোর্টে যাতায়াতের সময় আমরা প্রত্যেকে তাদের দেখতে পেতাম তারা তাদের সেলের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো। টোকাগ্রাফির সাহায্যে রাত্রে আমরা কথাবার্তা চালাতাম। টোকাগ্রাফিতে কানাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কেন তিনটি গুলী করেছিল। উত্তরে সে বলে, "হত্যাটা যাতে হত্যার চেষ্টায়ই পরিণত না হয়, মৃত্যু নিশ্চিত করবার জন্যই তিন বার গুলী করি।" পাহারাদাররা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করতো আমরা কেন বসে বসে দেয়ালের গায় টোকা মারি। আমরা হেসে উড়িয়ে দিতুম। তারা ভাবতো, আমরা পাগল। টোকাগ্রাফি হয়তো অনেকে বুঝবেন না। কিন্তু সে সব এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

কানাইয়ের ফাঁসিই আগে হয়। সে দিন ১০ই নভেম্বর ১৯০৮ সাল। ফাঁসির দিন যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, তার চেহারাও তত সুন্দর হতে লাগলো। সে বেশ মোটা-সোটা হয়েছিল এবং ওজনেও বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ফাঁসির আগের দিন আমরা কোর্ট থেকে ফেরবার সময় প্রত্যেকেই একে একে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সে প্রত্যেককে নমস্কার করে' হাসিমুখে বিদায় নেয়। মিলিটারি প্রহরীদের অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলাতে তারা খুব সন্তর্পণে কানাইয়ের এই শেষ বিদায়-সম্ভাষণের সুযোগটুকু করে' দিয়েছিল।

ফাঁসির দিন ভোর বেলায় কানাইকে ডেকে জাগানো হয়—সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। তাকে প্রস্তুত হ'তে বলা হলে কানাই বললে, "দাঁড়াও, আগে আমি মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে নি।" তার পর কানাই ধীরে-সুস্থে প্রশান্ত মনে ভগবানের নাম নিয়ে একখানা পুরাণের কিয়দংশ পাঠ করে বললো, "আমি প্রস্তুত; এখন আমাকে নিয়ে চলুন।" আমাদের সেলের পিছন দিক দিয়ে কানাইকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে গেল। কানাইএর ধীর-স্থির পদধ্বনি আমরা অনুভব করলাম। ফাঁসি-মঞ্চে উঠবার আগেই কানাই তার চসমা ও পুরাণখানি তার দাদাকে দেবার জন্য অনুরোধ করে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে দিল। ৬টা বাজতেই ফাঁসি দিবার সংকেত করা হলো। জল্লাদ এসে তাকে ফাঁসি-মঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে তার মাথায় টুপি ও চোখ-মুখের আবরণ পরিয়ে দিল। শোনা যায়, কানাই জল্লাদকে সরিয়ে দিয়ে টুপি ও আবরণ খুলে ফেলে দিয়েছিল এবং নিজ-হাতেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিল। কিন্তু যুক্তিতে ইহা টেঁকে না। দড়ি পরানো ঠিকই হয়েছে দেখে নিয়ে জল্লাদ সরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কানাইএর পায়ের নিচের মঞ্চের তক্তা সরিয়ে নেওয়া হলো। কানাই ঝুলে পড়লো—সব শেষ হয়ে গেলো! দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে এইরূপে আরও একটি মহান্ বীর সৈনিক-জীবনের অবসান হলো।

সৎকারের জন্য কানাইএর মৃতদেহ জেলের বাহিরে তার আত্মীয়-স্বজনদের হাতে দেওয়া হয়। বাইরে এসে কানাইকে পুষ্পমাল্যে সাজিয়ে নিয়ে তাঁরা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হলেন। লক্ষ লক্ষ লোক—স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ দলে দলে কানাইএর শবানুসরণ করে। কেওড়াতলা শ্মশানে শবদেহ নামিয়ে রাখতেই সহস্র সহস্র নরনারী তার পায়ের ধূলা নিতে লাগলো। সমস্ত দিন ধরে এইরূপ ভীড় চলতে লাগলো। বিকালে কোন রকমে ভিড় থেকে শবদেহ সরিয়ে এনে দাহ করা হয়। চিতা-ভস্ম নিয়ে আবার কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

কানাইএর চসমা, পুরাণখানা এবং অস্থি ও চিতাভস্ম চন্দননগরে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। কানাইলাল চন্দননগরেরই অধিবাসী ছিল।

জেলের ভিতরে কি করে পিস্তল, রিভলভার গিয়েছিল, তা জানবার একটা আগ্রহ সকলের হয়, তাই সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার মনে করি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই জেলখানায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তা পূর্বে বলা হয়েছে। দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসিবার সময় অনেকেই আমাদের জন্য ফল-মূল খাবার ইত্যাদি আনতেন। প্রথম প্রথম পুলিশ ও সিপাহিরা এই সমস্ত পরীক্ষা করে আমাদের হাতে দিতো। শীঘ্রই তাদের হাত বন্ধ করে দেওয়া হলো, আর তারা খাবার পরীক্ষা করতে হাত তুলতে পারলো না। এই সুযোগে সন্দেশের টুকরির মধ্যে একটি পিস্তল এসে জেলখানায় হাজির হয়। আমাদের সহকর্মী বর্ধমান জেলার শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কাগজে মুড়ে একটি রিভলভার উপেনের হাতে-হাতে দিয়ে যায়। এই অসম সাহসী শ্রীশচন্দ্রের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে যা আজও প্রকাশিত হয় নাই। সত্যেনের মেদিনীপুরের সহকর্মী প্রমোদেন্দু ঘোষ মাঝে মাঝে জেলে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে আসতো। সত্যেন তাকে বলে, একটা রিভলভার এনে দিতে। প্রমোদেন্দু রিভলভার আনবার জন্য কাঁথী যায়। কয়েক দিন পর ফেরবার পথে সে খবরের কাগজে দেখে, নরেন গোঁসাই আলিপুর জেলে গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছে।

জমা-খরচের খাতা

কানাই সামন্ত

নিজেই নামকরণ করেছি নিজের মনে—
যশোদা মায়ী,
সুজাতা যেন।
এদেশিনী গোয়ালার মেয়ে তারা,
দুধ জোগায় প্রবাসী বাবুদের প্রদোষে আর প্রভাতে।

এসেছি হাওয়া খেতে—
ঘি দুধ মধু মিষ্টান্নের বেলাতেও তা বলে
নিরুৎসুক উদাসীন নই—
এসেছি বিহারের এক আধা-শহর আধা-গণ্ডগ্রামে।
সকালে দেখি
ভারী কাঠের বোঝা মাথায় এসেছে সাঁওতাল মেয়েরা;
অক্লান্ত পরিশ্রমে বনে বনে ভেঙেছে কাঠ,
চড়াই-উৎরাই পথ ভেঙেছে কত পাহাড়ে পাহাড়ে;
চতুর দোকানদারের দ্বারে দ্বারে এখন ফেরে,
দরে বনে না,
ঘুরে মরে ছোটো বাজারের ঠাণ্ডা-কঠিন
শান-বাঁধানো গোলকধাঁধার অলিতে-গলিতে।
দক্ষিণায়নের সূর্যও যখন
প্রখর হয়ে ওঠে মধ্যাকাশে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর রমণীরা অর্ধেক দামে বেচে দিয়ে যায়
সমস্ত পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমের সঞ্চয়।
কাঠের হাতবাক্স আর খেরো-বাঁধা খাতার
স্তূপের পিছনে গদিয়ান
হৃদয়হীন ব্যবসাদারিকে মন বলেছে, ধিক্!

রঙিন ফুলের ফসলে উড়ে উড়ে বেড়ানো
ফুরফুরে প্রজাপতির মতো মেয়েদের নিয়ে
সন্ধ্যায় নদীর ধারে যাই হাওয়া খেতে—
যে জন্যে আসা।
সোণালি-রূপালি বালি আর বালি;
এখানে-সেখানে তারই লীলায়িনী নদী
শীতের দিনে সুপ্ত রূপসী নাগিনী,
পাহাড়ি নাগের সহোদরা,
ঊর্মিল চিত্রতনু।
ওপারে আম আর কাঁটালের বাগান;
প্রস্ফুটিত অড়রের খেত
সযত্নরচিত স্তরে স্তরে সজ্জিত চন্দ্রমল্লিকার বিছনে
অষ্টপ্রহরের বন্দিনী যেন চাঁদেরই হাসি
ঝর্ণা-ধারায়
তুষারের উপর।
চঞ্চল হয়ে ওঠে মেয়েরা,
ছুটে চলে,
স্ফুরিত অঙ্গে আলোয়ানে
মনে জাগায় প্রজাপতির চঞ্চল ডানা—
আশাতীত শোভার আবিষ্কার আশায় লুব্ধ।
চেয়ে দেখি উঁচু পাড়ির উপর দাঁড়িয়ে—অনেক দূরে,
অর্ধকটি কুহেলিনীমগ্ন,
ধূসর গৃধ্রকূট,
তারই পিছনে এ কী দিনাবসানের ছবি
রিক্তসম্বল দিগ্বধূ
অস্তসূর্যের বিদায়-পথে ছড়ালো
একটি মুঠি শুধু ফাগ।

ফেরৎ পথের দু'ধারে সতেজ গমের জমি;
শুভ্র-ফুল-ছিটোনো মূলোর ক্ষেত;
আলুর চারার তৃষ্ণা মেটাতে
তার-বাঁধা লাঠা নুইয়ে
কুয়ো থেকে জল তোলে তখনও চাষী;
সাজানো ফসলের মধ্যেই সাজানো বাড়ি—
লেপামোছা মাটির গড়ন, খোলার ছাদ।
দরিদ্রের ঘরণী ঝরা-পাতা স্তূপীকৃত ক'রে পথের ধারে
পোড়ায় আর জল ছিটোয়:
শীতের দীর্ঘ রাত—সঞ্চিত তারই গুমো আগুনে
রুদ্ধঘরে পরিবার সুদ্ধ লোকের খিলধরা হাড়ে
সামান্য একটু তাত পৌঁছবে শুনতে পাই।
দগ্ধ তৃণ আর প্রচুর ধোঁওয়া তাড়াতাড়ি পার হয়ে এসে
ছোট এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি:
হায় কী কষ্ট!

আমাদের এই বাসায় রোজ সকালে
কালো মাটির ভাঁড় মাথায়
দুধ জোগায় যে গোয়ালিনী,
প্রতিদিন প্রদোষে

ঝন্‌ঝনে কাঁসার লোটা হাতে
মলিন মোটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে
গুটি-গুটি আসে যে বুড়ি,
মহুয়াগন্ধি মিষ্টি কথা যাদের বারো আনাই বুঝিনে,
তাদেরই দু'জনের
নাম দিয়েছি সুজাতা বেন আর যশোদা মায়ী—
বিহারী নাম ছাই মনে কি থাকে।
তা ছাড়া হয়তো দেখেছি স্মিত সরল মুখের
অধরে চিবুকে সেই দেবের প্রসাদ
বুদ্ধের পদাম্বুজে

দুর্লভ পায়সান্ন নিবেদনের তৃপ্তির যা আভাস ;
দেখেছি অপরার বার্ধক্যরেখাবলিত নয়নে সেই উজ্জ্বলতা
কোনো না কোনো জন্মে যা অব্যয় অরূপকে কোলে ক'রে
স্তন্যধারাতুর্গঙ্গিনী
লালন করে থাকে স্নেহ-ধারায়।
যা হোক, তারা তো জানে না,
কাজেই সকৌতুকে হাসে না
গদ্যছন্দে পদ্যছন্দ মেশানো অদ্ভুত অনাহূত এ কবিত্বে।
জল মেশাতে তারা জানে না ;
আট সেরের বেশি দুধ দিতে চায় না টাকায় ;
আমিও ক্ষীণ অনুযোগে জানাই—দশ সের
অন্তত ন' সের না পেলে আমার বড় লোকসান।

এই ভাবেই চলছিল।
একদা সুজাতা এসে শুনল, দুধ তার ভালো নয়।
বাজার-ফেরতা এসে দেখি
বসে আছে উঠোনের মাঝখানে ;
রাগ ক'রে দেয়নি সেদিনের দুধ—
দাম চায় ;
দেখালে একবার বটের আটার মতো দুধ—
এ কেন মন্দ হবে।
হোক বা না হোক চুকে গেল দেনা-পাওনা,
চলে গেল ;
দাঁড়ালো তবু আবার দরোজার গোড়ায় ;
আধখানা ফিরে মৃদু স্বরে বলতেই হল—বাবু,
আজকের দুধটা নেবে না?

তখন দুপর ;
বাসার প্রায় সকলেরই শেষ হয়ে গেছে স্নানাহার।

যশোদা মায়ীকেও বলা গেল সেদিন রাত্রে,
ভোর-বেলার দুধ
(শিশুর প্রাণরক্ষে আর
বয়স্কদের চায়ের নেশার অনুরোধে
খুব ভোরেও দিয়ে থাকে আধ সের)
বলে দিলাম—আর দিয়ো না।
কেন যে দেবে না বুড়ি কি বোঝে।
বোঝে না যে দশ সেরের দরে দুধ পাব সকালে,
ভালো দুধ—
বেশি দামে সুজাতা বা যশোদার দুধ নিয়ে ফল কী?
রাত্তিরে যশোদা বরং দিক,
জোগাড় করা যায়নি অন্যত্র থেকে।
ভাঙা-ভাঙা হিন্দুস্থানিতে বোঝানো যায় কি এত।
আমি সে চেষ্টা করিনি।
আম গাছের মহুয়া গাছের অন্ধকারে
গুটি-গুটি যায় আবার ফিরে ফিরে আসে ;
ছোটো পাঁচিল ঘেঁষে
বারম্বার যা জিজ্ঞাসা করে গেল বুড়ি
কাণে বাজছে এখনও যেন—
বাবু আঁধারে দুধ নেবে না?
বিহানে দুধ নেবে না?
সকালে কেন দুধ নেবে না?

জমা-খরচের খাতায়
নাম টোকা আছে যশোদা মায়ী, সুজাতা বেন :
খেপে খেপে দিয়েছি তাদের
দু' টাকা, পাঁচ টাকা, বারো আনা, পাঁচ সিকে,
এমনি কত।
হিসেব ঠিকই মিলেছে,
কম বা বেশি দিইনি।
আমাদের বাড়িওয়ালার খাতক—
তারই ছোটো ছেলে
এই মাত্র দুধ দিয়ে গেল যে,
কী যেন ম'হাতো, তার
নাম দেব না নন্দলাল।

নামে কি আসে যায়

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়

দার্জিলিং জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এবং সিকিম রাজ্যের সীমা-রেখায় তিস্তা ও রংগীত বা রঙ্গীত নদীর সঙ্গম। সিকিমের এক হ্রদ হতে জন্ম নিয়ে নগাধিরাজ কাঞ্চনজংঘার পাদদেশ স্পর্শ করে এবং তারই পাদোদকে সমৃদ্ধ হয়ে তিস্তা দার্জিলিং জেলাকে ফল-ফুলে সাজিয়ে, জলপাইগুড়ী ও রংপুর জেলাকে ধন-ধান্যে ভরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের বুকে যেয়ে আপনাকে উজাড় করে দিয়েছে। রংগীতের উৎপত্তি ও জীবনও কাঞ্চনজংঘার করুণা-বারির পরশে। নেপাল রাজ্যের কোল ঘেঁষে, দার্জিলিংয়ের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উচ্ছল আনন্দে নাচতে নাচতে যেয়ে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। কোন কোন ভৌগোলিকের মতে এর জন্ম না কি তিস্তার পরে এবং সকল বিষয়েই এ তিস্তার চেয়ে ছোট। বস্তুতঃ, তিস্তার নাম সকলের কাছে যে ভাবে পরিচিত সে ভাবে ক'জনই বা রংগীতকে জানে? অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিস্তার সমৃদ্ধি, প্রাখর্য্য, ভীষণতার অনেকখানি রংগীতের সঙ্গে মিলনের পর থেকেই, রংগীতের সর্বস্ব আত্মসাৎ করে। নিজের যা কিছু আপন, সবই নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে রংগীত আজ তার নামটাও যেন হারাতে বসেছে।

ভ্রমণকারীদের মতে এই দুই নদীর সঙ্গম সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর দর্শনীয় বস্তু। বিখ্যাত প্রকাশক Newman Co., তাঁদের Guide to Darjeeling বই-এ এক স্থানে বলেছেন Tommy Moor কখনও ভারতে আসেননি; কিন্তু এলেও এই দুই নদীর সংগম-মাধুরীর যথার্থ সম্মান ভাষায় তিনিও দিতে পারতেন না। সুতরাং আমরাও সে চেষ্টা করব না। আমরা কেবল এইটুকু বলব যে, যে দর্শক এর মনোহর রূপ উপভোগ করতে পারবে না, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিক্ দিয়ে সে একেবারেই অন্ধ।

এ বর্ণনার মোহ উন্মাদনা উপেক্ষা করতে পারিনি। তাই ভবঘুরের ঝোলা-লাঠি সম্বল ক'রে উপস্থিত হলুম সেই স্বর্গীয় দৃশ্যপটের সামনে। বিস্মিত, স্তম্ভিত, যেন সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকি। আনন্দ, আবেগ ও কত বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ যেন অসহ্য হয়ে আসে; চোখের কোণ হতে গড়িয়ে পড়ে অবাধ্য অশ্রুবিন্দু। মনে হয়, সত্যই এই সৌন্দর্য্য ভাষায় রূপ দেবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। মানুষ যদি বাঁধতে পারত একে ভাষার জালে, তবে ভগবানের সংগে তার পার্থক্য থাকত কোন্‌খানে? ঐ যে গভীর বনানী ভেদ করে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে উচ্ছল ফেনিল জলধারার উপর, ঐ যে তার বর্ণচ্ছটা, মানুষ তার কী বর্ণনা দিতে পারে? কতটুকু ফোটাতে পারে তার আসল রূপ?

আত্মহারা হ'য়ে চেয়ে থাকি। এক দিক্ দিয়ে প্রবল বেগে নেমে আসছে খরস্রোতা তিস্তা ছোট-বড় সকল রকম প্রস্তর-খণ্ডের সকল বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে। ছোট তৃণগুল্ম যেন সাহস ক'রে জন্মাতে চায় না তার কাছে। বিরাট মহীরুহ পর্য্যন্ত যেন তার তফাতে থাকতে চায়—এতই তার প্রখরতা! জল তার একটু ঘোলা এবং বর্ণও তার যেন একটু ঘোলাটে ধরণের নীলাভ। অপর দিক্ দিয়ে নেমে আসে রংগীত একেবারে বিভিন্ন রূপে। গতি তার মন্থর, যেন কোন সু ছন্দের গানের সঙ্গে তালে তাল রেখে পা মিলিয়ে—একটু বেশী জোরে গেলেই ছন্দপতন! বৃহদাকার প্রস্তরগুলিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে, কারও গায়ে একটু সাদরে হাত বুলিয়ে দিয়ে, ছোট উপলখণ্ডগুলির উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে সে চলেছে, পাছে তাদের আঘাত লাগে। দু'পাশে বিরাজমান শাল-পাইনের ঝুলে-পড়া দু'-একটা শাখাকে করছে সে সস্নেহে চুম্বন। অগণিত ফুল ফুটে আছে তার অতি সন্নিকটে একান্ত নির্ভয়ে। রাশি রাশি বনবিহঙ্গ, প্রজাপতি তারই জলপান করে চলে যাচ্ছে বিনা দ্বিধায়। জলের বর্ণ তার ঘোর নীল, বরং একটু সবুজাভ, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ; জলের নীচে প্রতি উপলখণ্ডটি গণনা করা যায়।

কতকটা যেন সঙ্কোচের সংগে সে মিশতে যায় তিস্তার সাথে। কিন্তু তিস্তা যেন চায় না, সে আসুক। তাই যত বারই রংগীত যায় এগিয়ে, তিস্তা তাকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে দেয়। নদীস্রোতের কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় স্বচ্ছ ও ঘোলা জলের সুস্পষ্ট পার্থক্য। তার পর ধীরে ধীরে রংগীত হারিয়ে ফেলে আপনাকে; তিস্তার ঘোলা জলে সব একাকার হয়ে যায়।

রডোডেনড্রণের গাছে গাছে আগুন লেগেছে লাল ফুলে। তারই নীচে বসে আছি তিস্তার জলের পানে চোখ মেলে। অপার্থিব পরিবেশের মাঝে মনের মধ্যে এক কল্পলোকের জাল বিস্তৃত হয়ে চলেছে। অকস্মাৎ কাণে এসে বাজে অনুচ্চ নারী-কণ্ঠস্বর! যেন এক জন করছে কারও কাছে কোন অনুযোগ বা মিনতি। প্রত্যুত্তরে আসে আর এক কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং উদ্ধত। চারি দিকে চেয়ে দেখি, কোন জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ কোথা হতে এ কথোপকথনের শব্দ আসে? আরও ভাল ক'রে শুনতে চেষ্টা করি। এবার মনে হয়, যেন জলের ভিতরই কথা হচ্ছে জলস্রোতের অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনির সংগে। কৌতূহল বেড়ে যায়। ক্রমে কথা বোঝা যায়। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "না তিস্তা দিদি, তুমিই আমাকে ভুল বুঝ্‌ছো। আমি তো তোমার সঙ্গে সর্বদাই মিলতে চাই; তুমিই আমায় ছোট বলে দূরে ঠেলে রাখ।"

উদ্ধতকণ্ঠ বলে, "তুই থাম রঙ্গি! এ তোর মন-গড়া কথা। আসলে তুই-ই থাকতে চাস্ আলাদা, আর পাঁচ জনের কাছে দেখাতে চাস্......"

বাধা দিয়ে রংগীত বলে, "না, দিদি, না! এ তোমারই ভুল ধারণা। বলতে পারো, আমার আলাদা বেঁচে থাকার তাৎপর্য্য কি? তোমার জীবনের যা লক্ষ্য, যা পরিণতি, আমারও কি তাই নয়? অথচ আমার একা বাঁচার কতো অসুবিধে তা তো তুমি জান না। আর কী সুখই বা তাতে?" কণ্ঠ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে আবার বলে, "আমাকে দুর্বল পেয়ে সকলেই করে বিপক্ষ-আচরণ। যে দোষ আমার নয়, সেই দোষে আমি দোষী কেবল আমার দুর্বলতার অপরাধে। তোমরা বড়, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ সাহস করে না; আর সব তাল পড়ে আমার উপর। আরও দুঃখ আমার এই যে, সুযোগ পেলে তুমিই দু'কথা শুনিয়ে দিতে ছাড় না। এদিকে আবার শুনছি, মানুষরা না কি যুক্তি করছে আমাকে বেঁধে পাওয়ার হাউস, জলের কল, আরও কী সব তৈরী করবে। আমি একা, দুর্বল, তাই না তারা আজ এ সাহস করে। এতেও তুমি বলো, আমি আলাদা থাকতে চাই? বল তো, এ ভাবে আমি কত দিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব?" ক্রন্দনের আবেগে ভাষা জড়িয়ে আসে।

তিস্তার কণ্ঠ আসে, "বেশ তো, তুই মিশতে চাস্, এতে তো আমার কোন আপত্তিই নেই। বরং আমিও তাই চাই। তোর সঙ্গ পেয়ে আমার যে বল কতটা বাড়ে তা তো আমি অস্বীকার করতে পারি না। তবে তোর বাপু ঐ এক অন্যায় জিদ—নাম পাল্‌টাবো না। কেন, যদি আমার সঙ্গেই মিলে যাবি তবে আবার আলাদা নামের দরকার কি? কিছুই বুঝি না। আমার নামে তোর নাম হবে। ও-সব অন্যায় আবদার ছাড়্‌।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। লাগছে মন্দ নয়। দুইটি পর্বত-দুহিতার মান-অভিমানের পালা বেশ অভিভূত করে এনেছে। সহসা রংগীত যেন চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,—"দিদি, আমার যা কিছু সবই তো তোমায় নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছি; তাতেও তুমি খুশী হলে না? আমার ধীর ছন্দময় গতি তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে দেখ কত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার সমতা রাখতে আমি হাঁফিয়ে উঠছি। আমার সবুজ-নীল রং তোমার রং-এ একাকার হয়ে গেল। আমার জলের স্বচ্ছতা—যা নিয়ে আমি সারা দুনিয়ায় বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারি, তা-ও তোমার ঘোলা জলে কোথায় হারিয়ে গেছে। কেবল মাত্র শেষ সম্বল আছে আমার ঐ নামটুকুর, তা-ও তুমি কেড়ে নিতে চাও? তোমার প্রভাবে জগতের সকলেই আমাকে ভুলেছে; যেটুকু বা আছে তাও তুমি ছাড়তে রাজী নও? বল এতে কী লাভ তোমার? তোমার নাম তো সবাই জানে, তবুও

অকস্মাৎ মানব-কণ্ঠস্বরে বাস্তব জগতে ফিরে আসি। ভুটিয়া কাঠুরিয়ার দল সাবধান করে দিয়ে যায় যে, আর ওখানে থাকা নিরাপদ নয়; ভাল্লুক নামবার সময় হয়েছে। ঝোলা ঘাড়ে নিয়ে উপরে পা বাড়াই। মনের কোণে একটা বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে। সত্যই তো, নামটুকু ছাড়া রংগীতের আর রইল কি? ভাবি সেই মহাকবির কথা—যিনি লিখে গেছেন, "What's in a name?"—'নামে কি আসে যায়'। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা যতই উলটে যাই, কেবলই চোখে পড়ে,—মাত্র এই নামের জন্যই কত না বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে! আজ এই যে বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হানাহানি—এর মূলে কেবল নামের মোহ ছাড়া আর কিছু আছে কি? তবে কি কবির কথা মিথ্যা?

বহু দূরে অবজারভেটরী-হিলের চূড়াকে আড়াল করে ফেলে উড়ে-যাওয়া একটা মেঘের টুকরো। এখনও অনেক পথ বাকী, গতি বাড়িয়ে দিই।

ঘাট —বিমল রায়

সার্থক বাক্

শুভেন্দু ঘোষ
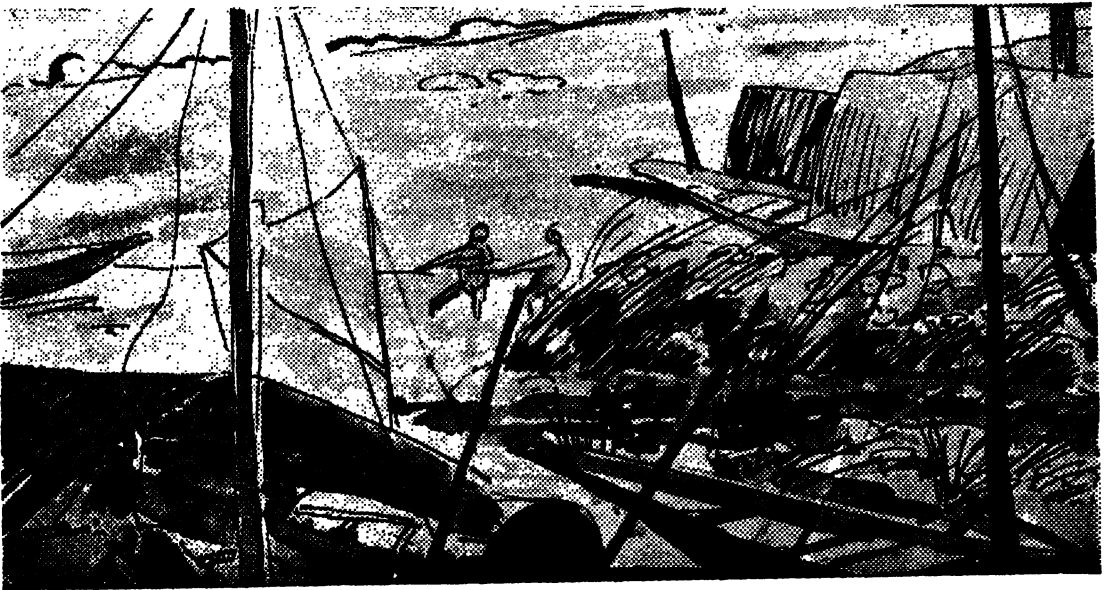
বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ

কালিদাস এখানে বাক্ আর অর্থের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেছেন, সে সম্পর্ক পাওয়া যায় বাক্ যেখানে সার্থক শুধু সেখানে। কিন্তু বাক্ মাত্রই যদি সার্থক হত, তাহলে বাগর্থপ্রতিপত্তি কামনা করে মহাকবিকে এ বন্দনা করতে হত না। বাক্ মাত্রই যে সার্থক নয়, সার্থক বাক্ যে অতিশয় বিরল—এটা অতি সাধারণ কথা। অধিকাংশ কথারই কোনো মানে হয় না—প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে তাদের জন্ম, সেটা মেটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু। অধিকাংশ বাক্যই ক্ষীণজীবী :

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

আমরা হামেশাই যে-সব কথা বলি তাদের অর্থ কতটুকু? নাই বললেই চলে। একটা গাছ—এ কথা বললে গাছটার কতটুকু পরিচয় আমরা পাই? পরিচয় ঠিক মত পাই, যদি ঐ তার রূপ—তার উপরে আলোছায়ার খেলা—তার গাঢ় সবুজ পাতা—তার বিচিত্র ভঙ্গিতে শাখা-প্রশাখা-বিস্তার—এ সব কিছু নিয়ে গাছটা আমাদের সত্তাকে নাড়া দেয় তা হলে। এ পরিচয় যে বাক্ দিতে পারে তাই সার্থক। অথচ এ পরিচয় দেবার জন্যে যে মেলা কথা বলার দরকার, তা মোটেই নয়। সব চেয়ে অল্প কথায় সব চেয়ে বেশী বলা যায়, বাক্ সার্থক হলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত হয়ে ওঠে—তার বাণী রূপ পায় এক ওঙ্কার-ধ্বনিতে।

মার্কিণ মনীষী থোরো এক জায়গায় বলেছেন, "হোমার যেই বলেন, 'সূর্য্য উঠল' অমনি সূর্য্য ওঠে।" হোমারের বাক্ সার্থক এই কারণেই যে, সেটা উচ্চারিত হবা মাত্র, আমরা সত্তায় উপলব্ধি করি, পূর্বগগন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ধরণী নতুন দিনের আলোয় চোখ মেলল। অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি'তে দেখি, কোঁকড়া রোজ ভোরে সবার আগে উঠে মাটীতে বুক দিয়ে ডাক দিত আলো'কে, সে ডাকে সূর্য্য উঠত। সত্যিই তাই। তার গান যখন বন্ধ হল, গোলাবাড়ির পাখিগুলো সূর্য্য ওঠার বিস্ময়টা আর ঠিকমত নিজেদের মধ্যে অনুভব করতে পারত না। কোঁকড়ার বাক্ সার্থক। হোমারের মত কোঁকড়ার মত, আমরাও বলি 'সূর্য্য উঠল', কিন্তু সূর্য্য ওঠে কই? নতুন দিনের আলো বিস্ময় আনে কই? আমাদের সত্তার জ্যোতিঃ-স্নান তো হয় না।

এখানে থোরোর আর একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা এমন কিছু নতুন নয়—অনেক মুনিই অনেক ভাবে সেটা বলেছেন, তবু কথাটা পুরানো হবার নয়। কথাটা হচ্ছে এই :

The millions are awake enough for physical labour but only one in a million is awake enough for effective intellectual exertion, only one in a hundred millions to a poetic or divine life. To be awake is to be alive…

অর্থাৎ, শুধু গতর খাটানোর জন্যে যতটুকু জেগে থাকা দরকার ততটুকু জেগে থাকে সবাই। কিন্তু সার্থক মননের জন্যে যতটা চেতনার প্রয়োজন ততখানি চেতনা থাকে লাখে এক জনের, আর দৈব জীবন সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকে কোটিতে এক জন। জেগে থাকাই হল জীবন্ত থাকা—সত্যিকার বেঁচে থাকা।

সার্থক বাক্ হচ্ছে সেই বাক্ যা সত্তার সুপ্তি ভাঙিয়ে তাকে জাগিয়ে দেয়—সে বাক্ বহন করে শব্দরূপী ব্রহ্মের অমৃত স্পর্শ। সার্থক বাক্ হচ্ছে মন্ত্রের মত—তা মন্ত্রই, উচ্চারণ করা মাত্রই তা আমাদের ঘুমন্ত প্রাণের ওপর জীবন-কাঠি ছুঁইয়ে দেয়।

দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লব দুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান,—সেইমত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত-উচ্ছাস,
আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস?

সার্থক বাক্ শক্তি রাখে এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের—অনন্ত আভাস দেওয়ার। বাল্মীকি ছন্দ দিয়ে মানুষের বাক্যের এই ত্রুটি শোধরাবার প্রস্তাব করেছিলেন এখানে, কিন্তু তা ছাড়া যে সেটা অসম্ভব হত এমন নয়। বিশ্বসত্তার তো একটা ছন্দ আছে, সে ছন্দে ধরা থাকলে আদিকবি-আবিষ্কৃত অনুষ্টুভের বন্ধন না মেনেও বাক্ প্রত্যক্ষ প্রকাশ লাভ করতে পারত। মোট কথা, সত্তার গভীর থেকে বিচ্ছুরিত বাক্ স্বয়ংই অর্থময়—তার অর্থ খোঁজা একান্তই বিড়ম্বনা।

কালিদাস বলেছেন, বাক্ আর অর্থের সম্পর্ক হচ্ছে হরপার্বতীর সম্পর্ক—দু'য়ে এক, একে দুই। সার্থক বাকে ধ্বনিই অর্থ হয়ে ফোটে, ধ্বনি আর অর্থের মধ্যে কোনো ছেদরেখা টানা সেখানে মোটেই সম্ভব নয়।

এতক্ষণ বাকের যে অর্থের কথা বলা হল, সে অর্থ হচ্ছে অক্ষয়, অব্যয়। এ রকম সার্থক বাকের সার্থকতা যেন দেশ-কালের তোয়াক্কা রাখে না;—এরা হল মুক্ত, এদের অর্থের সীমা হচ্ছে সত্তার সীমা। সার্থক বাক্ হল সঙ্গীতের মত। এখানে মনে পড়ছে টলষ্টয়ের উক্তি :

There is more soul in a sound than there is in a thought. A thought is like a purse—it contains pennies, mere trifles, while a sound remains unsoiled, pure through and through.

অর্থাৎ, ধ্বনিতে আত্মা যতটা ধরা পড়ে, চিন্তায় তা পড়ে না। চিন্তা হচ্ছে টাকার থলির মত। ওতে থাকে তামার পয়সা—অতি তুচ্ছ জিনিষ সে সব। আর ধ্বনি হচ্ছে একেবারে খাঁটি জিনিষ—কোনো মলিনতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সার্থক বাক্ও ধ্বনিই; তার অর্থকে, ব্যঞ্জনাকে চিন্তায় ধরা যায় না, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

একথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, আমরা এ প্রবন্ধে যে বাকের কথা বলছি তা চিরদিনই অত্যন্ত বিরল। কোনো ভাষাতেই—কোনো সাহিত্যেই তা ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায় না, যদিচ সব ভাষাতেই সব

সোমনাথ পত্তন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বর্ব্বর করে ভাঙার গর্ব্ব সোর-সোলে হাঁকে-ডাকে।
ফোটা পারিজাত কাটে যেই কীট বীর কে বলিবে তাকে ?
পরশমণিও ভাঙে মুদ্গার,
কিন্তু তাহার কতটুকু দর ?
লক্ষ মুক্তা চূর্ণ করিয়া নোড়া সে নোড়াই থাকে।

মন্দির-ভাঙা উৎসাহী দল কোথায় অতঃপর ?
ধরার ধূলায় মিশেছে তাদেরো গর্ব্বিত পঞ্জর।
সে দেউল আজও না থাকিয়া আছে
অমরত্বের দাবী লভিয়াছে,
কোটি কোটি মনে গড়িয়া উঠিছে বৎসর বৎসর।

মত্ত ভাঙার উল্লাসে যারা তাহারা হয়েছে গত,
তোমরা গড়ার উল্লাসে মাতি গঠনেতে হও রত।
যাহা ছিল—তার চেয়েও বিশাল
গড়িতে ডেকেছে আজ মহাকাল,
কর হে জগৎ-শিল্পী চরণে সম্ভ্রমে মাথা নত।

আজ ঈশানের বিষাণে উঠেছে নব উত্থান ডাক,
কাল-সাগরের বক্ষ হইতে মাথা তোলে মৈনাক।
ভাঙা প্রস্তর-কণিকার মাঝ—
'জাগৃহি' বর জাগিতেছে আজ,
করেছে ভক্ত রূপকারগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ।

নিহত অযুত পাণ্ডা পূজারী টহলী দৌবারিক,
মৃত্যুঞ্জয়, সারা ভারতের লভুক আরত্রিক।
মাগে হিন্দুর দেহ-প্রাণ-মন,
মন্দির তব পুনরাগমন,
আলোকে, বাদ্যে, স্তোত্রে, মন্ত্রে মুখরিত হোক দিক্।

বসি মহাকাল কি ভাঙি কি গড়ে মোরা কি বুঝিতে পারি ?
গড়ে বিচূর্ণ গ্রহ তারা দিয়ে সাগর দ্বীপের সারি।
দর্পী পরশু, কুটিল কুঠার,
হয় যে ত্রিশূল শিবের মুঠার,
কাল মুদ্গর কল্কির হাতে হয়ে উঠে তরবারি।

দেশেই বাক্ থাকা সম্ভব। মানবাত্মা যেখানেই আছে সেখানেই তার চরম ধ্বনিরূপ প্রকাশ হয়েছে, এ রকম মনে করলে কিছু অন্যায় হয় না। অবশ্য কম-বেশি আছে। তবে, নিছক বাক্—মন্ত্রসম বাক্—খুব কমই উচ্চারিত হয়, তার বেশি হবার কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ, বাকের ব্যঞ্জনা হচ্ছে আকাশের মত, সত্তা যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তার কাছে তা ততটুকু।

বাক্ সম্বন্ধে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত। বাক্ হচ্ছে ধ্বনি, যা আমাদের সত্তাকে জাগিয়ে দেয়—তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে সক্রিয়। তা প্রাণবন্ত, তার নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—যার মুখ থেকে উচ্চারিত হল তার কোনো লক্ষণ সে বহন করে না। সমগ্র সত্তা থেকে উদ্ভূত বলে, তার ক্রিয়াও সমগ্র সত্তার উপর, কেবল মনের উপর নয়। অবশ্য শুধু মনকে নাড়া দেয়, এমন বাক্য আছে প্রচুর; অন্য কত রকমের বাক্যও আছে, কিন্তু সে সব বাক্ নয়—আমরা যাকে সার্থক বাক্ বলছি তা নয়।

কথাটা হচ্ছে, সমগ্র সত্তার ভাষাতেই শুধু সমগ্র সত্তাকে জাগান যায়—মনের ভাষাতে নয়। অবশ্য মনের নিজের বলতে কোনো ভাষা নাই—সত্তার ভাষার প্রতিধ্বনি দিয়ে তা তৈরী। ভাষার জন্ম মনে কি আর কোথাও সে প্রসঙ্গ এখানে না তুলে বলা যেতে পারে; বাক্ হচ্ছে সেই ভাষা যাতে মনের কোনো ছোপ পড়ে না। প্রতিদিনের ভাষাকে ঘষামাজা করে উজ্জ্বল করে নিয়ে বাক্ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—সমগ্র সত্তা থেকে তা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসারিত হয়। বাক্ হচ্ছে informed by the overmind—অতিমানসের সৃষ্টি।

(নেতাজী.)　　　(নেতাজী)

জার্ম্মাণীতে নেতাজী বসুর জন্মদিনে প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনায় (উপরে)
আই, এন, এ'র কুচকাওয়াজ প্রদর্শন। (তলায় প্রীতি-ভোজ।

(নেতাজী)　　　—বসুমতী
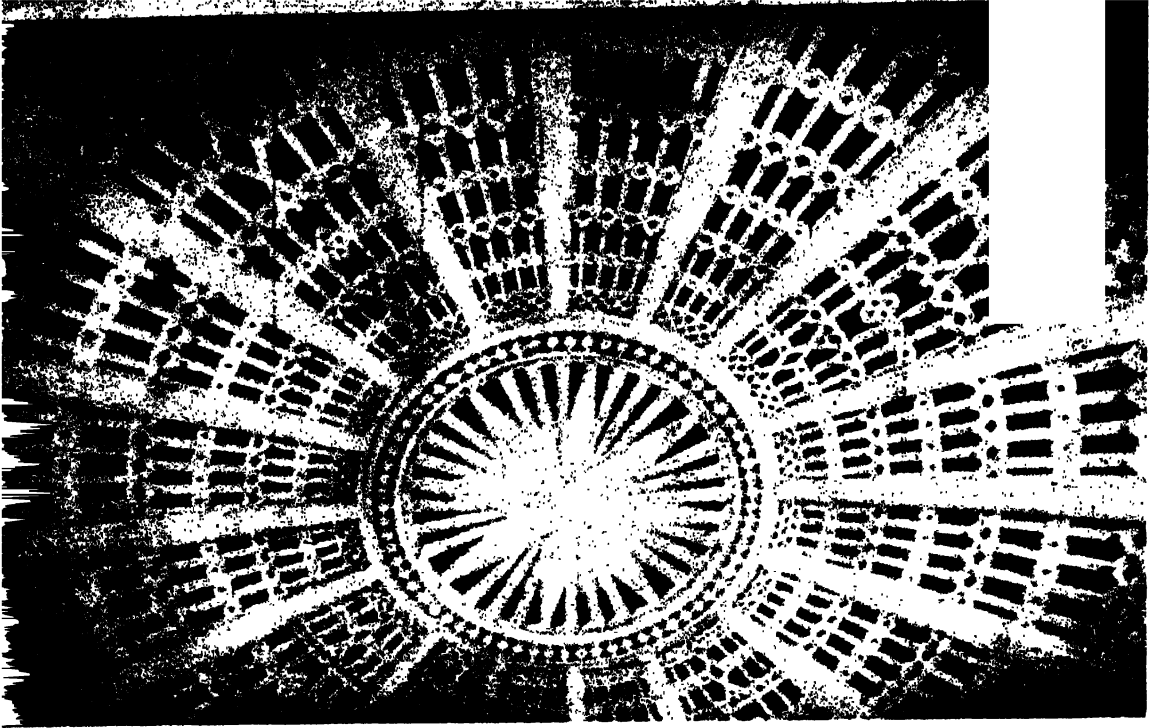
বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদ ভবনের গম্বুজের ভিতরের মাথা

—সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(প্রথম পুরস্কার)

বাঙলার —'র আসল মাথা

(রাজাজী ও পণ্ডিতজী)

হংসুলীবাকের উপকথা (তৃতীয় পুরস্কার) —অসিত সেন

—তারাদাস চট্টোপাধ্যায়

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আঁ মরণ !　　(দ্বিতীয় পুরস্কার)　　—ননী পাল

—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

অবলা —ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আলোকচিত্র সম্বন্ধে: আমাদের বাঙলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন বাঙলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি যাতে মাসিক বসুমতীর মত আলোকচিত্রের দেখা মিলেছে। বসুমতীই একমাত্র আমাদের চোখের সামনে হাজির করে দিয়েছে আমাদের দেশের সমাজের নানান দিক্-বিদিক্—পরশমণির মত যার অনুসন্ধানে হাতড়ে ফিরলেও সহজে তা ধরা পড়বে না চোখে। কিন্তু আমাদের দেশের এই কাগজ, কালি আর ছাপা-বিভ্রাটের দুর্য্যোগ বহন করেও একমাত্র মাসিক বসুমতীই বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের মুখের কাছে এগিয়ে দিয়েছে বাঙলা দেশকে। লাফ করবেন, চেটে খাওয়ার জন্য নয়, চোখ তুলে যাতে আপনারা যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করেন। 'সত্যিই,' মাসিক বসুমতীর পাঠক-সম্প্রদায় (এবং পাঠিকারা) এ বিষয়ে আমাদের যে উৎসাহ ও সহযোগিতায় কৃতার্থ করেছেন তা আর ভাষায় প্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই। প্রতি মাসেই আমরা সকলেই তার নমুনা দেখছি স্বচক্ষে।

আমাদের এই অভিনব প্রচেষ্টায় আমরা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাই। যেগুলি আপনাদের স্মরণীয় কর্তব্য।

যথা:—

১। এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিই ছবি হয়। অর্থাৎ এমন ছবি আমাদের দপ্তরে আসে যা চোখের পক্ষেই পীড়াদায়ক। দেখলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়। তাই আমরা জানাই, এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিকার ছবি হয়। তা দেখে যেন সকলের চোখ ও মন পরিতৃপ্ত হয়—এই কথা।

২। ছবি পাঠাবার সময় ছবির পিছনে যদি আপনার নাম না দেন তা হ'লে আর কথাই নেই। আপনার ছবি অনাথ শিশুর মত আমাদের 'বিবেচনাধীন' ফাইলে পড়ে অরণ্য-রোদন করতে থাকবে। তার পর

দুহিতা —রবীন্দ্রনাথ মিত্র

একটি ছবি সত্যিই ভাল লাগে সেগুলি অজ্ঞাতনামা নাম দিয়ে এক দিন প্রকাশ করে দেব।

এই ছবির পিছনে নাম না থাকার একমাত্র প্রতিকার হিসাবে স্থির করেছি যে, এই অজ্ঞাতনামাদের নাম আমরা প্রকাশ করতে চাই। ছবি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনি উক্ত দলের এক জন হয়েছেন দেখেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাদের জানালেই আমরা এর প্রতিকার করব।

৩। ৬"×৮" ইঞ্চি মাপের ছবি পাঠালে আমাদের সুবিধা হয়।

৪। ছবিতে যেন কোন নাম না থাকে, অর্থাৎ ছবির নাম আমরাই দিয়ে থাকি। অবশ্য, কোন বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীদের নাম হলে নিশ্চয়ই জানাবেন।

৫। প্রকৃতি ও সমাজের সাম্প্রতিক বিষয়ের ছবি হলে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে ছবি ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে তা যেন আর পাঠাবেন না। আলোকচিত্র সম্বন্ধে ভাল রচনা সাদরে গৃহীত হবে। এই বিষয়ে আমরা আমাদের দেশের আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান বা 'ক্লাব' যাদের আছে তাঁদের সহযোগিতা চাই।

অবশেষে —মণিকান্ত গুহ

শেষ সংবাদ

অমলা দেবী

২

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া জাপান বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে হানা দিল। সারা দেশে সৈন্য-সংগ্রহের ধুম পড়িয়া গেল। এই সময়ে দারোগা বাবু এক দিন লিখিয়া পাঠাইলেন, রায় সাহেব সৈন্য-সংগ্রহের জন্য গ্রামে বক্তৃতা করিতে আসিবেন। স্কুলের হলে যেন সভার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়। এ জেলায় সৈন্য সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন রায় সাহেব। গত যুদ্ধেও এ কাযটি করিয়াছিলেন। মাসে মাসে মোটা মাহিনা পাইয়াছিলেন, তা ছাড়া পুরস্কার-স্বরূপ রায় সাহেব খেতাব পাইয়াছিলেন। এবারেও করিতেছেন। বেতন কিছু পান কি না জানি না। বংশীধরের নামে কনট্রাক্টারীতে যাহা পাইতেছেন, তাহাতে বেতনের দরকারও নাই তাঁহার। এবারে পুরস্কার-স্বরূপ 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইলেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন রায় সাহেব এস-ডি-ও সাহেবকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে আসিলেন। দিন দুই আগে ঢোল-শহরত করিয়া গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে সকলকে মিটিংএ যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রায় শ'খানেক লোক আসিয়া জমায়েত হইল; অধিকাংশই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। আমাদের অন্নদা ও বংশীধরের জন কয়েক কর্ম্মচারী ছাড়া যুবক কেহ আসিল না। রায় সাহেব ওজস্বিনী ভাষায়, নাক-মুখ ফুলাইয়া, গলা কাঁপাইয়া, তারস্বরে বক্তৃতা করিলেন। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিবে, তাহাদের বর্ত্তমানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য, পরিধেয় ও বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য্য, আরাম ও বিরামের বাহুল্য সম্বন্ধে এমন বিশদ—বিস্তারিত বিবরণ দিলেন ও ভবিষ্যতের এমন উজ্জ্বল, রঙীন ছবি আঁকিলেন যে সকলেরই মনে হইল—মরণ ও বাঁচন যখন ভাগ্য-বিধাতা কর্ত্তৃক জন্ম-মুহূর্ত্তে নির্দ্ধারিত, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও কালে ঘটিবেই, তখন বাড়ীতে থাকিয়া নানা অভাব ও অসুবিধার কণ্টক-যাতনা সহ্য না করিয়া যুদ্ধে যোগদান করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাগ্যে শ্রোতারা অধিকাংশই বয়স্ক, সংসারে সহস্র খোঁটাতে সহস্র রকমের দড়া দাঁড় দিয়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা না হইলে রায় সাহেবের বক্তৃতার ঝঞ্ঝা সকলকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিত।

এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে দিন কয়েক আন্দোলন চলিল। বিবাহিত বেকার যুবকেরা স্ত্রীদের কাছে, বেকার বওয়াটে ছোকরারা মা-বাপের কাছে যুদ্ধে যাইবার ভয় দেখাইয়া নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে লাগিল।

অন্নদার বাড়ীতেও দিন কয়েক চুপ-চাপ গেল। অন্নদা যত রাত্রেই বাড়ী আসে, একবার ডাক দিবা মাত্র দরজা খুলিয়া দেয় বৌ। জবাবদিহি করিবার জন্য জিদ করে না। স্ত্রীর কাছে এক দিন এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেই কহিলেন—"ওদের যে ভয় দেখিয়েছেন—বৌ কিছু বললেই যুদ্ধে যাবেন। তাই, বৌ কিছু বলে না। বলে—'কিছু বলব না, দিদি, যা ইচ্ছে হয় করুক। মুখ বুজে সইতে ভগবান পাঠিয়েছেন, সয়েই যাব। যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, চোখের সামনেই থাকুক'। বৌএর বিশ্বাস—এ যাত্রা ও বাঁচবে না।"

দিন কয়েক পরে বিকালে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেই স্ত্রী কহিলেন—"আজ আবার অন্নদাদের বাড়ীতে আর এক কাণ্ড—"

প্রশ্ন করিতেই তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন ও স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছিলেন, বিশদ বর্ণনা করিলেন।

অন্নদার জ্বর হইয়াছে বলিয়া দিন দুই কাজে যায় নাই; বাড়ীতেই আছে। সকালে পাশের গ্রামের এক জন কাপড়ের দোকানদার তাগাদায় আসে। মাস খানেক আগে অন্নদা না কি তাহার দোকান হইতে একখানা দামী শাড়ী কিনিয়াছে, তাহারই দামের জন্য। অন্নদা তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া, সরাইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু কথাটা বৌএর কানে পৌঁছে; অন্নদা বাড়ী আসিতেই বৌ জিজ্ঞাসা করে—"ও লোকটা কিসের জন্যে এসেছিল গো?"

অন্নদা জবাব দেয়—"একখানা শাড়ী কেনা হয়েছিল বংশী বাবুর জন্যে, তারই দাম চাইতে এসেছিল।"

—"তোমার কাছে এল যে—?"

—"আমিই কিনে এনেছিলাম।"

—"বংশী বাবুর শাড়ী তুমি কিনতে গেলে কেন?"

—"আমাকে বলেছিলেন কিনতে—"

"—সহরে থেকে, সেখানে শাড়ী না কিনে এখানে শাড়ী কিনবার দরকার হ'ল কেন বংশী বাবুর?"

অন্নদা রাগিয়া উঠিয়া জবাব দেয়, "কি করে জানব, জিজ্ঞেসা কর গে বংশী বাবুকে।"

বৌ আর কিছু বলিল না, মা দুর্গার ফুল ছিল বাড়ীতে; আনিয়া বলিল—"ছুঁয়ে বল দেখি—বংশী বাবুর শাড়ী—"

অন্নদা ফুল ছুঁইয়া কহিল—"বংশী বাবুর শাড়ী—"

বৌ জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্যে কিনেছিলেন?"

অন্নদা কহিল—"তা' কি করে জানব?"

ব্যাপারটা এইখানেই মিটিয়া যাইত। ফ্যাসাদ করিল বুড়ী ঝির নাতনী। বুড়ী ঝি সকালে আসতে পারে নাই, তার বদলে তার নাতনী কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ব্যাপারটা দেখিতেছিল। হঠাৎ বৌ-এর চোখ পড়িল তাহার উপরে। ঝাঁঝাল গলায় কহিল—"তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস্ লা?"

মেয়েটা কহিল—"দাদা বাবুর কাণ্ড দেখে হাসছি বৌদিদি। মা দুগ্গার ফুল ছুঁয়ে মিথ্যে কথা। সাড়ী আমাদের পাড়ার সরোজিনীকে কিনে দিয়েছে দাদা বাবু। সেই শাড়ী পরেই তো ছুঁড়ি কাজে যায় আজকাল। আমার কথা পিত্যয় না হয়তো আমাদের পাড়ার সব্বাইকে জিগ্যেস কোরো—সব্বাই জানে—"

বৌ ধমক দিয়া কহিল—"বেশ করেছে। তোকে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোর কাজ হয়ে গিয়ে থাকে তো বাড়ী চলে যা।"

মেয়েটি গালে হাত দিয়া কহিল—"ও মা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? বেশ তো, যাচ্ছি; ভালর জন্যেই বলছিলাম তুমায়; এখন থেকে দাপন না করলে কাঁদতে হবেক শেষ কালে—" বলিয়া মেয়েটা চলিয়া গেল।

তার পর খুব ঝগড়া। বৌ ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া

দিল। রান্না-বান্না কিছুই করিল না। অন্নদা প্রথমে আস্ফালন করিল, তার পর যুদ্ধে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইল, শেষে অনুনয়-বিনয় করিল; বৌ কোন কথার জবাব দিল না; দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর অন্নদা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪ দিন—রাত তখন একটা। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা গভীর নিদ্রামগ্ন। আমারও তন্দ্রা আসিয়াছে। হঠাৎ মেয়েলী কণ্ঠের ডাক শুনিলাম—'দিদি, ও দিদি'—তন্দ্রা টুটিয়া গেল। আবার সেই আর্ত্ত, করুণ নারী-কণ্ঠের ডাক—'দিদি'। বুঝিলাম বৌ ডাকিতেছে। স্ত্রীকে জাগাইয়া দিলাম। তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

কহিলাম—"পাশের বাড়ীর বৌমা বোধ হয় ডাকছেন; কি বলছেন—দেখ দেখি!"

স্ত্রী জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলছ?"

বৌ কহিল—"উনি এখনও আসেননি। সেই সকালে জ্বর-গায়ে কিছু না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। কি করব দিদি?"

স্ত্রী কহিলেন—"আজ আর কি করা যাবে। সকাল হোক, কাল খোঁজ করবেন। বুড়ী এসেছে তো?"

—"হ্যাঁ, এসেছে।"

—"তা'হলে শোওগে। ভাবনার কিছু নাই। রাগ করে আসেনি হয়তো। তাঁবুতেই থেকে গেছে। কাল উনি বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আসবেন।"

পরের দিন, অন্নদাদের কাজের যায়গায় গিয়া খোঁজ করিয়া জানিলাম—অন্নদা সেখানে কাল গিয়াছিল, সারা দিন ছিল, তার পর সন্ধ্যার বাসে সহরে গিয়াছে। খুব সম্ভব, রায় সাহেবের কাছে গিয়াছে।

স্ত্রী গিয়া বৌকে খবর দিলেন। সব শুনিয়া বৌ কিছু বলিল না; ম্লান, বিষণ্ণ মুখে বসিয়া রহিল। সে দিনও রান্না-বান্না করিল না। আমার স্ত্রী, বাড়ী হইতে খাবার লইয়া গিয়া, অনেক বুঝাইয়া স্নানাহার করাইয়া আসিলেন।

বিকালে বাড়ী ফিরিয়া দোতলার জানালা হইতে দেখিলাম—বৌ শোবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুখে বিষাদের গাঢ় ছায়া; অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাব; চোখে শূন্যদৃষ্টি। কি ভাবিতেছে সে? অতীত সুখ-সৌভাগ্যের কথা? যে সুখ, যে সৌভাগ্য স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেছে; হাউইএর মত ঊর্দ্ধে উঠিয়া, বিচিত্র রংএর ফুলঝুরি কাটিয়া নিমেষের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়াছে। হয়তো ভাবিতেছে স্বামীর ভালবাসার কথা। যে ভালবাসা পার্ব্বত্য নদীর ঢলের মত প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে দুই কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেছে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা অবোধ মেয়ে—ভাগ্য ও ভালবাসা দুই-ই যে ভঙ্গুর—জানে না। জানিলে হয়তো দুঃখ কম পাইত।

সে-দিন শনিবার। সন্ধ্যার বাসে অভয় আসিল। অভয় আমাদের গ্রামের ছেলে; কালেক্টরীতে কাজ করে; সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক বাস করে। সম্প্রতি তাহার স্ত্রী বাড়ীতে আছে। সেই জন্য রবিবারের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

অভয় আমার সহিত দেখা করিয়া জানাইল—অন্নদা যুদ্ধে নাম লিখাইয়াছে—রায় সাহেবের প্ররোচনায় সম্ভবতঃ। কিন্তু নাম লিখাইবার পরেই তাহার চোখ ফুটিয়াছে। এখন ছাড়ান পাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। রায় সাহেবকে ধরিয়াছিল; তিনি হাঁকাইয়া দিয়াছেন। অন্নদার বিশ্বাস—রায় সাহেব চেষ্টা করিলেই তাহার নাম কাটাইয়া দিতে পারেন। অন্নদার স্ত্রী যদি রায় সাহেবের কাছে গিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার মন গলাইতে পারে তাহা হইলে হয়তো সুরাহা হইবে।

স্ত্রীকে সব পরিচয় দিতেই তিনি গালে হাত দিয়া বলিলেন—"ও মা, তাই না কি! ছুঁড়ীটা তো মরে যাবে তা' হলে! ও-বেলায় কত কষ্টে দুটি ভাত মুখে করিয়েছি ও খবর পেলে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"এখনও উপায় আছে—বুঝিয়ে বোলো। সহরে গিয়ে রায় সাহেবকে ধরাধরি করতে পারলে ছেড়ে দিতে পারে।"

স্ত্রী কহিলেন—"ওর কি এ অবস্থায় যাওয়া চলবে?"

—"খুব চলবে। কাল তো বাস্ নাই গরুর গাড়ী করে ষ্টেশনে যেতে হবে, তার পরে রেল গাড়ী—সেখানে রিক্সা। এমন কিছু ধকল হবে না।"

—"ফিরবে কখন্?"

—"যদি ছাড়িয়ে আনতে পারি তো কালই। গরুর গাড়ীটাকে ষ্টেশনে থাকতে বলে যাব।"

পরদিন বৌকে লইয়া সহরে পৌঁছিলাম। রায় সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। চাকরের কাছে শুনিলাম, রায় সাহেব দিবানিদ্রায় নিমগ্ন। বসিবার ঘরে দুই জনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৌ দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া চৌকীর এক পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল।

স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছিলাম—খবরটা শুনিয়া বৌ পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়াছিল, তার পর বলিয়াছিল—'আমি জানতাম, দিদি! মন আমার সারাদিন ঐ কথাই বলছিল।' তার পর কতক্ষণ শুষ্ক, বিহ্বল চক্ষে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—'যা' বলে গেল তাই করল, দিদি, একবার আমার কথা ভাবল না! এতটুকু মায়া হ'ল না আমার উপরে? পুরুষ মানুষ এত শীগ্‌গির ভুলতে পারে তা' কোন দিন ভাবিনি, দিদি!' সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চোখ হইতে ঝরিয়াছিল অশ্রুধারা।

রাস্তায় বৌ কাঁদে নাই। গরুর গাড়ীতে এক পাশে চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া স্থির ভাবে বসিয়াছিল। ট্রেনেও তাই। মাঝে মাঝে পিপাসা হইয়াছে কি না, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়াছিল।

বেলা ছয়টার পর রায় সাহেব বাহির হইলেন। পরিধানে বাহিরে যাইবার পোষাক, হাতে লাঠি। আমাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"তুমি! কি ব্যাপার? কতক্ষণ এসেছ?"

কহিলাম—"চাকরটাকে খবর দিতে বলেছিলাম, দেয়নি?"

রায় সাহেব ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"হ্যাঁ—দিয়েছিল বটে! তো ভাবলাম, কোন মক্কেল বোধ হয়—" হঠাৎ অন্নদার বৌএর দিকে তাকাইয়া, গভীর বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"উনি?"

কহিলাম—"অন্নদার বৌ—"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া রায় সাহেব কহিলেন—"অন্নদার খবর পেয়ে এসেছেন বুঝি? খবর পেল কি করে?"

কহিলাম—"অভয় গিয়ে বলেছে।"

রায় সাহেব সঙ্কোচে বলিলেন—"আমি অনেক নিষেধ করে-ছিলাম; কিছুতেই শুনলে না; নিজে গিয়ে নাম লিখিয়ে এল; কি করব বল?" তার পর স্বাভাবিক গলায় বলিতে লাগিলেন—"বলে—বাড়ীতে বসে বসে ঐ সামান্য চাকুরী করতে ভাল লাগে না। তা' কথাটা তো মিথ্যে নয়। এত টাকা রোজগার করেছে মাসে মাসে ওর কি আর ও-চাকরী ভাল লাগে? কিন্তু কি করা যাবে? ভাগ্য! অথচ আমাদের বংশী—"

বাধা দিয়া কহিলাম—"অন্নু বলছিল, অন্নদা নাম লেখাবার পরেই মত বদলেছে। নাম কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।"

রায় সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"পাগল আর কাকে বলে? ছেলেখেলা পেয়েছে না কি? মামা-বাড়ীর আবদার?" গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"জেল হয়ে যাবে। মিলিটারীর ব্যাপার জান তো?"

কহিলাম—"বৌমার তো এই অবস্থা। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আর কেউ নাই। যদি বুঝিয়ে বলা যায়—"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রায় সাহেব কহিলেন—"কিছুতেই কিছু হবে না। ওদের সৈন্য চাই—কার বাড়ীতে কি অবস্থা দেখতে গেলে ওদের চলবে না। তা' ছাড়া—দরকারই বা কি? বাড়ীতে তো শুনি বেলেল্লা গিরি করে বেড়াচ্ছে। তার চেয়ে দিন কতক বিদেশে গিয়ে, সেখানে কড়া শাসনে থেকে, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারে তো মন্দ কি? রাজার হালে থাবে, পরবে, মোটা মাইনে পাবে; যুদ্ধের পরে ভাল চাকরী পাবে। যা' ওর বিদ্যে, বাড়ীতে বসে কি-ই বা রোজগার করবে ও? খাওয়া-পরা চালানোই তো দুষ্কর হবে। আর, বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নাই বলছ, বাড়ীতে বৌমার থাকবারই বা দরকার কি? বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকলেই পারেন তারা তো নিয়ে যাবার জন্যে সাধা-সাধনা করছে শুনতে পাই।"

বৌ ধীরে ধীরে উঠিয়া, আগাইয়া আসিয়া, রায় সাহেবের পায়ের কাছে বসিয়া, স্পষ্ট গলায় বলিল—ওঁকে ফিরিয়ে আনুন দয়া করে—"

রায় সাহেব কহিলেন—"আমি কি করব, মা! আমার কোন হাত নাই। ও-সব যুদ্ধের ব্যাপার। বড় বড় সাহেবরা কর্ত্তা। তাদের সঙ্গে আমাদের মত লোকের কথা বলাই দায়। বললেও রাখবে না। উল্টে সৈন্য-সংগ্রহে বাধা দিচ্ছি বলে আমার জেল হয়ে যাবে—"

বৌ করুণ কণ্ঠে কহিল—"আপনার কথা শুনবে। আপনি বলুন একবার; আমার মুখ চেয়েও বলুন—"

রায় সাহেব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আজ সন্ধ্যায় একটা সভা হচ্ছে। তাতে সৈন্যদের সম্বর্দ্ধনা করা হবে। আমার নেমন্তন্ন আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মিলিটারী সাহেবরা সব আসবেন। আমি একবার বলে দেখব। তবে ভরসা কিছু কোরো না, মা! হবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। তবে যাবার আগে অন্নদা তোমার সঙ্গে যাতে একবার দেখা করে যেতে পারে—তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

আমাকে সভা-স্থান সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়া কহিলেন—"ন'টা-সাড়ে ন'টার সময়ে বৌমাকে নিয়ে সামনে অপেক্ষা কোরো"—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাকে এক কাপ চা'-ও খাইতে বলিলেন না। তাহাতে অবশ্য দুঃখ নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—অন্নদার অতি-নিকট আত্মীয় ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও, তাহার স্ত্রীকে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজের বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ পর্য্যন্ত করিলেন না। বাধ্য হইয়া আমার এক ছাত্র-জীবনের বন্ধুর বাড়ীতে বৌকে লইয়া গেলাম।

যথাসময়ে সভা-গৃহের সামনে হাজির হইলাম। গৃহের অভ্যন্তর বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। সহরের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা জেলার বীর যুবকদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। সভা-গৃহের সামনে রাস্তায় সারি-সারি মোটর গাড়ী, রিক্সা ও দুইটা মিলিটারী লরী দাঁড়াইয়া আছে। এখানে-সেখানে অনেক লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সভা-গৃহে বক্তৃতা চলিতেছে শুনিতে পাইলাম।

রাস্তা হইতে একটু দূরে একটা গাছের নীচে স্বল্প অন্ধকারে বৌকে দাঁড়াইতে বলিয়া সভা-গৃহের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উর্দ্দি-পরা খানসামারা একটা পাশের ঘর হইতে পরাতে করিয়া নানা খাদ্য-দ্রব্য লইয়া যাইতেছে। বুঝিলাম, বক্তৃতার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও চলিতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। একের পর এক বক্তৃতা চলিতে লাগিল, বক্তৃতান্তে হাত-তালির শব্দ। দু'-চারিটা গান হইল—বাঙ্গালীর অতীত বীরত্ব-কাহিনী-সম্বলিত উদ্দীপক গান। কে এক জন 'ক্যারিকেচার' করিল, হাসির কলরোল উঠিল সভা-গৃহের মধ্যে। সৈন্যদের পক্ষ হইতে এক জন সাহেব ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া এই বিদায়-সভার আয়োজনের জন্য সহরবাসীদের ধন্যবাদ দিলেন। তার পরই সভাভঙ্গ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জন দুই মিলিটারী সাহেব, তাহাদের পিছনে সাহেবী পোষাক-পরা দেশী হাকিম, ডাক্তার ও উকীলরা, লম্বা কোট ও মাথায় পাগড়ী-বাঁধা মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররা, অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকরা সভা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকলের মুখেই পরিতৃপ্তির প্রসন্ন হাসি। সভাটা 'সাকসেস' হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়াটাও বেশ হইয়াছে। তা'ছাড়া, সরকার বাহাদুরের কাছে জেলার মান-রক্ষা হইয়াছে। দেখিলাম—সামনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মিলিটারী সাহেবদের পাশে আসিতে-আসিতে রায় সাহেব বিনয়-বিগলিত হাসিতে মুখ বিস্ফারিত করিয়া, হাত কচলাইতে কচলাইতে আলাপ করিতেছেন। মিলিটারী সাহেব দুই জনও কৃপা-কটাক্ষে তাকাইয়া রায় সাহেবের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলিতেছেন। হয়তো এতগুলি বলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য রায় সাহেবকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিতেছেন। পরম আত্মপ্রসাদে রায় সাহেব আত্মহারা হইয়া উঠিতেছেন।

সকলে ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমি রায় সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কতকটা আগাইয়া গেলাম। হঠাৎ আমার উপরে দৃষ্টি পড়িল রায় সাহেবের, চকিতে মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন—"অনুমতি হয়েছে। অন্নদা আসছে, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখা করিয়ে দাও—" বলিয়া মুখে আবার হাসি ফুটাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিলিটারী সাহেবদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

নব-সংগৃহীত সৈন্যেরা সকলেই পাড়াগাঁয়ের যুবক। পরিধানে—খাকী হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-হাতা শার্ট, পায়ে মোজা ও ভারী বুট-জুতা। এ রকম পোষাকে অনভ্যস্ত সকলেই। চাল-চলনে অস্বাচ্ছন্দ্যতা ও আড়ষ্টতা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দুই-চারি জন খোঁড়াইতে সুরু করিয়াছে। অধিকাংশ লোকের মুখের ভাব ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ। ভাল-ভাল কথা শুনাইয়া, ভাল-ভাল খাবার খাওয়াইয়া, হাত-তালি দিয়া

ও পিঠ চাপড়াইয়া, কর্তৃপক্ষ ও সহরের লোক যে সাময়িক উত্তেজনা ও উৎসাহের দীপ্তি তাহাদের ফুটাইয়াছিল, তাহা অচিরে মিলাইয়া গিয়া অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ও প্রিয়জন-বিচ্ছেদের বেদনা তাহাদের মুখে গাঢ় ছায়া ফেলিয়াছে।

অনেক পিছনে অন্নদা আসিতেছে। চাল-চলনে আড়ষ্টতা নাই। কিন্তু মুখে ব্যাকুল-চকিত চাহনি। যেন কাহারও আসার প্রতীক্ষা করিতেছে। পিছনে গিয়া হাত ধরিতেই চমকিয়া আমার দিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এসেছেন! রায় সাহেবকে দিয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারলেন?"

এক পাশে ডাকিয়া আনিয়া কহিলাম—"রায় সাহেবকে বললাম অনেক করে; বললেন—হবে না কিছুতেই। না গেলে জেল হয়ে যেতে পারে—"

মুখ আঁধার করিয়া গভীর হতাশার সহিত কহিল—"হয়নি তা'হলে! জানতাম—তবু ভেবেছিলাম যদি—"

কহিলাম "বৌমাও বললেন অনেক করে—"

চমকিয়া কহিল—"এসেছে না কি? কোথায়?"

কহিলাম—"ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন; চল না।"

অন্নদা সাগ্রহে কহিল—"যেতে দেবে আমাকে?"

কহিলাম—"হ্যাঁ, রায় সাহেব বললেন, অনুমতি হয়েছে—"

—"চলুন তা হলে—"

আমি হাত বাড়াইয়া কহিলাম—"ঐ গাছটার নীচে যাও—"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, রায় সাহেব হন্তদন্ত হইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন—"অন্নদা কই?"

কহিলাম—"ঐ যে। দেখা করতে গেছে।"

—"কতক্ষণ গেছে?"

—"এই মাত্র।"

—"বেশীক্ষণ নয়, মাত্র পাঁচ মিনিট। তা'ও অনেক কষ্টে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিয়ে ওদের সাহেবকে বলিয়ে ব্যবস্থা করা গেছে। তুমি গিয়ে তাড়া দাও দেখি—"

কহিলাম—"এই তো গেল—"

কড়া-গলায় রায় সাহেব কহিলেন—"তা' যাক্, তাড়া দাও গে। মন-প্রাণ উজাড় করে কথা বলবার সময় নাই। তা'ছাড়া, এই সুযোগে সট্‌কে পড়ে তো মুস্কিল—"

ধীরে ধীরে গাছটার দিকে চললাম। দেখিতে পাইলাম—বৌ অন্নদার পায়ের কাছে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে; অন্নদারও চোখ হইতে জল পড়িতেছে। দুইটি হৃদয়ের সংযোগ-প্রণালীর মধ্যে যে আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিয়াছিল, চোখের জলে তাহা বোধ করি ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে।

রায় সাহেব হাঁক দিলেন—"অন্নদা, এস, এস, আর সময় নাই।"

অন্নদা চলিয়া আসিল। আমার কাছে আসিয়া, আমার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে কহিল—"দাদা, চললাম। যদি বেঁচে ফিরতে পারি, আবার দেখা হবে। ও একা রৈল, দয়া করে খোঁজ-খবর করবেন—" বলিয়া রুমালে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

মিলিটারী লরী দুইটিতে চড়িয়া সৈন্যরা চলিয়া গেল। মিলিটারী সাহেবরা গেলেন মোটরে। যাবার আগে আর একবার রায় সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। চরিতার্থতায় রায় সাহেবের মুখ চক্‌চকে হইয়া উঠিল। তার পর আমার কাছে আসিয়া কহিলেন—"বৌমাকে নিয়ে আজই যাচ্ছ তো? তা' হলে আর দেরী কোরো না। এগারোটার ট্রেণ। বৌমাকে বুঝিয়ে দিও—ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখলে তো, কত ছোকরা গেল। কত স্ফূর্ত্তি! হবে না কেন? রাজার হালে খাওয়া-পরা, মোটা মাইনে—আখেরে সরকারী বড় চাকরী। বয়স থাকলে আমিই চলে যেতাম। আচ্ছা, আসি আমি; কাল আবার কোর্ট তো; কাজ পড়ে আছে অনেক—" বলিয়া পা চালাইয়া চলিয়া গেলেন।

বৌমাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাস্তায় কান্না-কাটি করে নাই। সেই আগের মত স্তব্ধ ভাব। গাড়ীতে জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির বসিয়া রহিল সারাক্ষণ।

৩

মাস কয়েক পরে বৌ একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। শিশুটি অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। এ কয় মাস বৌ খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অত্যন্ত অযত্ন করিয়াছে। কাজেই শিশুটি পুষ্টিলাভ করে নাই। প্রসবের সময়ে বৌ-এর বাপের বাড়ীর কেহ আসে নাই। তাহার মা নাই; বাবা অসুখে শয্যাগত। কাজেই যাহা কিছু কর্ত্তব্য, করিয়াছেন আমার স্ত্রী, আর বুড়ী ঝি। অন্নদার যাওয়ার পর হইতেই বুড়ী ঝি একেবারে বৌএর অভিভাবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌ সংসার সম্বন্ধে যত উদাসীন হইয়া উঠিতেছে, সে-ও সেই মাত্রায় সজাগ ও সতর্ক-দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। শিশুটির লালন-পালনের ভারও নিজের হাতে লইয়াছে এবং বৌকে তাগিদ দিয়া-দিয়া মাতার কর্ত্তব্য করাইয়া লইতেছে।

অন্নদার চিঠি আসে মাঝে মাঝে। টাকা আসে মাঝে মাঝে রায় সাহেবের ঠিকানায়। রায় সাহেব প্রাপ্য সুদ কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা বৌ-এর কাছে পাঠাইয়া দেন। সংসার কোন মতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বৌ-এর মনে সুখ নাই—সংসারে নিষ্ঠা নাই। যন্ত্রের মত সংসারের কাজ করিয়া যায়। কাজ না থাকিলে শোবার ঘরে চুপ-চাপ বসিয়া কি ভাবে। অন্নদার যাওয়ার দিন হইতে যে অন্ধকার তাহার মনের দিগন্তে নামিয়াছে, তাহারই মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে দেখিবার চেষ্টা করে হয়তো।

রায় সাহেব মাঝে মাঝে গ্রামে আসেন। বৌ-এর খোঁজ-খবর নেন। এখানে না থাকিয়া বাপের বাড়ী যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ পরামর্শ দেন। একটা অসমর্থ বুড়ি ঝিএর উপর নির্ভর করিয়া, একলা এত বড় বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয়। বুড়ো-ঝিটার চোখের দৃষ্টি নাই, রাত্রে হয়তো ঘুমে অসাড় হইয়া থাকে সারা রাত। এই অবস্থায় ঐ সমর্থ বয়সের মেয়ের একলা ঐ বাড়ীতে কি বিপদ না হইতে পারে? কোন দুষ্ট লোক রাত্রে বাড়ী ঢুকিয়া অত্যাচার করিতে পারে। কিংবা, পাড়ারই কোন ভদ্রলোক সদিচ্ছার ভাণ করিয়া কোন রকমে মেয়েটার বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া পথে বসাইতে পারে। অতএব অন্নদার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তাঁহার মত যে, এখন বাপের বাড়ীতে বাবার তত্ত্বাবধানে বৌ-এর বাস করাই সঙ্গত ও নিরাপদ।

বৌ কোন কথায় কাণ দেয় না।

মাস কয়েক পরে রায় সাহেব গ্রামে আসিয়া পাড়ার মাতব্বরদের নিজের বৈঠকখানায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমিও সঙ্গ লইলাম। পরম আপ্যায়ন সহকারে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন রায় সাহেব। তার পর চা ও খাবার আসিল প্রত্যেকের জন্য। খাওয়া শেষ হইলে প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া দামী সিগারেট দিলেন। সকলে যখন মৌজ করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন—রায় সাহেব নানা কথার পর আসল কথাটি পাড়িলেন।

তাঁহার এক জন আত্মীয় হঠাৎ আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছেন। অণ্ডালের কাছে বাড়ী। মিলিটারী বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রাম ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত জমি দখল করিয়া লইতেছে। ওখানে না কি উড়ো-জাহাজ নামিবার মাঠ প্রস্তুত হইবে।

সকলে সশব্দে ঢেকুর তুলিয়া কহিল—"সর্ব্বনাশ!"

রায় সাহেব কহিলেন—"আমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন তিনি। আমার কি কর্ত্তব্য বলুন দেখি -"

সমস্বরে জবাব আসিল—"আশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

রায় সাহেব কহিলেন—"কোথায় দিই বলুন দেখি? বাড়ীতে তো এক কোঁটা যায়গা নেই। তাঁর আবার পরিবারটি বেশ বড়—"

সকলে সিগারেট টানা বন্ধ করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া উঠিল—সত্যই তো, কোথায় আশ্রয় দেওয়া যায়?

রায় সাহেবই সমস্যার সমাধানের সূত্র ধরাইয়া দিলেন; কহিলেন—"আপনারা বোধ হয় জানেন, অন্নদার বাড়ীটা আমার কাছে বন্ধক আছে। যে টাকা অন্নদা আমার কাছে নিয়েছে, তার তুলনায় ও-বাড়ীর মূল্য কিছুই নয়। শুধু অন্নদাকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে এতগুলো টাকা এক রকম জলে ফেলে দিতে হয়েছে। কারণ, অন্নদা কোন দিনও দেনা শোধ করতে পারবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত ঐ বাড়ী নিয়েই আমাকে দেনা খালাস করে দিতে হবে।"

রায় সাহেবের মহানুভবতায় সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল।

রায় সাহেব বলিলেন—"এখন অন্নদার বৌ যদি বাড়ীটা ছেড়ে দেয়, তা'হলে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয়ের থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

সকলেই প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিল।

রায় সাহেব কহিলেন—"তবে আমার তো সরাসরি এ কথা বলা চলে না; আপনারা সবাই মিলে বুঝিয়ে যদি বৌটিকে রাজী করাতে পারেন—"

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়াছিলাম। এক কাপ চা মাত্র খাইয়াছি; খাবার খাই নাই, সিগারেটও খাই নাই; কাজেই বেপরোয়া ভাবেই কহিলাম—"বৌমা যাবেন কোথায়?"

জবাব দিলেন পাড়ার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর গাঙ্গুলী; সজোরে সিগারেটে টান দিয়া, এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, কাশিতে কাশিতে নাকি-গলায় কহিলেন—"বাপের বাড়ী যাবে—আর কোথায় যাবে?"

আর এক জন কহিলেন—"মেয়েদের যাবার আর যায়গা কোথায়? স্বামীর অবর্ত্তমানে বাপই তো অভিভাবক—"

আর এক জন কহিলেন—এখানে পড়ে থাকবার দরকারই বা কি? কিসের টান কে জানে?" বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আর এক জন কহিলেন—"ঐখানেই তো থাকতে হবে চিরদিন। অন্নদা যেখানে গেছে, সেখান থেকে তো আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না; কি বলুন দাদা—" বলিয়া রায় সাহেবের দিকে তাকাইলেন।

রায় সাহেব কোন কথা বলিলেন না; কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আপনারা তা'হলে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেখুন। না রাজী হলে, আমাকে বাধ্য হয়ে আদালতের সাহায্য নিতে হবে, সে কথাটাও জানিয়ে দেবেন -"

সকলে সমর্থন করিয়া কহিল—"নিশ্চয়! তা' নিতে হবে বৈ কি! টাকা তো ফেলনা নয় কারও। অতগুলো টাকা—"

পরদিন বেলা দশটার সময়ে অন্নদার বাড়ীতে হঠাৎ চেঁচামেচি আরম্ভ হইল। জানালা খুলিয়া দেখিলাম—বৌ বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে—কোলে ছেলে। উঠানে দাঁড়াইয়া ক্ষেন্তি পিসি আর অঘোর ঠাকুমা। দু'জনেরই স্নানাহ্নিক সমাপ্ত, কপালে তিলক—হাতে হরিনামের ঝুলি। সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন দু'জনে। সামনে দাঁড়াইয়া বুড়ি ঝি হাতের ঝাঁটা আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর গাঙ্গুলী এবং পাড়ার অন্যান্য মাতব্বরেরা।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। সকলে সদলবলে বৌকে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন। ক্ষেন্তি পিসি ও অঘোর ঠাকুমাকে তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হইয়াছে।

ঝি চীৎকার করিতেছে—"কি মনে করেছ তুমরা? ছেলে-মানুষ পেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতে চাও? এই বুড়ী মাগী বেঁচে থাকতে তা' হবেক নাই—বলে দিছি তুমাদের—"

ক্ষ্যান্ত পিসি কহিলেন—"এ্যা মর, মাগী! লাফাচ্ছিস্ কেন? ঘর কি অন্নদার আছে না কি? দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে যে—"

বুড়ী তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"বলে দিকেই হোল—বিকিয়ে গেছে। বিকিয়ে যাবেক কিসের জন্যে শুনি? এত জমি, পুকুর, বাগান গিলেও রাঘব-বোয়াল মিন্সের পেট ভরে নাই? আবার এই ঘরটুকু গিলবার জন্যে নোলা সক্‌সক্ করছে! বলে দাও গা' তুমরা, এক পা' ই ঘর থেকে নড়বেক নাই বৌ—" বলিয়া ঝাঁটাটা বাড়াইয়া কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই ক্ষেন্তি পিসি ও অঘোর ঠাকুমা রাগে, অপমানে মুখ হাঁড়ি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বুড়ী ঝি দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—"বুড়ো বুড়ো মিন্সেরা সব, তিন কাল যেয়ে এক কালে ঠেকেছে, লজ্জার মাথা খেয়েছে সব! ঘরে সোয়ামী নাই, একলা পড়ে আছে বেচারী ছেলেমানুষ! কোথায় খোঁজ-খবর কর', দুটো মিষ্টি কথা বলে ভুলান; তা নয়—ঘর থেকে তাড়াবার ফন্দী! ছিঃ ছিঃ, ভদ্দর লোকের এই রীত! মুখে আগুন সবাইকার!" হাঁকিয়া কহিল—"তবে বলে দিচ্ছি সব্বাইকে, বঁটি হাতে করে বসে থাকব দুয়োরে দিন-রাত; চৌকাঠ পেরিয়েছ কি, মুড়িয়ে নাক কেটে দিয়ে বুচো করে ছেড়ে দিব—"

ব্যাপারটা সম্প্রতি স্থগিত রহিল। রায় সাহেব আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। পোদ্দারদের একটা পোড়ো বাড়ী সম্প্রতি দেনার দায়ে দখল করিয়াছিলেন। সেটাই একটু মেরামত করাইয়া দিয়া আত্মীয়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন।

[ক্রমশঃ

পারিপার্শ্বিক

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছোট]

যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে, সুতরাং এবারের মতো প্রিয়নাথেরও কাজ শেষ হোলো। পঙ্গপালের মতো জাহাজ-বোঝাই ক'রে যারা এক দিন দলে দলে এখানে এসেছিলো আজ তারা তেমনি ভাবেই সকলে ফিরে যাবে। এখন আর যুদ্ধ নেই—সমস্ত দেশে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ঘুরে শেষের দিকে ময়মনসিং-এ তাকে কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ক্যানটীনের ব্যবস্থাপনার কাজে সে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলো; আসবার সময়ে হাত ঝাঁকিয়ে বড়ো সাহেব সে কথা আনন্দের সংগে উচ্চারণ করেছিলেন, সার্টিফিকেটেও তার সগৌরব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

যুদ্ধের আগে প্রিয়নাথ জাহাজের কাজ করতো, ছিলো টালি-ক্লার্ক, অধিকাংশ সময়েই রাত্রের ডিউটী পড়তো, কাজটার উপরে বিরক্তিও ছিলো সেই জন্যে। যুদ্ধের কাজে যখন তার ডাক এলো, তখন প্রিয়নাথ মনে ক'রেছিলো এ তার পরম সৌভাগ্যের আভাষ; দেশ-ভ্রমণের যে গভীর ইচ্ছাটা এতো দিন নীরবে মনের মধ্যে প্রসুপ্ত ছিলো এতো দিন পরে তা সার্থক হ'লো।

প্রায় সেই সময়েই অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদানের মাস আগে প্রিয়নাথ বিয়ে করে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে—সাধারণ লেখা-পড়া জানা; তার থেকে বেশী প্রিয়নাথ অবশ্য কোনো দিনই আশা করতে পারেনি। দিন কাটছিলো। প্রথম দুটো বছর কাটলো দাক্ষিণাত্যের দেশ-গুলিতে, তার পরে উত্তর-[illegible]। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতো প্রিয়নাথ, বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যেই তার একটি কন্যা লাভ হলো।

তার পরেই তাকে পাঠানো হলো বর্মায় এবং সেখান থেকেই সোজা বাংলা দেশে। এ পর্যন্ত বাংলার বহু জায়গায় ঘুরে অবশেষে সে ময়মনসিং-এ এসে বসলো এবং এইখান থেকেই তার এ-চাকরী-জীবনের সমাপ্তি।

যে কারণেই হোক, বাড়ীর সংগে প্রিয়নাথের গভীর কোনো নাড়ীর টান ছিলো না, যখন ফিরলো, তখন তাকে কলকাতায় শ্বশুর-বাড়ীতেই এসে উঠতে হ'লো।

স্ত্রী কল্যাণী আন্তরিক খুশী হলো। অনেক দিন পরে সে তার বাপের বাড়ীতে আবার ফিরতে পারলো। কথা-প্রসংগে তার মা এক দিন আভাস দিলেন যে, প্রিয়নাথ এখানে একটা নতুন চাকরী জোগাড় করতে পারলেই তাঁরা কাছাকাছি একটা বাসার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। প্রস্তাবটি যুক্তিসংগত, তাই কয়েক দিন থেকে কল্যাণী প্রিয়নাথের চাকরী হওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দিন গুণছে। প্রিয়নাথও চেষ্টা করছে খুব। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগ খুব! হঠাৎই চাকরী যোগাড় করা কঠিন ব্যাপার—সুতরাং দেরী হ'তে লাগলো।

কিন্তু কল্যাণীরই ভাগ্য বলতে হবে, মাস খানেকের মধ্যেই হঠাৎ এক কাগজ-ব্যবসায়ীর দোকানে প্রিয়নাথের চাকরী হোলো, প্রথমেই মাইনে ষাট টাকা। অবশ্য এ বাজারে এই আয় নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য, তবু প্রিয়নাথ এরই উপরে ভরসা ক'রে ভেসে পড়লো—দু'-এক দিনের মধ্যেই কাছাকাছি বকুল-বাগান অঞ্চলে তারা একটা ছোট্ট বাসায় উঠে এলো। একখানি ঘর আর ছোট্ট একটু বারান্দা। ভাড়া মাসে বারো টাকা, আর লাইটের জন্যে এক টাকা। মন্দ কি, প্রিয়নাথের ঘরখানি ভালোই লাগলো।

বাড়ীর কর্তা যিনি, তিনি কিছু দিন হোলো মারা গেছেন, সুতরাং তাঁর প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রী-ই এখন কর্ত্রী। পাঁচটি ছেলে তাঁর, একটি মাত্র মেয়ে, বয়স ষোলোর

কাছাকাছি। বড়ো ছেলেটি মিলিটারীর কাজে জব্বলপুরে প'ড়ে আছে, শোনা যাচ্ছে, শীগ্‌গিরই না কি তার ছুটি হ'য়ে যাবে।

বাড়ীর কর্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। কল্যাণীর মায়ের সংগে তাঁর দীর্ঘ কালের আলাপ। সুতরাং কল্যাণীর মায়ের পক্ষে এই দুর্দিনেও বাড়ী সংগ্রহ ক'রে দেওয়া কঠিন হয়নি—বিন্দুবাসিনীও খুব খুসী হ'লেন। বললেন, আপনার মেয়ে-জামাই এসে আমার বাড়ীতে থাকবে এ তো পরম সৌভাগ্য, অন্য লোক হ'লে আমার পক্ষে ভাড়া দেওয়া অসুবিধে হোতো—ওই তো একখানি মাত্র ঘর, আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়েই যাতায়াতের ব্যবস্থা, জানা-শোনা আর চেনা মানুষ ছাড়া এ ভাবে ঘর ভাড়া দেওয়া যায় না।

কল্যাণী ঘরটিকে দু'-এক দিনের মধ্যেই ভারী সুন্দর ক'রে গুছিয়ে ফেললে। এক পাশে জামা-কাপড়ের আলনাটা রাখলে, অন্য দিকে ট্রাংক আর ছোট-খাটো সব খুচরো জিনিষ। ওরই মধ্যে এক জায়গায় তোলা উনুনে ছোট্ট একটু রান্নার ব্যবস্থা ক'রে নিলে। বিন্দুবাসিনী আগেই ব'লেছিলেন, রান্না-ঘরের আলাদা ব্যবস্থা নেই মা। ওরই মধ্যে তুমি যদি ক'রে নিতে পারো তাহ'লেই হবে।

কল্যাণী এ কষ্টটাকে কষ্ট বলে মনেই করলো না—একে এখন ক'লকাতায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া যে কী দুর্ঘট তা যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরাই জানেন। সেই অবস্থায় সে যে এই ঘরটুকু পেয়েছে এই যথেষ্ট। আর তাছাড়া তাঁর এই বিন্দু মাসীমা সত্যিই খুব ভালো মানুষ, না হ'লে এতো সহজে আজকাল কেউ এ উপকার করে না।

কল্যাণী তার মেয়ের নাম রেখেছে শোভা। বছর চারেক বয়েস হ'য়েছে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। প্রিয়নাথ রোজই কিছু-না-কিছু নিয়ে আসে মেয়ের জন্যে। কোনো দিন বিস্কুটের টিন, কোনো দিন লজেন্সুস।

বিন্দুবাসিনীর ছোট তিনটি ছেলে ঘরের আসে-পাশে ঘুরে বেড়ায়, পরনে একটা ক'রে হাপ্‌ প্যান্ট, শুধু গা। কল্যাণী তাদের ডেকে বিস্কুট হাতে দেয়, লজেন্‌সুস্ দেয়।

অভাবের সংসার বিন্দুবাসিনীর। স্বামী যখন বেঁচেছিলেন তখন অনেক কষ্টে এই বাড়ীটুকু ক'রেছিলেন। আর একটা লাইফ-ইন্সিওর ছিলো। এই লাইফ-ইনসিওর আর বাড়ী—এই হচ্ছে বিন্দুবাসিনীর একমাত্র সংস্থান। বিদেশে বড়ো ছেলে আছে বটে, টাকাও পাঠায় কিছু, কিন্তু সেই বা আর ক' দিন, তারো তো ছুটি হবার সময় হ'য়েছে।

কষ্টে-সৃষ্টে অনেক বুঝে তবে তাঁকে এই বৃহৎ সংসারকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মেজো ছেলেটির লেখা-পড়া কিছু হোলো না। হ'তোই না—ছোট বেলা থেকেই বাজে অভদ্র কতোগুলি ছেলের সংগে মিশে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—এখন মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতেও তার আর দ্বিধা নেই। সারা দিন বাইরে বাইরেই থাকে। রাত্তিরে ১০টা নাগাত বাড়ী ফেরে, তার পরে দু'টি খেয়েই বিছানা আশ্রয় করে। কয়েক মাস হোলো লম্বা লম্বা চুল রেখেছে—শোনা যায়, তাস খেলায় তার মতো দক্ষ আর দ্বিতীয় নেই পাড়ায়।

প্রথম দৃষ্টিতেই কল্যাণীর এ ছেলেটিকে ভালো লাগেনি—কেমন একটা বিশ্রী ভংগীতে সে 'স' উচ্চারণ করে; হাত-পা নাড়া, কথাবার্তা ... [illegible] অশোভন—তবু কল্যাণী প্রথম থেকেই তার সংগে সহজ ভাবে মিশবার চেষ্টা ক'রেছে—সকাল বেলা চা করে যি দিয়ে চিঁড়ে ভেজে স্বামী এবং কন্যাকে দেবার সময় তাকেও ডেকে চা খাইয়েছে—ভিতরে সামান্য বিরক্তি থাকলেও কোনো দিন বাইরে সে এ কথা প্রকাশ করেনি।

এক এক ক'রে অনেকগুলি দিন পার হয়ে গেলো। কল্যাণী ইতিমধ্যেই বেশ বুঝতে পারলো যে, বিন্দুবাসিনীর ছেলে-মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে যে দীনতাকে সে লক্ষ্য করছে, তা তাদের জন্মগত। এক দিন কল্যাণীর বড়দা' অশোক বেড়াতে এলো। কথা-প্রসংগে এই কথাটাই সে তার বড়দা'কে জানালে। অশোক বললে, এটা খুবই স্বাভাবিক, অভাবে মানুষকে অনেক নীচে নামিয়ে দেয়, তার পরে যাদের জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত তাদের তো এ পরিণাম অপরিহার্য্য।

কল্যাণী হাসলো, বললে, কোনো দিন ওদের তা ব'লে ফিরিয়ে দিতে পারিনি দাদা। রোজ যখন ভাত নিয়ে বসবো, ঐ ছোট দু'টি ছেলে এসে বসবে কাছে, ওদের না দিয়েও উপায় নেই, তখনি দু'টি ভাত দিয়ে মাছ তুলে দিই। ওদের দৈনন্দিন যে আহার তা দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়।

অশোক বললে, যতোটা পারিস্, দান করিস্—জীবনে এর থেকে আনন্দের কাজ তো আর কিছু নেই—তবে নিজের দিকেও লক্ষ্য রাখিস্—শেষ পর্য্যন্ত এই দানের জন্যে তোর যেন কোনো কষ্ট না হয়, সেটাও ভাবিস।

—তা তো নিশ্চয়ই। কল্যাণী হাসলো, আমার সাধ্য না থাকলে আমি কোথা থেকে সাহায্য করবো? তা তো করিই, এই আজকে একটু নুণ, কাল একটু চা, পরশু একটু সরষের তেল, তার পরের দিন চিনি, এ-তো অনবরত চেয়ে নিতেই আসে, কিন্তু তার বেশী যদি কোনো দিন চায়, তা তো আর আমি পারবো না দাদা?

—না, সেই কথাই তোকে বলছি, যতোটা তোর ক্ষমতা, ততো-টুকুই দিস্—জানবি, সেইটুকুই মনুষ্যত্ব।

মাঝে-মাঝে প্রিয়নাথ এগিয়ে অনুযোগ করে—খেয়ালী মানুষ হলেও সংসার সম্বন্ধে সে মোটেও উদাসীন নয়—এই নিয়ে ভিতরে ভিতরে দু'-একবার অসন্তুষ্টিও প্রকাশ ক'রেছে মাঝে-মাঝে; কিন্তু কল্যাণী থামিয়ে দিয়েছে, বলেছে, যাক্ গিয়ে, লোকে সহরে কতো অসুবিধে সহ্য ক'রে বাস করে থাকে—তার তুলনায় এ সব কিছুই না—এ সব গায়ে না মাখলেই হোলো।

মেয়েটির সংগে কল্যাণীর ভাব হ'য়েছে—নাম অতসী। বছর ষোলো বয়স। বিন্দুবাসিনী বিয়ে দেবার জন্যে প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছেন। মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ আছে। রঙটা মন্দ নয়—তবে স্বাস্থ্য বড্ডো খারাপ। কল্যাণী ইতিমধ্যেই তার সঞ্চয় থেকে দু'টি সাবান, একটি স্নো, এক শিশি সুগন্ধি তেল তাকে উপহার দিয়েছে। অতসী ভারী খুসী—কল্যাণীকে দিদি ব'লে ডাকে, পাড়ায় বাড়ী-বাড়ী ঘুরে সে কল্যাণীর খুব সুখ্যাতি করে আজকাল।

কল্যাণীর বাপের বাড়ী কাছেই। প্রায়ই ও সন্ধ্যের দিকে এ-বাড়ীতে আসতো। অশোক স্থানীয় একটা স্কুলের মাষ্টার, সন্ধ্যের পর কোনো কোনো দিন পড়া-শুনো করে, কোনো দিন বা ইজি-চেয়ারে শুয়ে অন্ধকার ঘরে ব'সে সিগারেট টানে। সংসারের সংগে তার সংযোগ নেই বললেই হয়; তবে কল্যাণীকে সে খুব

ভালোবাসে—বোনের সামান্য কোনো অসুবিধে ঘটলে তার প্রতীকার ক'রে তবে অন্য কথা।

এক দিন সন্ধ্যার পর এ-বাড়ী থেকে যাবার আগে অশোক কল্যাণীকে বললে, আর কিছুর জন্যে তো ভাবি না, ভাবি তোমাদের ওই কর্ত্রী ঠাকরুণ বিন্দুবাসিনীর জন্যে। মানুষটিকে সাধারণ ব'লে মনে হয় না, একটু সাবধানে থাকিস্। পরিবেশ যদি ভালো না হয়, তাহ'লে চার দিকের আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে যে, জীবন অনেক সময়ে দুর্বিষহ হ'য়ে ওঠে।

সরল মন কল্যাণীর, এই কথায় সে হেসে ব'লেছিলো, না দাদা, সে ভয় নেই, আমি কারুর কোনো কথাতেই থাকি না—লোকেই বা কেন আমাকে বিরক্ত করতে আসবে?

অশোকও হেসেছিলো, বলেছিলো, সে তো নিশ্চয়ই। আমি যে বলছি 'হবেই'—তা তো নয়, তবে এ-সব ক্ষেত্রে এই রকম আশংকাই বেশী থাকে।

দিন চলতে লাগলো। সত্যিই—সুখের নয় দুঃখ চক্রাকারে ঘোরে। এক দিন অতি সামান্য কারণে কাগজের দোকানের কর্তার সংগে প্রিয়নাথের মতান্তর ঘটলো। তর্কের মধ্যে সে অশোভন মন্তব্য করলো কর্তার মুখের ওপরে—বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, ফলে সেই দিনই চাকরী গেলো প্রিয়নাথের, নিতান্ত বিরক্ত-মুখে সে বাড়ী ফিরে এলো।

সব শুনে তবু কল্যাণী হাসলো, বললে, তাতে কি হয়েছে? একটা চাকরী গেছে আবার একটা হবে চেষ্টা করো—মন খারাপ করবার এতে কি আছে?

কিন্তু এটা যুদ্ধ-পরবর্তী যুগ, চাকরী আর আগের মতো সহজ-লভ্য নয়; প্রিয়নাথ যথাসাধ্য চার দিকে চাকরীর জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো।

এক-এক দিন অত্যন্ত নিরাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরে প্রিয়নাথ নিজের শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেয়, বলে, এবারে আর চাকরী নয়, ব্যবসা-ট্যাবসার কিছু চেষ্টা দেখা যাক্!

কল্যাণী উৎসাহ দেয়, বলে, বেশ তো! সেই বা মন্দ কী?

আয় নেই—সুতরাং কল্যাণীকে একটু সাবধানে চলতে হয়—ফলে আগের সেই অবাধ দাক্ষিণ্যের স্রোতে এবারে ভাঁটা পড়ে।

প্রথম যে দিন চিনি চাইতে এসে বিন্দুবাসিনী শূন্য হাতে ফিরলেন, সেই দিন থেকেই তাঁর কথায় এবং ব্যবহারে কিছুটা সুরের বদল হলো—কল্যাণী তা লক্ষ্য করলো, কিন্তু কিছু প্রকাশ করলো না।

আর অভাব যা ঘটছে কল্যাণীর—তা তার দাদা বা মা মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এক দিন দেখা গেলো, মাস দু'য়েক বাড়ী ভাড়া বাকী প'ড়েছে প্রিয়নাথের। বিন্দুবাসিনী আজ-কাল প্রায়ই তাগাদা দেন, প্রিয়নাথ ব'লেছে, অবিলম্বেই সে ভাড়া মিটিয়ে দেবে।

দিন কাটতে লাগলো, কিন্তু নানা কারণে প্রিয়নাথের মন ভালো নেই—তার স্বাভাবিক ব্যবহারেও কেমন যেন একটা রুক্ষতা আসলো। আজকাল অতি সামান্য কারণেই সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। কল্যাণী চুপ ক'রে যথাসাধ্য সহ্য ক'রে যায়।

বিন্দুবাসিনী আক্রমণ করলেন অন্য দিক্ থেকে। এক দিন কল্যাণীর অনুপস্থিতিতে প্রিয়নাথকে [illegible] এ ভাবে [illegible] বাপের বাড়ীর যে-কী [illegible] ছাড়া যে রকম চলা-ফেরা তোমার বউ-এর, তাতে ওকে একটু শাসন করা উচিত—বাবা, তোমার।

কয়েক দিন থেকে সামান্য কারণে কল্যাণীর সংগে একটু মত-বিরোধ চলছিলো, বিন্দুবাসিনীর কথাটা মন্ত্রের মতো কাজ করলো—একবার সোজা হ'য়ে উঠে বসলো সে—কোনো কথা বললে না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রিয়নাথ ভাবতে লাগলো, সত্যিই তো, কল্যাণীর স্বাধীনতা অনেকখানি মাত্রা ছাড়িয়েছে। এতো দিন তা লক্ষ্য করেনি প্রিয়নাথ, কিন্তু ক্রমশঃ ওর স্বভাবটাই যে বেড়ে চলেছে— এবারে তার সাবধান হওয়া উচিত। বিরক্তিতে সে রাত্রে কথা বললে না প্রিয়নাথ কল্যাণীর সংগে।

এই ঘটনার পরে আরো কয়েক দিন কেটে গেছে। অবসর মতো বিন্দুবাসিনী তাঁর আরো কয়েকটি শাণিত তীর ছুড়েছেন, সিদ্ধি বোধ হয় এবার প্রায় কাছাকাছি এসেছে।

সে দিন দুপুরে কল্যাণী প্রাত্যহিকের মতো বাপের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। এমন সময়ে প্রিয়নাথ অগ্ন্যুদ্গিরণ করলো, বললে, আমি বারণ করছি, তুমি রোজ রোজ ও-বাড়ী যেতে পারবে না।

কল্যাণী কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হোলো, বললে, তুমি বলছো কি?

—আমি যা বলছি, তার মানে তুমি বোঝো—ন্যাকামী করো না!

কল্যাণীর সমস্ত শরীর মুহূর্তের জন্যে যেন জ্বলে উঠলো, তার পর এক মুহূর্ত সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো—বললে, আমি যাবো, দেখি তুমি আমাকে কি ক'রে আটকাও?—ব'লে সে তার মেয়ের হাত ধ'রে একলাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে ব'সে রইলো, বিন্দুবাসিনী সময় বুঝে কাছে এসে বললেন, তোমায় অনেক দিন থেকে বলেছি বাবা! দেখলে তো, কতখানি বেড়ে গেছে?

সন্ধ্যার সময় কল্যাণী ফিরে এলো। প্রিয়নাথ কোনো কথা বললে না—ভিতরে ভিতরে সে রাগে জ্বলে যাচ্ছিলো—রাত্রে খাবার দিয়ে কল্যাণী যখন ডাকতে এলো, তখনো সে সেই ভাবে ব'সে। কল্যাণীর কথায় একেবারে ফেটে পড়লো, অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গাল দিয়ে উঠলো কল্যাণীকে।

তার পরে তর্কের মুখে এমন ধাক্কা দিলে যে কল্যাণী সে বেগ সামলাতে পারলো না—চৌকাঠের উপরে পড়ে গিয়ে তার কপাল কেটে গেলো।

পরের দিন সন্ধ্যার পর এ খবর অশোকের কানে এলো। কল্যাণীই এ কথা এতোক্ষণ জানায়নি কাউকে—কিন্তু ঘটনা-চক্রে শেষ পর্যন্ত তা গোপন রইলো না।

এই বার অশোকের ধৈর্য্যের আসন টললো। এতো দিন সে আশা ক'রেছিলো, দাম্পত্য কলহের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাই ঘটবে, আবার শান্তি আসবে তাদের সংসারে। কিন্তু আজকের ঘটনায় সে শুধু স্তম্ভিত হোলো না—অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হোলো। তখনি ছোট ভাইকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে সে, আর কল্যাণীকে চিঠি লিখে দিলে যে, এই চিঠি পাওয়া মাত্র সে যেন এক-বস্ত্রে সে তার মেয়েকে নিয়ে এখানে চ'লে আসে।

কল্যাণী ফিরে এলো। কল্যাণীর বাবা বললেন, এই ঘটনায়

পরে যদি সারা জীবন কল্যাণীর ভার বহন করতে হয় তাতেও তিনি রাজী আছেন—অশোকও সমর্থন করলো। বললে, এ-রকম অমানুষ যে, তার শাস্তি হওয়া উচিত। তার পরে একটু হেসে বললে, এক দিন প্রিয়নাথ ওর ভুল বুঝতে পারবেই—এবং মাথা নীচু ক'রে এসে এক দিন ওকে ক্ষমা চাইতে হবেই!

কথাটা প্রিয়নাথের কাণে গেলো, শুনে সে ব'লে পাঠালে, সে সব কথা যেন কল্যাণীর বাবা আর দাদা চিরকালের জন্তে ভুলে যান। শীগ্‌গিরই ওর একটা চাকরীর আশা আছে, সেটা পেলেই আবার নতুন ক'রে বিয়ে করবে প্রিয়নাথ, তখন বুঝবে, কতো ধানে কতো চাল।

এ কথায় অশোক হাস্‌লো শুধু।

এ দিকে বিন্দুবাসিনী আজকাল প্রিয়নাথের পরিচর্য্যার জন্তে অস্থির হ'য়ে আছেন। মেয়ে অতসী দিন-রাত শশব্যস্ত, কখন কি দরকার লাগবে প্রিয়নাথের। বিন্দুবাসিনী তাকে অভয় দিয়েছেন, বলেছেন, তোমার ভয় কি বাবা? এমন সোমত্ত জোয়ান বয়েস, একটা চাকরী জোগাড় করো, আমি তোমাকে খুব ভালো দেখে মেয়ে এনে বিয়ে দেবো।

প্রিয়নাথও অবিবেচক নয়—আজকাল বিন্দুবাসিনীর বাজার-খরচটা সেই চালায়—গত রাত্রিতেও প্রায় দু'সের ওজনের একটা বড়ো ইলিশ মাছ সে এনেছিলো।

এই ঘটনার পরে আরো তিন মাস কেটে গেছে। আমাদের কাহিনীর বর্ণিত মানুষগুলির জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, সেইটুকু লিপিবদ্ধ করতে পারলেই আমার কাজ শেষ হবে।

শীত শেষ হ'য়ে এসেছে। বসন্তের বাতাস যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়—অন্ধকার ঘরের মধ্যে ক্লান্ত শরীরে ইজি-চেয়ারের ওপরে অশোক শুয়েছিলো, বাইরে রাস্তার উপরে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে, এমন সময়ে কল্যাণী এসে সুইচ টিপে আলো জাললে। তার পরে হাসিমুখে এসে প্রিয়নাথকে প্রণাম করে বললে, চলি দাদা, সময় হ'লে যাবেন একবার।

পিছনে খোভাকে কোলে ক'রে প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে—তাড়াতাড়ি সে-ও এসে প্রণাম করলে, আজ তার ভুল ভেঙেছে, যে স্বার্থের জন্তে বিন্দুবাসিনীর এতো স্নেহভাজন হ'তে পেরেছিলো এক দিন—সেই স্বার্থেই সামান্ত আঘাত লাগতেই তিনি নিজ-মূর্তিতে প্রকাশিতা হ'লেন—এইবার প্রিয়নাথ চিন্‌লো বিন্দুবাসিনীর আসল রূপ, বুঝতে পারলো, কল্যাণীর উপরে সে কতো নিদারুণ অবিচার ক'রেছে! তার পর এক দিন এসে সে কল্যাণীর বাবা আর মা'র কাছে মাপ চাইলে, তার পরে কল্যাণীর কাছে বললে, জীবনে আমার খুব বড়ো শিক্ষা হ'য়েছে, এবারের মতো তুমি আমাকে সংশোধনের সুযোগ দাও।

প্রিয়নাথের ভাগ্যচক্রেরও পরিবর্তন ঘটেছিলো। সম্প্রতি লিলুয়াতে ই-আই-আর ওয়ার্কশপে ভালো চাকরি পেয়েছে, সেইখানেই চমৎকার একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে—আজ কল্যাণী আর খোভাকে নিয়ে সেখানেই তারা রওনা হবে।

অশোক উঠে দাঁড়ালো। একটু হেসে বললে, যাবো বই কি ভাই, তবে বাড়ী ভাড়া নেবার আগে আশ-পাশের লোক কি রকম তার খবর কি নিয়েছিলে?—ব'লে হেসে সে তাকালো প্রিয়নাথের দিকে।

কল্যাণীও হাস্‌ছিলো—বললে, না দাদা, সে ভয় আর নেই, এবারে একেবারে গোটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি আমরা—ব'লে দুজনে হাসতে হাসতে গিয়ে খোভাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো—বারান্দার উপরে কল্যাণীর বাবা ও মা দু'জনেই এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরাও হাসছিলেন।

একটা গর্জন ক'রে মোটরটা বাঁক ঘুরলো।

ভারতবর্ষ

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

সমস্ত ভারতবর্ষ আজ গান করে।
আমি শুনি:
প্রত্যেকটি মিস্ত্রি কাজ করতে করতে গান করে,
কাঠের মাপ নিতে নিতে গান গায় ছুতোর মিস্ত্রিরা,
কাজে তৈরী হবার জন্তে রাজমিস্ত্রিরা সুর ধরে,
মাঝিরা নৌকা থেকে আর সারেঙরা জাহাজ থেকে,
মুচি বেঞ্চে বসে জুতো সারে আর গান করে,
কামার-কুমোর-চাষী ছেলেরাও সারা দিন গান গেয়েছে।
মায়ের মিষ্টি গান আর যুবতী স্ত্রীর সুর—
সেলাই করতে করতে মেয়েদের মাঝে গুন্‌-গুন্‌ রব ওঠে,
সর্বদাই সর্বত্র গানের বিস্তৃতি, স্ত্রী-পুরুষ গানে বিভোর,
দিনের শেষে তরুণদের পার্টিতেও গানের ফোয়ারা।
যেন ভারতের দিকে দিকে প্রাণমাতানো সুরের সুতীক্ষ্ণ ইসারা।

বোবা-বধূর চোখ-ইশারা

স্বামী কৃষ্ণানন্দ

"আমি-আমি করি বুঝিতে না পারি
কে আমি, আমাতে কি আছে রতন ?"

—বিস্মৃত

বিচিত্র, রহস্যময়, পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎকে নানা ভাবে বুঝিবার জন্ম আমরা প্রত্যেকেই দিবারাত্রি কত কি-ই করিতেছি। জগৎকে জানিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে একটি বিষয় বুঝিতে হইবে; সেটি হইতেছে এই—জীবের যথার্থ স্বরূপ কি অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি-আমি" বলিয়া দিন-রাত চেঁচামেচি করিতেছি, সেই আমি-টা বাস্তবিক কে বা কি? অতিবড় ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতিক্ষুদ্র তৃণগাছিটি পর্য্যন্ত সকলের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই যে অবিচ্ছিন্ন "আমি-আমি" ধ্বনি অসীম অন্ধকারের সর্বপ্রান্তভাগ স্পন্দিত, মুখরিত, উদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া অতিক্রম কারাহীন বেগে অনন্ত মহাকাশের দিগ্বিদিকে দিশেহারা পাগলের মত অবিরাম ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে এবং যাহার জন্ম কল্পে-কল্পে যুগে-যুগে, জন্মে জন্মে, দেশে-দেশে এত যে নাচানাচি হাসাহাসি-ঢলাঢলি, দাপাদাপি-কাঁদাকাঁদি-গলাগলি, মারামারি-কাটাকাটি-দলাদলি ইত্যাদি মহা তুমুল ব্যাপার, সেই আমি-টার যথার্থ পরিচয় কি এবং তার এত ছুটাছুটিই বা কেন?

"নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।"

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের এই রসময়ী, কলাবতী বোবা-বধূটি (প্রকৃতি দেবী) অতীব সুরুচিসম্পন্না ও কৌতুকপ্রিয়া বলিয়া নানাবেশধারিণী বা বহুরূপিণী অর্থাৎ সতত পরিবর্ত্তনশীলা; এই কারণ, তাঁর বড় সাধের এই বিশ্ব-জগতের সব-কিছুই সদা অস্থির ও অবিরত পরিবর্ত্তনশীল এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতাই হইতেছে তাঁর এক অপার রহস্যময় চোখ-ইশারা। বহুরূপিণী অনন্তরঙ্গিণী বোবা-বধূর এই যে বিরাট সংসাররূপ বিচিত্র রঙ্গালয়—ইহাতে কয়েকটি মহল আছে। প্রথম মহল, তাঁহার বহির্বাটিকা অর্থাৎ স্থুল বা বাহ্য জগৎ—ইহাই হইতেছে আমাদের জাগ্রতাবস্থা। দ্বিতীয় মহল, তাঁহার উদ্যান-বাটিকা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অন্তর্জগৎ—ইহাই হইতেছে আমাদের স্বপ্নাবস্থা। তৃতীয় মহল, তাঁহার বিশ্রামাগার অর্থাৎ কারণ-জগৎ—ইহাই হইতেছে আমাদের সুষুপ্তাবস্থা (স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাবস্থা) সর্বজনবিদিত এই যে তিনটি মহল অর্থাৎ আমাদের এই যে তিনটি অবস্থা—ইহারাই হইতেছে আমাদের মায়াবিনী বোবা-বধূটির মুখ্য মুখ্য তিনটি চোখ-ইশারা। পরিবর্ত্তনশীলতা, জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—প্রকৃতিরাণীর মুখ্য মুখ্য এই চারিটি চোখ-ইশারা হইতে আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব যে, আমাদের প্রত্যেকের চিররহস্যময় এই আমি-টার কোনরূপ যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব কি না? পরিচয় বলিতে আমরা যাহা-কিছু বুঝিয়া থাকি, তাহাদিগকে ঠিক ঠিক তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(ক) বাহ্য-বস্তুর বা কর্ম্মের সংযোগ-বিয়োগের সম্বন্ধ লইয়া যে সব পরিচয়;

(খ) শরীরের সম্বন্ধ লইয়া যে সব পরিচয়;

(গ) চিত্তের বা মনের সম্বন্ধ লইয়া যে সব পরিচয়।

ধনবান্, দরিদ্র, জমিদার, গৃহহীন, বিবাহিত, অবিবাহিত, এই সব হইতেছে বাহ্য বস্তুর এবং কৃষক, লেখক, দারোগা, অধ্যাপক, চিত্রকর, এই সব হইতেছে বাহ্য কর্ম্মের সংযোগ-বিয়োগরূপ সম্বন্ধ লইয়া পরিচয়; স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বালিকা, অন্ধ, রূপবতী, হেমপ্রভা, মদনমোহন, অমুকের মাতা, অমুকের পুত্র, এই সব পরিচয় হইতেছে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া; সুখী, দুঃখী, নিষ্ঠুর, দয়ালু, প্রেমিকা, গুণবতী, বুদ্ধিমান্, লজ্জাহীনা, এই সব পরিচয় হইতেছে চিত্তের বা মনের সম্বন্ধ লইয়া। নিখিল চরাচরে জীবের যত প্রকার জাগতিক পরিচয় আছে, তাহাদের সকলকেই সাক্ষাৎ ভাবে হোক্ বা পরম্পরাক্রমে হোক্, পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগের কোন-না-কোনটির মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে—কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের আমি-টার যথার্থ পরিচয় এই তিনটি বিভাগের কোনটিতে বাস্তবিক আছে কি না? এ বিষয়ে আমাদের মহা মাননীয়া, কৌতুক-প্রিয়া, শিক্ষয়িত্রী বোবা-বধূটির কিরূপ চোখ-ইশারা, তাহাই দ্রষ্টব্য।

"এ কি কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ী!
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব, বলে' দাও মোরে অয়ি!"

—রবীন্দ্রনাথ

"তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ,
তুমি কি বহ্নি, আমি পতঙ্গ,
জ্বালো জ্বালো এ জীবনে অগ্নি
উজ্জ্বল হৃদি-দাহিকা।"

—প্রমথনাথ চৌধুরী

(ক) যেমন কোন মনুষ্যের শরীরস্থ পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণ তাঁর শরীরের বর্ণের যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না, যেমন কোন কাগজের উপর লিখিত ক-অক্ষরটি ঐ কাগজের যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না, যেমন কোন পানপাত্রের মধ্যস্থিত দুগ্ধটুকু ঐ পানপাত্রের যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না, সেইরূপ বাহ্য বস্তুর বা কর্ম্মের সংযোগ-বিয়োগ সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন যে সব পরিচয় কখন আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইতেছে এবং কখন বা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, সেই সব পরিচয়ের কোনটিই আমাদের এই আমি-টার যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না। আজ আমি দরিদ্র আছি—এক মাসের মধ্যে কোন উপায়ে হয় ত আমি ধনবান্ হইলাম এবং আমার দারিদ্র্য নাশপ্রাপ্ত হইল; আবার এক মাস যাইতে-না-যাইতেই কোন কারণে হয় ত আমি ধন হারাইয়া পুনরায় দরিদ্র হইয়া পড়িলাম এবং সেই সঙ্গে আমার ধনবত্ত্বেরও নাশ হইল। এই দুই-তিন মাসের মধ্যে দারিদ্র্য জন্মিল ও মরিল—ধনবত্ত্ব জন্মিল ও মরিল। আমি কিন্তু এই দুই-তিন মাসের মধ্যে জন্মলাভও করিতেছি না, মরিতেছিও না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দারিদ্র্যকে বা ধনবত্ত্বকে ছাড়িয়াও আমার এই আমি-টার থাকা সম্ভব হইতেছে; তবে আর কোন্ মুখে কেমন করিয়া বলি যে এই দারিদ্র্য বা ধনবত্ত্ব আমার আমি-টার যথার্থ পরিচয়? অতএব আমাদের অসীম দয়াময়ী এই বোবা-বধূটি সংযোগ-বিয়োগরূপ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনরূপ চোখ-ইশারা দ্বারা আমাদিগকে অবিরাম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, বাহ্য বস্তুর বা কর্ম্মের সংযোগ-বিয়োগ সম্বন্ধ লইয়া উৎপন্ন যে সব পরিচয়কে আমরা আমাদের যথার্থ পরিচয় বলিয়া মনে করিতেছি, সেই সব অসংখ্য পরিচয়ের মধ্যে

কোনটিই আমাদের এই আমি-টার যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না। তবে আমি কে?

(খ) এইবার আমরা বোবা-বধূর ইঙ্গিত হইতে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব যে, হাড়-মাসের খাঁচারূপ আমাদের জাগৃতিকালীন এই স্থূল শরীরটাই আমাদের যথার্থ "আমি" কি না; যদি এই শরীরটা আমাদের "আমি" হইতে ভিন্ন বস্তু হয় অর্থাৎ যদি এই শরীরটা আমাদের "আমি" না হয়, তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধ লইয়া যে সব পরিচয় হইবে, সেই সব পরিচয়ও আমাদের এই আমি-টার যথার্থ পরিচয় হইবে না। আমার এই পূর্ণ স্থূল শরীরটা হইতে যদি একখানি হাত বা পা অথবা অন্য কোন অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমার শরীরটা ত অপূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু শরীরের এই ভাবে অপূর্ণ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও আমার আমি-টা অপূর্ণ হয় না, পূর্ব্ববৎ পূর্ণই থাকিয়া যায়—এই স্থূল শরীরের বৃদ্ধি-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আমি-টার বৃদ্ধি-ক্ষয় হইতেছে না। এক দিন যে ব্যক্তি শক্তিশালী, বিশাল ও সুশ্রী তনু লইয়া মেদিনী কাঁপাইয়া ও দর্শকবৃন্দকে চমকিত করাইয়া ধরণীর বুকের উপর দিয়া মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারের মত বুক ফুলাইয়া হেলিয়া-দুলিয়া গজেন্দ্রগতিতে চলিয়া যাইতেন, আজ তাঁর সেই শরীরের এতই কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, অতীতের সেই মেদিনী-কাঁপান ও সকলকে চমকিত করান দীর্ঘ স্থূল বরবপু আজ লাঠির সাহায্যে কাঁপিতে কাঁপিতে ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাওয়ার মুখে শুষ্ক তুচ্ছ খড়-কুটোর মত পথের উপর দিয়া যেন ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতেছে। "রূপের ভরে গরব করে" যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা অনিন্দ্যসুন্দরী কিছু কাল পূর্ব্বে হাসির ছটায় চমকিতা সৌদামিনীর মত অতি প্রখরা প্রভার চমক মারিয়া পথিকের নয়ন ধাঁধাইয়া গরীব বেচারার মন-প্রাণ হরণ করার বিজয়োল্লাসে অহঙ্কারে মাটিতে পা না ফেলিয়া পথের উপর দিয়া পরীর মত যেন উড়িয়া উড়িয়া চলিতেন—সেই বরবর্ণিনী মহা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আজ এ কি মহা শোচনীয়াবস্থা। সেই প্রাণ-গলান রূপ, সেই মন-মজান হাসি, সেই হৃদয়-মাতান আকর্ণবিস্তৃত যুগ্মভ্রূ, সেই চিত্ত-ভুলান, কৃষ্ণঘন, কুটিল-চিক্কণ কুন্তলকলাপ, অলক্ত-রঞ্জিত সুকোমল চরণের সেই লঘু ভঙ্গিমাময়ী গতি, কোমল ক্ষীণ ওষ্ঠাধরের সেই অনুপমা লালিমাময়ী আভা, উদ্ভ্রান্তকারী আঁখি দু'টির সেই মর্ম্মভেদিনী মোহিনী দৃষ্টি, সুঠাম মরাল-কণ্ঠের সেই কোকিলনিন্দিত মধুর ঝঙ্কার, সর্ব্বাঙ্গে কাঁচা বিমল পারদের মত পূর্ণ যৌবন-লাবণ্যের চলচল উচ্ছসিত রস-সমুদ্রের সেই মদিরাময়ী লহরীমালা, সব না-জানি-কার কি এক যাদুমন্ত্রের প্রভাবে অতীতের কোন্ আঁধার পাথারতলে চিরদিনের মত একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে।

রূপ-কান্তি-যৌবনের ঘটা—
"যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা"।
—রবীন্দ্রনাথ

তবুও কিন্তু হায়! আজও তাঁর সেই আমি-টা ইন্দ্রধনুচ্ছটাহীন বিরহী আকাশের মত বিজন, বিষাদঘন অন্ধকার মাঝে একা বসিয়া বসিয়া পুরান সেই দিনের কথার বন্ধ্যা-স্মৃতি লইয়া অলসৌদাস্যভরে শুধু সময়-কাটানর জন্যই মিছামিছি খেলা করিতেছে—এ যেন সঙ্গিহীন বিড়ালছানার নিজের লেজের সহিত খেলা করা।

"————তরুশ্রেণী উদাসীন
চেয়ে আছে রাজপথপাশে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে!————
————অলস-ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
—রবীন্দ্রনাথ

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই শরীরটা নিত্য নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু আমাদের আমি-টা যেন অচলায়তনের মত ঠিক একই ভাবে বসিয়া বসিয়া শরীরের এই সব পরিবর্ত্তন দেখিতেছে—শরীরের বৃদ্ধি-ক্ষয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা আমি-টার বৃদ্ধি-ক্ষয়-পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তবে আর কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জাগৃতিকালীন এই স্থূল শরীরটাই আমাদের "আমি"? এই শরীরটা যে আমার "আমি" নহে, এ কথা বুঝাইবার জন্য আমাদের রঙ্গময়ী বোবা-বধূটি যত ইঙ্গিত করিতেছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পর্শী ইঙ্গিত হইতেছে আমাদের স্বপ্নাবস্থা। গভীর রাত্রিকালে কোন পল্লীগ্রামের এক আঁধার নীরব ঘরে একখানি পালঙ্কের উপর নিদ্রিত হইয়া আমি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম যে, মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা নগরীর রৌদ্রদীপ্ত কোলাহলময় রাজপথের উপর দিয়া ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া অফিস যাইতেছি। স্বপ্নের দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্যই হোক্ মিথ্যাই হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না; ঐ স্বপ্নের দ্রষ্টা ত আমার এই সত্য আমি-টা—কারণ, জাগ্রতাবস্থায় আসিয়া আমার এই আমি-টাই ত বলিয়া থাকে—"গত রাত্রে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।" এখন দেখা যাইতেছে যে, যে-শরীরটা গভীর রাত্রে পল্লীগ্রামের আঁধার নীরব প্রকোষ্ঠে পালঙ্কের উপর চক্ষু বন্ধ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই হাড়-মাসের স্থূল শরীরটা হইতে এই স্বপ্ন দর্শনকালে আমি এতই আশ্চর্য্যরূপে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন আর ঐ স্থূল দেহটার কথা এবং ঐ দেহটা যে কালে যে স্থানে যে ভাবে ও যে অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সেই কালের কথা বা সেই স্থানের কথা বা সেই ভাবের কথা বা সেই অবস্থার কথা অর্থাৎ সেই সম্পর্কের বিন্দু মাত্র কোন কথাই আর মনে করিতে পারিতেছে না। তবে আর কোন্ মুখে কেমন করিয়া বলি যে, জাগৃতিকালীন এই স্থূল শরীরটাই আমার যথার্থ "আমি"? অতএব অপূর্ব্ব কৌশলময়ী আমাদের এই বোবা-বধূটি স্বপ্নরূপ চোখ-ইশারা দ্বারা প্রতি রাত্রেই আমাদিগকে পুনঃপুনঃ ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, জাগৃতিকালীন এই স্থূল শরীরটা আমার যথার্থ "আমি" নহে। আবার জাগৃতিরূপ চোখ-ইশারা দ্বারা তিনি ইহাও বুঝাইয়া দিতেছেন যে, স্বপ্নকালীন ঐ সূক্ষ্ম শরীরটাও আমার যথার্থ "আমি" নহে—কেন না, এই জাগৃতিকালে ও স্বপ্নকালীন ঐ একই "আমি" রহিয়াছে বটে, কিন্তু এখন আর স্বপ্নকালীন ঐ সূক্ষ্ম শরীরটা নাই। অতএব বোবা-বধূর অসীম অনুগ্রহে আমরা এত দূর পর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীরই আমাদের যথার্থ "আমি" নহে। শরীরই যখন আমাদের "আমি" নহে, তখন শরীর সম্বন্ধ লইয়া আমরা নিজেদের যে সব পরিচয়কে সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেই সব অগণিত

পরিচয়ের একটিও আমাদের "আমি"টার যথার্থ পরিচয় নহে। তবে আমি কে?

(গ) এইবার আমাদের বোবা-বধূটির চোখ-ইশারা হইতে আমরা একবার বুঝিবার চেষ্টা করিব যে, আমাদের এই মনটি বা চিত্তটি আমাদের যথার্থ "আমি" কি না। যদি এই মন বা চিত্ত আমাদের যথার্থ "আমি" না হয় অর্থাৎ যদি এই মন বা চিত্ত আমাদের আমি-টা হইতে ভিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে এই মনের বা চিত্তের সম্বন্ধ লইয়া যে সব পরিচয় হইবে, সেই সব পরিচয়ও আমাদের আমি-টার যথার্থ পরিচয় হইবে না। নিশীথ নিশায় কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের একটি আঁধার ও নীরব ঘরে একখানি পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া যখন আমি জাগ্রত ছিলাম, তখন মনে করিতেছিলাম যে, পালঙ্কের উপর শায়িত এই স্থূল শরীরটাই বুঝি "আমি"। আঁখির একটি পলক পড়িতে-না-পড়িতে না-জানি কোথা হ'তে আমাদের এই মহারঙ্গময়ী যাদুকরী বোবা-বধূটি কিছু কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই যেন একটু চোখ টিপিলেন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ চোখ-টেপারূপ যাদুমন্ত্রের অদ্ভুত ফল দেখা দিল। সেই নিশীথ রাত্রি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, সেই আঁধার নীরব ঘর, সেই পালঙ্কশয্যা, সেই শায়িত স্থূল শরীর, একটি তুড়ির সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন অলস কল্পনার মত না জানি কোথায় মিলিয়ে গেল। এ কি অদ্ভুত ভেল্কি! জাগৃতির খেলাধুলা ও ঘর-কন্না সব জাগৃতির পথের উপরই পড়িয়া রহিল—স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের অভিনব খেলার আরম্ভ হইল। স্বপ্নে আমি দেখিতে লাগিলাম যে, মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা মহানগরীর রৌদ্রদীপ্ত কোলাহলময় রাজপথের উপর দিয়া ট্রামে চড়িয়া অফিস যাইতেছি—কি বিপরীত দৃশ্য, কি অপরূপ কৌতুক, কি রহস্যময়ী ক্রীড়া!

বল এ খেলার কোথা আছে পার করুণা করি'।
বউ কথা কও, প্রাণ-মন লও চরণে ধরি॥

নূতন দেশের নূতন খেলা। স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের আলোকে, স্বপ্নের ট্রাম-গাড়ীতে বসিয়া স্বপ্নের আমি স্বপ্নের নরনারীদের সঙ্গে দু'টো স্বপ্নের সুখ-দুঃখের কথার আরম্ভ যেমনই স্বপ্নের ঘোরে করিতে গেলাম—অমনি সঙ্গে সঙ্গেই চপলা কুহকিনীর আবার মনোমোহিনী অপাঙ্গভঙ্গিমা। "রবি-দরশনে নীহার যেমন ক্রমে ধীরে ধীরে হয় অদর্শন", ঠিক্ তেম্নি অত-বড় ঐ স্বপ্ন-জগৎটি মায়াবিনীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইতে না পারিয়া লাজে জড়সড় হইতে হইতে একেবারে বাষ্পের মত কোথায় উড়ে গেল।

স্বপনের দেশে স্বপনের মেলা স্বপনের খেলা—
আরম্ভ না হ'তে হ'তে এসে গেল বিদায়ের বেলা।

স্বপ্নের খেলা-ধূলা, স্বপ্নের ঘর-কন্না, স্বপ্নের রাগ-দ্বেষ, স্বপনের হাসি-অপমান-অভিমান, সব স্বপ্নের পথের উপরই পড়িয়া রহিল—

"হায় রে হৃদয়! তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু
পথপ্রান্তে রেখে যেতে হয়!"

——রবীন্দ্রনাথ

অপার কৌতুকময়ী মায়াবিনী বোবা-বধূটির বরণ-কাঠিরূপ চোখ-ইশারার স্পর্শ মাত্রেই নীরব বিজন ঘন বিস্মৃতিময় সুষুপ্তির দেশে (কারণ-জগতে) আসিয়া পড়িলাম—বিলুপ্ত বিরত চিত্ত নিখিল-বিস্মৃত।

"————আমার সকল দৈন্য-লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে; হৃদিশয্যাতল,
শুভ্রদুগ্ধফেননিভ কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।"

——রবীন্দ্রনাথ

ঘনঘোর সুষুপ্তির নিবিড় গভীর প্রেমালিঙ্গনে আমি একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত ও আত্মহারা—এখন আর কোথাও কেহই নাই, এখন আর কোথাও কিছুই নাই।

"ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে?"

—— রবীন্দ্রনাথ

কোথায় বা সেই জাগৃতির গভীর রাত্রি আর কোথায়ই বা সেই স্বপ্নের মধ্যাহ্নকাল, কোথায় বা সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আর কোথায়ই বা সেই বিশাল কলিকাতা সহর, কোথায় বা সেই আঁধার নীরব ঘর আর কোথায়ই বা সেই রবিকরোজ্জ্বল কোলাহলময় রাজপথ, কোথায় বা সেই পালঙ্কশয্যায় শুয়ে-থাকা তনু আর কোথায়ই বা সেই ট্রামে চড়ে-যাওয়া বপু! সব যেন

"এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে ক্ষণকাল ডুবে গেল নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব নাম, সব রূপ, সব ভাব, হাতের একটি তালির সঙ্গে সঙ্গেই যাদুর মত "সন্ধ্যারক্তরাগ সম তন্দ্রাতলে হয়ে গেল লীন"—এখন আর কাহারও চিহ্নমাত্র নাই, এখানে আর কিছুরই নাম-গন্ধও নাই। এখন আর পালঙ্কে শুয়ে-থাকা জাগৃতির সেই স্থূল শরীরটাও নাই এবং ট্রামে চড়ে-যাওয়া স্বপ্নের সেই সূক্ষ্ম শরীরটাও নাই। এখন যে কেবল শরীর দু'টোই নাই—তাহা নহে; এই সুষুপ্তির দেশে আমার এই আমি-টা আমার চিত্ত বা মন হইতেও এতই নির্মম ভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, লজ্জা-ঘৃণা, হিংসা-ভয়, ক্রোধ-বিস্ময় প্রভৃতি চিত্তের বা মনের অনন্তভাবের মধ্যে একটিকেও এখন আর স্মৃতিপথে পর্যন্ত আনিতে পারা যাইতেছে না—চিত্তস্থ কোন ভাবের কোন প্রকারই উপলব্ধি এখানে নাই। তবে আর কোন্ মুখে কেমন করিয়া বলি যে, এই মন-টাই বা চিত্তটাই আমাদের যথার্থ "আমি"? এই মনই বা চিত্তই যখন আমা হইতে ভিন্ন বস্তু অর্থাৎ ইহা যখন আমার "আমি" নহে, তখন ইহার সম্বন্ধ লইয়া যে-সব পরিচয়কে আমরা নিজ-পরিচয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেই সব সংখ্যাতীত পরিচয়ের কোনটিই আমাদের এই আমি-টার যথার্থ পরিচয় হইতে পারে না। তবে আমি কে?

যে বস্তু বা ভাব কখন আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইতেছে এবং কখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, সে বস্তু বা ভাব আমা হইতে ভিন্ন, উহা আমার পর, উহা আমার "আমি" নহে—যাহা আমার পর, আমা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ যাহা আমার "আমি" নহে, তাহার পরিচয়ে আমার পরিচয় হইবে কিরূপে? তাহা কখনই হইতে পারে না। যাহা আমার যথার্থ পরিচয় হইবে, তাহা আমাকে ছাড়িয়া কস্মিন্ কালে কোন অবস্থাতেই থাকিবে না, থাকিতে পারিবে না। জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই আমার আমি-টাও অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু এই তিন অবস্থাতে শরীর ও মন বা চিত্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেছে না—বোবা-বধূর এই ইঙ্গিতটুকুই ত আমাদিগকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিতেছে যে, শরীরই বল বা চিত্তই বল, ইহাদের কোনটিই আমি নহি। তবে আমি কে?

জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই যাহা একটানা থাকিয়া যাইতেছে, উহাই হইতেছে আমার "আমি"। এখন প্রশ্ন এই—এই তিন অবস্থাতে একটানা কি থাকিয়া যাইতেছে? জ্ঞান। আমাদের এই উত্তরে অনেকেই আপত্তি করিবেন এবং বলিবেন—সুষুপ্ত্যবস্থায় আমাদের জ্ঞান থাকে না। সুষুপ্ত্যবস্থাতেও আমার জ্ঞান থাকে; তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমি জানিলাম কিরূপে যে, স্বপ্ন ও জাগৃতি ছাড়াও আমাদের সুষুপ্তি নামে এক অবস্থা আছে? দ্বিতীয়তঃ, সুষুপ্তি কালে যে জগৎ-সংসার আমার সামনে থাকে না, এ কথাই বা আমরা জানিলাম কিরূপে? তৃতীয়তঃ, সুষুপ্তি যে স্বপ্ন ও জাগৃতি এই দুই অবস্থার মত নহে, ইহাই বা আমি জানিলাম কিরূপে? সুষুপ্তির পরিচয় পাওয়া জ্ঞান বিনা সম্ভব হয় না। যাঁহার জীবনে কোন দিনই সুষুপ্তি হয় নাই, তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিবেন না যে, স্বপ্ন ও জাগৃতি ছাড়াও সুষুপ্তি নামে তাঁর এক তৃতীয় অবস্থা আছে। রামলাল এখন আছেন—এ কথা বুঝিতে হইলে জ্ঞান থাকা চাই; রামলাল এখন নাই—এ কথাও বুঝিতে হইলে জ্ঞান থাকা চাই। স্বপ্ন ও জাগৃতি কালে এক এক জগৎ থাকে—এ কথা বুঝিতে হইলে জ্ঞান থাকা চাই; সুষুপ্তি কালে কোন জগৎই থাকে না—এ কথাও বুঝিতে হইলে জ্ঞান থাকা চাই। ভাবের বা মিলনের অনুভূতিও জ্ঞানসাপেক্ষ, অভাবের বা বিরহের অনুভূতিও জ্ঞানসাপেক্ষ—জ্ঞান বিনা অনুভূতি সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, এই জাগ্রতাবস্থায় আমাদের সুষুপ্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়—সেই জন্যই ত এখন সুষুপ্তির অনুপস্থিতিতেও আমরা বলিতেছি যে, এখন আর সুষুপ্তি নাই। সুষুপ্তির যদি কোন জ্ঞানই আমার না থাকিত, তাহা হইলে উহার স্মৃতিও আমার থাকিত না—কারণ, অজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি থাকা সম্ভব হয় না। আমাদের চিরদিনের পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বোবা-বধূ জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ ইঙ্গিত দ্বারা প্রত্যহ আমাদিগকে অবিরাম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, জাগৃতিকালীন এই স্থূল শরীর ও দৃশ্য-প্রপঞ্চ বা বাহ্য জগৎ, স্বপ্নকালীন ঐ সূক্ষ্ম শরীর ও দৃশ্য-প্রপঞ্চ বা সূক্ষ্ম জগৎ ও মন বা চিত্ত, জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় এই সব বস্তুর থাকার (ভাবের) অনুভব এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় ইহাদের না-থাকার (অভাবের) উপলব্ধি করিবার জন্য সদা, সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের এই আমি-টা দ্রষ্টারূপে বা জ্ঞাতারূপে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া যাইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও একটানা ভাবে থাকিয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের আমি-টার সঙ্গে জ্ঞানের এই যে নিত্য, অখণ্ড সম্বন্ধ—ইহা দ্বারাই আমাদের লজ্জাবতী বোবা-বধূ চোখ-ইশারায় আমাদিগকে ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে, এই জ্ঞানই হইতেছে আমাদের আমি-টার যথার্থ পরিচয়। শুধু তাহাই নহে, সুষুপ্ত্যবস্থায় একমাত্র এক প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি ব্যতীত আমাদের এই আমি-টার অন্য কোন প্রকার অনুমাপক লিঙ্গ বা চিহ্ন বা পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া এই জ্ঞান যে কেবল আমাদের আমি-টার একটি পরিচয়, তাহাই নহে—এই জ্ঞানই আমি বা আমিই জ্ঞান। আমাদের এই বোবা-বধূটির নানাবিধ চোখ-ইশারা হইতে ধীরে ধীরে আমরা তাঁহারও পরিচয় পাইব, তখন বুঝিতে পারিব যে, আনন্দই তাঁর যথার্থ পরিচয়। আমাদের এই আমি টা বিরহী, বোবা-বধূর পিয়াসী অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দের পিয়াসী, আমাদের এই বোবা-বধূটি বিরহিণী, আমাদের এই আমি-টার পিয়াসিনী অর্থাৎ আনন্দ জ্ঞানের পিয়াসী। জ্ঞান না থাকায় এই বোবা-বধূটি স্বরূপগত আনন্দের অনুভব করিতে পারিতেছেন না এবং কথাও কহিতে না পারিয়া বোবা হইয়া রহিয়াছেন। আনন্দস্বরূপিণী বা মহাশক্তিময়ী এই বোবা-বধূটি শুধু জ্ঞানের অভাবে বা বিরহে স্বরূপগত আনন্দের সার্থকতা খুঁজিয়া না পাওয়ায় নিয়ত চঞ্চলা বা পরিবর্তনশীলা হইয়া নানা ভাবে অসংখ্য প্রকার চোখের সঙ্কেত অবিরত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁর এই চোখ-ইশারার তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্যই ত তাঁর এই বিরাট জগৎ-সংসারের রচনা! আমাদের এই আমি-টাও অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দের অভাবে বা বিরহে স্বরূপগত জ্ঞানের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া না পাওয়ায় শান্তি পাইতেছে না—তাই সর্বত্র ইহার এই অবিরাম ছুটাছুটি বা খুঁজাখুঁজি। সেই জন্যই ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই এই জগৎ-সংসারকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে বা বোবা-বধূটিকে নিশি-দিন অবিরাম নানা ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বুঝাটি ঠিক হইতেছে না বলিয়া আমাদের বুঝিবার চেষ্টার শেষ হইতেছে না, তাই কর্ম্মেরও অন্ত হইতেছে না, শান্তিও পাওয়া যাইতেছে না। ওগো ও রহস্যময়ী বোবা-বধূ!

"অয়ি প্রিয়তমে! কি কথা বুঝাতে চাও?
কিছু বলে' কাজ নাই; শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি' লহ গো সবলে
আমার আমি-রে। নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।"

—রবীন্দ্রনাথ

জ্ঞান ও আনন্দ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ জীব ও বোবা-বধূ, অনাদি কালের এই বিরহী যুগলের যেদিন এক সম্পূর্ণ মহামিলন হইবে, সেদিন আমাদের এই বোবা-বধূটির আর চোখ-ইশারা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না—সেই কারণ, তাঁর এই সব সংসার-রচনাও বন্ধ হইয়া যাইবে; আমাদের এই আমি-টারও তখন কিছুই আর অপ্রাপ্য বা অভাব-অভিযোগ থাকিবে না—তদ্ধেতু ইহার এই অবিশ্রাম ছুটোছুটি বা খুঁজাখুঁজিও বন্ধ হইয়া যাইবে। মহামিলনের সেই পূর্ণালিঙ্গন—

"শুধু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মত
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি।"

—রবীন্দ্রনাথ

সেদিন আমাদের বিরহসন্তপ্তা রসময়ী এই বোবা-বধূটি তাঁর চিরবাঞ্ছিত এই জ্ঞানের বুকের পূর্ণালিঙ্গন পাইয়া মহতী তৃপ্তির মোহন আবেশে অতিবিহ্বলতা বশতঃ ঢলিয়া পড়িয়া গলিয়া গলিয়া সর্বত্র সর্বময়ী হইয়া ছড়াইয়া পড়িবেন; আমাদের এই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভ্রান্ত আমি-টাও শরীররূপ এই অন্ধ, সঙ্কীর্ণ, নিরানন্দ কারাগার এবং চিত্তরূপ এই জড়, কঠোর, দুঃখদায়ী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বিপুলাহ্লাদে নিখিলবিস্মৃত ও আত্মহারা হইয়া দেশ-কাল-কার্য্য-কারণাদির সকল সীমার অতিক্রমণ করিয়া ঐ সর্বব্যাপিনী আনন্দময়ী মহাশক্তিকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন ও আত্মস্থ করিয়া এবং উঁহার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া অভেদে একাকার হইয়া জন্ম-মৃত্যু ও সর্ববিধ পরিবর্তনের পরপারে অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দ-রূপে চিরবিরাজ করিতে থাকিবেন—

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সেখানে আর অভাবও নাই, বাসনাও নাই, কর্ম্মও নাই, পরিবর্তনও নাই—অতৃপ্তি না থাকায় পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই নাই।

———সর্ব্বকাম
মহামিলনের মাঝে লভেছে বিশ্রাম!

তখন আর আমাদের এই লক্ষ্মীছাড়া আমি-টাই বা কোথায় এবং তখন আমাদের এই জাড্যময়ী বোবা-বধূটিই বা কোথায়! অর্থাৎ তখন আনন্দহীন জ্ঞানই বা কোথায়, জ্ঞানহীনা প্রকৃতিই বা কোথায়! সেখানে আর—

"স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, নাই তুমি-আমি।"

—অক্ষয় দত্ত।

তখন সেখানে যা থাকিবে, তা ঘৃতও নয়, ময়দাও নয়—লুচি; জলও নয়, মিছরিও নয়—সরবৎ। দুধও নয়, চিনিও নয়—রসগোল্লা; শুধু জ্ঞানও নয়, শুধু আনন্দও নয়, দুই-এ মিলিয়া এক—জ্ঞানময় আনন্দ বা আনন্দময়ী অনুভূতি। সদানন্দের সহিত নিত্যজ্ঞানের এই যে চিরমিলন—ইহাই সচ্চিদানন্দ (সৎ (নিত্য) + চিৎ (জ্ঞান) + আনন্দ); ইহাই হইতেছে সকল জীবের চরম আদর্শ, অন্তিম লক্ষ্য, পরমা গতি। মধুরেণ সমাপয়েৎ; ইহাই হইতেছে সকলের শেষ কথা—ইহা বর্ণনায় অযোগ্য ও কল্পনার অতীত অচলানন্দে চিরবিভোর, শুদ্ধ, অখণ্ড, একসার, একটানা এক অনুভূতি মাত্র। অনুভূতির শেষ সোপান—অবাঙ্মনসগোচরম্।

"———ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে
পিয়াসী মনের সাথে।"

—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় পতাকা-বন্দন

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস, বার-এট্-ল, মহাশয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থের স্বস্তিবাচন।

১

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজা ভজমানা দধানাম্।
চতুর্বিংশত্যংশভৃত্তত্ত্বচক্রাং
নমামস্তাং ভারতীয়াং পতাকাম্।

২

ব্রহ্মেশানানন্তরূপায়মানাং
মধ্যে কালং কালচক্রং বহন্তীম্।
কিয়ল্লোকোত্থাননাশৌ মিমন্তীম্
নমামস্তাং ভারতীয়াং পতাকাম্॥

৩

ত্রয়ীমঙ্গে সূচয়ন্তীং ত্রিবর্ণৈ-
র্ভক্তিং জ্ঞানং কর্ম্ম বার্য্যাত্রিমার্গম্।
মহাশক্তিং বিষ্ণুচক্রপ্রকাশাং
নমামস্তাং ভারতীয়াং পতাকাম্॥

৪

বৌদ্ধং জৈনং খৃষ্টমাহম্মদৌ বা
ত্রিভির্বর্ণৈর্বর্ণয়ন্তীং ত্রিবর্ণীম্।
অশোকস্বং ধর্ম্মচক্রং মৃশন্তীং
নমামস্তাং ভারতীয়াং পতাকাম্॥

৫

ভূমিং শস্যশ্যামলাং দর্শয়ন্তী
জ্ঞানং শুভ্রব্রহ্মাত্মচক্রং শ্রয়ন্তী।
স্বাতন্ত্র্যাখ্যং নবরাগং স্পৃশন্তী
জয়ত্যেষা ভারতে বৈজয়ন্তী॥

৬

স্বতন্ত্রত্বং সত্ত্বতং বোধয়ন্তী
গর্ব্বং প্রাচ্যং সর্বতো দীপয়ন্তী।
শান্তিং চক্রন্ বিশ্বচক্রং নয়ন্তী
জয়ত্যেষা ভারতে বৈজয়ন্তী॥

৭

কালং মৃত্যুং নিম্নভূমৌ ক্ষিপন্তী
শৌর্য্যং সৌরালোকবদ্ ভাসয়ন্তী।
উদ্যল্লক্ষ্মীকান্তিমুচ্চৈর্ভজন্তী
জয়ত্যেষা ভারতে বৈজয়ন্তী ॥

১

নমি ভারতীয় পতাকায়
গৈরিক ধবল শ্যাম-তিন বর্ণ শোভিছে ক্রমিক,
শ্রুতিগীত গুণময়ী প্রকৃতির ইহাই প্রতীক।
রক্ষিছে সে জনতায়—যে লয় শরণ তায়,
প্রাচ্যের প্রাচীন তত্ত্ব চক্রে শোভে চব্বিশ রেখায় (১)

২

নমি ভারতীয় পতাকায়—
রূপে যার ব্রহ্মা শিব অনন্তের বরণ মিশায়
অঙ্গ 'পরে বিরাজিত কালচক্র কাজল আভায়
উত্থান-পতন কত—জাতি ভুঞ্জে অবিরত,
দাঁড়ায়ে সে সাক্ষিরূপে হেরিতেছে ভারত ধরায় ॥

৩

নমি ভারতীয় পতাকায়—
ত্রিবর্ণ প্রকাশে আভাসে জানায়—ঋক্ যজুঃ সাম
এই তিন বেদ—যেন ত্রিসন্ধ্যার বর্ণের সমান।
আর্য্য সাধনার মর্ম্ম—ভক্তি জ্ঞান আর কর্ম্ম
পার্থ-সারথির দীপ্ত সুদর্শন চক্র শোভে তায় ॥ (২)

৪

নমি ভারতীয় পতাকায়—
বৌদ্ধের গৈরিক, জৈন-শ্বেতাম্বর শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান,
শ্যামল-হরিৎ যাহে মুস্‌লিমের বর্ণ দীপ্যমান।
অথবা ত্রিবর্ণে রটে—বর্ণভেদ অকপটে
মহারাজ অশোকের ধর্ম্মচক্র অঙ্কে শোভা পায় ॥

৫

ভারতীয় পতাকার জয়—
নিম্নে হেরি শস্যচ্ছায়ে শ্যামবর্ণা ভারত ধরণী!
যা হ'তে উঠিল শুভ্র আত্মজ্ঞান-দীপ্তি সনাতনী।
নিজ রাষ্ট্র চক্রচ্ছলে, হের—ঘর্ঘরিয়া চলে (৩)
স্বাধীনতা-উষারাগ উর্দ্ধভাগে ছড়াইয়া রয় ॥

৬

ভারতীয় পতাকার জয়—
সতত স্বাধীন-ভাব উদ্বোধিতে প্রকাশ যাহার,
উদ্দীপিত করে যাহা মধুরিমা প্রাচ্য মহিমার।
অশান্ত চঞ্চল বিশ্ব—চক্রসম হয় দৃশ্য
দেয় তারে নিজ বক্ষে শ্বেতচিহ্ন চিরশান্তিময় ॥

৭

ভারতীয় পতাকার জয়—
কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যুরূপী, নিক্ষেপিয়া তারে ভূমিতলে
শৌর্য্য সম সৌরালোক শুভ্রদ্যুতি উপরে উছলে।
গৌর কান্তি—জয়শ্রীর, উচ্চে স্ফুরে চিরস্থির
অনুকূল ভাগ্যচক্র সৃষ্টি করে বিশ্বের বিস্ময় ॥

---

(১) ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম দর্শন—সাংখ্যদর্শন। উপনিষদ্ ইহার মূল, যথা—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদি শ্বতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র। এই মন্ত্রে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ পর পর উল্লিখিত হইয়াছে। লোহিত—রজোগুণ, শুক্ল সত্ত্বগুণ এবং কৃষ্ণ—তমোগুণ। এই তিন গুণের সমষ্টি হইলেন প্রকৃতি। জতীয় পতাকায় ঠিক্ সেই ক্রমেই বর্ণ তিনটি সাজান হইয়াছে। সুতরাং এই পতাকা সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির প্রতীক। এই পতাকার মধ্যস্থিত চক্রটিতে চব্বিশটি পাখ আছে—কেন? কারণ, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে বাদ দিলে আর যে কয়টি তত্ত্ব (elements) স্বীকার করা হইয়াছে—তাহার সংখ্যাও চব্বিশ। সম্রাট্ অশোকের ধর্ম্মচক্রে এই সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বানুরূপ তত্ত্ব স্বীকৃত হইত বলিয়াই তাহাতে চব্বিশটি রেখা দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন মহারাজ অশোকের বহু পূর্ব্বেই ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন দর্শনানুসারেও এই 'জাতীয় পতাকা প্রাচীন ভারতের জাতীয়তার গৌরব বহন করিতেছে।

(২) হিন্দুর সর্ব্বস্ব হইল বেদ। বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। ঋক্ যজুঃ ও সাম লইয়াই ত্রয়ী। অথর্ব্ব বেদ ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে। ঋগ্বেদ—উদীয়মান সূর্য্যের সহচারিণী গায়ত্রীর সঙ্গে থাকেন; যজুর্ব্বেদ—মধ্যাহ্ন সূর্য্যসহ বিহারিণী সাবিত্রীর সহিত এবং সামবেদ সায়ংকালীন রাত্রিমুখী সরস্বতীর সহিত থাকেন বলিয়া—গৈরিক, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণে তিন বেদেরও সূচনা করা হইয়াছে। ভক্তি—ঈশ্বরানুরক্তি, জ্ঞান,—স্বচ্ছতা এবং কর্ম্ম আবিলতার নিদর্শন ধারণ করে বলিয়া পতাকায় রক্তিমা, শুভ্রতা ও শ্যামলতার দ্বারা গীতা-কথিত ঐ তিনটি সাধন-মার্গের আভাস প্রকাশিত। মধ্যে যে চক্র আছে—তাহা গীতা-বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র। ইহাতেও প্রাচীন ভারতের জাতীয় ভাবধারার গৌরব রক্ষিত হইতেছে।

(৩) চক্রশব্দ রাষ্ট্র অর্থেও উল্লিখিত আছে। জাতীয় পতাকার আট প্রকার অর্থ এই শ্লোকগুলিতে দেওয়া হইয়াছে।

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

২

সংবাদপত্র মানুষের মনে বেশ রেখাপাত করতে পারে, সে জন্য যাদেরই একটু সামর্থ থাকে তারাই স্ব-স্ব স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সংবাদপত্রগুলিকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে রাখার জন্যে বড়ই ব্যগ্র থাকে। সে কথা আমি পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু তা বলে কি স্বাধীন মতাবলম্বী সংবাদপত্র আমেরিকাতে নাই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা খুঁজে বের করা বড়ই কষ্টকর কাজ। এক দিন এক স্থানে সংবাদপত্র বিক্রি দেখতে দাঁড়াই। শুধু আমি একাই দাঁড়িয়ে ছিলাম না, অনেক আমেরিকানও দাঁড়িয়েছিল।

সংবাদপত্র বিক্রি করছিল একটি কুকুর। কুকুরটি ষ্টলের দরজা আগলিয়ে শুয়েছিল। যেই সংবাদপত্র উঠাচ্ছিল সেই সংবাদপত্রের দাম দেয় কি দেয় না কুকুরটা দেখছিল। কুকুরটাকে ক্ষেপাবার জন্য অনেকে মূল্য না দিয়েই চলে যাবার চেষ্টা করে। যেই ক্রেতা মূল্য না দিয়ে পথের দিকে পা এগুতে যায় অমনি কুকুরটা দৌড়ে যেয়ে সেই ক্রেতার পা কামড়ে ধরে। অবশ্য শক্ত করে কামড়ায় না। সংবাদপত্রের মূল্য দিয়ে দিলেই কুকুরটি ক্রেতার পা ছেড়ে দিত। বিষয়টা দেখে আমারও একখানা সংবাদপত্র কেনার ইচ্ছা হল। সংবাদপত্র শুধু এক দামেরই বিক্রি হচ্ছিল। কুকুরটিকে বোধ হয় পাঁচ সেণ্টের নিকেল মুদ্রাই শেখানো হয়েছিল, সে জন্য শুধু পাঁচ সেণ্ট দামের সংবাদপত্রই সেখানে রক্ষিত হয়েছিল। মজা দেখবার জন্য পাঁচ সেণ্ট দিয়ে আমিও একখানা সংবাদপত্র কিনলাম। অবশ্য পথে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র পড়া কোন কালেই আমার অভ্যাস ছিল না। সে জন্য সংবাদপত্রখানা ভাঁজ করে পকেটস্থ করলাম। কুকুরটার কার্য্যকলাপ আরও অনেকক্ষণ দেখে অবশেষে স্থান ত্যাগ করলাম। রাত্রে হোটেলে এসে সংবাদপত্রখানা খুলে দেখলাম, যুদ্ধের সংবাদের কলমে মস্ত বড় করে লিখা রয়েছে **N-I-L.** অর্থাৎ সংবাদ দেবার মত কিছুই নেই। এই সংবাদপত্র অনেকগুলি লোক মিলে কোপারেটিভ মতে পরিচালনা করে। সংবাদপত্রের নাম হল 'পিপলস্ ওয়ার্ল্ড'।

আমেরিকাতে স্বাধীন ভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করা বড়ই কষ্টকর কাজ। ভাল ভাল প্রবন্ধ পেতে হলে বেশ মোটা টাকা দিতে হয়। বিজ্ঞাপন যোগাড় করতেও বেশ পরিশ্রম করতে হয়। তবুও প্রায়ই নূতন সংবাদপত্রের জন্ম হয় এবং পুরাতন সংবাদপত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পাওয়া যায়।

কুকুরের সংবাদপত্র বিক্রি করা দেখে ভাবলাম, এমনতর আরও আজগুবি কিছু দেখতে পাব যদি আর্থারের সাহায্য লই। সে জন্য সোজা আর্থারের বাড়ীতে চলে গেলাম। আর্থার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর পাতানো পিতা এবং স্ত্রী-পুত্র বাড়ীতে ছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র আর্থারের ছোট ছেলেটি দৌড়ে কাছে এল এবং বলল, "বন্ধু, কেমন আছ?" তাকে কোলে নিয়ে বললাম, "বেশ আছি বন্ধু, চল তোমার মায়ের কাছে যাই।" আর্থারের স্ত্রী তখন বিকালের খাদ্য তৈরী করছিলেন। পাক্-ঘরে গিয়েই বসলাম।

ইউরোপীয় প্রথা মতে বিশেষ পরিচিত লোক ভিন্ন আর কাউকে পাক-ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। আর্থারের সংগে আমার বিশেষ পরিচয় হয়, সে জন্যই তার পাক-ঘরে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছিলাম।

আর্থারের স্ত্রীর সংগে যখন কথা বলছিলাম তখন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি দু'বার আর্থারের জীবনী পড়েছেন, এখন বলুন ত, তা'তে কি বিশেষত্ব আছে?"

—"বিশেষত্ব আছে তার মধ্যে অনেক, কিন্তু এইটুকুই বুঝেছি, যদি মানুষ কাজ পায় এবং উপার্জন করতে পারে, তবে অতি সহজেই ভাল মানুষে পরিণত হতে পারে।'

আর্থার-পত্নী বললেন, "আর্থার কিন্তু বড়ই ভয় খেয়ে গেছে। তার এক মাত্র ভয়ের কারণ হল, কি জানি তাঁর ছেলের সেই দুর্দ্দশা হয়, যে দুর্দশা হতে তিনি মুক্ত হয়েছেন। সে জন্যই তিনি প্রগতিশীলদের সংগে নানারূপ জটিল পরামর্শ করেই দিনাতিক্রম করেন, কিন্তু কাজে কিছুই হচ্ছে না। আর্থারের জীবনী পড়ে আপনি ঘাবড়িয়ে গেছেন, কিন্তু জানেন না, আমাদের দেশে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল তাদের বলা হত 'হবো।' এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন হবো আর দেখতে পাওয়া যায় না। হবোরা কোন কাজ করতে রাজী হত না। পায়ে হেঁটে, ট্রেণে লুকিয়ে এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়ে নানারূপ কুকর্ম করে সময় কাটাত। অনেকে উপবাস করে মরত। যখনই কেউ তাদের কাজের নিন্দা করত তখন তারা বলত 'এড্ভেনচার করছি, এতে দোষ কি আছে?' অবশ্য এদের আত্ম-জীবনী আপনার না পড়লেও চলবে। কিন্তু যে ষ্টেট্ এরূপ লোককে বিনা বাধায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে দেয় এবং যে সমাজ এরূপ অলস লোককে খেতে দেয়, সেই সমাজ যদি শিক্ষিত বলে দাবী করে তবে তা কি সহ্য করা যায়? নিশ্চয়ই না। আনন্দের সহিত বলছি 'হবো' আর নেই। এখন পথে-ঘাটে বেকার দেখতে পাওয়া যায়। এই বেকারের দল হবো হতেও জঘন্য কাজ করতে রাজী হয়। কথা হল যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে **'Right to work'** নিয়ম প্রচলন না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা স্বর্গরাজ্যে বাস করেও নরক-যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি।

"হলিউড্ হতে আরম্ভ করে মামুলী নাগরিক-জীবন পর্য্যন্ত যেখানে ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করতে হয়, সে স্থানকে কি স্বর্গরাজ্য বলা যেতে পারে? আপনাকে যদি কোন কাজের যোগাড় করতে হয় তবে সর্ব্বপ্রথম যেতে হবে সেই লোকটির কাছে, যে লোকটা লোক নিযুক্ত করে। হয়ত সে তখন অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেললেন, 'হবে না'। কাজ-প্রার্থীর কাজ না হওয়া মানেই উপহাস করা। যে দেশের জল বদ্‌হজম দূর করে, সে দেশে যদি খাদ্যাভাব হয় তবে লোক দাঁড়ায় কোথায় বলুন ত? আমরা এখন আর এ সব বিষয় নিয়ে অগ্রসর হব না। হয়ত আর্থার এসে পড়বেন। আর্থার আপনাকে হলিউডে নিয়ে যাবেন, সে কথা আমাকে বলেছেন, দেখবেন ম্যাকি কনির মত লোকও কত দরিদ্র, তাকে কত হীনতা স্বীকার করতে হয়। এখন ভাল করে সানফ্রান্সিস্কো দেখে নিন, তার পর আপনাকে

সাইকেলেও কিছুটা ভ্রমণ করতে হবে, নতুবা বুঝতে পারবেন না, নন্দনে কিরূপে নরকের সৃষ্টি হয় ?"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আর্থার ফিরে এসে আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন. "আপনার গেখোতে গিয়েছিলাম, সেখানে একখানা পত্র রেখে এসেছি। যা হউক, আপনাকে আগামী কল্য বিকালে একটি লেকচার দিতে হবে। সেখানে অনেক বিদেশী লোক থাকবেন। অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ড, কেনেডিয়ান, সাউথ আফ্রিকান, লেটিন্, আমেরিকান্ ইত্যাদি। বলার বিষয়-বস্তু হবে ভ্রমণ।" সাদরে আর্থারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং আর্থারের স্ত্রীর অনুরোধে সেখানেই রাত্রের খাবার খেতে রয়ে গেলাম। আমেরিকাতে সময়ের মূল্য খুব বেশী, সে জন্য অপরের ঘরে নিমন্ত্রণ খেয়ে সময় নষ্ট করে শুধু অকেজো লোকই আমিও অকেজো লোকই ছিলাম, সে জন্য সময় নষ্ট করতে রাজী ছিলাম।

আমরা ভাবি, আমেরিকানরা যা খায় তা এত পুষ্টিকর যে, তা আমরা ধারণাও করতে পারি না। সেই ভাবাপন্ন হয়ে যারা আমার 'হাঁ, না', দু'টি কথার উপর নির্ভর করেন, তাঁদের 'হাঁ' বলেই সন্তুষ্ট করি। বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকাতে কোনরূপ ভেজাল জিনিষ বিক্রি করতে দেওয়া হয় না বলেই আমেরিকার লোক যা খায় তাই হজম করতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল থাকে। আমাদের দেশ থেকেও যে দিন ভেজাল দ্রব্যের লোপ হবে, সে দিন থেকে আমরাও স্বাস্থ্যবান হ'ব।

রাত্রে খাবারের টেবিলে গিয়ে দেখলাম, মাত্র আলুসিদ্ধ, মাখন, কপিসিদ্ধ এবং কয়েক টুকরা মাছ-ভাজা টেবিলে রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রচুর পরিমাণে ঘন দুধ এবং ব্রাউন রুটিরও সমাবেশ ছিল। সামান্য আলুসিদ্ধ এবং কপিসিদ্ধের সংগে মাছ-ভাজা খেয়ে সকলেই দুধ-রুটি পেট ভরে খেল! আমেরিকার সর্বত্রই দুধ-রুটির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় ধনীরাও দুধ-রুটি খেয়েই সুখী থাকেন।

পরের দিন যথাসময়ে সভাতে গেলাম। সভা হয়েছিল একটি বড় হলঘরে। সেখানে নানা জাতের লোকের সমাবেশ দেখে সুখী হয়েছিলাম। প্রথমতঃ, সভার কার্য্য আরম্ভ হবার পরই এক জন লম্বা মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন, মিষ্টার অমুক ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে লেকচার দেবেন। ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে লেকচার দেবার জন্য অনেক ভদ্রলোকের সমাবেশ হয়েছিল। যার নাম করা হল, তিনি এক জন আমেরিকান এবং বিশেষ গণ্যমান্য লোক। উপরন্তু তিনি এক জন নাবিক। আমাদের দেশে যদি কোন চাটগাঁয়ে খালাসী আমেরিকা সম্বন্ধে লেকচার দিতে দাঁড়ায়, তবে আমরা সর্বপ্রথমই ভাবব, এই লোকটা নিরক্ষর, সে বুঝবেই বা কি আর বলবেই বা কি? আমেরিকার খালাসীরাও প্রায় তদ্রূপই? লেখাপড়ার খুব কমই ধার ধারে। এমতাবস্থায় নাবিককে প্রথম বক্তা হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় সেখানে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, কিন্তু বক্তা যখন নিজের পরিচয় গোপন রেখে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে উদ্বৃত বাক্যগুলি বলে যেতে লাগলেন তখন মনে হল, ভদ্রলোক পেশাদারী নাবিক নন, শিক্ষিত লোক।

সভা শেষ হয়ে গেলে বক্তাদের একটি ছোট্ট সভা হল। তাতে ছিলেন সভার উদ্যোক্তা এবং বক্তাগণ, একে অন্যের সংগে পরিচিত হবার পর আর্থার খালাসীকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "মিষ্টার জন্সন্ 'হাটস্চেন' পত্রিকাগুলিতে সহকারী সম্পাদকের কাজ করতেন, কিন্তু তিনি ভারতবাসীর প্রতি বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকায় চাকরী হতে বরখাস্ত করা হয়। চাকরী হতে বরখাস্ত করার পর তিনি খালাসীর কাজ করে কলিকাতায় পৌছেন (He was a working passenger)। এবং সেখানে পৌছে নিজেকে এংলো-ইণ্ডিয়ান পরিচয় দিয়ে সমুদয় ভারতবর্ষ কম খরচে দেখতে সক্ষম হন। যত দিন তিনি ইণ্ডিয়াতে ছিলেন, পারতপক্ষে কখনও তিনি আমেরিকান বলে নিজেকে পরিচয় দেননি। অবশেষে বম্বেতে পৌছে এক দিন একটি ছোট্ট ক্লাবে নিজের পরিচয় দেন এবং খালাসীর কাজ করেই দেশে ফিরে আসেন। এবার তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা বই সত্বরই লিখবেন এবং পুনরায় এশিয়াখণ্ডের কোথাও বেড়াতে যাবেন।"

ভদ্রলোক আমাদের দেশ সম্বন্ধে এত সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন যে, সে সব সংবাদ আমরাও রাখি না।

আমেরিকায় সংবাদপত্র-সেবী বলে কোনও জীব দেখতে পাওয়া যায় না। তারা এ পর্য্যন্ত বোঝে যে মজুরী রয়েছে অতএব তার মূল্য পেতে হবেই। এখানে সেবা বলে কিছুই নেই। সেবার দিন অনেক বৎসর আমেরিকা হতে চলে গেছে। সে জন্য জারনেলিষ্টদের মধ্যে চাকরী পাওয়াতে যেমন আনন্দ নেই যাওয়াতেও তেমনি দুঃখ নেই। আমেরিকার জারনেলিষ্টদের মধ্যে যখন আর্থার তার আত্মকাহিনী বিবরণ করেছিলেন, তখন আমিই বললাম, আমেরিকার মত সভ্য দেশে গ্রেপস্ বয়-এর জীবন-চরিত গড়ে উঠা ভয়ানক অন্যায়। আমার কথায় সকলেই সায় দিলেন এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। এখানে আর্থারের চুম্বক-জীবনী দেওয়া গেল এবং পরে বলা হবে, আর্থার আমেরিকাতে কি পরিবর্ত্তন এনেছিলেন।

"আমার নাম আর্থার। জন্মভূমি চিকাগোর এক ছোট পল্লীতে। যাদের টাকা-পয়সা থাকে তাদের পল্লী-জীবন বড়ই আরামের। আমাদের জীবনযাত্রা আরামের ছিল না, কারণ আমার বাবা ছিলেন মামুলী দিন-মজুর। সাপ্তাহিক ঘরভাড়া দেওয়ার পর যা বাঁচত তাতেই আমাদের খাই-খরচ চালাতে হত। মা ছিলেন বড়ই মিতব্যয়ী। সে জন্য অভাব অনুভব হত না বটে তবে অন্যান্য ছেলেদের মত সিনেমা অথবা বন-ভোজনে যেতে পারতাম না। আমাদের পরনের স্যুট মামুলী থাকার জন্য পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা আমাদের কাছেও আসত না, এতে বড়ই অসুবিধা হত। অনেকে আমাদের ঘৃণা করত এবং বলত, যদি এখানে থাকতে হয় তবে মানুষের মত থাকতে হবে। আমাদেরও মানুষের মতই থাকতে ইচ্ছা করত, কিন্তু সে অবস্থা আমাদের ছিল না যাতে করে বড় বড় চাকুরিয়ার ছেলেমেয়েদের সম ভাবে আমরা চলতে পারি।

"আমার ঠিক মনে আছে সে দিনের কথা—যখন আমি উনিশ বৎসরে পদার্পণ করি। তখন হুভার ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আমার বাবার চাকরী চলে যাওয়ায় খাদ্যাভাব লেগেই ছিল। সরকারী রুটির উপর আমাদের নির্ভর করতে হত। ক্রিস্মাস্ আসল। ধনী এবং মিশনারীরা খাদ্য পাঠালেন। আমার মা দানের খাদ্য সবাইকে ভাগ করে দিলেন। আমি সে খাদ্যে তৃপ্ত হই এবং সেজন্য রাত্রে ঘুম বেশ হয়েছিল। অন্যান্য দিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম হত না। শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, জন্ এসে আমাকে ডাকছে। আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সে বলছিল, 'আর কেন এখানে থাকছ, চল এবার আমরা কালিফরনিয়াতে যাই। সেখানে আঙুরের বাগানে কাজ পাব এবং পেট ভরে খেতে পারব। চিকাগো দরিদ্রের বাসস্থান। এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে।'

"ঘুম হতে উঠেই জনের বাড়ীর দিকেই রওয়ানা হই। তার বাবারও চাকুরী ছিল না এবং তাদেরও খাবার ছিল না। জন ঘরেই ছিল। সে আমায় দেখেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'গত পরশু তোমার কাছে যে প্রস্তাব করেছিলাম তাতে যদি রাজী হও তবে আর দেরী করে লাভ নেই। আজই রওয়ানা হওয়া যাক্।' আর্থার জনের কাছে গতরাত্রের স্বপ্নের কথা বলল। উত্তরে জন বললে, 'আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তুমি বেশি করে ভেবেছিলে বলেই স্বপ্নেও তাই দেখেছ। তুমি বস, আমি কিছু খাদ্য এবং সামান্য বস্ত্র নিয়ে এখনই বের হব। আমার মা-বাবা বিদেশে যাবার জন্য আদেশ দিয়েছেন।' জনের বাবা ঘরে ছিলেন না। সে জন্য জন একটুও দুঃখিত হল না। সে তার মায়ের কাছ থেকেই বিদায় নিল এবং তার মায়ের গণ্ডদেশে ছোট দু'টি চুমু খেয়ে বললে, 'বিদেশে যেয়ে তোমার জন্য টাকা পাঠাব মা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।' জনের মা ছেলেটিকে আঁকড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু দিয়ে বিদায় নিলেন।

"জন্ এবং আর্থার উভয়ে মিলে আর্থারের ঘরে এসে ঢুকল। জনের হাতে একটু পুটুলী, পরনে একটা ভাল পোষাক। জনের নূতন নেক্‌টাইটা লক্‌লক্ করছিল। জন্‌কে দেখেই আর্থারের মা-বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'জন্ কোথায় যাচ্ছ?' জন্ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, 'কালিফরনিয়াতে যাচ্ছি।' আর্থারের মা জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেখানে কি কোন কাজ পাবে জন্?' জন্ গম্ভীর হয়ে বললে, 'সে আমাদের ভাগ্য। এখানে খেতে পাচ্ছি না, একবার বিদেশে গেলে দোষ কি? উনিশ বৎসর বয়স হয়েছে, এখন সাবালক হয়েছি, আর কত দিন মা-বাবার ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকব?' বৃদ্ধ বললেন, 'ঠিক বলেছ, আমার পুত্র আর্থারকে তোমার সংগে নিয়ে যাও।' জন্ বললে, 'তার যদি কোন ভাল পোষাক থাকে তবে দিয়ে দিন। আমি যে খাদ্য সংগে নিয়ে যাচ্ছি তাতে আমাদের দু'দিন আরামে চলে যাবে। আপনারা যদি আরও খাদ্য দেন তবে বোঝা মস্ত বড় হয়ে যাবে। হিচহাইক করে আমাদের লস্ এঞ্জেলস্ যেতে হবে। সে জন্য খাদ্যের বড় বোঝা কোন মতেই সংগে রাখা ভাল হবে না। এতে ফল হবে, দুর্দান্ত ছেলেদের কাছে ডেকে নিয়ে আসা।'

"দুর্দান্ত ছেলেদের কথা আমেরিকার প্রায় লোকই জানে, সে জন্য আজকাল এদের সায়েস্তা করার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এদের কথা অন্যত্র বলা হবে"।

"আর্থারের মা তাড়াতাড়ি করে ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক হতে একটা পুরাতন স্যুট বের করে আর্থারের হাতে দিলেন। আর্থার তাই পরল। পুরাতন স্যুটটা তাকে মানাল না, তবুও আর্থার তাতেই তৃপ্তি অনুভব করল এবং জনের মত তার মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে চলে আসল। আর্থার যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার মায়ের দু' ফোঁটা অশ্রু মাটিতে পড়তে দেখেছিল। মায়ের অশ্রু সে অনেক বার দেখেছিল কিন্তু এই বিদায়কালীন অশ্রু আর্থারকে শোকাতুর করেছিল। পথে এসে আর্থার ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে। জন তাকে কাঁদতে নিষেধ করল এবং হাত ধরে ষ্ট্রীটের মোড় ফিরেই ষ্ট্রীট্-কারে করে চিকাগোর আটচল্লিশ নম্বর ষ্ট্রীটের দিকে রওয়ানা হল। জনের সংগে মাত্র দশ সেন্ট ছিল. সেই দশ সেন্ট 'ষ্ট্রীট-কারের খরচেই শেষ হয়ে গেল। তারা যখন আটচল্লিশ নম্বর ষ্ট্রীটে গিয়ে থামল তখন তাদের কাছে আর একটি সেন্টও ছিল না। ষ্ট্রীট-কার হতে নেমেই জন্ একগাল্ হেসে যখন আর্থারের দিকে তাকাল তখন দেখতে পেল, আর্থারের মুখ শুকিয়ে গেছে। এরই মাঝে জন্ যেন হেংলা হয়েছে।

"আর্থারের ডান হাতটা ধরে জন্ বললে, 'তুমি পুরুষ মানুষ, সে কথা মনে আছে আর্থার? ঘাবড়িয়ে গেলে চলবে না, যদি ক্ষুধা পেয়ে থাকে তবে চল পার্কে গিয়ে বসি এবং উভয়ে মিলে কিছু খাই।'

"না জন্, আমার ক্ষুধা হয়নি, শুধু মায়ের কথা মনে হচ্ছে।' জন্ বললে, 'হঁ, মায়ের কথা বলছ, চল, ঐ যে দেখছ লোক জড় হয়েছে তাতে অনেক বুভুক্ষু মা রুটির জন্য কেমন করে ছটফট করছেন তা দেখা যাক্। তোমার মা-বাবা এখনও ঘরের মধ্যেই থাকতে পারছেন। চল, আমার সংগে, দেখবে কত মা-বাবা ঘর-ভাড়া না দিতে পেরে সাবওয়েতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সংখ্যা গুণেও শেষ করতে পারবে না।'

"জন্ আর্থারের হাত ধরে জনতার দিকে এগিয়ে চলল। জনতা নির্বাক্ হয়ে লেকচার শুনছিল। বক্তা বলছিলেন, 'যদি এমন করে আমাদের বাঁচতে হয়, তবে মরাই ভাল। প্রেসিডেন্ট হুভার আমাদের সর্বস্বান্ত করতে বসেছেন। যার দৈনিক আয় ছিল তিন ডলার তাকে মাত্র ত্রিশ সেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এদিকে রুটির দাম, ঘরের ভাড়া, বস্ত্র—এ সাবের দাম যেমন ছিল তেমনি আছে। আমাদের কি উপবাস করে মরতে হবে? বন্ধুগণ, উপোস করে মরার পূর্ব্বে বিদ্রোহ করা চাই, বিদ্রোহ দীর্ঘজীবী হউক।' সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'বিদ্রোহ দীর্ঘজীবী হউক।' জন্ এবং আর্থার উভয়েই নির্বাক্ ছিল কিন্তু যখন পুলিশের গুলীতে বক্তা মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জন্ এবং আর্থার সমস্বরে চিৎকার করে বলল, 'বিদ্রোহ দীর্ঘজীবী হউক।' তার পরই আরম্ভ হল বেটন চার্জ। জন আর আর্থার দাঁড়িয়ে থাকল না, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল এবং নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

"রেঁস্তোরায় একটি সিটও খালি ছিল না। উভয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। কতক্ষণ পর বয় এসে তাদের বসবার যায়গা করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কি দেব?'

তাদের কাছে একটি সেন্টও ছিল না। আর্থার জবাব দিল, 'কি আর দেবেন, আমাদের কাছে একটি সেন্টও নেই, পুলিশের ভয়ে এখানে চলে এসেছি।' তাদের অবস্থা দেখে বয় কি ভাবল, তার পর দু গ্লাস দুধ এবং রুটি এনে হাতে দিয়ে বললে, 'তোমরা এ সব খেয়ে ফেল, তোমাদের হয়ে আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি।' আর্থার দুধ রুটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু জন আর্থারকে বাধা দিয়ে বললে, 'তা হবে না জন্, আমরা পুরুষ, ভিখারী নই, দানের জিনিস আমরা খাব না। ছিনিয়ে খেলে পাপ হবে না, কিন্তু এ যে দান।' বয়কে ধন্যবাদ দিয়ে উভয়ে রেঁস্তোরা হতে বের হয়ে গেল। পথে অগণিত লোক চলেছে। প্রায় লোকই ভুখা। খাবারের দোকানে ঢুকছে আর মামুলী দু'-এক টুকরা রুটি খেয়ে চলে আসছে। সিগারেট কেনার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না, কিন্তু নেশাখোর সিগারেট-সেবীরা লজ্জাভয় পরিত্যাগ করে, পথ থেকে সিগারেটের ভুক্তাবশিষ্ট টুকরা খুঁজে নিয়ে তাই দিয়ে সিগারেট তৈরী করে খাচ্ছিল। অনেকে অপরের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে এবং সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে পথ চলছিল। জন্ এবং আর্থার সিগারেট খেত না, সে জন্য তাদের সিগারেটের জন্য চিন্তা করতে হয়নি।

[ক্রমশঃ

[কথা-চিত্র]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

জানালার গরাদে দু'টো দু'হাতে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন পীতাম্বর। কোচোয়ানের পদস্পষ্ট ঘণ্টার ধ্বনির সংগে গাড়ীর গতি-শব্দ তাঁর কাণে বাজতে লাগল; মনে হল—বুকের ছাতির উপরে জোরে জোরে কে বুঝি মুষলের ঘা দিচ্ছে।

তবে ত সমদ্দারের কথা মিছে নয়! চিঠিতে যা লিখেছে, নিজের চোখেও যে এইমাত্র তাই তিনি স্পষ্ট দেখলেন! চোখ-ঝলসানো রূপ, পরনে বাহারী শাড়ী, এক-গা গয়না—সোমত্ত বয়েস, অথচ সিঁথেয় সিঁদুর নেই! পীতাম্বরের বেশ মনে পড়ছে—বেহায়া মেয়েটার হাসি এখনো তাঁর যে দু'টো চোখের দৃষ্টিতে ভাসছে, সে দৃষ্টিতে মাথার কোথাও সিঁদুরের রেখাটিও ধরা পড়েনি। তবে? কোন্ ভদ্দর ঘরের মেয়ে অমন করে ধেয়ে এসে একটা জোয়ান ছেলের হাত ধরে টানাটানি করতে পারে—এই দিনের আলোয় একটা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে?··· তাহলে, এই মেয়েটাই সেই খেমটাউলি—নবীন সমদ্দার চিঠিতে যার কথা লিখেছে?

ভাবতে ভাবতে পীতাম্বরের দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথায় গিয়ে ওঠে! দু'হাতে মাথাটা টিপে সে বলে ওঠে: এই খেমটাউলির পয়সায় তাহলে মেগা নবাবী করছে, আর এই পাপের পয়সাই সে কি না··· ছি, ছি, ছি—এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্তও নেই!···

পীতাম্বর আর ভাবতে পারল না—চিঠিখানা মুড়ে দুমড়ে তক্তপোষের ওপর ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্তের মত ঘরখানার এদিক্ থেকে ওদিক্ পর্য্যন্ত অস্থির ভাবে বার কতক ছুটোছুটি করল। হঠাৎ ঘরের এক কোণে আলনায় ঝোলানো তার পুরানো ছাতাটার সংগে জড়ানো ময়লা কাপড় ও ফতুয়াটির উপর নজর পড়ল। অমনি তার মনে হ'ল—যে জামা গায়ে ঝুলছে, যে মিহি কাপড়খানা সে পরে আছে—সেগুলো তার নিজের নয়, মৃগেন দিয়েছে, আর তার জন্যে টাকা যুগিয়েছে ঐ খেমটাউলি মাগিটা! ছি-ছি-ছি, এখনো কি না পাপের পয়সায় কেনা জামা-কাপড় সে পরে রয়েছে! পীতাম্বরের মনে হল, সর্ব্বাঙ্গ বুঝি জ্বলে যাচ্ছে তার! তখনি ছুটে গিয়ে ছাতিটা সেই অবস্থায় আলনা থেকে নিয়ে এল, টেনে টেনে কাপড়খানা খুলে আলাদা করল; তার পর মৃগেনের দেওয়া ফরসা কাপড়, ফ্লানেলের নরম পিরাণ একে একে ছেড়ে ফেলে, সেই ময়লা কাপড়-জামা পরে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এর পরও—এই ঘর, এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত তার অসহ্য হল, অজ্ঞাতে যে পাপ করে ফেলেছে, তার ত আর চারা নেই, কিন্তু এখানে থেকে, সে পাপের বোঝা আর ভারি করবে কিসের লালসায়? আবার তার মাথা গরম হয়ে উঠল, আর কিছু না ভাবতে পেরে, কর্ত্তব্য, ভদ্রতা, হিতাহিত জ্ঞান—সব ঠেলে ফেলে পাগলের মত টলতে টলতে তিনি

উপহারের উপযোগী নানাবিধ সৌখীন জিনিস-পত্রে সীতার ঘরখানি ভরে গেছে। 'ছিন্নমস্তা' গীতাভিনয়ের বিপুল সাফল্যের জন্য নাট্যকারকে অভিনন্দিত করবার জন্যে যে সম্বর্দ্ধনা উৎসবে এই জিনিসগুলি উপহৃত হবে।

বৌরাণী, সীতা, অশোক—প্রত্যেকেই এক একটি উপহার স্বতন্ত্র ভাবে দেবে। নাট্যকার থেকে আরম্ভ করে, নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সুষ্ঠু অভিনয় করে যারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের জন্যও বহু উপহার-দ্রব্য কলকাতা থেকে কিনে আনা হয়েছে।

প্রত্যেক জিনিসটির সংগে এক এক টুকরো মোটা কাগজ ঝুলছে, যাকে উপহার দেওয়া হবে তার নাম তাতে লেখা আছে। একটি একটি করে প্রত্যেক জিনিসটি সীতা মৃগেনকে দেখাতে থাকে। সেই সংগে প্রশ্নও চলে—কেমন জিনিসটি বলুন? খুসি হবে ত? সে রাত্রে কি সুন্দর গেয়েছিল বলুন ত?

মৃগেনের পক্ষে সব কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। রাজবাড়ীর আসরে অভিনয়ের প্রসংগে কোন প্রশ্ন উঠলেই তাকে সন্তর্পণে সেটি এড়াতে হয়। কিন্তু সীতার মত চতুর মেয়ের কাছে বেশীক্ষণ আর এ ভাবে লুকোচুরি খেলা তার পক্ষে সম্ভব হয় না—অবশেষে তাকে স্বীকার করতে হল: দেখুন, তাহলে না বলে পারছিনে—রাজবাড়ীতে সে রাত্রে আমার যাওয়া হয়নি, অভিনয় দেখব কি করে বলুন?

সীতা ও অশোক উভয়েই যেন আকাশ থেকে পড়ে—যুগপৎ উভয়েই সবিস্ময়ে বলে উঠল: সে কি?

মৃগেন বুঝল, আর লুকাচুরি করে লাভ নেই—সব কথাই খুলে বলে ফেলাই ভাল, নতুবা শেষ পর্য্যন্ত পীতাম্বরের সামনেই রীতিমত অপ্রস্তুত হতে হবে। তাই সে তখন একটি একটি করে সব কথাই বলল। কেন সে রাত্রে রাজবাড়ীতে যায় নাই। পীতাম্বর কে—তার সংগে কি সম্বন্ধ তার। শুধু তাই নয়—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পীতাম্বরের কন্যা মায়ার প্রসংগ। এমন কি, যে সূত্রে সে অভিমান করে গৃহত্যাগ করে—তার কাহিনী পর্যন্ত সব কথাই শুনিয়ে দিল, কিছুই গোপন করল না

সীতা বলল: এ যে সেই পিদ্দিমের নীচেই অন্ধকার হল মৃগেন বাবু! আপনি নাটক লেখেন, চরিত্র সৃষ্টি করেন, আর নিজের নায়িকাটিকে ভুল বুঝলেন!

অশোক বলল: তা বলে অমন করে অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে আসা আপনার কিন্তু ঠিক হয় নি!

সীতা বলল: আপনার যেমন বুদ্ধি! অভিমান করে উনি যদি না নিরুদ্দেশ যাত্রা করতেন, তাহলে বৌরাণীর যাত্রার দলে ওঁর নাটক খুলত কে?

অশোক বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ—এটাও ভাববার মত কথা বটে! যাক্, তাহলে মৃগেন বাবুর জীবনে এরই মধ্যে রোমান্সের আলো পড়েছে বলুন! ঐ যে কে এক—কানায়ের কথা বললে না, ঐ ছোকরাই তাহলে আপনার শিল্পেশনন্দিনীর 'ওসমান' বলুন?

সীতা বলল: কিন্তু আপনি এমন চাপা তা কিন্তু জানতাম না মৃগেন বাবু! কিচ্ছুই ভাঙেননি ত নিজে থেকে, জেরা করে করে আমিই ত আপনার গুপ্তকথা বার করলাম। যাক্, ভালই হল—আমাদেরই কাজ একটু বাড়ল। কথা-শিল্পীর সংগে চিত্র-শিল্পীকেও সম্বর্দ্ধনা করা যাবে।

অশোক বলল: কিন্তু তার আগে চিত্র-শিল্পীর চোখের সামনেও আলো ফেলা উচিত ত? তিনি যে এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে

সীতা বলল: হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কাজের কথা আপনি বলেছেন বটে! বেশ ত, তাহলে চলুন—তিন জনেই একসংগে যাওয়া যাক্, তিনি জানুন—তাঁর হবু-জামাই কেউ-কেটা নয়, আর ওঁর ঐ বন্ধুর কথা বাজে!

সীতা চাকরকে ডেকে গাড়ী বার করবার হুকুম দিল। একটু পরেই তিন জনে এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

৩৫

মৃগেনের বাসার সামনে গাড়ী এসে যখন থামল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পাচক ও চাকর পাকশালায় জটলা করছে—বাড়ীর ওপর-তলায় আলো পড়েনি। মৃগেনের আগেই সীতার তর্জনে চাকর আলো নিয়ে উপরে ছুটল। তার প্রায় পিছনে পিছনে উপরের আলোকিত ঘরখানায় ঢুকে তিন জনেই দেখল—তাদের একান্ত বাঞ্ছিত মানুষটি সেখানে নেই, ঘরের মেঝের ওপর একখানা চুল-পাড় ধুতি ছাড়া-অবস্থায় পড়ে আছে—তক্তাপোষে বিছানো সতরঞ্চির উপরে ফ্লানেলের পিরাণটিরও ঠিক সেই অবস্থা।

সীতা ও অশোক উভয়েই মৃগেনের মুখের দিকে তাকাল—মৃগেনের চোখ দু'টো পীতাম্বরের ছাড়া-কাপড় ও পিরাণটির উপর নিবদ্ধ হয়ে যেন কোন গভীর রহস্যের সন্ধান করছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে দ্বারের কাছে চাকরটি দাঁড়িয়েছিল। মৃগেন তাকে জিজ্ঞাসা করল: বুড়ো বাবু কোথায় গেছেন জানিস্?

সে উত্তর করল: না—আজ্ঞা।

—সন্ধ্যার আগে তাঁকে এ ঘরে দেখিছিলি?

—না আজ্ঞা।

—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্—সে জানে কি না।

চাকর চলে গেলে মৃগেন বলল: জামা-কাপড় ছেড়ে গেছেন দেখছি।

অশোক বলল: কিন্তু গেলেন কোথা?

হঠাৎ সীতার চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠল—সংগে সংগে এগিয়ে গিয়ে সতরঞ্চির কিনারা থেকে দোমড়ানো একখানা বাদামী রংয়ের কাগজে লেখা চিঠি তুলে নিল। সেখানা খুলতে খুলতে বলল: একটা সূত্র পাওয়া গেছে।

অশোক জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি?

ততক্ষণে সীতা মোড়া কাগজখানা খুলে পাঠ সুরু করেছে। পড়তে পড়তেই বলল: যার সন্ধানে আমরা এসেছি।

দু'জনেই নির্বাক্ দৃষ্টিতে সীতার দিকে চেয়ে রইল। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই চিঠিখানা শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে সীতা বলল: ব্যাপার গুরুতর! মৃগেন বাবু কুস্তি হতে গিয়ে নিজের পায়েই কুড়ুল মেরেছেন।

মৃগেন নির্বাক্। অশোক জিজ্ঞাসা করল: কুস্তি হয়েছেন—মানে?

চিঠিখানা মৃগেনের হাতে দিয়ে সীতা বলল: মহাভারত পড়েননি—কুন্তি কি রকম করে কথা চেপে রেখে নিজের সর্বনাশ করেছিল?

অশোকও এগিয়ে গিয়ে চিঠির উপরে ঝুঁকে পড়েছিল। পড়ার দেখি! শিরোমণিনন্দিনীকে মাত করতে খাসা চাল চেলেছে কিন্তু! হ্যাঁ মৃগেন বাবু, আপনার সে খেমটাউলিকে হারিয়ে এলেন কোথায়?

সীতা বলল: থামুন আপনি—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না—খেমটাউলির রহস্য আমি ভেঙে দিচ্ছি। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না—হঠাৎ আজ এ চিঠি উনি কি করে পেলেন?

এই সময় পাচক এসে জানাল যে, বিকেলে সে যখন চৌরাস্তায় পানের দোকানে বসেছিল, তখন বুড়ো বাবু সেখানে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় জন কয় দেহাতী লোক আসে, এক জনের সংগে তাঁর জানা শোনা ছিল—সেই লোক একখানা চিঠি বুড়ো বাবুকে দেয়। চিঠিখানা নিয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরে যান। তার খানিক পরেই বৌরাণীর গাড়ী আসে। গাড়ীর পিছনে বসেই সে বাজারে গিয়েছিল।

মৃগেন বলল: আজ বিকেলেই তিনি চিঠিখানা কারুর কাছ থেকে পেয়েছেন। বাড়ীতে এসে চিঠি পড়েই মন তাঁর বিগড়ে যায়। রগ-চটা মানুষ ত, রাগ আর বরদাস্ত করতে পারেননি। আমার দেওয়া কাপড়-জামা সব ছেড়ে চলে গেছেন!

অশোক বলল: কিন্তু তার আগে আপনাকে ত একবার জিজ্ঞাসা করাও তাঁর উচিত ছিল।

মৃগেন বলল: ওঁর স্বভাব ত আমি জানি। বৌরাণীমার দৌলতে আমার শ্রীবৃদ্ধির কথা কিছুই ত ওঁকে বলিনি, আমি জানি—এই নিয়ে উনি একটু ধোঁকায় পড়েছিলেন। তার পর এই চিঠি পড়েই—ওঁর মনে অন্ধ ধারণা হয়েছে; হয় ত ভেবেছেন—ঐ খেমটা-উলির টাকাতেই আমার এমন নপর-চপর—

সীতা নীরবেই এদের কথা এতক্ষণ শুনছিল, এই সময় সে মুখখানা শক্ত করে বলল: শুধু ভাবেননি মৃগেন বাবু, তাকে চোখে দেখেছেনও তিনি। উড়ো চিঠির খবর পড়েই এমন বাড়াবাড়ি কেউ করতে পারে না—যদি না চোখে দেখে।

অবাক্ হয়ে দু'জনেই সীতার মুখের পানে তাকাল। ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে মৃগেন বলল: আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—কিন্তু চিঠির ঐ খেমটাউলির কথা আমিও এই প্রথম শুনছি। অথচ আপনি বলছেন—অধিকারী মশাই না কি তাকে দেখেছেন!

কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়ে সীতা বলল: নিশ্চয়। নৈলে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই তিনি চলে যান? এখন রহস্যটা শুনুন—চিঠিখানা পেয়েই অধিকারী মশাই এই ঘরে এলেন। খাম খুলে চিঠি পড়েই রক্ত তাঁর গরম হয়ে উঠল। কি করবেন ভাবছেন—এমন সময় আপনি বাড়ীতে ঢুকলেন। সংগে সংগে আমিও গাড়ী থেকে নেমে আপনাকে এক রকম জোর করে গাড়ীতে নিয়ে গেলাম। এই ঘর থেকেই তিনি তা দেখলেন। চিঠির যে খেমটাউলি তাঁর মগজে ঘুরছিল, চোখের সামনে সে এল বাস্তব হয়ে। মনের সন্দেহ কেটে গেল সব—আর কি এখানে থাকতে পারেন তিনি! হবু-জামায়ের সংস্রব কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—আপনিও যেমন করে এক দিন আপনার বন্ধু কানায়ের সৌভাগ্য দেখে বৈরাগ্যের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন!

মৃগেন বলল: আপনি ঠিক ধরেছেন সীতা দেবী। আমার বেশ মনে হচ্ছে—এই কাপড়, এই জামা আজ তিনি পরেছিলেন।

যা ছিল—তাই পরে চলে গেছেন। এই ঘরেই সেগুলো ছিল, এখন ত দেখছি না। যাক্—আপনারা বসুন ত।

মৃগেন জামাটা তক্তপোষ থেকে তুলতেই তার পকেট থেকে একখানা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিখানার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এ সেই মায়ার চিঠি—পীতাম্বর এখানা পড়ে জামার পকেটেই রেখেছিল। মৃগেন চিঠিখানার শিরোনামা দেখেই চমকে উঠল। পড়ার সংগে সংগে তার মুখের আশ্চর্য পরিবর্তন সীতা ও অশোককে কৌতূহলী করে তুলল।

সীতা জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি এখানা মৃগেন বাবু?

মৃগেন উত্তর করল: মায়ার চিঠি—তার বাবাকে লিখেছে। এই চিঠিখানা যদি আজ সকালেও পড়তে পেতাম—

মৃগেনের স্বর এখানে রুদ্ধ হল, দুই চোখ তার অশ্রু-বাষ্পে ভরে গেছে।

সীতা বলে উঠল: ও কি, কেঁদে ফেললেন যে মৃগেন বাবু!

চিঠিখানা সীতার হাতে দিয়ে মৃগেন বলল; পড়ুন আপনি—তাহলে বুঝবেন।

সীতা ও অশোক দু'জনেই পড়ল সে চিঠি। অশোক বলল: ওর দোষ কি, আমারই কান্না পাচ্ছে। কত কষ্টেই এই ছত্রটা তিনি লিখেছেন ভাবুন ত—'দুঃখ এই যে, মৃগেন মশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া গেলেন'!

সমবেদনার সুরে সীতা বলল: কিন্তু এখন আফশোষ করে কোন ফল ত নেই মৃগেন বাবু! আপনাদের দু'টি প্রাণে যাতে মিলনগ্রন্থি না পড়ে তাই নিয়ে যে একটা রীতিমত চক্রান্ত চলেছে তাতে ভুল নেই। এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে—অধিকারী মশাইকে খুঁজে বার করা। গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে—হেঁটে তিনি আর কত দূর যাবেন? আর দেরী নয়—উঠুন।

তিন জনেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল। মায়ার চিঠির মর্মস্পর্শী কথাগুলি মৃগেনকে তখন অভিভূত করেছে—অভিভূতের মতই সে তাদের সংগে চলল।

৩৫

তখন খানিকটা রাত হয়েছে।

টলতে টলতে জনবিরল পথ ধরে চলেছেন পীতাম্বর। তাঁর ভগ্ন দেহ আশ্রয় করে বইছে দুশ্চিন্তা ও বিক্ষোভের একটা বিশ্রী ঝড়। কোথায় চলেছেন তার হিসাব নেই, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাউকে কোন প্রশ্ন নেই,—আপন মনেই চলেছেন।

সীতার জুড়ি চলেছে রাস্তা কাঁপিয়ে সবাইকে সচকিত করে। মাঝে মাঝে গাড়ীর গতি হ্রাস করে রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে দোকানী, পসারী বা পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে সীতা: একটি অচেনা লোককে যেতে দেখেছেন কেউ? লম্বা চেহারা—ফতুয়া গায়ে—হাতে ছাতা?

কে এক জন বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখিছি। ঘণ্টাখানেক আগে এই পথ ধরে গিয়েছে যেন—

গাড়ীর গতি আবার দ্রুত হয়।

দূরের রাস্তায় পীতাম্বরও চলে অবিশ্রান্ত গতিতে।

পথ এখন নির্জন। একটা তেমাথার সামনে আসতে পীতাম্বরের গতি রুদ্ধ হল। আর যেন পা চলে না—সর্বদেহ অবসাদে ঝিমঝিম করছে। কিন্তু তাকে যেতেই হবে—বিশ্রামের অবসর কোথায়। কিন্তু কোন পথে পা বাড়াবেন তিনি—বামে না দক্ষিণে?

ও কি? কিসের ও তীব্র ধ্বনি?…ভট্ ভট্ ভট্—

পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—ভট্‌ভটিয়া গাড়ী। এক সাহেব আসছে চালিয়ে। শংকায় তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতে গেলেন তিনি—সাহেবও মোটর-বাইক সামলাতে না সামলাতে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন পীতাম্বর। ভগ্নকণ্ঠ থেকে আর্তস্বর খসিয়ে উঠল: মা ব্রহ্মময়ি গো! সাহেবের বাইক তখন থেমে গেছে। ছুটে গিয়ে পীতাম্বরকে তুলে ধরলেন, গায়ের ধুলো ঝেড়ে হাত দু'টি ধরে আশ্বাস দিলেন: চীয়ার অফ্ মাই ওল্ড বয়—সংগে সংগে ফ্লাস্ক থেকে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন। চোখ মেলে চাইলেন পীতাম্বর।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন; কোথায় টোমার বাড়ী আছে বাবু?

ধীরে ধীরে পীতাম্বর উত্তর করলে: অনেক দূর সাহেব! বারাকপুর থেকে দশ ক্রোশ তফাতে শ্রীনগরে আমার বাড়ী।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে সাহেব বললেন: অল্ রাইট! আমিও বারাকপুরে যাবে—টুমিকে তোমার গোড়ে লইয়া যাবে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই সাহেব অপূর্ব কৌশলে ও ক্ষিপ্রহস্তে পীতাম্বরকে তুলে বাইক-সংলগ্ন বেতের কেরিয়ারে বসিয়ে দিলেন। পীতাম্বর আপত্তি করলেন, বাধা দিতে গেলেন, অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, সাহেব শুধু হাসেন—হাসতে হাসতে তাঁর বাইকে ষ্টার্ট দিলেন।

আবার ভট্ ভট্ ভট্ শব্দে রাতের নির্জন রাজপথ কাঁপিয়ে সাহেবের মোটর-বাইক ছুটল।

খানিক পরে রাস্তার এই তেমাথায় এসে দাঁড়াল সীতার গাড়ী। বামে দক্ষিণে দুই দিকে দু'টি দীর্ঘ পথ। এখন কোন্ রাস্তায় তার গাড়ী যাবে?

পথ নির্জন, একটি লোকেরও দেখা নেই। তিন জনেই পরামর্শ করতে লাগল—কি করবে এখন, কোন্ পথে যাবে?

অগত্যা গাড়ী ফেরাতে হল। সীতা বলল: বাড়ীতেই চল, মায়ের সংগে পরামর্শ করতে হবে—এ সব ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি চমৎকার। যা করবার, কাল করা যাবে।

হুকুম পেয়ে কোচোয়ান গাড়ী ঘুরিয়ে নিল। রৌরাণীর বাড়ীর অভিমুখে গাড়ী ছুটল।

[ক্রমশঃ

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

আঠারো

সম্মতি-পত্রখানি পাইয়াই মিষ্টার বোস্ নিশ্চিন্ত হর্ষে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘর ও ঝরণার ঘর—উভয়কার ঘরের সঙ্গে টেলিফোনের সংযোগ ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি ঝরণাকে টেলিফোনে ডাক দিলেন। ঝরণা আসিতেই, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা 'রেডি' হয়ে নাও—এখখুনি বীণার বাড়ী যেতে হবে—"

ঝরণা হাসিমুখে কহিল, "মাসীমার-বাড়ী?"

"হ্যাঁ। তার মতটা একবার নিতে হবে তো!"

নরেশ বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করিল, "তা হলে এখনো 'ফাইন্যাল' হয়নি?"

"কে বল্‌লে—হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে!" মিষ্টার বোস্ এই সঠিক বার্ত্তাটা নরেশের চোখে-মুখে যেন গুঁজিয়া ধরিলেন। তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বীণাকে তুমি চেনো না নরেশ, —অমত করবার সে মানুষই নয়!"

নরেশের মুখে বিরক্তির রঙ্‌ দেখা দিল। ঈষদ্রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু সাত জনের দ্বারস্থ হওয়াই বা কেন?"

ঝরণা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এইবার একটু হাসিয়া কহিল, "মাসীমা 'সাত জনের মধ্যে এক জন' নয়। এক জনেরই ভেতর এক জন!"

"ঝরণা ঠিক বলেছে—ঠিক্, ঠিক্! দেখা গেল, মিষ্টার বোসের চক্ষুর্দ্বয় যেন সহসা আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে! সেই সজল-তীক্ষ্ণ চোখ দুইটি নরেশের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ঝরণা যা বলেছে—ঠিক্! এই ধরো—কোন কাজ-কর্ম্মে বীণা মত না দিলে, ওর দিদিই কোন দিন তা' করেনি! তুমি তাকে দেখনি, নরেশ, তাই তাকে চেনো না!" একটু চুপ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "ঝরণা স্বয়ং সম্মতি দিয়েছে—এই কথা শুন্‌লে বীণা অমত করবে?—পাগল আর কি! বরং আহ্লাদে আটখানা হবে!" বলিয়াই উভয়কে তাড়া দিলেন—"নাও, তোমরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসো—"

ঝরণা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি—না!" অতঃপর কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া নতমুখে সুরু করিল, "এক জন তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁকে বাহন কোরে বিয়ের আগে মাসীমার কাছে আমার যাওয়া চল্‌বে না, বাবা!" মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "সে-সব—বিয়ের পর!"

মিষ্টার বোস্ এ্যাটর্ণী মানুষ—আইনজ্ঞ। কথাটা বুঝিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ঠিক্। তুমি তো উপস্থিত যেতেই পারো না!—নরেশ, তুমি একাই তবে 'রেডি' হও—"

ঝরণার কথাটায় বুঝিবা একটু খোঁচাও ছিল, মধুও ছিল। নরেশ আড়-চোখে একবার ঝরণার দিকে চাহিল, সে চাউনিতে তিরস্কারও ছিল যতটা, প্রার্থনাও ছিল ততটা। মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা, আমিও যদি না যাই—"

নরেশ মুখখানা ভারি করিয়া জবাব দিল, "কিন্তু তার আগে তো তাঁর মতামত?"

"না।" কথাটার উত্তর দিল ঝরণা। কহিল, "মাসীমার মতেরই যদি প্রয়োজন হয়, তা' হলে কড়া-ক্রান্তি হিসেব কোরে তার মূল্য দিয়ে আস্‌তে হবে আপনাকেই। অতএব—" নরেশের প্রতি এক কৌতুক-কটাক্ষ করিয়া মাসীমার বাড়ীর রাস্তাটা সে আকারে-ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর বাক্যব্যয় হইল না। মিষ্টার বোস্ মোটর বাহির করিতে বলিলেন।

* * * *

অনতিবিলম্বেই বীণাদের গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। নামিতে গিয়া মিষ্টার বোস্ কি ভাবিয়া নরেশকে কহিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা করো—আমি ওদের সংবাদ দিই।" বলিয়াই তিনি একাই নামিয়া গেলেন।

বীণা ও নির্ম্মল তখন দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া কতকগুলা কাগজ-পত্র লইয়া কিসের আলোচনা করিতেছিল, মিষ্টার বোসকে দেখিয়াই উভয়ে আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সমস্বরে কহিল, "এই যে—না চাইতেই জল। আমরাই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম—"

মিষ্টার বোস্ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তা' যাবে বৈ কি! নিশ্চয়ই যাবে।—কিন্তু, হঠাৎ?"

"যেমন আপনিও হঠাৎ!"—নির্ম্মল একমুখ হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সহজ কণ্ঠে কহিল, "আমি একটি 'ট্রাষ্ট' সম্পাদন করছি—সেটি আপনাকে একটু মেজে-ঘষে ঠিক কোরে দিতে হবে!"

মিষ্টার বোস্ সবিস্ময়ে কহিলেন, "ট্রাষ্ট?"

নির্ম্মল মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ!—আমার বিষয়-সম্পত্তি, অর্থ-কড়ি—সব কিছুরই সময় থাক্‌তে একটা ব্যবস্থা করা দরকার!—মানুষের শরীর-গতিক কখন্ কি রকম থাকে, বলা যায় না ত!"

মিষ্টার বোস্ প্রস্তাবটা অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "উত্তম!—বীণার নামে ত? তা' 'ট্রাষ্ট' কেন? উইল করো—"

নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, "বেনিফিসিয়ারীর সে ইচ্ছে নয়!" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমাদের সন্তান নেই, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে স্কুল আছে! এই 'ট্রাষ্ট' হচ্ছে—আমাদের স্কুলের নামেই!" হাতের কাগজ-পত্রগুলা একবার অকারণ নাড়া-চাড়া করিয়া আবার সুরু করিল, "স্কুলের সঙ্গে একটা বোর্ডিং থাক্‌বে—এই বোর্ডিংয়ের অধিবাসী হবে কেবল মাত্র তারাই, যারা গরীবের ছেলে, যাদের প্রতিভা আছে, কিন্তু অর্থের অভাবে সে-প্রতিভা দপ্ কোরে জ্বলে উঠতে পারে না!"

মিষ্টার বোস্ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু তোমাদের এখনো কাঁচা বয়েস! সন্তান তোমাদের আজ হয়নি, কাল যদি হয়?"

নির্ম্মল বীণার দিকে একবার তাকাইয়াই অবিলম্বে জবাব দিল, "যদি হয়, তা' হলে এই-সব দরিদ্র ছেলের ওপর আর-একটি না-হয় বাড়বে!"

মিষ্টার বোস্ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "বীণার মত আছে?"

নির্ম্মল তেম্‌নি করিয়াই কহিল, "প্রস্তাবটা মোটেই আমার নয়!"

"ট্রাষ্টি কে হবে?"—তুমি, না, বীণা—না, উভয়েই—না একের

প্রশ্নটার জবাব দিল বীণা। "নাম এখনো বসেনি। লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি—নামটা বেশ-একটু ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে!"

এমন সময়ে নীচে হইতে মোটরের হর্ণের আওয়াজ আসিতেই, মিষ্টার বোস্ ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহো-হো! দেখো, একটা কথা বল্‌তে এসেছি—ঝরণার বিয়ে!"

"ঝরণার বিয়ে?"—উভয়েই আকস্মিক আনন্দে যেন চমকিয়া উঠিলেন। বীণা হাসি চাপিয়া কহিল, "এমন কথাটা আপনি বুঝি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলন?"

মিষ্টার বোস্ অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না—না! ভুলবোই যদি, এখানে আস্‌বো কেন? আর আসবোই যদি—ভুল্‌বো কেন? একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া কহিলেন, "একটু ওই ধার পানে চলো দিকিনি—" বলিয়াই নির্ম্মল ও বীণাকে বারান্দার প্রান্তস্থিত একটি কক্ষে লইয়া গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই অকপটে বিবৃত করিলেন। ঝরণার প্রতি নরেশের সর্ব্বপ্রথম সম্পর্ক কি ছিল, এবং উহা কিরূপে বর্ত্তমানে কোন্ স্থানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বলিয়া গেলেন। এবং, তিনি যে উভয়কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহাও কহিলেন। ঝরণার সম্মতি-পত্রের কথাটাও বাদ পড়িল না।

নির্ম্মল সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "একসেলেণ্ট ম্যাচ—"

মিষ্টার বোসের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, "তা হলে, তোমাদের অমত নেই তো?"

"তোমাদের—মানে?"—বীণা মিষ্টার বোসের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। করিয়াই কহিল, "তোমাদের ভেতর আমাকেও ধরলেন না কি?"

"হ্যাঁ—কেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"—মিষ্টার বোসের মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টি সংশয়ে ও উদ্বেগে ভরিয়া উঠিল।

বীণা গম্ভীর ভাবে কহিল, "তা' হলে, ভুল করলেন!"

মিষ্টার বোস্ বিপদে পড়িয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কেন? পাত্র শিক্ষিত—তা' ছাড়া—মানে হচ্ছে—পরস্পর পরস্পরকে বুঝে-শুনে নিয়েছে!"

বীণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ভুল বুঝবেন না! আমি আপত্তি করিনি! আমার কথা এই—আমার সমর্থন নেই।" বলিয়াই চুপ করিল। অতঃপর নির্ম্মলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই দৃঢ় অথচ বিনম্র কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "শিক্ষাব্রতীর বউ হয়ে, শিক্ষা—এই তীর্থভূমির ওপর এক কলঙ্কের নিশান তুলে দিয়ে তাকে সনাক্ত করতে আমি পারি নে!"

"তার মানে?"

"মানে আপনি জানেন, কিন্তু আজ আপনার তা' মনেই পড়বে না!"—বীণার মুখখানা সহসা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। সেই আড়ষ্ট মুখে একটু হাসির আভা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "শিক্ষক আর ছাত্রী, এদের আসল সম্পর্কটা আপনি বোধ করি, প্রয়োজন মত বিস্মৃত হয়েছেন!"

মিষ্টার বোস্ চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা! ও-সব কথা তুমি তুলছ কেন? নরেশ, অর্থাৎ 'পাত্র'—সে যেমন গৃহ-শিক্ষক, তেম্‌নি ঝরণার বন্ধু—"

"কাজেই, আইনে আট্‌কাবে না—এই তো?" বীণা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল। তার পর একটি-একটি করিয়া কহিতে লাগিল, "আমি জান্‌তাম, যাঁরা আদালতের পোষ্যপুত্র অর্থাৎ এটর্ণী, ব্যারিষ্টার, উকিল—তাঁরা আইনের ফাঁক দেখিয়ে মক্কেলেরই সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু নিজের মৃত্যুকেও যত্ন কোরে আমন্ত্রণ করতে তাঁদের যে বাধে না, সে-নজীর দিলেন—আপনি!" একটু থামিয়াই কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া সুরু করিল, "বলুন ত, আপনাদের ওই নরেশ বাবুটি, উনি যে দিন আপনাদের বাড়ী ঢোকেন, সে দিন তাঁর পরিচয় কী ছিল—ঝরণার টিউটর, না বন্ধু?"

মিষ্টার বোস প্রশ্নটার সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বীণা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "পারবেন না! এই জবাব আপনার সিভিল্-প্রসিডিওরে নেই!" অতঃপর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা অনিয়ম, একটা অনাচার, একটা দুর্নীতি—এর প্রশ্রয় আমার কাছ থেকে আপনি আশা করবেন না!"

মিষ্টার বোস্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "কিন্তু, এ-রকম কেস আদালত সমর্থন করেছে!"

বীণা একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, "সে আপনার আদালত!" পরক্ষণেই মুখের ভাব কঠিন করিয়া সুরু করিল, "কিন্তু আমার আদালতের ডিক্রীটা একবার শুনে রাখুন—ছাত্রী শিক্ষকের সন্তান! সুতরাং, শিক্ষকের মনে ছাত্রীর দেহ, ছাত্রীর রূপ, ছাত্রীর যৌবন পড়তে নেই! অতএব, এদের ভেতর পরিণয়-কল্পনা একেবারেই অচল। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে শিক্ষকের পরিচয় হয়—রাক্ষস!" বলিয়া উঠিয়া গিয়া জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তেই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "এ যদি সম্ভব হতো, তা' হ'লে মহাভারতে উত্তরার পরিচয় অর্জ্জুনের 'পুত্রবধূ' হতো না!"

"মহাভারতের যুগ এ নয়!"—সহসা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া নরেশ প্রবেশ করিল। সে যে কখন উঠিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরকার কেহই জানিতে পারে নাই। মিষ্টার বোসের দিকে তীক্ষ্ণ-কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি উঠে আসুন, স্যার—"

"নরেশ?"—মিষ্টার বোস ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাড়াতাড়ি নরেশের দিকে একটু সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাকে যে একটু অপেক্ষা করতে বোলে এলাম!"

নরেশ উগ্র কণ্ঠে জবাব দিল—"অপেক্ষা করবার একটা সীমা আছে, এটা বোধ করি আপনার জানা নেই!"

নির্ম্মল ও বীণা উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। নির্ম্মল মিষ্টার বোসকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই বুঝি নরেশ বাবু?"

মিষ্টার বোস্ সাগ্রহে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ!—আমার ভাবী জামাই!"

গৃহে অতিথি আসিয়াছে। নির্ম্মল ব্যস্ত হইয়া নরেশকে অভ্যর্থনা করিতেই, সে অবজ্ঞায় বলিয়া উঠিল, "যথেষ্ট হয়েছে! আমার শ্বশুর মশাইকে যারা অপমান করে, তাদের আমি ঘৃণা করি—"

নির্ম্মল ও বীণা উভয়েই চম্‌কিয়া উঠিল। তাহাদের মুখ দিয়া কোন কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই মিষ্টার বোস্ জিব

কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাদের কি বল্‌ছ, নরেশ ? এরা আমাকে অপমান করেছে—না, তা তো করেনি !"

নরেশ থিয়েটারী ভঙ্গিতে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ধোরে দশ ঘা জুতো মারলেই অপমান করা হয়, নইলে হয় না—এ-জ্ঞানটা তা' হলে আপনার কাছ থেকেই আমাকে আজ পেতে হলো !"

ব্যাপারটা বিশ্রী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া নরেশকে মৃদু হাসিয়া কহিল, "নরেশ বাবু, 'ব্যালেন্স' হারিয়ে ফেলবেন না। ধরুন, আমরা না-হয় আপনার শ্বশুর মশাইকে দশ ঘা জুতো মেরেছি, কিন্তু তার ওপর আপনার আবার এক-ঘা পড়ে কেন ?—আপনি তো শিক্ষিত লোক।" একটু থামিয়াই কথাটা শেষ করিল, "দয়া কোরে এসেছেন, বসুন, একটু আলাপ করি—"

মিষ্টার বোসও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—বসবে বৈ কি !—বোসো, নরেশ, বোসো—এ তোমার মাস-শাশুড়ীর বাড়ী। এঁরা তোমাকে দেখবেন—এঁদের মতামত দরকার—"

"আবার সেই মতামত ?"—দস্যুর ন্যায় নরেশের চোখ দু'টো যেন জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি জানেন, এই বিয়ে যদি পণ্ড হয়, একটা ট্র্যাজিডি ঘটতে পারে !"

"ট্র্যাজিডি ?"

"হ্যাঁ ! আপনার কন্যা হয়তো আত্মহত্যা—"

"থামো বাবাজি !" মিষ্টার বোস হাসিয়া ফেলিলেন। তার পর শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "যদি 'ডিফেণ্ড' করতে হয়, এঁদের কাছে আমার 'কেস' আমি নিজেই 'ডিফেণ্ড' করবো ! আমার 'ব্রীফ' নিয়ে তুমি দাঁড়াবে—সে মানায় না !" বলিয়াই পুনশ্চ একটু হাসিলেন। তার পর ধীর কণ্ঠে সুরু করিলেন, "ঝরণা আমারই কন্যা, অর্থাৎ 'ফ্লেস্ আর ব্লাড'—এর আইন অনুযায়ী ও আমারই এক অংশ ! সুতরাং, ও যদি কারুর সঙ্গে পরামর্শ কোরেই আত্মহত্যা করে, তা' হলে আগে আমার সঙ্গেই পরামর্শ করবে ! তুমি সে-জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, বাবাজি !" বলিয়াই থামিলেন। একটু পরেই আবার আরম্ভ করিলেন, "একটা মূল্যবান্ কথা জেনে রাখো, নরেশ—আজকালকার মেয়েরা বিয়ের আগে নিজেকেই বেশি কোরে চিনে রাখে ! নিজের সম্পত্তি হঠাৎ হস্তান্তর কোরে নিজে নিঃস্ব হবে, এ কল্পনা তারা মোটেই করে না ! তোমরা যা দেখো, তোমরা যা ভাবো, তোমরা যা বোঝো—তা আগাগোড়াই ভুল ! এই ভুল, এরই কুহকে তোমরাই বরং সময়ে-সময়ে আত্মহত্যা কোরে বোসো।" অতঃপর ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাক্, ও-সব তর্কের কথা। আমার 'কেস' খুবই সহজ। আমি করেছি সঙ্কল্প, ঝরণা দিয়েছে সম্মতি—ব্যস ! এর অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।"

কথাটা শেষ করিয়াই মিষ্টার বোস নরেশকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইবেন, নির্ম্মল তাড়াতাড়ি হাতের কাগজগুলার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, "তা হলে, আমাদের এটা—"

"বিয়ের ঝাঞ্ঝাটা চুকে যাক্ তার পর এক দিন যেয়ো—" বলিয়াই মিষ্টার বোস নিজেকে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ঘেরাটোপে আবৃত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

উনিশ

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

মিষ্টার বোসের আর অবসর নাই। বিবাহের আয়োজন লইয়াই তিনি দিবা-রাত্র ব্যস্ত। একটি মাত্র কন্যা—ঘটা করিয়াই বিবাহ দিবেন। নিমন্ত্রণ-পত্র চলিয়া গিয়াছে—হাইকোর্টের জজ, সাহেবরা হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট সাহেব, বাঙালী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বাড়ী সাজাইবার কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে এক ইউ-রোপীয়ান কোম্পানী। অলঙ্কারের ফর্দ্দ, জিনিষ-পত্রের 'লিষ্ট', আহার্য্যের 'আইটেম্'—এ-সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছে স্বয়ং ঝরণা ! সে যেন এক নূতনতর রুচির প্রবর্ত্তন করিবে !

আর তিন দিন মাত্র দেরি—বাড়ীতে নহবৎ বসিয়াছে। দ্বিপ্রহরে মিষ্টার বোস্ ও নরেশ উভয়েই বাজারে গিয়াছেন, দরোয়ান আসিয়া ঝরণাকে সংবাদ দিল—"দিদি সাব, একঠো বহুমানুষ আপ্‌কো সাথ ভেট মাঙ্‌ছে—"

ঝরণা হুকুম দিল—"লে আও—"

দরোয়ান বউটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া পৌঁছিয়া দিয়া গেল। বউটির কোলে একটি শিশু আর সঙ্গে একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে। তাহার পরনে আধ-ময়লা ঈষৎ ছেঁড়া একখানি সাড়ী, অলঙ্কারের ভিতর—দুই হাতে মাত্র দুইগাছি সোনা-বাঁধানো 'নোয়া'। ছেলেগুলির পোষাক-পরিচ্ছদের অবস্থাও তদ্রূপ শোচনীয়। কোলের ছেলেটির গা একেবারেই খোলা। বউটিকে দেখিয়া মনে হয়, সহরের মেয়ে সে নয়।

বউটি তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে নামাইয়া রাখিয়াই ঝরণার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটি মায়ের দিকে একবার তাকাইয়া ভয়ে কাঁদিয়া ককিয়া উঠিল। ঝরণা পা ছাড়াইয়া ছেলেটিকে টপ করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া বউটিকে কহিল, "কে আপনি ?—আপনার ছেলে নিন্—" বলিয়াই ঝরণা ছেলেটিকে তার মায়ের কোলে দিতে যাইবে, সে প্রাণপণ শক্তিতে তাহার গলা আঁকড়াইয়া ধরিল। ঝরণা হাসিয়া জোর করিয়া ছেলেটির মুখটি হাতে করিয়া একটু ফিরাইয়া চুমু খাইয়া কহিল, "থাকে, থাকো।" অতঃপর বউটির দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করিল—"আপনি কে—এইবার বলুন তো ? কি দরকার ভাই ?"

হয়ত বা এক প্রচণ্ড আশঙ্কা ছিল, হয়ত বা এক দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কোচ ছিল—কিন্তু, ঝরণার এই অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধ-মধুর আচার-আচরণে সে-সমস্ত সন্দেহ বউটির মন হইতে যেন বাষ্পের মত উড়িয়া গেল। আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "খোকাকে নামিয়ে দিন—ওর গায়ে ধূলো-কাদা।"

ঝরণা হাসিয়া কহিল, "তাই তো ! আমার এমন কাপড়খানাই এখখুনি নোংরা হয়ে যাবে।" বলিয়াই সে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ছেলেটির বুক-পিঠ, মুখ-চোখ আগাগোড়া মুছাইয়া দিল।

বউটি অবাক্ হইয়া কহিল, "কাপড়খানি নষ্ট করলেন ?"

"একেবারে !" বলিয়াই ঝরণা ছেলেটিকে দুই হাতে একবার উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল, তার পর মুখের উপর নামাইয়া চাপিয়া ধরিয়া বউটিকে এক মৃদু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "কৈ, বললেন না ?"

সঙ্গে সঙ্গে বউটির মুখখানা পুনশ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল।

কি এক হাহাকার, কি এক আসন্ন মৃত্যু যেন তাহাকে তাড়া করিয়াছে। ছেলে-মেয়ে দুইটিকে সামনে দাঁড় করাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এদের আপনি রক্ষে করুন—" ফোঁপাইয়া উঠিল।

এক অপরিচিত বিস্ময়ে ঝরণার মুখ-চোখ ভরিয়া উঠিল এবং কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বউটি যেন এক আকস্মিক আতঙ্কে মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতে লাগিল, তার পর গলা চাপিয়া কহিল, "উনি কোথা?"

"উনি?—উনি কে?"

বউটি ভয়ে-ভয়ে ঝরণার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া নতমুখে জবাব দিল, "নাম করতে নেই—আমার স্বামী।"

আকাশে মেঘ নাই, প্রকৃতি শান্ত—এরূপ অবস্থায় যদি সহসা কাহারো সম্মুখে বজ্রপাত হয়, তখন সে যেমন চম্‌কিয়া উঠে, তেম্‌নি ঝরণা চম্‌কিয়া উঠিয়া কহিল—"নরেশ বাবু?"

বউটি নতমস্তকেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'হুঁ।' তার পর মুখ তুলিয়া ঝরণার মুখখানা চোখে পড়িতেই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, যেন সে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিয়া লইল—এই বড়লোকের মেয়েটির হাতে এইবার তাহার অপমানের আর অবধি রহিবে না। তাড়াতাড়ি ব্যগ্র-কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি আপত্তি করিনি, দিদি! কোন কথাই বলিনি—কিছুটি বলিনি! এই আমার ছেলে-মেয়ে—এদের মাথায় হাত দিয়ে—"

"দিব্যি করো না—" ঝরণার কঠিন কণ্ঠে যেন কক্ষের অচেতন পদার্থ পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিল, তার পর বউটিকে ভিতরকার একটি ঘরে লইয়া গিয়া কহিল, "উনি এখন নেই। কেন, আর কিছু আমাকে বলবে তুমি?"

দুর্লভ ক্ষণ বুঝি বা বহিয়া যায়! বউটি তাড়াতাড়ি আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার এই দুধের বাছারা—"

"থাম্‌লে কেন?"

"যাতে এদের নিয়ে কলকাতায় থাকতে পাই, শুধু সেই ব্যবস্থাটা করুন আপনি—"

"চুপ!" ঝরণা এক জোর ধমক দিল। তার পর চক্ষুর্দ্বয় তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার অকল্যাণ করো না।"

অকল্যাণ?"

হ্যাঁ! তুমি বড়—আমি ছোট! আমাকে আপনি আপনি বল্‌লে আমার কল্যাণ করা হয় না।"—বলিয়াই ঝরণা একমুখ হাসিয়া উঠিল। তার পর স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কেন, তুমি কোল্‌কাতা থেকে চলে যাচ্ছ না কি?"

বউটি সাহস পাইয়াছে। তাড়াতাড়ি কহিল, "হ্যাঁ, দিদি! আজই সন্ধ্যার ট্রেনে! উনি আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছেন—ফরিদপুর জেলায়!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "তাই কি আমার বাপ-মা আছে? আছে—দাদা, তাঁরই দিন চলে না—কচি-কাচা পাঁচটি! সেখানে গিয়ে এই ছেলেগুলোকে কি খাইয়ে বাঁচাবো, দিদি?" কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল।

ঝরণা চুপ করিয়া শুনিতেছিল। মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, "কাকে কি বলছ—আমাকে? আমি তোমার 'দিদি' নই।"

বউটি ঝরণার মুখের দিকে চাহিতেই, সে আবার বলিয়া উঠিল, "দিদির ছোট হলে যা হয়, আমি তোমার তাই—বোন্।"

বউটির মুখখানা লজ্জারক্ত হইয়া উঠিল। নতমুখ হইয়া কহিল, "আচ্ছা!"—যেন আনন্দ তাহার মুখে আর ধরে না। কিন্তু, সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী! দেখা গেল, নিমেষেই তাহার সারা মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বেদনা-বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিল, "এখানে মানুষের কাছে থেকেই ছেলে-পিলের এই দুর্গতি! কাছ-ছাড়া হলে—"

"মা—" মেয়েটি বউটির দিকে কাতর চক্ষে তাকাইল, যেন সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না!

বউটি মেয়েটির প্রতি চোখ টিপিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইল।

কিন্তু ছেলেটি সে-শাসন মানিল না। হঠাৎ ফোঁপাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদের ক্ষিদে পাইনি বুঝি!"

"আবার!" বউটি শাসন-কঠিন কণ্ঠে এক ধমক দিয়া ছেলেটিকেও কোলের কাছে টানিয়া লইল।

ঠিক সেই সময়ে ঝরণার পিঠের দিকে আঁচলে টান পড়িল। খোকাকে তখনো সে কোল হইতে নামায় নাই। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, খোকা তাহার আঁচলের অনেকটা মুখে পুরিয়া ফেলিয়াছে। ঝরণা তাড়াতাড়ি আঁচলটা খোকার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া বউটিকে প্রশ্ন করিল, "এরা এখনো কিছু খাইনি, বুঝি?"

বউটি এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না, ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল নিরোধ করিবার চেষ্টা না করিয়াই কহিল, "আমি এদের মিছে মা, বোন্!"

ছেলেটিরও অভিযোগের যেন আর অবধি নাই। কহিল, "আমাদের রান্না হয়েছে, বুঝি?"

সমগ্র ব্যাপারটা কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়া কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা ঝরণার বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া ছেলেটিকে সহাস্যে কহিল, "তোমার মা তা'হলে কোনো কাজের নয়।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ঠোঁট বাঁকাইয়া জবাব দিল, "ইস্—তা বৈ কি! তুমি কিছু জানো না। বাবা র‍্যাশন এনেছে বুঝি? 'র‍্যাশন' আন্‌লে তবে তো রান্না হবে।"

"তোমার মা বলেনি—তাই।"

"না—বলেনি! বলেছিল বোলে, মাকে বাবা আজ যা মেরেছে—"

"সন্টু"—বউটি ধমক দিয়া উঠিল। তার পর ছেলেটির হাতটা ধরিয়া দুয়ারের দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া রোষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "চলো, বাড়ী যাবে চলো! কোথাও তোমাদের আন্‌তে নেই!" বলিয়াই চোখ দিয়া খানিক অগ্নিবৃষ্টি করিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে টানিয়া লইল। তার পর ঝরণাকে কহিল, "না ভাই, আমি বাপের বাড়ীই যাবো। এই সব বদ-বেয়াড়া ছেলে-পিলে—এরা ঘরের কথা চাপতে জানে না। এখানে এরা থাকলে ওঁর অখ্যাতি হবে।" বলিয়াই বাহিরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "বল্‌বে—ছেলে-পিলেকে কি খাওয়াবো? কেন—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি! কারুর বাড়ী মুড়ি ভাজ্‌বো, কারুর বাড়ী বাসন মাজ্‌বো—এদের মুখ পানে চেয়ে সব করতে পারবো আমি। তবে বলবে অপমান? অপমানটা সেখান ওঁর মুখ তো আর হেঁট করবে না।" বলিয়াই দুয়ারের দিকে ফিরিল।

ভিজা আঁচল, সেই আঁচলটা হাতের মুঠির ভিতর চাপিয়া

ঝরিয়া ঝরণা এতক্ষণ নিঃশব্দে বউটির দিকে চাহিয়াছিল। এইবার যেন সচকিত হইয়া উঠিল। কহিল, "একটা কথা বলবে?" বউটি পুনশ্চ মুখ ফিরাইতেই, ঝরণা বলিয়া উঠিল, "তোমার খোকা—ওর পেটেও বুঝি একটু দুধ পড়েনি আজ?"

এক দুঃসহ যন্ত্রণায় বউটির মুখটা যেন দেহ হইতে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। প্রাণপণে নিজের ভেতরটা চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "শুধু আজ? ক'দিনই!" একটি বার মুখ নীচু করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই, ভাই! আজ পাঁচ-সাত দিন ধরে ওঁর কাছে আমরা যেন বিষ হয়েছি। পাঁচ-সাত দিন ধরেই ঘরে কিছুই নেই। একঘরেরা একটু কোরে ফ্যান্ দেয়, তাই খাইয়ে এদের আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। আমি পারি, বোন্—আমি সব পারি!"

বলিয়াই বউটি দ্রুত বাহির হইয়া যাইবে, ঝরণা ডাকিল—"একটু দাঁড়াও—" তাহার গলার স্বর অস্বাভাবিক। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তাহার ভিতরে এক মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হইয়াছে! পা দুইটা টলিয়া-টলিয়া পড়িতেছিল—কোনোওরূপে ঘরের এক কোণ হইতে একটা ক্যামেরা আনিয়া টক্ করিয়া উহাদের একটা ফটো তুলিয়া লইল।

বউটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। তাহার নিজের ছবিগুলি—কোলের ছেলে-পিলেকে কোলের কাছে গুছাইয়া লইয়া নিক্রান্ত হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝরণাও যেন চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল বাহিরের দিকে মুখ করিয়া—যেদিক্ দিয়া ঐ বউটি এই মাত্র পা ফেলিয়া-ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! এম্‌নি ভাবে কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তার হুঁস ছিল না, এক সময়ে তার চমক ভাঙিল। দেখিল—দৃষ্টির মাথায় আচম্‌কায় এক অনাবিষ্কৃত লোকালয়ের ছদ্মবেশ উন্মোচিত হইয়াছে—ভিতরে অসংখ্য রাক্ষস! ঝরণা অতি স্পষ্ট করিয়াই বুঝিল—ওই লোকালয়, উহারই নাম 'শিক্ষিত সমাজ,' যাহার অন্যতম অধিবাসী নরেশ—মৃত্যুহীন, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! অতঃপর—

অতঃপর 'শিক্ষিত সমাজের' যে ওঁঙ্কার-মূর্ত্তি—যে রচিত-তপোবন আবহমান কাল ধরিয়া লোক-সমাজের মূঢ়-মূক, অজ্ঞান-অন্ধের আত্ম-সমর্পণ, স্তব-স্তুতি, ক্রন্দন-প্রার্থনা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আজ এক নিমেষে ঝরণার ধিক্কার-বিদ্রোহে বিষাক্ত অন্তর—তাহারই অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

স্বপ্ন শেষ

শ্রীঅনাথকুমার চট্টোপাধ্যায়

সে দিনের স্নিগ্ধ রাতে সুন্দর চন্দ্রমা—
বাতায়ন-পথ দিয়ে,
তোমার কপোলে প্রিয়ে;
পড়েছিল এঁকে-বেঁকে। তাহারি উপমা,
দিতে গিয়ে হই ভাষা-হারা।
তোমার কুঞ্চিত কেশ করি নাড়া-চাড়া,
নোতুন চুম্বনে,
সকল সুপ্তিরে নাশি' পুলকিত মনে;
প্রকাশিনু অন্তর-আবেগ।
কিসের উদ্বেগ;
তোমার নিদ্রিত মুখে জাগে বার বার।
সহসা আবার—
যাই ফিরে,
বিবাহিত জীবনের সে বাসর-নীড়ে।
ভালে,
সলজ্জ প্রকাশে,
চন্দনের রঙে রাঙা ছোট মুখখানি।
প্রিয়ে, প্রিয়া, ওগো, রাণী
নব সম্বোধনে
ডেকেছিনু হরিণনয়নে!
দিনে, দিনান্তরে
খুঁজনাই খুঁজনায়ে কত খোঁজ করে।

তার পরে খুলি,
পুরানো চিঠির তাড়াগুলি
একে একে যাই পড়ে।
অক্ষরে, অক্ষরে;
অপূর্ব্ব আবেশ-মাখা।
খরস্রোতা নদী সম যেন আঁকা-বাঁকা—
যৌবনের জল,
উদ্দাম উচ্ছল।
শেষ পত্র আসে,
পড়ে যাই নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
হায় এ কি!
"যৌবন মরিয়া গেল" এই কথা দেখি।
সমাপ্ত হয়েছে পত্র জানায়ে প্রণাম।
জলভরা আঁখি লয়ে ফিরে চাহিলাম,
বাতায়নে দেখি চাঁদ নাই।
একান্ত বৃথাই
অতীতের ক্ষণ-স্বপ্ন ডুবে গেল পারে।
নিরেট আঁধারে,
চেয়ে দেখি প্রিয়া মোর নিশ্চল স্থবির।
নামে আঁখি-নীর—
এ ব্যর্থ স্বপনে;
ভাঙা ঘরে ভাঙা বাতায়নে।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৩

এই সোজা পথেই চলছে সংসার। যারা যাবার, তারা গেছে এগিয়ে—যাদের ত্বরা নেই, তারা জল-কাদা বাঁচিয়ে—আলো-অন্ধকার দিন-ক্ষণ বিচার করে—পায়ের দাগে পা মিলিয়ে চলছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। সারা কার্ত্তিকের ভোর-বেলায় মেয়েরা শিউলি ফুলে আঁচল ভরতে আসে পুরন্দরদের উঠোনের শিউলি-তলায়। শিউলির সঙ্গে তোলে আরও অনেক ফুল। বেড়াটা ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকবার জো নেই, শক্ত উঁচু বেড়া—আগড়টা লোহার শিকল দিয়ে আটকানো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে, কুলুপের চাবি থাকে মাধবের জিম্মায়। তবু কচি হাতে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে যতটা যায়, তারা গন্ধরাজ, গাঁদা ও গোলাপ ফুল তুলে শিউলি ফুলের তলায় চাপা দিয়ে রাখে। ওদের যম-পুকুর—পুণ্যি-পুকুরের দেবতা—ওদের সেঁজুতি—ভাল ফুল পেলেই কুমারী কন্যাং স্বামি-সৌভাগ্য, এয়োতি ও ধন-সম্পদ দু'হাত ভরে দেন।

দুপুরে ছেলের দল পথের ওপর খেলে ডাংগুলি—চু-কপাটি। হার-জিতের খেলায়—হৈ-চৈ করে কাটে সারাটা দুপুর। আর সন্ধ্যে বেলায়—আরও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গায়ে চাদর জড়িয়ে গোল হ'য়ে বসে আঙুল নিয়ে খেলে ইকড়ি-মিকড়ি। সুদীর্ঘ ছড়ার শেষ কথাটি তার যে আঙুলে গিয়ে ফুরিয়ে যাবে—তার সেই আঙুলটি উঠবে, অর্থাৎ সে আঙুল মুড়বে। এমনি করে দশ-বারটি ছেলে-মেয়ের সব ক'টি আঙুল মুড়বে—ছড়াটিকে বহু বার আবৃত্তি করতে হয়। তবু তারা ক্লান্তি বোধ করে না। খেলার আনন্দে আবৃত্তি চলে :

ইকড়ি-মিকড়ি
চাম-চিকড়ি।
চামের কৌটো মজুমদার,
ধেয়ে এলো দামোদর।
দামোদরে হাঁড়ি-কুড়ি
গোয়ালে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হ'লো বেলা,
ভাত খাওসে জামাই শালা।
ভাতে প'লো মাছি—
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হ'লো ভোঁতা
খা গুয়ারের মাথা।

যারা খেলা করে, তারা ছড়ার সুরটিকে নিয়েই মেতে ওঠে। জামাইকে যে আদরের আহ্বানে ভাত বেড়ে দেওয়া হ'লো—সে ভাতে কোন্ ফাঁকে মাছি পড়লো? এবং মাছিই যদি পড়লো তো তাকে হাত দিয়ে না উঠিয়ে কোদাল দিয়ে চাঁচতে হয় কেন? এবং সে ভাত কি পাথরের চেয়ে শক্ত যে, তার ওপর কোদাল চালালে কোদাল ভোঁতা হবার সম্ভাবনা? আর কোদাল ভোঁতা হ'লে অমন অখাদ্য খাইয়ে কেন খেলাটা পাকা করা হয়? এ-সব সম্ভব অসম্ভব ঘটনা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না।

বাস্তবিক, পায়ের দাগে পা রেখে এমনি ভাবেই চললেই না সংসারের প্রশ্ন-কুটিল পথ সুগম ও সরল হ'য়ে আসে! নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ক্লান্ত একটি ঘুঘুর ডাকে মন উদাস হ'য়ে ঘোরে কোন্ তেপান্তর মাঠের মাঝখানে, আসন্ন সন্ধ্যায় শিশু-কণ্ঠের ওই ছড়ায় উধাও হ'য়ে মন ছুটে যায় শৈশবের স্মৃতি-বাসরে।

যারা সঙ্গী ছিল তারা পাশে নেই—নূতন সঙ্গী কেউ আসেনি। সামনে পড়ে রয়েছে বহু দূর প্রসারিত পথ। সোজা পথে চলে চলে মন ক্লান্ত হ'য়ে উঠলো—দেহে জমলো আলস্য। একঘেয়ে কাজের মধ্যে নিত্য নিয়মিত খাওয়া-শোওয়া চিন্তা-দুঃখ আর সুখের দোলে দোল খাওয়া! এ ভাল লাগে না—ভাল লাগে না। ইন্দ্রজিৎ বন্ধুর লেখাগুলি চোখের জলে ঝাপসা হ'য়ে ওঠে। লেখার মধ্যে জীবন কল্লোলিত হ'তে চায়—জীবন উপচে পড়তে চায়।

গভীর রাত্রিতে দুয়োরে টোকা পড়লো। বাতাসের শব্দ কি? না—স্পষ্ট কে ডাকছে! ঠক্—ঠক্—ঠক্।

দুয়োর খুলে পুরন্দর জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি—শশী।

শশী! কোথা থেকে?

শশী উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দুয়োরে খিল লাগিয়ে দিলে। বললে, আলোটা জ্বাল তো।

আলো জ্বেলে চমকে উঠলো পুরন্দর! এ কি মূর্ত্তি শশীর! খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢেকে গেছে, মাথার চুলে জটা বেঁধেছে, পরণের কাপড়ে—কিন্তু সে কাপড়, না মাটি, না আর কিছু বোঝা দুষ্কর। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি—চোখগুলো কোটরে ঢুকে ওকে হিংস্র পশুতে রূপান্বিত ক'রেছে।

শশী মেঝের ওপর বসে পড়ে বললে, আর পারি না, আমি কাল পুলিশে ধরা দেব—কালদা। মাথার ওপর ফাঁকা আকাশ—কিছুতে ঘুম আসে না।

পুরন্দর বললে, কিছু খাবি?

শশীর চোখ দু'টো চকচক করে উঠলো। বললে, না থাক।

এই যে—এই ঘরেই রয়েছে। মুড়ি আর নারকেল-নাড়ু। ধামাটা এগিয়ে দিলে শশীর সামনে।

শশী মুঠো-মুঠো করে কয়েক খাবলা খেয়ে হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিলে।

পুরন্দর বললে, আর খাবি নে?

শশী বললে, না। কাপড়টা ছেঁড়া, নইলে ওদের জন্ত কিছু নিয়ে যেতাম।

আচ্ছা, সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলে আলনা থেকে একখানা কাপড় টেনে নিলে। এই নে এইটা পরে—

তুমি কোথায় কাপড় পাবে কালদা?

পুরন্দর হেসে বললে, তোর ভাবনা নেই শশী, আজ-কাল ক্লথ কমিটির মেম্বার আমি—আমার কাপড়ের অভাব হয় না।

শশীর চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, বললে, শাড়ী পাও তোমরা?

সব পাই। ধুতি, শাড়ী, জামার কাপড়—

শশী বাধা দিয়ে কি বলতে গেল কিন্তু মুখ নামিয়ে নিলে লজ্জায়।

পুরন্দর বললে, কিছু বলবি?

না, সে লজ্জায় কথা তোমায় বল্‌তে পারবো না, কালদা। আমি যাই। সে উঠে দাঁড়ালো।

পুরন্দর বললে, লজ্জা কি শশী, বল।

শশী দেওয়ালের পানে চেয়ে কি ভাবলে খানিকক্ষণ। তার পর মুখ না ফিরিয়েই বললে, না, লজ্জা করবো না। আমাদের চরিত্তির তোমার তো অবিদিত নেই, কালদা—সেই মাগীটার কথা বলছিলাম। যখন পালিয়ে যাই, তখনি ও আমায় বলেছিল কি না।

পুরন্দর রাগ করলে না। বরং শশীর ওপর ওর প্রীতি বাড়লো এই কথা শুনে। হ'তে পারে শশীর আদি কামনার মধ্যে আদিম বর্ব্বরটা বার-বার আত্মপ্রকাশ করেছে নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে—তবু ভোগ-তৃপ্তির মতো করে ও নারীকে চায়নি। স্ত্রীর ওপর ওর নিষ্ঠা কতখানি সে পুরন্দর জানে না, কিন্তু যে মেয়েটিকে ও নীতিসঙ্গত ভাবে পায়নি, তাকে ও ভালবেসেছে। তার কথাও ও ভাবে।

পুরন্দর বললে, কালই আমি এর ব্যবস্থা করবো।

শশী মুখ ফিরিয়ে বললে, আজ আসি কালদা।

পুরন্দর বললে, সত্যিই তোরা ধরা দিবি?

কাপড় পেলাম—খাবার পেলাম—বাক্ না আরও দু'দিন। হেসে ও আলোটা নিবিয়ে দিলে ফুঁ দিয়ে।

পুরন্দর চুপি চুপি বললে, কিছু টাকা নিবি?

কি করবো টাকা? লোকালয়ে বেরুতে পারি না, টাকা চিবিয়ে তো খিদে কমবে না কালদা। সে চলে গেল।

থমথমে অন্ধকারে রাত্রিটা কি বিশ্রী মনে হচ্ছে!

শশী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবলে। উত্তর-পাড়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। প্রায় সব সমর্থ লোকই আজ জেলে। কেবল যতীন, শশী আমার হরিপদ নিরুদ্দেশ। গরীব মুসলমান-পাড়ার জন-কয়েক ঘরামি, মিস্ত্রি আর করাতিও জেল খাটছে। পুলিশের মার সইতে না পেরে এক জন ঘরামি আর এক জন কৈবর্ত্ত পুলিশের কাছে নিজেদের দুষ্কৃতিগুলি স্বীকার করেছে। ভুপেন সেনের ভাণ্ডার লুঠ—শ্রীধরের কলমের আম-বাগান নষ্ট ও ইব্রাহিমের দোকান লুঠ ও তাকে মার-পিট সমস্তটা পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। দীর্ঘ দিনের জন্ত ওদের সশ্রম কারাদণ্ড ও মোটা টাকা জরিমানা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও কিছু দিন করে কারাবাস করতে হবে। দেশ শান্ত হয়েছে।

মেজ বাবু অবশ্য খালাস পেয়েছেন। শ্রীধরের আঘাত গুরুতর হয়নি। আর কলকাতার বড় ব্যারিষ্টার কয়েক জন সাক্ষীকে দিয়ে প্রমাণ করিয়েছেন—খুনের উদ্দেশ্যে গুলী ছোড়েননি মেজ বাবু। প্রকাশ্য সভায় পারিবারিক কলঙ্ক আরোপ করে শ্রীধর যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছিলেন। মানী লোক—সহিতে পারেননি। পকেটে ওঁর আসল টোটা থাকলেও তা ব্যবহার করেননি, কেন না, বিপক্ষকে ভয় দেখানোই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য, আঘাত করা নয়। নাম মাত্র জরিমানা করে হাকিম মেজ বাবুকে ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কোর্টে গিয়ে দাঁড়ানোর লজ্জা ও নাম মাত্র জরিমানার অসম্মান মেজ বাবুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছে। কোর্ট থেকে বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি এসে সেই যে তিনি অন্তঃপুরে ঢুকেছেন আর বার হননি। নিকট-আত্মীয় ছাড়া কেউ ওঁকে দেখতে পায় না। লোকে বলে, উনি শয্যা নিয়েছেন। খুব সম্ভব, বিছানা ছেড়ে আর ওঁকে উঠতে হবে না। বিনায়ক-মন্দিরে পিসিমা প্রত্যহ ফুল যোগান দিয়ে আসেন কিন্তু অন্তঃপুরে গেলেও মেজ বাবুর ঘরে উঁকি মারতে তিনি এযাবৎ সাহস করেননি। মেজ বাবুর অসুখ—এই কথাই শুনে আসছেন বাড়ীর মেয়েদের মুখে।

এক দিন খুব ভোর বেলা মেজ বাবুর বাড়ি থেকে চাকর এসে পুরন্দরকে খবর দিলে—মেজ বাবু ডাকছেন!

বিশ্বাস হলো না—পুরন্দর জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে, না পিসিমাকে?

পিসিমা তো রোজই যান—আপনাকে ডাকছেন বাবু।

এ বাড়ির অন্দর-মহলে কোন দিন ও প্রবেশ করেনি। আজ দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল, ক'টি প্রাণীর বাসের জন্ত কি বিরাট ব্যবস্থা এঁদের ছিল। বাইরের প্রকাণ্ড ঠাকুর-দালানটার রোয়াক ধ্বসে গেছে—থামগুলোয় নোণা ধরেছে। প্রকাণ্ড শাণ-বাঁধানো উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে—তবু মনে হয়—এ ব্যবস্থা একার জন্ত ছিল না। ঐশ্বর্য্যের প্রচার, ওটা মানুষের ধর্ম্ম, কিন্তু বাস-গৃহের ঐশ্বর্য্যের মতো ঠাকুর-দালানের ঐশ্বর্য্য উত্তম পুরুষের ভোগাসক্তির পরিচয় দেয় না। পূজাকে উপলক্ষ করে গ্রামকে নিকটে টানা, একমাত্র এই পুণ্য-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সম্ভব। অন্দর-মহলের চক-মিলানো বাড়িতে যে অসংখ্য ঘর, বারান্দা, চত্বর অলিন্দ মানুষের বাসের চেয়েও বাহুল্যে উপচে পড়ছে—তার পানে চেয়ে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ঘরের পর ঘর অতিক্রম করতে ক্লান্তি আসে না!—প্রশস্ত উঠোনে কত বার আনা-গোনা করা যায়! দু' চোখে ফুটে ওঠে যে বিস্ময়, তা শিল্প-সঞ্জাত নয়, তা এর বিরাট অবস্থান বা অসংখ্য কক্ষ-দরদালানের সমাবেশ নয়। মানুষ কি করে নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারে এই দুর্ভেদ্য সৌধ-অরণ্যের মাঝখানে, কি করে অহর্নিশ নিজেকে সে এই বিরাট পরিবেশের দ্বারা ক্লান্ত করে—এই ভেবে তার বিস্ময় বাড়ছিল। হয়তো সমৃদ্ধির দিনে পরিবার ছিলো বৃহৎ—প্রয়োজন হ'য়েছিল বাড়িকে এই ভাবে তৈরী করবার। আজ ক্ষীয়মাণ জন-সংখ্যায় বাসের আনন্দের বদলে এ বাড়ি ভয় দেখাচ্ছে মানুষকে, বিস্ময় বাড়াচ্ছে দর্শকের।

নম্রতা এগিয়ে এসে বললে, আসুন।

চত্বর—দালান—আর অনেকগুলি ঘর পার হয়ে পুরন্দর মেজ বাবুর শয়ন-কক্ষে এসে পৌছলো। হল ঘরের মতোই সুবিস্তীর্ণ সে ঘর। দেওয়ালে পঙ্খের কাজ এখনও সজ্জ সমাপ্তির দীপ্তিতে শ্রীমান্, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে সেকালের সুদৃশ্য বেলোয়ারী ঝাড়, দেওয়ালে সুদৃশ্য দেওয়াল-গিরি। সারি-সারি চওড়া জানালা দিয়ে প্রভাতের আলো এসে পড়েছে ঘরে। মেহগ্নি পালিশের কারুকার্য্য-খচিত প্রশস্ত এক পালঙ্কে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন মেজ বাবু। টক্-টক্ করে বাজছে একটা ক্লক ঘড়ি, তার মৃদু-গম্ভীর আওয়াজে সেকালের আভিজাত্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। আরও দু'টো কারুকার্য্য-খচিত আলমারি রয়েছে উত্তর দেওয়াল ঘেঁসে—পুরন্দরের নজরে পড়লো না।

নম্রতা খাটের কাছে এসে ডাকলে, মেজকা, পুরন্দর বাবু এসেছেন।

মেজ বাবু নড়ে উঠলেন। গায়ের দোয়োখা শালটার কন্ধার কাশ্মীরী শিল্প আলোয় প্রকাশিত হ'লো। বললেন, কালো, এদিকে এসো।

খাটের সামনে দু'খানা টুল ছিল। পুরন্দর তার পাশে এসে দাঁড়ালে। বললে, কেমন আছেন?

মেজ বাবু বললেন, বস

পুরন্দর বসলে না—প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলে।

মেজ বাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। বালিশের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠলেন। মনে হ'লো, এইটুকু পরিশ্রমে ওঁর শ্বাস-কষ্ট আরম্ভ হ'য়েছে।

নম্রতা বললে, আবার উঠছো কেন মেজকা, ডাক্তার না বারণ করেছে!

মেজ বাবু বললেন, ডাক্তার কি জানে? পুরন্দরের পানে ফিরে বললেন, যা যাচ্ছে তা চলে যাক্—কি বল?

পুরন্দর এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে নম্রতার পানে চাইলে।

মেজ বাবু তা লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন, তোমাদের কবি না বলেছেন:

ফুরায় যা তা দে রে ফুরাতে—
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনে কো কুড়াতে।

ডাক্তার অবশ্য কবি হ'লে এর অর্থ বুঝতেন।

পুরন্দর বললে, কিন্তু আপনি যদি ভেঙ্গে পড়েন—

মেজ বাবু বললেন, আমি ভেঙ্গে পড়লে কি আর হবে! নম্রতার দিকে আঙুল উঠিয়ে বললেন, এরা যথেষ্ট শোক পাবে—কাঁদবে। কিন্তু সে কান্না বাইরের কেউ শুনতে পাবে না।

নম্রতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। পুরন্দরের বিস্ময় বাড়ছে। মেজ বাবু—এই সব কথা বলবার জন্যই এত সকালে তাকে ডেকেছেন কি!

মেজ বাবু বললেন, মানুষের সম্পদ আর গৌরব পদ্মপত্রের জল—এ কথা শাস্ত্রকাররা বলেছেন। সহসা যেন বুঝতে পারলেন, এ সব কথা পুরন্দরকে বলে ফল কি! শাস্ত্র-বাক্য—যা বার্দ্ধক্যে বিশ্বাসের বৃন্তে লগ্ন হয়ে পরম সত্যের মত প্রতীয়মান হ'চ্ছে, তা যৌবনে শ্রুতি ছাড়া আর কোথাও প্রবেশাধিকার পায়নি। যৌবন ভিতর থেকে ঠেলে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। বস্তুমূল্যে পৃথিবীকে মনে হয়েছিল অপরূপ। বার্দ্ধক্য নিয়ে এসেছে সংহতি। বিত্তার মনকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিনের পাওনাকে বিচারের তৌলে ফেলে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষছে। ঠিক লাভ-ক্ষতি নয়—তবে কিসের হিসাব, ঠিক করে বলাও কঠিন। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, বাইরেকে আশ্রয় ক'রে সে সান্ত্বনা পাচ্ছে না। এই অট্টালিকা, ধন-দৌলত, মান-সম্মান, পুণ্য—সব মিলিয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে, একটা কিছু করা উচিত অথচ সে জিনিসটা কি?

মেজ বাবু আর শাস্ত্রবাক্য আওড়ালেন না। বললেন, তুমি ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাস কর?

পুরন্দর হাঁ বলবে কি না বলবে, বুঝতে পারলে না। তার বিশ্বাসে কিছু এসে-যায় না জগতের। কিন্তু যে লোক চলে যাচ্ছে? এক লোক থেকে অন্য লোকে, তার মনে আঘাত দেওয়া উচিত হবে কি?—ভেবেই ও উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করলে।

মেজ বাবুই উত্তর দিলেন, জানি, তোমরা বিশ্বাস কর না। অপুকেও জানতাম। তার জন্য তোমাদের দোষ আমি দিই না। কারণ, এ কাল ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার কাল নয়; অপু বলতো, তোমাদের ঠাকুরের রূপ না কি আলাদা?

পুরন্দর বললে, অবশ্য ঈশ্বর মানা আর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা—

জানি—জানি, তোমরা যা বলবে, জানি। তাইতো ডাকলাম তোমাকে। একটি অনুরোধ আমি করবো তোমায়। সেটা ঠিক অনুরোধ নয়—তোমাদের না বুঝে মনের ঝোঁকে যে কর্ত্তব্য করেছিলাম এক দিন, তার দায়িত্ব চাপিয়ে যাব না তোমাদের ঘাড়ে। বল, রাখবে, আমার অনুরোধ?

পুরন্দর বললে, সে জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ব্যস্ত! সে অবসরই বা কোথায় আমার। হাঁ, আমি বলছিলাম—ঐ বিনায়ক-মন্দির। যেদিন আমি থাকবো না সেদিন তোমরাও ঘটা করে ওই বিগ্রহকে বিসর্জ্জন দিও গঙ্গার জলে। ও দেবতার প্রয়োজন আজ নেই।

পুরন্দর বললে, কে বললে আপনাকে? উনি গণদেবতা—গণের মঙ্গল করেন!

সে অন্য অর্থে। মানুষের দেহে ঐরাবতের মাথা—এ সৃষ্টির মধ্যে যত রকমের ব্যাখ্যাই নিহিত থাক না, তোমাদের ভোলানো যাবে না। আর কাজ কি বোঝা ব'য়ে,—আমার পাপ আমার সঙ্গেই চলুক। জের টেনে লাভ কি ও-সবের? আগ্রহে আর একটু উঠে বসলেন বিছানায়।

পুরন্দর বললে, আপনার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না।

মেজ বাবু একমুহূর্ত্ত পুরন্দরের মুখের পানে চেয়ে বললেন, তোমার ধাত দেখছি অপুর চেয়ে আলাদা। তার পর হাসলেন।

পুরন্দর বললে, আপনার কীর্ত্তি নষ্ট করতে অপূর্ব্ব বাবুরও ইচ্ছে হবে না।

তা হয়তো হবে না। তবে কীর্ত্তিও থাকবে না। বলে হাসলেন কিন্তু পুরন্দরকে বাধা দিয়ে মেজ বাবু বললেন, আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করো না কালো, এত দিন বহু লোককে পরামর্শ দেওয়া, বোঝানো—এই ছিল আমার কাজ।...কনুই সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়—চোখ বুজে বললেন, আচ্ছা, যেতে পার।

পুরন্দর বুঝলে, যৌবনের মেজ বাবু আদেশ দিচ্ছেন। নম্রতার সঙ্গে ও বাইরে এলো।

বাইরে এসে ও নম্রতাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি অসুখ ওঁর?

নার্ভাস ব্রেক ডাউন।

ব্রেণের কোন রকম—

কিছু না। ভাবছেন—যে সব কথা উনি বলছেন তা সুস্থ মানুষের কথা নয়? না পুরন্দর বাবু, মেজকা ভুল করেছেন হয়তো অনেক, কিন্তু ভুল বুঝেছেন কোন দিন, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

পুরন্দর বললে, ভুল না বুঝলে মানুষ ভুল করবে কেন?

নম্রতা বললে, ঠিক এই তর্কই ওঁর সঙ্গে বহু বার করেছি। উনি বলেন কি জানেন, এক মানুষের ভুলকে অন্য মানুষের বুদ্ধির দ্বারা মাপতে যাওয়াও ভুল।

কিন্তু সাধারণ ভাল-মন্দর একটা ষ্টাণ্ডার্ড তো আছে? অধিকাংশ লোকে যা গ্রাহ্য করে—

নম্রতা বললে—উনি বলেন, সাধারণ মানুষের বিচার সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে হয়তো খাটে। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া পদার্থ মাঝে মাঝে দেখা যায় না কি? তার বিচার সাধারণের দ্বারা সম্ভব নয়।

কথা কইতে কইতে ওরা বৈঠকখানার প্রান্তে এসে পৌঁছলো। নম্রতা হাত উঠিয়ে নমস্কার করলে, আচ্ছা. আসবেন মাঝে মাঝে।

পুরন্দরের মনে এখন প্রশ্ন জেগেছে, সাধারণ মানুষরা সত্যিই কি অসাধারণদের বুঝতে ভুল করে? কিন্তু সাধারণ আর অসাধারণের পার্থক্য বোঝা যাবে কিসে? বর্ত্তমানের রূপ বড় স্পষ্ট—প্রখর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মত—তাই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে বিভ্রান্ত করছে মানুষকে।

৩৪

হাতে কাজ ছিল না, একখানা বই নিয়ে বসবে, মনে করেছিল। বই নিয়ে বসা হোলো না। মা এসে বললেন, কালো এক কাজ কর দিকি, বাবা! তোর ঘরের চালির ওপর খান-আষ্টেক বোরা আছে—পেড়ে আমাদের ঘরের পর্দ্দা করে টাঙিয়ে দে দিকি। ঘরের দুয়োর-জানলাগুলো বড় ফাঁক হ'য়ে গেছে—শীতবস্ত্র, ওই কাঁথা! ঠাকুরঝি বুড়ো হয়েছেন—কষ্ট হবে এবার শীত কাটাতে।

আজ-কাল বাসবের স্মৃতিশক্তির কিছু উন্নতি হয়েছে। কাজ-কর্ম্মও সে করে। বাসবকে নিয়ে পুরন্দর সারা দুপুর বেলায় পরদা তৈরী করলে। মাধব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফুলগাছের গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছিল।

বিকেল বেলায় রমা এসে বললে, আজ কি মজা হ'য়েছে, জান কালদা? বাবাতে আর মা'তে ঝগড়া করে তুলসী গাছের মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছে।

মন্দির ভেঙ্গেছেন?

হাঁ, দুপুর বেলায় বাবা তো রোজ দাবা খেলতে যায় ভূতো সা'র বাড়ি। আজ না কি হেরে ঢোল হ'য়ে এসেছে। এসেই সে কি তম্বী! বলে, এত দিন যা হয়নি, তাই হ'লো আজ তোমাদের অনাচারের জ্বালায়। যত শত্যিক জাত-ছোঁওয়া ন্যাকড়া দিয়ে নিশেন তৈরী করে টাঙিয়েছে হাড়হাভাতে মেয়েটা তুলসীর মন্দিরে—দেবতা কি থাকেন এই অনাচারে? যাবার সময় মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে তবে বেরুই অথচ আজ হ'য়ে গেলাম অশ্বচক্র! ওরা সবাই না কি ঠাট্টা করে বলেছে—তোমার তেরাত্রি ওযুদ্ হ'য়েছে গোঁসাই, এ ক'দিন দাবা আর ছুঁয়ো না। বলে খিল-খিল করে হেসে উঠলো রমা।

মনটা পুরন্দরের নানান্ দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল—রমার ছেলেমানুষি ভাল লাগলো না। বললে, আচ্ছা, এখন যাও, আমার কাজ আছে।

রমা সে কথা কাণে নিলে না, বললে, অশ্বচক্র কি কালদা?

পুরন্দর বললে, খেলায় সব চেয়ে খারাপ হার। যাও, এখন বাড়ি যাও।

রমা বললে, বাঃ রে—খালি বাড়ি যাও—বাড়ি যাওই তো করচো। আমার আর একটি নিশেন তৈরী করে দেবে কে?

কেন, তোমার নিশেন কি হ'লো?

রাগের মাথায় বাবা তার কিছু রেখেছে কি না! টুকরো করে ছিঁড়েছে। মা'ও না-শাবল দিয়ে মন্দির ভেঙ্গে এক টানে তুলসী গাছটি উপড়ে দিলে। বললে, তোর ধম্মের না-কিছু করেছে!

নিশেন ছিঁড়লে বলে তোমার মা'র অত রাগ হ'লো বুঝি?

শুধু নিশেন ছিঁড়লো—মারেনি আমায়? আস্ত এক-গাদা কঞ্চি ভেঙ্গেছে আমার পিঠে। দেখ না, দাগড়া দাগড়া হয়ে আছে পিঠ। বলে পুরন্দরের হাতটা টেনে সে পিঠের ওপর রাখলে।

চমকে উঠলো পুরন্দর। এ মেয়েটি কি! অত মার খেয়েও আবার নতুন নিশান তৈরীর জন্য অনুরোধ করতে এসেছে? বললে, আবার নিশেন নিয়ে গেলেই মারবে তো তোমার বাবা?

ইস্—অত ভাত আর দুধ দিয়ে খেতে হয় না! মারবে? আর তো তুলসী গাছ নেই যে, নোংরা হবে বলে মার খাব? এবার চাঁপা গাছে টাঙাবো নিশেন। বলে ঘাড় নেড়ে হাসলে রমা।

পুরন্দর বললে, যাই হোক, নিশান তোমার টাঙাতেই হবে? তা গাছে নিশান না টাঙিয়ে আমাদের সঙ্গে পথে গান গেয়ে নিশেন হাতে করে ঘুরবি। বাড়ির লোকের মার খাবি কেন—পুলিশের মার খাস বরং!

রমা ঠোঁট উল্টে বললে, ভারি পুলিশ! আমি চুরি করেছি না কি যে ওরা মারবে? আর মেয়েমানুষ বুঝি গান গেয়ে রাস্তা দিয়ে যায়? নিন্দে হয় না?

পুরন্দর হেসে বললে, নিন্দে হয় বলেই তো পুলিশ মারে।

যাও, ঠাট্টা ভাল লাগে না। বলে মুখ বাঁকিয়ে সে উঠোনে গিয়ে নামলো। সেখান থেকে বললে, কাল আসব কিন্তু।

সন্ধ্যার শাঁখ কখন বেজেছে—কখন চৌকাটে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুনুচিটা হাতে করে মা এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরে, পুরন্দরের খেয়াল হয়নি। ধুনোর মিষ্টি গন্ধ ও আঘ্রাণ করতে করতে ভাবছিল, কবে আসবে সেদিন—যেদিন পুলিশের চোখে আমরা নির্দ্দোষ হব। আমাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য কি মূল্য দিতে হবে? আর সে মূল্য দেব কাকে?

মা বললেন, কালো তুই কি বলেছিলি অনাদিকে—সে দু'খানা নতুন কাপড় দিয়ে গেল এই মাত্তর।

কাপড়? চমকে উঠলো পুরন্দর।

হাঁ। একখানা পেড়ে ধুতি আর একখানা শাড়ী। তা শাড়ীটা বোধ হয় ভুল করে দিয়ে গেছে।

পুরন্দর লাফিয়ে উঠে বললে, কোথায় কাপড়? বলে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সে বাড়ীর ভেতরে এলো। দাওয়ার ওপর থেকে শাড়ীখানা তুলে নিয়েই ছুটলে বাইরের দিকে।

মা বললেন, দেখ পাগল! আলোটা নিয়ে যা। আর এই রাত্তিরে কাপড় বদলাবার কি-ই বা দরকার?

পুরন্দর মনে মনে বললে, এ ভুল নয়—কোন অদৃশ্য শক্তির সঙ্কেত। নইলে আমি তো মা আর পিসিমার নাম করে পরশু দু'খানা স্লিপ দোকানে পাঠিয়েছিলাম—তারা হিসাব করে একখানা ধুতি আর একখানা শাড়ী দিয়েছে। এ ভুল না হ'লে শশীকে কথা দেওয়া না দেওয়া আমার সমান হ'তো। ওদের ব্লক থেকে ভ্রষ্টা চরিত্রের মেয়ের জন্য কাপড় সংগ্রহ করা খুব সহজ হ'তো না।

চলতে চলতে ও বার-দুই হোঁচট খেলে। অন্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হ'য়েছে। পথ অসমতল, চিন্তার ভারে মন আচ্ছন্ন। রাত্রিতে ওই মেয়েটাকে কাপড় দিতে যাওয়া সঙ্গত হবে কি না, ও ভাবতেই পারলে না। ওর কেবলই মনে হ'চ্ছিল—আজ রাত্রে শশী যদি আসে? যদি বলে, কাপড় দিয়ে এসেছ তো কালদা? তার বিশ্বাস, আজ রাত্রিতেও শশী আসবে।

শ্রীধরের বৈঠকখানায় আলো জ্বলছিল। জানালা দিয়ে সে আলো এসে পড়লো পথের ওপর। পথটা বেশ সমতল মনে হ'তেই পুরন্দর পায়ের গতি দ্রুত করলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা

ইট পায়ে লেগে হোঁচট খেয়ে সে পড়লো এক জনের ঘাড়ে। লোকটা বললে, কে রে—কাণা না কি?

পুরন্দর সামলে নিয়ে বললে, বড্ড লেগেছে কি?

বৈঠকখানা থেকে লণ্ঠনটা জানালার গরাদে দিয়ে বাড়িয়ে সে প্রশ্ন করলে, ফটিক দাদা না কি! কি হলো?

পুরন্দরের সর্ব্বাঙ্গে আলো পড়তেই ফটিক বললে, আরে এ যে পুরন্দর বাবু! বাঃ, বেশ শাড়ীটা তো! পাড়ের জেল্লা আছে। বলে কাঁপড়ের ভাঁজের ভেতর হাত চালিয়ে বললে, দেখি খোলটা?

পুরন্দর বললে, ছাড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বলে সে পাশ কাটাবার উদ্যোগ করলে।

ফটিক বললে, আহা-হা, দেখলেই কি ক্ষয়ে যাবে তোমার কাপড়? তা শাড়ী নিয়ে কি করবে তুমি? আমার বউ অনেক দিন থেকে এমনি পাড়ের কথা আমায় বলেছিল।

জানালা দিয়ে লণ্ঠনটা ভেতরে টেনে এনে ভেতরের লোকটি বললে, বাড়ির ভেতর এস ফটিক দাদা, বাবু ডাকছেন।

ফটিক কাপড় ছেড়ে বললে, কাল তোমার দুয়োরে তারকেশ্বরের হত্যে হবো মাইরি!

ভিতরে আসতেই শ্রীধর বললেন, ওটার সঙ্গে ঠাট্টা—ইয়ারকি—কি কোন কথা বলবে না, বারণ করে দিয়েছি না?

ফটিক বললো, শাড়ী দেখেই তো কথা কইতে হলো, এই রাত্তিরে শাড়ি নিয়ে ও যাচ্ছে কোথায়? ব্ল্যাক মার্কেটিং যদি না হয় তো আমার নাক-কাণ কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন শ্রীধর। আগ্রহ ভরে বললেন, ঠিক ঠিক, ছুটে যাও—পঞ্চু, তুমিও যাও—আরও যাকে দেখবে তাকে সঙ্গে নেবে। এই নাও টর্চ্চ—এ নিশ্চয়ই ব্ল্যাক মার্কেট!

ওরা চলে গেলে শ্রীধর আপন মনে হেসে বললেন। হুঁ, বাবা, মাছ খায় সব পাখী, ধরা পড়েছে খালি মাছ-রাঙা।

সারদা দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল—শম্ভু তার কাছে বসে কোথায় স্বপ্নাদ্য দৈব ওষুধ পাওয়া যায় তার বিবরণ জানাচ্ছিল। ফটিক ঝড়ের মত সেখানে এসে বললে, এই মাত্তর একটা লোক এদিকে দিয়ে গেছে—দেখেছ?

সারদা বললে, ওই তো, মালীদের পুরন্দর যাচ্ছে। সাড়া নিলাম।

ফটিক বললে, যদি মজা দেখতে চাও তো আমাদের পিছু-পিছু এসো। ও লুকিয়ে কাপড় বিক্রী করতে যাচ্ছে।

ফটিক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা উঠলো। বাতের ব্যথা আর হাঁপানি যেন মন্ত্র পড়ে কে ভাল করে দিলে!

পুরন্দরকে অনুসরণ করে দলটি এসে পৌঁছলো—সেই ভাঙ্গা দেওয়াল দেওয়া অখ্যাত বাড়িটার সামনে। ফটিক আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না। পঞ্চুর গায়ে চিমটি কেটে বললে, তবে ব্ল্যাক মার্কেটের ঠাকুরদা রে, পঞ্চু! যা—যা, খবর দিগে যা বাবুকে! শীগ্‌গির।

পঞ্চু ছুটলো খবর দিতে। ইতিমধ্যে সবাইকে বাড়ির চার দিকে দাঁড় করিয়ে ফটিক পা টিপে-টিপে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। একটি মাত্র ঘরে মিট-মিট করে জলছিল সরষের তেলের একটি প্রদীপ।—দুয়োরের দিকে পিছন ফিরে পুরন্দর কি বলছে মেয়েটিকে। মেয়েটি কাপড় হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ। আস্তে আস্তে দুটি দুয়োর এক করে—ফটিক সামনের দিকে টানতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটির নজর পড়লো—দুয়োরটা ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে আ সছে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, দুয়োরে কে? কে—

তার কথা শেষ হ'লো না—সবেগে দুয়োরটা চৌকাঠের ওপর আছড়ে পড়লো—ঝন্‌-ঝন্ করে শিকল দেওয়ায় শব্দ হলো।

টর্চ্চের আলো গলিতে ফেলে ফটিক আনন্দে চীৎকার করে উঠলো,

'রুই কাতলা জোড়া কই—

শ্রঃ—এ ঐ!'

সেই রাত্রিতে নতুন উৎসাহে জেগে উঠলো গ্রাম। সবাই এসে পৌঁছলেন—অখ্যাত সেই গলিটার ঘৃণিত এই বাড়িটার মধ্যে। ইংরেজের আইন না থাকলে পুরন্দরের কি অবস্থা হ'তো অনুমান করা শক্ত নয়। আবার বিপদ এই—ও অপরাধে রাজার আইন গ্রামবাসীদের নীতি-ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত মোটেই সাহায্য করবে না।

শ্রীধর ক্রুর হাস্ত করে বললেন, সেকাল হ'লে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দেয়া যেত—এখন যে আইনের ম্যার-প্যাঁচে ধর্ম্ম যেতে বসেছে।

ফটিক বললে, যখনই ওর হাতে শাড়ী কাপড় দেখলাম, তখনই কিন্তু এঁচেছিলাম—

পঞ্চু বললে, ভাগ্যিস্ তুমি শেকল তুলে দিয়েছিলে ফটিকদা!

ফটিক নিজের কৃতিত্বে এক-গাল হেসে বললে, এ-সব ব্যাপারে শেকল না তুলে দিলে কি ধরে-ছুঁয়ে পেতে কাউকেও? সঙ্গে সঙ্গে সব হাওয়া, বাবা! কতই দেখলাম এ রকম কেস!

মেয়েটি প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করেছিল—এখন চুপ করে কাঁদছে। অমন মুখরা আর লজ্জাহীনা মেয়ে, এদের বড়যন্ত্রে সে-ও লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না।

আর পুরন্দর? কোন কথাই সে বলেনি। বলা বৃথা জেনেই প্রতিবাদ করেনি—মোটে গ্রাহ্য করেনি এই ধিক্কার—বাক্য—লাঞ্ছনা! হাঁ—খুবই বেজেছে তার মনে। মনে তার পাপ ছিল না—তবু কোথা থেকে এলো পর্ব্বত প্রমাণ লজ্জা? সত্যাগ্রহী সে—মিথ্যার চাপে এমন নুয়ে পড়লো কেন? নীতি—আচার—কোন কিছুকে গ্রাহ্য করেনি সে অন্তায়ের পোষক হলে। অথচ সেই মিথ্যাই ওকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না। দৈহিক লাঞ্ছনা কিছু ঘটেছে—জামাটা আর কাপড়খানা তার সাক্ষী। তাও তত বাজছে না ওর মনে—যেমন ওদের এই বিদ্রূপের বিষাক্ত শরগুলি ওকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। এই মিথ্যার মূল্যেই গ্রাম ওকে বর্জ্জন করলে চিরদিনের মত। চিরদিনের জন্য মুছে গেল ও গ্রাম থেকে—এই নিদারুণ শাস্তি ও মাথা পেতে নেবে কি করে?

শ্রান্ত হ'য়ে সবাই চলে গেল!

পুরন্দরও চলে আসছিল—মেয়েটি ওর সামনে মাথা কুটতে কুটতে আত্মহারা করুণ কণ্ঠে বললে, কেন আপনি এলেন আজ? কেন এলেন?

ম্লান হেসে পুরন্দর বললে, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আসবো।

এই রাত্রিতে বহু হিতৈষী এসে ঘটনাটা সালঙ্কারে বর্ণনা করে গেছে বাড়িতে। পিসিমা শোনা অবধি উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ছেন সংবাদদাতাদের—মা হাঁড়ি কোলে করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন

আমি ও পৃথিবী

শ্রীসুমণি মিত্র

প্যাঁতাবাহার গাছের পাতা ঝরলো ব'লে
পৃথিবী কি থমকে থেমে দাঁড়ায়
কিংবা আস্তে চলে ?
—কি এসে যায়
যে যার চলে নিজের কাজে,
দুঃখ-সুখের আন্দোলনে জীবন-তরী ঠিক ভেসে যায়।

পৃথিবী চলে, আমিও চলি
হোলোই বা তার আকাশটা পথ আমার না হয় তুচ্ছ গলি
তার ঐ চলার শেষ লেখা নেই, বেশ আছে—।
আমার চলার সুরু এবং শেষ আছে।

চ'লে-চ'লেই পৃথিবীটা কাটায় দিন
চাকায়-বাঁধা জীবনটা তার অর্থহীন
চলতে গিয়ে পথটাকেই সে জানে
পথের-ধারের-পৃথিবীটার পায় না খুঁজে মানে।
আমার চলা কিন্তু থেমে থেমে ;
গাছের ছায়ায় একটু ব'সে,
পথের ধারে স্বভাব-দোষে
নতুন নতুন ফুলের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার চলা,
রাখাল যখন বাঁশী থামায় একটু আমার কথা বলা।
আমি জানি—
চলার চেয়ে থামাটা মোর অনেকখানি।
জুঁই-চাপাটার সঙ্গে আমার অনেক কথা
হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে-আসা টুকরো গানের
আমি শ্রোতা।

কখন আবার এগিয়ে-চলার তাগাদাটা
ঠোঁট ফুলিয়ে সুরু করে কাঁদাকাটা,
তখন দেখি চলার পথে অনেক বাকী।
চলতে গিয়ে না-চলার এই ইচ্ছেটুকু
(তবু) মনের মধ্যে লালন করে বাঁচিয়ে রাখি।

আবার আমি চলি না যে এমন তো নয়
পথের-ধারের সঙ্গে আমার একটু শুধু ছোট্ট প্রণয়।

ডি, এইচ, লরেন্সের দুটি কবিতা

অমিয় ভট্টাচার্য্য

গোধূলি

বসুন্ধরা-গর্ভ হ'তে অন্ধকার আসে,
লালিম পশ্চিম খণ্ড গ্রাস করে পরম গভীরে।
পিঙ্গল প্রান্তর হ'তে উৎসারিত শিশু-কলোচ্ছ্বাস ;
ধূসরিত প্রাচীন প্রাকার।

নিশিভাণ্ড হ'তে গন্ধ ঝ'রে ঝ'রে পড়ে।
চন্দ্র-নীল পতঙ্গের চকিত চলন।
পার্থিব দিনের অর্থ
ক্ষয় হয় মিথ্যার মতন।

শিশুদের খেলা
ঝিকিমিকি একক তারকা আলোক-গুণ্ঠনে।
মিলায় দিবস-যান দৃষ্টি অন্তরালে।

দুঃখে এবং লজ্জায়

গলিত সূর্য্যাস্ত পানে চেয়ে থাকি,
আর সাধ হয়,
আমিও অমনি যাই রক্তাক্ত তোরণ অতিক্রমি'
কালো-বেগুনীর বাধা-পারে।

সাধ হয়, যাই চ'লে রক্তাক্ত তোরণ অতিক্রমি' ;
যেখানে আমার লজ্জা
ফেলে রেখে যাবো,
যার-পথে ফেলে যাওয়া জুতোর মতন ;
যেখানে বেদনা রেখে যাবো,
ছেড়ে-ফেলা পোষাকের মতো ;
যেখানে মাংসল দেহ ত্যাগ ক'রে যাবো,
অনির্দ্দিষ্ট পথে-চলা পথিকের
ফেলে যাওয়া মালের মতন।

তার পর, একবার শুধু ফিরে চেয়ে
দেখে নেবো, আমার সে ছুঁড়ে দেওয়া দেহ
অকেজো মালের মত প'ড়ে আছে জুড়ে।
—আনন্দের অট্টহাসি আকাশ ভরবে

রান্নাঘরে। বাসব আর মাধব দু'জনে মুখোমুখি বসে আছে বটে—একটু কোন কথা কইছে না। তাদের অতি প্রিয়জনের এই কলঙ্ক-বার্ত্তা সমুদ্র-কল্লোলের মত অকস্মাৎ ছুটে এসেছে দু'জনের মাঝখানে। কাছে থেকেও তাই তারা—বহু দূরে।

পুরন্দর বাড়ি আসতেই মুখরা পিসিমাও নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেউ তাকে কিছু বললে না—তবু ও বুঝলে, তারটা যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছেছে। হাত-পা ধুয়ে সে বাইরের চৌকিতে এসে শুয়ে পড়লো।

মা ধীরে ধীরে উঠে এলেন রান্না-ঘর থেকে। ধীরে ধীরে এসে বসলেন চৌকির ওপর, ওর শিয়রের দিকে। ধীরে ধীরে স্নান হাতখানি ওর মাথায় রাখলেন। তার পর আঙুলগুলি ওর চুলের মধ্যে চালিয়ে দিলেন সন্তর্পণে, যেমন ভাবে ছেলেবেলায় মাথায় যন্ত্রণা হ'লে ওকে শুশ্রূষা করতেন। এই নীরব সান্ত্বনায় পুরন্দরের অন্তর্নিহিত উত্তাপ ও বেদনা হু-হু করে বেরিয়ে আসতে লাগলো চোখের জলে। মাথাটা মায়ের কোলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে প্রকৃত অভিমানী ছোট ছেলের মতো ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মা ওর মাথার মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলেন সন্তর্পণে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন না।

[ক্রমশঃ

সীমার ঊর্দ্ধে

বেচু প্রামাণিক

স্যার সি, কে, মুখার্জির বিপুল সম্পত্তির একমাত্র মালিক শ্রীঅশোকনাথ মুখার্জি।

খুব অল্প দিনের মধ্যে অশোকের নাম পল্লবিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো চার দিকে।

রুমালের গায়ে সেণ্টের মতো অশোকের সর্বাঙ্গে যেন হঠাৎ-পাওয়া সম্পত্তির সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং বন্ধু জুটতে বেশী দেরী হ'ল না।

স্যার সি, কে, মুখার্জির জীবিত কালে অশোক ছিল অত্যন্ত লাজুক আর নম্র—কোনো কাজেই নিজেকে সহজ ভাবে মানিয়ে নিতে পারতো না। বাবার আদেশে তিন-চার জন চাকর সর্বক্ষণ তার চার পাশে ঘোরাঘুরি করতো অনুগত ছায়ার মতো। জামার হাত গলিয়ে দেওয়া থেকে পায়ের জুতো খোলা সবই ক'রে দিতো চাকরেরা। ডিনারের সময় হ'ত একই ব্যাপারের পুনরভিনয়—চামচে গ্লাস তোয়ালে হাতে নিয়ে দু'জন চাকর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতো মূর্তির মতো—আদেশ পেলেই প্রয়োজনীয় বস্তুটি বাড়িয়ে দিতো তার দিকে।

বাবা মারা গেলেন। অত্যন্ত দিশাহারা ও বিভ্রান্ত মনে হ'ল নিজেকে। স্যার সি, কে, মুখার্জি যেন তার সকল সহায়ের খুঁটি উপড়ে নিয়ে গেছেন। অশোক নিজেকে এতখানি অসহায় এর আগে আর কখনো মনে করেনি।

অট্টালিকার আশে-পাশে, বাড়ির বাগানে আলো আর বাতাসেরা খেলা ক'রে যায়—এই আলো আর বাতাসে এখন আর কোনও অনুশাসনের লিপি ভেসে নেই, সন্ত্রস্ত নিয়মনিষ্ঠ চাকরেরা একে একে স'রে গেছে দূরে, তার বদলে জুটেছে বন্ধুর দল।

অশোকের মনে হচ্ছে, তার আকাশে এবার বুঝি এক নব-সূর্য্যের অভ্যুদয়। বাবার পুরানো শাসন ও আদেশ বাতিল ক'রে দিয়ে অশোক বেরিয়ে এলো জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সুপ্তি-স্নাত প্রভাতের মতো। হঠাৎ যেন সে বুঝতে পেরেছে, সত্যই সে এত দিন আলোর আড়ালে গোপন থেকে বহু অনাস্বাদিত কাল কাটিয়ে এসেছে—বাবা যেন তার সব আলোটুকু আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন একখানা গুরু-গম্ভীর মেঘের মতো। সেই মেঘ আজ ভাগ্যাকাশে অনুপস্থিত। অশোক আলোক-পিয়াসী।

স্বামীর এই দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল রমলা। অভিযোগ করলো। কিন্তু অশোকের মুখে সেই এক কথা: ভালো না লাগলে বাপের বাড়ি চলে যাও। আমার কোনো আপত্তি নেই।

কথাগুলি নিষ্ঠুর আঘাতের মতো রমলার বুকে গিয়ে লাগে। রমলা আর দ্বিতীয় কথা বলে না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে যায়। অশোকের এই উত্তর শুনে প্রথম প্রথম দুর্জয় অভিমানে তার দুই চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসতো। এখন সহ্য হ'য়ে এসেছে। বিরাট অট্টালিকার মধ্যে বন্দিনী রাজকন্যার মতো রমলা মাঝে মাঝে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবে—ভাবে সে সত্যই চলে যাক্ বাপের বাড়ি, স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু সচেতন হোক্ অশোক। কিন্তু পারে না। সে চলে গেলে অশোকের উচ্ছৃঙ্খল গতি আরো বেড়ে যাবে,

ফিরে এসে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তা গ্রহণ করা শক্ত হবে রমলার।··· অশোকের সহৃদয় উপদেষ্টা কেউ ছিল না, রমলা তা-ও জানে।

বন্ধু ইন্দ্র সেনের গলা শোনা গেল: অশোক আছিস্ না কি?

—আছি, আয়। ড্রইং-রুমে ব'সে অশোক মুখে একটা লম্বা পাইপ গুঁজে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছিল—ইন্দ্র সেনের গলা শুনে রিভলভিং চেয়ারটা প্রবেশ-দ্বারের দিকে ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসলো। জুতোর মস্-মস্ শব্দ তুলে ইন্দ্র প্রবেশ করলো। পাশের চেয়ারটায় অংগুলি নির্দেশ ক'রে অশোক বললো—বোস্।

ইন্দ্র ব'সে বললো—সুখবর। মিস্ পাপিয়া বসু আজ আসছেন কাশানোভায়। তোর সংগে আলাপ করবেন।

—সত্যি? অশোকের চেয়ারটা বার-কতক দুলে উঠলো—পাইপের ধোঁয়াগুলো এঁকে-বেঁকে গেল মাথার ওপরে।

—ঠিক চারটেয় আসবেন। এখন সাড়ে তিনটে। যেতে পারবি?

—বস্, আসছি।

কলকাতা শহরের একটি প্রস্ফুটিত যুঁই—এই পাপিয়া বসু। যুবক-মহলে আলোচিত হবার মতো একটি মারাত্মক ছন্দ-ভরা কবিতা যেন।

অশোক প্রস্তুত হ'ল। বেশী সময় ছিল না। সেন্টের জন্তে শীষ্ দিতে দিতে অশোক শোবার ঘরে ঢুকলো—রমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড় কুঁচিয়ে রাখছিল।

—শীগ্‌গির রমলা···

—কী? রমলা বিস্মিত হ'ল।

—সেন্ট, সেন্ট···

—কি করবে সেন্ট?

—কি করে সেন্ট?

—এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

—ব্যস্ত? না না। দাও। গ্লোবের স্পেশাল 'শো'টা ফস্কে যাবে নইলে।

সেন্টের জন্তে এতখানি মিথ্যে বলবার কোনো প্রয়োজন ছিল না অশোকের, কারণ, রমলা জানে, আজ এই সময় গ্লোবে কোনো স্পেশাল 'শো' দেখানো হচ্ছে না। তবু যথাসম্ভব হাসিমুখে ড্রেসিং টেবিলের ওপর আঙুল নির্দেশ ক'রে শান্ত স্বরে সে বললে—ওই তো! তোমার সামনেই দু' শিশি ভর্ত্তি সেন্ট রয়েছে। ব'লেই কাপড় কুঁচোনো রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল রমলা। স্বামীর নির্লজ্জ অভিসার-সজ্জা তাকে নিদারুণ পীড়া দিচ্ছে।

পকেট থেকে দু'টো দামী সিল্কের রুমাল বার ক'রে সেন্টে চুবিয়ে নিলো অশোক। সাবান দিয়ে মুখটা ধুয়ে এসেছিল আগেই, তোয়ালে দিয়ে বেশ ক'রে ঘসলো—সামান্ত ক্রিমানী ঘষে পাউডার বুলুলো আস্তে। ঘাড়ে আর গলায় পাউডার ছড়ালো। চুলগুলি সুবিন্যস্ত করলো। প্রসাধনের উজ্জ্বলতায় নিজেকে বিকীর্ণ ক'রে দ্রুত-পায়ে সে নেমে এলো নীচে।

ইন্দ্র বসেছিল। দু'জনে একসংগে বেরিয়ে পড়লো।

অশোকের মোটরটা যখন কাশানোভার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চারটে বাজতে বেশী দেরী ছিল না। অশোক নিজে ড্রাইভ ক'রে এসেছে, মোটরটাকে রাস্তার এক ধারে দাঁড় করিয়ে ইন্দ্রকে নিয়ে সে কাশানোভার ভেতরে ঢুকলো। অর্কেষ্ট্রা বাজছিল—মধুর সুর··· বয় এসে উপস্থিত হ'ল। ইন্দ্র বললো—কিছু অর্ডার দাও অশোক।

অশোক বললো—এখন নয়।

রিষ্টওয়াচের হলদে কাঁটা ঠিক চারটের ঘরে।

ইন্দ্র বললো—ঐ আসছে!

চেয়ে দেখলো অশোক: চেয়ে দেখ্‌বার মতো একটি সুন্দরী তরুণী স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে ইন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে। কাছে এলো পাপিয়া। মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসলো সে, বললো—কতক্ষণ এসেছো?

প্রশ্নটা ইন্দ্রের প্রতি। ইন্দ্রের চোখের তারায় একটা গাঢ় সুখাবেশ মুহূর্তের জন্তে ঘনিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল: এই কিছুক্ষণ। সে উত্তর দিলো।

ইন্দ্র চেয়ে চেয়ে দেখছিল তারই দেওয়া একটা সিগারেটের ধোঁয়া-রঙের সাধারণ শাড়িতে সুসজ্জিতা হ'য়ে তারই বন্ধুর সংগে আলাপ করতে এসেছে পাপিয়া। কত দিন এই শাড়িটা পরবার জন্তে অনুরোধ করেছিল ইন্দ্র, কিন্তু পাপিয়া প'রেনি।···এখন তার ছন্দায়িত সুঠাম সুশ্রী দেহখানি ঘিরে শাড়িটি এমন ক'রে উপর দিকে উঠে গেছে, ঠিক যেন একটি ঊর্দ্ধমুখী সতেজ লতা। ইন্দ্রের মনে হচ্ছে, সে যেন জন্ম-জন্ম পাপিয়াকে এমন মনোমোহিনী রূপেই দেখতে পায়···

ইন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিলো:

—শ্রীঅশোকনাথ মুখার্জি, স্যার সি· কে· মুখার্জির একমাত্র পুত্র··· পাপিয়া বসু, স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী···

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—আপনার কথা প্রায়ই শুনি 'সেনে'র মুখে—পাপিয়া বলছে: আলাপ ক'রে ধন্ত হলুম।

—আমিও ধন্ত···অশোকের তরফ থেকে উত্তর: এই মুহূর্তটি চিরদিন স্মরণ থাকবে আমার।

সেদিন কাশানোভা থেকে বেরিয়ে অশোক যেন স্বপ্নের বাতাসে ভর দিয়ে কল্পনার আকাশে ঘুরে বেড়ালো। অশোকের মনের পাপ্‌ড়িতে হঠাৎ এক অচেনা রঙের আভা দেখা দিলো। পাপিয়া বসুর সময় ছিল না বেশী, দু'-চারটে কথা বলেই চলে গিয়েছিল; খায়নি কিছু। অশোক একটু আহত হয়েছিল। কিন্তু তার শেষ কথাগুলি তার কর্ণে নিয়তই সুধা-বর্ষণ করছে: গরীবের কুঁড়েতে যাবেন কিন্তু এক দিন। খুব খুশী হ'ব।

পাপিয়া চলে যাবার পর সমস্ত কাশানোভাটা কেমন যেন শূন্য ও নিরর্থক বোধ হ'তে লাগলো অশোকের। এই জনপূর্ণ কলমুখর হলের সমস্তটা ছেয়ে এতক্ষণ যেন একটা দমকা বাতাস অশোকের মন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চলা-ফেরা করছিল। হঠাৎ সে বাতাস বিদায় নিয়েছে। অশোকের মনে হ'ল, সে যেন নির্বাসিত হ'য়ে এক নিরানন্দ পুরীতে বাস করছে।

ইন্দ্র বললো—উঠবি না কি?

—কোথায় যাবি উঠে?

—পার্কে বেড়িয়ে আসা যেত।

—চল্।

দাঁড়িয়ে উঠে আবার ব'সে পড়লো অশোক।

—কি রে? ইন্দ্র ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছে অশোকের মনের গতি : কিছু খাবি?

—হ্যাঁ। অশোকের কথার মধ্যে একটা অহেতুক বিভ্রান্তির সুর : লেমোনেড। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

—শুধু লেমোনেড খাবি?

—অশুদ্ধ ক'রে খাইনি কোনো দিন।

—খেয়ে দ্যাখ্।

কাছেই ছিল বয়—ইন্দ্র তার মারফৎ আদেশ পাঠালো। বয় দু'টো ফেনা-ভর্তি গ্লাস এনে রাখলো দু'জনের সামনে।

হাসলো অশোক : নেশা হবে না তো?

—পাগল!

খাবার আগে অশোক একবার জিজ্ঞেস ক'রে নিলো : পাপিয়া দেবীর ঠিকানাটা কি জানো, ইন্দ্র?

—জানি।—পাপিয়ার ঠিকানা বললো ইন্দ্র : কেন?

—এমনি।

দু'জনে গ্লাস ঠেকিয়ে চুমুক দিলো।

সবটা খেয়ে নিয়ে অশোকের মনে হ'ল, এই কাশানোভার উজ্জ্বল আলোকরাশির উপর যেন বিস্মৃতির মতো কালো অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। নিজেকে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মাথার তন্ত্রীগুলো আকস্মিক কোনো আঘাতে অবশ ও শিথিল হ'য়ে গেছে অনুভূতিহীন কোনো মরা মানুষের মতো। মনে হ'ল, সে যেন যুগ-যুগান্ত পার হ'য়ে এক অবচেতনার রাজ্যে পদার্পণ করেছে—সাড়া নেই, স্মৃতি নেই। মাথাটা অত্যন্ত ভার হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপর মুখ গুঁজে অসাড়ের মতো পড়ে রইলো অশোক। ইন্দ্র একটা কড়া সিগারেট ধরালো।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে অশোক মাথা তুললো, বললো—চলো ইন্দ্র। স্বর জড়িত, অস্পষ্ট।

ইন্দ্র পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করছিল, একটা অশোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আর একটু ব'সে যাও না-হয়।

—না, চলো। সিগারেটটা ধরালো অশোক।

বিল্ চুকিয়ে দিয়েছিল ইন্দ্র—দু'জনে বেরুলো।

মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে অশোক আজকের এই জীবন-পরিবর্তনকারী বিপ্লবের কথা মনে মনে একবার আলোচনা ক'রে নিলো মেধাবী ছাত্রের মতো। আজকের অভিজ্ঞতা যেন বহু অভিজ্ঞ লোকের মজলিসে রস-ঘন ক'রে বলবার মতো। মনে হচ্ছিল, অশোক বুঝি আর পেছিয়ে নেই। এই কলকাতায় ইন্দ্রের মতো আরো দশ জনের সংগে সে সমান ভাবে পাল্লা দিতে পারে। ইন্দ্রকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছে অশোক।

ইন্দ্রের বাড়ি পড়ে আগে। মোটর থামিয়ে অশোক তাকে নেমে যেতে বললো—ইন্দ্র বন্ধুর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবার প্রস্তাব জানালো। অশোক মাথা নেড়ে বললো—না। আমি ঠিক আছি। তুমি যাও।

তখন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। তার ওপর ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। সমস্ত কলকাতা অন্ধকারে থম্-থম্ করছে নির্জন ভয়ংকর একটা কারাগারের মতো। অশোক সেই চাপ-অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভাবছিল, আমরা তো আলোর মানুষ, তবু এত অন্ধকার কেন?

বাড়ির গেটের সামনে অশোক মোটর থামালো। বাড়ির ড্রাইভার চিকণলাল লম্বা একটা স্যালুট জানিয়ে এগিয়ে এলো কাছে। অশোক বললো—গ্যারেজমে বন্ধ কর দেও। অশোক একটু টলছে, গলার স্বর একটু জড়িত। চিকণ বিস্মিত হ'য়ে মোটরের ভেতরে ঢুকে গ্যারেজের দিকে চললো। বহু কালের পুরোনো ভৃত্য—আজ এই বাড়িতে একটা মস্ত-বড় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলো।

অশোক বাড়িতে প্রবেশ ক'রে ওপরে উঠে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। সেই পোশাকেই শুয়ে পড়লো বিছানায়। তার পর তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না—নেশাচ্ছন্ন চোখ দু'টিতে নেমে এলো গাঢ় তন্দ্রা···

অশোকের পাশে শুয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত রমলার চোখে ঘুম এলো না, ঘরের বাতাসে একটা কিসের দুর্গন্ধ তার সংগে কানাকানি ক'রে যাচ্ছে।···অন্ধকারে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তার পদ্ম-সুন্দর ডাগর চোখ দু'টি অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠলো।

একটা অস্ফুট কাতরোক্তি ক'রে অশোকের ঘুমটাও ভেঙে গেল এই সময়।

রমলা বললো—মাথাটা টিপে দেব?

—দাও।

কিন্তু কপালে হাত দিয়ে রমলা যেন চীৎকার ক'রে উঠলো—এ যে ভীষণ জ্বর দেখছি, ডাঃ মিত্রকে ফোন করি একবার—

—না, না···

—বড্ড জ্বর মনে হচ্ছে।

—ঘুমুলেই সেরে যাবে। রমলার একটা হাত টেনে নেয় অশোক : তুমি রয়েছো কাছে, জ্বর কি হ'তে পারে রমা?

রমলা চুপ ক'রে থাকে। বহু কাল পরে শোনা 'রমা' ডাকটুকু অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে।···মাথাটায় হাত বুলোতে বুলোতে রমলা এক সময় ভাখে স্বামী সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছে···সহজ স্বাভাবিক নিশ্বাস পড়ছে।

পরদিন সকালে জ্বর থাকে না।

হাত-মুখ ধুয়ে অশোক বেরুতে যাচ্ছিল, রমলা কাতর চোখে কাছে এসে দাঁড়ালো, বললো—আজ আর বেরিয়ো না—বিশ্রাম নাও। মানুষের শরীর—

অশোক তার কথায় কর্ণপাত করে না, বেরিয়ে গেল মোটর নিয়ে। ফ্ল্যাট-নাম্বারটা ভুলতে পারেনি অশোক। মোটর গিয়ে দাঁড়ায় পাপিয়ার ফ্ল্যাটের নীচে। বেয়ারার হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দেয় ভেতরে। পাপিয়া স্বয়ং নেমে এসে অভ্যর্থনা করলো তাকে—কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন।

স্মিত হাস্যে অশোক নমস্কার জানালো।

প্রতি-নমস্কার ক'রে পাপিয়া বললো—কালকে আমার ঠিকানাটা দিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলুম···ভাবলুম, ভুলটা যখন হ'য়েই গেছে, কোন্ ক'রে নিমন্ত্রণ জানাবো আপনাকে—কিন্তু ফোন্-নাম্বারটাও খুঁজে পেলুম না ফোন্-গাইডে···আপনার বাবার নামেই সম্ভবতঃ ফোন্-নাম্বারটা আছে—আর কি মুস্কিল দেখুন, আপনার বাবার পুরো নামটাও আবার জানি নে।

—তাতে কি হয়েছে, আমি তো এসেই গেছি!

—সে আমার সৌভাগ্য! আচ্ছা আসুন, ওঁরা সবাই অপেক্ষা করছেন।

—ওঁরা?

—আজ একটা গানের জলসার মতো আয়োজন করেছি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাটা মাঝে-মাঝে বড় বিস্বাদ লাগে—তাই এই বৈচিত্র্য।

—ওঃ, চলুন। অশোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

পাপিয়ার ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। তার ও-পাশের ফ্ল্যাটটায় থাকতেন এক ভদ্রলোক, তিনি উঠে গেছেন অন্য যায়গায়, ওটাও ভাড়া নিয়েছে পাপিয়া। আর এ-পাশের ফ্ল্যাটটি পাপিয়ার এক অনুরক্তের—সে এমনি ছেড়ে দিয়েছে। মোট এই তিনটে ফ্ল্যাট নিয়ে গানের জলসা বসেছে। পাপিয়ার রুমটাতেই বসেছে আসর—বাকী দু'টোর একটাতে আহারের আয়োজন, অপরটাতে অতিথি-পরিচিতি। যারা মাতাল হ'য়ে পড়ছে, বাসি-খাবারের মতো তাদের ফেলে দিয়ে আসছে 'অতিথি-পরিচিতি' রুমে। এই রকমই একটা জ্ঞানহীন মাতালকে দু'জন যুবক ঘর থেকে টেনে বার ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল পাশের রুমটায়—পাপিয়া আর অশোক এসে পড়লো সামনে! পাপিয়া সহাস্যে বললো—রায় বাহাদুর অত্যধিক খেয়েছেন দেখছি যে!

—হ্যাঁ। খুব।

—গান গাইছে না?

—গাইছে না আবার! সেই উৎকট গলা আর উদ্ভট সুর: টু নাইট আই মিট্ ইউ ডারলিং, ডারলিং—

সমস্বরে সবাই হেসে উঠলো।

পাপিয়া বললো—কত বিচিত্র ধরণের মানুষ যে এখানে দেখতে পাবেন তার ঠিক নেই, মিঃ মুখার্জি!

এই সময় পাপিয়ার ঘরের মধ্যে থেকে একটা সুমিষ্ট গানের সুর ভেসে এলো। পাপিয়া বললো—রেডিও-আর্টিষ্ট বিজনলতা রায়। আমার বান্ধবী।

দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে যে ভদ্রলোকটির ওপর উভয়ের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে পড়লো, তার ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল শান্ত সৌম্য মুখভাবের প্রতি তাকিয়ে পাপিয়া বললো—অধ্যাপক তাপসরঞ্জন ভট্টাচার্য। ইউনিভারসিটির একটি উজ্জ্বল রত্ন। গান শুনতে ভয়ানক ভালোবাসেন। তাই স্থান-অস্থানের বাচ-বিচার করেন না···

—ওর পাশের ভদ্রলোকটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন—বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা বাসুদেব গাঙ্গুলি। ওর এক জনের পরে যে লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখের মধ্যে মদের বোতল পূরে দিয়েছেন—উনি কে জানেন? 'জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-সংঘের' সভাপতি—জয়দেব বোরাজ। উনি নিজে জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে এই ভাবে রক্ষা করেন।

অশোক শুধু হাসলো।

পাপিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এমনি ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো:

—আর, ওই কোণের ভদ্রলোকটি যে মেয়েটির দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অথচ মেয়েটি ওকে ফিরেও দেখছে না—ওই গর্বিতা মেয়েটি হ'ল স্যার উমাশংকরের নাত্নী সীতা বসু। ভদ্রলোক হলেন ওরই অনুরক্ত অমল দত্ত—খিব্‌স্ এম্-এ, প্রফেসারি করেন। চিত্রাভিনেত্রী নীলিমা দেবীকে চিনতে পারছেন? অমন পোজ্‌টি দেখেও না? তাহ'লে আপনি বাংলা সিনেমাই দেখেন না, বুঝছি। ওই হেলিওট্রোপ্‌ রঙের শাড়ি-পরা হাস্য-মুখরা মেয়েটির পরেই যে মেয়েটিকে মনে হচ্ছে কতই উদাস—উনিই নীলিমা দেবী। বাসুদেব গাঙ্গুলির ভাবী পত্নী বলতে পারেন।···

বিজনলতার গান শেষ হ'য়ে গেল।

পাপিয়া বললো—এবারে আমার একটা গান আছে। আপনি বসুন।

পাপিয়া গান গাইতে আসরে নেমে পড়লো। অশোক অত ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক একটা নির্বাক্ ছবির মতো।

—আরে অশোক যে!

অশোক পেছন ফিরে, তাকালো।

ইন্দ্র বললো—শোন্, কথা আছে।

তাকে একটু নিরালায় টেনে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্র বললো—তোর বাড়ি থেকেই আমি আসছি। এখানে তোকে পাব আশা করিনি···

অশোক বললো—বল্, কি বলবি?

—এই ফাংশানে পাঁচশো টাকা সর্ট পড়েছে। পাপিয়া বলছিল, যদি তুই ডোনেশন্ হিসেবে দিস্···

—পাঁচশো? একটু ইতস্ততঃ করলো অশোক।—নে। পাঁচটা একশো টাকার নোট বার ক'রে সে তুলে দিলো ইন্দ্রের হাতে।···
ইন্দ্র ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য দিকে—খস্-খস্ করছে নোটগুলো তার হাতে। পাঁচটা রাত্রির আয়ু বাঁধা রইলো এতে পাপিয়ার। পাঁচ রাত্রির জন্যে পাপিয়া তার—সম্পূর্ণ তার···

* * * *

পাপিয়ার সাহচর্য ত্যাগ করা কঠিন হ'য়ে উঠেছিল অশোকের। পাপিয়াও এ সুযোগ ব্যর্থ হ'তে দিলো না। বাবার জমানো ব্যাংকের অর্থ ক্রমে ক্রমে শূন্য ক'রে আনছে পাপিয়া—অশোক দিয়েই যাচ্ছে, থেমে গিয়ে দান-প্রতিদানের হিসেব-নিকেশ করলো না একবারও···

ইতিমধ্যে অশোকের কতকগুলি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম জুটে গিয়েছিল। এগুলিও ইন্দ্র সেনের আবিষ্কার। পাপিয়াকে নিয়েই অশোক এত ব্যস্ত ছিল যে, ওদিকে যাবার সময়টুকুও পায়নি। আজ হঠাৎ পাপিয়ার ফ্ল্যাটের নীচে মোটর দাঁড় করিয়ে ওদের কথা মনে পড়ে গেল। পাপিয়ার রুমটার পানে তাকালো অশোক, সব জানলাগুলো বন্ধ। কোথাও বেরিয়েছে হয়তো। অশোক মোটর ঘুরিয়ে নেবার আদেশ দিলো চিকণলালকে।

যা আশা করেছিল ঠিক তাই। তাকে ঢুকতে দেখে কেউ অভ্যর্থনা করলো না, সাড়া দিলো না···

—ভেরি সরি। অশোক ক্ষমা চাইলো।

প্রত্যুত্তরে প্রীটি একটিবার চোখ তুলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ইভ্ অনন্যমনে রসাল নভেলখানা পড়ে যেতে লাগলো। কেটিয়া আর লোটাসের উগ্র আলোচনার মধ্যে বিরতি ঘটলো না এতটুকু। লিলির লিপষ্টিক-ঘষা রক্তোষ্ঠ ঠোঁটে সিগারেট জ্বলতেই লাগলো।—ব্যাপার দেখে অশোক মুচকি হাসলো।

অনেক সাধাসাধির পর সকলের অভিমান ভাঙলো। কারণ-স্বরূপ অশোক জানালো: স্ত্রীর ভীষণ অসুখ করেছিল তাই আসতে পারিনি।

কেটিয়া বললো—তোমার ওয়াইফ, আছে না কি?

—আছে।

—বাংগালী?

—ইয়েস্।

শুনে কেটিয়া আর ইভ্ এমন ক'রে হেসে উঠলো যে অশোকের মনে হ'ল, বাঙালীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে সে যেন এতটুকু উঁচু দরের রুচির পরিচয় দিতে পারেনি। অশোক অপ্রতিভ হ'ল একটু।

হঠাৎ লিলি সিগারেট ফেলে দিয়ে একেবারে অশোকের গলা জড়িয়ে ধরলো—এবারে ওয়ালটেয়ারে সিজন্-টুর দিতে নিয়ে যাবে না, ডারলিং? লিলির মাঝে মাঝে এ রকম ভাবোচ্ছ্বাস জাগে।

অশোক তার ঠোঁট লক্ষ্য ক'রে ঈষৎ নত হ'ল: সিয়োর!

ইভ্ বললো—আমাকে একটা জার্মানীর রয়াল-গাউন্ এনে দিতে হবে কিন্তু!

প্রীটি বললো—তার আগে একটা পার্টি দিতে হবে—মনে থাকে যেন।

লোটাস বললো—দিতে হবে মানে? সেদিন উনি বলেছিলেন কি?

—বলেছিলুম বুঝি!

এক ঝট্‌কায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে লোটাস বললে—নয় তো কী?

—আচ্ছা, আচ্ছা। লোটাসের ওই মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার ভংগীটা সহ্য করতে পারে না অশোক—তার ওপর কথায় কথায় বাঙালী মেয়ের মতো অভিমান। রক্তস্রোতে যেন আগুন ধরে যায়। এদের মধ্যে লোটাসেরই বয়েস অপেক্ষাকৃত কম এবং সে-ই এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। অশোক বলে—বাপ-মায়ের দেওয়া ওর নামটা সত্যই সার্থক হয়েছে, ও একটি জীবন্ত লোটাস!

কেটিয়া বললো—অনেক দিন পার্টি দাওনি মুখার্জি—এবার একটা দাও।

সুতরাং পার্টি দিতেই হবে। নইলে মান থাকে না এদের কাছে। এদিকে ব্যাংক শূন্য।···সেখান থেকে টাকা তুলতে গিয়ে কোথায় যেন একটু ব্যথা বাজলো।···অনেক ভেবে-চিন্তে সস্তায় একটা মোটর গাড়িই বিক্রি ক'রে ফেললো সে। কিনলো ইন্দ্র। মাছের তেলে মাছ ভাজে সে। অশোকের সংগে বন্ধুত্বের পুণ্যে ইতিমধ্যে অনেক কিছুই সে ক'রে ফেলেছে। রেশ-মাঠ থেকেও পেয়েছে কিছু। অথচ তার কাছ থেকে প্রথম বার টাকা ধার চাইতে গিয়ে অশোক শুনেছিল—মাফ্ করো বন্ধু! লিমিট্ বজায় রেখে তবে আমি পথ চলি। তোমাকে হাজার-খানেক টাকা ধার দিলে কাল 'পজিশন্' বজায় রাখতে পারবো না।···রূঢ় আঘাত লেগেছিল একটা চেতনায়। দুলে উঠেছিল পৃথিবীটা। 'লিমিট'? 'পজিশন'?

তবু পার্টি দিলো অশোক।

পার্টির দিন বেশী ক'রে মদ খেতে পারলো না। বললো—শরীর খারাপ।

ইভ বললো—কাওয়ার্ড!

প্রীটি একটা ফেনা-ভর্তি গ্লাস তুলে ধরলো তার মুখের কাছে।

অশোক বললো—নো, প্লিজ···

লাল ঠোঁট দু'টো বিকৃত ক'রে প্রীটি বললো—শেম্ টু ইউ···

অশোক ব'সে ব'সে ওদের মদ খাওয়া দেখলো—প্রলাপ ও গান শুনলো। নাচলো লোটাস—সুন্দর। তার পর ওদের অলক্ষ্যে এক সময় সেখান থেকে বেরিয়ে অশোক মোটরে গিয়ে উঠলো! মনে হ'ল, সে যেন এত দিন পরে একটা প্রচণ্ড নাগ-পাশ ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে বেরিয়ে এসেছে মুক্তির পৃথিবীতে। এখানকার বাতাস কত সুন্দর, আলো কত মিষ্টি!—দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো একটা। বড় অসময়ে তার চেতনার ঘুম ভেঙেছে—জানতে পেরেছে আনন্দ করবার শেষ-রাত্রিটি আজ অতীত-প্রায়। আর সে আনন্দ করতে পারবে না—সব ফুরিয়ে গেল। টাকা নেই। বাস্তবিক সে আজ রিক্ত, শূন্য। এত বড় পৃথিবী আজ যেন তাকে বিরাট মুখ-ব্যাদান করছে। নিঃস্বতার সুযোগে সবাই স'রে যাবে একে একে···

কথাটা ভাবতে গিয়ে অকস্মাৎ এক জনের কথা মনে পড়ে গেল তার—রমলা। একটি নির্দোষ স্বামিপ্রাণা নারীর কথা। করুণায় শ্রদ্ধায় বিগলিত হ'য়ে উঠলো অশোকের চিত্ত। মনে হ'ল, তাদের দু'জনের জীবনে এই যে অবাঞ্ছিত ক্ষমাহীন দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় আহ্বান ক'রে আনলে, তা বুঝি রমলার হাজার ফোঁটা চোখের জলেও দূর হবে না। ঝম্-ঝম্ করছে অশোকের মাথা।

—থামো, থামো চিকণলাল! চীৎকার ক'রে উঠলো অশোক।

চিকণ মোটর থামালো এবং বিস্মিত ভাবে পেছন ফিরে খেয়ালী প্রভুর পানে তাকালো।

রাস্তার এক পাশে একটা ডাষ্টবিনের গোড়ায় এক দল শীর্ণকায় বুভুক্ষু আবর্জনা ঘাঁটছিল—খাদ্যের অন্বেষণে। মন্বন্তর। একটা ডালভাত-মাখা মরা ইঁদুর এক জন টেনে বার করতেই ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল নতুন প্রাণ-স্পন্দনের মতো। কিন্তু ওটাকে কোনো প্রকারে খাওয়া যাবে না। বুঝতে পেরে গভীর হতাশায় তাদের বুভুক্ষু অন্তর ভ'রে গেল। ওদের মধ্যে থেকে কয়েক জনের দৃষ্টি মোটরটার ওপর পড়তে—আস্তে আস্তে উঠে এলো দল ছেড়ে।

—একটা পয়সা বাবু, দু'দিন কিছু খাইনি।

—এই কচি ছেলেটা এখনো নড়ছে বাবু, দু'টো পয়সা—একটু দুধ খাওয়াব।

স্যার সি. কে. মুখার্জির বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীঅশোকনাথ মুখার্জির কাছে তখন একটি পয়সাও ছিল না। পকেট একেবারে শূন্য।

ওদের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অশোক আদেশ দিলো—চালাও চিকণলাল।

মোটর ছেড়ে দিলো।

রঙ্গ-মঞ্চ

শ্রীমতী নীলিমা ভট্টাচার্য্য

১

'মনোরমা' নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ সুপ্রভা দেবীর বাড়ীর সম্মুখে প্রায় একই সময় বিপরীত দিক্ হইতে দুইটি ফিটন গাড়ী আসিয়া থামিল। দুইটি গাড়ী হইতে দুই জন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক নামিয়া একই সঙ্গে সুপ্রভা দেবীর সুসজ্জিত বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটা লম্বা অপরিসর হলের ভিতর দিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে হয়; তাহার দুই পাশের দেওয়ালে বড় বড় আয়না বসানো। আয়নাগুলির গঠন ও বসাইবার কায়দা এমন যে, হলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তাহাতে প্রতিমূর্ত্তি একটু একটু বিকৃত ভাবে দেখা যায়।

সুপ্রভা দেবী তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বসিয়া নাই, ইহা দেখিয়া আগন্তুকদ্বয় উভয়েই ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু কেহই অপরের সম্মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। সুপ্রভা দেবীর খাস ভৃত্য হারাধন নির্ব্বিকার মুখে উভয়কেই পর পর নত হইয়া সেলাম করিল এবং হাত জোড় করিয়া উভয়কেই দুইটি সোফায় বসিতে অনুরোধ করিল। হারাধন কোন্ দিন হইতে এখানে রহিয়াছে তাহা কেহ জানে না। তবে, হারাধন যে সুপ্রভার বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন, এ কথা সবাই জানে। সুপ্রভা দেবীও হারাধনের সেবা ও দক্ষতার

প্রশংসা করেন এবং এ পর্য্যন্ত যত ভৃত্য [illegible]ছেন, তাহাদের মধ্যে যে সে শ্রেষ্ঠ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। হারাধন ধোপ-দুরস্ত পায়জামার উপর শার্ট চড়াইয়া অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাবে কথাবার্ত্তা বলে। সুপ্রভা দেবীর ঘরে যখন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সমাগম হয়, সকলে যখন হাসিতে ও গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হারাধন তখন নীরবে দ্বারদেশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষায় একটা টুলের উপর বসিয়া থাকে।

আগন্তুক ভদ্রলোক দুই জন বসিবার পর হারাধন তাহার স্বাভাবিক বিনীত ভাবে বলিল, "দয়া করে একটু বসুন। উনি বড় ঘরে সূর্য্য বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।" ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু বলিলেন না, শুধু তাঁহাদের মুখের উপর একটা কালো ছায়া পড়িল। তাহা অসন্তোষ বা ঈর্ষা বা অন্য কিছুরও হইতে পারে। সূর্য্য বাবু এক জন নামজাদা অভিনেতা, অল্প দিন হইল নাট্যজগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। বয়স ২৪।২৫, রাজকীয় চেহারা। সূর্য্য বাবু ও সুপ্রভা দেবী শীঘ্রই একটা বিখ্যাত নাটকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। ইঁহাদের একটি বিশেষ ঢংএর ছবি-সম্বলিত পোষ্টার সহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। আসন্ন অভিনয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইনি প্রায়ই সুপ্রভা দেবীর বাড়ী আসিয়া থাকেন। সূর্য্য বাবুর উপস্থিতি আগন্তুকদের কাহারো মনঃপূত হয় নাই, তাহা তাঁহাদের মুখ-চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আগন্তুকরা সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। এক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ক্যাপ্টেন পাল নামে খ্যাত। নিজ চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছেন। এখন অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক। বিবিধ ফ্যাক্টরী ও ব্যাঙ্ক চালাইয়া থাকেন। শুধু মাত্র টাকার জোরেই রাজনীতির আসরেও পসার করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন যুগের ঢেউ রাজনীতির রঙ্গ-সমুদ্র হইতে তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে। টাকার বাঁধ এই নব জল-তরঙ্গ রোধ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য বোধ করেন। বিদ্যার পুঁজি তাহার না থাকিলেও, অর্থবলে তিনি বড় বড় বিদ্যায়তনে মোড়লী করেন। তাঁহার অর্থপুষ্ট খবরের কাগজে যখন তাঁহার ভূয়া প্রশংসা বাহির হয় এবং অনুগ্রহপ্রার্থীর দল যখন সেই সব কীর্ত্তির উল্লেখ করে, তখন আত্ম-তৃপ্তিতে তাঁহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসে। ক্যাপ্টেন সাহেবের চেহারাখানাও খুব শক্ত ও মজবুত। দৃঢ় পেশীবহুল, লোমশ ও বেঁটে চেহারা। সুপ্রভা দেবীর সহিত তাঁহার অনেক দিনের আলাপ, কিন্তু অর্থ ও প্রতিপত্তির পূর্ণ প্রয়োগ করিয়াও সুপ্রভাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার ক্ষোভ আছে।

অন্য ভদ্রলোকটির নাম শ্রীনলিনীবিহারী—বিখ্যাত নাট্যকার ও সুরশিল্পী। কয়েকখানি অতি আধুনিক নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু থিয়েটারের মালিকদের নাট্যরস-বোধের অভাব দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি আছে। অভিনেত্রীদের সহিত ঘনিষ্ঠতার গর্ব্ব করেন। নলিনীবিহারীর ছিপছিপে চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার চাঁছা। আজানুলম্বিত ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী ও ভূমিস্পর্শী ধুতি পরিহিত নলিনী বাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এটা নাটকের কোন্ অঙ্ক হইতে পারে? আজ তিনি এখানে অনেক আশা করিয়া আসিয়াছেন, একান্তে দুই জনে নব-রচিত একটা নাটকের আলোচনা করিবেন, অথচ ঠিক এই সময় কিম্ভূত-কিমাকার বেরসিক ক্যাপ্টেন আসিয়া [illegible] কি করিয়া?

ক্যাপ্টেন সাহেবও বসিয়া বসিয়া ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন, আজ সন্ধ্যায় ককটেল পার্টিতে না যাইয়া, সেখানে একটা বড় রকম কনট্রাক্ট বাগানো যাইত, তাহার ভরসা ত্যাগ করিয়া, তিনি আকুল হৃদয়ে সুপ্রভা দেবীর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সুপ্রভা দেবীর কাছে বসিয়া তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত দেহ-মন একটু সতেজ করিয়া লইবেন। নিভৃতে বসিয়া সুপ্রভা দেবীর কাণে কাণে বলিবেন, সম্প্রতিকার কারবারে তাঁহার অপ্রত্যাশিত মোটা লাভ হইয়াছে—এই সকল এবং অন্যান্য আরও মধুর পরিতৃপ্তির মূর্তিমান্ ব্যাঘাত-স্বরূপ এই মেয়েলী অপদার্থ নলিনীটা আসিল কেন?

২

ক্যাপ্টেন সাহেব ও নলিনীবিহারী আসিবার কিছু সময়ের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সুপ্রভা দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য! কত দিন পরে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল। ভাবছিলাম, ভুলেই বা গেলেন।"

একখানি মূল্যবান বাসন্তী রংএর শাড়ী ফ্যাশন-দুরস্ত করিয়া পরা, সুপ্রভা দেবী তাঁহার পূর্ণ যৌবন ও সৌন্দর্য্যের সমস্ত অনতিক্রম্য আকর্ষণ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার উজ্জ্বল মুখের উপর উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো প্রতিফলিত হইতেছে; মুখের হাসির বঙ্কিম রেখা ও চোখের চটুল চাহনি দেখিয়া প্রত্যেকের মনেই ধাঁধা লাগিল—বোধ হয় তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া সুপ্রভা দেবী কথা বলিয়াছেন। উপস্থিত দুই জনেই তাড়াতাড়ি উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছেন, এমন সময় পাশের একটি দরজা খুলিয়া সূর্য্যকান্ত বাবু প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যকান্তর অভিনয়ের পোষাক, স্বল্প বস্ত্রের উপর একটি ব্যাঘ্র চর্ম্ম, দক্ষিণ হস্তে একটি বল্লম। দেখিতে দীর্ঘকায়, সুপুরুষ। দরজা খুলিতে খুলিতে অভিনয়ের সুরে বলিতেছিলেন, "দেবী, বহু যুগ ধরে তব আশে…" ঘরের ভিতর আগন্তুকদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে চুপ করিয়া গেলেন। বলিলেন, "মাপ করবেন, আপনাদের দেখতে পাইনি। আমার অভিনয়ের বাকী অংশ…"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই নলিনী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ। এতে আর কি হয়েছে? অভিনয় ত সবাই করছি। সারা পৃথিবী জুড়েই ত' রঙ্গমঞ্চ।"

সূর্য্যকান্ত বাবু ইন্দ্ৰধনের হাতে বল্লমটি দিয়া একটি সোফায় বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আর এক জন বাহিরের দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। সুপ্রভা ছাড়া আর সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্রভা দেবী অগ্রসর হইয়া পরম আগ্রহ ভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া একটি চেয়ারে বসাইলেন। আগন্তুক খর্ব্বকায়, পঞ্চাশের কিছু বেশী বয়স। মাথার চুলগুলি বড় বড়, যত্নের অভাবে রুক্ষ, জট পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দাড়ি-গোঁফ-সমাচ্ছন্ন মুখ। পরনে গেরুয়া রংএর কাপড় ও পাঞ্জাবী। চোখ দুইটিতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি ও স্নেহের কোমলতা মিশিয়াছে; এই চোখ দুইটিই সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া নিজেই পরিচয় দিলেন, "আমার নাম ভবানন্দ, সুপ্রভা আমাকে ডেকেছেন। ওঁর বিশেষ দরকার আছে।"

সকলের মুখে একটা ঈর্ষার কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকেই উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু আর কেহ আগে উঠে কি না দেখিবার জন্য প্রত্যেকেই বসিয়া রহিলেন। সুপ্রভা দেবী সকলকে চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আপনারা বসুন—বসুন, ব্যস্ত হবেন না। আমার স্বামীজীর সঙ্গে একটু কথা আছে, আমি একটু পরেই আসছি।"

ক্যাপ্টেনের মুখে একটা কড়া জবাব আসিয়াছে, বলিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতেছেন, নলিনী বাবু চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া চশমা একবার খুলিতেছেন একবার লাগাইতেছেন, আর সূর্য্যকান্ত বাবু বল্লম উঁচু করিয়া ধরিবার ভঙ্গীতে হাত উঁচু করিয়া তুলিতেছেন। সুপ্রভা দেবী চটুল ভঙ্গীতে ক্যাপ্টেনের ডান হাত ধরিয়া এক পাশে লইয়া গিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্টেনের মুখের অন্ধকার কাটিয়া আসিল; তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি যাচ্ছি।" ফিরতে বেশী দেরী হবে না—সূর্য্যকান্তর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এই প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তড়াক্ করিয়া উঠিয়া হল-ঘরের একটি দরজা দিয়া একটি ছোট ঘরে চলিয়া গেলেন। ক্যাপ্টেনের মুখে করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুপ্রভার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিজয়ীর ভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। সুপ্রভা দেবী বিলোল কটাক্ষে

নলিনীবিহারীর দিকে চাহিয়া, একটু অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্যাপ্টেনের একটু পেছনে বাহির হইয়া গেলেন।

নলিনীবিহারীরও মনের কুয়াসা যেন কাটিয়া গিয়াছে। সুপ্রভা দেবীর অনুরাগ সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ নাই। নলিনী বাবু মৃদু শিস্ সহকারে একটা গানের সুর বাজাইতে লাগিলেন। শুধু ভবানন্দ বসিয়া বসিয়া সুপ্রভা দেবীর চাতুর্য্য ও ছলনাময়ী রূপ বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। নলিনী বাবু কিছু পরে কি মনে করিয়া ভবানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "ভাখো ঠাকুর, সুপ্রভা দেবী নেহাৎ ভাল মানুষ, অত্যন্ত সরলা। একে তুমি দু'টো বোল-চাল দিয়ে ভুলিয়ে কিছু বাগিয়ে নিতে পারো; কিন্তু দেখো, বেশী এগিয়ো না। পুলিসের বড় সাহেব মিঃ বাসু আমার বন্ধু, আমি মনে করলেই তোমাকে দু'টি বছরের জন্তে ঘানিতে জুড়ে দিতে পারি। কথাটা মনে রেখো ঠাকুর। এই সেদিন মিস্ রেবা ঘোষের বাড়ীতে পার্টি ছিল, মিঃ বাসু ছিলেন প্রধান অতিথি..."

নলিনী বাবু এই রকম নিজের মনে কত কি বলিয়া যাইতেছেন, ভবানন্দ অন্তমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ কাণে আসিল। ভবানন্দ সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং দরজা দিয়া বাহিরের লম্বা হল-ঘরটির দিকে গেলেন। নলিনী বাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিক হইতে ক্যাপ্টেন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া নলিনী-বিহারীর গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "শয়তান, এ তোমার কাজ, আজ তোমাকে শেষ করব।"

নলিনীবিহারীর চশমা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, সুবিন্যস্ত মাথার চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চোখ-মুখের ভাব অস্বাভাবিক। কিন্তু নলিনী বাবু স্থির গলায় বলিলেন, "আমার শেষ হওয়াই ভাল। কিন্তু ছাড়, এ আমার কাজ নয়। বুঝেছি এ তোমারও কাজ নয়। যে সয়তান এ কাজ করেছে, তাকে চরম দণ্ড না দিয়ে আমাদের জীবনে শান্তি নেই।" নলিনীবিহারীর স্থির অকম্পিত কণ্ঠস্বরে ক্যাপ্টেন তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার মধ্যে ভবানন্দ হলের বড় উজ্জ্বল আলোটা জ্বালিয়া দিয়াছেন। হলের এক পাশে, একটা দরজার ধারে, একটা আয়নার ঠিক নীচে সুপ্রভা দেবীর দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। পিঠের দিকে হাতের কাছে জামা একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ঠিক তাহারই একটু নীচে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন, তখনও রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, নিটোল, অপরূপ সুন্দর শুভ্র দুইটি বাহু সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে।

ভবানন্দ এতক্ষণ ঝুঁকিয়া এক মনে দেখিতেছিলেন, উঠিয়া বলিলেন, "বড় দেরী হয়ে গেল। আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। সব শেষ হয়ে গেছে। আমি কিছু করতে পারলাম না।"

এই সময় হল-ঘরের এক পাশ হইতে একটি দরজা দিয়া আসিয়া হারাধন ধীরে ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে নিস্পন্দ মৃতদেহের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া নির্নিমেষ নয়নে কি দেখিল; তাহার পর টলিতে টলিতে বসিবার ঘরে যাইয়া অবসন্ন ভাবে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। ভবানন্দ ছাড়া কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। ইতিমধ্যে কখন সূর্য্যকান্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরিধানে এখনও আগেকার পোষাক, চোখ-মুখে বিহ্বল ভাব। ভূমিশায়ী সুপ্রভার দেহের দিকে দেখিতে দেখিতে ক্রোধে চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু হঠাৎ ক্যাপ্টেন ও নলিনীবিহারী একসঙ্গে তাহার উপর লাফ দিয়া পড়িয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সূর্য্যকান্ত কম বলশালী ছিলেন না। একা আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ কাবু হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে ভবানন্দ দৌড়িয়া গিয়া দুই জন পুলিশ ডাকিয়া আনিয়াছেন। পুলিস প্রথমে যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে ছাড়াইয়া দিল এবং মৃতদেহের ভার গ্রহণ করিল। ক্যাপ্টেন ও নলিনীবিহারী উভয়েই একই জবানবন্দী দিলেন। সূর্য্যকান্ত সুপ্রভাকে হত্যা করিয়াছে, তাঁহারা উভয়েই দেখিয়াছেন। পুলিশ সূর্য্যকান্তকে গ্রেপ্তার করিল। ভবানন্দ হারাধনের দিকে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দেখা গেল, হারাধন তখন সোফায় বসিয়া আছে বটে, কিন্তু কখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। সকলে বুঝিলেন, একনিষ্ঠ ভৃত্য হারাধন প্রিয় প্রভুর এই শোচনীয় বিয়োগ সহ্য করিতে পারে নাই।

৩

সারা সহরে অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। সংবাদপত্রের মালিক ও পাঠকগণ বহু দিন এমন মজাদার খবর পায় নাই। বড় বড় হরফে শিরোনামা দিয়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপানো হইতেছে। হত্যাকারী সূর্য্যকান্ত হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে। দেশের সুসন্তান, বিশিষ্ট নাগরিক ক্যাপ্টেন এবং বিখ্যাত শিল্পী নলিনীবিহারী অপরাধীকে ধরিয়াছেন—এই সব বিবরণ পড়িয়া পাঠককুল খুশী হইয়া ক্যাপ্টেন ও নলিনীবিহারীর বিরুদ্ধে চোরাবাজার ও দুর্নীতির যে সব অভিযোগ ছিল, তাহা ক্ষমা করিতে উৎসুক হইয়াছে। নাট্য ও চিত্র-জগতের সমুজ্জ্বল তারকা সুপ্রভা দেবীর পাষণ্ড হত্যাকারীকে যাহারা জীবন বিপন্ন করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন, তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করা চলে।

বিচারের দিন আদালতে লোক ধরে না। ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিযুক্ত হইয়াছে। ভীড়ের মধ্যে ছাত্র-সংখ্যাই বেশী, বয়স্ক লোকদিগের সংখ্যাও কম নহে। খবরের কাগজে বিশেষ সান্ধ্য-সংখ্যা বাহির হইবে। রিপোর্টাররা অনেক আগে হইতে তোড়-জোড় করিয়া বসিয়াছেন। দেশের রাজনীতি অথবা দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী অপেক্ষা এমন চমকপ্রদ খুন-জখমের খবর—বিশেষ করিয়া যাহার সহিত কুৎসা জড়িত থাকিতে পারে, এমন খবর খুবই জনপ্রিয়। এ কথা রিপোর্টাররা ও মালিকরা বিশেষ জানেন। তাই সময় সময় এই সব খবর অন্য সকল খবরকে কোণঠাসা করিয়া খবরের কাগজের সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া থাকে।

সূর্য্যকান্তকে পুলিশ-পাহারায় আসামীর কাঠগড়ায় আনা হইল। সূর্য্যকান্তর সেই সতেজ লাবণ্যযুক্ত দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটি বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুল অবিন্যস্ত, রুক্ষ। সূর্য্যকান্ত চারি দিকে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ফাঁসীর আসামীর এই কাতর দৃষ্টি কাহারও করুণা সঞ্চার করিতে পারিল না। সকলেই মনে মনে সূর্য্যকান্তর মৃত্যুদণ্ড কামনা করিতে লাগিল।

গম্ভীর বদন বিচারক আসন গ্রহণ করিবার পর, সরকারী

উকিল উঠিয়া সংক্ষেপে মামলার প্রাথমিক দু'একটি কথা বলিলেন। তার পর প্রথম সাক্ষীর ডাক পড়িল। ক্যাপ্টেন পাল সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া শপথ করিয়া বলিয়া গেলেন, "স্বর্গীয়া সুপ্রভা দেবীর গানের আমি এক জন ভক্ত ছিলাম। ঘটনার দিন সন্ধ্যা বেলায় সুপ্রভা দেবীর গান শুনতে আমি তাঁর বাসায় আসি। সুপ্রভা দেবীর একটি নেকলেস স্মিথের দোকানে তৈরী করতে দেওয়া ছিল। সুপ্রভা দেবী আমাকে সেইটি আনতে বলেন। আমি কিছু দূর যাওয়ার পর মনে পড়ে যে মনি-ব্যাগ এবং রসীদটি নিয়ে আসিনি। তাই তাড়াতাড়ি গা'় ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাই। হল-ঘরের দরজার কাছেই সুপ্রভা দেবীর মৃতদেহ পড়ে আছে দেখতে পাই। হল-ঘরের বড় আলোটা তখন জ্বলছিল না, একটা ছোট আলো জ্বলছিল। ঘরের অপর কোণে কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই, আমি তাকে দৌড়ে ধরতে যাই, সে-ও দৌড়ে লুকিয়ে পড়ে। আমি সূর্য্যকান্তকে দেখেছি। সেই হত্যা করে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল।"

সূর্য্যকান্তর বন্ধুরা তাকে সমর্থন করিবার জন্তে এক জন প্রবীণ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। ক্যাপ্টেনের জবানবন্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাকে পালাতে দেখলেন, তাকে দেখতে কি রকম? সে কি নলিনী বাবুর মত দেখতে?"

ক্যাপ্টেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "না। আমি যাকে দেখেছি, সে খুব জোয়ান—খুব লম্বা-চওড়া চেহারা। কাঁধ দু'টো বড় বড়; অনেকটা জানোয়ারের মত মুখ। ঠিক এই সূর্য্যকান্ত ছাড়া কেউ নয়।"

ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "বাস্, বাস্, যথেষ্ট, জানোয়ারই ত' আমার দরকার।"

দ্বিতীয় সাক্ষী নলিনীবিহারী বলিলেন, "ক্যাপ্টেন তাঁহাকে ভুল করিয়া ধরিবার আগে তিনি এক জনকে পলাইতে দেখিয়াছেন, সে এই সূর্য্যকান্ত ছাড়া আর কেউ নয়।"

ব্যারিষ্টার উঠিয়া হঠাৎ কড়া-স্বরে জেরা করিলেন, "ঠিক করে বলুন ত, যাকে দেখলেন, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক?"

নলিনী বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, "না না, স্ত্রীলোক কেন হবে, পুরুষের মতই দেখতে, তবে—"

ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "পুরুষের মত দেখতে, তবে কি বলছিলেন বলুন।"

নলিনীবিহারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হঠাৎ দেখলে মেয়ে মনে হতে পারে বটে, তবে—"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "থাক্, থাক্, আর তবের দরকার নেই। মেয়েমানুষের মত দেখতে, তবে সূর্য্যকান্ত ছাড়া আর কেউ নয়; বুঝেছি। আপনি বসুন।"

তৃতীয় সাক্ষী ইহার পর আসিয়া কাঠগড়ায় উঠিলেন। ইনি স্বামী ভবানন্দ। আগেকার মতই মাথায় রুক্ষ জটা-ভার, কাঠগড়ার একটু উপর পর্য্যন্ত মাথাটি উঠিয়াছে। ইনি বলিলেন,—কিছু দিন আগে এক দিন গঙ্গার ঘাটে সুপ্রভা দেবীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সুপ্রভা দেবী তাঁহাকে প্রশ্ন করেন কি করিয়া জীবনে শান্তি লাভ করা যায়? সুপ্রভা দেবী বলিয়াছিলেন, নানা বিপরীতমুখী স্রোতের টানে তাঁহার জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, এই জীবন ত্যাগ করিয়া তিনি শান্তি ও আনন্দের জীবন গ্রহণ করিতে চান। সুপ্রভা দেবীর কথাবার্ত্তার মধ্যে ভবানন্দ একটা প্রচ্ছন্ন নির্ম্মল ধর্ম্মভীরু নারী-মনের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাই তিনি এক দিন তাঁর বাড়ী গিয়া উপযুক্ত উপদেশ দিবেন ও পথ-নির্দ্দেশ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। ঘটনার দিন সেখানে এই উদ্দেশ্যে গিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বলিতে গিয়া বলিলেন, "আমার যেতে অত্যন্ত দেরী হয়ে গেল। হতভাগিনীকে রক্ষা করতে পারলাম না।"

ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনি যখন অন্ধকার হল-ঘরে ঘটনার পরেই গেলেন, তখন কি কাকেও দেখেছিলেন? আপনার কাছে আমি নিশ্চয় সত্য কথা আশা করতে পারি?"

ভবানন্দ সবিনয়ে বলিলেন, "আমি একটা মূর্ত্তি দেখেছিলাম, তবে তা আপনাদের বিশ্বাস হবে কি না বলতে পারি না।"

ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "না, না, আপনি বলুন; আপনার কথা বিশ্বাস করব বই কি।"

ভবানন্দ একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভা দেবীর শায়িত মৃতদেহ দেখে আমি যেমন দৌড়ে যাব, অমনি আমি হল-ঘরের পাশে চকিতে একটা মূর্ত্তি সরে যেতে দেখলাম, কিন্তু সেদিকে কোনও নজর দেওয়ার আমার অবসর ছিল না। আমি দৌড়ে যেয়ে ঝুঁকে দেখলাম, একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে সুপ্রভা দেবীর পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছে, আর সেই অস্ত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে মৃত্যু ঘটিয়েছে। আমি যখন ঝুঁকে পড়ে দেখছি, হারাধন এক পাশ থেকে এসে মৃতদেহটা দেখল, আমি চেয়ে দেখলাম, তার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছে, সে টলতে টলতে…"

ব্যারিষ্টার সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "থামুন, থামুন, স্বামীজী। আপনার কাছে হারাধনের কথা শুনে কি হবে? আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন। আপনি কি রকম মূর্ত্তি দেখেছিলেন, আর তাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না?"

ভবানন্দ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখুন, চকিতে যে মূর্ত্তিটি আমি দেখেছিলাম, তাকে কি ভাবে যে বর্ণনা করব ভেবে পাচ্ছি না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মূর্ত্তিটি দেখতে ভূতের মত, এই বড় বড় চুল, এত বড় মাথা, অন্ধকারে চোখ দু'টো ঠিক…"

ব্যারিষ্টার সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। এক জন বলেছেন, জানোয়ারের মত, এক জন বললেন, স্ত্রীলোকের মত, আর ইনি সকলের উপর টেক্কা দিলেন, বললেন, ভূতের মত! হাঃ হাঃ।"

ব্যারিষ্টার সাহেব বসিয়া পড়িলেন। আদালত-কক্ষে সকলে মামলার পরিণতি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকান্তকে আর হত্যাকারী বলিয়া দণ্ডিত করা যাইবে না—ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের জেরার গুণে সাক্ষীরা সব উল্টা-পাল্টা বলিয়া ফেলিয়াছে। ভবানন্দ একটু অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। বিচারক একটু ঝুঁকিয়া ভবানন্দর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চোখ দু'টিতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। একটু যেন কৌতুকের হাসিও লুকানো আছে।

বিচারক এবার নিজে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বলুন ত, আপনি যে মূর্ত্তি দেখলেন, তা কি খুব অস্বাভাবিক মনে হল না?"

ভবানন্দ স্বামী বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে ঠিক অস্বাভাবিক নয় ; আমি আবার তখুনি চিনতে পারলাম কি না।"

বিচারক বলিয়া উঠিলেন, "চিনতে পারলেন ? কৈ, তা ত কিছু বললেন না ? কাকে চিনতে পারলেন ?"

ভবানন্দ একটু হাসিয়া নম্র কণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে, আমাকে। সে আমারই প্রতিমূর্ত্তি। হল-ঘরের দু'পাশে, দরজার ও জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেওয়ালে, হরেক রকম আয়না সাজানো ছিল, তাতে আমাদের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়েছিল। আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেব তা দরকারী মনে করলেন না। আয়নায় প্রতিফলিত মূর্ত্তির দিকে বেশী নজর না দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি মৃতদেহ পরীক্ষায় মনোযোগ দিয়েছিলাম। আর কে হত্যাকারী হতে পারে তাই ভাবছিলাম। এমন সময় হারাধনকে টলতে টলতে চলে যেতে দেখলাম। একটু পরেই দেখি হারাধন নিশ্চল ভাবে সোফার উপর বসে, মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। সকলেই ভাবল, প্রভুর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে হারাধন হাটফেল করল। কথাটা এক দিক দিয়ে ঠিকই। কিন্তু মৃত্যুটা তারই হাতের দেওয়া, এ কথাটা কেউ ধরতে পারেননি। বহু দিন একনিষ্ঠ ভৃত্যের মত হারাধন থেকেছে, স্বামিত্বের সকল গর্ব্ব ধূলায় মিশিয়ে সুপ্রভার নূতন জীবনে হারাধন সুপ্রভার সঙ্গে নূতন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সুপ্রভা যখন তার ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে ভুবনজয়ী অভিনয়ের দ্বারা অগণিত লোকের প্রশংসা ও অর্থ অর্জ্জন করত, তখন হারাধন লোকচক্ষুর অগোচরে যে অতি সুন্দর অভিনয় করে দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত কাটাত, তা যে কোনও বড় অভিনেতার অভিনয়ের চেয়ে কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু শুধু অভিনয় ত' জীবনের পাত্র আনন্দ ও শান্তিতে ভরে দিতে পারে না। আর আনন্দ ও শান্তি না পেয়ে মানুষ বাঁচবে ক'দিন ? উভয়ের জীবনের পুঞ্জীভূত অভিনয়ের গ্লানি উভয়কে শেষ পর্য্যন্ত এই শোচনীয় পরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে কিছু করতে পারলাম না।"

সমস্ত আদালত-গৃহ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলে যেন একটা জীবন্ত উপন্যাসের অপ্রত্যাশিত উপসংহার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। বিচারক সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ খর্ব্বকায় নিরহঙ্কার ভবানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ভবানন্দ স্বামী আবার ধীর ভাবে বলিলেন, "সূর্য্যকান্তর কোনও দোষ নাই। ওকে হল-ঘরে কেউ ছুটে পালাতে দেখেনি। সবাই নিজের নিজের মূর্ত্তি আয়নাতে দেখেছে।"

বিচারক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ভবানন্দ স্বামী, হল-ঘরে অন্য সাক্ষীরা নিজের নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখেছে, কিন্তু কেউ চিনতে পারেনি। অথচ আপনি আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখা মাত্র কি করে চিনতে পারলেন ?"

ভবানন্দ স্বামী একটু অপ্রস্তুত বোধ করিলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে, মনে হয়—ঠিক জানি না, কারণটা বোধ হয় এই যে, আমি খুবই কম আয়নাতে মুখ দেখি কি না, হয়ত তাই…"

আদালত-গৃহ উচ্চহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। *

* অস্কার ওয়াইলডের একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

ছড়া

দিলীপ দে-চৌধুরী

রেগো না, রেগো না, রেগো না—
পেছনে কারুর লেগো না !
থেকো না সাতে কি পাঁচেতে
গণ্ডগোলের কাছেতে—
ঘমোলে কিছুতে জেগো না !

তোমার গলার সুর যেনো
ষ্টীলের আসল ক্ষুর যেনো !
কী তার আহা গিটকিরী
সাধ্য কে দেয় টিটকিরী
সত্যি চিটে গুড় যেনো !

মন্দ কি আর দেখতে এমন
মূলোর মতোন দাঁতটি কেমন—
প্যাঁচার মতোন নাকটি তাহার
মিনির মতোন চোখের বাহার
ধারাপাতের পাতাটি [illegible] !

প্রথম

পালা সুরুর আগে
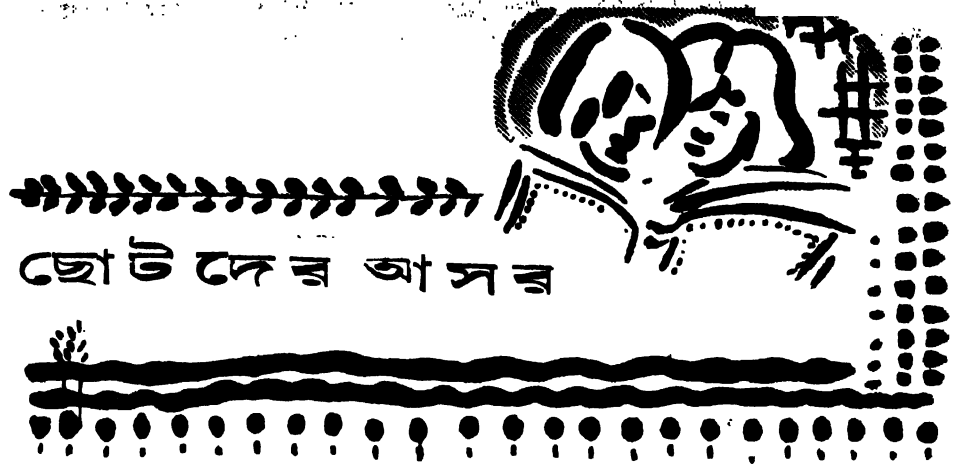
আধুনিক ইতিহাস বলে, কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের কাহিনী হচ্ছে পৌরাণিক রূপকথা। এখানে ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তর্ক করবার দরকার নেই। রামায়ণী কথাকেও তাঁরা আমল দেন না। এ নিয়েও গোলমাল ক'রে লাভ নেই।

কিন্তু আজ আমরা যে মহাবীরের কাহিনী বলতে বসেছি, তিনি পৌরাণিক ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের মানুষ নন। কেবল প্রাচীন ইতিহাসে, ভ্রমণ-কাহিনীতে, কাব্যে ও নাট্য-সাহিত্যেই তাঁর নাম অমর হয়ে নেই, তাঁকে সত্যিকার রক্ত-মাংসের মহাবীর ব'লে স্বীকার করেছেন আধুনিক ঐতিহাসিকরাও। সপ্তম শতাব্দীর আর্য্যাবর্ত্ত গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে একমাত্র তাঁরই নামের মহিমায়। তিনিই হচ্ছেন ভারতের শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই ব'লে তিনি নিজের নাম সই করতেন—মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ। ইতিহাস তাঁকে হর্ষবর্দ্ধন ব'লে জানে।

ভারতে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হর্ষবর্দ্ধন হচ্ছেন চতুর্থ স্থানীয়।

ঐতিহাসিক ভারতে সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রীকবিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত (৩২৩ বা ৩২২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কিংবা তারও দুই এক বৎসর আগে)। তাঁর সাম্রাজ্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের উপরে পূর্ণ গৌরবে প্রভুত্ব বিস্তার করেন যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও পৌত্র বিন্দুসার ও অশোক। ২৩২ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তার পর অর্দ্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই লুপ্ত হয়ে যায় মৌর্য্যরাজ্য।

মৌর্য্যদের কয়েক শতাব্দী পরে দ্বিতীয় ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রায় সারা ভারতবর্ষ তিনি জয় করেছিলেন। এই দ্বিতীয় ভারত-সাম্রাজ্য ইতিহাসে গুপ্ত-সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্তের আরো তিন জন প্রসিদ্ধ বংশধর হচ্ছেন সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (কালিদাসের কাব্যের বিক্রমাদিত্য), সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্ত এবং সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত। শেষোক্ত সম্রাটের মৃত্যুর (৪৬৭ খৃঃ) পর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু গুপ্ত-রাজারা আরো কিছু কাল পর্য্যন্ত সিংহাসন রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

হূণদের প্রাধান্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। হূণ রাজা মিহিরকুল শেষটা এমন অত্যাচার আরম্ভ করে যে, মালবের অধিপতি যশোধর্ম্মদেব তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। যশোধর্ম্মদেবের আহ্বানে ভারতের আরো কয়েক জন রাজা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ৫২৮ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুলের সঙ্গে যশোধর্ম্মদেবের স্মরণীয় যুদ্ধ হয়। মিহিরকুল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

এই যশোধর্ম্মদেবই হচ্ছেন তৃতীয় ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরের শেষ পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল হচ্ছে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ।

আশ্চর্য্য কথা হচ্ছে এই যে, এত বড় এক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সম্বন্ধে ইতিহাস আর বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। কিংবা এ জন্যে বিস্মিত না হ'লেও চলে। কারণ, ইংরেজ ঐতিহাসিক যে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন" উপাধি দিয়েছেন, এক শত বৎসর আগেও আমরা তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানতুম না। দৈবগতিকে এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের লিখিত এক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাই আজ আমরা তাঁর অপূর্ব্ব ও বিচিত্র কাহিনী জানতে পেরেছি। সুতরাং এমন আশা করলে অন্যায় হবে না যে, হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে ঐ ভাবেই আমরা হঠাৎ এক দিন সম্রাট্ যশোধর্ম্মদেবেরও সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারব।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বৃহৎ নাম ছিল যশোধর্ম্মদেবের। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা কি-রকম ছিল, আজ পর্য্যন্ত তা আবিষ্কৃত হয়নি। বড় জোর এইটুকু বলা যায়, যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে আর কোন একচ্ছত্র সম্রাট্ বিদ্যমান ছিলেন না; উত্তরাপথের ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজত্ব করতেন ভিন্ন ভিন্ন রাজারা এবং মিহিরকুল না থাকলেও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের এখানে-ওখানে মাথা তোলবার চেষ্টা করত ছোট ছোট হূণ-রাজারা বা তাদের নিকট-সম্পর্কীয় গুর্জ্জর-বংশীয় দলপতিরা।

মহাভারতের শেষ-মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তখন (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে) রাজত্ব করতেন যে-সব অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত রাজা, তাঁদের মধ্যে প্রধানত এই তিন জনকে নিয়ে আমাদের কাহিনী আরম্ভ করব। স্থানেশ্বরের প্রভাকরবর্দ্ধন। মালব দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত। মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত।

দ্বিতীয়

যুবরাজের যুদ্ধযাত্রা

কুরুক্ষেত্র !

এ নাম শুনলে আজও প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্তস্রোত ! এ কেবল কুরু-পাণ্ডবের আত্মঘাতী যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এখানেই প্রথমে পার্থসারথিরূপে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিল গীতার মহাবাণী। এখানে এক দিকে যেমন ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধারা অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়ে অর্জ্জন করেছিলেন অমরত্ব, আর এক দিকে তেমনি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আর্য্য-ভারতের সমস্ত ক্ষাত্র-বীর্য্য। এই শতস্মৃতি-বিজড়িত ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালে আজও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায় শত মৃত পুত্রের শোকে কাতর গান্ধার-কন্যা গান্ধারীর করুণ ক্রন্দন, নিষ্ঠুর সপ্তরথীর দ্বারা আক্রান্ত বালক অভিমন্যুর নিষ্ফল সিংহনাদ, দুঃশাসনের রক্তপান ক'রে তৃতীয় পাণ্ডবের উন্মত্ত তাণ্ডব, রক্তবন্যায় ভাসতে ভাসতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ঊনচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয় শত সৈন্যের চরম মৃত্যুযন্ত্রণা ! এই বিরাট নরমেধযজ্ঞের ফল কি ? পাণ্ডবদের মৃত্যুর পরে আর্য্যাবর্ত্তে এমন কোন ক্ষত্রিয় রইল না, বিদেশী যবনদের বাধা দেবার জন্যে সবল হস্তে যে অস্ত্রধারণ করতে পারে ! তাই তারই কিছু কাল পরে উত্তর-ভারতের নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখি ইরাণী এবং গ্রীক্ দিগ্বিজয়ীদের।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কুরুক্ষেত্র বা স্থানেশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন প্রভাকরবর্দ্ধন। তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বটে, কিন্তু গুপ্তবংশীয় ক্ষুদ্রতর রাজারা তখনও ভারতবর্ষের মধ্যে সবংশে সম্ভ্রান্ত ব'লে গণ্য হতেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের রাণী ছিলেন যশোমতী। তিনি গুপ্তবংশজাতা এবং সেই জন্যে তাঁর স্বামী নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করতেন। তাঁদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন ও কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন। রাজ্যশ্রী নামে তাঁদের এক কন্যার নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন কান্যকুব্জের অধিপতি গ্রহবর্ম্মার সহধর্ম্মিণী।

তখন ভারতের প্রত্যেক রাজাই ভাবতেন, বাহুবলে পররাজ্য অধিকার করাই হচ্ছে রাজার বা বীরের ধর্ম্ম। যে রাজা নিজের রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইতেন, তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণ উচ্চ ধারণা পোষণ করত না। সত্য কথা বলতে কি, আজও পৃথিবী একটুও বদলায়নি। আজও পৃথিবীর যত যুদ্ধবিগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে পররাজ্য লোভ।

গুপ্তরাজকন্যা যশোমতীকে বিবাহ ক'রে প্রভাকরবর্দ্ধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছিল। উত্তরে পাঞ্জাবের কয়েকটি প্রদেশ করতলগত ক'রে, দক্ষিণে মধ্য-ভারতের মালব দেশ পর্য্যন্ত গুপ্তবংশীয় রাজা খুব সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রেই জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সেই বংশের দেবগুপ্তকে সামন্তরাজরূপে মালবের সিংহাসনে বসিয়ে প্রভাকরবর্দ্ধন আবার স্থানেশ্বরে ফিরে এলেন। তখন ভারতে সম্রাট্ পদবীর চলন ছিল না। যাঁরা সাম্রাজ্যের অধিকারী হতেন তাঁরা গ্রহণ করতেন একরাট্ কিংবা মহারাজাধিরাজ পদবী। প্রভাকরবর্দ্ধন মহারাজাধিরাজরূপে পরিচিত ছিলেন।

৬০৪ খৃষ্টাব্দ খবর এল উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের দুর্দ্ধর্ষ হূণরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

প্রভাকরবর্দ্ধন যুবরাজকে ডেকে বললেন, "রাজ্যবর্দ্ধন, আমি ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। অদূর-ভবিষ্যতে তুমিই হবে মহারাজা। আমি বর্ত্তমান থাকতেই তোমার উচিত, রাজকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া। বিজাতীয় হূণরা বিদ্রোহী হয়েছে, তুমি তাদের দমন করতে যেতে পারবে কি ?"

তরুণ যুবক রাজ্যবর্দ্ধন নতমস্তকে হাস্যমুখে বললেন, "ক্ষত্রিয় আমি, অস্ত্রধারণ করাই আমার কর্ত্তব্য। মহারাজের আদেশ হ'লেই আমি যুদ্ধযাত্রা করতে পারি।"

প্রভাকরবর্দ্ধন বললেন, "উত্তম, বৎস ! এবারে হূণদের এমন শিক্ষা দিয়ে আসবে, ভবিষ্যতে তারা যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু স্মরণ রেখো যুবরাজ, এই হূণরা সহজ-শত্রু নয়। তোমার জননীর পূর্ব্বপুরুষরা এক সময়ে ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট্। কিন্তু দুরাত্মা হূণদের দৌরাত্ম্যেই তাঁদের বিপুল সাম্রাজ্য আজ পরিণত হয়েছে অতীতের স্বপ্নে।"

রাজ্যবর্দ্ধন বললেন, "স্মরণ রাখব মহারাজ !"

পনেরো বছরের ছোট রাজকুমার হর্ষবর্দ্ধন, পিতার নয়নের মণি। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "পিতা, আমিও কি ক্ষত্রিয় নই ? দাদা যাবেন যুদ্ধে, আর আমি ব'সে থাকব রাজপ্রাসাদে ? কেন, আমার কি অস্ত্রশিক্ষা হয়নি ?"

প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁর মাথার উপরে সস্নেহে হস্তার্পণ ক'রে বললেন, "এখনো সময় হয়নি পুত্র ! যথাসময়ে তুমিও যুদ্ধযাত্রা করবে বৈ কি !"

কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন বোঝ মানে না।

মহারাজা তখন বাধ্য হয়ে বললেন, "বেশ বাছা, তুমিও কিছু সৈন্য নিয়ে যুবরাজের পিছনে পিছনে যাও। যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে পার্ব্বত্য অরণ্যে তুমি মৃগয়ার অনেক সুযোগ পাবে। সেইখানে শিবির স্থাপন কোরো। দরকার হ'লে যুবরাজ তোমাকে আহ্বান করবেন।"

এ ব্যবস্থা মন্দের ভালো। হর্ষবর্দ্ধন আর কিছু বললেন না।

[ক্রমশঃ

এ্যাটমের বিচিত্র কথা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার

মৌলিক পদার্থের সাথে তো পরিচয় তোমাদের হয়েছে আগেই এও তো তোমরা শুনেছ যে, দুনিয়াতে মাত্র ৯২ রকমে মৌলিক পদার্থ আছে ব'লে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। ঐ মৌলিকগুলো ধর্ম্ম আর বিশেষ গুণ বিবেচনা ক'রে সেই অনুযায়ী কতকগুলো শ্রেণীতে

মধ্যে। ক্লাসে যেমন ধারা প্রত্যেক ছাত্রেরই থাকে একটা বিশেষ 'রোল নম্বর', তেমন ধারা এই মৌলিকদেরও আছে প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ ক্রমিক সংখ্যা।

ইস্কুলের রোল নম্বরের মতন কিন্তু যেমন-তেমন করে এ ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়নি। মাইনে দিতে দেরী হলে বা নাম-কাটা গেলে ছাত্রের রোল নম্বর তো হামেশাই ওলট-পালট হয় ইস্কুলে!—পরাগের রোল নম্বর জানুয়ারী মাসে ছিল ৭, কিন্তু এপ্রিল মাসে বাকী মাইনে দিয়ে নাম তুলতে তা'র রোল নম্বর হল ৪৬। মৌলিকের ক্রমিক সংখ্যা কিন্তু এমনি ধারা ওলট-পালট হয় না। যার ক্রমিক সংখ্যা ৭, সে চিরকালই থাকবে ৭, যতক্ষণ পর্যান্ত তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় থাকবে ততক্ষণ কোনও প্রভেদ হবে না তার নম্বরে। এই-বার যার যার বিশেষ ক্রমিক সংখ্যা শুদ্ধ মৌলিকগুলোর নাম পর পর সাজিয়ে লিখছি, মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝবে সব।

১।	হাইড্রোজেন	২৪।	ক্রোমিয়াম
২।	হিলিয়াম	২৫।	ম্যাঙ্গানিজ
৩।	লিথিয়াম	২৬।	লোহা
৪।	বেরিলিয়াম	২৭।	কোবাল্ট
৫।	বোরণ	২৮।	নিকেল
৬।	কয়লা (কারবন)	২৯।	তামা
৭।	নাইট্রোজেন	৩০।	দস্তা
৮।	অক্সিজেন	৩১।	গ্যালিয়াম
৯	ফ্লোরিন	৩২।	জার্মেনিয়াম
১০।	নিয়ন	৩৩।	আর্সেনিক
১১।	সোডিয়াম্	৩৪।	সেলেনিয়াম
১২।	ম্যাগনেসিয়াম	৩৫।	ব্রোমিন
১৩।	অ্যালুমিনিয়াম	৩৬	ক্রিপ্টন
১৪।	সিলিকন	৩৭।	রুবিডিয়াম
১৫।	ফসফরাস	৮৩।	স্ট্রনসিয়াম
১৬।	গন্ধক	৩৯।	ইট্রিয়াম
১৭।	ক্লোরিণ	৪০।	জিরকোনিয়াম
১৮।	আর্গন	৪১।	নাইয়োবিয়াম
১৯।	পটাসিয়াম	৪২।	মলিবডিয়াম
২০।	ক্যালসিয়াম	৪৩।	মেসিউরিয়াম
২১।	স্ক্যানডিয়াম	৪৪।	রুদেনিয়াম
২২।	টিটানিয়াম	৪৫।	রোডিয়াম
২৩।	ভ্যানাডিয়াম	৪৬।	প্যালাডিয়াম

এই তো হ'ল মৌলিকদের তালিকা। মেনডেলিফের পিরিয়ডিক টেবলের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি মৌলিকগুলোকে পরীক্ষা ক'রে তাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ যেন একটু আত্মীয়তার ভাব দেখতে পেলেন—গুণে বৈশিষ্ট্যে; এমন কি, কোনও কোনও বিশেষ ধর্ম্মেও। তাই দেখে তিনি গুণ হিসাবে বসিয়েছিলেন ঐ ক্রমিক সংখ্যাগুলো। গুণের পারম্পর্য্য বিচার ক'রে তিনি নম্বরগুলো বসাতে গিয়ে দেখলেন যে, মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে। ড্রিলের সময়ে তোমরা যখন সারি বেঁধে দাঁড়াও তখন মাষ্টার মশাই কি [illegible] তা দেখনি? [illegible] সব [illegible] খাটো ছেলেকে রেখে ক্রমে

ধারাই একটি কাজ ক'রছিলেন,—তবে উচ্চতা নয়, গুণ বিবেচনা করেই তিনি সাজাচ্ছিলেন মৌলিকদের। এমনি ধারা করতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে একটি মৌলিক থেকে তার পরবর্ত্তী মৌলিকের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ বেশী দেখতে পেলেন। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত ক'রলেন যে, ঐ মৌলিক দু'টির মধ্যবর্ত্তী স্থানে দু'-একটি মৌলিক বসবে। কিন্তু যে ধরণের মৌলিক ঐ জায়গায় বসা উচিত, সে রকম কোন কিছু তখন জানা ছিল না ব'লে তিনি ঐ ঘর খালি রেখে দিলেন। আর সেই ঘরে লিখে রাখলেন, ঐ অজানা মৌলিকটির যেমন গুণাবলী থাকতে হবে তা'র কথা।—আবার ফিরে চলো 'ড্রিল-ক্লাশে'। আচ্ছা ধরো, ড্রিল মাষ্টার মশাই তোমা-দিগকে ছোট থেকে ক্রমে বড় হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে দেখেন যে, প্রথম যে দাঁড়ালো তার চেয়ে দ্বিতীয় ছেলে এক ইঞ্চি উঁচু; আবার দ্বিতীয়র চেয়ে তৃতীয় এক ইঞ্চি উঁচু—এমনি ধারা এক ইঞ্চি এক

৪৭।	রূপা	৭০।	ইটারবিয়াম
৪৮।	কাডমিয়াম	৭১।	লিউটেসিয়াম
৪৯।	ইনডিয়াম্	৭২।	হাফনিয়াম্
৫০।	টিন	৭৩।	ট্যানটালাম
৫১।	অ্যান্টিমোনি	৭৪।	টাংষ্টেন
৫২।	টেলুরিয়াম	৭৫।	রেনিয়াম
৫৩।	আয়োডিন	৭৬।	অসমিয়াম
৫৪।	জেনন্	৭৭।	ইরিডিয়াম
৫৫।	কেসিয়াম	৭৮।	প্ল্যাটিনাম
৫৬।	বেরিয়াম	৭৯।	সোণা
৫৭।	ল্যানথানিয়াম	৮০।	পারদ
৫৮।	সেরিয়াম	৮১।	থেলিয়াম
৫৯।	প্রাসিওডিমিয়াম	৮২।	সীসা
৬০।	নিয়োডিমিয়াম	৮৩।	বিসমাথ
৬১।	ইলিনিয়াম	৮৪।	পোলোনিয়াম
৬২।	স্যামারিয়াম	৮৫।	? (শূন্য-অজ্ঞাত মৌলিকের জন্য)
৬৩।	ইউরোপিয়াম	৮৬।	রেডন
৬৪।	গ্যাডোলিনিয়াম	৮৭।	? (শূন্য-অজ্ঞাত মৌলিকের জন্য)
৬৫।	টার্বিয়াম	৮৮।	রেডিয়াম
৬৬।	ডিসপ্রোসিয়াম	৮৯	অ্যাকটিনিয়াম
৬৭।	হোলমিয়াম	৯০।	থোরিয়াম
৬৮।	এরবিয়াম	৯১।	প্রোটাকটিনিয়াম
৬৯।	থুলিয়াম	৯২।	ইউরেনিয়াম

ইঞ্চি ক'রে ক্রমে ক্রমে বাড়ছে ছেলেদের উচ্চতা! কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ দেখলেন যে, পঞ্চম ছেলের চেয়ে ষষ্ঠ ছেলে ২ ইঞ্চি উঁচু, তার পর থেকে কিন্তু বাকী ছেলেদের উচ্চতা বাড়ছে আবার আগের মত,—তবে তিনি কি করবেন?—এমন একটি ছেলে যোগাড় করবেন যার উচ্চতা পঞ্চম আর ষষ্ঠ ছেলের মাঝামাঝি অর্থাৎ পঞ্চম ছেলের চেয়ে এক ইঞ্চি বেশী। যদি ঐ মাপের ছেলে না পাওয়া যায়, তবে মাঝখানে ঐ রকম একটু গোঁজামিল বা ছন্দপতন থেকেই যাবে। পিরিয়াডিক টেবলের প্রায় সবগুলো শূন্য স্থানই পূরণ করা হ'য়ে গেছে। মাত্র বাকী আছে দু'টো ৮৫ আর

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পাঁচ

সুখদা—

'এখুনি যাবেন ?'

'ক্ষতি কি ? চলুন না।'

'জমিদার-বাড়ীতে কে কে আছে ?'

'ঐ বললাম, অমুতোষ বাবু, তার ভগিনী মালতী দেবী, অমুতোষ বাবুর খুড়তোত ভাই সুবিমল। চাকর-বাকরের মধ্যে বহু কালের এক পুরাতন ভৃত্য সুখদাস। তা'ছাড়া বনমালী নামে এক উড়ে চাকর, সোফার হরিদাস ও রাঁধুনে বামুন শ্রীকৃষ্ণ। শংকর ঘোষ লোকটা ছিল একাধারে নায়েব, পার্শ্বচর ও পরামর্শদাতা শ্রীবিলাস চৌধুরীর। শংকর ঘোষ ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিল কলকাতায়। এবং শ্রীবিলাসের মিলে চাকরী নিয়ে ঢোকে। বয়স তখন তার ছিল মাত্র আঠার বৎসর। অসাধারণ বুদ্ধি-তৎপরতার ফলে শ্রীবিলাস চৌধুরীর মন আকর্ষণ করে নেয়। এবং ক্রমে সে জমিদার-বাড়ীতে এসে প্রবেশ করে, সে-ও বার বছর আগেকার কথা। লোকটা অবিবাহিত। আত্মীয়-স্বজন কেউ তার আছে বলে কেউ জানে না। জমিদার-বাড়ী ছেড়ে কখনো সে কোথাও যায়নি এক দিনের জন্যও।

সুব্রত গাড়ী ড্রাইভ করছিল, চলছিল তারা জমিদার-বাড়ীর দিকে।

হঠাৎ এক সময় সুব্রত প্রশ্ন করলে, 'শংকরের মৃত্যু-সংবাদ অমুতোষ বাবু কি ভাবে গ্রহণ করলেন ?'

'অত্যন্ত আহত হয়েছেন। তিনি ত' বুঝতেই পারছেন না, শংকরের মত লোকের এ দুনিয়ায় কোন শত্রু থাকতে পারে। লোকটা না কি অত্যন্ত নির্বিরোধী গো-বেচারী গোছের ছিল।'

'হুঁ। বাড়ীর থেকে কখন শংকর ঘোষ বের হয়ে আসে কেউ জানতে পেরেছিল বা দেখেছিল ?'

'হাঁ, সন্ধ্যার পর না কি সোফার হরিদাস তাকে গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করতে দেখে শুধিয়েছিল, কোথায় যাচ্ছেন শংকর বাবু ? শংকর ঘোষ না কি জবাব দেয়, একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে।'

জমিদার-বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামল।

সে কালের প্যাটার্ণে তৈরী চকমিলান তিন-তলা ইমারৎ। বহু দিন রং লাগানো হয়নি, হলদে রং অনেকগুলো বর্ষার বারিধারায় সিক্ত ও ধৌত হয়ে পুরাতন পচা পাতার রং ধরেছে। সামনেই লোহার গেট।

গেট পার হলে একটা বাগান, বহু কালের অযত্নবর্দ্ধিত গাছপালায় জংগলে পরিণত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুশান্তর পিছু-পিছু সুব্রত বাইরের ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

মস্ত বড় একটি হল-ঘর।

ঘরের এক কোণে প্রকাণ্ড তক্তপোষের পরে ফরাস বিছান, ওয়াড়-পরানো দু'-চারটে তাকিয়া।

দুটো চেয়ার পেন্ট।

ঘরে আসবাব-পত্রের আর কোন বাহুল্যই নেই।

এক জন ভৃত্য একটি ঝাড়ন হাতে ঘরখানি পরিষ্কার করছিল ওদের দু'জনকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে লোকটা মুখ তুলে চাইল।

'এই যে বনমালী, তোমার বাবু আছেন ?'

'হাঁ। বসুন বাবু, এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

বনমালী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গল। একটু পরেই বাইরের বারান্দায় খড়মের খট্-খট্ শব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে যিনি প্রবেশ করলেন, সুব্রত তার দিকে মুখ তুলে চাইল।

সুশান্ত ঠিকই বলেছিল, ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছা-কাছি হবে।

দীর্ঘ উন্নত চেহারা। শরীরের মাংসপেশীগুলো অত্যন্ত সজাগ। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথার চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটা। চুলের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় পেকে শাদা হয়ে গেছে।

জোড়া ভ্রূ।···

উন্নত নাসা, চোখ দু'টি কিন্তু ছোট ছোট গোল গোল।

দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। পরনে একটি শাদা ফুল-হাতা সার্ট, ও জিনের হাফ প্যান্ট।

'নমস্কার সুশান্ত বাবু,' আগন্তুক হাত তুলে নমস্কার জানান।

'নমস্কার অমুতোষ বাবু, ইনি বিখ্যাত গোয়েন্দা সুব্রত রায়। ইনি জমিদার অমুতোষ রায়।'

উভয়ে হাত তুলে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার জানাল।

'বসুন আপনারা। একটু চা আনতে বলি।'

'না না,' এখন চা থাক।' সুব্রত বাধা দিল।

'সে কি! তাই কি একটা কথার কথা হলো, ওরে বনমালী, চা নিয়ে আয় দু'কাপ।'

'আপনি বুঝি চা খান না অমুতোষ বাবু ?' সুব্রতই প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে না। সারাটা জীবনই ত' স্কুল-মাষ্টারী করে কাটালাম কি না ? সংযম। নিজের মধ্যে সংযম না থাকলে ছাত্রদের মধ্যে সংযম আনব কি করে ? তাছাড়া আমরা মশাই তখনকার কালের বি-এ, বি-টি, আপনাদের যুগের এই হাল ফ্যাসানের চা পান আমাদের সময়ে রেওয়াজ ছিল না। বুঝলেন কি না ?···

'আপনি শুনলাম পাকশী স্কুলেই মাষ্টারী করতেন ?' সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

'হাঁ। পাকশী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম। দীর্ঘ একুশ বছর সেকেণ্ড মাষ্টারী করেছি। যত সব চ্যাংড়া সে'দিনকার ছেলে-ছোকরা এসে হেড-মাষ্টার হয়ে বসতে লাগল, আর আমি তখনকার কালের বি-এ, বি টি,···যাক্ গে সে কথা।'

বনমালী ট্রে'তে ক'রে চা নিয়ে প্রবেশ করল।

সুব্রত ও সুশান্ত চায়ের কাপ দু'টো তুলে নিল হাতে।

'আচ্ছা, শংকর ঘোষ লোকটা কেমন ছিল বলে আপনার মনে হয় ?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'শংকর! Externally he was excellent, beautiful exquisite, but internally he was a মাকাল ফল।'

অমুতোষ রায়ের কথা বলবার ভঙ্গীতে সুব্রতর বেজায় হাসি

পেয়েছিল, কোন মতে চায়ের কাপের আড়ালে সেটা সামলে নিল,
'মাকাল ফল কেন ?'

'বুদ্ধি ছিল না লোকটার একেবারে। অথচ আমার দাদা-মশাইয়ের 'পরে না কি লোকটার একটা ভয়ংকর আধিপত্য ছিল। শুনেছি, লোকটার পড়াশুনা just up to 3rd class মানে আপনাদের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত! এই ধরণের লোকেরা জীবনে কি করতে পারে? কিন্তু লোকটা ছিল বড় সাদাসিধে, কোন প্রকার গোলমাল বা ঝামেলার মধ্যে ছিল না। একান্ত নির্বিরোধী, তাকে যে কেউ ঐ ভাবে খুন করতে পারে এ ত' আমার ধারণারও অতীত।'

'শংকর ঘোষ শুনেছি আপনাদের এ-বাড়ীতে অনেক দিন আছে।'

'হাঁ, প্রায় ১০।১২ বৎসর হবে।'

'কত করে মাহিনা পেত শংকর ঘোষ?'

'ইদানিং আমার মামার মৃত্যুর আগে তাকে ১১০৲ টাকা করে দেওয়া হতো।'

'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে যাচ্ছি সুব্রত বাবু' সুশান্ত বললে, 'শংকর ঘোষের ঘর সার্চ করতে করতে তার বাক্সের মধ্যে একটা পাশ-বই পেয়েছি, তাতে দেখলাম, ইদানিং বছর খানেক থেকে সে প্রায় ৫০০৲ টাকা করে পোষ্টাল সেভিংয়ে জমা দিচ্ছিল, তার মাহিনা যদি মোট ১১০৲ টাকা হয়, তবে কয়েক মাস ধরে অত টাকা ও জমা দিচ্ছিল কেমন করে ব্যাঙ্কে? আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন, অমুতোষ বাবু?'

'আজ্ঞে না।'

'শংকর ঘোষের ঘরে কোন চিঠি-পত্র পাওয়া যায়নি?' সুব্রত প্রশ্ন করলো।

'না' সুশান্ত জবাব দেয়।

'আচ্ছা, আপনাদের বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সুখদাস শুনেছি শংকর ঘোষের পাশের ঘরেই থাকত, তা'ছাড়া সে-ও ত' অনেক দিন এ-বাড়ীতে আছে. সে-ও কিছু বলতে পারলে না শংকর ঘোষ সম্পর্কে?' সুশান্ত বলে।

'আপনাদের সুখদাসকে একটিবার ডাকতে পারেন অমুতোষ বাবু? তাকে কয়েকটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।' সুব্রত বলে।

'নিশ্চয়ই' অমুতোষ বাবু সুখদাসকে ডাকতে ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে যান।

একটু পরেই অমুতোষের পিছু-পিছু সুখদাস এসে ঘরে প্রবেশ করে।

সুব্রত সুখদাসের দিকে তাকাল।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের কিছু ঊর্দ্ধেই হবে।

কিন্তু বার্দ্ধক্যেও শরীরের কোথাও এতটুকু ভাঙ্গন ধরেনি।

বেঁটে-খাটো লোকটি, কালো কুচকুচে গায়ের রং, বেশ পেশী-বহুল চেহারা।

মাথার সামনের দিকে বিস্তীর্ণ একটি টাক।

বুকের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে।

চোখ দু'টো গোল গোল ভাসা ভাসা, চোয়ালের হাড় দু'টো ব্রণের আকারে ঠেলে উঠেছে দু'পাশ দিয়ে।

মুখের ডান দিকে একটি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত-চিহ্ন।

দাঁতগুলি কালো কালো, বোধ হয়—অতিরিক্ত ধূমপানের ফল। নীচের ঠোঁটটা পুরু। খানিকটা যেন ঝুলে পড়েছে।

চোখের দৃষ্টি যেন ঘষা কাচের মত!

পরনে একটি পরিষ্কার ধুতি।...গায়ে সাদা ছিটের একটি ফতুয়া।

'তোমারই নাম সুখদাস?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে।...'

'তুমি এ বাড়ীতে শুনলাম অনেক দিন আছো।'

'আজ্ঞে।' ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব।

'শংকর ঘোষ তোমার পাশের ঘরেই থাকত?'

'আজ্ঞে।'

'শংকর ঘোষ লোকটা কেমন ছিল বলতে পারো?'

'ভালই।'

'তোমার সংগে নিশ্চয়ই সদ্ভাব ছিল?'

'আজ্ঞে' তা ছিল বৈ কি।...তবে ইদানিং আমার প'রে যেন সে একটু বিরক্ত ছিল। আমার সংগে বিশেষ প্রয়োজন না হলে বড় কথাবার্ত্তা কইতো না।'

'কেন? দু'জনের সংগে তোমাদের ঝগড়া হয়েছিল না কি কিছু নিয়ে?'

'আজ্ঞে না।'

'শংকর ঘোষের আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথায়ও কিছু ছিল কি না বলতে পার?'

'না, যত দূর জানি, এ সংসারে তার আপনার জন কেউই ছিল না।'

'কাল শেষ তার সংগে তোমার কখন দেখা হয়?'

'দুপুরে একবার বাইরের ঘরে দেখেছিলাম, তার পর আর জানি না।'

'তখন সে কি করছিল?'

'সংবাদপত্র পড়ছিল।'

'আচ্ছা অমুতোষ বাবু, শংকর কি তার নিজের ইচ্ছামত আপনাদের গাড়ী ব্যবহার করতে পারতো?'

'আজ্ঞে, মামা বাবুর আমল থেকেই সে এ-বাড়ীর গাড়ী ব্যবহার করছে, আমি এসেও আর তাকে নিষেধ করিনি। হাজার হলেও এ-বাড়ীর অনেক দিনকার পুরাতন লোক। বলতে গেলে ও এক রকম আমাদের এক জন বাড়ীর লোকের মতই হয়ে গেছিল!'

'আচ্ছা, সুখদাস তুমি যেতে পার।'

সুখদাস প্রণাম জানিয়ে ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে গেল।

'বেলা হলো, এবারে আমরা উঠি অমুতোষ বাবু।'...সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

ছয়

অন্ধকার পথে

গাড়ী আবার চলেছে।

সুব্রত নীরবে ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে গাড়ী চালাচ্ছিল।

সুশান্তই প্রশ্ন করে, 'কি রকম বুঝলেন?'

'আপাততঃ তেমন বিশেষ কিছুই না। একটা কথা শুধু ভাবছি

কয়েক মাস ধরে শংকর ঘোষ সেভিংস্ ব্যাংকে ৫০০৲ করে টাকা জমা দিচ্ছিল। ঐ টাকা সে পেত কোথা হতে? মাহিনা ত' ছিল তার মাত্র শুনলাম ১১০৲ টাকা।

'লোকটা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। তার বাক্স-প্যাঁটরা খুঁজেও এমন কিছুই পেলাম না কাল, যাতে করে অন্তত কিছু হদিস্ পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা, অমুতোষ রায় শংকরের মৃত্যু-সংবাদটা কেমন ভাবে নিয়েছিল?'

'প্রথমটা ত' সে বিশ্বাসই করতে চায় না। তার পর শংকরের মৃতদেহ দেখবার পর সে যে ব্যাপারটা মোটেই আশা করেনি এবং বিশেষ ভাবে আহত হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা গেছিল।

সুশান্তর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, সুশান্ত সুব্রতকে বললে, 'সুব্রত বাবু, একটা অনুরোধ করবো, আশা করি, নিরাশ হবো না?'

'কি?' সুব্রত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

'কেসটা বিশেষ জটিল ব'লেই আমার মনে হচ্ছে, আমার চেষ্টায় এর কিনারা কত দূর হবে বলতে পারি না; যদিও আপনি এ লাইন ছেড়ে দিয়েছেন, তবু এ কেসটায় আপনার সাহায্য পেলে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান্ মনে করবো।'

'অত কিন্তু কর'ছেন কেন সুশান্ত বাবু? আমার ক্ষমতায় যতটা কুলাবে নিশ্চয়ই আপনাকে আমি সাহায্য করবো। আপনি যেমন অনুসন্ধান করছেন তেমনি করুন, মাঝে মাঝে আমাকে কোনে সংবাদ দেবেন।'

'কিন্তু কোন্ পথ ধরে যে এগুবো, তাই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।'

'শুনুন, আপাততঃ বিশেষ যে কিছু করবার আছে তাও নেই। তবে কয়েকটি কথা আপনাকে আমি বলে যাই। শংকর ঘোষের recent movements সম্পর্কে একটু খোঁজ নিন। কিছু না কিছু জানতে পারবেনই। দ্বিতীয়তঃ, খোঁজ নেবার চেষ্টা করুন শংকর ঘোষের কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। তৃতীয়তঃ, আপনার কোন এক জন বিশ্বস্ত লোককে ঐ বাড়ীর মধ্যে কোন চাকরীর ছল করে ঢোকাতে পারেন কি না চেষ্টা দেখুন। যদি তা সম্ভব হয়, সে-ই বাড়ীর সকলের মুভ্‌মেন্টস্ সম্পর্কে নজর রাখবে। এবং সময় মত আপনাকে রিপোর্ট দেবে। চতুর্থতঃ, জমিদার-বাড়ীর আশে-পাশে যে ঘর-বাড়ীগুলো আছে সেখানেও একটু খোঁজ-টোজ নিন, যদি কোন নতুন তথ্য পান।'

'বেশ তাই করবো। আপনার নির্দেশ মতই চলবো।'

সুব্রত কিন্তু সুশান্তর কাছ হতে বিদায় নিয়ে বরাবর বাড়ীর দিকে না গিয়ে, সুজিতদের বাড়ীর দিকেই গাড়ী চালাল। এবং এবার ভাল রাস্তা ধরে না' গিয়ে কাঁচা রাস্তাটা ধরেই চলল, গত রাত্রে প্রথম সে যে রাস্তাটা ধরে চলেছিল।

দিনের বেলাতেও এ রাস্তায় বিশেষ লোকজনের কোন ভিড় নেই। নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কয়েক জন হেঁটুরে রাস্তায় তরকারীর ধামা ও কাঁধে বাঁকে তরকারী নিয়ে বাজার থেকে বোধ হয় ফিরছে।

বেলা তখন প্রায় সোয়া-এগারটা হবে।

শীতের রৌদ্র এর মধ্যেই প্রখর হয়ে উঠেছে।

বাতাসে বেশ উত্তাপ।

সুজিতের বাড়ী এসে গাড়ী থামতেই সুজিতের বাবা আদিনাথের সংগে দেখা হয়ে গেল, 'এই যে সুব্রত! শুনেছো এদিকের কাণ্ড? গত রাত্রে জমিদার-বাড়ীর শংকর ঘোষ না কি কার হাতে খুন হয়েছে।'

'সুজিত কোথায় মেসো মশাই?

'সে বোধ হয় উপরে তার ঘরেই আছে! তা তুমি যে ফিরে এলে?'

'সুজিতের সংগে কয়েকটা কথা ছিল, বলতে ভুলে গেছি; তাই আবার ফিরে এলাম।'

সুব্রত কোন মতে আদিনাথের প্রশ্নটাকে এড়িয়েই চলে গেল উপরের সিঁড়ির দিকে।

সুজিত তার ঘরেই ছিল, সুব্রতকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল, 'এ কি সুব্রত, আবার ফিরে এলি যে?'

'বাড়ী যাইনি এখনো। কোন্নগরেই ছিলাম এতক্ষণ। এখানকার থানার ও-সি সুশান্তকে নিয়ে জমিদার-বাড়ীতে গেছিলাম। তোর অনুমানই সত্য। শ্রীবিলাস চৌধুরীর নায়েব শংকর ঘোষই খুন হয়েছে, কাল রাত্রে।'

'হাঁ, সে কথা ত' সকালেই শুনেছি। এতটুকু ছোট জায়গায় এমন একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ রটতে কি দেরী লাগে না কি?···

'তোর সংগে আমার গোটাকতক কথা আছে সুজিত, কিন্তু তার আগে স্নান করতে চাই।'

বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, সুব্রতর শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

স্নানের পর খেয়ে সুব্রত সুজিতের শয্যার 'পর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল: আঃ, এখন একটা লম্বা ঘুমের প্রয়োজন।'

সুব্রত চোখ বুজলো।

ঘুম ভাংগল তার সেই বেলা চারটের পরে।

সুজিত তখন নীচে জামাই-মেয়ের বিদায়-ব্যাপারে ব্যস্ত! সুব্রত নীচে নেমে এল।

সুজিতকে ডেকে বললে, আজকের রাত্রিটাও আমি তোদের এখানেই থাকব সুজিত।'

'বেশ ত' খুব ভাল কথা।'

'অনেক দিন পাড়াগাঁ দেখিনি, একটু ঘুরে-ফিরে আসি।'

সুব্রত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

শীতের রৌদ্র তখন ঝিমিয়ে এসেছে।

সুব্রত ঘুরে কাঁচা খোয়া-রাস্তাটা ধরে এগুতে লাগল। অনেকটা পথ হেঁটে যখন সে গত রাত্রের মোটরটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে পৌঁছাল, বেলা-শেষের শেষ-রৌদ্রের লালিমাটুকু মাঠের কোল ঘেঁসে উন্নতশীর্ষ নারিকেল গাছগুলির সরু চিকণ পাতায় পাতায় যেন রক্ত আলিম্পন বুনছে।

হঠাৎ সুব্রতর নজরে পড়ল, কে এক জন মাথা নীচু করে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

দূর থেকে চিনতেও সুব্রতর কষ্ট হয় না, এবং সে রীতিমত চমকেই উঠে।

পথের পাশেই কতকগুলো বুনো গাছের ঝোপ, সুব্রত চট্‌পট্‌ সেই ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে।

এ সেই কালকের যুবকটি।

যুবকটি যেন স্বগত চিন্তায় বুঁদ হয়ে পথ চলছে।

ক্রমে তার সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে নাবল।

যুবকটি যখন মাঠের মধ্যকার সরু পায়ে-চলা পথটি ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছে, সুব্রত তাকে অনুসরণ শুরু করল।

মাঠের পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে তার পর সে আবার বড় রাস্তার 'পরে গিয়ে উঠল।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার একটু একটু করে প্রকৃতির বুকে নেমে আসছে।

রাস্তা ধরে কিছুটা এগুবার পর যুবকটি একটা একতলা ছোট বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

সুব্রত বাড়ীটার কাছে এসে দরজা ঠেলে দেখে, দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ।

খানিকক্ষণ গুম্‌ হয়ে সুব্রত কি যেন ভাবলে, তার পর দরজার কড়া নাড়লে।

সংগে সংগে ভিতর হতে প্রশ্ন এলো, 'কে?'

'দরজাটা একবার খুলবেন মশাই?'

'কে?' দরজাটা খুলে গেল, সামনেই একটি ধুম্র-মলিন হ্যারিকেন বাতী হাতে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটি।

যুবক অন্ধকারে দণ্ডায়মান সুব্রতর দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, 'কে আপনি, কি চান?'

'ভিতরে আসতে পারি কি?…'

সাত

সুবিমল

'কে আপনি?' যুবক একটু বেশ রূঢ় ভাবেই প্রশ্নটা যেন সুব্রতর মুখের পরে ছুঁড়ে দেয়।

সুব্রত চট্‌ করে কতকটা যেন এক প্রকার যুবকটিকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে একটু ঠেলেই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল, ভয় পাবেন না। আমার নাম সুব্রত রায়। আপনার সংগে গোটাকতক কথা আছে।

যুবকটি ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা যেন বেশ একটু হকচকিয়েই গেছিল, কিন্তু মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বললে, 'কি রকম লোক মশাই আপনি, জোর করে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢোকেন? কি আপনার মতলব বলুন ত?'

'আহা, চটছেন কেন স্যার? আমিও এক জন ভদ্রলোক, চোর-ছ্যাঁচড় নই। বলেছিই ত' আপনার সংগে আমার গোটাকতক কথা আছে।…কথাগুলো শেষ হলেই চলে যাবো।'

'আপনার সংগে আমার কোন কথাই থাকতে পারে না। আপনি এখুনি চলে যান।'

'আহা, আপনার যে আমার সংগে কোন কথা থাকতে পারে না, তা ত' জানিই।…কথা আমার আপনার সংগে।'

যেন ভাবলে, তার পর বললে, 'কি আপনার কথা, চট্‌পট বলে ফেলুন, আমার অনেক কাজ।'

'বসতে ত' বলবেনই না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই না হয় বলি। আমাকে অবশ্যি আপনি চিনতে পেরেছেন, কেন না কাল রাত্রের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে নিশ্চয়ই যাননি। আপনি কাল অমন করে হঠাৎ চলে এলেন, নামটাও আপনার বললেন না।'

'আমার নাম জেনে আপনার লাভ কি?'

'শুনুন। আমি গত কালই বলেছিলাম আমার নাম সুব্রত রায়। কিছু দিন আগে আমি পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্‌টিগেশন বিভাগে কাজ করতাম; কিন্তু এখন আর করি না। তবে রহস্যের পিছু-পিছু ছোটার নেশাটা এখনও আমার একেবারে যায়নি।'

'আপনি তা হলে এক জন গোয়েন্দা?'

'কথাটা একটু রূঢ় শোনায় না কি। বলতে পারেন, সখের রহস্য-ভেদী। গোয়েন্দা কথাটার ইংরাজী শব্দ যদিও ডিটেকটিভ, ওদের দেশে। আমাদের দেশে কিন্তু ঐ পদবাচ্য যারা, তাদের কেউই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। তার কারণ, সেই স্বদেশী যুগ হতে সুরু করে আজ পর্যন্ত ঐ শব্দটার সংগে অনেক লজ্জা ও দুঃখের কাহিনী জড়িয়ে আছে। তাই ও-শব্দটা আমার নামের সংগে 'সখের' অলংকারযুক্ত করেও ব্যবহার করতে একান্তই নারাজ। কিন্তু ও-সব বাজে কথা থাক্‌। আপনি হয় ত' জানেন, শংকর ঘোষের খুনের ব্যাপার পুলিশের হাতে পড়েছে, এবং তারা রীতিমত অনুসন্ধান শুরু করেছে, ঐ অনুসন্ধানের সূত্র ধরে যদি তারা আপনার বাড়ীতে এসে চড়াও হয়, তবে আপনার পক্ষে হয় ত' একেবারেই ভাল হবে না।'

'কেন? তারা আমার বাড়ীতে আসবে কেন? খুনের সংগে আমার সম্পর্ক কি? আর আপনিই বা গায়ে পড়ে এ-সব কথা আমাকে শোনাতে এসেছেন কেন? কি আপনার মতলব বলতে পারেন?'

'মিথ্যে রাগারাগি করে কোন ফল হবে না। আপনি কাল রাত্রে মোটরটার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার পকেটে একটি সাংঘাতিক অস্ত্রও ছিল। কি উদ্দেশ্যে আপনি অমন সময় সেখানে গেছিলেন?'

'আপনি নিজেই ত' আমার পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, তার ছয়টি চেম্বারেই গুলী ভর্তি ছিল।'

'দেখুন, আপনি যে খুনী নন, সেটা আমি গত কালই বুঝেছিলাম, তা নাহলে নিশ্চয়ই ও-ভাবে আপনাকে আমি চলে আসতে দিতাম না। আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে এখানে আসিনি, বিশ্বাস করুন। আপনি আমাকে কাল রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন। এক দিন না এক দিন আপনাকে সব কথা পুলিশের কাছে খুলে বলতেই হবে। কিন্তু আজ যদি আমার কাছে খুলে বলেন, তাহলে ব্যাপারটা হয় ত' শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাণ এড়িয়েও যেতে পারে।'

'আমি এমন কিছুই জানি না, যা আপনাকে আমি বলতে পারি।'

'আপনি গত সন্ধ্যায় শংকর ঘোষের সংগে দেখা করেছেন

'হাঁ।' একটু ইতস্ততঃ করে যুবক জবাব দেয়।

'কেন?'

'সে আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাকে আমি বলতে পারবো না।'

'বেশ, আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'অসীম রায়।'

'এ বাড়ীতে আপনার সংগে আর কে কে আছেন?'

'আমি আর আমার এক ছোট ভাই সুসীম।'

'এখানে আপনারা কত দিন এসেছেন?'

'মাস দুই হবে।'

'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

'হরিদ্বার। এখানে বাসন্তী মিলস্‌'য়ে একটা কাজ পেয়ে আমি এসেছি।'

'আপনার মা বাবা জীবিত আছেন?'

'না, তাঁরা বহু দিন স্বর্গগত হয়েছেন।'

'শংকর ঘোষের সংগে আপনার কত দিনের পরিচয়?'

'বাসন্তী মিলস'য়ের কাজ নিয়ে আসবার পর পরিচয় হয়, মাস দেড়েক হবে।'

'এর আগে আপনার সংগে তার কোন পরিচয় ছিল না?'

'না।'

'বর্ত্তমান জমিদার অমুতোষ রায়কে আপনি চেনেন?'

'বাসন্তী মিলস'য়ের কর্ত্তা হিসাবে এক দিন দু'দিন দেখেছি, আলাপ-পরিচয় নেই।'

'লোকটি কেমন বলে আপনার মনে হয়?'

'মন্দ কি! আমার সংগে কোন দিন খারাপ ব্যবহার ত' করেননি। তা'ছাড়া শুনেছি, মিলের দু'-চার জন কর্ম্মচারীদের কাছে, যে, লোকটি অত্যন্ত দয়ালু এবং গরীবের দুঃখ বোঝেন।'

'আপনি এখানে আসবার আগে হরিদ্বারে কি করছিলেন?'

'আপনার ও-প্রশ্নের জবাব দিতে আমি ইচ্ছুক নই। আশা করি, আপনার যা জানবার, জানা হয়ে গেছে।'

'তা কতকটা হয়েছে বৈ কি!...আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার!'

'নমস্কার।'

সুব্রত অসীমের বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল।

• • • •

সুব্রত যখন সুজিতের ওখানে ফিরে এল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেছে। মেয়ে-জামাই অনেকক্ষণ বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

উৎসব-শেষে অত বড় বাড়ীটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। গত রাত্রের উৎসবের স্মৃতি নিয়ে খালি ঘরগুলো যেন নিশ্বাস ছাড়ছে।

সুজিত তার নিজের ঘরেই ছিল, সুব্রতকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে প্রশ্ন করলে, 'এই যে সুব্রত! এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

'সহরের নিত্য-নৈমিত্তিক কোলাহলের বাইরে এখানকার এই শান্ত নির্জ্জনতাটুকু মন্দ লাগছিল না রে! চারি দিক স্তব্ধ, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, চারি দিকে একটা শান্তি সুস্নিগ্ধ পরিবেশ।'

'কি রে, হঠাৎ কবি হয়ে উঠলি না কি?'

ছোকরা, এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে থাকে। একটি ছোট ভাই আছে, সুসীম।'

'পরিচয় তেমন নেই, তবে সামান্য জানা-শোনা আছে। কেন?'

'শ্রীবিলাস চৌধুরীর বাসন্তী মিলস্‌'য়ে চাকরী করে না?'

'হাঁ, উইভিং ডিপার্টমেন্টে ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরী করে না কি শুনেছি। লোকটির স্বভাব একটু যেন গম্ভীর প্রকৃতির। এখানকার লোক-জনদের সংগে তেমন মেশেন না। এখানে একটা ক্লাব আছে। এখানকার ছেলে-বুড়ো সকলেই প্রায় সে ক্লাবে যান, কিন্তু অসীম বাবুকে কোন দিনও সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছোট ভাই সুসীম অবিশ্যি এখানকার সকলের সংগেই বিশেষ পরিচিত। দু'-চার দিন আমার সংগেও আলাপ হয়েছে। ছেলেটি একটু বেশী কথা বলে।'

'হুঁ। আমি একটা কথা ভাবছি, সুজিত।'

'কি?'

'আমি যদি তোদের এখানে কিছু দিন থাকি, তোদের কোন অসুবিধা হবে না ত' ভাই?'

'অসুবিধা! কি তুই বলছিস্‌ সুব্রত!...বরং বিশেষ সুখীই হবো আমরা। হাঁ রে, তুই কি শংকর ঘোষের খুনের তদন্তের ব্যাপারে হাত দিয়েছিস্‌?'

'কেসটা বেশ একটু ইন্‌টারেসটিং বলেই মনে হচ্ছে। দেখি না, কত দূর কি দাঁড়ায়।'

'হুঁ, শিকারী বিড়ালের গোঁফের তা' দেওয়া দেখেই অমনি একটা কিছু অনুমান করছিলাম। তা অনুসন্ধান কত দূর এগুল?'

'আপাততঃ বিশেষ কিছুই নয়। তবে আশা করছি, ২।১ দিনের মধ্যেই বড় রকমের একটা সূত্র হাতে এসে যাবে।'

'বলিস্‌ কি?'

'হাঁ।'

ভৃত্য এসে বললে: 'দাদা বাবু, ও-বাড়ীর সুবিমল বাবু এসেছেন আপনার সংগে দেখা করতে।'

'সুবিমল! উপরে পাঠিয়ে দে।'

'এই ও-বাড়ীর সুবিমলটি কে হে?'

'অমুতোষ রায়ের খুড়তুত' ভাই। কেন, জমিদার-বাড়ীতে দেখিস্‌নি?'

'না।'

একটু পরেই তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি সুশ্রী যুবক এসে ঘরে প্রবেশ করল।

'আসুন সুবিমল বাবু!...ইনি সুব্রত রায় আমার পরম বন্ধু। একদা পুলিশের বিশেষ অনুসন্ধান বিভাগে চাকরী করতেন, এখন কাজে ইস্তাফা দিয়ে আবার সখের গোয়েন্দাগিরী মাঝে মাঝে করে থাকেন। মিলিয়নীয়ার!...আপনারা যাকে বলেন লাখোপতি! আর ইনি সুবিমল রায়, জমিদার অমুতোষ বাবুর খুড়তুত' ভাই।'...

সুজিতের পরিচয়ে সুবিমল যেন হঠাৎ চমকে উঠে। নিশ্চিন্ত পথিক অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সহসা সামনে বিষধর সাপ দেখলে যেমন চমকে উঠে।

যুবকের সুশ্রী মুখখানা মুহূর্ত্তে যেন সাদা একটা আশংকায় কালো

দীর্ঘ মজবুত চেহারা। পরনে শান্তিপুরে মিহি ধুতি, গায়ে পাতলা ভয়েলার পাঞ্জাবী. সেই পাঞ্জাবীর আড়াল থেকে দেহের সুঠাম গঠন যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুন্দর টানা দু'টি চোখ। নাকটা টিকোল। মাথায় কোকড়ান চুল ব্যাক-ব্রাশ করা।

সমস্ত দেহটা জুড়ে যেন একটা পরিচ্ছন্নতা, এক-নজরে চোখে পড়ে।

'বসুন সুবিমল বাবু!'···সুজিত অনুরোধ জানায়।

'না, না। আমি জানতাম না যে আপনি ব্যস্ত আছেন। আচ্ছা, আর এক সময় আসব, নমস্কার!'

'আরে না না, ব্যস্ত কে বলল? বসুন! বসুন!'

'না, মানে···এখন থাক।'

'আহা, বসুন না।···'

সুবিমল কতকটা যেন অনন্যোপায় হয়েই সামনের খালি চেয়ারটায় ধপাস্ করে বসে পড়ে।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুবিমলকে তখনও দেখছে।

'তার পর, কাল রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে এলেন না যে? আমি নিজে গিয়ে বলে এলাম!'

'দুঃখিত। আমি একান্ত দুঃখিত সুজিত বাবু! আপনি নিশ্চয়ই জানেন···একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে?'

'হাঁ, শুনেছি, আপনাদের বাড়ীর শংকর ঘোষ মারা গেছে।'

'তবে আপনি সবটা জানেন না। সাধারণ মৃত্যু নয়। কারোর দ্বারা খুন হয়েছে উঃ কি ভয়ানক! আমি আর মালতী ত' কাল সারাটা রাত ঘুমাতেই পারিনি।'

'কেন, ভয় না কি?'

'ভয়! "ভারতী ভবনে" যদি একটা রাত কাটাতেন তবে বুঝতে পারতেন। সমস্ত বাড়ীটা জুড়ে যেন কেমন একটা ভৌতিক ছায়া থম্-থম্ করছে! বিশেষ করে রাত্রে. যেন দম আটকে আসে। অদ্ভুত সব শব্দ। আমার মনে হয়, বুড়ো শ্রীবিলাস চৌধুরীর আত্মা এখনও ঐ দালানের ইট, চুণ বালী সুরকীর সংগে মিশে আছে! কারা যেন গভীর রাত্রে বাড়ীর ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়!'

সুজিত হা-হা করে হেসে উঠে···আপনি কি পাগল হলেন সুবিমল বাবু? এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত? তা'ছাড়া, আপনার মত এক জন এ্যাথেলেট্!'

'ভূত আমিও বিশ্বাস করি না সুজিত বাবু! কিন্তু তবু যেন সারারাত ঘুমাতে পারি না। বিশেষ করে শ্রীবিলাস চৌধুরীর ওই বুড়ো চাকর সুখদাস···ও যেন অচল এক প্রাণহীন দেহ! ওকে দেখলেই আমার বইয়ের পাতায় দেখা মিশরের মমির কথা মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখেছেন কখনো, লোকটার চোখে কি রকম এক মরা চাউনি। ও যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়। বাড়ীর সর্বত্র ও যখন তখন একটা ছায়ার মত নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর আমার কি মনে হয় জানেন? লোকটার আড়ি পাতা স্বভাব আছে। পরের কথা লুকিয়ে শোনা।

সুব্রতর চোখের দৃষ্টি মুদে আসে, আর শ্রবণ শক্তি প্রখরতর হয়ে উঠে।

মত আমার মনের মধ্যে চেপে বসেছে! সমস্ত বাড়ীটা ভরে যেন একটা অসুস্থ আবহাওয়া!'

'এমনও ত' হতে পারে সুবিমল বাবু, সব কিছুই আপনার মনের মধ্যে একটা বিকৃত রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠেছে। আসল ব্যাপারটা হয় ত' কিছুই নয়।' এতক্ষণে সুব্রত মৃদু ভাবে কথা বললে।

সুবিমল চম্‌কে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, আপনারা ঠিক বুঝবেন না সুব্রত বাবু, আর আমিও হয় ত' বুঝিয়ে ঠিক আপনাদের বলতে পারছি না। কিন্তু যাক্ গে সে সব কথা। আমি এসেছিলাম সুজিত বাবু, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে।' সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল বললে।　　[ক্রমশঃ

শীত আসে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

শীত আসে, ঐ শীত আসে—
ঝাপ্‌সা দেখায় চার পাশে।
পিক্-পাপিয়ার নাইকো সুর।
ঘোমটা-ঢাকা দিক্-বধূর
দু'চোখ দিয়ে ঝরছে জল;
শিশির গড়ে তাজমহল।
ঠান্‌দি হোথা জোর কাশে,
শীত আসে, ঐ শীত আসে।

ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপছি ঐ—
কলমখান চলছে কই!
পদ্মপুকুর কাঁদছে ভাই,
পদ্ম-শালুক নাই রে নাই।
দশটা বাজে—মস্ত রায়
লেপের তলায় নিদ্রা যায়।
ঝরা পাতার নিশ্বাসে—
শীত আসে ঐ শীত আসে।

আদুড় গায়ে কোন্ ছেলে
চূণ-সুরকির চট মেলে
আটচালাতে রোদ পোহায়—
কালকে-ভাজা পাঁপর খায়।
অনেক দূরে, অনেক দূরে—
ইষ্টিশানের বাঁশীর সুরে
স্বপ্নে আমার গান ভাসে।
শীত আসে, ঐ শীত আসে।

সিম্বা'র প্রতিশোধ

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

সরকারী চাকরিতে আফ্রিকার নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে আমায়। সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কাজ—পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল যেখানে যখন কাজের তলব পড়েছে সেখানেই হাজির হয়েছি; সে-বার আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল টাঙ্গানিকা হ্রদের নিকটবর্তী

ওখানে ছিলাম আমরা মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারিনি। এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, মানুষ না কি মন্ত্রবলে সিংহের রূপ ধারণ করতে পারে আর ঐ সিংহরূপী মানুষ সাধারণ সিংহের চেয়ে ঢের বেশী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। প্রায়ই শুনতাম, সিংহ এসে ঘর থেকে মানুষ টেনে নিয়ে গেছে, অথচ অনেক চেষ্টা করেও সিংহের সন্ধান পাওয়া যেত না।

বর্ষা কালেই সিংহের উপদ্রব হত বেশী। বর্ষা শুরু হলেই ওরা বেরিয়ে পড়ত জঙ্গল ছেড়ে এবং গ্রামের আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করত শিকারের লোভে। দু'-একটা গরু-ছাগল প্রায়ই পাওয়া যেত মাঠ থেকে। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বেশী দূরে গেলে মানুষেরও নিস্তার নেই—গরু চরাতে গিয়ে কত রাখাল যে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এ ধরণের ঘটনায় গ্রামে অবশ্য বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত না। প্রকৃতির শাসন যেখানে দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্ব্বলের পরাজয় সেখানে ঘটবেই তো! কিন্তু পশুরাজ যখন গরু-ছাগল উপেক্ষা ক'রে প্রতি রাত্রে গ্রামে হানা দেয় নর-মাংসের সন্ধানে, তখনই গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয় আর তারা সভয়ে বলাবলি করে, সিম্বা মাটুর (সিংহরূপী মানুষ) আবির্ভাব হয়েছে গ্রামে।

সে বছর বর্ষা কালটা যে রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, তা সহজে ভোলবার নয়। প্রতি রাত্রে নিকষ-কালো মেঘে আকাশ যেত ছেয়ে, মেঘের গর্জ্জন হত শুরু, আর কালো আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠত বিদ্যুতের লকলকে শিখা। তার পর বৃষ্টি নামত মুষল-ধারায় আর ঝড় বইত শন্-শন্ করে। আর সেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সিংহের ভয়াল আক্রমণ হত শুরু!

নিঃশব্দে কুটীর-প্রাঙ্গণে ঢুকে ঘরের দেয়ালে গর্ত্ত ক'রে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকারের উপর। ঝড়ের গর্জ্জনে চাপা পড়ে যেত অসহায় মানুষের আর্ত্তনাদ—শিকার মুখে করে সিংহ সরে পড়ত সবার অলক্ষ্যে।

আতঙ্কে গ্রামবাসীরা অভিভূত হয়ে পড়ত। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মানুষ শিকার করতে সিংহ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এল কি করে, এ তারা ভেবে পেত না। কোন জানোয়ারই তো এমন দুর্য্যোগে আশ্রয় ছেড়ে বেরুতে সাহস করে না—বিপদের ভয় শুধু মানুষেরই নয়, পশুদেরও আছে যথেষ্ট। এ যে সত্যিকার সিংহ নয়, এ যে 'মাচাউই', ডাইনীর মন্ত্রে সিংহে রূপান্তরিত কোন হতভাগ্য মানুষ, এ ধারণা বদ্ধমূল হয় তাদের।

পাহাড়ের উপর একটা টিনের 'শেডে' থাকতাম আমি। সঙ্গে জন কয়েক চাকর-পেয়াদা। পাহাড়ের উপর ঝড়ের প্রকোপ হত তীব্র, রাত্রে অনেক সময় চোখে ঘুম আসত না—বাতাসের শোঁ-শোঁ গর্জ্জন মনে কেমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। পাহাড়ের নীচে বহুদূর-বিস্তৃত কলা বন, তারই মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আবাহাদের কুঁড়ে ঘর।

এক দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙে। বাতাস শন্-শন্ করে বইছে, পাহাড়ের নীচে থেকে ভয়ার্ত্ত চীৎকার ভেসে এল কানে। আবাহারা প্রায়ই চীৎকার করে রাত্রে—কখনো চেঁচামেচি করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে, কখনো বা পশু-চোরের ভয়ে। কাজেই গোলমাল শুনলে আমরা বড় একটা চঞ্চল হতাম না। কিন্তু সে রাত্রির চেঁচামেচির মধ্যে যেন একটা অসাধারণত্ব ছিল। মিনিট দুই-তিন পরেই ঢাক বাজতে শুরু হল। বুঝতে পারলাম, গ্রামের মোড়লরা প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম ব্যস্ত ভাবে। পূর্ব্ব-আকাশে তখন উষার অস্ফুট আলো দেখা দিয়েছে। কাদা-ভরা পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ঝড়-বৃষ্টির দাপটে চারা গাছগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—বজরার ক্ষেত বিপর্য্যস্ত।

কুঁড়ে ঘরগুলির কাছাকাছি হতেই দেখলাম, এক দল লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যোদ্ধার বেশে—কোমরে গাছের ছালের চিত্রিত আবরণ, হাতে লম্বা বর্শা। গম্ভীর মুখে আমায় তারা অভিবাদন করলে। রাত্রে গোলমাল হয়েছিল কেন জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"বাওয়ানা, কাল রাত থেকে বুড়ো মাপাবিগোয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না," জবাব দিলে তারা, "সম্ভবতঃ কোন সিংহ তার ঘরে ঢুকে বিছানা থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। দেয়ালে শুধু একটা গর্ত্ত রয়েছে, তা'ছাড়া আততায়ীর আর কোন নিশানা নেই।"

"এ দুর্ঘটনা ঘটল কখন্?" প্রশ্ন করলাম আমি।

তারা বললে, ভোরের কিছুক্ষণ আগে চীৎকার শুনেছে তারা—চীৎকার শুনেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি।

"এ যে কেমনতর সিংহ বুঝতে পারছি না," ভীত-মুখে মন্তব্য করে তারা—"এ কোন চিহ্নই রেখে যায়নি! সিংহ সাধারণতঃ কাছাকাছি কোথাও শিকারটা রাখে অবসর মত তার সদ্ব্যবহার করবার জন্ত। কিন্তু এত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও রক্ত বা হাড় নজরে পড়ল না।"

আধ ঘণ্টা আমরা বৃথা ঘোরাঘুরি করলাম। কোথাও রক্তের দাগ নেই—মনুষটা যে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে এ নিঃসন্দেহ; কিন্তু ঘাস বা কাদার উপর তার কোন নিদর্শন নেই। নিরাশ হয়ে যখন ফিরছি, সেই সময় হঠাৎ আমার পা ঠেকল কাদায় অর্দ্ধমগ্ন কি একটা শক্ত জিনিষের গায়ে। আমি থামলাম সেখানে, জিনিসটা কী ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, ওটা একটা মানুষের মুণ্ড, তখনো স্থানে স্থানে মাংস লেগে রয়েছে।

কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। ঐ সামান্ত খাদ্যের লোভে সিংহ যে ওখানে ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। আহার্য্যের পরিমাণ যদি বেশী থাকত—যদিও সেটা মোটেই প্রীতিকর হত না—তবে আমরা হতভাগ্যের দেহাবশেষের উপর ফাঁদ পেতে ওখানে অপেক্ষা করতে পারতাম সিংহ ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত।

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পরেই আগুন জ্বালা হল ঘরে ঘরে, ঢাক বাজাতে লাগল ডুম্-ডুম্ করে আর অন্ধকারের মধ্যে গ্রামবাসীদের হাঁক শোনা যেতে লাগল মাঝে মাঝে। ভয় পেলে আবাহারা নিজেদের আশ্বস্ত করাবার চেষ্টা করে পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে। সবাই সজাগ আছে, এ ভরসাটুকু কম নয়।

রাত্রি একটু গভীর হতেই আকাশে মেঘ ডাকতে লাগল আর বৃষ্টি নেমে এল ঝম্-ঝম্ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন গেল নিবে আর লোক-জনের কলরবও গেল থেমে। চোখে কখন্ ঘুম নেমে এসেছিল জানি না, হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম গেল ভেঙে। মনে হল যেন কার চীৎকার শুনলাম আমি, কাণ খাড়া করে রইলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু টিনের ছাদের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

পরদিন সকালে ভীত বিবর্ণ মুখে এক দল গ্রামবাসী এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। দলপতি বললে, "বাওয়ানা, সিংহ আবার এসেছে। মিরেম্বির ঘরে ঢুকেছিল কাল রাতে—মাপারিগোয়ার ঘর থেকে মাত্র বিশ হাত দূরে। ঝড় বইছিল খুব জোরে, তবু মিরেম্বির আওয়াজ কাণে এসেছিল আমাদের, কিন্তু যখন আমরা বর্শা ও জলন্ত কাঠ নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন মিরেম্বিকে পেলাম না ঘরে—বুঝলাম, আমরা পৌঁছুবার আগেই সিংহ তাকে টেনে নিয়ে উধাও হয়েছে।"

মাপারিগোয়ার ঘরের দেয়ালে যেমন একটা গর্ত্ত দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি একটা গর্ত্ত দেখলাম মিরেম্বির ঘরে। এবারও মৃত ব্যক্তির দেহ নিকটে কোথাও পাওয়া গেল না. অনেক সন্ধানের পর, একটা কলা গাছের নীচে শুধু তার রক্তাক্ত মুণ্ডটা দেখতে পাওয়া গেল।

এবার অবশ্য আততায়ীর অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কুটীরের কাছেই। পায়ের ছাপ যে সিংহেরই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না—আর এ-ও নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, সিংহ একা আসেনি, সঙ্গে ছিল আরেকটি সিংহ!

পর-পর আরও তিন রাত্রি সিংহ দু'টো গ্রাম থেকে লোক নিয়ে গেল টেনে। তার পর ওদের সাহস গেল বেড়ে—হানা দিলে পাহাড়ের উপর কুলি-বস্তিতে। এক জন কুলি ঘুমুচ্ছিল ঘরের বারান্দায়, তাকে তুলে নিয়ে ওরা নিঃশব্দে প্রস্থান করলে। কুলি-বস্তির চতুর্দ্দিকে সাত ফুট উঁচু মাটির দেয়াল। কুলিদের সর্দ্দার বললে, মাঝ-রাত্রে সে দেখলে প্রকাণ্ড কি একটা জানোয়ার দেয়াল টপ্‌কে ভিতরে এসে পড়ল—তার পর আর একটা জানোয়ার চকিতে এসে জুটল তার সঙ্গে—অন্ধকারে কোথায় যে সে এতক্ষণ লুকিয়েছিল, তা সে দেখতে পায়নি। পাছে হাঁক-ডাক করলে কুলিরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে বিপন্ন হয়, এই ভয়ে সে চেঁচাতে পারেনি।

বেলা হতেই লোক-জন এসে জড় হল আমার কোয়ার্টার্সের সামনে। এবার সিংহের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল—পাহাড় থেকে নেমে সিংহ দু'টো দূরে জঙ্গলের দিকে গেছে। জনকতক শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম সিংহের সন্ধানে। সিংহ দু'টোকে মারতেই হবে; নইলে রোজই এসে ওরা উপদ্রব করবে। আধ মাইল পথ আমরা খুব সাবধানে চললাম, ভিজে মাটিতে সিংহের পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট। আমরা সকলেই লক্ষ্য করলাম, পথে কোথাও এমন চিহ্ন নেই, যাতে মনে হয় সিংহ শিকার সমেত জঙ্গলে এসেছে। তবে মানুষটার দেহ গেল কোথায়? কুলি-বস্তির কাছে সিংহ যে তাকে ভক্ষণ করেনি, এ একেবারে নিঃসন্দেহ—কোথাও মানুষের রক্ত বা দেহাবশেষের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ আমাদের দলের এক জন চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে, তার পর নীচু হয়ে কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। এক মুহূর্ত্ত পরেই মাটি থেকে রক্তমাখা একটা নরমুণ্ড তুলে নিয়ে সে উঁচু করে ধরল আমাদের সামনে।

একটু পরেই শুরু হল বৃষ্টি, সিংহের পায়ের ছাপ গেল মিলিয়ে, কাজেই আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না।

কাদা মন্থন করে যখন আমরা ক্লান্ত-পদে বাড়ী ফিরছি, সেই সময় এক জন গরীব স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলে। কোলে তার তিন বছরের একটি শিশু। স্ত্রীলোকটি জঙ্গলের ধারে একটা জীর্ণ কুঁড়ে-ঘরে একা বাস করে। আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে শুনে সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হল। সঙ্গীদের এক জনকে বললাম, স্ত্রীলোকটিকে যেন যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রামে এনে রাখা হয়—সিংহের আস্তানার অত কাছে থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে এক জন কর্ম্মচারী ছুটে এসেছে আমার কাছে। জরুরী ব্যাপার—এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে আমাকে। গিয়ে দেখি, এক জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোক পাশাপাশি দু'টি খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছে—দু'জনেরই হাত ক্ষত-বিক্ষত। তাদের মুখে যা শুনলাম, তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

ওরা স্বামি-স্ত্রী ঘরের মধ্যে আগুন জেলে গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে ছিল, হঠাৎ এক সময় বাইরে থেকে কে ওদের দরজায় একটা ঘা দিলে ভয়ানক জোরে। ভয় পেয়ে ওরা তাকাল দরজার দিকে। বাইরে তখন প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে, ওরা লক্ষ্য করলে, আগল ঠেলে দরজার ঝাঁপটা ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ছে ভিতর দিকে। তার পর, হঠাৎ আগুনটা যেই একবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে, ওরা সেই আগুনের আলোয় লক্ষ্য করলে, সিংহের একটা থাবা ঝাঁপের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। দু'টো শক্ত কাঠ—একটা আরেকটার উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা—আগলের কাজ করছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড চাপে তার একটা গেল ভেঙে। আগুনের ভিতর থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে গেল দরজার দিকে, আর তার স্বামী দরজায় পিঠ দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল দরজাটাকে রক্ষা করবার জন্য।

কয়েক মুহূর্ত্ত সংগ্রাম চলল ভীষণ ভাবে, সিংহ থাবা দিয়ে তাদের দু'জনকেই আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করলে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হচ্ছে এইবার বুঝি দরজা ভেঙে পড়বে! এদিকে বিদ্যুতের আলোয় ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে তারা দেখলে দু'টো প্রকাণ্ড সিংহ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে ঢোকবার দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে। সিংহের নখের আঘাতে হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকটি জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে খোঁচা মারলে জানোয়ার দু'টোর মুখে আর সেই আঘাতে ওরা ছুটে পালাল অন্ধকারের মধ্যে।

"মাজি," আহত লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি, "তুমি যে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ, এর জন্য মুঙ্গু (ঈশ্বর) ও তোমার সাহসী স্ত্রীকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সিংহ দু'টোকে যে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ এতে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছি, ওরা হয়তো আর আসবে না এদিকে—কিন্তু এত বড় একটা কাজের জন্য তোমাদের ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয়নি—হাতটা জখম হয়েছে শুধু।"

এক মুহূর্ত্ত ওরা চুপ করে রইল। তার পর স্ত্রীলোকটি কথা কইলে। "বাওয়ানা," ম্লানমুখে সে বললে, "আমরা রক্ষা পেয়েছি সত্য, কিন্তু সবাই আমাদের মত ভাগ্যবান নয়। আমাদের কাছে বাধা পেয়ে সিংহ দু'টো—সিংহ বলা ওদের সঙ্গত হবে না, সিংহের আকারে ওরা মানুষ—হানা দেয় আমাদের পাশের ঘরে।"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। "বল কি? কাদের ওরা টেনে নিয়ে গেল?"

"সেই গরীব স্ত্রীলোকটি ও তার শিশু—যাদের আপনি গ্রামে এনে রাখতে বলেছিলেন," বিষণ্ণ মুখে জবাব দিলে স্ত্রীলোকটি—"দু'জনেই ঘুমুচ্ছিল সেই ঘরে, আর দু'জনকেই ওরা টেনে নিয়ে গেছে।"

এবার গ্রামে সত্যিকার আতঙ্ক দেখা দিল। সবার মুখেই উদ্বেগের ছায়া—সবাই ফিস্ ফিস্ ক'রে আলোচনা করে সিম্বা-মাটু সম্বন্ধে। গ্রামের এক জন মাতব্বর এসে গম্ভীর মুখে আমায় বললে, গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা নিরালা জায়গায় এক জন মায়াবী থাকে, রাত্রে কাউকে একা পথ চলতে দেখলে সে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে এবং সিংহে রূপান্তরিত করে তাকে ছেড়ে দেয় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করবার জন্যে।

নরমাংসলোলুপ মায়াবীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। গ্রামবাসীদের সন্দেহ একাধিক লোকের উপর, কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। আদিম সংস্কার যেন তাদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সর্ব্বত্র ভয় ও উদ্বেগের ছায়া।

এ অবস্থায় আমি গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে এক দিন সভা বসালাম। আমি তাদের বললাম সিংহের উপদ্রব থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো, কিন্তু ঐ সিংহ সম্বন্ধে তারা যে সব অদ্ভুত ধারণা পোষণ করছে তা নিতান্ত অমূলক—অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন না করাই ভাল। কিন্তু আমার কথা তাদের মনের উপর কোন রেখাপাত করলে না, কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে তারা বসে রইল। খানিক পরে তারা বললে, ঐ সিংহ যে সাধারণ সিংহ নয়, এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ—ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে স্থানীয় ওঝার সাহায্য নিতে হবে, আর ওঝার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তবে গ্রামবাসীদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

দু-এক দিন পরেই খবর এল, গ্রামের নিকটে একটা জঙ্গলের মধ্যে সিংহ দু'টিকে দেখা গেছে। আবার আমি লোক-জন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সন্ধানে। অতি সন্তর্পণে আমরা এগুতে লাগলাম, প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবছি, এইবার হয়তো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর, কিন্তু কোথাও ওদের দেখা গেল না। বর্শাধারী শিকারীদের ব্যূহ ভেদ করে ওরা নিঃশব্দে কখন সরে পড়েছে! সেই রাত্রেই ওরা আবার গ্রামে ঢুকে এক জন স্ত্রীলোককে টেনে নিয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে।

ফাঁদ পাতা হল গ্রামের নিকটে। ফাঁদে গোটা-কতক ছাগল ও ভেড়া রাখা হল সিংহকে প্রলুব্ধ করবার জন্য। এক জন সরকারী প্রহরী এসে বসল খানিকটা তফাতে—বন্দুক হাতে ক'রে। কিন্তু সিংহেরা এ সবে প্রলুব্ধ হল না—ভেড়া-ছাগল উপেক্ষা করে নিকটস্থ একটি কুঁড়েঘর থেকে ওরা টেনে নিয়ে গেল একটি মানব-শিশুকে।

হতাশ হয়ে আমি গ্রামের মোড়লকে ডেকে পাঠালাম। বললাম, "দেখো মাতোয়ালি, আমরা তো যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই সিংহের উপদ্রব দমন করতে পারলাম না। গ্রামের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—আমরা তাদের আর ভরসা দিতে পারছি না। বড় আপিসে খবর দিয়েছি—সেখান থেকে সরকারী কর্ম্মচারীরা আসবার আগে তোমরা তোমাদের প্রাচীন ব্যবস্থা যা কিছু আছে তা একবার প্রয়োগ করতে পারো।"

আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে মাতোয়ালি বললে, এক জন অভিজ্ঞ ওঝার সঙ্গে পরিচয় আছে তার—মানুষকে সকল রকম বিপদ থেকে মুক্ত করবার বিদ্যা তার জানা আছে। দু'টে গরুর বিনিময়ে সে এমন একটা প্রক্রিয়া করতে পারে, যার ফলে সিংহ আর কখনো গ্রামবাসীদের কাউকে স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

সরকারী চাকরি করি বলে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমি সমীচীন মনে করলাম না, তবে দূর থেকে কিছুটা লক্ষ্য করলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে দলে দলে গ্রামবাসীরা অগ্রসর হতে লাগল একটা জলাভূমির দিকে। এক-এক জন কাছে আসে আর জলার ধারে দাঁড়িয়ে সেই ওঝা একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার কপালটা চিরে মন্ত্র পড়ে কি একধা ওষুধ ঘসে দেয় ভিতরে।

সেই রাত্রে গ্রামে আর কোন বিপদ ঘটল না এবং তার পর থেকে সিংহের উপদ্রব একেবারে থেমে গেল গ্রামে।

সত্যি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মন্ত্র-তন্ত্রের যে এত শক্তি থাকতে পারে, এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দিন কয়েক পরে যে খবর এল, তা আরও অদ্ভুত। শুনলাম, ওঝার উপর সিম্বা প্রতিশোধ নিয়েছে ভীষণ ভাবে। চল্লিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে বাস করত ওঝা। গ্রামের নাম মাকারি। যে রাত্রে আমাদের ওখানে ওঝা ভয়ার্ত্ত স্ত্রী-পুরুষের দেহে ওষুধ প্রয়োগ করছিল সিংহের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করবার জন্য, ঠিক সেই রাত্রেই সিংহ হানা দেয় মাকারি গ্রামে। এর আগে ঐ গ্রামে সিংহের উপদ্রব না কি কোন দিনই হয়নি।

বাড়ী পৌঁছুতে ওঝার দু'দিন লেগেছিল। পৌঁছে দেখে, বাড়ী-ঘর একেবারে লণ্ড-ভণ্ড—যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব হিংস্র তাণ্ডবে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করে সবে মাত্র বিদায় নিয়েছে। উঠোনে পা দিতেই তার স্ত্রী এসে আর্ত্ত কণ্ঠে বললে, "মগংগা, দু'রাত্রি প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে এখানে—এ রকম ঝড় এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। ঝড়ের বেগ যখন ভীষণ হয়ে উঠেছে, সেই সময় কোন দুষমণ আমাদের উঠোনে ঢুকে ঘরের দেয়ালে গর্ত্ত করে তোমার মা আর বোনকে টেনে নিয়ে গেছে। অনেক খোঁজ হয়েছিল কিন্তু দুষমণের পাত্তা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে শুধু তোমার মা আর বোনের আধ-খাওয়া মুণ্ড। আজ সকালে জন কতক লোক বলাবলি করছিল, দুটো সিংহ না কি ভোরের দিকে জঙ্গলে ফিরছিল, তারা দেখেছে।"

শীত

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

শীত এলো রে দোলা দিয়ে সরষে ক্ষেতের ফুলে,
বোরো ধানের নতুন পাতা উঠলো দুলে দুলে!
কড়াই-ক্ষেতের ভরা গাছে,
বুনো ফড়িং লাফিয়ে নাচে,
কিংশুকেরই বোঁটার বাঁধন গেল আজি খুলে।

টগর, গাঁদা গাছে গাছে বসায় রঙের মেলা,
ঘুঘু ডাকে 'ওঠো ওঠো' শীতের সকাল বেলা।
আবছায়া-পথ কুয়াসাতে,
রাখাল চলে পাচন হাতে,
সজনে গাছের ফুলে ফুলে ভ্রমর করে খেলা।
ঘাসের বুকে শিশির-কণা করে ঝলমল,
ঘুড়ি নিয়ে মাঠে মাঠে খেলে ছেলের দল।
খেজুর-রসের মধু-গন্ধে
পরাণ নাচে মহানন্দে,
নতুন গুড়, পায়েস, পিঠায় লোভে সে চঞ্চল।

এক মিনিটের গল্প

বিবেকের দংশন

মনোজিৎ বসু

প্রত্যেকের মধ্যেই দুটো জিনিস আছে। একটা ভালো, আর একটা মন্দ। ভালো জিনিসটাকেই আমরা বলি বিবেক; আর মন্দ জিনিসটা হ'লো শয়তান। মানুষের অন্তরের এই বিবেকই মানুষকে নিরন্তর সৎ-পথে চালিত করে; আর অন্তরের ঐ শয়তানটাই মানুষকে নিয়ে যায় অধঃপাতের পথে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর কিশোর জীবনে একবার এই শয়তানের পাল্লায় প'ড়ে কি রকম মন্দ-পথে যেতে শুরু করেছিলেন, সেই ঘটনাই তোমাদের বলছি।

গান্ধীজী তখন কিশোর। ইস্কুলে যান। লেখাপড়া শেখেন। ভালো ভালো বই পড়েন। রামায়ণের গল্প শোনেন! 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' তাঁর মনে এক অপূর্ব সাড়া এনে দেয়। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সেই আদর্শ সম্মুখে রেখে মা-বাবাকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। কখনো তাঁদের লুকিয়ে কোনো কাজ ক'রতে সাহস পান না। মা-বাবাকে লুকিয়ে কোনো কিছু করাকে, তিনি পাপ ব'লেই মনে করেন।

অথচ এই পাপই তিনি এক দিন ক'রে ব'সলেন।

মোহনদাসের মেজদা'র এক বন্ধু প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসত বেড়াতে। সেই সূত্রে তার সঙ্গে মোহনের ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় হয়। ছেলেটি কিন্তু মোটেই ভালো ছিল না। নানা রকম বদ্-স্বভাবের দিকে তার ঝোঁক ছিল। এ-সব জেনে-শুনেও মোহন মিশতো তার সঙ্গে। মোহনের উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেটিকে নানা রকম উপদেশ দিয়ে—সৎপরামর্শ দিয়ে তার বদ্-স্বভাব দূর করা। কিন্তু অনেক ক'রেও মোহন তার চরিত্র সংশোধন করাতে পারলো না। উল্টে সে নিজেই পড়লো তার খপ্পরে। ছেলেটি মোহনের রুগ্ন চেহারার কথা উল্লেখ ক'রে বললো—'তুই মাংস খেতে শুরু কর, তাহ'লেই তোর চেহারা ফিরে যাবে, আমার মত তাগড়াই শরীর হবে। দেখিসনি, সাহেবগুলোর কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা? প্রত্যেকেই এক-একটি জোয়ান। ওরা মাংস খায় বলেই না অমন চেহারা! তুইও মাংস খেতে আরম্ভ কর, দেখ্‌বি, ক'দিন বাদেই চেহারা কেমন পাল্টে গিয়েছে।'

মেজদা'র ঐ বন্ধুর এ হেন উপদেশ শুনে মোহনদাস মাংস খাওয়া স্থির ক'রে ফেলল। কারণ, তার নিজের রুগ্ন ও দুর্বল চেহারার জন্য সে মনে কোনো আনন্দই পেত না। কিন্তু মাংস খাওয়া যায় কি ক'রে? বাড়িতে তো ও-পাট নেই। তাদের পরিবারে মাংস হ'লো নিষিদ্ধ খাদ্য। কিন্তু জোয়ান হ'তে গেলে মাংস খেতেই হবে। কাজেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ বন্ধুটির সাহায্যেই কিশোর মোহনদাস মাংস খেতে সুরু ক'রল। প্রথম দিন মাংস খেতে গিয়ে ভারী অস্বস্তি বোধ হ'লো। গা ঘুলিয়ে উঠলো। রাত্রে ঘুমের ঘোরে মনে হ'লো, ছাগলটা যেন তার শরীরের মধ্যে ঢুকে চীৎকার করছে। যাই হোক, বলিষ্ঠ হবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তো মোহনদাস বার ৫।৬ এমনি ক'রে মাংস খেল। কিন্তু আর পারে না। ক্রমাগত তার অন্তরের সেই বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে, তাকে যেন কাণে কাণে বলে—'এ তুমি কি ক'রছ? মা-বাবাকে না জানিয়ে তোমাদের বংশের এই নিষিদ্ধ খাবার তুমি কেন খাচ্ছ? এ যে পাপ। মহাপাপ।'

অবশেষে বিবেকের কাছে শয়তান পরাজয় মান্‌লো। মোহনদাস ঠিক ক'রল, যত দিন মা-বাবা আছেন তত দিন আর মাংস ছোঁবে না। কিশোর গান্ধী সেই যে মাংস খাওয়া ছেড়েছিল, বড় হয়েও তা আর ধরেনি। বিবেকের শক্তি সহস্র শয়তানকে অনায়াসে পরাজিত করতে পারে।

খেজুর-রসের গান

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পৌষ এলো রে হিমেল হাওয়ায় উঠলো নেচে প্রাণ।
তাইরে নাইরে গাই রে মোরা খেজুর-রসের গান।
　　খেজুর গাছে ঝুলছে হাঁড়ি
　　ঐ দেখ না সারি সারি
টস্-টসিয়ে পড়ছে ঝরে খেজুর-রসের বান।
জিরেন কাঠের রসের তরে মন করে আন-চান।

কোথায় লাগে তাতারসি, নলেন গুড়ের পানা।
কলের চিনির মিষ্টতা ভাই ভালই আছে জানা।
　　'জেলি' ও 'জ্যাম' হার মেনে যায়
　　'লজেন্স' যে আজ পাত্তা না পায়
সরিয়ে রাখ মণ্ডা-মিঠাই সরপুরিয়া ছানা।
খেজুর রস চুমকে খেতে কেউ কো'র না মানা।

আয় রে ওরে 'ক্যাবলা', 'গোপা', অন্ত, অমিতাভ।
খেজুর গাছের তলায় মোরা যাবই, ওরে যাব।
　　পর না কাপড় এঁটে-সেঁটে
　　যেতে হবে একটু হেঁটে
ওই ওখানে গেলে পরেই রসের খনি পাব।
যত খুশী পেটটি পুরে খেজুর-রস যে খাব।

সাজ ও সজ্জা

শ্রীঅরুণা আলী

সভ্যতার সাথে সাথে মানুষের সমাজে একটা বিষয় বেশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। সেটা হচ্ছে, খুব সহজ অথচ সুরুচির সহিত নিজকে প্রকাশ করা—সে কথাতেই হউক কিংবা পোষাকেই হউক। কথা সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আজ শুধু পোষাক সম্বন্ধে—বিশেষতঃ মেয়েদের পোষাকের প্রয়োজনীয়তা ও রুচিবোধ সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

বহু বহু বৎসর আগেও দেশ যখন সভ্যতায় ততটা অগ্রসর হয়নি, তখনও দেখা যায়, মানুষের সাজ-সজ্জার প্রতি বেশ নজর ছিল। অবশ্য সুরু থেকেই মেয়েদের দেহ-সজ্জার প্রতি লক্ষ্য বেশী ছিল। ইহা কতকটা প্রাকৃতিক কারণে ও সামাজিক প্রয়োজনেও বটে। আদি যুগে পুরুষ যখন তীর-ধনুক নিয়ে খাদ্য আহরণে গভীর অরণ্যে ছুটাছুটি করত, নারী হয়ত তখনও কোন পাহাড়ী ঝরণার পাড়ে বসে বনফুলে নিজ অঙ্গের আবরণ এবং আভরণ দুই-ই তৈরী করতে ব্যস্ত থাকত। তা' ছাড়া, আবরণ দিয়ে ঢেকে নিজকে রক্ষা করবারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সাথে এই প্রয়োজন-বোধেরও পরিবর্ত্তন হতে সুরু হল। কাজেই মেয়েদের পোষাকের পরিবর্ত্তন হ'তে লাগল।

বর্ত্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ। কল-কারখানা আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে দিন-রাত ছুটে চলছে। আজ আমাদের পোষাকের প্রয়োজন একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। আমাদের ব্যবহারীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে খাদ্যের পরই পোষাকের স্থান, ইহা নিশ্চিত। আমাদের সাজ ও সজ্জার তাগিদেই সভ্যতাকে যেমন সক্রিয় রেখেছে, ঠিক সেই-রূপ বেশ-ভূষায় সুরুচির পরিচয় দিয়ে দেশের সংস্কৃতিকে বজায় রাখবার গুরু দায়িত্বও আমাদের।

আপনাকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করলে সকলেই আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য-বোধ সকলের নেই এবং থাকাও সম্ভবপর নয়। ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক ভাবে ম্যাচ্ করে পোষাক পরতে জানলে নিতান্ত কুরূপাকেও বেশ ভাল দেখায়, রূপবতীর ত কথাই নেই। পোষাক পরিধানের নিপুণতা ও রুচির উপর শুধু যে আমরা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তা নয়, পোষাকের নিপুণতার উপর আমাদের শুচিতা ও সম্ভ্রম বহুলাংশে নির্ভর করে। কাজেই সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, এই সম্বন্ধে আমাদের দুটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, আমাদের শরীরের গড়ন অনুযায়ী পোষাক পরিধান এবং সময় ও স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার পোষাক ব্যবহার করা। কোন একটা ভাল সুন্দর শাড়ী পরে বাইরে বেরুলেই হল—অনেকে তাই মনে করেন। মানান অমানানের কি প্রয়োজন? আমার এতো সময় নেই বাপু ইত্যাদি অনেক কথাই তাঁহারা বলেন; কিন্তু এঁদের কাউকে বন্ধুদের মধ্যে কেহ যদি জোর করে তাঁহার শরীরের গড়ন ও সময় উপযোগী একখানা সাধারণ শাড়ীও পরিয়ে, অন্ততঃ দুই-চার মিনিটও আরসির সামনে দাঁড় করাতে পারেন, শুধু তখনই বোনটি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—হ্যাঁ ভাই, রুচির প্রয়োজন আছে বটে।

আমাদের শারীরিক গড়নের শ্রেণিবিভাগ করলে দেখতে পাই, কেহ লম্বা, কেহ খাটো, কেহ রোগা, কেহ কালো, কেহ বা মোটা। সাধারণতঃ প্রমাণ গড়নের খুব কম মেয়েই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের শ্রেণিবিভাগের সাথে সাথে আমাদের পোষাকও বিভিন্ন বিভাগে ফেলা যায়।

অনেক রকম পাড়ের শাড়ী আছে যারা কেবল লম্বাদেরই মানায়। যেমন চওড়া স্কার্ট পাড়, চওড়া ফুল-লতাপাতা পাড় বা যে কোন রকমেরই চওড়া পাড়ের শাড়ী। খাটো মহিলারা যদি চওড়া পাড়ের শাড়ী পরেন, তা'হলে তাঁদের দূর থেকে দেখতে যেন আরও খাটো মনে হয়। কাজেই খাটোদের জন্য তিন বা চার আঙুল চওড়া পাড়ের শাড়ীই ভাল। লম্বাদের আবার সরু পাড়ের শাড়ীতে আরও বেশী লম্বা দেখায়। কাজেই নিজেদের উচ্চতা অনুযায়ী নিজেদের শাড়ীর পাড় পছন্দ করা উচিত।

এখন ধরুন শাড়ী যদি ডুরে (striped) হয়, তা'হলে যাঁরা খুব লম্বা তাঁদের আড়েতে (Breadthwise) ডুরে শাড়ী ভাল মানায়, কিন্তু খাটো মহিলারা যদি আড় ডুরের শাড়ী পরেন, তবে তাঁদের উচ্চতা যেন আরও কম দেখায়। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে কিছুটা লম্বা দেখাবার জন্যও খাটোদের লম্বালম্বিতে

(Lengthwise) ডুরে শাড়ী এবং লম্বাদের আরও যেন অমানানসই লম্বা না দেখায়, সেই জন্ম আড়েতে ডুরে শাড়ী পরা যুক্তিসঙ্গত।

আজকাল দেশে ছাপা (Printed) শাড়ীর প্রচলন খুবই বেশী। ছাপার আকার ছোট-বড় অনেক প্রকারের আছে। এখানেও লম্বা ও খাটো মহিলাদের একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যদি শাড়ীর জমিতে ছোট বা বড় ফুল-পাতার ছাপ থাকে, তবে লম্বা ও রোগাদের বড় ছাপের শাড়ী এবং খাটো ও মোটাদের সর্ব্বদা ছোট-ছোট ছাপার শাড়ী বেছে নেওয়া শ্রেয়ঃ। বড় ছাপ খাটো ও মোটা মেয়েদের গায়ে ভালো দেখায় না।

সবাইকে সব রংয়ের কাপড়ে মানায় না, ইহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ফরসাদের গাঢ় রংয়ের পোষাকে যত ভাল দেখায়, কালোদের তত দেখায় না। গাঢ় রং ময়লা গায়ের রংকে যেন আরও গভীর করে তোলে। সুতরাং শ্যামবর্ণ এবং কালো মেয়েদের ফিকে রংয়ের শাড়ীই পরা ভাল। খুব ফরসা মেয়েরাও ফিকে রংয়ের শাড়ী নিশ্চয়ই পরবেন, কিন্তু এমন রং নয় যাহা গায়ের রংয়ের উপর আভা ফেলে গায়ের রংকে অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে করে তুলবে—যেমন বেশী ফিকে হলুদ, বেশী ফিকে কমলা, বেশী ফিকে গোলাপী ইত্যাদি। গায়ের রং অনুযায়ী যেমন শাড়ীর রং হওয়া দরকার, তেমনি শাড়ীর রং অনুরূপ ব্লাউজের ও জুতা বা চটির রং হওয়া উচিত। একই রংয়ের শাড়ী ও ব্লাউজ পরলে ভালই দেখায়, কিন্তু আরও সুন্দর মানায় যদি এই দুই পোষাকের জন্ম একই রংয়ের দুই প্রকার শেড (shade) ব্যবহার করা যায়। ধরুন, শাড়ী যদি গাঢ় সবজে (deep green) হয় এবং ব্লাউজ যদি ফিকে সবজে (light green) হয় কিংবা দামী ব্রকেডের পাড়যুক্ত শাড়ীর সহিত যদি পাড়ের রংয়ের ব্রকেডের ব্লাউজ পরা যায়। অনেক সময় শাড়ী ও ব্লাউজের জন্ম একই রংয়ের দুই প্রকার শেডের কাপড় পাওয়া যায় না—সেখানে শাড়ীর পাড়ের ভিতরকার কোন এক রং বেছে নিয়ে সেই অনুরূপ ব্লাউজ করলে মন্দ হয় না। কিংবা শাড়ীর জমিতে যদি রঙিন ফুল থাকে তবে উহার সহিত কোন ডুরে কাপড়ের ব্লাউজ মোটেই মানাবে না। কিন্তু এখানে শাড়ীর ফুলের কোন একটা রং বেছে নিয়ে ঐ রংয়ের ব্লাউজ তৈরী করা রুচিজনক হবে।

চেষ্টা করতে হবে শাড়ীর ও ব্লাউজের জন্ম যেন একই রকম কাপড় ব্যবহার করা হয়। যেমন সিল্কের সহিত সিল্ক, ব্রকেডের সহিত ব্রকেড, সুতির সহিত সুতি ইত্যাদি।

বেশী রোগা মেয়েদের সিল্কের শাড়ী মানায় না অর্থাৎ তাঁহারা এমন কোন শাড়ী কিংবা জামা পরবেন না, যাহা তাঁদের গায়ের সঙ্গে একেবারে এঁটে বসে। তাঁহারা সর্ব্বদা একটু মোটা জমির শাড়ী পছন্দ করবেন। খদ্দরের শাড়ী এঁদের পক্ষে ঠিক পরনসই হবে। মোটা মেয়েদের অবশ্য গায়ের সঙ্গে এঁটে জামা-কাপড় পরলে বেশ ভালই দেখায়। যাঁরা খাটো এবং মোটা, তাঁদের পক্ষে কিন্তু মোটা জমির কোন শাড়ী কিংবা জামা খুবই অমানানসই হবে। রোগা মেয়েরা আবার খাটো হাতা ব্লাউজ পরবেন না, তাহাতে তাঁদের আরও বেশী বেশী রোগা দেখাবে। এঁদের পক্ষে সর্ব্বদা লম্বা হাতা জামা পরাই শোভনীয়। লম্বা হাতা জামা তৈরীর বেশ একটা কথা অবশ্যও মনে রাখতে হবে যে, হাতাটা যেন ঠিক বন্ধনীর (Wrist) উপরে এসে সম্পূর্ণ বন্ধনীকে ঢেকে রাখে—শুধু হাত দু'টোই বাইরে থাকবে।

এবার একটু বলা যাক, স্থান ও সময়-বিশেষে কি ভাবে পোষাকের পার্থক্য করা যেতে পারে। এখানে রং সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটু জ্ঞান রাখতে হবে, কেন না, রংই বিশেষ ভাবে পোষাকের রূপ দেয়। কতকগুলি রং আছে যাহা খুব শান্ত, শীতল ও প্রীতিজনক; যেমন—নীল, সবুজে, ফিকে হলুদ ও কমলা, লাল, বেগুনে ও গাঢ় হলুদ খুব আনন্দের ও জাঁকজমকের পরিচয় দেয়; শাদা রংয়ের ভিতর দিয়ে পবিত্রতা ও সরলতার ভাব প্রকাশ পায়। লাল, বেগুনে, গাঢ় গোলাপী, গাঢ় কমলা ও গাঢ় নীল রং সাধারণতঃ গরম হয়, ফিকে নীল, শাদা, সবজে, ফিকে হলুদ রং ঠাণ্ডা হয়।

এই সব কারণে সাধারণতঃ শীতকালে শরীরকে গরম রাখবার জন্য আমাদের বেশীর ভাগ গাঢ় রংয়ের পোষাক ও গ্রীষ্মকালে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্ম ফিকে রংয়ের পোষাক পরা বিধেয়।

ভোরের দিকে এবং দিনের প্রথম ভাগে ফিকে হলুদ, ফিকে সবুজ রংএর শাড়ী ফরসা মেয়েদের খুব ভালই মানায়। অপেক্ষাকৃত কালো মেয়েরা সকাল বেলা একটু গাঢ় কমলা রং, গাঢ় নীল রং শাড়ী পরতে পারেন। বেশী কালো মেয়েদের শুধু সাদা কিংবা খুব ফিকে কোন রং কালো এবং লাল রং ছাড়া শাড়ী পরলে ভাল দেখাবে। দুপুরে সকলকেই সাদা শাড়ীতে ভাল মানায়। ফরসা মেয়েরা বিকেলের দিকে বিশেষতঃ রাত্রে গাঢ় রংএর শাড়ী পরবেন—সে যে কোন রংই হউক। কালো মেয়েরা কিন্তু অতিরিক্ত গাঢ় কোন রংই পরবেন না—লাল এবং কালো রং ত নয়ই।

সব স্থানে সব রংএর পোষাক পরলে শোভা পায় না, ইহাও আমাদের শিখে রাখা উচিত। শিক্ষার স্থানে যেমন স্কুল, কলেজে সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের সাদা পোষাকই পরা বিধেয়, কিংবা রঙীন পরলেও খুব ফিকে রং পরা উচিত। প্রার্থনা বা পূজা-গৃহে, যেমন গির্জ্জা বা মন্দিরে পারতপক্ষে সাদা পোষাক পরলেই খুব ভাল হয়। যদি কোন বিবাহে, রাত্রি-ভোজনে বা রাত্রির কোন উৎসবে নিমন্ত্রণ থাকে তা'হলে সেই সব স্থানে একটু জাঁকজমক, দামী ও গাঢ় রংয়ের সাড়ী পরলেই ভাল দেখায়। রাত্রিকালীন কোন উৎসবে ফিকে রং পরা উচিত নয়, কেন না, উজ্জ্বল বাতির আলোতে পোষাকের ফিকে রং বিবর্ণ হয়ে সাদা দেখায়। মনে করুন, বৈকালে কোন টি-পার্টিতে (চায়ের নিমন্ত্রণ) নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এখানে কি প্রকার পোষাক পরা উচিত? খুব দামী রং-চংয়ের ভারী জরীর খুব চওড়া পাড়যুক্ত বেনারসী শাড়ী পরলে নিশ্চয়ই অমানান হবে। সুতরাং সেখানে মানানসই শাড়ী বেছে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন ধরুন, একটু ফিকে রংএর জরজেটের শাড়ী বা ফিকে রংএর মুর্শিদাবাদের বা অন্ত কোন সিল্ক শাড়ী। অবস্থাপন্ন না হলে কোন ভাল রঙীন ছাপা শাড়ীও চলতে পারে, কিন্তু সাদা না পরলেই ভাল হয়। আজকাল অনেকে জরজেটে বা ভয়েল কাপড়ে আলাদা ভাবে পাড় বসিয়ে ব্যবহার করেন—রুচি মত পাড় বসাতে পারলে উহা বেশ সুন্দর মানানসই হয়।

যাঁহাদের অনেক কাপড়-জামা আছে শুধু তাদের নয়। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও অল্প ও অতি সাধারণ কাপড়-জামা পরেও কি ভাবে সুরুচির পরিচয় দিতে পারেন, যথাশক্তি সহজ ও সহানুভূতির সহিত তাই বলা হল।

"সাজ ও সজ্জা" আলোচনা আজকের মত এখানেই শেষ হল। একটা কথা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুধু বাইরে যেতে হলেই যে সুরুচিসম্পন্ন পোষাক পরিধান করা উচিত এবং বাড়ীতে এসে যে কোন ভাবে থাকলেই হল, ইহা যেন আমার বোনেরা মনে না করেন। বাড়ীতেও যতটা সম্ভব সংযত এবং সুরুচিপূর্ণ পরিধেয় পরে থাকা উচিত। "বাড়ীটির" শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করতে পারলে বাইরের প্রশংসার কোন মানেই হয় না, ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি। শুধু ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি নয়, সমাজের এবং জাতির সুখ-শান্তিও বহুলাংশে ইহার উপরই নির্ভর করে।

নারী

মল্লিকা মৈত্র

অন্তহীন অন্ধকারে যুগান্তের মহাকাল গুহা,
অন্ধকার মসীলিপ্ত কুহেলিকা স্বপন-মাখান
তুমি নারী। শৌর্য্যহীন তুমি কাপুরুষ।
তোমার অজস্র রূপে নূতনের সৃষ্টি করা ভাষা
চক্ষের জলের মাঝে মেশা তব অমরার জ্যোতি
তবুও নিশ্বাসে তব শুষ্ক হোল পুরুষের প্রাণ
বিষাক্ত জিহ্বায় তবু ক্ষুধিত তিয়াষা।
মাতঙ্গিনী তবু অনিন্দিতা,
শ্যামাঙ্গিনী তবুও ক্ষুধিতা।
অপরূপ রূপ-প্রস্রবণে
টেনে নিয়ে চলে যাও ধ্বংসের সৃষ্টিকে
যেখানে রুদ্রের রথে মুক্ত হোল তোমার গুণ্ঠন।
অনন্ত আঁধারে ঢাকা তোমার অন্তর,
বিষাক্ত জ্বলন্ত শ্বাসে পূর্ণ সদা শুষ্ক বিম্বাধর।
তোমার গুণ্ঠনতলে চটুল নয়নে
মেশা ধ্বংস-বীজমন্ত্র, সঘনে লেখা।
উচ্চকিত অট্টহাস্য চাপা আছে গমকে গমকে
বক্ষের নিচোল তলে।
লজহীন হিংস্র ভাষা কুটিল নিশ্বাসে
ধ্বংস হোল রূপহীন সৌন্দর্য্যের দ্যুতি।
অন্ধকার রূপহীন শুধু অন্ধকার
স্তব্ধ অমানিশা-ঘেরা পঙ্গু অন্ধকার
তোমার বক্ষের তলে।
যুগান্তের সূচীপত্র লেখা তব কালো অন্ধকারে
তবুও মানসী তুমি, তুমি শ্যামা শিখরি-দশনা
অজ্ঞান আঁধারে মৌন তন্বী বিজয়িনী।

সংস্কার

শ্রীমতী বিজলী রায়

কিছু দিন আগে একটি সুহৃৎ-সভায় দেওঘরের পূজনীয় হংস মহারাজ তাঁর উপদেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন,—"যে পাত্রে রসুন দিয়ে রান্না করা হয়, সে পাত্র যতই ধোয়া-মাজা হোক, তাতে কিন্তু কোথায় যেন একটু রসুনের গন্ধ লেগেই থাকে, তেমনি এখানে লোকের সমাজ-জীবনে যতই পরিবর্ত্তন আসুক না কেন, সংস্কারটাকে লোকে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।"

এক সময় মনে হয় যে, সংস্কার আমাদের ছাড়ছে না, না আমরা সংস্কার ছাড়তে পারছি না।

যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক, অতীতের যা কিছু শুভ তাই বর্ত্তমানের সঙ্গে প্রতিফলিত ক'রে বাকী অন্ধ নির্ব্বোধ সংস্কারগুলো জোর ক'রে বন্ধ ক'রা দরকার। শুভ জিনিষের অনুশীলন করা দরকার, কিন্তু কতকগুলি অন্ধ সংস্কার আমাদের জীবনে এমন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে রয়েছে যে, জোর করেও আমরা তা ছাড়াতে পারছি না।

তাই এখনও লোকে বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা ঘরে রেখে নিজে যেন চোর-দায়ে ধরা পড়েছেন। সেই মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে না দিয়ে ঘরে এনে আটকে রাখেন। প্রতিভার অপমৃত্যু এখানেই ঘটল। অসুখ করলে আজও পাঁচ দেবতার দুয়ারে পিতা-মাতা ধর্ণা দেন, কিন্তু প্রাণের ভিতর সত্য-শিব-সুন্দর ঠাকুরের সন্ধান করতে বড় একটা কেউ চান না। খ্যাত-অখ্যাত সব দেবতাকে ঘুষ দিয়ে রোগ ভাল করবার চেষ্টা করেন।

সন্তান না হলে হাতের জলশুদ্ধি হয় না, তাই তুকতাকযুক্ত মাদুলী সংস্কারবশে অনেক আধুনিকাদের হাতেও বাঁধা দেখেছি। কিন্তু সহজ পন্থা ডাক্তার দেখান, তা সেদিকে খুব কম লোকেই যায়।

বিদ্যাসাগর কত দিন আগে বিধবা-বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু তা অনুমোদিত হলেও কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে? খুব কম বয়সে বিধবা—কিংবা কুলশয্যার রাত্রে বৈধব্য-প্রাপ্ত মেয়েরা জ্ঞান হওয়ার পর আজও সমাজকে ভয় ক'রে মনের কামনা-বাসনা রুদ্ধ ক'রে নীরবে এই অদৃষ্টের কশাঘাত মেনে নিচ্ছেন। সাহস সঞ্চয় করে যে বাবা-মা বিধবা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, তার প্রতি সংস্কার-বশবর্ত্তী হয়ে সমাজের প্রতিটি উদার অনুদার দৃষ্টি অবজ্ঞা কৌতুক-মিশ্রিত হাসির সঙ্গে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। মানুষেরই সৃষ্ট তথাকথিত নীচ জাতি যদি শুদ্ধ চিত্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে আহার্য্য তুলে দেয়, তা'হলে সে আহার্য্য গ্রহণ করতে তাঁর মনের কোণে সংস্কারে কুণ্ঠা জেগে ওঠেই ওঠে।

সেই জন্য মন্ত্রি ব্রাহ্মণ অতিথিকে, শূদ্র গৃহস্বামী সভয়ে নিজেকে দূরে রেখে অপরিচ্ছন্ন ভাড়াটে পৈতাধারীকে এনে তাঁর সেবা করান।

আমাদের কিন্তু এই রকম বহু অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ অনুকরণ, অন্ধ সংস্কার জোর করে ছাড়তেই হবে। দু' চোখ রগড়ে ভাল করে বাইরের জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। আমরা কোথায়, কত দূরে পড়ে আছি,—অন্য জাতি আজ সগর্ব্বে তাদের জাতীয়তা ঘোষণা করে কত দূর এগিয়ে চলেছে। আজ অন্য জাতির কাছে আমরা উপহাসাস্পদ কৃপার পাত্র।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি সত্ত্বেও যে দুর্য্যোগের ঘনঘটা মাথার উপর নেমে এসেছে, তা পরাধীনতার চাইতেও ভয়াবহ। কূট রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ না ক'রে আমাদের এখন বড় কর্ত্তব্য সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা কারণ, ব্যষ্টি হতেই সমষ্টির কল্যাণ-সাধন সম্ভব হয়।

মনে পড়ে!

সবিতাবালা দেবী

আষাঢ়ের অপরাহ্ণ। কিছুক্ষণ আগে সূর্য্যাস্ত হয়ে গেলেও এখনও বেশ আলো আছে। দক্ষিণের চওড়া বারান্দায় একটি বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ছড়ানো, কিছু আগে চা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে। কয়েকটি বেতের চেয়ারও বিশৃঙ্খল ভাবে পড়ে আছে। একখানি ছাড়া সবগুলিই শূন্য। ঐ চেয়ারটিতে এক জন মধ্যবয়স্কা মহিলা বসে আছে, চোখ দু'টি তার আকাশের উপর নিবদ্ধ। কি দেখ্‌ছে ও? আকাশে মেঘের সমারোহ কি? তবে একটুও চঞ্চলতা নাই কেন?

এইবার বৃষ্টি খুব জোরে আরম্ভ হল। একটু একটু ছাঁটও ওর গায়ে লাগছে, তবুও ও স্থির হয়ে বসে আছে। থেকে থেকে ডান হাত দিয়ে ওর কপালের কুচো চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টি তার আকাশের দিকে থাকলেও মন তার চলে গেছে শৈশবের অতীত দিনগুলির মধ্যে……ঐ তো চণ্ডী-মণ্ডপের সামনে চওড়া চাতালটার উপর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মিলে খেলা করছে! এ কি! ছেলে-মেয়েদের দলের মধ্যে নিজেকে সে যে মোটেই চিনতে পারছে না। ঐ রোগা-রোগা ফরসা মত মেয়েটি, কোমরে কাপড় জড়িয়ে একটা জানলার উপর ওঠবার চেষ্টা করছে। পরিশ্রমে মুখ তার ঘেমে উঠেছে। বেড়া বিনুনিটা প্রায় খুলে গেল। মেয়ের কিন্তু গ্রাহ্য নেই কিছু। ঐ কি এ? তার এখনকার দেহখানি দেখলে তো মোটেই তা বিশ্বাস হয় না।…

বৃষ্টিটা আরো জোরে এলো, তার সঙ্গে ঝড়ও। চাকরয়া এবার জানলা-দরজা সব বন্ধ করছে। দুম-দাম আওয়াজ হচ্ছে। গা'টা ভাল করে ঢেকে চেয়ারের উপর ও নড়ে-চড়ে বসলো, কিন্তু আর বাইরে বসা যাচ্ছে না, এইবার ও উঠল। চোখের সামনে থেকে চণ্ডী-মণ্ডপের ছবিটা যেন কে গুটিয়ে ফেললে। সিঁড়ির ঘরে একটা বড় আলো জ্বলছিল। আলোর টুকরোগুলো পাশের ঘরে পর্দার ফাঁক দিয়ে গিয়ে অন্ধকারের উপর ছিটিয়ে পড়েছে যেন। ও বারান্দা থেকে পাশের ঘর দিয়ে আলো-ছায়ার গালচেখানা মাড়িয়ে সিঁড়ির ঘরে এলো। উপর থেকেই চাকরদের ডেকে স্বামি-পুত্রের খোঁজ নিলে। তাঁরা তখনও বেড়িয়ে ফেরেননি। অন্য দিন হলে সে বই নিয়ে বসে, কিন্তু আজ আর বই পড়তে ভাল লাগছে না। ঘরের ভিতর এসে আলো না জ্বালিয়ে বারান্দার দিকে মুখ করে একটা সোফার উপর বসে পড়লো। বাইরে তখনও ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতি চলছে। এইবার যেন ঝড়ই জয়ী হবে বোধ হচ্ছে। ক্রমশঃ বৃষ্টি কমে এল, মাঝে মাঝে ব্যাংগুলোও বৃষ্টির সুরের সঙ্গে গলা মেলাবার অপচেষ্টা করছে। ঐ আওয়াজে মন তার আরো উদাস হয়ে যাচ্ছে।

"এরা এখনও বাড়ী ফিরছে না কেন? খোকার একটু গান শুনতুম।" একবার উঠে আলো জ্বেলে ঘড়ীটা দেখে নিলে। "বেশী রাত হয়নি তো! সাড়ে আটটা।" আলো নিবিয়ে সোফার উপর হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। বৃষ্টি অনেকটা কমেছে, কিন্তু বিদ্যুতের তলোয়ার-খেলা এখনও চলছে। "এটা আষাঢ় মাস, এই মাসেই আমি এদের বাড়ী এসেছি। ওঃ, কত দিন হয়ে গেল।" তার চোখের উপর একটি উজ্জ্বল ছবি ভেসে উঠল।…

মস্ত বাগান-বাড়ী। ফটকের পাশে নহবতে সাহানার আলাপ চলছে। নানা রঙের ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাল্‌বে সারা বাড়ী ও বাগান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রিতেরা সাদরে অভ্যর্থিত হচ্ছেন। হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠলো। 'বর এসেছে' ছোট ছেলে-মেয়েরা কনেকে খবর দিতে ছুটলো। যেন সে-খবর কনের জানতে বাকি আছে! ঐ যে পিঁড়ির উপর কিশোরী মেয়েটি চুপ করে বসে আছে। ঐ চঞ্চল মেয়ের পক্ষে চুপ করে বসে থাকাটাই মহা শাস্তি। যাই হোক, ছেলে-মেয়েরা ওর কাছে আসাতে ও যেন বাঁচলো। ছেলে-মেয়েরা সব বরের বর্ণনা দিতে লাগল। যদিও ও আগে বরকে দেখেছে তবুও এক-এক বার ইচ্ছা করতে লাগল—যাই, ছুটে একবার দেখে আসি, বরকে কেমন দেখাচ্ছে। আবার ভাবলো—না, দরকার নেই, যাব না, একেই আমার নাম—'বেহায়া মেয়ে'।

খানিক পরেই কয়েক জন মিলে পিঁড়িশুদ্ধ তাকে উঠিয়ে নিয়ে বরের সামনে দাঁড়ালো। পাশ থেকে কে এক জন বললে, "চোখ তুলে দেখে হাসো।" শুনেই হাসিতে ওর পেট ফুল-ফুল করে এসেছে। "এ কি রে বাবা, হাসি না পেলেও হাসবো?" যাই হোক, কার্য্যতঃ হাসিটা ঠিকই হয়ে গেল।

বাসর-ঘরে এয়োরা বর-কনেকে শুইয়ে দিয়ে বার হয়ে গেল। বর কনের মাথায়, গালে হাত বুলিয়ে আদর করছে, কনে চুপ করে ঘুমের ভাণ করে পড়ে আছে। এক বার হাত বুলানো বন্ধ হতে কনে ভাবলো, বর বুঝি ঘুমিয়েছে। আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চোখ খুলেই দেখে—বর ড্যাব ড্যাব করে তার দিকে চেয়ে আছে! মহা মুস্কিল! একবারে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেছে! কিছুক্ষণের মধ্যে বরের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিলো। ভোর বেলায় দরজায় জোরে জোরে কে ধাক্কা দিল।

ঘুম ভেঙ্গে দেখে বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। তার স্বামী সোফার কাছে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। "ওমা, কখন তুমি বাড়ি ফিরলে?" ধড়-মড় করে সে উঠে বস্‌লো। আবার জোরে জোরে মেঘ ডেকে উঠলো। দরজায় ধাক্কারই মত মনে হচ্ছে বটে!

গান

শ্রীমতী তপতী বসু

সে আসি বাজায় বাঁশী মোর বাতায়ন-তলে কত রজনীর শেষে,
কভু যেন তারে দেখেছিনু হায় কোনখানে মোর বন্ধুর বেশে।
চেয়ে মোর মুখপানে সে থমকি দাঁড়ায়
মরমে বাঁধিতে মোরে দু'বাহু বাড়ায়
কভু বাঁধিতে চাহিলে তারে বারে বারে
চকিতে মিলায় হেসে।
ক্ষীণ-ধারা যেই নদী মরুর বুকে গোপনে মরিতে চায়
জল-ভরা মেঘ তারে মরম-দুখে সলিল বরষি যায়।
মরু চায় তাঁরে বাঁধিবারে ব্যথিত উষর বুকে
মেঘ হেলা-ভরে চলি যায় আপন চলার সুখে।
নিজে যে দেয় না ধরা কেমনে বাঁধিব তারে
আপন বাহুর পাশে।

শরৎ-সাহিত্যে বিন্দুর ছেলে

অনুরূপা মুখোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্য নিয়ে বাংলার অনেক লেখক এবং সাহিত্যিক অনেক লিখেছেন এবং অনেক বাগ্মী অনেক বলেছেন। অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অতুল সম্পদ স্থান করে গেছেন, তা কোন দিনই ক্ষয় হবে না—শেষ হবে না। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের বহুবিধ রূপে আমরা মুগ্ধ ও বিভোর হয়ে উঠি, তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই নারীকে প্রিয়ারূপে, সখীরূপে, দাসীরূপে, কিন্তু তার মধ্যে মাতৃ-রূপিণী যে নারীকে দেখি, তাঁর মহান্ মাতৃত্বের অনাবিল স্নেহ-ধারায় আমাদের হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়, মন বিগলিত হয়। বর্ত্তমান নারী-চরিত্রের বিন্দু আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই ধনি-কন্যা আদরিণী রূপসী বধূর যে ত্যাগ, উদারতা, স্নেহ, মায়া, মমতা, বাৎসল্য দেখতে পাই, তাতে মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। সামান্য বীজের পরিণতি বৃহৎ বৃক্ষে—তাই অন্নপূর্ণার মুখের এক দিনের সামান্য একটি কথায় বিন্দুর মধ্যে জেগে উঠলো স্নেহময়ী নারী। বিন্দুর প্রকৃতি বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মেশানো—বিন্দু জল দান করে, ফল দান করে, বিন্দু আপনাকে দেয় বিগলিত করে, স্নেহপাত্র প্রিয়জনের কাছে আপনাকে দেয় উজাড় করে। বিন্দুর কোথাও ছলনা নাই, কপটতা নাই, মিথ্যা নাই। অমূল্যকে ঘিরে যে স্বপ্নজাল বিন্দু বুনে চলেছে, তার কোথাও একটু ত্রুটি—একটু ছিদ্র থাকলে বিন্দুর চলবে না। বিন্দুর প্রকৃতিতে বর্ষার আর্দ্রতার সঙ্গে মিশে আছে গ্রীষ্মের রুক্ষতা; তার বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিন্দু ফুলের মত কোমল, আবার বজ্রের মত কঠোর। বিন্দুর প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের খর রৌদ্রদাহ আবার জ্যোৎস্নার মুক্তা-শুভ্র সৌন্দর্য্য বিরাজমান। বিন্দু আগুনের মত জ্বলে ওঠে, আবার বসন্তের মলয় বাতাসের মত স্নিগ্ধতায় সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। কোমলে, কঠোরতায়, স্নেহে, মায়ায়, বাৎসল্যে, ভক্তিতে, ভালবাসায় বিজড়িত এই নারী-চরিত্র এক অপূর্ব্ব বস্তু। যাদবের মুখে আমরা শুনতে পাই, "মা আমার জগদ্ধাত্রী, বরও দেন আবার খাঁড়াও ধরেন আবশ্যক হলে।" সত্যি, আমরা বিন্দুর মধ্যে দুই রূপ দেখতে পাই। অমূল্যকে "তার চোখের আড়ালে পাঠশালার ছেলেরা মার-ধোর করবে, হয়তো চোখে কলমের খোঁচা ফুটিয়ে দেবে" আশঙ্কায় যে বিন্দু যাদবের কাছে অনুমতি ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, সেই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার বিন্দুই অমূল্যর সামান্য অবাধ্যতায় পাখার বাঁটের বাড়ি মেরে ঘরে শেকল দিয়ে পূরে রেখে বেলা পর্য্যন্ত খেতে না দিয়ে উপোষ পাড়িয়ে রাখতে কুণ্ঠা বা দ্বিধা করেনি। বাঘিনী যেমন তার শিশু-শাবককে অপহরণের আশঙ্কায় অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে সর্ব্বস্নেহ ও একাগ্রতা দিয়ে ঘিরে লুকিয়ে রাখে, বিন্দু তেমনি বিশ্ব-সংসারের সকল সংস্পর্শ হতে অমূল্যকে সরিয়ে রাখতে চায়। অমূল্যর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি বিন্দুকে তন্ময় করে রেখেছিল; পাছে অমূল্য অসৎ সঙ্গে মিশে বিগড়ে যায়, এই আশঙ্কায় বিন্দু সমগ্র জগৎ-সংসার এক দিকে রেখে অমূল্যকে নিরাপদ বর্মে ঘিরে রাখতে চায়। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত সর্ব্বগুণযুক্ত কৃতবিদ্য অমূল্যর পরিচয়ে লোকে বলবে, "ঐ অমূল্যর মা" এই আশায়, এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় বিন্দু বর্ত্তমানে লোক, লৌকিকতা, সমাজ, সংসার সব কর্ত্তব্য ত্যাগ করে কেবল মাত্র অমূল্যকে নিয়ে তার সাধনার স্বর্গ গড়ে তুলতে চায়। যেদিন অমূল্যর পকেটে সিগারেটের টুকরো বেরুলো, সেদিন বিন্দুর মুখে যে সর্ব্বহারা বিক্ষত ব্যথিতের ছবি ফুটে উঠেছে, তা আমরা মানস-নেত্রে দেখতে পাই। রাজা ভরত বানপ্রস্থে গিয়ে যেমন হরিণ-শিশুর মায়ায় জপ-তপ-মন্ত্র-আরাধনা সব ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি আদর্শ সন্তান গড়ে তুলবার কামনায় এই মহীয়সী ধন-সম্পদশালিনী নারী সকল বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করেছে। এলোকেশীর কথায় চুল বাঁধবার কথায় বিন্দু বলেছে, "ছেলে বড় হয়েছে, দেখতে পাবে—আমার মাথায় খোঁপা দেখলে হাঁ করে চেয়ে থাকবে, সে বড় লজ্জার কথা!" নিজেকে এই যে সর্ব্ব রকম বিলাস-ভোগ সুখ হতে বঞ্চিত করা, তার মূলে আছে ছেলেকে অবিলাসী আসল মানুষ গড়বার প্রেরণা। বিন্দুর ছেলের প্রতি ছত্রে ছত্রে আমরা যে মাতৃ-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাই তার মাধুর্য্য অনুভব করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। বন্ধ্যা নারীর অপরের গর্ভজাত সন্তানকে ভালবাসা আশ্চর্য্য বা নতুন ব্যাপার নয়—কিন্তু বিন্দুর মাতৃ-হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে যে ভাবে বাৎসল্যে ভরে উঠেছে, বিন্দু যে ভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে তার এই সদ্গুণই আমাদের মুগ্ধ করেছে। মায়ের বুকের গোপন আশার কথা প্রত্যেক মায়েই জানেন, সে ছবি সব মা চেনেন; তাই বিন্দুর অতল অপার স্নেহ-সমুদ্রের গভীরতা দেখে, অপূর্ব্ব সুকোমল স্নেহ-মণ্ডিত মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয়ে মন বিস্মিত শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়ে।

সন্তান-স্নেহের গভীরতা ছাড়া বিন্দুর হৃদয়ের অপর সকল সুকোমল বৃত্তিগুলিও উপভোগে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার যে কথান্তর, রাগারাগি হোত তার মূলে ছিল—অমূল্যর প্রতি অপরিমিত স্নেহ-বাৎসল্য,। যখনই বিন্দুর সদা-সতর্কতার সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা কিছু বলেছেন, বিন্দু তখন এই মাতৃস্থানীয়া বড় জাকে ব্যঙ্গ করে কটু কথা বলতে ছাড়েনি, কিন্তু অন্নপূর্ণার প্রতি বিন্দুর যে অগাধ ভক্তি-ভালবাসা ছিল, যে নির্ভরতা ছিল, বাস্তব সংসারে তা বিরল। যখন অন্নপূর্ণা সামান্য কথায় রাগে দিশেহারা হয়ে ছেলের নামে শপথ করে বিন্দুর লঘু পাপে গুরুতর শাস্তি দিয়ে স্বামি-পুত্র নিয়ে পৃথক্ হয়ে আছেন—সে সময়েও মা বিন্দুকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চাওয়ায় বিন্দু বলেছে, "সেই শত্রুর অনুমতি না পেলে আমার যাবার উপায় নেই।" গভীর অভিমানের রুদ্ধ আবেগে এ যে কত-বড় ভালবাসার ভক্তির নীরব অভিব্যক্তি, তা হৃদয়বৃত্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝবেন। এ ভালবাসার রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমাদের মর্ম্ম-মঞ্জুষায় অনন্ত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে থাকে। যাদবের প্রতি যে দেবভক্তি বিন্দুর ছিল, সে জিনিষ খুবই দুর্লভ। বিন্দুর মুখে আমরা শুনতে পাই, "কপাল নিয়ে যে জন্মেছিলুম দিদি, সে কথা মানি; ধন, দৌলত, আদর, আহ্লাদ, অনেকেই পায়, সেটা বেশী কথা নয়; কিন্তু এমন দেবতার মত ভাসুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই; আমার অদৃষ্ট দিদি, তুমি হিংসে করে করবে কি?" এই বিপুল স্নেহশালিনী নারীর অন্তরের ব্যাকুলতা না বুঝে সংসারে সকলেই যখন তাকে শাস্তি দিয়েছে, তখনও আত্মাভিমানিনী বিন্দু অভিমানে স্তব্ধ হয়ে থেকেছে। শেষে নিরুপায়ে যাদবের পায়ে ধরেছে—অন্তরের একাগ্রতা নিয়ে প্রার্থনা করেছে, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও, আমার...

মানুষ অমন করে দু'টো দিনও বাঁচবেন না।" কি অশান্তি, কি মর্ম্মদাহ, কি শোচনীয় উৎকণ্ঠা যাদবের একান্ত স্নেহের আদরের পাত্রী কন্যাতুল্যা বিন্দুকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে, তা ভাবতে গিয়ে হৃদয় চঞ্চল ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যেদিন নরেনের মুখে শুনতে পেল, "পকেটে করে দু'টি ছোলা-ভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিক্‌কার গাছতলায় বসে খায়," সে দিন হতে সমস্ত সংসার বিন্দুর কাছে বিড়ম্বনার বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। নিরন্তর বুকের ভেতর যে অব্যক্ত যাতনা হচ্ছে, তাকে প্রকাশ না করতে পেয়েই সে ব্যথা দুষ্ট কীটের মত নিয়ত বিন্দুর বুকের ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে। বিন্দুর স্নেহের একমাত্র দুলাল, তার অগাধ অসীম স্নেহের ধন অমূল্য দুঃখ-দারিদ্র্যতায় কষ্ট পাচ্ছে ; যে অমূল্য চিরকাল ভোগসুখে লালিত পালিত, তার আজ মুখে সুখাদ্য ওঠে না—দীন দুঃখীর খাদ্য দু'টি ছোলা-ভাজা লোকচক্ষুর আড়ালে অমূল্য গোপনে খায় ;—পিতৃতুল্য ভাসুর শেষ বয়সে ১২ টাকা মাইনেতে সমস্ত দিন অনাহারে থেকে কাজ করেন—বিন্দুর পক্ষে এর চেয়ে গভীরতম শাস্তি আর কি আছে ? কোন সুখাদ্যের দিকে বিন্দু চোখ মেলে তাকাতে পারে না, তার মনের গায়ে জেগে ওঠে যাদবের বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত অনাহার-ক্লিষ্ট মূর্ত্তি ! বিন্দুর সমস্ত জগতে একটি মাত্র ছবি ভেসে বেড়ায়, সে তার প্রিয় প্রার্থিত প্রাণাধিক অমূল্যধনের দরিদ্র বেশ-ভূষায় ম্লান মুখচ্ছবি—যে অমূল্য তার হৃৎপিণ্ডের গোড়ায় দড়ি বেঁধে প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে টানছে, অথচ বাইরের রুদ্ধ অভিমানে ছুটে যেতে পারছে না ; অন্নপূর্ণার পবিত্র মধুর স্নেহচ্ছায়াই এ কি বিন্দুর কম শাস্তি ? যখন বিন্দুর স্বামী তার এই চরম দুঃখের কোন প্রতিকার করলেন না, স্নেহের মূর্ত্ত বিকাশ বড় ঠাকুর বিন্দুকেই অপরাধিনী ভেবে সব ত্যাগ করে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাধাপুরের কাছারীতে চাকরী নিলেন, যখন চিলের ছাদের আড়ালে সমস্ত দিন পথের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও সেই লাল রংয়ের ছাতিটি চোখে পড়লো না, যখন অন্নপূর্ণার দিক্ থেকে ক্ষমার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না—তখন বিন্দুর আর আশা করবার কিছু রইল না। বিন্দু নিঃসংশয়ে বুঝছে, সকলে তাকে ত্যাগ করেছে, এই বোঝাতেই এই দুঃখময় অনুভূতিতে সে তার লক্ষ্য পথ ঠিক করে নিলে। অনাহারে তিল তিল করে জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করে দিয়ে মৃত্যুর শীতল কোলে বিন্দু বিশ্রাম চায়। তাই যাত্রাকালে পাচিকা বামুনের মেয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বিন্দু বলছে, "তুমি বামুনের মেয়ে, বয়সে বড়—আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর ফিরতে না হয়, এই যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয় !" দুঃখের আঘাতের কষ্টি পাথরে আজ বিন্দুর প্রকৃত মনের রূপ ফুটে উঠেছে। পূর্ব্বের সেই দর্পিতা একগুঁয়ে জেদি জমিদারের আদরিণী দুহিতা আজ নম্র, আনত, শীর্ণক্লিষ্ট—আজ সকলেরই অনুকম্পার ভিখারিণী। দুঃখে, আত্মগ্লানিতে বিন্দু আজ মৃত্যুপণ করেছে—তার প্রিয়জনরা, তার আপন-জনরা ভুল বুঝে তাকে যে শাস্তি দিয়েছে, তারই শোধ নিতে তার এই অনাহারে মৃত্যুবরণ। মাধবের কাছে শেষ অনুরোধ, "সমস্ত আমার অমূল্যর ; শুধু দু' হাজার টাকা নরেনকে দিও আর তাকে পড়িও, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে।" কি অসীম অনন্ত অতুলনীয় ভালবাসা—অথচ এই নরেনের ওপর তার আগে বিতৃষ্ণা আর [illegible] দিলে পাছে, নরেনের [illegible] অমূল্য বিগড়ে যায়। এই নরেনের সংস্পর্শ এড়াবার জন্ত বিন্দু অন্নপূর্ণার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, অমূল্যকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা করে ছেলে পড়াতে চেয়েছে—কিন্তু যেদিন জেনেছে বিন্দু—নরেন আমার অমূল্যকে ভালবাসে, সেই দিন হতে বিন্দুর কাছে নরেনের দাম বেড়ে গেছে। ভালবাসার সোণার কাঠির স্পর্শে মানুষ কি না করতে পারে !

অভিমানিনী বিন্দু—স্নেহময়ী বিন্দু শেষ সময়ে চুপি-চুপি মধাবের কাছে অনুরোধ করেছে, "সে ছাড়া আর যেন কেউ আমাকে আগুন না দেয়।" এই দুর্ল্লভ বাৎসল্য আমাদের চোখের পাতাকে জলভারাক্রান্ত করে তোলে। মাধব এসে যখন খবর দিলেন, "দাদা পাগলের মত কান্নাকাটি করছেন," ভক্তিমতী নম্রহৃদয়া বিন্দু তখন প্রসন্ন মনে জিজ্ঞাসা করছে, "তাঁর পায়ের একটু ধূলো এনেছ ?" বিন্দুর মাথার শিয়রে বসে অন্নপূর্ণা যখন কাণের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বলেছেন, "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিস্ ?" প্রীতিময়ী বিন্দু তখন উত্তর দিয়েছে, "পাচ্ছি দিদি।" বিন্দু জানে, অন্নপূর্ণার সঙ্গে আছে তার অন্তর্জীবনের টান। সে স্নেহ ভালবাসা মেকি নয়—ভেজাল নয়, তা গঙ্গাজলের মতই পবিত্র, দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই শুচি ; কোন পঙ্কিলতা হিংসা দ্বেষ নাই। দোরের কাছে যাদব এসে যখন বলছেন, "বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেছি।" আর এক দিন যখন এতটুকুটি ছিলে তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার আসতে হবে তা ভাবিনি, তা মা, শোন, যখন এসেছি তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় ও-মুখো আর হব না। জান তো, মা, আমি মিথ্যা কথা বলি না।" তখন করুণাময়ী বিন্দুর এই অকপট স্নেহ-বাৎসল্যের মন্দাকিনী ধারায় অভিমানী ব্যথিত হৃদয় জুড়িয়ে গেল। যে বিন্দু মা-বাপের সহস্র অনুনয়ে আদরে ভর্ৎসনায় মিনতিতে এক কৌটা ঔষধ খায়নি—মাধবের শত চেষ্টা যাকে এক কৌটা দুধ খাওয়াতে সমর্থ হয়নি, সেই বিন্দু আজ চেয়ে খাচ্ছে অন্নপূর্ণার কাছে, "দাও দিদি, কি খেতে দেবে," তার অশেষ স্নেহের পাত্র তার বুকভরা ধন অমূল্যকে আজ কাছে পেয়েছে, বিন্দুর সকল চাওয়া আজ পূর্ণ হয়েছে। এই বিন্দু আমাদের হিন্দুর ঘরে সহস্র বৎসরের সাধনার ধন। বিন্দু স্নেহময়ী, বিন্দু প্রীতিময়ী, বিন্দু প্রেমময়ী, বিন্দু করুণাময়ী, বিন্দু তাপদগ্ধ সংসারে শান্তিজল, বিন্দু সংসার-আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা, বিন্দু আমাদের চিরনমস্যা। বিন্দু কোন দিন ম্লান হবে না, বিন্দুকে ভোলা যায় না। এই গরীয়সী মাতৃমূর্ত্তির স্মৃতির পাদপীঠে আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার অনির্ব্বাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবো।

আর তিনি আমাদের চিরপূজ্য চিরপ্রণম্য—যিনি এই মহীয়সী বিন্দু-চরিত্রের স্রষ্টা—সেই অপূর্ব্ব লীলা-কুশলী কথার যাদুকর শরৎচন্দ্রের মানস-কন্যা বিন্দু আমাদের অভিভূত করেছে, মুগ্ধ করেছে—শরৎচন্দ্রের দান ভাবীকালেও অমর হয়ে থাকবে। শরৎ-সাহিত্যে প্রত্যেক নারী-চরিত্র এত পবিত্র ও মধুর, যার তুলনা নাই। যেখানে তিনি পতিতা-চরিত্র এঁকেছেন, সেই অসতীর অবচেতন মনেও যে সতীত্বের জ্বালা লুকিয়ে আছে তাও উপলব্ধির জিনিষ।

মালয় দেশে সাড়ে তিন বৎসর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

ডাকাতের দল যখন ঠিক আমাদের বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল তখন সবারই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছে, তবু বড়বাবু এতগুলি লোকের মধ্যে সাহস পেলেন, কেন না তাঁরই পরিচিত দু'-একটিকে তিনি চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, আপনারা দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞাসা করি এরা কি জন্য এসেছে। এবং তিনি ডাকলেন এক জনকে…এই কিমতেক, কি জন্য এ ভাবে তোমরা এখানে এসেছ, কোন দরকার আছে কি?

কিমতেক বোধ হয় সর্দ্দার হবে ; সে এগিয়ে এল ও জবাব দিল, কেরাণী—আমরা আজ আমাদের নিজেদের কাজে বেরিয়েছি মার-পিট ও ডাকাতি করতে। তবে প্রথম তোমার সাথে যখন দেখা হল তখন বেশী কিছু বলতে চাই না, হাজার হলেও তুমি বড় কেরাণী আমি তোমার কাছে খেয়েই মানুষ। কিন্তু আমি জানতে চাই যে এখানে এত লোক কেন?

বড়বাবু বললেন একটু চড়া সুরেই, তোমার কি মাথার দোষ হয়েছে? তুমি ভুলে যাচ্ছ জগতে কি হচ্ছে এখন? যুদ্ধের জন্য মানুষ তার প্রাণ বাঁচাতে আমাদের ষ্টেটে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সহরের শত শত লোক আজ সহর ছেড়ে দূরে দূরে জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, তা কি তুমি নূতন জানছ না যাচাই করতে এসেছ? আর আমার এখানে যারা এসেছে তারা সবাই ভদ্র ও আমার বন্ধু, তোমার কোন উদ্দেশ্যই এখানে থাকতে পারে না। অতএব আমি বলছি, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমাদের দেখে ছেলেপুলে নিয়ে মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

কিমতেক ঠিক কাঠের মত দাঁড়িয়ে শুনল এবং মুখ না তুলে জবাব দিল, আচ্ছা আমরা কিছু বলতে চাই না, তবে আগে আগে যাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা ছিল তাদেরই মটে আমরা চাই, তাই জন্য কেরাণী, আমাদের বাধা দিও না—আমরা এই লোকগুলিকে একবার ভাল করে দেখতে চাই—এই বলে তারা সব হুড়-মুড় করে বারান্দায় উঠে এল এবং সবার মুখের দিকে কটাক্ষ হানতে লাগল যেন নির্দ্দোষীকেও দোষী করতে চায়।

আমাদের অবস্থা দেখে বড়বাবু বললেন, আপনারা অত ভয় খাবেন না, আমরা এতগুলি লোক আছি, যদি নিতান্তই বাড়াবাড়ি করে তবে মারপিট হয় হোক, বেটাদের দৌড়টা কত দূর আমরাও দেখতে চাই। ৪০০ কুলী আছে, ডাকলেই পাওয়া যাবে।

কিমতেক এবার সবাইকে এক এক করে ডাকল ও নাম জানতে চাইল, কেউ জবাব দিল না। উনি এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না, সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ সর্দ্দার, তুমি শত্রু খুঁজতে এখানে এসেছ, তাকে তুমি নিশ্চয়ই চিনবে, তবে আমাদের নাম চাও কেন? আমরা সব সহরের লোক, সরকারের চাকরে। অযথা বিবাদ ও লোকের ক্ষতি করা আমাদের অভ্যাস নাই, তাই মনে হয়, শত্রু তুমি এখানে পাবে না।

কিমতেক একটু নরম হল, বলল, তা নয়, আমাদের এই যে দল দেখছ এদের বাবা বাবা কষ্ট দিয়েছে তাদেরই আমরা খুঁজছি, তা তোমরা তাদের কেউ নও, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমরা চল্লাম। এই বলে সে আর দাঁড়াল না, সবশুদ্ধ হুড়-মুড় করে চলে গেল।

সন্দেহ অনেকের অনেক রকম হল। আমার ভয় তখনও যায়নি, কে জানে, যদি বদমাইসী করে যাকে হক এক জনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলত যে এই লোকটি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, আর ঐ লোকটি আমাকে মেরেছিল ইত্যাদি। কিন্তু ভদ্রতা মনে হওয়ায় যে ছেড়ে দিল, তাই তখন আমরা সত্যই ভাগ্য বলে মনে করলাম। সেদিনের মত রেডিও বন্ধ হল, সকলে নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন। দাদা এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বললেন, বলা শক্ত কত দূর এদের উদ্দেশ্য কি কোরবে বেটারা কে জানে,—যদি আলো জ্বলে, তবে হয়ত দেখতে পেলে আবার আসবে, তার চাইতে বাতি নিবিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার। কথা মত আমরা সে রাত্রি তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করলাম, কিন্তু ভয়ে চোখ বুজবার ক্ষমতা রইল না।

বাইরের মূর্ত্তি আজ ভয়ানক নিস্তব্ধ। কুলীরা তবু সকাল করে ওঠে ও স্ত্রী-কন্যাদের বকাবকি করে, তাতে অনেকটা সাহস থাকে, আজ তাও নেই সবাই চুপচাপ হয়ত অকাতরে ঘুমচ্ছে তারাও বোধ হয় সারারাত জেগেছিল।

অনন্ত বলল, বৌদি, আমাদের রোজ ত বেশ ঘুম হয় তবে কাল রাত্রে এক কোঁটাও ঘুম হল না কেন? আচ্ছা ডাকাত এসেছিল যা হোক। বললাম, এবার থেকে দিনে ঘুমিও রাতে জেগে থেকো। সে বলল, সেরেছে আর কি, পরীক্ষা এলেও আমি রাত জেগে পড়ি না। আর ডাকাতের পাল্লায় পড়ার ভয়ে রাত জাগতে হবে? আমি বললাম, এও ত একটা জীবনরক্ষার পরীক্ষা দিচ্ছ ভগবানের কাছে।

তার পর দাদা ও উনি বসলেন আলোচনায়। কোথা যাওয়া যায়—কি করা যায়? এখানে থাকলে ত আরো মুস্কিলে পড়তে হবে ইত্যাদি। এই সব ভাবতে ভাবতে আমাকে ডাক পড়ল। আমি এসে বসলাম ও বিচার করলাম, মরা আর না হয় বাঁচা এই ত এখন জীবনের মূল্য? তা দেখা যাক এখানেই বসে, যা কপালে লেখা আছে হোক, কোথাও আর যাচ্ছি না। ডাকাত সর্ব্বত্রই আছে, লুকান চলবে না, এখানের বড়বাবু তবু জানা-শুনা হয়ে গেছে, এত হাওয়ান কুলীরা আছে, এদের সাথেও আমাদের একটু একটু আলাপ হয়েছে, তাতে অনেকটা ভরসা আছে, এখন মনস্থির করে এখানেই থাকা হবে। এর পর আর কেউ অমত করলেন না।

সেদিনের ডাকাতের বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে প্লেন ও কামানের শব্দে মাঝে মাঝে চমকে ওঠা বাদে অন্য আর ভয়াবহ কিছু ঘটেনি। প্লেন এখনও নিয়মিত যাতায়াত করে এবং খেতে-শুতে আমাদের নিয়মিত ছুটতে হয় জঙ্গলের গভীরতার মধ্যে মাথাটাকে বাঁচাতে। ক্রমশঃ সেটা খুবই সহ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে রেডিওর যে আসরটুকু বসত, সেটাও ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল, কেন না, ব্যাটারী গেল খারাপ হয়ে। তাতেই যুদ্ধের ব্যাপার শুনা বন্ধ হয়ে সব ভরসা গেল। সেই সময় সিঙ্গাপুরে পুরো-পুরি লড়াই চলছে। মাঝে মাঝে দু'-একটি লোক সাইকেল করে এখান-সেখানে যাতায়াত করত, তাদের কাছে কিছু কিছু খবর পাওয়া যেত। এই ভাবে বনবাসে দুই মাস কাটল। সে যে কি একঘেয়ে ও বিশ্রী তা বলা যায় না। জাপানীরা না কি এ জায়গা সে জায়গা [illegible]

করছে ও অনেক কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে শুনা গেল। আমাদের এখানে তবে শীঘ্রই আবির্ভাব হবে, সেই এক দুর্ভাবনা তখন পেয়ে বসল। কেমন তাদের রূপ, কেমন ব্যবহার, এই তর্ক-বিতর্ক তখন সকল বাড়ীতে সুরু হল। সে গুজবে সব জিনিষ-পত্র শিকায় তোলা হল। যে যেখানে পারল সম্পত্তি লুকাল। খড়ের বাড়ীর থাপরের মধ্যে আমরাও আমাদের সঞ্চিত জিনিষ লুকিয়ে রাখলাম। জাপানীর ব্যবহার নিন্দনীয়, তাদের অত্যাচার প্রচণ্ড, খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ তারা আগেই কেড়ে নেয়। আমাদের মত লোকের এ দু'মাস টিনের খাবার খেয়ে ভয়ানক অসুবিধা মনে হতে লাগল। টাটকা তরকারীর লোভ পেয়ে বসল। উনি ও দাদা এক দিন ঠিক করলেন যে, কামপোং গ্রামে যাবেন, সেখানে মালয়দের কাছে শাকপাতা পাওয়া যেতে পারে—ডিম, চারা মাছও মিলতে পারে, কিন্তু সাহস থাকা চাই, কেন না এই দুর্দিনের সময়ে মালয়রা হয়ত ছুরী নিয়েই বসে আছে। এখন নিজেদের দেশে নিজেরাই রাজা, এ স্বাধীনতা হয়ত এখন তাদেরও এসেছে। চীনাদের মত অত ভয়ঙ্কর না হলেও মালয়রাও রুক্ষ স্বভাবের আছে, বিশেষ যারা ক্ষেতী লোক। এ সব ভেবেও তবু ওনারা বেরুলেন টাটকা ভেজিটেবিলের খোঁজে। ৩।৪ মাইল অন্ততঃ নদীর ধার ও পাহাড়ের পা দিয়ে হাঁটতে হবে, বুনো শুয়োর, ঘোষ ও বাঘের দেখা সব সময় পাওয়া যায়। সকাল ৭টায় এরা বেরিয়ে বেলা তিনটায় ফিরল—মোচা, লাল আলু কচু, চীনা বেগুন আর ভেণ্ডি নিয়ে। উনি বল্লেন, ক্ষেতে অনেক হয়ে আছে কিন্তু দিতে চায় না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তবে মালয়রা কিছু দিল। কিন্তু চীনারা মহা পাজী, যথেষ্ট তাদের তরকারী ফলে আছে, দিতে চায় না, ভদ্র-অভদ্র কেয়ার করে না, সোজা তাড়া করে, ভয়ে সবাই পালিয়ে এসেছে অন্ততঃ প্রাণটা এদের হাতে দেবার ইচ্ছা নাই—থাক খাওয়ার লোভ। শুনে আমি ভয় পেয়ে অস্থির। বল্লাম, আর তোমরা গ্রামে যাবার নামও ক'র না, টিনের মাছ, ডাল ও পাঁপর ভাজা এই খাও সেও ভাল, তবু কচু মোচা কিনতে চিনার কবলে যেতে হবে না। কিন্তু আমার কথা তখন কে শোনে? ওদের তখন গ্রামে ঘোরার নেশা পেয়ে বসেছে। এক দিন সমস্ত বাড়ীর লোকগুলি বড় দল বেঁধে বেরুলেন ঐ একই পথে গ্রাম দেখতে।

যখন গ্রাম বেড়িয়ে সব ফিরে এলেন তখন দেখতে খুবই চমৎকার—পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত লাল টুকটুকে কাদা—মুখে গায়েও। এক মস্ত বাঁশে দু'দিকে কলার কাঁদি ও তরকারীর বোঝা ঝুলিয়ে, দাদা ও উনি কাঁধে করে আসছেন। বাঁক কাঁধে দু'জনাকে ফিরতে দেখে হাসিও পেল দুঃখও হল। এত কষ্ট এরা কখনও পায়নি আরও কত কষ্ট হয়ত আছে। আমি চুপ-চাপ ছিলাম, এ সব দেখে কিছু বললাম না। উনি বল্লেন, আর যাওয়া হবে না, সেই যে কথায় বলে—"কাশী যেয়ে দেখব মাসী" আমাদেরও ঠিক তাই। সহরে যেয়ে তখন সুখ করে খাওয়া হবে, এখন ঐ দুধ-দই দিয়েই চলুক। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম, তবু যা হোক শিক্ষা হয়েছে। দাদা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, গরম জল ও আইডিন নিয়ে পায়ের সেবায় বসেছেন, অনন্ত তখন ঘাড়ে ম্যালিশ করছে। বল্লাম, সেদিন আমার কথা শুনলে না ত দাদা? আজ কেমন সুখ পেলে? তবু শুধু সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া আর কি? দাদা বল্লেন, এই ত চাই রে—এ সব মনে রাখবার জিনিষ, সুখ ত যথেষ্ট পাওয়া গেছে; এখন দুঃখ ও কষ্ট একটু পাওয়া যাক্। ক্রমে সেই একটু কষ্ট কি রূপ ধারণ করেছিল তা জানাবার ইচ্ছা আর হয় না।

একদিন সহরে শোনা গেল, দোকানদাররা না কি ঠিক করেছে যে, অত লুট পাট আর করতে দেওয়া হবে না, দোকানীরা নিজ নিজ চৌকিদার রাখবে দোকান রক্ষা করার জন্য। ৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে এক মিটিং হল। চীনা, মালয়, ইণ্ডিয়ান সবই জড়ো হল, সব জাতই না কি সাহায্য করবে, সবাই মিলে-মিশে সহর বাড়ী রক্ষা করবে। সমস্ত দিন ও রাত পাহারা চলবে, এবং চাঁদা তুলে তাদের মাইনে ও খাওয়া দিতে হবে। মন্দ নয়, এ রকম যদি আগের থেকে করত তবে এত জিনিষ নষ্ট বা চুরি হত না। যাক্, শত্রুতা হয়ত কিছুটা কমবে; গরুর গাড়ী করে সামান্ত সামান্য মাল মশলা ও শুকনা মাছ নিয়ে দোকানীরা আবার দোকান খুলল, সবই ফাঁকা ও ভাঙা, নতুন সহর এক বসল, ডাকাতরা কিন্তু তত কিছু কেয়ার করে না। অনবরত ঘুরছে, দিন-রাত সহরেই আছে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, ভাঙা বাড়ীতে ঢুকছে ও বেরুছে, যেন কত না কাজে ব্যস্ত তারা, যেখানে যা পাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে, এ সব দেখে চীনাদের যিনি কর্ত্তা তাকে অন্যান্য লোক বলল যে, ডাকাতদের ও ভাবে চুরি করতে মানা কর। তখন সে চীনাটি সব ডাকাতের লোকদের ডেকে জানাল যে, তোমরা এ ভাবে আর অনিষ্ট কর না, যা হবার হয়েছে, এখন সবাই মিলে-মিশে থাকা দরকার—যতক্ষণ না যুদ্ধটা থামে।

এর পর জাপান এল। ১০ই ফেব্রুয়ারী পাহাংএ জাপানীর দর্শন আমরা পেলাম। আগের দিন বিকালে প্লেন এসে চারি দিকে কাগজ ফেলে গেল, তাতে লেখা ছিল—যখন সৈন্য এসে পৌঁছাবে তখন যেন কোনও লোক কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটায়। তারা যা চাইবে তা যেন দেওয়া হয়। যারা সাহায্য না করবে পরে তাদের শাস্তি পাওনা থাকবে। প্রতি বাসিন্দা যেন তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয়, ইত্যাদি মালয় ভাষাতে লেখা ছিল। তাই আজ সকালের দিকে যখন সাইকেল ও লরী করে সৈন্য এসে পৌঁছল তখন সাহায্য করা পড়ে থাক, তারা কি আকৃতি ও প্রকৃতির তৈরী তা আর বাসিন্দাদের দেখার দরকার হল না। যে যেখানে দেখেছে ও শুনেছে সবই চম্পট দিচ্ছে প্রাণ নিয়ে। তার পর জাপানী সহরে প্রবেশ করে দেখে, মাত্র কয়েক জন চীনা তাদের দেখে এগিয়ে আসে ও কোথায় তারা থাকবে ইসারায় জায়গা দেখিয়ে দেয়। তার মধ্যে এক জাপানী কিছু কিছু চীনা ভাষা বলতে পারত, চীনা কর্ত্তারা তাদের চাল ও বাসন চিনি নুণ ইত্যাদি কিছু কিছু দিল, না হলে লোকের বাড়ী অত্যাচার সুরু হচ্ছিল। গরু, ছাগল, মুরগী যা পায় সোজা নিয়ে যেত। ইণ্ডিয়ানদের দেখলে তারা জিজ্ঞাসা করত "ইন্দোজিনকা?" অর্থাৎ তুমি ইণ্ডিয়ান কি? এই ভাষাটি তারা বেশী ব্যবহার করত। যারা অফিসারদের মধ্যে সামান্য ভাঙা ভাঙা ইংরাজী বলতে পারত, তারা তখন সহরের লোকদের বলল যে, আমাদের নিপ্পন (জাপান) লোকদের তোমরা যখনই যত বার দেখবে তত বার নমস্কার জানাবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে পিঠ-মাথা ঝুঁকিয়ে সাধ্যমত নুয়ে নুয়ে নমস্কার দিতে হবে

এবং যদি কেউ কোন কথা বলে, তবে ঐ প্রথায় ধন্যবাদ দিতে হবে "হারিগাতে—গোজাইমাস" এই বলে।

দু'দিনেই মানুষের পরিবর্ত্তন এল, ভাবনায় লোকে ভেঙ্গে পড়ল। এই ত উপস্থিত রাজাদের ব্যবহার! এদের সাথে ভবিষ্যতে কাজ করা ও আহার চাওয়া কি ভাবে সম্ভব হবে তাই মহা চিন্তা হয়ে গেল। চীনাদের উপর তারা তাদের শত্রুতার অনেক চিহ্ন এঁকে দিল, তাদের ঘরে ঘরে অত্যাচার সমান তালে করতে লাগল। ১২ই ফেব্রুয়ারী তারা আবার সব চলে গেল সিঙ্গাপুরের পথে। তখন চীনাদের মিটিং চলল,—কি ভাবে এর প্রতিশোধ তারা নেবে। জাপানী সাহেব নোটিশ টাঙ্গিয়ে ও পতাকা উড়িয়ে গেল, নোটিশে লিখে দিল—লোকেরা যারা সহর ছেড়ে দূরে চলে গেছো, তারা নির্ভাবনায় ফিরে আসতে পার, আমাদের ভয় কর না। এর পরে জাপানী যখন আসবে তখন তোমরা অনেক সাহায্য পাবে। কিন্তু আমাদের চেয়ে সাহস যাদের আছে তারা সব চলে গেলো সহরে, আমরা তখনও তপোবনে রইলাম, যুদ্ধের ফলাফল শুনে তবে বেরুন হবে। রাস্তায় দোকানে ও সহরের মধ্যে লোক চলাচল একটু একটু সুরু হল। বাজার বসেছে, জিনিষ-পত্র নামে মাত্র, কেনা ও দেখার মত কিছুই নাই। যারা যা চুরি করেছিল তারা তা মাটিতে পুঁতে রেখেছে, কেউ বা শুক্‌নো কুয়োর মধ্যে ফেলে কাঠ-খড় চাপা দিয়ে রেখেছে। তারি মধ্যে সহরে যাতে অনাসৃষ্টি না হয় তার জন্য দোকান-পাট খুলে বসা, তাতে লোকের সাহস একটু বাড়ায় বই কি? সেই সময়ে এক দিন দুপুর বেলা দু'টি মাদ্রাজী ভদ্রলোক এলেন আমাদের ষ্টেটে। তাঁরা না কি কোয়ালালামপুর যাবেন, এখন সেখানে জাপানী আছে, সিঙ্গাপুরে খুব জোরেই যুদ্ধ চলছে, ঐ দ্বীপটি বাদে সমস্ত মালয় ত জাপানীরা গিলে বসে আছে। এবং বৃটিশ নোট নিয়ে জাপানী নোট দিচ্ছে ঐ একই দামে। মন্দ নয়, নানা লোকে নানা রকম জল্পনা তুলল, কেউ বলল, এ টাকা কেড়ে ওদের টাকা চলবে। কেউ বলল, ইংরাজী টাকার দাম হয়ত থাকবে না। কেউ বা বলল, দেখা যাক, জাপানীর টাকা কি রূপ নিয়ে দাঁড়ায়।

[ক্রমশঃ।

লাঞ্ছিতা!

নমিতা মিত্র

লাঞ্ছিতা বোন! মিছামিছি আর কোরো না ক্ষোভ,
মুক্তিপথের হদিস্ দিয়াছে গান্ধীবাদ,
বিষ খেয়ে মরো—কোরো না মিথ্যা প্রাণের লোভ
মৃত্যুর মাঝে দেখিবে মিটেছে বাঁচার সাধ।

বিষ নাহি পাও সীতার মতন ধরিও তেজ;
জটায়ু বা রাম উদ্ধার-কাজে না দিল দেখা,
দেখিবে রাবণ পলায়ে গিয়াছে গুটায়ে লেজ!
তোমারই দুঃখে নব রামায়ণ হতেছে লেখা।

নারী-জীবনের সেরা অপমান সয়েছো বোন!
দুঃখ কোরো না; "রাম নাম" শোনো অহর্নিশ,
তীর্থসেবা ও গঙ্গাস্নানেতে রাখিও মন;
নও ভাল হয়—পারো যদি খেতে খানিক বিষ।

উদ্ধার তুমি পাও বা না পাও,—চিন্তা নেই,
তোমার জন্য ঘুম ভুলে গেছে শাস্ত্রকার;
উদ্ধার পেলে কি হ'বে তোমার,—তাই ভেবেই,
কত মাথা-ব্যথা, নতুন বিধান চমৎকার!

জীব-জগতে অপত্যস্নেহ

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সেই আদিম যুগ হতে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, সন্তানের জন্ম গর্ভস্থ ভ্রূণ থেকে মাতা-পিতার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত। স্তন্যপায়ী জীবেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। অপত্য-স্নেহটা আমরা এদের মধ্যে বেশী দেখে থাকি। লিনিয়াসের মতে এদের উন্নতির পথ হল এদের মা। বানর কেমন করে তার সন্তানদের বৃক্ষারোহণের প্রাথমিক চেষ্টাগুলোকে সাহায্য করে তা হয়ত আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু এরা শুধু সাহায্যই করে না, দরকার হলে অনেক সময় চপেটাঘাত করে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার গিয়ানা অঞ্চলে এক প্রকার নিশাচর বানর আছে। সন্তান যথেষ্ট বড় হয়ে গেলেও তাদের প্রত্যেক গ্রাস খাবার আপনি চেখে, বিষাক্ত এবং ভক্ষণযোগ্য কি না দেখে তবে তাদের খেতে দেয়।

ক্যাঙারু ও ওপোসাম তাদের বাচ্চা হবার পর দুর্ব্বল শিশুগুলিকে তাদের পেটের মধ্যে এক প্রকার থলি অথবা মার্ত্তপিয়াম্ এ ভরে রেখে দেয় এবং সেইখানেই তারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাপদে লালিত-পালিত হয়।

সিংহ-শাবককে শিক্ষা দেবার জন্য তাদের মা শুয়ে শুয়ে নিজের ল্যাজটা ধীরে ধীরে নাড়তে থাকে। শাবকেরা সেই ল্যাজটা ধরবার জন্য তার ওপর লাফিয়ে পড়ে এবং অনেক সময় আঁচড়ে-কামড়ে ল্যাজের অগ্রভাগ ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তবু তাদের মা খুশী-মনেই এই সব দুরন্তপনা সহ্য করে। পার্ব্বত্য ছাগেরা অনেক সময় তাদের শাবকদের বন্ধুর পথে চলাচলে অভ্যস্ত করার জন্য শায়িত ভাবে অবস্থান করে, আর শাবকেরা তাদের গায়ের উপর উঠা-নামা করে এবং খেলার ছলে পর্ব্বত-আরোহণ শিক্ষা করে।

সিন্ধু-সিংহেরা জলচর হলেও বাচ্চা হবার সময় ডাঙ্গায় এসে বাস করে এবং প্রায় শাবকের যখন এক মাস বয়স হয়, তখনই তাকে সাগর-জলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে সাঁতার শেখায়।

এ ছাড়াও কুকুর, বেড়াল, ভেড়া প্রভৃতির মধ্যে অপত্য-স্নেহের উদাহরণ বিরল নয়। বাছুরের প্রতিমূর্ত্তি গড়ে গোয়ালারা কি ভাবে গরুদের প্রলোভিত ক'রে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়, তা বোধ হয় অনেকেরই চোখ এড়ায়নি।

স্তন্যপায়ীর পরেই আমরা দেখে থাকি পক্ষিশ্রেণীর জীব। এদের অধিকাংশকেই আমরা ডিমে তা দিতে দেখেছি। যদি এদের ডিম সরিয়ে নেওয়া হয় কিংবা কোন রকমে ডিম পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এদের আর চীৎকারের অন্ত থাকে না।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পায়রারা তাদের খাওয়া-দাওয়ার পরে বাচ্চাদের মুখে বমি করে দেয়। এটা আর কিছুই নয়, বাচ্চাদের এমনি খাবার হজম করার ক্ষমতা নাই বলেই অর্দ্ধ পরিপাক করা খাবার তাদের মুখে ঢেলে দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিকেরা একে পায়রার দুধ বলে থাকেন।

পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্বর্ণ-ঈগল সন্তানদের প্রথমে এক টুকরো খাবারের লোভ দেখায়, পরে সেইটে ঠোঁটে নিয়ে আস্তে আস্তে উড়তে থাকে এবং লুব্ধ শাবকেরা তাকে অনুসরণ করে।

মনুষ্য সমাজের মত পক্ষী সমাজেও অনাথ শিশুকে আত্মীয়-পরিজনদের পালন করবার রীতি আছে। ওয়ালটার গুড ফেলো নামে এক বিখ্যাত পক্ষি-সংগ্রহকারী জাভার চড়ুই পাখীর সম্বন্ধে বলেছেন যাদের অনেকগুলি বাচ্চা ও একটি বা দু'টি ধাত্রী পাখী থাকলে খাবার দেবার সময় ধাত্রীরা বাচ্চাদের খাওয়াতে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠে যে, অধিকাংশ সময়েই নিজেদের খাবার নিঃশেষ হয়ে যায়।

মনুষ্য সমাজে সন্তান পালন এবং রক্ষা দুইয়েরই ভার মাতা-পিতার। পক্ষী সমাজেও এর ব্যতিক্রম হয় না। চিল অথবা বাজ পাছে মুরগীদের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে, খোলা যায়গায় হাঁটবার সময় মুরগীরা পাখা বিছিয়ে তার তলায় বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটে। অনেক সময় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, মোরগেরা এদের আগে আগে চলে ও জীবন বিপন্ন করেও সন্তানদের রক্ষা করে থাকে।

আবার দক্ষিণ-মেরুর পেঙ্গুইনের অপত্য-স্নেহ এতই প্রবল যে, কোন শাবক মাতৃ-পিতৃহীন হলে এরা তাকে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে লালন-পালন করে এমন কি, ডিম প্রসব করে ডিম প্রস্ফুটিত হবার পূর্ব্বেই যদি কোন পেঙ্গুইন মারা যায়, তা হলে সে ডিমে তা দিবার জন্য স্ত্রী পেঙ্গুইনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং এ ভাবে মাঝে মাঝে ডিম নষ্ট হতেও দেখা গেছে।

সরীসৃপদের মধ্যে অপত্য-স্নেহ দেখা গেলেও বলবার মত বিশেষ কিছুই নেই। তবে কুমীরদের অনেক সময় বাসায় ডিম পেড়ে তাকে আগলে বেড়াতে দেখা যায়। পাইথনরা তাদের দেহের কুণ্ডলীর মধ্যে ডিম রেখে দেয় এবং এই ভাবেই তাদের ডিমকে তা দিয়ে ফোটায়।

উভচরদের মধ্যেও অপত্য-স্নেহ দেখা যায়। এইরূপ অনেক উভচর দেখা যায়, যারা পাতার দ্বারা বাসা তৈরী করে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। নোটোট্রিমা বলে এক প্রকার ব্যাঙ আছে যারা পিঠের মধ্যে থলি করে ডিম পুরে রাখে এবং সেই থলির মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয় এবং এই বাচ্চা ব্যাঙাচি অথবা পূর্ণবৃদ্ধ অবস্থাতেই বাহির হতে পারে।

পাইপা য়্যামেরিকানা নামক এক প্রকার উভচর দেখা যায়, যাদের স্ত্রীগুলির পিঠ জনন-কালে নরম ও স্পঞ্জের মত হয়ে যায়। পুরুষগুলি এই ডিম মুখে করে তুলে পিঠের উপর দিয়ে দেয় এবং ডিমগুলি তাদের পিঠের মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত করে ঢুকে যায়। এই উভচরদের মধ্যে পিতৃ-স্নেহের উদাহরণও বিরল নয়। ইউরোপের অবষ্টেরিক কুনো ব্যাঙদের পিঠে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। আবার সাউথ য়্যামেরিকার রাইনোডার্ম্মা ডারুয়িনি নামক পুরুষ-ব্যাঙকে তাদের স্বর-থলিতেও ডিম নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়।

মনুষ্য সমাজে আমরা সাধারণতঃ মাতা ও পিতা উভয়কে সন্তান পালন করতে দেখে থাকি এবং শিশু অবস্থায় মাতার দায়িত্বই বেশী বলে মনে হয়। কিন্তু মৎস্যশ্রেণী জীবদের মধ্যে ঠিক উল্টাই আমাদের চোখে পড়ে।

ষ্টিকিল ব্যাক এক প্রকার মাগুর ব সিঙ্গি জাতীয় মাছ। এদের পুরুষ-মাছ জলের তলায় বাসা করে, স্ত্রী-মাছ এই বাসায় ডিম পেড়ে রেখে চলে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা না হওয়া পর্য্যন্ত এদের বাবা বাসার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে এদের আগলায়।

সামুদ্রিক অশ্ব এবং নল মাছনামক পুরুষ-মাছদের বুকে এক প্রকার থলি করে ডিম নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়, এই থলি তাদের বুকের দিকের পাখনারই রূপান্তর মাত্র—বৈজ্ঞানিকেরা একে ঠাট্টা করে বুক-পকেট বলে থাকেন।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, "মাছের মায়ের ভালবাসা", কিন্তু এরিয়াস নামক এক প্রকার টেংরা জাতীয় মাছকে তাদের মুখের ভিতরে ডিম নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। বাচ্চা না হওয়া পর্য্যন্ত এরা এই ভাবেই ঘোরে। সুতরাং কথাটা প্রবাদ হলেও সত্য নয়।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকা বলিতেছেন :—"সম্প্রতি কৃষি বিভাগের সচিব মাননীয় শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষির ও মৎস্য চাষের উন্নতিকল্পে অনেক রকম পরিকল্পনার উল্লেখ করেছেন; সে সকল পরিকল্পনার মধ্যে নূতন কিছুই নেই; সেই খোড়, বড়ি, খাড়া অর্থাৎ বীজ বিতরণ, পতিত জমির চাষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সব পরিকল্পনা অতি পুরাতন এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যে অজস্র অর্থব্যয় হয়েছে তার তুলনায় কাজ কিছুই হয়নি। দেশের লোক আর নূতন নূতন পরিকল্পনার কথা শুনতে চায় না; তারা চায় বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ। সচিব মহাশয় যদি অনুগ্রহ করে বলতেন যে, যান আপনারা অমুক জায়গায় নিজের চোখে দেখে আসুন এক টুকরোও পতিত জমি পড়ে নেই, সবই লাঙলের ফালের নীচে গেছে; কিংবা যদি বলতেন, যান অমুক গ্রামে দেখে আসুন নিজের চোখে যে আর উনুনে গোবর যায় না, ঘুঁটে দেখতে পাওয়া যায় না, ঘাস, পাতা, পানা, আবর্জনা সবই যাচ্ছে মাঠে, তা'হলে আমরা বুঝতুম তিনি মামুলী পরিকল্পনার কথা ছেড়ে একটা কিছু করেছেন। অথচ এই কাজটা অতি সহজে করা যায়, বিশেষ পরিকল্পনার দরকার হয় না।" সচিব মাননীয় শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় এই মন্তব্যের জবাবে কিছু বলিবেন কি? মন্তব্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যদি একটি সহজ সর্ব্বজনসাধ্য কৃষি এবং মৎস্য-চাষ উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা সর্ব্বজনবোধ্য ভাবে প্রকাশ করিতেন—আরো ভালো হইত। মন্তব্যের ধারও বাড়িত। এখনও করিলে হয়।

* * * * * *

'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় শ্রীজগদানন্দ ঘটক লিখিতেছেন :—"চাষের পক্ষে আজকাল সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে—খাটিয়ে লোকের অভাব। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, গত শ্রাবণ মাসে ক্রমাগত দশ দিন হাঁটাহাঁটি, অসম্ভব রকমের তোষামোদ ও পর্য্যাপ্ত মজুরির লোভ দেখিয়েও চাষের জন্য একটা মজুর মেলাতে পারিনি এ ছাড়া মজুরদের শক্তিহীনতা, বলদের দুর্ব্বলতা, লাঙল ব্যবহারের অসুবিধা, উপযুক্ত বীজ ও সারের অত্যন্ত অভাব প্রভৃতি সহস্র প্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে গ্রামের চাষ-বাস যে কি অসহায় ভাবে বিপন্ন—তা গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত মাত্রেই ভাল ভাবে জানেন। চাষের সময় এত অল্প দিন স্থায়ী হয় যে, এই সব অনিবার্য্য কারণে সব জমি আবাদ হওয়া ত দূরের কথা, যেগুলো আবাদ হয় তাদের উৎপাদন অন্যান্য দেশের উৎপাদনের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। খাদ্য-উৎপাদনে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হ'তে হ'লে অতি শীঘ্র এই মান্ধাতার আমলের চাষ-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক; এ বিষয়ে সরকার বাহাদুর যত তাড়াতাড়ি দৃষ্টি দেন ততই মঙ্গল।" সকল বিষয়ই কি সরকার 'বাহাদুরকে' করিতে হইবে? সরকার 'বাহাদুরের' মুখ চাহিয়া না থাকিয়া দেশের লোকের কি কোন কার্য্য করিবার মতো শক্তি এবং দক্ষতা নাই? ন্যূনতম সাহায্য অবশ্যই সরকার হইতে আমরা আশা করিতে পারি—কিন্তু তাহা পাইবার পূর্ব্বে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ এবং তৎপরতা অবশ্যই আমাদের দেখাইতে হইবে। সাহায্য দাবী করিবার অধিকার পূর্ব্বে অর্জ্জন করিতে হইবে।

* * * * * *

'গণবার্তা'য় প্রকাশ যে :—পূর্ব্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব তাঁহাদের অনেক। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ্য দৃষ্টি আজও পড়ে নাই। ফলে, তাঁহারা নামমাত্র বেতনে কোন ক্রমে দিন কাটাইতেছেন। আর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতার জন্য অন্যত্র জীবিকার্জ্জনের উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সে জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে লেকচারারদের সংখ্যা ৮১ জন। তাঁহাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর ২১ জন লেকচারার বেতন পান ৩০০৲—৪০০৲। প্রথম শ্রেণীর বাকী লেকচারার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর "এফিসিয়েন্সী-গ্রেডের" লেকচারারা (১০ জন) পান ২০০৲—৩০০৲ হিসাবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বাকী ৫০ জনের ৩১ জন পান ১২০৲—২০০৲ হিসাবে, এবং ১৬ জন ২০০৲, এবং অবশিষ্ট ৩ জন পান ২৫০৲ টাকা। এই শ্রেণী-বিভাগের উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।" নিষ্প্রয়োজন বলা ঠিক নহে। বলা উচিত, মন্তব্য করিয়া কোন লাভই হইবে না; কারণ, পাকিস্তান সরকার 'বৃহত্তর' কর্ম্ম লইয়া কাশ্মীর, জুনাগড় এবং কাছাকাছি ত্রিপুরার সীমানা অঞ্চলে অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। তপশীলী বাঙ্গালী-মুসলীমের শিক্ষার কথা চিন্তা করিবার সময় পরে বহুত মিলিবে।

* * * * * *

লীগ-তুলী 'ইত্তেহাদে' নিম্নলিখিত সংবাদটি এখনো কেন প্রকাশিত হয় নাই? লীগ-জয়ঢাক 'আজাদ'ও কেন নীরব? সংবাদটি অন্য কোন পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম :—"বরিশালে চাউলের মণ ৫৫৲ টাকার কোঠায়! সহরে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের শতকরা ৮৫ জনের ঘরে চাউল নাই। বোর্ডিং, হোটেল প্রভৃতির অবস্থা অচল। ডাক কর্মচারীরা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চাউলের দাবী জানাইয়াও সমাধান খুঁজিয়া পাইতেছে না। গ্রামের অবস্থাও তথৈব চ। আর-এস-পি এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক কর্মিগণ বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টার এবং বক্তৃতার মারফৎ এই সমস্যার সমাধানের প্রোগ্রাম প্রচার করিতেছে। বাজারে

চাউলই উঠে। তাহাও অতি-মূল্য দিয়া কেনা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। সহরে বুভুক্ষু জনতার ভীড় বাড়িতেছে। মালসা হাতে ছেলে-মেয়ে কাঁখে গৃহস্থরা সহরে আসিতেছে। সবাই দিশেহারা। এই সময় সরকার যদি আরও জোর দিয়া চোরা-কারবারী এবং মজুতদারদের হাত হইতে চাউল বাজারে আনার বন্দোবস্ত করে এবং অন্ত দিকে বিনা সুদে কিছু কিছু টাকা ঋণ দেয়, তাহা হইলে আমন শস্য উঠা পর্য্যন্ত লোক কিছুটা খাইয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু সরকারী নজর সে দিকে আছে বলিয়া মনে হয় না।" সমদর্শী লীগ সরকার এই একটি বিষয়ে সত্যই ন্যায়বিচার করিতেছেন। তাঁহাদের শাসন-গুণে হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতেছে এবং আরো কিছু কাল এই ভাবে মরিতে থাকিলে, নাজিমুদ্দীনের হুমকি সত্বেও উভয় বাঙ্গলা এক হইবে। নাজিমুদ্দীনের পিতাঠাকুর মহাশয়ও ইহা রোধ করিতে পারিবেন না! নাজিমুদ্দীনের জয় হউক!

*   *   *   *   *   *

বরিশালের 'নকীব' কপালে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন :—"বরিশালের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের অফিসার ও কর্ম্মচারিগণের দুরবস্থা দেখিলে মনে হয়, পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকার তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণই উদাসীন বা তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করাকে সরকার কর্ত্তব্যের বাহিরেই মনে করিতেছেন। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারিগণের প্রকৃত প্রভু রহিয়াছেন—সুদূর করাচীতে। তবে এ-ও বলিতে পারেন 'যেখানে আপন শাশুড়ী সালাম পায় না, সেখানে খালা-শাশুড়ী পিড়ে বায়' বরিশালে পোষ্ট ও টেলি-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই আজ পর্য্যন্ত থাকার স্থানটুকু পায় নাই। রেস্তোরাঁয় থাকিয়া খাইয়া এবং শত রকম অন্য অসুবিধার মধ্যে অফিস-কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন। আমরা দেখিতেছি, সরকারের রিকুইজিসনের বাড়ী তালাবদ্ধ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তবু কেন কর্ম্মচারিগণ অবাঞ্ছিত অসুবিধা ভোগ করিয়া চলিয়াছেন? আমরা আশা করি, পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকার তাহার কর্ম্মব্যস্ত চলার পথে অভিভাবকহীন বাঙ্গাদিগকে স্মরণ করিয়া নেকী হাছেল করিবেন।" 'নকীব' অনাবশ্যক ক্রন্দন করিতেছেন। একটু কষ্ট করিয়া সন্ধান করিলে 'নকীব' জানিতে পারিতেন যে, যে বাড়ীগুলি রিকুইজিশন করা হইয়াছে, তাহা সবই হিন্দুদের এবং ইহা হিন্দুদের গৃহহারা করিবার জন্যই দখল করা হইয়াছে। গরীব এবং তপশীলী বাঙ্গালী-মুসলীম পোষ্টাল কর্ম্মচারীদের আশ্রয় দিবার জন্য নহে। এই ত আরম্ভ মাত্র, কাজেই চোখের জল ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন। কাজে লাগিবেই।

*   *   *   *   *

উপরি-উক্ত বিষয়ে রাজসাহীর 'হিন্দু-রঞ্জিকা' ভয়ে ভয়ে নিম্নস্বরে বলিতেছেন :—"আমরা শুনিতে পাইতেছি, এই সহরে এমন কতকগুলি বসত-বাটী রিকুইজিসন করা হইতেছে, যে স্থানে বিগ্রহাদির পূজা ও আরাধনা করা হইয়া থাকে। আবার এমন বাড়ীও লওয়া হইয়াছে, যাহার অধিবাসী মাত্র এক জন অসহায় বিধবা ও তাঁহার পুত্রকন্যা। ইহা সত্য কি না বলিতে পারি না। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুরোধ, কর্ম্মকর্ত্তাগণের এ ব্যাপারে আরও বিবেচনা করিয়া হস্তক্ষেপ করা উচিত। স্বভাবতঃই এই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বর্ত্তমানে কিছুটা আতঙ্কের ভিতরে বাস করিতেছে। এই আতঙ্ক যে অহেতুক—ইহা তখনই প্রমাণিত হইবে যখন রাষ্ট্র-পরিচালকগণ সংখ্যালঘু দলের সকল নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন। আমরা আশা করি, এখন হইতে এইরূপ ভাবেই কার্য্য করা হইবে।" 'হিন্দু-রঞ্জিকা' কেবল "শুনিতেছেন" না, চোখেও দেখিতেছেন; কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু-পত্রিকার সত্য কথা বলা, বিশেষ করিয়া পাক্-রাষ্ট্র সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য, অত্যন্ত ভীষণ অপরাধের কথা। কাজেই বৃদ্ধ 'হিন্দু-রঞ্জিকা' "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" পন্থায় চলিয়াছেন। দোষ দিতেছি না, পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের সমধর্ম্মীদের বিরুদ্ধ অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ মাত্র করিতেছি। প্রতিকার-চিন্তাও কম করিতেছি না।

*   *   *   *

বাখরগঞ্জ জিলার মেহেন্দিগঞ্জ থানাধীন ৮নং চরগোপালপুর ইউনিয়ন ফুড কমিটির সেক্রেটারী মুস্তাক্কর আলী সাহেবকে 'নকীব' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন করা হইয়াছে :—"১। ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪৭ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত আপনি ইউনিয়ন রিটেইলদের কাছ থেকে যে প্রত্যেক কেরোসীন জেরে ।০ আনা করিয়া আদায় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ কি ৮০০৲ শত টাকা? ২। আপনি রেশন কার্ড বিতরণের সময় ইউনিয়নবাসীদের কাছ থেকে যথাক্রমে ৵০, ।০, ।৴০ করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহার পরিমাণ কি ৫০০৲ শত টাকা নয়? ৩। কাপড়ের পারমিট দিবার সময় ইউনিয়নবাসীদের কাছ থেকে দুই পয়সা করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহার পরিমাণ কি ২০০৲ শত টাকা নয়? এই ইউনিয়নবাসীদের জনহিতকর কার্য্যের ১৫০০ শত টাকা কি আপনার গুপ্ত পকেটে আছে? উপরোক্ত টাকা নিবার সময় আপনি জনসাধারণের নিকট জনহিতকর কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু জনসাধারণ কি জনহিতকর কার্য্যের কোন সুপ্রমাণ পাইয়াছে? আমরা জনসাধারণ এমন কি ইউনিয়ন ফুড কমিটিও আপনার নিকট উক্ত টাকার হিসাব চাহিয়া অনেক বার ফেল করিয়াছি। কিন্তু এখন আপনার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। এই দুর্দ্দিনে এই টাকা জনসাধারণের কত যে উপকারে আসিত তাহা আপনি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। জনসাধারণের টাকা খাইতে উদ্যত এই ভয়াবহ সর্ব্বনাশকারীকে দমন করিতে পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকার পক্ষের নিকট জোর আবেদন জানাইতেছি। আশা করি, সম্পাদক ছাহেব এই বিষয় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন না।" বহু দিন গত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পত্রলেখকগণ কোন জবাব পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সামান্য টাকার হিসাব লইয়া এমন গোলমাল করিয়া ভদ্রলোককে হয়রাণ করিবার প্রয়োজন কি? লীগের "নৌকাবিলাস" পর্ব্বে ৩।৫ কোটি টাকাই যখন জলে ডুবিয়া গেল তখন সামান্য

দেড়-দুই হাজার—এমন কি? ধরিতে হইলে নাজিম এবং সুরাবর্দী গভর্ণমেন্টের কয় জন প্রধান বাদ যাইবে? পাকের গোদারাই কি বাদ পড়িবে?

আসাম সম্পর্কে 'জনশক্তি' সম্পাদক বলিতেছেন :—"আসামের পার্ব্বত্য জাতীয়দের সমস্যা চিরকালের। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ও সত্যিকার জাতীয়তাবোধের। উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা যে দু'-এক জনের আছে, আসামের প্রাদেশিক রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তাঁহারা দূরে অপসারিত। জাতীয়তাবোধ শুধু 'অসমীয়া'র সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। 'আসাম অসমীয়াদের' এই ধ্বনি জাতীয়তার ধ্বনি নয়। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই একমাত্র আসাম প্রদেশ বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের জন্মভূমি—বাসভূমি। 'অসমীয়া' সেখানে অন্ত সকলের সমবেত লোকসংখ্যার তুলনায় অল্প। তথাপি ভাষা, কৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকার ক্ষেত্রে অসমীয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত দুশ্চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে দিকে দিকে অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল তো চরম পত্র দাখিল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের দাবী ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে নাগা পাহাড় অঞ্চলের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণও হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস কেন ইহা সত্য, আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীর অদূরদর্শী রাজনীতিই আসাম গবর্ণর স্যার আকবর হায়দারীকে পরিচালিত করিতেছে এবং ভারত সরকারকেও ভুল বুঝানো হইতেছে। সেদিকে আসাম সরকার এখনো যে সব ইংরাজকে কর্ম্মচারিরূপে পুষিতেছেন তাহাদেরও কাহারো কাহারো হাত গোপনে ক্রিয়া করিতেছে। শুধু নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চলেই নয়, অন্যত্রও অসন্তোষ দেখা দিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের অবস্থাও বাহিরে-ভিতরে এক নয়। মুসলীম লীগের আর পাকিস্তানের উপর ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপের প্রচার-কার্য্য করিয়া লাভ কি? আজ পূর্ব্ব-পাকিস্তান খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়কে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার জন্ত স্বাভাবিক ভাবেই চেষ্টা করিতে পারে বৈ কি?" আসাম সম্পর্কে এই সমস্যা কেবলমাত্র তথাকথিত জন কয়েক স্বার্থপর অসমীয়ারই নহে। ইহা সমগ্র ভারতের চিন্তার বিষয়। সুখের কথা, রাষ্ট্রনায়কগণ এ-বিষয়ে সজাগ হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

• • • • • •

'জনশক্তির' মন্তব্য—"আমরা দেখিতেছি, আসাম বিরাট সমস্যার সম্মুখীন, সঙ্কট তাহার সম্মুখে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর আসাম নির্ভরশীল। কাজেই এখনও সুস্থির দূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় দিলে ভবিষ্যৎ মঙ্গলজনক হইতে পারে, সঙ্কট কাটিতে পারে। বাঙ্গালী বিদ্বেষ আর অসমীয়া আধিপত্য-প্রচেষ্টা আসামকে বিপর্য্যয়ের পথেই টানিয়া নিবে। স্যার আকবর হায়দরী সম্ভবতঃ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ১৫ই আগষ্টে তিনি যে বিভিন্ন জাতিকে 'হুজুরের' স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যেন সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, নয়া দিল্লীর বেতার বক্তৃতায় সুর কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" এ-বিষয়ে আমরাও প্রায় একমত।

• • • • • •

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শিল্প, অর্থ ও রাজস্ব সচিব শ্রীহামিদুল হক চৌধুরী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—"বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় আর নাই। গবর্ণমেন্টের এখন প্রকৃত কার্য্য করার সময় আসিয়াছে। প্রকৃত সমস্যার সমাধানের জন্ত গবর্ণমেন্টকে এখন বিশদ কার্য্যসূচী অথবা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহার পর গবর্ণমেন্টকে শিল্প প্রসার ও কলকারখানা স্থাপনের জন্ত শিল্পপারদর্শী ব্যক্তি ও কারিগরের সন্ধান করিতে হইবে। কমিটিতে তিনি বিশেষ যোগ্য লোক পাইয়াছেন এবং কমিটির সকল সদস্য পূর্ব্ববঙ্গের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে অভিজ্ঞ কারিগরের অভাব হইয়াছে। প্রয়োজন বোধ করিলে গবর্ণমেন্ট অভাব পূরণের জন্ত বিদেশ হইতেও কারিগর আমদানী করিতে পারেন। দেশের লোকেরাই যাহাতে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনীয় কারিগরের অভাব পূরণ করিতে পারেন, তজ্জন্ত অদূর ভবিষ্যতে দেশে এবং বিদেশে তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষা উপযোগী বিশেষ কোন কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নাই। গবর্ণমেন্ট আর অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন না। সত্বর তাঁহারা কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।" চমৎকার কথা। কাজে পরিণত হইলে দুঃখের কোন কারণ নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে—পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রকৃত মালিক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা বসিয়া আছেন সুদূর করাচীতে!

• • • • • •

'হিন্দুরঞ্জিকা' (রাজশাহী) দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—"কয়েক মাস হইল চিনি, কয়লার ও বস্ত্রের অভাবে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য ব্যবহারের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু শিশু ও রোগীর যে চিনি ও মিছরীই এক মাত্র পথ্য। বহু শিশু ও রোগী পয়সা থাকিতেও মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে ভাবিতেছেন কি? বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইবার উপক্রম। সহরে কয়েকটি ব্যক্তি তাঁতের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং উহাতে ৬৲ টাকা ৬।০ টাকা মূল্যে মোটা হইলেও বস্ত্র পাওয়া যাইত, দুর্ভাগ্য বশতঃ সূতার অভাবে তাহাও বন্ধ হইয়াছে। কাগজ-ব্যবসায়ীরা কাগজ আমদানী বন্ধ করিয়াছেন—ইহা ইচ্ছাকৃত কিম্বা অভাবের দরুণ তাহা আমরা জানি না। কাগজের অভাবে বাৎসরিক পরীক্ষার দিন প্রতিটি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকেই পিছাইয়া দিতে হইয়াছে এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে নিজ দায়িত্বে অন্ত স্থান হইতে কাগজ আনিতে হইয়াছে। এটা অনেক টাকার ব্যাপার তাই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় দোকানে কাগজ পাওয়া না গেলে ছাত্র, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, প্রত্যেকেই অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে! কাগজের অভাবে ডাক্তার, প্রেস্‌ক্রিপসন কাটিতে পারিতেছে না, উকিল, মোক্তার দরখাস্ত লিখিতে পারিতেছে না, ছাত্র লেখার কাজ করিতে পারিতেছে না,—ব্যবসায়ী খাতা লিখিতে পারিতেছে না. এ একটা মহা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে. [illegible]

উপস্থিত।" আমরাও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন প্রকার সাহায্য দান আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে আশা করি, শীঘ্রই সে-দিন আসিবে।

• • • • • •

'প্রদীপ' পাঠে জানিতে পারি :—"তমলুক বাজারে ইদানীং তরিতরকারী ও মাছের দর সাধারণ গৃহস্থের ক্রয়-সীমার বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি তাহার ন্যায়সম্মত অধিকার খাটাইয়া যথাসম্ভব তাহাদের মূল্য কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির এই উত্তম প্রশংসনীয় এবং বহু কাল পরে চেয়ারম্যানকে আবার একটা প্রকৃত জনহিতকর কাজের মধ্যে পাইয়া রেট-পেয়ারগণ সকলেই আনন্দিত। কিন্তু রেট-পেয়ারগণকে এক্ষেত্রে শুধু মুখে আনন্দ ও সহানুভূতি দেখাইলেই চলিবে না, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজ নিজ স্বার্থত্যাগ করিয়া উদ্যোগী কমিশনারদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে। অতি-লাভ মানুষকে আজ নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। যে জিনিষের দর একবার চড়িয়াছে তাহা কমান সহজ নহে। বিশেষ যে ব্যবসায়ীরা এত দিন অতিরিক্ত লাভ পাইয়াছে তাহারা ইহাতে বাধা দিবার জন্য সাধ্যমত যে কোন ত্রুটী করিবে না, ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বাজারে অন্যান্য তরি-তরকারীর ব্যবসায়িগণ পথে আসিলেও মৎস্যব্যবসায়িগণ রীতিমত অসহযোগ আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক দিন ত বাজারে মাছের আমদানী নাই বলিলেই চলে। অথচ দর যে এমন কিছু অন্যায় কমান হইয়াছে তাহাও নহে। বরং যেখানে চালানী মাছ ভিন্ন গতি নাই সেই কলিকাতার বাজার-দরের সঙ্গে তুলনায় কোন কোন মাছের দর বেশী বলিয়াই মনে হইবে। তথাপি যখন জেলেরা রাজী হইতেছে না তখন সহরবাসীদেরও উচিত, কিছু দিন মাছের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জেলেদেরও সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করা। কলিকাতায় ঐরূপ একাদিক্রমে কয়েক দিন বয়কট করিয়াই অতিলোভী জেলেদের জব্দ করা হইয়াছে। এখানে সহরবাসীরা সেরূপ পারিবে না কেন?" 'প্রদীপ' বিশেষ চিন্তা করিবেন না। কলিকাতাতে আমরাও বিশেষ সুখে নাই। অবস্থা প্রায় একই প্রকার।

• • • • • •

'নও জোয়ান' মন্তব্য করিতেছেন :—"সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খাজা-মন্ত্রিসভা না কি কয়েক জন ছাত্র নেতাকে তাহাদের দেশ-সেবার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন মোটা মাহিনার সরকারী চাকুরী। দেশসেবা করা, সে ত ভাল কথা! যাঁহারা দেশসেবা করেন, তাঁহারা মহাজন। আর মহাজনরা দেশের সেবা করিয়াই থাকেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা আনন্দ পান,—শান্তি পান। দেশের জনগণ চিরদিন তাঁহাদের ত্যাগের কাছে ঋণী হইয়া থাকে এবং যুগে যুগে তাঁহাদের নাম স্মরণ করে, ইহাই তাঁহাদের বড় পুরস্কার। আজ খাজা-মন্ত্রিসভা এই নূতন দেশপ্রেমিকদিগকে অভিনবরূপে পুরস্কৃত করিয়া দেশপ্রেমিকের প্রতি আনুগত্যের এক নূতন অধ্যায় খুলিলেন। এমনিতর দেশসেবা করিয়াই যদি অনুপযুক্ত হইলেও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরী পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখছি অচিরে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের স্কুল-কলেজগুলিতে তালা পড়িয়া যাইবে। আমরা খাজা-মন্ত্রিসভার নিকট জানিতে পারি কি, এই দেশপ্রেমিক মহার্ঘ-মহাজনরা কাহারা? কোথায় কোন্ মাঠে লড়াই করিয়া এমনি ক'রে রাতা-রাতি তাহাদের কপাল খুলিয়া গেল? আর এই অভিনব পুরস্কার লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গেলেন?" 'নও জোয়ানে'র বয়স এখনও বেশী হয় নাই। তাই পাকিস্তানীদের কোন কোন কার্য্যে অবাক্ হইতেছেন! কিন্তু এখনও তেমন অবাক্ হইবার মত কিছু হয় নাই। কিছু কাল পরে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াও 'নও জোয়ান' অবাক্ হইবেন না! তবে চোখের পাকিস্তানি-ছানি কাটাইলে হয়ত বা অবাক হইলেও হইতে পারেন!

• • • • • •

১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'পল্লীবাসী' (কালনা) পাঠে জানিতে পারিলাম যে :—ঐ সপ্তাহে বিজ্ঞাপন ও নিলামী ইস্তাহার ছাড়া অন্য কোন সংবাদই নাই!! চমৎকার!

• • • • • •

চট্টগ্রামের এক সংবাদদাতা 'পাঞ্চজন্য'কে জানাইতেছেন যে :—"খাদ্য-সংকটের ফলে, ধর্ম্মপুরের লোকের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। বন্যার পর হইতে ক্রমশঃ লোকের ক্রয়-ক্ষমতা কমিতে থাকে। কয়েক কিস্তী রেশনের চাউল কন্‌ট্রোল, সস্তা এবং ফ্রি চাউল দেওয়া হইয়াছে। উহার পরিমাণ ছিল সপ্তাহে ১০০ মণ। তাহাও নিয়মিত ছিল না। কোন মাসে হয়ত মাত্র ২ বারই পাওয়া গেল, কিন্তু কক্সবাজারে বেশী তুফান হওয়ায় না কি এই এলাকার জন্য বরাদ্দ চাউলও কক্সবাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হোল্‌সেল ডিলার হাঁটাহাঁটি করিয়া কোন ক্রমেই চাউল আদায় করিতে পারিতেছে না। অথচ সাতকানিয়া থানাতেও তুফানের প্রকোপ তেমন কম ছিল না। প্রায় সমস্ত ঘরই কোনও না কোন রকমে তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। লোকে হাহাকার করিতেছে। এমন অনেক লোক আছে যাহারা বৃষ্টির সময় মাথা গুঁজিবার যায়গা পাইবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতেও এমন কোন সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। যাহাতে এই এলাকার শত শত দুঃস্থ অনশনক্লিষ্ট লোককে বাঁচান যাইতে পারে। ৪।৫ দিন হইল, ধর্ম্মপুরের শ্রীসর্ব্বানন্দ শীল এবং শ্রীরসিক আচার্য্য অনাহারে মারা গিয়াছে। শীঘ্রই সরকার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্য না পাইলে আরও অনেক লোক অনাহারে মারা যাইবে।" ইহার পরবর্ত্তী সংবাদে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থা আরো গুরুতর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু স্যার নাজিমুদ্দীন পরম নিশ্চিন্ত মনে "রাজত্ব" কায়েম করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। দুই-চারিটা বাঙ্গালী মরিলেও ক্ষতি নাই!!

★

এম, ডি, ডি

রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ও বাঙলা :—

নিখিল ভারত রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যতম সেমি-ফাইন্যালে বাঙলা হোলকারের বিরুদ্ধে ১২৮ রাণে পরাজিত হয়। এবারের খেলায় বাঙলা অনেক রকমে সুবিধা পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের সঙ্গে সি, এস, নাইডু ও সি, টি, সর্ব্বাতে যাওয়ায় হোলকার আক্রমণ বিভাগ যথেষ্ট শক্তিহীন হোয়ে পড়ে। এদিকে নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ বাঙলার কোন কাজেই আসে নাই! বাঙলার দল-নির্ব্বাচনের বহু পূর্ব্বে দলপতি নির্ব্বাচিত হলেন প্রবীণ খেলোয়াড় কার্ত্তিক বসু। দল গঠনের পরে স্বাস্থ্যের অজুহাতে কার্ত্তিক বসু ও পারিবারিক অসুস্থতার জন্য কে, ভট্টাচার্য্য খেলিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। ফলে দ্বাদশ খেলোয়াড় এস, মুস্তাকী ও পুলিন মিত্র দলভুক্ত হয়। কার্য্যকালে এস, মুস্তাকী প্রথম ইনিংসে দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া দলের পতন-রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ও নিজের দাবী সপ্রমাণ করে। গাইকোয়াড় ও বৈদের মত অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞাতনামা বোলারদের সাহায্যে ভূয়োদর্শী খেলোয়াড় সি, কে, নাইডু বাঙলার ব্যাটসম্যানদের হতভম্ব করে দেন। মাত্র ১৫ রাণে বাঙলার প্রথম ইনিংস শেষ হোলো। দ্বিতীয় ইনিংসে চতুর্থ উইকেট জুটীতে ১৬৮ রাণ যোগ হয়। পঙ্কজ রায় (১০৬) ও পার্কিস ৫০ রাণ করে। পঙ্কজ রায় গত বৎসরে রঞ্জী প্রতিযোগিতায় প্রথম আত্মপ্রকাশে যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে। এই বৎসরে পর পর দুইবার সে এই সম্মানের অধিকারী হয়। অনেকের মতে আম্পায়ারের সন্দেহজনক নির্দ্দেশে না কি পঙ্কজকে রাণ-আউট হতে হয়। এই দুই জন খেলোয়াড় ব্যতীত বাঙলার কোন ব্যাটস-ম্যান টিকিতে না পারায় বাঙলা ১২৮ রাণে পরাজিত হয়। বৈদের মারাত্মক বোলিং বাঙলাকে পর্য্যুদস্ত করে। এক সময়ে তাহার পড়তা হয় ৬০১—২—৬—৫। হোলকার পক্ষে মুস্তাক আলীর ব্যর্থতা বিশেষ লক্ষ্যের ব্যাপার। তাহার খেলা দেখিয়া মনে হয় যে, অষ্ট্রেলিয়া সফরে মুস্তাকের ঘটনা-পরম্পরায় অনুপস্থিতি ভারতীয় দলের কোন রকমেই শক্তিহ্রাসের কারণ হয় নাই। জগদেলের সাবলীল ব্যাটিং প্রশংসনীয় হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে জগদেল দ্বিতীয় ইনিংসে শত রাণে বঞ্চিত হয়। প্রথম জুটীর খেলায় সুকলার ও কুঞ্জরু চমৎকার ব্যাটিং দেখিয়া আমাদের স্বভাবতঃই মনে হইতে থাকে যে, উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে প্রকৃত অনুশীলনের ব্যবস্থা না হইলে আমাদের ক্রিকেট-ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির কোন আশাই নাই।

ফলাফল :—

রাণ-সংখ্যা

হোলকার—১ম ইনিংস—২১১ (কুঞ্জরু ৫২, জগদেল ৩১, বৈদ ২৩, ভায়া ৫১, এস ব্যানার্জী ৪৫ রাণে ৩টি, পি চ্যাটার্জী ৬০ রাণে ২টি)।

বাঙলা—১ম ইনিংস—৭৫ ([illegible]) গাইকোয়াড় ৫৪ রাণে ৫টি, নাইডু ৩৩ রাণে ৪টি)।

হোলকার—২য় ইনিংস—২৬৭ (জগদেল ৯৬, মুস্তাক আলী ২৭, ভায়া ৪৫, নাইডু ২৩, গাইকোয়াড় ২১, এস ব্যানার্জী ৫০ রাণে ৭টি, এস মুস্তাকী ৪১ রাণে ২টি)।

বাঙলা—২য় ইনিংস—২৫৬ (পি রায় ১০৬, পার্কিস ৫০, বৈদ ৩৭ রাণে ৫টি, গাইকোয়াড় ৪৪ রাণে ৩টি)।

নিঃ ভাঃ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা :—

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনায়াসে এক ইনিংস ও ২১ রাণে পরাজিত করিয়া বোম্বাই উপর্য্যুপরি চার বৎসর রোহিণ্টনবারিয়া কাপ-বিজয়ী হইয়াছে। ফাইন্যালে বিজিত আগ্রা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী লক্ষ্ণৌকে পরাজিত করিয়া শেষ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। লক্ষ্ণৌর বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রাণে অগ্রগামী থাকিয়াও কলিকাতা শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট ১৭ রাণে পরাজয় বরণ করে। কলিকাতার অধিনায়ক দিলীপ ঘোষ প্রথম দফায় মাত্র ২২ রাণে ৭টি উইকেট দখল করে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে নৈরাশ্য-জনক ফিল্ডিংএর সুযোগে লক্ষ্ণৌ যথেষ্ট রাণ করে। প্রত্যুত্তরে কলিকাতা ব্যাটসম্যানগণ হঠকারিতা ও অহেতুক ব্যস্ততার ফলে মাত্র ১৫৪ রাণে সকলে আউট হইয়া যায়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাকে আন্তঃ প্রাদেশিক খেলার প্রস্তুতি-পর্ব্ব বলা চলিতে পারে। সেই খেলাতেও আমাদের খেলোয়াড়েরা উপযুক্ত গুরুত্ববোধের ও আত্মনির্ভরতার আশাতীত অভাবে বার বার লাঞ্ছিত হয়েই চলেছে।

জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা :—

এবার কলিকাতায় দশম বার্ষিক জাতীয় ও আন্তঃ প্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর জমে! আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে চেক-খেলোয়াড়দ্বয় জনা ও এণ্ডি য়েডজ সিঙ্গলসে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জনা বিজয়ী হয়। এই দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে জনার খেলার কৌশল বেশী কার্য্যকরী হইলেও এণ্ডি য়েডিজেরও খেলা অধিকতর দর্শনীয় ও সাবলীল হয়। তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের আগন্তুক জুটীদ্বয় বার্ণা ও বেলাক এবং জাবাডোস ও কেলেনের খেলা এদের তুলনায় আরও উন্নত স্তরের বলিয়া মনে হয়। ডাবলস্ ফাই-ন্যালে তাহারা চন্দ্রাণা ও শিবরামণকে পরাজিত করে। এই অনুষ্ঠানের কোন বিভাগেই বাঙলা চরম সম্মানের অধিকারী হইতে পারে নাই।

বেঙ্গল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব পরিচালিত উক্ত প্রতিযোগিতার অবসান হইয়াছে। সিঙ্গলস ফাইন্যালে গত বৎসরের বিজয়ী দিলীপ বসু ভারতের সেরা খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

ফলাফল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস :—সুমন্ত মিশ্র ৬—৪, ৬—৩ ও ৮—৬ সেটে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস :—সুমন্ত মিশ্র ও মনোমোহন ৬—৪, ১০—৮ ও ৬—৪ সেটে দিলীপ বসু ও খসু সেনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস :—মিসেস কে সিং ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—৩ সেটে মিস খান্নাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস :—দিলীপ বসু ও মিসেস মোদী ৬—৩ ও ৬—২ সেটে মানমোহন ও মিসেস কে সিংকে পরাজিত করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতা।—

তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনায় কোন বিষয়েই একমত হইতে না পারায় গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় কেহই বিস্মিত হয় নাই। এই সম্মেলন যে ব্যর্থ হইবে, সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই সে-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি এইরূপ আকস্মিক ভাবে সম্মেলন শেষ হওয়ার আশা হয়ত অনেকে করেন নাই, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সম্মেলন চূড়ান্তরূপেও ভাঙ্গিয়া যায় নাই,—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয় আবার কবে মিলিত হইবেন, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যর্থতার দায়িত্ব বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন এবং মার্কিণ রাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল যে-ভাবে রাশিয়ার উপর চাপাইয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। গত ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছেন: **"Ever since its existence, the Foreign Ministers' Council had alternated between carrying out its original intentions and being used for entirely different purposes. The work to bring about agreement had, therefore, been handicapped."** অর্থাৎ 'গোড়া হইতে পররাষ্ট্র-সচিব কাউন্সিল একবার ইহার মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং আবার 'সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কাউন্সিলকে নিয়োজিত করা হইয়াছে।' পররাষ্ট্র-সচিব কাউন্সিলকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কে নিয়োগ করিয়াছে এবং কি এই উদ্দেশ্য, তাহা তিনি গোপন রাখেন নাই। মিঃ বেভিন ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স একটা মতৈক্যে আসিতে চাহিয়াছে, আর রাশিয়া এই সম্মেলনকে বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্যের প্ল্যাটফরম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। মিঃ বেভিন বলিয়াছেন: **'Unfortunately, propaganda showed through all the discussions throughout the three weeks of the conference. It made it really impossible for us to get to grips with the fundamental principles involved."** অর্থাৎ 'দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্মেলনে তিন সপ্তাহব্যাপী সমস্ত আলোচনার মধ্যেই প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। ইহারই জন্য সংশ্লিষ্ট মূলনীতিগুলিকে আয়ত্তে আনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।'

মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল লণ্ডন সম্মেলন হইতে দেশে ফিরিয়া ২০শে ডিসেম্বর ওয়াশিংটন হইতে এক বেতার বক্তৃতায় লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ব্যর্থতার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তিনটি শব্দ দ্বারাই তাহা সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রয়টারের সংবাদে বলা হইয়াছে: **"Mr Marshall accused Russia of 'obstruction, frustration of carping criticism' in causing the failure of the London meeting of the Council of Foreign Ministers."** অর্থাৎ 'লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিব-কাউন্সিলের অধিবেশন ব্যর্থ হওয়ার জন্য মিঃ মার্শাল রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি, বিফলতা সৃষ্টি এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।' লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য মিঃ বেভিন এবং মিঃ মার্শাল উভয়েই রাশিয়াকে দায়ী করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে সাত সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয়ের মস্কো সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্বও তাঁহারা রাশিয়ার উপরেই চাপাইয়াছিলেন। সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদা' লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতাকে "New victory of Soviet deplomacy"—'সোভিয়েট কূটনীতির নূতন বিজয়' বলিয়া অভিহিত করায় অনেকের মনেই হয়ত সন্দেহ জাগিতে পারে যে, রাশিয়া এই সম্মেলনের ব্যর্থতাই চাহিয়াছিল। কিন্তু সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হওয়ার দুই দিন পূর্ব্বে বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতা এড়ান অপেক্ষা এই সম্মেলন ব্যর্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা মীমাংসা হইলে মার্শাল পরিকল্পনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা কি বৃটেন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতা যে মার্শাল পরিকল্পনারই প্রথম বিজয় সূচনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা পটস্‌ডাম চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহাই রাশিয়ার অভিমত। রাশিয়ার এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই এবং [illegible] কে কার্য্যকরী করিবার উপায় মাত্র, তাহা ক্রমেই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে। পটস্‌ডাম সম্মেলনে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয় জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি, নাৎসী দল এবং কার্টেল, ট্রাষ্ট প্রভৃতি শিল্প-সংহতি ধ্বংস করিবার এবং জার্ম্মাণীকে গণতান্ত্রিক করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ

হইয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে বৃটেন এবং আমেরিকা সম্বন্ধে প্রথমোক্ত তিনটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকার উপর বৃটেনের অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য রূঢ় অঞ্চলের শিল্পগুলিতে নাৎসী শিল্পপতিদেরই প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী যে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হইবে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই এবং এই সমাজতন্ত্র যে বেভিন-মার্কা সমাজতন্ত্র হইবে না, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক জার্ম্মাণী আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্র হইয়া থাকিতে চাহিবে না, ইহাও সত্য। জার্ম্মাণীর শিল্পাঞ্চলগুলি বাদ দিয়া মার্শাল পরিকল্পনাও সাফল্য-মণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই লণ্ডন সম্মেলনের ব্যর্থতা যে মার্শাল পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, লণ্ডনের পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়া কত দূর গড়াইবে?

মার্শাল পরিকল্পনা ইউরোপকে পরস্পরবিরোধী দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই বিভাগের কাজ পাকা হইয়াছে লণ্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায়। কিন্তু এই ব্যর্থতার পরিণামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক যুদ্ধ যে পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, ইহাও অনস্বীকার্য্য। মার্কিণ পত্রিকায় ইহাকে 'cold war' বা 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু লণ্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর এই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। কোথায় কোথায় এই যুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা, তাহা অবশ্যই আলোচনা করা যাইতে পারে। উত্তর-গ্রীসে কম্যুনিষ্টদের গরিলা গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় গৃহযুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স ও ইটালীতেও গৃহযুদ্ধের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। গ্রীসে, ফ্রান্সে এবং ইটালীতে এই গৃহযুদ্ধ কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট বিরোধীদের যুদ্ধ হইলেও পরোক্ষ ভাবে এই যুদ্ধ রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে-সকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী প্রতিবাদের ব্যবস্থা হইতেছে, তাঁহারা যদি সেইখানেই রাশিয়ার হস্তক্ষেপ দেখিতে পান, তাহা হইলে ডলারের মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। কিন্তু লণ্ডন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় রুশ-মার্কিণ কূটনৈতিক বিরোধ গ্রীস, ফ্রান্স ও ইটালী অপেক্ষা জার্ম্মাণীতেই তীব্রতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা অনেকের মনেই জাগিয়াছিল। অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অতঃপর বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স স্বতন্ত্র ভাবে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিবে। কিন্তু মিঃ মার্শাল তাহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। আমেরিকা অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্র ভাবে সন্ধি করিতে উদ্যোগী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ওয়াশিংটনের দায়িত্বশীল মহল মনে করেন যে, কোরিয়া, চীন ও জাপান—প্রাচীর এই তিনটি দেশে অদূর ভবিষ্যতে রুশ-মার্কিণ কূটনৈতিক বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

রাশিয়া জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের কোরিয়া কমিশন সমর্থন করে নাই। রাশিয়ার দৃষ্টিতে এই কমিশন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবু যে এই কমিশন কোরিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচনে তদারক করিতে বিরত থাকিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। রাশিয়া যদি এই কমিশনকে উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে না দেয়, তাহা হইলে কমিশনের কর্ম্ম-তৎপরতা আবদ্ধ থাকিবে শুধু দক্ষিণ-কোরিয়ায়। দক্ষিণ-কোরিয়ায় আমেরিকার মনোমত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেও কোরিয়া বিভক্তই থাকিবে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ হইতে রাশিয়াকে বহিস্কৃত করিবার কি কোন চেষ্টা হইবে? কে জানে? কিন্তু অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্য ভবিষ্যতে উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। এই বিরোধের পরিণাম রাশিয়া, না আমেরিকার অনুকূল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? চীনা কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য চীনের তথাকথিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য দানও রুশ-মার্কিণ কূটনৈতিক বিরোধকে তীব্র করিয়া তুলিতে কম সহায়তা করিবে না। চীনা কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিবার জন্যই যে চিয়াং কাইশেককে আমেরিকার সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, তাহা মার্কিণ কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের পদ্ধতি লইয়া রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। জাপ সন্ধি-সম্মেলনে রাশিয়া যদি ভেটো ক্ষমতা বর্জ্জন করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে রাশিয়াকে বাদ দিয়াই আমেরিকা জাপানের সহিত সর্ত্ত নির্দ্ধারণের আলোচনা আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিবে কি? এই প্রশ্নের উত্তর চীন কি করিবে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। জাপ সন্ধি-সম্মেলনে অন্যান্য মিত্রশক্তির যোগদান সম্পর্কে চীনের আপত্তি নাই বটে, কিন্তু ভেটো ক্ষমতা সম্পর্কে চীন রাশিয়ার সহিত একমত। জাপ সন্ধি সম্মেলনে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের ভেটো ক্ষমতা বর্জ্জন চীন সমর্থন করে না। আমেরিকা ও বৃটেন যদি চীনকে তাহাদের মতাবলম্বী করিতে পারে, তাহা হইলেই শুধু রাশিয়াকে বাদ দিয়া জাপ-সন্ধি-সম্মেলন আরম্ভ হওয়া সম্ভব। চীনকে বাদ দিয়া আমেরিকা জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের আলোচনা কিছুতেই আরম্ভ করিবে না। কিন্তু কম্যুনিষ্ট-দলনের জন্য আমেরিকার নিকট সাহায্যপ্রার্থী চীন আমেরিকার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিবে, ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব। রাশিয়াকে বাদ দিয়া জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের আলোচনা যদি সত্যই আরম্ভ হয়, তাহা হইলে রুশ-মার্কিণ মতভেদ চূড়ান্ত আকার গ্রহণ করিবে। তখন রাশিয়াকে বাদ দিয়া জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু ইহার পরিণাম হইবে দ্বিধা-বিভক্ত জার্ম্মাণী। এই ভাবেই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ক্রমশঃ সশস্ত্র যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিবে।

গ্রীক গরিলা গবর্ণমেণ্ট—

গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) উত্তর গ্রীসে জেনারেল মার্কস ভাফিয়াডেসের নেতৃত্বে গরিলা গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় গ্রীসের গৃহযুদ্ধে এক নূতন পর্য্যায় সুরু হইয়াছে। গরিলা গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, এথেন্সস্থিত বৈদেশিক মহলের মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট না কি গত ছয় মাস ধরিয়া এইরূপ গরিলা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন। গ্রীসের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকৃত

সংবাদ যদিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, তথাপি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই আশঙ্কা হইতেই গ্রীসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। গ্রীসের কম্যুনিষ্টদের পরিচালনাধীনেই এই গরিলা গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে। যাহারা মনে করেন যে, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই শুধু কম্যুনিজম পরিপুষ্টি লাভ করে, তাঁহারা গ্রীক গরিলা গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা হইতে এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সাহায্য সত্ত্বেও, গ্রীসের সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতি একটুও প্রশমিত হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রীসের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কিন্তু গ্রীসের তথাকথিত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট ধর্ম্মঘটের প্রেরণা দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভয় দেখাইয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বাধ্য করেন। ইহাতে কি ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট গ্রীক গণতন্ত্রের স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হয় নাই?

সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট ছাড়া অন্যান্য বামপন্থীদিগকে লইয়া গ্রীক গবর্ণমেন্টের ভিত্তিকে আরও ব্যাপক করিবার জন্য যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হওয়ার পরই জেনারেল মার্কস গরিলা গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রীসের সরকারী মহল যে এই গবর্ণমেন্টকে গ্রীক জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া মনে করিবেন না, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এথেন্সস্থিত মার্কিণ-মহল যদি গ্রীক গরিলা গবর্ণমেণ্ট গঠনকে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। প্যারী নগরীর সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'লি মোঁ' (Le Monde) তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহাকে "কমিনফরমে"র কার্য্যাবলীর নূতন অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই পত্রিকাখানিতে ফরাসী গবর্ণমেন্টের বৈদেশিক নীতিই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। গরিলা গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ায় গ্রীসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্ষেত্রে অতি দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন ঘটিবে এ কথা কেহ-ই মনে করেন না। কম্যুনিষ্টরা গ্রীসের যে-সকল অঞ্চল দখল করিয়া রহিয়াছেন, সেই সকল অঞ্চলে তাঁহারা যে তাঁহাদের শক্তিকে সংহত করিতে চান, গরিলা গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এই গরিলা গবর্ণমেন্ট গঠনকে উপলক্ষ করিয়া গ্রীক গবর্ণমেন্টের দমন-নীতি যে অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিতেছে, তাহার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। গরিলাদের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিশীল, তাঁহাদের সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) সরকারী ভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা অভিযান দ্বারা ৫০০ কম্যুনিষ্টকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট আত্মরক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ২৫০ জন কম্যুনিষ্টকেও পুলিশ গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। যে চৌদ্দ হাজার নির্ব্বাসিত বামপন্থীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

গ্রীক জনসাধারণের উপর দমন-নীতি চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক গরিলাদের সহিত গ্রীক গবর্ণমেন্টের যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারও কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংবাদে প্রকাশ যে, কোনিৎসা অঞ্চলে গ্রীক গবর্ণমেন্টের সৈন্যবাহিনী কম্যুনিষ্ট গরিলাদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। গ্রীসে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে সাহায্যদানের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। মার্কিণ নৌবহর ভূমধ্যসাগরে যাওয়ারও এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মঃ সোফোলিস এই সংবাদকে গ্রীসকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্কল্প বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রীক গরিলা গবর্ণমেন্টকে মানিয়া লওয়া সম্পর্কে বুলগেরিয়া, আলবানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াকে সতর্ক করিয়া দিতেও ভুলেন নাই। সব সত্ত্বেও গ্রীসের গৃহযুদ্ধের অবস্থা যে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনে যাহা ঘটিতেছে গ্রীসে তাহারই পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীসের পররাষ্ট্র-সচিব মনে করেন যে, গরিলা গবর্ণমেন্টের আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বিচার্য্য বিষয়। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেও কোন ফল হইবে কি? গ্রীক-যুগোশ্লাভ সীমান্তে গরিলাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গঠিত আন্তর্জ্জাতিক কমিশন এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারে নাই।

ফ্রান্সে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের পরিণতি—

ফ্রান্সের সংবাদে এক দিকে বলা হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ধর্ম্মঘটকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছে, আবার এ কথাও বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকখানি পূর্ণ করা হইয়াছে। জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু বেতন বৃদ্ধির দাবী লইয়াই যে ফ্রান্সের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। তাহাদের দাবী অনেকখানি পূরণ হওয়ার অর্থ ধর্ম্মঘটের সাফল্য ছাড়া আর কিছু বুঝায় বলিয়াও মনে করা কঠিন। তাই যদি হয়, তবে শ্রমিক ধর্ম্মঘট চূর্ণবিচূর্ণ করার অর্থ কি? ইহার অর্থ খুবই যে তাৎপর্য্যপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিটা যেমন প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই, তেমনি সোশ্যালিষ্টরা শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার্ম্মাণীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেও এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল। ফ্রান্সে শ্রমিকদের মধ্যে এই ভেদ সৃষ্টি জেনারেল দ্য গলের হাতে শাসন-কর্ত্তৃত্ব যাওয়ার পূর্ব্ব সূচনা মাত্র।

ইতিমধ্যেই জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সে একদলীয় সুদৃঢ় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার ধূয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান কোয়ালিশন গবর্ণমেন্টকে তিনি উপযুক্ত শক্তিশালী বলিয়া মনে করেন না। কাজেই ধর্ম্মঘট বিধ্বস্ত হওয়ার পরে তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থানের যে কথা উঠিয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হওয়ায় যে-তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা, তাহা যে সোশ্যালিষ্ট নয় এ কথাও সত্য। শ্রমিকরা যত দিন কম্যুনিষ্টদের পক্ষে থাকিবে, তত দিন কম্যুনিষ্টবিরোধী আন্দোলন শ্রমিক-বিরোধী আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় সে-কথা বলিবার উপায় যেমন থাকিবে না, তেমনি সোশ্যালিষ্ট দলের পক্ষেও একক ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব। সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টিই বৃহত্তম দল হইলেও সোশ্যালিষ্টদের সহযোগিতাতেই কম্যুনিষ্টদিগকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইতেছে। ধর্ম্মঘট বিধ্বস্ত হওয়ার মন্ত্রিসভা হইতে সোশ্যালিষ্টরা বিতাড়িত হওয়ার সময়

আসিয়াছে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা ঐ দলেরই হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা। আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী সাহায্যই এ কার্য্য সমাধা করিবে মনে করিলে ভুল হইবে না।

রুমানিয়ার রাজার সিংহাসন ত্যাগ—

রুমানিয়ার ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক রাজা মাইকেল গত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) সিংহাসন ত্যাগ করায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আর একজন মাত্র রাজা অবশিষ্ট রহিলেন গ্রীসের রাজা পল। যে সিংহাসন ত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি রুমানিয়ার রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক বৎসরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে বিপুল পরিবর্ত্তন রুমানিয়ায় সাধিত হইয়াছে, তাহাতে জাতীয় জীবনের নিয়ামক প্রধান প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন সম্বন্ধ। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাজা মনে করেন যে, রুমানিয়ার জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান পরিস্থিতির পক্ষে রাজতন্ত্র আর উপযোগী নহে এবং দেশের উন্নয়নের পক্ষে গুরুতর বাধাস্বরূপ। রাজা মাইকেল পদত্যাগ করায় রুমানিয়ায় প্রজাতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকা এই ব্যাপারে বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট না কি এই ঘটনার গুরুত্ব অনুভব না করিয়া পারেন নাই। বুর্ব্বোঁ-বংশীয় রাজকুমারী এ্যানের সহিত তাঁহার বিবাহের ব্যয় বহন করা রুমানিয়ার পক্ষে সাধ্যাতীত, রাজা মাইকেলের মন্ত্রিবর্গ এই অভিমত প্রকাশ করাই এই পদত্যাগের কারণ বলিয়া মনে করা কঠিন। মিঃ চার্চ্চিল না কি রাজা মাইকেলকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসন ত্যাগকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ দেওয়াই যে মিঃ চার্চ্চিলের উপদেশের সার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা মাইকেল এ বিষয়ে বৃটেন ও আমেরিকাকে নিরাশ করিয়াছেন।

মাইকেলের পিতামহ রাজা ফার্ডিনাণ্ড ১৯২৭ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা ক্যারল তখন রাজনৈতিক কারণে ফ্রান্সে নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছিলেন। কাজেই রুমানিয়ার রাজ-সিংহাসনে বসিলেন ছয় বৎসর বয়স্ক বালক মাইকেল। কিন্তু তাঁহার পিতা ক্যারল ১৯৩০ সালে হঠাৎ বিমানযোগে রুমানিয়ায় পৌঁছিয়া নিজকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করায় আকস্মিক ভাবে মাইকেলের রাজত্বের অবসান ঘটে। রাজা (দ্বিতীয়) ক্যারলকেও জার্ম্মাণীর চাপে ১৯৪০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়। নাৎসী-অধিকারের সময় মাইকেল কার্য্যতঃ বন্দী অবস্থাতেই বাস করিতেন। ১৯৪৪ সালের ২৩শে আগষ্ট রুশ সৈন্যবাহিনী যখন তাঁহার প্রাসাদ হইতে ৭০ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন জাতীয় কৃষক-দল, উদারনৈতিক দল এবং সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দলের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতায় রাজা মাইকেল ফ্যাসিষ্ট শাসনের উচ্ছেদ করেন। রাশিয়া তাঁহাকে 'সোভিয়েট অর্ডার অব ভিক্টোরী' দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিল।

রাজসিংহাসন ত্যাগ বা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের গত নয় বৎসরের ইতিহাসে নূতন কোন ঘটনা নয়। ১৯৩৯ সালে ইটালীর আক্রমণে আলবানিয়ার রাজা জগ বিতাড়িত হন। ১৯৪০ সালে রুমানিয়ার রাজা দ্বিতীয় ক্যারলের সিংহাসন ত্যাগের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার গণপরিষদ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করায় রাজা দ্বিতীয় পিটার সিংহাসন হারান এবং যুগোশ্লাভিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভোটাধিক্য হওয়ায় রাজা দ্বিতীয় সাইমনের রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রেরও অবসান হয়। ইটালীতে রাজতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল (তৃতীয়) ১৯৪৬ সালের মে মাসে পুত্র উম্বার্টোর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ সালের জুন মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভোটাধিক্য হওয়ায় ইটালীতে উম্বার্টোর রাজত্ব এবং রাজতন্ত্র উভয়ের অবসান হইয়াছে। সম্প্রতি ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল মিশরে নির্ব্বাসিত অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ—

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত যদি সত্যই কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে ১৯৪৮ সালেই প্যালেষ্টাইন বিভক্ত হইবে এবং শত্রুভাবাপন্ন আরব-জগতে গঠিত হইবে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র। প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন বহাল থাকা অপেক্ষা এই ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক সদস্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও প্যালেষ্টাইন হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্যালেষ্টাইন বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আরব লীগের জেনারেল সেক্রেটারী আজম পাশা বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভক্ত করা হইলে আরবরা কি করিবে তাহার পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বে গঠন করা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) পর্য্যন্ত কায়রো সহরে আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অবশ্য কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সম্মেলনের পর যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, আরবদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ যে ব্যর্থ হইবে এবং শেষ বিজয় লাভ না করা পর্য্যন্ত আরবরা যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে, বিশ্ববাসী তাহা অবশ্যই দেখিতে পাইবে। আরবদের এই হুমকী কত দূর পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

মধ্য-প্রাচীর আরব রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কিরূপ? প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিতে পারে এরূপ সৈন্যবল মিশর, সিরিয়া এবং লেবানন কাহারও নাই। ট্রান্সজর্ডানের আরব লিজিয়নই একমাত্র সুগঠিত এবং সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যবাহিনীর অফিসারগণ সকলেই বৃটিশ। এই সৈন্যবাহিনীকেও প্যালেষ্টাইন আক্রমণের মত বড় বলিয়া কেহ মনে করেন না। অবশ্য সমগ্র আরব রাষ্ট্রের মিলিত সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। কিন্তু এই সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক কোন্ আরব রাষ্ট্র হইতে মনোনীত করা হইবে, ইহা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। শোনা যায়, প্যালেষ্টাইনের ভাবী শাসন-কর্ত্তৃত্ব আরব উচ্চতর কমিটির হাতে ন্যস্ত করার যে অভিপ্রায় সিরিয়া, লেবানন এবং সৌদী আরব প্রকাশ

করিয়াছিল, ইরাক এবং ট্রান্সজর্ডান তাহার বিরোধী। মিশর না কি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের মতানৈক্য দূর করিতে পারে নাই। কোন কোন আরব রাষ্ট্র না কি প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য জাতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়োগের বিরোধী; তাঁহারা প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য শুধু স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা গঠিত সৈন্যবাহিনীরই সমর্থক। বস্তুতঃ, মিশরের রাজা ফারুক এবং সৌদি আরবের রাজা ইবন সৌদের মধ্যে ইসলামী জগতের নেতৃত্ব লইয়া একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। উভয়ের প্রত্যেকেই পুনরায় খেলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং নিজে খলিফা হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন। এক দিকে ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান এবং আর এক দিকে ইবন সৌদ এই দুই পক্ষের মধ্যে পুরাতন পারিবারিক কলহের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লার পিতা এবং ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফৈজলের পিতামহ মক্কার প্রধান শেরিফ হোসেনকে বিতাড়িত করিয়াই ইবন সৌদ তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইরাকের বর্ত্তমান বালক রাজা রাজা আবদুল্লার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র। রাজা আবদুল্লার বৃহত্তর সিরিয়া আন্দোলনকে সিরিয়া অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান এবং ইরাক লইয়া বৃহত্তর সিরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলে ভূমধ্যসাগর এবং পারস্য উপসাগর উভয়ের সহিতই এই রাষ্ট্রের সংযোগ সাধিত হইবে। মিশরের রাজা ফারুক এইরূপ একটি বৃহৎ আরব-রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লেবাননের খৃষ্টানরাও বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলন সমর্থন করে না। আরব-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই কলহ, অবিশ্বাস এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইয়া তাহাদের সাম্মিলিত অভিযান যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও অভিযানের বিপুল ব্যয় কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে এবং তহবিল কাহার হাতে থাকিবে তাহাও বড় কম কঠিন সমস্যা নয়। আরব রাষ্ট্র-সমূহের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কাজেই আরব রাষ্ট্রসমূহের প্যালেষ্টাইন আক্রমণ কতখানি সম্ভব হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা অবশ্য বলিয়াছেন, 'My troops are Arab and they are free. They will remain in the service of the Palestine Arabs if the latter are threatened.' ট্রান্সজর্ডানের সৈন্যবাহিনীর কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরীক্ষিত বহুসংখ্যক ইহুদী সৈন্য সংগৃহীত করিতে পারিবে। অনেকে মনে করেন যে, ইহুদীরা নিজেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আরব রাষ্ট্রসমূহের প্যালেষ্টাইন আক্রমণ যদি সম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও প্রবল আরব-ইহুদী সঙ্ঘর্ষ উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ, ইতিমধ্যেই আরব ও ইহুদীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছে এবং বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার পর এই সংঘর্ষ আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে। প্যালেষ্টাইন ত্যাগের সময় বৃটিশ আরবদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া যাইতে পারে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করেন। এ পর্য্যন্ত দুই বার সশস্ত্র আরবরা বৃটিশ পুলিশের অস্ত্রাগার হইতে প্রথম দফায় ৩২০টি রাইফেল, ব্রেন-গান এবং ষ্টেন-গান ও ৬০ হাজার গুলী এবং দ্বিতীয় দফায় ৭৫টি রাইফেল, ৩ হাজার গুলী এবং কতকগুলি ষ্টেন-গান ও পিস্তল লইয়া গিয়াছে। অনেক বৃটিশ অফিসার স্বেচ্ছাসেবক সাজিয়া আরবদিগকে সাহায্য করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কথা অনেক দিন পূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কপটতাপূর্ণ বৃটিশ নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই চলিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজা ফৈজলকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিলে প্যালেষ্টাইনকে সংযুক্ত আরবের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার কয়েক মাস পরেই উয়েইজম্যানের নিকট চিঠি লিখিয়া ব্যালফুর প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু যুদ্ধের পর যুক্ত আরব রাষ্ট্রের স্বপ্নই শুধু ব্যর্থ হয় নাই, প্যালেষ্টাইনের দুই-তৃতীয়াংশ ট্রান্সজর্ডানকে প্যালেষ্টাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবদুল্লার রাজ্য গঠন করা হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা অসম্ভব। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনে যে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে, তাহাতে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘেরও হইবে ভরাডুবী। আর স্বাধীন ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র গঠিত হইলেও প্যালেষ্টাইনে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কোন আশা দেখা যায় না।

স্বাধীন ব্রহ্মদেশ—

৬১ বৎসর ১ মাস ১ দিন পরে গত ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪৮) ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর পাঁচ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ দীর্ঘকালের পরাধীন এশিয়ার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিতেছে, এ কথা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রথমে স্থির হইয়াছিল, ৬ই জানুয়ারী ব্রহ্মদেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। পরে ৪ঠা জানুয়ারীই ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ধার্য্য হয়। বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে ব্রহ্মদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে শুভ কামনাসূচক বাণী। বৃটিশের অধীন দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশই সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীনতা লাভ করিল, ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু গত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনে যে ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া ব্রহ্মের এই স্বাধীনতা এবং এশিয়া মহাদেশে বৃটিশ-নীতির তথাকথিত বিপ্লবাত্মক নীতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দিবসেই ব্রহ্ম পার্লামেণ্টে এই চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের রক্ষা-ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কই এই চুক্তির বিষয়-বস্তু। ব্রহ্মের রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুসারে অতি সত্বর ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইবে এবং অতঃপর বৃটেন ব্রহ্মদেশে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ এবং ব্রহ্মদেশের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। জরুরী অবস্থায় ব্রহ্মদেশ বৃটেনের নিকট সামরিক সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে। চুক্তির অর্থ নৈতিক দিক্‌ হইতে দেখা যায়, ব্রহ্মদেশের পুনর্গঠনের জন্য বৃটেন যে ঋণ দিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মকুব করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ঋণ ব্রহ্মদেশ শোধ করিবে ২০টি বাৎসরিক কিস্তিতে। বাণিজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্পর্ক সংক্রান্ত সর্ত্ত নির্দ্ধারিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত চুক্তিপত্রের সহিত সংযুক্ত নোট অনুসারে বাণিজ্য সম্পর্ক পরিচালিত হইবে।

উল্লিখিত চুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সামরিক দিক্ হইতে বৃটেনের উপর ব্রহ্মের যে নির্ভরশীলতা রহিয়া গেল, তাহা ব্রহ্মের সার্ব্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বৃটিশ মূলধনের দ্বারা। বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমস্তই বৃটিশের হাতে। কয়েকটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মের চাউলের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল রপ্তানি হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ বৃটিশ মূলধনে পরিচালিত চাউলের কলে ভানা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের বনসমূহের বেশীর ভাগই বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা দেওয়া আছে। পেট্রোলিয়াম শিল্প ব্রহ্মদেশের একটি প্রধান শিল্প। এই শিল্পের তিন-চতুর্থাংশই বৃটিশের হাতে। ব্রহ্মের রৌপ্য খনি ও টুংস্টান খনিও বৃটিশের হাতেই। কত দিনে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ মূলধনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে তাহা বলা কঠিন। ব্রহ্মদেশ সমাজতন্ত্রী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও বৃটিশ মূলধনের প্রভাব সত্ত্বে তাহা সম্ভব হইবে কিরূপে? ব্রহ্মদেশের আয়তন ফ্রান্স অপেক্ষাও বৃহৎ, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ বর্ম্মী। বর্ম্মী ছাড়া ব্রহ্মদেশে মন্, শান এবং আরাকানী এই তিনটি জাতি আছে। মনুরা বাস করে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের অধিত্যকায় বাস করে শান জাতি। বর্ম্মীরা ৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে আগমন করে। ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মী রাজা আনোরাতা মনদের রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু বর্ম্মীরা মনদের বর্ণমালা এবং হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আনোরাতার বংশ ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং এই সময়ই চীনের মোগল সম্রাট্ কুবলা খান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। অতঃপর বর্ম্মী রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ম্মী রাজাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। বর্ম্মী রাজ আলাউঙ্গপায়া মনদের পেগু রাজ্য দখল করেন। তাঁহার বংশধরগণও রাজ্যবিস্তারে মন দিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্যাম রাজ্য ও আরাকান দখল করেন। অতঃপর ব্রহ্মরাজ ১৮২১ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইলে বৃটিশের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৮২৪-২৬ সালের প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে বৃটিশ আরাকান এবং টেনাসেরিম দখল করে। ১৮৫২ সালে পেগু বৃটিশের অধিকারে আসে। ১৮৮৫ সালে বৃটিশ দখল করে সমগ্র ব্রহ্মদেশ। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ বৃটিশের শাসন হইতে মুক্ত হইল।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হওয়ার ৭ বৎসরের মধ্যেই জেনারেল আউঙ্ সানের পিতা বোমিন্ আউঙ্ প্রথম বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তার পর আরও কয়েক বার বিদ্রোহ হইয়াছিল। ১৯২০ সালের ছাত্র-বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩০ সালে তোরাওয়ারী জেলায় সায়া সানের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ হয়। সমাজতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক্ করা হয়। অতঃপর জাপ আক্রমণ, জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ দখল, জাপ কবল হইতে ব্রহ্মদেশের উদ্ধার এবং জেনারেল আউঙ্ সানের নেতৃত্ব সমস্তই আধুনিক ঘটনা। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ চারিটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল ইউনিটে বিভক্ত হইবে: (১) ব্রহ্ম (২) শান রাজ্য (৩) কাচিন রাজ্য এবং (৪) কারেন পার্ব্বত্য রাজ্য। ব্রহ্মদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল এ-এফ-পি-এফ-এল্ অর্থাৎ এন্টি-ফ্যাসিষ্ট পিপুলস্ ফ্রিডম লীগ। এই দলই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টে নেতৃত্ব করিতেছেন। এই রাজনৈতিক দলটি কতকগুলি উপদল লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে সোশ্যালিষ্ট পার্টি এবং পিপুলস্ ভলান্টিয়ার অরগেনিজেশন মিলিত হইয়া মার্ক্সিষ্ট লীগ গঠিত হইয়াছে। মার্ক্সিষ্ট দল, স্বতন্ত্র দল এবং সীমান্তের নেতারা সকলেই এ-এফ-পি-এফ-এল-এর সহিত সহযোগিতা করিতে প্রতিশ্রুত। একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিই ব্রহ্ম পার্লামেণ্টে বিরোধী দলরূপে থাকিবে।

উ স ও অপর আট জনের প্রাণদণ্ড—

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী আউঙ্ সান ও তাঁহার সহকর্মীদের হত্যার মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ স এবং অপর ৮ জন আসামীর প্রতি গত ৩০শে ডিসেম্বর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ১ই অক্টোবর এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়।

উ স মায়োচিৎ দলের নেতা। জাপ আক্রমণের পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি বিলাতে যাইয়া ব্রহ্মদেশকে ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা দিবার জন্ত মিঃ চার্চ্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া দেশে ফিরিবার পথে জাপানের সহিত সংযোগ রক্ষার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করা হয়। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে উগাণ্ডায় আটক রাখা হইয়াছিল।

রাশিয়ার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি—

রাশিয়া যে-ভাবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধের সময় রাশিয়াতেও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। সেই সঙ্গে একটা বাজার-দরও প্রচলিত ছিল। এই বাজার-দরটাও সরকারী দর, চোরা-বাজারের দর নয়। অতঃপর নিয়ন্ত্রিত দর ও বাজার-দর বলিয়া পৃথক্ কিছুই রহিল না। যুদ্ধের সময় রাশিয়াতেও কিছু মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণী যে-অঞ্চল দখল করিয়াছিল, সেখানে জার্ম্মাণীও অনেক রুবল প্রচলন করিয়াছে। কাজেই রাশিয়ার দৃষ্টিতে নোটের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াছে। এই জন্ত রাশিয়া নূতন রুবল প্রচলন করিবে। ব্যাঙ্কে আমানত ৩ হাজার রুবল পর্য্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় বলিয়া অভিহিত। উহার পরিবর্ত্তে সম-পরিমাণ নূতন রুবল দেওয়া হইবে। ৩ হাজারের ঊর্দ্ধ ১০ হাজার রুবল মাধ্যমিক সঞ্চয় বলিয়া গণ্য। উহার পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ রুবলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ নূতন রুবল দেওয়া হইবে। উহার ঊর্দ্ধে সমস্ত রুবলের পরিবর্ত্তে উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ নূতন রুবল পাওয়া যাইবে। শুধু ব্যাঙ্কে রক্ষিত রুবল সম্বন্ধেই এই নীতি প্রযোজ্য। যাহারা ঘরে নগদ রুবল রাখিয়াছে তাহারা সঞ্চিত রুবলের পরিবর্ত্তে এক-দশমাংশ মাত্র নূতন রুবল পাইবে। নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্ত সরকারী ঋণের মূল্য এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া হইবে। কোন ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ নীতি গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। রুবলের আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার (১ পাউণ্ড = ২১ রুবল) অপরিবর্ত্তিতই রাখা হইয়াছে।

নূতন রুবল প্রবর্ত্তন করায় এবং আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিত রাখায় আন্তর্জ্জাতিক বাজারে রুবলের স্থান বহুগু

হইয়াছে। ইহাকে মার্শাল-পরিকল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে রাশিয়ার কূটনৈতিক অবস্থার দৃঢ়তাসূচক বলিয়া অনেকে মনে করেন।

ইরাণ-মার্কিণ সামরিক চুক্তি—

পারশ্যের মজলিস কর্ত্তৃক রাশিয়ার সহিত তৈলচুক্তি অগ্রাহ্য হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী গোভাম এস্ সুলতানে যে বেতার বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে অনেকেই রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মন্ত্রিসভার তিন জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তার পর পারশ্যের মজলিসে সুলতানের প্রতি অনাস্থা-সূচক প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) মজলিস বিপুল ভোটের সংখ্যাধিক্যে সর্দ্দার হেকমতকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মজলিসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রিসভা গঠন না করিয়াই তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন মঃ হাকিমি। তিনি ২১শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মঃ হাকিমি প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরেই ২৪শে ডিসেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে জানান যে, ১৯৪৭ সালের ৬ই অক্টোবর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পারশ্যের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পারশ্যের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারশ্য তাহার সামরিক বিভাগ সংক্রান্ত কোন কাজে আমেরিকার সম্মতি ব্যতীত অপর কোন বিদেশীকে নিয়োগ করিতে পারিবে না। রাশিয়ার সহিত তৈলচুক্তি মজলিস কেন অগ্রাহ্য করিল, ইহারই মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরাণ-মার্কিণ সামরিক চুক্তির সর্ত্তাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝায় যে, এই চুক্তি দ্বারা পারশ্যের সার্ব্বভৌমত্ব খর্ব্ব করা হইয়াছে। মজলিস কি চুক্তি অনুমোদন করিবে? মজলিসের কয়েক জন সদস্য এই চুক্তিকে অসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মজলিসকে এই চুক্তির কথাই পূর্ব্বে জানান হয় নাই। মজলিস যদি এই চুক্তি অগ্রাহ্য করে, তবে উহা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে কি? ইরাণের সৈন্যবাহিনীর জন্য রাশিয়া সামরিক উপদেষ্টা এবং টেকনিশিয়ান প্রদান করিবে, এইরূপ একটা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। উহা ব্যর্থ করাই ইরাণ-মার্কিণ সামরিক চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য।

চীনের গৃহযুদ্ধ—

চীনা কম্যুনিষ্টরা মুকডেন দখল করিতে সমর্থ হইবে, ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে এইরূপ সম্ভাবনা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আপাততঃ এই সম্ভাবনায় কতকটা ভাঁটা পড়িলেও মুকডেন বিপদ্মুক্ত হইয়াছে বলা যায় না। মুকডেন অধিকার করিতে পারিলে মাঞ্চুরিয়ায় কম্যুনিষ্টদের আধিপত্য সুদৃঢ় হইবে শুধু তাহাই নহে, চীনের উত্তর অংশের প্রদেশগুলিকে আক্রমণ করিতেও তাহাদের সুবিধা হইবে। গৃহযুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া কুয়োমিণ্টাং দল এবং তাঁহাদের মার্কিণ বন্ধুরা যে শঙ্কিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে চীনের তথা-কথিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিল শূন্য। ১৯৪৭ সালে ৪ কোটি চীনা-ডলার ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু রাজস্ব হইতে আয় হইয়াছে মাত্র এক কোটি ৩০ লক্ষ চীনা-ডলার। সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয়িত হইতেছে শুধু চীনের কম্যুনিষ্টদের দমনের জন্য। মিঃ বুলিট মনে করেন যে, আমেরিকাই শুধু এই গৃহযুদ্ধ দমন করিতে সমর্থ। চীনকে সাহায্য দিবার জন্য তিনি তিন বৎসরের একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বৎসরে ৪৫০০ লক্ষ ডলার হিসাবে তিন বৎসরে ১৩৫০০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। ইহাকে চীনের জন্য মার্শাল-পরিকল্পনার প্রসার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টে যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতা রহিয়াছে, তাহা দূর না হইলে চীনকে সাহায্য করিয়াও কিছু হইবে না, অনেক আমেরিকাবাসী এইরূপ মনে করেন। চীনে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কুয়োমিণ্টান দলের আধিপত্য দূর হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বন্দিনী

ডালি মুখোপাধ্যায়

ঘুচাব তোমার লজ্জা মা গো
ঘুচাব তোমার দুখ,
শৃঙ্খল হাতে বন্দিনী—
ভেঙ্গে যায় মম বুক।
কত শত তব পুত্র ও মা
মরে যে অনাহারে,
মোদেরি শস্য নিয়ে যায় মা গো
বিদেশীরা ভারে ভারে।
সোনার ভারত নাম এ দেশের
বিশ্বে সবাই জানে,
যতই শোষণ করুক তারা
মরব না মোরা প্রাণে।
সবারি লোভ ছিল যে মা গো
মোদের দেশের 'পরে,
দুর্ব্বল মোরা তাই ত রেখেছে
তাদের অধীন করে।
স্বাধীন ছিল ভারতবর্ষ
হায় রে মীরজাফর,—
নবাব হবার লোভে তুমি
ছিলে যে বিভোর।
তাই তুমি হায় যোগ দিলে যে
ইংরাজেরই সাথে,
নিজেই তুমি পরিয়ে দিলে
শৃঙ্খল মা'র হাতে।
আজ মোরা সব এক হব ভাই
হিন্দু-মুসলমান,
বন্দিনী মা'র দুঃখ মোরা
করব যে অবসান।

ভারতের শিল্প-সঙ্কট

নয়া দিল্লীতে শিল্প-সম্মেলন উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই অবনতি দেখা যায়। অর্থনৈতিক সঙ্কট ব্যাপারটিকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, আমরা সব দিক দিয়াই এক অভূতপূর্ব্ব শিল্প-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। একমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই এই সঙ্কট দূর করা সম্ভব।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সত্যকার কোন পরিকল্পনার কথা তিনি বলেন নাই। বোধ হয়, এখনও ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতায় আশ্বাসের কোন কারণ নাই বরং শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাজেট পেশ করিবার সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সন্মুখম্ চেট্টি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত পরিকল্পনা মাফিক শিল্পোন্নয়নের ধারণার বিশেষ সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাঁহাদের মতে শিল্প-সঙ্কট এড়াইবার এক মাত্র ঔষধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ শ্রমিক-ধর্ম্মঘট। অতএব শ্রম-বিরোধ আইনের সাহায্যে ধর্ম্মঘট বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইলেই সঙ্কট অতিক্রম করা সম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, উৎপাদন হ্রাস অথবা শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। মূল ব্যাধি নহে। ব্যাধি কি—তাহা ডক্টর মুখার্জ্জি নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু উল্লেখ করিবার সৎসাহস তাঁহার নাই। কংগ্রেস শিল্পপতিদের হাতের খেলনা মাত্র—এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বয়ং শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়াও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সচিব মহাশয় কেবল বক্তৃতায় উৎপাদন বাড়াইবার কথা না বলিয়া, ধর্ম্মঘট কেন হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করিলে আমরা সুখী হইতাম। প্রধান মন্ত্রীও এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্শে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘটের জন্য কেবল আন্দোলনকারীদের দায়ী করা ভুল। সুতরাং শিল্প-সঙ্কটের এবং উৎপাদন হ্রাসের প্রকৃত কারণ উল্লেখ করিলেই তাঁহার সদিচ্ছার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত।

যুদ্ধের সময় টাকায় পাঁচ টাকা লাভ করিয়া শিল্পপতিরা মূলধনের অধিক মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছে। ওদিকে জনসাধারণের জীবন-যাপনের মানও বাড়িয়া গিয়াছে। আজ মুনাফা সে পরিমাণ অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। আবার জীবন ধারণের মান কমানও অসম্ভব। মালিকরা যুদ্ধের কয় বৎসর যে মুনাফায় অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেইরূপ লভ্যাংশ না পাওয়ায় উৎপাদন হ্রাস ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছেন। কারণ, উৎপাদন হ্রাস করিলে চাহিদা বাড়িবে। অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করিবেন। কাজ কমাইয়া দিলে শ্রমিক কমাইতে হয়। অতএব ক্রমাগত বাছাই আর ছাঁটাই চলিতেছে। এদিকে জীবন ধারণের ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমিকদের যে মানুষের মত খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার উপযোগী বেতন দেওয়া প্রয়োজন, এ কথা শিল্পপতিরা কোন দিনই মনে করেন না। ফলে বেতন বৃদ্ধির কথা উঠিলেই হয় কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিম্বা শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য করা হয়। শিল্পপতিরা লাভ বাড়াইতে না পারিলেই উৎপাদন কমাইয়া দেন। এসট্যাব্লিশমেণ্ট খরচ কমিয়া গেলে লাভের রেশো বাড়িয়া যায়। ইহাতে দেশ এবং দেশবাসী বাঁচিল কি মরিল, তাহাতে তাঁদের কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা শিল্পপতিদের ঘাঁটাইতে সাহস করেন না। কোপ পড়ে গরীব শ্রমিকদের উপর!

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যত দিন ব্যক্তি-বিশেষের হাতে শিল্প-পরিচালনার ভার থাকিবে, তত দিন জনসাধারণের প্রয়োজনে নহে, ব্যক্তিগত মুনাফাই হইবে শিল্পোন্নতির উৎস। সুতরাং মুনাফা হ্রাসের আশঙ্কায় শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হইবে না। লাভের অঙ্ক বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ধর্ম্মঘটের বন্যায় দেশকে প্লাবিত করা হইবে! ইহার ফল সর্ব্বব্যাপী বিপর্য্যয়। এই সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে দেশের প্রধান শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকসত্ত্ব হইতে সরাইয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের জীবন ধারণোপযোগী বেতনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে যে সব বড় বড় কাপড়ের কল, ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি আছে, সেগুলি ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য রাখিয়া দিয়া কেবল ভবিষ্যতে নূতন কারখানা খুলিয়া সমস্যা সমাধানের কথা গবর্ণমেণ্ট যখন ভাবিতেছেন তখনই বুঝা গিয়াছে যে, হয় তাঁহারা এই সঙ্কটের প্রকৃত কারণ বুঝেন নাই অথবা বুঝিয়াও সাহসের অভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। বুদ্ধির অথবা সাহসের যাহারই অভাব হউক না কেন, দেশবাসীর অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। মুখে ভাল কথা বলিলেই সঙ্কট কাটিবে না, মূল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু সরকারকে যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাহা করিবেন, এরূপ দুরাশা আমরা করি না। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে তাঁহাদের বাধ্য করিতে হইবে। যদি গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তবেই এই বিপর্য্যয় অতিক্রম করা যাইবে, নচেৎ ভারতের ভবিষ্যৎ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।

শ্রমিক-মালিক চুক্তি

ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্প-সম্মেলনে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে তিন বৎসরের জন্য এক শান্তি-চুক্তি হইয়াছে।

প্রস্তাবটি শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিরা সকলেই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই চুক্তি-সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ আশা করা সম্ভব নয়। কারণ, উৎপাদন কম হওয়ার দায়িত্ব শিল্পপতিরা বোল আনায় শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। মালিকদের ত্রুটির জন্ম উৎপাদন কম হইতেছে কি না, গভর্ণমেণ্টও তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম দায়িত্ব যে প্রধানতঃ শিল্পপতিদেরই শুধু শ্রমিকদের নহে, যত দিন এই সত্য স্বীকৃত না হইতেছে তত দিন এই শান্তি-চুক্তির সাফল্য আমরা আশা করিতে পারি না।

বিদেশী মূলধন

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নূতন যে কারখানা খোলা হইবে, তাহার অর্থ আসিবে কোথা হইতে? সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এন. ভি. গ্যাডগিল এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশে বড় বড় পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্ম বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বা বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিদেশী পুঁজি গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার মতে বিদেশী পুঁজি সম্বন্ধে এ দেশে যে কুসংস্কার আছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ছিল, এখন আর নাই। বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিলেও, বিদেশী স্বার্থ আমাদের দেশে কায়েমী বাসা বাঁধিবে। কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলে মূলধন পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। মার্শাল পরিকল্পনায় ইউরোপে সাহায্য দান, আসলে ইউরোপে মার্কিণ স্বার্থের কায়েমী বুনিয়াদ তৈয়ারী করিবার ফাঁদ। এক মার্কিণ ছাড়া অন্য কোন দেশই আর্থিক সাহায্য করিতে পারে না। তাহাদের অর্থে দেশে কারবার আরম্ভ করিলে শেষ অবধি আমাদের শিল্প তাহাদের কর-কবলিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহু দিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট উইলসন সাহেব বলিয়াছিলেন, "কোন দেশে যে পরিমাণে বিদেশী পুঁজি নিয়োগ করা হয়, দেশের স্বাধীনতাও সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়।" আজও ভারতবর্ষ বৃটিশ মূলধনের কবল হইতে মুক্ত হয় নাই, ইতিমধ্যে নূতন করিয়া আবার বিদেশী মূলধনকে ভারতে শিকড় গাড়িতে দিবার পথ ভারত সরকার প্রশস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমেরিকা যে শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল-কথিত "আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে" অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হইবে না তাহা সুস্পষ্ট। মার্কিণ পুঁজিপতিরা একটা নির্দ্দিষ্ট সুদে এ দেশকে টাকা ধার দিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা এ দেশে মার্কিণ মূলধন, যন্ত্রপাতি এবং কারিগর দিয়া ব্যবসা খুলিতে চান। ফলে আমাদের শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিযোগিতায় ভাসিয়া যাইবে। ভারতের স্বাধীনতা কেবল বাক্যে পর্য্যবসিত হইবে। এ দেশে যুদ্ধকালে শিল্পপতিরা যে প্রচুর মুনাফা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে এ সব কাজে না লাগাইয়া বিদেশী পুঁজির জন্ম ভারতবর্ষ এত ব্যস্ত কেন? বোধ হয়, এ দেশের শিল্পপতিদের অর্থ লইতে সরকারের সাহস নাই। এবং দেশের ধনিক-শ্রেণীও দেশের চেয়ে অর্থকে অধিক ভালবাসেন, সেই জন্ম এই দারুণ সঙ্কটের সময় যখের ধন আগুলিয়া বসিয়া আছেন। অথচ কংগ্রেস এই সকল শিল্পপতিদেরই প্রধান সহায় এবং মুখপাত্র! নিয়তির কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ!

ভারতের কর-নীতি

দক্ষিণ-ভারতীয় বণিক্ সভার প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থ সচিব মিঃ সমুখম্ চেট্টি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সহিত কলিকাতা শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সভা সম্মিলিত বণিক সমিতি-সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ কাম্বরেব্যাচের বক্তৃতার এক অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোন নূতনত্ব পাওয়া যায় নাই। অর্থ-সচিব ভারতের শিল্পপতি ও বণিক্‌দিগকে কর-ভার লাঘবের আশ্বাস দিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে দাবী করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করিবার সমর্থন। উদ্দেশ্য—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকে পঙ্গু করা। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব ফ্যাসিষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন কি?

ভারতের কর-নীতি সম্বন্ধে বহু কাল পূর্ব্বে ১৯২৪-২৫ সালে একবার তদন্ত হয়। ১৯৪৬ সালে তদন্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্ম সম্ভব হয় নাই। ১৯২৪-২৫ সালের তদন্তের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কোন শ্রেণীর উপরই কর-ভার গুরুতর নয়, কিন্তু কর-ভার বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট অসাম্য রহিয়াছে। ধনীরা নানা করের বহুলাংশ ফাঁকি দেয়, দরিদ্রশ্রেণী বহন করে ট্যাক্সের অধিকাংশ বোঝা। অর্থ-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, আয়করের প্রাপ্য অর্থের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী সরকার পান না। যুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা যাঁহারা ফাঁকি দিয়াছেন, সরকার তাঁহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটা তদন্ত হইবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে সরকারকে সেই অভিপ্রায় বর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের সমস্ত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। ইহাদের ঘাঁটাইতে কংগ্রেস সরকার সাহস করেন না। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা কি ভাবে সম্ভব হইবে? ভারতে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগের স্থান আছে। সে জন্ম পুঁজিপতিদের ইচ্ছামত লাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। তাঁহাদের কর-ভারও লাঘব করিতে হইবে। তবে গভর্ণমেণ্ট চলিবে কি করিয়া? আমাদের মতে মুনাফার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। শিল্পপতিদের কিছু সুবিধা না দিলে শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে, কিন্তু অত্যধিক সুবিধা দিলে অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়িতেই থাকিবে। কয়েক জন ধনী অধিক ধনী হইলে দেশবাসীর কোন উপকারই হইবে না। সে ক্ষেত্রে দেশের উন্নতি হইয়াছে বলা বাতুলতার সমান।

হায়দ্রাবাদ

বহু সময় অপব্যয় করিয়া, বিস্তর কথা-কাটাকাটির পর সাময়িক ভাবে ভারত ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্ম একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হইল। ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭ হইতে ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৮ পর্য্যন্ত এই চুক্তি কার্য্যকরী থাকিবে। চুক্তিতে বলা হইল যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতে বৃটিশ সরকার এবং হায়দ্রাবাদের মধ্যে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যান-বাহন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল চুক্তি ছিল, তাহা বলবৎ থাকিবে; তবে নিজামের উপর বৃটিশের যে প্রভুত্ব ছিল, ভারত সরকারের তাহা থাকিবে না, অর্থাৎ নিজামের সার্ব্বভৌম অধিকার থাকিবে। নিজাম রিসেপ্ত

কোথাও কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন না। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এজেন্ট জেনারেল নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে ভারত সরকারের বিদেশস্থ প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। হায়দ্রাবাদের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত ভারত সরকার সৈন্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন না এবং যুদ্ধের সময় ব্যতীত হায়দ্রাবাদে ভারত সরকার সৈন্ত সমাবেশ করিতে পারিবেন না। এই চুক্তি যথাযথ পালিত হয় কি না দেখিবার জন্ত দিল্লীতে নিজামের এবং হায়দ্রাবাদে ভারত সরকারের এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। এই চুক্তি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হইল। সর্দ্দারজী হায়দ্রাবাদ পাকিস্থানে যোগ দিল না এই আনন্দে বিভোর হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ঠকাইয়া নিজাম যে নিজের দাবী স্বীকার করাইয়া লইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কংগ্রেস মানিয়া লইল, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। নিজাম রাজ্যের জনসাধারণ পথে বসিল। সর্দ্দারজীর রাজাদের উদ্দেশ্যে মৌখিক হুঙ্কার এবং পণ্ডিতজীর "ভারতীয় ইউনিয়নে কোন দেশীয় রাজ্য যোগদান না করিলে তাহাকে শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইবে" এই আস্ফালন, সবই নিছক বাক্যবাজিতে পরিণত হইল। জনসাধারণের দাবী উপেক্ষা করিয়া এই চুক্তির ফলেই আজ হায়দ্রাবাদে অব্যাহত স্বৈরাচার সম্ভব হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় নেতাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ষ্টেট কংগ্রেস নেতারা নিজামের সহিত সহযোগিতা না করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাইতেছেন। নিজামের তথাকথিত গণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা যে তাহা সহ্য করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রিসভার কর্ণধার লায়েক আলি সাহেব জানাইয়াছেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইল আশঙ্কা সমূহ দূর করা এবং দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটান। দেশের শান্তি এবং অগ্রগতি ব্যাহত করিবার চেষ্টা হইলে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা দমন করিতে ত্রুটি করিবেন না।" তাৎপর্য্য মোটেই দুর্ব্বোধ্য নহে। কার্য্যকরীও করা হইতেছে। জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চলিয়াছে। ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিনের নীতি শতকরা ৮৭ জন অমুসলমানের উপর প্রয়োগ করা হইতেছে। ভারত সরকার ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া নিজের হাতে রোপিত বিষবৃক্ষের ফল দেখিতেছেন। কিছু করিবার ইচ্ছা অথবা উপায় নেই, চুক্তি অনুসারে। পণ্ডিত নেহরু হায়দ্রাবাদ সংক্রান্তীয় প্রশ্নের উত্তরে—"এই ভার সর্দ্দারজীর উপর দেওয়া হইয়াছে" বলিয়া দায় খালাস হইয়াছেন। প্রকাশ, সর্দ্দার প্যাটেলের দেশীয় রাজ্যবিভাগ মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে নিজামের সহিত হায়দ্রাবাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সকল প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত নিজামের যে সকল গ্রাম বিদ্রোহ করিয়াছে, ষ্টেট কংগ্রেসের ঘাঁটি সেই সকল গ্রামের সাধারণ লোককে দমন করিবার জন্ত কংগ্রেসী পুলিশ নিজামের পুলিশের সহিত একসঙ্গে কাজ চালাইবে। ভারত সরকারের পরিচালকবর্গ দেশকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই জন্তই কি এত দিন স্বাধীনতার সংগ্রাম চালান হইয়াছিল? "দায়িত্বশীল" নিজাম সরকারের মন্ত্রিসভা ও তাঁহাদের অভিভাবক আমাদের "প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী এবং কিষাণ-মজুর প্রজারাজের সমর্থক" ভারত সরকার যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! নিজামকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে মুষল প্রসবে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে উহাই এক দিন তাঁহাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না।

জওহরলালজীর ভাষণ

ভারতীয় বিমান বাহিনী ফৌজদের নিকট বক্তৃতা দিতে যাইয়া, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার অখণ্ড ভারতের স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভাবাবেগে কথাগুলি শুনিতে ভাল, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সবই ভুয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভারত বিভাগে তিনিই কি সম্মতি দেন নাই? ফৌজ কি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই ভাগ করা হয় নাই? ভারতীয় সংস্কৃতির কথা ফৌজদের জানান ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এই সংস্কৃতির উদার মনোভাব, অর্থাৎ সহ্য এবং ক্রমাগত তোষণ-নীতির ফলেই ভারত আজ বিভক্ত। সেই জন্তই বাঙ্গালায়, পাঞ্জাবে রক্তের নদী বহিয়াছে, সহস্র সহস্র হিন্দু ও শিখ নারী নিগৃহীতা ও অপহৃতা হইয়াছে। কংগ্রেসী নেতারা ভারতের শাসন-ভার লইয়া যাহা করিতেছেন, তাহাই ফ্যাসিজম, আর যাহাকে তিনি সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া নাক সিঁটকাইতেছেন, তাহাই সত্যকার জাতীয়তাবোধ। মুসলিম লীগ যদি মুসলিমদের পৃথক্ করিয়া লয়, তবে হিন্দুরা হিন্দুত্ব-বোধে লজ্জিত হইবে কেন?

ভারতীয় মুসলমান

ভারতের মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া, জাতীয়তার পথে পরিচালিত করাই ছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রথম মুসলিম সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তাহার পর প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আকুল আবেদনের বিশেষ কোন ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ শহরে দ্বিতীয় মুসলিম সম্মেলনে তিনি আবার আবেদন করিয়াছেন। এবারও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলিম লীগকে জাগাইয়া রাখাই মুসলিম লীগের বৃহৎ নেতৃত্বের অভিপ্রায়। দুই জাতিতত্ত্ব তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং স্পষ্ট স্বীকারও করেন। কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বের মত ভারত বিভাগে মত দিয়া অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন না! সুতরাং মুসলিম লীগ থাকিবেই, মৌলানা সাহেবের শত আবেদনেও ভারত ইউনিয়নে মুসলিমরা মনে-প্রাণে যোগ দিবে না। তাঁহাদের আনুগত্য থাকিবে মিঃ জিন্না ও পাকিস্তানের প্রতি। তাঁহাদের সুবুদ্ধির জন্য চোখের জলে না ভাসিয়া, যাহাতে তাঁহারা ভারত ইউনিয়নের কোন ক্ষতি না করিতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাশ্মীরের ব্যাপার হইতে কংগ্রেসের অন্ততঃ এই শিক্ষাই হওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্তানী বিচার

ভারত-পাকিস্তান চুক্তিতে শুধু পাকিস্তানের পাওনা টাকার কথাই ছিল না, পাকিস্তানকে বাঁচাইবার জন্ত অতি উদার সর্ত্ত (পাকিস্তানের দায়গুলি ভারত মিটাইয়া দিবে এবং ৫০ [illegible]

পাকিস্তান কিস্তিবন্দীতে তাহা শোধ করিবে) ভারত সাহায্যও করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের অর্থে এবং ভারতের নিকট হইতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়াই তাহারা কাশ্মীরের হানাদার-বাহিনীকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ভারত সরকার অত্যন্ত বিলম্বে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া আত্মহত্যা করিতে আপত্তি করিয়াছেন। ফলে কাশ্মীর সম্পর্কিত আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং স্যর জাফরুল্লা খাঁ মহা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতেছেন, "এই সকল টাকাকড়ি এবং সামরিক মাল-মশলা ভারত সরকার পাকিস্তানকে দয়ার দান হিসাবে কিম্বা কর্জ্জ হিসাবে দেন নাই। পাকিস্তানই উহার প্রকৃত মালিক। সমানাধিকার ভিত্তিতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি হইল, তাহা কেমন করিয়া মানিয়া চলিতে হয়, ভারত তাহা ভাল ভাবেই দেখাইল বটে!" কৃতজ্ঞতা অথবা চক্ষুলজ্জাও নাই। ভারতীয় নেতারা দুধ-কলা দিয়া সাম্প্রতিক কাল সাপ পুষিয়াছেন, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিচয় কোথা? কাশ্মীরে হানা চলিতে লাগিল, দিল্লীতে ভারত সরকার দিনের পর দিন "সৌহার্দ্দপূর্ণ" আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। শেষে যে বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তাহা আমাদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের চিরাচরিত তোষণের পথ প্রশস্ত রাখিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সহিত বন্ধুত্বটা অটুট রাখিবার জন্য জাতিসঙ্ঘে কাশ্মীর-প্রসঙ্গ তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ভারত সরকার পাকিস্তানের মনোবাঞ্ছাই যে পূর্ণ করিয়াছেন, করাচীর পাকিস্তানী কর্ত্তারা তাহা গোপন রাখেন নাই যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া হা-হুতাশ করা বৃথা। ভবিষ্যতে ভারতীয় নেতাদের আপোষ ও তোষণের পথ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। নচেৎ পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের চাপে ভারতে স্বাধীনতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবে।

—

সর্দ্দারজীর ভাষণ

১৮ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের জনতাকে সম্বোধন করিয়া ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে নিরাপত্তা বিলের সমর্থনে তাঁহার যুক্তিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বিলকে সমর্থন করা প্রয়োজন, কারণ, আমরা সকলেই স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম এবং স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। বিদেশীরা চলিয়া গিয়াছে, স্বদেশী সরকার কায়েম হইয়াছে, অতএব সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করা অনুচিত। ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলেই মেওয়া ফলিবে। কথাগুলি সত্য এবং মিথ্যা দুই-ই। পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা পাই নাই। যতটুকু মিলিয়াছে, তাহা সর্দ্দারজী-প্রমুখ বৃহৎ নেতৃত্ব এবং তাঁহাদের ক্ষুদে নেতারাই পাইয়াছেন। জনসাধারণ পূর্ব্ববৎ তিমিরেই রহিয়াছে। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সুবিধার জন্যই এই বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে পণ্ডিতজী সর্দ্দারজী ইত্যাদিকে আনিয়া সুপারিশের কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজনই বা কোথায়? পাকিস্তান সম্পর্কে তিনি "তরবারির আঘাত তরবারি দ্বারাই রোধ করা হইবে" বলিয়া হুমকী দিয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপে তাহার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। হায়দ্রাবাদে তিনি যাহা করিয়াছেন, কাশ্মীর সম্পর্কে গোড়ার দিকে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তার অভাবই সূচিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ ক্ষমতার ওকালতী করিয়া কি ফল?

—

কাশ্মীরের উভয় সঙ্কট

জাতিসঙ্ঘের নিকট দরবার করিয়া ভারত ও কাশ্মীরের স্বার্থের ক্ষতি বই লাভ যে কিছু হইবার আশা একেবারেই নাই, যে কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকই তাহা বুঝিতে পারে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি তিন জন-সমন্বিত কমিশন গঠন করা হইবে এবং বৃটেন এই কমিটির মধ্যে তাহার প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকারকে ঢুকাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে ছাড়িবে না। এই কমিশন কাশ্মীরে যাইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির জন্য আদেশ দিবে বলিয়াও প্রকাশ। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করিবার কোন তাগিদই থাকিবে না, যেহেতু, তাহারা মৌখিক ভাবে হানাদারদের সঙ্গে সম্পর্ক এ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াই আসিয়াছে। হানাদারেরা তো আর কাশ্মীর সম্পর্ক মীমাংসার জন্য জাতিসঙ্ঘের শরণাপন্ন হয় নাই যে জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ পালন করিতে তাহার মাথা ব্যথা থাকিবে? অথচ এই ধরণের আদেশের ফলে ভারত সরকার হানাদারদের বিরুদ্ধে যেটুকু সামরিক কার্য্যকলাপ চালাইতেছেন, তাহাও সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে ন্যায়তঃ বাধ্য থাকিবেন। কারণ, তাঁহারাই কাশ্মীর সমস্যায় মধ্যস্থতা করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করার কি তাঁহাদের পক্ষে ভাল দেখায়? ফল যাহা দাঁড়াইবে তাহা ইন্দোনেশিয়ার দিকে দৃকপাত করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ওলন্দাজ সরকার জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া যেমন আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে, হানাদারদের ছদ্মবেশে পাকিস্তানও সেইরূপ আক্রমণ চালাইয়া যাইয়া ভারত সরকারকে আরও বে-কায়দায় ফেলিবে। ইহার পর বৃটিশ প্রভাবিত কমিশন যদি কাশ্মীরকে মুসলমান প্রাধান্যের নামে পাকিস্তানের হস্তে তুলিয়া দিতে চাহে, তবে 'সভ্যতার' মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নেহরু গভর্ণমেণ্ট কি তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন? যদি তাহা না লন, তাহা হইলে পাকিস্তানের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন পথই ভারত সরকারের সভ্য নেতাদের নিকট খোলা থাকিবে না। লাভের মধ্যে হইবে এই যে, পাকিস্তান সরকার তখন প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতে পারিবে—'দেখ দেখ বিশ্ববাসী, ভারত সরকার জাতিসঙ্ঘের গণতান্ত্রিক মতামত অগ্রাহ্য করিতেছে!'

ইহার পর বুঝিতে কষ্ট হয় না, কাশ্মীর সমস্যা জাতিসঙ্ঘে উপস্থিত হওয়াতে, পাকিস্তানের মন্ত্রিবর্গও এত উৎফুল্ল হইয়াছেন কেন। বস্তুতঃ পক্ষে ভারত সরকার পাকিস্তানের ফাঁদেই পা দিয়াছেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ আজ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। এক দিকে পাকিস্তানের সাহায্যপুষ্ট হানাদারগণ তাহাদের স্বাধীনতা হরণে ব্যস্ত, আর এক দিকে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ তাহাদের পুরা দমে সাহায্য না দিয়া জাতিসঙ্ঘের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই অদ্ভুত অবস্থায় কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলে করিয়া কয় জন লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিবে তাহা সন্দেহ।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

অর্থ উপার্জন করার চেয়ে যেমন অর্থ রাখা কঠিন, সেইরূপ স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা দুরূহ। সে জন্য প্রয়োজন শক্তির অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর—স্থল, নৌ এবং বিমান। ভারতের আর্থিক অবস্থা এখন এমন নহে যে, বিরাট 'ষ্ট্যাণ্ডিং' বাহিনী রাখিতে পারে। সুতরাং শক্তিশালী সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। কুঞ্জরী কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সামরিক শিক্ষার। পরিকল্পনাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম সিনিয়র বিভাগ। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহ, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ এবং টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশন সমূহের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে এই বিভাগে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় অংশের নাম জুনিয়র বিভাগ। স্কুল সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ১৩ হইতে ১৭ বৎসর। তৃতীয় বিভাগটি ছাত্রীদের জন্য। উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে এই শিক্ষার জন্য ছাত্রী নির্ব্বাচন করা হইবে। সিনিয়র বিভাগে মাত্র ৩০ হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইবে। কোন্ প্রদেশে কত জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এই সিনিয়র বিভাগ হইতেই ভবিষ্যৎ অফিসারগণ নির্ব্বাচিত হইবে। জুনিয়র বিভাগে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইবে। কোন্ স্কুল কত জন ছাত্র দিবে তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। উদ্দেশ্য হইবে শরীর ও চরিত্র গঠন এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা। অল-ইণ্ডিয়া ওয়ার একাডেমীতে ভর্ত্তি হওয়ার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল এবং সুস্থদেহ করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে পুরুষের কাজও চালাইতে পারে। টেলিগ্রাফ, বেতার, টেলিফোন, নার্সিং প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। লেখাপড়া শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়, এই ভাবে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

পরিকল্পনাটি চমৎকার। ভারত সরকার যে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সত্যই সময়োপযোগী এবং অত্যাবশ্যক। কিন্তু পাকিস্তান বাদ দিয়া ভারতের যে অংশ লইয়া ভারত ইউনিয়ন গঠিত, তাহা বিশাল। সুতরাং সুপারিশ আশানুরূপ হয় নাই। আরও প্রসার প্রয়োজন। অন্ততঃ কলেজের ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স ট্রেনিং কোর রূপান্তরিত হইবে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে। যেখানে হইবে স্কুল-কলেজের ছাত্র। প্রত্যেকের জীবনের দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক্ আছে—ছাত্র-জীবন ও সামরিক-জীবন। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে গেলে প্রয়োজন এমন অফিসার, যাঁহারা শিক্ষক। ছাত্ররা তাঁহাকে চেনে তিনিও ছাত্রদের জানেন। কি উপায়ে শিক্ষা দিলে ছাত্ররা চট করিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহা তিনি বুঝেন। অতএব সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স ট্রেনিং কোরের অফিসারদের এই নূতন কোরে নিয়োগ করা। আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে জাতীয় সামরিক বাহিনী সকল দিক্ দিয়াই উপকৃত হইবে।

বড়দিনের সভা-সম্মেলন

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ২৩শ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে রেওয়া রাজ্যের সাতনায়। ২৮শে ডিসেম্বর সম্মেলন আরম্ভ হয়। সভাপতি ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তাঁহার অভিভাষণে ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং কম খরচে শিক্ষাদানের কৃষ্ণ কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি মনে করেন, যত দিন ভারতের বিভিন্ন অংশের লোক স্বচ্ছন্দে হিন্দি ভাষা ব্যবহার না করিতে পারিবে, তত দিন ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন রাখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে ডাঃ পি, এস, লোকনাথনের সভাপতিত্বে। ২২শে ডিসেম্বর সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার গবর্ণর রাজাজী অর্থনীতিবিদ্গণকে কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করার মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অর্থনীতি শাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান, রাজনীতির সহিত তাহার নিবিড় সম্বন্ধ! প্রাকৃত বিজ্ঞানের মত নিরপেক্ষ ভাবে অর্থনীতির চর্চ্চা করা সম্ভব নয়। ডাঃ লোকনাথন এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা এবং ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনীতি একযোগে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তানের অর্থনীতি ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ না হওয়ার কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এশিয়ার পুনর্গঠন খুব বড় কথা। আমরা ভারতেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারি নাই, জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে পাটনায়। অধিবেশন আরম্ভ হয় ২রা জানুয়ারী। নির্ব্বাচিত সভাপতি কর্ণেল স্যার রামনাথ চোপরা তাঁহাদের দেহে অস্ত্রোপচার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণ স্যার সি, ভি, রমণ পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণে আধুনিক ও ভারতীয় ভেষজের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশতি অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে একটি শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খের। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালীদের হিন্দী শিখিতে এবং যে অঞ্চলে বাস সেখানকার জীবনযাত্রার সহিত খাপ খাওয়াইতে পরামর্শ দেন। বাঙ্গালীদের বলেন, ঐক্যবোধ জাগ্রত করিতে, প্রাদেশিকতা দূরে ফেলিতে। কথাগুলি সময়োপযোগী, কিন্তু বাংলা অথবা বাঙ্গালীদের চেয়ে অন্যান্য প্রদেশ ও প্রদেশ-বাসীদেরই সেই উপদেশ আজ বেশী প্রয়োজন। বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা সকলেরই মুখে 'বাঙ্গালী খেদাও' বুলি। কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব এঁদেরও প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। মূল সভাপতি বলেন যে, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলেও বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একই আছে। তাহাকে বিভক্ত করিতে গেলে দেশের ও জাতির উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইবে। এই দিক্ দিয়া সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর্ত্তৃক সম্পাদিত
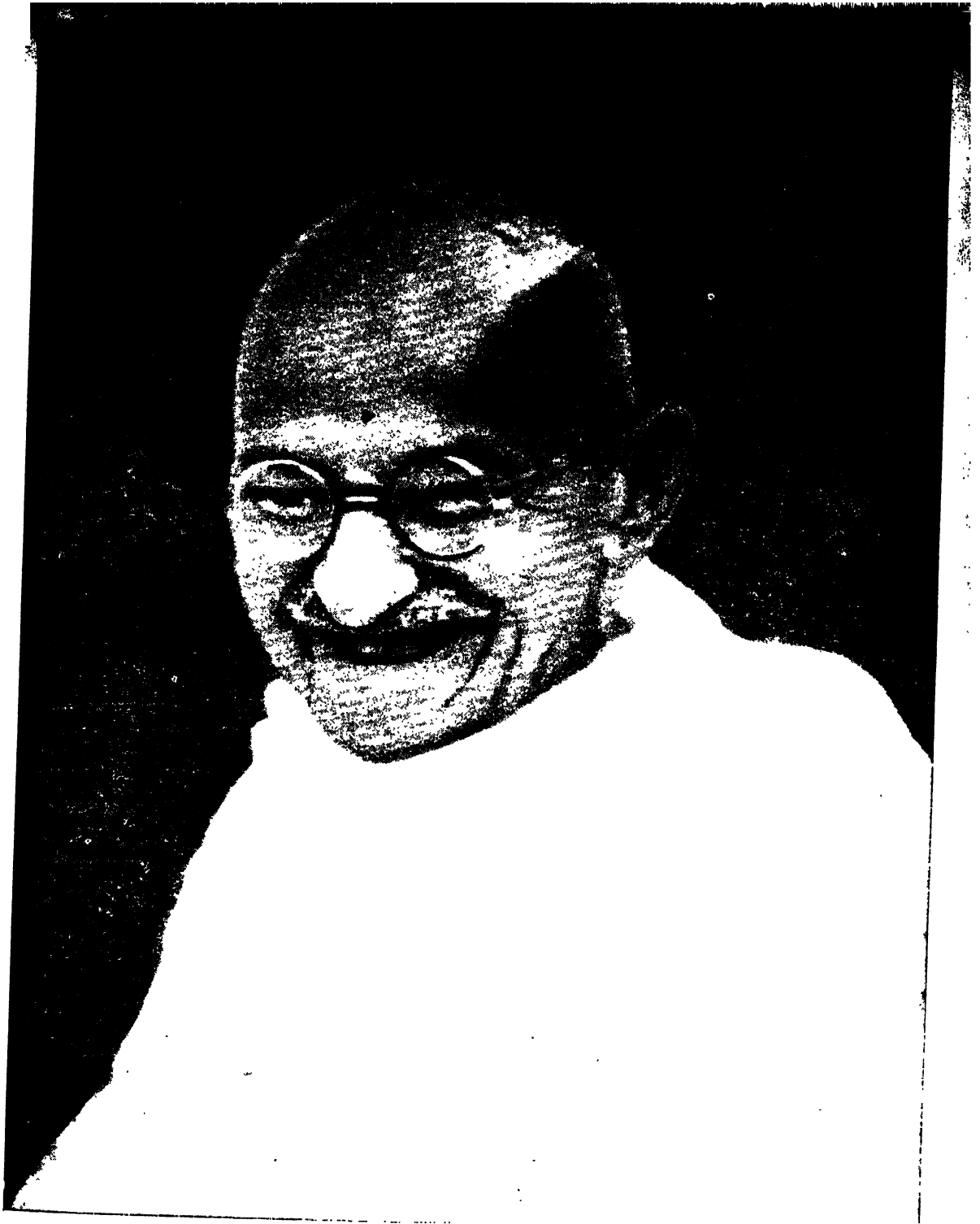
Symbol of innocence, purity and love."

—Oscar Wilde

ফটো—মনুজ দাস
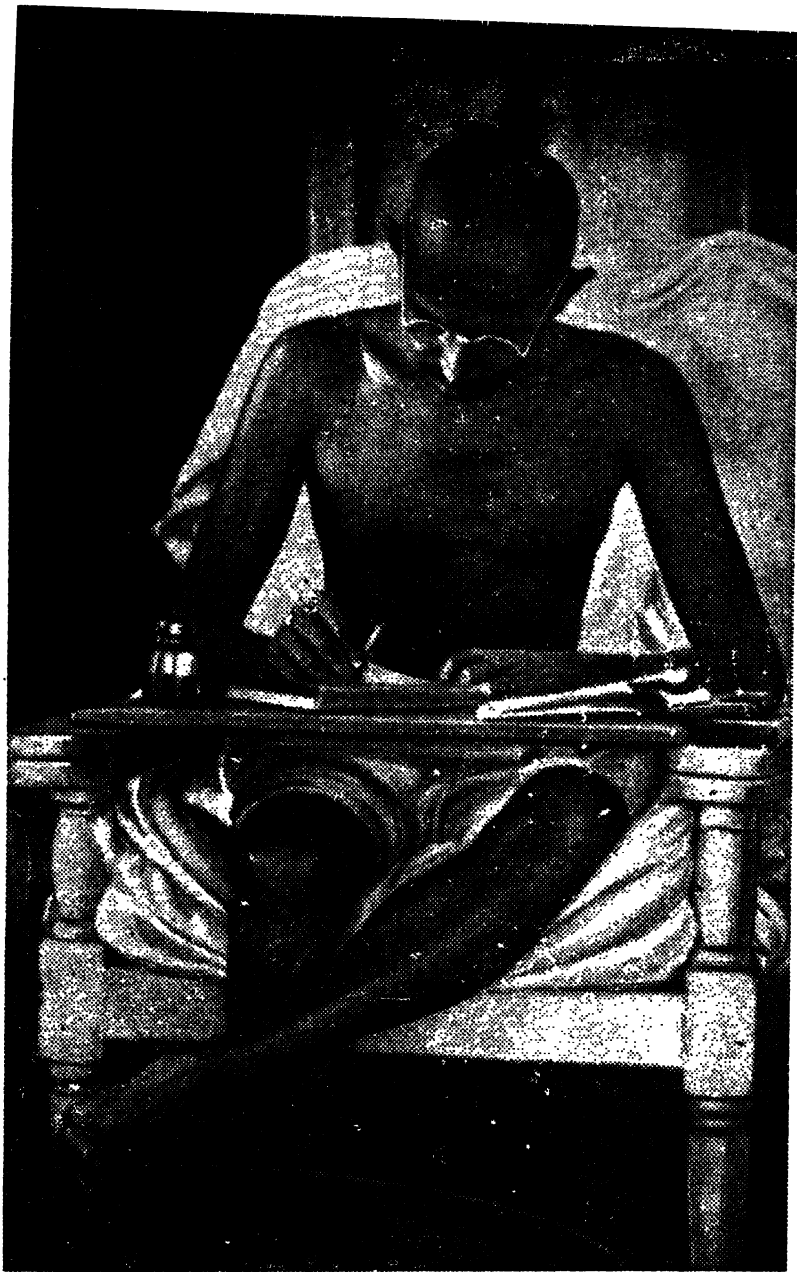
—বসুমতী

"মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন ধর্মের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাকে আমরা শ্রদ্ধা করচি, এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েচেন, তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে, তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫৪ চতুর্থ সংখ্যা

"যে লোক স্বেচ্ছায় নিজের দোষের কথা পরিষ্কার করে অন্যের কাছে বলে এবং আর না করার প্রতিজ্ঞা করে, সে সবচেয়ে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করে।"

* * * *

"আমার জীবনের গোপনতা কিছু নেই। আমার জীবনের প্রতিটি পাতা সকলের জন্যে খোলা।"

* * * *

"আমি সবচেয়ে গরীব মেথরের পায়ের ধূলো নিতে পারি, কিন্তু সম্রাটের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে রাজী নয়।"

* * * *

"যে মানুষ নিজে চোখের জল ফেলে—সে পরের চোখের জল মোছাতে পারে না।"

* * * *

"সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যেদিন আলোর রশ্মি দেখতে পাবো, সেদিন আমি সবাইকে ডাক দেবো।"

* * * *

"আমার জীবন এখানেই শেষ হতে পারে। এত দিন ধরে যে হিন্দু ও মুসলমান ভাই-বোনের মত বাস করে এসেছে তাদের মনে মিলনের প্রতিষ্ঠা করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ফলদাতা একমাত্র ভগবান।"

* * * *

"দেখো, আমি এখন বাঙালীর মধ্যে তাদেরই একজন—আজ আমি বাঙালী। আমি নোয়াখালীবাসী। এইখানেই আমার কাজ।"

* * * *

"হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত না হলে আমি দেহরক্ষা করব।"

* * * *

"আমার মত শত শত লোক নষ্ট হয়ে যাক, তবু সত্যের জয় হোক্।"

—মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসা-প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব—এ কথা আমরা মানি কি? মহাত্মা যদি বীর পুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে এমন করে আজ আমরা ওকে স্মরণ করতুম না। কারণ লড়াই করার মত বীরপুরুষ এবং বড় বড় সেনাপতি অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলবো না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন 'মরবো তবু মারবো না এবং এই করেই জয়ী হবো' এ একটা মস্ত বড় কথা—একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্য্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্ম্ম-যুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়। হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্ম্ম-যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্ম্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে। হার পেরিয়ে থাকে জিত—মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য। এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে।

ইউরোপে আমরা স্বাধীনতায় কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখ্‌তে পাই। অবশ্য আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য্য পেয়েছে। সেই পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্ম্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃষ্টধর্ম্মে মানব-প্রেমের বড় উদাহরণ আছে, ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত পাপ যত দুঃখ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন, এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে, এ কথা খৃষ্টধর্ম্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজী এমন এক জন খৃষ্ট-সাধকের সঙ্গে মিলতে পেয়েছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়-এর কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃষ্টান ধর্ম্মের অহিংস নীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন এক জন লোকের, যিনি সংসারে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস নীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাসিত করেছিলেন। মিশনারী অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে তাঁকে বাঁধা-বুলি শুনতে হয়নি। খৃষ্টবাণীর এই একটি বড় দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদু, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্ম্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরের কৃত্রিম অধিকারী বিশেষের পাহারা দেওয়ার জন্য নয়, তা নির্বিচারে সর্ব্বমানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথু রাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্য। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম্ম, সকল ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃষ্টবাণীর নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়, আর খৃষ্টান জাতি বলে নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায়নি; কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায়, ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস নীতি গ্রহণ করেছেন আর চতুর্দ্দিকে তার জয় বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টিতে গান্ধীজী

গান্ধীজী মূলতঃ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি খাঁটী হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর ধর্ম্মের সঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট বা সংস্কারের সম্পর্ক ছিল না। ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ফেডারেশন অফ্ ইনটারন্যাশানাল ফেলোশিপের বৈঠকে বলেন: "সুদীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল ধর্ম্মেই কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, সকল ধর্ম্মই আমার কাছে হিন্দুধর্ম্মের মতই প্রিয়।" তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সত্য। নৈতিক ভিত্তির সঙ্গে না মিললে কোন চিরাচরিত প্রথাই তিনি মানতেন না। এ জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যা ভাল মনে করতেন, সেই পথ অবলম্বনে তাঁর কোনও অসুবিধা হত না। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের এতে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু কোন অসুবিধাই তাঁকে সত্য পথ থেকে টলাতে পারত না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে নিজের উপর দিয়ে পরীক্ষা করতেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা ছিল এইরূপ: "আমি এমন একটি ভারতবর্ষ গঠনের জন্য কাজ করব, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও মনে করবে যে, এটা তাদের নিজের দেশ, যে দেশ গঠনে তাদের হাত থাকবে, এই ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না, সকল সম্প্রদায় পরম ঐক্যের মধ্যে বাস করবে,—যে দেশে অস্পৃশ্যতা ও পানদোষ থাকবে না * * * *....নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে.........ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।" হিন্দুধর্ম্মকে তিনি একটি বিশ্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতিকে তিনি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন: "ভারতীয় সংস্কৃতি—হিন্দুও নয়, ইস্লামীয়ও নয়, কারও নিজস্ব নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি এ সকলের মিলনের ফল।"

তিনি জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অল্প কয়েক জন ধনী ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, তিনি তা ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি জনগণকে তাদের তন্দ্রা দূর করে জাগরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই পদদলিত জনগণকে উন্নত করবার ইচ্ছাকে তিনি ধর্ম্মেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: "অর্দ্ধাহারী জাতির কোন ধর্ম্ম, কলা বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। * * * * আমি এমন কলা ও সাহিত্য চাই যা লক্ষ লক্ষ জনগণ উপলব্ধি করতে পারে।" ভারতের লক্ষ লক্ষ নিঃস্বের জন্য তাঁর মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকত। তাঁর যত কিছু কাজ ছিল, এদের ঘিরেই। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেকের চোখের জল মুছে দেওয়া।

কাজেই এমন এক জন লোক যে ভারতের জনগণকে আকৃষ্ট করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; কেবল জনগণই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও তিনি এক বিরাট্ বিপ্লব এনে দিয়েছেন। এমন কি, তাঁর বিরোধীদের মনেও।

তিনি যখন প্রথম কংগ্রেসে প্রবেশ করেন, তখন কংগ্রেসের কাজ ছিল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি কংগ্রেসকে একটি গণতান্ত্রিক ও গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৃটিশ-শাসনের প্রধান খুঁটি হল ভয়, মর্য্যাদাবোধ ও সহযোগিতা। তাই তিনি এই সকল ভিত্তিকে প্রথম আক্রমণ করেন। আমাদের তিনি বলেন: "তোমরা, যারা কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করে থাকো, তোমরা তাদের মুক্তি দাও। যে প্রথার ফলে দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার সৃষ্টি হয়, সেই প্রথা দূর কর।" তিনি আমাদের যে সকল উপদেশ দেন, আমরা সে সকল প্রস্তাব মাত্র আংশিক ভাবেই গ্রহণ করেছি এবং কখন কখনও মোটেই গ্রহণ করিনি। তাঁর শিক্ষার মূল কথা—সত্য ও নির্ভীকতা এবং কাজ। এই কাজ করবার সময় সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে জনগণের মঙ্গলের দিকে। বৃটিশ-শাসনের সময় ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল ভয়। সেই ভয় তিনি জনসাধারণের মন থেকে দূর করে দেন।

আমাদের দেশে জাতিভেদ দূর করবার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ আন্দোলন কখনও জনগণকে স্পর্শ করেনি। গান্ধীজী এই আন্দোলন করেছেন জনগণকে নিয়ে। তিনি জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে এই প্রথা, এই অস্পৃশ্যতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

গান্ধীজী পর্দা-প্রথার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রথা অতি জঘন্য ও নৃশংস। এই প্রথা নারী সমাজকে অনুন্নত করে রেখেছে। তিনি বলেছেন যে, এই বর্ব্বর প্রথা প্রথমে যে উপকারেই লেগে থাকুক না কেন, এখন দেশের অশেষ ক্ষতি করেছে, তিনি বলেছেন যে, নারীকে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও আত্ম-উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে।

গান্ধীজী ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য—ত্যাগের প্রতীক। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর বাণী কেবল ভারতের জন্যই নয়, উপরন্তু বিশ্বের জন্যও। বিশ্ব-শান্তি তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন উগ্র ভাব ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা কামনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি ফেডারেশনই একমাত্র সঠিক পথ। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ তাঁহার ছিল প্রধান কাম্য। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণকে তিনি দেশের কল্যাণের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ এই ধরণের।

বিগত মহাযুদ্ধ ভারতের সামনে এনে দিয়েছিল বহু অভাব-অভিযোগ। এবং সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ২।১টি বড় বড় শিল্প যখন কুটীর-শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করতে লাগল, তখন গান্ধীজী গুজরাটের প্রসিদ্ধ বণিক্‌বংশভূত হয়েও ভারতের জীর্ণ কঙ্কাল দেখে শিউরে উঠলেন। ভারতের জনসাধারণের জীবন ধারণের হারের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের লোকের জীবন ধারণের হারের তুলনা করে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন—দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে কিরূপ শিল্প ভারতের মত গরীব দেশে প্রযোজ্য হবে। তিনি ছিলেন গ্রাম্য কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতী। এতে বেকার সমস্যা যত শীঘ্র দূর করা যাবে, বড় বড় শিল্পের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। বড় বড় শিল্প-চালনার শক্তিকে মানুষের বড় একটা কাজে লাগানো হবে না—যন্ত্রই হবে সে শিল্পের প্রধান শক্তি। তিনি বলতেন, একটি যন্ত্র হাজার হাজার শ্রমিকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে। তিনি যন্ত্র-শক্তিকে বড় ভয় খেতেন। এই জন্যই তিনি আজীবন ভারতবাসীকে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তারা ঘরে-ঘরে কুটীর-শিল্প গড়ে তোলে এবং অবসর সময়ে তাঁরা যেন চরকা হতে হাতে-কাটা সুতা প্রস্তুত করেন। এই পথ ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে দেশের সামনে বাধা আসবে অনেক।

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

—"Discovery of India" হইতে

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।

—রবীন্দ্রনাথ

শেষ প্রণাম

ওই শোন ওই শোন বাজে
শোকাত ভারতের বিষণ্ণ অন্তর-মাঝে—
জয়তু গান্ধীজী, প্রণাম গান্ধী মহারাজে ॥

এ নাম একদা হবে দুঃখী-দুঃস্থজন আশা
নির্বাক্ মূঢ় মূক মুখে দিবে জীবনের ভাষা,
আনিবে চেতনা নব এ মৃত সমাজে।
জয়তু গান্ধীজী, প্রণাম গান্ধী মহারাজে—
ওই শোন ওই শোন বাজে
শোকার্ত ভারতের অস্থির অন্তর-মাঝে।

যে আনিল এ কুটিল কুৎসিত হিংসার পাথারে
মা ভৈঃ মন্ত্র আজ নমি সেই মানুষের ত্রাতারে।
করি সম্বল সবে নির্ভয় অহিংস-মন্ত্র
পার হব সে পাথার ভেঙে লোভ-স্বার্থের তন্ত্র ;
হত্যা-হিংসা মুখ লুকাইবে লাজে।
জয়তু গান্ধীজী, প্রণাম গান্ধী মহারাজে—
ওই শোন ওই শোন বাজে
শোকার্ত ভারতের শঙ্কিত অন্তর-মাঝে ॥

পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ।
যাদের জীবন ছিল ব্যবসার পণ্য,
শোষণে শোষণে যারা জীর্ণ,
তুমি তাদের লাগি অনুখন ছিলে জাগি',
অহিংস-পন্থায় শান্তির অনুরাগী—
পুড়ালে জীবন-দীপ সত্যের আলো মাগি'
সংশয়-কালো করি দীর্ণ।
পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ ॥

তোমারে প্রণাম করি এ যুগের ভীষ্ম,
প্রণমি নূতন-যুগ-বুদ্ধ,
মহাভারতের যীশু নমো নমঃ গান্ধী,
ত্যাগ-হোমানল-পরিশুদ্ধ !
ত্যজি নরদেহভার আরো হ'লে আপনার
দেখালে ক্ষুদ্ধজনে শান্তির পারাবার,
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি সুনিবিড় এ আঁধার
করিলে আলোক-সমাকীর্ণ.
পীড়িত পতিত ভীত মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ ॥

এই হ'ল ভালো হে ভগবান্,
ধন্য তোমার মহাবিধান
মানব-প্রেমিক পুত্র তোমার
মানুষের হাতে ত্যজিল প্রাণ ॥

আজো হিংসার বিরাম নেই,
যুগে যুগে তাই ঘটিছে এই,
তোমার মহিমা প্রচারিতেই
বিশ্বাসীদের আত্মদান।
এই হ'ল ভালো হে ভগবান্ ॥

হিংসার স্রোত রুধিতে পাঠাও
অবতারদের বারংবার,
কভু পাপ কভু পুণ্য প্রবল—
বিচিত্র তব এ সংসার !

পাপ-পুণ্যের সে সংগ্রাম
এখনো মথিছে মর্ত্যধাম,
এবার ধন্য গান্ধীনাম—
সবে গাই তাঁর বিজয়-গান।
এই হ'ল ভালো হে ভগবান্ ॥

—সজনীকান্ত দাস

রেবতীভূষণ ঘোষ

গান্ধীজীর "ষ্টাইলই" তাঁর চরিত্র

ইংরেজীতে একটা সুপরিচিত কথা আছে, 'Style is the man himself'—ষ্টাইলের মধ্যেই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। কথাটা মিথ্যা নয় বললেও সব বলা হয় না। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বলছেন—কাব্যের আত্মা হ'ল 'রীতি'। কাব্যের আত্মা রীতি তো নিশ্চয়ই, কবির আত্মাও রীতি, কবির এবং মানুষেরা ষ্টাইলের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'রীতি' কথা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। 'রীতি' হ'ল ভাষার দোষগুণ বিচার, ষ্টাইল কিন্তু ঠিক তা নয়। ষ্টাইল তার চাইতে আরও অনেক বড় জিনিস। বিষয়বস্তুর বিশিষ্টতার জন্য, প্রেরণার বৈচিত্র্যের জন্য, একই লেখকের রচনার রীতির তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কোথাও ভাষার গতি খরস্রোতা নদীর মতন স্বচ্ছ সাবলীল, কোথাও 'শান্ত শ্যাম স্তব্ধ সুগম্ভীর', কোথাও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতন উত্তাল তার ভঙ্গিমা, ভয়ঙ্কর অথচ অদ্ভুত সুন্দর। ওজস, গুণ, প্রসাদ ও শ্লিষ্টতা গুণ, গাঢ়বন্ধতা—এ সব হ'ল ভাষার গুণাগুণ। ষ্টাইল এই ভাষাগত গুণাগুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'ষ্টাইল' হ'ল ভাষাগত ও ভাবগত গুণাগুণের এক অপূর্ব সমন্বয়, যার মধ্যে প্রেরণার সঙ্গে মানুষের ভিতরের প্রাণটিও নিরাভরণ মূর্তিতে প্রকাশ পায়। 'ষ্টাইল' ভাব ও ভাষার মিলনে এমনই এক অভিনব সৃষ্টি যার মধ্যে স্রষ্টার সম্পূর্ণ সত্তাটি চেনা যায়। 'রীতি' তাই 'ষ্টাইলের' প্রতিশব্দ হতে পারে না। লেখকের চরিত্র, লেখকের ব্যক্তিত্ব, লেখকের মেজাজ আবেশ দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্ত এই 'ষ্টাইলের' মধ্যে ধরা প'ড়ে যায়। এ-রকমটি আর কোথাও ধরা পড়ে না। রীতি ষ্টাইলের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু ষ্টাইলের সর্বস্ব নয়। "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া"—ষ্টাইল কতকটা তাই। ষ্টাইলকে তাই আলঙ্কারিকদের রীতি-বিচারের মতন বিচার বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন মানুষকে যেমন সম্পূর্ণ চিনতে পেরেছি বলা ভুল, তেমনি ষ্টাইলকেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুল। মনের মানুষটি যেমন ধরা দিয়েও একেবারে ধরা পড়তে চায় না, কাছে এলেও যেমন মনে হয় দূরে—বহু দূরে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, বড় বড় মানুষের ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার গভীর সান্নিধ্য, তার হাব-ভাবে কথা-বার্তায় কাজ-কর্মে অথবা ভাবপ্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিমার মধ্যে প্রতিফলিত হলেও এ কথা বলা যায় না, সে ব্যক্তিটিকে একেবারে ইট-পাথরের মতন চিনে ফেলেছি, অথবা কারও ব্যক্তিসত্তাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে ফেলেছি। আরশিতে যে চেহারাটা দেখা যায় সেটা আসল চেহারার একটা অতি-নিকট নকল চেহারা মাত্র। আসল মানুষের রক্ত-মাংসের তপ্ত স্পর্শ তার মধ্যে কখনই পাওয়া যেতে পারে না। প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস তার মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তবু বলা যায়, আরশির চেহারাটা ফটোগ্রাফ নয়। আসল মানুষটা সামনেই আছে, কাচের সাধ্য নেই অবশ্য যে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণতা বিচ্ছুরিত করে, অথবা তার প্রাণের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত করে। তবু শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে বক্ষঃস্থলের যে ওঠা-নামার ছন্দ তা ঐ আরশির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, রক্ত-মাংসের গন্ধ বা উষ্ণতা না বিচ্ছুরিত হলেও তার আভাটা সেখানে নিশ্চয়ই ফুটে ওঠে। ক্যামেরার চাইতে আরশির ক্ষমতা এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে অনেক বেশি। আরশির কাছাকাছি আসল মানুষটিকে সব সময় থাকতে হয়। 'ষ্টাইলকে' তাই 'আরশির' সঙ্গে তুলনা করলে ভুল করা হয় না। এর অত্যন্ত কাছাকাছি আসল মানুষটি সব সময়ই থাকে, তার প্রাণের স্পন্দন, তার রক্ত-মাংসের জীবন্ত সত্তাকে তার মধ্যে অনুভব করা যায়। তপ্ততার অনুভূতিটুকু কল্পনাসাপেক্ষ। 'ষ্টাইল' তাই আরশি তো নিশ্চয়ই, ভেনিসিয়ান আরশি।

'ষ্টাইল' সম্বন্ধে এর বেশি প্রাগোক্তির প্রয়োজন নেই এখানে। এটুকুর প্রয়োজন ছিল এই জন্য যে, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর ষ্টাইলের মধ্যে যে ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া মূর্খতারই নামান্তর মাত্র। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব অনির্বচনীয়, তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি কোন শিল্পীরও নেই। তবু যে সব গুণাগুণ নিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে, তার চরিত্র পূর্ণতা লাভ করেছে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তিনি 'একটি মানুষ' হিসাবে সূর্যের মতন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছেন, সেই সব গুণাগুণের অনেকটা পরিচয় তাঁর লেখার ষ্টাইলের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তবু এ কথা বলতেই হবে, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা আসেননি, তাঁদের পক্ষে ষ্টাইলের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিনতে পারা সাধনাতীত ব্যাপার। তা'হলেও চিনতে যে পারা যায় না তা নয়, 'চোখ' যদি সজাগ থাকে, 'মন' যদি উন্মুখ হয়, তা'হলে চেনা নিশ্চয়ই যায়, অবশ্য সে-চেনা যদিও আরশির ভিতর দিয়ে চেনার মতনই হবে। তাই গোড়াতেই বোঝা প্রয়োজন যে, 'ষ্টাইল' আরশি ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও সেটা ভেনিসিয়ান আরশি।

আরও একটা কথা 'প্রাগোক্তি' হিসাবে বলা এখানে বিশেষ প্রয়োজন। গান্ধীজীর যে ষ্টাইলের কথা এখানে বলা হবে সেটা হ'ল তাঁর 'ইংরেজী ষ্টাইল'। গান্ধীজীর মাতৃভাষা ইংরেজী নয়, হিন্দুস্থানীও নয়। গান্ধীজীর মাতৃভাষা গুজরাটী। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে গুজরাটী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু গুজরাটী ভাষায় গান্ধীজীর লেখার বা বক্তৃতা করার সুযোগ জীবনে বিশেষ হয়নি। গুজরাটী ভাষায় তাঁর রচনা বা বক্তৃতা যে নেই তা নয়, আছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের

ঘনিষ্ঠতম পরিচয় সেই গুজরাটী ষ্টাইলের মধ্যেই পাওয়া যাবে। গুজরাটী ষ্টাইলটাই হ'ল গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের ভেনিসিয়ান আরশি। হিন্দুস্থানী বা ইংরেজী আর যাই হ'ক, ভেনিসিয়ান আরশি নিশ্চয়ই নয়! কিন্তু গান্ধীজীর রচনার বেশির ভাগই হ'ল ইংরেজী ভাষায় লেখা। সেই রচনার ষ্টাইলের ভিতর দিয়েই তাঁকে এ দেশের এবং বিদেশের অধিকাংশ লোক চেনে। ইংরেজী ভাষাকে তিনি যে রকম আপনার ক'রে নিয়েছিলেন তাতে অনেক ইংরেজও লজ্জিত হবেন। এখানে সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, ইংরেজী ভাষাকে যে তিনি শুধু আত্মসাৎ করেছিলেন তা নয়, ইংরেজ জাতের যা কিছু বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব তাও তাঁর মতন এমন ভাবে একেবারে আপনার ক'রে নিতে কাউকে দেখা যায়নি। তাঁর চরিত্রের যে নিয়মানুগত্য, যে শৃংখলা ও সংযম-বোধ, যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তা ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতীয় চরিত্রের যে ঐতিহাসিক ঢিলেমি ও দীর্ঘসূত্রতা তার ছিটেফোঁটাও ছিল না তাঁর মধ্যে। এ দেশের রাজা-বাদশাহরা, সাধক-সংস্কারকরা জীবনটাকে দেখেছেন 'শাশ্বতের' পটভূমিতে—'মহাকালের' পরিপ্রেক্ষিতে। গান্ধীজী কোন দিনই তা দেখেননি। বাইরের জগতেও না, ব্যক্তিগত জীবনেও না। তাই মহাসাধক হলেও, তাঁকে বিপ্লবী মহাসাধক বললে খুব অন্যায় হয় না। "শাশ্বতের" নয়, গান্ধীজীর জীবনে "ঘড়ির" মূল্য অসাধারণ। 'মহাকাল' নয়, প্রত্যেকটা দিন, ঘণ্টা, মিনিট পর্যন্ত তাঁর কাছে মূল্যবান। তাঁর খাওয়া-শোয়া, বিশ্রাম, কাজ-কর্ম, প্রার্থনা পর্যন্ত সবই ঘড়ির কাঁটা ধ'রে, মহাকালের বৈঠা ধ'রে নয়। এটা এদেশী রীতি নয়। এটা পাশ্চাত্য রীতি। এই ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। আশ্চর্য! যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার "যন্ত্রকে" দানব ভেবে কোন দিন অভিনন্দন জানাতে পারেননি, তিনি মনে-প্রাণে এমন ভাবে 'যান্ত্রিক নিয়মানুগত্য'কে গ্রহণ করলেন কি করে? বিদেশীর জাতীয় বিশিষ্টতাকে এই ভাবে আত্তীকরণের অসাধারণ ক্ষমতা যাঁর আছে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই বিদেশীর মাতৃভাষাকে নিজের মাতৃভাষার মতন আয়ত্ত করা সম্ভবপর। তা ছাড়া, আদর্শ ইংরেজের মতন এতটা আপনার ক'রে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করার মধ্যেই গান্ধীজীর ঐকান্তিক সার্বজাতিকতা-বোধ প্রকাশ পেয়েছে বলা চলে। বিশ্বমানবতাবোধ যাঁর অস্থি-মজ্জায় মিশে যায় তিনি যে গুজরাটী এবং ভারতীয় হয়েও ইংরেজী ষ্টাইলের প্রবর্তক হবেন, তাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দও তো বাঙালী। কিন্তু তাঁদের ইংরেজী 'ষ্টাইল' কি তাঁদের সর্বজনীন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়? এ সব কথা স্বীকার করেও বলতে হবে, অন্তত সত্যের খাতিরে যে, ইংরেজী ভাষা এ দেশের মাতৃভাষা নয়, তাই 'ইংরেজী ষ্টাইলও' এ দেশের কারও ব্যক্তিত্বের ভেনিসিয়ান আরশি নয়, যদিও আরশি নিশ্চয়ই।

এই ক'টি কথা মনে রেখে আমরা এখানে গান্ধীজীর ইংরেজী ষ্টাইলের আলোচনা করব। অবশ্য আলোচনাটা ঠিক ষ্টাইলের সাহিত্যিক বিচার নয়, তা স্বল্প-পরিসরে করা সম্ভবও নয়, এখানে তার প্রয়োজনও বিশেষ নেই। এখানে সেই ষ্টাইলের মধ্যে গান্ধীজীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কতটা ফুটে উঠেছে তারই বিচার করব। বিচার-প্রসঙ্গে দেখব, ইংরেজী ষ্টাইলটা গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের কাছে ভেনিসিয়ান আরশি না হলেও, বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার আরশি। তার মধ্যেই তাঁর আসল সত্তাটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর মাতৃভাষায় লেখা রচনার ষ্টাইলের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর সত্তার গভীরতম পরিচয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে গুজরাটী রচনার উল্লেখ না ক'রে আমরা ইংরেজী রচনা উদ্ধৃত করব কেন তা আগেই বলেছি। খুব বেশি উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই, কারণ গান্ধীজীর 'ষ্টাইল' একটি, তাঁর ষ্টাইলের মূলগত বিশিষ্টতাও একটি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বও এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং তাঁর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই একই 'ষ্টাইল' প্রকাশ পাবে, এবং সেই ষ্টাইলের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বও ফুটে উঠবে। তাই ষ্টাইলের নমুনা হিসাবে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেও যা কাজ হবে, দু'-একটি দৃষ্টান্ত দিলেও তার চাইতে কিছু কম কাজ হবে না।

গান্ধীজীর ইংরেজী ষ্টাইল ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলার আগে, এ যুগের ইংরেজী ষ্টাইলের দু'-এক জন যুগ-প্রবর্তকদের রচনা উল্লেখ করব। এক জন টি, ই, লরেন্স (ডি, এইচ, নন), আর এক জন উইনষ্টন চার্চিল। এই দু'জনকে বেছে নেওয়ার কারণ আছে। টি, ই, এবং উইনষ্টন দু'জনেই ইংরেজ জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দু'টো দিকের প্রতিমূর্তি। টি, ই-র মধ্যে ইংরেজ জাতির ঐতিহাসিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সে-চরিত্রের জন্য ইংরেজদের জাতিগত শ্রেষ্ঠতা আজও রাজনৈতিক কারণে আমাদের দেশের কোন ইংরেজ-বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, উদারতা ও স্পষ্টবাদিতা। টি, ই, লরেন্সের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে আরবদের সংঘবদ্ধ ক'রে যুদ্ধে নামাবার জন্যে পাঠিয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধের পরে আরবদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যুদ্ধে জয় হবার পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা হ'ল স্বতন্ত্র জাতের, সেখানে ইংরেজ, আমেরিকান, ডাচ, ফরাসী সকলের বৈশিষ্ট্যই এক। ইংরেজ জাতের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই তা নয়। তাই টি, ই, যুদ্ধের খেতাব বর্জন করলেন, সৈনিকের জীবন থেকেও অবসর গ্রহণ করলেন এবং শেষে "Seven Pillars of Wisdom" নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে আরবদের সঙ্গে তাঁর জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেলেন। টি, ই'র নিজের ভাষাতে বলতে গেলে, "The book is just a designed procession of Arab freedom from

[ইহার পর ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]
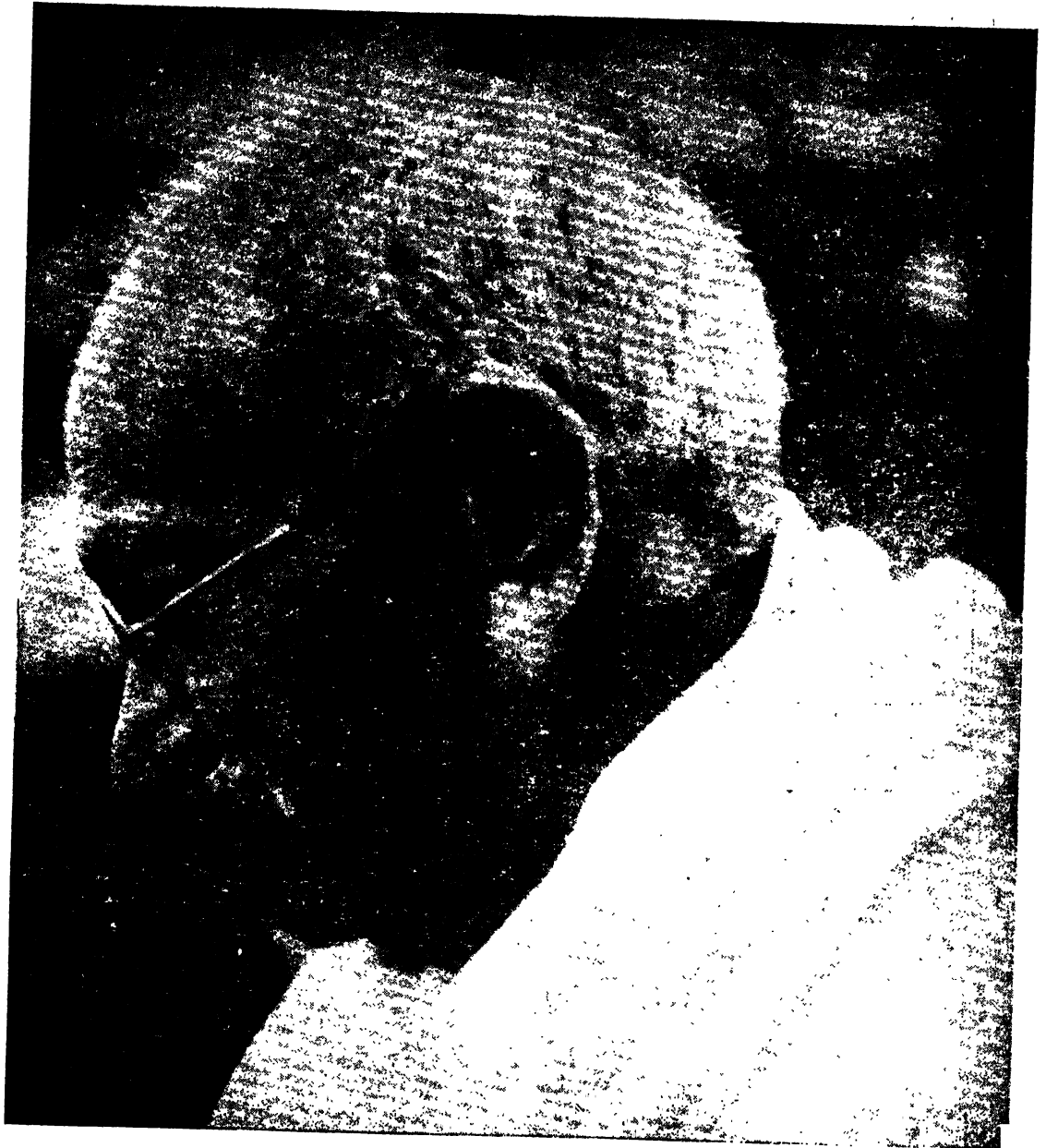
"আমার জীবনই আমার বাণী"

ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহ-তারা—
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয় তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন-'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক, ঘুচে যাক সব শোক,
সব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্যজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ— সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

—রবীন্দ্রনাথ

হাওয়া-গাড়ীতে কস্তুরবা'র সঙ্গে

সুভাষ যখন রাষ্ট্রপতি তখন —বসুমতী

ডুলীতে নোয়াখালী পরিভ্রমণ —বসুমতী
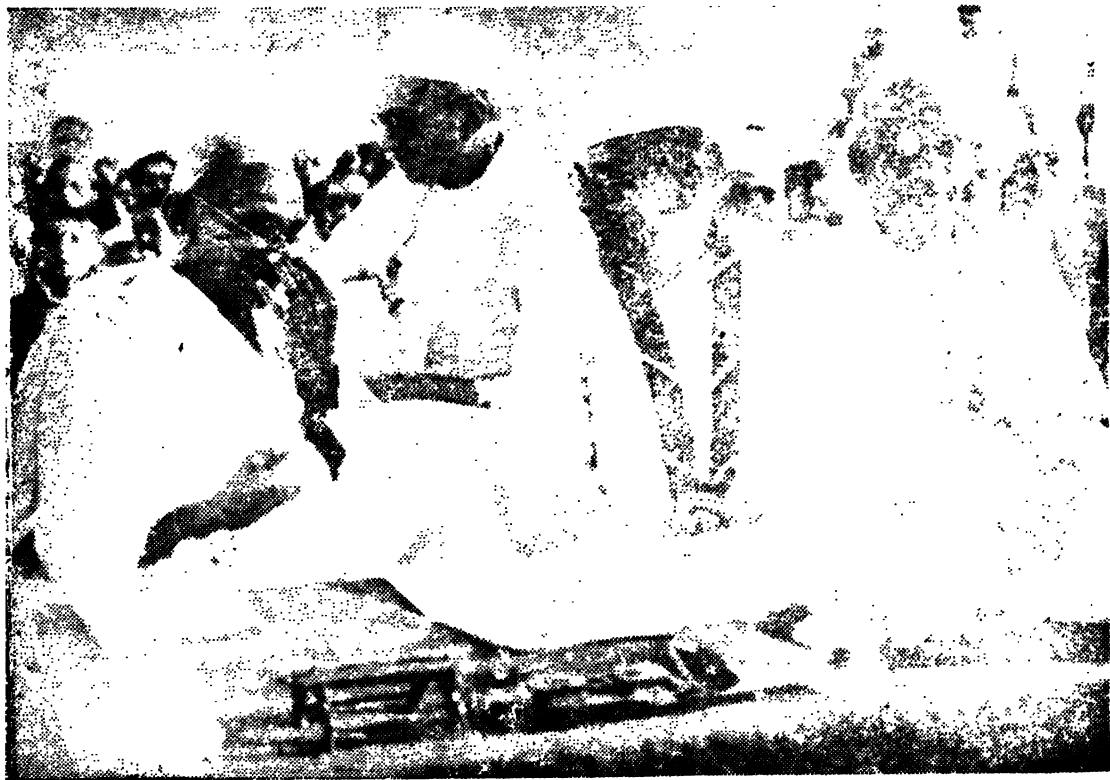
দুই গান্ধী —বসুমতী

"হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হলে
আমি দেহরক্ষা করব।"

—মহাত্মা গান্ধী

ঐক্য —মনুজ দাস

মহাত্মাজী

নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও, মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্তত আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায় তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটেই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যাসেটিসিজম তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায়-বসনকে আমি দেখবা মাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বলতে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকে পাবেন।

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

মহাত্মা আত্মার ধর্ম্ম দেহের নয়, সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই ক'টি অসাধারণ গুণ দেখতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত, তাঁহার নির্ভীকতা আর পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কত দূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোন অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যুক্তি নেই; তাঁ'র এ ভাষা যেমন সংযত তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ ভাষায় তাঁর মনের নগ্নরূপ লোকের চোখের সুমুখে তিনি ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদপূর্ণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ করলুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতায় সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে ষ্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ—ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ সৃষ্টি করতেন তাহলে তাঁর জন্ম-মৃত্যু যে একই তারিখে হত, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই।

লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যুক্তি হয় না এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায়নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পূরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্ব্বে হয়েছে যে, হয়ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেননি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তার পর অসংখ্য নন-কো-অপারেশন ভক্তদের মুখে অগণ্য বার শুনেছি যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল এবং এই সব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময় তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতায় ও সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি ওয়ার্ক অব আর্ট-স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের—সক্রেটিসের বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও তুষ্ট করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের এপোলজি বাঙলায় অনুবাদ করবার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ করতে সমর্থ হই, তাহলে বাঙলা পাঠক মাত্রেই দেখতে পাবেন যে, উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

বর্ত্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব, কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি, কে কি সে বিষয়ে ততটা মন দিইনে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে টু ডু, আর সেকালে ছিল টু বি এই দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তার দু'টি-চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

যে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এত দিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পড়ে আসছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, অপর কারও চরিত্রে ততটা পাওয়া যায়নি।

এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী এক জন আদর্শ পুরুষ এ কথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবল মাত্র পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে, উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই জনসাধারণের কাছে তাঁর এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন—অর্থাৎ নন-ভায়োলেন্স-এর বদলের তিনি ভায়োলেন্স প্রচার করতেন, তাহলে জনসাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তাহলে তিনি স্থিতধী ব্যক্তির বশীকরণ শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে রাখা উচিত, যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্মমও নই, নিরহঙ্কারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই। আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হব এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হব।

—সবুজপত্র, ১৯২২ —প্রমথ চৌধুরী

আমেরিকাও কেঁদেছে

আমেরিকার সহরতলী পেনসিলভেনিয়ার পেরকাসিতে সেদিনও সূর্য্য উঠল। আমরাও উঠলুম, ছেলেরা স্কুলে যাবে—একটু দূরে। সবাই মিলে সকালের চায়ের টেবিলে বসে দৈনন্দিন গল্প-গুজব করছিলুম।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আকাশটা ঘোলাটে, তুষার পড়েছে খুব। ছেলেরা ভাবছিলো আরও তুষার পড়লে কেমন হয়।

সহসা আমাদের পিতা ঘরে ঢুকলেন। মুখ মেঘাবৃত। বললেন—রেডিও থেকে এক সাংঘাতিক খবর পেলুম এই মাত্র। সবাই তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম—শুনলুম মৃত্যুতুল্য সংবাদ,—গান্ধীজী আর ইহজগতে নেই।

ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এক আমেরিকান পরিবারের কাছে এ সংবাদ যে কত মর্ম্মান্তিক, ইচ্ছে হয় ভারতবাসীদের সে কথা জানাই।

সংবাদের সবটা শুনলুম। সাধারণ মৃত্যু নয়। সমগ্র জীবন যিনি শান্তি ও মৈত্রীর জন্যে সাধনা করেছেন, তাঁর দেশের মানুষের শান্তির জন্যে জীবন পণ করেছেন,—তিনি নিহত হয়েছেন। আমাদের দশ বছরের ছেলেটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, আমার ইচ্ছে হয়, কেউ যেন কখনও আর বন্দুক তৈরী করতে না শেখে।

আমরা গান্ধীজীকে কখনও দেখিনি। যখন আমরা ভারতে ছিলাম তিনি জেলে ছিলেন। তবু আমরা সকলেই তাঁকে জানি। এমন কি ছেলেরা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে এত পরিচিত ছিল যেন তিনি আমাদের সঙ্গেই বাস করছেন। পৃথিবীর গুটিকয়েক ঋষির তিনি ছিলেন অন্যতম,—পৃথিবীর সত্যপালন করতে যে গুটিকয়েক নির্ভীক ঋষি জন্মেছেন,—তাঁদের ভেতর তিনি অন্যতম।

তোমরা ভারতবাসীরা শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, আমেরিকায় তাঁকে চেনে না এমন লোক নেই। রাস্তায় একটি চাষার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগে দেখা হোল, সে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, সবাই ত' বলে গান্ধী খুব ভাল মানুষ—, তবে গান্ধীকে ওরা মারলে কেন?

আমি মাথা নাড়লুম। সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, ধীরে ধীরে বললে—মনে হয়, যীশুকে তারা যেমন মেরেছিল, গান্ধীকেও বোধ হয় ঠিক সেই রকম সেই জন্যই মেরেছে।

সে ধ্রুবসত্য বলেছিলো। জগতে একমাত্র যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনার সঙ্গেই গান্ধীজীর মৃত্যুর তুলনা হয় না। গান্ধীকে তাঁরই দেশের মানুষ মেরেছে—এ জগতে আর এক ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনী।

শুধু আমাদের দেশ নয়, জগতের সর্ব্বত্র, যারা কখনও দেখেনি, তারাও আজ কাঁদছে। তিনি বিশ্বমানবের মন জয় করে এক অপরূপ মুহূর্ত্তে ইহজগৎ পরিত্যাগ করেছেন।

—পার্ল, এস, বাক্

গান্ধীজী

"দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালি ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধীজী !' 'গান্ধীজী !'
বাতায়নে ছাখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
কৃষাণের বেশে কে-ও কৃশ-তনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !
কৌসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,'
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !
ক্রোর টাকা আর ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝিঁ
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য ?—'গান্ধীজী' ! 'গান্ধীজী !'

* * * *

এশিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্‌লাম্-সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে যারা এশিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে গেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-হাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈবুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া মর্ম্ম রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোণা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা তন্ত্র-সহ
অভয় মন্ত্র দিয়ে দেশ দেশে ফিরিছে যে অহরহ;
"মহাবাণী যার শকতি—আধার, অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে—
স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিবে তপে।"

* * * *

যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে—পেয়েছে স্বরাজ গণি;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ-স্বকরে নিজের বসন বোনা;
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল করে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকার ছায় যারা হাত প্রেষ্টিজ অজুহাতে,—
স্বরাজ—সে নৈবুজ্য তেমন আম্‌লাতন্ত্র সাথে।
হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্ব-প্রকাশের পথে
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চরিত্র-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎশালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।' কহে যে সবে;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধীর গাহ জয়"।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মহাত্মাজীর প্রিয় ভজন

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে॥
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক ভব ভবন-দ্বারে॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে॥
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস-রাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে॥

—রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেকের অল্পকাল মধ্যেই আমি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও অনুরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধান্বিত হই। ১৯১৩ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অসহযোগ আন্দোলন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আমাকে সেখানে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে কবিকে আমি সচেতন করিয়াছিলাম। আমার আন্তরিক ইচ্ছার আতিশয্যে তিনি আমাকে বলেন, "বিলম্ব করিবেন না; আপনার যাওয়াই বিধেয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া আপনি তাঁহার কার্যে আত্মনিয়োগ করুন।" কবির আশীর্বাদ লইয়া আমি যাত্রা করি।

পরবর্তী কালেও, যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রদেশে আমার পরলোকগত বন্ধু উইলি পিয়ারসনের সহিত যাতায়াত করি, প্রতিবারই কবি তাঁহার আশীর্বাদ আমায় পাঠাইয়াছেন, তথাকার অধিবাসিবৃন্দের ভিতর তাঁহার প্রীতির বাণী প্রচার করিতে আমায় বলিয়াছেন।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে সামরিক আইনের ঘন দুর্যোগে কবি আমার আশ্রমে কালক্ষয় না করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে বলেন, আমিও মহাত্মাজীর নেতৃত্বে সেখানে কর্মরত হই। অবশেষে কবির সম্মতিক্রমে মহাত্মাজী আমায় পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করেন।

মালাবারের হাঙ্গামার সময়, যখন মোপলা ও হিন্দু উভয়েই ভয়াবহ নিপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী পুনরায় আমাকে উঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত তথায় যাইতে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে আমি কবির অনুমতি-প্রার্থী হইলে আশ্রমে আমার সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন সত্ত্বেও কবি আমায় মালাবারে দুর্গতদিগের সাহায্যার্থে যাইতে বলেন। মালাবারে আমার থাকাকালে কবি কোনো দিনও আমার আশ্রম হইতে অনুপস্থিতি জনিত অসুবিধার উল্লেখমাত্র করেন নাই, অধিকন্তু আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব আতত্রাণে সাহায্য হইতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও গুরুতর অস্ত্রোপচারের পর মহাত্মার অতিশয় অসুস্থাবস্থায় তাঁহার সন্নিধানে থাকিবার নিমিত্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আশ্রমে তাঁহাকে আমরা সকলে "গুরুদেব" বলি) স্বেচ্ছায় ও আনন্দে দ্বিধামাত্র না করিয়া আমাকে পুনরায় শান্তিনিকেতন হইতে পুণায়, অতঃপর আহ্মেদাবাদে প্রেরণ করিয়াছেন। গুরুদেব যখন মধ্য-প্রাচ্য প্রদেশে গমন করেন তৎপূর্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি যেন কোন মতেই আমাকে মহাত্মার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ সাগ্রহে আমায় বলেন, "মহাত্মাজী তোমার প্রয়োজন বোধ করেন, বিলম্ব করিও না, এখনই যাও।" আমিও সেই দিনই গুরুদেবের আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করি।

দুর্গতের প্রতি সমবেদনা

আমার মনোজগতে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই মহাপুরুষের সমাবেশ কিরূপে ঘটিল? কি কারণে আমার অন্তরে এতদুভয়ের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি সমাবর্তী হইয়া উঠিয়াছে? তাহার কারণ এই যে, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যেই দরিদ্রের প্রতি, অভাবগ্রস্ত ও নির্য্যাতিতের প্রতি, দুর্দশাগ্রস্ত জনমানবের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতার প্রচুর নিদর্শন পাইয়াছি। উত্তর-ভারতে সর্বত্রই কবি রবীন্দ্রনাথের দুঃস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রতি গভীর প্রীতির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বৎসরের পর বৎসর, গঙ্গাতীরবর্তী শিলাইদহে কবি তাহাদিগের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করিয়াছেন, তাহাদের দুঃখ-বেদনার ভার বহন করিয়াছেন। গ্রাম্য জীবনের আখ্যায়িকাবহুল উৎকৃষ্ট ছোট গল্পগুলি কবির গল্প রচনার শ্রেষ্ঠতমাংশ বিবেচিত হয়। কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া গ্রামবাসীদিগের সহিত অবস্থান করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এই প্রকার নির্জন প্রবাসের সুযোগেই আমি কবিহৃদয়ের গুরুত্ব ও গভীরতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতি, নির্জনতার অভিলাষ, ভারতের পল্লী জীবনের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ এবং দরিদ্রের প্রতি সহজ ও সুগভীর সহানুভূতি এই সময়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শান্তিনিকেতনে বিচিত্র কর্মব্যস্ততার ভিতরেও কবির দরিদ্র-প্রীতি কদাপি ম্লান হয় নাই।

মহাত্মাজীর পুণ্য-সঞ্চারী প্রভাব

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের প্রথম ও গভীরতম অনুভূতি দুর্দশাগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িতকে কেন্দ্র করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসকালে তাঁহার এই মহতী সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি। জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্রের প্রতি তাঁহার করুণা সমভাবে প্রবাহিত দেখিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু বার দেখিয়াছি, তামিল শিশু ও নারী-পরিবৃত হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। চালানী চুক্তিবদ্ধ হতভাগ্য মজুরদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি কত গভীর তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। আর্ত মানব মাত্রের প্রতিই তাঁহার করুণা বিদ্যমান। দারিদ্র্যপীড়িতের প্রতি তাঁহার অনুকম্পা ও নিষ্ঠার নিদর্শন প্রকৃত পক্ষেই অতীব বিস্ময়জনক। ওতপ্রোত ভাবে তাহারা আমার মন-প্রাণ অভিভূত করিয়াছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই তিনি ইহারই পরিচয় নিঃশব্দে অবিরত দিতেছেন। বাক্যাপেক্ষা কার্যের দ্বারাই পীড়িত, নির্যাতিত, অক্ষম, রুগ্ন ও অসহায়ের প্রতি তাঁহার অপার করুণা প্রকটিত করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ তিনি সর্বপ্রথম কর্তব্য বলেন কেন? মাদক দ্রব্য ও পানীয় বর্জনের জন্য তিনি সাতিশয় নির্বন্ধ প্রকাশ করেন কেন? চরকায় সুতা-কাটা ও বস্ত্রবয়নের ব্যবস্থা প্রতি কুটীরে প্রচলনের প্রচেষ্টাই তাঁহার কর্মপদ্ধতির শীর্ষে স্থানলাভ করিয়াছে কেন? এই জন্য অর্থনীতির

দোহাই তিনি দেন নাই, রাজনৈতিক কারণও তাহার নিকট সর্বপ্রকৃষ্ট নহে। বস্তুত, তাঁহার নিকট ইহার প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মমূলক। প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে তিনি এইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন শুধু এই কারণেই যে, দরিদ্রতম ভারতীয় গ্রামবাসীকে দারিদ্রের পাশমুক্ত করিতে হইলে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই উপায়ে তাহারা স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজন মত খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে, অর্ধভুক্ত বা ভিক্ষাবস্থায় দুসম্পূর্ণ অনাহারী থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঋণভারে নিস্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

একদা মহাত্মা গান্ধীকে পত্রযোগে আমি জানাইয়াছিলাম যে, অস্পৃশ্যতা বর্জন যেরূপ প্রাধান্য পাওয়া উচিত তাহা না হইয়া জাতীয় আন্দোলন গঠন উদ্দেশ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ক্রমশঃ তৎপরিবর্তে মুখ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মাজী ঐ পত্রের উত্তরে লিখেন যে, যত দিন তিনি এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, তত দিন আমার এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কেন না, তাঁহার জীবনের গূঢ়তম সত্তা এই সমস্যা-কেন্দ্রিক। বস্তুত, এই বিষয়ে তাঁহার নিজের অনুভূতির সুগভীরত্বের জন্যই তিনি এই বিষয়ে সমধিক বাগবিন্যাস করিতে পারেন না।

উক্ত পত্রে আমি আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম, মাদক দ্রব্য ও সুরাপানের সম্বন্ধে। মহাত্মা গান্ধী পানদোষ বর্জনের উপরও সমতুল্য গুরুত্ব আরোপ করেন। সুরা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষ অতি দ্রুত ভাবে অধঃপতনে অগ্রসর হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী যথাসাধ্য এই দুর্দশা হইতে মুক্তির প্রচেষ্টা করিতেছেন। কেবল মাত্র এই পানদোষ ও মাদক দ্রব্যের নেশার জন্য দরিদ্র লোকে কোন মতেই দুঃখ-দৈন্য হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টা করিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী আধুনিক যুগের এই দুরপনেয় কলঙ্কের কৃতপ্রতিজ্ঞ বিরুদ্ধপন্থী। আমার জ্ঞাতসারে অদ্যকার দিনে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সমগ্র জগতের (কেবল মাত্র ভুক্তভোগী ভারতবাসী নয়) দরিদ্রবন্ধু অপর কেহ নাই, দরিদ্রের জন্য তাঁহার মত আজীবন কঠোর ত্যাগ স্বীকার কেহই করেন নাই।

উভয়ের মানবপ্রীতি

এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য প্রাঞ্জল ভাবে আমি মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিষ্ঠা এবং উদ্রেকের কারণ নির্দেশ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যেই সমান ভাবে জাজ্বল্যমান মানবপ্রীতি এবং নির্যাতন ও দারিদ্র-পীড়িতের সেবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

শুধু কণ্ঠনীতিতেই নয়, সাক্ষাৎ কর্মক্ষেত্রেও কবি অনুরূপ কর্মসাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম-পথের ধূলিতে কবি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তিনিও দরিদ্রের সহিত একত্র বাস করিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের ভার বহন করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েই একমত যে, দেশসেবকবৃন্দ যত দিন না সমস্যার আত্যন্তস্থিত অস্তিম দারিদ্র্যগ্রস্ত, সমাজে সর্বনিম্নস্থ, সর্বহারা হতভাগ্যের সেবায় তৎপর না হইবেন তত দিন ভারতের স্বাধীনতালাভ কদাপি হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই সমগ্র সমস্যার মূল কেন্দ্র এবং এই কারণেই আমার চিত্ত এতদুভয়ের প্রতি এরূপ গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

উভয়ের জাগ্রত দেশাত্মবোধ

স্বদেশ-প্রীতির ক্ষেত্রেও উভয়েই সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া ভারতবর্ষকে ভালবাসেন। উভয়েই এ ক্ষেত্রে আমার গুরু-স্থানীয়। ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উভয়েই সর্বান্তঃকরণে আনন্দ প্রকাশ করেন। ভারতের অপমানে (১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের দুর্ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়) তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত অবদান মানবতার আত্মবোধ নিদর্শন। সেই সময় আমি উভয়ের সহিত অবস্থান করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মানসিক ক্লেশ ও অসহ্য অশান্তির আমি প্রত্যক্ষদর্শী। সামরিক আইনের অজুহাতে সেই নিদারুণ অত্যাচারের ফলে স্তম্ভিত বিস্ময় ও দ্বিধার ভাব ভঙ্গ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জ্ঞাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কি কখনও কেহ ভুলিতে পারেন? ক্ষুব্ধ ক্রোধাবেশে তিনি "স্যার" উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় যে পত্র রচনা করেন তাহার দরুণ সমগ্র বিশ্বলোক ঐ জঘন্য অত্যাচারের জটিল গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই পত্রই সম্ভবতঃ অসহযোগ আন্দোলনের সর্বাধিক জলন্ত ও প্রাথমিক নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্র কলিকাতায় যখন রচনা করেন, আমি তাঁহার সহিত তখন অবস্থান করিতেছিলাম। তাঁহার অব্যবহিত পূর্বে আমি বোম্বাইতে মহাত্মা গান্ধীর নিকট ছিলাম। এ সময় মহাত্মার মনের অশান্তি ও গ্লানি আমি প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত আছি। অবিলম্বে পাঞ্জাবে গিয়া কারাবরণের সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বহু কষ্টে নিবৃত্ত করা হয়। ঠিক করিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু তাঁহাকে পাঞ্জাব গমনের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে আমিও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, সে সময় তখনও আসে নাই।

ত্যাগ-স্বীকারে অভিন্নতা

আমার এই প্রবন্ধের দ্বারা কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি আমার বাঞ্ছনীয় নয়। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মনস্বিতা এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসামঞ্জস্য আমার অজ্ঞাত নহে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি গভীরতর ঐক্যসূত্রের সন্ধান আছে এবং তাহারই অনুসন্ধানে আমার প্রবন্ধটি রচিত। সাধারণ মানবের নিকট যাহা প্রিয় ও বিশেষ ভাবে কাম্য, উভয়েই আদর্শের খাতিরে তাহা বিসর্জন করিয়াছেন। হয়তো তাঁহাদের এই ত্যাগস্বীকার উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল উৎস একই।

—সি, এফ, এণ্ডরুজ

❋ সূর্য্য-বীজ ❋

শতাব্দী যায় গড়িয়ে
—সময়-সমুদ্রের সামান্য একটা ঢেউ।
হে কালের অধীশ্বর
অন্য মনে তুমি কি থাক ভুলে?

পৃথিবী আবর্ত্তিত অন্ধ নিয়তির চক্রে।
মানুষের ইতিহাস হিংসার বিষে ফেনিল।

ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা
একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা, শ্মশানের প্রান্তচর
আবর্জনা-কুণ্ড ঘিরে, বীভৎস চীৎকারে'
নির্লজ্জ হিংসায় তারা, হানাহানি করে,—
'মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার' দিকে দিকে বেজে ওঠে।
তুমি কি তখনও নির্লিপ্ত নির্বিকার?

মন বলে,—না।

যুগে যুগে তুমি পাঠাও তোমার দূত
—সূর্য্যাংশের অনির্ব্বাণ প্রাণ-শিখা।
দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে সমস্ত দীপ যখন নির্ব্বাপিত,
মৃত্যুর তমিস্রায় সমস্ত পৃথিবী যখন নিমগ্ন,
অকম্পিত সে শিখা
তখনও জ্বলে পরম দুঃসাহসে,
অন্ধ রাত্রির সমস্ত বিভীষিকাময় ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে
দাঁড়ায় একা;
বলে,—এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

এই শিখা বার বার আমাদেরই মাঝে জন্ম নেয়,
ধন্য করে
এই ধরণীর ধূলি-মলিন শতাব্দী।

যে আধারে সে শিখা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে,
সে আধার যায় ভেঙে;
তবু সে শিখা ত' হারিয়ে যাবার নয়।

আকাশের তারায় আর একটু অপরূপ দীপ্তি
সে শিখা রেখে যায়,
পৃথিবীর শ্যামলতায় বুলিয়ে দিয়ে যায়
আর এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতা,
আকাশের নীলিমা তার কাছে পায়
রহস্য-নিবিড় আর এক মহিমা।

দেশে দেশে মানব-সত্যের যে সংশপ্তক বাহিনী
আজও সাজছে নিঃশব্দে চরম সংগ্রামের জন্যে,
যুগে যুগে যারা সাজবে,
তাদের মশালে সেই শিখারই আলো,
তাদের পতাকায় তারই অম্লান দীপ্তি।
কত শতাব্দীর ঢেউ
সময়ের সমুদ্রে হবে লীন,
মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মূঢ়তায়
পথ হারাবে;
তবু হে কালের অধীশ্বর
হতাশ আমরা হব না।

এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য্য-বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয়।
মোহাচ্ছন্ন বর্ত্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে'
সুদূর যুগান্তে তার সঙ্কেত প্রসারিত;
মানবতার গভীর উৎস-মূল
অক্ষয় তার প্রেরণা।

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ,
তবু সেই সূর্য্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়,
এই আমাদের গৌরব।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

—এলজিএইচ
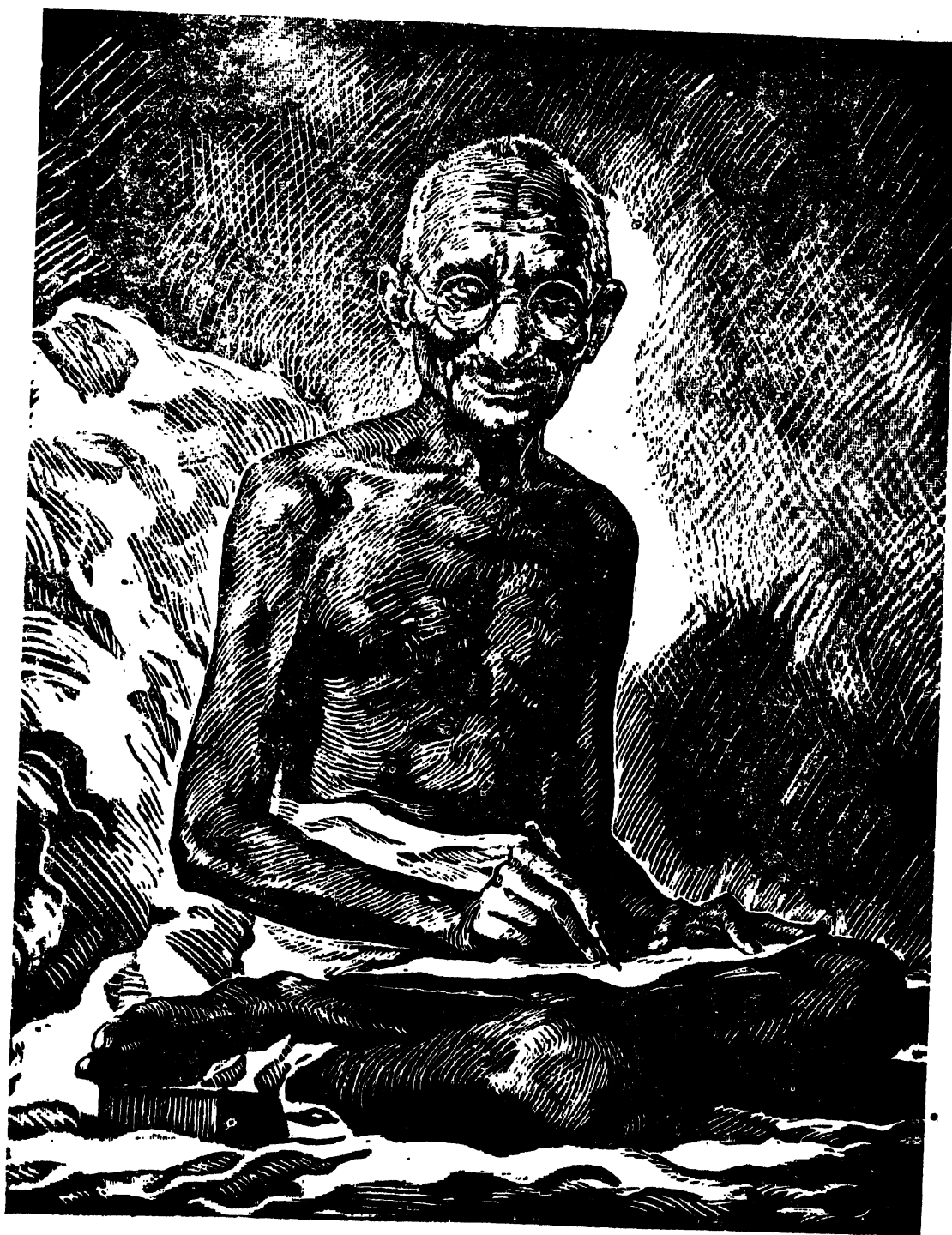
বেঁচে আছ শুধু তুমি...

ব্লীৎজ, পত্রিকার সৌজন্যে

আমরা সবাই মৃত।
আজ শুধু বেঁচে আছ তুমি—
বেঁচে আছ বাঁচিয়ে তুলতে আমাদের।
একটা দুর্ব্বার শক্তিকে পেছনে রেখে
তুমি চলে গেছ।
ক্ষয় নেই, শেষ নেই সেই শক্তির।
তোমারই সে অঙ্গুলি-সংকেতে
আমরা এতদিন চলেছি।
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয়ের অন্ধকারে
আজও তুমি আমাদের সারথি।

ইতিহাসে অমরত্ব-লাভ!
অতি সাধারণ সৌভাগ্য।
ইতিহাস তুমি যে স্বয়ং॥
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সে তুমি,
জাতির দেহ, মন, আত্মা—তাও তুমি।
আমাদের সত্তায় অনুভব করি তোমাকে
অনুভব করি আমাদের মূর্চ্ছিত চেতনায়—
প্রচণ্ড ঝড়ের সুগভীর সে অনুভূতি।
আশ্চর্য্য হই অন্ধ বাধার স্পর্দ্ধা দেখে
যখন সে তোমার গতিপথ রোধ করে দাঁড়ায়।
আরো আশ্চর্য্য হই
যখন তুমি ক্ষমা করো তাকে।

তোমারই নিশ্বাসে অনুভব করি
আমাদের জীবন—
আমাদের প্রাণের স্পন্দন।
তুমি কি শুধু স্মরণীয়?
আত্মার আত্মা যে তুমি প্রতি মানবের।
অদৃশ্য সমাহিত শান্তির মধ্যে তুমি বসে আছ
মানবমৈত্রীর দৈববাণী কণ্ঠে নিয়ে।
হিংসায় ভরা পৃথিবীতে আজ উঠেছে
সেই বাণীর প্রতিধ্বনি।

জীবনের উর্দ্ধলোকে তোমার আসন,
তোমার তাই মৃত্যু নেই।
এই শোকার্ত্ত সংকীর্ণ পৃথিবীতে
তুমি যে মৃত্যুহীন আলোকস্তম্ভ!
নিশ্চল নিষ্কম্প দ্যুতি তুমি,
আশা তুমি,
আশ্রয় তুমি,
হিংস্র অন্ধকারের মধ্যে।
তুমিই ভরসা ব্যথাহত নিখিল মানবের,
দুঃখ ও দুর্দ্দৈবের একমাত্র ত্রাতা তুমি।
শঙ্কা ও সন্দেহ,
বঞ্চনা ও বেদনা,
মাথা নত করে তোমার বিশ্বাসের কাছে।

হে সত্যাশ্রয়ী!
তোমারই উপলব্ধ সত্যের মধ্যে
উৎকীর্ণ হ'য়ে রইলো শাশ্বত জয়ের ঘোষণা
শত-শতাব্দীর ইতিহাসের পটে।

—হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
অনুবাদক—মণি বাগচী

মহাশ্রাদ্ধ

দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত অজ্ঞতার দীর্ঘ বিভাবরী
অতিক্রম করেছে পৃথিবী
তবু তুমি হে-অভ্যাস রোমাঞ্চিত প্রাচী। অভ্যাস
অজ্ঞতার আষ্টে-পৃষ্টে অর্থহীন যুক্তির বন্ধনে
ঈশ্বরের জন্ম দাও,
যে ঈশ্বর বাণী দেয় বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করে
নির্বিরোধী মানুষের লঘুচিত্তে জাগায় বেদনা
যে ঈশ্বর জন্ম নেয় মানুষের ধ্যানের ঔরসে।

জাতক দেবত্ব পায়
আপন পিতৃত্ব ভুলে পিতা করে পুত্রের ভজন
অভ্যাসের দীর্ঘ তপে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ নয় আজো
অনন্ত শ্মশান-ভস্মে অনন্ত অশ্রুর কলরোলে
ক্ষীরোদ লবণ দধি সমুদ্র-মন্থনে
অমৃতে ও হলাহলে
ঈশ্বরের মহাজন্ম তবু চলে প্রাচীন অভ্যাসে।

ঈশ্বর ঈশ্বর শোনো অতিপূজ্য অদ্ভুত ঈশ্বর
ঋষিশ্রাদ্ধে মাতৃশ্রাদ্ধে পিতৃশ্রাদ্ধে আজো শ্রাদ্ধ করি
মহাগুরুনিপাতনে শ্রাদ্ধ করি যুগ-যুগান্তর
নগ্নপদে নতমুখে একবস্ত্রে জনসিন্ধু-তীরে
শ্মশান-বৈরাগ্যে মৌন মন
ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে বিদীর্ণ বিহ্বল
শ্রাদ্ধ করি মহাভিক্ষু নিহত-পিতার
শ্রাদ্ধ করি শ্রদ্ধেয় আত্মার।

ক্ষমা প্রেম অহিংসার শ্রাদ্ধের বাসরে
মুণ্ডিত মস্তকে মহাপাপের অনলে দগ্ধ মন
শ্রাদ্ধ করে স্বয়ং ঈশ্বর
অরক্ষিত জনকের নিহত আত্মার
অন্তরের বাণীমূর্তি শ্রাদ্ধ করে—মহামানবের
বিধাতার মহাশ্রাদ্ধ
ক্ষমা প্রেম শান্তি অহিংসার
পিতৃদ্রোহী ভগবান্ শ্রাদ্ধ করে আপন সত্তার।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

ভারতে গান্ধী-যুগ

প্রভাবে-পীড়নে ভারতের জন-সাধারণ তখন জড় পদার্থ। অন্যায়-অনাচার, অধর্ম্ম ও নির্ব্বীর্য্যতার সুযোগে যে বেদুইন সভ্যতা ভারতকে গ্রাস করেছিল, সে সভ্যতা ভারতের ভেদকে শাশ্বত করে তুলেছে—সে ভেদের সুযোগে মহাভারতকে গ্রাস করেছে ইউরোপ। ভারতের জনগণের শোণিত শোষণ করে প্রাণটুকুও কেড়ে নিয়েছে তারা।

এমন সময় মাথা তুলল্ দুনিয়ার গণশক্তি। ধ্বনি উঠ'ল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। জাগে বিদ্রোহ, বাধে বিপ্লব—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, গলিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। যৌবনের সে জল-তরঙ্গ নব্য ভারতেও এসে পৌছে। ভেঙ্গে গড়বার আয়োজন এখানেও চলে।

কাথিয়াবাড়ের সুদামাপুরীতে মোহনদাস যখন জন্মেছিলেন (১৮৬৯ খৃঃ—২ অক্টোবর, প্রায় ৭-১৫ মিঃ) তখন এদেশে এক দিকে যেমন পাশ্চাত্যপন্থী ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব, তেমনি প্রভাব রাজা রামমোহনের, কেশবচন্দ্রের ও সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের। এর ৩ বছর পরে আর এক জন যুগনেতা শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। প্রাচীনতম পরিস্থিতিতে মোহনদাসের জন্ম। পিতা কাবা গান্ধীর চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী পুতলীবাঈএর চার সন্তানের সর্ব্বকনিষ্ঠ মোহনদাস। তাঁদের ধনি-পরিবার দুই পুরুষ ধরে সামন্ত নৃপতিদের প্রধান মন্ত্রিত্ব করেন। কাবা গান্ধী রাজকোটে যখন বিচারপতির পদ নিলেন, তখন মোহনদাসের বয়স ৭ বছর। পড়েন রাজকোটের এক পাঠশালায়। এই বয়সেই ধনী-বণিক গোকুলদাস মাকনজীর শিশুকন্যা কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হয়, আর ৫ম শ্রেণীতে পড়বার সময় সে বিয়ে হয় সম্পন্ন মোহনদাসের মন এতে সায় দেয়নি, তিনি ব'লছিলেন—"I can see no moral argument in support of such preposterously early marriage" সে ইয়ং বেঙ্গলের যুগ। সর্ব্বত্র বেপরোয়া বিদ্রোহ। ইংরেজ বিদ্বেষের অঙ্কুরিতও হচ্ছে একটু একটু রাজকোটে মোহনদাসের কিশোর বন্ধুরাও চঞ্চল। তারা বললে—"ইংরেজরা কেমন শক্তিমান দেখেছ? হ'য় ৫ হাত লম্বা জোয়ান! তারা খায় মাংস। তাইতেই ত' জুড়ে ভারতবাসীর উপর করে কর্তৃত্ব। দেশ যদি মাংস খেতে সুরু করে, তা হলেই তারা ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারবে।" মোহনদাসেরও বিশ্বাস হল তাই। গোপনে চলল বন্ধুদের সঙ্গে মাংস খাওয়া, গোপনে চলল ইংরেজের মত পা ফাঁক করে সিগারেট খাওয়া।

বয়স তখন ১৬ (১৮৮৫)। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের হ'ল জন্ম। রাজকোটে তাঁর বাবার হল মৃত্যু। (১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান) এল পরিবর্ত্তন ভারতের ভাবজগতে, গান্ধীজীরও মনে। ১৮ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্ত্তি হয়ে দেখলেন, লেখাপড়ার অসুবিধে। বন্ধুরা বললেন, যাও বিলেত। মা বললেন, ছেড়ে কি করে থাকব? জিদ ধরলেন মোহনদাস, যেতেই হবে। বললেন—দিব্যি করছি মা, মদ, মাংস, মেয়ে তিন বর্জ্জন করব। সমাজ বললে, সমুদ্রযাত্রা—সে হতেই পারে না। মোহন বললে—কে মানে তোমাদের? সমাজ করে এক ঘরে। নির্দ্দেশ দেয়, বিলেত যাত্রায় যে ওকে সাহায্য করবে তার জরিমানা পাঁচ সিকে।

কিন্তু পাঁচ সিকে ওঁকে ধরে রাখতে পারে না। বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়লেন (১৮৮৮, ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। বিলেতে যখন পৌছলেন, তখন 'জেণ্টেলম্যান' সাজবার জন্য ইংরেজী কেতার পোষাক হ'ল, সিল্কের হ্যাট হল। নাচনা শিখতে গিয়ে ছন্দে পা পড়ল না। বেহালায় ইংরেজী গৎ বাজাতে গিয়ে বেসুরো বোল বেরুল। বক্তৃতা শিখতে চেষ্টা করলেন, ফরাসী ভাষার পাঠ নিতেও চাইলেন, সুবিধে হ'ল না।

বিলেতেও তখন ভারতীয় স্বাদেশিকতার অনুকূল হাওয়া বইছে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় প্রবাসী ভারতবাসীরা উদ্বুদ্ধ। মোহনদাস সে প্রভাব এড়াতে পারেন নি। জীবনধারা তাঁর ভিন্নমুখে চলে।

তিনি হিসেবী হলেন। খরচা অর্দ্ধেক কমালেন। ৮।১০ মাইল প্রত্যহ হাঁটতে লাগলেন। খুব পড়া-শুনা চললেও দুই বারের চেষ্টায় লণ্ডন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করলেন (১৮৯০, ২১ বৎসর)। ঠিক এই সময় কেমব্রিজে বসে অরবিন্দ এক্রয়েড ঘোষ যখন ভারত উদ্ধার করবার জন্য সন্ত্রাসবাদী ভাবধারায় পুষ্ট হচ্ছিলেন, তখন মোহনদাস থিওসফিষ্টদের সঙ্গে গিয়ে ম্যাথু আর্ণল্ডের গীতা-পাঠে ব্যস্ত।

ব্যারিষ্টারী খেতাব নিয়ে এরই এক বছর পরে, (১২ই জুলাই, ১৮৯১) মোহনদাস ভারতে ফিরলেন ওকালতী ব্যবসা করবার জন্য। ওতে সুবিধে হয় না। স্যর ফিরোজ শা মেটা বললেন—'সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছ। ইংরেজ রাজপুরুষদের জানতে-বুঝতে দেরী আছে।' কাথিয়াবাড়ের চক্রান্ত তাঁর ধাতে সয় না। পোর বন্দরের এক মুসলমান কারবারী (আবদুল্লা কোং) চাকরী দিয়ে যখন মোহনদাসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান (১৮৯৩, এপ্রেল) আর এই বছরই ভারত স্বাধীন করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অরবিন্দ এসে পৌঁছলেন বিলেত থেকে ভারতে, আর যুব-ভারতের মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণী বিশ্বময় প্রচার করতে বের হলেন।

গায়ে লম্বা কোট আর মাথায় পাগড়ী, মোহনদাস নাটালে ডার্ব্বান আদালতে গেলেন ব্যারিষ্টারী করতে। ম্যাজিষ্ট্রেট বললে, খুলে ফেল পাগড়ী! মোহন বললেন, সে হবে না। আদালত থেকে বেড়িয়ে এসে সংবাদ পত্রে আন্দোলন চালাতে গেলেন। সংবাদিকরা বললে, 'Unwelcome visitor'। ওরা ভারতবাসীদের নাম দিয়েছিল 'কুলী' 'স্যামি'। মোহনদাসের নাম হ'ল 'কুলী ব্যারিষ্টার।' ওখানে পৌছানর ৭।৮ দিন পরে ট্রেণে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট করে তিনি চললেন প্রিটোরিয়া। নাটালের রাজধানী মারিৎস্বুর্গ ষ্টেশনে শ্বেতাঙ্গরা 'কালা' লোককে তাদের সঙ্গে বসে চলতে দেখে বললে—'এখানে বসা চলবে না।' নামতে অস্বীকার করলে এক কনষ্টেবল ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে। শীতের রাতে সেখানে বসে মোহনদাস কাঁপতে লাগলেন—সঙ্কল্প করলেন, এই কালা-ধলার ভেদ ভাঙ্গব—ভাঙ্গব!

সেই রাতেই তিনি আবার ট্রেণে উঠে প্রাতে চার্লস টাউনে পৌছলেন। তার পর ঘোড়া-গাড়ী। গাড়ীর কণ্ডাক্টার শ্বেতাঙ্গ।

কণ্ডাক্টারের স্থান কোচম্যানের পাশেই থাকে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গটির হুকুম, মোহনদাসকে কোচম্যানের পাশে বসতে হবে। নিজে গিয়ে বসল ভিতরে। কয় ঘণ্টা পর গান্ধীজীকে যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললে, পায়ের তলায় বস। গান্ধীজী বললেন, হতে পারে না। সাদাটা তাঁর কাণ দিল মলে—তাঁকে টেনে নামাতে চাইল, মারতে লাগল। মোহনদাস কোচবক্সের পিতলের রেলিং চেপে ধরে অচল পড়ে রইলেন। সন্ধ্যায় গাড়ী ষ্টাণ্ডার্টনে পৌঁছলে দাদা আবদুল্লার বন্ধুরা তাঁকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। কোচ কোম্পানীর এজেন্টকে সব ব্যাপার জানিয়ে তিনি পত্র দিলেন, কিন্তু সাদাটার শাস্তির জন্য জিদ্ করলেন না।

সেই রাতেই জোহান্সবার্গে পৌঁছে মোহনদাস গ্রাণ্ড ন্যাশনাল হোটেলে গেলেন, হোটেলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অস্পৃশ্য ভারতবাসী বলে ঢুকতে দিল না।

মোহনের বয়স তখন ২৫। যুগটা এশিয়ার যুব-জাগরণের। ভারতে লর্ড ডাফরিণের কীর্ত্তি ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ইংরেজের কাছে করজোড়ে বারোয়ারী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। অরবিন্দের নেতৃত্বে যুব-ভারত বলছে—আবেদন-নিবেদনে দেশ স্বাধীন হবে না, চাই Purification by blood and fire (৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩) ;—স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে ভারতের কথা প্রচার করে ভারতীয় তরুণদের বুকে প্রদীপ্ত করলেন আশা ও উৎসাহ (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)—চীনে খৃ-আন্দোলন মিশরে প্যাট্রিয়টিক দলের (হাসন-এল-বান্নান) আন্দোলন—দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের উদ্যোগ—রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাপানের তোড়জোড়। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বধর্ম্ম সাধনায় যুব-ভারতের ভবিষ্য কর্ম্মধারার যে আভাস মিলেছিল, তার ভার যেন এসে পড়েছিল মোহনদাসের উপর। তাই দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের ৭ বছর পরে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি অবহেলিত ভারতবাসীর সেবার জন্য সর্ব্বধর্ম্মদর্শনের, বিশেষতঃ খৃষ্ট-দর্শনের সাধনায় ব্যস্ত। তিনি পড়লেন কোরাণ, বাইবেল, টলষ্টয়ের 'Kingdom of God is Within You', ম্যাক্সমূলারের What India can Teach us' জর থুস্ত্রের বাণী, উপনিষদ প্রভৃতি পড়তে লাগলেন। আর এ সব দর্শনের সাধনা হতে লাগল নির্য্যাতিত ভারতবাসীদের সেবায়। তিনি পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করলেন যে, বিদেশেও ভারতবাসীরা খৃষ্ট-উপাসক জাতিদের নিকট লাঞ্ছিত, ভারবাহী ক্রীতদাস। তাই প্রধানতঃ অহিংস খৃষ্টান সাধনা দিয়ে তিনি খৃষ্টানদের মনে সদ্বুদ্ধি ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলবার ভার নিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের সম্বন্ধে সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করে ফেললেন। প্রিটোরিয়ায় ভারতবাসীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের দুর্দশার কথা তিনি বর্ণনা করলেন। এ সভায় যোগ দিয়েছিল বেশীর ভাগ মুসলমান (মেমন) বণিকরা, হিন্দুর সংখ্যা ওখানে কম। সভায় গান্ধীজী বক্তৃতা করলেন—প্রথম বক্তৃতা। বললেন, প্রথমে আত্মশুদ্ধি কর, সত্যবাদী হও, পরিচ্ছন্ন হও, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর মধ্যে মিল আন।

যে মামলায় জন্য মোহনদাসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার আপোষ হয়ে যেতেই (১৮৯৪) তিনি ভারতে ফিরবেন ঠিক হ'ল। ডার্বানে তাঁর বিদায় সম্বর্দ্ধনা-সভায় বসে 'নাটাল মার্কারী' পত্রের এক জায়গায় দেখলেন, নাটাল সরকার ভারতবাসীদের ভোটাধিকার লোপ করতে এক বিলের আয়োজন করছে। ভারতবাসীরা মোহনদাসকে অনুরোধ করল, এ বিপদে ফেলে না যেতে। তিনিও রাজী হলেন।

ঐ দিনই রাতে তিনি নাটাল ব্যবস্থা পরিষদে দাখিল করবার জন্য আবেদনের খসড়া তৈরী করলেন। সরকারের কাছে তার পাঠান হ'ল বিল স্থগিত রাখতে অনুরোধ করে। এক মাসের মধ্যে আবেদনে সই করল ১০ হাজার ভারতবাসী। ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড রিপনের কাছে তা পাঠান হ'ল। প্রত্যহ সভা! প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে কি জাগরণ! তারা গান্ধীজীকে বললে—আপনি নিয়মিত কিছু টাকা নিন। তিনি বললেন—কাঞ্চন বিনিময়ে জনসেবার রুচি তাঁর নেই। নাটালের সুপ্রিম কোর্টে এডভোকেটরূপে ভর্ত্তি হবার জন্য তিনি আবেদন জানালে নাটাল ল সোসাইটি বাধা দিল, তবু আবেদন গ্রাহ্য হ'ল।

এ সময় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর উপর শ্রদ্ধা বশতঃ গান্ধীজী নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপন করলেন। এ কংগ্রেস বছরে একবার বারোয়ারীতলার উৎসব নয়। নাটাল কংগ্রেসের ২৫ বছরের তরুণ নেতা মোহনদাস বাহিরে যেমন আন্দোলন চালাতেন, ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত সদাচার ও উন্নতি বিধানের বাস্তব আয়োজনও কম করেননি। সেখানকার কিশোর যুবকদের জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন কংগ্রেসের উদ্যোগে নাটাল এডুকেশনাল এসোসিয়েশন। তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি তখনকার দিনে অভিনব। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সহযোগিতা কর যথাসম্ভব, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যা খবর পাও সংবাদপত্রে প্রচার কর, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণের জবাব দাও। নাটালের আদর্শে ট্রান্সভাল ও কেপটাউনেও শাখা-প্রতিষ্ঠান তিনি গড়লেন।

এই আড়াই বছরে জন-সেবার সঙ্গে মোহনদাসের ওকালতী ব্যবসায়ে অর্থাগম মন্দ হয়নি। স্থির করলেন, নাটালেই স্থায়িভাবে বাস করবেন। তাই স্ত্রী ও দুই ছেলে (একটি ৮ বছরের, ১টি ৪ বছরের) আনবেন স্থির করে ভারতে ফিরলেন (১৮৯৬,—২৮ বৎসর)।

কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন—সার ফিরোজ শাহ মেটা, জজ বদরুদ্দীন তায়েবজী, জজ রাণাড়ে, বালগঙ্গাধর তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই নাটাল থেকে তার। যেতেই হবে। সপরিবারে যাত্রা করলেন (২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬)।

নাটালে ষ্টিমার থেকে নামতেই (১৮৯৭,—১৩ই জানুয়ারী) কতকগুলো শ্বেতাঙ্গ যুবক চেঁচিয়ে উঠল—গান্ধী! গান্ধী! তথাকার প্রসিদ্ধ এডভোকেট মিঃ লাফটন রিক্সা ডাকালেন। শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডারা আটক করল, পাথর, পচা ডিম ছুঁড়ে মারল। কেউ তাঁর পাগড়ী কেড়ে নিল, কেউ মারতে লাগল লাথি। মার খেয়ে পড়ে গেলেন। এক বাড়ীর রেলিং চেপে ধরলেন। গুণ্ডাদের প্রহার থামল না। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি গান্ধীজীকে আবৃত করে দাঁড়ালেন। পুলিস এসে তাঁহাকে নিয়ে থানায় গেল। এক ডাক্তার বন্ধু সেবা করলেন। তাঁকে থানায় লুকিয়ে থাকতে বলা হ'ল। তিনি বললেন—'নিশ্চয় ওদের উত্তেজনা কমে গেছে, তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়। ওদের সদ্বুদ্ধির উপর

বিশ্বাস করতেই ত হ'বে।' পুলিশের পাহারায় রুস্তমজীর ভবনে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা ওখানে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের সদ্‌বুদ্ধি হয়নি। তারা রুস্তমজীর বাড়ী ঘিরে ফেলল। চীৎকার করতে লাগল—গান্ধীকে চাই! পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট গান্ধীজীকে পত্র লিখে জানালেন, তোমার বন্ধুর বাড়ী ও সম্পত্তি, আর তোমার স্ত্রী-পুত্রাদিকে যদি বাঁচাতে চাও, ছদ্মবেশে বাড়ী ছেড়ে পালাও। ভারতীয় এক কনষ্টেবলের পোষাক তিনি পরলেন, মাথায় দিলেন লোহার বাটি, তার উপরে মাদ্রাজী পাগড়ী। সঙ্গে চলল সাদা পোষাকে দুই গোয়েন্দা—এক জন মুখ পেণ্ট করে ভারতীয় ব্যবসায়ী সেজেছিল। চটের স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে, কতকগুলো বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে থানায় গিয়ে পৌঁছলেন।

বৃটিশ উপনিবেশ-সচিব জোশেফ চেম্বারলেন নাটাল সরকারকে তার করে জানালেন, গান্ধীর আক্রমণকারীদের অভিযুক্ত কর। নাটাল সরকারের পত্রের উত্তরে গান্ধীজী লিখলেন—'আমি কাউকে অভিযুক্ত করতে চাই না। যারা আমায় মেরেছিল তাদের কোন দোষ নাই। ওদের কেউ বুঝিয়েছিল যে, আমি ভারতে গিয়ে নাটালের শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে সাজান কথা প্রচার করেছি। তাদের নেতাদের অপমান করেছি। এ জন্ত দোষ নাটাল সরকারের। আমি কাউকেই অভিযুক্ত করতে চাই না। আমার স্থির বিশ্বাস, সত্য যখন প্রকাশ পাবে, তখন তারা তাদের আচরণের জন্ত হবে অনুতপ্ত।'

শ্বেতাঙ্গরা লজ্জা পেয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করেছিল, গান্ধী নির্দ্দোষ। তারা গুণ্ডাদের নিন্দা করেছিল। গান্ধীজী এ সম্বন্ধে পরে বলেছেন—'এই lynching আশীর্ব্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা বেড়ে গেছল, এতে আমার কাজ হয়ে উঠেছিল সহজ। এই অভিজ্ঞতা থেকে সত্যাগ্রহ অনুশীলনের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।'

এ বছরই ইংরেজ-রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবের দিনে দামোদর চাপেকার র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌টেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে হত্যা করে (প্রথম রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড)। আবার এই বছরই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। আফ্রিকায় বসে ২৮ বছরের যুবক গান্ধীজীও জীবনের ধারা বদলেছিলেন। নিজের কাপড়-চোপড় নিজে পরিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে বই পড়ে নিজে শিখলেন, স্ত্রীকে শেখালেন। প্রিটোরিয়ার শ্বেতাঙ্গ হাজামখানায় যখন তাঁকে ঢুকতে দিল না, তখন তিনি ক্লিপার কিনে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজে ক্ষৌরকার্য্য করতে লাগলেন। ভারতীয় শিশুদের ও-দেশের স্কুলে প্রবেশ নিষেধ, তাই নিজের ছেলেদের স্কুলে পাঠালেন না, বাড়ীতেই গুজরাটি ভাষায় গল্পের ছলে শিখাতে লাগলেন। একটা ছোট হাসপাতালে তিনি প্রত্যহ প্রায় ২ ঘণ্টা সেবার কাজ করতে লাগলেন, এতে তামিল তেলেগু ও উত্তর ভারতের লোকদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে লাগল। তারা তাঁকে আপনার জন মনে করতে লাগল।

বয়স তখন ত্রিশ (১৮৯৯)। বাধল বুয়র যুদ্ধ (১০ই অক্টোবর)। বোম্বায় বীরভে বাঙ্গালী যুব-সমাজে বিদ্যুৎ সঞ্চারণ করেছে। সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে। বয়রদের প্রতি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সহানুভূতি থাকলেও তিনি মনে করলেন যে, ভারতের মুক্তি হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহায়তায়। কাজেই বৃটিশ-শাসনের প্রতি আকর্ষণের ফলেই তিনি ইংরেজকে এ যুদ্ধে সাহায্য ক'রেছিলেন।

ভারতে তখন দৈব দুর্য্যোগ। মহা ভূমিকম্পে (১২ জুন, ১৮৯৭) প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসী বিপন্ন। বহু নদ-নদী বিশুষ্ক। চারি ধারে অনাহার ও হাহাকার—দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। দক্ষিণ আফ্রিকায় সে সংবাদ যখন পৌঁছল, প্রত্যেক প্রবাসী ভারতবাসী সেবার জন্ত অর্থ পাঠালেন ভারতে গান্ধীজীর হাত দিয়ে।

(৩২ বছর বয়সে ১৯০১) গান্ধীজী দেশে ফিরলেন। সোণা, হীরে, মাণিক, কত কত অর্থ, কস্তুরবার জন্ত লক্ষ টাকার কণ্ঠহার উপঢৌকন। গান্ধীজী বললেন, এ সব রইল প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্ত—"Conviction has ever grown on me that a public worker should accept no gifts."

কলকাতায় তখন কংগ্রেসের অধিবেশন (১৯০১ ডিসেম্বর)। বিপন্ন দেশবাসীর ধারণা—"People had believed that regeneration could only come from outside, that another nati n would take us by the hand and lift us up and that we have nothing to do for ourselves,"—গান্ধীজী কলকাতার কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার হ'লেন—অন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কংগ্রেস অধিবেশনে ধাঙ্গড়ের কাজের বাস্তব শিক্ষা দিলেন। নিজে কংগ্রেসের এক জন সাধারণ সম্পাদকের কেরাণী ও বেয়ারার কাজ গ্রহণ করলেন।

স্বামিজী তখন ভারতময় মানুষের সন্ধান করে ফিরছেন—আর আইরিশ বিপ্লবী নারী ভগিনী নিবেদিতা। গান্ধীজীরও ইচ্ছে হ'ল, পরিক্রমণ ব্যতীত স্বদেশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। গোখলে দিলেন লোহার এক টিফিন বাক্স। বার আনা দিয়ে নিজে ক্যাম্বিসের এক ব্যাগ কিনলেন। ব্যাগে একটা মস্ত উলের কোট, একখানা ধুতি, গামছা ও ১টা সার্ট। কাঁধে কম্বল ও লোটা। যাবেন কলকাতা থেকে রাজকোট। বাহন ট্রেণের থার্ড ক্লাশ। বারাণসী, আগ্রা, জয়পুর, পলানপুরে ধর্ম্মশালায় ১ দিন করে বিশ্রাম। ব্যয় সবলকে ৩১৲। বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের পর শুনলেন এনি-বেশান্ত পীড়িতা, দেখা করলেন। ১৯০২ মার্চ্চের মাঝামাঝি বোম্বাই গিয়ে যখন আফিস খুললেন, তখন তাঁর মনোভাব বরদাস্ত করবার মত অবস্থা স্বামিজীর সাক্ষাৎ প্রভাবে বিচলিত ভারতের নও-জোয়ানের নেই। এ বছরই স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নেবার সময় ভারতের সেবার ভার দায়স্বরূপ অর্পণ করেছিলেন ভারতের নতুন জাতের কাঁধে। তারা সে দায় গ্রহণ করে অনুশীলন সমিতি খুলল পুণায়, ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি থেকে অরবিন্দ বাংলায় বিপ্লবের বীজ আমদানী করলেন। মাত্র আন্দোলনে তুষ্ট হ'ল না দেশ! তাদের নেতারা বলতে লাগলেন—"Agitation is not in any sense a test of true patriotism. The test is selfhelp and se'f sacrifice" ... self help এবং self sacrifice

চলতে লাগল, তখন-দারুণ আ

আফিস ভেঙ্গে গান্ধীজী আবা

বয়স ৩৩)।

প্রিটোরিয়ায় পৌঁছে দেখেন (১লা জানুয়ারী, ১৯০৩) রাজপুরুষরা সব নতুন কাছে ঘেঁসবার উপায় নেই। ভারতবাসীদের উপর যাদের দরদ নেই, তাদেরই নিয়ে এসিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট গড়া হয়েছে। গান্ধীজী ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা ডেভিডসনের সঙ্গে অনেক কষ্টে দেখা করলেন, তিনি তাঁর সহকারীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রাজপুরুষরা গান্ধীকে দেখে রীতিমত ভয় করতে শুরু করেছে। ডেভিডসনের এসিসষ্ট্যাণ্ট স্থানীয় ভারতবাসীদের ডেকে ধমকে দিলেন ট্রান্সভালে গান্ধীজীকে ডেকে আনবার জন্যে। আদালতের যোগে সংগ্রামের জন্যে সুপ্রিম কোর্টে এটর্ণীগিরি করবার আবেদন করলেন। তাঁর চেষ্টায় ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হ'ল দৃঢ়তর সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী আপনার অন্তরকে তপঃশুদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। গীতার ১৩ অধ্যায় তিনি মুখস্থ করলেন। আর পড়তে লাগলেন স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র। 'অপরিগ্রহ' ও 'সমভাব' এই দুই তাঁকে পেয়ে বসল! ১০ হাজার টাকার এক বীমা তাঁর ছিল, তিনি তার প্রিমিয়ম আর দিলেন না, বীমা নষ্ট হয়ে গেল। ভাইকে লিখলেন, এ পর্য্যন্ত যা সঞ্চয় করেছিলাম সব রইল তোমার। কিন্তু এর পর আর কিছুরই আশা করো না, সব ভারতবাসীদের জন্য রইবে। বোম্বাইএ এক বন্ধুকে লিখলেন—"সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করলে তাঁর পথে চলব কি করে? দিনের আলোর মত আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, অপরিগ্রহ ও সমভাব হতে হ'লে অন্তরের পরিবর্ত্তন, মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন চাই।"

সংবাদ এল (১লা মার্চ্চ, ১৯০৪) প্লেগে মুমূর্ষু ও মৃত ভারতীয় কুলিদের খনিগুলো থেকে আনা হচ্ছে। তিনি তাদের ভার নিজ হাতে নিলেন। সঙ্গে নতুন কাজ ইংরেজী, তামিল, গুজরাটী ও হিন্দী ভাষায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন। এই পত্রিকার জন্য আপনার সঞ্চিত ২০০০ পাউণ্ড ব্যয় করলেন। এই কাগজে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গুজরাটী ভাষায় যে সব প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, পরে তার ইংরেজী অনুবাদ হয়। রাস্কিনের Unto This Last বই পড়ে এ সময় তাঁর মনোভাবের এক আমূল পরিবর্ত্তন হয়। কায়িক পরিশ্রম বেড়ে যায়, ঔষধ ব্যবহার বন্ধ হয়। ম্যাক্সেটারের 'No Breakfast Association'এর কথা শুনে প্রাতরাশ বন্ধ হয়, Justএর "Return to Nature' বই পড়ে শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে নতুন নতুন অনুশীলন চলতে থাকে। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার জন্য একটা আশ্রম (Phoenix settlement) তৈরী হয়। আশ্রমের সবাইকে কায়িক শ্রম করতে হ'ত, সবারই সমান ভাতা মাসে ৩ পাউণ্ড। ভারতীয় ছুতোর প্রেসের জন্য চালা বাঁধল, চালায় বসল হস্তচালিত প্রেস, তাতে ছাপা হয় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন।'

ভারতে তখন Babus of Bengalএর যুগ। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের (১৯০৪) সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর বন্ধু স্যর হেনরী কটনের কথায় "Babus of Bengal, strenous and able, who rule and control public openion from Peshawar to Chittagong"—ভারতে তখন বঙ্গ-বিচ্ছেদের ফলে (২০ জুলাই ১৯০৫) বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন—বিপ্লবী গুপ্ত প্রচেষ্টা, আর সে আন্দোলন ও প্রচেষ্টার জন্য মনে বনে ও কোণে মৃত্যুস্পর্দ্ধী তরুণের সাধনা—অরবিন্দের ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনায় এমন সব ব্রহ্মচারীর আয়োজন 'who would return to the গৃহস্থ আশ্রম when allotted work was finished' ভারতের বাইরে লণ্ডনে, গান্ধীজীর দেশ কাথিয়াবাড় থেকেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি গঠন করে গান্ধীজীর 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র মত 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট' প্রকাশ করলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চেয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতবাসীর অবস্থা ফেরাতে; 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট' বললে—'It seems that any agitation in India must be carried on secretly and that the only method which can bring the English Government to its senses are the Russian methods vigorously and incessantly applied until the English relax their tyranny and are driven out of the country."

১৯০৬ এপ্রিলে (৩৭ বৎসর) দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহ—প্রকৃতপক্ষে খাজানা বন্ধ আন্দোলন। গান্ধীজী ইণ্ডিয়ান এম্বুলেন্স কোর গঠন করে ইংরেজের সাহায্য করতে লাগলেন। সাদারা আহত জুলুদের সেবা করতে চাইত না। জুলুদের সেবার ভার গান্ধীজীর দলকে নিতে হয়েছিল। সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে, এ বিদ্রোহের অজুহাতে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ নিপাতই করতে চায়। তবু করেন সহযোগিতা, যদি ওদের চিত্তশুদ্ধি হয়। এ ব্যবহারের বিনিময়ে ওরা ভারতীয় নবাগতদের বিরুদ্ধে আইন করল (১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭)। গান্ধী মিশন বিলাতে গেলেন। ফল কিছু হ'ল না। চলল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন। দলে দলে এসিয়াবাসী জেলে যেতে লাগল, জেলে স্থান সঙ্কুলান যখন হ'ল না, তখন খনির খাদে তারা বন্দি-জীবন যাপন করতে লাগল। মগনলাল গান্ধী এ আন্দোলনের প্রথম নামকরণ করেছিলেন 'সদাগ্রহ', গান্ধীজী পরে তা পাল্টে নাম দেন 'সত্যাগ্রহ।'

এ সময় গান্ধীজীর পসার চমৎকার, বছরে আয় ৫।৬ হাজার পাউণ্ড। তিনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করলেন, সব সঞ্চয় আন্দোলনকে দান করে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করলেন।

শ্বেতাঙ্গ সরকার যখন ভারতীয়দের জন্য রেজিষ্ট্রেসন সার্টিফিকেটের পার্মিট অফিস খুলল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবাসীরা সেগুলো পিকেট করতে লাগল। প্রিটোরিয়ায় মসজিদে বিরাট জনসভা। গোখলে তার করে (১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬) উৎসাহিত করলেন।

৩০শে নভেম্বর নাম রেজিষ্ট্রারীর শেষ দিন। ১৩ হাজার ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ৫১১ জন নাম লিখাল। গান্ধীজী, চীনা নেতা কুইন ও অপর ২৪ জন সত্যাগ্রহীকে ম্যাজিষ্ট্রেট ডেকে পাঠিয়ে (২৮শে ডিসেম্বর) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সভাল ছেড়ে যেতে হুকুম দিল।

তখন স্মাটসের প্রতাপ। ট্রান্সভালে নতুন ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ। এ অত্যাচারের আর অত্যাচারের প্রতিরোধের প্রভাব ভারতে এসে পৌঁছল। ভারতে তখন মারাঠি ও বাঙ্গালীর নেতৃত্বে বিপ্লবের তাণ্ডব, বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের হিড়িক, জাগ্রত যুব-নারায়ণের তূর্য্য নিনাদ—

চল রে চল রে চল রে সবাই জীবন-আহবে চল
বাজবে সেথায় রণভেরী আসবে প্রাণে বল।

ভারতেও সত্যাগ্রহের জন্ম 'পুণ্য বিশাল' বরিশালে। প্রথম প্রচারক বিপিন পাল, তিনি বললেন—"One method is passive resistence, which means organised determination to refuse to render any voluntary or honorary service to the Government." বৃটিশ আদালতের কাজে জবাবদিহি করতে নায়ক ও কর্ম্মীরা অসম্মত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আদালতকে জানালেন—"বিধাতৃ নির্দ্দেশে স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টায় আমি যে ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিতেছি, তজ্জন্য আমি কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত নহি।"

কিংসফোর্ডের আদালতে অভিযুক্ত বিপিন পাল বললেন—"I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interest of public peace. I refuse to answer any question in connection with this case." (২৬শে আগষ্ট, ১৯০৭)।

দক্ষিণ আফ্রিকায়ও (১০ই জানুঃ, ১৯০৮) গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্ম্মীদের যখন আদালতে অভিযুক্ত করা হ'ল, তাঁরা কেউই আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বললেন—হাঁ দোষী। গান্ধীজী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললেন, তোমার তূণে যত বড় শাস্তি আছে, দাও। হ'ল দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। প্রথম কারা-অভিজ্ঞতা জোহান্সবুর্গ জেলে। ভারতীয় সমাজ উত্তেজিত।

কে বা আগে প্রাণ
করিবেক দান,
তার লাগি কাড়াকাড়ি!

বললে চল জেলে! ভারতীয় ফেরীওয়ালারাই আগে চলে। বললে, লাইসেন্স দেখাব না। সপ্তাহে প্রায় দেড়শ' গ্রেপ্তার।

৩০শে জানুয়ারী প্রিটোরিয়ায় জেনারল স্মাট্স গান্ধীজীকে ডেকে পাঠালেন। বললে—তোমরা ছাড়া পাবে। যদি স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ভারতবাসী নাম রেজেষ্টারী কর তবে কালা কানুন উঠিয়ে নেওয়া হবে। ছাড়া পেয়ে ঐদিনই তিনি গেলেন জোহান্সবুর্গে। মধ্যরাত্রে মসজেদে হাজার লোক সমবেত। সবাই আপোষ মেনে নিল। মাত্র কয় জন পাঠান বললে, হতেই পারে না।

১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে গান্ধীজী ও আর কয় জন সহকর্ম্মী রেজিষ্ট্রেসন সার্টিফিকেট নিতে গেলেন। মির আলম কয় জন পাঠানকে নিয়ে পেছু নিল। মির আলম গান্ধীজীর মাথায় করলে আঘাত। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। পাঠান গ্রেপ্তার হ'ল। গান্ধীজী বললেন, ওকে ছেড়ে দাও—"Let the blood split today cement the two communities indissolubly." রোগশয্যায় শুয়ে গান্ধীজী টিপসই দিলেন।

জেনারল স্মাট্স কিন্তু কথা রাখেনি। কালাকানুন সে উঠিয়ে নেয়নি। স্মাটসকে পত্র দিলেন গান্ধীজী—ট্রান্সভাল সরকারকেও। লিখলেন—"আপোষের সর্ত্ত অনুসারে এসিয়াটিক একট্ যদি উঠিয়ে না নেওয়া হয়, যদি নির্দ্দিষ্ট তা রখের মধ্যে এ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত জানান না হয়, তা হলে ভারতবাসীরা যে সব সার্টিফিকেট পেয়েছে তা পুড়িয়ে ফেলে ভবিষ্যৎ বরণ করে নেবে।"

কালা কানুন ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হয়। জোহান্সবুর্গের হামিদিয়া মসজেদের ময়দানে মস্ত কটাহে জলন্ত প্যারাফিনে ২ হাজার কালা কানুন গান্ধীজী পুড়ালেন (১৬ই আগষ্ট)।

নাটাল থেকে ফিরবার পথে সার্টিফিকেট দেখাতে না পারার জন্য গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল (১৫ই অক্টোবর)। টিপসই দিতে চাইলেন না। দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। প্রিটোরিয়া জেলে নির্জ্জন সেলে আটক। কয়েদীর পোষাকে প্রহরীরা তাঁকে পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল। মুক্তি পেলেন ১৩ই ডিসেম্বর (১৯০৮)।

আফ্রিকার চার উপনিবেশ সংযুক্ত করবার তখন ব্যবস্থা করছিল বুয়ার আর ইংরেজরা। ভারতবাসীরা বিপদের আভাস পেয়ে গান্ধীজীকে বিলেত পাঠাল। ফল হ'ল না। ইউনিয়ন বিল পাশ হয়ে গেল। এ সময় (১৯০৯) গান্ধীজী টলষ্টয়কে পত্র লিখলে, তিনি জবাবে লিখলেন—"God help our dear brothers and co-workers in the Transval."

কেপটাউনে ফিরে (১৯১০) গান্ধীজী তার পেলেন, রতনজী টাটা সত্যাগ্রহ কাণ্ডে ২৫ হাজার টাকা দান করেছেন। তখন আশ্রম গড়বার ইচ্ছে হ'ল। জার্ম্মাণ বন্ধু কালেন বাখ্ ১১০০ একর জমি দিয়ে দিলেন। পুরুষ ও নারী কর্ম্মীদের জন্য পৃথক্ মহল তৈরী হল। ভারতের বিভিন্ন দেশের সর্ব্ব জাতের নরনারী আশ্রমে স্থান পেল। রান্না থেকে মেথরের কাজ সববাইকে করতে হ'ত। নিরামিষ আহার। প্রত্যেককে হাতের কাজ করতে হ'ত। গান্ধীজী স্যাণ্ডাল তৈরী করতেন।

এপ্রিলে গান্ধীজী আবার টলষ্টয়কে পত্র লিখে জানালেন, তিনি তাঁর "humble follower."

ভারতে তখন যে জাগরণ, তার সাথে গান্ধীজীর কোন যোগাযোগ ছিল না। বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হল ও অঙ্গ সংযোগ হ'ল। ফাঁসির দড়ীতে সহিদরা মরল, কারা-কক্ষে কাদের শেকল বাজল। দ্বীপান্তরে উত্তর দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে চেয়ে কাদের নিশ্বাস পড়ল। বঙ্গ কিশোরদের উত্থান ও সংগঠন, ভাবী ভারতের ভিত্তি গড়বার জন্য দধিচীদের বুকের অস্থি দান, এসব যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল। সুরাটের দক্ষযজ্ঞ, লোকমাণ্য ও অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও লাজপতের বাস্তব নেতৃত্বে প্রতি গৃহে নব কর্ম্ম-প্রেরণার কথা গান্ধীজী জানতেন বৈ কি? তবে সে কর্ম্মনীতি তিনি অসমর্থনও করেননি, সমর্থনও করেননি।

তখন তাঁর শক্তি সংগ্রহের সাধনা। সে সাধনায় সিদ্ধির পর যে নতুন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হবে, ভারতের ভগবান সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন।

আফ্রিকায় মডারেট নেতা গোখেল, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী দলের সঙ্গে স্মাট্স সরকারের আপোষ করিয়ে দিয়েছিলেন (১৯০২)। কিন্তু শ্বেত জাতি ভারতবাসীদের মানুষ বলে জ্ঞান করেনি। তারা যখন ভারতীর বিবাহ বিধিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করল, তখন গান্ধীজী জননীদের সত্যাগ্রহ করতে আহ্বান করলেন। প্রথমে সত্যাগ্রহ করলেন কস্তুরবা। নারীদের পেছনে দাঁড়াল খনির শ্রামকরা। দুই দিনে ৩৬ মাইল পথ হেঁটে ওরা ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছল। গান্ধীজী তার করে সরকারকে নোটিশ দিলেন। সরকার তথা মালিকরা পশুশক্তি প্রয়োগ করল। অনেকে আহত হ'ল। অকুতোভয় সত্যাগ্রহী শ্রমিক

দল। ২০৩৭ পুরুষ, ১২৭ নারী ৫৭ জন শিশু—পুরোভাগে গান্ধী-ভাই—পরনে পায়জামা ও সার্ট। (২৮শে অক্টো ১৯১২)।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। আত্মসমর্পণ। জামিনে খালাস, আবার অভিযানে যোগদান। আবার গ্রেপ্তার, আবার জামিন, আবার অভিযানে যোগদান। ৪ দিন ৩ বার গ্রেপ্তার। সাজা, ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। পর দিন তিন খানা ট্রেণ বোঝাই অভিযানকারীদের গ্রেপ্তার করে নাটাল কারাগার ভর্ত্তি। জ্বলে আগুন। নাটালের ২০ হাজার শ্রমিক হাতিয়ার নামায়। চলে জুলুম—শ্রমিকের খুনে খনি লালে লাল।

আপোষ করতে চায় স্মাট্‌স্! বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেয় গান্ধীজীকে (১৮ ডিসেম্বর)। গান্ধীজী বলেন, আপোষ না হওয়া পর্য্যন্ত একাহারী হয়ে রইব, শ্রমিকের কাপড় পরব।

ভারতে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রশংসা হ'ল। গোখেল আবার স্মাট্‌সের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য এণ্ড্রুজ ও পিয়ারসনকে পাঠালেন। আপোষ হতে চায় না। গান্ধীজী বললেন, ১লা জানুয়ারী (১৯১৪) চলবে অভিযান। ভারত ময় বিক্ষোভ। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের কাজের প্রতিবাদ করল। আপোষ হল। দক্ষিণ আফ্রিকার মহাসত্যাগ্রহের অবসান হ'ল। ১৮ই জুলাই (১৯১৪—৪৫ বৎসর) কস্তুরবা ও জার্ম্মাণ বন্ধু কালেনবাসকে সঙ্গে করে গান্ধীজী ইংলণ্ডে গোখেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

হঠাৎ বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ ৪ঠা আগষ্ট। ৬ই গান্ধীজী লণ্ডনে পৌঁছলেন। গোখেল প্যারিতে আটক পড়লেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ জীবরাজ মেটা তখন ইংলণ্ডে। গান্ধীজী প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে সেবাদল তৈরী করে ইংরেজকে সাহায্য করতে চাইলেন, ইংরেজ সম্মত হ'ল।

এ সময় ভারতে ইংরেজ "Thinking a good deal lately of possible counterpoise to Congress aims." মসলেম লীগের চেষ্টা, "to promote among the Mussalmans of India feeling of loyalty to the British Govt." মসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না (১৯১৩) কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালী করলেও তাঁর দলের নীতি হ'ল, "attainment under the ægis of the British crown of a system of self-Government suitable to India."

ভারতের কংগ্রেস এ সময় নিস্তেজ, মসলেম লীগের নামে মাত্র অস্তিত্ব। ও-দিকে মহাযুদ্ধের সুযোগ নিতে বিপ্লবী যুব-ভারতের পেশোওয়ার থেকে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত বিদ্রোহের মহা আয়োজন—তাদের সাহায্য করবার জন্য ক্যালিফোর্ণিয়া ও ফিলিপাইনস্ থেকে জার্ম্মাণ সাহায্যের ব্যবস্থা, নানা স্থানে দুর্দ্দমনীয় তরুণদের স্বাধীনতার সশস্ত্র অসমসাহসিক অভিযান। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচেষ্টা পণ্ড—মুক্তিকাম ভারতবাসী দলে দলে ধৃত ও নির্য্যাতিত। প্রেস আইন ও রাজদ্রোহকর সভা বিধিতে দেশের কণ্ঠ রুদ্ধ। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা আক্রমণের পর মারাঠি বিপ্লবীদের কাছে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আবেদন। এ সময় লোকমান্য তিলক ও এনি বেসান্ত কারামুক্ত হয়েছেন।

গান্ধীজী বিলাতে বসে সব খবর পাচ্ছিলেন। এ সময় গুরুতর পীড়িত হওয়ায় তাঁকে ভারতে ফিরতে হয় (৯ই জানুয়ারী ১৯১৫)। পরনে স্বদেশী মিলের কাথিয়াবাড়ী কোর্ত্তা, পাগড়ী ধুতি! বোম্বাইএ নামতেই গোখেল খবর পাঠালেন, গবর্ণর লর্ড উইলিংডন ডেকেছেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নববর্ষের খেতাব 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদকে গান্ধীজীকে ভূষিত করলেন। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পেলেন গোখেল মারা গেছেন (১৯শে ফেব্রুয়ারী)।

এর প্রায় ১ মাস বাদ (২৩শে মে) শান্তিনিকেতনের আদর্শে আমেদাবাদের কাছে কোচরাব গ্রামে ২৫ জনকে নিয়ে তিনি আশ্রম খুললেন। আশ্রমবাসীদের সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অচৌর্য্য, নির্ভীকতা, অপ্রতিগ্রহ, লোভহীনতা, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা দূর, মাতৃ ভাষার যোগে শিক্ষা ও খদ্দরের সম্বন্ধে শপথ নিতে হল। কয় মাস পর যখন অস্পৃশ্য দুদা ভাই, তার স্ত্রী দানি বহিন ও কন্যা লক্ষ্মী আশ্রমে স্থান পেল, তখন বন্ধুরা অর্থ সাহায্য বন্ধ করে আশ্রম বর্জ্জন করলেন। কিন্তু অজ্ঞাত এক ব্যক্তি পাঠালেন ১৩ হাজার টাকা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন সভায় (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬) তিনি বললেন—"ভারতের মুক্তির জন্য ইংরেজের সরে যাওয়া দরকার বা তাদের তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। বুঝলে স্পষ্ট ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ করব না যে তাদের যেতেই হবে। আর এই বিশ্বাসের জন্য আমি প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত।"

কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে মিঃ জিন্নার ও যুবক জওহরলালের প্রথম দেখা। পর-বৎসর পাটনায় (১০ই এপ্রিল, ১৯১৭) বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে চম্পারণের চাষীদের দুরবস্থার খবর নিলেন। প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী স্পষ্ট বললেন, তাদের ব্যাপারে বাহিরের লোকের মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কমিশনার গান্ধীজীকে অবিলম্বে ত্রিহুত থেকে চলে যেতে বললেন। ১৬ই এপ্রিল হাতী চড়ে তিনি মতিহারী যাত্রা করতেই নোটিশ এল, পরের ট্রেণে চলে যেতে। আদেশ মানলেন না। সমন এল। পরদিন বিচার। সংবাদ রটনা হতেই বহু দূর-দূর থেকে হাজার-হাজার চাষী আদালতে ভীড় করল। লেঃ গভর্ণর মামলা উঠিয়ে নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করলেন। চাষীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য গান্ধীজীকে নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হ'ল।

আগষ্ট। মণ্টেগু শাসন-সংস্কার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হল। কংগ্রেস ও লীগ সংস্কারের যে যুগ্ম পরিকল্পনা গড়েছিল, গান্ধীজী তার সমর্থন করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষক ও শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য গান্ধীজী যেমন অকুতোভয়ে নেতৃত্ব করেছিলেন, ভারতে এসে সেই অভিজ্ঞতায় শ্রমিক-মালিকে আপোষ করিয়ে জনসাধারণের দুরবস্থা দূর করবার আয়োজন তাঁকে করতে হয়। চম্পারণ চাষীদের অবস্থার প্রতিকার হওয়ার খেদা ও আমেদাবাদের শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের দুর্দ্দশা বিদূরীকরণের জন্য গান্ধীজীর সাহায্য চাইলেন। আমেদাবাদের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের দুর্ব্বলতা দেখে তিনি ৩ দিন উপোস করলেন। ২১ দিন ধর্ম্মঘটের পর অবশ্য আপোষ হয়েছিল। তার পরেই খেদা সত্যাগ্রহ। অজন্মার জন্য গুজরাটের

খেদা জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সরকারের কাছে নিষ্ফল তার করলেন। স্থির হ'ল, সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ সময় তাঁর সহকর্ম্মী ছিলেন সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, অনসূয়া বেন, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি। নদিয়াদ অনাথাশ্রম থেকে সত্যাগ্রহীরা অগ্রসর হ'ল এই শপথ করে—"স্বেচ্ছায় খাজনা দেব না, জমি বাজেয়াপ্ত হয় হোক।" সরকার জুলুম সুরু করল—জমির ফসল, চাষের হাল, লাঙ্গল, অস্থাবর ক্রোক করতে লাগল। এ সত্যাগ্রহ সার্থক হয়েছিল।

এপ্রিলে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড দিল্লীতে ওয়ার কনফারেন্সের অধিবেশনে যোগ দিতে গান্ধীজীকে আমন্ত্রিত করেন। তিলক, এনি বেশান্ত ও আলি-ভাইদের আমন্ত্রিত করা হয়নি বলে গান্ধীজী সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। আলি ভাইদের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করতে চাইলে গান্ধীজীর আবেদন নামঞ্জুর হয়। কলকাতায় মসলেম লীগের অধিবেশনে গান্ধীজী মুসলমানদের ডেকে বললেন, "আলি-ভাইদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম কর।" আলিগড়ে মুসলিম কলেজের যুবকদের ডেকে বললেন—"মাতৃভূমির সেবার জন্য ফকির হও।"

বড়লাটের সাধ্য-সাধনায় গান্ধীজী অবশ্য পরে ওয়ার কনফারেন্সে যোগ দিলেন। খৃষ্টান ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থাবান গান্ধীজী হিন্দুস্থানীতে মাত্র এক কথায় লড়াইয়ে সৈন্য সংগ্রহ প্রস্তাবের সমর্থন করে বললেন—"এ কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হয়েই এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।" কনফারেন্সের পর বড়লাটকে লিখলেন, বৈঠকে তিলক, এনি বেসান্ত ও আলি-ভাইদের না ডেকে মস্ত ভুল করেছ।

খেদায় গেলেন সৈন্য সংগ্রহ করতে ইংরেজের হয়ে। সরকারের অত্যাচারে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত। তারা তাদের প্রিয় গান্ধীজীকে একখানা গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত দিল না। তিনি এক প্রচার-পত্রে লিখলেন—"ভারতে ইংরেজ শাসনের অনেক কুকীর্ত্তি, তার মধ্যে বড় কীর্ত্তি একটা গোটা জাতকে নিরস্ত্র করা। আমরা যদি অস্ত্র ব্যবহার করতে চাই তাহলে এই হ'ল স্বর্ণ-সুযোগ।"

তাঁর এই প্রচার-পত্রে গত দশ বছরের ভারতের বিপ্লবী তরুণ দলের সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি সমর্থনই করেছেন এবং লড়াইয়ের সুযোগও নিতে বলছেন। তাই এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যখন রাওলাট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ হ'ল (১৯১৯,—৫০ বছর), তখন রোগশয্যাতে পড়ে রইলেও তিনি নীরব থাকতে পারেননি। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ হর্ণিম্যান, ওমর শোভানি, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার প্রভৃতিকে ডেকে সত্যাগ্রহের আয়োজন করতে লাগলেন। বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভার কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল।

কেন্দ্রী ব্যবস্থাপক সভায় রাওলাট বিল পেশ হ'ল (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)। বিতর্ক অধিবেশনে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ১৮ই মার্চ্চ, বিল আইনে পরিণত হ'ল। পরদিন শ্রীযুত রাজা গোপালাচারিকে তিনি বললেন—"কাল রাতে স্বপ্নে আদেশ, দেশকে ব্যাপক হরতাল করতে বল।"

গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণা করলেন। বললেন, সবিনয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর।

দিল্লীর জুমা মসজেদে হিন্দু-নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বক্তৃতা করতে আহ্বান করা হয়েছে। শোভাযাত্রার উপর পুলিস চালাল গুলী। গুলী চলল লাহোরে, অমৃতসরে। বোম্বাইয়ে পূরা হরতাল। গান্ধীজী বললেন, সত্যাগ্রহ কর। বললেন, দরিয়ার পানি থেকে ঘরে ঘরে নুণ তৈরী কর, রাজদ্রোহ কর, নিষিদ্ধ পুঁথি প্রচার কর, পাঠ কর। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর "হিন্দ স্বরাজ" আর রাস্কিনের Unto this Last এর গুজরাটি অনুবাদ 'সর্ব্বোদয়' পথে পথে বিক্রি হতে লাগল। মুসলমানেরা তাদের মসজেদে গান্ধীজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করল। ৭ই এপ্রিল মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে করে গান্ধীজী দিল্লী হয়ে অমৃতসর যাত্রা করলেন। ট্রেণ পালওয়ালে পৌঁছবার আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল—পঞ্জাবে যেতে পাবে না। ট্রেণ থেকে নামতে বলল। গান্ধীজী বললেন, নিশ্চয় না। ওরা গ্রেপ্তার করে এক ছ্যাকড়া গাড়ীতে জোর করে উঠাল। মথুরায় এক পুলিস-ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পরদিন প্রাতে একটা মাল-গাড়ীতে গান্ধীজীকে পুরে বোম্বাই চালান দিল। দুপুরে সাবাই মাধোপুর ষ্টেশনে মালগাড়ী থেকে ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়ে দিয়ে পুলিস অনুরোধ করল, দয়া করে সোজা বোম্বাই চলে যান, পঞ্জাবের সীমান্ত যেন পার না হন। গান্ধীজী বললেন—"এ হতে পারে না।" ওরা জোর করে ধরে ১১ই এপ্রিল বোম্বাই নিয়ে গেল।

গান্ধীজী গ্রেপ্তার। লোক গেল ক্ষেপে। বোম্বাইয়ে পুলিস জনতার উপর চালায় আক্রমণ। জনসভায় গান্ধীজী জনতাকে বলেন—"সত্যাগ্রহী হিংসা করবে না। অহিংস হতে না পারলে আমি ব্যাপক সত্যাগ্রহ ত' করতে পারব না।" কে শোনে? নাদিয়াদ রেল-ষ্টেশনে জনতা রেল-লাইন ভাঙ্গল। আমেদাবাদে মার্শাল ল' জারি হ'ল। পঞ্জাবে ডাঃ কিচলু, ডাঃ সত্যপালকে ওরা গুম করল। জনতার উপর গুলী চলল। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা-বাগে জেনারাল ডায়ারের ফৌজ মৃত্যু বণ্টন করল—মার্শাল আইন ঘোষণা করল। জনসাধারণকে রাজপথে চাবুক মারল, বুকে হাঁটাল। পঞ্জাবের সত্রাপ সার মাইকেল ও ডয়ার জেনারল ডায়ারকে তার করে জানালেন—খুব কিয়া, আচ্ছা কিয়া। বোম্বাই-এ 'বোম্বে ক্রনিকলের' সম্পাদক হর্ণিম্যান নির্ব্বাসিত হ'লেন, 'ক্রনিকল' বন্ধ হ'ল। গান্ধীজী 'ক্রনিকলে'র সাপ্তাহিক পত্র—'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' সম্পাদন ভার নিলেন।

পঞ্জাবে যাবার জন্য গান্ধীজী ছটফট করছিলেন, কিন্তু আইন অমান্য করতে চাননি। অনুমতি চাইলে বড়লাট বার-বার বলতে লাগলেন—"not yet"। যখন পঞ্জাবের অনাচার তদন্তের জন্য হাণ্টার কমিটী নিযুক্ত হ'ল, তখন বড়লাট গান্ধীজীকে তার করলেন—১৭ই অক্টোবরের পর পঞ্জাব যেতে পারেন।

পঞ্জাবে গিয়ে সমবেত হয়েছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। গান্ধীজীর সঙ্গে মতিলালের প্রথম পরিচয় হ'ল। ওঁরা স্থির করলেন, হাণ্টার কমিটী বর্জ্জন করতে হবে। কংগ্রেস চিত্তরঞ্জন দাশকে নিয়ে বে-সরকারী তদন্ত কমিটী গড়ল।

তখন পশ্চিম এশিয়ায় মুসলমান-রাজ্যগুলোকে ভেঙ্গে গড়া হচ্ছে। যুদ্ধে পরাজিত তুরস্কে মুস্তাফা কামাল স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন (১৯ মে, ১৯১৯)। আফগানিস্থান ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে (৩রা মে)। ভারতের মুসলমানরাও ইংরেজী-বিদ্বেষী—মসলেম লীগের ইংরেজ-প্রীতির বন্ধন তারা অস্বীকার করে, 'খিলাফতের' জন্য দরদী হয়ে উঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে

স্বস্বার্থে সংগ্রামের জন্ম উদ্ধত হয়েছে। গান্ধীজীর সভাপতিত্বে ২৪শে নভেম্বর নিখিল ভারত খিলাফং কনফারেন্স বসল। বৈঠক ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করতে অনুরোধ করল। হজরত মোহানী বললেন—"তোমাদের বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন চলুক—but give us something quicker"—গান্ধীজী বললেন—'non-co'operati on."

অমৃতসর কংগ্রেস। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল। ৩৬ হাজার প্রতিনিধি সমবেত। ইংলণ্ডের রাজা বিক্ষুব্ধ ভারতকে শাসন-সংস্কার বকশিস দেবার কথা ঘোষণা করলেন। আলি ভাইরা মুক্তি পেয়ে (২৫শে ডিসেম্বর) কংগ্রেসে অধিবেশনে যোগ দিলেন। গান্ধীজী বললেন—"যখন সম্রাট কর প্রসারণ করেছেন, প্রত্যাখ্যান করো না।" চরমপন্থী দলের নেতা চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, তিলক বললেন—চাই না রিফর্ম। গান্ধীজীর সঙ্গে তবু আপোষ হয় চরমপন্থীদের। কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীজী সর্ব্বপ্রথম যোগ দেন।

১৯২০ (৫১ বৎসর) গান্ধীজীর নেতৃত্বে বড়লাটের দরবারে খিলাফৎ ডেপুটেশন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বড়লাটের আশ্বাস আশাপ্রদ নয়। হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট (মে) পড়ে গান্ধীজী পাকা অসহযোগী। খিলাফত সাব-কমিটিতে গান্ধীজী, সৌকৎ আলি, মহম্মদ আলি, মৌলানা আজাদও ঘোষণা করলেন অসহযোগ। গান্ধীজী বড়লাটকে লিখলেন—"মুসলমান বন্ধুদের পরামর্শ দিয়েছি—আপনার গবর্ণমেণ্টকে যেন তাঁরা সমর্থন না করে। আর হিন্দুদের বলেছি, মুসলমানদের হাতে হাত মিলাতে।" বড়লাট বললেন—মস্ত বেয়াকুবী।

অসহযোগের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ৩১শে জুলাই রাতে লোক-মান্ত তিলক স্বর্গে গেলেন। গান্ধীজী বললেন—"My strongest bulwark is gone." ১লা আগষ্ট গান্ধীজী তাঁর সরকারী পদক-গুলো বড়লাটকে ফিরিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নাইট পদত্যাগ করলেন। ১৮ হাজার মুসলমান ভারত ছেড়ে যাবার জন্ম প্রস্তুত হ'ল।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল অনুরোধ করলেন গান্ধীজীকে স্বরাজের দাবী করতে। অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হ'ল। ২৬শে ডিসেম্বর নাগপুর কংগ্রেস সে প্রস্তাব অনুমোদন করল। এই দিন থেকে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর নাম অভিন্ন হ'ল। দেশের সেবায় আত্মশুদ্ধির জন্ম গান্ধীজী সঙ্কল্প করলেন, প্রত্যহ আধ ঘণ্টা সুতো না কেটে তিনি আহার করবেন না। চরকা-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা তিনি করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ! দেশব্যাপী সে কি মুমুক্ষু জনগণের উত্তেজনা! সরকার করলে নেতৃবৃন্দের গতিরোধ। যৌবন জলতরঙ্গে সে বাঁধ কোথায় ভেসে যায়! মে মাসে আসামের চা বাগানে ১২ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট, পূর্ব্ববঙ্গে রেল-কুলীদের ধর্ম্মঘট। খিলাফৎ কনফারেন্সও বললে, ডিসেম্বরের মধ্যে ইংরেজ যদি খিলাফৎ সম্পর্কে মতের পরিবর্ত্তন না করে, তবে Indian Republic ঘোষণা করা হবে। আগষ্টে গান্ধীজী বললেন, বিলাতী কাপড়ে আগুন দাও। জ্বলল আগুন নগরে নগরে। আলি-ভাইরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। গান্ধীজী কৌপীনবস্ত্র হ'লেন (১৬ই অক্টোবর)। কংগ্রেসের কার্য্যধারার প্রধান করণীয় হ'ল, খাদি ও চরকা। গান্ধীজী বললেন—ওতেই স্বরাজ।

১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এলেন। জনগণ তাঁকে চাইল না। তারা চার দিন চালাল দাঙ্গা, আর রক্তস্রোত। গান্ধীজী ৫ দিন উপোস করলেন। চিত্তরঞ্জন, লাজপত, মতিলাল, জওহরলাল কারারুদ্ধ হ'লেন। সরকার আপোষ করতে চাইল গান্ধীজীর সঙ্গে, মধ্যস্থ জিন্না ও পণ্ডিত মদনমোহন। কিন্তু আপোষ ব্যর্থ হ'ল। গান্ধীজীর ভাবে প্রবুদ্ধ ভারতের ৩০ সহস্রের অধিক নরনারী কারাবরণ করল। (১৯২২, ১৪ই জানুয়ারী) সর্ব্বদল সম্মেলনও আপোষের চেষ্টা করলেন, ফল হ'ল না।

গান্ধীজী বড়লাটকে নোটিশ দিলেন (১লা ফেব্রুয়ারী)—বার-দোলিতে সত্যাগ্রহ চালাবেন। সরকার চালাল জুলুম। চৌরীচৌরায় (৫ই ফেব্রুয়ারী) ক্ষুব্ধ জনতা বহু পুলিস পুড়িয়ে মারল। গান্ধীজী ক্ষুব্ধ। আবার ৫ দিন উপোস। সত্যাগ্রহ স্থগিত রইল। বললেন, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ যে পারে করুক। লিখলেন (৯ই মার্চ্চ)—'Rivers of bloodshed by the Government cannot frighten me."—ওরা রাজদ্রোহের অভিযোগে গান্ধীজীকে অভিযুক্ত করল (১৮ই মার্চ্চ)। আমেদাবাদের আদালতকে ডেকে গান্ধীজী বললেন—"মাদ্রাজ, বোম্বাই, চৌরী-চৌরার সব দায়িত্ব আমার। জানি, আগুন নিয়ে খেলেছি, তবু আগুন নিয়েই খেলব। আমার কাছে মাত্র এই পথই খোলা মিঃ জজ, হয় পদত্যাগ কর, না হয় চরম দণ্ড আমাকে দাও।"

জজ ব্রুমফিল্ড ৬ বছর কারাদণ্ড দিয়ে সেদিন গান্ধীজীকে হেসে বলেছিল—"You will not consider it unreasonable, I think, to be classed with Mr. Tilak." গান্ধীজী জজকে এ জন্ম ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

এই কারাবাসের সময় গান্ধীজীর আত্মজীবনী "The Story of My Experience with Truth" গুজরাটি ভাষায় লেখা হয়।

১৯২২, নভেম্বরে কামাল পাশার সাফল্যে খিলাফৎ সমস্যা মাঠে মারা যখন গেল, মুসলমান নেতাদের উৎসাহ তখন কমে গেল। ফলে '২৩ সালে দেশে বাধল সাম্প্রদায়িক বিরোধ। জনগণের উৎসাহ কমে গেল। কংগ্রেসেও দুই দল হ'ল—স্বরাজী ও চরকাপন্থী। সহসা এপিণ্ডিসাইটিস রোগাক্রান্ত গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে এসে (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪, ৫৫) চরকাপন্থীদের জানালেন, স্বরাজীরা যা করে করুক, তোমরা গঠনমূলক কাজ করে যাও।

যুব-ভারত অসহযোগের নিশ্চিত মন্থর পাদক্ষেপে অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। গণ-উত্থান নেই—দেশ সাম্প্রদায়িক বিরোধে বিচ্ছিন্ন, মুসলমানরা হাত গুটিয়েছে—ইংরেজ শাসনদণ্ড দুলিয়ে খালি ব্যঙ্গ হাসি হাসছে। দেশবন্ধু সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট করে মুসলমানদের সহযোগিতা ভিক্ষা করলে কোকনদ কংগ্রেস তা অগ্রাহ্য করল। মসলেম লীগের সর্ব্বাধিনায়ক জিন্না স্পষ্ট ঘোষণা করলেন—"The League is not able and not willing to keep abreast with the movement and had perforce to go into the background." কাজেই বিপ্লবীরা পূর্ব্ব পন্থার অনুসরণ করবে স্থির করল। চলল পীড়ন—চলল বন্ধন—নির্ব্বাসন—ফাঁসী। গান্ধীজী এদের নিন্দা করলেন। ওরা পটভূমি থেকে সরে গেল আন্দামানে, মান্দালয়ে, ইনসিনে বা ইংরেজের কারা-পিঞ্জরে। ১৯২৫, ১৬ই জুন বাংলায় গান্ধীজীর উপস্থিতিতে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ। ১৯২৬ ডিসেম্বরে

রোগশয্যায় শায়িত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানের গুলীতে নিহত। গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনে যুব-ভারত স্বাধীনতা প্রস্তাব করলে গান্ধীজী বাধা দিলেন—দেশ প্রস্তুত নয়। ১৯২৭, (৫৮) ৫ই নভেম্বর বড়লাট লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে ডেকে সাইমন কমিশনের ঘোষণায় ঘুষ দিতে চাইলে, ঘৃণায় গান্ধীজী দিল্লী থেকে ফিরে গেলেন। পণ্ডিত জওহরলালের প্রভাবে কংগ্রেস মাদ্রাজে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করলে গান্ধীজী একটু দুঃখিত হ'লেন। ১৯২৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে নামল। ভারতব্যাপী হরতাল। সরকার জুলুম চালাল। জওহরলাল আহত হলেন। লাজপত রায়কে প্রাণ দিতে হ'ল (১৭ই নভেম্বর, ১৯২৮)। গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই বারদোলি সত্যাগ্রহ চালালেন। ১৯২৮, ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে জওহর ও সুভাষের চেষ্টায় স্বাধীনতা আদর্শের জন্য সরকারকে নোটিশ দেওয়া হ'ল। সুভাষের বিচার। যতীন দাসের ৬১ দিন অনশনে মৃত্যুবরণ। বড়লাটের ট্রেণে বোমা। চার্চ্চিলের ঘোষণা—ভারতের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রমর্য্যাদার দাবী—অপরাধ। ২৩শে ডিসেম্বর গান্ধীজীকে লর্ড আরউইন বলে দিলেন—ঔপনিবেশিক মর্য্যাদার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেন না।

লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শ ঘোষণা করল। ইংরেজ-প্রত্যাখ্যাত গান্ধীজী বড়লাটকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—এইবার আমাদের অবস্থা কি তা আমরা বুঝলাম। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০, ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা শপথ গ্রহণ করা হ'ল। ২২শে মার্চ্চ—গান্ধীজী লর্ড আরউইনকে চরম পত্র দিলেন। সত্যাগ্রহ চলবে। বললেন—"হাঁটু গেড়ে করজোড়ে চেয়েছিলাম রুটি, পেলাম পাথর!"

সবরমতী আশ্রমে ৭৫ হাজার সমবেত। গান্ধীজী বললেন—এক সর্ত্ত হবে, সম্পূর্ণ অহিংস—তার পর চলে এস আমার সঙ্গে স্বাধীনতার মহাসমরে। ১২ই মার্চ্চ প্রাতে সাড়ে ৬টায় হ'ল যাত্রা। গান্ধীজী ৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ডাণ্ডি অভিযান করলেন বললেন, হয় নুণ আইন উঠিয়ে ফিরব, না হয় আমার এ দেহ ভাসবে সাগর-জলে। জনতা আসে দেখতে—ফুল দেয়, মালা দেয়, নারকেল দিয়ে শুভযাত্রা কামনা করে—পতাকা আন্দোলিত করে দেয় সম্মতি। গান্ধীজী তাদের সস্নেহে বলেন—খদ্দর পর, মদ খেও না, সরকারের সঙ্গে সহযোগ করো না। সত্যাগ্রহে যোগ দাও। ২০০ মাইল পায়ে হেঁটে চলা। ডাণ্ডির বালু-বেলায় লক্ষ নরনারী। সরোজিনী নাইডু এসেছেন। নাইডু আহ্বান করলেন গান্ধীজীকে—"Law breaker." দেশের প্রতি কোণে জ্বলে আগুন! লক্ষ লক্ষ এগিয়ে চলে স্বাধীনতা—স্বাধীনতা! মুক্তির অভিযান!

বড়লাটকে দ্বিতীয় চিঠি গান্ধীজীর। এবার আক্রমণ দর্শনা, চর্শাদার লবণ-গোলা। বায়ু ও বারির মত লবণ গণ-সম্পদ। ওরা গ্রেপ্তার করে গান্ধীজী গভীর নিদ্রামগ্ন। ওরা মুখের উপর টর্চ্চ ফেলে। ওরা তাঁর শয্যা ঘিরে দাঁড়ায় ধরে নিয়ে যারবেদা জেলে বন্দী করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্ম্মী ৬৩ বৎসরের বুড়ো ইমাম সাহেব তাঁর জায়গায় এগিয়ে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে আড়াই হাজার লোক দর্শনা আক্রমণ করে। ওরা লাঠি চালায়, খুন করে, জখম করে ভারত-ময় পীড়ন—১ লক্ষের দণ্ড। পণ্ডিত মতিলাল ধৃত

২৫শে জানুয়ারী ১৯৩১ (৬২) গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা বিনাসর্ত্তে মুক্ত। মতিলালের মৃত্যু (৬ই ফেব্রুয়ারী)। ৪ঠা মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত। ১৯২১এ 'এক বছরে স্বরাজ' হবে এই আশায় বিপ্লবীরা আপনাদের কর্ম্মকাণ্ড স্থগিত রেখেছিল গান্ধীজীর আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে—তারা সে আন্দোলনে যোগও দিয়েছিল সর্ব্বতোভাবে। কিন্তু 'এক বছরে স্বরাজের' সঙ্গে যে গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের অপর কাম্য—"Righting of Khilafat wrong" ব্যর্থ হয়ে যখন মুসলমানদের হেভুকী দেশপ্রেমে বাধা দাঁড়াল, তখন যথোপযুক্ত সংযমী কর্ম্মীর অভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখতে গান্ধীজী বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ, সরকারের দমন ও পীড়ন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। বিদেশী দর্শকদের ধারণা "the drastic measures employed to quell Gandhi's campaigns deliver the spark to the perenial store of terrorist dynamite."

কেন্দ্রী পারষদে বোমা-ধ্বনির সঙ্গে নব বিপ্লবের "ইনকিলাব জিন্দাবাদের" নব ধ্বনিতে ভারত হ'ল মুখরিত। ভগৎ সিং, যতীন দাস, বটুকেশ্বর এ ধ্বনির মূর্ত্ত বিগ্রহ—তারা মানুষ মারতে যায়নি তারা জানিয়ে দিয়েছিল—আজ হ'তে যে মহাবিপ্লব সুরু হ'ল, স্বাধীনতা অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত তা দীর্ঘজীবী হোক! গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানেরও ধ্বনি, "জয়—নয় মৃত্যু!" গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে—৫৪,০৪৯ সৈনিক করল কারা-বরণ, তার মধ্যে বাংলার বন্দী সব চাইতে বেশী (১১,৪৬৩)। হিংসাপন্থী বিপ্লবীরাও প্রস্তুত হচ্ছিল চরম আঘাত করবার জন্য।

মহাবিপ্লবের অগ্রদূত ভগৎ সিং। তাঁর মহানিনাদ কম্পিত-কলেবর বৃটিশ পাইলট। গান্ধীজীর সঙ্গে আরউইনের চুক্তির বড় সর্ত্ত ছিল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি। ভগৎ সিংও মুক্তি পাবে, গান্ধীজীর এই ছিল আশ্বাস কিন্তু কাপুরুষ আরউইন গোপনে ভগৎকে ফাঁসি দেবার বন্দোবস্ত করেছিল। সে বুঝেছিল, মহা বিস্ফোরকে আঘাত করবার ফলে দেশব্যাপী রক্তগঙ্গা বইবে তাই হত্যা-সংবাদ গোপন রেখেছিল। শ্বেতাঙ্গ নারীদের সাবধান করে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ১০ দিন যেন তারা ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার থেকে বের না হয়। এক দিন মধ্য-রাত্রে (২৩শে মার্চ্চ) ওরা তাকে ফাঁসি দিল। যুব-ভারত গান্ধীজীর কৈফিয়ৎ চাইল। করাচী কংগ্রেসে তাঁর মর্য্যাদা প্রায় ক্ষুণ্ণ হল যুব-বিপ্লবীরা কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁকে কৃষ্ণ-পতাকা দেখাল, কৃষ্ণ-মাল্য দান করল। গান্ধীজী নব-জীবন সভার সভাপতি বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সাহায্য চাইলেন, কংগ্রেস অধিবেশনে বিপ্লবী ভগৎএর প্রশংসা প্রস্তাব নিজে উত্থাপন করলেন। করাচী কংগ্রেসে বিপ্লবী নব-ভারতের মহা বিজয় ঘোষিত হ'ল।

গান্ধীজীকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে নিযুক্ত করা হল (১০ই জুন, ১৯৩১)। ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি লণ্ডন পৌঁছলেন। শত শত দরিদ্র নরনারী-শিশু-কুমারী মুরিয়েল লেষ্টারের গৃহে তাঁকে দর্শন করতে গেল। বৈঠকের অবসানে তিনি বলে এলেন—"আমার পথ কোন্ দিকে জানি না, কিন্তু এতে কিছুই আসে যায় না। আমার পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও অন্তরের অন্তর থেকে বৈঠককে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

তার পর ইউরোপ ভ্রমণ। লণ্ডন থেকে ফ্রান্সে। সুইটজারল্যাণ্ডে রোমা রোলাঁর সঙ্গে দেখা (৬ই ডিসেম্বর)। রোমে মুসোলিনীর সঙ্গে কথা (১২ই)। ফিরলেন ভারতে ২৮শে ডিসেম্বর।

এর মধ্যে ইংরেজের পীড়ন বেড়ে গেছে। বাংলা ও সীমান্ত প্রদেশে অর্ডিন্যান্সের প্রকোপ। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান ও সহস্র সহস্র খুদাই খিদমৎকার গ্রেপ্তার। পণ্ডিত জওহরলাল ধৃত। বছর শেষ হবার পূর্বে ১০ হাজার মুক্তিকাম ভারতবাসী পিঞ্জরাবদ্ধ। ভারতে পদার্পণ করেই গান্ধীজী বোম্বাই-এর আজাদ ময়দানের মহতী সভায় ঘোষণা করলেন—"I take these as gifts from Lord Willingdon, our Christian Viceroy for is it not a custom during Christmas to exchange greetings and gifts ?" দেখা করতে চাইলেন বড়লাটের সঙ্গে, বড়লাট দেখা দিতে চাইলেন না।

৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেস গান্ধীজীকে আবার সত্যাগ্রহ অভিযান চালাবার ভার দিলেন, আর বিশ্বের স্বাধীন জাতের নরনারী ও তাদের সরকারকে আহ্বান করে বললেন, এই সংগ্রামের গতি-প্রগতি তোমরা দেখে যাও।

১৯৩২—আরম্ভ হ'ল গান্ধীজীর মহা সংগ্রাম। ইংরেজ কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করল। ৪ঠা জানুয়ারী ওরা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে যারবেদা জেলে চালান দিল। এক দিকে চলল নিরস্ত্র মহা সংগ্রাম, সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী অভিযান। এ সময় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের প্রভাবে মুসলমান তরুণদের মধ্যে প্রচার করা হল—"Muslims are a seperate Nation and as such they should be allowed to form a Federation of their own consisting of the Muslim majority Provinces."—মুসলিম বিপ্লবী দল গোপনে গোপনে এই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্ম ষড়যন্ত্র পোক্ত করতে মনোনিবেশ করল।

১৭ই আগষ্ট ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঘোষণা। গান্ধীজী তাঁকে জানালেন, "প্রাণ দেব।" ২০শে সেপ্টেম্বর উপোস আরম্ভ হ'ল। ভারতময় নেতারা চঞ্চল হ'লেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। মৌলানা সৌকৎ আলি তাঁর মুক্তির দাবী করলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর যারবেদা-চুক্তিতে হরিজন, হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা সই করলেন। ইংরেজ তবু অত্যাচার শিথিল করেনি। নারীও হয় ক্ষিপ্ত। নারীও হয় বিপ্লবী। বাংলার গবর্ণর গুলী খেল। বিপ্লবী নারী বললেন—"I invite the attention of all to the situation created by the measures of the Government which can unsex a frail woman like myself, brought up in all the best traditions of Indian womanhood."

দরিদ্র ও সামাজিক অবিচারাহত হরিজনদের প্রতি কর্ম্মীদের সচেতন করবার জন্ম এ সময় গান্ধীজী ২১ দিন অনশন করলেন (৮ই মে—২৯শে মে)। আবার অনশন ১৬ই আগষ্ট। ২৩ আগষ্ট অবস্থা শঙ্কটজনক—সুতরাং বিনা সর্ত্তে মুক্তি। এর ৭ দিন পরে পণ্ডিত জওহরলাল খালাস পেলেন।

এর পর সংগ্রামের গতি বদলে গেল। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই ১৯৩৫এর শাসনতন্ত্রের সুবিধা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক হতে চায়। তারা রাঁচিতে বসে স্বরাজ্য দল তৈরী করেছে (মে, ১৯৩৪)। গান্ধীজী তাঁদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করলেন, বুঝলেন, কর্ম্মি-স্তর থেকে না উঠে যারা হঠাৎ নেতা হতে চায়, তাদের দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলবে না। তিনি গণসংগঠন করবেন স্থির করলেন। তিনি বললেন—"I feel that masses have not received the full message of Satyagraha owing to its adulteration in process of transmission,"—সত্যাগ্রহ তিনি বন্ধ করলেন (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪)। তিনি দেখলেন, মুসলমানরা জাতীয়তা আন্দোলন বর্জ্জন করেছে। পাকিস্তানপন্থী বিপ্লবী মুসলমানদের সঙ্গে জাতীয়তাপন্থী মুসলমানরা মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে এক হয়ে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণ করেছে (মার্চ্চ, ১৯৩৪), নতুন শাসনতন্ত্রও মেনে নিয়েছে। কংগ্রেসও প্রায় নিমরাজি। গান্ধীজী গণসংগঠনের জন্য, হরিজন সংগঠনের জন্ম ১০ মাস ভারতব্যাপী চেষ্টা করলেন। বোম্বাই কংগ্রেসের পর তিনি কংগ্রেস এক রকম ত্যাগই করলেন।

এই ভাবে কাটে কয় বছর।

১৯৪৭ (৬৮)—কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জিতে ১১ প্রদেশের মন্ত্রিত্বের ভার নিয়েছেন। গান্ধীজী বললেন, গণ-সংগঠনে মন দাও, চাষীদের অবস্থার উন্নতি কর, গণশিক্ষার ব্যবস্থা কর. কারাগারগুলো গণ-সংশোধনাগারে পরিণত কর।

দেশে তখন চরমপন্থীদেরও সংগঠন চলছে, তারা কংগ্রেসী শাসনের সুযোগ নিচ্ছে। মসলেম গণ-সংযোগের চেষ্টা চলায় মসলেম লীগ ক্ষিপ্ত হচ্ছে। জিন্না ঘোষণা করছেন—(১৯৩৮) "All hopes of communal unity had been wrecked on the rock of Congress Fascism."

চরমপন্থী যুব-ভারত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করছে—তাদের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী নিয়ে সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের গোলমাল বেধেছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯, মার্চ্চ—৭০ বৎসর) সুভাষচন্দ্রেরই নেতৃত্বে যুব-ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী করেছে।

তার পর বাধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। বড়লাট গান্ধীজীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। গান্ধীজী বললেন, "my own sympathies are with England." কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্ম তাঁর দাবী সম্বন্ধে বড়লাট কোন প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলেন না। ১৭ই অক্টোবর তিনি মাত্র এই বললেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ সরকার এ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে সম্মত। গান্ধীজী আবার বললেন,—"profoundly disappointing.—কংগ্রেস চেয়েছিল রুটি—পেয়েছে পাথর।"

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করল (৮ই নভেম্বর)। ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হল। গান্ধীজী বললেন, (১৯৪০—৭১) শান্তিপূর্ণ ও মানজনক আপোষের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। জার্ম্মাণী তখন ইংলণ্ডে প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে। ২রা জুলাই গান্ধীজী বৃটেনকে পরামর্শ দিলেন অহিংসা পন্থা অবলম্বন করতে। গান্ধীজী আভাস পেয়েছেন, বিপ্লবী ভারত এ মহাযুদ্ধের সুযোগ নিতে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে—তারা ইংরেজকে ৬ মাসের নোটিশ দিতে চায়। তাঁর নির্দ্দেশে কংগ্রেস ইংরেজের সহযোগিতা করতে চান। তবে দাবী—"an immediate declaration of full independence of India and the formation of a Provisional

Government at the centre"—বড়লাট প্রস্তাব করেন প্রত্যাখ্যান। ওয়ার্দ্ধার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে আসন্ন মহাসংগ্রামে নেতৃত্ব করতে অনুরোধ করে (২৩শে আগষ্ট, ১৯৪০)। ১১ই অক্টোবর তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালালেন। ভারতের দিকে দিকে এই আন্দোলন প্রসারিত হ'ল। কিন্তু তিনি দেখলেন, অহিংসা সম্বন্ধে তরুণ দলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হচ্ছে। তিনি আবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করলেন (৩০শে ডিসেম্বর)। অধৈর্য্য বিপ্লবীরা প্রস্তুত হল স্বদেশে গণ-সংগ্রাম করতে ও তার সাথে ইংরেজ-শত্রু বিদেশীদের সাহায্যে সশস্ত্র অভিযান দ্বারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে। '৪১এর স্বাধীনতা দিবসে চরমপন্থীদের নেতা সুভাষচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে ভারত থেকে পলায়ন করলেন।

দেশে বৈদ্যুতিক চঞ্চলতা। ১৯৪২, ১৬ই জানুয়ারী আবার গান্ধীজী কংগ্রেসের সংগ্রামের নেতৃত্ব করতে সম্মত হলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর ইংরেজের হাত-ছাড়া। ১১ই মার্চ্চ জাপানের আক্রমণে বিপন্ন ইংলণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক ভারত-বিদ্বেষী চার্চ্চিল বাধ্য হয়ে ক্রিপস্ মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত করলেন—"to rally all forces of Indian life to guard their land from the menace of the invader." ২৭শে মার্চ্চ ক্রিপসের সঙ্গে দিল্লীতে গান্ধীজী আলাপ করে বুঝলেন, ওদের প্রস্তাব হ'ল "a post dated cheque", ২৯শে মার্চ্চ ক্রিপসের প্রস্তাবের মোদ্দা কথায় প্রকাশ পেল যে, "The defence of India will not be in Indian hands even if all parties want it."

সুতরাং ভারত বিক্ষুব্ধ। কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট প্রস্তাব বললে, দূর হটো! ছাড় ভারত! ৯ই আগষ্ট—ওরা গান্ধীজীকে করে গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তার করে কংগ্রেসের শত-সহস্র নেতা ও কর্ম্মীকে। গান্ধীজী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মীদের ওরা পুণার কাছে আগা খাঁর প্রাসাদে নিয়ে আটক করে। ১৪ই আগষ্ট গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগোকে এক পত্রে জানালেন—"মস্ত ভুল করেছ। আমি তোমাদের বন্ধুই আছি। ভগবান তোমাদের পথ নির্দ্দেশ করুন।" ১৫ই আগষ্ট তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্ম্মী মহাদেব দেশাইকে কারাগারে হত্যা!

তার পর? মহাবিপ্লব ভারতে—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। '৪৩, ২রা জুন—সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে। ৫ই জুন আজাদ হিন্দ সৈন্যদল নিয়ে নেতাজীর রণ-হুঙ্কার—চলো দিল্লী। সরকার ও সহকর্ম্মীদের অনাচারের মূক প্রতিবাদে গান্ধীজীর ৩ হপ্তা অনশন (১০ই ফেব্রুয়ারী, ৩ মার্চ্চ)। অবস্থা মন্দ দেখে প্রতিবাদে ১৭ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের মন্ত্রিসভার ৩ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ। ২২শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির সন্ধ্যায় কস্তুরবা গান্ধীজীকে ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। বিদেশী সাংবাদিকের ভাষায় আগা খাঁ প্রাসাদের কাছে কস্তুরবা'র চিতা ভস্মকে সামনে রেখে "The oldman sat under the tamarind tree and wept," ৬ই মে বিনা সর্ত্তে মুক্তি পেয়েই গান্ধীজী প্রথমে কস্তুরবা ও মহাদেবের চিতাস্থানে ফুল দিয়ে এলেন।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যে অনির্ব্বাণ জ্যোতি মুমুক্ষু ভারতের পথ প্রদর্শন করছিল, তাকে ম্লান করবার জন্য ইংরেজ যেমন অবিরাম চেষ্টা করেছে, তেমনি চেষ্টা করেছে ইংরেজের কবুতর চরগুলো। ভেদ ও বৈষম্য দূর করবার জন্য গান্ধীজীর চেষ্টা বারবার বিফল হয়েছে, বারবার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। লিনলিথগো আর ওয়াভেল তাঁকে এ চেষ্টায় সাহায্য করেনি, মহম্মদ আলি জিন্নাও করেনি—অনৈক্য ওরা মেনে নিয়েছে, অনৈক্যের সুযোগ নিয়েছে, ঐক্য সংস্থাপনে সাহায্য করা দূরে থাকুক ওরা বিরোধী হয়েছে। মিঃ জিন্না ও গান্ধীজী যদি মিলতেন, তবে অঘটন ঘটত। কিন্তু তা কি হবার?

তবু গান্ধীজী চেষ্টা করলেন। বন্ধন-মুক্তির পরই (১৭ জুলাই) তিনি পাঁচগনি থেকে মিঃ জিন্নাকে লিখলেন—"ভাই জিন্না, এক দিন ছিল, যখন আমি মাতৃভাষায় কথা বলতে আপনাকে প্ররোচিত করেছি। আজ সেই ভাষাতেই লিখতে সাহস করছি। জেলে থাকতে আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছিলাম। খালাস পেয়ে আর পত্র দিইনি। কিন্তু আজ মন ডেকে বলছে আপনাকে পত্র দিতে। আপনার ইচ্ছামত দিনে আসুন আলাপ করি। আমাকে ইসলামের বা এ দেশের মুসলমানদের শত্রু বলে মনে করবেন না। মাত্র আপনার নয়, সারা দুনিয়ার আমি বন্ধু ও দাস। আমায় হতাশ করবেন না।"

দেখা হ'ল। আলাপ হ'ল। মিঃ জিন্নার পাষাণ মন গলবার মত নয়। ৩১শে জুলাই জিন্না-গান্ধী চিঠিপত্র সংবাদপত্রে ছাপা হ'ল। গান্ধী নিরাশ হলেন।

তার পর চেষ্টা ইংরেজের সাথে। বড়লাট চাইলেন, 'definite and constructive policy' গান্ধীজীর কাছে। তাও তিনি দিলেন। বললেন, কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবে যে সত্যাগ্রহের কথা বলা হয়েছে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তার আর প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস এবার সমরোদ্যমে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে—যদি···যদি ইংরেজ অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করে, আর কেন্দ্রে জাতীয় সরকার স্থাপন করে। তা'হলে ভারত ইংরেজের যুদ্ধে সহযোগিতা করবে, তবে যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে পারবে না। গান্ধীজী বড়লাটকে জানালেন—আমি আপনারই হাতে। মানজনক আপোষের বিন্দুমাত্র আশা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমি আপনাদের দ্বারে ঘা দিয়েই যাব।

ওয়াভেল ওঠালেন হিন্দু, মুসলমান, সংখ্যিষ্ঠ সম্প্রদায়দের সর্ব্বসম্মত প্রস্তাবের কথা। বললেন, আগে তোমাদের মধ্যে আপোষ করে ঠিক কর। গান্ধীজী বললেন—"সরকারের এই জবাব থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ৪০ কোটির উপর যে প্রভুত্ব ইংরেজ সরকার করছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ৪০ কোটির তা কেড়ে নেবার মত শক্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ তারা তা ছাড়বে না। আমি নিরাশ হব না। ভারত আধ্যাত্মিক উপায়ে তা অর্জ্জন করবে।"

তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন—কোয়াদি আজমের মনের পরিবর্ত্তন হোক।

তখন পাকিস্তান ফ্রন্ট হয়েছে, এণ্টি-পাকিস্থানী ফ্রন্টও গজিয়েছে। ওয়াভেল সরকার গান্ধীজীর চরকা-সঙ্ঘ পর্য্যন্ত ধ্বংস করবার মতলব করেছে। গান্ধীজী বললেন (৩ সেপ্টেম্বর)—"সঙ্ঘ ভেঙ্গে তার সম্পত্তি ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দাও। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে যদি এই সম্পদ প্রবেশ করে, কার সাধ্য তাকে ধ্বংস করে। গবর্ণমেন্ট ত' ৪০ কোটি নর-নারীকে পিঁজরের পুরতে পারবে না, বা ৪০ কোটিকে গুলী করেও মারতে পারবে না!

বোম্বাইয়ে আবার গান্ধী জিন্না সাক্ষাৎ (৯ই সেপ্টেম্বর)। জিন্নার গলা জড়িয়ে ধরলেন পরম স্নেহে। জিন্না হেসে বললেন, ওরা ছবি

তুলবে। নিষ্ফল আলাপ চলেছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম প্রার্থনা-সভায় জিন্না ঘোষণা করেছিলেন—পাকিস্তান লাভ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না পাওয়া পর্য্যন্ত সব রকম স্বার্থই মুসলমানকে ত্যাগ করতে হবে—শপথ কর। পরদিন সার্ব্বজনীন প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজীও বললেন—"যদি স্বাধীন হতে চাও, যদি ভারতের মুক্তি চাও, হিন্দু-মুসলমান ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনবন্ধন ঘনিষ্ঠ কর।"

পর বৎসর সিমলায় ওয়াভেল প্ল্যান নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়াভেলের পত্র-বিনিময়। সিমলা-বৈঠকে গান্ধীজী ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল।

তার পর-বছর এল (১লা এপ্রিল) বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন। কংগ্রেস মিশনের প্রস্তাবিত গণ-পরিষদে যোগ দিয়ে স্বাধীন সংযুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করতে সম্মত হ'ল (২৬শে জুন)। ২১শে জুন অন্তর্ব্বর্তী-সরকার নিযুক্ত হ'ল। মিঃ জিন্নার দল ক্যাবিনেট কমিশন বর্জ্জনের হুমকি দেখিয়ে বললে—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

৫০ বছর আগে বাংলাদেশেই মুসলমানেরা হিন্দু-রক্তে মাতৃভূমি রঞ্জিত করে বাংলা দু'ভাগ করে স্বাধীনতার আন্দোলনের মৃত্যুপন্থী যোদ্ধাদের সৃষ্টি সম্ভবপর করেছিল, আর ঠিক ৫০ বছর পরে এই বাংলাতেই এই মুসলমানেরাই হিন্দুর রক্তে মাতৃভূমি সিক্ত করে ইংরেজের সাহায্যে দেশকে ভাগ করে নিয়েছিল মৃত্যুপন্থী কোন্ ভাবী যোদ্ধাদের সৃজনের জন্য, তা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

গান্ধীজী অন্ধকার দেখলেন। বললেন, আর বেঁচে কি হবে? জিন্নার ভক্তদের প্রহারে পীড়িত হতভাগ্যদের আর্ত্তনাদ গান্ধীজীকে ব্যাকুল করেছিল (৩০শে ডিসেম্বর)। তিনি আবার মিলনের আশা করলেন। নোয়াখালিতে একা ঘুরে বেড়ালেন (২রা জানুয়ারী) ধর্ষিতা হিন্দু-নারীকে সান্ত্বনা দিয়ে। লীগের প্রহারাহত ক্ষুব্ধ কলকাতার যুবকদের প্রতিহিংসা রোধ করলেন মৃত্যুপণ অনশন করে (১লা—৪ঠা সেপ্টেম্বর)। তার পর চললেন দিল্লীতে—সঙ্কল্প, সাম্প্রদায়িক হিংসা হয় লোপ করবেন, নয় প্রাণ দিবেন। মুখে সেই এক ধ্বনি 'করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে।' হিংসায় উন্মত্ত ভারতে ইন্ধন আসে সমুদ্র-পার থেকে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ বীর ও ত্যাগীর সাধনা ব্যর্থ করে নবলব্ধ রাজনৈতিক অধিকারকে ভিতর থেকে ক্ষুণ্ণ ও ব্যর্থ করবার জন্য চক্রান্ত স্বার্থবাদদের নির্ম্মম পরম প্রয়াস। গান্ধীজী ইঙ্গিত পান। বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন—"চার দিকে ঘন তমসা, এবার বিদায় নেই। বলেন—"অব শিব, পার কর মেরা নৈইয়া।" ১৯৪৮, ১৩ই জানুয়ারী মিলনের শেষ চেষ্টা মৃত্যুপণ অনশন। সবাই বললে—রাষ্ট্রগুরু, সম্বরণ কর, আমরা পণ করছি এ দেশ ভাঙ্গব। ১৮ই জানুয়ারী গান্ধীজী বললেন—তাই হোক।

কিন্তু ভারত-গগনে রাহুর আবির্ভাব যে মহা জ্যোতিঃ স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল, তাকে আবৃত করবার জন্য পাপ-তমসার প্রভাব চলছিল। ওরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। ওরা হত্যা করে রাষ্ট্র-সবিতাকে ভারত-গগন থেকে অপসারিত করতে চেয়েছিল।

২০শে জানুয়ারীর প্রার্থনা সভায়—মিলনের মন্ত্র পাঠ করতে গান্ধীজী যাচ্ছিলেন—যেমন প্রত্যহ যান। তমসা-দূত এসে প্রদীপ্ত বহ্নিকে নমস্কার করেছিল—আর তাঁর দেহকে হত্যা করে প্রতি ভারত-বাসীর চিত্তে ও অঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিল। গান্ধীজী মুখ ফিরে তাদের শেষ নমস্কার করেছিলেন—

'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সুমতি দে হে ভগবান!'

যাঁর জন্মদিনে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার পত্তন হয়েছে—প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্জ্জনের জন্য এক হাতে গীতা এক হাতে কৃপাণ নিয়ে যিনি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতকে স্বাধীনতার সক্রিয় পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যাঁর চেষ্টায় কংগ্রেসের ভিক্ষার আবেদন দুর্জ্জয় দাবীতে পরিণত হয়েছিল, গান্ধীজীর এই দৈহিক অপসারণে জাতিকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছেন—

"The power that brought us through so much struggle and suffering to Freedom, will achieve also, through whatever strife or trouble, the aim which so poignantly occupied the thoughts of the fallen leader at the time of his tragic ending, as it has brought us freedom, it will bring us unity. A free and united India will be here and the Mother will gather around her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and united people." সিদ্ধ যোগীর বাণী সফল হোক্। গান্ধীজীর জয় হোক্। জয় হিন্দ!

শ্রীতারানাথ রায়

মহাত্মাজীর সাধনা ও আমাদের দায়িত্ব

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সমগ্র ভারতবাসীর—সমগ্র বিশ্ববাসীর অন্তর মথিত করিয়া গভীরতম শোক মর্ম্মবেদনা এবং ক্ষোভের আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী আর ইহজগতে নাই, দুষ্কৃতকারীর গুলীতে অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি মানব-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হত্যাকারীর এই নৃশংস আঘাত ভারতের অন্তরাত্মাকেই আহত ও রক্তাপ্লুত করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী ভারতের জাতীয় জীবনে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে, তাহার রক্তাক্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন কোন দিনই আর বিলুপ্ত হইবে না। আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার ছয় মাসও পূর্ণ না হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনকে গভীরতম তমিস্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। যাহা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই, তাহাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আমাদের অন্তরকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমরা এই মহাপ্রাণকে, এই অমূল্য জীবনকে রক্ষা করিতে পারি নাই, আমাদের শোণিতাক্ত সমগ্র অন্তর নিঙড়াইয়া শুধু এই আর্ত্তনাদই আজ উত্থিত হইতেছে না, আমাদের কোন্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই মহামানবকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল, এই প্রশ্নও সকলের অন্তরকে গভীর ভাবে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের অন্তরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমাদিগকে করিয়াছে আত্মানুসন্ধানী। মহাত্মাজীর আরব্ধ ব্রত যে অসমাপ্ত রহিয়াছে তাহার প্রতিও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এই মর্ম্মান্তিক আঘাত। মহাত্মাজী যত দিন আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তত দিন তাঁহার আদর্শ ও নীতির প্রতি আমরা কোন আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস হইতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধে অনুষ্ঠিত করাচী, গুজরাট ও পারাচিনারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বেদীমূলে পাঁচ লক্ষেরও অধিক ভারতবাসীর জীবন বলি দিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় নাই। পঞ্চনদের পবিত্র ভূখণ্ড সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় শ্মশানপ্রায় হইয়াও আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়াছে। সহস্রাধিক কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াও আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে নাই। অর্দ্ধ কোটির অধিক হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়া, এবং পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের ৪০ লক্ষেরও অধিক মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইয়াও আমাদিগকে জাগ্রত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১০ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও যে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এ কথা জানিয়াও জাগ্রত হইবার ইচ্ছা আমাদের হয় নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অমূল্য জীবন দান করিয়া সেই অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছি। মর্ম্মান্তিক বেদনা ও দুঃখের মধ্যে আমাদের বোধশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। মহাত্মাজীর জীবনালোকে উদ্ভাসিত সত্য-পথে যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলেই শুধু দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে আমাদের শক্তি, মহাত্মাজীর উত্তর-সাধকরূপে আমাদের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিবে তাঁহারই অসমাপ্ত সাধনা। মর্ম্মান্তিক দুঃখে আমরা জাগিয়াছি কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যে ভারতীয় ঐক্য নবজন্ম লাভ করিয়াছে কি?

যুগ যুগেই মহামানবকে সত্যের জন্য, অহিংসার জন্য, আদর্শের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র কপোতের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজা উশীনরের পুত্র শিবি নিজের দেহ-মাংস দানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দধীচি নিজের জীবন দিয়াছিলেন পরোপকারের জন্য। নিষাদের তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইয়াছিলেন। সক্রেটিসকে তাঁহারই দেশবাসীরা হেমলক বিষ পান করাইয়া হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার স্বজাতীয়গণই যিশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল। কোরেশ-বংশীয়রাই হজরত মহম্মদকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীকেও তাঁহার দেশবাসীর হস্তেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল। এ পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার ইতিহাস 'Martyrdom of Man' ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এই সকল মহাপুরুষের বহু সংখ্যক অনুগামী রহিয়াছে সন্দেহ নাই, তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক আত্মত্যাগ মানব জাতির চিন্তাধারায় গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, এ কথাও সত্য। কিন্তু এ কথাও আমাদের ভুলিবার উপায় নাই যে, যাহাদের কল্যাণ সাধন এই সকল মহাপুরুষ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই হাতে তাঁহাদিগকে জীবন দিতে হইয়াছে। জীবন দিয়াও তাঁহারা পৃথিবী হইতে হিংসা-দ্বেষ দূর করিতে পারেন নাই, মানুষের জীবনকে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে ভরিয়া তুলিবার মহৎ ব্রত তাঁহাদের ব্যর্থ হইয়াছে। মানব-ইতিহাসের গোড়া হইতে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে মহাত্মাজীর জীবন দান তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবে কি? মহাত্মা গান্ধী হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও বৈষম্যে পরিপূর্ণ মরজগতে সত্য, অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আমরা সার্থক করিতে পারিব কি? মহাত্মাজী নিহত হওয়ার মর্ম্মান্তিক ব্যথা-বেদনা আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়াছে, ক্ষোভের অন্তর্দ্দাহ উত্তপ্ত শলাকার মতই আমাদের অন্তরকে অহর্নিশ বিদ্ধ করিতেছে। দেশবাসীর এই মর্ম্মভেদী ক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতেও আমরা দেখিয়াছি। মহাত্মাজীর হত্যাকারী এবং এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি দেশবাসীর অন্তর্দ্দাহকে প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপিত করিতেও যে আমরা দেখি নাই তাহাও নয়। কিন্তু মহাত্মাজীর পার্থিব দেহকে বিনাশ করার মধ্যেই কি শুধু এই মর্ম্মান্তিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে? হত্যা কি শুধু দেহেরই হয়? মহাত্মা গান্ধীর এক অনশন ব্রত উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আহুত পল্লীবাসীদের সভায় বলিয়াছিলেন, "খৃষ্টান শাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদীরা যীশুখৃষ্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার

কি শুধু দেহের? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়? সকলের চেয়ে বড় মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেচেন! সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না?" কবিগুরু আরও বলিয়াছেন, "বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি, তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দেই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড় সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম।" কবিগুরুর এই মানদণ্ড দিয়া মহাত্মাজীর অনুগামীদিগকে যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? নিজেদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে অন্তরের বিক্ষোভকে যাঁহারা প্রচণ্ড ক্রোধের মধ্যে অভিব্যক্ত করিতে প্ররোচনা দিয়াছিল, তাঁহাদিগকে যদি কবিগুরুর এই মানদণ্ড দিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? হত্যাকারী তাঁহার পার্থিব দেহকেই শুধু বিনাশ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু মহাত্মাজীর অনুগামীরা, প্রচণ্ড ক্রোধের উন্মাদনাতার কি মহাত্মাজী বাঁচিয়া থাকিতেই তাঁহার আদর্শকে পুনঃ পুনঃ হত্যা করেন নাই? মহাত্মাজীর আদর্শকে বিনাশ করা এবং তাঁহার পার্থিব দেহকে বিনাশ করা, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর মর্মান্তিক, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহারই নশ্বর পার্থিব জীবন নাশ হওয়ার মর্মান্তিক ব্যথা বেদনা যদি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আমাদিগকে পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই শুধু এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হইবে।

মহাপুরুষদের জীবনের বৃহত্তম ট্রেজেডি হইতেছে এই যে, সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, গদগদ কণ্ঠে তাঁহাদের স্তবগাথা গান করে, কাহাকেও ঈশ্বরের পুত্র, কাহাকেও প্রেরিত পুরুষ, কাহাকেও অবতার, আবার কাহাকেও স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়াই পূজা করে, কিন্তু কেহ-ই মহাপুরুষদের উপদেশ প্রতিপালন করে না, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে না, তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে না। জর্জ বার্ণার্ড শ' তাঁহার অনুপম ভাষায় এই সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন, "In a stupid nation, the great of genius becomes a God, everybody worships him and nobody does his will." অর্থাৎ নির্ব্বোধ জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঈশ্বরে পরিণত হন। প্রত্যেকেই তাঁহাকে পূজা করে, কিন্তু কেহই তাঁহার ইচ্ছানুসারে কাজ করে না। কিন্তু যাহারা কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বানাইয়া তাঁহার জীবনের ব্রতকে পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ, তাহাদিগকে নির্ব্বোধের জাতি বলিয়া অভিহিত করা যায় কি? জর্জ বার্ণার্ড শ' নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "The most effective way of shutting our minds against a great man's ideas is to take them for granted and admit he was great and have done with him." অর্থাৎ এক জন শ্রেষ্ঠ মানবের মতবাদের দিক্ হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় ঐ মতবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা এবং তিনি যে এক জন শ্রেষ্ঠ মানব তাহাও মানিয়া লওয়া। তাহা হইলেই মহাপুরুষকে শেষ করিয়া ফেলা হইল।' বার্ণার্ড শ' দুর্ব্বোধ্য কথা প্রাঞ্জল। বস্তুতঃ, সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী কর্ণধারগণ মহাপুরুষের জীবন-ব্রতকে ব্যর্থ করিবার যে সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যুগ যুগে তাহার অব্যর্থ কার্য্যকরী শক্তি নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধেও তাঁহাদের এই নীতি ব্যর্থ হয় নাই। মহাত্মাজী যে দেশবাসীর অন্তরে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই। তথাপি, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে দেশবাসী তাঁহার আদর্শকে কতটুকু মর্য্যাদা দিয়াছে, মহাত্মাজীর নীতি কার্য্যকরী করিতে কতটুকু সহায় হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। হত্যাকারী অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক মহাত্মাজীর পবিত্র দেহে কোন্ প্রাণে আঘাত হানিতে পারিয়াছে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। মহাত্মাজীর জীবনের উপর আঘাত হানিবার চেষ্টা আরও অনেক বার হইয়াছে। মহাত্মাজী ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বলিয়াছিলেন, "But if some one were to kill me in the belief that he was getting rid of a rascal, he will kill not the real Gandhi but one that appeared to him a rascal." অর্থাৎ 'একটা দুরাত্মাকে অপসারিত করিতেছে এই বিশ্বাসে কেহ যদি আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে সে সত্যিকার গান্ধীকে হত্যা করিবে না, হত্যা করিবে তাহাকেই—যে তাহার কাছে দুরাত্মা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।' বস্তুতঃ মানুষ তাহার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই জগৎকে দেখিয়া থাকে। যাহার প্রকৃতি যেরূপ, জগৎ তাহার কাছে সেইরূপই প্রতিভাত হয়। মহাত্মাজী মানুষের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলাইতে চাহিয়াছেন, চাহিয়াছেন মানব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিতে। সুতরাং তাঁহার প্রচেষ্টাকে যে যে-দিক্ দিয়া স্বীয় স্বার্থের ক্ষতিজনক বলিয়া মনে করিয়াছে সে, সেই দিক্ দিয়াই মহাত্মাজীর মহতী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার ভক্ত সাজিয়া, তাঁহার অনুগামী সাজিয়া তাঁহার আদর্শ ও নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই দুষ্কৃতকারী করিয়াছে মহাত্মাজীর পার্থিব দেহের বিনাশ। কিন্তু সত্যিকার মহাত্মা গান্ধী বাঁচিয়া আছেন। তিনি যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের বলিষ্ঠ সাধনার মধ্যেই তিনি থাকিবেন অমর হইয়া।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিগত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস মহাত্মাজীর স্বপ্নের স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনার কাহিনী। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জয়লাভের পর ভারতবর্ষকে তিনি যখন তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করা স্থির করিলেন, তখনই হইল ভারতে জাতীয় আন্দোলনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ। যদিও দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেস সভাপতির আসন হইতে কংগ্রেসের লক্ষ্যস্থল স্বরাজ বলিয়া ১৯০৬ সালেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবর্গের দৃষ্টিতে এই স্বরাজ ভারতের শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কতক পরিমাণে শাসন-ক্ষমতা লাভ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসে শুধু শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হইয়াছে। ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লব যেমন সমাজতন্ত্রকে গণশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তেমনি মহাত্মার নেতৃত্ব কংগ্রেসের আন্দোলনকে দুর্ব্বার গণশক্তির মহাসাগরে

মিশাইয়া দিল। বস্তুতঃ গণ-আন্দোলনের নেতারূপেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর প্রথম আবির্ভাব। গিরমিটিয়া-প্রথা রহিতের জন্য আন্দোলনই ভারতে মহাত্মাজীর প্রথম আন্দোলন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে সরকার এই গিরমিটিয়া-প্রথা রহিত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার দ্বিতীয় আন্দোলন নীল চাষীদের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন। চম্পারণের পর খয়রায় কৃষকদের উপর করবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আহমদাবাদে মিল-মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। আহমেদাবাদে তিনি যে শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠন করেন, বোধ হয় ভারতে উহাই সর্ব্ব প্রথম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারতে ব্যাপক ভাবে জন-জাগরণের সৃষ্টি করে তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন। তাঁহার আইন অমান্য আন্দোলন হয় ত' তেমন ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই এবং ১৯৪০ সালের আন্দোলন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তাঁহার 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের পর তিনি এবং নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হইলে দেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব।

মহাত্মাজী যেমন ভাবী ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তেমনি কোন্ পথে এই স্বপ্ন সফল হইবে তাহার পথও নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনিই। এই পথ তাঁহার নিজস্ব পথ। ভারতের জন্যও এই পথই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯১৭ সালে গুজরাটী রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে তিনি ঘোষণা করেন, "This Satyagraha is India's special weapon." অর্থাৎ 'এই সত্যাগ্রহ ভারতের বিশেষ অস্ত্র।' এই সত্যাগ্রহ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বরাজ কোন্ পথে অর্জ্জিত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমার স্বপ্নের স্বরাজ তখনই আসিবে, যখন আমরা সকলেই দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিব যে, আমাদের স্বরাজ শুধু সত্য ও অহিংসার পথেই অর্জ্জিত, পরিচালিত ও রক্ষিত হইবে।"

মহাত্মাজীর স্বরাজ জনগণের স্বরাজ। ইহাকেই তিনি রামরাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে অহিংসার উপরে। কেহ ই কাহারও শত্রু হইবে না। সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। সকলেই লেখাপড়া শিখিবে এবং তাহাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। রোগের আক্রমণ যথাসম্ভব কম হইবে। কেহ-ই নিঃস্ব থাকিবে না। শ্রমিকরা সকলেই কাজ পাইবে। ধনীরা তাঁহাদের সম্পদ জাঁকজমকে ব্যয় না করিয়া বিজ্ঞতার সহিত কল্যাণজনক কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থাই মহাত্মার রাম-রাজত্ব। তিনি শ্রেণি-সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন শ্রেণি-সহযোগিতায়। তাঁহার বিশ্বাস, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া ধনীরা স্বেচ্ছায় দরিদ্রের স্বার্থ-রক্ষক হইয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁহার নির্দ্দেশিত সত্য ও অহিংসার পথে আমাদের নেতৃবৃন্দ, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী এ পর্য্যন্ত কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন এবং মহাত্মাজী নিহত হওয়ার মর্ম্মান্তিক আঘাতের প্রেরণায় কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবেন। সমালোচনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া আমরা এত দিন যাহা করিয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, আমরা মহাত্মাজীকে শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা-ভক্তিই করিয়াছি, না তাঁহার নির্দ্দেশও কিছু কিছু পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহাত্মাজী নিহত হওয়ার মর্ম্মান্তিক আঘাতে আমরা যে বিমূঢ় ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কৃচ্ছ্র-সাধনার বলিষ্ঠ পাদক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্য পথ কি ধ্বনিত হইয়া উঠিবে না? অহিংসা ও সত্যের পথ আমরা সত্যই গ্রহণ করিয়াছি কি? হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে আমরা সত্যই বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি কি?

রৌলট আইন এবং জালিয়ানওয়ালা-বাগের মর্ম্মন্তুদ ঘটনাকে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্য ও অহিংসার অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৭-১৮ সাল হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরব্যাপী মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসা-সংগ্রামে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং দেশের অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারিগণ দ্বিধাহীন চিত্তে অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন কি? পুনঃ পুনঃই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছেন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া তিনি নিজেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সঙ্কটের সময় তাঁহারা আবার তাঁহাকে ডাকিয়াছেন: নূতন নেতৃত্ব, নূতন পথ কেহ-ই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর, দ্বৈতশাসন ব্যর্থ করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার গ্লানির মধ্যে, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর, ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইলে, ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার মধ্যে, ১৯৪৬ সালের মে মাসে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব এবং ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের সময় এইরূপ অবস্থা ঘটিতে আমরা দেখিয়াছি। পরিপূর্ণ ভাবে কোন দিনই তাঁহার নেতৃত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে, সংশয়-কম্পিত হস্তে তাঁহারা সত্য ও অহিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন আংশিক ভাবে—গ্রহণ করিয়াছেন সেইটুকু—যেটুকু তাঁহাদের কাছে সুখকর মনে হইয়াছে। তাঁহার যে নির্দ্দেশ কষ্টকর মনে হইয়াছে, নিজেদের শ্রেণি-স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিতে কোন দিনই আমরা কুণ্ঠিত হই নাই। মহাত্মাজী সত্যকে তাঁহার আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সত্যকে গ্রহণ করিয়াছি কি? যীশুখৃষ্টকে যখন বিচারের জন্য পণ্টিয়াস পিলেটের (Pontius Pilate) নিকটে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি আত্মসমর্থনের জন্য বলিয়াছিলেন, "...I should bear witness unto the tru[illegible]h. Every one that is of the truth heareth my voice." পিলেট তাঁহার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Wha[illegible] is truth"? অর্থাৎ সত্য কি? কিন্তু যীশুখৃষ্টের উত্তর শুনিবার আগ্রহ তাঁহার ছিল না। আমাদেরও মহাত্মাজী সত্য বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহা জানিবার আগ্রহ হয় নাই। মহাত্মাজী সত্যসন্ধানী ছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের পারস্পরিক সঙ্ঘাতে ভারতের ইতিহাস যে পথে পরিচালিত হইতেছে, মহাত্মাজী তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সত্যদ্রষ্টা। এই সত্যকে তিনি সুষ্ঠু ভাবে রূপ দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই গণানুগত্য তাঁহার নেতৃত্বকে ঘেরিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্বের সার্থকতা

নির্ভর করিতেছিল কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, চিন্তাশীল শিক্ষিত সাধারণ এবং দেশের সর্ব নৈতিক শক্তির অধিকারী দল কর্মশক্তির উপরেই একান্ত ভাবেই, এ কথা বলিলে একটুকুও ভুল হয় না। মহাত্মাজীর নির্দেশ যেটুকু তাঁহার তাঁহারা দল শ্রেণী স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছেন সেইটুকুর উপরেই তাঁহারা জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের যে অংশের উপর জোর দিলে অনুকূল অংশটুকু শক্তিশালী হইতে পারিত, সেই অংশকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মাজী শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন তাঁহার এই শিক্ষার প্রতিই আমরা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। কিন্তু তিনি ধনীদিগকে দরিদ্রের ন্যাসরক্ষক হওয়ার যে উপদেশ দিয়াছেন, বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকে ধন ব্যয় না করিয়া দরিদ্র-সাধারণের কল্যাণের জন্য ধন ব্যয় করিতে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়াছি। মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসা ভাল; আর আমরা শত্রুর লাঠির সম্মুখে আমাদের কাপুরুষতাকে অহিংসার আবরণে আবৃত করিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়াছি। কিন্তু দুর্বলকে পীড়ন করিবার সময় অহিংসার ক্ষণভঙ্গুর আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের হিংসা-প্রবৃত্তি হিংস্র হইয়া উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। মহাত্মা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি লোক তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে এমন ভাবেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ রোধ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? গত ৬ই জানুয়ারী (১৯৪৮) করাচীতে এক হাঙ্গামায় বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ নিহত হয়। ১২ই জানুয়ারী (১৯৪৮) গুজরাট ষ্টেশনে আশ্রয়প্রার্থী ট্রেণ আক্রান্ত হয় সশস্ত্র পাঠান কর্তৃক। ইহার কয়েক দিন পরেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মাজী অনশন ব্রত গ্রহণ করায় ভারতে করাচী ও গুজরাটের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে নাই। মহাত্মাজীর এই অনশনের কোন শুভ প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানে তো হয় নাই। পাকিস্তানে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণিত আক্রমণ চলিতে থাকা সত্ত্বেও যাঁহার অমোঘ প্রভাবে ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে নাই, সেই মহাপ্রাণ হিন্দু দুষ্কৃতকারীর হস্তে নিহত হইয়াছেন, এই মর্মান্তিক বেদনা ও ক্ষোভ রাখিবার স্থান আমাদের নাই। এই গভীরতম শোকে অভিভূত হইয়া কলিকাতা হইতে লুৎফুল কাদীর নামক জনৈক মুসলমান 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮) লিখিয়াছেন 'Muslim of undivided India were suspicious of Mahatma Gandhi. Muslims of divided India stand convinced that he was their sincerest friend and truest guide.' অর্থাৎ 'অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেন। কিন্তু বিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও প্রকৃত পথপ্রদর্শক ছিলেন।' ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানগণ যদি এই সত্য উপলব্ধি সত্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পাকিস্তানে অমুসলমানদের ধন-প্রাণ নিরাপদ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মহাত্মাজীর আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করা কি তাঁহাদের উচিত নয়? মহাত্মাজীর আদর্শ তো কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য নয়, কোন জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষের জন্যও নয়। তাঁহার আদর্শ হিন্দু মুসলমান সকলের জন্যই। ভারতের ন্যায় পাকিস্তানের জন্যও—সমগ্র পৃথিবীর জন্যই।

মহাত্মাজী সমাজতন্ত্রবাদী বা কম্যুনিষ্ট ছিলেন কি না, সেই প্রশ্ন আলোচনা করিবার সময় ইহা নহে। মহামান্য আগা খাঁর সহিত নিভৃত আলোচনার সময় মহাত্মাজী না কি বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের অবসান এক দিন হইবে—(Withering away of the State) এই তত্ত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজীর সদ্য বিয়োগ-ব্যথিত চিত্তে এই সকল বিষয় লইয়া কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের এন্টিথেসিস লইয়া কোন আলোচনা করিতেও আজ আমরা অসমর্থ। কিন্তু মহাত্মাজীর স্বপ্নের ভারতের চিত্র আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their Country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people; an India in which all Communities shall live in perfect harmony.........This is the India of my dreams......I shall be satisfied with nothing else." অর্থাৎ 'এমন একটি ভারত গঠনের জন্য আমি সাধনা করিব, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও ইহাকে নিজের দেশ বলিয়া ভাবিতে পারে, যাহাকে গড়িয়া তুলিতে তাহাদের কথাই কার্য্যকরী হইবে; এমন এক ভারত—যেখানে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণী বলিয়া কিছু থাকিবে না; এমন এক ভারত—যেখানে সকল সম্প্রদায় সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বাস করিবে।......ইহা-ই আমার স্বপ্নের ভারত। ইহা ব্যতীত আর কিছুতেই আমি তৃপ্ত হইব না।' মহাত্মাজী তাঁহার স্বপ্নের ভারতকে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার স্বপ্নের ভারত আজও বহু দূরবর্ত্তী। কিন্তু তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই স্বাধীনতা যে সত্যিকার স্বাধীনতা নয়, তাহা তিনি নিজেও জানিতেন। তাঁহার জীবনাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সংশোধনমূলক যে-খসড়া প্রস্তাব রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা এখনও লাভ হয় নাই।" কিন্তু যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মহাত্মাজীর স্বপ্নের ভারতকে বাস্তব রূপ দিতে আমরা সমর্থ। প্রথমে যেটুকু স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি তাহাকে রক্ষা করিবার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত বিভাগের পরে যে দুর্দ্দশা ও ধ্বংসের স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছে—আলেয়ার পিছনে না ঘুরিয়া সেগুলিকে অপসারিত করিবার জন্য নিয়োগ করিতে হইবে আমাদের সর্ব্ব শক্তি। এইরূপে স্বাধীনতা রক্ষার সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রাকার গড়িয়া মহাত্মাজীর স্বপ্নের ভারত—শ্রেণীহীন জনগণের ভারত গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতে হইবে। এই পথেই দুষ্কৃতকারীর হস্তে মহাত্মাজীর প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার মহাপাপ আমরা ক্ষালন করিতে সমর্থ হইব, সফল হইবে মহাত্মাজীর জীবন-স্বপ্ন। আমাদের এই নির্ভীক বলিষ্ঠ সাধনার মধ্যেই মহাত্মাজী অমর হইয়া থাকিবেন।

জয়তু মহাত্মা গান্ধী।

নোয়াখালী পরিক্রমা —বসুমতী
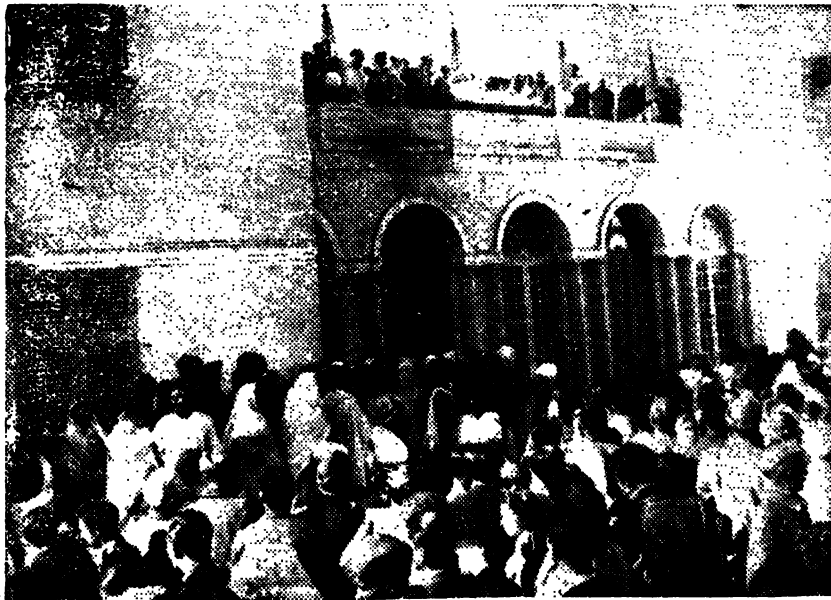
বিড়লা-ভবনে দর্শনপ্রার্থী।
ছাদে মহাত্মাজীর শবদেহ
দেখা যাইতেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভারতের জনগণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কথা ও তাঁর কার্য্যাবলীর সঙ্গে এত সুপরিচিত যে, আমাকে যদি তাঁর জীবনের ঘটনাবলী কথা আবার বলতে হয়, তবে তাঁদের অভিজ্ঞতার অবমাননাই করা হবে। তার পরিবর্তে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মাজীর স্থান কোথায়, আমি শুধু তাই আলোচনা করব। ভারতের সেবায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর অবদান এত অসামান্য ও অনুপম যে, তার জন্যে তাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সর্ব যুগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শোষণের ফলে ভারতের দারিদ্র ও ব্রিটেনের সমৃদ্ধি

ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর যে স্থান, তা বুঝতে হলে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। আপনারা সকলে জানেন, ব্রিটিশ যখন ভারতের মাটিতে পদার্পণ করল, তখন ভারত এমন একটা দেশ ছিল, যেখানে দুধ-ভাত ছিল সচ্ছল—ভারতের ঐশ্বর্য্যই সমুদ্রের ওপারের দারিদ্র্যপীড়িত ইংরাজদের প্রলুব্ধ করেছিল। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনীতিক দাসত্ব ও অর্থনীতিক শোষণের ফলে ভারতের জনগণ ক্ষুধায় ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে। আর যে ব্রিটিশ জাতি এক দিন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিল, আজ তারা ভারতের ধন-সমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠেছে। দুঃখ ও দুর্ভোগ, দীনতা ও নিপীড়নের ভিতর দিয়ে ভারতের জনগণ শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, তাদের বহু রকমের সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে তাদের হারানো স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন।

ভারত-বিজয়ে ইংরেজের অপকৌশল

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত-বিজয়ের উপায়গুলির কথা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রিটিশ ভারতের কোন অংশের সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়নি, তারা একবারে সমগ্র ভারত বিজয় এবং অধিকার করতে চেষ্টাও করেনি। পক্ষান্তরে, তারা এ দেশে সামরিক কার্যকলাপ আরম্ভ করবার আগে সর্বদাই উৎকোচ ও দুর্নীতির সাহায্যে এক শ্রেণীর লোককে করায়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। বাঙলাতেই এই ব্যাপার ঘটেছিল। এখানে প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে বাঙলার মসনদ অর্পণ করে তাকে বশীভূত করা হয়েছিল। সেই সময়ে ভারতে ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা কারও জানা ছিল না। বাঙলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলা মুসলমান ছিলেন; তাঁর প্রধান সেনাপতি মুসলমান হয়েও তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং হিন্দু সেনাপতি মোহনলালই শেষ পর্যন্ত সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, বিশ্বাসঘাতকতা রোধ করতে এবং তার শাস্তিবিধান করতে যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাহলে কোন জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার আশা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলার এই ঘটনাচক্র যথাসময়ে ভারতের জনগণের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারেনি। এমন কি, সিরাজদ্দৌলার পতনের পরেও যদি ভারতের জনগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হত, তাহলে তারা অনায়াসেই এই অবাঞ্ছিত বিদেশীদের ভারতের বুক থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হ'ত।

স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষায় ঐক্যের প্রয়োজন

এ কথা কেউ-ই বলতে পারে না যে, ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেনি। কিন্তু তারা সকলে মিলে একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেনি। যখন ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করল, তখন কেউ-ই তাদের পিছন থেকে আক্রমণ করেনি। পরে যখন ব্রিটিশ দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধরত হ'ল, তখন মধ্য-ভারতের মারহাট্টারা কিম্বা উত্তর-ভারতের শিখেরা—কেউই টিপু সুলতানের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়নি। এমন কি, বাঙলার পতনের পরেও দক্ষি ভারতের টিপু সুলতান, মধ্য ভারতের মারহাট্টাগণ ও উত্তর ভারতের শিখেরা সম্মিলিত হলে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করা সম্ভব হ'ত। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা করা হয়নি। সুতরাং এক একবার ভারতের এক এক অংশ আক্রমণ করা এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বেদনাময় অধ্যায় থেকে আমরা শিক্ষালাভ করেছি যে, যদি শত্রুর সম্মুখে ভারতবাসিগণ সম্মিলিত ভাবে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তারা কখনো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। এমন কি স্বাধীনতা অর্জন করলেও তারা তা রক্ষা করতে পারবে না।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতের জনগণের চোখ ফুটতে অনেক সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ভারতের নানা অংশে তারা একযোগে ব্রিটিশকে আক্রমণ করল। সংগ্রাম আরম্ভ হলে প্রথমে ইংরেজ অনায়াসে পরাজিত হ'ল। এই সংগ্রামকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করলেও আমরা একে "প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" বলে থাকি। কিন্তু দু'টি কারণে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরাজয় ঘটে। ভারতের সমস্ত অংশ এই সংগ্রামে যোগদান করেনি এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের সামরিক দক্ষতা শত্রুর সেনা-বাহিনীর অধিনায়কদের চেয়ে নিকৃষ্টতর ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব

তার পর জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার পর ভারতের জনগণ সাময়িক ভাবে হতবুদ্ধি ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত চেষ্টা ইংরেজ তার সমস্ত

বাহিনীর সাহায্যে নির্মম ভাবে চূর্ণ করেছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন, ব্রিটিশ পণ্য-বর্জন, সশস্ত্র বিপ্লব—এর কোনটির দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হয়নি। আশার আর একটি আলোকরশ্মিও অবশিষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অবরুদ্ধ রোষ প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ নূতন পদ্ধতি—স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন অস্ত্রের সন্ধানে ফিরছিল। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ অথবা আইন অমান্য আন্দোলনের অভিনব পদ্ধতি নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেন। মনে হ'ল, স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শনের জন্যে স্বয়ং ভগবান যেন তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে সমগ্র জাতি তাঁর পতাকা-তলে সমবেত হলো। সংগ্রামের নূতন পথ চেয়ে জাতি যেন বেঁচে গেল। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখমণ্ডল আশা ও বিশ্বাসের আলোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। আবার মনে হ'ল, ভারতের জয় সুনিশ্চিত।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মাজীর অতুলনীয় অবদান

কুড়ি বছর অথবা তার চেয়েও অধিক কাল যাবৎ মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গে ভারতীয় জনগণও ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯২০ সালে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন অস্ত্র নিয়ে যদি আবির্ভূত না হ'তেন, তা'হলে ভারতকে আজও হয়তো অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে থাকতে হতো। এ-কথার মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নাই। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবদান অপূর্ব, অতুলনীয়। কোন একক ব্যক্তি তার জীবিতকালে ঠিক এই রকম অবস্থায় এর চেয়েও বেশী কিছু করতে পারতেন না।

মহাত্মাজীর নিকট হইতে ভারতবাসীর শিক্ষা

১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় জনগণ মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে দু'টি জিনিষ শিক্ষা করেছে—যা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অপরিহার্য। সবপ্রথমে তারা জাতীয় সম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা করেছে, যার ফলে তাদের হৃদয়ে এখন বিপ্লবের অনুপ্রেরণা সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে; দ্বিতীয়তঃ, তারা দেশব্যাপী এমন একটি প্রতিষ্ঠান লাভ করেছে, যার প্রভাব ভারতের দূরতম পল্লীতেও গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাধীনতার বাণী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করায় সমগ্র জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তারা পেয়েছে। চরম মুক্তি-সংগ্রামের স্বাধীনতার জন্য শেষ যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত।

অন্যান্য দেশেও স্বাধীনতার সংগ্রামের মূলে আধ্যাত্মিক জাগৃতি

আধ্যাত্মিক জাগরণের ফলে কেবল যে ভারতেরই স্বাধীনতা-সংগ্রাম সূচিত হয়েছে, তা নয়। ইতালীর 'রিসর্জিমেন্টো' আন্দোলনে ম্যাটসিনিই প্রথম ইতালীর জনগণকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করেন। তার ফলে বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি তাঁর অনুবর্তী হ'য়ে এক হাজার সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের পুরোভাগে থেকে রোম অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। আধুনিক কালের আয়ার্ল্যাণ্ডেও সিনফিন দল ১৯০৬ সালে এই দলের উদ্ভব কালে আইরিশ জনগণকে একটি কর্মতালিকা প্রদান করেছিল। এই কর্মতালিকার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থার সাদৃশ্য থেকে ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৬ সালে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে।

ভারতের বাহির হইতে মুক্তিবাহিনী প্রেরণের কথা

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার সরল পথে দৃঢ় ভাবে আমাদের পরিচালনা করেছেন। তিনি ও অন্যান্য নেতৃগণ আজ কারান্তরালে বন্দিজীবন যাপন করেছেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তা দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে তার স্বদেশবাসিগণকে সম্পন্ন করতে হবে। দেশের ভিতরে ভারতীয়গণ আছেন, শেষ সংগ্রামের জন্য তাঁদের যা কিছু দরকার, তা তাঁদের আছে। কেবল একটি জিনিষের তাঁদের অভাব—তা হচ্ছে মুক্তি-সেনাদল। এই মুক্তি-সেনাদল ভারতের বাইরে থেকে পাঠাতে হবে এবং তা কেবল ভারতের বাইরে থেকেই পাঠান যেতে পারে।

মহাত্মাজীর অহিংস ও আমার সশস্ত্র সংগ্রামের কারণ

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় জাতির কাছে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা উত্থাপিত ক'রে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—"যদি ভারতের আজ তরবারি থাকতো, তা'হলে ভারত তরবারি কোষমুক্ত করতো।" এমনি ভাবে যুক্তি দেখিয়ে তার পর মহাত্মাজী বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা অবান্তর বলেই দেশবাসীর পক্ষে তার পরিবর্তে অপর উপায় হচ্ছে অসহযোগ অথবা সত্যাগ্রহ। তার পর থেকে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে এখন তরবারি কোষমুক্ত করা সম্ভবপর। আমরা এ জন্য আনন্দিত ও গর্বিত যে, ভারতের মুক্তি-বাহিনী সংগঠিত হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তার সৈন্যসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এক দিকে আমাদের সেনাদলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করে—তাঁদের যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নূতন সেনাদল গঠন ক'রে রণক্ষেত্রের সৈন্য-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ দীর্ঘ এবং কঠোর হবে এবং যে পর্যন্ত ভারতে ইংরেজরা বন্দী অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত না হয়, সে পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ ক'রে যেতে হবে। আমি আপনাদের এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিতে চাই যে, আমাদের মুক্তি-বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার পর ইংরেজের কবল থেকে সমগ্র ভারতকে মুক্ত করতে অন্ত পক্ষে এক বছর অথবা সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে। আসুন, আমরা সে জন্য উঠে-পড়ে লাগি এবং দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই।

—সুভাষচন্দ্র বসু

মহাত্মাজীর চিতার প্রতি স্থিরদৃষ্টি এঁদের। অমৃত কাউর, লেডী, লর্ড ও পামেলা মাউন্টব্যাটেন, মৌলানা আজাদ ও চীনা রাষ্ট্রদূত।

মহাত্মাজী যেখানে নিহত হয়েছেন

শেষশয্যা
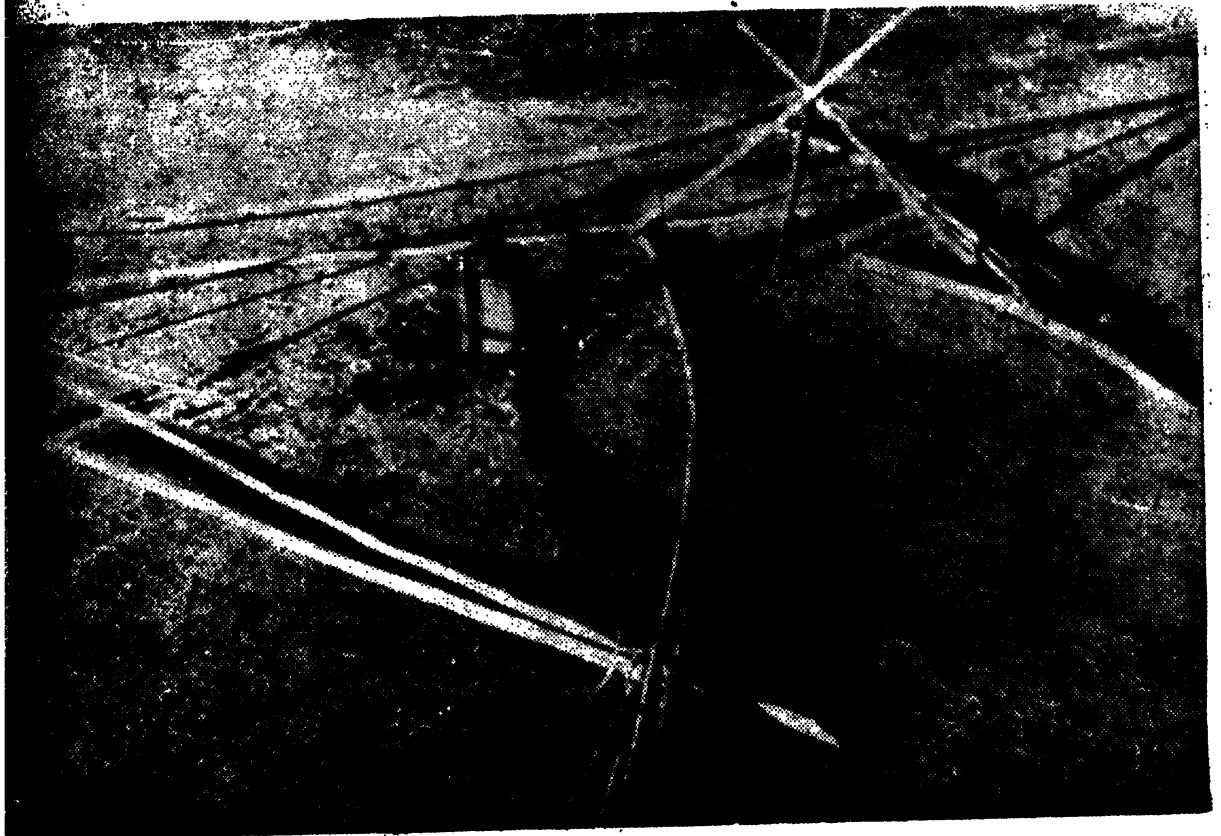
রামধুন সঙ্গীত

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম।

মঙ্গল-পরশন রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম॥

শুভ শান্তি-বিধায়ক রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম।

বরাভয়-দানরত রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম॥

নির্ভয় কর প্রভু রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম।

দীন দয়াল রাজা রাম
　　পতিত পাবন সীতারাম॥

রাজা রাম, জয় সীতারাম
　　পতিত পাবন সীতারাম॥

[illegible]

মহাত্মা গান্ধী

ক্ষুদ্রকায় দুর্বল একটি মানুষ, শীর্ণমুখ প্রশান্ত দু'টি চোখ বাহিরের দিকে প্রসারিত দু'টি কান। মাথায় সাদা রঙের একটি পাগড়ি, পরনে মোটা সাদা রঙের একখানি থান, অনাবৃত দু'টি পা। খাদ্য,—চাউল, ফল ও জল। ভূমিতে শয়ন, স্বল্পকাল মাত্র নিদ্রা, অক্লান্ত কাজ। তাঁহার দৈহিক প্রকাশ আদৌ গ্রাহ্য করিবার মতো নয়। তাঁহাকে প্রথমে দেখিলেই এক বিরাট ধৈর্য ও অসীম ভালবাসার প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়। পিয়ারসন যখন তাঁহাকে ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেন, তখন ঋষি ফ্রান্সিস্ অব আসিসের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। পরম শত্রুর প্রতিও তাঁহার অগাধ স্নেহ, অপার সৌজন্য, অসীম তাঁর দীনতা। সদা-সচেতন, চঞ্চল, আমি ভুল করিয়াছি এ কথা স্বীকার করিতে যেন তিনি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি কদাপি তাঁহার ভুল গোপন করেন না। কখনো আপোষের মধ্যে আসে না, কখনো কূটনীতির আশ্রয় লন না, কখনো বক্তৃতায় মাৎ করিতে চাহেন না বরঞ্চ বক্তৃতার কথা তিনি ভাবেনও না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে স্তুতি ও সম্বর্ধনার জন্য জনসাধারণকে স্বতঃই ব্যাকুল ও ব্যগ্র করে তাহাও তিনি পছন্দ করেন না। অনেক সময় এই সম্বর্ধনার ভীড়ে তাঁহার ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহখানি নিষ্পেষিত দলিত হইবার সম্ভাবনাও ঘটে। তখন তাঁহার বন্ধু মওলানা সৌকত আলি নিজের বিপুল সবল দেহের আশ্রয়পুটে তাঁহাকে সকল বিপদের হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করেন। এই মহাপুরুষ মহাত্মা জনসাধারণের স্তুতিতে'বশে একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়েন। অন্তরে অন্তরে জন-শব্দে তাঁহার অবিরল অবিশ্বাস, গণশাসন বা বিশৃঙ্খল জনতার প্রতি তাঁহার পরম ঘৃণা। মাত্র কতিপয়ের সান্নিধ্যেই তিনি স্বস্তি এবং সহজ ভাব অনুভব করেন। নির্জন নৈঃশব্দে থাকিতে তিনি ভালবাসেন, কারণ তখন তিনি বিধাতার নীরব নির্মল বাণী শুনিতে পান।

ইনি সেই মানুষ, যিনি ত্রিশ কোটি মানুষকে কর্মপ্রেরণায় জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কম্পমান করিয়া দিয়াছেন, যিনি মানবের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছেন প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ এক নীতির আন্দোলন আদর্শ।

ইঁহার পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যে ১৮৬৯-এর ২রা অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতা করমচাঁদ গান্ধী এবং রাজ্যের প্রধান সচিব ছিলেন। ইনি ধনী, বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর পিতামাতা উভয়েই হিন্দুধর্মের জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এই জৈনদের ধর্মের মূল সূত্র অহিংসাকে ইনি পরবর্তী-কালে সগৌরবে সারা বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। জৈনদের মতে বোধির অপেক্ষা প্রেমই মানুষকে পরম পুরুষের সান্নিধ্য-গোচর করে। গান্ধীজীর পরিবারে নিয়মিত ভাবে রামায়ণ পাঠ হইত। গান্ধীজীর বাল্য-শিক্ষা নিয়োজিত ছিল এক ব্রাহ্মণের হস্তে। এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিষ্ণুশর্মার রচনা পড়াইতেন। পরবর্তী কালে গান্ধীজী অনুযোগ করেন, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই।

ইংরেজি ভাষা তাঁহাকে মাতৃভাষায় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া তিনি ইংরেজি ভাষা বিরোধিতার স্বপক্ষে যুক্তিও দেখান। যাহাই হউক, হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রচুর অধিকার জন্মে, তবে তিনি বেদ ও উপনিষদগুলির কেবল মাত্র অনুবাদই পাঠ করেন।

বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হয়। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'ইনস্ অব কোর্টে' তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে যান।

তাঁহার মা অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বিলাত যাইবার পূর্বে পুত্রকে জৈনধর্ম অনুসারে তিনটি শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন—মদ্য, মাংস ও নারীর বর্জন। আমরা তাঁহার আলোচনার একটিতে (১৩ই এপ্রিল, ১৯২১) লক্ষ্য করি যে, তিনি ইউরোপে অবস্থান কালে অন্যান্য বহু ধর্ম সম্বন্ধেও পড়াশুনা করেন এবং এই পড়াশুনার ফলে এক সময় তিনি খৃষ্টান ধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে দুলিতে থাকেন। অবশ্য পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে কেবল মাত্র হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব। তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বোম্বাইএর হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হন। কিন্তু কয়েক বৎসর বাদে তিনি এই পেশাকে দুর্নীতি-পরায়ণ ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন। এমন কি, যে কয়েক দিন তিনি এ্যাড-ভোকেটের কাজ করেন তখনও তিনি কোন মামলার মধ্যে অন্যায় আভাস পাইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতেন।

এই সময়ে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের ক্রিয়াকলাপে তিনি নিজের মধ্যে তাঁহার ভাবী জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট সঙ্কেত পান। এই নেতাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহারা হইলেন পার্শি বোম্বাইয়ের মুকুটহীন রাজা দাদাভাই এবং অধ্যাপক গোখলে। ইঁহারা উভয়েই এক ধর্মে দীক্ষিত দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। গোখলে তাঁহার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক; ভারতীয় শিক্ষার সমস্যাকে যাঁহারা জিয়াইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদের অন্যতম এবং দাদাভাই, গান্ধীজীর নিজের প্রমাণ প্রয়োগ অনুসারে যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, তিনি গান্ধীজীর তারুণ্য-চঞ্চল উত্তেজনাকে বল্‌গারুদ্ধ করিয়া গান্ধীজীকে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে অহিংসাকে কার্যত ব্যবহারের প্রথম পাঠ দেন। তিনিই শেখান নিষ্ক্রিয় শৌর্য, আত্মার প্রাণোন্মাদনা, যাহা অমঙ্গলের প্রতিরোধ করে—অমঙ্গলের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা। এই প্রবন্ধের অন্যত্র আমরা এই যাদুকরের মন্ত্র "প্রেম"এর মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিব, কে

প্রেম শব্দটি ভারতের প্রশান্ত-গম্ভীর বাণী বহন করিয়া আজ বিশ্বের তোরণে উপস্থিত হইয়াছে।

১৮৯০-৯১-এর মধ্যে দেড় লক্ষ ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায়, বিশেষ করিয়া নাটালে বসবাস করিয়াছিলেন। এই বিদেশী জনস্রোতের আগমনের ফলে এখানে সাদা অধিবাসীদের মধ্যে কালাদের প্রতি ঘৃণার মনোভাবের উদ্রেক হয় এবং এই ঘৃণাকে সরকার নির্বাসন ও নির্যাতনের কাজে লাগান এবং ভারতবাসীদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। যাঁহারা ইতিপূর্বে এখানে বসবাস করিয়াছিলেন, সরকার তাঁহাদের বহিষ্কারের সঙ্কল্প করেন। এইরূপে নিয়মিত নির্যাতনের ফলে তাঁহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। দুর্বহ ট্যাক্স, পুলিশের অসম্মানজনক আইন-কানুন, প্রকাশ্যে দলে দলে উৎপীড়ন, লিনচিং, লুঠপাট, বলাৎকার প্রভৃতি ব্যাপার চলিতে থাকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা গান্ধীজীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। ফলে গান্ধীজী সেখানে ছুটিয়া আসেন। তার পর রাষ্ট্রের ও হিংস্র জনসাধারণের বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয় বিবেকের যুগান্তকারী এক সংগ্রাম। তখনো উকিল থাকায় আইনের পথেই তিনি এশিয়াটিক বিতাড়নের বিলের আইন-বিরুদ্ধতার দিকটি দেখাইলেন এবং ভয়াবহ বিরোধিতা সত্ত্বেও জিতিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী স্বদেশবাসীদের জন্য নাগরিকের সম্মানজনক অধিকার লাভ এবং সেই অধিকার উদ্দেশ্যে সাধারণ দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়ের জীবন বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ঋষি ফ্রান্সিস অব আসিসির মতো দারিদ্র্যকে বরণ করিবার জন্যই পরিত্যাগ করিলেন জোহান্সবার্গে তাহার প্রসারের প্র্যাকটিশ। তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত ভারতীয়দের সকল দুঃখে-দারিদ্র্যে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন নির্বিরোধিতার মন্ত্র। তিনি টলষ্টয়ের প্রধান ভক্ত ছিলেন। তাই টলষ্টয়ের অনুকরণে তিনি ডারবানে একটি কৃষি কলোনীর পত্তন করিলেন। তিনি সমস্ত ভারতীয়কে সেখানে একত্রিত করিলেন এবং প্রত্যেককে জমি ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যের শপথ গ্রহণ করাইলেন। ভৃত্যের কাজগুলির অধিকাংশই তিনি নিজের হাতে করিতে লাগিলেন। সেখানে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই মানুষগুলি নিঃশব্দে গবর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ করিয়া গেল। তাহারা শহর হইতে চলিয়া আসায়, শহরের কলকারখানার জীবন হইয়া পড়িল পংগু অচল। এ যেন সত্যই দেবতার নামে কোনো হরতাল, যাহার বিরুদ্ধে হিংস্র-শক্তি অশক্ত। প্রথম যুগের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রোমের যেমনটি হইয়াছিল। কিন্তু উৎপীড়কেরা নিজেরা বিপদে পড়িলে গান্ধীজী তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য যে ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, সে ভাবে প্রেম ও ক্ষমার আদর্শ বহন করিতে—এই খৃষ্টানদিগের মধ্যেও কয় জন পারিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রতিবারে, যখনই দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই গান্ধীজী তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিয়াছেন এবং স্বেচ্ছায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় রেডক্রশ বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী আগুনের সম্মুখেও দুঃসাহসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য দুই বার সুখ্যাতির সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯০৪ সালে যখন জোহান্সবার্গে বিরাট প্লেগের তাণ্ডব শুরু হয়, তখনও গান্ধীজী একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে যখন নাটালে আফ্রিকার মূল অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও তিনি এম্বুলেন্স বাহিনীর পুরোভাগে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং নাটালের গবর্ণর সে জন্য তাঁহাকে প্রকাশ্য জনসভায় ধন্যবাদ দেন।

তথাপি এই শৌর্য, সাহস এবং সেবা কালা আদমীদের প্রতি ঘৃণার বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে পারিল না। গান্ধীজী কয়েক বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং (ইহাও আবার নাটালের গবর্ণর কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অব্যবহিত পরেই) তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে পিঞ্জরায় পুরিয়া রাখা হইল। উন্মত্ত জনতা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, অপমান করিল। একবার মৃত বলিয়া গান্ধীজী পরিত্যক্ত হইলেন। তিনি শহীদের সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিলেন কিন্তু তথাপি কোনো মতেই তাঁহার বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিল না। প্রতিবারের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের পর তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হিংসাপন্থীদের উত্তরে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বিখ্যাত পুস্তক, বীর্যবান প্রেমের বাণী হিন্দ স্বরাজ রচনা করিলেন। বিশ বৎসর পর্যন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম চলিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে গান্ধীজী পুনরায় নাটাল হইতে ট্রান্সভালে নির্বিরোধিতার আন্দোলন সুরু করিলেন। পুনরায় তিনি হাজার হাজার ভারতীয়ের সঙ্গে কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারে এই অসংখ্য ভারতীয়ের জন্য স্থান সঙ্কুলান হইল না। তাই তাঁহাদিগকে খনিতে আটক করিয়া রাখা হইল। কিন্তু এইবারে ভারতের মর্মস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বড়লাটও নিজে জনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কার্যের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন। অদম্য স্থৈর্য ও মহা-আত্মার যাদু কাজ করিল, প্রশান্ত শক্তির সম্মুখে নত হইল হিংস্র বল। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বাপেক্ষা বনেদি শত্রু জেনারেল স্মাট্‌স, যিনি ১৯০৯ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আইনী কিতাব হইতে তিনি এই ভারতীয়-বিরোধী আইনকে কোন মতেই সরাইবেন না, তিনিও পাঁচ বৎসর বাদে এই আইনের অপসারণে প্রীত হইলেন। ভারতীয়দিগের দাবীর সমর্থন করিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং এক সাম্রাজ্য কমিশন প্রায় সকল বিষয়েই গান্ধীজীর সহিত একমত হইয়া গেলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের একটি বিলে যে সকল ভারতীয় স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে চাহিবেন তাহাদিগকে থাকিবার অধিকার দেওয়া হইল। এইরূপে বিশ বৎসরের ত্যাগের ফলে নির্বিরোধের নীতি জয়লাভ করিল।

—রোমাঁ রোলাঁ

মহামানবের প্রতি মনীষীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ট্রান্সভালে আপনার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সংবাদ দুনিয়ার এই প্রান্তে আমাদের কাছেও এসে পৌছেছে এবং বর্ত্তমান জগতে যে সব মহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান চলছে, তার মধ্যে একে সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী বলেই আমি মনে করি। কেবল মাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিগুলিই নয়, সমগ্র জগতের পক্ষে সে কাজ অপরিহার্য্য বলেই গৃহীত হবে।

—কাউণ্ট লিও টলষ্টয়

আমাদের ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মত গান্ধী আইন-কানুন এবং অর্ডিন্যান্স সৃষ্টি করবার জন্য আসেননি—তিনি এসেছেন নূতন মানুষ সমাজকে গড়বার জন্য।···ইনি হলেন সেই মানুষটি যিনি ত্রিশ কোটি নর-নারীকে বিপ্লবের পথের পথিক করেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ধর্ম্মের এমন একটা প্রেরণা এনেছেন মানুষের রাজনীতির ক্ষেত্রে, দু' হাজার বৎসরের মধ্যেও যার তুলনা আমরা দেখিনি ···একটা কথা ধ্রুব সত্য—হয় গান্ধীর আদর্শ জয়লাভ করবে, নয় তাঁর আত্মা খৃষ্ট এবং বুদ্ধ অবতারের মত নূতন নূতন অবতারের মধ্যে রূপ নেবে। অবশেষে এমন একটা অবতারের মধ্যে তাঁর আদর্শের চরম প্রকাশ আমরা দেখতে পাব, যিনি অর্দ্ধেক মানুষ এবং অর্দ্ধেক দেবতা; যাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে সেই জীবনের আদর্শ, যা নূতন মানবকে নিয়ে যাবে নূতন পথে।

—রোমাঁ রোলাঁ

বাহিরের কোন শক্তির সমর্থন তাঁহার পিছনে না থাকিলেও তিনি তাঁহার দেশের জনগণের নেতা; তিনি এক জন রাজনৈতিক; কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক সাফল্য কোনরূপ কলা-কৌশলের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, পরন্তু তাহা তাঁহার আস্থা-উৎপাদনকারী ব্যক্তিত্বের শক্তির উপর নির্ভর করে। তিনি এক জন বিজয়ী যোদ্ধা, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বলপ্রয়োগের নিন্দা করেন; তিনি জ্ঞানী ও বিনয়ী, কিন্তু তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পপরায়ণ ও সুসমঞ্জস। তিনি সারা জীবন তাঁহার দেশের জনগণের কল্যাণ ও তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন; তিনি এমন এক জন মানুষ যিনি সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব লইয়া ইউরোপের পশুশক্তির সম্মুখীন হইয়াছেন এবং বরাবর মহত্তর হইয়া উঠিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা হয়ত বিশ্বাস করিতে চাহিবে না যে, তাঁহার মত ব্যক্তি কখনও রক্তমাংসের দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।

—অধ্যাপক এ আইনষ্টাইন

যদি রক্তপাতের সাহায্যে কোন আন্দোলন সার্থক হয়ে ওঠে এবং চরিত্রহীন নরনারীকে নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়, তা'হলে সেই বিজয়-গৌরবকে কি ভগবান বিজয় বলে গ্রহণ করবেন? আমাদের ত' মনে হয়, ভগবান তা করবেন না। আমরা কামনা করি, আয়ারল্যাণ্ডেও এক জন গান্ধী জন্মগ্রহণ করুন এবং নরনারী তাঁকে ঋষি বলে তাঁর উপদেশ নতমস্তকে পালন করুক।

—আয়ারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ইয়েটস্‌

ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা দিয়ে আমি বলছি, যীশুখৃষ্টের সঙ্গে গান্ধী একাসনে বসবার যোগ্য ব্যক্তি। এই পবিত্র ও সাধু-জীবন যাপনকারী ভারতীয় মহাপুরুষ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিচ্ছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নীতির মধ্য দিয়ে তা আচরণ করবার পথ প্রদর্শন করছেন। তিনি সমাজকে এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নতুন রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। যদি আমি প্রভু যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় বার জন্ম-পরিগ্রহের বিষয় বিশ্বাস করতাম, তা'হলে বলতাম, প্রভু যীশুই মহাত্মা গান্ধীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

—রেভাঃ হোমস্‌

মাহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন—ভারতে যে সব বড়লোক জন্মগ্রহণ করছেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

—লয়েড জর্জ্জ

যদিও এ কথা বলতে আমার কুণ্ঠার সীমা নেই, তবু সরল ভাবে স্বীকার করছি যে, মিঃ গান্ধীর চাইতে ন্যায় ও করুণার এত বড় প্রতিমূর্ত্তি, ক্ষমাশীল, দুঃখভোগী আমাদের ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্ত্তার এত বড় খাঁটি প্রতিনিধি আমি আর কাউকে জানি নে।

—দি রাইট রেভারেণ্ড হোয়াইটহেড

গান্ধীজীর জীবনে যখন পরাজয়ের মুহূর্ত্ত আসে, তখনই তিনি হন সব চেয়ে ভয়ঙ্কর।···পরাজয় তাঁকে নিয়ে যায় জনতা থেকে দূরে। সেখান থেকে তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় আবির্ভূত হন, তখন কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় নূতন জলন্ত বাণী।

—জর্জ্জ স্লোকম

শান্তির পথকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্ররূপে পরিণত করবার যে গৌরব—সে গৌরব গান্ধীর প্রাপ্য। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে, সাধু হলেই মানুষ হয় বোকা, আর চালাক চতুর হতে গেলে তাকে অসাধু হতেই হবে। গান্ধী সাধু এবং বুদ্ধিমান দুই-ই।

—শেরউড এডি

পরম ধর্ম্ম হল সেই, যার লক্ষ্য প্রেম, ক্ষমা, উদারতা এবং শান্তি। সেই ধর্ম্ম হ'ল অন্তরের ধর্ম্ম। এই পরম ধর্ম্মের মর্ম্মকে যাঁরা উদ্ঘাটিত করেছেন এবং তার আদর্শকে যাঁরা সত্য করে তুলেছেন নিজেদের জীবনে—তাঁদের মধ্যে তিন জনকে ভাবী কাল সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করবে। এই তিন জনের নাম—গৌতম, যীশুখৃষ্ট এবং গান্ধী।···মহাত্মা গান্ধীর মত স্বার্থলেশশূন্য মানব-হিতে উৎসর্গিত-প্রাণ, মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুর্লভ। জগতের অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় এই পবিত্রতার অবতার মহাপুরুষও সব সময় নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেন এবং নিজের অক্ষমতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের মুক্তিতেই তাঁর নিজের মুক্তিসাধনের একমাত্র আশা। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী অসীমের সুরে বাঁধা, তাই মানুষ তাঁর কি করতে পারে না পারে, তিনি তা গ্রাহ্য করেন না। তাঁর একমাত্র ভয়, ভারত ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শকে পরিত্যাগ করে পাছে পশুবলের আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি তাই হয়, তাহ'লে তিনি হিমালয়ের গভীর অরণ্যে নিজেকে নির্ব্বাসিত করে জীবনের অবশিষ্ট কাল দেশের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনায় ও উপবাসে কাটিয়ে দেবেন। ঈদৃশ মহাপ্রাণ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিমানের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা বিফল।

—ডাঃ ওয়ালার ওয়ালস্‌

আমি তাঁকে দিনের পর দিন দেখেছি। তাঁকে দেখেছি ভোরের আগে ঠাণ্ডায়, অন্ধকারে; তাঁকে দেখেছি মধ্য-রাত্রে যখন তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন; তাঁকে দেখেছি মধ্যাহ্নে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছেন। তাঁকে দেখেছি এক জন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর বসবার ঘরে আগুনের পাশে; তাঁকে দেখেছি সেণ্ট জেমস্ প্যালেসে রাজা, মহারাজা এবং মন্ত্রিগণের মধ্যে বসে থাকতে। দেখেছি, সব সময় তাঁর সেই একই মূর্ত্তি—শান্ত, প্রফুল্ল, কৌতুকপ্রিয়, গুণগ্রাহী, স্বার্থশূন্য, ভগবান এবং মানুষের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

—মুরিয়েল লিষ্টার

ইউরোপ থেকে আমদানী আধুনিক সার্ব্বভৌম যে সব রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনীতিকে বরেছেন জীবনের পেশা, তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন। জাতির মর্ম্মকে বুঝবার ক্ষমতা নেই তাঁদের। ভারতবর্ষ চায় এমন এক নেতাকে যিনি একাধারে হবেন তার রাষ্ট্রগুরু এবং ধর্ম্মগুরু। গান্ধীর মধ্যে এই দু'য়ের মিলন ঘটেছে।

—ফুলপ মিলার

মহান্ আত্মা, মহাত্মা গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া এক জন বলিয়াছেন, তিনি একটি নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন—বিপুল বৃটিশ রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন শান্তিসেনা দ্বারা। গোলা-গুলী, বন্দুক-কামানের জোরে ইংরেজ যেমন নিজেকে নিরাপদ মনে করে, এই বিশাল ভারতভূমির সর্ব্বত্র তাঁহারা নিরস্ত্র ভাবে তদনুরূপ বা ততোধিক নিরাপদ বলিয়া অনুভব করিবে। ইহাই মহাত্মাজীর নূতন ভাবধারাটির স্বরূপ। ত্রিংশত কোটির অধিক নরনারীকে তিনি এই মহান্ ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। ভূমণ্ডলের একটি মহাজাতি আত্মার বলে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত হইবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে।

—ব্লাক ওয়াটসন

আমি কি করিয়া তাঁহার কথা প্রচার করিব? তাঁহার ভাস্বর আত্মার তুলনায় আমি কিছুই নই। আর যিনি স্বভাবতই মহৎ তাঁহাকে আর চেষ্টা করিয়া মহৎ করিতে হয় না। তাঁহারা নিজের প্রভায় নিজেই জাজ্বল্যমান থাকেন এবং যখন সমগ্র জগৎ প্রস্তুত হয়, তখন তাঁহারা লোকসমাজে প্রত্যক্ষ হন। যখন সময় আসিবে তখন গান্ধীরও প্রচার হইবে, কারণ আজ তাঁহার প্রচারিত প্রেম, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী সমগ্র জগতের বিশেষ দরকার।

সমগ্র প্রাচ্যের আত্মা আজ গান্ধীতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তিনিই আজ দেখাইতেছেন যে, মানবের আদিম উপদেশ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্য দিয়াই মানবের আত্মার পরিস্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-সজ্জার মধ্যে মানবের দেহ ও মান উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমরা গান্ধীজীর নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ মানুষের স্বর্গীয় সত্তার ভারতের বিশ্বাস যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই ভারতকে দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী যে নৈতিক শক্তির প্রতিভূ এবং এই পৃথিবীতে একমাত্র প্রতিভূ, সেই শক্তিতে আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে।

এমন দিন আসিবে, যেদিন দুর্ব্বল, সৎ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ প্রমাণ করিবে যে, অবনতরাই পৃথিবীর ভাবী অধিকারী। ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, মহাত্মা গান্ধী যিনি শরীরে দুর্ব্বল, বস্তু-সম্পদে অসহায়, তিনিই প্রমাণ করিলেন যে, ভারতের নিরস্ত্র নির্য্যাতিত মানুষের অন্তরে অবনত বিনতের অজেয় শক্তিই গোপন রহিয়াছে।

—রবীন্দ্রনাথ

যে সমস্ত মহাপুরুষ নূতন যুগের বার্ত্তা ঘোষণা করেন, ভগবদ্দত্ত শক্তিবলেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিতর দিয়া আমরা চিরন্তন মাহাত্ম্যের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এই মাহাত্ম্যের আলো-রেখা যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সামাজিক আবর্জ্জনাকে এবং অন্যায়কে স্পর্শ করে ও আমাদিগকে আত্মানুভূতির সুযোগ দেয়। মহাত্মাজী এমনিতর একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন,—অহিংস ব্রত উদ্‌যাপন কর, আত্মাকে অনুভব কর ও আত্মস্থ হও—ইহাই তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র। বিভিন্ন যুগে এই প্রকারই বিভিন্ন শিক্ষা ভারতবাসীকে কর্ম্মের পথে নিয়োজিত করিয়াছে: প্রকৃত পক্ষে এই মূল সত্যের উপরই ভারতীয় সভ্যতা স্থাপিত এবং এই জন্যই জাতি ও ধর্ম্মানুসারে বহুধাবিভক্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করা মহাত্মার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। পাশ্চাত্যের রীতিনীতিই যে এক মাত্র রীতিনীতি নহে এবং প্রাচ্যের যে অন্ধের ন্যায় পাশ্চাত্যের সভ্যতার অনুসরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, মনীষী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহা বলিয়াছেন; কিন্তু মহাত্মার ভিতর দিয়াই ভারত এই সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছে।

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, তাহা এমনই অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় যে, চিরকালের জন্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতবর্ষের যখন কোনই আশা ছিল না, ভারতবাসীরা যখন জাতীয় সংগ্রামে নূতন পদ্ধতি ও নূতন অস্ত্রের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতেছিলেন, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে গান্ধীজী তাঁহার অভিনব অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইল। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া গেল। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখ আশায় ও বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হইল। চরম জয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি যদি ১৯২০ সালে সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র হাতে আগাইয়া না আসিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোহ আজও ভাঙ্গিত না। কোনও এক জন ব্যক্তি এরূপ অবস্থার বিপাকে এক জীবনে এতখানি সাফল্য অর্জ্জন করেন নাই। ঐতিহাসিক তুলনা হিসাবে তাঁহার কাছাকাছি মুস্তাফা কামালের নাম করা যাইতে পারে। ১৯২০ সাল হইতে ভারতবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট দুইটি শিক্ষা পাইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে যে দু'টি অপরিহার্য্য। প্রথমতঃ, তাহারা জাতীয় আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের হৃদয় বিপ্লবাত্মক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র দেশব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে, ভারতবর্ষের দুর্গমতম গ্রামেও যাহার প্রভাব পৌঁছিয়াছে। স্বাধীনতার সোজা সড়কে গান্ধীজী আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।"

—নেতাজী—সুভাষচন্দ্র বসু

মর্ম্মাহত মানবসমাজ

নিরাপত্তা পরিষদে—

মহোত্তম আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি প্রকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাত্মা গান্ধী জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার জীবনের আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিবে। যাঁহারা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে চাহেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার অহিংসা আদর্শকে প্রচার করিবার কাজে সাহায্য করা। এই আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে।

—সভাপতি ল্যাঙ্গেনহোভ

সারা জগতের দুরদৃষ্ট এই যে, এমন এক জন মহাপুরুষের মৃত্যু এইরূপে সম্ভব হইল; কিন্তু তাঁহার মতবাদ তাঁহার মৃত্যুর পরেও সম্মানিত হইবে। এমন কি জীবিতাবস্থায় যতখানি হইত, তদপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত হইবে। যদি ভারতের জনগণ শান্তির পথে চলিতে থাকে, তবেই তাঁহার মৃত্যু নিরর্থক হইবে না। তাঁহার স্মৃতি পুণ্যময় হইবে।

—সিরিয়ার প্রতিনিধি

মহাত্মার মৃত্যুতে এশিয়া এক মহান্ নেতাকে হারাইল। তাঁহার আদর্শ মাত্র এক বৎসর হইল সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সত্যই বেদনাদায়ক।

—চীনের প্রতিনিধি

এই সংবাদে ফরাসী প্রতিনিধি দল অতীব মর্ম্মাহত।

—ফরাসী প্রতিনিধি

গান্ধীজী এমন এক ব্যক্তি যে, তাঁহার মহত্ব কেবল তাঁহার জীবদ্দশায়ই অনুভূত হয় নাই, ইতিহাসেও ইহা উল্লিখিত থাকিবে। ভারতের ন্যায় উপমহাদেশে ও বর্ত্তমান পৃথিবীতে তাঁহার প্রদর্শিত প্রেমের ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রয়োজন।

—বৃটিশ প্রতিনিধি

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি আতঙ্কিত হইয়াছি। ভারত ও মানব জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন যখন ভারতের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মুহূর্ত্তে এইরূপ আততায়ীর হস্তে বিনষ্ট হওয়া অত্যন্ত বিপত্তিজ্ঞাপক।

—পাকিস্থান প্রতিনিধি

সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে আমি ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রতি গভীর মনোবেদনা জানাইতেছি। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজী ভারতের ইতিহাসে গভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যে সংগ্রাম চালাইয়াছে, উহার সহিত গান্ধীজীর নাম চিরদিন জড়িত থাকিবে।

—সোভিয়েট প্রতিনিধি

সঙ্কট ও বিরোধের কালেই সহনশীলতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার আত্মত্যাগ পৃথিবীর মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করিবে ইহাই আমরা একান্ত ভাবে আশা করিতেছি।

—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি

গান্ধীজী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। ফ্রান্সে এমন একজন লোক নাই যিনি গান্ধীজীর নাম জানেন না বা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করেন না।

—ফরাসী প্রতিনিধি

গান্ধীজীর মৃত্যু কেবল মাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপর্য্যয় স্বরূপ নহে। তাঁহার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানুষের চিত্তে ঐক্যবুদ্ধি বৃদ্ধি করিবে বলিয়াই আশা করি।

—কানাডার প্রতিনিধি

গান্ধীজী ছিলেন বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব, ন্যায়বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শান্তিবাদী শক্তিগুলি জয়ী হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

—আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি

গভীর সন্তাপের সহিত প্রত্যেকে মহাত্মা গান্ধীর পাশবিক হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি জানি, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকের নিধন সম্পর্কে আমাদের গভীর সহানুভূতি প্রকাশের কালে আমি বৃটিশ জাতির মনোভাবই প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র যুগের মানব বলিয়া মনে হইত। চরম সাধু-জীবন যাপন করিয়া তিনি তাঁহার কোটি কোটি স্বদেশবাসীদের দ্বারা ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত মহাপুরুষরূপে সম্পূজিত হইতেন। তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীদের গণ্ডীর বাহিরেও তাঁহার প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক গোলযোগপূর্ণ দেশে তিনি সকল ভারতবাসীর নিকট তাঁহার আবেদন জ্ঞাপন করিতেন। ২৫ বৎসর যাবৎ এই একটি লোকের দ্বারা ভারতীয় সমস্যার প্রত্যেক বিষয় প্রধানতঃ বিবেচিত হইতেছিল।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীদের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক এক জন জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্য যন্ত্রযুগের বিরোধী ছিলেন এবং সমাজের সহজ ও সরল অবস্থা কামনা করিতেন।

কিন্তু অহিংসাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নীতি ছিল। তিনি যে শক্তি অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বনের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। হিংসা দ্বারা যাঁহারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিতেন, তিনি তাঁহাদের বিরোধিতা করিতেন।

যে সরলতা ও নিষ্ঠাসহ তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিতেন, তাহা সকল সন্দেহের অতীত ছিল।

তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক মাস তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে আমৃত্যু অনশনের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি সামাজিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন।

অবিচারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল। তিনি দরিদ্রদের বিশেষ ভাবে অনুন্নত শ্রেণীসমূহের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিতেন।

হত্যাকারী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়াছে। শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার আত্মা তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে পূর্ব্ববৎ অনুপ্রাণিত এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচার করিতে থাকিবে।

—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী

এই দারুণ দুর্ঘটনায় ভারত ও সমগ্র পৃথিবীর যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। আমরা সকলেই অত্যন্ত প্রশংসার সহিত মিঃ গান্ধীর সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলাম। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আমাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। তিনি যে শান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ভারত তাহা প্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

—বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন

আমাদের যুগে সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক সময় উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বে যাহা প্রচার করিয়াছেন, যদি আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতাম, তাহা হইলে তিনি নিহত হইতেন না। সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছে। তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কতক পরিমাণে কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে আমাদের অবশিষ্ট জীবনে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর দানের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রচারিত আদর্শ ও নীতি অনুসারে চলিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—ভারতের হাই কমিশনার মিঃ মেনন

এই মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য ঘটনা বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে আর কিছু ঘটে নাই। যদি মানব সভ্যতার অভিব্যক্তির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সকল মানব মহাত্মা গান্ধীর এই বিশ্বাস গ্রহণে অসমর্থ হইতে পারেন না যে, বিতণ্ডামূলক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শক্তির ব্যাপক প্রয়োগ কেবল মাত্র অন্যায়ই নহে, পরন্তু উহার মধ্যে আত্মধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সময়ের অনেক অগ্রে চলিতেছিলেন।

—জেনারাল ডগলাস ম্যাক আর্থার

আমার বিশ্বাস এই যে, যখন আমরা এই যুগের ইতিহাস যথার্থ ভাবে পর্য্যালোচনা করিব, তখন দেখা যাইবে যে, মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, যিনি ইংরেজ জাতিকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে এবং কুনীতি ত্যাগ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

—কোয়েকার্স দলের মিঃ আলেকজাণ্ডার

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর জন্য কেবল মাত্র ভারতবাসীরাই বিলাপ করিবেন না, যাঁহারা ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সাফল্যে বিশ্বাসবান তাঁহারাও বিলাপ করিবেন।

—ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মুর্জ্জ বিদল্ত

গান্ধীজীর শোচনীয় মৃত্যুতে ভারতের জনসাধারণকে আমার ও আমার সহকর্ম্মীদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বিশ্বের সকলেই সমভাবে নিন্দা করিবে। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে তাঁহার অপসারণে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তাঁহার মহৎ প্রচেষ্টা শান্তি ও শুভেচ্ছাকামিগণ আন্তরিকতার সহিত স্মরণ রাখিবে। আমরা একান্ত ভাবে আশা করি যে, তাঁহার এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খান

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বাধিক শোচনীয় দুর্ঘটনা এবং তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর মানবের তিরোধান হইল। তিনি বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সত্য, জ্ঞান ও শান্তির জলন্ত প্রতীক ছিলেন। সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে তিনি একটি বাণী দিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহাকে মনাবোচিত মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে, তথাপি সমগ্র মানব জাতি তাঁহার মহান্ শিক্ষা হইতে মুক্তির অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে থাকিবে। শান্তির প্রতীক যীশুখৃষ্টের মত মহাত্মা গান্ধীও জলন্ত ক্রুশে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন।

—ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলী

ভারতের প্রিয় শিক্ষক এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গান্ধীজী আততায়ীর হস্তে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছেন জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমি জানি, সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে তাঁহার একটি মাত্র কামনা ছিল যেন তাঁহার মৃত্যুতে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা এই উপলক্ষে আরও রক্তপাত না হয়। বরং এশিয়ার উপমহাদেশের সমস্ত অধিবাসীদের পুনর্ম্মিলন হউক।

—লর্ড পেথিক লরেন্স

আততায়ীর হস্তে গান্ধীজীর মৃত্যুতে আমি যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাহা অবিশ্বাস্য, যাহা বুদ্ধির অগম্য তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের যুগের দেবোপম ব্যক্তিও উন্মত্ত ব্যক্তির রোষভাজন হইয়া থাকেন, ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সক্রেটিসের সময় হইতে আমাদের কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। সক্রেটিসকে বিষপান করিতে হইয়াছিল এবং যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হন।

বিলীয়মান অতীতের একমাত্র প্রতীক মহাত্মা গান্ধী আর নাই। আমরা তাঁহার দেহটাকে হত্যা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার মধ্যে সত্য ও প্রেমের যে স্বর্গীয় আলোক ছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করা যাইবে না।

—সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

গান্ধীজীর মৃত্যুতে সারা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। এই শোচনীয় পরিণাম ভারতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক লালসাকে শান্ত করুক। গান্ধীজী ইহার জন্যই জীবন দান করিয়াছেন।

—জেনারেল স্মাটস্

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট ও জনগণ মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাত হইয়া গভীর দুঃখ বোধ করিতেছেন। মানবতার কল্যাণ

ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি সারা জীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন, এই জন্ম অষ্ট্রেলিয়ায় তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। ভারত সরকার ও ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে আমরা গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জোসেফ চীফলী

বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকে যে পাশবিকতাপূর্ণ আবহাওয়া দেখা যাইতেছে, মিঃ গান্ধীর হত্যায় তাহাতে শেষ ইন্ধন যোগাইয়াছে। ইউরোপে জাতীয়তার জন্ম! এই মতবাদ এখন অপরাধ ও রক্তপাতের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় সরিয়া যাইতেছে।

—ইতালীয় পররাষ্ট্র-সচিব

শান্তিবাদী ভারতীয় নেতা যখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্ম চেষ্টা করিতেছিলেন তখনই তাঁহার মৃত্যু হইল। মিশর সমগ্র বিশ্বের সহিত এই মহান্ নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কারণ তিনি দেশবাসীর অবস্থার উন্নতির জন্ম সর্ব্বদাই কাজ করিয়া গিয়াছেন।

—মিশরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোকরাশি পাশা

হিংসা দূর করিবার জন্ম যে জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসর্গীকৃত, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল হিংসাপূর্ণ কার্য্যের দ্বারা। ইহা ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার।

—কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় আততায়ীর হস্তে গান্ধীজীর মৃত্যুতে ভারতবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতার স্থপতি। তাঁহার বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও ত্যাগ ব্যতীত ভারতবর্ষ তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিত না। সম্মিলিত ভারত গঠনের জন্ম মৃত্যু হওয়ায় তিনি মহত্তর আসনে উন্নীত হইয়াছেন। চীন দেশ গভীর দুঃখের সহিত এই ক্ষতি অনুভব করিতেছে। গান্ধীজী এক জন বিরাট এশিয়াবাসী। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট তাঁহার আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে।

—চীন সরকার

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে আমি যে কিরূপ হতবাক্ হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। ভারতবাসীদের এই শোকাবহ ও অপূরণীয় ক্ষতিতে আমার গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

—ব্রহ্ম ইউনিয়নের সভাপতি

ভারতবর্ষ হইতে নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের অধিবাসিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু এখানে বর্ম্মী জাতিরও আঘাত বলিয়া অনুভূত হইতেছে এবং আজ ব্রহ্মেরও শোক-দিবস বটে। সমস্ত সরকারী অফিসাদি ও স্কুলসমূহ বন্ধ হইয়াছে। আমাদের সাধারণ দুঃখের দিনে ভারতের মহান্ নেতার তিরোধানে ব্রহ্মদেশ গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

—ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী

এই সংবাদ চিন্তা করার পক্ষেও ভয়ানক। আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমি শুধু এই মাত্র বলিব, তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবীব্যাপী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

—ট্রান্সভাল নিরপেক্ষ প্রতিরোধের চেয়ারম্যান

আমাদের এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় প্রায় একই রূপ ছিল। অদ্য ভারতীয়েরা শোক-সন্তপ্ত; তাহাদের দুঃখে আমরা সমবেদনা জানাই। যে নেতা তাহাদের জন্ম স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকেই হারাইয়াছে। তাঁহার আত্মত্যাগ ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য আনয়ন করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপনই তাঁহার জীবনে সকলের চাইতে প্রিয় ছিল।

—আয়ারের প্রধান মন্ত্রী ডি ভ্যালেরা

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ ভারতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা বলা যায় না।

—লর্ড লিনলিথগো

মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় শুধু যে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাই নহে; উপরন্তু জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপরও আঘাত হানা হইল। সকলে যখন বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে শোকাভিভূত, তখন স্বাধীনতার শত্রুগণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বের শান্তি ও মৈত্রীই যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা সকলেই এই বিচারবুদ্ধিহীন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্ম শোকাভিভূত হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর যে আদর্শাবলীর জন্ম তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম দৃঢ়তর সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। মহাত্মাজীর সাম্প্রতিক অনশনের পর ভারতের মর্য্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শহীদের প্রতি সম্মান এ দেশে ক্রমশঃ গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। ঠিক সেই সময় গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটিল, এক্ষণে ভারতবাসীর উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করিতেছে। সমগ্র বিশ্ব ভারতের প্রতি উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

—পার্ল বাক

এই মহৎ ব্যক্তির মৃত্যু বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছে।

—সিংহল ইউরোপীয় সঙ্ঘ

মিঃ গান্ধীর মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হইয়াছে। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে দিল্লীতে আমি তাঁহার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমার মনে যে মহৎ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিব না। আমার মনে হইতেছিল যে, আমি যেন এক জন বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিত হইয়াছি।

—বৃটিশ বিমান-সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন

অদ্য আমার পক্ষে বলিবার কিছুই নাই। বহু ভাষায় পৃথিবীর বহু লোক ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী জগৎবিখ্যাত ব্যক্তি। যাঁহারাই সত্য ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁহারাই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন! তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যেন সর্ব্বহারার ন্যায় ব্যবহার করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হই। তাঁহার

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শও শেষ হইল, ইহা বিশ্বাস করা যায় কি? আমরা কি তাঁহার মন্ত্রলব্ধ শিষ্য নহি, তাঁহার মহান্ কাজের উত্তরাধিকারী নহি? বুক চাপড়াইয়া চুল ছিঁড়িবার সময় গিয়াছে। যাহারা মহাত্মা গান্ধীর অবমাননা করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত পদে দাঁড়াইয়া চ্যালেঞ্জ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা তাঁহার জীবিত প্রতিনিধি, আমরাই তাঁহার সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধ-প্রপীড়িত পৃথিবীতে আমরা তাঁহার পতাকা-বাহক। সত্যই আমাদের পতাকা, অহিংসার মন্ত্রই আমাদের ধর্ম্ম, বিনা রক্তপাতে বিজয়ই আমাদের শক্তি। আমরা কি আমাদের পিতার আদেশ মানিব না? আমরা কি তবে আমাদের প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিব না? তাঁহার সংগ্রামকে আমরা কি বিজয়ের পথে লইয়া যাইব না? পৃথিবীর সম্মুখে মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ বাণীকে আমরা তুলিয়া ধরিব না? তাঁহার বাণী আর কেহ শুনিতে পাইবেন না বটে, কিন্তু আমরা কি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তাঁহার বাণীকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিব না?

আমার প্রভু, আমার নেতা, আমার পিতার আত্মা শান্তি চায় না। আমার পিতার শান্তি নাই। আমাদের শপথের প্রতি অনুরক্ত থাকিবার প্রেরণা দাও। তোমার বংশধর, তোমার উত্তরাধিকারী, তোমার শিষ্য, তোমার স্বপ্নের অভিভাবক, ভারতের ভাগ্যের পরিপোষক, আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার শক্তি দাও।

—সরোজিনী নাইডু

রাণী ও আমি গান্ধীজীর শোচনীয় মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভারতের জনগণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তজ্জন্য আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ

অত্যধিক সৎ হওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

ইহা একটি শোকাবহ ঘটনা।

—জাপ সম্রাট হিরোহিতো

আমরা কেবল মহাত্মা গান্ধীর জন্য দুঃখিত নহি, পরন্তু মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা সমগ্র জগতের জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টার উপায় হিসাবে হিংসার উচ্ছেদ করিতে হইবে।

—জাপ প্রধান মন্ত্রী তেৎসু কাতায়ামা

মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইহা কেবল ভারতের ক্ষতি নহে, ইহাতে সমগ্র মানব সমাজের ক্ষতি হইল। মহাত্মা গান্ধী শান্তি ও স্বাধীনতার অগ্রদূত ছিলেন।

—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট হাত্তা

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবাসী যে শোক পাইয়াছে, তজ্জন্য আমি ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে সমবেদনা জানাইতেছি। আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীরাও ভারতবাসীর এই দুঃখে শোক প্রকাশ করিতেছে। জীবে দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির জন্য গান্ধীজী চিরদিন কাজ করিয়াছেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভারতবাসী ও জগদ্বাসী সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হউক, এই প্রার্থনা করিতেছি।

—আয়ার্লণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সিন ওকেলি

মহাত্মা গান্ধীর অপ্রত্যাশিত শোচনীয় মৃত্যুতে আমার মনে যে বেদনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমি গোপন করিতে পারিতেছি না। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র জগতের ক্ষতি হইল। তিনি যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহা সকলের মনে বদ্ধমূল না হইলে জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। আমার মনে হয়, সকল প্রকার হিংসার নিন্দা করাই তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

—চিলির প্রেসিডেণ্ট গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেজ ভিডেলা

"আমাদের চতুর্দ্দিকে আজ যে পরিবেশ, তাহাতে আমার নীরব থাকাই আমি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। কারণ, এই ধরণের ঘটনায় যে কোন কথাই মূল্যহীন হইয়া পড়ে ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে এইটুকু আমি বলিব যে, যে আলোক-বর্ত্তিকা আমাদের স্বাধীনতার পথে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রজ্বলিত থাকিবে। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যতে এই জাতি একটি সুমহান্ ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে। দুঃখ বরণের দ্বারা যে ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে সেই ভাবেই দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরলোকগত সেই নেতার ইহাই ছিল চিন্তার একমাত্র বিষয়। বহু সংগ্রাম ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা আমরা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, তাহা যে ভাবেই হউক, তাঁহার লক্ষ্যস্থলে আমাদের পৌঁছিয়া দিবে। স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমাদের মা তাঁহার সন্তানদের তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত করিবেন ও তাহাদের একটি সুমহান্ ঐক্যবদ্ধ জাতির শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"

—শ্রীঅরবিন্দ

"মোহনদাস গান্ধীর হত্যার সংবাদে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আপনাকে, আপনার সরকারকে এবং ভারতের জনগণকে আমার সহানুভূতি জানাইতেছি। গুরু হিসাবে এবং নেতা হিসাবে তাঁহার প্রভাব শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যু সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী জন-সমাজে গভীর দুঃখ আনিয়া দিয়াছে। শান্তি এবং সম্প্রীতির জন্য আর একটি মহামানবের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। তবু আমি জানি, এশিয়ার মানুষ তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক পরিণতি হইতে তাঁহার প্রদর্শিত পথে আরো দৃঢ় ভাবে চলার প্রেরণা লাভ করিবে।"

—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান

"আমাকে এখনই ভারতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি শুধু মহাত্মার ইচ্ছাতেই রওনা হইয়াছিলাম। তিনি উপবাস-ভঙ্গের পর আমাকে আমার মাতৃভূমিতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমার স্থান ভারতে এবং আমার সেইখানেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। যে ভারতে মহাত্মা গান্ধী নাই সেই ভারতের কথা আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

—অরুণা আসফ আলী

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৮৬৯, ২রা অক্টোবর কাথিয়াওয়াড়ের পোরবন্দরের এক বাণিয়া-পরিবারে গান্ধীজীর জন্ম হয়।

১৮৭৬, পিতামাতার সহিত রাজকোট যান। ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। গোকুলদাস মাকাঞ্জি নামক জনৈক বণিক্-কন্যা কস্তুরবাঈ-এর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়।

১৮৮১, রাজকোটের উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৮৩ কস্তুরবাঈ-এর সহিত বিবাহ হয়।

১৮৮৪-৮৫, গোপনে মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করেন। কিন্তু পিতা-মাতাকে প্রতারণা করিবেন না ঠিক করিয়া এক বৎসর বাদে সে অভ্যাস ত্যাগ করেন।

১৮৮৮, সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কিছু দিন নৃত্য ও গীত শিক্ষা করেন—তাঁহার ধারণা হয় যে, এ দু'টি ভদ্রলোক হইবার পক্ষে অপরিহার্য।

১৮৮৯—৯০ সাধারণ ভাবে জীবন-যাপন করা সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর খরচ অর্দ্ধেক কমাইবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম গীতা অধ্যয়ন করেন ও ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

১৮৯১, জুন মাসে আইন ব্যবসায়ে যোগদানের জন্য ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৮৯৩, এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। তথায় একটি মুসলিম বণিক-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন-উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৯৪, নাটালের সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট হিসাবে নাম লেখান। তিনিই তথাকার প্রথম ভারতীয় এডভোকেট হন। বাইবেল, কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ ও টলষ্টয়ের "দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন্ ইউ (ভগবানের রাজ্য তোমারি হৃদয়ে)" গ্রন্থ পাঠ করেন।

মে মাসে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৬, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে আন্দোলন শুরু করেন। নবেম্বর মাসে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।

১৮৯৭, দক্ষিণ আফ্রিকার গিরমিটিয়া শ্রমিক (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক) সম্বন্ধে ভারতবর্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া জনতা ১৩ই জানুয়ারী তিনি ডারবানে পৌঁছিলে তাঁহাকে আক্রমণ করে।

১৮৯৯, বুয়র-যুদ্ধে ভারতীয়দের এম্বুলেন্স কোর গঠন করেন। যুদ্ধের পদক পান।

১৯০১, ভারতে ফিরিয়া আসেন।

১৯০২, ট্রান্সভালে এশিয়াবাসীদের বিরোধী আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ডাক আসে।

১৯০৩, ট্রান্সভাল সুপ্রিম কোর্টে এটর্ণীরূপে নাম লেখান এবং ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করেন।

১৯০৪, জোহান্সবার্গে প্লেগ আরম্ভ হইলে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাস্থ্য-চর্চা সম্বন্ধে গুজরাটী ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। এইগুলি পরে ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া "গাইড টু হেলথ" নামে প্রকাশিত হয়।

১৯০৬, জুলু বিদ্রোহে ভারতীয় ষ্ট্রেচারবাহী কোর গঠন করেন। চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অক্টোবর—ডিসেম্বর মাসে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীর নিকট ভারতীয়দের দাবী জানাইবার জন্য ইংলণ্ড যান।

১৯০৭, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করেন। জন-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

১৯০৮, ট্রান্সভাল ত্যাগ না করায় ১০ই জানুয়ারী ২ মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। জেনারেল স্মাটসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৩০শে জানুয়ারী আহ্বান আসে। একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ায় কারামুক্ত হন। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঠানদের আক্রমণে প্রায় নিহত হইয়াছিলেন। এই মীমাংসাকে পাঠানরা ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী ভাবিয়া তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। আক্রমণকারীদের কোনরূপ শাস্তিদানে তিনি বাধা দেন। জেনারেল স্মাটস্ মীমাংসার সর্ত ভঙ্গ করায় ১৬ই আগষ্ট পুনরায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৫ই অক্টোবর পুনরায় দুই মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৯, প্রতিনিধিরূপে জুন মাসে ইংলণ্ড যান। নবেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাজে বসিয়া "হিন্দ্ স্বরাজ" রচনা করেন।

১৯১০, ৩০শে মে জোহান্সবার্গে টলষ্টয়-ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১১-১২, ফার্মের দুই ব্যক্তির নৈতিক পতনের জন্য ১ সপ্তাহ অনশন করেন ও ৪ মাস দিনে একবার মাত্র আহার করেন। ইহার পর ১৪ দিন অনশন করেন।

১৯১২, ইউরোপীয় পোষাক পরিধান ও দুগ্ধপান ত্যাগ করেন। টাটকা ফল আহার আরম্ভ করেন।

১৯১৩, ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন নারী ও ৫৭টি বালক লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও পরে বেকসুর মুক্ত হন।

১৯১৪, ২১শে জানুয়ারী সত্যাগ্রহ বন্ধ করেন। জেনারেল স্মাটসের সহিত আপোষ রফা হয়। জুলাই মাসে ইংলণ্ড যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে আগষ্ট মাসে লণ্ডনে ভারতীয় এম্বুলেন্স কোর গঠন করেন।

১৯১৫, জানুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পান। ২৫শে মে আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পরে সবরমতী আশ্রম নামে অভিহিত হয়।

১৯১৫-১৬, ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভারত ও ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেন।

১৯১৭, হাতে কাপড় বুনিবার জন্য চরকার ব্যবহারের কথা প্রথম তাঁহার মনে উদয় হয়। নীল-চাষের মজুরদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য চম্পারণ গমন করেন। এখানে তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। রায়তদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বিহার সরকার যে কমিটি গঠন করেন, তিনি তাঁহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৮, জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ। আমেদাবাদ কাপড়ের কলের শ্রমিকদের হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং একটা আপোষ-নিষ্পত্তির নিমিত্ত অনশন অবলম্বন করেন।

১৯১৯, রাউলট বিল প্রত্যাহার করাইবার সঙ্কল্প লইয়া সত্যাগ্রহ-সঙ্কল্প-পত্রে স্বাক্ষর করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এপ্রিল মাসে দেশময় হরতাল হয়। পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সে আদেশ মানিতে স্বীকৃত না হওয়ায় দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হন। সেখান হইতে বোম্বাইতে নীত হন।

অবসরে জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সবরমতী আশ্রমে জনসভায় বক্তৃতা দিয়া প্রায়শ্চিত্তমূলক তিন দিন অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার পর্ব্বত প্রমাণ ভুলের কথা স্বীকার করেন পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেন। গুজরাটী দৈনিক 'নবজীবনে'র সম্পাদক হন। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'রও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বে-সরকারী তদন্ত কমিটির সদস্য হন।

নবেম্বর মাসে নিখিল ভারত খিলাফৎ কনফারেন্সের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার গ্রহণের জন্য কংগ্রেসকে উপদেশ দেন। ১৯২০, কাইজার-ই-হিন্দ, জুলু-বিদ্রোহ ও বুয়র-যুদ্ধে প্রাপ্ত পদক বড়লাটের নিকট ফেরৎ দেন। পাঞ্জাবের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ অর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

১৯২১, কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য সংগ্রহ করিয়া এক কোটি টাকা সংগ্রহ করা ও ২০ লক্ষ চরকা ভারতবর্ষে চালু করিবার জন্য কার্য্যসূচি গ্রহণ করেন। জুলাই মাসে সম্পূর্ণ বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলন আরম্ভ করেন। বোম্বাইতে বিদেশী বস্ত্রের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস তাঁহার হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন।

১৯২২, বরদলৈতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন বলিয়া বড়লাটকে চরম-পত্র দেন। চৌরীচোরায় জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ কনষ্টেবল দগ্ধ হওয়ায় সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২৪, এপেনডিসাইটিস অস্ত্রোপ্রচার হয় ও ৫ই ফেব্রুয়ারী কারামুক্ত হন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবনে'র সম্পাদনার ভার পুনরায় গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য ২১ দিনব্যাপী অনশন করেন।

১৯২৫, নিখিল ভারত কাটুনী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৯২৮-১৯২৯ সালের মধ্যে যদি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া না হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৯২৯, তাঁহারই নির্দ্দেশে লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বরাজ।

১৯৩০, অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাঁহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। কংগ্রেসের দাবী যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে লবণ আইন ভঙ্গ করিবেন বলিয়া বড়লাটকে পত্র দেন। ১২ই মার্চ্চ ডাণ্ডি যাত্রা শুরু করেন। গ্রেপ্তার হইয়া বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ হন। সারা ভারতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। প্রায় ১ লক্ষ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়।

১৯৩১ সালে বিনা সর্ত্তে মুক্ত হন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হইয়া বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ হন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় হরিজনদের জন্য পৃথক্ আসন নির্দ্ধারণে বিরোধিতা করিয়া আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। ছয় দিন বাদে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতিতে অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩ সালে সাপ্তাহিক 'হরিজন' প্রকাশ আরম্ভ করেন।

আত্মশুদ্ধির জন্য ৮ই মে ২১ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করেন। ৯ই মে ছয় মাসের জন্য অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করেন। জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন। সত্যাগ্রহ আশ্রম ভাঙ্গিয়া দেন। বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন। হরিজন উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভাবে সফর আরম্ভ করেন।

১৯৩৪ সালে কুটীর-শিল্প, হরিজন-উন্নয়ন ইত্যাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগের জন্য রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন।

১৯৩৬ সালে মধ্য-প্রদেশের সেবাগ্রামকে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৩৯ সালে রাজকোটের শাসনকর্ত্তা শাসন-সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা যাহাতে তিনি পালন করেন, তাহার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন। ১৯৪০ সালের যুদ্ধের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯৪১ সালে তাঁহার অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অব্যাহতি দেন।

১৯৪২ সালে নয়াদিল্লীতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্রিপস্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মে মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারত ত্যাগ করিতে আবেদন জানান। ৮ই আগষ্ট "ভারত-ত্যাগ" প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বোম্বাইতে রাষ্ট্রীয় মহাসভায় বক্তৃতা দেন। ৯ই তারিখে গ্রেপ্তার হইয়া পুণায় আগা খাঁর প্রাসাদে আটক হন। আগষ্ট—ডিসেম্বর। আগষ্ট-বিপ্লব সম্বন্ধে ভারত সরকার ও বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপ করেন।

১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ২১ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করেন এবং ৩রা মার্চ অনশন ত্যাগ করেন।

১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী আগা খাঁ প্রাসাদে কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু। ৬ই মে বিনাসর্ত্তে মুক্ত হন। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ আলোচনা করেন। ২রা অক্টোবর, তাঁহার ৭৫তম জন্মতিথিতে উপহার পান। কস্তুরবা স্মৃতি-ভাণ্ডারে ১১০ লক্ষ টাকা উপহার পান।

১৯৪৫ সালে সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূর করিবার নিমিত্ত মিঃ জিন্নাকে তিনি তাঁহার সহিত বোম্বাইতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। পরে কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়।

এই বৎসর সমস্ত কংগ্রেস-নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয় ও সিমলা সম্মেলন হয়। গান্ধীজী বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ভারতে আগমন। অন্যান্য নেতাদের সহিত গান্ধীজীর সহিতও তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নোয়াখালির পল্লী পরিক্রমণ করেন। জুলাই মাসে কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। আগষ্ট মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবসান ঘটে। পুনরায় ১লা সেপ্টেম্বর হাঙ্গামা বাধিলে তিনি অনশন করেন। ইহা ফলপ্রসূ হয়। ইহার পর তিনি দিল্লী গমন করেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের জন্য গান্ধীজী ১৩ই জানুয়ারী অনশন আরম্ভ করেন ও বিভিন্ন দলের নেতাদের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ১৮ই জানুয়ারী অনশন ত্যাগ করেন।

৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

বিপর্য্যয়

কৃষ্ণসুচিত্রা দেব

—আমার কিন্তু একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি না গেলে কি চলে না, মা ?

—চলবে না কেন ? তবে সুলেখা আর অজিত অত করে যাবার জন্তে বলে গেল—না-যাওয়াটা কি ভালো দেখায় ? আর যেতে তোর আপত্তিই বা কিসের ? সুলেখা আর অজিত সংসারে এই ত দু'জন মাত্র প্রাণী। আর কেউ নেই ত যে লজ্জা করবে ?

—লজ্জার জন্তে ঠিক নয়, মা।

—তবে আবার কি ?

—তোমাদের সঙ্গে গেলে যেমন লাগত তেমন কি আর লাগবে ?

মা হেসে বললেন—তা আমাদের আর যাওয়া হয়ে ওঠে কই ? তুই যখন সুবিধে পাচ্ছিস্, ঘুরেই আয়। 'আমরা' ত আর দেখাতে পাল্লুম না কিছুই।

—আমি কি কোন দিন কোথাও যাবার কথা বলেছি যে তুমি অমন করে বলছ ? অমন করলে কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না। শ্রীলেখা রাগ করে বলে।

না-যাওয়ার কি যে আপত্তি অনেক অনুসন্ধান করেও মিলল না, তাই তার ক্ষীণ আপত্তিটুকু ভেসে গেল মায়ের অনুরোধ আর বোনের দাবীতে। সকলের আগ্রহে অগত্যা শ্রীলেখাকে রাজী হতে হল. অবশেষে সে এক দিন সত্যিই কাঞ্চনপুরে এসে পৌছল। কাঞ্চনপুরের জমিদার তার দিদির স্বামী; জমিদারীতে এসে এত খাতির ও সম্মান পেয়ে শ্রীলেখা সত্যিই বিস্মিত। কলকাতার মেয়ে সে—কাগজে চিরকাল পড়েছে জমিদার ও প্রজায় বিবাদ-বিদ্রোহ, কিন্তু এ যে সত্যি ঠিক বইয়ের মত। প্রজারা ঠিক পিতার মত সম্মান যুবক-জমিদারকে না করলেও রাজার মত সম্ভ্রম করে চলে। নজরানার পরিমাণও যৎসামান্ত নয়।

মুগ্ধ হয়ে পড়ে শ্রীলেখা। সপ্তাহে দু'-তিনখানি করে পত্র দেয় মা'কে। লেখে, এখানকার বিবরণী, প্রজা ও জমিদারের খাতির সম্মান সদ্ভাব।

সুলেখাও ভারী খুসী এক জন অজ্ঞ শ্রোতা পেয়ে। শ্রীলেখার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না যে, সে কোন জিনিষের অর্থ সহজে উপলব্ধি করবে। সুলেখা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আগ্রহ ভরে সব জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় ঠিক তেমন ক'রে, যেমন করে অজিত বুঝিয়েছিল তাকে যখন প্রথম এনেছিল এখানে বিয়ের পর।

সুলেখাকে জমিদারের ঘরে দেবার মত সঙ্গতি ছিল না সুলেখার বাবার। কিন্তু বিধির ইচ্ছায় হয়তো [illegible] [illegible] হল অভাবনীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্য।

[illegible] এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বিশেষ আমন্ত্রণে [illegible] মিলিত হয়ে যায়। সেখানে সুলেখার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করবার প্রার্থনা জানায়। বলা বাহুল্য যে, এ ধরণের খবরে কোন আপত্তি ওঠে না। সচ্চরিত্র, সুশ্রী ও শিক্ষিত ধনী, অল্পবয়সী জামাই যদি অনাহুত ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে মধ্যবিত্ত পরিবার তাকে অনুগ্রহ ছাড়া আর কি ভাবতে পারে! সুতরাং সুলেখার বিয়ে হয়ে গেল আনন্দের সমারোহে।

বরপক্ষ থেকে আপত্তি জানাবার মত বিশেষ কেউই ছিল না। অজিত শৈশবে মাতৃহীন এবং আইনতঃ সাবালক স্বীকৃত হওয়ার বয়সে পিতৃহীন, কাজেই বাধা দেবার মত প্রবল ছিলেন না কেউই। অজিত থাকে কলকাতায়। জমিদারীর সমস্ত ভার ম্যানেজার গোমস্তা নায়েবের ওপর। বছরে দু'বার করে পরিদর্শন করা ছাড়া তার সঙ্গে আর তেমন কিছু আত্মীয়তা নেই তার জমিদারীর।

সুলেখার বিয়ে হয়ে গেছে। এবার শ্রীলেখার পালা। শ্রীলেখা সুলেখার চেয়েও সুন্দরী। সাধারণ মেয়েদের মত সে শিক্ষিতা। তার অভিভাবকবর্গ আশা করেছেন যে, সুলেখার চেয়ে রূপ বেশী, হয়ত বা এই কারণে আরো ধনি-গৃহে সে স্থান পাবে। বর্ত্তমানে সকলেরই ঘরে বয়স্থা মেয়ে রয়েছে; সে দৃষ্টান্ত ও সাহসের ওপর

নির্ভয় করে তারা সৎপাত্রের অনুসন্ধান করছেন। ছোট মেয়ে তাদের বেশী প্রিয়।

কাঞ্চনপুরের বিশাল বাড়ীটায় শ্রীলেখা নিজের জন্য একখানি ঘর বেছে নিয়েছে। ভারী সুন্দর ঘরটা। চারি দিক্ খোলা, জানলা দিয়ে দেখা যায় নানা রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

দক্ষিণের জানলায় দাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে বিশাল কাজল-কালো ঝিলটা, কালো জল সদাক্ষণ চিক-চিক করছে যেন। ভারী নির্জ্জন। উত্তর দিকের বারান্দার ধারে গেলে দেখা যায় দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। সকালে রাখালের দল নিয়ে আসে গরুর পাল, আবার বিকেলে ফিরে যায় দল বেঁধে—ধূলো উড়িয়ে।

পশ্চিম দিকে বাগান। জানলার পাশেই প্রকাণ্ড গাছ। দেখতে বাহারী বটে, কিন্তু শ্রীলেখার সদাই ভয় গাছ বেয়ে যদি চোর ঢোকে ঘরের ভেতর; তাই সে সব সময়েই এই জানলাটা বন্ধ করেই রাখে।

পূর্ব্ব দিকের ফালি বারান্দাটা শেষ হয়েছে সুলেখার ঘরের সামনে। ছোট্ট বারান্দা। দু'জনের বেশী মানুষ দাঁড়াতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। সাদা পাথরের মেঝে আর সাদা দেয়ালের মধ্যে কি যেন একটা সামঞ্জস্য এনে আরো সুন্দর করে তুলেছে ঘরের ভেতর।

কলকাতার গায়ে-গা-লাগা বাড়ীগুলো যেন কি রকম বিশ্রী মনে হয়—শান্ত নির্জ্জন পল্লীগ্রামে শ্রীলেখা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

দিন কেটে যায় বেশ আনন্দে। সে দিন শ্রীলেখা তার বিছানায় শুয়ে মা'কে চিঠি লিখছে আপন মনে। সুলেখা গেছে কলের ঘরে, আর অজিত বাইরে নিজের কাজে। নিরিবিলিতে শ্রীলেখা লিখে যায় পাতার পর পাতা। হঠাৎ সে লেখনী থামিয়ে চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

—কে? ও দিদি। ছাড়, ছাড় চিঠিটা শেষ করে নিই। শ্রীলেখা তার চোখের ওপর থেকে দু'টি হাতের স্পর্শে অনুভব করে, তার চোখের ওপর যার হাত পড়েছে, সে আর যেই হোক সুলেখা নয়।

চোখের ওপর থেকে জোর করে হাত নামিয়ে শ্রীলেখা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার সামনে দাঁড়িয়ে এক জন মহিলা—যে তার চোখ টিপে ধরেছিল, আর তার পাশে সহাস্য-মুখ এক যুবক। দু'জনেই অপরিচিত!

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই মহিলাটি হেসে উঠল—ও কি, অমন করে দেখছ কি? চিনতে পারছ না আমায়?

না তো···

—সত্যি? সত্যি চিনতে পারছ না আমায়? আচ্ছা তবে বলি—আমি কৃষ্ণা আর ও হচ্ছে আমার ছোড়দা সুজিত। কি গো, চিনতে পারলে না?

—আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি আপনার ভুলে যাওয়া কিন্তু ভারী অন্যায়—বুঝলেন? পরিচয় দিতেও চিনছেন না? আচ্ছা, কলকাতার সব মেয়েরাই কি এমন?

এদের আকস্মিক আগমনে শ্রীলেখা প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছল। এবার কলকাতার নামে ভ্রূকুটি করায় সে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে—কেন?

—কেন আবার কি?

অজিতকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাকে উদ্দেশ করে সুজিত বলে—দাদা, ভারি আশ্চর্য্য, আমাদের চিনতেই পারছে না।—আচ্ছা বেশ, এবার মনে পড়ে কি না দেখুন ত!

দক্ষিণের জানলার ধারে আসবার জন্য সুজিত শ্রীলেখাকে আহ্বান জানায়।

—ঐ যে, ঐ ঝিলেতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলেন মনে পড়ে? কৃষ্ণা আপনাকে তুলতে গিয়ে সে-ও ডুবে গিছল, তার পর আমি গিয়ে—নাঃ, আপনি এত শীগ্‌গির উপকারটাও ভুলে গেলেন যে, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

অজিতের হাসি-ভরা মুখের দিকে লক্ষ্য করে বিব্রত হয়ে শ্রীলেখা বলে,—দেখুন, আপনারা ভুল···

কথা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে অজিত বাধা দিয়ে বলে—জানিস্ কৃষ্ণা, সুজিতও চিনতে পেরেছে ঠিক কিন্তু ও যে তোদের বৌদি এ কথা স্বীকার করে না, আর খৃষ্টান হবার সঙ্কল্প মাথাটাও দেখ্, সিন্দুরবিন্দু বিলুপ্ত করেছেন। লেখা, তুমি ওদের বড্ড অপ্রতিভ করে তুলছ।

সুজিত আর কৃষ্ণা অজিতের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, কারণ ওরা জানে, অজিত ওকে লেখা বলেই সম্বোধন করে।

শ্রীলেখার শুভ্র সীঁথির পানে চেয়ে বলে,—সত্যি না কি বৌদি?

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢোকে সুলেখা। ওদের চমকিত করে দিয়ে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে—এ কি ঠাকুরপো? কৃষ্ণা? তোমরা কোত্থেকে? আকাশ থেকে পড়লে না কি?

তারা দু'জন সমস্বরে বিস্ময় কণ্ঠে বলে,—বৌদি! তুমি? তবে ইনি কে? আমরা যে এতক্ষণ এঁকেই বৌদি···

—না গো, ভুল করনি তা বলে, উনি হচ্ছেন নাম্বার টু লেখা দেবী, এবং ইনি নাম্বার ওয়ান।

কৃষ্ণা প্রশ্ন করে—ও, আপনি বৌদির বোন? নমস্কার।

শ্রীলেখার যেন সম্বিত ফিরে আসে—হাঁ, নমস্কার।

অজিত বলে—দেখ, তোদের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের পরিচয় করিয়ে···

—আবার ইয়ার্কি হচ্ছে? আগে এক জনকে সামলান তবে আর এক জনকে চাইবার বাসনা করবেন।

দেখই না পারি কি না···

—চাইলেই ত আর পাওয়া যায় না। আর আপনি চাইছেন বলেই যে আমায় চাইতে হবে, এ কথা অর্থহীন। আমারও ত একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। সেটা ত একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়।

—তা, অনিচ্ছা হবেই বা কেন? আমি রূপবান, গুণবান বিদ্যাবান, ধনবান, তার পর তোমার সুন্দরী দিদির স্বামী, অতএব ভগিনী, এর পর অনিচ্ছা বলে কোন বস্তু থাকতে পারেই না।

শ্রীলেখা হেসে বলে—ওরে বাপ, রে, বানে বানে দেখছি অস্থির, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ অচল।

অজিত মৃদু হেসে বলে—উহুঁ স-চল। সাপের ছুঁচো গেলা জান তো? জান না? তবে শোন। সাপ ছুঁচো খায়, তার পর অর্দ্ধেকটা গিলে তার গন্ধে অস্থির হয়ে ওঠে, গিলতে পারে না অথচ তখন উগরাবার উপায় থাকে না। তোমরাও ত তাই কর, ভাল হলে ভাল—নয় ত যদি খারাপ লাগে তাও প্রকাশ করবার উপায় নেই।

—আপনার যুক্তি খুবই সরস আর বক্তৃতাও সুন্দর, কিন্তু কাগজে ছাপার মত বেশ খাঁটি প্রায়।

—তারা একটা ইডিয়েট। জান লেখা—ওরা শ্রীকে তুমি বলে ভুল করে…

—তা ত দেখলুম, কিন্তু ওরা একেবারে হাজির—খবর না দিয়ে যে?

—কেন দাদা? আমার চিঠি পাওনি?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, পেয়েছি—না পেলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠালে কে?

—তাও ত বটে কিন্তু—বুঝেছি এবার, তুমি বৌদিকে চমকে দেবার জন্যে বুঝি…

—হ্যাঁ, কিন্তু বৌদি ত চমকালো না—হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট গিন্নী চমকে গেছে আর ঠকেছ তোমরা দু'জনে।

—দ্বিতীয় পক্ষে নারাজ আমি, সুতরাং ও সম্বোধন না করলেই বাধিত হব।

—সে কি? হতাশার ভঙ্গীতে অজিত বলে। এত দিন ত এই দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলে না, আজ—আজ বুঝি কোন…এই…এই…হঠাৎ এত অপ্রসন্ন কেন হলে?

—আচ্ছা, ঠাট্টাই চলবে শুধু। বেচারীরা ট্রেণ থেকে নামল এই, আর খাওয়া-দাওয়া ত ছেড়ে দাও, বসতে পর্য্যন্ত বললে না। সুলেখা বললে।

—বৌদি, আমরা খেয়েই এসেছি, অত তাড়া…

—তোমাদের মুখ বলছে ক্ষিদে পেয়েছে, বুঝলে, যাই নিয়ে আসি, তোমার দাদার গরজ দেখলে তো ভাই। একবার খাবার কিংবা বসবার কথা মুখ দিয়ে বার করেছে? আমি না থাকলে হয়ত একেবারে পত্র পাঠ পৃষ্ঠ প্রদর্শন, কি বল?

—কক্ষনো নয়। প্রতিবাদ করে অজিত। তোমরা না থাকলে যথেষ্ট শান্তির অভাবনা হোত কিন্তু এখন দুই গিন্নী সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে যদি আমায় ব্যবস্থা করতে হয়, তবে আমার এখন—মানে সংসার ছেড়ে বনে বাসই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তবুও যখন আমায় কথা বলতে হচ্ছে, তখন এই কথা বলি যে, আমার প্রথম গিন্নীর রান্না খেয়ে তোমরা সুখ্যাতি করেছ। এবার দ্বিতীয় গিন্নী, তোমার পরীক্ষা। বড় গিন্নীর ছুটী।

…ওর ঘাড়ে সব ভারটা চাপানো কিঞ্চিৎ অন্যায় দাদা, আমিও তাই কিছু সাহায্য করব, কেমন? কৃষ্ণা বলে।

—না, না, আপনি এই মাত্র ট্রেণ থেকে নামলেন, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একলাই পারব। শ্রীলেখা বলে।

—আমিও পারব—ভাবছেন কলেজে পড়ি বলে ও বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই? কিন্তু জানেন, কলেজের ফীষ্টে আমিই বাঁধা রাঁধুনী।

—বেশ তবে আসুন। আপত্তি না করে শ্রীলেখা বলে।

কৃষ্ণা শ্রীলেখার চেয়ে বড়, হয়ত সুলেখারই বয়সী, কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব হয় অন্তরঙ্গ ভাবে। শ্রীলেখা ওর কাছে বসে ওদের দেশের কথা, কলেজের গল্প শুনে কাটায়। মনে মনে কল্পনা করে, 'সেও যদি এ ভাবে শিক্ষিত হতে পারত! তাই সুলেখার সঙ্গ ছেড়ে এখন কৃষ্ণার সঙ্গেই দিন কাটায়। তার পছন্দসই ঘরখানিতে এখন ওদের তিন জনের শোবার ব্যবস্থা হয়। আর ওরা দু'ভাই শোয় পূর্ব্বোক্ত ঘরে।

অজিত ঠাট্টা করে বলে—কৃষ্ণা, শ্রীর মতিগতি আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।

শঙ্কিত হয়ে শ্রী তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—এখন আর আমায় পছন্দ হয় না, আচ্ছা সত্যি করে বল দেখি, ওর মনের বাতাস এখন কোন দিকে বইছে?

আশ্বস্ত হয়ে শ্রীলেখা বলে—ওঃ, তাই বলুন, ঠাট্টা!

—একে তুমি ঠাট্টা বল? এ যে 'সিরিয়াস'! আর এখন ঠাট্টা করবার মত আমার মনের অবস্থা নয়।

—কেন মনের আবার হঠাৎ কি হল? বৈরাগ্য না রাগ?

—না, রাগ নয় তবে তোমার নব অনুরাগ দেখে বিরূপ হব-হব বলে চিন্তা করছি বুঝলে শ্যালিকা সুন্দরী!

লজ্জিত শ্রীলেখা কিছু বলে না, বিব্রত হয়ে উঠে পালায়।

বিব্রত হলেও বেশ ভাল লাগে এদের সাহচর্য্য। বাড়ীকে নিঃসঙ্গ অবস্থা আর এই দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করে। কলকাতা সহর কোলাহল, লোকবহুল হলেও সেখানকার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে নিজেকে ঠিক সমান পর্য্যায়ে এনে মিশতে পারে না শ্রীলেখা। ও মেয়েগুলো যেন কি রকম! সরলতা নেই এতটুকু, যদিও বা কারু একটু থাকে সেও চেষ্টা করে সে মাধুর্য্যটুকু অহঙ্কারের অন্তরালে এনে ফেলতে। সরলতাটা অনেকটা দুর্ব্বলতার সামিল মনে করে তারা। অহঙ্কার আর চালে পরস্পর পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে চায়। শ্রীলেখা এটাকে বরদাস্ত করতে না পারলেও প্রতিবাদ ক'রে অনধিকার বাক্য ব্যয়ে শান্তি-ভঙ্গ করতে রাজী নয়। তাই নীরবে সরে আসে ওদের আবহাওয়ার বাইরে।

সকলেরই ইচ্ছা ছিল সে কাঞ্চনপুরে দু'-তিন মাস থাকে। কারণ সুজিত ও কৃষ্ণার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে এবং এর পর লম্বা ছুটী। আর এদের কোন কাজ নেই কলকাতায় যে তাড়াতাড়ি ফেরবার দরকার, অতএব সকলেই স্থির করলে, এইখানে থাকা হবে। কিন্তু তা সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

শ্রীলেখার কোন এক স্থান থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসায় তার মা-বাবা তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত লিখেছেন, কারণ, পাত্রপক্ষ দেরী করতে চায় না।

সকলেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। ম্যানেজার অসুস্থ হওয়ায় অজিত সে কাজ পরিদর্শন করছে। সে এখন এখান ছেড়ে যেতে পারবে না। ম্যানেজারের অসুস্থতায় নিজে সেরেস্তার কাজ দেখতে গিয়ে সে বুঝতে পারে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে কাজে, যা ঠিক মত না করে নিজের দোষ ঢেকে রাখতে সে সব চেপে রাখছে। এই বিশৃঙ্খলা যে ভবিষ্যতে প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দেবে না সে বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নেই। তাই নিজের হাতে সব ভার তুলে নেয় সে শেষে স্থির হয়, ওরা সকলেই কলকাতায় ফিরবে সুজিতের সঙ্গে, কাজ শেষ হলে যথাসম্ভব শীঘ্র অজিতও ফিরে আসবে। সকলের অভিলাষ শুধু তার জন্যেই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় দেখে লজ্জিত হয় শ্রীলেখা।

যাবার দিন স্থির হয়ে যায় ওদের। শ্রীলেখা দক্ষিণের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে কালো ঝিলটার দিকে। হয়ত এই শেষ, আর কোন দিনও আসবে না কাঞ্চনপুরে। কোথায় তার বিয়ের কথা চলছে তা সে জানে না; জানবার প্রয়োজনও নেই এখন। এখন ভবিষ্যৎ নয়, বর্ত্তমানই চিন্তনীয়। কাঞ্চনপুরের স্মৃতি সে কোন দিন ভুলবে না। শান্তিপ্রিয় সে, তাই এই শান্ত পল্লীটিকে বড় গভীর ভাবে ভালবেসেছে। সহরের শিক্ষিত সভ্য নাগরিকদের

চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর ঐ কৃষক-গৃহস্থ, এখানকার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। এরা অনেক বেশী সুন্দর।

—ও। বলে লাভ নেই কৃষ্ণা, পিসিমাকে চিনিস্ ত ভাই। শ্রীলেখা একটু চমকে ওঠে। নীচের বাগানে অজিত আর কৃষ্ণা কথা বলছে। অনধিকার জেনেও সরে আসতে পারে না।

—তবু আমার বিশ্বাস দাদা, শ্রীর রূপে যা কিছু…

—না রে, আমার কথা শুনবে না।

—একবার বলেই দেখ না দাদা, বল বলবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, বলব রে।

শ্রীলেখা সরে আসে। বুঝতে পারে কৃষ্ণার মনোবাসনা। মনকে প্রশ্ন করে, এ কার ইচ্ছা? কৃষ্ণা না সুজিতের? সে কি খুসী হবে?

ভাবনার সময় বেশী নেই। তাড়াতাড়ি জিনিষ-পত্র গোছগাছ করতে আরম্ভ করে দেয় সে।

ছোট ষ্টেশন। তবু লোক-জনের কিছু অভাব নেই। সুজিত বলে,—বৌদি, এস এই দিকে, আমাদের রিজার্ভ করা কামরা। কুলীরা মোট নিয়ে আগে এগিয়ে যায়।

পাঁচ জনে ট্রেণের কামরায় উঠে বসে। অজিত ঘড়ি দেখে বলে, —আর পাঁচ মিনিট।

—যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এস কিন্তু!

—নিশ্চয়ই, সে কথা বলতে। তার পর শ্রী তুমি ত আর আমায় বরদাস্ত করছ না! নতুনের আগমনের আগেই পুরানোকে বিদায় দিচ্ছ?

ট্রেণের শেষ ঘণ্টা পড়ে। অজিতও নেমে পড়ে।

শ্রীলেখা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জবাব দিতে যায়, কিন্তু অকস্মাৎ যেন কী ব্যথায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। জবাব দেওয়া হোল না, ট্রেণ চলতে শুরু হয়েছে। অজিত রুমাল নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। সকলেই উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে প্ল্যাটফর্মের দিকে। ষ্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেণ বিস্তৃত মাঠের ওপর চলেছে।

সকলেই নীরব। কথা আরম্ভ হলে সকলেই যোগ দিতে চায়, কিন্তু প্রথম সুরু করে কে?

সকলের দৃষ্টি কামরা ছাড়িয়ে বাইরে নীল আকাশ আর ধানের ক্ষেতে হারিয়ে যায়!

শ্রীলেখা বুঝতে পারে না, কেন এ দুর্ব্বলতা! আসবার সময় গোপনে সে যতটা উৎসাহিত হয়েছিল এখন ঠিক ততটা পরিমাণেই নিরুৎসাহ। কলকাতা তার জন্মভূমি. তবুও।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণা প্রথমেই।—কাঞ্চনপুরে এসে দিনগুলো বেশ কাটল, না ছোড়দা? তোমার বন্ধুর সঙ্গে দিল্লী গেলে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এত আনন্দ পেতুম না, না?

সহজ সুরে সুজিত উত্তর দেয়—না।

কৃষ্ণা মনে মনে বিরক্ত হয় সুজিতের স্বীকারোক্তিতে। কৃষ্ণা ভাবে, এখন কি কথা উত্থাপন করবে।

সকলের নীরব মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা বলে,—শ্রীকে আমরা কোন দিনই ভুলব না বৌদি, কি বল ছোড়দা?

সুজিতের দৃষ্টি তখন সুদূর বন-বনান্তে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নির্ব্বিকার ভাবে সে বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে।

সুলেখা হঠাৎ আশ্চর্য্য হয় সুজিতের দিকে চেয়ে।—এত চুপ-চাপ কেন হাস্যপরিহাসপ্রিয় সুজিত!

কৃষ্ণার প্রশ্ন সে প্রশ্ন করে,—কেন?

সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণা বলে—পরিচয়টা একবারে নতুন ধরণের কি না।

সুজিতের যেন সম্বিত ফিরে আসে। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে বলে—সত্যি।

কৃষ্ণা খুব খুসী হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতাকে চিরতরে দূর করবার চেষ্টা করে সে।

—আমাদের পরিচয়টা ভুলের মধ্যে হলেও আমাদের ভুলে যাবে না তো শ্রী?

শ্রীলেখা অন্যমনস্ক ভাবে বোকার মত প্রশ্ন করে,—ভুলব কেন?

—কেন? কৃষ্ণা হাসে।—কেন? এমনিই। এই ধর, তোমার বিয়ের কথা চলছে, কলকাতায় গিয়েই যদি তোমার বিয়ে হয়ে যায়, তার পর আমাদের কথা মনে রাখবে ত?

শ্রীলেখার অজান্তে, তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তার চোখ দু'টির ওপর সুজিতের চোখ পড়ে। সুজিতের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলতেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে শ্রীলেখা। ছিঃ ছিঃ, ওঁরা কি ভাবছেন! দিদিই বা কি ভাববে! নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে—এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার কথা ভাবছ কেন?

—আর কতক্ষণই বা একত্রে আছি ভাই, জোর চার পাঁচ ঘণ্টা। তার পর ত যে যার আবাসে, আর কবে দেখা হবে তার কোন ঠিক নেই ত?

শ্রীলেখা বলে—দেখা না হলেও ভুলব না। তোমার সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয়টাও বেশ মজার মধ্যে হয়েছে।

সুলেখার দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করে শ্রীলেখা। ও কি ওর মনের মধ্যেটা দর্পণের মত দেখতে পাচ্ছে? তবে কেন ও চেয়ে আছে?

—কলেজে আমার সুনাম আছে পাকা রাঁধুনী বলে, এজন্যে যে একটু অহঙ্কারও না ছিল এমন নয়, কিন্তু শ্রী আমাকে হার মানিয়েছে। কিছু মনে কোর না ভাই বৌদি, শ্রী কিন্তু তোমার চেয়েও ভালো রাঁধে। আগামী পিক্‌নিকে শ্রীকে যেতেই হবে, কি বল ছোড়দা?

সুজিত বলে—বেশ ত, তবে উনি যদি বিনা মাইনেতে রাঁধতে রাজী হন।

কৃষ্ণা বলে—রাজী না হন' ভারী বয়ে গেল, ওকে জোর করে ধরে নিয়ে আসব। আর ওর মাকে রাজী করানো…সে আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার ছোড়দা।

মৃদু হেসে সুলেখা বলে—হাঁ, তা পারে, প্রথমতঃ তোমার রূপ দেখেই মা ভুলবেন আর দ্বিতীয়তঃ যা নাছোড়-বান্দা মেয়ে তুমি। রাজী না করিয়ে কি ছাড়বে না কি?

সুজিত বলে—একটা মিথ্যে বললে, বৌদি। মানি, কৃষ্ণার রূপ আছে, কিন্তু তোমার মা'কে ভোলাবার মত নয়।

—কেন, কেন?

—তার দুই মেয়ে যে আরও সুন্দরী, তাই।

—ঠিক বলেছ ছোড়দা—কৃষ্ণা বলে।

—এ দেশের লোকেদের একটা দোষ যে, নিজের কোন জিনিষই ভালো লাগে না তা সুন্দর হলেও। মৃদু হেসে বলে শ্রীলেখা। বাকী পথটুকু বেশ গল্প-গুজবেই কেটে যায়।

শ্রীলেখা বাবার সঙ্গে বাড়ী চলে আসে আর সুলেখা ওদের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়।

কাঞ্চনপুরের খুঁটিনাটি সব বিবরণ দিতে বসে মা'কে।

* * * *

যথা সময়ে নির্ব্বাচিত পাত্রপক্ষ দেখতে এলো শ্রীলেখাকে।

অপছন্দ হবার মত কিছুই ছিল না তাদের, তাই পছন্দও হোল। কিন্তু মা আপত্তি করে বললেন—শ্রী আমার ছোট মেয়ে তাকে অত দূর-দেশে পাঠাব না, আর তা ছাড়া বিদেশ বিভুঁয়ে ও একলা থাকবেই বা কি করে? তিন কুলেও কেউ নেই আর!

—কিন্তু এর চেয়ে ভালো পাচ্ছই বা কোথায়?

—কেন, সুলেখা বলছিল অজিত এলে পরে ওর পিসির সঙ্গে কথা কয়ে দেখবে, ছেলেটি দিব্যি। সে দিন সুলেখার সঙ্গে এসেছিল।

—হয় যদি তবে ত ভালই, কিন্তু আগে থেকে এ পাত্র সম্বন্ধে মুখ বেঁকিও না। কি জানি, কি বরাত শ্রীর!

অজিত কিছু দিন পরেই ফেরে কাঞ্চনপুর থেকে।

শ্রীলেখাকে দেখবার জন্যে আবেদন নিয়ে আসে তার অভিভাবকদের কাছে। তারা সস্নেহে সম্মতি দেন।

শ্রীলেখাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে অজিত।

তাকে দেখে পিসিমা সুখী হন; বেশ সুন্দরী বউ হবে, এ কথা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু দেনা-পাওনার কথা উত্থাপনে অজিত যখন জানালে যে বিশেষ কিছুই দিতে পারবে না, তখন তিনি শ্রীলেখার সামনেই বলে বসলেন, তবে ও ডোমের চুবড়ী ঘরে তুলে লাভ কি?

অপমানে শ্রীলেখার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে যায়। অপ্রতিভ কৃষ্ণা শ্রীলেখার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। তার পর বলে,—একটু বোস শ্রী, আমি আসছি।

শ্রীলেখা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বাইরের খোলা দালানে বসে পিসিমা ও অজিতের কথা তার কাণে আসে।

—লাভ নেই জানি পিসিমা, কিন্তু লোকসানও ত নেই।

—হ্যাঁ রে অজু, রূপটাই কি সব?

—না, তা বলি না, রূপ ম্লান হয়ে যায় আর লক্ষ্মীও ত চিরচঞ্চলা, এ কথা তোমার অজানা নয়।

—লক্ষ্মীকে রাখতে পারলে সে থাকে বৈ কি। তুই রূপে মজেছিস বলে যে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে রূপ-রূপ করে ক্ষেপতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

—তা কুৎসিতই কি ভালো? পছন্দসইও ত চাই। না হয় সুজিতকে একবার বলে দেখ, যদি ও···

ধমক দিয়ে পিসিমা বল্লেন—থাম্ অজু, কালকের ছেলে সুজিত, তার আবার পছন্দ অপছন্দ! হ্যাঁ, দাদা বেঁচে থাকলে দেখতুম'খন কেমন রূপ দেখে বিয়ে করা!

—থাক গে সে সব কথা। তুমি রাজী নও?

—না। রাজী হব কি করে? ভবিষ্যৎটাও ত ভাবতে হবে বাছা!

—ভবিষ্যৎ? অজিত হাসে। কেন, তোমার টাকার অভাব?

—তর্ক করিস নে অজু, টাকা থাকলে বিলিয়ে দেব এমন কথা কেউ কয় না কি?

—তা তোমায় বলছে কে?

—বলি, তার পর বাপ-মা ভাই-বোন গুষ্টী শুদ্ধুকে পুষতে হবে ত?

—না, হবে না তা। অজিত বিরক্ত হয়ে বলে। আমি থাকতে তা হতে দোব না। ওরা মাত্র দুই বোন। আর ভিক্ষে করে খাবার মত অবস্থা নয় ওদের, থাক, বিয়ে যখন হবে না তখন এ বিষয়ে কিছু বলা নিরর্থক।

—তা কি করব বাছা, আমার কাছে পষ্ট কথা।

পাশের ঘরে একলা শ্রীলেখা বসে। কৃষ্ণা আর ফেরেনি। চাকরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে যে, বিশেষ দরকারে সে বাইরে যাচ্ছে।

শ্রী জানে, হঠাৎ কেন এই বিশেষ দরকার পড়ল।

সব কথাই তার কাণে যায়। বিছানার ওপর মুখ গুঁজে শ্রীলেখা কেঁদে ফেলে। ঘরের ভিতর পদশব্দ শুনে মুখ তুলে দেখে সুজিত। সুজিত প্রশ্ন করে—আপনি কাঁদছেন?

শ্রীলেখা কোন জবাব দেয় না। বালিশের ওপর মুখ রেখে নিজেকে সম্বরণ করবার চেষ্টা করে। সুজিত চলে যায় প্রশ্নের জবাব না পেয়ে।

লজ্জিত সুলেখা বহু বার থাকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রীলেখা রাজী হল না। অজিতের অনুরোধে তাকে রাত্রে খেতে হোল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া সেরে অজিত শ্রীলেখাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল।

শ্রীলেখাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে তার মা। আর শ্রীলেখা নীরবে বসে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর শ্রীলেখা ছোট ছেলের মত কেঁদে ফেলে।

বিস্মিত হয়ে মা ভাবেন, কি এমন ঘটল যাতে শ্রীর চোখে জল আসতে পারে। শুধু জল নয়, এ যে অপমান আর পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি অশ্রুভারে নেমে আসছে।

শ্রীলেখা সব কথাই খুঁটিয়ে বললে মা'কে।

—গরীব বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্ মা—এতেই কি ভেঙ্গে পড়লে চলে! হয়ত আরও শুনতে হবে কত কি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন।

—বিয়ে দিও না মা, বেশ আছি।

—আজ বেশ আছিস, মা, কিন্তু আমরা গেলে কি হবে ভাব দেখি? আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় চাইতে গেলে হয়ত বা চিনি না বলে তাড়িয়ে দেবে, স্বামী ছাড়া আর কেউই আপন হতে পারে না, মা!

শ্রীলেখা নীরবে মা'র উপদেশ শোনে।

—দেখি বলে, ওরাই যদি রাজী—

উত্তেজিত হয়ে শ্রীলেখা বলে,—না না, কখনো নয়, মা। আমার জন্যে অত নীচু হও যদি তবে আর কিছু করতে না পারি, নিজের গলায় দড়ি দোব। যে সব কথা বলেছে, এর পর যেচে এলেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, মা!

মা হাসলেন। বল্লেন—না রে না, আমি মিছিমিছি বলছিলুম। কেন, তুই কি আমার মেয়ে নস্ যে যার—তার দোরে যেচে বেড়াব? তবে যেখানে ভবিতব্য সেখানে হবেই।

শ্রীলেখার বাবা পূর্ব্বোক্ত পাত্রের সঙ্গে সব কথা ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু একটু মুস্কিল হয়। পাত্রের বাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। প্রথম বিয়ের তারিখ যেদিন, সেদিন বিয়ে হলে ঠিক তার পর

দিনই তাকে রওনা হতে হবে, কারণ তার ছুটী ফুরিয়ে এসেছে। তার সঙ্গেই শ্রীলেখার বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেটির নাম কিশোর। বয়সে যুবক হলেও দেখতে কিশোরের মতই।

কিছুক্ষণ কথা বলে মা বোঝেন, শ্রীলেখা ভাল লোকের হাতেই পড়েছে।

যাবার আগে তাকে ডেকে গোপনে অনেক উপদেশ দেন, স্বামী ও সংসার সম্বন্ধে। শ্রীলেখারও মন আকুল হয়ে ওঠে, এখনই তাকে পরিচিতদের পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে অপরিচিতের আবেষ্টনীতে। হয়ত আর আসবে না কোন দিন।

অজিত পরিহাস করতে যায়, কিন্তু হাসির আবরণ খসে পড়ে, আগেকার সুর যেন কোথায় ছিন্ন হয়ে গেছে।

ক্রন্দনরতা শ্রীলেখা সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

দু'দিন ট্রেণে কাটাবার পর শ্রীলেখা পৌছায় স্বামীর কর্মস্থলে। ষ্টেশনের অদ্ভুত ঘোড়ার গাড়ীগুলো দেখে জানতে ইচ্ছে করে ওগুলির নাম, কিন্তু লজ্জায় কোন প্রশ্ন করে না।

কিশোর যেন বুঝতে পারে ওর মনের কথা। নিজে থেকেই সে বলে,—ওগুলোকে কি বলে জান? কখনো দেখনি বোধ হয়? ওটার নাম হচ্ছে টাঙ্গা।

পথে যেতে যেতে কিশোর সব জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় শ্রীলেখার। শ্রীলেখার লজ্জা একটু একটু করে ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। প্রশ্ন করে, আচ্ছা, ষ্টেশনে যে বাঙ্গালী লোকটি এসেছিলেন, তিনি কে?

উনি হচ্ছেন আমার সহকারী, ছেলেটি ডাক্তার, নাম অরুণ, আমায় দাদার মত শ্রদ্ধা করে।

—ও, আচ্ছা ঐটে কি?

—ঐটে এখানকার সরকারী হাসপাতাল।

—এইখানে আপনি—

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি নয় তুমি। এখানেই আমার কাজ।

—আর ঐ ছোট সুন্দর বাড়ীটা, ওটা কার?

—ওটা ভাল লাগছে?

—হ্যাঁ বেশ, সুন্দর, বেশ বাড়ীটি।

—ওটা হচ্ছে কিশোর-ভবন। কি, বুঝলে না? ওটা আমাদের বাড়ী।

ওরা এসে পৌছায় বাড়ীতে। শ্রীলেখার বেশ লাগে, খুব বড় না হলেও ছোট নয় বাড়ীটা। সামনে মস্ত বড় বাগান, পেছন দিকেও তাই। কিশোর সঙ্গে থেকে শ্রীলেখাকে বাড়ী-বাগান দেখায়। একটা বড় ফুল গাছের তলায় একটা কালো পাথরের ওপর সাদা কাজ করা বেদী। শ্রীলেখা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করে এটা কার কবর?

—ওটা কবর নয়। এ আমার গরমের সময়ের জায়গা। বোস ওখানটায়, ভাল লাগবে বেশ। আমি কত রাত্রে এখানে কাটিয়েছি। ঐদিকে যে ছোট ঘরটা, ওটা রান্না-বাড়ী, কিন্তু ওখানে এক জনকে আসবার জন্যে বলেছি। আমাদের হাসপাতালের পাশ-করা নার্স। আমি ত মাঝে মাঝে ট্যুরে যাব। বেশী দিনের জন্যে নয়, মাসে দু'-একবার যাব, দু'-তিন দিন থাকব। তখন একলা থাকবে—তাই। বেশ ভালো লোক, নাম লক্ষ্মী।

—হিন্দুস্থানী? আমি ত হিন্দী জানি না?

—শিখে নেবে। আর লক্ষ্মীর জন্ম এ দেশে হলেও বাংলা কথা জানে সে বেশ ভালই।

আসবার সময় মা আশ্বাস দিয়েছিলেন—তাড়াতাড়ি আসিস, আবার. কথাগুলিকে তা হয়ে উঠলো না। প্রথমতঃ, সংসার ছেড়ে গেলে কিশোরের অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ, কিশোরের ছুটী এত অল্প যে সে সহজে যেতে চায় না। অনুরোধ করে বলে—মা'র সঙ্গে ত এত দিন ছিলেই, পরে আবার যাবে, আমি ত মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই বাইরে কাটাই।

অনুরোধ এড়াতে পারে না শ্রীলেখা।

কিশোরের অনুপস্থিতিতে বড় নির্জ্জন লাগে শ্রীলেখার। নির্জ্জনতা আর ভালো লাগে না। মনে পড়ে ছোটবেলার সেই কোলাহল-মুখরিত কলকাতা। মনে মনে তুলনা করে এখান আর সেখানকার আকাশ আর জমিন। শ্রীলেখার মনে হয় একবার ছুটে চলে যায় মা-বাবার কাছে, দেখে আসে তারা কি করছেন। কতটা ভাবছেন শ্রীলেখার জন্যে।

প্রতি সপ্তাহে মা'কে আর সুলেখাকে চিঠি দেয় সে।

মা'কে জানায়, সে সুখী হয়েছে। জানতে ইচ্ছে করে রুমা আর সুজিতের কথা, হয়ত দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের খবর জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয়। সুলেখাও কিছু জানায় না।

—বৌদি, হঠাৎ একটা ভারী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলুম।

—কি বলুন ত?

—কিশোর-ভবন কবে "শ্রীভবনে" পরিণত হল?

—যবে থেকে ঘরে শ্রী প্রবেশ করেছেন তবে থেকেই শ্রীতে পরিপূর্ণ হয়েছে। দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী অরুণের কথার জবাব দেয়।

—কি যে বল লক্ষ্মী! লজ্জারক্ত স্বরে শ্রীলেখা বলে।

—ঠিকই বলেছে বোন—আচ্ছা, চলি বৌদি।

—এরই মধ্যে!

—যাচ্ছিলুম হাসপাতালে, নাম পরিবর্ত্তন দেখে ভাবলুম, এত দিন কিশোর-ভবন দেখলুম আজ দেখে যাই শ্রীভবন। আচ্ছা, বৌদি চললুম; লক্ষ্মী, তুমিও যাবে না কি?

—আপনি এগোন, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পর পর দু'জনেই চলে যায়। শ্রীলেখা হাঁপিয়ে ওঠে একলা। কিশোর সাত দিনের জন্য গেছে বাইরে। বসে বসে কত কি ভাবে শ্রীলেখা। হঠাৎ একটা অভিসন্ধি জাগে মনে।

ডিউটি শেষ করে লক্ষ্মী বাড়ী ফিরতেই শ্রীলেখা তার কাছে আবেদন জানায়।

—বেশ ভালো কথা দিদি, কিন্তু তোমার বর অত বড় ডাক্তার—তার কাছে না পড়ে আমার কাছে পড়বে কেন?

—বরকে জানাব না, শুধু তুমি আর আমি বুঝলে?

শ্রীলেখা মহানন্দে পড়া সুরু করে দেয়। আনন্দ এই যে, সবাইকে সে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবে।

কিশোরের ট্যুর করা যেন বেড়ে যায়। শ্রীলেখা খুসী হয় যেন কিশোরের অনুপস্থিতিতে। সে ভাল করেই পড়বার সুযোগ পায়।

পড়তে পড়তে ভাবে—দিদি, মা, বাবা কি বিশ্বাস করবেন যে শ্রী ডাক্তারী পাশ করেছে ?

দিন কেটে যায় একটু যেন দ্রুতগতিতেই। শ্রীলেখা আর ব্যস্ত হয় না কলকাতার জন্য। কিশোর খুশী হয়। মা প্রতি পত্রে আসবার আমন্ত্রণ জানান। শ্রীলেখা অসুবিধার কথা জানিয়ে আশ্বাস দেয়। শ্রীলেখা মা'র পত্রে জানতে পারে, সুলেখা এখন দু'সন্তানের জননী। ছেলে প্রথম, মেয়ে তার পরে।

পড়ার চাপে তাদের দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করতেও শ্রীলেখা ভুলে যায়। কিশোর বলে, আজকাল আর ত কলকাতায় যাবার জন্যে ব্যস্ত হও না ?

শ্রীলেখা বলে, বয়সের সঙ্গে মায়াটা কমে আসছে বোধ হয়, দেখ না, তোমার শাস্ত্র কি বলে।

শ্রীলেখার পড়ার খবর অজ্ঞাত থাকে সকলের কাছেই। আর একটা বছর। অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে শ্রীলেখা—আর একটা বছর। সে পাশ করবেই, পড়ায় কোন দিনও অবহেলা করে নি সে।

টেলিগ্রামটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে যায় শ্রীলেখা। ভাবতেও পারে না এ কি সম্ভব ? সত্যিই কি মা নেই ? আজ ছ'বছর তার বিয়ে হয়ে গেছে, এক দিনও মা'র কাছে যেতে পারেনি, মা'র সঙ্গে আর দেখা হোল না। শ্রীলেখা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে কাঁদতে থাকে। কিশোর নেই কাছে। লছমী হাসপাতালে। শ্রীলেখা ভেবে পায় না কি করবে ? মা মারা গেছে কলেরায় আর বাবাও সেই রোগে আক্রান্ত। শেষ দেখা করতে চান তিনি।

শ্রীলেখা তার ছোট চাকরটাকে হাসপাতালে পাঠায় অরুণের কাছে। খবর পেয়ে অরুণ তাড়াতাড়ি চলে আসে। কিশোর নেই, হঠাৎ বুঝি কোন বিপদ-আপদ···কথাটা মনে হতেই অরুণ চলে আসে তাড়াতাড়ি।

ঘরে ঢুকে শ্রীলেখাকে কাঁদতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে—বৌদি, তুমি কাঁদছ কেন ? কিশোর দা···

শ্রীলেখা নীরবে টেলিগ্রামটা এগিয়ে দেয়। সবটা পড়ে একটু আশ্বস্ত হয় সে।

—আমায় কি করতে বল ?

—যেমন করে হোক ওঁকে একবার খবর পাঠান, আমি কলকাতা যাব নইলে হয়ত বাবাকেও আর দেখতে পাব না। শ্রীলেখার চোখ জলে ভেসে যায়।

—কিন্তু বৌদি, কোথায় যাব তার ত ঠিক নেই, দু'-তিন যায়গায় তাঁর যাবার আছে···

—তবে আপনিই আমায় নিয়ে চলুন।

—আমি ত ছুটী পাব না। কিশোর দা নেই তার পর আমি যদি চলে যাই তবে কাজ চলবে না। আচ্ছা, আমি দেখছি যদি খবর দিতে পারি। যদি খবর পায় তবে সে আজ-কালের মধ্যেই এসে পড়বে।

শ্রীলেখার কান্না ছাড়া সম্বল ছিল না আর কিছু। তাই খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে দুটো দিন কেঁদে কেঁদেই শেষ হয়ে গেল।

পরদিন কিশোর ফিরল। তাকে কেন ডাকা হয়েছে তা তার অজ্ঞাত। তাই শ্রীলেখাকে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করে,—এ কি শ্রী ? কাঁদছ কেন ? ওঠ, বল কি হয়েছে।

শ্রীলেখা নতুন একখানা টেলিগ্রাম বার করে দেয়।

সবটা পড়ে সে অপরাধীর মত প্রশ্ন করে,—মা'র কাছে যাবে শ্রী ?

শ্রীলেখা বালিসের তলা থেকে আর একখানা টেলিগ্রাম এনে দেয়।

কিশোর অপরাধীর মত চুপ করে থাকে।

অসময়ে ফিরে আসায় আবার কিশোরকে ফিরে যেতে হয়। এবার সে সঙ্গে নিয়ে যায় শ্রীলেখাকে। শ্রীলেখা আপত্তি করেনি। কি হ'বে বাড়ীতে থেকে ?

নতুন জায়গায় এসে শ্রীলেখা বড় অসুবিধায় পড়ে। পল্লী অঞ্চল, কাঁচা রাস্তা, খোলার ঘর। ঠাণ্ডায় কষ্ট হয়। শ্রী ভবনে ফেরবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সেদিন কাজ সেরে ফিরে কিশোর বলে—চল শ্রী, এবার বাড়ী চল।

কথার সুরে সন্দেহ ক'রে কিশোরের দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলো শ্রীলেখা। গা ভীষণ গরম। কিশোর শুয়ে পড়ে। অসুস্থ কিশোরকে নিয়ে শ্রীলেখা এই খোলার ঘরে থাকতে রাজী হয় না। স্থানীয় লোক-জনদের সাহায্যে কিশোরকে সে শ্রী-ভবনে নিয়ে আসে।

শ্রীলেখার সেবা ও চিকিৎসায় কিশোর প্রশ্ন করে বিস্মিত হয়ে।

সব কথা বলে শ্রীলেখা।

সানন্দে কিশোর বলে—তবে তোমার চাকরী গেল অরুণ। আর তোমায় দরকার নেই, আমি সেরে উঠলে শ্রী-ই হবে আমার প্রধান সহকারী।

—সত্যি বৌদি ? অরুণও বিস্মিত হয়। শ্রীলেখার কাজেই প্রমাণ হয় সত্যতার।

জ্বর কমছে না দেখে শ্রীলেখা ভয় পায়। বুঝতে পারে, এ শুধু সামান্য জ্বর নয়, বোধ হয় টাইফয়েড। শঙ্কিত হয়ে সুলেখাকে আসবার জন্যে লিখে দেয়।

কিছু দিন পরে শ্রীলেখার আহ্বানের পর আসে তার চিঠি,—অনেক যুক্তি অসুবিধা জানিয়ে লিখেছে তার আসা সম্ভব নয়। শ্রীলেখা স্তম্ভিত হয় চিঠি পড়ে। সুলেখা যে এভাবে কোন দিন চিঠি দেবে তা কল্পনা করেনি সে। মনে পড়ে কাঞ্চনপুরের যত আত্তি। এ ত সেই দিদিরই পত্র। শ্রীলেখা হতাশ হয়ে পড়ে।

কিশোর বলে,—দিদি কিছু অন্যায় লেখে-নি শ্রী. মনে করে দেখ, তোমায় যদি কেউ যাবার জন্যে বলতো তবে তুমিই কি নিজের ঘর-সংসার ফেলে যেতে পারতে ? তার আবার দু'টি-তিনটি ছেলে-মেয়ে।

শ্রীলেখা চুপ করে থাকে।

অরুণ বলে—বৌদি, ব্যস্ত হবেন না, কিশোর দা'কে সারিয়ে তোলাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ। তার পর তুমি আছ, লছমী আছে, কিছু ভয় পেও না, ও সেরে উঠবে।

ক্ষীণ স্বরে কিশোর বলে,—হ্যাঁ অরুণ, আমায় তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোল, আমি সেরে উঠে শ্রীকে পড়াব। আমি থাকতে ও অন্যের কাছে পড়বে কেন ? কি বল শ্রী ? রাজী ত ?

শ্রীলেখার আশা-ভরসা আর অরুণের চেষ্টা ব্যর্থ করে, তার আশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত করে এক দিন কিশোর সত্যিই ছেড়ে চলে গেল।

একত্রিশ দিন সমান রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি যেন আজ শ্রীলেখার দেহে ভর করলো। কিশোরের মৃতদেহের পাশে সমানে বসে রইল সে। তার চোখের জল নিঃশেষ হয়ে গেছে। পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে সে অরুণের কার্য্যকলাপ দেখতে থাকে।

—বৌদি ওঠ, যা হবার তা হবেই, এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।

শ্রীলেখা সহজ সুরে বলে—দুঃখ ত করিনি একটুও।

অরুণ কিছু বলে না। মনে মনে ভাবে, তাই ত আরো ভয়!

—তবে ওঠ বৌদি, আজ দু'দিন তুমি কিছু মুখে দাওনি। এতে শরীর খারাপ হবে যে! তোমার দিদির কাছে খবর পাঠাব বৌদি?

—কেন?

—তিনি আসুন এখানে···

—না থাক, আমার জন্যে কাউকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আর যারা এ খবরে বিচলিত হয়ে চলে আসতেন তারাই নেই। কাকেও খবর দিতে হবে না। সম্পর্কের বলতে আপনি ছাড়া আর কেউই নেই।

—তবু বৌদি একলা এখানে থাকা—আর তা ছাড়া ব্যবস্থাই বা কি হবে?

—ব্যবস্থা আমি নিজে করব। এখান ছেড়ে অন্য কোথাও আমি যেতে পারব না—একলা! তা লছমী ত থাকবে, এ ছাড়া উপায় কি?

—বেশ, আমি রোজ আসবার চেষ্টা করব।

শ্রীলেখার জীবনের বীণার তার যেন ছিঁড়ে যায়। ক'মাস আগে কিশোর মারা গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে শ্রীলেখার হাসি, ভাষা, সুখ। পড়তে বসে, কিন্তু মন বসে না। কি হবে পড়ে? রাত জেগে পড়া করে পাশ ক'রে কাকে আশ্চর্য্য করে দেবে সে?

বাগানটা আগাছায় ভরে ওঠে। কিশোরের হাতে-গড়া বাগান, শ্রীভবনের শ্রী যেন বাড়িয়ে তুলত। কাজের অবসরে ওরা দু'জন বাগানের কাজে নিযুক্ত হোত। সামান্য মাটি খুঁড়ে, গাছের গোড়ায় জল ঢেলে কত আনন্দ তারা পেত।

এইখানে বসত, ঐখানে লিখত। এইটা শোবার ঘর। আলনায় জামা-কাপড়। খাটের নীচে চটি জোড়া তেমনি বাঁকা ভাবে পড়ে রয়েছে। তার ব্যবহার-করা সব জিনিষই রয়েছে, শুধু সে নেই—যার অভাবে শ্রীলেখা থাকতেও শ্রীভবন শ্রীহীন হয়ে উঠেছে।

ঐ বকুল গাছের তলায় সাদা পাথরের কাজ-করা কালো বেদীটা—যেটা কবর বলে ভুল করে ছিল শ্রীলেখা। সেটাতে ওরা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে এসে বসত। কিশোরের গলা ছিল বড় মিষ্টি। শ্রীলেখার গলা অত সুন্দর না হলেও গাইতে পারত সেও। দু'জনে এখানে কত গান গেয়েছে। শ্রীলেখার দু'চোখে জল ভরে যায়।

বকুল গাছটা আজ ফুলে ভরে গেছে। আজ পূর্ণিমা। চাঁদের রূপালী আলো পড়ে গাছটা বড্ড সাদা দেখাচ্ছে—শ্রীলেখার পরনের পাড়হীন থানের মতই।

তেলহীন চুল লালচে ভাব ধারণ করছে! দেহ হয়ে গেছে ক্ষীণ। কিশোর অসুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত তার শরীর খারাপ হতে থাকে, এখন অবহেলা আর অযত্নে দিন-দিন আরো খারাপ হয়। [illegible] মুখ সব সময়েই শুকনো, চোখে জল নাই, অধরে হাসি, মুখে ভাষা—তাও যেন লোপ পেয়েছে। হাত দুখানি নিরাভরণ। তাকে দেখলে কান্না পায় অথচ সে নির্ব্বাক নির্ব্বিকার যেন পাথরের প্রতিমূর্ত্তি!

যে শ্রীলেখা প্রশ্নে প্রশ্নে কিশোর আর লছমীকে অস্থির করে তুলত, সে আজ নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে। লছমী বলত,—পড়ার সময় বাজে কথা বলে অন্যমনস্ক হলে পড়া ভুলে যাবে।

তার শূন্য হাত দু'টি দেখে এক দিন থাকতে না পেরে লছমী অনুরোধ করে বলল,—দিদি, অন্ততঃ দুগাছা চুড়ী পর, ও হাত আর যে দেখতে পারছি না।

মৃদু হেসে বলে,—কার জন্যে পরব? কি হবে? সে হাসি যেন ঠিক কান্নারই প্রতিমূর্ত্তি। অপ্রতিভ লছমী নীরবে সরে যায়।

অরুণ বলে—বৌদি, এত চুপচাপ থেক না—কথাবার্ত্তা কও, নয় ত শক্ত অসুখ কিংবা পাগল হয়ে যাবে।

—কি কথা বলব? সব কথা আমার ফুরিয়ে গেছে।

অরুণ মনে মনে বলে, এ রকম কথা বলার চেয়ে নীরবে থাকাই ভাল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই আর বলে না শ্রীলেখা।

মনকে শক্ত করে বই খুলে পড়তে বসে শ্রীলেখা।

অরুণ তিন মাসের জন্যে সহরতলীর কোন এক হাসপাতালে চলে গেছে। ইচ্ছা না থাকলেও তাকে যেতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু শ্রীলেখা পাশ দেয়নি। এ অঞ্চলে তাকে সকলেই চেনে, তাই পাশ না করলেও প্র্যাকটিশের কিছু ক্ষতি করে না।

বইয়ের পৃষ্ঠায় যেন কিশোরের ছবি ভেসে ওঠে। শ্রীলেখা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদেই ভ্রম বুঝতে পেরে স্থির হয়ে বসে। কত কথা মনে পড়ে। লছমী চলে গেছে এখান থেকে। চলে গেছে সুদূর বিহারে। বিয়ে করেই গেছে। ওদের স্বজাতি লোকটি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছিল। তাকে সেবা-শুশ্রূষা করবার ভার লছমীর ওপর পড়ে। সে আরোগ্য হয়ে লছমীকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যায়।

সেই থেকে শ্রীলেখা একলা।

সব সময়ে মনে পড়ে কলকাতার কথা, কিশোরের কথা। তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইলেও তারা রেহাই দেয় না। বারে বারে মনে পড়ে অতীতের কথা।

মনে পড়ে যায় কাঞ্চনপুরে তাদের সেই পরিচয়ের ভ্রমের কথা। ঘটনাটি যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শ্রীলেখা সব কথা স্মরণ করে হেসে ফেলে।

ঘরে ঢোকে অরুণ। শ্রীলেখাকে এ ভাবে একলা বসে হাসতে দেখে সে বিস্মিত হল। কিশোর মারা যাবার পর বোধ হয় এই প্রথম তার মুখে হাসি। কিন্তু কি এমন ব্যাপারে যা ওর শোক-গাম্ভীর্য্যকে পরাভূত করে হাসি ফুটে উঠতে পারে। শ্রীলেখার হাতে-ধরা বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে হাস্যরসের অনুসন্ধান করে।

—কি দেখছেন? এ তো আপনাদের পরিচিত বই।

—তাই ত দেখছি। নীরস ডাক্তারী শাস্ত্রে হাস্যরস পেলে কোথায়?

—বলব। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে।

—এখনও ঠিক ফিরিনি, কাজে এসেছি, আজই আবার চলে যাব, তা তোমার···আচ্ছা, আগে তোমার কথাটা শুনে নিই, বল।

শ্রীলেখা সব ঘটনা বলে যায়।···

—বেশ মজার ত! হ্যাঁ, শোন, যে জন্ম এলুম বলি, কে যেন এক ব্যারিষ্টরের মেয়ে—সে এখানে এসেছে শরীর সারাতে, এখানে বুঝি চেনা কেউ আছে। তা যাক গে, মেয়েটির শরীর খারাপ···আমায়···

ডেকে সে কথা শুনে আমার লাভ কি?

—শোন না আগে সবটা। তার পর আমায় ডেকেছিলেন, আমি আজ এসেছি, ওরা খবর পেয়েছিলেন। সে যাই হোক, গেলুম কিন্তু 'পেসেন্ট' আমার কাছে চিকিৎসা করাতে নারাজ। তাঁর আত্মীয়টি আমার কাছে মাপ চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোন ভাল লেডী ডাক্তার আছে কি না। আমি তোমার ঠিকানা দিয়ে এসেছি। এখুনিই হয়ত ডাকতে আসবে। খুব সম্ভব আজ-কালের মধ্যেই 'ডেলেভারি' হবে······

পেসেন্টকে না দেখেই বুঝে নিলেন······

—হ্যাঁ, যে-সব উপসর্গ শুনলুম তাতেই অনুমান করে নিলুম, তবে এটা যে নির্ভুল অনুমান তা বলছি না। ঐ শোন, কড়া-নাড়ার আওয়াজ, এলো বোধ হয় ডাকতে। ভাল কথা, কেস জুটিয়ে দিলুম—কমিশন চাই।

—নিশ্চয় পাবেন। আপনি বসুন, আমি ঘুরে আসি।

ব্যাগটা নিয়ে শ্রীলেখা চলে যায়।

অরুণ এদিক্ সেদিক্ দেখতে থাকে। পেসেন্টের মেজাজ অতিরিক্ত খিট্‌খিটে। অবশ্য তার সঙ্গে কোন কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের ছেলের বউ, এ জন্য অহঙ্কার আছে একটু। অবশ্য ভুগে-ভুগে মেজাজ খারাপ হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। শ্রীলেখার সমবয়সী হবে কিন্তু আরও অল্প বয়স দেখায়। শ্রীলেখা যেন প্রৌঢ়ার মত হয়ে গেছে।

বাড়ী ফিরতেই অরুণ প্রশ্ন করে—কেমন দেখলে?

—খুব ভালো মনে হোল না, তবে মনে হয় বেঁচে যাবে, দু'-এক দিনের মধ্যেই হবে।

—আচ্ছা, আজ তবে চলি, আবার আসব সুবিধা পেলে।

—আচ্ছা।

মেয়েটির নাম বেলা। বড় বেশী কথা বলে। শ্রীলেখা তাকে বলে—অত বেশী কথা বলা ঠিক নয় তোমার, বেলা!

বেলা বলে—কথা বলতে দিন, এখানে এসে অবধি প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। আমি যখন এখানে আসি তখন···

বেলা বলে চলে—তার স্বামী তাকে কত ভালবাসে, আসবার আগে ওরা খুব চিন্তিত হয়েছিল কি করে ছেড়ে থাকবে। শ্রীলেখা সব কথা শোনেও না।···আমার এক ননদ আছে, বেশ ভালো দেখতে, আমার চেয়েও বড়, কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি।

শ্রীলেখা মনে মনে বিরক্ত হয়। বলে এবার চুপ কর বেলা—নয় ত কাল থেকে আমি আর আসব না। আমি এলে তুমি বড্ড বেশী কথা বল, এটা ঠিক নয়।

বেলা অনুনয় করে বলে—না না, আপনি আসবেন, আমি চুপ করে আছি রেখাদি, আপনি আসবেন।

শ্রীলেখা রেখা দেবী নামে প্র্যাক্‌টিশ করে। বেলার ছেলেকে ওষুধ দিতে দিতে বলে,—আচ্ছা।

খানিকক্ষণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বেলা আবার কথা আরম্ভ করে।

—জানেন রেখাদি', এই সপ্তাহে আমার ননদ আসবে, আপনার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবো।

—কার সঙ্গে আসবে? ওর বরের সঙ্গে?

—না, আপনি বড্ড ভুলে যান রেখাদি', তার বিয়ে হয়নি, কোলকাতার স্কুলের ইন্‌সপেক্টার, না কি!

শ্রীলেখা বুঝতে পারে, তবু বেলাকে একটু খুসী করবার জন্ত প্রশ্ন করে ও,—তবে তোমার বরের সঙ্গে আসবে বুঝি?

বেলার লজ্জা দেখে শ্রীলেখা হাসে। বাড়ী ফেরবার সময় তার মা'কে বলে আসে, তার রোজ আসবার দরকার নেই! ইঞ্জেকশনটা সপ্তাহে দু'তিন-বার চলবে, তবে দরকার বোধ করলে ডেকে পাঠাবেন।

বাড়ী ফিরে ক্লান্ত ভাবে শ্রীলেখা বসে পড়ে। টেবিলের ওপর থেকে এ্যালবামটা তুলে নিয়ে কিশোর আর তার ছবিগুলো দেখতে থাকে তন্ময় হয়ে। কতক্ষণ কেটে যায়, আয়া এসে খবর দেয়,—বেলার বাড়ী থেকে চাকর এসেছে, ডাকছে। কোন বিপদ অনুমান করে শ্রীলেখা ব্যস্ত হয়ে চলে আসে।

—কি হল? এইমাত্র ত দেখে গেলুম, এরই মধ্যে···

—না না, কিছু হয়নি, দু'জনেই ভাল আছে।

—তবে

—বেলার ননদ এসেছে তাই···

শ্রীলেখার ইচ্ছে হয় হাস্যমুখী মহিলার গালে চপেটাঘাত করে চলে আসে, কিন্তু ভদ্রতায় বাধে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে বেলার ওপর। উপরে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেন বেলার মা। প্রশংসা করে মহিলাটি বলেন—আপনার সেবা-যত্নের কথা শুনলুম মা'র কাছে।

—সেটা কি খুব প্রশংসার বিষয়? ওটা আমাদের পেশা।

হঠাৎ মেয়েটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে—আচ্ছা শুনলুম, আপনার স্বামী অনেক অর্থ রেখে গেছেন, তবে আপনি···

—আমি যেন রোজগার করি তাই বলছেন ত? অর্থের জন্ত আমি ডাক্তারী করি এটা ঠিক নয়। তবে ধনীদের কাছ থেকে অর্থ নিই, সে অর্থ আমার জন্যে নয়, গরীব রোগীদের জন্যে। আচ্ছা আজ উঠি, নমস্কার।

শ্রীলেখা একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আবার ফিরে এসে বলে, আপনার জামাইয়ের আসার কথা ছিল এসেছেন?

—না, কাজে আটকে গেছে, কাল এসে পৌঁছবে লিখেছে। তা, কাল ও ইন্‌জেকশনটা দেবে না কি?

—হ্যাঁ, ওটা বন্ধ করা চলবে না। আচ্ছা নমস্কার।

সকলকে নমস্কার জানিয়ে সে গাড়ীতে এসে বসে। হঠাৎ মনে পড়ে, মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি ত? চেনা-চেনা মনে হয় অথচ মনে পড়ে না, কে? অস্বস্তি লাগে বড়। আবার ভাবে, চেনা হলে সেও ত আমায় চিনতে পারত। দেখতে মন্দ নয়, তবে বড্ড বেশী বয়স হয়েছে বলে মনে হয়।

নানা রকম চিন্তা করতে করতে বাড়ী এসে পৌঁছায়।

ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়তেই চমকে ওঠে। আগামী কাল তাদের বিয়ের তারিখ।

বিছানা থেকে উঠে সব ঘর পরিষ্কার ক'রে শ্রান্ত ভাবে আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়। চাকরকে বলে দেয়, কেউ ডাকলে বলে দেয় যেন সে বাড়ী নেই।

বিছানায় শুয়ে কত অবান্তর কথা মনে পড়ে তার। ভাবতে ভালো লাগে না অথচ ভাবনা যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সুলেখার কথা মনে পড়ে, সে ছিল কত আপন, কিন্তু পরিবর্ত্তন হল, আপন হল পর। সংসার হল সব কিছুরই বিপর্য্যয়।

সে, নতুন সংসারে এলো সেখান থেকে সরে, দিদিও সন্তানদের নিয়ে জড়িয়ে পড়ল নিজের সংসারে।

মার আশা ছিল, শ্রীলেখা যেন সুখী হয়, সুলেখার মত ধনিগৃহে যেন তার স্থান হয়। সুখী সে হয়েছিল। সুলেখার মত বড়লোক না হলেও কোন কিছুর অভাব ঘটেনি তাদের।

বিছানায় শুয়েই থাকে। সকাল হয়ে গেছে কখন, কিন্তু তবু শুয়ে থাকে। আজ তার বিয়ের তারিখ। কত হৈ-চৈ করে আগে আগে কাটিয়েছে তারা এই দিনটি। এতো সুখ ভগবান সহ্য করলেন না।

কত কথাই মনে পড়ে। তবুও উঠতে হয়। আজকের দিনটাতেও সে নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করতে পারবে না। সময় হয়ে গেছে।

যাবার আগে বাগান থেকে এক গোছা সাদা ফুল নিয়ে এসে কিশোরের ছবিটাকে ভালো করে সাজায়। তার পর অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে চলে যায়।

বেলা ও তার শিশুপুত্রটি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে ওঠে শ্রীলেখার চিকিৎসা ও এ-দেশীয় জলবায়ু বা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্ত। কুশলাদি প্রশ্নের পর তাকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বার করতে দেখে বেলা অনুনয় করে বলে,—আজকে ওটা থাক না, রেখাদি'!

স্পিরিটসিক্ত তুলা দিয়ে ছুঁচটা পুঁছতে পুঁছতে শ্রীলেখা বলে—সে কি বেলা, আজ অন্ততঃ তোমার দু'টো নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বলছ যখন, তখন একটাই···আচ্ছা, মুখটা ওদিকে ফেরাও, এদিকে কিছু দেখতে হবে না তোমাকে···ব্যস, এই ত হয়ে গেল।

—উঃ, বেলা বিকৃতস্বরে বললে। শ্রীলেখা হাসলে।

—বাপের মুখটা যেন কেটে বসানো হয়েছে। নাতীকে আদর করতে করতে তার দিদিমা বললেন।

শ্রীলেখার মনে পড়ে যায়, তার জামাইএর আসবার কথা।

—আপনার জামাই এসেছেন?

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ত একেবারে ভুলে গেছি। ও কেষ্ট, একবার যা তো, জামাই বাবুকে বলে আয়, ডাক্তার দিদি এসেছে।

শ্রীলেখা বলে—আজ থাক, পরে হবে, এখন ট্রেণ-জার্ণি···

—না না আসুক মা, যদি কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে।

শ্রীলেখা মাথার কাপড় টেনে বসল। বেলার স্বামী ঘরে ঢুকতেই সে প্রশ্ন করলে—কেমন ছেলে দেখলেন?

—নিজের ছেলে, তবুও বলি চমৎকার। মা'র কাছে আপনার সেবা-যত্নের কথা শুনলুম, আপনি না থাকলে হয়ত কেউই বাঁচত না।

কণ্ঠস্বরটা পরিচিত মনে হতেই শ্রীলেখা মুখ তুলে চাইলে।

ইনি বেলার স্বামী? এত পরিচিত তবুও তাকে চিনতে পারলে না কেউ? বেলার ননদও নয়? তাকে কি এত কুশ্রী দেখতে হয়ে গেছে যে···

মাথার কাপড়টা বেশী করে টেনে, কণ্ঠ স্বর মৃদুকরে শ্রীলেখা বলে—উনি আমাকে বড্ড স্নেহ করেন তাই এত কথা বলেছেন, এ ত আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের পেশা।

—তা হলেও কর্ত্তব্য ক'জন করেন বলুন?

—মানুষের মত, নারীর মতই যদি নারীর হৃদয় থাকে তবে সে কখন কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। বেলা আর ছেলেটির জন্ত ভাববেন না, তারা দু'জনেই সুস্থ। আচ্ছা, এবার আমি চলি, নমস্কার।

শ্রীলেখা প্রতি-নমস্কারের অপেক্ষা না করেই দ্রুতগতিতে গাড়ীতে এসে বসে—বেলার মা'র খাবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

শ্রীলেখা ভেবে পায় না, সে যত অপরিচিত থাকতে চায়, ভগবান যেন তাকে পরিচিত করাতে চায় সকলের সঙ্গে। এ ছাড়া এমন পরিচিত ব্যক্তি এসে পড়েছে সামনে—যার সঙ্গে অতীত দিনের অনেক কথাই স্মরণে আসে।

শ্রীলেখা স্থির করতে পারে না তার কি কর্ত্তব্য। সেদিন বেলাদের লোক ডাকতে এসে ফিরে গেল। শ্রীলেখা জানিয়ে দিলে, তার যাবার প্রয়োজন নেই। নার্স থাকলেই যথেষ্ট।

অন্যান্য রোগীকে পরিদর্শন করলেও মনটাকে আকর্ষণ করছিল বেলার ছোট ঘরটি। ছোট ঘরটিকে কেন্দ্র করে তার চিন্তাসূত্র জাল বুনে চলে। রোগী দেখা শেষ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ীতে এসে ঢোকে।

ঘরে প্রবেশ করে বিস্মিত হয় সে—ঘরে বসে গল্প করছে অরুণ আর বেলার স্বামী। তিনি নিজে এসেছেন শ্রীলেখাকে নিয়ে যাবার জন্ত।

অরুণ বলে—বৌদি, আমি জানতুম না যে তোমার রোগী আমার বন্ধুর স্ত্রী। আজ ভাগ্যের ফেরে এখানে এলুম তাই একটা পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা পেলুম।

শ্রীলেখা প্রশ্ন করে না। কখন এলে, কেমন আছ। শুধু শুষ্ক-মুখে বলে—ভালো, কিন্তু আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত, তাই অভ্যর্থনায় ত্রুটি হবে কিঞ্চিৎ।

—অভ্যর্থনার জন্ত ব্যস্ত হতে হবে না। এবার ত আপনি আমারও বৌদি হলেন, সময়ে-অসময়ে এসে জ্বালাতন করে যাব।

শ্রীলেখা কিছু বলে না। স্মিত মুখে ঘাড় নেড়ে চলে যায় নিজের ঘরে। অনেকক্ষণ পরে অরুণ এসে বসে।

শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করে—বন্ধুর সঙ্গে কথা হল? কি বললে?

—এমনিই, কি করি, কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করছিল, আর তোমার কথা ও জানতে চাইলে।

—কি বললেন?

—বললুম আমার দাদার স্ত্রী। হেসে বললে, বেশ, গুণীসুদ্ধ ডাক্তার।

পরদিন সকালে বেলার স্বামীর আগমন-সংবাদ পেয়ে শ্রীলেখা অত্যন্ত বিরক্ত হোল। অরুণ চলে গেছে, বেলা ভালো আছে, তবু কেন বার বার আসে ভদ্রলোক। ভদ্রতার খাতিরে তবু আসতে হয় বাইরে।

সপ্রতিভ কণ্ঠে তিনি বলেন—আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনাকে সেটা রাখতে হবে।

—কি অনুরোধ, না জেনে বলতে পারি না—রাখতে পারব কি না।

—তা শুনব না, এটা রাখতেই হবে।

—অসম্ভব বা অন্যায় হলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—না না, অন্যায় অনুরোধ করব কেন? আমি বলছি, আমার বোনটিকে আপনার ঘরে স্থান দিতে হবে। আপনিও তাকে দেখেছেন, অপছন্দ হবে না নিশ্চয়ই।

—আপনার বোনকে? তাকে নিয়ে আমি কি করব? আমার ত কেউ নেই।

—অরুণের জন্যে নিতে বলছি।

—ভুল করেছেন সুজিত বাবু, যার কাছে প্রয়োজন সেখানে যান, কাজ হবে আপনার।

—বলেছিলুম তাকে, কিন্তু সে বলে, বৌদি বেঁচে থাকতে আমি কি বলব? আপনি যদি পছন্দ করেন তবে···

—আমার পছন্দ অপছন্দ অবান্তর। সে বুদ্ধিমান, বিবেচনা করার বয়স হয়েছে, সে যদি ভালো বোঝে···

—সে অনুমতি চাইছে আপনার···

···বেশ, আমি মত দিচ্ছি, কিন্তু আপনারা আমার দেওরটিকে ভাল করে বাজিয়ে বাচিয়ে নেবেন, সে গরীব, বড়লোক নয়, চাকরিটুকু সম্বল, আপনার মা পছন্দ করবেন ত?

—মা? হ্যাঁ, অরুণের রূপ-গুণ দুই-ই আছে···

—না, নেই; রূপ আছে শুধু, রূপো নেই; গুণের মধ্যে তার ব্যবহার, এই ত? আপনার মা যদি এতেও পছন্দ করেন তবে বলব—তাঁর সুবুদ্ধি···মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

—মানে, আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝলুম না।

—কেন, এতই শক্ত? যাক গে, আমায় চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ, আপনি অরুণের বৌদি।

—শুধু তাই নয়, আপনার বৌদির ছোট বোন—চিনতে পারছেন?

—আপনি শ্রীলেখা দেবী? এই চেহারা হয়েছে আপনার? আমি চিনতেই পারিনি। এখানে—এ ভাবে দেখব, তা কল্পনাও করতে পারিনি কোন দিন!

—কোথায় আর কি ভাবে দেখবেন আশা করেছিলেন, জানি না! তবে এখন যে ভাবে আর যেখানে দেখছেন, এটা সত্যই।

সুজিত প্রশ্ন করে—ওখানকার খবর জানেন?

—না, জানতেও চাই না, পরিবর্ত্তনশীল জগতে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়েছে, পুরানো দিনের ছিন্নসূত্র সম্পর্ক, কে আর কতটা ধরে রাখতে পারে? পুরানো চলে যায়, নতুনের হয় আবির্ভাব।

—একটা কথা কিন্তু পুরানোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এক দিন আপনাকে বৌদি বলে ভুল করেছিলুম, তাই আজ বৌদির রূপে দেখা পেলুম।

শ্রীলেখার মনে পড়ে যায় ঘটনাটা।—আপনার অনুরোধ আমার মনে আছে, আপনি এখন আসুন।

সুজিত চলে গেল নীরবে।

কি করবে কিছু স্থির করতে না পেরে শ্রীলেখা একখানা চিঠি লিখতে আরম্ভ করে।

চিঠি শেষ করে শ্রীলেখা সারা বাড়ীটা বার বার ঘুরে ঘুরে দেখে। বাগানে বেদীটায় বসে খানিকক্ষণ। আবার ঘরে এসে চিঠিটা পড়ে। খামের ভেতর বন্ধ করে চিঠিটাকে। তার পর আলমারী খুলে কিছু জামা-কাপড়, টাকা নিয়ে সুটকেশ গোছাতে বসে।

দেয়ালে টাঙানো বিয়ের ছবিটা, টেবিলের ওপরে কিশোরের ছবি আর এ্যালবামটাও সুটকেশে নিয়ে নেয়।

আলমারী খুলে একখানা রঙীন শাড়ী ঘুরিয়ে পরে। বাম হাতে পরে সরু ছোট্ট ঘড়িটা, ডান হাতে এক গোছা চুড়ী। সুটকেশটা বন্ধ করে চাকরের হাতে চিঠিটা দিয়ে বল্লে,—অরুণের কাছে দিয়ে আসবে।

শ্রীলেখার কাছে বলেও সেই দিন অরুণ ফিরে যায়নি কর্ম্মস্থলে। সুজিত এসে তাকে সুখবর জানিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই এলো শ্রীলেখার চাকর চিঠি নিয়ে।

চিঠি না খুলেই অরুণ অনুমান করে নিলে এর ভেতর আছে বৌদির অনুমতি-পত্র।

একটু ইতস্ততঃ করে খুলে ফেললে চিঠিটা।

'ঠাকুরপো,

বিধাতার ইচ্ছানুসারে শ্রীভবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি—আমার অনিচ্ছাসত্বেও। ইচ্ছা রইল-মৃত্যুর আগে এখানে আসব। আমার শ্রীভবনের ভার তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। শ্রীভবন নামটা থাকবে, কিন্তু একে গড়ে তুলো সেবা-ভবন ক'রে। আমার সমস্ত অর্থ রইল এর ব্যয়ের জন্যে। আলমারীতে গয়নাও রইল। এসবের চাবী দিয়ে যাচ্ছি আয়ার হাতে। চিঠি পড়ে ব্যস্ত হোয় না।

আমার জন্যে চিন্তাও কোর না। কোথায় যাব জানি না এখনও। সুজিত বাবুর বোন কৃষ্ণা আমার বন্ধু। আমাদের পরিচয়ের কথা তুমি শুনেছ। এরা আবার আমার জামাই-বাবুর ভাই ও বোন। তোমার দিক্ দিয়ে কোন আপত্তি না থাকলে তাকে তুমি গ্রহণ কোর!

আশা করি, আমার ইচ্ছা ও তোমার বন্ধুর স্মৃতি রাখবার জন্য চেষ্টা করবে আপ্রাণ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

—ইতি বৌদি।'

চিঠিটায় ব্যস্ত হতে বারণ থাকা সত্বেও অরুণ তার বাড়ী ছেড়ে চলে যায় বৌদি'র খোঁজে। অরুণের বাসস্থানটা একেবারে শহরের শেষ প্রান্তে। তবু সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে।

জল্পনা-কল্পনার অবকাশ পায় না। এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। শ্রী-ভবনে ঢুকেই বুঝতে পারে, এখানে না এসে ষ্টেশনে যাওয়াই তার উচিত ছিল।

আয়া তার আগমন-শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে এক গোছা চাবী এনে দেয়।

অরুণ প্রশ্ন করে,—মেমসাহেব কোথায়?

আয়া বলে,—জানি না, মেমসাব সেজে-গুজে সুটকেশ নিয়ে অনেকক্ষণ আগে কোথায় চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বল্লে না। আমায় চাবী দিয়ে বল্লে অরুণ বাবু এলে দিস্। আর বেয়ারাকে বল্লে,—আমি চলে গেলে পর চিঠিটা অরুণ বাবুর কাছে দিয়ে আসিস্।

অধৈর্য্য হয়ে অরুণ বলে—বৌদি চলে যাবার পর চিঠি নিয়ে আমার কাছে গেছে?

—হ্যাঁ, জানায় আয়া।

—ব্যস ব্যস, আর কিছু জানতে চাই না। চাবীর গোছা আর চিঠিটা পকেটে পুরে অরুণ ছুটে যায় সুজিতের কাছে।

ওদিকে ষ্টেশনে এসে বিনা টিকিটে ট্রেণে চড়ে বসে শ্রীলেখা। চেকার এলে তার পর টিকিট নেবে, এখন নেবে কিনবে না সে, এখানের অনেকেই চেনে তাকে, তাই এই সাত গোজ করে চেষ্টা করে নিজেকে লুকাবার।

গাড়ী চলতে শুরু করেছে। শ্রীলেখার মনে পড়ে, প্রথম যে দিন সে এখানে আসে।

মনে পড়ে, যে দিন কাঞ্চনপুরে যাবার কথা হয় সেদিন সে বলেছিল—আমার কিন্তু একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না, মা? আজও ঠিক এই কথাই সে বলতে চায় কিন্তু তবু তাকে যেতে হবেই। পরিচিত আবেষ্টনীর মাঝে তার দুঃখপূর্ণ জীবনকে নিয়ে কিছুতেই সে থাকতে পারবে না। কিন্তু যত দূরেই যাক আর যেখানেই যাক, সে আসবে আবার এখানে, ফিরে আসবে তার শ্রীভবনে। যখন সব পরিচয় ছিন্ন করে আহ্বান আসবে তার। যখন তাকে যেতে হবে সেই অপরিচিত স্থানে—যেখানে যাবে সবাই—যায় সবাই। অথচ যে চির অপরিচিত সকলের কাছে। তখন—তখনই সে আবার ফিরে আসবে এখানে।

নির্জ্জন কামরায় বসে শ্রীলেখা করযোড়ে প্রণাম জানায়। চোখ দিয়ে মুক্তাধারার মত ঝরে পড়ে জলের ফোঁটা—কত দুঃখ, ব্যথার রূপ ধ'রে।

ট্রেণের গতি বাড়তে শুরু করে সশব্দে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছন দিকে তাকায়। সারা কাঞ্চনপুর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। শ্রীলেখার চোখে শুধু শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ।

সন্ধ্যা-ভৈরবী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জীবনের পথে খালি কুড়িয়েছি ধূলো ও কাঁকর,
নিজের হুকুমে আমি সখ ক'রে নিজের চাকর!
পথশেষে এসে যবে ছাড়িয়াছি যত-কিছু আশা—
ধুলো-পটে এ কি বাণী—লেখা কার সোনার আখর!

সোনার অক্ষরে আঁকা বাণী ক্রমে হ'ল মূর্ত্তিমান,
দাঁড়াল সুমুখে মোর আজন্মের কলস্বপ্নগান!
কণ্ঠে বাজাইয়া বেণু বলিল সে, "হতাশ পথিক!
এসেছ যে-দিক্ থেকে, সেই দিকে কর গো প্রস্থান!'

"কি আছে সেখানে দেবি? নাই কোন নূতন বিস্ময়।
পরিচিত, পুরাতন—রূপ, রস, গন্ধ সমুদয়।"
হাত দু'টি ধ'রে মোর ছন্দে বলে স্বপনপ্রতিমা—
"ফিরে চল ওগো বন্ধু! সেথা নিত্য নব সূর্য্যোদয়!

সূর্য্যাস্ত-প্রদেশ ছাড়ি ফিরি ফের পূর্ব্বাচল পানে।
মানসী বান্ধবী মোর কাছে এসে কহে কানে কানে:
"তোমার অন্তরে বন্ধু, থাক্ চিরজীবন্ত প্রভাত,
বন্ধ কভু হোয়ো নাকো অন্ধকার সন্ধ্যার শ্মশানে।

জাতীয়তাবাদ

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

জাতীয়তাবাদ শব্দটি আরও অনেক শব্দের মতো বিদেশের আমদানী। ভারতীয়েরা যখন ঐক্যের জন্য লালায়িত হইল, তখনই জাতীয়তার উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আসিল। ভারতে বৈসম্যের অন্ত ছিল না। এই সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া সমস্ত ভারতীয়দিগকে ঐক্যবদ্ধ করা যে কত কঠিন ছিল, তাহা না বলিলেও চলে। বৃটিশ-শাসনের ফলে জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হইয়াছিল ইহা যেমন সত্য, ততোধিক সত্য এই, বৃটিশ রাজশক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্যই জাতীয়তার অভ্যুদয় হইয়াছিল। যখন এই জাতীয়তার আদর্শ সমগ্র ভারত জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রহণ করিল, তখন ইহার জন্য একটি সার্বজনীন মন্ত্রের প্রয়োজন হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সে মন্ত্র যোগাইয়াছিল। সমস্ত জাতি নানা বৈষম্য বৈচিত্র্য ও বিভেদ সত্বেও সমষ্টি ভাবে দেশ-মাতৃকার চরণ বন্দনা করিল। সেই অবধি ভারতে এক জাতি হইল। এক জাতি, এক প্রাণ হইয়া দেশের দীক্ষিত নেতৃগণ সকলকে এক ত্রিবর্ণ পতাকার নিম্নে আহ্বান করিলেন। ভারতে বৃটিশ-শাসনের অবসানেরও বিষাণ সেই সঙ্গে বাজিল।

কিন্তু যে জাতীয়তাবাদের দেবতা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্', উদ্গাতা জাতীয় কংগ্রেস, পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং, সে জাতীয়তার ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃটিশ প্রভুর প্ররোচনায় মুসলমান জাতীয়তার রাখীবন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল, 'বন্দে মাতরমে' আপত্তি উঠিল। কাজেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বও সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু কংগ্রেস সে কথা মানিয়া লইল না; বরং ইংরাজকে ভারত ছাড়া করিবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার পথ দেখাইয়া দিল, বিপ্লবের দেশব্যাপী দাবানলে তাহাই এক বিস্ময়কর অভূতপূর্ব লক্ষ্যে পরিণত হইল সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ভারতের স্বাধীনতা কামনা মূর্ত হইয়া উঠিল ব্রহ্মদীমান্তের মৃত্যুপণ অভিযানে। সুভাষচন্দ্র দেখাইলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বলতম রূপ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অভিযানের শোকাবহ পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে সে জাতীয়তাবাদের সৌরভ কর্পূরের মতো উড়িয়া গেল। ভারতে যে ভাঙন ধরিয়াছিল, তাহা শানওয়াজ, ধীলন, সোকনাথন ঠেকাইতে পারিলেন না। মুসলমানেরা 'দুই জাতিবাদে'র ধূয়া তুলিয়া শুধু যে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন, তাহা নহে; জাতীয়তাবাদেরও সর্বনাশ করিয়া ছাড়িলেন।

এখনও অবশ্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয়তাবাদেরই প্রতীকরূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। কংগ্রেস এখনও জাতীয়তাবাদের মরণোন্মুখ তরুমূলে জলসেচন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু দুই জাতিবাদের প্রভাবে দেশমাতৃকার সিংহাসন টলিয়াছে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র শক্তি হারাইয়াছে। যে মন্ত্রের প্রভাবে এক দিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এক উত্তেজনার ঢেউ বহিয়াছিল, সে মন্ত্র পতিতপাবনী গঙ্গারই ন্যায় আর মর্ত্যলোকে বেশী দিন থাকিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। শুধু পূজারি থাকিলে কি হইবে? মন্ত্র কোথায়? প্রতিমা কোথায়? মা কোথায়? সেই সর্বাভরণ-ভূষণা সর্বার্থসাধিকা শরণ্যা সুখদা বরদা ভারতমাতা কোথায়? পূজার কোশাকুশি আজ গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সিন্ধুর তীর্থ সলিলের পরিবর্তে কোটি নর-নারী-শিশুর তাজা রক্তে ভরিয়া গিয়াছে।

জাতীয়তার পূজায় বিঘ্ন ঘটিয়াছে; অহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অমেধ্য নরবলিতে তৃপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কলিযুগে ধর্মের যেমন তিনখানি পদ ভগ্ন হইয়া একখানি পদ মাত্র অবশিষ্ট আছে, তেমনি ভারতে জাতীয়তারও অবশিষ্ট আছে একখানি পদ। মুসলমান যে দিন জাতীয়তাকে অস্বীকার করিয়া সাম্প্রদায়িক সত্তাকে প্রাধান্য দিলেন, সেই দিনই জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে তাহার অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়িল। হিন্দু-মুসলমান, এই দুই স্তম্ভের উপর যে রঙ্গ-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহার একটি স্তম্ভ ধ্বসিয়া গেলে মন্দিরের পতন অনিবার্য হইয়া পড়িল। এখনও অবশ্য বহু মুসলমান আছেন—আমি অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা ধরিতেছি না, কারণ তাঁহাদের সংখ্যা গণনীয় নহে—যাঁহারা জাতীয়তাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা পাকিস্তানের ন্যায় একটি ধর্মপ্রধান রাজ্য (Theocratic State) চাহেন না, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে তেমন তেমন অবস্থা ঘটিলে কত দূর টিকিয়া থাকিতে পারিবেন, তাহা বলা কঠিন। এই যে পাঁচ কোটি মুসলমান হিন্দুস্থানে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহস্র সদিচ্ছা মনে থাকিলেও কার্য্যকালে অর্থাৎ উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বিরোধ বাধিলে হিন্দুদের কোনও উপকারই করিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয়। সে জন্য তাঁহারা কখনই হিন্দু ভারতের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিতেছেন না। পাকিস্থানে যে সকল হিন্দু পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা ঐ একই প্রকার। অর্থাৎ পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট কখনও তাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই যদি হয় আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি, তবে আর জাতীয়তা রহিল কোথায়?

এই উভয়-সঙ্কট দেখিয়াই মহাত্মা গান্ধী—জাতীয়তাবাদ যাঁহার প্রতি রক্তবিন্দুতে মিশানো রহিয়াছে—পরামর্শ দিলেন সমস্ত মুসলমানের কর্ত্তব্য মুসলিম লীগে যোগদান করা। এই স্পষ্ট ভাষণের জন্য সংবাদ-পত্রে মহাত্মাকে অনেক অপ্রিয় সমালোচনা শুনিতে হইল। কিন্তু চিন্তা-শক্তির তীক্ষ্ণতা ও সুস্পষ্টতা গুণে তিনি বিশ্ব-বন্দিত। বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে সত্য ভাষণ হইতে কখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি চুপ করিয়া গেলেন; হয়ত ভাবিলেন, আজ দেশ আমার কথা বুঝিতে পারিল না, পরে বুঝিতে পারিবে!

সত্যই মনে হয়, এই ঋষিকল্প সাধকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি বটে, কিন্তু ইতিহাস তাহার পাষাণ ফলকে সমস্তই সযত্নে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেছে। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না তাহার ভেদনীতির দ্বারা ভারতের জাতীয়তাবাদে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিলেন। হিন্দুদের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না এবং পূর্ব হইতে প্রস্তুতির জন্য তাহারা হিন্দু মহাসভাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিল। অল্প দিনের মধ্যে অগণিত লোক বীর সাভারকারের আহ্বানে সাড়া দিল। সারা দেশ অদ্ভুত ভাবে প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তখন আগষ্ট বিপ্লবের জন্য কারাকক্ষে আবদ্ধ। হিন্দু মহাসভা তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিল এবং দেশে অপূর্ব উন্মাদনা আনিয়া দিল।

কিন্তু ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস নেতারা যখন জেলের বাহিরে আসিলেন, তখন সারা দেশ তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিল, অমানুষিক দুঃখ-ক্লেশ বরণের জন্ত হিন্দুরা মনে-প্রাণে তাঁহাদিগকেই জয়মাল্য অর্পণ করিল। হিন্দু মহাসভাকে লোকে প্রায় ভুলিতে বসিল। তাহার একটি কারণ এই যে, কংগ্রেস কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়-বিশেষের পতাকা বহন করিতে রাজী নহে। কংগ্রেস চিরদিনই জাতীয়তার পতাকা-তলে দেশের সর্ব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবশিষ্ট সেনানী ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার উগ্র জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করিল। লোকে আবার হিন্দু ধর্মকে ধামা চাপা দিয়া জাতীয়তায় মাতিয়া উঠিল। মিঃ জিন্না বলিলেন, ঐ হিন্দু মহাসভাই কংগ্রেসের রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেস আর কিছুই নহে, হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। হিন্দুরা দেখিল, ধর্মের ছাপ না-ই বা রহিল, কার্যতঃ আমরা ত যাহা চাহিতেছি অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান রাষ্ট্র—তাহাই ত পাইব, অতএব নাম লইয়া মারামারি কেন? কংগ্রেস মনে করিল, জিন্না যাহাই বলুন, জগতের দরবারে আমরা খুব সাচ্চা আছি।

ফলে এমন একটি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে এক বিষম বিষাক্ত পরিস্থিতির উদয় হইয়াছে। জন কতক মহাপ্রাণ দেশভক্ত মুসলমানের মুখ চাহিয়া আমরা কোটি কোটি হিন্দুর স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইতে চলিয়াছি। আমাদের সর্বজনপ্রিয় নেতা জওহরলালজী সেদিন বলিয়াছেন যে, তিনি কোনও হিন্দুরাষ্ট্রের অধিনায়ক থাকিতে চাহেন না। কথা ঠিক তাঁহার মতোই হইয়াছে। তিনি যাহা বলিলেন তাহা তাঁহার আজীবন সাধনা-লভ্য আদর্শ, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই বাণী বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল এবং মনে করিল ভারতের সৌভাগ্য যে এমন নেতা তাহারা পাইয়াছে!

কিন্তু বর্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতীয়তার শবদেহকে যতই জোরে জড়াইয়া থাকা যাক্, তাহাতে তাহার প্রাণ-সঞ্চার হওয়া সম্ভব নহে। কারণ আর কিছু নয়, মুসলমানগণ যতই তাঁহাদের সংস্কৃতি, আদর্শ ও ধর্মের পার্থক্যকে অচল বেষ্টনী দিয়া ঘিরিতেছেন, ততই হিন্দুরা একেবারে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুরা যে একটা জাতি, সে কথা হিন্দুরা স্বীকার করিবার পূর্বেই মুসলমান তাহাকে স্বতন্ত্র জাতিতে ঠেলিয়া না দিয়া ছাড়িতেছেন না। তাঁহাদের রাষ্ট্রে মুসলমান কর্মচারী, মুসলমান পুলিশ, মুসলমান সৈন্য—অ-মুসলমানের স্থান নাই, কাজেই অবশিষ্ট ভারতের পক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। কারণ, পাকিস্তানের যত অ-মুসলমান কর্মচারী অ-মুসলমান সৈনিক সমস্ত হিন্দুরাষ্ট্রে নির্বাসিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি জাতীয়তার দোহাই দিয়া আমরা হিন্দু বা শিখদের বিদায় দিয়া ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইয়া মুসলমানকে নিযুক্ত করিতে যাই, তাহা হইলে জাতীয়তার আদর্শ বাঁচিতে পারে, কিন্তু অ-মুসলমান বাঁচিবে না। বস্তুতঃ, হিন্দু-মুসলমান-অধ্যুষিত ভারতবর্ষ হঠাৎ বিলাতের এক ফতোয়ায় দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভাব্যের গণ্ডীর বাহিরে মোটেই নয়।

আমাদের নেতাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা মনে করিতেছেন, পাকিস্তান অচিরে তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে এবং আবার হিন্দু ও মুসলমান-ভারত এক হইয়া একীভূত বিশাল ভারতের প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু এ ধারণা সাম্প্রতিক ঘটনা-পরম্পরায় দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না। তাঁহাদের ইচ্ছা সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সমদৃষ্টি যে ভাল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি? কিন্তু বৈষম্যের বিষ ছড়াইয়া যেখানে আকাশ-বাতাস জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সেখানে সমদৃষ্টি শুধু অন্যায় নহে, অপরাধ। মুসলমান তাঁহাদের রাষ্ট্রকে 'পাকিস্তান' নাম দিয়া সোজাসুজি কষি টানিয়া মুসলমান-রাষ্ট্র ভাগ করিয়া লইলেন; কিন্তু আমরা সেই কষির কাছে গিয়া থমকিয়া গেলাম—আমাদের রাষ্ট্রকে 'হিন্দুস্থান' বলিতে পারিলাম না—সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে বলিয়া আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন গৌরবময় নামও গ্রহণ করিলাম না—সাম্প্রদায়িকতা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করিব না। আমরা নাম লইলাম 'ইণ্ডিয়া'। এই আত্ম-প্রবঞ্চনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিলের কথা যদি সত্য হয়, তবে এই ত 'পহিল দফা' অর্থাৎ বিরোধের এই ত সুরু। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা মনে করিবার কারণ নাই, কারণ পাকিস্তানের ভিতরের খবর তিনি যত জানেন, এত আর কেহই জানে না। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এখনও আমরা সচেতন হইতে পারিলাম না।

ভবিতব্য

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

এখানে নাটক এসে হয়নিক' শেষ,
এখন পঞ্চম অঙ্কে যবনিকা নয়;

এ ত' শুধু দৃশ্যান্তর; বিভ্রান্তি নিষেধ?
আবার লক্ষ্যের পথে আগানো নির্ভয়!
সামনে সড়ক দেখি কঙ্করে বোঝাই
আশাতীত অসরল দুর্গম দুর্বোধ—
পিচ্ছল পাহাড়ে-পথ অজস্র চড়াই

এবার সংগ্রাম সুরু তোমায়-আমায়।
পঞ্চাশের ঝড় রচে মেরেছো মানুষ,
আমার শ্রমের পণ্যে স্ফীত মুনাফায়
বন্ধুর গোপন সাজে তোমার জৌলুষ;
তোমাকে চিনেছি দেব, অজস্র কৃপায়—

টাইফাস্

অ্যান্‌টন্ প্যাভ্‌লোভিচ্‌ চেকভ্‌

পেত্রগাড থেকে মস্কোয় ফিরতি-ট্রেণের এক ধোঁয়াচ্ছন্ন কামরায় তরুণ লেপ্টেন্যাণ্ট ক্লিমভ বসে। তাঁর ঠিক উল্টো দিকে চাছা-ছোলা করে কামানো এক ধনী বয়স্ক ভদ্রলোক বসে বসে পাইপ টেনে চলেছেন ক্রমাগত। দেখে মনে হয়, ফিন্ অথবা সুইডিশ্; একই বিষয় বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলোচনা করছেন ক্লিমভের সংগে।

—"ও, আপনি তাহ'লে এক জন অফিসার? আমার ভাইও অফিসার; সে হচ্ছে নাবিক, এখন কন্‌স্ট্যাড-এ থাকে। তা আপনি মস্কো চলেছেন কেন?"

—"সেখানে বদলী হয়েছি।"

—"তাই না কি? আপনি কি বিবাহিত?"

—"আজ্ঞে না। আমি কাকীমা এবং আমার বোনেদের সংগে থাকি।"

—"আমার ভাইও অফিসার, কিন্তু সে বিয়ে করেছে, ছেলে-পুলেও দু-তিনটি।"

ফিন্ ভদ্রলোকটি অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকেন, তার পর এক-চোট প্রাণখোলা হাসি হেসে নিয়ে অভ্যস্ত ভংগীতে "হুঁঃ" করে চেঁচিয়ে উঠে পাইপটা ঝেড়ে নেন। ক্লিমভের এ সব ভারী বিশ্রী লাগে, সব কথার উত্তর দেন না ভালো করে, ঘৃণায় মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, ওঁর হাত থেকে পাইপটা মুচড়ে কেড়ে নিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে বের করে দিলে তবু যেন কিছুটা তৃপ্তি পাওয়া যায়! ক্লিমভ মনে মনে ভাবেন যে, এই ফিন্‌গুলো আর গ্রীকরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীব-বিশেষ; অকর্মণ্য, বিদ্‌ঘুটে, যাচ্ছেতাই জাত! এরা হচ্ছে পৃথিবীর বোঝা, এদের দিয়ে পৃথিবীর কোন্ উপকারটা হবে?

ফিন্ আর গ্রীকগুলোর কথা ভেবে তাঁর গা বমি-বমি করতে লাগলো! এদের সংগে তুলনা করতে লাগলেন মনে মনে ফ্রেঞ্চ আর ইটালীয়ানদের; সংগে সংগে চোখের সামনে ভেসে উঠলো [illegible], [illegible] মার্বেল [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হাসোগাই চোখে পড়ে।

তরুণ অফিসারটি মুষ্‌ড়ে পড়লেন, গোটা সিটটা রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও মনে হতে লাগলো যেন হাত-পা ছড়াবার জায়গা তুক্ নেই! মুখ তাঁর শুকিয়ে উঠলো, রাজ্যের চিন্তা এসে হানা দিলো তাঁর মাথার মধ্যে! তার মধ্যেও স্বপ্নের মতো আবছা শুনতে লাগলেন চাকার শব্দ, নানা জনের গুঞ্জন-ধ্বনি, এবং লোকের ওঠা-নামার বিশ্রী কোলাহল। বাঁশি, ঘণ্টা, কনডাক্‌টারের চীৎকার, মানুষের পদধ্বনি সবই যেন আগের চেয়ে বেশি করেই কানে বাজতে লাগলো। সময় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে, ট্রেণ প্রতি মিনিটে থামছে, যান্ত্রিক ভাষায় যেন প্রশ্ন করছে—'ডাক তৈয়ার?'

স্পিরভ ষ্টেশনে তিনি জল খেতে নামলেন একবার, রেস্তরাঁ-কারের মধ্যে তাঁর নজরে পড়লো জন কয়েক গোগ্রাসে কী সব খাচ্ছে।—"ওঃ! এরা খাচ্ছে কি করে!" তাঁর গা ঘিন-ঘিন করতে লাগলো; আর যেন এদের রোষ্ট-ভর্তি ফুলো মুখগুলো দেখতে না হয় তার জন্যে প্রাণপণে চোখ বুজলেন ক্লিমভ; এদের রাক্ষুসে খাওয়া দেখে মন তাঁর অসুস্থ হয়ে উঠলো!

অন্য দিকে এক সুন্দরী, মাথায় লাল টুপি, একটি মিলিটারীর সংগে অন্তরংগ হয়ে কথা বলছে। হাসলেই তার ধব্‌ধবে সাদা চমৎকার দাঁতগুলো আত্মপ্রকাশ করছে! নারী, তার ঝক্‌ঝকে দাঁতের হাসি, ক্লিমভের মনে আবার সেই কাটলেটের বিরক্তিকর স্মৃতি এনে দিলো, এ সমস্তই তাঁর অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে। তিনি ভেবেই পেলেন না যে, এই সুন্দরী মেয়েটি কি করে সহ্য করছে মিলিটারীটিকে!

জল খেয়ে তিনি ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। ফিন্ ভদ্রলোক তখনও বসে-বসে পাইপ ফুঁকছেন, নোংরা জলপ্রবাহের মতো বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ভারী হয়ে উঠেছে কামরার আবহাওয়া!

খানিক বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থেকে ক্লিমভকে প্রশ্ন করলেন, "হুঁঃ, এটা কোন্ ষ্টেশন?"

—"আমি ঠিক জানি না," মুখখানাকে ভালো করে ঢেকে ক্লিমভ সেই কটুগন্ধী ধোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন।

—"টাভার কখন্ পৌঁছোবে বলতে পারেন ?"

—"জানি না মশাই। অত্যন্ত দুঃখিত···আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, শরীরটা ভালো নেই···সর্দি লেগেছে।"

ফিন্ ভদ্রলোকটি জানলার কাছে পাইপটা ঠুকে নিয়ে আবার তাঁর সেই নাবিক-ভাইয়ের একঘেয়ে গল্প জুড়লেন। ক্লিমভ আর সে দিকে মন দিলেন না। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন বাড়ীর কথা। চাকর প্যাভেলের কথা মনে করে তাঁর হাসি এলো। সুন্দর গুছোনো তার কাজ! কাজ থেকে ফিরে এলে প্যাভেল তাঁর পা থেকে পরম যত্নের সংগে বুটজোড়া খুলে নিতো, টেবলে খাবার জল ঢেকে রেখে আলো নিবিয়ে দিয়ে সাবধানে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে যেতো; তার কথা যেন তাঁকে খানিক আরাম দিলো এই অস্বস্তিকর যন্ত্রণার মধ্যেও!

সময় কেটে যাচ্ছে বাতাসের মতো শীষ দিয়ে, বাইরে ঘণ্টা, বাঁশী, কোলাহলের যেন শেষ নেই। হতাশায় ক্লিমভ কুশনটাকে জোর করে চেপে ধরলেন মাথার ওপর; আবার তাঁর মনে পড়লো নতুন করে প্রিয় বোনটি কেটির কথা আর আর্দালী প্যাভেলের, কিন্তু বোন আর আর্দালীর মুখ একসংগে মনে ভিড় করে সব গোলমাল করে দিলো, একাকার হয়ে গেলো সব কল্পনা।—ব্যর্থ-হতাশায় ভেঙে পড়লেন ক্লিমভ। কুশনের ভেতর থেকে তপ্ত নিশ্বাস সমস্ত মুখটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আলস্যের ভারে অন্য পাশ ফিরেও শুতে পারছেন না তিনি।···ভারী ঠাণ্ডা অবসাদ কি তাঁর শিরা-উপশিরাকে স্নায়ুর মতো নিশ্চল করে ফেললো?···

প্রথম মাথা তুলতেই চোখ ঝলসে দিল পরিপূর্ণ প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো। আরোহীরা ওভারকোট চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক্-ওদিক্। ট্রেণ থেমেছে কোন একটা ষ্টেশনে। শাদা পোষাকের ওপর নম্বর সেঁটে খুব ব্যস্ত হয়ে বাক্স-প্যাটরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুলিগুলো ষ্টেশনের বাইরে। ক্লিমভও উঠলেন, পরিপাটি করে ওভারকোটটি গায়ে চাপিয়ে নামলেন ষ্টেশনে। সারা রাত্রি ঘুম হয়নি, মাথাটা ঝিম হয়ে আছে। মাল-পত্র নিয়ে একটা 'ক্যাব' ভাড়া করলেন, গাড়ীওয়ালা ভাড়া দাবী করলো, এক রুবল পঁচিশ কোপেক; গাড়ীতে এক দণ্ডও সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না ক্লিমভ। এই মুহূর্তে টাকার যেন কোন দামই নেই তাঁর কাছে!

বাড়ীতে ক্লিমভকে অভ্যর্থনা জানালেন কাকীমা আর আঠারো বছরের বোন কিটি। কিটির হাতে খাতা-পেন্সিল; খাতা-পেন্সিল দেখে ক্লিমভের মনে পড়লো যে, বোন এবার মাষ্টারী পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তিনি কোন দিকেই মন দিতে পারছেন না, কোন কিছুই ভালো লাগছে না, তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন খানিক এদিক্-ওদিক্ ঘুরে মাতালের মতো টলতে-টলতে তিনি নিজের ঘরে এসেই লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়, কারুর কোন প্রশ্নই তাঁর কানে ঢুকলো না।··· ফিন্ ভদ্রলোক···লাল টুপি মাথায় হাস্যময়ী তরুণী···মাংসের ঝোটের ঝোটকা গন্ধ···আলোর কম্পমান শিখা···গত রাত্রের সব কিছু খুঁটিনাটিই মনে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, পাশে আত্মীয়দের তীব্র কণ্ঠস্বর কানে কিছুই ঢুকছে না।

একটু প্রকৃতিস্থ হলে বুঝতে পারলেন যে, তিনি বিছানায় শায়িত, পোষাক-পরিচ্ছদ বিশৃংখল, পাশে জলের বোতল হাতে প্যাভেল দাঁড়িয়ে,—তবু কেন মনটা শান্ত হচ্ছে না? হাত-পাগুলোও আগের মতো অসহ্য ব্যথায় ধসে পড়ছে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে জিভটাকে যেন ভেতর দিকে টানছে, তা'ছাড়া এখনও যেন তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন সেই হতচ্ছাড়া ফিনটার পাইপ-টানার একটানা ফস্-ফস্ শব্দ!

···প্যাভেলের পেছন থেকে ডাক্তারের কণ্ঠ বাজলো ক্লিমভের কানে—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে; তাকাও তো একবার এদিকে, হ্যাঁ··· আমার দিকে এবার তাকাও—ভয় কি?" ডাক্তার নির্ভীক ধরণের মানুষ, দৃঢ় মুখের পেশী, সপ্রতিভ গলায় বললেন—"বাছা রে!"

"বাছা বললেন যে?" ক্লিমভ ফোঁস করে উঠলেন, "কেন আপনার এই আত্মীয়তা? যতো সব যাচ্ছেতাই!" কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর শুনে ক্লিমভ নিজেই চমকে উঠলেন! কেমন যেন শুকনো, দুর্বল আর কাঁপা আওয়াজ, নিজেই অনুভব করতে পারলেন না, কী বললেন এই মুহূর্তে ডাক্তারকে!

"তা বেশ, তা বেশ," ডাক্তারের কথায় বোঝা গেল যে, তিনি এতে মোটেই দুঃখিত হননি,। "আচ্ছা এখন আর কথা বোলো না।"

সারা বাড়ীতে ধ্বনিত হোল বিপদের সংকেত···দিনের আলো সরে গিয়ে এক মুহূর্তেই বাড়ীতে নেমে এলো তমসা, ঘরে-ঘরে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ডাক্তারের নিস্পৃহ গলার "তা বেশ, তা বেশ" শব্দ!

ডাক্তার কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ক্লিমভের কাছ থেকে নড়লেন না। যতো চেনা-অচেনা মুখ ভিড় করতে লাগলো ক্লিমভের মনে···প্যাভেল, ফিন্ ভদ্রলোক, লাল টুপি তরুণী, ক্যাপ্টেন টরোশেভেচ, সার্জেণ্ট ম্যাগিসমেনকো, ডাক্তার! সবাই অনর্গল কথা বলে চলেছে, হাত নাড়ছে, সিগারেট খাচ্ছে, ধোঁয়াও ছাড়ছে! ক্লিমভের মনে হোল, বিছানার পাশেই অদ্ভুত পোষাকে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছেন; এমন পোষাক পরতে ক্লিমভ তাঁকে কোন দিন দেখেননি। ক্লিমভ ভাবলেন যে, পাদ্রী বুঝি তাঁকে পোল অফিসার বলে ভেবেছেন, তাই তিনি হেসে প্রতিবাদ করে উঠলেন—"ফাদার আলেকজাণ্ডার, পোলরা ভয়ে জংগলে পালিয়ে গেছে।" পাদ্রী কিন্তু ততক্ষণে সরে গেছেন ক্লিমভের মন থেকে! রাত্রে তিনি দেখলেন, সবাই একের পর এক এসে তাঁকে কি যেন বলে যাচ্ছে! হঠাৎ গুঁড়ি মেরে দু'টো ছায়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে—এ কি, এ যে তাঁর কাকীমা আর বোন! বোনের ছায়াটি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলো, প্রণাম করলো ইষ্টদেবতা ইকোনকে, সংগের ছায়াটিও প্রণাম করলো সেই সংগে! হঠাৎ আবার তাঁর নাকে ভেসে এলো সেই ফিন্ ভদ্রলোকের কড়া তামাকের গন্ধ আর ঝোটের দুর্গন্ধ! ভীষণ বেগে উঠে এলো বমি, চীৎকার করে উঠলেন—"নিয়ে যাও, এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।" কোন উত্তর নেই, শুধু শুনলেন পাদ্রীর একঘেঁয়ে মন্ত্রোচ্চারণ আর সিঁড়িতে কার পদধ্বনি।

একটু সুস্থ হয়ে ক্লিমভ দেখলেন বিছানার পাশে কেউই নেই, প্রভাতে সূর্য জানালা দিয়ে মশারিতে এসে পড়েছে, সূর্য-কিরণ যেন কেমন কাঁপছে মৃদু মৃদু। সরু খড়্গ তলোয়ারের মতো এক ফালি আলো জলের বোতলটায় পড়ে ঘরের মধ্যে রামধনু রঙ তুলেছে!

অনুবাদঃ মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটি

অগ্নি মিত্র

একটি দ্বাদশবর্ষীয় সুন্দরী মেয়ে তার প্রিয় পোশাক পরেছে। সাদা সিল্কের একটা বেবী-ফ্রক, পায়ে শরতের মেঘের মত ফরসা কেডস্, বকের পালকের মত শুভ্র মোজা—ওপরে সরু ক'রে লাল দাগ দেওয়া সাদা মোরগের মাথার ঝুঁটির সাথে তুলনা করা চলে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্য্যন্ত নেমেছে। হাতে মোটা কাচের দু'টি চুড়ী—গাঢ় নীল। ফর্সা মেয়েদের সব রংই মানায়। স্নিগ্ধ, চঞ্চল মুখখানি, দুষ্টুমি ভরা চাউনি। ভ্রূ-রেখার মাঝখানে ছোট একটি কুঙ্কুমের টিপ—চার পাশে শ্বেত চন্দনের বিন্দু সযত্নে অঙ্কিত। অনেকক্ষণ ব'সে মেয়েটি নিজেকে এত চমৎকার ক'রে সাজিয়েছে। বরুণদা' ঠিক যেমনটি পছন্দ করে, তেমনটি।

রাস্তার সঙ্গে সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্ করছে মেয়েটি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল অথচ এখনও বরুণদা আসচে না। রাস্তায় এত লোক চলাচল করছে, কেউ একবারও তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করচে না, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন? এক জন কেউ জিজ্ঞাসা করলেই ও উত্তর করতে পারে যে, বরুণদা'র সাথে পাঁচটায় বেড়াতে যাবার কথা, অথচ সে এখনও আসচে না। সামনের তেতলা বাড়ীটার ওপরও কম রাগ হ'চ্ছে না মেয়েটির। ঐ বাড়ীটার জন্যেই তো রাস্তাটা সম্পূর্ণ দেখা যায় না। রাস্তাটা না দেখলে বরুণদা' যদি এসে পালিয়ে যায়! সবাই যেন শত্রুতা সুরু ক'রেচে তার সাথে।

বারান্দা থেকে নীচে রাস্তা দিয়ে যত দূর দেখা যায়, তাকাল মেয়েটি। নাঃ, আসচে না। এমন মিথ্যেবাদী বরুণদা'টা! আসুক না আজ, দেখিয়ে দেবে মজা। আর কোন দিন যদি সে তার সাথে বেড়াতে যায়, তখন তার নাম শিখাই নয়।

—শিখা। জানালা থেকে ডাকলো রেখা। শিখার চেয়ে দু'বছরের বড়।

—ছোড়দি। মাথা ঘুরিয়ে সাড়া দিল শিখা। ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ দুলে উঠল।—দেখ না, বরুণদা' এখনও আসচে না।

—বেশ হ'য়েচে। যেমন তোর বরুণদা, তেমন তুই। কি দাদাই যে পেয়েচিস্!

—ছোড়দি, ভাল হবে না। অভিমানে দুলে উঠল ঠোঁট দু'টি শিখার। বরুণদা'র নিন্দা সওয়া তার অভ্যাস নয়।

—বলব না তো কী? রোজ রোজ তোকে মিথ্যে কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। আমি হ'লে—

—শিখা। রাস্তা থেকে প্রতীক্ষিত গলার ডাক এল। বরুণ এসে দাঁড়িয়েচে।

পলকে ফিরে দাঁড়িয়ে আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শিখা। হাসতে হাসতে দৌড়ে এসে বরুণের একটা হাত টেনে নিয়ে অভিমান ভরে ব'ললে,—এতক্ষণ এলেন না যে? আমি সেই কখন থেকে বাইরে এসে ব'সে আছি।

—একটা জরুরী কাজ ছিল। সান্ত্বনা দেবার ছলে হাসতে হাসতে বরুণ কৈফিয়ৎ দিলে।—এখনও অনেক বেলা আছে।

—হুঁ, আছে না ছাই! চলুন, আর দেরী ক'রব না। হাত ধ'রে টানতে সুরু ক'রল শিখা।

—দাঁড়াও যাচ্ছি। অমন ক'রে টানলে পড়ে যাব যে! বরুণ শিখার হাত ধ'রে পা বাড়াল।

—বরুণদা'! হঠাৎ রেখা ডাকল।—চ'লে যাচ্ছেন যে?

বরুণ পা থামিয়ে রেখার মুখের দিকে চাইল। নব যৌবনোদ্ভিন্না রেখার মুখমণ্ডল আরক্তিম হ'য়ে উঠেচে ওইটুকু কথা ব'লতে গিয়ে। চোখে ফুটে উঠেছে মৃদু লজ্জা।

—কি ব'লচ? বরুণ প্রশ্ন করে।

—আপনি রোজ শিখাকে নিয়ে বেড়াতে যান, কই আমাকে তো এক দিনও নিয়ে যান না? লজ্জা আর কৌতুক দু'য়ে মিলে রেখার কথা বলার ভঙ্গীটিকে কেমন যেন মিষ্টি ক'রে দিল।

বিব্রত হ'য়ে বরুণ কি যে ব'লবে বুঝে উঠতে পারলে না। কোন উত্তর মুখে এলো না প্রথমে। খানিক চুপ ক'রে শেষে শিখার ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে ব'ললো—তোমার লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে তাই।

—ওই মুখপুড়িটার বুঝি লেখা-পড়া নেই? রেখা ক্রমশ যেন স্বচ্ছ হ'য়ে উঠচে।

—অ্যাই ছোড়দি! শিখা তেড়ে উঠল। বরুণদা'র নামে কি সব ব'লেচিস্, দেখ ব'লে, অ্যাঁ? ছোড়দির অরুচিকর বিশেষণ প্রয়োগের পাল্টা জবাব দেবার ভাল একটা উপায় পেয়ে শিখা চঞ্চলা হ'য়ে উঠল।

—যাঃ! রেখার আরক্তিম মুখ এক নিমেষে মহা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ স্বরে বরুণের উদ্দেশ্যে ব'লে উঠল,—ওর কথায় কাণ দেবেন না বরুণদা'—ভারী মিথ্যেবাদী! বলেই ছুটে পালাল রেখা।

এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বরুণ। তার পর শিখার হাতে মৃদু টান দিয়ে ব'ললে,—চল।

বরুণের সঙ্গে এদের পরিচয় বেশী দিনের নয়। পাড়ার সরস্বতী পূজার আনন্দ উৎসবে শিখা নেচেছিল, তখন থেকে বরুণের সঙ্গে তার পরিচয়। তার পর কিছু দিনের ভেতরই শিখার সব চাইতে বড় বন্ধু হ'য়ে দাঁড়িয়েচে বরুণ। আদুরে ছোট মেয়ের বন্ধু, পরিবারের প্রত্যেকেই বরুণকে নিয়েচে আপন-জন ক'রে। বেশ ছেলেটি। বয়স চব্বিশ, এবারে এম-এ পরীক্ষা দিয়েচে। পাতলা ছিপ্‌ছিপে দেহের গড়ন। মুখে বিনয়ীর নম্রতা আর স্নিগ্ধ হাসি লেগে আছে। শিখার মা মনে মনে হাসেন, এই দুই অসমবয়সী বন্ধু-বান্ধবীর কথা ভেবে। এটা বিধাতার একটা ফন্দী ব'লেই ভাবেন তিনি। রেখার সঙ্গে বেশ মানাবে। অবশ্য কাউকে এ কথা জানাননি, নিজে ভেবেচেন মাত্র।

অনাঘ্রাতা অপাপস্পর্শী নিষ্কলুষ মনের অধিকারিণী রেখা। দেহে-মনে আকস্মিক জোয়ারের স্রোত যেন একটা অবলম্বনের জন্য বরুণকে নিয়ে এসেচে তার মনের কিনারায়। রেখা বরুণকে ভালবেসেচে। উচ্ছল যৌবনের আবেগে এক এক সময় রেখা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে মনে। ভাবে, বরুণকে ব'ল্‌বে, কিন্তু পারে না।

বরুণকে শিখার মা ধ'রে ব'স্‌লেন যে, তার যখন অবসর আছে তখন দু'-এক সময় রেখাকে যদি সে পড়া-শোনা করায়, তিনি খুব খুসী হ'ন। সঙ্কোচে কোন আর্থিক চুক্তির কথা তুলতে লজ্জা হয় তাঁর।

বরুণেরও ঠিক ওইখানেই লজ্জা। কোন মতে ব'ল্‌লে, রেখা পড়া-শুনা নিয়মিত করে ব'লেই তো জানি।

—না না, তাহ'লে মিথ্যে কথা ব'লেচে। একদম পড়ে না। তা বাবা, তুমি মাঝে মাঝে একটু সময় ক'রে আসতে পারবে না?

—সময় আমার যথেষ্ট আছে মাসীমা। বরুণ কি ব'ল্‌বে ঠিক ক'রতে পারে না। অদূরস্থিতা উদ্‌গ্রীব রেখার চোখের ওপর একবার তাকিয়ে বলে, আচ্ছা, আসব।

মুহূর্ত্তে রেখার মুখ অজানা আনন্দে লাল হ'য়ে ওঠে। এই সুগভীর উল্লাস পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই ত্রস্তপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দিন যায়—বরুণ নিয়মিত আসে, রেখাকে পড়ায়। দু'জনের সান্নিধ্যে কোন জড়তা নেই, অথচ ব্যবহারে সঙ্কোচের সীমা নেই। পড়ার ফাঁকে রেখা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বরুণের পানে। বরুণ বুঝতে পারে—সহজ স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে তাকায়, রেখার চোখ কী চায় দেখবার জন্যে। রেখা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাটির সাথে যেন মিশে যায়। যে কথাটা ব'লবার জন্যে মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে থাকে, তা বলা হয় না—শুধু একটা অস্পষ্টতার ভেতরেই সব কিছু মিলিয়ে যায়। বরুণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে শিখার জন্যে। তার আবির্ভাব হ'লেই বরুণের সমস্ত মন এক নিমেষেই কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনায়, কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনায়—আর ছোট্ট ছেলেটির মত শিখার সাথে বয়সের ব্যবধান মুছে দিয়ে, সেই ভাবে কথা বলে। রেখা হয়তো কোন দিন চুপ ক'রে ব'সে থাকে, অথবা কোন দিন ধীরে ধীরে উঠে যায়।

দিনগুলি হয়তো এই ভাবেই কেটে যেত, কিন্তু সহসা বরুণ নিজেকে আবিষ্কার করল অদ্ভুত ভাবে। প্রথমে সে নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব হ'ল। হ'তে পারে শিখা সব চেয়ে সুন্দরী স্ফুটনোন্মুখ যূঁই-কলিটির মত। হয়তো তার অন্তরের সমস্ত সম্পদ উন্মুখ হ'য়ে উঠেচে মুক্ত আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বার জন্যে, কিন্তু তবুও সে নিতান্ত বালিকা। বরুণকে নিজের দাদা ব'লে জানে সে—কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, তাকে নিয়ে বরুণের মনোজগতে কতখানি পরিবর্ত্তন হ'য়েচে। পাতার ফাঁকে সামান্য দেখ্‌তে পাওয়া কুঁড়িটির মত পবিত্র সুন্দরী মেয়েটি বরুণের মানস-লোকের প্রিয়া।

রেখা বুঝে উঠ্‌তে পারে না সমস্ত হৃদয় উজাড় ক'রে যাকে সে তার জীবনের প্রথম অর্ঘ্য দিয়েচে, সব জেনে-শুনেও তার সে পূজা নিতে আগ্রহ নেই কেন! কচি কিশোরীর আঘাত পাওয়া মন ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে—চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সব কিছু সংশয়ের বাইরে এসে দাঁড়াতে।

অঙ্কের খাতা খুলতেই ছোট্ট এক টুকরো কাগজ গড়িয়ে পড়ল হাতের কাছে। কৌতূহলী হয়ে বরুণ খুল্‌ল কাগজখানা। লেখা রয়েছে এক পংক্তি—'বরুণদা, আপনার সাথে আমার কয়েকটি কথা আছে।' লেখাগুলি দেখ্‌লেই বোঝা যায়, মন যখন বিভ্রান্ত—মরীয়া তখনই এমন ভাবে লেখা চলে। অক্ষরগুলি ঈষৎ কাঁপা। লিখবার সময় হাত কেঁপেছিল।

প্রথম বিস্ময় কাটতেই প্রশান্ত দৃষ্টিতে রেখার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বরুণ বললে,—কি কথা? রেখা নিরুত্তর। বরুণ একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে—কই, কিছু বলচ না যে?

রেখা চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা-গলায় বললে,— আমার শরীর খারাপ লাগচে—আমি যাই। ব'লেই বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

খপ্‌ ক'রে তার একখানা হাত ধ'রে সস্নেহে বসিয়ে বরুণ বললে,—বসো। তুমি কি বলতে চাও আমি জানি রেখা!

ঝর-ঝর ক'রে জল নেমে এলো রেখার চোখে। শাড়ীর আঁচল চোখে চাপা দিয়ে চোখের জল ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল শুধু।

কিছুক্ষণ পরে বরুণ মৃদু স্বরে বললে,—তুমি আমাকে ভালবাসো তা আমি জানি। আমিও তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। ছিঃ বোন, কাঁদে না। মেয়ে হ'য়ে পুরুষকে ঐ এক দিক্‌ থেকে ভালবাসতে শিখলেই চলবে কেন? যে তোমাকে বোনের আসন দিয়েচে—তাকে ভাই বলেই কাছে টেনে নাও।

রেখা সহসা বরুণের দিকে তাকালো। তার পরেই আবার দ্বিগুণ বেগে চোখ ছাপিয়ে এলো তার। অতি কষ্টে বললে,—আমার অন্যায় হ'য়েচে, বরুণদা'।

—অন্যায় কারুরই নয়। বরুণ তেমনি স্নিগ্ধ স্বরেই বললে,—তুমি মনে ক'রো না যে তোমার ওপর আমার ভুল ধারণা হয়েচে। তোমাকে আমি চিনি। আমাকেও তুমি ভুল বুঝো না—ছিঃ, চোখ মুছে ফেল। আজকে আর পড়াব না—আজ তোমার ছুটি।

রেখা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে বরুণের কাছে

এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে, তার পর সংযত গলায় বললে,—আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, বরুণদা'।

হেসে বরুণ তাকালো তার দিকে। রেখা লঘু পায়ে বাইরে চলে গেল। আজ তার চলার ভঙ্গীতে কোন জড়তা বা সঙ্কোচ নেই।

হঠাৎ কি হল, সে নিজেই বা কেন এমন করে কথা বললে, রেখাই বা কেন আজ এত উদ্দাম হ'য়ে উঠল—ভাবছিল বরুণ। চুল দুলিয়ে শিখা ঢুকল ঘরে। ধপ্ করে রেখার চেয়ারে বসে বললে—আজ একটা কবিতা শোনাবেন বলেছিলেন।

—ও, হ্যাঁ। বরুণের চমক্ ভাঙলো।—বাঃ, তোমাকে তো দেখতে চমৎকার লাগচে! আমার মনে হয় কি জানো শিখা, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আর নেই। 'স্নো-হোয়াইটের' গল্প জানো তুমি?

—জানি না তো, বলুন। শিখা প্রস্তুত হ'য়ে ব'সল গল্প শুনবার জন্যে।

—আগে কবিতা শোন। ব'লে পকেট থেকে বরুণ বের ক'রল রবি ঠাকুরের 'খেয়া'। এক টুকরো কাগজ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট করা ছিল একটা পৃষ্ঠা, সেটা খুলে একটু কেসে নিয়ে ব'ললে, কবিতার নাম 'অনাবশ্যক'। ব'লে পড়তে সুরু ক'রে দিলে :—

"কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি এসে শুধাই তারে ডেকে,
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো, বালা।"

বাধা দিয়ে শিখা বললে—ছাই কবিতা। এর কি মানে হ'ল?

—মানে? বরুণ একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ব'ললে,—মানে দিয়ে কি হবে, এখন শোন :—

"...আমার মুখে দু'টি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রইল চেয়ে ভুলে,
সে কহিল, 'আমার এ যে আলো
আকাশ-প্রদীপ শূন্যে দিব তুলে'।"

—ধ্যেৎ। ঠোঁট বেঁকিয়ে শিখা আবার বাধা দিলে, অন্য কবিতা পড়ুন।

—কাল অন্য বই নিয়ে আসব। পকেটে বইখানা রেখে উঠে দাঁড়ালো বরুণ।

—তাহ'লে গল্পটা বলুন, যেটা একটু আগে জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

—আজ না, কাল ব'লব।

—তাহ'লে যেতে দেব না। বরুণের হাত ধ'রে জোর ক'রে বসালো শিখা।—হ্যাঁ, বলুন।

বরুণ 'স্নো-হোয়াইটের' গল্প ব'লতে সুরু ক'রলে। সে দেখতে কি রকম সুন্দরী ছিল, তার সৎমা কেমন ক'রে হিংসা ক'রে তাকে বার-বার মারতে চেষ্টা ক'রে শেষে বিষ-মাখানো আপেল খেতে দিয়ে মেরে ফেলল। তার পর কেমন ক'রে এক রাজপুত্র স্নো-হোয়াইটকে বাঁচিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে এলো।

যতক্ষণ গল্প চ'লছিল, শিখা রুদ্ধ নিশ্বাসে এক-মনে শুনছিল। শেষ হ'তেই যখন জানা গেল, স্নো-হোয়াইট ম'রল না বরং অজান্ হিংসুটে সৎমা ম'রে গেল; হাততালি দিয়ে শিখা ব'ললে,—বাঃ চমৎকার গল্প!

বরুণ প্রশ্ন ক'রলে, আচ্ছা ধরো, তুমিই যদি ওই রাজকুমারী হ'তে?

—কিন্তু আমার যে সৎমা নেই। শিখা চিন্তিত হ'য়ে ব'ললে—অমন ক'রে হিংসেই বা ক'রবে কে আমাকে?

—তোমার দিদি—মানে রেখা। বরুণ কেমন যেন অস্বাভাবিক গলায় ব'ললে।

—ঠিক ব'লেচেন। দিদিটা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। তা ও পারে অমন ক'রে জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে আসতে। শিখা রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে।

—আচ্ছা, তোমার দিদি না হয় ফেলে এলো, কিন্তু বাঁচাবার জন্যে এক জন রাজপুত্তুর চাই তো?

—ধ্যেৎ! আপনি যেন কি? আরক্ত মুখে শিখা সলজ্জ ভাবে ব'ললে।—তবে হ্যাঁ, এক জন পারে। আর কাউকে যে আমি চিনিও না।

—স্নো-হোয়াইট কি রাজপুত্তুরকে চিন্ত? বরুণ ক্রমেই উৎসুক হ'তে থাকে।

—না চিনুক, কিন্তু সে লোকটা তো ভালো ছিল। যদি একটা ডাকাত কিম্বা একটা গুণ্ডার হাতে পড়ত? কল্পিত ভয়ে শিখা শিউরে ওঠে।—দরকার নেই বাবা ওতে। তার চেয়ে এক জন চেনা ভালো লোক, যেমন আপনি যদি সেই রাজপুত্তুর হন তাহ'লে কিন্তু বেশ মজা হয়, না? ইয়া বড় একটা সাদা ঘোড়ার 'পরে চ'ড়ে বনের ভেতর দিয়ে যেতে বেশ লাগে।

বরুণ চেয়ে রইল শিখার মুখের দিকে। ও বুঝতেই পারল না শিখা কথা বলল, না, শিখার অন্তরালে যে নারী রূপ-পরিগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে সে ব'লল!

অন্তরালের সেই গোপন রূপটি তার উদ্বোধন নিজে নিজেই ক'রল ত্রয়োদশী শিখার দেহ-মনকে কেন্দ্র ক'রে। প্রথম আবির্ভাবেই যেন এত দিনকার সমস্ত পরিচিত অপরিচিতকে নতুন চোখে দেখবার জন্যে সেই আত্মপ্রকাশকামী নারীটি ত্রয়োদশীর নতুন ক'রে দৃষ্টিদান ক'রল। 'স্নো-হোয়াইটের' গল্প শোনার দিন আর নেই। ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে আবদার জাগাবার দিন চ'লে গেছে। আবরণহীন চঞ্চলতা আর নেই—এক বছরের ব্যবধানে সেই স্বভাব-চাপল্য একেবারে অন্তর্হিত না হ'লেও তার ওপর এসেছে মানান-বেমানান যাচাই ক'রবার মত মনোভাব। কথাবার্ত্তায় কোন সঙ্কোচ নেই, কিন্তু দূরত্ব যেন ক্রমেই প্রকট হ'য়ে উঠচে।

শাড়ী-পরিহিতা সলাজ শিখা বরুণের চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগিয়ে ব'ললে,—কই, কবিতা পড়ুন।

এই এক বছর বরুণ নিয়মিত কবিতা প'ড়ে শুনিয়েচে শিখাকে। বাক্যব্যয় না করে আলমারী থেকে নজরুলের 'সঞ্চিতা'খানা এনে পড়তে সুরু ক'রলে 'খুকী ও কাঠবেরালী।'

"কাঠবেরালী, কাঠবেরালী পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়মুড়ি খাও? দুধভাত খাও? বাতাবী লেবু, লাউ?
কুকুরবাচ্ছা বেরালছানা, তাও?"

জোড়ের কবি

ধীরানন্দ রায়

প্রতিসরণ

(POETA PROFITEOR)

আমি কবি তাই
যত বাণী মোর গান হয়ে ওঠে ভাই!
রজনীগন্ধা গন্ধ বিলোয় দিবসে রাতে,
মন যে আমার মৃদুল হাওয়ার মাতনে মাতে;
ফুলে ও মধুতে
সুরে ও বঁধুতে
আমার আকাশে রামধনু রচা হয়;
শ্যামলী নীপের, হিল্লোল মৃদু
বিহ্বলে গাহে জয়।
আমি কবি নই কুমোরের, নই কামারের,
নীচ ধোপা নাপিতের,
আমি কবি, যত মানুষের
আমি কবি মহামানুষের!
সুদূর আলোর সন্ধান আনি
নীলিমার সাথে করে কানাকানি,—
দুঃখ ও জ্বালা পীড়ন মথন,
অবকাশ যার ভরে সারা খন,
আমি তার সাথে নেই;
মহাদ্যুতি আমি সুদূরের কবি সেই।
কবিতা আমার নিজেরে শুধু যে ঘেরিয়া রচে,
অসীমের দেহে সসীম সকল প্রভেদ মোছে।
ভরা বরষায়, বাতায়ন হতে, মেঘের কোলে
চিকুর এলানো কাজলা মেয়ের নয়ন জলে;—
দেখি, কলাপী বধূর উচ্ছ্বাস মধু পুচ্ছ মাঝে
আকুল গন্ধে উতলা আমার ছন্দ নাচে।
বাহিরের যত সত্যনিচয়ে মিথ্যা মানি
মিথ্যে হ'লেও নিজের বাণীরে সত্য জানি।
ব্যথা আর শোক,
আঁধারের পথে যত দুর্যোগ
এড়িয়ে চলি,—
আমাদের বাটে ছড়ান' থাকে যে পুষ্প-কলি।

প্রতিফলন

(POETA AMATORIS)

আমি কবি নই, ব্যথা মোর তাই গান হয়ে ওঠে নাকো,
গোলাপ এড়িয়ে কাঁটা চোখে পড়ে হাজারে—লাখো।
জীর্ণ দেউলে পায়রারা বাসা বাঁধে,
বাব্‌লা বিছানো, শিয়াকুল-ঝোপে পথহারা ঘুঘু কাঁদে,—
সেথা, কবিতা আমার পায় নাকো দিশে খুঁজে
ওপর তলার মনোমন্দিরে কপাট থাকে যে বুঁজে।
আমি কবি নই বরষার—
শীত-শরতের; নই কবি আমি ভরসার।
আমি প্রকৃতির কবি নই,
পীড়িত-দলিত-মথিত-মনের মর্মের কথা কই।
আমি, মহামানুষের রাজ্যে করি না বাস—
তাই, গগন-স্পর্শী অসীম: প্রেমের পাই নাকো নির্যাস,
ক্লেদ-পংকিল গণ্ডীতে ঘেরা মোদের জীবনে তাই
অমানুষ বলে কোনখানে কিছু নাই।
ঊষর মরুর ধূ ধূ করা বুকে মানুষেরা দেয় চাষ,—
জনতারই লাগি মানুষেরা খাটে দূর করি অবকাশ।
হাতুড়ী পিটোয় যারা
তাজমহলের কীর্তি তো রাখে তারা।
তবু, মহাপুরুষের দলে—
মানুষেরে আজও দূর করে দেয় হীনতার জঞ্জালে।...
মাথার উপরে সূর্য ছড়ায় অগ্নিধারা,
ক্ষেতে-ও-লাঙ্গলে লগ্ন যারা—
তারাই যে আনে শ্যামলী প্রান্তের সোণালী আলো,
তারাই মোছায় দুঃখ দীপের নিকষ কালো।
কামারের শালে, তপ্ত নেয়াপে আগুনের ধারা লাগি
মহারুদ্রের শক্তি যে ওঠে জাগি।
দিকে দিকে শুধু অর্চনা তারই চলে
প্রভুদের দাস লাঞ্ছনা-হত সেই মানুষের দলে।
ফসল ফলান' ঘর্মে মোদের ধর্ম জাগে
কর্মের দান জগত মাগে,
সে মহাদানের, নিখিল প্রাণের, গাহি শুধু "জয় হোক,"
আবরণ ভেদি যত দীনতার অসীম দুঃখ-শোক।

জোরে হেসে উঠলো শিখা। ও তো একদম বাচ্চাদের কবিতা!

ম্লান হেসে বরুণ ব'ললে, ও, তুমি বুঝি আজকাল বড় হ'য়েচ?

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল শিখার মুখ। বইখানা বন্ধ ক'রে আস্তে আস্তে উঠে বসল বরুণ।—'আজ শরীরটা ভাল লাগচে না, যাই।'

—সে কি, জ্বর-টর হয়নি তো? ব্যস্ত হয়ে শিখা এগিয়ে এসে বরুণের কপালে-বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে,—না, জ্বর হয়নি। কাল আসবেন তো?

—ভালো থাকলে আসতে পারি। শীতের সকালের মত ফিকে হয়ে গেছে বরুণের মুখ।

...সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটি যেন সব চেয়ে কুৎসিত হয়ে গেছে। ফুটনোন্মুখ যূঁই কুঁড়ি আর প্রস্ফুটিত সূর্য্যমুখীতে অনেক তফাৎ। সূর্য্যমুখীর মত শিখার সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়েচে সত্যি, কিন্তু যত দিন সে ফোটেনি তত দিন তার ভেতর যে সম্ভাবনা ছিল সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য, আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা যেন মূল্যহীন হ'য়ে গেছে। বরুণের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শিখাকে সে ভালবাসতো।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৫

ব্ল্যাক-মার্কেট, চুরি, দাঙ্গা—এ-সব ব্যাপারে গ্রামে যথেষ্ট হৈ-চৈ হ'লেও ওগুলির স্থায়িত্ব বেশী দিন নয়। চুরি—দাঙ্গা কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনার পর শান্ত হ'য়ে আসে; ব্ল্যাক-মার্কেট অদৃষ্ট যারে বোঝাটাকে সামান্ত ভারি করেছে মাত্র! কিন্তু মানুষের চরিত্র যদি নষ্ট হয় কোন স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে—সে দুর্নীতিকে লোকে বহু দিন পর্য্যন্ত মেনে নিতে পারে না। ওরা বেশির ভাগ সাধু নয় বলেই বুঝি চরিত্র আর সব দিক্ দিয়ে শিথিল বলেই এই একটি দিকের ত্রুটিকে ভীষণতম অপরাধ বলে গণ্য করে। সামাজিক বিধি-নিষেধ আজকাল ফলপ্রসূ হয় না বলে হাসি-টিটকারী, সঙ্গবর্জ্জন ও বাক্যালাপ বন্ধ করে ওরা অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পায়। বাড়ীর বাইরে পুরন্দরের জগৎ যে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে সে এই কারণে। এই মিথ্যা অপবাদকেও গ্রাহ্য না করলেও—এর দরুণ মানুষের মনে যে অকারণ জ্বালা ধরায়, তার থেকে নিষ্কৃতি লাভও কম ক্ষমতার কাজ নয়। সব সময়ে সহ্য করতে পারে না পুরন্দর। ওদের চড়া কথা বলে ভর্ৎসনা করলো—ওরা বেশি উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে।

ইদানীং সে বাড়ীর বার হওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। তবু নিস্তার নেই। কিছু দিন থেকে আর এক উৎপাত সুরু হয়েছে। সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পরে অন্ধকার গাঢ় হ'লে, ওদের বাড়ীতে ঢিল পড়তে আরম্ভ হ'য়। কোন দিক্ থেকে পড়ে, ঠাহর করা যায় না। প্রথম প্রথম অপদেবতার কাজ বলে পিসিমা রামনাম জপ করতেন। আজ-কাল তিনিও বুঝতে পেরেছেন, মানুষের দুষ্কৃতি নিয়ে অপদেবতাদের মাথাব্যথা এত দীর্ঘ দিন থাকবার কথা নয়। তিনি কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে উপবাসী যমকে আমন্ত্রণ করেন, এই সব অত্যাচারীদের ও তাদের পরিবারবর্গের সকলকে স্বভবনে নিয়ে যাবার জন্ত।

এক দিন পাঁচীলের গায়ে লুকিয়ে থেকে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেকে ধরে ফেললে পুরন্দর। ছেলেটি চক্রবর্ত্তীদের। মাষ্টারের বাড়ি থেকে পড়া তৈরী করে ফিরে যাবার সময়, নিত্য নিয়মিত ভাবে এ কাজটি সে করে আসছে। কাঁদতে কাঁদতে সবই সে স্বীকার করলে। আরও এই দলে যারা আছে ও যারা তাদের শিখিয়ে দিয়েছে এই কাজ করবার জন্ত, তাদেরও নাম করলে।

পুরন্দর বললে, চল তোমার বাবার কাছে যাচ্ছি। আর ইস্কুলের মাষ্টারদেরও বলে দেব।

ছেলেটি খপ করে পুরন্দরের পা জড়িয়ে ধরে বললে, বাবাকে বলবেন না, তাহ'লে আমার পিঠের ছাল তুলে দেবে।

তবে রোজ রোজ ও-কাজ কর কেন?

ছেলেটি জানালে, প্রথম প্রথম ভয় করতো অন্ধকারে। কিন্তু তার পর বেশ আমোদ লাগলো। পুরন্দরের পিসি যতই গাল দেন—ওদের খেলা না কি ততই জমে ওঠে।

পুরন্দর বললে, ঈশপস্-এর গল্পটা মনে পড়ে না? . হোয়াট ইজ, প্লে টু ইউ—ইজ ডেথ, টু আস।

ছেলেটি মাথা নামিয়ে বললে, আমায় মাপ করুন।

পুরন্দর তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে, বাড়ী যাও। তোমার সঙ্গীরা সব চলে গেছে তো? একলা যেতে পারবে অন্ধকারে?

ছেলেটি অসহায় করুণ কণ্ঠে বললে, আপনি একটু এগিয়ে দিন।

পরের দিন থেকে আর ঢিল পড়লো না।

তবু পুরন্দর যথাসম্ভব লোকের সঙ্গ বর্জ্জন করে চলে। নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে বাড়ীর বার হয় না। হাতের কাজ শেষ হ'লে ও বই থেকে গল্প করে দেশ-বিদেশের। বাসু আর মাধব অবাক্ হ'য়ে শোনে।

আজকাল গল্প করার উৎসাহ ওকে পেয়ে বসেছে। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অন্তর্বিপ্লবের আলোক্ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পরাধীন বহু দেশ। চীনের গৃহযুদ্ধের যবনিকাপাত শীঘ্র হবে না, ইন্দোচীনে আগুন জ্বলছে—সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে জাভায়। সিরিয়ায়, লেবাননে, গ্রীসে, বেলজিয়ামে, বলকানে, পারস্তে কোথায় না অন্তর্নিহিত উত্তাপের ধুম গাঢ় হয়ে উঠছে? ভারতবর্ষ তো আগ্নেয় গিরির গহ্বরের উপর দাঁড়িয়ে। ফ্যাসিশক্তি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়েছে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের নিয়ে। চারি দিকের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধকালীন সমস্যা এত বিভিন্নমুখী, পরস্পরবিরোধী ও জটিল ছিল না। বিজিতদের মনেও শান্তি নেই।

কিন্তু সব চেয়ে পুরন্দরের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে—নতুন এক শক্তির উদ্‌ঘাটন।···উনিশশো বিয়াল্লিশে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে দেশব্যাপী জাগরণের যে তরঙ্গ কল্লোল তুলেছিল, এবার যেন বৃহত্তর আকারে সেই তরঙ্গই নতুন শক্তিতে ও অপূর্ব্ব রূপে ফিরে আসছে নতুন বাণী নিয়ে। দিল্লীর লাল কেল্লায় যে কাহিনীর যবনিকা একটু একটু করে উঠছে তা কাহিনী নয়, স্বপ্ন নয়—সে দিন এসেছিল বুঝি সত্যই! চিরজীবী সুভাষ দু'শো বছরের শক্ত শিকলে ঝন্‌ঝনা তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে ভূমিকম্পের দোলা লেগেছিল। শহীদ ও স্বরাজ স্বাধীন ভারতের দু'টি স্তম্ভ ভারত মহাসাগরের বুকে জেগে উঠেছিল। জাতীয় বাহিনী প্রথম এসে মণিপুরের বুকে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করেছিল। স্বাধীন ভারতের ব্যাঙ্ক—তার আইন-কানুন—তার ডাকটিকেট কেনা হয়েছিল। স্বাধীন বহু জাতি তার স্বাধীন সত্তা মেনে নিয়েছিল।

হাঁ—তরঙ্গ এসে পড়লো। তার কম্পন-বেগ শিরার শোণিত-প্রবাহে উন্মাদনা জাগাচ্ছে। একুশে নবেম্বরে মহানগরীর রাজপথ প্রথম অঞ্জলি দিয়েছে তার পায়ে। বিপ্লব-বহ্নি-পরিশুদ্ধ শহীদরা জয়যাত্রা করে চলে গেছে সেই পথ দিয়ে।···ঢেউ আসেনি এই গাঁয়ে—এসেছে অস্ফুট সুর আর কাঁপন। ছোট ছোট ছেলেরা জাতীয় পতাকা হাতে 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি করে এ-পথ ও-পথ এ-গলি ও-বাড়ী করে তাদের মিছিল নিয়ে ফিরেছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত। সত্যিই কি সে তরঙ্গের মর্ম্মকথা ওদের চেতনায় আঘাত করেছে, না খেলার মতো করে ওরা এই জীবন-মরণ সমস্যাকে বরণ করে নিলে।

বাসব বললে, দাদা, এবার তেইশে জানুয়ারী সুভাষ-জন্মতিথি পালন করবো আমরা।

পুরন্দর বললে, আমাদের সঙ্গে কেউ মেশে না, কথা বলে না—আমরা কি করে পালন করবো তাঁর জন্ম-তিথি?

বাসব বললে, অনেক ছেলে এবার মিছিল বার করবে। ওরা অনেক পতাকা অর্ডার দিয়ে গেছে।

পুরন্দর বললে, জাতীয় পতাকা তৈরী করে জন্মোৎসব পালন করবি তো?

বাসব বললে, তাতে কি—যার যেমন ক্ষমতা সে তেমন করবে বই কি। আমরা তো আর দাম নেব না কারও কাছ থেকে।

অবাক্ হয়ে পুরন্দর বললে, তাহলে আমাদের সংসার চলবে কি করে?

বাসবও অবাক্ হয়ে বললে, সেদিন তোমার মুখে গল্প শুনলাম, কত লোক বর্ম্মায়, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে জাতীয় বাহিনীকে রক্ষা করবার জন্ত তাঁদের সর্ব্বস্ব দিয়েছেন নেতাজীর পায়ে। আজ তাঁরা পথের ভিখারী।

পুরন্দর বললে, টাকা কোথায় পাবি বাসু?

বাসব বললে, আমার নামে পোষ্টাপিসের পাস-বুকে যে পঁচিশটা টাকা আছে—মা'র সই নিয়ে আজ উঠিয়ে নেব।

পুরন্দর অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ব্যথায় ও আনন্দে ভরে উঠছে বুক। ওর মনে হ'লো, বাসু পাশ কাটিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়ে আনন্দের কথা—বাসুর স্মৃতিশক্তি বুঝি এই দেশ-সেবার উৎসাহে সম্পূর্ণ ফিরে এলো।

বাইশে জানুয়ারী ও কিছুতেই বসে থাকতে পারলে না বাড়ীতে। লোকের হাসি-টিট্‌কারী সব-কিছু তুচ্ছ হ'য়ে গেল। যে ধ্বনি দূর থেকে নিকটে আসছে ক্রমশঃ—তারই সুরে মগ্ন হয়ে প্রতিকূল গ্রাম্য-পরিবেশ ও ভুলে গেল। দুপুরে বেরিয়ে পড়লো পথে। গেল বার ছাব্বিশে জানুয়ারীতেও পথ তার কত আপন ছিল। যেখানে দিয়ে ও বুক-ভরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলে চলে গেছে শশীদের নিয়ে—সেখানকার ধূলিতে জেগেছে রোমাঞ্চ, আকাশে উঠেছে প্রতিধ্বনি, দু'ধারের মূক-মৌন বাড়ী-ঘর গাছ-পালায় ছড়িয়ে পড়েছে বিস্ময়। ছাব্বিশে জানুয়ারীতে ও অনুভব করেছে এই রোমাঞ্চ, প্রতিধ্বনি, বিস্ময় প্রকৃতিকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ফিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে অন্তরে। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হ'য়েছে অন্তর।

আজ শশীরা নেই, নেই কোন সঙ্গী—যারা গেল বারের ছাব্বিশে জানুয়ারী পালন করেছে পুরন্দরের পাশে দাঁড়িয়ে। তিন-রঙা পতাকা দুলিয়ে যারা কণ্ঠ ভরে তুলেছে মাতার জয়ধ্বনিতে তারা কেউ নেই। আজ যারা আয়োজন করেছে সুভাষ-জন্মতিথির, যারা আহ্বান করবে ছাব্বিশে জানুয়ারীকে—তারা চেনে না পুরন্দরকে। নাই বা চিনলে? ওরা পথের মোড়ে যে উৎসব-তোরণ রচনা করেছে—তিন-রঙা পতাকার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করেছে মুক্ত ভারতের যে বরেণ্য নেতার প্রতিমূর্ত্তিকে—কে বলেছে সকলের পরিত্যক্ত হয়েও পুরন্দর তার শ্রদ্ধা-উপহার দিতে পারবে না ওই মূর্ত্তির উদ্দেশে? ওদের কণ্ঠে মিলাতে পারবে না কণ্ঠ? ওদের হাত ধরে রোমাঞ্চিত দেহে প্রদক্ষিণ করতে পারবে না এই গ্রামকে?

প্রত্যেক পাড়ায় বাঁশের ফ্রেমে তৈরী হ'য়েছে তোরণ। কামিনী ও দেবদারু-পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বাঁশ। গেটের মাথায় কাগজের শিকল তিন-রঙা পতাকার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। মাঝখানে টাঙানো সেই বরেণ্য বীরের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি—যাঁর জন্মোৎসব জাতির জীবনে নূতন জোয়ার এনেছে। প্রতিমূর্ত্তির নীচের লাল কাগজের হরপে লেখা 'জয় হিন্দ'।

উত্তর থেকে দক্ষিণ-পাড়া সবটা ঘুরে বেড়ালে পুরন্দর। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ব্যস্ত রয়েছে অর্ঘ্য রচনায়—কারো পানে চাইবার অবসর তাদের নেই। ওদের সামনে যে মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা জানাবার যে আয়োজন—তাতেই ওরা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছে। ওদের সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছে এই অত্যাসন্ন উৎসব।

পুরন্দর মনে মনে বললে, বার বার ভেঙ্গে গেছে তরঙ্গ। আহা—এ তরঙ্গ যেন না ভাঙ্গে—যেন কূলে এসে পৌছয়। কূলে এসে সে ভাঙ্গবেই কিন্তু সেই সঙ্গে ভাসাবে বহু জনকে—টেনে নেবে আপন কোলে—গভীরে।

দক্ষিণ-পাড়াতে ক'টা তোরণের মধ্যে অবনীদেরটাই সব চেয়ে বড় আর সাজানোও ভাল হয়েছে। অবনীরা জন-কয়েকে তখনও তার সজ্জা শেষ করেনি। কোথায় কি দিলে মানাবে তারই আলোচনা চলছে।

পুরন্দর সেখানে দাঁড়িয়ে বললে, বাঃ—সুন্দর হ'য়েছে তোমাদের গেট।

একটি ছেলে উঠে পুরন্দরের কাছে এলো। বললে, আচ্ছা, কাগজের মালা না দিয়ে আগাগোড়া নিশেন দিলে মানাবে না?

অবনী গেটের ও-পাশ থেকে ধমক দিলে, মণির সব তাতেই বাহাদুরি! নিশেন দিলে ভাল হয়, সে যেন আর আমরা জানি না?

মণি চ'টে উঠে বললে, পুরন্দর বাবু কি বছর বলে এই সব করছেন, ওঁর চেয়ে তোমরা বেশী জান?

অন্যান্য ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠলো। দুলাল বলে একটি ছেলে বললে, ম'ণেটা কি গাধা! সুভাষ বাবুর জন্ম-উৎসব যেন প্রত্যেক বারেই হচ্ছে!

মণি প্রতিবাদ করতে গেল—অবনী কঠিন কণ্ঠে বললে, কাজ করতে চাস্ তো চলে আয়। যাদের মাথায় অনেক রকম মতলব খেলে—তারা যে আমাদের চেয়ে সব বিষয়েই ঝানু, সে আমরা জানি। বাজে লোকের সঙ্গে গল্প করতে চাও যদি—বেশ, তফাতে যাও।

মণি ফিরে এলো দলের মধ্যে। পুরন্দরের কান আর চোখ-মুখ কখন গরম হ'য়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষে লোক মারা যাচ্ছে শুনে যারা এক দিন বলেছিল—আমাদের কি! কোথায় কে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তারাই বলছে—

অপমানকে জোরে এক পাশে ঠেলে পুরন্দর আপন মনে বললে, না—না, সেদিন আর এ দিনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমার অপমানটা কেন গা পেতে নিচ্ছি? এরা যে ফিরেছে বিপথ থেকে পথে, সেই কি সব চেয়ে লাভ নয়?

ফিরবার পথে সিরাজের সঙ্গে দেখা।

কি দোস্ত—কোথায় চলেছ? সিরাজ হেসে প্রশ্ন করলে।

গাঁয়ে জোয়ার এসেছে—তাই দেখছি ঘুরে।

সিরাজ বললে, জোয়ারে গা ভাসিও না—কাদায় গিয়ে পড়বে।

পুরন্দর বললে, তাই বুঝি তোমরা চুপ-চাপ আছ?

সিরাজ বললে, তা-ও না।

পুরন্দর বললে, এ তোমাদের অন্যায়।

সিরাজ বললে, কিসে?

ভারত স্বাধীন হ'লে তোমরা কি তার ফল ভোগ করবে না? যাঁরা জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁরা-সব জাতের লোক—।

সিরাজ শব্দ করে হেসে উঠলো। বললে, এটা ভারতবর্ষ।

বর্ম্মা নয়—মালয় নয়—সিঙ্গাপুর নয়। আমরা যুদ্ধ করতে যাইনি। কেউ আমাদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়েও আসেনি।

পুরন্দর তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, কি বলচো স্পষ্ট করে বল।

সিরাজ বললে, তোমার মন-মেজাজ ভাল নেই বোধ হয়—তাই একটুতেই চটে-চটে উঠছো।

এই কথায় পুরন্দর আপনাকে ফিরে পেলে। সত্যি আসন্ন উৎসবে ওর ঠাঁই হবে না জেনেই ও মনে মনে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে। সিরাজের হাত ধরে বললে, মাপ কর ভাই।

সিরাজ বললে, তোমার কথার একটি উত্তর আছে। এই উৎসব থেকে আমরা দূরে সরে নেই—এর মধ্যেই আমরা আছি। সময় হ'লে কাউকে ডাকতে হবে না ভাই, আপ-সে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চলতে চলতে পুরন্দর আপন মনে প্রশ্ন করলে, সে কবে?—সে কবে?

না—সাধারণের উপেক্ষা ও সইতে পারছে না। ও সংযম হারিয়ে ফেলছে। এ অধিকার কে তুলে দেবে কার হাতে? ও-ই কি দিতে পেরেছিল কারুকে? কত হাবিশে জানুয়ারী তো এসেছে। তীরের কোলে জলের দাগের অস্পষ্ট একটি রেখা কোথাও তো চোখে পড়লো না। দাগ যখন পড়ে—আপন স্থষ্টির খেয়ালেই তা পড়ে। হয়তো সময়, হয়তো প্রতিবেশ, হয়তো মন, হয়তো এই সবের স্বর্ণ যোগাযোগ।...চৈতন্যের প্রথম প্রকাশ—স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার কেউ দেবে না হাতে তুলে, এগিয়ে গিয়ে নিজেকে নিতে হবে।

সে সঙ্কল্প করলে, কেউ না ডাকুক, কালকের উৎসবে যোগদান করবে।

৩৬

বাড়ী ফিরতেই পিসিমা বললেন, কোথায় ঘুরছিলি সারা দিন টো-টো ক'রে? মিত্তিরদের বাড়ী থেকে তোকে দু'বার ডাকতে এসেছিল।

ন?

মেজ বাবুর অবস্থা ভাল নয়।

পুরন্দর বাইরের দিকে পা বাড়াতেই পিসিমা বললেন, দাঁড়া বাপু। দু'দণ্ড সুস্থির হ'য়ে একটু জল খেয়ে তবে যাবি।

জলখাবার খেয়ে পুরন্দর ভাবলে, ওখানে যাওয়া তার উচিত হবে কি না। নিজের লাঞ্ছনার কথা সে আজ মনে ঠাঁই দেয়নি, কিন্তু তার সংস্পর্শে এসে ওদের যদি কোন প্রকার অসম্মান ঘটে। এমনিতেই তো গ্রামের লোক মুখ ফিরিয়েছে অস্তগামী সূর্য্যের দিক্ থেকে। শক্তির শিখর থেকে নেমে গেলে খ্যাতির রশ্মিও ললাটকে আর উজ্জ্বল করে তোলে না। সে কথা মেজ বাবু ভাল করে জানতেন কি না ও জানে না। তবে অসীম ঔদাসীন্যে তিনিও নিজেকে টেনে নিয়েছিলেন গ্রামের শুভাশুভ থেকে। প্রার্থী এসে কোন দিন বিমুখ হয়নি তাঁর কাছে। এবং সেই কারণেই হয়তো বা গ্রামের লোক ওঁর বদান্যতার অন্তরালে আবিষ্কার করেছে ওঁর অহঙ্কারকে! তা মর্য্যাদার দম্ভ ওঁর বরাবরই ছিল। সে দম্ভকে গ্রাম এখনও হয়তো ভয় করে চলে। আর ভয় করে চলে বলে কাপুরুষের যা ধর্ম্ম—শক্তিহীনকে আঘাত করা, লঘু করা,—তা-ও হয়তো যথানিয়মে ওঁর মৃত্যুর পর ঘটবে। আবার ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা দুর্বল লোকের অভাবও নেই গ্রামে। জীবিত কালের সেই বিদ্বেষ ভাবকে এই সব লোক হয়তো পোষণ করবে না—হায় হায় করে ছুটে আসবে সাহায্যের জন্য। কিন্তু পুরন্দরকে দেখলে কোন পক্ষেরই হৃদয় কোমল হওয়ার কারণ ঘটবে না। লাভে হ'তে মৃত ব্যক্তির অসম্মান হতে পারে। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে—যাবে না।

বাসব পতাকা তৈরী নিয়ে মেতে আছে। সারা দিনের পরিশ্রমে ওর স্নায়ু-শিরা শক্ত হয়ে উঠেছে। কত লোক আসছে-যাচ্ছে—ও তাদের ডেকে ডেকে দিচ্ছে পতাকা। বলছে, তোমরাও এক একটি দলের এক-একটা নাম রাখবে। যেমন নেহরু-দল, গান্ধী-দল, সুভাষ-দল। দাদার মুখে শুনেছি, আজাদী ফৌজরা ঐ সব নামে দল গড়েছিল।

মাধবের কোমরের যন্ত্রণা বেড়েছে। বিছানায় শুয়ে ও এক-একবার অস্ফুট স্বরে কাতরাচ্ছে।

পুরন্দর বললে, অমন করছো কেন মাধব কাকা?

মাধব ক্লিষ্ট স্বরে বললে, ধান নিড়োতে নিড়োতে মাজাটা কেমন খট্ করে উঠলো। বামুন অনেকক্ষণ ধরে ডলে দিয়েছে—তবু কন্-কন্ করছে মাঝে মাঝে।

বাতের ব্যথা নয় তো? টারপিন তেল দিয়ে একটু মালিস করে দেব?

না রে বাবা—চিরকালই কি থাকবো? যাবার একটা হেতু চাই তো?

সত্য—কিছুই থাকে না।

ক'দিন হ'লো, সে কাগজে পড়েছে—রাজবন্দী ইন্দ্রজিৎ বসু মুক্তি পেয়েছেন। খবর পেয়েই ও তাঁকে প্রণাম জানিয়ে একখানি পত্র দিয়েছিল। সেই পত্রের উত্তর এসেছে আজ। এই গ্রাম সম্বন্ধে ইন্দ্রজিৎ বসু যে সব মন্তব্য করেছেন, আগেকার চিঠিগুলিতে—ওর একে একে সে সব মনে পড়ছে। এবারও গ্রাম সম্বন্ধে কিছু অনুযোগ করে থাকবে, নতুবা ইন্দ্রজিৎ বসু কেন লিখলেন:

কালের কষ্টিপাথরে স্থায়ী দাগ কাটে যে জিনিষ—তা দুর্নাম নয়, অপযশ নয়। চোর-ডাকাতের সঙ্গে বার বার বাস করে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, দুষ্কৃতি একটা খারাপ বৃত্তি হলেও মানুষ সংশোধনের অতীত হয়ে যায় না। পশুত্বের এক ধাপ এগিয়ে এলে আইন তাকে দণ্ড দান করে কঠোর। কিন্তু প্রবল বৃত্তির স্বভাবই হচ্ছে আঘাত পেলে হিতাহিত জ্ঞান তার লোপ পায়। মানুষকে পশু বলে ঘোষণা করে, পশুবৎ ব্যবহার কর—দেখবে, সে পিশাচ হয়ে উঠেছে। তোমার কথাই বলছি এবার। যারা তোমাকে আজ অহেতুক পীড়ন করছে তারাই তোমার সহিষ্ণুতার দ্বারা এক দিন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। আঘাত দিলে যদি বেদনা বাজলো কি না এ সন্দেহ জাগে, তাহ'লে আঘাতের শক্তি হ্রাস পায়। তুমি সহ্য কর—সহ্য কর। সত্যাগ্রহীর এই শিক্ষাকে ভুল বুঝো না।

গ্রাম সম্বন্ধে লিখেছো—সেখানে সাড়া জাগছে। দূরের ঢেউ মনে হ'চ্ছে নিকটে এসে পড়লো। এখানেও তারে দাঁড়িয়ে তর্ক-বিতর্ক, লাভ ক্ষতি নিয়ে অনর্থক কালক্ষেপ হতে পারে। উনিশশো একুশের ঢেউ যেমন ফিরে গিয়েছিল, উনিশশো ত্রিশের ঢেউ যেমন ভেঙে পড়েছিল কূলে, উনিশশো বিয়াল্লিশে যেমন ঢেউ দেখা গেল না—কল্লোলই শুনলে, এবারও হয়তো তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু না। মাটি আজ উর্ব্বরা হয়েছে—কল্পনাকে রূপ দিয়েছেন ভারতের যে নির্য্যাতিত বীরবৃন্দ—তাঁদেরই ত্যাগে শতাব্দীর সাধনা

দ্রুত সিদ্ধির পথ ধরেছে। আমরা শক্তি ফিরে পেয়েছি, আমাদের ভয় নেই।

ভাবছ ঢেউ ফিরে যাবে—ভেঙ্গে পড়বে? যাক্ না ফিরে, আবার সে আসবে নতুন শক্তি নিয়ে—নতুন প্রাণ নিয়ে। প্রত্যেক দশককে নয়—এবার আসবে প্রত্যেক দণ্ডে। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'য়েছে—তরঙ্গকে রোধ করবে কোন্ শক্তি?

গভীর রাত্রিতে চিঠির ভাষা বুঝি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'য়েছে—তরঙ্গকে রোধ করবে কে? কালের কষ্টিপাথরে স্থায়ী দাগ কাটে যে জিনিস, তা দুর্নাম নয়—অপযশ নয়।

খুট—খুট—খুট। কে কড়া নাড়ছে। পুরন্দর কি শুয়ে আছে? স্বপ্ন দেখছে ঘুমের ঘোরে? অন্ধকার ঘর। মাধব ও বাসুর গভীর নিশ্বাস ফেলার শব্দ অন্ধকারে মর্ম্মরিত হচ্ছে। এই মাত্র না প্রদীপ জ্বেলে পড়ছিল সে ইন্দ্রজিৎ বসুর চিঠি? কিন্তু কোথায় প্রদীপ? পত্রই বা কই? সে কি নিদ্রার ঘোরে ওবেলায় চিঠিখানি আবৃত্তি করে চলেছে হুবহু।

খুট—খুট—খুট। বাইরে কে কড়া নাড়ছে। বালিশের নীচেয় হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা মিললো—প্রদীপ পাওয়া গেল না। একটা কাঠি জ্বেলে সে দুয়োর খুলে দিলে। বাইরের হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল—দাওয়ায় চাঁদের আলো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

পুরন্দর স্তম্ভিত বিস্ময়ে এক মিনিট কাল চেয়ে রইলো জ্যোৎস্না-মাখা সেই আলোয়ান-ঢাকা মূর্ত্তির দিকে। তার পর অর্দ্ধ স্বগতোক্তি করলে, আপনি!

মাথার ওপর থেকে আলোয়ানের অবগুণ্ঠন খসে তখন শাড়ীর রেশমী পাড় চাঁদের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে।

নম্রতা বললে, একটা জাতীয় পতাকা দিতে পারেন?

পুরন্দর এক মুহূর্ত্তে কৌতূহল দমন করে বলল, দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

আলো জ্বেলে সে ঘরের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলে—কোথাও মিললো না পতাকা। বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে পতাকা—নিজেদের বাড়ীর ওপর টাঙানোর জন্ত একটাও অবশিষ্ট নেই।

ওর অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা দেখে নম্রতা শুষ্ক কণ্ঠে বললে, একটিও নেই?

না।—বাসু দিন-ভোর তৈরী করে বিলিয়েছে কি না। কাল তৈরী করে পাঠিয়ে দেব।

নম্রতা ব্যগ্র স্বরে বললে, কিন্তু আমার যে এখনই দরকার। দেখুন না ভাল করে।

আবার সে খুঁজতে লাগলো, সিন্দুকের ডালা তুলে বাক্সের চিঠির গোছার মধ্যে। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল একটা পতাকা। কাপড়ের নয় কাগজের নয়, রেশমের। তাতে বোনা তিন-রঙা রেশম—মাঝখানে সবুজ রঙের একটা ছোট চরকা। তার পাশে লাল পশমে লেখা 'বন্দে মাতরম্।' কিন্তু সেটা নম্রতাকে দেওয়া উচিত হবে কি না, পুরন্দর ভাবতে লাগলো।

নম্রতা বললে, বাঃ, ঐ তো না একটা? দিন—দিন।

পুরন্দর বললে, এটা আপনিই দিয়েছিলেন এক দিন।

খুলে পতাকাটা ও মেলে ধরলে। প্রদীপের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠলো মসৃণ রেশম।

নম্রতা হাত বাড়িয়ে সেটা নিলে। বললে, কিছু মনে করবেন না—এটা আমি একেবারে নিলাম। আর কথা না বলে সে দাওয়ার নীচে এসে দাঁড়ালো।

পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো দাওয়া থেকে। বললে, আপনি একা এলেন কেন এত রাতে?

নম্রতা বললে, আপনি কই . গেলেন না তো?

লজ্জিত হয়ে পুরন্দর বললে, কেন যাইনি—

নম্রতা চলতে চলতে বললে, জানি।

সত্যিই কি জানে নম্রতা? যদি জানে, তো এই রাত্রিতে এখানে আসবার দুঃসাহস ওর কেমন করে জন্মালো?

চলতে চলতে নম্রতা বললে, আপনি ফিরে যান।

পুরন্দর বললে, আর একটু এগিয়ে দিই আপনাকে।

নম্রতা হঠাৎ ফিরে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, আপনার বাধবে না? লজ্জা করবে না?

পুরন্দর অধোমুখে উত্তর দিলে, লজ্জা আমার জন্ত নয়।

নম্রতা বললে, তাও জানি। কিন্তু লজ্জা করবো সে অবসর আমাদেরই বা কোথায়?

পুরন্দর উত্তর দিলে না।

নম্রতা মুখ ফিরিয়ে চলতে চলতে বললে, আচ্ছা আসুন। রাত আর বেশি নেই। তবুও পুরন্দর তাকে অনুসরণ করছে দেখে বললে, কাল সকালে একবার আসবেন! আসবেন—বুঝলেন। অনুনয়ে ওর কণ্ঠস্বর করুণ হ'য়ে উঠলো।

পুরন্দর বললে, কেন বলুন তো?

নম্রতা বললে, কাল আমরাও শোভাযাত্রা বার করবো। তাই তো এটা চেয়ে নিলাম—

বলতে বলতে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

পুরন্দর নম্রতার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের ভুল অর্থ বুঝলে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, নিশ্চয় আসবো। সুভাষ-জন্মতিথির উৎসবে—

নম্রতা মুখ ফিরিয়ে মৃদু স্বরে বললে, জন্মতিথি নয়। একটু আগে মেজকা' মারা গেলেন।

পশ্চিম থেকে পাণ্ডুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর শোকস্তব্ধ থমথমে মুখে,—দু'চোখে টল-টল করছে জল।

চাঁদের ছলছলে আলোয় পৃথিবী অকস্মাৎ গম্ভীর ও শব্দহীন হয়ে উঠলো। মুহূর্ত্তের জন্ত থেমে গেল অনাদি কালের অব্যাহত স্রোত।

জীবন-সাগরে মৃত্যু প্রচণ্ড একটা দোলা দিলে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্ত। মুহূর্ত্ত পরে দূরে বেজে উঠলো একটা শাঁখ।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে—সামনে—বামে ও দক্ষিণে—শাঁখ শাঁখ শাঁখ। প্রতিধ্বনিত হ'লো সেই আহ্বান। মৃত্যুর বিক্ষো ফেলে জীবনের ঢেউ এগিয়ে আসছে। শব্দে কেঁপে গ্রাম, কেঁপে উঠলো নিদ্রিত গাছ-পালা, পথ, প্রাসাদ, কাঁপতে সে ধ্বনি-তরঙ্গ বিস্তৃত হ'লো আকাশে। তারাটা সেই উৎসব ঘোষণার সঙ্কেতে বার বার কাঁ

সমাপ্ত

কবি ও পরী

শ্রীসুলতা কর

বড় রাস্তার মোড়ে ঝকঝকে তিনতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনের ঘরে খাবারের দোকান। কাচের আলমারীতে কেক্, পুডিং, মাখন, মধু আরও কত কি উপাদেয় খাবার সাজান রয়েছে। এই প্রাসাদের তুল্য বাড়ীর তিনতলায় থাকত দোকানদার আর তার স্ত্রী। এই বাড়ীরই একতলায় একখানি অন্ধকার ছোট ঘর, সামান্ত টাকায় ভাড় নিয়ে থাকত এক গরীব কবি।

এরা ক'জন ছাড়া আর একটি প্রাণীও এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে থাকত। যদিও দোকানদার, তার স্ত্রী কিংবা গরীব কবি কেউ তার অস্তিত্ব জানতে পারত না, কিংবা তাকে দেখতে পেত না। সে হ'ল এক্ অতি ছোট পরী।

প্রথম এই বাড়ীতে এসে পরী ভাবতে লাগল--তাইত, কার ঘরে থাকব? দোকানদারের, না কবির?

গরীব কবির ঘরে কোন আসবাব নাই, মাত্র একটি লোহার খাট, ছেঁড়া বিছানা, টেবিলে স্তুপাকার বই। আর বড়লোক দোকানদারের যেমন দামী আসবাবে সাজান ঘর, তেমনি চমৎকার খাবারে সাজান দোকান। কি মিষ্টি মধু বোতলে রয়েছে। ওই মধু পেয়েই ত বাঁচতে হবে—এই সব নানা কথা ভেবে ছোট পরী ঠিক করল, দোকানদারের ঘরই তার থাকবার উপযুক্ত জায়গা। কাজেই সে দোকানদারের ঘরেই থাকতে লাগল।

এক সন্ধ্যা বেলা, কবি দোকান-ঘরে এসে অল্প একটু মাখন কিনতে চাইল। রাতে পাঁউরুটির সঙ্গে খাবে। অতি গরীব সে, ভাল খাবার খেতে পায় না, ভাল পোষাক পরতে পায় না।

বড়লোক হলেও দোকানদার আর তার স্ত্রী ছ'জনেই গরীব কবিকে খুব ভাল বাসত। মাখন কাগজে মুড়তে মুড়তে দোকানদার হেসে জিগেস করল—"কি ভাই, ভাল আছ ত? কেমন শীত পড়েছে বলত?"

কবি বলল—"হ্যাঁ, ভালই আছি। এবারে বড় জোর শীত।"—কথা বলতে বলতে হঠাৎ কবির চোখ পড়ল দোকানদারের হাতের মাখন-মোড়া কাগজের দিকে। কি সব যেন তাতে লেখা রয়েছে।

কবি হাত বাড়িয়ে বলল—"কাগজটা একবার দাও ত দেখি?" দোকানদার কাগজ এগিয়ে দিল। দোকানের ঝলমলে আলোয় ছেঁড়া কাগজের টুকরা ছড়িয়ে ধরে কবি এক-মনে পড়তে লাগল—কি চমৎকার কবিতা!

মন তার মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল—"কোথা থেকে পেলে তুমি এই কাগজটা? এমন দামী জিনিষ নষ্ট করে কি মাখন মুড়তে আছে?"

দোকানদার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—"ওঃ, এই কাগজের কথা বলছ? দিন-কতক আগে এক বুড়ী আমার দোকানে এসেছিল। বুড়ীর পয়সা ছিল না। একটা মোটা কাগজের পুরানো বই আমাকে দিয়ে একটু কফি চাইল। ছেঁড়া পুরানো বই আমার আর কি কাজে লাগবে? তবু, গরীব মানুষ চাইছে, দয়া হ'ল; বইটা রেখে কফি দিলাম। দেবে না কি বইটা? ওই কোণে পড়ে রয়েছে। ছ'আনা আর দিলেই দিয়ে দেবো।"

কবি ব্যস্ত হয়ে বলল—"আছে না কি বইটা? দাও, দাও, এখনই দিয়ে দাও। এখন ত আমার হাতে পয়সা নাই, মাখনটা তুমি ফিরিয়ে নাও। তার বদলে বইটা দাও। রাতে পাঁউরুটি আমি মাখন না দিয়েই খেতে পারব, কিন্তু এমন কবিতা পড়তে না পেলে সারা রাত ঘুম হবে না।"

একটু হেসে দোকানদারকে ঠাট্টা করে বলল—"খাবার তৈরীর কথা তুমি খুব ভাল বোঝ সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিতার দাম যে কত, সে আর কি বুঝবে বল? তোমার দোকানের পুরানো কাগজ-ভর্ত্তি ওই কাঠের ডেস্কটাও যেমন কবিতা বুঝবে, তুমিও ঠিক সেই রকম বুঝবে।"

অন্য লোক হলে এ-রকম কথায় রেগে যেত, কিন্তু দোকানদার এই পাগলাটে কবিকে ভাল করেই চিনত। তাই তার কথাতে একটুও রাগ করল না। হেসে বলল—"তা ভাই ঠিক বলেছ। শুকনো পাঁউরুটি খেয়ে কবিতা পড়তে তোমরাই পার। আমাদের ও-সব আসে না।"

দোকানদার আর কবিতে যখন এই সব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তখন ছোট পরী কাঠের ডেস্কের পাশে বসেছিল। 'দোকানদার আর কাঠের ডেস্ক ছ'জনেই সমান কবিতা বোঝে'—কবির এই কথা শুনে সে খুব রেগে উঠল। ভাবতে লাগল—কবি এত গরীব যে খেতে পায় না, অন্ধকার ঘরের কোণে পড়ে থাকে। আর দোকানদার কত বড়লোক, কি চমৎকার প্রাসাদে রয়েছে, কত ঐশ্বর্য্য ভোগ করছে। কোন্ সাহসে কবি দোকানদারকে বোকা বলে?

পরী মনে মনে গজরাতে লাগল। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন পরী উঠে দোকানদারের শোবার ঘরে গেল। সে আর তার স্ত্রী অগাধে ঘুমাচ্ছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পরী একটা মন্ত্র বলতে বলতে দোকানদারের স্ত্রীর মুখ থেকে জিভটা খসিয়ে নিল।

মন্ত্রের গুণে তার ঘুমও ভাঙল না, জিভ খসে যাওয়ার জন্য কষ্টও হল না।

দোকানদারের স্ত্রী ছিল ভারী মুখরা। একবার সে কথা বলতে আরম্ভ করলে কারও সাধ্য ছিল না তাকে থামায়। কাজেই তার জিভেরও অনর্গল বকুনীর অভ্যাস হয়েছিল।

ছোট পরী জিভটা নিয়ে চলে গেল বাইরের দোকান-ঘরে। যে কাঠের ডেস্ককে কবিতা বোঝে না বলে কবি অপমান করেছিল, প্রথমে তার গায়ে জিভটা লাগিয়ে দিল।

পরীর মন্ত্রের জোরে জিভ দোকানদারের স্ত্রীর মত অনর্গল কথা বলতে আরম্ভ করল।

পরী জিগেস্ করল—"আচ্ছা ভাই কাঠের ডেস্ক, কবি যা বলল, তা কি ঠিক? কবিতা কাকে বলে তুমি কি জান না?"

সগর্ব্বে কাঠের ডেস্ক বলে উঠল—"নিশ্চয়ই জানি। এই যে আমার উপর ছেঁড়া কাগজের স্তূপ দেখছ, এদের ভিতর কত কবিতা লেখা আছে। এক একটা প্রবন্ধ যেখানে শেষ হয়, তখন তার তলাতে চার লাইন, ছয় লাইন ছোট ছোট যে সব লেখা বার হয়, তাকে বলে কবিতা। কত লোক আবার সেই সব চার-ছয় লাইন লেখা কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে যত্ন করে রেখে দেয়।"

অহঙ্কারে ফুলতে ফুলতে কাঠের ডেস্ক বলে চলল—"কবিতার কত কথা আমি জানি, আর আমায় বলে কি না কবিতা বোঝে না? গরীব কবির কাছে ক'টা কবিতা আছে? ওর চেয়ে ঢের বেশী কবিতা আমার বুকে আমি ধরে রেখেছি।"

পরী এবার জিভটা সরিয়ে নিয়ে কফি তৈরীর কলে লাগিয়ে দিল। ঠিক যেমন জোরে দোকানদারের স্ত্রী বকে যায়, তেমনি জোরে কল ঘুরতে লাগল আর বলতে লাগল,—"আমিও কবিতা বুঝি—আমিও কবিতা বুঝি।"

কলের কর্কশ আওয়াজে অস্থির হয়ে পরী তাড়াতাড়ি জিভটা খুলে নিল। তার পর এক-এক করে লাগিয়ে দিতে লাগল মাখনের বোতলে, টাকার ক্যাশ বাক্সে, কেকের কৌটায়। জিভ লাগান মাত্রই তারা সবাই বলতে লাগল—"আমরাও কবিতা বুঝি,—আমরাও কবিতা বুঝি।"

এই সব শুনে পরী ভাবল—তবে ত দেখছি কবি মিথ্যা কথা বলেছে। এরা সবাই কবিতা বোঝে বলছে। যাই একবার এদের মতামত কবিকে জানিয়ে আসি।

পরী একতলার অন্ধকার ছোট ঘরের দিকে চলল। কবির ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। পরী নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি মারতে লাগল। সে দেখতে লাগল—কবির টেবিলে একটি মোমবাতি জ্বলছে। সেই অল্প আলোয় ঝুঁকে পড়ে সে এক-মনে দোকান থেকে কেনা ছেঁড়া কবিতার বইটি পড়ছে। পড়তে পড়তে হঠাৎ কি এক আনন্দে তার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাতে অন্ধকার ঘরে কোথা থেকে যেন হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাল্বের আলো জ্বলে উঠল।

পরী অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—ছেঁড়া কবিতার বইয়ের পাতার ভিতর থেকে ঠিকরে উঠছে আলোর ফোয়ারা। কবি এক-মনে কবিতা পড়ছে, তার মাথার উপর রঙীন আলোর গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি আশ্চর্য্য সুন্দর নীল তারার ফুল থেকে-থেকে ফুটে উঠছে।

কোথা থেকে ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। সমস্ত ঘর জুড়ে বেজে উঠছে স্বর্গীয় গানের সুর।

ছোট পরী পৃথিবীতে কত দিন রয়েছে। কিন্তু কখনও এমন সুন্দর স্বর্গের ছবি দেখিতে পায়নি। কতক্ষণ পরে কবি ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘর অন্ধকার, পরী আর কিছু দেখতে পেল না বটে, তবুও শুনতে লাগল মিষ্টি গানের সুর। কে যেন ছোট-বেলার ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে কবিকে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে! দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পরী ভাবতে লাগল—ছেঁড়া কবিতার বইয়ের ভিতর যে এত ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তা ত আমি কোন দিন ভাবিনি! এবার বুঝেছি, কবি এত গরীব হয়েও কোন্ সাহসে দোকানদারকে আর তার কাঠের চেয়ার-টেবিলকে ঠাট্টা করতে পারে। কবি যে ঐশ্বর্য্য পেয়েছে, ওরা তার এক কণাও পায়নি।

এই সব ভাবতে ভাবতে পরী চলল বাইরের দোকান-ঘরের অবস্থা দেখতে। দোকান-ঘরে পৌঁছে শুনতে পেল কর্কশ চীৎকার! দোকানদারের স্ত্রীর জিভ মনের সাথে চীৎকার করে চলেছে। কোথায় কবির ঘরের মিষ্টি গানের সুর, আর কোথায় এই কর্কশ চীৎকার!

অস্থির হয়ে উঠে পরী তাড়াতাড়ি আসবাব-পত্রের গা থেকে জিভ খসিয়ে নিয়ে দোকানদারের স্ত্রীর ঘুমন্ত মুখে লাগিয়ে দিয়ে এল।

সারা রাত ছোট পরীর ঘুম হ'ল না। কেবলি ভাবতে লাগল, তাই ত, কোথায় থাকা যায়? দোকানদারের ঘরে, না, কবির ঘরে? কবির ঘরে থাকা কত আরামের, কি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব, কি মিষ্টি গান শুনতে পাব। দোকানদারের অহঙ্কার-ভরা কথা আর তার স্ত্রীর কর্কশ ঝগড়া শুনতে হবে না।

কিন্তু একটু পরে হঠাৎ পরীর মনে হল—যখন খিদে পাবে তখন মধু কোথায় পাব? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরী বলল—"খারাপ লাগলে আর কি হবে। দোকানদারকে দেখছি ছাড়া যায় না।"

কাজেই ছোট পরীকে দোকানদারের ঘরেই থেকে যেতে হল। কিন্তু আর তার আগের মত এখানে মন বসত না। প্রতি রাতে যখনি কবির ঘরের মিটমিটে মোমবাতী জ্বলে উঠত, অমনি সে ছুটে চলে যেত কবির অন্ধকার ঘরের দরজার পাশে। অবাক্ হয়ে রোজই দেখত সেই প্রথম দিনের দৃশ্য। কবি কবিতা পড়ছে, রঙীন আলোয় ঘর ভরে উঠেছে, দেব-লোকের গান শোনা যাচ্ছে, পারিজাতের গন্ধে ঘর ভরপুর।

নিজের ঘরে ফেরার পথে রোজই তার মনে হত—বাইরেটা কি ঠাণ্ডা, কি অন্ধকার আর কত বিশ্রী। সেই-সঙ্গে মনে হত, কি আশ্চর্য্য, যতক্ষণ না কবির ঘরের আলো বাইরে এসে পড়ে, যতক্ষণ না তার ঘরের বাতি নেভে, ততক্ষণ তো এ-সব কিছুই বুঝতে পারি না।

এমনি ভাবে ছোট পরীর কত দিন কেটে গেল। তার পর এক দিন একটা ব্যাপার ঘটল।

গভীর রাত। কবির ঘর থেকে ফিরে এসে পরী নিজের বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় বাইরে হঠাৎ ভয়ানক গোলমাল উঠল।

'আগুন' 'আগুন'—প্রতিবেশীদের চীৎকার, দমকলের হুইশিল্! পরী চমকে বিছানায় উঠে বসল।

কি হ'ল, কোথায় আগুন লাগল—দেখবার জন্য সে ছুটে বাইরে এল। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝতে পারল না। বাড়ীর সকলেই ঠিক তারই মত হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখে উঠে স্তম্ভিত হয়ে ছুটোছুটি করছে, চীৎকার করছে। নিজেদের বাড়ীতে কিংবা পাশের বাড়ীতে আগুন লেগেছে বুঝতে পারছে না।

সমস্ত বাড়ী ধোঁয়ায়, আগুনের আলোয় ভরে উঠেছে। পরী চেয়ে দেখল, ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দোকানদারের স্ত্রী কানের দামী ইয়ারিং খুলে ফেলে জামার তলায় লুকোবার চেষ্টা করছে। বুড়ী ঝি নতুন কেনা চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে। দোকানদার টাকার ক্যাশবাক্স বার করে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। এই বিপদের মুহূর্ত্তে বাড়ীর প্রত্যেকেই—তার সব চেয়ে প্রিয় আর সব চেয়ে দামী জিনিষটিকে বাঁচাবার জন্য যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

পরীর মনে হল—তাই ত আমারও তো উচিত নিজের সব চেয়ে প্রিয় জিনিষটিকে বাঁচান। কিন্তু কোথায় সে জিনিষ? দোকান-ঘরে না কবির ঘরে? হঠাৎ বাইরের আগুন আরও জোরে ঝলসে উঠল। মুহূর্ত্তেই কি এক প্রেরণায় পরী ছুটে চলল কবির ঘরের দিকে। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে। চেয়ে দেখল, কবি প্রশান্ত মুখে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অগ্নিলীলা দেখছে। আগুন লেগেছে পাশের প্রতিবেশীর বাড়ীতে। টেবিলে পড়ে রয়েছে সেই ছেঁড়া কবিতার বই।

পাগলের মত ছুটে গিয়ে পরী কবিতার বই তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার পর ছুটতে ছুটতে চলে গেল আগুনের তাণ্ডবলীলা থেকে অনেক দূরে—খোলা মাঠে নীল আকাশের তলায়।

কতক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। তার পর তার মন শান্ত হ'ল। কবিতার বইয়ের মলাটে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—"এত দিনে বুঝলাম, আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ কি? মধুর চেয়ে কবিতাকে আমি ঢের বেশী ভালবাসি। ভাগ্যে এমন বিপদ এসেছিল, তাই তো বুঝলাম সব চেয়ে কাকে ভালবাসি!

পেটের ক্ষুধা মিটাবার জন্য দোকানদারের ঘরে থাকি বটে, কিন্তু কবিতা নইলে কি মনের ক্ষুধা মেটে? আজ থেকে কবির ঘরেই আমি থাকব। কবির ঘরে না থাকলে কি স্বর্গের পরী বাঁচতে পারে?" *

---

* [বিদেশী গল্পের ছায়া

চা-মাহাত্ম্য

মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

বন্দিলাম গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন—
সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধি হয় বন্দিলে চরণ।
ভক্তিযুত হয়্যা বন্দি দেব মহেশ্বর
হলাহল পান করি রহিলা অমর।
কাশীর কোটাল বন্দি শ্রীভৈরবনাথ
ফাজিল কার্ত্তিক বন্দি গোঁফে যার হাত।
সঙ্কট-হরণ বন্দি, বন্দি লেজ তার—
শিরেতে বুলায়্যা করে ভব-সিন্ধু পার।
প্রণমামি কুষাণ্ডারে মেনকার সুতা
যাহার মন্দিরে যায়্যা হারাইনু জুতা।
এ পর্য্যন্ত শেষ করি বন্দনার পালা
চায়ের মহিমা কিছু বলি এই বেলা।
চা খাইব এ কথাটি বলিও না আর—
কেন চা খাইবে তাহা ভাব' একবার।
কোথায়, কখন্, কে বা, কেন চা খাইল
কাহার কৃপায় কারা খবর পাইল?
চিয়াপানি খায় চীনা মার্কপোলো কয়—
জগৎ জুড়িয়া তার উঠে জয় জয়।
জাপানের চায়াওয়া কিমোনো পরিল—
চা—নো—ইউ উৎসবে হিবাচী জ্বালিল।
রাশিয়ার সামোভার টগ্‌বগ্ ফোটে—
তুর্কমান, খীরগিজ্, কসাকাদি জোটে।
তিব্বতের দুলো-লামা বাড়াইল হাত—
চা সেখানে পেয় নয় খাদ্য যেন ভাত!
বাঁশের চোঙের মধ্যে মাখম পূরিল—
ছাতু, নুণ, চা দিয়া পম্প করিল।
বানান ভুলিল স্যর টমাস ডেস্‌প্যাচে—
থা হইল TEA তাই আজ তারা বেচে।
ইটালীর কেত্তলীতে দ্য'ভিঞ্চির ছবি।
মুখরিত চা'-চক্র আসরে মহাকবি।
চা'-চাতকের দল বীর নিশ্চয়
ক্ষয়, ক্ষতি, রোগ-ভোগ তবু জয় জয়।
চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ।
সর্ব্ববিধ ব্যাধি দূরে করে পলায়ন।

অমলা দেবী

মাস কয়েক পরে একটা ব্যাপার ঘটিল। আমাদের গ্রামের মাইল ছয় দূরে একটা জঙ্গল সেই জঙ্গলে সৈন্যদের ছাউনী তৈরী হইতে লাগিল। এই কাজের ভারপ্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টর অন্নদার বৌ-এর সম্পর্কে ভগিনীপতি। নাম অজিত বাবু। অজিত বাবু দামী মোটরে চড়িয়া বৌ-এর সঙ্গে দেখা করিতে আসলেন এক দিন। বৌ-এর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এইখান হইতে কাজ দেখা-শুনা করা স্থির করিলেন। অন্নদার বৈঠকখানাটা ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়াছিল এত দিন। অজিত বাবু ঘরটা মেরামত করাইয়া লইয়া সেইখানে থাকার ব্যবস্থা করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল অন্নদার বাড়ীতে। বৌ-এর যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সেই জন্ত এক জন চাকর ও এক জন পাচক নিযুক্ত করিলেন।

পাড়ার মাতব্বরেরা কয়েক দিনের মধ্যেই অজিত বাবুর সহিত খাতির জমাইতে সুরু করিলেন। তাঁহাদের বেকার ছেলেদের নিজের অধীনে কাজ দিলেন অজিত বাবু। আরও নানা ভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগলেন। ফলে, তাঁহারা অজিত বাবুর অত্যন্ত অনুগত হইয়া উঠিলেন। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে অন্নদার বৈঠকখানার রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত বসিয়া অজিত বাবুর গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও অনেকে অজিত বাবুর অনুগ্রহ প্রত্যাশায় ভিড় করিতে শুরু করিল। অন্নদার বাড়ীতে আনা-গোনা শুরু করিল পাড়ার ও অন্য পাড়ার অনেক প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা, নিজের নিজের বেকার ছেলে বা নাতির চাকরীর জন্ত অন্নদার বৌকে দিয়া অজিত বাবুর কাছে সুপারিশ করাইবার উদ্দেশ্যে। বৌ-এর শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। দিন-রাত বৌ-এর খবরদারী করিতে লাগিল তাহারা। কাজেই আমরা দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

অন্নদার বাড়ীখানার চেহারা বদলাইয়া গেল। অজিত বাবু নিজের খরচে সমস্ত বাড়ীটা মেরামত করাইয়া দিলেন। অন্নদার সংসার-তরণীর হালও ধরিলেন। জীবন যাত্রার ধরণে বড়লোকিয়ানার জৌলুস ধরিল। ভাল খাওয়া, ভাল পরা। প্রসবের পর হইতে বৌ-এর শরীর সুস্থ ছিল না; শিশুটি তো আজন্ম রুগ্ন। পাশের গ্রামের ডাক্তারের হাতে তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। সহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া দুই দিন দুই জনকে দেখিয়া গেলেন। বৌ-এর মনোরঞ্জনের জন্ত অজিত বাবু একটা গ্রামোফোন ও বিস্তর রেকর্ড কিনিয়া আনিয়া দিলেন। বৌ-এর এখন আর সংসারের কোন কাজই করিতে হয় না—ঠাকুর-চাকর সব করে। ছেলেরও তদারক করিতে হয় না, তার ভার সম্পূর্ণ বুড়ী ঝির হাতে। বুড়ী ঝির কাজের জন্ত তাহার নাতনীকে নিযুক্ত করা হইল। বৌ এখন শুধু খায়-দায়, অজিত বাবুর দেওয়া ভাল-ভাল শাড়ী, সেমিজ, ব্লাউস পরিয়া দোতলার শোবার ঘরে বসিয়া সারা-দিন গ্রামোফোন বাজায়; আর সন্ধ্যার সময়ে অজিত বাবুর মোটরে চড়িয়া সপুত্র হাওয়া খাইয়া আসে। কেষ্টি পিসি আর অঘোর ঠাকুমা মুখ টিপিয়া হাসেন, আর বলেন, আহা যদি অন্নদা আসিয়া স্বচক্ষে বৌ-এর এত সুখ দেখিয়া যাইত!

পাড়ায় মেয়েদের মনে ঈর্ষার হুল ফুটিতে লাগিল। একসঙ্গে জড় হইলেই ঐ আলোচনা। ভগিনীপতির এত ভালবাসা! ভাল ভাল শাড়ী, গয়না কিনিয়া দেওয়া! ঠাকুর-চাকর রাখিয়া রাজরাণীর মত আরামের ব্যবস্থা করা! হাওয়া-গাড়ীতে চড়াইয়া বেড়াইয়া আনা! নিজের স্বামীর কাছেও যে এত আদর-যত্ন পায় না কেউ!

কেহ হয়তো চোখ টিপিয়া, মুচকি হাসিয়া কহে—শুধুই কি দেয়?

অঘোর ঠাকুমা কাছে থাকিলে নাতবৌদের ঠাট্টা করিয়া বলেন—"অকর্ম্মা স্বামীগুলোকে ছেড়ে দে। বড়লোক ভগিনীপতি থাকে তো ধর গে—যুদ্ধের বাজারে সুখে থাকবি, বাহারে দামী শাড়ী পরবি, হাওয়া-গাড়ী চড়ে, ফরফর করে আঁচল উড়িয়ে হাওয়া খেয়ে আসবি।"

মেয়েরা হাসিয়া গড়াইয়া পিয়া জবাব দেয়—"কারও যদি বড়লোক ভগিনীপতি না থাকে, ঠাকুমা!"

—"না থাকে তো পরের ভগিনীপতিকেই ধর গে, পারিস্ তো—"

গৃহিণীকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি বল দেখি?"

স্ত্রী কহিলেন—"কিসের?"

—"অন্নদার বৌ-এর—"

—"কি আবার ব্যাপার? ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছে এক রকম করে।"

মুচকি হাসিয়া কহিলাম, "এক রকম করে নয়—বেশ ভাল রকম করেই। স্কুলে শুনি তো—নানা লোকের মুখে নানা কথা; নিজের চোখেও তো দেখি কিছু কিছু।"

গৃহিণী গম্ভীর মুখে কহিলেন—"খাওয়া-পরার কষ্ট নাই; সংসারের কাজ করতে হয় না; ছেলেটারও চিকিচ্ছে হচ্ছে; দিন-রাত বাড়ীতে গান-বাজনা, লোকের ভিড় আর হৈ-চৈ; এইগুলোই লোকে দেখে আর শুনে। কিন্তু মেয়েমানুষের ওই তো সব নয়। চোখের জল শুকোয় না ওতে—"

সবিস্ময়ে কহিলাম—"অন্নদার জন্যে এখনও কান্নাকাটি করে না কি?"

—"হ্যাঁ, আড়াল পেলেই কাঁদে। যমের দরজায় স্বামীকে পাঠিয়ে কোন্ মেয়ে না কেঁদে পারে বল?"

কহিলাম,—"তবে যে শুনলাম, খুব ফূর্ত্তি এখন; ভগিনীপতির সঙ্গে হাসি-খুসি, আমোদ-প্রমোদ—"

গৃহিণী ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন—"ও-কথা বোলো না। সতীলক্ষ্মী বৌ। হিংসেয় কে কি না বলে? চোখের সামনে ছেঁড়া কাপড় প'রে, দু'বেলা আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে মরতে দেখলেই লোকে ভাল বলত। তা'ছাড়া, অজিত বাবু ভাল লোক।"

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম—"কি করে জানলে?"

গৃহিণী কহিলেন—"আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যে!"

সভয়ে কহিলাম—"বল কি। তুমি আবার ও-ফাঁদে কেন? ভাল শাড়ী-গয়না না দিতে পারি, হাওয়া-গাড়ী এক দিন চড়িয়ে নিয়ে আসব সহরে গিয়ে—যত খরচই হোক!"

গৃহিণী সক্রোধে কহিলেন—"খুব হয়েছে! সব সুখই করিয়েছ, ওই টুকুই বাকী! বাজে কথা বোলো না। হাওয়া-গাড়ী চড়ার

জন্তে হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি আর কি! ঐ হিংসেতে পাড়ার মেয়েগুলো মরে গেল। বৌ চায় না এ-সব; অজিত বাবু শুনে না। ডাক্তার বলেছে, ছেলেটাকে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আনতে। ছেলের জন্তেই যেতে হয় তাকে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"অজিত বাবুকে দেখলাম সেদিন। বিকেল বেলায় বৌ-এর ওখানে গিয়েছিলাম। অজিত বাবু চা খেতে এলেন। তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম বৌ খপ করে হাত ধরে বলল—'যাবেন না দিদি! জামাই বাবুর কাছে লজ্জা কি? আমার দাদার মতন, আপনারও'। অজিত বাবু খুব খাতির করলেন। তোমার নাম করে বললেন—'ওঁর কথা অনেক শুনেছি। আলাপ করতে পারিনি, সময় কম; একদিন আলাপ করে আসব।' উনি যাবার পরে বৌ অজিত বাবুর সব পরিচয় দিল। খুব গরীবের ছেলে; নিজের বাড়ীতে রেখে মানুষ করে ওর সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে দেন ওর বাবা। বৌকে ছোট বোনের মত দেখেন বরাবর। অনেক টাকা রোজগার। মস্ত বড় ঠিকেদার তো!" বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"ঐ রকম একটা লোক, নিজের লোকের এত দুরবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারে? তুমি পারতে আমাদের কলু (কল্যাণী আমার কনিষ্ঠা শ্যালিকা) যদি কষ্টে পড়ত, আর তুমি মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে?"—বলিয়া আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইলেন। ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইতে হইল। গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—"তা'ও বৌ কিছু নিতে চায়নি প্রথমে। অজিত বাবু ওর দিদিকে চিঠি লিখে দেন। ওর দিদি অভিমান করে চিঠি লেখে ওকে। চিঠি দেখাল আমাকে—"

কহিলাম—বৌ-এর দিদি তো এখানে এসে থাকলেই পারে। তা'হলে কোন কথার সৃষ্টি হয় না।"

স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সাফাই গাহিলেন—"কি করে আসবে? অজিত বাবুর তো এক যায়গায় কাজ নয়। আজ এখানে, কাল সেখানে। স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের বর্দ্ধমানে বাড়ীভাড়া করে রেখেছেন। ছেলে-মেয়েরা পড়া-শুনা করে সব ওখানে। ছেলে-মেয়েদের রেখে তো আসা চলে না; বিশেষ করে মেয়েদের—সব বড় হয়েছে তো। তবে আসবে না কি সব পূজোর সময়ে।"

মাঝে এক দিন রায় সাহেব আসিলেন। অঘোর, ক্ষেন্তি এবং তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা রায় সাহেবের কাছে দরবার করিল,—ব্যবস্থা কর একটা, চোখের সামনে বেলেল্লাগিরি আর দেখা যাচ্ছে না!

রায় সাহেব আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া কহিলেন—"কি হ'ল?"

অঘোর ঠাকুমা মুখপাত্রী হিসাবে কহিলেন—"ঐ অন্নদার বৌটা; বড়লোক ভগিনীপতিকে নিয়ে কি কাণ্ডই না করছে! সোয়ামী বিদেশে পড়ে; বেঁচে আছে কি না ভগবান জানেন; ছুঁড়ি শাড়ী-গয়না পরে, ভগিনীপতির হাত ধরে, হাওয়া গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। আরাম কত। চাকর, ঝি, বামুন; নড়ে বসতে হয় না। দিন-রাত গান-বাজনা, রাত দুপুর পর্য্যন্ত ভগিনীপতিকে নিয়ে হাসি-গল্প-ফুর্ত্তি।"

রায় সাহেব চুপ করিয়া শুনিয়া কহিলেন—"বলেছিলাম যে তখন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারলে কৈ?"

অঘোর ঠাকুমা খনখন্ করিয়া কহিলেন—"যাবে কেন ছুঁড়ি? ভিতরে ভিতরে ঐ সব মতলব আঁটছিল। না হলে কোথায় থাকত মিন্‌সে, অন্নদা বাড়ী থাকতে কখনও আসেনি, হঠাৎ এখানে কাজ কত্তে এল—"

রায় সাহেবের মনের গায়ে যে কাঁটাটা সম্প্রতি বিঁধিয়া থাকিয়া অহরহ: যন্ত্রণা দিতেছে, তাহাতেই [illegible] হাত দিলেন অঘোর ঠাকুমা। একটা ব্যথার তরঙ্গ বহিয়া গেল রায় সাহেবের মনে। এই কাজটির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি; প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারেন নাই। রায় সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"মেয়ে মানুষের চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, মানুষের সাধ্য কি? তবে আমার করবার কিছু নেই। যা কিছু করা উচিত পাড়ার মুরুব্বিদের। আমি তো ঘরের বৌকে জোর করে বার করে দিতে পারি না।"

অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে ক্ষোভের শব্দ করিয়া অঘোর ঠাকুমা কহিলেন—"বোলো না বাবা, ওদের কথা! রাত দিন পড়ে আছে মিন্‌সের বৈঠকখানায়। ছেলেদের চাকরী করে দিয়েছে সবাইকার। বলবার মুরোদ কোথায়?"

—"দেখি কি করতে পারি। সবই তো ভগবানের হাতে। মানুষ নিমিত্ত মাত্র—" আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মঞ্চ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে বাণী দিলেন রায় সাহেব।

পরের দিন রাত্রে রায় সাহেব অজিত বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। অন্নদার বৌ-এরও নিমন্ত্রণ ছিল। শারীরিক অসুস্থতার অছিলায় সে গেল না।

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। আশ্বিন মাসে পাড়ার দুর্গাপূজায় মোটা চাঁদা দিলেন অজিত বাবু। দুই দিন যাত্রার খরচ বহন করিলেন। পাড়ার অনেক লোকের কাপড়, চিনি ও কেরোসিন সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অভাবগ্রস্ত অনেককে অর্থ সাহায্য করিলেন। গ্রামে রব উঠিল—এক জন মানুষের মত লোক গ্রামে আসিয়াছেন বটে! পয়সা রোজগার করিলেই হয় না, খরচ করিতে জানা চাই। রায় সাহেব তো অনেক টাকা রোজগার করিতেছেন—কোন দিন কাহাকে উপুড়-হাত করেন নাই। রায় সাহেবের কাণে কথাটা পৌঁছিল; কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে হজম করিলেন।

আমাদের পাড়ায় আগে পূজার পরেই নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া যাইত। যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা পাড়ার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। খাওয়াটা হইত অবশ্য সাধারণ রকমের—ডাল, ভাত, দু'-একটা সাধারণ তরকারী, মাছ, পায়স। আগে সস্তা-গণ্ডার দিনে বেশী খরচ হইত না। কয়েক বৎসর বিশেষ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন রায় সাহেবই শুধু খাওয়ান। তাও অনেক সাদা-সিধে, নেহাৎ নিয়ম-রক্ষার মত। এ বৎসর অন্নদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইল পাড়ার সকল লোকের। খাওয়াটা হইল আমেরী ধরণের। পোলাও, মাছ ও মাংসের বিবিধ প্রকারের ব্যঞ্জন, নানাবিধ মিষ্টান্ন। খরচ সব বহন করিলেন অজিত বাবু। ব্যবস্থা করিলেন তাঁহার স্ত্রী। পূজার সময়ে ছেলে-মেয়েদের লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। আমিও গিয়াছিলাম। অন্নদার বৌকে

দেখিলাম। বারান্দার এক পাশে ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। আগে পাড়ার পুরুষদের সামনে পুরা ঘোমটা দিত বৌ। আজকাল ঘোমটা আধা ছাঁটাই করিয়াছে। পাড়ার পুরুষদের আর পুরুষ বলিয়া গণ্য করে না—এমন হইতে পারে। কিন্তু মুখখানি শুষ্ক দেখিলাম। বাড়ীতে এত আনন্দের ঢেউ বহিতেছে, তবু তাহার মুখে আঁধার নামিয়াছে কেন বুঝিলাম না।

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর কাছে কারণ জানিতে পারিলাম। তাহার ছেলেটির আবার অসুখ আরম্ভ হইয়াছে। পূজার ভিড়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। রোগ না কি বাঁকা-পথ ধরিয়াছে।

দিন কয়েক পরে শুনিলাম—সহর হইতে ডাক্তার আসিয়াছে। পাশের গ্রামের নরহরি ডাক্তারকে বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তার দু'দিন পরে, শেষ রাত্রে মর্ম্মভেদী কান্নার রোল উঠিল অন্নদার বাড়ী হইতে। ছেলেটি মারা গেল।

স্ত্রী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়েদের পাহারা দিবার জন্ত বাড়ীতে রহিলাম। বুককাটা কান্নার ঢেউয়ে চোখের ঘুম কোথায় ভাসিয়া গেল।

অন্নদার ছেলের মৃত্যুর খবর পাইয়াও অন্নদার শ্বশুর আসিতে পারিলেন না। তিনি এখনও শয্যাগত। অজিত বাবুকে চিঠি লিখিলেন। চিঠিতে অনেক দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। অজিত বাবুর এখানের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে; অন্যস্থানের কাছে কাজ পাইয়াছেন। অবিলম্বে সেখানের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কাজেই তার আর বেশী দিন থাকিবার উপায় নাই। তাঁহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ছেলে-মেয়েদের স্কুল খুলিতে দেরী নাই। অথচ বৌ তাঁহাদের সঙ্গে বাবার কাছে যাইতে চাহিতেছে না। তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী দুই জনে অনেক বুঝাইতেছেন, বৌ কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। তাহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া কি করিয়া তাঁহারা যাইবেন, ভাবিয়া তাঁহারা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় সাহেব এক দিন অজিত বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অজিত বাবু বাড়ীর ভিতরে ছিলেন। আজও স্বামি-স্ত্রীতে বৌকে বুঝাইতেছিলেন। রায় সাহেবের আসার খবর পাইয়া তিনি নিজে বাহিরে গিয়া রায় সাহেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিয়া বারান্দায় বসাইলেন। বারান্দার এক পাশে বৌ ও তাহার দিদি বসিয়াছিল। রায় সাহেবকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল।

রায় সাহেবের সামনেই কথাটা পাড়িলেন অজিত বাবু। রায় সাহেবও সাগ্রহে অজিত বাবুকে সমর্থন করিলেন।

বৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল। কেন যাইতে চাহিতেছে না—প্রশ্ন হইল। বৌ জবাব না দিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর বৌ কহিল—"উনি নিষেধ করেছেন—"

সকলে সমস্বরে কহিলেন—"কে? অন্নদা?"

বৌ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

অজিত বাবু কহিলেন—"কিন্তু একা থাকতে পারবে?"

মৃদুকণ্ঠে বৌ কহিল—"একাই তো ছিলাম এত দিন। বুড়ী ঝি কাছে থাকবে।"

রায় সাহেবের চোখ দুইটা রাগে জ্বলিয়া উঠিল। প্রশান্ত হাসি হাসিয়া মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন—"অন্নদা যখন থাকতে বলেছে, তখন থাক, মা। তবে সাবধানে থেকো। পুত্রশোকে মাথার ঠিক থাকে না মায়ের, জীবনের মায়া পর্য্যন্ত চলে যায়; সামলাতে না পেরে হয়তো সাংঘাতিক কিছু করে বসে। এই জন্যে এই সময়টায় মেয়েদের একলা থাকতে দেওয়া কিছুতে উচিত নয়। তার জন্যেই—"

দিদি সাতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"সত্যি!" সানুনয়ে কহিলেন—"চল ভাই—আমার সঙ্গেই চল দিন কয়েকের জন্যে। মনটা একটু ভাল হ'লে ফিরে আসবি।"

বৌ মৃদু, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—"না দিদি, উনি ফিরে না এলে কোথাও যেতে পারব না। আমার জন্যে কিছু চিন্তা কোরো না তোমরা।"

৫

মাস দুই কাটিয়া গেল। বৌ-এর জীবনযাত্রা পুরাতন পথে ক্লান্ত, মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। তাহার ভাব শান্ত, স্তব্ধ। পুত্রশোকের বাহ্যিক বিক্ষোভ মিলাইয়া গেছে, এখন দহন চলিতেছে অন্তরের অন্তস্তলে। বাহিরে তাহার কোন প্রকাশ নাই। মা ধরিত্রীর মত অন্তরের দাহকে অসীম সহিষ্ণুতায় কঠিন শীতল আবরণের অন্তরালে গোপন করিয়া, অবিচলিত গতিতে নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন কোন দিন গভীর রাত্রে নিঃশব্দ অন্ধকারে জানালায় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকে। মুখ দেখিতে পাই না, চোখের ভাষা পড়িতে পারি না, অনুমান করিয়া লই, তিমির রাত্রির মধ্য দিয়া ঐ স্বামি-বিরহ-বিধুরা, পুত্রশোকাতুরা মেয়েটির হৃদয়ের ব্যাকুল বার্ত্তা নিঃশব্দ তরঙ্গ তুলিয়া বাংলা দেশের মৃত্যু-মথিত পূর্ব্ব সীমান্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এক দিন অভয় আসিয়া খবর দিল—রায় সাহেব অন্নদার বাড়ীখানি দখল করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। নালিশ করিয়াছেন, ডিক্রী করিয়াছেন, আইনানুসারে আর আর যাহা করণীয়, করিয়াছেন; এখন যে কোন দিন বৌকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া বাড়ীখানি দখল করিয়া লইবেন।

স্ত্রীকে পরিচয় দিতেই তিনি গালে হাত দিয়া কহিলেন—"ও মা, তাই না কি? বুড়ী ঝি যে রাঘব বোয়াল বলে, মিথ্যে নয়! অত্ত পেট মিন্‌শের, খিদে মিটছে না কিছুতেই। অন্নদার ফিরে আসার তর সইছে না—"

কহিলাম—"বৌকে বলবে না কি?"

স্ত্রী কহিলেন—"কি হবে ওকে বলে? কি করবে ও? মেয়েমানুষ! ওর বাবা তো শয্যাগত, আর অজিত বাবুর বোধ হল নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নাই। তুমি বরং অন্নদাকে একটা চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে দাও। ও বরং সরকারের কাছে দরখাস্ত করুক ঐ বুড়োটাকে সায়েস্তা করে দিবার জন্যে। সরকারের জন্যে প্রাণ দিতে গেছে অন্নদা, ওর কথা সরকার শুনবে না?"

পৌষের শেষাশেষি রায় সাহেব সপরিবারে গ্রামে আসিলেন। কনীর একটি ছেলে হইয়াছে, তাহার অন্নপ্রাশন। তা'ছাড়া, এ বৎসর নববর্ষে 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন। এই দুই উপলক্ষে গ্রামের লোকদের খাওয়াইবেন।

এবার তিনি আসিবা মাত্র পাড়ার মাতব্বরেরা পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের ছেলেগুলি আবার যেকো

হইয়াছে। রায় বাহাদুর পূর্ব্বের মতই আপ্যায়ন করিয়া সকলকে বসাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে খাওয়ানো'র সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। এক-এক জনের উপর এক-একটা কাজের ভার দিতে চাহিলেন। সকলে সানন্দে ও সোৎসাহে ভার গ্রহণ করিলেন, এবং আবদার ধরিলেন যে, এ রকম একটা আনন্দের ব্যাপারে নহবৎ বসানো উচিত। রায় বাহাদুর রাজী হইলেন।

এবারেও রায় বাহাদুর মাতব্বরদের কাছে প্রস্তাব করিলেন—তাঁহার ছোট বাড়ী, লোক-জন বিস্তর; কাজেই এই বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। অন্নদার বৌ যদি দু'-তিন দিনের জন্যও বাড়ীটা ছাড়িয়া দেয় তো সব দিক্ দিয়া সুবিধা হয়; অন্নদার বৌ তো একা মানুষ, এক পাশে থাকিবে. কোন অসুবিধা হইবে না তাহার।

মাতব্বরেরা দল বাঁধিয়া অন্নদার বাড়ী গিয়া বৌকে অনুরোধ করিলেন, অনেক বুঝাইলেন. বৌ কিছুতেই রাজী হইল না। বুড়ী ঝি বাড়ীতে ছিল না। সে আসিতেই সকলে সরিয়া পড়িলেন। রায় বাহাদুর শুনিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন—"বেশ, তা'হলে এখানেই হোক এক রকম করে; অসুবিধা হবে খুব, কিন্তু কি করা যাবে বলুন—"

সকলে একসঙ্গে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন—"মেয়েটা অত্যন্ত অবাধ্য। সায়েস্তা করা উচিত।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোর বেলা হইতে নহবৎ বাজিতে লাগিল। পাড়ার পুরুষ ও ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা জামা ও চাদর জড়াইয়া রায় বাহাদুরের বাড়ীর সামনে জড় হইল। সমস্ত বাড়ীটা উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত উৎসবের আনন্দে চঞ্চল। সারা গ্রামের লোকের মনেও সেই আনন্দের স্পন্দন ছড়াইয়া পড়িল। শীতের মেঘহীন আকাশ ও প্রসন্ন সূর্য্যকর-দীপ্ত পৃথিবীও যেন এই আনন্দে যোগ দিল।

বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদের মনেও উৎসবের আরামময় আনন্দের সুর বাজিতে লাগিল। আজ আর রান্না-বান্না নাই। ঢিমা তালে সংসারের কাজ চলিতেছে। কি কাপড়, কি গহনা পরিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া হইবে, তাহারই মনে মনে অথবা প্রকাশ্যে জল্পনা চলিতেছে। অঘোর ঠাকুমা ও ক্ষেন্তি পিসি বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আয়োজনের বিরাটত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছেন।

বেলা দশটা। বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, গ্রামের পিয়ন সামনে রাস্তা দিয়া যাইতেছে। আমাদের গ্রামে বিকালে ডাক আসে, পরের দিন সকালে বিলি হয়। পিয়নটা যখন না থামিয়াই চলিয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয় চিঠি নাই। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম, "চিঠি আছে না কি?"

পিয়ন থমকিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিল—"আজ্ঞে না। এ পাড়ায় অন্নদা বাবুর বাড়ীর একটি চিঠি ছিল। আর কারও নাই—" বলিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ অন্নদার বাড়ীতে কান্নার শব্দ উঠিল কি হইল, ছুটিয়া দেখিতে গেলাম। দেখিলাম—বৌ বারান্দায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে বুড়ী ঝিটা উঠানে বসিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে হাহাকার করিতেছে। পাড়ার একটি ছেলে এক পাশে মুখ চুণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ছেলেটিকে ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—যুদ্ধ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ হইতে একটি চিঠি আসিয়াছে। খবর—অন্নদা দিন কয়েক আগে মারা গিয়াছে। চিঠিটি পড়াইবার জন্য ছেলেটিকে বুড়ী-ঝি ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বুড়ী-ঝিটা আমাকে দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া আমার পায়ের নীচে লুটাইয়া পড়িল ও মাটীতে মাথা ঠুকিতে-ঠুকিতে, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কহিল—"আমাদের কি সর্ব্বনাশ হোলো গো দাদা বাবু!"

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সান্ত্বনার ভাষা মুখে আসিল না।

রায় বাহাদুরের বাড়ী হইতে সানাইয়ের মধুর সুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে পল্লীর আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

দিন দুই পরে রায় সাহেব লোক পাঠাইয়া বৌকে জানাইয়া গেল—আদালত হইতে লোক আনিয়া তিনি বাড়ী দখল লইবেন। আর অপেক্ষা করা তাঁহার চলিবে না।

এবার বৌ আপত্তি করিল না। জানাইল—অন্নদার শ্রাদ্ধের পরই সে চলিয়া যাইবে।

দিন কয়েক পরে এক দিন শেষ রাত্রে আমরা স্বামি-স্ত্রী অন্নদার বাড়ী গেলাম। বাড়ীর সামনে একটা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বৌ আজ যাইবে। তাহার বাবা তাঁহার গোমস্তাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার সঙ্গে যাইবে। আমার স্ত্রী ভিতরে গেলেন। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বৌ বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে কিছুই লয় নাই। জিনিষ-পত্র যাহা ছিল সব বুড়ী ঝিকে দিয়াছে। পরনে থান কাপড়; মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, সর্ব্বাবয়বে গ্রীষ্মের শুষ্ক বালুময় নদীবক্ষের শুভ্র রিক্ততা, মুখে ঊষর প্রান্তরের ঔদাসীন্য, চোখে অবসানের করুণ অবসাদ। ধীর-পদে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম—সুখ তোমার জীবনে নাই, কিন্তু যেন শান্তি পাও।

গরুর গাড়ীটা চলিয়া গেল। বুড়ী ঝি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সারা বাড়ীটা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বিরাট পশুর মত মূক বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দিন কয়েক পরে রায় বাহাদুর গ্রামের মাতব্বরদের লইয়া বাড়ী দখল করিলেন। সকলকে লইয়া দোতলা ও একতলার ঘরগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কি কি বিষয়ে সংস্কার করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তার পর ঘরে ঘরে তালা লাগাইয়া ও বাহিরের দরজায় একটা ভারী তালা ঝুলাইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি ও আমার স্ত্রী দোতলার জানালা হইতে দেখিতেছিলাম। সবাই চলিয়া গেলে স্ত্রী কহিলেন—"রায় বাহাদুর নয়, রাহু বাহাদুর! ওর দৃষ্টিতে এত বড় ঘরটা ছারখার হয়ে গেল!"

সমাপ্ত

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৩

জ্যান্ এবং আর্থার অনেকক্ষণ শহর ভ্রমণ করে একটি পার্কে গিয়ে বসল। প্রকৃতপক্ষে আর্থার চলতে পারছিল না। জ্যান্ মনে করত, আর্থার হবে শক্ত লোক, কিন্তু ঘর থেকে বের হবার পরই আর্থার যেরূপ দুর্বলতা দেখাতে লাগল, তাতে মনে হল, আর্থারকে সত্বরই ঘরের দিকে ফিরে যেতে হবে। সন্ধ্যার পূর্বে জ্যান্ আর্থারকে সে কথা বলে ফেলল। আর্থার ঘাসের উপর মাথা রেখে বলল,—ঘরে যেয়েই বা কি লাভ হবে? সেখানেও কাল থেকে খাবার থাকবে না। আমি ঘর হ'তে চলে আসায় অন্তত ছোট ভাই-বোনরা, এখনও ঘরে যা আছে তাই খেয়ে কয়েক দিন প্রাণ বাঁচাতে পারবে। ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা অন্তত আমার সামনে মুখে এনো না।

—তাই হবে আর্থার, তোমাকে আর ঘরে ফিরে যেতে বলব না। কিন্তু মনে রেখো, এরূপ ভাবে হেলিয়ে পড়লে চলবে না। আমাদের রাত্রে খাবার আছে বটে, কিন্তু ঘুমাবার স্থান নেই। রাত্রে আমাদের শুতে হবেই, সে জন্য তুমি কি একটুও চিন্তা করেছ?

—নিশ্চয়ই করেছি জ্যান্, রাত্রে বিছানার পরিবর্ত্তে আমাদের মাটিতেই শুতে হবে। তবে সে স্থানটি কোথায় তা এখনও জানি না। তুমি বোধ হয় নিশ্চয়ই জান?

জ্যান্ কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘাসের উপর একটু বসেই উঠে দাঁড়াল এবং জ্যান্‌কে ইংগিতে বলল,—ঐ দেখ একখানা রংগিন গাড়ী যাচ্ছে। গাড়ীতে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। তাঁর কাছে যদি আমরা কাজ চাই তবে হয়ত বৃদ্ধ দয়া করতে পারেন। তাড়াতাড়ি করে উঠ। বোধ হয়, গাড়ীখানা কাছেই কোথাও দাঁড়াবে। চল, গাড়ীটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটু যাই।

উভয়ে গাড়ীর দিকে দৌড়াল না বটে, তবে তারা যে ভাবে চলছিল, তাতে অপর লোক ভাবছিল এরা দৌড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ পা চালিয়ে গিয়ে গাড়ী ধরা তাদের ভাগ্যে সেদিন সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। গাড়ীটা হঠাৎ মোড় ফিরিয়ে নিগ্রো সহরের দিকে চলে গেল।

এবার আর্থারের রাগ হল এবং জ্যানের দিকে তাঁকিয়ে বলল,— এরূপ করে ছোটবেলায় অনেক মোটর গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন্ করে কোন দিন কোন গাড়ী ধরতে পারিনি। এখন আমরা আর শিশু নই। পরিপূর্ণ বয়স এবং পূর্ণ যৌবনের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। শরীরে শক্তি আছে এটা খুবই সত্যি কথা, তা বলে বাতাসকে অস্ত্র নিয়ে রুখতে যাওয়া যেমনি আহাম্মকি কাজ, এ-ও অনেকটা তদ্রূপ। এখন চল, একটা স্থান্ খুঁজে কোথাও শোয়া যাক্।

পাশ দিয়ে এক জন নিগ্রো নারী চলে যাচ্ছিলেন। তিনি আর্থারের কথা শুনে একটু দাঁড়ালেন এবং আর্থার ও জ্যান্‌কে লক্ষ্য করে বললেন,—এই কিশোর, তোদের কি থাকবার কোথাও [illegible]

জ্যান্ এগিয়ে গিয়ে রমণীর সম্মুখ ভাগে দাঁড়াল এবং বলল—হাঁ মেম্, আমরা এখন বিপদগ্রস্ত, এমতাবস্থায় দয়া করে যদি কোথাও একটু স্থান দাও তবে সবিশেষ বাধিত হই।

—বাধ্য-বাধকতার দরকার নেই, তোমরা আমার সংগে চলতে পার, তবে একটা কথা মনে রেখো, আমার ফ্ল্যাটে ভয়ানক ইঁদুরের উৎপাত। তোমাদের ইঁদুর তাড়াতে হবে। আমার ছোট মেয়েটা ইঁদুরের ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তোমরা ইঁদুর মারতে পারবে ত?

—নিশ্চয়ই মেম্, চল না, তোমার ঘরে যাই। ইঁদুর মারবার জন্য ঔষধের দরকার। ঔষধ আছে ত?

—আছে বই কি, চল আমার ঘরে।

জ্যান এবং আর্থার উভয়ে মিলে ইঁদুর মারার ফন্দি আঁটতে লাগল এবং এক জন অপর জনকে বললে—যাক্, আজকের মত ত শোয়া যাবে। আমাদের সংগে যে খাদ্য আছে তাতে রাতটা ভালরূপেই কেটে যাবে। তার পর যদি উক্ত নিগ্রো রমণী আমাদের কিছু খেতে দেয়, তবে সোণায় সোহাগা।

একটু যাবার পরই তারা একটা প্রকাণ্ড পার্কের কাছে আসল। পার্কে অনেকগুলো নিগ্রো বসেছিল। নিগ্রোরা খুব কম কথা বলে, সে জন্য এত বড় একটা বিরাট জনতার মাঝেও বেশ নীরবতা বিরাজ করছিল। জ্যান্ এবং আর্থার যখন নিগ্রো রমণীর পেছন্ পেছন্ চলছিল, তখন একটা নিগ্রো যুবক মৃদু হাসি হেসে একটু উচ্চস্বরেই বললে—এরা এখনও ষাঁড়ে পরিণত হয়নি, এদের কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

কথাটা নিগ্রো রমণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র মহিলা দাঁড়ালেন এবং চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করলেন—ওরে ও নিগ্রোনীর ছেলেরা, তোদের অপরকে সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই, মন্তব্য করার বেলা কিন্তু পঞ্চমুখ! তোদের মা যে সকল আমেরিকানের ঘরে চাকরী করছিল, সেই শ্বেতকায়রা জাহান্নামে যাক্। তোদের মা'দের একটুও ভদ্রতা শেখায়নি। হাঁ, হাঁ, হাঁ, (ইয়া, ইয়া, ইয়া) জাহান্নামে যাক্।

নিগ্রো মহিলার কথা শুনে জ্যান্ আর্থারের গায়ে ধাক্কা দিলে এবং অতি সংগোপনে বললে—আমাদের বড়লোকরা চাকরাণীদের সংশিক্ষা দেয়নি বলে কৃষ্ণকায়দের কাছ থেকে বেশ গাল খাচ্ছে। আর্থার নির্বাক্ হয়ে থাকল এবং অনেক কিছু ভাবল। অবশেষে যখন নিগ্রোনীর ঘরে পৌঁছিল তখন আর্থার মুখ খুললে এবং জ্যান্‌কে বললে—বুঝলে জ্যান্, যদি আমরা ইঁদুর ধরতে না পারি, তবে আমাদের উদ্দেশ্যে এই ধরণেরই পূর্বানুরূপ মন্দ কথা বর্ষণ হবে, অতএব সাবধান!

আর্থারের কথায় জবাব না দিয়ে জ্যান্ ইঁদুর ধরার ফাঁদটা ভাল করে একবার চিন্তা করে নিলে, তার পর রুমগুলি ভাল করে দেখে কয়েকটা ছিদ্র বের করল। ছিদ্রগুলি পুরাতন। নিগ্রো রমণী ছিদ্রগুলি সিমেণ্ট দিয়ে যদি বন্ধ করতেন, তবে তার মেয়ে বাড়ী ছেড়ে পালাত না। জ্যান্ আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল—এ বাড়ীতে সে আর কত দিন থাকতে চায়?

আর্থার বললে—এখানে থেকে কোনও লাভ নেই, যদি নিগ্রো রমণীর কাছ থেকে কিছু ডলার পাওয়া যায়, তবেই ভাল। কালিফর্ণিয়া যাওয়া অনেকটা সুগম হবে। জ্যন আর আর্থার উভয়ের চিন্তাধারায় ডলার পাওয়াই ভাল হবে ভেবে, নিগ্রো রমণীর কাছে গেল এবং বলল—ইঁদুরের উৎপাত তারা চিরতরে বন্ধ করে দিবে এবং সেজন্য নিগ্রো রমণী কত খরচ করতে রাজী আছেন ?

নিগ্রো রমণী চিৎকার করে বললেন—(A grant) এক শত ডলার আমি খরচ করেছি। আরও এক শত ডলার খরচ করতে রাজী আছি।

জ্যন্ বললে—হাঁ, পারব মেম। তবে কথা হ'ল, তুমি সত্যিই কি এক শত ডলার খরচ করেছ ?

—নিশ্চয়ই। এই ধর, ইঁদুর ধরার ফাঁদ কিনিতে খরচ হয়েছে তিন ডলার। যাতায়াত খরচ দশ সেণ্ট। আমার মেয়েকে অন্য পাড়ায় পাঠাতে পাঁচ সেণ্ট, তার নূতন জুতার দাম দশ ডলার। এটা কি এক শত ডলার নয় ?

জ্যন্ হেসে বললে—আচ্ছা, যা খরচ করেছ তাই যদি দাও তবেও আমরা তোমার বাড়ী হতে ইঁদুর তাড়াতে সক্ষম হব। আমরা সে জন্য এক শত ডলার অথবা তার অর্দ্ধেকও চাই না। পাঁচ ডলার দিতে রাজী আছ ?

নিগ্রোনী চিৎকার করে বললেন—ওরে বাপ রে, এত টাকা কোথা হতে দেব ? এক ডলারই দিতে পারি কি না তা কে জানে ? যাক্ গে, এ সব বাজে কথা, তোমরা কিছু কর, তার পর দেখব কি দিতে পারি।

জ্যন্ এবং আর্থার উভয়ে মিলে কতক্ষণ পরামর্শ করল তার পর নিগ্রো মহিলার কাছে গিয়ে কুড়ি সেণ্ট কর্জ চাইল। নিগ্রো রমণী বিনা আপত্তিতে তাদের কুড়ি সেণ্ট কর্জ দিলেন এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললেন। জ্যন্ এবং আর্থার নিকটস্থ একটি চুণ, বালি এবং সুরকির দোকানে গিয়ে বালি, সিমেণ্ট এবং কতকগুলি বড় বড় পাথর কিনে এনে, ইঁদুরের যাওয়া-আসার ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দিল। ইঁদুর পাথর কেটে উপরে উঠতে পারল না, সে জন্য সে রাত্রে ফ্ল্যাটে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল না। ঘুম থেকে উঠেই জ্যন্ এবং আর্থার ছিদ্রগুলি পুনরায় পরীক্ষা করল এবং আরও ভাল করে ছিদ্রগুলি পাথর দিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে সকালের খাবার আনতে নিগ্রো রমণীকে আদেশ দিল। নিগ্রো রমণী প্রত্যুষেই পরেজ, এবং কফি তৈরী করে রেখেছিলেন। এরা টেবিলে বসা মাত্র নিগ্রো রমণী ওদের দাঁত এবং মুখ ধুয়ে আসতে আদেশ করলেন এবং বললেন—তোমাদের বাড়ীতে বোধ হয় কোন নিগ্রো রমণী কাজ করত না। যদি কোনও নিগ্রো রমণী তোমাদের বাড়ীতে কাজ করত, তবে তোমাদের মুখ হতে দুর্গন্ধ এবং দাঁতে ময়লা জমে থাকত না।

লজ্জায় মাথা নত করে জ্যন্ এবং আর্থার পুনরায় মুখ ধুয়ে আসল।

নিগ্রো রমণী উভয়কে প্রচুর পরিমাণে পরেজ দিয়ে বললেন,—আমার ঘরে দুধ নেই সে জন্য চিনির সাহায্যেই তোমাদের পরেজ খেতে ...হতে অবশ্য দুধ দিয়েছি এবং সে দুধ বাস্তবিকই ঘন ...ার তৈরী কফি যে খেয়েছে, সেই বুঝতে পেরেছে, কফি ...চ আমি কত পারদর্শী। হেনরী-পরিবারে আমার নাম সুপরিচিত। কে না জানে মিস্ হিলের নাম ? আমি সেই মিস্ হিল, বুঝতে পেরেছ ? মিস্ হিল অনেক বারই "বুঝতে পেরেছ" কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, তার পর জ্যন্ এবং আর্থারের কাছ থেকে যখন কোন উত্তরই পেলেন না, তখন তিনি শান্ত হয়ে বললেন—তোমরা আমার ঘরে কয়েক দিন থাক, যদি বুঝি ইঁদুর আর না আসে তবেই তোমাদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় করব। এখন তোমরা ঘর হতে বের হয়ে যাও। যখন আমি কাজ থেকে ফিরে আসব, তখন তোমাদের ডেকে আনব। তোমরা হলে চোরের জাত। তোমাদের ঘরে রেখে আমি বাইরে গিয়ে শান্তি পাব না, তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমার মনিব মিষ্টার হিল একদিন আমার মণিব্যাগ চুরি করেছিলেন, তোমরা ত তাদেরই ছেলে-পিলে। আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝেছ ? এখন যাও।

জ্যন্ এবং আর্থার ঘর হতে বের হয়ে নিকটস্থ একটা পার্কে গিয়ে বসল। পার্কে অনেকগুলি নিগ্রোও বসেছিল। কতকগুলি আমেরিকান পার্কের পাশে মোটর দাঁড় করিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়েছিল। তারা যেন কাউকে খুঁজছিল। তারা যাদের খুঁজছিল, তারা কে ? দ্বিধা না করে জ্যন একটি বৃদ্ধ নিগ্রোর কাছে বসে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, বলতে পার, ঐ যে গাড়ীওয়ালারা পার্কের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা কাকে খুঁজছে ?

বৃদ্ধ নিগ্রো জ্যনের কথা শুনে একটু হাসল, তার পর বলল—ওহে আমার পুত্রগণ, তোমরা কত দিন তোমাদের মা-বাবাকে ছেড়ে এসেছ ?

জ্যন্ আগ্রহ সহকারে বললে—বাবা, আমরা আমাদের মা-বাবাকে গতকল্য ছেড়ে এসেছি।

বৃদ্ধ আরও একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—গত রাত্রে তোমরা ছিলে কোথায় ?

আমরা ছিলাম এক বৃদ্ধ নিগ্রো রমণীর ঘরে, তার ঘরে ইঁদুরের বড়ই যন্ত্রণা।

হাঁ, বুঝতে পেরেছি, মিস্ হিলের কথা বলছ। মহিলাটি বড়ই ভদ্র এবং বোকা। তার বোকামির জন্য মিঃ হিল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সে যা হোক, আমার পুত্রগণ, তোমরা আমাকে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছ। একটু দাঁড়াও, কি করে প্রশ্নটির জবাব দিতে হয় একটু ভেবে নেই।

বৃদ্ধ দাঁড়াল, চোখ উলটিয়ে দিল, কতক্ষণ হাসল, কতক্ষণ পায়চারী করল, তার পর ভয়ানক রেগে গেল। কতক্ষণ পর যখন তার রাগ থামল, তখন জ্যন এবং আর্থরের মাঝখানে বসে উভয়ের মাথায় চুমু দিয়ে বলল—শুন পুত্রগণ, আমারও ছেলে ছিল। তাকে তোমাদের লোকই লিন্চ করে হত্যা করেছে। যেদিন থেকে আমার ছেলে ইহ-জগৎ হতে বিদায় নিয়েছিল, সেদিন থেকে আমি শ্বেতকায়দের সংগে কথা বলা বন্ধ করেছিলাম। আজ আমার কি একটা অবস্থা হয়েছে বলতে পারি না। তোমাদের আমি ভালবেসে ফেলেছি। তোমাদের আজ আমি পুত্রবৎই মনে করি, অতএব তোমাদের রক্ষার ভার এখন আমার হস্তেই ন্যস্ত হয়েছে জেনো। আমার পুত্রকে তোমাদের লোক আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, তা বলে তোমাদের আমি মারতে দেব না। আর্থার এবং জ্যনকে বৃদ্ধ নিগ্রো জাঁকড়িয়ে ধরে বললে—ঐ যে দেখছ

শয়তানগুলি, ওরা হল পাপী। তাদের কাম-রিপুর চরিতার্থে যুবক যুবতী যাকে পায়, তাকেই টাকা দ্বারা বশীভূত করে অকালে হত্যা করে। বুঝলে পুত্রগণ? তোমরা উপবাস করে মরবে তবুও ঐ শয়তানদের সংস্পর্শে যাবে না। আমার কথা বুঝেছ?

জ্যান্ বললে, না বাবা—কিছুই বুঝতে পারিনি।

বৃদ্ধ আবার কি চিন্তা করল, তার পর পাশের একটি নিগ্রো যুবককে ডেকে এনে কি বলল এবং সে স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে গিয়ে বসল। নিগ্রো যুবক জ্যান্ এবং আর্থারের সংগে অনেকক্ষণ কথা বললে, তার পর বৃদ্ধকে ডেকে এনে তার স্থানে বসিয়ে দিলে। বৃদ্ধ আর কোন কথা বললে না, শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। জ্যান্ এবং আর্থারও বৃদ্ধের পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকল, তার পর জ্যান্ বৃদ্ধের হাতে হাত রেখে বললে—বাবা, তোমার কাছ থেকে যে উপদেশ পেলাম তা প্রাণান্তেও ভুলব না। এখন আমরা একটু বেড়িয়ে এসে মিস হিলের বাড়ীতে যাব এবং সেখানেই কয়েক দিন থেকে কালিফর্ণিয়ার দিকে রওনা হব।

বৃদ্ধ উভয়কে আশীর্বাদ করল—এবং বলল, তোমরা সুখী হও। হুভারের রাজত্ব কোন মতেই থাকবে না।

জ্যান এবং আর্থার মিস্ হিলের ফ্ল্যাটে তিন দিন থাকার পর মিস্ হিল তাদের পাঁচ ডলার দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। পাঁচ ডলারের সাহায্যে তারা কালিফর্ণিয়ার অর্দ্ধেকটা পথ অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। বাকি পথটুকু তারা পায়ে হেঁটে এবং হিচহাইক করে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়।

জ্যান্ এবং আর্থার পরিশ্রান্ত হয়ে একটি লগ্-হাউস আশ্রয় নেয়। লগ্-হাউসটি একটি আংগুর বাগানের কাছে অবস্থিত। দিনের বেলা ঘুমিয়ে সন্ধ্যার সময় যখন তারা ঘুম থেকে উঠল, তখন দেখতে পেল, তাদেরই সামনে বড় বড় আংগুরের গুচ্ছ পেকে রয়েছে। দ্বিধা না করে তারা আংগুরের গুচ্ছ নিয়ে আসল এবং পেট ভরে খেল। আংগুর খেতে মিষ্ট এবং আরামদায়ক, কিন্তু ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। তারা যতই আংগুর খাচ্ছিল ততই তাদের ক্ষুধা বেড়ে যাচ্ছিল। রাত্রে খাবার আহরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, সে জন্য সারাটি রাত বসেই কাটাতে হয়েছিল। পরের দিন সকাল বেলা তারা গেল বাগানের মজুর দলে যোগ দিতে। সেখানে দৈনিক ত্রিশ সেণ্ট মজুরীতে কাজ পেল। বিকাল বেলা দু'জনার মিলে ষাট্ সেণ্ট হাতে করে একটা খাবারের দোকানে গেল। সেখানে ষাট্ সেণ্টে তাদের অর্দ্ধেক পেটও ভরল না। রাত্রে মজুরদের শোবার ঘরে আসল এবং উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকল।

পর দিন প্রাতে জ্যান্ দেখতে পেল, অনেক মজুরের মাথার কাছে রুটি-মাখন রয়েছে, আর্থারকে তাই দেখাল। আর্থার মজুরদের কি করে খাওয়া চলে তাই জিজ্ঞাসা করল। এক জন মজুর ঠাট্টা করে বললে—"হে ধনিপুত্রগণ, পাশের ঘরটাই হল পাকের ঘর, সেখানে যার যা ইচ্ছা পাক করে খেতে পারে, আমরা সবাই পাক করে খাই। ত্রিশ সেণ্ট মজুরী পেয়ে যদি খাবারের দোকানে যেতে হয়, তবেই কর্ম্ম সারা! যদি শরীরের মধ্যে প্রাণটা রাখতে চাও, তবে আজ বিকাল বেলা রুটি-মাখন, কফি এবং দুধ-চিনি কিনে এনে ঐ পাশের ঘরে পাক করে খেয়ো। বুঝলে?

অপরিচিত লোকটির কথা শুনে জ্যান্ এবং আর্থার বাইরে গেল এবং কিছুটা আংগুর আহরণ করে তাই খেয়ে কাজে গেল। পাঁচটার সময় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, ষাট্ সেণ্ট হাতে করে বাজারে গেল এবং দরকারী খাদ্য কিনে এনে পাক-ঘরে পাক করল। পাকের মধ্যে শুধু গরম জল। গরম জলে কফি এবং চিনি একই সংগে ছেড়ে দিয়ে কতক্ষণ বসে থাকল। কফি যখন হয়ে গেল তখন তারই সাহায্যে তারা দু'টা রুটি উদরস্থ করল। এ রকম করে দিন-গুলি কাটছিল বেশ, কিন্তু জ্যান্ এক দিনও ভাবেনি, তাদের সব্জি এবং মাংস খাওয়া দরকার। সে কথা কেউ তাদের বলেও দেয়নি। বোধ হয়, সে জন্যই আর্থারের জ্বর হয়। জ্যান্ আর্থারকে হসপিটালে পাঠাতে মনস্থ করল কিন্তু নিকটস্থ হসপিটালে তার স্থান হল না। হুভারের রাজত্বে রোগীরও হসপিটালে স্থান হচ্ছিল না। অবশেষে ক্যাম্পে থেকেই জ্যানের শুশ্রূষায় আর্থার আরোগ্য লাভ করে।

জ্যান্ ভাবলে, এরূপ কাজে পেটও ভরবে না, শরীর ঢাকার মত কাপড়েরও সংস্থান হবে না। এমতাবস্থায় অন্য কোন কাজের বন্দোবস্ত করা দরকার, কিন্তু এই দুর্দিনে কোথায়ই বা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। এক জনের আয় দিয়েই কয়েক দিন দু'জনের চালাতে হল, তার পর যখন আর্থার একটু সবল হল তখন উভয়ে মিলে কাজে যেতে লাগল। জ্বরের পর আর্থার রুটি বেশী খেতে লাগল। প্রত্যেকটি রুটির দাম দশ সেণ্ট। ত্রিশ সেণ্টের রুটি আর্থার একাই খেয়ে ফেলে। জ্যান আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়। এরূপ করে দু' সপ্তাহ চালাবার পর জ্যান এক দিন কাজে গেল না। তার শরীরও দুর্বল হয়ে গেছে। জ্যান্ সারা দিনের পর যখন ঘুম থেকে উঠল, তখন বুঝল, তার 'হে ফিভার' হয়েছে। হে ফিভারে কেহই বাঁচিয়ে যায় না, তাও জ্যান্ পরের দিন কাজে গেল। জ্যানের পাশে যে লোকটি কাজ করছিল সে হেসে বললে—ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! মজুরের আবার সর্দ্দিকাশি কি? কাজ করলে খাবার পাবে, কাজ না করলে মরতে হবে।

জ্যান জবাব দিল—তাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে ক্ষতি কি, কাজ করেই মরব।

পাশে দাঁড়ানো মজুর কিন্তু দমল না, সে আবার বললে—আমাদের মজুরী ততটুকুই দেবে যতটুকুতে আমাদের শুধু প্রাণরক্ষা হয়, এর বেশী নয়, জ্যান্! আমাদের যীশু এসে যদি এর বেশী দেওয়াতে চান তবুও পারবেন না। হুভারের লোক এবার আমাদের যমালয়ে না পাঠিয়ে ছাড়ছে না, বুঝলে?

জ্যান্ বললে—এস, আমরা বিদ্রোহ করি। তবেই আমরা যা চাই তাই পেয়ে যাব।

পাশে দাঁড়ানো লোকটা আর কথা বললে না। তাকে নির্বাক্ দেখে জ্যান্ বললে—চুপ করে রইলে যে, এস না, বিদ্রোহ করি। বিদ্রোহ করতে সাহস নেই, কাজ করবার ক্ষমতা নেই, শুধু বকাবকি করলে ত চলবে না।

আর্থার উভয়ের কথা শুনছিল, সে একটু কাছে এসে বয়স্ক মজুরকে জিজ্ঞাসা করলে—"হাঁ ভাই বল ত, কোন নিকৃষ্ট কাজ করে উৎকৃষ্ট পয়সা কোথাও পাওয়া যায় কি?

বয়স্ক মজুর বললে—গোবর পরিষ্কার করতে পারবে কি? বড়ই দুর্গন্ধ! গোবরে নানা রকমের পোকা থাকে, যদি সেই পোকার দংশন সহ্য করতে পার তবে বেশ রোজগার করতে পার, কিন্তু

সেই কাজে বড়ই কষ্ট পেতে হবে। অনেক সময় পোকার দংশন সারাতে হসপিটালে যেতে হয়। যদি সেই কাজ করতে রাজী হও, তবে দৈনিক তিন ডলার করে পাবে। ঐ যে দেখছ ফার্মটা, সেখানে এই নিকৃষ্ট কাজের জন্য লোক নেওয়া হয়।

কথার শেষ এখানেই হল। তিন ডলার কথাটা আর্থারের কাণে বেশ ভাল শুনাল। সে ভাবতে লাগল, তিন ডলারে ত্রিশখানা রুটি পাওয়া যাবে, তিন ডলারে অনেক খাদ্য কিনতে পারবে। পেট ভরে খেতে পাবে। তিন ডলারে নিশ্চয়ই কয়েকটা 'পাই' (এক রকম মুখরোচক খাদ্য) কেনা যাবে। দু'জনায় মিলে পাব ছ'ডলার। অনেক টাকা দৈনিক পাওয়া যাবে। কাল সকালেই আমরা নূতন কাজে যাব। যে টাকা বাঁচবে তা তাড়াতাড়ি করে বাড়ীতে পাঠাব।

সে দিন জানের কাজ ভাল না হওয়ায় মাত্র কুড়ি সেন্ট পেল এবং উহা আর্থারের হাতে এনে দিল। আর্থার জ্যানকে কিছুই বললে না। নির্দ্ধারিত পাক করে উভয়ে কিছু-কিছু করে খেয়ে, নিজ নিজ বিছানায় আশ্রয় নিল আর্থারের ইচ্ছা ছিল, জ্যানকে বিকাল বেলাই নূতন কাজের কথা বলবে, কিন্তু তাকে সে কথা বলা হয়নি। কম খাদ্যের কথা চিন্তা করে নূতন কাজের কথা ভুলে গেছে। বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার সাথে-সাথেই তারা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আর্থার জ্যানকে বললে,—চল, গোবর ফেলার কাজ করিগে।

জ্যান কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করেই বললে—যে কাজ বল সে-কাজই করতে রাজী আছি। এখন আমরা আর মানুষ নই। পেটের ক্ষুধার কষ্টে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি।

আর্থার একটু চিন্তিত হয়ে বললে—এটাও একটা কাজ, আমি ঘৃণা করি কিন্তু আমাদের মত অনেকেই অম্লান বদনে তাই করে যাচ্ছে এবং সমাজে তাদেরও স্থান আছে। আমরা এমন কোন কাজ করব না, যে কাজে সমাজে যেয়ে মুখ দেখাতে পারব না।

জ্যান আর কথা বাড়াল না। মাঠের উপর দিয়ে ছোট্ট পথ পথ ধরে চলল। দু'দিকে আঙুর বাগান। বাগানে অনেক লোক কাজ করছে। কেউ কেউ বাস্কেট সন্তর্পণে বোঝাই করছে। কেউ বা আঙুরের লতা হতে আঙুরের থোক একটা একটা করে কেটে আনছে। আঙুরের রং কালো, বেগুনে এবং নানা রকমের। কিস্‌মিস্ জাতীয় আঙুর অনেক মজুর মুঠ-মুঠা করে খাচ্ছে, আর দুঃখ-দৈন্যের কথা ভুলে যেয়ে একমনে কাজ করছে। বাগানের মালিকও আঙুর বাগানে কাজের পদ্ধতি দেখছে। জ্যানের মন আপনা হতেই বাগানের মালিকের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে উঠল। আর্থারকে সে-কথা বলল না, শুধু নিজের মনেই সে রুষ্ট ভাবটা সজাগ রাখল।

আর্থার নীরব ছিল, হঠাৎ আর্থার বলে উঠল—আমরা পেটের দায়ে নিকৃষ্ট কাজ করতে যাচ্ছি বলে, আমার এবং তোমার মনে দুঃখ হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হল, আমার এবং তোমার বাবা কলের মজুর। কলের মজুররা যদিও ভাল কাজ করে, তবুও তাদের ধমকানি খেতে হয়। আমরা এমন কাজ করব যাতে মোটেই ধমকানী খেতে না হয়। ধমকানী-শাসানী এ সব আমার মোটেই সহ্য হয় না।

জ্যান এ সব কথায় জবাব দিল না।

কতক্ষণ চলার পরই তারা এল একটা মস্তবড় খাটালের কাছে। খাটালে তখনও গাইগুলি বাঁধা ছিল। সে দিকে দু'জনে উঁকি মেরে দেখতে পেলে, খাটালটা তত অপরিষ্কার নয়। শুকনা খড়ের উপর গোবর জমা হয়ে আছে। যদি তাই পরিষ্কার করতে হয় তবে কাজ ত মোটেই কষ্টকর নয়, অথবা খারাপও নয়। খাটাল হতে তারা গেল একটা মানুষ থাকবার ঘরে। সেখানে যেয়ে কয়েক জন লোককে দেখতে পেল। লোকগুলি সবাই বৃদ্ধ! যুবকদ্বয়কে দেখে এক জন বৃদ্ধ বললে—কি হে, তোমরা এখানে কি মনে করে?

জ্যান মাথা হতে টুপিটা ডান হাত নিয়ে বললে—শুনতে পেলাম, এখানে কাজ আছে সে জন্য এসেছি।

এক জন বৃদ্ধ বললে—হঁ, কাজের কথা বলছ, এখানে কাজ আছে সত্যই, তবে তোমরা কি সে কাজ করতে পারবে?

জ্যান একটা বেঞ্চিতে বসে বললে—পারব না কেন, দেখিয়ে দিন কি করতে হবে?

বৃদ্ধ যুবকদ্বয়কে তার সংগে চলতে বলল এবং একটু দূরে যেয়েই একটা স্তূপাকার গোবরের ঢিবি দেখিয়ে বললে—এই যে দেখছ গোবরের ঢিবি, তাই উঠিয়ে নিকটস্থ জমিতে দূরে দূরে স্তূপীকৃত করে রাখতে হবে। যে কাজের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার মজুরী বাবদ তিন ডলার করে পাবে। তবে এটাও মনে রেখো, এই কাজ করতে হলে অনেক বিপদ-আপদের সম্ভাবনা। নানা রকমের বিষাক্ত পোকা ত আছেই, অধিকন্তু গোবরের ঢিবিতে রেটেল সাপও থাকতে পারে।

জ্যান এবং আর্থার উভয়েই কাজ করতে রাজী হল, ভবিষ্যতের বিপদটুকুর মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না। গোবর ফেলার কাজ আরম্ভ হয় বেলা নটার সময়, যারা গোবর ফেলে তাদের সস্তা দরে খাদ্য দেওয়া হয়। সে দিন সকাল বেলা জ্যান এবং আর্থার পরিজ, রুটি, মাখন এবং বেশ বড় এক-এক টুকরা করে পাই খেতে পেয়ে বেশ খুশী হল। বৃদ্ধ তাদের দু'টা বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বললে—এ দু'টা বিছানা খালি আছে, তোমরা এর দু'টাই ব্যবহার করতে পার।

জ্যান এবং আর্থার যখন খেয়েছিল, তখন ফার্মের মালিক সেখানে এসেছিল। তার বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী নয়। জ্যান এবং আর্থারকে দেখা মাত্র মালিক বললে—এদের কাজে নিয়েছ কি?

বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে বললে—হাঁ বস্, এদের কাজে নিয়েছি, গোবর ফেলতে রাজী হয়েছে।

মালিক হাঁ হাঁ বলে কাজের জায়গা হতে বিদায় নিল।

তখনও নটা বাজেনি। অনেক মজুর লেপ ঢাকা দিয়ে তখনও শুয়েছিল। ঘাসের উপর হতে কুয়াসাও শুকায়নি। এমন সময় আসল কয়টি মহিলা। তাদের প্রত্যেকের বয়স চল্লিশের উপর, কিন্তু লিপস্টিক লাগিয়ে সুন্দর গাউন পরে তারা এসেছিল। তারা এসেই যারা শুয়েছিল তাদের ধমকি দিয়ে বলতে লাগল, এখনও শুয়ে আছ, তোমাদের লজ্জা করে না? উঠ আমরা এখন বিছানা পরিষ্কার করব।

যারা শুয়েছিল, তারা উঠল এবং মুখ ধোবার জন্য নিকটস্থ গরম জল দেওয়া মেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুইল। তার পর খাবারের টেবিলে যখন জ্যান এবং আর্থারকে দেখল, তখন তাদের

চমক ভাঙল। প্রত্যেকেই এ স্থান ত্যাগ করে জ্যান্ এবং আর্থারকে অন্ত কাজে যেতে উপদেশ দিল, অথচ কেউ তাদের বলল না, কেন তারা অন্ত কাজে যাবে। জ্যান্ এবং আর্থার সকলের কথায়ই হাঁ হাঁ করল, তার পর কাজে চলে গেল।

কাজ শক্ত ছিল না, ঘৃণারও ছিল না, পোকাও দেখলে, কিন্তু রেটেল সাপ সেখানে ছিল না। তারা নীরবে অর্দ্ধেক সময় কাজ করে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল, অন্যান্যরাও আসল। স্যুপ খেয়ে চপ এবং কাটলেট খেতে পেল। তার পর সব্‌জি, আলুসিদ্ধ, পেঁয়াজ-সিদ্ধ, রুটি মাখন খেল। খাবারের শেষে এক গ্লাস করে ঘন দুধও খেতে পেল।

খাওয়া হয়ে গেলে দুই বন্ধুতে যখন কাজে যাচ্ছিল তখন আর্থার বলছিল—এমন সুখাদ্য ঘরেতেও খেতে পাইনি।

জ্যান্ অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলল—দেখা যাক্, ক'দিন এখানে কাজ করা যেতে পারে। আজকের মজুরি দুটি ডলার যদি পকেটস্থ করতে পারি, তবেই রক্ষা।

আর্থার আর কোন কথা বলল না। আর্থারের শরীরে শক্তি হয়েছে। সে হুইল-বেরো ঠেলে ক্ষেতে ফেলে আসছিল আর জ্যান্ হুইল-বেরোতে গোবর দিয়ে বোঝাই করছিল। প্রত্যেক ঘণ্টায় তারা পালা বদলাচ্ছিল। ছটার সময় যখন তাদের কাজের শেষ হল, তখন তারা দৈনিক মজুরী নেবার জন্ত অফিসে গেল। অফিসে যাবার পর মালিক তাদের সহাস্য বদনে প্রত্যেককে তিন ডলার করে মজুরী বিদায় দিলেন। জ্যান্ সেই হাসির অর্থ কিছুটা উপলব্ধি করল, আর্থার কিছুই বুঝল না। সপ্তাহ সমাপ্ত হবার পর আর্থার তার উপার্জিত টাকা মায়ের কাছে মনিঅর্ডার করে পাঠাল, আর জ্যান্ নিজের বেল্টের মধ্যে নোটগুলি লুকিয়ে রাখল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর্থার তার মায়ের কাছে ডলার পাঠাতে আরম্ভ করল, আর জ্যান্ দশ ডলারের নোট জমা করে যখন এক শত ডলার করল, তখন এক দিন সে কাউকে কিছু না বলে কর্মত্যাগ করে কোথায় গেল, তা কেউ জানল না। আর্থার যখন জ্যানের কোন খবরই পেল না, তখন তার নিজের বালিশের নীচটা দেখতে ইচ্ছা করল। দেখল, তার বালিশের নীচে একখানা পত্র রয়েছে। পত্রে লেখা ছিল:—

প্রিয় আর্থার—

আমি তোমার সংগ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমাদের দুর্দিন অতি কাছে। আমি জানি, তুমি দুর্দিন বরণ করে নেবে, আমি তা পারব না, সে জন্ত স্থান ত্যাগ করা আমার পক্ষে শুভ-জনক ভেবে তাই করলাম। আমার কাছে এখন দেড় শত ডলার আছে। তোমার কাছে একটি পেনীও নেই। নিজের দুর্দিনের জন্ত কিছু হাতে রেখো, নতুবা হাটে মারা যাবে। একটু বুদ্ধি খরচ করে চল, তবে হয়ত বিপদ হতে উদ্ধার পাবে।

তোমার প্রিয়বন্ধু জ্যান্।

[ক্রমশঃ

শুভ অভ্যুত্থান

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

পদধ্বনি কার শুনি জীবনের জয়গান সাথে,
অশান্ত আশাতে
আকুল উদ্বেল হয় বসুধার গতি ছন্দোহীন
শৃঙ্খল-বিহীন!

প্রাণের জোয়ার
মানুষের আর
মানিবে না সমাজের বাঁধন-শাসন-অত্যাচার।
মানুষ জেগেছে ওই দিগন্তে তাহার কলোচ্ছ্বাস,—
নূতন প্রভাতে তাই তার
নব-জীবনের অভিযান,—
কল্যাণের শুভ অভ্যুত্থান
ভাঙে পুরাতন কারাগার।

বিপ্লবের বন্যাস্রোত শাসকেরে করে উপহাস,
প্রচণ্ড আঘাতে তার ভেসে যায় রাজা-জমীদার
ধনিকের শোষণের সমষ্টির আঘাতে দুর্ব্বার;
সমাধি রচিত হয় শাসকের বহে না নিশ্বাস।
নূতনের ইমারত গড়ে ওঠে ধ্বংসস্তূপ হতে
জনগণ-জাগরণে বিপ্লবের বহ্ন্যুজ্জ্বল স্রোতে।

বঞ্চনার অবসানে পায়
ইতিহাস নূতন অধ্যায়।
ভোগের আরতি শুধু আরবে না ধনীর শিয়রে,
ক্ষমতা-মদের নেশা টুটে যায় জনযুগ ভরে।

শারদ প্রভাত হাসে নূতন যুগের বার্ত্তা লয়ে,
ঋতুরাজ সাজাইয়া ফাগুনের বাসন্তী বীথিকা
মানুষের বন্দনায় মিলনের গীতিখানি গায়,
জীবন-সুধার ধারা ধরা দেবে সবার হৃদয়ে।
অন্নহীন বস্ত্রহীন সর্ব্বহারা চলেছে এবার,
প্রগতির যাত্রাপথে অভ্যুত্থান নিশ্চিত তাহার।

রামরাজ্য গঠনের আশা
মিথ্যা-স্বপ্ন আজি আর নয়
সে তো আজ জীবন্ত বাস্তব—
জীবনবেদের সত্য ভাষা।

ভাঙার প্রলয়ে হেরি সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা
রক্তে মোর লাগে দোলা আগত ঐ সে সূচনা—
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা মন্ত্রে এ কী মুখর ব্যঞ্জনা।

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৮

মুঙ্গের যাত্রার প্রাক্কালে গোপাল দেখা করিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের সঙ্গে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে। তখন রজনী গভীরা। মহানিশায় মহাসাধক মা-নামের বেড়ায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন গোপালের সাথে। প্রবাদ—অভয়ার অভয় বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল মন্দির-প্রাঙ্গণে।

উষায় হইল যাত্রা। চূর্ণী নদীর কিনারায় ষোল দাঁড়ের ভাউলে প্রস্তুত ছিল যাত্রীর জন্য। পাতা-লতা-পুষ্পমাল্য দিয়া ভাউলে সুসজ্জিত করিয়াছিল মহারাজার ভক্ত প্রজাবৃন্দ। আজু গোঁসাই সে বিষয়ে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন আন্তরিকতায়। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছিল, গোপালের জয়যাত্রা দেখিবার ঔৎসুক্যে। সকলেই হরিধ্বনি করিতেছিল যাত্রার সাফল্য কামনায়।

মুঙ্গের যাত্রার বিরোধিতা করিয়াছিল মাত্র কয়েক জন ব্যক্তি। মহারাজার প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছিল না, এ কথা বলিলে ভুল হয়। গোপালের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাহাদের ছিল ভীষণ ঈর্ষা। ঈর্ষাবশেই তাহাদের বিরোধিতা। কিন্তু সে ভাব দেখাইলে পাছে তাহাদের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে, এই ভাবিয়া তাহারা উত্তেজনার সুরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল—যেখানে মহা-মহা পণ্ডিত হার মেনে গেছেন, সেখানে আমাদের গোপালদা'কে পাঠান শুধু অনুচিত নয়, পাপও বটে; কেন না, গোপালদা' আমাদের নয়ন-মণি, গোপালদা'কে ওরা যদি গুম্ করে, তা হ'লে কৃষ্ণনগর কাণা হয়ে যাবে।

ইহার অপেক্ষাও দুর্ব্বল যুক্তিতে যাহারা কোমর বাঁধিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ স্ত্রী-সর্ব্বস্ব বীরপুরুষ, কেহ পরান্নভোজী চাটুকার, কেহ স্নান-ঘাটের পয়সা-কুড়ান জাত-হারান পুরুষপুঙ্গব, আর কেহ বা পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া ঘরে-বাইরে পরস্মৈপদী।

এই মনস্তত্ত্বের মানুষগুলাকে গোপাল ভাল করিয়াই চিনিতেন। ইচ্ছা করিলে ভাল করিয়াই তিনি তাহাদের শিক্ষা দিতে পারিতেন। "ক্ষমা শক্তৌ" কথাটার উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন সেই ভাবেই।

ক্ষমার অযোগ্য ছিল এক জন মানুষ। তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি দুই-ই মন্দ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া তাহার ছিল দাবী। কিন্তু তাহার আচার-ব্যবহার চণ্ডালাধম। সে বিশ্বনিন্দুক ও পরস্বাপহারী। ধনী ব্যক্তি তাহার ছিল উপাসনার বস্তু; কিন্তু নির্ধন-গুণী তাহার পরম শত্রু। রামপ্রসাদকেও সে দেখিত বাঁকা চোখে। সেই কারণেই গোপাল এই উপবীতধারী চণ্ডালকে সাধ্যমত দূরে রাখিতেন।

তাহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া রকমফেরে গোপালের মুঙ্গের যাত্রা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল, তখন গোপাল রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানান্তে অভিশাপের প্রস্রবণ সৃষ্টি করিবার ভয় দেখাইলেন। মাথায় উষ্ণীষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে শঙ্খবলয় থাকায় মুঙ্গের-যাত্রীর ব্যক্তিত্বে অধিকতর অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নদীতীরে সমবেত জনমণ্ডলী মুগ্ধ-নেত্রে যাত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিধ্বনিতে বিদায়-অভিবাদন করিল, তরী যাত্রী লইয়া খরস্রোতে ঘোরপাক খাইয়া গন্তব্য পথে তীরবেগে ভাসিয়া চলিল। গোপাল অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করিলেন যুক্তকরে। তখন তরুণ অরুণ-কিরণোদ্ভাসিত উদার আকাশে কলকাকলীর ঐক্যতান ঝঙ্কৃত হইয়া ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছে।

নৌকাবাসে গোপাল একাহারী হইয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে এক জন সুগায়ক ছিল, গোপালের নির্দেশ মত গায়ক রামপ্রসাদী গান গাহিয়া যাত্রার পথ আনন্দ-মুখর করিত।

সাত দিনের পর মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া গোপাল সরাসরি নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া জানান্ দিলেন—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-পুরোহিত নবাব বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছে। তিনি নবাব বাহাদুরের দর্শনাভিলাষী।

পুরোহিত শব্দের অর্থটা নবাব বাহাদুর ঠিক মত বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন—এই মানুষটা পণ্ডিতদেরই কেজুড় হইবে, পণ্ডিতদের জীবন-ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া মনে হওয়ায়, কৃষ্ণনগর হইতে আগত পণ্ডিতদের তিনি খুব সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেন। সেই কারণে তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই হুকুম নবাব বাহাদুরের। গোপালের উপরও সেই আদেশ হইল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু গোপাল আরম্ভ করিল—চীৎকার, নৃত্য, উল্লম্ফন, অনর্গল বক্তৃতা নবাবের কর্ম্মচারী তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে যাওয়ায়। রাজকর্ম্মচারী ও গোপাল উভয়েই স্ফীতোদর। বাম-ফসাকসিতে দুই জনেই পড়িল মেঝ্যার উপর। তাহার পর উঠিতে পারে না দুই জনেই। আরসুলা উল্টাইয়া পড়িলে বেচারার যে অবস্থা হয়, গোপাল ও রাজকর্ম্মচারীরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল। চারি-পাঁচ জন জোয়ান মিলিয়া এই দুই স্ফীতোদর পুরুষ-পুঙ্গবকে উঠাইয়া বসাইতে তবে তাঁহারা রক্ষা পান।

নবাব বাহাদুর অলিন্দে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যে বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছিলেন। নবাবের নিকট গোপালের ডাক পড়িল আনন্দের আকর্ষণে। স্বকার্য্যোদ্ধারে গোপাল সিদ্ধপুরুষ। কে জানে, আরসুলার মত চিৎ হইয়া পড়া এবং ভুঁড়ি লইয়া হাস্যোদ্দীপক ভাবে মাটীর উপর গড়াগড়ি খাওয়া গোপালের ইচ্ছাকৃত কি না। গোপাল অল্পেই বুঝিয়াছিলেন নবাব-দরবারে হাওয়ার গতি কিরূপ। সেই বুঝিয়াই হয়ত তাঁহার এইরূপ কৌশল। তিনি শুধু হাস্যার্ণবই ছিলেন না; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁহার অসাধারণ, কূট রাজনীতি-বিশারদ বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল।

গোপাল ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েক বার নবাব-দরবারে গিয়াছিলেন কৃষ্ণনগরাধিপের কায-কারবারে। তাহাতেই নবাব-মহলের কায়দা-কানুন বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন তিনি। আদব-কায়দায় নবাব বাহাদুরকে কুর্ণিশ করিয়া গোপাল বলিলেন—"আমি নবাব বাহাদুরের দরবারে এসেছি এইটুকু জানাতে যে,

সারা বাংলার যিনি ভাগ্য-বিধাতা, তাঁর বিচার বিবেচনা কোনো রকমই হীন হ'তে পারে না ; কেন না আল্লার কৃপায় তিনি অভ্রান্ত। আমি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্য হ'লে কি হয়, সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না একটুকুও। ভুলপথে চ'লে কৃষ্ণচন্দ্র এখন কেষ্ট পাবার উপক্রম ক'রে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছেন। তাই নবাব বাহাদুরের কাছে অপরাধী হ'য়ে মরণটাকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছেন মহারাজা।"

কথাগুলায় নবাব কৌতুকানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত গোপালের তুলনা করিয়া নবাব এইটুকু বুঝিলেন, মানুষটা কৃষ্ণনগররাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বটে, কিন্তু নবাবের বিচারে তাহার খুবই শ্রদ্ধা আছে। মনে মনে এই বিচার করিয়া গোপালকে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে তুমি মনে কর, আমি অন্যায় বিচার করি না ?" শির নত করিয়া গোপাল কহিলেন—"কিছুতেই নয় সাহান-সাহ ! হুজুরের বিচার অভ্রান্ত।"

"যদি আমি কৃষ্ণচন্দ্রকে ফাঁসি দিই, তা হ'লে অন্যায় হ'বে কি ?"

"এক দম নয়। পাপ করলেই ফল ভোগ করতে হয়। মহারাজ সাহানসার অনুগত হ'লে তাঁর ভালই হ'ত। তা' যখন হ'ন নাই তি'নি, তখন ত ফাঁসি-কাঠে ঝুলতেই হ'বে। ও ত' ঠিক বিচার হ'য়েছে জনাব।"

"তা' ত হ'ল, তবে তুমি এলে কেন আমার দরবারে কৃষ্ণচন্দ্রের হয়ে দরবার করতে ?"

"আজ্ঞে, দরবার করতে আমি আসি নাই একেবারেই। আমি এসেছি শুধু এই সমাচার নিয়ে যে, মানুষটাকে যখন পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করার সুখ-সুবিধা হ'তে বঞ্চিত করতে মনস্থ করেছেন, তখন তাঁকে ভগবানের নাম ধ্যান করবার সুযোগটা মাত্র সাত-দিনের জন্য দিন। তার পর তাঁকে কোতলই করুন, আর ফাঁসি-কাঠেই ঝোলান পচ্ছন্দ এবং গোলমেকাতে।"

গোপালের কথায় নবাব বুঝিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি গোপালচন্দ্রের তেমন অনুরাগ নাই। তবে নিমক খাইয়া তাহাকে কতকটা নিমক-হালাল হইতেই হইয়াছে নিমকহারাম হইতে সে নারাজ। গোপালের এই মনস্তত্ত্ব নবাব সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দণ্ড সাত দিনের জন্য মঞ্জুর করিলেন এবং ভগবানকে স্মরণ করার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। এই কয়েক দিনের জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নজরবন্দী রহিলেন মাত্র গোপালের কাতর প্রার্থনার ফলে। মহারাজের সকাশে নির্ভুল হইয়া যাতায়াতের অনুমতিও পাইয়াছিলেন গোপাল। তাহাতে বাধা সৃষ্টির উদ্যমও হইয়াছিল যথেষ্ট। কিন্তু নবাব তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই আদৌ। গোপালের জল উঁচু-নীচু বলার ভঙ্গীতে প্রীত হইয়া গোপালকে নবাব প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার আবদার উপেক্ষিত হয় নাই। প্রকারান্তরে ইহা যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব, এমন কথাও অকুণ্ঠিত ভাবে বলা চলে।

গোপালের আর একটা আব্দার ছিল। ভগবানকে স্মরণ করা ... ক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দান-ধ্যান ও সাধু-সজ্জনকে যথেচ্ছ ভাবে ...াদি করাইবার সুযোগ পাইবেন। তাহাতে নবাব-সরকার কোনো ওজর-আপত্তি করিবে না—করিলে, নবাবের অনুমতিক্রমে তাহা না-মঞ্জুর ও বাতিল হইবে। সেই আদেশই বহাল রহিল গোপালের বুদ্ধি-চালে।

আহারাদির ব্যবস্থা হইল সুচারু। নানা আহার্য্যের মধ্যে কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়ার পারিপাট্য সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল ধনী-নির্ধন জনসাধারণকে। ভোগবিলাসী নবাব বাহাদুরও কৌতূহলবশে রসনা-তৃপ্তির বস্তু দুইটির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা না-করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আস্বাদ গ্রহণের পূর্ব্বে গোপালকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "উহাতে নিমক নাই ত ?"

গোপাল কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন—"আর কেউ ও-প্রশ্ন করলে, তার নামের পূর্ব্বে বেকুফ শব্দটা ব'লে যেত আপনা-আপনি। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র সাহানসা। আমরা ভাবি, ওটা আপনার রহস্য। কেন না, মিষ্ট বস্তুতে কেউ কখনো নিমক মেশায় না, মেশাতে চায় না বিস্বাদ হ'বার ভয়ে।"

নবাব বাহাদুর খোস-মেজাজেই ছিলেন তখন। গোপালের বলার ভঙ্গী তাঁহাকে আরো খুসী করিয়াছিল। খুসীর হাসিতে গোপালকে পুরস্কৃত করিয়া গোপালকে বলিলেন—"নিমকের কথাটা কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তা বোঝ গোপাল মহম্মদ ?"

গোপাল শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"তোবা তোবা, আপনি কি করলেন সাহানসাহ ? কাফেরকে মহম্মদী শিরোপা দেওয়া চলে না ত কোনো মতেই।"

"কিন্তু আমি যদি তোমাকে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করি তোমার মহারাজার সঙ্গে ?"

গোপাল বুঝিলেন, নবাবী মনের ঝড় বহিতে সুরু হইয়াছে। সে ঝড় ভূমিসাৎ করিবে হিন্দুস্থানীর প্রাসাদ-চূড়া। মনের ভয় মনে চাপিয়া গোপাল স্মিত মুখে বলিলেন—"সাহানসার মুখের কথা বার হ'তে না হ'তেই ও পবিত্র ধর্ম্ম আমার গ্রহণ করা হয়ে গেছে। আর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরও তাই। কেন না, মহারাজা আজ সাত দিন ক'ল আপনার দেওয়া সিধা এক পাশে রেখে দিয়ে কেবল মাত্র নিমকটুকু নিয়ে নিমক-জল খেয়ে প্রাণধারণ করছেন। আমরা নিমকহারাম নই সাহানসা। আমাদের জাত নিমকহালাল।"

নবাব বাহাদুর গোপালের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। সে চাহনির ভাষা গোপালের ভাষায় —হিন্দুর ধৈর্য্য স্থৈর্য্য, সহনশীলতা ও উদারতা কত বড়।

গোপালকে নবাব বিদায় দিলেন কিছুক্ষণ পরে নবাবের তখনো ভাবনার বিরাম নাই। তখনো তিনি বসিয়া রহিলেন চিত্রার্পিতের মত।

গোপাল মনে মনে হাসিয়া বিচারে সিদ্ধান্ত করিলেন—তাঁহার ধাক্কায় কাজ হইয়াছে। কিন্তু সাত দিন ত কাটিয়া গেল। ক্লাইবের প্রতিশ্রুত রক্ষার লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না।

আশা রঙিন কাচ। সেই কাচের মধ্য দিয়া গোপাল যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশান্বিতই হইলেন। সিদ্ধ-সাধক রামপ্রসাদের এক জন ভক্ত-শিষ্য গোপালের সন্নিধানে আসিয়া বলিয়া গেলেন—গুরুদেব বলিয়াছেন, শ্যামা মায়ের কৃপায় মহারাজ অচিরেই মুক্তি পাইবেন।

যে সন্ধ্যায় প্রাক্কালে এ কথা হইয়াছিল, তাহার পর দিনই সসৈন্যে ক্লাইবের আগমন ও আক্রমণ। বিপক্ষ দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

ক্লাইবই মহারাজাকে মুক্তিদান করিলেন। দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

কুড়ি

পরদিন প্রাতে নিচেকার একটি ঘরে মিষ্টার বোস ও নরেশ উভয় মিলিয়া জিনিষ-পত্রের মিল করিতেছিল, এমন সময় ঝরণা আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার মুখের প্রকৃত শান্ত, অথচ সর্বাঙ্গে যেন এক উগ্র দৃঢ়তা ছাপাইয়া পড়িতেছে। হাতে এক টুকরা কাগজ ছিল সেই কাগজটুকু মিষ্টার বোসের হাতে দিয়া কহিল, "ওটা 'প্রেসে' পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবা—"

'বিবাহ বন্ধের নোটিশ।'—মিষ্টার বোস ও নরেশ চমকিয়া উঠিল। উভয়েই মূঢ়ের ন্যায় ঝরণার দিকে তাকাইতেই সে তৎক্ষণাৎ কহিল, "বিয়ের দিন, আজ বাদ কাল—এ ছাড়া আর উপায় নেই।"

"বিয়ে বন্ধ—সে কি?"

"রুচি নেই।"

মিষ্টার বোস কি করিবেন, কি বলিবেন—ঠিক করিতে পারেন না। ঝরণার দিকে ঘন-ঘন বার কয়েক তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হঠাৎ তোমার রুচি—কিছু বুঝতে পারছি না তো!"

"আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার!"—নরেশ আকস্মিক ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না, যেন এক ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল এইমাত্র মানুষের রক্তের আস্বাদন পাইয়াছে! গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি বুঝতে পেরেছি—সেই স্ত্রীলোকটা, যার আপনি আবদ্ধ হয়েছিলেন,—নিশ্চয়ই সেই কখন কোন্-সময় এসে বিগড়ে দিয়ে গেছে—"

মিষ্টার বোস জিব্ কাটিলেন। কহিলেন, "বীণার কথা বলচ? নরেশ, তাকে তুমি চেনো না! সে কারো পিঠের ওপর ছুরি বসায় না! আবশ্যক হলে সামনা-সামনিই বুকের ওপর পিস্তলের গুলী করে!"

নরেশ ঝরণার প্রতি এক অগ্নি-কটাক্ষ করিয়া মিষ্টার বোসকে বলিয়া উঠিল, "তা'হলে, আপনার কন্যাই বলুন—কেন? 'কনসেণ্ট' দিয়ে এখন 'রুচি' নেই বললে তো আর চলে না!"

মিষ্টার বোস বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঝরণার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "নরেশ যা বলছে—ও-কথা ও বলতে পারে! হুঁ—পারে বৈ কি! 'কনসেণ্ট'—"

"কনসেণ্ট?"—ঝরণার মুখ দিয়া একটু শ্লেষের হাসি বাহির হইল। পরক্ষণেই মুখখানা কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "দান করতে বসে সম্পত্তির 'কনসেণ্ট' যদি প্রয়োজন হয়, তা'হলে আমিও কিছু অনিয়ম করিনি!"

মিষ্টার বোস মাথা নাড়িয়া কথাটা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিলেন। নরেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ঠিক! ঝরণা যা বলছে—ও-কথা ও বলতে পারে। হুঁ—আইন-সঙ্গত!"

নরেশ তেমনি উগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, আমি কত দূর এগিয়েছি, তা' জানেন? বন্ধু-বান্ধব—শিক্ষিত সমাজ—"

"থামুন—" ঝরণা বাধা দিল। ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তাদের কাছে এ-রকম একটা ব্যাপার—'passing event'! একটু খাড়িয়াই পুরুষ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সুরু করিল, "পুরোপুরি বিয়েটা, তাই-ই, যদি কারুর ভাঙে, তা' হলেও সেটা তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না।"

নরেশের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। ঝরণার দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি জানো—এই বিয়ে না হলে আমার মাথা কাটা যাবে—"

ঝরণা তেমনি করিয়াই তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "না—তা' আপনাদের যায় না, নরেশ বাবু। আপনাদের চিত্রগুপ্তের খাতায় এই রকম একটা পলকা বিভীষিকা—তার জমা-খরচ থাকে না। যদিই বা থাকে, তা' সে পাথরের শ্লেটে—প্রয়োজন হলেই মুছে ফেলা যায়।" পরক্ষণেই ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "শুনুন, আর আমার প্রাইভেট টিউটারের প্রয়োজন নেই। এ-বাড়ীর সঙ্গে আপনার যেন আর সংস্রব না থাকে!"

মিষ্টার বোস চমকিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় ঝরণার দিকে তাকাইলেন।

নরেশ আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। যেটুকু সৎ চেতনা তাহার বুকের ভিতর অবশিষ্ট ছিল, তাহা এইবার যেন উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি ড্যামেজ-স্যুট আনবো—"

"তার আগে আপনি পুলিশের আসামী—" বলিয়াই ঝরণা কাপড়ের ভিতর হইতে সেদিনকার গৃহীত নরেশের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার ফটোখানা বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এদের চিনতে পারেন?"

নরেশ চমকিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখখানা কালি-মূর্ত্তি হইয়া গেল।

ঝরণা ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "মানুষের ইতিহাসে আপনার পরিচয় কি বলতে পারেন?"

মিষ্টার বোস হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার নরেশের দিকে আর একবার ঝরণার দিকে বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের হলো কি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে—"

ঝরণা হাতের ফটোখানা মিষ্টার বোসের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"এইটি হচ্ছে নরেশ বাবুর গোপনীয় সংসার!"

"বলো কি!—" মিষ্টার বোস চমকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন; তার পর অপ্রকৃতিস্থ ভাবে নরেশের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নরেশ, এরা তোমার—"

"স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—" ঝরণা দাঁতে দাঁত দিয়া কথা কয়টি বলিয়াই সুরু করিল, "এরাই আমাকে বাঁচিয়ে গেছে, বাবা!"

"নরেশ!"—মিষ্টার বোসের বজ্র-কণ্ঠে যেন ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। দেখা গেল—তাঁহার সৌম্য-শান্ত চক্ষুর্দ্বয় ধ্বক-ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যেন শ্মশানবাসী এক শ্রেষ্ঠ দেবতা এইবার এই চলন্তি চরাচরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন! ক্রোধে ঠক্-ঠক করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে নরেশের কাছে সরিয়া আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "নরেশ! তুমি এই সব গোপন কোরে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে এসেছ? উঃ—তুমি কী হে? তুমি না শিক্ষিত, তুমি না এক জন এম্-এ—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ 'সন্তান', আত্মীয়-স্বজনের 'গর্ব্ব'? তুমি, তুমি নরেশ—কি কাজ করেছ, জানো—শিক্ষিত বাংলার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছ! বিশ্বাসী বিগ্রহ বোলে বাপ্তীর

দরবারে তার এক রত্ন-সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসন—তাকে কলঙ্কের কালি দিয়ে তুমি বিমূর্ত্তি করে দিয়েছ।" মিষ্টার বোস হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একটু থামিয়াই আবার অধিকতর উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বিশ্বাস-ঘাতক—তোমার শাস্তির মাত্রা মানুষের 'পেনাল-কোডে' আজো তৈরী হয়নি। জেলখানায় দিলে তোমার সম্মান বাড়বে—তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। যাও—"

নরেশও আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, পিঠটান দিতে পারলেই বাঁচে। ঘাড়-মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর ঝরণাও যেমন চলিয়া যাইবে, মিষ্টার বোস তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "একটু দাঁড়া! একবার আর ফিকিনি আমার সঙ্গে—" বলিয়া ঝরণাকে স্বীয় শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহার স্ত্রীর ছবিখানা দেখাইয়া বেদনা-বিপ্লব কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার একমাত্র সন্তান। আমার মৃত্যুর পর—ওঁকে গিয়ে কি বলবো, মা, তা'হলে—"

ঝরণার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আমার বিয়ের কথা বলছো তো? বিয়ে আমি আর করবো না—এ কথা তো আমি বলিনি বাবা!"

"না, না—তাও বলিস্‌নি! তবে কি জানিস্—ওই 'কন্‌সেন্ট' কথাটা আইনের বই খুললেই চোখে পড়ে! বেশ, বেশ—তবে 'পাত্র' দেখি! এবারে—আই-সি-এস—"

ঝরণা মুখ নামাইয়া কহিল, "না বাবা, যাঁকে আমি বিয়ে করবো, তিনি হবেন—আমারই পছন্দ মত—"

মিষ্টার বোসের আনন্দ যেন আর ধরে না। বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম—"

"তিনি হবেন—নিরক্ষর!"

"নিরক্ষর!—সে কি?" মিষ্টার বোস চমকিয়া উঠিলেন।

কিন্তু, ঝরণার কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তার কারণ—তাঁর ভেতর শিক্ষার কলঙ্ক থাকবে না।"

মিষ্টার বোস বিভ্রান্ত নেত্রে শুধুই কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না।

ঝরণা সুরু করিল, "আর—তিনি হবেন দুঃস্থ, অবস্থা-শঙ্কিত, দীনদরিদ্র—"

"তাতে আমার আপত্তি নেই! আমার অভাব কি—"

"আর এই বাড়ীতেই তিনি থাকবেন, আমার চোখের মাথায়।"

মিষ্টার বোস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বুঝিছি, মা! নরেশ যে গ্লানি রেখে গেছে, তা' হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হবে না। কিন্তু, নিরক্ষর—তাকে তুই সহ্য করবি কেমন কোরে, মা?"

ঝরণা প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "যদি না পারি, তা' হলে আমার বিয়ে করাই চলে না, বাবা!"

"না, না—না! তাই হবে—" মিষ্টার বোস ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বেশ, বেশ—তাই হোক!"

অতঃপর কালের মুখ চাহিয়া বিদ্রোহী কন্যার প্রত্যেক সর্ত্তে রাজী হইয়া মিষ্টার বোস সেই দিনই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই বিজ্ঞাপনেই সাড়া দিয়াছে—মলিন।

একুশ

ইতিমধ্যে নিবারণের সংসারে এক কৃষ্ণ আবরণ পড়িয়াছে।

বিবাহের পর সাত দিনও কাটিল না, সন্ধ্যা বিধবা হইল। ছেলেটির যক্ষ্মা রোগ ছিল, বিবাহের পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু এই লোকসান, ইহা আকারে ও পরিমাণে বড় যতই হোক্ না কেন, শোক-বারি কাহারো চোখ দিয়া বাহির হয় নাই—না সরস্বতীর, না সন্ধ্যার। শোক-তাপের বাহিরে আসিয়া উভয়েই যেন এক নব-নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কেবল মাত্র এক দিন সরস্বতী কন্যাকে একটি কথা বলিয়াছিল, যেদিন সে স্বামীর শেষ কাজ সারিয়া শুভ্র বাসে অঙ্গ ঢাকিয়া শুধু-হাত করিয়া ঘরে উঠে। কহিয়াছিল, "সাড়ী কাপড়গুলো এখন পরে' ফেল্, তার পর—"

সন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিল—"না।"

ভাঁটু দাঁড়াইয়াছিল। সে রাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'তা' হলে তুই এখন থেকেই থান কাপড় পরবি?"

সন্ধ্যা হাসিয়া জবাব দিল, "দাদা, মেয়েমানুষের এই জীবনটাই সত্যি! মাটির আরাধনা কোরে যাদের মাটির ওপর ফুটতে হয়, তাদের কোন-কিছুরই ওপর নালিশ চলে না।"

সরস্বতী নিঃশব্দে সরিয়া গেল। কিন্তু দাঁড়াইয়া রহিল ভাঁটু, যেন অনেক কথাই তার বলিবার আছে, কিন্তু কি বলিবে, তাহা সে মনের মধ্যে গুছাইয়া সাজাইতে পারিতেছে না। ক্ষণকাল পরে সহসা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু হাতের চুড়ি দু'গাছা—তা' তো পরবি?"

সন্ধ্যা পুনশ্চ হাসিল। কহিল, "তা' পরতে পারি যদি লোকে কুকুর ধরিয়ে না দেয়! বলি, পরনে থান কাপড়, আর হাতে চুড়ি—কি রকম মানাবে বলো দিকিনি?"

এই সৃষ্টি-ছাড়া বোনটাকে লইয়া ভাঁটু কিছুতেই পারিবে না। বেচারা কি আর করে, মুখখানা হাঁড়ি করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

কিন্তু এইখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইল না। সন্ধ্যার সেই নিরাভরণ মূর্ত্তিটা ভাঁটুর মনে অহরহঃ পীড়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যার পরই সে গেল বড়মা'র কাছে, তিনিই যেন তার উচ্চ আদালত! গিয়া দেখিল, সন্ধ্যা ও বড়মা'র ভিতর কিসের একটা জোর তর্ক উঠিয়াছে। ভাঁটুকে দেখিয়াই, সন্ধ্যা তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, বল তো—যে-মানুষ চিঠি লিখলেও জবাব দেয় না, তাকে আবার চিঠি-পত্র দিতে আছে?"

ভাঁটু কোমর বাঁধিয়া যে-আপিলটা পেশ করিতে আসিয়াছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াই বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কার কথা বলছিস্—মলিনদা'র কথা?"

সন্ধ্যা আকারে-ইঙ্গিতে জানাইল—"হুঁ!"

ভাঁটু যেন বেশ একটু চিন্তায় পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "চিঠি তাকে লিখেছিল কে—তুই?"

"আমি কেন? বড়মা—"

"বড়মা?—তা'হলে জবাব এখন আসবে না।"

"হেতু?"

"তুই বুঝবি না! নিশ্চয়ই তার এখনো চাকরি-বাকরি হয়নি—সেই লজ্জায়! বরং, তোর নাম দিয়ে তুই একখানা চিঠি লেখ—"

সন্ধ্যা মুখ নামাইল।

বড়মা'ও তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা! ও কি এখন

ও-সব পারে।" অতঃপর উপর দিকে মুখ করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্‌! তোকে কি আর বল্‌বো—দুখের মেয়ে, সে দু'দিন সাধ-আহ্লাদ করবে—তা-ও তোর সহ্য হলো না! আরে, বরাত।" অতঃপর ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে ভাঁটুকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই না হয় একখানা লেখ! এই কথা লিখবি—'তুমি' কেমন আছ, শুধু এই খবরটা জানাও'!—হ্যাঁ—" সন্ধ্যাকে লক্ষ্য করিয়া সতর্ক কণ্ঠে কহিলেন, "ওর যে এই দশা হয়েছে, এ-কথা যেন চিঠিতে লিখিস্‌ না। এ তো আর সুখের খবর নয়।"

ভাঁটু প্রবীণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "বড়মা! তিন পয়সা কোরে পোষ্টকার্ড—অনর্থক পয়সা খরচের আমি পক্ষপাতী নই। এক আমি যা বল্‌লাম, তাই যদি হয়তো হোক্‌—সন্ধ্যা চিঠি লিখুক্‌, নইলে আরও দিন কতক চুপচাপ থাকো, চাকরী হলে নিজেই সে চিঠি দেবে।"

সন্ধ্যা কথাটার প্রতিবাদ করিল। কহিল, "কিন্তু, তোমাদের মন আর মেয়েমানুষের মন—এক নয়, দাদা, এ-কথাটা তুমি জেনে রেখে। তোমরা হচ্ছ পাথর। বাড়ীতে বুড়ো মা, তিনি ভাববেন—এ হুঁস্‌ তোমাদের থাকে না!"

ভাঁটু হাসিয়া কহিল, "তবে তুই লেখ—"

"ও-কথার উত্তর একবার তো পেয়েছ?" সন্ধ্যা একটি বার মুখ নামাইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "মা লিখলে জবাব আস্‌বে না, আর আমি লিখলেই জবাব আসবে?"

"হ্যাঁ! তার কারণ—তোর হাতে গুরু মশায়ের বেত্‌ আছে।" বলিয়াই ভাঁটু হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার মুখখানা লজ্জারক্ত হইয়া উঠিল। এক-মুখ রাগিয়া উঠিল, "আমার গরজ।" মুহূর্ত্তেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "একটা অনিয়ম, তাকে নিয়ম বোলে তোমরা মেনে নিতে পারো, কিন্তু—এটা জেনে রেখো, দাদা—আমরা তা পারি না!"

"না পারো, তবে চুপ কোরে থাকো।" বলিয়া ভাঁটু দুই হাত তুলিয়া যেন প্রসঙ্গটাকে চাপা দিল। তার পর বড়মা'র দিকে ফিরিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "বড়মা, তোমার কাছে আমি আজ নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি—" অতঃপর সন্ধ্যার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাপ-মা বেঁচে, তাই, নইলে—আমিও থান কাপড় পরতাম।"

কোথা হইতে কি কথা পড়িল, বড়মা বুঝিতে না পারিয়া ভাঁটুর দিকে তাকাইতেই, সে তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই ওর কথা বলছি—না-হয় ও বিধবাই হয়েছে, তা হলেই বা—তা বোলে এখন থেকে ও থান কাপড় পরবে—শুধু-হাত করবে? এই বয়সে ওই সব পণ্ডিতপণা ওকে মানায়?"

বড়মা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভগবান ওকে সন্ন্যাসী সাজিয়েছে—আমরা মানুষ, আমরা কি করি, বল্‌?"

"বা—বা—বাঃ! বেশ হাকিম তুমি? বলি, তুমিও তো বিধবা হয়েছিলে—কিন্তু, ক'বছর বয়সে বল দিকিনি? নিশ্চয় চুল পাক্‌বার সময়-সময়! আর ও?—" সন্ধ্যাকে একবার নির্দ্দেশ করিয়াই সুরু করিল, "ওর বয়সটা একবার দেখবে তো? মা, না—ও-সব হবে না। তোমার ভগবানকে এখন বছর কতক শিকেয় তুলে রাখো—ও বড় হোক্‌, বুড়ো হোক্‌, চুল পাকুক—তার পর তাঁকে নামিয়ে এনে বোলো—'ওগো, ভগবান্‌! এই নাও তোমার সন্ন্যাসী।' এখন তুমি ওকে বল দিকিনি—'ওরে লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, যদি তুই থান কাপড় পরিস্‌, হাত শুধু করিস্‌—তা'হলে, তোর মুখ দেখ্‌বো না'।"

"ষাট্‌, ষাট্‌!" বড়মা মনে-মনে একটু শিহরিয়া উঠিলেন, তার পর ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "সন্ধ্যা যে কি বস্তু, তা' তুই জানিস্‌ নে, বাবা। মেয়েমানুষ স্বামী নিয়ে ঘর করে কিংবা স্বামী হারিয়ে ভেসে-ভেসে বেড়ায়, কিন্তু সন্ধ্যা ও-দু'টো দলের—একটাও নয়! মেয়েমানুষের জাত, তারই মুখ রাখতে মা আমার অবতীর্ণ হয়েছেন—এয়োস্ত্রীর চিহ্ন অঙ্গে ও রাখতে পারবে না, বাবা! তা'হলে আপনাদের মুখে যে কালি পড়বে খানিক।"

যার-তার মুখ দিয়া এ-সব বাক্য নিঃসৃত হয় নাই, স্বয়ং বড়মা'র মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে! কাজেই ভাঁটু একটু দমিয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "তাই ত? ঠকে গেলাম, দেখছি!"

সন্ধ্যাও এইবার দিন পাইয়াছে, হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, জেতবার চেষ্টা আর এক দিন না-হয় করো, সে দিন আর একটি হাকিম বাড়ী আস্‌বেন।" অতঃপর সহসা চঞ্চল-চকিত হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "আর বাজে কথা বল্‌লে চল্‌বে না—বড়মা'র জলখাবার তৈরী করতে হবে।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

অতঃপর রান্না-ঘরের দিকে যেমন পা বাড়াইবে, সরস্বতী উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাকে কহিল, "ওরে, তোর গুরুদেব এসেছেন—শীগ্‌গির একবার আয়! ধুলো-পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তুই নিজের হাতে জল না দিলে উনি হাত-পা ধোবেন না।"

বৈধব্যের পর হইতেই সন্ধ্যা দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। স্বামীর বংশের যিনি কুলগুরু, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার ঠিকানা মিলিয়াছে—তিনি থাকেন কাশীধামে। তিনি না কি সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার দীক্ষা-মন্ত্র সেবামার্গের নির্দ্দেশ। কাশীধামে যে-কয়েকটি বিশিষ্ট সেবাশ্রম আছে, ইঁহার সেবাশ্রম তন্মধ্যে অন্যতম। ইঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনা হইয়াছে।

* * * সন্ধ্যার মুখখানা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "একটু দেরি হবে, মা! বড়মা'র এখনো জল খাওয়া হয়নি!" বলিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সরস্বতীও আর অপেক্ষা করিল না।

বড়মা রাত্রে চোখে ভালো দেখিতে পান না, তাই সন্ধ্যা আসিয়া বড়মা'র জন্য কোন দিন একটু দুধ গরম করিয়া, কোনো দিন বা একটু সুজি করিয়া দেয়। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে, তখনো সন্ধ্যার কাজ সারা হয় নাই, সরস্বতী পুনশ্চ আসিয়া তাগাদা দিয়া কহিল, "গুরুদেব রাগ করবেন যে? একটি বার আয়, তার পর এসে যা-হয় করিস্‌? এমনি তাঁর পণ—হাত-মুখ ধোবার জল আর কেউ দিলে হবে না।"

সন্ধ্যা নিশ্চিন্ত ভাবেই কহিল, "আর হয়ে এসেছে মা! এইবার বিছানাটা ছড়িয়ে দিলেই হয়। তুমি চলো—"

শয্যার বাহুল্য ছিল না। একটি মাদুর, একটি বালিশ—তাহাই পরিপাটি করিয়া পাতিয়া দিয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল।

গুরুদেব!—তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন তিনি কড়া মহাজনের মতই আদায় করিয়া যাব

অহবিলে রাখিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, দিব্যকান্তি, শুভ্রকেশ, সব চেয়ে তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি-মহিমা অতি-বড় সংসারীকেও চমক লাগাইয়া দেয়। তাঁহার দিকে একটি বার চক্ষুপাত করিলে দৃষ্টি যেন আর ফিরানো যায় না—ওই সংসার-বিবাগী মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গে এমনিই এক তীব্র আকর্ষণ!

বড়মা'র গৃহ হইতে বাহির হইয়াই সন্ধ্যা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিল, আসিয়া দেখিল—গুরুদেব আনমনে পায়চারি করিতেছেন এবং পলকে-পলকে যেন তাঁহার মুখ-চোখ দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা উথলিয়া পড়িতেছে। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবারণ ও সরস্বতী। সন্ধ্যাকে দেখিয়াই নিবারণ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "টেলিগ্রাফ করে গুরু আনিয়ে এই রকম তাঁর অপমান করা—"

সরস্বতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "যা, যা—শীগ্‌গির গাড়ু-গামছা নিয়ে আয়—"

সন্ধ্যা গুরুদেবকে একটা প্রণাম করিয়াই যেমন পশ্চাৎ ফিরিবে, গুরুদেব কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়াও!" বলিয়াই সন্ধ্যার নিকট সরিয়া আসিয়া তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতৃদেব তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন! আমার সেবা অবহেলা করে তুমি অন্য এক জনের সেবায় এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে—এ কথা সত্য?"

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল—"হ্যাঁ।"

"কে তিনি?"

সন্ধ্যা চুপ করিয়া রহিল।

নিবারণ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "বলো না—আমার সাত-পুরুষের বড়মা!"

গুরুদেব একবার নিবারণের দিকে তাকাইয়াই সন্ধ্যাকে কহিলেন, "জবাব দাও—"

সন্ধ্যা প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "উনি আমার কেউ-ই নন।"

"না, না—না! তা' নয়!" দ্রুত কণ্ঠে কথাগুলা বলিতে বলিতে সহসা ভাঁটু প্রবেশ করিল এবং সটান গুরুদেবের কাছে গিয়া যেন বাজি রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "স্যার! আসল কথাটা ও ঢাকছে! 'বড়মা' ওর মাকে মা, বাপ্‌কে বাপ্‌!"

ছেলেটির এই আকস্মিক আবির্ভাবে গুরুদেবের যেন একটু চমক লাগিল। প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি?"

ভাঁটু যেন বিশ্ব-প্রকৃতির সন্তান—স্বচ্ছ, সবল, স্বচ্ছন্দ! তার মনে কোন বিকারও নাই, দ্বিধা-সঙ্কোচও নাই। কহিল, "আমি?—আমি সন্ধ্যার ভাই।"

গুরুদেব ছেলেটির মুখের দিকে এক পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি ত স্যার' নই—আমাকে 'স্যার' বোলে ডেকো না।"

"তবে?"

"বন্ধু!"

"গ্র্যাণ্ড!"—ভাঁটু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু যেন দমিয়া গিয়া কহিল, "কিন্তু, এটা যেন কেমন-কেমন ঠেকে। আপনি অত বড় লোক—ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন, লম্বা গোঁফ-দাড়ি, পাকা চুল—আপনাকে 'বন্ধু' বলি কেমন কোরে?"

গুরুদেব কিন্তু দুর্দ্দান্ত লোক। তিনি কোন কথা শুনিবেন না।

ভাঁটু নিরুপায় হইয়া কহিল, "যেমন বয়েই হোক্!—বেশ, তাই বল্‌বো! তা' বল্‌লেই বা—ও-একই কথা! তবে, একটা স্যার—খুড়ি—বন্ধু, বন্ধু! একটা কিন্তু আমাকে 'কন্‌সেশন' দিতে হবে! 'বন্ধু'কে তুমি বলতে হয়, কিন্তু আপনাকে 'তুমি' বলা চল্‌বে না—একটু বড়-সড় গোছের কি না! এই—'আপনি' বল্‌বো!"

গুরুদেব গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তু'মি' বল্‌লেও রাগ করবো না', 'আপনি' বল্‌লেও খুসী হবো না।"

"বয়ে গেল! অমন ঋষির মতন একটা লোক—তাঁকে 'তুমি' বল্‌বো?—'নেভার'!" ভাঁটু সমস্যাটার এই ভাবে একটা এক-তরফা ডিক্রী নিয়াই সন্ধ্যাকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই চালাক হলে কি হবে, বড্‌ডো তুই বোকা! তোর গুরুদেব—এক-জোড়া বাপ-মায়ের সমান—তাঁর কাছে কোনো কথা ঢাক্‌তে আছে? জোর কোরে বল্—'বড়মা আমার সব!"

গুরুদেব তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বীকার করলাম! কিন্তু যিনি গুরু, তাঁকে শিষ্য তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে—এ নিয়মও গুরু-শিষ্যের শাস্ত্রে তো নেই, বন্ধু!"

ভাঁটু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সন্ধ্যা কাউকে কখনো করেছে, যে, আপনাকে করবে?"

সন্ধ্যাও এইবার কথা কহিল। বিনম্র কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ভুল বুঝবেন না, বাবা! অপরাধ আমি কিছু করিনি!" একটু থামিয়াই পুনশ্চ সুরু করিল, "জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি—আপনার আজ পদধূলি পড়েছে, এ সংবাদ পেয়েও আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে আসিনি—সাধারণ নিয়মে এ এক মস্ত অপরাধ—তা' আমি জানি! কিন্তু এই নিয়ম-এর সম্মান রাখবার আমার যো ছিল না যে বাবা! ঠিক ওই সময় বড়মা'র জল খাবার সময়—হয় একটু দুধ, না-হয় একটু সুজি? বুড়ো মানুষ—রাত্রে চোখে দেখতে পান না, হাতে-পায়ে বশ নেই—তাই আমাকেই প্রতিদিন খাইয়ে-ধুইয়ে-শুইয়ে আসতে হয়!"

গুরুদেব সন্ধ্যার প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "গ্রামে আরও তো লোক আছে?"

এক ম্লান হাসি হাসিয়া সন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "আছে। কিন্তু বড়মা—ওঁরা বড্‌ডো গরীব! কেউ যায় না!" পরক্ষণেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "অনেক দেরি হয়ে গেছে! এইবার আমাকে অনুমতি দিন—"

গুরুদেব পিছন ফিরিয়া দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া, পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না। এই অনুমতি, এর অর্থ হচ্ছে—দীক্ষার পূর্ব্বেই শিষ্যকে স্বীকার কোরে নেওয়া? কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার এক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন—"

সন্ধ্যা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুদেবের প্রতি তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধন থাক্‌লে গুরুমন্ত্র নিষ্ফল হয়! অতএব হেতু যাই হোক, যে আকর্ষণে তুমি আজ আবদ্ধ ছিলে, সেই আকর্ষণ ছিন্ন করবে তুমি?"

সন্ধ্যা শিহরিয়া উঠিল।

ভাঁটুও চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "বড়মা'কে ত্যাগ করবে সন্ধ্যা? কি বলছেন আপনি, বন্ধু?"

নিবারণের আনন্দ আর ধরে না। ভঁটুকে ধমক দিয়া বলিয়া দ, "তুই চুপ কর্। গুরুবাক্য—"

গুরুদেব নিবারণের দিকে একবার বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সন্ধ্যাকে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রস্তুত?"

সন্ধ্যা মাটির মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ।"

* * * *

প্রভাত হইতেই দীক্ষার সমারোহ পড়িয়া গেল। গৃহে লোক-জনে ভরিয়া গিয়াছে—গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সকলেই নিমন্ত্রিত।

এদিকে লুচির খোলা, ওদিকে মিষ্টান্নের কড়াই, আর এক দিকে ক্ষীর-দই—মাছের বায়গায় কুকুরের ঝগড়া! সমস্ত মিলিয়া সারা বাড়ীখানাকে যেন এক বিচিত্র উৎসবের উৎকট প্রদর্শনী করিয়া তুলিয়াছে। দীক্ষা-গ্রহণের সময় আসন্ন হইতেই সন্ধ্যা আসন গ্রহণ করিল। যোগাসনে উমা, তাঁহাকে চোখে দেখি নাই, কিন্তু এই পট্টবস্ত্র-পরিহিতা তরুণী তাপসীর সংযম-কঠিন মূর্ত্তির দিকে তাকাইলে মনে হয়, তেত্রিশ কোটি অহঙ্কারী দেবতাকে সায়েস্তা করিবার নিমিত্তই ধরাতলে এই মেয়েটির আবির্ভাব হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয়-সন্তানের হস্তে কুশ দিয়া গুরুদেব কহিলেন, "বলো—'অপবিত্র: পবিত্রো বা'—"

"অপবিত্র:—"

এমন সময়ে বড়মা'র বাড়ীর দিকে সহসা ঢোলের ঘা পড়িল—

সন্ধ্যা চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে ফিরিয়া উৎকর্ণ হইল। গুরুদেব শাসন-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বলো—'পবিত্রো বা'—"

"পবিত্রো—"

পুনরায় ঢোলে জোরে ঘা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তের ন্যায় ভঁটু ছুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাকে বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যা, বাবা বড়মা'কে বার কোরে বাড়ী দখল নিচ্ছেন! শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির—"

যে মানবী-মূর্ত্তিতে সন্ধ্যার এত দিন পরিচয় ছিল, তাহা নিমেষে এক কালী-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই সন্ধ্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যে-দিক্‌টায় শালগ্রাম শিলা, যে-দিক্‌টায় গুরুদেব, সেই দিক্‌টায় একবার নমস্কার করিয়াই তীরের ন্যায় নিক্রান্ত হইয়া গেল! তখন বড়মা'র গৃহাঙ্গনে লোকে লোকারণ্য—কোর্টের নাজির, কোর্টের পেয়াদা, চৌকিদার, দফাদার, আর গ্রাম ভাঙিয়া যত লোক। নিবারণের তাণ্ডব কাণ্ড চলিয়াছে। সে স্বয়ং চৌকিদার লইয়া ঘর হইতে হাঁড়ি-কুড়ি, থালা-পাথর বাটি-ঘটি, ঘুঁটে-কাঠ, মাদুর-বালিশ সমস্ত টানিয়া বাহির করিয়া উঠানে জড় করিতেছে—এইবার ঘরে চাবি দিবে! বড়মা এক পাশে দাঁড়াইয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতেছেন! খসখসে পট্টবস্ত্রখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, সন্ধ্যা তাহা বেড় দিয়া কসিয়া কোমরে জড়াইয়া ঝড়ের ন্যায় উড়িয়া আসিয়া বড়মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তার পর নাজিরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাড়ী আমার, দখল আমি নিজেই নিলাম—" তাহার চোখ দিয়া যেন ঝলকে-ঝলকে অগ্নি নির্গত হইয়া সমগ্র জনতার উপর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার এরূপ মূর্ত্তি গ্রামের লোক আর কোনোও দিন দেখে নাই—সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। নাজির, তিনিও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই মেয়েটিই এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক। তিনি সসম্ভ্রমে সন্ধ্যার নিকট সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আর একটা কাজ বাকী আছে—বাঁশগাড়ি—"

"আপনারা বেরিয়ে যাবেন কি না, বলুন—"

"কি বলছেন আপনি! আপনাকেই তো বাড়ীর দখল দিতে এসেছি! আপনি দরখাস্ত করেছেন—"

"মিথ্যে কথা! দরখাস্ত আমি কোনো দিনই করিনি, দখলও আমি কোনো দিনই চাইনি—"

নাজির বিস্ময়ে সন্ধ্যার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "সে কি? দরখাস্ত আপনি করেননি,—দখল আপনি চাননি?"

সন্ধ্যা তেমনিই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "একবার বলেছি, আবার বল্‌ছি—না।"

অদূরে ঝাঁপানের সঙের ন্যায় নিবারণ দাঁড়াইয়াছিল, নাজির তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দরখাস্তে সই কার?"

এরূপ কাণ্ড যে ঘটিবে, নিবারণ তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। আজ সন্ধ্যা দীক্ষার অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবে, এই সুযোগে কাজ হাঁসিল করিবে, এই স্থির করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সে ওদিক্‌কার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিল। কিন্তু, তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্র পণ্ড হইল দেখিয়া মুখটা সে চুণ করিয়া ফেলিল। কহিল, "ও একই কথা—"

নাজির আইনজ্ঞ লোক। কহিলেন, "তার মানে?"

"সইটা অবশ্য—আমারই।"

"মেয়ের নামে সই করবার আপনার ক্ষমতা আছে—'পাওয়ার অফ এটর্নী'?"

নিবারণ দুই-এক বার কাশিয়া থুতু ফেলিয়া কহিল, "তা নেই-বা-ই বা থাক্‌লো—আমারই তো মেয়ে।"

নাজিরের মুখখানা ক্রোধে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। কহিলেন, "আপনি তা' হলে জাল করেছেন! আপনার কন্যা যদি 'স্টেপ' নেন, আপনার 'প্রসিকিউশন' হতে পারে।" তার পর সন্ধ্যার দিকে ফিরিতেই তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মা! দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ধরে এই কাজই করছি। কিন্তু আজ যা দেখলাম, এমনটি আর কোনো দিন দেখিনি! দেখেছি—ছেলের হাত ধরে মা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, স্ত্রীর হাত ধরে স্বামী বেরিয়ে এসেছে গাছতলায়, মুমূর্ষু বাপ-মাকে বার কোরে এনে বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে সন্তান—এ-ও দেখেছি! দেনদারের সর্ব্বনাশ, তারই নিষ্ঠুর আনন্দে পাওনাদার মেতে উঠেছে, কিন্তু দেনদারকে বাঁচিয়ে সেই আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এমনটি পাওনাদার আর কাউকে দেখিনি! বয়সে তুমি ছোট, নইলে এখখুনি বল্‌তাম—পায়ের ধূলো একটু দাও তো, মা!" বলিয়াই নিজের দলবল লইয়া বাহির হইয়া যাইবেন, দূর হইতে এক সতেজ কণ্ঠস্বর আসিল, "শুধু আপনি নন—আমিও!" বলিতে-বলিতে গুরুদেব দ্রুতপদে ভীড় ঠেলিয়া সরিয়া আসিলেন, তাঁহার মুখে হাসি, চোখে আলোক-ছটা। সন্ধ্যা বাহির হইয়া আসিতেই তিনিও তদনুসরণ করিয়া জনতার পশ্চাতে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সন্ধ্যা ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, আপনি?"

গুরুদেবের মুখে হাসি আজ যেন ফুরাইবে না। কহিলেন, "হাঁ, এলাম—তোমার কাণ্ড দেখতে!" পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সুরু করিলেন, "তোমাকে একটু যাচাই কোরে নিতে চেয়েছিলাম,

মা! কিন্তু, আমিই ঠকলাম। এমন কোরে আমাকে লজ্জা দিতে এ-পর্য্যন্ত কেউ পারেনি—সে-সাহস একা তোমারই হয়েছে!"

সন্ধ্যার মুখটি লজ্জারক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমার মন্ত্র?"

গুরুদেব স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মন্ত্রই তোমাকে দিতে এসেছি! তোমার বড়মা কৈ?" সন্ধ্যা বড়মা'কে দেখাইয়া দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উনিই তোমার ইষ্ট-দেবতা—ওই নামই তোমার মন্ত্র!"

যুগপৎ বিস্ময়ে, আনন্দে ও সংশয়ে সন্ধ্যা গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইতেই গুরুদেব তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "এ ছাড়া তোমার দেহে অন্য নাম তো খাটে না, মা!" একটু থামিয়াই পুনশ্চ সুরু করিলেন, "শিশুর মন, শিশুর প্রকৃতি, শিশুর আগ্রহ—এই সব পরীক্ষা কোরেই ঠিক সেই দিকে তার শিক্ষা সুরু করতে হয়, নইলে পরিচয়ে সে ভবিষ্যৎ-মানুষ হয় না। ঠিক তেমনি ধারা শিষ্যের মন, তার প্রকৃতি, তার আগ্রহ নিয়মের কষ্টিপাথরে ফেলে তার ইষ্টমন্ত্র নির্ণয় করা প্রয়োজন। ভগবান—তিনি এ চান না যে, মানুষ জপ করুক—তাঁর নাম! তিনি চান, তাঁরই রচিত মানুষ জপ করুক—তাঁরই রচনা! শিষ্যের মনের মানুষ ঠিক করাই গুরুর কাজ, এই কাজই আমি করেছি, মা! বেশি কিছু করিনি!"

সন্ধ্যার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে সুরু হইয়াছিল, সহসা সে গুরুদেবের পদতলে ভাঙিয়া পড়িল। গুরুদেব শশব্যস্তে তাহাকে উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাজ আমার ফুরিয়েছে, আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। তোমার ওপর আমার একটা নির্দ্দেশ রইলো, মা!—এই নিকেতন, এই তোমার 'বড়মা'র মন্দির! কিন্তু, অচিরাৎ এর সংস্কার প্রয়োজন। আমি ফিরে গিয়েই তোমাকে অর্থ পাঠিয়ে দেব, সেই অর্থে একটি মন্দির তৈরী করবে, তারই ভেতর প্রতিষ্ঠা করবে—তোমার ওই ইষ্ট-দেবতাকে!"

"টাকা আমি দেব, বাবা!" সহসা নিবারণ ছুটিয়া আসিয়া অতর্কিতে গুরুদেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গুরুদেব তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইতেই, নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুনিরোধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার একটু প্রায়শ্চিত্তের অনুমতি দিন!" আমি পাষণ্ড—আমার সাজানো সংসারে আমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছি! নেবাবার একটু জল, এই ভিক্ষা আমাকে দিতেই হবে, বাবা!"

গুরুদেব একটু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "তথাস্তু—" আর দাঁড়ালেন না।

অতঃপর যে কৃষ্ণ যবনিকা এত দিন ধরিয়া পাশাপাশি এই দুই প্রতিবাসীর মাঝখানে পড়িয়াছিল, তাহা কালের বুঝি বা এক অবশ্যম্ভাবী নির্দ্দেশে নিমেষে উন্মোচিত হইয়া গেল! নিবারণের উৎসাহ দেখে কে! পরদিন প্রভাতেই সংস্কার-কার্য্য সুরু হইয়া গেল। জীর্ণ মাটির ঘর, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া সন্ধ্যার পরিকল্পনায় সেখানে অচিরেই রূপ পাইল এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—ছবির ন্যায় একখানি গৃহ, মন্দিরের আকারে—তাহার চতুষ্পার্শে ফল-ফুলের বাগান। সেই নিকেতনে যেন নূতন করিয়াই প্রতিষ্ঠিতা হইলেন 'বড়মা'। যাঁর পদমূলে বসিয়া রহিল সন্ধ্যা, যেন তার খেয়ালি মন মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনায় সিদ্ধিলাভ করিবেই করিবে! কিন্তু, মলিন—সে যদি একটি বার চক্ষে দেখিত!

[ক্রমশঃ

আমরা ও পৃথিবী

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমাদের বয়সে বয়সে পৃথিবী প্রাচীন
হয়, আমাদেরি জাত রসে কখনো রঙীন

কখনো সে উদাসীন সূর্যচক্রপথে
কখনো বা শিশু-চোখে কী জানি কী মতে
নির্বিবাদী সমসঙ্গী সে হয়ে দাঁড়ায়
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে হৈমন্তী তন্দ্রায়
তবু কিছু অকাল অশ্রুতে
অজস্র কালের জ্বালা কোথাকার সবখুতে
মন ধুতে চায়—কিংবা নির্জীব কোনো সব ফেলে-ছুড়ে
চলে যেতে বৈরাগী বাউলের সুরে

থমকে দাঁড়ায় না কো—আর এক শক্ত মন
আক্রোশে কোলে প্রতিহিংসুক সে খোঁজে ইন্ধন
হয়তো তখনি কোন মোলায়েম গদীতে
কে ঘুমকে গালি পাড়ে—রক্তপ্রভু এ নিশীথে
সে দেখি সার্থক জীবন পৃথিবী ধন্য
এ চোখে বঞ্চিত যে সে নেহাৎ বন্য
তাই আমি নিশ্চুপ আমাদের সভ্যতায়
আমাদের মতবাদের ক্রমোন্নত তীক্ষ্ণতায়

আমরা পৃথিবী আর আমাদের হাবে-ভাবে
যে দিন চলে গেছে সে যেমন ছিল
আজো যা আছে তা তেমনি যাবে।

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৬

শ্রীনগরে বার্ষিক বারোয়ারী উৎসবটির দিন ঘনিয়ে আসায় এই সময় উদ্যোক্তাদের ঘন ঘন মিটিং-এর সংগে রীতিমত উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে। উৎসব সুরু হবার কয়েক দিন পূর্বে 'বসুমতী' কাগজে ছাপা দু'টো খবর সারা গ্রামখানাকে হঠাৎ হক্‌চকিয়ে দিল। প্রথম খবরটি বিয়োগান্ত—প্রত্যক্ষদর্শী কোন সংবাদদাতা অপমৃত্যুর যে মর্মন্তুদ খবরটি দিয়েছেন, এই গ্রামের সংগে তার সংযোগ থাকাতেই এই চাঞ্চল্য। উক্ত সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ: 'মৃগেন রায় নামে এক যুবা বারাকপুরের নিকট ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। মৃতের জামার পকেটে প্রাপ্ত কাগজ-পত্র হইতে তাহার নাম জানা গিয়াছে যে, সে খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নামক কোন গ্রামের অধিবাসী। এক কীর্ত্তনওয়ালীর সহিত নবদ্বীপ যাইতেছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।'

অপর সংবাদে খুব বিস্তৃত ভাবে বৌরাণীর প্রসিদ্ধ যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত 'ছিন্নমস্তা' নাটকের সমালোচনা সম্পর্কে রচয়িতা মৃগেন রায়ের প্রচুর সুখ্যাতি করা হয়েছে। নদীয়ার মহারাজার সভাপতিত্বে পণ্ডিতমণ্ডলীর মান-পত্র ও উপাধি দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ইত্যাদি।

দু'টি খবর নিয়ে খুবই আলোচনা চলেছে। অপমৃত্যু সংবাদের মৃগেন যে যাদব রায়ের নিরুদ্দিষ্ট ছেলে তাতে কারুর সন্দেহের অবকাশ রইল না। আনন্দোৎসবে দুঃসংবাদটা খুবই মর্মান্তিক হোল। যাদব রায়ের বাড়ীতে কান্নারোল উঠলো, যাদব রায় শয্যা নিলেন।

গ্রাম্য মাতব্বররা বলাবলি করেন: দেখ অদৃষ্টের খেলা! একই নামের এক জন অপঘাতে প্রাণ দিলে, আর এক জন কত যশ পেলে—'ছিন্নমস্তা' পালার কত নাম আজ!

শেষের খবরটাকেও গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে, গ্রামের বারোয়ারীতে বৌরাণীর দলকেই বায়না করা হয়েছে 'ছিন্নমস্তা' পালার সুখ্যাতি শুনে।

গ্রামের সকলেই মৃগেন ছেলেটিকে ভালবাসত; বারোয়ারী উৎসবে সে-ও এক জন উদ্যোক্তা ছিল। অন্যান্য বার তারই নির্দেশ মত যাত্রা-দল বায়না করা হোত। আজ সবাই তার অভাব বোধ করে ব্যথা পেল—ছেলেরা বারোয়ারী-মণ্ডপে একটা শোক-সভাও করল। তবে শোকটা আসন্ন উৎসবের আবর্তে আর স্থায়ী হতে পারল না।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেই পীতাম্বরের বাড়ীতে মায়ার বিয়ের আয়োজন একটা যেন নূতনতম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গ্রামশুদ্ধ সবাই জানত, যাদব রায়ের ছেলে মৃগেনের সঙ্গে হবে পীতাম্বর অধিকারীর মেয়ে মায়ার বিয়ে। মৃগেনের অপমৃত্যু সংবাদটির সংগে সংগেই যে, সারদার ছেলে কানাইয়ের হাতে মায়াকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হবে, সেটা কেউ কল্পনাও বুঝি করেনি। কিন্তু এ বিবাহের ব্যবস্থা না করেও যে উপায় ছিল না—কে তা বুঝবে! একান্ত অসহায় ও নিরুপায় হয়েই গোকুলকেও এ-বিবাহে মত দিতে হয়েছে; আর, রুগ্ন মৃতকল্প সর্বস্বান্ত ভাইয়ের জীবন এবং এই সংসারটির ভবিষ্যৎ ভেবে মায়াও এই বিবাহের নামে মর্মচ্ছেদী যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় নিজের মাথাটি গলিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। সরস্বতী পূজার পর যে লোকের ফেরবার কথা প্রচুর অর্থ নিয়ে,—সে স্থলে প্রায় দেড় মাস অতীত হয়েছে, পীতাম্বরের আসা ত দূরের কথা, কোন খবর পর্যন্ত তাঁর পাওয়া যায়নি। চিঠির জবাব না পেয়ে পরেশ পালের নামে জবাবী কার্ডে যে চিঠি লেখা হয়েছিল, পরেশ পাল খুব সংক্ষেপে তাতে লিখে জানিয়েছে যে, সরস্বতী পূজোর আগের দিন ঝগড়া করে অধিকারী এখান থেকে চলে গেছে। তার পরের খবর সে জানে না।

এর পর অভাবের তাড়নায় দুঃখ চরম হয়ে দাঁড়ায়, তার ওপর সারদার তাগাদা। যে ভাইকে মহাজন সাজিয়ে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছিল সারদা—সে ভাই এখন বোনের ইসারায় কঠোর তাগাদায় বাড়ী মাথায় করে তুলেছে। ভাবনায়-চিন্তায় গোকুল আকুল হয়ে যখন ভাবতে থাকে—মৃত্যু ছাড়া আর মুক্তি নেই; ঠিক সেই সময় অতুল এসে ক্রমাগতই কাণে মন্ত্র দিতে থাকে—মায়া মনে করলেই ত সব গোল মিটে যায়, কোন ভাবনাই থাকে না।

কথাটার অর্থ বেশ বুঝেও গোকুল মৌন থাকত প্রথম প্রথম—কথাটার উপযুক্ত উত্তর তার কণ্ঠে এলেও ভগ্ন দেহে সামর্থের অভাবে প্রয়োগ করতে পারত না। এর পর যখন মৃগেনের অপমৃত্যুর খবর এলো, তখন অতুল বললো: আর কেন, যার আশায় ছিলে সেই যখন গেল, আর মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কাজ কি? বাপের ভিটে যদি নিলেমে ওঠে-ভাই ভাজ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়, না খেয়ে মরে—মায়া কি তাতে খুসি হবে?

গোকুল তথাপি গুম হয়ে থাকে—কোন উত্তর দেয় না। মায়াকেও বিনিয়ে বিনিয়ে অতুল কথাটা শোনায়। এর পর মায়া আর কি করতে পারে? মৃগেনের অপমৃত্যুর খবর যদিও সে ঠিকমত বিশ্বাস করেনি, তবুও কত বড় ঘা যে সে পেয়েছে, কী ভীষণ যাতনা যে মুখ বুজে সে সহ্য করেছে, অন্তর্যামী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কে তা বুঝবে? যিনি বুঝতেন—সেই স্নেহময় বাবা আজ কোথায়? বেঁচে আছেন কি না কে জানে! অগত্যা এক দিন জোর করে বুকে শক্তি এনে মুখখানা শক্ত ক'রে সে অতুলকেই বললে: আমি রাজী হলে যদি সব দিক্ রক্ষা হয়, আমি মত দিচ্ছি, তুমি যা করবার, কর ছোড়দা!

ছোড়দা এই কথাটি শোনবার প্রত্যাশা করেই প্রসাদী ও সারদার ইসারাতে এত দিন কল-কাটি ঘোরাচ্ছিল; সে আশা পূর্ণ হতেই পারিপার্শ্বিক হাওয়া যেন যাদুমন্ত্রের মত বদলে গেল। যারা কড়া তাগাদায় বাড়ীর উঠান পর্যন্ত দমিয়ে দিয়েছিল, এখন তাদের আলাদা মূর্ত্তি—দাতা ও বন্ধুরূপে নূতন সুর তুলেছে। গোকুল অবস্থাটা উপলব্ধি করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। করুণা আঁচলে চোখ-মুখ চেপে নীরবে কাঁদে। প্রসাদীই এখন এ শুভকর্মে সর্বময়ী কর্ত্রী—অতুল তার আঁচল ধরে বেড়াচ্ছে। সংসার এখন তাদের হাতে, অর্থাৎ রিক্ত সংসারটি হাতে নিয়ে তারাই করেছে পূর্ণ।

করুণা মুখখানি ম্লান করে ভাবে : সেই দারুণ অভাব, সদা নেই-নেই—সে-ও বুঝি অনেক ভালো ছিল এর চেয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে ও-পক্ষের কাবলেওলার চেয়েও চড়া তাগাদা, রুগ্ন স্বামীর অসহায় অবস্থা মনে পড়লেই সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, ভয়ে সে চোখ বুজায় ; কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি কোথায় ? অমনি যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ার ম্লান মুখখানি ! বুকের ওপর কে যেন অদৃশ্য হাতে হাতুড়ির ঘা দেয়। ও ! নিজেদের নিষ্কৃতির জন্যে হাস্যময়ী নির্ম্মল কমলিনীর উপরে কী নির্ম্মম ব্যবহার করতে হয়েছে আজ ! কিন্তু কি করতে পারে এখানে অভাগিনী করুণা—তার অক্ষম সামর্থহীন রুগ্ন স্বামী ? ভাই শত্রু, ভাজ শত্রু, চার দিকে শত্রু,—অথচ এই শত্রুরাই আজ দরদী হয়ে তার সংসারের উপর কর্ত্তৃত্ব করছে, জানাতে চাইছে—কি উপকারই করছে অসময়ে ! কিন্তু অবস্থার ফেরে আজ এদের মাথা তোলবারও শক্তি নেই, ‘না’ বলতে ভাষা বার হয় না মুখ দিয়ে—সবই সইতে হচ্ছে ! ও, ভগবান ! এ কি সাংঘাতিক অবস্থায় ফেললে !

এই সঙ্গীন অবস্থার মুখে উৎসব-মত্ত পল্লীকে সচকিত এবং আনন্দ-নিরানন্দে দিশেহারা বাড়ীখানাকে চমৎকৃত করে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হোলেন গৃহস্বামী পীতাম্বর। প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতেই পারেনি ; আর চিনবেই বা কেমন করে ? দামী জামা-কাপড় প’রে বাবু সেজে হাওয়া-গাড়ী চড়ে দরিদ্র শিল্পী পীতাম্বর অধিকারী যে গ্রামে আসবে, কেউ কি এটা কোন দিন ভাবতে পেরেছিল ?

এখানে বলা আবশ্যক—সেই সাহেব বারাকপুরে গভীর রাতে পৌঁছেও পীতাম্বরকে ছেড়ে দেননি, সাদরে এক সুন্দর কুঠিতে নিয়ে যান। হিন্দু বেয়ারাকে দিয়ে সেই গভীর রাত্রেই দোকান খুলিয়ে খাবার আনিয়ে তাঁকে খাওয়ান। তার আগেই আসবার সময় দীর্ঘপথে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিলেন সেই সদাশয় সাহেব। খাবার পর নতুন ক্যাম্প খাটে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলেন : মত ডরো মিঃ অডিকাড়ী—কল্য টুমি গরে যাইবে—আমি বন্দোবষ্ট কড়িয়া ডিবে।

তখনো কি পীতাম্বর জেনেছিলেন যে, সাহেব জেলার কলেক্টর !···পরদিন সকালে সামান্য একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে পীতাম্বরের অদৃষ্ট-দেবতা নতুনরূপে দেখা দিলেন যেন। খুব ভোরেই পীতাম্বরের ওঠা অভ্যাস ছিল, সেদিনও উঠেছিলেন তিনি। ভোরের আলোয় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দরদালানে কতকগুলি মূর্ত্তি এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। দেখেই তাঁর শিল্পী-মনটিও বুঝি কি এক গভীর বেদনায় টন-টন করে উঠল ; শিল্পীর হাতে গড়া জিনিসগুলির প্রতি এতখানি অশ্রদ্ধা তিনি সহ্য করতে পারলেন না—সব ভুলে গিয়ে অন্তরের দরদ দিয়ে মূর্ত্তিগুলিকে নিয়ে পড়লেন পীতাম্বর। কতক্ষণ সেই কাজে লিপ্ত আছেন খেয়াল নেই তাঁর, হুঁস হোল পিছন থেকে সাহেবের পূর্ব-রাত্রের সেই অশুদ্ধ অথচ মিষ্ট কণ্ঠস্বরে। কোন প্রদর্শনীর ব্যাপারে সাহেব নিজেই এই মূর্ত্তিগুলি আনিয়েছিলেন—এদের আদর্শে নূতন মূর্ত্তি গড়িয়ে কতকগুলি পৌরাণিকও ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রকীর্ণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পীতাম্বরের পিছনে দাঁড়িয়ে সাহেব কৌতুহলী হয়েই তাঁর কাজ দেখছিলেন ; ক্রমে কৌতুহল শ্রদ্ধায় পরিণত হোল। এই শিল্পটির প্রতি পক্ষপাত থেকেই সাহেব অন্ন-বিত্তর অনুরক্ত ছিলেন—কর্ম্মরত পীতাম্বরকে এক-নজরে দেখেই তিনি তাঁর শিল্পি-মনের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর সযত্ন সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলির আদর্শ তাঁরই নির্দ্দেশে কতিপয় শিল্পী নিয়ে গেছেন, কিন্তু মূর্ত্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে স্থাপিত করার দিকে কেউই মনোযোগী হননি।

সাহেব ডাকলেন : মিঃ অডিকাড়ি ?

পীতাম্বর সাহেবকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, কুণ্ঠিত ভাবে বলতে লাগলেন : এগুলো যাচ্ছেতাই করে রেখেছে দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি হুজুর, যেখানে যেটি থাকা দরকার, তেমনি করে রেখিছি।

সাহেব বুঝলেন, তাঁর পরিচারকদের কাছেই পীতাম্বর জানতে পেরেছেন যে তিনি জেলার হাকিম। মৃদু হেসে বললেন : আপনকার সহিত আলাপ কড়িয়া আমি কাল জানিয়াছিল যে আপনি শিল্পী আছেন, এখন টাহা প্রট্যয় হইল। এবং জানিল যে আপনি বাষ্টব শিল্পী born artist হইটেছেন।

পীতাম্বর বললেন : হুজুর, আমরা হচ্ছি কারিকর, দরদ দিয়ে মূর্ত্তি গড়ি, মনে করি—তারও প্রাণ আছে। তাই যখন দেখলাম—কোনোটার মাথা নিচু হয়ে আছে—পা দু’টো ওপরে, কোনোটা বা হেলে পড়েছে, কেউ উপুড় হয়ে আছে—দেখেই শিউরে উঠি হুজুর, মনে হোল, বুঝি আমার মাথাটাই কেউ নিচে রেখে পা দুটো শূন্যে তুলে দিয়েছে !

সাহেব বললেন : আমি এক পুষ্টক মধ্যে আপনকার বাক্য পাঠ করিয়াছে। এক পণ্ডিত মনুষ্য যেখন ডেখিল টাহার লাইব্রেরীর কেটাব সকল ঐ মূর্তি সকলকার ন্যায় ডিজ্-অর্ডার হইয়া রহিয়াছে, টিনি অনুভব করিল যেন কোন দুর্দ্দান্ত আডমি টিনিকে বন্ধন্ কড়িয়া মষ্টক নিম্নে নটো কড়িয়া ডিল।

এর পর সাহেব তাঁকে ড্রয়িং-রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আরো কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করে পূর্ববৎ বিকৃত বাঙলা ভাষায় যা বললেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে : বড়লাট বাহাদুরের উদ্যোগে শীগ্‌গির একটা খুব বড় একজিবিসন খোলা হবে। কলেক্টর সাহেব সেই সম্পর্কে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। অনেক রকমের অনেক মূর্ত্তি গড়ানো হবে। সাহেব এক-নজরেই পীতাম্বরকে দেখেই চিনে নিয়েছেন। এর ভার তিনি তাঁরই ওপর দিতে চান। তিনি বিভাগীয় অফিসারকে ডেকে এখুনি তার ব্যবস্থা করবেন। পীতাম্বরের সব কথাই সাহেব পথে শুনে জেনেছিলেন তার টাকার এখন খুব দরকার। সাহেব তারও ব্যবস্থা করে দেবেন।

ব্যবস্থা করতে বিলম্ব হয়নি। অফিসারকে আনিয়ে সাহেব একটা চুক্তিপত্র লিখিয়ে নেন। পীতাম্বরকে সাতশো টাকা তখনি আগাম দেওয়া হয়। সাহেব তাঁর কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ করেননি। চাপরাশিকে দিয়ে বাজার থেকে ভাল জামা-কাপড় আনিয়ে বাবু সাজিয়ে মোটর গাড়ী করে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। কথা স্থির হয়েছে যে, মেয়ের বিয়ে দিয়েই পীতাম্বর বারাকপুরে গিয়ে কাজের ভার নেবেন। এই ভাবে ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের সংগেই পীতাম্বরের চেহারারও আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পীতাম্বরকে দেখে মায়া ডুকরে কেঁদে উঠল : বাবা, তুমি সত্যিই এলে !···যে কান্না এত দিন চেপে রেখেছিল, আজ আর বাধা মানল

না। সাড়া পেয়ে টলতে টলতে গোকুল এসে বসে পড়লো দাওয়ার ধারে। তারও চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। গোকুলকে দেখেই পীতাম্বর বললেন: য়্যাঁ, এ কি চেহারা তোর হয়েছে যে গোকুলো! বলেই নিশ্বাস ফেললেন জোরে। করুণা ছুটে এসে হেঁট হয়ে শ্বশুরের পায়ে গড় করে উঠানেই একটা মোড়া পেতে দিল। পীতাম্বর যেই মোড়াটির উপর সোজা হয়ে বসেছেন, অমনি অতুলের ঘর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। চমকে উঠে পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন: ও কি, শাঁখ বাজে কেন রে? ব্যাপার কি!···মায়া আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোকুল মুখ ফিরিয়ে নিল। করুণা চোখে আঁচল দিল। অবাক্ হয়ে তিন জনের মুখের পানে তাকিয়ে পীতাম্বর বলে: তোরা সবাই যে কাঁদতে শুরু করে দিলি! কেউ ত বললিনি, শাঁখ বাজল কেন?

অতুল ছুটে এসে প্রশ্নের উত্তর দিল: মায়ার যে বিয়ে হচ্ছে কাল, আজ অধিবাস কি না···ও-বাড়ী থেকে শুভকর্মের জিনিস-পত্তর এলো এই মাত্তর। ভালোই হোল, তুমি এসে পড়েছ—

সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদীও ছুটে এসে শ্বশুরকে গড় করে স্বামীকে একটা ইসারা করলো। সেই সংগে অতুল পীতাম্বরকে বলল: চল না, জিনিসগুলো দেখবে।

মায়ার বিয়ের কথা শুনেই পীতাম্বর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে যেন, অবস্থাটা কতক বুঝতে পেরে মুখখানা তুলে অতুলের পানে চেয়ে বললেন: মায়ার বিয়ে! শুভকর্মের জিনিস এল? ও, তাই গোকুল মুখ ফিরিয়ে বসেছে, বড় বউ-মা চোখে আঁচল দিয়েছেন, মায়া অঝোরে কাঁদছে, আর তোদের দু'জনের মুখে দেখছি হাসি আর ধরছে না! বাড়ীতে যেন একসঙ্গে আলো-ছায়ার খেলা চলেছে—ব্যাপারখানা খুলেই বল না রে অতুলো—তোর মুখেই শুনি; কার সনে মায়ার বিয়ে দিচ্ছিস্ তোরা?

মুখখানা শক্ত করে অতুল বলল: কেন, কানায়ের সঙ্গে।

পীতাম্বর বললেন: বটে! ও, তাই ওদের চোখে জল, আর তোদের মুখে হাসি! মায়ার বে; অথচ, আমি কিছুই জানলুম না!

অতুল: জানবে কি করে? ছিলে কোথায় ম্যাদ্দিন? জানো, সর্বস্ব বিকিয়ে যাবার যো হয়েছিল,—বাড়ী-জমি বাঁধা দিয়েছিলে মনে নেই? সুদে-আসলে এক-কাঁড়ি হোয়েছিল—গলা পর্য্যন্ত ডুবেছিলুম—

পীতাম্বর: না হয় মাথা পর্যন্তই ডুবতিস্,—কিন্তু কানায়ের সঙ্গে মায়ার বিয়ে দিলেই কি উদ্ধার পাবি ভেবেছিস্?

অতুল: পাবোই তো, আমাদের মহাজন নবীন সমদ্দার যে কানায়ের মামা, তা ত জানতে না? আসলে টাকাটা হচ্ছে কানায়ের মা'র—বিয়ে হলে সব ছেড়ে দেবে বলেছে।

পীতাম্বর: তাই বল্, মায়াকে বেচবার মন করেছিস্! বোনকে বেচে বাঁচতে চাস্—এই ত? ও!···এত দূর···

এই সময় পা টিপে-টিপে কানায়ের মা সারদা সামনে এসে দাঁড়াল; মুখখানা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল: এই যে বেই, কেমন আছেন? ভালো হোল এসে পড়েছেন! দেখুন না কাণ্ড—কোথায় মিগেনের সংগে মেয়ের তোমার বিয়ে হবে, তা সে হতভাগা ত অপঘাতে মরে আমাদেরও মেরে গেল—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পীতাম্বর সোজা হয়ে বসলেন, সংগে সংগে বলে উঠলেন: কি বললে কানায়ের মা? মিগেন···আমাদের মৃগ···

সারদা: হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মিরগো—রেলগাড়ী চাপা পড়ে মরেছে না···

পীতাম্বর: য়্যাঁ, মৃগেন মারা গেছে?

মায়া এবার ডুগ্‌রে কেঁদে উঠলো।···কথাটা উঠতেই প্রসাদী চট করে সরে গিয়েছিল—এই সময় 'বসুমতী' কাগজখানা এনে অতুলের হাতে দিল। অতুল খবরটা এক-নিশ্বাসে পড়ে গেল—সংবাদদাতার নামটি পর্য্যন্ত।

মনে মনে কৌতুক বোধ করে পীতাম্বর বললেন: ভারি তাজ্জব ত! এই সে দিনও তার সংগে যে আমার দেখা রে?

মায়া সর্বাগ্রে ধড়মড় করে আরো সোজা হয়ে দাঁড়ালো—এতক্ষণ খুঁটিটি ধরে কোন রকমে যেন্ আধা-ভাঙ্গা হয়ে খাড়া ছিল সে।

পীতাম্বর বলে চললেন—ওরে, আমি ত মরেই যেতুম মৃগেন না থাকলে। পথে মুখ থুবড়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ মৃগ এলো দেবদূতের মতন সেখানে; তুলে নিয়ে গেল তার বাসায়। পাকা বাড়ী, খাসা ব্যবস্থা, তোফা বিছানা, ভালো-ভালো জামা-কাপড়, কি খাইদায়ের ঘটা, বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা···ওরে, কি তোয়াজই করছিল আমায়—

গোকুলও এতক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে—উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—বলছ কি বাবা, মৃগ—আমাদের মৃগেন?

পীতাম্বর: হ্যাঁ হ্যাঁ—বললে, চাকরীর সন্ধানে এসেছি। তার পরে হোল কি—বেশ সেরে উঠিছি তখন, দেখলুম, একটা মেয়ে এসে—রাজকন্তের মতন সে মেয়ের রূপ—কত গয়না-গাঁটি গায়ে—গাড়ী করে এলো, এসেই মৃগেনের হাত ধরে নিয়ে তুললো গাড়ীতে—ওপরের ঘরে দাঁড়িয়ে দেখলুম আমি—মাথাটা ঘুরে গেলো—মনে হোল, চোখ দু'টো সেই মেয়েটা যেন গেলে দিয়ে গেলো! তার পরই ত তখুনি সেই দণ্ডেই সেখান থেকে চলে আসি রে!

পীতাম্বরের মুখের পানে ঠায় তাকিয়ে তাঁর কথাগুলি সারদা শুনছিল, এই সময় বলে উঠল: তাহলে ত ঠিকই মিলে যাচ্ছে—ঐ হারামজাদীই তাহলে সেই খেমটাউলী ছুঁড়ি—

অতুলও সোৎসাহে বলল: সারদা দিদি ঠিক বলেছে—আমারো মনে হচ্ছে, এর পরেই ঐ অপঘাত ঘটেছে—

মুখখানা শক্ত করে পীতাম্বর বললেন: না না, সে হতে পারে না, ও-খবর মিছে।

অতুল: মিছে বললেই হোল, কাগজে ছেপেছে—

পীতাম্বর: ও অমন ছাপে। মনে নেই—সে বছর রাঘব দারোগার মরার খবর কাগজে ছেপেছিল। তা নিয়ে কি হৈ-চৈ; তার পর, দেশ থেকে রাঘব দারোগা সশরীরে এসে হাজির! এ-ও ঠিক তাই—এতে মৃগর পরমায়ু বেড়েছে।

আরো প্রতিবাদ উঠতে পীতাম্বর বললেন: ভাল কথা, কাগজ-খানা কোন তারিখের দেখ ত?

অতুল কাগজখানা খুলে তারিখ দেখে বললো: ২৭শে মাঘ, শনিবার।

পীতাম্বর: আর ৫ই ফাল্গুন বুধবার ওর সঙ্গে ছ মাস ছাড়াছাড়ি। তাহলে কি করে এ খবর সত্যি হবে? এ কোনো দুষ্টু লোকের কাজ।

অতুল ও প্রসাদীর উৎসাহ দমে গেলেও সারদা হাল ছাড়ল না, সে বলল: তবে বাপু হক কথা বলি; ও-খবর মিছেও যদি হয়, ওকে মরার সামিল বলেই ধরে নেওয়া উচিত। অমন ছেলে বেঁচে থাকলেই বা কি—গেরামে যখন আর মুখ দেখাতে পারবে না। সমাজ ত ওর মুখও দেখবে না—যে একটা বেহুস্তে খেমটাউলীকে নিয়ে…

মুখখানা বিকৃত করে পীতাম্বর বললেন: থামো বাপু, থামো; এখন বেশ সব খোলসা হয়ে আসছে…অতুলো বললে যে, আমাদের মহাজন নবীন সমদ্দার হচ্ছে কানায়ের মামা…আর ঐ সমদ্দারই আমাকে চিঠিতে ঐ খেমটাউলীর কথা লেখে! সে না কি বারাকপুর ইষ্টিসানে মৃগের সঙ্গে খেমটাউলীকে দেখেছে। আচ্ছা বাপু, বল ত—টাকার তাগাদা করতে বসে এ খবরটা আমাকে দেবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল ঐ সমদ্দারের?

অতুল বলল: তাহলে কি তুমি বলতে চাও—ও'র খবরটা মিছে? তবে বলি, তোমার কথাই যে সত্যি, তা মানবো কি করে? তুমিও ত নিজের মুখে এই মাত্র বললে—গয়না-গাঁটি পরা একটা সুন্দরী মেয়ে এসে মৃগর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুলেছে…তুমি স্বচক্ষে দেখেছ, আর তাই দেখেই চলে এসেছ? তবে?

ছেলের মুখে এ কথা শুনে পীতাম্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাই ত, এ প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দেবেন? নিজের মুখের কথাই যে তাঁর এ কথার বিরুদ্ধে চলেছে।

সারদা শ্লেষের সুরে বলে উঠল: আহা—থামো না বাপু, কেন আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ! এসেছেন তেতে-পুড়ে, আগে জিরোতে দাও, মাথাটা ঠাণ্ডা হোক, তখন সবই বুঝবেন! এখন এদিক্কার কাজ…

এই কি পীতাম্বর অধিকারী মশায়ের বাড়ী?

বলতে বলতে উঠানে এসে দাঁড়ালো সীতা। তার পিছনে অশোক চৌধুরী, আর উর্দীপরা এক গুর্খা সিপাহী—কোমরে কুকরি বাঁধা, মাথায় মিলিটারী টুপী, চাপরাসে লেখা রয়েছে—এষ্টেট রৌরাণী চৌধুরাণী।

সীতাকে দেখেই পীতাম্বর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তার পর বড় বড় দু'টো চোখের দৃষ্টি একই ভাবে নিবদ্ধ রেখে সোৎসাহে বললেন: এই যে! হ্যাঁ…এই ত সেই মেয়েটি…এরই হাত ধরে মৃগেন—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই সীতা বলল: আর আপনি বুঝি তাই দেখেই আমাকে আপনার মহাজন নবীন সমদ্দারের উড়ো চিঠির খেমটাউলী মনে করে তখুনি মৃগেন বাবুর বাসা ছেড়ে পালিয়ে এলেন? আমি কে, কেন গিয়েছিলুম, কেন তাকে ডেকে নিয়ে গেলুম অত তাড়াতাড়ি—সে সব জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করেননি?

অপ্রস্তুতের মতন মুখখানার এক বিমূঢ় ভংগি করে পীতাম্বর বললেন: ঠিক, ঠিক, মস্ত ভুলই আমার হয়েছিল তখন। পথের মানুষকে তুলে যে সারালে, অত তোয়াজ করলে, আমি তাকে কিছু না বলেই—

সীতার মুখ তখন খুলে গেছে; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলতে লাগল: জানেন, আপনার জন্যই তিনি সৌভাগ্যের সাদর আহ্বানকেও গ্রাহ্য করেননি। আপনাকে জানাননি যে—তিনিই 'ছিন্নমস্তা' পালার নাট্যকার। তাঁর খ্যাতি লোকের মুখে ধরে না। তাঁকে মানপত্র দেওয়া হবে—এই খবর দেবার জন্যে আমি তাঁর বাসায় যাই—জোর করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই। মৃগেন বাবু আমার ভাই, তাঁর সৌভাগ্যে সুখী হয়ে ছোট বোনটির মতনই আমি তাঁর হাত ধরেছিলুম।

মায়া টলতে টলতে সীতার সামনে এসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল: আপনি যেই হোন, শুধু বলুন…তিনি…তিনি তাহলে …সত্যি সত্যিই…উদ্গত অশ্রুর আবেগে মায়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

সীতা তার মুখখানা তুলে ধরে সস্নেহে বলল: বুঝতে পেরেছি, তুমিই মায়া। কিন্তু শোনা কথায় ত দাম নেই ভাই…নিজের চোখেই তাঁকে এখুনি দেখতে পাবে। আমরা যে মৃগেন বাবুকেও ধরে এনেছি। তিনি তাঁর বাবার সংগে আসছেন। সেখানেই যে শুনেছি—আজ তোমার অধিবাস; তাই…

তার পর পীতাম্বরের দিকে ফিরে বলল: আপনার মহাজন সমদ্দার মশায়ের চিঠিখানাও রাগ করে ফেলে এসেছিলেন। তা থেকেই সব জানতে পেরেছি, আর সে চিঠিখানাও এনেছি। কিন্তু সমদ্দার কোথায়? তাকে ত দেখছি নে?

সারদা এই সময় এগিয়ে এসে চড়া সুরে বলল: তাহলে শোন বলি বাছা, সে যখন মহাজন—মহাজনের মতনই আসবে গামছা নিয়ে—ঐ জোচ্চোর মিনসের গলায় দিয়ে…

মুখে এক-ফালি হাসির তীক্ষ্ণ ঝিলিক তুলে সীতা বলল: দেনার ভয় দেখাচ্ছেন ত? বুঝেছি, আপনি কানায়ের মা। বলি, তাহলে শীগ্‌গির যান—তাঁকে বলুন গে, সেই গামছায় বেঁধে যেন দলিলখানাও নিয়ে আসেন—জানেন, মৃগেন বাবুর এখন আয় কত? একখানা পালা লিখে কত টাকা পেয়েছেন? দেনার টাকা আগেই তিনি তুলে রেখেছেন।

পীতাম্বর নীরবেই সীতার কথা শুনছিলেন। এখন সংযত কণ্ঠে বললেন: তার আবশ্যক হবে না মা-লক্ষ্মী! জামায়ের টাকায় দেনা শোধবার লজ্জা থেকে লজ্জা-নিবারণী মা আমাকে বাঁচিয়েছেন। যাঁর প্রতিমা গড়ি—তিনিই রেখেছেন মুখ। ওগো কানায়ের মা। খতখানা শীগ্‌গির আনো—আমার এই মা-লক্ষ্মী যা বললেন—

এখন শেষের অস্ত্রটি নিক্ষেপ করল সারদা; তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে বলল: খেমটাউলী ত মা-লক্ষ্মী হলো দেখছি! তা এই মা-লক্ষ্মীটি কে শুনি? ভাটপাড়ার কোন্ মা-ঠাকরুণ ইনি গো?

সারদার এ প্রশ্নের উত্তর করল, অশোক চৌধুরী। এ পর্যন্ত কোন কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সারদার কথাটি ইটের মত পড়তেই সেও তৎক্ষণাৎ পাটকেলটি প্রয়োগ করে বসল। মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বলল: আমার মুখেই শুনুন না বলি—ঠাকুরুণটির পরিচয় পেলে মনের ঝাঁঝটুকু কমে যাবে নিশ্চয়ই! রৌরাণীর নাম শুনেছেন ত? এই পরগণার বারো আনার মালিক তিনি—এখানকার জমিদারীর মালিকানা স্বত্বেও তাঁর হিস্যা আছে—ইনি তাঁরই কন্যে, বুঝলেন?

জোঁকের মুখে যেন নুণ পড়ল। অশোক চৌধুরীর কথাগুলো যে সক্রিয়, সারদার পরবর্তী অবস্থা থেকেই সেটি বুঝা গেল। মৃদু

মুখখানা তখন ছায়ের মত বিবর্ণ হয়েছে, দুই চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেছে। সারদা শুনেছিল, শ্রীপুর এষ্টেটের বড় সরীকের হিস্যাটি বৌ·রাণী সরকার চড়া দরে সম্প্রতি খরিদ করেছে এবং তার ভিটে-বাড়ী-জমি-জেরাৎ সব কিছুই এই জমিদারীর মধ্যে।

সারদার মনোরাজ্যে যখন এই বিপ্লব চলেছে, সেই সময় মৃগেনকে নিয়ে উল্লাসের সুরে অধিকারীকে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হলেন যাদব রায়। পীতাম্বরকে অভ্যর্থনা করবার অবসর না দিয়েই বলে উঠলেন: ভাই অধিকারী, সবই শুনেছি আমি, সব শুনেছি। এই দেখ—মেগাকে নিয়ে এসেছি, আজ থেকে এর ওপরে আমার অধিকার নেই—মৃগেন এখন তোমাদের।

পীতাম্বর উত্তর করলেন: মা জগদম্বা আমারো মুখ রেখেছেন ভায়া! 'মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত!' পণের টাকা আমার তৈরী—ধুলো-পায়েই দোব বলে এখনো পায়ে জল দিইনি; এই নাও।

বলতে বলতে পীতাম্বর জামার পকেট থেকে খামে-ভরা নোটের পুলিন্দাটি বার করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, যাদব রায় যেন একেবারে বদলে গেছেন, মাথা নাড়তে নাড়তে কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললেন: না হে অধিকারী, না—টাকার কথা আর বোল না দাদা! তোমার মৃগেন ঢের টাকা এনেছে—উপলক্ষ হয়েছেন ঐ সীতা মা! বিনা পণেই আমি তোমার মেয়েকে নিতে এসেছি—আয় মা, আয়, অধিবাস সত্য হোক, সার্থক হোক—

সীতাও এই সময় এগিয়ে গিয়ে মৃগেন ও মায়ার হাতে হাত মিলিয়ে সহাস্যে বলল: মায়া-মৃগ এক হোক্—সেই সংগে জেগে উঠুক গ্রাম।

সীতার কথার সংগে সংগে শাঁখ বাজিয়ে করুণা সত্যিই গ্রামখানাকে জাগিয়ে দিল।

সমাপ্ত

জুতো

শ্রীকবি

সাদা কাগজের উপর গভীর লাল কালি, আকাশ লাল হ'য়ে আসছে।

ফাঁকা পথের কেন্দ্রে একটা জলন্ত সিগ্রেট।

ঘনায়মান সায়াহ্নে সিগ্রেটের স্ফুলিঙ্গ ভীষণ ইঙ্গিতময়।

জুতো।

ফাঁকা পথের উপর হঠাৎ গড়িয়ে গড়িয়ে চলল অনেক জুতো। সাদা, কালো, বাদামী, হরেক রকম চেহারার জুতো—চলেছে।

'—বাবু পালিশ,—বাবু-পালিশ।'

একটা মুচির ছেলে ক্লান্ত স্বরে চেঁচায়। উৎসুক চাহনীতে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গড়িয়ে-চলা জুতোগুলির দিকে। ক্ষুদ্র চোখে বড় হ'য়ে প্রতিফলিত হ'ল একটা পাম্পশু। কেরাণীর ছেঁড়া, জোড়া-তালি দেয়া পাম্পশু শ্লথ বেগে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তার পিছু—সদর্পে গড়িয়ে আসছে মোটা বুট জুতো।

পা-দানিতে মাথা রেখে—ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে মুচির ছেলের।

হঠাৎ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে ফুটপাতের আবেষ্টনী। সরল রেখায় অনেকগুলি জুতো একটার পর একটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে তার কাছে। তীব্র বেগে গড়িয়ে এসে, সব কয়টি জুতো হঠাৎ স্থির হ'য়ে—তলা উলটিয়ে, মুখোমুখি দাঁড়াল তার সামনে। ঐ তো বিরাট একটা চটি জুতো—তার সমস্ত তলদেশ দিয়ে, জগৎ অন্ধকার করে—নেবে এলো ছোট মাথার উপর। তার পর অতল হিম-সাগরে ডুবে গেল মাথাটি। আচম্‌কা—শিউরে জেগে উঠে বসল, চোখ রগড়িয়ে চেয়ে দেখল—দূরে হেঁটে চলেছে বিরাট এক বাসস্কিন বুট। অত বড়ো জুতো? আনন্দে—ছুটে গিয়ে ছোট দুই হাতে আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরল মুচির ছেলে। দানবীয় পা'টি অনায়াসে পা-দানির উপর তুলে ধরল বিরাট বুট।

কালি দিয়ে পালিশ করছে জুতোর সাবলীল চারটি ধার। ভয়ে ভয়ে স্পর্শ করছে—সেই শক্ত জুতো—ছোট দু'হাত দিয়ে। হঠাৎ দু'হাত পেতে সে বললে—'সাব, পয়সা?' অকস্মাৎ ব্যঙ্গ করে নিগ্রো উলটিয়ে তুলে ধরল জুতোর তলদেশ। দু'টি ছোট চোখে জগৎ অন্ধকার হ'য়ে এল—। শক্ত সাবলীল চারটি ধার পিষে মেরে ফেলেছে ক্ষুদ্র আত্মা।

দূরে চলন্ত জুতোর চাপে হঠাৎ সিগ্রেট নিবে গেল ফাঁকা পথে।

সাদা কাগজের উপর গভীর কালো কালি, আকাশ কালো হয়ে আসছে। *

---

* গতিশীল কলার (Dynomic Art) ইঙ্গিত আছে এই রচনায়। আমাদের দেশের শিল্পীরা এই দিকে দৃষ্টি দেননি এখন পর্য্যন্ত। মাঃ বঃ সঃ

তৃতীয়

হরিষে বিষাদ

নীলাকাশের অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, নীল মেঘমালার মত। তাদের শিখরগুলো বিপুল শূন্য ভেদ ক'রে উঠে গিয়েছে উপর দিকে, তারা যেন কোন দুর্গম দানব-লোকের কালো পাথরে গড়া সারি সারি পুঞ্জ-দেউল। সেই পার্ব্বত্য রাজ্যের নীচের দিকটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে, বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক গহন অরণ্যের লতাগুল্মতরুর নিবিড় শ্যামলতা।

সেখানে বনস্পতিদের মাথার উপরে রবিকররেখায় সোনার ঝালর দেখে ভেঙে গিয়েছে গানের পাখীদের রাতের ঘুম; উত্তপ্ত জীবনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা প্রেরণ করছে আকাশে বাতাসে পৃথিবীর দিকে দিকে গীতিময়ী প্রীতির বাণী।

কিন্তু কলকণ্ঠ বিহঙ্গদের স্তম্ভিত ও স্তব্ধ করে আচম্বিতে অদূরে জেগে উঠল বৃহৎ এক জনতার উত্তেজিত কোলাহল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল হস্তীর বৃংহিত, ধাবমান অশ্বদলের দ্রুত পদধ্বনি।

চঞ্চল হয়ে উঠল অরণ্যের অমানুষ বাসিন্দারা! এ-সব বিপদ-জনক ধ্বনি তাদের কাছে অপরিচিত নয়। কোন্ অন্তরালে একটি মৃত মৃগের দেহ নিয়ে ব'সে চিত্র-বিচিত্র ব্যাঘ্র নিশ্চিন্ত প্রাতরাশের আয়োজন করছিল; কোন্ ঝোপের আড়ালে শুয়ে শুয়ে মাটির উপরে লাঙ্গুল আছড়ে বাঘিনী আহ্বান করছিল তার শাবকদের খেলা করবার জন্যে; সারা রাত বনে বনে ঘুরে ভল্লুক ও ভল্লুকী ক্লান্ত দেহে গিরিগুহায় ফিরে দিবানিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; অন্ধকারের বিভীষিকা দূর হয়েছে দেখে হরিণ-হরিণীরা সাহস সঞ্চয় ক'রে দলে দলে বেরিয়ে এসেছিল নতুন রোদে চিক্কণ শিশিরস্নাত তৃণভূমির উপরে। সমবেত মানুষদের ভয়াল সাড়া পেয়ে তারা সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠে যে যে-দিকে পারল স'রে পড়ল। বনতল শব্দিত ও কম্পিত ক'রে একসঙ্গে মিলে-মিশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল বাঘ, ভাল্লুক, বরাহ, বরাহ, নেকড়ে, হরিণ ও শশকরা। উপরেও গাছের শাখা ছেড়ে আকাশের আশ্রয় নিলে সারস, বক, হাঁস, ময়ূর ও আরো নানা জাতের পাখীরা। বানররা আরো উঁচু ডালের উপরে উঠে ঘনপত্রের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে কিচির-মিচির শব্দে চারি দিকে রটিয়ে দিতে লাগল একই আসন্ন বিপদের সংবাদ। বনবাসী এই সব জীব কেউ কারো বন্ধু নয় বটে, কিন্তু তারা সব চেয়ে ভয়াবহ শত্রু ব'লে মনে করে মানুষদের। বাঘ জীবহিংসা করে কেবল নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে, কিন্তু মানুষ হত্যা করে অকারণ আনন্দেই। হরিণরা বনে থেকে বাঘের খোরাক হ'তেও রাজি, তবু মানুষের কাছে লোকালয়ে আসতে প্রস্তুত নয়।

বনে আজ শিকার করতে বেরিয়েছেন থানেশ্বরের রাজকুমার হর্ষবর্দ্ধন। সঙ্গে আছে তাঁর বয়স্যরা এবং সৈন্যগণ।

দীর্ঘদংষ্ট্রা বিপুলবপু এক বরাহ—দুই চক্ষে তার ক্রোধের অগ্নি, নাসারন্ধ্রে ঝড়ের ঝাপটা, চার পায়ে বিদ্যুতের গতি। পিছনে পিছনে ধেয়ে আসছে এক তেজী ঘোড়া, পৃষ্ঠে আসীন তরুণ হর্ষবর্দ্ধন, দক্ষিণ হস্তে তাঁর উদ্যত বর্শাদণ্ড।

হঠাৎ অরণ্যপথে দেখা দিলে আর এক অশ্বারোহী, দূর থেকেই সে চীৎকার ক'রে বললে, "রাজকুমার, রাজকুমার! ক্ষান্ত হোন—অশ্বরশ্মি সংযত করুন।"

রাশ টেনে ধরতেই হর্ষবর্দ্ধনের ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেই অবসরে এক লাফ মেরে পাশের ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বরাহটা।

অনতিবিলম্বে অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ল।

হর্ষবর্দ্ধন বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "এমন অসময়ে এসে আমাকে বাধা দিলে, কে তুমি?"

অশ্বারোহী মাটির উপরে নেমে প'ড়ে নতমস্তকে অভিবাদন ক'রে বললে, "রাজকুমার, আমি মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের বার্ত্তাবহ।"

—"কি বার্ত্তা তুমি এনেছ?"

—"মহারাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত।"

হর্ষবর্দ্ধন সচমকে বললেন, "সে কি, আমি যে পিতাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখে এসেছি!"

বার্ত্তাবহ বললে, "জীবন হচ্ছে স্রোতের ফুলের মত—এই আছে, এই নেই! মহারাজা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আপনাকে স্মরণ করেছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে না গেলে আপনি তাঁকে জীবন্ত দেখতে পাবেন না।"

মহাভারতের শেষ মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ

আবার দুঃসংবাদ

সপ্তাহ কাল পরে হর্ষবর্দ্ধন যখন অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে পিতার রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, মহারাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের সংজ্ঞা তখন লোপ পেয়েছে।

বিপদের উপরে বিপদ! মহারাণী যশোমতী প্রতিজ্ঞা করেছেন, স্বামিহারা পৃথিবীতে তিনি এক মুহূর্ত্ত বাস করতে রাজি নন, প্রভাকরবর্দ্ধনের আগেই দেহত্যাগ করবেন জ্বলন্ত চিতায়!

হর্ষবর্দ্ধন মায়ের পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "মা, মা! আমি কি একসঙ্গে মাতৃপিতৃহারা হব?"

যশোমতী বললেন, "বাছা, স্নেহের মোহে আমাকে অভিভূত করবার চেষ্টা কোরো না। সন্তানকে ইহলোকে রেখে পিতামাতা পরলোকে গমন করবেন, এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম। কিন্তু তার পরও পিতামাতা জীবিত থাকেন সন্তানের মধ্যেই। সুতরাং আমাদের অভাব তোমাকে অনুভব করতে হবে না। ধার্ম্মিক হও, বীর্য্যবান হও, আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব হও,—তোমার প্রতি এই আমার শেষ আশীর্ব্বাদ!"

প্রধান মন্ত্রী এসে বললেন, "মহারাণি, মহারাজের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, আজকের রাত কাটে কি না সন্দেহ! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? যুবরাজ সুদূর রণস্থলে, কিন্তু রাজসিংহাসন তো এক মুহূর্ত্ত শূন্য থাকতে পারে না! তবে কি আমরা ছোট রাজকুমারকেই সিংহাসনের অধিকারী ব'লে মনে করব?"

যশোমতী শান্ত স্বরে বললেন, "মন্ত্রিবর, জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ, জননীর কাছে সব পুত্রই সমান। যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকেই আপনারা সিংহাসনের উপরে স্থাপন করতে পারেন। আমি এখন পরলোকের যাত্রী, ঐহিক বিষয় নিয়ে আর কেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন? আমার চোখের সামনে এখন জাগছে কেবল স্বামি-দেবতার পবিত্র পাদপদ্ম, তাই দেখতে দেখতে এইবারে আমি অগ্নিশয্যায় শয়ন করব" বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন দ্রুতপদে।

প্রধান মন্ত্রী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো, মহারাজা এখন হতবাক্, মহারাণীও আমাদের কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন না। আমাদের কর্ত্তব্য কি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, "আপনাদের কর্ত্তব্য তো খুব স্পষ্ট!"

মন্ত্রী সবিস্ময়ে বললেন, "কি রকম?"

—"পিতৃদেবের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে যুবরাজের জন্যে অপেক্ষা করা।"

—"রাজকুমার, আপনি বালক, তাই এমন কথা বলতে পারলেন। শূন্য সিংহাসন যে কত বিপদের আধার, সে জ্ঞান এখনো আপনার হয়নি। কার জন্যে আমরা অপেক্ষা করব? যুবরাজ! তিনি গিয়েছেন ভয়াবহ হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে তিনি যদি কেবল মাত্র পরাজিত হন, তাহ'লেও ততটা চিন্তার কারণ নেই, কারণ তার পরেও শত্রুদের দ্বিতীয় বার বাধা দেবার সুযোগ হ'তে পারে। কিন্তু ভগবান না করুন, যুদ্ধে যদি যুবরাজের মৃত্যু হয়, তাহ'লে এই অরাজক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে কে?"

হর্ষবর্দ্ধন পূর্ণকণ্ঠে বললেন, "রক্ষা করব আমি। দাদার অবর্ত্তমানে আমি আছি। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়, এটুকু ভালো ক'রেই জেনে রাখবেন, যুবরাজ বর্ত্তমান থাকতে কোন দিনই আমার মনে ঠাঁই পাবে না তুচ্ছ রাজ্যলোভ।"

হর্ষবর্দ্ধনের কচি মুখে এখনো দেখা যায়নি গোঁফের রেখা। সেই শিশুর মতন সরল মুখের পানে তাকিয়ে প্রবীণ মন্ত্রী মনের ভিতর থেকে একটুও জোর পেলেন না। মনে মনে বললেন, "তোমার মুখ দেখলে এখনো তোমাকে নারী ব'লেই সন্দেহ হয়। হূণ যুদ্ধে যুবরাজের পতন হ'লে তুমিই রাজ্য রক্ষা করবে বটে!"

হর্ষবর্দ্ধন দাঁড়িয়েছিলেন প্রাসাদের এক বাতায়নের সামনে। বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, "দেখুন মন্ত্রী মশাই, দেখুন দেখুন!"

—"কি রাজকুমার!"

—"এক অশ্বারোহী সৈনিক বায়ুবেগে অশ্বচালনা ক'রে প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে নামল। নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রের কোন বার্ত্তা এসেছে।"

পরক্ষণেই শোনা গেল ঘন ঘন ভেরী, দামামা ও বহু কণ্ঠের উচ্চ জয়ধ্বনি!

মন্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "তাহ'লে কি যুবরাজ হূণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন?"

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, "নিশ্চয়। বর্ব্বর হূণদের সাধ্য কি আমার দাদাকে পরাজিত করবে।"

প্রাসাদের প্রধান প্রহরী বেগে ছুটে এসে খবর দিলে, "রণক্ষেত্র থেকে অগ্রদূত সংবাদ বহন ক'রে এসেছে, মহাবীর রাজ্যবর্দ্ধনের প্রবল প্রতাপের সামনে দুর্ব্বৃত্ত হূণ-দস্যুদল ঝটিকাতাড়িত তৃণদলের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অসংখ্য হূণবন্দী নিয়ে যুবরাজ রাজধানীর দিকে আগমন করছেন!"

চারি দিকে শোক-দুঃখের সঙ্গে আনন্দের বিচিত্র সম্মিলন! মহাসতী মহারাণী যশোমতীর চিতাগ্নিশিখা ম্লান হ'তে না হ'তেই মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের অন্তিম নিশ্বাস মিলিয়ে গেল অনন্তের অতলে। এবং ক্রন্দন-মুখরিত রাজপুরীর মধ্যে যখন প্রবেশ করলেন নতশিরে সাশ্রুনেত্রে যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধন, তখন তাঁর মুখে দেখা গেল না যুদ্ধজয়ের কোন আনন্দেরই নিদর্শন।

রাজ্যবর্দ্ধনও তরুণ যুবক, হর্ষবর্দ্ধনের চেয়ে মাত্র চার বৎসরের বড়। যথাসময়ে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ল না। তিনি ভালো ক'রে সিংহাসনে বসতে না বসতেই পাওয়া যেতে লাগল দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ।

প্রথমেই শোনা গেল, মালব দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

রাজ্যবর্দ্ধন মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করলেন।

কিন্তু মন্ত্রণা-সভায় কর্ত্তব্য স্থির হ'তে না হ'তেই পাওয়া গেল চরম দুঃসংবাদ।

মালবরাজ দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ আক্রমণ করেছেন। সেখানকার রাজা এবং রাজ্যবর্দ্ধনের সহোদরা রাজ্যশ্রী দেবীর স্বামী গ্রহবর্ম্মা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। রাজ্যশ্রীও বন্দিনী, "সাধারণ দস্যুর স্ত্রীর মত তাঁর দুই চরণে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে লৌহশৃঙ্খল!"

কেবল তাই নয়, মগধ-গৌড়-রাঢ় দেশের গুপ্তবংশীয় মহারাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত মালবপতির সঙ্গে যোগ দেবার জন্তে সসৈন্তে এগিয়ে আসছেন দ্রুতবেগে।

দারুণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে রাজ্যবর্দ্ধন বললেন, "কি, আমার নিরপরাধী ভগিনীর অপমান! আমি এখনি যুদ্ধযাত্রা করব!"

মন্ত্রিগণ ও সেনাপতি জানালেন, "মহারাজ, আমাদের সমগ্র বাহিনী এখনো প্রস্তুত হবার সময় পায়নি।"

রাজ্যবর্দ্ধন অধীর কণ্ঠে বললেন, "চাই না তোমাদের সমগ্র বাহিনী! আমার সঙ্গে চলুক কেবল দশ হাজার অশ্বারোহী! দুরাচার দেবগুপ্তের মত তুচ্ছ পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদ করতে সেই সৈন্তই যথেষ্ট। থানেশ্বরের রাজকন্তা বিধবা, আমার সহোদরা বন্দিনী, আমি কি আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে পারি?"

[ক্রমশঃ।

একটা ছোট্ট চড়াই পাখী

ইন্দিরা দেবী

বোসদের বাড়ীর কুকুরটা খিদের জ্বালায় বেরিয়ে পড়লো। কি করবে, আধপেটা খেয়ে আর না খেয়ে কত দিন থাকবে বলো? সব কাজ করে, সারা রাত্তির বাড়ী পাহারা দিয়ে, অপরিচিত লোক এলে ভেউ-ভেউ করে ডেকে সবাইকে সচেতন করিয়ে—লাভ কি না অনাহার কিম্বা অর্দ্ধাহার? তোমরাই বলো, কারুর ভাল লাগে? এক-আধ দিন নয়, এমনি কত দিন যে গেল তার ঠিক নেই। কর্ত্তাও দেখেন না আর বাড়ীর গিন্নী বা বৌয়েরা? আরে, সে কথা আর বলে কাজ নেই, সব চাকরদের হাতে, খাবার তারা অর্দ্ধেক চুরি করে বেচে দেয়। তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর, ভুলো না খেতে পেয়ে পেয়ে নিজে খবর নিয়ে দেখেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার স্বচক্ষে দেখা।

ভুলো রাগে অভিমানে অবশেষে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে যখন গেট পার হচ্ছে তখন চাকরদের পর্য্যন্ত দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। স্নানাহার করে মেজাজটা শান্ত করে, পান-দোক্তা চিবোতে চিবোতে তারা দিবানিদ্রার চেষ্টা করছে।

রাগে-দুঃখে ভুলোর চোখে জল এসে গেল। ভাবলে, মোটা করে এক কামড় দিই চাকরটার হাঁটুতে, কিন্তু না, থাক, এ-বাড়ীতে থাকবোই না।

ভুলো বড়-রাস্তা ছাড়িয়ে একটা লোকজন কম-চলা পথে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবলো: অতঃপর?

গাছের ডালে একটা চড়াই পাখী বসেছিল। শুকনো মুখে জল-ভরা চোখে ভুলো কি ভাবছে দেখে চড়াই জিজ্ঞেস করলে: কি হয়েছে তোমার?

ভুলো চারি দিক্ দেখে উপরের দিকে চেয়ে বললে: এ রকম যেন কারুর না হয়।

—কেন? কেন? চড়াই নীচের আর একটা ডালে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো।

মনের দুঃখে ভুলো তাকে সব খুলে বললে।

চড়াই পাখী বললে: আচ্ছা, তুমি এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমায় খাওয়াবো।

চড়াই উড়ে-উড়ে আর ভুলো হেঁটে-হেঁটে বাজারের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

দুপুরে বাজারে সব দোকানী ব্যাপারীরা খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ বাড়ী গেছে।

মাংসের দোকানেও সেই অবস্থা। লোকগুলিকে ঘুমুতে দেখে চড়াই বললে: ভুলো দাদা, তুমি দোকানের নীচে দাঁড়াও। এই বলে সে বড় বড় কয়েক খণ্ড মাংস ঠোঁটে করে টেনে টেনে নীচে ফেলে দিতে লাগলো আর ভুলো খেতে লাগলো।

ভুলোর খাওয়া শেষ হলে চড়াই বললে: চলো ভুলো দাদা, ঐ দিকের দোকানে আরো ভাল মাংস আছে, তোমায় খাওয়াবো।

চড়াই পাখী উড়ে গিয়ে আগেই ঠোঁটে করে টেনে টেনে মাংস ফেলতে লাগলো পথের উপর, ভুলো এসে আবার খেতে সুরু করলে। খেতে খেতে ভুলো ভাবছিল: কত দিন তার ভালো করে খাওয়া হয়নি, আর চড়াই-এর উপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠছিল।

খাওয়া শেষ হতেই চড়াই বললে: আর কি খাবে বল ভুলো দাদা?

সামনের একটা পা তুলে মাথা চুলকে নিয়ে ভুলো বললে: অনেক মাংস খেয়েছি ভাই, এবার একটু রুটী খেতে ইচ্ছা করছে।

—তাই বলো। এসো আমার সঙ্গে।

একটা রুটীর দোকানে এসে চড়াই আবার ঠোঁট দিয়ে দিয়ে প্রায় ৩।৪খানা রুটী মাটীতে ফেলে দিলো, ভুলো পেট ভরে খেয়ে নিলো।

দোকান-ঘরের একটা সিলিং-এর উপর বসে চড়াই বললে: পেট ভরেছে ভুলো দাদা?

—হ্যাঁ ভাই খুব, খুব। চলো, এবার যাই।

একে দুপুরের রোদ তার উপর গরম কাল—একটু পথে ঘুরতেই ভুলোর খুব কষ্ট হতে লাগলো, একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে ভুলো বললে: সত্যি, তুমি এত খাইয়েছ, ভীষণ পেট ভরে গেছে। তোমায় অনেক ধন্তবাদ!

চড়াই একটু হাসলে, বললে: তুমি আমার ভাই হলে আজ থেকে, কেমন?

গভীর কৃতজ্ঞতায় ভুলো বললে: নিশ্চয়ই। কিন্তু জানো ভাই চড়াই, আমার এত পেট ভরে গেছে আমি আর চলতে পাচ্ছি না। চলো, রাস্তার ওদিকে যাই, ঐ বড় বাড়ীগুলোর ও-পাশে যে মাঠটা পড়ে আছে ঐ দিকে।

—বেশ তো, চলো।

দু'জনে যেতে লাগলো। কিন্তু খানিকটা গিয়ে ভুলো আর চলতে পারে না, অত খেয়েছে, পেট ভারী। পথের উপরই শুয়ে পড়লো।

ভুলোর কষ্ট হচ্ছে দেখে চড়াই বললে: আচ্ছা, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও ভুলো দাদা, আমি এখানে বসে তোমায় পাহারা দিচ্ছি।

একটুখানির মধ্যেই ভুলো অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। চড়াই বসে আছে, কিছুক্ষণ পরেই একটা গরুর গাড়ী আসতে দেখে চড়াই এগিয়ে গিয়ে বললে: দেখো, তোমরা সাবধানে যাও, ওখানে আমার ভাই ঘুমোচ্ছে, তাকে দেখ, যেন চাকা তার গায়ে না লাগে।

যে চালক, তারই জিনিষ ছিল গাড়ীর ভিতরে। মুখ বেঁকিয়ে লোকটা বললে: অত দেখবার সময় নেই।

ছোট্ট চড়াই পাখী বললে : ও-কথা বলো না, এখনও বলে দিচ্ছি, সাবধান, আমার ভায়ের যেন না লাগে।

লোকটা তার কথায় কাণ দিল না, হন-হন করে গাড়ী চালিয়ে দিলো, গাড়ীটা ভুলোর উপর দিয়ে চলে গেল।

চড়াই দেখলো, তার বন্ধু, তার-ভাই দু'-আধখানা হয়ে পথে পড়ে আছে। রক্তে পথটা লাল হয়ে গেছে।

চড়াই তার ভায়ের এই অবস্থা দেখে প্রথমে খুব কাঁদলো, তার পর উড়তে উড়তে গিয়ে সেই গাড়ীটার উপরে বসে বললে : আমার ভাইএর প্রাণ নিয়েছ, আমিও তোমার প্রাণ নেবো।

চালক মুখ ভেংচে বল্লে : যাঃ, যাঃ, একটা ছোট্ট চড়াই তার আবার কাণ্ড দেখো—ভাগ। এই বলে হাতের চাবুক তুললো।

চড়াই পাখী উড়ে যাবার সময় বল্লে : মনে থাকে যেন তোমাকে যা বলেছি তা করবই।

একটা ভয়ানক অবিশ্বাসের হাসি হেসে চালক গাড়ী চালিয়ে যেতে লাগলো।

চড়াই আর একবার উড়ে এসে বল্লে : মনে থাকে যেন শুধু মেরে ফেলবো তা নয়, আগে তোমায় গরীব করবো, তার পর প্রাণ নেবো।

চালক আর একবার চাবুকটা ঘুরিয়ে নিলে চড়াইএর সামনে।

বাঁশের পিপে করে তরল রং নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ীর চালক। যথা-সর্বস্ব নষ্ট করে রং কিনে নিয়ে যাচ্ছে, এই রং দোকানে দিলে সে প্রচুর টাকা পাবে, যাতে তার নষ্ট জিনিস-পত্র উদ্ধার হয়েও অনেক টাকা থাকে হাতে। আজ রং বাড়ী পৌঁছবে, কাল সে মাল দোকানে দিয়ে দেবে—পরশু সে বড়লোক। তার ক্ষেত-খামারের কাজ, একটু মোটা লাভের আশায় সে এই কারবারে হাত দিয়েছে।

এখন হয়েছে কি, চড়াই না গাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো। গরুর গাড়ী হলেও ছই দিয়ে ঢাকা ছিল। মুখ দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে—বাঁশের পিপের গায়ে যে রং ঢালবার আর বেরোবার পথ ছিল, সেটি খুলে ফেললে। চালক তো আপন-মনে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে আর ভিতরে এক-এক করে তিনটি পিপের মুখ খুলে দিলো। সারা পথ রংএর আলপনা হতে হতে চললো। রাস্তার এক জন লোক চালককে ডেকে বললে : ওহে, খুব তো গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছ, এদিকে পিছনে দেখেছ, সব যে পড়ে গেছে।

চালক যেই নামতে যাবে অমনি ছোট্ট চড়াই তার মুখের সামনে এসে বললে : "আমার ভাইকে মেরেছ, আগে তোমায় গরীব করবো, তার পর তোমার প্রাণ নেবো।"

চাবুকটা সজোরে ঘোরাতে সেটা চালকের গায়ে এসেই লাগলো, চড়াই তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

নিজের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে চালক পিছন দিকে এসে দেখে—কী সর্বনাশ! তিনটি পিপে একেবারে খালি, কোথাও কিছু নেই! চালক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, এখন উপায়?

আর উপায়? তখন সব পিপে খালি।

চালক পথের উপর বসে পড়ে যখন ভাবছে, তখন এদিকে চড়াই এসে গরু দু'টির চোখ ঠুকরে ঠুকরে একেবারে অন্ধ করে দিলে। গরুর চীৎকারে যখন চালক এলো সামনের দিকে, তখন চড়াইএর কাজ সারা হয়ে গেছে।

—"আগে তোমায় গরীব করবো তার পর তোমার প্রাণ নেবো"—চালকের মুখের সামনে এসে এই বলে সে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

হায়! হায়! হায়! এমন বিপদ! গরু দু'টোও গেল? চালক পথে বসে ভাবতে লাগলো, এখন কি উপায়?

সে দিন আর সে বাড়ী ফিরতেই পারলো না, গ্রামের ভিতর বাড়ী; যেতেও দেরী হবে, মনও খারাপ। এদিক্ ওদিক্ ঘুরে পরের দিন যখন সে তার কুটীরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর বলছে : এখন আমার মত গরীব আর কেউ নেই।

হঠাৎ চড়াইটি মুখের সামনে এসে উড়ে বলে গেল : "এখনও হয়নি, গরীব হবার আরো বাকী আছে।"

আবার চড়াই পাখী? রাগে-দুঃখে চালক কি যে করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। দরজায় শব্দ পেয়ে ওর বৌ দরজার কাছে এসে বললে : "তুমি এতক্ষণে এলে? এদিকে যা কাণ্ড, আমার জীবনে দেখিনি!"

চালক শঙ্কিত হয়ে বললে : আবার কি হলো, একে তো আমার এই অবস্থা, গরু দু'টোকে কোনো ক্রমে নিয়ে এসেছি, এরা একেবারে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, যা রং কিনেছি সব গেল! এখন যে কি হবে? যাক্ গোলায় যা ধান ছিল, অন্যান্য যা শস্য ছিল, সব রোদে দিয়ে ঠিক করে রেখেছ তো? খেতে পাবো তো?

—সেই কথাই তো বলছি, কাল একটা পাখী এসে গোলার চার দিকে ঘুরছিল। আশ্চর্য্য কাণ্ড, একটা ছোট্ট চড়াই পাখী! আজ যখন সকাল বেলা সমস্ত ধান-চাল ইত্যাদি উঠানে ঢেলে রোদে দিয়েছি, আর কোথা থেকে দেখি হাজারে হাজারে ছোট ছোট চড়াই, অন্য পাখী এসে বসে গেছে, যত তাড়াই তত আসে। আমি তো পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। আরো আশ্চর্য্য শোনো, এই একটু আগে তারা সবই প্রায় শেষ করে এনেছে, আর অবশিষ্ট হয়তো কিছুই নেই।

—হায়, হায়! আমি একেবারে হতভাগ্য গরীব হয়ে গেলাম! কপাল চাপড়ে চালক বললে।

—"এখনও অনেক বাকী"···বলেই মুখের সামনে চড়াইটা উড়ে গেল।

সামনেই একটা কাস্তে পড়েছিল, রেগে চালক যেই সেটা তুলে নিয়ে চড়াইএর দিকে ছুঁড়লো, চড়াই তখন অনেক দূরে, কাস্তেটা গিয়ে পড়লো একটা গরুর মাথায়, রক্তের বন্যা বইতে লাগলো, গাঁ গাঁ করে শব্দ করে গরুটা তখনি মরে গেল।

—সব গেল, গরুটা পর্য্যন্ত, কিছুই রইল না, আমি একেবারে গেলাম! রাগে-দুঃখে সে বললে।

—না এখনও যথেষ্ট হয়নি, অনেক বাকী। মনে আছে, আমার ভাইকে পথে চাপা দিয়েছিলে? এই বলে চড়াই আবার এক পাক দিয়ে উড়ে গেল।

রাগে অন্ধ হয়ে চালক যেমনি কাস্তেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়েছে, ধারালো চকচকে কাস্তে সূর্য্যকিরণে ঝকঝক করে উঠেই গিয়ে পড়লো বাকী গরুর উপর—এবং সেই একই অবস্থা তার, তৎক্ষণাৎ।

চালক চীৎকার করে উঠলো : সবই তো গেল, আমি কি পাগল হয়ে যাবো?

—না, এখনও দেরী আছে—বলেই আবার ফুড়ুৎ করে চড়াই উড়ে গেল।

চালকের বৌ প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে সে চালকের

হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে এলো। সান্ত্বনা দিয়ে বললে : যা হয়েছে হয়েছে, এখন এসো, ঘরে এসে বিশ্রাম করো।

চালক ঘরে ঢুকলো, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। তার সব গেছে—ধং, ধান, চাল, গাড়ী, এমন কি, বলদ দু'টো পর্য্যন্ত।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো চালক, আর তার বৌ ঘরের সামনেই একটা ছোট জ্বলন্ত উনানে চায়ের জল বসালো। আগে তার পরিশ্রম কিছু লাঘব করে তার পর যা হয় ব্যবস্থা দেখা যাবে।

বৌটি চা করতে লাগলো আর মাথায় হাত দিয়ে চালক বসে ভাবছে : একটা ছোট্ট পাখী এত ক্ষতি করতে পারে—অশান্তি আনতে পারে ?

হঠাৎ মুখের সামনে চড়াইটা আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল, বললে : মনে থাকে যেন গাড়ীওয়ালা, তোমার প্রাণ দিতে হবে।

আবার পাখীটা ? গাড়ীওয়ালা ক্ষেপে গেছে। ওর বৌ যেখানে চা তৈরী করছিল সেইখানেই ছিল কুটনো কাটবার ধারাল বঁটী, সেখানা তুলে নিয়ে যেই পাখীটার দিকে ছুঁড়লো সেখানা গিয়ে পড়লো বাসন-পত্রের উপর—ঝন্-ঝন্ করে সব ভেঙ্গে-চুরে একাকার ! পাখীটা তখনও ঘরের জানলার উপর বসে আছে দেখে গাড়ীওয়ালা এবার কাটারীখানা ছুঁড়লো। কাটারীটা গিয়ে পড়লো উনুনের কাছে। চায়ের বাটি গেল উল্টে, উনুন ভেঙ্গে আগুন উঠলো দেওয়ালে—খড়ের চাল ধরে ধরে আর কি ! তক্ষুনি বউ মাটী চাপা দিয়ে উনুনটা বোজালে কিন্তু পাখীটা তখন উড়ে উড়ে বাসন-পত্র ফেলছে। চালক যত তাড়া দেয় সে উড়ে গিয়ে আর একটায় বসে, আর চালক আবার যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। চড়াইএর কিছুই হয় না, চালক ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে।

বৌ বললে : তুমি কি করছো, পাগল হলে না কি ?

চালক বললে : ওকে আমি ধরবো, ধরে টুকরো টুকরো করবো।

চড়াই আবার এলো সামনে একটা টুলের ওপর : গাড়ীওয়ালা, মনে থাকে যেন তোমার প্রাণ নেবো।

হঠাৎ চালক ধরে ফেললে পাখীটাকে। মুঠোয় ভেতর পুরে বললে : কেমন, এবার ?

বৌ বললে : কেটে ফেলো ওটাকে, যত নষ্টের মূল হচ্ছে ঐ পাখীটা—একটা ছোট পাখী এত সাংঘাতিক ?

গাড়ীওয়ালা বললে : না, আমি ওকে আস্ত খাবো, বলেই মুখে পুরে দিলে।

চড়াই রীতিমত পেটের ভিতর গিয়ে ঝটাপট-ঝটাপট করতে লাগলো। একবার উপরে আসে আবার ভিতরে যায়। শেষের বার মুখের ভেতর থেকে চড়াই বলে উঠলো : গাড়ীওয়ালা, মনে থাকে যেন, জীবন দিতে হবে।

রেগে গিয়ে চালক বৌকে বললে : আমি হাঁ করি, তুমি ওটাকে ঐ কুড়ুল দিয়ে মারো।

বৌটিও রেগে গিয়ে তার স্বামীর হাঁ-করা মুখের মধ্যে যেই কুড়ুল ছুঁড়েছে—সেটা গিয়ে পড়লো চালকের মাথায়। ব্যস্—তখনি শেষ।

গাড়ীওয়ালার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। চড়াই পাখী ফুড়ুৎ করে কখন উড়ে গেছে।

ছোট্ট চড়াই পাখী গাড়ীওয়ালাকে ধনে-প্রাণে মেরে গেল।

হ্যাঁ, একটা ছোট্ট চড়াই পাখী।
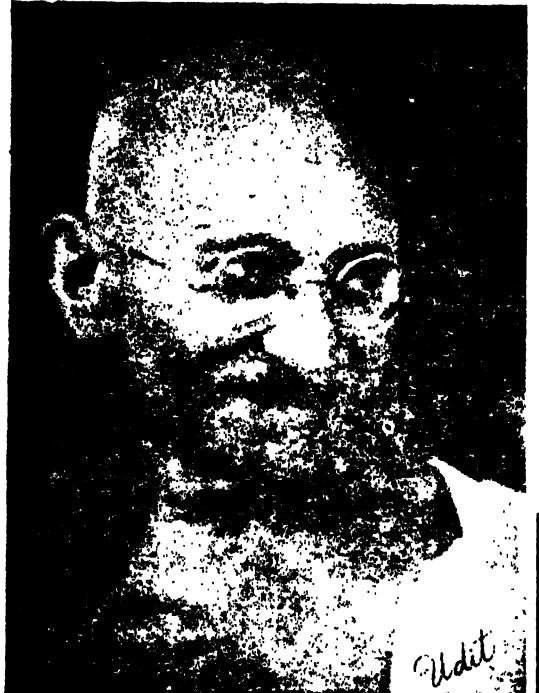
মহাত্মা-প্রয়াণে

প্রভাত বসু

আমাদের বুকে বেঁচে থাকো গান্ধীজী
তোমারি স্মরণে জাতির নয়ন অশ্রুতে ওঠে ভিজি'।
বেদনার ভারে কণ্ঠ হারায় ভাষা,
তমসার মাঝে তবুও জাগাও আশা—
মৃত্যুর বুকে অমৃত-দেউল তুমি যে গিয়াছ সৃজি'।

কাণ্ডারী, এই মুক্তি-তরণী তুমিই ভিড়ালে তীরে ;
সহসা বাতাসে ভেঙে গেল হাল, পাল যে পড়িল ছিঁড়ে।
বাপু, তুমি আজ এসো এসো ফিরে
কোটি মানুষের বুকের নীড়ে—
ব্যথাতুর চিতে আমরা যে যাচি তোমারি শরণ হে দধীচি !
আমাদের বুকে বেঁচে থাকো গান্ধীজী !

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

লাইব্রেরী-ঘরে

'নিমন্ত্রণ করতে?' বিস্মিত ভাবে সুজিত সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলে।

'হাঁ। পরশু, মানে শুক্রবার মালতীদি'র আশীর্বাদ, সেই উপলক্ষে অমুতোষদা' একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন করেছেন, মিলে অনেক কর্মচারীরাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আপনার ঐ দিন আসা চাই-ই কিন্তু, আর···আপনার বন্ধু সুব্রত বাবু যদি কিছু না মনে করেন, তবে উনি এলে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হবো।' শেষের কথা কয়টা বলতে বলতে সুবিমল সুব্রতর দিকে মিনতি-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'নিশ্চয়ই, বিলক্ষণ, এর জন্ম আর কি, ভোজের ব্যাপারটা চির-দিনই আমার কাছে লোভনীয় সুবিমল বাবু, তবে সুব্রতর কথা, সেটা ওই বলতে পারে।'

'কি বলেন সুব্রত বাবু, আসবেন ত'?' সুবিমল আবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'হঠাৎ যদি কোন কাজে না আটকা পড়ে যাই তবে হয় ত' যাবো, অন্ততঃ যাবার সত্যিই চেষ্টা করবো।' সুব্রত বললে।

এর পর সুবিমল নমস্কার জানিয়ে সে রাত্রের মত বিদায় নিয়ে গেল।

সুবিমলের সংগে সংগে সুজিত নীচে পর্যন্ত গেল।

উপরের ঘরে ফিরে এসে দেখলে, সুব্রত ইজিচেয়ারটার 'পরে চোখ বুজে পড়ে আছে।

'কি রে, কি ভাবছিস্ এত, না, ঘুমিয়ে পড়লি?'

'ভাবছিলাম একটা কথা, অমুতোষ রায়ের মত আদর্শবাদী শিক্ষকের অধীনে থেকেও সুবিমল বাবু এমনটি হলো কি করে? ফিন্‌ফিনে বাহারী শান্তিপুরে ধুতি, অমন মসৃণ ভায়লার দামী পাঞ্জাবী! এ ত' তখনকার কালের বি-এ, বি-টি, শ্রীঅমুতোষ রায়ের line of teaching নয়!'

সুব্রতর কথায় সুজিত হো-হো করে হেসে উঠে।

'হাসলি যে?'

'তাহলে তোর কাছেও বলেছেন ভদ্রলোক—আমি শ্রীঅমুতোষ রায় তখনকার কালের, বি-এ, বি-টি!'

'না, না, হাসি নয় সুজিত। ভদ্রলোকের ওই একটি উক্তি থেকেই তার ভিতরের মানুষটা যেন মনের পর্দায় সুস্পষ্ট ছবির মতই ভেসে উঠে।'

'আমার কিন্তু ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনলেই হাসি পায়। সে তুই যাই বলিস্ না কেন। কিন্তু যাক সে কথা, সত্যিই তুই জমিদার-বাড়ীতে পরশু দিন যাচ্ছিস্ না কি?'

'নিশ্চয়ই।···'

উৎসব-মুখরিত জমিদার বাড়ী।

সুব্রত সে-দিন বাইরে থেকে জমিদার-বাড়ীর বিরাটত্বের যে আন্দাজই করতে যে পারেনি, আজ এ-বাড়ীতে পা দিয়ে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলে।

বিরাট তিন মহলা ইমারৎ

নিক বিজলী-বাতি নেই বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে আছে সুপ্রাচীন বিত্তশালীদের মত উজ্জ্বল ঝাড়-বাতি।

দোতালায় প্রকাণ্ড একটা হল-ঘরের মধ্যে তিন-চারটি ঝাড়-বাতি জ্বলছে। সমগ্র ঘরটি আলোয় আলোকিত।

অতি আধুনিক কেতায় ভাড়া-করা ফার্নিচার দিয়ে সমগ্র হল-ঘরটি সুসজ্জিত করা হয়েছে।

নানা বয়েসী মেয়ে-পুরুষের ভিড়।

সুব্রত সুজিতের সংগে হলঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সংগে সংগে যেন কতকটা হকচকিয়েই যায়। অসংখ্য কণ্ঠের নানাবিধ গুঞ্জন।

আশ্চর্য্য! আজ কিন্তু অমুতোষ রায়ের পরনে হাফ-প্যান্ট সার্ট নয়, সাধারণ ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী!

ভদ্রলোক অতিমাত্রায় ব্যস্ত। চারি দিকে চর্কীর মত ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের মিষ্ট ভাষায় আদর-অভ্যর্থনা করছেন।

পাশের একটা ঘরে ষ্টেজ বেঁধে আমন্ত্রিতদের আনন্দ দানের জন্ম ম্যাজিকের ব্যবস্থা হয়েছে।

যাদু-সম্রাট সোরকার আজ এখানে তার যাদুর ভেলকী দেখাতে আহূত হয়েছেন।

ছেলে-মেয়ে-বুড়ো নানা বয়েসীদের ভিড়; ঘরটা যেন গিস্‌ গিস্‌ করছে।

জমিদার-বাটীর উৎসবই বটে!

সুব্রত এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ এক কোণে ওর নজর পড়তেই ও যেন কতকটা অবাক ভাবেই চমকে উঠে।

একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুশ্রী যুবক যেন কতকটা সকলের থেকে পৃথক্ হয়েই, এক পাশে ভিড় বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ও যেন এ উৎসবের কেউ নয়। আনন্দ-কলহাসির সম্পূর্ণ বাইরে।

যুবকের চোখে একটি রঙিন কাচের চশমা।···

ঠোঁটের পরে বেশ ভারী এক জোড়া পাকানো গোঁফ।

সুব্রত একটু একটু করে ভিড় বাঁচিয়ে যুবকের কাছাকাছি এগিয়ে যায়।

এবং কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনে হেসে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, সোরকারের ম্যাজিক আরম্ভ হতে আর কত দেরী বলুন ত?'

সুব্রতর প্রশ্নে যুবকটি চমকে সুব্রতর দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে, 'বলতে পারি না।'

'আচ্ছা, সোরকারের ম্যাজিক আপনি কোন দিন দেখেছেন?'

'না।'

'বেশ দেখার কিন্তু ভদ্রলোক, বিশেষ করে 'একস্‌রে আই' সিমপ্লি চরমিং!'

যুবক হাঁ না কোন জবাবই দেয় না।

হঠাৎ এমন সময় মঞ্চের কালো পর্দা সরে যায় দু'পাশে।

সোরকারের ম্যাজিক সুরু হয়।

সুব্রত ধীরে ধীরে সেখান হতে সরে পড়ে।

একবার পিছন ফিরে তাকায়, যুবক একাগ্র চিত্তে ম্যাজিক দেখছে।

*　　　*　　　*

সমস্ত দর্শকগণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ !···

যুবকটি ধীরে ধীরে ঘর হতে বের হয়ে বারান্দায় আসে।

লম্বা টানা বারান্দা।···

যুবকটি একবার এ-দিক ও-দিক তাকাল, তার পর এগিয়ে চলে বারান্দা দিয়ে।

বারান্দাটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা সিঁড়ির মুখে।

ঐদিককার সিঁড়িতে তেমন জোর আলোর ব্যবস্থা নেই। একটা দেয়াল-বাতি জ্বলছে মাত্র।

তারই মৃদু আলোয় সমস্ত সিঁড়ি-পথটা যেন একটা আলো-আঁধারীতে থম্-থম্ করছে।

যুবক সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, তার সামনেই আর একটা উপরের তলার মত টানা-বারান্দা। বোঝা যায়, এটা ভিতরের মহল

এ-দিকটা অন্ধকার।

যুবক একটা টর্চ-বাতী জ্বালাল।

টর্চের আলো ফেলে ফেলে অতি সন্তর্পণে যুবক এগিয়ে চলেছে।

একটা বদ্ধ-দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজাটা কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল।

এটাও একটা প্রকাণ্ড হল-ঘর।

চারি পাশে আলমারী-ঠাসা নানা বই।

জমিদার-বাড়ীর লাইব্রেরী-ঘর।

অন্ধকারে একটা টর্চের আলোর রশ্মি এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে।

যেন অন্ধকারে আলোর একটা চোখ···কি খুঁজে ফিরছে।

চারি দিকের আলমারীর গায়ে মাঝে মাঝে আলোর রশ্মিটা গিয়ে মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয়, আবার তখুনি সরে যায়।

ঘরের এক কোণে দাঁড় করান প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি।

যুবক ঘড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন যুবকের কাণে আসে। দরজাটা খোলাই ছিল, একটা অস্পষ্ট আলোর আভাস যেন চকিতে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় স্ফুরণ লাগিয়েই আবার মুহূর্তে যায় মিলিয়ে। যুবক দ্রুত সতর্ক পদবিক্ষেপে চট্ করে একটা বড় আলমারীর পিছনে আত্মগোপন করে।

শব্দটা যেন এদিকেই আসছিল না ?

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে আত্মগোপন করে থেকে, আবার এক সময় যুবক আলমারীর পিছন হতে বের হয়ে এসে, খোলা দরজা-পথে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় দৃষ্টিপাত করে।

না, কিছুই চোখে পড়ে না।

ঐদিকে উপরের উঠ্ বার সিঁড়িটা, মৃদু একটু আলোর আভাস, অন্ধের আলো-ছায়ায় যেন অস্পষ্ট।

যুবক আবার সন্তর্পণে ফিরে আসে এবং বড় দাঁড়-করান ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে, ঘড়ির পাশে একটা বোতাম টিপতেই ঘড়ির নীচের অংশে একটা গুপ্ত ফোকর দেখা দেয়।

হঠাৎ আবার পায়ের শব্দ।

চকিতে আলো নিবিয়ে যুবক বিদ্যুদ্‌গতিতে আলমারীর পিছনে আত্মগোপন করে।

এক মিনিট, দু' মিনিট,···না, আর কোন শব্দ নেই।

আবার যুবক আলমারীর পিছন হতে বের হয়ে আসে এবং ঘড়ির নীচের গুপ্ত ফোকরে হাত চালিয়ে অধীর আগ্রহে কি যেন খুঁজতে থাকে।

না···ফোকর শূন্য। কিছুই সেখানে নেই।

হঠাৎ আবার একটা শব্দ।···

চকিতে আলো নিবিয়ে যুবক পিছন দিকে ফিরে তাকাল।

এবার আর ভুল নয়, খোলা দরজার ঠিক উপরেই এক জন দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা হ্যারিকেন।···

যুবক যেন ভূত দেখেছে। গতিহারা।···

আগন্তুক এগিয়ে আসে।···আগন্তুক আর কেউ নয়, এ-বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সুখদাশ।

সুখদাশ আরো একটু এগিয়ে এসে ঘরের একটা দেওয়ালবাতি জালিয়ে দিল। নির্জন কবরখানার 'পরে যেন হঠাৎ এক টুকরো মরা চাঁদের আলো এসে পড়লো। বহু দিনের অব্যবহৃত নির্জন হল-ঘরখানা যেন সহসা ঘুমের মধ্যে একটু কেঁপে উঠে। চার পাশের দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেনটিং, বড় বড় বুক-সেলফ ও বইয়ের আলমারী।

সুখদাশের ভাবহীন মুখের 'পরে বাতির আলো পড়েছে; মনে হয় যেন এইমাত্র কোন নির্জন কবর-শয্যা হতে ও উঠে এল।

'এই অন্ধকার ঘরে কি করছিলেন বাবু?' সুখদাশ নির্বিকার ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

'উঃ, ভারী চমকে দিয়েছো তুমি আমাকে। নীচে এসেছিলাম, হঠাৎ এই ঘরের দরজাটা খোলা দেখে ঘরে ঢুকে পড়ি। এত বই, তাই দেখছিলাম।

সুখদাশ নির্বিকার ভাবে যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একবার সে তার মরা কাচের মত চোখের চাহনি নিয়ে অদূরে প্রকাণ্ড ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই আবার যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

'এই ঘড়িটা কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য!'

'হাঁ, প্রায় দেড়শ বছরের পুরাতন ঘড়ি। এই বাড়ীর বুড়ো কর্তার বাপ ঐ ঘড়িটা পারস্য থেকে কিনে আনেন। অদ্ভুতই ঘড়িটা। প্রহরে প্রহরে ওর ঘণ্টার শব্দ সমস্ত বাড়ীময় গুম্-গুম্ করে বাজত। আজ বছর পাঁচেক হলো নষ্ট হয়ে গেছে, জমিদার বাবু অনেক চেষ্টা করেছিলেন সারাবার, কিন্তু কেউ-ই ওটা সারতে পারলে না। এখন চলুন বাবু, দিনের বেলা এসে এক দিন এ-ঘরের সব কিছু দেখবেন, অনেক পুরাতন দামী দামী বই এই লাইব্রেরীতে আছে।'···

'চল।···আমাকে উপরে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দাও।'

'আসুন।'

সুখদাশের পিছু-পিছু যুবক ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

চোখে তখন তার রঙিন চশমাটা কিন্তু ছিল না।

সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে সুখদাশ অন্য দিকে চলে গেল।

যুবক চশমাটা আবার চোখে লাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

নয়

রহস্যময় ঘড়ি

উপরে সোরকারের ম্যাজিক প্রদর্শন তখন পুরো দমে চলেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দর্শকের দল।

যুবক আবার এক সময় নিঃশব্দ পদ-সন্চারে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

মৃত্যুর মতই নিস্তব্ধ সমস্ত সিঁড়ি-পথটা। আশে-পাশে কেউ নেই।

অন্ধকার নির্জন বারান্দাটা দ্রুত সতর্কিত পদে যুবক অতিক্রম করে আবার সেই একটু আগের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যুবক ঘড়িটার সামনে দাঁড়াল; এবং বোতাম টিপতেই সেই গুপ্ত ড্রয়টি দেখা গেল।

আকুল আগ্রহে হাত ঢুকিয়ে কি যেন ও ড্রয়ের মধ্যে খোঁজে।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বেশ সুন্দর ঘড়িটা না স্যার?'

বিদ্যুৎ চমকের মত যুবক ফিরে দাঁড়াল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুব্রত, মুখে তার অদ্ভুত এক প্রকার হাসি।

'আপনি!'···রুদ্ধ শ্বাসে কোন মতে যুবক বলে: 'আপনি আমাকে অনুসরণ করছিলেন?'

'বোধ হয়ত তাই!···কিন্তু কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এসে এমনি করেই আপনি ঘরে ঘরে সব দেখে বেড়ান না কি? অবিশ্যি বাড়ীর অন্য কারও অনুপস্থিতিতে।'

'হাঁ, তা একটু-আধটু করে থাকি বৈ কি!' রুক্ষ স্বরে যুবক জবাব দেয়।

'সত্যি!'···তার পর একটু এগিয়ে এসে গুপ্ত ড্রয়টার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সুব্রত বলে, 'অবিশ্যি এ ধরণের ঘড়ির প্রতি কোন interestই আমার কোন দিন নেই। তবু ঘড়িটার গুপ্ত ড্রয়ে কি এমন আবিষ্কার করতে আপনি ব্যস্ত, বলুন ত?'

'অবিশ্যি ড্রয়টা হঠাৎ খুলে গেছে, আমি খুলতে চাইনি। আপনি যদি মনে করে থাকেন, চুরির মতলবে আমি এ-ঘরে ঢুকেছি, তবে ভয়ানক ভুল করবেন। চুরি আমার পেশা নয়।

'থাকলেও আজকের রাত্রে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ফল হয়নি। কি বলেন?'

এমন সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবং একটু পরেই ঘরে এসে যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি স্বয়ং বাড়ীর মালিক, অমুতোষ বাবু!

'আরে, সুব্রত বাবু যে?···একা একা এই সময় এ-ঘরে কি করছেন। উনি কে?···'

'আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে আপনার লাইব্রেরীটা দেখছিলাম। চমৎকার সংগ্রহ কিন্তু!···

'হাঁ, এটা আমার মামার প্রপিতা মহাশয়ের লাইব্রেরী। ভদ্রলোক মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন।' বহু পুরাতন দামী-দামী বই এই লাইব্রেরীতে আছে। আসবেন না এক সময়। দেখবেন, যদি কোন কিছুর সন্ধান পান। আপনার এ-বন্ধুটিকে ত কখনো দেখিনি?'

'ওর নাম সুবোধ জানা। এক কালে আমার এ্যাসিষ্টেন্ট হয়ে কাজ করেছিলেন। ওর দৃষ্টটা খুব সূক্ষ্ম তাই আজ আপনার এখানে আসবার সময় সংগে করে এনেছি। অবিশ্যি তাড়াতাড়িতে আপনার অনুমতিটা নিতে পারিনি।'

'বিলক্ষণ। এর আবার অনুমতি কি? আপনাকে আগেই বলেছি, এ-বাড়ীর দরজা আপনার জন্য সর্বদাই খোলা থাকবে, যখন খুসি আসবেন, যাকে খুসী নিয়ে আসবেন সংগে।'

'না, তবু গৃহকর্তার একটা অনুমতির প্রয়োজন বৈ কি।'

'না না। ওসব 'ফরমালিটি' আমার আদপেই নেই। জানেনই ত', আমরা হচ্ছি তখনকার কালের বি-এ, বি-টি! আতিথ্যটা আমাদের রক্তে ও মজ্জায় মিশে আছে। তা চলুন এবার উপরে, মিঃ সোরকারের ম্যাজিক বোধ হয় শেষ হয়ে এল, খাওয়া-দাওয়া এবারে সুরু হবে। আসুন। আমি দেখি আবার অতিথি-অভ্যাগতদের···' বলতে বলতে অমুতোষ বাবু ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

যুবক এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুব্রত ও অমুতোষ বাবুর কথাবার্তা শুনছিলেন। ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। অমুতোষ বাবুর প্রস্থানের সংগে সংগে সে সুব্রতর মুখের দিকে তাকালো। তার মুখের মাংসপেশীগুলো যেন একটা দৃঢ়তায় সজাগ হয়ে উঠেছে। গম্ভীর স্বরে সে বললে, 'এ সবের মানে কি সুব্রত বাবু? কেন আপনি অমুতোষ বাবুর কাছে আমার সত্য পরিচয় দিলেন না? কেন আপনি এ সব মিথ্যা কথাগুলো ওঁর কাছে বানিয়ে বললেন?'

'আশ্চর্য্য! মশাই, আপনার ব্যবহার! কোথায় আপনাকে একটা আকস্মিক বিশ্রী রকমের পরিস্থিতি হতে এ ভাবে বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিলাম বলে আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দেবেন, তা না, উল্টে আমাকেই কথা শুনাচ্ছেন?' সুব্রত স্মিত ভাবে বললে।

'ধন্যবাদ! আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইবো চিরকাল এর জন্য। কিন্তু এ সব কেন করলেন সেটা জানতে পারি কি? আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি, আপনি আমাকে প্রথম হতেই চিনতে পারছেন, এবং আমাকে আপনি এতটুকুও বিশ্বাস করেন না।'

'বিশ্বাস যে আপনাকে এতটুকুও করি না, সে কথা খুবই সত্যি মিঃ অসীম রায়। কিন্তু আমার তদন্তের ব্যাপারে আর কেউ মাথা ঘামাক, এটা আমি আদপেই পছন্দ করি না। ওটা আমার একটা 'ভ্যানিটি'ও বলতে পারেন।'

অসীম রায় সুব্রতর কথায় এবারে যেন সত্য সত্যই নিজেকে হারিয়ে ফেলে রুক্ষ স্বরে জবাব দেয়, 'কিন্তু আপনি যদি আমাকে চোর ঠাউরে থাকেন, অথবা ভেবে থাকেন শংকর ঘোষের হত্যাকারী আমিই, তবে কেন আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন না? কেনই বা সর্বদা এ ভাবে ছায়ার মত আমার পিছু-পিছু ঘুরছেন?'

'আরে, আপনি যে চটেই উঠ্‌ছেন অসীম বাবু! হট্ করে ঝোঁকের মাথায় আপনাকে খুনী বলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলে, আমাকেই তারা রাঁচী পাঠাবার হয়ত দ্রুত ব্যবস্থা করবেন। তা'ছাড়া কারো লাইব্রেরী ঘরে, একটা সেকালের পুরাতন ঘড়ির গুপ্ত ড্রয়ের সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধিৎসা যদি জাগেই, তাতে আমারই বা কি বলবার থাকতে পারে বলুন?'

অসীম রায় চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি সুব্রত বাবু! আপনার মুখের দিকে চাইতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। আপনি

অমুতোষ বাবুর সামনে আমি যাতে অপদস্থ না হই তার জন্ত আমাকে বাঁচাননি। আপনি নিজেও এই ঘড়িটার গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জানতে কম উৎসুক নন; এবং সেই জন্তই ও-ভাবে অমুতোষ বাবুর সামনে কতকগুলো মিথ্যা কথা ব'লে গেলেন। তা'ছাড়া আপনি ভাবেন, আমার ব্যবহারে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।'

'ঠিক। ঠিক ধরেছেন অসীম বাবু।'

'তা হলে শুনুন, ঐ ঘড়িটা সম্পর্কেও যেমন আমার কোন ঔৎসুক্য নেই, তেমনি আমার মধ্যেও জানবার মত কোন রহস্যই নেই। তার চাইতে আপনি এখুনি উপরে গিয়ে অমুতোষ বাবুর কাছে আমার ছদ্মবেশ উদ্‌ঘাটিত করে আমার সত্য পরিচয় দিন। সে জানুক যে আমি— আমি এক জন চোর। আপনার আমাকে এ ভাবে অনুসরণ অসহ্য।'

'তা'তে আমার ক্ষতি ছাড়া এতটুকুও লাভ নেই। ও কথা বললেই এখুনি তিনি আপনাকে এ-বাড়ী হতে ঘাড় ধরে বের করে দেবেন। তা'তে আমার কোনই লাভ নেই ত'।'

'ওঃ, বেশ। আপনি যদি মনে করে থাকেন, আপনি এ ভাবে আমাকে অনুসরণ করে আমার কোন গোপন রহস্য আপনি উদ্‌ঘাটিত করবেন, তা হলে মস্ত বড় ভুল করেছেন।'

'সত্যি না কি শ্রীযুক্ত অসীম রায়? আসুন না, এক হাত বাজী ধরতে রাজী আছেন সুব্রত রায়ের সংগে?' সুব্রত সহাস্য মুখে অসীম বাবুর দিকে পূর্ণ ভাবে তাকাল।

কিন্তু অসীম বাবু সুব্রতর কথার আর কোন জবাবই দিল না, দ্রুত পদবিক্ষেপে ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে গেল।

সুব্রতর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হাসির ঢেউ জেগে উঠে মিলিয়ে গেল।

একটু আগে কথা বলতে বলতে অসীম বাবু যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সে তার চোখ হ'তে রংগীন চশমাটা খুলে ঘড়ির সামনে রেখেছিল, যাবার সময় সেটা তাড়াতাড়িতে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে ঘড়ির সামনে থেকে চশমাটা তুলে নিল, এবং নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে সেটা রেখে ধীরে ধীরে যে খোলা দরজা-পথে একটু আগে অসীম বাবু অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই দরজার দিকে এগুল।

ম্যাজিক-পর্ব শেষ হয়ে গেছে, উপরে দোতলা হতে অভ্যাগতদের হাস্যমুখর সমালোচনা ও কলহাসি ভেসে আসছে।

সুব্রত আপন মনে একটা পরিচিত রবীন্দ্র-সুর শিষ দিতে দিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। [ক্রমশঃ

এলোমেলো

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দুলছে।
কাঁচা-পাকা মাথাগুলো কেবলি যে দুলছে।
দুলছে।
রেলগাড়ি ঘর্ঘর—
চুল ওড়ে ফর্‌ফর্‌,
ফেলে-আসা বাড়ি-ঘর সবি তারা ভুলছে।
দুলছে।
গরমেতে পাকে আম;
অবিরাম ঝরে ঘাম—

[illegible]

এক মিনিটের গল্প

তহমিনা

শামসুদ্দীন

তহমিনা।

ঠিক যেন বন-মল্লিকা। জীবন্ত পূর্ণিমা অথচ নিরাভরণ।

মুনীর বলে: পল্লবিনী লতের, যেন একটি মাংসের পিণ্ড।

এ সব ন্যাকামী চলবে না। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে চলতে হবে সমান তালে পা ফেলে। বুঝেছ? বোরখার ও-লেবাব ছিঁড়ে ফেল।

তহমিনা ভাবে: তাই ত'। চোখে নতুন আলোক, নতুন স্বপ্ন।

: হ্যাল্লো, রশীদ যে!

: এই ত,' তার পর?

: এই চলে যাচ্ছে। আজ একটু কাজ আছে ভাই। এক্ষুনি বাড়ী যেতে হবে। বড় পরিশ্রান্ত এখন। এক দিন আসিস্ কিন্তু আচ্ছা?

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মুনীরের জীবনে আসে শৈথিল্য। মনে জাগে বাস্তবের নির্লজ্জ রুঢ়তা।

: তহমিনা, একটু শুনবে কি?

: ও, তুমি। হ্যা, এখন ত সময় নেই। এই আটটা বাজতে ১০ মিনিট বাকী আছে। সুন্দর বই আছে অরোরাতে। এই যে রশীদ। ও, সময় নেই বুঝি? চলো, চলো।

তহমিনা বার হ'য়ে যায়। আর মুনীর চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। ভাবে: পল্লবিনী লতের।......

বর্ণ-বিদ্বেষ

মনোজিৎ বসু

এই পৃথিবীতে সবার রং এক রকম নয়। কেউ গোরা, কেউ কালো, কেউ পীত। তাই বোধ হয়, মানুষে মানুষে গায়ের রং নিয়ে এত বিদ্বেষ। ভারতবাসীকে কালা-আদমি ব'লে ইউরোপ-আমেরিকার শেতাঙ্গ জাতিরা এক সময় কি অবহেলা—কি অশ্রদ্ধাই না ক'রতেন! এখনো যে করেন না এমন নয়। তবে শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও মনের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণ-বিদ্বেষটা ক'মে আসছে। কিন্তু শিক্ষিত ও সুসভ্য বলে পরিচিত শেতাঙ্গ জাতির মনেও এক কালে এই রকম বর্ণ-বিদ্বেষ যে কত প্রবল ছিল, তারই ছোট্ট একটা কাহিনী আজ শোনো।

তোমরা নিশ্চয়ই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্জের নাম শুনেছ। তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অর্থাৎ এশিয়ার ও ইউরোপের বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি। তাঁর মত দার্শনিক সে-যুগে বড় একটা ছিল না। আর সব চেয়ে বড় কথা হলো, তিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মের এক জন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। এত গভীর পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি খৃষ্ট-ধর্মের মূল কথাগুলি

করা সম্ভব হ'তো না। এই জন্যই ক'লকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলে, বিশেষ ক'রে খৃষ্টান-মহলে রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের প্রসিদ্ধি ছিল।

কিন্তু হ'লে হবে কি! তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ খৃষ্টধর্ম-প্রচারককেও ক'লকাতার ইউরোপীয় গীর্জাগুলি ঢুকতে দেওয়া হ'তো না। তিনি উত্তর-ক'লকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে এক গীর্জায় পৌরোহিত্য ক'রতেন। সেখানে শুধু ভারতীয় খৃষ্টানরাই এসে তাঁর কথা শুনতেন, তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা ক'রে যেতেন। খাঁটি সাহেবেরা কেউ এখানে আসতেন না।

এদিকে হয়েছে কি জানো? বিলেতে থাকবার সময় অধ্যাপক ব্লকোর্ট নামে এক জন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের পাণ্ডিত্য ও খৃষ্টধর্ম-প্রচারের খ্যাতি শুনেছিলেন। তিনি যখন একবার কোনো কাজে ভারতবর্ষে এলেন, তখন রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা শুনতে ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তার পর ক'লকাতায় এসে এক দিন সোজা চ'লে গেলেন হেদুয়ার ধারের সেই গীর্জায়। কিন্তু যাওয়ার সময় মনে মনে তাঁর কতো দ্বিধা—কতো সংকোচ। শ্বেতাঙ্গ হয়ে তিনি যাচ্ছেন কালা-আদমিদের গীর্জায়, সংকোচ! সংকোচ হ'তে পারে বৈ কি। যদিও তিনি খৃষ্টান, যদিও হেদুয়ার ধারের এই গীর্জায় সেই খৃষ্টধর্মেরই আলোচনা হয়ে থাকে, তবু সাহেবের মনে সেই বর্ণ-বিচারের ভাবটাই প্রবল হয়ে দেখা দিল। যাই হোক, তিনি চুপি-চুপি গিয়ে তো গীর্জায় বেঞ্চে বসলেন। রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা হলো। অধ্যাপক ব্লকোর্ট আগাগোড়া তা মন দিয়ে শুনলেন এবং মনে মনে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতার অজস্র প্রশংসা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু সব দিক থেকে সন্তুষ্ট হলেও অধ্যাপক ব্লকোর্ট কিছুতেই রং-এর কথা ভুলতে পারেননি। এই প্রসঙ্গেই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"আমি তো গিয়ে বেঞ্চে বসলাম। কিন্তু চোখ দু'টি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে তাঁর বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। পাছে, রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের গায়ের ঐ কালো রং আমাকে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট করে তোলে, এই জন্যই চোখ খুলে রাখতে সাহস করিনি। কিন্তু, একথা আমি স্বীকার ক'রবই যে, তাঁর মতো এত সুন্দর ক'রে খৃষ্টধর্মের কথাগুলি ব'লতে বিলেতের আর কাউকেই শু'নিনি।"

তাহ'লেই দেখ, যাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রচার অধ্যাপককে মুগ্ধ ক'রেছিল সকলের চেয়ে, তাঁর (রেভারেণ্ড বাঁড়ুজ্জের) দেহের বর্ণই আবার তাঁর (অধ্যাপকের) অসন্তুষ্টির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু এই অধ্যাপকের কথাই বা বলছি কেন, বিখ্যাত কবি ল্যাণ্ড কালা-আদমিদের সব সহ্য ক'রতেন, ক'রতেন না কেবল ঐ গায়ের রং। তিনিও এক জায়গায় বলেছিলেন যে, তিনি কালা-আদমিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার কথা কল্পনাই ক'রতে পারেন না।

মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েও, যাঁরা তার বাইরের এই বর্ণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তোমরা তাদের কি চোখে দেখবে?

ক্যারম খেলা —রামকৃষ্ণ বসু

—অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ—
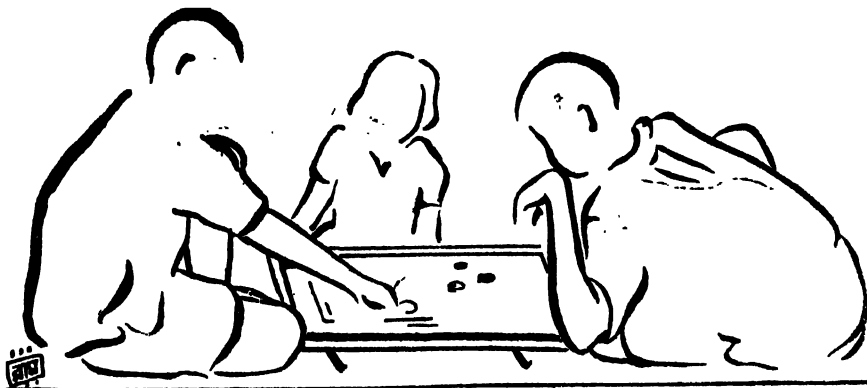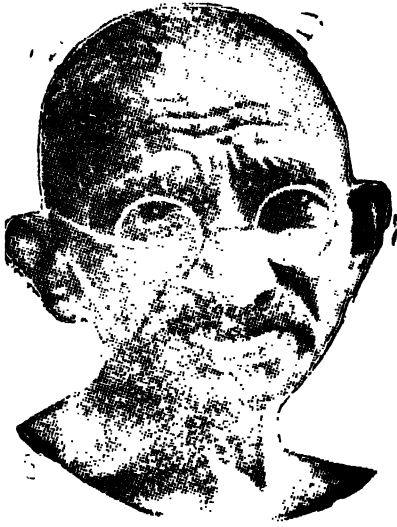
১৯৪৬ সালে গান্ধীজী দর্শনে

আরতি মণ্ডল

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত সব সময়েই কাগজের আশায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতাম। কাগজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভাই-বোনে কাড়াকাড়ি করতাম…কে আগে কাগজ পড়বে। আমরা তখন ফরিদপুরে ছিলাম। আমার মাসীমা ছিলেন আমাদের কাছে।

সেদিন শুক্রবার, আমরা তিন বোন, আর আমাদের মত মাসীমার ছুই মেয়ে কাগজের আশায় বসে আছি। কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সবাইকে কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখে দিদি বল্লেন, —"আমি পড়ি, তোরা শোন।" দিদির কথাই আমরা মেনে নিলাম। দিদি বল্লেন, "শোন একটা নূতন খবর।" আমরা সবাই আগ্রহের সহিত দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিদি পড়তে আরম্ভ করলেন: "আগামী রবিবার একটি বিশেষ ট্রেণে গান্ধীজী নোয়াখালী পরিদর্শনের জন্ত রওনা হইবেন।" আর কি খবর শুনবো, আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলাম "গান্ধিজী দর্শনের" উৎসাহে। মাসীমা আমাদের সব কাজেই উৎসাহ দিতেন। ভাবলাম—মাসীমার কাছে গেলে হয় তো আমাদের এই আশা পূর্ণ হবে, সবাই মিলে মাসীমার কাছে গেলাম। তিনি খুব উৎসাহেই বললেন, "বেশ তো, চল তোমরা, আমি তোমাদের নিয়ে যাব।" ছুই বোনের মধ্যে মা'ই ছিলেই বড়। তাই মাসীমা বললেন, "আগে তোমরা জামাই বাবুর মত নিয়ে এসো।" আমার বাবাকে আমরা সবাই ভয় করতাম। বাবার কাছে মত দিতে কেউই যেতে চায় না। আমাদের এই আশার আলো যে এই সামান্ত কাজের জন্ত নিবে যাবে, তা আমার সহ্য হল না। দিদি আর আমি গেলাম বাবার কাছে। আমরা দু'জনে বল্লাম: বাবা, গান্ধীজী রাজবাড়ী ষ্টেশনে pass করে নোয়াখালী যাচ্ছেন, আমরা কি রাজবাড়ীতে গান্ধীজীকে দেখতে যাব?" বাবা বল্লে: "তোরা কি কোন দিন গান্ধিজীকে দেখিস নি?" আমরা বল্লাম: "না।" বাবা বল্লেন: "আচ্ছা, তবে যা।" আনন্দে বাবার শেষ কথাটাও শুনতে আমার সইল না। দু'জনে দৌড়ে গিয়ে মাসীমাকে জড়িয়ে ধরে আর কোন কথা না, কেবল—"মাসীমা মত পেয়েছি।" Drawing roomএ আমাদেরই পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক আর মেসো মশায় ছিলেন। আমাদের সেদিকে লক্ষই ছিল না। এদিকে ভদ্রলোক তো অবাক্। তিনি মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "ব্যাপার কি?" মাসীমা সব কথা খুলে বল্লেন। তার পর আমরা সন্ধ্যা আটটার রেডিওতে ঠিক খবর শুনতে যেয়ে শুনলাম: "গান্ধীজীর যাওয়া বুধবার পর্য্যন্ত স্থগিত।" সে দিনের সেই উৎসাহ যে কি ভাবে দমন করেছি, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সেই ভদ্রলোকটির নাম অরুণকুমার গোস্বামী। তিনি বেশ একটু ঠাট্টার ছলেই বল্লেন: "Jumping for nothing." সেদিন আমাদের বলবার আর কিছুই ছিল না, শুধু শুনে গেলাম, আর ভাবলাম, বলবার দিন হয় তো আমাদেরও এক দিন আসবে।

ক্ষীণ আশা নিয়ে দিন গুণ্‌তে লাগলাম, দিন যেন যেতেই চায় না। সেদিনের সেই এক-একটি দিন আমাদের মনে হচ্ছিল যেন এক-একটি মাস, শনি, রবি…গুণতে গুণতে এলো মঙ্গলবার—খবরের কাগজ আসতেই দেখি, "বুধবার গান্ধীজীর নোয়াখালী যাইবার সম্ভাবনা।" গান্ধীজীর যাইবার কোন স্থিরতা নাই দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বুধবার ভোরে উঠে বারান্দায় বসে আছি আর ভাবছি আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা! মাসতুতো বোন শুক্লা এবং ভাই রঞ্জু দু'জনেই এসে আমার সঙ্গে গালে হাত দিয়ে সিঁড়িতে বসে পড়ল। আস্তে আস্তে এলো দিদি, মেজদি, কুলু, বাবলু ও মাস্তুতো বোন কল্যাণী। কিছুক্ষণ আমাদের দুঃখের কথা হ'ল। তার পর যে যার আপন কাজে চলে গেলাম। মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়ছি—হঠাৎ শুক্লা হাসি-ভরা মুখে ছুটতে ছুটতে এসে বল্ল।—"আরতিদি'—আরতিদি'! মা তোমাকে ডাকছেন।" শুক্লার মুখে হাসি দেখে বুঝলাম, নিশ্চয় কোন শুভ সংবাদ। কারণ একটু আগেই যাদের নিয়ে হয়েছিল দুঃখের কমিটি, তাদের মুখে হাসি—সংবাদটা শুভ না হয়েই পারে না। মাষ্টার মশায়ের কাছে ছুটি চাইবার ধৈর্য্যটুকু আমার ছিল না। ছুটে গেলাম মাসীমার কাছে, গিয়ে দেখি আমি ছাড়া সেই সভায় আর সকলেই উপস্থিত। এমন কি অরুণ বাবুও। কারণ আমি তখন মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়ছিলাম। মাসীমা বল্লেন: "তোরা স্নান করে ঠিক হয়ে নে। রেডিওতে আটটার খবর শুনে আমরা রওনা হব। আর কি, সেদিনের মত মাষ্টার মশায় ছুটি দিলেন। আমরা স্নান করে ঠিক হতে গেলাম। আনন্দের চোটে আমাদের কাজ যেন এগোতেই চায় না। আমরা ভাই-বোন সকলেই জামা-কাপড় পড়ে ঠিক হয়ে নিলাম, আটটার রেডিওতে শুনলাম, "বুধবার প্রাতে একটি বিশেষ ট্রেণে গান্ধীজী নোয়াখালী রওনা হয়েছেন।" আমাদের আনন্দ আর কে দেখে? আমরা ভাবতেই পারিনি যে ভাগ্যদেবী হঠাৎ আমাদের উপর এতখানি প্রসন্ন হবেন!

আমরা সাড়ে ৯টার ট্রেণে গান্ধীজী দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অরুণ বাবু আমাদের সঙ্গী হলেন। সেদিন আমরা একটু একটু করে অরুণ বাবুকে বলতে লাগলাম: "Jumping for something." তখনও তিনি বলেছিলেন যে, "এখন কেন বলছেন। দেখা তো না-ও হতে পারে।" আমরা এর উত্তরে বলেছিলাম, "এতখানি উৎসাহ নিয়ে রওনা হয়ে আমরা কেউই ভাবতে পারি না যে, গান্ধীজী-দর্শন আমাদের ভাগ্যে নেই।"

ট্রেণে উঠলাম। ফরিদপুর থেকে রাজবাড়ী যেতে ২-২।০ ঘণ্টা সময় লাগে। ট্রেণ খুব [illegible]

"কলকল্ ছলছল্ চলেছে ঝরণা জল স্থির নাহি এক পল চলেছে •••এই গানটার এই লাইনটাই আমরা বার বার গাইছিলাম, "আশা আছে দেখা মিলিবে।"•••রাজবাড়ী ষ্টেশনে নামলাম। আমরা যাঁর বাড়ীর অতিথি হয়েছিলাম তাঁর নাম মৃগেন ব্যানার্জ্জী। মৃগেন ব্যানার্জ্জী এবং মুকুল মিত্র আমাদের জন্ম ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁদের বাড়ী গেলাম। তাঁদের বাড়ীটা ছিল ষ্টেশনের খুব কাছেই। সেই জাগয়াটা বেশ সুন্দর গ্রামের মত ছিল। আমাদের জন্ম সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। গিয়েই চা খেলাম। খুব ইচ্ছা হল, এই গ্রামের মত আঁকা-বাঁকা মাটির পথে বেড়াতে। ভাই-বোন সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। একটু যেতেই দেখলাম কতগুলি বাড়ী। বাড়ীগুলি দেখবার জন্ম ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম, যত গ্রাম্যবধূ যে যার আপন কর্ম্মে রত। কেউ ধান ভাঙ্গছে, কেউ রান্না করছে, কেউ তার ছোট্ট ছেলে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা সেই আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে চলেছে। তাদের পরনে মলিন বসন। তাদের সেই সহজ সরল মিষ্টি ভাষাগুলি শুনে সেদিন আমার এই গানটাই বার বার মনে হচ্ছিল—"বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা"•••

কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও তারা আমাদের অভ্যর্থনা ঠিক সময়েই করেছিল। তাদের সেই ছোট্ট মাটির ঘরের বারান্দায় আমাদের বসতে বলতে তারা একবারও ভোলেনি। সকলেই সকলের বাড়ীতে বসতে বলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত কার বাড়ীতে বসব ঠিক করতে না পেরে আমরা বললাম—"আমরা বসবো না। আমরা সকলের বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখবো।" তখন একটা বুড়ি জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা দিদিমণিরা, তোমাদের তো কোন দিন দেখিনি?" "আমরা এখানে থাকি না। গান্ধীজী নাম শুনেছ?" "হ্যাঁ, গানদির নাম শুনেছি। সে না কি আজ এখানে আসবেন।" "হ্যাঁ, তিনি তোমাদের এই রাজবাড়ী ষ্টেশনে আসবেন। আমরা তাঁকে দেখতে ফরিদপুর থেকে এসেছি।" তারা সকলে জড় হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দিদিমণিরা, লোকে বলে—মুসলমানরা না কি আমাদের কেটে ফেলবে। এ কথা সত্যি না কি?" এ রকম যে কিছু হবে না তা যদিও আমাদের ঠিক জানা ছিল না, কিন্তু তবুও তাদের এই ছোট-খাটো সুখের সংসারে ভয় না বাড়িয়ে ভয় দূর করবার জন্ম বললাম, "কে বলেছে? ও-সব কিছু হবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।" তারা আমাদের কথাই বিশ্বাস করল।

হঠাৎ মা'দের ডাকে আমাদের চমক ভাঙ্গল। বাড়ী ফিরতেই মা'রা বললেন, "স্পেশাল ট্রেণ আসবার সময় হয়ে গেছে। তোরা ঠিক হয়ে নে। ষ্টেশনে যেতে হবে।"•••তার পর আমরা ষ্টেশনে রওনা হলাম। এই সব কাজের মধ্যে অরুণ বাবুকে দুই-এক বার jumping for something বলতে আমরা ভুলিনি। সেদিন আর অরুণ বাবু আমাদের কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কারণ, এ কথার প্রতিবাদ করার তার আর কিছুই ছিল না। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, সেখানে আমাদের মত অনেক মেয়ে। তাদের দেখে খুব আনন্দ হ'ল, কারণ তারাও এসেছে আমাদের মত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা সকলেই তাদের দলে মিশে গেলাম। আশে-পাশের দুই-একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে [illegible]। ষ্টেশনে গান্ধীজী দর্শনের জন্ম ছেলে-মেয়েদের বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রেণটা আসতেই আমাদের চোখে পড়ল গান্ধীজী হাত জোড় করে বসে আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করছেন। কিন্তু তার শরীর অসুস্থ থাকায় আমরা সমবেত কণ্ঠে তাঁকে কোন 'শাউটিং' দিতে পারি নাই। ট্রেণটা আসতেই ছেলেরা ছুটে গেল ট্রেণের সামনে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেই জায়গাটা ছিল প্ল্যাটফর্মের চেয়ে নীচু। এতে আমরা আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন দু'-তিন জন ভদ্রলোক বললেন—"আপনারা উঠে আসুন।" আমরা উঠে গেলাম এবং বেশ ভাল ভাবেই গান্ধীজীকে দর্শন করলাম। অতিরিক্ত ভীড় হওয়াতে আমরা আর অপেক্ষা না করে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। আমাদের আনন্দ আর কে দেখে? কারণ আমাদের আশা, মহৎ উদ্দেশ্য, কল্পনা সব কিছুই সফল হয়েছে। বাড়ী ফিরে এলাম। মৃগেন বাবুর বাড়ীর কাছেই একটা পুকুর ছিল, খুব ইচ্ছা হ'ল পুকুরে স্নান করতে। এই একটা দিনের আনন্দে বাধা দেবার ইচ্ছা বোধ হয় মা'দের ছিল না, তাই তাঁরা বল্লেন—"চল, সকলে পুকুরে স্নান করে আসি।" আমরা পুকুরে স্নান করতে গেলাম। ঘণ্টা-দুই জলে লাফা-ঝাঁপি করে বাড়ী ফিরে এলাম এবং আনন্দের মধ্যে দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করলাম। রাত্রি আটটার ট্রেণে যেতে হবে জেনে খুব ইচ্ছা হ'ল, আমাদের নূতন গ্রাম্য-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। সকলে তাদের ওখানে যেতেই তারা জিজ্ঞাসা করলে—"দিদিমণিরা, গান্দিকে দেখেছ। বললাম—"হ্যাঁ।" তার পর তাদের গান শুনালাম, গল্প করলাম। কোন্ ট্রেণে এখান থেকে যাব সব কিছুই তাদের খুলে বললাম। তার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। সকলে এক সঙ্গে রাজবাড়ী টাউন দেখতে বেরোলাম। ডাকবাংলা, কাছারী এবং টাউনের কিছুটা অংশ দেখে বাড়ী ফিরে এলাম। দিদি আমাদের মিষ্টি খাওয়ালেন, হৈ-চৈএর মধ্য দিয়ে মিষ্টি খাওয়া শেষ করলাম। তার পর রওনা হলাম ষ্টেশনের পথে। পথটা ছিল খুব সরু। রাস্তার পাশে একটা মাটির ঢিপি ছিল। তার নীচে খাল কিন্তু খালে জল ছিল না। সরু রাস্তা দিয়ে গরু আসছে দেখে দিদি সেই ঢিপির উপর উঠে খালে নামতে যেয়ে একটা চারা গাছে পা আট্‌কে খালের মধ্যে ধপাস্ করে পড়ে যায়।

মৃগেন বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ট্রেণে উঠলাম। ট্রেণ ছেড়ে দিল। আনন্দের অবসানে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

আমাদের দান

বেলা বসু

হে ভারত, আজি নূতন প্রভাতে স্মরিও মোদের দান
জাতির জীবনে এনেছে যে নারী শুচিতা ও কল্যাণ!
আমরা এনেছি রূপ-রস-সৌরভ
বাড়ায়েছি মোরা স্বদেশের গৌরব—
জাতীয় পতাকা হস্তে ধরিয়া বীর নারী দেছে প্রাণ।
সংগ্রাম-ব্রত নিয়েছি জীবন-পণে
পিছে থাকি নাই জাতির চরম-ক্ষণে;
ভগিনী ও জায়া, জননী-রূপিণী নারী
মুক্তি-যজ্ঞে আহুতি সঁপেছে তারি—
আমাদের বুকে স্বাধীনতা-দীপ জ্বলিছে অনির্বাণ।

রাতের শিউলী

কণপ্রভা ভাদুড়ী

শিউলীর বাসর-রাত্রি। সুখের বিষয়, আকাশে সে দিন চাঁদও ছিল, আবার কোকিলও ডাকছিল দূরে কাদের আম-বাগানে। বহু কল্পনার রং-মাখা প্রত্যাশার স্পর্শ-মাখা এই রাত্রি। এই রাত্রি শিউলীকে শান্ত হয়ে ঘুমুতে দিল না। বেদনা-বিনিদ্র চোখে সে তার নূতন সঙ্গীটির ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে বসেছিল। এক সময় রাত্রি জিগ্যেস করিল, "তুমি কি একেই চেয়েছিলে শিউলী? জান না? কাকে পেলে তাও জান না? কি ব'ললে, মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ছন্দ পতন ঘটেছে? তা সত্যি, কিছু মনে কোর না ভাই শিউলী। তোমার বরের নাক-ডাকার ওই শব্দটা কেমন যেন বিশ্রী—"

শিউলি সচকিত হয়ে সরে বসল। সত্যি, ওই শব্দটা বড় একঘেয়ে। উত্তরীয়তে টান লাগায় বরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শিউলীর হাত দু'খানি ধরে সে বললে, একটু গল্প করবে না। নাঃ, বড্ড জোরে কথা বলে, আর হাতও বড্ড জোরে চেপে ধরে। শিউলী একে ভালোবাসতে পারবে না।

বর আবার বললে, "বেশ, কথা না বল, কাছে এসে বস।"

ওরে বাবা, জীবনে যাকে কখনও দেখেনি, মনে যার এক কোঁটাও কোনও ধারণা নেই, মন যাকে চিনতেই পারছে না, শিউলী তার কাছে গিয়ে বসবে কি করে? একটু নির্জন স্থানে গিয়ে মনকে যাচাই করে দেখবার জন্য ও উঠে দাঁড়াল। গায়ের থেকে ওড়নাটা খুলে শয্যার একাংশে রেখে ও ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গভীর রাত্রে নববধূ গাঁটছড়া খুলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বর অসহায় দৃষ্টিতে সুন্দরী বধূর পানে চেয়ে রইল। এই মাত্র ঘর ও বাহিরের প্রমীলার রাজ্যে দুঃখের ছায়া নেবেছে। কোনও রকমে জেগে উঠলে আর নিস্তার নেই। এই নিষ্করুণা নারী-বাহিনীর হাতে হত্যা হবে নিজের নিভৃত রাতের সমস্ত প্রশান্তি। নিজের বাড়ী হলে ও নিশ্চয়ই একবার চ্যালেঞ্জ করে দেখত বধূকে, কিন্তু এখানে পদে পদে শাসন নয়, শঙ্কা। নিরুপায় হয়ে বর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের কেস আর লাইটার বার করে তার সদ্ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

ও-দিকে শিউলী পা টিপে-টিপে সমস্ত পথ অতিক্রম করে নেবে এসে দাঁড়িয়েছে নিজের পরিত্যক্ত বিবাহ-আসরে। এই স্থানটি ছাড়া আর কোথায় এক তিল জায়গা খালি নেই। যে দিকে চাও সর্বত্র ঘুমন্ত মানুষ। শিউলী এসে দাঁড়াল সামিয়ানার নীচে। আসর সন্ধ্যা বেলা যেমন ভাবে সাজান হয়েছিল ঠিক সেই রকমই রয়েছে, শুধু মেঝেটা বিশৃঙ্খল হয়েছে ফুলের পাপড়ী আর সিগারেটের বাক্সতে। সন্ধ্যা বেলা শিউলী যখন ফুলের মালা গলায় এই আসরে প্রবেশ করেছিল, তখন ও কি জানতো যে, ওর জীবন এমনি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? বরকে ও কিছুতেই ভাল-বাসতে পারবে না? দুষ্ট মন কিছুতেই সায় দেবে না নতুন মানুষটিকে ও চেনে বলে। কেন এমন হোল? শিউলীর এত রূপ, এত প্রত্যাশা, এত কল্পনা, এত অভিলাষ, এ কি মনের মধ্যেই ব্যর্থতার প্রাচীর চাপা পড়ে মারা যাবে? শিউলী অধৈর্য্য হয়ে কাঁদতে চাইল, কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জলও এল না। নিদারুণ ব্যর্থতা! শিউলী এখন কি করবে? এমন সময় পাহাড়ী দেশের এক সুদূর প্রান্ত হতে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল এক অশ্বারোহী তরুণ যুবা। শিউলীর তিক্ত বিক্ষিপ্ত মনে নেমে এল প্রশান্তির প্রলেপ। ও আত্মগত ভাবে বললে, "তুমি যেখানে রয়েছ, সেখানে একলা আমি কি করে যাবো? তোমায় মিনতি করি, তুমি এসে আমায় নিয়ে যাও।"

অশ্বারোহী হেসে বললে, "আচ্ছা আমি আসছি একটু পরে।"

সে আসছে, শিউলীকে নিয়ে যেতে সে আসছে। নিবিড় সার্থকতায় শিউলীর মন ভরে ওঠে। অনুভূতিতে জেগে থাকে শুধু একটি আশার রাগিণী, একটি বিশেষ ছন্দ নিয়ে, সুর নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে, স্মরণের প্রসন্নতা নিয়ে। হারায় না—কিছুই হারায় না; সবই মনের মধ্যে থাকে। কিছু বা ভালোবাসায়, কিছু বা অবহেলায়।

পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট দেশ। অঙ্গে তার কাঁচা ধানের সুষমা। বাতাসে তার প্রিয় স্পর্শ। বুনো ফুলের গন্ধে ভালোবাসার বিহ্বলতা। শিউলী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে তার দাদার বাড়ীতে। এইখানেই এক পাহাড়ের ধারে আতাবনের মধ্যে যে দেখা পেল ওই অশ্বারোহী তরুণ যুবার। চোখে চোখ মিলতেই ওর মন কথা কয়ে উঠল, একে আমি চিনি, এ আমার বহু জন্মের পরিচিত।

বৌদি মীরা ঠাট্টা করে বলে, "কি শিউলী, ঘটকালী করবো না কি?"

শিউলী হাসে আর বলে, "বৌদি যেন কি!"

মীরা যখন দ্বিপ্রহরে তার শিশুকন্যা সহ বিশ্রাম করে, শিউলীকে সেই সময় ডাক দেয় মুসাফির প্রান্তর। সে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ের ধারে শাল-মহুয়ার পায়ের কাছে আগাছায় ভরা কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে। পায়ের কাছ দিয়ে সর-সর করে বহুরূপী চলে যায়, কাঁটায় কাপড় ছিঁড়ে যায়, হাত ছড়ে যায়, তাতে শিউলীর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এই আতা-বনের ধারে এলেই ওর দেখা হয় সেই অশ্বারোহী যুবকের

কুমারের সঙ্গে। দুপুরে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় থেকে নেমে সে বিশ্রামের জন্য বাংলোয় ফেরে। শিউলীর সঙ্গে দেখা হলে সে হেসে রুমাল নেড়ে চলে যায়। শিউলীও হেসে হাত নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দেয়। ঘণ্টা কয়েক পরে বিশ্রাম করে ছেলেটি আবার যখন কাজে ফিরে যায় তখন দেখা যায়, শিউলীকে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে শাল ফুল কুড়াতে। কিন্তু চোখে চোখে কথা বলা কোনও ভুলেই বন্ধ হয় না। যখন অশ্বারোহীর দীর্ঘ দেহ পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়, অশ্বখুরধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায়, তখন শিউলীর মনে জাগে অদম্য কৌতূহল। পাহাড়ের বাঁকে কি আছে? শিউলী জানে না. পাহাড়ের ওই বাঁকে খুব জোর পাথর-কাটার কাজ চলছে। লোভী মানুষ প্রকৃতিকে নিরাভরণা করে মহানগরীর বুকে গড়ে তুলছে ঐশ্বর্যের মীনামহল। অসংখ্য শ্রমিক খাটছে. অজস্র অর্থ আসছে ঘরে, সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট কোয়ারীর মালিক হৃত-গৌরব বীর রাজপুত-নন্দনদের উদরের স্ফীতিও বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। আর কুলি-মজুর, মেয়ে-পুরুষ, যারা নিজের বিন্দু বিন্দু দেহের রক্ত দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পশুর মত পরিশ্রম করে তাঁদের অর্থ আগমের পথ সুগম করে দিচ্ছে, তাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ, দারিদ্র্য আর দুর্নীতির কি উৎকট আত্মপ্রকাশ! মরুক তাদের ঘরের জোয়ান ছেলেরা যক্ষ্মা হয়ে, কচি ছেলেরা কলেরা হয়ে, পড়ে থাক ওদের ঘরের মেয়েরা গিয়ে বিদেশীদের বিলাস-কক্ষে—একটা রঙ্গীন কাপড় আর দু'টো টাকার লোভে, তা'তে কারু কিছু এসে-যাবে না। হোক যত দুর্নীতি, তাতে টাকা আসা ত বন্ধ হবে না—টাকা বরং বেশীই আসবে। টাকা চাই—আরও টাকা! মাঠের ঘাস শুকিয়ে হলদে হয়ে যাক্ ক্ষতি নেই, মাটিতে যতটুকু রস আছে নিংড়ে নেওয়া চাই। মানুষের দুরন্ত লোভের রসদ জোগাচ্ছে ওই পাহাড়। জঙ্গল কেটে মরুভূমি হয়ে গেল, পাহাড় কেটে খাদ হয়ে গেল, তবুও মানুষের তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই। ওই পাহাড়ের বাঁকে সুদর্শন অশ্বারোহী যুবাটি কি করে, শিউলীর দেখতে ইচ্ছে করে।

দ্বিপ্রহরের প্রশান্ত নিভৃতির মধ্যে শিউলী রোজ আশা করে থাকে—ওদের মধ্যেকার অপরিচয়ের ব্যবধান আজ নিশ্চয়ই ঘুচে যাবে। নিশ্চয়ই আজ কোনও ছলে ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটি ওর সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু কোনও দিনই তার সে আশা সফল হয় না। অশ্বারোহীর যাতায়াতে কোনও দিন ব্যতিক্রম ঘটে না, হাসিতে কোনও অকপটতা থাকে না, অঙ্গুলী ইঙ্গিতেও মধুরতা দেখা যায় না। তবুও শিউলী রোজই আসে, ছেলেটি তাকে দেখে রোজই হাসে।

এই সময় এক দিন সেই কোয়ারীতে বেড়াতে এলেন এক বিখ্যাত সেতারিষ্ট। সেতারে তাঁর সে কি মিঠে হাত! তাঁর মেজরাপ-পরা আঙ্গুলগুলি যখন তারের উপর খেলা করে, তখন মনে হয় তাঁর পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বত্র নেমে আসে অসংখ্য উর্বশী আর তিলোত্তমা। সকলেই আদর করে তাঁকে নিয়ে যায় বাড়ীতে, বাজনা শোনে, খাওয়ায়। সে দিন শিউলীদের বাড়ীতে ছিল তাঁর নিমন্ত্রণ। অনেকক্ষণ বাজনা শুনিয়ে তিনি বাইরে এসে বসলেন। সকলে তাঁকে ঘিরে বসল গল্প শোনার জন্য। তিনি অনেক দিন নিজাম ষ্টেটে ছিলেন শিক্ষানবীশ হয়ে। এক সময় তিনি বললেন, আজ আপনাদের শোনাবো আমার জীবনের সাধনা-সিদ্ধির অপূর্ব উপলব্ধির কথা।

সকলে উৎসুক হয়ে বললে, "বলুন ওস্তাদজী, বলুন।"

পায়ের উপর পা তুলে অপূর্ব ভঙ্গীতে একখানি হাত হাঁটুর উপর রেখে তিনি বসলেন। চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল তাঁর অঙ্গুরীয়ের কমল হীরা। মণিবন্ধে বাঁধা সোনার ঘড়ি। শিউলী মীরার কানে কানে বলল, "বৌদি, ইনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কোনও যোগী"—

মীরা বললে, "যোগী নয় রে গন্ধর্ব।"

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি যখন হায়দরাবাদে ছিলাম, তখন প্রতিটি পূর্ণিমা রাত্রে নীল পাহাড়ে গিয়ে বসে সেতার বাজাতুম। সে দিনও ছিল এমনি পূর্ণিমা রাত। নির্জন শৈলভূমি। আমি বসে সেতার বাজাচ্ছিলুম, এক সময় শুনতে পেলুম, অপূর্ব এক নূপুর-শিঞ্জিনী। আমার সমস্ত চেতনায় নেমে এল বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-শিহরণ! চোখ মেলতে চাই, কিন্তু পারি না। প্রত্যক্ষ অনুভব করছিলুম সামনে কারুর উপস্থিতি। জোর করে চোখ খুলতে অপূর্ব এক দৃশ্য দেখলুম। নীল শাড়ী-পরা অপূর্ব এক নারীমূর্ত্তি দুলুর পায়ে নাচছে। ওঃ, সে কি নাচ, পা মাটিতে পড়ছে কি না পড়ছে; দেহের সে কি ভঙ্গী, রূপের কি জ্যোতি, হাতে ধরা ছিল তাঁর একটি বীণা। আর গলায় সাদা মুক্তার মালা। তাইতে আমার ধারণা হোল, ইনি নিশ্চয়ই সরস্বতী। যেই এই কথা মনে ভাবা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের যন্ত্রও গেল থেমে। সমস্ত মন লুটিয়ে পড়তে চাইল তাঁর পায়ের তলে। সেতার ফেলে আমি পাগলের মত তাঁর পায়ের সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়লুম। 'মা গো, আমার ডাকে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিলে তুমি?' তার পর যখন চেতনা হোল, চোখ মেলে দেখলুম, আকাশে তেমনি জ্যোৎস্না, তেমনি নির্জন শৈলভূমি। কিন্তু কোথায় আমার সেই নৃত্যপরা মাতৃমূর্তি? কোথায় মিলিয়ে গেল সে অপূর্ব নূপুর-নিক্কণ? আর কি একবারও দেখতে পাবো না? হায়, হায়, কেন অত তাড়াতাড়ি বাজনা বন্ধ করে দিলুম? না দিলে হয়ত আরও কিছুক্ষণ দেখতে পেতুম। সকলে শুনে বললে, 'আমি না কি সিদ্ধ সাধক। সার্থক আমার সাধনা! আমি কিন্তু সেই থেকে আজও মনে মনে বিরাট ব্যর্থতায় বোঝা বয়ে—বেড়াচ্ছি। যেখানে যত পাহাড় আছে, সমস্ত জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ আজও পাইনি; মনে হয় পাবো, জীবনের শেষ দিনেও পাবো।"

তিনি চুপ করলেন, চাঁদের আলোয় তাঁর চোখের কোণে জলে উঠল বিন্দু-বিন্দু অশ্রু। শ্রোতাদের মুখে কোনও কথা নেই। শিউলীর দাদা তখন মনে মনে ভাবছিলেন, "এ আবার আর এক জাতের পাগল!" পাগলামী বন্ধ করার জন্য তিনি বাজখাই গলায় হেঁকে বললেন, "ওস্তাদজী, আপনার খাবার প্রস্তুত।" ওস্তাদজীর মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র এক হাসি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

সে দিন ছিল রাসের পূর্ণিমা। কোয়ারীর ম্যানেজারের বাড়ী ভগবানের জন্মোৎসব। নিমন্ত্রিত হয়ে সকলেই সেখানে গেছেন। শুধু শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ীতে রইল মীরা আর শিউলী। ওরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, এই দিনে ওরা যাবে নীল পাহাড়ে সেতার নিয়ে। মা সরস্বতীকে মর্ত্যে অবতরণ করানোর জন্য সাধনা করবে। মীরা সেতার বাজায় খুব ভালো। শিউলী বললে, "ওস্তাদজী যদি পারলেন, তুমিই বা কেন পারবে না বৌদি?"

সন্ধ্যার পর বাড়ীর সকলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে গেলে, ওরা

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ের পথে। আমলকী আর বাবলার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অপ্রশস্ত পাহাড়ী-পথ। আগে যাচ্ছে মীরা পিছনে শিউলী, তার হাতে সেতার। মীরা এ-দিকের পথ-ঘাট সব চেনে, তাই সে আগে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চারি দিক্ হাসছে। এক সময় মীরা বললে, "ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে রূপালী পাতের মত একটা জিনিষ মাটিতে পড়ে রয়েছে, ওটা কি বল ত শিউলী ?"

শিউলী চেয়ে দেখলে, দূরে—বহু দূরে, নিম্নভূমিতে, আকাশ আর বনানীর মধ্যভাগে শ্বেত-শুভ্র একটি ললিত রেখা। "মরুভূমি না জ্যোৎস্নায় অমন দেখাচ্ছে বৌদি ?"

মীরা হেসে বললে, "দূর বোকা, এদিকে মরুভূমি কোথায় ? ওটা হচ্ছে গঙ্গা, ওইখানটা রাজমহল কি না ? রাজমহলের গঙ্গার ধারে 'সব্‌জী দালান' নামে চমৎকার একটি উত্তান আছে। দেখতে যাবি শিউলী ?"

শিউলী বললে, "চল না বৌদি" ?—

এমন সময় মীরা চেঁচিয়ে উঠল, "এই শিউলী, অত কিনারা দিয়ে হাঁটিসনি ; নীচে কি গভীর খাদ দেখেছিস্ ? একবার পা ফসকালে একেবারে জীবন্ত সমাধি !"

শিউলী চকিত হয়ে বলল, "তাহলে যে আমাদের সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

পাহাড়ের গায়ে এ জায়গাটায় অসম্ভব বনতুলসীর জঙ্গল। হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। কিন্তু তার একটু পরেই এক জাতীয় সাদা সাদা ফুল দেখা গেল ; সে আপন শুভ্রতায়, সুগন্ধে আপনি পরম ঐশ্বর্যবান। কি তার গন্ধ চমৎকার, সেই নির্জন পাহাড়ী পরিবেশের মধ্যে মনকে যেন পাগল করে দেয়। মীরা বললে, "এরই নাম কুচি ফুল। রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন এই ফুল।"

শিউলী একটি ফুল তুলে নিয়ে মাথায় রাখল গুঁজে। ঠিক এই সময় পাহাড়ের পিছন থেকে একটা কিসের শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হোল, কারা যেন মাটী পিটছে। এ ত পাহাড়-কাটার শব্দ নয় ? তবে কি ? ওরা দু'জনে থেমে দাঁড়াল। শব্দ আরও নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার উৎকট প্রতিধ্বনি। কেউ কোথাও নেই। নির্জন দুর্গম পাহাড়ের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে দু'টি তরুণী ভাবছে, কি করা যায় ? মাথার উপর রয়েছে তাদের আশাদাত্রী পূর্ণিমার চাঁদ। মীরা বললে, "চল শিউলী, ফিরে যাই। বুঝতে পারছি না কিসের শব্দ ?"

শিউলী বললে, "বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটা কিছু ছুটে আসছে এদিকে। কিন্তু সেটা বাঘ-গণ্ডার নয় ত ?"

মীরা বললে, "গণ্ডার এ জঙ্গলে নেই। বাঘ মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু বাঘ এলেই তার কেউ ডাকে। তাই মনে হচ্ছে, বাঘ নয়। তবে মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ীরা শীকার করতে বেরোয় শুনেছি। অনেক সময় ওরা হাতের টিপ লক্ষ্য করার জন্ত মানুষও মারে। দৌড়ো শিউলী, খুব জোর দৌড় মার—" শিউলীকে তখনও হাসতে দেখে মীরা খিঁচিয়ে বললে, "জানিস না ত কিছু ? দাঁত মাজ্‌-করা তখন বেরিয়ে যাবে। দলে দলে দৈত্যের মত সব বুনো মানুষ, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিষ-কাঁড় দিয়ে যখন পা খোঁড়া করে দিয়ে, লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত আগুনে ঝলসে খাবে, তখন মেয়ের হাসিটা থাকবে কোথায় ?"

ব্যাপারের গুরুত্বটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শিউলীও এবার ছুটতে সুরু করল। মীরা তার হাত থেকে সেতারটা নিয়ে আগে ছুটেছে। কিছু দূর যেতেই ওরা পাহাড়ের নীচে দেখতে পেল একটা আলোক-রশ্মি। পিছনের শব্দও সমানে ওদের পিছু-পিছু আসছে, তবে গতি কিছু শ্লথ হয়েছে বলে বোঝা যায়। এমন সময় নীচু থেকে হাঁক এল, "কৌন হ্যায় উপরমে ?"

মীরা বললে, "আমাদের চাপরাশী রে শিউলী"—

শিউলী চিৎকার করে বললে, "আমরা রাম সিং, তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে এস।"

রামসিং বললে, "আমি আসতেছি দিদিমণি, কুছ ডর নেহি।"

মীরা ফিস-ফিস করে বললে, "থামিস্ নে শিউলী, একেবারে কাছে এসে পড়েছে—"

শিউলী বললে, "থামিনি, তুমি চল।"

এমন সময় একটা বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল থেকে রামসিং আলো হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই, ওরা দু'জনে থমকে থেমে পড়ল, এবং সেই সুযোগে ঘোড়ায় চড়ে একটি সুন্দর যুবা ওদের অতিক্রম করে চলে গেল। মীরা ত হেসে আকুল। ওঃ, এর জন্ত আমাদের এত ভয় ? দাঁড়াও না, ছেলেকে জব্দ করছি আমি। আমি আর হাঁটতে পারবো না রে শিউলী। বড্ড পা-ব্যথা করছে !"

শিউলীর কানে কিন্তু মীরার কোনও কথাই যাচ্ছিল না। ওর চোখের সামনে তখন ভাসছিল। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একটু হেসে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়ার মোহন ভঙ্গীখানি। একেই ত বলে বীরপুরুষ। এর পায়ে শিউলী সমস্ত জীবন বিলিয়ে দিতে পারে। মনখানি সুন্দর বলে ত হাসিখানিও এত সুন্দর! মীরার বিদ্রূপ আর আক্ষেপের তীক্ষ্ণ শলাকা ওর মনে কোনও রেখাপাতই করতে পারল না। পাহাড়ের বাঁকে কি আছে ওর দেখাও হোল না। যে পথে ওরা এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে গেল। মীরা রাগ করে তার সেতার রামসিংএর হাতে দিয়ে দিল। শিউলী তখনও নিরুত্তর।

তার দিন কয়েক পরে শিউলীর বাবা খবর পাঠালেন মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্ত। কারণ তার বিয়ের স্থির করা হয়েছে। খবর শুনে শিউলীর মুখ কালো হয়ে গেল। বিয়ে হবে ওর কার সঙ্গে ? সে কেমন হবে ? শিউলী তাকে কি ভালোবাসতে পারবে ? কখনও না। ওর সমগ্র চেতনায়, সমগ্র ভালবাসায় জড়িয়ে রয়েছে একটি অশ্বারোহী তরুণ যুবার মধুর স্মৃতি। চোখের তারায় তারায় যে প্রেম হয়, তাকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে করে শিউলী।

যা হোক, শিউলীকে তার প্রেমের স্মৃতি-জড়ানো কোয়ারী ছেড়ে যেতেই হোল। পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট ষ্টেশন। শিউলী গাড়ীতে উঠে বসেছিল। এখনি ছাড়বে। মীরা এসেছিল ওকে পৌঁছে দিতে। এক সময় বললে, "ওই অসভ্য ছেলেটার জন্ত আমাদের সেদিনকার সমস্ত আনন্দ মাটী হয়ে গেল, না রে শিউলী ?"

শিউলী ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় সে বৌদি ?"

মীরা দেখিয়ে দিল, প্ল্যাটফরমের নীচে ঘোড়া নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কারুর জন্ত অপেক্ষা করছে। কিন্তু মুখর মূর্ত্তিখানি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শিউলীর হৃদয়

উপর। মীরা তার অর্থ বুঝেই শিউলীকে দেখিয়ে দিল। গাড়ী ছেড়ে দিল। মীরা চোখে জল নিয়ে নেবে গেল।

শিউলীর চোখে চোখ মিলতেই, অশ্বারোহী হেসে হাতের রুমালখানি উড়িয়ে দিল বাতাসে। একেই শিউলীর মন ভালো ছিল না, তার পর ঠিক বিদায়ের মুহূর্ত্তে তাকে দেখে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। শিউলীর একবার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, "চল্লাম, জীবনে আর কোনও দিন হয়ত দেখা হবে না।" কিন্তু হায়, রেলগাড়ী ওর আত্মসংবরণের জন্য অপেক্ষা করল না। শিউলীর সমস্ত আশাময় আবেগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিষ্ঠুরের মত চলে গেল অজানা ভবিষ্যতের দিকে। সীতা পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য যা ছিল, তা অদৃশ্যই রয়ে গেল। যা ঝরে যাবার, তা ঝরে গেল; যা সঙ্গে নেবার তাই নিয়ে শিউলী প্রবেশ করল তার নূতন জীবন।

নিশীথিনীর শ্লথ অঞ্চল তখনও পৃথিবীর গায়ে রয়েছে জড়ানো। বিদায় নেবার সময় হয়েছে শুকতারার। প্রথম বর্ষার নূতন শিউলী গুলি সবে ঝরতে সুরু করেছে। নূতন সূর্যের সম্ভাবনায় আকাশের সুদূর প্রান্তরে ঈষৎ সাদার প্রলেপ। একটি নূতন দিন গিয়ে আর একটি নূতন দিন আসছে। সে কি নিয়ে আসছে পৃথিবীকে দেবার জন্য? শিউলী ভাবছে পূর্ব-দিগন্তের পানে চেয়ে, কিছুই নয়, এই আগামী দিনের গহ্বর শুধু বিরাট ব্যর্থতায় ভরা। তা না হলে কাল যা ছিল মধুর, একান্ত আপনার, আজ তাকে আর নিজের বলে খুঁজে পাই না কেন? যাকে কোনও দিন চিনতুম না, সেই আজ এসে দাঁড়াল কাছে, আর যে ছিল কাছের, সে চলে গেল কোন্ দূরান্তে! শিউলীর কল্পনার রথাশ্ব যে আরও কত দূর-দূরান্তরে ছুটে বেড়াত, তার কিছুই ঠিক ছিল না, কিন্তু হঠাৎ দোতলার বারান্দায় কাশির শব্দ শুনে ও চমকে উঠে উপর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেল, বারান্দায় রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর বর। দু'টি চোখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা! শিউলী চকিতে মাথার উপর আঁচলটা তুলে দিয়ে উপরে উঠে গেল। একটি অচেনা লোকের নীরব আহ্বানে সে কেন এমন ভাবে ছুটে যাচ্ছে, শিউলী তা বুঝতে পারল না। ও নিজের ইচ্ছা-শক্তির অজ্ঞাতে সেই অপরিচিতের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হোল। ওকে দেখে সস্নেহে বর বললে, "ওখানে কি খুঁজতে গিয়েছিলে শিউলী? কি জিনিষ তোমার হারাল?"

শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় কিছু যাদু আছে না কি? বরের চোখের দিকে একবার চেয়ে তখনই চোখ নীচু করে শিউলী বললে, "না কিছু হারায়নি।"

শিশুর খেলাধুলা

দীপিকা পাল

শিশু খেলতে ভালবাসে। শৈশবের অধিকাংশ সময়টাই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছোটদের কাটে। ছোট শিশু মাত্র দু'-তিন মাস হয়ত তার বয়স, কিন্তু রাত-দিন শুয়ে শুয়ে আপন মনেই হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে চলেছে। শিশুর এই খেলাধুলার মধ্য দিয়েই তার প্রাণপ্রাচুর্য্য ও সুস্থ দেহ-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে শিশু তেমন খেলাধুলা করে না, নির্জীব, নিষ্প্রাণ বা কাঁদুনে, রাত-দিন কেবল ঘ্যান-ঘ্যান করে, তার সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কারণ আছে। হয়ত তার শরীর ঠিক সুস্থ নয় কোন গলদ আছে কিংবা ঠিক মত পুষ্টি হচ্ছে না, কিংবা এই ধরণের অন্য আর কোন কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান।

সামান্য জিনিষের মধ্য থেকেই শিশুরা কত খেলার বস্তু আহরণ করে নেয় ও তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মত্ত থাকে। তারা নতুনত্ব চায়। মাঝে মাঝে হয়ত খেলার বস্তুর সন্ধানে মায়েদের দরকারী জিনিষ নিয়েও টানাটানি সুরু করে; কখনও কখনও হয়ত রীতিমত অঘটনও ঘটিয়ে বসে থাকে।

দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম ও অঙ্গ-পরিচালনার দরকার। খেলাধূলার মধ্য দিয়েই শিশুর সে প্রয়োজন মেটে। আবার খেলাধুলার মধ্য দিয়েই শিশুরা নিয়মানুবর্ত্তিতা ও discipline শেখে। প্রত্যেক খেলারই কতকগুলি নিয়ম আছে। তা না মানলে চলে না; কারণ তা'হলে সেই খেলার সকল মাধুর্য্য নষ্ট হয়—তা আনন্দদায়ক হয় না।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, খেলাধুলা সময়ের অপব্যয় মাত্র। তাই শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন খেলাধুলা ছাড়া অন্য বিষয়েও (যেমন লেখাপড়া ইত্যাদিতে) তাদের মন দেওয়ার দরকার বলে মনে হয়, তখন থেকেই অভিভাবকেরা ছোটদের খেলাধুলাকে এক রকম বিষনজরেই দেখতে সুরু করেন। কিন্তু এই রকম ধারণা থাকা যে খুবই ভুল সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নেই। অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাই না যে, ছোটরা রাত-দিনই খেলা নিয়ে মেতে থাকুক। তবে শিশু-জীবনে যে খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে, এ কথা না স্বীকার করে উপায় নেই।

খেলাধুলায় শিশুর প্রথমেই দরকার সঙ্গীর। কিন্তু সে কেবল শিশুর খেলার সুবিধার জন্য নয়। শিশুর মনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলবার জন্য শিশুকে পাঁচ জনের মধ্য দিয়ে মানুষ করে তোলার দরকার। নিঃসঙ্গ ভাবে যে সব শিশুরা মানুষ হয়, তাদের মন ঠিক ভাবে প্রসারতা লাভ করে না। ফলে তারা স্বার্থপর, সঙ্কুচিতমনা ও অসামাজিক হয়ে গড়ে উঠে। পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হলে প্রত্যেককেই কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন আপনা থেকেই গড়ে উঠে ও সহানুভূতিশীল মনের বিকাশ হয়।

যখন আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন ছিল, তখন এক সংসারে সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে মানুষ হত। সুতরাং সঙ্গীর অভাব শিশুরা তেমন বোধ করত না। কিন্তু একক (single) সংসারে শিশুরা সঙ্গীর অভাব যথেষ্ট বোধ করে। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ে বা বোর্ডিংএ কিংবা যেখানে সুবিধা আছে সেখানে আরও ছোট থেকে কিণ্ডারগার্টেনে ভর্ত্তি করে দেওয়া ভাল। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যে শিশুকে নানা শিক্ষণীয় বিষয় শেখান যায়, Kindergartenগুলি তারই প্রমাণ। আর এই খেলাধূলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের যত সহজে শিখাতে পারা যায় তেমন আর কিছুতেই নয়।

মনের সজীবতা ও প্রফুল্লতা বজায় রাখবার জন্য খেলাধুলা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এইটাই খেলাধুলা করার সব চেয়ে বড় উপকারিতা। সুতরাং ছোটদের খেলাধুলা করা যে কেবল দোষণীয় নয় তাই নয়, এর আবশ্যকতাও আছে।

মালয় দেশে সাড়ে তিন বছর

শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

ষোড়শ খণ্ড

১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা ছ'টার সময় আমরা লোক-মুখে খবর পেলাম যে, সিঙ্গাপুর জাপানীরা অধিকার করেছে সম্পূর্ণ ভাবে। পরের দিন ভোর বেলা প্লেন এসে কাগজ ফেলে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, যুদ্ধ এদেশে থেমেছে, সিঙ্গাপুর নাম এখন নেই—"সোনানতো" নতুন নাম হয়েছে। গোলা-গুলীর ভয় থামল কিন্তু জাপানীর কবলে আমাদের কি হবে, পুরুষদের মধ্যে সেই কথাই বলাবলি চলল। ধন্যবাদ ও নমস্কারের যথাযথ প্রথা তারা আগেই বলে দিয়ে গেছে, এ ভাবে মেনে না চলতে পারলে তরোয়ালের কোপ খেতে হবে। ঠিক হল যে আমরা এবার বাসায় ফিরে যাব। গাড়ী বা বাস মেলে না, গরুর গাড়ীতে জিনিষ-পত্র ও ছেলেদের নিয়ে আমাকে উঠতে হবে। চার মাইল হাঁটা ত আমার পোষাবে না, সে অভ্যাসও নাই। সবাই তখন লরীর চেষ্টা করতে বেরুলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক কনট্রাক্টারের একটি লরী পাওয়া গেল। তখনকার সময়ে লরী পাওয়া বা দেখা যেতই না, সেদিন সন্ধ্যায় যখন লরী চেপে আমরা প্রথম সহরে এলাম, তখন লোক ভেঙ্গে পড়ল লরীর ধারে, সবাই তখন লরী চালককে পাকড়াও করল—কাল থেকে আমাদের প্রতি জনের সংসার সহরে তুলে আনতে হবে। মন্দ নয়, ব্যবসাটা বেশ চলবে ভেবে সেও চার গুণ ভাড়া হেঁকে দিল, তবুও লোকে রাজী হল, অন্ততঃ গরুর গাড়ী চড়তে হবে না। ছ'মাসের পরে আবার আমরা বাসায় ফিরে এলাম, নিজের বাড়ীতে আজ লাগল অদ্ভুত। সাধের পোষা জানোয়ারগুলির পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল—স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ। বাড়ীর দেওয়াল শার্শী ভাঙ্গা, কাচের টুকরো কুচিতে পা ফেলবার উপায় নেই। উঠানের উপর সুন্দর ডালিম গাছটির তলায় কোন প্রভু আগুন জ্বালিয়ে রান্না করেছেন, তার তাতে সেই যে গাছটি শুকিয়ে গেছে, আজ এই দীর্ঘ চার বছরে তার একটি পাতাও গজাতে দেখলাম না, কত কষ্ট কত যত্ন তাকে করেছি। তার লাল টুকটুকে ফলগুলি ঠিক পশ্চিমী আনারের মত মিষ্টি ছিল। বড় ব্যথা পেলাম গাছটির দুর্দ্দশা দেখে। যুদ্ধ যে একটা হয়ে গেল তার সমস্তই চিহ্ন চারি দিকে পরিস্ফুট। কলে জল নাই, কুলী ডেকে নদী থেকে জল তুলিয়ে বাড়ী-ঘর পরিচ্ছন্ন করিয়ে তবে বসবাসের উপযোগী করা হল। রাত্রে আলো নাই, সকাল সকাল শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য উপায় নাই, সারা রাত ঘুম হল না, ভাবনা আছে—ভয়ও আছে। সকালে উঠে আমরা এদিক্ ওদিক্ ঘুরছি এমন সময়ে ওংলী এসে হাজির। ওংলীর সাথে চার মাস পরে দেখা, সে এখানে এসেছে দুপুরে 'টৈমেলো'তে যাবে। সেখানে তার বাপের মস্ত কাঠের কারবার ও বড় বড় ওষুধের দোকান আর হোটেল দু'-তিনখানা আছে। ধনী বাপের একমাত্র পুত্র সে, জাতে কংকু, চীনা অর্থাৎ ভদ্রলোক। ওংলীর বাপ-মার সাথে আমাদের খুবই পরিচয় আছে। পথে আমাদের বাড়ীটি পাওয়ার জন্য সে বিশ্রাম করতে এসেছে। কিন্তু বেচারার অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। মাত্র একটি ছোট প্যান্ট তার পরণে! কোয়ালালামপুর থেকে সে আসছে। কোয়ালালামপুর থেকে তের মাইল সে বেশ আনন্দেই আসে। তার পর থেকে তার দুর্দ্দশা সুরু হয়। পথের ধারে এক জায়গায় কতকগুলি জাপানী সৈন্যের সাথে দেখা হয় এবং তারা ওকে থামতে ইসারা করে। ওংলী কথা মত সাইকেল হতে নেমে তাদের কাছে যায় ও ইংরাজিতে বলে যে, আমি টৈমেলো যাচ্ছি বাপ-মার কাছে। তারা ইংরাজী শুনেই তার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছে ও ভবিষ্যতে যেন ও-ভাষায় কথা না বলে তার জন্য সাবধান করে দিয়েছে। এত অপমানিত হয়েও ওংলী চলে আসছিল কিন্তু এক জন এসে তার সাইকেলটি কেড়ে নিল। অনেক কাকুতি-মিনতি করেও ফেরত পেল না। তার ব্যাগ কোট প্যান্ট সার্ট মোজা জুতো সব কেড়ে নিল। ফেরৎ চাইলে মুখ খিঁচিয়ে উঠল, "আলান আলান পিগিনে"—অর্থাৎ হেঁটে হেঁটে চলে যাও।

সপ্তদশ খণ্ড

জাপানীর রাজত্ব প্রায় এক বছর হতে চলল। প্রথম খুবই কষ্ট হত তাদের ভাষা বুঝতে ও বোঝাতে। তাদের মধ্যে যারা বড় দরের লোক তারা ইংরাজী জানে, কিন্তু কিছুতেই তা বলতে চায় না; নিজেদের ভাষাটাই চালাতে চেষ্টা করে—তা' বুঝতে না পারলে চড় খেতেই হয় ভদ্র-অভদ্র সবাইকে। দোকানে ঢুকে জিনিষ নিয়ে যায়, দোকানী যদি আঙ্গুল দেখিয়ে দামটি চায় তাহলেই পদাঘাত। দোকান খুলে রাখা দায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ম—সবাইকেই সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চা ও তার পর ৫।৬ মাইল দৌড়তে হবে। বালক ও বালিকারা রোদের তেজ সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছা গেলে তাদের তখন বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দেয় ও সুস্থ হলেই আবার আসতে বলা হত। নাচ-গান এটাও সঙ্গে ছিল।

রবারের ষ্টেটে আমাদের ইণ্ডিয়ান কুলীরাই কাজ করত। বেচারারা এক বৎসর বেকার অবস্থায় থেকে খেতে না পেয়ে এখন দিন-মজুরের কাজ করতে লাগল। কিন্তু শরীরে শক্তি নাই। কাজ করে যা রোজগার হয়, সন্ধ্যা বেলা হিসাব করে দেখা যায়, তা'তে একারই খেতে কুলাবে না, সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কি খাবে! এক বেলা খায় ত এক বেলা পায় না। সরকারের যারা চাকরে, তারাই আধ-পেটা খাবার মত চাল পায়, বাকী লোক কিছুই পায় না। ধান লোকে পোঁতান সুরু করল, তা-ও তিন ভাগ জাপানীদের দিতে হবে ও এক ভাগ চাষীরা পাবে, এই রকম হুকুম হল। টাকা যার আছে সে-ও ভাত খেতে পায় না। এক মণ চাল তখন চার হাজার ডলারে উঠেছে। নুণ চিনি পাওয়া যায় না; কি করে লোকে জীবন ধারণ করবে? ফলে লুঠ-তরাজ চলতে লাগল। সোণা, গহনা, বাসন, বসন বিক্রী করল, তাতেও চলে না। গরীবরা মারা যেতে লাগল। সরকার গরীবদের আশা দিলেন যে, আমাদের সঙ্গে যদি কাজ কর তবে মোটা মাইনে ও চাল-কাপড় প্রচুর পাবে—তোমাদের সংসার আমরা দেখব। বেচারারা খেতে পাচ্ছিল না, যদি প্রভুদের দয়ায় তাদের ছেলে-মেয়ে দু'মুটো খেতে পায়, তবে কেন রাজী হবে না? সবাই তখন কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কাজে গেল কিন্তু আর ফিরল না। কোথায় গেল, কেউ জানল না। জিজ্ঞাসা করার হুকুম নাই, মারের ভয়ে শুধায় না কেউ। স্ত্রী, পুত্র, মা-বাপ রইল পড়ে। বৃদ্ধেরা সহজেই কষ্টের পরপারে চলে গেলো। নারীরা শিশু কোলে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল, একটি একটি করে ঢলে পড়তে লাগল পথের ধারে।

[ক্রমশঃ।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"নির্ভর" মন্তব্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই মন্তব্য করিতেছেন : "সরকারী কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছু মন্তব্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে তাঁহাদের স্বরূপ যেরূপ উৎকট ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে না বলিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান কৃষি-দপ্তর আঁকড়াইয়া যে সকল কর্ম্মচারী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যহই অভিযোগ করা হইতেছে। তাঁহারা যে 'আমীরি চালে' চলিয়া আসিতেছিলেন আজিও তাহার পরিবর্ত্তন হইতে দিতে রাজী নহেন। দপ্তরে দালাল মহাশয়গণের যাতায়াত আজিও অব্যাহত আছে, কর্ম্মচারিগণের সহিত তাহাদের লেনা-পাওনার বহরও পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে। আলু-বীজ লইয়াই বর্ত্তমানের জুয়াখেলা। বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই দিকে দৃষ্টি দিবেন?" আশা করি, ডাঃ রায় এই অভিযোগের প্রতি তৎপর দৃষ্টি দান করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবেন। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি তথাকথিত যে সকল অভিযোগ ছিল, আশা করি, ডাঃ রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি সেই প্রকার কোন অভিযোগ করিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ আমরা পাইব না।

* * * * * *

বরিশাল হামিদিয়া প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত নূর আহমদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং সম্পাদিত 'নকীব' বলিতেছেন : "রাষ্ট্ররক্ষায় 'দৈনিক' ও সৈনিকের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সৈনিকগণ বহিরাক্রমণ প্রতিহত করে—আর 'দৈনিক' জাতি ও জনগণকে রাষ্ট্র-স্বার্থে সতত সচেতন রাখে। দু'শো বৎসরের বিদেশী শাসনের সৃষ্ট মূর্চ্ছা দেশগুলিকে চেতনা দিতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নিজস্ব সংবাদপত্র একখানা দৈনিক নাই। তদোপরি হিন্দুস্থানের অসংখ্য সংবাদপত্রগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা বিরুদ্ধ বিবৃতি ও অলিক বার্ত্তা প্রত্যহ পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রতি ঘরে পরিবেশন করিয়া জনগণ-মনে স্বরাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থার বীজ নিপুণ হস্তে বপন করিতেছে। ইহার প্রতিরোধে ও অন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থায়ই আজ জননেতাগণ উদাসীন। এই ঔদাসিন্যের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিয়া আমরা হতাশ—নিরাশ আমরা হইব না—। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অধিবাসিগণের মধ্যে বহু সম্পত্তিশীল সঙ্কল্পী দেশপ্রাণ মহাপুরুষ রহিয়াছেন—যাহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারাও একখানা উচ্চাঙ্গের দৈনিকের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে। সেই মহানুভব পাকিস্তান-দরদী বন্ধুদের নিকটই আমাদের শেষ কাকুতি—ইহা আমরা অস্বীকার করি না—পূর্ব্ব-পাকিস্তানে দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বহু অন্তরায় ও অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু জাতির সম্মুখে যাহা ফরজে কেফায়া—তাহা সম্পাদন করিতে শত অন্তরায় ও অসুবিধাকে অপসারণ করিয়া নিতেই হইবে।" নূর আহমদ মহাশয় বোধ হয় বরিশালের বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার অবসর লাভ করেন নাই। যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, চট্টগ্রাম নামক স্থানে 'পাঞ্চজন্য' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে আছে। অবশ্য নূর সাহেব যদি মুসলীম পত্রিকার কথা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে—মুসলীম পত্রিকা নাই বলিয়া হিন্দু পত্রিকাগুলিকে গালিমন্দ দিবার কোন কারণ ছিল না। হিন্দু পত্রিকাগুলির পেশা অলীক বার্ত্তা পরিবেশন নহে। ঐ কার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধ কয়েকটি লীগ পত্রিকার প্রায় একচেটিয়া বলিলেই হয়। কিন্তু 'আজাদে'র ঢাকা গমন পরিকল্পনার কি হইল? 'বিজ্ঞাপন' কমতির ভয় হইয়াছে কি?

* * * * * *

পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে দলে দলে লোক, বিশেষ করিয়া বিত্তশালীরা পশ্চিম-বঙ্গ এবং ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য স্থানে প্রয়াণ করিতেছেন। এই সম্বন্ধে রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' বলিতেছেন : "এই ভাবে সম্পত্তিসম্পন্ন ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ যদি স্থানান্তরে চলিয়া যান তাহা হইলে যে সমস্ত অগণিত অসহায় নরনারী অন্যত্র যাইতে অপারগ, তাহাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনতিবিলম্বে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন তাঁহারা কি সত্যই করিতেছেন? স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরও এই বিষয়ে দায়িত্ব কম নহে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সময় সময় নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব লইয়া কোন কোন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ Procurement বিভাগ, সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কোন কোন কার্য্যকলাপ ঐ মনোভাবাপন্ন বলিয়া সংবাদ আসিতেছে এবং তাহার ফলেও আতঙ্ক ও ত্রাসের ভাবটা কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ ইদানীং বারংবার নানা ভাবে নানা স্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি ভাল ব্যবহারের আশ্বাস-বাণী প্রচার করিতেছেন, কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মচারী দৈনন্দিন কার্য্যাবলী চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব এখনও বদলাইতে সক্ষম হন নাই দেখা যাইতেছে।" এ বিষয় প্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নেতাদের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিজেদের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন। নেতাদের মধ্যে বহু জন দুই নৌকায়

'ঢাকা-প্রকাশে' প্রকাশ : "মিউনিসিপ্যালিটীর নবনিযুক্ত কর্ম্মকর্ত্তা এক নোটিশ দ্বারা সহরবাসী জনসাধারণকে তাহাদের দেয় বাকী ট্যাক্স সত্বর আদায় করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের প্রচেষ্টা সাধু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নোটিশ হইতে জানা যায় যে, করদাতাদের নিকট মিউনিসিপ্যালিটীর ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্য কর বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বতন চেয়ারম্যান বা আদায় বিভাগের প্রধানগণের কর্ম্মকুশলতা যে প্রচুর ছিল না তাহা সহরবাসী মাত্রই উপলব্ধি করিয়াছেন। পানীয় জলের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, রাস্তাঘাট ধুলিপূর্ণ এবং ভগ্ন, স্থানে স্থানে আবর্জ্জনাপূর্ণ, জল-নিকাশের নর্দ্দমাগুলি অপরিস্কৃত ও ভয়ানক দুর্গন্ধপূর্ণ—এই ত সহরের সুখ-সুবিধা ? ১০ লক্ষ টাকা অবশ্যই দুই-এক বৎসরে বাকী পড়ে নাই, কিন্তু মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কর আদায়ের জন্য প্রকৃত কোন কঠোরতাই অবলম্বন করেন নাই। সম্ভবতঃ প্রাপ্তপদ হারাইবার আশঙ্কাই প্রধান ছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তা যদি কোন কারণেই তাহার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ না হন এবং একনিষ্ঠ ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন তবে আশা করা যায় সহরে শ্রী ফিরিয়া আসিবে।" এ বিষয় কলিকাতা ও ঢাকার অবস্থা প্রায় একই প্রকার। প্রতিকার যদি কিছু হয় আনন্দের কথা। কিন্তু ভয় হয়, ঢাকার মিউনিসিপ্যাল অবস্থা "কড়া হইতে ফ..উনে" পড়ার মত না হয়।

• • • • •

'ঢাকা-প্রকাশ' সংবাদ দিতেছেন : "করোনেশন পার্কে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' দিবস উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। এক জন বক্তা স্বর্গত বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার পর মিঃ ফজলুল হক বক্তৃতা দিতে উঠেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রধানতঃ কংগ্রেসের সংগ্রামের ফলেই ইংরেজকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে। এই কথা বলা মাত্র এক দল মুসলমান উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া মিঃ হককে আক্রমণ করে। সভার উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় গোলযোগ শেষ পর্য্যন্ত থামিয়া গেলেও সভার কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়।" হক সাহেব হক্ কথা না বলিয়া বোধ হয় মিথ্যা কথা বলিয়াছেন তাই এই প্রতিবাদ। মিঃ জিন্না এবং লীগের প্রচেষ্টাতেই ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে, হক সাহেবের এই কথা বলাই উচিত ছিল।

• • • • • •

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত 'আর্য্য পত্রিকা' বলিতেছেন : "বর্দ্ধমান শ্যামরায় রোডে খাল্লাজীর দেবালয়ে নানা অনাচার হইতেছে বলিয়া প্রকাশ, উক্ত দেবায়তন প্রাঙ্গণে না কি মুর্গী হত্যা করা হয়। দেবালয়ের তোরণ-দ্বার সর্ব্বদাই প্রায় বন্ধ থাকে। এবং এক জন অবাঞ্ছিত স্ত্রীলোককে না কি উক্ত স্থানে বাস করিতে দেখা যায়। উহাকে দেখিয়া পল্লীর সকল মহিলাই দেব-দর্শন বন্ধ করিয়াছেন।" সংবাদটি স্থানীয় হইলেও ইহার গুরুত্ব কেবল মাত্র স্থানীয় নহে। বাংলার অন্যান্য বহু স্থানের বহু দেব-মন্দির সম্বন্ধে একই প্রকার অভিযোগ আছে। দুঃখের বিষয়, দেশবাসীর এ-দিকে তেমন প্রখর দৃষ্টি নাই। দেব-মন্দিরগুলিকে এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। সরকার হইতেও বর্ত্তমানে দেখা কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কোন পূজা-অর্চ্চনা স্থানে কোন প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য না করা হয়। পূজা-মন্দিরগুলিকে 'রাজনৈতিক-আড্ডা' স্থানে পরিণত করার বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

• • • • •

"হিন্দুর নিকট নিবেদন" শীর্ষক একটি প্রচারপত্রে বলা হইয়াছে যে : "জাতিবিভাগ যদি অনিষ্টকর হইত তাহা হইলে হিন্দু অপেক্ষা ভারতের অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ (যাঁহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই) বেশী উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প-বাণিজ্য সকল বিষয়েই ভারতে হিন্দুরাই শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও হিন্দুরা অধিকতর কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছে। কারণ, গত মহাযুদ্ধে যতগুলি ভারতীয় সৈনিক "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জন হিন্দু। হিন্দুদের সহিত ইংরাজ ও জাপানদের সহিত তুলনা করা উচিত হইবে না। কারণ এত দিন ভারত পরাধীন ছিল, ভারতীয়রা যাহাতে বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করে এ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশের লোক যাহাতে শিল্প ও বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করে, সে জন্য বরাবর যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ একই অবস্থার মধ্যে একই গবর্ণমেণ্টের শাসনে থাকে, কেবল ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রভেদ আছে। যখন দেখা যায় যে একই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া হিন্দুরা সকল বিষয়ে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা জাতীয় উন্নতির পথে অধিকতর উপযোগী।" এ-যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। একমাত্র বক্তব্য এই যে, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এত দিন যাহারা পদানত ছিল, তাহারা আর পদানত থাকিতে রাজী নহে। সমাজের সুবিধা এবং সুযোগ—কেবল মাত্র এক দল লোকের ভোগ-দখলে বংশানুক্রমে থাকিবে—এ যুক্তি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অচল ছিল। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিবার সময় বোধ হয় হইয়াছে।

• • • • • •

ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশ : "ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদুল মাহমদীতে নর-নারীগণের জনসভা হয় এবং কাদিয়ানের নিরাপত্তাকল্পে প্রার্থনা হয়, সভায় পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের মুসলমান অধিবাসীদের উপর তথাকার হিন্দু-শিখ দুর্ব্বৃত্তগণ যে বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছে তাহা আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। সভায় ইহাও স্থির হয় যে, প্রস্তাবগুলির নকল ভারত ডোমিনিয়ন এবং পূর্ব্ব-পাঞ্জাব এবং পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট, এবং সংবাদপত্র সমূহে ও আহমদিয়া পাকিস্তান কেন্দ্রে প্রেরিত হউক।" সংবাদ হিসাবে ইহার কোন মূল্য আমরা দিই না। কিন্তু মুসলমান সমাজে এক দল তথাকথিত

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি ভাবে মিথ্যা, অর্দ্ধ-মিথ্যা এবং এক-তরফা সংবাদ প্রচার করিয়া দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতেছে, তাহা দেখিবার বিষয়। শোকপ্রকাশ করিবার সময় এই অতি ধার্ম্মিকদের একবারও পশ্চিম-পাঞ্জাবের অমুসলমানদের কথা মনে হইল না কেন? প্রচারের অসুবিধা হইত বলিয়া কি?

* * * * * *

'বীরভূম-বাণী' পাঠে জানিতে পারি যে: "পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থান হইতে সংবাদে প্রকাশ, পাকীস্তানে কায়েদে আজাম রিলিফ ফাণ্ড নামক একটি তহবিল খোলা হইয়াছে। ঐ তহবিলের জন্য জনসাধারণের নিকট প্রচুর টাকা আদায় করা হইতেছে। বগুড়ায় বন্দুকের লাইসেন্সের রিনিউ করিবার সময় বন্দুক প্রতি এক শত টাকা পেট্রোলের গ্যালন প্রতি দুই আনা, রেশন দোকানে চিনির উপর সের-প্রতি এক আনা, রেজেষ্টারী অফিসে দলিল রেজেষ্টারী করার কালে প্রতি দলিলে দুই আনা, এতদ্ব্যতীত সিমলা ভবনে এবং অন্যান্য বহু প্রকার দ্রব্যে এবং ট্রেণগামী যাত্রীর উপরও টাকা আদায় করা হইতেছে।" এবং আরো কিছু কাল ধরিয়া হইতে থাকিবে। কিন্তু বীরভূমে বসিয়া মড়া-কান্না কাঁদিলে অবস্থার কোন প্রতিকার হইবে কি?

* * * * * *

'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিতেছেন: "বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই খেজুর গাছ জন্মে; তবে যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাতেই এই গাছের সংখ্যা বেশী। আমাদের দেশের খেজুর তেমন বড়ও হয় না, মিষ্টিও হয় না; ইহার আঁটিও খুব বড়; সেই জন্য ফল হিসাবে ইহার তত আদর নাই; রসের জন্যই আমাদের দেশে খেজুর গাছের বেশী আদর; এই রস হইতে অতি উপাদেয় গুড় প্রস্তুত হয়। যশোর, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার খেজুরের গুড় অতি প্রসিদ্ধ এবং উহার চাহিদাও বেশী। প্রধানতঃ যশোর ও অন্যান্য কয়েক স্থানে পূর্ব্বে খেজুরের গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইত; ইহাকে "দলুয়া" চিনি বলিত; কিন্তু বর্ত্তমানে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত আর হয় না বলিলেই চলে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে যেমন খেজুরের গুড়ের জন্য খেজুরের গাছের যত্ন করা হইত, এখন আর সেইরূপ করা হয় না; এমন কি অনেক স্থানে খেজুর গাছ হইতে রসও সংগ্রহ করা হয় না; ইহার ফলে অনেক স্থানেই খেজুর গাছ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; আবার যে সকল গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয়, সেই সকল গাছের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া সেই সকল গাছ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ রসও পাওয়া যায় না। কিন্তু খেজুর গাছ হইতে বেশ আয় করা যায়; বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে গুড় ও চিনির অভাব দূর করিবার জন্য খেজুরের গুড় প্রস্তুতের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। খেজুর গাছ কাটিয়া উহা হইতে রস সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার; যাহারা এই কাজ করে তাহাদিগকে 'সিউলি' বা 'গাছি' বলে। দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেক স্থানেই 'সিউলির' অভাব বশতঃ খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।" বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও খেজুরের চাষ প্রভূত পরিমাণে হইতে পারে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইত। সমবেত চেষ্টা এবং সরকারী সাহায্যে এখন কেন হইবে না?

* * * * * *

তার পর মিত্র মহাশয় বলিতেছেন: "...৪ মাস খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত। বৃষ্টি-বাদলের দিন ছাড়া এই ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যেক গাছ হইতে ৬০ দিন রস সংগ্রহ করা যায়; গড়ে এক ঋতুতে প্রত্যেক গাছ হইতে ২০০ সের অর্থাৎ ৫ মণ রস পাওয়া যায়; ৮ সের রসে এক সের গুড় হয়; সুতরাং প্রত্যেক ঋতুতে একটি গাছ হইতে মোটামুটি ২৫ সের গুড় পাওয়া যায়। যদি কেহ প্রত্যেক বৎসর ৬৩টা গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ৫০ মণ গুড় পাইবেন; বর্ত্তমান সময়ে ৫০ মণ গুড়ের মূল্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা; তবে গাছের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে এবং রস সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত 'গাছি' নিযুক্ত করিতে হইবে। 'গাছির' নিকট হইতে গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে খুব বেশী সময় লাগে না।"

* * * * * *

'নীহার' বলিতেছেন: "মেদিনীপুর জেলায় এবার সর্ব্বমোট কংগ্রেস সদস্য-সংখ্যা—২,৬৬,৪১৩ জন; তন্মধ্যে সদর মেদিনীপুর মহকুমায়—১৩,২১০; কাঁথি মহকুমায়—৬৫,০৫৪; তমলুক মহকুমায়—৬১,৫১০; ঝাড়গ্রাম মহকুমায়—৪১,৫১৬ ও ঘাটাল মহকুমায় ২৫,০২৩ জন।" কলিকাতার সভ্য-সংখ্যা কত? কিন্তু কেবল সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? বর্ত্তমানে কংগ্রেসের জাতি-গঠন-মূলক এবং দেশ কল্যাণকর কোন কার্য্যক্রমের কথা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসী-সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি কংগ্রেস সভ্যদের মনোভাব 'সরকারী' হইয়া যায়, তাহা হইলে সবই বৃথা হইবে! দেশে এখন কাজ প্রচুর, কিন্তু কাজ করিবার লোক যেন কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। চিন্তার কথা!

* * * * * *

'মেদিনীপুর হিতৈষী' বলিতেছেন: "ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী রপ্তানীর প্রায় অধিকাংশ দ্রব্যের ১৫ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানী পণ্য বা লৌহজাত দ্রব্য ও হোমিওপাথিক ঔষধও শতকরা ১৫ ভাগ আমদানী রহিত করিয়াছেন। এবং অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিও এ ভাবে কমাইয়াছেন বা উহার কিছু ইতর-বিশেষ করিয়াছেন আইনের বলে। কিন্তু ইহা বিজ্ঞতার কাজ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, বাধ্য হইয়াই ঐরূপ করিতে হইয়াছে এই জন্য যে, বিদেশী জিনিষের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা চাই। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট কাগজের নোট লয়েন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই সোণা-রূপার টাকা মিত্র

প্রয়োজনে ভারত হইতে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হয়েন এবং তদ্বিনিময়ে কাগজের এক টাকার নোট প্রচলন করেন। এখনও যে টাকা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে রূপা নাই। এইরূপে ভারত গবর্ণমেন্ট নিরুপায় হইয়াছেন। মালের আমদানী বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ইহা কি সত্য? এইরূপে আমদানী বন্ধ হওয়ায় দেশে পণ্যদ্রব্য স্বচ্ছল হইতেছে না। দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত অধিক হইতেছে। এ জন্ত ভারতময় জনগণের হাহাকার পড়িয়াছে; যদি উহাই আমদানীর বাধক হয় তবেই ত জনগণের আর উপায় নাই। বিশেষতঃ ঔষধ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমদানী শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়া যাওয়ায় দরিদ্র জনগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। আশা করি, ভারত গবর্ণমেন্ট আশু ইহার প্রতিকার করিবেন।" আমরাও এ-বিষয়ে একমত।

•

'প্রদীপ' দুঃখের সঙ্গে বলিতেছেন: মহানবী জন্মদিবস মুসলমান ভাইগণ সময়োচিত গাম্ভীর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সেদিন অধিকাংশ মসজিদ সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং মুসলমানগণ মলিদ সরীফ পাঠ ও যথাসাধ্য দান-ধ্যানাদি করেন। প্রবাদ আছে, প্রবাদই বা বলি কেন, আমরা জানি, এই সব উৎসবে বা ধর্ম্মকার্য্যে পূর্ব্বে বহু হিন্দু আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিতে বা রবাহূত ভাবেও আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পাইত! তখন মসজিদেও যাতায়াতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ইংরাজের চক্রান্তে, কায়েদে আজমের দ্বিজাতি-তত্ত্ব প্রচারিত হইবার পর মুসলমানগণ এতটা পৃথক্ হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সব কিছুই যেন গোপনীয়, সবই যেন নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিন্দুদের পূজা-পার্ব্বণে আনন্দ-উৎসবেও তাঁহারা আর পূর্ব্বের মত মিশিতে চাহেন না বা পারেন না। এমন কি, ধর্ম্মাধর্ম্মভেদহীন কংগ্রেস অনুষ্ঠান কিম্বা নেতাজীর জন্মোৎসবেও যোগ দিতে তাঁহাদের বড় একটা দেখা যায় না। বড় বড় ধর্ম্মজ্ঞ মুসলমান অবশ্য এই মনোভাবের নিন্দা করিয়াছেন ও ইহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইসলাম ধর্ম্ম পরম উদার ও সমদর্শী। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমও সেদিন বলিয়াছেন, শরিয়তের আইন অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই পরিচালিত হইবে, সেখানে সংখ্যালঘুদের ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার অনুচর বা সহচরগণ যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক, বরং ইসলামের উপর ভক্তি উড়িয়া যাইবারই কথা।" লীগ-মুসলীমের চোখ হইতে পাকিস্তানী-ছানি কাটাইবার ব্যবস্থা না হইলে এ-অবস্থার কোন প্রতিকার হইবে না। তবে আশা আছে, মহাত্মাজীর শোকজনক অকালমৃত্যু—ভারতের সকল সমাজের এবং সকল স্থানের জনগণের মধ্যে নব চেতনা আনয়ন করিবে। ফলে কায়েদে আজমের দ্বি-জাতিতত্ত্বের সমাধি লাভ এবং ভারত পুনরায় এক হইয়া হিন্দু-মুসলমানের সমবেত মাতৃভূমি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

• • • • •

'প্রদীপে' প্রকাশ: "সম্প্রতি তমলুক মহিষাদলে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতির সভাপতিত্বে এবং এম্ এল এ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক ও গণ-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্তের উপস্থিতিতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সভা হয়। তাহাতে গেঁয়োখালিকে একটি বন্দর এবং তথা হইতে বালুঘাটা পর্য্যন্ত নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলকে শিল্প-বাণিজ্যোপযোগী করিবার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে কার্য্যকরী পরিকল্পনা রচনা করিতে একটি শক্তিশালী সাব কমিটিও গঠিত হইয়াছে।" সাধু প্রস্তাব। অনতিবিলম্বে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইলে ভাল হয়।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত মুসলীম সাপ্তাহিকের সাম্প্রদায়িক প্রচার দেখুন। 'জিন্দেগী' বলিতেছেন: "এক্ষণে মুসলমানদের সম্মুখে মাত্র একটি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। হিন্দু কংগ্রেসের মনোভাব বদলাইবার নহে। পবিত্র কোরাণ শরীফে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা কোন ভাবেও বিশ্বাসীর (মুসলমানের) বন্ধু হইতে পারে না। ইহা দেয়ালে লেখা, ইহার পরিবর্ত্তন হইবে না। হিন্দুস্থানে ফ্যাসিষ্ট কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি অনুযায়ীই মুসলমান সাধারণ ব্যবহার পাইতে থাকিবে। হিন্দুস্থানের মুসলমান সাধারণ যতো সদিচ্ছাই প্রকাশ করিতে থাকুন না কেন, পরিবর্ত্তে তাঁহারা চপেটাঘাত ভিন্ন আর কিছু পাইবে না। সিন্ধুর কথাই ধরুন। সিন্ধুতে কোন হাঙ্গামাই নাই। সেখানে প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-বড় সকলেই হিন্দুসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ-মানসে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা আজও বানের পানির মতো চলিয়াছে। কারণ ইহা তাহাদের পূর্ব্বপরিকল্পিত এবং সাধারণ হিন্দুকেও ইচ্ছা না থাকিলেও ইহা মানিতে হইতেছে। হিন্দুস্থানের মুসলমানরা ইহার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানেই থাকিয়া তাঁহাদের গবর্ণমেন্টের প্রতি সমস্ত আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকিলেও তাহাদের নিস্তার নাই। সময় আসিলে দেখা যাইবে, মুসলমান সাধারণ যখন নিজস্ব ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এবং সম্মান লইয়া হিন্দুস্থানে বাঁচিয়া থাকিতে যাইবেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন আর তাহাদের স্থান নাই! সম্প্রতি মাষ্টার তারা সিং যে হুমকী দিয়াছেন, তাহাতেই সকলে আমার কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।" কিন্তু পাকিস্তান একেবারে স্বর্গরাজ্য! সেই কারণেই বোধ হয়, হাজার হাজার হিন্দু ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে—অবশ্য গোপনে! নাজিম-সরকার কি নিদ্রা যাইতেছেন? ভাবিয়া পাই না, তাঁহার শ্রী-নাসিকার সামনে এমন বিদ্বেষ প্রচার কেমন করিয়া ঘটিতেছে!

• • • • • •

'জিন্দেগী'র সংবাদ: "কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমায় ৫৫০০০৲ টাকা কায়েদে আজম রিলিফ ফণ্ডের চাঁদা আদায় হইয়াছে। কুমিল্লা শহরের হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়িগণ ৫০,০০০ টাকা চাঁদা দিতে ওয়াদা করিয়াছেন। ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রাম থানার বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে মহামারী আকারে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ঘোলপাশা, চৌদ্দগ্রাম ও জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে শতাধিক লোক আক্রান্ত হইয়াছে।" "হিন্দু ব্যবসায়ীরা আনন্দে এবং স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে রাজী হইয়াছেন"—একথা 'জিন্দেগী' বলেন নাই কেন? মনে পড়ে নাই? মহামারী আকারে লোক মরিতে থাকুক—কিন্তু কায়েদে আজম ফাণ্ডে টাকা যেন কম না পড়ে।

এস, ডি, ডি,

মহাত্মার আকস্মিক মহাপ্রয়াণে স্তব্ধ পৃথিবীতে ভারতীয় খেলা-জগৎ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিশ্বের মহামানব, শান্তির অগ্রদূত জাতির জনক ও ভারতের জাতীয়তার প্রতীক এই মহাপুরুষের আততায়ীর হস্তে অকাল বিয়োগ, বিশ্বের খেলোয়াড়ী মহলকে শোকে মুহ্যমান করিয়া দিয়াছে। নিখিল ভারতীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকায় সমস্ত খেলাধূলা বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দেন।

বাঙ্গলা দেশের ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং বিভিন্ন জাতীয় খেলাধূলার পরিচালকমণ্ডলী জাতীয় শোক প্রকাশার্থ নির্দ্দিষ্ট কয় দিন অন্তর্ভুক্ত ক্লাব সমূহকে খেলাধূলা বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কেন্দ্রের রেস্ কর্তৃপক্ষ এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট ঘোড়দৌড়ের সূচী বাতিল করিয়া দেন। অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল তাহাদের ভিক্টোরিয়া প্রদেশের সহিত খেলার সূচনায় এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ শোকার্ত্ত দেশবাসীর সঙ্গে উপবাস করিয়া মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করে।

পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলার প্রারম্ভে, নীরবতা পালন করিয়া মাঠের সকলে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরলোকগত পুণ্যাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। মেলবোর্ণ মাঠে সমস্ত পতাকা অবনমিত রাখা হয়। অষ্ট্রেলিয়া-প্রবাসী বেদনাতুর ভারতীয় খেলোয়াড়েরা রেডিও মারফৎ গান্ধীজীর অন্তিম-যাত্রার প্রতিটি বার্ত্তা শ্রদ্ধানতচিত্তে অবগত হন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ, এস, ডিমেলো শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ক্রিকেট দলের ম্যানেজার মিঃ পঙ্কজ গুপ্তকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যেন সরকারী শোক-উদযাপন দিবসে যে সময়ে মহাত্মার অস্থি পুণ্য ত্রিবেণীসঙ্গমে বিসর্জ্জন করা হইবে, সে সময়ে সাগর-তীরে উপস্থিত থাকিয়া প্রিয় বাপুজীর স্মৃতিতর্পণ করেন। তাঁহার মতে আজীবন সত্যাশ্রয়ী কঠোর নিয়মানুগ এই মহামানব ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সেরা খেলোয়াড়। তাঁহার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে খেলোয়াড়-সুলভ শৃঙ্খলার ছাপ। জয়ের উচ্ছ্বাস বা পরাজয়ের ব্যর্থতা তাঁহার দৃঢ়চিত্তে কোন বিকারের সঞ্চার করে নাই। রাজঘাট মহাতীর্থে গান্ধীজীর স্মৃতি-বেদীমূলকে কেন্দ্র করিয়া, বিরাট ষ্টাডিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আবেদন করিয়া তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় গান্ধীজীর মহান্ আদর্শ কিছুটা রক্ষিত হইবে। জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের খেলোয়াড় ও দর্শকের সমাবেশে ইহা একটি মহা মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। বিরাট ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা জন-গণ-মন-অধিনায়কের স্মৃতিরক্ষার যে কোন প্রচেষ্টাই সেই বিশাল ব্যক্তিত্বের তুলনায় নগণ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আজীবন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে সমস্ত খেলা-মহলের যে দায়িত্ব আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকিতেই হইবে।
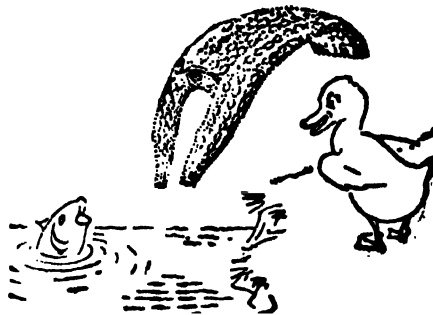
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বেভিন-পরিকল্পনা—

মার্শাল-পরিকল্পনার পর বেভিন পরিকল্পনা। গত ২২শে জানুয়ারী (১৯৪৮) কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন ইটালী সহ সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপ লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার এই বক্তৃতাকে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা বলিয়া অভিহিত করা হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, তাঁহার বক্তৃতা যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহা মিঃ বেভিন নিজেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন, "We are indeed at a critical moment in the organisation of the post-war world. The decision now taken. I realise, will be vital to the future peace of the world." অর্থাৎ "আমরা প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধোত্তর জগতের এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে উপনীত হইয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই সময়ে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে পৃথিবীর ভাবী শান্তির পক্ষে উহা হইবে একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়।" কিন্তু বেভিনের দৃষ্টিতে এই সঙ্কটের জন্য কে দায়ী, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। আমেরিকার দৃষ্টিতে রাশিয়া এবং কম্যুনিজমই যত অনিষ্টের মূল। মিঃ বেভিনও এই মার্কিণ মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "If the policy is pursued of trying to dominate Europe by any one power by whatever means, direct or indirect, we are driven to the conclusion that it will inevitably lead again to another war." অর্থাৎ 'যদি কোনও একটি শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত না হইয়া পারি না যে, এই নীতি অবশ্যম্ভাবী রূপে আর একটি যুদ্ধের কারণ হইবে।' এই শক্তিটি কে, তাহা যদিও মিঃ বেভিন প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তাহা হইলেও রাশিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই যে তিনি এই কথা বলিয়াছেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আমেরিকার দৃষ্টিতে রাশিয়া কি ভাবে বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে তাহা আমরা বহু বার শুনিয়াছি। মিঃ বেভিন তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, রাশিয়ার অর্থনৈতিক নীতি তাহাদের ভাল লাগে এবং ধীরে ধীরে সেই নীতি তাহারা অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং আমেরিকার দৃষ্টিতে রাশিয়ার পক্ষে উহা অমার্জ্জনীয় অপরাধই শুধু নয়, উহা ভবিষ্যৎ শান্তির বিঘ্নকারক। সুতরাং বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিনও তাহাই মনে করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাশিয়া না কি গ্রীসকেও তাহার তাঁবে আনিবার জন্য নির্মম ভাবে চেষ্টা করিতেছে। মিঃ বেভিন মনে করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে আগুন লইয়া খেলা করা বিপজ্জনক। তাঁহার এই উক্তি যে খুবই সত্য, তাহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আগুন লইয়া খেলা করিতেছে কে?

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যে অভিযোগ তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া মিঃ বেভিন বলিয়াছেন যে, রাশিয়া তাহার আয়ত্তাধীন যে কোন উপায়ে পূর্ব্ব-ইউরোপকে এবং পশ্চিম-ইউরোপকেও কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অত্যন্ত ভাল মানুষ সাজিয়া তিনি বলিয়াছেন, "Nothing the Government do now will be directed against Ru sia or any other country, but we are entitled to organize kindred soul in the We t just as they have organized kindred souls in the East." অর্থাৎ 'গবর্ণমেণ্ট এখন যাহা করিবেন তাহা রাশিয়া বা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তাহারা যেরূপ সম-মতাবলম্বী লোকদিগকে লইয়া পূর্ব্ব-ইউরোপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, আমরাও তেমনি পশ্চিম-ইউরোপে সম-মতাবলম্বী লোকদিগকে লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অধিকারী।' বৃটেনের 'কিনড্রেড সোল' বা সম-মতাবলম্বী কাহারা? মিঃ বেভিন পশ্চিম ইউরোপে যে ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে থাকিবে বৃটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লুক্সেমবুর্গ, ইটালী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ইউরোপীয় দেশ। অন্যান্য ঐতিহাসিক দেশ বলিতে তিনি কোন্ কোন্ দেশকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না। কিন্তু শুধু উল্লিখিত দেশগুলিই নয়, তাহাদের অধীনস্থ দেশগুলিও এই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা মিঃ বেভিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, শুধু ইউরোপের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইউরোপের যে প্রভাব আছে, তাহার প্রতি এবং তাহা ছাড়াইয়া আরও দূরে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত। তিনি বলিয়াছেন, "In the first place, we turn our eyes to Africa, where great responsibities are shared by us with South Africa, France, Belgium and Portugal, and equally all oversea territories, especially in South-East Asia, with

which the Dutch are closely concerned." অর্থাৎ 'প্রথমতঃ আমরা আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। আফ্রিকায় আমরা দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও পর্তুগালের সহিত গুরু দায়িত্বের অংশীদার। সমস্ত অধীনস্থ দেশ, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতি আমরা অনুরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সহিত ওলন্দাজগণ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।' অধীন দেশগুলির সমস্ত সম্পদ ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত মিঃ বেভিনের একান্তই প্রয়োজন। তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না। ফ্রান্সও ইন্দোচীনে থাকিয়া যাইবে।

মিঃ বেভিনের এই পরিকল্পনা ক্রসম্যান, জেনিংস্‌ফাস প্রভৃতি শ্রমিক সদস্যের সমর্থন লাভ করিতে না পারিলেও মিঃ চার্চ্চিলের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ফুলটনের কুখ্যাত বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ কমনওয়েলথ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন, বেভিন-পরিকল্পনায় তিনি তাহাকেই রূপায়িত দেখিতে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বেভিন-পরিকল্পনা মার্শাল-পরিকল্পনারই রাজনৈতিক দিক্। মিঃ মার্শাল তাঁহার পরিকল্পনায় এই দিক্‌টা উহ্য রাখিয়াছেন। মিঃ বেভিন দিয়াছেন তাহাকেই সর্ব্বাঙ্গীন রূপ। সুতরাং বেভিন-পরিকল্পনা আসলে স্বতন্ত্র কোন পরিকল্পনা নয়। উহা মার্শাল-পরিকল্পনার পাদটীকা (foot note) মাত্র। মিঃ বেভিন আশা করেন যে, তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যুদ্ধাশঙ্কা নিবারিত। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল মনে করেন যে, অধিক বিলম্ব হইবার পূর্ব্বে রাশিয়ার সহিত একটা মীমাংসা করাই যুদ্ধ নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। রাশিয়ার প্রীতি বশতঃ মিঃ চার্চ্চিল এ কথা বলেন নাই। কারণ তিনি বলিয়াছেন, "রাশিয়া পরমাণু বোমার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত যদি আমরা অপেক্ষা করি, তাহা হইলে রাশিয়ার সহিত আলোচনায় কোন সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমি মনে করি না।" রাশিয়ার পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত মীমাংসার পথটা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই। তিনি কূটনৈতিক আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াও না বলিয়া পারেন নাই যে, "যুদ্ধ হইবে না, এই পন্থা সে সম্বন্ধে কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই পথে যুদ্ধ নিবারণের একটা উৎকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং যুদ্ধ যদি বাধিয়া উঠেও, তাহা হইলেও এই যুদ্ধ হইতে বিজয়ী হইয়া বাহির হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ পাওয়া যাইবে।" মিঃ চার্চ্চিলের অভিপ্রায় অনুমান করা কঠিন নয়। রাশিয়াই যাহাতে প্রথম আক্রমণ করে তাহার প্ররোচনা সৃষ্টি করাই তাঁহার এই উক্তির লক্ষ্য।

বেভিন-পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ ভাবেই সমর্থন লাভ করিয়াছে। মিঃ মার্শাল বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত ইহা (বেভিন-পরিকল্পনা) একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। মিঃ ডালেস ইহাকে "profoundly significant" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেনেটর ভ্যানডেনবার্গ ইহাকে 'terrific' এবং 'hopeful' বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু ফ্রান্সের বাম পন্থী পত্রিকা ইহাকে 'Phoney Union' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐক্যের কথা যত বেশী বলা হইবে পশ্চিমী ইউনিয়ন পন্থীরা পূর্ব্বের ইউনিয়ন-পন্থীদের উপর ততই অধিক পরিমাণে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিবেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ টাইম' মিঃ বেভিনের বক্তৃতাকে ওয়াশিংটনের নির্দ্দেশে দেওয়া বক্তৃতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা রচনা করা যত সহজ তাহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। অন্ততঃ আশানুরূপ দ্রুত কার্য্যে পরিণত করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাই অবিলম্বে এইরূপ ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিবে। ফ্রান্স তাঁহার মুদ্রা ফ্রাঁয়ের মূল্য হ্রাস করায় ইঙ্গ-ফরাসী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম-ইউরোপ সৃষ্টি করার পথে কম বাধা সৃষ্টি করিবে না। পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে বৃটেন ও আমেরিকা যে অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই দ্বৈতাঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করিবার কথা ঘোষণা করিতে হইয়াছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে জার্ম্মাণী সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ আলোচনা আরম্ভ হইবে। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা একমত হইয়া যাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ফ্রান্স কি সহজেই তাহা মানিয়া লইবে? বৃটেন ও ফ্রান্স বেনেলুক্স দেশের অর্থাৎ বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গের সহিত মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণী সম্বন্ধে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে এই দেশত্রয়ের অধিকার স্বীকার না করিলে, এই মৈত্রী সম্ভব হইবে কি? আমেরিকার অভিপ্রায় না জানিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিবে না। ডানকার্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে ভাবী জার্ম্মাণ আক্রমণের প্রতিরোধ করার কথা আছে। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অন্যান্য দেশের সহিত সম-মর্য্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু জার্ম্মাণীর আক্রমণে যাহারা নিপীড়িত হইয়াছে, তাহাদের মন জার্ম্মাণীকে তাহাদের সমমর্য্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সহজে সায় দিতে পারিবে কি? এই সকল কথা বিবেচনা করিলে, ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম-ইউরোপ আমেরিকা ও বৃটেনের যতই কাম্য হউক উহাকে পরিণত করা বড় সহজ হইবে না। হইলেও এই ঐক্যের আন্তরিকতা থাকিবে কি? তবে আমিরিকার তাঁবেদার দেশ হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশই প্রতিবাদ করিতে পারিবে না বটে।

ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস—

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস এবং খোলা-বাজারে স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইটালীর মুদ্রা লীরার মূল্য হ্রাসের পর ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস আন্তর্জ্জাতিক অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবে, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ফরাসী মন্ত্রিসভা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-তহবিলের (International Monetary Fund) কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দুই সপ্তাহ আলোচনার পর ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস এবং খোলা-বাজারে স্বর্ণ বিক্রয় নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আপত্তি খণ্ডনের জন্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের নীতির কোনরূপ সংশোধন করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় না।

কিন্তু আপত্তি সত্ত্বেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিলের কর্ত্তৃপক্ষ যে ফ্রান্সের এই নীতি গ্রহণে নিমরাজী হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ফ্রাঁ-র মূল্য হ্রাসের বিধান ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪৮) হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং খোলা-বাজারে স্বর্ণ বিক্রয় নীতি কার্য্যকরী হইয়াছে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ফ্রাঁ-র মূল্য শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। ডলার-ফ্রাঁ-র বিনিময় হার প্রতি ডলারে ২১৪·১২ ফ্রাঁ করা হইয়াছে এবং পাউণ্ড ষ্টার্লিং ও ফ্রাঁ-র বিনিময় হার ধার্য্য করা হইয়াছে প্রতি ষ্টার্লিং পাউণ্ডে ৮৬৪ ফ্রাঁ। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ১৭৬ ফ্রাঁ-র সমান ছিল এবং আলোচ্য মূল্য হ্রাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ছিল ৪৮০ ফ্রাঁ র সমান।

ফ্রাঁ-র মূল্য হ্রাস করায় যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এক মাস পূর্ব্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যখন ফ্রান্সব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তখন বিলাতের 'ডেইলী মেল' পত্রিকা উহাকে বলশেভিক বিতাড়ন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের এই মুদ্রামূল্য হ্রাসকে উক্ত পত্রিকা মস্কো এবং কম্যুনিজমের বিজয় এবং ফ্রান্সব্যাপী ধর্ম্মঘটের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহার প্রথম ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস ব্যাপারটা এত বেশী টেকনিক্যাল বিষয় যে উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই মূল্য হ্রাসের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। ফ্রান্সের মূল্যসূচী ১৯৩৮ সালে যাহা ছিল বর্ত্তমানে তাহার ১৩ গুণ বাড়িয়াছে। ফ্রান্সের ইস্যুকৃত ফ্রাঁ-র পরিমাণ ৭,৩২,০০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ হইতে ১,১৫,০০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে শতকরা ৬৪ ভাগ। পণ্যমূল্য এবং মজুরি এত বাড়িয়াছে যে, ফ্রান্সের রপ্তানি-বাণিজ্য কমিয়া গিয়াছে। ফলে আমদানী-বাণিজ্যের মূল্য সঙ্কুলানের জন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রাঁ-র মূল্য হ্রাস হওয়ায় ফ্রান্সের রপ্তানি বাড়িয়া এবং আমদানী কমিয়া উভয়ের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান ছিল তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কিন্তু ইহাতেও রপ্তানির পরিমাণ এবং আমদানীর পরিমাণের ব্যবধান কতক পরিমাণে থাকিয়াই যাইবে। এমন কি, মার্শাল পরিকল্পনার সাহায্য পাইলেও এই ব্যবধান একেবারে দূর হইবে না। এই জন্য খোলা-বাজারে স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক রপ্তানিকারক যে-পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange in a hard currency) পাইবেন, তাহার অর্দ্ধেক বিনিময়ের নূতন হারে গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক রপ্তানিকারক খোলা-বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। ডলার এবং অন্যান্ত দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার যে উচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে, ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। কারণ আমদানী-কারকগণকে তাঁহাদের আমদানীকৃত পণ্যের জন্ত এই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে হইবে। ফ্রান্সের বহু ধনী ব্যক্তির হাতে প্রচুর সোণা এবং বৈদেশিক মুদ্রা গোপনে মজুত রহিয়াছে বলিয়াও আশঙ্কা করা হইয়াছে। খোলা-বাজারে স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবহার এই সোণা ও বৈদেশিক মুদ্রা গোপন মজুত হইতে বাহিরে আসিতে বাধ্য হইবে। ফলে ফ্রাঁ-র মূল্য সময় সময় আরও হ্রাস হওয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

ফ্রাঁ-র মূল্য হ্রাস হওয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে বৃটেনও পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করিবে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। বৃটেন পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করিবে না, এ কথা সরকারী ভাবেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেকে আশঙ্কা করেন যে, পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা বৃটেন দীর্ঘ কাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। এমন কি, ইউরোপের অন্যান্ত দেশকেও মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে হইবে, এইরূপ মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিযোগিতা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এইরূপ অবস্থা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ইহাতে মার্শাল-পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অবশ্য ইতিমধ্যে আমেরিকার শেয়ার ও শস্যের বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গত ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী এই দুই দিনে শেয়ার বাজারে যে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে ২০০ কোটি ডলার উবিয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কট আশঙ্কা করিয়াই উহার প্রতিরোধের জন্ত মার্শাল-পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে। ইউরোপের সকল দেশেই যদি মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলেও মার্শাল-পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। বরং আমেরিকার ইহাতে সুবিধাই হইবে। কিন্তু মিঃ বেভিনের পশ্চিম ইউরোপের সংহতি প্রতিষ্ঠার আশা আলেয়ার মত হইয়া উঠিবারই আশঙ্কা।

প্যালেষ্টাইনের সঙ্কট—

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্রস্তাব কার্য্যকরী করা যে বড় সহজ হইবে তাহা প্যালেষ্টাইন কমিশনের সদস্যরা ক্রমে তাহা অনুভব করিতেছেন। লেক সাক্সেস হইতে ২২শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্যালেষ্টাইন কমিশন গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে প্যালেষ্টাইনের জন্ত সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সাধারণ পরিষদের প্যালেষ্টাইন বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাব সামান্ত মাত্র লঙ্ঘন না করিয়াই সৈন্য নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রধান সমস্যা এই যে, সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া সৈন্য নিয়োগ করিবার মত সৈন্য কোথায়? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্যালেষ্টাইন কমিশনকে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহের অধিক পূর্ব্বে কমিশনের প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না। আগামী ১৫ই মে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হইবে। কাজেই মে মাসের প্রথম ভাগের পূর্ব্বে কমিশনের প্যালেষ্টাইনে যাওয়া সম্ভব হইবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কয়েকটি বিষয়ে কমিশনকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্যালেষ্টাইনে কোন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠিত হইতে দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, কমিশন প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হইলে ঐ সময় হইতে ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এক পক্ষ কাল কমিশনের নিরাপত্তার দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন সৈন্যবাহিনী দিতে

পারিবেন না। ভাবী বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের সীমান্ত কমিশন কর্তৃক পর্যাবেক্ষণেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইতে অসমর্থ। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আরব লিজিয়ন এবং ট্রান্সজর্ডান ফ্রন্টিয়ার বাহিনী অপসারিত করা হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত সতর্ক-বাণীতে কমিশন যে কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছেন, তাহা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রদত্ত তাহাদের রিপোর্ট হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্ত পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা না করিলে প্যালেষ্টাইনের নিরাপত্তা এবং শাসন-পরিচালন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ, প্যালেষ্টাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে-ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং বে-সামরিক শাসন-ব্যবস্থা যে-ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের প্রস্তাব কার্য্যকরী করা সম্বন্ধে কমিশন যে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন তাহা খুব স্বাভাবিক। প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হইতে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ একরূপ সমান ভাবেই চলিতেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড লিষ্টওয়েল গত ২০শে জানুয়ারী লর্ড-সভায় প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত বিতর্কের সময় বলিয়াছেন, ৩০শে নভেম্বর (১৯৪৭) হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাঙ্গামায় মোট ৬৪৫ জন আরব এবং ৩৩৩ জন ইহুদী নিহত হইয়াছে। আহত হইয়াছে ৫৭৭ জন আরব এবং ৬৩৩ জন ইহুদী। ২০ জন বৃটিশ সৈন্স নিহত এবং ৭২ জন আহত হইয়াছে। দীর্ঘস্থায়ী হাঙ্গামার ফলে প্যালেষ্টাইনের অর্থ নৈতিক অবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। জেরুজালেমস্থিত বৃটিশ অর্থ নৈতিক কর্ম্মচারীরা এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার পরে প্যালেষ্টাইনের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। নিরাপত্তা পরিষদ এই সকল সমস্যার প্রতিকারের জন্ত কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা কিছুই জানা যায় না। প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান উদ্যোগী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পন্থা অনুমোদন করিবেন নিরাপত্তা পরিষদ তাহাই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমেরিকার কম্যুনিজম-ভীতির সুযোগ লইয়া জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে আরব উচ্চতর কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, প্রায় ১৫ লক্ষ কম্যুনিষ্ট-এজেণ্ট পশ্চিম-ইউরোপ এবং মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। বিবৃতিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল কম্যুনিষ্ট-এজেণ্টদের কতক ইহুদী এবং কতক রুশ। এই বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, ইহুদীদের সহিত রাশিয়ার এক গোপন চুক্তি হইয়াছে এবং 'Zionism now is a secret ally of communism." অর্থাৎ জিওনিজম এখন কম্যুনিজমের গোপন মিত্র। বৃটেনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইয়াছে যে, প্যান ইয়র্ক এবং প্যান ক্রিসেণ্ট জাহাজদ্বয়ের ইহুদী আরোহীরা কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্ট-এজেণ্টরা প্যালেষ্টাইন ছাইয়া ফেলিয়াছে, এই কথাও বৃটেন আমেরিকাকে জানাইয়াছে। উক্ত জাহাজদ্বয়ের ১৫০০০ জন আরোহীর মধ্যে ১৩,০০০ জনই কম্যুনিষ্ট, এ কথা অবশ্য ইহুদী এজেন্সীর কার্য্যকরী সমিতির জনৈক সদস্য বার্লকার অস্বীকার করিয়াছেন।

এই সকল প্রচার-কার্য্যের ফলে কম্যুনিজমের ভয়ে ভীত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন্ পন্থা গ্রহণ করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন। এদিকে আরব লীগ রাজনৈতিক কমিটি বৃটিশ চলিয়া গেলেই প্যালেষ্টাইনের প্রত্যেকটি সহর এবং গ্রাম দখল করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ৫ হাজার হইতে ৬ হাজার আরব ইতিমধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে এবং প্রতিদিন আরও প্রবেশ করিতেছে। আক্রমণটা হইবে আসলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে। আগামী আগষ্ট মাসে প্যালেষ্টাইন যে রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের বিশেষ কার্য্যকরী কমিটি (Special Working Committee) জেরুজালেমে আন্তর্জাতিক শাসনের একটি খসড়া-পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি রচনা করিতে ২১ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে এবং উহাতে প্রধান বিধি আছে দশটি। পূর্ব্বে আবুদিস, দক্ষিণে বেথেলহেম, পশ্চিমে এইন করিম এবং উত্তরে শু'ফাৎ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী জেরুজালেম সহর সহ সমগ্র অঞ্চলের আন্তর্জ্জাতিক শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অঞ্চলে প্রায় এক লক্ষ ইহুদীর বাস। আরবদের সংখ্যাও প্রায় এক লক্ষ হইবে। এই আরবদের অর্দ্ধেক মুসলিম আরব এবং অর্দ্ধেক খৃষ্টান আরব। প্যালেষ্টাইনের বাহির হইতে আরব এবং ইহুদী বাদ দিয়া একটি পুলিশ-বাহিনী গঠন করা হইবে। এই পুলিশবাহিনী সমস্ত পবিত্র স্থান এবং ধর্ম্মমন্দির সমূহ রক্ষা করিবে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন কতখানি নিরাপদ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

ইঙ্গ-ইরাক সন্ধি—

ইরাকে জনমতের যে-জয় হইয়াছে, সাধারণতঃ এইরূপ জয় কদাচিৎ হইয়া থাকে। গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইংলণ্ডের পোর্টস্মাউথে বৃটেন ও ইরাকের মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার প্রতিবাদ বাগদাদে ছাত্র ও জনসাধারণের প্রবল বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বিলাতে থাকায় অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী জামাল বাবান ইঙ্গ-ইরাক সন্ধির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করায় বিক্ষোভকারীদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। কিন্তু জনমতের প্রবল চাপে ইরাকের রিজেণ্ট, ক্রাউন প্রিন্স এবং রাজনৈতিক নেতৃগণ এক বৈঠকে সমবেত হইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই নূতন ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি দ্বারা ইরাকের জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না এবং এই চুক্তি দ্বারা দেশের অধিকার ও জাতীয় দাবীসমূহ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। কাজেই এই নূতন ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি অনুমোদন করা যায় না। ২১শে জানুয়ারী রাত্রে রাজপ্রাসাদ হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ সালেহ্ জবর ২৫শে জানুয়ারী লণ্ডন হইতে এক বিবৃতিতে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির বিরুদ্ধে বাগদাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার কঠোর নিন্দা করেন। এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনে তিনি যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সংবাদে তাহাও প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সন্ধির প্রতিবাদকারীদিগকে শাস্তি দিবার জন্ত লণ্ডন হইতে তিনি এরোপ্লেনে বাগদাদে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হয়। ২৪শে জানুয়ারী রাত্রে

সৈয়দ সালেহ, জবরের মন্ত্রিসভার পতনের সংবাদ রাজপ্রাসাদ হইতে ঘোষণা করা হয় এবং ২১শে জানুয়ারী সৈয়দ মহম্মদ এস-সাদরের প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই নূতন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ১১৫ জন ছাত্রের জীবন এবং ৩০০ জন লোক আহত হওয়ার বিনিময়ে ইরাকের জনমত এই বিজয় লাভ করিয়াছে। অবিলম্বে পোর্টসমাউথে সম্পাদিত ইঙ্গ-ইরাক সন্ধি বাতিল করিবার জন্য দাবী উত্থিত হইয়াছে।

১৯৩০ সালে ইরাক ও বৃটেনের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার পরিবর্ত্তে এই নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই নূতন সন্ধি ২০ বৎসর বলবৎ থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সন্ধির সর্ত্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সর্ত্তগুলি ইরাকের স্বার্থ অপেক্ষা মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থরক্ষার পক্ষেই বিশেষ অনুকূল। ইরাকের দুইটি বিখ্যাত বিমান ঘাঁটী হাব্বানিয়া এবং শেইবাতে বৃটিশ-বাহিনী মোতায়েন রাখিতে বৃটেনের অধিকার বিলোপ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইরাককে যে ভাবে বৃটেনের সামরিক তাঁবে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে উহা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর যে-কোন দেশের সহিত বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলেই ইরাকে সশস্ত্র বৃটিশ-বাহিনী প্রেরণের অধিকার বৃটেনকে দেওয়া হইয়াছে। ইরাক হইতে বহু দূরবর্ত্তী পৃথিবীর সুদূর অন্য প্রান্তে যদি বৃটেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে বৃটেন ইরাকে সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনী আনিতে পারিবে। বৃটিশ সামরিক বিভাগ ইরাকের স্থল ও বিমান-বাহিনীকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ইরাককে বৃটেনের নিকট হইতেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। ইঙ্গ-ইরাক যুক্ত সামরিক বোর্ড গঠন করিতে হইবে। সন্ধিপত্রের সহিত যে পাদটীকা যুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শান্তির সময়েও বৃটিশ-বাহিনীকে ইরাকের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে দিতে হইবে। কতগুলি বিমান-ঘাঁটী বৃটেন এবং ইরাক একযোগ ব্যবহার করিতে পারিবে। এই সর্ত্তটি শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা বলিয়াই সকলের মনে হইবে মাত্র।

ইরাকের সহিত এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় বৃটেন মনে করিয়াছিল যে, মধ্য-প্রাচীর সমস্ত দেশের সহিতই বৃটেন ঐ রূপ সর্ত্তে সন্ধি করিতে পারিবে। মিশরের সহিত ১৯৩৬ সালে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাও এ সন্ধির ছাঁচেই ঢালিয়া সাজা অতঃপর সম্ভব হইবে বলিয়াও বৃটেন আশা করিয়াছিল। কিন্তু ইঙ্গ ইরাক সন্ধি লইয়া ইরাকে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বৃটেনের এই আশা পূর্ণ হওয়ার পথে যে বিপুল বাধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইরাকের সমস্যাও বড় সহজ নয়। এই নূতন সন্ধি ইরাক যদি অনুমোদন না করে, তবে ১৯৩০ সালের সন্ধিই কার্য্যতঃ বহাল থাকিবে। মধ্য-প্রাচীর আরব শক্তিগুলি যে পর্য্যন্ত প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ না করিতেছে, তত দিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তত দিন তাহারা ইঙ্গ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হইয়াই থাকিবে। ইরাকে জনমতের যে জয় হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা বোধ হয় এখনও বহু দূরবর্ত্তী।

ইন্দোনেশিয়া—

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের 'গুড্ অফিস কমিটি' ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিণ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ অবস্থার চাপে পড়িয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে নাই। শক্তিহীন 'গুড্ অফিস কমিটি'র উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের যে-সুদীর্ঘ ছয় মাসব্যাপী আলোচনা চলিতেছিল, তাহার ফলে তিনটি দলিল রচিত হয় : (১) যুদ্ধবিরতি চুক্তি (The Truce Agreement); (২) রাজনৈতিক আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মূল নীতি (The Principles Forming An Agreed Basis For The Political Discussions) এবং গুড্ অফিস কমিটি কর্ত্তৃক উভয় পক্ষের নিকট উপস্থাপিত রাজনৈতিক মীমাংসা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অতিরিক্ত মূল নীতি (Additional Principles For The Negotiations Towards A Political Settlement Submitted By C. G. O. To Both Parties) 'গত ১৬ই জানুয়ারী 'গুড্ অফিস কমিটি' এক ইস্তাহার জারী করিয়া ঘোষণা করেন যে, ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এই কমিটি এবং ডাচ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত যুদ্ধ-বিরতির সর্ব্বশেষ প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রও এক ইস্তাহার জারী করিয়া ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য কতকগুলি রাজনৈতিক নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতিগুলি গ্রহণ করিতে নেদারল্যাণ্ড পূর্ব্বেই সম্মত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই অকস্মাৎ আবার সব গোলমাল হইয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, যোগ্যকার্ত্তার যে বৈঠকে এই চুক্তি চূড়ান্ত ভাবে রচিত হয়, সেই বৈঠকে কমিটি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সার্ব্বভৌমত্ব ইহাতে ক্ষুন্ন হইবে না। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সর্ত্তাবলী যে খুবই কঠোর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ২১শে আগষ্ট তারিখের সীমানাই প্রজাতন্ত্র ও ডাচ-অধিকৃত রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমানা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ গবর্ণমেণ্টেরই সার্ব্বভৌমত্ব থাকিবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টে প্রজাতন্ত্রের পর্য্যাপ্ত প্রতিনিধি থাকিবে, এই সর্ত্তাধীনেই প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত সর্ত্ত মানিয়া লন। কিন্তু 'গুড অফিস কমিটি'র ছয় দফা সর্ত্ত-সম্বলিত প্রস্তাব প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ত্তাধীনে মানিয়া লওয়া নেদারল্যাণ্ডের পছন্দ হয় নাই। তাঁহারা এইরূপ সর্ত্তাধীনে মানিয়া লওয়ার বিরোধী। এই অবস্থায় 'গুড্ অফিস কমিটি' যে নীতি গ্রহণ করেন তাহা খুবই বিস্ময়কর। তাঁহারা নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর আপোষের মনোবৃত্তি প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়া প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টকেই আরও ত্যাগস্বীকার করিতে অনুরোধ করেন। ফলে ডাচ ইন্দোনেশীয় আলোচনা এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছে। আমীর সরফুদ্দিন প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন, ডক্টর হাত্তা প্রধান মন্ত্রী হন এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

বর্ত্তমানে সুমাত্রা ও জাভার বৃহৎ অংশ ডাচ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে এই অংশ অত্যন্ত মূল্যবান। বাহির হইতে রণসম্ভারের সরবরাহ না থাকায় ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র ডাচ-বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। জাভা এবং সুমাত্রার যে অংশ বর্ত্তমানে প্রজাতন্ত্রের অধিকারে, অর্থনৈতিক দিক্

হইতে তাহার বিশেষ কিছু মূল্য নাই। উহাকে ঘাটতি অঞ্চল বলিলেও ভুল হয় না। ডাচ গবর্ণমেণ্টের সামরিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাভা এবং সুমাত্রায় কয়েকটি তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ সমর্থ হইয়াছেন। সুমাত্রায় তিনটি তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। একটি পেডাংএ, দ্বিতীয়টি পালেম্বাং-এ এবং তৃতীয়টি টেলোক বোটাং এ। পশ্চিম-জাভায় সুনদানীদের গবর্ণমেণ্ট এবং পূর্ব্ব-জাভায় মাজুরায় একটি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শান্তির শক্তি পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করা কত সহজ, ইন্দোনেশিয়া তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত। বোর্ণিও, মালাক্কাস, দক্ষিণ অংশ বাদে সেলেবিস-এ কার্য্যতঃ ডাচ-আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের শাসিত অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট ইন্দোনেশিয়ায় হয় প্রত্যক্ষ ডাচ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে না হয় গঠিত হইয়াছে ডাচ-তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট। এক বৎসর পূর্ব্বে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, এক বৎসর পরে সে-সম্বন্ধে আশা পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সহযোগিতা ব্যতীত ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র যাহাতে সহযোগিতা করিতে না পারে, তাহার কোন ব্যবস্থাই আর বাকী রাখা হইতেছে না। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের 'গুড অফিস কমিটি'র সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদের জয় হইয়াছে।

ইন্দোচীন—

ভিয়েটনামের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোন সংবাদই প্রকাশ হয় না। কিন্তু গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে ভিয়েটনামের ভবিষ্যৎ লইয়া আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বাও দাও এবং ইন্দোচীনের ফরাসী হাই-কমিশনার মঃ বোলায়ের (M. Bollaert) মধ্যে জেনেভায় চারি দিনব্যাপী এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনায় কোন শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। তবে ফরাসী হাই-কমিশনার আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের নিকট যে চারি দফা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রস্তাব চারিটি এই-রূপ : (১) ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে ভিয়েটনামের ঐক্য এবং স্বাধীনতা, (২) ভিয়েটনামের পুলিশ-বাহিনী এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভিয়েটনামী হইবে, কিন্তু নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রভৃতির অফিসার হইবে ফরাসী, (৩) ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্ট কনসাল নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু মন্ত্রী এবং এম্বেসেডার নিয়োগ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে, (৪) ভিয়েটনামে যাহাতে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসেই উভয়ের আবার আলোচনা হইবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা হইবে বলিয়া উভয়েই আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

বাও দাও বলিয়াছেন যে, তিনি টংকিং, আনাম এবং কোচিন-চায়নার ঐক্যের সমর্থক। লাওস এবং কাম্বোডিয়া ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুইটি অঞ্চলের সহিত ফ্রান্সের একটা বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। কোচিন-চায়নাকেও ফ্রান্স ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। এ সম্বন্ধে গণভোট অবশ্যই গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কোচিন চায়না ভিয়েটনাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা দিতেছেন। কিন্তু বাও দাও ডাঃ হো চি মিনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিবেন কি না, তাহারই উপর ফ্রান্সের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। বাও দাও যে, যে-কোন মূল্যে তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরায় উদ্ধার করিতে চান তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও আস্থাভাজন বলিয়া প্রকাশ। বাও দাও হয়ত আশা করিতেছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে অনিচ্ছুক ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি অনেক কিছু সুবিধা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কতটুকু পূর্ণ করিতে পারিবেন, তাহার উপরেই তাঁহার সিংহাসন উদ্ধার করিবার আশা নির্ভর করিতেছে।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম—

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান গত ১২ই জানুয়ারী মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট ১৯৪৮-৪৯ সালের (১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের জুন পর্য্যন্ত) যে বাজেট প্রেরণ করিয়াছেন, অনেকে তাহাকে পররাষ্ট্র-নীতি বাজেট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি রাশিয়া ও কমুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবার নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এই বাজেটকে রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক যুদ্ধের বাজেট বলিলে ভুল হইবে না। রাশিয়ার তথাকথিত সম্প্রসারণ-নীতিকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ইউরোপ হইতে এশিয়া পর্য্যন্ত যে অর্থনৈতিক প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক এই বাজেট-বরাদ্দের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আমেরিকার ৪৪০০০ মিলিয়ন ডলার আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩১,৭০০ মিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে ৭০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ১৮ ভাগ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে সাহায্য দিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। কংগ্রেসকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ইউরোপ যদি একনায়কত্বমূলক শাসনের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থাপিত আর্থিক সাহায্যের পরিকল্পনায় ব্যয় অপেক্ষা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যয় অনেক বেশী হইবে।

আমেরিকা যে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির আয়োজন কম করিতেছে তাহা নয়। আমেরিকা নূতন পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতেছে। এতদ্-সংক্রান্ত গবেষণা এবং বোমা নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য এ পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে ২৫০০ মিলিয়ন ডলার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতি মিঃ লিলিয়েনথল বলিয়াছেন যে, উহার জন্য অন্ততঃ ৫০০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করিতে হইবে। রাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সত্যই সক্ষম হইয়াছে কি না সে-সম্বন্ধে নানা মত দেখা যায়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-নীতি কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশ আগামী চারি বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিবে এবং এমন কতগুলি দ্বারা অস্ত্র তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবে যেগুলি দ্বারা ৫ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী সহরের উপরেও আঘাত হানিতে পারা যাইবে। অন্যান্য দেশ বলিতে যে রাশিয়াকেই

বুঝান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিশন মনে করেন যে, আমেরিকার পক্ষে একমাত্র বিমান-শক্তি দ্বারাই আত্মরক্ষা করা সম্ভব। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া এমন স্থান অধিকার করিতে হইবে, যে-স্থান হইতে ধ্বংসকে আমাদের মাতৃভূমি হইতে তাহার (শত্রুর) দেশে ফিরিয়া পাঠাইতে পারি।' এইরূপ অগ্রসর হইয়া থাকিবার ব্যবস্থার নামই যে মার্শাল-পরিকল্পনা, তাহা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাজেট-বাণীতে সুপরিস্ফুট দেখা যায়।

আয়ারের সাধারণ নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি আয়ারে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ডি-ভ্যালেরার 'ফিয়ানা ফেইল' (Fianna Fail) দল এবারের সাধারণ নির্ব্বাচনে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন না। ডি ভ্যালেরার দল যদিও নির্ব্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে নাই, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক্ হইতে এই দল অন্যান্য সকল দলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নির্ব্বাচনে 'ফিয়ানা ফেইল' দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না, এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ার মূলে ছিল রিপাবলিকান দল নামে নূতন একটি দল সৃষ্টি। এই দলের নেতা মিঃ ম্যাকব্রাইড। এই 'ফিয়ানা ফেইল' অপেক্ষাও অধিকতর বামপন্থী ও শিল্পপতি এবং শ্রমিক এ উভয় শ্রেণী 'ফিয়ানা ফেইলে'র সমর্থক ছিল, তাহারা এই দলকে সমর্থন করিতেছে এইরূপ মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। এই নূতন দল সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবে, এই প্রতিশ্রুতির জন্য শ্রমিকরা এই দলের সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিল। আবার আমদানীর উপর হইতে উচ্চ শুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় শিল্পপতিরাও 'ফিয়ানা ফেইল' দলকে পছন্দ করিতেছিল না। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, আয়ারবাসীরা ডি ভ্যালেরার উপর আস্থা এখনও হারায় নাই। কিন্তু নূতন গবর্ণমেণ্ট কিরূপ হইবে, ইহাই প্রশ্ন।

ডি ভ্যালেরা রিপাবলিকান দলের সহিত কোয়ালিশন করিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। 'ফিয়ানা ফেইলে'র পরেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক্ হইতে রক্ষণশীল দল 'ফিনে গেইলে'র স্থান। কিন্তু শ্রমিক দল, জাতীয় শ্রমিক ও কৃষক দল, রিপাবলিকান দল প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় এই দল গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবে সে ভরসাও নাই। কাজেই ডি ভ্যালেরা সংখ্যালঘু গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন, এইরূপ সম্ভাবনাই বেশী।

সিংহলে স্বাধীনতা—

৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) সিংহল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। যদিও এই স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে সিংহল কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসনশীল ডোমিনিয়ন ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, তথাপি উহাকে স্বাধীনতার পথে প্রথম পাদক্ষেপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কত বৎসর পরে সিংহল স্বাধীনতার পথে প্রথম পাদক্ষেপ করিল, তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন বলিয়া অনেকে মনে করেন। পর্ত্তুগীজরা সর্ব্বপ্রথম সিংহলে আসে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে। ক্রমে তাহারা সমগ্র দ্বীপটির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রায় ১৫০ বৎসর সিংহল পর্ত্তুগীজদের অধীনে ছিল। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা সিংহলে আসে। ক্যাণ্ডির রাজা ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করেন; কিন্তু ক্যাণ্ডি রাজ্য ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র সিংহলেই ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশরা সিংহলে আসে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এবং এক বৎসরের মধ্যেই ডাচদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৃটিশ-শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৯৬ সালে সিংহলকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সহিত সংযুক্ত করা হয়। সিংহল ক্রাউন কলোনী হয় ১৭১৮ সালে। ১৯৪৮ সালে সিংহল বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন হইল।

জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দিক্ হইতে সিংহলকে ভারতের অঙ্গ বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না। সিংহলীদের আদি পূর্ব্বপুরুষরা বাংলা ও উড়িষ্যা হইতে যাইয়া সিংহলে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। মধ্যযুগে বহু সংখ্যক তামিল অধিবাসী সিংহলে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। সুতরাং বর্ত্তমান সিংহলীদের অধিকাংশই উল্লিখিত আগন্তুকদের বংশধর। বৃটিশ শাসনের সময় চা ও রবার বাগানে কাজের জন্য বহু সংখ্যক ভারতীয় সিংহলে যায়। বর্ত্তমানে এইরূপ ভারতীয়ের সংখ্যা ৮ লক্ষের কম নয়।

মালয় যুক্তরাষ্ট্র—

গত ২১শে জানুয়ারী (১৯৪৮) মালয়ের ৯টি দেশীয় রাজ্যের সুলতানদের সহিত মালয় ইউনিয়নের গবর্ণরের এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় মালয় যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। নয়টি দেশীয় মালয় রাজ্য এবং পেনাং ও মালাক্কা সেট্‌লমেণ্ট লইয়া এই মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। মালয় যে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় ইহা-ই প্রধান লাভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মালয়ও জাপানের কবলিত হইয়াছিল এবং বৃটেন উহা পুনরায় অধিকার করে। যুদ্ধে মালয়ের অধিবাসীদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মালয়ের জন্য একটি মালয় ইউনিয়ন পরিকল্পনা গঠন করেন। সুলতানরাই যে শুধু এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন তাহা নয়, মালয়ের অধিবাসীরা এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও উহার বিরোধী ছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বামপন্থীদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিলেও সুলতানদের দাবী অগ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কাজেই ঐ পরিকল্পনা বাতিল হইয়া যায় এবং গোপনে একটি ত্রিপক্ষীয় আলোচনা চলিতে থাকে। এই আলোচনার ফলেই নূতন পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে। এই তিন পক্ষে এক পক্ষ গবর্ণমেণ্ট, দ্বিতীয় পক্ষ সুলতানগণ এবং তৃতীয় পক্ষ ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানিজেশন। এই প্রতিষ্ঠানটি মালয়ের ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারীদের প্রতিষ্ঠান।

বর্ত্তমান পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ইংলণ্ডেশ্বর এবং সুলতানদের যৌথ সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুলতানরা নিয়মতান্ত্রিক রাজা হইবেন। পররাষ্ট্র বিভাগ এবং দেশরক্ষা বিভাগ সংরক্ষিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই পরিকল্পনা যে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থবাদী ও মালয়ের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব আপোষে মিটাইবার প্রয়াসের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গান্ধীজীর "ষ্টাইলই" তাঁর চরিত্র

[৩৮০ পৃষ্ঠার পর]

Mecca to Damascus" তাই লেখা যখন হ'ল তখন উইনষ্টনের মতন লোকও বলতে বাধ্য হলেন :

"It ranks with the greatest books ever written in the English language…It will take its place at once as an English classic. His book will be read as long as the English language is spoken."

কথাটা ঠিক। এক একটা যুগে এ রকম অমর রচনা সৃষ্টি হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু "সেভ্‌ন্‌ পিলার্স" ইংরেজী ভাষায় যদি অমরত্ব লাভ করে তা'হলে তা করবে শুধু এই জন্যে যে, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ তা টি, ই'র চরিত্রে ছিল এবং তাঁর সেই চরিত্র, সেই আদর্শ সত্তা ও ব্যক্তিত্ব তাঁর ষ্টাইলের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজ জাতের অস্তিত্ব যত দিন থাকবে তত দিন টি, ই'র সেভ্‌ন্‌ পিলার্স সকলে মহাকাব্যের মতন পড়বে, যদিও তা যুদ্ধের কাহিনী মাত্র। গ্রন্থের ভূমিকাতে টি, ই, তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ষ্টাইলে লিখছেন :

"We were fond together, because of the sweep of the open places, the taste of wide winds, the sunlight, and the hopes in which we worked. The morning freshness of the world-to-be intoxicated us. We were wrought up with ideas inexpressible and vaporous, but to be fought for. We lived many lives in those whirling campaigns, never sparing ourselves: Yet when we achieved and the new world dawned, the old men came out again and took our victory to remake in the likeness of the former world they knew…We stammeved that we had worked for a new heaven and a new earth, and they thanked us kindly and made their peace."

এ রকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এবং না দিলে যেন খুশি হওয়া যায় না। এ শুধু এক জন ইংরেজের ষ্টাইল নয়, এ যেন ইংরেজ জাতের জাতীয় ষ্টাইল। ইংরেজ জাতির যা কিছু মহত্ত্ব তা যেন এই ষ্টাইলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, পরিচ্ছন্নতা, উদারতা এবং সবার উপরে কঠোরতা-জনিত গাঢ়বন্ধতা, কিছুরই অভাব নেই এই ষ্টাইলের মধ্যে। ঠিক এরই পাশে উইনষ্টন চার্চিলের 'ষ্টাইলে'র নমুনা যদি তুলে দেওয়া যায় তা'হলে ইংরেজের চরিত্রের আর একটি দিক্‌ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিলেতে রক্ষণশীলদের এক সভায় চার্চিল সাহেব বলছেন :

It is alarming and also nauseating to see Mr. Gandhi, a seditious Middle Temple Lawyer, now posing as a fakir of a type well-known in the East, striding half-naked up the steps of the Viceregal place, while he is still organising and conducting a defiant compaign of civil disobedience, to parley on equal terms with the representative of the King Emperor…These are his well known aims. Surely they form a strange basis for heart to heart discussions—'Sweet' we are told thev were—between this malignant' subversive fanatic and the Viceroy of India.

টি, ই'র আগেকার উদ্ধৃতির সঙ্গে চার্চিলের এই ভাষার তুলনা করলে বোঝা যায়, একটা ইংরেজ জাতির ভাষা আর একটা দাম্ভিক, গর্বোদ্ধত, অভিজাতবংশীয় সাম্রাজ্যবাদীর ভাষা, যার কোন জাত নেই। চার্চিল ইংরেজী ষ্টাইলের মাষ্টার, কিন্তু তা'হলেও এ কথা বলতেই হবে যে, তাঁর রচনা অথবা বক্তৃতার মধ্যে ইংরেজের জাতীয় চরিত্র সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু টি, ই'র ষ্টাইল তা নয়। টি, ই'র ষ্টাইলের মধ্যে ইংরেজ জাতির অন্তরাত্মার স্পন্দন পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। গান্ধীজী যে ইংরেজী ষ্টাইলের প্রবর্তক, যে ষ্টাইলকে তিনি আত্মসাৎ ক'রে আপনার ক'রে নিয়েছিলেন, সে হ'ল ইংরেজ জাতের ষ্টাইল। চার্চিলের শ্রেণীগত ষ্টাইল নয়, টি, ই'র জাতীয় ষ্টাইলের ধারাই গান্ধীজীর ধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। তার কারণ, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি গান্ধীজীর বিরোধিতা গোটা ইংরেজ জাতির প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে পরিণত হয়নি কোন দিন। কোন বিশেষ শ্রেণীর ঔদ্ধত্য বা অন্যায় তাঁর বিশ্বমানবতাবোধ হিংসা-দ্বেষের মলিন স্পর্শে কলঙ্কিত করতে পারেনি। তাই তিনি কিছু দিন আগেও লিখেছেন :

But it is no use brooding over the past or British mistakes. It is more profitable to look within. The British will take care of themselves, if we will take care of ourselves. Our mistakes or rather defects are many. Why blame the British for our own limitations? Attainment of Independence is an impossibility till we have solved the communal tangle. There are two ways of solving what has almost become insoluble. The one is the royal way of non-violence, and the other violence.

এই হ'ল গান্ধীজীর ষ্টাইল, চার্চিল যাঁকে "Seditious Middle Temple Lawyer, now posing as a fakir এবং "malignant subversive fanatic" বলেছেন। আশ্চর্য এই যে, "ফকির-বেশধারী মিডল টেম্পলের ব্যারিষ্টার" গান্ধীজীর আজীবনের রচনাবলীর মধ্যে 'malignant' 'subversive' বা 'fanatic'-এর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, যদিও চার্চিলের

প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে এই সব ক'টি উপসর্গই অত্যন্ত প্রকট। চার্চিলের জাত্যভিমান, শ্রেণী-আভিজাত্য ও ঔদ্ধত্য, লর্ড বংশের 'ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট' রক্তের প্রবাহ, কোনটাই গান্ধীজীর মধ্যে নেই। এ কথা ঠিক যে, তিনি ফকির এবং "of a type well-known in the East", কিন্তু সেটা তাঁর 'pose নয়, যেমন ইংরেজের জাত্যভিমানটা চার্চিলের কাছে "পোজ" বা ভান মাত্র, কিন্তু ইংরেজের মতন ইংরেজ টি, ই'র কাছে কখনই নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার 'creation' বা সৃষ্টি তাই চার্চিলরা নন, কয়েক জন মাত্র টি, ই, লরেন্স। চার্চিলরা হলেন 'Slag' এবং 'by-product' মাত্র। এই স্ল্যাগ, গান্ধীজী আবর্জনার মতনই বর্জন করেছেন, তাই তাঁর ষ্টাইলে মেকলে-গ্লাড্‌ষ্টোন-চার্চিলের ছোঁয়াচ লাগেনি।

শুধু বিদেশের চার্চিলদের নয়, এ দেশের চার্চিলিয়ান মেজাজের অনেক নেতার তীক্ষ্ণ বাণের খোচাতেও তাই গান্ধীজীর ষ্টাইলের মধ্যে 'ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ফ্যানাটিকের' বিরক্তি বা শ্লেষ, কটূক্তি বা হঠোক্তি, কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায়নি। হিন্দু-মুসলমানের একতা এবং ভারতের একজাতত্বে গান্ধীজীর অগাধ বিশ্বাসের উত্তরে একবার জিন্না সাহেব তাঁকে লেখেন:

"I, however, regret to have to say that your premises are wrong as you start with the theory of an Indian nation that does not exist, and naturally, therefore, your conclusions are wrong··· There is so much in your article which is the result of imagination. It is due partly to the fact that you are living a secluded life at Segaon and partly because all your thoughts and actions are guided by 'inner voice'. You have very little concern with realities, or what might be termed by an ordinary mortal 'practical politics'··· Events are moving fast, a campaign of polemics, or your weekly discourse in the Harijan on Metaphysics, philosophy and ethics, or your peculiar doctrines regarding KHADDER, AHIMSA and spinning are not going to win India's freedom. Action and statesmanship alone will help us in our forward march.

এর পাশে গান্ধীজীর রচনা তুলে দিচ্ছি:

"There was a time when every Muslim was professing that India was his motherland. The Ali brothers believed in it. I am not prepared to believe for a moment that it was a lie or bluff. I would prefer to be ignorant Mother than to doubt my colleagues···From my childhood, I am a firm believer in Hindu Muslim and communal unity···When I had been to Africa, I undertook a brief for a Muslim client. I championed their cause there. I never distrust them. I did not return from Africa as a disappointed or as a defeated man. I do not care for the abuses which are being hurled on me by some of my Muslim friends. I do not know what I have done that has offended them···I dine with the Muslims. I dine with all without any consideration to their caste or religion. I hate none and there is no hatred in me···Jinnah Sahib has been a congressman in the past. He seems now to be misguided. I pray long life for him and wish that he may survive me. A day will certainly dawn when he will realise that I have never wronged him or the Muslims. I have the fullest confidence in the sincerity of the Muslims. I will never talk ill of them even if they kill me."

জিন্না সাহেবের ষ্টাইলের মধ্যে তাঁর চরিত্রগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটে উঠেছে। তিনি যে প্র্যাকটিকাল পলিটিসিয়ান এবং কল্পনার ধারও ধারেন না, তা বেশ হাড়ে-হাড়ে মালুম হয়। তাঁর হতাশা-জনিত বিরক্তির ভাব তাঁর ষ্টাইলে সুস্পষ্ট। তাঁর চারিত্রিক কাঠিন্য ও রুক্ষতাও তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ-ঝঙ্কারের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সহনশীলতা, উদারতা এবং সম্প্রীতিবোধের শোচনীয় অভাবও তাঁর নিষ্ঠুর শ্লেষোক্তির মধ্যে সুপরিস্ফুট। উদ্ধত, ম্যালিগন্যাণ্ট এবং ফ্যানাটিক চার্চিলের ভারতীয় সংস্করণ যে জিন্না সাহেব, তা তাঁর ও চার্চিলের ষ্টাইলের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

গান্ধীজীর ষ্টাইল ঠিক এর বিপরীতধর্মী। কারণ গান্ধীজীর চরিত্র চার্চিল-জিন্নার বিপরীত। গান্ধীজীর চরিত্র সরলস্বভাব শিশুর মতন, তাই তাঁর রচনাও যেন শিশুকণ্ঠের কাকলি। তার মধ্যে অভিমান আছে, আত্মাভিমান নেই, গভীর অনুভূতি আছে, ফ্যানাটিকের উন্মত্ততা বা সস্তা ভাব-প্রবণতা নেই। তার মধ্যে যুক্তি আছে, সে যুক্তি অচল অটল আত্মবিশ্বাসের প্রাঞ্জল যুক্তি, হিসাবনবিশের শুকনো নীরস লড়বড়ে যুক্তি নয়। তার মধ্যে শ্রেণী, জাতি বা ধর্মের সঙ্কীর্ণতা নেই, ঔদ্ধত্য বা গোঁড়ামি নেই, তাই তাঁর ষ্টাইলের মধ্যে ভুলেও কখন নিষ্ঠুর শ্লেষ দেখা যায় না, উদারতার দিগন্তলীন মহাসমুদ্রে সব অভিযোগ মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়, সত্যের নির্মল দিবালোকের মতন তাঁর উক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, এ ষ্টাইল মেকলে-গ্লাড্‌ষ্টোন-চার্চিলের ষ্টাইল নয়, জিন্না সাহেবেরও নয়। এ ষ্টাইল যিশুখৃষ্টের ষ্টাইল, রামকৃষ্ণ-চৈতন্যের ষ্টাইল। এ ষ্টাইল প্রাচ্যের পাশ্চাত্য ষ্টাইল, যেখানে পুব আর পশ্চিম দেওয়া-নেওয়ায় এক হয়ে গেছে। টি, ই'র ষ্টাইলে যে ইংরেজসুলভ কঠোর গাঢ়বদ্ধতা আছে, গান্ধীজীর ষ্টাইলে তা নেই। গান্ধীজীর ষ্টাইলে আছে পশ্চিমের আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা এবং তার সঙ্গে আত্মার মতন অদৃশ্য ভাবে মিশে আছে প্রাচ্যের বিনয় ভাব, কুণ্ঠা ও নম্রতা। গান্ধীজীর ষ্টাইলই তাই তাঁর চরিত্র।

—মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে প্রার্থনা

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমিদমুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

হে অন্তর্য্যামী পূর্ণ পরমব্রহ্ম —যে মহামানবের স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনায় আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আজ এই অনন্ত আকাশ-তলে সমবেত হয়েছি, তার মধ্য তুমিই একমাত্র সৎ, চিৎ ও ও আনন্দের বিকাশ করে তোমার মহিমা ব্যক্ত করেছ। তোমারই সত্য, অহিংসা ও প্রেমের বাণী ও আদর্শকে বাস্তবে সেই দেবমানবের জীবনে মূর্ত্ত করে তুলেছ।

হে পরমপুরুষ পরমেশ্বর!—মহাত্মা গান্ধীর অন্তরে তুমিই এই নবযুগে, ভারতের নবজন্মে চল্লিশ কোটি নরনারীর সমষ্টি আত্মার অমৃতময় আকাঙ্ক্ষারূপে জাগ্রত হয়ে করেছ লীলায়িত তোমার মহিমাকে—সেই মহিমাতে তুমি প্রকাশ করেছ আত্মিক শক্তির বিজয়-গৌরব,—আজ তোমার কাছে আমাদের কাতর প্রার্থনা, যেন আমরা সেই মহিমাকে মাথা নত করে গ্রহণ করতে পারি।

হে জ্যোতির্ম্ময় স্বতঃপ্রকাশ!—তোমার যে জ্যোতিঃ মহাত্মাজীকে আশ্রয় করে এনেছে ভারতের এই স্বাধীনতা—সেই অনির্ব্বাণ আলোকেই অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যেন সর্ব্ব-ধর্ম্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐক্য ও প্রেম। তাঁর সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে ভারত যেন বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। আমাদের এই আকুল প্রার্থনা যেন তোমার অমৃতময় চরণ স্পর্শ করে। তোমার জ্যোতিতে, জ্ঞান ও সত্যের আলোকে মহাত্মাজীর তপস্যা যেন বিশ্বমানবকে জ্যোতিষ্মান্ করে তোলে।

ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি, ন চন্দ্রতারকাঃ
নে মা বিদ্যুতোভান্তি—কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

হে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্!—তুমি অণু হইতেও অণু যাহা, মহৎ হইতেও মহৎ যাহা—তারই মধ্য দিয়া বিশ্বরূপে প্রকটিত,—ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্ তারই মধ্যে তোমারই প্রেরণায় ঈষণায় লীলায়িত মহাত্মাজীর জীবনবেদ, তাঁরই জীবন্ত জাগ্রত আত্মিক সাধনায় কর পরিপূর্ণ এই নব ভারতকে, ভারতের পুণ্যতীর্থ বেদীতে আবার ধ্বনিত হয়ে উঠুক—'সত্যমেব জায়তে নানৃতম্,'—নব ভারতের আকাশে আবার বাজিয়া উঠুক সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বাণী ও অনুভূতি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

হে পুরুষোত্তম!—তুমি নিরাকার, নির্গুণ অপ্রকাশ, তুমি সাকার, সগুণ, স্বতঃপ্রকাশ। মানবের মধ্যে তোমার অবতরণ ও তোমার মধ্যে মানবের লীন যুগ যুগ ধরে সত্য হয়ে রয়েছে। তাই এই যোগের মানুষ, আনন্দের উপাসক, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সাধক মহাত্মাজীর মধ্যে তোমার অবতরণ আমরা যেন করতে পারি অনুভব। মৃত্যুর মধ্যে যে অমৃতের জয়গান মানব-কল্যাণে গেয়েছেন তিনি, তা যেন তোমারই বাণীরূপে শুনতে পাই।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিল দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

হে জগন্মাতা, বরাভয়দায়িনী, আত্মশক্তি!—আমরা তো তোমারই সন্তান—বিশ্বের অণু-পরমাণুতে তোমার যে অপার করুণা, স্নেহ, আশীর্ব্বাদ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে—যে সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরশ দিয়ে আমাদের মণ্ডিত করে রেখেছ, আজ তোমার সেই পরম স্নেহের সন্তান, জগতের শ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মাজী আর আমাদের মধ্যে বাস্তব ভাবে নেই—তোমারই চরণে লীন হয়ে রয়েছে—পূর্ণ সমর্পিত হয়ে রয়েছে তোমার মধ্যে। আমাদের এমনি শক্তি ও ভক্তি দাও, যেন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরে তাঁকে পরমাত্মীয় করে রাখতে পারি। তোমারই বাণী নিয়ে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হয়ে তিনি ফিরেছেন আমাদের মধ্যে—আমাদের হৃদয়-দ্বারে আঘাত দিয়েছেন—তাঁর ডাকে আমরা যেন দিতে পারি অন্তরের সাড়া।

হে চিন্ময়ি পরমেশ্বরি!—তোমারই এক শ্রেষ্ঠ ভক্তের রক্তে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ধরিত্রী রঞ্জিত হয়েছিল, বিশ্বপ্রেমে মানব জাতিকে করেছিল জাগ্রত—আজ আবার তোমারই এক ভক্ত সন্তান হৃদয়ের রক্ত সিঞ্চনে তোমারই সত্য, অহিংসা ও প্রেমের আদর্শকে করলেন প্রতিষ্ঠা এই ধরণীর বুকে,—তোমারই বিজয় পতাকায় অঙ্কিত করলেন জীবনের জয়গান—দিয়ে গেলেন অমৃতের সন্ধান। তাই আমাদের ব্যথা, বেদনা ও অশ্রুভরা প্রার্থনা—যেন তাঁর মহৎ আদর্শকে জীবনের চির সাথী করে তুলতে পারি, যেন তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'তে পারি।

হে অনাদি, অনন্ত শাশ্বত জগন্মাতা!—মহাত্মাজীর আদর্শে তোমার এই জগৎ নবজন্ম লাভ করুক। মানব-অন্তরে নেমে আসুক সেই অনির্ব্বাণ জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক, সেই অরূপের রূপ—বাজুক বিশ্বমানব-কণ্ঠে "জয়তু গান্ধীজী।"

হে পুরুষোত্তম! স্থূল সূক্ষ্ম চরাচরব্যাপী সত্তা ও বিকাশ—আজ পুণ্যসলিলে মহাত্মাজীর পবিত্র চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের শুভ লগ্নে তাঁর সত্তা ও বিকাশ তোমার পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণে সর্ব্বত্র এক ওঁকাররূপে রইল ব্যাপ্ত হয়ে, যুগে যুগে মানুষের ইতিহাসে এক কল্যাণবীজ রইল নিহিত তোমার সৃষ্টি-যজ্ঞ পূর্ণ করে তুলতে, আত্মা তাঁর এক হইতে বহুর মধ্যে রইল বিগ্রহ হয়ে। এই সত্তা ও বিকাশ অক্ষয়, অমর, নিত্য সর্ব্বগত—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য,—আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে আমরা সেই ক্ষর ও অক্ষররূপী মহাত্মাকে প্রণাম করি। আমাদের এই আত্মনিবেদন, এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, এই অন্তরের প্রণতি যেন পৌঁছে যায় তোমার চরণে—হে ভগবান! আজ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ
ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং
ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ওঁ তৎসৎ
অসতো মা সদ্গময়ো
তমসো মা জ্যোতির্গময়ো
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়ো ॥
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাত্মাজী

(স্তুতি-গীতি)

প্রণাম তোমায় আজ হে মহান্ !   হে মহান্ !
মহিমা তোমার হেরি সাগর সমান, হে মহান্ !
শুভ্র সুনীল অনিলের তলে অচল অটল হিমাদ্রি সমান, হে মহান্ !

ভীমহৃদয় লইয়া এসেছ, যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থ সেজেছ,
স্কন্ধে জয়ের পতাকা বহিয়া মায়ের নিগড় ছিঁড়েছ।
তুমি হে অতুল নাহি তাতে ভুল
জগতের কাছে দিয়েছ প্রমাণ, হে মহান্।
অহিংস অসহযোগ ভারতে তোমারই নিয়োগ।
কোরকে কীটের সম অমোঘ অস্ত্র অনুপম
অধীনতা হীনতায় কেটে করি খান-খান, হে মহান্ !

কত বাদ-বিসম্বাদ এনেছিল পরমাদ
তোমার লক্ষ্যের পথে নহে সে তো অনুমান
আগষ্ট বিয়াল্লিশ সালে খড়্গ এল কংগ্রেস-ভালে,
ঘিরিল যে নেতাদলে যেন এক বেড়াজালে
আগা খাঁ-প্যালেস-তলে আটক বিধান, হে মহান্ !

কংগ্রেস ধ্বংস হবে বৃটিশ-কবলে ছলে বলে অথবা কৌশলে
এ কথা সম্রাট্ বলে।   কংগ্রেস তোমার—
এ কথা তো কয়েছিলে সদর্পে মস্তক তুলে।
তুমি যে স্বরাজ-স্তম্ভ ভাঙ্গিলে বৃটিশ-দম্ভ
আইনের স্বার্থগ্রন্থি ছিঁড়িয়া করি প্রমাণ, হে মহান্ !

তোমার ত্যাগের তূর্যে দাবী করি চিরদিন
অধীনতা ভুলে যেয়ে ভারত রবে স্বাধীন।
কাতর-কণ্ঠে যে সে চেয়েছিল এই দিন
নিম্ন কর্ম্মচারী আর যত ধনী কিষাণ, হে মহান্ !

সাম্রাজ্যবাদী দলে এ কথা সদাই বলে
পাইবে গো স্বরাজ তব যুদ্ধের পরে।
সুদীর্ঘ দগ্ধ তৃষা বিভাজ্য করে যে আশা
কত দিন সহে আর চঞ্চল অন্তর।
সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় তোমারে ডাকিয়া কয়
পাবে তব রাজ্য ফিরে ভেস না আর আঁখিনীরে
স্বাধীনতা অঙ্কে তব দিয়েছেন ভগবান, হে মহান্ !

পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব কীর্ত্তি আসে
সোনার আঁখরে লেখা নূতন পাতায়।
ভারতের রাষ্ট্র আজি জিনিল স্বরাজ-বাজী
লিখিল কর্ম্মের সূচী নূতন খাতায়।
তাই আজ ভারতের টুটিল সব অভিমান
সদর্পে করিবে সে নব নব অভিযান, হে মহান্ !

হে মহান্, হে দিক্‌পাল, ছিন্ন বঙ্গে আসি' তুমি দেখাইলে ইন্দ্রজাল।
১৪ই তারিখে যারা হয়েছিল আত্মহারা
নিমগ্ন মোহের ঘোরে প্রতিশোধ তরে
কোথায় মিশাল সে সাম্প্রদায়িক ধারা ;
পড়িল যে মনে সেই হিন্দু-মুসলমান
তাই তারা ছুটে এসে কোলাকুলি করে।
গোলাপের বারিপাত ধুয়ে দেয় রক্তপাত
আরক্ত হিন্দুর নয়ন হয় যে সরল।
মিটিল সব অরাতি ভাব প্রণয়ের আর নাহি অভাব
মুছে ফেলে দেছে সব মুসলিম গরল।
নূতন এই কলিকাতা হাসিতেছে লতাপাতা
করে দেছে নিজগুণে সকলই সমান, হে মহান্।

ইংরাজের শরে গণি মেঘের গর্জ্জন
তরবারি আঘাতে গণি করকার পাত
সভয়ে লইয়াছিল প্রমাদের স্মরণ
ভাবে নাই কভু মনে এই ইংরাজ জাত
যাইবে ছাড়িয়া সব ভারতের মায়া
দিয়ে যাবে আমাদের স্বাধীনতার ছায়া
তাই হেরি ভূরি ভূরি উল্লাসের আক্রমণ প্রাসাদের দ্বারে।
স্বেচ্ছায় প্রবেশে তারা হয়ে আজ আত্মহারা
কাড়িয়া লয়েছে ভয় অদৃষ্টের পরিচয়
ইতস্ততঃ ছুটে বলে জয় ভারতের জয়।
প্রাসাদাভ্যন্তরে গেলে আনন্দে উপাড়ি ফেলে,
সদর্পে মারে যে লাথি রাজ-কেদারায়।
তাই হে তোমায় সাধি নহে তারা অপরাধী।
অধীন নহে কো তারা করে না আর হায় !   হায় !
তুমিই তো দিয়াছ প্রভু এ পথের সন্ধান, হে মহান্ !

সত্যের আশ্রয় করি' স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরি'
জাতীয় পতাকা-তলে হইলে সম্রাট্।
স্বাধীনতা মূলমন্ত্র করিয়াছ দান
ভারতের নরনারী করে প্রণিধান,
তাই আজ সবে মিলি করে স্তুতিগান, হে মহান্ !

কে দিয়াছে অধিকার স্বাধীনতা আবিষ্কার
করিতে হে এত দিনে ভারতের পরে ?
দিয়াছেন বিশ্বপতি অগতির যিনি গতি
করিতে মোচন দুঃখ, সুখ সমাধান, হে মহান্ !

নাহি ভয়, নাহি ভয়, জয় ভগবানের জয়
সুদীর্ঘ জীবন লহ ডাকি ভগবান, হে মহান্ !

—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী

অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক মহামানব মহাত্মা গান্ধী ১৬ই মাঘ, শুক্রবার অপরাহ্ণে প্রার্থনা-সভায় যাইবার সময় আততায়ীর গুলীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বিনামেঘে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর, অধিকতর নৃশংস ও মর্ম্মান্তিক এই ঘটনায় দেশবাসীর সমগ্র অন্তর অসহনীয় ব্যথা-বেদনায় গুমরিয়া উঠিয়াছে, গভীরতম শোকের প্রলয়-ঝঞ্ঝায় সকলের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত। শোকে, মর্ম্মবেদনায় কণ্ঠ আমাদের মূক, লেখনী স্তব্ধ। এই গভীরতম মর্ম্মবেদনা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই।

যিনি হিংসার রাজ্যে অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অবশেষে নিজের রক্ত দিয়া সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। যিনি সে-দিনও তাঁহার উপর বোমা-নিক্ষেপকারীর প্রতি অন্তরের গভীর দরদ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই অহিংসা মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির জীবন নাশ করিয়া পশু অপেক্ষাও এই অধম আততায়ী ভারতের প্রাণশক্তিকেই নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যা করিয়াছে, বিশ্বমানবের সভায় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অপরাধী করিয়াছে সমস্ত ভারতবাসীকে। সে-দিন মহাত্মাজী যখন সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশ তখন তাঁহার অমূল্য জীবনের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে-দিন অনশনব্রত ভঙ্গ করিলেন, তখন সমগ্র দেশের অন্তস্তল হইতে যেন এক পাষাণ-ভার নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হায়! কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই দুষ্কৃতকারীর নিষ্ঠুর আঘাতে মহাত্মাজীকে আমাদের হারাইতে হইল। মহাত্মাজী ছিলেন সমগ্র ভারতের অন্তরাত্মা। আর্ত্তের দুঃখে তাঁহার অন্তর যে কিরূপ আকুল হইয়া উঠিত, বহু বার তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এক বৎসর পূর্ব্বেও নোয়াখালীতে দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে তাঁহার পরিভ্রমণের কথা আজ পুনঃ পুনঃই আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া আমাদের এই গভীর শোককে আরও গভীরতর করিয়া তুলিতেছে। অসহনীয় এই শোকে সান্ত্বনা নাই।

আততায়ী এক জন শিক্ষিত হিন্দু যুবক। নাম নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। পুণার দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুরাষ্ট্রে'র সম্পাদক।

১৭ই মাঘ, শনিবার দ্বিপ্রহরে মহাত্মা গান্ধীর শব লইয়া বিরাট শোকযাত্রা বাহির হয়। বিড়লা-ভবন হইতে পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ শবানুগমন করেন। মুহুর্মুহুঃ 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' ও শঙ্খ-ধ্বনিতে দিল্লী মহানগরীর চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অপরাহ্ণ ৪-৫৫ মিনিটের সময় পাঁচ লক্ষ শোকসন্তপ্ত নরনারীর উপস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী মহাত্মাজীর চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। অবিনশ্বর মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নশ্বর দেহ অপরাহ্ণ ৬টার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হয়।

২৮শে মাঘ, বুধবার প্রাতে গান্ধীজীর অস্থিবাহী স্পেশ্যাল ট্রেণ দিল্লী ত্যাগ করে। ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার ত্রিবেণী-সঙ্গমে (প্রয়াগে) মহাত্মাজীর পূত অস্থি বিসর্জ্জন করা হয়। এলাহাবাদ দুর্গ হইতে ২ মিনিট অন্তর অন্তর মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ বৎসরের স্মৃতিসূচক ভাবে ৭৯টি কামান-ধ্বনি করা হয়।

মহাত্মাজীর আদর্শ

ভারত গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর মিশন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই গবর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন না। কোন বে-সরকারী সৈন্য বাহিনীর অস্তিত্বও রাখিতে দেওয়া হইবে না। অকল্যাণ ও হিংসার শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর সহযোগিতাও তাঁহারা চাহিয়াছেন। আশা করি, দেশবাসী মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের এই আহ্বানে সাড়া দিবেন।

পশ্চিম-বঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা

ঘোষ-মন্ত্রিসভা বিদায় লইয়াছেন। ৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় এগার জন সহযোগী লইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কোন বিশেষ দল মাত্র হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচন না করায় এই মন্ত্রিসভার ভিত্তি যথেষ্ট ব্যাপক হইয়াছে। যোগ্য ব্যক্তি কংগ্রেসসেবী না হইলেও মন্ত্রিসভায় তাঁহাকে গ্রহণ করা উচিত, এই নীতি অনুসরণে এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত, এই জন্য ডাক্তার রায় আমাদের প্রশংসাভাজন। দলীয় স্বার্থ না থাকায় দেশের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে নজর দিবার সম্ভাবনা অধিক, ইহাই আমাদের আশা।

প্রধান মন্ত্রী—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন।

অন্যান্য সদস্যগণ—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—সমবায়, ঋণ, সাহায্য এবং পুনর্ব্বসতি। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পূর্ত্ত, নির্ম্মাণ এবং যোগাযোগ। শ্রীভূপতি মজুমদার—সেচ এবং জলপথ। শ্রীপ্রফুল্ল সেন—অসামরিক সরবরাহ। শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—ভূমি এবং রাজস্ব। শ্রীনীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার—বিচার এবং আইন প্রণয়ন। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি—শ্রম। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা—কৃষি ও পশু-চিকিৎসা। শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন ও মৎস্য।

নূতন মন্ত্রিসভায় আরও তিন জন সদস্য গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ। তাহা সত্য হইলে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে যোগ্য

ব্যক্তি গ্রহণ করার সুযোগ এখনও রহিয়াছে। এই বারো জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্ম্মণ বিদায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষ-মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সময় শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে দপ্তরগুলির ভার লইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদনযোগ্য। ঐ দপ্তরগুলির জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ নাই। শ্রমিক-নেতা শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে শ্রম-সচিব কেন করা হয় নাই তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না।

৯ই মাঘ, শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহার মন্ত্রিসভার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে করণীয় দায়িত্ব তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম, খাদ্য ও বস্ত্র-সমস্যার সমাধান; দ্বিতীয়, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল লোক আশ্রয়ের আশায় পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা; তৃতীয়, সীমান্তের অধিবাসীদের মন হইতে আতঙ্ক দূর করিবারও সেই সঙ্গে সম্ভব হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা। মূল সমস্যাগুলি ডাঃ রায় ঠিকই আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন তিনি এবং তাঁহার সহযোগীরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্যার সমাধান করিবেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব। এখনও তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সময় আসে নাই। আমরা তাঁহাদের উপর আস্থা ও আশা রাখি, যেন নিরাশ না হইতে হয়, এই প্রার্থনা।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া এই কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই প্রথম এইরূপ পরিকল্পনা কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করেন। রিপোর্টে পরিকল্পনার চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান আয় ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং এ সম্পর্কে বৈষম্য বৃদ্ধি নিরোধ করা। তৃতীয়, শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে ব্যাপক কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পর্য্যাপ্ত মান বিধান করা। চতুর্থ, দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিরাক্রমণ নিরোধের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমগ্র দেশকে এবং প্রত্যেক অঞ্চলকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা এবং সহর ও পল্লীর অর্থনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

পরিকল্পনার মধ্যে জনসাধারণের প্রতি দরদ অভিব্যক্তির পরিস্ফুট। কিন্তু এই শুভেচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইবে কি? ইতিপূর্ব্বেও এই ধরণের বহু পরিকল্পনা হইয়াছে, কিন্তু সবই ধামা-চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন হইতেই কোন আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বভোগী থাকিবে না। জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপ করা হইবে। জমিদারদের ক্ষতিপূরণের বিপুল বোঝা বহন করিয়া কৃষি ও কৃষকের উন্নতি করা সম্ভব কি? মধ্যস্বত্বভোগীদের স্থলে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে কৃষক পরিণত হইবে কৃষি-মজুরে। মাত্র জমিদারের স্থান অধিকার করিবে সমবায় প্রতিষ্ঠান। কৃষি-মজুরদিগকে জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী দিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হইলেও, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদিগকে ঐরূপ মজুরী দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইরূপ অবস্থা না দাঁড়ায়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপের সুপারিশ অবশ্যই প্রশংসনীয়। শিল্পগুলিকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে না। এই পাঁচ বৎসর প্রস্তুতির সময়। মূলধন ও লভ্যাংশ সম্বন্ধে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে, সেগুলি কবে কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলা হয় নাই। যত দিন শিল্পগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা না হইবে, তত দিন আইন করিয়া এই সকল সুপারিশ কার্য্যকরী করা হইলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পের প্রসার কোন দিনই সম্ভব হইবে না। ফলে প্রচুর পরিমাণে পণ্যও উৎপন্ন হইবে না এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করা যাইবে না। আবার মূলধন ও লভ্যাংশ সম্বন্ধে এই সকল সুপারিশ ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্বের শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রযোজ্য না হইলে, শিল্পপতিরা অতিরিক্ত লাভ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ফলে মজুরীও বাড়িবে না। জনগণের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে। জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিলে ধনতন্ত্র থাকিবে এবং রাষ্ট্রকেও নিয়ন্ত্রণ করিবেন ধনীরাই। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিক হয়, তাহা হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে বলা চলে না।

পুনর্ব্বসতি সমস্যা

আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্যার্থ দশ কোটি টাকার তহবিল লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সন্মুখম চেট্টী যে 'পুনর্ব্বসতি অর্থ-সাহায্য প্রতিষ্ঠান বিল' ভারতীয় পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়াছেন, গত মঙ্গলবার তাহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তিন জন সরকারী এবং তিন জন বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি পুনর্ব্বসতি ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হইবে। এই বোর্ডকে সাহায্য করিবার জন্য অনধিক পনের জন সদস্য লইয়া একটি পরামর্শদাতা কমিটিও গঠন করা হইবে। বিলটিকে ভারতীয় পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনেই আইনে পরিণত করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অর্থ-সচিব যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সমগ্র দেশবাসী তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইহাও আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারিতেছি না যে, এই বিলের লক্ষ্য শুধু পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীরাই। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব তথা আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি প্রধানতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানের হিন্দু ও

শিখদের প্রতিই আকৃষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা আজও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কংগ্রেসী নেতারাও এ সম্বন্ধে উদাসীন। বৃহৎ নেতৃত্বের দৃষ্টি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার কোন চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না;

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। তাঁহাদের মধ্যে এ পর্যান্ত যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত এই দশ লক্ষ হিন্দুরও পুনর্ব্বসতির কোন ব্যবস্থা পশ্চিম-বঙ্গে হয় নাই। এদিকে পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুদের অবস্থা যে প্রায় চরম সীমায় আসিয়াছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের জন্য কাহারও প্রাণে একটু দরদ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পাঞ্জাবে যে অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থা ঘটিবার সময় পর্যান্ত অপেক্ষা করিলে, পূর্ব্ববঙ্গে একটি হিন্দুকেও আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা চলিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে হিন্দু-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা আর সম্ভব হইবে না। সর্ব্বোপরি এই সমস্যার সমাধান বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব কোন দিনই হইবে না। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষেও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়াই এই সমস্যার সমাধানের জন্য পন্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

পশ্চিম-বঙ্গের অন্ন ও বস্ত্র-সমস্যা

পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় শনিবার, ২৭শে মাঘ এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ও বস্ত্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহের এবং খাদ্য-শস্যের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সার্থকতা তাহাদের উদ্যমের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করিবে। রেশনে চাউলের বরাদ্দ কিছু বাড়িবে কি না সে-সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী কিছুই বলেন নাই। কিন্তু ১৯৪৮ সালে পশ্চিম-বাঙ্গালার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীর মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। রেশনে যে পরিমাণ চাউল দেওয়া হয়, তাহাতে বড় জোর তিন দিনের বেশী চলিতে পারে না। রেশন বরাদ্দ কম, ইহার উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতি দিনই বহু হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় এবং পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে আসিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ঘাটতি অঞ্চল। র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ভাবে বাঙ্গালা বিভাগ করা হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। ইহার উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে প্রায় ১৩।১৪ লক্ষ লোক। এই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালে পশ্চিম-বঙ্গের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন, তাহা সত্যই আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রদেশে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব আর সরকার রাখেন নাই। কিন্তু মাদ্রাজে তো ভারত গবর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাকিস্তান ভারতকে যে চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মোটা অংশই মাদ্রাজে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকুক আর নাই থাকুক, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। আরও কয়েক বৎসরই যে দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ যাইবে এইরূপ আশঙ্কাকে অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই। পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিজেই পশ্চিম-বঙ্গের গুরুতর খাদ্য-পরিস্থিতির কথা স্বীকার করিয়াছেন। যদিও তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টায় তাঁহারা কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তথাপি রেশন বরাদ্দ বৃদ্ধি না হওয়া পর্যান্ত শুধু আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব কি? অন্ন-সমস্যার পরেই আমাদের বস্ত্র-সমস্যা। গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অদ্য হইতে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবে। বঙ্গীয় টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের হাতে ৪৫ হাজার গাঁইট কাপড় আছে। এই কাপড় স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ধারায় বিক্রয় করা হইবে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, কি ভাবে কাপড় বণ্টন করা হইবে, তৎসম্পর্কে এবং কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে শীঘ্রই এক ঘোষণা জারী করা হইবে। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠিয়া গেলেই কাপড়ের দাম যে বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিমাণ বাড়িবে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার কাপড়ের কলের মালিকরাই কাপড়ের দাম স্থির করিবেন। মিল-মালিক সমিতি গবর্ণমেণ্টকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, দাম খুব বেশী বাড়িবে না এবং দাম ন্যায়সঙ্গত করা হইবে। দাম কত বেশী হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে এবং কত হইলে তাহা অত্যধিক বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, তাহা অনুমান করা অবশ্য সম্ভব নয়। কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত দামের স্বরূপ শীঘ্রই আমরা দেখিতে পাইব। চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর দাম দ্বিগুণের বেশী বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বাজারে চিনির অভাব নাই। কাপড়ের অবস্থাও যে সেইরূপই হইবে, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে না। কাপড়ের দাম বাড়িলেও কাপড় যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। কাপড় কম উৎপন্ন হইতেছে, এ কথাও বোধ হয় আর শোনা যাইবে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন দিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় নাই। এখন ভাল কাপড় যথেষ্ট পাওয়া যাইবে, কিন্তু উহা কিনিবার মত আয় আমাদের বাড়িবে না।

বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চল

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা মুখে বহু বার স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে করিতেছেন ঠিক ইহার বিপরীত। বিহারের মানভূম, ধানবাদ, পূর্ণিয়া, দুমকা প্রভৃতি যে সব অঞ্চল এক দিন ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা নিজেদের খুসী-মত বিহারের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন, আজ পশ্চিম-বাঙ্গালা তাহাই ফিরিয়া পাইতে চায়। কংগ্রেসের নীতি হিসাবে ইহা ন্যায়সঙ্গত দাবী, কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট ইহা সহ্য করিতে নারাজ। ধানবাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের নিকট ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল গোপন নির্দেশ দিয়াছেন যে, যাহারা বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহ পশ্চিম-বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য

আলোচনা চালাইতেছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। ইহা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তারা এ বিষয়ে অবগত নহেন, অথবা ইহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদও বাঙ্গালাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে উৎসুক। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম-বাঙ্গালা আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম-বাঙ্গালাকে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে বিহারের বাঙ্গালী অঞ্চল ফিরিয়া পাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। বিহারের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট দিতে নারাজ, কংগ্রেস সভাপতি বিমুখ। বাঙ্গালার মন্ত্রিসভাও এ বিষয়ে নীরব। আমাদের দুর্ভাগ্য! ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিবার নাই।

হায়দ্রাবাদ

গত ২৯শে নভেম্বর ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দ্রাবাদের নিজামের এক বৎসরের স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। দুই মাসের মধ্যেই নিজাম তাঁহার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছেন। জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হইতেছে। ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আর ভারত গবর্ণমেণ্ট পুত্তলিকার মত নির্ব্বিকার ভাবে সমস্ত দর্শন করিতেছেন।

জনগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় নিজামের যে আপত্তি আছে, তাহা নিজামের মন্ত্রিসভা গঠনের নমুনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ জনগণের গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হইলে হায়দ্রাবাদ ভারত ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে না। সুতরাং যোগদানের প্রশ্ন এখন সুদূর-পরাহত। এই সকল কারণেই ষ্টেট কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ইত্তেহাদ উল-মুসলমিন ও ষ্টেট-পুলিশ কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিতেছে। সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে এক কোটি টাকারও অধিক। এদিকে স্থিতাবস্থা চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদস্থ ভারতের এজেণ্ট জেনারেল হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অবশ্য আশ্বাস দিতেছেন যে, নিজাম যদি স্থিতাবস্থা চুক্তি ভঙ্গ করেন, তবে তাহার প্রতীকার করার ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্টের আছে। কিন্তু প্রজা-নিপীড়ন বন্ধ করিবার কোন ক্ষমতা আছে কি? জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইতেছে না কি? আবার শুনা যাইতেছে, কাশ্মীরে আজাদী হানাদার ফৌজকে সাহায্য করিবার জন্য ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (সৈন্য?) প্রেরণ করিতেছেন। এই সকল অত্যাচার স্বৈরাচার কি ভারত গবর্ণমেণ্ট নীরবে সহ্য করিবেন? স্থিতাবস্থার স্বরূপ আজ কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে উঠে না। যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম করিয়াছে, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে নিজাম যে নিষ্ঠুর ভাবে দমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও কি ভারত গভর্ণমেণ্টের মনে কোনরূপ বিকার হয় না? হায় কংগ্রেস! অন্যায় যে করে সে দোষী বটেই, কিন্তু অন্যায় যে সহ্য করে, সে-ও কম দোষী নহে।

কাশ্মীর

স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ লইয়া শেষ অবধি অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন। যাহা করিবেন তাহাতে ভারতীয় ইউনিয়ন বা কাশ্মীরবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার আশা খুবই অল্প।

কাশ্মীর সমস্যার মূল কথা এই যে, ঐ দেশটি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে। অবশ্য চূড়ান্ত ভাবে নয়। যোগদানের প্রশ্ন গণভোটের দ্বারাই নির্ণীত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আগত যে সকল পাঠান উপজাতিরা জোর করিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্তানে পুরিতে চাহে, তাহাদের আক্রমণ বন্ধ করা আবশ্যক। কারণ, তাহা না করিলে নিরপেক্ষ গণ-ভোট গ্রহণ অসম্ভব। ইহাই ছিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের দাবী। শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার সংশোধনী প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন, "স্বস্তি-পরিষদ পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করিতেছে, তাঁহারা যেন উপজাতীয়দের কাশ্মীর হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বুঝান ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেন; পাকিস্তান ভূখণ্ডের উপর দিয়া তাহাদের চলাচল করিতে দিতে অস্বীকার করেন এবং হানাদারদের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কোন প্রকার সাহায্য না দেন।" কিন্তু অতিথিবৎসল পাকিস্তান, হানাদার পাকিস্তানী ভ্রাতাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবেন কোন্ প্রাণে? তাই পরম শান্তিপ্রিয় স্যার জাফরুল্লা খাঁ এই প্রস্তাবে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "উপজাতীয় আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গেলে যুদ্ধ করিতে হয়; আমরা এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতেই আসিয়াছি, নূতন করিয়া যুদ্ধ করি কেমন করিয়া?" সুন্দর যুক্তি! তিনি বলিলেন,—"একমাত্র সমাধান এ ক্ষেত্রে, হয় ভারতকে কাশ্মীরের আন্দোলন ধ্বংস করিতে হইবে, অন্যথা আজাদ কাশ্মীরের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ জয়যুক্ত করিতে হইবে।" মীমাংসার ইচ্ছা থাকিলে এই ধরণের উক্তি কি সম্ভব হইত?

স্বস্তি-পরিষদ গণভোটের মারফৎ কাশ্মীরের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে এতই উৎসাহী যে, যুদ্ধবন্ধের মুখ্য প্রশ্নটা একেবারে ধামা-চাপা দিয়া দিয়াছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ অষ্টিনের প্রস্তাবের মূল কথাই হইল, গণভোটের সময় কাশ্মীরের উপর এক তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' শাসন চাপাইয়া দিয়া শেখ আবদুল্লার গবর্ণমেণ্টকে গদীচ্যুত করা। প্রকাশ, স্বস্তি-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই মার্কিণ প্রস্তাবের অনুকূলে। সুতরাং ন্যায়বিচার কতখানি হইবে তাহা বুঝাই যাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ারই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। ভারত সরকার সাধ করিয়া এই ষড়যন্ত্র-জালে পড়িলেন কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এখন বাহির হইবেন কি করিয়া তাহাও বলা কঠিন। যদি পরিষদের কার্য্যপ্রণালী মানিয়া লন তাহা হইলে কাশ্মীরের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা হইবে না কি? কোন দায়িত্বশীল, মর্য্যাদাসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টই এই ধরণের বিচারের প্রহসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আশা করি, ভারত সরকারও করিবেন না।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সরস্বত্যৈ নমো নমঃ

—সুনীল পাল

—[illegible]

"বাল্যকালে আমার যে ধর্ম-বিশ্বাস ছিল, জীবনসায়াহ্নেও আমি তাহা হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। আমি বিশ্বাস করি যে, যে ধর্মের আমি অনুরাগী ও উপাসক সেই ধর্মকে রক্ষায় ভগবান্ আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবেন। অবশ্য কাহাকেও ভগবানের হাতের যন্ত্র হইতে হইলে পূর্বে তাহাকে ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইয়া ও সর্বদা ঐগুলি পালন করিয়া যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।"

—মহাত্মা গান্ধী

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৪ পঞ্চম সংখ্যা
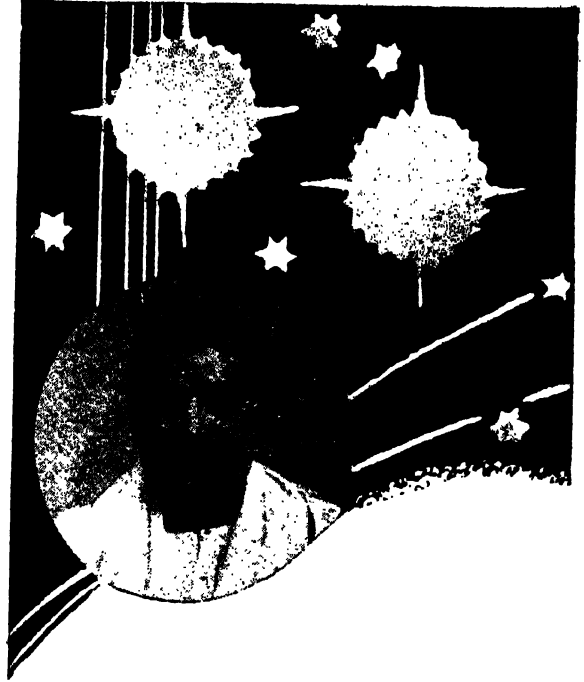
আমি কে?

ডাক্তার। তবে এই আমি টামি যা বল্‌ছ, এগুলো কি? এর ত মানে বল্‌তে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেল্‌ছেন?

গিরীশ। মহাশয়, কেমন করে জান্‌লেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এই "আমি" তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—তাঁর লীলা!

"এক রাজার চার বেটা। তারা রাজার ছেলে—কিন্তু খেলা করছে—কেউ মন্ত্রী হয়েছে, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেল্‌ছে!

(ডাক্তারের প্রতি) শোনো। তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মান্‌তে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।

Sonship and the Father; জ্ঞানযোগ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

ডাক্তার। সব সন্দেহ যায় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কাছে এই পর্য্যন্ত শুনে যাও। তার পর বেশী কিছু জান্‌তে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বল্‌বে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুন্‌কে চাল দিতে পারে। রেল-ভাড়া যদি দিতে হয় ত কর্ত্তাকে জানাতে হয়।

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি শোন

"জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে অবতার অবতার বল্‌ছ, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই,—দেখ্‌বে এস। অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্‌লেন, কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? অর্জ্জুন বল্‌লেন, একটি বৃহৎ গাছ, কাল-জাম থোলো থোলো হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন, ও কাল-জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ। তখন অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, কৃষ্ণ থোলো থোলো ফলে আছে। কৃষ্ণ বল্‌লেন, এখন দেখ্‌লে? আমার মত কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।

"কবীরদাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানর-নাচ নেচেছিলে।

"যত এগিয়ে যাবে, ততই ভগবানের উপাধি কম দেখ্‌তে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে ষড়্‌ভুজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে দ্বিভুজ গোপাল। যত এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতির্দর্শন করলে—কোন উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে এক জন ভেল্‌কি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখ্‌লে, এক জন সওয়ার আস্‌ছে। ঘোড়ার উপর চড়ে খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজ-গোজও সত্য নয়, অস্ত্র-শস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখ্‌লে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি না, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বিচার করতে গেলে কিছুই টেঁকে না।

ডাক্তার। হাঁ, এতে আমার আপত্তি নাই।

The world (সংসার and the Scare crow]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড়-দুড় কচ্ছে!

"চোরে ক্ষেতে চুরী করতে এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোন মতে ঢুকতে পারছে না। এক জন কাছে গিয়ে দেখ্‌লে,—খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে,—ভয় নাই। তবু ওরা আস্‌তে চায় না—বলে, বুক দুড় দুড় করছে। তখন ভুঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে আর বল্‌তে লাগ্‌লো, এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'।

ডাক্তার। এ সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) হাঁ। কেমন কথা?

ডাক্তার। বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটা Thank you দাও।

ডাক্তার। তুমি কি বুঝ্‌ছো না—মনের ভাব? আর কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না গো! মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই—বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার। এখানে তেমন মূর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি-গুগ্‌লিও আছে (সকলের হাস্য)। *

—কথামৃত

* গিরিশ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার—মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতম্

[স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত]

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালম্।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ
সন্তাপ-সংস্থিতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ১॥

রে বিভ্রান্ত ভোগসুখে কেন রে নিরত,
মোহবশে নিরন্তর ভ্রম' দীর্ঘপথ ?
সুখাব্ধিতে বিশ্রামের যদি মনোরথ,
ভজ ভব-দুঃখ-হর রামকৃষ্ণ-পদ॥ ১॥

দুর্ব্বার-ঘোর-ভবদাববিদহ্যমানো
জন্মন্যসে মলিনবাসনয়া সুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ
সন্তাপ-সংস্থিতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ২॥

জ্বলিতেছ দুর্নিবার ভব-দাবানলে,
ফিরিছ বাসনাবশে সুখ পাবে ব'লে,
নীচাশ্রয় কেন, শান্তি যদি মনোগত,
ভজ ভব-দুঃখহর রামকৃষ্ণ-পদ॥ ২॥

শাস্ত্রেষনাত্মসু কথং হি ভব প্রবৃত্তি-
দুস্তর্কজালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধম্।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজ মন্দবুদ্ধে
সন্দেহ-বিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৩॥

অনাত্মশাস্ত্রের বাক্যে কেন তব রতি,
গুরুবাক্যে প্রতিকূল কুতর্কে কুমতি,
কুসিদ্ধান্ত ছাড়ি মূঢ় জ্ঞানে হও রত,
ভজ রে সংশয়-হর রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৩॥

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তি-
স্তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন নিসেব্যমানে।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্
সন্ত্যক্ত-কামকনকং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৪॥

হেরি সদা অনুরাগ কামিনী-কাঞ্চনে,
ভোগে কোথা তৃষ্ণাক্ষয় ?—বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
ভববন্ধহেতু কাম,—শৃঙ্খল নিয়ত,
ভজ কাম-হেম-ত্যাগী রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৪॥

ভার্য্যামশেষগুণভূষিত-ভক্তিযুক্তাং
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব।
দূরাৎ প্রণম্য স্থিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৫॥

নানাগুণে অলঙ্কৃতা—ভার্য্যা ভক্তিমতী,
ভোগসুখে অনুরক্তা শতেক যুবতী,
মাতৃজ্ঞানে দূরে রাখি, হইলা প্রণত ;
ভজ কামগন্ধহীন রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৫॥

সংস্পৃষ্ট-ধাতু-নিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য-
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৬॥

স্বর্ণ রৌপ্য ধাতুস্পর্শে কাঁপে কলেবর,
সংজ্ঞাহীন বক্র চারু অঙ্গুলি-নিকর,
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—সদ্যঃ জড়বৎ,
ভজ ত্যাগি-শ্রেষ্ঠ যোগী রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৬॥

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্র-চিত্তান্,
কুর্ব্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৭॥

পরিশুদ্ধ প্রেমরূপী বিমল পবিত্র,
সুধী জানে স্বার্থহীন মহান্ চরিত্র,
চাহ হেন প্রেমময় ভাব-রসাস্পদ,
ভজ ভক্তপ্রেমনিধি রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৭॥

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ।
যৎ প্রেম হেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৮॥

স্নেহে মাতা, প্রেমে পিতা, সখ্যভাবে ভ্রাতা,
অহেতু করুণাসিন্ধু শুনি' জয়-গাথা।
অতুল যাঁহার প্রেম, ভক্তি কোকনদ,
ভজ সদা প্রেমসিন্ধু রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৮॥

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না-
ন্তর্হিতে ভবতি ভাব-বিকারযুক্তা।
আরাদ্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে
প্রেষ্ঠানুমানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৯॥

পতি-সম্মিলনে যথা প্রফুল্ল ললনা,
বিচ্ছেদে বিরহবশে ক্ষুব্ধা আনমনা,
ভক্ত-সঙ্গ-সুখে সুখী—বিরহে আহত,
ভজ প্রেমমূর্ত্তি গুরু রামকৃষ্ণ-পদ॥ ৯॥

সংসার-দুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগঃ
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথা-করুণা-কটাক্ষৈঃ।
আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা-
স্তং ধর্ম্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১০ ॥

যোগৈশ্চ সাধনশতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিরোধনেন।
যচ্ছন্নিধিং মুহুরুপেত্য পুমাঁল্লভেত্তং
তং শান্তিশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১১ ॥

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাম্।
ভৃত্যায়তেঽপ্যখিলভূত-মহেশ্বরো য-
স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১২ ॥

নাধীতশাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা
নাধীত-বেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীত-তন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্ম্মবক্তা
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৩ ॥

নির্ব্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী
নিষ্কর্ম্মকোঽপি সততং পরকর্ম্মকর্ত্তা।
নির্দ্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজপার্ষদৈর্যো
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈঃ।
তারাগণৈরিব বিধুর্দ্যুতিমত্র ধত্তে
তং স্বর্গশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৫ ॥

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শম্ভুভক্তৈঃ
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণবশেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ
সংজ্ঞায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥

ভ্রমন্ নানা-যোনৌ বহুবিধ-শরীরং পরিগতঃ
সুখং নাল্পং লেভে কনকযুবতীভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং প্রণত-সুহৃদং শান্তিসুখদং
বিরক্তোঽহং যাচে তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাম্ ॥ ১৭ ॥

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতি-বিষয়াশাপরিবৃতং
সদা রক্ষ ব্রহ্মন্ কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে
বিবেকং বৈরাগ্যং পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥ ১৮ ॥

যো ভজেৎ পরয়া ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং স্তবাষ্টকম।
ভববন্ধাব্ধিনির্মুক্তঃ সদ্যো ভবেন্ন সংশয়ঃ ॥

বিকৃত সংসার-দুঃখে, যাচে ধর্ম্ম-বল,
করুণায় প্রিয়কথা ফল অবিরল,
আশ্বাসিয়া শিষ্যে দেন পৌরুষ-সম্পদ,
ভজ ধর্ম্ম-মোক্ষদাতা রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১০ ॥

যোগে আর শতবিধ সাধনে যে ফল,
চিত্তবৃত্তি-নিরোধে যে আনন্দ বিমল।
যাঁহার মুহূর্ত্ত-সঙ্গ হেন ফলপ্রদ,
ভজ শান্তি-সুখদাতা রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১১ ॥

পুরুষে পুরুষে যেই হেরে নারায়ণ,
রমণীতে রমণীতে জননী দর্শন।
বিশ্বের ঈশ্বর সদা দাসভাবে নত,
ভজ অভিমান-শূন্য রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১২ ॥

অনধীতশাস্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানে জ্ঞানী,
অনধীতবেদ মুখে স্ফুরে বেদবাণী ;
অনধীততন্ত্র ক'ন কুলতন্ত্র যত,
ভজ মূর্ত্ত্যতত্ত্ববোধ রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৩ ॥

বাসনা-রহিত, নিত্য পরহিতে ব্রতী,
পরকর্ম্মপর যোগী নির্ব্বাণ-মূরতি,
নির্দুঃখ, পরের দুঃখে ব্যথিত সতত,
ভজ দুঃখে অকাতর রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৪ ॥

ভক্তজন-পরিবৃত পার্ষদের সহ,
নৃত্য-গীত হরিকথা চলে অহরহঃ।
তারাদল মাঝে বিধু ;—দ্যুতি মধ্যগত ;
ভজ স্বর্গ-সুখ-দাতা রামকৃষ্ণ পদ ॥ ১৫ ॥

শাক্ত দেখে কালীরূপা, শৈব দেখে শিব,
বৈষ্ণবশেখর, কৃষ্ণ-প্রেমের ত্রিদিব ;
জ্ঞানীরা পরমহংস জানি ভক্তিনত ;
ভজ রে পরমদেব রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৬ ॥

বহু দেহ ধরি' বহু যোনিতে ভ্রমণ,
কামিনী-কাঞ্চন ভুঞ্জি' সুখী নহে মন,
তুমি প্রণতের বন্ধু চিনেছি তোমায়,
যাচি শান্তি নিত্য ভক্তি তব রাঙ্গা পায় ॥ ১৭ ॥

কুমতি, বিষয়ে আশা-মুগ্ধ মোর মন,
গহন কুপথে দুঃখ পাই অনুক্ষণ।
রক্ষা কর দুঃখ হ'তে কৃপাসার-দানে,
বিবেক বৈরাগ্য দাও, শোকদগ্ধ প্রাণে ॥ ১৮ ॥

প্রাণে পরা ভক্তিসুধা রামকৃষ্ণ ভজে,
সদ্য ভববন্ধমুক্ত—তাঁর পদরজে ॥

কবিবর হরীন্দ্রনাথ ঘোষ-কৃত পদ্যানুবাদ।

নরদেবতা

দেবতা, গুরু, সখা, মিত্র, বন্ধু—আমাদের সর্ব্বস্ব—যখন আসিয়াছ, তখন যুগান্তরে যেমন পার্থ-সারথি হইয়া এই নরধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তেমনি আমাদের বড় সাধের মনোরথে সমাসীন হইয়া পুনরায় উহাকে পরিচালিত কর—দেবতা! তোমার অমৃত-বাণীতে আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব—তোমার আশ্বাস পাইয়া আবার ধর্ম্মক্ষেত্রে—এই ভারতক্ষেত্রে সমবেত হইব। দ্বাপরের শেষ ভাগে পার্থের রথ পরিচালনা করিয়াছিলে—আজ হে ব্রাহ্মণরূপী নর-দেবতা, এই সমাজ-রথকেও তুমি অগ্রগামী করিয়া দাও। গো-ব্রাহ্মণের বড় দুর্দ্দিন, বেদবাণী অজ্ঞাত, মহান্ তুমি অণু হইয়া মর্ত্ত্যের মানবরূপে তোমার চির-আদরের ধর্ম্মকে রক্ষা কর। তাই দয়াময়, আজ বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ নরনারী তোমায় করযোড়ে আহ্বান করিতেছি।

তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের শ্রদ্ধার আসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। তুমি না রাখিলে আমাদের কে রাখিবে? তুমি পতিতের সংরক্ষণকারী—দুর্ব্বলের বল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী নরদেবতা—দয়া করিয়া যদি অবতীর্ণ হইয়াছ, তবে তোমার সাধের ভারতভূমিকে ম্লেচ্ছ-দুর্গতি হইতে মুক্ত কর। যে আবর্জ্জনায় সমাজ-প্রাঙ্গণ অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে,—যে মলিন ছায়ায় সমাজ-গৃহ অস্পৃশ্য—অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই ছায়া অপসারিত করিতে বাঞ্ছা করি। বাঞ্ছাকল্পতরু, পূর্ণ কর আমাদের বাসনা। দেবতা তুমি,—শক্তিময় তুমি—এমন শক্তি আমাদের দান কর, যাহাতে সমাজরূপী এই স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠাকে আমরা পরিশুদ্ধ করিতে পারি। আমাদের অঙ্গনে মায়ের চরণ-লেখামালা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সক্ষম হই।

ভাগীরথীতটে তুমি আসিয়াছ, গঙ্গার জলকল্লোল-গানে আমরা সে কথা শুনিতে পাইয়াছি। মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার আগমনকে অনুভব করিয়াছি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শিব, বিরক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তুমি আসিলেও তোমার চক্ষের ওই প্রসন্ন দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি কে? তুমি নিরক্ষরতার ছলনা করিলেও অনুভব করিয়াছি, তুমিই সেই বেদগোপ্তা। নহিলে কাহার বাক্যামৃতে বেদ ও বেদান্তবাণী এমন করিয়া নিঃসারিত হয়? তুমি চির-শঠ। এবার ছলনা করিলেও তোমার চাতুরী যে ধরিতে পারিয়াছি দেবতা। তুমি রামকৃষ্ণ,—একাধারে তুমিই কি রাম ও কৃষ্ণ নহ?

উঠ, উঠ, বাঙ্গালী! এই মাহেন্দ্রক্ষণে একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মি! তোমার শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্য-দেবতাগণ! আর এস—বাঙ্গালী ভাই-ভগিনী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা—বৃদ্ধ-যুবা—বালক-বালিকা—আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব রামকৃষ্ণরূপী নরদেবতাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি—যুগপূর্ব্বে আমাদের যিনি দুষ্কৃত মোচন করিয়াছিলেন, ইনিই তিনি!

—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

জীব-শিব

[রোমাঁ রোঁলা]

তোতাপুরী চলিয়া যাইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্তর হইতে যে দিন নামিয়া আসিলেন, তাহার পরদিনই তাঁহার চোখে পড়িল যে, দুই জন মাঝি ঝগড়া করিতেছে। দেখিয়া তিনি বড় ব্যথা পাইলেন। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে দেখিয়া তিনি বিশ্বের ব্যথায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পৃথিবীর সকল দুঃখ তাঁহার সমৃদ্ধ চিত্তে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

বর্ত্তমান জগতে মানবজাতি পরস্পরকে ঘৃণা করিতেছে, চারি দিকে ভস্মাচ্ছাদিত রণবহ্নি। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে আজ দ্বন্দ্ব। আজ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ থাকিতেন, বিশ্বময় এই ঘৃণা দেখিয়া তিনি কত যে কষ্ট পাইতেন, তাহা বলা যায় না।

কিন্তু এই পরমহংস তাঁহার বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া দৈনন্দিন ও লৌকিক জীবনের ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইতেন। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী পৃথিবীর সহিত গোটেই সম্পর্ক রাখেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহা করেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিশ্বের ব্যথা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ বিশ্বপ্রেম। পৃথিবীময় দুঃখের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেন—'জীব-শিব!' তিনি প্রত্যক্ষ করেন, ভগবানকে যে ভালবাসে, তাহার দুঃখ, কষ্ট, ভ্রম, ত্রুটি এবং আতিশয্যের মধ্যেও ভগবানকে ত্যাগ করা চলিবে না।

আমরা জানি যে, তাঁহার বরেণ্য শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি জনসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য চিদানন্দরসে ডুবিয়া থাকিতে দেন নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বিশ্বের নরনারীকে তাঁহার পক্ষপুট দ্বারা আবৃত করিয়া দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজিও রামকৃষ্ণ মিশন সেই কার্য্য করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেন—"মনের শান্তি চাও ত' অন্যের সেবা কর... ভগবানকে পাইতে চাও ত' মানুষের সেবা কর।" রামকৃষ্ণ মিশন এই মহা উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতেছেন।

পৃথিবীর ধর্ম্মবাদগুলি আজ যে দুর্ব্বল ও নষ্ট হইতেছে, তাহা এই উপদেশ বিস্মৃত হইবার জন্য। উহারা আজ মানুষকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর মানুষও তাই ধর্ম্ম ভুলিয়াছে। মানুষ আজ ভগবৎশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া আত্মশক্তি গড়িতে চাহিতেছে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ য়ুরোপীয় শিল্পী বীথোভেন ভগবানের উপর নির্ভরশীলদের আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে মানব, নির্ভর কর আপনাতে...।" লৌকিক বুদ্ধি আজ ভগবান আর মন্দিরকে এক করিয়াছে। মানুষ আজ আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ভগবদ্-বিদ্বেষী হইতেছে। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম শক্তিমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নিয়মই করিয়াছে যে, যদি কোনও বিজয়ী রাষ্ট্র এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সুযোগে হস্তার্পণ না করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে, তবে সে সেই রাষ্ট্র অত্যাচারী হইলেও তাহাকেই সমর্থন করিবে। এই ভাবে ইহারা পাশব শক্তি ও অন্যায়ের সমর্থন করিতেছে। ফলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই যে, নির্য্যাতিত জন-সাধারণ—অন্যায় ও পাশব শক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত হইবার সময় এই ধর্ম্মকেও অত্যাচারীর সয়তানসহোদর বলিয়া মনে করিতেছে। এই অগণিত নরনারী—ভগবানে বিশ্বাস না করুক, শত্রুরূপেই ভগবানকে জ্ঞান করুক—তবু, তবু যখন চাহে—তাহারা ন্যায় ও সুবিচার, যখন চাহে তাহারা আলোক, তখনই মনে হয়, ইহারা 'শিব!' তখনই ঠাকুরের কথা মনে হয়—'জীব-শিব'...এই সত্য আজ অনুভব করিতে হইবে।

দুনিয়ায় ওলট-পালট হইয়াছে। এই দুনিয়াতেই আজ আমাদের বাস। জনসাধারণ আজ পদবিমর্দ্দিত, বার্ত্তা-বিনিময়ের আধুনিক নব আয়োজন ও আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনের ফলে যে বিশ্বব্যাপী নির্য্যাতনের কাহিনী প্রত্যহ প্রকাশ পাইতেছে, এই বিমর্দ্দিত নরনারী আজও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা চিত্তগত করিতে পারে নাই। আপনাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, সমাজে ন্যায় ও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা জীবন-মরণ চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ হইয়া থাকা চলিতেছে না। পাশ্চাত্যে আমাদের পক্ষে ইহা আর সম্ভবপর নহে। আমরা ত' তোমাদের মতন পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী নহি। তবু যুগধর্ম্ম আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে। মানবদুঃখের প্লাবন-তরঙ্গে আমরাও নিমজ্জিত হইতেছি। উহাদিগকে গিয়া সাহায্য করিতে হইবে। অনন্ত পুনর্জ্জন্ম আছে কি না জানি না, তবু ইহা ত' সত্য যে, প্রত্যেকটি প্রাণ জীবন্ত! ইহা ত' সত্য যে,

ইহলোকে প্রত্যেকটিরই বিবিধকর্তব্য রহিয়াছে? প্রত্যেকটি মানুষ যতটা সৎকার্য্য করিতে পারে, তাহা ত' তাহাকে করিতেই হইবে, বর্তমানে ত' তাহাকে যথাশক্তি সংগ্রাম করিতেই হইবে?

পাশ্চাত্য খণ্ডের রামকৃষ্ণভক্ত আমি নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ ও সহায়-ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া, আপনার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য বিশ্বের কর্তব্য ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। উহাদের সাহায্য করাই আজ প্রথম কায। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামীজীর সেই ক্রোধোক্তি আমার মনে আছে। এক গুরুভাই যখন বর্তমান জগতের দুঃখ-কষ্টে বিজড়িত হইতে না চাহিয়া ভগবচ্চিন্তায় বিভোর রহিবার প্রস্তাব করেন, তখন স্বামীজী বলেন—"বেদান্ত-চর্চ্চা আর ধ্যানধারণা পরজন্মের জন্য রেখে দে। এই দেহকে লাগিয়ে দে মানুষের সেবায়।"

আর তাঁহার সেই চিরস্মরণীয় প্রার্থনা—"বার বার জন্ম লইব, সহস্র দুঃখ সইব, যদি আমি সেবা করতে পারি ঐ বাস্তব ভগবানকে, সর্ব্ব আত্মার ঐ অখণ্ডরূপকে—যদি সেবা করতে পারি—সর্ব্ব জাতির ঐ পাপী নারায়ণ, ঐ দুঃখী নারায়ণ, ঐ দরিদ্র নারায়ণকে।"

ভগবৎ-প্রেমিকদের কি ভুলই আজ হইতেছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, মানুষের সঙ্গে মিশিলে প্রেমভক্তি কমিয়া যায়, মন নামিয়া যায়। কিন্তু এই কথা ত' তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, লক্ষ কোটি অগণিতরূপে ভগবান নিত্য-কাল গঙ্গা-প্রবাহের মতন চলিয়াছেন। এই ধারণা হইলে চিত্ত নমিত হয় না, প্রসারিত হয়—নব সঞ্জীবিত হয়।

প্রত্যেকটি জীবন্ত ভগবানের সেবা কর! আবার এ কথাও মনে রাখিও যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম সদা প্রকাশ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মে গিয়া এই সব লক্ষ কোটি রূপ এক হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির আদিতে অবিচল শান্তরূপে যে ভগবান ব্যাপ্ত ছিলেন, আজিকার বিশ্বঝঞ্ঝার বিপন্নদের সাহায্যার্থ হস্ত প্রসারিত করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বিবেকানন্দ তাহা সর্ব্বদা সন্ন্যাসীদের স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাঁহাদের সঙ্কল্প দুই—সত্যলাভ ও জীবসেবা। স্বামীজী বলিতেন, মানুষকে আপনার পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে হইবে।

সহায়শূন্য ঐ নিঃসঙ্গ নিঃস্বদের তবে সাহায্য কর! ঐ যাহারা ঋজু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, উহাদের কর সাহায্য! তাহাদের চেষ্টায় দাও যোগ! এই ভাবেই ত' পরে বিশ্ব-গ্লানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাগ্রত শক্তির সমবায়ের সহিত আমরা সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইব।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে তোমরাই সাম্যের পতাকাবাহী। এই পতাকাতলে সকল সংগ্রাম ও সংঘাত শুরু হইবে। বিশ্ব-বিপ্লবে শান্তি, শৃঙ্খলা, সাম্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তোমাদিগকেই, ইহা তোমাদেরই কর্তব্য, তোমরাই ইহার জন্য নির্ব্বাচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতন হও। তাঁহার ঐ বিস্তৃত অশ্বত্থ-ছায়াতলে সমবেত হইয়া রণে ক্লান্ত ও আহত অযুত নরনারী শান্তি ও আশ্রয়ের প্রত্যাশা না করিয়া, কর প্রেম-বিস্তার! সাম্যবোধের অমোঘ সঞ্জীবনী প্রচার কর। দুষ্টরা দুষ্ট নহে, পথভ্রষ্ট। কোন্ পথে যাইবে, উহারা জানে না। মুক্ত নরনারীর শ্রেষ্ঠতম নেতা লেনিন জঘন্য-অত্যাচার-পীড়িত হইয়াও মৃদু হাসিয়া সহকর্ম্মীদের ক্রোধ এই বলিয়াই শান্ত করিয়া দিলেন—"কি আর করা যাইবে ভাই! যে যার বুদ্ধিমতই কায করিতেছে।"

এই বুদ্ধি জাগে না, তাই ত' বিশ্বের যত দুর্ভাগ্য। দাও বুদ্ধি জাগাইয়া,—জ্ঞান দিয়া উহাদের অপকার-প্রবৃত্তি দূর করিয়া দাও। বুঝাইয়া দাও যে, প্রতিবেশীর অপকার করার অর্থ আপনারই অহিত করা। এক জন ক্ষতি করিতে আসিলে য়ুরোপের অন্যতম মহাপুরুষ ভিক্টর হুগো বলেন—"ওরে মূর্খ, বুঝিতেছ না যে, তুমিই আমি?"

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত যাদুপ্রভাব এই যে, তাঁহার মতে 'তুমি' 'আমি' ও সমগ্র পৃথিবীই যে মাত্র মানবচিত্তে প্রতিবিম্বিত, তাহা নহে; তাঁহার মতে মানবচিত্তে বিশ্বের হয় অবতরণ। ভগবান পৃথিবীতেই প্রকাশিত, তাঁহার অনন্ত রূপ বহুরূপে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—জীব—শিব।

আপনাদের সেবায় নিযুক্ত মাসিক বসুমতী আগামী চৈত্র মাসে পঁচিশ বর্ষ অতিক্রম করছে। বহু দিন পূর্ব্বের কথা, ১৩২৯ সালের বৈশাখে মাসিক বসুমতী প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পর ক্রমে ক্রমে বাঙলার ঘরে ঘরে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলে জনসমাদর লাভ করে, আজ বাঙলার একমাত্র মুখপত্রিকার সম্মান-যোগ্যতা মাসিক বসুমতী পেয়েছে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন জনসাধারণ—মাসিক বসুমতী তাঁদের ঘরোয়া কাগজ। বাঙলার শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি ও রুচির পরিচালক মাসিক বসুমতী।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে আরও একটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও মাসিক বসুমতীই কেবল মাত্র সংগৃহীত হয়ে থাকে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। এক মাস ধরে পড়তে পাওয়ার পর মাসিক বসুমতী স্থান পায় বইয়ের আলমারীতে। ১৩২৯ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর স্থান অটুট অবস্থায় আছে, আপনাদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও তাই থাকবে—এ আশা আমরা করতে পারি।

পঁচিশ বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য আমরা রজত-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করছি। আমাদের আয়োজন কতটুকু কৃতকার্য্য হবে সে সম্বন্ধে এখন না বলাই ভাল। তবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি, আলোকচিত্র প্রভৃতির সমন্বয়ে মাসিক বসুমতীর রজত-জয়ন্তী সংখ্যা যে অপরূপ রূপ গ্রহণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যাটি আগামী জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই প্রকাশিত হবে। এ বিষয়ে আমাদের গ্রাহক, গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষকদের যদি কোন বক্তব্য ও পরামর্শ থাকে জানালে মতামত নামধাম সহ আমরা সাদরে প্রকাশ করব। নমস্কার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বিভূতিচরণ ঘোষ

যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্গাব্দ ১২৪১, ১০ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জীবের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার ডাক-নাম ছিল গদাধর। তাঁহাদের আদি বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুরের নিকট দেরে গ্রামে ছিল। পরে তাঁহারা জাহানাবাদের সন্নিকটস্থ শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে বসবাস করেন। ক্ষুদিরামের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার যজন-যাজন দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামকৃষ্ণদেবের জন্মের পর হইতেই তাঁহাদের সংসারে আর বিশেষ অভাব-অনটন রহিল না। তাঁহাদের গ্রামে এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নাম ধর্ম্মদাস লাহা। ধর্ম্মদাসের পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত রামকৃষ্ণদেবের বন্ধুত্ব ছিল, সে জন্য রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা লাহা-বাবুদের বাটীতে যাইতেন। লাহা-বাবুদের এক অতিথিশালা ছিল। রামকৃষ্ণদেব অতিথিদের সেবা-যত্ন করিতেন এবং অতিথিরাও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লেখাপড়ায় রামকৃষ্ণদেবের কোন আগ্রহ ছিল না, এমন কি, মাতৃভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই, অল্প স্বল্প জানা ছিল। ক্ষুদিরাম তাঁহাকে পাঠশালায় দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন, "পাঠশালে গিয়া কি করিব? লেখাপড়ার ফল তো কেবল চাল কলা। তেমন বিদ্যা আমি শিখিব না।" তবে রামকৃষ্ণের মেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রবল ছিল। একবার যাহা কিছু শুনিতেন তাহা'ই মুখস্থ হইয়া যাইত। তাঁহার গ্রামের এক কর্ম্মকারকন্যা ধনী তাঁহাকে শিশুকালে লালন-পালন করিয়াছিলেন। উপনয়নের সময় নূতন ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণদেবকে অগ্রে ভিক্ষা দান করিয়া ধাত্রী ধনমণি দাসী তাঁহার ভিক্ষামাতা হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন।

১২৫৩ সালে রামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ঝামাপুকুরে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় রামকৃষ্ণদেবের বয়স অনুমান ১৬ বৎসর। এখানে আসিয়াও রামকৃষ্ণদেবের লেখা-পড়ার কোন অনুরাগ জন্মে নাই। তবে সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল।

১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার রাণী রাসমণি স্নানযাত্রার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন—নবরত্ন মন্দিরে ভবতারিণী শ্রীশ্রী৺কালীমূর্ত্তি, স্বতন্ত্র মন্দিরে শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, সম্মুখস্থ গঙ্গাতীরে দ্বাদশ ৺শিবমন্দির। রামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার সেই দেবালয়ের পূজকরূপে বৃত হন এবং রামকৃষ্ণদেবও দাদার সহিত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। রামকুমার এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর কাল মাত্র দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তিনি পরলোকগমন করেন। ইহার পর রাণী রাসমণি রামকৃষ্ণদেবকে কালীপূজায় বরণ করেন। ১২৬২ হইতে ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের সাধন-কাল।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে যাইতেন। তখন তাঁহার সাধনাবস্থা। তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া পল্লীবাসিনী রমণীরা বলিতেন—তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবের জননী চন্দ্রা দেবী নিকটস্থ শিবালয়ে হত্যা দিলেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পাইলেন—"ভয় নাই, ভূতে পায় নাই, ভগবানের আবির্ভাব রামকৃষ্ণদেবে হইয়াছে।" ইহাতে জননী আশ্বস্তা হইলেন। অতঃপর জননী পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে শুভ দিনে শুভ লগ্নে রামকৃষ্ণদেবের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। পাত্রীর নাম সারদামণি, বয়স ছয় বৎসর। বিবাহের পর রামকৃষ্ণ এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদামণিকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মাতৃভাবে ষোড়শীরূপে পূজা করিয়াছিলেন। এক দিন রামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী পতির পদসেবা করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" তদুত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বারূপিণী দেখিতেছি। যে মাকে আমি পূজা করি এবং যে মা আমাকে উদরে স্থান দিয়াছেন, সেই মা'ই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন।"—রামকৃষ্ণদেব সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন, "স্বপ্নেও কখনও কোনও স্ত্রীলোককে "মা" ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখিতে পাই নাই।" কায়মনোবাক্যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই যে পূর্ণব্রহ্ম লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় রামকৃষ্ণদেব তাহা নিজ আচরণে সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার পূজার সময় তিনি আত্মহারা হইতেন। কখনও রোদন করিতেন, কখনও মাকে বলিতেন, "মা! আমার প্রাণ যায়। একবার দেখা দে মা! আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকের নিকট মান চাই না, লোকে আমায় জানুক, মানুক, গণুক, এমন সাধও নাই মা, তুই আমায় দেখা দে মা।"

রামকৃষ্ণদেবের তন্ত্র-সাধনের সময় তথায় অনেক তান্ত্রিকের সমাগম হইত। কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামী প্রায় সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শী কামিনীর পূজা করিবার বিধি আছে। ষোড়শী পত্নীর পূজা ইতঃপূর্ব্বে সমাধা করিয়া রামকৃষ্ণদেব তন্ত্র-সাধনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১২৯১ সালের ১১শে চৈত্র, শুক্রবার, গুডফ্রাইডে দিবস বেলা ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অনুগত ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রতিপাদন করিলেন। রামচন্দ্রই "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী" গঠন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। যে সতর জন নবীন সন্ন্যাসী বরাহনগরের মঠে স্বামী বিবেকানন্দকে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল :—

১। নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ। ২। রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ৩। যোগীন—স্বামী যোগানন্দ। ৪। বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ। ৫। নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ৬। শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ৭। কালী—স্বামী অভেদানন্দ। ৮। বুড়ো গোপাল—স্বামী অদ্বৈতানন্দ। ৯। শরৎ—সারদানন্দ। ১০। তারক—স্বামী শিবানন্দ। ১১। লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ। ১২। হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ। ১৩। তুলসী—স্বামী নির্ম্মলানন্দ। ১৪। সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীত। ১৫। গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ। ১৬। সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ। ১৭। হরিপ্রসন্ন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

শ্রীমা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১টার সময় ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জীবনের ইহলৌকিক লীলার অবসান হয়।

ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী

মুক্ত পুরুষ সংসারে কি রকম থাকেন জান? যেমন পানকৌড়ি জলে থাকে, কিন্তু তাদের গায়ে জল লাগে না।

বিষয়ী লোকদের মন গুবরে পোকার মতন। গোবরের পোকা গোবরের ভেতর থাকতে ভালবাসে। যদি গোবর ছাড়া তাদের কিছু দাও তাহলে ভাল লাগে না।

সংকাপড়ের ভানও ভাল, সোনার মাচা দেখে আসল আতার কথা মনে পড়ে। গেরুয়া পরলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হতে পারে; কিন্তু কালা পেড়ে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরলে নিধুর টপ্পা মনে আসে।

সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে! এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এই রকম করে তাঁকে দেখা পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়—সত্যি বলছি, মাইরি বলছি!

নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়—যেমন কাক খুব চতুর কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেমনি সংসার-ক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকি করতে যায় তারাই কেবল ঠকে থাকে। অর্জ্জুনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধরব সেটা করব, প্রাণপণ—ছাড়ব না। তারই নাম পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব।

তবে, যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দেখবে বলে তপ, জপ, ধ্যান-ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে, সেখানে তার প্রকাশ নিশ্চয় আছে জানবে। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে।

জ্ঞান লাভ হলে তারা সংসারে কি রকম ভাবে থাকে জান? যেমন সার্সির ঘরে বসে থাকলে ভেতরের ও বাহিরের দুই দেখতে পায়। সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল। ভক্তের জন্ম তিনি সাকার, জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিরাকার।

তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভেতরের সার বস্তু মানুষের ভেতর দিয়ে আসতে পারেন ও আসেন। ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন—প্রেম, ভক্তি শিখাবার জন্ম।

ঈশ্বর দু'বার হাসেন। যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে জমি বখরা করে নেয় আর বলে এ দিকটা আমার, ওই দিকটা তোমার। তখন একবার হাসেন। আর একবার হাসেন, যখন লোকের অসুখ কঠিন হয়ে পড়েছে, আত্মীয় স্বজনেরা সকলে কান্নাকাটি কচ্ছে, বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কি? আমি ভাল করে দেব। বৈদ্য জানে না যে ঈশ্বর যদি মারেন, তবে কার সাধ্য তাকে রক্ষা করে।

আঁদ্রে জিদের ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

মণি বাগচি

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মানস-জীবনের পরিচয় যতটা তাঁদের কবিতা, উপন্যাস বা নাটকে না পাওয়া যায়, তার বেশী পরিচয় মেলে তাঁদের ডায়েরী বা আত্মজীবনীতে। এই ডায়েরী বা আত্মজীবনীর মধ্যে তাঁরা নিজেদের যে ভাবে প্রকাশ করেন, ঠিক সেই ভাবে তাঁরা ধরা দেন না তাঁদের অন্য কোনো লেখার মধ্যে। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য যে ভাবে সমাদৃত, পঠিত এবং আলোচিত হয়, দুঃখের বিষয়, তাঁদের আত্মজীবনীর বা ডায়েরীর পাঠক-সংখ্যা বিরল, সমালোচকের সংখ্যা আরো বিরল। প্রত্যেক প্রতিভার জীবনের দু'টো দিক আছে—একটি হোলো তার মানস-জীবন, অপরটি হোলো তার বহিরঙ্গ-জীবন। এই দুই জীবনের সীমা-রেখা যেখানে এসে মিশেছে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় সেইখানেই। কাব্যে, উপন্যাসে বা নাটকে তাঁরা পাঠকের কাছে লেখক মাত্র; কিন্তু আত্মজীবনীতে তাঁরা ব্যক্ত করেন তাঁদের নিগূঢ় জীবন, বিশ্লেষণ করেন সেই জীবনের বিচিত্র অনুভূতি। এই জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবে অনেক সময় গণ্য হয় তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত অথবা তাঁদের আত্মজীবনী। কবিগুরু গ্যেটের আত্মজীবনী তাই পৃথিবীর সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ। অনেক দিন পরে পৃথিবীর সাহিত্যে আমরা ঠিক এমনি ধরণের একখানি বই পেয়েছি আঁদ্রে জিদের জার্নালের মধ্যে। অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী বিস্ময়কর সাহিত্য-জীবনের পরিচয় যেমন এর মধ্যে আছে, তেমনি আছে একটা যুগের পরিচয় আর আছে সেই যুগের দিক্‌পাল সব সাহিত্যিকদের জীবনের বৈশিষ্ট্যের চমৎকার বিশ্লেষণ। কম ক'রে ইউরোপের দু'শো সাহিত্যিকের কথা আছে তাঁর জার্নালের মধ্যে। এমন দরদ দিয়ে, এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীতে এর আগে আর কোনো সাহিত্যিক অন্য সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কখনো আলোচনা করেননি, যেমন করেছেন আঁদ্রে জিদ। শুধু এই কারণেই তাঁর জার্নাল বা ডায়েরী আজ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে।

জিদের বয়স যখন কুড়ি বছর, তখন থেকেই তিনি সুরু করেন এই ডায়েরী লিখতে। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের দৈনন্দিন বহু ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে এই ডায়েরীর প্রতিটি পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। শুধু কি ঘটনা? হৃদয়ের অনুভূতির এমন সংকেতময় প্রকাশ, বুদ্ধির এমন সংবেদনশীল অভিব্যক্তি যে, পড়লে পরে মনে হয় এই রোজনামচায় ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের একটা উজ্জ্বল যুগের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের মানস-জীবনের কাহিনী, এমন কি, ইউরোপের সমসাময়িক সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রতিভার বিশ্লেষণই এই ডায়েরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জিদ যখন সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন তখন মালার্মে, মেটারলিংকেরও সাহিত্য-জীবনের সুরু। জিদের জার্নালের গোড়ার দিকটায় আছে তাঁর নিজের সম্বন্ধেই বেশী বিবরণ। পরের অধ্যায়গুলিতে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কথা। জিদ যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে, তখনো পর্যন্ত এই ডায়েরী তিনি প্রকাশ করেননি। যেদিন এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হোলো, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে এমন জিনিষ বিরল বললেই হয়। এক জন সাহিত্যিকের রোজনামচার ভেতর দিয়ে একটা যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিখুঁত পরিচয় কত সুন্দর ও সম্পূর্ণ ভাবে দেওয়া যেতে পারে তার প্রমাণ দিলেন আঁদ্রে নিজে তাঁর

আঁদ্রে জিদ

এই জার্ণালের মধ্যে। এ যদি শুধু তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী হোতো, কিম্বা তাঁর উপন্যাস-নাটক কবিতা-প্রবন্ধের পরিপূরক হোতো তাহলে এই ডায়েরী সম্বন্ধে পাঠ বা সমালোচকদের আগ্রহ থাকবার কথা নয়। ফরাসী সাহিত্যের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের ওপর অপূর্ব্ব আলোক সম্পাতের জন্যেই এই জার্ণালের এত খ্যাতি। শিল্প ও জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হলেও সেই সাহিত্যিকের সৃষ্টি সার্থক—যিনি জীবন থেকে শিল্পকে এবং শিল্প থেকে জীবনকে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করেন। এই জার্ণালের মধ্যে আমরা যে আঁদ্রে জিদকে পাই তিনি দার্শনিক, সত্যদ্রষ্টা এবং স্পষ্টবক্তা। তাই এক জন বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর জার্ণাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই কথা বলেছেন: "It is certain that the Journals of Andre Gide, like Goethe's Conversations and Montaigue's Essays, reveal a moral philosopher. Struggling with the fundamental problems of humanity." অবশ্য সাহিত্যের সজ্জন সমাজে ব্যক্তিগত ভাবে জিদ যদিও অপাংক্তেয়, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য কেউ করতে পারেনি—তাঁর জন্মভূমি তো নয়ই, এমন কি, সমগ্র ইউরোপও নয়। তার একটা মাত্র কারণ এই যে, আঁদ্রে জিদ্ আগে মানুষ তার পরে লেখক।

আঁদ্রে জিদের সমগ্র জার্ণাল একখানি বিরাট গ্রন্থ—ফরাসী সাহিত্যের মহাভারত। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শিল্প, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জার্ণালের যেখানে যেখানে আলোচনা আছে, তারই বিশিষ্ট অংশের অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে, এদেশে জিদের এই সাহিত্য-কীর্ত্তির সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের এই প্রথম পরিচয়।

• • • •

৫ই জানুয়ারী, ১৯০২

"আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আত্মপ্রতারণা করবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তবে সার কথা হোলো আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ নিজের মূল্য নিজে উপলব্ধি করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা। আজ দুপুরে আমার এখানে খাবার জন্যে আঁরি এলবার্ট, লিঁও ব্লুম, সার্লে সাঁভি, মার্শেল দ্রুঁকে নেমন্তন্ন করেছি। সেই সঙ্গে আত্মগর্ব্বে জনকতক সদ্য নূতন লেখকদেরও এনেছি। প্রাচীন ও নবীনের দল মুখোমুখি বসে। আমিও আছি এদের মধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দল-ছাড়া। দলের মধ্যে আমি নিজেকে সব সময় বড় অসহায় মনে করি। কিন্তু দেখেছি, আমি যখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তখনই আমি আর অন্য সময়ে পাঁচ জনের মধ্যে আমি এক জন। তাই কোনো পার্টিতে অন্য কেউ আমার কাছে দুঃসহ নয় যতটা দুঃসহ আমি নিজে আমার কাছে।

"খাওয়া-দাওয়ার পর কথাবার্ত্তায় বেশ সজীবতা এলো অর্থাৎ আলোচনাটা ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়ালো ঐক্যতানিক। ঐক্যতান কিন্তু তার মধ্যে কোনো হার্মনি নেই। তবে সুবিধে এই সাঁভি, ব্লুম আর এলবার্ট কেউ এক ছাঁচে কথা বলেন না। সাঁভি সব কিছুর মধ্যেই 'দেহসর্ব্বস্বতা' (sensuality) লক্ষ্য করে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেন। এঁদের শ্রোতার পক্ষে নীরব থাকাই সুবিধাজনক। বিতর্কটা সুরু হোলো ফ্লেবেয়ারকে * নিয়ে অর্থাৎ ফ্লেবেয়ার কী পরিমাণে মেয়েদের ভালবাসতেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি কী প্রত্যাশা করতেন, আর শেষ পর্য্যন্ত তাদের নিয়ে আসলে তিনি কি করতেন। কথা একটা বলা সহজ, কিন্তু তার প্রকৃত সংজ্ঞাটা আগে বোঝা দরকার। এই "সেনসুয়ালিটি"র অর্থ আমার কাছে স্বতন্ত্র। মানবাত্মার সত্য অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে নয়; গ্রহণ করে, স্বীকার করেই আত্মার স্বচ্ছতম প্রকাশ, সুন্দরতম অভিব্যক্তি। ফ্লেবেয়ারকে আমি যে ভাবে বুঝেছি তাতে মনে হয় মেয়েদের ভালোবাসার চেয়ে মেয়েদের সম্বন্ধেই তাঁর কৌতূহল অপরিসীম। এ কথা বেশ বুঝতে পারি যে, তাঁর মধ্যে দু'টো প্রকৃতি—সূক্ষ্ম আর স্থূল। এই মানুষই গণিকালয়ে দুর্দ্দান্ত রক্ত-মাংসের এবং সতেজ যৌবনের মানুষ, আবার একেই দেখেছি নারীদের সঙ্গে, বিলাসিনী অভিনেত্রীদের সঙ্গে এক সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষ। দেহের চেয়ে তাঁর মনটা যে সুন্দর, এই কথাটা তিনি অন্য লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেন। আমি যদি মেয়েমানুষ হতাম, তাহলে ফ্লেবেয়ারের চেয়ে অন্য কোনো পুরুষ যে আমাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারত না—এ কথা স্বীকার করতাম। আবার সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারতাম যে এত সহজে অন্য কোন পুরুষকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হত না।

"এমনি একটা মানসিক কল্পনার মধ্যে ফ্লেবেয়ারকে নিয়ে আমি একান্তে ছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ কাণে এলো আঁরি এলবার্টের একটা রূঢ় কথা—ফ্লেবেয়ার সিফিলিসগ্রস্ত ছিলেন। সাঁভি বললেন, ফ্লবার্টও ছিলেন তাই! আমি প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু এরা দু'জনে নাছোড়বান্দা। প্রতিবাদ যখন নিষ্ফল হলো তখন আমি নিক্ষেপ করলাম ব্রহ্মাস্ত্র। বৈজ্ঞানিক ভুংক্রান্তের দোহাই দিয়ে বললাম—যে কোনো সভ্য সমাজের জনতায় দেখতে পাওয়া যাবে যে, দু'জনার মধ্যে পাঁচ জনই সিফিলিসগ্রস্ত—এবং তার পর বললাম, তবে সুখের বিষয়, আমরা এখানে উপস্থিত আছি পাঁচ জন।

"আঁরি এলবার্টের কণ্ঠস্বরে এতটুকু দরদ নেই, দাক্ষিণ্য নেই। তিনি শুধু সেই বিষয়ই কথা বলেন যে বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল আর তিনি ওয়াকিবহাল সেই বিষয়ে যা তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়। তাই ভাবলাম—এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হোক। হেতু, আত্ম-প্রতারণার প্রশস্তি না শোনাই ভালো, যে-মানুষ সম্পর্কেই তা হোক না কেন।"

এই আলোচনার পর মধ্য-রাত্রে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করে করে আঁদ্রে জিদ তাঁর সে দিনের জার্ণালে যে মন্তব্য করেছেন, ভাষার স্বচ্ছতা এবং ভাবের প্রগাঢ়তায় তা অনুধাবনযোগ্য।

"অনেক সময় দেখেছি, একটা কাজের বাস্তবতা প্রকাশ পায় তার প্রত্যক্ষ ফলের ভেতর দিয়ে। পৃথিবীতে বড় বড় অপরাধগুলি তখনই সম্ভব হয়েছে যখন তার অনুষ্ঠান হয়েছে ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। পরে অবশ্য অপরাধী তার জাগ্রত চৈতন্যে ফিরে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সে যে এক জন অপরাধী নয়—এই স্বীকৃতি অন্যের কাছ থেকে পেতেও তার আরও বেশী আগ্রহ।

৮ই জানুয়ারী

"ফ্লেবেয়ার সম্পর্কে লেখা দরকার।...ফরাসী সাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি এক জন প্রতিভা এবং আধুনিক ইউরোপের তিনি এক জন

---

* সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আঁরি ব্রেঁন।

সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ লেখক—শুধু শ্রেষ্ঠ? এক জন বিদগ্ধ লেখক। টৈগোলের বইয়ের মধ্যে আমি মগ্ন হয়ে যাই। তবে তিনি বড় বিপজ্জনক লোক—বিপজ্জনক এই অর্থে যে, তিনি পাঠকের চিন্তাকে সহজেই প্রভাবান্বিত করে তোলেন। তিরিশ বছর বয়সে তার বই পড়ে বিমুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছি।

আঠারো বছর আগে ম্যাক্স আমাকে বলেছিল—"তুমি চোখ দিয়ে হাসো, তোমার মুখ ক্ষয়ে যাবে।"

বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তবে কি ক'রে হাসবো?"

"স্রেফ ঠোঁট দিয়ে—" সে বললে—"আমার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

সেই ঘটনার পরে আজ টৈগোলের জার্নালের একটা লাইন হঠাৎ চোখে পড়লো:—"থিয়েটারী হাসি।" কথাটা তিনি বলেছেন নেপোলিঁ সম্বন্ধে, "যিনি হাসতেন চোখ দিয়ে নয়, দাঁত দিয়ে।"

সে দিন এক বন্ধু এসে রীতিমতো বিস্মিত হলেন, যখন দেখলেন আমি টৈগোলের জার্নালের মাঝ-পথে। আমি বললাম, যত মন্থর গতিতে এ জিনিষ পড়া যায় ততই ভালো। কেন না, এ বই পড়া আর এর লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা একই কথা। টৈগোলের সঙ্গচ্যুত হলে জীবনটা যেন নিঃসঙ্গ ব'লেই মনে হয়। টৈগোল রীতিমতো উত্তেজক।

• • • •

১৭ই মার্চ্চ, বুধবার, ১৯০৪

"কল্পনা কদাচিৎ আইডিয়ার আগে আসে, বিশেষ আমার বেলায়। আইডিয়াই আগে, পরে কল্পনা। কিন্তু কল্পনাহীন আইডিয়া কোনো কাজের নয়, শুধু চিন্তার মধ্যে নিয়ে আসে আলোড়ন। চিন্তার জন্ম আইডিয়া থেকে, কল্পনা থেকে নয়। কল্পনা-সর্ব্বস্ব লেখার পরমায়ু খুব বেশী নয় আর কল্পনা-সর্ব্বস্ব লেখকের সৃষ্টিশক্তি খুব বেশী দিন সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পারে না।

"বিতর্কটা উঠলো সে দিন এডমণ্ড গাসের সম্মান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায়। মেটারলিঙ্ক আর আঁরি দ্য রেনারের মাঝখানে বসেছিলেন বেলজিয়ান কবি এমিলি ভারহার্ণ। মেটারলিঙ্কের কানের কাছে মুখ এনে ভারহার্ণ বললেন—আমার ব্যাপারে, আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, প্রকৃত পক্ষে আমার নিজের লেখা ছাড়া অন্য কারো লেখা সম্পর্কে কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ নেই।

"মেটারলিঙ্ক উত্তরে বললেন:—ঠিক আমার মতই। কিন্তু আমি আর একটু ওপরে। এখন যা লিখছি সেই সব লেখার ওপর আমার নিজেরই কোনো উৎসাহ নেই।

"বেলজিয়ান কবি চকিতে ঈষৎ লম্ফ প্রদান করে বললেন—উঁহু—দু'টো জিনিষ ঠিক এক নয়। আমি যা লিখি তার সম্পর্কে আমার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা থাকে না—বুঝলেন, নিজের লেখা আমি 'প্যাসানটলি' ভালোবাসি···সেই কারণেই অন্যের লেখা সম্পর্কে আমি হিমরক্ত উদাসী।

পরের দিন লুব্রেতে যখন দেখা হোলো, এই ভারহার্ণই আমাকে বললেন—"জানেন, মেটারলিঙ্কটা কী শয়তান, বলে কি না, লিখতে হয় বলেই সে এখন লেখা—নইলে আসলে তার মধ্যে সত্যিকারের আর কোনো প্রেরণা এখন নেই।"

বুঝলাম, সে মেটারলিঙ্ক আর বেঁচে নেই। সেই ক্ষমতাশালী মেটারলিঙ্ক! আইডিয়াহীন কল্পনার বুঝি এই পরিণতি।

• • • •

গ্যেটে বলেছেন: "সময় সময় অনুভব করেছি যে পৃথিবীতে এমন কোনো ভীষণ দুষ্কার্য্য নেই যা আমার পক্ষে করা অসম্ভব।" কথাটা সত্যি। শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই জঘন্য দুষ্কার্য্য করতে সব চেয়ে বেশী সক্ষম। কিন্তু মজা এই, সাধারণতঃ তাঁরা তা করেন না। কারণ, তাঁদের প্রেম আর জ্ঞান এই রকম কোনো দুষ্কার্য্য করার পক্ষে প্রবলতর অন্তরায়। এর থেকে প্রকৃত ভালো হওয়া কাকে বলে সেটা জেনেছি। সমস্ত কিছু দুষ্কার্য্য করতে যে সক্ষম অথচ আদৌ করে না, পৃথিবীতে সেই একমাত্র সৎ। আমি কিন্তু এমন সৎলোক হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করি নে। কারণ, এর দ্বারা ইচ্ছাশক্তির অপমৃত্যু ঘটে।

প্রচ্ছদপট

এবারের প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের মহাপীঠস্থান পঞ্চবটীর আলোকচিত্র দেওয়া হইল।

অহিংসা ও রাষ্ট্রনীতি

অধ্যাপক মহেশ্বর দাশ

অহিংসা অর্থে আমরা সাধারণতঃ হিংসার অভাবই (ন হিংসা—অহিংসা—নঞ্‌ তৎপুরুষ) বুঝি। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ হিংসা হইতে নিবৃত্তিই অহিংসা শব্দের শক্তি অনেক সময়ে ব্যবহারের দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ দর্শনে আমরা শব্দের অর্থানুসন্ধান করি। পঙ্কে মৎস্যাদি বহু পদার্থ জন্মলাভ করিলেও ব্যবহার অনুযায়ী আমরা পদ্মেই পঙ্কজ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। অহিংসার বেলাও ঠিক সেইরূপ। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ হিংসা হইতে নিবৃত্তি যদি অহিংসা শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক জীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ অহিংসার দ্বারা জীবন ধারণ করে এরূপ একটিও জীব সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"ন হি পশ্যামি জীবন্তং লোকে কঞ্চিদহিংসয়া"—শান্তিপর্ব্ব।

ন হিংসা=অহিংসা—এই স্থলে নঞ্‌ শব্দের অর্থ অভাব নহে, অল্পতা। অহিংসা শব্দের অর্থ অল্প হিংসা অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনে হিংসা না করাই অহিংসা শব্দের অর্থ। হিংসার একান্ত অভাব—এই অর্থে অহিংসা শব্দের অর্থ করিলে ব্যবহারিক জীবন উক্ত যুক্তিতে অচল হইয়া পড়ে। প্রয়োজন বোধে হিংসা ধর্ম্মসম্মত, প্রয়োজন ক্ষেত্রে হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কেবল ক্লীবত্বের পরিচায়ক নহে, ব্যক্তিগত, জাতিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন অসম্ভব ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

লৌকিক জীবন দেখা যায় সম্পূর্ণ অহিংসাব্রত হইয়া যে মুনি-ঋষিগণ অরণ্যে প্রস্থান করেন, জীবন ধারণের প্রয়োজনবোধ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টির তাগিদও তাঁহাদিগকে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মহাভারতে উক্ত আছে—

"বিনীতক্রোধহর্ষা হি মত্বা বনমুপাশ্রিতাঃ।
বিনা বধং ন কুর্ব্বন্তি তাপসাঃ প্রাণধারণম্‌।"

শাঃ পঃ ১৫ অঃ।

অর্থাৎ যে তাপসগণ ক্রোধাদি রিপু দমন করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও হিংসা না করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া জলে, পৃথিবীতে, ফলে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট অবস্থান করে, আমরা স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সেইগুলির বিনাশ সাধন করি, অন্যথায় আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভবপর হয় না। তাই মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।
ন চ কশ্চিন্ন তান্‌ হন্তি কিমন্যৎ প্রাণযাপনাৎ।"—শাঃ পর্ব্ব।

অহিংসা দ্বারা যে জীবন ধারণ অসম্ভব—এই সম্বন্ধে মহাভারতকার আরও বলিয়াছেন—"অহিংসার দ্বারা জীবন ধারণ করে এমন প্রাণী জগতে দেখা যায় না। সবল প্রাণী সকল সময়ে দুর্ব্বল প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়া জীবন ধারণ করে। প্রাণরক্ষার জন্য নকুল মূষিককে, বিড়াল নকুলকে, কুকুর বিড়ালকে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু কুকুরকে হিংসা করিতে দেখা যায়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, এই সমস্ত জগৎ প্রাণের অন্ন অর্থাৎ খাদ্যস্বরূপ—ইহাই ঈশ্বরের চিরন্তন বিধান, ইহার পরিবর্ত্তন কখনও সম্ভবপর নহে।" (শান্তিপর্ব্ব, ১৫ অধ্যায়)।

তাহা হইলে, হিংসার অভাব এই অর্থে অহিংসা শব্দের প্রয়োগ ব্যবহারিক জীবনের কুত্রাপি দেখা যায় না। অনুদরা কন্যা বলিতে আমরা উদরবিহীন কন্যা এই অসম্ভব অর্থ করি না, অল্প অর্থাৎ ক্ষীণ উদরবিশিষ্টা কন্যাকেই বুঝি, সেইরূপ, অহিংসার অর্থে হিংসার অভাব নহে, অল্প হিংসাই অহিংসা শব্দের প্রকৃত অর্থ। প্রয়োজন বোধে হিংসা করাই অহিংসা এবং তাহাই ধর্ম্ম, নীতি ও যুক্তিসঙ্গত।

সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে এমন কি পরম শান্তিময় ঋষিগণের আরণ্য জীবনেও অহিংসার কোনও স্থান নাই। থাকিলে ঋষিগণ মধ্যে মধ্যে রাজসাহায্যে রাক্ষসবধের ব্যবস্থা করিতেন না। রাক্ষস দ্বারা উপদ্রুত ঋষি বিশ্বামিত্র সুদূর অযোধ্যায় আসিয়া রাক্ষসবধের জন্য দশরথের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বীর কুমারদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে তপোবনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাবতীয় যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। রাক্ষসগণের দ্বারা উপদ্রুত দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণ রামচন্দ্রের নিকট আবেদন করিলে তিনি একাই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। যদি অহিংসার দ্বারাই রাক্ষস দমন সম্ভবপর হইত তাহা হইলে এই ঋষিগণ হিংসার পথে না গিয়া অন্য উপায়ে এই দুর্ব্বৃত্তদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিতেন। যখন আরণ্য জীবনে হিংসার স্থান নাই, তখন যে রাষ্ট্রনীতির ছত্রচ্ছায়ায় যাবতীয় ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আশ্রয়লাভ করিয়া রহিয়াছে, এবং অনন্ত ভোগের আধার যে রাষ্ট্রে শত শত কোটি কোটি লোকের ধন, প্রাণ ও সম্মানের নিরাপত্তা ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্রনীতিতেও যে অহিংসার স্থান কোনও অবস্থায় থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, রাষ্ট্রনীতির সহিত দণ্ডনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং সমস্ত বিশ্বমর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রবর্ত্তিত সেই দণ্ডনীতি সম্পূর্ণরূপে হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। দণ্ডনীতি পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর, রাষ্ট্রের সেই কর্ণধারগণ যদি অহিংসার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালন সম্ভবপর মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে শান-গাছেও ফলন হওয়া সম্ভবপর হইবে। মহাভারতকার বলিয়াছেন যে, 'দণ্ডনীতির মূল ভিত্তি হিংসাকে উপেক্ষা করিয়া যে রাজা রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার এই গুরুতর প্রমাদের জন্য রাজ্যের প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের দ্বারা ধনে, প্রাণে ও সম্মানে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে; রাজ্যমধ্যে বিপুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এই প্রকার ভ্রম-প্রমাদ-বিশিষ্ট রাজাই সাক্ষাৎ অধর্ম্মের অবতার।'

"রাজ্ঞঃ প্রমাদদোষেণ দস্যুভিঃ পরিমুষ্যতাম্‌।
অশরণ্যঃ প্রজানাং যঃ স রাজা কলিরুচ্যতে।"

শান্তিপর্ব্ব ১২ অঃ।

দণ্ডনীতিই রাজনীতির প্রধান অবলম্বন। দণ্ডের ভয়েই রাষ্ট্রের জনসাধারণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করে, কেহ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ অন্যের অপকার সাধন করিতে সাহসী হয় না। যদি কেহ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে স্থলে উপযুক্ত ভাবে দণ্ডনীতির প্রয়োগ হইতেছে না। মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।"

অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ-চরিত্র নহে, সকলেই দণ্ডের ভয়ে স্ব-স্ব পথে বিচরণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু সুবিধা বোধে মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস পায়। দণ্ডের দ্বারাই প্রজাগণের ধন, মান ও জীবন রক্ষিত হয়। রাজদণ্ডের ভয়ে মহাপাপিষ্ঠরাও পাপকার্য্য করিতে ভীত হয় এবং দণ্ডনীতির উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে সমস্ত রাষ্ট্র অরাজকতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।

"দণ্ডেন রক্ষ্যতে ধান্যং ধনং দণ্ডেন রক্ষ্যতে।
রাজদণ্ডভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্ব্বতে॥
যমদণ্ডভয়াদেকে পরলোকভয়াদপি।
পরস্পরভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্ব্বতে॥
• • • •
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেকে ন খাদন্তি পরস্পরম্।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ॥"—শান্তিপর্ব্ব।

রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়া যদি কেহ উপযুক্ত ভাবে দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করেন এবং মনে করেন যে অহিংসপন্থায় রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইবে, তাহা হইলে সেই সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের ক্লীবতা হেতু রাষ্ট্রমধ্যে ঘোর বিপ্লব দেখা দেয় এবং দণ্ডনীতি বিহীন সেই রাষ্ট্রনায়কগণ অধিক দিন রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে পারেন না। দণ্ডনীতি বিহীন দুর্ব্বল রাষ্ট্রনায়কগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"ন ক্লীবো বসুধাং ভুঙ্‌ক্তে ন ক্লীবো ধনমশ্নুতে।
ন ক্লীবস্য গৃহে পুত্রা মৎস্যাঃ পঙ্ক ইবাসতে॥
মিত্রতা সর্ব্বভূতেষু দানমধ্যয়নং তপঃ।
ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্ম্মঃ স্যাৎ ন রাজ্ঞো রাজসত্তম॥
অসতাং প্রতিষেধশ্চ সতাঞ্চ পরিপালনম্।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্ম্মঃ সমরে চাপলায়নম্॥
যস্মিন্ ক্ষমা চ ক্রোধশ্চ দানাদানে ভয়াভয়ে।
নিগ্রহানিগ্রহৌ চোভৌ স বৈ ধর্ম্মবিদুচ্যতে॥" শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ যে ক্লীব ও দুর্ব্বল সে পৃথিবী ভোগ করিতে পারে না, তাহার পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন তাহার নিকট শান্তিতে থাকিতে পারে না, প্রজাগণ যে থাকিতে পারিবে না ইহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বভূতে মিত্রতা, দান প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি, সাধুগণের পরিরক্ষণই রাজার কার্য্য এবং যে রাষ্ট্রনায়কের ক্রোধ এবং ক্ষমা, দানশক্তি এবং অপহরণের শক্তি, ভীতি উৎপাদন এবং অভয় দানের সামর্থ্য, অনুগ্রহ এবং নিগ্রহের যোগ্যতা—এই উভয়বিধ গুণ রহিয়াছে তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবিদ্ নৃপতি; লোকে তাঁহাকে যেমন ভয়ও করে, তেমনি শ্রদ্ধাও করে। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন—

"অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ।"

অর্থাৎ যাহার মধ্যে ক্রোধোদ্দীপক তেজোবীর্য্যাদি নাই, সেই লোককে শত্রুগণ যেমন ভয় করে না, মিত্রগণও তেমনি শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রনায়কগণ প্রকৃত দণ্ডনীতি-সম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ভাবে দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যে কেবল শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় না, তিনি নিজেও উত্তম শাসক বলিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন এবং রাজ্যভোগের প্রকৃত অধিকারী হন। যাঁহারা হিংসানীতি অবলম্বন না করেন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ প্রজা-পালন প্রভৃতি কর্ম সম্ভবপর হয় না।

"নাঘ্নতঃ কীর্ত্তিরস্তীহ ন বিত্তং ন পুনঃ প্রজাঃ।"
—শান্তিপর্ব্ব।

উদাহরণ-স্বরূপ মহাভারতকার বলিয়াছেন—'ইন্দ্র যত দিন দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রাসুরকে বধ না করিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহার নাম ছিল ইন্দ্র, আর বৃত্রাসুরকে বধ করার পর তাঁহার নাম হইল মহেন্দ্র।' এই প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে—লৌকিক জগতে দেখা যায় যে, সমস্ত দেবতা ক্রোধনস্বভাব এবং যাঁহারা অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন বলিয়া লোকের ধারণা আছে, লোকে সেই সমস্ত রুদ্রাদি দেবতারই সাড়ম্বরে পূজা করিয়া থাকে, ব্রহ্মা প্রভৃতি শান্ত এবং ক্রোধহীন দেবতার পূজা কেহ করে না।

"য এব দেবা হন্তারস্তান্ লোকোঽর্চ্চয়তে ভৃশম্"
—শান্তিপর্ব্ব।

'অর্থাৎ যে সমস্ত দেবতা হননশীল লোকে তাহাদিগকেই অধিক পূজা করিয়া থাকে।'

সুতরাং রাষ্ট্রের যাবতীয় শৃঙ্খলা সমস্তই দণ্ডনীতির উপর নির্ভর করিতেছে। দণ্ডনীতির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অহিংসার স্থান যে মূলতঃ নাই, আলোক এবং অন্ধকারের সহাবস্থানের ন্যায় রাষ্ট্রনীতি ও অহিংসার সহাবস্থান যে অসম্ভাবিত এবং বিরুদ্ধ, তাহ শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা ভূয়িশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহাভারতকার অহিংসাকে সাধু হিংসার নামান্তর বলিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলগণকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্যই হিংসাত্মক দণ্ডনীতি। অহিংসার পন্থা অবলম্বন করার অর্থ সেই উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বৃত্তগণকে প্রশ্রয় দেওয়া। এবং সেই প্রশ্রয়ের ফলে সাধু ব্যক্তিরা দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হন, তাহা হইলে অহিংস পন্থা অবলম্বন করার মূলে সাধু ও শৃঙ্খলাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি হিংসাই বিদ্যমান রহিয়াছে। গোষ্ঠ ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেই ব্যাঘ্রের প্রতি অহিংসার অর্থ নিরীহ গরুগুলির প্রতি হিংসা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"লোক-যাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
অহিংসা সাধুহিংসেতি শ্রেয়ান্ ধর্মপরিগ্রহঃ॥" শাঃ, পঃ।

অর্থাৎ লোকস্থিতিরক্ষার জন্য ধর্মের এই প্রকার নির্ব্বাচন করা হইয়াছে যে, অহিংসা সাধুহিংসার নামান্তর। সুতরাং আর্ত্তত্রাণ-রূপ ধর্ম প্রতিপালন করিতে হইলে হিংসাই একমাত্র উপায়। রাজনীতির প্রধান অবলম্বন দণ্ডনীতির সারমর্ম এই যে, যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে শত্রুর মর্ম্মস্থল ছিন্ন না করা যায় কিংবা মৎস্যঘাতী যেরূপ মৎস্যের বধ সাধন করে সেইরূপ শত্রুর উচ্ছেদ সাধন না করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রনীতিতে অভ্যুদয় লাভ কখনই সম্ভবপর নহে।

"নাচ্ছিত্বা পরমর্ম্মাণি নাকৃত্বা কর্ম্ম দারুণম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে॥" শাঃ পঃ।

অতএব উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে, লৌকিক রাষ্ট্রে হিংসার অভাব এই অর্থে অহিংসা শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতির ন্যায় অলীক। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে এমন কি পরম শান্তিময় আরণ্যজীবনেও অহিংসার কোনও স্থান নাই। আর যে রাষ্ট্রনীতির সহিত অসংখ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রা ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে এবং যাহার অভাবে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত শৃঙ্খলা, সমস্ত নিরাপত্তা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, সেই রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অহিংসার স্থান আলোকে অন্ধকারের স্থানের ন্যায় একেবারে অসম্ভব ও বিরুদ্ধ। অহিংসা ও রাষ্ট্রনীতি এই দুই বিরুদ্ধ বস্তুকে যিনি একত্র সমাবিষ্ট করিতে চাহিবেন, তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার জন্য মূলতঃ দায়ী হইবেন।

মহাতর্পণ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

এই ভারতের মহামানবের শোণিত-সিন্ধুতীরে
আমাদের চোখে দুঃসহ জ্বালা নেবেনি অশ্রুনীরে
নিহত রাষ্ট্রগুরু
তর্পণ হল সুরু
অভেদ মন্ত্রে আসে নব যুগ উদ্দাম উল্লাসে
প্রলয়ের রাঙা সমুদ্র-বুকে মহাশবদেহ ভাসে।

শোণিত-সাগরে ভাসে মহাশব অভয়ঙ্কর বেশে
ঝড়ের ডানায় ভর করে চলি ব্যথায় অট্ট হেসে
ভয় নেই ভয় নেই
জাগ্রত জগতেই
বিপ্লবী প্রেম বিপুল আবেগে শত তরঙ্গ মেলি
মেঘ গর্জনে দুর্জয় কোটি প্রাণ ওঠে উদ্বেলি।

জানি পিতা জানি প্রেমের সাধনা একদা সিদ্ধ হবে
ক্ষমা করো আজ এ যুগের যত ভৈরবী ভৈরবে
ললাটে বহ্নি জ্বলে
বিরাট গগন-তলে
প্রলয় মেঘের বিদ্যুতে লেখা সাম্যের ইতিহাসে
উদ্ধত শিরে আসে মহাপ্রেম জলন্ত বিশ্বাসে।

বিশ্বাস রেখো বড় বেদনায় খড়্গ ধরেছি হাতে
সৃজনের ফুল ফোটাবোই জেনো সুবিপুল সংঘাতে
যত ঘৃণা যত পাপ
যত ব্যথা সন্তাপ
বজ্র-নখরে শোষণের মূল ফেলে দেব ছিঁড়ে খুঁড়ে
ঝড়ের ডানায় ভর করে চলি রক্ত আকাশ জুড়ে।

মনে-প্রাণে চির অহিংস মোরা প্রেমই সত্য জানি
চারি দিকে তবু গর্জন করে বিষাক্ত হানাহানি
বিপুল অগ্নি-স্রোতে
ঐক্যের রণপোতে
গণ-তরঙ্গে পার হয়ে যাবো সমুখের যত বাধা
আমাদের গান বিপুল আত্মপ্রত্যয়ে সুর সাধা।

হে পিতা একশ' পঁচিশ বছর অমেয় তোমার আয়ু
ঊনআশী পার হ'তে না হ'তেই কালের ঝঞ্ঝা-বায়ু
সহসা মধ্যপথে
কুটিল হিংসা-রথে
হরণ করেছে ভারতের পাপে করুণার বিগ্রহ
এখনো কি ক্ষমা? আজো অহিংসা? জয়ী হবে নিগ্রহ?

আমাদের বুকে এ মহাপাপের প্রতিশোধ হ'ল জমা
নব ভারতের ইতিহাস থেকে মুছে গেল আজ ক্ষমা
শেষ অহিংস বাণী
চিতায় যুক্ত পাণি
ক্ষমা চেয়ে গেছ ভারতের কাছে দুর্জয় অভিমানে
শেষ নিশ্বাসে ঘনালো ঝঞ্ঝা বিপ্লবী আহ্বানে।

আজ থেকে গণসিন্ধুর বুকে মহাতর্পণ সুরু
শোষিত বুকের পঞ্জরে জাগে বিপ্লবী রণগুরু
প্রেমগুরু নিপাতনে
সর্ব হারার মনে
ভয়লেশহীন শৃঙ্খল ছাড়া কিছু নেই হারাবার
ঝড়ের দোলায় টলমল করে বিক্ষোভ-পারাবার।

বিশ্বাস আর জাগে না জাগে না বৈষ্ণবী সঙ্গীতে
ক্রূর বিষধর সর্পের মুখ-চুম্বনে প্রেম দিতে
আপোষে উপোষে ভয়ে
ধ নি ক চি ত্ত জ য়ে
অক্রোধে ক্রোধ ক্ষমায় বিরোধ ঘোচেনি এ মরলোকে
ইতিহাসে আজো থামেনি হত্যা ক্ষমা বিহ্বল শোকে।

তোমার নিহত আত্মার বাণী শুনেছি শুব্ধ প্রাণে
করজোড়ে তুমি ডাক দিয়ে গেছ বিপ্লবী ভগবানে
ঝড় আসে মহাবেগে
সূর্য লুকায় মেঘে
মাটির গর্ভে বাসুকির ফণা শঙ্কায় দুলে ওঠে,
অশুভ গ্রহের পঞ্জরভাঙা গগনে উল্কা ছোটে।

দোলক

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

দোলক দুলিতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে অথবা পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে দোলক দুলিতেছে। যে দিকে যায়, সেই দিক্ হইতে আসে; যে দিক্ হইতে আসে, সেই দিকে যায়। যাওয়া-আসা তাহার মুহূর্তে মুহূর্তে। দোলন তাহার প্রতিমুহূর্তে। প্রতিমুহূর্তে সে গতিশীল, বিরামহীন। দুলিতে দুলিতে এক প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল,—মনে হইল এইবার বুঝি থামিবে, এইবার যেন গতিহীন হইয়াছে। কিন্তু না, তাহা ঘটিল না। দোলক বিরত হইল না। আপাত-দৃষ্টিতে যাহা গতিশূন্যতা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা তো বিরতি নহে—উহা অপর প্রান্তাভিমুখে যাত্রার সূচনা মাত্র। দোলনের এক প্রান্তে উপস্থিত হইবা মাত্র বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্তন। অপর প্রান্তেও স্থিতি নাই—তন্মুহূর্তে দোলন সুরু। গতিপথের কোনো স্থানেই স্থিতি দেখি না—প্রান্তেও নহে, পথের কোনো বিন্দুতেও নহে।

দার্শনিক বিস্মিত হ'ন। এ কি বিড়ম্বনা দোলকের! দোলে কেন? কোথায় যাইতে চাহে? যাইতেছে না কেন? তবে কি ইহার কোনো গন্তব্য স্থান নাই? শুধু চলিতেই চাহে, চলাই ইহার কার্য্য। যদি চলিতেই চাহে, যদি ইহার প্রকৃতি গতিময় হয়, গতিশীলতাই ইহার ধর্ম্ম হয়, তবে অব্যাহত গতিতে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলেই পারে! গতিপথে সহসা বিপরীতগামী হইবার কি প্রয়োজন ঘটিল? যদি বিপরীত গমনের অকস্মাৎ প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে পুনরায় সম্মুখে দুলিয়া আসিবার কারণ তো নাই! তবু অগ্রসর হইয়া আসে। আসে তো ফিরিয়া যায় কেন? যদি ফিরিয়া যায় তো পুনরায় আসে কেন? আসা-যাওয়ার এই আবৃত্তি কেন? ইহার মূলে কি? গতিশীলতা যদি ইহার ধর্ম না হয়, বিরামই ইহার ধর্ম—ইহার কাম্য হয়, তাহা হইলে গতিপথের কোনো বিন্দুতে ইহার দোলন ক্ষান্ত হইতে পারে; ইহা অনন্ত বিশ্রাম, অনন্ত শান্তিলাভ করিতে পারে। তবে এত দোলা কেন?

বৈজ্ঞানিক মৃদু হাস্যে বলিবেন—দোলক তো দুলিবেই। দুলিবার জন্যই দোলকের সৃষ্টি। দোলককে দুলিতেই হইবে। ইহার ধর্ম্ম কি, ইহার কাম্য কি—ও সব বুঝিবার কথা নহে। তবে ইহার একটি বিরাম-রেখা আছে—তাহা সত্য। সেই রেখায় অবস্থাপিত হইলে ইহার পূর্ণ বিরাম। এ কথাও সত্য যে, বিরাম-রেখার দিকেই তাহার গতি। অক্ষ হইতে ইহার দূরত্ব সৃষ্টি হইলেই ইহা বিরাম-রেখার দিকে আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু আপন বেগে ইহা দোলনের মধ্যপথে বিরাম-রেখাকে অতিক্রম করিয়া যায়। পুনরায় আকর্ষণে ইহার অক্ষরেখাভিমুখী গতি সৃষ্ট হয়। এই গমন ও পুনর্গমন আপন বাধার দ্বারা প্রতিহত না হইলে কত কাল যে চলিত তাহা বলা যায় না। গতির সৃষ্টি মুহূর্তে গতিরোধ করিবার জন্য ঘর্ষণাদি বিরুদ্ধ-শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে, নহিলে দোলন-গতি ক্ষান্ত হইত না। এই সকল প্রতিবন্ধক শক্তি দোলকের বিরাম-রেখা হইতে উহার দূরত্ব হ্রাস করিয়া ক্রমশঃ দূরত্ব নাশ করে। একবার বিরাম-রেখায় স্থাপিত হইতে পারিলে দোলক আর দুলিবে না। পুনরায় ইহাকে বলপূর্বক বিরাম-রেখাভ্রষ্ট না করিলে ইহা অচল হইয়া থাকিবে। ইহাতে ভাবিবার কী আছে?

ভাবিবার কিছু নাই। দোলক—দোলক মাত্র। বিশ্বজগতের সহিত তাহার তুলনা চলে না। এমন কি উপমাও অচল, হাস্যজনক; কারণ হয়তো তাহা বিজ্ঞানসম্মত কি না স্থির নাই। তবে দার্শনিক-মন দোলকের সহিত সমগ্র বিশ্বের প্রাণযাত্রার কোথায় একটা অস্পষ্ট মিল দেখিতে পাইতেছে। দোলকের আচরণে যেন বিশ্ব-রহস্যের আভাস আছে। দোলকের কিছু বলিবার আছে।

বিজ্ঞান বলিতেছে—দোলক তাহার বিরাম-রেখায় অবস্থাপিত হইতে পারিলেই আর দুলিবে না; বলপূর্বক তাহাকে বিরামচ্যুত না করিলে সে দুলিবে না, তাহার অনন্ত বিরাম ঘটিবে। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিতে নাই, অতএব ইহা সত্য। তাহা হইলে কী দাঁড়াইল? দোলককে তাহার কামনা অনুযায়ী থাকিতে দিলে সে শান্ত হইয়া থাকিবে, দুলিবে না। বিরামচ্যুতি হইতেই ইহার দোলন এবং এই বিরাম-রেখায় আসিয়া স্থিতিবান্ হইবার জন্যই ইহার গতি। তবে কি দোলকের স্বভাব দোলন নহে, বিশ্রাম? দোলন দোলকের ধর্ম নহে, অনন্ত বিরতিই ইহার ধর্ম, ইহার কাম্য? দুলিবে না তাই দুলিতেছে। গতিহীনতার জন্য গতিশীলতা, নিশ্চলতার জন্য চঞ্চলতা। স্থির হইবার জন্য সে অস্থির; শান্ত হইবার জন্য সে অশান্ত। বিরামের আকর্ষণে বিরাম-বিহীন।

গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন—দার্শনিক-মন বলে। মন চমৎকৃত হয়—বিচার মৃত্যুকে দেখাইয়া দেয়। দোলক তাহার কাম্য লাভ করিলেই মৃত হইল। চির-বিরাম তাহার মৃত্যু। দোলনের অবসানে দোলকের আত্মনাশ। যাহার দোলন নাই, তাহাকে দোলক বলিব কেন? দোলক তাহার দোলন বন্ধ করিলেই দোলকত্ব হারাইল। বিরাম-রেখায় চির বিরামে তাহার দোলক-জীবন শেষ। দোলনারম্ভে তাহার জীবন আরম্ভ, দোলনেই জীবন, দোলনের অবসানে জীবনের অবসান। বিরামচ্যুতি হইতেই দোলন, বিরামের আকর্ষণে দোলন, বিরামের সহিত মিলনে মৃত্যু। মৃত্যু হইতে জীবন জাগ্রত হইয়া মৃত্যুর আকর্ষণে গতিমান্, মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। সুপ্তিভঙ্গ মাত্র নির্ঝর বেগবান্ হইয়া থর-থর করিয়া ভূধর কাঁপাইয়া ছুটিল, পৃথিবী প্লাবিয়া ফেলিতে চাহিল! চতুর্দিকে পাষাণ-প্রহরী গতিরোধ করিতে লাগিল, নির্ঝরকে নিশ্চল করিয়া পুনরায় সুষুপ্তিতে লইয়া যাইতে চাহে। সুপ্তিভঙ্গ মাত্র এই বাধার উপলব্ধি, গতির সঞ্চার-মুহূর্তে গতিরোধ অনুভূত হইতেছে; গতির জন্মে যাহার জন্ম, সেই বাধা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে কী উপায়ে? কিন্তু বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। বাধা ভাঙিয়া চলিতে হইবে। সুষুপ্তির, শান্তির, মৃত্যুর দূত প্রতি মুহূর্তে গতিরোধ করিয়া বাহিতের আক্রমণ জানাইতেছে, প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। বাহিতের আহ্বানেই চলা, তবু বাহিতের দূতকে অস্বীকার করা চাই। ইহাই আত্মদ্বন্দ্ব; কিন্তু এই আত্মদ্বন্দ্বেই গতির সত্তা, গতির প্রকৃতি নিহিত। অতএব নির্ঝর দুর্বার বেগে বাধা ভাঙিয়া, রাশি রাশি শিলা খসাইয়া ছুটিল। সে যে মহাসাগরের ডাক শুনিয়াছে, শান্তি-পারাবার তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। অবশেষে সেই নির্ঝর শান্তি-পারাবারের সম্মুখে আসিয়া পড়িল! এইবার কি সে থামিতে পারিবে? সব দ্বন্দ্ব, সব ক্লান্তি শেষ হইবে? শুধু শান্তি, শুধু শান্তি! নিশ্চল নিস্তরঙ্গ শান্তিতে লীন হইবে? জাগরণ-ক্ষণ হইতে চলার মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্ট বাধা যে চির-বিরামে লইয়া যাইতেছিল, এতক্ষণে কি সে চির-নিশ্চলতার নির্ঝরের নির্ঝর-জীবন শেষ হইল? দোলক নীরবে কোন্ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে?

বিরাম-রেখার আকর্ষণে দোলায়মান দোলক দোলনের বেগে তাহার রেখাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া এই অতিক্রমণ পুনরতিক্রমণ চলিতে থাকিবে—যদি তাহার বেগ-সঞ্জাত বাধাই বিশ্রাম ঘটাইয়া না দেয়। এ কি বিড়ম্বনা! বিরামে উপস্থিত হইতেছে, অথচ বিরত হইতে পারিতেছে না; কাম্যের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে কিন্তু কাম্যকে পাওয়া যাইতেছে না। কামনার বেগে বার বার কাম্যকে অতিক্রম করিতেছে, তথাপি সমাপ্তি ঘটিতেছে না। জীবন মৃত্যুকে বার বার স্পর্শ করিতেছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নূতন জীবন-স্পন্দনে জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুতে লীন হইতে পারিতেছে না। অনন্ত কালেও পারিবে না। অনাদি হইতে অনন্ত কাল ইহাই চলিবে। মহাসাগরের আহ্বানে নির্ঝর ছুটিয়াছিল; তাহার বেগ মুহূর্তে মুহূর্তে আপন বাধার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বাঁধিতেছিল—পারে নাই। মহাসাগরের সহিত মিলন-ক্ষণে সেই বাধা অলক্ষ্য হইয়া উঠিল, নির্ঝরের গতি রুদ্ধ হইল, নির্ঝর নিজেকে হারাইল।

নির্ঝর নিজেকে হারাইল, তাহার নির্ঝর-জীবন শেষ হইল। কিন্তু দোলন তো শেষ হয় না, পুনরায় আরম্ভ হয় মাত্র। এই পুনরারম্ভে পুরাতন বেগেরই প্রকাশ; প্রতি মুহূর্তে নূতনত্বে পুরাতনের পরিচয়; নূতন-পুরাতনের মিলন হইতে নূতনের সঞ্চার-পথ। নির্ঝরের বেগ মৃত্যু-সাগরকে স্পর্শ করিল মাত্র, মৃত্যু-সাগরকে অতিক্রম করিয়া অসীমের পথে ছুটিল। শান্তি-সাগরে তাহার যাত্রা বেগশূন্য হইল না। শান্তি-পারাবারের কর্ণধার তাহাকে পারাবারের সহিত আপনাকে মিশাইতে দিলেন না। নূতনের মাঝে পুরাতন জাগিয়া রহিলেন। পুনর্বার চিরশান্তির ক্রোড় হইতে স্খলিত হইয়া শান্তির উদ্দেশে যাত্রারম্ভ করিল। কিন্তু নব যাত্রারও অবসান আসন্ন হইল—হিম-মৃত্যু তাহাকে নিশ্চলতার বাঁধনে বাঁধিতে চাহিল। আবার সুপ্তিভঙ্গ, আবার কর্মপথে অভিযান। অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাধা পড়িলে নিস্তার নাই। অনন্ত জনম মাঝে অনন্ত কাজে জীবকে চলিতে হইবে,—তাহাকে চির বিশ্রামের ভিতর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে তো আর সে থাকে না! আকাশের প্রতি তারা তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার নিমন্ত্রণ লোকে-লোকে, নব নব পূর্বাচলে, আলোকে আলোকে। সে যে ছুটিয়া যায় বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন। জীবন ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। মৃত্যুতে খণ্ডিত জীবনের আপাতঃসমাপ্তি, নূতন খণ্ড জীবনের সূচনা। সকল ব্যথা বিচ্ছিন্ন হইয়া ফুল হইয়া ফুটিল। ফুল ফুটিল, বাতাসে দুলিল, শোভা-সৌরভ বিকীরণ করিল। তাহার পর তাহার পরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। চরম বেদনায় মৃত্যুর ক্রোড়ে সে ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু বীজ রাখিয়া গেল। মৃত্যুর স্পর্শে নব প্রাণ জাগিয়া উঠিল।

মন কামনার তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। প্রতি ক্ষণে তাহাকে কত সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার গণনা নাই। মন ছুটিতেছে, বিরাম নাই। সহসা কামনার বেগ নিঃশেষ হইল, মন কাম্যকে স্পর্শ করিল, মনের মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু সেই ক্ষণেই মনের নব জন্ম, নূতন কামনার বেগ। কামনা হইতে কামনান্তরে মনের গতি। ক্ষণে ক্ষণে শান্তি, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু তাহাকে খণ্ডিত করিতেছে। কামনাহীন মন, গতিহীন মন, নিশ্চল প্রশান্ত মন মৃত মনেরই নামান্তর। 'নিষ্কাম' মন তো কামনাহীন মন নহে; কামনা-হীনতার অন্তরালে যে কামনা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে—'নিষ্কাম' হইবার কামনা। নহিলে অনন্ত মরণে বিরাম লাভ করা যাইত। তাহা তো স্পর্শনীয় মাত্র, তাহাতে লীন হওয়া তো যায় না। মন কিরূপে সেই অসীম মৃত্যু-পারাবারে আত্ম-নিমজ্জন করিবে? কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রে ধাবমান মন যেমন আপন দ্বন্দ্বঘটিত পথে কোথাও কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে, তখন কি তাহার বেগ থামিয়া যায়? সমাধিমুখী মন কি মৃত? মৃত কী করিয়া বলি। অগণিত লক্ষ্য বস্তুর ভিতর একটিকে অসংখ্য মুহূর্ত ধরিয়া লক্ষ্য করিতে পারি; বহু বিষয়ের ভিতর একই বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে পারি। একটি লক্ষ্য বস্তুর ভিতর অসংখ্য লক্ষ্যনীয় বিষয় নিহিত আছে, নহিলে দেখা এক মুহূর্তে শেষ হইয়া যাইত। একটি চিন্তনীয় বিষয় একাধিক হইয়া চিন্তা-স্রোতকে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত ও বেগবান্ করিতেছে, নচেৎ যে কোনো বিষয় এক মুহূর্তে মন হইতে অপসৃত হইত। বহুর ভিতর যেমন এক সম্ভব, একের ভিতরও তেমনি বহু যে সম্ভব। সীমার মাঝে অসীম—ইহা তো কবির কাব্য-বিলাস মাত্র নহে। সমাধিমুখী মন তাহার কেন্দ্রের অন্তরে যে অনন্ত কেন্দ্রশ্রেণী আবিষ্কার করে, এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে অনন্ত মুহূর্ত ধরিয়া ছুটিতে থাকে। গতি-বেগের দ্বন্দ্ব তাহাকে মুহূর্তে মুহূর্তে আহত করিতেছে; ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু ঘটিতেছে; নব বেগ, নব গতি সঞ্চারিত হইতেছে। সমাধিমুখী মন ক্ষণে ক্ষণে শান্তির স্পর্শ পাইতেছে। কেন্দ্রীভূত মন বাহ্যতঃ মৃত, প্রশান্ত মনে হইতেছে। অন্তরে তাহার দ্বন্দ্ব-শান্তির আবর্তন। অগণিত শান্তি-বিন্দুর স্পর্শে ও আকর্ষণে সঞ্চারিত তাহার বেগ।

বহুর ভিতরে এক, একের ভিতরে বহু। বহুর যে-কোনো একটি স্বয়ং বহুর সমষ্টি। বহুর ভিতরে একের পরিচয়, বহুর পরিচয়ে একের পূর্ণতা। ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কেন্দ্রের ভিতরে অগণিত কেন্দ্রাণু; কেন্দ্রাণুর অন্তরে কেন্দ্র-পরমাণু; আবার পরমাণুরও অণু-পরমাণু রহিয়াছে। অন্তরে, অন্তরের অন্তরে, তদন্তরে যে-গতি, তাহারও তো শেষ নাই। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম—গভীরতার শেষ কোথায়! স্থূল বস্তু-খণ্ডের গভীরতম, সূক্ষ্মতম সত্তা শক্তি ব্যতীত তো আর কিছু নহে। 'নিষ্কাম' কামনার কেন্দ্র হইতে ধ্যানস্থ মন কেন্দ্রাণুতে প্রবাহিত হইতেছে; কেন্দ্রাণু হইতে কেন্দ্র-পরমাণুতে ধাবিত হইতেছে; অবশেষে কামনার সূক্ষ্মতম সত্তায় গিয়া পৌঁছিল, কামনা মিলাইয়া গেল, মন অনন্ত শক্তি-পারাবারে গিয়া তরঙ্গিত হইতে লাগিল। অসীমের সহিত সীমার এই মিলন-ক্ষণে বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলাইয়া দুলিয়া উঠিল।

কর্ম মহাসাগরের দিকে চাহিয়া দেখি, অগণিত কর্মতরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, পতিত হইতেছে। পতনোন্মুখ তরঙ্গ উত্থানোন্মুখ তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে না হইতেই আর একটি উদ্দেশ্যের উদ্দেশ পাই। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা, ব্যবস্থার পর ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে, পরিত্যক্ত হইতেছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে, প্রয়োজন মিটিয়াছে—পরিকল্পনা ত্যাগ কর, নূতন গ্রহণ কর। অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, প্রয়োজন মিটিতেছে না, ব্যবস্থা অনুপযুক্ত—অতএব ত্যাগ কর, নূতন গ্রহণ কর। যে ভাবেই হউক্, আমরা প্রতিনিয়ত পুরাতনকে ত্যাগ করিয়াছি, নূতনকে গ্রহণ

করিতেছি ; কিন্তু পুরাতনকে সম্যক্ [illegible] পূর্ণ নূতনকে পাই না। পুরাতনের সহিত নূতনের যোগেই নূতন জন্মলাভ করে। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা নূতনের আরম্ভে পুরাতনকে গ্রহণ করি। অভিজ্ঞতা কি নব পরিকল্পনার ভিত্তি নহে? পুরাতনের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্ত্ত প্রভাবান্বিত হইতেছি। যাহা আপাত উপলব্ধির বাহিরে, আপাত চেতনার বাহিরে, তাহা সক্রিয়তার বাহিরে নহে। পুরাতনের ক্রিয়া নূতনের অন্তরে আপাত দৃষ্টিতে ধরা না পড়িলেও তাহাকে অস্বীকার করা তো যায় না। পুরাতনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইলেও সে তন্মুহূর্ত্তে নিঃশেষিত হয় না। আপনার বিলীয়মান বেগেই নূতনের সঞ্চার করে, নূতনের অন্তরে প্রবেশ করিয়া নূতন-পুরাতনের যোগসাধন করে। প্রয়োজনে যে ব্যবস্থার জন্ম, প্রয়োজন শেষেও তাহা টিকিয়া থাকে, নূতন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে; অবশেষে নূতন ব্যবস্থাকে পূর্ণ করিতে অদৃশ্য হয়। অনুপযুক্ত সমাজ-বিধি নিষ্প্রয়োজন হইলেও গতায়ু না হইতে পারে—আপনার ঝোঁকে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে।

প্রয়োজন! কিসের প্রয়োজন? অভাব হইতে অব্যাহতির প্রয়োজন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হইতে মুক্তির প্রয়োজন, শান্তির প্রয়োজন। বেগ থাকিলেই তাহার বাধা আছে, সক্রিয় বাধা থাকিলেই বেগ আছে। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা নাই। অভাব হইতে অব্যাহতি, সংঘর্ষ হইতে মুক্তি—ইহা গতিহীনতা, বেগহীনতা, মৃত্যু ব্যতীত কিছু নহে। শান্তি ও মৃত্যু একই সত্তায় সত্য। আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি, সমাজ গড়িতেছি, শান্তির আহ্বানে। উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই আর না-ই হই, আমরা স্বীকার করি আর না-ই করি, সঞ্চিত প্রাণধারা শান্তির আহ্বানে গতিমান্। মৃত্যুর আকর্ষণে আমরা সক্রিয় হইতেছি; আমরা ছুটিতেছি, প্রাণপণে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছি। সকল হৃদয় দিয়া, সকল বুদ্ধি দিয়া, সকল শক্তি দিয়া শান্তি চাহিতেছি, মৃত্যু চাহিতেছি। বাঁচিবার নামে মৃত্যুর স্পর্শানুভূতি লাভের কী ঐকান্তিক চেষ্টা! সৃষ্টিচক্রের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! মৃত্যুর আকর্ষণে সঞ্চারিত প্রাণ আপন হইতে সঞ্চার-পথ সৃষ্টি করিয়া লইতেছে। নব নব বেগ, নব নব সঞ্চার-পথ। খণ্ডিত প্রাণের মৃত্যুমুখী গতির শত শত পথ—কোথাও মিলিত, কোথাও পরস্পর-বিরোধী। এই সকল সঞ্চার-পথের কত না নাম! 'রাষ্ট্র', 'সমাজ', 'বিধি-বিধান,' 'শাসন' 'নিয়ম'! কী ভাব-বৈচিত্র্য। 'আদর্শ' অত্যাচারের প্রতিশোধ, 'রুটির লড়াই' 'বিপ্লব'—কত শব্দ অভিধানকে পুষ্ট করিতেছে। কিন্তু ইহাদের অর্থ এক। একই স্থানে আমরা চলিয়াছি—সেই শান্তি, সেই মৃত্যু!

অস্তিত্বের কোনো মুহূর্ত্ত স্থান-কালের ভাসমান বিন্দু মাত্র নহে। কোনো মুহূর্ত্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পূর্বাপর সকল সম্পর্ক-শূন্য নহে। স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু সম্বন্ধও আছে! অস্তিত্বের সকল মুহূর্ত্ত পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে গ্রথিত। ঘটনা-মুহূর্ত্তের প্রত্যেকটির ইতিহাস আছে; নূতন ঘটনা-মুহূর্ত্ত পূর্ব মুহূর্ত্তাবলীর সম্ভাব্য ফল মাত্র, পূর্ব সম্ভাবনাকে পূর্ণ করিতেছে মাত্র। কিন্তু নূতন ঘটনা-মুহূর্ত্ত ইতিহাস-সঞ্জাত হইলেও পূর্ব মুহূর্ত্তাবলীর সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হইবা মাত্র নিজেকে এবং নিজের সমগ্র অস্তিত্বের গতিকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। এই তাই প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের সঞ্চার-পথ নূতন ভাবে সৃষ্টি হইতেছে। যে পথে জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পূর্ণ পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারিতেছে না। যে পথে আসিয়াছি, সে পথে অপর কেহ আসিতে পারিবে না, সে পথে আমিও ফিরিতে পারিব না। স্থান-কালের এই পথ প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন, প্রতি মুহূর্ত্তে অদ্বিতীয়।

দোলক দুলিতেছে, নীরবে আপত্তি জানাইতেছে। ভাবিতেছে, সে তো একই পথে যাওয়া-আসা করিতেছে। যে পথে যাইতেছে, সে পথে ফিরিতেছে। যে পথে ফিরিতেছে, সে পথে আবার আসিতেছে। তাহার পক্ষে তো একই পথে যাওয়া-আসা সম্ভব হইতেছে!

দোলক বড় আত্মকেন্দ্রিক, বড় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন। নিজের বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছে না, নিজের অতিরিক্ত কিছু ভাবিতেছে না। সে নিজের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজের কথাই কেবল ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সে একই পথে আসা-যাওয়া করিতেছে। সে উপলব্ধি করে নাই, তাহার নিজের অবস্থার প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার সঞ্চরণ পথও পরিবর্তিত হইতেছে। সমগ্র স্থান-কালের পটভূমিকায় তাহার গতি-পথ কি কোনো দু'টি মুহূর্ত্তে এক থাকিতে পারে? সমগ্র বিশ্বে কি একমাত্র সে গতিশীল? একটু উদার-দৃষ্টিতে দেখিলেই দেখা যায়, একই পথে আসা-যাওয়া চলে না। যে পথে আসা, সে পথে যাওয়া যায় না। শুধু যে দিক্ হইতে আসা, সেই দিকে যাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু পথ এক নহে। দিক্ এক হইতে পারে, পথ পৃথক্—ইহা সম্ভব। ইহা শুধু সম্ভব নহে, ইহার ব্যতিক্রমই অসম্ভব। দোলক ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে। ইহাই গতিচক্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রাণধারার সঞ্চার-পথের ইহাই রহস্য। সমাজ ভাঙিতেছি, সমাজ গড়িতেছি, অগ্রসর হইতেছি। ভাঙা-গড়ার কার্য্য ক্রমাগত চলিতেছে, ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। অবশেষে চোখ খুলিয়া দেখি, অগ্রগতি আমাদিগকে কোথায় আনিয়াছে! যে দিক্ হইতে দূরে যাইতে চাহিয়াছিলাম, দূরে যাইতেছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই দিকেই আসিয়া পঁহুছিয়াছি! যে সমাজ ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলাম, প্রগতি পুনর্বার তাহারই কাছাকাছি আনিয়া দিয়া এক পর্য্যায় শেষ করিল! এ কি পরিহাস! দর্শনের যে ব্যাখ্যা এক দিন ব্যঙ্গভরে ত্যাগ করিয়াছিলাম, ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আবার তাহারই অনুরূপ গ্রহণ করিতে বলিতেছে। এ কি নির্বুদ্ধিতা?

পরিহাসই হউক, নির্বুদ্ধিতাই হউক, ইহা সত্য। আমাদের গতি চক্রপথে, কিন্তু কোনো মুহূর্ত্তে একই পথে নহে। যাত্রা অনন্ত কালের, সঞ্চার-পথ অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্ট হইবে, চক্রাকারে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু কখনই একই চক্রে নহে, পথের হুবহু পুনরাবৃত্তি কখনও নহে। এ যেন স্ক্রুর প্যাঁচে পড়িয়াছি; ঘুরিতেছি, পূর্ব-পরিচিত দিকে আসিতেছি, যাইতেছি; কিন্তু কখনই পূর্বস্থানে পঁহুছিতেছি না, কখনও পূর্ব-পথে চলিতেছি না। বিশ্বপ্রাণ এই প্যাঁচে পড়িয়াছে, তাহার নিস্তার নাই।

অগণিত তরঙ্গ লইয়া সমুদ্র, অসংখ্য খণ্ডিত জীবন লইয়া মহাজীবন। কোন ক্ষণে দোলা লাগিয়াছে, মহাজীবন দুলিতেছে। মৃত্যু হইতে জন্ম, জন্ম হইতে মৃত্যু তাহার দোলা চলিতেছে। কোন্ ক্ষণে নটরাজ তাঁহার বিষাণে ফুৎকার দিবেন, এ মহাজীবন মহা-মৃত্যুতে নিঃশেষ হইবে। আবার ব্রহ্মার ধ্যান হইতে মহা বিশ্বপ্রাণ জাগিয়া উঠিবে, নূতন পথে তাহার মহাযাত্রা আরম্ভ হইবে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্ষের সম্মুখে অনিত্য এই যে জগৎ, ইহার অন্তরালে রয়েছে অনন্ত এক মহাশক্তি। সেই শক্তি ও ব্রহ্ম একই বস্তু। আবার ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর বা ভগবান। সেই ভগবান নিজ শক্তি সহায়ে সৃষ্টি করেছেন জীব জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" সৃষ্টি করিয়া তাহারই ভিতরে তিনি সর্ব্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজমান। তিনি আধার এবং আধেয় দুই-ই। আবার সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে তিনিই নরদেহে এই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পুরাণ ইতিহাস চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিদিত আছে, "এতে চাংশকলাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়ে সাধুদিগের পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত এবং দুরাচারীদিগকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হই।'

ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মানব সমাজের নৈতিক জীবন প্রভৃতি যখন বিপন্ন হয় তখনই দেখা যায়, সেই ভগবৎ শক্তিই সংস্কারকরূপে আধিকারিক পুরুষ বা সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে বিশ্বকল্যাণে অবতাররূপে এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

সমগ্র জগৎ যখন সাম্রাজ্যবাদিত্বের ও ধনতান্ত্রিকতার মোহে পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও হানাহানিতে উন্মত্ত, একে অপরের শোষণে ও শাসনে ব্যস্ত ও তৎপর, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, প্রেম বা ভ্রাতৃত্বের কোনও সন্ধান রাখে না, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সেই ভগবৎ শক্তিই যেন একাংশে ভারতমাতার ক্রোড়ে মহাত্মা গান্ধীরূপে প্রকাশিত হইলেন। যুগোপযোগী এই ঋষি বিশ্বজগৎকে শুনাইলেন এক অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী, "সত্য ও অহিংসা—রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসা"—এই অভিনব বাণী, আর ব্যক্তি মাত্রেরই স্বাধীনতায় আছে অধিকার এবং সেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে এই সত্য ও অহিংসা দ্বারা, আর দেখাইলেন হরিজনে প্রেম ও জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের ও মিত্রতার প্রেমের বন্ধন, আর ভারতের হিন্দু-মুস্লিম জটিল সমস্যার ঘোর দুর্দ্দিনে গাহিলেন সেই মিলনের গান, "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম সবকো সন্মতি দে ভগবান" এবং অনিষ্টের বিরুদ্ধে করিলেন ইষ্ট সাধনের এক নব অভিযান, যে অভিযানে দেশ-মাতৃকা আজ হারাইলেন তাঁহার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান. এবং সমগ্র বিশ্ব হারাইল প্রেমিক ও সত্যিকারের দরদী বন্ধু এক জন।

বিশ্বের রাজনৈতিক গগনে নবরাগে রঞ্জিত এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অভিনব রাজনৈতিক জাতির জনক পুণ্যভূমি ভারতভূমির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মহাত্মাজীর নশ্বর জীবন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির রীতি অনুযায়ী আজ এক আততায়ীর হস্তে ধ্বংস হইল। হায়! কি দুর্দ্দৈব বিধাতৃ-লিখন! এই নিকৃষ্ট আদর্শবাদী আততায়ী নিমিত্ত মাত্র, কারণ তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী, কিন্তু "আজ কাঁদিছে বিশ্ব কাঁদিছে প্রকৃতি।"

মনে পড়ে আজ শ্রীরামকৃষ্ণালোকে উদ্ভাসিত বিশ্ববিশ্রুত যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের কথা, যাঁহার অন্তরাত্মায় জেগেছিল সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ, যাঁর হৃদে ফুটেছিল ভবিষ্যৎ এক প্রেমের জগৎ! মনে পড়ে আজ তাঁর সেই মর্ম্মস্পর্শী বাণী—"ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, পণ্ডিত ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী ···কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই···' আর মনে পড়ে, আজ সারা বিশ্ব যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়বাদিত্বের ও হননকারী বৈজ্ঞানিক যুগের মাদকতায় অন্ধ ও উন্মত্ত, আমেরিকার অন্তর্গত ধনজনমুখরিত শিকাগো সহরে সেই ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন, ও বিশ্বের আধ্যাত্মিক গগনের সূর্য্যস্বরূপ ও মহাজ্ঞানের আকর স্বামী বিবেকানন্দ এই পুণ্যভূমি ভারতভূমির পরম সম্পদ ধর্ম্মের বার্ত্তা সেখানে বহন পূর্ব্বক যখন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের সেই অমৃতত্বের বাণী—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" একমাত্র চৈতন্য বা আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান ও সর্ব্বভূতে তাহার একত্ব অনুভূতিই মাত্র প্রকৃত ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়, নাহি যেথা ভেদাভেদ নাহি সেথা জাতিভেদ শূদ্র কি ব্রাহ্মণে, সকলেই সেই এক অমৃতের সন্তান।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই মহীয়ান্ আদর্শে প্রভাবান্বিত গান্ধীজীর কথা মনে পড়ে আজ বিলাতে রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে যখন আহ্বান করা হইল, স্বাধীনতার এই নির্ভীক সৈনিক ও বীর সাধক কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া যখন সদর্পে ঘোষণা করিলেন, "আমি আমার ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের জন্য আজ আপনাদের দ্বারে উপস্থিত, আপনারা আমার কামনা পূর্ণ করুন।" কি প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশবাসীদের প্রতি প্রীতির নিদর্শন!

আবার যখন সাম্রাজ্যবাদিত্বের ও ধনতান্ত্রিকতার মোহে আচ্ছন্ন, বিলাতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ইঁহাকে আখ্যা দিয়াছিলেন — Half necked seditious Fakir'—"অর্দ্ধনগ্ন ফকির;" তখন তিনি ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"হে আমার প্রিয়বন্ধু! ফকির হইতে আমি বহু দিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু নগ্ন হওয়াও আরও কঠিন ব্যাপার, আপনি আমাকে এই আখ্যা দিয়া প্রকারান্তরে আমার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধিই করিয়াছেন। হে বন্ধু! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন ও কাজে নিযুক্ত করিয়া আমাকে দেশের সেবা করিবার সুযোগ দিন!" কি নিরভিমান ও দীনতার পরিচয়! মনে হয়, যেন নিকৃষ্ট অহংটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবার পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দেয় যখন তাঁহারা দেখে, ছলনকারী এই বৈজ্ঞানিক যুগে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁহার অহিংসার সংগ্রামের রীতি!—"হে বৃটিশ বন্ধু! তোমরা স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ কর, স্বাধীনতায় জন্মগত অধিকার হইতে আমাদের বঞ্চিত না করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভ্রাতৃত্ব ও মিত্রতার মধুর মিলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, নচেৎ সত্যাগ্রহ বা আমরণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন আহুতি দিব।"

আবার সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়, কারণ, ইতিহাসে কি পুরাণে সংগ্রামের যাহা আছে পরিচয় তাহার মধ্যে আছে ধ্বংস বা নিষ্ঠুরতা, এমন কি কুরুক্ষেত্র প্রমুখ ন্যায় ও ধর্ম্মযুদ্ধেও আছে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, কিন্তু স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক এই মহান্ পুরুষের অদ্ভুত সংগ্রামে নাহি হিংসা নাহি নিষ্ঠুরতা—ইহাই বিশ্বে তাঁহার একটি অভিনব দান।

জন্মভূমির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া শাক্যসিংহের ন্যায় ভোগৈশ্বর্য্যের চরম অধিকারী হইয়াও অনিত্য ভোগ তুচ্ছ জ্ঞানে, সমাজের নিকৃষ্ট স্তরের জীবিকাবলম্বীদের ন্যায় জীবন যাপন পূর্ব্বক একাত্মবোধে আচণ্ডাল দুঃস্থের সেবা করিয়া দেখাইলেন তিনি হরিজনে প্রেম এবং তাঁহার আদর্শ বিশ্বের মাঝে প্রতিপন্ন করাইল যে সত্যই তিনি এক জন মহাত্মা।

আধ্যাত্মিক গগনের ভাস্কর স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—**Lord Sri Ramkrishna can do create thousands of Swami Vivekanda from the particles of dust"** যে "শ্রীরামকৃষ্ণ ধূলিকণার মধ্য থেকে সহস্র সহস্র স্বামী বিবেকানন্দ সৃষ্টি করিতে পারেন, সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন তাঁহার অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"দেখ, যেখানে দেখবি দশ জনে গণে মানে সেখানে জানবি মা জগদম্বার প্রকাশ—তিনিই প্রকাশিতা হইয়াছেন"—যিনি সময়ান্তরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "মা বলেছে, মা ও আমি এক" (যেমন **Lord Gesus** বলিয়াছিলেন, **"I and my Father in Heaven are one"** 'আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতা একই বস্তু।" আবার গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যেমন বলিয়াছিলেন, "যদ্ যদ্বি ভূতি মৎ সত্ত্বং···'

যেখানেই শক্তির বিকাশ সেখানেই আমার সত্তা বর্ত্তমান···

তাই আজ ভারতমাতার শীর্ণ দুর্ব্বল এই সন্তানটির মধ্যে বিশ্ব দেখিল, অমিত বিক্রম ও সেই মহাশক্তির খেলা।

মহাকালের বিধানে—নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়া দেহীতে মিলিল, কিন্তু বিশ্বে রহিল অমর কীর্ত্তিসম্পন্ন পুণ্য আদর্শ আর রহিয়া গেল সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি-নির্ব্বাণের জলন্ত আদর্শ;—যমুনা-তীরে আত্মাহুতির সেই লেলিহান চিতানল শিখায়—রচনায় এক ভবিষ্যৎ অখণ্ড ভারত।

হে মহান্ আদর্শবাদী হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ বিশ্বের প্রেমিক, ভারতের স্বাধীনতার ওহে অগ্রদূত! তোমার চরণে আজ কোটি নমস্কার!

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!
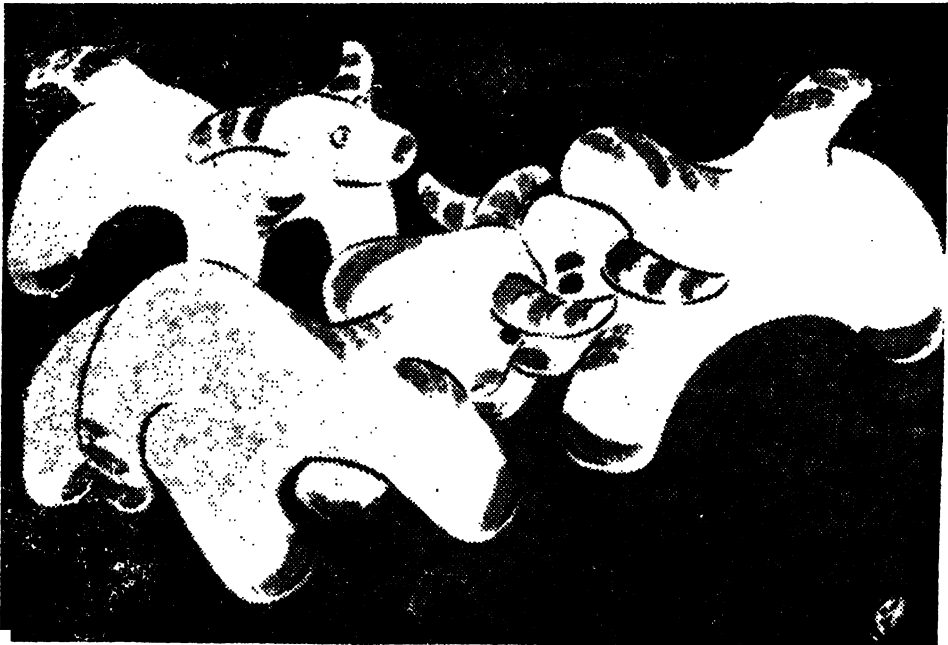
ক্ষীরের পুতুল —প্রাণকৃষ্ণ পাল

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

অর্থনৈতিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শব্দটির ব্যবহার যেমন বেসুর তেমন বেমানান; বাস্তব পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া নিছক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। জগতের অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন সমস্ত দেশগুলিই জাতীয়তাবাদী। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এবং উহা বৃদ্ধি করিবার মানসে প্রতিবেশীর ক্ষতি করিতে কোন রাষ্ট্রই ভ্রূক্ষেপ করে না। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত যখন বাধে, দেখা দেয় যুদ্ধ; স্থানীয় বা দেশীয় সমরই অগৌণে পরিণত হয় বিশ্ব-সমরে। আত্মোদ্ধারের পরিবর্তে তাই তারা দেয় আত্মবিসর্জন। যুদ্ধান্তে শত্রু-মিত্র সকল দেশগুলি হয় প্রায়ই ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, পঙ্গু। পূর্ব্বেকার বৈভব ও ঐশ্বর্য্য হারাইয়া রাষ্ট্রগুলি সাময়িক ভাবে মিশিতে চায় প্রতিবেশিরূপে; সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নয়।

যুদ্ধান্তে এই সকল দেশগুলির মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা যায়; যুদ্ধ-পূর্ব্বে যদি তাহার শতাংশের একাংশও পরিলক্ষিত হইত তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় ত আর থাকিত না। আর দেশে দেশে এই অবিশ্বাস, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই আন্তর্জ্জাতিক কোন প্রচেষ্টাই শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে দুর্ব্বল দেশগুলি যখন একটু সবল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত পশুটা জাগিয়া উঠে। আত্মস্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দেয় বিশ্ব-স্বার্থকে। এই তো আন্তর্জ্জাতীয়তাবাদের ধারা!

১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামিবার পর দেখা গেল শুধু হিটলার-পরিচালিত জার্ম্মাণী নয়, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ভিন্ন সমস্ত জয়ী ও বিজিত দেশগুলিই যুদ্ধের বোঝা বহন করিতে সক্ষম হয় নাই! ধনে-জনে তাহারা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপে ও এশিয়াখণ্ডে এমন কোন দেশ নাই যে গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে, যুদ্ধের চাপ সহ্য করিয়াও সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর ৪৪টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের "বৃটন উড্‌সে" ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বে সমবেত হয়। কেবল মাত্র রাশিয়া এই সম্মেলনে হাত মিলায় নাই। এই সভায় দুইটি সমাজ-শিশুর উদ্ভব হয়। উত্তর কালে ইহারাই আমাদের কাছে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ব্যাঙ্করূপে পরিচিত।

গত এক শতাব্দী কালের ভিতর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ধারা অনেকাংশে বদলাইয়াছে। মুক্ত, অবাধ বাণিজ্য অনেক কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তদুপরি পাঁচ বছরের যুদ্ধের পেষণে পেষণে অপ্রশস্ত বাণিজ্য-পথ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্য-জাহাজের অপ্রতুলতা ও বৈদেশিক অর্থ-বিনিময়ের বাধা-নিষেধ। সর্ব্বোপরি পণ্যদ্রব্যের অভাবের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বর্ত্তমানে আর তার সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয় না। ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের পেষণে উহা এক নির্দ্দিষ্ট ধারায় চালিত হইতেছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত দেশগুলির মধ্যেই বিদেশীয় বাণিজ্য চলিতে থাকে; যেমন বৃটেন ও তাহার উপনিবেশগুলির মধ্যে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিধি-নিষেধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে দিন দিন ক্ষীণকায় করিয়া ফেলিতেছে। মুদ্রা-বিনিময়ের পথ হইতে বাধা-নিষেধগুলি যথাসম্ভব সরাইয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যকে বহুমুখী করিয়া তোলাই আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য।

প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ক্ষেত্রের প্রসারতার জন্য অর্থভাণ্ডারে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে সভ্যবৃন্দ প্রয়োজন বোধে যথাসম্ভব দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য-তালিকাভুক্ত হইতে হইলে প্রত্যেক সভ্যকে ভাণ্ডারে তাহার নিজের দেশীয় মুদ্রা ও সোণার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে হয়। ঐ চাঁদার মধ্যে সোণার পরিমাণ হইবে মোট চাঁদার শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ অথবা দেশীয় সোণা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় সঞ্চিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র। এই দুইয়ের যে হিসাবে দেয় সোণার পরিমাণ কম হইবে উহাই সাধারণত ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ ভাণ্ডারে ৪০ কোটি ডলার মুদ্রা জমা দেয় এবং এই টাকা ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ্চের মধ্যেই দিতে হইয়াছিল। এই চাঁদার কতক অংশ ছিল সোণায়, কতক ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রায় আর অবশিষ্ট অংশ ছিল সুদবিহীন কোম্পানীর কাগজে। ভাণ্ডারের নিয়মানুযায়ী প্রয়োজন-বোধে এই চাঁদার হার বাড়ান বা কমান যাইবে। সত্য সত্যই কোন দেশের পক্ষে চাঁদার হার বৃদ্ধি বা হ্রাস করা উচিত কি না তাহা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষই স্থির করিবেন। যুদ্ধের পর আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে হইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক সভ্যকে তাহার দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মূল্য সোণা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হয়। ভারতবর্ষও এই আমন্ত্রণে তাহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার আর একবার সুযোগ পায়। স্বভাবত সরকার ঐ সময় দেশের জনমত গ্রহণ করিয়া টাকার মূল্য ১ শিং ৬ পেন্স অথবা ১০০ ডলার প্রতি ৩৩০ শিং ৮৫২. টাকায় ধার্য্য করেন। এই বিনিময়-হার ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন।

এই প্রকারে যখন প্রত্যেক সভ্য দেশের নিকট হইতে তাহার দেয় চাঁদা আদায় হইয়া গেল, তখন ভাণ্ডারে তালিকাভুক্ত কোন দেশীয় মুদ্রারই আর অভাব থাকিল না। এমন অবস্থায় কোন একটি দেশ যদি অন্য আর একটি দেশীয় মুদ্রার অনটন বোধ করে তখন উপযুক্ত পরিমাণ নিজের দেশীয় মুদ্রা ভাণ্ডারে জমা দিয়া বিনিময়ে ঐ দেশ তাহার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করিতে পারে। তাই বলিয়া কোনও সভ্য ক্রমাগত ভাণ্ডার হইতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং কোন ক্রমেই কোন দেশ ৫ বছরের বেশী এই প্রকারের ঋণ ভাণ্ডার হইতে পাইতে পারিবে না।

অপর পক্ষে যদি কোনও দেশ তাহার দেশজাত পণ্য দ্রব্য কেবল রপ্তানী করিয়া চলিতে থাকে কিন্তু অন্য দেশজাত দ্রব্য আমদানী করিতে নারাজ হয়, তখন সেই দেশের মুদ্রার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভাণ্ডারের পরিচালকমণ্ডলী এই দেশীয় মুদ্রাকে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রারূপে ঘোষণা করিবেন এবং ইহার যথোপযুক্ত বণ্টনে মনোনিবেশ করিবেন। প্রয়োজন বোধে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার

সরবরাহ বন্ধ করা হইবে। ফলে ঐ দেশ হইতে বিভিন্ন দেশে আমদানীর পরিমাপ হ্রাস পাইতে থাকিবে। কেন না, আমদানীর উপযুক্ত অর্থ যোগাইবার ক্ষমতা বিভিন্ন দেশগুলির সেই অবস্থায় আর থাকিবে না।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, বর্ত্তমানের অস্বাভাবিক অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি যখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ গতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে তখন বর্ত্তমানের বিধি ব্যবস্থা, মুদ্রা বিনিময়-হার প্রভৃতি আপনা হইতেই অকেজো হইয়া পড়িবে কি না? সেই আশঙ্কায় অর্থ-ভাণ্ডারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অনুন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারে; আবার এমনও হইতে পারে যে, যে দেশগুলি আজ অর্থ নৈতিক ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাদের পক্ষে সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইয়া উঠিবে। ভাণ্ডারের নিয়মানুযায়ী এমতা-বস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ বিনিময়-হারের অদল-বদল করিতে নারাজ হইবেন না। তবে এই সকল ক্ষেত্রে বিবেচনা করিতে হইবে, সত্যই সত্যই বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় কি না? রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত যদি কোন দেশ তাহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিতে সচেষ্ট হয়, তবে সে আবেদন ভাণ্ডার কর্ত্তৃক গ্রাহ্য করা হইবে না।

ক্রমাগত অর্থ নৈতিক সঙ্কটের চাপে অথবা অন্য কোন কারণে যদি কোন দেশ বিদেশীর কাছে দেনাদার হইয়া পড়িতে থাকে, তখনই তাহার মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব ভাণ্ডার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, অন্যথায় নয়। আর এইখানেই আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য। এত কাল আমরা নিজের দেশ, নিজের অর্থ, নিজের স্বার্থ ষোল কলায় বজায় রাখিতেই ব্যস্ত ছিলাম। আজ আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সহিত প্রত্যেক দেশের একটা অদৃশ্য অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ যেন সমসূত্রে গাঁথা চাকার সমষ্টি। অন্যটাকে না ঘুরাইয়া একটাকে চালু করা যায় না! সেই জন্য বৈদেশিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেশীয় কোন একটা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা চলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রগতি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। যত দিন স্বর্ণমান পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল, তত দিন দেশীয় ও বিদেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার উহার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইত—পৃথক্ ভাবে অন্য কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। স্বর্ণমান মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা আজ আর আমাদের নাই। আমদানী শুল্ক, অল্প মূল্যে বিদেশীয় বাজারে মাল বিক্রয়, মুদ্রা-বিনিময়ের নানাবিধ বাধা-নিষেধ প্রভৃতির আক্রমণে স্বর্ণমান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জাতীয়তাবাদের টানা-পড়েনে আন্তর্জ্জাতিক সকল প্রকার সাধুতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমসাময়িক কালের অর্থভাণ্ডার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যেন সাধুতার পিছু ডাক।

সে যাহা হউক, সংক্ষেপে বলা চলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রধানতঃ দুইটি সংকল্প লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বিভিন্ন সভ্য দেশগুলির মুদ্রার হার নির্দ্ধারণ করিয়া বৈদেশিক বিনিময় ক্ষেত্রের সমতা রক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ, সেই সূত্রে কোনও দেশে বিদেশী মুদ্রার সাময়িক ঘাটতি দেখা দিলে তাহার পূরণ করা। মনে রাখিতে হইবে, দেনাদার দেশগুলি অর্থভাণ্ডার হইতে এই প্রকারের সাহচর্য্য চিরস্থায়ী ভাবে পাইবার আশা করিতে পারে না। সুতরাং সমস্যার সমাধান ষোল আনা হইল না। যুদ্ধের পরিণামে আজ আমরা দেখিতেছি, আমাদের চতুর্দ্দিকে কেবল অভাব আর অনটন। এই অভাব মিটাইতে হইলে চাই অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা—চাই অগণিত অর্থ, যাহার একক ব্যবস্থা করা ইউরোপ ও এশিয়াখণ্ডের কোন দেশের পক্ষেই বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। এই দিক্ দিয়া যাহাতে কিছুটা সুরাহা হয়, যাহাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি আর্থিক সাহায্য লইয়া তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা আবার সজীব করিয়া তুলিতে পারে, সেই আশায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের গোড়া পত্তন হইয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বিনা কলকারখানা প্রভৃতির বড় রকমের শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা যায় না। এই প্রকারের ব্যবসায়ে যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যোগান দেওয়া কষ্টসাধ্য। তদুপরি আছে সুদের হার। উচ্চ হারে ঋণ গ্রহণ করিলে ব্যবসায়কে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে বেগ পাইতে হয়। দেনা পরিশোধ করাও সময়সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। যাহাতে সভ্য দেশগুলি ন্যায্য সুদে ঋণ পাইতে পারে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক তাহার জন্য যত্নবান।

১৯৪৬ সনের ২৫শে জুন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের বিলিকৃত মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ ইতিমধ্যে প্রত্যেক সভ্যকে জমা দিয়া দিতে হইয়াছে। বাকী শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ তাগিদ অনুযায়ী দিতে হইবে। ১৯৪৭ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্কের যে ত্রৈমাসিক বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইয়াছে ৮২২,৫১,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৭১৪,২৮,৩০,০০০ ভারতীয় মুদ্রা। এই মূলধন হইতে ব্যাঙ্ক ফরাসী দেশকে ২৫ কোটি ডলার ঋণ দিয়াছে, ওলন্দাজেরা পাইয়াছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এই ঋণলব্ধ টাকা কাপড়ের কল, রেল ইঞ্জিন, মটর গাড়ী, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে—যাহাতে উহা দ্বারা ঐ সকল দেশের যান-বাহন, শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক ডেনমার্ক ও লাক্সেমবার্গকে যথাক্রমে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ও ১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে। কিন্তু জগতে অর্থের আজ যে চাহিদা তাহা মিটাইবার পক্ষে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কোথায়? ফরাসী দেশ ধার চাহিয়াছিল ৫০ কোটি ডলার। ওলন্দাজরা আবেদন করিয়াছিল ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের জন্য। ব্যাঙ্কের পক্ষে এই দেশগুলির আবেদন সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তদুপরি ব্যাঙ্কের দ্বারে বর্ত্তমানে আবেদনকারীর দল যে ভীড় করিয়া আছে—যথা, চিলি ৪৩ কোটি ডলারের জন্য, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩৫ কোটি ডলার, ইরাণ ২৫ কোটি ডলার, পোল্যাণ্ড ৬০ কোটি ডলার, ম্যাক্সিকো ২০ কোটি ডলার ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাতে প্রার্থীদের মনোরঞ্জন করা ব্যাঙ্কের পক্ষে কতটা সম্ভবপর হইবে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। তবুও ত আজ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ককে কাণা আদমীর ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। সুতরাং অধিকতর অর্থের সমাগমের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় কেন্দ্রে বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই

ধরণের অর্থ সংগ্রহের পথে দুই প্রকারের অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ককে জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে সময় লাগিয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র গচ্ছিত রাখিয়া বাজারে প্রয়োজন বোধে মালিকগণ যৌথ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে অনায়াসে টাকা ধার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও সহজ ছিল না। উভয় দিকেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২৫ কোটি ডলার মূল্যের ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, সুইজারল্যাণ্ডেও এই প্রকারের ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ জন্‌ মেকলয় চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রধান বাধা বিভিন্ন দেশের সুদের তারতম্য। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্ক যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে তাহার সুদের হার শতকরা ৩ ডলার, সুইজারল্যাণ্ডে সুদের হার সাধারণতঃ শতকরা ৩ হইতে সাড়ে তিন ফ্রাঙ্ক। ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সভ্য দেশগুলিকে যে অর্থ ধার দিয়া থাকে তাহার উপর শতকরা সোয়া ৩ ডলার হিসাবে সুদ পাইয়া থাকে; তদুপরি আছে শতকরা দেড় ডলার হিসাবে কমিশন। শতকরা সাড়ে ৩ ডলার হিসাবে টাকা সংগ্রহ করিয়া শতকরা সোয়া ৩ ডলার হিসাবে সেই টাকা খাটাইলে অবিলম্বে ব্যাঙ্ককে লালবাতি জ্বালাইতে হইবে। অধিকন্তু, পৃথিবীর একাধিক দেশে, যথা যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে সুদের হার শতকরা সোয়া ২ টাকা হইতে আড়াই টাকা মাত্র। এই সকল দেশের পক্ষে চড়া দামে টাকা কর্জ্জ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না। সুতরাং ইহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সাহচর্য্য পাইতে তেমন আগ্রহশীল হইতে পারিবে না।

তাই বলিয়া সুদের হার হ্রাস করাই একমাত্র সমস্যা নয়। সুদের হার হয়তো বা শতকরা ৩ ডলারে আনা যাইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ব্যাঙ্ককে ধার দিবার মত শক্তি আজ আর কি কোন দেশের আছে? আর যদিও বা যুক্তরাষ্ট্র টাকা ধার দিতে রাজী হয় তবুও কি আন্তর্জ্জাতিক অর্থসমস্যা সহজ হইয়া যাইবে? যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ আজ পৃথিবী চায় না, চায় উহারা তাহার উৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভার। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিয়া সভ্যদেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রেই উহা ব্যয় করিতে হইবে। প্রথম কয়েক বৎসর এই ব্যবস্থা মন্দ হইবে না। পরবর্ত্তী কালে যখন বিভিন্ন দেশগুলির উৎপাদন শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তখন তাহার পাওনা টাকার বদলে কিছু কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বিভিন্ন দেনাদারদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে রাজী না হয় তবে আর এক নূতন সমস্যা দেখা দিবে। দেনাদার দেশগুলির পক্ষে তখন তাদের ঋণ শোধ করাই একরূপ কঠিন হইয়া উঠিবে; আর সেই সমস্যাই যেন দিনে দিনে ঘনাইয়া আসিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার সাময়িক ভাবে এক দেশীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য দেশীয় মুদ্রার সরবরাহ করিতে পারে, ব্যাঙ্ক সংগঠন ও পুনর্গঠনের জন্য অল্প পরিমাণে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু কি ভাবে এই প্রকারের ঋণ শেষ পর্য্যন্ত পরিশোধিত হইবে, তাহার কোন পরিকল্পনা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঋণ পরিশোধ করার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা না থাকার জন্য আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক তাহাদের সকল প্রকার অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও অনেকাংশে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আশঙ্কা হয়, এই দুর্ব্বলতার জন্যই হয়তো এক দিন এই প্রতিষ্ঠান দুইটি তাহাদের কার্য্যকারিতা হারাইয়া ফেলিবে।

সমস্যাটি মোটেই জটিল নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অর্থ কর্জ্জ দিতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে সে এ-ও চায়, যেন এই অর্থ তাহার দ্রব্য ক্রয় করিতে তাঁহারই দেশে ব্যয়িত হয়। দেনাদারদের নিকট হইতে কোন কিছুই আমদানী করিতে সে ইচ্ছুক নহে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহচর্য্যে গড়িয়া তোলা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আর তাই যদি না হয়, তবে শুধু বাগাড়ম্বরের সার্থকতা কোথায়? তীব্র জাতীয়তাবাদই যদি আমাদের মজ্জাগত বৃত্তি হয়, তবে আন্তর্জ্জাতীয়তাবাদকে শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, সভা-সমিতিতে আর কত দিন বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে?

১৯৪৭ সনের ১লা মার্চ্চ হইতে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারে টাকা গ্রহণ-পর্ব্ব আরম্ভ হয়। বছর খানেক যাইতে না যাইতেই জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জ্জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় ফরাসী দেশকে উপলক্ষ করিয়া। বিধ্বস্ত ইউরোপখণ্ডে ফরাসী দেশ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যেমন শতধা বিখণ্ডিত হয় তেমন আর কোনও দেশ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী দেশীয় মুদ্রা ফ্রাঙ্কের বিনিময়-মূল্য ছিল ষ্টার্লিং প্রতি ১৭৬ ফ্রাঙ্ক। বর্ত্তমান বছরের প্রথম দিকে উহাই দাঁড়ায় ৪৮০ ফ্রাঙ্কে। ফরাসী দেশ নিজের রপ্তানী-শিল্পের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার জন্য তাহার দেশীয় মুদ্রার মান ৮৬৪ ফ্রাঙ্কে স্থিরীকৃত করিতে প্রয়াসী হয় এবং আইন প্রণয়ন করিয়া উহাই কার্য্যকরী করিয়া লয়।

ফরাসী দেশের এই কার্য্যাবলী আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার সুনজরে দেখে নাই। ভাণ্ডারের মতে ফরাসী দেশের এই প্রচেষ্টাকে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কতটা সহায়তা করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। অপর পক্ষে উহা দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামান বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা ভয়াবহ। ফরাসী দেশ যেমন তাহার মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হার হ্রাস করিবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিও প্রয়োজন বোধে তাহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাস করিতে ক্ষান্ত হইবে না। ফলে মুদ্রা-বিনিময় হার হ্রাসের এক তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে। অন্তবর্ত্তী কালে একাধিক দেশের বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হইবে। ফরাসী সরকার কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহার পরামর্শও সে গ্রহণ করে নাই। আত্মস্বার্থের বিনিময়ে বিশ্ব-স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সে যত্নবান হয় নাই। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জ্জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বে জাতীয়তাবাদই চিরাচরিত প্রথায় জয়ী হইল। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ অবস্থা বেগতিক দেখিয়া নিঃশব্দে গা-ঢাকা দিলেন।

প্রদোষ না প্রত্যুষ ?

(বিশেষ পুরস্কার) —বাসন্তী সরকার

এই ছবির নিচে নাম না থাকার একমাত্র প্রতিকার হিসাবে স্থির করেছি যে, এই অজ্ঞাতনামাদের নাম আমরা প্রকাশ করতে চাই। ছবি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনি উক্ত দলের এক জন হয়েছেন দেখেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাদের জানালেই আমরা এর প্রতিকার করব।

৩। ৬"×৮" ইঞ্চি মাপের ছবি পাঠালে আমাদের সুবিধা হয়।

৪। ছবিতে যেন কোন নাম না থাকে, অর্থাৎ ছবির নাম আমরাই দিয়ে থাকি। অবশ্য, কোন বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীদের নাম হলে নিশ্চয়ই জানাবেন।

৫। প্রকৃতি ও সমাজের সাম্প্রতিক বিষয়ের ছবি হলে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে ছবি কোথাও প্রকাশিত হয়ে গেছে তা যেন আর পাঠাবেন না। আলোকচিত্র সম্বন্ধে ভাল রচনা সাদরে গৃহীত হবে। এই বিষয়ে আমরা আমাদের দেশের আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান বা 'ষ্টুডিও' যাদের আছে তাঁদের সহযোগিতা চাই।

আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী —নলিন দেব

আজকে মোরা রাজার রাজা

আলোকচিত্র সম্বন্ধে :—আমাদের বাঙলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন বাঙলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি যাতে মাসিক বসুমতীর মত আলোকচিত্রের দেখা মিলেছে। বসুমতীই একমাত্র আমাদের চোখের সামনে হাজির করে দিয়েছে আমাদের দেশের সমাজের নানান দিক্‌-বিদিক্‌— পরশমণির মত যার অনুসন্ধানে হাতড়ে ফিরলেও সহজে তা ধরা পড়বে না চোখে। কিন্তু আমাদের দেশের এই কাগজ, কালি আর ছাপা-বিভ্রাটের দুর্য্যোগ বহন করেও একমাত্র মাসিক বসুমতীই বাঙলার পাঠক-[illegible] কাছে এগিয়ে দিয়েছে বাঙলা দেশকে। মাফ করবেন, [illegible] খাওয়ার জন্ত নয়, চোখ তুলে যাতে আপনারা যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করেন। সত্যিই, মাসিক বসুমতীর পাঠক-সম্প্রদায় (ছায়ে পাঠিকা কম) এ বিষয়ে আমাদের যে উৎসাহ [illegible] সহযোগিতায় কৃতার্থ করেছেন তা আর ভাষায় প্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই। প্রতি মাসেই আমরা সকলেই তার নমুনা দেখছি স্বচক্ষে।

কি তাল বলুন তো ?

[উত্তর ৬২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় পুরস্কার) —অরুণ রায়

আমাদের এই অভিনব প্রচেষ্টায় আমরা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চাই। যেগুলি আপনাদের স্মরণীয় কর্তব্য।

যথা :—

১। এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিই ছবি হয়। অর্থাৎ এমন ছবি আমাদের দপ্তরে আসে যা চোখের পক্ষেই পীড়াদায়ক। দেখলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়। তাই আমরা জানাই, এমন ছবি পাঠাবেন তা যেন সত্যিকার ছবি হয়। তা দেখে যেন সকলের চোখ ও মন পরিতৃপ্ত হয়—এই কথা।

২। ছবি পাঠাবার সময় ছবির পিছনে যদি আপনার নাম না দেন তা হ'লে আর কথাই নেই। আপনার ছবি অনাথ শিশুর মত আমাদের 'বিবেচনাধীন' ফাইলে পড়ে অরণ্য-রোদন করতে থাকবে। তার পর যদি আমাদের এই ধরণের কোন একটি ছবি সত্যিই ভাল লাগে সেগুলি অজ্ঞাতনামা নাম দিয়ে এক দিন প্রকাশ করে দেব।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি —শান্তিপ্রসাদ রায়
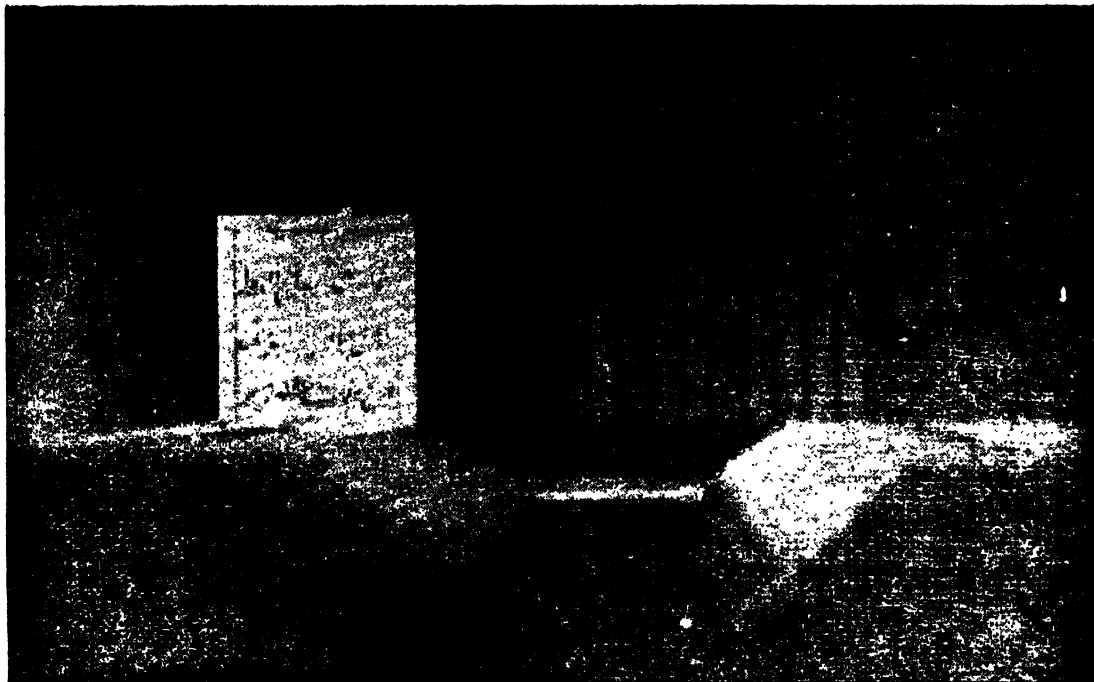
স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার (প্রথম পুরস্কার) —কালিদাস মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্নৌ ষ্টেশন —রীণা দাসগুপ্তা
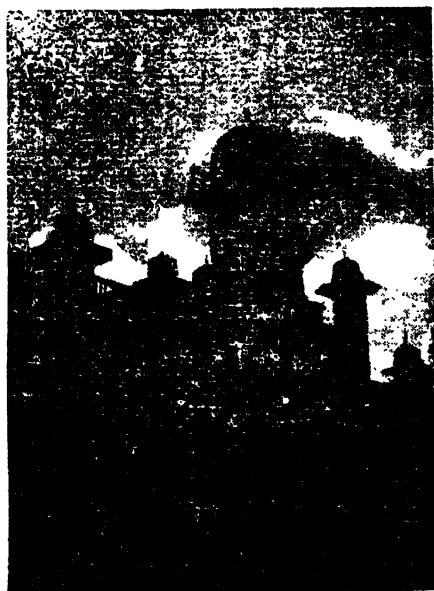
আজাদীর পরে

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

দেশের লোক আজাদী পাইয়াছে।

গাবতলী গাঁয়ের মাতব্বরগণ জহুরের নমাজ সারিয়া রঙিন চেকের লুঙ্গী, মার্কিণের পিরাণ, মাথায় টুপী, কাঁধে গামছা ও বগলে লাঠি লইয়া চিকনাই নদীর ধারে বড় মাঠে যাইতেছে। সেখানে পাঁচখানা গাঁয়ের পরামাণিকরা আসিবে, দরবার বসিবে। ছোট দারোগা সাহেব কচু মিয়া দরবারে বক্তৃতা করিবেন। কোম্পানী বাহাদুর নিজের মুলুকে চলিয়া গেলেন, দেশের লোক আজাদী পাইল, এই কথা কাগজে লিখিয়া ঘোষণা করিবেন। খালি মুখের কথা নয়—আট আনার ষ্ট্যাম্প-মারা কাগজে লিখিয়া সকলকে শুনাইয়া দিবেন। বিড়ি টানিতে টানিতে, গল্প করিতে করিতে মাতব্বররা চিকনাই নদীর ধারে বড় মাঠের দিকে চলিয়াছে।

গাঁয়ের পথ, চিকনাই নদীর দিকে যাইতে যেখানে পাকুড় গাছটার বাঁয়ে বাঁকিয়াছে, তাহার কাছে খোঁড়া ইদুর বাড়ী। লোকে তাহাকে ল্যাংড়া ইদু বলে। তাহার নাম ইদু মৃধা, আগে লোকে বলিত ইদু সরদার, এখন খাতির করিয়া ইদু পরামাণিক বলে। বয়েস হইয়াছে, বিঘা পনের-ষোল জমি আছে, বাড়ীতে গোয়াল লইয়া সাড়ে তিনখানা ঘর, একখানা মহিষের গাড়ী খাটে; একখানা ডিঙ্গি নৌকা, খান দুই জাল আছে। পরামাণিক বলিলেও বলা যায়, একেবারে তুচ্ছ করবার মত মানুষ নহে। তার পর ছেলে এরফানের রোজগার হইতেও কিছু পায়।

তুচ্ছ করিবার মত মানুষ মোটেই নয়। এক কালে তাহার মত দুর্দান্ত লোক গাবতলী গাঁয়ে দুইটি ছিল না। যেমন জোয়ান, তেমনি দাঙ্গাবাজ, তেমনি মামলাবাজ। সেকালে যখন পাটের বাজার গরম ছিল হাটে, প্রথম ক্ষেপ পাট বিক্রয়ের টাকা হাতে আসিতেই ইদুর মাথা গরম হইয়া উঠিত। লোকে সন্ত্রস্ত হইয়া ভাবিত, ইদু এই বুঝি কাহার মাথা ফাটায়, নয় বৌ বাহির করে! ফৌজদারী করিয়া, দেওয়ানী করিয়া বিঘা ত্রিশ-চল্লিশ জমি দারোগা, চৌকিদার, উকিল, মোক্তারের পেটে দিয়াছে। জোত-জমি খুইয়া, খোঁড়া হইয়া তাহার দাপট গিয়াছে। তবু মরা হাতী লাখ টাকা। ল্যাংড়া যখন ক্ষেপিয়া উঠে, ইদু সরদারের কীর্ত্তি-কলাপ যাহারা জানে তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়।

উঠানের বাঁ-দিকে গাব গাছতলাটাতে একটা ভাঙ্গা বেতের মোড়ায় বসিয়া ইদু তামাক খাইতেছিল। গায়ে পিরাণ, মাথায় টুপী কাঁধে গামছা লইয়া ইদু দরবারে যাইবার জন্য প্রস্তুত। বাঁ-পাটা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া গিয়াছে, চলিতে লাঠি দরকার হয়। মোটা বাঁশের লাঠিখানা মোড়ার পাশে মাটিতে রাখিয়াছে।

এ পথে গাবতলীর মাঠে যাইতে ইদুকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। মাতব্বররা তাহা জানিত। একে একে ইদুর হুঁকায় একটা করিয়া টান দিয়া তাহারা পথ চলিতে লাগিল। ইদুও লাঠি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহাদের পিছনে চলিল।

গাবতলীর মাঠে নিশান উড়াইয়া দিয়া ছোট দারোগা ঘোষণা করিল—কোম্পানী বাহাদুর চলিয়া গেল, মোছলমান ভাই সব আজাদী পাইয়াছে। আজ হইতে মুলুকে পাকিস্তান কায়েম হইল। আল্লা হো আকবর!

ষ্ট্যাম্প-মারা কাগজ পড়া হইল না, মাতব্বরদের মন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। তবে ছোট দারোগার মুখের জবান কোম্পানীর আইনের সমান বলা যায়। মন হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সকলের সঙ্গে গলা মিলাইয়া ধ্বনি দিল—আল্লা হো আকবর!

কচু মিয়া মাতব্বরদের আদাব জানাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া থানায় চলিয়া গেল। দশ মাইল দূরে মিঠনপুরের বাজার লুঠ হইয়াছে থানায় খবর আসিয়াছে। আজাদী এক রাতের বাসি হইতে-না-হইতে লুঠ-তরাজ সুরু করিয়া দিল বেটারা! যাহা করিবার থানায় একটু জানাইয়া কর না বাপু, মিছা দৌড়-ঝাঁপ করিতে হয় না। কচু মিয়া জোরে ঘোড়া চালাইয়া চলিয়া গেল।

দরবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। লাঠি ভর দিয়া ইদু পরামাণিক যে বাঁশের মাচানের উপর হইতে কচু মিয়া ঘোষণা করিয়াছিল তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ডাকিয়া বলিল:

—ভাই সব, তোমরা ঘরে যাতিছ, যাবার আগুই আমার দুইড্যা বাত হোনো। দারোগা ছাহেব জানাল্যান—মোছলমান ভাই সব আদাজি পাইয়াছে। আদাজি পাইছে মানে কি বুঝল্যা পরামাণিকের ব্যাটারা? মানে হইলো—কোম্পানী লাল বাত্তি জ্বালাইলো, মোছলমানরা আবার বাদশাই পাইলো। মানে হইলো—মুলুকের তামাম জিনিসে মোছলমান হক্‌দার হইলো। ভদ্দরলোকের, মানে বাবুগোর বেবাক সম্পত্তি মোছলমানের হিস্তায় আইলো। মানে বুঝল্যান? মানে—দুনিয়া উল্‌ট্যা গ্যালো। মোছলমান আদাজি পাইলো, আজ থেনে মোছলমান ভাই-ভাই, কাজিয়া-ফ্যাসাদ সব আপোষ হয়্যা গ্যালো। কাজিয়া-ফ্যাসাদ করতি চাও তার জন্য ভেন্ন মানুষ আছে, মোছলমান ভাই-ভাই। এবার মানে বুঝল্যান?

আল্লা হো আকবর ধ্বনির মধ্যে ইদু পরামাণিক মাচান হইতে সাবধানে নামিয়া আসিল। মানে ইহার মধ্যেই কিছু কিছু বুঝিয়াছে সকলে, তাহাদের মুখ দেখিয়া জানা যাইতেছিল। কথার মত কথা একটা বলিয়াছে বটে ল্যাংড়া ইদু পরামাণিক। তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া মাতব্বররা এক গাল হাসিয়া, আদাব জানাইয়া বিদায় লইল।

দরবারে নিজের বক্তৃতায় ইদু নিজেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে গাব গাছতলায় ভাঙ্গা মোড়ায় বসিয়া হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে ও থুথু ফেলিতে লাগিল।

মোছলমান আদাজি পাইয়াছে, মোছলমান ভাই-ভাই, মোছলমানের মধ্যে সব আপোষ! এঃ, কলিজার মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া উঠিতেছে! মোছলমানের মধ্যে সব আপোষ, সব আপোষ! ইদু পরামাণিকের কলিজা ভাবে, আবেগে ফাটিয়া যাইবার মত হইল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চোখের জল মুছিয়া হুঁকায় টান দিয়া দেখে কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া ইদু পরামাণিক ধীরে ধীরে টানিতে লাগিল।

হঠাৎ টুপ করিয়া একটা পাকা গাব গাছ হইতে তাহার মাথায় পড়িল। কাকে ঠোকরাইয়া খাইতেছিল, জোরে ঠোকর লাগিয়া পড়িয়া গেল। এই ভাবে বঞ্চিত হইয়া কাকটি গলা বাড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নীচের দিকে চাহিতে লাগিল।

পাকা গাব মাথায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইদু পরামাণিকের বুদ্ধি খুলিয়া গেল।

কচু মিয়ার আগে থানায় ছোট দারোগা ছিল এক জন হিন্দু! তাহার মুসলমান সাহসের নিকায় বৌকে আজ প্রায় আট মাস হই ইদু পরামাণিক বাহির করিয়া আনিয়াছিল। সে ঠিক বাহির করে

নাই, স্ত্রীলোকটি নিজেই পলাইয়া আসিয়াছিল এরফানের সঙ্গে। এরফানের সঙ্গে আগে হইতে আলাপ ছিল। এরফান বলে, সহিস সাহেব ও তাহার থানার চৌকিদার, গঞ্জের দোকানদার—এই রকম সাত-আট জন ইয়ার-দোস্তকে খুশী রাখিতে রাখিতে সে নাজেহাল হইয়া এরফানের হাতে-পায়ে ধরিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তার পর হইতে তাহার বাড়ীতেই আছে। এখন এরফান হইয়াছে তাহার ধর্ম্ম-বেটা, ইদু নিজে তাহাকে নিকা করিবে স্থির করিয়াছে। এদিকে সহিস সাহেব দুই নম্বর ফৌজদারী রুজু করিয়া দিয়াছে—কুসলান ও ধর্ম্মনাশ। এক দফা শুনানী হইয়াছে, তার পর লম্বা দিন পড়িয়াছে। বাপ-বেটা দুজনকেই আসামী করিয়াছে, বড় লজ্জার কথা। এইবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এখন মুসলমান ভাই-ভাই, একটা আপোষ করিয়া ফেলা ভাল। মেয়েমানুষটিকে ফেরৎ দিতে হইবে।

ইদু পরামাণিক তাহার ছেলে এরফানকে ডাকিল।

এরফান আসিল। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস, পাতলা বাবু-বাবু চেহারা। এরফান চণ্ডী পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়াছে। তার পর নেউগীপুরের হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। গাবতলী গাঁয়ে তাহার মত লায়েক আর কেহ নাই।

হাল-চাষ ভাল না লাগায় এরফান ফেচুনগরে দর্জ্জির দোকান করিয়াছে। ফেচুনগরে থানা। গঞ্জ জায়গা, পয়সাওয়ালা ছোট-বড় ব্যবসাদার অনেক। এরফান দেখিয়াছে, কত রকমে তাহারা পয়সা কামায়। দেখিয়া-শুনিয়া এরফান চালাক হইয়াছে। লীগে যোগ দিয়া সে ফেচুনগর লীগ কমিটির খাজাঞ্চী হইয়াছে। লীগের নামে হিন্দু-মুসলমানের কাছে চাঁদা তোলে, ফণ্ডে টাকা জমায়। এখন তাহার বহু প্রতিপত্তি।

এরফানের চেহারা যেমন ভদ্র, মানুষ সে তেমনি ভদ্র। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি-ডাকাতি সে ঘৃণা করে, হিন্দুদের মত চালাকী করিয়া কাজ করা তাহার পছন্দসই উপায়। এই যেমন ফেচুনগরের কানাই কুণ্ডু। গলায় তুলসীর মালা, কপালে ফোঁটা, আট হাত কাপড় পরিয়া হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গলিয়া কথা বলে সকলের সঙ্গে। যাহার গলা কাটিবে স্থির করিয়াছে তাহাকেও ভাই রে—বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিবে। বলে, সকলের দুঃখে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু দিন-মজুরী করিয়া যে খায় সুদের একটা পয়সা বাকী থাকিলে হাসিতে হাসিতে কুণ্ডু তাহার পরনের নেংটিখানা খসাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিবে।

এরফান লীগ কমিটির খাজাঞ্চী ও কাজের মানুষ, কিন্তু অন্তরটি তাহার বড় নরম—কবির মত নরম। নেউগীপুরের হাইস্কুলে পড়িবার সময় বিনা মাহিনায় পড়িতে পাইবার দরবার করিবার জন্য বাবুদের বাড়ীতে যাইতে হইত। বাবুদের ছোট-ছোট মেয়েরা গাঁয়ের পথে চলিয়া বেড়াইত, বাড়ীর সম্মুখে খেলিত। ষোল বছরের বালক এরফানের কবির মত কোমল মন তাহাদের দেখিয়া কেমন করিত। গাঁয়ে ফিরিয়া চিকনাই নদীর ধারে বসিয়া সে নিজের মনে গজল গাইত। এই বয়সে অনেক গজল তাহার মুখস্থ।

সে সব অনেক দিনের কথা। সেই হইতে নিজ জাতির মেয়েদের উপর এরফানের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। নেউগী-পুরের কামার, কুমার, নমশূদ্র পাড়ার মধ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। ফেচুনগরে থাকিয়া এখন সে লায়েক হইয়াছে, বুঝে, কিসে কাজ হয়। বুঝাইয়া দিয়াছে চণ্ডী পণ্ডিতের নূতন বৈষ্ণবী। কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবী আর কোথায় বাবুদের বাড়ীর মেয়েছেলে। কবি এরফান সতৃষ্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ দেশের লোক আজাদী পাইয়া গেল। এরফানের কবি-প্রাণ উৎফুল্ল হইল।

বাপের ডাক শুনিয়া এরফান গাব গাছতলায় আসিল। পাকা গাবের ভিতরের শাদা নরম শাঁসের খানিকটা তাহার পিতার চুলের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। এরফান উপরের দিকে চাহিল। বঞ্চিত কাকটি এতক্ষণ নীচু ডালে নামিয়া গলা বাড়াইয়া ঘন ঘন গোল চক্ষু ঘুরাইতেছিল, আর বোধ হয় ভাবিতেছিল, খোঁড়ার মাথায় ঠোকর দিয়া শাঁসটুকু তুলিয়া লইবে কি না। এরফানকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে চক্ষুর নিমেষে সমর-কৌশল বদলাইয়া ভূপতিত, অর্দ্ধভক্ষিত পাকা গাবটি ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া অদূরবর্তী ঘরের চালের উপর বসিল।

ইদু পরামাণিক ছেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—তাহ বাঁজান, এক কামের কতা মনে আইছে। মোছলমান আজাজি পাইছে, এহন সব মোছলমান ভাই-ভাই। এই বাগে ছইছ সাহেবের কবিলাটারে ছাইড়্যা দিয়া আপোষ কইরা ফ্যালি। তুমি কি কও?

পুত্রের সম্মতি পাইয়া ইদু বলিল,—তয় আর দেরী লয়। তুমি ত এহন ফ্যাচুনগরে যাবা, ওডারে সাতে লিয়্যা যাও। ছইছ ছাহেবের হাতি ওডারে দিয়্যা কইও, আপনার মাল ফিরি দিল্যাম—নালিশ খারিজ কইর‍্যা ল্যান। সব মোছলমান এহন ভাই-ভাই।

পুত্রকে উপদেশ দিয়া ইদু অন্দরে অর্থাৎ পিছনের ঘরের দিকে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল সহিস সাহেবের ভূতপূর্ব্ব পত্নীকে তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইতে।

আদেশ শুনিয়া সহিস সাহেবের হতভাগিনী ভূতপূর্ব পত্নী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খোঁড়ার ভাল পা'খানা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বলিল, তাহাকে সে হারামজাদার কাছে পাঠাইলে সে মারিয়া ফেলিবে। এখানে ত গতর খাটাইতে কসুর করে না, তবে কেন তাহাকে ফেরৎ পাঠানো হইতেছে।

ইদু পরামাণিক গর্জন করিয়া তাহাকে ধমকাইতে লাগিল। বলিল,—হারামজাদি, যাবি লয় তয় কি তোর জন্যি বাপ-ব্যাটায় জেল খাটমু ?

স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিল যে তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে বাজারে গিয়া উঠিবে, দারোগা সাহেবের সহিসের ঘরে আর যাইবে না।

তাহার বাজারে যাইয়া উঠিবার কথা শুনিয়া ইদু একটু ব্যঙ্গ-হাস্য করিল। তার পর ছেলেকে ডাকিয়া আদেশ করিল—হারামজাদী বিটিরে চুলের ঝুঁটি ধইর‍্যা লিয়া যাও দেহি। হালী ছইস ছাহেবের কাছে যাবান না। আরে তুই না গেইলে আপোষ হবি ক্যামনে ? লিয়্যা যাও তো বিটির চুলের ঝুঁটি ধইর‍্যা টানতি টানতি।

স্ত্রীলোকটি ইদু পরামাণিকের পা ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল। যে তক্তপোষের উপর সে শুইত তাহার নীচে হইতে একটি রং-করা টিনের ছোট বাক্স টানিয়া বাহির করিল। বাঁশের আড়ায় একখানা ক্ষার-কাচা সাড়ী শুকাইতেছিল, সেখানা ভাঁজ করিয়া বাক্সে পুরিল। একখানা গামছা ছিল আড়ার এক পাশে, সেখানা ভাঁজ করিয়া বাক্সে পুরিল। তার পর বাক্সটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সাড়ী ও গামছা ইদু পরামাণিক দিয়াছিল। এই দুইটি জিনিষ বাক্সে পুরিবার সময় ইদু একবার ভাবিল উহা কাড়িয়া লইবে।

স্ত্রীলোকটি আবার হাঁকিয়া বসে এই ভয়ে নিরস্ত রহিল। ঘর হইতে সে উঠানে নামিয়া আসিল।

উঠানে নামিয়া ইদুর চিত্তের কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। ট্যাঁক হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া বলিল—টাহা দুইডা লেও দেহি। ভালো মানষের বিটির মত যাবা, বুঝল্যানি ?

এরফান প্রস্তুত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফেচুনগরের দিকে যাত্রা করিল। যাত্রার পূর্ব্বে পিতা তাহাকে একান্তে ডাকিয়া নিম্ন স্বরে উপদেশ দিল,—ভাহ বা'জান, মোছলমান আদাজি পাইছে। এহন থেনে আর মোছলমানের মাইয়ার তর লজ্জর দিবা না। সেডা গুনাহের কাম হবি। ফোসলাও, চুরি করো, কাইড়্যা ন্যাও—আরো কত মাইয়া রইছে। তুমি মোর লায়েক ব্যাটা, তোমারে আর কমু কি। বুঝল্যানি ?

এরফান মাথা নাড়িল। কবি-প্রাণ এরফানের স্বপ্ন, তার উপর ভক্তিভাজন পিতার উপদেশ ! সে বুঝিয়াছে বৈ কি।

এরফানের সঙ্গে সইস সাহেবের ভূতপূর্ব্ব পত্নী দৃষ্টির আড়াল হইলে ইদু পরামাণিক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গাব গাছতলায় ভাঙ্গা মোড়ায় বসিয়া হুঁকাটি উঠাইল। অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মোটের উপর এ মেয়েমানুষটি মন্দ ছিল না, তাহাকে থুশী রাখিতে চেষ্টা করিত। ইহাকে লইয়া তাহার হারেমে দুইটি মাত্র বিবি ছিল, একটি চলিয়া গেল। বয়েসটা কিন্তু ইহারই অনেক কাঁচা ছিল। ইদুর মনে একটু আপশোষের ভাব আসিল।

তামাক খাইতে খাইতে ইদু ভাবিতে লাগিল।

তিন দিন আগে নেউগীপুরের বড় তিস্যার কাছারীতে সে খাজানা দিতে গিয়াছিল। খোঁড়া মানুষ, গাড়ী লইয়া সে খাজানা দিতে গিয়াছিল। কাছারীর পুকুরের ধারে গাড়ী থামাইয়া নামিতে সে দেখিল, একটি মেয়ে স্নান করিয়া পুকুরের উত্তর পাড়ে নায়েব বাবুর বাড়ীর দিকে যাইতেছে। নায়েব বাবুর বড় মেয়ে, সে চিনে। লতা না পাতা দিয়া কি একটা নাম যেন, মনে পড়িতেছে না। খাসা মেয়ে। হুঁকায় সুখ-টান দিয়া চোখ বুঁজিতে মানসনেত্রে সে একটা চমৎকার উপায় দেখিতে পাইল।

তাড়াতাড়ি খাজানাটা দিয়া ফেলিয়া সে বড় বেকুবি করিয়াছে। কে তখন জানিত যে হঠাৎ আদাজি পাওয়া যাইবে ? তা হউক, তিন দিন আগে সে খাজানাটা দিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া টাকাটা মারা যাইতে পারে না। তাহা হইলে আর আদাজির মানে কি হয় ? সে কাল সকালেই নায়েব বাবুর কাছে যাইবে। এক ঢিলে দুই চিড়িয়া মারিবে সে। নায়েব বাবুকে ধমক দিয়া খাজানার টাকা ফেরৎ চাহিবে। বাদশাহী এখন তাহাদের হাতে, তিন দিন আগে বোকামি করিয়া টাকাটা দিয়াছে তাই বলিয়া সেটা মারা যাইবে না কি ? দিক নায়েব টাকা ফেরৎ। খাজনা-বাজনা আর হাত বাড়াইয়া লইতে হইবে না।

খাজানার টাকা ফেরৎ লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া সে নায়েবকে আবার ধমক দিবে। টাকা ফেরৎ ত দিলে বাপু, এবার মেয়েটাকে ছাড়িয়া দেও। এত দিনেও যখন বিয়া দিতে পার নাই, আপত্তি করিবার কিছু নাই। মেয়ে তোমার পার করা দরকার, ভাল মত পার হইয়া যাইবে। কলমা পড়াইয়া সে তাহাকে নিকা করিবে। যদি মেয়ে ধরিয়া বসে তবে ঘরে যে বুড়ী বিবি আছে সেটাকে না হয় তালাক দিয়া তাড়াইয়া দিবে। মানুষ সে খারাপ নয় নায়েব মশায় !

বাপ-মা তুলিয়া গালাগালি না করিয়া কিরূপ ভাষায় নায়েব মশাইকে কড়া ধমক দেওয়া যায়, খোঁড়া ইদু পরামাণিক মনে মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।

পথের বাঁকে এক জন মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। শীর্ণকায়, ময়লা ফর্সা রং, গায়ে চাদর, পায়ে পুরাতন একজোড়া চটি, হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলি। ইদু পরামাণিক দেখিল চণ্ডী পণ্ডিত।

চণ্ডী পণ্ডিত কাছে আসিলে ইদু বলিল,—কি মনে কইর‍্যা পণ্ডিত ? টাহার নাগ্যা আইছ ? বোয়ো—বোয়ো।

বসিবার মধ্যে একটি মাত্র ভাঙ্গা মোড়া ও একখানা চাটাই যাহা ছিঁড়িয়া এক-তৃতীয় অংশে দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডী পণ্ডিত বাড়ীতে আসিলে ইদু নিজে ছেঁড়া চাটাইতে বসিয়া পণ্ডিতকে মোড়ায় বসিতে দিত। আজ এই খাতিরটুকু করা তাহার অনাবশ্যক মনে হইল।

পণ্ডিত কোথায় বসিবে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া ইদু হাসিয়া বলিল,—আরে ভাহো কি পণ্ডিত, এহন থাকি ঐ চাটাইতেই বসবা। মোছলমান আদাজি পাইছে জানো নি ? য্যাদ্দিন বড়মানষি কইর‍্যা মোড়ায় বসতিছিল্যা, এহন মোড়া ছাড়ি মাটিতে বসবা। বুঝল্যানি ? বোয়ো, দুইড্যা বাত আছে তোমার সাতি।

পণ্ডিত দায়ে পড়িয়া আসিয়াছিল। বাড়ী তাহার কাছেই, গাবতলী গাঁয়ে। কয়েক ঘর গোয়ালা, দুই ঘর কুমার ও সে মুসলমান প্রতিবেশীদিগের মধ্যে বাস করে। আগে নেউগীপুরে বাড়ী ছিল, সে ভিটা ছাড়িয়া মুসলমান-পল্লীর এক পাশে ঘর তুলিয়া বাস করিতেছে। গাবতলীর পাঠশালার মাষ্টারী করিয়া কিছু পায়, আর বিঘা চারেক জমি আছে। ইহাই সম্বল করিয়া দুইটি প্রাণীর সংসার কোন মতে চালাইতে হয়।

পাঠশালায় পড়াইবার জন্য সে মাসিক বেতন পায় পাঁচ টাকা। এরফান পাঠশালার অবৈতনিক সম্পাদক, গাঁয়ে চাঁদা করিয়া এই টাকাটা যোগাড় করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে বাকী পড়িয়া যায়। এবারও বাকী পড়িয়াছে, এরফান টাকাটা নিজের তহবিল হইতে পিতার হাতে দিয়াছে পণ্ডিতকে দিবার জন্য, কিন্তু পিতা টাকাটা হাতে রাখিয়াছিল। দুই-চারি দিন পণ্ডিত হাঁটাহাঁটি করুক তখন দেওয়া যাইবে। পাওনা টাকা চাহিলেই যদি দিয়া ফেলা হয় তবে টাকা দেওয়ার অর্দ্ধেক সুখ ত চলিয়া গেল।

পণ্ডিত পাওনা টাকা চাহিতে আসিয়াছে, বাধ্য হইয়া ছেঁড়া চাটাইতে বসিল।

হঠাৎ ইদু জিজ্ঞাসা করিল—হ পণ্ডিত, তোমার গাছের গুপারি পাকিছে ? একটা বাত বলি হোনো। পাকা গুপারি হাটে লিয়্যা বিক্রী করবা না। য্যাদ্দিন গুপারি বিক্রী কইর‍্যা পয়সা খাইছ, এহন আর সে কাম চলবিনি। আজ মানুষ পাঠামু তোমার গাছের গুপারি ব্যবাক্ পাইড়্যা আনতি। গুপারি হাটে ব্যাচমু আমি।

কিছু বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডিত বোকার মত চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ইদু বলিল,—আরে মশয়, পণ্ডিতি কাম করো বোকার মতন ফ্যাল-ফ্যাল কইর‍্যা তাহাও ক্যান ? তোমাগো তামাম জিনিসে এখন আমরা হকদার, জানো না ? গুপারি আমি লিশ্চয় নিমু, তয় তুমি খাতি চাও এক আদ পোণ তোমারে দিলিও দিতি পারি।

পণ্ডিতের মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইদু হুঁকাটা তাহার দিকে ধরিল। বলিল,—আরে গোঁসা কর ক্যান ? ল্যাও, তামুক খাও। এহন থাকি কলার পাতায় কক্কে বসায়্যা টানতি হবি না, আমাগো মত হুঁকা টানবা। আদাজি হয়্যা এডা তো দেহি তোমাগো ভালই হইছে পণ্ডিত !

পণ্ডিত আগের মত হুঁকা হইতে কলিকা তুলিয়া লইয়া দুই হাতের মুঠার মধ্যে বসাইয়া টানিতে লাগিল। ইদু স্বর মোলায়েম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ পণ্ডিত, তোমার বষ্টুমীর ওমর কত হইলো ? মানুষে কয় দেখতি খাপসুরত, কাঁচা ওমর।

চণ্ডী পণ্ডিত বৈষ্ণবী লইয়া ঘর করে। এই বৈষ্ণবীর জন্য তাহাকে নেউগীপুরের বাস তুলিয়া দিতে হইয়াছে। বৈষ্ণবীর বয়েস পঁয়ত্রিশের উপর হইয়াছে, সে বলে পঁচিশ। তামাক টানিতে টানিতে পণ্ডিত বলিল,—এই এক কুড়ি দুই-তিন হইতে পারে।

শুনিয়া খোঁড়া ইদু পরমাণিক উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল,—হ পণ্ডিত, ওয়াতেই হবি। এহন হোন দেহি আমার বাত। তুমি হ'ল্যা বষ্টুম মানুষ, দশ-কুড়ি বিঘা ধানী জমি নাই, পাঠশালার পাঁচটা টাহায় খাওন-পরন সব করতি হয়। বষ্টুমী লিয়্যা ক্যান কষ্ট পাও ? ওডারে ছাড়ি ল্যাও ; কলমা পড়ায়্যা আমি নিকা পুষি। হারেমটা মোর খালি। এক বিটি বুড়ী রইছে, খ্যাদায়্যা দিমু সেডারে তোমার বষ্টুমী যদি কয়।

চণ্ডী পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ইদুকে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করিতে লাগিল।

ইদু প্রথমে হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—আরে পণ্ডিত, ভাল মানুষডার মতন মুহের কতায় ছাড়তি বলল্যাম ভাইতি ব্যাজার হইছ। আদাজী প্যায়্যা কোন হালা মোছলমানের ব্যাটা এই মতন ভালমানষি কাম করে ? খোশ হলি তোমার বষ্টুমীরে কাড়ি আনতি পারি, বাঁধি আনতি পারি, তা জানো ? তুমি দোস্ত মানুষ, তাই ভাল মুহে বলতিছি।

তার পর হঠাৎ সে রাগিয়া উঠিল। বলিল—তুমি হল্যা চাঁড়ালের ব্যাটা, মোনা ভুঁইমালীর ব্যাওয়ারে ফোসলায়্যা বষ্টুমী করিছ, নিজির গাঁও থেনে পলায়্যা গাবতলীতে ঘর বানাইছ। ছোট জাতের ব্যাটা, ভাল কথার মানুষ লও। এই তোমারে কইছি, তোমার গর্দান লিয়্যা বষ্টুমীরে নিক্যা করতি পারি, আদাজি পাইছি জানো না ? যাও যাও, ক্যাচোর-ক্যাচোর করবা না, ভাল চাও তো বষ্টুমীরে কাল বিয়ানে এহানে হাজির করবা, হুকুম দিল্যাম। বুঝল্যানি ?

তাহার কথা শুনিয়া পণ্ডিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল একখানা বাঁশ পাইলে খোঁড়ার ডান পা-টিকেও খোঁড়া করিয়া দেয় এক ঘায়ে, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সে একখানা বাঁশের খোঁজ করিতে লাগিল।

ইদু পরামাণিক হুকুম জানাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল। ট্যাঁক হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া সে বলিল—এই ল্যাও তোমার তলবের টাহা। পড়াও না পড়াও তলব আর পাবা না। বাপু, খাওয়াবার মুরদ নাইক বষ্টুমী রাখবার সখডা আছে দেহি। আরে এ কি মোছলমানের কথা ? ম্যাকখান ছেঁড়া লুঙ্গী থাকলি মোছলমান চার-চারডা বিবি রাখতি পারে। তাগরে কথা আলাদা। তারা বাদশার জাত, এহন আবার আদাজি পাইছে। বুঝল্যানি ?

পণ্ডিত টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইছু পরামাণিক ঠাণ্ডা হইয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল।

এরফান দারোগার মহিসের ভূতপূর্ব বিবিকে লইয়া ফেচুনগরের থানায় যাইতেছিল। চিকনাই নদীর পূর্ব পাড় ধরিয়া সে চলিতে লাগিল, পিছনে রঙিন টিনের তোরঙ্গ হাতে বিবি। রাস্তার কয়েক হাত নীচে চিকনাই নদীর সরু খাল কচুরী পানায় ঢাকিয়া গিয়াছে। গাবতলীর চাষী-ঘরের মেয়েদের স্নান করিবার ও ঘরকন্নার জল লইবার জন্ত জায়গায় জায়গায় পানা সরাইয়া দুই ধারে বাঁশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈশাখ মাসে জল শুকাইয়া যায় পানা মরিয়া যায়। তখন নদীর তলায় মাঝে মাঝে গর্ত করিয়া জল সংগ্রহ করা হয়। সেই জলে স্নান-পান দুই-ই চলে। এখনও জল আছে নদীতে। মাঝে মাঝে বাঁশ বাঁধিয়া পারাপারের সেতু তৈয়ারী হইয়াছে।

গাবতলী গাঁয়ের পূর্ব সীমানার কাছাকাছি আসিতে এরফান দেখিল, এক জন স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া মাটির কলসীতে জল লইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিল, স্ত্রীলোকটি চণ্ডী পণ্ডিতের নূতন বৈষ্ণবী হরিদাসী। এরফানকে দেখিয়া হরিদাসী মিশি দেওয়া কালো দাঁত ও কালো মাড়ী বাহির করিয়া একটু হাসিল। তার পর মাথার কাপড় অল্প একটু টানিয়া দিল। এরফান তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না। সে-কাল আর নাই, হরিদাসীদের দিকে নজর দিবার দিন আর নাই। সেদিন সে সহরে গিয়াছিল লীগের কাজে। উকিল বাবু মাষ্টার বাবুদের মেয়েরা ইস্কুলে পড়িতে যায় দেখিয়াছে। কি তাহাদের চেহারা, কি তাহাদের সাজ! কত কালের সাধ তাহার, এবার আজাদী হইয়াছে, সময় আসিল। কালই সে সহরে রওনা হইবে স্থির করিল, গোলমালের খবর কিছু কিছু আসিতেছে। চিকনাই নদীর ও-পারে নেউগীপুরে বাবুরা কেহ থাকে না, বাড়ীতে কেবল বুড়ী মাসী-পিসীদের রাখিয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত চলিয়া গেলে ইছু পরামাণিক ভাবিতে লাগিল।

আজাদি হইয়াছে, চণ্ডী পণ্ডিতের পাঠশালাটা আর কোন্ কাজে আসিবে? পাঠশালা ঘরের টিনগুলি খুলিয়া আনিয়া একখানা নূতন ঘর তুলিয়া ফেলিবে। আচ্ছা, ঘর ত তুলিল, সে ঘরে রাখিবে কাহাকে? চণ্ডী পণ্ডিতের বৈষ্ণবীর কথা মনে হইল। নায়েব বাবুর মেয়ের চাইতে বৈষ্ণবী অনেকটা হাতের মধ্যে। পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া সে বৈষ্ণবীকে নিকা করিয়া সেই ঘরে রাখিবে। পণ্ডিতকে তাড়ান সহজ। সে নমশূদ্র। গোয়ালা, কুমার কেহ তাহার ডাকে আসিবে না।

বড় রকমের দাঙ্গা-ফ্যাসাদের মধ্যে এখন আর যাইতে ভাল লাগে না। ছিল সে এক সময়। খোঁড়া সে চিরকাল ছিল না। বেশ কয়েক বছর আগে পাট বেচিয়া সে মোটা টাকা পাইল হাতে। তিন দফা ফৌজদারী বাধাইয়া দিল। শেষ দফায় যাইতে হইল জেল। জেল হইতে ফিরিয়া বিত মণ্ডলের বৌকে হাত করিবার জন্ত এক রাত্রে মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগাইল। মণ্ডল ছিল তখন ঘরে বেহুঁস, সে খবর লইয়াছিল। ভাল করিয়া আগুন লাগিয়া গেলে বৌটা আধপোড়া অবস্থায় তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল। তার পর ছুঁড়ির সে কি চিৎকার! পাড়া-প্রতিবেশী জমিবার আগে পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিয়া বৌটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া সে পলাইল। রক্তাক্ত ছুঁড়ির চিৎকার আর থামে না। আঁচড়াইয়া তাহার একটা চোখ কাণা করিয়া দিল প্রায়। নদীর ঘাটে আনিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিতেছে, নৌকায় তুলিয়া হাঁসপুরের বিলের দিকে সরাইয়া ফেলিবে। বর্ষার জল তখনও নদীতে আছে। বৌটার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একখানা সড়কীর ফলা আসিয়া তাহার বাঁ পায়ের হাঁটুর নীচে গাঁথিয়া গেল, সে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তার পর মাথায় কয়েক ঘা লাঠি, সে বেহুঁস হইয়া গেল। ঘরে বেহুঁস শালা মণ্ডল যে এমন কাজ করিতে পারে, কে জানিত?

কয়েকটা মাস সে বিছানায় পড়িয়া রহিল, সহরের হাসপাতালে থাকিতে হইল। বাঁ পা'খানা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া গেল। বিত মণ্ডল বৌ লইয়া ফেরার। ইছু ভাবিল, হইত আজকের দিন, হুলিয়া করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেটাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইতাম। মুছলমানের গায়ে হাত!

সেই হইতে ইছু হুঁসিয়ার হইয়া এ সকল কাজে হাত দেয়। কিন্তু আর হুঁসিয়ার হইবার দরকার নাই, আজাদি হইয়াছে: ইছু পরামাণিক প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল,—চণ্ডী পণ্ডিতের বষ্টুমীরে নিশ্চয় আমি নিমু, ব্যাটা কোন কতা কলি তার গদ্দান নিমু।

বেলা গড়াইয়া বিকাল হইয়া আসিল। তখনও কিছু আলো আছে পথের বাঁকে অনেকগুলি লোকের গলা শোনা গেল।

নেউগীপুরের বাজার লুঠ করিয়া চিড়া, মুড়ি, গুড়, বাতাসা, মশলা, ডাল প্রভৃতি লুঠের মাল কাপড়ে বাঁধিয়া কয়েক জন লাঠিধারী লোক ফিরিতেছিল। এক জনের মাথায় তামাক মাখিবার চিটেগুড়ের হাঁড়ি। হাঁড়িটা ফাটিয়া গিয়াছিল। কালো, পাৎলা চিটে গুড়ের ধারা লোকটির কপাল, মুখ, দাড়ি বাহিয়া ঝরিতেছে।

লুঠ স্তুরু হইয়া গিয়াছে দেখিয়া খোঁড়া ইছু পরামাণিক উৎফুল্ল—উত্তেজিত হইয়া উঠিল। লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—কি আনল্যা ভাই সব? চিড়্যা, মুড়ি, বাতসা? ছোঃ, আজাদি পায়্যাও চিড়্যা-মুড়ি, গামছায় বাঁধি ফিরল্যা? বাক্স, প্যাটরা, মাইয়া ছাবাল কিছুই নাই দেহি। কি সব মরদের ব্যাটারা!

লোকগুলি কোন উত্তর না দিয়া মুড়ি ও বাতসা চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া যায় দেখিয়া সে আরও অগ্রসর হইল। বলিল—আরে বাপু, গোণ্ডা কয় বাতসা দিয়া যাও না দেহি। মাণিকপীরের কিয়্যা, মোছলমান ভাই-ভাই, দিয়্যা যাও কয়খান বাসৃতা।

দলের এক জন লোক এক মুঠা মুড়ি তাহার সম্মুখে মাটিতে ছিটাইয়া দিয়া বলিল,—বাসতা নাই, মুড়িগুলান খুঁট্যা খাও পরামাণিকের ব্যাটা।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া খোঁড়া ইছু পরামাণিক লোকটিকে মারিবার জন্ত হাতের লাঠি উঠাইতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া পা দুমড়াইয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

মাটিতে পড়িয়া ইছু পরামাণিক মুখভঙ্গী করিয়া অশ্রাব্য গালাগালি করিতে লাগিল, থু থু করিয়া মুখের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল!

লোকটা সঙ্গীদের ডাকিয়া ব্যঙ্গ-হাস্যে বলিল,—খোঁড়া ইছু ক্যামোন মুড়ি খাতিছে ভাহ।

হাসিতে হাসিতে লুঠের মাল বহিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

—

পূর্ব্ববঙ্গের বাইচ খেলা

শ্রীশান্তি পাল

কাল অপরাহ্ণ। ঘর্ঘরার দুই কূলে গ্রামে গ্রামে পুরনারীগণ কুলার উপর বরণডালা সাজাইয়া ও মঙ্গলঘট মাথায় করিয়া দলে দলে মোড়লের বাটীতে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের জাঁক-জোকার ও উলু-উলিতে ঘর্ঘরার দুই তীর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নদীবক্ষে বিভিন্ন গ্রামের 'দৌড়-বাইছা-নাও'গুলি নানা রং-এর পতাকা উড়াইয়া নদীর কিনার ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে 'সারি' গাহিতে গাহিতে ছাড় ঘাটের দিকে যাইতেছে। দর্শকগণ ইতর-ভদ্রনির্ব্বিশেষে সোৎসাহে স্ব স্ব গ্রামের নৌকার মালিকের নাম ধরিয়া—'সাবাস শুধিয়া মধু'! 'সাবাস বাহার আলি'! 'সাবাস বুধিয়া মধু'! চীৎকার করিতেছেন। বাহার আলি স্বরচিত 'বয়ান' ধরিয়াছে এবং মাঝি-মাল্লারা বাইচ-নৌকার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া টিকারা ও কাংসের তালে তালে বৈঠা ফেলিয়া চলিতেছে। মাঝিদের এক দলের কপালে গাঢ় সবুজ ও আর এক দলের কপালে গাঢ় লাল রং-এর ফেট্টা বাঁধা। তাহাদের ঝাঁকড়া চুলগুলি শ্রাবণের ভিজা বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া উড়িতেছে। মোড়লেরা বাইছ-নৌকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া মাঝি-মাল্লাদের ছড়া কাটিয়া ডাক দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। মাঝিদের 'হো—হো' রব শুনিয়া দর্শকবৃন্দ সচকিত হইয়া উঠিতেছেন :—

"ভব যাব পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে,
হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে।
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও
আলিস্যি ক'র না বান্দা পীরের নাম নাও।"
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

(দ্বিতীয় মোড়লের হাঁক)

"কয় নীলমণি ও মা জননী,—
সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি,
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)
যাব গোচারণে রাখাল সনে
বলাই দাদা শিঙ্গে দিচ্ছে ধ্বনি।"
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

(তৃতীয় মোড়লের হাঁক)

"এস গো মা মনসা পূরাও মনের আশা
তোমা বিনা গতি নাহি ত্রিসংসারে,
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)
তোমার ও করুণাচলে মহাদেবের কন্যা হ'লে
ডাকি মা তোমায় আজ বারে বারে।"
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

উঠল বেজে ঘণ্টা কাঁসি,—
বাই ছেড়েছে দেখ্ রে আসি';
একশোখানা বৈঠা জুড়ে
শুধিয়া মধু আসছে উড়ে!

উদয়-গিরি উদয়-গিরি,—
যাচ্ছ কোথায়—যাচ্ছ ফিরি?
মহলগিরি একটু দাঁড়াও,
একটু দাঁড়াও,—বাই দেখে যাও!

বুধিয়া মধু আরেক ধারে
ভাসান ছেড়ে, বৈঠা মারে,
নাকিরে উঠে কাঁসার তালে
চাপান মেরে বসল হালে!

রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো,—
মেছুয়া—মাণিক সামনে বাড়ো;
উদয়তারা বাঁকের মুখে
ঘুরিয়ে নে না', গলুই রুখে!

ঘুর্ণাবর্তে কে যায় চ'ড়ে,
শঙ্খচূড়ের পিছন ধ'রে?
হংসখলা, কাজল রেখা
নোঙ্গর তোলার সময় এ কি?

রাস্তা ছেড়ে, রাস্তা ছেড়ে,—
কাদের ও-না' আসছে বেড়ে?
বুধিয়া মধু তাই না দেখি!
বাসের নায়ে মারলে সে কি?

হাফিজ মিঞা উঠল হেঁকে,—
টানাপানি থাসনে রে কে?
আলগা কেন বৈঠা তোদের?
বাড়্ না আগে?—গায় গে' ভেড়!

পীরবদরের নামটি নিয়ে
শুধিয়াকে ধর্ পাল্লা দিয়ে।
কইবে কি তোর মাউগ-পোলা?
ছিটকী বাড়ী বড়ই গোলা!

বাকোই বাকোই ডাক ছাড়ে কে,
শুরোয় ব'সে বৈঠে রেগে?
চিত্সী-মাঝি কঠিন ও-ঠাঁই,
কঠিন আরও বাইছ বাওয়া ভাই!

শক্ত ক'রে, বৈঠা ধরো,
বুধিয়া মধু বাড়ছে বড়ো!
সাবাস্ মাঝি! সাবাস্ তোরা!
সাত-গাঁ'তে নেই তোদের জোড়া!

বাংলার মাঝি মোরা হাল ধরি রঙ্গে,—
ঘর্ঘরে করি বাস কুমীরের সঙ্গে!
জল আর ডিঙ্গি-না সম্বল বৈঠে,
কম্বল ছেঁড়া-চেটা দড়া-ধাড়ে 'টৈ'-টে।
ঝড়-ঝড়ি ঝাপটায় যাই নাক' ভড়কে,
এক বাঁক থেকে যাই আর বাঁকে হড়কে!
উত্তাল ঘর-ঢেউ-এ করি রণনৃত্য,
ঘূর্ণীতে প'লে পর উল্লাসে চিত্ত!

চৌভিতে চলে চোখ চর হ'ল চৌরি,
উনকোটি বাও ধ'রে নেউটিয়া দৌড়ি।
কাল-বৈশাখী সাথে করি নিতি পাল্লা,—
গৈরিকী পালে বাঁধি নৈঋতী ঝঞ্ঝা!
দুর্দ্দম দাঁড় বেয়ে হাত হ'ল শক্ত,
কব্জীতে কত জোর গায় কত রক্ত!
জো'-র-ভাঁটা মানি নাক' জল কেটে ঘুলিয়ে

ঘুরি-ফিরি হাসি-খেলি চেত্তাটি ফুলিয়ে।
বেপারি ও কোশা বালিয়া পাল,—
ঘুরাব মাচোয়া পক্তা জাল,
না সামাল! না সামাল!
বুধিয়া মধুকে চেপে দে হাল,
ছপ্ ছপা ছপ্ বৈঠা চাল!
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

রণজয় নয় চন্দ্রপাল,—
ছোটি-খটি ভীমা নাটশাল,
না সামাল! না সামাল!
বাসের আলিকে চেপে দে হাল!
ছপ্ ছপা ছপ্ বৈঠা চাল!
(হো-হো-হো-হোঃ! হো-হো-হো-হোঃ!)

হাপুস মেরে টান্ রে সবাই
চল্ রে ও-ভাই সামনে বেড়ে,
সিংহমুখী বা'চের ডিঙ্গি
পিছন থেকে আসছে তেড়ে!

ব্যাঙগুলো উঠছে ভেসে—
ডিগবাজী খে' ডুব পালে সে।
ঠিক যেন দেখ্, মশক ভাসে
মৎস্যগুলো পালায় ত্রাসে।

ডিম ছাড়িছে ভাঙ্‌না মাছে,—
চিতিয়ে প'ড়ে শিশুর কাছে;
কচ্‌রী-পানা যাচ্ছে ভেসে,—
ডিমের কাঁড়ি লাগছে এসে!

গাঁও-না চলে মাঝ গাঙে দে'—
দুই তীরে সে যাত্রী সেধে।
টাপরে-মাঝি হনহনিয়ে
গাঁও-না ফেলে যায় খণিয়ে!

মালোর মাঝি জাল ফেলে সে,
ব'সল কাড়ায় হালটি নে' সে।
গোড়ের গায়ে গড়গড়িয়ে
গোণের প'ড়ে ভিড়ল গিয়ে!
আড়ি-গুরোয় পা ঝুলিয়ে
কে চ'লেছে জল ঘুলিয়ে?
ডরার-খোপে ছৈ ফেলে কে
ছড়িয়ে দু'-পা ঘোম্‌টা ঢেকে?

সাবাস্‌ জোয়ান, খুব হুঁসিয়ার!
তাল কাটে না চাইতে ও-ধার!
বৈঠা হানো গভীর জলে,
ঢেউ লেগে বাই-পান্‌সী টলে!

বাই খেলেছ চন্দনাতে,—
ভৈরবে আর সুনন্দাতে;
নামটি যেন যায় না চ'লে,
যোদ্ধা কথা দিচ্ছি ব'লে।

লোহার মত শক্ত হাতে
জল কেটে যা' বোঠের ঘা-তে।
লাখিরপাড় ও হাজরাবাড়ী
এক পলকে যা' ভাই ছাড়ি'!

বেপারি ও কোশা বালিয়া পাল,—
ঘুরাব মাচোয়া পণ্ডা জাল
না সামাল! না সামাল!
বুধিয়া মধুকে চেপে দে হাল!
ছপ, ছপা ছপ, বৈঠা চাল!
(হী-হী-হী-হীঃ! হী-হী-হী-হীঃ!)

রণজয় নয় চন্দ্রপাল,—
ছোটি-ঘটি ভীমা নাইশাল,
না সামাল! না সামাল!
বাসের আলিকে চেপে দে হাল!
ছপ, ছপা ছপ, বৈঠা চাল!
(হী—হী—হী—হীঃ! হী—হী—হী—হীঃ!)

হাপুস মেরে টান রে সবাই
চল্ রে ও-ভাই সাম্‌নে বেড়ে,
ব্যাঘ্রমুখী বা'চের ডিঙি
পিছন থেকে আস্‌ছে তেড়ে!

বক চরিছে বিলের ধারে—
গোঁৎ পেড়ে গাং-চিল ছোঁ মারে!
তান ধ'রেছে ভাউয়া-ব্যাঙে—
দাঁড়িয়ে বকী একটি ঠ্যাঙে!

শামুক খোঁজে শামুক খোলে,—
ডাক ডাহুক ও গাড়া পোলে।
পানকৌটি ডুব দে' ওঠে,
পান খেয়ে সে লাল্‌চে ঠোঁটে!

ধানের ক্ষেতে জাওলাগুলি,
হাওয়ায় কেমন খেলছে দুলি।
নুইয়ে পড়া শিরে শিরে,
দেখ্‌ছি সোণার স্বপনটিরে।

চল্ রে ও-ভাই সাম্‌নে বেয়ে,—
দেখিস নে তুই দু'-ধার চেয়ে।
পথ যে এখন অনেক বাকী,
পয়লা ক্ষেপেই হারবি না কি?

গুধিয়া মধু আরও বাড়ো,—
ডাইনে এচে?—বাঁয় সে আরো।
বৌ-ঝিয়েরা নাইছে ঘাটে,—
ঢেউ লাগে না বুকের টাটে!
হাটুরে-না' হাট নিয়ে সে
ওই ঘাটে কি ভিড়ল শেষে?
লজ্জাবতী লজ্জা পেয়ে,
অবাক চোখে রইল চেয়ে।

বাই-না দেখে ঘোমটা টানে,
কেউ ছুটেছে ডাঙার পানে।
কেউ বা জলে ঘট ভরিতে
চম্‌কে ওঠে আচম্বিতে!

বুক-জলে কে ডুবিয়ে গলা,
কা'র ঝিয়ারী ক'রছে সলা?
কলসী কাঁখে কুঁচকে কটি
বৌ চ'লেছে কাদের ওটি?

জলচুড়ি আর কঙ্কণেতে
কানাকানি ক'রছে যেতে
চ'লতে পথে পদ্ম ফোটে,—
দুষ্ট অলি অম্‌নি জোটে!

কেউ এলে' গা,—সোঁতায় প'ড়ে,—
কেউ বা ডুবে প'ড়ল সরে।
কাদের নারী, কোথায় বাড়ী,
বৈঠা ধ'রে মারছে পাড়ি?

ভাসিয়ে ডিঙি-নাও ওগো ভাসিয়ে ডিঙি-নাও,—
কাদের মেয়ে কিনার ঘেঁসে
মিষ্টি হেসে যাও?
বসত তোমার কোন গাঁয়ে?
ফুল ঝরান, কা'র দ্বারে?
'বৌ কথা ক' ডাক শুনে কি
শিউরে ওঠে গাও?

নাচিয়ে ডিঙি-নাও ওগো নাচিয়ে ডিঙি নাও,—
কোমল হাতে বৈঠা বেয়ে
একলা কোথা যাও?
কপাল ঘামে রোদ্দুরেতে,
থাম্‌বে বল কদ্দুরেতে?
ভাঙন-ধরা ওই কূলে হায়
কোথায় থোবে পাও?

পল্‌কা ডিঙি-নাও, ও যে পলকা ডিঙি-নাও,—
কতক্ষণ ও সইতে পারে
পাগলা ঢেউয়ের ঘাও?
দেখছ না কি জোয়ার লাগে,
ওই চরণের ছোঁয়াচ মাগে,
টল্‌ছে তরী ফুল্‌ছে যে জল
উঠ্‌ছে ঝড়ো—বাও!

দুলিয়ে ডিঙি-নাও ওগো দুলিয়ে ডিঙি-নাও,—
কোন্ বিদেশীর বাঁশীর মায়ায়
কোথায় উধাও ধাও?
রাখাল ছেলের স্বপন-পরী,
অচিন গাঁয়ের ও কিশোরী,—
নামটি তাহার যাও ব'লে যাও
আমার মাথা খাও!

ফিরিয়ে ডিঙি-নাও ওগো ফিরিয়ে ডিঙি-নাও,—
টলটলে ওই ডাগর চোখে
বারেক ফিরে চাও!

বৈরাগী মন মোর কোন্ সুরে গান গায়?
কোন্ তাল কোন লয়ে ঘর্ঘরা ঘুরছায়?
খেয়ার ভাঙে ঢেউ কোন্ ঘাটে কলকল্?
ছলছল্ ঘোল্-জল কোথা উজে টলমল্?

টলমল তনুমন ঢলঢল যৌবন,—
চলচল দুই কূলে ঝলমল্ নলবন!
টুলটুল্ কা'র মুখ, জুলজুল নিশ্বাস?
চুলবুল্ কা'র বুক বৈঠায় বিশ্বাস?

বিশ্বাস রাখ ভাই ভয় নেই হারবার,
বিশ্বাস থাকলেই নিশ্চয় জয় তার!
পয়লার চক্কর,—চাই বল হিম্মৎ,
বাই-না'র টক্কর,—তিন-বাঁক বাজখৎ!

ঝারখৎ তিন-বাঁক, ভয় ভয় ঠাঁই ঠাঁই
ভেড়বার সম্ভব নায়ে নায়ে আর নাই।
আর জোর দুই-বাঁক, দুই ঘাট, দুই চর
তার পর হৈ হৈ রৈ রৈ রাতভর!

বেপারি ও কোশা বালিয়া পাল,—
ঘুরাব মাচোয়া পন্তা জাল,
না সামাল! না সামাল!
তুফান উঠেছে টালমাটাল!
ছপ্‌, ছপা ছপ্‌, বৈঠা চাল!
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

রণজয় নব চন্দ্রপাল,—
ছোটি-ঘটি ভীমা নাটশাল,
না সামাল! না সামাল!
ঘাঘর টলিছে পাঁড়-মাতাল!
ছপ্‌, ছপা ছপ্‌, বৈঠা চাল!
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

হাপুস মেরে টান রে সবাই
চল রে ও ভাই সামনে বেড়ে,
পদ্মমুখী বাঁচের ডিঙি
তোর পিছনে আসছে যে রে!

বাঁক-বরাশে উঠছে পানি
সামলে নে রে বাই-না খানি।
জলুই আঁটো তক্তা জুড়ে,
আড়-ঘাটা দেখ,—ওই তো দূরে?

পয়লা বারে বাস্‌নে ভেসে,—
জমাও পাড়ি চরটি ঘেঁসে!
জোড়া নায়ে ভেঙ্কি খেলে
ভড়্‌কে দে রে চিত্‌সী-ছেলে!

বৈঠা হানো সাপটে ধ'রে,
গুখোর ঝিঁকের কে না ডরে!
সাত-পাঁ জানে আড়ং-বাঁচে
হার মেনেছে গুখোর কাছে!

গোলের মাঝি গুন টানে রে—
বাই দেখে কি থাম্‌ল সে রে?
হাটুরে মাঝি হাল্লা ক'রে
পাল্লা ধরে মারতে তোরে!

এক না' চলে এ-পার ঘেঁসে,—
আর না' চলে ও-পার দে' সে;
পারাপারের ঢেউ-এ টুটে
জোয়ার যে জল চলকে উঠে!

জোয়ার জলে ভড়ক' না ভাই
[illegible] বেঁয়ে চ,—জল হেঁকে যাই।
[illegible] কোথা,—বাতার তলে?
[illegible] আসল জলে!

আরও বাড়ো,—আরও বাড়ো;—
মুখ চেয়ো না তোমরা কারো।
বাই খেলছে, খেলুক না তা,
তুই কেন রে ঘামাস মাথা?

বেপারি ও কোশা বালিয়া পাল—
ঘুরাব মাচোয়া পন্তা জাল,
না সামাল! না সামাল!
দুকূল ছাপিয়া ভাঙে জাঙাল!
ছপ্‌, ছপা ছপ্‌, বৈঠা চাল!
[হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হো]

রণজয় নব চন্দ্রপাল,—
ছোটি-ঘটি ভীমা নাটশাল
না সামাল! না সামাল!
তামাম দুনিয়া দেখে কামাল!
ছপ্‌, ছপা ছপ্‌, বৈঠা চাল!
(হো—হো—হো—হোঃ! হো—হো—হো—হোঃ!)

হাপুস মেরে টান রে সবাই
চল্‌ রে ও ভাই সামনে বেড়ে,
সবার পিছে বাঁচের ডিঙি
নাগফণীও আস্‌ছে তেড়ে!

ঝপা-ঝপ ফেল দাঁড় মাঝি-মাল্লা,
কেন করো হাঁক-পাক ধরো পাল্লা।
ওই কার গলুইয়ের ডগ বেরিয়ে,
বাঁ দিক চাপ ভাই বা' পেরিয়ে।

চিত্‌সীর মাঝি তোরা ঝলকে কি ভয়?
ছোট কাল হ'তে জল ক'রেছ তো জয়
ঢেউয়ের ডাক শুনে মূর্ছো কি যাও?
তুফানের শিরে বাই-বাচারী নাচাও!
কামট কুমীর দেখে ভড়ক না ভাই
চটপট্‌ ওই ঘাটে চাই যাওয়া চাই।
(হো—হো—হোঃ! হো—হো—হোঃ!)

থম্‌ থম্‌ মেঘ দেখ আকাশের গায়,
থেকে থেকে চিকুর হানে ঠায় ঠায়!
শোঁ-ও শোঁ-ও গর্জন ওঠে বাত্যায়,—
ঘাঘরের দুই তীর করে তোলপাড়!
বাঁশ-ঝাড় নল-ঝাড় ঝড়ে দুলছে—
সিংহের কেশ যেন রাগে ফুলছে!
ডোঙা-ডিঙি, সালতি, জং পালোয়ার—
লঙ্গর-লগি ফেলে থাক্‌ একবার,
বাই-না ভুর্কিসে পাশ দে' তার,
তরতর বেয়ে যাক্‌ গতি দুর্বার!
(হো—হো—হোঃ! হো—হো—হোঃ!)

ওই দেখ্‌ ঝুলছে নয়া ঝক্কা-ঘাট,—
চলো ঝট্‌ নিতে হবে বাড় চট্‌পট্‌।
দুর্বল ন'স তোরা নমশূদ্র,
ক্ষত্রের বল্‌ ধর গায়ে রুদ্র!
জেলে-জোলা মালী-মাল রাজবংশী—
জল কেটে পথ কর যা' ধ্বংসি!
শাস্ত্রের বিধি সব দে উল্টে
বৈঠার ঘা দিয়ে ভেঙে ভুলটে!
সামলে নে না-টা বাঁক ফেরে ফের্‌,
ওই ঘাট—আড়-ঘাট—ওই ঘাটে ভেড়্‌,
(হো—হো—হোঃ! হো—হো—হোঃ!

তোর পিতে-পিতেমো ধ'রে বৈঠা,
ঘাঘরের জলে নেমে নে'ছে খৈ-টা!
তোমরা কি কম কিছু তা'র চে' ভাই?
বাহ-বাহ-বাহ নাও-চলধাওয়াধাই!
ওই শোন্‌ জাঁক দেয় উলু-উলি রব,—
মঙ্গল-ঘট থুয়ে করে কলরব।
চন্দন সিন্দুর ল'য়ে ফিরছে,—
এয়োতিরা দলে দলে ঘাটে ভিড়ছে।
গাও জয় মনসার আজ গাজনে,—
তুলে দাও নাওখান শেষ শাজনে!

ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং—
লঙ্গর-লাগ তোল পালোয়ার জং!

চিত্‌সীর মেয়ে বৌ-ঝিরা সবে,—
আমতলা ঘাটে মাতে উৎসবে।
গুখিয়ার ডিঙি জয়ী আজ বাঁচে,
জাঁক দিয়ে পাড়া-পড়সীরা নাচে।
মঙ্গল-ঘট মাথে নিয়ে তারা
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরে পাড়া-পাড়া।
পাট-শাড়ি প'রে আড়-বেঁকী পায়ে,
এঁকে-বেঁকে চলে বিয়ালের বায়ে।
তারকাটা-বাজু কঙ্কণচুড়ে,—
পয়ালের মালা তুলে গলা জুড়ে,—
চৌদানী হাতে শাঁখা ঝলমলে,—
ঝমঝম্‌ তোড়া বাজে পা-র তলে;—
দাঁড়াইল আসি' গুখিয়ার আগে,
ছল ছল দিঠি প্রেম অনুরাগে।
গুখিয়ার নামে বন্দনা করি'.

হেসে কুটিকুটি গায়ে গায়ে পড়ি'!
বলে,—জয় জয় জয় গুখি সাহা
কব জিতে এত জোর ধরো [illegible]—বাহা!
তব নামে মাঝী জয় গেছে লুটে,
[illegible] উজলিয়া—উঠে!

বিন্দু ও ত্রিভুজ

শ্রীচিত্রিতা দেবী

আবার সেই চিরকালের পুরানো ত্রিভুজ—এ গল্প শুনিয়া শুনিয়া কাণ পচিয়া গিয়াছে—এখন নূতন কিছু বল। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম যত খুসী ভুজ লইয়া গল্প বল আপত্তি নাই—কিন্তু দোহাই, তোমার ঐ ত্রিভুজটার কথা আর বলিও না। বন্ধুবর চটিয়া বলিলেন—বাছ, তোমার আর গল্প শুনিয়া কাজ নাই। রোজ রোজ নতুন গল্প কোথায় পাইব? বার বার একই গল্প বলিতে বিধাতার তো কোন বিরক্তি নাই—তবে তোমার শুনিতে আপত্তি হইলে চলিবে কেন বাপু? চিরকালের পুরানো সূর্য্যটা তোমার চোখ পচাইয়া দিয়া [illegible] যে তোমার পছন্দ মত খান-কয়েক নূতন সূর্য্য আকাশময় ছড়াইয়া পড়িবে এমন সম্ভাবনা তো দেখি না। কাজেই আর বৃথা বাক্যের জাল বিস্তার করিও না, যাহা বলি শুনিয়া যাও। তবে আমি তোমাকে একেবারেই বঞ্চিত করিব না—কিছু নূতনত্ব আছে। বাসি ভাতের উপর একটুখানি কাসুন্দি।

কি রকম! কি রকম! বন্ধুকে উৎসাহ দিবার জন্যে অবহিত হইবার ভাণ করি। ইহা কেবলি সাধারণ ত্রিভুজ মাত্র নহে—এর ভিতরে আছে একটি বিন্দুর কাহিনী।

[illegible]? অর্থাৎ, বন্ধু বলিলেন—[illegible] একটি বিন্দু। [illegible]

এক দিন বিধাতার চক্রান্তে সে কেমন করিয়া একটা সমকোণ ত্রিভুজের চিরন্তন গতির মধ্যে আটকা পড়িয়া যায়, কে জানে। এই ব্যূহ হইতে অভিমন্যুর মত সে বাহির হইবার পথ জানিত না। তাহার প্রাণ চাহিত মুক্তি—তাহার বুদ্ধি চাহিত স্বাভাবিক শান্ত জীবনের সহজ সরল রেখাটি ধরিয়া চলিতে—কিন্তু তাহার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা—বুদ্ধির অগম্য তাহার নিগূঢ় চেতনা এই ত্রিভুজের গতির ছন্দে নাচিতে নাচিতে ছুটিতে থাকিত এবং কোন মতেই ইহার বন্ধনসীমা অতিক্রম করিতে চাহিত না।

মূঢ়ের মত আবার প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—অর্থাৎ?

বন্ধু বলিলেন—অর্থাৎ, তোমার ঘটে অতটুকু বুদ্ধি নাই—এখনো বুঝিলে না অবন্তী একটি নারী।

সত্য কথা বলিতে কি, ব্যাপারটা এতক্ষণ ভাল বুঝিতে পারি নাই। কালিদাসের আমলের পুরানো সহরটার সহিত মানুষের অস্তিত্ব মিশিয়া কেমন এক রকম গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে কথা না মানিয়া, নিজেকে বুদ্ধিমান্ প্রমাণ করিতে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিলাম—আঃ, সে কথা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি—কিন্তু তার পর?

বন্ধুবর আরম্ভ করিলেন—এক সময়ে এই সহরে অবন্তী নামে এক নারী বাস করিত। সে যুবতী, কিন্তু সে হয়ত রূপসী নয়, নাক-চোখ মুখের মাপে হয়তো তাহাকে লোকে সুন্দরী বলিবে না; কিন্তু তাহা না হইলেই বা কী! তাহার দীঘল শ্যামল দেহবল্লরী ঘিরিয়া চল-চল লাবণ্যের ঢেউ দুলিয়া দুলিয়া নাচিত। তাহার চলনে, বলনে, ভঙ্গীতে প্রতি মুহূর্তে উচ্ছল প্রাণস্রোত তাহার রূপের দীনতা অতিক্রম করিয়া ঝরিয়া পড়িত। তাহার অস্তিত্বের এই আকর্ষণের বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সুন্দরীরাও তাহাকে ঈর্ষা করিত এবং সুন্দরীদের গোবেচারী স্বামিগণ স্ত্রীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই তাহাকে অবহেলা করিতে পারিত না।

অবন্তী বুদ্ধিমতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার উত্তীর্ণ হইতে যতখানি বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশী বুদ্ধি সে রাখিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহের ছাপ তাহার না থাকিলেও সরস্বতীর কৃপা হইতে সে বঞ্চিত নয়। তাই ছাপমারা বিদুষীরা অবজ্ঞাভরে নাক সিঁটকাইলেও তাহাদের স্বামীরা অবন্তীর বিষয়ে কথা কহিতে শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়িত।

অবন্তী হৃদয়বতী।

সাধারণ রমণীরা কেবল একটি ছোট সংসারে স্বামী এবং গুটিকয়েক কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া যে হৃদয়বৃত্তির চর্চা করিয়া থাকে, তাহার চেয়ে অনেক সরল হৃদয়ের অধিকারিণী। তাই বিদ্বেষপরায়ণা স্ত্রীরা যখন তাহার চরিত্র সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিত, তখন স্বামীরা ব্যথিত হইয়া বলিত—আহা চুপ কর, যে কথা বোঝ না তাহা লইয়া আলোচনা করিও না। সকলের নাড়ীর বেগ সমান তালে চলে না—সকলের অনুভূতি সমান প্রবল নয়।

স্ত্রী বর্ণনা এ যুগে অচল। অতিষ্ঠ হইয়া বলি, সব তো বুঝিলাম, এখন গল্পটা কোথায়? বিন্দুর কথাই তো সাত কাহন করিয়া কহিলে—ত্রিভুজের দেখা তো মিলিতেছে না?

মিলিবে, মিলিবে। বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, এখনি ত্রিভুজের দেখা মিলিবে—অত ব্যস্ত হইও না। এখনি ত্রিভুজ ধীরে আসিয়া তাহার ত্রিবাহু বিস্তার করিয়া বিন্দুকে ঘিরিয়া ফেলিবে, তাহার আর উদ্ধারের কোন উপায় রহিবে না।

হায়! আমারও উদ্ধারের উপায় রহিল না। এই উদ্ভট জ্যামিতিক গল্প আমাকে শুনিতেই হইবে।

তার পরে…?

তার পরে, এক দিন আলো জ্বলিল, বাঁশী বাজিল, শুভলগ্নে শুভহিবুক যোগে, বহু দিন হইতে অবন্তী যাহাকে ভালবাসিত, তাহারই সহিত এক দিন তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

বল কি? প্রথমেই বিবাহ—ত্রিভুজ কোথায়?

আঃ, তুমি একেবারে মূর্খ! তোমার মত নিরেটের কাছে এ গল্প বলিয়া বেণা-বনে মুক্তা ছড়াইব না। আমি কিছুই বলিব না।

বহু কষ্টে বন্ধুর মান ভাঙাইলাম। আবার বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সহরের প্রান্তে নিভৃত একটি ছোট কুটীরে অবন্তীর স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর বাঁধিল। অবন্তীর স্বামী বলিয়া তাহাকে নিতান্তই স্বামী মাত্র মনে করিও না। তাহারও স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ছিল—তাহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। শিল্প-জগতে সে বিস্ময় আনিয়াছিল। সে শিল্পী। সে কবি। কথায় বলে, অর্থ ও যশ পরস্পরকে বহন করিয়া আনে, কিন্তু তুমি জান, এ পোড়া দেশে তাহা হইবার যো নাই। অবন্তীর স্বামী যশস্বী হইলেও অর্থবান্ ছিল না। বাণীর সেবিকা অবন্তীরও গৃহিণীপণায় মন ছিল না। কাজেই তাহাদের সংসারটির অবস্থা বুঝিতেই পার। চারি দিকে সমস্তই নিতান্ত এলো-মেলো ভাবে ফেলানো-ছড়ানো থাকিত। দেখিলে মনে হইত, এইমাত্র বুঝি কেহ বিদেশ হইতে বেড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কিছু আসিয়া যাইত না। তাহাদের বুদ্ধি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া এমন একটি আশ্চর্য্য মিলনস্বর্গ গড়িয়া তুলিয়াছিল যেখানে এই সব সাংসারিক খুঁটিনাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অর্থের অপ্রাচুর্য্য অথবা ব্যবস্থার অভাব, কিছুই তাহাদের সেই স্বর্গটিকে আঘাত করিয়া পীড়িত করিতে পারিত না। দুপুরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্বামিত্র কী একটা কাজে বাহিরে যাইত—ইহা ছাড়া সমস্ত ক্ষণ তাহারা শিল্পচর্চ্চা করিত, পরস্পরের লেখা লইয়া আলোচনা করিত, সৎসাহিত্যের রস দু'জনে মিলিয়া একসঙ্গে পান করিত এবং এমনি করিয়া এক-একটি দিন এক-একটি মুহূর্ত্তের মত কাটাইয়া দিত। অবন্তীর আনন্দমুখর দিনগুলি প্রজাপতির মত বিচিত্র রঙিন পাখা মেলিয়া উড়িতে লাগিল।

অবন্তী মনে করিল, সে সুখী। শ্বশুর-শাশুড়ীর বালাই অবন্তীর নাই। তবু কোথা হইতে এক খুড়ী-শাশুড়ী খুড়তুতো দেওরকে লইয়া হঠাৎ এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহরেই কোথায় না কি দেওরের খুব ভাল কাজ হইয়াছে।

বহু দিন পরে আত্মীয়ের মুখ দেখিয়া বিশ্বামিত্র উল্লাসিত হইয়া উঠিল। নিজে বাজার করিতে গেল এবং উৎসাহের আতিশয্যে একেবারে দশ টাকার বাজার করিয়া আনিল। এদিকে অবন্তীর ঘর-বাড়ীর অবস্থা এবং আচার-বিচারে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখিয়া খুড়ীমা বিস্মিত হইলেন এবং নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গোপনে পুত্রকে বলিলেন—এখানে আমি কোন মতেই থাকিতে পারিব না। পুত্র

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দেখি, যদি কোন ব্যবস্থা না হয় তবে অগত্যা তোমাকে দেশে পাঠাইতেই হইবে।

বিশ্বামিত্র কিন্তু মনে মনে খুশী হইয়া উঠিল। তৃতীয় ব্যক্তির যোগদানে তাহাদের দ্বৈত সভাটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে এবং অবন্তীরও এক জন ফরমাস খাটিবার লোক জুটিবে—এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া এক দিন বিশ্বামিত্র কহিল—কেমন, বাড়িভাড়া করিবার সখ মিটিয়াছে তো? কোথায় বাড়ী পাইবে এই বাজারে? বোধ হয়, রাস্তার ধারের গাছগুলা ভাড়া খাটিতেছে। তার চেয়ে এইখানেই নিশ্চিন্ত মনে রহিয়া যাও। অবন্তী হাসিয়া কহিল—খুড়ীমা তো আদর দিয়া ছেলেটির মাথা খাইয়া রাখিয়াছেন, এখন আমার হাতে পড়িয়া ঠাকুরপোর কষ্ট হইবে। পরিহাস ভরে উক্ত হইলেও কথাটা সত্য। ঠাকুরপো আবার চারি দিক্ চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে এক দিন পুত্রকে অবন্তীর হাতে সমর্পণ করিয়া সন্ত্রস্ত চিত্তে লক্ষ বার বিপত্তারিণীকে স্মরণ করিয়া, খুড়ীমা এই অনাচারের কুঠী হইতে পলাইয়া বাঁচিলেন। অবন্তী সাধ্যমত প্রিয়তোষের যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। স্বামীর জন্ত কখনো তাহাকে কিছু করিতে হয় নাই। রান্নার ভাল-মন্দ লইয়া বিশ্বামিত্রের কোন অনুযোগ ছিল না। পেট-ভরানো ছাড়াও খাদ্যের যে আর একটা সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য আছে, সেদিকে মন দিবার অবকাশ তাহার ছিল না। জামা যেমন হোক্ একটা পাইলেই তাহার চলিয়া যায়। কিন্তু প্রিয়তোষের মা অবন্তীকে একটি দামী সাড়ি উপহার দিলেন এবং তাহার হাতে ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বার বার বলিয়া দিলেন—বৌমা, দেখিও, উহার খাওয়া-দাওয়ার একটু যত্ন করিও। আহা! বাছা আমার নানা রকম খাইতে ভালবাসে, উহার যেন পেট ভরিয়া খাওয়া হয়, আর উহার জামায় যেন বোতাম পরানো থাকে, আর স্নানের ঘরে তেলের শিশিতে যেন তেল থাকে। মাথা খাও, এইটুকু তুমি দেখিও।

অবন্তী প্রিয়তোষের যত্ন আরম্ভ করিবা মাত্র সে অসহায় শিশুর মত তাহার হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাকে বার বার ডাকিয়া খাইতে বসাইতে হয় এবং কাছে বসিয়া এটা খাও, ওটা খাও—ভাত ক'টা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না—ঝোল দিয়া খাইয়া ফেল, তরকারীটা বুঝি ভাল হয় নাই—তবে ফেলিলে কেন,—এমনি করিয়া খাওয়াইতে হয়। তাহারই আপিসের তাড়া, অথচ তাহার স্নানের তাগিদ্ দেওয়া অবন্তীর কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রিয়তোষের জন্তে অবন্তীকে ঘর-দ্বার সাজাইতে গুছাইতে মন দিতে হয়। কারণ, প্রিয়তোষ প্রায়ই এটা-ওটা জিনিষ কিনিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলে এবং সেই সব জিনিষ অদল বদল করিয়া, বারে বারে নতুন ধরণে ঘর সাজাইতে তাহার বড় ভাল লাগে। বিরক্ত বিশ্বামিত্র নিত্য-নূতন হাঙ্গামায় অস্থির হইয়া বারান্দায় একটি কোণা আশ্রয় করিয়া লেখার মধ্যে ডুবিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অবন্তীকে প্রিয়তোষের এই খেলায় যোগ দিতেই হয়; ক্রমে সে আবিষ্কার করে, এই খেলার মধ্যে ভারী একটা মজা আছে।

এখন আর প্রিয়তোষকে অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতে হয় না—অবন্তী সারা সকাল নষ্ট করিয়া তাহার জন্তে মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রিয়তোষের জামায় বোতাম লাগাইয়া, তাহার জন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিয়া, তাহার ঘর গুছাইয়া অবন্তীর দিনগুলি যেন লঘুপক্ষ মেঘের মত উড়িয়া যাইতে লাগিল।

সাহিত্য-সভার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ছেদ পড়িতে লাগিল। কত দিন সকাল বেলা একা একা প্রুফ দেখিতে দেখিতে বিশ্বামিত্র বার বার দ্বারের দিকে চাহিয়াছে—কিন্তু অবন্তী তখন রান্না-ঘরে চাটনী তৈরি করিতে ব্যস্ত। কত দিন গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনশেষে ফুলের গন্ধভরা শান্ত সন্ধ্যায় দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া এলিয়েটের নবতম রচনার স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অবন্তীর জন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিয়াছে, সে শোবার ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া প্রিয়তোষের কাছে কাপড় কুঁচাইতে শিখিতেছে এবং তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া তাহাদের দু'জনের সম্মিলিত উচ্চহাসি জানলার ফাঁকের দক্ষিণা বাতাসকে আকুল করিয়া দিতেছে।

বিশ্বামিত্রের স্বভাবে জোর করিবার তাগিদ ছিল না। অবন্তীর ভাল না লাগিলেও তাহাকে জোর করিয়া কবিতা পড়িয়া শুনাইতে হইবে অথবা তাহার ছবির মডেল হইয়া বসিতে হবে—এ কল্পনা তাহার সাধ্যাতীত। অবন্তীর বিরহে সে কাতর হইলেও, তাহার কবিপ্রাণ সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিল না। বৃহত্তর মুক্তির দিকে সে স্বভাবতঃই নিজেকে অগ্রসর করিয়া দিল। সে নিজের লেখার মধ্যে—নিজের ছবির মধ্যে একাকী অবগাহন করিতে লাগিল। তবু মাঝে মাঝে তাহার চিত্ত মথিত করিয়া অন্তরের শিরাগুলি জ্বালায় অস্থির হইয়া, ফুলিয়া ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন অবন্তীর সেদিকে দৃষ্টি দিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রিয়জনকে সেবা করিতে লোকের ভাল লাগে, কিন্তু সেবা করিতে করিতে যে কেউ প্রিয় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা আগে কখনো শোনা যায় নাই। এখন প্রিয়তোষকে ছাড়ার কথা অবন্তী ভাবিতে পারে না। সে যদি কখনো বাড়ী খুঁজিয়া পায় তবে কি হইবে, এ কথা ভাবিতে গিয়া অবন্তীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। মানুষের ছোট-খাট নানা ধরণের পরিচর্য্যার মধ্যে, তাহার খুঁটিনাটি সেবার মধ্যে, তাহার প্রত্যেকটি তুচ্ছ আবদার রাখিবার মধ্যে যে এত আনন্দ জমা থাকিতে পারে তাহা কি অবন্তী জানিত? একাকী বসিয়া ধ্যান করা চলে, কিন্তু সাহিত্যের রস-সম্ভোগে সঙ্গীর প্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন যশের ফেনিল মদিরা পাত্র ভরিয়া ঠোঁটের কাছে আগাইয়া আসিল, তখন বিশ্বামিত্রের সাধ জাগিল, পাঁচ জন সাক্ষী রাখিয়া তাহা পান করে।

বিশ্বামিত্রের দক্ষিণের বারান্দায় ঘন ঘন সাহিত্যের বৈঠক জমিয়া উঠিতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধবেরা অবন্তীর পরিবর্ত্তনের কথা কিছুই জানিত না, তাহারা তাহাকে খুঁজিয়া-পাতিয়া ধরিয়া আনিয়া একেবারে মাঝখানে বসাইয়া দিত। তাহাকে বাদ দিয়া বিশ্বামিত্রের বাড়ীতে যে কোন কিছু ঘটিতে পারে, এ কথা কাহারও কল্পনাতেও আসিত না। বহু দিন ধরিয়া সাহেব-বাড়ীর সিদ্ধ তরকারীর পরে ঝাল-চচ্চড়ি লোকে যেমন উপভোগ করে, তেমনি করিয়া অবন্তী এই বৈঠকগুলি আস্বাদ করিতে লাগিল। শিল্পলক্ষ্মীর প্রভাব আবার তাহার মধ্যে কাজ করিতে শুরু করিল। কিন্তু এবারে তাহার গতি মন্দ, ছন্দ ধীর। উল্লসিত বিশ্বামিত্র আত্মহারা হইতে গিয়া ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল সে প্রিয়তোষকে ভোলে নাই। উহারই মধ্যে সে প্রিয়তোষের খাবার ঠিক করিয়া, আবদার করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া, তাহার পোষাক গুছাইয়া, তাহাকে আপিসে পাঠাইয়া, তবে বিশ্বামিত্রের লেখার প্রুফ দেখিতে বসে। প্রিয়তোষের জন্ত স্কার্ফ বুনিতে-বুনিতে অথবা

তাহার পানের সুপারী কুঁচাইতে কুঁচাইতে সে বিশ্বামিত্রের কবিতা শোনে। শুনিতে শুনিতে যখন তাহার মুখে স্বপ্নাবেশ ঘনাইয়া আসে, হাত আপনি স্তব্ধ হইয়া কোলের উপর পড়িয়া যায়, আশান্বিত বিশ্বামিত্র ভাবে, ওষুধ ধরিয়াছে। আবার রাত্রি বেলা হতাশ হইয়া দেখে, সেই একই খেলার পুনরভিনয়—হয়, অবন্তী প্রিয়তোষের বিছানা ঝাড়িয়া পরিপাটী করিয়া মশারি গুঁজিয়া দিতেছে কিম্বা সুগন্ধি মসলাযুক্ত পান তাহার মুখের মধ্যে পূরিয়া দিতেছে।

এমনি [illegible] দিন যায়। ত্রিভুজের দুইটি বাহু যখন ক্রমশ পুষ্ট পরিপূর্ণ [illegible], তখন একটা কুক্ষণে তৃতীয় বাহুটি আসিয়া উদয় হইল।

লম্বা [illegible] চেহারা—ঘন মোটা চুল পেছন দিকে ব্যাক-ব্রাশ করা, [illegible] পুরু, কিন্তু তীক্ষ্ণ নাক এবং চওড়া কপাল, মুখে বর্মা চুরুট—ধনীবংশীয় নিষ্কর্মা আধুনিক কায়দা-দুরস্ত অবনীশ চৌধুরী এক দিন বিশ্বামিত্র রায়ের সাহিত্য-সভায় আসিয়া যোগ দিল। ছোট বেলায় কবে না কি তাহারা একসঙ্গে স্কুলে পড়িত, সেই সূত্রে নতুন আলাপ জমিয়া উঠিল। অবনীশের অন্তরে ছিল সাহিত্যিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা; বিশ্বামিত্রের মনের গহনে গোপনে ছিল ধন ও প্রতিপত্তির প্রতি সহজাত মোহ। কাজেই দেখিতে দেখিতে দুই জনে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল।

অবনীশকে দেখিবা মাত্র অবন্তীর বুকের ভিতরে কি যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, হঠাৎ যেন একটা কালো ধূমকেতু আসিয়া পরিচ্ছন্ন আকাশের প্রান্তে দেখা দিয়াছে।

অবনীশ প্র্যাকটিক্যাল—সে কাজের লোক। ভাবের চেয়ে বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল বেশী। বন্ধু-গৃহে কাব্যের রসপানের চেয়ে কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ তাহার বেশী কাম্য ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবন্তী কোন মতেই তাহাকে ধরা দিল না। অবনীশকে দেখিলেই অবন্তীর শরীরময় রক্তস্রোত কেমন দাপাদাপি করিতে থাকিত, তাহার গম্ভীর গলার মৃদু অথচ পরিব্যাপ্ত আওয়াজে অবন্তীর বুকের মধ্যে কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিত। সে পলাইয়া গিয়া প্রিয়তোষের বাগ-উদ্যান কিম্বা বিশ্বামিত্রের প্রুফ দেখার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিত। বহুক্ষণ পরে উঠিয়া দেখিত, চিত্ত শান্ত হইয়াছে।

একদা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে রৌদ্রে যখন চারি দিক্ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, এবং ক্বচিৎ দু'-একটা কাক কা-কা করিয়া এধার ওধার উড়িয়া যাইতেছে, যখন আপনার নিভৃত ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া একটা ছায়া-ঘন অন্ধকার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আধ-শোয়া ভাবে অবন্তী তাহার নতুন গল্পের প্লটটি লইয়া হিমসিম্ খাইতেছে, তখন সহসা দ্বারের বাহিরে পরিচিত মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। বিস্মিত অবন্তী তাড়াতাড়ি বেশ-বাস সম্বরণ করিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কোন মতে চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া দিল। নিখুঁত গরদের স্যুট-পরা ঘন সুগন্ধ তাম্রাভ চুল পিছন দিকে উল্টানো, অবনীশ চৌধুরী মৃদু হাস্যে মাথা নত করিয়া বিলাতী কায়দায় অবন্তীকে অভিবাদন করিল। ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়া উঠিয়া অবন্তী স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দেখুন তো কী মুস্কিল? এ সব কি আমাকে পোষায়? পোড়া মুলুকে আসিয়া আমাকে অবধি কাজের লোক করিয়া তুলিল। কারখানার নানা কন্ট্র্যাক্ট লইয়া এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে ঘুরিয়া মরিতে হইতেছে। বাঃ! আপনার ঘরটি কী সুন্দর—কি চমৎকার নরম কোমল অন্ধকার আর কেমন ঠাণ্ডা। এদিকে বাহিরে চাহিয়া দেখুন, দিগন্ত পুড়িতেছে খাঁ-খাঁ করিয়া, চোখ জ্বালা করিয়া ওঠে রৌদ্রের তেজে। সত্যিই জগতে আপনারাই সুখী। ও কি অমন চুপ করিয়া আছেন কেন? এক গ্লাস জলও কি দিবেন না? একটু বসিতেও কি বলিবেন না? অবনীশের কণ্ঠে অভিমান স্ফুরিত হইল। লজ্জিত হইয়া অবন্তী বলিল, অবশ্যই।

ঘরের মধ্যে আসিয়া অবনীশ আরাম করিয়া বসিল।

প্রিয়তোষের জন্যে বরফে ভেজানো কাঁচা আমের সরবৎ তৈরী করাই ছিল। মৃদু চুমুকে ধীরে ধীরে তাহা পান করিতে করিতে অবনীশের তীক্ষ্ণ আঁখি তীব্র দৃষ্টির সার্চলাইট ফেলিয়া অবন্তীর চোখের মধ্যে সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত অবন্তী চাহিয়া রহিল, কোন মতেই দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

অবনীশ বুদ্ধিমান্—সে এই সংসারটাকে ভালো মতে চিনিত। অজস্র স্তুতিবাদে সে অবন্তীকে প্লাবিত করিয়া দিল এবং নানা উপলক্ষে নানা রকমের অসংখ্য উপহারে অবন্তীর অঙ্গ ভরিয়া, তাহার আলমারী বোঝাই হইয়া উঠিতে লাগিল। অবনীশ শুধু অবন্তীকে উপহার দিয়াই ক্ষান্ত হইল না—বিশ্বামিত্র ও অবন্তীর প্রতিভাকে নিজ নাম-সহযোগে নানা দিক্ দিয়া অর্থবহ করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল—রাজা মহারাজার দল বহু অর্থের বিনিময়ে প্রিয়তোষের চিত্রলিপি লাভ করিতে লাগিল এবং প্রকাশকেরা টাকার অঞ্জলি বাঁধিয়া তাহাকে সাধাসাধি করিতে লাগিল। ইহাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রিয়তোষও যে কেমন করিয়া হঠাৎ অবন্তীর ফরমাশ খাটিতে খাটিতে যুক্ত হইয়া পড়ে তাহা সে নিজেও জানে না। তবু মাঝে মাঝে তার ঢিলা হইয়া কোথা হইতে বেসুরা রাগিণী ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া ওঠে। প্রিয়তোষ বুঝিতে পারে, তাহার আর সেদিন নাই। তাহার সেবার মালাটি অবন্তীর হাত হইতে বার বার ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। হারানো সূত্রটি খুঁজিয়া পাতিয়া আবার মালাটি গাঁথিয়া তুলিতে বড় দেরী হইয়া যায়। কত দিন দশটা বাজিয়া গিয়াছে অথচ স্নানে যাইবার তাগিদ না পাইয়া প্রিয়তোষের মনে হইয়াছে, বেলা বুঝি এখনো আটটার গণ্ডি অতিক্রম করে নাই। হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ায় চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাইতে গিয়া দেখিয়াছে—সেবিকা নাই, ঠাকুর খাবার লইয়া উপস্থিত। জানা যায়, আজকের সভায় এক জন নামজাদা সাহিত্যিক আসিবেন, তাহারই অভ্যর্থনার জন্য অবনীশের সহিত অবন্তী ফুল কিনিতে গিয়াছে মার্কেটে। এমনি করিয়া দিন যায়।

অবনীশের সংস্পর্শে অবন্তীর সমস্ত শরীর ঝিণ-ঝিণ করিয়া বাজিতে বাজিতে ঝরণার মত উচ্ছল হইয়া ওঠে। এই তীব্র অনুভূতির কথা অবন্তী সাহিত্যে অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাকে কখনো আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নাই। ক্রমে এমন হইল যে, অবনীশকে দেখিলেই তাহার সর্বাঙ্গ ঝিম্-ঝিম করিয়া আসিত। তাহার বুদ্ধি তাহাকে যুক্তি দিত পলাইয়া বাঁচিতে, তাহার ধমনীতে প্রবাহিত বহু যুগের সংস্কার তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিত—কিন্তু তাহার স্নায়ুতন্ত্রীর মর্মে মর্মে রুদ্ধ অবচেতনা আবার তাহাকে তার খুলিয়া বাহির করিয়া আনিত। দিনে দিনে অবন্তী আপনাকে এই

নতুন অনুভূতির তীব্র সুখের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করিল। ঘূর্ণীর মত অবনীশ তাহাকে এখানে-ওখানে লইয়া ঘুরিতে লাগিল। অবনীশের জন্ত সন্ধ্যার প্রভাতে তাহারই দেওয়া নানা ভূষণে সজ্জিতা হইয়া তাহার সহিত পিকনিকে গিয়া, সিনেমা দেখিয়া অবন্তীর দিনগুলি উদ্দাম দক্ষিণা বাতাসের মত একেবারে উধাও হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে শরৎকাল আসিয়া পড়িল। নীল আকাশের গায়ে শুভ্র মেঘের দল তুলার মত ফাটিয়া ছড়াইয়া গেল। চারি দিকের প্রকৃতি হইতে একটা শ্যামল সতেজ আভা বাহির হইয়া এই পুরানো সহরটার ইট-কাঠ বাহির করা জীর্ণ দেহের উপর সরস নবীনতার হিল্লোল বহাইয়া দিল। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া উৎসবের আগমনী সকলের চলায় ফেরায় ছন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সারা বৎসরের কর্মক্লান্ত দিনগুলির পরে ছুটির কল্পনায় অভিজাত কেরাণীর দল মাতিয়া উঠিল। এমনি সময়ে একদিন অবনীশ আসিয়া প্রস্তাব করিল—চল এই ছুটিতে সকলে মিলিয়া দার্জ্জিলিংএ ঘুরিয়া আসা যাক্। তিন জনে মিলিয়া আমরা একটি ছোট কুটীর ভাড়া করিব। বিশ্বামিত্র কবিতা শুনাইবে—প্রিয়তোষ বাঁশী বাজাইবে, আমি চুরুট খাইব আর তুমি মধ্যমণির মত সভা উজ্জ্বল করিয়া আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নব নব প্রেরণা যোগাইবে। এই লোক-জন ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির আড়ালে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রটি কেবলি হারাইয়া যাইতেছে। চল, তাহাকে নতুন পরিবেশে নতুন করিয়া গাঁথিয়া তুলি। অবন্তী উৎসাহিত হইয়া উঠিল—কিন্তু বিশ্বামিত্র কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে—আর প্রিয়তোষ এমনি নিশ্চুপ যেন তাহার অস্তিত্বই নাই।

ক্রমে ক্রমে দার্জ্জিলিং যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। অবন্তীর জন্তে নানা রকম কোট, ড্রেসিং গাউন প্রভৃতি আসিয়া জমা হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন সকাল বেলায় প্রিয়তোষ আসিয়া কহিল যে, সে একটি ভাল বাড়ী পাইয়াছে—সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত—মাকেও চিঠি লেখা হইয়া গিয়াছে—এখন কালই সে নিজের বাড়ীতে যাইতে চায়। বহু দিন পরে অবন্তী চাহিয়া দেখিল, প্রিয়তোষের মলিন পাঞ্জাবীর পকেটের কাছটা ছেঁড়া—এখানে ওখানে কালীর দাগ—বোতাম কতগুলি নাই—যেগুলি আছে সেগুলিরও অবস্থা শোচনীয়। তাহার রুক্ষ চুলে ধুলা উড়িতেছে, এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অবন্তীর হৃদয় শতধা ভাঙিয়া পড়িল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রিয়তোষের দক্ষিণ হাতটি জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—ঠাকুরপো, এ তুমি কিছুতেই করিতে পার না—না—না—কিছুতেই না। বল, বল, বল শীঘ্র—বল, তুমি কখনো যাইবে না—আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর, কখনো তুমি এ গৃহ ত্যাগ করিবে না—বল—বল—

অবন্তীর অবস্থা দেখিয়া প্রিয়তোষের দয়া হইল। মনে বুঝিল, এখনো ছাড়িবার সময় আসে নাই—কখনো আসিবে কি না তাই বা কে জানে। মুখে বলিল, আচ্ছা, তাহাই হইবে; কিন্তু এই ময়লা আচ্ছা, জামা-কাপড়গুলা আর তো পরি পারিতে না—তোমার বাড়ীতে ধোপার যাতায়াত বন্ধ হইল কেন? অবন্তী জোড় হাত করিয়া বলিল—ক্ষমা কর—আর এমন হইবে না। সারা দিন ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়া আবার সে প্রিয়তোষের অবস্থা প্রায় ফিরাইয়া আনিল।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় রান্না-ঘর হইতে অবন্তীকে খুঁজিয়া আনিয়া বিশ্বামিত্র বলিল—একটা কথা আছে।

তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অবন্তীর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহার মলিন বিষণ্ণ মুখে কিসের যেন ছায়া পড়িয়াছে। বহু দিনের হারানো কী একটা বেদনা তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিল। অবন্তীর মন কেমন করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিল—রাজা বাহাদুর—অমুক নারায়ণ একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুনিয়াছ তো? আমি তাহার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আজ তাহার মঞ্জুর-পত্র আসিয়াছে। পাঁচ বছর ধরিয়া আমেরিকায় বসিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা সম্বন্ধে রিসার্চ্চ করিতে হইবে। তোমার জন্তে ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি—তাহারা তোমাকে মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া যাইবে। এই বাড়িতেই থাকিও, তাহা হইলে সব দিক্ দিয়াই সুবিধা। আমার জাহাজ যাইশে ছাড়িবে। মধ্যে আর পনোরো দিনও সময় নাই—ইহারই মধ্যে সব কিছু গুছাইয়া লইতে হইবে। কাজেই আর আমার এবারে দার্জ্জিলিং যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। ক্ষমা করিও, তুমি প্রিয়তোষ ও অবনীশের সঙ্গে যত দিন ইচ্ছা ঘুরিয়া এস। আর মধ্যে মধ্যে খবর দিও। বিদেশে তোমার সংবাদের জন্তে উৎকণ্ঠিত থাকিব।

অবন্তী শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—বিশ্বামিত্রের সব কথা বোধ হয় তাহার কাণেও যায় নাই। তাহার সামনে সমস্ত জগৎ একান্ত মিথ্যা হইয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছিল। ব্যাকুল ভাবে অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু না বলিয়া দেরাজ হইতে কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া অবন্তীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—নাও, এইগুলি আলমারীর মধ্যে রাখিয়া দাও। ব্যাঙ্কের কাগজ—ইনসিওরেন্সের খবরাখবর—সমস্তই এইগুলির মধ্যে একসঙ্গে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

অবন্তী উপুড় হইয়া একেবারে বিশ্বামিত্রের পায়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয় গুমরাইয়া উঠিতেছিল। সে আর পারিল না—উচ্ছ্বসিত আর্ত্ত-কান্নায় তাহার সমস্ত শরীর বিশ্বামিত্রের পায়ের উপর খান্‌খান্ হইয়া টুটিতে লাগিল। অবন্তীর বক্ষ ফাটিয়া চূর্ণ হৃদয় ঝরিয়া পড়িল—ওগো, দয়া কর—দয়া কর আমাকে—আমাকে ক্ষমা করিও না—শাস্তি দাও, মার আমাকে—তবু দয়া কর আমাকে, একেবারে ত্যাগ করিও না, তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না। বিশ্বামিত্র মনে মনে বুঝিতে পারিল, এখনো ছাড়িবার সময় আসে নাই—কখনো আসিবে কি না তাই বা কে বলিতে পারে? মুখে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, তাহাই হইবে, এখন ওঠ তুমি—এমনি করিয়া কি পায়ের উপর পড়িয়া থাকিতে হয়? ওঠ, ওঠ—চল—কত দিন ধরিয়া আমার ক্রেফগুলি জমিয়া উঠিতেছে—তোমার নিপুণ হাতের স্পর্শে তাহাদের উদ্ধার কর। ঠিক এমনি সময় দ্বারের বাহিরে কাহার ছায়া পড়িল। অবনীশ ভিতরে আসিয়া কহিল—কী, তাহা হইলে দার্জ্জিলিং যাত্রার সমস্ত ঠিক তো? বিশ্বামিত্র একবার নতনেত্রা অবন্তীর অশ্রু-সজল আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর করুণায় বলিয়া উঠিল—সে তো সমস্তই ঠিক আছে—এখন ট্রেণে চাপিতে যেটুকু দেরী।

* * * *

এ কী ! বন্ধুকে থামিতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলি—থামিলে কেন—তার পর ? বন্ধু ভ্রুকুটী করিয়া বলেন—তার পর তুমি একটি নিরেট মূর্খ—ইহার পরে আর গল্প নাই।

বার বার মূর্খ অপবাদে চটিয়া উঠি, কিছু বলি না। বন্ধু দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলেন—সত্যই বলিতেছি, তাহার পরে আর গল্প নাই। শুধু তার পর হইতে ত্রিভুজের ত্রিসীম পথের অন্তহীন গতির মধ্যে বিন্দুর চলে নিরন্তর পরিক্রমা। সে কাহাকেও ছাড়ে না—তাহাকেও কেহ ছাড়িতে পারে না। বিদুষী অবন্তীর সাহায্যে বিশ্বামিত্রের কাব্য-সভা রমণীয় হইয়া ওঠে। গৃহিণী অবন্তীর পরিচর্য্যায় প্রিয়তোষের ঘর-দ্বার, বসন-ভূষণ সমস্তই পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিত হইয়া ওঠে আর প্রেমিকা অবন্তী অবনীশের আহ্বানে ময়ূরীর মত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া নাচিয়া ওঠে।

—এখন বল, ইহারও পরে তুমি কি প্রশ্ন করিবে—তার পরে ?

খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারি না, বলি—হাঁ ভাই, আরো একবার প্রশ্ন করিব—তার পরে তুমি এমন দরদ মাখিয়া একটি সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত মেয়েকে এতটা বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে কেন ? ত্রিভুজকে চতুষ্কোণ করিবার ইচ্ছা আছে না কি ? বন্ধু হাসিয়া কহিলেন—ঠিক ধরিয়াছ—ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাধ্য নাই। যখন কেবল দুইটি বাহু একটি মাত্র কোণ সৃষ্টি করিয়া পড়িয়াছিল, তখন একটা পথ খোলা ছিল। যে কেহ সমধর্মী তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা হইবার যো নাই। দৃঢ় বন্ধনে ত্রিভুজ পরস্পরকে বাঁধিয়াছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। কাজেই ওদিকে আর বৃথা দৃষ্টি দিই না। ছাতাটি খুলিয়া বন্ধুবর বাহির হইবার উপক্রম করিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কহিলাম—এখনি বাড়ী গিয়া কি করিবে ? চল না, একটু লেকের ধারে বেড়াইয়া আসি।

বন্ধুবর ইতস্তত করিয়া কহিল—একটা নিমন্ত্রণ আছে।

কোথায় ?—চকিত হইয়া প্রশ্ন করি।

পিছন ফিরিয়া চলিতে চলিতে বন্ধু বলেন—প্রসিদ্ধ শিল্পী—রায়ের বাড়ীতে ; তাঁহার শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায়—ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ—আর দেরী নাই।

বীর-বন্দনা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

রুচিমুখে যারা গেয়ে গেল জীবনের গান
আর হাসি-মুখে ফাঁসি-কাঠে দিল বলি প্রাণ—
গাও, আজি গাও তাহাদেরি জয়গান !

যাহাদের পানে চাহিল না কেহ ভুল করি একবার,
আর যাঁহাদের চিরতরে লুট হল আঁখিজল-পারাবার—
গাও, আজি গাও তাহাদেরি জয়গান !

মধু আর বিষ দুই-ই যারা অক্লেশে করে গেল পান,
তুচ্ছিলো জীবনের যত কোটি গান আর অভিমান—
গাও, আজি গাও তাহাদেরি জয়গান !

এই ধরণীর পথে খেলে গেল ফাগ, বুকেরি রক্ত নিয়া,
শূল-রোখ, রাঙা-চোখ, কভু ডরিল না অঙ্গুলী দিয়া—
গাও, আজি গাও তাহাদেরি জয়গান !

জীবন ? তারে চিনিয়াছে তারা সকলের বাড়া সুন্দর করি ;
তাহাদেরি পায় যৌবন-সন্ধ্যায় আমি কবি নতি করি।

বৈদিক সভ্যতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈদিক ধর্মে যেরূপ উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোনও ধর্মে তাহা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, অন্য ধর্মে বুদ্ধ ও খৃষ্টের ন্যায় সর্বত্যাগী ব্যক্তি আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মেই এমন সকল চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সংসারে থাকিয়াও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের দ্বারা তাঁহাদের লোকোত্তর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ লোক বুদ্ধ ও খৃষ্টের আদর্শের প্রশংসা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা ইহাও মনে করে যে, তাহাদের পক্ষে এত উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নহে। তাহাদের এইরূপ ধারণা থাকিয়া যায় যে, সংসারে থাকিলে বেশী ত্যাগ করা বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নহে। হিন্দুধর্মের আদর্শগুলি সাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। হিন্দু যখন শ্রীরামচন্দ্র ও ভীষ্মের আদর্শ দেখে, তখন সে মনে করে যে পিতার সুখের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করা কি মহৎ! মড়োবারের রাজদূত মাড়বার রাজকন্যার সহিত মেবারের যুবরাজ চণ্ডের বিবাহ প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু চণ্ড যখন শুনিল—পিতা পরিহাসচ্ছলেও ঐ কন্যার সহিত তাঁহার নিজের পরিণয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন চণ্ড সে কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল না, বৃদ্ধ রাণা বুঝাইয়া বলিলেন, এই কন্যার পুত্র হইলে সে রাণা হইবে ইহাই মাড়বার-রাজের আগ্রহের কারণ। তখন চণ্ড সহাস্য বদনে বলিলেন, "পিতা, আপনিই এই কন্যা বিবাহ করুন, তাহার পুত্রই রাণা হইবে, আমি আজ এই রাজসভায় সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া মেবারের রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলাম।" রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ভীষ্ম বা সতী সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর ন্যায় চরিত্র জগতের অন্য কোনও ধর্মে বা সাহিত্যে দেখা যায় না। রামায়ণের কাহিনীর সহিত ইলিয়ডের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতা দেবীকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেইরূপ মেনিলাসের পত্নী হেলেনকে পেরিস লইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া সীতা দেবীকে উদ্ধার করেন। সেইরূপ মেনিলাস পেরিসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া হেলেনকে উদ্ধার করে। উভয় গ্রন্থের গল্পের আখ্যান ভাগের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও আদর্শের মধ্যে কত বড় পার্থক্য! রাবণ সীতাকে লঙ্কার রাণী করিবার কত চেষ্টা করিল, সীতা এই প্রস্তাব ক্রোধে ও ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু হেলেন পেরিসের অঙ্কশায়িনী হইতে কোনই আপত্তি করিল না, আবার যখন মেনিলাস তাহাকে উদ্ধার করিল, তখন পুনরায় মেনিলাসের গৃহিণী হইল। পাতিব্রত্য ধর্মের ধারণাই নাই।

হিন্দুধর্মে এই সকল উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিয়া যাহাতে সর্বসাধারণের উপর এই সকল চরিত্রের পূর্ণ প্রভাব পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল চরিত্র যদি কেবল মাত্র ব্যাস ও বাল্মীকির গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিত, তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষে এই সকল চরিত্রের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হইত না। এ জন্য এই সকল কাহিনী বিভিন্ন কথিত ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। দোকানী দিবসের পরিশ্রমের পর কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস পাঠ শোনে, হইয়াছে, চিত্ত-বিনোদনের জন্য সিনেমা দেখিতে যায়, সেখানে পাশ্চাত্ত্য সমাজের জঘন্য চিত্র সকল দেখিয়া আমোদ পায়। কথকতায় দ্বারা আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার কিরূপ উত্তম ব্যবস্থা ছিল, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক লেখনীর রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বেদী পীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা-মালা শিরোপরি বেষ্টিত করিয়া নাদুস-নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর-সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ-পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য,—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বাঙ্গালী নব্য নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। * * অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট কদাচার দুরাশয় অসার অনাযোগ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।" কথক ঠাকুরের মুখে ধর্মকথা শোনা অপেক্ষা থিয়েটারে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের গান শুনিতে নব্য বাঙ্গালী ভালবাসিত, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য। তখনও সিনেমা হয় নাই। সিনেমার টিকিট সংগ্রহ করিবার জন্য যুবকের দলের প্রাণপণ আগ্রহ তিনি দেখেন নাই।

পুরাণের গল্পের মধ্য দিয়া কেবল উচ্চ আদর্শগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা হইত তাহা নহে, এই সকল গল্পের সাহায্যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের সহিত সর্ব-সাধারণের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইত। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক তত্ত্ব সকল উচ্চ-শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিরাও গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকলের সহিত সুপরিচিত। তাহারা জানে যে, এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, আমরা এখন যে কর্ম করিতেছি তাহার ফল যেমন পরে ভোগ করিব, সেইরূপ পূর্বে যে ভাল-মন্দ কর্ম করিয়াছি তাহার ফলে এখন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, যে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আমাদের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, ঈশ্বর লাভ না করিলে আমাদের পুনর্জ্জন্ম এবং দুঃখময় সংসার-ভোগ হইতে নিস্তার নাই। রামপ্রসাদের সাধন-তত্ত্বসম্বলিত সঙ্গীত, বাউলের আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীত—বাঙ্গালার মাঠে-ঘাটে গীত হয়। ভিখারী এক মুষ্টি চাউলের পরিবর্তে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অমূল্য রত্নরাজি বিতরণ করিয়া যায়। যাত্রা-গান-কথকতার সাহায্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের সুমহান্ চরিত্রগুলির প্রভাব হিন্দুর আপামর জনসাধারণের উপর পতিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে বেদান্তের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলির সহিত তাহাদিগকে সুপরিচিত করা হইয়াছে।

সর্বসাধারণের মধ্যে উচ্চ আদর্শ এবং ধর্মভাব প্রচার করিবার জন্য ভারতের কবি তাঁহার কবিত্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, শিল্পী তাঁহার শিল্প-শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, ভাস্কর তাঁহার ভাস্কর্য-কৌশল

রচনাগুলি ভগবানের অবতার সম্বন্ধীয়। সমগ্র ভারতে যে অসংখ্য দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির কালের প্রভাবে অথবা বিধর্মীর অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি এখনও ইহা বিদ্যমান, তাহা দর্শন করিয়া বিদেশী পণ্ডিত ও কলাবিদ্‌গণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কত অর্থ, কত পরিশ্রম এবং সর্বোপরি কত ভক্তিপূর্ণ সাধনার ফলে এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে, মন্দির-গাত্রে দেব-দেবী, মনুষ্য, পশু-পক্ষী প্রভৃতির অনুপম প্রতিকৃতি গঠিত হইয়াছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ তীর্থ-যাত্রী এই সকল মন্দির দর্শন করিয়া ভগবানের সেবাতে দেহ-মন এবং যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করাই যে জীবনের সার্থকতা এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। ভারতে যুগে যুগে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, অন্য কোন দেশে তত আবির্ভাব হয় নাই। ইহা এক দিকে যেরূপ ঐ সকল মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ জনসাধারণের মধ্যে সেই মহত্ব উপলব্ধি করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আমরা পূর্বে যে সকল কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহার দ্বারা ভারতের জনসাধারণের চরিত্র কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য সমান অবস্থায় হিন্দু এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জাতীয় ব্যক্তিগণের আচরণ তুলনা করা যাইতে পারে। রাজপুত জাতির ইতিহাসে দেখা যায় বার-বার সহস্র সহস্র রাজপুত জীবন বিসর্জন দিয়াছে তথাপি পরাধীনতা স্বীকার করে নাই। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহ এবং তাঁহার একাদশ পুত্র স্বদেশের স্বাধীনতার তরে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তাঁহাদের সহিত বহু সহস্র রাজপুত বীরও জীবন উৎসর্গ করিলেন। বাগ্‌জি, পুত্তজি, বাদল, জয়মল, চালাপতি মান্না প্রভৃতির কীর্ত্তি-কাহিনী চিতোরের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি যে বিশ্বযুদ্ধ হইল, তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের বীরবৃন্দের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন ত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, নরওয়ে যখন দেখিল যে, যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা নাই তখন অধীনতা স্বীকার করিল, রাজপুত বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল না। উভয় দেশের রমণীর চরিত্রের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শত্রু নগর অধিকার করিবে যখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না, তখন রাজপুত-রমণী সতীত্ব রক্ষার জন্য কত বার প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন,

"দেখ রে জগৎ মেলিয়া নয়ন
দেখ রে চন্দ্রমা দেখ রে গগন
স্বর্গ হতে চেয়ে দেখ দেবগণ
জলন্ত অক্ষরে রাখ রে লিখে।
স্পর্দ্ধিত জগৎ তোরাও দেখ রে
সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।"

কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এরূপ দেখা যায় না। শত্রু দেশ জয় করিল, দেশের রমণীবৃন্দ বিজেতা শত্রুসৈন্যের সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিল, সে মেলা-মেশার নাম দেওয়া হইয়াছে fraternization অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বকরণ, কিন্তু ইহা যে ভ্রাতা নামে কলঙ্ক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিছু দিন পূর্বে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডের কতকগুলি রমণী প্রকাশ্য সভা করিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের স্বামীরা যখন যুদ্ধ উপলক্ষে বিদেশে গমন করিয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইতেছেন, তখন স্ত্রীদিগকেও ব্যভিচার করিতে অধিকার প্রদান করা উচিত। বিগত দুই মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্য সমাজে যে ব্যাপক ভাবে দুর্নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে ইহা সুবিদিত। British Council of Churches একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার নাম Home and Family Life. তাহাতে লেখা হইয়াছে, "...The gravity of the situation of the family in Western society... No words can express the perils of disintegration of the family which confronts the modern world... the corrosive action of a completely secular view of life." অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজে পরিবারের অবস্থা ভয়াবহ হইয়াছে; আধুনিক জগতে পারিবারিক বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা কত বেশী তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না; জীবনকে কেবল ঐহিক দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে সমাজ ভাঙিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য সমাজের এইরূপ অবনতি সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক সমাজ-সংস্কারক পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে হিন্দু সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বৈদিক সভ্যতায় সামাজিক জীবনের সকল বিভাগে যেরূপ উচ্চ আদর্শ দেখা যায়, অন্য সভ্যতায় সেরূপ দেখা যায় না। যাত্রা-গান-কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই সকল উচ্চ আদর্শ হিন্দু জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ জন্য হিন্দুর চরিত্র এবং নীতিজ্ঞান অন্য জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নত। ইহার একটি কারণ, বৈদিক সভ্যতা যত দীর্ঘকাল জীবন্ত আছে, পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্যতা তত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে নাই।

ব্ল্যাক বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

সবিতা সহরের এমন একটা ফ্ল্যাটে থাকে, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বড় পার্কটা—শোনা যায় হট্টগোল হৈ-চৈ, সভা-সমিতির বক্তৃতা। সে যখনই সময় পায় ঝুল-বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় নীচের দিকে তাকিয়ে। শুধু পার্কটাই দেখা যায় না, দেখা যায় অবিরাম জন-জীবনের প্রবাহ। চার দিক্ থেকে-ধেয়ে এসে মিশেছে তাদের বাড়ীর তলায়—মানুষের পায়ে-চলা রাস্তার মোহানায়।

চলেছে কুলী, চলেছে কেরাণী, নিরীহ শ্রমিক অথবা পোষ্টাল পিওন নতুবা কোনও সাংবাদিক। যে যার কাজের চিন্তায় মগ্ন, কিন্তু পূর্ণ করে চলেছে সভ্য মানুষের অগ্রগতি—বিংশ শতাব্দীর প্রগতি। কারা তাদের চালায়, কেন তারা চলে, এ কথা হয়ত তারা ভাবে না, তবু এগিয়ে চলেছে সোজা-বাঁকা নানা দিকে যে যার অংশ পূর্ণ করতে। তারা শুধু চায় পেট ভরে খেতে, দম ভরে খাটতে।

কিন্তু সে আহার্য আজ নেই, সোনার ফসল-ফলা দেশ আজ কাঙাল। ভিক্ষাপাত্র পেতে চেয়ে রয়েছে পশ্চিমে। তবু তারা বিদ্রোহ করছে না। তাদের অস্থি-মজ্জার পুঁজি খুইয়ে স্বল্পাহারে থেকেও সেবা করে চলেছে প্রগতির। স্বাধীনতা তারা পেয়েছে, শান্ত-সুবোধ ছেলের মত মাথা পেতে নিয়েছে। ভাল-মন্দ বিচার পর্যন্ত করেনি।···

কিন্তু এই যে কোটি কোটি নর-নারী, এদের কাণ্ডারীরা নিশ্চিন্ত নয়। মনে আশংকা, হৃদয়ে উগ্র ভয়—কখন ফেটে ওঠে লাভা-স্রোত।

প্রলয়ের আলোড়ন ধামা-চাপা দিয়ে রেখেছে তারা। জানে—সত্যি করেই জানে, তাই প্রমাদ গণছে মনে মনে।

নইলে এ্যাসেম্ব্লিতে কেন এই ব্ল্যাক বিল?

আজ স্বল্পাহারে থেকেও কি শিল্পী সাজিয়ে দিচ্ছে না, গড়িয়ে দিচ্ছে না শ্রমিক, কবি কি দিচ্ছে না প্রাণ?

সাংবাদিক কি মুখর হয়নি? উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—তবু কি প্রয়োজন ছিল এই সর্বগ্রাসী বিলের? আমাদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে শিকল তৈরী করছে কাদের জন্য?···

আরও অনেক কথা বলেছিল কান্তি। তখন সবিতা তার মুখ-চোখে কি এক অনির্বচনীয় রক্তিম স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিল, তা সে প্রকাশ করে বলতে পারে না। সে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল। এত সুন্দর করে—এত আবেগ দিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারে তা সে জানল প্রথম সেদিন।

কান্তি চলে গেছে এই ব্ল্যাক বিলের প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু সবিতা কিছু ভুলতে পারেনি।

এই কান্তিকে পাওয়ার আশায়ই সে ভাল একটা চাকরির প্রলোভন ত্যাগ করেও এখানে রয়েছে।

দেওঘরে বসেও কান্তি তাকে ধরা দেয়নি, মেদিনীপুর থেকেও সে এড়িয়ে এসেছে। তবু আশায় বসে রয়েছে সবিতা। সে ধ্যান-মগ্না—কান্তিময় তার বিশ্ব-সংসার।

দশটা-পাঁচটায় সে আফিস করে। তার পর দাঁড়িয়ে থাকে এখানে এই ঝুল-বারান্দায়। প্রত্যাশার অঞ্জলি সে নিত্য পূর্ণ করে রাখে আগ্রহে, কিন্তু কান্তি আসে না—হঠাৎ হয়ত এক দিন আসে। সেই এক মুখে অধীর আবেগে বলে যায় যত বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-গাথা। সবিতা কিছু বলতে পারে না, শুধু নীরবে শুনে যায়।

কখনও এক কাপ চা সে দিতে পারে, কখনও পারে না—এর মধ্যেই উঠে পড়ে। সত্য সত্যই তার কাজের সূচী শুনলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, দৃক্‌পাত নেই বেশ-ভূষার দিকে—শুধু কাজ। পরের দুঃখ দূর করতেই যেন তার জন্ম, আপনার বলে কিছু নেই এ জগতে।

সবিতা দেখে এসেছে এক দিন, কোথায় এই কর্মীরা থাকে, কি খায়, কেমন করে চলে।

প্রকাণ্ড একটা হল-ঘর—ভাঙা, আস্তর খাওয়া শ্রীহীন পুরানো একটা দালান। তারই ভেতর কাতারে কাতারে দু'লাইনে বিছানা। দু'-দু'খানা কম্বল, হয়ত দু'-একটা বালিশ আছে কারুর, কারুর বা সে সব ঝামেলা নেই। দাড়ি কেউ কামায়, কেউ বা অবকাশ পায় না। এদিক্ ওদিক্ খাতা-পত্তর, দোয়াত-কলম, দামী দামী বইগুলো সব ছড়ান। অথচ এদের মধ্যেই
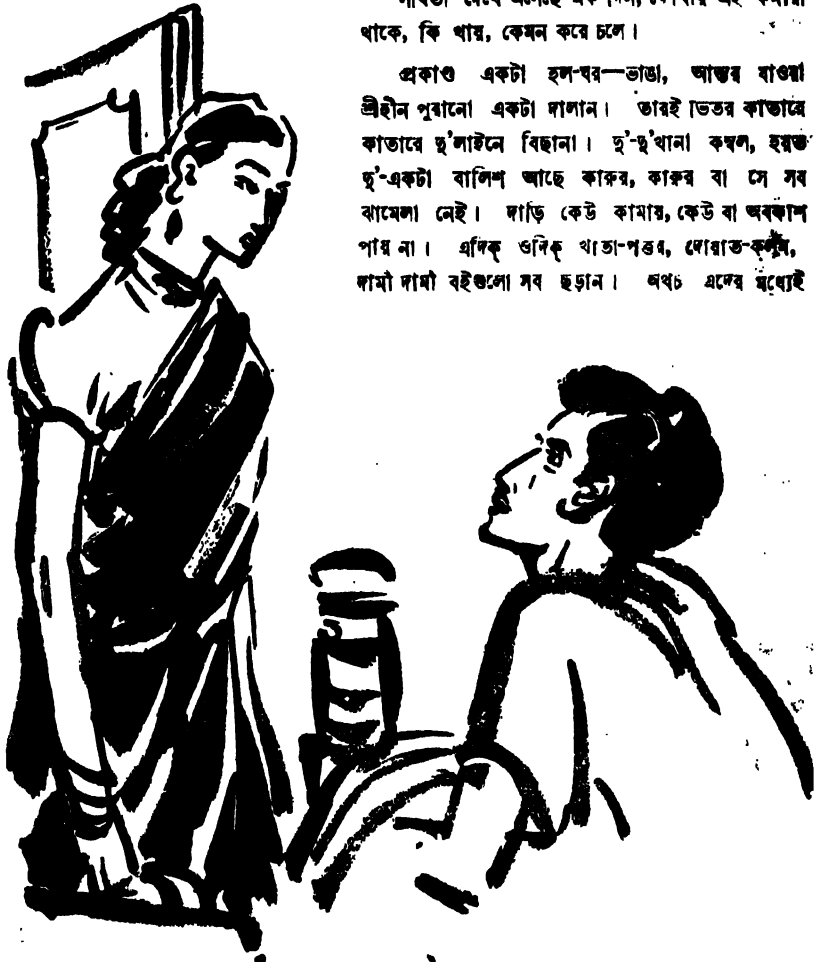
জ্ঞান কর্ম-সাধনা যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। কত পীড়ন নিষ্পেষণেও এরা ক্ষয় হয়নি। ক্ষান্ত হয়নি অন্তঃসলিলা বহুধারার মত জন-জীবন সতেজ রাখতে।

কান্তি এদেরই এক জন। সবিতা গর্ব বোধ করে—শ্রদ্ধা-বোধ করে।

সময় সময় সবিতা একটু একটু রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করে।

'তোমরা মন্ত্রীদের একটু সুস্থ হতে দাও—দেখো না তাঁরা কি করেন?'

'সবিতা, এখনও তাঁরা যদি সুস্থ হতে না পেরে থাকেন তবে আর কবে হবেন? আমরা তো সুস্থই ছিলাম, কেন তাঁরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেন? একে একে এই যে ক'টা মাস কি ভাবে কাটল তুমি কি জানো না? আমরা পচা চাল, ভেজাল ময়দা খেয়েও যখন চুপ করে তাদের ইচ্ছা ও ইংগিতে কাজ করে চলেছি, তখন কেন তাঁরা আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধার জন্ত তোড়জোড় করছেন?'

'কান্তি, খাদ্যাভাব এক দিন কিম্বা এক মাসে কি মেটান সম্ভব? বাইরের জগতের দিকে একবার চেয়ে দেখছ না? উপবাসে অনাহারে অর্দ্ধাহারে নিত্য কত লোক মরছে?'

'কিন্তু সেই শবের শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে আর এক দল তো ফেঁপে-ফুলে উঠছে। সে সব বড় কথা ছেড়ে দিলাম—ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই এসো। আচ্ছা, বাস্তবিক যারা সভ্যতার এবং সমাজের প্রাণ তারা যখন না খেয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে—এদেরই প্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা একটি বেলাও কি কম খেয়েছেন? কথাটা ভাল শোনাচ্ছে না, কি বলো? বালকের উক্তির মত কানে ঠেকছে, না সবিতা? কিন্তু চিন্তা করে দেখো, তার পর নীরবে অনুভব করে দেখো, কত মর্ম-স্পর্শী আমার কথা!'

'কিন্তু এ কি সম্ভব? তাঁরা না খেয়ে থাকবেন?'

'পুঁজিপতিরা না খেয়ে থাকবেন না। তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক বিলাস-ব্যসন অব্যাহতই থাকবে, তাদের বাহন মন্ত্রীরাও না খেয়ে থাকলে আমাদের জন্ত খাটবে কে? পুলিশ উপোস করলে শৃঙ্খলা রক্ষা করবে কে? শুধু না খেয়ে থাকবে অভাগারা, এ যুক্তি অকাট্যই বটে!…এঁরা যদি হাজার বছরের জন্তও মৌরসী পাট্টা নিয়ে গদি আঁকড়ে থাকে তবু সে দুর্গতি দূর হবে না, তা কি তুমি বিশ্বাস করো?'

'নানা বিশৃংখলা, নানা জটিলতা হঠাৎ সুরু করার আশা করাও তোমার উচিত না।'

কান্তি হেসে বলে, 'আমরা এঁদের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করিনি—তবু চুপ করে সময় দিচ্ছিলাম এঁদের। এঁরা যে কত অসহায় তা তোমরা জানো না, কিন্তু আমরা জানি।'

'এতটা তুচ্ছ করার কোনই অর্থ হয় না কান্তি! একটা রাজ্য শাসন সংরক্ষণ করা সহজ ব্যাপার নয়।'

'হ্যাঁ, সহজ নয়, যতক্ষণ স্বৈরাচারী নীতির অনুসরণ করে চলেন রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা। পথ একটা আছে, সে সহজ পথ তো এঁরা সজ্ঞানেই [illegible] সাধনা [illegible] এবং [illegible] জানি, চিরদিনই এঁরা তা চলবেন।

আর নিজেদের অক্ষমতার জন্ত কেবলই বড়বড় বুলি আওড়াবেন। তোমরা বিভ্রান্ত সবিতা, তাই কিছু বুঝতে চাচ্ছো না। নইলে তোমাদের চোখের ওপর দিয়ে এমন একটা কালো আইন পাশ করে নিয়ে যেতে চান, যাতে তোমরা আর টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারবে না।'

তবু সবিতা বিশ্বাস করতে পারে না, ভাল লাগে না কান্তির কথা। আজ সারা দেশ যাঁদের ওপর একটা আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে, তাঁদের প্রতি এ আচরণে মনে মনে পীড়িত হয় সে।

যাই কান্তি বলুক, তবু সে সুন্দর। দীর্ঘনাশা সুঠাম গড়ন—কান্তি অপূর্ব!

এক দিন সবিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আর কত কাল অপেক্ষা করে থাকব?'

'যত দিন না সুস্থ নর-নারীর মত দেশে আমরা বাস করতে পারি।'

সেদিন কি এখনও আসেনি? ভাবে সবিতা, জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু ভয় হয়।

না ফাঁকি দিচ্ছে তাকে, চলছে এড়িয়ে? ওরা সকলেই তো তাই। ওরা স্বাধীনতা আনবে কাদের জন্ত?…এত ভয়? সংসারের? পোষ্যের? দুর্ভাবনা ভবিষ্যতের?

তা এড়িয়েও তো সুখী হওয়া যায়। বিজ্ঞানের পূজারী ওরা—ওরাই কি সব চেয়ে অজ্ঞান? সবিতা তো বোকাও নয়—তবে?

আসে কান্তি। বলবে তাকে, কিন্তু কেন যেন বলতে পারে না। তার চেয়ে একটু জলখাবার এনে দেয়, দেয় চা বানিয়ে।

'আজ পেটে কিছু পড়েনি। তুমি কি করে বুঝলে?'

'তোমাদের ক্ষুধার কথা আমরা মুখ দেখলেই টের পাই।'

'আশ্চর্য্য কিন্তু তোমরা!'

আর একটু আশ্চর্য্য করে দিতে চাইছিল সবিতা, কিন্তু তা পারল না। ভাবল, থাক্, আর এক দিন সে তা করবে। এ জলখাবার যতই প্রচুর হোক আরও ক্ষুধা আছে কান্তির।

'আমি আর দেরী করতে পারিনে—পাঁচটা বাজে প্রায়।'

'তুমি দেরী করতে পার না, কিন্তু সারা দিন আমি অপেক্ষা করে আছি কি করে?'

'তোমার আজ আফিস নেই—ছুটির দিন—'

ক্ষুণ্ণ মনে সবিতা বলে, 'তা সত্যি।'

'চটপট করে সেরে নেও আর পাঁচ মিনিটের ভিতর। যাবে যখন মিটিংয়ে একসংগেই যাই।'

'অনেক দিন ভাবছি তোমার বক্তৃতা শুনব, কিন্তু ভাগ্যে কুলায় না।'

'কার? তোমার না আমার?'

ঘর একখানা কিন্তু মানুষ দু'টি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ে, ব্লাউজ বদলায় সবিতা। একটু বিশৃংখল ভাবেই সব করে। কেমন যেন একটু সুখ অনুভব করে এই ইচ্ছাকৃত অসংযমে।

প্রসাধনে কাটায় অনেকটা দামী সময়। তার পর চেয়ে দেখে

আয়নার দিকে। এবার ভাল করেই তাকায়।

কান্তি নেই।

সে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

পাঁচ মিনিটের স্থলে দশ মিনিট, পনর মিনিট গত হয়, তবু ওঠে না সবিতা।

'আমি চললাম সবিতা, তুমি ধীরে ধীরে এসো।'

খটাখট্ জুতার শব্দ শোনা যায় সিঁড়িতে।

চমকে উঠল সবিতা, কিন্তু অনুসরণ করতে পারল না কান্তির। আর করবেই বা কি করে? তার বেশভূষা বিস্রস্ত।

আবার দেখা সন্ধ্যার পর—একেবারে আকস্মিক।

গংগার পাড় ধরে আসছিল সবিতা, ভাল লাগছিল না, তাই দেরী করে ধীরে ধীরে আসছিল হেঁটে। নদী-বক্ষে আলোগুলো কখনও তীব্র, কখনও ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে স্থানে স্থানে। বেশ যেন ছন্দে ছন্দে মিলে যাচ্ছে সবিতার মনের সংগে। তার জীবনের কখনও সংঘাত এসেছে তীব্র, কখনও ঝাপ্‌সা। তবু বয়ে চলেছে বাঁধা খাতে এখানের এই গংগার মত। একটা ক্লান্তি এসেছে। কেন এসেছে এই ক্লান্তি আপন মনেই জিজ্ঞাসা করছিল সবিতা। আবার আপন মনেই জবাব দেবে ভাবছিল—এমন সময় দেখা!

'এখানেই এসো, বসি একটু আবছা অন্ধকারে।'

'তোমাকে যেন বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে সবিতা?'

'কই, না তো।'

'সেদিন তুমি আর যাওনি বুঝি মিটিংয়ে?'

'না।'

'আমি তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম মিটিংয়ের পর তোমার জন্ত। তুমি গেলে না কেন? রাগ হয়েছিল বুঝি আমার ওপর? কি করব, আমার তো এমনিতেই দেরী হয়ে গেছিল পাঁচ মিনিট। পার্টির কাজ—'

'হ্যাঁ সে কথা তো ঠিক। কিন্তু—'

'তবু তোমার জন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল—এই তো?'

'নিশ্চয়।' আবার ক্লান্ত মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে নর্তন করে ওঠে দুর্বার লিপ্সা। কান্তির হাতখানা সবিতা চেপে ধরে। 'একটা কথা বলব? জবাব দেবে? স্বাধীনতা দেবে আজ একটি দিনের জন্ত?'

সম্মতি জানায় কান্তি নীরবে।

'ব্যক্তি-স্বাধীনতা? অকুণ্ঠ চিত্তে মনের দাবী জানাবার স্বাধীনতা?'

'দিলাম তো—এখন বলো সবিতা, অত উতলা হচ্ছ কেন?'

'আমি অনুরোধ করি, তুমি এখন সম্মতি দেও কান্তি। এসো আমরা বাসা বাঁধি। তুমি চিন্তা করো না, ভয় পেও না—তোমার প্রগতি মন্থর হবে না, বরং খরতর হবে গতি।'

'তুমি বোঝ না সবিতা।'

উঠে দাঁড়ায় কান্তি। 'চলো এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দিন দু'য়েক পরের কথা—

খুব অপমান-বোধ করেছিল সবিতা। কিন্তু আহত সর্পিণী যেমন ফিরে দাঁড়ায় তেমনি সে-ও দাঁড়াল ফিরে। সে জয় করবে, ছিনিয়ে নিয়ে আসবে কান্তিকে। সে এলিয়ে পড়বে না—অধীর হবে না অভিমানে।

সে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল এই সব। তখন রাত হয়েছে খানিকটা।

দেখা গেল, রাস্তার চৌমোহানায় একটা জন-কল্লোল—অসন্তোষ ফেনিয়ে উঠেছে জন-সমুদ্রে।

সে ত্বরায় নীচে নেমে গেল।

ছাত্র কেরানী কুলীরা বলাবলি করছে—

এ্যাসেমব্লী হাউসের সুমুখে ওপেন ফায়ারিং হয়েছে।

নির্বিচারে চালিয়েছে পুলিশ জুলুমবাজি…

সবিতা ভয়ে আগেই এসেছিল অফিস থেকে; সে ছাত্র-সমাবেশ দেখে এসেছে। কেন এ সমাবেশ তা সে জানে এবং কত দূর যে অত্যাচার হয়েছে, তা-ও বুঝতে পারে। ছাত্রীরাও তো বাদ যায়নি—রেহাই পায়নি ওদের হাতে। আইন পাশ হওয়ার মুখেই এই।

সবিতা তরতরিয়ে ওপরে ওঠে। দু'খানা কম্বল জোগাড় করে নেয়—আর একটা স্যুটকেশে গুছিয়ে নেয় সব যা-যা নিত্য দরকারী। দুয়ারে তালা দেয়। তার পর ফের নেমে পড়ে রাস্তায়।

'কে?'

'ভিতরে আসতে পারি?'

'আসুন।'

দুয়ার ঠেলে যে ভিতরে প্রবেশ করে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় কান্তি।

'হঠাৎ এত রাত্রে?'

'ভয় পেলে না কি? আজ আর তোমাকে অনুরোধ করতে আসিনি—প্রতিবাদ করতে এসেছি ব্ল্যাক বিলের।'

একটা রুদ্র দৃঢ়তা ফুটে ওঠে সবিতার কমনীয় মুখে।

সামাজিক

প্রভাত দেবসরকার

গেট'টা পার হ'য়ে বেশ কয়েক পা মাটি মাড়িয়ে সামনে এগুতে হয়। হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলে আগন্তুক অতিথি বড় অসহায় বোধ করে—মানসিক অস্বস্তিটা জড়িত পদক্ষেপে বাচনিক হ'য়ে ওঠে। গেট আর বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী সযত্ন-বিন্যস্ত বোবা মাটিটুকু যত রাজ্যের লজ্জা এবং সঙ্কোচ টেনে আনে। না জানি, এ গৃহের গৃহীদের মেজাজ কেমন!

অনায়াসেই বাড়ীটা খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু অনায়াসে তারক বাবু বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারছেন না। নেমন্তন্ন-বাড়ী যে এত নিস্তব্ধ নিষ্ক্রিয় হ'বে তা কে জানে—অথচ ভুল বাড়ী নয়, ভুল ঠিকানাও নয়! তা ছাড়া আত্মীয়তার সম্বন্ধ যখন আছে, অবস্থা-বৈষম্য হেতু পরস্পরের চেনা-পরিচয় না থাকলেও কৃতী ধনী আত্মীয়ের বিভব-বৈভব স্থাবর-অস্থাবরের খোঁজ-খবর লোক-পরম্পরা তারক বাবু রাখেন। বাড়ী ভুল কখনো হয়নি! আপন পিসীমার ছেলে, ভূপতি চৌধুরীর বাড়ী এটা। হঠাৎ তারক বাবুর এমনি মনে হয়, ভূপতির বয়েস এখন কত? ভূপতি বেশ মোটা আর চকচকে হ'য়েছে, সে দিন দেখলুম, গাড়ী করে স্বামি-স্ত্রী নেমন্তন্ন করতে এসেছিল—অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় আবির্ভাব! সে দিন খাতির করতে গিয়ে নিভা দৃষ্টিকটু রকমে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল: দিদি, মাঝে-মাঝে আসবেন কিন্তু! ভূপতির অনেক আগে তারক বাবুর বিয়ে হয়েছিল—মাতুলালয়ে থাকা কালীন ভূপতি নিভাননীকে বৌদি বলেই ডাকতো। আশ্চর্য্য, সে দিন নিভাননীর অত-বড় ভুলটা কারো চোখে পড়েনি। আজ আসবার সময় নিভা বার কয়েক নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গো, তুমি বড়, না, ভূপতি ঠাকুরপো বড়? নির্বোধের মত প্রশ্ন!

দূর থেকে দেখা যায়, গাড়ী-বারান্দার নীচে দু'-তিনটে মোটর দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ীগুলোর চাঁদির পালিশে বৈদ্যুতিক আলো প্রতিফলিত হ'য়ে তৈলাক্ত বনেদী টাকের মত চকচক করছে—দু'-একটা ছায়ামূর্ত্তি এদিক্-ওদিক্ সিঁড়ির উপর-নীচে ওঠা-নামা করছে।

তারক বাবু কম্পাউণ্ডের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন—ইস্, এরি মধ্যে এত অন্ধকার হ'য়ে গেছে! বিলাতী মৈশুমী ফুলের কেয়ারীগুলো আর দেখা যায় না—এখন বোঝাও যাবে না, ওরা ওখানে আছে কি নেই। ভূপতির এই বাগানে কোথাও যদি একটা হাস্নুহানার ঝাড় থাকতো, এই ভর সন্ধ্যে বেলার নিশ্বাসটা কি মধুর না লাগতো? নিজের বাড়ীর ভাঙ্গা পাঁচিলের গলা ইঁটের স্তূপে বেড়ে ওঠা হাস্নুহানার ঝাড়টার কথা মনে পড়লো: এই মুহূর্ত্তে গন্ধটা কিন্তু কিছুতে নাসারন্ধ্রে আনতে পারা যাচ্ছে না। আশ্চর্য্য ফুল, আশ্চর্য্য তার গন্ধ, দিনের আলোয় নিজ দেহ-সৌরভের এতটুকু অবশিষ্ট রাখে না।

আপাতত এখানের অন্ধকারকে সুন্দর করতে কোন ফুলের সুবাস নেই—এখানের নিশ্বাসকে ভারি করতে মাঝে মাঝে 'মবিল আর পেট্রোলের' চোঁয়া গন্ধ আশ-পাশ থেকে ছুটে আসছে। এক সময় তারক বাবুর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে: শীতকাতুরে ভূপতির প্রাসাদ এই? হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে তারক বাবুকে এমনি ভাবে ইতস্তত করতে দেখে চোর ভেবে চিৎকার করে' ওঠা বিচিত্র নয়। ভূপতি চৌধুরী তারক বাবুর পিসতুতো ভাই, কে শুনবে সে কথা—ভূপতি যদি নিজে মুখে সে-কথা স্বীকার না করে?

হন-হন করে কয়েক পা এগিয়ে যেতে একটা উগ্র গন্ধ নাকে এল—তারক বাবু মনে মনে হেসে দেখলেন—বুড়ো বয়েসের সখের জন্যে, না, নিভাননীর ছেলেমানষীতে বোঝা গেল না। বুক-পকেটের ভাঁজ-করা রুমালটা থেকেই সেন্টের গন্ধটা আসছে: স্বামীকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে বিশিষ্টতর করবার জন্যে কি নিভা অনেক দিনের ভুলে যাওয়া আধ-খালি সেন্টের শিশিটা লুকিয়ে রুমালে খালি করে দিয়েছে? তারক বাবু রুমালটা বুক-পকেট থেকে নামিয়ে পাঞ্জাবীর পাশের পকেটে রাখলেন। নিভা ছেলেমানুষ হ'লেও তিনি তো আর ছেলে-মানুষ নন? কিন্তু সে দিন ভূপতিরা কি যেন একটা মেখে এসেছিল, তারক বাবুর হাড়-পাঁজরা বার-করা ঘরে গন্ধের নেশায় ঝিম ধরে গিয়েছিল।—ভূপতির চেয়ে তারক বাবু আর কত বড়? সখটা কি বয়েসের, না সামর্থের, না মেজাজের?···

ভেতরের দিকে একটা হল-ঘরে আশীর্বাদের আয়োজন হয়েছে—মন্দ লোক-জন আসেনি, উপস্থিত অভ্যাগতদের কেউই তারক বাবুকে চেনেন না। ঘরে ঢুকতেই এমন একটা জিজ্ঞাসা নিঃশব্দে উচ্চারিত হ'লো যে, তারক বাবু থতমত খেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন—বড় বোকা-বোকা মনে হ'লো নিজেকে। ভূপতির বড় ছেলের আজ পাকা দেখা—সভাস্থলে ভূপতি এবং হবু বর কেউই এসে পৌঁছয়নি এখনো। এরা কন্যা-পক্ষের লোক, ভূপতির আপনার জন সব—তাঁকে চিনবে কি করে? এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে এক ছড়া রজনীগন্ধার শীর্ণ মালা হাতে দিয়ে মুখ ফুটে বললে, আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

ভাবটা, চেনা-পরিচয়ের দরকার কি, এসে বসে' সভাটাকে জাঁকিয়ে তুলুন। এদের কাছে ভূপতির খোঁজটা নিয়ে আপন অন্তরঙ্গতাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল তারক বাবুর, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলেন। সভায় এসে পা মুড়ে বসলেন। হাঁসের ডিমের কুসুমের মত আলোকিত ঘরের রঙ, মেজেকের বিচিত্র সতরঞ্চকাটা ছক চোখকে বড় পীড়া দেয়—বসে থেকে থেকে তারক বাবুর মনে হয়, মনের এই পরাভূত নির্জীব ভাবটাকে উত্তীর্ণ করবার মত পোষাকের জাঁকজমক তাঁর নেই—আজকের দিনে লজ্জা পাবার মত তাঁর পরিচ্ছদ—সতরঞ্চকাটা ছকে চোখ দু'টো আটকে গিয়ে বঁড়শিবিদ্ধ মীনের মত ছটফট ক'রতে লাগল। রজনীগন্ধার মালাটা এক সময় দলা পাকিয়ে পকেটের মধ্যে পুরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে সামনের ট্রে থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে তারক বাবু আশপাশের ভদ্রজনদের প্রসাধন-পারিপাট্য ঘটায় মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। এখন ওঁদের জন্যে তিনি লজ্জা পেলেন। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় হাঁসের ডিমের কুসুম ঘুলিয়ে উঠলো: গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতী, সোনার আঙটী-বোতাম, সযত্ন-লালিত গাম্ভীর্য্য সব মিলিয়ে ঘরটার আবহাওয়া একটা অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তির মত ছটফট ক'রছে। সিগ্রেটের উর্দ্ধগামী ধোঁয়ায় অভ্যাগতদের ভাব-সমুদ্র কিছুটা মথিত হ'চ্ছে বোধ হয়।

ছেলের হাত ধরে ভূপতি ঘরে ঢুকলো—নেপথ্যে মিহি-গলার লাজুক ফুঁ-এ শাঁক বাজল। ছেলেকে সংরক্ষিত আসনে বসিয়ে হাত যোড় করে ভূপতি বললে, এবারে দয়া করে আপনারা কাজ আরম্ভ করুন।

সভায় বেশ একটা সাড়া জাগল। কন্যা-পক্ষের আত্মীয়-স্বজন সগুঞ্জরণে প্রস্তুত হ'লেন: কে আগে আশীর্বাদ ক'রবেন এই নিয়ে একটু সমস্যারও সৃষ্টি হ'ল যেন—ঠেলাঠেলি একটু।

হঠাৎ আবিষ্কারের সুরে ভূপতি বলে উঠলো: তারুদা যে! কতক্ষণ?—তা ওখানে বসে আছ কেন, এদিকে এসো!

তারক বাবু বাধা দিলেন, বেশ আছি। কাজটা শেষ হ'য়ে যাক।

ভূপতি ছাড়বে না: তা কি হয়—তুমি আমাদের লোক, পরের মত নিয়ম রক্ষে করলে চলবে কেন—আচ্ছা যা হোক, সোজা বাড়ীর ভেতর না গিয়ে এখানে বসে আছ!

অভিযোগগুলো শুনতে তারক বাবুর ভালই লাগল—উত্তর না দিলে হৃদ্যতার আঁচটা যেন বেশী করে উপলব্ধি করা যায় না। ভদ্রতা এবং সৌজন্য-বোধ আছে ভূপতির। বয়ঃজ্যেষ্ঠের সম্মান দিতে সে এখনো ভোলেনি। এই সময় নিভার আশে-পাশে কোথাও থাকা উচিত ছিল। ভূপতির চেয়ে তারক বাবু মাত্র এক বছরের বড়—তাও, দশ-বিশ বছর পরস্পরের অসাক্ষাতের ফলে দাদা-ভাইএর সম্বন্ধ মনে রাখবার কথা নয়। আর বয়েসের তুলনায় ভূপতি অপর্যাপ্ত রোজগার ক'রছে, মুঠো-মুঠো, রাশি-রাশি, কাঁড়ি-কাঁড়ি—বয়েসকে ভূপতি হার মানিয়েছে। তারক বাবুর এখন বয়েস কত? সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ?—উনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ? বয়েসকে ঠায় ধরে রাখা যায় না? ঘসা তামার পয়সা দেখতে কেমন লাগে? বেশ আঁটসাঁট আছে এখনো ভূপতি—ছেলেবেলার মুখের বসন্তের দাগগুলো সব মিলিয়ে গেছে, কালো রঙটা বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তারক বাবু নিজেকে প্রশ্ন করেন: ভূপতির এখন দৈনিক আয় কত? দু'শ', তিনশ'—হাজার? কত হতে পারে? একটা অঙ্ক হঠাৎ তারক বাবুর মাথায় আসে—আচ্ছা, ভূপতির এখন যত বয়েস সেই সংখ্যাটাকে তত দিয়ে গুণ করলে তার আয়ের হিসাবটা পাওয়া যায় না? হাজার ছাড়িয়ে সংখ্যাটা ফেঁপে-ফুলে ওঠে। পঞ্চাশ বছরে মাত্র দেড়শ' টাকা রোজগার করেন তারক বাবু মাস গেলে—নিজের বয়েসের সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে ওর বেশী দাঁড়ায় না—পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পঞ্চাশ যোগ করলেও ঐ একই ফল হয়। এখন এক মাত্র লটারির টিকিট পেলে রোজগারের দিক থেকে ভূপতিকে মেরে দেওয়া যায়। তারক বাবু ভাবেন—কোন রকমে তাঁর নামে কোন দিন একটা লটারীর টিকিট ওঠে না?

পাত্র-পক্ষের হ'য়ে প্রথমে আশীর্ব্বাদ করলেন তারক বাবু—ভূপতির আগ্রহাতিশয্য উপেক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু বড় বাধ-বাধ লাগছিল তারক বাবুর, আড়ষ্টতা কিছুতে কাটাতে পারছিলেন না। ধরে-বেঁধে এ সম্মান না দেখালে যেন ছিল ভাল। হাত কাঁপতে কাঁপতে ধান-দূর্বা ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় পৌঁছবার আগেই পড়ে গেল। তাঁর মনে হলো, ভূপতির এ বাড়াবাড়ি উপস্থিত কারো পছন্দ হয়নি—

বড়লোকের খেয়াল সহ্য করতে হয় বলেই সকলে মুখ বুজিয়ে আছেন। আগা-গোড়া ব্যাপারটা আদিখ্যেতার মত মনে হচ্ছে না কি?

তারক বাবুর মনটা বড় স্পর্শ-কাতর হ'য়ে ওঠে—খুঁচিয়ে ঘা করার মত তাঁর কোথায় যেন বাজে। হয়তো না-এলেই ভাল করতেন। নিছক বয়েসের জোরে আজকের দিনে বরকর্তার সম্মান আদায় করাটা নেহাৎই হাসির ব্যাপার—সাক্ষীগোপাল!

যৌতুকের হীরার আঙটীটা বড় মূল্যবান মনে হয়: বিস্মিত বিস্ফারিত চোখের মত নাড়া-চাড়ায় দ্যুতিমান হ'য়ে উঠতে লাগল। অনেক চোখের ইসারায় মেয়ে-পক্ষের সামর্থ্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায় নিঃসন্দেহে—বোধ হচ্ছে, ভূপতি সমান ঘরে কাজ ক'রছে—জলে জল বাধছে। তারক বাবুর মনে পড়ে বুড়ি ঠাকুরমার কথা—নাতির বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে বলতে শুরু করেছিলেন, তাঁর তারু হীরের টুকরো! ভূপতির মা বেঁচে থাকলে তাঁর নাতিকে আজ ওর চেয়ে মূল্যবান কিছু বলতেন হয়তো, বড়লোক বাপের এক মাত্র ওয়ারিশন—হলেই বা কিছু দুর্বল, অপরিণত বয়স্ক। ভূপতির ছেলের কত বয়েস হ'বে এখন? নীরুর চেয়ে এক বছরের ছোট—নীরুর যদি বাইশ হয়, সমীরের এখন হ'বে একুশ। এখনো পর্য্যন্ত নীরুর কোন সম্বন্ধই তারক বাবু পাকাপাকি করতে পারলেন না, গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে কি টানা-ছেঁড়াটাই না হচ্ছে!—এ নিয়ে আশাভঙ্গের মনোবেদনা নিভাননী বুঝলেও নিরুপমার মনের কথা কি তাঁরা স্বামি-স্ত্রী বুঝতে পারছেন? মেয়েটা বারে বারেই সেজে-গুজে নিঃশব্দে এসে বসে—নিজের নামটা অনুচ্চে অস্ফুট উচ্চারণ করে, তার পর কয়েকটা সন্ধানী চোখের সামনে সেঁকা রুটীর মত কিছুক্ষণ বসে থেকে জড়িত পদক্ষেপে সভাস্থল ত্যাগ করে। মেয়েটির প্রতিটি ভাবভঙ্গি তারক বাবুর মুখস্থ হয়ে গেছে—তার পর কি! তুলনায় একটু বেয়াড়া মনে হয় ভূপতির ছেলেকে: নমস্কারের কথা মনে না করিয়ে দিতে পুরোহিতকে প্রণাম করেনি। কিন্তু এ সব ব্যাপারে নিরুপমার এতটুকু ত্রুটী কোন দিন কারো চোখে পড়েনি।

আশীর্ব্বাদের পর্ব শেষ হতে ভূপতি তারক বাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল—গলাটা জড়িয়ে কানে-কানে বললে, এদের খাওয়া দাওয়াটা একটু দেখা-শোনা কর—এত আয়োজন ম্যানেজ করবার কেউ নেই, শেষটা একটা বদনাম না হয়। তুমি ভাই দয়া করে ভেতরে গিয়ে দেখা শোনা কর।

ভূপতি এক রকম টেনে-হিঁচড়ে তারক বাবুকে ভেতরে নিয়ে গেল। সোনামুখী সিগ্রেট একটা তারক বাবুর মুখে গুঁজে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিয়ে বললে, মনে কর, এটা তোমার কাজ—মান-অপমান, সুনাম-বদনাম যা হবার তা তোমারই হবে।

তার পর ভূপতি এমনি চেঁচামেচি আরম্ভ করলে যেন অকূল পাথারে হঠাৎ একটা কূলের সন্ধান পেয়ে গেছে, যেন একটা কঠিন সমস্যার অচিন্তনীয় সমাধান হ'য়ে গেল। সিগ্রেটের টিনটা তারক বাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে ভূপতি অদৃশ্য হয়ে গেল।····

তারক বাবু সন্ধান করে ভিয়ান-ঘরে উপস্থিত হলেন। গুটি-স্রাবেক উড়ে ঠাকুরে গরান কাঠের আগুনে, তেলে-ঘিয়ে-রসে ঘরটা রম-রম করছে—খালি পেট ঘুলিয়ে তোলবার মত।

তারক বাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চুপটি করে—সন্ধানী চোখ দু'টোকে ঘরের সূক্ষ্ম ধোঁয়াটে আবরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে একটু যেন দেরীই হলো। এক কোণে একটা চেয়ার দখল করে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন—বেশ বোঝা যায়, ভূপতির আত্মীয় কেউ, আজকে ভক্ষ্য এবং ভোজ্য দ্রব্যের প্রচুর আয়োজনের এতটুকু যাতে অহেতুক অপচয় না হয় তার পাহারায় আছেন। ভূপতি না বললেও ভূপতির আত্মীয়রা উপযাচক হ'য়ে এ ভার নেন।

হঠাৎ এক জন অপরিচিতের আবির্ভাবে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন—আস্বাদন অভিপ্রায়ে মুখে-পোরা চপের টুকরোটা গলায় বিঁধে যাবার উপক্রম হলো। ভিয়ান-ঘরে তাঁর অভিভাবকত্বের মর্য্যাদাহানি হলো না কি? বড় অসহায়ের মত চাইছেন ভদ্রলোক।

এক জন ঠাকুর জিগ্যেস করলে, কেমন হয়েছে কর্ত্তা বাবু? কর্ত্তা বাবু ঢোক গিলে বললেন, বেশ!

সঙ্গে সঙ্গে তারক বাবু প্রশ্ন করলেন, কি কি তৈরী হয়েছে? আর কত দেরী?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক জবাব দিলেন—না, সব রেডি। কি ঠাকুর? ঠাকুররা মাথা নেড়ে শব্দ করে সায় দিলে।

বৃদ্ধকে চিনতে তারক বাবুর একটু বিলম্বই হয়েছিল। অপ্রস্তুতের মত এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বিস্মিত বৃদ্ধ কিছু প্রশ্ন করবার আগেই তারক বাবু বললেন, আমি ভূপতির মামাত ভাই—তারক।

ওহো, তুমি—সেই কত কাল আগে দেখা!—বৃদ্ধ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। মনে হলো, এত দিন পরে তারক বাবুর সাক্ষাৎ লাভে তিনি খুব খুশীই হয়েছেন। কুশল প্রশ্ন করে আত্মীয়তা করতে এতটুকু কার্পণ্য করলেন না। নিজের পাশে একটি চেয়ার আনিয়ে তারক বাবুকে বসিয়ে জিগ্যেস করলেন, কেমন হয়েছে বাবা আয়োজন? দস্তুর মত কি বল?

তারক বাবু নিঃশব্দে আয়োজন দেখতে লাগলেন—মনে মনে ভাবলেন, এতো কি লোকে একসঙ্গে খেতে পারে? ভূপতির অনেক পয়সা, নিমন্ত্রিতরা আজ আকণ্ঠ অপর্য্যাপ্ত আপ্যায়িত হ'য়েও তার তল পাবে না—ফেলে-ছড়িয়েও ফুরবে না। হঠাৎ পেটটা ঘুলিয়ে উঠলো! যেন—বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হ'য়েছে তারক বাবুর মনে হ'লো।

হ্যাঁ, জামাইয়ের জন্তে গর্ব অনুভব ক'রতে পারেন ভূপতির শ্বশুর অবিনাশ বাবু। পরাশ্রয়ী একটি অনাথের সঙ্গে একদা তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, অনেক পয়সা খরচও করেছিলেন। এই নিয়ে তারক বাবুর ঠাকুমা প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, ছেলেটার কপাল ভাল, পড়েছে ভাল! বড়লোক শ্বশুর—আর আমার তারকের কি খোয়ার দেখ দিখি, তিনটে পাশ হীরের টুকরো ছেলে।

বুড়ি নেপথ্যে তারক বাবুর বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলতেন, অনেক দিনের কথা সে-সব। ভাবতে আত্মপ্রতারণার মত মনে হয় এখন। আশ্চর্য্য!

বৃদ্ধ আর একবার বললেন, দস্তুর মত খরচ করেছে ভূপতি—সে তুলনায় ওরা আর কি করেছিল? আজকালকার দিনে পঞ্চাশটা 'মেনু' করা কি মুখের কথা!

তারক বাবু জিগ্যেস করলেন, মেয়ের পাকা-দেখায় আপনি গিয়েছিলেন না কি? ওঁরা বুঝি খুব বড়লোক?

অবিনাশ বাবু বললেন, না, আমি যাইনি—তবে শুনিচি খুব বড়লোক !

একটু থেমে অবিনাশ বাবু আপন মনে বলতে লাগলেন, বুড়ো হয়েচি, সব সময় সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠে না—শরীরটাও তেমন ভাল যাচ্ছে না। বুড়ো মানুষের সব জায়গায় না যাওয়াই ভাল, কি বল ?

অবিনাশ বাবুর কথায় তারক বাবু কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস পেলেন। ঠিক ধরতে পারছেন না, সেটা কি ?

অবিনাশ বাবু তখনও বলছেন, অবশ্য ভূপতি আমাকে বার বার করে যাবার কথা বলেছিল। তবে ছেলে বারণ করলে, আমি যখন যাচ্চি আপনার না-গেলেও চলবে। ভেবে দেখলুম, কথাটা ঠিক।

এত কথা তারক বাবুর শোনবার প্রয়োজন ছিল না। ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দেবার মত আপন মনে বকে যাচ্ছেন। শুনতে শুনতে তারক বাবুর খটকা লাগে, ভূপতি যেতে অনুরোধ করছে আর ছেলে বারণ করছে, কেন ? অবিনাশ বাবু কার কথা ঠেলতে পারেন ? আর সামাজিকতায় বৃদ্ধের আসন তো সর্বাগ্রে। তারক বাবুর অবিনাশ বাবুর প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা মনে পড়ে—ভূপতির বিয়ের সময় কি রাশভারি আর অভিজাত বলে মনে হ'য়েছিল লোকটাকে। সেই লোক আজ ভিয়েন-ঘরে উঞ্ছবৃত্তির পাহারায় রয়েছেন, ভূপতির কুটুম-বাড়ী না-যাওয়ার দরুণ নিজে থেকে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন এক জন দূর-সম্পর্কীয়ের কাছে ! তারক বাবুর মনে হলো, যা নিয়ে অবিনাশ বাবুর প্রতাপ-প্রতিপত্তি, তা অনেক দিন হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। সরল ভদ্রলোক বলে মনে হলেও অবিনাশ বাবুকে দীন না-ভেবে পারলেন না তারক বাবু।

অবিনাশ বাবু এক সময় বললেন, খাবে না কি বাবা একখানা চপ—টেষ্ট করে দেখ না, আমাদের জিভের কি সে তার আছে—বুড়ো হয়েছি !

তারক বাবু মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন। ব্যক্তিত্বের অভাবটা অবিনাশ বাবু বার্দ্ধক্যের আবরণে ঢাকতে চাইছেন বার বার, বেশ বোঝা যায়। জাহির করবার মত সর্বজনস্বীকৃত শক্তি তাঁর খোয়া গেছে, তাই সামাজিকতায় আজকাল তিনি অন্দর-মহলে বিরাজ করেন। তারক বাবুর নিস্পৃহতায় অবিনাশ বাবু যেন একটু মিইয়ে গেলেন—দৃশ্যত: একটু ক্ষুণ্ণও হলেন। মনে মনে ভাবলেন, নতুন কুটুম-বাড়ী না যাওয়ার কারণটা এ রকম একটা লোককে বলে ভাল করেননি। সামান্য একখানা চপ 'টেষ্ট' করবার কি আপত্তি থাকতে পারে ? আর তা ছাড়া তিনি যখন বড়-মুখ করে বলছেন ! তারক বাবুকে অবিনাশ বাবুর ভাল বলে' মনে হয় না।

ভিয়ান-ঘর থেকে বেরিয়ে তারক বাবু এক সময় ভেতরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন ! অতলে তলিয়ে যাওয়ার মত সান-বাঁধান এই ফাঁকা জায়গাটুকুর চার পাশ ঘিরে খাড়া কংক্রীটের গাঁথ্‌নী—প্রগাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ওপরের দিকে চাইলে মনে হয়, সারা বাড়ীটা বুঝি হুমড়ী খেয়ে মাথার ওপর পড়ল—জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়ার আশঙ্কা এ সময় সমস্ত অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেওয়া বিচিত্র নয় ! উপরের গবাক্ষ-পথে ঢোলাই করা অধোগামী আলোর রশ্মিগুলো সর্বনাশা হাতছানির মত। আলো-অন্ধকারে বাড়ীটার প্রকাণ্ডত্ব যতই প্রকট হতে থাকে, তারক বাবুর ততই বন্দী হওয়ার কথা মনে হয়। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় অক্ষম আর অসহায় বোধ করেন। তারক বাবু: অনেক দূরাগত অস্পষ্ট আক্ষেপ, হা-হুতাশ কানে বাজতে লাগল—অনেক জীবনের ব্যর্থতা বাঙ্ময় রূপ পরিগ্রহ করতে চায় !

কে যেন প্রয়োজন বোধে হঠাৎ উঠানের আলোটা জেলে দিলে। তারক বাবু চোখ দু'টো রগড়ে নিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দালানে উঠলেন। কন্যাপক্ষদের আর কতক্ষণই বা আটকে রাখা যায় !···

ইতিমধ্যে দোতলায় একটি ঘরে খাবারের জায়গা করা হ'য়েছে ; গুটি দশেক সুদৃশ্য ভেলভেটের আসনের সামনে মূল্যবান কাচের প্লেট-ডিস্‌-বাটি-গেলাসের ভিড় জমান হ'য়েছে। চোখ-ধাঁধান আলোয় ভোজ্য দ্রব্যের লোভনীয়তা শান দেওয়া ছুরির মত লক্‌-লক্‌ করছে। এক একটি পাতের গোড়ায় এতগুলি প্লেট, এতগুলি ডিস, এতগুলি বাটি যে গুণে ওঠা দুষ্কর—পঙ্‌ক্তির সার একাকার হয়ে গেছে, কেবল আসনে স্ব স্ব স্থান সংরক্ষিত। ভোজ্য দ্রব্যের বহুবিধ প্রকরণে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আপত্তি উঠলো : এ কি করেছেন ? একেবারে রাজসূয় !

ভূপতি মুখে তুষ্টস্বরে 'না—না' বলে হাত জড়ো করে রইল। ভূপতির 'না—না'র ইঙ্গিতটা লুফে নিয়ে পাশ থেকে এক জন বললে, আপনাদের যোগ্য আর কি হ'য়েছে !

ভূপতির সরকার মশায় বললেন, তাও কি শালার পয়সা ফেললে জিনিষ মেলবার জো আছে, এটা মেলে তো ওটা মেলে না—মুস্কিল ! আজকাল খাইয়ে সুখ আছে ?

কন্যাপক্ষের মধ্যে ছোকরা গোছ এক জন বললে, খাদ্য-সঙ্কটের দিনে এত আয়োজন কিন্তু ভাল নয়—Social crime !

কথাটায় ধাক্কা অনেকের লেগেছে মনে হ'লো—ভূপতির মুখের কৃতিত্বের হাসিটা যেন মিলিয়ে গেল।

সরকার মশায় ছোকরার ছেলেমানষী সহ্য করার মত গমকে গমকে হেসে বললেন, কিন্তু এতে রেশানের কোন জিনিষই নেই—সেদিক্‌ থেকে কোন অন্যায় হয়নি নিশ্চয়ই।

বুদ্ধির প্রশংসায় সবাই হেসে উঠলো। ছোকরার বাচালতায় কন্যাপক্ষীয়ের কর্ত্তা ব্যক্তিও মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বাবু সরকার মশায় লজ্জার হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে দিলেন ! তারক বাবু কিন্তু ছোকরার কথার খোঁচাটি ভুলতে পারলেন না। আপন অনুচারিত বক্তব্যের সঙ্গে কোথায় মিল আছে যেন—আজকের আয়োজনে ভূপতির যত বাহাদুরী কীর্ত্তিত হোক্‌, যত সামর্থ্য প্রকাশ পাক্‌, নিঃসন্দেহে এ ধরণের অপব্যয়ে তার কোন অধিকারই নেই—সকাল-বেলায় আধপেটা রসাস্বাদহীন ভোজ্য দ্রব্যের কথা তারক বাবুর অকস্মাৎ মনে পড়লো। চোখ দিয়ে চেখে মন দিয়ে তারক বাবু আনমোনা হ'য়ে অবিনাশ বাবুর 'মেনু' মেলাতে লাগলেন ! পোলাও, লুচি, চপ, কাটলেট, ফ্রাই, কোপ্তা, কোর্মা, রোষ্ট, গলদা, বাগদা, পোনা ভেটকি, কই, ইলিশ, চিতল, পার্শে, তোপসে, মাটন, কাটলেট,—কারি, দো-পেঁয়াজী—আলু ভাজা, বেগুন ভাজা,—পটল ভাজা, শাক ভাজা, আস্ত মোঁচা-চিংড়ীর চিনে কাবাব—দই, সন্দেশ, রাজভোগ রাবড়ি, পুডিং, পায়েস-পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ, লেবু, কলা, আঙুর—মুড়ির ঘণ্ট !

তারক বাবু আর গুনতে পারছেন না, চোখে ধাঁধা লাগছে—এখানে

ভুর্ষ্য বৃত্তকে ঘিরে অনেকগুলো বৃত্ত এঁকে চোখের সামনে ঘোরান'র ইঙ্গিত। প্লেটের ওপর চীনে কাবাবের চিংড়ীগুলো যেন শুঁড় নাড়তে শুরু করেছে—আঃ! কি দ্যুতিমান্ স্বর্ণাভ রঙ!

আলুবখরা, আনারস, আমড়া একই রস পরিবেশন করছে—সন্দেশে কামড় দিয়ে শাক ভাজায় মনোনিবেশ করা খুব অস্বাভাবিক অসম্ভব ব্যাপার হবে কি আজ? চুষে চেটে গিলে কিছুতেই তৃপ্তি যেন পাওয়া যায় না!···

অবিনাশ বাবু খুব চটেছেন বলে মনে হয়। সবার অসাক্ষাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারক বাবুর কানে এল—অবিনাশ বাবু বলছেন, শালার সরকারকে এত করে বললুম, আমার জন্তে একটা চীনে কাবাব রেখো তা শুনলে না—যেন কে বলেছে তো বলেছে! এদিকে সকাল থেকে জানোয়ারের মত খেটে মরছি, কোমর-পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে—খাবার বেলায় আমি শালা কেউ নয়—সব ভুপতির আস্কারায় এমনি হ'য়েছে—বুড়ো শালা, শুধু খাটতেই আছে!—

তারক বাবুর বেদনার সঙ্গে মনে পড়লো—এই লোক এক দিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে স্ফুর্তি করে সারা-রাত বেহুঁস হ'য়ে থাকতেন—আড্ডা-বহরা তটস্থ! অন্ততঃ আজকের দিনে শ্বশুরের মর্য্যাদা রাখা উচিত ছিল ভুপতির! এত বড় কর্ম্মকাণ্ডে ভুপতির স্ত্রীর তো কোন সাড়া-শব্দ নেই—বুড়ো বাপের খাওয়া-দাওয়ার খোঁজটা তিনি করতে পারেন? দেখে-শুনে খাবার স্পৃহা তারক বাবুর কিন্তু অনেক আগেই চলে গেছে।

•

ভুপতি তারক বাবুর কথা ভোলেনি। আজকের নিমন্ত্রণে তাঁর যথাযথ সম্মান রাখবার জন্তে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা—অবিনাশ বাবুর পঞ্চাশ রকম মেনুর একটি কি দু'টি যদি থাকে! ঘরে ঢুকেই কেমন একটা গোপনতা টের পাওয়া যায়—দেওয়াল গাত্র বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক রশ্মি মেঘাবরণে চাঁদের আলোর মত ঝিম-লাগা। বড় বেদনাতুর মনে হয় ঘরের আব-হাওয়াটা।

তারক বাবু জিগ্যেস করলেন, পঙ্ক্তিতে না-বসে এখানে একলা-একলা ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না।

ভুপতি কাচের গেলাস দু'টো সামনা-সামনি রাখতে রাখতে জবাব দিলে, দেখবে কে যে ভাল দেখাবে? দেখো না কি করি—বস চেয়ারটাতে চুপটি করে।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে বড় বেশী একটা বিস্মিত হ'লেন না তারক বাবু। মুখ ফুটে একবার কেবল জিগ্যেস করলেন, আজকাল বাড়ীতে বসেই আরম্ভ করেছো? ভাল!

ভুপতি বললে, কি, ভৎর্সনা করচো? তা কর, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু যাই বল, আজকের ঐ রাবিশগুলো কোন ভদ্রলোকে stand করতে পারে না।

তারক বাবু বললেন, আমি তোমার ও-জিনিষ খাবো না কিন্তু!

ভুপতি অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলে, মানে? আগে তো খেতে—আমার হাতে-খড়ি তো তোমার কাছে! মনে করচো, বেহায়াপনা করবো? তুমি দেখো—নেভার!

তারক বাবু নিঃশব্দে কাটলেটে কামড় দিতে দিতে ভুপতিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল, কেউ-ই কোন কথা বললে না। ঘরের ভেতর মূক গোপনতাটার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। নিস্তব্ধতায় ঝিমোন আলোটা আরো ঝিমিয়ে এল। নির্লোভী প্রকৃতিস্থ তারক বাবু এক সময় লোভ সংবরণ করতে পারলেন না, অপ্রকৃতিস্থ হ'লেন। নীরবতা ভঙ্গ করে ভুপতি বললে, জান তারুদা, ছেলে আমাকে অপমান করেচে!

তারক বাবু সাড়া-শব্দ করলেন না—ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে বাইরে যাবার দরজার দিকে চাইতে লাগলেন।

ভুপতি বলতে লাগল: বলে কি না বিয়ে করবো না—আমার খেলাধুলো নষ্ট হ'য়ে যাবে। শুনেচো কস্মিন্ কালে এমন কথা তোমরা? তোর মত একটা ছেলেকে যে ওরা মেয়ে দিচ্ছে—এই তোর বাপের ভাগ্যি! কত বড়লোক ওরা জান তুমি?

তারক বাবু একেবারে বোবা হ'য়ে গেছেন। ভুপতির ছেলের বিয়ে না-করার যুক্তিটায় বড় কৌতুক বোধ করেন। চোখের ওপর হীরের আঙটাটা জ্বলছে যেন।

ভুপতি বলছে: পয়সা অনেক রোজগার করেচি—কিন্তু সংসারে শান্তি নেই দাদা। বৌটা চিরুগ্ন, সব সময় কাৎ হ'য়েই আছেন!

একটা দামী চালানী ফুলকপি তারক বাবুর চোখের ওপর ভেসে উঠলো।

ভুপতি হঠাৎ বলে উঠলো, আমাকে দো-পেঁয়াজি খাওয়া শেখাচ্চে—বলে খাওয়ার জন্ম দিই আমি! রান্না মাংসে পেঁজ ছড়িয়ে দিলে কি দো-পেঁয়াজি হয় না, তার আলাদা প্রেপারেশন আছে? আরে, তোদের পয়সাই আছে—খাওয়ার তোরা কি জানিস্? তেমনি দিয়েচি আজ খোঁতা মুখ ভোঁতা করে—পাল্লা দিতে এসেচেন!

তারক বাবু আর একবার অবিনাশ বাবুর পঞ্চাশটা মেনু স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। 'বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, মাছের কালিয়া, মুড়ির ঘণ্ট'—আর কিছু মনে করতে পারছেন না। না, ভুপতিটা সব মাটি করে দিলে!

দু'জনে যখন ঘর থেকে বেরুল বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দালানে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, উঠানে আলোগুলো ঠায় জ্বলছে। নীচ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ এল: ছ্যাঁক-শোঁ-শোঁ-ও! ভিয়ান-ঘরে কেউ এখনো উনুন থেকে আধপোড়া কাঠগুলো বার করে জল ঢেলে নিবুচ্ছে—উৎসব শেষে জ্বলন্ত অঙ্গারের আর আবশ্যকতাই বা কি?

দালান মাড়িয়ে পার হতে হতে তারক বাবুর মনে হলো, অপরের চশমা চোখে দিয়ে তিনি হাঁটছেন: কেমন সব আবছা আর ঘসা-ঘসা। কে জানে, ভুপতি কি ক'রে দিলে!

কয়েক পা সিঁড়িতে দিতেই তারক বাবুর আচ্ছন্ন ভাবটা যেন গুলিয়ে উঠলো—নীচু হয়ে ত্রস্ত ক্ষিপ্র হাতে একটা কি কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

ভুপতি জিগ্যেস করলে, ও কি, এখানে বসচো যে—বাড়ী যাবে না? ওঠ, ওঠ, বড্ড খেয়েচো দেখচি!

ভুপতির মটরে গা-ঢেলে দিয়ে তারক বাবু চশমায় প্রতিফলিত একটা সম্রাটের অনেকগুলো মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন। ভুপতির পাশে বসে তারক বাবু নিজের পকেটটা মুঠো করে ধরে রইলেন। আজ খাওয়াটা ভালই হয়েছে ভুপতির ওখানে!

• • • •

পরের দিন অনেক বেলায় তারক বাবুর ঘুম ভাঙল। মাথার কাছে রাখা চায়ের কাপে চা-টা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে—বোধা পুকুরে

'সর' পড়ার মত চায়ের কাপে 'সর' পড়েছে। ঘুম ভেঙেই ভূপতির কথা মনে হলো তারক বাবুর—মনে পড়ছে না। কাল অত রাত্তিরে কে দরজা খুলে দিয়েছিল—ভূপতিকে গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে নিভাননী কি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল অভ্যর্থনা করতে? নিভাননী নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারেনি—ভূপতির মত লোকের যখন-তখন আসাটাই তার কাছে এমন পরম বিস্ময়!

নিভাননী ঘরে ঢুকলো। তারক বাবু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন—লজ্জায় নিভাননীর মুখের দিকে চাইতে পারলেন না। বছর পঁচিশ আগে এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে এই রকম লজ্জা পেয়েছিলেন তারক বাবু—যার সামনে লজ্জা পেয়েছিলেন সে-ও ঐ মানুষ। আজকের লজ্জা পাওয়ার সঙ্গে সেদিনের লজ্জা পাওয়ার তুলনা করা চলে কি না কে জানে!

নিভাননী জিগ্যেস করলে, বাজার যাবে না—আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে। ডাল-ভাত অনেকক্ষণ নেবে গেচে।

লজ্জা কাটিয়ে তারক বাবু বললেন, আজ বাজার গেলে আর অফিস যাওয়া হ'বে না। বুলাকে বরং পাঠাও—

নিভাননী বললে, কই, তা হ'লে টাকা দাও।

তারক বাবু ইসারা করে বললেন, জামার পকেটে আছে, দেখ।

নিভাননী তারক বাবুর জামার পকেট হাতড়ে দেখতে লাগল। আর তারক বাবু বিছানায় বসে আড়চোখে চেয়ে একটা বিস্ময়ের আশায় মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বিস্ময়টা এখনি নিভাননীর মুখ দিয়ে ফেটে পড়লো বলে! রুদ্ধশ্বাসে তারক বাবু নিভাননীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

বিরক্ত হয়ে নিভাননী বললে, কই, মোটে যে দশটা পয়সা! বলে টুকরো কাগজের বাণ্ডিল একটা আর রজনীগন্ধার ছেঁড়া মালা এক ছড়া তারক বাবুর দিকে ছুঁড়ে দিলে। মালাটা চাপে ম্লান হয়ে গেছে, ছেঁড়া সুতোর আশ্রয় ছেড়ে কয়েকটা ফুল নিভাননী এবং তারক বাবুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়লো।

তারক বাবু এমন অসহায় ভাবে চাইলেন যে, নিভাননীকে আর কিছু বলবার দরকার হলো না। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বললে, উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু!

বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে টুকরো কাগজগুলো একটি একটি করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন তারক বাবু। না, কালকে ভূপতির বাড়ী ভোজের ফর্দ্দ এগুলো—পঞ্চাশ রকম মেনুর স্মারকলিপি, ক্রম-হিসাবে। সঙ্গে একটা বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতার ক্যাশ মেমো একশ' তিরিশ টাকা।

ভূপতির বাড়ীর সিঁড়িতে কাল রাতে ফেরবার পথে বসে' পড়বার কথা তারক বাবুর মনে পড়ল। পকেট কামড়ান মুঠোটাও স্মরণ হয়। কিন্তু ঐ কাগজের বাণ্ডিলে একটি অতি-পরিচিত সম্রাটের একটিও মুখের প্রতিকৃতি আজ দেখা যাচ্ছে না। নেশাটা এখন পুরোপুরি ছুটে গেছে!

কাল রাতে দরজাটা নিভাননী খুলে না দিয়ে যদি নিরুপমা খুলে দিয়ে থাকে—বাপের সম্বন্ধে কি ভাবছে মেয়েটা? আরো এক দিন ভূপতির ওখানে নিমন্ত্রণ পাবার আশা আছে? আপাততঃ মাসকাবারি ক'টা দিন সুবিধে মত ধার করে' বাজার-খরচ চালাতে হ'বে!

সোমনাথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জাগায়ে রেখ'না নিতি—
জাতিতে জাতিতে সর্ব্বপ্রথম সংঘর্ষের স্মৃতি।
ধর্ম্ম কি জাতি আঘাতে পায় না লয়,
লভি' বল তার অমোঘ অভ্যুদয়,
আনে চূর্ণকে পূর্ণ করিতে নূতন সংস্কৃতি।

নয় শতাব্দী পর
এলো আহ্বান ভাঙা মন্দির নূতন করিয়া গড়।
ভগ্ন তুচ্ছ প্রতি প্রস্তর-কণা,
বিষলতা হয়ে যেন ধরিতেছে ফণা
নীল সমুদ্র নীল অম্বরে উঠে 'জাগৃহি' স্বর!

ও কি মহাসঙ্গীত!
আসিছে জগ-মঙ্গলকারী—শিবেতর ক্ষয়কৃৎ।
ভেব না ও শুধু হিংসার রণধ্বনি?
নীলকণ্ঠের ও যে ডমরুর ধ্বনি,
অহি গর্জ্জিছে—জটাজালে শোভে রবি-শশী অগণিত।

ভক্তি-নম্র মনে—
গড়ে তোলো সবে মহামন্দির শাশ্বত সনাতনে
মহামানবের এ সাগর-তীরে ফের
উঠুক দেউল সুপ্রাচীন ভারতের,
মঙ্গলময় শিব প্রতিষ্ঠা হোক মঙ্গল ক্ষণে।

স্বর্গে মর্ত্তে টান
যেন এ সৌরমণ্ডল চাহে সোমনাথ উত্থান।
করি বিলম্ব দেখিতে কর কি সাধ?
গোটা এ ভারত গঠনেতে উন্মাদ
লৌহ মুষল প্রসব করিছে গ্রহ ঘূর্ণ্যমান?

ডাকো 'শিব শম্ভো'
অনাগত কাল করেছে দেউল কখন আরম্ভ।
পশ্চাৎপদ আজি যদি হও সবে
তবু মন্দির জেনো নির্ম্মিত হবে,
ভাঙার দম্ভ নহে এ তো—জানো গঠনের দম্ভ।

সুরশিল্পী মোৎসার্ট

WOLFGANG AMADEUS MOZART

1756—1791

শ্রীচিত্রগুপ্ত

[সঙ্গীতে অতুলনীয় সৃষ্টি-শক্তির অধিকারী মোৎসার্ট—অতি শৈশবে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রেছিলেন; সে জনপ্রিয়তা তিনি হারিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে। অবশেষে দারিদ্র্যের মধ্যেই পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে মারা যাবার পর নিঃস্বদের কবরে তিনি কবরিত হন।]

উলফগ্যাঙ মোৎসার্ট জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে জার্ম্মাণীর সালৎসবুর্গ (Salzburg) শহরে। ছবির মত সুন্দর সালৎসবুর্গ শহরটি তখন ছিল সালৎসবুর্গের প্রিন্স আর্কবিশপ সিগিসমুণ্ড (Sigismund)এর শাসনাধীন।

উলফগ্যাঙের পিতা লিওপোল্ড (Leopold) মোৎসার্ট ছিলেন সিগিসমুণ্ডএর দরবারের এক জন সঙ্গীত-শিল্পী (Vice-kapellmeister)। কারিগর-বংশের সন্তান এই শিক্ষিত, কর্ম্মঠ ও স্থিতধী ভদ্রলোক নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন ক'রে জীবনে যথেষ্ট উন্নতি ক'রেছিলেন।

ভদ্রলোকের সাতটি সন্তানের মধ্যে মারিয়া এ্যান্ (Maria Anne) ব'লে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ও উলফগ্যাঙ মোৎসার্ট নামে এই ছেলেটি ছাড়া অপরগুলি শৈশবেই মারা যায়। যাই হোক্, মেয়ে মারিয়ার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ও দক্ষতা দেখে তিনি মেয়েকে তার আট বছর বয়েসেই সঙ্গীতে দীক্ষা দেন এবং যত্ন ক'রে ক্লাভিয়ার (Clavier) নামক যন্ত্র বাজাতে শেখাতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে উলফগ্যাঙের বয়েস পূরো তিনও হয়নি। বাপ মারিয়াকে বাজনা শেখাচ্ছেন, উলফগ্যাঙ নিবিষ্ট মনে তাই শুনছে আর দেখ্‌চে। তার পর তাদের শিক্ষাপর্ব্ব শেষ হতেই শিশু উলফগ্যাঙ অতি কষ্টে গিয়ে টুলের ওপর উঠে তার কচি কচি আঙুল দিয়ে যে সঙ্গীতটি এতক্ষণ চল্‌ছিলো সেটি বাজাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। অপটুতার প্রচুর প্রমাণ সত্ত্বেও ঐটুকু ছেলে তার মধ্যেই যে দু'-চারটে শুদ্ধ সুর বার করতে সক্ষম হোলো, তা দেখে তার বাপ বিস্মিত না হ'য়ে পারলেন না!

এই আবিষ্কারের পর, শিশু মোৎসার্ট সুবিধে পেলেই রোজ ঐ যন্ত্রটি দখল ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কস্‌রৎ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বাপ তাই দেখে ছেলেকে ভোলাবার জন্য তাকে দু'-চারটে খুব সহজ নাচের বাজনা দেখিয়ে দিতে লাগলেন। সঙ্গীতের ওপর বেশী ঝোঁক থাকায় সে দিদির চেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের 'পাঠ'গুলো শেষ ক'রে দিদির পাঠগুলোও আয়ত্ত ক'রতে লাগলো। বয়েসে দিদির চেয়ে পাঁচ বছরের ছোটো হ'লেও নিজের অসাধারণ নিষ্ঠা ও শ্রমশক্তির গুণে সে সর্ব্ব রকমে দিদিকে ছাড়িয়ে গিয়ে পিতার বিশেষ মনোযোগ দখল করলে। সঙ্গীতে অসাধারণ নিষ্ঠা ও অদ্ভুত শ্রমশক্তির এই যে নমুনা তাঁর মধ্যে অতি শৈশবেই দেখা গেল, অতি হ্রস্ব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইটাই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর একটা বৈশিষ্ট্য যা' তাঁর অত অল্প বয়েসেও লক্ষ্য করা যেতো সেটা হচ্ছে তৈরী সঙ্গীতের নকল করার চেয়েও নতুন সুর সৃষ্টি করার দিকে তার অসামান্য ঝোঁক। নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করবার ক্ষমতার পরিচয় সে দিলে যখন তার বয়েসের পঞ্চম বর্ষও অতিক্রান্ত হয়নি। অথচ এখনও পর্য্যন্ত সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় বিদ্যার (technique) সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি। এই সময়ে (১৭৬২ সালের গ্রীষ্মকালে) রচিত তাঁর একটি সরল সঙ্গীত এখনও পাওয়া যায়। সৃষ্টির অপূর্ব্বতার দিক্ দিয়ে সেটি তেমন উল্লেখযোগ্য না হ'লেও, তার মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট স্বকীয়তার লক্ষণ দেখা যায়।

আসলে সঙ্গীতের অতি সূক্ষ্ম একটা সংস্কার নিয়েই মোৎসার্ট জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। ঐ শৈশবে তাঁর যে সঙ্গীত-চর্চ্চা, তা ছিল প্রধানতঃ তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যেই কিন্তু ওরই মধ্যে দিয়ে তিনি যে সহজাত সূক্ষ্ম অনুভূতি, মার্জ্জিত রুচি আর উন্নত ধরণের পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছিলেন, উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে তা' তাঁর পিতার গুণকেও ছাড়িয়ে গেছলো।

অনুভূতি ছিল তাঁর অতি তীব্র। ভাবাবেগের তীক্ষ্ণতা কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, তবে এটা তাঁর রুচিকে ক'রে তুলেছিল অত্যন্ত সুকুমার। আর্কবিশপের ব্যাণ্ড শুনতে গিয়ে কোনো দিন যদি কোনো বাদকের বাজনাকে সুর থেকে এক চুল এদিক্-ওদিক্ করতে শুনতো তা হ'লেই বালক মোৎসার্ট অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতো। কাণ তার এ বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ ছিল যে সামান্যতম ভুলও তার কাছে ধরা পড়তো আর এ জন্তে সে অন্তরে সত্যিকার বেদনা অনুভব ক'রতো।

দশ বছর বয়েসের আগে পর্য্যন্ত মোৎসার্ট 'ট্রামপেট'-এর আওয়াজ সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ সম্পর্কে তাঁর কাণের অনুভূতির অতি-সৌকুমার্য্যের জন্যে শুধু মাত্র সঙ্গীতের বিরোধী শব্দ মাত্রেই তাঁকে পীড়িত ক'রতো। আর সেই জন্যে বিকট আওয়াজের সম্ভাবনা মাত্রকেই তিনি দস্তুর মত ভয় ক'রতেন। মোৎসার্ট-পরিবারের এক বন্ধু এ সম্পর্কে একবার লিখেছিলেন যে, গুলীভরা পিস্তল তুলে ধ'রলে লোকে যেমন ভয় পায়, মোৎসার্ট সেই রকম ভয় পেতেন যদি কেউ একটা 'শিঙা' তাঁকে লক্ষ্য ক'রে তুলে ধ'রতো!

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ উলফগ্যাঙের বয়েস যখন মাত্র ছ' বছর, তখন তাঁর বাবা লিওপোল্ড মোৎসার্ট ঠিক করলেন যে তিনি তাঁর প্রতিভাবান্ এই সন্তান দু'টিকে নিয়ে এক ভ্রাম্যমাণ গীতবাদ্যের দল তৈরী ক'রে দেশ ভ্রমণে বার হবেন। এটা কেমন সাফল্য অর্জ্জন করতে পারে তা পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি সপ্তাহ খানেকের জন্যে এদের নিয়ে 'মিউনিক' শহরে গেলেন। সেখানে উলফগ্যাঙ ও মারিয়া দু'জনেই খুব সুনাম অর্জ্জন করাতে তাঁরা কয়েক মাস পরে 'ভিয়েনা' যাত্রা ক'রলেন। সেখানে পৌঁছবার আগেই এই ছেলে-মেয়ে দু'টির অসামান্য শক্তি ও খ্যাতির খবর সেখানকার লোকেরা জেনে গেছলো। তাই তাঁরা ভিয়েনায় পৌঁছেই অসাধারণ সম্বর্দ্ধনা পেলেন।

তার পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের দরবার থেকে এলো তাঁদের আমন্ত্রণ। সম্রাট্ স্বয়ং তাঁদের সঙ্গীত শুনে, বিশেষ ক'রে বালক উলফগ্যাঙের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে, তাঁর নাম দিলেন 'ক্ষুদে যাদুকর (The little magician) আর তাঁর বাবাকে এক শত ডুকাট (Doucat) মুদ্রা পুরস্কার দিয়ে বসলেন। আর রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারা অতিরিক্ত আদর-যত্নে

বালক উলফগ্যাঙের মাথাটি খেয়ে দেবার জোগাড় করলেন। যদিও তাঁদের আদরে অভিভূত হওয়ার চেয়ে সঙ্গীতের নেশাতে মত্ত থাকাতেই মোৎসার্টের বেশী আগ্রহ ছিল। যাই হোক, সম্রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁকে একটি মহামূল্য 'দরকারী পোষাক' উপহার দিলেন আর রাজবাড়ীর ছেলে-মেয়েরা হোলো তাঁর খেলার সাথী।

এদের মধ্যে মারী আন্তোয়ানেৎকে তাঁর বিশেষ ক'রে ভালো লাগলো। বেচারী আন্তোয়ানেৎ উত্তর জীবনে এক দিন ফ্রান্সের রাণী হন এবং তার পর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অভ্যুত্থানের ফলে বিপ্লবীদের হাতে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এক দিন প্রাসাদের অতি-মসৃণ ভাবে পালিশ-করা মেঝেয় পা পিছলে যখন উলফ্‌গ্যাঙ্‌ প'ড়ে গেছলেন, তখন মারী আন্তোয়ানেৎ পরম-যত্নে তাঁকে ধ'রে তোলায় উলফ্‌গ্যাঙ্‌ তাঁর ওপর অত্যন্ত খুশী হ'য়ে তাঁকে বলেন, 'তুমি বড়ো ভালো মেয়ে; আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

ভিয়েনায় এই সাফল্য লাভের পর মোৎসার্টরা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গেলেন 'পারী' (Paris)। গাড়ী ভেঙে গিয়ে সেটি মেরামত ক'রতে এক দিন সময় লাগার জন্যে পথে তাঁদের এক দিন আটকে যেতে হয়। এই সুযোগে লিওপোল্ড্‌ বালক মোৎসার্টকে নিকটস্থ এক গির্জায় নিয়ে গিয়ে, সেখানকার উৎকৃষ্ট অর্গ্যানটি কেমন ক'রে বাজাতে হয় তাই দেখাতে গেলেন। এই উপলক্ষে অর্গ্যানের প্যাডালটি কি ভাবে চালাতে হয় তা বোঝাতে বাবা মাত্র বালক 'মোৎসার্ট' ব'লে উঠলেন, 'বুঝতে পেরেছি।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসনে উঠে ব'সে এমন ভাবে অর্গ্যানটি বাজাতে আরম্ভ করলেন যে, দেখে সকলের মনে হ'তে লাগলো, নিপুণ ভাবে অর্গ্যান বাজানোর অভ্যাস যেন তাঁর অনেক দিনের!

এই দেখে এর পর থেকে লিওপোল্ড সব জলসাতে ছেলেকে সঙ্গীত-রচয়িতা এবং হার্পশিকর্ড (Harpsichord) বাজিয়ে হিসেবে পরিচিত করা ছাড়া অর্গ্যান বাজিয়ে হিসেবেও পরিচিত ক'রতে লাগলেন।

একটু ধরাধরি ক'রে বাপ লিওপোল্ড মোৎসার্ট 'পারী'তে ফ্রান্সের তখনকার সব চেয়ে প্রভাবান্বিতা রমণী মাদাম্‌ দ্য পম্পাদুর-এর সঙ্গেও নিজের পুত্র-কন্যাসহ পরিচিত হবার ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। উলফ-গ্যাঙের কেমন মনে হোলো, মাদাম পম্পাদুর অতি চমৎকার মহিলা। সুতরাং সে মাদামকে চুম্বন করতে উপক্রম করল। কিন্তু মাদামের বোধ হয় এই বছর সাতেকের ছেলেটির এই সাহসকে ধৃষ্টতা ব'লেই মনে হয়ে থাকবে। তাই তিনি মোৎসার্টকে একটু সরিয়েই দিলেন। মোৎসার্ট কিন্তু তাতে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, "আমাকে চুমো খেতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞীর একটুও বাধলো না, আর, ইনি একেবারে কে এমন কেউকেটা এক জন যে, আমাকে চুমো খেতে নারাজ?"

যাই হোক, চুমো না খেলেও মাদাম পম্পাদুর ভার্সাইএর দরজা মোৎসার্টদের জন্যে খুব দরাজ হাতেই খুলে দিলেন। সুতরাং নিজেদের নৈপুণ্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে ফ্রান্সের সকলের মন জয় করার তাঁদের খুব সুবিধেই হ'লো।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মোৎসার্টদের সঙ্গীত শুনে প্রীত হ'য়ে তাঁদের যে-রকম সমাদর করেছিলেন, ফ্রান্সের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কাছেও তাঁরা সেই রকম সমাদরই পেলেন। 'ভার্সাই' প্রাসাদে স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর পাশের আসনে ব'সে নিমন্ত্রণ খেতে দেওয়া হোলো বালক উলফ্‌গ্যাঙ মোৎসার্টকে। সম্রাজ্ঞী তাঁকে খাওয়ালেন, তাঁর সঙ্গে খেললেন; উলফগ্যাঙ মোৎসার্টও সম্রাজ্ঞীকে স্বরচিত সঙ্গীত শোনালেন। তার পর সেখান থেকে রয়্যাল চ্যাপেলে গিয়ে সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের এক ঘণ্টা ধ'রে 'অর্গ্যান' বাজিয়ে পরিতৃপ্ত ক'রলেন।

ফলে পারীর সৌখীন সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের এমন কদর হোল যে, সেখানে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁরা ক্রমাগত এখানে ওখানে 'জলসা' করে প্রচুর উপার্জ্জন করে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁরা গেলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে তাঁদের সমাদর আবার আগেকার পাওয়া সব সমাদরকেও ছাড়িয়ে গেল। সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী শার্লোৎ (Charlotte) সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীত শুনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেন। বিশেষ ক'রে উলফগ্যাঙএর হাত এখন ক্ল্যাভিয়ার ও অর্গ্যানে আরও পাকা হয়ে ওঠায় এবং তাঁর সৃষ্ট অনেকগুলি সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরা এই বালকের প্রতিভা দেখে চমৎকৃতই হ'লেন। উলফগ্যাঙের বাজনার সঙ্গে রাণী নিজে গান গাইলেন। রাজা বেছে বেছে শক্ত শক্ত সঙ্গীত তাঁকে বাজাতে দিলেন। বালক মোৎসার্ট অবলীলাক্রমে সেগুলো বাজিয়ে দিলেন। ইংলণ্ড ত্যাগ করার পূর্ব্বে উলফগ্যাঙ মোৎসার্ট যে বিদায়-বাসরের অনুষ্ঠান করলেন, তাতে যে ক'টি 'সিম্‌ফনী' বাজানো হোলো তার সব ক'টিই ছিল তাঁর নিজের রচনা। এই প্রসঙ্গে এ কথা ভুললে চলবে না যে, বালক উলফগ্যাঙএর বয়েস ছিল এ সময়ে মাত্র আট বছর!

ইতিমধ্যে তাকে নিয়ে 'শিশু প্রতিভা', 'শিশু প্রতিভা' ক'রে এমন হৈ চৈ বেধে গেল যে, সেই একঘেয়ে খ্যাতির আতিশয্য বালক মোৎসার্টের পক্ষে প্রায় ক্লান্তিকরই হ'য়ে উঠলো। ইংলণ্ডময় তার নাম রটে গেল 'প্রকৃতির বিস্ময়' (Wonder of Nature)। সমাদরের বাড়াবাড়ির দরুণ তার বিশেষ লাভ না হ'লেও একটা সুবিধে হোলো এই যে, এর ফলে তার নানা দেশের উৎকৃষ্ট সাঙ্গীতিকদের সঙ্গীত শোনবার সুযোগ হোলো। তাতে তার লাভ হোলো এই যে, অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত সাঙ্গীতিকের ভাগ্যেও যতটা শিক্ষা লাভ ঘটে না, বারো বছর বয়েস হবার আগেই মোৎসার্টের ভাগ্যে তা জুটে গেল। যে-বয়েসে মানুষের মনের ওপর শিক্ষার ছাপ সব চেয়ে গভীর ভাবে 'দেগে' বসে, সেই বয়েসে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুফল হোলো এই যে, এর দরুণ তার উত্তর-জীবনের সৃষ্ট সমস্ত সঙ্গীতই ঔজ্জ্বল্য, সম্পূর্ণতা ও বহুমুখী বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হবার ভিত্তিমূল পাকা হ'য়ে গ'ড়ে উঠলো।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে মোৎসার্টরা সালৎসবুর্গে ফিরে এলেন এবং সঙ্গীতে উলফগ্যাঙের গভীরতর শিক্ষা শুরু হোলো। ন' মাস বাদেই কিন্তু তাঁকে আবার ভিয়েনায় যেতে হোলো। সেখানে গুটি বসন্তের আক্রমণে তাঁর প্রায় জীবনসংশয়ের উপক্রম হোলো। কোনো গতিকে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন। বছর খানেক বাদে আবার তিনি ওখানে গেলেন এবং সরাসরি রাজ-দরবারেও প্রবেশ করলেন। কিন্তু এক দিকে সমব্যবসায়ীদের ঈর্ষ্যাতুর কূট কৌশল আর অন্য দিকে রাজানুগ্রহের আর্থিক দিকটায় ব্যয়-সংকোচএর

প্রয়োজন, এই দুইয়ে মিলে তাঁদের এবারকার অভিযান কিন্তু আগেকার তুলনায় অনেকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়লো। তবুও সম্রাটের পরামর্শে বালক মোৎসার্ট La Finta Semplice বলে একটা অপেরা রচনাও করলে, কিন্তু শিশু হ'লেও পেশার ক্ষেত্রে দারুণ শক্তিমান্ এই বালকের বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যাতুর স্থানীয় সাঙ্গীতিকদের কূট কৌশলের ফলে ঐ অপেরার 'অনুষ্ঠান' হওয়া কিছুতেই সম্ভব হোলো না।

তার পর ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মোৎসার্টরা যখন একবার বাড়ী ফিরেছিলেন, সেই সময়ে উলফগ্যাঙ-এর বাবা লিওপোল্ড মোৎসার্টের সহৃদয় প্রভু—সাল্‌ৎস্‌বুর্গের আর্কবিশপ—এই অপেরার কথা শুনে এ'টির অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আদেশ দেন। এই অনুষ্ঠান শুনে তিনি এত খুসী হ'লেন যে, তখনি বালক উলফগ্যাঙকে তাঁর সভা-শিল্পী (Kapell meister) ক'রে নিলেন। তাঁর এই নিয়োগ ছিল শুধুই সম্মানের নিয়োগ—এ জন্ম তার পক্ষে নিয়মিত হাজির থাকা বা নিয়মিত কাজ করার কোনো বাধ্য-বাধকতা ঐ সহৃদয় আর্কবিশপ মহোদয় আরোপ করেননি। সুতরাং ছেলেকে ইটালীতে নিয়ে গিয়ে তার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দেবার বাসনায় লিওপোল্ড মোৎসার্ট উল্‌ফগ্যাঙকে নিয়ে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই রৌদ্রোজ্জ্বল দেশের দিকে রওনা হলেন।

ধীরে-সুস্থে পথে নানা জায়গায় সাফল্যমণ্ডিত 'জল্‌সা' ক'রতে ক'রতে বড়দিনের আগেই তাঁরা ইটালীতে পৌঁছলেন। সর্ব্বত্রই বালক মোৎসার্ট একই রকমের সমাদরে সম্মানিত হ'তে লাগলো। এই সময়ে তার বাবা লিওপোল্ড বাড়ীতে চিঠি লিখলেন, 'ছেলে কি রকম সম্মান পাচ্ছে সে কথা এখন আর না লিখলেও চলে।'

যাই হোক, জানুয়ারী মাসের শেষে তাঁরা 'মিলান' শহরে গিয়ে অষ্ট্রিয়ান গভর্ণর জেনারেলএর কাছেও প্রচুর অনুগ্রহ লাভ ক'রলেন। সেখান থেকে তাঁরা রওনা হ'লেন 'বোলোনা'র (Bologna) দিকে। মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে পৌঁছলেন ফ্লোরেন্সে (Florence)। বোলোনায় অল্প কালের অবস্থিতির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ওখানে উল্‌ফগ্যাঙ তখনকার ইটালীর সঙ্গীত-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রদ্ধাভাজন এবং ধর্ম্মপ্রাণ Covanni Martiniর প্রশংসা অর্জ্জন করলেন। তাঁর প্রশংসা লাভের ফলে সমগ্র ইটালীর কাছে তাঁর আদর সুপ্রতিষ্ঠিত হোলো। সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকেই বালক মোৎসার্টের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শোনবার জন্যে দলে দলে এসে ভিড় করতে লাগলো।

তার পর উল্‌ফগ্যাঙরা পৌঁছলেন রোমে। তাঁরা রোমে পৌঁছবার আগেই উল্‌ফ্‌গ্যাঙের খ্যাতি সেখানকার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছলো যার ফলে নামটি জানতে পারা মাত্র লোকে তাদের আদর-যত্নে ঘটা লাগিয়ে দিতে লাগলো। যাই হোক্, রোমে পৌঁছে সেই দিনই উল্‌ফগ্যাঙ গেলেন ওখানকার বিখ্যাত ধর্ম্মমন্দির 'সিসটাইন্ চ্যাপেলে', বিখ্যাত গায়ক এ্যালেগ্রীর (Allegri) কণ্ঠে বহু প্রশংসিত Miserere নামক সঙ্গীতটি শুনতে। এই সঙ্গীতটি ছিল ওখানকার একটি বিশেষ সম্পদ। তাই স্বরলিপির সাহায্যে বা অন্য ভাবেও এ'টি কাউকে শিখতে দেওয়া হোতো না। বাছা-বাছা লোকরাই কেবল অনেক তদ্বির ক'রে ওখানে গিয়ে এটি একবার শুনে আসতে পেতো। কড়া নিয়ম ছিল এই যে, যদি গির্জ্জার সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের সাহায্যে এই সঙ্গীতটি বাইরের লোকের কাছে চ'লে যায় তা হ'লে তখনি গির্জ্জার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে দারুণ অপমানের সঙ্গে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

বালক মোৎসার্টের অসাধারণ স্মরণ-শক্তির প্রভাবে এমন ভাবে 'সুরক্ষিত' সঙ্গীতখানি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই বাইরে চ'লেই এলো। মাত্র একবার শুনেই উল্‌ফগ্যাঙ সম্পূর্ণ সঙ্গীতটি তার অতি জটিল খুঁটি-নাটি শুদ্ধ—তখনি শিখে নিলেন এবং বাসায় ফিরেই তার নিখুঁত একটি স্বরলিপি লিখে ফেললেন। এমন নিখুঁত হোলো সেই স্বরলিপি যে, পোপের এক জন সভা-সাঙ্গীতিক, ক্রিষ্টোফোরি (Christofori) সে'টি পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে কোনো ভুল বার ক'রতে না পেরে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা শেষ পর্য্যন্ত আর চাপা রইলো না। সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেল। এমন কি, খৃষ্ট জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরু পোপের কাণে পর্য্যন্ত যখন খবরটা পৌঁছলো তখন তিনি নিজেই কৌতূহলী হ'য়ে উল্‌ফগ্যাঙের কাছে তা' শুনতে এলেন আর শুনে অত্যন্ত খুসীও হ'লেন।

এর পর 'জল্‌সা' উপলক্ষে তাঁরা নেপল্‌স—(Naples)এ গেলেন। রাজকুমারের যোগ্য সম্মান উল্‌ফগ্যাঙ রোমে পেয়েছিলেন। কিন্তু সব চাইতে মজার ব্যাপার ঘ'টেছিল নেপল্‌স্-এ। সেখানে তাঁর শ্রোতারা তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনেই ধ'রে নিয়েছিল যে, এমন সঙ্গীত সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এ ছেলেটি নিশ্চয়ই যাদু জানে। তাই তারা নিজেদের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগলো, 'খোকা, তুমি তোমার আঙুল থেকে ঐ আংটিটি খুলে ফেলো তো!' তাদের কেমন বদ্ধমূল ধারণা হ'য়েছিল যে, তার হাতের ঐ আংটিটি নিশ্চয় মায়ার যাদু দিয়ে মন্ত্রপূত; তাই ঐটির জোরেই অমন বাজনা তার পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে। আংটিটি খুলে ফেললে আর তাকে অমন ভাবে বাজাতে হবে না। কিন্তু তাদের কথায় হাতের আংটি খুলে ফেলার পরও যখন মোৎসার্টের হাত দিয়ে সমান মিষ্টি বাজনা বার হ'তে লাগলো তখন আর বিস্ময়ে তাদের মুখ দিয়ে কথা বার হোলো না!

নেপল্‌স্ ভ্রমণ সমাধা ক'রে জুন মাসে তাঁরা আবার রোমে ফিরে এলেন। ফেরবার কয়েক দিন পরে মহামতি পোপ স্বয়ং তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে অভ্যর্থনার সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং বালক উল্‌ফগ্যাঙকে 'ধর্ম্ম-সংস্থা'র পক্ষ থেকে The order of the Golden Spur নামক উচ্চ সম্মানে ভূষিত ক'রলেন।

এই উপলক্ষে উল্‌ফগ্যাঙের বাবা দেশে চিঠি লিখলেন, 'ভেবে ভাখো, আমার ঐ বাচ্চা ছেলেকে খাতির দেখিয়ে লোকে যখন ঘটা ক'রে সম্ভাষণ জানায় Signor Cavalier ব'লে, তখন আমার কি রকম হাসি পায়! সুখের কথা এই যে, ছেলের কিন্তু এ ব্যাপারেও 'দেমাক্'-এ মাথা বিগড়ে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। ধর্ম্মাধিপতির দেওয়া এত-বড় উচ্চ সম্মান নিয়েও কোনো মাথা-ব্যথা জাগার বদলে তার মন সঙ্গীতের সুগভীর সাধনার মধ্যেই ডুবে রইলো। প্রকৃতি তার রইলো, আগেকার মতই বিনয়-বিনম্র; অন্তঃকরণও তার থেকে গেল আগেকার মতই সহজ সারল্যে ভরপুর।

অবশেষে রোম থেকে পিতা-পুত্রে আবার ফিরলেন বাড়ীর দিকে—

পথে যথারীতি নানা স্থানে 'জলসা' দিতে দিতে। 'বোলোনা' হ'য়ে মিলানে যখন এলেন তখন তাগিদ এলো উলফগ্যাঙের ওপর একখানা অপেরা রচনা করবার—যেটি অনুষ্ঠিত হবার কথা হোলো সামনের বড়দিন। ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের প্রাণপণ চেষ্টায় এবারও কিন্তু এ আয়োজনে যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হোলো। ব্যবস্থা এমনই পাকা ক'রে দাঁড় করানো হোলো যাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং সমালোচকরা সকলে মিলে চৌদ্দ বছরের একটি ছেলের তৈরী অপেরার অনুষ্ঠান হবার পরিকল্পনাকে স্রেফ হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

অপেরা কিন্তু তবু হোলো শেষ পর্য্যন্ত এবং হোলো তখনকার ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অপেরা হাউস মিলানের LA SCALA-তে। অপেরার নাম Mitridate—রচয়িতা চৌদ্দ বছরের ছেলে উলফ্-গ্যাঙ্ মোৎসার্ট। অপেরা পরিচালনাও করলেন তিনি স্বয়ং। অপেরা আরম্ভ হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত শত রসগ্রাহী শ্রোতাদের বিমুগ্ধ প্রশংসার সামনে হতমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিদ্রূপ-মুখর বিষকণ্ঠ নীরব হ'য়ে যেতে বাধ্য হোলো।

এখানে এই সাফল্যের পর একে একে তুরিন (Turin), ভেরোনা, ভেনিস্, পাদুয়া (Padua) প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকেও উচ্চ প্রশংসার জয়মাল্য কণ্ঠে দুলিয়ে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে উলফ্ গ্যাঙ্ তাঁর সালৎস্‌বুর্গের বাড়ীতে ফিরে এলেন একখানা অপেরা আর একখানি সেরেনাটা (Serenata) রচনার তাগিদ নিয়ে। ঘরে ফিরেই তিনি সেই রচনা নিয়ে ব'সলেন।

সালৎস্‌বুর্গ যখন ছেড়েছিলেন উলফ্ গ্যাঙ্ তখন শিশু ছিলেন বললেই হয়—এখন তিনি ফিরে এলেন অন্য রূপ নিয়ে। এ রূপ এক দিকে সহজ সারল্যে ভরা একটি চৌদ্দ বছরের কিশোর আবার অন্য দিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সঙ্গীত-সৃষ্টি ও সঙ্গীত-পরিবেশন সম্বন্ধে সুদুর্লভ নানা জ্ঞান-বিজ্ঞায় পরিপুষ্ট এক জন পরিণত শিল্পীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! এক কথায়, বিনয়-বিনম্র অথচ জ্ঞান-গরিষ্ঠ, একনিষ্ঠ সঙ্গীত-সাধনার সে যেন এক দেব-দুর্লভ মোহন মূর্ত্তি!

প্রত্যেক দেশ থেকেই কিছু না কিছু সোনা-মুঠোর পুঁজি তিনি তাঁর সদ্য-আহরিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে তখন ভ'রে এনেছেন। ফ্রান্স্ থেকে গ্রহণ ক'রেচেন তাদের নাট্য-সঙ্গীত, ইংল্যাণ্ড্ থেকে হ্যান্ডেল্ (সুবিখ্যাত গীত-স্রষ্টা HANDEL)এর বৈশিষ্ট্য—তাঁর সঙ্গীতের গঠনের বলিষ্ঠতা ও সমারোহের বৈরাট্য (The grandeur and solidity of structure), ইটালী থেকে সেখানকার গীত-রচয়িতাদের ভাবাবেগপূর্ণ সুরমাধুরী ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত পাণ্ডিত্যের পরিচয়পূর্ণ রচনার বিশিষ্ট নমুনাগুলি—সবই তিনি ব'য়ে নিয়ে এসেছেন তাঁর নবলব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারের মধ্যে একেবারে নিজস্ব ক'রে। ইটালী ভ্রমণের ফলে তাঁর লাভটা হ'য়েছিল সব চেয়ে বেশী। সেখানে সঙ্গীতের জগতে সকল রকম সমস্যার সমাধান করবার মতন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তিনি করায়ত্ত ক'রেছিলেন। আর ঐখানেই ইটালীর শ্রেষ্ঠ গীতস্রষ্টাদের সঙ্গে তাঁদেরই দেওয়া সর্ত্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'য়েও তিনি জয়ী হ'য়েছিলেন।

দুর্দ্দিন কিন্তু তবুও নেমে এলো মোৎসার্টের জীবনে। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে লিওপোল্ড্ মোৎসার্টের নিয়োগকর্ত্তা—সালৎস্‌বুর্গের সেই সহৃদয় আর্কবিশপ ভদ্রলোক মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় হাইরো-নিমাস্ ব'লে Colloredo-র যে কাউণ্ট্ ভদ্রলোক নতুন আর্কবিশপ হ'য়ে এলেন, তিনি ছিলেন সঙ্গীত এবং সংস্কৃতিমূলক যা কিছু জিনিষ জগতে আছে তা সবেরই ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং মোৎসার্টদের আগেকার সুযোগ-সুবিধে যা' কিছু ছিল তা সবই বন্ধ হোলো।

ছেলেবেলার তাঁর সে সোণার দিনগুলোর তুলনায় মোৎসার্টের জীবনে এলো এ কী দুর্দ্দিন! অবশ্য বাস্তব জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোৎসার্টের মতন শক্ত মানুষকে অভিভূত ক'রতে না পারলেও অসুবিধার সৃষ্টি হোলো এ জন্যে তাঁর জীবনে অপরিসীম। তাঁর কাঠখোট্টা নতুন মনিব উলফ্ গ্যাঙকে মাইনে দিতেন মাসে মাত্র এক পাউণ্ড এক শিলিং ছ' পেন্স মাত্র (আমাদের দেশের হিসেবে টাকা চোদ্দর মতন) কিন্তু তবুও নিয়মিত ভাবে তার কাছ থেকে প্রায়ই নতুন নতুন সঙ্গীত আদায় ক'রতে ছাড়তেন না। অথচ ভিয়েনায় গিয়ে 'জলসা' দিয়ে টাকা রোজগার ক'রতে দিতেও তিনি নারাজ।

উলফগ্যাঙের এখন ভরা যৌবন। সংসারের অর্থকষ্টের জন্যে বাপের পরামর্শে অবশেষে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আবার ভ্রাম্যমান 'জলসা' করতে বেরোলেন তিনি। এবার তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর মা। বাবাকে মনিব ছাড়লেন না। এবার কিন্তু জলসাতেও সুবিধে হোলো না। বিস্মিত হ'য়ে তিনি লক্ষ্য ক'রলেন, তাঁর সেই অপূর্ব্ব প্রতিভার যে আদর আগে সর্ব্বত্রই হয়েছিলো তার স্মৃতি পর্য্যন্ত এখন যেন লোকের মন থেকে মুছে গেছে। ফলে এবার একে টাকার দিক্ দিয়ে লোকসান হোলো, তার ওপর আবার জুটলো অবহেলা ও অপমান। অথচ তাঁর এই সময়ের রচনাগুলোই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা—পরিণত মস্তিষ্ক-প্রসূত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত! এ যে তাঁর জীবনের কী বিড়ম্বনা! তার ওপর তাঁর মা মারা গেলেন। সুতরাং সব দিক্ দিয়ে দুর্ভাগ্যের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরে এসে আবার পুরোনো মনিবের শরণাপন্ন হতে হোলো ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে (২৩ বছর বয়েসে)।

যাই হোক্, চব্বিশ বছর বয়েসে তাঁর ডাক পড়লো মিউনিক কার্ণিভ্যালের জন্যে একটা অপেরা লিখে দিতে। মিউনিকের শাসক তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে স্বীকার করলেন, জীবনে আর কোনো সঙ্গীত তাঁকে এতখানি অভিভূত ক'রতে পারেনি।

উলফগ্যাঙের মনিব কিন্তু এত-বড় এক জন প্রতিভাবান্ শিল্পীকে নিজের দরবারের অধীন ক'রে রাখার গৌরব উপভোগ করার মোহে তাঁকে যেমন ছাড়তে চাইতেন না তেমনি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবার লোভকেও কিছুতেই দমন ক'রতে পারতেন না।

প্রভু মোৎসার্টকে আদেশ দিলেন তাঁর সঙ্গে মোৎসার্টকে ভিয়েনায় যেতে হবে। সেখানে কিন্তু তাঁকে চাকর-বাকরদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করা হোলো। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ মোৎসার্টকে গান শোনাবার আমন্ত্রণ জানালেন ও সঙ্গীত শুনে প্রীত হ'লেন। মোৎসার্টের মনিব কিন্তু সম্রাটের দরবারে নিজের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মোৎসার্টকে সালৎস্‌বুর্গে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন। আদেশ অনুসারে সালৎস্‌বুর্গে ফেরার পর মোৎসার্টকে কিন্তু তিনি দরজা থেকে লাঞ্ছিত ক'রে বিদায় দেওয়ালেন।

সুতরাং ভিয়েনায় ফিরে মোৎসার্ট সঙ্গীত-শিক্ষকের পেশা গ্রহণ করলেন। এতে প্রশংসা তিনি পেলেন বটে, কিন্তু অর্থের দিক্ দিয়ে ভাগ্য তবু তাঁর অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেল। মোৎসার্টই বোধ হয়

প্রথম শিল্পী যিনি এক জন মাত্র মুরুব্বির ওপর নির্ভর ক'রে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পুরোনো প্রথা ত্যাগ করে স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে সুবিধে বিশেষ কিছু হোলো না। ভিয়েনার লোকরাও তাঁর ওপর বিরূপ হ'য়ে উঠলো। সম্রাট্ তাকে অপছন্দ না করলেও টাকা দিয়ে সাহায্য করার বেলায় কিন্তু তাঁরও হাত ভারী হয়ে উঠলো।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এই দুঃখের ওপর আবার এই সময়ে মোৎসার্ট বিয়ে ক'রে বস্‌লেন এমন একটি মেয়েকে যার না ছিলো টাকা, না ছিলো অল্প-খরচে গুছিয়ে সংসার চালাবার ক্ষমতা। যাই হোক, এরই মধ্যে সুখের কথা এই যে, তবুও তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে খুব বেশী অসুখী বলা চলে না এই জন্যে যে তাঁরা তাঁদের দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখেই মেনে নিতে পেরেছিলেন। এই সময়ে একবার এক বন্ধু তাঁদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, তাঁরা দু'জনে 'ভাল্‌ৎস' (WALZ) নাচে মত্ত হ'য়ে আছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বল্‌লেন, নেচে নেচে শরীর গরম রেখে তাঁরা শীতের লাঘব ক'রছেন!

মোৎসার্টের মেজাজটি ছিল খুব ধীর, স্থির ও দৃঢ়। কোনো অবস্থাই তাঁকে অপ্রসন্ন করে তুলতে পারতো না। নিত্য নব নব সঙ্গীতসৃষ্টির নেশায় মত্ত হ'য়ে দুনিয়া ভুলে থাক্‌বার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। একসঙ্গে অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্য ও অমানুষিক শ্রমশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও পরম অভিনিবিষ্ট ভাবে কাজ করে যাবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল তাঁর অধিগত। দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে দিন কাটলেও কেউ প্রার্থী হ'য়ে এসে তাঁর কাছে দাঁড়ালে তাকে তখনি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে দিতে তাঁর একটুও আটকাতো না। জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর অপূর্ব্ব অপেরাগুলো ভাঙ্গিয়ে অন্য লোক প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছে, আর তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে দিনের পর দিন অনাহারে অর্দ্ধাশনে থেকে শুধু সৃষ্টির পর সৃষ্টিই করে গেছেন!

কিন্তু এমন করে প্রকৃতিকে তার প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে দীর্ঘকাল শিল্প-সাধনাও সম্ভব হয় না। সুতরাং ক্রমে আরম্ভ হোলো প্রকৃতির প্রতিশোধ। শরীর ক্রমশঃ তাঁর ভেঙে পড়তে লাগলো।

এক দিন, দারুণ অবসাদে যখন তাঁর অসুস্থ শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে তাঁর মনকেও করে তুলেছে আচ্ছন্ন, ঠিক সেই সময় অদ্ভুত রহস্যময় ভঙ্গিতে অপরিচিত এক ব্যক্তি এসে বায়নার টাকা দিয়ে তাঁকে শব-যাত্রীর সঙ্গীত রচনা করবার নির্দ্দেশ দিয়ে গেল। সুতরাং মোৎসার্ট সেই অবস্থাতেই রচনা আরম্ভ করে দিলেন REQUIEM-এর —তাঁর জীবনের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত। রচনা করতে করতে তাঁর কেমন মনে হতে লাগলো যে এই শেষ—এই যে REQUIEM তিনি রচনা করচেন—এ তাঁর নিজেরই শেষ মহাযাত্রার সঙ্গীত! ক্ষিপ্তের মত তিনি তাঁর আত্মার সকল আবেগকে টেনে এনে ঢেলে দিলেন এই শেষ রচনার অন্তিম আয়োজনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে রহস্যময় মানুষটি আবার এক দিন এসে আরও কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে তাগিদ দিয়ে গেল তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে। REQUIEM কিন্তু মোৎসার্টের হাতে আর সমাপ্ত হ'তে পেলে না। তার আগেই বর্ষণ-বিধুর এক মৌন-ম্লান সন্ধ্যায় তাঁর সর্ব্ব শেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি অন্তিম-মহাসঙ্গীতকে অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়তে হোলো।

চরম দুঃখের দিনের পরম সান্ত্বনা—প্রীতি-ভরা হৃদয় নিয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট একান্ত সুহৃৎ সুরশিল্পী সুস্‌মায়ারকে (Sus mayer) শেষ নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত তিনি প্রাণান্তকর চেষ্টার দ্বারা পুঞ্জীভূত আগ্রহকে একাগ্র ক'রে তুলে বুঝিয়ে দিলেন, কেমন ক'রে তাঁর এই শেষ মহাকীর্ত্তিকে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। তার পরেই তাঁর অমর আত্মা—তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের ভরা যৌবনকে অবহেলা ক'রে তাঁর মর-জীবনের মাঝখানে হঠাৎ শেষ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে উধাও হ'য়ে গেল, অনন্ত সঙ্গীতের মহাশূন্য পথে। ডিসেম্বরের শীত-বিড়ম্বিত বিষণ্ণ বর্ষার ম্লান সন্ধ্যায় নিঃস্ব রিক্ত অবহেলিত শিল্পীর শ্রান্তি-জর্জ্জর, অনশন-ক্ষীণ দেহাবশেষের অনুগমন করবার মত বন্ধু-পরিজনের সমাবেশ হোলো না। বুকের রক্তের সঙ্গে নিজের পরমায়ু নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে অনাগত যুগের রসাশ্রয়ী নরনারায়ণের আত্মার সেবার জন্যে অনবদ্য সঙ্গীতের নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে চরম দিনে অবহেলিত অবস্থায় বিদায় নিলেন যে অপূর্ব্ব শিল্পী তাঁর দেহকে অনাড়ম্বরে সমাহিত করা হলো সর্ব্বহারাদের কবর-খানায়। ঝড়ের দিনে সেখানকার ধূলিকণার নিশ্বাস খেয়ালী রাজানুগ্রহকে আজও ঘৃণিত বিদ্রূপে ধিক্‌ত করে কি না কে জানে!

গাছের প্রেম

নারায়ণদাস সান্যাল

দিবসে দেখেছি ছায়া শুয়ে আছে
গাছের চরণমূলে,
পাদপ চাহে না ফিরে।
আগার-জগত নয়ন আড়ালে
বুকে লয় তারে তুলে,
আঁধার ঘনালে ধীরে।

কোরিয়া

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোরিয়া দেশটা আয়তনে গ্রেট বৃটেনের চেয়ে কিছু বড়। জাপানের উত্তর-পশ্চিম দিকে জাপান-সমুদ্রের অপর পারে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এই দেশের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ। তার মধ্যে ৯৭% লোকই কোরিয়া—মাত্র '৬৫০০০ বা ৩% জাপানী।

দেশটা কৃষি-প্রধান; প্রধান ফসল, চাল। কৃষির ওপর নির্ভর করে ৭৫% লোক। অর্দ্ধেক কৃষকেরই নিজের জমি নেই। তাদের জীবন-যাত্রার মানদণ্ড খুবই নীচু;—তার ওপর জাপানী শাসনের আমলে জাপান কোরিয়া থেকে জাপানে চাল চালান দিতে সুরু করলে; কোরিয়া কৃষকের অবস্থা হল "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।"

এক দিকে কৃষকের এই দারিদ্র্যের সঙ্গে আর এক দিকে একটা ধনী জমিদার সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। শতকরা ৩-জন লোকের অধিকারে ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ জমি। আর, চাষযোগ্য জমির অর্দ্ধেকই গিয়ে পড়েছিল জাপানী জমিদারদের হাতে। জমির খাজনার সাধারণ হার ছিল ফসলের অর্দ্ধেক।

কোরিয় জমিদারেরা সহরে বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকতো এবং জাপানী শাসকদের সহযোগিতা করতো। তারা ছিল কোরিয়ার গণ-স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় শত্রু।

'৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনায় এই কোরিয়াই হয়েছিল প্রধান ঘাঁটী। কাজেই তারা কোরিয়ায় শিল্পবিস্তারে মনোযোগ দিলে। শিল্পপ্রসার হতে লাগলো বেশ দ্রুতই, কিন্তু জাপানী ধনিকদের হাতেই থাকলো তার কলকাঠি। ব্যাঙ্ক, খনি, বৈদ্যুতিক শক্তি এ সব হল জাপানের একচেটিয়া অধিকার। কোরিয় ধনিকদের সহযোগ তার মধ্যে থাকলো বটে, কিন্তু সে জাপানী মালিকদের তাঁবেদার হিসেবে। কাজেই তারা দেশের লোকের চোখে হল বিদেশীর তাঁবেদার মাত্র।

জাপানী শাসনে কৃষক-মজুরদের সংঘগঠন বে-আইনী হয়েছিল; কিন্তু তবু কোরিয় জনগণ গুপ্ত ভাবেই সর্ব্বপ্রকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং কৃষক-শ্রমিকদের সংঘ সংগঠিত করে কাজ করে যাচ্ছিল। মহাযুদ্ধে জাপানীদের আত্মসমর্পণের সময় ঐ সব পার্টি এবং সংঘ কি পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তা' নীচের তালিকা থেকে বোঝা যায়:—

কৃষক-সংঘ	সভ্য-সংখ্যা	৫ লাখ
ট্রেড ইউনিয়ন	"	১ লাখ
ছাত্র-সংঘ	"	২০ হাজার
নারী-সংঘ	"	১০ হাজার
ইঞ্জিনিয়ার-সংঘ	"	২ হাজার

জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর এই সব সংখ্যা আরো অনেক বেড়েছে। '৪৫ সালের ডিসেম্বরে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য-সংখ্যা হয়েছে ৮ লাখ।

সব চেয়ে শক্তিশালী দু'টি রাজনৈতিক দল হ'চ্ছে পিপলস্ পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টি '২৫ সালে গঠিত হয়, এবং তার পর থেকে বরাবরই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে আসছে। '৪৫ সালের প্রথমে তাদের সভ্য-সংখ্যা ৩০ হাজার।

এই দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে দু'জন কোরিয় সেনাপতি কিম্ মুচিউং এবং কিম্ ইলসিংএর পরিচালনাধীনে এক কোরিয় বৈপ্লবিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। উত্তর-চীন ও মাঞ্চুরিয়ার সৈন্যদলের মধ্যেও তাদের লোক অনেক ছিল। তাদের সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে এক লাখ।

'৪৫ সালের আগষ্ট মাসে পিপলস্ পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কোরিয় জনগণ জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং অনেক স্থানে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এক মাসের মধ্যেই ১৪৫টা সহরে জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত পিপলস্ কমিটী গঠিত হয়।

লাল ফৌজ কোরিয়ার উত্তর সীমান্ত পার হয়ে কোরিয়ায় প্রবেশ করার, এবং আমেরিকান সৈন্যদল কোরিয়ার রাজধানী সেউলে প্রবেশ করার কিছু দিন আগে,—৬ই সেপ্টেম্বর,—ঐ সব পিপলস্ কমিটী ৬০০ প্রতিনিধি মিলে একটা জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বসে। ঐ সম্মেলনে এক কেন্দ্রীয় পিপলস্ কমিটী নির্ব্বাচিত হয়, শাসনবিধি প্রণয়নের জন্যে এক কমিটী গঠিত হয়, এবং এক অস্থায়ী পিপলস্ রিপাবলিক ঘোষিত হয়।

ঐ সম্মেলনে ঘোষিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কার্য্য-সূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট হয়:—জাপানী মালিকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা, এবং জমিহীন কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করা;—খনি, কল-কারখানা, শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা;—নরনারীর সমান অধিকার,—আট ঘণ্টায় শ্রমিকদের "রোজ",—সর্ব্বনিম্ন বেতন ও মজুরীর হার নির্ণয়;—সুদখোরী ও মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আইন করা।

এই সব ব্যবস্থা হওয়ার পর উত্তর থেকে লাল ফৌজ এবং দক্ষিণ থেকে আমেরিকান ফৌজ কোরিয়ায় প্রবেশ করে; তদবধি উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই দখলীকার শক্তির এলাকায় দুই বিপরীত নীতি এবং তদনুযায়ী বিপরীত অবস্থা গড়ে উঠেছে।

উত্তরে সোভিয়েট অধিকৃত এলাকায় পিপলস রিপাবলিকের নীতি অনুযায়ী ভাবে জাপানী মালিকদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে;—কোরিয় ধনিক ও জমিদারদের শক্তির অবসান হয়েছে। তাদের একেবারে উচ্ছেদ করা হয়নি, কিন্তু খাজনার হার খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর, অনেক কোরিয় জমিদার ভয়ে দক্ষিণে আমেরিকান এলাকায় পালিয়ে গেছে। সুতরাং তাদের প্রজাদের খাজনা এবং ঋণ একেবারে উড়েই গেছে।

তা ছাড়া, জাপানীদের এবং পলাতক কোরিয় ধনিকদের কল-কারখানাগুলোও গভর্ণমেণ্ট দখল করে নিয়েছে, এবং সেগুলো পরিচালিত হ'চ্ছে শ্রমিকদের কমিটীর কর্তৃত্বে। গভর্ণমেণ্ট হ'চ্ছে ঐ কেন্দ্রীয় পিপলস কমিটীই।

পক্ষান্তরে, দক্ষিণের আমেরিকান এলাকায় অবস্থা একেবারে বিপরীত। আমেরিকান সেনাপতি হজ প্রথমেই পিপলস্ কমিটি ভেঙ্গে দিলেন, এবং জাপানী গভর্ণর জেনারেলকেই গদীতে বসালেন। ফলে চারি দিক্ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো এবং তিনি ঐ জাপানী বড়লাটকে আবার গদীচ্যুত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তার ফলে নতুন সরকার গঠন করলেন—জমিদার ও শিল্পপতিদের সংঘ, ডিমোক্রেটিক পার্টির নয় জন সভ্য এবং বাইরের আর দুই জন সভ্য নিয়ে গঠিত এক অ্যাডভাইসারী কাউন্সিল গঠন করে'। এই

তথাকথিত ডিমোক্রেটিক পার্টির নেতা কিম্ সংসু '৪৩ সালেও কোরিয় জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন, জাপানের সম্রাট্ এবং বৃহত্তর পূর্ব্ব-এসিয়ার নব বিধানের জন্যে প্রাণ দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হজ চীনে চুংকিংএ চিয়াং কাইশেকের সমর্থনে গঠিত অস্থায়ী কোরিয়া সরকারের নেতা কিম্ কু এবং তার আমেরিকাস্থ প্রতিনিধি সিংম্যান রী'কেও নিয়ে এলেন। এই দুই নেতা আমেরিকার ধনিক শিল্পপতিদের সঙ্গে জড়িত। এঁরা এসেই স্থানীয় ধনিক জমিদারদের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমেরিকার নীতি কার্য্যকরী করার দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যেন জাপানীদের স্থলে আমেরিকার প্রতিষ্ঠা।

জাপানী কোম্পানি ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের ৩০০ কোটি টাকার কারবার আমেরিকান কোম্পানি নিউ কোরিয়ান করপোরেশনের কুক্ষিগত হ'ল।

জেনারেল হজ তিনটে জেলায় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে দেখলেন, লোকে পিপলস রিপাবলিকের প্রতিনিধিদেরই ভোট দেয়। কাজেই নির্ব্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাদের চাপে জেনারেল হজ জমিদারদের প্রাপ্য ফসলের অংশ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ধনিক জমিদারের পার্টি ডিমোক্রেটিক লীগকে লোকে চায় না।

মোট কথা, পিপলস রিপাবলিক জনসাধারণের মধ্যে এমন শেকড় গেড়েছে যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কোন ষড়যন্ত্র আর তাদের হটাতে পারবে না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৭) মার্কিণ সাংবাদিক আনালুই ষ্ট্রং উত্তর কোরিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে—

"গত এক বছর যাবৎ প্রতি দিন গড়ে দেড় হাজার অধিবাসী মার্কিণ-শাসিত দক্ষিণ-কোরিয়া হইতে সোভিয়েট-শাসিত উত্তর-কোরিয়াতে পলাইয়া আসিতেছে। শ্রমিকরা পলাইয়া আসিতেছে বেকারীর লাঞ্ছনা এবং পুলিশী অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য, কৃষকরা আসিতেছে অতিরিক্ত কর আদায় ও সরকারী জুলুমকে এড়াইবার জন্য, ছাত্ররা আসিতেছে মার্কিণ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য।

"সোভিয়েট এলাকায় ভূমি-সংস্কার, জাপানী শিল্প-ব্যবস্থার জাতীয়করণ এবং শ্রমিক-মঙ্গল আইন পাশ করার ফলে মার্কিণ এলাকায় নিগৃহীত জনগণের কাছে উত্তর-কোরিয়া আজ স্বর্গরাজ্য বলিয়া মনে হয়।

"কোরিয়া রাজবংশের আত্মীয় লী কাঙকুক (প্রগতিশীল মতবাদের জন্য ইনি সোভিয়েট এলাকায় পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন) আমাকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের শরৎ কালে মার্কিণ এলাকায় ১৫ লক্ষ লোক নিজেদের ন্যায্য দাবীর জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এই উপলক্ষে পুলিশের গুলীতে ৩০০ জন নিহত হয়, এবং ১০০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে মার্কিণ এলাকায় ২০০০০ রাজনৈতিক কর্ম্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। জাপ আমলেও রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা এর চেয়ে কম ছিল।

"সমগ্র কোরিয়ায় কবে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, সারা কোরিয়ার জনগণ অধীর আগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।"

গত ২৩।২।৪৮এর 'ষ্টেটসম্যানে' রয়টারের খবরে প্রকাশ: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া-কমিশনের সভাপতি মিঃ মেনন (ভারতীয়) নিরাপত্তা পরিষদের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন—

"দক্ষিণ-কোরিয়ায় নির্ব্বাচন যথাযথ ভাবে করতে হলে লোকের রাজনৈতিক এবং নাগরিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি দক্ষিণ-কোরিয়াবাসীর জীবন পুলিশের কৃপার ওপর নির্ভর করে। পুলিশ যাকে খুসী বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করতে পারে, যত দিন খুসী বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারে, এবং কোন আদালতের তার ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এ অবস্থায় নির্ব্বাচন করতে হলে সব পার্টিকে তাদের কাজ এবং প্রচার করার স্বাধীনতা দেওয়া দরকার।"

এর পর সংবাদপত্রে দেখা গেল, উত্তর-কোরিয়ায় স্থায়ী পৃথক সরকার গঠিত হয়েছে,—সোভিয়েটের কারসাজিতে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই খবর পাওয়া গেল, কথাটা মিথ্যা। কিন্তু ঐ মিথ্যা কথাটার ওপর ভিত্তি করেই আমেরিকান কর্ত্তার নির্দ্দেশে দক্ষিণ-কোরিয়ায় সমগ্র কোরিয়ার জন্যে এক স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ-কোরিয়া এইবার আমেরিকার স্থায়ী ঘাঁটী হ'ল।
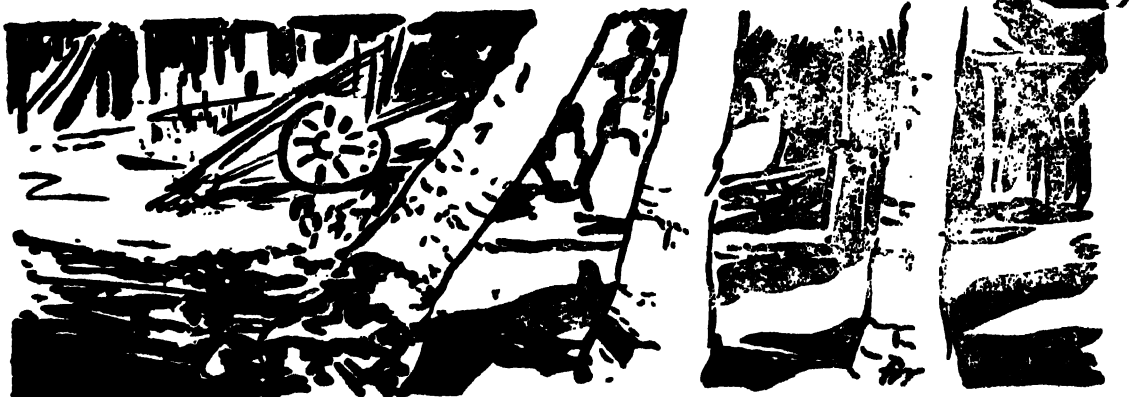
ভিয়েনা

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রাগ হইতে ভিয়েনা চলেছি। উইলকন ষ্টেশনে ভোর ৫টা ৩৫ মিনিটে পৌঁছিয়া ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিতে হইল। গাড়ীতে উঠিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম—আটটায় উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া প্রাতরাশ করিতে চলিলাম। গাড়ীর রেস্তরাঁ-কারকে মিট্রোপা বলে। ডিমের আমলেট দিল দু'টি—অপর্যা রুটি, জ্যাম, মাখন ও চা দিল—তার জন্য নিল সাড়ে ১৮ ক্রোণার। ইহাতে দু'টি ডিনার খাওয়া চলে। বিদেশীকে ফাঁকি দিতে লজ্জা হয় না—সকলে তাহাকে মনে করে বুদ্ধি-চাতুর্য্য।

গাড়ীতে একটি চেক-যুবকের সহিত আলাপ হইল। বুদ্ধিমান আশাদীপ্ত উৎসাহী এই তরুণটিকে আমার ভালই লাগিয়াছিল।

যুবক বলিল—"আমাদের রাষ্ট্রের পরিপন্থী জার্ম্মাণ-বাসিন্দারা—তারা কিছুতেই একে আপন মনে করে না—"

যুবকটির বাক্যে ও আলাপে উৎকট জার্ম্মাণ-বিদ্বেষ প্রকটিত ছিল—তখন সেটা আমার পছন্দ হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস আজ যুবকটির দূরদর্শিতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি মাত্র ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর স্বাধীনতা লাভ করে—সে স্বাধীনতা ইহারা পায় বিপ্লব ও ত্যাগের ফলে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সৌভাগ্য আজ তাহার নাই।

আলাপ হইয়াছিল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে; তখন চেক জাতির প্রাণে আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা—পথিক বন্ধুটির আলাপেও সেই বীর্য্য ও বিশ্বাসের পরিচয় মিলিল।

আমি বলিলাম—"ভবিষ্যতে মানুষের সভ্যতা বিশ্বজনীন হবে—সার্ব্বভৌম ভাব সমস্ত জাতিকে দৃপ্ত ও তৃপ্ত করবে।"

সহচর বলিলেন—"Internationalism বড় কথা—ভাবের দিকে ওর উপর উচ্চ ধারণা করতে হয়। কিন্তু আসলে ওটায় কাজ হবে না।"

মনে পড়িল—'নিজ তেজে চির দিন জাতির বিকাশ।' তথাপি বিশ্বপ্রীতির বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম।

স্বদেশ-প্রেমের জ্যোতিতে যুবকের মুখ উদ্ভাসিত। যুবক বলিলেন—"কল্পিত আদর্শ বড়, কিন্তু League of Nstions কার্য্যকরী হতে অনেক দেরী—স্বার্থ যেখানে সর্ব্বগ্রাসী সেখানে বিশ্বপ্রীতির কথা বলা নিরর্থক।"

যুবকের কথা মানি নাই। উপনিষদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সহিত বর্ত্তমান নীতিশাস্ত্রের আন্তর্জাতিকতার জয়গান করিয়া অনেক সময় কাটিল। দু'ধারে প্রকৃতির দৃশ্য বেশ লাগিল। মানুষের হস্ত ভূমিকে লক্ষ্মীশ্রী দিয়াছে। গিরি-দরীর উপর দিয়া চলিয়াছে চাষীর ক্ষেত্র—মনে হয় যেন তাদের সীমা নাই।

দূর বনভূমি বা গিরির পাদদেশে ক্ষেতের ছক মিলিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলাতে ভিয়েনা পৌঁছিলাম। আমাদের গাড়ী থামিল Franz Goseph Banhok নামক ষ্টেশনে, তাহার নিকটে হোটেল বেলিভিউতে উঠিলাম। হোটেলটি মন্দ নয়, তবে খাবার যা দিল তাহা অত্যন্ত খারাপ।

যাযাবর পথিকের মনে গৃহের আকর্ষণ প্রবল, তাই চিঠির আশায় প্রথমে কুকের ওখানে গেলাম, সেখান হইতে চিঠি নিয়া Y.M.C.A.র হোটেল দেখিতে গেলাম। ইহাদের আয়োজন মনোমত হইল না, তাই হোটেলে ফিরিলাম। ট্রামে ফিরিবার সময় গন্তব্যস্থান স্থির করিতে না পারিয়া একটি লোককে হোটেলের ঠিকানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিলাম। সে চেনে না—ভুল করিয়া নর্ড ব্যানহফে—উত্তর ষ্টেশনে নামাইয়া দিল। অনর্থক অনেক দূর চলিতে হইল—সেখান হইতে কষ্টে আপন হোটেল খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ফিরিয়া আনন্দে স্নান করিলাম—স্নানে অসীম পরিতৃপ্তি জাগে, মনে হয় যেন সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। জানি না, য়ুরোপীয়েরা কেন প্রত্যহ স্নান করে না। আমরা গরম দেশের লোক, জলকে আমরা ভালবাসি—তাই স্নান করিতে না পারিলে অসুখী হই। তার পর বসিয়া বসিয়া চিঠি লিখিলাম।

এখান হইতে একটা চিঠিতে লিখি—"একা একা চলতে হয়রাণ হয়ে উঠেছি, নানা অপরিচিত স্থান, খোল বাক্স, আবার বাঁধো, আবার চলো, এই বার বার নড়া-বসা আমার অলস আরামপ্রিয় মনকে আড়ষ্ট করে—তাই এখন জাহাজের দিকে মন ছুটছে—সেখানে দিব্যি আরামে নাক ডেকে ঘুমানো যাবে—এলিয়ে বিছানায় অলস দেহ" দেখিতেছি, দিনের পর দিন শ্রম সাধ্য ভ্রমণে বাঙ্গালী-চিত্ত জাতি-সুলভ আরামপ্রিয়তার পানে ঝুঁকিয়াছে।

পরদিন ভোরে উঠিয়া প্রাতরাশের অপেক্ষায় চিঠি লিখিতেছি—"এখন সকালের খাওয়া খাবো। দেবে চা, রুটি, মাখম ও জ্যাম, আর হয়ত ডিম। এই হোটেলের খাওয়াটা মোটেই ভাল লাগেনি আমার—কাজেই বাইরে খাবো ভাবছি। তার এক মুস্কিল ভাষা-জ্ঞানের অভাব। দেখা যাক, কি হয়, মুস্কিলের সঙ্গে লড়াইয়ে আমোদ আছে, তবে দিনের পর দিন সেটা ক্লান্ত ক'রে তোলে।"

ট্রামে না চড়িয়া হাঁটিয়াই চলিলাম। ভিয়েনাকে লোকে বলে স্বপ্নপুরী, গানের তীর্থ, প্রেম, হাসি ও উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী। সে কথা হয়ত মিথ্যা নয়, নগরের রূপসজ্জা অত্যন্ত চমৎকার। ইহার কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদগুলির মাঝে যেন এক ঘুমন্ত যুগের রূপ-কথা ঘুমাইয়া আছে।
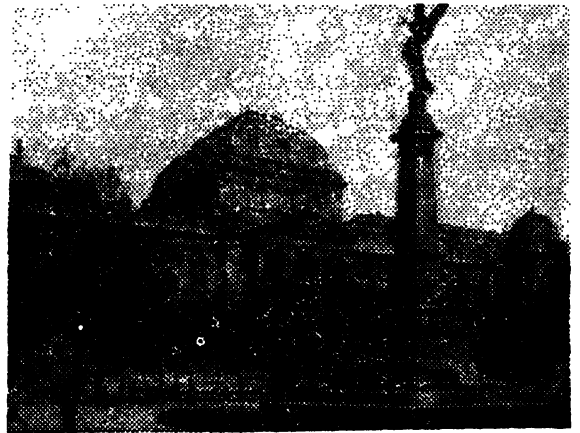
বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্ন-বিজড়িত সেই যাদু বিদেশী পথিকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে

অনুভব করা দুঃসাধ্য। তার পর যাহারা ভাষা জানে না—তাহারা ইহার আনন্দ-রস নিঃশেষে পান করিতে পারে না।

প্রথমে ভোটিব চার্চ্চে গেলাম। প্রাচীন ভিয়েনা সহরের চারি প্রান্তে যে দুর্গ পরিখা ছিল—সম্রাট ফ্রাঞ্জিস জোসেফ সেগুলি ধ্বংস

যাদুঘর

করেন এবং তাহার উপর বিস্তৃত পরিসর রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। সুন্দর, সুরম্য এই বুলেভার্ডগুলির ছায়া-শ্যাম ছবি অন্তরকে মুগ্ধ করে। ইহার নাম হইয়াছে রিং ষ্ট্রাসে—ইহার পাশে পাশে সরকারী বাড়ীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভোটিব চার্চ্চ স্থাপন রাজার মানসিকের ফলে—যখন সম্রাট যুবক ছিলেন, তখন তাহাকে হত্যার নিষ্ফল চেষ্টা হয়। তখন তিনি মানৎ করেন যে, উপাসনা-মন্দির গড়িয়া দিবেন। গথিক প্রথায় এটা নির্ম্মিত—দু'টি উচ্চ সরু চূড়া আকাশে উঠিয়াছে।

পাশেই বিরাট Rathaus বা টাউন-হল। এখানে ভিয়েনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা সুলভে মেলে, কিন্তু সে রসে বঞ্চিত, কাজেই শ্রুতিসুখই মিটিল। এই বিরাট পৌর-কক্ষ দেখিতে সময় লাগিল। ইহার ভিতরই ইহাদের নগর-কলা-ভবন। তাহার পর বুর্গ থিয়েটারে গিয়া একটি টিকিট কিনিলাম। সেখান হইতে Kunsthistorisches Museum দেখিতে গেলাম। য়ুরোপের নাম-করা যাদুঘর, ইহাতে মিশর-সভ্যতার চমৎকার সংগ্রহ আছে। তাহা ছাড়া, ইহার চিত্রশালা জগৎ-বিখ্যাত। ইহাতে রুবেন্স, রেমব্রাণ্ড, টিসিয়ান, র‍্যাফেল প্রভৃতি সেরা চিত্রকরদের ছবি আছে। গথিক দারুশিল্পের সংগ্রহও চমৎকার। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মরকত-মণি এখানেই আছে।

তার পর Holfburg প্রাসাদের সজ্জিত ভবন এবং ধন-ভাণ্ডার দেখিলাম। এক দিন যে সব সুন্দর কক্ষ রাজ-বধূদের কল কোলাহলে মুখর ছিল, সে সব আজ কৌতূহলী দর্শকদের লালায়িত দৃষ্টিতে মলিন। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের এই শোচনীয় পরিণতি মনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে।

চোখের সম্মুখে মানুষ দম্ভ ও গর্ব্বের এই চিতাশয্যা দেখে, তবু মানুষের অহঙ্কার নত হয় না। মানুষের মধ্যে যে দানব, সে পরাজিত ও ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়াও অপরাজেয় থাকে।

হফবার্গ ধন-ভাণ্ডারে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের দণ্ডছত্রচামরাদি রাজচিহ্নের সংগ্রহ আছে।

রাজ-প্রাসাদের এই সজ্জা ও সমারোহ দেখিয়া যখন ফিরি তখন একটি শোভাযাত্রা চলিতেছিল। ইংরেজী-জানা কাহাকেও না পাওয়ায় ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলাম না।

এখান হইতে একটি নিরামিষ রেস্তঁরায় খাইতে গেলাম। যে মেয়েটি পরিবেশন করিল—সে তরুণী। বয়স কুড়ি-বাইশ—মোটামুটি ইংরেজী বলিতে পারে। এখানে অনেক ভারতীয় খাবার পাওয়া যায়। পরিচারিকা বিশেষ যত্ন করিল—এই যত্ন ও সেবার ভিতর একটি অপূর্ব্বতা ছিল—যাহা আমার অন্তরে আজিও আনন্দের শিহরণ জাগায়। একটি ডিস পছন্দ না হওয়ায় সে বদল করিয়া অন্য খাবার দিল—পরিত্যক্ত খাবারের দাম নিল না। এমন আন্তরিকতা সুদুর্লভ।

পরিচারিকা আসিবার সময় বলিল,—"অন্য যেদিন আসবেন সেদিন আপনাকে আরও ভাল খাওয়াব।"

তরুণীর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইহা ব্যবসাদারী নয়—বিদেশীর প্রতি বিদেশিনীর সহজ মানবতা-সুলভ দরদ। আজ সাত সাগরের পার হইতে নীল-নয়নার সেই প্রীতি-সমৃদ্ধ সহৃদয়তার কথা মনে পড়ে।

খাওয়ার পর ডাক-ঘর খুঁজিতে গেলাম—অনেক ঘুরিলাম। তার পর Imperial Kino নামক চিত্রগৃহে একটি ছবি দেখিলাম। চিত্রকর রেমব্রাণ্ডের জীবনের ছবি—গঠন-কৌশল বা প্রয়োজনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ নাই, তবে একটি কথা খুব ভাল লাগে।

বাড়ীর চিঠিতে লিখি, "চিত্রকর বলছিলেন—যদি একটি নারীকে সত্যি করে ভালবাসা যায়, তবে সমস্ত নারীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তার কাছ থেকেই পাওয়া যায়—এ কথা জীবনে খাটে কি না কে জানে?"

ছবি দেখা শেষ করিয়া ভিয়েনার ষ্টুডেণ্টস ক্লাবে গেলাম। ছাত্রদের মিলন-স্থান—নানা দিগ দেশের ছাত্রেরা এখানে সমবেত হয়। হিন্দুস্থান ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশনের খবর নিলাম। উহারা যে বাড়ীর ঠিকানা দিল, সেখানে সন্ধান পাইলাম না। তার পর বুর্গ থিয়েটারে একটি কমেডির অভিনয় দেখিলাম। বুর্গ থিয়েটার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যমন্দির। ভিতরটা শ্বেত পাথরে তৈরি।

ভিয়েনাকে লোকে বলে সঙ্গীত-নগর। ইহার অপেরা, ইহার সঙ্গীত-শালা, সঙ্গীত-নৈপুণ্য জগজ্জয়ী। ইহার অধিবাসীদের সঙ্গীত-প্রীতি অতিশয়। য়ুরোপীয়েরা বলেন, স্পেনীয়েরা যেমন বৃষ-যুদ্ধ ভালবাসে, ইংরেজেরা যেমন ফুটবল প্রতিযোগিতা ভালবাসে, ভিয়েনার নাগরিকেরা তেমনই সঙ্গীত ভালবাসে। এখানেই সঙ্গীত-স্রষ্টা হেডিস, বীটোভেন, স্নবার্ট, মোজার্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ-গণের জন্ম হয়। অবশ্য ভাষা জানি না।

নিঃসঙ্গ বসিয়া মূক অভিনয় দেখিলাম। দেখিলাম সজ্জা-কৌশল, দেখিলাম নৃত্য-চাতুর্য্য, শুনিলাম সঙ্গীত, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না। দরদী সমঝদার বন্ধু না লইয়া ইহা দেখা বৃথা। কিন্তু নিরুপায়, বন্ধু বা বান্ধবী জোটানো একটা আর্ট, সে আর্টে আমি একান্ত আনাড়ি। সহৃদয় সরলতায় সংসারে বন্ধু জোটে না, তার জন্য চাই কুশলী বুদ্ধি—সে বুদ্ধি নাই।

থিয়েটার দেখিয়া আলোকিত রাজপথ দিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

নগরীর নৈশ আমোদ তখনও চলিতেছে। কাফেতে তখনও বিশ্রাম-অভিলাষী নর ও নারী অলস মাধুর্য্য সন্ধান করিতেছে। কাফে-গুলিতে তখনও চলিতেছে পানোন্মত্ত নৃত্য-বিলাস—কিন্তু সে আনন্দ নিঃসঙ্গ পথিকের নয়।
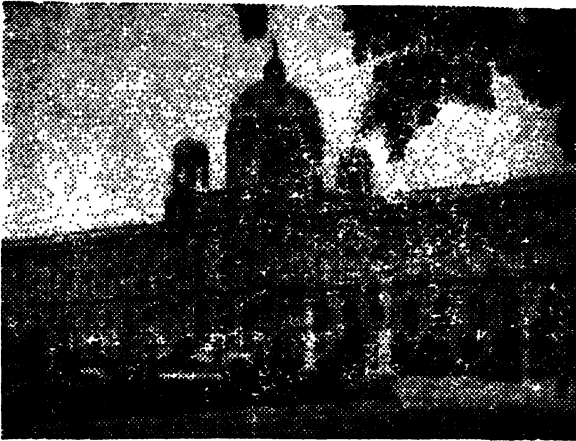
দপ্তরখানা

সকালে ভারতীয় ছাত্র-সঙ্ঘের সম্পাদক ডাঃ গারোলার সন্ধানে চলিলাম। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ একটু অসুবিধা ছিল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা—অনেক ঘুরিয়া একটি রেস্তরাঁয় দেখা মিলিল—সেখানে ডাক্তার প্রাতরাশ করিতেছিলেন, ভদ্রলোক আলাপী। বর্ণরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সন্ধান করিতেছিলাম—আমার একটি আত্মীয়ের জন্ত। তিনি দু'জন ডাক্তারের খোঁজ দিলেন—তাদের বাসায় না যাইয়া Natural History Museum দেখিতে গেলাম।

ভিয়েনাতে শতাধিক কলা-ভবন আছে। এক পাশে Kunsthistorisches অন্ত পাশে Naturlistorisches—মাঝখানে মেরিয়া থেরেসার স্মৃতিতে নির্ম্মিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পশু ও পক্ষীর সমাহার—অনেক দেখিয়াছি—কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে একবার চোখ বুলাইয়া নিয়া কুকের আফিসে চলিলাম। কয়েকটি চিঠি পেলাম।

তার পর গেলাম সেন্ট ষ্টিফেন গির্জ্জায়। বহু দূর হইতেই এই ক্যাথিড্রালের সু-উচ্চ চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মন্দিরটি গথিক স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইহাকে ভিয়েনাবাসীরা আদর করিয়া "বুড়া ষ্টিভ" বলে—ঠিক যেমন আমরা বলি বুড়া শিব-তলা। ইহার গম্বুজ-শীর্ষে উঠিলে ভিয়েনা সহরের দূর-বিসারী সৌধাবলীর একটি চমৎকার ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণের জন্ম সব দেশেই হয়—রূপকথা এবং কিংবদন্তী মানুষের কল্পনা-বিলাসী মনে জাগে। এমনই একটি গল্প শোনা যায়। এক জন তরুণ স্থপতি নাগরিকের সুন্দরী কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিল। দু'জনের মধ্যে বেশ প্রেম জন্মিয়াছে,—কিন্তু পিতার আভিজাত্যে আঘাত লাগে। পিতা বলিলেন—"না, সে সম্ভব নয়।" প্রণয়ী ছাড়িতে চায় না—তখন শর্ত্ত আসিল—"যদি এক বছরের মধ্যে তুমি বুড়া ষ্টিভের একটি বুরুজ গড়িতে পার, তবেই কন্যা মিলিবে।" স্থপতি আহার-নিদ্রা ভুলিল—কিন্তু তবুও অসাধ্য-সাধন সম্ভব নয়। তাই সে শয়তানের বর প্রার্থনা করিল। শয়তানের সাহায্যে সে বৎসরের পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ প্রায় শেষ করিল। তার পর এক চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল নিশীথে প্রণয়িযুগল নগরের আনন্দ-সমারোহ দেখিতে উপরে উঠিল। প্রণয়িনী ভাবাতিশয্যে পা ফসকাইয়া পড়িল। প্রেমিক প্রেমিকাকে ধরিতে গিয়া নিজেও পড়িল। শয়তান অলক্ষ্যে হাসিল এবং বুরুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া প্রেমিক-প্রেমিকার উপর সমাধি রচনা করিল।

গির্জ্জার ভিতরটি অন্ধকার, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। সূর্য্যের আলো রঙীন কাচের গ্লাসে আসিয়া পড়ে, তাহারই প্রতিফলিত আলোকে রঙ-বেরঙের খেলা দেখা যায়। সকলগুলি মিশিয়া একটি অদ্ভুত পরিবেশ গড়ে।

গির্জ্জার চারি পাশে মিষ্টান্নের দোকান—বুড়ীরা বসিয়া বেচিতেছে। প্রাচ্যের মন্দির-দৃশ্য মনে পড়ে।

এখান হইতে ফোহের মার্কেটে গিয়া ভিয়েনার আশ্চর্য্য ঘড়ি দেখিলাম। উহারা ইহাকে বলে Ankeruhr. ঠিক বারটার সময় ইহার কৌতুক-কৌশল দেখা যায়। ঘড়ির মধ্যে মেরিয়া থেরেসা, তাহার স্বামী, হেডিস প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের মূর্ত্তি আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক-একটি মূর্ত্তি বাহির হয়। কিন্তু বারটার সময় সমস্ত মূর্ত্তিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যায়—তাহাদের যাত্রা শেষ হইলে ঘণ্টা বাজে এবং কয়েক মিনিট ধরিয়া মধুর বাজনা বাজে। সেখান হইতে ফিরিয়া Ettenological Museum দেখিলাম। রক্ষী বিদেশী দেখিয়া ঠকাইয়া তিন শিলিং দামের টিকেট গছাইয়া দিল—জুয়াচুরি করিতে সর্ব্ব দেশেই লোক সুলভ।

এখান হইতে মেরিয়ানগাছায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে গেলাম। এখানে ডাঃ কাপুরের সঙ্গে দেখা হইল। ডাঃ কাপুর আমার আত্মীয়ের অসুখের কথা ডাঃ হ্যাটফিককে বলিবেন বলিলেন। এখানে অনেকগুলি ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রেস্তরাঁটিতে ভারতীয়দের প্রিয় অনেকগুলি খাবার পাওয়া যায়। এখানে ছেলেদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ হইল। তাহারা বলিল—তাহাদের কাহারও য়ুরোপ ভাল লাগে না—আমারও লাগেনি। এদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের মিল নাই—না আচারে, না বসনে, না চলায়, না রীতিতে, কাজেই আমরা যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িয়াছি।

এখান হইতে Schonbrunn রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। ইহা অষ্ট্রীয়ার সম্রাটগণের নিদাঘ আবাস ছিল। ইহার কক্ষে কক্ষে যেন সেই বিলাস-ব্যসনের অভিশপ্ত নিশ্বাস আজিও বাজিতেছে।

ট্রামে করিয়া গেলাম—অনেক দূর যাইতে হয়। পথে বড় বড় পার্ক এবং তরুবীথি পড়িল। এই প্রাসাদ মেরিয়া থেরেসার কীর্ত্তি—সুধা-ধবল এই প্রাসাদকে ভার্সেল প্রাসাদের অনুরূপ করিবার সংকল্পে নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদে প্রায় দেড় হাজার কক্ষ আছে। কক্ষে কক্ষে সুবৃহৎ দর্পণ—চীন দেশের ঝাড়। কঠিন এবং চীনা খেলানা আছে।

একটি কক্ষকে দশ লক্ষ ফ্লোরিন ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকে 'মিলিয়ন' কক্ষ বলে। একটি কক্ষে নেপোলিয়ান বাস করিতেন।

এই কক্ষে সম্রাটদের গাড়ীর প্রদর্শনী—তাহাতে সেকালে রাজারা

যে সব কারুকার্য্যখচিত গাড়ী চড়িতেন, সেগুলি সজ্জিত আছে। যুবরাজ ইউজিন এখানে প্রথমে একটি পশুশালা করেন—পার্কটি বড় হইয়া এখন চিড়িয়াখানায় পরিণত হইয়াছে। Tier garten নামক উদ্যানের মধ্যেই এই পশু-শালা অবস্থিত, এখান হইতে ট্রামে ফিরিয়া ডিনার খাইবার সুবিধা না পাইয়া একটি মিল্ক বারে গিয়া দুই বড় গ্লাস দুধ এবং রুটি খাইয়া সান্ধ্য-ভোজন শেষ করিলাম। পরে Royal Opera গৃহে গীতাভিনয় দেখিতে চলিলাম।

সেকস্‌পীয়ারের The Many Wivs of Windsor নামক হাস্যরসাত্মক নাটকটিকে নিকোলাস নামক এক জন শিল্পী গান দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছেন—অন্য এক জন ইহাকে গীতাভিনয়ে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

ষ্টেট অপেরা-গৃহ এক সময়ে সম্রাটদের অনুগ্রহপুষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি ছিল। তখন সান্ধ্য পোষাক না পরিলে এখানে টিকিট মিলিত না। এখন ছেলের দল বিয়ার পান করিয়া সস্তায় টিকিট কেনে এবং হল্লা করিয়া মাতায়।

তথাপি য়ুরোপের মধ্যে বোধ হয় বার্লিনের অপেরা ছাড়া এমন সুন্দর গীত-কক্ষ নাই। এখানে প্রায়ই কলা-রসিক সঙ্গীত-স্রষ্টাদের সুমধুর গীত বিচক্ষণ গায়কদের ললিত কণ্ঠে গীত হয়। রাত এগারোটায় বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিলাম।

প্রিয়তমা চিঠি দিয়াছেন—আমি প্রণয়-রসে মসগুল হইয়া আনন্দে কাটাইতেছি আর তিনি দুঃখ-সাগরে ম্রিয়মাণা। তদুত্তরে লিখিলাম —"অবিশ্বাসের কারণ কিছুই করিনি—কসিয়াবার্জ্জায় বিশ্ববিখ্যাত আমোদের যায়গা—অবশ্য উলঙ্গ নাচ দেখায় অপরাধ হয়েছে ভাবতে পার—কিন্তু হাজার হাজার লোক তা প্রত্যহ দেখে। অবশ্য যারা খারাপ তারা ওখানে নটীদের সঙ্গে আলাপ ও মেলা-মেশা করে—আমি তা করিনি নিশ্চয়ই জানো—আর আমার সঙ্গে ছিল দু'টি ভদ্র মেয়ে—ডিটা আর তার জার্ম্মাণ বান্ধবী—

ডিটার পরে হঠাৎ ঈর্ষ্যার বান ছুটল কেন? সে মেয়ে ভালবাসা দেওয়ার নয়, অবশ্য যে বন্ধু—বন্ধুর কবজ সে করেছে—তার পয়সায় তোমার প্যারির চিঠি আমার কাছে এসেছে—তার সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে, কিন্তু প্রেম চলে না—সে প্রেমের বাইরে।"

মঙ্গলবার ৮ই ডিসেম্বর। আজ এখানে ছুটি—সকালে উঠিয়া গন্তব্য স্থান বুডাপেষ্টের জন্য যে ষ্টেশনে যাইতে হইবে সেই Banhop দেখতে গেলাম। য়ুরোপের বড় বড় সহরে ৮।১০টি করিয়া ষ্টেশন—চারি দিকের জন্য চারিটি প্রধান ষ্টেশন থাকে—যথা, Nord Banhop উত্তর ষ্টেশন; West Bauhoh পশ্চিম ষ্টেশন—Sleid Bauhoh দক্ষিণ ষ্টেশন; Ost Bauhoh পূর্ব্ব ষ্টেশন। সেখান হইতে প্রিন্স ইউজিন রাজপথের পাশে তাহার নির্ম্মিত বেলভিডিয়ার প্রাসাদে গেলাম। সাভয়-যুবরাজ ইউজিন বীর ও শিল্পরসিক ছিলেন। ইহার উদ্যানগুলিকে মনে হয়, যেন কোন চিত্রকরের তুলিকায় রঞ্জিত পট। সুসমঞ্জস রেখা-বিন্যাসে বিন্যস্ত এই উপবন অতিশয় চমৎকার। ইহার মধ্যেই Baroque Museum এবং অষ্ট্রীয়ান গ্যালারি।

ফিসার ভন এরলাক নামক এক জন স্থপতি ইটালী হইতে জাঁক-জমকশালী বারোক-রীতি অষ্ট্রীয়ায় আমদানী করেন। কার্ল গির্জ্জায় প্রথম এই রীতি অবলম্বিত হয়। রাজা এই সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্যখচিত স্থাপত্য রীতিতে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি বারোক প্রথায় অজস্র প্রাসাদ ও সৌধ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন।

স্থাপত্যের চারুতা এবং মাধুর্য্য বুঝিবার মত বিদ্যা নাই। অলঙ্কার এবং গঠন-পারিপাট্যের নানা কলা-কৌশল না বুঝিলেও বেশ মনোমোহন বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম।

বারোক মিউজিয়মে অষ্ট্রীয়ার খ্যাত-কীর্ত্তি শিল্পী ও ভাস্করদের মনোহর চিত্র ও মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।

ভাস্কর্য্যের নিদর্শন

ফিরিবার পথে একটি ইতালীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে আমাকে Industry and Art Museum পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। তাহার সহিত ফাসিস্ত আন্দোলন সম্বন্ধে অল্প আলাপ হইল। সে বলিল,—"পৃথিবী চিরকাল শক্তির পূজা করে। তাই শক্তি পূজাই প্রগতির মন্ত্র। য়ুরোপীয়-জীবনে ভাবুকতার স্থান নেই—ভারতীয় কল্পনা-বিলাস য়ুরোপে অচল।"

কথাগুলি অপ্রিয় মনে হইয়াছিল, কিন্তু ইহাই সত্য। স্বপ্ন মধুর, ভাবুকতাপ্রিয়, কিন্তু জীবন সংগ্রামে তাহার স্থান নাই। যেখানে শক্তি, সেখানেই গৌরব।

এই কলা-ভবনে চারুশিল্পের বিশেষ সংগ্রহ আছে। এখান হইতে ডাঃ কাপুরের সহিত দেখা করিতে মারিয়ানগাছায় গেলাম। ভারতবাসীর প্রকৃতি অক্ষয় ও অবিনশ্বর—ডাক্তারের সহিত সে আলাপ করে নাই। সন্ধ্যায় পুনরায় দেখা করিতে বলিল।

ক্ষুব্ধ মনে ফিরিলাম। পথে একটা সিনেমায় টিকট কিনিলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম সে ছবি দেখিয়াছি—বলিলে তৎক্ষণাৎ টিকিট ফেরত লইল। এই ভদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের তুলনা করিলে বুঝি, কেন উহারা অগ্রসর, আমরা পশ্চাৎ-পদ। আশু লাভের আশায় আমরা ব্যবসায়ের কত যে ক্ষতি করি, আমাদের দুর্ম্মুখ অভদ্র ব্যবসায়ীরা যদি বুঝিতেন, তবে দেশের অনেক কল্যাণ হইত। Operen Kino একটি ডিটেকটিভ ছবি দেখাইল—প্রধান অভিনেতাটিকে নানা ছবিতে দেখিয়াছি—বেশ অভিনয় করে।

পথে অজানা বীরের সমাধি-মন্দির দেখিলাম। চারি দিকের

আড়ম্বরময় প্রাসাদের পাশে এই মর্ম্মর-নির্ম্মিত সৌধের সারল্য পথিককে মুগ্ধ করে। ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির উপর আলো আসিয়া পড়ে আর পথিককে স্মরণ করায়—মহাযুদ্ধে যে শোণিতপাত হইয়াছে তাহাতে যে লক্ষ লক্ষ নরবলি হইয়াছে তাহা স্বদেশপ্রেমকে জীবন্ত রাখিতে—তাই অজানিত বীরের উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধার অঞ্জলিকে শ্রদ্ধা করিতে হয়। সেখান হইতে ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির দিয়া ঘুরিয়া গেলাম। ভিয়েনা'য় চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং সঙ্গীত-বিদ্যা শিখিবার জন্ম নানা দেশ হইতে ছাত্র আসে।

সেখান হইতে American Studerts' Union নামক প্রতিষ্ঠানে গেলাম। গণ-তান্ত্রিক আমেরিকার ছাত্রদের সঙ্গে ভারতীয়দের সৌহৃদ্য জন্মে, তাই ভারতীয় ছাত্রেরা এখানেই আড্ডা করে।

রাজা এডওয়ার্ডের কাহিনী তখন সমস্ত জগতে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ-কাগজে বিশেষ খবর পড়ি নাই। এখানে একখানি আমেরিকান কাগজে বিস্তৃত বিবরণ পড়িলাম।

এক দিকে রাজ্য অন্য দিকে প্রেম—ইহার দ্বন্দ্বের চিত্র আমার চিরন্তনী নাটকে পরিস্ফুট করিয়াছি। আমার কল্পনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

অনেকে রাজা এডওয়ার্ডের নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—মোহের আকর্ষণে সাম্রাজ্য ত্যাগ অত্যন্ত নিন্দাই হইয়াছে। কিন্তু যিনি প্রেমের জন্ম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন—তাহার সে ত্যাগের অসীম শক্তির প্রশংসা না করিলে প্রত্যবায় হইবে।

প্রতিযোগী বলিবেন—লালসার ইন্ধনে অনেক মক্ষিকা পুড়িয়া মরিয়াছে। সে তাহার নির্ব্বোধ মৃত্যু। অবশ্য যুগ-যুগান্তের কবি ও শিল্পী যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাকে কেবল লালসা বলিয়া উপেক্ষা করিব, এত বড় ধৃষ্টতা আমার নাই। যে প্রেম মানুষকে সংকীর্ণ করে তাহা একান্তই তুচ্ছ, কিন্তু মানুষকে যাহা উদ্বুদ্ধ করে—তাহার মধ্যে অবিনশ্বরতার স্পর্শ আছে, এ কথা অনুভব করি।

ডাঃ কাপুরের সঙ্গে আলাপের জন্ম বসিয়া রহিলাম। কয়েক জন ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। এক জন ভারতীয় ডাক্তার এক জন ধনীর সঙ্গে আসিয়াছেন। ধনী এখানকার বিখ্যাত 'স্পা'তে ব্যাধি-নিরাময়ের জন্ম আসিয়াছেন। ডাক্তারটি এখানকার হাসপাতালের ব্যবস্থার খুব নিন্দা করিলেন। বলিলেন, এখানে চিকিৎসিত হইতে আসা অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়;

বিদেশে যেখানে কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার সন্নিকটে ব্যাধি নিরাময়ের জন্ম এক একটি সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের প্রস্রবণগুলি তীর্থ—এই তীর্থগুলিকে স্বাস্থ্য-নিকেতন গড়িয়া তুলিলে দেশে অনেক অর্থাগম হয়।

ডাঃ কাপুর আসিলেন, বলিলেন—তিনি সময় করিতে পারেন নাই। অবশ্য আপনার কিছু ভাবনার নেই মিঃ দাশ, আমি সবিশেষ লিখে আপনাকে জানাব।

তার পর দীর্ঘ দু'টি বৎসর কাটিয়াছে। সে পত্র এখনও ভারতের তীরভূমি স্পর্শ করে নাই। ইহাই ভারতীয় চরিত্র! স্বজাতির নিন্দা করিলে অনেকে রুষ্ট হন। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, য়ুরোপীয়দের তুলনায় এ সব বিষয়ে আমাদের চরিত্রবত্তা নাই। যাহার নিকট চিঠি লিখুন য়ুরোপে আপনি উত্তর পাইবেন। বাংলা দেশে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নিকট পত্র দিলে উত্তর পাওয়ার আশা দুরাশা বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহাই আমাদের দাম্ভিক আভিজাত্য। কথা দিয়া পালন করিলে আমরা তাহাকে মূর্খ ভাবি।

সকাল সকাল বাসায় ফিরিলাম।

সন্ধ্যালোক-দীপ্ত উৎসব-মুখর রাজপথ—পথে ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহে না, ক্লিষ্ট গলিত-কুষ্ঠ দয়ার নামে ব্যাধি-বীজ ছড়ায় না—পসারী পসার ফেলিয়া চলাচলকে রুদ্ধ করে না। সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা—তাহার সঙ্গে কর্ম্মব্যস্ত আনন্দ-ভাস্বর জীবন-যাত্রা। কাফেতে শত শত বিচিত্রিত নরনারী মসগুল হইয়া বসিয়াছে। তাহারা ক্ষণিকের জন্ম জীবনের গতি-ছন্দ ভুলিয়াছে।

রাজপথের স্থানে স্থানে পুষ্প-গন্ধমদির পুরোদ্যান। তাহার কোথাও কোথাও ঐক্যতান বাদ্য বাজিতেছে। কোথাও শ্রান্ত নর ও নারী দিনান্তে বিরাম লইতেছে। লণ্ডনের লোক-সংখ্যা অগণিত—সেখানে সব সময় মানুষকে বড় মনে হয়। কিন্তু ভিয়েনার তরুবীথি, নির্জ্জন পথ, সুপরিসর অলংকারখচিত সৌধ নিবিড় তৃপ্তি-সুলভ অবসরের কথা মনে করাইয়া দেয়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কুকের আফিসে পত্রের সন্ধানে চলিলাম। ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পূর্ব্ব ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী চড়িলাম। গাড়ীতে বসিয়া চিঠি লিখিলাম—"বুডাপেষ্টের গাড়ীতে এসে বসে পড়েছি, যতই পূবে আসছি, ততই ভারতবর্ষের মত অগোছাল বিশৃঙ্খলা নজরে পড়ছে। গাড়ীতে ভারতীয় গন্ধ, কুলির হাঁক-ডাক শব্দে প্রাচ্যের রূপ —তবে এখনও একেবারে প্রাচ্য বনেনি, পশ্চিমের হাব-ভাব লেগেই আছে—রাস্তায় খাওয়ার জন্ম খুব বড় একটা কলা, একটা আপেল, এক বাক্স বিস্কুট কিনে নিয়েছি—এতে খরচ পড়ল ১৭৫ গ্রোসেন—আমাদের প্রায় এক টাকার মত—রেস্তঁরায় খেতে গেলে পড়ত দু'টাকা—অথচ নিরামিষ কি খাব তাই নিয়ে ভাবনায় পড়তে হ'ত। এ দেশের পুলিশগুলি খুব ভদ্র—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে হাত মাথায় তুলে নমস্কার করে—তার পর বিনীত ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

গীতার কথা লিখছ না বলে মনটা হাহাকার করে ওঠে—(এই কন্যাটি বিলাত যাওয়ার পর স্বর্গত হয়, কিন্তু বাড়ীর লোক সে দুঃসংবাদ আমাকে জানায় না) জান ত আমি কল্পনা-বিলাসী—মনে মনে নানা দুঃস্বপ্ন আঁকছি—মনটা খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে—ফেরত ডাকে লিখো—অশান্তি ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করো।"

গাড়ীতে একটি জার্ম্মাণ-দম্পতি চলিয়াছে। উহাদের প্রণয়-মধুর কথোপকথন নিঃসঙ্গ যাত্রার বেদনাকে প্রশমিত করে।

গাড়ী ছাড়িল। দু'ধারে সমতল প্রান্তর—বন্ধুর পর্ব্বতমালা এ পথে নাই—আল্পসের দুরারোহ তুষার-মৌলি গিরি কিংবা সরল বন-খচিত অধিত্যকা নাই। বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে হঠাৎ এক একটি বায়ু-চালিত কল নীলাকাশের নীচে মাথা তুলিয়াছে।

ভিয়েনায় অতীত ও বর্ত্তমান এক সাথে মিশিয়াছে। অতীত তার কুসংস্কার ও যাদু নিয়া প্রগতির সাথে মিলিয়াছে। তাহাতে কোথাও বিরোধ বাধে নাই। তাই অষ্ট্রীয়ার মধ্যে নির্ব্বিরোধ যে পরিতৃপ্তির ছবি দেখিলাম, গাড়ীতে বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু হায়! কালের রথ-চক্র দুর্ম্মদ গতিতে চলিয়াছে। ১১৩৬ সালে যাহাকে দেখিয়াছি আজ সে রূপান্তরিত। কিন্তু বিবর্ত্তনই হয়ত জীবন—অতীতের স্মৃতির জন্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লাভ কি?

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

বাইশ

পঞ্জিকার এক শুভদিনেই মলিনের বিবাহ হইয়া গেল। না হইল ঘটাঘটি, না হইল কাহাকেও নিমন্ত্রণ—স্তব্ধ নিশীথে ক্ষণিক শিশির পড়িয়া মাটির একটু রঙ পরিবর্ত্তিত হইল যেন! মিষ্টার [illegible]সের আক্ষেপের সীমা রহিল না—তাঁহার একটি মাত্র কন্যা! কিন্তু ঝরণার মাথায় ভূত চাপিল। কহিল—"না। Not a drum will beat, not a funeral note." এর উপর আর কথা চলে না।

অতঃপর মলিনের দাম্পত্য-জীবন সুরু হইল। তাহাকে অষ্টপ্রহর ঝরণার চোখে-চোখে থাকিতে হয়—ঝরণার শাসনই তাহার প্রতি-মুহূর্ত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাখে। এক দিন আহারে বসিয়া দুধের বাটি ফেলিয়া রাখিয়া উঠিতে যাইবে, ঝরণা শাসন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার নিজের খেয়ালে এখানে থাক্‌লে চল্‌বে না—দুধ খাও!"

মলিন দুধের বাটিতে মুখ দিল।

মলিনকে প্রতিদিন কখন্ কি করিতে হইবে, তার একটা রুটিন প্রস্তুত করা ছিল। এক দিন আহারান্তে হাতে সাবান দিয়া চলিয়া আসিবে, ঝরণা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "লাল-জল, লাল-জল"—আঁচাইবার জলের বাল্‌তির কাছে সাবান ও 'পোটাস-পারম্যাঙ্গ্যানেটের' জল রাখা থাকে—মলিনকে প্রতিদিন প্রতিবার আহারান্তে সাবান আর ওই 'লাল-জলে' হাত ধুইয়া আসিতে হয়।

আর এক দিন আর এক কাণ্ড ঘটিল। মলিন পল্লীগ্রামের ছেলে—সর্ব্বদা কোঁচানো কাপড় পরিয়া থাকা তাহার অভ্যাস নাই, এক দিন কোঁচা-ভাঙিয়া কাপড় পরিতেই, ঝরণা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি চাষার জামাই নও—এ-কথাটা স্মরণ রেখো।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একখানা দেশী কোঁচানো কাপড় পড়াইয়া তাহাকে অব্যাহতি দিল।

এইরূপে বড়লোকের বাড়ীর উগ্র আভিজাত্যের নিয়ম কানুনে আত্মসমর্পণ করিয়া মলিন দিন কাটায়। প্রতিবাদও করে না, আগ্রহও দেখায় না।

কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এক দিন দ্বিপ্রহরে মলিন বাহিরে যাইবার নিমিত্ত গায়ে জামা দিতেই, ঝরণা প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

মলিন সকুণ্ঠ ভাবে জবাব দিল—"বাইরে!"

ঝরণা গম্ভীর ভাবে নিষেধ করিল—"না

মলিনের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। বাহিরে একটি বার তো তাহাকে যাইতেই হইবে। সেই 'মেস,' মেসে আছে হরি—হরির ঠিকানায় তাহার মায়ের চিঠিপত্র আসিবে! সে-দিনকার পত্রখানিরও জবাব দেওয়া হয় নাই। ওই দিকটার অন্তরভেদী আর্ত্তনাদ, তাহা শ্রবণ করিবার চৈতন্য সে এখনো হারায় নাই তো! কাতর চক্ষে ঝরণার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "একটি বার"—তাহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

ঝরণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল—"কোথা?"

মলিন জবাব দিল—"আমি এক মেসে থাকতাম কি না—বন্ধু-বান্ধব আছে!"

"বন্ধু-বান্ধব?"

মলিন আস্তে-আস্তে মাথা নিচু করিল।

ঝরণা ক্ষণকাল মলিনের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর, কহিল, "তা হলে, অনেক কথাই গোপন করেছ?"

মলিন চম্‌কিয়া উঠিল। নতমুখ হইয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, "না। আমার কেউ নেই।"

বলিয়াই জামাটা যেমন খুলিতে যাইবে, ঝরণা চট্ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "থাক্—যাও। কিন্তু, মনে রেখো—এইবার থেকে যে-দিন যেখানেই যাবে, আগে আমার অনুমতি নেবে! বুঝলে?"

মলিন সবই করিতে প্রস্তুত। সে স্পষ্ট করিয়াই জানে, তাহার ভিতর তাহার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, ঝরণা ডাকিল, "শোনো—"

মলিন ফিরিয়া আসিতেই, ঝরণা কহিল, "মোটর নিয়ে যেয়ো—"

তাহা হইলে মলিনের যাওয়াই হয় না! মেসের ঠিকানা এ বাড়ীর কাহারো নিকট সে প্রকাশ করিতে পারে না—সেখানে গোপনে তাহার মায়ের চিঠিপত্র আসিবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কাছেই তো?"

"তা হোক্। এ বাড়ীর জামাই হয়ে পায়ে-হেঁটে রাস্তা চলা হবে না।"

"আমি তো গরীব!"

"আমি তো নই।" বলিয়াই ঝরণা মুখখানা মেঘের মত অন্ধকার করিয়া গোটা পঁচিশেক টাকা আনিয়া মলিনের হাতে দিয়া কহিল, "এই টাকা ক'টা পকেটে রেখে দাও। পায়ে হেঁটে যাবে বলছো—আচ্ছা, তাই যাও। কিন্তু, রাস্তা-ঘাটে যে মিলিটারী-লরি—বাপ রে বাপ! যদি চাপা পড়ো, ট্যাক্সী করে বাড়ী আসবে। কথাগুলো কাণে গেল?"

অহেতুক দান! তাহা গ্রহণ করিতে মলিনের বাধিল। টাকা কয়টি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিল, "লরি চাপা আমি পড়বো না! তা কি পড়ি?"

ঝরণা চটিয়া উঠিল। কহিল, "কথা কেটো না। তোমার চেয়ে আমার বেশী বুদ্ধি আছে। রাস্তায় যদি এক কাপ চা খাবারই ইচ্ছে হয়—তখন কি করবে, শুনি? তার পর তোমার বন্ধু-বান্ধব, তাঁরা যদি বলেন—'বায়োস্কোপ দেখাও।' তখন লজ্জায় পড়বো কি আমি?"

মলিন আর বাক্যব্যয় করিল না, টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই ঝরণা পুনশ্চ বাধা দিল। এবার যেন সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কহিল, "মাথার চুলে চিরুণী পড়েনি কেন? অমনি উস্‌কো-খুস্‌কো মাথা নিয়ে কেউ বাড়ী থেকে বার হয়? বলি, লেখা-পড়াই যেন না শিখেছ, কিন্তু লোকের দেখেও কি এ-সব শেখনি?" বলিয়াই মলিনকে সজোরে টানিয়া লইয়া গিয়া 'ড্রেসিঙ-টেবিলের' সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া নিজেই তাহার মাথার চুলগুলি পরিপাটি করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

• • • •

বাবুরা সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে, হরি 'মেসে' একাই ছিল। মলিনকে দেখিয়া সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল। কি করিবে, কোথায় বসাইবে—তাহা যেন সে ঠিক করিতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে

তাহার নজর পড়িল দাদা বাবুর জামা-কাপড়ের উপর। পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আপনার চাকরি হয়েছে, বুঝি ?"

প্রশ্নটার হেতু মলিনের বুঝিতে দেরি হইল না। ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "জামা-কাপড় দেখে বলচিস্, বুঝি ? না—চাকরি হয়নি। এক বড়লোকের বাড়ী থাকি—তাঁরা পরতে দিয়েছেন।" বলিয়াই ঝরণার দেওয়া টাকা পঁচিশটা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ, হাত-খরচও ওঁরা মাসে মাসে কিছু-কিছু দেবেন, বলেছেন। এই দেখ, পঁচিশ টাকা আগাম দিয়েছেন—এই টাকা ক'টা তুই রেখে দে, 'মেসে' দিয়ে দিস্—" বলিয়াই হরির হাতে ফেলিয়া দিল, দিয়াই সুরু করিল, "বাকী যা থাকবে—"

"দাদা বাবু, ও একেবারেই মিটিয়ে দেওয়াই ভালো। বাকী টাকাটা আমিই না-হয় এখন দিয়ে দিই, তার পর আপনি আমাকে দিয়ে দেবেন। চাকরী না হোক্, হাত-খরচের টাকাও তো আপনি পাবেন ?"

কথাটা ঠিক্। সুনিশ্চিত টাকা। মলিন কহিল, "তা' বেশ।" বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "দোয়াত-কলম আর একটু কাগজ দিতে পারিস্ ?"

"চিঠি লিখবেন ?"

"হ্যাঁ। মায়ের সেদিন চিঠি এসেছিল, জবাব দেওয়া তো হয়নি!"

হরি অবিলম্বেই সমস্ত আনিয়া দিল।

মলিন কলমটা হাতে করিয়াই চমকিয়া উঠিল—সে যে নিরক্ষর! সেই এক দিন কোন্ বিস্মৃত দিনে, ধরিত্রীর যে-পরিচয়, তাহাকে ঘিরিয়া রাশি-রাশি শ্বেতপদ্মের অনির্ব্বাণ প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই আজ আবার অট্ট হাসি হাসিয়া নির্ম্মম ছলনায় পিছন ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়াছে! পশ্চাতের পরিচয়ে আজ তাহার চিহ্ন নাই, পশ্চাতের মানব-মূর্ত্তিতে আজ তাহার চেতনা নাই, পশ্চাতের চৈতন্যে আজ তাহার অনুভূতি নাই, পশ্চাতের আয়ত নেত্র আজ আলোকহীন। এই বিদ্রূপ-কলেবরের একখানি হাত আজ কেমন করিয়াই বা কলম ধরিয়া জননীকে প্রতারণা করিবে? মলিন আস্তে আস্তে কলমটা নামাইয়া রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দাদা বাবুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া হরি কহিল, "দাদা বাবু, লিখুন চিঠি ?"

হরি একটু-আধটু লিখিতে জানিত। মলিন তাহাকে কহিল, "তুই লেখ্, আমি বলি—"

হরি বিস্ময়ে কহিল, "আমি লিখ্‌বো? রাত জেগে-জেগে, বস্তা-বস্তা কি-সব লিখতে পেরেছেন, আর একখানা চিঠি লিখ্‌তে হবে হরিকে? আমি তো বানান জানিনে, দাদা বাবু!"

মলিন ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আমি বোলে দিচ্ছি, তুই লেখ্ তো—"

হরি আর প্রতিবাদ করিল না। লিখিল—

"মা! তোমার পত্র পেয়েছি। আমার জবাব দেবার কিছুই নেই। শুধুই এই কথাটা মনে রাখো, মা!—আজ আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর! মৃত্যুর দিন যখন তোমার ঘনিয়ে আস্‌বে, তখন এই কথাটাই স্মরণ রেখে দেহত্যাগ কোরো—তুমি এক অতুলনীয় নিরক্ষরের জননী!"

অতঃপর পত্রখানি ডাকে দিবার নিমিত্ত হরির হাতে দিয়া উঠিয়া পড়িতেই, হরি দ্রুত বলিয়া উঠিল, "দাদা বাবু, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানকার ঠিকানাটা? যদি আপনার চিঠি-পত্তর আসে—খবর দিতে হবে তো?"

"না। আমি আস্‌বো। তবে, ঠিকানাটা বলচিস্—তা' তোর কাছে রেখেই দে।" বলিয়াই মলিন মিষ্টার বোসের বাড়ীর ঠিকানাটা হরিকে দিয়া ফিরিবার পথ ধরিল।

আজ যেন তাহার জীবনের সব কাজই ফুরাইয়া গিয়াছে—সে আজ নিশ্চিন্ত, নিশ্চিহ্ন। জগতের হিসাব-নিকাশ করিতে হয় [illegible], অথচ তাহার দেনা-পাওনা সবই নির্ভুল মিটিয়া গিয়াছে! প্রতি পদক্ষেপেই তার মনে হইতে লাগিল—তাহার গ্রামখানি [illegible] তার পথে পড়িয়া, কিন্তু, তার পায়ের আঘাতে উহা আতঙ্কে সরিয়া যাইতেছে; যেন বা সেই দিক্ হইতে কত কোলাহল, কত কলরব উঠিয়া তাহার চলিবার পথ-ঘাট অবিশ্রাম মুখর করিয়া রাখিয়াছিল, এইমাত্র তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

তেইশ

দিন যায়, দিনের পর দিন।

মলিনের কথায় ও কাজে, আচার ও আচরণে বাড়ীর কাহারো মনে সন্দেহের অবকাশ রহিল না। মিষ্টার বোস মন-মরা হইয়াই থাকেন। পর্ব্বতপ্রমাণ আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি কন্যাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন, তার পরিসমাপ্তি ঘটিল এম্‌নি করিয়াই? বিরাম-বিহীন তাঁহার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের অবসান হইয়াছে!

এক-এক সময় তাঁহার মনে প্রশ্ন তোলে—মলিনের সুগৌর, সুদর্শন, সুস্থির চেহারাটি! তিনি মনে-মনে ভাবেন—সত্যই কি ছেলেটি নিরক্ষর? গোপনে মলিনের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, কিন্তু অবশেষে নিরাশই হন। এক দিন প্রকাশ্যেই একটা পরীক্ষা করিলেন।

বেলা প্রায় তিন ঘটিকা। ঝরণা পড়িবার ঘরে আরাম-কেদারায় একখানা বই হাতে করিয়া শুইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথার গোড়ার জানলাটা খোলা ছিল, সেই জানালা দিয়া খানিকটা চোরা-রোদ তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। মলিন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে তার চোখ পড়িতেই, সে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিয়া গেল—তাহার [illegible] চক্ষের উপর একখানি গোলাপী মুখ, সেই মুখের সতেজ [illegible] এখনিই বুঝি বা পুড়িয়া ঝল্‌সিয়া যাইবে! কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তে সে কি করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মনে করিল, ডাকিয়া জাগাইয়া দিই—কিন্তু, এ পর্য্যন্ত সে নিজে হইতে ঝরণাকে ডাকে নাই বা তাহার সঙ্গে নিজে হইতে [illegible] কহে নাই, সুতরাং কি বলিয়া ডাকিবে তাহা সে জানে না তো! আর একবার মনে করিল—দুয়ারে টোকা মারিয়া আওয়াজ করি—কিন্তু, তাহাই বা কি করিয়া সে পারে? আচম্‌কায় ঘুম ভাঙিলে মাথা ধরিবে যে! সে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অতঃপর পা টিপিয়া-টিপিয়া আস্তে-আস্তে বাহির হইতে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তার পর যেমন সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া আসিবে, দেখিল—অদূরে দাঁড়াইয়া মিষ্টার বোস। তাঁহাকে দেখিয়াই সে অপ্রতিভ

হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া সলজ্জ ভাবে এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে-সঙ্গে মিষ্টার বোসের মুখখানাও চরম এক তৃপ্তির আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। বুঝি বা এই কথাটাই তাঁহার মনে উঠিল যে, জগতের যাহা সত্য, যাহা স্বাভাবিক, তাহারই এক অংশ মূর্ত্তি ধরিয়া রূপ মেলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সৃষ্টির সুরু হইতে অদ্যাবধি স্বামি-তত্ত্বের বহু গবেষণা, বহু বিচার-বিশ্লেষণ পৃথিবীতে হইয়া গিয়াছে, ইহা যে তাহারই সর্ব্ববাদিসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত, তাহাই তাঁহার অন্তর্লোকে ছটা মেলিয়া প্রকাশিত হইল। স্বামি-স্ত্রীর আইন, তাহার ধারা-উপধারায় শিক্ষিত-মূর্খ, জ্ঞানী-নিজ্ঞানের কোনও পৃথক্ নির্দ্দেশ নাই, তাই বলিয়াই ইহা স্বাভাবিক, সহজ ও সত্য! আর, তাই বলিয়াই বুঝি বা মলিনের নিরক্ষর অন্তরাত্মা তাহার এক পরম আত্মীয়ার একটুকুও ক্লেশ সহ্য করিতে পারে নাই। * * * মিষ্টার বোস মলিনের দিকে ফিরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ওখানে অমন জড়সড় হয়ে দাঁড়ালে কেন, বাবা! লজ্জা কি—বেশ করেছ!" পরক্ষণেই যেন হঠাৎ মনে পড়িয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভালো কথা! দরোয়ান একখানা চিঠি দিয়ে গেল, বল্লে— জামাই বাবুর চিঠি—" বলিয়াই পকেট হইতে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া মলিনের হাতে দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার চশমা নেই! দেখো তো—কার চিঠি?"

মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। মলিন না দেখিয়াই পত্রখানা সকুণ্ঠ ভাবে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "আমি তো পড়তে জানি নে!"

মিষ্টার বোস দমিয়া গেলেন। পত্রখানা মিষ্টার বোসের। তিনি মনে করিয়াছিলেন—মলিন হয় তো বা অতর্কিত ভাবে চিঠিখানার উপর চোখ ফেলিয়াই বলিয়া ফেলিবে—'না। এ চিঠি আমার নয়। তাহা হইলেই সে ধরা পড়িয়া যাইবে'—তাঁহার সেই আশা-আশ্বাস নিমেষে বিকলাঙ্গ হইয়া গেল। ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনের ভিতর যে-আলোক মাঝে-মাঝে ছটা মেলিত তাহা চিরতরেই মিলাইয়া গিয়েছে। ছেলেটির প্রতি সন্দেহ আর তাঁহার লেশমাত্র রহিল না।

এ দিকে, এই বিবাহে ঢাক-ঢোল না বাজিলেও ঝরণার সহপাঠিনীদের নিকট তাহা কিন্তু গোপন রহিল না—এয়োস্ত্রীর চিহ্ন অপ্রকাশ রহিবে কেমন করিয়া? তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই অভিযোগের আর অন্ত ছিল না, তার পর ঝরণাকে তাহারা ধরিয়াছিল—তাহার স্বামীর সহিত পরিচয় করিয়া দিতে। কিন্তু ঝরণা অনুরোধটাকে আমোল দেয় নাই। এক দিন অপরাহ্নে বিনা নিমন্ত্রণেই তাহারা ঝরণার গৃহে আসিয়া পড়িল।

ঝরণা ও মলিন এক ঘরেই ছিল, অকস্মাৎ এই দল-বলকে দেখিয়াই ঝরণা বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। মলিনের দিকে ফিরিয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তুমি একটু ওদিকে যাও তো—"

ছেলেটি যে কে, তাহা অপর পক্ষের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তথাপি মেয়েদের ভিতর যে অগ্রণী, সে গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি বুঝি বাইরের কেউ?"

ঝরণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "না—"

"তা হলে এদিক্-ওদিক্ ওঁর না গেলেও চল্‌বে।" বলিয়াই ওই অগ্রণী মেয়েটি মুখের হাসি চাপিয়া মলিনকে হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, "আপনি বরং আর একটু সরেই আসুন—" অতঃপর মলিনকে কাছে বসাইয়া ঝরণার দিকে ফিরিয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "ভয় নেই। Elope করবো না—" বলিয়াই হাসিয়া উঠিল।

এই মেয়েটি ঝরণাদের কলেজের কলেজ-ইউনিয়নের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী—যেমনি ঠোঁটকাটা তেমনি সুরসিকা। নাম—হেনা। সে একাই কমন-রুম মুখর করিয়া রাখে। হেনাকে আর সব মেয়েরা যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয়ও করে—কারণ, কখন্ কাহাকে কি ভাবে অপ্রস্তুত করিয়া ফেলে, তাহার ঠিক নাই। ঝরণা তাহাকে বেশী করিয়া না ঘাঁটাইয়া শুধু কহিল, "আচ্ছা মেয়ে যা-হোক্! উনি কে, কেমন কোরে তুই চিন্‌লি?"

"বান্ধবীর ঘরে সুপুরুষ—দায়ে পড়েই চিনতে হলো।" বলিয়াই হেনা এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। পরক্ষণেই যেন ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্, তোর বর দেখতে আমরা আসিনি যে হাঁ কোরে ওঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবো! কি জন্যে এসেছি, শোন্—" বলিয়াই হাত-ব্যাগ হইতে কতকগুলা কাগজ-পত্র বাহির করিয়া সুরু করিল, "হঠাৎ একটা 'স্কীম' করা গেল—এই রকম 'স্কীম' কোন কলেজে কোনোও ইউনিয়ন আজ পর্য্যন্ত 'কন্‌সিভ'ও করেনি।" চক্ষুর্দ্বয় সুতীক্ষ্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা একটা 'ফাণ্ড' তৈরী করছি—Purely Women's Section."

ঝরণা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কহিল—"কেন?"

"গরীব ছেলেদের পড়বার জন্যে। এই 'ফাণ্ড' থেকে তাদের বেতন দেওয়া হবে।"

"কলেজ থেকে তারা তো free studentship পায়?"

"খুব সত্যি কথা। কিন্তু, কারা পায়? যারা কলেজ-বিধাতৃমণ্ডলের কাছে 'deserving student' তারাই পায়। কিন্তু, যারা ordinary merit-এর ছাত্র অর্থাৎ যারা 'deserving নয়— তারা পায় 'get out!' আমাদের এই fund—তাদেরই জন্যে।" —হেনার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঝরণারও মুখে-চোখে সমর্থনের দীপ্তি প্রতিভাত হইল। কহিল, "খুব ভালো আইডিয়া। সত্যিই তো,—ordinary merit-এর গরীবের ছেলে—তাদেরও তো উচ্চশিক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে? তারাও তো 'মানুষ' হতে চায়? কিন্তু টাকা তো অনেক চাই—"

"সংগ্রহ করবো! দেশের লোককে বল্‌বো—এ-ও এক 'বন্যবন্যা মেমোরিয়াল' এ-ও এক 'রবীন্দ্র-মেমোরিয়াল,' এ-ও এক 'দুর্ভিক্ষ-মহামারী-বন্যা'! যদি দুই-একটি ছেলেরও পড়বার মত টাকা তুলে কলেজ-অধিপতির হাতে আমরা দিয়ে যেতে পারি, তা হলেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক!" বলিয়াই হেনা হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া চকিত হইয়া একখানা খাতা খুলিয়া মলিনের সুমুখে ধরিল, ধরিয়া দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "Come on, friend!—চাঁদার খাতা আপনাকেই আগে open করতে হবে! নামটি লিখুন, তার পর টাকা—"

ঝরণার মুখখানা শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "উনি শাঁর তাকার দেবেন—"

"Thank you!" হেনা অধিকতর উৎসাহে মলিনকে বলিয়া উঠিল, "লিখুন, লিখুন—নামটি লিখুন—"

মলিন নতমুখে কহিল, "আমি লিখতে জানি নে।"

ঝরণা মুখ নামাইল ও অপর পক্ষের সকলেই চমকিয়া উঠিল। হেনা মৃদুস্বরে তার ঝরণার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "সে কি? তোর বর—"

"নিরক্ষর!"—ঝরণা কথাটি মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়াই মুখ নীচু করিল।

হেনা আর কিছু বলিল না। খাতাখানা বন্ধ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই ঝরণা বলিয়া উঠিল "নাম—আমি বলি, তুই লিখে নে—"

হেনা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"না। নিরক্ষরের নাম দিয়ে আমাদের চাঁদার খাতা এঁটো করবো—এ আমাদের 'স্বীম' নয়! His name will go down the list. কিছু মনে করিস্ নে—" বলিয়াই সকলে উঠিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরণারও মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—লজ্জায় অপমানে!

চব্বিশ

পরদিন প্রাতে মিষ্টার বোস স্তূপীকৃত 'ব্রীফের' ভিতর ডুবিয়া আছেন, ঝরণা প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মিষ্টার বোস ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দাও তো, মা! দাও তো—দাও তো—Privy Council-এর Ruling টা—1930 P. C.—" বলিয়াই সম্মুখের আলমারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ঝরণা বইখানি আনিয়া মিষ্টার বোসের হাতে দিতেই তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলেন—'Page 91—Survey entry: The entries in record are not the foundation of the title, but are more items of evidence—very good! এইবার 1938 P. C., 1 Patna Law Times, 2 Patna Law Journal, আর 72 C. L. J—"

ঝরণা হাসি চাপিয়া বইগুলি একে-একে বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, "আমার একটা কথা আছে, বাবা—"

"কথা আছে? তা' এতক্ষণ বলোনি তো—" মিষ্টার বোস হাতের বইখানা বন্ধ করিয়া এক পাশে ফেলিয়া রাখিলেন।

ঝরণা একটি বার মুখ নামাইল, তার পর মুখ তুলিয়া ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "ওঁকে—"

"ওঁকে—'ওঁকে' মানে মলিনের কথা বলছ তো? আচ্ছা—"

"একেবারেই নিরক্ষর কোরে রাখা চলবে না। অন্ততঃ নাম-সইটা—"

ঝরণাকে আর অগ্রসর হইতে হইল না। মিষ্টার বোস যেন ঝরণার মুখের কথাটি কাড়িয়া লইলেন। বলিয়া উঠিলেন, "আমিও তাই ভাবছি! নাঃ—'নিরক্ষর' কোরে রাখা একেবারেই চলবে না! আমার জামাই—নিরক্ষর? কি যে বলিস্! কালই স্কুলে পাঠাবো, তার পর কলেজ, তার পর বিলেত—"

ঝরণার হাসি আর থামে না। মুখে কাপড় চাপা দিয়া কহিল—"বাবা যেন কী! স্কুলে যাবার আর বয়স আছে?" পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া কহিল, "না! বাড়ীতেই উনি পড়বেন।"

"উত্তম! তা'হলে প্রাইভেট টিউটার—"

"আমি নিজেই পড়াবো—"

"ঠিক বলেছিস্—নিজের মানুষ নিজেই তৈরী কোরে নেওয়া ভালো।"

ঝরণা মুখ নামাইয়া কহিল, "তা'হলে, একখানা প্রথম ভাগ আর একখানা শ্লেট—" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

* * * *

সেই দিন হইতেই মলিনকে প্রথম ভাগ ধরানো হইল।

ঝরণা বলে—"বলো—'অ'—"

মলিন বলে—"অ—"

তার পর ঝরণা বলে—"বলো—'আ'—"

মলিন বলে—"আ,—"

অতঃপর ঝরণা পরীক্ষা করে—"বলো দিকিনি—কি বলে দিলাম?"

মলিন চুপ করিয়া থাকে।

ঝরণা চটিয়া যায়। মলিন কাতর কণ্ঠে বলে—"মনে থাকছে না যে!"

ঝরণা আবার বলিয়া দেয়, মলিন আবার ভুলিয়া যায়! ঝরণা দ্বিগুণ চটিয়া উঠে, উঠিয়া বলে—"মাথায় কি কিছুই নেই—গোবর আবার গোবর?"

মলিন লজ্জায় মাথা নীচু করে।

ঝরণা হাল ছাড়ে না, অধিকতর উদ্যমে পুনশ্চ লাগিয়া যায়। মলিনের কোলের উপর 'শ্লেট' দিয়া হাত ধরিয়া লেখায়—'অ—'

কিন্তু, স্বাধীন-হাতে লিখিতে গিয়া মলিন বিভ্রাট বাধাইয়া ফেলে—ভূতের লেখার ন্যায় হাত দিয়া অক্ষর বাহির হয়!

ঝরণার যেন কান্না পায়। মলিনের হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া-টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলে,—"আঙুলগুলো তো তুলতুলে—বশ মানে না কেন?"

মলিন যেন লজ্জা রাখিবার আর যায়গা পায় না, তার ঘাড়টা শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে! ঝরণা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যায়।

এইরূপে ঝরণার শিক্ষকতা চলে প্রতিদিন—নব-নব কৌশলে, নিত্য-নূতন প্রণালীতে। কিন্তু, সবই ব্যর্থ হইতে লাগিল—একটি অক্ষরও মলিন আয়ত্ত করিতে পারিল না।

কথাটা ক্রমশঃ মিষ্টার বোসের কাণে উঠিল। এক দিন অপরাহ্ণে তিনি স্বয়ং পরিদর্শন করিতে আসিলেন এবং তিনিও নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া খানিক ধস্তাধস্তি করিলেন, কিন্তু—না, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি আক্ষেপ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"মা সরস্বতীর নেহাৎ অ-কৃপা!"

অতঃপর তিনি বাহির হইয়া যাইবেন, হেনা সদলে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই মিষ্টার বোস—তাঁহাকে একটা নমস্কার করিয়াই সে ঝরণাকে লক্ষ্য করিয়া বিপুল হর্ষে বলিয়া উঠিল, "Grand success! অনেক টাকা উঠেছে—পনের হাজার আর তোর পাঁচ—" বলিতে বলিতেই তার লক্ষ্য পড়িল মলিনের দিকে, তখনো তার কোলে শ্লেট, হাতে পেন্সিল। তাহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ঝরণার দিকে এক কটাক্ষ করিয়া সহাস্যে কহিল, "এ সব 'cruelty to animal!' হাতে-খড়ির তো আর বয়স নয়!"

মিষ্টার বোস লজ্জায় আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—একটি বার এদিকে তাকাইয়াই দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরণারও মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। যথাসাধ্য

নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রায় খাড় করিয়া কহিল, "চেক্ দিতে হবে, বুঝি ?"

"আগে চাঁদার খাতায় নাম উঠুক—"

"বেশ, আমি ওঁর নাম বলি—তুই লিখে নে।"

হেনা চাঁদার খাতাখানা খুলিয়া ঝরণার সুমুখে ধরিয়া কহিল, "না। নাম—তোরই লেখ—"

"আমার নাম ?"

"হাঁ! হয় তোর, না-হয় তোর বাবার।"

"আমার নাম কি বাবার নাম—তা' তো আমি বলিনি!"

হেনা গম্ভীর ভাবে চাঁদার খাতাখানা টানিয়া লইল, লইয়া কহিল, "তা'হলে থাক্, ভাই।" খাতাখানাকে বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোর প্রস্তাব আমি কমিটির কাছে পেড়েছিলুম। সেদিন আমি যা বলে গেছি, তাঁরাও তাই সমর্থন করেছেন। তাঁরা বল্লেন—এ আমাদের 'অক্ষরের তাজমহল', নিরক্ষরের সামর্থ্য নিয়ে এর ভিৎ গাঁথা চলবে না।" আর দাঁড়াইল না।

অপরাহ্ণের স্নান-রবি তখনো অস্ত যায় নাই, কিন্তু ঝরণার মনে হইল, চারি দিক্ যেন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, যেন বা ধরিত্রীর আলোক রশ্মি তাহার দেখিবার আর অধিকার নাই। সে নিরক্ষরের স্ত্রী—সকলেরই নিকট সে ঘৃণা, হেয়, কৃপার পাত্রী : কলেজ ইউনিয়ন, কমিটি, প্রফেসর, প্রিন্সিপাল—আর সে ভাবিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া শয্যার দিকে অগ্রসর হইবে, মলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকুণ্ঠ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এইবার কি 'দ'গা' বুলোবো—"

"না। তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—" ঝরণা যেন একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া টলিতে-টলিতে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, প্রতিদিনকার মত ঝি বিছানা ঝাড়িতে আসিতেই ঝরণা তাহাকে কহিল, "মেঝের আর-একটা বিছানা করিস্—"

ঝি বিস্ময় প্রশ্ন করিল, "কেন দিদিমণি ?"

ঝরণা ধমক্ দিয়া কহিল, "যা বলি, তাই কর—" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ঝি অবাক্। গালে আঙুল দিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—"সোমত্ত মেয়ে—বলে কি গো ?"

• • • •

এই নিদারুণ ব্যবস্থার কথাটা বাড়ীর ঝি-চাকর সকলের কাণে তো উঠিলই, মিষ্টার বোসের কাণেও উঠিতে বাকি রহিল না। তিনি শিরে করাঘাত করিলেন। সমস্ত বাড়ীখানার উপরই যেন এক বিশ্রী অন্ধকারের প্রলেপ পড়িয়া রহিল—ঝি-চাকর, এরা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটায়, মিষ্টার বোস মুখ শুকাইয়া থাকেন, ঝরণা কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ করে না।

আজ-কাল মলিন প্রায় প্রত্যহই 'মেসে' যায়—ঝরণার আর অনুমতি লইতে হয় না। এক দিন গিয়া দেখিল—মায়ের পত্র আসিয়াছে। হাতের লেখা সন্ধ্যার। সে মনে-মনে একটু হাসিল। 'নারী'—এই নামটা উঠিয়া গিয়া যদি উহার নাম 'মহাজন' হইত! কিন্তু সে সব চিন্তা তাহার মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। মায়ের চিঠি! খামখানা ছিঁড়িয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—নিরক্ষর। পড়িবার অধিকার তাহার তো নাই। যে আত্মনির্বাণ সে জগতের কাছে নিবেদন করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, তাহাকে আবার সে ফিরাইয়া লইবে কোন্ হিসাবে—কেমন করিয়া ? পত্রখানি হরির হাতে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুই পড় হরি, পড়ে আমাকে শোনা—"

হরি অবাক্ হইয়া গেল। কহিল, "আপনার হলো কি, দাদা বাবু ? সেদিন বল্লেন—হরি, তুই লেখ, আজ আবার বল্‌ছেন—হরি, তুই পড়্—"

মলিন হাসিয়া কহিল, "চিঠিখানা লিখেছিস্ তুই—তার জবাবটা তুই পড়বিনে ?"

হরি কি আর করিবে। বানান করিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল। মা লিখিয়াছেন—

"মলিন! তোমার পত্র পেয়ে মর্ম্মাহত হলাম। তুমি—নিরক্ষর ? তুমি যে কি—তা' হয়ত তুমি জানো না! কিন্তু, তোমার মা হয়ে আমি কি জানি, শুনে রাখো—মা-সরস্বতী যদি কোনো দিন নিঃসন্তান হন, সেই দিনই তুমি হবে নিরক্ষর। ম্যাট্রিক থেকে এম্ এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি প্রথম হয়েছ—এমন সন্তান কোন্ দেশে ক'টি কার গর্ভে জন্মায়, বলতে পারো ? ঋণের দায়ে হয়তো তোমার ভদ্রাসন বিক্রী হয়েছে, হয়তো বা আমি নিরাশ্রয় হয়েছি, কিংবা তোমার চাকরী হয়নি—এই সব হেতুই যদি তোমাকে জগতের কাছে 'নিরক্ষর' বোলে প্রমাণ করে, তা হলে আমারও এই আশীর্ব্বাদ রইলো, বাবা—এম্‌নিটি 'নিরক্ষর' তুমি জন্ম জন্ম হয়ো!"

মলিন পত্রখানা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর কখন্, কোন্ সময়—তাহা সে জানে না, পত্রখানা সার্টের পকেটে রাখিয়া ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া মলিন নীচে নামিয়া গিয়াছে, ঝরণা তখনো উঠে নাই, আল্‌নায় ঝোলানো মলিনের জামাটার দিকে তার নজর পড়িল, দেখিল—পকেটে খানিক বাহির হইয়া একখানা যেন চিঠি! চিঠি ?—ঝরণা চমকিয়া উঠিল। আত্মীয়-বন্ধুহীন—তার পকেটে চিঠি ? বিস্ময়ে ও ক্রোধে তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন নিমেষে ক্ষেপিয়া উঠিল। নিজেকে যেন এক ঝাঁকি মারিয়া তুলিয়া আগ্নেপিণ্ডের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়াই দেখিল—শিরোনামায় মলিনের নাম। অতঃপর পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে গিয়াই সে চমকিয়া উঠিল—এ কি! তার পর, তার দৃষ্টি যেন আর চলে না, যেন কোন্ অকাল-প্রভাতে চরাচরের রাশি-রাশি কুহেলিকা আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনওরূপে পত্রখানির শেষ অক্ষরে পৌঁছিয়াই তাহার চোখের জ্যোতিঃ যেন-এক দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিবিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অস্বাভাবিক জীবনের আকস্মিক স্পন্দনে সে একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া গেল—যেন বা তাহার সতেজ চৈতন্য আচম্বিতে একটি বার মাতাল হইয়াই একান্ত নিস্তেজ, নিঃশেষ, নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, অথবা এই চলতি দুনিয়া—ইহার কোলাহল-কলরব কবে কখন্ মেয়েটির সমগ্র—সব অনুভূতির কাছে নীরব, নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছে। • • • কতক্ষণ সে এইরূপ ভাবে বেহুঁস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে জানে না, নীচে ভৃত্যদের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং সে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা ঠিক তেম্‌নি করিয়া পুনশ্চ পকেটে রাখিয়া অবসন্নার ন্যায় টলিতে-টলিতে শয্যায় আসিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ।

ভিজা কলোডিয়ন পদ্ধতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

কাচের উপর কলোডিয়নের প্রলেপ দিয়ে ভিজা অবস্থায় ফটো তোলা পদ্ধতিটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্কট আর্চার প্রথম আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে নেগেটিভ করায় কতকগুলি এমন বিশেষ সুবিধা আছে, যা শুকনো পদ্ধতিতে নেই, তাই ভিজা পদ্ধতিটি আজও এই শিল্প-ব্যবসায়ীদের নিকট পূর্ব্বের ন্যায়ই সমাদৃত ও এর মৃত্যু কোন দিনই ঘটবে ব'লে আশঙ্কা করা যায় না।

কলোডিয়ন ফিল্ম নেগেটিভ রৌদ্রে বা যে কোন উত্তাপের সাহায্যে শীঘ্রই শুকানো যায়, কিন্তু জিলেটিন ফিল্ম উত্তাপ বা রৌদ্রে শুকানো যায় না, কারণ জিলেটিন কোন রকম উত্তাপ পেলেই গলতে থাকে। কলোডিয়ন ফিল্ম অতি সহজে সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে একটা কাচ থেকে আর একটা কাচের ওপর তুলে বসানো যায়, যাকে বলা হয় ষ্ট্রিপিং ফিল্ম। যেহেতু কলোডিয়ন ফিল্ম নেগেটিভকে অনেকগুলি কেমিকেলের সংস্পর্শে ও তাদের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই হেতু, খারাপ নক্সা থেকেও উৎকৃষ্ট না হ'লেও কার্য্যোপযোগী ভাল নেগেটিভ প্রস্তুত করা যায়। যে কোন আকারের খুব ছোট ও বড় নেগেটিভ ভিজা পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়, শুধু নানা রকম আকারের কাচ থাকলেই চলে, এবং নেগেটিভের কাজ শেষ হ'য়ে গেলে ফিল্ম পরিষ্কার ক'রে নিয়ে, সেই কাচকে আবার কাজে লাগানো যায় তত দিন—যত দিন না কাচের ওপর কোন রকম দাগ হয়! খরচের দিক থেকেও শুক্‌না প্লেট অপেক্ষা ভিজা প্লেট্‌এর দাম পড়ে অনেক কম, তাতে ব্যবসাক্ষেত্রে লাভের অংশ বেশী থাকে। ভিজা প্লেট্ ফটোগ্রাফীতে একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে, সেটা হ'চ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। কাজের ভাল ফল নির্ভর ক'রবে সাবধানতা, মনোযোগিতা ও দক্ষতার উপর। ভিজা প্লেট্ ফটোগ্রাফী পদ্ধতিটির সম্পূর্ণ চিত্র সোজা ও সংক্ষিপ্ত রেখার দ্বারা এই ভাবে টানা চলে:—একটি পরিষ্কার কাচকে আয়োডাইজড্ কলোডিয়নের প্রলেপ দিয়ে সিলভার নাইট্রেট্ সলিউসনে ডুবিয়ে পদার্থগুলিকে আলোক ধারণ ক্ষমতায় পরিণত করা হয়, এবং ভিজা অবস্থায় ক্যামেরায় এক্সপোজ দিয়ে অদৃশ্য প্রতিবিম্বকে ডেভালপিং সলিউসনের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হয়। কিন্তু কি ভাবে হয় এটা জানার ইচ্ছা অনেকের মনে আসা স্বাভাবিক। আমরা জানি যে, যে বস্তু আলোর সকল রশ্মিগুলি শোষণ করে নেয় তার রং আমরা দেখি কালো। কালো বস্তুর ওপর থেকে কোন আলো প্রতিফলন হয় না। অপারেটর বা ফটোগ্রাফার যখন কোন বস্তু লেন্সের সামনে রেখে আলোর সাহায্যে তাকে এক্সপোজ দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে কি? সে লেন্সের সামনের বস্তুর উপর আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে লেন্সের মধ্য দিয়ে লেন্সের পিছনে রাখা ফটো-প্লেট—যাহা এমন কতকগুলি পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত ও আলোর ক্রিয়ায় যার উপর রাসায়নিক দ্রব্যগুণের পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহার উপর গিয়া পড়ে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা চাই বাইরের আলো বস্তুর উপর প্রতিফলিত হ'য়ে যত দূর সম্ভব ফটো-প্লেটের উপর গিয়া পড়ুক। আগেই ব'লেছি যে, সাদা বস্তুর উপর হ'তে আলো প্রতিফলিত হয় খুব বেশী পরিমাণে, সেই জন্যে আমরা অরিজিনাল্ কপি বা নক্সা সাদা কাগজের উপর আঁকতে দিয়ে থাকি এবং যদি কাল সাদা ছবি বা নক্সা হয়, তাহ'লে যে কালি আঁকার জন্য ব্যবহার করা হবে তা যেন খুব কালো হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখি। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাতে আলোর প্রতিফলন কার্য্যটি পূরো মাত্রায় হয় ও সঙ্গে সঙ্গে আলোর শোষণ ক্রিয়াটিও হয় তদনুরূপ। এখন একটু ভেবে দেখলেই আমার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর সকলের কাছে সহজ হ'য়ে উঠেছে বলে মনে হবে। আমরা এক্সপোজ করি ছবির বা নক্সার সাদা জায়গাগুলি, ছবিটিকে নয় অর্থাৎ কালো কালির সাহায্যে সাদার বুকে যে ছবিটি আঁকা হ'য়েছে, সেই কালো জায়গাগুলি নয়।

ভিজা কলোডিয়ন প্লেটের উপর প্রতিফলিত আলোকরশ্মি পড়ে রাসায়নিক দ্রব্যগুণের দ্বারা সিলভারের উপর যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাকে মেটালিক ষ্টেট বলে। সেই রৌপ্যধাতু-প্রতিবিম্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে হিরাকস্ ব্যবহার করা হয়, তার পর তাকে ফিক্সিং সলিউসন হাইপো অথবা পটাসিয়াম সাইনাইডের মধ্যে দিলে যে সকল জায়গায় আলোর ক্রিয়া হয়নি অর্থাৎ নক্সার কাল কালি দিয়ে আঁকা জায়গাগুলি বা লাল, সবুজ, হলদে, কমলা রং দিয়ে আঁকা রেখাগুলি বা স্থানগুলি খেয়ে যায়। এর পর কতকগুলি অন্যান্য কেমিকেলের সাহায্যে নেগেটিভকে ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় আনা হয়, এবং শেষে সিলভার নাইট্রেট্ সলিউসন বা সোডিয়াম সালফাইড্ সলিউসনের সাহায্যে কালো করা হয়।

সীট গ্লাস এবং প্লেট্ গ্লাস ভিজা ফটোগ্রাফীতে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাধারণ কাচে নানা রকম দোষ থাকে, যেমন উঁচু ঢেউয়ের মত দাগ, ছোট ছোট বায়ু-বুদ্বুদ ইত্যাদি। এ সকল কাচ ব্যবহার করলে নেগেটিভে শুধু দাগ আসার ভয় নয়, নেগেটিভ দস্তার ওপরে ছাপবার সময় প্রিণ্টিং ফ্রেমের মধ্যে যখন চাপ দেওয়া হয় তখন ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সীট গ্লাস বা প্লেট্ গ্লাস যাতে কোনরূপ দোষযুক্ত না থাকে, প্রস্তুত কালীন সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কাচকে আবহাওয়ার হাত হ'তে রক্ষা করবার জন্যে গ্রীজের প্রলেপ দেওয়া থাকে। সেই জন্য ব্যবহারের আগে তাকে কষ্টিক পটাসের জলে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়।

কষ্টিক পটাস এক ভাগ; জল চার ভাগ।

অনেক কাচে আবার ভেসলিনের প্রলেপ দেওয়া থাকে, এগুলিকে গরম জলে সাবান গুলে ধুয়ে নিলে পরিষ্কার হয়। এর পর কাচগুলিকে নাইট্রিক এসিডের জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়, পরে কলের তলায় ফ্লানেলের প্যাড দিয়ে ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে জল ঝরিয়ে নিয়ে এগ-এ্যালবিউমেন সলিউসনের প্রলেপ দিয়ে শুকোতে দিতে হয়। শুকোতে দেওয়ার জন্যে কাঠের খাঁজ-কাটা র‍্যাক বিশেষ উপযোগী। কাচ পরিষ্কার সলিউসন—

নাইট্রিক এসিড ২।০ আউন্স; জল ২০ আউন্স।

এ্যালবিউমেন সাবস্ট্রাটাম্:—একটি ডিমের সাদা অংশ ও জল ২০ আউন্স বেশ ক'রে হুইস্কএর দ্বারা ফেঁটে নিয়ে কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া মিশিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দিতে হবে, পরে ফানেলের মুখে তুলো দিয়ে (সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হ'চ্ছে ফিল্টএর সাহায্যে ছেঁকে নেওয়া) ভাল ক'রে ছেঁকে নেওয়া অর্থাৎ ফিল্টার করা। তার পর পরিষ্কার কাচটির ওপরে আস্তে আস্তে ঢেলে কাচের দু'টি কোণ ধরে এমন ভাবে ঘোরাতে হবে, যাতে কাচটির সব জায়গায় লাগে। প্রথম বার এ্যালবিউমেনের প্রলেপ দিয়ে কাচের ওপরকার এ্যালবিউমেন সলিউসন ফেলে দেওয়া দরকার; কারণ, কাচের ওপরে যে জল থাকে তার সঙ্গে মিশে সলিউসন পাতলা হ'য়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয় বার এ্যালবিউমেন সলিউসন প্রলেপ

দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত সলিউসন আর একটি পাত্রে ঢেলে রাখা যায় ও পরে সেইটি আবার ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা চলে। ছোট কাচ, এমন কি ১৮"×১৪" ইঞ্চি কাচও হাতে ক'রে ধ'রে এ্যালবিউমেন সলিউসনের প্রলেপ দেওয়া চলে, কিন্তু বড় কাচের বেলায় হাতে ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে একটা ৬ ইঞ্চি চৌকো ও চার ইঞ্চি উঁচু কাঠের বাক্স নিয়ে তার ওপরে জুট বা ছেঁড়া ন্যাকড়া পুরু করে দিয়ে ওপর থেকে আর একখানা মোটা কাপড় ঢাকা দিয়ে চার পাশে টেনে পেরেক মেরে দিতে হবে—যাতে বাক্সটির ওপর বেশ নরম প্যাডের মত হয়। এবার বড় কাচের এর ওপর রেখে বাঁ হাতে কাচের বাঁ দিকের কোণটি ধ'রে ডান হাত দিয়ে ছাঁকা এ্যালবিউমেন্ সলিউসন্ কাচের মধ্যখানে সাবধানে আস্তে আস্তে ঢালতে হবে, যাতে কোন রকম বায়ু-বুদ্বুদের সৃষ্টি না হয়। তার পর দু'হাতে কাচের দু'টি কোণ ধ'রে সহজেই কাচটিকে ঘুরিয়ে (কাচের সব জায়গায় যাতে সলিউসন্ লাগে এমনি ভাবে) সলিউসনটুকু কাচের উপরকার যে কোন একটি কোণ দিয়ে ফেলে দিতে হবে। সহজেই কথাটা বললুম এই জন্তে যে, কয়েক দিন অভ্যাস করলেই উপায়টি এত সহজ বলে মনে হবে যে, ৩০"×২৪" ইঞ্চি কাচে প্রলেপ দিতে অসমান হবার যে সন্দেহ মনে হয়ত বা জেগেছিল, এখন সেই সন্দেহ নিজের মাঝে আপনা হ'তেই সমাধিলাভ করবে যখন এই উপায়ের দ্বারা একখানা ৪৮"×৩৬" ও সিকি ইঞ্চি মোটা কাচ যার ওজন হবে ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩ সের—অতি সহজেই প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হবে।

এ্যালবিউমেন্ সলিউসনের প্রলেপ দেওয়ার পর কাচগুলিকে খাঁজ-কাটা কাঠের র‍্যাকে শুকোতে দেওয়া হয়, এবং শুকোবার পর কাচের যে দিক সলিউসন লাগানো হয়েছে, সেই দিকটা আর একটি সলিউসন্ মাখানো কাচের পিছন দিকে থাকে এমনি ভাবে পর-পর একটার উপর আর একটি রাখতে হয়। বিভিন্ন আকারের কাচ এই ভাবে এ্যালবিউমেন্ সলিউসনের প্রলেপ দিয়ে রাখা চলে ও প্রয়োজন হলেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে আয়োডাইজড্ কলোডিয়নের প্রলেপ দিয়ে সিলভার সলিউসনে ডুবিয়ে আলোক ধারণ ক্ষমতায় পরিণত করতে হয়।

সাবস্ট্রাটাম্ সলিউসনের দু'টি ফরমূলা দিলুম। একটি জিলেটিন্ ও অপরটি এ্যালবিউমেনের।

এ্যালবিউমেন সাবস্ট্রাটাম্

শুকনো এ্যালবিউমেন্ ফ্লেক্ বা পাউডার	৩০০ গ্রেন্স্
লাইকার এ্যামোনিয়া '৮৮০	৪০ ফোঁটা
জল	৪০ আউন্স

মেশাবার উপায়—যদি পাউডার এ্যালবিউমেন হয়, তা'হলে একটি বোতলে জল ঢেলে তা'তে এ্যালবিউমেনটুকু ঢেলে দিয়ে বোতলের মুখে হাত চেপে খানিকক্ষণ নাড়াতে হবে, তাহ'লেই জলের সঙ্গে মিশে যাবে, পরে সেটাকে একটা পাত্রে ছেঁকে নিয়ে পূর্ব্বে বর্ণিত উপায়ে কাচে লাগাতে হবে। যদি ফ্লেক্ এ্যালবিউমেন হয়, তা'হলে তাকে এক রাত্রি ভিজতে দিয়ে রাখা ভাল, তাহ'লে বেশ নরম হ'য়ে থাকে এবং হুইস্ক এর দ্বারা ফেঁটে নিয়ে ছেঁকে অর্থাৎ ফানেলের সাহায্যে ফিলটার ক'রে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রলেপ দেওয়া চলে। এ্যালবিউমেন্ সলিউসন্ তাজা ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ কারণ; প্রথমতঃ এ্যালবিউমেন্ সলিউসন্ থাকে না, নষ্ট হ'য়ে যায় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরেই একটা দুর্গন্ধ বেরোয় আর দ্বিতীয়তঃ দু'-এক দিনের পচা এ্যালবিউমেন্ ব্যবহার ক'রলে নেগেটিভের উজ্জ্বলতা বা স্বচ্ছতা নষ্ট হয় অর্থাৎ ফগ্-এর সৃষ্টি হয়।

জিলেটিন্ সাবস্ট্রাটাম

নেল্সন্ জিলেটিন্	৬০ গ্রেন্স
এ্যামোনিয়া '৮৮০	১১৫ ফোঁটা
জল	৬০ আউন্স

প্রথমে ১০ আউন্স ঠাণ্ডা জলে জিলেটিন্ ভিজতে দিতে হবে। (যে পাত্রে জিলেটিন ভেজানো হবে সে পাত্রটির যেন কম-পক্ষে ৭০ আউন্স জল ধারণের ক্ষমতা থাকে) এবং ঘণ্টা খানেক ভিজতে দেওয়ার পর পাত্রটি ষ্টোভ বা ইলেক্ট্রিক হিটারের সাহায্যে গরম করতে হবে ততক্ষণ—যতক্ষণ না জিলেটিন সম্পূর্ণ ভাবে গলে যায়, তার পর এ্যামোনিয়া ও বাকি জল মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার ক'রতে হবে। জিলেটিন সাবস্ট্রাটাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তথাপি আমার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি নিঃসঙ্কোচে ব'লতে পারি যে, এ্যালবিউমেনই সাবস্ট্রাটামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তা ছাড়া প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার-বিধি জিলেটিন অপেক্ষা সহজ। সাবস্ট্রাটাম্ অর্থাৎ এ্যালবিউমেনের প্রলেপ কাচের ওপরে দেওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু কলোডিয়ন ফিল্মকে প্লেটের বুকে ধরে রাখার জন্ম। কোন কাচে জিলেটিন বা এ্যালবিউমেনের প্রলেপ না দিয়ে কলোডিয়নের প্রলেপ যদি দেওয়া হয়, তাহ'লে সিলভার-বাথে দেওয়ার পর দু'-চার বার ডিস রক্ ক'রলেই কলোডিয়ন ফিল্ম উঠে আসবে, আর যদি বা সিলভার-বাথে সাবধানতার ফলে টেঁকে যায়, ডেভালপ করার পর যেমনি ধোবার জন্তে কলের তলায় ধরা হবে, তখনই প্লেটের ওপর থেকে ফিল্ম ভেসে বেরিয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে, ষ্ট্রিপিং নেগেটিভ্, অর্থাৎ যে নেগেটিভ থেকে ফিল্ম অন্য কাচে বসাবার জন্ম তুলে নেওয়া হয়, সে কাচে সাবস্ট্রাটাম্ কাচের সবটায় লাগানো হয় না, শুধু চার ধারে আধ ইঞ্চি আন্দাজ চওড়া এ্যালবিউমেন সলিউসন স্পঞ্জের সাহায্যে লাগিয়ে দিতে হয়, যাতে ক'রে কলোডিয়ন ফিল্ম ভেসে বেরিয়ে যেতে না পারে। শুধু সাবস্ট্রাটামের একটা বাঁধন দেওয়া মাত্র। এই বাঁধন দেওয়াকে এজিং বলা হয়। অনেকে এজিং-এর জন্তে রবার সলিউসন ব্যবহার করেন। কিন্তু আমি বরাবর ষ্ট্রিপিং নেগেটিভের জন্তে এ্যালবিউমেন এজিং দিয়ে থাকি ও আজও পর্য্যন্ত কাজের দিক্ থেকে কোন অসুবিধা হয়নি, উপরন্তু এ্যালবিউমেন এজিং সলিউসন রবার এজিং সলিউসন অপেক্ষা সস্তা পড়ে।

রবার এজিং ফরমূলা

রবার ম্যাসটিকেটেড	১ আউন্স
বেনজল্ খাঁটি	২৫ আউন্স

[ক্রমশঃ

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৪

জ্যানের পত্র পড়ে আর্থারের মন ছোট হয়ে গেল। সে বেশ চিন্তিত হল, তার পর ভাবল, চিন্তা করে আর লাভ নাই। জ্যান নিশ্চয়ই তার দুর্বলতা টের পেয়েছে। এই দুর্বলতার শেষ কোথায় তাও দেখতে হবে। তার পর নিশ্চিন্ত মনে সে কাজে লেগে গেল। অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে এল না। নিজেই হুইলবেরোতে কাঠের বাক্সে গোবর বোঝাই করে দূরে নিয়ে রেখে আসতে লাগল। এতে তার পরিশ্রম বেশ হত বটে কিন্তু মনটা আগের মত না থেকে ক্রমেই কঠিন হতে লাগল।

কাজ শেষ করে আর্থার যখন ঘরে ফিরল তখন দেখতে পেল, তাদের খামারের মালিক তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। দরিদ্র লোক আমেরিকার খামারের মালিক হতে পারে না। খামারের মালিকরাই পরোক্ষ ভাবে ভোট দিয়ে সেনেটে প্রতিনিধি পাঠায়। এ-হেন মনিব সামান্য একটা মজুরের জন্যে অপেক্ষা করছে সে কি কম কথা! আর্থারকে দেখা মাত্র মনিব মহাশয় বললেন, "তোমার বন্ধু চলে গেছে, সেজন্য দুঃখিত হয়ো না, সত্বরই তোমাকে অন্য কাজ দেব, তাতে তোমার ভালই হবে।" আর্থার মনিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাত-মুখ ধুতে গেল। ঘরে এসে জমানো মজুরী জ্যানের মতই বেল্টের পকেটে রেখে কোমরে এঁটে দাঁড়িয়ে কি ভাবল, তার পর বিছানাতে শুয়ে অস্পষ্ট করে বলল, "টাকাই যখন জীবনের মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন যেন-তেন প্রকারে টাকা রোজগার করাই কর্তব্য।" আর্থারের দুর্ব্বল মন হঠাৎ সবল হয়ে উঠল। সে কাজে মন দিল। দুই মাস অনবরত কাজ করে গোবর ফেলার কাজ শেষ করল। তার পর সে বেকার হল। বেকার হয়েও সে আস্তানা পরিত্যাগ করল না। সেখানেই বিনামূল্যে থাকতে লাগল।

এক দিন সকাল বেলা মালিক এসে বললেন, "তোমাকে মুরগী পোষার কাজ দিতে চাই, সেখানে অনেক কিছু শিখতে পারবে। মাইনে এবং থাকার স্থান একই থাকবে।" আর্থার কাজ পেয়ে সুখী হল এবং সে দিনই মুরগীর ফারমে কাজ করতে চলে গেল। আর্থারকে মুরগীর ফারমের ম্যানেজার আকারে-ইংগিতে মালিকের চরিত্র-দোষের কথা জানাল। আর্থার কিন্তু এ সব বিষয়ে কাণ দিল না। আপন মনে কাজ করে যেতে লাগল। মুরগীর ফারমের কাজ সে ভাল করেই শিখল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হয়ে যেতে লাগল। পুরাতন বৎসর কাটিয়ে গিয়ে নূতন বৎসরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। আর্থার তার মায়ের কাছে এক দফে তিন শত ডলার পাঠিয়ে বাকী ডলারগুলি ব্যাংকে জমা দিল। আর্থারের শরীর বেশ শক্ত হয়ে উঠল এবং সে যে-কোন কঠিন কাজ করতে সক্ষম হল। মুরগীর ফারমে ঘাস-কোটা, লাকড়ি-চিরা, মাটি-কাটার কাজও করত এবং অবসর সময়ে পুরাতন সংবাদপত্র পড়ে সময় কাটত।

অবসর সময়ে আর্থার এক দিন একখানা সংবাদপত্র মন দিয়ে পড়ছিল। তাতে একটি সুন্দর প্রবন্ধ ছিল। সেই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় বলছিলেন, "আমেরিকার মধ্যবিত্ত এবং মজুর-পরিবার দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ভেংগে যাচ্ছে। পিতা পুত্রের সন্ধান রাখে না, মা কন্যার কথা ভুলে যায়, এমন কি মাসতুত ভাই মাসতুত বোনের সংগে অজানিত ভাবে পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করে ফেলে। এটা কি বহুল পরিমাণে যন্ত্র-ব্যবহারের ফল, না অন্য আর কিছু, তা চিন্তা করার সময় এসেছে। যদি আমেরিকাকে বাঁচাতে হয় তবে এ সম্বন্ধে একটি কমিশন বসাতে হবে।" আর্থার যে সংবাদপত্রখানা পড়ছিল তার নাম হল 'কালিফরনিয়া গারজিয়ান্'।

আর্থার সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে বিছানার এক দিকে রেখে দিয়ে তার মা-বাবার কথা ভাবতে লাগল। বেশিক্ষণ তাদের কথা সে ভাবতে পারল না। প্রথম তার দু'টা চোখ জলে ভরে উঠল, তার পর ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

পাশের বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করল, "আর্থার, কাঁদছ কেন? তুমি ত বড় হয়েছ, এ বয়সে কেউ কাঁদে না। পুরুষ হও আর্থার, এ বয়সে কাঁদলে কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। মনে রেখো, আমেরিকায় কাপুরুষের স্থান নেই। চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, রেকেটিয়ার্স যা হতে চাও, সব কিছুতেই সাহসের দরকার। ভেবো না, তোমার মা-বাবা তোমার জন্য বেশী চিন্তা করছেন। আমারও তোমার মতই অবস্থা ছিল, ভাবছিলাম, মা-বাবার কাছে গেলে শান্তি পাব, কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে দু'দিন থাকার পরই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার উপস্থিতি তারা দরকার মনে করেন না। বাধ্য হয়ে বাড়ী হতে বেরিয়ে এসেছিলাম, এর পর আর ঘরমুখো হইনি। কা কস্য পরিবেদনা। দুনিয়াতে সত্য বলে যদি কিছু থাকে তবে আছে সৰ্ব্বশক্তিমান্ ডলার। যদি ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয় তবে কাঁদতে হবে সর্বশক্তিমান্ ডলারের জন্য। আমরা পশু হয়ে গেছি আর্থার! ডলার ছাড়া আর কিছু বুঝি না। বুঝতে দেওয়া হয় না। গীর্জার ধর্মযাজক ডলারের অনুপাতে ধর্মকথা বলে। খাবারের দোকানে ডলারের অনুপাতে খাদ্য পাওয়া যায়। শোবার বিছানার তারতম্য হয় দামের অনুপাতে। যদি ডলার তোমার কাছে না থাকে, তবে ভূমিশয্যাই হবে শেষ সম্বল। গীর্জা হতে বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্বত্র ডলারের অনুপাতে ধর্ম এবং বিদ্যার মান নির্ণয় হয়। এখন বুঝে নেও, ডলার কত শক্তিশালী। আর্থার কেঁদ না, কাঁদলে কোনই লাভ হবে না, অরণ্যে রোদন হবে মাত্র!"

এক দিন আর্থারের মনিব তাকে ডেকে পাঠাল এবং বাগিচার কাজে নিযুক্ত করল। বাগিচার কাজ করার সময় আর্থার মনিবের বাড়ীতেই থাকতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে এক দিন জ্যানের কাছ থেকে একখানা পত্র এল। জ্যান সে পত্র হলিউড থেকে লিখেছিল। নূতন আমদানী (New find) হিসেবে জ্যানকে লস্‌এঞ্জেল্‌স সহরের কোনও ষ্ট্রীট হতে এক জন লোক সিনেমাতে কাজ করার জন্য নিয়ে যায়। ডাকাতের ভূমিকায় জ্যান্ বেশ দক্ষতা দেখাতে থাকে। কিন্তু যার সংগে তার প্রেম করার ব্যবস্থা ছিল, সেই মেয়েটি জ্যানের কাছে কাম-ভিখারী হয়। জ্যান্ তাতে রাজী হয়নি। মেয়েটির কোম্পানিতে বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তার প্রতিপত্তির প্রভাবে জ্যান্ কোম্পানি হতে কর্মচ্যুত হয়। এতেও জ্যানের প্রতি মেয়েটির

রাগ যায়নি। যেমেটি অন্ত লোকের সাহায্যে জ্যানকে হত্যা করবার বন্দোবস্ত করে। বিষয়টি জানতে পেরে জন্ লস্ এঞ্জেলস পরিত্যাগ করে স্যান ফ্রান্সিসকোতে যায় এবং নাবিক হয়ে বিদেশে চলে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়। এই পত্রেই জ্যন্ আর্থারকে লিখেছিল, যদি তার ইচ্ছা হয় তবে সে যেন নাবিক হবার জন্ত চলে আসে। উভয়ে এক জাহাজে কাজ করলে বেশ সুখে থাকতে পারবে।

এই পত্র লেখার পর জন্ আর্থারের কাছে আর একখানা পত্র লিখল, তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল :—

প্রিয়বন্ধু,

তোমাকে পত্র লেখার পরই ছ'ঘণ্টার মধ্যে একটি চাকুরী পাই, সেই চাকুরীর মজুরী প্রত্যেক ঘণ্টায় চল্লিশ ডলার। চাকুরীটি একটি ড্রাগ আউটে। বোধ হয় তুমি ড্রাগ আউট কথাটা বুঝতেই পারবে না। ড্রাগ আউট মানে হল মাটীর নীচে একটা ঘর। সেই ঘরে বিজলী বাতির সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিজলী বাতি বুঝিয়ে দিলে সবই অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, আমারই মত অনেক যুবক-যুবতী এক দিকে বসে আছে আর অপর দিকে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ রয়েছে। তাদের কারো বয়স চল্লিশে পৌঁছেনি। তারা আমাদের মত যুবক-যুবতীদের প্রেম-ভিখারী ছিল। আমাদের কতক্ষণ বসে থাকার পরই সবাইকে খাবার দেওয়া হল। খাবার খেয়ে আমরা বসেছি অমনি সবগুলি বাতি একসংগে নিবে গল। বাতি নিবে যাবার পর যা ঘটল তা সভ্য জগতের কোন ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। সেখান থেকে চল্লিশ ডলার ঠিক-ঠিকই পেয়েছিলাম। কিন্তু টাকাটার প্রতি আমার এতই ঘৃণা হয়েছিল যে, সেখান হতে ফেরবার পথে একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে চল্লিশটি ডলারই দরিদ্রের খাবার-কাপে জমা দিয়ে চলে এসে সোজা ক্রে ষ্ট্রীট দিয়ে সি-ম্যান্ অফিসে যেয়ে খালাসীর কাজে ভর্ত্তি হয়ে তোমার কাছে এই পত্র লিখলাম। তুমি এস না, আমি কোথায় যাব তার কোনও ঠিকানা নেই। আমেরিকাতে যদি ফের আসি তবে বিদেশ থেকেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসব। দ্বিতীয় কথা হল, হুভার যত দিন প্রেসিডেণ্ট থাকবেন তত দিন আমেরিকায় ফেরব না। এক দিকে অভাব আর অন্ত দিকে দেশের বুকের উপর দুষ্ট লোকের অনাচার, তা কি সহ্য করা চলে? বিদায়।

আর্থার ছ'খানা পত্রই একসংগে পেল এবং ঠিক করল যদি সে জ্যানের মত কোনও বদ্‌লোকের ফাঁদে পড়ে তবে সে উচ্চমূল্যে নিজেকে বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তা একটা ভাল ব্যাংকে জমা রাখবে এবং ভবিষ্যতে সেই টাকা দিয়ে শরীর এবং মনের উন্নতি করবে।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই আর্থারের প্রতি তার মনিবের দৃষ্টি পড়ল। আর্থার তার মনিবের প্রত্যেকটি কথায় রাজী হল এবং ঠিক হল, আর্থার প্রত্যেক দিন পঁচিশ ডলার করে পাবে। আর্থার আর আর্থার রইল না, সে নিজেকে উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রী করে দিলে। তার মনিব তাকে আরও উচ্চমূল্যে অন্ত এক মহিলার কাছে বিক্রি করেছিলেন। শ্বেতকায়দের মধ্যে এরূপ ভাবে এখনও আমেরিকাতে দাস-ব্যবসা চলে।

কি করে আর্থার নিজেকে বিক্রি করল তার আভাস অনেকটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার পর কি করল তা বলা ভাল হবে না বলে এখানেই বিষয়টি পরিত্যাগ করা হল। অবশ্য অনেকেই তা জানবার জন্ত উৎসুক হবেন। এটা হল আমাদের ইহুদী প্রকৃতি। ইহুদীরা এখন আরবদের ঘরে বসে আরবদের ঘাড়ে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছে, আর আমরা তাদের পরিত্যক্ত বদ্ অভ্যাস সানন্দে গ্রহণ করেছি। সে জন্ত আমাদের দেশে নানারূপ 'হ্যানের' তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাচ্ছে।

আর্থারের জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই কাটছিল। ক্রমাগত দেড় বৎসর সে ব্যাংকে টাকা জমিয়ে রাখছিল। দু'বৎসর পর আর্থারের শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় অর্জিত টাকা ব্যাংকে নিয়ে জমা রাখতে খুবই আলস্য করত। দু'বৎসর পরে এক দিন আর্থারের শহরে যাবার ইচ্ছা হল। পথে চলবার ক্ষমতা খুব কমই ছিল, তবুও সে চলল এই ভেবে যে—দু'মাসের জমানো টাকা বেল্টে গুঁজে রাখা চলে না। সংগে বেশী টাকা থাকলেও আমেরিকাতে অনেক যুবক-যুবতীর অকালে মৃত্যু হয়। সে সংবাদ সংবাদপত্রে বের হ'ত। যে সকল যুবক-যুবতী অপরকে সন্তুষ্ট করে টাকা রোজগার ক'রত তারাই এ সব যুবক-যুবতীকে হত্যা করত।

যখন সে পথ চলছিল তখন তার সংগে এক জন বৃদ্ধের দেখা হয়। আর্থারের অবস্থা দেখে বৃদ্ধের দয়া হয় এবং বৃদ্ধ এই বলে আর্থারকে আশ্বাস দেয় যে যদি কোন দিন আর্থার বিপদে পড়ে তবে যেন সে তার কাছে আসে। অতি কষ্টে আর্থার শহরে গিয়ে টাকাগুলি ব্যাংকে জমা দিয়ে একটা হোটেলে গেল এবং সেখানে শুয়ে থাকল। হোটেলে তার বেশ ঘুম হল এবং পরের দিন যখন সে ঘুম হতে উঠল তখন বুঝতে পারল Health is wealth কা'কে বলে। আরও এক দিন হোটেলে যাপন করে আর্থার পরের দিন বৃদ্ধের কাছে যায়। বৃদ্ধ তখন নিজের কেবিনেই ছিল। আর্থারকে দেখে বৃদ্ধ বলতে লাগল, "কি হে আর্থার, হুঁস-বুদ্ধি কিছু হল?" আর্থার মাথা নত করে রইল। তার পর বলল, "এবার অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু এর পরে কি করব?"

"আগে স্বাস্থ্য ফিরে পাও—তার পর যা-হয় একটা কিছু করা যাবে। তুমি কি আমার এখানেই থাকবে মনস্থ করেছ?" আর্থার বললে, "সে জন্তই ত' এসেছি।" "তাই যদি হয় তবে ক'টা বড়-বড় বাক্স একত্রিত করে ঐ পাশের জাজিমটা বিছিয়ে ফেল। আমি এখন কাজে যাচ্ছি। কাজ থেকে এসে কিছু খাবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু মনে রেখো, তোমার চরিত্র খারাপ হয়েছে। আমার বাক্সগুলিতে কি আছে তাই তুমি জানতে চাইবে, কিন্তু খবরদার এতে হাত দিও না।"

"তাই হবে বৃদ্ধ, এখন তুমি যাও। নিকটস্থ রেঁস্তোরায় বসে অনেক সময় কাটাতে সক্ষম হব, তার পর যখন তুমি আসবে তখন বিছানা করে শোব।"

বৃদ্ধ চলে গেল। আর্থার একটা বাক্সের উপর বসে চিন্তা করতে লাগল। সে ভাবল, "এই ত জীবন, এরূপ ভাবে আর কত দিন চলবে। দেশের সর্বত্র হাহাকার। অনেকেই পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। যারা খেতে পাচ্ছে তাদের খাদ্য এত বেশী রয়েছে যে খেয়েও শেষ করতে পারছে না। এ সব কথার মীমাংসা করার লোকও পাওয়া যাচ্ছে না, সকলেই বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার ত মনে হয় না, এ সব কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এ সবের

পেছনে রয়েছে শয়তানের ইচ্ছা। শয়তান দমনের ব্যবস্থা করার কি কোন উপায় নেই ?"

সুচিন্তায় অনেকক্ষণ মগ্ন থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আর্থারও সুচিন্তায় অনেকক্ষণ মগ্ন থাকতে পারল না। সে উঠে দাঁড়াল এবং একটার পর একটা করে বাক্স খুলে যখন মূল্যবান্ কিছুই পেল না তখন হতাশ না হয়ে একখানা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। বেশিক্ষণ বইও পড়তে পারল না। বৃদ্ধের বিছানাতে শুয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাংল তখন দেখতে পেল, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে বৃদ্ধ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ বললে, "আর্থার তোমার মত আত্ম-বিক্রয়কারীকে আমার বিছানায় শুতে দেখে বড়ই রাগ হয়েছে। তুমি জান না, এত দিন কি কাজ করেছ ?"

বৃদ্ধ আর কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ বিছানার চাদর এবং বালিশের ওসারগুলি বদলাল, তার পর আর্থারের দিকে তাকিয়ে বললে, "এগুলি তোমার বিছানায় বিছিয়ে ফেল। এখন থেকে মনে রাখবে, তুমি এক জন পাপী। আমার বিছানায় কেন, কারো বিছানায় তোমার বসা উচিত নয়।"

দ্বিরুক্তি না করে আর্থার নিজের বিছানা সজ্জিত করল, তার পর বৃদ্ধের সংগে যেয়ে নিকটস্থ রেস্তোরাঁয় মজুরের খাদ্য খেয়ে এল। অভাবের রাজত্ব সময়ে মজুরদের জন্য যে খাদ্য রেস্তোরাঁয় বিক্রি হত তার দাম কম ছিল এবং যত বাজে খাদ্য মজুরদের দেওয়া হত।

বৃদ্ধ দেখতে পেল, আর্থার মজুরদের খাদ্য খেতে পারছে না। খাবার শেষ করে যখন বৃদ্ধ পথে এল তখন আর্থারকে বলল, "এই খাদ্যই তোমাকে খেতে হবে। তুমি মজুরের সন্তান। যদি সুস্বাদু খাদ্য খেতে চাও তবেই তোমাকে পাপকার্য্যে রত হতে হবে। মামুলী খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে, তোমার সমশ্রেণীর লোকের যেন ভাল খাদ্যের সংস্থান হয়। তাদের খাদ্যের উন্নতির সংগে তোমারও খাদ্যের উন্নতি আপনা হতেই হবে। তুমি আমি মজুর-জগতের লোক। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হল মজুরের উন্নতি করা।"

"সে কিরূপে হবে মিষ্টার ?"

লক্ষ্য করার বিষয়, আর্থার বৃদ্ধের নাম ধরে ডাকতে সাহস করল না। মিষ্টার বলে সম্বোধন করল। বৃদ্ধের নামের সংগে আমাদের বিষয়বস্তুর কোনও সম্বন্ধ নাই। সে জন্য আমরা বৃদ্ধকে ভবিষ্যতে মিষ্টার বলেই পরিচয় দেব। মিষ্টার আর্থারকে বললে, "তুমি যে বইটা পড়ছিলে তাতেই সকল কথা বলা হয়েছে। তুমি সেই বইটা পড় এবং বুঝবার চেষ্টা কর। আমি ভাল করেই জানি, তোমার মগজে এখন যে মস্তিষ্ক আছে তা সবই শুকিয়ে গেছে, তবুও তোমার চেষ্টা করা দরকার। বই-পড়ার সংগে তোমার অন্যান্য পরিশ্রমও করতে হবে। আমি তার ব্যবস্থা করব।"

মিষ্টার এবং আর্থার যখন কেবিনে ফিরছিল তখন মিষ্টারের সংগে দেখা হল উইলীর। উইলী যুবক। বয়স বেশী হয় ত' কুড়ি। তার হাত দু'খানা লোহার মত শক্ত। চোখ দু'টা প্রজ্বলিত। দেখতে যদিও নিরীহ-ভাবাপন্ন কিন্তু রণমুখো সেপাই। তার পায়ে ওজনদার জুতা, লম্বা মোজা, নেকটাইটা বেশ মোটা, চুলগুলি ক্লিপ দিয়ে কাটা। দাড়ি-গোঁফ কাটেন বলে মুখটা রুক্ষ। দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার। তার পদবিক্ষেপ ঠিক মজুরের মত। বিকাল বেলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে বেশ একটু কন্‌কনে শীত অনুভব হচ্ছিল। উইলী অথবা আর্থারের গায়ে ওভারকোট ছিল না। আর্থারের দাঁতগুলি ঠক্‌-ঠক্ করছিল আর উইলী কোটের বোতামগুলি খুলে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মিষ্টারের সংগে বেপরওয়া হয়ে চলছিল।

উইলী মিষ্টারকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "এই বজ্জাতটাকে কোথা হতে এনেছ ?"

"আর বল না এটার কথা। এটা জাহান্নামে যেতে বসছিল। উদ্ধার করেছি, তবে বোঝে বেশ। একটা বই পড়তে দিয়েছি, দেখা যাক্ কি হয়। ওকে মানুষ করার ইচ্ছা রাখি। কাল সকালে তোমার কাছ থেকে একটি ডলার ধার করতে পাঠাব, এতে তার কায়িক পরিশ্রম হবে। একে তোমার ঘরে বসতেও দেবে না। কিছু খেতে যেন না পায় অথচ তুমি তার সামনে বসে খাবে। বুঝলে ত', ব্যাপারখানা কি ?"

"সব বুঝেছি বৃদ্ধ। আমাদের মত যুবকদের প্রথমত মিষ্টি খেতে দেয়, সিনেমায় নিয়ে যায় এবং যখন আমরা সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত হই তখন সিনেমার পয়সা বন্ধ করে দেয়, তার পর ফাঁদে ফেলে। সেই ফাঁদে যারা পা দেয় তারাই জাহান্নামে যায়।"

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলল, "না হে, আর্থার সেরূপ ছেলে নয়, সে বেশ চতুর। তার কাছে অনেক টাকা আছে। হয়ত বিগড়ে যাবে। যদি বিগড়ে যায় তবে তাকে আর পথে আনা যাবে না। এখন অন্য কথা বলা যাক্। আগামী পরশু রবিবার আছে। তোমার বন্ধুদের নিয়ে এখানে এস। এর সংগে সব ভাইকে পরিচয় করিয়ে দেব। এর নাম হল আর্থার, তুমি এখন এর সংগে বাজে কথা বলতে পার।"

উইলী বললে, "কি আর কথা বলব। মুখ খুলেই সেই এক কথা। আচ্ছা, তুমি একে কি বই দিয়েছ ?"

"টাকার কথা।"

"এ সব বই পড়ে এখন সে কোন রস পাবে না। গল্পের বই দাও, ভাষাও শিখবে, নানা বিষয় জানতেও পারবে।"

"তাই হবে, এখনই একটা বই দেব। তুমি আমার কেবিনে গিয়ে দেখবে হারামজাদা কত অধঃপাতে গিয়েছে। সে আমার সব বই তোলপাড় করেছে। তার নিশ্চয়ই কোনও বদ্ মতলব ছিল। হারামজাদা বড্ড চালাক, বুঝলে ?"

উইলী মুখ ফিরিয়ে আর্থারের দিকে চেয়ে বললে, "সুবিকাল, মিষ্টার আর্থার, কেমন আছ ?"

আর্থার বললে, "বেশ ভাল আছি।"

উইলীর শক্ত শরীর দেখে আর্থারের বেশ হিংসা হচ্ছিল। সে ভাল করেই জানত, তার শরীরও শক্ত ছিল, কিন্তু নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে। এবার নূতন করে শরীরকে গঠন করতে হবে, এতে সময় লাগবে। শরীরকে গঠন করা সোজা কাজ নয়। শরীর গঠন করতে হলে সময়ের দরকার।

কেবিনে এসেই উইলী আস্তিন্ গুটিয়ে এক কেট্‌লি ঠাণ্ডা জল মস্ত বড় জালা হতে একটা হাণ্ডেলের সাহায্যে বের করে এনে কেটলিটা আধ-মরা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে নূতন করে তাতে কাঠ দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন ধা-ধা করে জলে উঠল। কাফি তৈরী করার নিয়ম উইলীর জানা ছিল। ঠাণ্ডা জলেই সে একমুঠা কাফি ঢেলে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাফির সুগন্ধে ঘরটা আমোদিত হয়ে গেল। কাফি হয়ে যাবার পর বৃদ্ধ ক্রিম্ এবং চিনির ঢাকা নিয়ে এল। তিন কাপ কাফি তৈরী করে প্রথম কাপ বৃদ্ধের হাতে দিয়ে উইলী আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কাপে ক'টুকরা চিনি দেব?"

আর্থার এতক্ষণ উইলীর কাফি তৈরীর নিয়ম দেখছিল আর ভাবছিল. যদিও লোকটা খাঁটা মজুর, তবুও কাফি তৈরী করা বেশ ভালই জানে।

আর্থারকে নীরব দেখে উইলী পুনরায় বললে, "কথা বলছ না যে?"

"হাঁ, ক্ষমা কর, আমি আর কিছু ভাবছিলাম, চার টুকরা চিনি দিলেই চলবে।"

উইলী পুনরায় আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কাফি তৈরী করতে জান?"

"নিশ্চয়ই জানি, আমি যখন শয়তানটার ঘরে থাকতাম তখন গোবর-ফেলা, মুরগী-পোষা, কাফি-তৈরী এই তিনটি কাজ শিখেছিলাম।"

উইলী বললে, "সব জেনেও অধঃপাতে গেলে, লজ্জা করে না?"

"আমাদের আবার লজ্জা কিসের? বল ত, লজ্জা বলতে যা বুঝায় তা কারও আছে? সামান্ত মজুর থেকে আরম্ভ করে আমাদের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবই ভিখারী। আমি ভিক্ষা করিনি। শরীরটা বিক্রি করে বেশ রোজগার করছি এবং পতনের শেষ কোথায় তাও দেখে এসেছি। আমার আর পতন হবে না।"

পরদিন সকাল বেলা আর্থার উইলীর কেবিনে গেল। উইলী তখন পরেজ, আমলেট, পেয়াজের সুপ আর রুটি-মাখন নিয়ে খেতে বসছিল। আর্থার দাঁড়িয়ে উইলীর কাছে মিষ্টারের হয়ে একটি ডলার চাইল। উইলী বলল, "দাঁড়াও, খেয়ে নেই তার পর ডলার দেব। আর্থার উইলীর ঘরের দেওয়াল-পঞ্জীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র উইলী আর্থারকে বললে, "আমার দেওয়াল-পঞ্জীর দিকে তাকিও না, তাতে নানারূপ গোপনীয় কথা লেখা রয়েছে, তোমার সে-দিকে তাকানো উচিত নয়। তুমি অসংযত, সে জন্ত অপরের গোপন জিনিসে আপনা হতেই চোখ চলে যায়। তোমার পক্ষে কেবিনের বাইরে দাঁড়ানোই ভাল হবে।" আর্থার কেবিনের বাইরে গিয়ে একটা লগের উপর বসল এবং নিজের চোখ এবং মনকে ধিক্কার দিতে লাগল। উইলী খাবার খেয়ে আর্থারকে ডেকে একটি ডলার দিয়ে বলল "বিদায়।"

আর্থার ডলারটি নিয়ে মিষ্টারের হাতে দিল এবং বলল, "এই নেও ডলার, আমি আর কখনও উইলীর কেবিনে যাব না।"

মিষ্টার বললে, "নিশ্চয়ই তুমি কোনও অন্তায় করেছ?"

"হাঁ, অন্তায় করেছি নিশ্চয়ই, তাঁর দেওয়াল-পঞ্জীর দিকে তাকিয়েছিলাম. সে বলল, তাতে না কি গোপনীয় কথা লেখা রয়েছে। সাদা কাগজে গোপনীয় কথা লেখা রয়েছে এই প্রথম শুনলাম।"

মিষ্টার বলল, "তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, তার পর তুমি হবে মানুষ। বিপদ কাটিয়ে এসেছ, এখন মানুষ হবার চেষ্টা কর। আমি এখন কাজে যাচ্ছি, তুমি এই বইটা পড়ে ফেল। বিকালে এসে তোমার কাছ থেকে জানতে চাই, কি পড়েছ? রেঁস্তোরায় গিয়ে খাবার খেয়ো, তার পর এই বই।" বইটা দেখতে বেশ মোটা, আসলে মোটা নয়। এটা হল, প্রকাশকদের বজ্জাতি। তারা ছোট বইকে মোটা কাগজ দিয়ে ছাপায়, সে জন্ত দেখতে বেশ মোটা দেখায়।

মিষ্টার চলে গেল। আর্থার দরজা লাগিয়ে নিকটস্থ স্নানাগারে গেল। সাওয়ার-বাথের বন্দোবস্ত ছিল। দু'টি মাত্র স্নানাগার। একটিতে স্নান করতে পাঁচ সেণ্ট এবং অপরটিতে স্নান করতে এক ডলার দিতে হয়। আর্থার ভাবল, এক ডলারের স্নানাগারে গেলে বোধ হয় অনেক সুবিধা পাবে। কিন্তু এক ডলারের স্নানাগারে প্রবেশ করেই এক জন যুবতীকে দেখতে পেল। যুবতীর মুখে লাবণ্য ছিল না, শরীরে মাংস ছিল না। যুবতী সামান্ত কাপড়ে আবৃতা ছিল। তাকে দিগম্বরী বললে কোন দোষ হয় না। যুবতী আর্থারের কোট খুলে দিতে আসছিল, হেসে তাকে চুম্বন করতে চাইছিল. কিন্তু আর্থার আর সেই আর্থার ছিল না। সে ধীরে ধীরে রুম হতে বের হয়ে এসে ডলার ফেরত চাইল।

স্নানের ঘরের মালিক প্রথমে ডলার ফেরৎ দিতে আপত্তি করল, কিন্তু পরে যখন আর্থার নিজের রূপ ধারণ করল, তখন ডলার ফেরৎ দিল। ডলারটি ফেরৎ পেয়ে নিজের কেবিনে এসে চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে খেল এবং কেবিনে ফিরে এসে বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল। আর্থার ঘুম হতে উঠে স্নানাগারের স্ত্রীলোকটির কথা ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ সেই আধ-মরা মুখের করুণ হাসির কথা চিন্তা করল। যুবতীটা ভাল করে সওদা করতে পারে নাই বলেই তার আজ এই দুর্দশা। সে-ও যদি তারই মত টাকা জমাতে পারত তবে তাকে আজ এই ছোট্ট স্নানাগারে শরীর বিক্রয় করতে হ'ত না। যাক গে এ সব কথা, কিন্তু এ সব হতে কি রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই? এই যুবতী, এই আমি, সবই এক পথের পথিক। আমাদের মত হাজার হাজার যুবক যুবতী অসময়ে জীবন-যৌবন হারিয়েছে, তাদের কেউ রক্ষা করছে না। আমাদের মত লোককে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সৎপথে থেকে উপার্জনের পথ কেউ দেখিয়ে দিচ্ছে না। এ দেশের যুবক-যুবতী চোরা বালীর উপর দাঁড়িয়ে যতই চিৎকার করে বলছে, "রক্ষা কর," ততই চোরা বালি তাদের গ্রাস করছে। কি জানি, কি করে এই বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

বৃদ্ধ ঘরে আসা মাত্র আর্থার বৃদ্ধের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বলল, "বৃদ্ধ, আমি একা পাপী নই, বুঝতে পারছি, আমেরিকার প্রায় যুবক-যুবতীই আমার মত পাপী। এদের রক্ষা করার মত কি কোনও উপায় নেই?" তার পর স্নানাগারে যেয়ে যা দেখেছিল তাই বৃদ্ধকে অকপটে বলল।

বৃদ্ধ বললে, "আর্থার, তোমার মন বড়ই দুর্বল। তোমার মনটাকে এখন সবল করার চেষ্টা কর, বই পড়ে জ্ঞান অর্জন কর, তার পর সবই বুঝবে। এখন আমাকে হাত-মুখ ধুতে দাও, তার পর কিছু খেতে হবে, পেটটা যে একেবারে খালি, সে কথা কি ভুলে গেছ?"

আর্থার উঠে দাঁড়াল, তার পর বাইরে গিয়ে বসল।

[ক্রমশঃ

বৃহত্তর বঙ্গ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অতি-ভদ্রতার একটি দোষ হইতেছে, বিশ্ব-প্রেমের খাতিরে দেশ-প্রেমকে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে করা এবং পরার্থপরতার কথা ভাবিতে যাইয়া আপনার স্বার্থ ও ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে অনুপযুক্ত হইয়া পড়া। সত্ত্বগুণ একটি উৎকৃষ্ট গুণ হইলেও সত্ত্বগুণের প্রশান্তি ও ক্ষমা জিনিষটি যদি আলস্য, ভীরুতা ও শক্তিহীনতা জনিত যুদ্ধ-বিমুখতা হয়, তাহা হইলে সেই সত্ত্ব ভাবটি তমোগুণেরই ছদ্মবেশ বলিয়া জানিতে হইবে।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে এই তমোগুণের প্রভাব আসিয়াছে। আমরা অতি-সভ্য, অতি-ভদ্র, অতি-ভালমানুষ হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, সকলকেই আমরা ভালবাসিয়া ঘরে স্থান দিতে শিখিয়াছি এবং তাহাদের তরফ হইতে যখন আঘাত আসিয়াছে, তখন আমাদের তরফ হইতে অবস্থা হইয়াছে "মারিতে আসিলে মরিতে স্বীকার ধরিব না তবু অস্ত্র।" অথচ সেই সময় যদি কেহ অগ্রণী হইয়া আমাদের ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করে, তখন আমরা অতি-বুদ্ধির প্রেরণায় সকলেই তর্ক আরম্ভ করিয়া দিই এবং বাহার জন মানুষের মধ্যে তিপ্পান্ন জন নেতা উপস্থাপিত করিয়া দলাদলি করি।

আজ যদি সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট বাংলাকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য আলোচনা উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই তাহাতে বাধা দিয়া হিন্দীর হইয়াই ওকালতি আরম্ভ করেন এবং বাংলার সংলগ্ন বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে যদি বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা তোলা হয়, তাহা হইলে অনেকেই সেই দাবীটিকে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার অপবাদ দিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, আমরা যদি আমাদের নিজেদের দাবী নিজেরাই না জানাই, তাহা হইলে অপরে কি সেই কাজ আমাদের হইয়া করিবে? আর তাহাও যদি করে তাহা হইলে অপরের সেই করুণার দান গ্রহণ করিয়া আমাদের কি হইবে? সেই উচ্ছিষ্ট অন্নে আমাদের জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, "এ কথা এখন তোলা হইতেছে কেন? আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার যুগে আমাদের কি এমন হারাইয়াছে, যাহার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে?"

হারাইয়াছে অনেক কিছুই এবং হারাইতে বসিয়াছিও অনেক কিছুই। আমাদের মাতৃভূমি আজ বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের প্রতিষ্ঠা আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাংলার বাহিরে আমরা আজ লাঞ্ছিত হইতেছি, ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ আমরা পরের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হইতেছি।

কংগ্রেস বহু দিন ধরিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাংলার তরফ হইতে যেই মাত্র ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব লইয়া বিহারের সিংভূম, মানভূম ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি লইয়া পশ্চিম-বঙ্গের পুনর্গঠনের প্রস্তাব উঠিল, অমনি বড়-বড় নেতারা মারমুখী হইয়া উঠিলেন। রামমনোহর লোহিয়া বলিলেন—"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীর কোনও যুক্তি নাই; অর্থ-নৈতিক ভৌগোলিক প্রভৃতি বিচারগুলিই হইতেছে প্রধান বিচার্য্য বিষয়।"

এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে—"এই যে অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার কথা বলা হইতেছে তাহার ন্যায্য অধিকারী কে? বিহারে সুখ-সুবিধাই কি বাঙ্গালীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠি হইবে?"

জগৎনারায়ণ লাল বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীরা যে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলার সহিত সংযুক্ত করিতে চাহিতেছে ইহার কোনও যুক্তি নাই, কারণ পশ্চিম-বঙ্গ ত এখন একটি হিন্দুপ্রধান রাজ্য হইয়া গিয়াছে, এখন আর বিহারের হিন্দুপ্রধান অংশগুলিকে বাংলায় টানিবার প্রয়োজন কি?" কিন্তু আমরা যে পাকিস্তানী সংগ্রামের জন্য বিহারের ঐ জেলাগুলি চাহিতেছি, এ কথা তিনি আবিষ্কার করিলেন কি করিয়া?

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ বলেন—"বাঙ্গালীরা যে বিহারের খানিকটা অংশ দাবী করিতেছে ইহা অত্যন্ত অন্যায়; বিনা সংগ্রামে আমরা এক ইঞ্চিও জমি ছাড়িব না।"

গান্ধীজী অবশ্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীদের উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। কারণ, গান্ধীজীর ভাষ্যকারেরা অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন" শব্দটার অর্থ হইতেছে নূতন প্রদেশ গঠন, (যেমন মারাঠা, তামিল, অন্ধ্র প্রভৃতি;)—পুরাতন প্রদেশ পুনর্গঠন নহে। বাঙ্গালীর জন্য যখন পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশ রহিয়াছে, তখন বাংলাকে আর পুনর্গঠনের প্রয়োজন নাই।" জহরলালজী বলিয়াছেন—"প্রদেশ গঠনের সময় ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ ছাড়াও অনেক কিছু বিবেচনা করিবার আছে।" আমরা ভয় করিতেছি, এই "অনেক কিছু বিবেচনা" করিতে যাইয়া বিহারীদের আব্দার, জগৎনারায়ণ হইতে জয়প্রকাশের যুক্তি প্রভৃতি সব কিছুই বিবেচনা করিবেন, এবং বাংলার ন্যায্য দাবীর কথাটি ভুলিয়া যাইবেন।

সেই জন্যই আমাদের দাবী করিবার প্রয়োজন হইয়াছে; অকুণ্ঠিত বিশ্বাসে, নির্ভীক কণ্ঠে সেই দাবী আমাদের জানাইতে হইবে।

একটা চলতি কথা আছে, "লাঠি যার জমি তার।" বাঙ্গালীদের আর যাহাই থাকুক উপস্থিত যে লাঠি তাহাদের নাই এ কথা বোধ হয় বিহারীরা জানেন এবং সেই জন্য জমির লড়াই আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা জামসেদপুরে লাঠির আশ্রয় লইয়াছেন।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, লাঠির জোর ছাড়া আরও একটা বড় জোর আছে, সেটা হইতেছে নৈতিক অধিকারের জোর। ইহাকে না মানিলে সভ্য সমাজের কোনও অর্থই হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই নৈতিক অধিকারের ভিত্তি কি? এই নৈতিক অধিকারের ভিত্তি হইতেছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবীতে আজ ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্তান বিভক্ত হইয়া যাইল, পাকিস্তান হইতে আবার পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব পৃথক্ হইয়া গেল, আর সেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির দাবী লইয়া যদি মানভূমের ১৮১০৮১০ লোকের মধ্য হইতে ১২২২৬৮১ জন বাঙ্গালী, সিংভূমের ১২১৮০২ জন লোকের মধ্যে ১৪৭৫১৭ জন বাঙ্গালী (এখানে বিহারীর সংখ্যা মাত্র ৮৩০৪৭ এবং বাকী সকলে আদিবাসী) এবং ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণার একটা বৃহৎ অংশস্থিত বাঙ্গালীরা যদি তাহাদের মাতৃভূমির সহিত সংযুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইবে?

রাজনৈতিক কারণে একটা দেশ বা প্রদেশের মানচিত্রের রূপ বার বার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কণিষ্কের সময় ভারত সাম্রাজ্যের মানচিত্র যাহা ছিল, সমুদ্রগুপ্তের সময় তাহা ছিল না; আবার অশোকের ভারতবর্ষের সহিত হর্ষবর্দ্ধনের ভারত সাম্রাজ্যের সীমারেখারও কোনও মিল ছিল না। সেইরূপ বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমানা কখনও বা দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ—বঙ্গদ্বার) পর্য্যন্ত, কখনও বা কাশী পর্য্যন্ত, কখনও আরও দূরে গিয়াছে। বাঙ্গালী আজ সে বাংলাকে দাবী করিতেছে না। তবে যেটুকু অঞ্চলের লোককে তাহারা বাঙ্গালী বলিয়াই জান, যে অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত বাঙ্গালীদের ভাষাগত, কৃষ্টিগত, আচার-বিচারগত সামঞ্জস্য সত্য সত্যই বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলটুকুকে বাঙ্গালী তাহার মাতৃভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে চাহিতেছে। ইংরেজের কূটনীতির প্রভাবে তাহাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যে পৃথগন্নের ব্যবস্থা হইয়াছিল, বাড়ীর উঠানের মধ্য দিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে পাঁচিল উঠিয়াছিল, আজ সে ব্যবস্থাকে তাহারা বাতিল করিতে চায়। ইহা কি অন্যায়?

এক দিন বাংলার যুযুৎসু মনোবৃত্তিকে শক্তিহীন করিবার জন্য ইংরেজ বঙ্গভঙ্গের আয়োজন করিয়াছিল। সেই দিন বাংলায় যে জাগরণ দেখা দিয়াছিল, সেই দিন বাঙ্গালী যে ত্যাগের, যে সংহতির, যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহাই ভারতকে নূতন করিয়া জাতীয়তার প্রেরণা দিয়াছে।

জাগ্রত গণদেবতার শুষ্কারিত আস্ফালন দেখিয়া ইংরেজ ভীত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গভঙ্গের "settled fact"কে "unsettled" করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কূট চক্রান্ত বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাংলার যে ক্ষতি করিতে চাহিয়াছিল ভঙ্গ বঙ্গ জোড়া দিয়াও তাহারা সেই ক্ষতিটুকুই অন্য ভাবে করিয়াছিল এবং সেই ক্ষতির ব্যাপকতা আরও সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া ভগ্ন বঙ্গকে জোড়া দিয়া এবং বাংলা হইতে পাঁচটি জেলা বিহারকে এবং কয়েকটি জেলা আসামকে দান করিয়া, আর কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ইংরেজ এক ঢিলে অনেক পাখী মারিয়াছিল। এই চালের ফলে (১) পাঁচটি হিন্দুপ্রধান জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সমগ্র নবগঠিত বাংলাকে একটি মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করা হইল। (বলা বাহুল্য, ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানগণ ইংরেজের "সুয়া রাণী" হইয়াছিলেন) (২) ইহার ফলে যুযুৎসু ভাবাপন্ন হিন্দু বাঙ্গালীদের অনেকখানি অংশ বিহারে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের সংহতি ও আক্রমণ-শক্তি নষ্ট করা হইল এবং (৩) ইহারই ফলে বিহার ও আসামকে জমি দান করিয়া এবং দিল্লী অঞ্চলের লোককে ভারতের রাজধানী দান করিয়া চাকরি-বাকরির সুবিধা দিয়া এক দিক দিয়া যেমন বাঙ্গালীকে ছোট করা হইল, অন্য দিক দিয়া তেমনি অবাঙ্গালীদের সন্তুষ্ট করিয়া বাঙ্গালী-পীড়নের বিরুদ্ধে অবাঙ্গালীদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সার্থকতার আনন্দে ইংরেজের এই শঠতা আমরা সে দিন বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর ইংরেজের ভেদনীতির হীনস চক্রান্তে এবং মুসলিম লীগের দশ বৎসরের শাসনের কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতায় তিক্ত—বিক্ষুব্ধ হইয়া আমরা এত সাধের সম্মিলিত বঙ্গকে পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছি এবং সেই আন্দোলন সার্থকও করিয়াছি। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে আত্মরক্ষার জন্য অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবার যে নীতি আছে, সেই নীতি অনুসারেই আমরা আমাদের বঙ্গদেশকে পুনরায় বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশ শুধু দ্বিধা-বিভক্তই হয় নাই, ইহা বিভক্ত হইয়াছে চারিটি ভাগে। পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গ ছাড়া ইহার একটি অংশ পড়িয়া গিয়াছে বিহারে, আর একটি অংশ পড়িয়াছে আসামে।

আজ একটি বৃহৎ জাতি এই ভাবে রাজনৈতিক হীন চক্রান্তে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যে জাতির মাতৃভাষা ভারতের মধ্যে গরিষ্ঠতম সংখ্যক লোক মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে, সেই সাড়ে ছয় কোটি বাঙ্গালী আজ ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া ঘরে-বাহিরে মার খাইতেছে। আসামের "বাঙ্গাল খেদা, উড়িষ্যায় বাঙ্গালীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ, তাহার নিজের দেশে অবাঙ্গালী ধনিকের শোষণ ও অবাঙ্গালী শ্রমিকের প্রতিযোগিতা এবং "ঘটি" "বাঙ্গালের" রেষারেষি—এই অবস্থা যদি বেশী দিন থাকে তাহা হইলে আমরা দাঁড়াইব কোথা?

এই অবস্থার প্রতিকার চাই এবং সেই প্রতিকারের জন্য আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে।

এই সংগ্রামের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে "প্রোপাগাণ্ডা।"—আমাদের জানাইতে হইবে কেন সংগ্রাম করিতেছি, কিসের জন্য সংগ্রাম করিতেছি, এবং এই সংগ্রাম করিবার জন্য নীতিগত অধিকার আমাদের কতটুকু।

ইহার জন্য বোধ হয় প্রথম কার্য্য হইতেছে, বাংলা-ভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গের সমগ্র ভূভাগকে একসঙ্গে দেখাইবার জন্য একটি মানচিত্রের ব্যবস্থা করা। এই মানচিত্র দেখিয়া সমস্ত বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে—"এই আমাদের বাংলা দেশ, আমাদের জন্মগত অধিকারের এতটা অংশ হইতে আজ আমরা রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত হইয়াছি।" কিন্তু এই বঞ্চনা আমরা যদি সহ্য না করি, তাহা হইলে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের সাড়ে ছয় কোটি বাঙ্গালী করিতে না পারে কি? ভারত ইউনিয়নের মধ্যে তাহারা যদি থাকিতে চায়, তাহা হইলে ভারতের রাজনীতি পরিচালনার সিংহের অংশটা তাহারাই পাইবে, আর যদি ভারত ইউনিয়নের মধ্যে তাহারা না-ও থাকে, তাহা হইলেও তাহারা ফরাসী, জার্ম্মাণী, জাপানী প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা খুব ছোট জাতি হইবে না।

বৃহত্তর বাংলার মানচিত্রটি দেশের প্রত্যেক স্কুল, কলেজ শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠানে, পার্কে, বাজারে, রেলওয়ে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত; প্রত্যেক সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে রঙিন slidএর সাহায্যে তাহা দেখান উচিত। খবরের কাগজের মারফৎ, স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের মারফৎ, (ভূগোল, এ্যাটলাস, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় পুস্তকে) এই মানচিত্রের প্রচার হওয়া প্রয়োজন বাংলা দেশের মানচিত্র বলিতে যেন বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলটিকে দেখাইবার ব্যবস্থা থাকে। রাজনৈতিক কারণে সেই বৃহত্তর বঙ্গের যে অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই পশ্চিম-বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, বিহার এবং আসাম প্রদেশস্থিত বঙ্গগুলিকে

দারভাঙ্গা
পূর্ণিয়া
মুঙ্গের
হাজারিবাগ
পালমৌ
রাঁচি
সিংভূম
ময়ূরভঞ্জ
বালেশ্বর
সাঁওতাল পরগনা
গোয়ালপাড়া
গারো
খাসিওজয়ন্তিয়া
সিলেট
মনিপুর
লুসাইপর্ব্বত
নাগাপর্ব্বত
ব ঙ্গো প সা গ র

বিভিন্ন রং-এর সাহায্যে দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিলেই কিছু অসুবিধা থাকিবে না।

ইতিহাসে শুনিতে পাওয়া যায়, এক জন পারসীক সম্রাট্ গ্রীক্ দেশের প্রতি তাঁহার যুযুৎসা জাগ্রত রাখিবার জন্য এক জন ভৃত্যকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার ভোজনের সময় সে বলিবে, —"মহারাজ, গ্রীকদের স্মরণ রাখিবেন।" আমাদের পরিকল্পিত বৃহত্তর বঙ্গের মানচিত্রটিও যদি প্রতিনিয়ত আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় —'ইহাই আমাদের মাতৃভূমির স্বরূপ,' তাহা হইলে সেই মাতৃভূমির পূর্ণ অধিকারের জন্য আমরা প্রেরণা পাইব। অবশ্য এ যুদ্ধের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন নাই, আইন-সঙ্গত নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই এ যুদ্ধে জয়লাভ হইতে পারে যদি ইহার জন্য শক্তিশালী গণমতের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

প্রাদেশিকতার অজুহাতে হয়ত অনেকে এই বৃহত্তর বঙ্গের পরিকল্পনাটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন এবং ইহার বিরোধিতাও করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, লর্ড কার্জন বাংলার প্রতি যে অবিচার করিয়া গিয়াছিলেন, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ সেই অবিচারেরই পুনরভিনয় করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার রোয়েদাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধকে অসন্তোষের মধ্য দিয়া জিয়াইয়া রাখা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনায় অস্থায়ি ভাবে বাংলার যে বিভাগ হইয়াছিল, তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল মাত্র ৩৩৭৬ বর্গ-মাইল অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাপ্য শতকরা ৪৬ ভাগেরও কম। সীমানা কমিশনের ফলে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছে তাহা অপেক্ষাও কম, আমরা পাইয়াছি বাংলার মোট আয়তনের শতকরা ৩৩ ভাগ মাত্র!

এই রোয়েদাদে উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং-এর সহিত পশ্চিম-বঙ্গের কোনও সংযোগ-ব্যবস্থা রাখা হয় নাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ কূটনৈতিক চালে বাংলার প্রতি শেষ অবিচার হইয়াছে, তাহার খানিকটা প্রতিকার হইতে পারে যদি বাংলার সহিত সংলগ্ন বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুরের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল ও পূর্ণিয়া জেলাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমস্ত বাঙ্গালী যদি আজ 'ভাই-ভাই এক-ঠাঁই' থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জোর করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ রাখিবার ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় গণতন্ত্রের আদর্শও রক্ষিত হয় না, দেশের কল্যাণও হয় না।

ভারতের নিরাপত্তার দিক্ দিয়াও মানভূম প্রভৃতিকে বাংলার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার একটা সার্থকতা আছে। বাংলা হইতেছে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত, ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে না পারিলে ভারতের নিরাপত্তা ব্যাহত হইবে।

অবশ্য আমাদের পরিকল্পিত বৃহত্তর বাংলা গঠনের স্বপ্ন শুধু পশ্চিম-বঙ্গকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেই সফল হইবে না। যে দিন বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ধর্ম্মান্ধতার গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ববোধকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিবেন, সেই দিনই আমাদের বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের স্বপ্ন পূর্ণ ভাবে সফল হইবে,—তখন আর বাংলাকে উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও থাকিবে না।

'জয় হিন্দ.'

মানুষ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আকাশে উড়েছে ফানুস
বিহ্বল হয়ে চেয়ে রই আমি
পাড়ার লোকের কাছে শুনে জানি
উড়িয়েছে ওটা মানুষ।
ঠাকুমা-দিদিমা বলে :
আকাশ-প্রদীপ ওটা হ'বে বুঝি!
চির-অবাধ্য আমি জানি ওটা
অন্য কারণে জ্বলে।
আকাশেতে তার পর
দৃষ্টি আমার এমনি ফেরাই—
ফানুস কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে
কোথায় বেঁধেছে ঘর!
আকাশে মিলাল ফানুস
সহসা দেখেছি সেই আকাশেই
অজানিত কোন্ জিজ্ঞাসা নিয়ে

প্রাচীন বাংলার কথক

রবীন চৌধুরী

১

অতি কঠিন পাহাড়ের বুক হ'তে যে ঝরণা-ধারা নামে, বহু দেশ পার হলে এক দিন তার মোহনায় লাগে বহুর-বাঁধা জাহাজের মাস্তুলের ভীড়। তার আগে অতি মন্থরগতিতে বিরল-বৃক্ষ-বন দিয়ে তাকে কাটতে হয় পথ। সে পথের ধারে চরা করে দু'-চারটি হরিণ, সে ঝরণার কাচের মত জলে খেলা করে দু'-এক ঝাঁক মাছ, পাহাড়তলার অতি নির্জনে এমনি করে গড়ে ওঠে আগামী দিনের মহানদী।

ন'শো পঞ্চাশে মাগধী অপভ্রংশের জটা হতে জন্ম হল যে বাংলা-ভাষার, বারশো অবধি আড়াইশো বছরের শৈশবটাও তার কাটল এমনি নির্জনে। বৃষ্টি-থামা মেঘের মত আজ তার রূপের অন্ত নেই, কিন্তু সেদিন তার দিনের চাঁদের মত রূপ বঙ্গ-কবিকুলকে ভোলাতে পারল না। সন্ধ্যাকর হতে জয়দেব পর্য্যন্ত সংস্কৃত কবিদল এ অগভীর স্রোতস্বিনীতে কাব্য-তরণী ভাসাতে সাহস পেলেন না; শ্রীধর, পুরুষোত্তম, ভবদেব ভট্ট বৈতরণীর মত সযত্নে পরিহার করলেন তাকে। শ্রীধর দাসের সম্পাদনায় যে কবিতা-সঙ্কলন বেরুল তের শতকে, চৌরঙ্গীপাড়ার সেই সদুক্তি কর্ণামৃতে স্থান হল না একটিও বাংলা রচনার। মাগধী অপভ্রংশের ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ের শৈশবটা কাটল পথে-প্রান্তরে অভিজাত সমাজের অবহেলায়।

প্রাচীন বাংলার কথক আর শ্রোতা দুই জনসাধারণ—চিরদিনই যারা লাঙল ধরে এল, কলম ধরল না। তবু সেই অনভিজাত সমষ্টি-মনের ভাব আর ভাবনা দিয়ে গড়ে উঠেছিল আমাদের সাহিত্য, তাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ধর্ম্মবোধ, পাপবুদ্ধি নিয়ে তৈরী হয়েছিল তার ভিত্তিটা।

২

দুষ্মন্ত যেদিন লতা-মণ্ডপে শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, সেদিন তাঁর নিজেকে মণ্ডপের কাষ্ঠদণ্ড ও শকুন্তলাকে তার লতা মনে হওয়া বিচিত্র নয়। পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন সাহিত্যের পাঠকও ভাবতে পারেন, যে যুগের ধর্ম্ম ও সাহিত্য যেন শিব ও শিবের জটা, সহকার ও আলোক-লতার মত দু'জনে দু'জনকে আলিঙ্গন করে রয়েছে।

এর কারণটা সোজা। যে বাঁচাটা আজকে সমস্যাই নয় সেদিন সেই বাঁচার প্রশ্নই ছিল সব প্রশ্ন, সব চিন্তাই ছিল ঐ এক চিন্তা। প্রকৃতির মুখে আজ আমরা লাগাম কর্যেছি, কিন্তু অসহায় মানুষের দল উড়োকলে সেদিন আকাশ জয় ক'রতে পারেনি। সাত সাগরের দেশে যেতে পারেনি জাহাজ ভাসিয়ে, রাতকে দিন করতে পারেনি লক্ষ বাতির বিদ্যুৎ জ্বেলে। প্রকৃতি আজ আমাদের ক্রীতদাসী, কিন্তু সেদিন তারা প্রকৃতির ক্রীতদাস।

আর স্বামীর ভেলায় ভাসতে ভাসতে বেহুলা যখন দেখল, নেতা ধোপানী পাটাতনে আছড়ে মারছে ছেলেকে, তার পর ভাঁই-করা স্বর্গের কাপড়-কাচা শেষ হলে বাঁচিয়ে তুলছে তাকে, অর্থাৎ তার হাতে আছে জীবন-মরণ কাঠি, অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে করতে আদি-মানুষেরাও দেখল তার স্বেচ্ছাচারী প্রভুর মুখ বিমাতার মত কঠিন, আবার মায়ের মত প্রসন্ন হাস্যে ঝলমল করে উঠছে। দিগন্ত নীল সমুদ্রতীরের ভয় হরিণের ম ত তাই তাদের চিত্ত জুড়ে জাগল তীব্র ভয় অসহ্য বিস্ময়।

এই ভয়-বিস্ময় হতে জন্ম হল মানুষের ধর্ম্মের। তার রুদ্র মূর্ত্তিকে সোমরস পান করিয়ে চলল শান্ত করবার চেষ্টা আর তার লক্ষ্মীশ্রীর জনতা করল বন্দনা হাজার কণ্ঠের গভীর আনন্দ মিলিয়ে। ঋগ্বেদের মত প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃতির এই দু'টি রূপ। ঝড়-দেবতা, অগ্নি-দেবতা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির দেবতা: প্রমুখ দেবমণ্ডলীর স্তুতি, তাঁদের প্রসাদ-ভিক্ষার জন্য যাগ-যজ্ঞ-হোমাদির আয়োজন—আর যে প্রকৃতি উষা হয়ে সূর্য্য-টিপ পরে নেমে এল পৃথিবীতে, জ্যোৎস্না হয়ে অন্ধকার করল দূর, তার প্রসন্ন অভ্যর্থনা। প্রকৃতির তেত্রিশ কোটি প্রত্যঙ্গ হতে এই ভাবে প্রাচীন মানুষ গড়ে তুলল তেত্রিশ কোটি দেবতার pantheon. পাথরের জন্তু-জানোয়ার মত আজ তাকে guide মনে হতে পারে, কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মের এই-ই আদি ইতিহাস।

সেদিন শুধু মাত্র বাঁচবার তাগিদে দিনের চব্বিশ ঘণ্টা কেটেছিল পূজার্চ্চনায়, যাগ-যজ্ঞে, নৃত্য-গীতের ধর্ম্মোৎসবে। সব ভাব আর ভাবনা অবসিত হয়েছিল এই এক সমুদ্রে। এই ছিল সেদিনের জীবন, সুতরাং এই হল সেকালের কাব্য-কথা। চীন, জাপান, গ্রীস, ভারতবর্ষ; সব দেশেরই আদি সাহিত্য তাই ধর্ম্মমুখী।

আর বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের পাঠকেরা শুনে বিস্মিত হবেন যে, সে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ নেই। সূর্য্যালোকে সাত রঙের মত সাত মন মিলেছে তাতে, কিন্তু বুঝবার জো নেই। আজকের সাঁওতালী নাচে, বাগদী-বাউরী সম্প্রদায়ের উৎসব গীতে যে collective emotionএর প্রকাশ দেখি, ঐ সাহিত্যেও রয়েছে সেই একই জিনিষ।

এ-কথা নিয়ে এত ঘটা করার উদ্দেশ্য, আমাদের প্রাচীন রচনার স্বরূপটা বোঝানো। সেখানেও ঐ একই ব্যাপার। শিব, চণ্ডী, মনসা নিয়ে তাদের শিবায়ন, মনসার ভাসান, শ্রীমঙ্গল পাল, সেন আমলের আরও কত না অনার্য্য দেবতা নিয়ে আরও কত মঙ্গলকাব্য, কিন্তু তার সব আমরা পাই নি। প্রস্তর-দেবতার মত অনেকেই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে।

*   *   *   *

রামায়ণ, মহাভারত অথবা ইলিয়াড, ওডিসির মতন আমাদের ঐ মঙ্গলকাব্যগুলিকেও মালার সঙ্গে তুলনা করা চলে। যে হীরা মালিনী মালা গাঁথত রাজবাড়ীর জন্য, তাকে কিন্তু ফুল তুলতে হত মালঞ্চ হতে। যে মহাকবিরা আমাদের দিয়ে গেছেন এ সব কাব্য তাঁদেরও চয়ন করতে হয়েছে অসংখ্য ছড়া নিজ নিজ সমাজ হতে। রামায়ণের পাঠকেরা হয়ত জানেন না, বাল্মীকির জন্মের আগেই রাম-রাবণের কাহিনী নিয়ে কত আখ্যান, গাথা উত্তর আর দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে ছিল। রাঢ় দেশেও আজ ভাজকে নিয়ে কত ছড়া কাটছে ছোট ছোট মেয়েরা। ভাদ্রের পল্লীতে সে এক সমারোহ যাঁদের ক্ষমতা ও ইচ্ছা আছে, এই জমিদার-কন্যার করুণ কাহিনী থেকে তাঁরা একখানি ভাজ-মঙ্গল লিখতে পারেন।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি গাঁথা হয়নি এ যুগে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যকালে বা কৈশোরে তাদের কাব্য সম্বন্ধ রূপ দেওয়া হয়েছে এ কথা শুনে আপনারা যেন হতাশ হবেন না। কারণ যদিও তা হয়েছে, তবুও ন'শো পঞ্চাশ হতে বারশো পর্য্যন্ত আড়াইশো বছরে আদি-যুগেই তাদের ছড়াগুলির সৃষ্টি করেছে জনসাধারণ। আর কাব্যরূপ পাবার সময় যদিও তাদের না-আর্য্য প্রকৃতিকে আর্য

করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেই অস্পৃশ্য রচনাকে করা হয়েছে হিন্দু-গ্রন্থাগারের উপযুক্ত—তবুও সেই সহরে সংস্করণের মধ্যে পুরোনো বাংলার ছবির মত তাদের যথার্থ জনক প্রাচীন বাংলার সেই জনসাধারণের না-আর্য্য রূপটিও উঁকি মারছে।

বাংলা দেশের এ মঙ্গলকাব্যগুলি যত না ধারে, তত ভারে কাটে। তাদের রচনাও হয়েছে যেমন ঝুড়ি-ঝুড়ি, হারিয়েছেও তেমনি ঝুড়ি-ঝুড়ি। সংখ্যাধিক্যে তবুও তারা অগণ্য হয়ে উঠেছে। আর সে বেণুবনে অন্ধ না হয়ে আপনারা এক শ্রেণীর একখানা করে কাব্য পাঠ করবেন। যেমন ধরুন, মনসার ভাসান বা মনসামঙ্গল পড়তে হলে বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব অথবা বংশীদাস—এক জনের রচনাতেই চলবে। চণ্ডীমঙ্গলের জন্য মুকুন্দরাম, ধর্ম্মমঙ্গলের জন্য ঘনরাম চক্রবর্ত্তীই যথেষ্ট। এতে যেমন আবর্জ্জনা ঘাঁটার বিরক্তি হতে বাঁচবেন, তেমনি যথার্থ সাহিত্য-পাঠের বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করবেন।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন এবং ময়নামতীর গান, ধর্ম্মমুখী এ দু'টি কাব্য নাথদের। শিব-উপাসক এ সম্প্রদায়ের মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা, হাড়িপা—এই চারি আদি-সিদ্ধার মাহাত্ম্য নিয়ে বহু কাহিনী চলিত রয়েছে প্রাচীন কাল থেকে। গোরক্ষবিজয়ে গৌরীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধার এবং ময়নামতীর গানে ময়নামতী হাড়িপা-গোবিন্দ বা গোপীচন্দ্র সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যে সন্ন্যাস সাত-ঘাটের জল খাইয়ে গোপীচন্দ্রকে করেছে নাকাল, সোণার কাঠির স্পর্শ দিয়ে ময়নামতীর গানকে সেই করেছে সাহিত্যে উন্নীত।

এ দু'টি শৈব-নাথ সাহিত্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সঙ্কলনে লাগবে। অবশ্য তাতে "কার পখরির (পুকুরের) পানি কেহ নাহি খাএ। মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখাএ।" (কবি ভুল্লীর গোরক্ষবিজয়) কিংবা "সোণার ভাটা দিয়া রাইজরের ছাওয়াল খেলায়" (ময়নামতীর গান)—রামরাজ্যেও অসম্ভব এমনতর কল্পনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবং প্রচার-পন্থী হলেও এদের 'পঠন-পাঠন' ভস্মে-ঘি-ঢালা হবে না। আদি যুগ বা প্রাচীন যুগে এদের চড়ারূপ ছিল কি না বলা শক্ত। দীনেশ বাবু ও গ্রীয়ারসন সাহেব মনে করেন, গোরক্ষনাথ একাদশের কিন্তু ভাণ্ডারকর বিশ্বাস করেন, দ্বাদশ শতাব্দীর বলে। সুতরাং তাদের আদি বা মধ্য যে যুগেরই সাহিত্য বলুন না কেন, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তাতে।

৩

উৎপত্তি হতে মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত নদীর গতিবিধি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, নৌকোয় ভাসতে ভাসতে নিশ্চয়ই তাঁরা দেখেছেন যে, ক্ষীণ একটা ধারা ঘুরঘুটি অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে বনের লতা-পাতার দেশ ছেড়ে বিচিত্র জনপদের গাছতলা, পুকুর-পাড়, শিব-মন্দির পার হয়ে কি ভাবে সাগর-জলে হারিয়ে গেল এক দিন। এক মুখে তার সবুজ-পাড় তীরে গরু চরছে, হাঁটু-জলে ঠেলে নৌকো পারাপার চলছে, খেয়াঘাটে হাটুরেরা যে রান্না চড়িয়েছে তারি ধোঁয়ায় অশ্বত্থের মাথাটা শ্রাবণ মাসের তালবনের মত অন্ধকার হয়ে উঠলো—আর এক মুখে জেগেছে সমুদ্রের বাদ, পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ তুলে বিভ্রান্ত মালবিকা ছুটেছে অগ্নিমিত্রের অভিসারে।

বস্তুতঃ তার দু'টো বাঁকেও যেমন মিল নেই, সময়ের দু'টো মুখেও তেমনি গরমিল। তাই দেখি, পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাচীন সাহিত্য আর আমাদের ঐতিহাসিক কালের প্রাচীন (আসলে আধুনিক) সাহিত্য দু'টো মহুয়া গাছের মত ফুলে-ফলে লতা-পাতায় একেবারে এক হয়ে যেতে পারেনি।

দশম থেকে দ্বাদশের বঙ্গজনগণ প্রাচীন বাংলার কথক। তারা যদি হয় অর্দ্ধ-সভ্য, পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য-জনকেরা হবে পুরো অসভ্য। আর সেই আদিমদের জীবন একেবারে অনিশ্চিত, প্রকৃতির তারা একেবারে ক্রীতদাস, বাঁচবার সমস্যা তাদের একমাত্র সমস্যা—সুতরাং তাদের সাহিত্য হয়েছে পুরোপুরি ধর্ম্মকেন্দ্রিক। কিন্তু আমাদের আদি-কথকদের জন্ম পাল, বর্ম্মণ, সেন আমলের স্বর্ণযুগে, পাল ভাস্কর্য্যের গৌড়-মাগধী রীতি যখন নেপাল, তিব্বত, শ্যাম, ইন্দোচীনে ছড়িয়েছে, অজন্তা গুহার চিত্রে বাঙ্গালী রূপদক্ষ প্রতিভার ছাপ রেখে এসেছে, বাংলার বাহিনী গিয়ে চাল-ফরোয়ালে বাহুবলে সাম্রাজ্যের করেছে বিস্তার। তাই আমাদের সাহিত্যে ষষ্ঠী, মনসা, শিব, শিবানীর সঙ্গে এমন কতকগুলি কাহিনী রয়েছে যা লৌকিক, হৃষ্ট-তুষ্ট মানুষেরই কথা কয়ে বাচাল।

এ কথা সত্য যে, দেবরাজ্য থেকে দৃষ্টি একেবারে ফেরায়নি। সাপ, বাঘ, কুমীর, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল: এ সব উৎপাত হতে রেহাই পেতে তখনও চালাচ্ছিল তের পার্ব্বণ বার মাসে। প্রতি বর্ষায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তারা দিয়েছিল মনসা দেবীর পূজো, গোলাভরা ধান আর মাঠ আলো-করা ফসলের জন্যে হাত পেতেছিল শিবের দুয়োরে, মঙ্গল প্রার্থনায় করজোড়ে দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে, সন্তানের জন্যে 'শাকে ভর' দিয়েছিল ষষ্ঠীঠাকুরের আটচালায়। তবুও পাল, সেন সম্রাটদের রাজছত্রতলে জীবনে তাদের ছিল অনেকখানি নিশ্চিন্তি। আর এই নিশ্চিন্তি তাদের দিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মানুষের জগতে দৃষ্টিপাতের অবসর। তারা দেখতে পেয়েছিল সকালের ঠাণ্ডা রোদ্দুরে ছেলেরা ছুটে চলেছে প্রজাপতির পিছনে, কাক-চোখ জলে দাঁড়িয়ে বাসন ধুয়ে শানের ওপর তুলে রাখছে কিশোরী, সূর্য্য ঘুরে যেতে সকালের চাষ শেষ করে জোয়ান ছেলেরা ফিরছে মাঠ হতে—আর তারা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল জীবনের শ্রীতে। সম্মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনিতে সেদিন তাই তাদের আনন্দ উঠেছিল ছাপিয়ে, আর তারই ভগ্নাংশ উপছে পড়েছিল যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গানে, ডাক খনার বচনে, রূপকথার রচনে।

• • •

গাথাকৃতি এ সব সমাজমুখী রচনার মধ্যে পাল-রাজাদের উদ্দেশে লেখা যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গানগুলি লুপ্ত। সুতরাং আজ বুঝবার উপায় নেই সেদিন কি ভাবে তারা জানিয়েছিল সমষ্টি-মনের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা।

ডাক ও খনার বচনে তাদের প্রজ্ঞার প্রকাশ। এ প্রজ্ঞা চাষ-বাস, জ্যোতিষ, কুটীর-রচনা, বৃক্ষ-রোপণ নানা কথাকে আশ্রয় করেছিল। দিনের পর দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা যা দেখেছিল, তারই জ্ঞানটুকু আশীর্ব্বাদী রেখে গেছে ভাবী কালের বংশধরদের জন্যে। ডাক ও খনার বচন নদীর মত, তার স্রোতে এসে মিলেছে কত যুগের জ্ঞানধারা। তাই উৎপত্তি-মুখের শ্রীটুকু তার আজ সঠিক জানবার জো নেই।

তার পর রূপকথা। চিরকালের ঠাকুমা আর নাতি-নাতনী সংবাদ। গাঁয়ের জ্যোৎস্না পড়েছে পাঁচীরে। মিঠে হাওয়া কাঁটালের

পাতা ফেলছে মাটির উঠোনে। শান্ত বিড়াল থাবা পেতে বসে আছে মেয়েদের গা ঘেঁসে। ঠাকুমার আশে-পাশে নামছে রাজপুত্তুর, রাজকন্যে, তেপান্তরের মাঠ আর সরোবর, দৈত্যপুরী আর দেবমন্দির। মানুষের এই সব-সম্ভবের অসম্ভব সাহিত্যে, সব চাওয়ার সব-পেয়েছির দেশে এক হয়ে গেছে কথক আর শ্রোতা, বুড়ো-মন আর শিশু-মন।

অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিল রূপকথার। রূপকথা তাই মানুষের মত পুরোনো আর এই চির-নতুন মায়া-রাজ্য গড়ে মানুষ ভোলাল শিশুকে, নিজেকেও।

আমাদের আজকের রূপকথায় বিদেশী রাজপুত্তুর রয়েছে, কারণ বিদেশীরা এ দেশে এসেছে। তবু দেখতে হবে, কোন রাজকন্যার পুতুলটি একমেটে হয়েছে সে যুগে, কোন গল্পটির কাঠামো গড়ে উঠেছে সেকালে—বহর বেঁধে ডিঙ্গা যেত এখন বহিঃসমুদ্রে, মেয়েরা পূজা করতো ধাত্রা-কাত্রা-খুয়া-ভাদালি, এ সব অনার্য্য দেবতার। কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালার মত সব গল্পগুলো যদি সে যুগের হয়, তবে সেই অর্দ্ধ-আদিম রচকদের সমাজ ও মনের ছবি তাতে থাকবেই।

৪

আমাদের প্রাচীন বাংলা নিয়ে কেবলি অনুমান আর সংশয়, সংশয় আর অনুমান। তার দেবমণ্ডলী সম্বন্ধেও, তার সমাজ-জীবন সম্বন্ধেও; সুতরাং ধর্মমুখী, সমাজমুখী দুই ধরণের সাহিত্য ব্যাপারেও। কিন্তু নিঃসংশয় যাঁরা হতে চান, অনুমান অপছন্দ করেন, চর্য্যাগুলি পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। দশম থেকে দ্বাদশের মধ্যে লেখা বৌদ্ধ সহজিয়াদের লেখা এই গানগুলি অবিকৃত ভাবেই আমরা পেয়েছি। নেপাল দরবারের পুঁথিশালা হতে পদগুলির আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের এক অক্ষয় কীর্তি।

কিন্তু সেকালের ভাষার অবিকৃত সাহিত্যিক নিদর্শন হলেও চর্য্যাগুলি সাহিত্য নয়। তাদের রচকেরা চেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে—কাব্যের ছিটে-ফোঁটা দিয়ে বক্তব্যকে তাই সরস করা হয়েছে এখানে।

সাড়ে বেয়াল্লিশটি চর্য্যায় সেদিনের নবজাত বাংলার রূপ আছে। 'নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহারি কুড়িআ' (ওরে ডোমনী, নগরের বাইরে তোর কুঁড়ে।) প্রভৃতি পদে জাতিভেদ-বিভাজিত সে বঙ্গ-সমাজের ছবিও তাতে আছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তবুও চর্য্যাগুলি সাহিত্য নয়। ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের হৃদয় হতে ঝরণার মত উপছে তারা পড়েনি। শ্রোতার মনে রসলোক সৃষ্টি করে তোলা তাদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য, পাঠককে বৌদ্ধ করে তোলা। এবং এ প্রচার সে সাধুরা অবহিত হয়েই করেছেন।

সে যুগে গদ্য থাকলে চর্য্যাগুলি গদ্যে লেখা হত। তাতেই তারা মানাত। আর চর্য্যাপদ সাহিত্য না হয়ে প্রমাণ করছে প্রাচীন বাংলার কথক কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, কোন সম্প্রদায়ও নয়।

জ্ঞানদান উদ্দেশ্য হলে অঙ্ক-বিজ্ঞানকেও সাহিত্য পর্য্যায়ে ফেলতে হয়। তাতে যেমন রাজী নই, ডাক ও খনার বচনকেও তেমনি সাহিত্য বলছি না। কিন্তু তাকী বচনার সাহিত্য-মূল্য অস্বীকার করবে কি করে? তাদের জন্ম যে জনসাধারণের হৃদয় হতে, গঙ্গার জন্ম যেমন গোমুখী হতে। কাব্যমূল্য তাদের সামান্য হতে পারে, কিন্তু সামান্য কাব্যমূল্যও তাদের আছে।

• • • •

সন্ধ্যাকর নন্দী হতে জয়দেব পর্য্যন্ত সেদিনের অভিজাত কবিদল ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন সংস্কৃত রাজকন্যার পাণিগ্রহণ লক্ষ্য করে। অত্যন্ত নিকটের বঙ্গকুমারীকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাবার কথাটা দূরপ্রসারী তাঁদের লক্ষ্য হতে এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনের এই নবজাতক যে জনগণের অঙ্গনে গিয়ে উঠলো, সেই প্রাকৃত জনেরা একে ভোলেনি। অপটু তাদের হস্ত, সম্পাদি তাই জাগেনি। কিন্তু অকৃত্রিম তাদের আগ্রহ—সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পাদির অঙ্কুর তাই জেগেছিল। নগর-রচনার ইতিহাসে বন কেটে গেল যারা, আজ নগরবাসীরা সেই কাঠুরেদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছে।
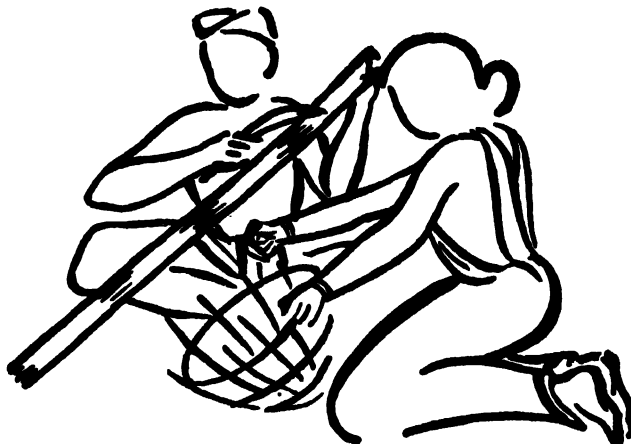
—রামকৃষ্ণ বসু

পুঞ্চের কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

পুঞ্চ মূলতঃ একটি নদের নাম। পুঞ্চ নদের নাম হইতে যে ক্ষুদ্র রাজ্যের বুকের উপর দিয়া নদটি বহিয়া গিয়াছে, উহা পুঞ্চ আখ্যায় অভিহিত। পুঞ্চকে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত একটি অর্দ্ধস্বাধীন ক্ষুদ্র উপরাজ্য বলা যায়। কোহালার নিকটে ঝেলাম উপত্যকার উপর দিয়া যে প্রসিদ্ধ পথটি আগাইয়া গিয়াছে উহার কিয়দংশ পুঞ্চ রাজ্যের ভিতর অবস্থিত। এই পথের এই অংশে যাইবার সময় পুঞ্চ রাজ্যের তরফ হইতে একপ্রকার শুল্ক প্রত্যেক পর্য্যটকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। রাজধানী পুঞ্চ শহরটির প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রীতিকর। একটি পরম মনোরম উপত্যকার শীর্ষদেশে নগরটি অবস্থিত। এই উপত্যকাটির পার্শ্বে প্রসারিত পর্ব্বতশ্রেণী তুষারশুভ্র শীর্ষ উত্তোলন করিয়া চক্রাকারে দাঁড়াইয়া রহিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছে। এই শৈলমালাকে পুঞ্চ-রাজ্যের একটি সীমানাও বলা যায়। জম্মু এবং রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগরের দিকে যে পথদ্বয় গিয়াছে, উহাদিগকে পুঞ্চ-রাজ্য হইতে এই পর্ব্বতগুলিই পৃথক্ করিতেছে।

ট্যাং গ্রোট হইতে পুঞ্চ শহর পর্য্যন্ত মোটর যাইবার পথ প্রস্তুত হইলেও যাঁহারা ভাল ভাবে ভ্রমণ করিতে চা'ন, তাঁহাদের পক্ষে মোটর অপেক্ষা টাট্টুতে চড়িয়া ভ্রমণ করাই উচিত। আমরা চাওমুখ পর্য্যন্ত মোটরে গিয়া তথা হইতে টাট্টুতে রওনা হইয়াছিলাম। টাট্টু-ঘোড়াগুলি অত্যন্ত দৃঢ়-দেহ এবং বন্ধুর পথের অত্যন্ত উপযোগী। কাশ্মীরের ন্যায় চড়াই ও উৎরাই-এর দেশে এই খর্ব্বকায় অশ্বতর জাতীয় জীবের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা কয়েকটি টাট্টু মীরপুরে ভাড়া করিয়াছিলাম। কতকগুলি আমাদের মালপত্রের জন্য, কতকগুলি আমাদিগকে বহনার্থ। অবশ্য মাল-পত্রের জন্য কুলীও করিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে এক প্রকার বস্ত্রাবাস ছিল। যেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে তথায় বস্ত্রাবাস বিস্তৃত করা হইত।

পথের দুই ধারে আরণ্য দাড়িম্ব ও বদরী বৃক্ষ সারি-সারি দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে গ্রামের পাশে শস্যক্ষেত্র। কাশ্মীরে বাঙ্গালার মত ধান্যই অধিক জন্মে এবং কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীদের মত ভাত খাইতেই ভালবাসে, এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিতে পারে। আমরা ঝেলাম নদের বক্ষে অগণিত ধান্য-বোঝাই নৌকা শ্রীনগরের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া যাইতে দেখিয়াছি। কাশ্মীরের সরকারী শস্য-ভাণ্ডারে প্রচুর ধান্য সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় এই ধান্য-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। কাশ্মীর তুষারশুভ্রশীর্ষ শৈলমালায় সমাবৃত বন্ধুর দেশ হইলেও এখানে অগণিত নদী-নালা ও জলাশয় থাকার জন্য সলিল সেচনের সুবিধা আছে বলিয়া স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্য বাঙ্গালার মতই অনুষ্ঠিত হয়। এই ভূস্বর্গ আখ্যায় বিখ্যাত দেশের আর একটি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য শৈলশ্রেণীর পাদদেশে এবং নদ-নদী ও হ্রদাবলীর পার্শ্বে প্রসারিত শষ্প-শ্যাম মনোরম ময়দান।

দুই দিকে স্বভাব-শোভার অফুরন্ত ভাণ্ডার, মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও ঊর্দ্ধে উত্থিত, কখনও নিম্নে অবতীর্ণ আমাদের অগ্রসর হইবার সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। সংবাদপত্রের সাহায্যে যাহা জানিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, এই দুর্গম পথেই আজ ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীর উপজাতিদের পশ্চাদ্ধাবনে রত রহিয়াছে। পুঞ্চ রাজ্যের বহু অংশ আক্রমণকারীরা অধিকার করিয়া লইয়াছিল বলিয়াও জানা যায়।

আমরা কোটলিতে কয়েকদিন ছিলাম। পুঞ্চ নদের কয়েক শত ফুট ঊর্দ্ধদেশে তৃণশ্যাম মালভূমির বক্ষে বিরাজমান কোটলি গ্রামখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই গণ্ডগ্রামখানিকে পুঞ্চ রাজ্যের শস্য-কেন্দ্র বলা চলে। চারি দিক্ হইতে ধান্যসমূহ এখানে আনীত হয়। নদী-স্রোতের সাহায্যে চালিত কলগুলির দ্বারা সেই ধান্যসমূহকে চাউলে পরিণত করা হয়। নদীগর্ভে সারি সারি প্রসারিত কলগুলি সম্পূর্ণ সাধাসিধা ও প্রাচীন ধরণের। ইষ্টক-নির্ম্মিত দালানে নয়, খড়ের ছাউনি-যুক্ত আটচালায় কলগুলি স্থাপিত আছে। নদীর প্রধান ধারা হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া যে স্রোতের সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে প্রস্তুত পেষণীযন্ত্রগুলিকে তাহারাই চালাইতেছে। এই চালাগুলি প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা-স্রোতে উৎপাটিত হয় বা ভাসিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় তথায় পুনরায় চালা নির্ম্মিত হয়, অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে ধানকল স্থাপিত হইয়া থাকে।

পুঞ্চ নদ চিরতুষারাবৃত হস্থ পীর পাঞ্জাল পর্ব্বতপুঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া ইহার জল সর্ব্বদাই তুষার-শীতল। চির-তুষার হইতে সদ্য সম্ভূত বলিয়াই বোধ হয় এক প্রকার সবুজ আভা এই নদী-নীরে দৃষ্ট হয়। যে জলে নামিলে জমিয়া যাইব বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় অসংখ্য মৎস্য তথায় সহর্ষে ক্রীড়া করিতেছে। বাঙ্গালা দেশের মাছকে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় মরিয়া যাইবে।

আমরা কোটলিকে গণ্ডগ্রাম বলিলেও এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাই শহর আখ্যায় অভিহিত হয়। এই সব পর্ব্বতবন্ধুর দুর্গম দেশে আমরা পঞ্জাব বা যুক্তপ্রদেশের ন্যায় জনসমৃদ্ধ শহরের আশা করিতে পারি না। আমরা কোটলির পর যে স্থানে বস্ত্রাবাস বিস্তৃত করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম তাহার নাম সেরাহ্, বা সেরা। কোটলির ন্যায় গুরুত্ব না থাকিলেও এই জায়গাটির বৈশিষ্ট্য—এখানে পুঞ্চ সরকারের শুল্ক আদায় করিবার কার্য্যালয় অবস্থিত রহিয়াছে। সেরার এক দিকে খাস কাশ্মীর রাজ্য, অন্য দিকে পুঞ্চ উপরাজ্য। কোটলিকে গ্রাম না বলিয়া নগর বলা যায়, কিন্তু সেরাকে গ্রাম ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। গ্রামের চারি দিকে পর্ব্বতপুঞ্জ ও অরণ্যানী। এই অরণ্যে কৃষ্ণকায় তিতির পাখী প্রচুর পরিমাণে আছে শুনিয়া প্রবীর বাবু বন্দুক হস্তে বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। এক দল লোকের আবির্ভাবে সহসা তাঁহার অগ্রগতি বাধা পাইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন এই অঞ্চলে রাজকীয় ও জাতীয়তাবাদী দলে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। পর্ব্বতবেষ্টিত পুঞ্চ অঞ্চল জাতীয় আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় সরকার হইতে কিঞ্চিৎ কঠোরতা অবলম্বন করা হইতেছিল। যে দলটি প্রবীর বাবুকে বন্দুক লইয়া আগাইতে বাধা দিল, তাহারা রাজকীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। দলপতি এক জন উকিল। তিনি প্রবীর বাবুকে জানাইলেন, বিদ্রোহী বা বিপ্লবী দলের কেহ আপনার বন্দুকটি কাড়িয়া লওয়া অসম্ভব নয়; অন্য দিকে রাজকীয় দল বিপ্লবী মনে করিয়া আপনার বন্দুক ছিনাইয়া লওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আপনারা যে বাঙ্গালী ভ্রমণকারী মাত্র, উত্তেজনার বশে সে কথা কাহারও তো না-ও মনে পড়িতে পারে।

এই সময় কিছু দূরের একটা কোলাহল কাণে গেল। রাজকীয় দলের দুই জন লোক আসিয়া উকিলটিকে জানাইল যে

আন্দোলনকারীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে সভা করিবার জন্য যাইতেছে। কথাটা শুনিয়া প্রবীর বাবু একটু দমিয়া গেলেন দলপতি উকিলটি বুদ্ধিমান। তিনি প্রবীর বাবুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, সহস্র সহস্র সৈন্য আমাদের দলের সঙ্গে আছে। ওদের দলে মিশিলে আপনার ভয়ের কারণ থাকিত। কারণ, আজ হোক্ কাল হোক্ আন্দোলনকারীদিগকে বন্দী করা হইবেই। রাজকীয় দলের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রবল রাজশক্তি, সুতরাং আপনার ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমি বলিয়া ফেলিলাম—প্রজাশক্তি কি রাজশক্তি অপেক্ষাও প্রবলতর নয়? উকিলটি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—প্রজাশক্তি বলিয়া কোন শক্তিই এখানে নাই। এখানকার জনসাধারণ আন্দোলনকারীদের কথা শুনিয়া না বুঝিয়া হুজুগে মাতিয়াছে। নিজেদের হিতাহিত সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। আমি বুঝাইলেও মাথা নাড়িবে, ওরা বুঝাইলেও মাথা নাড়িবে। আবার অন্য এক দল আসিয়া যদি অন্য কথা বুঝায় তাহা হইলে তাহাতেই সম্মতি দিবে। প্রজা রাজাকে কর দিবে, সেই করের বিনিময়ে রাজা প্রজাকে রক্ষা করিবেন, প্রজার হিত ও উন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই নিয়ম। রাজাকে না মানিয়া প্রজারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়াই কি প্রজাশক্তির বিকাশ? প্রজাশক্তির বিকাশ হইবে রাজাকে কেন্দ্র করিয়াই—রাজাকে অমান্য করিয়া নহে। এই বলিয়া উকিলটি মনুসংহিতা হইতে আপনার মতের সমর্থক কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন।

পরদিন আমরা সেরা হইতে পুঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কোটলি হইতে সেরা পর্য্যন্ত আসিতে আমরা যে নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম, সেরা হইতে পুঞ্চ পর্য্যন্ত প্রসারিত পথের উভয় পার্শ্বে তদপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যে আঁকা-বাঁকা উপত্যকার বুকে পথটি সুদক্ষ চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত আলেখ্যের মত দূর দিক্‌চক্রের দিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আগাইয়া গিয়াছে উহা কাশ্মীর সুলভ কমনীয় কান্তি (বিভিন্ন বর্ণাঢ্য) কুসুমকুলে শোভমান কুঞ্জকানন সমূহে পরিপূর্ণ। চলিতে চলিতে মনে হয়, যাহা দেখিতেছি তাহা কোন অদ্ভুতকর্ম্মা ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট মায়িক ব্যাপার নয় তো? পুষ্প-পাদপশ্রেণীর বক্ষে নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণশালী বিহঙ্গম বসিয়া রহিয়া উহাদের বৈচিত্র্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। পক্ষীগুলিকে বড় বড় পুষ্প বলিয়া মনে হইতেছিল। শুধু ফুলের নয়, ফলের গাছও অগণিত দেখা যাইতেছিল। এই ফলের গাছগুলির অধিকাংশই রোপণ করা হইয়াছে। পুঞ্চ উপরাজ্যটি ফলের বাগানের জন্য বিখ্যাত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোটলী কাশ্মীরের একটি শস্যকেন্দ্র। পুঞ্চ সহরটিকেও শস্যকেন্দ্র বলা যায়। কাশ্মীর উপত্যকার ভিতর পুঞ্চ অঞ্চলেই ফুল, ফল ও শস্য সর্ব্বাধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা পথে টাট্টুর উপর চড়িয়া এবং মাল বোঝাই করিয়া বহু লোককে পুঞ্চ সহরের দিকে আগাইতে দেখিলাম। গাধার উপর চড়িয়া বা মাল বোঝাই করিয়া যাতায়াত-দৃশ্যও দেখা গেল। দেখিলেই বুঝা যায়, সাধারণ জনগণ অত্যন্ত দরিদ্র। আমার পাশেই এক কাশ্মীরী মুসলমান অশ্বতরপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া যাইতেছিলেন। ইনি এক জন ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক কাশ্মীরী জনসাধারণের শিক্ষাশূন্যতা ও দৈন্য-দারিদ্র্যের কথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আমাকে জানাইলেন। শের-ই-কাশ্মীরের প্রতি ইহার অগাধ শ্রদ্ধা। ইহার মতে দেশীয় নৃপতিগণের অধিকাংশই আত্মসুখসর্ব্বস্ব, প্রজার সুখ-দুঃখের সংবাদ তাঁহারা রাখেন না বলিলেই হয়। প্রজাদের উচ্চশিক্ষা তাঁহারা আদৌ পছন্দ করেন না; কারণ, তাঁহারা জানেন, প্রজারা শিক্ষালোক পাইলে নির্বিষ্ট ভাবে নতশিরে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার কিছুতেই করিবে না। ভদ্রলোকটি ইহাও জানাইলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় তাহার এক পূর্ব্বপুরুষ ইসলামে দীক্ষিত হন। ধর্ম্ম সম্পর্কিত গোঁড়ামির লেশমাত্রও ভদ্রলোকটির নাই। তিনি ইহাও জানাইলেন যে প্রায় সমস্ত কাশ্মীরী মুসলমানরাই তাঁহারই মত গোঁড়ামিশূন্য। সীমান্তের পুস্তভাবাভাষী পাঠান উপসম্প্রদায়দের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই, ইহাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। এই অংশের উপাদেয় ফলপ্রদ স্থান সমূহের মধ্যে কুলু উপত্যকার পরেই পুঞ্চ উপত্যকার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

পুঞ্চ শহরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৮ হাজার ৮ শত ফুট উচ্চ। সুতরাং কাশ্মীর উপত্যকার অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইহার উচ্চতা কিঞ্চিৎ অল্প। কাশ্মীরের উচ্চতর অঞ্চলগুলিতে যখন সুতীব্র শীত তখন পুঞ্চ উপত্যকা, পুঞ্চ সহর অত্যন্ত প্রীতিকর। শুধু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে পুঞ্চ অপেক্ষা কাশ্মীরের উচ্চতর উপত্যকাগুলিই উপভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য আমাদের মত উষ্ণ সমতল প্রদেশবাসীর পক্ষে উচ্চতর অংশ অপেক্ষা পুঞ্চ অঞ্চল অধিকতর প্রীতিপদ এ বিষয়ে সংশয় নাই। রাজধানী পুঞ্চের চারি দিকে প্রসারিত পার্ব্বত্য পুষ্পপাদপপূর্ণ প্রকৃতিকে দেখিলে মনে হয় যেন চির বসন্তের দেশে আসিয়াছি।

পুরাতন ও নূতন পুঞ্চরাজ বলদেব সিংহের দুইটি প্রাসাদই দেখিলাম। নূতন প্রাসাদটির নিম্নবর্ত্তী ক্রম-নিম্ন পথে আগাইয়া যাইলে নদীতীরে পৌঁছান যায়। নগরটি ক্রমশঃ যেন নিম্নে নামিয়া নদীতটে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন-দুর্গের বিরাট প্রাকারের চতুর্দ্দিকে খর্ব্বকায় গৃহগুলি মাতৃপদতলে শিশুদের মত দাঁড়াইয়া আছে। পুঞ্চ নগরটি ক্ষুদ্রকায় কিন্তু নিরুপম নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যে বেষ্টিত বলিয়া এই ক্ষুদ্রতা অনুভূতি হয় না। সন্ধ্যার পর সমস্ত শহরটি ক্রীড়া-ক্লান্ত বালকের মত মাতৃস্বরূপা পার্ব্বত্য প্রকৃতির ক্রোড়ে শান্ত হইয়া সুপ্তিসাগরে ডুবিয়া যায়। কেবল পার্ব্বত্য প্রবাহিনী পুঞ্চের উচ্চ কলগীতি নৈশ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতিরন্ধ্রে প্রবেশ করে।

পুঞ্চ নগরেও দুইটি দলের কলহ-কোলাহল আমাদের কর্ণগোচর হইল। গ্রাম ও নগরবাসী তরুণরাই শেখ আবদুল্লার জাতীয় আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান সমর্থক। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত কথোপকথনে আমরা যাহা জানিলাম তাহাতে বুঝা গেল, তাহারা সকলেই সাগ্রহে আন্দোলন সমর্থন করে, কেবল কেহ কেহ রাজভক্ত অভিভাবকদের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারে না। একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্র আমরা কাশ্মীরী ভাষায় অনভিজ্ঞ জানিয়া আমাদিগকে হিন্দীতে বলিল,—এক রোজ সমুচা কাশ্মীর ইসি তরফ আ যাগা। এই বালকের ভবিষ্যৎবাণী সত্যই সফল হইয়াছে। জানি না, সে জীবিত রহিয়া এই সাফল্য স্বচক্ষে দেখিতেছে কি না। একটা সত্য আমরা কাশ্মীর ভ্রমণকালে অবগত হইয়াছিলাম। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য প্রথমে ছিল না। দিল্লীর বাদশাহগণ কাশ্মীরে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত আরম্ভ করায় তাঁহাদেরই প্রভাবে, প্রচারে ও প্রতাপে বহু বর্ণহিন্দুও ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।
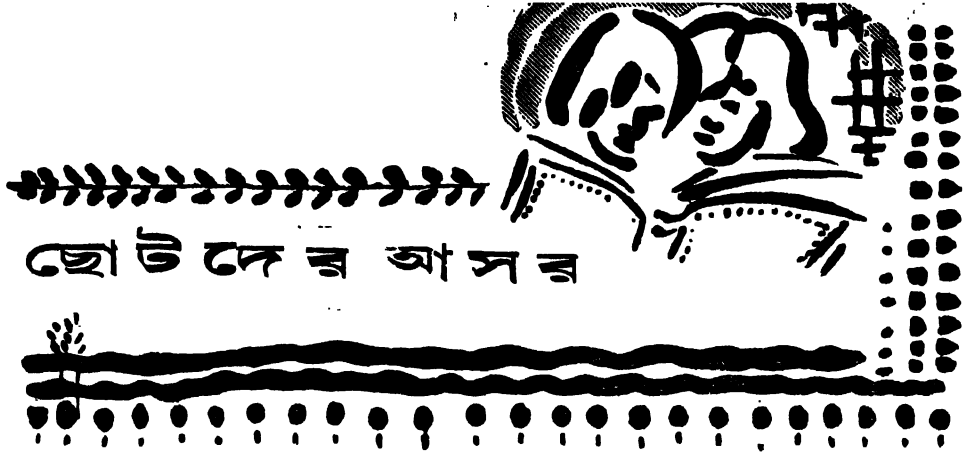
পঞ্চম

বাংলার রাজা শশাঙ্ক

মধ্য ও পশ্চিম-ভারত মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের অধিকার-ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেও প্রায় তাঁর মতনই ক্ষমতাশালী আর এক নরপতি ছিলেন, তাঁর নাম শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করেছিল; এমন কি, দক্ষিণ উড়িষ্যার কোঙ্গোদমণ্ডলের মাধব বর্ম্মাও ছিলেন তাঁর সামন্ত রাজা।

মহারাজা শশাঙ্কের মনে ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যে পরাক্রান্ত গুপ্ত-সম্রাটরা এক সময়ে সসাগরা ভারতভূমির শাসনদণ্ড দৃঢ় হস্তে পরিচালনা করতেন এবং যাঁদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, সেই সম্ভ্রান্ত বংশেই তাঁর জন্ম। গুপ্ত-বংশের এক কন্যা মহাসেনগুপ্তাকে জননীরূপে পেয়ে স্থানেশ্বররাজ প্রভাকর-বর্দ্ধন নিজেকে যার-পর-নাই ভাগ্যবান ব'লে মনে করতেন। সুতরাং সেই রাজবংশেরই মুকুটধারী পুত্র হয়ে শশাঙ্কের মনে যে বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, এ জন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই।

শশাঙ্কের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন গুপ্তবংশের পূর্ব্বগৌরব। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে তিনি জয় করতে লাগলেন রাজ্যের পর রাজ্য। কেবল মগধ, রাঢ় ও গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর হয়েই তিনি পরিতুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি দেখলেন, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ (এখন রাঙামাটি নামে খ্যাত। এ স্থানটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের দক্ষিণে আছে) নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ ও অধিকার করতে সাহসী হয়েছেন। তিনিও তখন কামরূপ-রাজকে আক্রমণ ও পরাজিত না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না।

এমন সময়ে গুপ্তবংশীয় আর এক রাজা, মালবের দেবগুপ্তের কাছ থেকে এল এক আমন্ত্রণ-লিপি।

দেবগুপ্ত লিখেছেন:

"মহারাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত,

একই পবিত্র বংশে আমাদের জন্ম। আমাদের দু'জনেরই দেহের ভিতরে আছে একই পূর্ব্বপুরুষের রক্ত। সেই রক্তের দোহাই দিয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

গুপ্তবংশের সন্তান আমি, এত দিন বাধ্য হয়েই স্থানেশ্বরের প্রভাকরবর্দ্ধনের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলুম। কিন্তু এত দিন পরে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। প্রভাকরবর্দ্ধন আর ইহলোকে বিদ্যমান নেই। তাঁর দুই পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই আমি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেই ক্ষান্ত হইনি, প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাতা কান্যকুব্জের মুখর-বংশীয় রাজা গ্রহবর্ম্মাকেও যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেছি এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী রাজ্যশ্রীও এখন আমার হস্তে বন্দিনী।

কিন্তু আমার লোকবল আপনার মত প্রবল নয়। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলুম, স্থানেশ্বরের নূতন রাজা রাজ্যবর্দ্ধন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। আমার এই দুঃসময়ে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে আসেন, তা'হলে কেবল যে আমি একাই উপকৃত হব তা নয়, আমরা দুই জনে মিলে হয়তো আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতেও পারব। মহাশয়ের অভিমত অবিলম্বে জানতে পারলে বাধিত হব। ইতি"

মধ্য ও পশ্চিম-ভারত পর্য্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তৃত করবার এমন সুযোগ শশাঙ্ক ছাড়তে পারলেন না। তিনি উত্তরে লিখলেন:

"মহারাজা দেবগুপ্ত,

আপনার সাহায্যের জন্যে আমি যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করব।

কিন্তু বিনা অপরাধে আপনি রাজ্যশ্রী দেবীকে বন্দিনী করেছেন কেন? এ যে গুপ্তবংশের পক্ষে কলঙ্কের কথা! গুপ্তবংশের কেউ কোন দিন নারীর বিরুদ্ধে হাত তোলেননি। অতএব অবিলম্বে রাজ্যশ্রী দেবীকে মুক্তিদান করলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি"

কালবিলম্ব না ক'রে মহাসমারোহে শশাঙ্ক সৈন্যসজ্জা আরম্ভ করলেন। নির্ব্বোধরা এবং শত্রুরা আজ অপবাদ দেয়, বাঙালী সামরিক জাতি নয়, বাঙালী অস্ত্রধারণ করতে জানে না। কিন্তু আগে—এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব যুগেও বাঙালীদের কেউ কাপুরুষ বলতে ভরসা করত না। সাধারণত মগধ ও বঙ্গ বলতে সবাই তখন এক দেশই বুঝত। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, মগধ ও বঙ্গের সিংহাসনে বিরাজ করেছেন একই রাজা।

ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগেও দেখা যায়, মধ্য-এসিয়া থেকে আগত বিদেশী আর্য্য জাতি উত্তরাপথের অধিকাংশ অধিকার ক'রেও মগধ ও বঙ্গের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেননি। বিখ্যাত গ্রন্থ "শতপথ ব্রাহ্মণ"

মহাভারতের শেষ মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনা কালেও মগধ ও বঙ্গ বাহুবলে আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মহাভারত ও রামায়ণেও বাঙালী রাজাদের নাম আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন: "বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি অল্পবয়সপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। * * * প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহ-সূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"

মগধ ও বঙ্গের শূদ্র অধিপতি মহাপদ্মনন্দই হচ্ছেন আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ বা "একরাট্"। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার যখন ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করেন, তখন বহু বিজ্ঞাপিত আর্যবীরগণ প্রাণপণেও তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারেননি। সে-সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ বাস করতেন মগধ-বঙ্গের যুক্তসাম্রাজ্যে। তাঁকে জয় না করলে ভারতবর্ষ জয় করা হয় না। অতএব আলেকজাণ্ডার মগধ-বঙ্গকে আক্রমণ করতে অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকেরই বর্ণনায় দেখি, মগধ-বঙ্গের শূদ্র রাজার মহাশক্তির কথা শুনে আলেকজাণ্ডার ভয় পেয়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করবার দুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চাৎপদ না হয়ে পারেননি।

মহারাজা শশাঙ্কের পরলোক গমনের অনেক পরেও দেখি, বাঙালীর বাহুবল অধিকতর প্রবল হয়ে উঠেছে। অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর ধর্ম্মপাল উত্তরে দিল্লী ও জলন্ধর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। উপরন্তু, বাঙালী সৈন্যদল জয়যাত্রায় বেরিয়ে রাজপুতানার কতক অংশ (ভোজদেশ ও মৎস্যদেশ), পাঞ্জাব (কুরু ও যদু), গান্ধার ও যবন, কীর (কাঙড়া) ও অবন্তী (উজ্জয়িনী) প্রভৃতি দেশের রাজাদের অনায়াসে পরাজিত করেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক দেশেই উন্নতি ও অবনতির এক-একটা যুগ আসে। কোথায় আজ প্রাচীন মিশর, পারস্য, গ্রীক, রোমীয়, তাতার ও আরব সাম্রাজ্য? এক জাতি ওঠে এবং এক জাতি পড়ে।

বাঙালীর ক্ষাত্র-বীর্য্য দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল মুসলমান অধিকারের যুগেই। কিন্তু বাঙালী কোন দিনই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। মুসলমানেরা যখন ভারতে অত্যন্ত প্রবল, তখনও স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে ইন্ধনের মতন আপন আপন জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার প্রতাপ, সীতারাম, চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রভৃতি। তবু দুষ্ট রসনায় শুনি মিথ্যা কথা—বাঙালী ভীরু, বাঙালী যোদ্ধা নয়! একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

বার বার প'ড়েও চীন আবার দাঁড়িয়ে উঠছে। বাঙালীও প'ড়ে মরবে না, আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।

অতঃপর আমাদের কাহিনীর সূত্র ধরা যাক্। মহারাজা শশাঙ্কের সৈন্যসজ্জা সমাপ্ত হ'ল। বিপুল এক বাহিনী নিয়ে তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। তাঁর মনে আনন্দের সীমা নেই। এত দিন পরে তিনি লাভ করেছেন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করবার যথার্থ সুযোগ। তাঁরও বুকের ভিতরে আজ যেন আবার জাগ্রত হয়েছে ভারতবিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের অমর আত্মা!

দেবগুপ্ত আছেন কান্যকুব্জে। মগধ-বঙ্গ থেকে বহু—বহু দূরে! সেকালের কোন সৈন্যদলই একালের মত দ্রুতবেগে যুদ্ধযাত্রা করত না বা করতে পারত না। অশ্ব ও হস্তী অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে পথ পার হ'তে পারে বটে, কিন্তু কোন বাহিনীই তো কেবল অশ্বারোহী, গজারোহী বা রথারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে অসংখ্য পদাতিকও এবং তাদেরও পিছনে ফেলে রেখে অগ্রসর হওয়া চলে না। তার উপরে সেকালের পথ-ঘাটের অবস্থাও ভালো ছিল না। কাজে-কাজেই যদিও শশাঙ্কের মন বাচ্ছিল বাতাসের আগে-আগে, তবু তাঁর এবং সৈন্যদের দেহের গতি হ'ল মন্থর।

অবশেষে শশাঙ্ক সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন কান্যকুব্জের অনতিদূরে।

সেইখানে গুপ্তচরের মুখে শোনা গেল চরম এক দুঃসংবাদ!

যাঁকে সাহায্য করবার জন্যে শশাঙ্ক নদ-নদী, পর্ব্বত, কান্তার ও প্রান্তর অতিক্রম ক'রে স্বরাজ্য ছেড়ে এত দূরে এসে পড়েছেন, সেই মালবরাজ দেবগুপ্ত ইতিমধ্যেই স্থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্দ্ধনের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও নিহত হয়েছেন!

শশাঙ্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেলে আঘাত। কিন্তু তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, এখন আর প্রত্যাগমন করা চলে না! তাহলে দেশব্যাপী নিন্দুকের জিহ্বা তাঁকে 'কাপুরুষ' ব'লে অখ্যাতি রটনা করবে। তার উপরে এখনো তাঁর প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। দেবগুপ্ত আর তিনি একই বংশজাত। রাজ্যবর্দ্ধন তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুকে হত্যা করেছেন, তাঁকে শাস্তি না দিয়ে তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না।

গুপ্তচরের দিকে ফিরে শশাঙ্ক শুধোলেন, "প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা জয়শ্রী কোথায়?"

—"মহারাজা দেবগুপ্ত তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তার পর তিনি যে কোথায় গিয়েছেন, কেউ তা জানে না।"

—"দুর্ব্বল নারীর প্রতি সবল পুরুষের অত্যাচার হচ্ছে মহাপাপ। হতভাগ্য দেবগুপ্তকে হয়তো সেই পাপের জন্যেই নিজের প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। চর, তুমি আর কোন সংবাদ জানো?"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! কিন্তু তাও সুসংবাদ নয়।"

—"কি রকম?"

—"স্থানেশ্বরের মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধন আপনার আগমন-সংবাদ পেয়েছেন।"

—"এটা খুবই স্বাভাবিক। তার পর?"

—"তিনি আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।"

—"তাঁর সৈন্যসংখ্যা জানো?"

—"জানি। তিনি দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা আরো কম। কারণ, মহারাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর প্রায় তিন হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে।"

শশাঙ্ক নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার পর বললেন, "চর, তুমি মূল্যবান সংবাদ এনেছ। তোমাকে পুরস্কৃত করব। এখন যাও।"

গুপ্তচর অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে।

শশাঙ্ক সহাস্যে মনে মনে বললেন, "আমার এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনের সাত হাজার সৈন্য! যুদ্ধে আমার জয় অনিবার্য্য!"

ষষ্ঠ

বাঙালী পাখী

শশাঙ্ক স্থির করলেন, রাজ্যবর্দ্ধনকেই আগে আক্রমণ করবার সুযোগ দিবেন।

রাজ্যবর্দ্ধন তরুণ যুবক, তাঁর প্রকৃতিও নিশ্চয় উগ্র; নইলে শশাঙ্কের বিপুল সৈন্যবল সম্বন্ধে কোন সন্ধান না নিয়েই মাত্র সাত হাজার সৈনিকের সঙ্গে এমন ভাবে অগ্রসর হ'তে সাহস করতেন না।

শশাঙ্ক মৃদু হাস্য ক'রে সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোকেরা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের লোকদের বরাবরই তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান করেন। মগধ আর বঙ্গের বাসিন্দারা তাই তাঁদের মতে নগণ্য 'পক্ষী' মাত্র। রাজ্যবর্দ্ধন বোধ হয় ভেবেছেন, তাঁর সাত হাজার যোদ্ধাকে দেখলেই আমার এক লাখ সৈন্য ভীরু পাখীর পালের মতই উড়ে পালিয়ে যাবে!"

সেনাপতি বললেন, "চমৎকার যুক্তি বটে!"

শশাঙ্ক বললেন, "অতিরিক্ত সৌভাগ্য মানুষের সুবুদ্ধি হরণ করে। উত্তর-ভারতের লোকেরা আমাদের কেবল 'অনার্য্য' ব'লে ডেকেই তুষ্ট নয়। তারা বলে কি না, মগধ আর বঙ্গদেশে পদার্পণ করলেও তাদের পাতিত্য দোষ জন্মাবে, তাদের আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! অহমিকা এর উর্দ্ধে আর উঠতে পারে না! অতি-দর্পে লঙ্কা আর অতি-মানে কৌরবদের পতন হয়েছিল। আজকেও আবার তারই পুনরভিনয় হবে। সেনাপতি মহাশয়, আপনি অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহ রচনা ক'রে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করুন। ব্যূহের দক্ষিণ আর বাম বাহুতে স্থাপন করুন রথারোহী সৈন্যদের। শত্রুরা যখন ব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করবে, তখন আপনার কর্ত্তব্য কি জানেন?"

হাস্যমুখে সেনাপতি বললেন, "আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না মহারাজ! আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ যুদ্ধের নামে হবে প্রকাণ্ড একটা ছেলেখেলা!"

দুই ভুরু কুঞ্চিত ক'রে শশাঙ্ক বললেন, "পতঙ্গ যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় তখন অগ্নিকে কেউ তার জন্যে দায়ী করে না। স্বরাজ্য ছেড়ে এত দূরে আমি ছেলেখেলা করতে আসিনি, কিন্তু শত্রুরা যদি ছেলেখেলা করে তাহ'লে আমার কি দোষ?"

সেনাপতি বললেন, "যুদ্ধে যে আমাদের জয় হবে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার পর রাজ্যবর্দ্ধনকে নিয়ে আমরা কি করব?"

শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, "সেনাপতি মহাশয়, রাজনীতি বড় নির্ম্মম, কারণ রাজনীতি বড় স্বার্থপর, আমাদের প্রধান পূর্ব্বপুরুষ সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকেই 'সমূলে উৎপাটন' না ক'রে ক্ষান্ত হননি।"

সেনাপতি কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে বললেন, "কিন্তু মহারাজ, রাজ্যবর্দ্ধনকে বালক বললেও চলে।"

—"সিংহশিশু অবহেলার যোগ্য নয়। আর একটা কথা ভুলবেন না। আমার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আছে রাজ্যবর্দ্ধনের রাজ্য, শুনেছি, সে ধার্ম্মিক ব'লে প্রজারা তাকে ভালোবাসে। রাজনীতি বলে যে, সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হ'লে নিজের রাজ্যের কল্যাণ হয় না। এর পরে আপনাকে আর কিছু বলা বাহুল্য। আমি রাজ্যবৃদ্ধি আর নিজের রাজ্যের কল্যাণ চাই। বুঝলেন?"

অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন সেনাপতি।

শশাঙ্ক আপন মনে বললেন, "রাজ্যবর্দ্ধন, তোমার উন্নতি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরোধী। কিন্তু তোমার জন্যে আমি দুঃখিত।"

রাজ্যবর্দ্ধন দুর্দ্ধর্ষ হূণ-সমরে বিজয়ী হয়ে ইতিহাসে স্থায়ী খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু বয়সে তিনি কাঁচা হ'লেও তাঁর বুদ্ধিকে অপরিণত ব'লে মনে করা চলে না। তাঁরও আগে তাঁরই মতন বয়সে গ্রীক-দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার অসাধারণ সামরিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজ্যবর্দ্ধনের মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। একে তাঁর সহোদরার স্বামী নিহত, তার উপরে বিধবা রাজ্যশ্রীও নিরুদ্দেশ এবং তারও উপরে পঞ্চনদ অঞ্চলের সাধারণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে তিনিও সত্য সত্যই মনে করেছিলেন যে, স্থানেশ্বরের সাত হাজার সৈন্য বঙ্গাধিপের লক্ষ সৈন্যের চেয়েও বলবান।

এই ভ্রান্ত ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতেও দেরি লাগল না। শশাঙ্ক যে ফাঁদ পেতেছিলেন, রাজ্যবর্দ্ধন সেই ফাঁদেই পা দিলেন অন্ধের মত। স্থানেশ্বরের সাত হাজার অশ্বারোহী মগধ-বঙ্গের বিপুল বাহিনীর মধ্যভাগ আক্রমণ করল। মগধ-বঙ্গের মধ্যভাগের গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাদের বাধা দিতে লাগল এবং সেই অবকাশে তাদের অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহের দক্ষিণ ও বাম বাহুও এগিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সমগ্র স্থানেশ্বর-বাহিনীকে একেবারে ঘিরে ফেললে। ঠিক বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ হয়েও রাজ্যবর্দ্ধনের সৈন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল বটে বিপুল বিক্রমে, কিন্তু এক লক্ষের সামনে সাত হাজারের শক্তি কতটুকু? দেখতে দেখতে স্থানেশ্বরের ক্ষুদ্র বাহিনী নিঃশেষে হারিয়ে গেল সমুদ্রের মাঝখানে ঠিক নদীর মতই।

শিবিরের বাইরে যুদ্ধের কোলাহল—অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, আহতের আর্ত্তনাদ, যোদ্ধার গর্জ্জন, দামামার ডিমি-ডিমি-ডিমি, কিন্তু মহারাজ শশাঙ্ক তখন জনৈক পারিষদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে দাবা-বোড়ে খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। জ্যোতিষী না হ'লেও তিনি জানতেন যে, আজকের যুদ্ধের ফলাফল কি হবে।

বার্ত্তাবহ সংবাদ নিয়ে এল,—স্থানেশ্বরের বাহিনী প্রায়-নির্ম্মূল, রাজ্যবর্দ্ধন নিহত।

ভ্রূ-সঙ্কোচ ক'রে শশাঙ্ক শুধোলেন, "নিহত? কার হস্তে?"

—"সেনাপতি মহাশয় স্থানেশ্বরের মহারাজাকে স্বহস্তে বধ করেছেন।"

শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে রইলেন গম্ভীর মুখে। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, "পণ্ডিতরা বলেন, অমঙ্গল থেকেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার আর এক ধাপ উপরে উঠলুম। স্থানেশ্বরের অমঙ্গলের উপরে মগধ-বঙ্গের মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা। এ জন্যে রাজনীতি আমাকে অপরাধী ব'লে মনে করতে পারবে না।"

সপ্তম

নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

প্রভাত কাল। স্থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদ।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক তেরোশো পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলছি। বর্তমানের পটে সেদিনকার আর্য্যাবর্ত্তের আলোক-চিত্র একেবারেই ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আজও অপরিবর্তিত হয়ে আছে সেদিনকার দৃশ্যমানা প্রকৃতি!

নির্ম্মল নীলাকাশ, জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত-সূর্য্য, সোনালী কিরণ-বন্যা, মুক্তকণ্ঠ গানের পাখী, স্নিগ্ধ সমীরণ-হিন্দোলায় ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত শ্যামলতা। প্রকৃতি বর্ণনা করতে বসলে আজকের লেখকও এর চেয়ে নূতন কিছু দেখাতে পারবেন না।

রাজকুমার হর্ষবর্দ্ধন আপন মনে করছিলেন কাব্য রচনা।

কৃপাণ এবং লেখনী, এই দুটিই হর্ষবর্দ্ধনের কাছে ছিল সমান প্রিয়। বালক-বয়স থেকে ভালোবাসতেন তিনি কবিতাকে এবং পরিণত বয়সে এই কাব্যানুরাগ তাঁর খ্যাতিকে কতখানি অমর ক'রে তুলেছিল, সেটা আমরা দেখতে পাব যথাসময়েই। হর্ষবর্দ্ধনের নিজের সৃষ্ট কাব্যলোকের মধ্যে আজও তাঁর মনের কথা উত্তপ্ত ও জীবন্ত হয়ে আছে বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে!

হর্ষবর্দ্ধন সেদিন কবিতা রচনা করছিলেন। কিন্তু প্রথম শ্লোকটি শেষ করতে না করতেই হঠাৎ বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।

পরিচারক এসে জানালে, সেনাপতি সিংহনাদ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন সচমকে বললেন, "দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ?"

—"আমি জানি না প্রভু!"

—"বেশ, সেনাপতিকে এখানে আসতে বল।"

সেনাপতি সিংহনাদ ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মত।

—"কি ব্যাপার সেনাপতি?"

সিংহনাদ প্রায়-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

"দেব দেবভূয়ং গতে নরেন্দ্রে দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে-চ।

রাজ্যবর্দ্ধনে বৃত্তেঽস্মিন মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুনাত্বং শেষঃ।"

হর্ষবর্দ্ধনের বুকের মধ্য দিয়ে যেন উল্কাগতির প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল, খ'সে পড়ল তাঁর হাত থেকে লেখনী! আড়ষ্ট কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন, "সেনাপতি, কি বললেন? দুষ্ট গৌড়-ভুজঙ্গের দংশনে মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গে প্রস্থান করেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ দেব!"

—"গৌড়-ভুজঙ্গ? মগধ-বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক? সেই গৌড়াধম হত্যা করেছে আমার দাদাকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ দেব! কেবল তাঁকেই হত্যা নয়, সেই দুরাচারের কবলে প'ড়ে আমাদের সাত হাজার সৈন্য একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

—"আর আমার দিদি রাজ্যশ্রী? তাঁর খবর কি? দাদা তো তাঁকেই উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন!"

—"স্থানেশ্বরের রাজকন্যার কথা কেউ সঠিক বলতে পারছে না। কেবল এইটুকু জানা গিয়েছে যে, তিনি এখন আর বন্দিনী নন। কিন্তু মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধনও তাঁর সন্ধান পাননি। লোকের মুখে প্রকাশ, রাজকন্যা না কি বিন্ধ্য পর্ব্বতের কোথায় গিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন।"

হর্ষবর্দ্ধন আবার কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় ভণ্ডী ও আরো কয়েক জন মন্ত্রী।

ভণ্ডী বললেন, "কুমার হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যের চারি দিকে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, স্থানেশ্বরের সিংহাসন আবার শূন্য। মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধনের শোচনীয় অকালমৃত্যু আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে বটে, কিন্তু এখন আমাদের আত্মহারা হবার বা শোক করবারও অবকাশ নেই। হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে এখনি তোমাকে মুকুট ধারণ করতে হবে।"

হর্ষবর্দ্ধন বেগে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর দুই বিস্ফারিত চক্ষে ঠিকরে উঠল আগুনের ফিন্‌কি! দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "মুকুট? আমি এখন মুকুট ধারণ করব? ছার এই মুকুট! আমার অত্যাচারিতা অভাগিনী বিধবা সহোদরা নিরুদ্দেশ, আমার দাদার—স্থানেশ্বরের মহারাজাধিরাজের পবিত্র মৃতদেহ নিয়ে এখন হয়তো কাড়াকাড়ি করছে শকুনি-গৃধিনীর দল, এই সময়ে মুকুট ধারণ করব আমি? আপনারা জ্যেষ্ঠ, আপনারা জ্ঞানী, কিন্তু এ কি বলছেন আপনারা! মুকুট এখন আমার কাছে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, এখন আমার কাম্য কেবল প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! আজ আপনারা সকলে আমার এই প্রতিজ্ঞা শুনে রাখুন, যত দিন না দিদি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে পারছি, যত দিন না আমার দাদার শত্রুদের শাস্তিবিধান করতে পারছি, তত দিন আমি দক্ষিণ হস্ত দিয়ে অন্নগ্রহণ করব না!"

[ক্রমশঃ।

আলোয় লেখা

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ি

আজকাল বড় বড় দোকান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, থিয়েটার বায়োস্কোপ হলের নাম আলোয় লেখার রেওয়াজ হয়েছে। এত দিন সারি দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতির ডুম সাজিয়ে এ-কাজ করা হোত। কিন্তু সে কৌশল এখন সেকেলে বলে বাতিল হয়ে গেছে। তা'ছাড়া এ ভাবে আলোকিত করায় বিদ্যুতের খরচ হয় বেশী—টাকাও লাগে এক কাঁড়ি। অথচ দেখতেও তেমন সুন্দর হয় না! কিন্তু নীয়ন আলোকে (neon) বাড়ী সাজালে খরচও যেমন কম পড়ে দেখতেও হয় তেমন সুন্দর ও মনোহারী। মেট্রো, লাইট-হাউস প্রভৃতি এই স্নিগ্ধ নীয়ন আলোকে আলোকিত হয়ে রাতের অন্ধকারে এক অপূর্ব রহস্যময় মায়া সৃষ্টি করে, সে তোমরা যারা কলকাতায় বাস কর রোজই প্রায় তা দেখতে পাও।

প্রায় আশী বছর আগেকার কথা। বোহেমিয়ায় এক কাচের মিস্ত্রী বাস করতেন। সরু নলকে আগুনে নরম করে ফুঁ দিয়ে তাকে নানা আকারের তৈরী করায় ছিল তাঁর প্রধান দক্ষতা। লোকটির নাম গাইসলার। তিনি একবার একটি মজার পাম্প উদ্ভাবন করেন, এই পাম্পের সাহায্যে তিনি একটি কাচের নল থেকে বাতাস বের করে নেন। নলটির দু'দিকে দু'টো ধাতব চাকতি বা ইলেকট্রোড

(electrode) লাগানো ছিল। তার পর এই চাকতি দু'টোকে তিনি যতগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ততগুলি পর-পর বসান বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। ব্যাটারীগুলোকে পর-পর সারবন্দী করে একটার সঙ্গে আর একটাকে যুক্ত করে দিলে ইলেকট্রোডগুলিতে তড়িৎ প্রবাহের চাপ বা ভোল্টেজ (voltage) ইচ্ছামত বাড়ান যায়।

এই ভাবে চলল তার পরীক্ষা-কার্য।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, সব জিনিষের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না। যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ সহজে প্রবাহিত হয় তাদের বলা হয় তড়িৎ-পরিবাহী (conductor), আর যে সব পদার্থ তড়িৎ বহন করে না তাদের বলা হয় অপরিবাহী (non-conductor)। শুকানো কাঠ অপরিবাহী বলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা কাঠের মই কিংবা টুলের উপর দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের লাইন প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। পৃথিবীর উপর বায়ুর চাপ প্রায় ৭৬০ মিলিমিটার। এই চাপে বায়ু বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না। কাজেই বায়ু-ভর্ত্তি নলে গাইসলার যে তড়িৎ চলাচলের কোনই লক্ষণ দেখবার আশা করতে পারেন না, সে ত সহজেই বুঝতে পারছ। কিন্তু গাইসলার যখন তার নল থেকে ধীরে ধীরে বাতাস বের করে নিতে লাগলেন, তখন এক সময় এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, নলের নিরালোক অংশ (dark space) থেকে এক অপূর্ব দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই দ্যুতি বা আলোককেই বলা হয় গাইসলার দ্যুতি। আজকের নীয়ন নলগুলি যে নীতির উপর নির্ভর করে পরিকল্পিত, গাইসলারের পরীক্ষা বস্তুতঃ তারই প্রথম পাঠ।

গাইসলারকে যে পাম্প নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল, সেগুলি তেমন উঁচুদরের ছিল না। তাদের সাহায্যে নলের ভিতরকার বাতাসের চাপ লঘুকরণ করা চলত না অধিক দূর অবধি। আজকের দিনেও নলকে সম্পূর্ণ বায়ু-নিরপেক্ষ করা সুকঠিন কাজ। কিন্তু সে যুগে গাইসলার যদি আধুনিক কালের মত খুব শক্তিসম্পন্ন পাম্প পেতেন, তিনি যে আরো অনেক মজার মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
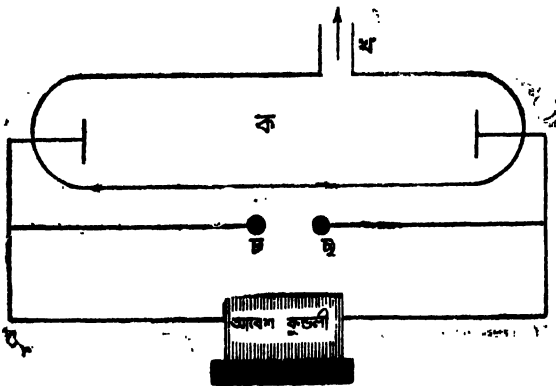
আচ্ছা, এবার ল্যাবোরাটরীতে এই রকম একটি নল নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। 'ক' হোল দু'দিক বন্ধ করা একটি ফাঁপা কাঁচের নল। নলের পিঠে 'খ'র সঙ্গে একটি শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম পাম্প লাগান আছে। এর সাহায্যে নলটিকে ক্রমশঃ বায়ুশূন্য করা যাবে। নলটির ভিতরে দুই প্রান্তে দু'টো ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে সীল করে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রোডদের একটি হোল পজেটিভ ইলেকট্রোড বা এ্যানোড (anode), আর একটি নিগেটিভ ইলেকট্রোড বা ক্যাথোড (cathode)। তার পর ইলেকট্রোড দু'টিকে আবার তারের সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে আবেশ-কুণ্ডলীর (Induction coil) সঙ্গে। আবেশ কুণ্ডলী হোল এমন একটি যন্ত্র যার কাজ হচ্ছে কম চাপের (lower voltage) বিদ্যুৎকে উচ্চ চাপ (higher voltage) সম্পন্ন করা।

ছবিতে দেখলেই বুঝতে পারবে, আবেশ-কুণ্ডলী থেকে জাত বিদ্যুৎ চাপ নলের মধ্য দিয়েই হোক অথবা 'চ ছ' ছোট দূরত্বের পথেই হোক, যে-পথটা সহজতর হবে সে-পথ দিয়েই তড়িৎ প্রবাহ পাঠাতে পারবে।

এইবার কাজ সুরু করে দেওয়া যাক্।

নল থেকে একটু একটু করে বায়ু বের করে নিতে নিতে এমন একটা সময় আসবে, যখন আর নলেতে বায়ু থাকবে না বললেই চলে।

নলেতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু থাকে, তড়িৎ দুই প্রান্তের ইলেকট্রোডের মধ্যস্থিত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না। তখন সহজগম্য বাইরের ছোট ব্যবধান (চ ছ) পথেই তড়িৎ লাফিয়ে চলে যায় এবং চড়-চড়াৎ শব্দে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই আমরা। কিন্তু ভিতরের বায়ুর চাপ যতই কমতে থাকে বাইরের চড়-চড়াৎ শব্দ এবং বিদ্যুৎ-স্ফুরণও একেবারে বন্ধ হয়ে আসে। ক্রমশঃ নলের ভিতরে একটা নীলাভ আলোর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রেখা দেখা যায়।

বাইরে দূরত্বের ব্যবধান কম হলেও বায়ুর চাপ বেশী, অথচ ভিতরের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হলেও বায়ুর চাপ-হ্রাসের ফলে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চলাচল সহজতর হয়েছে।

এই ভাবে পাম্প করে যতই বাতাস বের করে নেওয়া হতে থাকবে, নীলাভ আলোয় লালের আমেজ দেখা দেবে এবং ক্রমশঃ সমস্ত নলটি ঐ লাল আলোয় ভরে যাবে। অবশ্য ক্যাথোডের কাছে তখনও নীলাভ আলোর এক ফালি অক্ষুণ্ণ থাকে। তা'ছাড়াও এই দু' আলোর মাঝখানে কিছুটা নিরালোক ব্যবধানও রয়ে যায়।

পাম্পটি যদি নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ আর্দ্রতা-মুক্ত হয়, তাহলে নীলাভ দ্যুতি ক্ষীণকায় হতে হতে একেবারে সাদায় রূপান্তরিত হবে আর ঐ নিরালোক অংশটিকেও এক সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন আবার ক্যাথোডের কাছ ঘেঁসে একটি নতুন অন্ধকার অংশ দেখা দেবে এবং কালোর চারি ধারে একটি স্তিমিত দ্যুতির বলয়।

এই ভাবে ভিতরের বাতাস যতই বের করে নেওয়া হবে, ক্যাথোডের কাছাকাছি নিরালোক অংশের পরিধিও ততই বিস্তৃততর হতে থাকবে। তখন মাঝের এবং এ্যানোডের কাছাকাছি দ্যুতিও ক্রমশঃ মুছে যাবে। এই ভাবে নিরালোক অংশ কাচের নলের অনেকখানি গ্রাস করলে আর এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়। হঠাৎ এক সময় কাচের নলটি সবুজের বন্যায় ভরে যায়। ক্যাথোডের কাছে এই সবুজ সব চেয়ে উজ্জ্বলতম।

গোড়ার দিকে এই সব নলের সাহায্যে ঘর-বাড়ী আলোকিত করার চেষ্টা হয়েছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি প্রবল অন্তরায়

দেখা দিয়েছে। নলের ভিতরে বাতাস কিছুটা না কিছুটা থেকে যেতই যা' ইলেকট্রোডগুলিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বিকার ঘটাত। ইলেকট্রোডগুলিও দ্রুত ক্ষয় পেত। এদিকে ভ্যাকুয়ামের ভিতর দিয়ে ত' আর বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না; কাজেই নলের ভিতরকার গ্যাসের শেষ চিহ্নটুকু এই ভাবে ব্যয়িত হওয়ার ফলে তড়িৎ-প্রবাহ চলাচলও বন্ধ হয়ে যায় এবং নলটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অকেজো হয়ে পড়ে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডক্টর ডি, এম, মুর নামক এক ভদ্রলোকের মাথায় এক নতুন বুদ্ধি খেলল। ভদ্রলোক নলের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় ভালব (valve) যোগ করে দিলেন। ভালবের কাজ হোল ভিতরের গ্যাস নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুব সামান্ত পরিমাণ নতুন গ্যাস ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া। এই ভাবে পূর্বোক্ত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা হোল। এই আলোকের নামই 'মুর লাইট।' মুর লাইটের সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় যদি কার্বন ডাই-অক-সাইড ব্যবহার করা হয়। কার্বন ডাই-অকসাইড কিছুটা মৃত (inert) গ্যাস। এর আলোক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল। কিন্তু এর জন্ত যে সব যন্ত্রপাতি দরকার সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য—কাজেই অনুপযোগী।

বিদ্যুৎ মোক্ষণ কাচ-নল (discharge tube) নিয়ে যখন পরীক্ষা চলছিল তার আগেই বাতাসের দুষ্প্রাপ্য (rare) গ্যাসগুলি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। যারা এই প্রকার নলের ভিতরে দিয়ে তড়িৎ চালিয়ে গবেষণা করছিলেন তাদের পক্ষে এই আবিষ্কারে অকল্পিত সুবিধা হয়ে গেল। এই দুষ্প্রাপ্য গ্যাসগুলি আবার মৃত বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অর্থাৎ কি না, কোন অবস্থাতেই এরা কোন পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। এবার নলটি যদি এই সব গ্যাসে ভর্তি করে নেওয়া যায়, ইলেকট্রোডদের আর কোনই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্যাসগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় নলেতে অবস্থান করবে এবং তখন ইলেকট্রোডদের আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এখন স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। এই গ্যাসগুলি যখন মৃত গ্যাস, তখন এরা নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ গমনাগমনে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না ত? এরা কি বিদ্যুৎ-পরিবাহী?

হাঁ, পরীক্ষা-করে দেখা গেছে, নিম্ন চাপে এই গ্যাসগুলিও বিদ্যুৎ-পরিবাহী। নীয়নের (neon) উপস্থিতিতে বিস্ময়কর উজ্জ্বল আলোক পাওয়া গেল। হিলিয়াম (hilium) থেকে যে আলোক পাওয়া যায় তাও বেশ প্রখর।

এই মৃত গ্যাসগুলি কারা? কি ভাবেই বা এদের পাওয়া যেতে পারে? নীচের তালিকায় এদের পাঁচটির নাম দেওয়া হোল। সাধারণ বাতাসের দশ লক্ষ ভাগে এদের পরিমাণ যতটুকু তাও পাশে-পাশে লিখে দেওয়া হয়েছে। তালিকাটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই বুঝতে পারবে, এদের পরিমাণ কত নগণ্য। তথাকথিত নীয়ন নল-গুলিতে সাধারণতঃ যাদের ব্যবহার করা হয় তাদের নাম হচ্ছে—নীয়ন, আরগন (argon), হিলিয়াম এবং নীয়ন ও হিলিয়ামের সংমিশ্রণ।

এদের মধ্যে একমাত্র হিলিয়ামকেই নৈসর্গিক উপায়ে পাওয়া যায়। আমেরিকার মাটির অন্তরালে অনেক হিলিয়ামের ডিপো আছে—সেখান থেকে এদের সংগ্রহ করা যায়। তা'ছাড়া প্রধানতঃ বাতাসকে তরল করে এদের পৃথক্ করে নেওয়া হয়ে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, নীয়ন নলে কোন্ কোন্ গ্যাস ব্যবহার করা হয়। নীয়ন হিলিয়ামের সংমিশ্রণে নীয়নের পরিমাণ তিন ভাগ আর হিলিয়ামের পরিমাণ থাকে মাত্র এক ভাগ। ক্রিপটন আর জেনন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে এদের ব্যবহার করা হয় না।

অপেক্ষাকৃত সরু নলেই আলোকচ্ছটা বেশী খোলতাই হয়। সাধারণতঃ সোডা মিশ্রিত কাচের নল (soda glass) ব্যবহার করা হয়। এ নলগুলিকে যে কোন ভাবে বাঁকান সহজ। কেবল মাত্র সবুজ রঙ পাওয়ার জন্ত রঙ-করা নল চাই।

নীয়ন উজ্জ্বল নারাঙি লাল রঙে দীপ্তি পায়। নলে যদি একটু পারদের বাষ্প (mercury vapour) ভরে নেওয়া যায়, নীলাভ দ্যুতি পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পারদ বাষ্পীভূত হতে চায় না বলে নীয়ন, আরগন ও পারদ-বাষ্প একসঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এদের হলদে নলে রাখলে সবুজ দ্যুতি পাওয়া যাবে। হিলিয়াম-ভর্তি নল আইভরির মত শাদা রঙ বিচ্ছুরিত করে।

গাছ-পাকা

দুলাল বসু

বাগানের কোণে খোকা লাউ-চারা পুঁতলো,
লক্‌লকে ডগা তার বাঁশ বেয়ে উঠলো;
গ্যারাজের টিন-ছাওয়া ছাদ ছিল সাম্‌নে,
তারি পরে সোজা উঠে দশ দিকে ছুটলো।
মাথা তার কতগুলো নাই কোন সংখ্যা—
সারা বাড়ী ছেয়ে যাবে, মনে হয় শংকা।
খোকা বলে: কি হ'য়েছে, বাড়ুক না, ক্ষতি কি?
ইণ্ডিয়া ছেয়ে যাক্, ছেয়ে যাক্ লংকা।
বাড়ী আছে ফান্নু দিদি, লাউ-শাক ভক্ত;
বলে: খোকা, কোন্ ডগা কাটা যায় দেখ্ তো?
খোকা হাঁকে, সাবধান, প্রাণে যদি থাকে ভয়—
আমি আছি পাহারায়, কাটা বড় শক্ত।
চক্ষেতে ঘুম নাই, লেখাপড়া ঘুচলো
খোকা ঘোরে কাঁধে নিয়ে ধনু-তীর ছুঁচলো;
কাক-চিল ওড়ে নাক' এ পাড়ার আকাশে,
খোকা বলে: এত দিনে লাউ-ফুল ফুটলো।
ধপ-ধপে লাউ-ফুল, রাতে আসে ভোম্‌রা,
খোকা বলে: 'বয়কট্, এসো নাক' ভোম্‌রা—
শত্রুর চারি দিকে, কি ঘরে কি বাইরে,
সব্বাই ভারী লোভী, ফকির কি ওম্‌রা'।"
দিন যায়, রাত যায়, খোকা দেয় পাহারা,
ফুল থেকে ফল ধরে, বড় হয় তাহারা—
ফান্নু দিদি ভেবে খুন, এবার কি হবে হায়,
বাস্তিরে কচকচ কেটে নেবে সাহা-রা।
হঠাৎ-ই এক দিন ছুরি নিয়ে মত্ত,
হাসি-মুখে লাউ-বনে ছোটে খোকা ত্রস্ত;
প্রকাণ্ড লাউ এক কেটে এনে বললে:
এই নাও ফান্নু দিদি, হয়ো নাক' ব্যস্ত।
গাছ-পাকা ফল পাওয়া নয় সোজা কর্ম—
পাহারা রাখতে গিয়ে ছুটে গেছে ঘর্ম।
প্রথম ফসটি এই এত দিনে পাক্‌লো—
ডালনা-ঘন্ট খেয়ে বোঝো এর মর্ম।

দশ

কয়েকটি কথা

পরের দিন প্রত্যূষে সুব্রত সবে মাত্র ঘুম হ'তে উঠে প্রভাতী চায়ের কাপটা নিয়ে আরাম করে চুমুক দিচ্ছে, ভৃত্য এসে জানাল, নীচে দারোগা বাবু অপেক্ষা করছেন, সুব্রত বাবুর সংগে না কি দেখা করতে চান, বিশেষ কি প্রয়োজন আছে।

সুজিত পাশেই একটা সোফায় বসে সেদিনকার দৈনিক সংবাদ-পত্রটা পড়ছে, ভৃত্যের কথায় চোখ তুলে প্রথমে ভৃত্যের দিকে তাকাল, পরে সুব্রতর দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাকাল।

সুব্রত বললে, 'তাকে উপরে পাঠিয়ে দাও, হরিচরণ!'

'যে আজ্ঞে।' ভৃত্য নীচে চলে গেল।

একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'এখানকার দারোগা সুশান্ত বাবুকে চিনিস্ সুজিত?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'না।'

'আমার সংগে কিছু দিন আগে ও একটা কেসে কাজ করেছিল।'

সুশান্ত বাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'আসুন সুশান্ত বাবু! ইনি আমার সহপাঠী বন্ধু সুজিত আর ইনি এখানকার থানা ইন্‌চার্জ সুশান্ত সেন।'

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার জ্ঞাপন করলে।

'বসুন সুশান্ত বাবু, চা চলবে নিশ্চয়ই?' সুজিত প্রশ্ন করলে।

'আপত্তি নেই' মৃদু হেসে সুশান্ত জবাব দেয়।

সুজিত চায়ের জন্ত নীচে চলে গেল।

'তার পর কি সংবাদ সুশান্ত বাবু! কত দূর এগুলেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি সুব্রত বাবু, যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি এখনো। ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন বিশ্রী ভাবে জটিল যে কিছুই যেন কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছি না। সত্যি কথা বলতে কি, সেই জন্তই আপনার কাছে আসা।'

'কিন্তু জানলেন কি করে যে আমি এখানে আছি।'

'পুলিশের লোক ত' আমরা হাজার হলেও!'

'তা ঠিক। কিন্তু পুলিশের সংগে একযোগে কাজ করবার আমার এতটুকুও ইচ্ছা নেই মিঃ সেন।'

'কিন্তু আপনি না সাহায্য করলে যে আমি আর কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। তা'ছাড়া, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ঘটনা-চক্রে আপনি যখন এ ব্যাপারটার সংগে জড়িত হয়ে পড়েছেনই, জনসাধারণের দিক্ থেকেও আপনার একটা কর্তব্য আছে।'

'যেমন?'

'যেমন পুলিশকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে খুনীকে ধরিয়ে দেওয়াই ত' আপনার উচিত!...সমাজের প্রতিও ত' আপনার একটা কর্তব্য আছে।'

সুজিতের পিছু-পিছু হরিচরণ ট্রেতে করে, এক প্লেট খাবার ও এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে প্রবেশ করলে।

চা পানের?'

'ওটা চায়েরই আনুসংগিক। একটা অন্তটার সংগে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। তা'ছাড়া, সরকারের প্রতিভূ আপনারা। আপনাদের তুষ্ট রাখাই ত' আমাদের কর্তব্য।'

'কথায় সুজিতের সংগে পারবেন না মিঃ সেন। অতএব আর বৃথা কালক্ষয় না করে দক্ষিণ হস্তের কাজ সুরু করুন।'

জলযোগ ও চা-পানের পর সুশান্ত বললে, 'আমার কথাটা যে শেষ হলো না সুব্রত বাবু, চলুন না একটি বার আমার ওখান হতে ঘুরে আসবেন।'

সুশান্তর কথার ভাবার্থ ধরতে সুব্রতর এতটুকুও দেরী হলো না। সহাস্যে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুজিত আমার সহপাঠী ও বন্ধু, অতএব নির্ভয়ে আপনি আপনার সরকারী মহলের গোপন কথা (?) খুলে বলতে পারেন। কিন্তু একটু আগে সমাজের প্রতি কর্তব্যের যে দোহাই পাড়ছিলেন, সে যুক্তি কিন্তু মানতে আমি রাজী নই মিঃ সেন। কর্তব্যের সংগা তখনই আসে যখন উভয় পক্ষে সেটা প্রযুজ্য। তবু আপনাকে সাহায্য করবো যখন বলেছি, তখন আমার সাধ্যমত করবোই।'

'কিন্তু সত্যি বলুন ত', আপনার কি এই কেস্‌টা সম্পর্কে কোন interestই নেই?'

'নিশ্চয়ই। খুবই interested আমি।'

'আপনি কি কোন সূত্রই পাননি সুব্রত বাবু?'

'সত্যিই যখন কিছু সত্যিকারের সূত্র পাবো, সেই মুহূর্তেই আপনাকে আমি জানাব মিঃ সেন। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ কিছুই বলবার মত নেই।'

'কিন্তু আমিও ত' বুঝতে পারছি না, কোন্ পথ ধরে চলি।'

'কেন?'

'দেখুন না, এক জন লোক খুন হয়েছে, এক নির্জন পথের মধ্যে। Struggleএর কোন চিহ্ন নেই; কোন motive খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একমাত্র চুরি ছাড়া। কিন্তু এই জায়গায় গুলী করে খুন করে ডাকাতী বা চুরি করাটাও ত' একটা হাস্যকর ব্যাপার!'

'কিন্তু ঐ পথ ধরেই বা চিন্তা করছেন কেন মিঃ সেন? Absolutely foolish theory। শংকর ঘোষকে কোন ডাকাত বা চোর খুন করেনি। আপনাকে সেদিনও আমি কতকগুলো কথা বলেছিলাম, আজও বলছি, সূত্রের কথা বলছিলেন, অনেকগুলো সূত্র ত' আপনার চোখের সামনেই রয়েছে, সেগুলোর যথেষ্ট মূল্য আছে।'

'যেমন?'

সুব্রত সুশান্তর প্রশ্নে যেন কতকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, খোলা জানালা-পথে দৃষ্টিপাত করে।

রৌদ্র-ঝলসিত নির্মেঘ বিযুক্ত আকাশ।

ওই দূরে কয়েকটা চিল উড়ছে।

'ভাল কথা মিঃ সেন, 'সুব্রত বলে : জানেন', যে-ই শংকর ঘোষকে হত্যা করুক না কেন, আগে হতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েই করেছে, ইংরাজীতে যাকে বলে premeditated murder.'

'এঁ্যা! বলেন কি সুব্রত বাবু?' বিস্ময়ে যেন হতবাক্ হয়ে যায় সুশান্ত বাবু। তার পর সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এ ধরণের কিছুই ত' আমি জানি না? অবিশ্যি আপনি যা বলছেন, তা স্বীকার করতে আমি রাজী আছি, যদি কোন definite proof পাই।'

'ঠিক কথা। কিন্তু সত্যিই তার প্রমাণ আছে। আপনি একটা মোটর গাড়ীর মধ্যে, এক নির্জন রাস্তায় এক নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন, এই হচ্ছে এক নম্বর প্রামাণ্য সত্য।'

'নির্জন রাস্তা, সেটা কি একটা প্রামাণ্য সত্য হলো না কি? এর মধ্যে কি এমন significance আছে?'

'নিশ্চয়ই বিশেষ রকম significant. আপনি হয় ত' ব্যাপারটাকে negative সূত্র হিসাবে ভাবছেন, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কথাটা আমার ভাববার মত কি না? দ্বিতীয় নম্বর গাড়ীর position.'

'গাড়ীর position।' বিস্মিত দৃষ্টি তুলে সুশান্ত বাবু তাকাল।

'নিশ্চয়ই। গাড়ীটাকে রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল। কেবল পাশের আলো দু'টো জ্বালান ছিল। কেন? কেন?'

'হয় ত' অনেক কারণে ঐ রকম করা হয়েছিল? হয় ত' খুনী তার কাজে কোন রকম বাধা পেয়েছিল।'

'তাহলে ওই ভাবে গাড়ীটাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে নিশ্চয়ই সে রাখত না। গাড়ীটাকে definitely park করা হয়েছিল।'

'এমনও ত' হতে পারে, গাড়ীর ইঞ্জিনের কোন গোলমাল হয়েছিল?'

'তাহলে নিশ্চয়ই সে গাড়ীটাকে ঠিক করবার অন্ততঃ চেষ্টাও করতো না কি? আমি সংবাদ নিয়েছিলাম, ঐদিন সকাল বেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ওদিক্‌কার কাঁচা রাস্তায়—বিশেষ করে যেখানে গাড়ীটা দাঁড় করান ছিল, সেখানে বেশ কাদা ছিল। অথচ আমি খুব ভাল করে শংকর ঘোষের পায়ের জুতো পরীক্ষা করে দেখেছি, জুতোতে কোথাও এতটুকু কাদা বা ধুলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। খট্‌খটে শুক্‌নো ছিল দু'পাটি জুতোই।'

'সত্যি? তা'হলে এর থেকে এই প্রমাণই হয়, লোকটা ওইখানে ইচ্ছা করেই গাড়ী দাঁড় করিয়ে কারও অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ঐ সময়, ঐ নির্জন রাস্তায় কার সংগেই বা সে দেখা করতে গেছিল? কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে ব্যাপারটা আগাগোড়াই!'

'কেন অদ্ভুত ঠেকছে আপনার? এমনও ত' হতে পারে, শংকর ঘোষ যার সংগেই দেখা করতে যাক না কেন, সে চেয়েছিল আগা-গোড়াই ব্যাপারটাকে অন্যের দৃষ্টি হতে গোপন রাখতে। তাই হয় ত' সে অমন সময় ঐ নির্জন রাস্তা বেছে নিয়েছিল, গোপন সাক্ষাতের সময় ও স্থান হিসাবে।'

'হাঁ। হাঁ। ঠিক্ এদিক্‌টা আমি একেবারেই ভেবে দেখিনি। কিন্তু এই সংগে এ কথাও ত' আমাদের ভুললে চলবে না সুব্রত বাবু, লোকটার চরিত্রে কোন রকম সন্দেহ জনক কিছুই ছিল না, এদিকে সে অনেক দিন ধরে আছে, অনেকের সঙ্গেই সে ছিল পরিচিত। এবং যত দূর জানা যায়, লোকটা ধীর শান্ত ও ভাল স্বভাব-চরিত্রেরই ছিল।'

'তার পর ধরুন তৃতীয় নম্বর, তারও বিশেষত্ব আছে। এ ক্ষেত্রে আরো একটা জিনিষ আমাদের বিবেচনা করে অবশ্যই দেখতে হবে, খুনী আচমকা শংকর ঘোষের জানবার বা বুঝবার আগে তাকে খুন [illegible] কি না? [illegible] তার যে [illegible] [illegible] আসছে, তা বুঝবার আগেই খুনী তাকে চরম আঘাত করে কি না? আমার কথাটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন মিঃ সেন?'

'মানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, নিহত হবার ঠিক আগে শংকর ঘোষের অবস্থাটা ঠিক কি ছিল? আপনি এক প্রকার ধরেই নিচ্ছেন, যে লোক বা লোকেদের সংগে শংকর ঘোষ ঐ সময় ঐ রাস্তায় দেখা করতে গেছিল, সে বা তারা তখন সেখানে শংকর ঘোষকে খুন করবার অপেক্ষাতেই ছিল?'

'না, ঠিক তা নয়। আমার কথার মানে ঠিক্ আপনি উপলব্ধি করতে পারেননি দেখছি।'

'কেন?'

সুব্রত এবারে সুশান্তর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে: সুশান্ত বাবু, crime জিনিষটাই আগাগোড়া বেজায় জটিল। অতি সূক্ষ্ম ভাবে, সব দিক্ লক্ষ্য রেখে আগাগোড়া সমস্ত কিছুই বিচার করতে হবে। আপনাকে ত' আগেই এইমাত্র বলেছি, এটা premeditated murder. গোড়াতেই যদি সে কথাটা আমার ভুলে যান, তবে হিসাবে আগাগোড়াই কেবল ভুল হবে। ধরুন, শংকর ঘোষ যদি এ কথা জানতই—যে লোক বা লোকেদের সংগে সে-রাত্রে ঐ জায়গায় সে দেখা করতে চলেছে, সে বা তারা তাকে খুন করতে চায়, তবে কি সে তার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হয়েই যেত না? কিন্তু আমাদের ঘটনা হতে প্রমাণ হয়নি কি, শংকর ঘোষের সংগে কোন প্রকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না? এক প্রকার ও-ধরণের কিছুর জন্য এতটুকু প্রস্তুত না হয়েই সে গেছিল! এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান, কাল, খুন করবার পদ্ধতি দেখে আমার মনে হয়, এমন কেউ শংকর ঘোষকে খুন করেছে, যার সংকল্পই ছিল যাতে করে খুনের সময় কেউ তাকে না দেখতে পায়; আর সেই জন্যই শংকর ঘোষকে ঐ জায়গা পর্য্যন্ত অনুসরণ করে গিয়ে গুলী করে।'

'তা কি করে সম্ভব, সুব্রত বাবু? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, শংকর ঘোষ গাড়ীর মধ্যে ছিল। এবং আপনার অনুমানই যদি সত্য বলে মেনে নিই, তবে নিশ্চয়ই শংকর ঘোষ তার অনুসরণকারী অন্য কোন গাড়ীর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এবং তাহলে সে কি একটু সন্দেহও করতো না?' বিস্মিত ভাবে সুশান্ত বলে।

আমার মনে হয় কি জানেন? অবিশ্যি এটাও আমার অনুমান বা ঘটনাকে সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করে mathematical calculationও বলতে পারেন, শংকর ঘোষ যে শুধু গাড়ীর শব্দই শুনেছিল তা নয়, দেখেছিলও। যদিচ এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার যাবো না যে, আততায়ী মোটর-বাইকে এসেছিল।'

'তাই না কি! কিন্তু কেন বলুন ত'?'

'অতি সোজা ব্যাপার! এই জন্য স্বীকার করতে চাই না যে, আপনি হয় ত' বলবেন, খুনী মোটর-বাইকে চেপে এসে রাস্তার ধারের ঝোপের পাশে শংকর ঘোষকে খুন করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। এবং তার পর হয় ত' তাতে করে চেপেই মাঠের মধ্যের পায়ে-চলার রাস্তা ধরে চলে গেছে। আসল কথা হচ্ছে, খুনী শংকর ঘোষকে হয় কোন লুক্কায়িত জায়গা হতে খুন করেছিল। যার মানে এই দাঁড়ায়, সে আগে হতেই জানত যে, শংকর ঘোষ ঐখানে আসবে ঐ দিন ঐ সময়। [illegible] এমনও হতে পারে, কোন যানে চেপে সামনা-সামনি এসে [illegible] ছুড়ে।'

'হাঁ, আপনার কথা ঠিক হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করি কি করে? তা ছাড়া, ঐ ভাবেই যদি তৃতীয় কোন আততায়ীর দ্বারাই শংকর ঘোষ নিহত হয়ে থাকে, তবে কার সংগে ঐ সময় ঐ স্থানে শংকর ঘোষ দেখা করতে গেছিল?'

'সেটা অবিশ্যি আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে মিঃ সেন!' সুব্রত হাসতে হাসতে বলে।

'কিন্তু একটা কথা আমি এখনো বুঝতে পারছি না সুব্রত বাবু, আপনার অনুমানই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ কোন ডাকাত বা চোর শংকর ঘোষকে খুন করেনি, চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে, তবে খুনী কি জন্য খুন করলে? 'মোটিভ্' কি? কেন সে খুন করলে?'

'মোটিভ্ অবিশ্যিই ছিল চুরি!...'

'বাঃ রে! একটু আগে ত' আপনি অন্য ধরণের কথা বলছিলেন?'

'না, আপনার বোঝবার ভুল মিঃ সেন, ও-কথা আমি কখনো বলিনি। আমি কেবল বলেছিলাম, কোন চোর বা ডাকাত এসে শংকর ঘোষকে খুন করেছে, তা সত্যিই নয়। তার মানে এ কথনই নয় যে, খুনী পরে কিছু চুরি করেনি!'

'আচ্ছা সুব্রত বাবু, আর একটা কথা। আপনি যেমন অনুমান করছেন যে, খুনী আগে থাকতেই সংকল্প করে খুন করেছে, সে ক্ষেত্রে আমি ধরে নিতে নিশ্চয়ই পারি, খুনী শংকর ঘোষকে বেশ ভাল ভাবেই জানত, এবং সে কখন্ কোথায় যায়, কি করে না করে সবই জানত! বেশ, তাই যদি হয়, তবে এ কথা নিশ্চয়-ই আপনি আমাকে বলতে পারবেন, খুনী কি এমন কোন জিনিষের অস্তিত্ব জানত যা সেই সময় শংকর ঘোষের কাছে ছিল, যার জন্য সে শংকর ঘোষকে শেষ পর্য্যন্ত খুন করতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি?'

সুব্রত না হেসে আর থাকতে পারলে না, সুশান্তর কথায়।

'বাঃ, কি চমৎকার চিন্তাশক্তি আপনার মিঃ সেন! সেটা যখন আপনি জানতে পারবেন, খুনী যে কে, সে রহস্যও আপনার চোখের প'রে আলোর মত ভেসে উঠবে পরিষ্কার হয়ে। শুনুন, আলোচনা অনেক করা গেছে, তর্কে শ্রীকৃষ্ণ মিলবে না। আপনাকে আমি বর্ত্তমানে দু'টো কথা স্মরণ রাখতে বলছি। ১ নং হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জামার পকেটগুলো কেউ হাতিয়ে গেছে, এবং তার পকেটে কোন পার্স বা ডাইরী কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু নীচের একটা পকেটে গোটা দশেক টাকা নোটে ও খুচরাতে মিলিয়ে ছিল। বাঁ হাতে একটা সোনার ব্যাণ্ড সমেত দামী সোনার রিষ্টওয়াচও ছিল, সেটা তখনও চলছিল। দ্বিতীয় নং আপনিই আমাকে বলেছেন, আপনি শংকর ঘোষের জিনিষ-পত্র খুঁজতে খুঁজতে তার বাক্সর মধ্যে না কি একটা 'পাস'-বই পেয়েছেন, তাতে জানা যায়, শংকর ঘোষ গত কয়েক মাস হতে যা তার মাহিনা তার চাইতে ঢের বেশী টাকা প্রতি মাসে পাস বইতে জমা দিয়ে আসছিল। কোথা হতে লোকটা অত বেশী টাকা পাচ্ছিল?'

'হাঁ, তার অনুসন্ধানও আমি করছি। আশা করছি, শীঘ্রই কিছু না কিছু জানতে পারবো। তা'হলে আপনার অনুমানে খুনী টাকার জন্য শংকর ঘোষকে খুন করেনি?'

'হাঁ, টাকার জন্য খুনী খুন করেনি।'

'আচ্ছা, এ ছাড়া আর কিছু আপনি আমাকে বলতে পারেন না, সুব্রত বাবু?'

'না। ভাল করে আমার কথাগুলো আগাগোড়া চিন্তা করে দেখুন গে, তা'হলেই জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন, কোন পথে কি ভাবে এগুলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে আসবে। আচ্ছা, এবারে তাহলে আসুন, অনেক বেলা হলো।'

এক প্রকার যেন জোর তাগিদ দিয়েই সুব্রত সুশান্তকে ঘর হতে ঠেলে বের করে দিল।

ক্রমে সুশান্তর জুতোর শব্দ সিঁড়ি দিয়ে মিলিয়ে গেল।

সুজিত এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনের কথা-বার্ত্তা শুনছিল। সুশান্ত ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই বললে, তোর কথার হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে সুব্রত, এই খুন সংক্রান্ত ব্যাপারের অনেক কিছুই যেন তুই জানিস্? খুনী কে, তাও জানিস্ না কি রে?'

'জানাটাই ত' আমাদের কাজ। অসাধ্য বলে কোন কিছু জিনিষই এ পৃথিবীতে নেই সুজিত। কিরীটির সংগে যদি কখনো কোন রহস্যের তদন্তে তুই থাকিস্ কখনো, তবে বুঝতে পারবি, কি চুলচেরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তার। কেমন ধীরে ধীরে অংকের দুরূহ কঠিন প্রবলেম নিষ্পত্তি করবার মত সে এ জিনিষগুলোরও নিষ্পত্তি করে দিত! তুই হয় ত' শুনলে অবাক্ হয়ে যাবি, খুনী কে, তাও আমি জানতে পেরেছি।'

'সে কি! খুনী কে, তুই তা জানিস্?'

'বোধ হয় ত' জানি।'

'তবে ধরিয়ে দিচ্ছিস্ না কেন?'

'খুনী বলে এক জনকে শুধু ধরিয়ে দিলেই ত' হবে না, সেটাকে আমার facts and figures দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ত'?'

'আহা, তা যেন হলো, বেচারী সুশান্ত বাবু অন্ধকারে মাথা ঠুকে মরছে, তাকে অন্তত একটু hints দিলি না কেন? হয় ত' তার কাজের সুবিধা হতো অনেক তাতে।'

'প্রচুর hints দিয়েছি। বুদ্ধি থাকলে ওর থেকেই ও অনেক কিছু মীমাংসায় আসতে পারবে। ওর বেশী বললে ও হয় ত' তাড়া-হুড়া করে সব কিছু কাঁচিয়ে দেবে, ফলে আমার এই কয় দিনের কাজ ও পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।'

'তাহলে তুই এই রহস্যের তদন্ত করছিস্ বল?'

'হাঁ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, জড়িয়ে পড়েছি যে, এ কথাটা অস্বীকার করি কি করে আজ।'

[ক্রমশঃ।

লুচিস্থানের ইতিহাস

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

লুচি দিয়ে দেশটা যে গড়েছিনু সেবারে
সেখানের সব লুচি খেয়ে গেল দেদারে,
খেয়ে গেল যত সব বৌদ্ধ ও খৃষ্টান;—
তাই বলে তার নাম হোলো বেলুচিস্থান।

সৎকাজ বিফলে যায় না

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা। আরব দেশে এক রাজা ছিলেন—সেই রাজার ছিল বাসাদ নামে এক ছেলে। এ রকম ছেলে সচরাচর দেখা যায় না—সমবয়সীদের সাথে প্রাণ ঢেলে আমোদ-আহ্লাদে যেমন সে যোগ দিত, তেমনি দুঃখীর দুঃখেও তার সমবেদনার অবধি ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি ও সাহস অসাধারণ ভাবে বেড়ে উঠল। খোঁয়াড়ে আবদ্ধ দুরন্ত আরবী ঘোড়ার মত তার মন সর্বদাই অজানা দেশের রহস্য জানবার জন্য ছটফট করত। তাদের বাড়িতে নানা দেশের কত সওদাগর মাঝে-মাঝে এসে উপস্থিত হতেন। বাসাদ তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের ধন-দৌলত এবং অদ্ভুত কাহিনীর বিষয় যতই শুনতে লাগল, ঐ সকল দেশ দেখার আগ্রহও তার ততই বেড়ে চল'ল।

এক দিন সে একাকী দেশ ভ্রমণে বার হবার জন্য পিতা-মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করল। পাছে তাঁদের একমাত্র পুত্র মনে আঘাত পায়, সে জন্য তার মাতা-পিতা মনে মনে অশান্তি বোধ করলেও বাসাদের অনুরোধে রাজী হলেন।

বাসাদ মা-বাবাকে অভিবাদন করে বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক দিন সে ক্রমাগত চলেছে—সাহস দেখানর মত কিছুই তার চোখে পড়ল না। এক দিন সে কয়েক জন মুসাফিরের কাছে শুনতে পেল যে, সেখান থেকে অনেক দূরে এক সুলতানের রাজ্য। সেই সুলতানের একটি কন্যা আছে, যার মত রূপসী কন্যা পৃথিবীতে আর নাই। কত দেশের কত-শত রাজপুত্র ঐ কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য উৎসুক হয়ে সেখানে গিয়ে সুলতানের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে শেষে ঐ নিষ্ঠুর সুলতান সুমানের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। কন্যার পাণিপ্রার্থী রাজকুমারকে সুলতান কয়েকটি কঠিন কাজ করতে দেন; যে রাজপুত্র সেগুলির সমাধান করতে পারবেন তাঁর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে—যিনি অপারগ হবেন তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ যাবৎ কেহই এ পরীক্ষায় উৎরাতে পারেননি।

এই অদ্ভুত সংবাদ শুনে বাসাদের প্রাণ আনন্দে মেতে উঠল। এত দিন পরে সে সত্যই একটি কাজের মত কাজের সন্ধান পেয়েছে। সে তখনই তার আগের মতলব ত্যাগ করে মরুভূমির ভিতর দিয়ে সুলতান সুমানের রাজধানীর দিকে রওনা হল।

এই নতুন পথে চলা সুরু করার তিন দিনের মধ্যে তেমন কিছুই তার চোখে পড়ল না—চার দিনের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে সে একটি মরুদ্যানে এসে পৌঁছল—সেখান থেকে চার দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, মরু-বালি ভিন্ন গাছ-পালা বা ঘাস-পাতা কিছুই দেখা যায় না। কাজেই সে রাত্রিবাস করার জন্য ঐ জায়গায় থাকা স্থির করল। সে তার ঘোড়া থেকে নেমে মরুদ্যানের এক পাশে একটি খেজুর গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বিছানা পেতে নিল। বুদ্ধিমানের মত বাসাদ বাড়ি থেকে বের হবার সময় কয়েক দিন চলার মত খাদ্য-পানীয় সঙ্গে এনেছিল। সুতরাং এখন পর্যন্ত খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে তার কোনই চিন্তা ছিল না। এখানে বসে সে যেমনই খাবার উদ্যোগ করছে—তখন সে দেখতে পেল, কিছু দূরে চকচকে বালির মধ্যে ঠোঁট দিয়ে কতকগুলি পায়রা খাবারের চেষ্টা করছে। কিন্তু এই মরুভূমির মধ্যে খাবার পাবে কোথায়? এদিকে অপরিচিত লোকটির নিকটে আসতেও তাদের সাহস হচ্ছিল না। পায়রাগুলির দুর্দশা দেখে সহৃদয় বাসাদের প্রাণে করুণার উদ্রেক হল। সে তৎক্ষণাৎ কয়েকখানি রুটি গুঁড়ো করে পায়রাদের সামনে ছিটিয়ে দিল—পায়রাগুলি তখন মহা আনন্দে খুঁটে-খুঁটে খেতে সুরু করল। বাসাদের এই ব্যবহারে একটি পায়রা সাহসে ভর করে উড়ে এসে তার কাঁধের উপর বসল। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পায়রাটি মানুষের স্বরে আস্তে আস্তে বাসাদের কাণের কাছে বলল—"অসংখ্য ধন্যবাদ! আমাকে এবং আমার অনুচরদিগকে আপনি অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। হয়ত আমিও কোনও না কোনও সময়ে আপনার উপকারে আসতে পারি। আমার ডান দিকের পাখা থেকে আপনি একটি পালক ছিঁড়ে রাখুন। যদি কখনও দরকার হয় তবে এই পালকটি দুই আঙুলের মধ্যে রগড়াবেন—তাহ'লে তখনই আমরা আপনার সাহায্যের জন্য এসে হাজির হব।"

এই কথা বলেই পাখী আকাশে উড়ে গেল—অপর পায়রাগুলিও তার অনুগমন করল। বাসাদ পালকটি নিয়ে সযত্নে তার কোমর-বন্ধের মধ্যে রেখে দিল এবং মনে মনে বলল—কে জানে, এর দ্বারা এক দিন আমার কত উপকার হতে পারে। তার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরদিন সকালে যখন জেগে উঠল, তখন দিগন্তে উষার রঙের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাসাদ সকাল সকাল ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল। দিনের পর দিন যায় কিন্তু মরুভূমির পথ যেন আর ফুরায় না। এদিকে তার ঘোড়াও ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; তার সাথে যে খাবার ছিল, তাও ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। এইরূপ অবস্থায় সে এক দিন সন্ধ্যায় বিশ্রামের আয়োজন করছে এমন সময় দূরে একটি হাতী দেখতে পেল। হাতীটি তার দিকে আসছে তবে তার চেহারা বড় কাহিল দেখাচ্ছিল—হাতীটি করুণ চোখে বাসাদের দিকে চেয়ে কিছু খাবার চাইছে মনে হল। বাসাদ কোনরূপ ভয় না পেয়ে তাড়াতাড়ি তার যে সামান্য খাবার ছিল তার অর্দ্ধেকটা হাতীকে খেতে দিল। হাতী ঐ খাবারটুকু খেয়ে আবার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকায় বাসাদ সামান্য একটু টুকরো রেখে অবশিষ্ট সব খাবারটুকুই হাতীকে খেতে দিয়ে বলতে লাগল—"খাবার তো আমার নিঃশেষ হয়ে গেল, জানি না, এর পর কিরূপে এই মরুপথে আমার প্রাণ রক্ষা করব।" মনে হল, হাতী এই কথা বেশ বুঝতে পারল—কারণ সে তখন বাসাদের সামনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে বিনীত ভাবে শুঁড় নেড়ে অভিবাদন জানাতে লাগল এবং মানুষের ভাষায় বলতে লাগল—"হে সজ্জন, তুমি আমার বিপদে যেরূপ দয়া দেখিয়েছ তার জন্য আমি তোমার নিকট অতিশয় ঋণী। আমার লেজ থেকে একটি লোম নিয়ে রাখ এবং যদি বিপদে পড় তবে এটি রগড়ালে আমি এসে সাধ্যমত তোমার সাহায্য করব।" বাসাদ হাতীর এই কথা শুনে একটি লোম নিয়ে যত্ন করে সেই পালকের সঙ্গে কোমরবন্ধে রেখে দিল। হাতীও যে পথে এসেছিল অন্ধকারের মধ্যে সেই পথে চলে গেল। রাজপুত্র তখন মাটির উপর শুয়েই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রাতে সে আবার তার যাত্রা সুরু করল, কয়েক দিন চলার পর এক দিন সে দূরে একটি খাড়া পর্বতশ্রেণী দেখতে পেল

এই পর্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত মরুভূমি এসেছে এবং এর অপর পার থেকেই আরম্ভ হয়েছে সুলতান হুমানের রাজ্য। মরুভূমির মধ্যে বহু দিন চলায় তার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তার নিজের রসদও নিঃশেষ হয়ে এসেছে—সুতরাং সে ঠিক করল, এই সন্ধ্যার মধ্যেই পর্বতশ্রেণীর নিকট লোকালয়ে তার পৌঁছান চাই ই। এই ভেবে সে যথাসাধ্য জোরে তার ঘোড়া ছুটিয়ে চল্‌ল। বাসাদ পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটির পিঠ চাপড়িয়ে একটু আদর করে তার কাছে যে সামান্য কয়েক ফোঁটা পানীয় ছিল তা মুখে দিতে যাচ্ছে এমন সময় পাহাড়ের ভিতর থেকে অদ্ভুত একটি কোলাহল তার কাণে গেল। সে তখনই ছুটে পাহাড়ের দিকে গেল এবং কোন্ দিক থেকে শব্দ আসছে তার খোঁজ করতে করতে একটি গুহা দেখতে পেল। গুহার মধ্যে প্রকাণ্ড হাফরে বড় বড় লৌহখণ্ড গরম করে রাক্ষসের মত চেহারায় এক দল লোক নেহাইএর উপর সেগুলি প্রকাণ্ড হাতুড়ী দিয়ে পিটাচ্ছে। তারা এত মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে যে, বাসাদের উপস্থিতি তারা টেরই পায় নাই। বাসাদ চারিদিক্ চেয়ে দেখল, হাতুড়ী দিয়ে বড় একখণ্ড লৌহে আঘাত করবার সময় তা থেকে একখণ্ড ছুটে এসে একটি রাক্ষসের বাহুতে লেগে কেটে গেছে এবং অজস্র রক্ত পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে বাসাদ ভয় ভুলে গিয়ে এই আহত লোকটির শুশ্রূষার জন্য তার কাছে ছুটে গেল। সে ক্ষতস্থান ভাল করে দেখে পরিষ্কার করে তার নিজের শাল ছিঁড়ে বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করে দিল এবং তার কাছে যে সামান্য কয়েক ফোঁটা পানীয় ছিল তা আহতকে খেতে দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল।

রাক্ষসের মত লোকগুলি এতক্ষণ বিস্মিত ভাবে বাসাদের কাজ দেখছিল। বাসাদ চলে যাবার উপক্রম করতেই তারা তার চারি পাশে ঘিরে দাঁড়াল এবং করমর্দন করে তাকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। তার পর রাক্ষসদের মধ্যে এক জন যুবককে সুন্দর একটি লোহার শিঙা উপহার দিয়ে বলল—"এই শিঙাটি যত্ন করে রেখে দিও। যদি কখনও আমাদের সাহায্য দরকার হয় তবে এই শিঙাতে ফু দিয়ে শব্দ করলেই আমরা অবিলম্বে তোমার সাহায্যার্থে উপস্থিত হব।"

বাসাদ মনের আনন্দে তার ঘোড়াটির কাছে গিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করল। শুয়ে পড়ে তার এই কয় দিনের অভিজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ভোরেই রওনা হয়ে বিকালের দিকে সুলতান হুমানের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। সন্ধ্যা-সূর্য্যের রক্তিম আভা প্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল্ করছিল। প্রাসাদের চার পাশে সুগন্ধি পুষ্পভরা উদ্যান, তার পরেই সুন্দর সবুজ ঘাসের মাঠ দূর-দিগন্তে মিশে গেছে। এগিয়ে গিয়ে প্রাসাদের চার পাশে যে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রাচীর আছে তার দিকে চোখ পড়তেই বাসাদ দেখতে পেল যে, প্রাচীরের যে অংশ চূড়ার আকারে উঁচু হয়ে উঠেছে তার স্বর্ণচূড়ায় নানা রঙের চুলযুক্ত অসংখ্য মাথা মালার আকারে সাজান রয়েছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে তার অন্তরাত্মা এই দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠল—তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এই মাথাগুলি রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী কত হতভাগ্য নিরীহ রাজপুত্রের!

সন্ত্রস্ত হ'য়ে বাসাদ তার ঘোড়া থামিয়ে দিল। তার মনের অদম্য বল ক্ষণেকের জন্য যেন উবে গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সাহসে ভর করে সুলতানের সিংহদ্বারে গিয়ে হাজির হ'ল। সুলতানের নিকট পৌঁছালে সে তার আগমনের কারণ নিবেদন করল। সুলতান বললেন—"হে যুবরাজ তুমি হয় ত' জান না যে, এই প্রচেষ্টায় তোমার মাথা খোয়া যেতে পারে?"

"আমি এ কথা ভাল ভাবেই জানি, তাই আমি চাই যে, আপনি শীঘ্রই আমাকে আপনার পরীক্ষা করতে দিন।" বাসাদ বলল। বেচারা বাসাদ ভেবেছিল যে, তার সাহসিকতা এবং শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ তার শারীরিক শক্তি ছিল অসাধারণ এবং সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রেও তার দক্ষতা ছিল অনন্যসাধারণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপার দাঁড়াল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

সুলতান যুবককে তাঁর দুর্গ-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাঁচ-মিশালী শস্যের একটি প্রকাণ্ড গাদা ছিল—ধান, যব, গম, জোয়ার, জই, ভুট্টা, মাষকলাই, মটর, মুগ, অরহর, খেঁসারি, ছোলা, তিল, গোবর্গোটা, সরিষা, রাই, তিসি প্রভৃতি সকল শস্যই সেই গাদার মধ্যে মিশান। সুলতান বাসাদের দিকে চেয়ে বললেন—"হে রাজপুত্র, তোমার পরীক্ষা হচ্ছে, এই গাদার ভিন্ন ভিন্ন শস্য আজ রাত্রির মধ্যেই পৃথক্ করা।" তার পর দাড়ি নেড়ে বললেন, "কাল ভোরের মধ্যে এই কাজ শেষ না হলে প্রাতর্ভোজনের সময় তোমার গর্দান লওয়া হবে।"

সুলতানের এই কথা শুনে বাসাদ যার-পর-নাই ভয় পেয়ে গেল। তবুও সে কাজে হাত দিবে ভাবল। সেই রাক্ষুসে গাদার নানা রকমের শস্য পৃথক্ করার কথা সে যতই চিন্তা করে ততই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসে। ছেলে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে আর যদি বাড়ি না ফেরে তবে পিতার মনে কিরূপ আঘাত লাগবে সেই চিন্তায় বাসাদ মুসড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে, মরুভূমির মধ্যে পাখীটি বলেছিল—দরকার হলে সে তাকে সাহায্য করবে। এই কথা মনে পড়া মাত্রই সে সেই পায়রার পালকটি দুই আঙুলের মধ্যে নিয়ে রগড়াল। আশ্চর্য্য ব্যাপার! রগড়ান মাত্রই সোঁ-সোঁ শব্দ শোনা গেল এবং দেখতে দেখতে অসংখ্য পায়রা এসে এই প্রকাণ্ড শস্য গাদার চার পাশে ব'সে এক-এক দল এক-এক প্রকার শস্য ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে পৃথক্ পৃথক্ গাদা করে রাখতে লাগল। ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ঐ পাহাড়ের মত গাদা নিঃশেষে বাছা হয়ে গেল। এই দেখে বাসাদ গদ-গদ চিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল এবং ভাবল—"ভাল কাজের ভাল ফলই হয়।" এই সময় পায়রাদের মধ্যে একটি উড়ে এসে রাজপুত্রের কাঁধের উপর বসে বলল—"তুমি খুসী হয়েছ আমাদের কাজে?" বাসাদ আদরের সঙ্গে পায়রাটির গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—"হে পাখি! আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর—আমি তোমাদের এই উপকারের কথা কখনও ভুলতে পারব না।" পাখীটি কয়েক মিনিট বাসাদের এই আদর পেয়ে আকাশে উড়ে গেল—অপর পাখীরাও তার অনুগমন করল। তার পর বাসাদ মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ল এবং বেশ খানিকটা বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে নিল।

সুলতান হুমান খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন যে, সে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে। তার পর সব চেয়ে তাঁর বেশী আশ্চর্য্য লাগল যখন দেখলেন যে, যুবক তার কাজ উত্তম ভাবে সম্পন্ন করেছে। তিনি মনে মনে খুসী হলেও মনের ভাব চেপে রেখে বললেন—"তুমি

আশাতীত ভাবে কাজটি শেষ করেছ। এখন আমার সঙ্গে এস—খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর—সন্ধ্যায় আজ তোমাকে দ্বিতীয় কাজটির ভার দিব।"

সত্য সত্যই বাসাদকে সুসজ্জিত দুর্গ-কক্ষে নিয়ে গিয়ে চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা করা হল। বাসাদ এত আতিথেয়তার মধ্যেও কেবলি তার দ্বিতীয় পণের কথাই ভাবতে লাগল। বিকালে সুলতান তাকে তাঁর সুরম্য উদ্যানের মধ্যে নিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড দীঘি দেখিয়ে বললেন—"এই রাত্রির মধ্যেই তুমি এই পুকুরটি শুকিয়ে ফেলবে—যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে পুকুরের জল নিঃশেষে ফেলে দিতে না পার—তোমার গর্দান যাবে।"

এই কাজের ভার পেয়ে বাসাদ এবার তত বিচলিত হল না—কারণ, হাতীর কথা তার মনে পড়ে গেল। অন্ধকার হ'য়ে এলে বাসাদ সেই হাতীর লোমটি রগড়াল। সঙ্গে সঙ্গে থপ্-থপ্ শব্দ শুনা যেতে লাগল এবং দেখতে দেখতে ৫০০ হাতী এসে পুকুরের চার পাশে দাঁড়াল। হাতীরা যেন বাসাদের উদ্দেশ্য আগে থেকেই বুঝতে পেরে প্রকাণ্ড শুঁড় দিয়ে দীঘির জল শোষণ করে বাইরে ফেলতে আরম্ভ করল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পুকুরের জল তোলা হয়ে গেল এবং পুকুরে আর এক ফোঁটা জলও অবশিষ্ট রইল না। তখন একটি হাতী এসে বাসাদকে শুঁড় দিয়ে অভিবাদন করে বল'ল—"যুবরাজ, আশা করি, আমাদের কাজে তুমি খুসী হয়েছ?"

বাসাদ হাতীর শুঁড়ে আদরের সঙ্গে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—"তোমাদের কাছে আমি খুবই ঋণী, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" "এখন বুঝলে, সৎকাজ কখনও বিফল হয় না"—এই বলতে বলতে হাতীটি চলে গেল। দলের অপর সব হাতীও তার অনুগমন করল। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত রাত্রির সেই নীরব নিস্তব্ধতা বাসাদের ভারী ভাল লাগল। সে মনের খুসীতে শুকনা পুকুরের তলদেশে নেমে তার ঠাণ্ডা উপভোগ করতে লাগল। তার এত আনন্দ হল যে, সেই মাটির উপর বসেই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে সুলতান বাসাদের এই অদ্ভুত পণরক্ষা দেখে যার-পর-নাই বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং তাকে সানন্দে ডেকে পূর্বদিনের মত আহারাদির ব্যবস্থা করে দিলেন।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সুমান তাঁর অতিথিকে ডেকে নিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় গেলেন। সেখানে স্তূপীকৃত ইট-কাঠ-চুণ-সুরকী প্রভৃতি বাসাদকে দেখিয়ে সুমান বললেন—"আজ রাত্রির মধ্যে তুমি এইগুলি দিয়ে আমার প্রাসাদের মত বড় একটি প্রাসাদ রচনা করে দিবে। যদি তা না পার তবে কাল সকালে ঘাতকের হাতে তোমার প্রাণ যাবে। আর যদি এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পার, তবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী রাজকন্যাকে তুমি পত্নীরূপে লাভ করবে।"

বাসাদের সেই রাক্ষসদের কথা মনে ছিল, সুতরাং সে জবাব দিল—"হে সুলতান, আপনি আপনার যায়গায় যান—আমাকে কাজে লাগতে দিন। মনে হয়, আমি এই কার্য্য সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন করতে পারব।"

সুলতান চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাসাদ তার শিঙ্গা মুখে দিয়ে ফুঁ দিল। একটি অদ্ভুত শব্দ হল এবং সেই শব্দ মিলিয়ে যাবা'র সঙ্গে সঙ্গে কাঠের গাদার পিছন থেকে সহসা এক জন রাক্ষসাকৃতি লোক এসে বাসাদের সম্মুখে দাঁড়াল। রাক্ষসটি বিনম্র অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করল—"হে বন্ধু, কোন্ প্রয়োজনে তুমি আমাদের স্মরণ করেছ? আমরা তোমার জন্য কি করতে পারি, বল?" বাসাদ বলল—"এই যে ইট-কাঠ দেখছ, এগুলি দিয়ে আজ রাত্রের মধ্যেই ঐ রাজপ্রাসাদের মত একটি বাড়ি তৈরী করে না দিতে পারলে কাল ভোরেই আমার প্রাণ যাবে। হে বন্ধু, এ বিষয় তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার?"

রাক্ষস হেসে বলল—"শুধু এইটুকু কাজ—আর তা হলেই তোমার জীবন রক্ষা পাবে!" সে তৎক্ষণাৎ তার অনুচরদিগকে ডাকল। তারা মুহূর্ত্তের মধ্যে এসে কাজ আরম্ভ করে দিল। বাসাদ সবিস্ময়ে তাদের কাজ দেখতে লাগল। ঠুক, ঠাক, চড়াৎ, টুং, টাং, চং, ঢাং নানারূপ শব্দ হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে ভিৎ তৈরী হয়ে গেল, দেয়াল উঠল—ছাদ ও গম্বুজ তৈরী হল এবং রাত্রি প্রভাত হবার আগেই সুলতানের প্রাসাদের চেয়েও সুন্দর সুরম্য ভবন নির্মিত হল। সমস্ত দেয়াল ও দরজা থেকে নয়নস্নিগ্ধকর রং ঝলমল করতে লাগল। দরজা এবং জানালায় নানা স্থানে এবং গম্বুজের চূড়ায় সোণা ও রূপার কাজ অপূর্ব শোভা ধারণ করল। সব পরিপাটি ভাবে শেষ করার পর একটি রাক্ষস বাসাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—"কেমন যুবরাজ, আমরা তোমার কথা রাখতে পেরেছি তো?" যুবরাজ বল'ল—"হাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এতে কি আর সন্দেহ আছে। তোমরা আমার মান এবং প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমাদের কাছে আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম।" রাক্ষস আবার বল'ল—"তুমি যেমন তোমার শেষ সম্বল দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলে, সে কথা কি আমরা কখনও ভুলতে পারব! তোমার যখনই দরকার হবে আমাদের স্মরণ করলেই আমরা তোমার কাছে আসব।" এই বলে বাসাদের দিকে বিনয়নম্র দৃষ্টিপাত করে রাক্ষস তার দলবল সহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র বাসাদ তখন প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করে সুসজ্জিত একটি কক্ষে সুরম্য একটি পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে পড়ল। বাসাদের আজ এত সুনিদ্রা হ'ল যে সকালে সুলতান নিজে এসে ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গলেন।

সুলতানের প্রিয় অনুচর সকালে উঠে যখন তাঁকে তাঁর প্রাসাদের সামনের বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত এই নূতন প্রাসাদের খবর দিল, তখন সুলতান যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁর কন্যাকে রাজোচিত অথচ অনাড়ম্বর বেশভূষা পরিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাসাদের সহিত সাক্ষাৎ করতে চললেন।

বাসাদও রাজকন্যার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেই দিনই মহা আড়ম্বরে রাজকন্যার সঙ্গে বাসাদের বিবাহ হয়ে গেল। রাজ্যের সকল গুণী-জ্ঞানী ধনী-মানী-আমির-ওমরাহ বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়ে বাসাদের সৌভাগ্য ও শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।

পূরা এক সপ্তাহ ধরে রাজপ্রাসাদে উৎসব অনুষ্ঠিত হল। তার পর উপযুক্ত অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রাজকন্যাসহ বাসাদ নিজের রাজ্যে রওনা হলেন। সুলতান বেন সুমান তাঁর সমস্ত সভাসদ্ নিয়ে তাঁর রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত নবদম্পতীকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসাদের মাতা-পিতা অপরূপ রূপসী রাজকন্যা লাভ করে তাঁদের পুত্রকে দেশে ফিরতে দেখে অপার আনন্দে নিমগ্ন হলেন। যুবরাজের অসীম সাহসিকতা ও সদ্গুণের সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্তিতে রাজ্যশুদ্ধ সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল।*

---

* মূল জার্মান হইতে অনূদিত

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বোঝার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

১
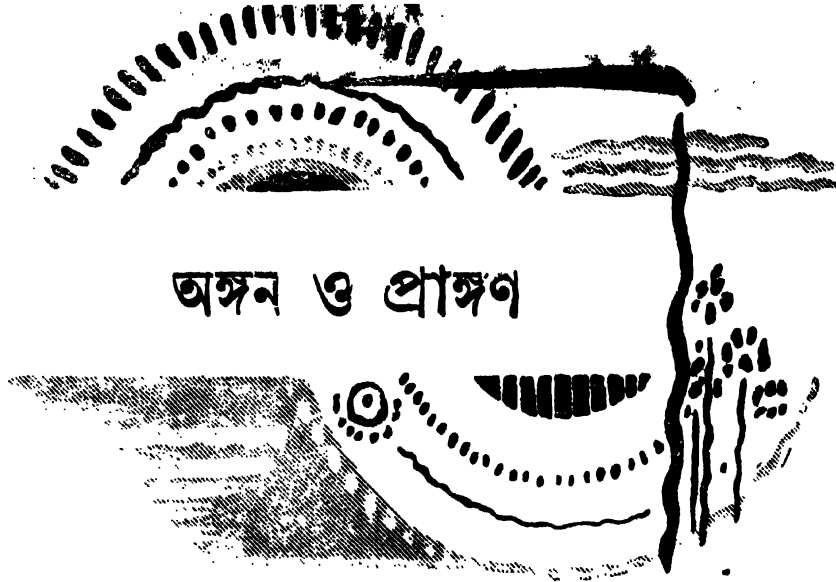
বাবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, একটি অচেনা গলা শুনতে পেয়ে ঢুকব কি ঢুকব না ভাবতে ভাবতেই বাবা ডাকলেন, মা সুমিতা ঘরে এসো, একে কিছু মাত্র লজ্জা কোরো না মা, ও যে অসিত।

বাবার পরিচয় দেওয়া শুনে উনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আহা, অসিত নামটা তো শুধু একা আমার নয়—আরো অনেকের আছে, ভালো করে পরিচয়টা দিন।

আমি একটু হেসে তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনিও করলেন। বাবা বললেন, মা সুমি, আমাদের একটু চা খাওয়াতে পারো? বললাম, বেলা যে দশটা হ'ল বাবা—মা আবার বকবেন। বাবা হেসে বললেন, না রে না, তুই আনলে কিছু বলবেন না।

চাকরটাকে চায়ের জল দিতে বলে এসে আবার ঘরে ঢুকলাম। আমি চিরকালই একটু লাজুক ধরণের ছিলাম, চট্ করে অচেনা লোকের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। অসিত বাবু নিজে থেকেই শুধোলেন, আপনি পড়েন না বুঝি?

বললাম, হাঁ, এটা আমার ফার্স্ট ইয়ার।

চাকর চায়ের সরঞ্জামগুলো দিয়ে গেল। চা তৈরী ক'রে ওঁদের দু'জনকে দিয়ে নিজেও এক পেয়ালা নিলাম। ঘরের পর্দা সরিয়ে দমকা হাওয়ার মত আমার বন্ধু অনিতা ঘরে ঢুকেই না বলে আমার চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বললে, সুমি, রাগ করলি ভাই? আমি মৃদু কণ্ঠে তার দিকে চেয়ে বললাম, ঘরে এক জন ভদ্রলোক রয়েছেন—দেখতে পাচ্ছিস্ নে?

অনিতা ছিল সেই জাতের মেয়ে যারা অসংখ্য পুরুষের মাঝে পড়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে না। অসিতের উপস্থিতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই আমার কানের কাছে মুখ এনে অনিতা স্পষ্ট ভাষায় বললে, তোর লাভার? কৃত্রিম কোপের প্রলেপ মাখিয়ে মুখ লাল ক'রে বললাম, দূর, তুই ভারি অসভ্য হয়েছিস্ অনি! উনি শুনতে পেলে কি ভাবতেন বল্ তো?

মনে মনে আনন্দ লাভ করতেন আর আমায় আশীর্বাদ [illegible]।

আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলাম, উনি হাসিমুখে অনিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

অনিতা হাসতে হাসতে বাবার চেয়ারের হাতলের ওপরে গিয়ে বসে হাত দু'টি জোড় করে বললে, প্রণাম—আমি যেচে আলাপ করছি কিছু মনে করবেন না যেন। সবাই বলেন আমি না কি বড় বাচাল।

অসিত বাবুও হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, আমি বাচাল মেয়ে খুব ভালবাসি। আমার একটি বোন আছে ঠিক আপনার মত, আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন তো?

কি বলে আবার—অনী বলে আমায় সবাই ডাকে, আমায় কেউ মান্য করে কথা বললে আমার ভারী হাসি পায়।

অসিত বাবু হেসে বললেন, বেশ তো, তাই বলে ডাকা যাবে।

অনিতা বাবার দিকে ফিরে বললে, জেঠামণি, কাল তোমায় কি বলে গিয়েছিলাম মনে আছে? নেই ত? সে আমি তখনি জানি যে তুমি ভুলে বসে আছ। আচ্ছা জেঠামণি, বলো ত, তুমি ওকালতী কি ক'রে করো?

বাবা হেসে বললেন,—কিছু ভুলিনি রে কিছু ভুলিনি। আজ তোর জন্মদিন—তোর সঙ্গে বাজার করতে যেতে হবে। মা সুমি, গাড়ীটা বার করতে বলে দে তো।

আমি বাইরে গিয়ে গাড়ী বার করতে বলে আবার ঘরে ঢুকতে অনি ব'লে উঠল, কি রে, আবার ঘরে ঢুকলি কেন? যা, কাপড় বদলে আয়।

আমি বাবার পড়বার টেবিলটা ভালো করে গুছোতে গুছোতে বললাম, না—আমার কলেজ রয়েছে।

আহা, আমারও তো কলেজ রয়েছে—এক দিন না হয় কলেজ কামাই করলি বাপু। বন্ধু বন্ধুর জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়—আর তুই আমার জন্যে একটি দিন কলেজ কামাই করতেও পারিস্ না মিতা?

ঘাড় নেড়ে বললাম, কলেজ কামাই করলে মিস্ সেন বড় রাগ

করেন। তোমরা যাও না। বাপু—আমায় নিয়ে টানাটানি করো কেন?

বেশ, না যাবি তো বয়েই গেল। জানি নে বাবা, এত টীচার-প্রীতি তোর কবে থেকে হোলো। বেদ-পুরাণের যুগের অনেক উৎকৃষ্ট গুরুভক্তির কথা শুনেছি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তুই যে টীচার-প্রীতির নিদর্শন দেখালি, তার তুলনা মিলবে না কোন কালেই। চলো জেঠামণি; আপনিও চলুন—আপনাকেও আমি নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের সঙ্গে যাবেন? অবশ্য যদি কোন কাজ না থাকে।

নাঃ, কাজ আর কি—বলে অসিত বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

২

কলেজ থেকে ফিরে বইগুলো র‍্যাকের ওপরে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে লাগলাম।

লোকে আমায় সুন্দরী বলে—আর সেটা কিছু মিথ্যে বলে না। সুন্দরী বলে আমার নিজেরও যথেষ্ট গর্ব্ব ছিল। কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারি নে, যেখানে আমি ও অনিতা দু'জনেই থাকি—সেখানে লোকে তার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ে কেন? অনিতাকে দেখতে কেউই সুন্দর বলে না। তার গায়ের রঙকে কালোই বলতে হবে, তবে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের তুলনায় সে একটু বেশী দীর্ঘ, নাকের গড়ন চেপ্টা ধরণের, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর, খুব সুন্দর তার চোখ দু'টি প্রাণ প্রাচুর্য্যে—তারা সব সময়েই ঝলমল করে। তার মুখের সব অপূর্ণতাই তার চোখ দু'টি পূর্ণ ক'রে তুলেছে। তার চোখ দু'টি একসঙ্গেই প্রকাশ করে নবারুণের দীপ্তি আর বর্ষা-ধারার চঞ্চলতাকে।

সুমি, তোর চুল বাঁধা হ'ল—বলে মা ঘরে ঢুকলেন।

এলো খোঁপাটায় গোটা-দুই কাঁটা গুঁজে বললাম, এই হয়ে গেছে—আমার নীল শাড়ীটা আর মুক্তোর গয়নাগুলো বার করে দাও না মা।

মা বললেন, তা দিচ্ছি, কিন্তু ফিরতে বেশী রাত্ত কোরো না যেন।

আচ্ছা বলে সাবান-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

গাড়ী থেকে নামতেই অনি হাসিমুখে দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, ও ভাই, তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠিক যেন নীল পরী—নীল পরী গো নীল পরী! তোর রূপেরি স্নিগ্ধ ধারায় ইচ্ছে যে হয় স্নান করি।

তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, ঢের হয়েছে কবিবর এখন একটু থামো তো।

কেন থামবো রে! আজ আমার এই জন্মতিথির দিনে আমি যদি মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকি, তা'হলে কি রকম দেখাবে বল্ তো? আজকে এমন দিনে আমি কি কোরব জানিস্? মনের দরজাটা একেবারে খুলে দিয়ে পৃথিবীর যত আনন্দ, যত উচ্ছ্বাস আছে সব সেই ঘরে ভর্ত্তি ক'রে নেব—যাতে আমার জীবনে কোন দিনই রসের ফোয়ারা শুকিয়ে না যায়! কি বলিস্?

হাসতে হাসতে বললাম, তাই করিস্।

অনি আজ একটা চাঁপা রংএর শাড়ী পরেছে, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন-লেখা বেশ দেখাচ্ছে ওকে। হল-ঘরে অনির মা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে প্রণাম করতেই কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এত দেরী কেন মা সুমিতা?

হেসে বললাম, আমার কি খুব বেশী দেরী হয়েছে মাসীমা?

হ্যাঁ গো লক্ষ্মী, হ্যাঁ, ব'লে তিনি হাসতে হাসতে কি একটা কাজে চলে গেলেন।

দেখলাম, কলেজের অনেকগুলি মেয়ে এসেছে—তা ছাড়াও আরো অনেকে এসেছেন—তাদের আমি চিনি নে।

অনি একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—নাম শুনলাম বিমান দত্ত। দূর-সম্পর্কে অনির মামা হন—বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে—ভদ্রলোক বিপত্নীক। বেশ সুন্দর চেহারা, কথা বলেন অজস্র। কি জানি, আমার কেমন তাঁকে ভালো লাগল না।

দু'-একটা কথা বলে আমি নন্দিতার কাছে এসে বসলাম।

অনিতা এসে বসে কি একটা আলোচনা জুড়ে দিলে।

মাসীমা ঘরে ঢুকে বললেন, সব চুপচাপ কেন রে অনু? তোর বন্ধুরা একটা গান-টান করুক না এবারে।

নন্দিতার গানে বেশ নাম ছিল। তাকে ঠেলা দিয়ে বললাম, তুমি একটা গান ধরো না নন্দা!

সে বললে, আহা নিজে গান করো না বাপু, আজ আমার গলা ভালো নেই।

অনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাচ্ছিল—তাই দেখে রাণী আস্তে আস্তে বললে, অনিতা, অত ঘন ঘন ওদিকে তাকাচ্ছ কেন? কেউ জুটেছে না কি?

অনি কথার জবাব না দিয়ে হাসিমুখে দরজার দিকে দৌড়ে গিয়ে অসিত বাবুর হাত ধ'রে টানতে টানতে ঘরে ঢুকল। আপনি কেন এত দেরী করে এলেন, বলুন তো? আসুন, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। বলে অনিতা ওর মা'র কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, মা গো, সকালে যাঁর কথা তোমায় বলেছিলাম—ইনিই সেই ভদ্রলোক, নাম—ও হরি আপনার নাম তো আমি জানি নে।

উনি হেসে বললেন, তুমি কি একবারও জানতে চেয়েছ?

বা রে, তা বলে আপনিও বলবেন না, না কি? বলুন—বলুন।

আমার নাম অসিত—অসিত মিত্র।

পরিচয়ের পালা শেষ ক'রে অনিতা অসিত বাবুকে বাজনার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে, সকালে কি বলেছিলেন মনে আছে তো?

মিউজিক্ টুলটায় ব'সে উনি বাজনার ঢাকা খুলে বললেন, তুমিও আমায় একটু সাহায্য করো অনিতা।

আহা! সকলে হাসুক আর কি? আমার গলার যা শ্রী!

উনি একটু হেসে বাজনায় সুর দিল।

নন্দিতা আমার কাণের কাছে মুখ এনে বললে, বেশ সুন্দর চেহারা তো ভদ্রলোকের—তুমি চেনো সুমিতা?

না—বলে গানের দিকে কাণ দিলাম—উনি তখন গাইছিলেন—

মনোহর রূপে তুমি
এলে ওগো প্রিয়তম,
রঙে ভরে মনে ভূমি
অনুপম, অনুপম।
সে গান গাহিল আজি দরদী ও কণ্ঠ,
সব-সব কাঁপে মন, তিরপিত অঙ্গ'।

অনিতা অর্গ্যানের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—গায়কের দরদী কণ্ঠস্বর সবাইএর মনকে স্পর্শ করেছিল। এ গান কি অনিকে উদ্দেশ্য করেই গাওয়া? কে জানে, শুধু শুধু আমার মনটা কেন ব্যথিত হয়ে উঠলো।

আমার গান আর ভালো লাগছিল না। উঠে বাইরে গিয়ে অনির মা'কে বললাম, মাসীমা অনিকে একবার ডেকে দিন না, আমি বাড়ী যাবো।

ওমা সে কি সুমিতা—অনু যে তোমার জন্তে সেতার আনিয়ে রেখেছে বাজাবে বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, মাসীমা, আমার বড় মাথা ধরেছে, ওকে ডেকে দিন।

মাসীমা চেচিয়ে ডাকলেন, ওরে অনু, সুমিতা যে বাড়ী যেতে চাইছে, তুই একবার এদিকে আয়।

অনি তখন অসিত বাবুর সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে তর্ক সুরু করেছে—মাসীমার ডাক শুনে কৌচ থেকে উঠে এসে বললে, কি মা?

মাসীমা বললেন, সুমিতা বাড়ী যেতে চাইছে।

অনিতা আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, কেন রে হঠাৎ বাড়ী যেতে চাইছিস—খাবি নে বুঝি?

মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললাম, খাবার ইচ্ছে নেই—এখন দেখ, বাইরে গাড়ী আছে কি না?

আচ্ছা, তা নয় দেখছি, কিন্তু তুই না খেয়ে গেলে আমি ভারি দুঃখ পাবো মিতা! একটু থেমে অনিতা আবার বললে, তুই রাগ করেছিস—অসিত বাবু কথা বলেননি বলে নয়? উনি তোকে নমস্কার করলেন, তুই দেখেছিস কি না জানিনে, তার পরে উনি তাই আর কথা বলেননি।

আমি একটু রাগ করে বললাম, উনি কখন নমস্কার করেছেন তা আমি জানি নে। কিন্তু তুমি কি ওঁর হয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে এসেছ? কেন অনি তার কোনই দরকার নেই।

অনিতা একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না না, ভাই, তুমি এখন—চটে রয়েছ—আজ বরং এ কথা থাক্, অন্ত দিন হবে'খন।

না, অন্ত দিন কি কোনো দিনই আমি এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে রাজী নই—বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

[ক্রমশঃ

মালয় দেশে সাড়ে তিন বছর

শ্রীমতী রেবারাণী ঘোষ

অষ্টাদশ খণ্ড

হেলথ অফিসারের গরু একটি মারা গেছে, তিনি ভাল করে গরুটির সদ্‌গতি করিয়েছেন। মাটিতে অবশ্যই পোঁতান হয়েছিল, রাত্রে কতকগুলি লোক ঐ দেহটি মাটী হতে এনে ভাগাভাগি করে সে রাত্রে বড়দিন করে। এ ব্যাপার পরদিন আমরা জানতে পারি। স্কুল-মাষ্টার মশায়ের কুকুর এক দিন পাওয়া গেল না। ধোপা-বস্তির এক চীনা বুড়ী—তার সেদিন ভূত ঠাকুরের পূজো ছিল, হাতের কাছে কুকুরটি পেয়ে, সেদিন ঠাকুরের মাংস ভোগ দেয়; [illegible]

কিন্তু জাপানী বললে, তাতে কি? বুড়ীটা অন্ত কিছু দিয়ে শোধ দিক, তাতেই হবে। পরে বুড়ী দু'টো মুরগী এনে দেয় ও ক্ষমা চায়।

আমাদের যে জমাদার, সে ছিল পাঞ্জাবী, যার সাথে মার-পিঠ করেছে, কে তার জিনিষ চুরী করেছে, তাই সে নালিশ করতে গেল। জাপানীর বড়কর্ত্তা তাকে এক ভাষায় জিজ্ঞাসা করল ও সে নিজ ভাষায় জবাব দিল। সাহেব যখন কিছুতেই বুঝল না তখন রেগে গিয়ে ধাঁই-ধাঁই করে চড় লাথী ইত্যাদি দিয়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। বেচারা কেঁদেই আকুল, তখন একটি চীনা ছোকরা বুঝিয়ে দিল, সে কি বলতে এসেছে। জাপানী তখন ঠাণ্ডা হয়ে লোকটিকে তুলে হোটেলে নিয়ে যায় ও পেট ভরে খেতে দেয়।

এই রকম অদ্ভুত তাদের মধ্যে অনেক ছিল। এক সোলজার লড়াই করে মাথা ফাটিয়েছে, তা দেখে তাদের বড় ডাক্তার বলল,—শরীরে টাটকা রক্তের প্রয়োজন, না হলে দুর্ব্বল হয়ে যাবে। সোলজারটি রক্তের জন্ত অপেক্ষা করেনি, সোজা সে নদীর ধারে চলে যায় ও একটি নিরীহ ব্যক্তির মস্তক ছেদনে টাট্‌কা রক্ত পান করে পূর্ব্ব-বল ফিরে পায়। তাদের তরোয়াল সঙ্গে ত আছেই, কোতয়ালের তরোয়াল না কি মন্ত্রপূত, সে তরোয়াল যার উদ্দেশ্যতে তোলা হয় সে নিশ্চয় কোপ খায়। সে লোকটির চেহারা দেখলে ছেলে-বুড়ো সবাই ভয় পায়। খুব ধারাল তাদের তরোয়াল, কোতয়ালের শরীরটা যেমন মোটা, গলার স্বরটাও তেমনি ভীষণ, তরোয়ালের রক্ত কখনও তারা মোছে না, মস্তক ছেদন হয়ে গেলে তরোয়ালকে খুব সম্মান দিয়ে মাথার উপর তুলে আনা হয় ও মন্ত্রপাঠ চিৎকার করে তাকে শুনান হয়। এই হল নিয়ম। জাতটি অত্যন্ত ধূর্ত্ত, ভয় কম, গুরুজনদের খুব ভক্তি করে, সামান্ত দোষে মনিব যদি মারে সে তা নীরবে সহ্য করে ও হাঁটু মুড়ে বসে মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে অনবরত প্রণাম জানায়। তাতে তাকে সম্মান দেখান হয়, এ রকম আমরা প্রায়ই দেখতাম।

একবার মালয়-বিয়ে দেখতে গিছলাম, আলীবিন হুসেন বিয়ে করছে, তার বউটি বেশ সুন্দরী—বিয়েতে অনেক বন্ধুবর্গ জড়ো হয়েছে। বরকন্তার সামনে দেখলাম এক জাপানী অফিসার বসে আছে। কি যে সে দেখছে বুঝা গেল না, চিন্তাটাই যেন তার বেশী। তার পর যখন সে উঠল তখন বাড়ীর অভিভাবককে এক জায়গায় ডেকে বলল—দেখো, আমার জন্ত শীঘ্র করে ঠিক এই রকম একটি মেয়ে জোগাড় করতে পার? আমি মুসলমান হয়ে তোমাদের মত আনন্দ করে বিয়ে করতে চাই। ঐ যে বরটি বসে আছে, তত ভাল নয় দেখতে। ও রকম কনে আমার কাছেই মানায়, তুমি যদি তাড়াতাড়ি না ঠিক কর, তবে টাকা দেব, এই কনেটিকেই আমাকে দিও। ভদ্রলোক কিন্তু-মিন্তু হয়ে তাকে যা হক বলে সেদিন বিদায় দেয় ও বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে পরের দিন সকলে হাওয়া খেতে "আলোর গাজা" চলে যায়। যখন জাপানীটা সেখান হতে বদলী হয়ে যায় তখন তারা আবার ফিরে আসে। জুজুবুড়ির ভয় বা বর্গী এল দেশে—সেই কথাটিই খুবই সত্যি হয়েছিল, প্রাণ ও মান দুই বাঁচাতে যথেষ্ট কষ্ট মানুষকে পেতে হয়েছে, সবই ভাষার আদান-প্রদানের জন্ত।

যখন তারা মানুষের মনের ভাব বুঝেছিল, তখন অনেক অত্যাচার করেছিল, কিন্তু সে শেষ সময়ে। এই দীর্ঘ তিন বৎসর হাসিমুখে [illegible] বোধ হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে হতাশার বাণী—

এ যুদ্ধ কবে থামবে ? ঐ কেবল শোনা যেত। আমাদের সহরে একবার বড় এক মিটিং হল, তাতে সরকার বললেন যে, চীনা কম্যুনিষ্ট আমাদের খুবই কষ্ট দিচ্ছে, সর্ব্বদা আমাদের পেছুতে আছে কিন্তু এ রকম ক'র না, এই শেষ মানা করছি। আর লোকরা,—তোমরা চাল চেও না, আমাদের সৈন্ত ঘাস খেয়ে যুদ্ধ করছে অতএব তোমরা কাটা আলু খেয়ে থাক, চাল পাবে না। এবার যদি মালয়ে যুদ্ধ হয় তবে আমাদের সাথে তোমরাও মরবে· মরতে ভয় থাকা কখনও উচিত নয়, যুদ্ধে যদি মারা যাও তবে ঈশ্বরের সাথে দেখা হয়। ইংরেজ যুদ্ধের মুখে তোমাদের দূরে চলে যেতে বলেছিল প্রাণ বাঁচাতে কিন্তু জাপানী তা বলবে না, ইত্যাদি।

ছোট ছোট সহরে তখন রাত্রে খুব ডাকাতি চলতো। দোকান-ঘর চীনারা পোড়াত, লোক ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ-ষ্টেশন পোড়াত, গোলা-বন্দুক নিয়ে যেত—ইত্যাদি অনেক রকম অত্যাচার হত।

জাপানীরা চীনাদের সাথে পেরে উঠত না, অগত্যা কিছু দিন আরম্ভ করল জঙ্গলে যাওয়া ও যাকে পায় ধরে আনা ও বন্দী করে শাস্তি দেওয়া, ছোট ছোট শিশু সহ নারীদের ঘরে পূরে আগুন ধরিয়েদেওয়া—এই রকম বিচার ও দণ্ডের উপর দিনগুলি কেটেছিল। জাপানীদের মনের অবস্থা খ্যাপা শেয়ালের মত হল। যখন বুঝল, হয় এদেশ নয় তাদের দেশে যুদ্ধ এগিয়ে এসেছে, যার তার সঙ্গে কথা বলে. ও কাঁদে, খায় না, বাসন ভাঙে, কাপড় পোড়ায়, কাগজ ছেঁড়ে, এই সব আরম্ভ করল। তখন লোক বুঝল, হয় যুদ্ধ, নয় পীস জগতে হবে। তার মতই মনে হচ্ছে, ১৫ই আগষ্ট সকালে সৈন্তরা পুলিস-ষ্টেশনে এসে সব বন্দুক তুলে নিয়ে চলে গেল ও লোকদের, বলল যুদ্ধ থেমেছে। তখন সে কি আনন্দ লোকেদের, কিন্তু কম্যুনিষ্ট তখন ছড়িয়ে পড়ল। তারা আর আনন্দ করতে দিল না, জাপানীদের কেয়ারও রাখলো না, যাকে পায় ধর-মার-কাট আরম্ভ হল। প্রায় দশ দিন তাদের হাতে তাদের শাসনে আমাদের প্রাণ রাখতে হয়েছে। যারা আগে আগে যা করেছে—তাদের জীবনের অঙ্ক তারা শেষ করে দিল। ভদ্র অভদ্র মানল না, ধরে ধরে জেলে পূরে রাখল।

সহরের উপর বসে আর এক অত্যাচার আমরা দেখলাম, সেও বড়ই মর্ম্মান্তিক। চীনাদের-সন্তুষ্ট রাণা তখন মহা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এবং এক দিন প্রভাতের আলোয় দেখা দিল দেশীয় সৈন্ত। এসে পৌঁছলেন বৃটিশ সরকার। তাঁদের জায়গা ফিরে পেলেন, অনেকগুলি প্রাণীর জীবন তাঁরা রক্ষা করলেন, বন্দীরা ছাড়া পেল ও আনন্দে তাদের মুখে হাসি ফুটল। জগতে কত কি পাওয়া গেল. কত কি হারাল।

প্রেম

শ্রীমতী কৃষ্ণসুষমা দেব

ওগো প্রিয়তমে মম প্রেম নহে উচ্চ গিরির শৃঙ্গ
সবার উপরে রহিবে দাঁড়ায়ে উচ্চ করিয়া তুঙ্গ।
প্রেমরাজি মম পূত বারি সম নির্ঝর নির্ম্মল
যত মলিনতা নিজ হৃদি দিয়া বহিয়া যাব সকল।
তুমি মহীরুহ সম ওগো প্রিয় রহিও দাঁড়ায়ে তীরে
আমি ঝরণার জল ছল-ছল চরণ চুমিব ধীরে।
যদি তব হিয়া কাঁপে ভাবি প্রিয়া কোন দিন মোর তরে
বাহুরূপী শাখা নামায়ে বারেক পরশ দিও গো মোরে।

প্রতিশোধ

শ্রীশতদল বিশ্বাস

১

ভবঘুরের পথের নেশা ঘুরিয়ে মেরেছে দেশ-দেশান্তরে—জীবন-সন্ধ্যায় আজ আবার ফিরে এসেছি—কি জানি কিসের টানে—শৈশবের লীলাভূমি খিদিরপুরে।

নদীর তীরে এলিয়ে দিয়েছি আমার শ্রান্ত দেহখানি। নদীর জলে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছি যেন আমারই জীবনের ছায়া-চিত্র!

—খুব ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে না,—মা যখন মারা যা'ন তখন আমি কতটুকুই বা—বছর আট হয়ত বা হব। মা'র মৃত্যুর পর বাবার আচরণে বড়ই বিস্মিত হলুম—কি যেন এক বিজাতীয় বিদ্বেষ-ভরা তাঁর দৃষ্টি! কারণে অকারণে আমাকে প্রহার ও নির্যাতন ক'রে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন—অবশ্য মা'র বর্ত্তমানেও তাঁর কাছে হতে স্নেহ বা আদর যে কখনও পেয়েছি তা মনে পড়ে না, তবে তখন এরূপ নির্যাতন ভোগ করতে কখনও হয়নি। আর তাঁর স্নেহের অভাবও বোধ করিনি তখন—কারণ মার স্নেহই ছিল আমার ছোট্ট বুকটা ভ'রে।

আমরা যে খুব গরীব ছিলুম—অতটুকু বয়সেও তা বুঝতে দেরী হয়নি। জন্মাবধি অভাবের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়ে তাতেই হয়েছিলুম অভ্যস্ত। তাই বুঝি প্রাচুর্যের—প্রাচুর্যের কেন স্বচ্ছলতার অভাবও কোন দিনও করিনি অনুভব। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে মা'র কোলে শুয়ে তাঁর স্নেহের পরশে—অর্দ্ধভুক্ত আমি—ক্ষুধার জ্বালাও যেতুম ভুলে।

মা'র মৃত্যুর পর হতে বাবা আমার উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করলেন। তিনি চট-কলে কুলিগিরি করতেন, উপার্জ্জনের অধিকাংশই মদ খেয়ে উড়াতেন। এক-এক দিন সারা দিন এক মুঠা অন্নও জুটত না। ক্ষুধার তাড়নায় এক দিন তাঁর কাছে বলেছিলুম—"বড্ড যে খিদে পেয়েছে—কিছু দাও না খেতে।" মদের নেশায় তখন তিনি বিভোর, আমার কথায় ভীষণ রেগে উঠলেন—"নবাব-জাদা এসেছেন—খেতে চাইছেন! দূর-হ—দূর-হ হতভাগা, বেরো আমার ঘর থেকে। এ্যাদ্দিন বাইরের জঞ্জাল ঘরে পুষেছি—এবার যেখান থেকে এসেছিস সেখানে ফিরে যা।" মারতে মারতে তিনি আমায় ঘর থেকে বার করে দিলেন। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তাঁর কথা ঠিক বুঝলুম না—কাঁদতে কাঁদতে সোজা চললুম গোরস্থানের অভিমুখে—যেখানে আমার স্নেহময়ী মা মাটী-মা'র কোলে চির-শান্তি চির-বিশ্রাম লাভ করছেন।

কিছু দূর গিয়ে হল করিম চাচার সাথে দেখা। তিনি আমায় দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্লেন—"এ কি আবদুল, ভর সাঁঝের বেলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলেছিস্ কোথা ?"

আমি তাঁর কাছে সব বল্লুম—তিনি [illegible]
বল্লেন—"জানোয়ার কোথাকার! মদ খেয়ে সব
ব্যাটার মত ফতেমা এ্যাদ্দিন যারে বুকে করে মানু[illegible]
ফতেমা মরতে না মরতেই সেই বাল্‌-বাচ্ছাটাবে[illegible]
বেলা ঘর থেকে নিকুলে!"

তার পর সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"চল আবদুল, চল আমার বাসায়, তোকে আর গণি মিঞার কাছে পাঠাব না।"

তাঁর সাথে গেলুম তাঁর বাসায়; চাচী তখন আঁখার সামনে বসে হাওয়া দিচ্ছেন, এক হাঁড়ি ভাত টগবগ করে ফুটছে—ফুটন্ত ভাতের গন্ধে আমার চোখে জল এল!

করিম চাচা চাচীকে কি বললেন—চাচী রান্না-ঘরের সামনে দাওয়ায় পাতা ছেঁড়া চ্যাটাইটার উপর আমাকে বসতে বললেন—তারই এক পাশে চাচীর কোলের ছেলেটা অকাতরে ঘুমাচ্ছে। চাচীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে বুঝতে দেরী হল না, তিনি আমায় দেখে মোটেই খুসী হন্‌নি।···এখন বুঝি, নিজের চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ের উপর আর একটি পোষ্য!—তাঁদের অভাবের সংসারে কি করেই বা তিনি খুসী হন।

করিম চাচার দিলটা ছিল খুবই দরাজ! অপরের দুঃখে তিনি একটুকুতেই কাতর হয়ে পড়তেন—নিজের মুখের গ্রাস তিনি অকাতরে ক্ষুধার্তের মুখে তুলে দিতেন!

রান্না হ'লে দাওয়ায় চটা-ওঠা কলাই-করা সান্‌কীতে আমাদের ভাত বাড়া হ'ল, চাচাকে ডাকায় তিনি বললেন—"আজ আমার খিদে নেই, আমি খাব না।"

চাচী ঝঙ্কার দিয়েউঠলেন—"সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর খিদে নেই কি রকম?"

চাচা বললেন—"আমার জন্যে বরং পান্তা চাট্টী রেখে দিও, কাল কলে যাবার আগে খাব।"

চাচী বললেন—"এখন খাও কালকের পান্তার ভাত, আমি দু'-মুঠো আবার চড়িয়েছি।"

পরে বুঝেছিলুম—মাপা চালের ভাতে আর একটি ভাগীদার জোটায় চাচার সেদিন হয়েছিল ক্ষুধার অভাব!

২

চাচার বাড়ীতে কাটল কিছু কাল।—চাচার দুই ছেলের সঙ্গে পাড়ার স্কুলেও পড়েছিলুম বছর তিন-চার। চাচার অভাবের সংসারে আবার আমার বোঝা!—অভাব-অনটন, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী—চাচীর মেজাজ একটুকুতেই যে বিগড়ে যেত—তা আর আশ্চর্য্য কি! তাঁর কথায় হুল মাঝে মাঝে যে বিঁধত না মনে এমনও নয়; তবু তো পড়ত না গায়ে বেতের চোট্‌—আর পড়তোও পেটে দু' মুঠো ভাত! এ কম বড়-কথা নয়? নীরবে সহ্য করতুম চাচীর বাক্যবাণ—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু কুলায় চেষ্টা করতুম তাঁর খোসামোদ করতে।

বৈকালে নদীর ধারে মাঠে গফুর আর কাশেম যখন বস্তীর অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলত—আমাকে সামলাতে হত চাচীর কোলের বাচ্ছাটাকে, রাবিয়া ও আয়েসা তখন খুবই ছোট, দামাল ছেলেটিকে তারা সামলাতে পারত না। খেলার মাঠের এক ধারে আমি খোকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। ছোট ছেলেদের পক্ষে খেলার সাথীদের খেলতে দেখে তাদের সাথে খেলতে না পারা যে কত বড় শাস্তি, তা যারা বহু পিছনে ফেলে এসেছে তাদের ছেলেবেলা—তারা কছুতেই বুঝতে পারে না। দিনের পর দিন খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে থাকি দুরন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে, একটি বার সবার সাথে মিলে খেলতে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। এক দিন সাহসে ভর করে গফুরকে বললুম—"গফুর ভাইয়া, খোকাকে তুমি একটু নাও, আমি পাঁচ মিনিট মাত্র খেলব তার পর আবার খোকাকে নেব—তখন তুমি আবার খেলো।"

গফুর মুখভঙ্গি করে ইতর ভাষায় গালি দিয়ে বললে—"খেলনে-অলা রে, খেলনে মাংতা! আমার বাপের খাস আর বাপের ব্যাটাকে ধরতে পারবি না? রাস্তার কুত্তাকে ঘরে এনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে, তা কুত্তা এখন মাথায় চড়তে চায়।"

তার কথায় সকলে হেসে উঠল, আমি লজ্জায় অপমানে কাঠ হয়ে গেলুম—মুখে একটি কথাও সরল না—এক পা'ও নড়তে পারলুম না—চলবার ক্ষমতাটুকুও বুঝি ফেলেছিলুম তখন হারিয়ে; কাশেম গফুরকে বললো—"ছিঃ ভাইজান্‌, আবদুলকে তুমি এমন করে কথা বললে—তোমার সরম হয় না?" কাশেম পেয়েছিল তার পিতার মত দরাজ দিল—অন্যায় সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না।

কাশেমের কথায় গফুর গজ-গজ করতে লাগল—"দরদ দেখান হচ্ছে—মস্ত মরদ!"

তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাশেম আমার কাছে এসে বলল—"আবদুল ভাইয়া, খোকাকে আমার কাছে দিয়ে তুমি খেলো—আজ আর আমি খেলতে পারব না, পায়ে বড় চোট্‌ লেগেছে—বাঁ হাঁটুটা মনে হচ্ছে জখম্‌ হয়েছে।"

কাশেমের হৃদয়ের গভীরতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এতক্ষণে আমার গলা হতে স্বর বার হল। ধরা-গলায় তাকে বললুম—"না ভাইয়া, আমি খেলব না. তুমিই খেল।—তোমার পা এখনই ঠিক হয়ে যাবে, আমি খোকাকে বাড়ী নিয়ে যাই।" কাশেমের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি জোর-পায়ে বাড়ী পানে চলতে লাগলুম, কিছু দূর গিয়েই ফিরলুম আবার নদীর দিকে। নদীর ধারে বড় অশত্থ গাছটার তলায় খোকাকে কোলে নিয়ে বসে পড়লুম। ওপারে সূর্য্য তখন নদীর কোলে একেবারে ঢলে পড়েছে, নদীর উপর দিয়ে বয়ে আসছে ঝিরঝিরে সাঁঝের হাওয়া—তার ঠাণ্ডা ছোঁওয়া লেগে দেহের তাপ জুড়াল বটে, কিন্তু মনের তাপ জুড়াল না একটুও।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুরন্ত খোকার চোখ দু'টি ঘুমে ঢুলে পড়ল। আমি কতক্ষণ যে বসেছিলুম জানি না; সময়ের হিসাব রাখবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। যতই মনে করি গফুরের কথা গায়ে মাখব না—মনে দুঃখ রাখব না, ততই গফুরের কথা—"রাস্তার কুত্তা"—চারি দিক্‌ হ'তে যেন আমায় ছেঁকে ধরে।

গফুরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে—তার কথার ঘৃণার বিষ আমার সারা দেহে যেন আগুন ছড়িয়ে দেয়। এক গফুরের কণ্ঠস্বর যেন শত কণ্ঠে চতুর্দ্দিক্‌ হতে প্রতিধ্বনিত হয়—"রাস্তার কুত্তা—রাস্তার কুত্তা"—সহস্র গফুরের সমবেত কণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি আমাকে চারি পাশ হ'তে চেপে ধরে পরিহাস করে—"রাস্তার কুত্তা"—"রাস্তার কুত্তা।"—আমার দম বন্ধ হয়ে আসে—আমার ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে···আমি পাগলের মত হঠাৎ চীৎকার করে উঠি। নিজের কণ্ঠস্বরে আমার চমক্‌ ভেঙ্গে যায়—আমার চীৎকারে ঘুমন্ত শিশুর নিদ্রা টুটে যায়—সে-ও চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে!

তাকে বুকে ধরে শান্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই গফুরেরই পিতার বাড়ী পানে—সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়া তখন নিবিড় ভাবে ঘনিয়ে এসেছে।

৩

উঠানে প্রবেশ করে শুনি, চাচী কার সাথে কথা কইছেন। আমার নাম শুনে সেখানেই গেলুম দাঁড়িয়ে। চাচী বলছিলেন—"হাঁ, ফতেমা ওকে কুড়িয়ে পায় নদীর ধারে বড় অশথ গাছটার তলায়, তখন সে মাত্র ক'দিনের বাচ্ছা, ফতেমার ছেলেপুলে হয়নি—সে তাকে মানুষ করেছিল পেটের ব্যাটার মত আদর-যত্নে। বেচারী ফতেমা মারা যাবার পরই গণি মিঞা আবদুলকে মার-ধোর সুরু করল। সে কোন দিনও ছেলেটাকে সুনজরে দেখেনি, শুধু ফতেমার ভয়েই যা-কিছু বল্‌তে পারত না। যাক্, এক দিন মদ খেয়ে আবদুলকে বেদম মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, গফুরের বাপ তাকে দেখে—তার মুখে সব কথা শুনে ঘরে এনে ঠাঁই দিল। তা সে বছর তিন-চার আগের কথা, সেই অবধি সে আমাদের কাছেই আছে। আমারই ভাই যত জ্বালা—নিজের ব্যাটা-বেটীদেরই পেট পুরে খেতে দিতে পারি না দু'মুঠো—আবার বাইরের জঞ্জাল এসে জুটল। গফুরের বাপের আর কি বল? সে তো বোঝা বাড়িয়েই নিশ্চিন্ত—এদিকে যে কোথা থেকে—"

চাচী মনের দুঃখ জানাবার লোক পেয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর সঙ্গিনীটি তাঁর কথায় স্রোত থামিয়ে বলে উঠলেন—"ছেলেটি দেখতে কেমন?"

চাচী বল্লেন—"তা ভাই আমি হক্ কথা কইতে পিছপা হই না—খাসা চেহারা। যেমন গোরা রং, তেমনি খপ্‌সুরৎ—নিশ্চয়ই কোন ভদ্দর লোকের কুড়ীর ছেলে।" হঠাৎ খোকা কেঁদে ওঠায় আমি তাকে নিয়ে চাচীর কাছে দিলুম, দেখলাম চাচীর সঙ্গিনীটি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন আর এ-ও আমার নজর এড়াল না যে, চাচী চোখ ইসারায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমিই সেই ছেলেটি।

কোন কথা না বলে আমি সেখান থেকে চলে এলুম। আমার ভিতর বয়ে গেল প্রচণ্ড এক ঝড়—তার দাপটে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। পৃথিবীতে কোন বন্ধনই ছিল না আমার, শুধু যে বন্ধনের স্মৃতির আলোয় উজ্জল হয়েছিল আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি—ঝড়ের অবসানে দেখলুম, সে বন্ধনটুকুও কাল্পনিক মাত্র—নাই তাতে প্রাণের টান—নাই তাতে রক্তের ডাক।

এত বড় পৃথিবীটা আজ হয়ে উঠল আমার চোখে একেবারে ফাঁকা। এর সাথে ক্ষীণ যোগসূত্রটিও আজ গেল ছিঁড়ে! ধরিত্রী মা'র বুকের মাঝে প্রবেশ করেনি আমার অস্তিত্বের মূল—পর-গাছার বায়বীয় মূলেরই ন্যায় তা অনন্ত শূন্যে ঝুলছে যেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার শেষ সম্বলটুকু—পুণ্য মাতৃ-স্মৃতি। তাই এখন অনুভব করলুম বুকের ভিতর অসহ বেদনা—বিরাট শূন্যতা! জ্ঞান হয়ে অবধি যাঁকে 'মা' বলে জেনেছি—আমার মুখের প্রথম কথায় যাঁকে 'মা' বলে ডেকেছি—যাঁর অসীম স্নেহে ভুলেছি সব দুঃখ-কষ্ট, সেই মহীয়সী মা আমার—আমার মা নন্! তাঁর পুণ্য-স্মৃতির আলোয় উজ্জল হয়েছিল—নির্ম্মম নির্বান্ধব এ পৃথিবীতে আমার চলার পথটি—সেই আলো আজ গেল নিবে। চতুর্দ্দিক্ তাই এখন অন্ধকার—অন্ধকার!

আমার পায়ের তলা হতে ধরিত্রী মা-ও যেন নিজেকে নিতে লাগলেন সরিয়ে—আমার অভিশপ্ত স্পর্শ থেকে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে।...আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলুম না—মাটির উপর পড়লুম বসে। তার পর ধীরে ধীরে মাটী-মা'র বুকের উপর দিলুম এলিয়ে আমার এই মাতৃ-পরিত্যক্ত অভিশপ্ত দেহটাকে।—'মা গো মা, কেন তুমি আমার কুড়িয়ে এনে তুলে নিয়েছিলে বুকের পরে? যে মা দশ মাস গর্ভে ধারণ করেও অনায়াসে আমার ত্যাগ করেছিল অপত্য-স্নেহের বন্ধন নির্ম্মম করে টুটে দিয়ে—তার অপেক্ষা কোন মহান স্নেহধারা ঝরেছিল শতধারে তোমার সন্তান-হীন বুভুক্ষু হৃদয় হতে—সেই পরিত্যক্ত অসহায় ক্ষুদ্র শিশুটির প্রতি! আজ আমার নাই জন্মের, নাই জাতির, নাই ধর্ম্মের বন্ধন—আজ আমি মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত!..."

মনে পড়ে গেল গফুরের কথা—"রাস্তার কুত্তা!" গৃহে আমার নাই অধিকার—'রাস্তার কুত্তা' রাস্তায় বার হলুম। কিন্তু সাবধান গফুর, 'রাস্তার কুত্তা'কে লোকে শুধুই ঘৃণা করে না—ভয়ও করে!—অন্ততঃ তার কামড়কে!

[ক্রমশঃ।

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে

শ্রীমতী চামেলীবালা মিত্র

হে করমবীর হে "করমচাঁদ" চিরদিন তরে হ'লে কি স্তিমিত।
কাঁপিল ভূধর কাঁপিল মেদিনী বিশ্ব-চরাচর হ'ল যে স্তম্ভিত।
"ভারত"-গগন হ'ল জ্যোতিহারা—হ'ল জ্যোতিহারা সাঁঝের তারা।
প্রিয়তম "পুত্র" হারায়ে জননী বিষাদ-ব্যথিতা সর্ব্বহারা।
অহিংসা যাঁর জীবনের ব্রত বিপুল এ বিশ্ব করিল জয়।
হিংসায় মাতি কোন্ শয়তান সে মহামানবে করিল ক্ষয়।
টলিল না হৃদি কাঁপিল না বাহু বজ্র পতন হ'ল না শিরে।
ঘৃণ্য পশুর হীন আচরণে শৃগাল বধিল "সিংহ বীরে"।
সপ্ত সিন্ধু মন্থন করি জয়ের পতাকা আনিল কে বা।
ন্যায় ধর্ম্ম ও ত্যাগের মন্ত্রে সারা জগতের করিল সেবা।
অমরাপুরীর হে অমর আত্মা গিয়াছ অমরলোকে।
তবুও আমরা কাঁদিব হে দেব চিরদিন তব শোকে।
ভুলে যেও নাক' মানবের ব্যথা
ধূলার ধরণী কাঁদিতেছে হেথা'
সেথা হ'তে তুমি দিও সান্ত্বনা দিও হে অভয় বাণী।
তোমারি আশীষে পেয়েছে ভারত হারানো রাজ্যখানি।
রাজ্যহীন আজি প'ড়ে আছে "তাজ"
হেথায় যে তব ছিল বহু কাজ
যুগ-যুগ ধরি তব পথ চাহি রহিবে "ভারতবাসী"।
আবার আসিও নররূপ ধরি হে অজের অবিনাশী।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুষ্টিয়া হইতে 'আনন্দবাজারে'র নিজস্ব সংবাদদাতা খবর দিতেছেন :—"ন্যাশনাল গার্ড এবং আনসার বাহিনীর কর্মীদিগকে অস্ত্রে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে এই জেলার কর্তৃপক্ষ এই জেলার যে সকল হিন্দুর বন্দুক আছে তাহাদিগের সকলকে তাহাদের স্ব স্ব বন্দুক আগামী ২৫শে তারিখের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে যখন ঐ সকল বন্দুকধারী জিন্না-ফাণ্ডে চাঁদা দিয়া তাহাদের লাইসেন্স বর্তমান সালের জন্য পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে এই বিষয় ঘূণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। এই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে বন্দুকধারীদিগের সামাজিক অবস্থা অথবা তাহাদিগের আর্থিক অবস্থানুযায়ী নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই। কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ বড় জমিদারের এখানে মিরপুর থানার এলাকায় দুইটি আদায় তহশীলের কাছারী আছে এবং সেই দুই কাছারীতে তাঁহাদের তহবিল এবং তাঁহাদের কর্মচারীদের আত্মরক্ষার জন্য একটি করিয়া বন্দুক আছে। এই জমিদারবংশ পুরুষানুক্রমে বহু দিন হইতে কুষ্টিয়ার সমস্ত সদনুষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন এবং এবারও জিন্না-ফাণ্ডে ১০০১৲ টাকা দান করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের উপর তাঁহাদের বন্দুক দুইটি দাখিল করিবার জন্য নোটিশ জারী করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দুরা অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিতেছে, এই নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য কি ?" অতি মহৎ। উদ্দেশ্য বুঝা কি এতই শক্ত ?

• • • • •

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা জানাইতেছেন যে, "গত ৫।১২।৪৮ তারিখে যশোহর জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড় বাইসা গ্রামনিবাসী হরিপদ বিশ্বাসের পুত্রবধূ (১৬ বৎসর) বাড়ীর বাহিরের কূপ হইতে জল আনিতে গেলে ১৪ ১৫ জন দুর্বৃত্ত মুসলমান তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, বালিকাটি চিৎকার করিলে ৪।৫ জন প্রতিবেশী উপস্থিত হয়, কিন্তু দুর্বৃত্তেরা বন্দুকের গুলী ছোঁড়ায় তাহারা সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৬।২।৪৮ তারিখে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী ঘোড়শাল গ্রামের মাঠে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। দুর্বৃত্তেরা বালিকাটির উপর প্রত্যেকেই উপর্য্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করে।" কিন্তু এ সংবাদ বিশ্বাস করিব কেমন করিয়া ? কারণ, 'ইত্তেহাদ' বা 'আজাদে' এমন কোন সংবাদ আমরা পাঠ করি নাই।

• • • • •

পত্রিকান্তরে প্রকাশ :—"ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী—পূর্ববঙ্গের অর্থসচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী করাচীতে বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে মাত্র কুড়ি হাজার হিন্দু অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অর্থসচিবের এই উক্তিতে এখানে বিস্ময় প্রকাশ করা হইতেছে। তিনি তাঁহার এই অদ্ভুত সংবাদের সূত্র প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এখানে ওয়াকিবহাল মহল বলিতেছেন যে, একমাত্র ঢাকা নগরী হইতেই অন্যূন ৪০ হাজার হিন্দু নরনারী চলিয়া গিয়াছেন বা যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য এই নগরী হইতে হিন্দু বিতাড়নে গবর্ণমেণ্টের একোমোডেশন বিভাগ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নির্ম্মম ভাবে বাড়ী রিকুইজিশন করিয়া অনেক হিন্দু-পরিবারকে বাড়ী ও দেশ ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী যদি খোঁজ নিতেন তবে জানিতে পারিতেন, ঢাকা সহরের পুরানা পল্টন, সেগুন বাগান, সিদ্ধেশ্বরী, কায়েৎটুলী, বক্সীবাজার, লালবাগ, উর্দ্দু, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি এক প্রকার গৃহশূন্য হইয়াছে তাহা ছাড়া টিকাটুলী, উয়ারী, গেণ্ডারিয়া, আরমানীটোলা, সূত্রাপুর প্রভৃতি হিন্দু অঞ্চলও আজ আর পূর্ব্বের মত নাই। ফলে উক্ত সহরের হিন্দুদের সামাজিক জীবন বিপন্ন হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের কথা ধরিলে সব চেয়ে বেশী বাস্তু ত্যাগ হইয়াছে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় (বিক্রমপুর)। এই মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু আজ হিন্দু গ্রামগুলি এক প্রকার জনশূন্য। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়ও বাস্তুত্যাগকারীর সংখ্যা অসংখ্য। সদর ও মাণিকগঞ্জ মহকুমায়ও বহু হিন্দু-পরিবার বাস্তুত্যাগ করিয়াছে। মোটের উপরে অনুমান, একমাত্র এই জিলা হইতেই এক লক্ষের বেশী হিন্দু নরনারী ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকায় চলিয়া গিয়াছেন।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

• • • • • •

নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠকবর্গকে হয়ত কিঞ্চিৎ আনন্দ দান করিবে :—"নওগাঁ (রাজসাহী) ২০শে ফেব্রুয়ারী জনৈক স্কুল-শিক্ষককে পাকিস্তানের ডাকঘরের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত শিক্ষক মহাশয় টাকা তুলিতে পোষ্ট অফিসে গিয়া প্রয়োজন মত অর্থ না পাওয়ায় স্কুল-গৃহে বসিয়া উক্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তৎক্ষণাৎ অপর এক জন শিক্ষক পোষ্ট অফিসে টাকা তুলিতে যান এবং পূর্ববর্ত্তী শিক্ষকের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে স্বীয় টাকা তুলিয়া লইতে চাহেন। পোষ্ট অফিসের কর্তৃপক্ষ পূর্ববর্ত্তী শিক্ষকের নাম জানিয়া লইয়া পুলিশে খবর দেন এবং পুলিশ উক্ত শিক্ষক মহাশয়কে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার করে।" অপরাধ সাংঘাতিক! এরূপ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত কাজীর বিচার যথাযথ হইয়াছে।

• • • • • •

পত্রান্তরে প্রকাশ :—"গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সহরের লীলারাণী দাসী (৩০) নাম্নী এক বিধবা এই মর্ম্মে জিলা কংগ্রেস অফিসে এক লিখিত অভিযোগ করিয়াছে যে, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কতিপয় মুসলমান জোর করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া [illegible]

উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। বরিশাল নবগ্রাম রোডের শ্রীহরিচরণ শীল এবং শ্রীভিকচন্দ্র বিশ্বাস কংগ্রেস অফিসে এক লিখিত অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে এ ডি এম সাহেবের পেস্কার-প্রমুখ কতিপয় মুসলমান তাঁহাদের ঘরের বেড়া কাটিয়া দিয়াছে এবং প্রথম বাদীর স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়াছে। ঝালকাঠি থানার এলাকাধীন আলোকদীয়া গ্রাম হইতে এই মর্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ১১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে স্থানীয় মুসলমানরা প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, হয় তোমরা ৭ দিনের মধ্যে হিন্দুস্থানে চলিয়া যাও নতুবা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কর। উপরোক্ত সকল বিষয়ই বাখরগঞ্জের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।" পুলিশ কর্তৃপক্ষ কেস লিখিয়া লইয়া তাহা যথাযথ ফাইল করিয়াছেন। অতএব আর কি?

• • • • • •

'যুগান্তর' সম্পাদক মন্তব্য করিতেছেন:—"ক্ষমতা হাতে পাইলে কিরূপে তাহার ব্যভিচার করিতে হয়, তাহার যদি কেহ নমুনা চাহেন, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ ঘরভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করুন। ভাড়াটিয়ারা যাহাতে বাড়ীর মালিকগণ কর্তৃক অযথা উপদ্রুত হইতে না পারেন, সেই জন্যই ঘরভাড়া নিয়ন্ত্রণ অভিন্যান্স প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই বিল যখন সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, তখনও ভাড়াটিয়া এবং মালিক উভয়ের প্রতি সুবিচারের আশায়ই উহা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সিলেক্ট কমিটির যে রিপোর্ট সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ বিড়ালকেই দুধের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা যত দূর জানি, এই কমিটির বারো জন সদস্যের মধ্যে এক জনও ভাড়াটিয়া নহেন। অধিকাংশ সদস্যই কলিকাতার একাধিক বাড়ীর মালিক। সুতরাং তাঁহাদের হাতে ভাড়াটিয়াদের দাবী কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন না হইলেও তাঁহারা যে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় বিসর্জন দিয়া এরূপ এক তরফা সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন, তাহাও কল্পনা করা সহজ ছিল না। তাঁহারা শুধু সহরের ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সহরতলী তথা কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলের বাড়ীগুলির ভাড়া বৃদ্ধিরও পরামর্শ দিয়াছেন।" এ বিষয়ের প্রতিকার করিতে পারেন একমাত্র ডাঃ রায়। কিন্তু সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিবার সময় তাঁহার হইবে না।

• • • • • •

"কায়েদে আজম জিন্না সহসা ঢাকায় আসিতেছেন। প্রকাশ যে, তিনি চট্টগ্রামেও যাইবেন। পাকিস্তান পার্লামেণ্টে বাংলা ভাষাকে গলা টিপিয়া মারা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান প্রসন্ন চিত্তে পরিপাক করিতে পারেন নাই। ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। কায়েদে আজম কি মুস্লিম তমুদ্দুনের, তথা ঐস্লামিক ইমানের দোহাই দিয়া এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে ঠাণ্ডা করিতে আসিতেছেন? পাকিস্তানের ধোঁকা দিয়া এক জাতিকে দুই জাতিতে পরিণত করার লড়াইয়ে এক দিন যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছিল, লড়াই-অন্তে আজ তাহাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া জলে ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে—বাঙলার মুসলমান কি এই ধোঁকাবাজীতে আর ভুলিবেন? তাঁহারা কি ইতিমধ্যেই পাকিস্থানী পয়গম্বরদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনেকটা ওয়াকেবহাল হইয়া উঠেন নাই?" কিন্তু আমাদের সন্দেহ আছে। শ্রীজিন্নার শ্রীমুখ দেখিলে পূর্ব্ববাঙ্গলার বাঙ্গাল মুসলমান হয়ত মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিয়া বিমাতার ভাষা উর্দ্দুকে ঘরে তুলিবার চেষ্টা করিবেন। তবে পূর্ব্ববাঙ্গলার মুসলীম যুব সমাজ রহিয়াছেন—এই যা ভরসার কথা।

• • • • • •

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুস্লিম ছাত্র লীগ-নেতা মিঃ আনোয়ার হোসেন, মিঃ নুরুদ্দিন আমেদ ও মিঃ এক্রামুল নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—"বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করিয়া খাজা নাজিমুদ্দিন যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। গণপরিষদে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য সদস্যরা যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতন্ত্রের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কোন জনমত এই ভাবে পদদলিত হয় নাই। পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্যের কথ্য ভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার অন্তর্ভুক্ত হইল না, ইহাপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রতি চ্যালেঞ্জ বিশেষ। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুবক ও ছাত্ররা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতেছে। আমরা কখনও সমগ্র ভাবে পাকিস্তানের উপর বাংলা ভাষা চাপাইয়া দিতে চাই নাই। ইহাতে লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানাইতেছি এবং সমস্ত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিতে বলিতেছি। নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত অযোগ্য নেতাদের অবশ্যই সম্প্রসারণ করিতে হইবে।" সাধু সংকল্প। কিন্তু না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।

• • • • • •

"বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়িতে কাপড় প্রতি-জোড়া ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। গত রবিবারে বহু স্থানীয় এজেন্ট কয়েক জন ক্রেতা কর্তৃক সাংঘাতিক ভাবে প্রহৃত হয়।" ভাল কথা, কিন্তু কলিকাতায় কি হইতেছে? এখানে কি ন্যায্য মূল্যে কাপড় বিক্রয় হইতেছে? মিল-মালিকগণ কি বলেন?

• • • • • •

"ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত গোরক্ষা ও উন্নয়ন সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিয়াছেন—তিনি বর্ত্তমানে ভারতে গোধন ও দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ৫ বৎসরে ৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারতে বর্ত্তমানে বার্ষিক ৬ শত কোটি টাকার দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। গো-জাতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইলে এই উৎপাদনের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকায় দাঁড় করান যাইতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর আগে বিলাত হইতে আনীত এক জন বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালী কাঠ ও পশু-খাদ্য বৃদ্ধির জন্য খালের ধার ও রেলওয়ে বাঁধ

বরাবর বাবুল ও নিম গাছ রোপণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই কাজ শক্ত নয়, কিন্তু কেহই উহাতে কাণ দেন নাই। কিন্তু উহা এখনও করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, আরও অনেক কাজ এখনই সুরু করা সম্ভব। উন্নত স্তরের প্রজনন, পশু-খাদ্যের সুব্যবস্থা, সরকার কর্তৃক গো-শালা ও গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রজননের ব্যবস্থা করার কাজে এখনই হাত দেওয়া যাইতে পারে।" সতীশ বাবু এ-বিষয়ে এক জন বিশেষজ্ঞ। আশা করি, দেশবাসী সতীশ বাবুর কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কেবল সরকারের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া আমরাও সামান্য ভাবে গো-রক্ষা এবং কৃষি ব্যাপারে অনেক কিছু বোধ হয় করিতে পারি।

* * * * *

মহাত্মাজী বলিয়াছেন:—"অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু ইহা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট পচনশীল পদার্থ। হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট একটা ভ্রম, একটা পাপ এবং উহা নিবারণ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম্ম ও পরম কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহা পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যে সকল হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝেন, অন্ততঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রত্যেক অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগিনীকে আপনার করিয়া লওয়া। তাহাদিগকে আদর পূর্ব্বক সেবা ভাব হইতে স্পর্শ করা এবং স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম মনে করা, অস্পৃশ্যের দুঃখ দূর করা, বর্ষ বর্ষ ধরিয়া আমরা যে তাহাদিগকে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি, তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে যে অজ্ঞানাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা ধৈর্য্যের সহিত দূর করা, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং ঐরূপ করিতে অন্য হিন্দুদের অনুরোধ করা, অনুপ্রাণিত করা।" কিন্তু এ ব্রত পালনে কোন প্রকার 'থ্রিল' নাই, কাজেই তথাকথিত গান্ধী-ভক্তের দলের কয় জন এ-কার্য্য করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবেন তাহা জানি না। 'সবে ধন' সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় একা আর কত করিবেন?

* * * * * *

'ঢাকা-প্রকাশ' পাঠে জানিতে পারি যে:—"ঢাকা সহরে ও সহরের উপকণ্ঠে বিগত ১১৪৬ ও ১১৪৭ সালে যে সকল সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল হইয়াছে তৎসম্পর্কে আনীত সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক মামলা সম্পর্কিত মামলায় যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই উহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাইকারী জরিমানা আদায় বহাল রাখা হইয়াছে।" *পূর্ব্ব-বঙ্গ সরকারের ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই, এমন কথা কে বলিবে?*

* * * * * *

'বীরভূম-বাণী' বলিতেছেন:—"বীরভূম জেলাবোর্ডের কার্য্যকলাপ গত বৎসরাধিক কাল যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। জেলাবোর্ডের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছাপাইয়াছি। রামপুরহাট মহকুমার সভ্যগণ রামপুরহাটের চেয়ারম্যান চাহিয়াছিলেন। রামপুরহাটের জনসাধারণের উপকার তাঁহারা কতটুকু করিয়াছেন তাহাও জনসাধারণের অজ্ঞাত নাই। সহরের অবস্থাও অবর্ণনীয়। আমরা আশা করি, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যক্তিগত সুবিধা, অসুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হইবেন। নির্ব্বাচনের সময় ভোটারদের যে প্রতিশ্রুতি সভ্যগণ দিয়াছেন, সে প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক সভ্যের প্রাথমিক ও প্রধান কর্ত্তব্য সম্ভ্রম-সম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন, কর্ম্মক্ষম, যোগ্য ব্যক্তিগণকে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা। এই নির্ব্বাচন সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে।" *কিন্তু কাজে কত দূর হইল? নির্ব্বাচন বোধ হয় এত দিনে হইয়া গিয়াছে।* ফলাফলের বিষয়ে কোন মন্তব্য এখনও জানিতে পারি নাই।

* * * * * *

'বীরভূম-বাণী' বলিতেছেন:—"রাস্তার উন্নতির জন্য মটরযান বিভাগের যে টাকা এ জেলায় পাওনা হয় সেই টাকা এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিউড়ী মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডকে দিয়েছেন। সিউড়ী মিউনিসিপালিটীর হস্তে ৭০ হাজার টাকা অধুনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার সর্ত্ত মার্চ্চ মাসের মধ্যে কাজ সমাধা করিতে হইবে। অর্দ্ধেক কাজ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিলে আর জেলা বোর্ডের হস্তে আসিয়াছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকাও মার্চ্চ মাস মধ্যে খরচ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই খরচ করার সময় বাঁধিয়া দেওয়ার আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। বীরভূম জেলার শুধু বীরভূম নয়, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বর্ষার পূর্ব্বে রাস্তায় মাটী পাথর যোগাড় করা হয় এবং বর্ষাগমে তাহা ছড়ান হয় নতুবা রাস্তার মাটী থাকে না ধুলায় পরিণত হয় ও রাস্তার মাটী গাছের উপরে উঠে। সুতরাং এ সময় টাকা মঞ্জুর করিয়া মার্চ্চ মাসের মধ্যে খরচ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া অর্থের অপব্যয় হইবে। সিউড়ী মিউনিসিপালিটী সিমেণ্ট এক বৎসর লিখিয়াও পাইতেছে না। এদিকে বীরভূমের নির্ব্বাচিত এম, এল, এ-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ মাটী ছড়ানর মত টাকাগুও ছড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে ভাবে রাস্তায় রাস্তায় টাকা ভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন রাস্তারই কিছু হইবে না, টাকাটা অপব্যয় হইবে। ইহাকেই বোধ হয় বলে মাঠে মারা যাওয়া।" তাই কি? টাকাটা অন্য কোথাও যে যায় না—সে বিষয়ে 'বীরভূম-বাণী' কি নিশ্চিত?

* * * * * *

বর্দ্ধমানের কথায় প্রকাশ:—"বাঁকুড়ার খ্যাতনামা জনসেবক শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোয়েনকার উদ্যোগে বাঁকুড়া সহর হইতে ৭ মাইল দূরে মধুবন গ্রামে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক অনিলমোহন গুপ্তের অধ্যক্ষতায় এই শিক্ষায়তন পরিচালিত হইবে।" শুভারম্ভ। বাঙলার গ্রামে গ্রামে কবে ইহা হইবে?

'যুগভেরী'তে প্রকাশ :—"পূর্ব্ব-বাঙলার যোলাটে প্রাদেশিক রাজনীতি, পক্ষপাতমূলক আচরণ, দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির বিরুদ্ধে সিলেটের সর্ব্বত্র যে গণবিক্ষোভ দেখা গিয়াছে তার প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে, মন্ত্রী হামিদুল হক সাহেবের সিলেট আগমনে। সিলেটের মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, সিলেটী ও শিলং-প্রত্যাগত কর্ম্মচারীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার, অবাঙ্গালী বিরোধ, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের দারুণ অর্থসঙ্কট সত্বেও ১৫ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ, ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে অযথা বিলম্ব, প্রভৃতিই ছিল এই বিক্ষোভের মূল কারণ। মন্ত্রী সাহেবের সিলেট সফরের সময় সিলেটের ফেচুগঞ্জে, শ্রীমঙ্গল ও সিলেট সহরে এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মন্ত্রী সাহেবের নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করা হয়।" কৈফিয়ৎ আজও মিলিয়াছে কি? বৃথা আশা!

* * * * * *

'নীহার' সংবাদ দিতেছেন :—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মহাপুরুষগণ দেশে বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা দেশবাসীর মধ্যে ক্রমে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে, ইহা দেশের পক্ষে খুবই কল্যাণের বিষয়। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কাঁথি থানার পারুলিয়া গ্রামনিবাসী বাবু প্রাণেশ্বর পালের সহিত দেউলবাড় গ্রামনিবাসী বাবু অযোধ্যারাম ভূঞ্যার বিধবা কন্যা শ্রীমতী কুন্তীবালার বিবাহ কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে। রামনগর থানার বাদলপুরনিবাসী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সাহুর সহিত শ্রীশশিভূষণ মান্নার বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রমীলাবালার পরিণয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মাইতি, কালীপদ বেরা ও ভূপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কার্য্য সুসম্পাদনে ব্রতী ছিলেন। সবং থানা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী বাবু কানাইলাল করের বিধবা ভগিনী শ্রীমতী বিমলাসুন্দরীর সহিত নারায়ণগড় রাজ ষ্টেটের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মাইতির বিবাহ কার্য্য এবং বালীচকের জমিদার বাবু মহেশচন্দ্র দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্যোগে শ্রীমতী দৈবকীবালার সহিত শ্রীযুক্ত কেনারাম গিরির বিধবা বিবাহ সমাধা হইয়াছে। বীরকোটা গ্রামের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় ইহার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানেই বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন ও প্রীতি ভোজে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।" বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে উপরি-উক্ত প্রকার সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। কেন? এ বিষয়ে হিন্দু মহাসভার দায়িত্ব কম নহে। সংস্কারমূলক কার্য্যে মহাসভার স্থান সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

* * * * *

চট্টগ্রামের 'পাকজন্য' বলিতেছেন :—"আন্দর দীঘির পারে বি, ও, সির বাংলার নীচ হইতে কতক ইট চুরি করিয়া বিক্রী করিবার অভিযোগে জনৈক গাড়ীওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব টেলিফোনে চুরির সংবাদ থানায় দিলে থানা হইতে এস, আই মিঃ এম, আই চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়াই আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা বহু রাস্তা হইতে ইট চুরি সম্পর্কে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম।" রাস্তাটি খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে চুরি বন্ধ করাইতে হইলে মসলিম লীগ সম্পাদকের হুকুম অবশ্য গ্রহণীয়।

* * * * *

'আসানসোল হিতৈষী' পত্রিকার এক পত্রপ্রেরক বলিতেছেন :—"১১৪৮ সালের শুভাগমে ভাড়ার হার যথেষ্টই বাড়ান হইয়াছে। কিন্তু যাত্রীদের সুখ-সুবিধার্থে 'সিলভার অ্যারো' দেখান ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন কি? তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার হার ২৫% বাড়িয়াছে কিন্তু যাত্রী হিসাবে উক্ত শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। পুরানো শাসনতন্ত্রে এই সব চালু থাকিলেও ন্যাশন্যাল গভর্ণমেন্টের কাছে আমরা সুখ-সুবিধা দাবী করিতে পারি।" অবশ্যই পারি—কিন্তু ক্রমে ক্রমে। ২০০ শত বৎসর সহ্য হইল আর দুইটা বৎসর তাহার ফাউ স্বরূপ সহ্য করা কি এতই কঠিন হইবে?

* * * * *

'ত্রিস্রোতার' অভিযোগ :—"আজ শিক্ষিত সমাজে উপরি পাওনা একটা গুণবিশেষ। বিবাহের বাজারে পাত্র নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনের উপরি পাওনা আছে কি না ইহা প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিতে অনেকেরই আজ কোন দ্বিধা হয় না। অথচ যে চুরির জন্য আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে এবং যে চৌর্য্যবৃত্তির অপরাধে আদালতে সাজা হইতেছে, এই উপরি পাওনাও স্রেফ সেই চুরি। তবে ইহার একটু রকম-ফের আছে এই মাত্র। শিক্ষিত সমাজ নীতির দিক দিয়া উপরি পাওনাকে যখন প্রায় পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে তখন আসিল যুদ্ধের প্রবল ধাক্কা। এই ধাক্কায় উপরি পাওনা চুরির পর্য্যায় হইতে ডাকাতির পদমর্য্যাদা লাভ করিল। উপরি পাওনা সম্বন্ধে যেটুকু বা দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল তাহা মুছিয়া একাকার হইয়া গেল এবং সুরু হইল ডাকাতি। বর্ত্তমান কালের ইহকালসর্ব্বস্ব মানুষ এই উপরি পাওনার লালসায় নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গেল এবং সর্ব্বোপরি বিবেক-বুদ্ধিকে নির্ব্বিচারে বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। উপরি পাওনার সুযোগ থাকিতে যাহারা ইহাকে তুচ্ছ করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে সমাজে তাহারা বোকা ও নির্ব্বোধ আখ্যা পাইল এবং যাহারা উপরি পাওনার সুযোগ পায় নাই তাহারা 'হায় হায়' করিতে লাগিল। সমাজের নৈতিক অধঃপতনের এই চরম অবস্থায় "ঠগ বাছিতে গ্রাম উজাড়" হওয়ার কথাই মনে হয়। ইহাদের বাছিয়া বাহির করাও সহজ নহে। উপরি পাওনা আদায় করে তাহা জানা গেলেও তাহাকে শাস্তি দিতে হইলে সাক্ষী-প্রমাণ সহ স্বাক্ষর করা নোট ইত্যাদি সহ ধরিবার পদ্ধতি ও নিঃসন্দেহ ভাবে আইন মত প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত চোরকেও সাধু বলিতে হইবে। ইহা প্রমাণ করার জন্য যে রকমারি সাজ-সরঞ্জাম দরকার তাহার জন্য প্রায় কেহই ইহা ধরিবার আগ্রহ প্রকাশ করে না বরং নিতান্ত অনুপায় হইয়া এই উপরি পাওনার কবলে আত্মসমর্পণ করে। সাক্ষী প্রমাণ সহ হাতে হাতে এই উপরি পাওনা ধরা সম্ভব হয় না বলিয়া শতকরা একটি লোককেও এই অপরাধে শাস্তি পাইতে হয় না বলিয়া মনে হয়।" আমরাও এ বিষয় একমত। সর্ব্বসাধারণ এ বিষয়ে কি কিছুই করিতে পারেন না? কোন ঔষধই এ রোগের নাই?

'বরিশাল হিতৈষী' বলিতেছেন :—"প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব সচিব. এবং অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গ দিনের পর দিন বলিতেছেন—পূর্ব্ব-বাংলার সংখ্যালঘুর ভয় নাই—রাজস্ব সচিব বলেন, হিন্দুরা জমি বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইও না, আইন করিয়া বিক্রয় বন্ধ করিব। কিন্তু কথা হইল যে এই আশ্বাস প্রদান বা ভীতি প্রদর্শন আবশ্যক হয় কেন? আমরা শুধু তর্কের খাতিরে বা খেয়ালে প্রশ্ন করিতেছি না। কত দূর গভীর দুঃখ, কত বড় ভীষণ আতঙ্ক হইলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মানুষ বাস্তভূমি ত্যাগ করিতে চায়? হিন্দু খাইবে কি? জমিতে স্বত্ব লোপ হইতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইতেছে, চোর-ডাকাত হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে, হিন্দুর জমির ধান কাটিয়া নিতেছে, বিচার প্রাপ্তিতে নানা অন্তরায় ঘটিতেছে। সে বিদেশে গেলেই তৎক্ষণাৎ অর্থোপায় করিতে পারিবে না, তাথারই জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে জায়গা-জমি বেঁচিতে চায়, তাহা তাহাকে করিতে দেওয়া হইবে না—ভয় দেখান হইয়েছে, অতএব তাহাকে আরও ত্বরান্বিত করা হইতেছে যে, রাজস্ব মন্ত্রীর ঐ ভীতি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বেচা সারিয়া বাঁচিতে হইবে। কেহ কেহ বলে, মার্চ্চ মাসে পাশপোর্ট চালু হইবে, অতএব চল, দেশ ছাড়িয়া চল। পাকিস্তানে এই ছয় মাসের মধ্যে এক জন হিন্দু চাকুরী পায় নাই। আরও কত বৃত্তি লোপ পাইয়াছে, হিন্দু পত্রিকার তিন পুরুষের নিলামী ইস্তাহার ১৬ সপ্তাহের মুসলমান পত্রিকাকে দেওয়া হইতেছে, মণিঅর্ডার রীতিমত পাইতেছে না। তবু বল ভয় নাই ভয় নাই, বলিতে পার কি খাই কি খাই? অতএব আন্তরিকতার সহিত ভয়ের হেতু দূর করার জন্যই আমরা আমাদের পাকিস্থান কর্ত্তাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। কিন্তু এ কথা ঠিকই যে, সকল হিন্দুরা চলিয়া গেলে যে মুসলমান অধিবাসীদের সুখ উপচাইয়া পড়িবে তাহা নহে—শ্রমজীবি-কৃষিজীবির মুখের গ্রাস হিন্দু-মুসলমানের মুখে খসিয়া পড়িবে—কিন্তু সে যে শ্রেণীর লোক তাহাতে তাহাদের বলিবার শক্তি নাই। সেদিন জনৈক ধনী ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, মহাশয় এই হারে ১০০০৲ টাকার স্থলে ৮০০০৲ হাজার টাকা ইনকমট্যাক্স ধরিলে স্বর্ণ ডিম্বপ্রসূ হংস বধ করা হইবে, সে একবারই একটি ডিম দিল আর দিবে না। জিন্না-ফণ্ড, ইনকম ট্যাক্স, বন্দুকের পাশ প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারে এই রকম ফণ্ড হইতেছে বলিয়াই, হিন্দু অদূর ভবিষ্যতেও কোনও আশার আলো দেখিতেছে না, তাই অনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টের পারাবার মাঝে সে ঝাঁপ দিতেছে, কাহাকেও ধোঁকা দিতে নহে, সখে নহে, খেয়ালে নহে, মন্ত্রিগণ সে কথাগুলি না বুঝিয়া শুধু অভিজাতদের ভয় দেখাইয়া মুসলমান খরিদ্দারের পক্ষে বাজার সস্তা করিতে পারিবেন, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা, ধন-দৌলত রক্ষা বা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।" আমাদের মন্তব্য না করিলেও চলিবে।

★তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সরোদ শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে উদয়শংকরের শিল্পীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমিরবরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গণতন্ত্র বনাম কম্যুনিজম—

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৮ সাল ছিল ইউরোপের এক ব্যাপক বিপ্লবের বৎসর। সেই বিপ্লব সার্থক হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে উহা যে অগ্রগতির প্রেরণা জোগাইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বিগত এক শত বৎসরে এই অগ্রগতি কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের এক শত বৎসর পরে ১৯৪৮ সালে ইউরোপে, এশিয়ায়, আমেরিকায় এবং আফ্রিকায় সত্যই কোন যুগান্তকারী বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে কি? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেহই অবশ্য দিতে পারিবে না। কিন্তু 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' যে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার সকল লক্ষণই চারি দিকে সুপরিস্ফুট। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে কূটনৈতিক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে দুইটি বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে—গণতন্ত্র এবং একনায়কত্বের মধ্যে লড়াই বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই কূটনৈতিক যুদ্ধকে সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ ধনতন্ত্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিজম্ ভীতি এবং রাশিয়ার সম্প্রসারণের ধ্বনি তুলিয়া মার্কিণ ধনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিগুলিকে সংহত করিয়া তাহার পতাকা-তলে সমবেত করিবার যে চেষ্টা করিতেছে, ১৯৪৮ সালে তাহাই পূর্ণ পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি ব্রাসেলস নগরীতে আহুত বৃটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম এবং লুক্সেমবুর্গ এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে যে মতৈক্য হইয়াছে, তাহাতেই পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। ইউরোপের যে কোন দেশ ইচ্ছা করিলে এই চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবে। এই চুক্তিতে যোগদান করিবার জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে আহ্বান করিতেও ত্রুটি করা হইবে না। ইটালী যে অবশ্যই এই চুক্তিতে যোগদান করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্ক্যাণ্ডিনেভির দেশগুলি যাহাতে এই চুক্তিতে যোগদান করে, তাহার জন্য সামরিক সহযোগিতার কথা এই চুক্তি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্শাল পরিকল্পনার প্রথম ফল। মার্শাল পরিকল্পনা যে কম্যুনিজম এবং রাশিয়ার তথাকথিত সম্প্রসারণ রোধ করিবার মতলবে তাহা এখন আর কেহই গোপন রাখিতেছেন না। গত ১লা মার্চ্চ মার্কিণ সিনেটে মার্শাল পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিতর্ক উত্থাপন করিতে যাইয়া ভ্যাণ্ডেনবার্গ বলিয়াছেন, "Aggressive Communism threatens all freedom and all security whether in old world or new, when it puts peoples everywhere in chains." 'অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবীতেই হউক আর নূতন পৃথিবীতেই হউক, আক্রমণাত্মক কম্যুনিজম যেখানেই জনগণকে শৃঙ্খলিত করে সেখানেই স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।' ইহা কম্যুনিজম ভীতি দ্বারা মার্কিণ সিনেটে মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এক মার্শাল পরিকল্পনার উপরে নির্ভর করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। কম্যুনিজম নিরোধ করিবার জন্য মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট পাঁচ দফা কর্ম্মসূচী সম্বলিত একটি পরিকল্পনাও উপস্থিত করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে কম্যুনিষ্টদিগকে উৎখাত করিবার জন্য আমেরিকা-বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমেরিকার বাহিরে মার্শাল পরিকল্পনা ব্যতীত গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহিরাক্রমণ নিরোধের জন্য প্যান আমেরিকান চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। জাপান সম্পূর্ণরূপে আমেরিকারই কবলে পড়িয়াছে। কোরিয়ার দক্ষিণার্দ্ধে আমেরিকা খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছে। চীনকে সামরিক সাহায্য দিতেও আমেরিকা ত্রুটি করিতেছে না—আরও সামরিক সাহায্য দিবার কথা উঠিয়াছে। গ্রীকদের হাত হইতে গ্রীসকে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকার গ্রীসের সামরিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণের সম্ভাবনার কথাও শোনা যাইতেছে। ইহার উপর পাঁচ দফা সম্বলিত কম্যুনিজম নিরোধের নূতন পরিকল্পনা। এই পাঁচ দফা কর্ম্মসূচীর প্রথম দফায় কম্যুনিজম মতবাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া উহার ফলাফল ব্যাপক ভাবে প্রচার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা মানুষের মানসলোক হইতে কম্যুনিজমের প্রতি আস্থা দূর করিবার জন্য বুদ্ধির স্তরে কম্যুনিজমের সঙ্গে সংগ্রামের আয়োজন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কাজকর্ম্মে কম্যুনিষ্টরা যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দ্বিতীয় দফা কর্ম্মসূচী। এই কাজ তো পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দফায় অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করা। ইহা যে পররাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই হইবে না তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইন সভার উপরেই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। যদিও বুর্জ্জোয়া

শ্রেণীই আইন সভাগুলিতে আধিপত্য করেন, তথাপি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান কিছু আছে বলিয়া আইন সভায় জনসাধারণের পক্ষেও কথা বলিবার কিছু কিছু সুযোগ মিলিয়া থাকে। পাঁচ দফা কর্ম্মসূচীর এই পরিকল্পনায় আইন সভার সার্ব্বভৌমত্ব এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি পথেই কম্যুনিষ্টরা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইহা-ই পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের ধারণা। কাজেই আমেরিকার দৃষ্টিতে উহা অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে হইবেই তো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠনে কিরূপ ভাবে সহায়তা করিবে গ্রীসে এবং ইটালিতে তাহা আমরা দেখিয়াছি। ফ্রান্সেও শীঘ্রই দেখিতে পাইব। জেনারেল দ গল যথাশক্তি ফ্রান্সের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জাতীয় পরিষদের অনেক সদস্য না কি দ গলের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মঃ সুম্যানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অনেকে আশা করেন যে, মাস খানেকের মধ্যেই জেনারেল দ গল পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

আমেরিকার মতে শক্তিশালী গণতন্ত্র যে কি চীজ গ্রীসে তাহা আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না? আমেরিকার সাহায্য ছাড়া এক দিনও এই গবর্ণমেণ্ট টিকিতে পারিত না। ইটালীতে এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার আশঙ্কায় গণতন্ত্রবাদীরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার পরে তাঁহাদের উৎকণ্ঠা খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত পাঁচ দফা কর্ম্মসূচীর চতুর্থ দফা অর্থনৈতিক রক্ষা-ব্যবস্থা। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে যাহাতে কোন শিল্প-সংক্রান্ত তথ্য প্রবেশ করিতে না পারে তাহার বিধান করাই অর্থনৈতিক রক্ষা ব্যবস্থা। পঞ্চম দফাটি কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে প্রচার কার্য্যের-কর্ম্মসূচী। মার্কিণ মতবাদ যে অধিকতর প্রগতিশীল এবং বিপ্লবোত্তর মতবাদ, এই প্রচার-কার্য্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে চালান হইবে। ইহার উদ্দেশ্য খুবই সরল। এই পরিকল্পনার রচয়িতারা মনে করেন, এইরূপ প্রচার-কার্য্য চালাইতে পারিলে কম্যুনিষ্টরা আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সুযোগ পাইবে না, তাহাদের তখন নিজেদের মতবাদ সমর্থনের কাজেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কম্যুনিজম নিরোধের জন্য পাঁচ দফা কর্ম্মসূচী সমন্বিত পরিকল্পনা গঠন করা হইতেছে, ইংলণ্ডে তেমনি চলিয়াছে 'গণতন্ত্রের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান' (International of Democracy) গঠনের আয়োজন। ইউরোপীয় সমস্যা সমূহ বিবেচনার জন্য গঠিত আন্তর্জ্জাতিক কমিটি কম্যুনিজমের বিরোধিতা করিবার জন্য এইরূপ একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছেন। পশ্চিম ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনই কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া আর বিবেচিত হইতেছে না। বস্তুতঃ, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্রণ্টে একসঙ্গে সামগ্রিক ভাবে আক্রমণের আয়োজন চলিয়াছে। গ্রীসে কম্যুনিজমের প্রতিরোধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্টকে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট বলিয়া যাহাকে সন্দেহ করা হইতেছে তাহাকেই গ্রেফ্‌তার করা হইতেছে। ইটালী ও ফ্রান্সে কম্যুনিষ্টদিগকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ব্রাজিলে গত মে মাসে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি করা হইয়াছে। ব্রাজিলের আইন সভা হইতে ১৮ জন কম্যুনিষ্ট ডেপুটীকে বহিষ্কার করার জন্য গত জানুয়ারী মাসে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। লেবানিজ গবর্ণমেণ্টও কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কানাডায় কম্যুনিষ্টদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাশ করিবার জন্য কানাডা গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুইডেনেও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রধূমিত হইতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও একটি কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের অজুহাতে 'হুকবালাহাপ' এবং জাতীয় কৃষক ইউনিয়নের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিতে মিঃ এটলী অস্বীকৃত হইয়াছেন, তথাপি শ্রমিক নেতাদের দিক্ হইতে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করিতে ত্রুটি করা হইতেছে না। চারিদিকে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এই যে জেহাদ চলিতেছে তাহাকেই কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হওয়ার পর এই সংগ্রাম হইয়া উঠিয়াছে অধিকতর তীব্র। মিঃ চার্চ্চিল উহারই মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আশঙ্কা দেখিতে পাইয়াছেন। তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কাকে আজ আর কেহই দায়িত্বহীন উক্তি বলিয়া মনে করে না। ভাবী মহাযুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব রাশিয়ার উপর চাপাইবার কোন আয়োজনেরই ত্রুটি করা হইতেছে না। কিন্তু রাশিয়া সত্যই আক্রমণ আরম্ভ করিবে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে। দারিদ্র্য দুঃখই অসন্তোষের মূল। যেখানে দারিদ্র্য সেইখানেই অসন্তোষ এবং সেইখানেই কম্যুনিজমের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার উর্ব্বর ক্ষেত্র, ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মার্কিণ ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণ দারিদ্র্য ও অসন্তোষ দূর করিতে পারিবে কি? দরিদ্রের গলা টিপিয়া ধরিয়া দারিদ্র্য ও অসন্তোষ দূর করা সম্ভব বলিয়া আজিও প্রমাণিত হয় নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়া—

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক জগতে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্প্রতি যে-আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এই আলোড়নের প্রকৃত তাৎপর্য্য যেমন উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তেমনি চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক গঠন এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে উহার গুরুত্বকে বাদ দিয়া এই তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী চেকোশ্লোভ মন্ত্রিসভার ২৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করায় মন্ত্রি-সভায় এক সঙ্কট দেখা দেয়। এই মন্ত্রিসভা-সঙ্কটের ষষ্ঠ দিবস ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় সঙ্কট দূর হইয়াছে। কিন্তু বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মন্ত্রিসভার ভাঙা-গড়া পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে

নূতন কোন ঘটনা নয়। মন্ত্রিসভায় রদ-বদল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও চলে। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার ১২ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স এত বিচলিত হইয়াছে কেন?

যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ইতিহাসের কথা এখানে আমরা আলোচনা করিব না। ১৯৪৬ সালের মে মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ায় জাতীয় গণপরিষদ (Constituent National Assembly) গঠিত হয়। এই পরিষদের আয়ুষ্কাল দুই বৎসর মাত্র। আগামী মে মাসে আবার নূতন নির্ব্বাচন হইবে। বিগত নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট দলই চেক্ পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে—যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে নাই। নির্ব্বাচনে যে সকল ভোট দেওয়া হইয়াছে তাহার শতকরা ৪০টি ভোটই পাইয়াছেন কম্যুনিষ্ট দলের প্রার্থীরা। চেক্ পার্লামেন্টের ৩০১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৪ জন কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য। অবশিষ্ট ১৫৭টি আসন দখল করেন সোশ্যাল ডেমোক্রাট, শ্লোভাকিয়ান্ ডেমোক্রাট, ক্যাথলিক পিপ্‌লস্ পার্টি, নেশন্যাল সোশ্যালিষ্ট এবং স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা। কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অ-কম্যুনিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এক নূতন ধরণের সহযোগিতার ভিত্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীসহ ২৪ জন মন্ত্রী লইয়া কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত ক্লিমেণ্ট গট্‌ওয়াল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর পদ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ বিভাগ এবং ইন্‌ফরমেশন বিভাগ এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার যে মন্ত্রিদ্বয় পান তাঁহারাও কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত। স্বতন্ত্র বা অদলীয় সদস্য জ্যান মাসারিক এবং জেনারেল লুড্‌ভিক স্‌ভোবোডা (Gen. Ludvick Svoboda) যথাক্রমে পররাষ্ট্র বিভাগ এবং দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য দপ্তরগুলি বিভিন্ন দলের সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার গবর্ণমেণ্ট পরিচালনে জাতীয় কোয়ালিশন ফ্রণ্টের (National Front Coalition) স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ফ্রণ্টকে শুধু একটা গঠনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলিলেও উহার গুরুত্বকে ঠিকমত প্রকাশ করা হয় না। কম্যুনিজম এবং গণতন্ত্রের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ক্ষেত্র এই জাতীয় ফ্রণ্ট-ই স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভিত্তি সৃষ্টি করে। জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট বেনেসের কৃতিত্ব যে অনেকখানি তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দলের সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই ফ্রণ্ট গঠিত। মন্ত্রিসভায় কোন বিষয় লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইলে উহা জাতীয় ফ্রণ্টে পেশ করা হয় এবং এখানে মীমাংসা হওয়ার পর বিষয়টি পার্লামেন্টে পেশ করা হইয়া থাকে। ভেটো নীতি অনুযায়ী এই ফ্রণ্টের কার্য্য পরিচালিত হয়, অর্থাৎ একমত হইতে না পারাকেই ভেটো বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সর্ব্বপ্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তিনটি দক্ষিণপন্থী দলের ১২ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। প্রথমে আট জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আর চারি জন পরে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এই পদত্যাগের কারণ বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা আবশ্যক।

পদত্যাগের দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই একটা রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্ট মন্ত্রী মঃ নোসেকের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তিনটি দক্ষিণপন্থী দলের কয়েক জন মন্ত্রী অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বলশেভিকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াই ১২ জন মন্ত্রী পদত্যাগের উগ্র পন্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহাদের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। পদত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ আভ্যন্তরীণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানিতে পারেন এবং এই সংবাদ আলোচনার জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। পদত্যাগকারী মন্ত্রীরা এই অধিবেশনে তো যোগদান করেনই না, অধিকন্তু, পদত্যাগ করিয়া এক সঙ্কটের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদত্যাগের ফলে যে সঙ্কট সৃষ্টি হইবে তাহাতে কম্যুনিষ্টদিগকে বাদ দিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎপরতা এবং প্রেসিডেণ্ট বেনেসের দৃঢ়তার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে একটা প্রধান সুবিধা ছিল এই যে, পররাষ্ট্র সচিব এবং দেশরক্ষা সচিব পদত্যাগ করেন নাই। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সকল দল হইতে মোট ২৪ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মঃ গট্‌ওয়াল্ড প্রধান মন্ত্রী এবং ডাঃ মাসারিক পররাষ্ট্র সচিব পদে বহাল রহিয়াছেন। যদিও সকল দল হইতেই সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, তাহা হইলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তি যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাশিয়ার সহিত চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধুত্ব যে আরও নিবিড় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাঁহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল, আইন প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র শাসন পরিচালন বিভাগ হইতে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সমূলে উৎপাটন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ তো আছেই। কিন্তু সদ্য-মুক্ত সঙ্কটের সৃষ্টি হঠাৎ এক দিনে হয় নাই।

মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্যারীতে আহূত সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রহণ করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিবার পর হইতেই এই সঙ্কট সৃষ্টির আয়োজন যদি চলিয়া থাকে তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইহার পর কমিনফরমের গঠন যে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে প্রবল প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বৈদেশিক সাহায্য কি ভাবে কতখানি পাইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যে বৃটেনের সমর্থন ও সহযোগিতা পাইয়াছে, স্পষ্ট ভাবেই এই অভিযোগ করা হইয়াছে। গত ২রা মার্চ্চ নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ হেনরী ওয়ালেস চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্কট সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পূর্ণ বিবরণ এখনও আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে প্রবল ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার দক্ষিণপন্থীদিগকে সাহায্য করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই দক্ষিণপন্থীরা সঙ্কট সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, পরিস্থিতিকে তাঁহাদের অনুকূল করিতে পারিবেন।

কিন্তু তাহা হয় নাই। কাজেই নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট দিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে।" এই অভিযোগ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি ১৯৩৯ সালের মিউনিক চুক্তি যে ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে হীনতাসূচক হইয়াছিল তাহাও স্মরণ করা আবশ্যক। চেকোশ্লোভাকিয়া মিউনিকের কথা ভুলিতে পারে নাই, পারিবেও না। জার্ম্মাণী সম্বন্ধে বৃটিশ ও মার্কিণ নীতিও তাহাদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে। সুদেতেন জার্ম্মাণরা নূতন চেক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের যে চেষ্টা করিতেছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তাহারা জার্ম্মাণীতেও জনপ্রিয় নয়, উদারনৈতিক চেকদের সহানুভূতি পাওয়ার আশাও তাহাদের নাই। নূতন মন্ত্রিসভার বিরোধী কোন দলের পক্ষেই বৃটেন ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের হাত হইতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই বোধ হয় বৃটেন ও আমেরিকার নাই। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে, তাহা যে আসলে চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়, নূতন গবর্ণমেণ্ট সে কথা দৃঢ় ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিক্রিয়া ফ্রান্স ও ইটালীতেও হওয়ার আশঙ্কা বৃটেন ও আমেরিকা উপেক্ষা করিতে পারে না।

ডাঃ মাসারিকের আত্মহত্যা—

প্রাগ হইতে ১০ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদ প্রকাশ, চেক পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ জ্যান মাসারিক আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, 'অসুস্থতা ও অনিদ্রা রোগের জন্য ডাঃ মাসারিক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তিনি হয়ত স্নায়বিক অস্থিরতার সময় জীবন বিসর্জ্জন দিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ডাঃ মাসারিক ছিলেন চেক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪০ সাল হইতে তিনি পররাষ্ট্র সচিব এবং জার্ম্মাণ আক্রমণের সময় তিনি চেক গবর্ণমেণ্টের বিদেশস্থ মন্ত্রী ছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া জার্ম্মান কবল হইতে মুক্ত হইলে তিনি দেশে ফিরেন। তাঁহার স্নায়বিক অসুস্থতার কথা পূর্ব্বে কিছুই শোনা যায় নাই,ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ইয়েমেনের রাজার হত্যারহস্য—

ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্র ইয়েমেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসভ্য এবং আরব লীগের সদস্য হইলেও এই রাজ্যটির সংবাদ সংবাদপত্রে খুব কমই প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইয়েমেনের ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ রাজা ইমাম যাহিয়া বিন্ মহম্মদ বিন্ হামিদ্উদ্দীনের হত্যা-রহস্যকে কেন্দ্র করিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সংবাদ-জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৪৮) কায়রোতে এক সংবাদে ইমাম যাহিয়ার মৃত্যুর কথা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইয়েমেনের রাজ-প্রতিনিধিরা এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেন এবং এই সংবাদ সম্পর্কে মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানান। এক মাস পরে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইয়েমেনের রাজধানী সানা হইতে 'কেবল'-যোগে আরব লীগকে জানান হয় যে, ইমামের মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর সানা বেতার ষ্টেশন হইতেও এই সংবাদ প্রচার করা হয়। ইহার পরেই ২০শে ফেব্রুয়ারী এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ইমাম যাহিয়াকে হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে ইমাম নিহত হইয়াছেন প্রথমে তাহা কিছুই জানা যায় নাই। কায়রো হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাগদাদের রাজনৈতিক মহল হইতে জানা যায় যে, গত মাসে লিবারেল ফ্রন্টের সদস্যরা ইমামকে তাহার শয্যায় গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইমাম তাঁহার চারি পুত্র এবং প্রধান মন্ত্রী সহ নিহত হওয়ার যে রহস্য উন্মোচিত হইয়াছে তাহা চাঞ্চল্যকর।

গত ১৫ই জানুয়ারী তাঁহার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইবে ইমামের মনে এই আশঙ্কা জাগ্রত হয়। ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং পক্ষাঘাত রোগ-গ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষে সঞ্চিত ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মরুভূমির গুপ্ত স্থানে প্রোথিত করিবার জন্য তিনি সদলবলে মোটর-যোগে যাত্রা করেন। ১৫ জন ক্রীতদাস কেরোসিনের টিনে করিয়া এই স্বর্ণ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণ যথাস্থানে প্রোথিত হওয়ার পর গুপ্তস্থানের সন্ধান যাহাতে কেহ না পায় সেই জন্য ইমাম না কি ঐ ১৫ জন ক্রীতদাসকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদে প্রকাশ যে, ইমামের মোটরের উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় বুলেট বর্ষণ করা হইয়াছিল। বুলেটের আঘাতে মোটর না কি ঝাঁঝরার মত হইয়া গিয়াছিল এবং ইমামের দেহে ৫০টি বুলেট বিদ্ধ হয়। ষাট বৎসর বয়স্ক আবদুল্লা অলওয়াজির নিজকে ইয়েমেনের ইমাম ও নিয়মতান্ত্রিক রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং আমীর ইব্রাহিমের প্রধান মন্ত্রিত্বে নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মৃত ইমামের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর সেইফ এল ইসলাম আহমেদও নিজকে ইয়েমেনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং পর্ব্বতের মধ্যে গুপ্ত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। এ ব্যাপারে আরব লীগ কি ব্যবস্থা করেন তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইবন সাউদ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন।

ইয়েমেনের আয়তন ৭৫ হাজার বর্গ-মাইল। লোক-সংখ্যা ৪০ লক্ষ। ক্ষুদ্র হইলেও ইয়েমেন অতি প্রাচীন রাজ্য। বাইবেলের যুগে ইয়েমেনের নাম ছিল 'সাবা' বা 'সেবা'। সেবার নৃপতিগণ আরবের অধিকাংশ এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকার অনেকাংশ পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। সেবা ঐশ্বর্য্যের জন্য বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেবার রাণী রাজা সোলেমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার গল্প পুরাণ-প্রসিদ্ধ। হজরত মহম্মদ যখন মক্কা হইতে মদীনায় পলাইয়া যান তখন ইয়েমেনের অধিবাসীরাই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। নিহত ইমাম পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজবংশ সমূহের অন্যতম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম জেইদ ৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। নিহত ইমাম তাঁহারই বংশধর বলিয়া কথিত। ১৯০৪ সাল হইতে ইমাম যাহিয়া ইয়েমেনে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। ইমাম যাহিয়া স্বৈরতান্ত্রিক রাজা এবং রাজ্যের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তাঁহার ১৩টি পুত্রের মধ্যে চারি পুত্র এই স্বৈরশাসন পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের রাজনৈতিক উদার মতের জন্য অনেক বার তাঁহাদিগকে বন্দিদশায় কাটাইতে হইয়াছে। এই চারি জনের অন্যতম ইব্রাহিম এডেনে নির্ব্বাসিত অবস্থায় নিজকে ইয়েমেন উদারনৈতিক দলের সভাপতি বলিয়া প্রচার করেন। ইমামের পুত্রদের সকলেই

নামের পূর্ব্বে 'সেইক এল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের তরবারি এই উপাধি ব্যবহৃত হয়। ইব্রাহিম নিজের নামের পূর্ব্বে 'সেইক এল হক' উপাধি ব্যবহার করিতেন। ইহার অর্থ ন্যায়ের তরবারি। ইব্রাহিমই ১৫ই জানুয়ারী ইমাম যাহিয়ার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করেন। ক্ষুদ্র ইয়েমেন রাজ্যের এই বিপ্লব প্রাসাদ-বিপ্লব না গণতান্ত্রিক বিপ্লব তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আবদুল্লা অলওয়াজির বৃদ্ধ ইমামকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রাজ-সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—

সুদানের ভবিষ্যৎ লইয়া বৃটেন ও মিশরের মধ্যে যে-মতবিরোধ ঘটিয়াছে, তাহার সুমীমাংসার কোন সম্ভাবনাই এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। গত ১৫ই জানুয়ারী সুদানের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অবিলম্বে আলোচনা করিবার জন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশর গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই প্রস্তাবের বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুদানের গবর্ণর জেনারেল স্যার রবার্ট হাউ সুদানের জন্ত একটি সংশোধিত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বৃটিশ ও মিশর উভয় গভর্ণমেণ্টের নিকট এই খসড়া পেশ করা হয়। ১৯৪৬ সালে সুদানের প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেল এবং বিশিষ্ট সুদানী নেতাদের মধ্যে রাজধানী খার্তুম সহরে এক বৈঠকে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহারই ভিত্তিতে এই সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবগুলিও যথাসময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছিল। মিশরে এই সংশোধিত খসড়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়। বিরোধী দলের পত্রিকাগুলিতে এই খসড়াকে 'সুদানে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেলের হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে মিশরীয় সংবাদপত্রে তাহার সমালোচনা তো করা হইয়াছেই, তাছাড়া এই খসড়ার বিরুদ্ধে সুদানকে মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার উপর বৃটিশ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিযোগও উপস্থিত করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিশর বৃটেনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছে। এই প্রত্যাখ্যানের পরে মিশরীয় সিনেটের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে মিশর-সুদানের ঐক্যের ভিত্তিতে সুদানের জন্ত একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে মিশর গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, মিশরের রাজার অধীনে সুদানীদিগকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনার অধিকার দিয়া একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে মিশরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা সিনেটের কর্ত্তব্য।

এ কথা সত্য যে, বৃটিশের প্রস্তাবিত সংশোধিত খসড়ায় সুদানকে কথা মাত্র স্বায়ত্ত-শাসনও দেওয়া হয় নাই। বৃটেন সুদানের উপর আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু মিশরের নীল নদের উপত্যকার ঐক্যের ধ্বনি যে সুদানীদের মনে মিশরের নিকট হইতে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়া সম্বন্ধে আশার সঞ্চার করে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মিশর সুদানের প্রশ্ন লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থ হইয়াছিল। কিন্তু নীল নদের উপত্যকার ঐক্য ছাড়া তাহাদের পক্ষে আর কোনই যুক্তি ছিল না। বস্তুতঃ, সুদানীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দিক হইতে কি মিশর কি বৃটেন কাহারও নিকটই তাহাদের প্রত্যাশা করিবার কিছুই আর দেখা যাইতেছে না।

সুদানের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ-মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা সুদান আক্রমণ করে। ইহার পর হইতে সুদানের ইতিহাস পরাধীনতার নির্মম নিপীড়নের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু বিভিন্ন সময়ে প্রভুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। নেপোলিয়ানের মিশর অভিযানের সময় আলবানিয়ার ক্ষুদ্র তামকূট-ব্যবসায়ী মহম্মদ আলীর এক বিরাট সুযোগ মিলিয়া যায়। গণ্ডগোলের সুযোগে মহম্মদ আলী নিজেকে মিশরের পাশা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তুরস্কের সুলতান তাঁহার এই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মহম্মদ আলী সুদান জয় করেন। মিশর বৃটিশের অধিকারে আসে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে সুদানে মেহদীদের এক ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা মিশরীয় সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে এবং সুদান হইতে মিশরীয় শাসনের উচ্ছেদ করে। সুদান অধিকার করিতে যাইয়াই বৃটিশ জেনারেল গর্ডন মেহদীদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। কিছু দিন পর্য্যন্ত বৃটেন আর সুদান অধিকার করিবার চেষ্টা করে নাই। ১৮৯৮ সালে জেনারেল (পরে লর্ড) কিচেনার বৃটিশ এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া সুদান অধিকার করেন এবং সুদানের শাসন-ভার বৃটিশ-মিশর যৌথ কর্ত্তৃত্বের উপর অর্পিত হয়। আজিও সেই ব্যবস্থাই চলিতেছে।

প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাবের ভাগ্য—

প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অনিশ্চিত বলিয়াই মনে হইতেছে। গত ৬ই মার্চ্চ নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চককে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্ত অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। তবে এই আলোচনার সময় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সংবাদ প্রয়োজন হইলে বৃটেন সেই সংবাদ সরবরাহ করিতে রাজী আছে। চীন প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরোধী। ফ্রান্স প্যালেষ্টাইন বিভাগ সমর্থন করিয়াছে বটে, কিন্তু ষোল আনা মন দিয়া করে নাই। রাশিয়া প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব শুধু সমর্থনই করে নাই, এই প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হউক ইহাই রাশিয়ার ইচ্ছা। প্যালেষ্টাইন বিভাগের উৎসাহী উত্তোক্তা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই আজ প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে যেন দোটানায় পড়িয়া গিয়াছে। বৃটেনের বিরাগের কারণ বুঝা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বৃটেনকে প্যালেষ্টাইনের ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিবে, এই আশঙ্কা লইয়া বৃটেন প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের জন্ত জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থ হয় নাই। কাজেই ম্যাণ্ডেট অবসানের পর প্যালেষ্টাইনে যাহাতে গৃহ-বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়া জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নির্দ্দেশের অসারতা এবং জাতিপুঞ্জের অসামর্থ্য ঘোষণা করে, ইহা বৃটিশের পক্ষে অবাঞ্ছিত না হওয়ারই কথা। কিন্তু

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে কেন? আরবদের দিক্ হইতে কোন প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে না, এই আশাতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগে উত্তোগী হইয়াছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধি সেনেটর অষ্টিন প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, প্রথমে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্যালেষ্টাইনের গুরুতর অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্যালেষ্টাইন বিভাগ কমিশন যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিভাগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্ত আন্তর্জাতিক সৈন্তবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই সেনেটর অষ্টিন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, প্যালেষ্টাইনের পরিস্থিতি পৃথিবীর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে কি না তাহা বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চক স্থির করিবেন এবং প্যালেষ্টাইনের পবিত্র ভূমিতে শান্তিরক্ষার জন্ত সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন কি না, তাহাও তাঁহারা তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থির করিবেন। এ কথাও তিনি অবশ্য জানাইয়াছেন যে, যদি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীতে তাহাদের অংশ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে। সেনেটর অষ্টিন বিভাগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় পন্থা গ্রহণ করিতে নিরাপত্তা পরিষদকে যেমন অনুরোধ করিয়াছেন, তেমনি বিশৃঙ্খলা নিরোধ এবং যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্ত সমস্ত গবর্ণমেণ্ট ও সমস্ত জনগণ এবং বিশেষ করিয়া প্যালেষ্টাইনের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট-সমূহ ও জনগণকে অনুরোধ জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। আরবরা প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিরোধী। তাহারা আমেরিকার অনুরোধে কর্ণপাত করিবে এই আশা বোধ হয় সেনেটর অষ্টিনও করেন না। কিন্তু সৈন্তবাহিনী নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন না হইলে প্যালেষ্টাইন বিভাগ কার্য্যকরী করিবার জন্ত নিরাপত্তা পরিষদ সৈন্তবাহিনী নিয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক শান্তির যতই বিঘ্নকর হউক না কেন, উহাকে স্থানীয় ব্যাপার বলিয়া সহজেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, প্যালেষ্টাইনে রুশ-সৈন্ত ডাকিয়া আনা আমেরিকা মোটেই পছন্দ করে না। প্যালেষ্টাইন রাশিয়ার নিকটবর্ত্তী দেশ তো বটেই, অধিকন্তু মধ্য-প্রাচীতে আমেরিকার তৈল-খনিগুলির অতি নিকটে রুশ-সৈন্তের উপস্থিতিকে আমেরিকা আশঙ্কার চক্ষেই দেখিবে, ইহার আর বিচিত্র কি? সেনেটর অষ্টিনের প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বেই এইরূপ কথা উঠিয়াছে যে, অবিলম্বে নিয়োগ করা যাইতে পারে আমেরিকার এইরূপ সৈন্ত-সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী নয়। স্বয়ং জেনারেল মার্শাল সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটির নিকট এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকেই ইহাতে বিস্ময় বোধ না করিয়া পারিবেন না। কারণ সৌদী আরব, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান—ইহাদের যে কেহ অবিলম্বে ৫০ হাজারের অনেক অধিক সৈন্ত নিয়োগ করিতে সমর্থ। আরবরা অবশ্য হুমকী দিয়াছে যে, আমেরিকার সহিত তাহাদের তৈলচুক্তি তাহারা নাকচ করিয়া দিবে। ইহাতেই আমেরিকা ভয় পাইয়া গিয়াছে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, আমেরিকার সাহায্য ছাড়া আরবদের এক দিনও চলিবে না, প্যালেষ্টাইনের জন্ত যুদ্ধ করা তো দূরের কথা।

বৃটেনের কথা এই যে, সে জোর করিয়া প্যালেষ্টাইন বিভাগ করা সমর্থন করে না। কিন্তু বৃটিশ কি সামরিক শক্তির বলেই গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে আধিপত্য করিতেছে না? প্যালেষ্টাইন বিভাগের ধুয়া প্রথমে বৃটিশই তুলিয়াছিল। আলোচ্য প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। সৈন্তবাহিনী নিয়োগ করিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে সৈন্তবাহিনী না রাখিলে চলিবে না, বৃটেন এই কথাও নিরাপত্তা পরিষদকে শুনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ সৈন্ত গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে রহিয়াছে। প্যালেষ্টাইন বিভাগের পর উহা অপেক্ষাও অধিক কাল আন্তর্জাতিক বাহিনী প্যালেষ্টাইনে রাখা প্রয়োজন হইবে কি? নিরাপত্তা পরিষদে ৬ই মার্চ্চ তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ফল কি হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। হয়ত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ফল প্রকাশিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করা না হইলেও বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসানে প্রবল রক্তস্রোতে প্যালেষ্টাইন প্লাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে বৃটিশ বা আমেরিকা কাহারও কোন ক্ষতি নাই।

ডি ভ্যালেরার পরাজয়—

আয়ারের প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্ত প্রতিযোগিতায় ডি ভ্যালেরা হারিয়া গিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন মিঃ কষ্টেলো। মিঃ কষ্টেলো ফিনা গেইল দলের নেতা। আয়ারের নূতন ডেইলে এই দল ৩১টি আসন পাইয়াছে। নিউ রিপাবলিকান দল পাইয়াছে ১০টি, কৃষক দল ৭টি, নেশন্যাল শ্রমিক দল ৫টি, শ্রমিক দল ১৪টি আসন পাইয়াছে। স্বতন্ত্র সদস্য ১২ জন। ডি ভ্যালেরার ফিয়েনা ফেইল দল একাই ৬৮টি আসন দখল করিয়াছে। স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে মাত্র তিন জন সদস্যের সহযোগিতা ফিয়েনা ফেইল পাইয়াছে। ডেইলে মোট সদস্য-সংখ্যা ১৪৭ জন। ফিনা গেইল, শ্রমিক, কৃষক, জাতীয় শ্রমিক, নিউ রিপাবলিকান এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের কোয়ালিশনের সম্মুখে ডি ভ্যালেরা পরাজিত হইয়াছেন। ১৯৩২ সালে ডি ভ্যালেরার ফিয়েনা ফেইল দল প্রথম ক্ষমতা লাভ করে। একাদিক্রমে ১৬ বৎসর এই দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

ডি ভ্যালেরা পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু মিঃ কষ্টেলোর গবর্ণমেণ্ট যে স্থায়ী হইতে পারিবে সে সম্বন্ধেও ভরসা করা কঠিন। আয়ার স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কয়েক বৎসর মিঃ কষ্টেলোর হাতেই শাসন-ক্ষমতা ছিল। ফিনা গেইল আয়ারের ব্য[illegible] স্বার্থের প্রতিনিধি। এই দলের সহিত কৃষক-শ্রমিক প্রভৃ[illegible] এই অদ্ভুত কোয়ালিশন কত দিন টিকিবে তাহা বলা কঠিন।

এণ্টার্টিকা সঙ্কট—

বৃটেনের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা ... এবং মধ্য-আমেরিকার গোয়াটিমালার যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে

তাহাতে খুব গুরুতর কোন সঙ্কট সৃষ্টি হইবে কি না, সে কথা এখনও কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এই বিরোধের স্বরূপটি অবশ্যই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। দক্ষিণ আমেরিকার পার্শ্ববর্ত্তী কোন অঞ্চলে কোন ইউরোপীয় শক্তির সার্ব্বভৌম অধিকার আর্জ্জেণ্টিনা মানিয়া লইতে রাজী নয়। ইহা ব্যতীত ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ জর্জ্জিয়া, দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ এবং যে সকল অঞ্চল আর্জ্জেণ্টিনার কুমেরু প্রভাবাধীন অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, সেগুলির উপর আর্জ্জেণ্টিনা তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বত্ব বজায় রাখিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বৃটেনের সহিত আর্জ্জেণ্টিনার বর্ত্তমান বিরোধ ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ লইয়া। গত ডিসেম্বর (১৯৪৭) মাসে আর্জ্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট গাম্মা দ্বীপে একটি স্থায়ী আবহাওয়া ষ্টেশন স্থাপন করিয়াছে এবং আর্জ্জেণ্টিনার এক দল অভিযাত্রী অবতরণ করিয়াছে ডিসেপশন দ্বীপে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আর্জ্জেণ্টিনার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে চিলির নৌ-অভিযান ফকল্যাণ্ড দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মহড়া দিয়াছে। বৃটেনও ঐ সামুদ্রিক অঞ্চলে একটি ক্রুজার-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছে। অবশ্য বৃটিশ পতাকা প্রদর্শন এবং বৃটেন যে ভয় পায় নাই তাহা চিলিকে সমঝাইয়া দেওয়াই এই ক্রুজার-বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য। গোয়াটিমালা বৃটিশ-হণ্ডুরাসের উপর বৃটেনের আধিপত্য স্বীকার করিতে রাজী নয়। মেক্সিকো দাবী করিয়াছে যে, যদি বৃটিশ-হণ্ডুরাসের স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পর্কিত কোন পরিবর্ত্তন হয়, তবে তাহার দাবীও যেন বিবেচনা করা হয়। ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বোগোটা (কলম্বিয়া) সহরে প্যান-আমেরিকা সম্মেলনে গোয়াটিমালার দাবী লইয়া আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। এই সম্মেলনে গোয়াটিমালা যে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে বলিয়া জানাইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব এই গোলার্দ্ধের শান্তি ও স্থায়িত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে। আর্জ্জেণ্টিনা সম্ভবতঃ গোয়াটিমালার প্রস্তাব সমর্থন করিবে।

বৃটেনের সহিত আমেরিকার উল্লিখিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের এই বিরোধের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করা আবশ্যক। গত বৎসর (১৯৪৭) সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ ভাবে গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভাবী মহাযুদ্ধে স্বয়ং-চালিত রকেট দ্বারা সহজভেদ্য স্থান হইবে পানামা ক্যানেল। পানামা ক্যানেল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িলে আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জাহাজ চলাচলের একমাত্র পথ থাকিবে ম্যাজেল্যান প্রণালী। দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড এবং এই মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ টাইরেরা ডেল ফুয়েগোর মধ্যে এই প্রণালী অবস্থিত। এই প্রণালীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যাহাদের অধিকার থাকিবে, তাহাদের পক্ষে এই প্রণালী ব্যবহার করা সহজসাধ্য হইবে। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ এই প্রণালীর নিকটেই অবস্থিত।

বৃটেনের সহিত আমেরিকার তিনটি রাষ্ট্রের এই বিরোধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে বৃটেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আর্জ্জেণ্টাইনা, চিলি এবং গোয়াটিমালা বৃটেনকে এইরূপ হুমকী দিতে সাহসী হইয়াছে। বৃটিশ এণ্টার্কটিকার বৃহৎ অংশে আর্জ্জেণ্টাইনা ও চিলি তাহাদের দাবী রক্ষার উদ্দেশে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছে। ইহাতেই বৃটেনের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। রাশিয়ার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ টাইমস' এই বিরোধকে দুইটি শৃগালের বৃটেনের উপর লাফাইয়া পড়ার সহিত তুলনা করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আছে তাহাদের প্রভু অপর একটি শৃগাল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে শৃগালের সহিত তুলনা করা অবশ্যই চলে না।

কোরিয়ার ভবিষ্যৎ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষুদ্র পরিষদে কোরিয়ার মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উত্তর কোরিয়ায় অর্থাৎ কোরিয়ার রুশ অধিকৃত অঞ্চলে গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র এবং গণ সৈন্যবাহিনী (People's Army) গঠিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আট দিন পরে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কোরিয়ায় অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুদ্র পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় যদি আর একটি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, তাহা হইলে কোরিয়া বিভাগ একরূপ স্থায়ী হইয়া উভয় কোরিয়ার মধ্যে স্থায়ী সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিবার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর কে, পি, এস, মেনন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে কোরিয়ার মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই যে নাই, তাহা স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে। দক্ষিণ কোরিয়া পুলিশ রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এই অভিযোগ মার্কিণ প্রধান সেনাপতি জেনারেল হজ অবশ্য অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি স্বয়ং ডক্টর মেননের কাছে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় 'হেবিয়াস কর্পাস'র কোন অস্তিত্ব নাই। যে কোন সময় যে কোন লোককে গ্রেফ্‌তার করা যাইতে পারে। প্রধান বিচারপতি আরও বলিয়াছেন যে, ৫০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে পুলিশ ১০ হাজার লোককে গ্রেফ্‌তার করিতে পারে এবং ফলে স্বাধীন নির্ব্বাচন ব্যাহত হইবে। ডক্টর মেননের কাছে তিনি বলিয়াছেন, "Any individuel Korean is at the mercy of rhe police. He may be arrested any time without warrant, kept in jail for indefinite periods and without any law providing for his imprisonment to be reviewed by the Court." অর্থাৎ 'প্রত্যেক কোরিয়াবাসী পুলিশের কৃপার উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ যাহাকে ইচ্ছা গ্রেফ্‌তার করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল জেলে রাখিতে পারে। তাহার বন্দিদশা সম্বন্ধে আদালতে বিবেচনা করার জন্য কোন আইন নাই।' ইহা-ই যেখানে অবস্থা সেখানে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল অনুমান করা কঠিন নয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার বামপন্থীগুলিকে দল কম্যুনিষ্ট-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অস্ত্র বলিয়া নিন্দা করা খুব সহজ। কিন্তু মার্কিণ-অধিকৃত কোরিয়ার যে চিত্র ডাঃ মেনন উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত উত্তর কোরিয়ার অবস্থা কি তাহা অপেক্ষাও খারাপ ? জাতিপুঞ্জের কোরিয়া

কমিশনকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এইরূপ যে হইবে তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারা গিয়াছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবারও কিছু নাই। উত্তর কোরিয়াকে মার্কিণ ভাবে জানাই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। রাশিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রবাদীদের যত অভিযোগই থাকুক, উত্তর কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনে রাশিয়া কোন হস্তক্ষেপ করে না। উত্তর কোরিয়ায় বেকার-সমস্যা ও চোরা-বাজার নাই, ইহাও বড় কম কথা নয়। দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের আশ্রয়-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়া যখন উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করে তখন ঐ অঞ্চলের অনেক দক্ষিণপন্থী এবং জাপানের অনুকূল লোকেরা সকলেই দক্ষিণ কোরিয়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তর কোরিয়ায় রাশিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই জমিদারী-প্রথা বিলোপ করিয়া কৃষকদের মধ্যে সমস্ত জমি বণ্টন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব বাবদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে উত্তর কোরিয়া বহু বৎসর যাবৎ ঘাটতি অঞ্চল। কাজেই শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রমিকদিগকে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্ট সস্তায় খাদ্যশস্য যোগাইয়া থাকেন। উত্তর কোরিয়ার অনেক সহরবাসী খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে চোরা-বাজার, বেকার-সমস্যা এবং প্রেক্‌তারের ভয়ে আবার তাহারা উত্তর কোরিয়ায় ফিরিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ কোরিয়ারও অনেক লোক উত্তর কোরিয়ায় চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অবশ্য ইহারা সকলেই কৃষক ও শ্রমিক। উত্তর কোরিয়া হইতে আর এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাইতেছে। ইঁহারা শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমিদার। এই ভাবে একটা অধিবাসী বিনিময় চলিলেও প্রত্যেক কোরিয়াবাসীই অখণ্ড কোরিয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু অখণ্ড কোরিয়ার আশা আজ সুদূর-পরাহত বলিয়াই মনে হয়।

চীনের গৃহযুদ্ধ—

চীনের গৃহযুদ্ধে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীর অবস্থা আজ সত্যই নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৬ সালে মাঞ্চুরিয়া শতকরা ৪০ ভাগ ছিল কুয়োমিণ্টাং-এর দখলে। বর্ত্তমানে প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া কম্যুনিষ্টদের দখলে। অবশিষ্ট অংশ সংগ্রাম-ক্ষেত্র। চীনের যে অঞ্চলকে কম্যুনিষ্টরা কুয়োমিণ্টাং-এর শাসন হইতে মুক্ত করিয়াছে তাহার আয়তন ২৩ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৭) ২৫টি সহর কুয়োমিণ্টাং-এর দখল হইতে কম্যুনিষ্টদের দখলে গিয়াছে। গত এক মাসের মধ্যে আরও কয়েকটি সহর কম্যুনিষ্ট বাহিনী দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণ ভাবে কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া গেলে দক্ষিণ চীনেও কুয়োমিণ্টাং-এর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে। তাই কুয়োমিণ্টাং দল অত্যন্ত করুণ ভাবে আমেরিকার নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইতেছে।

মিঃ বুলিট, জেনারেল উয়েডমেয়ার, জেনারেল ম্যাক আর্থার সকলেই চীনকে সামরিক সাহায্য দিবার পক্ষপাতী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সামরিক সাহায্যও বড় কম দেয় নাই। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মিঃ হেনরী ওয়ালেস বলিয়াছেন, "৭ম নৌবহর এবং আরও কয়েকটি নৌবহর চীনের নিকটবর্ত্তী সাগরে সর্ব্বদাই মহড়া দিতেছে। আমাদের ২৫ হাজার সশস্ত্র সৈন্য, ২৭১টি জাহাজ এবং বহু সংখ্যক এরোপ্লেন এবং আরও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ চীনের গৃহবিবাদে সাহায্য হিসাবে জেনারেল চিয়াং কাইশেককে দেওয়া হইয়াছে।" কুয়োমিণ্টাংকে আরও ৫৭ কোটি ডলার দেওয়ার অভিপ্রায়ও আমেরিকার আছে। চীনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে না বলিয়া রিপাবলিকান দল হইতে যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহার উত্তরে মার্কিণ বিমান বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সাইমিংটন চীনকে আমেরিকার সাহায্য দেওয়ার যে-হিসাব দিয়াছেন, তাহা সত্যই চমকপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে ভারী বোমারু বিমান ও জঙ্গী বিমান সহ ১০৭১টি বিমান দিবার জন্য এবং ১৫৩০ জন পাইলটকে শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে ১৩৬টি বিমান ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও টেকনিক্যাল দিক্ হইতে যুদ্ধের ঋণ-ইজারা ব্যবস্থার মধ্যে এই চুক্তি পড়ে। কাজেই চুক্তির জন্য সিনেটের অনুমোদন আবশ্যক হয় নাই বলিয়া এই চুক্তির কথা কেহই জানিত না। জাপানের আত্মসমর্পণের পর চীনের গৃহযুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিবার প্রকৃত কারণের সন্ধান এই চুক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টদের সহিত চিয়াং কাইশেকের মীমাংসার আলোচনা যখন আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল, সেই সময় তাঁহার এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধিই যে চিয়াং কাইশেককে আপোষ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

এম, ডি, ডি

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর :—

অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম সফর শেষ করে ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশে ফিরে এসেছে। এই অভিযানে ভারতীয় দল মোট ৫টি খেলায় জয়ী হয়। সাতটি খেলায় তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। অবশিষ্ট আটটি খেলা তাদের অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে এই সফরের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিচার চলে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আখড়ায় অপেক্ষাকৃত নবাগত ভারতীয় দল বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ক্রিকেট খেলোয়াড় দেশের বিরুদ্ধে প্রথম আত্মপ্রকাশে জয়লাভের স্পর্দ্ধা করে নাই। অষ্ট্রেলিয়াতে টেষ্ট দলে এতগুলি প্রতিভাবান্ চৌকস খেলোয়াড়ের সমন্বয় ইতিপূর্ব্বে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমাদের অধিনায়ক লালা অমরনাথ ঠিক এই কথাই বলেছেন। তবে এ কথা অস্বীকারের উপায় নাই যে, এই সফরে ভারতীয় ক্রিকেটারগণ, বিশেষতঃ তরুণেরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছে। ভারতীয় দল প্রথম শ্রেণীর মাত্র দুইটি খেলাতে জয়ী হয়। সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া একাদশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের সাফল্যে অনেকে উল্লসিত হয়ে টেষ্ট খেলায় তাদের সুফল সম্বন্ধে আশা করেছিলেন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া চারিটি টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে। দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকে। এই খেলায় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে তিন দিন খেলা একেবারে বন্ধ থাকে। প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ ভারতীয় দলকে নাস্তানাবুদ করে। শীতের দিনে শুকনা মাঠে খেলায় অভ্যস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়গণ প্রতিবার ভিজা মাঠের অসুবিধা ভোগ করে। আবার সফরের শেষ দিকে অসহ্য গরমের উৎপাতে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়। তবে ব্র্যাডম্যানের ন্যায় অনন্যপ্রতিভ খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়া দলের শক্তি শতধা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি টেষ্ট খেলাতেই ব্র্যাডম্যানের ব্যক্তিগত বিরাটত্বের আভাষ পাওয়া গেছে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেও ভারতীয় বোলারেরা ব্র্যাডম্যানের বিরুদ্ধে ভঙ্গ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার মোট ১৬টি সেঞ্চুরীর মধ্যে ব্র্যাডম্যানের ব্যক্তিগত অবদান হয় ছয় বার শতাধিক রাণ। ভারতীয় পক্ষে মোট ১৪টি সেঞ্চুরী হয়। লালা অমরনাথ নিজে একটি ডবল সেঞ্চুরী সহ ৫টি সেঞ্চুরী করেন। মানকড়ের তিনটি সেঞ্চুরীর মধ্যে দুইটি টেষ্ট খেলাতে হয়। হাজারী চতুর্থ টেষ্টে উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ করে পৃথিবীর ক্রিকেট-ইতিহাসে পূর্ব্বতন দ্বাদশ জন কৃতী খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে মানকড় অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরী করে। হাজারী একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় একই টেষ্টে উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ করার গৌরব অর্জ্জন করে। হাজারী আরও দুইটি সেঞ্চুরী করে। ফাডকরও একটি টেষ্ট সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব দখল করে। অধিকারী ও রঙ্গনেকারও ছোট-খাটো খেলায় সেঞ্চুরী করে। বোলারদের মধ্যে মানকড়, ৩১টি উইকেট দখল করে শীর্ষস্থানীয় হয়। অমরনাথ ও হাজারীও বোলিংয়ে সুনাম অর্জ্জন করে। এই সফরে সি এস নাইডু ৭২ ওভার বল করার ফলে ৩১৪ রাণের বিনিময়ে একটি মাত্র উইকেট পায়। তার মত ব্যর্থতার চূড়ান্ত পরিচয় আর কোন খেলোয়াড় দেয় নাই। রঙ্গনেকার বরাবর ব্যর্থতার পরে শেষ খেলায় শত রাণ করে দোষ কিছুটা খণ্ডন করে। তরুণদের মধ্যে ফাডকর, অধিকারী, সেন ও কিষেণচাঁদ সুনাম অর্জন করে।

ভারতীয় হকি দল :—

বিশ্বের হকি-মহলে দিগ্বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের একটি বাছাই সম্প্রদায় যাদুকর ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে আফ্রিকায় বিজয়াভিযান অবাধে শেষ করে এসেছে। মোট ২৮টি খেলায় তারা ২৭৩টি গোল করে।

ডেভিস কাপ ও ভারতীয় টেনিস দল :—

আন্তর্জ্জাতিক ডেভিস কাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রবীণ খেলোয়াড় সোহনী ও সুমন্ত মিশ্র নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মানমোহন, দিলীপ বসু, নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ খেলোয়াড়দের মধ্যে এক জন এসে ভারতীয় দল সম্পূর্ণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি বিশেষ ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুমন্ত মিশ্র ভারতের সেরা তরুণ খেলোয়াড়। কিন্তু গত সফরের পরেও সুইডিশ জুটি বার্জেলীন ও জোহান্সনের বিরুদ্ধে তার অসাফল্য আমাদের হতাশ করেছে। আমরা তার খেলার ক্রমিক উন্নতির কোন আভাষ পাইনি। চটুল অঙ্গভঙ্গীর প্রাচুর্য্য এবং একই রকমের ভুল-ত্রুটি করার একগুঁয়েমী তার খেলার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। কিন্তু "নিরস্তপাদপে দেশে।" অতএব আমাদের অবস্থাও ছোটবেলার গল্পের বুলির ভাষায় বলতে হয়, 'কিসের বদলে কি পেলুম—তাক্ ডুমাডুম্ ডুম' ইত্যাদি। সোহনীর আর কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ডাবলসে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কিন্তু তার বয়স, তার সামর্থ্যের সীমার দিকের নির্ব্বাচকদের নজর দেওয়া সমীচীন হোত।

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা :—

ত্রয়োদশ বার্ষিক নিখিল ভারতীয় অলিম্পিক লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোমতী ষ্টাডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী চ্যাম্পিয়ন পাতিয়ালা ১৮ পয়েন্ট লইয়া এবারেও শীর্ষস্থান অধিকার করে। বোম্বাই ৩১, মহীশূর ২৩, যুক্তপ্রদেশ ২২, বাঙ্গলা ১৭, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ১৪, মাদ্রাজ ১১, কোলাপুর ও বিহার প্রত্যেকে ৬, ফরিদকোট ৩ ও বরোদা ১ পয়েন্ট পায়। দিল্লী ও মধ্যপ্রদেশ কোন পয়েন্ট পায় নাই। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় মহীশূর ৩৪, বাঙ্গলা ২৩ ও বোম্বাই ২০ পয়েন্ট পাইয়া যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে। উভয় বিভাগের সাইকেল রেসে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন হয়। লং জাম্পে মহীশূরের এম সুয়ারেস ১৬ ফুট ৪-৭৮ ইঞ্চি লাফাইয়া নূতন রেকর্ড করেন। হপ ষ্টেপ ও জাম্পে মহীশূরের এইচ রেবেলো ৫০ ফুট ২ ইঞ্চি অতিক্রম করে। ১৮৯৬ সাল হইতে বিশ্ব অলিম্পিকে মাত্র তিন জন এ থলীট্ এই দূরত্ব অতিক্রম করে। জাপানের এন তাজিমা ১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে উক্ত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করে। তাহার ব্যক্তিগত ও পৃথিবীর রেকর্ড ৫২ ফুট ৫-৮ ইঞ্চি। এ বৎসর জাপানের অলিম্পিকে যোগদানের অধিকার নাই। অতএব রেবেলোর পক্ষে এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা যথেষ্ট। মহিলাদের ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে বাঙলা ৫২.১ সেকেণ্ডের রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করে। ১০০ মিটার দৌড়ে বাঙলার ডালসী বীকের পূর্ব্বেকার রেকর্ড অপেক্ষা ৪ সেকেণ্ড কম লাগে। ডায়োভোলাম প্রতিযোগিতায় বাঙলার হেম মুখার্জী কৃতিত্ব দেখান।

স্বাধীন ভারতের প্রথম বার্ষিক বাজেট

১৫ই ফাল্গুন ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত ষন্মুখম্ চেটি ভারতীয় পার্লামেণ্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, স্বাধীন ভারতের উহাই প্রথম বার্ষিক বাজেট।

আমাদের স্বাধীনতার প্রথম সাড়ে সাত মাসে ১৭২·৮ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে তৎস্থলে আয় দাঁড়াইয়াছে ১৭৮·৭৭ কোটি টাকা। সুতরাং ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি টাকা আয় বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির ৩·৩৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে বাণিজ্য-শুল্কের বর্দ্ধিত আয় হইতে এবং বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ায় পুরাতন মজুত কাপড়ের উপর ট্যাক্স হইতে পাওয়া গিয়াছে ৩ কোটি টাকা। চিনির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ায় চিনির বর্দ্ধিত মূল্যের যে অংশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন, তাহা হইতে ২·২৫ কোটি টাকা আয় হইবে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্কের আয়, কর্পোরেশন ট্যাক্সের আয়, আয়কর হইতে আয় এবং আফিম হইতে আয় কমিয়াছে। লবণ হইতে আয় বরাদ্দকৃত আয় অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের সংশোধিত হিসাবে ব্যয় বরাদ্দকৃত ব্যয় অপেক্ষা ১২·১ কোটি টাকা কমিয়া ১৮৫·২৯ কোটি টাকা হইয়াছে। সামরিক বিভাগের খরচ বরাদ্দ হইতে ৬·১১ কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং অসামরিক বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ হইতে বাঁচিবে ৫·৯৯ কোটি টাকা। আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে শুল্কের বর্ত্তমান হার ধরিয়া ২৩০·৫২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে অখণ্ড ভারতের বাজেটে ২৭৯·৪২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং অনুমান করা হইয়াছিল যে, নূতন ধার্য্য ট্যাক্স লইয়া ২৯৮·৪২ কোটি টাকা আয় হইবে। এই হিসাব হইতে আয়ের আগামী বৎসর ২৫৭·৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সামরিক বিভাগ বাবদ ব্যয় হইবে ১২১·০৮ কোটি টাকা এবং অসামরিক বিভাগ বাবদ ১৩৬·২৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাণিজ্য-শুল্ক হইতে আগামী বৎসর ৮১·৭৫ কোটি টাকা আয় হইবে. কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক হইতে আয় হইবে ৩৪ কোটি টাকা। করপোরেশন ট্যাক্স হইতে ৩৯·৫০ কোটি টাকা এবং আয়কর হইতে ৯০·৫০ কোটি টাকা আয় হইবে। ইহাই প্রধান প্রধান খাতে আয় বরাদ্দ। অসামরিক ব্যয় বরাদ্দ ১৩৬·২৯ কোটি টাকার মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য এবং খাদ্যশস্য বাবদ সাবসিডি এবং বোনাস বাবদ ব্যয় হইবে ২৯·১৫ কোটি টাকা। যদি এই ব্যয় আমাদের না করিতে হইত, তাহা হইলে বাজেটে ঘাটতি না হইয়া উদ্বৃত্তই হইত। সামরিক বিভাগের ১২১·০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে মূলধন ব্যয় খাতে ১৪·৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারত বিভাগের ফলে সামরিক বিভাগের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহাতে ব্যয় বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের সামরিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয় বরাদ্দ কিছুই করা হয় নাই। আয়-ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অর্থ-সচিব ব্যবসায়ে লাভের উপর কর যথেষ্ট পরিমাণে কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সুপার ট্যাক্সের সীমাও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা হইয়াছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিদের। চা ও কফির উপর উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। কাজেই চা ও কফির দাম বাড়িবে। আজকাল দরিদ্রতম ব্যক্তিও এক পেয়ালা চা খাইয়া ক্ষুধার জ্বালা দূর করে। কিন্তু তাহার খরচ বাড়িল। গরীবের পান-তামাকের মধ্যে সুপারীর উপর উৎপাদন-শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কয়েক শ্রেণীর তামাকের উপর ট্যাক্স বাড়িয়াছে। দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স গত বৎসর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আবার বহাল করা হইল।

স্বাধীন ভারতের রেল বাজেট

৩রা ফাল্গুন রেলওয়ে-সচিব ডক্টর জন মাথাই ভারতীয় পার্লামেণ্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের যে রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর ইহাই পূর্ণ এক বৎসরের বাজেট। আগামী পূর্ণ এক বৎসরের রেল-বাজেটে প্রথমেই তিনটি প্রধান বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। রেলওয়ে-সচিব যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল বৃদ্ধির জন্য কোন প্রস্তাব না করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারত বিভাগের ফলে এবং এই বিভাগের পরিণতি-স্বরূপ রেল-ব্যবস্থায় যে অবনতি ঘটিতেছিল, তাহা সাফল্যের সহিত নিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে এবং যদিও উল্লেখযোগ্য উন্নতি কিছু হয় নাই, তথাপি রেলওয়ে-সচিব উন্নতির অগ্রসরমান পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার আশা প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য রেলওয়ে বাজেটের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া। গত বৎসর অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের যান-বাহন-সচিব হিসাবে ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৭-৪৮ সালের অখণ্ড ভারতের যে রেল-বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল, কিন্তু রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন বাবদ ৫ কোটি টাকা রেলকর্ম্মীদের সুখ-সুবিধার জন্য সৃষ্ট ফাণ্ডে ৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় তহবিলে সাড়ে ৭ কোটি টাকা দেওয়ার বরাদ্দ করায় ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে দশ কোটি টাকা দাঁড়ায় এবং উহা পূরণের জন্য যাত্রীর ভাড়া টাকা-প্রতি এক আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতঃপর গত নভেম্বর মাসে উত্থাপিত সাড়ে সাত মাসের বাজেটেও যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এই ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যকরী হইয়াছে ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে।

১৯৪৮-৪৯ সালে ভাড়া ও মাশুল বাবদ মোট আয় ১৯০ কোটি টাকা

হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় ১,৪৭'১৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাড়ে সাত মাসে ভাড়া ও মাশুল বাবদ যে আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, সংশোধিত হিসাবে তাহা অপেক্ষা ৮ কোটি টাকা কম হওয়ায় প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অবশ্য যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল বাবদই আয় কম হইয়াছে, কিন্তু পার্শেলের ভাড়া হইতে আয় বাড়িয়াছে। তা ছাড়া বহু সংখ্যক সৈন্ত চলাচল হইয়াছে, সে-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। মালের মাশুল বাবদ ৫৭'২৯ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, মালের মাশুল বাবদ আয় হইয়াছে ৫৩'৩৮ কোটি টাকা। যাত্রীর ভাড়া বাবদ ৫২'১২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে উহা কমিয়া হইয়াছে ৪৫'২৮ কোটি টাকা। যদিও অন্যান্ত কোচিং-এর আয় বাড়িয়াছে তথাপি উক্ত সাড়ে সাত মাসে বরাদ্দ অপেক্ষা ৮ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে।

ব্যয়-বরাদ্দ খাতে দেখা যায়, রেলওয়ে পরিচালন বাবদ আগামী ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৪৭'১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার সহিত ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ ১১'১১ কোটি টাকা যোগ দিলে পাওয়া যায় ১৫৮'২৬ কোটি টাকা। চলতি বৎসরে রেল পরিচালনের যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল সংশোধিত হিসাবে ব্যয় তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্যয় কমে নাই। কারণ ব্যয়টা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। চলতি বৎসরে আয় যে পরিমাণ হ্রাস হইয়া ব্যয় কমিয়াছে, সে তুলনায় কম। কাজেই মোট ক্ষতি ২'৭ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা বাড়িয়া ৫'২ কোটি টাকা হইয়াছে। ফলে রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা না তুলিলে চলে নাই। চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরের রেল-বাজেটের অবস্থা অনেকখানি স্বচ্ছল বলিয়াই মনে হইতেছে। আগামী বৎসরে ভাড়া ও মাশুল বাবদ ১৯০ কোটি টাকা আয় হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যয় বাদে উহা হইতে ৩০'২২ কোটি টাকা থাকিবে। ইহা ব্যতীত বিবিধ খাতে আয় হইবে ২'১৮ কোটি টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত হইবে ৩২'৪০ কোটি টাকা। সুদ বাবদ ব্যয় হইবে ২২'৫৩ কোটি টাকা। কাজেই নীট উদ্বৃত্ত হইবে ১'৮৭ কোটি টাকা। সাধারণ রাজস্ব তহবিলে কিছু দেওয়া হইবে কি-না, তাহা পরিষদের সদস্য লইয়া গঠিত কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গের প্রথম বাজেট

পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ৪ঠা ফাল্গুন পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৮-৪৯ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, স্বাধীন ভারতের দুইটি নূতন প্রদেশের অন্যতম পশ্চিম বাঙ্গালার উহাই প্রথম বাজেট। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট বরাদ্দে প্রকৃত রাজস্ব খাতে অখণ্ড বাঙ্গালার মোট আয় ৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব খাতে আয় ১৯৪৭-৪৮ সালের অখণ্ড বাঙ্গালার বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ। শ্রীযুক্ত সরকার ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালের বরাদ্দকৃত ব্যয় অখণ্ড বাঙ্গালার ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ অখণ্ড বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ হইলেও রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ প্রদেশের আয়তনের অনুপাতে কম তো নয়ই বরং বেশীই। অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় প্রধান প্রধান খাতে আয়ের একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায়, আয়কর বাবদ আয় হইবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ভূমি-রাজস্ব বাবদ আয় হইবে ২ কোটি টাকা। আবগারী বাবদ আগামী বৎসরে ৬ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। আগামী বৎসর ষ্ট্যাম্প বাবদ ২।০ কোটি টাকা আয় হইবে। বিক্রয়-কর এবং অন্যান্ত ঐ জাতীয় কর হইতে আগামী বৎসর ৫ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কৃষি আয়কর খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং পাট-শুল্ক হইতে ১ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মোট ব্যয় হইবে ৩১ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে ৩২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট দিবেন। সুতরাং সাধারণ রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় হইবে মোটামুটি ভাবে সাড়ে ২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে অল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্য বাবদ ১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই এক কোটি টাকা বাদ দিলে পাওয়া যায় সাড়ে ২৪ কোটি টাকা। আয়তন অনুযায়ী ব্যয় না কমিবার তিনটি কারণের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুসংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের জন্ত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে বলিয়া ব্যয় বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলেও কলিকাতা সহরের শাসন পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় কমে নাই। এইগুলির মধ্যে কলিকাতার পুলিশ বিভাগের ব্যয়, রেশনিং বিভাগের ব্যয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত এবং অন্যান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় কারণ, কৃষি প্রভৃতি জনকল্যাণ-মূলক দফার ব্যয়-বরাদ্দের বৃদ্ধি।

মোটামুটি হিসাব ধরিয়া আগামী বৎসরে ৩১ কোটি টাকা আয় এবং ৩২ কোটি টাকা ব্যয় এবং ১ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতির কারণ সম্বন্ধে অর্থ-সচিব বলিয়াছেন যে, অল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে আর্থিক সাহায্য দিবার জন্ত ১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া এই ঘাটতি হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের ব্যয় আয়তনের অনুপাতে হ্রাস না হওয়ার যে তিনটি কারণের কথা অর্থ-সচিব বলিয়াছেন, তাহারই মধ্যে ব্যয় হ্রাসের পথের সন্ধান করিতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের আয়তনের তুলনায় সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে অনেক বেশী হইয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম্মচারী রাখিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। দ্বিতীয়, কলিকাতার জন্ত সরকারী ব্যয় হ্রাস না হওয়ার যে সকল কারণ অর্থ-সচিব প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে রেশন ব্যবস্থা অন্যতম। রেশনের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন চলিবার উপযোগী চাউল পাওয়া যায়। ইহার জন্ত রেশন ব্যবস্থা রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর নাই। প্রয়োজনের অনুপাতে কর্ম্মচারী রাখিলে এবং রেশন ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে বহুসংখ্যক লোক বেকার হইয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে যদি ঠিক মত

কার্য্যকরী করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বাড়তি লোকের কর্ম-সংস্থান হইয়াও আরও লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হইতে পারে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, ময়ূর নদী পরিকল্পনায় বহু লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হইবে। প্রয়োজন শুধু আমলাতান্ত্রিক প্রভাব অতিক্রম করিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনের ব্যবস্থা করা। তাহা হইলেই যে সকল কারণে ব্যয় হ্রাস সম্ভব হয় নাই, তাহার দুইটি কারণ দূরীভূত হইবে। বস্তুতঃ,১৯৪৮-৪৯ সালে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের সুদৃঢ় আর্থিক অবস্থাই সূচিত হইতেছে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম-বঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালন করিলে আমাদের সুদৃঢ় আর্থিক অবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইবে।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে যে খসড়া প্রস্তাবটি গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে, তাহা মহাত্মা গান্ধীর খসড়া গঠনতন্ত্র অনুসারে রচিত হয় নাই। মহাত্মাজী যদিও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া কংগ্রেসকে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করিয়া জনগণের সেবক হওয়ার জন্ম তাঁহার খসড়া গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তথাপি মৌলানা আজাদ মনে করেন যে, কংগ্রেসকে যাবতীয় কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করিতে হইবে, মহাত্মাজীর খসড়া প্রস্তাবের এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না। এইখানেই মহাত্মাজীর প্রস্তাবের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। মহাত্মাজী চাঁদা দেওয়াটা বাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহীত গঠনতন্ত্রে প্রাথমিক পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার জন্ম চাঁদার বিধান করা হইয়াছে। বার্ষিক চাঁদা এক টাকা অবশ্য এমন কোন গুরুতর ব্যাপার নয়, যদিও মহাত্মাজীর একটি মূলনীতি এখানেই ভঙ্গ করা হইয়াছে। ইহাকে যদি উপেক্ষাও করা যায়, তাহা হইলেও সক্রিয় সদস্যের যে সকল গুণপণা থাকার কথা ওয়ার্কিং কমিটির খসড়ায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেগুলিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। হাতে সূতা কাটা, অস্পৃশ্যতা ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস, সর্ব্বধর্ম্মে সমদৃষ্টি প্রভৃতি যে খুব ভাল গুণাবলী তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরে এই সকল গুণের একটা ভড়ং দেখাইতে কাহারও কোন অসুবিধা হইবে না। কংগ্রেস মাঝে মাঝে যে সকল জাতীয় ও গঠনমূলক কর্ম্মসূচী স্থির করিবেন, তাহার জন্ম প্রত্যেক সক্রিয় সদস্যকে তাঁহার সময়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবার বিধানও খুব চমৎকার। কিন্তু মহাত্মাজীর রচিত খসড়ায় প্রত্যেক কর্মীর জন্ম ২ হইতে ১০ দফা পর্য্যন্ত আরও যে কর্ম্মসূচী প্রদান করিয়াছেন, কোন সক্রিয় সদস্যদের জন্ম গৃহীত গঠনতন্ত্রে সেগুলির একটিও বিধান করা হয় নাই। অর্থাৎ সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্ম নিজ অঞ্চলের পল্লীবাসীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, কর্মী সংগ্রহ করা ও শিক্ষা দেওয়া, পল্লীকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া গঠন করা ইত্যাদি কর্মীর কোন কর্ত্তব্যই সক্রিয় সদস্যদের করিতে হইবে না। এ সব করিতে ক্ষমতালিপ্সু হইয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চ্চা করিবার সময় পাওয়া যাইবে কোথায়? তাই গৃহীত গঠনতন্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মসূচী স্থান পায় নাই। কিন্তু মহাত্মাজী কংগ্রেসকে লোক-সেবক সঙ্ঘ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই কংগ্রেসকর্মীদের জন্ম ঐ সকল কর্ম্মসূচী প্রদান করিয়াছিলেন।

হায়দ্রাবাদ

নিজাম গবর্ণমেণ্ট যখন অহিংস হুমকীতে বিচলিত হইবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না, তখন ভারতীয় নেতারাই নতি স্বীকার করিয়া একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি করিতে হায়দ্রাবাদের সহিত সম্মত হইলেন। এই চুক্তিতে ভারতের প্রধান দুইটি দাবী—অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান এবং দেশে দায়িত্বশীল শাসনপ্রতিষ্ঠা—স্বীকৃত হয় নাই; গৌণ যে দাবী স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার মূল কথা এই যে, হায়দ্রাবাদের দেশরক্ষা ব্যাপার ভারত সরকার এবং নিজাম উভয়ের কর্তৃত্বে থাকিবে এবং বৈদেশিক ব্যাপারে হায়দ্রাবাদ সরাসরি কোন কিছু করিতে পারিবে না। এই চুক্তিতে ভারতীয় ইউনিয়ন অপেক্ষা নিজামই যে অধিক সুবিধার অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থিতাবস্থা চুক্তির পর হইতে এক দিকে হায়দ্রাবাদে জনসাধারণের উপর স্বৈরাচারী তাণ্ডব যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি তথাকথিত চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার বিন্দু মাত্র আগ্রহও নিজাম সরকার দেখান নাই। স্থিতাবস্থা চুক্তির পর হায়দ্রাবাদে যে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনের প্রহসন চলিল, তাহাতে দেশ-শাসনে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা কোন অধিকারই পান নাই—হায়দ্রাবাদের শাসনযন্ত্র ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিনের সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদেরই করতলগত। সম্প্রতি এই সাম্প্রদায়িক দলটি কেবল মাত্র মুসলমানদের লইয়া পাঁচ লক্ষ লোকের এক সেনাবাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা এক দিকে রাজ্যের হিন্দুদের উপর যেমন অত্যাচার করিয়া বেড়াইবে, অন্য দিকে সুযোগ বুঝিয়া পাঠান হানাদারদের মত ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ গ্রাস করিবারও ত্রুটি করিবে না। বেরারের উপর নিজামের খরদৃষ্টির সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই নিজাম সরকারের নেতৃত্বে এই ধরণের বাহিনী গঠনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হায়দ্রাবাদকে ইসলামিস্থানে পরিণত করিবার আয়োজন যে পূরো দমে চলিতেছে, হায়দ্রাবাদ-প্রত্যাগত অনেক কংগ্রেস নেতাও সে অভিযোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে হায়দ্রাবাদে আজ গণতান্ত্রিক অধিকারের শেষ চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছে—'ডেকান ক্রণিকল' প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া, সভা-সমিতি করিতে না দেওয়া ইত্যাদি তাহারই লক্ষণ। ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিনের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, পাঠান পুলিশ এবং আরব সৈন্যদের অত্যাচারে আজ হায়দ্রাবাদবাসীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের অধিকাংশ নেতা আজ নিজামের কারাগারের অভ্যন্তরে দিন গুণিতেছেন। শুধু যে জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করিয়াই নিজাম ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নয়—স্থিতাবস্থা চুক্তি অস্বীকার করিয়া পাকিস্তানের সহিত আর্থিক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্থিতাবস্থা চুক্তি নিজাম এই ভাবে অগ্রাহ্য করিলেও ভারত সরকার কেবল মৌখিক প্রতিবাদ পাঠাইয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। হায়দ্রাবাদ এবং সেকেন্দ্রাবাদের এক শত আইনজীবী সম্প্রতি নিজামের আদালত সমূহ বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শুধু এই ধরণের "আইনসঙ্গত" আন্দোলনই নহে, নিজাম রাজ্যের বিভিন্ন

স্থানে কৃষকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের প্রায় দুই সহস্র গ্রাম নিজাম-শাসনমুক্ত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। নিজামের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ভারতীয় ইউনিয়নের জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাগুলি সাহায্য তো করেন নাই, বরং গণ-আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া হায়দ্রাবাদ সরকারের পুলিসের নিকট সমর্পণ করিতেছেন। গণ-আন্দোলনকে সাহায্য করিয়া হায়দ্রাবাদে সত্যকার জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের নীতি ভারত সরকার যদি এখনও গ্রহণ না করেন, তবে পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের পথই প্রশস্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-নীতি

১৩ই ফাল্গুন পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সরকারী দপ্তরখানায় আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-উন্নয়ন সম্পর্কে যে সরকারী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাকে মোটামুটি চারিটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্ত শিক্ষাবিদ্‌দিগকে লইয়া ব্যাপক প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটি গঠন করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সত্বর মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উত্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তৃতীয়, শিক্ষা-নীতি প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্ট সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সরকার ঐ প্রস্তাবটি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক্ হইতে সুদৃঢ় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী শিক্ষা-নীতির চতুর্থ অংশ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার জন্ত একটি কমিটি গঠন করা হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া গত জানুয়ারী মাসে নয়া দিল্লীতে শিক্ষা-সম্মেলন পর্য্যন্ত অনেক কিছু আশা-ভরসার কথা আমরা শুনিয়াছি। পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী পশ্চিম-বঙ্গের কালোপযোগী সংস্কারের আশ্বাস দিয়াছেন। পরিকল্পনা গঠন ও তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তাহা আমরাও বুঝি। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভরসা আমরা করিতে পারিতেছি না।

কাশ্মীর ও ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ

ইউনাইটেড প্রেসের উল্লিখিত সংবাদে প্রকাশ যে, কাশ্মীর-প্রসঙ্গ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইঙ্গ-মার্কিণ মহল হইতে ভারতের উপর বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপ দেওয়া হইবে। এই সংবাদে আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, ইঙ্গ-মার্কিণ মহলের চাপেই ভারত গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীর প্রসঙ্গ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদ হইতে অভিযোগ প্রত্যাহার করিবার কথাও যে ভারত গভর্ণমেণ্ট তুলিতে সাহস করিতেছেন না, তাহারও কারণ যে ইঙ্গ-মার্কিণ মহলের পরোক্ষ চাপ, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ গণতন্ত্র যে সামরিক পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে তাহাতে কাশ্মীরকে তাহারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিবে, কিন্তু কোন্ উপায়ে ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব, তাহাই প্রধান প্রশ্ন। কাশ্মীরের সংঘর্ষ চলিতে থাকিলে ভারত হারিয়া যাইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ভারত যাহাতে সমগ্র কাশ্মীর ত্যাগ করে তাহার জন্ত ভারতের উপর কিরূপ চাপ দেওয়া হইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। সংবাদে প্রকাশ যে, এই চাপটা হইবে ভারতের সম্মুখে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রলোভন উপস্থিত করা। ইহাতে যদি ভারত রাজী না হয়, তাহা হইলে ভারতের জনমতকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত শুধু জম্মু দেশ ছাড়িয়া দিবার জন্ত ভারতের উপর চাপ দেওয়া হইবে। অনেক রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক না কি বলিয়াছেন যে, সমগ্র কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানকে অসন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব ইঙ্গ-মার্কিণ মহল করিবে, ইহা অনুমান করা কঠিন।

ভারত অপেক্ষা পাকিস্তান যে বৃটেন এবং আমেরিকার প্রিয়পাত্র, তাহার অনেক পরিচয়ই আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। কমন্স সভায় আর্ল উইনটারটন এই আশ্বাস চাহিয়াছিলেন যে, ভারত যদি সাম্রাজ্য ত্যাগ করে এবং পাকিস্তান সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকে তাহা হইলে যুদ্ধ জাহাজ বিক্রয় সম্বন্ধে পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে কি-না। মিঃ নোয়েল বেকার উত্তরে বলিয়াছেন যে, আর্ল উইনটারটন যাহা বলিয়াছেন তাহা বিবেচনা করা হইবে। বৃটেন যদি পাকিস্তানকেই শুধু সামরিক সাহায্য প্রদান করে এবং ভারতকে যদি কোন সাহায্যই প্রদান না করে, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া চাপটা এই ভাবেও আসিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ, কাশ্মীর সমস্যা আজ ভারতের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া যুব-সম্মেলন

৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে কলিকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া যুব-সম্মেলনের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এরূপ সম্মেলন এই প্রথম। এই সম্মেলন শুধু ভাবের আদান-প্রদানের জন্ত আহূত সম্মেলন নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত স্বদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের সম্মিলিত ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রগতিশীল গণ-শক্তির যে বিচ্ছিন্ন অভিযান চলিয়াছে, তাহাকে সংহত করিয়া গণ-শক্তিকে দুর্ব্বার করিয়া তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া যুব-সম্মেলনকে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের যুব-শক্তির সম্মিলিত ফ্রণ্ট বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের কয়েকটি বামপন্থী দল এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বদেশী কায়েমী স্বার্থ কি ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, তাহা জানিয়াও আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ভারতীয় তরুণ তরুণীগণ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশের যুবশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ যুবশক্তির সংহতিই এক অপরাজেয়

দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া যুব-সম্মেলন বিভিন্ন দেশের যুবশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে দুর্ব্বার করিয়া তুলুক, ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

ডাক্তার এইচ এন রায় সম্মানিত

ন্যাশানাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যার ডাক্তার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

সম্প্রতি বিলাতের সর্ব্বোচ্চ ধাত্রীবিদ্যার এফ, আর, সি, ও, জি, (F. R. C. O. G.) উপাধি লাভ করিয়াছেন। ডাক্তার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির এক জন সদস্য। ডাক্তার রায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট আছেন।

শুল্কবেষ্টনী ও উভয় বাঙ্গালা

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুল্কপ্রাচীর সৃষ্ট হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়া ২০শে ফাল্গুন পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুল্কপ্রাচীর সৃষ্টি হওয়ায় মুখ্য দায়িত্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের। ভারত বিভাগের সময় উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে এক স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই স্থিতাবস্থা চুক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট কোন আগ্রহ প্রকাশ ত করেনই নাই, অধিকন্ত, ভারত হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রবেশপথে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট শুল্ক-অফিস স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই ভারত গভর্ণমেণ্টকেও বাধ্য হইয়া শুল্কবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সম্পর্ক যে স্বতন্ত্র রকমের সে-কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশপথে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট শুল্কবেষ্টনী গঠন করিবেন আর পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শুল্কবেষ্টনী গঠন করা হইবে না, এরূপ আশা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বা পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থা জনিত অসুবিধা দূর করা শুধু ভারত গভর্ণমেণ্ট ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের মিলিত চেষ্টা দ্বারাই সম্ভব। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনার ফলে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, উভয় সরকারই নিজ নিজ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া উভয় বাঙ্গালার মধ্যে বুঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা জানাইবেন। তাঁহারা জিনিষপত্রগুলির নাম পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কতগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা উভয় বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

প্রথম ভারতীয় রেজিষ্ট্রার

শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার বসু, সলিসিটর এবং নোটারী পাব্লিক, কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় নিযুক্ত হইলেন। মেসার্স জি, সি, চন্দ্র এণ্ড কোংর আর্টিকেল ক্লার্ক হিসাবে কার্য্য করিয়া মিঃ বসু ১১৩৩ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী তালিকাভুক্ত হন এবং স্বাধীন ভাবে ১১৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১১৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নোটারী পাব্লিক নিযুক্ত হন। ৩রা মার্চ্চ মিঃ বসু কর্ম্মভার গ্রহণ করেন।

কলিকাতার শেরিফ

আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতার শেরিফ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ

কমার্সের সভাপতি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ উন্নতির জন্য তিনি দায়ী। ভারত সরকারের গ্লাস প্যানেলের তিনি এক জন সদস্য। বাঙ্গালার কাচ নির্ম্মাতাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ট্রাইব্যুনালের এক জন সদস্য। বাঙ্গালার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে স্নেহময়ী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও প্রচার-শিল্পী শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের পত্নী শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী গত ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে গত ৬ মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। শ্রীমতী স্নেহময়ী স্বর্গত ব্যারিষ্টার

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্রী এবং ব্যারিষ্টার বসন্তকুমার লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা ছিলেন। সারল্য ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। স্নেহময়ীর দুই পুত্র সৌম্যেন্দ্র ও দীপেন্দ্র, উভয়েই কৃতী, কৃতবিদ্য। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার সর্বাঙ্গীন শান্তি ও মুক্তি কামনা করি।

ডাঃ মুঞ্জে

ডাঃ বি এস, মুঞ্জে আর ইহজগতে নাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একদা যাঁহারা পরিচালিত করিয়াছেন, ডাঃ মুঞ্জে তাঁহাদের অন্যতম। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পরিচালক হিসাবে ডাঃ মুঞ্জে কারাবরণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেও কোন দিন পশ্চাৎপদ হন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পর ইনি কংগ্রেস নেতাদের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন বলিয়া নূতন ভাবে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভের চেষ্টা করেন। হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিয়া ডাঃ মুঞ্জে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ক্ষাত্র-শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিলেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, অন্যথায় নহে। এই জন্য তিনি ভারতীয় যুবকদের, বিশেষতঃ হিন্দু তরুণদের সামরিক শিক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ভোঁসলে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু যুবকগণ যাহাতে সরকারী সমর বিভাগে যোগদান করে তাহার জন্যও তিনি বহু বার আবেদন করিয়াছেন। ইনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও সম্পাদক হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়া ডাঃ মুঞ্জে ভারতীয় হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমান স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও বান্ধবদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১৮ই মাঘ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁহার হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছু দিন যাবৎই তিনি অম্লশূল ও হাঁপানী প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। ১২৮৫ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বহরমপুর এস এম এক স্কুল হইতে বাল্যশিক্ষার পর তিনি কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং ডাফ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। কবি যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লেখা' এবং সর্ব্বশেষ প্রবন্ধ পুস্তক 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য'। প্রথম জীবনে তিনি কিছু দিন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। মৃত্যুকালে 'পূর্ব্বাচল' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে তিনিই একমাত্র রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহাই বোধ হয় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পণ্ডিত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ৮ই ফাল্গুন শনিবার আদিনাথ আশ্রমে যোগীগুরু পণ্ডিত-প্রবর হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান হইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'দৈনিক বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। যোগেন বাবুর মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালার প্রবীণতম সাংবাদিকের অভাব হইল বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না, তাঁহার সহিত বাঙ্গালার অতীত ও বর্ত্তমান সাংবাদিকতার ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটিল বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমরা একান্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিগুরু —আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম —গোপাল ঘোষ
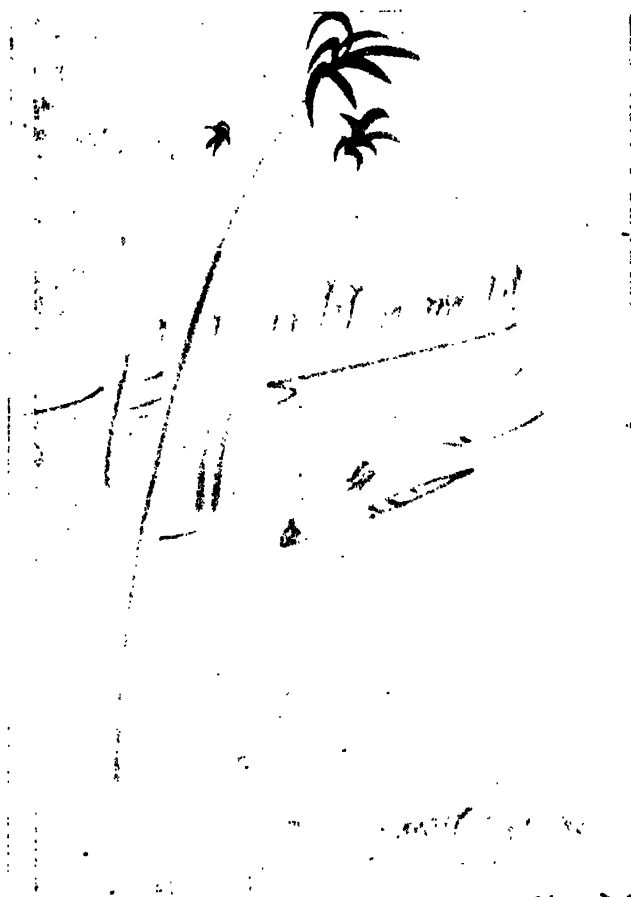
মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৪ ষষ্ঠ সংখ্যা
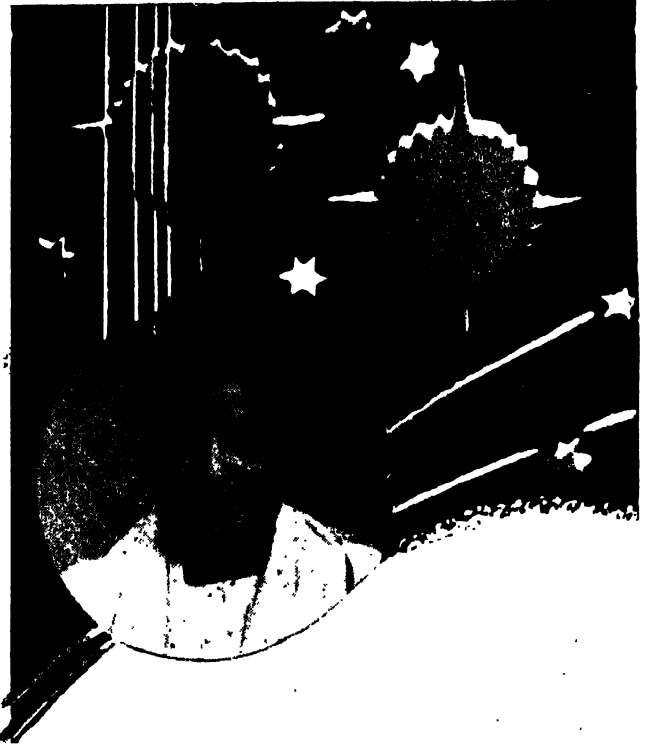
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম

(সাক্ষাৎকার)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটি বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া, ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিম বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম। তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়। জুতোর চোটে (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে ক'রে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার সাদা। সূর্য্য দূরে ব'লে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জান্‌তে পার্‌লে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না। সে অনেক দূরের কথা, সমাধিস্থ না হ'লে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ তিনি নানা রূপে প্রকাশ হন।

* * * * *

বঙ্কিম—মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—প্রচার! এগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই ক'রবেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ ক'রেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎ-কার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দু'দিন লোকে

শুনবে তার পর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি। যতক্ষণ তুমি বলবে, ততক্ষণ লোকে বলবে, আহা, ইনি বেশ বলছেন। তুমি থামবে, তার পর কোথাও কিছুই নাই।

"যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁশ ক'রে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি! কমে গেল।

"আর সাধন ক'রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার যায়গা নাই, আবার ডাকে ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে শুবি আয়।" (হাস্য)

* * * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম—পরকাল! সে আবার কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আসতে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞানলাভ হ'লে, ঈশ্বরদর্শন হ'লে মুক্তি হয়ে যায়—আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না, তার তো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো ধান ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কায হয় না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানী তা ব'লে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়া ফল নয়। তার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না।

* * * * *

বঙ্কিম—টাকা মাটী। মহাশয় চারটা পয়সা থাকিলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটী, তা হলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

* * * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স (Science) পড়তে হয় (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে Science না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিম—হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিক্কার জ্ঞান না হলে, ঈশ্বর জানবো কেমন ক'রে? আগে পড়া-শুনা ক'রে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তার পর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয় ত সবই জানতে পারবে।

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মা'র জন্য, মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্য্যন্ত যায়।

"অরুণোদয় হ'লে পূর্ব্ব দিক্ লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশী দেরী নাই।"

"এক জন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয়, ব'লে দিন, ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাবো। গুরু বল্লে, এসো আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে তাকে সঙ্গে ক'রে একটী পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামলো, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধ'রে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে দিবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিলো? শিষ্য বল্লে, প্রাণ যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু-পাটু করছিল। তখন গুরু বল্লে, ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ঐরূপ আটু-পাটু করলে, তখন জানবে যে, তাঁহার সাক্ষাৎকারের দেরী নাই।"

"তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব

[৬৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বঙ্কিমচন্দ্র —গোপাল ঘোষ

আমাদের

গ্রাহক গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষকদের

প্রতি আগামী নূতন বর্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

নববর্ষে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের অভিবাদন গ্রহণ করুন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় 'মাসিক বসুমতী' ১৩৫৫, বৈশাখ হইতে ২৭তম বৎসরে পদার্পণ করিল। আপনাদের পোষকতা এবং অনুগ্রহ আমাদের অগ্রগতির পথে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সেই জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

গ্রাহক, লেখক, শিল্পী অথবা সমালোচক, আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাদের কোন না কোন প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। আজ আপনাদের যাহা লিখিব সবই জানেন, তবুও বর্ষারম্ভে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। আমাদের 'মাসিক বসুমতী'র বার্ষিক মূল্য ৯৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৸০ আনা। অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ ব্যয় বেশি, অসুবিধাও অনেক। আপনি যদি নূতন গ্রাহক হ'ন, তাহা হইলে মণিঅর্ডার কুপনে 'নূতন' কথাটি লিখিবেন। পুরাতন হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। কলিকাতার গ্রাহকগণকে কিন্তু বিল করা বা ভিঃ পিঃ করা হইবে না।

আপনারা সকলেই 'মাসিক বসুমতী'র পূর্ণ সেট বাঁধাইয়া রাখেন। বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কোন মাসে গ্রাহক হইলে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক পূর্ণ সেট দেওয়া আমাদের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না। ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার রচনা কপি রাখিয়া পাঠাইলেই ভাল হয়। এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ আমরা ফেরত দিয়া থাকি কিন্তু সে জন্য সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট দিতে হয়। অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। আপনারা তো দেখিয়াছেন, কত বেশি রচনা আমাদের নিকট আসে। অবশ্য দ্রুত কাজ করিবার চেষ্টার ক্রটি করি না, কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে দেখিতে প্রায় চারি মাস লাগিয়া যায়। আশা করি, বিলম্বের জন্য আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

'মাসিক বসুমতী' বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী সাহিত্যামোদী সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি পত্র। আমাদের দল নেই, অর্থাৎ আমরা সর্ব্বদলীয়। একনায়কত্বের প্রথা লোপ করিতে আমরা বদ্ধপরিকর। যোগ্য লোক মাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধেয়। 'বসুমতী যা নেয়, তার দাম দেয়' এই উক্তি করিয়াছেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের এই গণতান্ত্রিক সাহিত্য-সাধনার ফলে 'মাসিক বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক সতীশচন্দ্রের প্রেরণা ও আপনাদের সকলের সহৃদয়তা আমাদের পাথেয়।

আশা করি, আপনি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। নববর্ষে আপনার দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কার—

বিনীত—
কর্ম্মাধ্যক্ষ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

-সুনীল পাল

"…মাসিক বসুমতীর রূপ ও রুচির অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি একে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা দেশের অত্যাধুনিক মনোভাব এর পাতায় পাতায় আত্মপ্রকাশ করছে। এবং এর মধ্যে কোন ছলনা নাই।"

"…পত্রিকাটি আমার মতে সব দিক দিয়া অধিকতর প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সাহিত্য রচনায় বাংলার আধুনিক কর্ণধাররা যোগ দেওয়ায় রসভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছবি সম্বন্ধেও গণ্ডী অতিক্রম করায় চিত্রকলার নানা দিক্ জানিবার সুবিধা গ্রাহকরা পাইতেছেন।"

দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের ভিতর নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।"

বঙ্কিম—মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে (সকলের হাস্য) ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে। ডুব দিতে হ'বে, তা না হ'লে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শুন—

গান—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন॥
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্ল্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাশুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া এক মনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে বাড়াবাড়ি ক'রে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাবো? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোকে এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর্ যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্‌খানে ব'সে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্লে, আড়ায় (কিনারায়) ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বল্লুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বল্লে, তা হ'লে যে রসে জড়িয়ে ম'রে যাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ রস অমৃতরস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়।"

"তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নাই, ডুবলে অমর হয়।"

এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন।

—কথামৃত

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। 'আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী।' হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না তুই সেই আছিস্, না আমি সেই আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই, তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজা দেখি, হৃদয়! এ জগৎ সংসারে—বধির অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে-সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল, সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গ' বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুকুররাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোক হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসি-কান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে; এখন হাসি-কান্না! ছি! কেবল লোকহাসান।

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও একা; কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মিসম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে, আবার স, ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন, কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, বশগত এবং বিগত শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দাদামশায়ের থলে

আজ আমি ৮৬ বৎসরে উপস্থিত; যে বয়সে বাঙালী প্রায়ই সকল দিক্ থেকেই সামর্থ্যহীন হয়। আমিও তা অনুভব করছি এবং সেইটিই আমার ভীতির কারণ। এখন পরম আপনজনের নামটিও ভুলে যাই। আরো কত ভুল হয়, তা জানবার সুযোগ আমার নাই। আপনারা দয়া করে তা বুঝে নেবেন।

আমাদের গ্রামসংলগ্ন পল্লীতে এক অতি সদাশয় লোক ছিলেন। গ্রামের কারো সাথে দেখা হলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। সব কথাতেই দু'বার Very Good—Very Good বলতেন। ভালো-মন্দ সব সংবাদেই তাঁর Very Good থাকতো। তাতেই মিটে যেতে। আমি তাঁর দু'বারের স্থানে তিন বার বলতে রাজী আছি; ফলে তাতেই মিটে যেন যায়। ভুল-চুক ক্ষমা করবেন।

সভা-সমিতি, সম্বর্ধনা, এ সব একটা কিছু ধরেই হয়ে থাকে। এবার আপনারা এই অশীতিপর বৃদ্ধকে ধরেছেন। পূর্বে বোধ করি, এমন জিনিষটি কেউ পাননি, অন্ততঃ আমার জানা নেই। সকলেই নূতন কিছু খোঁজেন। বেঁচে থেকে আমি আজ সেই নূতনের মধ্যে গণ্য হয়েছি। দেখছি, সর্বস্ব খুইয়েও লোক নির্ধন হয় না। আপনারা আজ এই বয়োজীর্ণ অশক্তকে ডাক দিয়েছেন—বোধ হয় অতীত দিনের কথা কিছু শোনবার জন্যে—যেহেতু আমি প্রায় পঁচাশী বৎসর পূর্বের লোক। অতীতের কথাই বলি—বালী ষ্টেশনে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা। পরে তাঁর ভালবাসাও পাই।

"লিখতে ইচ্ছা হয়"—শুনে খুশী হন; ৫।৭ মিনিট কথার পরে বলেন—"সাহিত্যে রস থাকবে বৈ কি, তবে কোন কথা তোমার ভালো লেগেছে বলে, জোর করে বা তার মোহে পড়ে কোথাও ঢোকাতে যেও না। যার ধাতে তা নেই, সে খবরদার যেন তা করতে না যায়। মোহ বড় ভুল করায়।"

বলেছিলুম—"সরস করে লিখতে বলছেন, কঠিন বা কাজের কথা সরস করে বলা যায় কি?"

তাতে একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—"বেশ কথা জিজ্ঞাসা করেছ। আমি তো বলিনি তা করতেই হবে। লেখকের বিষয় বিবেচনা না থাকলে সে লেখক নয়। কঠিন বিষয় হলেই বা, লেখক তো তুমি—পাঠকেরা তা ইচ্ছা করে পড়লেই হলো, সব লেখা আনন্দের জন্যে নয়, পড়ায় পাঠকের আগ্রহ আনলেই যথেষ্ট। আমার বলার মানে—পাঠককে অযথা বোঝা বইতে দেওয়া না হয়। তরকারী বা কাজের হলেও নিম চিবুতে কেউ ভালবাসেন কি? দেশে এখন পাঠক চাই, তা সৃষ্টি করতে হবে, তাই সরসেরও দরকার। তা বলে টেকো দারোগার মুখে রসিকতার কথা যেন ঢুকিও না। ভূতের মুখে রামনাম শোভন হয় না।"

আমি সাহিত্যের কথার একটু উল্লেখমাত্র করলুম—সাহিত্যের আদি-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা সর্বাগ্রে বলা উচিত বলে, নচেৎ আমার নিজের কিছু বলবার অধিকার ছিল না। আমি সাহিত্যের একটা দিক্ মাত্র নিয়ে থাকতুম, সেটা আমাকে আনন্দ দিত। সেটা ছিল তার রহস্যের দিক্। ভালো-মন্দের চিন্তা ছিল না, আনন্দ পেতুম, তাই লিখতুম।

আমি আর আপনাদের কবে পাবো, তাই দু'কথা কইলুম। আর সময় নেব না। এখন কিছু শোনবার ইচ্ছাই করি। আমার আর ভবিষ্যৎও নাই—আশাও নাই। মানুষের আশা ছোটো হয় না, কথা আছে—মরি তো গণ্ডায়। আমারো তা মনের অনুরূপ ছিল।

গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, ডায়ারীতে যা লিখেছিলুম—তাই শুধু এখানে তুলে দিলুম—

> এ জীবনে দু'টি কথা ছিল এ দীনের মনে
> শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ বন্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্রের,
> পেয়েছি তা। আর কি আছে? ভাবিনিও এ জীবনে;
> আজ দেখি অকস্মাৎ দেখাও পেলাম তৃতীয়ের।
> ছিল যাহা আশাতীত স্বাধীনতা অবশেষ
> অচিন্ত্য অভাবনীয়, তারো দেখা পেলাম আজ—
> এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ
> শেষ কথাটি বলে যাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ।

আমি বয়োজ্যেষ্ঠ এখন বোধ হয় বলতে পারি—মায়ের কৃপায় সকলের কল্যাণ হোক্—আর তাঁদের ভালোবাসা আমার পাথেয় হোক্। এই আমার শেষ কথা।*

---

* ২৮শে মার্চ্চ রবিবার, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৮৬তম জন্মতিথি উৎসব পূর্ণিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য পূর্ণিয়ায় সমবেত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। 'দাদামশায়ের থলে' শ্রীযুক্ত কেদারনাথের সম্বর্দ্ধনার উত্তরের সারাংশ।

মাসিক বসুমতীর তরফ হইতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

—জ্যোতিষ সিংহ

"কেউ ভাবে এই ইহকালে,
রাজ্য-সুখই ভোগের চরম,
কারুর মতে ভবিষ্যতে
স্বর্গ পাওয়াই লাভটা পরম।

ছেড়ে দিয়ে তত্ত্ব ও-সব
নগদা হিসাব মিটিয়ে দাও,
নেপথ্যের ওই ঢাকের ডাকে
কর্ণে তোমার আঙুল দাও।"

—ওমর খৈয়াম

পথিক, পথ হারাইয়াছ !

শুভেন্দু ঘোষ

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিক ভাবে। পথ বলিয়া কিছু আছে কি না তাহাতেই তাহার গভীর সন্দেহ জাগিয়াছে। যে-দেশে পথ নাই, সেখানে পথ-হারানোর কথা উঠে কি করিয়া? লক্ষ্য যদি না থাকে, পথ থাকে কি?

তবু তাহার কেমন যেন মনে হয়, হয় তো পথ বলিয়া কিছু আছে, এখন অগোচর থাকিলেও লক্ষ্য বলিয়া একটা কিছু হয় তো তাহার আছে। পরক্ষণেই সংশয় আসিয়া তাহার অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে: পথ? পথ কি? বহু জনের পদচিহ্ন যাহার উপর আঁকা রহিল তাহাই কি পথ? বহু জন চলিয়া গিয়াছে যে-পথে সে-পথে চলা হয়তো সহজ, কিন্তু বহু জন গিয়াছে কোথায়, কোন্ লক্ষ্যে?

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিক বুঝিবার চেষ্টা করিল, সে বহু জনের সঙ্গচ্যুত হইল কেন? কখন? সে যূথভ্রষ্ট হইল কি করিয়া? তাহা যদি না হইত, তাহাকে পথের কথা ভাবিতে হইত না। পথিক কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে একক, একেবারে নিঃসঙ্গ, এই অনুভূতি তাহার পূর্বেও হইয়াছে, এখন নূতন করিয়া বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। এইটাই হয় তো তাহার পথ হারানোর লক্ষণ, পথ হারানোর অনুভূতি।

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিকের মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া যদি এই নৈঃসঙ্গ্যবোধ আসিয়া থাকে তাহাও কাম্য, পথ লইয়া তাহার প্রয়োজন নাই। প্রবাহ যে তাহাকে টানিতে পারে নাই, সে যে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না—তাহার পথ স্বতন্ত্র, আর দশ জনের পথ নয়, বহু জন যে লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে সে-লক্ষ্য তাহার নয়।

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিক ভাবিতে লাগিল: তবে কি তাহার একটা পথ আছে, একটা লক্ষ্য আছে? সে কোনো দিন ভাবিয়া দেখে নাই। এখনই তবে এত ভাবনা কেন? পথ যে একটা আছে এ কথায় একদা তাহার বিশ্বাস ছিল বোধ হয়, খুব স্পষ্ট কিছু নয়, তবু একটা বিশ্বাসই। সুস্থ থাকিতে কেহই স্বাস্থ্য লইয়া মাথা ঘামায় না—পথ-চলা তখন অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ পথ আছে কি নাই, সে চিন্তাও কখনো মনে আসে নাই—পথ থাকাটাই ছিল একটা সংস্কারের মত। সে পথ গেল কোথায়? সে পথ যে লক্ষ্যে গিয়া শেষ হইয়াছিল সে লক্ষ্য গেল কোথায়? পথ হারাইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য হারাইয়াছে, না, লক্ষ্য হারাইয়াছে বলিয়া পথ হারাইয়াছে? হয় তো বা পথই ছিল লক্ষ্য। "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।"—অন্য কোনো লক্ষ্য হয় তো ছিল না।

সবই গুলাইয়া যাইতেছে। পথ আছে অথবা পথ নাই, লক্ষ্য আছে অথবা লক্ষ্য নাই—এ দুইটির কোনো একটিতে যদি সে বিশ্বাস করিতে পারিত।

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিক মাথা নাড়িল। পথ যে ছিল, এটা মানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। পথ থাকার একটা সংস্কার ছিল বটে, তাই বলিয়া পথ যে ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কি কারণ আছে? পথ বা লক্ষ্য যে কিছুই নাই, এ কথাতেও তো তাহার মন সায় দিতে পারিতেছে না। আছে বৈ কি! এই এখনই তো স্পষ্ট বোঝা গেল, নিঃসংশয় হওয়াটা তাহার লক্ষ্য—অন্তিম লক্ষ্য না হইলেও এখনকার তো বটে। অনিশ্চয়তা একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিঃসংশয় হওয়ার অর্থই যে হইল, যা হোক্, একটা দৃঢ় বিশ্বাসের ধরণীতে জীবনকে ফিরাইয়া আনা। সে ধরণীতেই কেবল পথ থাকিতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, সে ধরণী পাই কোথায়? জীবনের মূল রসগুলি দিয়া তাহার সৃষ্টি হওয়া চাই, জীবনের পুরাতন নূতন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সুসংগত ভাবে তাহাতে যুক্ত হওয়া চাই, নহিলে তো সে ধরণী অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

পথিক প্রত্যক্ষ করিল, তাহার পায়ের নীচে ধরণী দ্রুত ফাটিয়া যাইতেছে। যেখানেই সে পা রাখিতে যায় মাটী ধ্বসিতে থাকে। পা রাখিবে কোথায়? যতক্ষণ তলাইয়া না যায় ততক্ষণ না হয় গঙ্গাফড়িঙের মত ইতস্ততঃ লাফাইতে থাকিল; তাহাই বা চলিবে কতক্ষণ?

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ !

পথিক এতক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবে শুনিতেছিল, সে ভাব জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া কাণ পাতিল: এ ধ্বনি তো বাহির হইতে আসিতেছে না, তাহার নিজেরই বুকের গভীর তলদেশ হইতে উঠিতেছে। এ তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের আর্তস্বর। শ্রান্তিতে গা ভাসাইয়া দিয়া পথিক ভাবিল: পথ যদি হারাইয়াই থাকি, নূতন পথের কোনো দিশা যখন মিলিতেছে না, তখন হাত-পা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। পথ হারাইয়া থাকে, হারাইয়াছে!

এ ভাবনাতেও তো প্রাণের অশান্তি মিটিতেছে না। চিন্তার

পথিক পাগল হইয়া উঠিল। চিন্তা যদি না থাকিত, বেশ হইত! তাই কি? প্রাণ ডুবিতে বসিয়া চিন্তার হাত বাড়াইয়া শূন্তকে ধরিতে চাহিতেছে, যতক্ষণ প্রাণ আছে চিন্তা থাকিবেই, চিন্তা যে মানুষের প্রাণধারণের প্রয়াস।

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!

পথিক বুঝিল, প্রাণশক্তি যদি থাকে, পথের একটা দিশা মিলিলেও মিলিতে পারে। সে পথ তাহার নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। অকস্মাৎ সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিল: এত বড় দুঃসাহস কি তাহার এখনও আছে? যে ক্লান্তি যে জড়তা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সে কি তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে?

নিজেকে আশ্বাস দিবার জন্ত পথিক আপন মনে বলিয়া উঠিল: যেখানে আমার পদচিহ্ন পড়িতেছে, তাহাই আমার পথ। এত কাল জীবন যাহা সন্ধান করিয়া আসিতেছে, অজ্ঞাত অগোচর হইলেও যাহাকে চাহিয়া জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই তাহার লক্ষ্য, জীবনকেই তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে।

পথিক লক্ষ্য করিল, জীবন যেন তাহার জীবন নয়, এই ভাবে জীবনের উপর লক্ষ্য ও পথ খুঁজিবার ভার চাপাইয়া দিয়া সে যেন একটু সোয়াস্তি পাইতেছে। সে একটা বক্র-বিদ্রূপের হাসি হাসিল। তখনই আবার ভাবিল, এই যে জীবনকে সে তাহার নিজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিল, তাহা কি একেবারেই ভুল? সত্যই তো, এক দিক্ হইতে তাহার জীবনটা যেমন তাহার, যেমন স্বতন্ত্র, অন্ত দিক্ হইতে তাহা কি অবিচ্ছেদ অসীম জীবনের একটা ধারামাত্র নয়? নিখিল বিশ্বের জীবনস্রোতে কি তাহা পরিপ্লুত নয়? নিখিল জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই সে তাহার জীবনকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত এক করিয়া ভাবে নাই। জীবনের এই দুই দিক্, দুই রূপকে একসঙ্গে দেখিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাহার চিত্তে এই গভীর হতাশা নামিয়াছে বোধ হয়। দৃষ্টিসংস্কারের প্রয়োজন, তাহা হইলেই পথ আপনা হইতেই ধরা দিবে, লক্ষ্য গোচরে আসিবে।

পথিক নিজেকে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া তুলিল, মনকে ধমক দিয়া উঠিল: আবার ঐ সব ছেঁদো কথা! ফাঁকি দিয়া পথ পাইবার দুরাশা এখনও চলিয়াছে?

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

পথিক আর ভাবিতে পারে না, শূন্তমনে বসিয়া থাকে। হৃৎবৃত্তি, বুদ্ধি, কিছুরই উপর তাহার আর আস্থা নাই। বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া কিছুক্ষণ ভুলাইয়া রাখে মাত্র, উহা যে ছলনা নয় এ বোধ তো তাহার আর কিছুতেই আসে না। সত্যের কঠিন মাটী বলিয়া যাহারই উপর সে পা রাখিতে গিয়াছে, তাহাই যে চোরাবালি বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। যে দেবতার অস্তিত্বে তাহার কোনোরূপ বিশ্বাস নাই, পথিক করুণ বিনয়ে তাহারই নিকট আকুল প্রার্থনা জানায়, "কিছুতেই বিশ্বাস রাখা যায় না—এই যে সত্যটুকু এখনও হাতে আছে, তাহারই নির্দেশে আমাকে পথ চিনিতে দাও।"

ইমানের দাম

মুসাফির
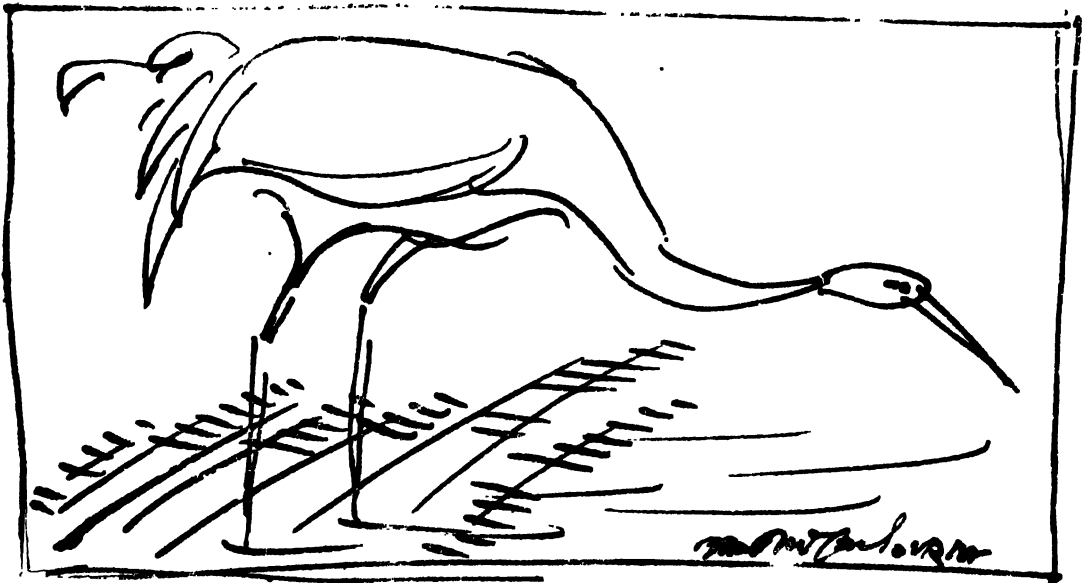
সোহরাব রুস্তমের মতো পুরাকালের কাহিনী নয়। প্রচলিত কিংবদন্তীর মতোই অনন্যসাধারণ এবং অবিশ্বাস্য এ সত্য ঘটনা; মাত্র কয়েক বছর আগে রাজপুতনায় ঘটেছিল।

মাধব সিং তখন জয়পুরের গদীর মালিক। সকল দেশে সকল কালেই রাজা-রাজড়ার হাতী-ঘোড়ার সখ থাকে, এঁর ছিল উটের প্রতি ঝোঁক। অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী, প্রতাপ ও চৈতক, মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে যুধ্যমান ঔরঙ্গজেব প্রভৃতির চিত্র সুপরিচিত। মাধব সিং সখ করে বহুমূল্য তৈলচিত্র করিয়েছেন তাঁর আদরের রূপমতীকে নিয়ে।

এ বংশের আর কোনও এক পূর্বপুরুষের খেয়াল অনুসারে রাজ্যেশ্বরের তোষাখানার পাহারাদারী ও জিম্মেদারীর ভার পড়ে 'মিনা' নামক আধা-জঙ্‌লী জাতির ওপর। তারা অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং সাহসী। রাজমাতা ও রাজবধূদের যুগ-যুগ সঞ্চিত অলঙ্কার—মহারাণাদের সৌখীন বহুমূল্য সঞ্চয়, হীরা-জহরৎ, স্বর্ণমুদ্রা সুরক্ষিত থাকে মিনা সর্দারের তদারকে। নিত্য ব্যবহার্য্য অর্থের তহবিলের পৃথক্ বিভাগ আছে। এই কার্য্যভার সাধারণতঃ রাজ্যশাসনের মত বংশগত ধারা অনুযায়ী চলে—জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্মানের অধিকারী হয়, কিন্তু তার যোগ্যতায় সন্দেহ জন্মালে যোগ্যতর ব্যক্তি নির্বাচিত হয়। আর একটি অদ্ভুত প্রথারও চলন আছে।

মেয়েরা, সৈনিকরা উল্কি ব্যবহার করেন; নিজ বাহুতে প্রিয়জন বা ইষ্টদেবের নাম বা চিত্র আঁকিয়ে রাখেন, আমরণ তার চিহ্ন লোপ হয় না। যে সর্দার এই দায় বহন করবে তার জঙ্ঘায় ঐ ভাবে রাজকোষের সমস্ত জিনিষের তালিকা লেখা থাকে। তার মৃত্যু ঘটলে যতক্ষণ না তার উত্তরাধিকারীর জঙ্ঘায় সে তালিকা এঁকে দেওয়া হয়, ততক্ষণ সে মৃতদেহ সৎকার করা হয় না, এমন কি স্থানান্তরিত করাও নিষেধ। এতখানি দুঃখ স্বীকার ও দুর্জ্জয় লোভ সংবরণ করার পরিবর্ত্তস্বরূপ এরা বিশেষ কিছু ধন-সম্পদ্ পায় না। সামান্য জায়গীর ভোগ করে—ভরণ-পোষণের জন্য অন্য জীবিকাও অবলম্বন করে। সে যে প্রজামণ্ডলের মধ্যে বিশেষ এক জন ইমানদার বলে গণ্য হোল—এটাই তার পরম ভাগ্য ও চরম লাভ; জীবন পণ করে সে এর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে! রাজা রক্ততিলক ও রক্তবীজের মালা পরিয়ে সর্দার বরণ করেন এবং একখানি শাণিত অসি উপহার দেন।

মাধব সিংএর আমলে সর্দার ছিল 'সুজন'। দিনে সে রুদ্ধ বিরাট লৌহ-কবাটের সামনে বসে থাকতো—রাতে সামনে এক আস্তানায় শুয়ে পড়তো। সহকারিরূপে কাজ করতো তার চৌদ্দ বছরের ভাবী পদপ্রার্থী সন্তান। সুজনকে প্রায়ই এক-মনে ভারী নাগরা জুতার কিম্বা ঘোড়ার খুরের নাল তৈরী করায় মগ্নচিত্ত দেখা যেত। তার ডান পাশে থাকতো একটা জলের মশক, হাপর, টুকরো যন্ত্রপাতি আর বাম পাশে তীরধনু, তরবারি।

মহারাণীর বিবাহ—নগরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। যোধপুরের রাজকুমারী লছমী দেবী জয়পুরের ভাবী রাণী। রূপমতী মাথায় কড়ির গহনা পরে, পায়ে নূপুরের শব্দ তুলে প্রধান উপঢৌকন নিয়ে গেল। তার গলার রূপোর ঘণ্টার টুং-টুং শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেল। সুজনের কিন্তু ছুটি নেই—তার দায় আরও বাড়বে—নতুন রাণীর দৌলতে আরও কত সমৃদ্ধি হবে এ কোষাগারের।

বিবাহ সমাপনান্তে শুভযাত্রা কালে লছমী দেবীর বিধবা বংশগর্বসচেতন মাতা একান্তে তাঁকে ডেকে হাতে একগাছা অমূল্য হীরের কাঁকন দিয়ে বললেন, "মা, যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেই তোমাকে জয়পুরেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছি। কিন্তু এক পরীক্ষা অসম্পূর্ণ আছে। প্রথম রাত্রিবাসকালে তুমি এই কাঁকন তাঁর হাতে দিয়ে এর জুড়ী মিলিয়ে দিতে বলো। যদি এ দাবী অপূর্ণ হয় তো এ গৃহে আবার ফিরে এসো, আমি সাদরে তোমাকে কোলে টেনে নেব। প্রিয়জনের প্রথম দাবী যে না মেটাতে পারে, সে মানুষ নামের যোগ্য নয়।"

লছমী এ আপৎসঙ্কুল প্রস্তাব শুনে শিউরে উঠে কম্পিত-হস্তে মায়ের দান গ্রহণ করে যাত্রা ক'রলেন নতুন পথে, নতুন মানুষের সঙ্গে।

মায়ের নির্দেশ মত লছমী মাধব সিংএর হাতে সেই হীরক-বলয় তুলে দিয়ে নিজের ভিক্ষা জানালেন। রাজা ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল বোধ ক'রলেন, পরে জানালেন, "দেবি, আমায় এক পক্ষকাল সময় দাও। ইতিমধ্যে তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে না পারলে মাধব সিং জানবে যে সে এ রাজতক্তে বসার যোগ্য নয়। আগামী কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমাকে তুমি এ কক্ষে দেখতে পাবে না—সে জন্য চঞ্চল হয়ো না।"

এলো আগামী কালের রাত্রি। নিশীথে রাজা ছদ্মবেশে রূপমতীর বল্‌গা ধরে ধীর ছন্দে নিঃশব্দে রাজপ্রাসাদের প্রাকার ছাড়িয়ে পরিখা পার হ'য়ে পশ্চিম দিকের বুনো পথে চ'লে গেলেন। জয়পুরী মিনার কারুকার্য্যখচিত সাদা পাথরের ঘরে হাতীর দাঁতের পালঙ্কে বসে একবার স্তিমিত প্রদীপ-শিখার আর একবার বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে লছমী দেবী ভাবলেন, "এমনই ঘন আঁধারে কি তাঁর জীবনের আলো গ্রাস করবে? এ কি কালরাত্রি এলো তাঁর জীবনে? এমন ভাবে রাজাহীন প্রিয়হীন রাজ্যে তাঁকে যে জীবন কাটাতে হবে—আজ কি তার সূত্রপাত ঘটলো?"

রাজা চলেছেন পথ বেয়ে—দূরে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে নাহারগড়ের। হয় তো আরও কিছু দূর গেলেই বিনিদ্র সুজনের ঋজু মূর্ত্তি ফুটে উঠবে। রূপমতীকে থামিয়ে হাতের স্পর্শের ইঙ্গিত জানিয়ে রাজা এগিয়ে গেলেন। সুজনের পার্শ্বস্থিত মশক তুলে জল ভরে এনে রাখলেন। এ কি সঙ্কেত, কে জানে!—সুজন প্রশ্ন করলো, "কি চাই?"

রাজা বলয়টি তার হাতে দিয়ে বললেন, "লছমী দেবীর মাঁ আমাকে পরীক্ষা করতে চান; এর জুড়ী মিলিয়ে রাজবধূকে

উপহার দিতে বলছেন? তোমার কাছেই এর সমাধান সম্ভব ভেবে ছুটে এসেছি।—আমার তথা এ রাজ্যের সম্মান আজ তোমার হাতে। অবশ্য পক্ষকাল সময় আছে।"

"ত্রিদিবেশের ইচ্ছা। পক্ষকাল নিষ্প্রয়োজন—আপনি প্রস্তুত হোন"—বলেই সে রাজার পাগড়ি খুলে নিয়ে চার পাট করে রাজার চোখ বেঁধে দিল। তার পর তাঁর হাত ধরে ঘুরে-ঘুরে একে একে লোহার কাঠামোয় গাঁথা পাথরের দরজা খুলতে খুলতে ও বন্ধ করতে করতে রত্ন-কক্ষে ঢুকে রাজাকে বন্ধনমুক্ত করে দিল। রাজা এত ঐশ্বর্য্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। শত শত অলঙ্কারের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টিপাত হতে লাগলো। অমনই অরূপ রত্নখচিত নিপুণশিল্পমণ্ডিত এক জোড়া কাঁকন মিললো। সাফল্যের আনন্দে রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সুজনের পিঠে থাপড় দিয়ে বললেন, "সাবাস্।"

সুজন বললে, "এ ছাড়া আর কিছু যদি চোখে লাগে পছন্দ করে যান—কাল দরবারে ভেটস্বরূপ পৌঁছে দেব। এ বালাও কাল পাবেন—আজ নয়।"

রাজা রূপমতীর জন্য মণি-মাণিক্যের ঝালরওলা এক হাওদা দেখিয়ে দিয়ে পূর্ব্বের মতোই ধীরপদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। সুজন সেইক্ষণেই তার জন্বায় লেখা তালিকা থেকে এ দু'টি জিনিসের নাম কেটে দিল। এর জন্য কোনও সাক্ষীর প্রয়োজন নেই—তার প্রধান সাক্ষী রইল তার ইমান।

প্রভাতে রাজ-দরবারে ভেট এলো। রাত্রে প্রতীক্ষমানা রাণীর হাতে রাজা কাঁকন পরিয়ে দিলেন। রাণী জিগেস করলেন, "আজ রূপমতী এক অপরূপ হাওদায় সজ্জিত হয়ে যোধপুরের পথে গেল কেন? সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী।"

রাজা হেসে জবাব দিলেন, "তুমি বাপের বাড়ীর পথের দিকে সারা দিন চোখ মেলে রাখ না কি? ঠিকই দেখেছ। তোমার মায়ের দেওয়া নমুনা-স্বরূপ কাঁকনটি তাঁকে ফেরত পাঠালুম—যাতে যোধপুর রাজ্য আরও এক জন নব বিবাহিত জামাতাকে বিপন্ন করতে পারে।"

রাণী নীরবে এ বক্রোক্তি সহ্য করলেন; বুঝলেন, দু'গাছি কাঁকনই এ রাজ্যের।

আর কিছু দিন গেল। রাজার জন্মোৎসব। অমাত্য-পারিষদেরা নানা উপহার আনছে। চতুর্দিকে বিলাসের স্রোত বইছে।

সুজন তার একমাত্র নাবালক পুত্রকে ডেকে দু'টি রক্ত গোলাপ দিয়ে বললে, "যাও বেটা, মহারাজকে ভেট দিয়ে এসো। ব'লো, 'তোষাখানার মালিককে দেবার যোগ্য সম্পদ আমার নেই।—তাঁর খেয়ে-প'রে আমরা মানুষ। তাঁর জন্মের শুভ লগ্নকে স্মরণ করে তাঁর যশোপূর্ণ দীর্ঘায়ু কামনা করে নিজ হাতে লালন করা গাছের প্রথম ফুল পাঠালাম। তিনি যেন দয়া করে গ্রহণ করেন।"

ছেলেটি বহ দিন এ গাছের গোড়া খুঁড়ে দিয়েছে—জলসেচ করেছে—গাছকে মুঞ্জরিত হতে দেখেছে।—অধীর আগ্রহে এই মুকুলগুলিকে দল মেলতে দেখেছে। এ ফুলে তার বড় মমতা। মিনাদের কাছে ছাড়পত্র থাকে—বালক সোজা রাজার কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলো এবং একটি ফুল দিল। রাজা সুজনের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ—সাদরে ফুল নিয়ে পাগড়ীতে রাখলেন।

বালকও রাজপুরীর সীমার বাইরে এসে রাজকীয় ঢঙে নিজের পাগড়ীতে দ্বিতীয় ফুলটি আটকে নিল। ভাবলো, "রাজার গাছে তো কত ফুল—কত হীরার ফুল—একটা কম দিলে ক্ষতি কি—অভাব তো নেই কিছু।"

নির্বোধ বালক পিতার কাছে এসে দাঁড়াল। সুজনের দৃষ্টি পড়লো সেই ফুলের ওপর।—"এ ফুল কি রাজা তোকে প্রসাদ করে দিয়েছেন, না তুই চেয়ে নিয়েছিস্?"

বালকের বিচারে ভুল হয়েছিল, কিন্তু মিথ্যা ভাষণে সে অভ্যস্ত নয়। অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, "না, রাজাকে একটি ফুল দিয়েছি—এটা রেখে দিয়েছি, আমার বড় পছন্দ হয়েছিল। এ রকম ফুল তাঁর অনেক আছে।"

"লুকিয়ে চুরি করে রেখেছিস্? তুই বেইমান?"—বলেই যন্ত্রচালিতের মতো তলোয়ারের আঘাতে সুজন পুত্রের শিরশ্ছেদ করলো। লাল ফুল ও লাল রক্তধারার মাঝে বালকের সরল মুখমণ্ডল—সুজন নত হ'য়ে চুম্বন করে বললো, "হায় বেটা, কি করলি"!"

তার পর নাহারগড়ের সকল দুয়ার বন্ধ করে ঘোড়ায় চড়ে গেল রাজ-দরবারে। শুধু জানাল যে সে পুত্রঘাতক—তার ন্যায়-বিচার হোক—যোগ্য সাজা হোক! প্রশ্নের উত্তরে তার কাছ থেকে কোনও কথা পাওয়া গেল না। রাজা তাকে একান্তে ডেকে প্রশ্ন ক'রলেন, "কি ব্যাপার ভাইজী, এ কি কাণ্ড?"

সুজন সব জানিয়ে বললো, "মহারাজ, একটি প্রার্থনা আছে, মঞ্জুর হোক।"

"কি চাও তুমি বলো—আমার তোমাকে অদেয় কিছু নেই।"

"কারো কাছে এ সংবাদ প্রকাশ করবেন না। সুজনের ছেলে বেইমান, এ যেন কেউ না জানে—তার চেয়ে গুরু অপরাধের সাজা আমি মাথায় পেতে নেব—হাসতে হাসতে ফাঁসী যাব।"

"তোমার কোন সাজাই হবে না। কিন্তু সামান্য একটি ফুলের জন্য এমন কাজ কেন করলে, ভাইজী?"

"সামান্য ফুল হলেও সামান্য ভুল নয়, রাজা। যে আজ সামান্য ফুলের লোভ সামলাতে পারলোনা, তার হাতে নাহার-গড়ের অতুল ঐশ্বর্য্য কেমন করে দিয়ে যাই? আবার আমার ছেলে ইমানের দাম জানে না বলে সে জীবিত থাকতে তাকে উত্তরাধিকারী ক'রতে পাব না—আমার মৃত্যুর পর আমার জব্বা থেকে অপর এক জনের জব্বায় এ তালিকার নকল উঠবে—এই বা কেমন করে সহ্য করি? প্রাণ দিয়ে ইমান রক্ষা করবে শপথ করেছিলাম—প্রাণের প্রাণ দিয়ে তার দাম দিলুম।"

অন্ধ্রসংস্কৃতি

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

অন্ধ্র-সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। আর তেলুগু ভাষা খুব মিষ্টি ভাষা তাই ইতালীয় ভাষার সংগে এর তুলনা করা হয়। অন্ধ্রসাহিত্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান আর দর্শন সম্বন্ধীয় যে সব রচনা আমরা পাই, তা' খুব সম্পদশালী নয়। সাহিত্যকে সম্পদশালী করার জন্যে যে সব উপাদানের প্রয়োজন, অন্ধ্র সাহিত্যে তার অভাব খুব বেশি, এই অভাবের কথা পদে পদে অনুভূত হয়! তবুও অমানুষিক চেষ্টার বিনিময়ে উপরোক্ত রচনার কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়েছে।

ভিরেসালিংগমের "তেলুগু কাভুলু" (তেলুগু কবিকথা) হচ্ছে এই চেষ্টার প্রথম ফসল। গুরুজাদা শ্রীরামমূর্তির "কবি জীবিতামুলু" (কবিদের জীবনকথা) খুব মনোরম হলেও তথ্যের ভুল আছে অনেক। তথ্যের ভুল থাকা খুব বিচিত্র ব্যাপার নয়, কেন না, তেলুগু কবিদের জীবন-সম্পর্কিত কোন খবরই সঠিক ভাবে সংগ্রহ করা যায় না।

অন্ধ্রসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি বেশ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ভানগুড়ি সুবারাওএর "অন্ধ্রসাহিত্যের ইতিহাস" "শাক্ত কবিদের "ইতিহাস" টি, অচ্যুতরায়ের "বিজয় নগর রাজত্বকালে অন্ধ্র সাহিত্যের ইতিহাস", কভিটভাঞ্জেডীর "অন্ধ্র সাহিত্যের ভূমিকা", প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। মিঃ জি, ডি, রাঘবরাও "তেলুগু গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস" লিখে অন্ধ্রসাহিত্যের ভাণ্ডার মূল্যবান করে তুলেছেন। কিন্তু চিলকুরি নারায়ণ রাওএর বই পাণ্ডিত্যের এবং লেখার ষ্টাইলের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাপক এবং পূর্ণাংগ ইতিহাস যাতে শুধু সাল-তারিখের শোভাযাত্রা না হয়ে ভাষার উন্নতিও হয়, তার দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বর্তমানে। জাতির কাছ'থেকে ভবিষ্যতে সর্বাংগসুন্দর ভাষার এবং সাহিত্যের ইতিহাস প্রস্তুত যে হবে, এটা তার শুধু ভূমিকা মাত্র। আজকের কাঁচা সড়ক এক দিন রাজপথে পরিণত হবে তারই প্রস্তুতি অন্ধ্র সাহিত্যের দিকে দিকে।

এই প্রসংগে পণ্ডিত মালডি সূর্যনারায়ণের "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" বইখানির উল্লেখ প্রয়োজন। এই বইটি মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ এবং সুন্দর সহজবোধ্য ভাবে রচিত। প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখেছেন গ্রন্থকার।

ব্যাকরণের মতো নীরস বিষয়ের ওপরও কয়েকটি হাল্কা ধরণের বই আছে। পণ্ডিত ভাজুল্য চিনাসিতারাম শাস্ত্রীর "তেলুগু ব্যাকরণ" সেই রকমের একটি বই। সাহিত্যের শাখায় আছে মিঃ ভেতুরী প্রভাকর শাস্ত্রীর "বিক্ষিপ্ত কাব্য-সঞ্চয়ণ।" তেলুগু সাহিত্যে আগে এই ধরণের কোন সঞ্চয়ন ছিল না—পরে অবশ্য কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে অনেকেই এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে এবং প্রাণপণ পরিশ্রম করে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর নাম ভাচুরী সুব্বারাও। অবশ্য এঁরই পর নাম মনে আসে নন্দীরাজু চালাপতিরাও-এর।

অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ স্যার সি, আর, রেড্ডীর অর্থশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত "অর্থশাস্ত্রে" আমরা তাঁর পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাই। ইনি কবিতাও লেখেন সুন্দর, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ এ রকম একাধারে পণ্ডিত এবং কবি কি না জানি না। তাঁর কবিতার ইংরাজী তর্জমা এবং বাংলা তর্জমাও বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

আজকাল প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত অবশ্যপাঠ্য হওয়াতে তেলুগু ভাষায় বহু পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রের ওপর। অধুনা ছোটদের মনোমত করে মনোবিজ্ঞানও রচিত হচ্ছে। তা'ছাড়া, রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্যে রাজনীতিক রচনা, স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান সরকারের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধেও একাধিক বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এগুলি সবই লোকশিক্ষা সিরিজ হিসাবে।

বিজ্ঞানের দিক্ থেকে কে, কোনদায়ারের "বিশ্বরূপম," জি, ভি, রাঘবরাও মহাশয়ের "প্রতিদিনের বিজ্ঞান," গুল্লাপালি নারায়ণমূর্তির "রেডিও" বিশেষ ভাবে খ্যাতিলাভ করেছে। এবার অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু এ সব দুরূহ কাজ কি এক জনের দ্বারা সম্ভব? সমস্ত ভারতীয় অধ্যাপকের সাহায্য না পেলে, সহানুভূতি না পেলে এতো বড় জিনিষ সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে বিশ্বাস হয় না।

ভারতীয় দর্শনের দিক্ থেকে অন্ধ্র কিছু উন্নত। দর্শনের বই কিছু কিছু আছে। সমস্ত পুরাণই দর্শনের আলোচনায় পূর্ণ। শতকের সব কবিতাও দার্শনিক কবিতা কিংবা অন্য ভাবে বললে বলা যায় কবিতায় দর্শনে পূর্ণ। অনন্ত ভূপাল মহাভারত এবং গীতার অনুবাদ অষ্টাদশ শতকে করে গেছেন। সেই সময়কার "সীতারামের সংবাদ" মনোবিজ্ঞান আর হঠযোগের মিশ্রণে রচিত। দর্শনের ভাণ্ডার খালি না হলেও কাব্যের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। দর্শনের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়েই সাহিত্যের দিকে অন্ধ্রসাহিত্য দুর্বল হয়ে গেছে। সাহিত্যকেও সমান অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবার যে একটা প্রেরণা এসেছে সেটা অবশ্যই আশার কথা।

ভাবপ্রকাশের কলাকৌশল

নাজমা বেগম

সাহিত্য শিল্পকলা সম্বন্ধে যখন কেউ আলোচনা করেন, তখন "রস" "সৃষ্টি" ইত্যাদি বাছা বাছা ধোঁয়াটে বুলির আমদানি করা হয়। তাতে সাহিত্য বা শিল্পকলার স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না, রসবোধও বাড়ে না। তার জন্য সবার আগে সাহিত্যিক ও শিল্পীর ভাবপ্রকাশের যে কারিগরি, যে কৌশল, যে বিশেষ ভঙ্গিমা তা ভাল করে বোঝার দরকার। সঙ্গীতের প্রধান বাহন সুর, তাই সুরশিল্পীর অথবা কোন সঙ্গীতের রসোপলব্ধি করার আগে "সুর" সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুরের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে বিচার করলাম, তাতে সুর ও সুরকার কারও প্রতি সুবিচার করা হয় না। শিল্পীর ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও পরিচয় থাকা উচিত। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। লেখার ক্ষমতা এবং ভাল ক'রে লেখার ক্ষমতার মধ্যেই সাহিত্যের মূল্য যাচাই হয়ে যায়। সাহিত্যিক তাঁর বিষয়ানুভূতিকে প্রকাশ করতে চান, রূপ দিতে চান। যে বিষয়টি সমগ্র সত্তা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন, যতটা সম্ভব তারই অখণ্ড প্রতিমূর্তি তিনি পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চান। এই উপস্থিত করার কাজটি তাঁর দিক্ থেকে আদৌ সহজসাধ্য নয়। মনের চার কোণে বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড অনুভূতি ও ঘটনাপুঞ্জ থেকে কবি একাগ্রচিত্তে, "ধ্যানবলে" এমন সব ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নির্বাচন করবেন এবং তাদের পারম্পর্য এমন ভাবে রক্ষা ক'রে গ্রথিত করবেন যে, একমাত্র তারই সহায়তায় তিনি খণ্ড চিত্রগুলিকে সর্বাধিক সমগ্রতা ও অখণ্ডতা দান করবেন। যিনি যত বেশী শক্তিশালী সাহিত্যিক তাঁর এই পারম্পর্য ও নির্বাচন তত বেশী ফলপ্রদ হবে। এইটেই হ'ল আধুনিক রূপবিন্যাসের সব চেয়ে বড় কথা।

মহাকবিদের ভাষা অলঙ্কার ঘটনাগ্রন্থন পরিবেশ সৃষ্টি, সব যে 'অপৃথগ-যত্ননির্বর্ত্য' নয় তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ও সাহিত্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। কথিত আছে, বাল্মীকি যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তাও তাঁকে আগে 'যোগবলে' এই সন্নিবেশ, পারম্পর্য ও নির্বাচনের দুরূহ কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল। তবেই তিনি রামায়ণের সমগ্র মূর্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাকে যখন ভাষার রূপ দিতে গেলেন, তখন না কি শোনা যায়, গণেশের পক্ষে চার হাতেও তার শ্রুতিলিখন সম্ভব হয়নি। আনন্দকুমার স্বামী বলেছেন :

Valmiki, before he begins dictation, first visualises in yoga the entire Ramayana, the characters presentitng themselves to his vision living and moving as though in real life, and the work being thus completed before the practcal activity is begun, the dictation is then so rapid that none but the four-handed Ganesha, using all his hands, can take it down."

(A. Coomerswamy: Transformation of Nature in Art.—"The Theory of Artin Asia" নামক অধ্যায়ের পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত)

শুধু যে রামায়ণ রচনার পূর্বে মহাকবি বাল্মীকি যোগবলে বিষয়োপলব্ধি করেছিলেন তা নয়। বৈষ্ণব সাধক-কবির রূপচিন্তাও তাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কি ভাবে ধ্যান করতে হবে, কি ভাবে সদা-সর্বদা তাঁদের রূপচিন্তা ক'রতে হবে, তারই উপায় বর্ণনা ক'রে শ্রীরূপ গোস্বামী 'শ্রীরূপচিন্তামণিঃ' নামে একখানি ছোট গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন। এই রূপারাধনা ও রূপচিন্তার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা রূপতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ-স্বরূপ। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রছি :

"বৃন্দাবনে যৌ রসিকৌ বিভাতঃ
পরস্পরপ্রেমসুধারসার্দ্রৌ।
তয়োস্তড়িদ্বিম্বিরুচঃ কিশোর্য্যা
নীলাংশুকান্তঃ স্মর মন্দহাস্যম্।"

"বৃন্দাবনে শোভে যেই রসিক দুই জন।
পরস্পর প্রেমসুধা-রসে আর্দ্র মন।
তার মধ্যে বিদ্যুৎ-কান্তি-জয়ী কান্তি যার।
কিশোরীর মন্দহাস্য স্মর অনিবার।
সেই হাস্য নীল বস্ত্রে হয়্যা আচ্ছাদিত।
বহির্গত হয়্যা তোষে ভক্তগণ-চিত।"

প্রথমে শ্রীরাধিকার মন্দহাস্য স্মরণ কর। এই মন্দহাস্যেরও রূপ আছে। কি সেই রূপ? নীলবসনা কিশোরীর নীলাবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে এসে সেই হাসি ভক্তদের চিত্ত তুষ্ট ক'রছে। তার পর কি?

"বেণীকৃতান্ কুঞ্চিতসূক্ষ্মকেশান্
চূড়ামণীমুজ্জ্বলপত্রপাশ্যাম্।
বক্রালকান্ সতিলকং ললাটং
ভ্রুবৌ দৃশৌ রঞ্জনরঞ্জিতা তে।"

"ক্রমে তাঁর রূপচিন্তা কর হে হৃদয়।
বেণীকৃত সুকুঞ্চিত সূক্ষ্ম কেশচয়।
চূড়ার মণিকে স্মর রুচির আকার।
চিন্তা কর দিব্য পত্র-পাশ্য অলঙ্কার।
চারুবক্র অলকাকে কর বিচিন্তন।
ললাট তিলকযুক্ত স্মর ওরে মন।
ভ্রূযুগল স্মর আর নয়ন-যুগল।
কজ্জল-রঞ্জিত যেহ পরম সুন্দর।"

শুধু মন্দহাস্য নয়। মাথার বেণী ও বক্রালক থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের নখ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড রূপের প্রত্যেকটি চিন্তা ক'রতে

হবে। বেণী পাকানো সুকুঞ্চিত কেশ, রুচির আকর চূড়ার মণিটি, দিব্য পত্র-পাশ্য অলঙ্কার, চূর্ণকুন্তল, ললাটোপরি তিলকপংক্তি, ভ্রূ ও নয়নযুগল, এক-এক ক'রে প্রত্যেকটি চিন্তা ক'রতে হবে। তার পর—

"শ্রুতদ্বয়ং কুণ্ডলযন্ধু চক্রি
শলাকিকে গণ্ডতলে মকর্য্যৌ।
নাসাং সমুক্তামরুণাধরোষ্ঠৌ
দন্তার্চ্চিষঃ সচ্চিবুকং সবিন্দুম্।"
"কুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণদ্বয়ে স্মর মন।
স্মর চক্রশলাকিকা যুগল ভূষণ।
গণ্ডযুগ-তলে স্মর মকরী-যুগল।
মুক্তাযুক্ত নাসা স্মর হয়্যা অচঞ্চল।
রক্ত ওষ্ঠযুগে স্মর আর দন্তপাঁতি।
স্মর বিন্দুসহ সৎচিবুকের খুতি।"

কুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণদ্বয় স্মরণ কর, চক্রশলাকিকা ও গণ্ডতলের মকরীযুগল স্মরণ কর? গজমুক্তাসহ নাসিকা, রক্ত ওষ্ঠ, দন্তকান্তি এবং তিল বা বিন্দুসহ চিবুক স্মরণ কর।

"কণ্ঠং ত্রিরেখং ক্রমলম্বমানান্
হারান্নতাংসৌ ভুজসাঙ্গদন্বম্।
কফোণিকে কঙ্কণচুড়িকাঢ্যে
সুলক্ষরেখারুণপাণিপদ্মে।"
"ত্রিরেখা সহিত কণ্ঠ কর বিচিন্তন।
যাহে শোভে ক্রম-লম্বমান হারগণ।
চিন্তা কর নতস্কন্ধযুগে হে হৃদয়।
অঙ্গদ সহিত স্মর রম্য ভুজদ্বয়।
কঙ্কণ-চুড়িকাযুক্ত কফোণি-যুগল।
শুভরেখাযুক্ত কর পদ্ম যুগতল।"

তার পর ত্রিরেখা সহ কণ্ঠ, অর্থাৎ কম্বুতুল্য কণ্ঠ চিন্তা কর, যে-কণ্ঠে ক্রমলম্বমান হার শোভা পাচ্ছে। অনুচ্চ স্কন্ধদ্বয় এবং অঙ্গদসহ অর্থাৎ বাজুসহ হাত দু'খানি চিন্তা কর, যে-হাতের দুই কফোণি কংকণ ও চুড়ি বেষ্টন ক'রে রয়েছে।

"রত্নোর্ম্মিকা অঙ্গুলিকা নখশ্রীঃ
শ্রিতাঃ কুচৌ কঞ্চুলিকারুণাভৌ।
নিষ্কং দলাভোদররোমপঙ্‌ক্তী-
র্নাভিং কৃশং মধ্যমুতং ত্রিবল্যা।"
"নখশোভাশ্রিত দশ অঙ্গুলীকে স্মর।
যাহে দশ রত্নাঙ্গুরী ভায় মনোহর।
কাঁচুলিতে রক্তবর্ণ ধুতিয়ে ধরায়।
চিন্তা কর বিল্বফল তুল্য কুচদ্বয়।
পদক ভূষণে স্মর দলাভ উদরে।
সূক্ষ্ম রোমপংক্তিলতা স্মর ভক্তিভরে।
নাভিকে স্মরণ কর ত্রিবলি সহিত।
ক্ষীণ মধ্যদেশে স্মর হয়্যা ভক্তিযুত।"

তার পর নখশোভাশ্রিত দশ অঙ্গুলীকে স্মরণ কর, যে-অঙ্গুলীতে দশটি মনোহর রত্নাঙ্গুরী শোভা পাচ্ছে। অরুণাভ কাঁচুলিসহ স্তনদ্বয়, ত্রিবলী সহিত অর্থাৎ উদরের সংকুচিত লোমশ রেখা ও তাঁদের সঙ্গে নাভিকে চিন্তা কর, ভক্তিভরে মধ্যদেশও চিন্তা কর।

"চিত্রাম্বরীরোপরি নীলশাটী-
মূরুদ্বয়ং জানুযুগঞ্চ জঙ্ঘে।
গুল্‌ফদ্বয়ং হংসকনূপুরশ্রী-
ভৃতোর্ম্মিকা অঙ্গুলিকা নখাংশ্চ।"
"বিচিত্র ঘাগরোপরি সুনীল বসন।
স্মর রামরম্ভাজয়ী উরুদ্বয়ে মন।
জানুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় স্মর গুল্‌ফদ্বয়।
দশ রম্য অঙ্গুলিকা যাহে বিরাজয়।
বলয়-নূপুর-শোভাধারী দশাঙ্গুরী।
চিন্তা কর দশ নখ চন্দ্র-গর্ব্ব-হারী।"

বিচিত্র ঘাগরার উপরের যে সুনীল বসন, তার নীচে যে উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় তাকে স্মরণ কর'। তার পর চিন্তা কর গুল্‌ফদ্বয় অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি দু'টি, তার সঙ্গে বলয়-নূপুর-শোভাময়ী দশাঙ্গুরী এবং চন্দ্রের দর্পহারী দশটি নখ পর্যন্ত। তার পর পদতলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন চিহ্নকে স্মরণ কর' (১)। এতেও কিন্তু 'রূপচিন্তা' সম্পূর্ণ হল না। "অথ শ্রীকৃষ্ণরূপস্মরণবৎ শ্রীরাধায়া রূপস্মরণলার্চ্যার পুনঃ পাদতলাবধিমন্দহাস্যপর্য্যন্তং রূপস্মরণপ্রকারং দর্শয়তি ষড়ভিঃ শ্লোকৈঃ" (শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামিকৃত টীকা)। এর পরেও শ্রীকৃষ্ণরূপ স্মরণের মতো শ্রীরাধার রূপ মাথার কেশ থেকে আরম্ভ করে পায়ের নখ ও পদতল পর্যন্ত বর্ণনা ক'রে, আবার বিলোমে অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে ছয়টি শ্লোকে পায়ের নখ থেকে মাথার কেশ ও মন্দহাস্য পর্যন্ত রূপ-বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের এই রূপচিন্তা ও রূপ-সন্নিবেশ, এই খণ্ডরূপ বর্ণন থেকেই পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি, অখণ্ড রূপটি রসোত্তীর্ণ হ'য়ে মানসপটে সুস্পষ্টরূপে ভেসে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপমাধুর্য ও রসাত্মক স্বরূপ উপলব্ধি করতে হ'লে, প্রকাশ করতে হ'লে, তাঁদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ ও বিশেষ সৌন্দর্য যেমন চিন্তা ও ধ্যান করতে হয়, তেমনি কলাসৃষ্টি করতে হ'লে তার আঙ্গিক ও উপাদানের পুংখানুপুংখ রূপ-বিশ্লেষণ ও রূপচিন্তার আবশ্যক হয়। যথোচিত অঙ্গ-সন্নিবেশ ভিন্ন রূপসৃষ্টি সার্থক হয় না এবং সমগ্রতা লাভ করে না। রূপকার তাঁর রূপসৃষ্টিকে সমগ্রতা দানের জন্য তার অঙ্গ-সংস্থান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ-বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন।

এইবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখা যাক, শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের অঙ্গ-সংস্থান সংবন্ধে কতখানি সচেতন। দৃষ্টান্ত আমরা অবশ্য সাহিত্য থেকেই দেব। সাহিত্যের অঙ্গ-সংস্থান হ'ল ভাষা, শব্দ-বিন্যাস, 'উক্তিবৈচিত্র্য' এবং ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস সন্নিবেশ ও অপূর্ব সমন্বয়। শব্দদোষ ও অর্থদোষ সংবন্ধে দণ্ডাচার্য বলেছেন, 'কাব্যকৌশলাৎ' সেগুলি কদাচিৎ গুণও হ'তে পারে এবং কাল ও পাত্র ভেদে 'ব্যর্থদোষ,' 'বিরুদ্ধার্থদোষ,' 'সংশয়দোষ' প্রভৃতিও গুণে

(১) 'শ্রীরূপচিন্তামণিঃ'—শ্রীপাদরূপগোস্বামী শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামি-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে এখানে শ্লোক ও তার বাংলা কাব্যানুবাদ উদ্ধৃত হ'ল।

পরিণত হয়। এ-কথার সত্যতা আমরা বড় কবি ও কলাকারের সাহিত্যে ও শিল্পে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। এই প্রসঙ্গে আমার রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' নামক একটি ছোট্ট কবিতা বার বার মনে পড়ছে। কবি বলছেন—

"কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠো আধুনিকা প্রিয়ে
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।...
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি করো না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো,
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পাও বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু ওই আসমানি শাড়ীখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত
সে যে অঙ্গের সংগীত।..."
—সানাই।

বাস্তবিকই যখন উতলা হৃদয়ের তাগিদে 'সাজিয়ে বলা' অগত্যাই আসে তখন তাকে অত্যুক্তি বা অতিভাষণের দোষে দুষ্ট বলা যায় কি? যায় না। কারণ, যে প্রিয়ার উদ্দেশে হৃদয়ের ভাব বাণীমূর্তি ধারণ ক'রছে সেই প্রিয়ার যে হাসি, যে 'আসমানি শাড়িখানির' ব্যঞ্জনা তার মধ্যে যে 'অতিরিক্ত মধু' সংহত হ'য়ে থাকে। ভাষা তা তাকেই রূপ দিতে চায়, অর্থাৎ কবি তো তাকেই ভাষার রূপ দিতে চান। সুতরাং সে-ভাষা যে প্রাত্যহিক মিতব্যয়িতা দূর করে আপনার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় 'অঙ্গের সংগীত' হয়ে উঠবে, সেইটাই তো স্বাভাবিক। একেই তো আলংকারিকেরা বলেন 'ব্যঙ্গার্থ' 'ধ্বনি' বাচ্যাতিরিক্ত কিছু, অর্থাৎ ঐ 'অতিরিক্ত মধু কিছু' যা তার মধ্যে সংহত থাকে। যেমন:

"গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রং লাগে
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিষ।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।
সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান..."
—সানাই।

এখানে কি পেলাম? প্রথমে একটা নিখুঁত পরিপূর্ণ ছবি, আঁচড়ের পর আঁচড়ে যে ছবিটি সম্পূর্ণরূপে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। এই আঁচড়গুলির পারম্পর্যই কিন্তু আসল এবং বিশেষ ভাবে নির্বাচন ও উপলব্ধি করার ব্যাপার। যেমন:

হাটের রাস্তায় সারি সারি গরুর গাড়ি চলেছে—
রাশি রাশি ধুলো উড়ছে—
ধুলোর রঙে রৌদ্রের রঙও গেরুয়া—
ধানের কলের কালিমাধূম্র হাত ঊর্ধ্বে প্রসারিত—
ধান পচানির গন্ধ—
মাঠের ওপারে রেলগাড়ির হুইস্‌ল—
দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা—

খণ্ড চিত্রগুলি এই ভাবে সাজাবার যে বিশেষ প্রণালী বা রীতি তাকেই আধুনিক ফিল্‌ম-টেক্‌নিসিয়ানরা "মণ্টেজ" (Montage) বলেন। সাহিত্যে এই "মণ্টেজের" নাম হ'ল "ঘটনাবন্ধ" অথবা "অঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ"। সাহিত্য কেন, রূপতত্ত্বের (Aesthtics) এইটাই মূল কথা।

সাহিত্যে শুধু ঘটনাবন্ধ নয়, তার সঙ্গে শব্দবন্ধও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আলঙ্কারিকদের "শব্দগুণ" আর এক দিক্ থেকে বিচার করলে "অর্থগুণও" বটে। শব্দ বা ভাষা শুধু যে ভাবের প্রতীক তাই নয়, তার একটা নিছক আক্ষরিক মূর্তিও আছে, যার "চিত্রগুণ" আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। সাহিত্যের এই আক্ষরিক চিত্রমূর্তি পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত ক'রে রসোপলব্ধিতে সাহায্য করে। সাহিত্যের এই রসবিচার শুনে অনেকে "বিশুদ্ধ" সাহিত্যিক হয়ত ব্যথিত হবেন। তাতে তাঁরা যত বড়ই "বিশুদ্ধ" এবং তথাকথিত "ক্রিয়েটিভ" হ'ন না কেন, সাহিত্যের রসবিচারের এই মানদণ্ড বদলাবে না।

তাহ'লে শেষ পর্যন্ত "রসবিচার" দাঁড়াচ্ছে কি? ভাবের বাহন ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গিমাই সাহিত্য বিচারের আসল মাপকাঠি। ভাষার "ধ্বনি" আছে, সেই ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে এবং তাতে রসোপলব্ধির সুবিধা হয়। ভাষার আক্ষরিক "চিত্রমূর্তি" দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অনুরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে। ভাষার গাঢ়বন্ধতা ঘটনাবন্ধতারই বাহ্যিক প্রকাশ, তার মধ্যে শিল্পীর বিষয়োপলব্ধি, ঘটনার নির্বাচন ও পারম্পর্য সবই প্রকাশ পায় এবং তার যথোচিত সন্নিবেশের উপর সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে। সাহিত্যের আদি অকৃত্রিম মানদণ্ড হ'ল তাই ভাবপ্রকাশের কলাকৌশল।

ঘোগ

প্র. না. বি.

১

লবঙ্গ দেশে একটি প্রবাদ আছে যে বাঘের ঘরে কখনো কখনো ঘোগ প্রবেশ করিয়া থাকে। সকলেই জানে যে, বাঘ অতিশয় মারাত্মক জন্তু, এখন তাহার ঘরে ঘোগ প্রবেশ করে শুনিয়া লোকে ভাবে যে, ঘোগ নিশ্চয় বাঘের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক। বাঘের চেহারা ও আচরণ সম্বন্ধে লোকের একটা পরোক্ষ ধারণা আছে, প্রত্যক্ষ ধারণা যাহাদের হয়, তাহারা সে অভিজ্ঞতা বলিবার জন্ত প্রায়ই থাকে না। বাঘের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঘোগকে লোকে কল্পনা করিয়া থাকে—এই ভাবে কল্পনার ধাক্কায় ধাক্কায় ঘোগের ভাগ্যে অনেকগুলি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারে লবঙ্গ দেশে গিয়া ঘোগ সম্বন্ধে আমার ভুল ভাঙিয়া গেল—ঘোগকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি—এই একটি বিষয় হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঘোগ আদৌ মারাত্মক নয়। বাঘের প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটিলে কি ফিরিতে পারিতাম?

ঘোগ অতিশয় নিরীহ, এমন কি, তাহার সহিত তুলনায় যে-কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত কেরাণীকেও অধিকতর হিংস্র মনে হইবে। এমন নিরীহ প্রাণী কখনো বাঘের মতো নরঘাতক জন্তুর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, করা সম্ভব নয়, এই অসম্ভবতাই ওই প্রবাদের নিগূঢ় অর্থ। অত কথায় কাজ কি, ঘোগের বর্ণনা করিলেই আমার উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। ঘোগের চেহারা আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। ঘোগ মানুষ, মধ্যবিত্ত শীর্ণ কেরাণীর মতো চেহারা, বুকে পিঠে প্রায় এক, উদরের বালাই নাই বলিলেই চলে, আর থাকিলেই বা কি, খাত্তের অভাবে পাকযন্ত্রগুলিতে মরিচা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহার গায়ে গলাবন্ধ জিনের জীর্ণ কোট, ইহাই তাহার একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি, পরনে নানা রঙের তালিমারা ধুতি, পায়ে ছেঁড়া জুতা, বারংবার তালি পড়িতে পড়িতে অরিজিন্তাল চামড়ার এক তিলও আর অবশিষ্ট নাই। তাহার ঘাড়ের উপরে ভাঁজ করা একখানা মলিন চাদর—ইহাতেই তাহার কৌলীন্ত। লেজহীন জানোয়ার যেমন কল্পনা করা যায় না, নিশ্চাদর ঘোগও তেমনি কল্পনার অগম্য। ঘোগের চোখে নিকেলের চশমা, দুশ্চিন্তার কালি, অসহায় ভাব এবং ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভীতি! ঘোগ ধীরে ধীরে চলে, জোরে চলিতে গেলে পাছে দেহের হাড় ক'খানা খসিয়া পড়ে এবং ধুতি ছিঁড়িয়া যায় সেই ভয়ে সে সংযতচরণ। হাড় খসিয়া পড়িলে তাহার তেমন দুঃখ নাই, ধুতি ছিঁড়িলে যেমন দুশ্চিন্তা। ঘোগকে স্বেচ্ছায় কখনো হাসিতে দেখা যায় না, কেবল কোন ব্যাঘ্র সম্মুখে পড়িয়া গেলে একটি করুণ মিনতির পোষমানা হাসি তাহার দন্তপংক্তিতে ফুটিয়া ওঠে। এই চাক্ষুষ বর্ণনাতেও ঘোগের স্বরূপ কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হইলে একবার লালদীঘি অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলেই চলিবে। আপিসের

কেরাণীদের সহিত ঘোগের একটা সুদূর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়—কোন নৃতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলে একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

২

লবঙ্গ দেশের প্রাণিতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেখানকার প্রাণিজগৎ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বাঘ ও ঘোগ। বলা বাহুল্য, বাঘও এক প্রকার মানুষ। বঙ্গদেশে বাঘের যে অর্থই হোক না কেন, লবঙ্গ দেশের অভিধানে বাঘ বলিতে এক শ্রেণীর মনুষ্যকে বুঝায়। সে দেশের বাঘ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আর স্বচক্ষে দেখিবার পরেও যখন জীবিত আছি তখন বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, লবঙ্গ দেশের বাঘ বঙ্গদেশের বাঘের মতো মারাত্মক নয়, তবে ঘোগের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ তাহা বলিতে পারি না। আমার বিদেশী চোখে বাঘে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, তবে যদি কোন সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকে, তাহা বলিতে পারি না। বাঘগুলি বলিষ্ঠ, স্থূলকায়, স্ফীতোদর, কোট-প্যাণ্টলুন পরিহিত, অবশ্য আজকাল কেহ কেহ সখ করিয়া মিহি ধুতি পরিতে সুরু করিয়াছে। বাঘের গলায় একটি করিয়া সরু সোণার হার। নৃতাত্ত্বিকগণ ওই হারটি দেখিয়া অনুমান করেন, বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে প্রাচীন কালের লোহার শিকল এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাঘ দ্বিপদ, তবে শুনিয়াছি, রাত্রি বেলা ইহারা চতুষ্পদ হইয়া শিকার সন্ধানে বাহির হয়। ঘোগের ডাক শুনিয়াছি, তাছাড়া কখনো 'হুজুর' বলে, কখনো 'স্যর' বলে, কখনো কখনো বা 'Excuse me Sir'—এই কথাও বলিয়া থাকে। বাঘের ডাক শুনি নাই, তবে তাহারা না কি 'বেয়ারা', 'চাপরাশি', 'চোপরও শূয়ারকি বাচ্চা' বলিয়া গর্জন করে। এমন ভীষণ বাঘের ঘরে ঘোগ প্রবেশ করিবে তাহা কি সম্ভব? তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা কাঁচা মাংসের লোভে বাঘ ঘোগের ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ঘোগের কচি মাংস বাঘের কাছে অতিশয় রমণীয়। ফলতঃ লবঙ্গ দেশের বাঘ ও ঘোগের সম্বন্ধে অনেকটা বঙ্গদেশের ধনী ও দরিদ্রের সম্বন্ধের অনুরূপ।

ঘটনাচক্রে একটি ঘোগের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়া গেল। রাত্রে সে আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। আফিস হইতে বাহির হইয়া ঘোগ যখন বাজারের দিকে চলিল, আমিও সঙ্গ লইলাম, বলিলাম, চলুন, আপনাদের বাজারটা দেখিয়া আসি। তাহার সঙ্গে বাজারে গিয়া দেখি যে, বাঘ ও ঘোগগণ পাশাপাশি কেনাকাটি করিতেছে, কে বলিবে তাহারা পরস্পরের শত্রু। আমার ঘোগবন্ধু বড় দেখিয়া একটি রুই মাছ কিনিয়া ফেলিল, তার পরে আমাকে লইয়া তাহার বাড়ীর মুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঘোগের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার গাঁ কাঁপিতে লাগিল।

সেই ব্যক্তি ঘোগকে বলিল—পয়সা বেশী হ'য়েছে, না? মস্ত মাছ যে কেনা হয়েছে? ওদিকে তো বলা হয় যে, মাইনেতে তো কুলোচ্ছে না, বলি, ব্যাপারখানা কি?

ঘোগ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, মাছটা কি হুজুরের বাড়ীতে পৌঁছে দেবো?

মনে হইল, বাঘ যেন খুশী হইয়াছে। বলিল, তা সখ ক'রে নিয়ে যাচ্ছ যাও, তার চেয়ে রাত্রি বেলা আমিই একবার ওদিকে যাবো।

ঘোগ খুশী হইয়া আভূমিনত সেলাম করিল। সেই ব্যক্তি দূরে চলিয়া গেলে আমি শুধাইলাম, ও ব্যক্তি কে?

ঘোগ বলিল—উনি এক জন বাঘ, শুধু তাই নয়, আমার আফিসের বড়বাবু।

তাই বটে, রূপার ছড়ি, বাঁধানো দাঁত, দামী শাল, সোনার বোতাম—এ সমস্তই তাঁহার ছিল, তবে বাঘ না হইয়া যায় কি প্রকারে?

আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা বাঘের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে বাঘের মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ঘোগ গিয়া শশব্যস্তে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া আনিল, বলিল, হুজুর শাক-ভাত প্রস্তুত।

বাঘ বলিল, বেশ, বেশ! তোমরা খাও। আমি একবার বরং ঘুগনিকে নিয়ে ঘুরে আসি।

ঘোগ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে একটি মহিলাকে লইয়া বাহিরে আসিল। অনুমান করিলাম, মহিলাটি ঘোগের পত্নী। বাঘ কোন ভূমিকা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া গিয়া মোটরে উঠিল, start দিয়া একবার মুখ বাহির করিয়া বলিল, ব্যস্ত হ'য়ো না শেষ রাত্তে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

ঘোগকে শুধাইলাম, ঘুগনি অর্থ কি? সে বলিল, ঘোগের পত্নীকে ঘুগনি বলে। আমি তাহাকে পুনরায় শুধাইলাম—এ কি কাণ্ড?

সে নীরবে হাতখানা কপালে ঠেকাইল। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—আপনি ছাড়লেন কেন?

ঘোগ বলিল—উনি যে আমার বড়বাবু, ওঁর মর্জ্জির উপরেই আমার পরিবারের সাতটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে!

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী গেলেন কেন?

ঘোগ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—একবার যাননি। ছেলে-মেয়েরা সাত দিন খেতে পায় না। তখন নিজে যেচে যেতে হ'য়েছিল।

তার পরে একটু থামিয়া বলিল—এ দেশের বাঘে শিকারে বের হয় না, শিকার তার গর্ত্তে আপনি গিয়ে ধরা দেয়।

আমি শুধাইলাম, দেশে কি আইনি নেই?

ঘোগ বলিল—বাঘেরাই আইন প্রণয়নের কর্ত্তা!

বলিলাম, আপনাদের কি নীতিজ্ঞানও লোপ পেয়েছে?

সে বলিল—ঘোগের নীতিজ্ঞান বিলাসিতার অবসর কোথায়? নীতিজ্ঞান বাঘ সমাজের অলঙ্কার। না থাকলে ক্ষতি নেই, থাকলে শোভা বাড়ে। সামাজিক নিমন্ত্রণের দিনে বাঘের পরিবারেরা অলঙ্কার, আর বাঘ মহাশয়েরা নীতিজ্ঞানে আপাদ-মস্তক সজ্জিত হ'য়ে বহির্গত হন! কিন্তু ঘোগের সে সুযোগ কোথায়? পুত্র-কন্যার নিশ্চিত উপবাস সম্মুখে নিয়ে নীতিবোধের পরীক্ষা দিতে পারে এমন দৃঢ়তা ঘোগ সমাজে বিরল।

তার পরে বলিল—হ্যাঁ, হোক আমার টাকা, আমি বাঘে পরিণত হই—তখন ও-সব উপদেশ মেনে চলতে পারবো, কারণ তখন নিশ্চয় জানবো যে, বাঘনিকে নিয়ে ঘোগের রাত্রে হাওয়া খেতে যাবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই।

একটু থামিয়া বলিল—নিন, চলুন আহারে বসা যাক গিয়ে।

ঘোগ চাকরের উদ্দেশে বলিল—ওরে, তোর মাঁ'র জন্যে একটু দুধ থাকে যেন, এসে যেন ক'রে দিতে ভুলিস না।

৩

তার পর দিন নবজ দেশে ছুটির দিন। সহরটা ঘুরিয়া দেখিবার জন্ম বাহির হইয়াছি। কিছু দূর চলিয়া পথে একটি ভিড় দেখিতে পাইলাম। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্ম নিকটে গেলাম। জনতার কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, গোটা দুই লাল পাগড়ির আভাস পাইলাম, অনুমান করিলাম, কোন একটা অপরাধী ধরা পড়িয়াছে, আমি জনতার পিছনে পিছনে চলিলাম। এমন সময়ে জনতার কেন্দ্র হইতে এক জন লোক বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে শুধাইলাম, মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

লোকটি বলিল—একটা চোর ধরা পড়িয়াছে।

আমি শুধাইলাম, কি চুরি করিয়াছে?

সে বলিল—মাটি।

মাটি চুরি বলিতে কি বুঝায় বুঝিতে পারিলাম না, অবাক হইয়া রহিলাম। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক আমার বিস্ময় দেখিয়া বলিল—আপনি যে অবাক্ হইলেন?

আমি বলিলাম, তা হইয়াছি বই কি! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ, মাটি চুরি এমন কি অপরাধ?

লোকটি বলিল—বলেন কি? মাটি চুরির চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে? সংসারে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদ্-অশান্তি, সবই তো মাটি চুরির জন্ম। দুর্য্যোধন হইতে হিটলার সকলেই মাটি চোর। বড় বড় সাম্রাজ্য মাটি-চুরির বনিয়াদেই প্রতিষ্ঠিত, মাটি-চুরি আপনি এত সামান্ত মনে করিতেছেন কেন?

আমি বলিলাম, সাধারণ ভাবে আপনার কথা সত্য! কিন্তু বর্ত্তমান চোর কতখানি মাটি চুরি করিয়াছে, কাহার মাটি চুরি করিয়াছে, কি উদ্দেশ্যে চুরি করিয়াছে—তাহার উপরেই সব নির্ভর করে না কি?

সে বলিল—না। একটা দেশ দখল করিলেও যে অপরাধ, আর এক মুঠা মাটি চুরি করিলেও বস্তুতঃ সেই একই অপরাধ, কারণ অন্যায়, অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।

বস্তুতঃ চোরটা এক মুঠা মাটি চুরি করিয়াছে, সাধারণের দখলী জমি হইতে উনুন নিকাইবার জন্ম সে এক মুঠা মাটি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে পাহারাওয়ালা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আমি শুধাইলাম, লোকটার বিচারে কি দণ্ড হইবে?

সে বলিল প্রাণে বাঁচিয়া গেলেও যাইতে পারে কিন্তু নির্বাসন সুনিশ্চিত।

সর্ব্বনাশ!

আমি বলিলাম, আপনাদের দেশে অনেক রাজা, মহাজন, ধনী আছে—তা' ছাড়া সকলেই কি মাটি-চোর নহে?

সে বলিল—না, তাহারা যাহা করে, দেশের বিধি-বিধান রক্ষা করিয়া তাহা করিয়াছে, কাজেই তাহারা চোর নহে। এই লোকটা দেশের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে মাটি চুরি করিয়াছে।

আমি বলিলাম, লোকটা নিশ্চয় দরিদ্র?

সে বলিল—নবজ দেশে দরিদ্র হওয়াই যে সব চেয়ে বড় অপরাধ।

আমি শুধাইলাম—তবে কি এই লোকটাই এ দেশে একমাত্র দরিদ্র?

সে বলিল—না, আরও আছে। তবে এ লোকটা যোগ।

—যোগ কি, মহাশয়?

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—যে ব্যক্তি একই সঙ্গে দরিদ্র ও নির্বোধ—সে যোগ। তার পরে বলিল—আমিও এক সময়ে যোগ ছিলাম, কিন্তু বুদ্ধিবলে প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া এখন বাদ হইয়াছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে বলিল—আচ্ছা, এখন আসি। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

কিয়দ্দূর গিয়া জনতাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল—এবারে আমি ভিতরের দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, এক জন পাহারাওয়ালার হাতে এক মুঠা মাটি। বুঝিলাম—ইহাই চোরাই মাল। আরও দেখিলাম, অপর পাহারাওয়ালা একটা লোকের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। বুঝিলাম, লোকটা চোর। কিন্তু চোরের মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ যে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত যোগ।

বেচারা!

পাছে সে লজ্জা পায় এই আশঙ্কায় আমি আর দেখা দিলাম না। কিছুক্ষণ পরেই পাহারাওয়ালারা যোগকে লইয়া গিয়া থানায় প্রবেশ করিল। জনতার অবশিষ্ট লোক ফিরিল, আমিও ফিরিলাম।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যোগের বিচার কালে উপস্থিত থাকিতে হইবে, তাহাতে ইহার বিচার এবং এ দেশের বিচার-পদ্ধতি দুই-ই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মৃত্তিকা ও ফসলের জন্ত সংগ্রাম।
পিতা ও পিতামহের জীবন-ইতিহাস।•••
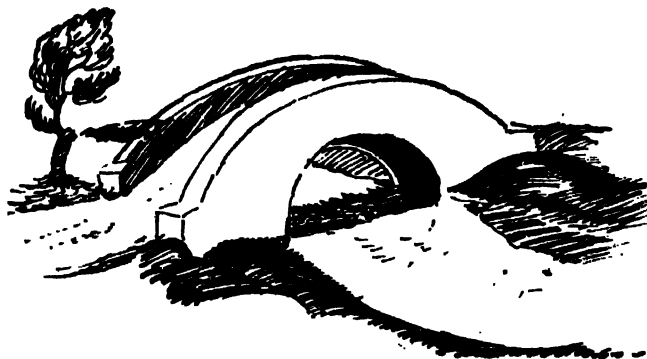
আজ সময় বদলে গেছে—তবু মনে হয়, এ যেন সে দিনের কথা—যে দিন খুব প্রাচীন হয়নি শক্তিগড়ের স্মৃতি-ফলকে। এখনও অনেকেই চোখ বুঁজলে দেখতে পায়, বিপ্রপদ বিয়ে করে আনল কমলকামিনীকে। রূপ তার অতি সাধারণ—কিন্তু আলাপ যারা করল, তারা বুঝল, বুদ্ধি তার অসাধারণ।

সেই কমলকামিনীই এক দিন দায় ঠেকে। সে এক বিষম দায়!

শীতের অপরাহ্ণ; প্রায় সায়াহ্ন বলে মনে হয় নিবিড় সন্নিবিষ্ট নারকেল সুপারি গাব তেঁতুল গাছের পরিবেশে। কমলকামিনী সবে ঘাট থেকে বাসন-কোসন ধুয়ে ঘরে এসেছেন। এক ঝাঁক পায়রা তার পায়-পায় হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। তাদের তাড়ালে যাবে না, তারা কিছু খেতে চায়। এদের কি খেতে দেবে? কতগুলো ক্ষুদ-কুঁড়ো একখানা কুলোয় করে এনে উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দিতে থাকে। গরীবের বৌ, পরনে তার একখানা দামী শাড়ী। রঙটা গাঢ় বেগুনী। সব কাপড়ই ছিঁড়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে বাক্স থেকে নামিয়ে দামী শাড়ীখানাই পরতে হয়েছে। তার বাপের বাড়ী থেকে গত বছর পূজার সময় ওখানা দিয়েছে।

বিপ্রপদ উঠানে এক পাশে দাঁড়িয়ে কমলকামিনীকে দেখছিল আর দেখছিল পায়রাগুলোর রকম সকম। একটা দু'টো করে প্রায় ঝাঁক সমেত তাকে গিয়ে ঘিরে ধরল। মাথায় হাতে পায় গায় গিয়ে উড়ে বসল। বক্তব্য—যা দিয়েছ তাতে হয়নি, আরও চাই।

কমলকামিনী চোখ-ইসারায় বিপ্রপদর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সে যেন তখন কি একটা পরিশ্রমের কাজ করে এসে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। হাতের দা'টা সে উঠানে রেখে ঘরে গেল।

কিন্তু ঘর থেকে খালি হাতেই ফিরে আসে—ভাণ্ডটা খালি। একটি ক্ষুদও নেই তার মধ্যে। মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হয়••• শীতকালেই এই, বর্ষাকাল তো পড়েই আছে! কমলকামিনী স্বামীর অবস্থা বুঝতে পেরে আর কিছু বলে না। নিজে নিজেই অতিকষ্টে পায়রাগুলোকে ছাড়িয়ে ঘরে ফেরে।

ঘরে-বাইরে সমান পোষ্য। বাইরেরগুলোকে ছাঁটাই করা সম্ভব, কিন্তু ঘরেরগুলোকে তা পারা যায় না। অল্প দিন যেতে না যেতেই কমলকামিনী বিপ্রপদকে বলে, 'তুমি বিদেশে যাও, না হ'লে এ পংপোষাল পুষতে পারবে না। আমাদের মত দরিদ্র ভদ্র পরিবারের সুখ-সুবিধা বিদেশে। নিজে তো চোখের ওপর দেখছ সব।'

'বলো কি! বিদেশে যাবো? আমার বাড়ী-ঘর দেখবে কে? কে রক্ষা করে রাখবে এ সংসার? ছোট-খাটো নয়, একেবারে জাহাজের মত সংসার!'

স্বভাবতই কমলকামিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটু রুক্ষ উত্তর—'এ সংসারে তুমিই কি একা পুরুষ মানুষ, না অন্য কেউ আছে? সেই রাত থাকতে উঠবে, চাল আনবে, মাছ ধরবে, জোগাড় করে দেবে কাঠ-কুটো, আর যারা—তারা দিব্যি এ-বাড়ী ও-বাড়ী তামাক খেয়ে গাল-গল্প করে সময় নষ্ট করবে। আমি তোমার পরিশ্রমের জন্ত হিংসা করছিনে, দুঃখ হয় যে, এ হাড়-ভাঙা খাটুনিতেও পোষায় না।'

কথাটা সত্যই। সারা দিন যে সে অমানুষিক পরিশ্রম করে, তার জন্ত এতটুকুও সহানুভূতির সুরে কেউ কথা বলে না। কেন যে স্বাচ্ছন্দ্য আসে না, তাও কেউ চিন্তা করে দেখে না। পোষ্যরা অভ্যাস মত তার কাছে চায়, না পেলে মুখ ভার করে থাকে। বিপ্রপদ একটা আশার ইংগিত পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করলে পোষায় বলতে পারো? আমি তো কোনও পথই দেখিনে।'

'আমার বাবা খুড়ো জ্যাঠা মিলে আট ভাই। বড় এক জন কেবল বাড়ী, আর সব বিদেশে। তাই তো আমাদের বাড়ীর অত ঠমখ চাল-চলনে, তুমি তো নিজেই সব জানো।'

'কিন্তু বিদেশে যেতে হলে যে সম্বল চাই, তা আমাদের কোথায়? বাড়ীতে কিছু দিনের খোরাকী রেখে হাতে সামান্ত কিছু নিয়ে যেতে হবে তো?'

'সে ব্যবস্থার ভার আমার ওপর থাক, তুমি কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ো এক দিকে।' কমলকামিনীর একমাত্র ভরসা তার গয়নাগুলো।

পরের দিন বিপ্রপদ এক-বস্ত্রে ট্যাঁকে মাত্র চার আনার পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার সময় পথে এক আত্মীয়-বাড়ী থেকে একখানা চাদর চেয়ে নিয়ে যায়। এখান থেকে এ জেলার টাউন ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের কম নয়। অবশ্য গয়নার নৌকায় গেলে পথ সোজা কিন্তু ভাড়া আট আনা। তার হাতে তো সে পুঁজি নেই, কাজেই পা দু'খানা ভরসা। মাঝ-পথে অপেক্ষা না করে সে একটানাই হেঁটে চলে! প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বড় পরিশ্রান্ত মনে হয় নিজেকে। একটু জিরিয়ে নিলে ভাল হতো কোনও এক গৃহস্থবাড়ী। সে সেই উদ্দেশ্যেই এক মুসলমান-বাড়ী গিয়ে ওঠে।

নামাজ পড়ে বাড়ীর মালিক ছুটোছুটি করছিল একটা দুষ্ট বলদ নিয়ে। সে বিপ্রপদর নিকট সব জিজ্ঞাসা করে তাড়াতাড়ি একটা গাছ থেকে দু'টো ডাব পেড়ে এনে দেয়। সের খানেক কাঁচা দুধ ও কয়েকটা পাকা কাঁঠালি কলাও দেয়। বিপ্রপদ খেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার যাত্রা সুরু করে। পাকা রাস্তা নেই, শুকনা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মেঠো পথে আবার চলতে থাকে হনহনিয়ে। আশায় উদীপ্ত হয়ে ওঠে মন। এই তো সে যদি না বলত, না চাইত, কে দিত তাকে খেতে? দরিদ্রের চেয়ে নিতে হবে, প্রয়োজন বোধে কেড়ে নিতে হবে, সময়মতে ছিনিয়ে আনা চাই। নইলে কে তাকে মুখে তুলে দেবে? এই দুনিয়াটা চোখ বুঁজে থাকবে। গঠিত স্বাস্থ্য বিপ্রপদকে আর ক্লান্তি গ্লানি স্পর্শ করতে পারে না। সে হেঁটে চলে, আর ভেবে চলে: সহরের অজস্র লোকের মধ্যে সে-ও এক জন। সেখানে সবাই যেন কাড়াকাড়ি হানাহানি মারামারি করে কি একটা পাওয়ার জন্ত ঠেলাঠেলি করে চলেছে। সেই জিনিষটার জন্ত সে-ও যেন প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে। তার শরীরে কত শক্তি! সে আগামী কাল নিশ্চয় একটা সাফল্য অর্জন করবে। মন তার বলছে করবেই। কাজ সে জুটিয়ে ফেলবে একটা—একেবারে নগদ-নগদ। কিন্তু প্রথম সে কি ভাবে গিয়ে দাঁড়াবে। এই তো তার সাজ-সজ্জা! একটা জামা নেই, না আছে জুতো এক-জোড়া। তাকে দেখলে বলবে কি লোকে? হয়ত কত লোক অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে নেবে। নিক! সে দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদ যখন ভয়াতুর শিখা নিয়ে আকাশের গায়ে দেখা দিল, ঠিক তখন সে এসে সহরের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াল।

'এই কুলী, কুলী—এখানে কুলী আছো কেউ?'

'হাঁ আছি, কোথায় যেতে হবে?' অমনি একটা তীব্র আলো বিপ্রপদর মুখের ওপর এসে পড়ে। সে চোখ দু'টো একটু কোঁচকায়।

'ষ্টীমার ঘাটে। তুমি, তুমি যাবে?'

'চলুন কি নিতে হবে?'

'এই বিছানা ও বাক্সটা।' আগন্তুক আলো ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়।

'তুমি একা তুলতে পারবে না, আমি ধরে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই, আমি একাই পারব তুলে নিতে।'

বিপ্রপদ অনায়াসে মোট দু'টো মাথায় করে হাঁটতে থাকে। তাদের দেশী মাপের দু'কাঠি চালের ওজন পাকি পঞ্চাশ সের। এ বোঝা তার চেয়ে অনেক হাল্কা। যখনই একটু স্বচ্ছলতা থাকে, তখনই তো সে দু'কাঠি চাল প্রায় এক মাইল দূর থেকে মাথায় করে বাড়ী নিয়ে আসে। দেশে বসে বোঝা টানতে যখন মান যায় না, তখন বিদেশে তাকে কে চিনবে? বিশেষত রাত্রিকাল। সহরটা ঘুমন্ত। রাস্তাগুলো জনবিরল।

ষ্টীমারের একটা কেবিনে বোঝাটা নামিয়ে দিতেই ভদ্রলোক ওকে চার আনা পয়সা দেয়।

এ যে অসম্ভব মজুরী! পয়সাটা কি সহরে এত তুচ্ছ! কামাই করা এত সহজ! ভুল হলো না কি ভদ্রলোকের? সারা দিন খাটলেও তো দেশে একটা কৃষাণকে এত পয়সা দেয় না কেউ।

'তোমার বাড়ী কোথায়? তোমাকে যেন এ কাজে নতুন বলে মনে হচ্ছে! এই হাতে-খড়ি না কি? তোমার নাম কি হে?'

'বাড়ী শক্তিগড়, এই জেলায়। নাম বিপ্রপদ বসু।'

'কি বললে, বিপ্রপদ বসু?'

'আজ্ঞে, হাঁ।'

'তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছ? খাসা চেহারা দেখছি, একেবারে সাহেবের মত যে!'

'ইংরেজীটা সামান্তই জানি। সে ধর্তব্যের মধ্যে না। কিন্তু বাঙলাটা মামা-বাড়ী থেকে একটু বেশী দিনই পড়েছিলাম।'

'লেখো তো নামটা ইংরেজীতে। আমার জমিদারী সেরেস্তায় এক জন মুহুরীর দরকার—ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। খাওয়া-থাকার খরচা লাগবে না, কিন্তু আপাতত মাইনে পাঁচ টাকা। চাকরী করবে? বাঃ, চমৎকার তো হাতের লেখা! তুমি আমার সংগে চলো। তুমি যেমন অধ্যবসায়ী, অতি সহজে উন্নতি করতে পারবে। পাঁচ টাকা বেতন শুনে ভাবছ? বেশ মোটা রকম উপরি-সুপরি আছে।' বলে, ভদ্রলোকটি উপরীর পরিমাণটা যে কত মোটা তা হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। অবশ্য তা এক হাতে দেখান সম্ভব নয় বলে দু'টো হাতই সে ব্যবহার করে। বিপ্রপদ মনে মনে সন্তুষ্ট হয়।

সে মুখে বলে, 'পাঁচ টাকার কথা ভাবছি নে, ভাবছি পারব কি না?'

'খুব—খুব পারবে। চলো, শিখিয়ে বুঝিয়ে নেবো। এক দিন তুমি আমার ষ্টেটের এক জন ডিহি-ম্যানেজার হবে, তোমার চোখে-মুখে যে সে কথাই বলছে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে মোট টানতে ও লজ্জা বোধ করোনি, বাহাদুর ছেলে বটে!'

নিজের প্রশংসা নিজের কাণে শুনে বিপ্রপদ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

'কি, চুপ করে রইলে যে?'

'আমি আর কি বলব, আমি নতুন মানুষ, আপনার ওপর সব নির্ভর—আপনি যা ভাল বোঝেন।'

'বেশ, বেশ, তুমি খেয়েছ? মুখখানা যে শুক্‌না দেখছি।'

'অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি কি না—না, না, আমার কিছু—'

'বুঝতে পেরেছি, খাওয়া হয়নি। লজ্জা কিসের? আমার সাথে অনেক খাবার রয়েছে। এই নেও, এইটা খোলো। এখন খাও। বুঝলে হে, লজ্জা করলে আজ আর আমার সংগে তোমার পরিচয় হতো না। কেমন তাই না? তবে?'

এইখানেই বিপ্রপদর সৌভাগ্যের সূচনা এবং এক দিন যে তার পরিণতি এত অসামান্ত হবে, তা সে কখন কল্পনাও করতে পারেনি।

২

মুহুরী থেকে নায়েব, নায়েব থেকে ম্যানেজার, পর পর তিন-তিনটা ধাপ অতিক্রম করতে বিপ্রপদর অনেক বছর কেটে যায়। খেতাবীও বদলায় তিন-তিন বার। প্রথম মশাই, তার পর বাবু, এখন সবাই বলে হুজুর। বড় বড় বর্দ্ধিষ্ণু প্রজারা, ডাক্তার, পুলিশ সাহেব, মহকুমার হাকিম আপনি ছাড়া কথা বলতে সাহস পায় না। দেশেও সে হাওয়া ছড়িয়ে গেছে। সময় সময় এ সব নিয়ে দু'দলে হাতাহাতি এবং মারামারি হয়ে যেতে লাগল। আর এ হাওয়ারই কথা। সম্ভব-অসম্ভব অনেক গল্পও তৈরী হলো।

যেদিন বিপ্রপদ প্রথম একখানা পূজা-মণ্ডপ তুললেন, আর সংগে সংগেই উঠল একখানা সুবৃহৎ টিনের নাটমন্দির, সেদিন হঠাৎ গ্রামের লোক দশআনী ছ'আনী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দশআনী মরল হিংসায় জ্বলে, ছ'আনী মুখর হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। সেই দু'দলই আবার এক হয়ে মিশে যেত কোনও নিমন্ত্রণের অনুষ্ঠান থাকলে। কারণ, বোসের বাড়ীর লেহ্যপেয়টা বিপ্রপদরে উপাদেয়!

আজও সে রকম একটা অনুষ্ঠান আছে এবং সেটা বিরাট রকমের। হেতু বিপ্রপদ হালে একখানা বিরাট রকমের বাঁসগৃহ তুলেছেন। অদ্ভুত সে ঘর। নাটমন্দিরের পাশেই বারচালা সেই ভূতের ঘর উঠেছে। ফুল-মালা দিয়ে সাজান হয়েছে আজ। বড় বড় শালগাছের খুঁটির ওপর চার দিকের চাল একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। আবার কেমন সুন্দর নীচের দিকে নেমে ধনুকের মত বেঁকে গেছে ছাউনীর শেষ প্রান্ত। দু'-দু' আংগুল অন্তর চেরার সংগে মাঠাম অতি সূক্ষ্ম বেত দিয়ে কারিগরী নক্‌সি প্যাচে বাঁধা। তার ওপর খুব দামী শীতল-পাটি বিছিয়ে ছাওয়া হয়েছে ছোপের অপূর্ব মজবুত চাল। কত দিন বসে, কত লোক খাটিয়ে যে এ ঘর তোলা হয়েছে, তা যারা না জানবে তাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। এ ঘর তুলতে নানা দেশ থেকে এসেছে নানা জিনিষ। চট্টগ্রামের বেত, আসামের কাঠ-বাঁশ শক্ত বুনো লতা। ঢাকা থেকে এসেছে কারীগর। বাস্তবিকই তারা গুণী লোক। এই সব বুনো জিনিষে এমন চিকণ ও পালিশ কাজ করেছে যে, দেখলে চোখ ফেরান যায় না। কোথায় লাগে দালান! সর্বশেষে তারা যা করলে তাতেই গ্রামের লোক তাক লেগে গেল। অনেকে মনে মনে ভয়ও যে না পেল তা নয়। কারিগরেরা দিল ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এক পল্লা পুড়ে নিবে গেল সে আগুন নিজে নিজেই। সবাই কারীগরদের ধন্ত ধন্ত করতে লাগল। ফলে তারা একটা মোটা বকশিশ দাবী করে বসল। বলে-কয়ে তাদের বিপ্রপদ যা দিলেন, তাও কম নয়। এক জোড়া দামী শাল, গরু চারটে, দু' বিঘে জমি এবং একখানা বাস্তভিটা। সেই থেকে তারা এ দেশের বাসিন্দা হয়ে আছে।

আজ গৃহ-প্রবেশ। নির্বিঘ্নে এবং মহা সমারোহে শেষ হয়ে যায়।

রাত্রে কমলকামিনী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠেন। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন আকাশে ঠেলে উঠছে। ক্রমশঃ হু-হু শব্দে জ্বলে উঠল আগুন। তাঁদের ধানের গোলা, চালের মটকি সব পুড়ে যাবে। ভূতের ঘরে আগুন লেগেছে।

বিপ্রপদ জেগে উঠে বলেন, 'স্বপ্ন দেখছো বড়-বৌ, গোবিন্দ নাম স্মরণ করো।'

কমলকামিনী তাই করেন বটে, কিন্তু মন তাঁর সুস্থ হয় না। সকালে উঠেই তিনি পুরুত ডাকিয়ে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। শুধু স্বামি-স্ত্রী ব্যতীত এ কথা বড় একটা কেউ জানে না। সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ ব্যবহার করেও স্বামী এবং স্ত্রীর মন একটা অস্বস্তিতে ভরে থাকে। কিন্তু কেউ কারুর কাছে কিছু বলে না।

সন্ধ্যার সময় যেমনি বৈকালীর ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যায় অমনি উভয়ে গিয়ে নীরবে পূজামণ্ডপে বসেন—নীরবেই প্রার্থনা করেন, 'অপরাধ যদি কিছু করে থাকি, ক্ষমা কর ঠাকুর!'

মণ্ডপখানা দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে হয় বোসেদের পুরুষানুক্রমিক শালগ্রাম শিলা এবং বিপ্রপদর সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের পূজা, অন্য ভাগ সংরক্ষিত থাকে দুর্গা ও কালীপূজার জন্ত।...

উজ্জ্বল দীপালোকে, ধূপধুনার মধুর গন্ধে, বৈকালীর বাদ্যে উভয়ের অন্তর-ভার মুক্ত হয়। শুভ্র শুচি হয়ে ওঠে মন। ভাবেন, ঠাকুর হাসছেন, ক্ষমা করেছেন বুঝি সব অপরাধ।

আরতি থামলে তাঁরা পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে ফিরে আসেন ঘরে।

বিপ্রপদ জ্যেষ্ঠ, মধ্যম শিবপদ, কনিষ্ঠ দেবপদ। তা ছাড়া খুড়তোত ভাই-বোন পাঁচ-ছ'জন। তাদের ছেলে-মেয়ে-অতিথ-অভ্যাগত নিঃসম্বল কুটুম্ব-কুটুম্বিনী জড়িয়ে সকাল-বিকাল প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের পাত পড়ে। আগেও এ পংগপাল ছিল, এখন অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা বাড়ে-বংশে একটু বেড়েছে, একটু বললে ভুল হবে—যথেষ্ট বেড়েছে। দেশের ছ'আনী এবং দশআনী, প্রথম পক্ষ প্রকাশ্যে এবং দ্বিতীয় পক্ষ অপ্রকাশ্যে বলে যে, কমলকামিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁর ভাগ্যেই বোসদের এ বাড়-বাড়ন্ত। অবশ্য দশআনীর এমন সত্য কথাটা বলতেও পোড়া আগুনে অন্তর দগ্ধ হয়ে যায়।

এখন কমলকামিনীর বয়স হয়েছে, বড় মেয়েরাই যুবতী, ছেলে অমরেশ একেবারে ছোট নয়। একটা ছোট মেয়ে তাঁর কোলে। মোট তাঁর ন'টি সন্তান। তার ভিতর ঐ একটি মাত্র ছেলে। বয়সের চঞ্চলতা কোনও দিনই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তবু যা ছিল আজ তা তাঁর দেহের বন্ধনে, অটুট স্বাস্থ্যের গৌরবে স্থির হয়ে গেছে। কি একটা গাম্ভীর্য, কি একটা মাদকতা যেন তাঁর দেহে এসে বাসা বেঁধেছে। আজ তাঁকে দেখলে ক্ষণিকের জন্ত কেউ কেউ যুবতী বলেই ভ্রম করে। কমলকামিনী শ্যামাংগী—কিন্তু বয়সের সংগে সংগে অপূর্ব শ্যামের সমারোহ এসেছে।

বিপ্রপদর নাট-মন্দিরটাই এ গাঁয়ের আড্ডার জায়গা। যত সকর্ম্মা-নিকর্ম্মা লোক এসে ভিড় করে এই এখানেই। দিবারাত্র শালিসী-মজলিসী গল্প-গুজবের এইটাই পীঠস্থান বলে পান-তামাকের ধর্ম্মশালাটা অহরহই খোলা থাকে। বামুন, কায়েত, মুসলমানের জন্ত তিনটা পৃথক্ হুঁকো আছে রূপো দিয়ে বাঁধান। আগুনের একটা বড় তাওয়া ও বড় একটা তামাকের ডিবা পড়ে থাকে নাট-মন্দিরটার এক পাশে। যে যত পারো হররদম চালাও, এমনি একটা ভাব। একটি স্থায়ী পণ্ডিত আছে। সেটি দোরোখা। কখনও ছেলেদের পড়ায়, অর্থাৎ ঠ্যাংগায়—কখন আবার মুহুরীর কাজ করে—অর্থাৎ ঠিকে ভুল করে রাখে! তবে তার সব চেয়ে বেশী অধিকার ধূমপানে। এ না কি তার পিতৃরোগ, মজ্জায় মিশে গেছে। তার পঞ্চমবর্ষীয় বংশধর কৃষ্ণধনের মধ্যেও না কি সংক্রামিত হয়েছে। অতএব তার কাছে এসে যে বসবে, তারও না কি অব্যাহতি নেই।

অল্প সময় হল নিতাই এসেছে, এসে এর মধ্যেই তিন ছিলিম পুড়িয়েছে।

'বাবু আর ক'দিন বাড়ী আছেন? এখন আর তো পরের চাকুরী না করলেও চলে। দিব্যি বসে বসে রাজভোগ খেতে পারেন।'

'হুঁ, তা পারি বটে। মা-লক্ষ্মী সেটুকু কৃপা আমাকে করেছেন, কিন্তু আরো অনেক সমস্যা আছে—ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিয়ে, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা—ও তোমরা বুঝবে না—তাই বিদেশে যাওয়া।'

'বুঝি বাবু সব! বেশী লেখা-পড়া শিখে এমন একটা কি হবে?'

'তা হলে কি বলতে চাও? ছেলে-পিলে মূর্খ হয়ে ঘরে বসে থাকবে?'

'এই দেখুন না, ও-বাড়ীর গাঙ্গুলী দু'টি ছেলেকে পড়ালেন—তারা মানুষ হয়ে লাভের মধ্যে দেশত্যাগী হলো। আমরা মুড়ি, চাঁদের

ছেলে গাঁয়ে থাক। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলে ঐ খাঁটি বস্তটায়ই সোণা ফলবে। কৃষিকর্ম্মে কি কম আয়?'

উপস্থিত যারা ছিল তারা সকলেই এক-বাক্যে সায় দেয়, 'ঠিক, ঠিক বলেছ সর্দ্দারের পো।'

বিপ্রপদ কর্ম্মঠ পুরুষ—শৈশবের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি—তাই নিষ্কর্ম্মা লোকগুলোর সঙ্গে গল্প করার অবসরেও একখানা ঝাঁকি জাল বুনছিলেন। হাত চালান বন্ধ করে বলতে লাগলেন, 'আমি বুঝি, বিদেশে যদিও বা যাও, লেখাপড়া শেখ, চাকরী বাকরী করতে হয় করো, কিন্তু দেশের মায়া ছাড়ো কি করে? বাগ-বাগিচা ফসলের মায়া?'

দীনু ঠাকুর সেয়ান মানুষ। একটা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে একটা মজলিস উপযোগী শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করে খুব ফেনিয়ে বুঝিয়ে দেয়। অবশ্য কতটা যে ব্যাকরণশুদ্ধ হল, সে দিকে সে মাথা ঘামায় না। উদ্দেশ্য বিপ্রপদকে খুশি করা।

নিতাই সরদার একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। সদ্য-সাজান তামাকটা যে পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল থাকে না।

ঠিক এমনি সময় কমলকামিনী একখানা বাটাপূর্ণ আস্ত পান, কুচো সুপারি ও কতখানি চুণ পাঠিয়ে দেন। অমনি মধুর চাকে ঢিল পড়ে। যারা পান খাবে এগিয়ে যায়। অশ্বিনী হাঁপানীর রোগী। পথ দিয়ে যাচ্ছিল, থামে, থেমে বলে, 'শুনছেন বোস ঠাকুর, সেই নাম-করা ডাকুটা মারা পড়েছে। একেবারে কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে না কি সাবাড় করেছে।'

রাজু বলে, 'আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ঘটনাটা ঘটেছে মাধবপুর এক নমঃশূদ্র বাড়ী—ভিক্ষে করতে গিয়েছিলাম কি না—রামদা দিয়ে কুপিয়েছে; কে বলে কুড়োল—পাঁঠা-কাটা রামদা।'

'তুমি না কি অন্ধ, স্বচক্ষে দেখলে কি করে বাপু?' বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

'বোস ঠাকুর, ভদ্দরলোকের ছেলে, বিশেষত কায়েতের ঘরে জন্মেছি—একেবারে অন্ধ হলে এতগুলো গাঁ চষে খাব কি করে?'

রাজুর সরলতায় সকলে হেসে ওঠে। হাসির চোটে অশ্বিনীর বুকের ওপরের ঢোলের মত মাদুলীটা দুলতে থাকে।

প্রসংগটায় অভিনবত্ব আছে। এমন মুখরোচক ঘটনা কালে-ভদ্রে দু'একটা ঘটে। তাই দীনু ফের আরম্ভ করে, 'মমিন ডাকুর কথা আমরা খুব ভাল করেই জেনে এসেছি। ঘরে ঢুকব ঢুকব করছিল শালা, অমনি বাড়ীর মালিক দিয়েছে অন্ধকারে ল্যাজা চালিয়ে। লাগবি তো লাগ, একেবারে তলপেটে। আর যায় কোথা বাছাধন, একেবারে চিৎ হয়ে পড়ল গিয়ে উঠানে।' বলে সে এমন একটা মুখভংগি করে, যে ল্যাজাটা যেন তারই তলপেটে বিঁধেছে।

দীনুর এমন ভংগিমাটায়ও অশ্বিনীর মনে করুণার উদ্রেক হয় না। সে রীতিমত রেগে যায়—'মিথ্যা কথা বলা আপনার অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কে বললে ল্যাজার কোপ? একেবারে রামদা'র। এই এইখানে।' বলে সে তার সরু গলাটার ওপর চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে এমন ঘা-ই মারে যে তা দেখে বিপ্রপদর ছোট ছেলে লেবাটা কেঁদে ওঠে।

ছুটে আসেন কমলকামিনী। ব্যাপার কি?

'দেখ অশ্বিনী, যত বড় মুখ নয়…'

'আহা হা, থামুন থামুন দীনুদা। এ তো মহা জ্বালা! যে ভাবেই হ'ক ডাকাত শালা মরেছে, এই আমাদের যথেষ্ট। ও নিয়ে আবার ঝগড়া করে আমাদের লাভ কি?'

নিতাই বলে, 'ঠিক কথা বলেছেন বাবু, ঠিক!'

দীনু আজকাল বিপ্রপদর নিতান্ত মুখাপেক্ষী, নইলে সে কি ছাড়ত অশ্বিনীকে! সে মুখে চুপ করে মনে মনে টগবগ করতে থাকে।

মাংসচোরা বাজের মত ছোঁ মেরে কয়েকটা পান মুখে পুরে অশ্বিনী কাঁপতে কাঁপতে বিদায় হয়।

রাজু লাঠি নিয়ে ওঠে। বেলা হয়েছে, ক'বাড়ী একটু ঘুরে আসবে। প্রত্যহ কি আর এই এক বাড়ীতে হাত পাতা যায়!

কমলকামিনী বলেন, 'রাজু, ভিক্ষে নিয়ে যাও। যে ক'দিন আছে সে ক'দিন দেবো, তুমি লজ্জা করে আবার ত্যাগ করে যেও না।'

এবার রাজু অন্ধ চোখ-জোড়া নিমেষে পাল্টে চক্ষুষ্মান্ চোখ-জোড়া কমলকামিনীর দিকে তুলে ধরে। সে জোড়াও প্রাচীন তবু আর্দ্র হয়ে ওঠে। 'মা, এ কথা সবাই বুঝলে এ বয়সে আর লোক ভগিয়ে বেড়াতে হতো না।'

'তোমার যে দিন অসুবিধা হবে, এখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল—তুমি বেত দিয়ে আমার ডালা-কুলো বেঁধে দিও, ওতেই তোমার রুজি পুষিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মা, আচ্ছা! এখনও আমি চোখে যা ঠাহর পাই তাতে ও-সব কাজ করতে পারি, কিন্তু নিত্য ও-কাজ কে দেবে বলো?'

রাজু ও কমলকামিনীর কথা বিপ্রপদ শোনেন না।

এই যে অজস্র পান-তামাক তিনি খরচ করতে পারছেন এর জন্য মনে মনে স্ফীত হ'য়ে ওঠেন। যে যা পারে সে তা খেয়ে যাক, নিয়ে যাক, এতে তার সৌভাগ্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিনিময়ে তিনি অর্জ্জন করবেন সম্মান। পয়সা দিয়ে মানুষে আর করে কি! আর বছরে ক'টাকাই বা তাঁর পান-তামাকে খরচ! পানের ত একটা 'বর' করেছেন পুকুর-পাড়ে। এ-সন অনেক তামাকও হয়েছে তাঁর ক্ষেতে। তিনি হিসেবী লোক। সারা বছরের খরচটা দিয়েছেন মাটিতে ছড়িয়ে। বছর অন্তর তা ফলে-ফুলে-লতায়-পাতায় ভরে উঠবে। তাঁর লোক-জনের তো অভাব নেই। তারা বসে বসে করবে কি?

জাল বুনতে বুনতে কখন যে বেলা দ্বিপ্রহর হয় তা বুঝতে পারেন না বিপ্রপদ। তিনি বাড়ী থেকে যাওয়ার পূর্ব্বে জালখানা শেষ করে রেখে যেতে চান। জাল বুনতে, মাছ ধরতে তিনি চির-দিনই পটু। এখন বিদেশে বসে বড় একটা সুযোগ হয় না, সম্মানও থাকে না। কিন্তু দেশে যারা আছে তারা তাঁরই বোনা জাল দিয়ে যে মাছ ধরবে, ছেলেমেয়েরা কলরব করবে—এ তাঁর ভাবতেও ভাল লাগে।

'তুমি কি ছুটি নিয়ে এসে দু'দণ্ড সুস্থ থাকতে পার না? বেলা কোথায় সে দিকে কি লক্ষ্য আছে? এখন ওঠো, স্নান করতে যাও—তোমার জন্যে আর সবাই কতক্ষণ বসে থাকবে?'

'তাই তো, সত্যিই বেলা অনেক হয়েছে দেখছি।'

'ছাই দেখছ! কৃষাণ-মজুরের ছুটি না নেওয়াই ভাল।'

'তা ঠিক। এখন তেল-গামছা দাও।' বলে বিপ্রপদ চারি দিকে চেয়ে দেখেন, কেউ নেই। 'তোমার মুখের কথা অক্ষয় হ'ক, আমি যেন সত্যি সত্যি কৃষাণ-মজুর হ'তে পারি।' হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে, নাটমন্দিরের কোণার খাটটার ওপর। নিতাই সরদার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। 'ও কি, এখনও যে তুমি যাওনি, তোমার কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে না কি?'

সে ম্লান হাসি হেসে বলে, 'না না। তবে কি জানেন বাবু, হুজুরের কাছে একটা নালিশ আছে।'

'কি নালিশ?…থাক্, সে সব পরে হবে। যখন এত বেলা হয়েছে তখন এখানেই নেয়ে-খেয়ে নেও। বড়বৌ, দু'খানা গামছা আর দু'খানা কাপড় পাঠিয়ে দাও। নিতাই এসো, এসো।'

খাবার ঘরে দু'খানা পিঁড়ি মুখোমুখি পাতা হয়েছে। নিতাই জাতে নাপিত। সে বিপ্রপদর সুমুখে বসে খেতে কুণ্ঠা বোধ করে।

কমলকামিনী বলেন, 'আরে, বসে পড়ো সরদারের পো। উনি তো আর বাঘ না যে তোমায় খেয়ে ফেলবেন। বসে পড়ো, আর দেরী করো না। বেলা অনেক হয়েছে।'

একই প্রকার দু'খানা খাগড়াই কাঁসার থালা, একই প্রকার ব্যঞ্জনপূর্ণ বাটি যখন দু'জনের সুমুখে দেওয়া হয়—তখন নিতাই তো দেখে অবাক্। অন্নপূর্ণা কেন এদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না? সে খাবে কি, একেবারে গলে যায়।

'হাত তুলে বসে থেকো না, ভাত ক'টি ঝোল দিয়ে মেখে নেও। দুধের বাটিটা এগিয়ে দে শ্যামলা। ঐ অন্নের জন্যই তো সংসারে এত কান্না। খেয়ে ফেলো, পাতে রেখো না। নিতাইকে একটু বেশী করে বরচে গুড় তুলে দে মা।'

নিতাই একেবারে পাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার আর লাগবে না—ভুরি-ভোজন হ'য়ে গেছে।

বিপ্রপদ উঠে আঁচাতে যান। নিতাই পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সে কি করবে? অন্তরালে বসে বৌরা তার বিষয় আলোচনা করছে না কি?

'কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? এই জল নেও, আঁচিয়ে এসো। এঁটো পাতটার জন্য ভাবছ? তুমি যে-ই হও, আজ আমার পরম সমাদরের অতিথি। তা ছাড়া তোমার একটা বিশেষ সম্মানও আছে। এক দিন তোমরা ছিলে এ দেশের রাজা। সে সম্মান কি একেবারে লুপ্ত হতে পারে? এই প্রকাণ্ড পরগণাটায় যত সম্পত্তি আছে, তার অর্দ্ধেকেরও বেশী ছিল তোমাদের। এ সব পুরোন দলিল ঘাঁটলে দেখা যায়। তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরাই কেউ না কেউ দান-বিক্রি-পাট্টা কবলা দিয়ে গেছে। তোমার ঠাকুরদার 'মুদাফতী' সম্পত্তির তো আর অভাবই নেই। এক দিন তোমাদের কাছে মাথা হেঁট না করে পারত এমন লোক বামুন-কায়েত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছিল না। শুনেছি, রায়চাদ সরদারের ভয়ে বুনো মোষও না কি স্তব্ধ হয়ে থাকত।' তার ইয়া লম্বা-চওড়া হাতীর মত বুকের পাটা ছিল, বুঝলে?'

নিতাই কাণ পেতে পূর্বপুরুষের কথা শোনে। যেন রূপকথা শুনছে। এক মুহূর্ত্তে এই পরগণাটার নক্সা তার চোখের সুমুখ দিয়ে ভেসে যায়। সত্যই, এ দেশে তারা এক দিন রাজা ছিল। সরদার উপাধিটা বাদশাহী আমলের পাওয়া। মানুষ অবস্থার দাস। তাই আজ উপাধিটা কৃত্রিম ভাঁড়ের লেজের মত মনে হয়। ভয় হয় এঁটো থালাখানা পর্য্যন্ত ফেলে যেতে। জরীপ করে আজ তাকে অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে সমাজের আমিন-গোষ্ঠী।

নিতাইর নালিশটার আর কোনই অর্থ হয় না, অর্থ তার প্রয়োজন—এক জোড়া সোণার মাকড়ি বন্ধক রেখে পঁচিশটা টাকা ধার দিতে হবে। সে একটা দায় ঠেকেছে। বিপ্রপদ কি জানেন এই দায় উদ্ধার করতে গিয়ে পরবর্ত্তী কালে তাঁকে কতখানি নাজেহাল হতে হবে? জানেন না বলেই সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করেন, 'টাকা দিয়ে কি করবে?'

'ঘোষালেরা একটা মিথ্যা আর্জি দিয়ে আমায় সর্বনাশ করেছে। এমন বেইমান দুনিয়ায় খুব কমই আছে বাবু। শুনলে আপনিও অবাক্ হয়ে যাবেন। বুড়ো ঘোষাল যিনি মারা গেছেন, তিনি কোনও কারণে একটা দায় ঠেকে আমার বাবার নামে একটা মিথ্যা পাট্টার দলিল সৃষ্টি করেন। নিজের একটা বড় সম্পত্তি রক্ষাই মূল উদ্দেশ্য ছিল তার। আমরা তাঁর ভাল-মন্দ কিছু জানিনে। সম্পত্তিও ভোগ-দখল করিনে। ওরা ঐ সম্পত্তির ওপর একটা ডিক্রি করিয়ে, দিয়েছে আমার বাড়ী-ঘর নিলামে। ঐ দলিল সত্য বলে প্রমাণ করাতে আমার বাবা ওদের হয়ে যে কত মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছেন—কত এসেছেন না খেয়ে হেঁটে সদর থেকে। তার প্রতিদানে ওরা দিতে চাচ্ছে আমার গলায় ছুরি।'

'বল কি? তোমায় মাকড়ি বন্ধক রাখতে হবে না। যে কটা টাকার দরকার, চেয়ে নিয়ে যাও। সদর থেকে ফিরে এসে মামলার খবরটা জানিও। আমি উদ্বিগ্ন রইলাম, বুঝলে?'

একে একে রূপোর পঁচিশটা টাকা নিতাই গুণে নেয়। এ-হাত থেকে ও-হাতে ফেলে। ঝন্-ঝন্ করে শব্দ হয়। কমলকামিনী আবার পান নিয়ে আসেন। নিতাই মহা তুষ্ট হয়ে এক চিলতা পান বাটা থেকে তুলে নেয়। চুণ-সুপারি দিয়ে মুখে পুরে দেয়। শক্ত করে মাকড়ি জোড়া কাপড়ে বাঁধে। তার পর সহসা কমলকামিনীকে মা বলে সম্বোধন করে পায়ের ধূলো নেয়। বিপ্রপদও পা সরিয়ে নিতে পারেন না।

হিসেবটা পণ্ডিত সাল-তারিখ বসিয়ে খাতার পৃষ্ঠায় লিখে রাখে। নিতাই চোখ দু'টো ঘন-ঘন মুছে নিজের দৃষ্টিশক্তিকে অযথা দোষারোপ করে, একটা নাম সই করে। তার পর তুলে ধরে দেখে কেমন হল।

বাড়ী থেকে নেমে নিতাই মেঠো পথ ধরে চলে যায়। সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'শানদার' বাড়ীর বাঁকড়া তেঁতুল গাছটার আবডালে না পড়ে, ততক্ষণ কমলকামিনী দৃষ্টি পেতে ওর পথের দিকে চেয়ে থাকেন। কত লোকই তো মা বলে ডাকে, কিন্তু ওর ডাকে যেন কি আছে!

[ক্রমশঃ

অনুপ গুপ্ত

(পরিচয়)

প্রতিমা দাস　　রজনীমোহন সেন　　মালবী সেন
নিশিকান্ত সেন　　স্যর হরপ্রসাদ গুপ্ত　　তপতী রায়
ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার　ডাঃ বিমল বসু ডাঃ ইন্দ্রনাথ সরকার
সুরেন　　কুসুম

প্রথম অঙ্ক

দার্জ্জিলিং। রজনীমোহনের বাড়ী। দোতলার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। সময়—সকাল ন'টা। সুরেন ও তৎপশ্চাতে তপতী রায় এবং ধীরেন মজুমদারের প্রবেশ

সুরেন। আপনারা বসুন। আমি এখুনি খবর দিচ্ছি।

তপতী। তোমার নীচেই বলা উচিত ছিল, যে ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ধীরেন। তপতী, চল আমরা যাই। এ সময় ওদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

সুরেন। আপনারা চলে গেলে মেমসাহেব আমার উপর অত্যন্ত রাগ করবেন।

ধীরেন। বেশ—আমরা তবে যাব না, এই বসলুম।

(তপতী ও ধীরেন বসলেন)

সুরেন। ডাক্তাররা এখুনি চলে যাবেন।

তপতী। ডাক্তাররা!

ধীরেন। ডাঃ সরকারের সঙ্গে অন্য কোনও ডাক্তার এসেছেন না কি?

সুরেন। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তপতী। কেন, মিষ্টার সেনের শরীর কি অত্যন্ত খারাপ?

সুরেন। আজ্ঞে না, ওই যে ওঁরা আসছেন।

(ডাক্তার ইন্দ্রনাথ সরকার ও তৎপশ্চাতে ডাঃ বিমল বসুর প্রবেশ)

[সুরেনের প্রস্থান।

ইন্দ্রনাথ। নমস্কার প্রফেসর মজুমদার, নমস্কার তপতী দেবী। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত ডাঃ বিমল বসু। আমি আর বিমল একসঙ্গে কারমাইকেলে পড়তুম।

(সকলে সকলকে নমস্কার করলেন)

বিমল। নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হলুম। রজনী বাবুর কাছে শুনেছি যে তাঁর অসুখের সময় আপনারা অনেক করেছেন।

তপতী। তিনি অতি বিনয়ী লোক তাই অত বাড়িয়ে বলেছেন।

ধীরেন। আমি কিন্তু কিছুই করিনি।

ইন্দ্রনাথ। রজনী বাবুর চেয়ে আপনারা অনেক বেশী বিনয়ী তাই প্রমাণিত হচ্ছে। তাকদায়—

তপতী। তাকদায় তো আপনি ছিলেন না। এ তো আপনার শোনা কথা মাত্র।

ইন্দ্রনাথ। সে কথা যে সত্য তার প্রমাণ এইখানে পেয়েছি।

তপতী। আসল কথা কি জানেন ডাক্তার বসু! আমরা, মানে আমার দাদা আর আমি, আর রজনী বাবুরা তাকদায় পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতুম। সেই সূত্রে আলাপ হয়েছিল। ওখানে জানেন তো লোকসংখ্যা খুবই কম। তাই একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়। সকালবিকেল ওঁদের বাড়ী গিয়ে গল্পসল্প করতুম, এই আর কি!

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু আমি শুনেছি—

তপতী। এই যে বললুম, প্রতিমা বাড়িয়ে বলেছে। একেবারে তিলকে তাল করে তুলেছে। তবুও প্রতিমাকে আমার ভয়ানক ভাল লাগে—

ধীরেন। মিসেস, সেনের কথা আমার বোন যদি একবার আরম্ভ করে তো ব্যস! একেবারে তুফান মেল! তার কোন শেষ নেই—ননষ্টপ।

তপতী। ও-রকম ভাল মেয়ে খুব কমই দেখা যায়।

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তপতী। ওর মতামত একটু বেয়াড়া ধরণের, সন্দেহ নেই—

বিমল। তা বটে।

ধীরেন। আপনার সঙ্গে রজনী বাবুদের অনেক দিনের আলাপ, না?

বিমল। হ্যাঁ। আমি ওঁদের কলকাতায় ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

তপতী। তা হলে তো আপনি প্রতিমার আজগুবি খেয়ালের কথা সবই জানেন। অবশ্য ওর অনেক মতের সঙ্গেই আমার মেলে না, কিন্তু তার জন্য তাকে ভালবাসতে দোষ কি? তা ছাড়া ওর স্বামি-ভক্তি, সেবা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ভালবাসা আমায় মুগ্ধ করেছে। তাকদায় যখন রজনী বাবুর শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল, তখনও রাত-দিন এক করে সে যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তা যে দেখেনি সে ধারণা করতে পারবে না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই—

ধীরেন। (হেসে) কি বলেছিলুম! তপতী, এঁদের একটু একলা থাকতে দেওয়া দরকার। রুগী দেখে এসে কনসাল্টেশন করবেন, কিন্তু তোমার জন্য—

তপতী। কিছু মনে করবেন না। আমার বোঝা উচিত ছিল—

বিমল। না, না। ইট ইজ অল রাইট!

তপতী। আমি বারান্দায় বসে রৌদ্র পোহাচ্ছি—

(একটা দরজার কাছে গেলেন)

ধীরেন। আমার সিগার ফুরিয়ে গেছে। চট করে গিয়ে এই বাকে কিনে আনি। নমস্কার ডাক্তার বসু, ডাক্তার সরকার—

[নমস্কার করে ধীরেনের প্রস্থান।

তপতী। (বারান্দার দরজা থেকে) আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিরক্ত করব না। তবে আমি শুনেছি, পরামর্শ মানে পলিটিক্স চর্চা, যুদ্ধের আলোচনা ইত্যাদি। কি বলেন?

[হেসে প্রস্থান।

ইন্দ্রনাথ। বেশ বলেছে!

বিমল। এঁরা আসল ব্যাপার যেন ঘুণাক্ষরেও জানেন না মনে হচ্ছে!

ইন্দ্রনাথ। একেবারেই জানেন না।

বিমল। তুমি বলছিলে, প্রতিমা কারো কাছে কিছু গোপন করে না।

ইন্দ্রনাথ। আমার কাছে তো করেনি।

বিমল। প্রফেসার মজুমদার আর তপতী দেবীকে এ ভাবে ঠকানো [illegible] এঁরা ভদ্র এবং অতি সরল প্রকৃতির লোক।

ইন্দ্রনাথ। তা সত্যি! অধ্যাপক আপন-ভোলা মানুষ আর তপতী দেবী বিধবা। দু'জনেই গোঁড়া হিন্দু, তবে আচার-ব্যবহারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।

বিমল। আমার তো এঁদের প্রথম দেখাতেই খুব ভাল লেগেছে। মেয়েটির অল্প বয়স—ভেরী স্যাড!

ইন্দ্রনাথ। স্যাড তো বটেই। হিন্দু সমাজের এটা আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ বোঝা শক্ত। তপতী দেবীর স্বামী আই এম এস ছিলেন। বিবাহের বছর দুই পরেই মারা যান। ওঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল, সে-ও কিছু দিন পরে মারা যায়। ওঁর ভাই চিরকুমার। ছোট বোনটিই তাঁর সব। শোক লাঘব করবার জন্ত প্রফেসার ওঁকে এদিকে বেড়াতে নিয়ে আসেন। তার পর রজনী বাবুদের সঙ্গে ওঁদের আলাপ-পরিচয় হয়।

বিমল। এবার রজনীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। তাকদায় ওর ম্যালেরিয়া হয়—

ইন্দ্রনাথ। ওখানকার ডাক্তারের রিপোর্টে তাই পেয়েছি। তবে সেটা এমন কিছু নয়। আসল রোগ হল নিউরেস্থিনিয়া। এখানে এসে যখন আমায় খবর দিলে তখন শরীরে কোন অসুখ নেই বললেও চলে।

বিমল। অত্যন্ত হাই ষ্ট্রাঙ্গ, ইমোশনাল প্রকৃতির লোক। তার যে শরীর সুস্থ সেইটা বিশ্বাস করানই শক্ত।

ইন্দ্রনাথ। ঠিক বলেছ।

বিমল। আমি বহু দিন থেকে ওকে জানি। এখন কি দিচ্ছ?

ইন্দ্রনাথ। কখনও কুইনিন, কখনও অ্যালকালি মিকশ্চার আবার কখনও কোন উইক পারগেটিভ। জাষ্ট টু হিউমার হিম। নিউরোটিক পেশেণ্ট কি না!

বিমল। ঠিকই করেছ। (ঘড়ি দেখে) আমার যে যাবার সময় হয়ে গেল। আজ এখানে আসবার সময় কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জান? স্যর হরপ্রসাদ গুপ্তর সঙ্গে!

ইন্দ্রনাথ। তুমি তো আজ-কাল অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক মহলের ফেভারিট ডাক্তার!

বিমল। না, না, তা নয়। তুমি আমার কথার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারনি। স্যর হরপ্রসাদ সম্পর্কে রজনীর মেসো হ'ন। রজনীর মা'র পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছেন।

ইন্দ্রনাথ। ও! তাহলে তো এদের একটু অসুবিধায় পড়তে হবে দেখছি!

বিমল। অবশ্য দার্জ্জিলিঙে লোকে এমনিও তো বেড়াতে আসে, তবু ব্যাপারটা ঘরোয়া এবং ঘোরালো মনে হচ্ছে—

(প্রতিমার প্রবেশ)

প্রতিমা। আমি ভেবেছিলুম, আপনারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন। (বিমলের প্রতি) কি রকম দেখলেন?

ইন্দ্রনাথ। এক সেকেণ্ড। (বারান্দার দিকে দেখিয়ে চাপা গলায়) তপতী দেবী আছেন।

প্রতিমা। (বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে) তপতী—

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী। প্রতিমা—

প্রতিমা। কখন এলে ভাই?

তপতী। এই একটু আগে। তোমাদের অসুবিধায় ফেললুম—

প্রতিমা। না, না। এ কি কথা! তুমি সোজা আমার ঘরে চলে গেলে না কেন?

তপতী। ভাবলুম তুমি যদি ব্যস্ত থাক। তোমার স্বামীর শরীর খারাপ—

প্রতিমা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) তিনি এখন ভাল আছেন। তুমি আমার ঘরে গিয়ে বস। আমি এখুনি যাচ্ছি।

[তপতীর প্রস্থান।

বিমল। রজনীকে দেখলুম। তার শরীরে কোন গ্লানি নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ।

প্রতিমা। ধন্তবাদ। উনি এ কথা শুনলে খুবই সুখী হবেন।

বিমল। (আড়ষ্ট ভাবে) আই অ্যাম গ্ল্যাড।

প্রতিমা। অসুখের পর থেকেই ওঁর এক ধারণা হয়ে গেছে যে, উনি পূর্ব্বস্বাস্থ্য বুঝি আর ফিরে পাবেন না।

বিমল। শ্রেফ নার্ভাসনেস। দুর্ব্বল-চিত্ত লোকদের এমন হয়। আশা করি, আমি রজনীর সে ধারণা বদলাতে সক্ষম হয়েছি!

(রজনীমোহনের প্রবেশ)

রজনী। (প্রতিমার প্রতি) আমার সম্বন্ধে ওঁর কি মত শুনেছ?

প্রতিমা। (হেসে) হ্যাঁ। সুসংবাদ!

রজনী। আপনাকে আমি আর কি বলে ধন্তবাদ দেব। কোথায় এখানে একটু বেড়াতে এলেন, তা না আমার জন্ত—

বিমল। আমি তোমাদের ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান এবং বোধ হয় ফ্যামিলি-ফ্রেণ্ডও।

রজনী। অফ কোর্স! বটেই তো! ডাক্তার সরকার, আপনি কিছু মনে করেননি তো?

ইন্দ্রনাথ! নট অ্যাট অল। লোকে যত নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, ততই আমাদের পসার বাড়ে। তাছাড়া বিমল আমার সতীর্থ ছিল।

রজনী। আপনারা একটু চা—

বিমল। আমি তো চা একেবারেই খাই না জান।

রজনী। ডাক্তার সরকার?

ইন্দ্রনাথ। নো অবজেকশন—থ্যাঙ্কস্।

রজনী। প্রতিমা—

প্রতিমা। আসুন ডাক্তার সরকার। তপতীকেও ডেকে নিয়ে একসঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

[প্রতিমা ও ইন্দ্রনাথের প্রস্থান।

রজনী। এর মধ্যে আপনি আমাদের বাড়ী গিছলেন কি?

বিমল। হ্যাঁ। এখানে আসবার কয়েক দিন আগেও গিছলুম। তোমার মার পায়ের বাত খুব বেড়েছে। তোমার জেঠতুতো ভাই নিশিকান্তর একটু হাঁপানীর মত হয়েছে—

রজনী। কলকাতায় ফিরে গেলে তারা যদি জানতে পারে যে এখানে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাহ'লে তো আপনাকে অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে হবে।

বিমল। তা হবে। আমার পোজিশন যেমন অকওয়ার্ড তেমনি ডেলিকেট হয়ে পড়বে।

রজনী। আপনি তাদের সোজাসুজি সব বলবেন, তাতে আমার

কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু আপনাকে এই একটি কথাই বলতে চাই যে, ডাকদার আমার যা অবস্থা হয়েছিল তাতে প্রতিমার সেবা-যত্ন না পেলে আমাকে আজ জীবিত দেখতে পেতেন না। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি বলতে পারেন অসুখ সকলেরই হয়, মৃত্যুও সকলেরই হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, আমার অসুখের আসল কারণ আমার দুঃখময়, ব্যর্থতাপূর্ণ বিবাহিত জীবন। ডাক্তার বসু, দিনে দিনে, তিলে তিলে, অশান্তি, মনোমালিন্য, কলহ আমার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করেছে—

(ওষুধের শিশি ও গেলাস নিয়ে প্রতিমার প্রবেশ)

প্রতিমা। আপনার ওষুধ খাবার সময় হ'ল।

রজনী। দাও।

(প্রতিমা ওষুধ গেলাসে ঢেলে রজনীকে দিল। রজনী ওষুধ খেল)

প্রতিমা। আপনার যে দশটার সময় কোথায় যাবার কথা ছিল ?

রজনী। ঠিক। ভুলেই গিছলুম। ক'টা বাজে ?

বিমল। দশটা বাজতে মিনিট কুড়ি আছে। আমাকেও এবার উঠতে হয়। আমার স্ত্রীকে নিয়ে একবার চৌরাস্তায় যেতে হবে। তিনি কি কিনবেন বলছিলেন।

রজনী। প্রতিমা, তোমার ডাক্তার বসু বলতে চাইছিলেন—

বিমল। (আড়ষ্ট ভাবে) চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমরা ওষুধের চেয়ে সেবা-শুশ্রূষার বেশী দাম দিই। সে জন্য আপনি রজনীর ধন্যবাদের পাত্রী।

প্রতিমা। ধন্যবাদ।

(ইন্দ্রনাথের প্রবেশ)

বিমল। নীচে আমার রিক্শা দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর দেরী করতে পারব না। ইন্দ্রনাথ, তুমি এখন যাবে না কি ?

ইন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, চল।

রজনী। নমস্কার ডাক্তার বসু, নমস্কার ডাক্তার সরকার।

বিমল। নমস্কার।

ইন্দ্রনাথ। আমি বিকেলের দিকে আবার আসব।

প্রতিমা। নিশ্চয়ই আসবেন। বিকেলে এখানে চা খাবেন।

[বিমল ও ইন্দ্রনাথের প্রস্থান।

রজনী। আমিও বেরোই।

প্রতিমা। ওভারকোট পরে যান। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

(পাশের ঘর থেকে ওভারকোট এনে দিলেন। একটা ছবি পকেট থেকে মেঝেয় পড়ল। রজনী ঝুঁকে তুলে নিলেন)

প্রতিমা। কি ?

রজনী। একটা ছবি।

প্রতিমা। দেখি। (দেখে) ডাকদার বেটা এঁকেছিলেন।

রজনী। (ওভারকোটের পকেটে রেখে) হ্যাঁ।

প্রতিমা। সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন ?

রজনী। (ওভারকোট পরতে পরতে) পকেটে রেখেছিলুম, যদি দরকার হয় মেসোকে দেখাব।

প্রতিমা। লাভ ?

রজনী। তোমার সম্বন্ধে যদি কোন ভুল ধারণা থাকে তা দূর হয়ে যাবে।

প্রতিমা। এতে নিজেকে অনেকটা নীচু করা হয়।

রজনী। ভুল ধারণা থাকায় ক্ষতি অনেক বেশী।

প্রতিমা। স্যর হরপ্রসাদের আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবার কারণ কি ?

রজনী। তিনি আমার মেসো। দেখা করতে গেলে কারণের প্রয়োজন হয় না।

প্রতিমা। ওরা কেন এমন করে বিরক্ত করে ? মানসিক উত্তেজনা—

রজনী। (হেসে) অসুস্থ শরীরের পক্ষে খারাপ, কিন্তু প্রতিমা, তোমার সেবায় আর তো আমি অসুস্থ নেই। ওরা কোন মতেই আমায় কাবু করতে পারবে না। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরনিন্দার তীব্রতা কমে যায়, রোষের তীক্ষ্ণ-ফলক ভোঁতা হয়ে যায়, সমাজের চীৎকার করে করে স্বরভঙ্গ হয়।

[রজনীর প্রস্থান।

(অন্য দরজার কাছে গিয়ে প্রতিমা তপতীকে ডাকলেন)

প্রতিমা। তপতী, এস ভাই, আমি একলা আছি।

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী। ডাক্তাররা তোমার স্বামীর সম্বন্ধে কি বললেন ?

প্রতিমা। ওঁরা ত বললেন আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই ত মনে হচ্ছে।

তপতী। (চেয়ারে বসে) তোমার সঙ্গে ছুটো পুরো দিন বাদে দেখা হলো। দু'দিন নয় ত দু'যুগ !

প্রতিমা। তোমার জন্য আমারই কি কম মন কেমন করেছে ! রোজই তোমাকে দেখতে যাবার জন্য ছটফট করি কিন্তু—

তপতী। কিন্তু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। সত্যি ভাই, এমন প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রেম কখনও দেখিনি।

প্রতিমা। (আড়ষ্ট ভাবে) তা নয়, অসুখ—

তপতী। থাক ভাই, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না।

প্রতিমা। (কথা ঘোরাবার জন্য) তোমাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রাখলুম, কিছু মনে কোরো না।

তপতী। পাগল আর কি। যদি মনেই করে থাকি—

প্রতিমা। তা'হলে তোমার কাছ থেকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করব।

তপতী। বেশ। শাস্তিস্বরূপ আমাকে একটা গান শোনাও। তোমার গান শোনা আমার যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। দু'দুটো দিন বাদ পড়েছে, বল কি ? তোমার মত মিষ্টি গলা আমি খুবই কম শুনেছি।

প্রতিমা। তুমি আমায় ভালবেসে বাড়িয়ে তুলছ। ভয় হয়, কোন দিন তোমার চোখে আমার পতন না হয়।

তপতী। ও কি কথা। তুমি চিরদিনই আমার কাছে এই রকমই থাকবে। এখন আসামী শাস্তি গ্রহণ করুক।

প্রতিমা। সানন্দে গ্রহণ করছি।

গান

দেখা হল তারি সাথে পথের ধারে।
যেন তারে দেখিয়াছি বারে বারে।
ভোরের আলোর মাঝে,
ঝিল্লী-মুখর সাঁঝে,
স্বপনের কুহকিনী মায়া-নদী ধারে।

মূরতি আঁকা আছে মনের পটে
আমার স্মরণ বাঁধা (তব) দেহ-তটে।
বিধি তার সাথে মোরে,
বাঁধিল যে প্রেম-ডোরে,
আপন করে দিল কোন অজানারে।

তপতী। চমৎকার! দু'দিন পরে শুনলুম বলে যেন আরও মধুর লাগল! স্বর্গীয়!

প্রতিমা। তুমি ভাই ভারী ঠাট্টা কর।

তপতী। কাল এক ভারী মজা হয়েছে, বলি শোন। চৌরাস্তার বেঞ্চে বসিয়ে দাদা ষ্টলে একটা বই কিনতে গিছল। একলা বসে আছি, পাশের বেঞ্চ থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, "ঐ রজনী বাবু না।" চেয়ে দেখি, তোমার স্বামী দূর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তার পর এক জন পুরুষ মানুষ বললে—"না, না, ও রজনী বাবু নয়।" তাতে সে মেয়েটি খুব জোর-গলায় বললে—"নিশ্চয়ই সে। খোঁজ নিতে হবে কোথায় আছেন।" আর একটি মেয়ে বললে—"যদি বুলবুলও এসে থাকে তা'হলে এক দিন যেতে হবে।" পুরুষটি প্রশ্ন করলে—"বুলবুল কে? মিসেস সেন?" দ্বিতীয় মেয়েটি উত্তর দিলে—"হ্যাঁ। আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু।" প্রথম মেয়েটি বললে—"বুলবুলকে চেন না? কলকাতায় ওকে কে না চেনে? মোষ্ট আপ-টু-ডেট সোসাইটি লেডী। সিভিলিয়ান সুনীল সেনগুপ্তের মেয়ে। আমরা এক-সঙ্গে স্কটিশে পড়তুম।" হ্যাঁ ভাই, তোমার নাম যে বুলবুল, তুমি যে সিভিলিয়ান সুনীল সেনগুপ্তের মেয়ে, এ কথা তো কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানাওনি। না, ওরা স্রেফ বাজে কথা কইছিল—

প্রতিমা। (জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে) ওরা ঠিকই বলছিল।

তপতী। তোমাদের চেনে?

প্রতিমা। আমাদের উভয়কে চেনে কি না জানি না।

তপতী। কিন্তু রজনী বাবু তো তোমাকে কখন বুলবুল অথবা বুলি বলে ডাকেন না।

প্রতিমা। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কারণ আমি সে নই।

তপতী। তুমি কি সিভিলিয়ান সুনীল সেনগুপ্তের মেয়ে নও?

প্রতিমা। না।

তপতী। তুমি কি রজনী বাবুর স্ত্রী—

প্রতিমা। (কাতর কণ্ঠে) তপতী—

তপতী। তুমি আমাকে ঠিক বন্ধু ভাবে নিতে পারনি। তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান, একটা প্রাচীর—

প্রতিমা। (এগিয়ে এসে) সে জন্ম আমি দোষী সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ এ প্রাচীর আমি নিজে হাতে ভেঙে দেব। যে মহিলাটির কথা তারা বলাবলি করছিল আমি সে নই। রজনী বাবুর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে আসেননি। তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—

তপতী। তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছেন?

প্রতিমা। কে কাকে ত্যাগ করেছে জানি না, তবে তাঁরা যে এখন পৃথক্ ভাবে থাকেন, কেবল তাই জানি।

তপতী। আর তুমি?

প্রতিমা। আমি বিধবা। সম্পর্কে রজনী বাবুর কেউ নয়।

তপতী। ডাকদায় তোমার সঙ্গে রজনী বাবুর প্রথম আলাপ হয়?

প্রতিমা। না, ক্যালিম্পঙে।

তপতী। (বিস্মিত কণ্ঠে) তুমি বিধবা? রজনী বাবুর কেউ নও? অথচ তাঁর সঙ্গে ক্যালিম্পঙ, ডাকদা, দার্জ্জিলিঙ—

প্রতিমা। আমি কখনও আমার সত্যকারের অবস্থা গোপন করি না। কিন্তু ডাকদায় তোমাকে আমি এত ভালবেসে ফেলি, তোমার প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে—(একটু থেমে) আমার ভুলের জন্ম আমায় ক্ষমা কর। কোন কথা গোপন করার ইচ্ছা আমার ছিল না—

তপতী। রজনী বাবু স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসে তোমাকে নিয়ে এখানে বসবাস করছেন?

(প্রতিমা চুপ করে রইলেন। তপতী উঠে দরজার কাছে গেলেন)

তপতী। এ সব শোনবার পর আমি আর তোমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে পারি না, তা বোধ হয় জানতে?

প্রতিমা। বোধ হয় কেন, নিশ্চিত ভাবেই জানতুম যে, আমাদের মধ্যে আজ হতে সকল বন্ধনই ছিন্ন হবে।

(একটু ইতস্ততঃ করে দরজা থেকে তপতী ফিরে এলেন)

তপতী। আমি যেন সব কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

প্রতিমা। বিশ্বাস নয়, বুঝতে পারছ না বল।

তপতী। বেশ তাই।

প্রতিমা। সবটা শুনলেই বুঝতে পারবে।

তপতী। সবটা বলছ না কেন?

প্রতিমা। চলে গেলে কাকে বলব?

তপতী। (একটা চেয়ারে বসে) বল। সবটা না শুনে আমার চলে যাওয়া উচিত হবে না।

প্রতিমা। আমার বাবার নাম ছিল দীনবন্ধু সেনগুপ্ত, শুনেছ কি না জানি না। তিনি এক জন সামান্য স্কুল-মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু ঘোরতর এবং উগ্রতর স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেমের ভিত্তি অহিংসা ধর্ম্মের ওপর স্থাপিত ছিল না। শক্তিই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর মতে শ্রমিক, চাষা, গরীব মুটে-মজুরই প্রকৃত দেশ। মুষ্টিমেয় ধনী, দেশী অথবা বিদেশী অর্থের সাহায্যে জনগণকে চেপে-পিষে মেরে ফেলবে, অনশনে, রোগে, তারা ভেঙে পড়বে, তাদের দেহকে গুঁড়িয়ে কঙ্কালের ওপর দিয়ে ধনীর বিজয়-রথ রক্ত-নিশান উড়িয়ে চলে যাবে, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তখনকার দিনে তাঁকে সরকার এবং ধনীরা যত রকম হৃদয়হীন এবং কুৎসিত ভাবে মানুষের বর্ণনা করা যায় তাই করেছিল। অনেক অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনা তিনি সহ্য করেছিলেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি দেবতা ছিলেন। গৃহ মধ্যে অমন নিরীহ ভাল মানুষ লোক আমি দেখিনি। অবশ্য ওঁর মতামত এখন আর আগেকার মত ভীষণ, ভয়াবহ অথবা জ্বালাময়ী বলে লোকে মনে করে না।

তপতী। তার পর?

প্রতিমা। বাড়ীর বাহিরে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করতেন বাবা, আর বাড়ীর ভিতর মা। আমার বাবা খুব স্নেহ করতেন বলে আমি মা'র চক্ষুশূল ছিলুম। এক দিন বাবা ধর্ম্মঘট আন্দোলনের প্রসেশন নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় সরকারের আদেশে তাঁকে গ্রেফ্‌তার

করা হয়। জেলেই তিনি মারা যান। আমরা নিঃসহায় নিঃসম্বল হয়ে পড়ি।

তপতী। আহা!

প্রতিমা। বাবা জীবনে কখনও সুখী হননি, বাহিরে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন সরকারের হাতে আর ঘরে মা'র হাতে। সেই জন্যই বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিবাহিত জীবন সুখের না হলে যে কত বড় অভিশাপ—

তপতী। অভিশাপ?

প্রতিমা। হ্যাঁ, তার চেয়ে বড় অভিশাপ আর বুঝি নেই। বিবাহিত জীবন, দাম্পত্য প্রেম, নর-নারীর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। যৌবনের স্বপ্নে গড়া, জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাণের অনুরাগ দিয়ে রাঙানো সেই সৌধ যখন অশান্তির ঝড়ে, ব্যর্থপ্রেমের হুতাশনে ভেঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন জীবনের যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে, তা কেবল শ্রীহীন সৌন্দর্য্যহীন প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। সে জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেকাংশে শ্রেয়ঃ! ঘরে ঘরে নর-নারী বিবাহের এই অভিশাপ বিনাবাক্যে মাথা পেতে নিচ্ছে। মুখ বুঁজে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে, ব্যর্থতার হলাহলে দেহ-মন জ্বলে যাচ্ছে। প্রেমহীন শান্তিহীন বিবাহিত জীবন—যেখানে শুধু দেহ নিয়ে কারবার, মনের কোনও দাম নেই—তা নরকের চেয়েও ভীষণ, পূতিগন্ধময়। হয়ত আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের খাপ খাবে না, কিন্তু আমার মতে প্রাণ যেখানে বন্ধন মেনে নিচ্ছে না, ন্যায়, ধর্ম্ম, সমাজের ভয় দেখিয়ে সেই বন্ধনকে অটুট রাখতে গেলে পুষ্পহার কণ্টকমালা হয়ে উঠে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী থাকে না, গণিকায় পরিণত হয়।

তপতী। তোমার নিজের জীবনী বলতে বলতে—

প্রতিমা। মাপ করো, অনেক অবান্তর কথাই বলে ফেললুম, যা শোনবার তোমার কোনও আগ্রহই ছিল না। আমার নিজের কথাই বলি শোন। বাবা যখন মারা যান তখন আমি কলেজে প'ড়ি। দেশের কাজে, মানে দল বেঁধে প্রসেশন, মীটিং, পিকেটিং ইত্যাদি করতে শুরু করেছি। সেই সময় দেশের এক জন বিখ্যাত নেতা ব্যারিষ্টার মৃত্যুঞ্জয় দাস মহাশয় আমায় খুব খাতির আদর-যত্ন করতে আরম্ভ করেন। ফলে আমাদের বিবাহ হয়।

তপতী। বিবাহ?

প্রতিমা। হ্যাঁ। তখনও এতটা দেখিনি, এতটা শিখিনি। তখন আমার বয়স ছিল আঠারো বছর, দেহ-মনে ছিল যৌবনের নেশা, চোখে ছিল স্বপ্নের মদির আবেশ। প্রেমের আশার নেশায় মন প্রাণ ছিল ভরপুর। আমার চোখে সে ছিল রূপকথার রাজকুমার, ঊষার অরুণ তপন, স্বর্গের অরূপ দেবতা! কিন্তু—

তপতী। তোমাদের বিবাহ বোধ হয় সুখের হয়নি?

প্রতিমা। তিন বছর আমরা একসঙ্গে ছিলুম। বিবাহের পর প্রথম কয় মাস আমাকে অস্বাভাবিক রকম যত্ন করলেন। এক মিনিট কাছ-ছাড়া করতেন না। কিন্তু সেই কয় মাসের মধ্যেই আমায় সম্পূর্ণ ভোগ করে যখন দেহের নতুন কোন রহস্য—নতুন কোন উন্মাদনা—নতুন কোন কামলিপ্সা চরিতার্থের উপাদান উদ্ঘাটন করতে পারলেন না, তখন আমাকে পায়ের ছেঁড়া জুতোর মত পদাঘাত করে ঘরের কোণে আবর্জ্জনের স্তূপে ফেলে দিলেন। তাঁর আসল পরিচয় যখন পেলুম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

তপতী। তুমি বদলে গেলে?

প্রতিমা। হ্যাঁ, একেবারে বদলে গেলুম। আমার নারীত্ব পুরুষের অবজ্ঞায় অশ্রদ্ধায়, অপমানে মরে গেল।

তপতী। তুমি যে বলছিলে তুমি বিধবা। তোমার স্বামী কি মারা গেছেন?

প্রতিমা। হ্যাঁ। বিবাহের তিন বৎসর পর তিনি মারা গেলেন—মাতাল অবস্থায় বেশ্যালয়ে।

তপতী। তুমি আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পার।

প্রতীমা। জীবন থাকলে তো পারব! আবার বিবাহ, আবার স্বামী—তপতী, আর কি সে বিশ্বাস, সে নির্ভরতা ফিরে আসে?

তপতী। কিন্তু তুমি আর রজনী বাবু—

প্রতিমা। আমাদের মাস তিনেকের পরিচয়। আমার বয়স এখন পঁচিশ বছর। বিধবা হয়েছি, একুশ বছর বয়সে। এ চার বছর কি করেছি জান? বছর খানেক বক্তৃতা দিয়েছি, তার পর হাসপাতালে গিয়েছি, সেখানে কিছু দিন রুগী হয়ে সেবা নিয়েছি, পরে নার্স হয়ে রুগীদের সেবা দিয়েছি—

তপতী। কি সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে?

প্রতিমা। বাবা যে সম্বন্ধে করতেন। তা ছাড়া আরও একটা বিষয়ে ছিল—নারী জাতিকে সাবধান করা।

তপতী। সাবধান করা! কেন?

প্রতিমা। যাতে তারা আমার মত ভুল না করে বসে, গর্ত্তে না পড়ে।

তপতী। বিবাহ?

প্রতিমা। হিন্দু নারীর চরম দুর্গতি বিবাহ—যে গর্ত্তে পড়লে আর বার হবার উপায় নেই। দুর্গন্ধে, বিষাক্ত বাষ্পে তিল তিল করে জীবনকে ক্ষয় করে। শেষে এক দিন দেখলুম আর কথা কইবার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই।

তপতী। কেন?

প্রতিমা। অনশনে, অনিদ্রায়। স্বামীর গৃহ অথবা অর্থ নেবার মত নীচতা আমার ছিল না, কারণ আমার স্বামী আমাকে তাঁর সহধর্ম্মিণীর আসন দেননি, বিবাহ করেছিলেন কেবল দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য। আমি তাই নিজেকে স্বামীর বিরহে এবং স্মৃতিপূজার জন্য বিধবার বেশে সজ্জিত করতে পারিনি। বাবার দেওয়া আমার যা-কিছু ছিল বিক্রী করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছি। যখন তার কিছু রইল না তখন একটি স্কুলে মাষ্টারী যোগাড় করলুম। সেখানকার প্রেসিডেন্ট এক জন দেশের নাম-করা নেতা। চাকরী পেতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, কিন্তু সে চাকরীও বেশী দিন রইল না।

তপতী। কেন?

প্রতিমা। আমার প্রতি তাঁর যত্নের পরিমাণ দিন দিন বড়ই বেড়ে যেতে লাগল, শেষে এক দিন তিনি যা বললেন তাতে চাকরী ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না। মান বাঁচালুম বটে, কিন্তু দুর্নাম কিনতে হল। যে ঘর ভাড়া করে ছিলুম

সেখানেও এক দিন তিনি শুভাগমন করলেন। সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিনা দোষে আমি পতিতা উপাধির দ্বারা ভূষিত হলুম। বাড়ীর মালিক সেই মুহূর্ত্তে আমাকে চলে যেতে বললেন। পথে এসে উত্তেজনায় অনাহারে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কয়েক জন রাস্তার পথিক দয়া করে আমাকে পুলিশের সাহায্যে হাসপাতালে দিলে এল।

তপতী। কি ভয়ানক!

প্রতিমা। সেখানে একটু সুস্থ হতেই দেখি, ডাক্তাররা এবং ডাক্তারী শিখতে আসা ছাত্রেরা কি হীন ঠাট্টা-ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করল। আমার অভিভাবক নেই, পুলিশে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেছে, অতএব—তাদেরই বা দোষ কি! পুরুষের কাছে নারীর মূল্য তো এর বেশী নয়। এক জন বৃদ্ধ ডাক্তার, হাসপাতালে ভিজিটিং ফিজিশিয়ানকে এই সব কথা বলতে তিনি উত্তর দিলেন—"কি করবে মা? সব জায়গায় এই অবস্থা।" ভাল হয়ে যাবার পর তাঁর পরামর্শ মত নার্সিং শিখতে লাগলুম। হাসপাতালে কাজ শিখতে গিয়ে অনেক দুর্গতি-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত। নার্সদের কোয়ার্টারে থাকতুম। সেখানে প্রায় প্রত্যেক নার্সেরই দু'-একটি করে ডাক্তার প্রেমিক থাকত, যাদের সাহায্যে তারা হাসপাতাল ছাড়া বাহিরেও ভাল ভাল কাজ পেত। আমার নিজেকে পুরুষের কামবহ্নি থেকে বাঁচাবার চেষ্টাকে প্রথমে তারা হেসে উড়িয়ে দিত, পরে ঠাট্টা করত,' শেষে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। দল বেঁধে আমার বিরুদ্ধে তারা হাসপাতালে রিপোর্ট করল যে আমি অত্যন্ত অসৎ জীবন যাপন করছি। যে ডাক্তাররা আমাকে প্রেম-নিবেদন করে করে হতাশ হয়ে পড়েছিল তারাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সাত দিনের মধ্যে কোয়ার্টার খালি ক'রে দিতে বললেন। সেই সময়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখি যে, ক্যালিম্পঙে এক জন নার্স দরকার। আমি তখনি আরজি পাঠাই ও মনোনীতা হয়ে ক্যালিম্পঙে চলে যাই। সেখানে যাকে নার্স করবার জন্ম আমাকে আনা হয়েছিল সেই রোগীই রজনী বাবু।

তপতী। চৌরাস্তায় কাল মেয়েটি যা বলেছিল, তাতে মনে হয়, রজনী বাবুর বিবাহ খুব বেশী দিন হয়নি।

প্রতিমা। দু'বছরেরও কম। নারীর মত পুরুষেরা বেশী দিন কোন কষ্ট-অশান্তি সহ্য করতে পারে না। ওঁর বিবাহিত জীবনও আমারই মত নিরাশার বিষে দগ্ধ—তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষ সহ্য করেছে নারীর নির্য্যাতন, অবহেলা। প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে পুরুষ গেছে, নারী নির্ম্মম পদাঘাতে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আমি নারী, তাই যত দিন স্বামী বেঁচে ছিলেন, নীরবে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করেছি। রজনী বাবু পুরুষ, নরকের দরজা ভেঙ্গে মুক্তি অর্জ্জন করেছেন।

তপতী। রজনী বাবুর নাম আমি বহু বার শুনেছি। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য, দু'-একটা ব্যাঙ্কের এবং কটন মিলের ডিরেক্টর—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—

প্রতিমা। উজ্জ্বলই থাকবে। উজ্জ্বলতরও হতে পারে।

তপতী। পলিটিক্যাল ব্যাপারে—

প্রতিমা। তিনি আগেকার জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন। আমাদের দেশের সমাজের, ধর্ম্মের, নারী-পুরুষের বন্ধনের মধ্যে যে বিরাট ফাঁকি রয়ে গেছে তার সংস্কার দরকার। আমরা সেই সম্বন্ধে লিখব।

তপতী। বাঙ্গলা দেশে লেখকরা খেতে পায় না, জান বোধ হয়?

প্রতিমা। জানি। আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, নরনারীর বৈধ মিলনস্বরূপ বিবাহের মধ্যে যে অবৈধতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সে সাহস, সে শক্তি আমাদের আছে। তোমার কাছে আমাদের এই ব্যাপারটা গোপন রাখায় যে সাহসের অভাব সূচিত হয়েছে, তার পিছনে ছিল তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ, ভালবাসা, পাছে তোমারও তোমার বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধাকে হারাতে হয় এই ভয়ে বলি-বলি করেও সব কথা তোমাকে বলে উঠতে পারিনি। কিন্তু কেবল এই একটি ঘটনা দিয়ে আমাদের বিচার কোরো না। আমরা কাউকে ঠকাতে চাই না, নিজেদের কোন ব্যাপার গোপনও রাখতে চাই না। আমাদের জীবন হবে সহজ, সরস এবং সরল—তার মধ্যে ফাঁকী, গোপনীয় অথবা কুৎসিত কিছু থাকবে না, এই আমাদের অভিলাষ।

তপতী। তুমি কি রজনী বাবুকে বিবাহ করে উভয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে চাও?

প্রতিমা। না।

তপতী। না?

প্রতিমা। না। তোমরা বিবাহ বলতে যা বোঝ, সে বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হতে চাই না। তাহলেই ফাঁকী, বিশ্বলতা, ঢাকাঢাকি এসে সব পণ্ড করে দেবে।

তপতী। অথচ তোমরা উভয় উভয়কে ভালবাস?

প্রতিমা। বাসি, কিন্তু তুমি যা মনে করছ এবং ভেবে ভয় পাচ্ছ, তা নয়। দেহের মিলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেন আমরা মনে করি যে, নারী-পুরুষ একত্র থাকলে তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ ছাড়া আর কোন বন্ধন থাকতে পারে না? আমরা দু'জনের ব্যথায় ব্যথী হয়ে থাকব, সাহায্য করব, সান্ত্বনা দেব। বিবাহ মানেই এক জনের উপর আর এক জনের অধিকার, আধিপত্য। জীবনকে নষ্ট করবার, ধ্বংস করবার সুযোগ দেওয়া। আমরা দু'জনেই এই অভিশাপে দগ্ধ হয়েছি, দু'জনেই ভুক্তভোগী। আমাদের জীবনের অমূল্য সময় সমাজের বন্ধনে দম আটকে মরেছে। ঘাত-প্রতিঘাতে, লাঞ্ছনা-অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েছে—জীবনী-শক্তি প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ ধ্বংসাবশিষ্ট নিয়ে আর টানাটানি কেন?

তপতী। ধর্ম্মতঃ বিবাহিত হলে ভবিষ্যতে অনেক লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

প্রতিমা। লোক ও সমাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে অহরহ নিজের আত্মার কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। যা বিশ্বাস করি না, সমাজের ভয়ে তা মানব কেন? এই কাপুরুষতার জন্যই আমাদের সমাজ এত পেছিয়ে।

তপতী। কিন্তু পুরুষ ও নারী একত্র থাকবে

প্রতিমা। অথচ যৌবন আকর্ষণ তাদের আদর্শচ্যুত করবে না, এই আমাদের জীবনের ব্রত।

তপতী। তা অসম্ভব!

প্রতিমা। সম্ভব যে নয় তার প্রমাণও নেই, কারণ কেউ কখনও সাহস করে সমাজের বিরুদ্ধে, লোক-লাজ, মান-অপমান অবহেলা করে এ চেষ্টা করেনি।

তপতী। এ যুদ্ধ কেবল সমাজের বিরুদ্ধে নয়, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধেও।

প্রতিমা। একটা বারো বছরের বিন্দু বিধবা বালিকাকে সমাজের শাসনে তাড়নে যে জীবন যাপন করতে হয় তাও প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। তবু তাও তো সম্ভব হয়। তবে এটাই বা হবে না কেন?

তপতী। প্রার্থনা করি, যেন তাই সম্ভব হয়। আমি এখন চলি।

প্রতীমা। হয়ত আমাদের এই শেষ সাক্ষাৎ।

তপতী। দাদাকে জিজ্ঞেস্ না ক'রে ভবিষ্যতে আমার আসা আর সম্ভবপর হবে না।

প্রতিমা। তা' আমি জানি।

তপতী। অবশ্য যদি দাদা আপত্তি না করেন—

প্রতিমা। তিনি ক'রবেনই।

তপতী। সে ক্ষেত্রে এই আমাদের চির-বিদায়। সমাজের নীতি, শৃঙ্খলা সব তুমি চূর্ণ করে দিয়েছ, কিন্তু তবু আমি তোমায় ভালবাসি; চিরকালেই ভালবাসব, বন্ধু বলে মনে ক'রবো।

[তপতীর প্রস্থান।

(প্রতিমা আড়ষ্ট হয়ে সোফায় বসে রইলেন। একটু পরে রজনীমোহনের প্রবেশ)

রজনী। কি হ'ল প্রতিমা, এমন ভাবে বসে আছ কেন?

প্রতিমা। তপতীকে আমি আজ সব কথা বলেছি।

রজনী। বলেছ?

প্রতিমা। হ্যাঁ। কাল চৌরাস্তায় কাণাঘুষো কিছু শুনেছিল, আমাকে প্রশ্ন করতে আমি পরিষ্কার ভাবে সমস্ত কথা খুলে বললুম।

রজনী। (ওভারকোট খুলতে খুলতে) তবে এদের সঙ্গেও ভবিষ্যতের জন্তে আমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হ'ল।

প্রতিমা। (কাষ্ঠহাসি হেসে) ভালই হ'ল।

রজনী। অবশ্য আমি ওদের সব কথাই খুলে ব'লতুম—

প্রতিমা। তাড়াতায় আমাকে মিসেস্ সেন বলে পরিচয় ক'রে দিতে—

রজনী। ঠিক আমি তোমার এই পরিচয় দিইনি, প্রফেসর মজুমদার তোমাকে মিসেস সেন ব'লে অভিহিত করাতে আমি আপত্তি করিনি।

প্রতিমা। করা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে এ রকম লুকোচুরি উচিত হবে না। আমি মিসেস্ দাস ব'লেই পরিচিতা হ'তে চাই।

রজনী। তাই হবে। ওরা অতিশয় নিরীহ ভদ্র, তাই আমার কেমন সাহস হ'ল না। তপতী দেবীর সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব হ'য়েছিল, না?

প্রতিমা। হয়েছিল, কিন্তু একটি কথায় ছিঁড়ে গেল, কারণ, সে বন্ধুত্বের ভিত্তি ফাঁকিতে ভরা ছিল।

রজনী। প্রতিমা, তোমার সাহস, শক্তি পুরুষকেও হার মানিয়ে দেয়।

প্রতিমা। পুরুষ নারীকে অবলা মনে ক'রে একটা গর্বে আত্মপ্রসাদ লাভ করে; নারী তাদের সে ভুল, সে ভ্রান্তি ভেঙে দিতে চায় না।

রজনী। সমাজের যে অত্যাচার নির্য্যাতন মুখ বুজে তুমি সহ্য ক'রছ, কোন পুরুষ তা' পারতো না।

প্রতিমা। নারীর ধৈর্য্য-শক্তি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী।

রজনী। এঁরা—বিশেষ করে মহিলাটি কে তুমি ভালবাসতে। অথচ এক-কথায় চলে গেল।

প্রতিমা। (একটা সেলাই হাতে নিয়ে) এ রকম আঘাত যে আমাদের সহ্য করতে হবে তা আমরা জানি, এবং সে জন্ত প্রস্তুতও আছি।

রজনী। তবু, দুঃখ তো হয়—

প্রতিমা। দুঃখকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলতে পারাই তাকে জয় করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। আপনার মেসোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

রজনী। হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্ত।

প্রতিমা। কোন গণ্ডগোল—

রজনী। না। খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। বললেন—"শরীর চমৎকার সেরেছে। যে সেবা-শুশ্রূষা করেছে তার প্রশংসা করতে হয়।"

প্রতিমা। এ রকম কথা তাঁর মুখ থেকে শুনব আশা করিনি। তবে আপনার কাছে শুনেছি, তিনি খুব খামখেয়ালী লোক।

রজনী। হ্যাঁ। তবে ওঁর সেই খামখেয়ালী ভাবের মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা লোক-দেখান, বলা শক্ত।

প্রতিমা। এটা বড়লোকদের স্বভাব। তার পর—

রজনী। তার পর তিনি আমাকে এই একগাদা চিঠি-পত্তর দিলেন— (পকেট থেকে বার করলেন) এইগুলি না কি আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেরা আমার কলকাতার ঠিকানায় দিয়েছেন। বললেন—"আবার দেখা হবে।" তার পর আমি চলে এলুম।

প্রতিমা। (বিস্মিত ভাবে) তা'হলে তিনি আরও কিছু দিন এখানে থাকবেন?

রজনী। কথার ভাবে তাই তো মনে হ'ল।

(টেবিলের ওপর চিঠিগুলো রেখে চেয়ার টেনে বসলেন। একটা একটা করে পড়তে আর ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। পরে উঠে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন)

রজনী। সব সেই একই কথা। "তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার কেরিয়ার।" চুলোয় যাক্।

(টেবিলের কাছে এসে সমস্ত চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন)

প্রতিমা। আপনার ভবিষ্যৎ। (ছেঁড়া চিঠিগুলো দেখিয়ে) ও জীবনটা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন আর একটা জীবনের, আর একটা ভবিষ্যতের সূচনা হচ্ছে।

রজনী। তা হচ্ছে। তবুও পুরাতনকে বিদায় দেবার সময় মনটায় একটু কষ্ট হয়।

প্রতিমা। কষ্ট হয়? কেন? পলিটিক্যাল কেরিয়ারই কি মানুষের একমাত্র ভবিষ্যৎ?

রজনী। আমি বেশ নামও করেছিলুম।

প্রতিমা। নামই কি সব?

রজনী। যতখানি এগিয়েছিলুম সবটা পিছিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। এই জীবনের প্রারম্ভে, বছর দু'য়েক আগে যদি তোমার সাক্ষাৎ পেতুম, তোমার মত এমন সেবা-পরায়ণা, নির্ভরযোগ্যা, সহানুভূতিপূর্ণা নারীকে যদি আমি জীবনসঙ্গিনীরূপে পেতুম—

প্রতিমা। সে কথা এখন ভেবে তো কোন লাভ নেই।

রজনী। নেই তা জানি। আমার নতুন জীবনে তোমায় সহায়-রূপে পাব, এই ভরসাতেই সাহস করে পা বাড়াচ্ছি।

প্রতিমা। আমি নিজেকে আপনার নির্ভরযোগ্যা পাত্রী প্রমাণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

রজনী। তা আমি জানি। প্রতিমার কাছে বসে হাত ধরে) আমি যখন পুরাতনকে ভেবে মন খারাপ করব, তখন তোমার প্রেম আমায় সে দুঃখ ভুলিয়ে দেবে, তোমার প্রেম আমার নব যাত্রা-পথে আলোকের সন্ধান দেবে।

(প্রতিমা কিছুক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে চুপ করে বসে থেকে ধীরে ধীরে নিজের হাত মুক্ত করে নিলেন, উঠে গিয়ে টিপয়-স্থিত ফুলদানির ফুলগুলি সাজাতে লাগলেন। রজনী তার দিকে এগিয়ে গেলেন)

রজনী। প্রতিমা!

প্রতিমা। কি?

রজনী। আমার প্রতি তোমার এরূপ ভাব কেন?

প্রতিমা। কিরূপ?

রজনী। আমাকে তুমি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো।

প্রতিমা। কই, না ত?

রজনী। এক এক সময় তুমি ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাও। যেন সচকিত। বনহরিণী, কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় শিউরে উঠছে।

প্রতিমা। (এক পা পেছিয়ে) কয়েক দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি।

রজনী। কি কথা?

প্রতিমা। আপনি কি মনে করেন না, আমাদের এই বন্ধুত্ব কত পবিত্র ও কত মহান্ হতে পারে, যদি—(থামলেন)

রজনী। যদি কি—প্রতিমা? থেমো না বলো।

প্রতিমা। যদি তার মধ্যে দেহের আকর্ষণ, প্যাশন না থাকে।

রজনী। তা যে হয় না প্রতিমা, আমি তোমায় ভালবাসি।

প্রতিমা। ভালবাসেন কাকে? আমাকে না আমার দেহকে?

রজনী। উভয়কেই। আমার চোখে দুই অভিন্ন।

প্রতিমা। দেহ উপলক্ষ করে যে ভালবাসা তাকে কাম বলে। দেহহীন ভালবাসা যার কারবার অন্তরকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে, তাকেই কেবল প্রেম বলা যায়। আমি চাই আমাদের মধ্যে এই ধরণের প্রেম, ভালবাসা। জগতের সামনে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চাই। উচ্চ কণ্ঠে বলতে চাই যে, মানুষ যদি নর-নারীর সম্বন্ধ শুধু দেহজ মনে করে তবে পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? এই দেখ, আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাসি কিন্তু আমাদের বন্ধনের মধ্যে যৌনগন্ধ নেই, আছে সাহচর্য্য, সহানুভূতি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান।

রজনী। কিন্তু তা কি সম্ভব?

প্রতিমা। কেন নয়।

রজনী। নর ও নারী যাদের দেহে আছে যৌবন, মনে আছে প্রেম—না, না, প্রতিমা, তুমি যে জীবনের কথা ভাবছ তা এ জগতে সম্ভবপর নয়। কেউ কোন দিন ভাবেনি, ভাববে না এবং আমরা যদি সম্ভবপর করে তুলিও, তবুও কেউ বিশ্বাস করবে না।

প্রতিমা। লোকের বিশ্বাসের জন্য আমি চিন্তিত নই, আমি ভাবছি, আমরা নিজেদের বিশ্বাস করতে পারব কি না?

রজনী। (অস্থির ভাবে) প্রতিমা, হয় তোমার শরীর খারাপ, না হয় তোমার মাথা খারাপ। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টায় বৃথা শক্তিক্ষয়ের আমি কোন সার্থকতা দেখি না।

(রজনীর বিরক্ত ভাবে প্রস্থান। প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ দুই হাতে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।)

আমাদের
আলোকচিত্র
সম্বন্ধে

আমরা [illegible] জানাতে বাধ্য হচ্ছি আর যেন ছবি পাঠাবেন না এখন। অন্ততঃ তিন-চার মাসের মত নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনারা, ছবি তোলার যন্ত্রপাতি নিয়ে আর এখন বেরুতে হবে না কোন বয়য়ের সন্ধানে—যেতে হবে না নদীর কিনারায়, পাহাড়ে-পর্ব্বতে পশু-পক্ষীর পিছু পিছু কিংবা ছুটতে হবে না কোন চঞ্চল হরিণীর অঞ্চল ইশারায়। আপনারা যদি কোন দিন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে এসে দেখতে চান, দেখবেন আলোকচিত্রের স্তূপ—দেখে সত্যিই মমতা হবে আপনাদের। আর আপনি যদি নিঃস্বার্থ সৌখীন আলোকচিত্র-শিল্পী হন তা হলে সহানুভূতিতে মন আপনার ভেঙ্গে পড়বে তাঁদের জন্য যাঁদের ছবি মনোনীত হয়েও প্রকাশ হতে পাচ্ছে না। কয়েক জন ইতিমধ্যেই ছবি ফেরৎ চেয়েছেন। আর তথাপি আমাদের অবস্থা এবং উক্ত বিরক্ত মনের অবস্থা বিবেচনা না ক'রেই ঘন ঘন ছবি পাঠাচ্ছেন আপনারা।

আপনাদের অর্থাৎ মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্র বিভাগের যাঁরা প্রাণ দান করেছেন—করছেন সেই সব উৎসাহিবৃন্দের [illegible] যেন আগামী ১লা আষাঢ় থেকে পুনরায় আমাদের স্মরণ করেন। এই সময়ের মধ্যে উক্ত বিরক্ত সম্প্রদায়কে মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন।

এখানে আবার আমরা স্মরণ করিয়ে দিই আমরা কি ধরণের ছবি চাই। কয়েক জন ক্রমাগত পত্র দিয়ে প্রশ্ন করছেন,—কি কি বিষয়ের ছবি আমরা পছন্দ করি? তাঁদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, আমরা ভাল বিষয় পেলেই গ্রহণ করি। ধরুন এই পাতার (পৃষ্ঠা) ছবিটি, এতে কি দেখছেন?

ভাঙ্গা-গড়ার খেলা দেখছেন না কি? ভঙ্গুর পদার্থের একটি পাত্রকে শেষে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে পাশাপাশি কেমন দেখানো হয়েছে! কিন্তু ছবিটির বিষয় লক্ষ্য ক'রে দেখুন ভাঙ্গা এবং গড়ার সমন্বয়ে অদ্ভুত। আমরা ছবি চাই বিষয়-সম্পত্তি সাধারণের। সুতরাং সাধারণ যা চায় তাই আমরা চাই। আমরা এমন অসাধারণ কিছু চাই না। সাধারণের দৃষ্টিতে আমাদের চাইতে হয়
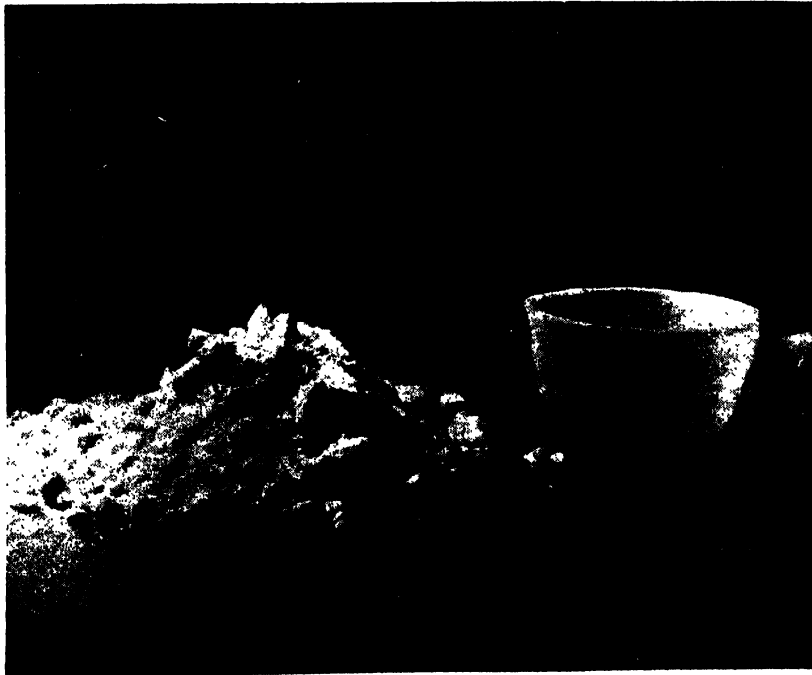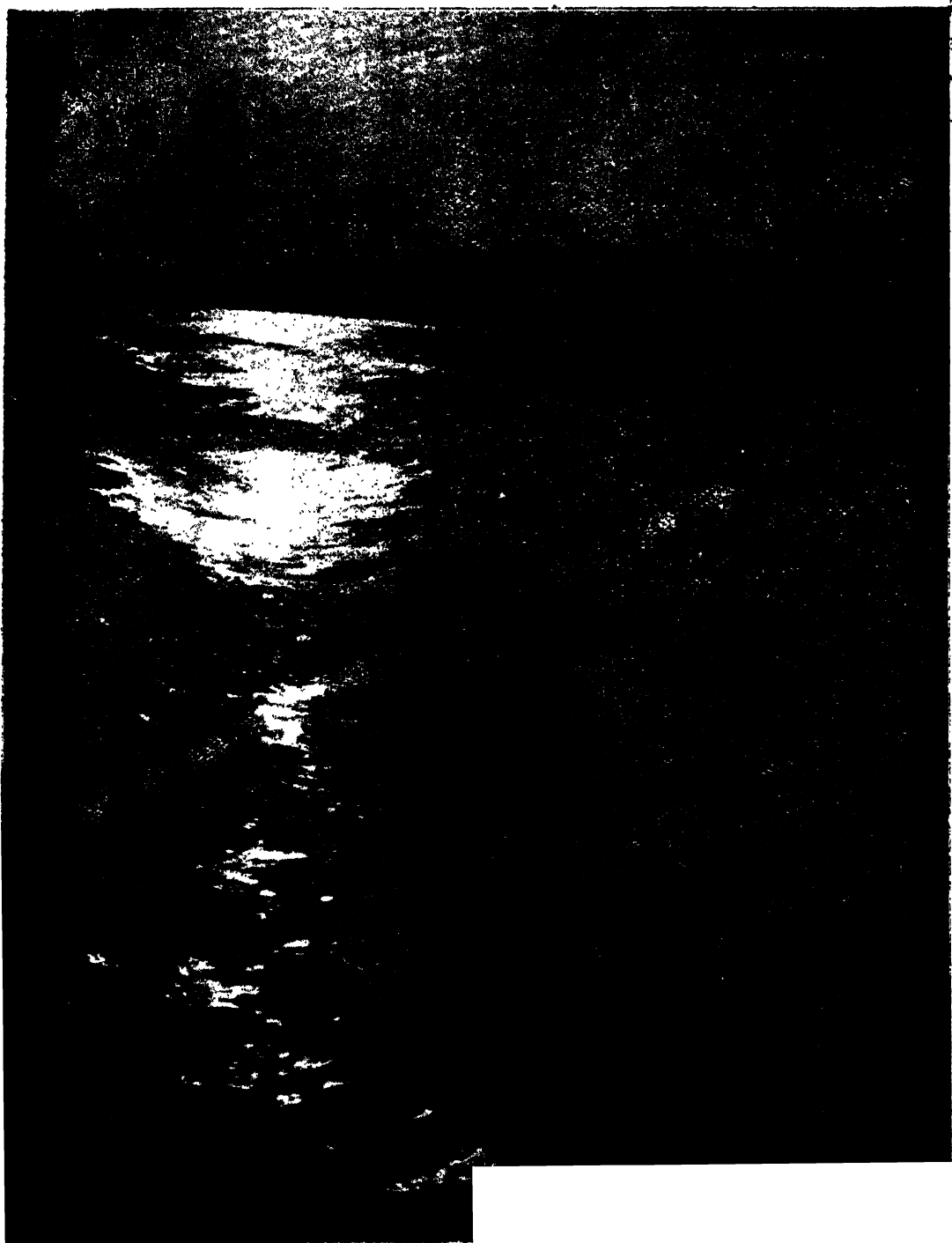
জল শুধু জল··· (প্রথম পৃ

টোপ গিলেছে

—অজ্ঞাতনামা

— অজ্ঞাতনামা

—খোকা চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পট
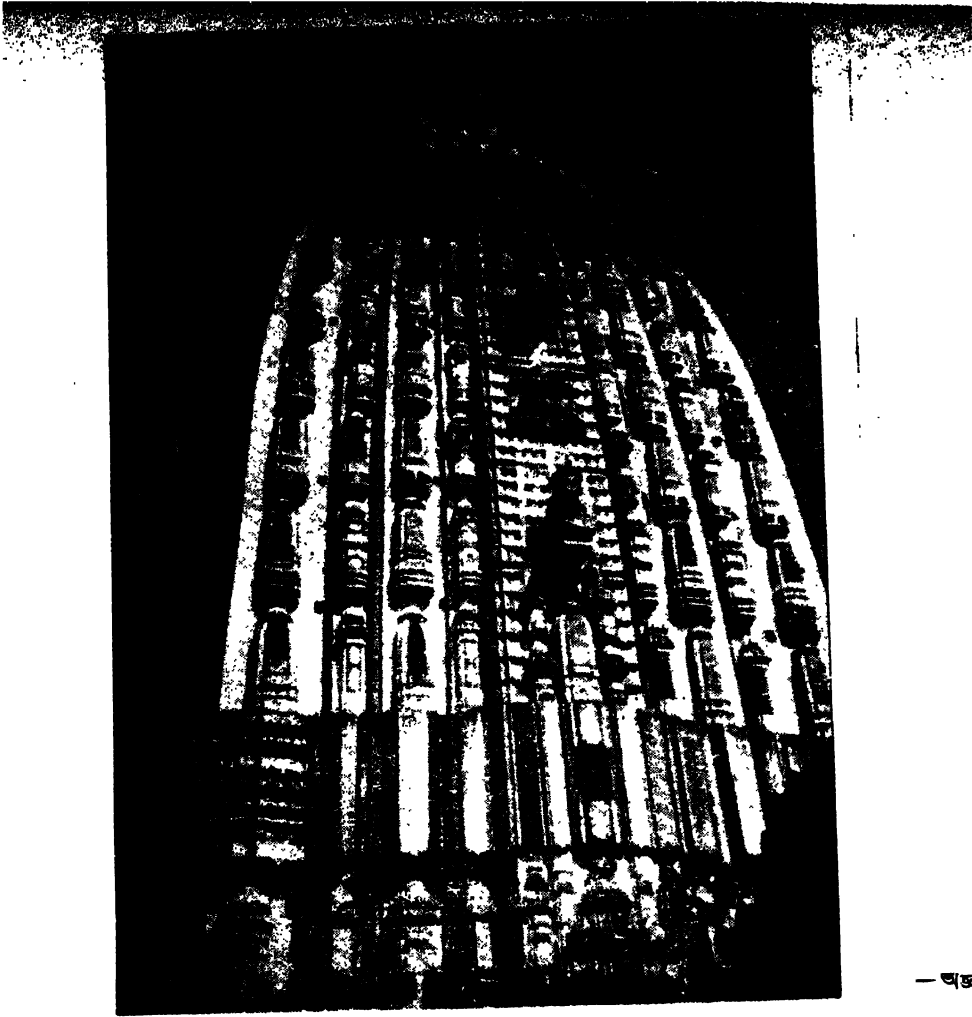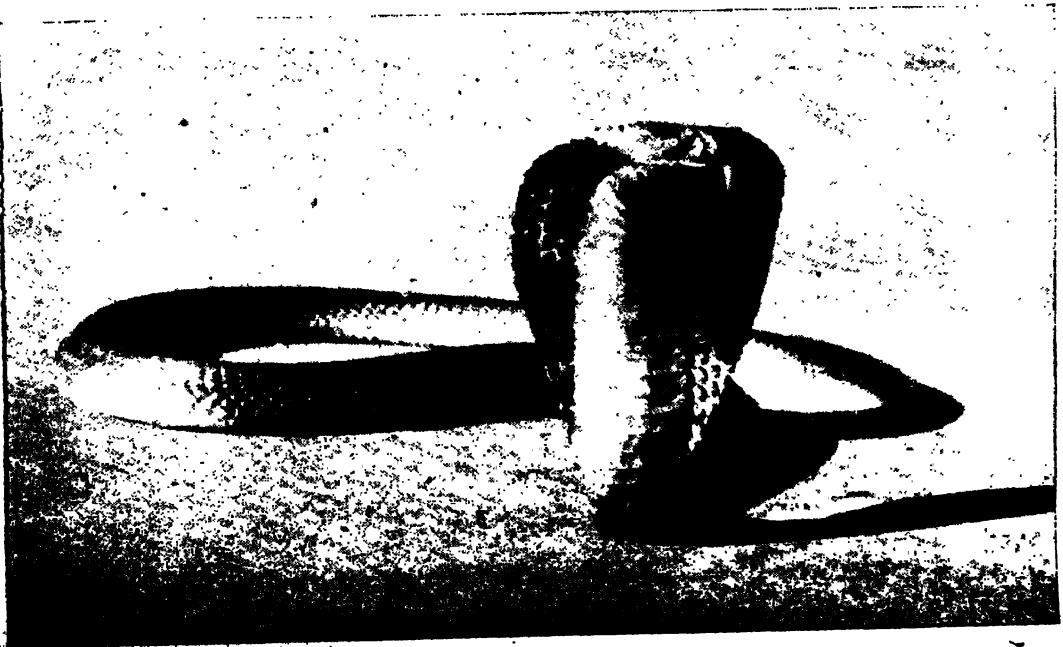
প্রচ্ছদ পটে যে ছবিটি মুদ্রিত হইল—তাহার নাম শিখারাণী—বয়স ৪ বৎসর। গত ২২শে মার্চ্চ ১৯৪৮ তারিখে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে সমবেত দর্শকগণকে শিখারাণী তাহার অপূর্ব্ব নৃত্য দেখাইয়া ৩ খানি রৌপ্য পদক লাভ করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, ৪ বৎসরের মেয়ের তাল, লয়, ছন্দ-সমন্বিত এইরূপ নৃত্য প্রকৃতই বিস্ময়জনক। শিখারাণী ১৭/১এ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বাগের কন্যা ও প্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ্ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছাত্রী।

প্রগতি (!) —[illegible] ঘোষ

সীমান্তে

দেবব্রত গুহ-ঠাকুরতা
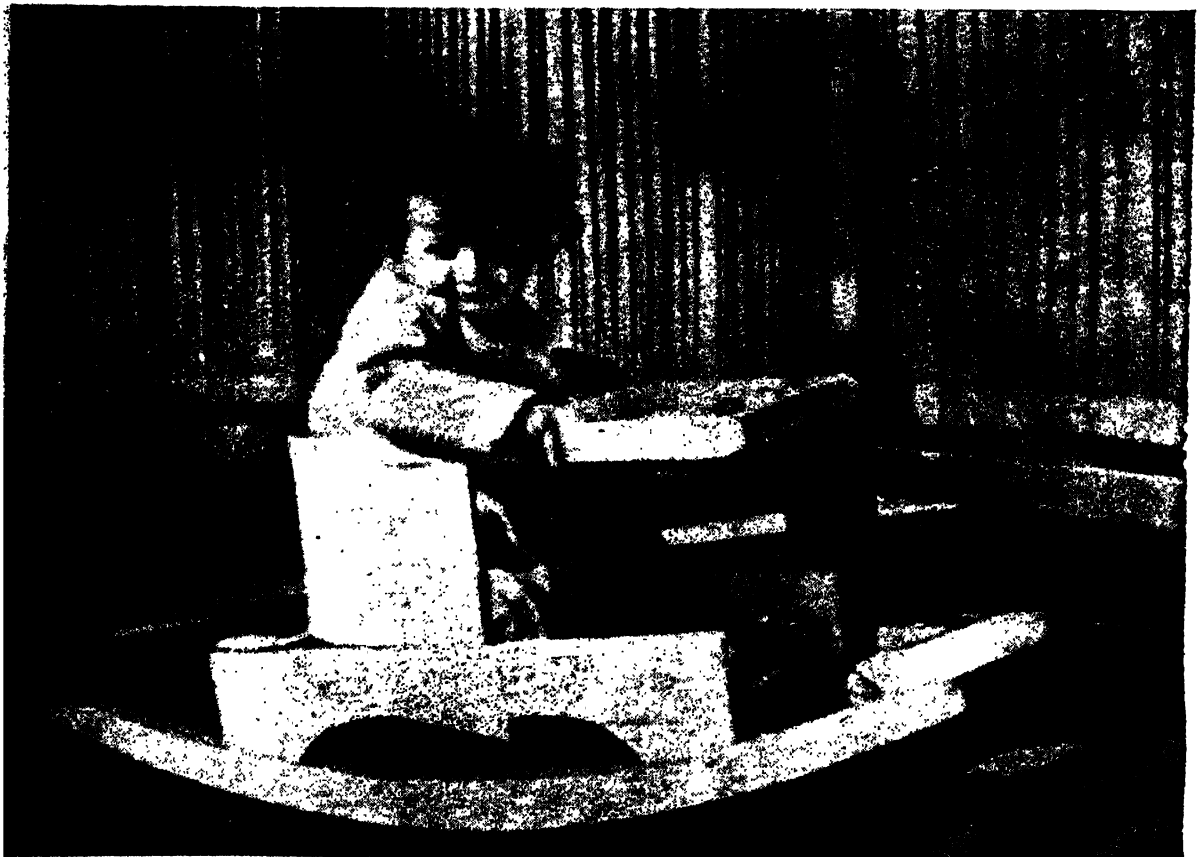
ঝাঁপ দেবার আগে শিকারী বেড়াল যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ইঁদুরের দিকে, প্রশান্তর চোখে সেই দৃষ্টি দেখতে পেলো নীলাম্বর এই মুহূর্ত্তে। উজ্জ্বল, উগ্র, স্থির, উন্নত।

আর মৃত্যুমুখ ভীত ইঁদুরের মতই কুঁকড়ে গেলো নীলাম্বর। ও জানতো, প্রশান্ত না হোক, ওর দাদা অথবা বাবা অথবা ওর কাকার সামনে এই ঘটনাটা এক দিন ঘটতোই। কত বার তার জন্ত ও নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছে; কোন্ কথার পর কি কথা বলবে, কেমন ভাবে বলবে, সে সব বিস্তৃত ভাবে ও ভেবেছে কত বার। কিন্তু, তখন শিকারী বেড়ালের এই দৃষ্টি ও কল্পনা করেনি, করা হয়ত' সম্ভবও ছিলো না, আর তাই পর্য্যাপ্ত মানসিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও ইঁদুরটার মতই কুঁকড়ে গেলো নীলাম্বর।

খুব মৃদু স্বরে আল্‌তো অস্পষ্ট হাসি মুখে মেখে এতক্ষণে কথা বললো প্রশান্ত, "এ ব্যাপারে আমার হয়ত' কিছু বলা বা কিছু করা ঠিক নয়, আর আমার করবারও খুব যে একটা বাসনা ছিলো, তা' নয়। তবু, আমি যে এই অনধিকার হস্তক্ষেপটুকু করছি, তার জন্য……"

ঘামে ভিজে গেছে নীলাম্বরের জামাটা। কানের পাশ দিয়ে যে গরম রক্তের স্রোত বইছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে নীলাম্বর। বাধা দিয়ে আমতা আমতা করে' বলে' উঠল, "না, না, কি যে বলো তুমি। তুমি কিছু অন্যায় করছো না। ঠিকই করছো তুমি, ঠিকই করছো…"

প্রশান্তর মুখে স্পষ্ট-হয়ে-ওঠা হাসির রেশ চোখে পড়া মাত্র কথার খেই হারিয়ে গেলো নীলাম্বরের। প্রশান্তর চোখ দু'টো আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মনে হ'লো।

আবার সুরু করলো প্রশান্ত সস্মিত মুখে, "ধন্যবাদ। আপনার আশ্বাসে বলাটা আমার পক্ষে সোজা হবে। ব্যাপারটা এত সূক্ষ্ম যে বলতে আমার একটু সঙ্কোচই ছিলো…"

ছোকরার এই হাড়-পোড়ান ভূমিকা আর কতক্ষণ চলবে—থাবার শরীর-স্পর্শ-লাগা ইঁদুরের মতোই ভাবলো নীলাম্বর।

ভীতির গহ্বর থেকে নিজেকে জোর করে টেনে তুলে বললো ও, "বল না? লজ্জা কি? বলেই ফেলো। কথাটা খোলাখুলিই আলোচনা…"

সব ভূমিকা শেষ করে দিয়ে হঠাৎ ঝাপটা মেরে প্রশ্নটা ছুঁড়েই দিলো প্রশান্ত, "দিদিকে কেন আপনি বিয়ে করছেন না?"

থাবাটা লেগেছে এবার। যথাসম্ভব গুটিয়ে নিলো নিজেকে নীলাম্বর। কোনও উত্তর দিলো না প্রশান্তের প্রশ্নের, কিন্তু উন্মুখ হয়ে রইলো প্রশান্তর পরের কথা শোনার জন্য।

হঠাৎ রসে ফেলার আফশোষে ঠোঁট কামড়ে প্রশান্ত সামলে নিলো নিজেকে। তার পর বললো, "দেখুন, ব্যক্তিগত ভাবে এতে আমার কোনও স্বার্থ থাকবার কোনও কথা নয়। আপনি দিদিকে বিয়ে করলেন বা না করলেন, তাতে আমার কোনও লাভ বা ক্ষতি নেই…" একটু থেমে প্রশান্ত আবার বললো, "…তবু, আমি বলছি কারণ এটাকে আমি সামাজিক বিশেষ একটা সমস্যা হিসেবে দেখছি। এদিক্ থেকে প্রয়োজন হলে আমার সাহায্যও আপনারা পেতে পারেন…"

আবার থামলো প্রশান্ত। উন্নত অপেক্ষমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো প্রশান্ত নীলাম্বরের দিকে। মাটির দিকে চোখ নামালো, দাঁতে নখ কাটতে থাকা নীলাম্বর স্তব্ধ হয়েই রইলো। হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হ'ল প্রশান্তর।

"আপনি বিয়ে করতে চান ত' দিদিকে?"

চমক ভেঙ্গে গেল নীলাম্বরের, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

"তা' করতে চাইলেই ত করা হয় না, এ ত' আপনার জানার কথা…" একটু ভেবে আবার বললো প্রশান্ত, "মনুর বিধানে

আপনাদের বিয়ের অনুমোদন খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা'ও ত' জানেন। এই অশাস্ত্রীয় কাণ্ডটি করতে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, তা' কি ভেবে দেখেননি ?"

কি বলবে নীলাম্বর। ভাবেনি' মানে ? কেবল ভেবেছে। রাত-দিন ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে রাত্রের ঘুম ওর ছুটে গেছে, দিনের কাজ ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবেছেই, করেনি কিছু, কারণ ভাবা এক জিনিষ আর তা' করা আরেক জিনিষ।

ক্রমেই ক্ষমাহীন, স্পষ্ট আর তীব্র হয়ে উঠছে প্রশান্ত, "দিনের পর দিন টেব্‌ল্ মাঝে রেখে দু'পাশে দু'জনে সরব অথবা নীরবে বসে' থাকার মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান ত' হয় না, নীলু বাবু।"

"কি করবো বল', কি করতে পারি আমি ?" অসহায় স্বরে নিজেকেই এই কথা বলতে শুনলো নীলাম্বর।

আর প্রশান্তর মনে হ'ল, ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দেয় ভদ্রলোকের মসৃণ গালে। তীব্র স্বরে বলে' উঠলো, "আশ্চর্য্য, আপনি কি এ সব কথা ভাবেননি' আগে ? পাঁচ বছর ধরে' দিদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, অথচ কখনই আপনার কি মনে হয়নি' যে এ প্রশ্নের সামনে এক দিন আপনাকে দাঁড়াতেই হবে ?"

"না, না. তা নয়। তা' নয়···" অসুস্থ প্রলাপোক্তির মত আবৃত্তি করে' উঠলো নীলাম্বর।

আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো প্রশান্ত, "না মানে ? আপনারা কি মনে করেছেন, জানি না আমি। প্যানপেনে ম্যানমেনে মন নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সাহস আসে কোথা থেকে আপনাদের ?"

প্রায় কেঁদেই ফেললো নীলাম্বর, "তুমি আমাকে ভুল বুঝছো শান্ত। সম্পূর্ণ ভুল বুঝছো আমাকে। আমি তোমাকে বলছি, আমার কোনও বদ্ অভিসন্ধি নেই। আমি সত্যিই বলছি, রাণীকে আমি······"

হঠাৎ রক্তিম হয়ে' লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারলো না নীলাম্বর।

প্রশান্ত লক্ষ্য করেছিলো ঝোঁকটা। কিন্তু, নীলাম্বরকে আরও সঙ্কোচ থেকে বাঁচিয়ে আড়ষ্টতা কাটাবার সুযোগ দিতেই হবে।

তাই। নিস্পৃহ স্বরে বলে' চললো ও, "পাঁচ বৎসর আপনাদের কার্য্যকলাপ দেখে আপনাদের সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ থাকবার ত' কথা নয়। কিন্তু, সাহসেরও ত' দরকার···"

আড়ষ্টতা কেটেছে অনেকখানি নীলাম্বরের। বেড়ালটা থাবা গুটিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য্য ভাবে মৈত্রী স্থাপনে তৎপর হয়ে উঠেছে।

ইঁদুরটাও সোজা মুখ তুলে এবার বলতে পারলো, "হাঁ, তা' ত' বটেই। বটেই ত'। তবে, ব্যাপারটা কি জানো প্রশান্ত, আমি ভেবেছিলাম যে এখনও সময় হয়নি'······"

"সময় হয়নি ?" বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলো প্রশান্ত। নির্ব্বুদ্ধিতাকে ও চিরকাল অশ্রদ্ধা করে এসেছে: আজ মনে হ'ল, অসহ্য।

"বলছেন কি আপনি ? গোঁড়া ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত এক পরিবারের কোনও একটি বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে পাঁচ বৎসর ধরে কোনও কাজ না থাকলেও আপনি রোজ একবার অন্ততঃ সাক্ষাৎ করেন, কথা বলেন কি বলেন না, আপনার কি ধারণা যে এটা কারুর নজরে পড়েনি ?" প্রশান্তর মনে হ'ল, নীলাম্বরের মত শিরদাঁড়াহীন লোকের মাথা আরও ঘুরিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। ও আবার বলে চললো, "জানেন আপনি, লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে ? হয়ত' এক দিন ওর বিয়েও হয়ে যাবে···"

এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো নীলাম্বর, "তাই না কি ? তবে কি হবে শান্ত ?" হঠাৎ প্রশান্তর হাত দু'টো চেপে ধরে বলে উঠলো নীলাম্বর, "তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও শান্ত। তোমার বাবাকে বলে দাও শান্ত।"

আর প্রশান্তর মনে হ'ল, দূত্তোর, না আসলেই ছিল ভাল। এমনি হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে প্রেম করে। মদ খেয়ে নেশা করতে পারে না। সুবিধে পেলে প্রেম করে' নেশা করে। কি দরকার ছিল তার মাথা গলাবার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ?

কিন্তু, আবার মনে পড়ল ওর, সত্যিই এর প্রয়োজন ছিল। ওর দিদির জন্য নয়। সামনে-বসে-থাকা এই গোবর-গণেশ নীলাম্বর বাবুর জন্য নয়, প্রয়োজন তার নিজের, সমাজের, অগ্রসর ইতিহাসের। যে ফাঁকা মিথ্যে বনিয়াদের ওপর এই আত্মম্ভরী দেউলিয়া সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, তা' ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন সম্পন্ন করার ভার তাদেরই ওপর।

প্রশান্ত বললো, "কিছু করবো না আমি আপাততঃ। আপনাদের বাড়ী থেকে বিবাহ প্রস্তাব করে' পাঠান আপনি বাবার কাছে" ও আবার একটু ভেবে বললো, "বাবা রাজী হবেন না। কেউ রাজী হবেন না।······রাজী না হ'ন, দরকার হ'লে দিদিকে নিয়ে পালিয়েও বিয়ে আপনাকে করতে হবে। সাক্ষী থাকবো আমি। আর তা' যদি না করেন ত' মনে রাখবেন যে আমি লোক সোজা নই, এমন কি খারাপ লোকই আমি।"

প্রায় শাসানোর মতই শোনালো প্রশান্তর শেষ কথাগুলো। সাত দিনের মধ্যে আবার খবর নেবে জানিয়ে বেরিয়ে এলো ও।

* * *

ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শ্যামদাস বাবু। দীর্ঘ ষাট-সত্তর বৎসর কালের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো শ্যামাদাস বাবুর আত্মনিমগ্ন মন।

ছোট বেলায় দেখা তাঁর পিতামহকে অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়তে লাগলো তাঁর। বৃন্দাবনে থাকতেন তিনি। মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। শুদ্ধাচারের দীপ্তি ছিলো তাঁর সারা দেহে। পায়ে জুতো পরতেন না, গায়ে জামা দিতেন না। একটা পাতলা উড়ুনী থাকত' গায়ে। রোজ দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক বেদ উপনিষদ-গীতা পাঠ না করে অন্ন স্পর্শ করতেন না।

পিতার কথাও স্মরণে আসছে। বয়স কালে যজমানী করতেন। রোজ সকালে স্নানে যেতেন গঙ্গায় বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত। শীত কালেও উপবীত সোজা করে ধরে এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী শেষ করতেন।

তার পর তিনি। অধর্ম্ম আচরণ কোনও কালে করেছেন বলে কেউ বলতে পারবে না। এ পল্লীতে তাঁদের নাম-ডাক আছে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পরিবার বলে।

এই বিপুল বংশ-মর্য্যাদা তাঁদের। আর এই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই পুত্র। পায়ে নূতন ফ্যাসনের এক জুতো,

কাপড়টা উল্টো করে বিচিত্র এক কায়দায় পরা, ডানা-কাটা অদ্ভুত এক কোট গায়ে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। উপবীত পর্য্যন্ত নেয়নি' ছোকরা।

আর এসেছে প্রশান্ত তাঁর মেয়ের সঙ্গে সেই ছোকরা নীলাম্বর মিত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। স্পর্দ্ধা!

প্রশান্ত আবার হাসি মুখে বললো, "তা' হলে বলুন আপনি, আপনার কি মত?"

"মত?" বজ্রস্বরে বললেন শ্যামাদাস বাবু, "আমার মত নেই।"

"কেন?"

"কেন। তাই যদি বুঝবে, তবে ত' মানুষই হ'তে···"

সস্মিত মুখে চিমটি কাটলো প্রশান্ত। "মানুষ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা আছে বিভিন্ন লোকের। সুতরাং থাক না সে কথা। আপনার কথাই বলুন···"

আবার গর্জ্জে উঠলেন শ্যামাদাস বাবু, "বলতে লজ্জা করলো না তোমার কথাটা? ভেবে দেখেছো তুমি নিজে চার দিক্ বিবেচনা করে?"

"এর মধ্যে এত চার দিক্ ভাববার ত' কিছু নেই? বিয়ের জন্ত একান্ত প্রয়োজন যা', তা' ওদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। সুতরাং, বিয়েতে বাধা কোথায়?"

"বাধা কোথায়?" চেঁচিয়ে উঠলেন শ্যামাদাস বাবু, "বিয়েটা নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার না কি? সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান নয়?"

হেসে উঠলো প্রশান্ত, "সমাজ? সমাজ কোথায় বাবা? আপনি যে সমাজের কথা বলছেন, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ নেই···"

বাধা দিলেন শ্যামাদাস বাবু, "তা' হ'লে পৃথিবীও নেই। ধর্ম্মও নেই, শাস্ত্রও নেই···"

শ্যামাদাস বাবুকে এত দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হ'ল প্রশান্তর। মাথার চুলগুলো সব সাদা, কপালে পড়েছে অগুন্তি ভাঁজ, অগ্নিগর্ভ চোখ কিন্তু তা'তে তেজ নেই, কেমন যেন ক্যাঁকাশে মত।

হেসে আবার বললো, "সত্যিই আপনাদের কালের সে ধর্ম্মও নেই, শাস্ত্রও নেই। কাল পালটে গেছে তাই ধর্ম্মও পালটেছে, শাস্ত্রও পালটেছে।" একটু থেমে আবার বললো, "এ যুগে মানুষের জন্ত শাস্ত্র রচিত হয়, ধর্ম্ম সৃষ্টি হয়, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের জন্ত মানুষ হয় না।"

কেমন একটা অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন শ্যামাদাস বাবু। আবার কেমন দুর্ব্বলও মনে হ'ল তাঁর এই চব্বিশ বৎসর বয়সের পুত্রের কাছে। আশ্চর্য্য হয়ে অনুভব করতে থাকলেন যে তাঁর ছেলেকে তিনি চেনেনই না মোটে। এদের ভাষা অচেনা, ভাব অজানা, চরিত্র অপরিচিত! পুত্রের যুক্তিকে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা বলে মনে হ'ল পিতার, কিন্তু পুত্রের অপরাজেয় আত্মবিশ্বাসের সামনে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বললেন, "এ ত' উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের যা' খুশী তাই করাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কি বলব?"

"কে বললো সমাজবিচ্ছিন্ন?" হেসে বললো প্রশান্ত, "সমাজের চেহারা বদলে যাচ্ছে। আর সে সমাজ শাস্ত্রের অকেজো পুরানো অর্থহীন অনুশাসনকে বরবাদ করছে। স্বীকার করছে নোতুন যুগের মানুষকে।" বিতণ্ড তর্ক করে' যাচ্ছে হঠাৎ স্মরণে আসায় প্রশান্ত বলে উঠলো, "আর এ ক্ষেত্রে ত' খুব সোজা কথা। এরা দু'জনে মিলিত হতে চায়। পরস্পরকে এরা ভালবাসে। এদের ভালবাসা এদের জীবনের চেয়ে নিশ্চয়ই আপনার সংজ্ঞাহীন সমাজের মূল্য বেশী নয়?"

ভালবাসা! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শ্যামাদাস বাবু। সেদিনকার সেই পুঁচকে ছেলেটা এত কথা শিখলো কোথা থেকে।

রাগে কাঁপতে থাকেন শ্যামাদাস বাবু, "তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। আমি বলছি, এ বিয়ে হবে না। কিছুতেই হবে না।"

মুচকি হাসলো প্রশান্ত। "তার পর আপনার মেয়ে যদি একটা করুন কিছু একটা সর্ব্বনেশে কাণ্ড করে বসে, তার দায়িত্ব আপনি নেবেন? আমি ত' ধরুন আপনার নামে এক নম্বর ঠুকে দেবো।"

"কী!" বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় না ভদ্রলোকের।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বজ্রাহত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সহসা মায়া হ'ল প্রশান্তর। শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বললো, "তর্ক থাক, বাবা। আসল কথা, ব্যাপারটাতে আপনার সংস্কারে বাধছে। অনেক দিন ধরে সঞ্চিত কুসংস্কার······"

"আমার বংশ-মর্য্যাদা আমার কুসংস্কার? তোমাদের এই যেচ্ছেচার-পানাকে অস্বীকার করা কুসংস্কার?······" গর্জাতে লাগলেন শ্যামাদাস বাবু।

"বংশ-মর্য্যাদা?" বললো প্রশান্ত, "এ বংশ-মর্য্যাদার মূল্য কতটুকু? সন্ধ্যে থেকে রাত পর্য্যন্ত কি খাব ভাবতে ভাবতে প্রতি-মুহূর্ত্তে আয়ু নিঃশেষ হয়ে আসছে। আপনাদের বংশকে বংশই যাবে লোপাট হয়ে। তার আবার মর্য্যাদা···"

"এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারবো না। আমার মেয়ে বিয়ে করবে কায়স্থের ছেলে, এ কিছুতেই হতে পারে না। কিছুতেই না। আমি বেঁচে থাকতে নয়···"সমস্ত যুক্তিতর্ক ছেড়ে প্রলাপোক্তির পথ ধরলেন শ্যামাদাস বাবু।

আর তা' ঠিকই ধরতে পারলো প্রশান্ত, "আপনি সব যুক্তি-তর্কে হেরে গেছেন বাবা। কারণ, সত্যিই আপনার কোনও যুক্তি নেই। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে দেখবেন যে ঐ কায়স্থ শ্রেষ্ঠ সন্তান আপনাদের সৎব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর বহু ছেলের চাইতেই হয়ত' ভাল···"

"লোকে কি বলবে?" আর্ত্তনাদ করলেন শ্যামাদাস বাবু।

"এ যুগের লোকেরা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। আশীর্ব্বাদ জানাবে দু'হাত তুলে···"

না, না। তা হয় না, তা হয় না। এ কি অবিশ্বাস্য অসম্ভব কথা বলছে প্রশান্ত। ভাবলেন শ্যামাদাস বাবু। এ কি অসম্মানের বোঝা তাঁর মাথায় চাপিয়ে দিতে চাইছে তাঁর পুত্র। কিছুতেই না। এ হবে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে পড়লেন শ্যামাদাস বাবু, "দেখো, আমি তোমাদের মত হঠাৎ গজানো ব্যাঙের ছাতা নাই। আমার বংশের একটা মর্য্যাদা আছে। পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে। সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে অস্বীকার করার মত জাহান্নমে এখনও আমি যাইনি।" একটু থেমে জোর দিয়ে শেষ কথা জানালেন, "আমার এ বিয়েতে মত নেই।"

"তবু, বিয়ে কিন্তু হবে।" বললো প্রশান্ত অদ্ভুত তৃপ্তির সঙ্গে।

"আমার মেয়ের বিয়ে আমার অমতে?"

"যদি আপনি মত না দেন।"

ফাঁকা চোখে তাকালেন শ্যামাদাস বাবু। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় আর দুর্ব্বল মনে হ'ল। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন। চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছে তাঁদের পৃথিবী, তাঁদের জীবন, তাঁদের সাধনা, তাঁদের বিশ্বাস। এ সম্পূর্ণ এক নূতন পৃথিবী, নূতন মানুষ আর তার নূতন জীবন-দর্শন নিয়ে গড়ে উঠছে। আর অত্যন্ত তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে থাকলেন শ্যামাদাস বাবু যে এই পৃথিবীতে তাঁদের স্থান নেই। তাঁরা পুরানো, অকর্ম্মণ্য, অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছেন।

ঘোষণা করলেন অবশেষে ভেঙ্গে-পড়া হতাশার সুরে, "তা হলে আমাকে চলে যেতে হবে বৃন্দাবনে।"

প্রশান্ত চুপ করে' রইলো।

* * * *

প্রশান্তর দিদি রাণী আর নীলাম্বরের বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু, ওদের সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্ক রইলো না প্রশান্তর। এমন কি, বিয়েতেও উপস্থিত ছিলো না প্রশান্ত।

ঘটনাটা ঘটেছিলো ওদের বিয়ের দিন দশেক আগে। প্রশান্তর সঙ্গে নীলাম্বর দেখা করতে চায়—রাণীর মুখে এই খবর পেয়ে ওর পার্ক ষ্ট্রীটের অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলো প্রশান্ত।

সেদিনকার সেই ভোম্বলদাস নীলাম্বরের সঙ্গে যেন এই নীলাম্বরের কোনও মিল নেই। পাঁচটা মিলের মালিক নীলাম্বর মিত্রের দিকে বিস্ময় স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো প্রশান্ত।

সুদৃশ্য চামড়া-ঢাকা চওড়া টেবলটার ও-পাশে গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে' কাকে যেন ফোন করছিলো নীলাম্বর। রিসিভার-ধরা হাতটার আঙুলে তিনটে হীরের আংটি রোদে ঝকমক করছিলো।

ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে' ফোনের কথা সেরে নিল' নীলাম্বর। তার পর হঠাৎ সোজাসুজি কথাটা পাড়লো না। আড়ষ্ট ভাবে টেবল-ঢাকা-কাচটার ওপরে রাখা কাগজ-পত্রগুলো নাড়া-চাড়া করলো। 'কেমন আছ' গোছের কয়েকটা নিরর্থক কথা বলার পর এক সময় বলেই ফেললো কথাটা, "তুমি ত' এখন কিছুই করছো না প্রশান্ত?"

প্রশান্ত রীতিমত চটে উঠলো, "করছি না মানে? অনেক কিছু করছি।"

বিস্মিত স্বরে বললো নীলাম্বর, "কৈ, রাণী ত' আমাকে সে কথা বলেনি'। আমি ত' জানি, তুমি কিছু করছো না। চাকরী করছো না কি? কোথায়?"

ব্যাপারটা বুঝেছে এতক্ষণে প্রশান্ত। প্রকৃত পক্ষে নীলাম্বরের উপকার করেছে সে আর তাই, উপকৃত নীলাম্বর পাল্টা উপকার করার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ও যে জগতের অধিবাসী, সে জগতে এক ভাবেই উপকার করা যায়—কাজেই ভাবিকি চালে সেদিনকার ম্যানমেনে নীলাম্বর যদি একটু মুরুব্বিয়ানাতেই হয়ে পড়ে ত' বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই প্রশান্তর।

একটু হেসে বললো প্রশান্ত, "না। চাকরী আমি করি না।"

সন্তর্পণে জানালো নীলাম্বর, "কিন্তু, করতে ত' হবে একটা। রোজগার ত' কিছু করতেই হবে তোমায়।"

শুভাকাঙ্ক্ষীর সুরেই কথাটা বললো নীলাম্বর। প্রশান্তও জানালো, "হাঁ, তা' ত' বটেই। চাকরী ত' করতেই হবে। না হলে খাবো কি?"

এতক্ষণ আলোচনাটা ছিল সাধারণ স্তরে। যেন দু'জনেই আলোচনা করছিলো আবহাওয়া অথবা দেশের পরিস্থিতি। কিন্তু এবার, অনুভব করলো নীলাম্বর, কথাটা সোজাসুজি বলেই ফেলতে হবে। ব্যক্তিগত স্তরে টেনে নামাতে হবে আলোচনাটাকে। আর তাই, আবার আড়ষ্ট হয়ে গেলো নীলাম্বর। অস্পষ্ট ভাবে বিনীত স্বরে নিবেদন করলো, "একটা কাজ আছে। যদি তুমি করো…"

যেন চাকরীটা গ্রহণ করে নীলাম্বরকে ধন্য করুক প্রশান্ত। কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে নীলাম্বর।

বিলক্ষণ উৎসাহিত হয়ে উঠলো প্রশান্ত, "তাই না কি? চাকরী আছে? কোথায়?"

"আমাদেরই একটা মিলে। মেটিয়াবুরুজে। একটু ম্যানেজ করে' দাও না তুমি।"

"কেন, ম্যানেজার নেই না কি আপনার?" প্রশ্ন করলো প্রশান্ত।

"না, ম্যানেজার ঠিক নয়, তবে তোমাকেই সব দেখতে-শুনতে হবে। ম্যানেজার কোনও কাজের নয়…" মালিকী সুর ফিরে আসছে নীলাম্বরের কণ্ঠে।

"কেন? ম্যানেজারের অপরাধ? কাজ-কর্ম্ম জানে না বুঝি?"

নড়ে-চড়ে বসলো নীলাম্বর। বললো, "আরে দূর, কাজ জানে না ছাই। আর কোনও মিলে আমার ষ্ট্রাইক হয়নি, কেবল ঐ মিলেই ত' ষ্ট্রাইক হ'লো। তোমাকে যে কাজটা করতে বলছি, সেই কাজ আগে যে করতো সেই ছোকরাই ত' মজুরগুলোকে ক্ষেপিয়ে এই কাণ্ডটা করলো। আর সবটাই ত' ঘটলো ওর চোখের সামনে…"

"তাই না কি?" বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো প্রশান্ত, "এখনও ষ্ট্রাইক চলছে?"

খুশীর হাসি হেসে বললো নীলাম্বর, "আরে, না না। সে ষ্ট্রাইক শেষ হয়ে গেছে কবে। সে ছোকরাকে বরখাস্ত করলাম, মজুরদের কয়েকটা পাণ্ডাকে ধরিয়ে দিলাম পুলিশে। ওদের ভেতরও ত' ভাল বুদ্ধিমান লোক আছে। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ষ্ট্রাইক তুলিয়ে নিলাম…"

নিজের কৃতিত্বে যেন আর একবার খুশী হতে থাকলো নীলাম্বর। প্রশান্তকে জানিয়ে দেওয়া গেছে তার কদরটা।

প্রশান্ত অদম্য আগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করলো, "কেন হঠাৎ ওরা ষ্ট্রাইক করতে গেলো? কি চাইছিল ওরা?"

"আরে, সেই পুরানো কথা। মাইনে বাড়াও…" বিরক্ত স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠলো নীলাম্বর, "মাইনে বাড়াও। আরে, মাইনে বাড়াবো কোথা থেকে? তোদের কাজ কি কিছু আছে? আমার তেমন লাভ হচ্ছে এখন?"

একটু থামলো নীলাম্বর। তার পর হঠাৎ প্রশান্তকে মধ্যস্থ মেনেই যেন বললো, "আচ্ছা, তুমিই বলো। যুদ্ধের সময় কাজ ছিল প্রচুর। সরকারী কনট্রাক্টে নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। তখন তোরা যে মাইনে পেয়েছিস্, আজও তাই পাবি না কি?"

"তা' ত' বটেই। যুদ্ধের সে এক সময় গেছে বটে। লাভ করেছেন অনেক তখন আপনারা, না?"

আফশোষ করে' বললো নীলাম্বর, "তেমন আর কই। কত লোক ত' লাল হয়ে গেছে। আমি ত' মাত্র গোটা কয়েক বাড়ী তুলেছি। মোটে কয়েক লক্ষ জমাতে পেরেছি ব্যাঙ্কে…" সংসারী নীলাম্বর বললো এবার, "কি আর এমন? খরচ কত বেড়েছে বলো দেখি? আমাদের এই সংসারটি পালন করতেই ত' আমার মাসে দেড় হাজারের মত বেরিয়ে যায়। তার পর আছে এই মিলগুলো, অফিসের এস্টাব্লিশমেন্ট। সোজা কাণ্ড? কি বলো তুমি প্রশান্ত?"

বিরক্তি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রশান্তর। আর হয়ত' নিজেকে সামলাতে পারবে না ও। বৈভব-গর্ব্বী স্বার্থপর ঐ লোকটার নাকে হয়ত' ঘুসিই মেরে বসবে।

তাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো প্রশান্ত। নীলাম্বরের মতই বিনীত ভাবে জানালো প্রশান্ত, "না, নীলু বাবু! ও চাকরী আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ…" মনের আগ্নেয় উষ্ণতার খানিকটা ওর মুখে ছুঁড়ে না দিয়ে পারলো না প্রশান্ত, "কারণ, জানেনই ত' আমি লোক খারাপ। ওই চাকরী নিলে হয়ত' আপনার বরখাস্ত লোকটার মতই কাণ্ড করে বসবো আমি। আপনার বাঁচবার নমুনাটা জানিয়ে মজুরগুলোকে হয়ত' ক্ষেপিয়েই তুলবো…"

নির্ব্বোধের মত ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বিস্ময়-বিমূঢ় নীলাম্বর। প্রশান্ত বেরিয়ে এলো।

দিদির প্রণয়ঘটিত ব্যা[illegible] সেদিন সে মাথা গলিয়েছিলো কেন, তা' মনে পড়ল প্রশান্তর।

ব্যাপারটাকে সে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখেছিলো। সামাজিক বঞ্চনার সমস্যা। অজ্ঞানতা, অসারতা আর মেউলিয়াপনার ওপর যা' প্রতিষ্ঠিত।

আর এই মাত্র বঞ্চনার আর এক চেহারা সে প্রত্যক্ষ করে এলো। আরও মারাত্মক, রক্তলোলুপ, উদগ্র, উলঙ্গ।

কিন্তু, এ দু'টো কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টো পৃথক্ ব্যাপার? না কি, একই চক্রান্তের দুই মুখ?

প্রশান্তর মনে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো প্রশ্নটা। আর এক সুতীব্র যন্ত্রণায় সারা গা তার জ্বালা করতে লাগলো।

দিদির বিয়েতে থাকেনি' প্রশান্ত। থাকবার উপায় ছিল না। সে রাত্রে তাকে যেতে হয়েছিল মেটিয়াবুরুজের এক নোংরা শ্রমিক- বস্তীতে। আলোকোজ্জ্বল রোমাঞ্চকর আত্মসন্তুষ্ট ছন্দমধুর বিয়ে-মণ্ডপ থেকে বহু দূরে টিমটিমে আলো-জ্বলা এক মেটে ঘরে বসে সে শ্রমিকদের কাছে তিনটে হীরের আংটি-পরা নীলাম্বর মিত্রের যুদ্ধকালীন লাভের অঙ্কটা নিখুঁত ভাবে পেশ করেছিলো।

বৃন্দাবনেই পাকাপাকি ভাবে বাসা বেঁধেছেন শ্যামাদাস বাবু।

অনুসরণ

মণীন্দ্র রায়

যাকে চাই সে তো এক নয়, খুঁজি তাই নিশি-দিন,
মিশি মেলা হাটে, কপাটের খিলতোলা ঘরে-ঘরে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার গানে সুর বেলা-বালুকায় লীন,
যেথায় চূড়ায় মিনারে মিনারে নীল মুঠি ধরে।
পিদিমের শিষে লালের কালিমা ছায়া কালো কালো,
ছায়া ঘোমটায় টানে রাঙে মন, রঙ ঝিকিমিকি
সন্ধ্যার লালে নীল ঝিলিমিলি পাতায় মিলালো,
আনত হিজলে-ভেজা হাওয়া কাঁপে খুশি ভরে দীঘি
শিহরে সবুজ ঢেউয়ে, পাড়ে-পাড়ে ঘাসের শিথানে
ঘুম-ভাঙানিয়া দোলা লাগে ; খোলে রূপসীর চুল
হঠাৎ প্রেমের জোয়ারে, কোমরে বাহুর খিলানে
বুকে-মুখে টানাচোখে ক্ষণিকের কালের পুতুল!
কত [illegible]-চোরা স্মৃতিপথে ঘোরা উপনিবেশে।
পদচিহ্নের রেখা বাঁধে সারা বাংলাদেশে।

অন্তরাল

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশ দ্বিখণ্ডিত হ'ল। এই ভাগাভাগির দায় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে এ'ল জাতির জীবনে। তাই আফশোষ ছিল না নিখিলের—তার একমাত্র শোবার ঘরটি কাঠের পার্টিশন করে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থায়। শোবার ঘর বলতে ওই একটি, এলোমেলো হয়ে জীবনকে বিছিয়ে দিতে মির্জাপুরের এই ১২ ফুট বাই ১৮ ফুট ঘরের ঐশ্বর্য্য ক'টা মানুষের বা ভাগ্যে ঘটে। যুদ্ধের আগে ভাড়া ছিল বার টাকা, সেই ভাড়া বাড়তে বাড়তে হল তিরিশ টাকা। "দেবেন না তো অন্যত্র সরে পড়ুন, এই রইল নোটিশ। কিচেন, বাথ, বেড-রুম, তিরিশ টাকায় টালা থেকে টালীগঞ্জ চষে ফেলুন, বস্তী বাড়ীতেও পাবেন না।"—বাড়ীর মালিকের মুখে এতো ইতিকথা, যখন বোমার ভড়কে কলকাতার মানুষ ভুলে গিয়ে এতটুকু আস্তানার জন্যে টালা-টালীগঞ্জ চষে বেড়াত। সেই কথাই পুরাতনী হ'ল—আহা, ওরা মেয়ে-বৌ নিয়ে পথে-বিপথে পড়ে রইবে, আর কি না নিখিলের মতন একলা মানুষ পরেশ পাণ্ডার বাড়ীর এত বড় ঘরটা এখন স্বার্থপরের মতন দখল করে থাকবে? দেশের, জাতির এই সঙ্কটে এ ত্যাগটুকু নিশ্চয়ই নিখিল করতে পারে। তাই হ'ল—কাঠের পার্টিশন উঠে চমৎকার একটা আলাদা ঘর বনে গেল। আর সামনের খোলা বারান্দাটুকু কেনেস্তারার ভাঙা-চোরা টিনে ঢেকে বনে গেল আরও একটি শোবার ঘর ও রান্না-ঘর। পথে-বিপথে থেকে শীতের এক ম্লান সকাল বেলায় জনৈক ভাগ্যবান্ ভজন খানেক পোষ্য নিয়ে এসে উঠলেন পরেশ পাণ্ডার সেই ফ্ল্যাটে।

অকৃপণ ভাবে কষ্টার্জ্জিত অর্থের বেশ একটা বড় অঙ্ক ঢেলে দিলেন ভদ্রলোক রামেশ্বর পাণ্ডার হাতে। "হেঁ, হেঁ, কোনও অসুবিধা হলেই বলবেন, বলবেন কিন্তু—আপনাদের জন্যেই সব" তামাক-পোড়া দাঁতে সবিনয় হাসি হেসে রামেশ্বর পাণ্ডা পকেটস্থ করলে সেই টাকা।

ভদ্রলোক হাতে যেন চাঁদ পেয়েছেন। এমনি একটা প্রশান্তি নিয়ে ফ্ল্যাটের আনাচ-কানাচ ঘুরে দেখতে লাগলেন। এদিকে ঘরের ভিতর নোতুন সংসার পাতবার ব্যস্ততার নানা শব্দ এসে নিখিলের কাঠের পার্টিশনে আঘাত করতে লাগল। 'খুকুর দুধ খাওয়াবার ঝিনুক...এই তো পেয়েছি মা, গানের খাতা কোথায় ফেললি মঞ্জু, লক্ষ্মীর বাসন...এই তো' ইত্যাদি ধরণের ব্যস্ততার কলরব। এরি মধ্যে কে যেন সশব্দে আছাড় খেল, 'বাইরে গিয়ে মর না সব'। চিপ-চিপ, করে কতকগুলি কিল পড়ল। এর পর সুরু হ'ল কান্নার ঐক্যতান। নিখিলের কৌতূহল এবার বিরক্তির পর্য্যায়ে এসে পৌছল, উঠে এল বারান্দায়, নোতুন প্রতিবেশীদের প্রতি সে কি সহৃদয় হতে পারবে?

'—আপনি বুঝি এদিকটায় আছেন?' নোতুন ভদ্রলোক নমস্কার জানালেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিখিল প্রতি-নমস্কার করলে সহৃদতায়।

"তা বেশ, দিন না মেয়েদের পাঠিয়ে আলাপ করে আসুক আমার ইয়েদের সাথে,—আচ্ছা, আমিই না হয় পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার ইয়েরই তো আসা উচিত। ওরে মঞ্জু......" ভদ্রলোক ব্যস্ততার সহিত তার ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলেন।

আলাপের সুত্রপাতেই নিখিল কেমন যেন আশ্বস্ত হতে পারলে না। সত্যিই যদি ভদ্রলোকের 'ইয়ে'—এখনি ভজন খানেক পোষ্য নিয়ে এসে পড়ে...।

দুপ-দুপ করে এসে ঢুকল

একটি মেয়ে, এক ঝলকে দেখে নিলে নিখিল তাকে, অপরূপ কান্তি-ময়ী শ্যামা দীর্ঘাঙ্গী, মোটে কৈশোর অতিক্রম করছে সে। নিখিলকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সলজ্জ জিভ কেটে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "বৌদি বুঝি ও ঘরে? মা এখন আসবে না কি না—তাই আমিই···"

কথা শেষ না করেই চলে গেল, বৌদির খোঁজে পাশের ঘরে; সেখানে বৌদির দেখা না পেয়ে ফিরছিল। নিখিল ডাকলে তাকে। "শোন, বৌদি তো এখেনে থাকেন না।"

"থাকেন না? তবে···" মেয়েটির চোখে যেন সবখানি উৎসাহ নিবে গেল।

"আমি একলাই থাকি, তোমার নাম বুঝি মঞ্জু? তোমার বাবার নাম কি খুকী?"

"না খুকী নই,—আমার নাম মঞ্জু, বাবার নাম রামেশ্বর চক্র-বর্ত্তী। মুখিয়ে উঠল মঞ্জু চোখে বিদ্যুৎ হেনে, দুপ-দুপ করে ওদের ফ্ল্যাটে চলে গেল।

নিখিল একটু অপ্রস্তুত হল মঞ্জুর এই আকস্মিক চলে যাওয়াতে, এতটুকু পরিচয়ে মঞ্জুকে খুকী বলাতে হয় তো ও ক্ষুন্ন হয়েছে।

এর পর নিখিল জানতে পারলে, রামেশ্বর বাবু চাঁদপুরের ওদিকে রেলওয়েতে গার্ড ছিলেন। সম্প্রতি হিন্দুস্থানে এসেছেন। তিনি ট্রান্সফার অফিস থেকে এখনও কাজের নিয়োগ-পত্র পাননি। আর জানলে, মঞ্জু খুকী মোটেই নয়, কুমিল্লা কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে সে পড়ত।

প্রথম দিন সেই যে রামেশ্বর বাবুর সাথে নিখিলের দেখা হয়েছিল তার পর আর হয়নি, রামেশ্বর বাবুও হয় তো নিখিলের দেখা পাননি।

নিখিল সাংবাদিকের কাজ করত। কখনও রাত্রিতে কখনও দিনে—বাঁধা ছিল তার কাজের সময়। সুতরাং প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তার কৌতূহল থাকলেও বিশেষ রকমের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তার হয় না।

যদিও রামেশ্বর বাবুর ঘরের ছেলে-মেয়েরা সুযোগ মত এসে নিখিলের সাথে লজেঞ্চ-চকোলেট খাবার দাদা পাতিয়ে গেছে। শুধু মঞ্জু আসতো না। হয় তো বা নিষেধ ছিল; বাঙালী ঘরের বাড়ন্ত মেয়ে—অপরিচিত পুরুষ—তা হলেই বা সে পাশের ঘরের লোক—তার সাথে মেলামেশা কে-ই বা সুনজর নিয়ে দেখবে। কিংবা মঞ্জু হয় তো নিখিলের ধৃষ্টতাকে ভুলতে পারেনি।

সে খুকী না কি? অনেক বার মঞ্জুকে সে তারই ঘরের সামনে ছাদে আলসে ধরে নিচে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছে। যখনই নিখিলের চোখে চোখ পড়ত, সেই প্রথম দিনের মতই চোখে বিদ্যুৎ হেনে অপসৃত হত দুপ দাপ করে তাদের ঘরে।

সে দিন কিন্তু অভাবিত ভাবে মঞ্জু এক চিঠি নিয়ে এসে উঠল নিখিলের ঘরে, "এই নিন দিদি লিখেছেন।"

চিঠিটি নিখিলের হাতে দিয়ে মঞ্জু নিখিলের বিছানার এক কোণে বসে পড়ল। আশ্চর্য্য লাগল নিখিলের, দিদির চিঠি কেন? আরও আশ্চর্য্য হল মঞ্জু চলে গেল না দেখে—অনেকখানি নির্ভরতার সাথে সে অপেক্ষা করে রইল—নিখিল এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে শেষ করল—দিদি লিখছেন,—'আপনাকে বিব্রত করছি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে, ত্রুটি নেবেন না।

রামেশ্বর বাবুর ছেলে ভাড়া না পাওয়ার অজুহাতে নানা উপদ্রব শুরু করেছেন, আজ না কি তিনি আমাদের কলের জল, আলোর লাইন ইত্যাদি কেটে দেবেন, এ বিষয়ে আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন না? ইতি মঞ্জুর দিদি।'—

চিঠিতে সম্বোধিত ব্যক্তির উল্লেখ নেই—তবু নিখিল আত্মমর্য্যাদা অনুভব করলে। পার্টিশনের ও-পাশে যিনি আছেন তাকে জানাবার জন্যেই জোরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই পারি···দেখছি কেমন সে···"

মঞ্জু সচকিত হল নিখিলের কথায়, পরক্ষণেই হেসে বললে, "কি দেখবেন? আজ তো তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, এক ফোঁটা জলও নেই ঘরে।"

নিখিল আশ্বস্ত হল, মঞ্জুর উপস্থিতি সে যেন ভুলেই গেয়েছিল, পার্টিশনের ও-ধারে যিনি তাঁর কথাই যেন সে এইমাত্র শুনেছে। আমাকে সাহায্য করতে পারেন না কি?—কিন্তু মঞ্জুর দিদি কেন, মঞ্জুর বাবাও তো বলতে পারতেন? খেয়াল হল নিখিলের।

"তোমার বাবা বুঝি অফিস গেছেন?" প্রশ্ন করলে নিখিল মঞ্জুকে।

বাবা তো মোগলসরাইতে বদলী হয়ে চলে গেছেন, মাকে নিয়ে। আপনি বুঝি শোনেননি? বেশ তো! বাবা আবার বলে গেছেন, প্রয়োজন মত নিখিলদা'কে বলিস্, সেই তোদের দেখা-শুনা করবে। খুব লোকের উপর ভার দিয়ে গেছেন যা হোক!"—মঞ্জু খুব অন্তরঙ্গ ভাবেই শ্লেষ জানালে।

কই, নিখিলকে এ বিষয়ে তো কিছু বলেননি মঞ্জুর বাবা? হয় তো জানিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও নিখিলের সাথে দেখা করতে পারেননি ভদ্রলোক।—"ঠিক বলেছ মঞ্জু, আমারই ত্রুটি হয়েছে, একটুও সময় করে উঠতে পারিনি।—রামেশ্বর বাবুর ছেলেকে সায়েস্তা করে দিচ্ছি এখুনি। যাও, দিদিকে গিয়ে বল; আর কোনও গোলমাল হবে না।" নিখিল আশ্বস্ত করতে চাইলে মঞ্জুকে।

"আপনি যেন বিলিতি নাটকের নাইট, এখুনি তলোয়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিতে, কিন্তু···" ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির ঢেউ তুললে মঞ্জু।

"কিন্তু কি?" নিখিল সপ্রশ্ন হ'ল।

"মঞ্জু শোন তো একবার।" পার্টিশনের ওদিক্ থেকে ডাক এল।

"ঐ দিদি, আসি"···বলে মঞ্জু ছুটে পালাল।

এর পর নিখিল রীতিমত ধমক দিয়েছে রামেশ্বর বাবুর ছেলেকে। "আবার যেন আপনার সম্বন্ধে আর কোনও অভিযোগ শুনতে না হয়, মনে রাখবেন। ভাড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাকে বলবেন।"

রামেশ্বর বাবুর ছেলে শুধু মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল, "ভাড়াটা পেলেই চুকে যায়, তা আপনি যে ওঁদের দেখা-শুনার ভার নিয়েছেন, সেটা তো আগে জানতে পারিনি।"

ব্যাপারটা সেখানেই চুকেছিল, সত্যিই মঞ্জু'দের উপর আর কোনও উৎপাত হয়নি।

ইতিমধ্যে নিখিল যেন আবিষ্কার করলে, মঞ্জু অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়েছে তার সাথে। অনেকখানি নির্ভর করতে পারে যেন সে নিখিলদা'র উপর।

নিখিল তার কল্পিত স্ত্রী সম্বন্ধে মঞ্জুর মনে অদ্ভুত কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। সত্যিই তো, নিখিলের জীবনে আপন-জন বলতে কেউ ছিল না। মঞ্জু আর মঞ্জুর দিদির আত্মীয়তাটুকু তার জীবনে এক অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিল। নোতুন নোতুন বিস্ময়ে অভিভূত করবার জন্যেই নিজের জীবনের সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে রোমাঞ্চকর গল্পের ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করত মেঞ্জুর মনে।

পার্টিশনের ওপারে অন্তরালবর্তিনী যে মানুষটি মঞ্জুর দিদি বলে পরিচিত, তাঁকে নিখিল কোনও দিন দেখেনি। শুধু মঞ্জুর মুখে শুনেছে, তিনি বিধবা—অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন, শ্বশুরালয়ে তাঁকে দিন গুজরাতে হয়, বাংলা দেশের গতানুগতিক বৈধব্য-জীবনের লাঞ্ছনায় আর কঠোর অনুশাসনে।

মঞ্জুর দিদির প্রতি সহানুভূতিতে নিখিলের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। এক দিন নিখিলের মঞ্জুর দিদিকে সাক্ষাৎ ভাবে চেনবার সুযোগ এল। এর পর যা ঘটল তা নিখিলের জীবনে মঞ্জুর দিদির সাক্ষাৎ পরিচিতি সুযোগ কি দুর্যোগের সূচনা করেছিল, তা নিখিল সারা জীবন ধরেও অনুধাবন করতে পারেনি।

সেদিন ছিল মঞ্জুর জন্মদিন, তাই মঞ্জুদের ঘরে নিখিলের ছিল নিমন্ত্রণ। সারা সন্ধ্যে নিখিল মঞ্জুর সাথে গল্প করল। দিদি রান্না-ঘরে ব্যস্ত ছিলেন কাজে। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে এসে নিখিলকে বলে গেলেন, "কত উপকার করেন আমাদের আপনি··· আজ একটু রান্না করে খাওয়াবার সৌভাগ্য হল,···ভারী খুশী হলেম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে।" ইত্যাদি ধরনের টুকরো কথা।

নিখিল দেখলে, মঞ্জুর দিদি অপরূপ সুন্দরী। বৈধব্যের সকরুণ দীপ্তিতে মুখখানি সিক্ত হয়ে আছে, চোখ দুটিতে ব্যথার নিবিড় আবেদন, দীর্ঘাঙ্গী, যৌবন অসংবদ্ধ শুভ্র সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে আছে।

মঞ্জুর দিদিকে দেখলে নিখিল, আর দেখলে নিজের হৃদয়কে। সেখানে মঞ্জুর দিদি কি অদ্ভুত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করল। কই এর আগে তো নিখিল কোন নারী সম্বন্ধে এমন বিমূঢ় হয়ে পড়েনি? এমন এবাস্ত বিহ্বলতা অনুভব করেনি? ভাবছিল, মঞ্জুর দিদি কেন এই অহেতুক বৈধব্যের পীড়নকে সারা জীবন ধরে বইবে? এ প্রশ্ন আরও বহু মনকে আলোড়িত করেছে ইতিপূর্ব্বে। সমাজের এই নিষ্ঠুর ও অনর্থক অনুশাসনকে মহানুভব বিদ্যাসাগর, বা আশুতোষের মতন মানুষ ভেঙ্গে দেবার জন্ম আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু এ সব ছিল নিখিলের কাছে শুধু নিছক আদর্শের কথা। মঞ্জুর দিদি তার জীবনে গভীর দাগ কেটে দিল।

মঞ্জু লক্ষ্য করছিল, নিখিল যেন কেমন একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। "কি ভাবছেন অত, দিদির কথা?" কটাক্ষ করলে মঞ্জু।

"সত্যি তাই, দিদিকে দেখে দুঃখ হয়। কি রূপ ওঁর, আর কি মিষ্টি স্বভাব!" নিখিল আচ্ছন্নের মত কথাগুলি উচ্চারণ করলে।

"দেখবেন, প্রেমে পড়ে যাবেন, কিন্তু প্রেম এ ক্ষেত্রে সুকঠিন, জানেন তো?" মঞ্জু মুখরা ও প্রগলভা হল।

মঞ্জুর কথা শুনে নিখিলের চমক ভাঙল, মঞ্জুর ইঙ্গিতকে পরীক্ষা করবার জন্তেই বললে—"আর যদি প্রেমে পড়ে যাই সত্যি সত্যি?"

"ইস্! প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম!" মঞ্জুর মনে মেঘ জমল।

এবার নিখিল হেসে উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। কিন্তু মঞ্জু সে হাসিতে এতটুকু সাড়া তুলল না। কথার গুরুত্ব যে কোথায় টেনে নিয়ে এসেছিল এই সান্ধ্য পরিবেশের ক'টি হৃদয়কে, তা যেন অজ্ঞাত থাকল না। নিখিল নিজের হাসিতে কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলে।

"মঞ্জু তুমি দুঃখ করলে যে—সপ্রশ্ন হ'ল নিখিল আড়ষ্টতা কাটিয়ে।

"এমনি—অকারণ হাসি আমার ভাল লাগে না, জানেন তো?" মঞ্জু ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

দিদি এলেন, বাঁচিয়ে দিলেন নিখিলকে—'ঝগড়া শুরু করেছে বুঝি পাগলী? চলুন নিখিল বাবু, গরীবের ঘরে কিছু সেবা হোক, চল মঞ্জু।"

মঞ্জু উঠল "বাবা, বৈষ্ণবজনোচিত প্রেম—চলুন নিখিলদা' দিদির সেবা গ্রহণ করতে।"

মঞ্জুর এই বক্রোক্তি দিদিকে আহত করল, যেন নিখিল স্পষ্ট দেখতে পেলে। খাবার পরিবেশন করলেন দিদি অতি সুনিপুণ হাতে। রান্নাতে যে অপরিমিত যত্ন ব্যয়িত হয়েছিল তা স্বাদেই প্রমাণিত হল। কিন্তু দিদি আর কথা বলেননি; শুধু মঞ্জু এটা খান, ওটা খান, বলে নীরবতা ভঙ্গ করছিল। নিখিল দেখলেন, দিদির চক্ষু আর্দ্র হয়ে উঠেছে। নিখিলের হৃদয়েও ঝড় উঠেছিল, দিদিকে কোনও কথাই বলা হল না। কোনও রকমে আহার-পর্ব্ব শেষ করে সে মঞ্জুদের গৃহ থেকে বিদায় নিল।

চলে আসবার আগে দিদি নিখিলকে প্রণাম করল, অতিথি-সেবায় এই সৌভাগ্যের জন্ম কৃতজ্ঞ মনের এই উচ্ছাস নিখিলকে অভিভূত করে ফেলল। কি বলবে সে দিদিকে? কত কিছুই বলবার ছিল, তবু বলা হল না।

পার্টিশনের দেয়াল—আর বেড়া করে রাখতে পারল না দু'টি মনকে। সেই রাত্রি, মনে আছে নিখিলের, কান্নায় আকাশময় তা ভরে ছিল পার্টিশনের বেড়া দেওয়া সেই ঘরটি।

নিখিল শুনেছিল অনেক রাত্রিতে, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, পাশের ঘরে। সে কি দিদি না মঞ্জু—কে কাঁদছে? ওদের কান্নার এমন কিছু কারণ আছে যা নিখিল নিজের কান্না দিয়ে ভরে দিতে পারে না।

এক দিন ঘুম ভেঙে নিখিল বারান্দায় এসে দেখলে, বাড়ীওলার ছেলে ক'টি মিস্ত্রি নিয়ে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মঞ্জুদের ঘরে যাবার পথটি বন্ধ করে দিচ্ছে।

মঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ওর মনে যে মেঘ জমেছিল তা চোখে-মুখে থম-থম করছে।

"ব্যাপার কি মঞ্জু?"

মঞ্জু কোন কথা না বলে নিখিলের ঘরে এল। বুকের নিচ থেকে একটি চিঠি বের করে দিলে নিখিলের হাতে, বললে, "এই বাবার চিঠি।"

রুদ্ধশ্বাসে নিখিল চিঠিটি পড়লে:

"কল্যাণীয়াসু, যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো বাছা আমার ঘরে তোমার ঠাঁই হবে না। যদিও আমি এ সব কথা বিশ্বাস করি না, তবুও সব কিছু নিজে জানবার ও বোঝবার জন্ম কলিকাতায় রওয়ানা হচ্ছি। আশীর্ব্বাদক, বাবা।"

নিখিল ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারল, বাড়ীওলার পুত্রটি যে এর মূলে রয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না,—বিশেষ করে আজকের সকালের এই বেড়া দেবার তার তৎপরতা সব কিছু প্রকাশ করছিল।

মঞ্জু বললে, "দিদি কাঁদছেন, বলছেন, আজই চলে যাবেন।"

কোথায় যাবেন, সে প্রশ্ন নিখিল করল না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, মঞ্জু আমারই ভুল হয়েছে বোন, আমিই চলে যাচ্ছি, তোমার দিদিকে বল।"

মঞ্জু অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়ল, অসহায় জলভরা চোখ দু'টি তুলে বললে, "না"

কিন্তু এই 'না' নিখিলকে ধরে রাখতে পারল না। তার ঘর গৃহত্যাগী নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

মাতেও ফালকোনে

প্রস্পের মেরিমে

[প্রস্পের মেরিমে—১৮০৩—১৮৭০ : ফরাসী দেশের রাজধানী পারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু কাল সরকারী জলযান বিভাগে কাজ করে পরে আইন সভার সদস্য এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক প্রস্তর-শিল্পাবলীর পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

'আর্ট ফর আর্টস সেক' বলে যে কথাটা আছে মেরিমের শিল্পের মর্ম্মকথা তা-ই। মেরিমে রিয়ালিষ্ট। যা সাদা চোখে দেখা যায় তাই অত্যন্ত হিসাব করে, সংযত হয়ে, বিনা মন্তব্যে নিপুণ ভাবে লিপিবদ্ধ করে চলেন—কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলতে চান না। যে বর্ণনার বিষয় অন্য লেখক পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে লেখেন, মেরিমে সেখানে কয়েকটি মাত্র ছত্রে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তোলেন। সব রকমের ভাবপ্রবণতা জনিত আতিশয্য তাঁর চোখে হাস্যকর। মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বা আশা তাঁর মনে দোলা দেয় না। নিরাশাবাদী মেরিমে বলতে চান যেন সমস্ত ঘটনার নিরাসক্ত দর্শক তিনি; কখনও কোন বিষয়ে অভিভূত বা উত্তেজিত হন না—কোন সাংঘাতিক ঘটনাও যখন বর্ণনা করেন তখন তার মধ্যে নামে না তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস, ভাষা হয় না উচ্চকণ্ঠ। বলা হয়, তাঁর রচনা ক্রূরোক্তি এবং কঠোরতাপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরিমের রচনা সরল, সহজ, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংবদ্ধ। ফরাসীরা বলে, হিউগো উপন্যাস নিয়ে কখনো ঐতিহাসিক ইন্দ্রজাল, কখনো রূপক কাব্য রচনা করেছেন; জর্জ সাঁ তার মধ্যে ভরে দিয়েছেন সুরের মাধুর্য্য দ্বারা; বালজাক সেখানে খুঁজেছেন সমাজ-তত্ত্বের প্রশ্ন; স্তাঁদলে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র পেয়েছেন এর মধ্যে: কিন্তু মেরিমের কাছে উপন্যাস নিছক শিল্পের রচনা বই আর কিছু নয়।]

ভেকিও বন্দর থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে উত্তর-পশ্চিম মুখে বাঁক নিয়ে চলতে থাক সোজা দ্বীপটির মধ্যভাগের দিকে। দেখবে, বেশ খাড়াই হয়ে উঠছে জমি। আরও তিন ঘণ্টা আঁকা-বাঁকা পথে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ডিঙিয়ে, নালা পেরিয়ে, ঘুরে ঘুরে তুমি গিয়ে পৌঁছবে একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গলা দেশের প্রান্তে। এ রকম জায়গার নাম 'মাকি'। কর্সিকা-র মেষপালকদের আস্তানা এই 'মাকি', পুলিশের সঙ্গে যাদের হাঙ্গামা তাদেরও আস্তানা এই মাকি। তোমরা নিশ্চয় জান যে, কর্সিকার কৃষকরা জমিতে সার দেওয়ার ঝঞ্ঝাট না করে খানিকটা জায়গার গাছ-পালাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে-আগুন যদি প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায় ত দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। সে যাই হোক, ছাইয়ের সারে উর্ব্বর এমন জমিতে ফসল ফলে চমৎকার। ফলন্ত ফসল সংগ্রহ করেই তারা তুষ্ট হয়। অবশিষ্ট খড় কুড়াবার জন্য অনর্থক শ্রমব্যয়ে আর বিন্দু মাত্র ব্যগ্রতা দেখায় না। তার পর মাটির নীচে অক্ষত থাকে যে-সব বৃক্ষমূল, তার থেকে বসন্তাগমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ কচি শাখা—কয়েক বছরের মধ্যে এই কিশলয়গুলি সাত-আট ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। এই ধরণের ঘন ঝোপ-ঝাড়েরই নাম 'মাকি'। নানা রকমের গাছ আর যদৃচ্ছাবর্দ্ধিত লতাপাতায় জড়িয়ে এ সব তৈরী। মানুষ একটা কুড়ুল সঙ্গে নিলে তবে এর মধ্যে দিয়ে চলতে পারে। তবে আবার এমন নিবিড় এবং জঞ্জালপূর্ণ 'মাকি'-ও আছে যা বন্য ভেড়াও ভেদ করে যেতে পারে না।

আপনি যদি মানুষ খুন করে থাকেন ত ভেকিও বন্দরের 'মাকি'তে যান—একটি বন্দুক, বারুদ, আর নির্ভুল লক্ষ্য সম্বল করে সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন। পীতাভ বর্ণের জোব্বা এবং তার সঙ্গে একটা টুপী নিতে ভুলবেন না—এ দু'টি পেতে বসতে ও মাথার উপর আচ্ছাদনের কাজ দেবে। মেষ-পালকদের কাছে পাবেন দুধ, পনীর, বাদাম। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কিম্বা কোন আইনের ভয় নেই সেখানে। একমাত্র বিপদ হতে পারে যখন আপনাকে সহরে যেতে হবে গোলা-বারুদের সঞ্চয় আনতে।

আমি তখন কর্সিকায়। মাতেও ফালকোনের বাড়ী 'মাকি' থেকে তিন মাইল দূরে। সহর অঞ্চলে বেশ ধনবান বলে তার নাম। ভদ্রলোকের জীবন। কোন কাজ-কর্ম্ম করতে হত না, যাযাবর জাতীয় এক দল মেষপালক তার যে ভেড়ার দলকে পাহাড়ে পাহাড়ে চরিয়ে নিয়ে বেড়াত, তাতেই তার দৈনন্দিন জীবিকা সংস্থান হত। যে ঘটনার কথা এখন আমি আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি, তার দু'বছর পরে যখন তাকে আবার দেখি তখন মনে হল, অন্ততঃ আরো পঞ্চাশ বছর বুড়ো হয়ে গিয়েছে সে। কল্পনা করুন, একটি লোক—বেঁটে অথচ দৃঢ় গড়ন, নিকষ কালো কোঁকড়ানো চুল, সুতীক্ষ্ণ বড় বড় চোখ, বুট জুতোর চামড়ার মত গায়ের রঙ। সে দেশে অনেকেরই যেখানে হাতের টিপ চমৎকার, সেখানেও বন্দুকে তার হাতযশ অসামান্য বলে খ্যাতি পেয়েছিল। যেমন ধরুন, একটা বন্য ভেড়াকে ঘায়েল করতে সে কখনো বক্‌সট্ নিক্ষেপ করবে না; একশ' কুড়ি পা দূর থেকে বুলেট দিয়েই সে তাকে খুসীমত মাথায় কিম্বা কাঁধে বিদ্ধ করবে। দিনে-রাতে সে একই ভাবে অক্লেশে হাতিয়ার চালাতে পারে। আমি তার এই দক্ষতার প্রমাণ জানি। অবশ্য যারা কর্সিকায় ভ্রমণে যায়নি তাদের কাছে এ সব কথা হয়ত' অবিশ্বাস্যই মনে হবে। আশী পা দূরে প্লেটের মাপে কাটা স্বচ্ছ এক টুকরা কাগজের পেছনে একটি মোমবাতি জ্বালান হল। সে লক্ষ্য স্থির করে নিলে আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। এক মিনিট পরে ঘোরতম অন্ধকারের মধ্যে গুলী ছুঁড়ে চার বারের ভেতর তিন বারই সে কাগজ ভেদ করল।

এমন অদ্ভুত গুণের জন্য মাতেও ফালকোনের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়েছিল। লোকে বলত', বন্ধু হিসেবে সে যেমন চমৎকার তেমনি আবার শত্রু হিসাবেও কি ভয়ঙ্কর। পরোপকার এবং দান-ধ্যান করে ভেকিও বন্দরে প্রতিবাসীদের সঙ্গে সে বেশ সম্প্রীতি রেখেই দিন কাটাচ্ছিল। তবু তার সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি শোনা যায়। সেটা এই যে 'কোর্তে'-য় থাকতে (যেখান থেকে সে তার পত্নীকে নিয়ে আসে) যুদ্ধ এবং প্রেম উভয় বিষয়েই সুকঠোর তার এক

প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে নিদারুণ ভাবে পরাস্ত করেছিল। শোনা যায়, লোকটি যখন জানালার সামনে ঝোলান আয়নায় মুখ দেখে দাড়ি কামাচ্ছিল তখন মাতেওই না কি আচম্বিতে গুলী বর্ষণ করে। তার পর ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। মাতেও-ও বিয়ে করে বউ নিয়ে এল। স্ত্রী জিউসেপ্‌পা তাকে প্রথম তিনটি কন্যারত্ন উপহার দিলে, (এতে তার ক্রোধ সপ্তমে উঠেছিল।) শেষে তাদের একটি পুত্র জন্মাল। মাতেও তার নাম রাখল 'ফরতুনাতো'—বংশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, কুলপ্রদীপ। মেয়েদের সকলেরই বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে। দরকার হলে তাদের বাপ এখন জামাতাদের ছোরা-বন্দুক ব্যবহার করতে পায়। ছেলেটির সবে দশ বছর, কিন্তু এরই মধ্যে সব সুলক্ষণ চোখে পড়ে।

শরৎ কালের দিন। মাতেও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 'মাকি'র মধ্যে মাঠে এক জায়গায় তার ভেড়ার দল পর্য্যবেক্ষণে গিয়েছে। বালক ফরতুনাতো সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মাঠ অনেক দূরে বলে তাকে নেওয়া হয়নি। তা' ছাড়া গৃহরক্ষার কাজে এক জনের অন্ততঃ বাড়ীতে থাকার বিশেষ প্রয়োজন বৈ কি। বাপ বাধা দিলে: দেখা যাক, সত্যি সত্যিই না যেতে পেয়ে ওর মনে কোন দুঃখ হয় কি না।

মাতেও চলে যাবার পরে কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। বালক ফরতুনাতো রোদ্দুরে চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল নীল পাহাড়গুলির দিকে। সে ভাবছে, সামনের রবিবারে সহরে সেনাপতি কাকার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার কথা। এমন সময় বন্দুকের শব্দে তার চিন্তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এক লাফে উঠে ঘুরে দাঁড়াল মাঠের যে দিকে শব্দটা, তার দিকে। মধ্যে মধ্যে আরও কয়েক বার গুলীর শব্দ শোনা যায়। শব্দ ক্রমেই কাছের দিকে আসছে। শেষে মাঠ থেকে মাতেও-র বাড়ী আসার পথে একটি লোককে দেখতে পাওয়া গেল—তার মাথায় পাহাড়ীদের মত ছুঁচলো টুপী, মুখে দাড়ি, বস্ত্র শতছিন্ন, বন্দুকে ভর করে কোন রকমে হেঁচড়ে হেঁচড়ে আসছে। এই মাত্র একটা গুলী লেগেছে তার উরুতে।

লোকটা আইন-পরিত্যক্ত। রাত করে সহরে গিয়েছিল বারুদ সংগ্রহ করতে, কিন্তু কর্সিকার পদাতিক সৈন্যদলের চোরা-পাহারায় হাতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ আত্মরক্ষার্থ বেপরোয়া লড়াই করার পরে সবে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এক পাথরের আড়াল থেকে অন্য পাথরে যেতে যেতে সে গুলী ছুঁড়তে লাগল। অনুসরণকারীরা তাতেও হটল না। সৈন্যদের খুব আগে সে বেরিয়ে যেতে পারেনি। তা'ছাড়া, ধরা পড়বার আগে 'মাকি'-তে পৌঁছনোর যেটুকু আশাও বা ছিল, এই মাত্র আহত হবার ফলে তাও সম্পূর্ণ নির্মূল হল।

ফরতুনাতো-র কাছে এসে সে বললে: "তুই মাতেও ফালকোনের ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি জিয়ানেত্তো সানপিয়েরো। হলদে কলারওয়ালা শয়তানগুলো আমার পেছনে লেগেছে। আমি আর চলতে পারছি নে, কোথাও লুকনোর জায়গা করে দে।"

"বাবার বিনা অনুমতিতে তোমায় লুকিয়ে রাখলে তিনি কি বলবেন?"

"সে বলবে তুই ঠিক করেছিস।"

"কি করে জানলে তুমি?"

"আঃ, শীগ্‌গির লুকনোর জায়গা দে; ওগুলো এসে পড়ল বলে।"

"দাঁড়াও, বাবা আসুক।"

"দাঁড়াও! গর্দ্দভরাম! পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা যে এখানে হাজির হবে? চল্, আমায় লুকনোর জায়গা দে, নয়ত' তোকে যমালয়ে পাঠাব।"

ফরতুনাতো পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে জবাব দিল: "তোমার বন্দুকে গুলী নেই, আর তোমার থলিতেও কোন কার্তুজ দেখছি নে।"

"আমার ছোরা দেখছিস্?"

"কিন্তু আমার মত দ্রুত ছুটতে পারবে কি?" বলে এক লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল সে।

"তুই মাতেও ফালকোনের ছেলে নস্। তুই কি তোর বাড়ীর সামনে আমায় বন্দী হতে দিবি?"

বালক বিচলিত হল এবার: "তোমায় লুকিয়ে রাখলে কি দেবে তুমি?" সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

দুর্ব্বৃত্ত লোকটি কোমরে বন্ধনীর সঙ্গে সংলগ্ন ছোট চামড়ার থলে খুঁজে-পেতে পাঁচ ফ্রাঙ্কের একটি মুদ্রা বের করলে। অবশ্য বারুদ কেনার উদ্দেশ্যে ঐটি ছিল।

রৌপ্যমুদ্রাটি দেখে খুসিতে ফরতুনাতো-র মুখে হাসি এল। সে ফ্রাঙ্কটি হাতে নিয়ে বললে: "নির্ভয় হও।"

তৎক্ষণাৎ সে গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী খড়ের গাদায় মস্ত বড় একটা গর্ত্ত করে ফেললে। জিয়ানেত্তো তার ভেতর গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লে বালক আবার সেটি একটুখানি নিশ্বাস নেবার মত ফাঁক রেখে বেশ করে ঢেকে দিলে; কারও কোন সন্দেহ হবার উপায় রইল না যে তার মধ্যে একটি মানুষ রয়েছে। নিজেকে চতুরের শিরোমণি ভাবল সে। একটা বেড়ালকে তার বাচ্চাকাচ্চা সহ এনে সে খড়ের গাদার ওপর বসিয়ে দিলে, ভাবটা যেন অনেকক্ষণ তাতে কারুর হাত পড়েনি। তার পর বাড়ীর কাছে পথের ওপর রক্তের দাগ রয়েছে চোখে পড়তেই কিছুটা বালি এনে সেখানে ছড়িয়ে দিলে। সব নিষ্পন্ন হয়ে গেলে আবার সে রোদ্দুরের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল।

মিনিট ছয়েক পরে হলদে কলার দেওয়া পল্টনী পোষাক পরে ছ'জন লোক মাতেও-র বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত। তাদের দলপতি এক জন সহকারী সেনাধ্যক্ষ। সহকারী সেনাপতিটির মাতেও-র সঙ্গে কি একটা দূর সম্পর্ক ছিল। (এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, কর্সিকায় আত্মীয়তার সম্বন্ধ লতায়-পাতায় জড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়)। লোকটির নাম তিওডোরো গাম্বা। বলবান লোক, দুর্ব্বৃত্তরা তাকে বাঘের মত ভয় করে চলে—তাদের অনেককে সে নিপাত করেছে।

"সুপ্রভাত, ভাগ্নে," ফরতুনাতোকে সম্বোধন করে সে বলল। "তুমি যে দেখছি মস্ত বড় হয়ে গিয়েছ। এখন এদিক্ দিয়ে কোন লোক গিয়েছে দেখেছ?"

"কি যে বল, আমি কি তোমার মত বড়", অত্যন্ত সহজ ভাবে সে উত্তর দিল।

"ক্রমে ক্রমে হবে। এখন বল ত, এদিক্ দিয়ে কোন লোককে যেতে দেখনি?

"কোন লোককে যেতে দেখেছি কি না ?"

"হ্যাঁ, মাথায় ছুঁচলো টুপী, গায়ে লাল এবং হলদে রঙের ডোরা-কাটা জামা ?"

"মাথায় ছুঁচলো টুপীওয়ালা একটা লোক, তার গায়ে লাল এবং হলদে রঙের ডোরাকাটা জামা ?"

"হ্যাঁ, শীগ্‌গির বল, আমার প্রশ্নগুলো আর ওগরাতে হবে না।"

"আজ সকালে পাদ্রী সাহেব তাঁর ঘোড়া পিয়েরোর পিঠে চড়ে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কেমন আছেন, আমি বললাম..."

"পুঁচকে শয়তান, বোকামীর যায়গা পাওনি ! বল, জিয়ানেত্তো কোন্ দিকে গিয়েছে। তাকেই আমরা খুঁজছি। আমি ঠিক জানি, সে এই পথে এসেছে।"

"কে বললে ?"

"কে বললে ? আমি নিজে দেখেছি তাকে।"

"আচ্ছা, তুমিই বল, ঘুমিয়ে থাকলে কেউ কি রাস্তার লোক দেখতে পায় ?"

"পাজী, তুমি ত ঘুমিয়ে ছিলে না ; বন্দুকের শব্দে তোমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

"মামা, তুমি কি ভাব, তোমার ক্ষুদে বন্দুকে এতই আওয়াজ হয় ? আমার বাবার রাইফেলে ওর চেয়েও বেশী শব্দ হয়।"

"জাহান্নমে যা তুই, উল্লুক কোথাকার। আমি ঠিক বুঝতে পারছি, তুই জিয়ানেত্তোকে দেখেছিস্। এমন কি হয়ত তাকে তুই-ই লুকিয়ে রেখেছিস্। বন্ধুগণ চল, ঘরে ঢুকে পড়ি, দেখা যাক, আমাদের লোকটা সেখানে আছে কি না। লোকটা এক পায়ে হাঁটছিল। শয়তানটার এটুকু বুদ্ধি নিশ্চয় ছিল যে, ঐ অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 'মাকি'তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তা'ছাড়া রক্তের দাগ এই পর্য্যন্ত এসে মিলিয়ে গেছে।"

"বাবা কি বলবে তাহলে ?" মৃদু হাসির সঙ্গে বলে ফরতুনাতো ; "কি বলবে যখন এসে শুনতে পাবে যে তার অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকেছিল ?"

"বদমাস !" সহ-সেনাপতি গাম্বা তার কাণ ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, "জানিস্, ইচ্ছা করলে আমি তোকে উল্টো সুরে কথা বলাতে পারি ? আমার তরোয়ালটার চওড়া ধারের বিশ-পঁচিশ ঘা পিঠে না পড়লে বোধ হয় তোর মুখ খুলবে না।"

ফরতুনাতো তেমনি মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

"আমার বাবা মাতেও ফালকোনে," বেশ জোর দিয়ে সে বললে।

"ছোকরা, উল্লুক, জানিস্ ইচ্ছা করলে তোকে আমি কোর্ট্তে কিংবা বাস্তিয়াতে টেনে নিয়ে যেতে পারি ? সেখানে পায়ে লোহার বেড়ি পরে জেলের মধ্যে খড়ের ওপর ঘুমুতে হবে। এবার যদি জিয়ানেত্তো সানপিয়েরো কোথায় না বলিস ত তোর মাথা কেটে ফেলব।"

বালক এই হাস্যকর ভীতি প্রদর্শনে হো-হো করে হেসে উঠল। সে আবার বললে : "আমার বাবা মাতেও ফালকোনে।"

"দলপতি," সৈন্যদের এক জন খুব নীচু গলায় ডাকল, "মাতেও-র সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে কাজ নেই।"

বেশ বোঝা গেল, গাম্বা বিব্রত হয়ে পড়েছে। তার যে অনুচরেরা ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল তাদের মৃদু স্বরে সে কি বললে। এটা কিছু বেশীক্ষণের কাজ নয়। কর্সিকাবাসীর কুটীর মাত্র একখানি চতুষ্কোণ ঘর নিয়ে। আসবাব-পত্রের মধ্যে একখানি টেবিল, খান কয়েক বেঞ্চি, সিন্দুক, তৈজস-পত্র এবং শিকারের অস্ত্রপাতি। ততক্ষণে বালক ফরতুনাতো বেড়ালটাকে আদর করতে থাকে, তার বেশ একটা কুটিল আনন্দ হতে লাগল—মামা এবং তার সৈন্যদল অপদস্থ হয়েছে বলে।

একটি সৈন্য খড়ের গাদার কাছে এল। বেড়ালটার দিকে তার চোখ পড়ল গিয়ে। অন্যমনস্ক ভাবে সঙ্গীনটা সে একবার খড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেখল তার পর একটা কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল, যেন সে নিজেই বুঝতে পারছিল যে, তার এ সাবধানতা কতখানি হাস্যকর। কিন্তু কোন নড়া-চড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বালকের মুখে তাতেও কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই।

সহ-সেনাপতি এবং তার অনুচরেরা অদৃষ্টকে গালমন্দ দিতে লাগল। মাঠের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে দেখছিল তারা। যেন যেদিক থেকে এসেছিল তারা সেখানেই আবার ফিরে যাবে ভাবটা এই। এমন সময় তাদের নেতার দৃঢ় প্রতীতি হল যে, ফালকোনের ছেলেকে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না, স্নেহ এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্।

"ক্ষুদে মামা," সে বললে, তুমি দেখছি পাকা চতুর হয়ে উঠেছ। তোমার অনেক আশা আছে। কিন্তু তুমি একটা মারাত্মক খেলা খেলছ আমাদের সঙ্গে। কেবল মাতেও-র সঙ্গে ঝগড়া বাধবে বলে— না হ'লে ঠিক বলছি, এতক্ষণ তোমাকে নিয়ে আমি সরে পড়তাম।

"তাই না কি ?"

"দাঁড়াও, আমার ভাই ফিরে এলে তাকে সব বলে দেব। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ ; চাবুক মারতে মারতে সে তোমার রক্ত বের করে দেবে।"

"তুমি কি করে জানলে ?"

"দেখতেই পাবে...কিন্তু শোন...ভাল ছেলের মত হও, একটা জিনিষ পাবে তা'হলে।"

"মামা, আমি তোমাকে একটু সদুপদেশ দিই। তা এই যে, এখানে যদি আর এক মুহূর্ত্তও গড়িমসি কর ত জিয়ানেত্তো 'মাকি'তে পৌঁছে যাবে। তখন সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করা তোমার মত লোকের কম্ম নয়।"

সহ-সেনাপতি পকেট থেকে একটা রূপোর ঘড়ি টেনে বের করলে। সেটার দাম দশ ক্রাউন। ফরতুনাতোর চোখ সেদিকে পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা লক্ষ্য করে সে ইস্পাতের চেনে ঝোলানো ঘড়িটাকে নাচাতে নাচাতে বললে :

"খোকা ! এ রকম একটা ঘড়ি যদি তোমার গলায় ঝোলে ত কত খুশী হতে পারবে। ভেকিও বন্দরের রাস্তা দিয়ে তখন অহঙ্কারী ময়ূরের মত বুক ফুলিয়ে হাঁটবে। লোকে এসে তোমায় জিজ্ঞেস করবে, ক'টা বেজেছে বলতে পার ?" তুমি জবাব দেবে, "দেখুন না, এই ত আমার ঘড়ি।"

"বড় হলে আমার যে কাকা সেনাপতি, সে-ই আমাকে ঘড়ি দেবে।"

"তা ঠিক। কিন্তু তোমার কাকার ছেলে এখনই একটা ঘড়ি পেয়েছে...অবশ্য সেটা এটার মত এত ভাল নয়...তা'ছাড়া সে ত তোমার চেয়ে অনেক ছোট।"

বালকের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"কি বল তাহলে, ঘড়িটা পছন্দ হয়?"

ফরতুনাতো আড়চোখে ঘড়িটার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখে। তার অবস্থা হল যেন কোন বেড়ালকে একটা গোটা মুরগীর ছানা দেওয়া হয়েছে। বেড়ালটা সেটাকে আক্রমণ করতে পারছে না লোকে হাসবে বলে, আর মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে লোভের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায়, অথচ অনবরত জিব চেটে চলেছে, যেন সে তার প্রভুকে বলতে চায়, "এ কি নিদারুণ রসিকতা!"

সহ-সেনাপতি গাম্বা কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘড়িটা দিয়ে দিতে উদ্যত। ফরতুনাতো হাত বাড়ালো না, কিন্তু বিরস হাসির সঙ্গে বললে: "তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ যে?"

"দোহাই ঈশ্বরের, আমি একটুও হাসছি না। খালি বলে দাও, জিয়ানেত্তো কোথায় তা'হলেই ঘড়িটা তোমার।"

ফরতুনাতোর মুখে আসে একটা অবিশ্বাসের হাসি। কালো চোখ দু'টি সহ-সেনাপতির চোখের উপর নিবদ্ধ করে সে দেখতে চেষ্টা করে তার কথাগুলির মধ্যে কতখানি সত্যতা থাকতে পারে।

"আমার এই কাঁধের পল্টনী তক্‌মা সব ফেলে দেব", বলে উঠল সহ-সেনাপতি, "যদি যে সর্ত্ত বলেছি তার পরিবর্ত্তে ঘড়ি না দিই। আমার অনুচররা সাক্ষী, কথার খেলাপ হবে না।"

বলে ঘড়িটাকে সে কাছে আনতে আনতে একেবারে বালকের বিবর্ণ গালের কাছে নিয়ে এল। বালকের মধ্যে লোভ এবং আতিথ্য-ধর্ম্মের সম্মানে কি দ্বন্দ্ব চলছিল, মুখে তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। তার অনাবৃত বক্ষ ফুলে ফুলে উঠছে, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। ঘড়িটা দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে তার নাকের ডগায় এসে স্পর্শ করতে লাগল। শেষে আস্তে আস্তে তার ডান হাতখানি ঘড়িটার দিকে উঠে গেল, আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করল সেটাকে, তার সমস্ত ওজন অনুভব করলে সে। কিন্তু চেনের প্রান্ত তখনও সহ-সেনাপতির হাতে···ঘড়িটার সম্মুখ-ভাগ নীল রঙের···ঝকঝকে নতুন আধার···সব বোধ হল যেন আগুনের মত জ্বলছে···প্রলোভন জয় করা অসম্ভব।

ফরতুনাতো তার বাঁ হাত তুললে, যে খড়ের গাদায় সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাঁধের উপর দিয়ে আঙুল তুলে তার দিকে সে ইঙ্গিত করলে। সহ-সেনাপতির বুঝতে এক দণ্ডও বিলম্ব হল না। চেনের প্রান্ত ফেলে দিলে সে। ফরতুনাতো এখন ঘড়িটার একমাত্র মালিক। হরিণের মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক লাফে খড়ের গাদার থেকে দশ পা দূরে এসে সে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা খড়ের বোঝা সরাতে লেগে গেল।

অল্প একটু পরেই খড়ের মধ্যে কি একটা জিনিষ নড়তে দেখা গেল। রক্তাক্ত দেহ একটা লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে ছোরা। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আঘাত জনিত অসাড়তার জন্য সোজা হয়ে উঠতে পারলে না। গড়িয়ে পড়ে গেল। সহ-সেনাপতি তার ওপর লাফিয়ে পড়ে তার হাত থেকে কুরকিটা কেড়ে নিলে। সে বাধা দিতে লাগল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে একটুও সময় লাগল না।

ভূমি-শায়িত, এক বোঝা খড়-কুটোর মত রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় জিয়ানেত্তো নিকটবর্ত্তী ফরতুনাতোর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল: "তোর বাপ···!" তার কথার মধ্যে রাগের চেয়ে ঘৃণা বেশী ফুটে ওঠে।

তার কাছ থেকে পাওয়া রৌপ্য-মুদ্রাটা বালক তারই দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তাতে ওর এখন আর কোন অধিকার নেই। দুর্ব্বৃত্ত লোকটা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। সে বেশ নির্ব্বিকার ভাবে সহ-সেনাপতিকে বলল: "ভাই গাম্বা, দেখছ ত আমি হাঁটতে পারছি নে; আমায় সহর পর্য্যন্ত তোমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"এইমাত্র না তুমি জোয়ান পাঁঠার মত ছুটছিলে?" নির্দ্দয় বিজয়ী পিঠ-পিঠ জবাব দিলে। "যাক, ভেবো না। তোমায় পাকড়াও করে আমি এত সুখী যে এখন যদি তোমায় পিঠে করেও তিন মাইল বয়ে নিয়ে যেতে হয় ত সে ভার আমার গায়ে লাগবে না। যা হোক দোস্ত, তোমার জন্য তোমার জোব্বা আর গাছের ডাল দিয়ে একটা পাল্কী তৈরী করে নেব আর ক্রেস্‌পলির খামার থেকে একটা ঘোড়া যোগাড় হবে'খন।"

"বেশ, বেশ," বন্দী উত্তর করলে; "আমার আরামের জন্য পাল্কীতে একটু খড়ও পেতে দিও, দেবে না কি?"

সৈন্যরা কাজে লেগে গেল। কেউ বাদাম গাছের ডাল দিয়ে বহন-শয্যা তৈরী করছে, কেউ বা জিয়ানেত্তোর ক্ষতস্থানের পরিচর্য্যা করছে। এমন সময় যে রাস্তাটা 'মাকি'র দিকে চলে গিয়েছে অকস্মাৎ তার মোড়ে মাত্তেও এবং তার স্ত্রীকে দেখতে পাওয়া গেল। স্ত্রী আগে আগে আসছে। মস্ত এক-ছালা বাদাম কুঁজো হয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসছে সে। স্বামীটির হাতে একমাত্র বন্দুকটি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই, আর একটা বন্দুক তার পিঠের ওপর ঝোলান। পুরুষের পক্ষে অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু ভার বহন করা অসম্মানকর।

সৈন্যদের দেখে মাত্তেওর প্রথম মনে হল, তারা তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। কেন এ কথা তার মনে হল? মাত্তেও কি আইন-বিরুদ্ধ কিছু করেছে? মোটেই তা নয়। তার যথেষ্ট সুনাম আছে। কথায় বলে যে 'ভাল মানুষ', সে তা-ই। তবে সে এক জন কর্সিকা-বাসী, উপরন্তু পাহাড়ী। আর কর্সিকার পর্ব্বতারোহীদের মধ্যে এমন লোকের দেখা মেলা ভার, যে বলতে পারে তার স্মৃতিতে কোন লঘু অপরাধ, গুলীবর্ষণ, ছুরিকাঘাত বা অন্য রকমের কোন ছোট-খাট ঘটনার চিহ্ন নেই। সে তুলনায় মাত্তেওর বিবেক অন্যের চেয়ে বেশী নিষ্পাপ বলতেই হবে। দীর্ঘ দশ বছর আগে সে একবার একটি লোকের দিকে গুলীবর্ষণ করেছিল। যা হোক, মাত্তেও সতর্ক হল, প্রাণরক্ষার্থ দরকার হয় যদি তারই জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলে সে।

"বউ," জিউসেপ্পাকে ডেকে বললে সে, "বস্তা নামিয়ে রাখ। তৈরী হয়ে নে।"

আদেশ প্রতিপালিত হল। অসুবিধে হতে পারে ভেবে সে তার কোমর সংলগ্ন থলে থেকে বন্দুকটা স্ত্রীর হাতে দিলে। একটা বন্দুকে গুলী ভরে নিয়ে গাছের পাশ দিয়ে দিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলতে লাগল। শত্রুতার আভাষ পাওয়া মাত্র মাত্তে সে সব চেয়ে মোটা গাছটার আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করে গুলী চালাতে পারে। তার স্ত্রী পেছন পেছন আসছিল অন্য বন্দুকটা এবং কার্ত্তুজের বাক্স নিয়ে। যুদ্ধের সময়ে অনুগত স্ত্রীর কর্ত্তব্য হল, যুদ্ধে প্রচুর গোলা-বারুদ যোগান দেওয়া।

অপর দিকে মাত্তেওকে এ ভাবে ঘোড়ার হাত দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে, পা টিপে-টিপে এগুতে দেখে সহ-সেনাপতির ভীষণ ভয় লেগে গেল।

সে ভাবলে, মাত্তেও যদি জিয়ানেত্তোর আত্মীয় কিংবা বন্ধু হয়, আর তাকে যদি সে রক্ষা করতে চায় ত তা'র দুটি বন্দুক থেকে দুইটি বুলেটে চিঠি ফেললে তা যেমন ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয় তেমনি নির্ঘাৎ তার গায়ে এসে লাগবে। আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা সত্ত্বেও সে যদি আমায় লক্ষ্য করে বসে···

এমনি সঙ্কটাবস্থার মধ্যে সে একটা খুব সাহসের সঙ্কল্প করে বসলে। সে ঠিক করলে, সে নিজেই এগিয়ে যাবে মাত্তেও-র কাছে, পুরনো পরিচয়ের সম্ভাষণ জানিয়ে তাকে ব্যাপার কি, বলবে খুলে কিন্তু মাত্তেও-র কাছ থেকে তার মধ্যে যে সামান্য দূরত্বটুকু তা যেন আর শেষ হতে চায় না।

"আরে বন্ধু মাত্তেও যে", সে চেঁচিয়ে উঠল, "কি খবর, কি রকম আছ? আমি, আমি—গাম্বা, তোমার ভাই।"

মাত্তেও নিঃশব্দে দাঁড়াল। এই কথা শুনে আস্তে আস্তে বন্দুকের নলটি উপরের দিকে তুলতে আরম্ভ করলে মাত্তেও। সহ-সেনাপতিটি যখন কাছে এসে পড়ল তখন দেখা গেল, সেটির মুখ একেবারে আকাশের দিকে।

"সুপ্রভাত," হাত বাড়িয়ে সম্ভাষণ জানালে দলপতি। "বহু দিন পরে দেখা হল।"

"সুপ্রভাত।"

"যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে, ভাবলাম তোমায় আর ছোট্ট পেপাকে দেখে যাই। আজ অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে। তবে অবশ্য সে-জন্য কোন আপশোষ নেই। কারণ একটা মস্ত শিকার পাওয়া গিয়েছে। এইমাত্র জিয়ানেত্তো সানপিয়েরোকে আমরা কয়েদ করেছি।"

"ভগবানের কি দয়া," বলে জিউসেপ্‌পা, "গত সপ্তাহে ডাকাতটা আমাদের একটা সোমত্ত ছাগল চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

এই কথা শুনে গাম্বা আরও খুসী হল।

"হতভাগাটা খিদের জ্বালায় মরছিল," বললে মাত্তেও।

"বদমায়েসটা সিংহবিক্রমে আত্মরক্ষা করছিল," একটু অপ্রতিভ হয়ে আবার বলে চলেন: "আমার দলের একটাকে নিপাত করেছে, অধিকন্তু কর্পোরাল সারদনের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। তবে সে জন্য তেমন দুঃখ করার কিছু নেই, সারদন ত ফরাসী···লোকটা তার পর এমন ভাবে লুকিয়েছিল যে কার সাধ্য খুঁজে বের করে। বাচ্ছা ভাগ্নে ফরতুনাতো না থাকলে আমি তাকে বের করতেই পারতাম না।

"ফরতুনাতো।" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে মাত্তেও।

"ফরতুনাতো।" তেমনি প্রতিধ্বনি করে বলে জিউসেপ্‌পা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জিয়ানেত্তো ওই খড়ের গাদার নীচে লুকিয়েছিল। ভাগ্নে তার চালাকিটা আমার ধরিয়ে দিলে। ওর কাকা কর্পোরালকে আমি বলব গিয়ে, সে একটা চমৎকার পুরস্কার পাঠিয়ে দেবে। সরকারী পক্ষের অভিযোগকারীর কাছে যে নালিশ-পত্র পাঠাব আমি, তাতে তোমাদের দু'জনেরই নাম থাকবে।"

"গোল্লায় যাক ও-সব।" নিম্নস্বরে বললে মাত্তেও।

তারা এতক্ষণে সৈন্যদের কাছে এসে পড়েছে। জিয়ানেত্তোকে পাল্কীর ওপর শোয়ান হয়েছে। তারা যাবার জন্য প্রস্তুত। মাত্তেওকে গাম্বার সঙ্গে দেখে সে একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করে হাসল। তার পর বাড়ীর দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দোরগোড়ায় থুথু ফেলে বললে: "বিশ্বাসঘাতকের বাড়ী।"

একমাত্র মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েই কারুর পক্ষে ফালকোনেকে এমন ভাবে বিশ্বাসঘাতক বলা সম্ভব! একটি বার মাত্র ছুরিকাঘাত, ব্যস, আর কিছু না, তাতেই অপমানের শোধ তুলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাত্তেও এ সব কিছুই করলে না। শুধু কপালে হাত দিয়ে বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাপকে আসতে দেখে ফরতুনাতো বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল। এবার সে বেরিয়ে এল। তার হাতে এক বাটি দুধ। সেটি সে দৃষ্টি ভূমি-নিবদ্ধ করে জিয়ানেত্তোর সামনে রাখলে।

"সরে যা।" বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠল জিয়ানেত্তো। তার পর এক জন সৈন্যকে লক্ষ্য করে বলল: "এস, পানীয় কিছু থাকে ত দাও।"

সৈন্যটি নিজের জলাধারটি তার হাতে দিলে। এই মাত্র যার সঙ্গে গুলী-গোলা চালাচ্ছিল এখন তার হাত থেকেই পাত্রটি নিয়ে সে জল খেতে লাগল। তার পর বললে, তার হাত দু'টো পেছন থেকে খুলে সামনে বুকের ওপর ক্রুশের মত বেঁধে দিতে।

"আমি একটু আরামে শুতেই পছন্দ করি", সে বললে।

সবাই তাকেই খুসী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। অতঃপর সহ-সেনাপতিটি চলার সঙ্কেত করলে। মাত্তেওকে সে বিদায় জানালে। মাত্তেও কোন জবাব দিলে না। তারা দ্রুত-পদক্ষেপে মাঠের দিকে চলে গেল।

দশ মিনিট বাদে মাত্তেও কথা বললে। ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে বালক একবার তার মা'র দিকে আর একবার তার পিতার দিকে তাকাতে লাগল। বাপ তখন বন্দুকের ওপর ভর করে দারুণ রাগে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

"আরম্ভটা ভালই করছ দেখছি", অবশেষে সে বললে। তার স্বর শান্ত। কিন্তু সে কণ্ঠের ভীষণ অর্থ যারা তাকে চেনে তাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না।

"বাবা!" কেঁদে উঠল বালক। চোখে তার জল। এগিয়ে আসতে লাগল সে যেন বাপের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে বলে।

কিন্তু মাত্তেও বজ্র-স্বরে বলে উঠল: "দূর হও আমার সম্মুখ থেকে!"

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বালক। তার পিতার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

জিউসেপ্‌পা এগিয়ে এল। ফরতুনাতোর সার্ট থেকে যে ঘড়ির চেনটা ঝুলছিল সেটা এই মাত্র তার চোখে পড়েছে।

"ও-ঘড়ি কে দিয়েছে তোমায়?" কঠোর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে।

"মামা, সহ-সেনাপতি।"

ফালকোনে ঘড়িটা নিলে। সেটাকে সে সবেগে ছুঁড়ে ফেলে দিলে একখণ্ড পাথরের গায়ে। সহস্র খণ্ডে চুরমার হয়ে পড়ল সে-ঘড়ি।

বলল, "বউ, এ কি আমার সন্তান?"

জিউসেপ্‌পার গাল দু'টি ইঁটের মত লাল হয়ে উঠল।

"মাতেও, কি বলছ তুমি ? জান তুমি, কার সঙ্গে কথা বলছ ?"

"বলছি, এ-বংশে এই সন্তানই প্রথম বিশ্বাসঘাতক হল।"

ফরতুনাতোর কান্না আর ফোঁপানি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ফালকোনের বেড়ালের মত চোখ তার দিকে স্থির নিবদ্ধ। অবশেষে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাটিতে ঠুকে সেটাকে সে পিঠের ওপর তুলে নিল। তার পর 'মাকি'র দিকে হাঁটা দিল। তার আদেশ পালন করে ফরতুনাতোও পেছন পেছন চলল।

জিউসেপ্‌পা ছুটে গিয়ে মাতেওর হাত ধরল।

"ও তোমার ছেলে." কম্পিত কণ্ঠে বললে সে। তার কালো চোখ দু'টি স্বামীর চোখের ওপর রেখে সেখানে কি অভিপ্রায় রয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করলে।

"ছাড়, আমি ওর বাপ," উত্তর দিলে মাতেও।

জিউসেপ্‌পা পুত্রকে চুম্বন করে কাঁদতে কাঁদতে গৃহে ফিরে গেল। মাতা মেরীর একটা প্রতিমূর্ত্তির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে সমগ্র হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল সে। এদিকে ফালকোনে হেঁটেই চলেছে। দু'শ পা অতিক্রম করে একটা পার্ব্বত্য নালার মধ্যে এসে থামল সে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দেখল সেখানকার মাটিটা বেশ নরম, খুঁড়তে কষ্ট হবে না। এইটেই উপযুক্ত যায়গা।

"ফরতুনাতো, ওই বড় পাথরটার ওপরে গিয়ে ওঠ।"

বালক আজ্ঞা পালন করে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসল।

"তোমার প্রার্থনা বলে নাও।"

"বাবা, বাবা, আমায় মেরো না!"

"তোমার প্রার্থনা বলে নাও!" ভীষণ কণ্ঠে আদেশ করল মাতেও।

স্খলিত স্বরে, আবদ্ধ কান্নায় বালক 'পাতের' আর 'ক্রেডো' বলা শেষ করল। প্রত্যেকটি প্রার্থনার শেষে তার বাবা 'আমেন' বলে উত্তর দিচ্ছিল।

"তোমার জানা প্রার্থনা এই-ই সব ?"

"বাবা, 'আভে মারিয়া' আর মাসি যে 'লিটানি' শিখিয়েছিল তাও আমি জানি।"

"ওটা মস্ত বড়, যাক, ক্ষতি নেই।"

বালক রুদ্ধ কণ্ঠে লিটানি আবৃত্তি শেষ করল।

"সব শেষ হয়েছে ত ?"

"বাবা, রক্ষা কর, ক্ষমা কর! আর করব না! কাকা কর্পোরালকে আমি এমন ভাবে অনুনয় করব যে, তিনি জিয়ানেত্তোকে ছেড়ে দেবেন!"

সে বলে চলেছিল। মাতেও তার মধ্যে বন্দুকে গুলী ঠিক করে নিশানা নিয়ে বলল: "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন!"

বালক শেষ চেষ্টা করল একবার উঠে গিয়ে পিতার চরণ জড়িয়ে ধরার জন্যে। কিন্তু অত সময় হল না। মাতেও গুলী ছুঁড়ল। ফরতুনাতোর দেহ পাথরের মত গড়িয়ে পড়ে গেল।

মৃতদেহের দিকে ফিরে আর একটি বারও তাকালে না মাতেও। বাড়ীর দিকে চলল সে, পুত্রের কবর দেওয়ার জন্য মাটি খুঁড়তে হবে, তাই কোদাল আনতে। সে সবে মাত্র কয়েক গজ অগ্রসর হয়েছে এমন সময় সাক্ষাৎ হল জিউসেপ্‌পার সঙ্গে—বন্দুকের শব্দ শুনে শঙ্কিত ভাবে ছুটে আসছিল সে।

"কি করলে তুমি ?" চেঁচিয়ে ওঠে জিউসেপ্‌পা।

"ন্যায়বিচার।"

"কোথায় সে ?"

"নালার ভেতর। আমি আসছি, ওকে কবর দিতে হবে। ও খৃষ্টান হয়েই মরেছে। ওর জন্য একটা শোকপালনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর খবর পাঠাও আমার জামাই তিওডোরো বিয়ানকিকে, এসে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

অনুবাদক : শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

স্বপ্নের হেমন্ত

(আধুনিক চেক কবি V. Dyk এর কবিতা থেকে)

সন্ধ্যায় একটি কাক ডাকতে ডাকতে কুলায় ফিরল
আমারও হৃদয় যেন সহসা খুলে গেল।

হেমন্তের দিনগুলি বিষাদ আনে,
মাঠে মাঠে ফুল ফোটে না;
গাছে গাছে পাখিরা আর গান গায় না।

কিন্তু গ্রামে গ্রামে সবাই খুশী:
মানুষেরা ফসল সংগ্রহ করে;
আর ক্ষেতে ক্ষেতে রোপন করে।

একাকী আমি প্রতিবেশীর গোলায়
চুপে চুপে এসে দাঁড়াই:
চেয়ে দেখি অন্য সবাই কী গভীর আনন্দ করে

একটি সন্ধ্যায় কাকের উদাস ডাকে
আমারও হৃদয় যেন সহসা খুলে গেল।

অনুবাদক : অপেশ গুপ্ত

হে নাবিক

নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

আমাদের তরী বন্দর হতে
ভেসে গেছে বহু কাল
হে নাবিক!
ঝঞ্ঝা হাসিছে উত্তাল বেগে
বিঘ্ন কুটিল জাল
দুর্জ্জন নির্ভীক।
হে নাবিক!

বুক চিরে যারা রক্তে ধুয়েছে
আস্তাকুড়ে ও ড্রেনে।
ভেঙে গেল যারা কারা-শৃঙ্খল
বিধান নেয়নি মেনে।
ভৈরবী যার সভায়, শক্তি
নিত্য করিছে দান
কাপালিক তারা,—
মুঠোয় তাদের খড়্গ সে খরসান।
ভেসে গেল কোথা কূল ছেড়ে আর
বন্ধন কেটে, গাই
তাদের মাঙ্গলিক।
দুর্গম পথে পথিক তাহারা
দুর্জ্জয় নির্ভীক।
হে নাবিক!

হেথা যারা আছে পাল কষে আর
নোঙর মাটিতে গেড়ে,
বিজয়লক্ষ্মী তাদের গিয়েছে ছেড়ে,
ঝঞ্ঝা তাদের আছড়ায় আর
ঢেউ দিয়ে যায় ঠেলা।
সাইক্লোন আসে ভাঙিতে তাদের
নির্জ্জীবনের মেলা
ধ্বংসের বেশে নামে মহাকাল
মুক্তি মন্ত্র নিয়ে,
তারি ছবি হোথা আঁকিছে মানুষ
বুকের রক্ত দিয়ে।

এ তো নহে খুন শাণিত অস্ত্রে
আততায়ীদের হাতে
আচমকা অপঘাতে।
বহু যুগ হতে যে মানুষ শুধু
মরিয়াও আজো বাঁচে,
ওরা শুধু তার কঙ্কালটিরে
ধরাশায়ী করিয়াছে।
ওরা নহে কাপুরুষ।

মানুষ মারার ব্যবসায় ওরা
লুকিয়ে নেয়নি ঘুষ
মানুষের হাত থেকে,
মহা বিপ্লব দেবতা ওদের
ঘুম ছুটায়েছে ডেকে।
জাগিয়াছে তারা, তাই,
মড়কে শ্মশান ভরে গেছে, জানি,
তবু শেষ হয় নাই।

অন্ধ তবুও চোখ পেল না তো
মৃত পেল না তো প্রাণ,
মানব-কণ্ঠে তবু তো ফোটে না
মহা মানুষের গান।
তোমরা করেছ ঠিক,
আসে সাইক্লোন হাল ধরে থাকো
হে নাবিক নির্ভীক!

এখনো ভাগাড়ে কাঁদিছে শৃগাল
শকুনি আকাশে উড়ে।
আলপনা আঁকা রক্ত আখরে
শ্যামলের বুক জুড়ে।
এখনো অস্ত্র শানিছে বিজুলি
বজ্র হানিছে মেঘে।
অগ্নি ক্ষরায় তপ্ত তপন
ঘূর্ণির মোহ বেগে।
এখনো পবন বিষ-নিশ্বাসে
শুকায় শিশির ধারা।
ফুলের নিবিড়ে ফলের বেদনা
এখনো কাঁদিয়া সারা।
লক্ষ্মীর লাগি এখনো কাঁদিছে
বাসনায় শয়তান।
যৌবন তার খসে ঝরে গেল
তবু পূরিল না প্রাণ।

তবে আর মোর মোহ নাহি, আর
নাই ভয় নাই লাজ।
মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াব রুখিয়া
শয়তান দেবরাজ।
খড়্গ আমার খরসান আর
কৃপাণে দিয়েছি ধার।
মায়ের বুকেতে কোথা আছে শিশু
সন্ধান লব তার।
ছুটেছি দিগ্বিদিক;
রক্ত-নিশানে মুক্তির বাণী
কণ্ঠে মাঙ্গলিক।
কূল-ছাড়া আর বাঁধ-ভাঙা মোরা
দুর্জ্জয় নির্ভীক।
অকল্যাণের নাম-হারা কূলে
যাত্রী মোরা নাবিক!

লাল কিল্লা লালে লাল

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

লাল কিল্লার কথা ওঠানো এখন হয়তো অবান্তর। হোক্ অবান্তর। কিন্তু এই লাল কিল্লার পাশেই ইতিহাসখ্যাত রাজঘাটে এই তো সে-দিন মহামানব মহাত্মা গান্ধীর অন্তিম শয্যা রচিত হোল। আর যে জায়গায় তাঁর বক্ষভেদ করে লাল রক্ত ছুটলো, সেও খুব দূরে নয়। এই লাল কিল্লার উপর চক্রশোভিত তিন-রঙা পতাকা পত-পত করে উড়তে-উড়তে এই তো কিছু দিন মাত্র আগে ঘোষণা করেছে,—'ভারতবাসী আমরা বিজয় লাভ করেছি এবার।' আমরা এখন মুক্ত ও স্বাধীন। আমরা আর অধীন নই কারো। লাল কিল্লার উঁচু মাথার উপর দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি ঘোষণা করতে সে কি গর্ববোধই না করেছিল সে-দিন! না করবেই বা কেন?

এই সেই লাল কিল্লা—এখানে কত কি কাণ্ড হয়ে গেছে, কত অঘটন ঘটে গেছে যুগের পর যুগ ধরে। সে সব এখন মহা মহা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অতীতের গর্ভে তলিয়ে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে, মাথা উঁচু করে লাল পাথরের ওই বিরাট বেষ্টনী। কি বিচিত্র এর ইতিহাস!

মোগল বাদশাহ সাহজহানের তৈরী এই লাল কিল্লা। একে পূর্ণাঙ্গ করে তৈরী করতে খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সে যুগের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এ যুগের কত? যমুনার কোল ঘেঁসে প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়ে লাল রঙের কিল্লা সোজা দাঁড়িয়ে আছে একশ' দশ ফুট মাথা উঁচু করে। আগা-গোড়া লাল পাথরের তৈরী বলেই এর নাম 'লাল কিল্লা'। সম্রাট্ সাহজহান এর ভেতরটিকে শোভায়-সম্পদে ভরপুর করে রেখেছিলেন, যত রকমে পারেন। এর 'দেওয়ানী খাস', 'দেওয়ানী আম', বিচিত্র 'রঙমহল' ও 'হামাম' প্রভৃতি সৌন্দর্যে ও বৈভবে জগতে ছিল অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আর এর মণি-মাণিক্যখচিত ময়ূর সিংহাসন? এর তো তুলনাই ছিল না সারা পৃথিবীর ভেতর। সাত কোটি টাকারও বেশী খরচ হয়েছিল এই সিংহাসনটি তৈরী করতে। এই টাকা এখনকার কালে কত হ'তে পারে, তা হিসেব করে দেখবার মতো। বিলাসের স্রোত বয়ে যেতো এই লাল কিল্লার ভেতর।

এ গেল এক দিক্। এ ছাড়া আর দিক্ও আছে। তা কিন্তু সুন্দর বা কোমল বা উজ্জ্বল নয় মোটেই। কুশ্রী কঠোরতা আর ঘোর অন্ধকারে ভরা সে দিক্। কত যে নিষ্ঠুর রক্তপাত হয়েছে, কত যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে এই লাল কিল্লার অনুশাসনের বলে, তার ঠিক-ঠিকানাই নেই। কয়েকটির কথা বলা যেতে পারে।

উচ্চাভিলাষী ঔরঙ্গজীব রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন দখল করে নিয়ে সাহানশাহ সাহজহানের প্রিয় দুলাল, মহাপ্রাণ দারাশিকোর মস্তক ছিন্ন করবার হুকুম দিলেন। সম্রাট্ সাহজহান নিজের কিল্লাতে নিজেই বন্দী। এই কদর্য হত্যাকাণ্ড রোধ করতে পারলেন না তিনি। সাহজাদা দারাশিকোর ছিন্নমুণ্ডে এই লাল কিল্লা লাল হয়ে উঠেছিল সে দিন।

স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে শিখ-গুরু তেগ বাহাদুরের নির্ভীক শির কাটা গিয়েছিল ঐ লাল কিল্লার ধর্মাধিকরণের বিচারে। আর সে বীভৎস ও নিদারুণ দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন সম্রাট নিজে, আর তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর সভাসদবর্গ। গুরু তেগ বাহাদুরের তাজা রক্তে সে দিনও লাল কিল্লা লালে লাল হয়ে উঠেছিল বিচিত্র রকমে।

বীর যোদ্ধা বান্দা শিখ জাতিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রায় আট শত শিখ যোদ্ধা সমেত লোহার শিকলে বন্দী হয়ে দিল্লীতে এলেন। তার পর লাল কিল্লার ধর্মাধিকরণের আদেশে এঁদের সকলেরই উচ্চ শির তলোয়ারের এক এক কোপে গড়িয়ে পড়তে লাগলো যখন রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে, তখন তো এই লাল কিল্লা অতি ভীষণ ভাবেই লালে লাল হয়ে উঠেছিল সে দিন। এই রকম লালে লাল হওয়ার কাহিনী কতই না আছে!

পারস্যের রাজা নাদির শাহ অত দূর থেকে এলেন লাল কিল্লা দখল করতে—তার ধন-রত্ন, মণি মাণিক্য, হীরা-জহরত আর ময়ূর সিংহাসনের লোভে। মুহম্মদ শাহ তখন দিল্লীর বাদশাহ। তিনি ভীরু ও দুর্বল। নাদির শাহ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর পাঁচ-পুরুষের ময়ূর সিংহাসন, আর সেই সঙ্গে লুঠে নিয়ে গেলেন পঞ্চাশ কোটি টাকার মণি-মাণিক্য। যাবার সময় লালে লাল করে দিয়ে গেলেন লাল কিল্লাকে—সম্রাটের জ্ঞাতি-কুটুম্বের রক্তে।

ক্রমে ক্রমে ঢুকলো এসে এ দেশে বণিক্ ইংরেজ একেবারে ভাল মানুষটি সেজে। শেষে তার ভাল-মানুষীর মুখোস খুলে গেল কিছু দিনের ভেতর। ভারতবাসীর স্বাধীনতা গেল, মান-সম্ভ্রম গেল—সবই গেল। তার পর ঘটনাচক্রে পড়ে ভারতের বীর যোদ্ধার দল দেশের স্বাধীনতা আর পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনবার আয়োজন করলে। এই আয়োজনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান এক জন ছিলেন লাল কিল্লার শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহ কিন্তু বাহাদুর ছিলেন না মোটেই। যে ইংরেজ বণিক্ এক দিন এই লাল কিল্লার নিকট কৃপা-ভিখারী ছিল, সেই বণিক্ এবার উদ্ধত মূর্তি ধরে সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী করলে আর তাঁকে দেশ ত্যাগ করিয়ে নির্বাসনে পাঠালে বন্য বর্মা মুলুকে। শুধু তাই নয়, সম্রাটের ভাইপো, শ্যালক, জামাতা প্রভৃতিকে ধরে ধরে কেটে ফেলা হোল নির্বিচারে, আর সম্রাটের দুই পুত্র ও পৌত্রকে গুলী করে মেরে ফেলে তাদের সুকুমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে কেটে লাল কিল্লার সুমুখে চাঁদণিচকের উপর একটা গাছের ডালে লটকে রাখা হল কিছু দিন ধরে—ভারতবাসীর ত্রাস উৎপাদনের জন্য। লাল কিল্লার উত্তরাধিকারীদের তাজা লাল রক্তে সে-দিন কি ভয়ঙ্কর রকমেই না লালে লাল হয়ে উঠেছিল এই লাল কিল্লা!

আর তার পর? গোড়াতেই বলেছি সে কথা। যে মহাপ্রাণ মহাত্মা গান্ধীকে পথের উপর দিয়ে চলে যেতে দেখলে ইচ্ছে করতো, নিজের বুক পেতে দিই তাঁর সামনে—আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান তিনি, না জানি, পায়ে তাঁর কতই লাগছে। করুণার নির্মল মূর্তি বিশ্ববরেণ্য এই মহাত্মারও সুকোমল দেহ ভেদ করে লাল রক্ত বয়ে গেছে এখানে এই সে দিন। লাল কিল্লার উন্নত শিরে আমাদের বিজয় পতাকা এখনো উড়ছে সগৌরবে। কর্ম, প্রেম ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক হোল এই ত্রিবর্ণ পতাকা। এক বৎসরও পূর্ণ হয়নি—স্বাধীনতা লাভের উৎসবের দিন কতই না আনন্দ! আশা হয়েছিল, অতীতের লাল রক্তপাতের চিহ্ন ধুয়ে-মুছে যাবে এই পতাকার পুণ্যবলে—অনর্থপাত আর ঘটবে না এই স্বাধীন পতাকার প্রভাবে। মনে হয়েছিল, উজ্জ্বল ও অক্ষয় হয়ে থাকবে এ পতাকা। সর্বজয়ী হবে এই পতাকা। তা হয়েছে কি? লাল কিল্লার অভিশাপ নয় তো?

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৫

বৃদ্ধের মেজাজ বড়ই খারাপ ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে এসেই যখন দেখল আনমনা ভাবে আর্থার ঘাসের উপর বসে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি হল। বৃদ্ধ জানত, দুর্বল যুবকগণই এরূপ ভাবে বসে থাকতে ভালবাসে। সে আর্থারের কাছে এসেই বললে, "উপরে নীল আকাশ, আশে-পাশে সবুজ ঘাসের উপর সুন্দর ঝিকঝিকে রোদ দেখে মনটাকে চাঙ্গা করছ, কেমন তাই নয় কি?"

আর্থার লাফিয়ে উঠে বলল, "চাঙ্গা করার কিছুই নেই মিষ্টার, আমি ভাবছি দরিদ্রের কথা।"

"দরিদ্রের কথা দরিদ্র ভাববে, তুমি তাদের ভাববার কে? দু'খান ত বই পড়েছ, তার পরই এত চিন্তিত হয়ে পড়লে? এ সব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও। দরিদ্র যদি স্বীয় দারিদ্র্য না বুঝে তবে আমাদের বুঝানো উলুবনে মুক্তা ছড়ানো হবে। তুমি ভেব না এটা সোভিয়েট রুশিয়া, এটা আমেরিকা। এখানকার লোক জেগেও মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন দেখে। তুমি ব্রেড্ লাইনে গিয়েছ, নিশ্চয়ই দেখেছ প্রত্যেকেই খাবার পেয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার সময় হোভারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেয়। একটা লোকও বলে না তার প্রাপ্য সে পেয়েছে। যে যুবতী তোমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করতে এসেছিল, সেই যুবতী যখন সচ্ছল হবে তখনই সে তার পূর্বের অবস্থা ভুলে গিয়ে সতী হবার প্রমাণ যোগাড় করবে। সে একবারও ভাবে না, কেন তার এরূপ দুর্দ্দশা হয়েছিল। ভাব-প্রবণতা রেখে দাও। বাস্তব চিন্তা কর, দেখবে আমেরিকার রূপ অন্য ধরণের। আমরা জংগলেই বাস করছি, কিন্তু এক শত হাত দূরে কেমন সুন্দর রেঁস্তোরা। ইউরোপে এরূপ ধরণের রেঁস্তোরা ক'টা আছে বল? থাকি আমরা কেবিনে, এখানে ইচ্ছা করলেই আমরা ইলেকট্রিক আনতে পারি। আমাদের পাশের কেবিনে গরম জল এবং ঠাণ্ডা জল স্নানাগারে আসে, হিটার রয়েছে, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে পায়খানা রয়েছে, ইচ্ছা করেই এ সব সুবিধা নিচ্ছি না। কিছু টাকা জমাতে হবে ভাই। যেদিন আমার হাতে এক হাজার ডলার জমা হবে সেদিন আর এখানে বসে থাকব না, সহরে চলে যাব, এটা নিশ্চয় কথা।"

বৃদ্ধের লেকচার শুনে আর্থার আরও চিন্তিত হল। সে কতক্ষণ চিন্তা করে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ তখন তন্ময় চিত্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখায় মত্ত ছিল।

বৃদ্ধকে একটু ঠেলে আর্থার জিজ্ঞাসা করল, "তবে এ সবের কি কোনও প্রতিকার নেই?"

বৃদ্ধ বললে, "এর উপায় তোমরা ঠিক কর, আমার ত এ সবে মাথা ঘাটাবার একটুও ফুরসৎ নেই। যাবার সময় প্রায় হয়ে এল। যৌবনে আপ্রাণ খেটে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করি। সেই অর্থের সদ্ব্যবহার গৃহিণী করেছিলেন। তাতে মোটেই দুঃখিত হইনি কিন্তু যেদিন গৃহিণী শিশু-সন্তানটি সহ ভবলীলা সাংগ করেন, সেদিন মনে বেশ দুঃখ হয়। তার পর থেকেই আমি চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, তাতে কৃতকার্য্য হইনি, কারণ জাল মোকদ্দমায় জড়িয়ে জেলে যেতে হয়, এতে মস্ত বড় একটা ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। তার পর জেলের ভেতর যে ধাক্কা লেগেছিল তা সামলাতে না পেরে জেল হতে বের হয়েই এখানে এসে কাজে লেগে যাই। এখান থেকে কোথাও যাইনি বন্ধু, যুবাকালে অনেক ধাক্কা খেয়েছি, আর সহ্য হচ্ছে না সে জন্যই চুপ করে থাকি। এখন তোমাদেরটা তোমরা সামলাও। মাথার চুল পেকে যাচ্ছে, দাঁত একটা একটা করে বিদায় নিচ্ছে, শরীরের প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, এর পরও তোমাদের চিন্তা? আর না বন্ধু, এবার বিদায় নেবার পালা।"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আর্থার এবং বৃদ্ধ রেঁস্তোরায় গেল। সেখানে যেয়েই দেখল, রেঁস্তোরার সামনে 'রিজার্ভ' কথাটা বড় বড় অক্ষরে লিখে সর্বত্র লটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "বল ত এ সময়ে আবার কোথায় খেতে যাই?"

ঘরের ভেতর হতে আর এক বৃদ্ধ বের হয়ে এসে বললে, "যাবেন না, আপনাদের জন্যই রিজার্ভ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইলেকশন্, বুঝলেন ত ব্যাপারখানা কি?"

বৃদ্ধ এবং আর্থার আর কোন কথা না বলেই রেঁস্তোরায় প্রবেশ করল। রেঁস্তোরা রিজার্ভ করেছে সেলভেসন্ আর্মির লোক। অনেক লোক খেতে বসেছে, তারাও খেতে বসল। এক জন লোক চিৎকার করে বলল, "রুজভেল্টা আগামী ইলেকশনে যাতে ভোট পান, এবং ডিমোক্রেটিক পার্টি ভোট-যুদ্ধে যাতে জয়যুক্ত হয়, সে জন্য আপনারা সকলেই চেষ্টা করবেন।"

সকলেই ডিমোক্রেটিক পার্টির জয়গান করল, শুধু বৃদ্ধ এবং আর্থার নীরব থাকল। পাশে বসা লোকটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, "ওহে বৃদ্ধ, হোভার তোমার পাতানো ভাই না কি?"

বৃদ্ধ মস্ত বড় একটা আলু গলাধঃকরণ করে বললে, "হোভার তোমার সম্পর্কিত ভাই, দেখতে পাচ্ছ না খাচ্ছি? পেটের জ্বালা আগে মেটাই তার পর রুজভেল্ট নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

পাশে বসা লোকটি পুনরায় বললে, "ক্ষমা কর বৃদ্ধ, তুমি যে এত ক্ষুধার্ত্ত তা আমি জানতাম না।"

বৃদ্ধ বললে, "এ সব কথা ভুলে যাও।"

প্রত্যুত্তরে অপর বৃদ্ধ বললে, "এখন আমরা কুখাদ্যের জন্যও দাম দিচ্ছি। যদি আপনারা দয়া করে রুজভেল্টকে ভোট দেন তবে এরূপ কুখাদ্যের জন্য আর দাম দিতে হবে না। কুখাদ্য বিক্রি বন্ধ করা, এটাও রুজভেল্টের একটি প্রতিজ্ঞা।"

লেকচার বন্ধ হইল। সকলেই খাবার খেয়ে পুনরায় হোভারের বদনাম করল, তার পর স্ব-স্ব কর্মস্থলে চলে গেল। বৃদ্ধ ফেরবার পথে আর্থারকে বললে, "হোভার আগামী ইলেকশনে কোন মতেই প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না, এটা নিশ্চয়। রুজভেল্ট যদি প্রেসিডেন্ট হন তবে আমাদের মাইনে যে বাড়বে তাও নিশ্চয়, অতএব আমরা রুজভেল্টকেই সমর্থন করব।"

আর্থার পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কথা কিছুই জানত না। এবার প্রেসিডেন্ট ইলেকশন সম্বন্ধে তার বেশ একটা ধারণা হল এবং বুঝল, প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের উপর মজুরদের ভাল-মন্দ অনেকটা নির্ভর করে।

কেবিনে এসে আর্থার যে বইটা পড়ছিল, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে আরম্ভ করল। বইটাতে তখনকার দিনের চিকাগো সহর, আমেরিকার সিভিল ওয়ার, লিন্‌কনের মৃত্যু, ইংলণ্ডের ইতিহাস এ সব ছিল।

ইংলণ্ডের ইতিহাস নিয়েই কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ছিল খাঁটি ইংলিশ-ম্যান্। সে বললে, "ভেব না আমি ইংলিশ বলেই ইংলণ্ডের প্রশংসা করছি। গ্রেটবৃটেনের ইতিহাসের সংগে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেকটা সম্বন্ধ রয়ে গেছে। তুমি বৃটিশ ইতিহাস পড়, বুঝতে পারবে, পৃথিবীর উন্নতির গোড়াতে কি ছিল এবং বর্তমানে তারই একটা পর্য্যায়ে আরও কতটুকু উন্নতি লাভ করেছে। তোমার যদি জ্ঞান অর্জন করতে হয় তবে লাফালাফি করলে চলবে না, মন সন্নিবেশ করতে হবে এবং ধীরে-সুস্থে পৃথিবীর সংগে নিজেকে পরিচিত করতে হবে। আমরা আমাদের পৃথিবীর সংগে পরিচিত না হয়েই মরি, সেটা যেন তোমার বেলায় না হয়।"

আর্থার বৃদ্ধের কথায় সম্মতি জানিয়ে বই পড়তে মন দিল।

রবিবার সকালটা মোটেই ভাল নয়। সারাটা সকাল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হয়েছে। আটটা থেকে বৃষ্টি যদিও থেমেছে তবুও আকাশ অপরিষ্কার। কনকনে সাইবেরিয়ান্ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। টেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে চলে আসছে। বাতাস উত্তর-পশ্চিম দিক্ হতে বইতেছিল বলেই সাইবেরিয়ার কথা আপনা হতেই এসে পড়ল। পল, মেথিউ এবং উইলী হার্গ্যাণের মধ্যে আসতে পেরেছে, ভ্যান্ আসেনি। সকলেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভ্যান ইংলিশ কায়দায় চলে। সময়ের খেলাপ হয় না, কিন্তু কেন তার দেরী হচ্ছে যদিও তা কেহ কেহ জানত, কিন্তু সকলে তা জানত না। ভ্যান্ সাইক্লোষ্টাইল দিয়ে "গল্পে আমেরিকা" ছাপাত। সেদিন গল্পে আমেরিকা বের হবার তারিখ ছিল। সাপ্তাহিক ছাপা হয়নি বলেই বোধ হয় তার দেরী হচ্ছে, এটা মনে করেই পল রান্না চাপাতে সুরু করল।

আমেরিকাতে ডেমোক্রেসী বর্তমান। কুৎসিত চিত্র পর্য্যন্ত ফাইন আর্টের নামে চলে। এ হেন দেশে সাইক্লোষ্টাইল ছাপানো, সাপ্তাহিক বের হওয়া নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ; কমিউনিজমের পুস্তকাবলী তখন প্রকাশ্যেই বিক্রি হত ; তবে কেন "গল্পে আমেরিকা" সাইক্লো-ষ্টাইলে গোপনে বের হয় ? বিষয়টা বড়ই গুরুতর, এ কথা বলতেই হবে।

বেলা নটার সময় ভ্যান্ একখানা "গল্পে আমেরিকা" হাতে করে এনে টেবিলে রেখে দিয়ে কালি-মাখা হাত নিয়েই মিষ্টারের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মিনিট দু'-একের মধ্যেই তার নাসিকা-ধ্বনি জানিয়ে দিল—বিকাল চারটার পূর্বে ভ্যানের ঘুম ভাঙ্গবে না।

মিষ্টার "গল্পে আমেরিকা" কাগজখানা হাতে নিয়েই বললেন, "এটা সত্যিকারের আজকের আমেরিকা। সেক্রামেন্টো সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে, সকলেই চোখ বুলিয়ে নাও। প্রবন্ধটি ছোট হলেও চিত্তাকর্ষক।"

প্রবন্ধটি ভাল করে পড়ে নিল। প্রবন্ধ পড়া হয়ে গেলে সকলেই একবাক্যে বলল, "এ জন্যই আমাদের পত্রিকা সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। কে এমন নির্জলা সত্য কথা বলতে সাহস করবে ? কালিফরনিয়ার রাজধানী আজ পংকে নিমজ্জিত। সেক্রামেন্টোর ডাকাতদের বিপক্ষের কেউ টুঁ শব্দ করে না। এই প্রবন্ধ যখন ডাকাতের দল পড়বে তখন হয়ত লেখকের মুণ্ডের জন্য দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবে।"

বৃদ্ধ বললে, "লেখক হিসাবে যদিও আমার নামটা দেওয়া হয়েছে, আসলে কিন্তু আমি এই প্রবন্ধের লেখক নই। যাক গে, আমার নামের অনেক লোক আছে। মনে রেখো, আগামী সপ্তাহে রুজভেল্টকে প্রশংসা করে যেন একটি প্রবন্ধ বের হয়।"

"উইলী মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে, বৃদ্ধের আদেশ মতই কাজ হবে।"

আর্থার এতক্ষণ চুপচাপ্ ছিল। সে বেশিক্ষণ চুপ্ করে থাকতে পারছিল না, বলল, "তোমাদের বই দেখে সুখী হলাম। তোমরা যত টাকা চাও আমি তত টাকা দিতে রাজী আছি। কিন্তু আমার টাকা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরৎ দিতে হবে, এই থাকবে সর্ত।"

সকলেই নির্বাক্। মিষ্টার আর্থারকে বললে, "তুমি ত মাত্র ক'দিন হল আমাদের এখানে এসেছ, তোমার কাছ থেকে আমরা কোন মতেই এখন টাকা নিতে পারি না। তুমি এখন জ্ঞান অর্জন কর, তার পর দেখব তোমার টাকা আমরা নিতে পারি কি না ?"

মিষ্টারের কথায় আর্থারের মন দমল না, সে পরের দিন শহরে গিয়ে দুই শত ডলার ব্যাংক হতে উঠিয়ে এনে মিষ্টারের হাতে দিল। মিষ্টার টাকাগুলি নিলেন বটে, কিন্তু টাকা দিয়ে কি করবেন সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না।

আর্থার এদিকে ইংলণ্ডের ইতিহাস শেষ করে আরও অনেক বই পড়ে ফেলেছে এবং মিষ্টারের বিশ্বাসভাজন অনেকটা হয়েছে। তাকে বই বিক্রি করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। সে ছোট ছোট বই মজুর-মহলে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। আর্থার স্নানাগার, জাগ আউট, নাইট ক্লাব, ইন্টার নেশনেল হোমে যেয়ে বই বিক্রি করতে পছন্দ করত। সকলেই তার কাছ থেকে বই কিনত আর অনেকেই বলত—লোকটা কত দরিদ্র, পরিধানের পেন্ট পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। আর্থার যখন স্যানফ্রান্সিস্‌কোর ব্রেড লাইনে গিয়ে দাঁড়াত তখন অনেকেই তাঁকে দয়া দেখাত। তার মুখ দিয়ে লালা বের হত, কোথাও বসলে আর উঠতে পারত না একপই ভান করত।

এক দিন সে একটি পর্তুগীজ গীর্জার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। পথে একটি মাতালকে পড়ে থাকতে দেখে দাঁড়াল। মাতাল সাহায্য চাইছিল। আর্থার মাতালকে না উঠিয়ে পুলিশ ডেকে আনল এবং মাতালদের আরাম করার হসপিটালে পাঠিয়ে দিল। সে ভাবত, এ দেশে প্রকাশ্যে কেউ মদ খেতে পারে না। মাতাল নিশ্চয়ই কোন গোপনীয় স্থান হ'তে মদ খেয়েছে। তার ইচ্ছা হল মদের আড্ডাটি বের করে সে জন্য ষ্ট্রীটের যে দিক গীর্জার সামনা ছিল তার একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেক ক্ষণ পর একটি লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এই, গরম হতে চাস্ কি ?"

"ইয়া বস্, সেই মতলবেই ত দাঁড়িয়ে আছি।"

লোকটা বললে, "এক ডলার দাও।"

আর্থার পকেট হতে কতকগুলি ভাংতো মুদ্রা দিয়ে এক ডলার সমজিয়ে দিল।

লোকটা পুনরায় বললে, "চল আমার সংগে।"

আর্থার লোকটার সংগে অনেক দূর গেল এবং একটি ছোট ওয়াইনের বোতল হস্তগত করে একেবারে কেবিনে ফিরে এল। এসেই বৃদ্ধের হাতে বোতলটি দিয়ে বললে, "মিষ্টার, এটাকে পরীক্ষা কর ত, দেখ এতে কি আছে?"

বৃদ্ধ একটু দেখেই বললে, এতে আছে রং-করা ম্যথিলিয়েটেট স্পিরিট। আগুনে ঢেলে দেব কি?"

আর্থার বললে, "ঢেলে দাও মিষ্টার। আমাদের দেশে এখন মদের পরিবর্তে ম্যথিলিয়েটেড স্পিরিট ব্যবহার করছে কম পয়সায় উচ্চ দরে চোরা-কারবারীরা। মদের নামে বা-তা বিক্রি করে দু'পয়সা করে নিচ্ছে। এ সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোন বই থাকে তবে আমাকে দিও, আমি মাতালদের কাছে বিক্রি করে দু'পয়সা পাব।"

বৃদ্ধ হেসে বললে, "মাতাল তোমার বই কিনবে না, বরং তোমাকে ধরিয়ে দেবে। এ সম্বন্ধে দু'পাতার একটা বই আছে। পার ত তা বিক্রি করে জেলে যেতে পার। একবার জেলটা দেখে আসা অন্যায় হবে না। রাজী আছ কি?"

আর্থার একটু চিন্তা করে বললে, "এখনও সময় হয়নি বৃদ্ধ, আরও কয়েক মাস পর নিশ্চয়ই জেলে যেতে হবে। দেখতে হবে আমাদের দেশের জেল আর জানতে হবে তার স্বরূপ।"

মাস দুয়েক কেটে যাবার পর এক দিন আর্থার কাউকে কিছু না বলে দু'সেণ্ট দামের দশখানা বই নিয়ে কেবিন হতে বের হল এবং ফ্রিস্কো যাবার বাস-ষ্টেণ্ডে যেয়ে দাঁড়াল। গ্রে-হাউণ্ড, বাস কোম্পানীর বাস এখান থেকে যাওয়া-আসা করে। ওয়েটিং-রুমের ভেতর বসে অনেকেই খাবার খাচ্ছিল। আর্থারও একখানা চেয়ার দখল করে এক পেয়ালা কাফির অর্ডার দিল। বয় এক কাপ কাফি এনে দিয়ে তৎসংগে দশ সেণ্টের বিল দিয়ে পয়সা নেবার জন্য হাত বাড়াল। আর্থার তামার সেণ্ট এক-দুই করে গুণে গুণে দশ সেণ্ট দিল। বয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সেণ্টগুলি কাউণ্টারে জমা দিল। একাউণ্টেণ্ট আর্থারের হাব ভাব পূর্বাপর সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। সে বয়কে বলল, এই ছোকরাকে প্রায়ই গ্রে-হাউণ্ড বাসে যেতে দেখি। জিজ্ঞাসা কর ত, সে কোথায় যায়?"

কে কোথায় যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা আমেরিকার সভ্যতা অনুযায়ী বড়ই অন্যায় কাজ। এই নিয়মটি গরীব-দুঃখীর প্রতিও প্রযোজ্য নয়। বয় দ্বিধা না করে আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল, "খোকা, তুমি প্রায়ই এ দিকে কোথায় যাও?"

আর্থার বললে, "আমি প্রায়ই স্যানফ্রান্সিস্কোতে যাই। সেখানে আমার এক কাকা থাকেন। বাবা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠান। আজও কিছু পাওয়া যায় কি না সে জন্য যাচ্ছি।"

বয় সে কথা একাউণ্টেণ্টকে বলতে গেল না। আর্থার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট ও উচ্চস্বরেই বলছিল। আর্থারের কথা শুনে শুধু হিসাব-রক্ষক নয়, সেখানে যারা বসেছিল সকলেই একবাক্যে হুভারকে উদ্দেশ করে কটুবাক্য নিক্ষেপ করল।

আর্থার বললে, "হুভারকে মিছামিছি বকুনি দিয়ে কোনই লাভ নেই। আমরাই ভোট দিয়ে হুভারকে প্রেসিডেণ্ট করেছি, ভবিষ্যতে হয়ত হুভারই আবার প্রেসিডেণ্ট হবেন। যাক গে, এ-সব হল বাজে কথা। আমরা গরীব লোক, কাজ পাওয়াই হল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

আর্থারের কথার প্রতিবাদ কেউ করল না। সকলেই ইচ্ছা করে অন্যমনা হয়ে রইল। আর্থার বুঝল, এখানে যারা বসে আছে তাদের সকলেই মজুর দলের লোক। সে-ও চুপ করে গেল। রেস্তোরাঁতে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কতক্ষণ পরে বাস্ এল। আগন্তুকরা বাস্ হতে নেমে হাত ও মুখ ধুয়ে নিল। অনেকেই কিছু খেল, তার পর নূতন এক পুরাতন যাত্রী নিয়ে বাস ফ্রিস্কোর দিকে রওয়ানা হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাস গোল্ডেন ব্রিজের উপর দিয়ে চলতে লাগল। এক জন যাত্রী হঠাৎ বাসের পেছন দিক দিয়ে লাফ দিয়ে সাগর-জলে ঝাঁপ দিল। সকলেই দেখলে, লোকটা সাগর-জলে তলিয়ে যাচ্ছে। মিনিটও অতিক্রম করেনি গাড়ী থামল এবং পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে দিল। অপর দিক্ হতে যে সকল গাড়ী আসছিল তাদের মধ্যে থেকে এক জন কোট-পেণ্ট ছেড়ে সাগর-জলে ঝাঁপ দিল। লোকটা ছিল শক্তিশালী এবং সাঁতার-পটু। সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আত্মহত্যা-প্রয়াসী লোকটাকে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠল। উপর হতে বয়া ও রশি ফেলে দেওয়া হল। কয়েকখানা ছোট লঞ্চও এর মধ্যে এসে গেল। সন্তরণ-পটু লোকটি হাত বাড়ানো মাত্রই যখন বয়া ও রশি হাতের কাছে পেলে তখন খুবই আনন্দ অনুভব করল। তার পর আত্মহত্যা-প্রয়াসী সমেত যখন লঞ্চের উপর এসে দাঁড়াল তখন উপর থেকে সবাই শতমুখে তাঁর প্রশংসা করল।

যে লোকটা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, সে মারা গিয়েছিল। তার শরীরে এমন শক্তি ছিল না, যাতে সে এই প্রবল আঘাত সহ্য করতে পারে। তাকে এমবুলেন্স লঞ্চ এসে নিয়ে গেল। গ্রে-হাউণ্ড বাসও মার্কেট ষ্ট্রীটের দিকে রওয়ানা হল। ওয়াই-এম-সির বাড়ীটার কাছে এসেই গাড়ি থামল। ইত্যবসরে আর্থার গাড়ি হতে নেমে সমুদ্র-তীরের পথ ধরে যেখানে নাবিকদের অফিস, তারই পাশের একটা রেস্তোরাঁতে বসে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে নিকটস্থ একটি গোপনীয় বিয়ার-সেলে গিয়ে দু'সেণ্টের বই প্রত্যেকের হাতে দিল। যে লোকটা বিয়ার বিক্রি করছিল তাকেও এক কপি দিতে ভুলল না। সকলেই চটি-বই পড়াতে মন দিল। বিয়ার-বিক্রেতাও চোখ বুলাতে আরম্ভ করল। একটু পরেই বিয়ার-বিক্রেতা যখন দেখল বইটাতে যা লেখা রয়েছে তার সবটাই তার বিপক্ষে, তখন সে এক লাফে কাউণ্টার হতে বের হয়ে আর্থারের গলা টিপে ধরল। আর্থার সে জন্য প্রস্তুত ছিল। চট্ করে বিয়ার-বিক্রেতার শরীরে বাঘ-নখ বসিয়ে দিল। বাঘ-নখে ছিল বিচ্ছুর বিষ মেশানো। বিয়ার-বিক্রেতা আর্থারকে পরিত্যাগ করে চিৎকার করে উঠল। মদ্যপায়ীরা আর্থারের পেছন নিল এবং হত্যাকারী বলে চিৎকার করে উঠল। দু'জন পুলিশ কাছেই ছিল। তারা দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলল। এবার আর্থার নিশ্চিন্ত মনে দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আমাকে গ্রেফতার করতে পার।"

পরের দিনই বিচার হল। বিচারে আর্থার তার নিজের দোষ

স্বীকার করল কিন্তু দশখানা বই কোথা হতে পেয়েছে তার একটা মিথ্যা ঘটনা তৈরী করে ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপহার দিল। বাঘ-নখটি আর্থার কোথা হতে পেল সে দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রুক্ষেপও করলেন না, কিন্তু বই কোথা হতে পেল সে কথাটাই ম্যাজিষ্ট্রেট্ আর্থারকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন কোনও সদুত্তর পেলেন না তখন বয় ছেলে ঠিক করে তিন মাসের জন্ম আর্থারকে জেলে পাঠালেন।

আমেরিকাতে বাঘ-নখ, পাঞ্জা, গোপনীয় ইনজেকসন্ এ-সবের সমূহ প্রচলন বর্ত্তমানেও রয়েছে। অস্ত্রের এত ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কেন যে আমেরিকানরা আদিম যুগের গুপ্ত অস্ত্রের ব্যবহার করে তা নিশ্চয়ই চিন্তনীয় বিষয়।

স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোর জেলে আর্থারকে রাখা হল না। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেক্রামেণ্টো। সেক্রামেণ্টোর জেল অতীব সুন্দর এবং জেলের কর্ম্মচারিবৃন্দ ভাল বলে সবাই জানে। ভাল জেলে যাওয়া আর্থার মোটেই পছন্দ করেনি।

সেক্রামেণ্টোর জেলের ফটক বড়ই সুন্দর। মস্ত-বড় একটা বাড়ী। তার চতুর্দিক্ উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীর হতে অনেক দূরে ফল এবং ফুলের বাগান। জেলের গেট্ হতে দরজা পর্য্যন্ত দু'দিকে সাজানো বাগিচা। আর্থার বাগান-বাড়ী এবং ফুলের বাগান বড়ই পছন্দ করে। এমন সুন্দর বাড়ীতে আসতে পারবে তা ধারণাও করতে পারেনি। জেল-ভ্যান্ দরজার সামনে আসা মাত্র দরজা খুলে গেল। সংগের কন্‌ষ্টেবল একে একে সকল কয়েদীকে গাড়ী হতে নামিয়ে জেলের পুলিশের হাতে দিয়ে দিল। জেল-পুলিশের পোষাক পৃথক্। সাদা কোটের উপর নানা রকমের কারুকার্য্য। আর্থার এবং অন্ত আর একটা যুবককে এক জন পুলিশ এসে হাতকড়া লাগিয়ে লিফ্টে উঠল। পাশে দাঁড়ানো পুলিশটা মুচকি হাসি হেসে অন্তান্ত কয়েদীদের নিয়ে অন্ত লিফ্টে অন্ত দিকে চলে গেল।

তিন তলাতে দুই যুবকদের রাখা হয়। সেখানে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে আর্থার এবং তার সাথীকে উলংগ হতে বলা হয়। উভয় যুবকই উলংগ হতে রাজি হল না। তারা বললে, "অন্ত স্যুট্ নিয়ে এস, আমরা আমাদের স্যুট্ দিয়ে দিচ্ছি। তার পর যদি ইচ্ছা হয় তবে পুনরায় তাল্লাশী নিতে পার।"

ওয়ার্ডেন একটু হেসে আর্থারের মুখে একটি ছোট ঘুসি মারলে। এতেই আর্থারের মুখ হতে রক্ত বেরোতে লাগল। দ্বিতীয় কয়েদী বিনা বাক্যব্যয়ে উলংগ হয়ে নিজের স্যুট পরিত্যাগ করে জেলের কয়েদীর পোষাক পরিধান করল। আর্থার দ্বিতীয় ঘুষির অপেক্ষায় রইল। দ্বিতীয় ঘুসি আসতে বেশি দেরী হল না, কিন্তু ঘুসিটা মুখে না পড়ে ডান্ কবজিতে পড়ল। আর্থারের ডান হাত অবশ হয়ে গেল। এবার আর্থারকে উলংগ করতে বেশি সময় লাগল না। আর্থার উলংগ হয়েই বসে থাকল। ওয়ার্ডেন আর্থারকে পেণ্টটা পরিয়ে দিয়ে পেছন দিকে একটি লাথি মেরে কোট গায়ে দিতে বললে। কিন্তু মাঝারি প্রকারের ঘুসিটা আর্থারকে এমনি কাবু করেছিল যে, তার ডান হাতখানা উঠাবার শক্তি ছিল না। সংগের কয়েদীর সাহায্য নিয়ে কোটটা কোন প্রকারে গায়ে দিল, তার পর জেলের জুতো এবং মোজা অতি কষ্টে পায়ে দিল।

জেল-কেরাণী অনেকক্ষণ আর্থার এবং তার সংগীর জন্ত অপেক্ষা করছিল। আর্থার এবং তার সংগী কেরাণীর কাছে আসা মাত্র সে একটু হাসল এবং ওয়ার্ডেনকে জিজ্ঞাসা করল, "কোন্‌টা আর্থার?" ওয়ার্ডেন আর্থারকে দেখিয়ে দিল। জেল-কেরাণী আর্থারকে লক্ষ্য করে বললে, "এরই মধ্যে রক্তপাত হয়েছে, ভাল হয়েছে, একটু টিনচার আয়ডিন্ লাগিয়ে দাও। ওকে চার নম্বর রুমে নিয়ে এস, সেখানে কানিংহাম আছে।"

গুণ্ডা-সর্দ্দার কানিংহাম আর্থারের অপরিচিত। সে জানত না কানিংহাম কত বড় নাম-করা গুণ্ডা। তার প্রচণ্ড প্রতাপ জেলের ভেতর এবং বাহির সর্বত্রই বিস্তমান। কানিংহাম আমেরিকান সরকারকে ভয় করত না, কিন্তু ভয় করত একটি পার্টিকে—যে পার্টির নাম শুনলে সে ভয়ে কেঁপে উঠত, সেই পার্টির নাম হল "আণ্ডার গ্রেজুয়েট ক্লাব।" কোন দুষ্ট ছেলে জেলে আসা মাত্র কানিংহাম তাকে পরীক্ষা করত এবং জেনে নিত, নবাগত যুবক কোনও দলের লোক কি না? কানিংহাম যদি বুঝতে পারত নবাগত দুষ্ট যুবক আণ্ডার গ্রেজুয়েট দলের অথবা কমিউনিষ্ট পার্টির লোক, তবে সেই নবাগতকে সে কিছুই বলত না, আট নম্বর রুমে পাঠিয়ে দিত। যদি বুঝত, নবাগত দুষ্ট যুবক উক্ত উভয় দলের কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয় তবে সে নবাগতকে নিজের দলে টেনে নিত এবং তার ইচ্ছামত সংশোধন করে জেল হতে তাড়াতাড়ি বের করে দিত।

কানিংহাম বয়সে প্রৌঢ়। মুখ দেখলেই মনে হয়, লোকটির ভেতরে দয়া-মায়া বলে কোন জিনিসই নেই। সে কাউণ্টারে বসেই সময় কাটাত। দু'টি যুবক কাউণ্টারে আসা মাত্র কানিংহাম সর্বপ্রথম যুবককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি? প্রথম যুবক তার নাম, গ্রামের নাম এবং তার পেশা বুঝিয়ে বলার পর একটু হাসল।

কানিংহাম বুঝল, প্রথম যুবক কোন্ প্রকারের লোক এবং কেনই বা পুলিশ তাকে ধরে এনেছে। প্রথম যুবকের সম্বন্ধে কানিংহাম একটু ভাবল তার পর বলল, "তুমি বেশি কথা বল, তোমার অন্তান্ত কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। এ দোষ সহজে পরিত্যাগ করতে পারবে না, আমি তোমাকে বিদেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি, বল ত কোথায় যেতে চাও?

যুবকের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কিছুই বললে না, চুপ করে অনেকক্ষণ থাকার পর শুধু বললে, "তোমার যেখানে ইচ্ছা।"

"হাঁ, আমার ইচ্ছা মতেই কাজ হবে—তোমাকে পুর্ত্তরীকোতে ফল-বাগানের কাজে পাঠানো হবে। যাও, বেড্ নম্বর ছাব্বিশ। সন্ধ্যার পর খাবার খেতে যেয়ো।"

প্রথম যুবক চলে যাবার পর কানিংহাম আর্থারের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার নাম কি?"

"জ্যান্ আর্থার।"

আর্থার এর বেশি একটা কথাও বললে না। দেখে কানিংহাম বললে, "কমিউনিষ্ট পার্টিতে গোপনে কাজ করছ আর বাইরে দেখাচ্ছ তুমি এক জন বদমাস, কেমন নয় কি?"

"কমিউনিষ্ট পার্টিকে সরকার এখনও সাম্রাজ্যদ্রোহী 'আউট্‌ল' করেনি। আমার যদি ইচ্ছা হত তবে প্রকাশ্যেই তাদের কাজে যোগ দিতে পারতাম, সে জন্ত জেলে আসতে হত না।"

কানিংহাম একটু চিন্তা করে বললে, "এরই মাঝে নাকে-মুখে রক্ত ঝরছে, তার কারণ কি?"

"আমাকে উলংগ হতে বলছিল—এটা কি জেল-সভ্যতার অংগ?"

"তা হবে কেন? উলংগ করা বড়ই খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি। কি জানি, কোন বদ্ রোগ আছে কি না দেখতে হবে।"

বেল টেপা মাত্র এক জন ওয়ার্ডেন এল। ওয়ার্ডেনকে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসার জন্ত কানিংহাম আদেশ করল। ওয়ার্ডেন চলে যাবার পর কানিংহাম আরও কয়টি প্রশ্ন করে বুঝল, আর্থার মজুর শ্রেণীর লোক। পেটের দায়ে কুকর্ম করে জেলে এসেছে। মজুর শ্রেণীর লোক যদি একবার পাপ কর্মে নিযুক্ত হয় তবে তারা কানিংহামের মতই হিংস্র জীবে পরিণত হয়। এ কথাটা কানিংহাম জানত।

ডাক্তার এসে আর্থারকে পরীক্ষা করলেন এবং সুন্দর একখানা সার্টিফিকেট দিয়ে বললেন, "লোকটা খাঁটি মজুর, বিয়ে করলেই সমস্ত দোষ কেটে যাবে।"

ডাক্তারের সার্টিফিকেট এবং কানিংহামের অনুমান উভয়টাই আর্থারের পক্ষে সুবিধাজনক হল। আর্থারকে পঁচিশ নম্বর রুমে পাঠানো হল। সেখানে যেয়ে দেখলে অনেকগুলি গুণ্ডা-মার্কা লোক। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে জুতার ফিতা পরিষ্কার করছে, কেউ বা পুরাতন সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পত্রিকা মনযোগ দিয়ে পড়ছে। পঁচিশ নম্বর রুমের ছাব্বিশ নম্বর বিছানায় গিয়ে আর্থার বসল। তখনও তার নাকের ব্যথা যায়নি। সে কতক্ষণ বসে তার পর বিছানাতে শুয়ে থাকল। খাবারের সময় ঘণ্টি বেজে উঠলে সকলেই দৌড়ে বের হল। আর্থার দৌড়তে পারল না, সে হেঁটেই চলল। প্রকাণ্ড হল-ঘরটার পাশে যেয়ে দাঁড়াল। লাইন করে কয়েদীরা একে একে ঘরে প্রবেশ করল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মগ্ এবং প্লেট নিয়ে যাচ্ছিল। প্লেট এবং মগে নম্বর থাকে। পঁচিশ নম্বর রুমের ছাব্বিশ নম্বর সিটের প্লেট্ এবং মগ ছিল না। আর্থার লাইন ছেড়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সকলে চলে যাবার পর এক জন ওয়ার্ডেন বললে, "তোমার মগ এবং প্লেটের জন্ত কানিংহামের কাছে যাও। সে তোমাকে সবই দিয়ে দিবে।"

[ক্রমশঃ

দোলে

শচীনাথ ভট্টাচার্য্য

স্থির শান্ত যমুনার তীরে সুবাসিত মলয় সমীরে পূর্ণিমার দিনে
কৃষ্ণ সনে রাধা বিনোদিনী সখী সাথে মধুরহাসিনী বিজন-বিপিনে ;
দুলিত দোলায় রঙ্গে কত,—অভিনব ভঙ্গে অবিরত আবীর-কুঙ্কুম
বাতাসের সাথে দিকে দিকে বিকশিত করিত নিমিখে মানস-কুসুম।

বর্ষে বর্ষে তাহারি স্মরণে প্রেমভরে সেই শুভক্ষণে সঞ্জীবিত করি' ;
দেশে দেশে দোলযাত্রা-দিনে আনমনে বিকচ-নলিনে দেবতারে স্মরি'
ভক্তি-মন্ত্রে করে পূজা তা'র মর্ত্ত্যবাসী আজো পূর্ণিমার ফাল্গুন-দিবসে
পুরাণের দেবতার মতো চিত্ত তা'র আনন্দে সতত দোলে প্রীতিরসে।
আবীর-কুঙ্কুম-রেণুকায় প্রীত মনে সর্বাঙ্গ মাখায় মুগ্ধ প্রিয়জনে ;
বৎসরের দুঃখ-দৈন্ত যত, একটি দিনের তরে গত,—ভাবে মনে মনে।

নাহি জানে, হায়, প্রতিদিন বঞ্চনা করিয়া শক্তিহীন প্রাণ-দেবতায়
দোলের আনন্দ ব্যর্থতায় দিগ্-দিগন্তরে মিশে যায় ক্ষুব্ধ নিরাশায়।
মিথ্যা তব পূজা, হে মানব, গীতি-মুখরিত কলরব নিয়ম-পালন
চিরকাল ধরি' আচরিত সংস্কার তোমার প্রতিষ্ঠিত,—করিতে দলন,
ভাঙ্গ সব নিয়ম-শৃঙ্খল, মুক্তকণ্ঠে বল অবিরল,—কাজ নাই দোলে ;
সমাজের হীন স্তরে বসি' ধনিকের অত্যাচারে খসি' দীন আর্ত্তরোলে
পঞ্জর আমার চূর্ণ হ'ল, আমারে ধরিয়া উর্দ্ধে তোলো, মানুষের ভাই,
অন্তায়ের দম্ভ কর চুর, বিলাসের স্বপ্ন হোক্ দূর, তবে প্রাণ পাই।
দোলা দেয় পরাণে আমার অন্নহীন নির্দ্দয় ব্যথার কটাক্ষ ভীষণ,
সে দোলায় দুঃখে দোলো,আপনার সুখ-স্বর্গ ভোলো, ভারতের মন।

"যমুনে! এই কি তুমি—"

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এই কি সেই জওহরলাল? কন্যাকুমারিকা হইতে কাশ্মীর, আরব সাগর হইতে আসামের গ্রাম, বন, পর্ব্বত, প্রান্তর সোল্লাসে সোৎসাহে যাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ-তরঙ্গে অবগাহন করিয়া নব জীবনের প্রেরণা পাইত, পাঞ্জাবের ঘটনা যত বীভৎস, যত ঘৃণ্য, যত নারকীয় হোক না কেন, জওহরলালকে হতাশা-পীড়নে রুদ্ধ-কণ্ঠ করিয়া দিবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইহাই কি ভবিষ্যৎ-লিপি? সাম্রাজ্যবলদর্পী বৃটিশের শত অত্যাচার, সহস্র নির্য্যাতন, অজস্র লাঞ্ছনাও যে নির্ভীক জওহরলালের বীর-হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে নাই, পাঞ্জাব ও দিল্লী তাহাকেও শ্রাবণের ধারাসিক্ত করিয়া দিল? স্বাধীন ভারতের এই দৃশ্যই কি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের কোটি কোটি নরনারীর কল্পনা রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল? মাত্র কয় দিন পূর্ব্বে, উদ্ধত ডাচের ভারতেনেশিয়া অভিযানে এই জওহরলালের কণ্ঠই না সর্ব্বাগ্রে মেঘগর্জ্জন করিয়াছিল? আমেরিকার টুম্যান, রাশিয়ার ষ্ট্যালিন-মলোটভের সুখ-সুপ্তি ভঙ্গ হইবার বহু পূর্ব্বে, এই জওহরলালই না শোষণবিলাসী ডাচের উদ্দেশে বজ্রনাদ করিয়াছিল? বিশ্ববিধান-ভবনে (উনো) এই উদাত্ত কণ্ঠই না সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মেঘমন্দ্রে বর্ণবিদ্বেষের উদ্দেশে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল? এই শান্ত, সংযত, তীক্ষ্ণ, তীব্র ও প্রেম-গদগদ কণ্ঠই না পৃথিবীর পরাধীন ও অসহায় জাতিপুঞ্জকে অভয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল? এই কণ্ঠই ভারতের ভাগ্যফল বর্ণন করিতে পৃথিবীর নেতৃত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল? এই জওহরলালই না এসিয়ার পরাধীন দেশগুলির উদ্ধার-সাধনে ভারতের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের ভরসা দিয়াছিল?

এই কি সেই জওহরলাল? বলিলেন, ভারতের মূক দুঃস্থ জনসাধারণের উন্নতিকল্পে কত বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলাম: হায়! সেগুলার পানে একবার ফিরিয়া দেখিতেও সময় পাই না! এই খেদোক্তি জওহরলালের, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়? বিনা রক্তপাতে কোন দেশ কখনও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। গান্ধীজীর অভিনব অহিংসা মন্ত্রে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে; তবুও, মাত্র কয় বিন্দু শোণিত জওহরলালকে বিভ্রান্ত ও বিচলিত করিল কেন? স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করিতে কয়েক লক্ষ না হয় জীবন বিসর্জ্জন দিলই, তাহাই বা জওহরলালকে কর্ত্তব্যে বিচ্যুত করিবে কেন? কেন তিনি সময় পান নাই? তাঁহাকে ত সোপ-ষ্টোন বা তেঁতুল-বীচির পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যায় নাই? তবে তাঁহার সময় না হয় কেন? দুর্ভাগ্য সেই দেশের—যে দেশের চার হাজার সরকারী কর্ম্মচারী বজায় থাকিতেও তেঁতুলবীচির সন্ধানে ছুঁচা টিকটিকির মত মন্ত্রীদেরও দৌড়-ঝাঁপ করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয়। দুর্ভাগা সেই দেশের—যে দেশের সংবাদপত্র ধৃত সোপ-ষ্টোনের স্বস্তিবাচনে স্তম্ভের পর স্তম্ভ অপব্যয়িত করে; একবার ভাবে না যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার জন্যই দরিদ্র করদাতার বক্ষঃশোণিত-সিক্ত অর্থের অধিকাংশই রাঘববোয়ালরূপী কর্ম্মচারীদিগের অতল গর্ভে অদৃশ্য হইয়া থাকে? কিছুই না করিবার জন্যই কি রাবণের গোষ্ঠী প্রতিপালন? কেন মন্ত্রিবর্গ কর্ম্মচারীদের এই কথা বলিতে পারে না যে, কর্ম্ম না করিলে ধুলা-পায়ে বিদায়! দেড় বস্তা তেঁতুল বীচি ধৃত করিয়া খবরের কাগজের আফিসে ছুটিবার দুষ্প্রবৃত্তি ভবিষ্যতে আর না হয় যেন? কিন্তু জওহরলাল, পরিকল্পনা কর্মীদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন কেন? নেহেরু ক্যাবিনেট কি শিশির ভাদুড়ীর থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর মত এক মনুষ্যের খেল্? প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্ট নাই, একজিকিউসানের লোক নাই? তাঁহার দেখাদেখি সমুদয় ক্যাবিনেট পাঞ্জাবের পানে নয়ন নিবদ্ধ করিয়াই দিনগত পাপক্ষয় করিতেছে? আর্ম্মি ডিপার্টমেণ্ট, ডিফেন্স মিনিষ্টার কি হিন্দুর ঠাকুর দেবতা-প্রতিমার সামিল? রিলিফ মিনিষ্টার কি রিলিফ ছাড়া আর সমস্ত কাজই করেন? যেহেতু পাঞ্জাবে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইতে কোটি কোটি মুদ্রা তন্খা-ভোজী কর্ম্মচারী সকলেই নিশ্চল, অচলায়তন? এই কি স্বাধীন দেশের চিত্র? পৃথিবীতে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে কি, যেখানে শান্তি ঠাকুরাণী পার্ম্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; যেখানকার রাষ্ট্র ও নরনারী "মধুর বহিছে বায়ু, ভেসে যায় রঙ্গে"? বিশৃঙ্খলা কোথায় নাই? যুদ্ধাশঙ্কা কাহার ঘুচিয়াছে? 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' বরাভয় কোন্ দেশ পাইয়াছে? লেক্ সাকসেসের শান্তি-ভবনে যত অশান্তি, এত অশান্তি আর কোথায়ও আছে কি? তাই বলিয়া কোন্ দেশের রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্র-তরণীর হাল ছাড়িয়া দিয়া দেড় মাসের মধ্যেই বদর বদর করিতে সুরু করিয়াছেন? কোন্ দেশের প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠে অশ্রুসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে?

আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কি সেই জওহরলাল? যে জওহর-লাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার "এসো" বলিয়া ডাকিলে, সমগ্র তরুণ ভারতবর্ষ তাঁহাকে অনুসরণ করিবে—প্রাণ দিতে বলিলে, অকাতরে প্রাণ দিবে—অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে বলিলে, হাসিমুখে অগ্নিপ্রবেশ করিবে—দুর্গম যাত্রা করিতে বলিলে, সাগর-পর্ব্বত তুচ্ছ করিবে, সেই জওহরলালই কি নৈরাশ্য-পীড়িত আর্ত্ত অসহায় কণ্ঠে মর্ম্মভেদী খেদোক্তি করিলেন?

ক্ষুদ্রের সহিত বৃহত্তের তুলনা যদি অমার্জ্জনীয় না হয়, তাহা হইলে আমরা সবিনয়ে ও সশ্রদ্ধচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের ক্লৈব্য পরিহারের উপদেশাত্মক শ্লোকটি নিবেদন করিতে চাহিব। বৃটিশের মনুষ্যত্ব, রাষ্ট্রীয় জগতে তাহার আভিজাত্য, গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রপূত "ভারত ছাড়" বাণীকে সার্থক করিয়াছে: মুস্লিম লীগের সে মনুষ্যত্ব, সে আভিজাত্য, সে ঐতিহ্য নাই, থাকিতেও পারে না, বিশ্বসৃষ্টি তাহা চাক্ষুষ করিয়াছে। লীগের দুষ্প্রবৃত্তির সূচনা মাত্রেই, ভারতের সচিবোত্তমের শৌর্য্য-বীর্য্যের এবম্বিধ নাটকীয় "পতন ও মূর্চ্ছা" ঘটিবার জন্যই কি কোটি কোটি ভারতবাসী অর্দ্ধ শতাব্দী কাল অনন্ত দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছিল? সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছিল? গান গাহিতে গাহিতে ফাঁসীর দড়ি কণ্ঠে জড়াইয়া লইয়াছিল? স্বাধীনতার এই ধ্যানই কি তাহারা করিয়াছিল? স্বাধীনতার এই চিত্রই কি পূজা করিয়াছিল? তরুণের সম্রাট্ জওহরলাল এই মন্ত্রেই ভারতকে উজ্জীবিত করিলেন?

হায়! ইণ্ডিয়া ডোমিনিয়নের ক্যাবিনেটেরই যদি এই মানসিক দৈন্য দশা, তাহা হইলে ক্ষুদ্র পশ্চিম-বঙ্গে সোপ-ষ্টোন, তেঁতুলের সীড, (রাইটার্স বিল্ডিংএ অশ্লীল শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র!) শান্তি সেনা এবং বঙ্গভাষার ফাইলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকাই সমীচীন হইবে না কি? কিন্তু তাহাতেও মুশকিল এই যে, 'সমীচীন, সমিচিন অথবা সমীচিন না হইবে কেন, এ সমস্যা কে ভঞ্জন করিবে?

চরম শৈত্যের সন্ধানে

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নানা রকম আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সাহায্যে বিজ্ঞান মানুষকে যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দময় জীবনযাত্রার সুযোগ দিয়েছে তেমনি অসীম, অনন্ত ও অস্বাভাবিকের পেছনে কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা পরিচালিত করে অনেক নূতন প্রাকৃতিক তথ্যের উপর আলোক-সম্পাতে সক্ষম হয়েছে। জল ও স্থলপথের হাজার হাজার মাইল পথ জরীপ করা সম্ভব হয়েছে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান ও দূরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় মানচিত্রে। পৃথিবীর সব কথা বুঝতে ও জানতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের আকাশের দিকে তাকাতে হলো। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহাদির আয়তন, উপাদান, আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পৃথিবী থেকে উহাদের দূরত্ব একে একে সমস্তই তাঁরা নির্ণয় করলেন। কিন্তু এ সকল আয়তন ও দূরত্বের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাইলের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। অতি বৃহৎ যেমন অস্বাভাবিক, অতি ক্ষুদ্রও তেমন অস্বাভাবিক। চুলের চেয়ে অনেক সরু তার অথবা অতিশয় পাতলা জিনিষের স্থূলতা (thickness) বের করা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে একটি সহজসাধ্য ব্যাপার। এক গজ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি পেতলের দণ্ড ফুটন্ত জলের বাষ্পে গরম করলে উহার দৈর্ঘ্য বাড়ে মাত্র ·০৫ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের এ পরিমাণকেও বিজ্ঞানের মাপ-কাঠীতে তেমন ক্ষুদ্র বলা চলে না। লাল, নীল, হলদে প্রভৃতি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wave-length) পরিমাণ হোলো প্রায় ১ ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগ। বিশেষ বিশেষ আলোক-যন্ত্র সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ নির্ভুল ভাবে এই নগ্ন-চোখে-অদৃশ্য অকল্পনীয় অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যেরও পরিমাপ করতে সমর্থ হয়েছেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর, ঠাণ্ডা ও গরমের, গতি ও স্থিরতা প্রভৃতির চরম সীমারেখায় পৌঁছনোর অভিযানে বৈজ্ঞানিকগণ যে সাফল্য লাভ করেছেন তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ "চরম শৈত্যের সন্ধানে"ও এই বিরাট অভিযানের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী।

শৈত্য ও ঠাণ্ডা বলতে আমরা বুঝি তাপের অভাব। এখন প্রশ্ন হলো তাপ জিনিষটি কি? আলো, বিদ্যুৎ ও চুম্বক প্রভৃতির মত তাপও শক্তি-বিশেষ। তাপ অদৃশ্য, কিন্তু জড় পদার্থের উপর উহার বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা উহার সত্তা আমরা উপলব্ধি করে থাকি। জিনিষের উষ্ণতা (temperature) ও আয়তন বৃদ্ধি, অবস্থার পরিবর্ত্তন, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রভৃতি তাপের কতগুলি সাধারণ ধর্ম্ম। কোন জিনিষ কতটা গরম বা ঠাণ্ডা (degree of hotness or coldness) এ প্রকাশ করার জন্য উষ্ণতা কথাটার ব্যবহার হয়। তাপ ও উষ্ণতা একার্থজ্ঞাপক নহে। উষ্ণতা পরিমাপের জন্য সেণ্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট দুই প্রকারের থার্ম্মোমিটার সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেন্টিগ্রেডে গলানো বরফের উষ্ণতা হোলো শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (০°) এবং ফুটন্ত জলের উষ্ণতা হোলো ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। খুব ঠাণ্ডা এবং খুব গরমের ধারণা করতে গেলে আমাদের বরফের এবং ফুটন্ত জলের কথাই মনে জেগে ওঠে। কাজেই আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডার সীমারেখা এবং ১০০ ডিগ্রী গরমের সীমারেখা নির্দ্দেশ করে থাকে।

জিনিষ মাত্রের তাপাভাবের অবস্থাকে বলা হয় ঠাণ্ডা। কোন জিনিষে তাপ প্রয়োগ করলে যেমন উহা অধিকতর গরম হয়, ঐ জিনিষ থেকে তাপ বের করে নিলে উহা আবার ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। জিনিষের উষ্ণতা সম্পর্কে প্রায় ১০০ বছর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের মনে কতগুলো প্রশ্ন জেগে ওঠে। কোন্ জিনিষ থেকে কতটা তাপ বের করে নেওয়া যায়? একটি জিনিষকে কতটা ঠাণ্ডা করা যায় এবং ঐ ঠাণ্ডা করার কি কোন শেষ সীমা আছে? কোন জিনিষের যতটা নিজস্ব তাপ আছে তার সমস্তটাই ওর থেকে বের করে নেওয়া কি সম্ভব? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান বৈজ্ঞানিকগণ পেলেন পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে। হিসাব করে জানা গেল, কোন জিনিষের উষ্ণতা কমিয়ে কমিয়ে যদি উহাকে ২৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নামানো যায় তবে উহার ভেতর কোন তাপই থাকবে না। জিনিষটি তখন সর্ব্বনিম্ন উষ্ণতায় এসে দাঁড়াবে। এই সর্ব্বনিম্ন উষ্ণতাকে বলা হয় চরম শূন্য উষ্ণতা। ইংরেজীতে বলা হয় Absolute zero degree। বরফ যত ডিগ্রীতে গলে অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম উষ্ণতাই হোলো এই Absolute zero। এই উষ্ণতাই চরম শৈত্যের সীমারেখা। সীমারেখার অস্তিত্ব জানা গেলেও বৈজ্ঞানিকগণ বিচার করে দেখলেন, কোন জিনিষকেই অতটা ঠাণ্ডা করা সম্ভব নয় অর্থাৎ উহার সমস্তটা প্রচ্ছন্ন তাপই বের করার প্রচেষ্টা কখনও ফলবতী হবে না।

উপরোক্ত প্রশ্নাবলী এবং উহাদের উপর সিদ্ধান্ত তাপ-বিজ্ঞানের গতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। হিমালয় অভিযানের মতই একটা অভিযানের উদ্দীপনা পদার্থবিদ্গণের সামনে উপস্থিত হোলো। কিন্তু হিমালয় অভিযানের মত এ অভিযান বলিষ্ঠ দেহের দরকার ছিল না, দরকার ছিল বলিষ্ঠ মস্তিষ্কের। আর এ দুই অভিযানের ধারা যেন বিপরীতমুখী। হিমালয়ের শীর্ষদেশে পৌঁছানো (যাহা এ পর্য্যন্ত কেহই পারেনি) একটা সংগ্রাম-বিশেষ—বরফ ও তুষারাবৃত দুর্গম বন্ধুর পথে অভিযানকারীর উঠে যেতে হবে। যত উপরে উঠা যায় ততই অভিযান হয়ে ওঠে বিপদসংকুল। কিন্তু উষ্ণতার ঊর্দ্ধগামী পথে (Region of high temperature) বিজ্ঞানের যাত্রা জয়যুক্ত হয়েছে বিনা বাধায়। শূন্য ডিগ্রীর ২৭৩ ধাপ উপরে অর্থাৎ ২৭৩ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় পৌঁছানো পদার্থবিজ্ঞানের অতি সামান্য ব্যাপার। গ্যাসের আগুনে টিন উত্তপ্ত করলে ঐ উষ্ণতায় (২৭৩ ডিগ্রী) উহা গলে যায়। যে ব্লাষ্ট ফার্নেসে লোহা গলানো হয় উহার উষ্ণতা হবে ১৬০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের বেশী। সূর্য্যের বহিরাবরণের তাপ হবে প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী। কৌশলী বৈজ্ঞানিক তাপ-বিজ্ঞানের নানা তথ্যের উপর নির্ভর করে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ উচ্চতম উষ্ণতা নির্ণয় করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে, উষ্ণতার নিম্নগামী পথে অবতরণ করা হিমালয়ের শীর্ষে পৌঁছানোর মতই সুকঠিন ও দুঃসাধ্য বলে প্রতিপন্ন হোলো। উষ্ণতার নীচের সীমানার দিকে যতই নামা যায় ততই নানা বিঘ্ন এসে দেখা দেয়; বিজ্ঞানের গতি মন্থর হয়ে আসে। এক শত বছর আগে তাপ-বিজ্ঞান —৭৩ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল, অর্থাৎ Absolute zero থেকে নির্ণীত উষ্ণতার ব্যবধান ছিল ২০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। ৫০ বছর পূর্ব্বে ব্যবধান হয় মাত্র ৫ ডিগ্রী অর্থাৎ তাপমান যন্ত্র —২৬৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উষ্ণতা নির্দ্দেশ করতে পেরেছে। আরও ৪ ডিগ্রী অর্থাৎ —২৭২ ডিগ্রীতে যেতে বিজ্ঞানের

আরও ২০ বছর সময় লেগেছে। শেষ ডিগ্রীর কিছুটা অর্থাৎ Absolute zero (—২৭৩) ডিগ্রীর কাছাকাছি পৌঁছাতে লেগেছে ১০ বছর। এ থেকে বোঝা যায়, Absolute zero ডিগ্রীতে পৌঁছানো হিমালয়ের শীর্ষে পৌঁছানোর মত দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়েছিল। তবে বলিষ্ঠ দেহ যাহা পারেনি, বলিষ্ঠ মস্তিষ্ক তাহা সম্পন্ন করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে।

চরম শৈত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের এই সুদীর্ঘ যাত্রা পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ, ইহার আনুষঙ্গিক হিসাবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার নিষ্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের এই যাত্রার শেষ ১০ ডিগ্রী না যাওয়ার পূর্ব্বে তেমন অদ্ভুত বা বিস্ময়কর কোন তথ্যের সন্ধান মেলেনি। শেষ দশ ডিগ্রীর উপরের সীমারেখায় অর্থাৎ —২৬৩ ডিগ্রী উষ্ণতায় পদার্থের আচরণ প্রায় স্বাভাবিক ছিল। ক্রমান্বয় ঠাণ্ডা করার ফলে গ্যাস প্রথমে তরল, তার পরে কঠিন অবস্থা ধারণ করেছিল এবং খুব ঠাণ্ডা করা হয়েছে এমন ধাতুর ভেতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সহজ ও দ্রুতগতি যথারীতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু শেষের ১০ ডিগ্রীর ভেতরে কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা গিয়েছিল। অদ্ভুত এ জন্য বলা হয়, কেন না ঐ সমস্ত ব্যাপারের সাথে আমাদের সাধারণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত কোন এক দিন এই অসামঞ্জস্যের প্রচ্ছন্ন কারণ নির্ণয় করবেন। আমরা এইবার আসল আলোচনায় প্রবেশ করবো।

থার্লোরিয়ার নামে এক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১১০ বছর পূর্ব্বে কঠিন কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড তৈরী করেন। কার্ব্বন-ডায়কসাইড স্বভাবতঃ একটি গ্যাসীয় পদার্থ—সাধারণতঃ বাতাসে অঙ্গারের দহনের ফলে এর উৎপত্তি। আমাদের বায়ুমণ্ডলের ইহা একটি ক্ষুদ্র অংশীদার হিসাবে বর্ত্তমান। বায়ুর সাধারণ চাপ হোলো প্রতি বর্গ-ইঞ্চির উপর প্রায় সাড়ে ৭ সের। ইহার ৩০ গুণ চাপ কোন আবদ্ধ স্থানের কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডের উপর প্রযুক্ত হলে উহা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রযুক্ত চাপ যদি ক্রমে আবার সরিয়ে নেওয়া হয় তখন কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড জলের বাষ্পীভবনের (evaporation) মত আবার গ্যাসে পরিণত হতে থাকবে। এর ফলে তরল কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডের অবশিষ্ট অংশের উষ্ণতা এত দ্রুত নেমে যায় যে, অতিশয় ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ইহা কঠিন অবস্থা লাভ করে। কঠিন কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড দেখতে বরফের মতই শাদা, কিন্তু উহার উষ্ণতা হোলো ৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। প্রায় এক শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিকগণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রয়োজন মিটাতেন কঠিন কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড ব্যবহার করে। বরফের সাথে বহু সাদৃশ্য থাকায় কঠিন কার্ব্বন-ডায়কসাইড শুকনা বরফ বলে পরিচিত। শুকনা বলার এই কারণ যে, বরফের মত উহার গা থেকে জলীয় বাষ্প বেরোয় না এবং উহা ভিজে স্যাঁতসেঁতে মত থাকে না। শুকনা বরফের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, ইহা জল-জমানো বরফের চেয়ে অনেক হাল্কা। এই সমস্ত কারণে কোন জিনিষ ঠাণ্ডা করা বা রাখার ব্যাপারে সাধারণ বরফের চেয়ে এই শুকনা বরফের ব্যবহার অনেক সুবিধাজনক বলে পরিগণিত হয়েছে।

গ্যাসীয় কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডকে উহার তরল অবস্থায় রূপান্তর করাতে বৈজ্ঞানিকদের কোন বেগ পেতে হয়নি—প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের অনুকূলে ছিল বলেই। কোন গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করতে হলে উহার উপর শুধু যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করলেই হবে না। প্রত্যেক গ্যাসের উষ্ণতা কমিয়ে এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় না নামানো হলে চাপ যত প্রবলই হোক, গ্যাস কিছুতেই তরল অবস্থা লাভ করবে না। এই নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতাকে বলা হয় সাঙ্কটিক উষ্ণতা বা critical temperature। প্রত্যেক গ্যাসের এক একটা নির্দ্দিষ্ট critical temperature আছে। এমোনিয়া, সালফার-ডায়কসাইড প্রভৃতির মত কার্ব্বন-ডায়কসাইড গ্যাসের critical temperature বাতাসের স্বাভাবিক উষ্ণতার অনেক উপরে। কাজেই কার্ব্বন-ডায়কসাইড গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করার জন্য যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করাই প্রয়োজন, গ্যাসের উষ্ণতা কমিয়ে নেওয়ার দরকার হয় না। আবার বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে যদি উক্ত গ্যাসের উষ্ণতা কমিয়ে খুব ঠাণ্ডা করা হয় তা হলেও উহা তরল অবস্থা লাভ করবে। কাজেই চরম শৈত্যের সন্ধানীদের প্রথম পথ-প্রদর্শক কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডকেই নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইথার নামক একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থের সাথে শুকনা বরফ আবার মিলানো হলে উহা দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে পড়ে এবং উহার উষ্ণতা —৭৭ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে নেমে যায়। এই কারণে ফ্যারাডে-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইথার ও শুকনা বরফের ঠাণ্ডা-মিশ্রণ অন্যান্য গ্যাস তরল অবস্থায় আনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

উষ্ণতার নিম্নসীমা পরিক্রমণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোলো তরল বায়ুর তৈরী অর্থাৎ বায়ুকে তরল অবস্থায় পরিণত করা। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে লিণ্ডে সাহেব এই কার্য্যটি সম্পন্ন করেন। তরল বাতাসের তৈরীর সাথে সাথে উষ্ণতার —১১৪ ডিগ্রী সীমারেখাও বৈজ্ঞানিকের আয়ত্তে এসে পড়লো। ডেবার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্র ভাবে তরল বায়ু তৈরী করেছিলেন প্রায় এক সময়েই। কিন্তু তরল বায়ু রাখার উপযুক্ত আধার অভাবে ভারি মুস্কিলে পড়লেন। সাধারণ ধাতু, মাটি বা অন্য কোন পাত্রে তরল বায়ু রেখে দিলে বাইরের বায়ুর তাপ ঐ সকল পাত্রে পরিবাহিত হয়ে তরল বায়ুকে গরম করে তোলে এবং উহা বাষ্পীভূত হয়ে আবার গ্যাসের অবস্থা লাভ করে। প্রয়োজন সত্যিই আবিষ্কারের জননী। ডেবার ভ্যাকুয়াম্ বা থার্মো-ফ্লাস্ক নামক যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করে উহার ভেতর তরল বায়ু রাখার ব্যবস্থা করলেন। এই থার্মো-ফ্লাস্কই আমরা ঘরে ঘরে যে সব কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকি তা সকলেই জানেন। তরল বায়ুর ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা এখন একটু আলোচনা করবো।

বাতাস যখন তরল করা হয়, তখন উহার উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দু'টি গ্যাসই এক সময় তরল অবস্থায় চলে যায়। কিন্তু তরল বায়ু যদি আস্তে আস্তে বাষ্পীভূত হতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা গেছে, নাইট্রোজেন অক্সিজেনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে গ্যাসের অবস্থায় ফিরে যায়। কাজেই কিছুক্ষণ বাষ্পীভবনের পরে বাকী তরল বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ নাইট্রোজেনের তুলনাই থাকে অনেক বেশী। এই কারণে অক্সিজেন

তৈরীর সহজ উপায় হিসাবে তরল বায়ুর আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। তরল বায়ু নিয়ে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক র‍্যামজে এবং ট্রাভার্স ক্রিপ্‌টন্ (Krypton) এবং জেনন (Xenon) ও নেয়ন (Neon) নামে বায়ুর তিনটি গ্যাসীয় উপাদান আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানে তরল বায়ুর শ্রেষ্ঠ দান হোলো ঠাণ্ডা করার উপায় হিসাবে। ডেবার্ সাহেব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন, —১৮০ ডিগ্রীতে বহু মৌলিক পদার্থের কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না। রোগ-জীবাণু এবং কতিপয় ফলের বীজ ঐ উষ্ণতায় ঠাণ্ডা করলেও উহাদের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যায় না। যদিও আবহাওয়ার স্বাভাবিক উষ্ণতার কিছু বেশী তাপেই উহারা জীবনীশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তুলা, ডিমের খোসা, ও চর্ম্ম প্রভৃতি জিনিষ তরল বায়ুতে ঠাণ্ডা করে সূর্য্যের আলোতে রাখা হোলো। এখন যদি ঐ জিনিষ-গুলো কোন অন্ধকার ঘরে রাখা হয়, তাহলে উহাদের গা থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ (Phosphorescence) আপনা থেকে হয়ে থাকে। সীসে তরল বায়ুতে ঠাণ্ডা করলে উহার স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম (elasticity) দেখা দেয়। তরল পারদ অনুরূপ ব্যবস্থায় জমে সীসের মত হয়, লোহা কাচের মত ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ফুল, ও ফল তরল বায়ুতে ডোবালে কঠিন অবস্থা লাভ করে; তখন ওদের সহজেই গুঁড়ো করা যায়।

কোন আবদ্ধ স্থানের বা পাত্রের ভেতরকার বাতাস বা অন্য কোন গ্যাসীয় পদার্থ তাড়িয়ে দিয়ে উহাদের বায়ুশূন্য অবস্থায় আনা (Production of Vacuum) বিজ্ঞানে একটি অপরিহার্য্য ব্যাপার। High Vacuum এর সৃষ্টি অর্থাৎ কোন আবদ্ধ স্থান বা পাত্রকে সম্পূর্ণ বায়ুমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে তরল বায়ুর সাহায্যে। কোন আবদ্ধ পাত্রে যত বেশী পরিমাণ বায়ু থাকে ঐ বায়ুর চাপও হয় তত বেশী। বায়ুর পরিমাণ একটু কমাইলে চাপও কমে আসে। বায়ুর পরিমাণ কমানো যায় দুই ভাবে—পাম্প দ্বারা বায়ু বের করে নিয়ে আবদ্ধ বায়ুকে ঠাণ্ডায় জমাইয়া তরল অবস্থায় পরিণত করে। পাম্পের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমাদের চারি দিকের বায়ুর স্বাভাবিক চাপ প্রায় ৭৬০ মিলিমিটার (৩০ ইঞ্চি)। অর্থাৎ বায়ুর চাপের জন্য একটি চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটারে ৭৬০ মিলিমিটার বা ৩০ ইঞ্চি উচ্চতার পারদ-স্তম্ভ দাঁড়িয়ে থাকে। পাম্পের সাহায্যে কোন আবদ্ধ স্থানের বায়ুর চাপ কমাইয়া ·১ মিলিমিটার পর্য্যন্ত নামানো যেতে পারে। কিন্তু তরল বায়ুর সাহায্যে বায়ুর চাপ কমিয়ে ·০০০০৫ মিলিমিটারে নামানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন গ্যাসকে বিশুদ্ধ এবং জলমুক্ত শুক্‌না অবস্থায় পাওয়ার জন্য এখন সমস্ত পরীক্ষাগারে তরল বায়ুর ব্যবহার চলছে।

তরল বায়ুর উষ্ণতার মাইল পাথরে চরম শৈত্যের দুর্গম পথ চিহ্নিত হওয়ার পরে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় বিশ বছর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৩০ বছর পূর্ব্বে। এ আবিষ্কার হোলো হাইড্রোজেন গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করা। পদার্থ-বিজ্ঞানে হাইড্রোজেনকে তরলীভূত করা একটি সুকঠিন ব্যাপার বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। যে সকল গ্যাস যে কোন নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় চাপবৃদ্ধির সাথে আয়তনে কমে এবং চাপের হ্রাসপ্রাপ্তির সাথে আয়তনে বেড়ে যায়, উহাদের আদর্শ গ্যাস (perfect gas) বলা হয়। হাইড্রোজেন এই শ্রেণীর গ্যাসের অন্তর্গত। আদর্শ গ্যাসের সাঙ্কটিক উষ্ণতা বা critical temperature খুব নীচের দিকে। এদের তরলীভূত করতে হলে প্রথমে চাই এদের খুব ঠাণ্ডা করে নিজ নিজ সাঙ্কটিক উষ্ণতার কিছু নীচে আনয়ন করা; তার পরে যথেষ্ট চাপ প্রযুক্ত হলেই উহারা তরল অবস্থা লাভ করে। থার্মো-ফ্লাস্কের আবিষ্কারক ডেবার্ সাহেব প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাসটি তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করেন। তরল হাইড্রোজেনের উষ্ণতা প্রায়—২৫৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড—এবসলুইট্ জিরোর মাত্র ১৫০ ডিগ্রী উপরে। আর হাইড্রোজেন গ্যাসের critical temperature হোলো—২৪২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। ডেবার্ সাহেব তরল হাইড্রোজেনকে অনেক পরীক্ষার পরে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় পরিণত করতে সক্ষম হন। কিন্তু উহার উষ্ণতা মাত্র ২।৩ ডিগ্রী কম বলে—২৫৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের সীমারেখা বেশী পেছনে ফেল্‌তে পারেনি।

হাইড্রোজেনের পরে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোলো হিলিয়াম গ্যাসের উপর। কোন মৌলিক পদার্থের সাথে এর রাসায়নিক মিলন হয় না বলে ইহাকে নিষ্ক্রিয় (Inert) গ্যাস বলা হয়। বিপরীতধর্ম্মী পরমাণুর রাসায়নিক আকর্ষণ (chemical affinity)-জয়ী এই চিরকুমার গ্যাসটিকে তরল অবস্থায় আনার প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিকগণ আত্মনিয়োগ করলেন। —২৫৮ ডিগ্রীর সীমারেখা থেকে নীচের ২৫ ডিগ্রীর পথ লক্ষ্য করে পর্য্যটন সুরু হোলো। বহু বিঘ্ন দেখা দিল, অনেকে সুবিধে না বুঝে হাল ছেড়ে দিলেন। অবশেষে লিডেন সহরের কেমারলিঙ্গ ওনেস্ নামক বৈজ্ঞানিক হিলিয়াম গ্যাস যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী করে উহা তরল অবস্থায় পরিণত করতে সমর্থ হন। তরল হিলিয়াম দেখতে জলেরই মত। এর সাহায্যে ওনেস্ সাহেব উষ্ণতার আরও নিম্ন ধাপে, অর্থাৎ Absolute zeroর মাত্র ২।৩ ডিগ্রী উপর পর্য্যন্ত যেতে সক্ষম হোলেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি আবিষ্কার তিনি করলেন যাহা বিস্ময় উৎপাদনে এবং কার্য্যকারিতায় অনেক অনুরূপ আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে।

তরল হিলিয়াম যে কতটা ঠাণ্ডা তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। এত অধিক ঠাণ্ডায় কতগুলো ধাতুর নূতন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লো। দেখা গেল, উক্ত ধাতুগুলো তরল হিলিয়ামের সাহায্যে ঠাণ্ডা করে উহাদের ভেতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে অক্ষুণ্ণ শক্তি নিয়ে ঐ প্রবাহ অবিরাম চলতে থাকবে। রোমাঞ্চকর বৈজ্ঞানিক কাহিনী বা গল্প যারা লেখেন তাঁদের কল্পনায়ও এরূপ অবাস্তব ধারণা স্থান পায় না। কোন পরিবাহক তারে (conductor) নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক চাপে (voltage) যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো যায় তা হলে ঐ প্রবাহের শক্তি নির্ভর করে পরিবাহক তারটির প্রতিরোধ ক্ষমতার (Resistance) উপরে। প্রতিরোধ যত বেশী হবে তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ তত ক্ষীণ হবে, আবার প্রতিরোধ কম হলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের বেগও বেড়ে যায়। পরিবাহক তার বা পদার্থের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতার উপর উহার প্রতিরোধ নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কোন পরিবাহক তার যত সরু হবে তত বেশী হবে উহার প্রতিরোধ; আবার যত মোটা হবে তত প্রতিরোধ শক্তি কমে যাবে। তেমনি নির্দ্দিষ্ট স্থূলতার পরিবাহক তার বা পদার্থ যত লম্বা হবে তত বেশী হবে উহার প্রতিরোধ শক্তি; এ সব হোলো বিদ্যুৎবিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। এমন কোন একটা জিনিষ

একবার মাত্র ঘুরিয়ে দিলে উহা গতিদায়ক শক্তি ব্যতিরেকে অনাদি অনন্ত কাল ঘুরতে থাকবে, এ যেমন উড়িয়ে দেওয়ার কথা, কোন পরিবাহক তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে উহা অক্ষুণ্ণ শক্তি নিয়ে চিরকাল চলতে থাকবে—এ-ও তেমনি অবিশ্বাসের কথা ছিল বহু দিন ধরে। কিন্তু ওনেস-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ যে কতগুলি বিশেষ ধাতুর তার তরল হিলিয়ামে ঠাণ্ডা করে উহাদের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহের অব্যাহত ও অবিরাম গতি লক্ষ্য করেছেন তা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করলেন, তরল হিলিয়ামের ভেতর ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করলে ঐ সমস্ত তারের বৈদ্যুতিক "প্রতিরোধ" বলে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না; কাজেই উহাদের ভেতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি থাকবে অক্ষুণ্ণ, আর গতি হবে নিরবচ্ছিন্ন। আমরা যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সাহায্যে আলো জ্বালাই, নানা যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করি, উহার অনেকটা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় সংযোগকারী তার-শৃঙ্খলের "প্রতিরোধ" ধর্ম্মের জন্ত। কাজেই বাস্তব ব্যবহারের দিক্ থেকে এখনও কার্য্যকরী না হলেও প্রতিরোধশূন্ত অথচ বিদ্যুতের পরিবাহক ধাতুর তারের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার যে কাহিনী তা সত্যিই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি গৌরবময় অধ্যায়।

পদার্থের শেষ তাপটুকু নিঃশেষ করে বের করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় উষ্ণতার নিম্নতম সীমার উপর ১০ ডিগ্রী পথ ধরে এই পরিক্রমণে আরও এমন কয়েকটি অসম্ভব ব্যাপার দেখা গেল, যাহা বৈজ্ঞানিকদের ধারণায় আসেনি। বিজ্ঞানে সাধারণতঃ সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে ক্রমিক ভাবে—আকস্মিক ভাবে নয়। তাপ বৃদ্ধির সাথে কোন ধাতুর আয়তন ও "প্রতিরোধ" শক্তি বাড়ে একটা নিয়মিত হারে। কিন্তু কয়েকটি ধাতুকে খুব ঠাণ্ডা করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, উহাদের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ শক্তি আস্তে আস্তে কমে আসে না। তার পরে যখন উহাদের Absolute zero ডিগ্রীর মাত্র ৮ ডিগ্রী ব্যবধানে নামানো হলো তখন দেখা গেল, উহার অন্ত কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি, কেবল বৈদ্যুতিক "প্রতিরোধ" সহসা তিরোহিত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা অভিনব ব্যাপার দেখা গেল, তাপ-শক্তি সমস্ত পদার্থের ভেতর দিয়ে কম-বেশী সময়ে চলাচল করে, এ হোলো প্রমাণিত তথ্য। কিন্তু হিলিয়ামের ভেতর দিয়ে তাপ-শক্তির যেতে এক মুহূর্ত্ত সময়েরও প্রয়োজন হয় না। হিলিয়ামকে শুধু চিরকুমার বলাতে ভুল হবে, এ যেন ঠাণ্ডা-পরমরূপ দুঃখ-কষ্টে-উদাসীন শিব হয়ে একটা বিরাট নিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে বিদ্যমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর রহস্য এখনও উদ্ঘাটন করতে পারেননি।

তরল হিলিয়াম আবিষ্কারের পর চরম শৈত্যের সন্ধানে নূতন রেকর্ড স্থাপনের আশায় কয়েক জন বৈজ্ঞানিক লেগে গেলেন। চরম শূন্ত বা Absolute zero ডিগ্রী থেকে ১ ডিগ্রী ওপরের অর্থাৎ —২৭২ ডিগ্রীর সীমানায় পৌঁছানো গেলো তরল হিলিয়ামকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করে। ওর চেয়ে ঠাণ্ডার আরও নিম্নতর সীমানা পাওয়া গেছে কয়েক বছর পূর্ব্বে কঠিন হিলিয়ামকে বিশেষ ব্যবস্থায় অধিকতর ঠাণ্ডা করে। ঠাণ্ডার ঐ সীমানা হবে Absolute zero ডিগ্রী থেকে ১ ডিগ্রীর কিছুটা কম। হিলিয়ামকে অবলম্বন করে শৈত্যের চরম সীমানায় যাওয়ার প্রচেষ্টা সমানে চলতে লাগলো। কিন্তু হিলিয়াম দ্বারা তা সম্ভব হোলো না। নূতন ধারণার আবশ্যকতা বৈজ্ঞানিকগণ অনুভব করলেন এবং সেদিকে চিন্তাধারা চালালেন। এখন, ক্রোম এলাম (এক জাতীয় ফিট্‌কিরি) এবং ঐরূপ কতিপয় রাসায়নিক লবণ পদার্থের একটা বিশেষ গুণ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই সমস্ত লবণ জাতীয় পদার্থ প্রবল চুম্বক-প্রভাব ক্ষেত্রে স্থাপন করে দেখা গিয়েছে যে, উহারা প্রথমটায় খানিকটা গরম হয়ে পড়ে, তার পরে চুম্বক-প্রভাব সরিয়ে নিলে উহারা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের এ-কথা মনে পড়লো। ক্রোম্ এলাম প্রচণ্ড চুম্বক-প্রভাব ক্ষেত্রে স্থাপন করে তরল হিলিয়ামের সাহায্যে উহাকে শৈত্যের প্রায় শেষ সীমানা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করা হোলো। পরে যেমনি চুম্বক-প্রভাব তুলে নেওয়া হোলো তখন দেখা গেল, ক্রোম এলাম তরল হিলিয়ামের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়েছে। উষ্ণতার মাপকাঠিতে দেখা গেল উহার উষ্ণতা, —২৭৩ ডিগ্রী থেকে মাত্র ১এর ৩০০০ ডিগ্রী ব্যবধানে নেমেছে। চরম শৈত্যের সন্ধানে যে অভিযান আরম্ভ হয়েছিল ১০০ বছর পূর্ব্বে তার পরিসমাপ্তি হোলো এই ভাবে।

উপবাসী আত্মা কাঁদে

রঘুনাথ ঘোষ

উন্নত ও বক্ষযুগে নিখিলের সমস্ত কামনা
নিঃশব্দে মূরছি পড়ে অবিরাম অজস্র ধারায়,
নিটোল যৌবনে তব উচ্ছ্বসিত অযুত বাসনা
চকিতে জ্বলিয়া ওঠে লেলিহান সহস্র শিখায়।

সুকুমার বরতনু, সুমোহন সরম-জড়িমা
নিয়ত আহ্বান করে নিরজনে মৌন ইশারায়;
অপরূপ মৃগ-আঁখি, অধরের সর্পিল ভঙ্গিমা
কি যেন বলিতে চাহে বাণীহীন নীরব ভাষায়।

সুধাস্নিগ্ধ মৃদু হাসি, সুগভীর নয়নের বাণী
চপল চলার গতি, সুমধুর অযুত ইঙ্গিত,
নিঃশব্দে কে যেন বলে সুকুমার মোর তনুখানি,
হৃদয়ে রণিয়া ওঠে সুধা-ঝরা কত না সঙ্গীত।

অদম্য পিপাসা জাগে, তবু হায় শঙ্কিত হৃদয়
কেবলি কাঁদিয়া মরে, দেখি, তব দেহের কিনারে;
তোমার আত্মার বুকে লাভা-স্রোত তপ্ত অগ্নিময়
উপবাসী আত্মা কাঁদে হতাশার ঘন অন্ধকারে।

পূর্ব্ব-ইউরোপে কি হ'চ্ছে ?

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ ধনিক-শ্রমিকের শ্রেণী-সংঘর্ষ। দেশের ধনোৎপাদনের ব্যবস্থার ভিত্তি যখন মালিক-শ্রেণী কর্ত্তৃক শ্রমজীবী উৎপাদকশ্রেণীর শোষণের ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ধনবাদের যুগের শ্রেণী-প্রকৃতি সুপরিস্ফুট হয়। ধনোৎপাদনের উপায় ও সাজ-সরঞ্জামগুলো—জমি, কল-কারখানা, খনি, জঙ্গল, যান-বাহন ব্যবস্থা,—তখন মুষ্টিমেয় মালিকের সম্পত্তি; আর দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনসংঘ তখন নিঃস্ব। পেটের দায়ে কায়ক্লেশে জীবনধারণের মত মজুরী নিয়ে শ্রম বিক্রী করে ধনিক-মালিকদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলাই তখন শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন-বিধি।

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির ফলে এই শোষণ-ব্যবস্থা ক্রমশঃই কঠোরতর হতে থাকে—বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যত বাড়ে শোষণ ব্যবস্থা ততই তীব্র হয়। অল্প লোক বেশী উৎপাদন করতে পারে, সুতরাং বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে,—ধনিকের মুনাফার পাহাড়ও বড় হয়; জনগণের শ্রম বিক্রয়ের প্রতিযোগিতায় শ্রমের মূল্য বা মজুরীও কমে। এই ভাবে জনগণের ক্রয়শক্তি কমে যায়। উৎপন্ন পণ্য আর দেশের বাজারে যথেষ্ট মুনাফায় বিক্রয় করা যায় না। ধনবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধের রূপ প্রকট হয়ে ওঠে শোষিত, নিপীড়িত, বুভুক্ষু শ্রমজীবী জনগণের এই শোষণ-ব্যবস্থা এবং তার প্রতীক ধনিক-মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত দুঃখ ও বিদ্বেষে। ধনবাদী দেশে শ্রেণী-সংঘর্ষ একটা ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

যখন দেশের শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করে' অন্তঃসারশূন্য করে' ফেলেও পুঞ্জীভূত মুনাফার পাহাড়টাকে মূলধন হিসেবে খাটানোর আর উপায় থাকে না, তখন সেই বাড়তি মূলধন অন্যান্য অনুন্নত দেশে খাটানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এক দেশ কর্ত্তৃক আর এক দেশ শোষণের যুগ শুরু হয়। এমনি করে ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এমনি করে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত দেশের ধনিকশ্রেণীর শোষণের ক্ষেত্র উপনিবেশে পরিণত হয়। এমনি করে ঐ সব ঔপনিবেশিক দেশগুলোতেও ক্রমশঃ বিদেশী শোষণের ফলে জনগণের দুর্দ্দশা চরম সীমায় ওঠে,—এবং একটা মুক্তি-সংগ্রামও শুরু হয়ে যায়। ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধের দ্বিতীয় রূপ এই ঔপনিবেশিক মুক্তি-সংগ্রাম।

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলো এমনি করে শিল্পে উন্নত কয়েকটা দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর যখন শোষণের ক্ষেত্র প্রসারের আর জায়গা থাকে না, তখন ঐ শোষক জাতিগুলোর মধ্যে পরস্পরের শোষণের ক্ষেত্রে হামলা করার লোভ দেখা দেয়। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা থেকে কূটনৈতিক লড়াই সুরু হয়, এবং সেই কূটনৈতিক যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়। ধনবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধের তৃতীয় রূপ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের শোষণ থেকে ধনবাদের বিষ এমনি করে নিজেদের মধ্যে চরম হানাহানিতে ফেটে পড়ে।

এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যুযুৎসু সাম্রাজ্যবাদীর দল জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজ নিজ দেশের শোষিত জনগণের জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং বিদেশী-বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, শত্রুর তোপের মুখের খোরাক করে পাঠায়। কিন্তু শ্রেণী-চেতন শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী সংঘ এবং ধনবাদ-বিরোধী নেতৃত্ব যেখানে গড়ে উঠেছে, সেখানে তারা শোষক-শ্রেণীর ভাঁওতায় ভোলে না, সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পরস্পরের হানাহানির সুযোগে দেশে বিপ্লবের আয়োজন করে, শত্রুশ্রেণীর পরস্পরের হানাহানিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ধনবাদের সঙ্কট আসন্ন দেখে দেশে দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর সংঘগুলো সোসিয়্যালিষ্ট ও সোসিয়্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বে নিজ নিজ দেশে যুদ্ধের বিরোধিতা করবে বলে ঘোষণা করেছিল; সুযোগ পেলে বিপ্লবও হবে অন্ততঃ কয়েকটা দেশে, এ কথাও অনেকে মনে করেছিল। কিন্তু ঐ সব সোসিয়্যালিষ্ট পার্টিগুলো সকল দেশেই যুদ্ধের বিরোধিতা করা দূরে থাক, নিজ নিজ দেশের সৈন্য-দলে যোগ দিয়ে নিজেরাই পরস্পরের গলা-কাটাকাটি করেছিল। শুধু লেনিনের নেতৃত্বে মার্কস্‌বাদী নীতির সঠিক বাস্তব ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব করে' রুশিয়াকে এক দিকে জারের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র শাসন, আর এক দিকে বিদেশী শোষকদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। তারই ফল আজকের দুনিয়ার বিরাট বিস্ময় সোভিয়েট ইউনিয়ন।

বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলের একটা দুর্ব্বল গ্রন্থি প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং তা'তে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যেমন ভাঙ্গন ধরেছিল, বিশ বছরের চেষ্টায় বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সে দুর্ব্বলতার অবসান দূরে থাক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার ভাঙ্গন আরো অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে পূর্ব্ব-ইউরোপ ও বল্কানের দেশগুলোতে। আজ ফ্যাসিষ্ট সামরিক শক্তির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে খসে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েট দেশের মতনই আর একটা বিস্ময়কর সৃষ্টিমূলক সংগঠন শক্তি ও কর্ম্মোন্মাদনার পরিচয় দিনে দিনে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠছে।

এই সব দেশে একটা নতুন ধরণের জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যা একটা নতুন ধরণে ধনতন্ত্রকে ভেঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করছে। ঠিক এই ধরণের ব্যবস্থা অন্যত্র নেই। কিন্তু এর ফলে পৃথিবীর ধনবাদী পদ্ধতিতে একটা বড় রকমের ভাঙ্গন লেগেছে, এবং পৃথিবীর শক্তি সমাবেশের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছে।

এই দেশগুলোতে ফ্যাসিষ্ট-গোলামী থেকে মুক্তির সংগ্রাম কয়েকটা বিশেষ কারণে একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল। প্রথমতঃ, এই মুক্তি-সংগ্রামের ভেতর দিয়েই এই সব দেশের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল শুধু জার্ম্মাণ-ফ্যাসিষ্টরাই তাদের শত্রু নয়, পরন্তু বড় বড় ধনিক, জমিদার সরকারী ও সামরিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি দেশী শাসক সম্প্রদায়ও তাদের শত্রু। নাজীদের বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে প্রস্তুত নয়, সেইটেই ছিল এই সব দেশের জনসাধারণের কাছে শত্রু বা মিত্রের পরিচয়।

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতা ও দলপতিদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিল শত্রুর পক্ষভুক্ত। যুগোস্লাভিয়ায় নেডিক, পাভেলিক প্রভৃতি জার্ম্মাণ দালালদের সঙ্গে ত' মুক্তিযোদ্ধাদের লড়তে হয়েছেই, উপরন্তু রাজা পিটার এবং তার পেটোয়া দ্রাজা মিহাইলোভিচের মতন পলাতক সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাদের লড়তে হয়েছে। পোল্যাণ্ডের মুক্তি-যোদ্ধাদেরও এই ভাবে পলাতক পোল সরকারের লণ্ডনস্থিত চক্র এবং জেনারেল বর কমরোউস্কির সঙ্গেও লড়তে

হয়েছে। রুমেনিয়াতে মুক্তি-যোদ্ধাদের লড়তে হয়েছে শুধু হিটলারের স্থানীয় দালাল অ্যান্টনেস্কুর সঙ্গে নয়, পরন্তু ধনিকদের পার্টি লিবারেল ও জারানিষ্ট দলের নেতা ব্রাটিয়ানু এবং ম্যানিউর সঙ্গেও। রুমানিয়ার ফ্যাসিষ্ট দলের মতন এরাও ছিল রুমেনিয়াকে জার্ম্মাণীর গোলামে পরিণত করার জন্যে দায়ী। কাজেই হিটলারের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেশে ধনিক-জমিদারদের শক্তিরও পরাজয় ঘটেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এই মুক্তি-সংগ্রামের ভেতর দিয়েই এই সব দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছিল। জনগণের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির শীর্ষস্থানীয় ছিল শ্রমিকশ্রেণী। সংগ্রামের সকল স্তরেই এই শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের বিপ্লবী অগ্রগামী দল কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্ব করেছে এবং সব চেয়ে বেশী আত্মবলি দিয়েছে। যুগোস্লাভিয়ায় তো কমিউনিষ্ট পার্টির ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব আগে থেকেই ছিল, সুতরাং জনগণের গণতান্ত্রিক মুক্তি-সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব স্বভাবতঃই তাদের হাতে ছিল,—এমন কি রুমানিয়ার মতন দেশেও যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের আগে দুর্ব্বল ছিল,—মুক্তি-সংগ্রামে প্রগতিশীল জনগণের একত্র সমাবেশ ও সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব কমিউনিষ্ট পার্টিই করেছে।

কাজেই, হিটলার এবং তার সঙ্গে ধনিক-জমিদার সম্প্রদায় পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেশে এমন একটা নতুন রাজনৈতিক গণশক্তি খাড়া হল, যার মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির স্থান হল সেরা।

তৃতীয়তঃ, এই সব দেশে এই প্রথম জনগণের আকাঙ্ক্ষা সফল হল,—যে সাফল্যের মূলে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং তার গণতান্ত্রিক নীতি। ফ্যাসিবাদের ধ্বংস সাধনে সোভিয়েটের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ, এবং যুদ্ধ শেষে হিটলারের কবলমুক্ত দেশগুলোর প্রগতিশীল সংগ্রামী গণশক্তির প্রতি সোভিয়েটের অকুণ্ঠ সমর্থনের ফলে এই সব দেশের জনগণ নির্ভয়ে নিজেদের জীবন ও দেশের পুনর্গঠনে একটা নতুন পথ ধরতে পারলে। লাল ফৌজ যে-সব দেশে উপস্থিত হয়ে জার্ম্মাণ সৈন্যদলকে বিতাড়িত করেছে, সে সব দেশে পূর্ব্বতন শাসকশ্রেণী ধনিক জমিদার আর নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বাইরেকার সাহায্য সংগ্রহ করতে পারেনি—দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের দিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যুদ্ধোত্তর অভিযান গ্রীসের পর আর এগোতে পারেনি।

এই নতুন গনতন্ত্রগুলোর চেহারা কিন্তু সব রকমে এক নয়। দেশগুলোর আগেকার অবস্থার তারতম্য অনুসারে বর্ত্তমানেও পার্থক্য রয়েছে। যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবানিয়ার অবস্থা খানিকটা কাছাকাছি,—যদিও তারা নিজেদের দেশের অবস্থা অনুসারে যথাসাধ্য পুনর্গঠনের কাজ নিজেদের মতলব অনুসারে করে চলেছে। তাদের উন্নতির গতিও সমান নয়। আবার, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা পূর্ব্বোক্ত দেশগুলো থেকে অনেক তফাৎ। এরাও গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু এই দেশগুলোতে অতীতের জের এখনও অনেক রয়েছে—যেগুলোকে এদের হঠাতে হবে।

কিন্তু এই সব তারতম্যের মধ্যেও পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন প্রচেষ্টার যে লড়াই চলেছে, তার মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার সর্ব্বত্রই সমান। এর মধ্যে তিনটে ব্যাপার প্রধান,—যে ব্যাপারগুলো যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় এই নতুন গণতন্ত্রগুলোকে প্রগতির প্রতীকরূপে প্রতিভাত করেছে।

সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের মূল প্রশ্ন—ক্ষমতা কাদের হাতে। এই দেশগুলোতে ধনিক-জমিদার প্রভৃতি শোষক-শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতাটা চলে এসেছে জনগণের হাতে; সরকারী ক্ষমতার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্ব্ব প্রকার শ্রমজীবী শ্রেণীর ঐক্যের ওপর,—যার পুরোভাগে আছে শ্রমিকশ্রেণী। এই ব্যাপারটার চেহারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের,—কোথাও বা এটার রূপ গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর সমবায়, কোথাও বা সর্ব্ব প্রকার শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্মিলিত পিপলস্ ফ্রণ্ট। যুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে এই রকমের ঐক্যবদ্ধ দল গঠন খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। যুদ্ধের পর, শান্তির সময়ে এই ঐক্যবদ্ধ গণসংগঠনগুলোই হল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বনিয়াদ—যার ফলে সমগ্র জনগণের স্বার্থানুযায়ী কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ করা সহজ হল। এই সব গণ-সংগঠনের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকায় আছে কমিউনিষ্ট পার্টি, কারণ তারাই জনগণের সব চেয়ে বিশ্বস্ত নেতা।

যুগোস্লোভিয়ায় পিপলস্ ফ্রণ্টের রূপ বিভিন্ন পার্টির সমবায় নয়; পরন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল যোদ্ধার এক দেশজোড়া গণ-সংগঠন।

বুলগেরিয়ায় গণতান্ত্রিক দলগুলোর সমবায়ে গঠিত হয়েছে প্যাট্রিয়টিক ফ্রণ্ট; কিন্তু এই ফ্রণ্টের স্থানীয় কমিটিগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়েছে নানা গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিরা। মূলতঃ বুলগেরিয়ার প্যাট্রিয়টিক ফ্রণ্ট একটা সম্পূর্ণ নতুন রকমের সংগঠন,—যার ব্যবস্থায় জনগণের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া সহজ হয়েছে।

পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টির সম্মিলিত গভর্ণমেণ্টরূপে।

কিন্তু এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও এই সব দেশ একটা বিষয়ে সমান; তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে দিয়েছে, এবং এই পরিবর্ত্তন অতি অল্প দিনেই হয়েছে। যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীতে রাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। (সম্প্রতি রুমেনিয়ার রাজা এই বলে রাজ্য ত্যাগ করেছেন যে, "দেশের নতুন অবস্থার সঙ্গে রাজতন্ত্র আর খাপ খায় না।" ফলে রুমেনিয়াও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে)। এই সব দেশের ইতিহাস বিভিন্ন রকমের হলেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই ছিল শোষণ-নির্য্যাতন ও যুদ্ধের কল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের চাষারা জমির জন্যে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল, আজ জমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে তাদের সে সংগ্রাম সফল হয়েছে। যে সামন্তরাজ ও জমিদারতন্ত্র পূর্ব্ব-ইউরোপের অনুন্নত অবস্থার জন্যে দায়ী, সে সব ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে।

পশ্চিমের দেশগুলোতে এখন পার্লামেণ্টারী ষড়যন্ত্রের কায়দায় সাধারণ নির্ব্বাচকদের ইচ্ছা কার্য্যকরী হতে পারে না;—সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর না মেলাতে পারলে, এমন কি বড় বড় পলিটিক্যাল পার্টিগুলোও গভর্ণমেণ্টে ঢুকতে পারে না। কিন্তু আজ এই সব নতুন গণতন্ত্রের দেশগুলোতে আর সে অবস্থা নেই। বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্টদের সংগঠন ওয়ার্কার্স পার্টি নির্ব্বাচনে ২২,৭৫,০০০ ভোট পেয়েছে, আর সোসিয়্যাল ডেমোক্রেটরা পেয়েছে ৭৮,০০০ এবং

রোমো লীগ পেয়েছে ৭১,০০০ মাত্র। কিন্তু এই শেষের দু'টো ডেমোক্রিটিক পার্টি এত কম ভোট পেলেও তাদের প্রতিনিধিরাও গভর্ণমেন্টে স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ তাদেরও মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে জনগণের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার ফলে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাও সহজ হয়েছে; আর কৃষির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়েছে—যার ফলে কৃষি-ব্যবস্থাও একটা নতুন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারগুলো মিলে দেশগুলোর চেহারাই বদলে গেছে। ফলতঃ, এই নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গুণে ধনতন্ত্রও ধ্বংস হয়ে পড়েছে, মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের শোষণ আর চলার উপায় নেই—সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন চলছে।

জনগণের সৃজনী-শক্তির রুদ্ধ দ্বার খুলে গেছে, এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজ হু-হু করে এগিয়ে চলেছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমশঃই পরিকল্পনানুযায়ী বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে, এবং পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ঠেলে পরিকল্পিত কর্ম্মসূচী সফল হয়ে যাচ্ছে। জেকোস্লোভাকিয়ার এক বছরের নির্দ্দিষ্ট শিল্প বৃদ্ধির কাজ সাত মাসেই সারা হয়ে গেছে; যুগোস্লাভিয়ায় দু'মাসেই এক বছরের কাজ ৩% ছাপিয়ে গেছে এবং '৪৬ সালের তুলনায় ৪১% বেড়েছে।

কাজের প্রতি মানুষের মনোভাব বদলে গেছে, এবং ফলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিও বেড়ে গেছে প্রচুর। জেচোস্লোভাকিয়ায় '৪৬ সালে এক জন লোক এক ঘণ্টায় যেখানে ৫০·৬২ ক্রোনেন মূল্যের মাল উৎপাদন করেছে, '৪৭ সালে সেখানে বর্দ্ধিত উৎপাদনের মূল্য হয়েছে ১০২·৮ ক্রোনেন। অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এক বছরে বেড়ে হ'য়েছে ডবলেরও বেশী।

পশ্চিম-ইউরোপের যে-সব দেশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী, যাদের হাতে বিরাট সম্পদ্ আছে,—যাদের শিল্প-ব্যবস্থাও অত্যুন্নত, কুশল শ্রমিক-সংখ্যাও যে সব দেশে প্রচুর, এবং বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যও যাদের আছে, এবং সর্ব্বোপরি যারা আমেরিকার কাছে প্রভূত ঋণও পাচ্ছে, সেই সব দেশও আজ তাদের আর্থিক জীবনের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা দূরে থাক, বরং দিনে দিনে ডলার ঋণের নাগপাশে জড়িয়ে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপের নয়া গণতন্ত্রগুলো ঐ সব দেশের তুলনায় অতি দরিদ্র এবং অনুন্নত অবস্থা সত্ত্বেও পুনর্গঠনের কাজে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা এত স্পষ্ট যে, বৈদেশিক সাংবাদিকরা সকলেই সেটা স্বীকার করে।

এই সব দেশের আর একটা বৈশিষ্ট্য জাতীয়তা সংক্রান্ত নীতি। ইউরোপের এই অংশে বহু কাল ধরে জাতীয় সমস্যা ছিল সাংঘাতিক, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সর্ব্বদাই হানাহানি লাগিয়ে রেখে দিত।

যুগোস্লাভিয়ার শাসন ছিল সার্ব্বিয়ার হাতে; তারা অন্যান্য জাতিগুলোকে নির্য্যাতন করতো, এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদারী করতো। জাতিবিদ্বেষ এখানে এত প্রবল ছিল যে, এক কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া সব জাতের লোকের মিলিত আর কোন পার্টিই ছিল না। কি রাজনৈতিক পার্টি, কি ট্রেড ইউনিয়ন, কি কৃষ্টি বা খেলাধূলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান—সবই ছিল সার্ব্বিয়, ক্রোশিয়, স্লোভেনিয়, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির পৃথক্ পৃথক্ সংগঠন। আর এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিপূর্ণ প্রভাব ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী-প্রতিক্রিয়াশীলদের।

মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, সারা দেশের সকল জাতির জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি নেই। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ যুগোস্লাভিয়ার সকল জাতি যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে সম্মিলিত গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ম্যাসিডোনিয়া নিয়ে দক্ষিণ স্লাভদের মধ্যে যে বিরোধ বরাবর চলে আসছিল, আজ সে বিরোধ ঘুচে গেছে; আজ ম্যাসিডোনিয়াও হয়েছে এক স্বাধীন গণতন্ত্র, এবং যুগোস্লাভ ফেডারেশনের এক সমান সদস্য। এই আভ্যন্তরীণ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ট্রানসিলভেনিয়ায় রুমেনিয় এবং হাঙ্গেরিয়ান জাতির বাস;—সেখানেও শত শত বৎসর ধরে এই দুই জাতির মধ্যে শত্রুতা লেগেই ছিল। বর্ত্তমানে রুমেনিয়ার সরকার ট্রানসিলভেনিয়ার হাঙ্গেরিয়ান অধিবাসীদের রুমেনিয় জনগণের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে, এবং তার ফলে রুমেনিয়া এবং হাঙ্গেরীর মধ্যেও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই রকমের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

সকল জাতির গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সমান অধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ জাতি-বিদ্বেষও ঘুচে গেছে, এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষেরও অবসান হয়েছে। ফলে, যে বল্কান ছিল ইউরোপের "বারুদের স্তূপ" আজ সেখানে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু এর ব্যতিক্রম রয়েছে গ্রীসে,—বৃটেন-আমেরিকার পুঁজিপতিদের কৃপায়।

এই সব বিদেশী পুঁজিপতিদের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলেই পূর্ব্ব-ইউরোপের নয়া গণতন্ত্রগুলো মুক্ত হয়েছে। এইটেই এই সব দেশের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সব দেশ এত দিন ছিল প্রকৃত পক্ষে ঐ সব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের উপনিবেশের সামিল, তাদের আর্থিক শোষণের খোরাক। কাজেই এই সব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল একেবারে অসম্ভব। যুগোস্লাভিয়ার প্রধান সম্পদ্ ধাতু "ওর"। কিন্তু তার উৎপাদনের ৯৮% বিদেশী ধনীদের হাতে ছিল। রুমেনিয়ার জাতীয় সম্পদ্ তেল। তার উৎপাদনের ৮০% ছিল বিদেশী কোম্পানীর হাতে! আর কয়লা এবং সোনার খনিও ছিল বিদেশীদের হাতে। এই অবস্থা ছিল সর্ব্বত্র।

বল্কানে শক্তি-উৎপাদনের উৎস বিরাট, কিন্তু তার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র কাজে লাগানো হয়েছিল। শিল্পের বিকাশ হতে দেওয়া হয়নি। যেটুকু হয়েছিল, সেখানেও জনগণের জীবনযাত্রার মানদণ্ড খুব নিম্ন স্তরে চেপে রেখে শ্রমের দাম মেসিনের চেয়ে সস্তা করে রাখা হয়েছিল।

আজ সে সব কথা হয়েছে অতীতের কাহিনী। বিদেশী পুঁজিপতিদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন আর্থিক নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির জোরে এই সব নতুন গণতন্ত্রগুলো হু হু করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। দুনিয়ার ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা যে ক্রোধান্ধ হয়ে "এলোপাতাড়ি" অপপ্রচার চালাবে, এ আর বিচিত্র কি?

পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলোর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছিল লড়াইয়ের সময় থেকেই! বল্কানে মিত্রশক্তির সৈন্য নামানোর জন্যে, চার্চ্চিলের মতলব, লড়াইয়ের পর পূর্ব্ব-ইউরোপে ঘাঁটী প্রতিষ্ঠা করা; যেন হিটলারের উত্তরাধিকার। সেই মতলবেই তারা যুগোস্লাভিয়ার রাজা পিটার এবং জেনারেল মিহাইলোভিচের মতন, পোল্যাণ্ডে পিলসুদস্কির দল আর্ম্মিয়া ক্রাজোয়া, রুমেনিয়ায়

ম্যানিউ এবং বুলগেরিয়ার পেটকভের মতন লোকদের গোপনে সাহায্য করেছিল। এই সব লোক ও দল অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরূপে ঐ সব দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে পরিপূর্ণ ও খাঁটি জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে বাধা দিতে নিযুক্ত হয়েছিল।

বস্তুতঃ, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই বৃটেন-আমেরিকা এই সব দেশের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে আসছে রীতিমত খোলাখুলি ভাবেই। যুগোস্লাভিয়া থেকে ট্রিয়েষ্টকে পৃথক্ করা, পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা জায়গাগুলোর ওপর পোল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক অধিকার অস্বীকার করা, তাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের তাদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উস্কানী দেওয়া এবং সাহায্য করা, তাদের দেশের এলাকার মধ্যে বিমান ও জাহাজ চালিয়ে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা —এই সব কায়দায় বৃটেন-আমেরিকা ঐ সব দেশের বিরুদ্ধে রীতিমত কূটনৈতিক আর্থিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাহায্য দেওয়ার চুক্তিভঙ্গ করে' আর্থিক অসুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে, এ সব চালাকী খাটছে না। কূটনীতিক চাপ বা মার্শাল-প্ল্যানের টোপ কোনটাই কার্য্যকরী হচ্ছে না। গণতন্ত্রের শত্রু এবং সাম্রাজ্যবাদী দালাল পেটকভ, পেযেটো, ম্যানিউ, নাগি, মিকোলাসজিক প্রভৃতির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে।

অবশ্য যারা দুনিয়াটাকে মুঠোর ভেতর আনতে চায়, তারা পূর্ব্ব-ইউরোপের এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা ছাড়বে না; কিন্তু এই সব দেশের লোককে ধাপ্পা দিয়ে তারা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবে না। আমেরিকার সর্ত্তে তাদের কাছে কর্জ্জ নেওয়ার অর্থ যে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া, এবং শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক দুর্গতি—এটাও তারা পশ্চিম-ইউরোপে দেখতে পাচ্ছে, আর পক্ষান্তরে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দেশটাকে শিল্পে উন্নত করে তোলা, এবং সোভিয়েটের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ফলে যে তাদের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে—এটাও তারা পরিষ্কার দেখছে; কাজেই তারা এই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছে।

যুদ্ধের শেষে যুগোস্লাভিয়ার শিল্পের উৎপাদন ছিল প্রাকযুদ্ধ কালের ৩০% থেকে ৫০% মাত্র; আর '৪৭ সালের অবস্থা হচ্ছে,—শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধের আগের অবস্থায় পৌছে ত' গেছেই, উপরন্তু কতকগুলো ব্যাপারে আগের চেয়ে উৎপাদন বেশী হচ্ছে; আর তা ছাড়াও নতুন দু'শোটা বড় বড় কারখানা তৈরীর কাজ চলছে—মেসিন তৈরীর শিল্প-ব্যবস্থা এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-ব্যবস্থা,—যা যুদ্ধের আগে ছিল না।

'৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পোল্যাণ্ডের কয়লার উৎপাদন ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার টন; আর '৪৭ সালের শেষে তার মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ হ'চ্ছে ৫০ লাখ টন। ফলে পোল্যাণ্ড আবার কয়লা রপ্তানী করতে পারছে।

লড়াই এবং দু'বছর অনাবৃষ্টির ফলে রুমেনিয়ার কৃষির অবস্থা হয়েছিল সাংঘাতিক;—কিন্তু '৪৭ সালে ফসল ভাল হওয়াতেই তারা শস্য রপ্তানী করতে পারছে।

এই সব দেশ বিদেশী মূলধনের ওপর নির্ভর না করে দেশের সম্পদকে নিজেদের শ্রমের সাহায্যে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা অনুসারে দেশের কৃষি-শিল্প গড়ে তুলছে। জেকোস্লোভাকিয়ার পঞ্চ বর্ষ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পকে ৫০% বাড়ানো, এবং জাতীয় আয়কেও ৫০% বাড়ানো। এই রকম বড় বড় পরিকল্পনার কাজ ঠিক হিসেব মতই এগিয়ে চলেছে বিদেশী পুঁজির সাহায্য ছাড়াই। প্রগতিশীল নীতির ফলে এই সব দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হ'চ্ছে অভূতপূর্ব্ব। এই নীতি সমাজতন্ত্রমুখী।

কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল ধনবাদী জগৎ এদের ওপর বিষম চটে গেছে। তারা যে শুধু পূর্ব্ব-ইউরোপের ঘাঁটীগুলোই হারিয়েছে, তাই নয়; উপরন্তু সমাজতন্ত্রের এলাকা যে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আপেক্ষিক শক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সমাজতন্ত্রে যে জোর বাড়ছে, এই ব্যাপারটাই তাদের চোখের ঘুম হরণ করেছে। আজকের দিনেও যে ছোট ছোট দেশও উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, এটা প্রমাণ হওয়াতেই যেন সাম্রাজ্যবাদীদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। তারা ক্ষেপে গিয়েছে।

তাই, প্রকৃত পক্ষে তারাই এই সব দেশের প্রকৃত সংবাদ ধনবাদী জগতের জনসাধারণকে জানতে দিতে চায় না। পাছে ধনবাদী জগতের জনসাধারণ তাদের সঙ্গে মিলতে চায়, তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায়, তাই সাম্রাজ্যবাদী শয়তানের দল ঐ সব দেশের চারিদিকে যেন একটা লৌহ বেষ্টনী দিয়ে সত্য সংবাদ ঠেকিয়ে রাখা, এবং তাদের কাজ-কর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এক একটা জাতির জীবনের অগ্রগতিকে দুনিয়ার চোখ থেকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ঘটনার ফাঁক দিয়ে সে সব কথা সারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

তাই বর্ত্তমানে সামরিক শক্তির ভয় দেখানোর বহর বেড়ে গেছে। তাই কথায় কথায় তাদের দালালেরা তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির কথা ছড়ায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে তাদেরই ভয় করার কারণ বেশী আছে। ধনবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ দু'টো মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কমে যাওয়া দূরে থাক বরং বেড়েই গিয়েছে; ক্রমশঃই বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার প্রগতিশীল শক্তিগুলোকেই শক্তিশালী করেছে, এবং ধনবাদকেই বে-ইজ্জৎ করছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধালেই তাদের মঙ্গল হবে না।

ভয় দেখিয়ে যে কাজ হ'চ্ছে না, তা ত' দেখাই যাচ্ছে। বৃটেন-আমেরিকার কত হুমকিই ত' এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ইউরোপের এই সব ছোট ছোট অনুন্নত দেশ পাল্টা ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিলে। সাহসে বা বুদ্ধিতে যে তারা খাটো নয়, তার ত' যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধের তোড়জোড়ের ঢং বা এটম্ বোমা দেখিয়ে তাদের দাবানো যাবে না। তারা দেখছে' ঝড়ের পরে নূতন সূর্য্যোদয়। তারা দেখছে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে তাদের হাতে। কোন বিদেশী রাজার "স্বাধীন" ডোমিনিয়ন, কোন বিদেশী দেনদারের অনুগত ভক্ত, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দুর্ভিক্ষের দেশের এশিয়ার নেতা হওয়ার মতন সখও তাদের নেই,—তার জন্যে বিলেত-আমেরিকার লেজুড়ও তারা হতে চায় না।

ঝর্ণা।

অধিকক্ষণ আর সে পড়িয়া থাকিতে পারিল না—একটু পরেই উঠিয়া পড়িল। তখন তার চোখে-মুখে—সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক আকস্মিক নবজীবনের যেন বড় উঠিয়াছে। সে যে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেষ্ঠ সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা আপন-জন। তার গর্ব্ব, তার হর্ষ—এ সমস্তর কি আর অন্ত আছে? তাহার মুখচোখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল, শিক্ষিত সম্প্রদায়—যাহাদের বিরুদ্ধে সে সে-দিন যে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ তুলিয়াছিল তাহা একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে—কখন যে, তাহা সে টেরই পায় নাই! কি করিবে, তাহা যেন সে ঠিক করিতে পারে না! অস্থির হইয়া বার কয়েক এদিক্-ওদিক্ করিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, যেন দুনিয়ার সাজানো প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিদর্প সে একবার ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়! তারপর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া 'ট্রাঙ্ক' খুলিয়া তাহার—'ম্যাটি ক' ও 'আই-এর' সার্টিফিকেট্ দুইখানি বাহির করিয়া তদুপরি একবার নেত্রপাত করিয়াই হাসিয়া উঠিল—ম্লান, নিস্তেজ! তার পর, সেই দুইখানি সার্টি-ফিকেট্—তাহার শিক্ষিত কলেবরের পরিচয়-পত্র খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল! তার পর, 'বাথ-রুমে' গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া যেমন সে বাহির হইয়া আসিবে, সম্মুখেই—হেনা ও মিষ্টার বোস!

মিষ্টার বোস হেনাকে দেখাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেদিন এঁদের স্কীমটা শুনতে পাইনি—আজ সব শুনলুম! ভালো—ভালো! 'এক্সেলেণ্ট স্কীম'! 'পাব্‌লিক সীম্প্যাথী' নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত—"

ঝরণা হাসিয়া কহিল, "উচিত নয়—এ কথা তো আমি বলিনি, বাবা—"

"নিশ্চয়ই বলিস্‌নি—তা' কি আর আমি জানি নে! হ্যাঁ, এঁরা বলছেন—পাঁচ হাজার টাকার চেকটা জয়েণ্ট-নামেই দিলেই তো সব গোল চুকে যায়! অর্থাৎ—তোর নাম আর মলিনের নাম। এ ক্ষেত্রে ওঁদের আইনেও আর বাধ্‌লো না—'ডোনার' হিসেবে মলিনেরও নাম রইলো!"

"খাতায় সই? উনি তো নিরক্ষর—"

"এক জন করলেই চলবে! এই ধর,—তোর আর আমার নামে ব্যাঙ্কে যেমন 'জয়েণ্ট-একাউণ্ট' আছে—'অপারেট্' করতে তুইও পারিস্, আমিও পারি।" উজ্জ্বল নেত্রে কন্যার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই মিষ্টার বোস্ বলিয়া ফেলিলেন, "একটা সই তো, সে তুই-ই না-হয় করলি!"

ঝরণা এইবার গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "তা' হয় না বাবা! এতে ওঁকে আরও স্পষ্ট কোরেই দেওয়া হয়! বরং এক কাজ করো—তোমার নাম দিয়েই চেক দাও—"

হেনা এইবার কথা কহিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সেই ভালো—"

"ওয়েট্—" হেনার প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই ঝরণা মিষ্টার বোসকে কহিল, "পাঁচ হাজার নয়—পঁচিশ হাজার—"

"পঁচিশ হাজার?"

"চম্‌কে উঠো না! মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, তাতে এক পয়সাও তোমার খরচ হয়নি! মনে করো, সেই খরচটা এইখানেই হলো!" বলিয়া ঝরণা [illegible] উঠিল।

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সাতাশ

মিষ্টার বোস অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন, "আরে, না—না, সে-কথা নয়—সে কথা নয়!—সে তো বটেই! তুই যখন বল্‌চিস্—দূর, দূর! আমার কথাটা কথাই নয়! পঁচিশ হাজার টাকা আবার টাকা—আমার এক মাসের বাড়ী-ভাড়াও নয়!" বলিয়া হেনার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা-জননি, তুমি তা' হলে একটু গল্প সল্প করো, চেকটা আমি চট্ কোরে নিয়েই আসি—"

"আর একখানা অমনি প্রিন্সিপালের নামে চিঠি—"

মিষ্টার বোস্ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাইতেই, ঝরণা তৎক্ষণাৎ একান্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে কহিল, "কলেজ থেকে আমার নামটা 'ষ্ট্রাক্-অফ্' করতে।"

মিষ্টার বোস্ ও হেনা উভয়েই চমকিয়া উঠিল। মিষ্টার বোস বিস্মিত নেত্রে কন্যার সহজ স্থির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সে কি! তুই আর পড়বি নে?"

ঝরণা হাসিয়া কহিল, "না, বাবা!"

"কেন?"

"আমি কি তোমার ছেলে যে, পড়তেই হবে? নইলে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না—হ্যাঁ, বাবা?"

মিষ্টার বোস বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না—না! তা' কেন? কি মুস্কিল!"

"অতএব পড়া আমি ছাড়লাম!" হাসিয়া কথাটা বলিয়াই ঝরণা গম্ভীর ভাবে পুনশ্চ সুরু করিল, "ফ্যাশনটা যদি বাদ দাও, বাবা, মেয়েদের কলেজে-পড়ার কোন অর্থই নেই। অভিভাবকেরা মনে করেন, বিয়ের বাজারে রথ চালিয়ে দেব! চলেও রথ—রথের কাছিতে হাতও পড়ে। কিন্তু, তার পর এই হয়—স্বামী মানুষটি সেই রথের চাকায় পড়ে' আর্ত্তনাদ করতে থাকে সারাটি জীবন! এতে কোরে মেয়েমানুষের কতটা যে ক্ষতি হয়, তা' তোমরা বুঝতে পারো না, বাবা!—স্বামীর সকাতর খাতির সে পায় বটে, কিন্তু অকাতর ভালোবাসা পায় না!"

এক দুর্দ্দান্ত পুলকে মিষ্টার বোসের চক্ষুর্দ্বয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা! Perfect inlerpretation of Domestic Law! বেশ, আমি এখ্‌খুনি চিঠি লিখে দিচ্ছি—" বলিয়াই হন্ হন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হেনার চোখ-মুখ দিয়া এতক্ষণ আগুন ছুটিতেছিল। বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌চিস্ ঝরণা? এক মাস পরেই 'টেষ্ট', তার পর পরীক্ষা—তার পরই গ্র্যাজুয়েট্! তোর মাথার গোলমাল হলো না কি?"

"একটু একটু!"—ঝরণা হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "একখানা গান মনে পড়ছে, শোন্—'তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমার রূপে—'"

হেনা ঝড় তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "নিরক্ষর স্বামী বোলেই তোর মাথায় গোলমাল হয়েছে—সত্যি!"

ঝরণার মুখে পুনশ্চ হাসির রেখা দিল। কহিল, "বলেচি তো—একটু একটু।"

"It is a tragedy."

"More than you expect!"—বলিয়াই ঝরণা উঠিয়া পড়িল। তার পর দ্রুত-চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড্ডো দেরি হয়ে যাচ্ছে! চল্, বাবাকে একটু তাগাদা দিই গে—" বলিয়াই হেনাকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * * *

ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেই, ঝরণা দেখিল—মলিন মুখ-হাত ধুইয়া নীচে হইতে উঠিয়া আসিয়া বই-শ্লেট লইয়া বসিয়াছে—তাহার কোলে 'শ্লেট,' সুমুখে 'বর্ণ-পরিচয়' খোলা—'অ-আ'। নিবিষ্ট চিত্তে ঘাড় হেঁট করিয়া সে শ্লেটের উপর বিচিত্র অদ্ভুত রেখা টানিয়া স্বরবর্ণের কাঠামো তৈরী করিতেছে। সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতে ঝরণা আর তাহার সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক রাখে নাই। তাই সে প্রাতে উঠিয়া নিজেই বই-শ্লেট লইয়া বসে—কত না কুণ্ঠায়, কত না লজ্জায়!

দৃশ্যটা চোখে পড়িতেই ঝরণার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—কী ভয়ঙ্কর! কী কপট অভিনয়! * * * খোলাখুলি সে কিছুই বলিতে পারিল না, তাহা হইলে তাহাকেই যে প্রথমে ধরা দিতে হয়! তাহা সে পারে না—সে-ধাতুতেই সে গঠিত নয়। অথচ, মলিনের ঐ নির্ব্বিকার মূর্ত্তি যতই তার চোখে পড়ে, ততই সে ভিতরে-ভিতরে ক্ষেপিয়া উঠে। ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনে মনে কি এক সঙ্কল্প আঁটিল, তার পর শ্লেষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "লেখাপড়ায় অত মন দিলে ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট বয় হয়ে পড়বে—থাক্!" বলিয়াই বই-শ্লেট কাড়িয়া লইয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এসো দিকিনি, যা পারবে—তাই কর্বে!"—বলিয়াই মলিনকে তাহাদের 'লাইব্রেরী-রুমে' লইয়া গেল। অতঃপর পুস্তকের একটি আলমারি দেখাইয়া দিয়া কহিল, "নামাও দিকিনি বইগুলো—"

মলিন তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালন করিল।

তার পর ঝরণা কহিল, "প্রত্যেক Auther-এর volume-গুলি ঠিক serially arrange কোরে রাখো—"

প্রায় সবগুলিই ইংরাজি বাক্য। মলিন বুঝিতে পারে না। অসহায়ের ন্যায় ঝরণার দিকে তাকাইতেই তাহার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "কি বল্লাম, বুঝতে পারলে না বুঝি, নয়? কি কোরেই বা বুঝবে—ইংরিজি-মিরিজি তুমি তো আর এক বর্ণও জান না! আচ্ছা, বুঝিয়ে বলি শোনো—প্রত্যেক গ্রন্থকারের বই ঠিক পর পর সাজিয়ে-সাজিয়ে ফের আলমারিতে তোলো। পারবে তো?"

এবার আর মলিন পশ্চাৎপদ নয়। ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ কাজে হাত দিল। কিন্তু, বেবাক্ বাড়াইয়া দিল কাজ। এক গ্রন্থকারের পুস্তকের ভিতর অপর এক গ্রন্থকারের পুস্তক—একখানা সোজা, একখানা উল্টা—এম্নি ভেস্তা করিয়া বইগুলি আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

ঝরণার মুখে কে যেন খানিকটা কালি দিয়া গেল। বইহাই বুঝি বা তার সঙ্কল্প ছিল যে, কৌশলে সে মলিনকে ভাতিয়া ফেলিবে। সেই উদ্দেশ্যেই সে এই বাণটি নিক্ষেপ করিয়াছিল! যদিই বা হঠাৎ সে বইগুলি ঠিকমত সাজাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তদণ্ডেই সে তাহাকে চাপিয়া ধরিবে—সে নিরক্ষর নয়! কিন্তু, অস্ত্রটা ফিরিয়া আসিয়া বিঁধিল তাহারই বুকে!

এদিকে মলিনের উৎসাহের ত্রুটি নাই। ক্ষিপ্র হস্তে, অবিলম্বেই বইগুলি সব এলোমেলো করিয়া তুলিয়া আলমারি বন্ধ করিল। ঝরণা আসন্নবর্ষী মেঘের মত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার চোখোচোখী হইতেই সে ভিতরকার ভাবটা চাপিয়া কহিল, "আলমারি বন্ধ করলে? একখানা বই আমার যে দরকার—দাও দিকিনি, একখানা 'বার্ণাড শ'—"

মলিন তৎক্ষণাৎ আলমারি খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া দিল—'টলষ্টয়!'

ক্ষোভে, দুঃখে ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ঝরণার মুখখানা এইবার লাল হইয়া উঠিল। সে বইখানাকে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরাজয়ের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ঘরে আসিয়াও সে সুস্থির হইতে পারিল না। ঘরময় যেন নিজেকে ছড়াইতে ছড়াইতে এই কথাটাই সে ভাবিতে লাগিল—এত বড় এক কপট অভিনয়ের তাৎপর্য্য কি? হঠাৎ মলিনের মায়ের পত্রখানার কথা তার মনে পড়িয়া গেল—'দারিদ্র্য, অবস্থার বিপর্য্যয়!' হোক্ তা'। সংসারের এমনই কি অগ্নি-প্রশস্তি যাহা ধরিত্রীর এক নন্দদুলালকে আত্মবিলোপের মায়াচন্দন দিতে পারে? শক্তিমান্ পুরুষ 'সুদর্শন চক্র' ধরিয়া সাংসারিক বিপ্লব ছিন্নভিন্ন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না কেন? এই সমস্ত ভাবিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। অতঃপর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—মা!

'মা!'—ইনিই বা কেমন?

মায়ের পত্রখানির প্রতি ছত্রই তাহার মনে পড়িতে লাগিল—'তোমার মা হয়ে আমি কি জানি, শুনে রাখো—মা-সরস্বতী যদি কোন দিন নিঃসন্তান হয়, সেই দিনই তুমি হবে নিরক্ষর!' ঝরণা চমকিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল—যদি মা ও সন্তান লইয়াই এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পৃথিবী, ইহার এক শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার এই বজ্রকণ্ঠ, কোন্ হিসাবে আজ মিথ্যা হইয়া যাইবে? কিন্তু কি পরমাশ্চর্য্য সেই মা। * * * সহসা তাহার মুখে যেন এক দেবদ্যুতি ঝলক মারিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি পাঠকক্ষে গিয়া এক টুক্রা কাগজের উপর লিখিল—'মা।'

'মা, মা!'—ঝরণা শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ওই অক্ষরটি যেন এক মহাপ্রলয়ের ঝড় তুলিয়াছে—সমগ্র চরাচর মত্ত-প্রকৃতির বিশৃঙ্খল নৃত্যে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এক সময় সে অবলোকন করিল—শান্ত-শয়ান জলমগ্ন এক বিশ্বের উপর দাঁড়াইয়া এক নারীমূর্ত্তি, আর তাঁহারই পদতলে বসিয়া—মলিন।

আটাশ

পরদিন।

পৃথিবীর মৃত্তিকার সবে মাত্র প্রভাতের আলোক-রশ্মি পড়িয়াছে। মিষ্টার বোস প্রাত্যহিকের মত নীচেকার বৈঠকখানায় বসিয়া চা পান করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদপত্রওয়ালা 'ষ্টেটস্ম্যান' পৌঁছিয়া

দিয়া গেল। পাতা খুলিতেই মিষ্টার বোসের চোখে পড়িল একটি সুশ্রী-সুন্দর যুবকের ছবি—তিনি চমকিয়া উঠিলেন! এ কে?—নিরক্ষর মলিন? ছবির উপরে বড়-বড় অক্ষরে লেখা—A New P. R. S. নিয়ে 'স্পেশ্যাল টাইপে' মুদ্রিত—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়!

মিষ্টার বোসের চক্ষের সম্মুখ হইতে এই চির পরিচিত পৃথিবীটার যেন নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল, গিয়া সেই স্থানে আগাইয়া আসিল এক নবীন প্রদেশ! তাঁহার চোখ দিয়া হর্ষ, আনন্দ, লজ্জা—যেন একসঙ্গে ফুঁড়িয়া বাহির হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি দেখিতে পাইলেন—সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী, তাঁহার হস্তে ধান-দূর্ব্বা!

মিষ্টার বোস্ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ঘন-ঘন টেবিলের উপর কলিঙ্‌-বেল্ টিপিতে লাগিলেন—ভৃত্যেরা সব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, তোরা ডাক্, ডাক্—শীগ্‌গির ডাক্—"

"কাকে—"

"দিদিবাবুকে—হ্যাঁ, হ্যাঁ. দিদিবাবু—"

মনিবের এই অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্যেরা আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাইল না। হতভম্ব হইয়া ত্রিতলের দিকে ছুট্ দিল।

ঝরণা নামিয়া আসিল, অপরাহ্নের ম্লান রবি-রশ্মির মত। তাহাকে দেখিয়াই মিষ্টার বোস অপরিমিত হর্ষে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ছবিখানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, দেখ্, দেখ্—দেখছিস্? আমার জামাই—আমার মলিন!" বলিয়াই সংবাদপত্রখানা তাহার হাতে দিল, তখন তাঁহার দুই গণ্ড দিয়া আনন্দাশ্রুর বন্যধারা বহিয়া চলিয়াছে!

ঝরণা যেন আজ প্রয়োজনের অধিক সহজ, স্বাভাবিক—নির্লিপ্ত। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির করিল না। তাহার সম্মুখে, দৃষ্টির মাথায় একখানি ছবি, একখানি প্রতিকৃতি—কিন্তু কার, তাহা যেন সে জানে না, চেনে না, অথচ অপলক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়াই রহিল।

অতঃপর ডাক পড়িল মলিনের। ঝরণা আর অপেক্ষা করিল না, সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

মলিন আসিল, মলিন—'নিরক্ষর!'

মিষ্টার বোস তাঁহার বুকের প্রস্রবণ যেন দুই হাতে চাপা দিয়া কাগজখানাকে উঠাইয়া লইয়া, গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "এঁকে চেনো?" বলিয়াই ছবিখানা মলিনের চোখের উপর ধরিলেন।

মলিন আস্তে-আস্তে মাথা নীচু করিল।

মিষ্টার বোস আর যেন নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারেন না! প্রাণপণ শক্তিতে গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে তদ্রূপ আবৃত করিয়া কহিলেন, "এই রকম ধরণের আত্ম-নির্ব্বাসন, অর্থাৎ যাকে বলে 'চিটিঙ্'—'পেনাল কোডে' এর একটা শাস্তির বিধান আছে! এ-কথাটা, বোধ করি, বেশই বুঝতে পারছ?"

মলিন চুপ করিয়া রহিল।

মিষ্টার বোস মলিনের আনত মুখের প্রতি এক গোপন কটাক্ষ করিয়াই পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "ভালো কথা! এই সব লুকোচুরি—নিশ্চয়ই এর একটা চমৎকার হেতু আছে? আচ্ছা, কি সেটা—তা' তুমি বলতে পারো না?"

"না বাবা! তা' উনি পারেন না।"—সহসা ঝরণা পুনঃ প্রবেশ করিল। তার পরনে অর্দ্ধ-মলিন একখানি মিলের সাড়ী, দুই হাতে মাত্র দুই গাছি শাঁখা! মলিনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "গোপন-প্রাণ—গরীবের আত্ম-সম্পত্তি!"

"গরীব?"—মিষ্টার বোস যেন অধীর উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে উভয়ের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার জামাই, সে গরীব?"

ঝরণা এইবার একটু হাসিল। হাসিয়াই কহিল, "বড়লোকের ছেলেই বড়লোক হয়, বড়লোকের জামাই বড়লোক হয় না।" বলিয়াই মলিনের হাতে একটা টান দিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিষ্টার বোস, তাঁহার এ দুঃখ রাখিবার যেন যায়গা নাই। তাঁর কাছে দাঁড়াইয়া ছিল হরিশ। উপস্থিত তাহাকেই পরম আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া অভিযোগ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌লি হরিশ! দেখলি—জামাইকে আর আমায় কিছুটি বলবার অধিকার নেই! একটা কথায় মেয়ের দশটা অভিমান!"

হরিশ বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া কহিল, "অভিমান তো হবেই কর্ত্তা বাবু। দিদিবাবু যে এখন ঘর-বর চিনে নিয়েছে!"

মিষ্টার বোস প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "নেবে না? আলবৎ নেবে! ওর গর্ভধারিণী যহন্ত কোরে আমাকে কি বলতো জানিস্, হরিশ?—'ঝরণার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না! বিয়ে হলে, ঘর-বর ও এমনি কোরেই চিনে নেবে যে তোমাকেই হয় তো ভুলে যাবে'!"—হাসিতে গিয়া তাঁহার গলাটা ভাঙিয়া গেল।

হরিশের গলাটা বোধ করি পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছে! দুই একবার কাশিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তাই যায়, কর্ত্তা বাবু—"

"এ্যাঁ! যায়?"

"আমার মেয়েটাও যে গেছে—"

"বলিস্ কি?"

"বিজয়ার পর যা একখানা চিঠি!"—হরিশ শব্দ করিয়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

মিষ্টার বোসের আইনের কেতাব আছে—তার ধারা-উপধারা তাঁহার কণ্ঠস্থ। হাত-মুখের এক প্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর ছেলে আছে বোলে তাই মেয়েটা ভুলে গেছে! কিন্তু আমার ও কে, বল্ দিকিনি—ছেলেকে ছেলে, মেয়েকে মেয়ে! আমার এই ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি—সব ওরই তো!"

"কিন্তু, আমার তো বিশেস্ হয় না, কত্তা বাবু?"

"হারামজাদা! বিশ্বাস্ হয় না কি?"

"আজ্ঞে, কত্তা বাবু! উনি কাপড়টা কি পরে' এসেন—লক্ষ্য কোরেছেন?"

মিষ্টার বোস চমকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি পরে' এলো?"

হরিশ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, আধ-ময়লা একখানা মিলের কাপড়! দিদিবাবুর অঙ্গে এ-সব কাপড় আর কোন দিন উঠেছে?"

"তোর মিথ্যে কথা!"

"তার পর, হাত দু'খানি খালি—ছেরেফ দু'গাছা শাঁখা!"

"লাখ্ টাকার ওর গহনা আছে—তা' জানিস্?"

হরিশ ম্লান হাসিয়া কহিল, "জানি কত্তা বাবু! কিন্তু আজ

উনি তার এক কুচিও পর্শ করেননি! যেন সত্যি সত্যি গরীবের বউটি!" বলিয়াই হঠাৎ সগর্ব্বে কর্ত্তা বাবুর দিকে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু বেশ মানিয়েছে, কর্ত্তা বাবু!—রাঙা পেড়ে কাপড়, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর—যেন তালপাতার কুঁড়ে থেকে মা-মঙ্গলচণ্ডী বেরিয়ে এলেন!"

"অ্যাঁ! মা-মঙ্গলচণ্ডী!—ঠিক বলেছিস, ঠিক! মা-মঙ্গলচণ্ডীর মতনই তো আমার মায়ের রূপ!"—মিষ্টার বোস, তাঁর চোখের কোণে বুঝিবা জল জমিয়াছিল, রুমালে চোখ মুছিয়া চশমাটা দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি কোরে পাবো দেখতে—চশমার 'পাওয়ারটা' বড্ডো কমে গেছে কি না! চশমার পাওয়ারটা—" বলিতে-বলিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

উনত্রিংশ

ঝরণার হাতে-পায়ে যেন ঝড় উঠিয়াছে।

ত্রিতলে উঠিয়াই মলিনের হাতে রেলের একখানা 'টাইম-টেবেল' দিয়া সে কহিল, "দেখো তো—মোহনপুর যাবার এখন ট্রেণ আছে কি না?"

মলিন চমকিয়া ঝরণার দিকে তাকাইল—তাহাদের গ্রামের নাম মোহনপুর। তাহার মায়ের সেই পত্রে ঝরণা তাহা জানিতে পারিয়াছিল।

ঝরণা তাড়া দিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "দেখো, চট্ কোরে—"

"মোহনপুর?"

"কথা কাট্‌তে বলিনি!"

মলিন মুখ নামাইয়া কহিল—'এখন নেই।'

ঝরণা আর কিছু বলিল না। এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া মোটর বাহির করিতে বলিয়াই মলিনকে লইয়া মিষ্টার বোসের কক্ষে নামিয়া আসিল।

মিষ্টার বোস তখন নিবিষ্ট চিত্তে কিসের একটা তালিকা তৈরী করিতেছিলেন, ইহাদের দেখিয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আয়, আয়—তোরা এসেছিস? এই মনে করছিলাম—ডাকি!" বলিয়াই হাতের ফর্দখানা ঝরণার দিকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "লিষ্টখানা একবার দেখ্, দেখিনি—কেউ বাদ পড়লো কি না?"

ঝরণার দৃষ্টি সপ্রশ্ন হইতেই মিষ্টার বোস বলিয়া উঠিলেন, "একটা 'পার্টি' দেব! বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন—সকলের কাছে মলিনকে আমি 'প্রেজেণ্ট' করবো। করবো না? মা-সরস্বতীর বরপুত্র আমার জামাই—এ-অহঙ্কার আমি কি চেপে রাখতে পারি?"

ঝরণার মুখখানা লজ্জারক্ত হইয়া উঠিল। একবার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াই মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমার তো এখন সময় নেই, বাবা!"

মিষ্টার বোস একমুখ হাসিয়া কহিলেন, "তা' তো থাক্‌বেই না। মলিনকে নিয়ে তুইও তো এখন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাবি!"

ঝরণা লজ্জানত মুখে কহিল, "না বাবা—আমরা যাচ্ছি বাড়ী—বাড়ীতে মা একা।"

কথাটা বলিয়াই ঝরণা মলিনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, সে-দৃষ্টিতে কি-এক দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিত ছিল, তাহা মলিন ঠেলিতে পারিল না। নতমুখ হইয়া কহিল—"আমার মা।"

"আমার বৈবাহিকা? তিনি বর্ত্তমান?"—মিষ্টার বোস অপরিসীম হর্ষে যেন মাতিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল স্তব্ধ-স্থির-নেত্রে ঝরণার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তার পর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "যাবি বৈ কি, মা। ছেলেবেলায় মা হারিয়েছিস্ আবার তুই মা পেলি। মায়ের কাছে যাবি না—যাবি বৈ কি!" শেষের দিক্‌টায় তাঁহার গলাটা ভারি হইয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, "কিন্তু আজই—এই দণ্ডে?"

ঝরণা সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "আর দেরি করলে যে চল্‌বে না, বাবা!" বলিয়াই উভয়ে মিলিয়া মিষ্টার বোসের পদতলে মাথা নোয়াইল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঝরণার কাপড়-চোপড়ের দিকে মিষ্টার বোস লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, এইবার সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল দেখিলেন—হরিশের কথাই ঠিক! মাথা তুলিতেই, তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কাপড়-চোপড় ছাড়লি নে! গয়না-গাটি—"

ঝরণা সলজ্জ ভাবে মাথা নাড়িল—"না।"

মিষ্টার বোসের চোখ-মুখ কপালে উঠিয়া গেল। কহিলেন, "তা হয় না! আমার মেয়ে হয়ে অমন গরীবের বেশে যাওয়া চল্‌বে না, মা!"

ঝরণা একটু হাসিল—সতেজ, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, "সে-বাড়ীর বউ হয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আমাকে মানায় না, বাবা!" বলিয়াই মলিনের হাতে একটা টান দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে, সম্মুখে—বীণা ও নির্ম্মল। ঝরণা থমকিয়া দাঁড়াইল, যেন এক আনন্দের ঝড় উঠিয়া হঠাৎ তাহাকে ধাক্কা মারিয়াছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া মিষ্টার বোসকে বলিয়া উঠিল, "বাবা, মাসীমা—"

বীণা ও নির্ম্মল, ইহারাও তখন বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া—মলিন? মলিনের দিকেও তখন আর চাওয়া যায় না। দুঃসহ লজ্জায় ও কুণ্ঠায় তাহার মুখ-চোখ আড়ষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ যেন তার নিজের অজ্ঞাতসারেই তার বুকের সমগ্র অবরোধ ঠেলিয়া রাস্তা করিয়া একটি মাত্র স্বর বাহির হইল—"মা?" তার পর শিশুর ন্যায় বীণার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বীণাও সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

এই দৃশ্যে মিষ্টার বোস ও ঝরণা উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল ওই দিক্‌টায় মূঢ়ের ন্যায় তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টার বোস নির্ম্মলকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে নির্ম্মল—"

নির্ম্মলও তেমনি করিয়া কহিল, "ওই কথাটা আমিও বল্‌তে যাচ্ছিলাম—মলিন এখানে?"

"মলিন? মলিন আমার যে জামাই!"

"আপনার জামাই?"—নির্ম্মলের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল।

এক অপ্রত্যাশিত চমকে বীণাও চমকিত হইয়াছিল। মলিনকে অতি সন্তর্পণে বুক হইতে ছাড়াইয়া পাশে দাঁড় করাইয়া হর্ষ-কম্পিত কণ্ঠে মিষ্টার বোসকে বলিয়া উঠিল, "আপনার জামাই—মলিন?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ—একশো বার হ্যাঁ!"—মিষ্টার বোসের চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে গর্ব্বের যেন ঢেউ উঠিয়াছে!

ঝর্, ঝর্, ঝর্—বীণার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া যেন আনন্দের ফুল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর কাহাকেও সে কিছুই বলিতে চায় না। শুধুই প্রগাঢ় স্নেহে ঝরণাকে তাহার অপর পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া উভয়েরই মুখচুম্বন করিল। তার পর একটু আশ্বস্ত হইয়া মিষ্টার বোসকে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু এ-সব কখন কি হলো, আমাদের তো একটুও জানালেন না, জামাই বাবু? ঝরণার টিউটার—তিনি কোথায় গেলেন?"

"সে scoundrel!—তবে, ছোট্ট কোরে বলি, শোনো—" মিষ্টার বোস ঝরণার দিকে ঘুরিয়া অনুরোধ কণ্ঠে কহিলেন, "একটুখানি তোরা অপেক্ষা কর। আমরা আসছি—তোদের সামনে সেই দুর্দ্দিনের কথা আমি আর বল্‌বো না।" বলিয়াই তিনি বীণা ও নির্ম্মলকে ডাকিয়া অন্য একটি কক্ষে গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখা গেল—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বীণাকে বলিয়া উঠিলেন, "এ সবের মালিক কে, জানো বীণা—তোমার দিদি। তিনিই ওপর থেকে সব বড়-ঝঞ্ঝা দু'হাতে সরিয়ে দিয়েছেন।" তার পর নির্ম্মলকে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু আমি তো কিছুই জানতে পারলাম না?—মলিন, তার সঙ্গে পরিচয়—তোমাদের কি কোরে হলো?"

নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, "আজ্ঞ তাড়াতাড়ি আছে—উনি এক্ষুনি কালীঘাট যাবেন, মলিনের নামে পূজো মেনেছেন। আপাততঃ যা দেখলেন, সেই দেখেই চুপচাপ থাকুন।" বলিয়াই নির্ম্মল ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে সেই ট্রাষ্ট-ডীডের 'ড্রাফট'খানা বাহির করিয়া কহিল, "এই নিন—সেই 'ট্রাষ্ট ডীডের' 'ড্রাফট্'—" বলিয়াই কাগজখানা মিষ্টার বোসের দিকে আগাইয়া ধরিলেন।

মিষ্টার বোস উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বেশ, বেশ—'ট্রাষ্টির' নাম বলিয়েছ?"

"দেখুন না?"

মিষ্টার বোস কাগজখানা ঝরণার হাতে দিয়া কহিলেন, "পড়তো, মা, নামটা—"

কাগজখানা খুলিয়া নামটা চোখে পড়িতেই ঝরণার মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

মিষ্টার বোস দারুণ উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিলেন, "কার নাম?"

ঝরণা মলিনের দিকে আঙুল বাড়াইল।

পৃথিবীর হর্ষ, তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার মিষ্টার বোস আর কাহাকেও আজ দিবেন না। মাতিয়া উঠিয়া কহিলেন, "মলিন?"

স্থির, গম্ভীর, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে নির্ম্মল অবিলম্বেই কহিল, "হ্যাঁ। কারণ কি জানেন?—মলিন, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিপ্লব—এ তার কারণ নয়। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার—কারণ এও নয়। ধনকুবের এটর্নী, তাঁর এক মাত্র কন্যার মালিক—এও তার কারণ নয়। কারণ—জগতের আজ সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থক দরিদ্র। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, তার বহু ওপরে আসন পেয়েছে আজ দারিদ্র্য; সেই আসনে অধিষ্ঠিত আজ—মলিন! তাই—" বীণার দিকে একবার চাহিয়াই কথাটা শেষ করিল, "তাই, উকিল মলিনের হাতেই [illegible] 'হরির মেয়েদের অভিভাবক।" বলিয়াই বীণাকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়া নীচে নামিয়া গেল। [illegible] আর দাঁড়াইল না।

দরজার মুখে মোটর প্রস্তুত। মলিনকে সম্মুখ করিয়া যেমন ঝরণা মোটরে উঠিবে, আর এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। হরি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। মলিনকে দেখিয়াই প্রবল আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "দাদাবাবু, পুলিশ—পুলিশ! শীগ্‌গির পালান, শীগ্‌গির—"

হরি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মলিন তাহাকে দুই হাতে বেড়িয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "পুলিশ—কেন?"

হরি যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ ইহাই—গত কল্য অপরাহ্নে সংবাদপত্রের এক জন 'রিপোর্টার' হরির মেসের ঠিকানায় আসে, আসিয়া মলিনের অনুসন্ধান করে। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে হরি মলিনের সেই পরিত্যক্ত ফটোখানা তাহাদের হস্তে সমর্পণ করে, তখন সে কি করিয়া জানিবে যে উহা আবার তাই 'খবরের কাগজে' ছাপিয়া দিবে? এক্ষণে এই মাত্র মেসে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, মেসের বাবুরা—ছাপা ছবিখানা তাহাকে দেখাইয়াছে পর্য্যন্ত। সুতরাং না জানিয়া সে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে! হরির বিশ্বাস—সংবাদপত্রে যাহাদের 'ফটোগ্রাফ' ছাপা হয়, তাহারা পলাতক আসামী!

মিষ্টার বোস, তিনিও নীচে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, হরির কথায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হরি যে কে, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না—ইহাদেরই মেসে মলিন প্রত্যহ যাতায়াত করিত। তাঁহার হৃদয়ের প্রশান্ত সাগরে আজিকার যত আনন্দ, তাহা আজ তিনি জগতের সকলকেই অকৃপণ বিতরণ করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং হরিকেও কেন তিনি বঞ্চিত করিবেন? তিনি তৎক্ষণাৎ যেন শত-মুখ হইয়া হরিকে আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বিবৃত করিলেন। তখন হরি আর সে 'হরি' নয়—গর্ব্বে, আনন্দে, হর্ষে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। মলিনের হাত দুইটা জোর করিয়া ধরিয়া কহিল, 'তা হলে দাদা বাবু, আপনাকে এখ্‌খুনি একবার মেসে যেতে হচ্ছে! ওই সব ছোটলোক, ওদের গিয়ে বল্‌বো—'দাদা বাবু যে কি বস্তু, আজ তোমরা নতুন চোখ নিয়ে চেয়ে দেখো—"

মলিন এক-মুখ রাগ করিয়া কহিল, "ছিঃ! তোকে কত বার বলেছি না—ওঁদের ছোট কথা বল্‌বি না। তবুও?"

হরির আজ বুঝি বা অন্তর-মন ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিবার দিন। সে বেদনা-বিপ্লব-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "আপনার কথা আপনি রাখুন, দাদা বাবু! আপনার মতন মানুষের মুখের ভাত যারা কেড়ে নেয়, হরি তাদের বড় কথা বল্‌বে না।" হঠাৎ সে অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিল। পুনশ্চ সুরু করিল, "দু'-এক মাসের টাকাই না-হয় বাকী পড়ে গিয়েছিল তাই বোলে খেতে বস্‌বার সময় 'মিল' বন্ধ করে দেবে? কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ ছিসেব কোরে তাড়ায়, কিন্তু, আপনাকে কি কোরে ওরা তাড়িয়েছে—এত শীগ্‌গির আপনি ভুলে গেছেন, দাদা বাবু? ওরা আবার ভদ্দর লোক, 'তাই পাঁজি খুলে মন্তর পড়ে' ওদের আরাধনা করতে হবে? আপনি দেখে নিন—আপনার ইষ্টিমন্তর।"

মলিন নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার মুখ তুলিয়া কি বলিতে

ভাবনা

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

হায় গো, এ কোন্ দুনিয়া আমার ?
অসুন্দর চারি দিকে মাথা তুলে নাচে বেশুমার
পদাঘাতে গুঁড়ো করে সব। কোন্ শয়তান
এ মাটির বুকে বুকে রচেছে শ্মশান।
হায় রে, মনে মনে, বাঁধা নীড়ে জ্বলেছে আগুন
মনে মনে ঘুণ।
পশুত্বের অন্ধ উন্মাদনা
ছারখার করে দিলো যৌবনের সব সম্ভাবনা
অর্থহীন মূঢ়তার এ কী গোনাগারি
হৃদয়ে হৃদয়ে ভরে আহাজারি।
এতোটুকু রঙ নেই, রোদ নেই আকাশে আমার
এ যৌবন কেঁদে কেঁদে করে হাহাকার।

এতো কাল রামধনু দেখেছি আকাশে
দিকে দিকে সামগান ভেসেছে বাতাসে,
রোমাঞ্চিত মনে আশা : এলো বুঝি দিন
এ জীবন বুঝি আর রাখিবে না ঋণ।

কোথায় সে ছবি তার, কোথায় সে গান
এ জীবন এরি মাঝে শেষ হবে, এ কোন্ বিধান ?

হায় রে কবি,
কান্না তোমার মিছে
হতাশারে রাখো পিছে।
ধ্বংস যাহারে ভাবো
যদি সে কখনো হয়ে ওঠে সম্ভবো
তবু সে ধ্বংস নয়,
তার মাঝে আছে নব জীবনের জয় ;
তার কোনো সুর শোনোনি তোমার কানে ?
তবে বৃথাই চিত্ত মুগ্ধ করেছো গানে !

তোমার কণ্ঠে গান
জাগাবে নোতুন প্রাণ,
জাগাবে জেনেছি নোতুন দুনিয়া-দারি,
পীড়িত মনে যে কামনা রয়েছে তারি।
বৃথাই আর্তনাদ !
এমন আরোও বিসম্বাদ
হয়তো নামাবে আরও অন্ধকার
ঢেকে দেবে সব জীবন রঙ্গ, আর,
রক্তে রাঙাবে পথ
আরো, আরো দূরে মিলাবে ভবিষ্যৎ ;
যেখানে নোতুন দিন
যেখানে জীবন মহাসমুদ্রে লীন।
ধ্বংস এ নয়, এ দুর্বার সংগ্রাম,
সব দিতে হবে দিতে হবে গুরু দাম।
দুঃখ অথবা ভয়,
তোমার পথেতে এরা তো পাথেয় নয় !
নিয়মে ধরেছে ঘুণ,
আজ ভাঙে যা কাল তারি দশ গুণ
এ ভাঙা-গড়া, বারংবার যে আসবেই,
তবু মৃত এ জীবন, নোতুন জীবন আনবেই !
নিরাশারে দূরে রাখো
যে জীবন চেয়েছো তাহার রূপেরে আঁকো
এসো তার পরে দাঁড়াও অভীক মনে
ডেকে নাও সাথে পীড়িত জনতা জনে ;
তমসার সাথে এক সাথ হয়ে লড়ো।
শ্মশানে শ্মশানে নোতুন জীবন গড়ো।
যদি তবুও মৃত্যু আসে,
ডেকে নাও তারে বুকভরা বিশ্বাসে ;
কারণ আমরা জানি গো ভাই,
মৃত্যুকে যারা বুকে তুলে নেয়, তাদের মৃত্যু নাই !

যাইবে, ঝরণা বাধা দিয়া হরিকে জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকা, হরি, মেসে বাকী আছে ?”

হরি কথা বলিবার পূর্ব্বেই মলিন নতমুখে কহিল, “আর বাকী নেই—যা ছিল, হরি সব দিয়েছে।”

“বলি, হরির নামটা না করলেই নয়, দাদা বাবু ?”—হরি যেন ক্ষেপিয়া উঠিল।

মলিনের মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল—ম্লান, নিষ্প্রভ ! কহিল, “মুখে যে এসে পড়ে ভাই !” একটু চুপ করিয়াই পুনশ্চ কহিল, “এখন বাড়ী যাচ্ছি, হরি ! ফিরে এসে আবার দেখা করবো। এখন মেসে যাও—”

“আবার ওখানে ?”—হরি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “ও-মুখো আবার ঢুকবে হরি—রাধামাধব ! কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি, দাদা বাবু—”

“বেশ করেছ। তুমি যে আমাদের হরি !—ঝরণার বক্ষের অবশিষ্ট গবাক্ষগুলিও যেন উন্মুক্ত হইয়া গেল। কহিল, “আমাদের সঙ্গে তুমিও চলো—”

এঁরা কে—এ প্রশ্ন হরির মনে এতক্ষণ জাগে নাই। এইবার সে যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ঝরণার দিকে সকুণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, “আপনি ?”

“আমি ? আমি তোমার বউদিদি ?”

“এঁ্যা ! তুমি বলো কি ! দাদা বাবুর বউ ? তা বলতে হয়—আচ্ছা লোক তো, তুমি ! দাঁড়াও, দাঁড়াও—একটা ‘গড়’ করি—” হরি আনন্দে যেন সাত হাত লাফাইয়া উঠিল। তার পর বউদিদির পদতলে যেমন উপুড় হইয়া পড়িতে যাইবে, ঝরণা তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া মোটরে তুলিয়া লইল।

[ক্রমশঃ

জীবন-বেদ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আশ্রমের মাঠ, ভক্ত পরিবেশ ঘিরে আসতে রাত অনেক হয়ে যায়। রাধানাথ উদাসীন ভাবে রেল-লাইনের ভাঙা গাঁকোর উপর বসে গান গায়। ক'টা দিন তার এই ভাবেই বয়ে চলেছে। জীবনের সার্থক মুহূর্তগুলির সঙ্গে বৎসরের এই কয়েকটি দিন-রাত্রির কোনো যোগ নেই। পুলটার ও-পারের সঙ্গে এ পারের কোনো যোগসূত্র নেই—যুদ্ধের সময়ে রেল কোম্পানী উঠিয়ে নিয়ে গেছে লাইনের লোহা আর পুলের সেতু কোন্ দূর পূর্ব্ব দেশে! রাধানাথ এই ফাঁকা ব্যবধানের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে গেছে তার জানা নেই। যখন খেয়াল হ'ল যে এবারে আশ্রমের দিকে যাওয়া দরকার, তখন তৃতীয় প্রহরের শেয়াল ডাকা সবে শেষ হচ্ছে।

পাথর-ছড়ানো লাইন-বিহীন রেলপথের ওপর দিয়ে রাধানাথের চলতে ভারি ভালো লাগে। কেমন একটা বহু দূরের সঙ্গে যোগ-সূত্র যেন সে অনুভব করে। সত্যি এক দিন এই রেলপথ দিয়ে ত ভাগলপুর যেতো কত লোক,—সেই রেলে চড়েই রাধানাথ প্রথম বাগডোবায় এসেছে।···রেলের পথ থেকে বেঁকে মিহি ধুলোর কাগ-ছড়ানো রাস্তা ধ'রে মন্থর গতিতেই সে আশ্রমে প্রবেশ করল।

সামনের মাঠে তাঁবুগুলোয় আলো জ্বলছে, কিন্তু বিশেষ কোনো সাড়া-শব্দ নেই। গুরুদেবের আটচালা এই প্রান্তে, চাঁদের আলোতে আটচালার শাদা দেওয়াল যেন আরও বেশি শুভ্র হয়ে উঠেছে, আর সব চেয়ে শুভ্র, নতুন শাঁখের গায়ের মত ধবধবে মসৃণ শুভ্রতায় দেবমন্দির আপন শ্রীমহিমায় অপূর্ব্ব মনে হয় রাধানাথের কাছে।

রাধানাথের পায়ের গোছ দু'টো অকারণেই দুর্ব্বল হয়ে যায়। ওর মনের উদ্বেল, উদ্দাম, অধীরতা সহসা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সারা দিন ধ'রে যে দর্শনের আকুলতায় সে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ায় সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুই যেন আর তার কাছে ততটা অভিপ্রেত নয়। আস্তে আস্তে চারি দিকে তাকিয়ে নিয়ে রাধানাথ মন্দিরের সোপানগুলি পার হয়ে চত্বরে উঠে দাঁড়াল।···আবার কিন্তু তার হৃদ্‌যন্ত্রের গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে যায়। আর যেন এক মুহূর্ত্তও সে ঠাকুরদের না দেখে থাকতে পারছে না।

কোমরের ডোরের সঙ্গে বাঁধা মন্দিরের চাবী। দরজাটা খুলেই ঘৃত-প্রদীপটি উস্কে দিয়ে রাধানাথ সারা মন্দিরটি এক পলকে দেখে নিয়ে মহাদেবের কাছে এগিয়ে যায়। এই পাগল দেবতাটিকেই সে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে—এ কথাটা নিজের মনের কাছেও যেন রাধানাথ গোপন রাখতে চায়। পঞ্চ দেবতার মন্দিরের পূজারী সে—তার পক্ষে এ অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়। তবু এক এক সময়ে তার নিজের চোখেই এই সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে—এ জন্য সে লজ্জিতও হয় এবং দায়ী করে সে ভোলানাথের ধূর্ত্ততাকে। সে বলে—'ঠাকুর, তুমি কেন আমায় টানো এমন ক'রে, সব ভুলিয়ে দাও? আমার কী দোষ বল? এত শয়তান তুমি আগে কে জান্‌ত, এম্‌নিতে দেখে ত বেশ ভালো মানুষ বলেই মনে হয় কিন্তু তোমার পেটে এত 'ইয়ে'···।'

এই 'ইয়ে' নামক বস্তুটিই রাধানাথের জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বল। এক কালে সে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও কোনো কাজে পাত্তা পায়নি, কারণ ওর 'ইয়ে' নেই—মানে 'যোগ্যতা' নেই। ওকে দেখলেই লোকে 'ইয়ে' মনে করে—অর্থাৎ ঠিক বোকা না হলেও [illegible] ভালো মানুষ ব'লে ধ'রে ন্যায়। এবং বাগে পেলেই 'ইয়ে' করে—মানে ঠকিয়ে নেয়। অবশেষে অনেক 'ইয়ে' (চেষ্টা) ক'রে হয়রাণ হয়ে ভাগলপুরে হাজির হ'ল। তার পর লোক-মুখে সে শোনে যে, মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশে কোন্ এক মহাপুরুষ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছেন। কথাটা তার মনে ধরল। সত্যি, আজকাল এই ধরণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের খুব প্রচলন দেখা যায় না। তার জীবনে হয় ত এমন সুযোগ আর আসবে না। অতএব এ 'ইয়ে' (সুযোগ) ত্যাগ করা 'ইয়ে' (ঠিক) হবে না।

তখন কে জানত যে, ভাগ্য-বিধাতার নির্দেশেই তাকে সেই স্বপ্ন-লোকের মত নানা কাহিনী বিজড়িত এই মন্দার পর্ব্বতের দিকে পরিচালিত করছে! মন্দার নামটির মাধুর্য্য আরও বেশি তাকে পেয়ে বসেছিল। ভাগলপুরে যে চাকরীর সন্ধান পেয়ে সে ছুটে এসেছিল, সেটা বাদ দিয়েই রাধানাথ মন্দারে এসেছিল।

তার পর কোথা দিয়ে এই কয়েকটি বৎসর তার জীবনের মাল্যকে সুন্দরতর ক'রে তুলেছে। শান্তির যে নীড় তার অলস স্বপ্নাশ্রয়ী মনকে সর্ব্বদা মধু-গন্ধে মোহিত করে রেখেছে তার মায়া যে এত তা কে জানত? পৃথিবীর ইতিহাসে যে পতন-অভ্যুদয়ের নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলেছে সে-সব কথা রাধানাথের জীবনকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। কেবল মাত্র যেদিন রেল-লাইনটা উঠে গেল, সেদিন তার মনে হয়েছিল যুদ্ধ যে পৃথিবীতে হচ্ছে মন্দার তারই অন্তর্গত। তবে সেই সঙ্গে একটা স্বস্তিরও নিশ্বাস সে ফেলেছিল—যেন কোন্ অচ্ছেদ্য বন্ধন আপনা হতেই মুক্তি দিয়ে গেছে তাকে।

যাক্ সে-সব কথা।

তার মত 'ইয়ে' (অকর্ম্মণ্য) লোককে যে এই পঞ্চদেবতার ভার বহন করতে হবে তা কে জান্‌ত?

সেই দিনটির কথা রাধানাথ নানা কারণেই ভুলতে পারে না। আজও এই নিশুতি রাতে স্তিমিত প্রদীপের সম্মুখে বিগ্রহগণের দিকে চেয়ে তার সেই দিনটির কথা মনে পড়ল। জীবনে সেই দিনই রাধানাথ প্রথম স্বীকৃত হ'ল—তার যে এতটুকু যোগ্যতা আছে সে বিশ্বাস তার নিজেরও ছিল না। যখন গুরুদেব তারই হাতে সম্বৎসরের সেবার দায়িত্ব সমর্পণ করলেন, তখন বোধ হয় সে-ই সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিল। ভীতও হয়েছিল সে-ই সব চেয়ে বেশি। সেই পুরাতন ছবিটি এখনও তার চোখের সামনে শুভ্র সমুজ্জ্বল। রাধানাথ মাটির ওপর বসে পড়ে তৃষিত ভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে—নারায়ণ, গণপতি, জগদ্ধাত্রী, সূর্য্যদেব, মহাদেবের মূর্ত্তি যেন সজীব হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। সহসা অস্ফুট স্বরে রাধানাথ যেন প্রশ্ন করে—ঠাকুর তোমরা আনন্দে আছ ত? উৎসবের মধ্যে তোমরা তৃপ্ত হও ত? দেশ-দেশান্তর থেকে কত, শত ভক্ত এসেছে তাদের প্রণতি-অর্ঘ্য নিয়ে—সবাই এ উৎসবে উৎফুল্ল! কিন্তু রাগ ক'র না ঠাকুর, তোমরা অন্তর্যামী, সবই ত বুঝতে পারো, আচ্ছা বলতে পার, আমার এ হৃদয়ে আনন্দ নেই কেন? শান্তি নেই কেন? কেবলই বুক ঠেলে কান্না [illegible] আসতে চায় কেন? আমার কর্ম্মের ক্ষয় হয়নি? আমার [illegible] সত্তার বিন্দুমাত্রও কি তোমাদের চরণপদ্মে উৎসর্গ করতে পারিনি?···রাধানাথের [illegible] কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। মর্ম্মরের

বুকে মানুষের অক্ষম হৃদয়াবেগ করুণা জাগাবার চেষ্টায় আকুল হয়ে মাথা নত ক'রে পড়ে থাকে।…

সারা বছর ধ'রে রাধানাথ সুস্থ মনে আনন্দিত ভাবেই পূজা-উপাচার সাজায়, তার সমস্ত কাজের মধ্যে উৎসাহের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। যতক্ষণ সে একাকী দেবতাদের কাছে থাকে তাঁদের সেবার কাজ নির্জনে থেকে করে তখন তার কর্মদক্ষতা কোথা হতে আসে কে জানে! সে বিভোর হয়ে থাকে কাজের নেশায়। ব'সে ব'সে অনেক গান রচনা করে, নিজেই আপন মনে সেই সব রচনা দেবতাদের শুনিয়ে খুশি হয়ে ওঠে। যেদিন ফুলের প্রাচুর্য্য ঘটে সেদিন গ'ড়ে মালা দিয়ে মন্দিরের দুয়ার ও অভ্যন্তর ছেয়ে দেয়। তার এ-সব কাজের আর এক জন উৎসাহী সমঝদার আছে, মন্দিরের চাকর দেবকীনন্দন। সে সাজায় আর দেবকীনন্দন অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। অবশেষে দেবকী বলে,—ঠাকুর মশাই, উৎসবের সময় দেখব এ-রকম করে সাজাবেন, আমি ফুল আনিয়ে দেবো, আহা তখন বাবা দেখে কত খুশ করবেন, আর সব কত লোকে বলবে 'বাঃ'। হাঁ!

উৎসবের নাম শুন্‌লেই রাধানাথ কেমন ধারা মনমরা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হিসেব করে উৎসবের আর কত দিন দেরি আছে। প্রতি বৎসরই সে ঠিক ক'রে রাখে, উৎসবের সময় ক'টা দিন ছুটি নিয়ে একবার বৈদ্যনাথধাম ঘুরে আসবে, একবার বুড়ানাথের শ্রীচরণেও প্রণাম ক'রে আসতে পারলে ভালো হয়। এ বছরও একখানা দরখাস্ত লিখে রেখেছিল রাধানাথ। কিন্তু যথারীতি অন্যান্য বার যা হয় এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি—শেষ পর্য্যন্ত আর আরজিটা জানাতে ভরসা হয়নি। সত্যি, বৎসরের মধ্যে এই চারটি দিন সবাই মিলিত হয়, তখন আশ্রমে কাজেরও চাপ পড়ে—কি ক'রে সব ফেলে দিয়ে যায় রাধানাথ! সবাই কী মনে করবে? প্রচ্ছন্ন ভাবে এদের সবাইকেই অতিথি বলে মনে হয় তার। এঁরা জানেন না মন্দিরের বা আশ্রমের সব খবর, আর জানলেও, এ ভাবে চলে যাওয়া যেন ভালো দেখায় না।…অগত্যা রাধানাথ এবারের দরখাস্তখানিও তার গানের খাতায় সযত্নে রেখে দেয়। প্রতি বৎসরই একখানি ক'রে দরখাস্ত মজুত হয়ে আসছে, সাত বৎসরের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত একটি দিন ছুটি রাধানাথ পায়নি—অবশ্য পায়নি বলা ভুল, নেয়নি।

আজ সন্ধ্যা থেকে পুলের ওপর বসে বসে স্থির করেছে রাধানাথ, এবার ঠিক সে ছুটি নেবেই। তাছাড়া আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা গুরুদেবকে জানাবে। আর্থিক অনুপপত্তির কথাটা আর না জানালেই নয়। মাসিক বরাদ্দ না বাড়ালে পঞ্চ দেবতার নির্ব্বাক্ সত্তা হয়ত আপত্তি করবেন না, কিন্তু তাঁদের পূজার প্রসাদে যাদের দেহ ধারণ করতে হয় তারা বাঁচে কি করে? অতএব মাসোহারা বেশী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নুণ-ভাত খেয়ে বাঁচতে হলেও এ বরাদ্দে আর চলে না। অবশ্য রাধানাথ খুব বিনীত ভাবেই কথাগুলি জানাবে। জানাতেই হবে, নইলে চাকর-বাকর সবাই চাকরী ছেড়ে দেবে ব'লে শাসিয়ে রেখেছে।

আজও বিকেলে দেবকীনন্দন বলেছে—ঠাকুর মশাই, কী হ'ল?

রাধানাথ অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিয়েছে, এই কালকেই জানাবো দেউকি। ইয়েটা পার হয়ে যাক, নইলে আজও বলতে পারতাম, কিন্তু সেটা ইয়ে দেখায়

দেবকী ঠাকুর মশাইএর ওপর খুব ভরসা করে না, নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে, কিন্তু এ বৎসর মুস্কিল হয়েছে,—তার মাইনে প্রতি বৎসর বাড়তে বাড়তে প্রায় পূজারী ঠাকুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, (বলা বাহুল্য, তার জন্ত ষোল আনা কৃতিত্ব দেবকীরই) এখন যদি ঠাকুর মশাইএর মাইনে না বাড়ে ত'তে দেবকীর অসুবিধে। পূজারী আর চাকর এক বেতন পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেবকী কেবলই রাধানাথকে বলে—ভাখো ঠাকুর, তোমার নিজের পেট ভরিয়েই নিশ্চিন্দি, দেশে বুড়ো মাকে যা খুশি পাঠিয়ে দিয়ে তুমি খালাস, কিন্তু আমায় দস্তুর মত সংসার করতে হয়। আর তোমারও বাবা লজ্জা দেখে মরে যাই, মুখের কথাটি বললেই তোমার দনাদ্দন মাইনে বেড়ে যায় তা নয়।

রাধানাথ বেশির ভাগ সময় চুপ করে থাকে। যখন রাগ হয় তখন সে বলে—ভাখ দেউকি, চাইলেই ত হয় না, আমি কি এত কাজ করি যার জন্তে বেশি চাইব? সত্যি, আমার খাটুনীই বা কী? পূজা, ভোগ রান্না, ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাওয়া। তোদেরকার পরিশ্রম তহয় না, বেশি চাই কি ক'রে? হাঁ, তোরা সত্যিই পরিশ্রম করিস্। তোদের দরকার আছে মানি। আমি বেশি নিয়ে কী-ই বা করব?

করবার তার অবশ্য অনেক কিছুই আছে, যথা, কতকগুলি 'গ্রন্থ' তার কেনা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া, আর একটা কথা… যেটা নিজের কাছেও প্রকাশ করতে লজ্জা পায় সে, এবার দেবদেবীর সেবার অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্ত বিবাহ করাটা খুব সমীচীন মনে হচ্ছে। সত্যি, উৎসবের সময়ে শিষ্যেরা এসে ঠাকুরদের যেমন সুন্দর মালা দিয়ে সুচারু ভাবে সজ্জিত করে. রাধানাথ ঠিক তেমনটি ক'রে সাজাতে পারে না, তাছাড়া যখন সুললিত কণ্ঠে মেয়েরা স্তব-গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, তখন রাধানাথ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে—বারো মাস এমন ক'রে মন্দিরের অঙ্গন সুর-ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়ে ওঠে না।…আরও এমনি কত অভাব ধরা পড়ে যায় উৎসবের সময়। নিজের অক্ষমতার তীব্র বেদনা তাকে অস্থির ক'রে তোলে, সে নিরুপায় হয়ে চষা-ক্ষেতের আল ধ'রে ধ'রে মন্দার পাহাড়ের শিলাখণ্ডে গিয়ে বসে। সাঁওতালদের গ্রাম, মজা ডোবা আর যবের শীষের গাছ উঁচু উঁচু একান্তবর্ত্তী তালগাছগুলি, মাঝে মাঝে শাখা-প্রশাখা পল্লবিত মুকুলগন্ধ মধুর আম গাছগুলি, কোনো কিছুই রাধানাথের উদাস উদ্‌ভ্রান্ত গতিকে ব্যাহত করতে পারে না। সে পাহাড়ের কাঁটা বনে অর্থহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। অক্ষমতার বেদনা তাকে প্রতি মুহূর্ত্তে দংশন করছে। সারাটা বছর ধ'রে মিথ্যার উপচার ছাড়া, অক্ষমতার অর্ঘ্য ছাড়া, ফাঁকির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই কি উৎসর্গ করতে পেরেছি দেবতাদের? বোধ হয়, এই তিনটি দিনই যথার্থ পূজা-অর্চ্চনা হয় পঞ্চ দেবতার—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রথম অর্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন শুরু হয়। সূর্য্যোদয়ের আগেই শতাধিক নরনারী মিলিত কণ্ঠে স্তবগান সমাপ্ত করে। মন্দিরের মার্ব্বেল পাথরের বেদিতে বেদগান হয়, তরুণ কিশোর ব্রহ্মচারীরা আসে বিদ্যাপীঠ হ'তে। তার পর সারা দিনমান চলে ভক্তি-প্রবাহের বন্যা। উৎসবের এ কয় দিন ভগবানেরই পূজায় সমগ্র ভার গ্রহণ করেন। রাধানাথ এ কয় দিন দর্শক ছাড়া

আর কিছুই নয়। কর্মহীন অবসরে তার মন হাঁপিয়ে ওঠে। পাহাড়ের গম্ভীর নিষ্ঠুর নীরবতা রাধানাথের ভারাক্রান্ত মনকে অধিকতর বিমর্ষ করে তোলে।···সে স্থির করে, আর নয়, এ মিথ্যা দিনাতিক্রমণের একঘেয়েমি আর চলবে না। সে চলে যাবে, কোথাও কোনো দূর দেশে, সেখানে গিয়ে সাধনার চেষ্টা করবে। সত্যি, গুরুদেব যে দায়িত্ব তাকে অর্পণ করেছেন তা বহন করার যোগ্যতা তার নেই, ছলনা দিয়ে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার আছে কি? এ অপরাধ, এ পাপ···।

সকালে পাহাড়ের মধ্যে যে বেদনার যন্ত্রণার তাড়না রাধানাথের অশান্ত হৃদয়কে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, গভীর রাত্রির কমনীয়তায় সেই বেদনা অশ্রুধারায় রূপান্তরিত হয়ে ঝরে পড়ে শান্তি-বারি সেচন করে। অবসাদের তৃপ্তিতে মূর্চ্ছিতপ্রায় করে দেয়। কি এক অপূর্ব্ব মায়ায় যার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দিনের লালিত সংকল্প, সন্ধ্যার চিন্তাপ্রসূত যুক্তিবদ্ধ পরিকল্পনা সব-কিছুই কোন্ এক মহা প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। অবোধ ভক্তির আবেগ রাধানাথের সমগ্র সত্তাকে রসমধুর করে দেয়।···তার মুদিত চোখের সামনে শিব, দুর্গা, নারায়ণ, জগদ্ধাত্রী, গণপতি সবাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন। তাঁরা মানুষের মতই রাধানাথের দিকে করুণাময় দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন।

মন্দিরে মঙ্গলারতির আহ্বানে ঘণ্টা বাজে। আবার শুরু হ'ল সমারোহের যজ্ঞ। রাধানাথের প্রসন্নতা কোথায় কোন্ গুহায় অবলুপ্ত হয়ে রইল।

আজ উৎসবের শেষ দিন। কি এক আসন্ন আনন্দের প্রতীক্ষায় রাধানাথ উৎকণ্ঠিত অন্তরে অন্তরে।

আজকের সব চেয়ে বড় অনুষ্ঠান দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

সারা বছর ধরে এই ঈপ্সিত দিনটির দিকে চেয়ে চেয়ে কত শত প্রাণী দিন কাটায়। মাঝে মাঝে দু'-এক জন আসে, রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করে—"ভোজটা কবে?"

দশ-বিশ মাইল দূর থেকে লোক আসে, সামনের সাঁওতালদের গাঁয়ের জনপ্রাণী বাদ যায় না, সবাই আসে। তা অমন তিন-চার হাজার কাঙালী আসে।

এবার আয়োজন কিছু খর্ব্ব হয়েছে। কারণ, শেঠদের দুর্বৎসর, যুদ্ধ থেমে গেছে, মন্দা বাজার। তাই চিড়ে, দই, গুড় আর জিলাপীর বন্দোবস্ত হয়েছে। আর এর সঙ্গে একটি ক'রে কাঁচা লঙ্কাও দেওয়া হচ্ছে।

বেলা পাঁচটা হয়ে গেল কাঙালী-ভোজন শেষ হ'তে হতে।

সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর রাধানাথ আস্তে আস্তে সেই বৃন্তচ্যুত সেতুটির পারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিশ্রামের এমন প্রশস্ত স্থান আর দুনিয়ায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, দেবকীনন্দন শাসিয়ে রেখেছে তাকে আজ আরজি পেশ করতেই হবে। সত্যি, বড় অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি বলে সে দরখাস্তটা গুরুদেবের হাতে দেবে? অবশ্য তাঁর হাতে না দিয়ে শ্যামাশঙ্কর বাবুর হাতে দিলেও হয়—না, থাক, তার চেয়ে গুরুদেবকে দেওয়া ঢের সোজা। শ্যাম বাবু সাতাশ রকমের জেরা শুরু করবেন। শেয়ার-বাজারের বাহু খেলোয়াড় শ্যাম বাবু, বড় কড়া মেজাজের লোক। এই ত আজ গুরুদেবের চোখের সামনে দু'টো লোককে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিলে—ওরা না কি একবার খেয়ে গিয়ে আবার এসেছে। আরে বাপু, দিবি ত দু'টো চিড়ে, তায় আবার একবার দু'বার কি? যে একবার খেয়ে আবার আসে তার নিশ্চয় পেট ভরেনি, নইলে সে আসবেই বা কেন? ভারি বিশ্রী লাগে রাধানাথের। সারা বছরের মধ্যে একটি দিন—দু'মুঠোর জায়গায় চার মুঠো দিলে ত আর গরীব হয়ে যাবে না, অথচ ও-বেচারী কতখানি খুশি হয়, যে পেলো তার মনের আনন্দ তোমার কল্যাণ করবে না! ওকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ হ'ল! আজ রাত্রেই আশ্রম অনেকটা শান্ত হয়ে আসবে। অনেক যাত্রী চলে যাবে আজই। বাকী রইল যারা তারা কাল বিকেল নাগাদ রওনা হবে। কোনো রকমে কালকের দিনটা কাটিয়ে দিলেই—ব্যাস, হয়ে গেল। তার পর আবার এক বছরের মত নিশ্চিন্দি।

আজ রাধানাথের মনটা কেমন যেন অকারণ আনন্দে পুলকিত। অবশ্য, প্রতি বৎসরই এমন হয়। উৎসবের সঙ্গে তার অন্তরের কোনো যোগ থাকে না,—সে থাকে প্রতীক্ষায়, উৎসবের শেষ হওয়ার দিকেই তার উৎসুক প্রতীক্ষা।

কিন্তু আজ এ ছাড়াও কিছু যেন বাড়তি আনন্দ হচ্ছে।

রুক্ষ পাহাড়ের বুকে জ্যোৎস্নার প্লাবন যে কমনীয় আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে তার দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। দৃষ্টি শ্রান্ত হয়ে পড়ে তৃপ্তির অবসাদে।

আস্তে-আস্তে চোখ বুজে আসে। ও দেখতে পায়, সারি সারি বসে আছে অসংখ্য নরনারী, তাদের পরনে জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড, চোখে বিশ্বের লোলুপতা আর সরলতা। কত যে মানুষ তার সীমা-সংখ্যা নাই। তারা সবাই একসঙ্গে চীৎকার করছে···"মালিক হাম্‌সে দ্যো।" সবাই চাইছে,—পেট ভ'রে খেতে চাইছে। শুকনো চিড়ের ওপর প্রায়-তরল দই, কালো গুড়, আর পাশে একটা ক'রে কাঁচা লঙ্কা—এক মুহূর্ত্তে আবার শূন্য শালপাতাটা পূর্ব্ববৎ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যতই ভ'রে দাও, তার শূন্যতা ভ'রবে না। কেউ অভিযোগ করছে, "হে হ মালিক, শুখা চুড়া, দাহি না মিলল।" এই অসংখ্য লোলুপ প্রাণী কোথা থেকে এসেছে। একটি দিনের আহার-প্রাচুর্য্য তাদের সারা বৎসরের খোরাক জোগায় না কি!··· সহসা একটি মুখ দেখে রাধানাথের মনে হ'ল, এ মেয়েটি যেন এ দলের নয়, জোর ক'রে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—পাতায় তার কোন ভোজ্য পড়ে নেই, কিন্তু পাবার জন্য ব্যগ্রতাও যেন নেই। ওকে প্রশ্ন ক'রলে রাধানাথ—তোমার কি চাই?

ও বললে—জী কুছ নেহি। পরসাদ মিল গিয়া।

রাধানাথ মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে থাকে, আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে থাকে সে। আহা কি ভক্তি! পরসাদ মিলা! ওর কালো কালো মুখের মধ্যে টানা টানা দু'কালো চোখ, তার গভীর সরল দৃষ্টি যেন কপিলা গাইএর চাহনী।

রাধানাথ নড়তে পারে না, ওর কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে বলে—তোর ঘর কোথা?

মেয়েটি তেমনি অচপল ভঙ্গিতে বলে—ওই গাঁয়ে।

—তুই রোজ আসবি পরসাদ নিতে? রোজ এসে মন্দির প্রদক্ষিণ করবি? ঠাকুরকে মালা গেঁথে দিতে পারবি? মন্দিরের ঠাকুর দেখবি আর পরসাদ মিলবে!

মেয়েটি ধব্‌ধবে শাদা দাঁত বার ক'রে হাসে—ওর সারা মুখখানা, সেই কালোর কালো মুখখানা হাসিতে ভ'রে যায়, ওর কালো চোখের তারা হাসিতে উজ্জল হয়ে ওঠে। আহা যেন কষ্টিপাথরের বুকে আঁকা জগদ্ধাত্রী। রাধানাথ বললে—তোমার নাম কি?

—মেরি নাম মুলকী।···হর রোজ পরসাদ মিলবে, হে মালিক?

রাধানাথ বললে,—তোমার নাম মুলকী নয়, মা জগদ্ধাত্রী। আমি জগদ্ধাত্রী বলে ডাকব।

মেয়েটি খুশি হয়ে বলে—কেয়া? জগ্‌ধাত্‌রী! জগ্‌ধাত্‌রী!

পরক্ষণে রাধানাথের বিশ্বাস হয়, জগদ্ধাত্রীই সত্যি তার সাম্‌নে উপবিষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় পঞ্চ দেবতার কথা। কিন্তু গণপতি, মহাদেব, সূর্য্য, নারায়ণ এঁরা সব কোথায়? বার বার ওই বিপুল জনতার মধ্যে তাঁদের সে খুঁজে খুঁজে ফেরে—কিন্তু কোথাও পেল না দেখা। নেই, দেবতারা নেই! তবে কি তাঁরা মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন? শুধু জগদ্ধাত্রী রয়েছেন তাঁর অসীম প্রসন্নতার দিব্য মাধুর্য্য নিয়ে! আর সব ম্লান, অবলুপ্ত হয়ে গেছে? ···না, তাঁরা সেই প্রত্যাখ্যাত দরিদ্রনারায়ণের দলে চলে গেছেন? মানুষের অকরুণ অন্তরের হেয়তা তাঁদের ব্যথিত করেছে—সেই দুঃসহ বেদনা, একমাত্র জননী ছাড়া বুঝি আর কেউ সইতে পারে না।

রাধানাথ বেশ বুঝতে পারে, দেবতারা চলে গেছেন মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে। জগদ্ধাত্রী ত তা পারেন না। তিনি স্নেহপুটে ঘিরে রেখেছেন এদের। নইলে বুঝি রুদ্রভৈরবের প্রচণ্ড তাণ্ডব প্রলয় ভীষণ আকার নিয়ে বিশ্বকে ছারখারে দিত।···জগদ্ধাত্রীর প্রতি মমতায় প্রণতিতে তার হৃদয় অবনত হয়ে যায়।

কিন্তু পরক্ষণে দেবতাদের এই অবিচারে রাধানাথের মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মানুষকে তাঁরা ত মানুষ ক'রেই পাঠিয়েছেন, তার স্বভাব-বৃত্তির প্রতিফলনকে তাঁরা ক্ষমার দৃষ্টিতে না দেখলে তাঁদের দেবত্ব কোথায়? শুধু এই তিন দিনের উৎসবের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই কি তাঁদের দিন কাটে? পূজার প্রতি লোলুপতা, সমারোহের প্রতি মোহ, অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি—এ ত দেবতার গুণ নয়। তাঁদের নির্বিকার, নির্বিকল্প মহনীয়তাই মানুষের লক্ষ্য হয়ে থাকবে যে! সারা বছরের মধ্যে একটি দিনের দান-দাক্ষিণ্যে ত মানুষের অনন্ত অভাবের বিন্দুমাত্র ক্ষয় করা যায়। বাকী সবই তাকে ভোগ করতে হয়। তবে আর এত মাতামাতি করা কেন এ নিয়ে? কারও অন্তরে যদি খর্ব্বতা থেকে থাকে তবে সেটা দূর করা কর্ত্তব্য—তার প্রতি বিমুখ হ'লে ত চলবে না ঠাকুর!···শেষের এ উক্তিটা রাধানাথ মহাদেবকে লক্ষ্য ক'রেই বলে। তার সব চেয়ে বেশি রাগ ওই মহাদেবেরই ওপর। তার বিশ্বাস, ওই পাগলা ঠাকুরই এই গোলমালের মূল পাণ্ডা!

পর-মুহূর্ত্তে তার মনে পড়ে যায়, মন্দিরের পূজারী সে। মন্দির-দেবতাদের সেবার ভার তারই উপর ন্যস্ত। রাধানাথ ছুটে গেল মন্দিরে। সেখানে গর্ভগৃহ শূন্য, দেবতাদের কোনও বিগ্রহ নেই। মন্দির-গাত্রে খোদাই করা অনেকগুলি চিত্র ছাড়া মন্দির সম্পূর্ণ রিক্ত। বহিঃপ্রাঙ্গণে গুরুদেব সমাসীন, তাঁকে পরিবৃত ক'রে শিষ্যগণ—তাঁর সব চেয়ে নিকটে অখণ্ড মণ্ডলাকারে কয়েকটি ক্রোড়পতি। গুরুদেবকে ঘিরে তারা অর্থহীন কোলাহলনিরত। তাদের কথার একটি বর্ণও রাধানাথ বুঝতে পারে না।

শূন্য মন্দির। দেবতারা কেউ নেই। জগদ্ধাত্রী কোথায় গেলেন? চারি দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রাধানাথ দেখলে—একমাত্র গুরুদেব আর সেই কূজনকারী মহা ধনিবৃন্দ ছাড়া মন্দির-চত্বরে কেউ নেই।

সে পাগলের মত কাঙালী-ভোজনের মাঠের দিকে ছুটে গেল। সেখানে রয়েছেন জগদ্ধাত্রী, তাঁকে ধরে রাখতে হবে। এই বিরাট শূন্যতা যদি তাঁর করুণায় পরিব্যাপ্ত হয় তবেই রক্ষা। কিন্তু, এ কী, শূন্য প্রান্তর, কেউ নেই! কোথায় গেছেন জগদ্ধাত্রী। সেই কষ্টিপাথরের করুণাময়ী জগ্‌ধাত্‌রীটি কোথায়।

কি এক অসহ্য বেদনায় রাধানাথের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সারা পৃথিবী শূন্যতার দহনে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, কোথাও এতটুকু বাতাস পর্য্যন্ত নাই। রাধানাথের মনে হ'ল, কে যেন তার কণ্ঠরোধ করতে চাচ্ছে।···দেবতা নেই!···জগদ্ধাত্রী নেই!···

চোখ মেলে সে দেখল, আকাশে তারাগুলি উজ্জল। দূরে মন্দার পাহাড় জ্যোৎস্নাধারায় সোনার মুকুটের মত, মাথায় শুভ্র স্ফটিকের মত মন্দির একটি। ওটা জৈনদের উপাসনা মন্দির। ওর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত।

এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল? কিন্তু কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন!

রাধানাথের মনে স্বপ্নের প্রভাব তখনও রীতিমত রয়েছে।

সে আশ্রমে আজ সকাল সকালই ফিরে এল। তার মন উতলা হয়েছে। সে আর মন্দির-দেবতাদের পূজারী থাকতে রাজি নয়। গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে আজই বিদায় নেবে, সামনে মাঘী-পূর্ণিমায় বুড়ানাথকে দর্শন ক'রে কোথাও চ'লে যাবে। কোথায় যে যাবে তা এখনও সঠিক জানা নেই তার—তবে, এখানে আর থাকা হবে না। এ সংকল্প তার অটল।

অস্থির মনের চঞ্চলতার সঙ্গে রাধানাথের গতিও ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। মনে মনে অধীরতা তার দ্রুত বেড়ে চলেছে।···দায়িত্ব বড় গুরুভার। আর নয়, এবারে মুক্তি নিয়ে বিশ্বের পথে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চল্‌তে পারবে।

গুরুদেবের একান্তবর্ত্তী কুটীরের জানালা দিয়ে ক্ষীণ প্রদীপের শিখা দেখা যায়। শান্ত, নির্জন বলেই মনে হয় কক্ষটি।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে রাধানাথ ডাকলে—বাবা!

ভেতর থেকে সাড়া এল, গম্ভীর গলায়, আস্তে—এস, ভেতরে এস।

প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে রাধানাথ গুরুদেবের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত্ত।

তিনি বলেন—এসেছ রাধানাথ, ভালোই হয়েছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটি কথা ছিল।

রাধানাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। শুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রু-শোভিত প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি পড়লে অন্তর আপনিই অবনমিত হয়ে আসে যেন। সদ্য যে দুঃস্বপ্ন রাধানাথকে বিচলিত করেছে, সে কথা তুলতে কেমন সঙ্কোচ হয় তার।

সে বলে—বাবা, কি আদেশ আপনার?

তিনি ক্ষণকাল মৌন থেকে বলেন—তাখো, আমারই নিজে থেকে এ-সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। তা আমার যদি ভুল হয়ে যায়, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি খুশিই হই,

রাধানাথ। সত্যি, আমার মত্তায় হয়েছে তোমার কাছে, তুমি তার জন্ত ক্ষমা ক'র।

বিব্রত হয়ে রাধানাথ তাঁর পা চেপে ধরে—বাবা, এ-সব কি আপনি বলছেন বাবা, আমি বুঝতে পারছি না। সত্যি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা!

—না, রাধানাথ, তুমি আমার পা ছেড়ে দাও। আজ আমি অপরাধী তোমার কাছে। শুধু আজ নয়, দীর্ঘ দিন ধ'রে তুমি আমার এ অত্যাচার সহ্য ক'রে চলেছ বিনা বাক্যব্যয়ে। আজ দেবকীনন্দন আমায় বললে তোমার কথা। তা আমি বলি কি, যদি তোমার মাসিকবৃত্তি আর পনেরো টাকা বৃদ্ধি ক'রে দিই তাতে তোমার অসুবিধা হবে কি? যদি অসুবিধে থাকে ত বাবা, বলো···। আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে আমি সে কথা জানাবো।

এতক্ষণে রাধানাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। দেবকীনন্দন তার উপর বিন্দুমাত্র ভরসা না রেখেই এ সব ব্যবস্থা করেছে। এ জন্ত দেবকীনন্দনের ওপর তার রাগ হয় না, নিজের উপরই সে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। লজ্জায়, কুণ্ঠায় সে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না, সে যেন বড় রকমের একটা অপরাধ করে ফেলেছে!

গুরুদেব কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বললেন—কি গো, চুপ ক'রে আছ?

—আজ্ঞে, আপনি অপরাধ নেবেন না, বাবা! আমি এ-সব কিছুই জানি না। আমার ত কই তেমন কিছু প্রয়োজন দেখি নে। অকারণে দেউকী আপনাকে ব্যস্ত ক'রেছে। বাবা, আমার জন্ত আপনি ভাববেন না।

একবার মনে হ'ল, দুঃস্বপ্নের ইতিবৃত্তটা তাঁকে সব খুলে বলে, কিন্তু গুরুদেবের শান্ত-সমাহিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে কেন যেন পারল না রাধানাথ। পরে ভাবলে, না হয় কাল প্রত্যুষেই বিদায় নেবে।

গুরুদেব বললেন—আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে এবার বলো, তুমি যেন কিছু বলবে ব'লে এসেছিলে।

মাথা চুলকে সে জবাব দেয়—আজ্ঞে, ইয়ে।

তার পর অনেকক্ষণ উভয় পক্ষই নীরব থাকে। রাধানাথ যেন কথায় খেই খুঁজে পায় না।

গুরুদেব তার হাত ধ'রে কাছে টেনে নিয়ে, পিঠে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলেন—বলো। রাধানাথ, আমার কাছে কোনো সঙ্কোচ ক'র না। তোমার মনের অগোচর যে কথা নয়, সে কথা আমায় বলতে বাধা কি? বরাবরই দেখেছি, তোমার মনে কোথায় যেন একটা নিঃশব্দ কুণ্ঠভাব, আত্মগোপন ক'রে থাকো তুমি। আমিও তোমায় উত্যক্ত করতে চাইনি রাধানাথ। কিন্তু যে কথা বলবার জন্ত এসেছ আজ, তা যদি না বলতে পারো তবে বুঝব, তুমি আমায় ব্যথা দিতে চাও না ব'লেই, বলতে পারোনি। কিন্তু তাতেই আমি কষ্ট পাবো, কারণ, এতে আমার প্রতি তোমার আস্থার অভাব প্রতীত হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের গুরু, রাধানাথ! তোমার কাছে আমার শিক্ষণীয় আছে বই কি!

এ কথায় রাধানাথের সমস্ত সঙ্কোচ-কুণ্ঠা কোথায় চলে গেল।

সে স্বপ্নের আদি-অন্ত সবই বললে, শুধু বলতে পারলে না সেই মুখ্যাটির কথা—সেই ক্রোড়পতি-পরিবেষ্টিত গুরুদেবের চিত্রটি সে বাদ দিয়ে গেল।···বলতে বলতে তার আবার সন্দেহ হ'ল যেন সমস্তটাই সত্যি। সে আর থাকতে পারল না, সে কিছু না ব'লেই, গুরুদেবকে প্রণাম করার কথা ভুলে গিয়ে দ্রুতগতিতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান করল।

ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাধানাথ বার বার ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল বিগ্রহ স্বস্থানে রয়েছেন ত? না, কই কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক সেই আগের মতই রয়েছেন তাঁরা। আরও নিকটে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। তার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে, রাধানাথ জানে না। সময়টুকু তার গভীর তন্ময়তার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে।

জগদ্ধাত্রীর স্বর্ণজ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে বলে—মা, তোর কষ্টিপাথরের মত যে মূর্তি কি মিথ্যা?···মহাদেবের বেদি স্পর্শ ক'রে বলে—বাবা, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমায় এখান থেকে ঠেলে দিতে চাচ্ছ কেন? আমি পারব না তোমায় ছেড়ে থাকতে। কেন দুর্মতি দিয়ে তাড়াতে চাও? ভবের হাটে পাক খাইয়ে কি তোমার এতই আনন্দ হবে?

অকস্মাৎ গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্র পাঠে উচ্চকিত হয়ে রাধানাথ বহিঃ-প্রাঙ্গণে এসে দেখল, গুরুদেব উপবিষ্ট।

রাধানাথ বসল তাঁর পিছনে।

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব স্তব শেষ ক'রে চোখ মেলে বললেন—রাধানাথ, কোথায় গেলে। শোনো।

নিঃশব্দে রাধানাথ তাঁর পাশে এসে বসল।

—ত্যাখো, আমার একটি আদেশ আছে।

—আজ্ঞা করুন।

—তোমার বিবাহ দিতে চাই আমি।

কে যেন রাধানাথের মাথায় বজ্রমুষ্টিতে আঘাত করল। সে আঘাতে তার সমস্ত চৈতন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে যেন।

গুরুদেব বলেন—মানুষ সাংসারিক জীব। তুমি বোধ হয় জানো, এক দিন সংসারের সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি বৈরাগ্য সাধনের জন্ত গিরিগুহায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেছি। অনেক দেখেছি।···কিন্তু এক দিন যখন দেখলাম, এক জন সন্ন্যাসী পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হা-হা-হা ক'রে অট্টহাস্তে পাহাড়ের দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত করে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় গেল স্রোত-মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে, সেদিন আমার মনে প্রশ্ন উঠল—এই কি সিদ্ধি? এই কি পথ? মানুষ তার জীবন দিয়ে জীবনকেই অস্বীকার করতে চায়, এ কেমন সার্থকতা? ফিরে এলাম, এখন আমি গুরুর কৃপায় এই বিশ্বাস করি, সমগ্র মানব-জীবন দিয়ে মনুষ্যত্বকেই অর্জন করতে পারা চাই। আজ তোমার মনে ভক্তির রূপ দেখে আমার মনে হচ্ছে, বৈরাগ্যের দিকে তোমার গতি। জীবন দিয়ে জীবনকেই জাগাও, অস্বীকার করতে যেয়ো না।

রাধানাথ তাঁর মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। তাঁকে চুপ করতে দেখে সে বললে—কিন্তু এত অবিচার! চারি দিকে অবিচার-বৈষম্য ছাড়া আর ত দেখি না কিছু, বাবা?

—অবিচার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে কি তার উপশম হবে, রাধানাথ? তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাকে আরোগ্য করবার চেষ্টা কর, সেটাই ব্রত হোক জীবনের।

—কিন্তু বিবাহ কেন গুরুদেব ?

—তার উত্তর এক দিন তুমিই দিতে পারবে। আজ আমার আদেশ পালনের জন্যই বিবাহ কর তুমি।

—এতে করে ইয়ে—

গুরুদেব তার কথা শেষ করতে অবসর না দিয়েই বল্লেন—তোমার এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার ভক্তিরস ব্যাহত হ'তে পারে এই আশঙ্কা আছে, তাই বলতে চাই না।

রাধানাথ বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে—গুরুদেব, আমার ভক্তিরস খুবই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনো গলদ নেই, অতএব তা অটুট থাকবে, কথার প্রভাবে তা বিনষ্ট হবে না। যদি হয় তবে বুঝতে হবে, ভক্তিরস আমার সত্য নয়। আপনার কাছে প্রার্থনা, আপনি ব্যক্ত করুন। আমি ত আপনার কাছে কোনো সঙ্কোচ করিনি ?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে গুরুদেব বলেন—আমি স্বেচ্ছায় বলছি না, রাধানাথ। তোমার প্রতি আমার আস্থা আছে বলেই বলছি। তুমি এর বিকৃত অর্থ করবে না, তোমার মন তেমন দুর্বল নয় শোনো, তুমি যে জগদ্ধাত্রীর রুক্ষ মূর্ত্তি দেখেছ, তাতে ক'রে অতি সুপ্তমনে রমণীর প্রতি আসক্তি প্রতীত হয়, কিন্তু তোমার পরিবেশের মধ্যে ভক্তির প্রাদুর্ভাব বশতঃ তুমি তাঁকে মাতৃরূপে দেখেছ। যে রমণীকে তুমি স্বপ্নে দর্শন করেছ সে কল্পনা হলেও তার প্রভাব নির্জ্ঞান মনে অনস্বীকার্য্য। জানি না, অবচেতন মন ছাড়া জাগ্রতাবস্থায় তোমার কিরূপ মনোভাব হয়। অতএব আমার ইচ্ছা, তোমার বিবাহ হয়।

বিবর্জ্জর রাধানাথ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্ময়ে, ঘৃণায়, অপমানে তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় জর্জ্জর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু তার যেন এক পা-ও নড়বার ক্ষমতা নেই, কে তার সমস্ত শক্তিকে অবশ ক'রে রেখেছে।

গুরুদেব উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—উত্তেজিত হয়ো না, রাধানাথ। সারা দিন খুব পরিশ্রম হয়েছে, ক্লান্ত হয়েছ, যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে। কালই তোমার মাকে পত্র দাও। পাত্রী আমি মনোনীত করেছি, তোমার বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপন ক'রে তার পর আমি যাবো এখান থেকে।

রাধানাথ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক্ নিশ্চল হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

গুরুদেব তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন—নিজেকেও বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে। চলো তো', আমায় একটু পৌঁছে দিয়ে যাবে।

এতক্ষণে রাধানাথ লক্ষ্য করে, গুরুদেব বিনা লাঠিতেই মন্দিরে চলে এসেছেন। সে প্রশ্ন করে—লাঠি আনেননি ?

জ্যোৎস্নাধারায় শান্ত-সৌম্য প্রসন্ন মানুষটির মুখে কি এক কমনীয়তা ফুটে ওঠে, তিনি স্মিত হাস্যে মৃদু কণ্ঠে বলেন—তোমরাই আমার যষ্টি।

কর্ম্মতরী

শ্রীহরগোবিন্দ নিয়োগী

সংসার দুস্তর পারাবার রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন,
দুঃখসুখ-স্রোত অনিবার মহাকাল করে বিবর্ত্তন।
শান্তি শুধু খোঁজে যেই জন ক্লান্তি তারে ধরে শিরোপর,
দুঃখ তরে লালসা যাহার উন্মত্ততা তারি সহচর।
সুখ নাই—নাহি দুঃখ হেথা, হেথা কর্ম্ম একমাত্র ধন,
ব্যর্থ ব্যর্থ সব শুধু হেথা সুখদুঃখ বৃথা আকিঞ্চন ?
তারের বলাকা করে প্রেম-প্রীতি হৃদে বিদ্যমান,
কর্ণধার সংসার সাগরে কর্ম্মতরী ধর মতিমান্—
শুন মোর মরমের কথা একমাত্র মহাসত্য সার,
কর্ম্ম কর্ম্ম একমাত্র খেয়া ভবনদী করে পারাপার।
সংসারে সংসারী সাজি হেথা যবে নেমেছ ধীমন্।
মনে রেখ কর্ত্তব্য হেথায় মোহ মায়া নহে অকিঞ্চন।
পশ্চাতে জীবন যাহা শুধু তাহা অলীক স্বপন,
সম্মুখে আশার কুহেলী শুধু বাঁধে লোহার বাঁধন—
এই মহাসন্ধে আজি লয়েছ যে মহাকর্ম্মভার
জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে রক্ষা করো সম্মান তাহার।

[অগ্নিযুগের কর্মী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ আমার পূজনীয় দাদুজী দুই বৎসর পূর্বে দামোদর নদের উৎস-সন্ধানে গিয়ে আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, আজ-কাল এই দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার দিনে সে চিঠিখানা অনেকেই পছন্দ করবেন আশা করি। তাই দাদুজীর সম্মতি নিয়ে চিঠিখানা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের জন্য দিলাম। চিঠিখানার সব স্বত্ব আমারই রইলো।

• • •

দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি যে, যাঁর সঙ্গে দাদুজী দেবনদ অভিযানে গিয়েছিলেন সেই মনীষী শচীন্দ্রলাল দাসবর্মা এম-এ (লণ্ডন) আর ইহলোকে নাই। অভিযানের কয়েক মাস পরেই তিনি পরলোক গমন করেছেন। শ্রীভগবান্ তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।—লেখিকা]

দেবনদ অভিযান

ইলা দাস

স্নেহের ইলা,

ভ্যালটনগঞ্জ থেকে তোমাকে লিখেছি যে, আমি প্যালামৌ বেড়াতে গিয়েছিলাম আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাসবর্মার সঙ্গে। শচীন বাবু হচ্ছেন ছোটনাগপুর বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর। তার পর চাদোয়া থেকেও তোমাকে চিঠি লিখেছি। চাদোয়া থেকে তোমাকে লিখেছিলাম যে, আমরা এক দিন দামোদর নদ যেখান থেকে বেরিয়েছে সেই দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, সে জায়গা চাদোয়া থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। কাজেই সেদিন ফিরে আসতে হয়েছিল। তার পরদিন আমাদের রাঁচি ফিরে আসবার কথা। কিন্তু রাত্রে স্থির হলো, পরদিন আমাদের রাঁচি রওনা হওয়া হবে না—শচীন বাবুর কাজ আছে। আমি শচীন বাবুকে বললাম, তিনি যদি পরদিন সকাল সকাল তাঁর কাজ সেরে নিতে পারেন তাহ'লে আমরা দেবনদ অভিযানে অর্থাৎ দামোদর নদের উৎস-সন্ধানে যেতে পারি। শচীন বাবু রাজী হলেন।

পরদিন শচীন বাবু ১০টার মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ করলেন এবং সকলে খেয়ে নিয়ে ১১টার মধ্যেই যাত্রা করলাম। চললাম আমরা পাঁচ জন—শচীন বাবু, এক জন স্কুল সব-ইন্‌সপেক্টর, দুই জন পণ্ডিত। ও আমি। সব-ইন্‌সপেক্টর বাবু ও এক জন পণ্ডিত একবার সেখানে গিয়েছিলেন বললেন। তাঁরাই হলেন আমাদের গাইড অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক। অনেকেই বললেন, রাস্তা মোটের উপর ৫।৬ মাইল হবে। আমরা মনে করলাম, এই যাওয়া-আসায় ১০।১২ মাইল পথ হাঁটতে পারা যাবে—ঐ তো একটু দূরে পাহাড়শ্রেণী মেঘের মতো দেখাচ্ছে; ওরই ওপর থেকে দেবনদ বেরিয়েছে—ও আর এমন বেশী দূর কি!

দামোদর নদকে এ অঞ্চলে দেবনদ (দেওনদ) বলে। এতো কাছে এসে দামোদরের উৎপত্তি স্থানটি দেখে যাবো না সেটা কি ভাল কথা! পণ্ডিতজীকে দিয়ে আমি একগাছা বাঁশের লাঠি সংগ্রহ করে নিলাম; পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে হবে তো। জলযোগের জন্য কয়েকখানা পরোটা ও কিছু ফল সঙ্গে নেওয়া হলো; ফিরে এসে ... খাওয়া হবে।

সরকারী পাকা রাস্তায় প্রায় দুই মাইল গিয়ে জংলী রাস্তা ধরতে হলো। রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল; তবে খুব বেশী নয়। আকাশ বেশ পরিষ্কার; শীতও বেশী নাই। কথাবার্ত্তায় বেশ যাওয়া যাচ্ছে। চারি দিকের দৃশ্যও বেশ সুন্দর। বনের মাঝে কোন কোন গাছে ফুল ফুটে আছে; ছোট ছোট চেনা ফলও দু'-চারটা পাওয়া গেল, খাওয়াও গেল। ফাল্গুন মাস; অনেক গাছের পাতা ঝরতে আরম্ভ হয়েছে। মাঝে মাঝে পলাশ গাছ ফুলে ভরে গেছে—"ফাল্গুনে আগুন লেগেছে বনে বনে—মনে মনে।" ফাল্গুন হাওয়া দূর থেকে কত রকম ফুলের সুবাস এনে মনকে মাতিয়ে তুলছে। মাঝে মাঝে দূরে দু'-একটা গ্রামও দেখা যায়; লোকজন বড় বেশী দেখা যায় না। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হতে হলো; এও সেই দেবনদ—সামান্য জল আছে। জুতা পায় দিয়েই পার হওয়া গেল—পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে। নদী পার হয়ে সকলে যাচ্ছি বেশ আনন্দেই। খানিকটা এগিয়েই দেখা গেল, রাস্তা থেকে একটু দূরেই জঙ্গলের মাঝে একটি ঘোটক-শিশু মরে পড়ে আছে; তার খানিকটা কিসে খেয়ে গেছে। সকলেরই গা একটু ছম্-ছম্ করে উঠলো। বেশ বোঝা গেল, এ ব্যাঘ্রাচার্য্যের কার্য; রাত্রে তিনি আবার আসবেন তাঁর ভোজন শেষ করতে। আমাদের অভিযানের উৎসাহ কিছু কমে গেল; কেউ কেউ ফিরতেও চাইলেন; কিন্তু কাজে আর তা হলো না—আমরা অগ্রসরই হতে লাগলাম। (রাগ করো না ইলা, তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছ। আর ভয় কি, ফিরে তো এসেছি।)

তখন দূরের পাহাড় একটু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার আমাদের দেবনদ পার হতে হলো। কিছু দূর গিয়ে একটি গ্রামে উপস্থিত হলেম। গ্রামের নাম বোদা। আমরা গ্রামের জমিদার-বাড়ী গেলাম। জমিদারকে সেখানে 'বরাইক' বলে। বরাইক সাহেব আমাদিগকে বেশ আদর-অভ্যর্থনা করলেন। এই গ্রামের পরে আবার নদী পার হয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করতে হবে। আমরা চাদোয়া থেকে যতটা গেলাম সেই প্রায় চার-পাঁচ মাইল হবে। কাজেই আমরা মনে করলাম, আমাদের আর দু'মাইলের বেশী যেতে হবে না। শচীন বাবু আর অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। কিন্তু এতো দূর এসে না দেখে ফিরে যাওয়া আমার ইচ্ছা নয়। কাজেই স্থির হলো, শচীন বাবু ও এক জন পণ্ডিত বরাইক সাহেবের ওখানে থাকবেন; আমরা তিন'জন পাহাড়ে যাবো। সাব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু ও পণ্ডিতজী যদিও পূর্বে পাহাড়ের ওপর গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের কথার ভাবে বুঝলাম, তাঁরা ঠিক পথ চিনে যেতে পারবেন না। আমি বরাইক সাহেবকে বললাম, আমাদের সঙ্গে একটি লোক দিতে—যে রাস্তা বেশ ভাল জানে। বরাইক সাহেব একটি লোক দিলেন; সে তার হাতিয়ার নিয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে চললো। শচীন বাবু বলে দিলেন, আমরা যেন ৪টার পূর্ব্বেই বরাইক সাহেবের ওখানে ফিরে আসি। আমরা প্রায় ২টার সময় রওনা হলেম। একটি পেঁপে ও গোটা দুই পেয়ারা সঙ্গে নিয়ে গেলাম—৪টার সময় এসেই তো বরাইক সাহেবের ওখানে জল-খাবার খাওয়া যাবে। শচীন বাবু রইলেন; আমরা চার জন রওনা হলেম—সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু, পণ্ডিতজী, আমি ও গাইড।

একটু দূর গিয়ে আবার সেই নদী (দেবনদ) পার হয়ে আমরা

পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। বেশ আনন্দই বোধ হতে লাগলো। পাহাড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা চলেছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাছ-ভর্তি ফুল ফুটে আছে; কখন কখন পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে; মৃদু-মন্দ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে—চলেছি আমরা বেশ আনন্দেই। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার নাম কি? সে বললো, তার নাম "বাঁশলোচন" অর্থাৎ বংশলোচন। আমরা চুপ করে একটু হেসে নিলাম। কিছু দূরে পাহাড়ের ওপর একটি গ্রাম দেখা গেল—কয়েকখানি কুটীর। আমরা সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম; একটু এগিয়েই একটা শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে লাগল; তখন বোঝা গেল একটা পাহাড়ী ঝরণা বয়ে যাচ্ছে ঝুম্-ঝুম্ শব্দে। বাঁশলোচনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো, "ঐ তো 'সোণা সাকী' বাবু, ঐখানে আমরা যাবো। আমরা আনন্দিত হলাম—এসে পড়েছি আর কি! একটু তাড়াতাড়ি চলেই আমরা গ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে আমরা একটু বসলাম। শব্দ বেশ জোরেই হচ্ছে শোনা গেল। বাঁশলোচন আমাদিগকে একটা জায়গায় নিয়ে গেল যেখান থেকে ঝরণাটা বেশ দেখা যেতে লাগলো—পাথরের ওপর থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে; সূর্য্য-কিরণ তাকে সোণার রঙে রঙিয়ে দিয়েছে। বেশ সুন্দর দৃশ্য হয়েছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝলাম, কেন একে "সোণা সাকী" বলে—"সাকী মানে যে সুরা পরিবেশন করে: আমাদের এ সাকী তরল সোণা পরিবেশন করে দর্শককে মাতিয়ে তোলেন; তাই তো এর নাম "সোণা সাকী।"

বাঁশলোচন আমাদের এই পর্য্যন্ত দেখিয়েই শেষ করতে চান। অনেকেই সোণা সাকীকেই দামোদরের উৎস মনে করে এখান থেকেই ফিরে যান। আমি বাঁশলোচনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই কি দামোদরের উৎপত্তি স্থান?" সে তখন গ্যাঁ-গুঁ করে বললো, "বাবু সাহেব, আপনি কি দেবনদ যেতে চান?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই, তা না হ'লে এতো দূর এলাম কি বাঁশলোচন দেখতে?" তখন সে লোক ডাকাডাকি করতে লাগলো। কারও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বাঁশলোচন জঙ্গলের মধ্যে একটি রাস্তা ধরে' চললো; আমরাও চললাম। একটু দূরেই একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই কি দেবনদ যাবার রাস্তা?" কেন না, বাঁশলোচনের ওপর আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। সে স্ত্রীলোকটি বললো, "আপনারা কি দেবনদ যেতে চান, বাবু সাহেব? সে তো অনেকটা দূর হবে। আপনারা তো সোণা সাকীর রাস্তায় চলেছেন।" সে আদিবাসী স্ত্রীলোক হলেও মায়ের জাতি তো—তার চোখে করুণা মাখানো। সে অনেক করে বললো যে, আমার যেতে কষ্ট হবে। যা হোক, সে যখন বুঝলো আমরা যাবোই, তখন সে একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বাঁশলোচনকে সব ভালো করে বুঝিয়ে দিল এবং নিজেও একটু সঙ্গে এসে বাবু সাহেবকে সাবধানে নিয়ে যেতে বলে দিল। তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা চললাম। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো আমাদের দিকে তাকিয়ে, যেন সে কত আত্মীয়—স্ত্রীলোক না হলে কি পুরুষের দুঃখ-দরদ বোঝে! আদিবাসী অসভ্য হ'লে কি হয়, তার ভিতরেও সেই একই মায়ের প্রাণ। একটু গিয়েই আমরা জঙ্গলের আড়ালে পড়ে গেলাম, আর তাকে দেখতে পেলাম না। ক্রমশই আমরা উঁচু পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, জঙ্গলও গভীর হতে লাগলো। উঠতে বেশ কষ্ট হতে লাগলো, কিন্তু কষ্ট আর কষ্ট বলে মনে করা গেল না চারি দিকের শোভা দেখে। চলেছি তো চলেইছি—রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নাই, রাস্তায় দু'-একটা জংলী জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখা যায়—একটু ভয়ও হয় বৈ কি। যা হোক, একটু পরেই আমরা গিয়ে দেওনদে উপস্থিত হলেম প্রায় ৪টার সময়।

এ জায়গাটি রাঁচি ও প্যালামৌ জিলার সীমান্ত প্রদেশে—সীমান্ত রেখার একটু পরেই রাঁচি জিলার মধ্যেই দামোদর নদের উৎপত্তি স্থান। একটি উঁচু পাহাড় প্রায় গোলাকার হয়ে সব দিক্ থেকে ঢালু হয়ে এসেছে। নিচে এক দিকে একটু ফাঁক। ঢালুর উপরে ও চারি দিকেই জঙ্গল। শাল গাছই বেশী, অন্য গাছও আছে—দু'-চারটা আম গাছও আছে। মাঝে মাঝে কোন কোন গাছে ফুল ভর্তি হয়ে আছে—মৃদু সুগন্ধ চারি দিক্ আমোদিত করেছে। ঢালুর মাঝখানে একটু নিচে, একটু উঁচু জায়গায় একটি বড় গাছ। বাঁশলোচন বললো, এটি বরুণ গাছ। গাছের নিচে অনেক শিকড় বেরিয়ে আছে—অশথ গাছের মতো। এই সব শিকড়ের নিচে খানিকটা জায়গায় কিছু জল জমে আছে—আধ হাঁটু খানেক জল হবে। সেই জল থেকে ধারা বয়ে যাচ্ছে ঝির-ঝির করে ঢালুর নিচের ফাঁক দিয়ে। জমা জল যখন অনেকটা শুকিয়ে যায়, তখন ঐ বরুণ গাছের নিচে থেকে ভক ভক করে জল বের হয়। যে জলটা জমা হয়ে আছে সে জলটা ময়লা, এবং তার চারি ধারে কাদা। সন্ধ্যার পর জংলী জানোয়ারেরা এখানে এসে জল খায়—অনেক জানোয়ারের পায়ের ছাপ এখানে দেখা গেল—বাঘ, সম্বর, হরিণ প্রভৃতির পায়ের দাগ।

দেবনদ বেরিয়েছেন বরুণ গাছের নিচে থেকে—বরুণ জলদেবতা। এই দেবনদই দামোদর নদ। দেবনদকে—দামোদরকে নমস্কার করে তার একটু জল মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া গেলো—দামোদর (বিষ্ণু—কৃষ্ণ) আমাদিগকে পবিত্র করুন; তাঁরই করুণায় আমরা দেবনদের দর্শন পেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বসে' বিশ্রাম নিয়ে পেঁপে ও পেয়ারার সদ্ব্যবহার করা হলো। জায়গাটি বেশ মনোরম। কিন্তু আর বেশীক্ষণ বসে' থাকা উচিত নয়—বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসে; বন্য জন্তুর ভয় আছে। দেবনদকে নমস্কার করে' আমরা রওনা হলেম; তারই ধারার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর নামলাম; দু'-এক জায়গায় তাকে পারও হ'তে হলো। পার হওয়া মোটেই শক্ত নয়—ধারা এক বা দেড় হাতের বেশী চওড়া নয়। এই ধারা থেকে আবার কয়েকটি ধারা বেরিয়ে গেছে; তার মধ্যে 'সোণা সাকী' একটি ধারা। এ সব ধারাই পাহাড়ের নিচে এসে আবার দেবনদেই মিলিত হয়েছে। এই তো দামোদর; এখানে তিনি শীর্ণোদর। এখানে দামোদরকে দেখলে বাঙলা দেশে তার দুর্দান্ত ধ্বংসলীলার কথা যেন ভাবাই যায় না।

আর বেশীক্ষণ আমরা দেবনদের সঙ্গে আসতে পারলাম না। বাঁশলোচন আমাদিগকে অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে চললো; বললো, পাহাড় থেকে নামতে ঐ রাস্তা সোজা হবে। পাহাড় ও জঙ্গলের মনোরম শোভা দেখতে দেখতে কিছু দূর আমরা বেশ আনন্দেই এলাম। কিন্তু তার পরই সুরু হলো পাহাড় থেকে সোজা নামা। এইরূপে নামাই কষ্টকর—পিছন দিক্ থেকে কেউ যেন ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে। পা পিছলে কিংবা হুমড়ি খেয়ে যদি পড়া যায় তাহ'লে

কোথায় যে চলে যাবো তার ঠিক নাই—দেবনদেই দেহরক্ষা করতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকবারও উপায় নাই। লাঠিটা আমাকে খুবই সাহায্য করলো। লাঠিটা সামনে ধরে' পিছন দিকে নিজেকে ঠেলে রাখতে রাখতে নামছি; কষ্ট বেশ হচ্ছে। এ কোন্ রাস্তায় আনলে বাবা বংশলোচন! আর কোথায় বংশলোচন! সে অনেকটা নিচে নেমে গেছে। যা হোক, এই রকম করে কোনরূপে, পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছানো গেল যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূরে দূরে দু'-একটা গ্রাম অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে বোদা বরাইক সাহেবের বাড়ী প্রায় দুই মাইল। অন্ধকার রাত্রি, সঙ্গে টর্চও নাই—সামনে বংশলোচন আছেন, তিনি যা করেন। কিছু দূর এসে লোকের হৈ-হৈ শোনা গেল। বংশলোচন বললো, হুঁড়ার (নেকড়ে বাঘ) বেরিয়েছে, তবে কোন ভয় নাই, বাবু সাহেব, ঐ দিক্ দিয়েই চলে গেছে। যা হোক্, আমরা যখন বরাইক সাহেবের বাড়ী পৌঁছালাম তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা। শচীন বাবু ৪টার পরেই পণ্ডিতজীকে নিয়ে চাদোয়া রওনা হয়ে গেছেন; রান্না-খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো। বরাইক সাহেব আমাদিগকে খুব আদর-যত্ন করলেন। আমরা বেশীক্ষণ বসে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। পায়ের যা অবস্থা—বেশীক্ষণ বসলে আর পা দিয়ে চলা যাবে না; চাদোয়ায় পৌঁছাতে রাতও বেশী হয়ে যাবে। বরাইক সাহেব ছাড়লেন না—পুরি, হালুয়া, লাড্ডু ও চা খাওয়ালেন ও তার পর আমাদের সঙ্গে আলো ও লোকজন দিয়ে আমাদিগকে জঙ্গলের রাস্তা পার করে দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা রওনা হলেম। যাবার সময় আমরা যেখানে মৃত ঘোটক-শিশুকে দেখেছিলাম, বরাইক সাহেবের লোকজন সে জায়গা ছাড়িয়ে আমাদিগকে আরও কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে গেল। বাঁশলোচনকে কিছু বক্‌শিশ দিয়ে আমরা তিন জন চাদোয়ার ডাক-বাংলার দিকে আসতে লাগলাম। রাস্তায় আর কোন বিপদ-আপদ হয় নাই। ডাক-বাংলায় এসে পৌঁছালাম যখন তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সকলেই আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন; ডাক্তার বাবুও উপস্থিত ছিলেন; শচীন বাবু খাবার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার বাবু বেশ লোক—তিনি আমাদিগকে এক দিন নেমন্তন্ন খাইয়েছিলেন এর আগে। যা হোক, আমাদের আর ঔষধ বা ডাক্তারের দরকার হয় নাই—যদিও আমরা হেঁটেছি প্রায় ১৫।১৬ মাইল। সকলেই অবাক্ হয়ে গেলেন আমাদের কাছে সব শুনে।

আমরা নিরাপদে ফিরে এলাম; দুর্ভাগা ঘোটক-শিশুর কথাই মনে হতে লাগলো। বিশ্রাম ও আহারাদি করে শুয়ে পড়লাম। গা-হাত-পা টিপে দেবার জন্য শচীন বাবু লোক ঠিক করে রেখেছিলেন। সকালে উঠে দেখি পায়ের অবস্থা কাহিল—জুতো আর পায়ে দেওয়া যায় না; পায়ের চেয়ে যেন জুতা ছোট হয়ে গেছে। যা হোক, সকালে কিছু খাবার খেয়ে বাসে রওনা হওয়া গেল। রাঁচি এসে পৌঁছালাম। দুপুরে রাঁচি এসে এক জোড়া ক্যান্‌ভাসের জুতা কিনে পায় দিতে হচ্ছে। আছি ভালোই। তোমাদের কুশল সংবাদ জানিও। আজ আসি ইলা। তোমরা সকলে আমার ভাল-বাসা ও আশীর্ব্বাদ জেনো।

শুঃ আঃ
তোমার "দাদুজী"
গণেশচন্দ্র ঘোষ

দুটি কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রেমিক

শান্ত কাক-চক্ষু নীলেই কোটি তারা-জন্ম চলে—
যে আকাশে শুধু মেঘ শুধুই আবেগ,
সে আকাশ ছেলেখেলায় নিজেই নিজেকে ছলে।
তাই আমি এত চুপ নির্বিকার:
যে বোঝে সে ভুল বোঝে—এ কি শুধুই আঁধার?
যদি ভাষা নাই থাকে এ চোখে
যদি মুখ কিছু না বলে—
তবু হৃদয় চেনে পথ কোথায় আগুন জ্বলে।

মৌমাছি

শুধু মধু শুধু মৌচাক
আমরাও ঝাঁকে ঝাঁক
মৌমাছি।
তাই এত ফুল এ কানন
প্রতি প্রান্তে স্মিতহাস পূর্ণ-আনন,
তাই তুমি আছ আমি আছি।

তবু হুল আছে—
আমাদেরো প্রেমে তাই মাঝে মাঝে ভুল আছে।
হয়তো তা ভুল নয়—
হয়তো তা আরো প্রেম, আমাদেরি বিস্ময়—
মাঝে মাঝে হয়তো এ ছুরির বড়াই
প্রেমেরি লড়াই—
মাঝে মাঝে হাসি-খুসি আকাশের নীল
হয়তো হঠাৎ তাই মেঘের মিছিল।

বোঝার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

৩
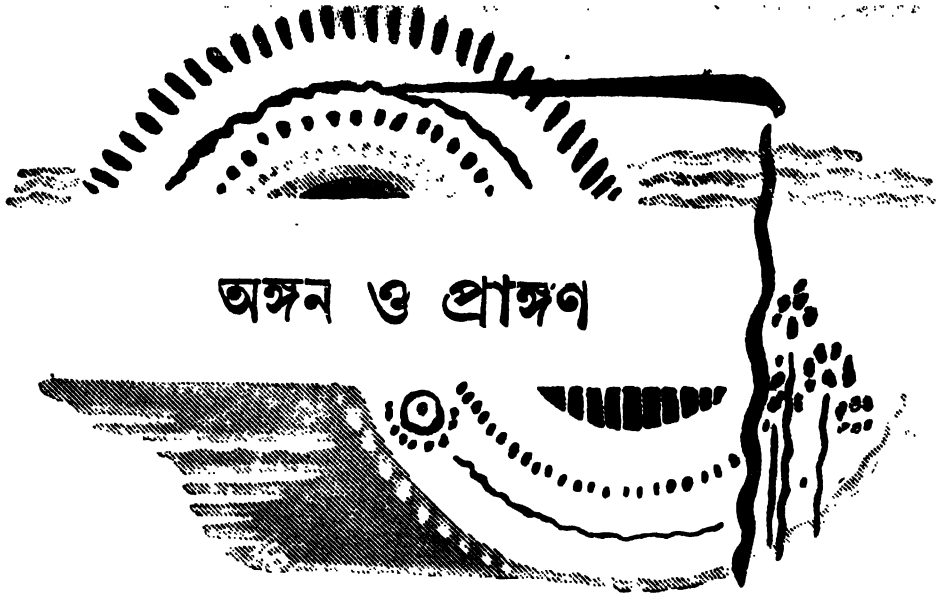
বাবার বন্ধু চন্দ্রকান্ত বাবুর বাড়ীতে আজ সকালে গিয়েছিলাম, কি চমৎকার লোক! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিগ্‌গেস করলেন। বাবা মারা যাবার পর আমাদের সংসার কি করে চলছে, মা খুব অধৈর্য্য হয়েছিলেন কি না, আমি এখন কি করছি; তার পরে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের একান্ত দুঃসময়ে আপনার লোকেরাও বলেননি। উনি চুপি চুপি বললেন, দেখ বাবা অসিত, তোমার যখনি যা দরকার হবে আমার কাছে চাইতে কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না, আমি তোমার কাকা।

আমি ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলাম।

তার পরে তাঁর মেয়ে সুমিতাকে দেখলাম। সে ঘরে ঢুকল—নব মুঞ্জরিত বনানীর শেষ প্রান্তে দিগন্তের নীলে সদ্য-ওঠা পূর্ণিমার চাঁদের মতন মোহময়ী কিরণ বিকিরণ করে। তার দেহে যৌবনের জোয়ার স্রোত সুরু হয়েছে, কিন্তু তা'তে পাহাড়ে নদীর উদ্দামতা নেই—আছে স্বচ্ছসলিলা সমতল দেশের নদীর মত কলনাদিনী পরিপূর্ণতা। সে আমাকে মুগ্ধ করলে রূপের জৌলুষ দিয়ে নয়, রূপের সৌম্যতা দিয়ে। নারী যে সব দিক্ দিয়ে এত সুন্দরী হয়, এ আমার ধারণায় ছিল না। সুমিতা আমায় দেখে ঘরে ঢুকতে লজ্জা করছিলেন—কাকা আমার পরিচয় দিলেন—আমি অসিত, আমায় লজ্জা করবার দরকার নেই।

সুমিতা শান্ত চরণে ঘরে ঢুকে কমল পাণি জোড় করে আমায় নমস্কার করে কাকার ইজি-চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার পরেই এলো অনিতা—যেন চঞ্চলতার জীবন্ত মূর্ত্তি! এক মিনিট স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সুমিতার কাণে কাণে অনিতা এমন কোনো কথা বললে যাতে তার সুন্দর মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। আরো খানিকক্ষণ কথা বলার পর আমরা তিন জনে বাজার করতে গেলাম।

আমার ইচ্ছে করছিল সুমিতাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু এক দিনের পরিচয়ে সে কথা বলতে সাহস হ'ল না, কি জানি, যদি কথা না রাখেন। একেই তো কথা বলেন অত্যন্ত কম—ওঁর সব যেন মেপে মেপে কথা, হাসি, চলা-ফেরা পর্য্যন্ত। আর অনিতা ঠিক তার উল্টো—হাসে অফুরন্ত, কথা বলে অজস্র, চলে তাড়াতাড়ি।

* * * *

সন্ধ্যা বেলায় অনিতার নিমন্ত্রণে ওদের বাড়ীতে গেলাম। সুমিতা এসেছেন দেখলাম।

নমস্কার করলাম, কিন্তু উনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন! দেখতে পেলেন, না, আমি গরীব বলে আমায় তাচ্ছিল্য করলেন বোধ হয়? আমি লজ্জিত হয়ে সরে এলাম।

অনিতা আমায় নিয়ে যে কি করবে ভেবেই পায় না—শেষে দুষ্টু মেয়ে আমায় বললে, আমার জন্মদিনে আপনার সঙ্গে দাদা পাতালাম। আমার দাদা নেই বলে বড় দুঃখ আমার—আজ থেকে আপনি আমার দাদা হলেন তো?

হেসে বললাম, বেশ তো।

শুধু বেশ তো নয়, রোজ বোনের কাছে আসতে হবে, বুঝলেন দাদা?

বললাম, তাহলে আমারও একটা অনুরোধ আছে—আমায় 'তুমি' বলতে হবে, ভাই-বোনে আপনি বলে কথা বলে না, এটা জানো তো?

অনিতা হেসে বললে, আচ্ছা তাই হবে। খানিক পরে দেখলাম, সুমিতা চলে গেলেন—অনুর সঙ্গে বোধ হয় একটু রাগারাগি হয়ে গেল। কারণ দু'জনের মুখই রাঙা হয়ে উঠেছিল। অনিতা এসে আমার পাশে বসে পড়ল। শুধোলাম, সুমিতা দেবী চলে গেলেন?

হ্যাঁ, কে জানে আজ ওর কি হয়েছে। নাহ'লে আমার জন্মদিনে পোড়ামুখী না খেয়ে রাগ করে চলে গেল! মনটা এত খারাপ হয়ে গেল!

অনু চুপ করে বসে রইল।

৪

ছি ছি, অনি কি মনে করছে না জানি। কোথাকার কে দু'দিনের চেনা অসিত বাবু, ওঁকে নিয়ে কি না আমাদের দু'বন্ধুর কথান্তর হয়ে গেল। বিকেলে ছুটির পরে বাড়ী না গিয়ে অনিদের বাড়ীতে গেলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই অনির হাসি শুনতে

গেলাম। ওর হাসির আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একটা টেবিলের সামনে অনি ও অসিত বাবু ব'সে—অসিত বাবুর হাতের ওপরে অনির একটা হাত রাখা।

আমায় দেখে দু'জনের হাসি বন্ধ হয়ে গেল—দু'জনেই কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। অনি হাসিমুখে উঠে এসে আমায় দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠল, আজ আমার কি ভাগ্যি রে, এ যে দেখি মেঘ না চাইতেই জল! আয় ভাই, বোস্।

কি জানি কেন অসিত বাবুকে দেখে আমার মনটা আবার কঠিন হয়ে উঠল। গম্ভীর মুখে বললাম, না, আমি এখনি যাব, তুমি কলেজ যাওনি কেন?

অনিতা হাসিমুখে অসিত বাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে, ও আজ নিজেও যায়নি—আমাকেও যেতে দিলে না। সত্যি তুই বসবি ন ভাই—বাব্বা, আমার ওপরে রাগ ক'রে তুই থাকতেও পারিস্—আমি কিন্তু পারি নে।

এবারে অসিত বাবু উঠে এসে বললেন, সুমিতা দেবী, দয়া করে একটু বসে যান—না হলে অনি বড় দুঃখ পাবে মনে। অনি দুঃখ পাবে তাই, না হলে বসতে বলতেন না! ওঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অনির কাছে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

৫

সকাল বেলায় বাবা ইজি-চেয়ারে শুয়েছিলেন, আমি তাঁকে সে দিনের কাগজ পড়িয়ে শোনাচ্ছিলাম। বাবা বললেন, সুমু মা, কাগজ থাক্, আমার মাথায় বরং একটু হাত বুলিয়ে দে দিকিন। চেয়ারটা বাবার মাথার কাছে সরিয়ে এনে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাবা জিগেস করলেন, তোর কলেজ কবে বন্ধ হবে রে সুমু মা? আমি বললাম, আর দিন তিনেকের মধ্যে। কেন বাবা?

এবারে ছুটিতে কোথায় যাবি কিছু ঠিক করলি?

আমি বললাম, ও বাবা, আমার কথা যদি শোনো, আমি তাহলে ঠিক পুরী যেতে তোমায় বলবো।

বাবা হেসে বললেন, এই গরমে দার্জিলিং সিমলে ছেড়ে তুই পুরী যেতে চাস্ মা?

মা ভিতরকার দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখে ঘরে ঢুকে বললেন, কি গো, বাপ-বেটির গল্প আজ আর শেষ হবে না বুঝি? সুমি, তোর আজ কলেজ নেই বুঝি?

আমি বললাম, বা রে, রবিবারেও বুঝি কলেজ যেতে হবে মা?

মা বললেন, ও মা, তাও তো সত্যি। হাঁ রে সুমি, এবারে অনু আসেনি কেন রে? ও না এলে বাপু আমার মনেই হয় না যে সেটা ছুটির বার। আমি চুপ করে রইলাম।

বাবাও বললেন, সত্যি, অনুমা' আসেনি কেন সুমু? আমি বিমর্ষ মুখে বললাম, কী জানি বাবা, কেন ও আসেনি।

মা বললেন, থাক্ ও কথা, হাঁ গা নন্দার চিঠি এসেছে না কি—আসবার কথা কিছু লিখেছে?

বাবা বললেন, কাল নন্দার দেওরের সঙ্গে পথে দেখা—বললে, কি জন্যে যেন এসেছে। নন্দা না এখানে আসবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছে। তা আমি বললাম, সুবিমল গিয়ে নিয়ে আসবে'খন।

সুনন্দা ও সুবিমল আমার দাদা ও দিদির নাম।

মা বললেন, হাঁগা তোমার কী একটু আক্কেল নেই?

বাবা সচাপে বললেন, আক্কেলের অভাবটাই বা কী দেখলে তুমি?

মা রাগ করে বললেন, কুটুমের ছেলের সঙ্গে দেখা হলো—তাকে এক দিনও তুমি খেতে বললে না? বাবা বললেন, না, তা কি আর বলেছি? সে-ই কাটিয়ে দিলে।

মা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, না কাটিয়ে আর কি করবে বলো, বাব্বাঃ, তোমার যে মেয়ে তৈরী করেছো—অনিলকে আর বারে কি অপমানটাই না করলে! কি মন্দ ছেলে, বি-এ পাশ করেছে—বাপের টাকাও রয়েছে—দু'বোনে এক জায়গায় থাকতিস্—তা নয়—

মা'র শেষ কথাটা না শুনেই আমি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

•   •   •   •

খাটে শুয়ে একখানা বই পড়ছিলাম—দিদি এসে আমার কাছে বসে বললে, কি বই পড়ছিস্ সুমু? আমি বইটা মুড়ে বললাম, "ঘরে বাইরে"—সন্দীপ কি ভীষণ লোক! দিদি, তুমি এ বইটা পড়েছো?

দিদি ভারী শান্ত মেয়ে—বয়স বছর কুড়ি। দিদি হেসে বললেন, পুরুষের আসল রূপই তো ওই সুমিতা! তবে যদি নিখিলেশের কথা বলিস, ওটা হলো কবির কল্পনা—ও সব গল্প-উপন্যাসেই পাওয়া যায়। বাস্তব জগতে মেলে না।

আমি বললাম, কিন্তু নিখিলেশের মতো স্বামী প্রত্যেক মেয়েই কী কামনা করে না দিদি?

দিদি বললে, হয় তো করে, কিন্তু ক'জনে পায় সুমু?

বাইরে অনির গলা শোনা গেল,—ও জেঠীমা, তোমার মেয়েরা কোথায় গো? মা বললেন, যা না, ওপরে রয়েছে। অনিতা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই বললে, কলেজ যাসনি কেন সুমি? আজ তো ছুটি হয়ে গেল।

বললাম, যাইনি শরীর ভালো ছিলো না ব'লে।

দিদি জিগেস্ করলে, তুই আজকাল আর আসিস্ নে কেন রে অনু?

আমি বললাম, আজকাল ও যে প্রেমে পড়েছে দিদি, তা বুঝি জানো না। কাল মানসী বললে—অনুকে প্রায়ই দেখি কালো ফ্রেমের চশমা পরা একটি ফর্সা মতো ছেলের সঙ্গে। তুমি চেনো না কি সুমিতা? আমি বললাম, না।

অনিতা হেসে বললে, না গো সুনিদি, তোমার বোন নিজেই পরেছে প্রেমের চশমা, তাই সকলকেই ও প্রেমিকা হ'তে দেখছে! এখন একটু গা তোল না গো রাজার ঝিয়ারী, অসিতদাকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

দিদি বললে, অসিত আবার কে? আমার মাসতুতো দেওরের কাছে একটি ছেলে আসতো তার নামও অসিত। ভারী ভিজুক্ ছেলেটি। চল্ তো দেখে আসি।

আমি বইখানা খুলে আবার পড়তে সুরু করলাম। অনিতা ক্ষুণ্ণিত স্বরে বললে, দেখলে সুনিদি, ও আবার বই মুখে বোসলো, ওঠ না সুমি— নীচে থেকে মা ডাকলেন, নন্দা, সুমি, নীচে এসো, উনি ডাকছেন। অনিতা বললে, কি রে, উঠতে হলো তো?

কথার জবাব না দিয়ে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কেশ-প্রসাধনের কিছু সুব্যবস্থা করে নিলাম।

বা রে মেয়ে! আমার কথার জবাব দিলি না যে—ব'লে অনিতা আমার খোঁপাটা নেড়ে দিলে।

তোর আবোল-তাবোল কথার জবাব দিতে গেলে আমায় অভিধান খুঁজতে হ'বে,—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বসবার ঘরে ঢুকতে বাবার কথাগুলো কাণে এলো, জানলে অসিত, কাল ভোরে উঠেই এখানে চলে আসবে। চা খেয়ে এই এগারোটা আন্দাজ বেরবো আর কি। হ্যাঁ, চান্‌-টান্‌ তুমি বাড়ী থেকেই সেরে এসো।

অনিতা ঘরে ঢুকে বললে, কোথায় যাওয়া হবে জেঠামশাই? আমি কিন্তু যাবো।

নিশ্চয়ই যাবি। তুই না গেলে আমাদের আমোদই হবে না, আমরা যে পরশু পুরী যাচ্ছি অনু।

আমি ঘরে ঢুকে অসিত বাবুকে নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন? উনি একটু হেসে বললেন, আজ্ঞে, ভালো আছি। আপনারা তা হ'লে পুরী যাচ্ছেন? বললাম, হ্যাঁ, এতো বেশী সমুদ্রের বর্ণনা রবি বাবুর কাব্যে পড়েছি, তাই মনে হয়, ওর সঙ্গে বুঝি আমার মিতালি আছে। "চয়নিকা"র পড়েছি সমুদ্রের বর্ণনা, আমার এখনো বেশ মনে আছে। মাঝের গোটা কয় লাইন আমার মনে গাঁথা রয়েছে—

"তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি' নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহ-খানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহ-খেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা।"

আমার ভারী ভালো লাগে সমুদ্রের রুদ্রমূর্ত্তি কল্পনা করতে! আচ্ছা অসিত বাবু, আপনি পুরীতে গেছেন?

অসিত বাবু হেসে বললেন, সে আর এই অধম জন নীরস কবিত্ব-হীন ভাষায় কী করে বলবে বলুন?

দিদি হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললে, নাম শুনেই চিনেছি, কেমন আছো ঠাকুরপো?

অসিত বাবু তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করে বললেন—বউদি, তুমি এখানে? এটা কী তোমার—

দিদি হেসে বললে, হ্যাঁ, বাপের বাড়ী, বসো ঠাকুরপো।

অনির দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, পোড়ারমুখীর দুষ্টু চোখ দু'টি হাসিতে ভ'রে উঠেছে। বাবা বললেন, মা সুমু, একটু চা দিতে বল্‌। আমি বাইরে এসে মাধব সিংকে চা দিতে বলে ঘরে ঢুকলাম। দিদি অনিকে বললে, অনু, একটা গান কর না রে! অনি বললে, আমায় কেন বলছো দিদি, তোমার বোন তারের যন্ত্র বাজিয়ে ফার্ষ্ট প্রাইজ নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী আসে—আর আমি কী করি জানো, বেসুরো গলায় নাকি সুরে কোনো রকমে একটা গান গেয়ে লোকের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তুলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরি—বলে অনিতা মুখের ভঙ্গী করুণ করলে। ওর মুখের ভঙ্গি দেখে সকলে খুব হেসে উঠলেন। দিদি বললে, তাই না কি রে সুমু? এস্রাজ বাজিয়ে একটা গান কর না ভাই। চাকরটা চা ও মা'র হাতে গড়া টুকি সন্দেশ দিয়ে গেল।

অসিত বাবু অনুরোধের সুরে বললেন, গান না সুমিতা দেবী! বাবাও অসিত বাবুর কথা সমর্থন করলেন। অগত্যা আমি এস্রাজটা বাজিয়ে একটি হিন্দী ভজন গাইলাম্‌। শেষ হ'লে সকলে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বাবা চোখ বুঁজে বললেন, সুমিতা, এস্রাজটা থামিও না—একটি ভৈরবী বাজাও। খানিকক্ষণ বাজিয়ে এস্রাজটা নামিয়ে রাখলাম। অসিত বাবু বললেন, খুব সুমধুর—আজ যা শোনালেন এ জীবনে তা আর ভুলবো না সুমিতা দেবী! সে কথা সকলেই জানে বলে অনি হেসে উঠলো।

হঠাৎ দিদি বললে, আচ্ছা বাবা, সুমির তো বিয়ে দিতে হবে, তা অসিত ঠাকুরপোর সঙ্গে দিলে কেমন হয়? দু'জনে পাশাপাশি বসেছে কী সুন্দর মানিয়েছে দেখ।

দিদির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় রাঙা মুখখানাকে নীচু করে আমি ঘর থেকে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এলাম। মা গো! দিদি যেন কী? এতো অসভ্য যে মুখের একটু আক্‌-ঢাক নে!

[ক্রমশঃ।

প্রশ্ন

শ্রীইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

সে তোমারি আহ্বান
শুনি যার ধ্বনি এসেছিনু হেথা
শোনাতে আমার গান।
কত না দীর্ঘ দিবস-যামিনী,
মুখর করেছে আমার রাগিণী,
আকুলিত করি তোমার সন্ধ্যা
গেয়েছে আমার বীণা;
ফুরায়েছে আজ যত প্রয়োজন,
তাই কি করেছ শেষ আয়োজন,
তাই কি আমার বাণী গীতহারা
হৃদয় ছন্দহীন?

শেষ বিদায়ের পরম লগনে
কি দিব তোমারে আনি?
যাহা কিছু ছিল এনেছিনু সাথে
সব দিয়ে আজ ফিরি শূন্য হাতে,
তোমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া
রিক্ত আজিকে আমি।
শুধু, একটুকু কথা শুধাই তোমারে
ওগো কবি!
আমার মাঝারে পেয়েছ কি তব
মরম-প্রিয়ার ছবি?
তব জীবনের গান,
আমার বীণায় নবরূপ ধরি'
পেয়েছে

প্রতিশোধ

শ্রীশতদল বিশ্বাস

৪

পথে নেমে দ্রুত চল্‌তে লাগলুম কল্‌কাতা অভিমুখে। খিদির-পুর এলাকার মধ্যে একবারও চাইনি পিছন ফিরে, কালী-ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছেছি—তখন রাত্রি হয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম নেবার জন্ত খানিকক্ষণ থেমেছি—দেখি, এক পানওয়ালার দোকানের নীচে অপ্রশস্ত স্থানটুকুতে দু'টি বালক বিড়ি প্রস্তুত করছে, মুগ্ধ হয়ে তাদের হাতের ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করতে লাগলুম। আমার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় এক জন একটু হেসে বললে, "হাঁ করে দেখছ কি? ট্যাঁকে কড়ি নেই—বিড়ি খাবার সাধ হয়েছে?"

সে একটি বিড়ি আমার দিকে এগিয়ে দিল, আমি মাথা নেড়ে জানালুম—বিড়ি আমার চাই না। সুরু হল আবার পথ চলা। একটু অগ্রসর হয়েই শুনলুম—কে যেন আমায় ডাক্‌ছে। ফিরে দেখি, সেই ছেলেটি আমায় ডাক্‌ছে। সে এগিয়ে এসে বললে—"খোকা, তুমি যাচ্ছ কোথা?"

জবাব দিলুম, "জানি না।"

সে বললে—"এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ জান না?"

আমি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"তোমাদের দোকানে আমায় রাতটুকু কাটাতে দেবে?"

সেও আমার কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল—"তোমার বাড়ী কোথা? কোথা হতে আস্‌ছ?"

আমি জবাব দিলুম—"আমার বাড়ী নেই, আমার কেউ নেই, যাদের বাড়ীতে ছিলুম, তারা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

সে বললে—"বেশ, আজ আমাদের কাছেই থাক"—আমার হাত ধরে সে সেই ছোট্ট খোপের ভিতর নিয়ে গেল।

আমি তাকে বললুম—"অনেকটা পথ হেঁটেছি, বড় ঘুম পাচ্ছে—আমি এক পাশে একটু শুয়ে পড়ি।"—কি দারুণ ক্লান্তি! ক্ষুধা-তৃষ্ণাও গেলুম ভুলে। শুয়েই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরের দিন খুবই ভোরে ঘুম গেল ভেঙ্গে। রাস্তার কলে মুখ ধুয়ে খানিকটা জল নিলুম খেয়ে, খালি পেট—গা গুলিয়ে উঠল। ছেলে দু'টির কাছে বিড়ি তৈরী করা শিখে নিয়ে সারা দিন বসে বসে বিড়ি তৈরী করলুম তাদের সাথে।···দুপুরে পানওয়ালা আমায় দু'টো পয়সা দিল, আমি মুড়ি কিনে খেয়ে আবার খানিকটা জল নিলুম খেয়ে। আবার সন্ধ্যা অবধি বিড়ি তৈরী করতে লেগে গেলুম।

ছেলে দু'টির কথা-বার্তার ইতরতায় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমি আবার বার হলুম রাস্তায়—রাস্তা যে ডাক্ দিয়েছে "রাস্তার কুত্তাকে"। অনবরত হেঁটে, অনেক পথ ঘুরে শেয়ালদায় পৌঁছুলুম রাত এগারটার পর।

এদিক্-ওদিক্ ঘুরে রাত কাটাবার মত একটা যায়গা খুঁজতে লাগলুম। অবশেষে ষ্টেশনের গেটের বাঁ-পাশের দোকানগুলির পর যে পোড়ো যায়গাটুকু আছে, সেখানে দেখি, একটা ভাঙা বেঞ্চ পাতা আছে দোকানের দেওয়ালের গা ঘেঁষে—আমি শুয়ে পড়লুম তারই উপর—শ্রান্ত দেহে ঘুম আস্‌তে দেরী হল না।

গভীর রাতে কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। চোখ কচ্‌লে দেখি—একটা গুণ্ডা গোছের মুসলমান অনর্গল গাল দিতে দিতে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি উঠে বসতেই সে আমাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"কোন্ নবাবজাদা রে, আমার যায়গা জুড়ে বসেছিস্?"

আমি ঘুম-মাখা স্বরে তাকে বললুম—"আমি জানতুম না এটা তোমার যায়গা। চারি দিক্ ঘুরে রাত কাটাবার মত একটু আস্তানা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে বেঞ্চটা খালি পড়ে আছে দেখে শুয়ে পড়ি।"

আমার কথা শুনে সে আগ্রহভরে আমার সব কথা একটু একটু করে আমার কাছ হতে বার করে নিল। তার পর আমাকে সেখানেই শুতে বলে সে চলে গেল অন্ত কোথাও শুতে। যাবার আগে মাথার দিব্য দিয়ে বলে গেল, কাল সকালে তার সাথে দেখা না করে যেন আমি চলে না যাই। আমাকে কাজও একটা জুটিয়ে দেবে—কথা দিয়ে গেল।

পরদিন সকালে সেই লোকটিই এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আমাকে সে নিয়ে গেল তাদের আড্ডায়। সেখানে দেখি, আমার মত আরও কতগুলি ছেলে আছে। তাদের মধ্যে কতগুলো আবার আমার চেয়েও ছোট।

সেখানে রীতিমত আমার শিক্ষা আরম্ভ হল। সে শিক্ষা সম্বন্ধে গৌরব করে বল্‌বার মত না হ'লেও তারই গুণে যে অল্প পরিশ্রমে দু'পয়সা রোজগার করেছি, তা স্বীকার করতে হবে।

প্রথম প্রথম বড় ভয় পেতুম—হাত কেঁপে যেত দারুণ সঙ্কোচে, এই জন্তই বহু বার ধরাও পড়ে গেছি—আর পুলিশের হাত থেকে শেখ্‌জীকে দু'-চার টাকা ঘুঁষ দিয়ে আমাকে ছাড়াতে হয়েছে। ফলে আমার ভাগ্যে জুটেছে বেদম মার। বহু-বার চেষ্টা করেছি এদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে, কিন্তু তাদের চরদের হাত হতে বেশী দূর যেতে একবারও পারিনি।—পালাবার চেষ্টার শাস্তিও অতি ভয়ানক, অগত্যা সে চেষ্টাও আমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হল।

···প্রথম প্রথম কাজে বিফল হলে প্রহারের ভয়টাই দেখতুম বড় করে,—তার পর ক্রমশঃ যখন বেশ একটু পাকা হয়ে গেলুম, তখন কাজ হাসিল করতে না পারলে—মারের ভয় থেকে না পারার লজ্জাটা হত বড়।

বছর খানেক পরেই কাজে বেশ হাত পাকিয়ে ফেললুম—দলের মধ্যে বেশ একটু নামও করে ফেললুম। ক্রমশঃ কাজের নেশা যেন আমায় পেয়ে বসল, আগের মত কাজ হাসিল করে দুঃখ আর হত না—বরং অহঙ্কারই হত নিজের হাতযশে। তা'ছাড়া, কাজে আনন্দও বেশ পেতুম।

৫

বছর কয়েক কেটে গেল তাদের দলে, তার পর অন্ত যায়গায় চলে গেলুম। ভিন্ন পাড়ায় একটা বস্তির ছোট একটা কুঠ্‌রী ভাড়া করে 'কাজ' চালাতে লাগ্‌লুম স্বাধীন ভাবে।—জুয়ায়, 'রেসের' মাঠেও মাঝে মাঝে দু'-দশ টাকা উপরি আয় হত বই কি। মাঝে মাঝে যখন মনে পড়্‌ত মাকে, করিম চাচাকে—লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হত। তাঁদের স্নেহের কি অপমানই করছি আমি আজ।

শৈশবে যে জীবন তাঁরা রক্ষা করেছিলেন পরম স্নেহে, সেই জীবনের আজ কি পরিণাম। অনুতাপে হৃদয় জ্বলে যেত, কিন্তু যখনই আমার মনে পড়ত আমি পরিত্যক্ত—অবাঞ্ছিত, তখনই নিবে যেত সে অনুতাপের দহন। গফুরের কথা—"পথের কুত্তা" আমাকে পাগল করে' তুলত।···আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কাজে লেগে যেতুম।···প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ নেব।··· গর্ভধারিণীর হৃদয়হীনতার প্রতিশোধ নেব। গফুরের দুর্বাক্যের প্রতিশোধ নেব।

গফুরের উপর প্রতিশোধ নেওয়া সহজ হবে, কারণ, জানি কোথায় গেলে তার দেখা মিলবে কিন্তু?···তারা কি আজও খিদিরপুরের সেই বস্তিতে আছে? যদি অন্যত্র চলে গিয়ে থাকে? যদি গফুরই আর ইহ জগতে না থাকে?···আমার সব জল্পনা কি তবে বিফল হবে?···না না···আমার জীবনকে যে ঠেলে দিয়েছে জাহান্নামের পথে···আমার বিদ্বেষ তাকেও ধাওয়া করে' যাবে। জাহান্নাম অবধি—তার নিস্তার নেই।

আর আমার গর্ভধারিণীর উপর প্রতিশোধ নেব কি করে? কোন ঠিকানাই যে নাই জানা।···আমার মনে কি জানি কেন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছিল—আমি মুসলমান নই—হিন্দুর সন্তান। আর সেই অবধি আমার জাতক্রোধ জন্মে গেছিল হিন্দু জাতির বিরুদ্ধে! আমার গর্ভধারিণীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে হিন্দু রমণী মাত্র! জন্মদাতার অপরাধের দণ্ড ভোগ করবে সমগ্র হিন্দু জাতি।

প্রতিহিংসার বিষে আমার সারা দেহ-প্রাণ জর্জরিত—বিবেক-বিবেচনার টুঁটি টিপে মেরেছে আমার জিঘাংসা-প্রবৃত্তি।···

আমার প্রতিশোধ নেবার উপায় সুগম হয়ে যাওয়ায় পাশবিক এক আনন্দে মন ভরে উঠ্‌ল।···

৬

কিছু দিন পরে এক দিন খিদিরপুর অভিমুখে যাত্রা করলুম গফুরের উপর প্রতিশোধ নেবার অভিলাষে। এক যুগ পরে ফিরে ফিরে এলুম আবার সেই খিদিরপুরে। যে খিদিরপুরে আমার হৃদয়হীন গর্ভধারিণী নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করেছিল।···যে খিদিরপুরে আমার স্নেহময়ী 'মা' আমায় কুড়িয়ে এনে বুকে ধরে মানুষ করেছিলেন তাঁর বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়ে।···যে খিদিরপুরে দুর্বৃত্ত মাতাল গণি মিঞা আমাকে গৃহ হ'তে বিতাড়িত করেছিল।···যে খিদিরপুরেই করিম চাচার মমতা ভরা প্রাণ অনাথ বালকের জন্ত কেঁদে উঠেছিল।···যে খিদিরপুরে চাচীর বাক্যবাণে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছিল।···যে খিদিরপুরে গফুর আমায় "রাস্তার কুত্তা" বলে গাল দিয়েছিল, আর তারই ফলে আমি সত্যই হয়ে উঠেছি "রাস্তার কুত্তার" মত পথচারী। নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব, ঘৃণ্য, মনুষ্য-পরিত্যজ্য!

ধমনীতে রক্ত উদ্বেল গতিতে প্রবাহিত হ'তে লাগল—মাথার ভিতর আবার আগুন জ্বলে উঠল! দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগলুম জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্ত! ···সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পূর্বে চোখের জলে বিদায় নিয়েছিল অনাথ নিষ্পাপ বালক আবদুল খিদিরপুর হ'তে—আর আজ ফিরছে সে খিদিরপুরে শয়তানের অবতাররূপে প্রতিহিংসার তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে!

বহুক্ষণ অন্বেষণ করেও আমাদের সেই পুরাতন বস্তির অস্তিত্বও খুঁজে পেলুম না। দ্বাদশ বৎসরে বহু পরিবর্তন ঘটেছে দেখলুম। হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাসান মিঞার কথা, করিম চাচার সাথে তিনি 'কলে' কাজ করতেন—তাঁর পিতা ছিলেন ও-পাড়ার মস্‌জিদের মোল্লা সাহেব···মস্‌জিদের পাশেই একখানা ছোট পাকা বাড়ীতে তাঁরা থাক্‌তেন।—মস্‌জিদে গিয়ে হাসান মিঞার খোঁজ করায় এক বৃদ্ধ আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—কাকে চান?—

আমি বললুম, হাসান মিঞাকে।

একটু হেসে তিনি বললেন—আমিই হাসান, কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।

আমি অবাক্ হয়ে দেখলুম বার বৎসরে কতই পরিবর্তন হয়! যে হাসান মিঞাকে দেখে গেছি বলিষ্ঠ জোয়ান—আজ বার্দ্ধক্যে তিনি হারিয়েছেন সেই সবল সুঠাম দেহ। এত পরিবর্তন যে আমি তাঁকে চিন্‌তেই পারলুম না। আমি তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম—"হাসান মিঞা, আপনাকে চিনতে পারিনি, বার বছর আগের আপনার চেহারাই মনে আছে, আর সেই চেহারাই দেখব আশা করেছিলুম। সুদীর্ঘ বার বছরের ব্যবধানের কথা ভুলেই গেছিলুম। আমি আবদুল করিম চাচার—"

আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই তিনি আমায় আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন, আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। কত কথাই তিনি বলে গেলেন—করিম চাচা কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গেছেন। আয়েষা ও রাবিয়ার বিয়ে হ'য়ে গেছে। চাচী ছোট ছেলেটিকে নিয়ে আয়েষার বাড়ী আছেন বছর খানেক হ'তে। কাশেম যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল—বর্ম্মার যুদ্ধে মারা গেছে।

কাশেমের মত লোকের অস্তিত্বেই এ জগৎ সুন্দরতর হয়ে ওঠে, অথচ তারাই যায় এ জগৎ ছেড়ে অচিরে। আর আমার মত হতভাগ্যেরা, যারা এই সুন্দর জগৎটিকে নরকে পরিবর্তন করে তোলে—তারাই রয়ে যায় দীর্ঘ জীবনের মৌরসী পাট্টা নিয়ে! ভগবানের এ কী লীলা!···

হাসান মিঞা বলে যেতে লাগ্‌লেন—গণি মিঞা অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় কলের কাজটি বহু দিন পূর্বে হারিয়েছিল—এখন চোখ দু'টিও হারিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে দিনপাত করছে।

ভাগ্যদেবী এমনই খামখেয়ালী,—এক দিন যাকে দিয়ে বিতাড়িত করেন আশ্রিতকে গৃহ হ'তে আর এক দিন তারও আশ্রয় ঘুচিয়ে তাকেও বার করেন পথে! গফুরের কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কি জানি কেন কিছুতেই যেন তার নাম উচ্চারণ করতে পারছিলুম না। কি এক অহেতুক আশঙ্কা আমাকে অভিভূত করে' ফেল্‌ছিল—হাসান মিঞা আমার অভিপ্রায় যদি ধরে ফেলেন!

বহুক্ষণ পর তার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—"গফুর?···গফুর তো বহু কাল পূর্বে মারা গেছে!"

সভয়ে প্রশ্ন করলুম—"কিসে মারা গেল?"

তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' কপালে করস্পর্শ করে' বল্‌লেন—"নসীব, নসীব! ভাগ্যের লিখন—এক দিন নদীর ধারে খেলার মাঠে সে অবধা একটা কুত্তাকে ঢিল ছুড়ে মারে, কুত্তাটা ক্ষ্যাপা ছিল,

তেড়ে এসে দিল কেটে—তাতেই হতভাগার জানটা গেল—বহু যন্ত্রণা কষ্ট পেলে! আল্লা, দুষমণেরও যেন সে অবস্থা না হয়!

তাঁর কথা শুনে তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলুম। বুকের ভিতর কলিজাটা হাপরের মত ধ্বক্-ধ্বক করতে লাগল—মাথার ভিতর ঝড় বয়ে গেল! আল্লা, এ কী শুনলুম?—আমার অন্তরের তীব্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি কি তবে মূর্ত হয়ে কুকুরের রূপে অনুধাবন করেছে হতভাগা গফুরকে?—আমার ঘৃণার বিষেই বুঝি সে জান হারাল! এ কী অদ্ভুত যোগাযোগ!

কিন্তু এ কী? যার সর্বনাশ করবার মানসেই এসেছি ফিরে—তার দুর্ভোগের সংবাদে কেন হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠল? মানব-মনের এ কী অজ্ঞেয় লীলা! গফুরের মৃত্যু-সংবাদে আনন্দ না হয়ে কেন দুঃখই হল!—আমার হৃদয়ে কি তবে এখনও কোমল বৃত্তিগুলির কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে? সুদীর্ঘ বার বৎসর নারকীয় লীলার মত থেকেও আজও কি আমার মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে? না—না, এ আমার ক্ষণিকের চিত্তবিকার মাত্র! আবদুল আর মানুষ নয়—তার মনুষ্যত্ব নিজ হস্তে সে বিনাশ করেছে। আর তার কোন আশাই নাই—মনুষ্য সমাজে আর তার স্থান নাই। যে পথে সে আজ চলেছে, সে পথের শেষে আছে বিভীষিকাময়ী চির রাত্রি!—নাই সেথা আলো—নাই শান্তি—নাই প্রীতি!

হাসান মিঞার কথা আর আমার কাণে প্রবেশ করছে না—অন্তরে বয়ে যাচ্ছে প্রবল ঝড়!

সে রাত্রিটা হাসান মিঞার বাড়ীতেই কাটালুম—পর দিন প্রত্যুষেই নদীর তীরে গেলুম—অজানা কি এক আকর্ষণের টানে।

৭

প্রভাতের শান্ত শ্রী আমার অশান্ত হৃদয়ে বুলিয়ে দিল শান্তি-দায়ী পরশ! স্তব্ধ হয়ে রইলুম দাঁড়িয়ে নদী-তীরে! ও'ছলাৎ' 'ছলাৎ' ছোট ছোট ঢেউগুলি পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অনন্ত জলরাশির মাঝে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন ঢেউ এসে নদীর তীরে আছড়ে পড়ছে—বিরাম নাই! কি অপূর্ব একাগ্রতা! ঢেউগুলি যেন আবেগ উদ্বেলিত হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে তীরের নিকট কি নিবেদন জানাচ্ছে, আর তীরের হৃদয়হীন অটলতায়—তার পদতলে আছড়ে পড়ে নিজেকে সংহার করছে! আমার মনের তীরেও এসে বার বার আছড়ে পড়ছে বিমিশ্র অনুভূতির উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতের ঊর্মিমালা!

কিছু পরে ধীর পদে অগ্রসর হলুম হাসান মিঞার বাটী উদ্দেশে। স্থির করলুম—আজই খিদিরপুর ত্যাগ করে চলে যাব কল্কাতায়। কিছু দূর গিয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ অশথ গাছটির তলায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত প্রত্যুষে কে কি করছে—দেখবার কৌতূহলে এগিয়ে চল্লুম। দেখি এক শীর্ণা বৃদ্ধা গাছের তলায় কি যেন খুঁজছে নিবিষ্ট চিত্তে। স্বপ্নাবিষ্টের মত বৃদ্ধাটি চলাফেরা করছে—আমার পদশব্দে সে চোখ তুলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, বৃদ্ধা উন্মাদিনী। আমার নিকট এসে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"দেখেছ?" আমি শুধালাম—"কি?" বৃদ্ধা একটু উত্তেজিত হয়ে বল্ল—"আমার ছেলে!—এই তো একটু আগে তাকে রেখে গেছি এখানে—এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।" আবারে সে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে শান্ত করবার জন্য সান্ত্বনা দিয়ে বল্লুম—"একটু ভাল করে খুঁজে দেখ—পাবে বৈ কি? একটু আগে রেখে গেছ যাবে কোথায়?"

তার কথা পাগলের প্রলাপ মনে করে, আমি সে স্থান ত্যাগ করে হাসান মিঞার বাড়ীর দিকে চল্লুম। কথায় কথায় তাঁকে পাগলী স্ত্রীলোকটির কথা বল্লুম। তিনি শুনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন—"নদীর তীরে গাছগুলির তলায় কি যেন খুঁজে বেড়ায়, জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, তার ছেলেকে কিছুক্ষণ আগে গাছের তলায় রেখে গেছে—আর খুঁজে পচ্ছে না! আহা! পাগলের কী সাজা! কথায় বলে, পাগলের বাড়া গাল নেই! মাথায় কী খেয়াল ঢুকেছে যে—সে তার ছেলেকে গাছের তলায় রেখেছিল আর খুঁজে পাচ্ছে না। এই এক খেয়ালে কি দুর্গতিই ভোগ করছে—রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, গাছের তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায়। পাগলী যে কোথা হতে আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না; তবে তাকে চেনে না এমন কেউ নেই।"

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলুম—"তবু আন্দাজ কত বৎসর পূর্ব্বে তাকে এখানে প্রথম দেখা যায়?"

ব্যাকুল নয়নে চেয়ে রইলুম তাঁর মুখ পানে—তাঁর উত্তরের আশায়। তিনি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে, মাথা নাড়াতে নাড়াতে কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন—"অনেক বছর আগের কথা, ঠিক মনে পড়ছে না, তবে মনে হচ্ছে, যেন সে সময় কি একটা ঘটনায় এখানে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ওহো, রোসো—রোসো, মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তখন করিম মিঞার বাসা হতে পালিয়ে যাও—সেই দিনেরই কথা। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে করিম মিঞা পাগলীকে প্রথম দেখে নদীর ধারে বুড়ো অশথ গাছটার তলায়। বেশ মনে পড়ছে, করিম মিঞা পরে বলেছিল, পাগলীকে দেখে তার কথা শুনে সহানুভূতি জানিয়ে তাকে বলেছিল—"মা, তুমিও এখানে ছেলে খুঁজছ? আমিও যে ছেলে খুঁজতেই এখানে এসেছি!"

নিমেষে পাগল স্ত্রীলোকটির রহস্য যেন আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল!···আমি জ্ঞানহীনের মত ছুটলুম নদীর তীরে বৃদ্ধ অশথ গাছটির দিকে—আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, সেই পাগল স্ত্রীলোকটিই আমার গর্ভধারিণী! আমাকে ত্যাগ করে—দিনে দিনে তিলে তিলে তীব্র অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনে ও অনুতাপের দহনে সে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। সুযোগ পাবা মাত্র ছুটে এসেছে সেই গাছের তলায়, যেখানে বহু বৎসর পূর্বে সে ত্যাগ করে গেছে নির্মম ভাবে আপনার সন্তানকে!

গাছতলায় পৌঁছে আর তাঁর দেখা পেলুম না! পাগলের মত নদীর তীরবর্ত্তী প্রতিটি গাছের তলায় অন্বেষণ করে বেড়ালুম তাঁকে। কিছু পূর্বেই দেখেছি যাঁকে, দেখেছি অন্বেষণ করতে হতভাগ্য এই আমাকেই! দিবারাত্র অবিরাম ঘুরে বেড়াতে লাগলুম নদীর ধারে ধারে—যদি মেলে তাঁর দর্শন! নদীর তীর ধরে গেছি দক্ষিণ অভিমুখে—গেছি উত্তর অভিমুখে বহু দূর পর্য্যন্ত।

তাঁকে খুঁজেছি নদীর তীরে প্রতিটি গাছ-তলায়, দিনের পর দিন কেটে গেছে—আহার নাই, নিদ্রা নাই, মন্ত্রমুগ্ধের মত—যন্ত্রচালিতের মত খুঁজেছি তাঁকে, তবু মেলেনি তাঁর দর্শন! সেই অবধি পথের নেশা আমায় ঘুরিয়ে মেরেছে, দেশ-দেশান্তরে শান্তি পাইনি কোথাও!

কিছু কাল দেশ-বিদেশে ঘুরে—প্রাণ টেনেছে আবার খিদিরপুর পানে। এসেছি ফিরে, আকুল চিত্তে ছুটে গেছি নদীর তীরে—অশথ গাছতলায়!…কিছু কাল আবার কেটেছে নদীর তীরে তীরে—গাছের তলে তলে—ভগ্ন হৃদয়ে আবার ছেড়েছি খিদিরপুর—বার হয়েছি পথের ডাকে!

* * * *

শ্রান্ত দেহে ফিরেছি আবার আজ খিদিরপুরে—চলার পথ শেষ করে।

"মৃত্যু"

কুমারী সন্ধ্যারাণী মহিন্তা

'নব-ভাগ্য পঞ্জিকা'খানি কেন রাখো লুকাইয়া
মানব দৃষ্টির থেকে? দেও প্রভু বাহিরিয়া
মেলে দাও পড়ে দেখি কি আছে ভাগ্যে লেখা;
ইচ্ছাময়, কৃপাময়, কর মোরে এই কৃপা।
দাও মেলে দেখি কেন হিয়ার এ কামনা
অপূর্ণ? আজো কেন অতৃপ্তি বাসনা,
কেন ভাবিতে গেলে চোখ ছলছলায়
আকাশ-কুসুম ভাবা কেন মোর নিবিয়া যায়?
তোমারে পূজিব বলে গাঁথিতে চাহিনু মালা
গাঁথা যে হ'ল না শেষ, আধা গাঁথা হ'ল;
কি দিয়ে পূজিব প্রভু তোমার ঐ চরণ?
প্রভু, মোর এই দুঃখ রয়েই গেলো।
কিন্তু তোমা কৃপা লভি পরের জন্মে—
সমাপ্তি সেই মালা দিব চরণে।

নারীর দীক্ষা

শ্রীমতী নির্ম্মাল্য দাশগুপ্ত

অতি শৈশবেই নারীর কর্ণে মন্ত্র দেওয়া হয়—সে নারী, তাহার জগৎ স্বতন্ত্র। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে এই বাক্যের যথার্থতা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার দায়িত্ব অসীম। সে শুধু মানুষ নয়, সে বর্ত্তমানে কন্যা ও ভগিনী এবং একদা তাহাকে স্ত্রী ও জননী হইতে হইবে। আচারে, ব্যবহারে, প্রকৃতিতে শিশুকাল হইতেই তাহাকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে সকলের লক্ষ্য থাকে।

যখন তাহার খেলিবার বয়স, সেই সময় তাহাকে কনিষ্ঠ ভাই-ভগিনীদের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ অথবা সমবয়স্ক ভ্রাতা যখন সানন্দে ক্রীড়ায় মত্ত, তখন ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে মাতার গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিতেছে অথবা রোরুদ্যমান কনিষ্ঠ ভাইটিকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা দিতেছে। ইহা লইয়া তাহার বিদ্রোহ নাই, অভিযোগ নাই। সে জানে, ইহাই স্বাভাবিক। ভ্রাতার মত নিজেকে লইয়া থাকিবার অধিকার তাহার নাই। ভাই-ভগিনীদের জন্য জননীর পর তাহারই দায়িত্ব। সুতরাং আদর-যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা দিয়া সে তাহাদিগকে প্রায় জননীর মতই ঘিরিয়া রাখে। দোষ-ত্রুটি ঘটিলে তাহাকে ভর্ৎসনা শুনিতে হয়—"মেয়েমানুষের এমন হলে চলবে কেন?" সে বুঝিয়া লয় যে, সাধারণ মানুষ হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে, সে শুধু মানুষই নয়, মেয়েমানুষ। এবং মানুষের পক্ষে যা শোভা পায়, মেয়েমানুষের পক্ষে তাহা সর্ব্বত্র শোভা পায় না। কী শোভা পায় বা পায় না, সে বিষয়েও যে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, ইহাও তাহার বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ, এই অপরের অনুমোদন ও মনোরঞ্জনই নারীধর্ম্মের বিশেষত্ব। নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া যে নারী সংসারের পাঁচ জনকে পরিতুষ্ট করিতে পারিল, সংসারে তাহারই জয়-জয়কার পড়ে। চারি দিক্ হইতে সে যে শিক্ষা, যে দীক্ষা লাভ করে—তাহা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নয়, ব্যক্তিত্ব-বিলোপের। ব্যক্তিত্বশালিনী রমণী সংসারে প্রিয় হয় না। যেহেতু, তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত সংসারে কাহারও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ বাধিতে পারে। সংসারের শান্তি অটুট রাখিতে হইলে সকলকেই খুশী রাখিতে হয়, এবং এই পর-চিত্ত-রমণে অকৃতকার্য্য হইল যে রমণী,—সে মনোরমা নয়।

প্রথম হইতেই যে তাহাকে ভবিষ্যতে ঘরণী, গৃহিণী হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সকলের লক্ষ্য থাকে, ইহার বহু পরিচয় আমরা পাই তাহার প্রতি অন্যের ব্যবহারে। স্নেহে প্রতিপালন করিলেও পিতা-মাতা তাহাকে অধিক আদর-যত্ন করিতে ভয় পান—কে জানে, ভবিষ্যতে মেয়ের ভাগ্যে কী আছে! আদর দিয়া মাটি না করাই ভাল। চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে আত্মীয়-স্বজন হইতে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই বিস্ময়োক্তি করে—'মাগো, এ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কী উপায় হবে?' মেয়ে একদা শ্বশুরগৃহে যাইবে ইহাই মুখ্য। বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পচর্চ্চা এ সবই গৌণ। মেয়ে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিলেও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা অতি সামান্য ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। আজকাল মেয়েরা বিনা বাধায় স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে। কন্যাকে নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদিতে পারদর্শী করিতে আজকালকার পিতা-মাতার আগ্রহের অভাব নাই—তবু এ সবই গৌণ—যত দিন না কন্যা গৃহিণী হয় তত দিনকার জন্য। সঙ্গীত-নিপুণা দেখিয়া যে গৃহে বধূ নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, সে গৃহও কয় দিন বধূর সঙ্গীতে মুখরিত থাকে তাহা আঙুলে গণিয়া বলা যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সব মেয়েদের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, বিবাহের পর তাহাদের কণ্ঠ নীরব। প্রাক্-বিবাহিত যুগে বিদুষী বলিয়া যে মেয়ের খ্যাতি ছিল, বিবাহের পর বিদ্যাচর্চ্চার সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। সংসারের কবলে পড়িয়া তাহার অন্য সমস্ত পরিচয়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে ঘরণী গৃহিণী, সে জননী ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।

সংযম, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মেয়েদের যে সব গুণাবলীর মহিমা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমস্তটাই কি সহজাত? অন্ততঃ ইহার এক অংশও কি অভ্যাস ও শিক্ষাগত নয়? ছেলেবেলা হইতেই মেয়েরা দেখিয়া আসিয়াছে যে, সংসারের অপরের সুখ-দুঃখের অন্তরালে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ চাপিয়া রাখিতে হইবে, সেই ভাবেই ধীরে ধীরে তাহাদের স্বভাব গড়িয়া ওঠে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূলে সংস্কার ও প্রকৃতির অলক্ষ্য দান অবশ্যই আছে, সংসারের দীক্ষা ইহাকে ফল-ফুলে শোভিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ করে।

কেবল মাত্র গুণের ক্ষেত্রে নয়, রূপের ক্ষেত্রেও এই দীক্ষা প্রযোজ্য

হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার রূপের হানি ঘটিলে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়াদের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। সে উৎকণ্ঠা ততটা বরং কন্যার জন্য নয়, যতটা বিবাহের বাজারে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে বলিয়া। এমন কথা প্রায়ই জানিতে পাওয়া যায় যে, মেয়ের বয়স অল্প থাকিতেই বিবাহ দেওয়া ভাল, নহিলে অধিক বয়সে চেহারার শ্রী থাকে না। বিবাহের পর মেয়ের সৌন্দর্য্য ক্ষয় হইলে ইঁহারাই আবার ভ্রূক্ষেপও করেন না। রূপের প্রয়োজন তাহার শেষ হইয়াছে। আর কেন? বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সন্তান-লাভও হয় তো হইয়াছে। তবে আর কী? নারী-জীবনের চরম লক্ষ্যে সে তো পৌঁছিয়াছে, এখন তাহার রূপ থাকিল বা না থাকিল তাহাতে কী আসিয়া-যায়? সূর্য্যমুখী ফুলের মত মেয়েদের দৃষ্টি শিশুকাল হইতেই এক দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

এই যে দীক্ষা তাহারা আবাল্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভিতর দিয়া লাভ করে, ইহাই তাহার সারা জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া রাখে। এই দীক্ষা এক প্রকার প্রাচীর। প্রাচীরের ন্যায় ইহা নারী-চরিত্রকে বাহিরের বিঘ্ন হইতে দূরে নিরাপদ বেষ্টনীতে রক্ষা করিয়া দৃঢ় করিয়াছে। অন্য দিকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ বিকাশ পাইতে দেয় নাই। ভাল ও মন্দে মিশিয়া ইহাই আমাদের দেশের নারীদের রূপ দান করিয়াছে। সভা-সমিতিতে, কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর যে রূপ দেখা যায়, তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার এই দীক্ষিত রূপ, এবং ইহাই এ-দেশের নারীর শাশ্বত রূপ।

ভবিষ্যৎ মানব ও নারী

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা

যান্ত্রিক যুগের দ্রুত অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষে চাইছে—সর্ব্বরকমে প্রকৃতিতে তার আয়ত্তাধীনে রাখতে অথবা তাকে সর্ব্বতোভাবে জয় করতে। নারীধর্ম্মের আদর্শের ব্যতিক্রম যাঁরা করতে চান তাঁরাও এই পথেরই পথিক, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাকে অনেকাংশে পরাজিত হ'তে হয়েছে, কারণ, নারীর নিজস্ব প্রকৃতিই গৃহমুখী। তার সার্থকতা নীড় নির্ম্মাণে।

সংসার যত সুন্দর ভাবে গঠন করা যায়, তারই মাঝে নারীর সাধনা সার্থকতা লাভ করে, তার দেশমাতৃকার চরণে পূজার পুষ্পাঞ্জলি—আদর্শ সন্তান, আদর্শ ভবিষ্যৎ মানব। প্রতি গৃহের কর্ত্রী নারী; এই রকম বহু সংসার নিয়ে একটি পল্লী, এবং এই রকম বহু পল্লী গঠন করে তোলে একটি নগর, যার আরও বৃহত্তর পরিণতি দেশ বা মহাদেশে। কাজেই, নারীর সাংসারিক দায়িত্ব কোনও সময়েই অস্বীকার করা চলে না।

আজকাল আর্থিক সংগ্রাম অনেক বেড়ে গেছে বলে নারীকেও অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনে গৃহকোণ ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু এইটাই আমাদের আদর্শ নয়, এটা প্রয়োজনের তাগিদে আদর্শের ব্যতিক্রম। ছোট ছোট শিশু-সন্তানদের বাড়ীতে রেখে বাইরে যাওয়ার অসুবিধা হয় বলে বহুবিধ শিশু প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা চলছে, অবশ্য যাঁদের স্বামী নেই, যাঁরা ছোট ছোট শিশু নিয়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে গঞ্জনা পান তাঁদের অনেক সুবিধা হবে এই রকম শিশু-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রকম Nursing home-এর বহুল প্রচলন হ'লে যে সখের খাতিরে বা আর্থিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সকলকেই চাকুরী-জীবন গ্রহণ করতে হ'বে তার কোনই মানে নেই। কারণ, যতই শিক্ষিতা Nurse বা ধাত্রীর কাছে আমাদের সন্তানরা থাকুক না কেন, তারা অনেকটা State children-এর মতন মানুষ হ'বে। তারা শিক্ষায় বা বুদ্ধিতে হয়তো সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে, কিন্তু তারা মায়ের ব্যক্তিত্বের প্রেরণা থেকে হ'বে বঞ্চিত। মায়ের কাছ থেকে সন্তানেরা যে মায়ের বৈশিষ্ট্য এবং পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, সে বিশিষ্টতা তারা হারিয়ে ফেলবে।

শিশু-সন্তানের শিক্ষার বনিয়াদ রচিত করার দায়িত্ব মায়ের। মাসিক বৃত্তিধারিণী ধাত্রী বা Nurse যা করবে তার সঙ্গে তাদের আন্তরিক যোগের কথা কল্পনাই করা বৃথা। সন্তানের মাঝে মানুষে আবার নূতন জন্ম-পরিগ্রহণ করে বেঁচে থাকতে চায়। সেটা তো শুধু তার রক্তের বা বংশের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নয়, তার বৈশিষ্ট্য তার আদর্শ সব কিছুকেই সে পরিস্ফুট দেখতে চায় তার সন্তানের মাঝে। এই দায়িত্ব মা ছাড়া আর কেউ কি সম্পন্ন করতে পারে? আন্তরিকতার স্পর্শ ছাড়া শিশুর চরিত্র গঠন হ'তে পারে না।

জয়তু মহাত্মা

শ্রীঅণিমা মুখোপাধ্যায়

হে মহামানব,
একতা, অহিংসা, প্রেম,
সত্যের সম্মান,
এই তব জীবনের বাণী।
তাই দিয়ে
হিংসার উন্মত্ত স্রোত রুখেছিলে তুমি
সমস্ত জীবন ভ'রে।
তার বিনিময়ে
প্রাণ দিলে আজ হিংসারই আঘাতে!
তবু মুখে রেখে গেছ ক্ষমাময় হাসি
যাত্রার শেষ ক্ষণে।
হিংসার আঘাত
ঘোষিয়াছে তোমারি বিজয়।

একাকার

শেফালি দেবী

অন্তরে অন্তর যাবে মিশি'—লুপ্ত হবো আমি,
হৃদয়ের অন্দরে তোমার সুপ্ত রবো আমি।
আনন্দে উজ্জ্বল যবে হবে মুগ্ধ হবো আমি,
আতঙ্কে কম্পিত যদি হও—যুদ্ধ দেবো আমি!
দুঃখে যদি ক্ষুব্ধ কভু হও—আশা দেবো আমি,
ক্রোধে যদি রুষ্ট কভু হও—ভাষা দেবো আমি!
দূরে যদি যাও চলে—নিয়ে যেও দূরে,
পরপারে তুমি আমি সুর দেবো সুরে!

মহাভারতের শেষ মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

অষ্টম

রাজ্যশ্রী

হর্ষবর্দ্ধনের সামনে রয়েছে এখন দু'টি প্রধান কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃহন্তা বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া এবং নিরুদ্দিষ্টা ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে রাজ্যশ্রীর সন্ধান না নিলে চলবে না। রাজ্যশ্রী হর্ষের চেয়ে আট-দশ বৎসরের বড় ছিলেন। শৈশবে তিনি দিদির কোলে চড়েছেন, তাঁর কাছে কত আবদার করেছেন। দিদিকে তিনি কেবল ভালোবাসতেন না। তাঁকে দেখতেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে। কারণ, রাজ্যশ্রী ছিলেন একাধারে বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী। হর্ষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রাজ্যশ্রী যদি পুরুষ হ'তেন তাহ'লে তিনি থাকতে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা হ'ত না আর কারুর।

সেনাপতি সিংহনাদ নিবেদন করলেন, "দেব, রাজ্যশ্রী দেবীকে আগে উদ্ধার করতে গেলে নরাধম গৌড়াধিপ যদি পালিয়ে যায়? বঙ্গ হচ্ছে দুর্গম দেশ, সেখানকার লোকদের আশ্রয় কেবল স্থলপথ নয়, জলপথও। একবার সে পলায়নের সুযোগ পেলে আর কি আমরা তাকে ধরতে পারব?"

হর্ষ বললেন, "হয়তো পারব না, তবু উপায় নেই। রাজ্যশ্রী দেবীর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র রক্ত। তার উপরে আমি পিতা-মাতাকে হারিয়েছি, একমাত্র ভ্রাতাকেও হারিয়েছি, পৃথিবীতে এখন দিদি ছাড়া আমার আর আপন-জন নেই। আমার দিদির সঙ্গে এক শত শশাঙ্ক তুল্যমূল্য নয়। আগে দিদিকে ফিরিয়ে আনি, তার পর অন্য কথা।"

—"আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?"

—"আপনি এখানে থেকেই নূতন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন। ইতিমধ্যে আমি এক হাজার লোক নিয়ে দিদির সন্ধানে যাত্রা করব। ফিরে এসে যেন সেনাদলকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাই।"

হর্ষের কবি-বন্ধু বাণভট্ট সাবধান ক'রে দিলেন, "দেখবেন রাজপুত্র, রাজ্যশ্রী দেবীকে উদ্ধার করতে যেন বিলম্ব না হয়! নিজের প্রতিজ্ঞার কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখবেন। বাঙালী-পাখী শশাঙ্ক যদি উড়ে পালায়, তাহ'লে সারা জীবনই আপনাকে নোংরা বাম হাত দিয়ে অন্নগ্রহণ করতে হবে।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে সিংহনাদের দিকে ফিরে হর্ষ বললেন "প্রধান সেনাপতি স্কন্দগুপ্ত এখন কোথায়?"

সিংহনাদ বললেন, "তাঁকে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিলুম বটে কিন্তু এখন তিনি জীবিত কি মৃত বলতে পারি না।"

বাণভট্ট বললেন, "রাজপুত্র, আপনি কি সেই স্কন্দগুপ্তের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, যাঁর মহা নাসিকা আপনার সম্ভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষদের নামের তালিকার চেয়েও বেশী দীর্ঘ?"

—"কবি, তোমার এই উপমাটি বেশ রুচিসম্মত হ'ল না যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, আমি সেই স্কন্দগুপ্তের কথাই জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানো?"

—"জানি বৈ কি রাজপুত্র! শশাঙ্ক-পক্ষীর চঞ্চু-তাড়নায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লম্বা দিয়ে তিনি এমন ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন যে, নিজের বাড়ীর অন্দর-মহলে রমণীর মত ঘোমটায় বদন ঢেকে অবস্থান করছেন।"

—"এখন পরিহাস রাখো কবি। একবার প্রধান সেনাপতির কাছে যাও, তাঁকে ব'লে এস—যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই-ই থাকে, প্রকৃত বীরকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে না পরাজয়ের গ্লানি। তিনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান তাহ'লে শশাঙ্কের সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। আমি চললুম।"

হর্ষ প্রস্থান করলে পর বাণভট্ট বললেন, "ওহে বাপু সিংহনাদ, স্কন্দগুপ্তের কেবল অতিদীর্ঘ নাসা নয়, তাঁর কেশও অতিপক্ক। রাজপুত্র শ্রীহর্ষ তাঁকে যে কথাগুলি বলতে বললেন তা শুনলে তিনি কি মনে করবেন বল দেখি?"

—"কি মনে করবেন?"

—"মনে করবেন, ছেলেটি গোঁফ না গজাতেই জেঠা-মহাশয় হবার চেষ্টা করছে।"

সিংহনাদ কোন রকম নাদসৃষ্টি না ক'রে মুখ টিপে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্পষ্টাস্পষ্টি হাসলেন না।

• • • •

বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার পাদদেশে জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশ। এমন ঘন জঙ্গল যে পাঁচ হাত অগ্রসর হ'লেই দৃষ্টি হয় বন্ধ। সেখানে বাঘ, ভাল্লুক অজগর ও বিষাক্ত সর্পাদি তো আছেই, তার উপরে যে

সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে পশুরাজ সিংহেরও প্রতাপ বড় কম ছিল না।

সেখানে বাস করত মানুষও। কিন্তু তারা সভ্য মানুষ নয়, অসভ্য ভিল। এক সময়ে তাদেরই পূর্ব্বপুরুষরা ছিল ভারতের আদিম বাসিন্দা। কিন্তু বিদেশী আর্য্য জাতির দ্বারা যখন উত্তরাপথ অধিকৃত হ'ল, তখন তারা এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এমনি সব দুর্গম গহন বনে বা পর্ব্বতের অন্তরালে। তাদের আত্মরক্ষার সম্বল ছিল কেবলমাত্র বল্লম বা তীর-ধনু। তারই সাহায্যে তারা করত দুর্দ্দান্ত সিংহ-ব্যাঘ্রদেরও প্রাণে ভীতির সঞ্চার। শিকারই ছিল তাদের প্রাণধারণের প্রধান উপায়, কিন্তু শিকার না জুটলেও তাদের খাদ্যের অভাব হ'ত না কোন দিন। অসংখ্য বৃক্ষদেবতা হাজার হাজার পত্রশ্যামল শাখা-বাহু বিস্তার ক'রে তাদের সামনে ধরত অফুরন্ত ও সুমিষ্ট অমৃত ফল এবং তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্যে নাচতে নাচতে ছুটে আসত সাগ্রহে সঙ্গীতমুখরা ও সুধাময়ী নির্ঝরিণী আর তটিনীরা। ছিল না কোন অভাব, ছিল না সংকীর্ণ সমাজের বাঁধন। নাগরিক এবং পরম শত্রু আর্য্যদের কার্য্য বা অকার্য্য নিয়ে তারা মাথা ঘামাতো না একটুও, বনে বনে বা পাহাড়ের শিখরে শিখরে আগল-ভাঙা উদ্দাম পুলকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করত প্রকৃতির একান্ত প্রাণের দুলালের মত।

স্থানীয় ভিলদের এক সর্দ্দার ছিল, নাম তার লটুনা। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, কিন্তু জোয়ান সে ত্রিশ বৎসরের যুবকের মত। তার সেই সাত ফুট লম্বা দেহ ও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুকের পাটা দেখলে চমকে ওঠে দুর্দ্দান্ত সিংহদেরও চক্ষু!

সভ্য মানুষদের নির্দ্দয় অসভ্যতার কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে এই লটুনা-সর্দ্দারেরই কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন স্থানেশ্বরের রাজকন্যা ও কান্যকুব্জের সিংহাসনচ্যুতা মহারাণী রাজ্যশ্রী দেবী।

বয়স তাঁর চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না, কিন্তু এখনো তাঁকে দেখলে মনে হয় পনেরো-ষোলো বছরের বালিকার মত। বর্ণ তাঁর হস্তীদন্তশুভ্র নয়, পক্ক আপেলের মতন রঙিন! সুডৌল তনু, পরিপুষ্ট বাহু, কোমলতা-মাখানো মুখখানি দেখলে কঠোর পাথরও বুঝি তরল হয়ে যায়! আর সেই দু'টি আয়ত নয়ন, তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন আত্মসমাহিত দিব্যদৃষ্টি!

আলুলিত কেশ, বিধবার শুভ্র বেশ। দেখলেই মনে হয়, যেন মূর্ত্তিধারণ করেছে সুপবিত্র এক অচঞ্চল হোমাগ্নিশিখা!

সেদিন সকালে স্তম্ভিত লটুনা-সর্দ্দার দাঁড়িয়েছিল চিত্রার্পিতের মত। তারই সামনে ভূমিতলে নতনেত্রে উপবিষ্টা রাজকন্যা, রাজমহিষী রাজ্যশ্রী। কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দ্দারের অনুচররা।

অবশেষে মূক লটুনা খুঁজে পেলে যেন তার আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর। সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে বললে, "লেড়কী, তাহলে সত্যিই কি তুই আমাদের ফাঁকি দিবি?"

রাজ্যশ্রী ধীর কণ্ঠে বললেন, "বাছা, এখনো কি তুমি আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারছ না?"

লটুনা অত্যন্ত দুঃখিত-ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "বুঝতে পারছি বেটী, বুঝতে পারছি। যার সোয়ামী নেই, তার কেউ থাকে না বটে। কিন্তু মায়ী, আমরা—তোর বেটারা এখনো তো তোর সামনেই দাঁড়িয়ে! তুই আগে ছিলি সহরের রাণী, কিন্তু আমরা যে আজ তোকে বনের রাণী ক'রে রাখতে চাই! তোদের সহরের চেয়ে কি আমাদের বন ভালো ঠাঁই নয়?"

রাজ্যশ্রী বললেন, "বাবা, সহর ভালো কি বন ভালো, তা নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না। কিন্তু আমার পক্ষে আর বেঁচে থাকবার কোন কারণ নেই। আমার স্বামী পরলোকে গিয়েছেন, আমি হিন্দু নারী—আমারও উচিত সহগমন করা। তুমি বোধ হয় শুনেছ, আমার মা ছিলেন স্থানেশ্বরের মহারাণী। আমার মৃত্যুশয্যাশায়ী বাবা শেষ-নিশ্বাস ফেলবার আগেই মা করেছিলেন জ্বলন্ত চিতায় আত্মদান। সেই পরম সতী জননীর কন্যা আমি, বিধবা হয়েও তবু এই তুচ্ছ জীবন আঁকড়ে আছি। কিন্তু কেন জানো? ভেবেছিলুম আমার স্বামীর হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি না দেখে মরব না! কিন্তু সে আশা আজ স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। দেবগুপ্তের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু সেই দুরাচার হয়তো আজও আমার স্বামীর সিংহাসন অধিকার ক'রে আছে। এখানে আসবার আগে কেবল এইটুকু খবর পেয়েছিলুম যে, দেবগুপ্তকে আক্রমণ আর আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমার ভাই মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধন করেছেন যুদ্ধযাত্রা। এখন আমার কি ধারণা জানো? যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতার পরাজয় হয়েছে। কারণ তিনি জয়ী হ'লে এত দিনে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করতেন। কে জানে, আমার ভাই জীবিত আছেন কি না? বাবা, দেবগুপ্ত যদি আবার আমার সন্ধান পায়, তাহ'লে আবার আমাকে বন্দী আর অপমান করতে পারে। আমার আর কোন আশাই নেই। এখন আমার বিধবা হয়েও বেঁচে থাকা হচ্ছে মহাপাপ। সর্দ্দার, আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহ'লে আর আমাকে বাধা দিও না, আমার জন্যে এখনি চিতাশয্যা রচনা কর!"

লটুনা সাশ্রু নেত্রে দুই হাত জোড় ক'রে বললে, "কিন্তু মায়ী—"

এইবারে রাজ্যশ্রীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ! তীক্ষ্ণ চক্ষে ও তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "এখনো 'কিন্তু'? সর্দ্দার, সর্দ্দার! এখনো তুমি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহ'লে আমি অন্য যে কোন উপায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব!"

—"মা, আমার একটি নিবেদন শোনো—"

—"না, না, আমি আর কোন কথাই শুনতে চাই না। এই পৃথিবীর প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে এখন বিষাক্ত। এখনি চিতার কাষ্ঠ আনাও, কর সেই কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ। যে নিজে মরতে চায়, তাকে তোমরা বাঁচাবে কেমন ক'রে?"

রাজ্যশ্রীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি দেখে লটুনা আর কোন কথাই বলতে সাহস করলে না। অত্যন্ত বিমর্ষের মত ধীরে ধীরে নিজের অনুচরদের কাছে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে কি বললে, রাজ্যশ্রী তা শুনতে পেলেন না।

* * * *

দাউ-দাউ জ্বলন্ত চিতা! ঊর্দ্ধে উঠে শূন্যকে দংশন করবার চেষ্টা করছে শত শত রক্তাক্ত লকলকে অগ্নিসর্প! আরো ঊর্দ্ধে তাদেরই দৃশ্যমান নিশ্বাসের মত উঠে যাচ্ছে পুঞ্জপুঞ্জ ধূম্রকুণ্ডলী!

রাজ্যশ্রী প্রস্তুত! ভাবশূন্য মুখে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন চিতার দিকে।

আচম্বিতে খানিক দূরে জাগ্রত হ'ল ঘন ঘন আকাশ-কাঁপানো দামামা-ধ্বনি।

রাজ্যশ্রী বেগে চিতার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে সচকিত কণ্ঠে বললেন, "সর্দ্দার, সর্দ্দার, দুরাত্মা দেবগুপ্ত নিশ্চয় আবার আমাকে বন্দী করতে আসছে!"

অধিকতর বেগে ছুটে গিয়ে লটুনা দাঁড়ালো রাজ্যশ্রীর পথরোধ ক'রে। বললে, "একটু অপেক্ষা কর মা! এ নিশ্চয় শত্রুর দামামা নয়! কারুকে গোপনে বন্দী করতে হ'লে কেউ কখনো দামামা বাজিয়ে নিজের আগমন-সংবাদ দেয় না!"

—"শত্রু নয়, বন্ধু? এই পৃথিবীতে আর আমার বন্ধু বলতে কে আছে সর্দ্দার?"

উত্তর পেতে বিলম্ব হ'ল না। ঘন জঙ্গলের সবুজ প্রাচীর ভেদ ক'রে আবির্ভূত হ'ল এক অশ্বারোহী মূর্ত্তি! উচ্চস্বরে সে ব'লে উঠল, "রাজপুত্র হর্ষবর্দ্ধন! স্থানেশ্বরের রাজপুত্র হর্ষবর্দ্ধন এসেছেন তাঁর সহোদরা রাজ্যশ্রী দেবীকে সানন্দ সম্ভাষণ করতে!"

নবম

প্রত্যাদেশ-বাণী

চিতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন রাজ্যশ্রী।

অরণ্যের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করছে দলে দলে অশ্বারোহী। অশ্বদের ধূলি-ধূসরিত দেহ এবং ফেনায়িত মুখ দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, বহু দূর থেকে অতি বেগে পথ অতিক্রম ক'রে তারা এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে।

অশ্বারোহীদের পুরোভাগেই দেখা গেল হর্ষবর্দ্ধনকে। এক লাফে মাটির উপরে নেমে প'ড়ে তিনি ছুটে এলেন রাজ্যশ্রীর কাছে। ব্যাকুল ভাবে নিজের দুই হাত দিয়ে ভগিনীর দুই হাত চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "দিদি, দিদি, এ কি দেখছি! তোমার সামনে জ্বলন্ত চিতা কেন?"

বিষাদ-মাখা হাসি হেসে রাজ্যশ্রী ধীরে ধীরে বললেন, "ভাই, ঐ চিতাই যে এখন আমার একমাত্র শয্যা!"

—"তা হয় না দিদি, তা অসম্ভব! তোমাকে হারালে এই পৃথিবীতে আমি যে হব একেবারে একলা!"

—"একেবারে একলা? কেন, তোমার মাথার উপরে তো আছেন রাজ্যবর্দ্ধন!"

—"তিনি এখন স্বর্গে।"

রাজ্যশ্রী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

হর্ষ বললেন, "মগধ-গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাঁকে হত্যা করেছে!"

খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত থেকে রাজ্যশ্রী বললেন, "তুমি এ কি দুঃসংবাদ দিলে হর্ষ? এক বৎসরের মধ্যেই আমি মাতা, পিতা, ভ্রাতা আর স্বামীকে হারালুম? আর সেই পাষণ্ড দেবগুপ্ত এখন কোথায়?"

—"নরকে। তাকে পরাজিত আর নিহত করবার পরেই আমার দাদা মারা পড়েছেন দেবগুপ্তের বন্ধু শশাঙ্কের হাতে। সেই খবর পেয়েই আমি আগে তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছি। এর পর আমাকে যেতে হবে শশাঙ্কের পিছনে। সে না কি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আবার গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আগে কান্যকুব্জ অধিকার ক'রে সে না কি স্থানেশ্বরও আক্রমণ করবে। কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেব না।"

রাজ্যশ্রী বললেন, "হর্ষ, সম্ভ্রান্ত রাজবংশে তোমার জন্ম। তুমি যে রাজকর্ত্তব্য পালন করতে পারবে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার স্বামিহন্তা শাস্তি পেয়েছে, আমি আর এ পৃথিবীতে থাকতে চাই না।"

—"কিন্তু দিদি, তোমার ভ্রাতৃহন্তা তো এখনো শাস্তি পায়নি!"

—"সে জন্যে তুমি রইলে হর্ষ!"

—"না দিদি, না! আমি যাব এখন শশাঙ্ককে শাসন করতে। আমার বর্ত্তমানে স্থানেশ্বরের শুভাশুভ দেখবে কে? যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত। রণক্ষেত্রে যদি আমারও মৃত্যু হয়? তখন তুমি ছাড়া পিতার বংশে রাজ্যচালনা করবার জন্যে তো আর কেউ থাকবে না!"

রাজ্যশ্রী সবিস্ময়ে বললেন, "তুমি কি বলতে চাও হর্ষ! আমি রাজ্যচালনা করব? তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি নারী?"

হর্ষ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কিছুই ভুলিনি দিদি, কিছুই ভুলিনি! তুমি নারী বটে, কিন্তু তুমি কি যে-সে নারী? পিতা বলতেন, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তোমার সঙ্গে তুলনীয় কোন পুরুষ তাঁর সমগ্র রাজ্যে নেই! আমার কথা রাখো দিদি। তুমি যদি স্থানেশ্বরের ভার গ্রহণ কর, আমি তাহ'লে নিশ্চিন্ত মনে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে পারি।"

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে রাজ্যশ্রী বললেন, "ভাই হর্ষ—"

হর্ষ বাধা দিয়ে বললেন, "দিদি, এখনো তুমি সব কথা শোনোনি। রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। বেশীর ভাগ মন্ত্রীর ইচ্ছা নয় যে, আমি সিংহাসনে আরোহণ করি! তাঁদের মতে আমি নাবালক, রাজ্যচালনা করবার মত বুদ্ধি বা শক্তি আমার নেই। কেবল আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভণ্ডী তাঁদের মুখবন্ধ ক'রে রেখেছেন! তিনি আমার পক্ষে না থাকলে স্থানেশ্বরের সিংহাসন এর মধ্যেই হয়তো আমার হাতছাড়া হয়ে যেত। দিদি, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা জানে না, রাজ্যে এমন লোক নেই। আমি চিরদিনই তোমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছি মায়ের স্নেহ। এই দুঃসময়ে তুমি যদি আমার মাথার উপরে থাকো, তাহ'লে পরম শত্রুরাও বাধ্য হয়ে আমার আনুগত্য স্বীকার করবে।"

এখনো রাজ্যশ্রীর দ্বিধার ভাব কাটল না। বাধো-বাধো গলায় তিনি বললেন, "ভাই হর্ষ, তোমার প্রস্তাব শুনে আমি ভীত হচ্ছি।"

হর্ষ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "ভয়? কোন ভয় নেই দিদি! তোমার কাছে আসবার আগেই আমি এক বৌদ্ধ মঠে গিয়েছিলুম নিজের ভবিষ্যৎ জানতে! দিদি, আমি কি প্রত্যাদেশ-বাণী পেয়েছি জানো? জম্বুদ্বীপে প্রথম সাম্রাজ্য ছিল মৌর্য্যরাজাদের। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত। তৃতীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন হূণবিজেতা যশোবর্দ্ধদেব। প্রত্যাদেশ-বাণী যদি মানতে হয়, তা'হলে আমিই হব না কি এখানকার চতুর্থ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিচিত্র বাণী শুনে পর্য্যন্ত আমার আশা হয়ে উঠেছে অনন্ত—সমস্ত চিত্ত আমার বিচরণ করছে অসীম আকাশে! দিদি, আমি কি স্থির করেছি তাও বলি শোনো। বিদ্যুদ্বেগে যুদ্ধ ক্ষেত্র

করবার জন্যে আমি আপাতত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করব না। যত দিন না প্রাপ্তবয়স্ক হই, যত দিন না নিজের শক্তির পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারি, তত দিন আমি রাজপুত্র শিলাদিত্য, এই নাম গ্রহণ ক'রে নিজের কর্ত্তব্যপালন করব। দিদি, আসলে রাজ্যচালনার ভার থাকবে তোমার উপরে, কেবল অস্ত্রচালনা করব আমি। এই খণ্ড খণ্ড আর্য্যাবর্ত্তকে আবার আমি অখণ্ড ক'রে তোলবার চেষ্টা করব। কিন্তু দিদি, তুমি সহায় না হ'লে আমার পক্ষে এই সুপবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করা সম্ভবপর হবে না।"

রাজ্যশ্রী পূর্ণকণ্ঠে বললেন, "হর্ষ, তোমার কথায় দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবনকে উৎসর্গ করলুম। ভগবানের ইচ্ছায় সফল হোক তোমার স্বপ্ন! সর্দ্দার, নিবিয়ে ফেলো চিতার আগুন!"

দশম

মরীচিকার অবসান

নিয়তি বড় নিষ্ঠুর, বহুবার নির্ম্মূল করেছে সে মানুষের বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

শশাঙ্ক ভেবেছিলেন, মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পশ্চিম উত্তরাপথকে করতলগত করবেন। কিন্তু দেবগুপ্ত পড়লেন মৃত্যুমুখে। রাজা ও নেতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মালব-সৈন্যরা হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ এবং শশাঙ্কও হলেন তাদের মূল্যবান সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

তার পর অভাবিত উপায়ে রাজ্যবর্দ্ধনকে পথ থেকে সরিয়ে শশাঙ্ক আবার কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন বটে। কিন্তু দৈবচক্রে আবার নিবু-নিবু হ'ল তাঁর আশার বাতি।

অকস্মাৎ সৈন্যদলের মধ্যে দেখা দিলে এমন মহামারী যে, শশাঙ্কের অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যদি কান্যকুব্জ ও স্থানেশ্বর আক্রমণ করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁর সাফল্য ছিল সুনিশ্চিত। কারণ অপ্রস্তুত শত্রু দমন করা কঠিন নয় কিছুমাত্র।

শশাঙ্কের সে সৌভাগ্য হ'ল না। একই স্থানে অচল হয়ে ব'সে ব'সে অসহায় ভাবে তিনি দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখতে লাগলেন, বিনা যুদ্ধে কেবল মাত্র মহামারীর কবলগত হয়ে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে তাঁর বিপুল বাহিনী। অবশেষে কয়েক মাস পরে মহামারী শান্ত হ'ল বটে, কিন্তু সৈন্যবলের দিক্ দিয়ে শশাঙ্ক হয়ে পড়েছেন তখন রীতিমত দুর্ব্বল।

তার উপরে গুপ্তচরের মুখে শত্রুপক্ষের খবর শুনে শশাঙ্কের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। পরামর্শের জন্য তিনি সেনাপতি ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করলেন।

শশাঙ্ক বললেন, "স্থানেশ্বরের রাজপুত্র হর্ষবর্দ্ধন আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহ করছেন। এখনো তাঁর সৈন্যসজ্জা সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো যদি আমরা স্থানেশ্বর আক্রমণ করতে পারি, তাহ'লে হয় তো বিজয়লাভ করব আমরাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর হবে কি?"

সেনাপতি বললেন, "অসম্ভব মহারাজ, অসম্ভব। মড়ক আমাদের অর্দ্ধেক সৈন্যকে হত্যা করেছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরও অধিকাংশ দেহে আর মনে এত দুর্ব্বল যে মৃতপ্রায় বললেও চলে। এখন আমরা আক্রমণ করব কি, কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পারব কি না সন্দেহ!

শশাঙ্ক বললেন, "জানি সেনাপতি, আমিও সে কথা জানি। কিন্তু আরো দুঃসংবাদ আছে। আপনারা সকলেই জানেন, কিছু কাল আগে কামরূপরাজকে যুদ্ধে আমরা পরাজিত করেছিলুম। আজ আমার বিপদ দেখে কামরূপ আবার সাহস সঞ্চয় করেছে। শুনলুম, আমার বিরুদ্ধে হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কামরূপের রাজপুত্র ভাস্করবর্ম্মা প্রবল এক সৈন্যদলের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে। এখন আমার কি করা উচিত?"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এই উভয়-সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আবার বঙ্গদেশে ফিরে যাওয়া।"

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, "বিনা যুদ্ধে পলায়ন? এ অঞ্চলের লোকেরা একে তো বাঙালীকে মানুষ ব'লে গণ্য করতে চায় না, তার উপরে বিনা যুদ্ধে শত্রুভয়ে পলায়ন করলে আর্য্যাবর্ত্তে আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। হারি আর জিতি, যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।"

নিরুত্তর হয়ে রইলেন মন্ত্রী ও সেনাপতি।

শশাঙ্ক অধীর ভাবে এদিকে-ওদিকে পদচালনা করতে করতে বললেন, "এক জায়গা থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। দাক্ষিণাত্যের মহাপ্রতাপশালী চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী আমার পরম বন্ধু। এই বিপদের সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনারা কি বলেন?"

সেনাপতি বললেন, "মহারাজ, এ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, চরম মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হয়ে যাবার আগে চালুক্যরাজ আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না।"

শশাঙ্ক বললেন, "তবু চেষ্টা ক'রে দেখব। ইতিমধ্যে হর্ষবর্দ্ধন যদি আক্রমণ করেন, আমরা আত্মরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার কেবল ততটুকু বাধাই দেব, সাধ্যমত এড়িয়ে চলব সম্মুখ-যুদ্ধ। আমরা আক্রমণ করব চালুক্যরাজের সাহায্য আসবার পরেই।"

বিপক্ষের জন্যে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না—যথাসময়ে উত্তর-পশ্চিমের বিশাল প্রান্তরের উপরে দেখা দিলে হর্ষবর্দ্ধনের বিপুল বাহিনী।

শশাঙ্ক বুঝলেন, অবিলম্বে চালুক্যরাজের সাহায্য না পেলে এই বৃহৎ বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য তাঁর হবে না।

গোড়ার দিকে হ'ল কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ। বোঝা গেল, নিপুণ সেনানায়কের মত হর্ষবর্দ্ধন পরীক্ষা ক'রে দেখছেন, মগধ-বঙ্গের ব্যূহের দুর্ব্বল অংশ কোথায়!

উভয় পক্ষই যখন বৃহত্তর শক্তিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে শশাঙ্ক স্বদেশ থেকে পেলেন আর এক বিষম দুঃসংবাদ! বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হর্ষবর্দ্ধন, শৈব শশাঙ্ককে আক্রমণ করেছেন শুনে বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের প্ররোচনায় মগধ-বঙ্গের দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহীরা। শশাঙ্কের নিজের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত।

তিক্ত কণ্ঠে শশাঙ্ক বললেন, "দৈব প্রতিকূল! এর পরও আর সা[illegible] দেখা চলবে না। সেনাপতি [illegible]

[illegible] বাধা দিন, কিন্তু সৈন্য দিয়ে এখনি আমাকে ফিরে যেতে হবে বিদ্রোহ দমন করতে। গৃহশত্রুর চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। বৌদ্ধরা মুখে করে অহিংসার জয়গান, অথচ আমার প্রজা হয়ে তারাই করতে চায় আমাকে পিছন থেকে দংশন। কিন্তু এই বকধার্ম্মিকরা এখনো আমাকে ভালো ক'রে চিনতে পারেনি—আমি হচ্ছি ধ্বংসের দেবতা শ্মশানপতি শিবের শিষ্য। বৌদ্ধদের এমন শাস্তি দেব, যা তারা আর কোন দিনই ভুলতে পারবে না।"

[ক্রমশঃ।

নূতন ফাঁদ

শ্রীলতিকা গোস্বামী

ভূঃস্বর্গ কাশ্মীর—
ছিলে তুমি বিশ্ব মাঝে উচ্চ করি শির
আপন সৌন্দর্য্য-গরিমায়।
বসি' তব তরু-ছায়'
কত কবি গাহিয়াছে তব স্তুতি-গান
সৌন্দর্য্য-পূজারী কত করিয়াছে পূজা ঢালি' মন-প্রাণ;
সহসা আজিকে হায়
বাঁধ-ভাঙা প্লাবনের প্রায়
পাকিস্তানী জেহাদ নামিল তব বুকে,
ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার তব একে একে রূপান্তর হ'ল ভস্মস্তূপে।
ধ্বংস করি' চলিয়াছে "কাফেরের দল"
চতুর 'তৃতীয় পক্ষ' টিপিতেছে কল
বাজাইছে যুদ্ধের দামামা
তালে তালে নাচিতেছে হিন্দুস্থানী রামমূর্ত্তি-পাকিস্তানী গামা।
পঞ্চনদীর দেশ
ধরি রুদ্র-বেশ
যুগ-যুগান্তের গড়া সভ্যতা-ইমারৎ
দয়া, ধর্ম্ম, মানবতা, যা' কিছু মহৎ
দিল বিসর্জ্জন।
নগ্ন বর্ব্বরতা, করাল বদন
করিয়াছে পূর্ণগ্রাস ভগৎ সিং লাজপৎ দেশ
জালিয়ানওয়ালাবাগ-ঐতিহ্য আজ সকলি নিঃশেষ।
চার্চ্চিল, ট্রুম্যান আরো যত শকুনি-গৃধিনী
করে সবে কাণাকাণি
আসে বুঝি পুনরায় সে শুভ লগন
সাম্রাজ্য-মুকুট-মণি ভারত অমূল্য ধন
তারে কভু ছাড়া যায়?
শৃগালের প্রায়
সুযোগ-সন্ধানী যত শিকারী প্রবীণ
গণিতেছে দিন
উদর পূরিবে কবে?
আবার মা ভৈঃ রবে
ইউনিয়ন-জ্যাক-মার্কা মেকী স্বাধীনতা-জালে
টানিয়া লইবে পুনঃ সদ্যমুক্ত ভারতের নিজ মুষ্টিতলে?

এক মিনিটের গল্প

সেবাধর্ম

মনোজিৎ বসু

জনসেবাই ছিল মহাত্মাজীর ধর্ম। তাঁর কাছে পৃথিবীর সকল মানুষই ছিল সমান। তিনি মানুষের সেবা ক'রে ঈশ্বরের সেবা ক'রতে চাইতেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তাঁর অস্তিত্ব তো সকল কিছুর মধ্যেই। তাই, মানুষকে ভালোবেসে গান্ধীজী ঈশ্বরের করুণা লাভ করেছিলেন।

তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ধনি-দরিদ্র, শত্রু-মিত্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান—সকলকেই সমান চোখে দেখতেন। বরং সমাজে যাঁরা অবহেলিত, নিপীড়িত, অস্পৃশ্য, তাঁদের জন্যই তাঁর ছিল বেশী দরদ, স্নেহ ও করুণা। মানুষ যে মানুষকে ঘৃণা করতে পারে—এ ধারণাই ছিল তাঁর কাছে মর্ম্মান্তিক।

সে অনেক দিন আগেকার কথা।

গান্ধীজী তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেখানকার জুলুরা বিদ্রোহ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে, খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে। কিন্তু ইংরেজেরা হারবার পাত্র নয়। বিদ্রোহকে গোলা-গুলীর আঘাতে কি ভাবে দমন করা যায় তা তা'রা জানে। ফলে একটা খণ্ড-যুদ্ধ লেগে গেল। দলে দলে জুলুরা প্রাণ দিলো—আর আহত হ'তে লাগলো তার অনেক বেশি।

গান্ধীজী সেবা দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই বিদ্রোহের মাঝখানে। ছয় সপ্তাহের বেশি তিনি ডারবান শহরে এই সেবা-কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। জুলুদের দিকেই গান্ধীজীর ছিল সহানুভূতি। কারণ তিনি জানতেন—জুলুরা ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ করেছে। আহত জুলুদের তিনি নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা ক'রতে লাগলেন। গান্ধীজী ও তাঁর সেবা-দলকে দেখে আহত জুলুরা খুব খুশি হ'লো। তাঁদের অনেককে সাংঘাতিক ভাবে চাবুক মারা হয়েছিল। তার ফলে ঘা হয়েছিল তাদের। সেবা-শুশ্রূষার অভাবে সে ঘা এত দিন প'চে উঠেছিল। তাই, সেবাব্রতে দীক্ষিত এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে তারা কি খুশি না হ'য়ে থাকতে পারে?

গান্ধীজীর ক্যাম্পে ছিলেন এক জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি তাঁদের সেবা করবার পদ্ধতি ও যত্ন দেখে অবাক্ হ'য়ে যান। গান্ধীজীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—'গোরারা এই আহত জুলুদের সেবা করতে চায় না। জুলুদের তারা ঘৃণা করে। আমি একা কি করি? এদের ঘা প'চে যাচ্ছে—এমন সময় আপনারা এলেন। তাই মনে হচ্ছে, এই নির্দ্দোষ লোকগুলির উপরে ঈশ্বরের দয়া আছে।'

চিকিৎসকের মতো আহত জুলুরাও গান্ধীজীকে ঈশ্বর-প্রেরিত দূত মনে করেছিল। আর, গান্ধীজী কি ভেবেছিলেন, জানো? তিনি ভেবেছিলেন—'আমরা যদি না যেতাম, তাহ'লে অন্য কেউ জুলুদের সেবার ভার নিত না। ঈশ্বর আমাদের সেবা করবার এই সুযোগ দিলেন ব'লে নিজেদের 'আমরা সৌভাগ্যবান্ মনে করি।'

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এগার

অস্বীকার

মধ্যাহ্ন আহারের পর সুজিত যখন বিশ্রামের আয়োজন করছে, সুব্রতকে জামা গায়ে দিতে দেখে বিস্মিত ভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল : 'কি রে! এই দুপুর রৌদ্রে জামা গায়ে দিচ্ছিস্, কোথায়ও বেরুবি না কি?'

'হাঁ ভাই, একটি বার 'প্রাত্যহিক' অফিসে যাবো।'

'হঠাৎ প্রাত্যহিক অফিসে কেন? এখান থেকেও ত ফোন করতে পারিস্!

'না রে, ফোন করলে হবে না, পুরাতন প্রাত্যহিকের ফাইলগুলো একবার ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে।'

'কেন? পুরাতন প্রাত্যহিকে এমন কি সংবাদ লুকান আছে শুনি?'

'বন্ধু! বলা কি যায়? কত মাদুলী, কত খুন কত হারানো-প্রাপ্তি সংবাদ ওর পাতায় পাতায় রয়েছে।'

যাই হোক, সুব্রত গাড়ী নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

• • স্ট্রীটে প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের অফিস। প্রকাণ্ড পাঁচ-তলা ইমারৎ, রোটারী মেসিনের ঝর-ঝর-ঝর শব্দ শোনা যাচ্ছে, আগামী দিনের সংবাদ ছাপা হয়ে চলেছে…

প্রাত্যহিকের ছোটদের আসরের স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীযুক্ত চক্রবাবু পণ্ডিতুণ্ডি, সুব্রতর কিছু চেনা-পরিচিত। এক কালে অবিশ্যি বন্ধুত্বের দাবী রাখত, কিন্তু এখন পণ্ডিতুণ্ডি মহাশয় সে কথা স্বীকার করতে নারাজ।

বেঁটে খাটো গোল-গাল লোকটি, গায়ের রং শ্যাম বর্ণ! গাল দুটো ফোলা-ফোলা, চোখে কালো গাটাপার্চারের ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটের কোলে এমন একটুখানি সদাজাগ্রত হাসির মৃদু আভাষ, যার ভাবখানা, 'আমি লীলা করতে এসেছি, আবার লীলা করেই চলে যাবো। খন্‌খনে গলায়, মেয়েলী ধরণে কথা বলবার ঢং! একাধারে তিনি ভাবুক, কবি, ঔপন্যাসিক, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া। এবং সব চাইতে বড় কথা, তিনি এক জন 'কমিউনিষ্ট।'

সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখেই পণ্ডিতুণ্ডি মশাই সাদর আহ্বান জানালেন, 'আরে, এসো, এসো—রহস্যভেদী যে, তার পর হঠাৎ কি মনে করে?'

সুব্রত বসতে বসতে বললে, 'আর ভাই, তোমাদের সাহচর্য্যে সদা-সর্বদা আসা, এমন সৌভাগ্য কি আমার আছে?'

'শুনলাম, আজকাল তুমি না কি খুন-খারাপী, রাহাজানী, তথাবীয় যত সব আজে-বাজে ভৌতিক ব্যাপারে তদন্ত করে বেড়াচ্ছ?'

'কি আর করি বল, ভাই। তোমাদের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'মোটা বই' নিয়ে ত' [illegible] ভাই খুন-খারাপী নিয়েই মেতে আছি। তাছাড়া তোমরা অনাগত [illegible] দিচ্ছ, কিশোরদের নিয়ে [illegible] মহাচক্র গড়ে বেড়াচ্ছ, সে ক্ষমতাও আমাদের নেই।'

'হেঁ হেঁ।…[illegible] বোলেছো। [illegible] চা হবে না কি?'

'না ভাই, চায়ের জন্য ত' এখানে আসিনি, এসেছিলাম প্রাত্যহিকের পুরাতন ফাইল কতকগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে।'

'বেশ ত', ঐ যে পাশের ঘরেই ত পাকার করা আছে, যত খুশী নাড়া-চাড়া করো।'

সুব্রত গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে, নোট-বইয়ে কতকগুলো কি নোট করে সে যখন পাশের ঘর হতে বের হয়ে আসল, বেলা তখন প্রায় পৌনে চারটে। কলকাতার রাস্তায় জল দেওয়া সুরু হয়েছে।

বড় রাস্তার পরেই পোষ্ট অফিস, সেখানে গিয়ে কাকে একটা মস্ত বড় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে, সোজা লালবাজারে তালুকদারের ওখানে গিয়ে হাজির হল।

তালুকদার তার অফিস-ঘরেই ছিল, তার সংগে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কি সব কথাবার্ত্তা হলো। তালুকদার সুব্রতর কথাগুলো নোট করে নিল।

• • • •

কোন্নগরে সুজিতদের বাড়ীতে সুব্রত যখন এসে পৌঁছাল, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার সবে তখন দিনান্তের শেষ আলোটুকু নিজের আবছায়ার মধ্যে অবলুপ্ত করে নিয়েছে।

সুব্রত সোজা এসে সুজিতের ঘরে প্রবেশ করলে।

ঘরের মধ্যে সুজিত, অমূতোষ বাবুর ভাই সুবিমল বাবু ও সুজিতের মা ভগবতী দেবী বসে কি সব কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুজিতের মা বললেন, 'রোদে রোদে কোথায় ঘুরতে গেছিলে?'

'বেশীক্ষণ এক জায়গায় আমি কোন দিনই বসে থাকতে পারি না মাসীমা, সে ত' আপনি জানেনই। পিঁটে-পিঁটে আমার কেমন যেন আলসেমির খিল ধরে।'

সামনেই চায়ের ট্রে একটি ছোট টি'পয়ের 'পরে রক্ষিত!

সুব্রত একটা চেয়ারের 'পরে ঝুপ করে বসে পড়ে এক কাপ নিয়ে চা ঢেলে নিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সুব্রত বললে; 'আঃ! তার পর সুবিমল বাবু যে, কি সংবাদ?'

'সকাল বেলা হতে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্তও সংবাদ ভালই ছিল, দাদার মেজাজটাও ভাল ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার একটু আগে কে এক অনাহুত আগন্তুক এসে কি যে সংবাদ দাদার কাছে পেশ করলে, সংগে সংগে দাদারও মেজাজ গেল বিগড়ে।'

'কে আবার অনাহুত আগন্তুক এলো এর মধ্যে, আর কি এমন দুঃসংবাদই বা পেশ করলে সে?' সুব্রত বিস্মিত ভাবে সুবিমল বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'ওঃ, আপনি দুর্মুখের কথা বলছেন? লোকটার এক চোখ কাণা। আমি আর মালতী দাদার পাশের ঘরেই বসেছিলাম। লোকটা আসলে সাধারণ, অতি সাধারণ দেখতে, ময়লা একটা ধুতি পরা, গায়ে একটা জীর্ণ কালো রংয়ের আলপাকার কোট। পাশের ঘরেই দাদা বসে কি যেন করছিলেন, লোকটা এসে দাদার ঘরে বরাবর ঢুকে পড়ল, তার পর অনেকক্ষণ ধরে তাদের কি সব কথাবার্ত্তা হয়।

'কিছু কথাবার্ত্তা [illegible] শুনতে পারেন কি?' সুব্রত প্রশ্ন করে।

'না।'

'কিন্তু তাহলে বুঝলেন কি করে যে সংবাদটা শুভ ছিল না?'

'লোকটা চলে যেতেই আমি দাদার ঘরে গিয়ে ঢুকি, দেখি, দাদা একটা চিঠি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন, এবং তাঁর মুখের 'পরে চিঠিটা পড়তে পড়তে যে ভাবটা ফুটে উঠছিল, কোন ক্রমেই সেটাকে শুভ সংবাদ বলে মনে হয় না। মুখের ভাব দেখে তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, যেন সর্বস্ব তিনি হারাতে বসেছেন।'

'চিঠিটা কে লিখেছে কিছু টের পেলেন না?'

'সবটা টের না পেলেও কিছুটা পেরেছি, উপরে লেখা ছিল, **Secret police branch.**

'হুঁ!...এবং ঐ চিঠিটা পড়তে পড়তেই অত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।' সুব্রত কথাটা বলে নিঃশব্দে চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শংকর ঘোষের খুনের রহস্যের 'পরে চিঠিটা কোন আলোক-পাত করল না কি হে সুব্রত! হাসতে হাসতে সুজিত প্রশ্ন করে।

'না।'

'দেখুন সুব্রত বাবু, আমাদের বাড়ীটা যেন ক্রমেই আরো রহস্যময় হয়ে উঠছে। কিন্তু তাই বলে আপনি যদি আমার দাদা অমুতোষ বাবুকে এই খুনের ব্যাপারে সম্পর্কিত আছে মনে করে থাকেন, তবে কিন্তু বড্ড ভুল করবেন। আর যাই হোক, আমার তখনকার কালের বি-এ, বি-টি, দাদা যে অমন একটা জঘন্য ব্যাপারে জড়িত হবেন, এটা ভাবতেই পারি না।'

সুব্রত সুবিমল বাবুর কথায় হেসে ফেললে: 'না না!...সত্যি কথা বলতে কি, একটু আগে এবং এখনও খুনের কথা বা খুনীর কথা আদপেই মনে পড়েনি। ভাবছি সম্পূর্ণ অন্য কথা।'

আচ্ছা সুব্রত বাবু, আজ তাহলে উঠা যাক্। 'রাত হয়ে গেল।'

সুবিমল বিদায় নিয়ে চলে গেল।

• • •

পরের দিন দুপুরের দিকে সুব্রত সুবিমল বাবুর কাছ হতেই সংবাদ পেল, অমুতোষ বাবু অনেকটা সামলে নিয়েছেন। যে কুসংবাদটা (?) গত কাল সন্ধ্যায় তাকে বিচলিত করেছিল, সেটার কালো ছায়া তার মনের 'পর হতে উবে গেছে।

কিন্তু 'ভারতী ভবনে'র 'পরে যে একটা আশংকার কালো ছায়া নেমে এসেছে, সেটা যেন কিছুতেই সরে যাচ্ছে না।

অমুতোষ বাবুর মেজাজটাও যেন দিনকে দিন কেমনতর হয়ে উঠছে। কাউকেই ভাল-চোখে দেখেন না। প্রত্যেককেই যেন তিনি সন্দেহ করেন।

আসলে প্রথম দিকে এ-বাড়ীতে না কি তাঁর আসবারই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মালতী ও সুবিমলের বারংবার অনুরোধের জেরটা ঠেলতে না পেরেই, অবশেষে এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে রাজী হয়েছিলেন।

সেদিন্ সন্ধ্যা বেলা অমুতোষ বাবুর সংগে পুরাতন ভৃত্য সুখদাসের ত' রীতিমত বচসাই হয়ে গেছে। বাড়ীতে লোক এখন বেশী। সুখদাসের বয়েস হয়েছে, সে আর এত খাটতে পারে না। এত ঝামেলা এখন আর তার ভাল লাগে না।

প্রভু-ভৃত্যে না কি [illegible] হবার পর [illegible] অমুতোষ বাবুর ঘর হতে বের হয়ে এল, তার মুখের 'পরে সুস্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাব।

অমুতোষ বাবু স্পষ্টই বলেছেন, এমন উদ্ধত প্রকৃতির লোককে যত তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, ততই মংগল। এবং এক জন সুদক্ষ ভৃত্যের জন্য তিনি 'প্রাত্যহিকে' বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন।

• • • •

দিন দুই পরে এক জন আধা-বয়েসী লোক চাকরীর উমেদার হয়ে জমিদার-ভবনে এসে দেখাও দিল। লোকটার নাম কৈলাসচরণ। জাতিতে সদ্গোপ। বহু কাল কলকাতার নানা স্থানে সুনামের সংগে চাকরী করেছে।

বেঁটে-খাটো গোল-গাল চেহারা। মাথার আর্দ্ধেকটা জুড়ে সুবিস্তীর্ণ একটি চক্‌চকে টাক। চোখ দু'টি ছোট-ছোট কুত্‌কুতে।

অমুতোষ বাবুর লোকটাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

কৈলাসচরণ 'ভারতী ভবনের' চাকুরীতে বাহাল হলো।

• • • •

সুবিমল সুব্রতকে সে দিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলো। কিন্তু সুব্রতর একটু দেরীই হয়ে গেল বের হতে।

সুব্রত ইচ্ছা করেই ঘোরা রাস্তাটা ধরে গাড়ী চালাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় অসীম বাবুর বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাল।

চওড়া রাস্তাটা কিছু দূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। তার পরই সুরু হয়েছে অপ্রশস্ত কাঁচা মাটির পথ। দু'পাশে ঘন সন্নিবেশিত আম ও লিচু গাছ, দিনান্তের শেষ রক্তিম রশ্মি দূর-দিগন্তের কোল ছুঁয়ে যেন বিদায়-নতি জানাচ্ছে। আসন্নবর্তী সন্ধ্যার ম্লান ধূসরতায় সমগ্র প্রকৃতি যেন বিষণ্ণ-বিধুর হয়ে উঠছে।

সহসা ক্রিং-ক্রিং শব্দে বেল বাজাতে বাজাতে একটা সাইকেল সুব্রতর গাড়ীর সামনে এসে পড়ল পাশের আম-বাগান হতে।

সুব্রত চমকে গাড়ীর ব্রেক্ কষতে গিয়ে দেখে, সাইকেল-আরোহী অন্য কেউ নয়, স্বয়ং সুশান্ত।

'আরে সুব্রত বাবু যে, এই আঘাটায় কি মনে করে?' সুশান্ত সাইকেল হতে নামতে নামতে সুব্রতকে প্রশ্ন করে।

'একই প্রশ্ন ত' আমিও করতে পারি মশাই?' সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

'ঐ পাড়ায় এসেছিলাম একটা ইন্‌কোয়ারী করতে।'...সুশান্ত আংগুল তুলে অদূরে কতকগুলো বাড়ী দেখিয়ে দেয়।

ঐ বাড়ীগুলোর মধ্যেই অসীমের বাড়ীটা দেখা যায়।

সহসা সুব্রতর চোখের দৃষ্টিটা প্রখর হয়ে উঠে। কে ও অসীমের বাড়ী হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে-মাঠের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে?

অত দূর থেকেও সুব্রতর দৃষ্টিতে লোকটার পরিচয় কিন্তু গোপন থাকে না। তার মুখ দিয়ে-তার অজ্ঞাতেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ যেন আচমকা বের হয়ে আসে, 'আরে আশ্চর্য্য!...

'কি আশ্চর্য্য!'...চকিতে সুশান্ত সুব্রতর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাতেই চলমান লোকটিকে দেখতে পায়।

'কিছু না, এক জন লোক চলে যাচ্ছে।'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি আমিও, কিন্তু ও লোকটা জমিদার-বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সুখদাস না?'

'হুঁ, সেই রকমই ত মনে হচ্ছে ।'

'কিন্তু আশ্চর্য্য ! ও লোকটার এদিকে কি দরকার পড়ল !'

'মনে হলো, যেন ঐ একতলা বাড়ীটার থেকেই বের হয়ে এল ।'

'বাড়ীটায় আশুতোষ বাবুদের মিলের এক জন কর্মচারী অসীম রায় নামে এক ভদ্রলোক ও তার ছোট ভাই সুসীম রায় থাকেন । এখানে ওরা নবাগত । ওদের সম্পর্কে বিশেষ কোন কিছুই জানি না । একটু-আধটু যা শুনেছি, ছোট ভাই সুসীম প্রায়ই এখানকার ক্লাবে যায় ও কালীতারা রেষ্টুরেন্টের এক জন নিয়মিত চা-সেবী । কিন্তু কথা হচ্ছে, ওদের সংগে জমিদার-বাড়ীর এক জন-পুরাতন ভৃত্যের কি যোগাযোগ থাকতে পারে ?'

'প্রশ্নটা নিজেকেই নিজে করুন না সুশান্ত বাবু ।'

'সুব্রত বাবু, সত্যি কথা বলতে কি, আমার স্থির বিশ্বাস, আপনি এ কেসটা সম্পর্কে আমাকে যতটুকু বলেছেন, তার চাইতেও অনেক বেশী কিছু বলবার হয় ত ছিল । আপনি হঠাৎ এ সময়ে এখানেই বা কেন ?'

'শুনুন, সুশান্ত বাবু, আপনাকে আর তবে বিশেষ কিছু গোপন করবো না । আমার কেমন যেন একটু মনে সন্দেহ হচ্ছে । একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন, সুখদাস অসীম বাবুর ওখানে যাতায়াত করে কেন ?'

'নিশ্চয়ই, এখনই যেতে পারি বলেন ত ?'

'না, আজ দরকার নেই, আমি নিজেই এখন ওদের ওখানে যাচ্ছি, তবে ভবিষ্যতে একটু নজর রাখবেন ।'

'বেশ, আজ তাহলে চলি । আবার কবে দেখা হবে আপনার সংগে ?'

'কোন একটা নির্দিষ্ট পথ পেলেই আপনাকে আমি জানাব মিঃ সেন ।'

সুশান্ত বাবু সাইকেলে আরোহণ করলেন ।

সুব্রত গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে অগ্রসর হলো । অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে আসছে, দু'তিন হাতের মধ্যে কিছুই নজরে আসে না ।

অসীমের বাড়ীর দরজার কাছে আসতেই, রাস্তার ধারেই যে ঘরটা, সেই ঘরটা হতেই যেন ক্রুদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'তোমার জেদের জন্যই সব পণ্ড হতে বসেছে দাদা ! তোমার ধারণা, এ ব্যাপারে আমি হাত দিলেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে । আসলে তোমার অতিবুদ্ধির জন্যই সব এমন বিশ্রী ভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে । তোমার ভুলের জন্যই ওই লোকটা সেটা পেয়ে গেল । তার পর, তুমিই আবার ঐ লোকটাকে এখানে ডেকে নিয়ে এলে । একবারও ভেবে দেখছো কি, ওই লোকটা আমাদের এখানে আসবার সময় কেউ যদি তাকে দেখে থাকে, তবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? তোমার ধারণা, যত বুদ্ধি একমাত্র ভগবান তোমার মাথাতেই ভরে দিয়েছেন, আর দুনিয়ার যত গরুর গোবর, সব আমার মাথার মধ্যে !'

'তুমি থামবে সুসীম ! গাধার মত চেঁচাচ্ছ কেন ?'

সুব্রত এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিল ।

দরজায় ধাক্কা পড়বার সংগে সংগেই ঘরের ভিতরকার বাক্‌-বিতণ্ডা যেন আচমকা থেমে গেল, এবং একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল ।

খোলা দরজার সামনেই একটা ধূমায়িত হ্যারিকেন বাতী হাতে দাঁড়িয়ে সুসীম ।

সুসীমকে বলতে গেলে সুব্রত এই প্রথম দেখলে ।

রুগ্ন মেয়েলী ঢংয়ের গড়ন । মুখটা সরু লম্বা, মাথার চুলগুলো সযত্নে ব্রাস করা । পরিধানে পরিষ্কার জামা কাপড় ।

'কাকে চান আপনি ?'

'অসীম বাবু, বাড়ী আছেন ? তার সংগে একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল ।'

বলতে বলতে এক প্রকার বিনা আহ্বানেই সুব্রত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় সুব্রতর গলার স্বর চিনতে পেরে অসীম দুই ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজাটার 'পরে এসে দাঁড়িয়েছে ।

'এই যে অসীম বাবু, নমস্কার ! সুব্রতর ঠোঁটের কোণে সুস্পষ্ট হাসি ।

অসীমের চোখে-মুখে একটা বিরক্তির সুস্পষ্ট রেখা ।'

'দেখুন, সেদিন রাত্রে 'ভারতী ভবনে' আপনি কিছু হারাননি ত ?'

'সংগে আমার কোন দিনই এমন কোন মূল্যবান জিনিষ থাকে না, যা হারাতে পারি !'···সুস্পষ্ট বিরক্তি যেন ঝরে পড়ে অসীমের কণ্ঠস্বর হতে ।

'দাদা, কি তোমার স্বভাব বল ত' ? মেজাজ ছাড়া কি কারো সংগেই কথা বলতে পারো না ?' তার পর সুব্রতর দিকে ফিরে তাকিয়ে সুসীম বলল, 'আপনারই নাম বোধ হয় শ্রীযুক্ত সুব্রত রায় ? দাদার কথায় কিছু মনে করবেন না, সুব্রত বাবু ? বসুন—বসুন !'···

সুসীমের ব্যবহারে সুব্রত কম বিস্মিত হয় না । যা হোক, সে সামনের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে ।

'হাঁ, আপনি যেন একটু আগে কি বলছিলেন, সুব্রত বাবু ?' সুসীম বলে চলে, দাদা সে রাত্রে 'ভারতী ভবনে' কোন কিছু হারিয়েছেন কি না ?'

'আমি কিছুই হারাইনি ।' অসীম জবাব দেয় ।

'মিথ্যা কথা বলা বা 'ভাঁওতা' দেওয়া আমার পেশা নয় অসীম বাবু, সত্যিই আপনি কিছু সে রাত্রে 'ভারতী ভবনে' ফেলে এসেছেন ।'

আচমকা যেন ঘরের মধ্যে একটা মৃত্যুর মতই ঠাণ্ডা আকস্মিকতা নেমে আসে । চকিতে দুই ভাই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, এক জনের চোখে বিস্ময়, আর এক জনের চোখে লজ্জা !

'আপনার চশমাটা আপনি ফেলে এসেছিলেন তাড়াতাড়িতে অসীম বাবু, এই নিন্ আমি কুড়িয়ে এনেছি ।' বলতে বলতে সুব্রত পকেট হতে রংগিন কাচের চশমাটা বের করে অসীমের দিকে তুলে ধরে ।

ততক্ষণে দুই ভাইয়ের মধ্যে যে আচমকা বিস্ময়টা জেগে উঠেছিল, কেটে গেছে ।

'ধন্যবাদ !' অসীম হাত বাড়িয়ে চশমাটা নিল ।

'আমাদের এ-বাড়ীতে কেউ-ই বড় একটা আসে না সুব্রত বাবু, বলতে গেলে আপনিই আমাদের বাড়ীর প্রথম অতিথি, আপনি চলে যাবেন না, বসুন, আমি চা করে আনি ।'

'না না, এ সময় আবার চা কেন ?'

না, চা আপনাকে খেতেই হবে, দেখবেন, আমি চমৎকার চা বানাতে পারি।'

সুসীম ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুব্রত চেয়ারের 'পরে বসে, সামনেই দাঁড়িয়ে অসীম। কারো মুখে কোন কথা নেই।

অসীমই প্রথমে কথা বললে, 'তার পর আজ আবার হঠাৎ কি মনে করে এ অধমের কুটীরে পদার্পণ করেছেন সুব্রত বাবু, জানতে পারি কি? নিশ্চয়ই এ সামান্য একটা চশমা ফেরত দিতেই এ সময়ে আমাদের কুটীরে আসেননি। আর যদি ভেবে থাকেন, সে কথাটা আমি সহজে বিশ্বাস করবো, তা হলে মস্ত বড় ভুলই করেছেন।'

'যাক্, ব্যাপারটা তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল,' সুব্রত প্রচুর হাসতে থাকে।

অসীম সুব্রতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেও হেসে ফেলে। এবং হাসতে হাসতেই বলে, 'আচ্ছা সুব্রত বাবু, আমার পিছনে এ ভাবে কেউ লেগেছেন কেন বলুন ত'? আপনার কাছে আমি এক জন অত্যন্ত সন্দেহজনক লোক। এটা আমি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্যিই যদি তাই আমাকে ভেবে থাকেন, তবে পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছেন না কেন?'

দেখুন অসীম বাবু, ব্যাপারটা তাতে এতটুকুও সহজ হয়ে আসবে না, লাভের মধ্যে তারা হয় ত' আপনাকে ফাঁসীর দড়িতে লটকে দেবে।'

সুব্রতর কথায় সহসা যেন অসীমের মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়; কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে বলে: 'আপনি পুলিশের পক্ষেই কাজ করেছেন, কেমন না? আপনি সে কথা অস্বীকার নিশ্চয়ই করবেন না। এবং আমিও জানি, সে কথা সত্যি! এবং এখনও আপনার ধারণা, শংকর ঘোষের খুনের মধ্যে আমার হাত আছে?...বেশ ত', তাই যদি হয়...'

সুব্রত অসীমকে বাধা দিল, আপনি কি সত্যিই অস্বীকার করতে পারেন অসীম বাবু, শংকর ঘোষের খুনের সংগে আপনার কোন সম্পর্কই একেবারে নেই?' সুব্রতর প্রশ্নটা যেন সহসা তীব্র একটা আলোর রশ্মির মতই অসীমের মনের কবাটের 'পরে আঘাত করে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অসীম সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতেও সুব্রত সুস্পষ্ট দেখতে পায়, মুহূর্তে যেন অসীমের মুখটা আবার ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একটা ভয়, সন্দেহ, উত্তেজনা যেন পর পর অসীমের মুখের প্রতি রেখায় রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন মতে একটা ঢোক গিলে অসীম চাপা-গলায় প্রশ্ন করে: 'তার মানে? কি আপনি বলতে চান সুব্রত বাবু?'

'আমি বলতে চাই, সে রাত্রে আপনি শংকর ঘোষের সংগে ঐখানে দেখা করতে গেছিলেন?'

'না।'...তীব্র কণ্ঠে অসীম জবাব দেয়।

'মিথ্যা কথা বলবেন না অসীম বাবু! কেন না, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভই নেই। শুনুন, শংকর ঘোষের সংগে কোন মূল্যবান জিনিষ ছিল, যেটা আনতে আপনি ঐ সময় তার সংগে দেখা করতে গেছিলেন। এবং সেই মূল্যবান কোন জিনিষের জন্যই বেচারী শংকর ঘোষকে অমন নৃশংস ভাবে নিহত হতে হয় আপনার পৌঁছাতে দেরী হয়ে গেছিল অসীম বাবু।'

'না, আপনার অনুমান ভুল সুব্রত বাবু! আপনার ধারণা অনুযায়ী আপনার হাতে কোন প্রমাণই নেই।'

'আছে, অসীম বাবু, আছে! যথাসময়ে জানতে পারবেন,' বলতে বলতে সুব্রত উঠে দাঁড়ায়। এবং অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অত ভয় পাবার কিছু নেই অসীম বাবু! আপনাকে আর আমার এ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই; যে সূত্রটির জন্য আজ এখানে আমি এসেছিলাম, তা আমার মিলে গেছে, এবং বাড়ীটাও, আশা করছি, শীঘ্রই খুঁজে বের করতে পারবো। হয় ত সব কিছু রহস্যই আমি অনায়াসেই ভেদ করতে পারতাম ঢের আগেই, যদি আমাকে সামান্য দু'-চারটে সংবাদ দিতে আপনার এতটা ঘোর আপত্তি না থাকত!

'সংবাদ? কি সংবাদ দেবো আমি! তা'ছাড়া কি আপনি মনে করেন যে, রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, শুনি?'

'সে আপনি একটু চিন্তা করলেই, বুঝতে পারবেন অসীম বাবু, বিশেষ কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি, নমস্কার! সুসীম বাবুকে বলবেন, আর এক দিন এসে না হয় তার হাতের তৈরী চা খেয়ে যাবো। অবিশ্যি আপনার যদি না আপত্তি থাকে!' হতবাক্ অসীমের দৃষ্টির উপর দিয়েই সুব্রত তড়িৎপদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশিয়ে যায়।

অসীমের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না।

একটু পরেই সুসীম ছোট একটা ট্রের 'পরে তিন কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

'এ কি! সুব্রত বাবু কোথায় গেলেন দাদা?'

'চলে গেলেন।'

চায়ের ট্রেটা সামনের গোল টি'পয়টার 'পরে রাখতে রাখতে সুসীম বললে, 'তোমার ব্যবহারেই তিনি দুঃখিত হয়ে চলে গেছেন নিশ্চয়ই। যাক গে, আমার আর কি! ঐ জন্যই ত' আমাদের এ-বাড়ীর ছায়াও কেউ মাড়ায় না।'

[ক্রমশঃ

সোণার বল

শ্রীইন্দিরা দেবী

রাজকুমারী সুচেতা, তোমাদের মত ফুটফুটে সুন্দর, চুলগুলি সোণালী আর চোখ দু'টি নীল। দেখলেই চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। রাজার তো আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই—তাই সুচেতার খুব আদর, আদরে আদরে কিন্তু সুচেতা খারাপ হয়ে যায়নি। তোমাদের মত সুন্দর আর ভালো মন তার।

এক দিন সুচেতা রাজপ্রাসাদের বাইরে যে বাগান সেই বাগানে বসে সোণার বল নিয়ে খেলা করছে। খেলতে খেলতে বলটা অনেক দূরে গিয়ে পড়লো। সুচেতা আবার ছুটলো সেখানে, আবার তাকে তুলে আনলো, আবার উঁচুতে তুলে তুলে খেলতে লাগলো। এইবার বলটা গিয়ে পড়লো বেশ দূরে, যেখানে এক ফাজি রূপোর মত নদী

এঁকে-বেঁকে চলে গেছে অনেক দূর—সেই নদীর এক প্রান্তে কোথায় ছিটকে গেল বলটা, অনেক খুঁজেও সুচেতা বল পেলো না।

—ও মা, কি হবে? সুচেতা কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সত্যি তো, ওর অমন সুন্দর বলটা, ওটা যে ওর ভারী পছন্দ, কাজেই যখন কিছুতেই পেলে না, তখন অনেক দুঃখে কান্না ছাড়া সুচেতা কি করবে বল? তোমরা হলে কি করতে? কাজেই সুচেতা নদীর ধারে বসে খুব কাঁদছে। নদীর জলে তার চোখের জল মিশিয়ে যাচ্ছে।

কোথায় ছিল একটা ব্যাঙ, থপ্-থপ্ করে লাফিয়ে এলো সুচেতার কাছে, বললে: তুমি এমন করে কাঁদছো কেন গো রাজকন্তে? কি হয়েছে তোমার?

সুচেতা তার সিল্কের জামার একাংশ দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললে: আমার সোণার বলটা কোথায় পড়ে গেছে, বোধ হয় নদীর ভিতর চলে গেছে, আমি এখন কি করি?

ব্যাঙ বললে: ওঃ, এই, তা তুমি চুপ কর, আমি এখনি তোমায় বল এনে দিচ্ছি।

সুচেতার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললে:—দেবে? দাও না ভাই লক্ষীটি।

—নিশ্চয়ই দেবো, কিন্তু তার আগে তোমায় একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—নিশ্চয় করবো, কি প্রতিজ্ঞা বল?

—আমি বলটা এনে দিলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ।

—শুধু নিয়ে যাওয়া নয়. আমার সঙ্গে একসঙ্গে খাবে, এক বিছানায় শোবে—বল?

সুচেতা তখন বলের জন্ত অধীর হয়ে উঠেছে, বললে: হ্যাঁ, সব আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

ব্যাঙ থপ্-থপ্ করতে করতে চলে গেল আর একটু পরে সোণার বলটা মুখে করে এনে দিতেই, সুচেতা বলটা নিয়ে দে ছুট, একেবারে রাজপ্রাসাদে।

ব্যাঙ পিছন থেকে ডাকছে: রাজকন্তে, শুনে যাও, শুনে যাও—আমি অত জোরে ছুটতে পারি না, তুমি এসো, আমায় নিয়ে যাও। রাজকন্তে···।

আর রাজকন্তে!—সে তখন পৌঁছে গেছে রাজপ্রাসাদে। বলটা যতক্ষণ পায়নি তখন ভেবেছিল ব্যাঙকে নেবে, একসঙ্গে খাবে—কিন্ত বলটা পাওয়ার পর ব্যাঙের কুৎসিত চেহারার দিকে চেয়ে সুচেতা আর ভাবতে পারে না।

ছুটতে ছুটতে সুচেতা ভাবছিল, কোনো রকমে বাড়ী পৌঁছে গেলে কে আর তার নাগাল পাবে?

আর বাড়ী পৌঁছে সুচেতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, উঃ, ঐ কুৎসিত ব্যাঙকে নিয়ে খাওয়া আর শোওয়া? অসম্ভব!

সেই দিন রাত্তে যখন সবাই খেতে বসেছে, এমন কি সুচেতার বাবা রাজা মশাই পর্য্যন্ত। সকলে মিলে খাওয়া হচ্ছে আর গল্প হচ্ছে। এমন সময়ে ব্যাঙের কথা শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে থপ্-থপ্ আওয়াজ। সুচেতা ভয়ে নীল হয়ে গেছে—সে ভাবতেই পারেনি, ব্যাঙটা তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসবে। সুচেতা তাড়াতাড়ি উঠে সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

রাজা মশাই আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে, দরজা বন্ধ করছো কেন? আর তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন সুচেতা?

সুচেতা তখন তার বাবাকে সব কথা বললে। সমস্ত শুনে রাজা-মশাই বললেন: তুমি যখন ব্যাঙকে কথা দিয়েছিলে, তখন অবশ্যই তোমার উচিত ছিল তাকে সঙ্গে করে আনা। যখন আননি, তখন—এখন যাও, ব্যাঙকে নিয়ে এসো, তার সঙ্গে খেতে হবে। কথা দিয়ে কথা না রাখার মত পাপ বা অন্তায় আর কিছুতে নেই। যাও, দরজা খোলো, নিয়ে এসো।

অগত্যা সুচেতা আর কি করে, নিয়ে এলো ব্যাঙকে ডেকে। ব্যাঙ যখন তার সোণার থালা থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছে, তখন ঘৃণায় সুচেতার সারা দেহ কুঁকড়ে উঠছে। ব্যাঙ বললে, খাও রাজকন্তে, চুপ করে আছ কেন?

বিরক্ত মুখে সুচেতা বললে: তুমি খাও, আমার পেট ভরে গেছে।

ব্যাঙ বেশ পেট ভরে খেয়ে নিলো তার মোটা বিচ্ছিরী পেটটা ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠেছে। সে আর নড়তে পাচ্ছে না, অতি কষ্টে রাজকন্তেকে বললে: আমায় তুলে নিয়ে চলো তোমার বিছানায়—আমি নড়তে পাচ্ছি না।

সুচেতার মুখে ঘৃণার একটা ভাব ফুটে উঠেছে, ব্যাঙের গায়ে সে কিছুতেই হাত দেবে না, এমন কি, বাবা যদি বকেন তবুও না।

সুচেতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তার পর চলে যাবার জন্ত পা বাড়াতেই রাজা মশাই গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন: সুচেতা, ব্যাঙকে উঠিয়ে নিয়ে যাও।

সুচেতার যতই রাগ হোক, ঘৃণা হোক, ঐ আদেশকে সে কিছুতেই অমান্ত করতে পারে না। অগত্যা বাঁ হাতে করে সে ব্যাঙকে তুলে নিয়ে তার ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তার পর নিজের নরম আর সুন্দর বিছানাতে শুয়ে পড়লো।

ব্যাঙ বললে: সুচেতা, আমায় উঠিয়ে নাও তোমার বিছানায়, আমি কি মাটিতে শুয়ে থাকবো?

রাগে ফেটে পড়ে সুচেতা বললে: অনেক সহ্য করেছি বাবার জন্তে, তোমাকে কিছুতেই আমার বিছানায় শুতে দেবো না।

কিন্ত তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, ভুলে যাচ্ছ, ব্যাঙ বললে।

নিশ্চয়ই, ব্যাঙকে তোমার বিছানায় শুতে দিতে হবে, এ কথা বলে রাজা মশাই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সুচেতা কি করবে, বিরক্ত মুখে ব্যাঙকে উঠিয়ে বিছানায় এক কোণে ফেলে রাখলে।

তার পর নিজের বিছানায় শুয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত কেটে গেছে। সকালে সুচেতা উঠে পালঙ্ক থেকে নামতে যাবে, দেখে বিছানায় এক কোণে এক জন রাজপুত্র বসে আছে।

সুচেতা অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখলো।

রাজপুত্র হেসে বললে: তুমি ভাবছো, একটা ব্যাঙকে বিছানায় শোয়ালাম—আর সে হয়ে গেল মানুষ?

সুচেতা এত অবাক্ হয়েছে যে কথা বলতে পারছে না।

রাজপুত্র আবার বললে: অনেক দিন ব্যাঙ হয়ে নদীর জলে বাস করেছি। কত দিন তার হিসেব নেই। শিকার করতে এসে এক

ডাইনী বুড়ীর কাছে পড়ি। সে আমায় ব্যাঙ করে দিয়েছিল আর বলেছিল, যদি কখনও কোনো রাজার মেয়ে তোমায় সঙ্গে খায় আর শোয়, তবেই তুমি আবার মানুষ হবে। কিন্তু তোমার যা ঘেন্না আমাকে, উঃ !

সুচেতা খুব লজ্জা পেয়েছে—সে কি আর জানতো, একটা নোংরা ব্যাঙ হঠাৎ রাজপুত্তুর হয়ে যাবে। সুচেতা তার বাবাকে গিয়ে সব বললে।

* * * *

তোমরা ভাবছো, এই বিজ্ঞানের যুগে এ সব আবার কি ? কিন্তু এ তো আজকের কথা নয়, বহু শতাব্দী আগের ঘটনা। ইচ্ছে না হলে বিশ্বাস করো না। তবে হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। রাজপুত্তুরের সঙ্গে রাজা মশাই সুচেতার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

গুস্তাভ্ ফ্লবেয়র

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পারী শহরে একটি তরুণ আইন পড়িতে আসিল। লাজুক, সুদর্শন, দাম্ভিক, ভাবপ্রবণ সে। লাল ফ্লানেলের শার্ট আর নীল আলখাল্লায় তাহাকে কোনও গ্রীক্ দেবতার মত দেখাইতেছিল। অল্পই সে কথা বলিত, কিন্তু যাহা বলিত তাহাতে মধু ও হুল দুই-ই থাকিত। যে কোনো সংস্কারের প্রতিই সে ছিল খড়্গহস্ত। তাহার কাছে সকলে, সে নিজেও, এক একটি মূর্খ। সে বলিত, "ঘুম থেকে উঠে প্রথমে যে উজবুকটিকে দেখি, সে আমি নিজেই, সকালে যখন আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে যাই।"

ছাত্রেরা উৎসুক হইয়া উঠিল। কে এই অদ্ভুত যুবক ?

—"ফ্লবেয়র। গুস্তাভ ফ্লবেয়র। ওর বাবা রুয়াঁর হাসপাতালে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক।"

একটি ছাত্র ফ্লবেয়রকে বলিয়াছিল, এত বড় লোকের ছেলে হইলে না জানি কেমন লাগে !

—"কী অসাধারণ লাগে শুনি ?"

—"কেন, তোমার বাবা কত লোকের প্রাণরক্ষা করেন।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ফ্লবেয়র উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আমার বাবা এই সব নির্বোধদের বাঁচিয়ে তোলেন, যাতে ভবিষ্যতে এরা আরও বোকামি করবার সুযোগ পায়।"

২

বরাবরই তিনি একটু অদ্ভুত—জীবনের বিষাদঘন, অর্থাৎ 'মর্বিড' দিক্‌টাতেই তাঁহার অনুরাগ বেশী। শৈশবে না কি তিনি বাপের হাসপাতালের পাঁচিলে বসিয়া 'মর্গ'এর মধ্যে মড়াগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতেন, উন্মাদ ও জড়বুদ্ধি লোক দেখিতেও না কি তাঁহার বিশেষ ভালো লাগিত।

তা'ছাড়া, তেরো বছরের পূর্বেই নিজে নাটক রচনা করিয়া, ভগিনীর সহিত অভিনয় করিতেন নিজেদের নাট্যমঞ্চে—অর্থাৎ খাইবার টেবিলে। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একখানা উপন্যাসও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, আর তৎসহ দু'টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—নাট্যকার কর্নেই এবং অজীর্ণ রোগ সম্বন্ধে।

কিন্তু এ সব খুব গোপনে করিতে হইত—বাপ দেখিতে পাইলে আর রক্ষা ছিল না। ডাক্তার ফ্লবেয়র সাহিত্যকে দু'চোখে দেখিতে পারিতেন না। বড় হইয়া পুত্র নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস যখন তাঁহাকে শোনাইতে যান, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। "সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম আমাদের ফ্লবেয়রদের—আমাদের কেউ কবি বা ছন্নছাড়া হবে, এ আমরা চাই না।"

অতএব সম্ভ্রান্ত এক বিদ্যালয়ে গুস্তাভকে ভর্তি করা হইল—সেখানে আট বৎসর ধরিয়া তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সাহিত্য রচনা করিলেন আর সহপাঠীদের পরিহাস-বাণে জর্জরিত করিলেন। শেষে আঠারো বছর বয়সে তিনি পিতাকে পরিষ্কার জানাইলেন, তিনি ডাক্তার হইবেন না।

বাপকে মোটেই অবুঝ বলা চলে না। তিনি বলিলেন, বেশ, ডাক্তার না হইলে উকিল হও; তিনি পুত্রকে প্যারীতে পাঠাইলেন আইন শিক্ষার জন্য।

কিন্তু গুস্তাভ নাছোড়বান্দা। "আমি লেখক ছাড়া আর কিছুই হব না। সিসিলির জলদস্যুদের রক্ত আমার দেহে বইছে,…" আর তাহাদেরই মত মনুষ্যচরিত্রের গভীর তলদেশ হইতে রত্নাহরণের উদ্দেশ্যে তাঁহার যাত্রা সুরু হইল।

বাপ ছেলের আশা ত্যাগ করিলেন। স্বস্তি পাইয়া গুস্তাভ আইনের বই ফেলিয়া 'দন্ কিয়োতে' (ডন্ কুইক্‌সোট্) লইয়া বসিলেন। এই গ্রন্থখানিই ফ্লবেয়রের নিকট বাইবেলের মত কাজ করিতে লাগিল। তিনি আরও জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, মানুষ শয়তান বলিয়াই যে এত দুঃখ-দুর্দশা, তাহা নয়, আসল কথা, মানুষ নির্বোধ। ইহা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কয়েকখানি উপন্যাস ও নাটক লিখিলেন, তাহার নায়কেরা কেহ আপনার আত্মা হারাইয়া ফেলিয়াছে, কেহ বা মৃগীরোগী, জীবন্ত অবস্থায় তাহার সমাধি হইল—কাহারও বা মা মানুষ, বাপ বানর—সকলগুলিই অস্বাভাবিক এবং অপরিণত—নিজের ও বন্ধুগণের চিত্তবিনোদনার্থে রচিত।

এই বন্ধুগুলি ছিল ফ্লবেয়রের চেয়েও ঘোরতর নৈরাশ্যবাদী। 'আমরা কল্পনা-পাগল কয়েক জন যুবক এক অদ্ভুত জগতে বাস করিতাম—উন্মত্ততা ও মৃত্যুর মাঝখানে আমরা পথ বাছিয়া লইয়াছিলাম—ইহাদের কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছিল—কেহ শয্যায় সুপ্ত অবস্থায় মরিয়া পড়িয়াছিল—এক জন গলবন্ধের সাহায্যে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল—কেহ বা চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মদ ধরে।'

ভাগ্যক্রমে ফ্লবেয়রকে এরূপ চরম কিছু করা হইতে রক্ষা করিলেন, অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অপর তিনটি বন্ধু—অর্নেস্ৎ শেভালিয়ে, আল্‌ফ্রেদ্ পোয়াতেভাঁ, আর মাক্‌সিম্ দুকাম্। ইঁহাদের মধ্যে পোয়াতেভাঁর ভগিনীই মপাসাঁর মা। আর দুকাম্ই প্রথম ফ্লবেয়রকে নিভৃত কোণ হইতে টানিয়া জন-সমুদ্রতীরে বাহির করেন—সঙ্গে করিয়া ভ্রমণে লইয়া যান প্রাচ্য দেশে।

'এ অভিজ্ঞতার কথা আমি কখনও ভুলিব না—কত বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রস—মিশর, নীলনদ, সিরিয়া, প্যালেস্‌টাইন, রূলতা, কন্‌স্তান্তিনোপল…যে গিরিশিখরে পিরা
নিকট আসিয়া আমি পূর্ববেগে ঘোড়া ছুট

তাই করিল—সে গভীর মহিমা দেখিয়া আমি কেমন হইয়া পড়িলাম—তখন সূর্যাস্ত। তাহারই রক্তিম বর্ণচ্ছটায় স্নান করিয়া উঠিল পিরামিড, তিনটি।

তিন পিরামিড, তিন বন্ধু, আর এক প্রেয়সী—এই হইল ফ্লবেয়রের সম্বল। প্রিয়া লুই কোলে সামান্ত কবিত্ব এবং অসামান্ত সৌন্দর্যের জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম দেখাতেই ফ্লবেয়র তাঁহার হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন এই রমণীর চরণতলে।

কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই। প্রথমতঃ, বৃদ্ধা বিধবা মাতার অসম্মতি। সমস্ত পুত্রস্নেহ ঢালিয়া তিনি একাই তাঁহাকে ভালবাসিতে চাহিয়াছিলেন, অন্ত কোনও নারী তাহাতে ভাগ বসাইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্লবেয়র বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রেয়সীকে সব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কেবল দেহের অধিকার বাদে। এ দেহ তো তাঁহার ছায়া মাত্র, কল্পনার রাজ্যেই তাঁহার সত্য পরিচয়।

তাহা সত্বেও লুইয়ের প্রভাবে তাঁহার পরবর্তী জীবন প্রভাবিত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রেরণায় নিজের রচনা-ভঙ্গীকে তিনি মার্জিত করেন এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকার্যে নামেন।

কিন্তু তার পরেই তাঁহার জীবন হইতে তিনি ইহাদের ছায়ার মত সরাইয়া দেন—বন্ধু-বান্ধবী সব। নিভৃত নিঃসঙ্গ মৌন মূক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন—তাহাই সম্বল করিয়াই বাঁচিয়া রহিলেন। লুইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইল, বন্ধুত্রয়ের সঙ্গেও তাই। সুহৃত্তম দুকাম্ যখন কোনও বইয়ের প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দিতে আসিলেন, ফ্লবেয়র উত্তর দিলেন, 'তোমার নিজের জিনিষগুলো ছাপাও বলে তোমাকে দোষ দিই না। আর আমার বইয়ের প্রকাশের বিষয়ে উপদেশ দিতে আসায় তোমার যে সহৃদয়তা প্রকাশ পেয়েছে, সে জন্ত ধন্তবাদ। কিন্তু আমার মঙ্গল নিয়ে তোমাদের মাথা-ঘামানোর বাতিক কিঞ্চিৎ হাস্তকর। আমরা দু'জনে আর একই পথের পথিক নই। আমরা পাড়ি দিয়েছি দুই ভিন্ন তরীতে; কামনা করি, ভগবান্ যেন উভয়কেই স্ব স্ব লক্ষ্যে নিয়ে যান—তোমাকে নিরাপদ বন্দরে, আমাকে উন্মুক্ত সমুদ্রের মাঝখানে।'

অতঃপর বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-পরিজন সবাইকে ছাড়িয়া তিনি দুস্তর, মুক্ত সাহিত্য-সমুদ্রের উদ্দেশে পাল উড়াইয়া দিলেন।

৩

লেখক হিসাবে ফ্লবেয়রের মধ্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্ ও রিয়ালিজ্‌ম্‌এর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। দু'টি ভঙ্গীরই তিনি সমান অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, "আমার মধ্যে দু'টি ভিন্ন মানুষ লুকাইয়া রহিয়াছে। এক জন ভালবাসে কাব্য-মাধুর্য, শব্দালঙ্কারের ঝকমকি, ভাবের সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ; অপর জন ভালবাসে ছোট-খাটো প্রতিদিনকার ঘটনা, ভাল-মন্দ দুই-ই। মানুষের পতন দেখিয়া সে —— পায়।"

কল্পনা ও বাস্তবের দোটানায় মধ্যে ফ্লবেয়রের সারা জীবন কাটিয়াছে। কখনও কল্পনার উদার আকাশে, কখনও প্রাত্যহিক বাস্তবতার অতল কন্দরে। উপন্যাসগুলি যে পর্য্যায়ে রচিত, তাহাতে আমরা দেখি, তিনি একবার রোমান্টিক, পরের বার রিয়ালিস্টিক হইয়াছেন—মাদাম বোভারি, সালাম্‌বো, ভাবপ্রবণ শিক্ষা, সন্ত আন্‌তনির প্রলোভন, বুভার ও পেকুশে। এ শুধু আকস্মিক নহে, ফ্লবেয়রের মনই এক বার এ-পথে, আর বার ও-পথে চলিয়াছে।

কিন্তু শব্দ-মাধুর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। শুধু ভাবের বাহনরূপেই তাঁহার নিকট শব্দের আদর ছিল না, তাঁহার কাছে গন্ধের ন্যায়, এক জন মানুষের মত শব্দও ছিল সজীব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। সামান্ত একটা বাক্যাংশ লইয়া তাঁহার সারা দিন কাটিয়া গিয়াছে। পারত পক্ষে তিনি এক পাতায় একই শব্দ একাধিক বার ব্যবহার করিতেন না। পাঠকদিগের হৃদয়ের প্রতিও যেমন, শ্রবণের প্রতি অবিচার করাও তাঁহার নিকট অন্যায় বোধ হইত।

তাই বলিয়া তাহাদের প্রতি যে তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নহে। মানুষকে সর্বদাই নির্বোধ বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মাদাম বোভারি-তে তিনি আঁকিয়াছেন, কেমন করিয়া একটি নারী একটার পর একটা ভুল করিয়া চলিয়াছে, কেমন করিয়া সর্বনাশের অতল গহ্বরে সে নামিয়া চলিয়াছে। এক এক জন পুরুষ তাহাকে সঙ্গ দিতেছে ক্ষণিকের জন্য, আবার চিরকালের মত চলিয়া যাইতেছে, রাখিয়া যাইতেছে কেবল বেদনাময় স্বপ্ন-মধুর স্মৃতি। অবশেষে বরণ করিতে হয় কলঙ্কের পঙ্ক-কুণ্ড আর মরণ—যে কোনোটিকে। মৃত্যুকেই সে বাছিয়া লয়। শেষ মিলন-যাত্রা করে সে দিগন্তের পরপারে।

৪

মাদাম বোভারি প্রকাশের পর সমালোচকেরা ফ্লবেয়রকে কুষ্ঠের মত ঘৃণ্য নৈতিক রোগে রুগ্ন বলিয়া ঘোষণা করেন। ফরাসী শাসন-বিভাগ তাঁহাকে জনগণের নিকট দুর্নীতিমূলক সাহিত্য প্রচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে। তুমুল কোলাহলের মধ্যে বিচার শেষ হইল। ফরাসী জনগণই আসিয়া সমালোচক ও শাসকবর্গকে বুঝাইল যে, ফ্লবেয়র যা আঁকিয়াছেন, তাহা জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। 'তুষার-প্রপাত বা আভালাঁশের যথাযথ বর্ণনা করিলেও যতটা দুর্নীতি প্রকাশ পায়, ইহাতেও তাই।'

আর, ফ্লবেয়র এই নিন্দা-প্রশংসার ঘূর্ণী বাত্যার অন্তরালে তাঁহার নিভৃত নীড়ে নিঃসঙ্গ ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন, মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবীর মানুষকে হাসাইতে ও উপহাস করিতে লাগিলেন। 'আমার রচনায় শ্লেষ আছে মানি। কিন্তু শ্লেষই তো বিস্বাদ জীবনকে লবণাক্ত করিয়া সুস্বাদু করিয়া তোলে!' এ-ই ছিল তাঁহার বক্তব্য।

সারা য়ুরোপে সর্বাপেক্ষা সঙ্গিহীন। নিজের মানসলোকেই তাঁর বছরের পর বছর কাটিত, শুধু মধ্যে মধ্যে পারীতে যাইতেন ভিক্তর হুগো, জর্জ সাঁদ-প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করিতে, তাঁহাদের জয়গানে সারা দেশ তখন মুখরিত। শোনা যায়, মাজা

একবার প্যারীর 'কাফে রিশ'-এ মিলিত হইতেন চারি জন 'অবজ্ঞাত লেখক'—জোলা, ফ্লবেয়র, টুর্গেনেভ ও দদে। কিন্তু নির্জনতাই তাঁহার বেশী ভাল লাগিত—সীন্ নদীর ধারে তাঁহার নীচু, সুদীর্ঘ বাড়ি—ছিতলের পাঠাগারের পাঁচটি জানালা দিয়া 'যে দিকেই চাই, সম্মুখে শুধু সুদূর-প্রসারী আকাশ।' এখানেই তাঁহার দিন কাটিত সুকঠিন নিয়ম-সংযমের মধ্যে। রোজ দশটায় চিঠিপত্র পাঠাতে এগারোটায় প্রাতরাশ, তার পর নদীতীরে কিঞ্চিৎ পদচারণ, সাড়ে বারো হইতে সাতটা অবধি একনিষ্ঠ সৃষ্টিকার্য। তার পর মধ্যাহ্ন-ভোজন, বাগানে ভ্রমণ, ও কুহেলিলীন নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া। এই সময়ই ভাবীকালের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মপাসাঁ তাঁহার চরণপ্রান্তে সাহিত্যে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি সকলের অজ্ঞাতে দূর-সম্পর্কীয় এক দরিদ্র আত্মীয়কে দান করেন। ধন্যবাদ আশা না করিয়া দান আর খ্যাতি আশা না করিয়া সাহিত্য-রচনা—এই ছিল তাঁহার জীবন। 'সব শেষে মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকে তাহার ভাবের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে—সেইখানেই তাহার একমাত্র আনন্দ, একমাত্র পুরস্কার।'

আর এমনি কল্পনানিমগ্ন অবস্থায় শেষ গ্রন্থ 'বুভার ও পেকুশে' রচনাকালেই তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল মৃত্যু—নূতন জগতে নূতন সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল।

পরিচয়

শ্রীনীলিমা দত্ত

কোরাস। ভারত মায়ের ধন মোরা ভাই
আমরা ভারতবাসী।

বাংলা-চাষা। ধরার বুকে মাটীর ঘরে
জনম মোদের ভাই,
বাংলা দেশে চাষীর বেশে
ক্ষেতের কাজে যাই।
চাষ ক'রতে ভালবাসি।

বিহার-কয়লা কুলি। মাটীর তলে আঁধার ঘরে
কয়লা কেটে তুলি,
গাঁইতি হাতে ভাই ত চলি
আমরা খাদের কুলি।
কয়লা কাটি রাশি রাশি।

পাঞ্জাবী। আমরা নির্ভীক
বলীয়ান্ শিখ,
স্বদেশের কাজে
বীর রণ-সাজে
ছুটি সব দিক্,
সদা মোরা হাসি।

কাশ্মীরী। ফুলের দেশে
তুষার দেশে
আমরা করি বাস,
বোরখা সাজে
শালের কাজে
থাকি বার মাস,
শান্সি 'পরে জলে ভাসি।

মহারাষ্ট্র-মারাঠী। নাই রে অন্ত
মারাঠী দুরন্ত
ছিল সবে দেশময়,
আমরা শান্ত
রণেতে ক্ষান্ত
ক'রো না মোদের ভয়,
সাগর-জলে আমরা ভাসি।

মাদ্রাজী। সাগরের পাড়ে
ভারতের ধারে
থাকি গিরি-বুকে,
পাথরের ঘরে
নানা পূজা তরে
জিনি সবে সুখে,
অনেক দিনের অধিবাসী।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'নির্ণয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা মন্তব্য করিতেছেন :—"নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি নয়াদিল্লী অধিবেশনে অতঃপর সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ হইতে বিরত থাকিয়া সত্যকার গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের একাংশে বলা হইয়াছে যে, ১৫ই আগষ্টের পর হইতেই হিন্দু মহাসভা তাহার পূর্ব্বতন নীতি সংশোধন করার বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুর ফলে এই প্রশ্ন সম্পর্কে ত্বরিত সিদ্ধান্ত করা আরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু মহাসভা অতঃপর আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় সমস্যার সমাধান জাতীয় গঠন-মূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সঙ্গে হিন্দু মহাসভা তথা হিন্দু মহাসভাপন্থী কর্ম্মিগণের কোনও সংশ্রব থাকুক বা নাই থাকুক ইহা অনস্বীকার্য্য যে, ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িকতা বিষ ছড়াইবার ব্যাপারে হিন্দু মহাসভার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইহার পরিসমাপ্তি হইলেই মঙ্গল, নচেৎ ভারত সরকারকে একান্ত অপ্রিয় কঠোরতার সহিতই এই সাম্প্রদায়িকতাকে দমন করিতে হইবে।" দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সত্যকার গঠনমূলক কার্য্যের কোন অভাব নাই। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের এক দল যুবক যে ভাবে স্বাধীনতার 'স্বাধীন' ব্যবহার এবং প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাতে দেশ-কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই চিন্তিত হইবেন, হিন্দু মহাসভার দিকে মনোনিবেশ করিলে সত্য সত্যই দেশের মঙ্গল করিবেন, এবং সেই সঙ্গে আগামী নির্ব্বাচনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এ বিষয়ে মহাসভাকে যে যুক্তিযুক্ত নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সমর্থন পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। অন্য দিকে দেশের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে যদি তাঁহাদের শাসনকার্য্য সত্য ভাবে চালাইতে হয়, তাহা হইলে বে-আইনী বিরুদ্ধ দল এবং তাহাদের বে-আইনী কার্য্যকলাপকে অবশ্যই কঠোর ভাবে দমন করিতে হইবে। অন্য কি পথ আছে?

• • • •

'আর্থিক-বাংলা' বলিতেছেন :—"সংসারের আয় সত্যই খুবই কম। কিন্তু তাই বলে গৃহিণী কি হতাশ হইয়া মাটিতে বসে পড়বেন, না, যাহাতে মাথার উপর হ'তে বিপদ কাটে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করবেন? "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এ কথার সার্থকতা ফুটিয়ে তোলার ভার ত গৃহিণীদের উপর। আজকালকার গৃহিণী যেন খাপছাড়া বলে মনে হয়। তাঁকে সর্ব্বদাই বলতে শুনি, "আমার জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদই হল না। আমায় দাসী করে এ সংসারে ঢুকান হয়েছে। আমার জীবন 'বৃথাই' গেল।" ইত্যাদি। ঠাকুর-ঝি-চাকরের উপর অযথা বাক্যবাণ বর্ষণ; শ্লথ অথচ মূল্যহীন শাসন; অযথা বাবুয়ানী ও বিলাসিতা; স্বামী, সন্তান-সন্ততিদের স্বহস্তের প্রস্তুত খাতাদি হইতে বঞ্চনা; গুরুজনদের পরিত্যাগ; "সোসাইটীতে চাকাবী প্রদর্শন" ইত্যাদি বহুবিধ গুণ অর্জ্জন করা আজকের তথাকথিত গৃহিণীর আদর্শ। স্বামী বেচারা আয় তার না হয় কমই করে তাই বলে কি স্ত্রী তার দুঃখের ভাগিনী হওয়াটাকে অসম্মানজনক মনে করে দূরে গিয়ে দাঁড়াবে, না, বায়বাহুল্য করিয়া সংসারের আর্থিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য প্রয়াস পাবে? আজ পুনর্গঠনের দিনে সমাজের বিশিষ্ট স্থানে অলংকৃতা গৃহিণী তোমায়ও কঠিন দায়িত্ব বহন করতে হবে সে কথা যেন ভুল না হয়।" কেবল মাত্র 'হায়!' বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ঘরের 'সিট' সম্বন্ধে সচেতন না থাকিয়া শহরে নারীর দল ট্রামের সিটের অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন!

• • • •

নারায়ণগঞ্জের 'বার্ত্তাবহ' দুঃখ করিতেছেন :—"পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত হইয়েছে,—তাহাদের বিশ্বাস প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে এই রকম একটা মন্তব্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী দিন কয়েক আগে কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে কি অবস্থায়—তাহা তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। ছোট-খাটো গুণ্ডামী-ষণ্ডামীর কথা বাদই দিলাম। সম্প্রতি হবিগঞ্জ মহকুমার লথাই থানার অধীন নওগাঁও গ্রামে কৈবর্ত্তগণের ৫ শত বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া জিনিষপত্রাদি লুঠ করিয়া সশস্ত্র সংখ্যাগুরুগণ যে বীরত্বের অভিযান চালাইল তাহা কি নিরাপত্তার পরিপোষক? প্রকাশ, এই রকম একটা আশঙ্কার সম্ভাবনা যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা হইয়াছিল। যথা সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ যদি যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে এই রকম একটা নৃশংসতম ঘটনা আদৌ হইতে পারিত না। Preventicn is better than cure—*প্রবাদ বাক্যটির মাহাত্ম্য কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের* জানা নাই? তদুপরি, যশোহর জেলায় মাগুরার সরস্বতী হরণের ব্যাপারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষিত অভিযুক্তগণকে জামিনে মুক্তি দিয়া অত্যদ্ভুত মনোবৃত্তি এবং ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বোধ হাওয়ায় উড়িয়া যাইবার মত হয় নাই? সরস্বতীকে ৪০।৫০ জন দুর্ব্বৃত্ত বাড়ী চড়াও করিয়া রাত্রির অন্ধকারে জোর করিয়া ছিনাইয়া নিয়া গেল,—ইহাতেই কি আইন ও শৃঙ্খলার মুখে কালি মাখিয়া দেওয়া হয় নাই? এই রকম ব্যাপারের আসামী, সে যতই সম্মানিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, জামিনে মুক্তি দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় নাই। এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আচরণ সংখ্যালঘুর মনে অনিরাপত্তাই জাগ্রত করিবে।" *কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জনাব নাজিমুদ্দীন এ সব ঘটনাকে কোন প্রকার গুরুত্ব অর্পণ করেন না। তাঁহার মতে, এই সব সাম্প্রদায়িক ঘটনা নেহাৎ "আঞ্চলিক" ব্যাপার মাত্র। সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বর্গসুখে বাস করিতেছে। মহামতি কায়েদে আজমও এ-বিষয়ে একমত। অতএব 'বার্ত্তাবহ' কেন বৃথা মাথা খারাপ করিয়া সময়, অর্থ, কাগজ ও কালীর অপব্যয় করিতেছেন? পাকিস্তান-প্রভুর গুণগান করিলে আখেরে ভাল হইবে।*

• • • •

'আর্য্য' পত্রিকায় প্রকাশ :—"মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় জগদ্বরেণ্য মনীষীর হত্যাকাণ্ড সহজ জ্ঞানসম্ভূত হইতে পারে না—ইহা বিকৃত মনোভাবের উদ্ভেদ্ মাত্র, যাহাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য নহে। সমগ্র ভারতবর্ষ—তথা নিখিল বিশ্বের এই দুর্য্যোগের দিনে কোনও নীতির সমালোচনা করা শুধু অশোভনই নহে—শোকবিহ্বল চিত্তে আবেগ প্রকাশ করাও অসম্ভব। মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পরেও যদি ভারতের যুবশক্তি তাহাদের তেজের পূর্ণ বিকাশ সাধনান্তর বিপথগামী না হইয়া এবং বর্ব্বরতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নারীর সম্মান এবং সমাজের কৃষ্টি রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তবে মহাত্মার আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। মহাত্মার দেহ ভস্মীভূত হইলেও তাঁহার অবিনাশী আত্মা ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকিবে।" মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এ বৎসর হোলীর দিনে কলিকাতার যুবশক্তির যে বিচিত্র রূপ চোখে পড়িল, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার আশা করিতে ভরসা পাইতেছি না। যুবশক্তির হাতে 'যুবতী শক্তির' নাস্তানাবুদ হওয়াটা আমাদের আরও বিচলিত করিয়াছে।

* * *

'বীরভূম-বার্ত্তা'র প্রকাশ :—"গত ৭ই মার্চ্চ বোলপুরে পশ্চিম বাংলার অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে এক চা-পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়। পূর্ব্বে এই সকল পার্টিতে "হাঁ হুজুরের" দল আমন্ত্রিত হইতেন, এখন সেখানে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ আমন্ত্রিত হন। কিন্তু খাদ্য সমস্যার এই ভয়াবহ সংকটেও এই সকল পার্টির ডিসগুলি তেমন মূল্যবানই রহিয়া গিয়াছে। সে-দিন উপরোক্ত পার্টিতে যখন আমন্ত্রিত সকলে খাইতে বসিয়াছেন তখন সেখানে বহু দরিদ্র বুভুক্ষু আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। কংগ্রেস-নেত্রী মায়া ঘোষ এই সকল বুভুক্ষুগণকেও খাবার দেওয়ার জন্য পার্টির উদ্যোক্তাগণকে অনুরোধ করিয়া বিফল হওয়ায় তাঁহার নেতৃত্বে কতিপয় কংগ্রেস-কর্ম্মী তাঁহাদের খাবারের ডিসগুলি সেই সকল বুভুক্ষুদের মধ্যে বিলি করিয়া দেন।' সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম।

* * *

'বরিশাল হিতৈষী'র মতে :—"প্রফুল্ল ঘোষ যত দিন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালার কর্ণধাররূপে রাষ্ট্রতরণী পরিচালনা করিয়াছেন,—সে সময় প্রত্যেক দিনের পত্রিকায় একটা না একটা চমকপ্রদ দুর্নীতি দমনমূলক ঘটনা থাকিত, আজ আর তাহা নাই, সেই প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীদের কোনও প্রশংসা নূতন মন্ত্রীরা করেন নাই—তাহার অর্থ বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কথাই বলিবেন—কাজ তেমন করিবেন না। অতএব পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা বাঙ্গালার তেমন কোনও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। আর পাকিস্থানবাসী হিন্দুরাও ঐ জাতিদের নিকট বিশেষ কিছু আশা করিবেন না।" কাজের কথা। আশা করি, পূর্ব্ববঙ্গের জাতিরা নিজেরাই এবার নিজেদের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন—করা উচিত বলিয়া মনে করি।

* * *

'বীরভূম বার্ত্তা' বলিতেছেন :—"বীরভূম জেলা রোডের রাস্তাগুলি সম্পর্কে আমরা বহু বার আলোচনা করিয়াছি। তাহা ছাড়া এই সকল রাস্তা সম্পর্কে জেলার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের অসুবিধার ও অভিযোগের কথা বহু বার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জেলার রাস্তাগুলির অবস্থা ঠিক যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। জেলা বোর্ড ও জেলাবাসী জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জেলার এই সব রাস্তাগুলি যেন গলিত শবের মত নখদন্ত বাহির করিয়া জেলার জয়-গৌরব (?) ঘোষণা করিতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিম-বাংলা সরকারের বহু কর্ত্তা ব্যক্তি বীরভূম পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন। জেলা বোর্ডের এবং জেলাবাসীর এই নগ্ন অক্ষমতা নিশ্চয়ই তাঁহাদের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে, জেলা বোর্ডের এই কর্ম্মনিপুণতা দেখিয়া তাঁহারা এই সকল কর্ম্মনিপুণদিগকে পুরস্কৃত করার কথা ভাবিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। তবে বৃটিশ রাজত্বের উপাধির যুগ থাকিলে এই সকল কর্ম্মীরা যে সর্ব্বাগ্রে পুরস্কৃত হইতেন সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।" নূতন মন্তব্যের অবকাশ পাইলাম না।

* * * *

'বরিশাল হিতৈষী'র মন্তব্য :—"ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ একদম হিন্দু মহাসভার দ্বার ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন। মহাত্মাজীর জীবনহানির পর সহসা চাকরিটা ছাড়িয়া দিলেন। মনে হয়, ডাক্তারের মাথাই বিগড়াইয়া গিয়াছে অন্যথা মহাত্মাজীর হত্যাপরাধ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া হিন্দু মহাসভার দুয়ার মুসলমানের নিকটও অর্গলমুক্ত করার কথা আসিল কেন? ইহাই মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। ১লা সেপ্টেম্বরের কলিকাতার দাঙ্গার পুনরুৎপাত হইতে মহাত্মাজীর বক্ষ-অঙ্গে গুলী একই ষড়যন্ত্রের শিকল। কারণ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার বিকৃত বীভৎস লেখনী নিঃসৃত গরল কত হিন্দুকে হীনমনা করিয়াছে। ইহারাই দেশের নেতা, সমাজ-নেতা। আর ইহারাই আসামকে বঙ্গভুক্ত করার অন্তরায় হইয়া সমগ্র বাঙ্গলা তথা পূর্ব্ব-বাঙ্গালাকে চির দুঃখ-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে—আর ইনি দিল্লী-প্রাসাদে মন্ত্রীর মুকুট পরিধান করিয়া সানন্দে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন। তাই মনে হয়, এক বিবৃতিতে সমস্ত পাপ বিধৌত হইবে না। আজ তাহার পাতি অনুসারে হিন্দুসভা কংগ্রেসের মধ্যে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিল।" এ-বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কোন মতামত দিবার নাই। পত্রিকার মন্তব্যে যাঁহাদের এবং যে পত্রিকার নাম করা হইয়াছে, আশা করি, তাঁহারা জবাব দিবেন। জবাব পাইলে আমরাই তাহা প্রকাশ করিব। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে—বিপদে পড়িয়া 'বরিশাল হিতৈষী'রও একটু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে অযথা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপর তিনি এতটা খাপ্পা হইতেন না।

* * * *

কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কে 'বর্দ্ধমানের কথা' কতকগুলি সুচিন্তিত কথা বলিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে, দীর্ঘ হইলেও, তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—"পশ্চিমবঙ্গ যেমন শিল্প-প্রধান তেমনি কৃষি-প্রধানও। জনসংখ্যার বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে এবং তাহারা কৃষির উপর নির্ভরশীল। গ্রাম তথা এই বিরাট জনসংখ্যার উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হ—

খাদ্য-বস্তুতে আত্মনির্ভরশীল নহে—এই অনটন পূরণ করিতে হইলে হয় বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে, নতুবা খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা কোন দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ, ইহাতে সকল সময়েই পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। অন্য দিকে বহু অর্থ বাহিরে চলিয়া যায়। খাদ্যের অনটন দূর করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ইহার জন্য কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া বর্ত্তমানে জমিতে যে হারে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা বাড়াইতে হইবে—যে সমস্ত চাষযোগ্য জমি অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে তাহা আবাদী করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ ধান্য চাষ হইয়া থাকে এবং ইহার জন্য প্রচুর জলের আবশ্যক। যে বারে, সময়ে এবং প্রয়োজন মত বৃষ্টি হয় সেইবারে ফসল ভাল হয়—যে বারে তাহা হয় না ফসল ভাল হয় না। তাহাতে এক দিকে যেমন প্রদেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে অন্য দিকে তেমনি কৃষক সমাজের আর্থিক ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য চাষীকে 'নিশ্চয়' করিতে হইবে। বর্দ্ধমান জেলা ধান্য-প্রধান জেলা। ধান্য চাষের সুব্যবস্থার সহিত কৃষকদের যেমন আর্থিক সম্পর্ক রহিয়াছে তেমনি প্রদেশের খাদ্যশস্য সরবরাহের সম্পর্ক রহিয়াছে। ক্যানেল অঞ্চলের বাহিরে ধান্য চাষ আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছে, সময়ে যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলেই চাষ হইবে নতুবা জমি পড়িয়া থাকিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি প্রয়োজন মত বৃষ্টি হয় তাহা হইলেই ধান ফলিবে নতুবা মরিয়া যাইবে। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং আশ্বিনের শেষে বৃষ্টি-পাতের অভাবে ধান মরিয়া যাওয়া প্রতি বৎসরের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে চাষীর আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইতেছে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ইহার প্রতিকার হইবে এবং দেশ সুজলা সুফলা এবং শস্যশ্যামলা হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে কিছু সময় লাগিবে এবং অন্তর্বর্ত্তী কালের জন্য জল-সরবরাহ ও কৃষি উন্নয়নের অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করিতে হইবে। দামোদর ক্যানেল সম্প্রসারণ করিয়া যত দূর পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে তাহা দিতে হইবে। ছোট-খাটো পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া খাল বিল পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া চাষের জন্য জল সরবরাহ করিতে হইবে। কুমুর, অজয়, বাঁকা, খড়ি ও দামোদরের বন্যার প্রতিকার করিয়া প্রতি বৎসর যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। দামোদরের বিগত বন্যায় যে সমস্ত জমি খালি পড়িয়া আছে তাহা উদ্ধার করিতে হইবে।" আশা করি, পশ্চিম বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর 'বর্ধমানের কথা'র প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

* * * *

জলপাইগুড়ির 'ত্রিস্রোতা'র অভিযোগ:—"এই সহরে প্রতিটি দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা যথেষ্ট কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রাচুর্য্যের দিনে ব্যবসায় একটা প্রতিযোগিতা থাকায় ক্রেতাদের তবুও একটা পথ ছিল, কিন্তু কণ্ট্রোলের দৌলতে সে পথও আর নাই। দর বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে ব্যবসায়ে মনোপোলি বা একচেটিয়া অধিকার। কণ্ট্রোল ইহাকে আরও কায়েম করিয়া দিয়াছে। এখন কণ্ট্রোল ক্রমশঃ উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এখানে দ্রব্যাদি সস্তা হওয়ার উপায় নাই। দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য করিতে লইলে ব্যবসায়ের মনোপোলি ভাঙা দরকার। ইতিমধ্যেই আওয়াজ শুরু হইয়াছে যে, "রেলে মাল আমদানীর অসুবিধা," "মাল আসে না" ইত্যাদি। ইহা আংশিক সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইহা বলিয়াই যাহাদের লুঠিবার তাহারা কিছু কাল লুঠিবে। নূতন কেহ অগ্রসর হইয়া এই মনোপোলি ভাঙ্গিলে দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হইবে।" পশ্চিম-বাঙ্গালার প্রতি সহরের অবস্থা প্রায় একই প্রকার। রোগও এবার 'ক্রণিক' হইতে চলিয়াছে, কাজেই 'ত্রিস্রোতা' খুব বেশী বিচলিত হইবেন না!

* * * *

'বরিশাল হিতৈষী'র মন্তব্য:—"শ্রীকিরণশঙ্কর মন্ত্রী হইয়াছেন, অন্যায় কিছুই নহে, তাহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করে না—এবং দুই-দুইবার মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল—সেই 'গুণিগণগণনারম্ভে ন পতিতে কঠিনী সুসম্ভ্রমাৎ যস্য', সেই কিরণ বাবু শেষকালে একটা স্বীকৃতি পাইলেন তাহার গুণের, তাহার ত্যাগের, তাহার কারাবরণের, ইহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণই হয় নাই। যাহারা সন্ত্রাসবাদ চালাইয়া আজ গান্ধীবাদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ উপভোগ করিতেছেন, সে শ্রেণীর মানুষ কিরণশঙ্কর নহেন। তবে কথা হইতেছে তাহার উক্তির সামঞ্জস্য লইয়া। তিনি হইলেন বাঙ্গালার খালিকজ্জমান—অথচ খালিকজ্জমানের ভীতি তাহার হওয়ার কথা নহে। আজ যে 'আজাদ' তাহাকে খোটা দেয়, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' নিন্দা করে, 'যুগান্তর' গালাগালি দেয়, সে শুধু এই দোষে। পূর্ব্ববঙ্গের কংগ্রেসী নেতাস্বরূপে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুগণকে দেশত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্টের নিকটে আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তার পর স-সে-মি-রা-র মনুষ্যের মত বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে অকূলে ভাসাইয়া দিয়া যাওয়া অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর নীচতা—এ কলঙ্ক-কালিমা হইতে তিনি এ জীবনে মুক্ত হইতে পারিবেন না—ইহাই আমাদের দুঃখের কারণ।" আমরা কি বলিব? পূর্ব্ব-বঙ্গের সমস্যা, কাজেই এ বিষয় পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর দুঃখ এবং মনের অবস্থা আমরা ঠিকমত বুঝিতে পারিব না। জবাব যাহা দিবার তাহা কিরণ বাবুই দিবেন!

* * * *

বর্দ্ধমানের 'আর্য্য' সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন:—"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, স্থানীয় কোনও এক অভিজাত নারীর কন্যা হইলে তাঁর স্বামী ১৭ই জানুয়ারী কিছু চিনির জন্য আবেদন করিলে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু ১৭ই জানুয়ারী যখন সদর ফুড এ্যাডভাইসারী কমিটীর সভা হইতেছিল তখন মহারাজ-কুমারের বিবাহের ভোজের জন্য ভৈরব নাগের পুত্র এক মণ আটা চাহিলে উক্ত কমিটী তৎক্ষণাৎ অফিসের মধ্যে ডাকিয়া এক মণ আটার পারমিট দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কমিটী ঠিক করেন যে বিবাহ উপলক্ষে ১০ সের আটা ও ৫ সের চিনির বেশী দেওয়া হইবে না। কিন্তু মহারাজের বেলায় এইরূপ আইনভঙ্গের কারণ কি? সাপ্লাই কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছু জানাইবেন কি?" চির-জানা বিষয়—কাজেই নূতন করিয়া জানাইবার কি আছে? অবাক্ হইবারও কিছু নাই!

* * * *

'বরিশাল-হিতৈষী' বলিতেছেন:—"পাকিস্তানে সৈন্যদল গঠন করা হইতেছে গভর্ণর সাহেব ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন—আমরাও করি, কারণ বাঙ্গালীকে অসামরিক জাতি আখ্যা দিয়া

সমগ্র ভারত পশ্চাতে ও নিন্দিত রাখা হইয়াছিল। ৪১ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান সত্বেও আর বাঙ্গালীকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না, এ ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করিয়া উদার ভাবে অধিক সংখ্যক বিহারী দ্বারাই সৈন্যদল গঠন হইতেছে—তবে কি বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ চাকুরীতে উদারতা, যুদ্ধশিক্ষায় উদারতা? এত উদার হইলে বাঙ্গালী মুসলমানের উদরী হওয়াই সম্ভাবনা, কারণ বাঙ্গালী হিসাবে তাহারা পূর্ণ মানুষ হইতে কখনই পারিবে না।" এ-বিষয়ে যুবক 'ইত্তেহাদ' এবং বৃদ্ধ 'আজাদ' কি বলেন বা চিন্তা করেন, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব। বাঙ্গালী মুসলমানের বিষয় কথা বলার অধিকার কেবল মাত্র তাঁহাদেরই—এমন কথা তাঁহারাই বলেন। বাঙ্গালী মুসলমানের বিষয় ভাল কোন কথা এবং মঙ্গলকর কোন প্রস্তাব আমরা করিলে কায়েদে আজমের মতে আমরা 'পঞ্চম-বাহিনীর' কার্য্য করিব, কাজেই—চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ।

* * * *

'আর্থিক-বাংলা' বলেন :—"ছাত্র ও ছাত্রীরা সংসারের ভার-স্বরূপ এবং ব্যয়-বাহুল্যের বিজয় পতাকা; সে বিষয় যদিও তাঁহারা অনুমোদন করেন না বা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করেন না তবুও যাদের পকেট হতে খরচাটি সঙ্কুলান হয়, তাঁদের সময় থাকতে অবহিত হ'তে বললে বোধ হয় গলতি হবে না। ছাত্র-জীবন হওয়া চাই সুন্দর, সরল, সদ্‌গুণমণ্ডিত এবং নিষ্ঠার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বর্ত্তমানে ইহার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। বরং অধিক ক্ষেত্রেই ঠিক এর বিপরীত ভাবগুলির প্রাচুর্য্য এত বেশী যে ছাত্রকে ছাত্র ব'লে চিন্‌তে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। তাই তাঁদের কাছে অনুনয়, যেন তাঁরা সত্যিকারের শিক্ষার্থিরূপে সংসারে প্রতিপন্ন হন এবং যথাসাধ্য ব্যয়-বাহুল্য কমাইয়া নিজের সংসারের আর্থিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য সহায়তা করেন।" ছাত্র-সংঘের মতামত এ-বিষয়ে বোধ হয় অন্য প্রকার। স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার যুগে তাঁহারা বোধ হয়—তাঁহাদের স্বাধীনতায় অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। এমন কি, যে পিতা-মাতা নিজেদের বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের সন্তানদের 'পড়ার' খরচা যোগান, তাঁহাদেরও না।

* * * *

'বরিশাল-হিতৈষী' বলিতেছেন, 'সাবাস'!—"নোয়াখালীর প্রচণ্ড শক্তিশালী জনাব গোলাম সাওয়ার মোকর্দ্দমায় বে-কসুর মুক্তি পাইয়াছেন—তবে কেন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পাবলিক প্রসিকিউটর তাহাকে এক বৎসর কষ্ট দিলেন? বিচারক বলিয়াছেন, গোলাম সাওয়ারের বিরুদ্ধে কেহ সাক্ষ্য দিতে আসে নাই অর্থাৎ পুলিশ সাক্ষিগণকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কারণ, রাজেন্দ্র রায় প্রভৃতি হত ব্যক্তিরা তো আর সাওয়ারকে দেখিতে আসিবে না। তবে একটা কথা মনে হয়, পাকিস্তানের পক্ষে উদাহরণটা যতই আশাপ্রদ, চমকপ্রদ হউক, হিন্দুস্থানের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ—অতঃপর যদি হিন্দুস্থানে এইরূপ আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থিত না হয়, আর হিন্দুস্থান গভর্ণমেণ্ট বলেন তাঁহারা সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে অনেক মুসলমান মোকদ্দমাকারী ভীত হইয়া সে প্রদেশ ত্যাগ করিতে পারে না? তাই বলি, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট এই খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করিবেন কি না দেখুন।"

* * * *

'আর্থিক বাংলা' বলেন :—"রোদ-বৃষ্টি হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ছাতার সৃষ্টি। কিন্তু সেই ছাতার ভাল কাঁচা উৎপাদনগুলির জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় অন্য দেশের উপর। যেমন ধরুন না ছাতার শিক। দেশী শিক কোন ছাতার ব্যবহার করা হয় কি না বা করিলেও তাহাতে কি ফল পাওয়া যায়, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা হয় নাই। শিক ছাড়াও ভাল ছাতা তৈয়ারী করিতে আরও বহুবিধ উপকরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে এই শিল্পটিকে উন্নত করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে মস্ত গ্লানিকর। ধনবান ব্যক্তিরা সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইয়া হউক অথবা স্বতন্ত্র ভাবেই হউক, এই একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলে সময়োপযোগী সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না ইহা স্থির বিশ্বাস।" কেবল ছাতার শিক-ই নহে, চোখ মেলিয়া দেখিলে এই প্রকার আরো বহু কিছু দ্রব্য চোখে পড়িবে—যাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, অথচ সামান্য চেষ্টা, যথেষ্ট চিন্তা এবং কিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্যে সেই সব দ্রব্য দেশে নির্ম্মাণ করা যায়। নিজেরা উদ্যোগী না হইলে আমাদের অভাব অন্য কেহ দূর করিতে পারিবে না। উদ্যোগী পুরুষদের জন্য সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা সকল সময়েই পাওয়া যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

* * * *

বরিশালের 'নকীব' অবগত হইয়াছেন :—"পটুয়াখালি মহকুমার (বাখরগঞ্জ) সাবডিভিসনাল অফিসার মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী-সাহেব তথাকার নেতৃবৃন্দ সহযোগে জনসাধারণের ভিতর অক্লান্ত প্রচার চালাইয়া কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ডের এক অপূর্ব্ব সাড়া আনিয়াছেন। মহকুমার সর্ব্ব শ্রেণীর জনগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া দলে দলে আসিয়া মহকুমা ট্রেজারীতে কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ডের দানের টাকা জমা দিয়া যাইতেছেন। এবং এ-পর্য্যন্ত দুই লক্ষ চারি হাজার চৌরানব্বই টাকা বার আনা সংগৃহীত হইয়া ট্রেজারীতে জমা হইয়াছে। পটুয়াখালীর হিন্দু মুসলমান ও বর্মী জনগণ মানবতারই পরিচয় দিতেছেন। দুর্গত মহাজেরদের আকুল ক্রন্দনে যাহার প্রাণে বেদনা বোধ আসিয়াছে, লাঞ্ছিত নিপীড়িতদের অশ্রু মুছাইতে যিনি যতখানি অগ্রসর হইয়াছেন, আল্লাহ তার জন্য ততখানি আগুয়ান হইয়া আছেন। আমরা আশা করি, পটুয়াখালী মহকুমা হইতে আরো বহু দান আদায় হইবে। পটুয়াখালীর এস্, ডি, ও, মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী, তথাকার নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য অফিসার ও কর্ম্মিবৃন্দকে তাহাদের এই মহান্ উদ্যমের জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি।" 'নকীবের' আশা, 'আরো দান আদায় হইবে।' আলবাৎ হইবে। কায়েদে আজম ফাণ্ডে 'দান' না করিয়া অন্য উপায় আছে কি? যাহাদের পেটে ভাত নাই, পরনে বস্ত্র নাই—তাহাদের কায়েদে আজম ফাণ্ডে, পিতৃনাম স্মরণ করিয়া, এমন বিচিত্র দানের কথা পাকিস্তানী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে (না রক্তাক্ষরে?) লিখিত থাকিবে?

* * * *

'দামোদর' পত্রিকা বলিতেছেন :—"গরুর গাড়ীর হালের জন্ত কৃষক ও গাড়োয়ানকুল হাহাকার করিতেছে। কত আবেদন করিতেছে, লোহালক্কড় কমিটি বারে বারে তাগাদা দিতেছে, কিন্তু সহরে বাবু অফিসারদের এজন্ত কোন নড়চড় নাই। এদিকে মোটর-গাড়ীর চাকার অভাব পড়িলে বা এক দিন মোটর বন্ধ হইলে তাহাদের চীৎকারের চোটে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। বর্তমানের চাষী গরুর গাড়ীর মত এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি বৎসরাধিক কাল পায় নাই! ধান কাটার বহু পূর্ব্বে দাবী করা হইয়াছিল, কৃষকদের চাষের কাজের জন্ত কাস্তে, কোদাল, জল-সেচনের ঢুনির পাত প্রভৃতি সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আখ মাড়াইয়ের জন্ত গুড়ের কড়াই প্রস্তুতের জন্ত লোহার পাত যে কত প্রয়োজন, তাহা কলিকাতা নগরীর বিজলী পাখার বাতাস-সেবিত নন্দদুলালরা কিরূপে বুঝিবেন? কৃষকদের প্রয়োজনীয় এই দ্রব্যগুলি কে যে সরবরাহ করিবেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কৃষি-বিভাগ বলেন, তাহাদেরই করিবার কথা এবং সরবরাহ বিভাগ বলেন, ইহার মালিক আমরা। আমরা দুই বিভাগের দুয়ারেই দণ্ডবৎ করিয়াছি, কিন্তু দুই পক্ষ হইতেই দুগ্ধের পরিবর্তে চাট পাইয়াছি। এই দুই বিভাগে আমাদের দুই জন বিচক্ষণ মন্ত্রী রহিয়াছেন, তাঁহারা এইবার গোয়াল সাফাইয়ের দিকে নেক নজর দিন?" আশা করি, আগামী বৎসর যথাকালে কৃষক এবং গাড়োয়ানকুল তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য পাইবে। অবশ্য এবার যদি 'গোয়াল সাফাই' হয়।

ঢাকার 'জিন্দেগী' পত্রিকায় প্রকাশ :—"সামান্ত কারণ দর্শাইয়া মুসলমানের রেশনের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হইতেছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর পারমিট দেওয়া হইতেছে না, আমদানী-রপ্তানীর কোটা মঞ্জুর করা হইতেছে না, ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা দ্বারা তাহাদের মধ্যে এমন ধারণা জন্মাইতেছে যে, মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক ভাবে হীন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। নিরাপত্তা আইনে বন্দী হইতে শত শত যুবককে গ্রেফতার করা হইয়াছে, ইহারা সকলে কাজকর্ম্ম করিয়া খাইত। ইহাদিগকে আটক রাখায় তাহাদের পরিবারবর্গ আজ অকূল পাথারে পড়িয়াছে। মুসলমানদের বাড়ী বলপূর্ব্বক দখল করা হইয়াছে। বে-আইনী প্রবেশকারীদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্ত পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় না। এই সব ব্যাপারের জন্ত সহরের মুসলমানরা ক্রমশঃ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, কলিকাতা হইতে লক্ষাধিক মুসলমান অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ইহারা পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল না, তাহারা পুরুষানুক্রমে এখানেই বাস করিয়া আসিতেছিল। প্রাদেশিক পুলিশ, আইন ও শাসন-বিভাগে বা মন্ত্রিসভায় পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমান নাই বলিলেই চলে।" পশ্চিম-বাঙ্গালায় তবু ত বহু মুসলমান নানা সরকারী কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে কয় জন হিন্দু কোন্ কোন্ সরকারী চাকরীতে বহাল রহিয়াছে, 'জিন্দেগী' তাহা জানাইবে কি? পকেটমার এবং গুণ্ডাদের ধর-পাকড়ে 'জিন্দেগী' এত বিচলিত হইলেন কেন?

এম, ডি, ডি,

হকি :—

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হতে চলেছে। বিলম্বিত সূত্রপাত ও পরে ঘটনা-পরম্পরায় নানা রকম বাধার জন্ত এ বৎসর লীগের খেলা স্বচ্ছন্দে চলা সম্ভব হয় নাই। ফলে পর্য্যাপ্ত সময়াভাবে অর্দ্ধপথে দ্বিতীয় 'বি' ডিভিসন লীগের খেলা বি, এইচ, এ, কর্ত্তৃপক্ষ এ বৎসরের মত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত খেলায় মোহনবাগান লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানে আছে। পাঞ্জাব স্পোর্টসের বিরুদ্ধে পরাজয়ে এবং ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করার ফলে তারা মোট তিনটি পয়েন্ট নষ্ট করে। একমাত্র পোর্ট দলের সঙ্গে তাহাদের খেলা বাকী আছে। পোর্ট দলের বিরুদ্ধে পরাজয় ব্যতীত পাঞ্জাব স্পোর্টস্ পাঁচটি খেলায় 'ড্র' করিলে তাহাদের লীগ বিজয়ের সমস্ত আশা একেবারে নষ্ট হয়। পাঞ্জাব স্পোর্টস্ তাদের লীগ-অভিযান শেষ করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ও ড্যালহৌসীর লীগের খেলা সম্পূর্ণ। গত বৎসরের লীগ-বিজয়ী পোর্ট কমিশনার্স দল বোম্বায়ে আগা খাঁ কাপে খেলতে যাওয়ায় তাদের লীগ খেলা বন্ধ আছে। তারা মোট ১২টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। একমাত্র কলেজীয়ানসের বিরুদ্ধে পোর্ট দলের একটি পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত বিপর্য্যয় না ঘট্‌লে তারা যে এবারেও লীগ-চ্যাম্পিয়ন হবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বোম্বায়ে আগা খাঁ কাপে প্রথম খেলায় কোর্কী রয়েলস দল তাদের বিরুদ্ধে ১২-০ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। পরের রাউণ্ডে বোম্বায়ের অন্যতম শক্তিশালী দল টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে প্রথম দিন গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করার পরে তারা শেষ পর্য্যন্ত ১-০ গোলে জয়ী হয়েছে। বোম্বায়ের আমন্ত্রণ-মূলক হকি প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে মোহনবাগান প্রথম খেলাতেই গোয়ালের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে পরাজয় বরণ করে। অবশ্য এই গোয়াল দলই ফাইন্যালে মহারাষ্ট্র একাদশকে ০-০, ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। বাইটন কাপ ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন হকি প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত হয়েছে।

লক্ষীবিলাস, ল্যাগডেন মেমোরিয়েল, কাইভান ও আন্তঃ কলেজ আশুতোষ চৌধুরী কাপে যথাক্রমে ১৩, ১১, ৩৫ ও ১২টি দল যোগদান করেছে।

পর পর তিনটি ট্রায়াল খেলার পরে আগামী নিঃ ভারতীয় ও আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্ত বাঙলা প্রাদেশিক দল গঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা এবার বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত হবে। বাঙলায় দলপতিত্ব করবে—পোর্ট কমিশনার্সের জ্যাকেন। গত আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলে যাদুকর ধ্যানচাঁদের সাহচর্য্যে খেলে জ্যাকেন প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এই দলের ম্যানেজার হয়েছেন ভবানীপুর ক্লাবের শ্রীনলিনীনাথ মিত্র। এই প্রতিনিধিমূলক দলে ১৬ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছে।

[গোল :—স (কলেজীয়ান্‌স), এস মুখার্জী (মোহনবাগান)

ব্যাক :—হজেস (কাষ্টমস), মুস্তাক আমেদ (মোহনবাগান) ও সরওয়ান (পাঞ্জাব স্পোর্টস)

হাফ ব্যাক :—এস, মুখার্জী (মোহনবাগান) সহঃ অধিনায়ক, ডালুজ (মেসারার্স), ক্লডিয়াস (পোর্ট কমিঃ) ও গ্যালিবার্ডী (পোর্ট কমিঃ)

ফরোয়ার্ড :—দুবে (মোহনবাগান), জি, সিং (পোর্ট কমিঃ) গ্ল্যাকেন (পোর্ট কমিঃ), জ্যাকেন (পোর্ট কমিঃ)—অধিনায়ক, শেঠী (পাঞ্জাব স্পোর্টস), ইন্দ্রজিৎ (মোহনবাগান) ও কাপুর (মোহনবাগান)।

মোটের উপর বাঙলা দলের নির্ব্বাচনে সাধ্যমত সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। খেলায় পরিচয়ে হয়ত কোন কোন অবস্থানের জন্ত অন্য কোন খেলোয়াড়ের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনুযায়ী মনোবল ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন খেলোয়াড়ের দাবীই সকলের আগে বিবেচ্য। সেই দিক দিয়া বি, এইচ, এর দল নির্ব্বাচন অন্যায় হয় নাই।

ক্রিকেট :—

রঞ্জী ফাইন্যাল :—বোম্বাইকে শেষ পর্য্যন্ত ১ উইকেটে পরাজিত করে হোলকার এ বৎসর রঞ্জী প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে। গত বৎসর বরোদার নিকট পরাজয়ের ফলে মহীশূরের বিরুদ্ধে জয়লাভে ১৯৪৬ সালে পাওয়া রঞ্জী ট্রফী তাদের হাতছাড়া হয়। বোম্বাই দলের নেতৃত্ব করে খ্যাতনামা খেলোয়াড় কে, সি, ইব্রাহিম। অনেকে বলেন যে, গত অষ্ট্রেলিয়া সফরে ইব্রাহিমকে দলভুক্ত না কোরে বোর্ড অন্যায় পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দিয়েছিল। প্রতিপক্ষ হোলকার দলের অধিনায়ক ছিলেন ভূয়োদর্শী প্রধান খেলোয়াড় সি কে, নাইডু। বোম্বাই দলে অবশ্য বিজয়, মার্চেণ্ট ও রাসী মোদী খেলে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত ভারতীয় দলের ৪ জন খেলোয়াড় রঙ্গনেকার ও কাডকর এবং সর্ব্বাতে ও সি, এস, নাইডু যথাক্রমে বিজিত ও বিজয়ী দলের সাহায্য করে। এই খেলায় সর্ব্বাতে ও নাইডুর বোলিং বোম্বাই দলের ব্যাটিংয়ে ভাঙ্গন আনে। অষ্ট্রেলিয়াতে সারা সফরে মাত্র একটি উইকেট পাওয়ায় সি, এস, নাইডু স্বদেশে এসেই যুগপৎ ব্যাটিং ও বোলিংয়ে যে রকম সাফল্য দেখিয়েছে, তাতে আশ্চর্য্য না হয়ে পারা যায় না।

রাণ সংখ্যা :—বোম্বাই—১১১ ও ৩৬১

হোলকার—৩৬১ ও এক উইকেটে ১৫

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ড :—

চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট খেলায় দশ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে দীর্ঘ দিন পরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' জয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে কোন খেলায় জয়ী হতে পারেনি। এতে তাদের বর্ত্তমান ক্রিকেটমান সম্বন্ধে অতি বড় আশাবাদীও বিশেষ আশার কোন আলোই খুঁজে পাবে না। আগামী শীত ঋতুতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারতে আসার কথা চলছে। অতএব তাদের কার্য্যকলাপ স্বভাবতঃই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়বস্তু হবে।

আন্তঃ-কলেজ খেলাধুলা :—

আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের দুইটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে সেন্ট জেভিয়ার্স ও বি, ই, কলেজ চরম সম্মানের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সেন্ট জেভিয়ার্স শেষ পর্য্যন্ত ১-০ গোলে জয়ী হয়।

আন্তঃ কলেজ ভলিবল ফাইন্যালে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ ১৫-১০, ১৫-১১ পয়েন্টে বিদ্যাসাগর কলেজকে পরাজিত করে।

আন্তঃ কলেজ বাস্কেটবল ফাইন্যালে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। ২১-২৮ পয়েন্টে আশুতোষকে পরাজিত করে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এবারের মত বিজয়ী হয়।

বিশ্ব অলিম্পিক স্পোর্টস ও ভারত :—

লণ্ডনে আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদান দেওয়ার জন্য ভারতের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হয়েছে —

১০০ মিটার দৌড়—ই, ফিলিপস্ (মাদ্রাজ)

ম্যারাথন্ রেস্—ছোটা সিং (পাতিয়ালা)

ষ্টীপল চেজ্—নাজীর সিং (পাতিয়ালা)

১১০ মিটার হার্ডল—জে, ভিকার্স (বোম্বাই)

হপষ্টেপ ও জাম্প—এইচ, রেবেলো (মহীশূর)

পোল ভল্ট—মুবারক হোসেন (যুক্তপ্রদেশ)

হাই জাম্প—গুরনাম সিং (পাতিয়ালা)।

ব্রড জাম্পে যোগ দেওয়ার উপযোগিতা দেখাতে পারলে বর্ত্তমান ইংলণ্ডে অবস্থানকারী বলদেও সিংকে (পাতিয়ালা) এই বিভাগে যোগ দেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে। বাঙলা থেকে কোন এথলিট না থাকায় বাঙালী ক্রীড়ানুরাগী মাত্রেরই দুঃখিত হবার কথা। কিন্তু মা ভৈঃ এই দলের কর্ণধার হয়েছেন আমাদের বাঙলা অলিম্পিকের জনাব নকী আমেদ। এথলেটিক্সে বাঙলার কত বৎসরে কতটুকু উন্নতি করেছে তা এঁর কাছেই জানা যেতে পারে। বাঙলা এথলেটিক্ স্পোর্টসের ইনিই আজ বহু বৎসর দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। কুস্তীগীর দলের ম্যানেজার হয়েছেন যুক্তপ্রদেশের জনাব সুলতান আমেদ। মল্লবীরেরা হচ্ছেন :—

ফেদার ওয়েট—সূর্য্য বংশী (বোম্বাই)

মিডল ওয়েট—কে, সি, রায় (যুক্তপ্রদেশ)

ব্যাণ্টাম ওয়েট্—নির্ম্মল বসু (বাঙলা)

ওয়েল্টার ওয়েট্—এ, ভার্গব (যুক্তপ্রদেশ)

ফ্লাই ওয়েট্—কে, যাদব (কোলাপুর)

লাইট ওয়েট—বান্টা সিং (পাতিয়ালা)

এই এথলিট নির্ব্বাচন উপলক্ষে ইডেন উদ্যানে যে নির্ব্বাচনী স্পোর্টস্ হয়, তার অব্যবস্থা সকলের চোখে পড়ে। পুরুষ বিভাগে পাতিয়ালা ও মহিলা বিভাগে বাঙলা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে। মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ে বাঙলার ডাল্ সী বীক নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করে। পোল ভল্ট ও হাই জাম্পে যথাক্রমে মুবারক হোসেন (যুক্তপ্রদেশ) ও গুরনাম সিং (পাতিয়ালা) নূতন ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করে।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে সভাপতি চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারীর বক্তৃতারত। বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস (পার্শ্বে) ও শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক মহাশয়কে (সম্মুখে উপবিষ্ট) দেখা যাইতেছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বার্লিনের সঙ্কট—

বার্লিন-সঙ্কটের মধ্যে যাঁহারা তৃতীয় মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, আপাততঃ তাঁহারা নিরাশ না হইয়া পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ সুরে যাঁহারা সুর মিলাইতে অভ্যস্ত নহেন, বার্লিনের ঘটনা তাঁহাদের কাছে যে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। বার্লিন জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত, অর্থাৎ বার্লিন নগরীর চারি দিকেই জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চল। বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে জার্ম্মাণীকে বিভাগ করিয়া লওয়ার জন্য পটসডামে যে চুক্তি হয়, তদনুসারেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ রাইখের রাজধানী শুধু কোন একটি রাষ্ট্রের হাতে থাকা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সেই জন্য সমগ্র জার্ম্মাণীর ন্যায় বার্লিনকেও বিজয়ী শক্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। কম্যাণ্ডাটুরা (Kommandatura) অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ বার্লিনের শাসন-পরিচালন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আলোচ্য বার্লিন-সঙ্কটের সৃষ্টি হয় গত ১লা এপ্রিল সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর বৃটিশ এলাকাগামী কয়েকখানি বৃটিশ মিলিটারী গাড়ী আটক করা হইতে। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় এবং গাড়ী আটকের প্রকৃত কারণও বিশ্ববাসীকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে দেওয়া হয় নাই। প্রথম গাড়ী আটকের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে অবস্থিত সোভিয়েট সামরিক গবর্ণর মার্শাল ভ্যাসিলি সোকোলোভস্কি বার্লিনস্থ অপর ত্রিশক্তির প্রতিনিধিদিগকে জানাইয়া দেন যে, অতঃপর বার্লিন ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে যাত্রীদের যাতায়াত ও মাল-চলাচল বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। এই নূতন বিধান অনুসারে সামরিক ও অসামরিক সকল যাত্রীরই যাতায়াতের অনুমতি-পত্র থাকা প্রয়োজন এবং রুশ কর্ত্তৃপক্ষ দুই বার—এক বার আঞ্চলিক সীমান্তে এবং আর একবার বার্লিনে প্রবেশের প্রাক্কালে যাত্রীদের পাশপোর্ট ও মালপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এইরূপ বিধান জারী করার কারণ সম্বন্ধে রুশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, বার্লিনে যেরূপ নিয়মিত ভাবে লুঠতরাজ চলিতেছে তাহাতে এই ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিধান জারীকে রাশিয়ার চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ পরিত্যাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া ফেলিল এবং বার্লিনে চতুঃশক্তি শাসন অচল করিয়া তোলাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করিল। রুশ কর্ত্তৃপক্ষ যখন সত্যই বৃটিশ ও মার্কিণ যাত্রীদের অনুমতি-পত্র ও জিনিষ-পত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল তখন তাঁহারা ধ্বনি তুলিলেন যে, রাশিয়া বার্লিনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যদিগকে অনাহারে রাখিয়া তাহাদিগকে বার্লিন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে চায়। বৃটেন ও আমেরিকা বিমানযোগে বার্লিনে খাদ্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। রাশিয়ার চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ হইতে চলিয়া যাইবার কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গত ২০শে মার্চ্চ বার্লিনে নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা প্রস্তাব করেন যে, লণ্ডনে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স এই ত্রিশক্তির সম্মেলনে জার্ম্মাণী সম্পর্কে যে সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এই পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করা হউক। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ার আপত্তি ও অনুপস্থিতি সত্ত্বেও লণ্ডনে ত্রিশক্তির বৈঠক বসিয়াছিল এবং জার্ম্মাণী সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাহা হউক, নিয়ন্ত্রণ-পরিষদে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স রাশিয়ার উল্লিখিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা মার্শাল সোকোলোভস্কি পরিষদের অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় পক্ষের গবর্ণর জেনারেল লুসিয়স ডি ক্লে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া রাশিয়ার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পরিষদের কাজ চালাইয়া যান এবং ঘোষণা করেন, "We came to Berlin by right and we have every intention of staying" অর্থাৎ 'আমরা নিজেদের অধিকারের বলে বার্লিনে আসিয়াছি এবং এখানে অবস্থান করাই আমাদের অভিপ্রায়।' জেনারেল লুসিয়স ক্লের এইরূপ উক্তি করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইহা শুধু গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টাই নয়, রাশিয়ার সহিত বিবাদকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার জন্য একটা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। বস্তুতঃ, চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ বাতিল করিয়া দিবার কোন অভিপ্রায় রাশিয়া প্রকাশ করে নাই, বরং উহার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিয়াছে।

বার্লিন সঙ্কট লইয়া যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার জন্যই চারি দিনব্যাপী সঙ্কটের আপাততঃ অবসান হইয়াছে। বার্লিন ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে ভ্রমণ সম্পর্কে রাশিয়া যে বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া এক পত্র দেয়। এই পত্রের উত্তরে রাশিয়া এই বিধি-নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিসমূহের সহিত এক আলোচনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। বৃটিশ-সামরিক গবর্ণমেণ্টকেও অনুরূপ পত্র দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর বার্লিন সঙ্কটের অবসান হইল। কিন্তু যাত্রী ও মাল-চলাচল সম্পর্কে বাধার বিধিনিষেধ আরোপ করার

যে তিনটি কারণ সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'টাস' কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কারণ, ইঙ্গ-মার্কিণ বৈতাঞ্চল হইতে বহু বুভুক্ষু লোক, মুনাফাদার, গুণ্ডা শ্রেণীর লোক এবং গুপ্তচর বে-আইনী ও ব্যাপক ভাবে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিতেছে। মুনাফাদারগণ, রাজনৈতিক দুষ্ট লোকরা এবং যুদ্ধাপরাধীরা অনিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের সুযোগে রেলযোগে যাতায়াত করিতেছে, ইহাই দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণ এই যে, বার্লিন হইতে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী পশ্চিম জার্ম্মাণীতে চলিয়া যাইতেছে। এই কারণগুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য হইলেও বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহাতে সন্তুষ্ট হইবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে রাশিয়ার সহিত অবিলম্বেই যুদ্ধ বাধাইবার অজুহাত সৃষ্টি করা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে তৃতীয় মহাসমরের সূচনা যে আরও কিছু দিনের জন্য পিছাইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ৫ই এপ্রিল সোমবার বার্লিনের গাটাও বিমান-ঘাঁটার নিকট বৃটিশ বিমান ভিকিংএর সহিত রুশ জঙ্গী বিমান ইয়াকের সংঘর্ষের ফলে বৃটিশ বিমান ভিকিং ধ্বংস হয় এবং ১৪ জন যাত্রীর মৃত্যু ঘটে। ইহা লইয়া বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল, অবশেষে তাহারও একটা মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। বৃটেন অভিযোগ করে যে, রুশ জঙ্গী বিমান উপর হইতে বৃটিশ বিমানের উপর পড়ায় বৃটিশ বিমান ধ্বংস হয়। কিন্তু রাশিয়া বলে যে, বৃটিশ বিমান পিছন হইতে রুশ জঙ্গীকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। বৃটেন দাবী করে যে, এ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য চতুঃশক্তির কমিটি গঠন করা হউক। কিন্তু রাশিয়া এই দাবী অগ্রাহ্য করে, কিন্তু বৃটেন ও রাশিয়ার যৌথ-তদন্ত স্বীকৃত হয়। গত ৭ই এপ্রিল মার্শাল সোকোলোভস্কী এই মর্ম্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, বিমান করিডর দিয়া বৃটিশ বিমান বার্লিনে যাওয়ার সময় কোনরূপ বাধা প্রদানের অভিপ্রায় রাশিয়ার নাই। এই আশ্বাসের পরে অবস্থা অনেকটা সহজ হয় এবং অতঃপর ৯ই এপ্রিলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, উল্লিখিত বিমান ধ্বংস সম্বন্ধে ইঙ্গ-রুশ যৌথ-তদন্তে বৃটেন সম্মত হইয়াছে। বার্লিন সঙ্কটের দুইটি পরিণতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, কম্যাণ্ডটুরা অর্থাৎ চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের ৮টি কমিটির ৬টি কমিটি বিলোপ করিতে পশ্চিমী মিত্রশক্তিত্রয় রাজী হইয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ, এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ দফা কার্য্যসূচী সম্বলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণী ও ফরাসী এলাকার জন্য অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের (Laender) এলাকা পুনর্গঠিত হইবে। গণ-পরিষদ গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হইবে এবং শাসনতন্ত্র রচনা করিবে গণ পরিষদ। কর্ম্মসূচীর পঞ্চম দফা নূতন পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন।

পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেই জার্ম্মাণীর বিভাগ স্থায়ী হইয়া পড়িবে। অতঃপর পশ্চিম জার্ম্মাণীর সহিত পশ্চিমী মিত্রশক্তিত্রয় স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে। পশ্চিম জার্ম্মাণী হইবে মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব্ব জার্ম্মাণী কমিন্ ফরমে যোগদান করিবে। হিটলার কম্যুনিজম ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি দিয়া জার্ম্মাণীর জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, পশ্চিম জার্ম্মাণীকে অতঃপর বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সেই সকল যুক্তি দিয়াই রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে। জার্ম্মাণীর বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের মীমাংসার পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং মহাযুদ্ধের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কাজও সম্পূর্ণ হইবে। সর্ব্বোপরি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সংস্কার করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিশ্ব-বিচারের (world trial) জন্য আমেরিকায় যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার পরিণামও বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। আমেরিকার ১৬ জন সিনেটর এই আন্দোলনের পিছনে রহিয়াছেন। জার্ম্মাণী স্থায়িভাবে বিভক্ত হওয়ার পর বার্লিন লইয়া আবার সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয়। বার্লিন জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত এলাকায় অবস্থিত। পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় বার্লিন ত্যাগে অনিচ্ছুক। পশ্চিম ও পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর মধ্যে লৌহ-যবনিকা সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু চারি শক্তি দ্বারা শাসিত বার্লিনে ঐরূপ লৌহ-যবনিকা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মার্কিণ অথবা বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের যে কেহ বার্লিনে যাইয়া রুশ-অধিকৃত এলাকার তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদিগকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবার একটা দাবীও আমেরিকায় উঠিয়াছে। সব মিলিয়া তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামকে যে নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোথায়, কি লইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, কে প্রথম গুলী বর্ষণ করিবে তাহা কিছুই এখনও অনুমান করা সম্ভব নয়।

মার্শাল-পরিকল্পনা—

অবশেষে মার্শাল-পরিকল্পনা বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গত ১লা এপ্রিল মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদে গ্রীস, তুরস্ক ও চীনকে অতিরিক্ত সাহায্য দান সহ মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য ৬২০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিয়া একটি বিল গৃহীত হয় এবং ৩রা এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। দশ মাস পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জর্জ মার্শাল এই পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। এই ৬২০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের মধ্যে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য অবিলম্বে পাওয়া যাইবে ৫৩০ কোটি ডলার। চীন সামরিক সাহায্য বাবদ ১৫ কোটি ডলার এবং অর্থ-নৈতিক সাহায্য ৪২ কোটি ডলার পাইবে এবং তুরস্ক ও গ্রীস অতিরিক্ত সাহায্য বাবদ পাইবে ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এই বিলের ইতিহাস এখানে আলোচনা করিবার মত স্থান নাই। ইউরোপীয় ১৬টি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্মেলনে যে পরিকল্পনা গঠন করা হয় তাহা স্বাক্ষরিত হয় গত সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) মাসে। এই পরিকল্পনাকে shoping list বা বাজারের ফর্দ্দ বলিয়া মার্কিণ সরকারী মহলে কঠোর সমালোচনা করা হয়। অতঃপর ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সম্মেলন পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া সাহায্য দাবীর পরিমাণ আরও হ্রাস করিতে বাধ্য হন। কিন্তু উহাও মার্কিণ রাজনৈতিক মহলে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মিঃ মার্শাল যে পরিমাণ সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন এবং অর্থ নৈতিক সম্মেলন সংশোধিত আকারে যে পরিমাণ সাহায্য দাবী করেন, হ্যারিম্যান কমিটির

রিপোর্টে উভয়েরই কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং এই কমিটি সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া ধার্য্য করেন। গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭) এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টে সাহায্যের যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয় আপোষে তাহাই সাহায্যের পরিমাণ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ইহাও প্যারী-সম্মেলনের সংশোধিত পরিমাণ অপেক্ষা ২৩১ কোটি ডলার কম। ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য চারি বৎসরে মোট ১৭ শত কোটি ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আলোচ্য বিলে মঞ্জুর করা হইয়াছে ৩৫০ কোটি ডলার। মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য দান করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ফ্রান্স, ইটালী এবং অষ্ট্রিয়াকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্য দিবার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিণ কংগ্রেস এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না করায় গত অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, ইউরোপের প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য দান খুবই অকিঞ্চিৎকর। আমেরিকার সাহায্য সত্ত্বেও ইউরোপকে প্রধানতঃ নিজের পায়ে ভর দিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। মার্শাল-পরিকল্পনাকে যাঁহারা লুফিয়া লইয়াছেন তাঁহারাও আশঙ্কা করেন যে, আমেরিকার এই সাহায্য ইউরোপকে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে সহায়তা করিবে মাত্র এবং চারি বৎসর পরেও ইউরোপের এই ষোলটি দেশ স্বাধীন ভাবে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মার্শাল-পরিকল্পনার ইহা-ই অর্থনৈতিক শেষ পরিণতি বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই সাহায্য গ্রহণের ফলে চারি বৎসর পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর এই ষোলটি দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতা এত বৃদ্ধি পাইবে যে, অর্থনৈতিক দিক্ হইতে তাহাদের স্বাধীন সত্তাই আর কিছু থাকিবে না। ইহার সহিত মার্শাল-পরিকল্পনার রাজনৈতিক পরিণাম বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এই দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। কম্যুনিজমকে রোধ করিবার জন্য মার্শাল-পরিকল্পনার টোপ ফেলিয়া এই দেশগুলিকে আমেরিকার পতাকা-তলে সমবেত করা হইতেছে। স্পেনকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ইটালী ও ফ্রান্সের বামপন্থীরা উহার যে কঠোর সমালোচনা করিলেন তাহাতে সচেতন হইয়া মার্শাল-পরিকল্পনা হইতে স্পেনকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর স্পেন আবার মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। সেনেটর ভ্যাণ্ডেনবার্গ বলিয়াছেন, স্পেনকে গ্রহণ করা হইবে কি না তাহা স্থির করিবার অধিকার ইউরোপের। ইহার স্পষ্টার্থ এই যে, ইউরোপের ষোলটি রাষ্ট্র নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্পেনকে মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করুক, ইহা-ই আমেরিকার আন্তরিক ইচ্ছা। চীনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দানও যে কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য, তাহা মার্কিণ সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির সংশোধিত রিপোর্টে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। উক্ত কমিটির প্রথম রিপোর্টে চীনের নেতাদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগ করা হইয়াছিল। পরে এই রিপোর্ট বদলাইয়া নূতন যে রিপোর্ট তৈয়ার করা হয়, তাতে চীনকে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধের প্রধান স্তম্ভ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

বিশ্বশান্তি রক্ষার আয়োজন—

পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মিঃ এটলী ইহাকে স্বার্থ ও ভীতির ফল বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা একই চিন্তাধারা-বিশিষ্ট প্রতিবেশীদের সঙ্ঘবদ্ধতা। কাহার বিরুদ্ধে এই সঙ্ঘবদ্ধতা তাহা তিনি না বলিলেও কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে চীনের বলাধানের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিজেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। গত ১৭ই মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক ভাবে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি পুনরায় প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "যত দিন ইউরোপের স্বাধীন জাতিসমূহ নিজের শক্তি পুনরুদ্ধার করিতে না পারিবে এবং যত দিন গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সাম্যবাদ দ্বারা বিপন্ন থাকিবে, যত দিন ইউরোপের যে-সকল দেশে কম্যুনিষ্ট আধিপত্য ও পুলিশী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন সেই দেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে।" সার্ব্বজনীন সামরিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি পৃথিবীতে কিরূপে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীন মিলিয়া বার্লিন-রোম-টোকিও এক্সিসের যে নূতন সংস্করণ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ফ্রাঙ্কোর স্পেনের এই এক্সিসে যোগদান অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ স্পেনকে মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা ইতিমধ্যেই উঠিয়াছে।

মার্কিণ কংগ্রেস স্পেনকে মার্শাল-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিয়াও পরে স্পেনকে বাদ দিয়াছে। স্পেনকে মার্শাল-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিবার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ইউরোপের ষোলটি রাষ্ট্রের উপর। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে পর্ত্তুগালের পররাষ্ট্র-সচিব সেনর দা মতো স্পেনকেও ইউরোপের পুনর্গঠন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। সম্মেলনে অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। পশ্চিম জার্ম্মাণীর এক জন প্রতিনিধি ইউরোপীয় পুনর্গঠন সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবে, এই মর্ম্মে উক্ত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন বলিয়াছেন, "জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় নাই বলিয়া জার্ম্মাণীর পশ্চিম অঞ্চল একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক এলাকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।" বস্তুতঃ রাশিয়ার চারি দিকে একটি সুদৃঢ় কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বেষ্টনী তৈয়ারী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সামরিক সাহায্য দিবার জন্য পুনরায় সামরিক ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করিতেছে। সুতরাং গণতন্ত্র ও শান্তি রক্ষার জন্য যে 'সাজ সাজ' রব সমগ্র

বিশ্ব ব্যাপিয়া উত্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অনেকে ১৯৪৯ সালেই আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠা অসম্ভব মনে করেন না।

ঘরে-বাহিরে উভয়ত্র-ই কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন চলিতেছে। বিগত মহাসমরের মধ্যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই কম্যুনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই আজ কম্যুনিষ্ট দমনের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বৃটেনে পার্লামেণ্টের ৬৪০ জন সদস্তের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মাত্র দুই জন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কম্যুনিষ্টদের প্রাধান্ত যথেষ্ট। ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ হইতে কম্যুনিষ্ট বিতাড়ন অবশ্য সহজ নয়। তবে সরকারী বিভাগ হইতে কম্যুনিষ্ট চাকুরীয়াদিগকে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। কম্যুনিজম তথা রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই যে সংগ্রামের আয়োজন চলিতেছে তাহার প্রধান হোতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এই আয়োজনের বিপুল সোরগোলের মধ্যে মিঃ হেনরী ওয়ালেসের ক্ষীণকণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

ইটালীকে ত্রিয়েস্তে অর্পণের প্রস্তাব—

গত ২০শে মার্চ্চ ওয়াশিংটন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্বাধীন ত্রিয়েস্তেকে ইটালীর হাতে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়া ও ইটালীর নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। হঠাৎ এইরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ১৮ই এপ্রিল ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার তারিখ। ইটালীতে কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা খুব শক্তিশালী। ইটালীর কম্যুনিষ্টরা এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা একযোগে কাজ করিতেছেন।

ইটালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁহাদের সদস্ত-সংখ্যা ২২ লক্ষ ৮৩ হাজার বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। ১৯৩১ সালে ইটালীতে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশী ছিল না। ১৮ই এপ্রিলের সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভের সম্ভাবনা মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে গিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ইটালীতে নৌবহরের উপর কোন দাবী-দাওয়া করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভের সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হইয়াছে।

ইটালীর মন্ত্রিসভা হইতে কম্যুনিষ্টরা বিতাড়িত হইয়াছে। এই ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য করিয়াছে তাহা অপ্রকাশ নাই। মার্কিণ সিনেটের সেনা-বিভাগ কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে গত ১৭ই মার্চ্চ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ্জ মার্শাল বলিয়াছেন, "ইটালীর গবর্ণমেণ্ট পুনর্গঠন কার্য্যে আমরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এক মাসের মধ্যেই সেখানে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে চলিয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলাফল শুধু ইটালীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ নহে।" কিন্তু ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা যাহাতে পরাজিত হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার জন্ত কি করিতে পারে, ইহা খুব কঠিন প্রশ্ন। গত ১১শে মার্চ্চ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিত্যালয়ে বক্তৃতা দিবার সময় মিঃ মার্শাল ইটালীর অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "আসন্ন নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা যদি ইটালীতে জয়লাভ করে তবে ইটালী মার্কিণ অর্থনৈতিক সাহায্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।" অতি সোজা স্পষ্ট কথা। কিন্তু ইহাতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত হইতে পারিতেছে না। তাই ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচনে গণশক্তির জয়লাভকে ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিয়েস্তেকে ইটালীর হাতে অর্পণের চেষ্টা চলিতেছে।

গত ২৪শে মার্চ্চ কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন অবশ্য অস্বীকার করিয়াছেন যে, ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইটালীকে ত্রিয়েস্তে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করা হয় নাই। তাঁহার এই অস্বীকৃতি বিপরীত অবস্থাকেই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত করিতেছে।

ইটালিতে ত্রিয়েস্তে অর্পণের প্রস্তাবের ফলাফল কি হইবে, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। রাশিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স একমত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়াছে। এ সম্পর্কে রাশিয়ার অভিপ্রায় এখনও জানা যায় নাই। প্যারী নগরীর শান্তি সম্মেলনে ত্রিয়েস্তে সম্বন্ধে ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার দাবী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়াই ত্রিয়েস্তেকে স্বাধীন বন্দর বলিয়া গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। রাশিয়ার অনভিমতে ত্রিয়েস্তে ইটালীর হাতে অর্পিত হইলেও ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্তবাহিনী চিরকালই সেখানে রাখিতে হইবে। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে তাহা সম্ভব নয়। ইটালীর সামরিক শক্তিও সীমান্ত রক্ষার উপযোগী শক্তিশালী নয়। কাজেই ইটালীর পূর্ব্বাংশের প্রদেশগুলি দ্বিতীয় গ্রীসে পরিণত হওয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

সংবাদ-স্বাধীনতা সম্মেলন—

জেনেভা নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবাদ-স্বাধীনতা সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে। গত ২৩শে মার্চ্চ এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ৫৭টি রাষ্ট্রের পাঁচ শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। গত ৩০শে মার্চ্চ এই সম্মেলনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, এই সম্মেলনে যোগদানকারী গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রত্যেকেই বৈদেশিক সংবাদদাতাদিগকে যাতায়াতের স্বাধীনতা এবং সংবাদ সংগ্রহ সম্বন্ধে নিজের দেশের সাংবাদিকদের সহিত সমান সুযোগ দান করিবেন। ভারতবর্ষে এই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নাই। কারণ, ভারতে বিদেশী সাংবাদিকরাই দেশী সাংবাদিক অপেক্ষা সংবাদ সংগ্রহের অধিকতর সুযোগ পাইয়া থাকেন। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন, দেশী সাংবাদিকদিগকেও বিদেশী সাংবাদিকদের মতই সংবাদ সংগ্রহের সমান সুযোগ ও অধিকার দান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রস্তাব কম্যুনিষ্ট সাংবাদিকদিগকে প্রবেশাধিকার দান করিবে না। কারণ, সেখানে কম্যুনিষ্টদেরই প্রবেশ নিষেধ করিয়া আইন রচিত হইতেছে। কম্যুনিষ্টদের সাংবাদিক হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার বিশেষ অধিকার পাওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কম্যুনিষ্টদের জন্ত নয়।

গত ৩রা এপ্রিল উক্ত সম্মেলনে চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতা সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নয়টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাবগুলিতে দাবী করা হইয়াছিল, ফ্যাসিষ্ট প্রচারকার্য্য এবং যুদ্ধের প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত। এই নয়টি সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে। আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে এবং ফ্যাসিষ্টরাও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মার্কিণ প্রস্তাবের চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতা যে কম্যুনিষ্টদের জন্ত নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা কাহাদের জন্ত? সংবাদের উৎসস্থানে যাওয়ার অধিকার এখনও সাংবাদিকদের আছে।

কিন্তু সংবাদ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করা তাহতে নিবারিত হয় নাই। ইহার জন্ত দায়ী সাংবাদিকরা নহেন, দায়ী সংবাদপত্রের পরিচালক-বৃন্দ। তাঁহারা যে সংবাদ প্রকাশ করিতে চান না তাহা প্রকাশিত হয় না। সংবাদ যে ভাবে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিতে চান, সেই ভাবে বিকৃত হইয়াই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র পরিচালনের বর্ত্তমান ব্যবস্থা যত দিন থাকিবে, তত দিন সাংবাদিকদের চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়াই থাকিবে।

পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা—

পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যা লইয়া গত জুন মাস (১৯৪৭) হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরমাণু-শক্তি কমিশনে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সম্প্রতি উহা অনিবার্য্য স্বাভাবিক পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গত ৩০শে মার্চ্চ (১৯৪৮) পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিটির আলোচনা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়ার পরিকল্পনা লইয়া গত জুন মাস হইতেই আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। এই আলোচনার শেষ পরিণতি-স্বরূপ বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স ও চীন রুশ-পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের জন্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, কলম্বিয়া এবং আর্জ্জেন্টিনা কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরমাণু-শক্তি কমিশনের দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে: একটি পরমাণু নিয়ন্ত্রণ কমিটি (Atom Control Committee) এবং অপরটি পরমাণু-শক্তি কার্য্যকরী কমিটি (Atomic Energy Working Committee)। উল্লিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় পরমাণু-শক্তি কার্য্যকরী কমিটিতে। পরমাণু নিয়ন্ত্রণ কমিটি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ কমিটির অধিবেশনে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাব সমর্থন করে বৃটেন, বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং কানাডা।

পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল তাহা পরিসমাপ্ত হইয়াছে সুতীক্ষ্ণ কটূক্তি, তিক্ততা এবং ব্যর্থতার মধ্যে। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের এক অশুভ প্রভাতে হিরোশিমার উপর পরমাণু-বোমা বর্ষিত হওয়ার পর আতঙ্কগ্রস্ত বিশ্ববাসীর মনে এই নূতন মারণাস্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ভীতি, এবং আশঙ্কাসঙ্কুল প্রশ্ন জাগিয়াছিল আজিও তাহার কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব হইল না কেন, এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরু তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরমাণু-শক্তি কমিশনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াই উহার উত্তর আমরা পাইতে পারি। নূতন মারণাস্ত্র পরমাণু-বোমার আতঙ্ক দূর করিতে হইলে, বোমা বর্ষণের প্রয়োজনীয়তাই আর যাহাতে না থাকে তাহার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। একটি কার্য্যকরী ভাবে শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনই যে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির একমাত্র উপায় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন কার্য্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পরই পরমাণু-বোমা বর্ষিত হয়। তথাপি এই নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মস্কো সম্মেলনে পরমাণু-শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক একটি কমিশন নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং গঠিত হয় পরমাণু-শক্তি কমিশন। কিন্তু যে দিন হইতে এই কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতেই একের পর আর বাধা-বিঘ্ন সৃষ্ট হইয়া পরিণামে এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির মূল কোথায় তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম যখন পরমাণু-শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা উঠে, তখন উহার বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, সে কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাঁহারা পরমাণু-বোমার রহস্য এবং নিয়ন্ত্রণ বিদেশী শক্তি-বর্গের হস্তে অর্পণের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের বিরোধিতার উত্তরে তৎকালীন মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ বার্ণেস বলিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের এবং নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে; কাজেই আমেরিকা তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে আমেরিকাই ভেটো ক্ষমতা বাদ দিতে চায়। পরমাণু শক্তি সম্পর্কে 'বারুচ পরিকল্পনা'র কথা আমরা সকলেই জানি। পরমাণু-শক্তি কমিশনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি মিঃ বার্ণার্ড বারুচ যে পরিকল্পনা উত্থাপন করেন তাহাই বারুচ পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু-উন্নয়ন কর্ত্তৃত্ব শক্তি (International Atomic Development Authority) গঠনের এবং উহার হাতে পরমাণু-শক্তি উন্নয়নের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনার দুই সর্ত্ত রাশিয়ার মনে গভীর সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। প্রথমতঃ, পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে ভেটো ক্ষমতা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিবে যে, এই আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু-উন্নয়ন কর্ত্তৃত্ব শক্তি (সংক্ষেপে এ-ডি-এ) সন্তোষজনকরূপে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আর নাই, তখনই আমেরিকা এই কর্ত্তৃত্ব শক্তির হাতে পরমাণু-বোমা প্রস্তুত-প্রণালী অর্পণ করিবে এবং তৈয়ারী পরমাণু-বোমাগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ এবং দুর্ভেদ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিমধ্যেই নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। রাশিয়ার ভরসা এক মাত্র ভেটো ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্যান্য রাষ্ট্রও তাহাদের স্বকীয় চেষ্টা দ্বারাই চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরমাণু-বোমা প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বারুচ পরিকল্পনা অনুযায়ী অপর কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই পরমাণু-বোমা প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিবে না, অথচ পরমাণু-বোমা প্রস্তুত-প্রণালী থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে। ইতিমধ্যে আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্ত নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের

নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে ভেটো ক্ষমতা প্রযোজ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র পরমাণু-বোমা বাদ দিয়া নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা শুধু হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র। ঐ বৎসরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি জাতীয় পরমাণু-শক্তি কমিশন গঠন করে এবং উহার হাতে বিপুল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। শান্তিকালীন এবং যুদ্ধকালীন উভয় সময়ের উপযোগী পরমাণু শক্তি উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থও বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ফলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণ পরমাণু-বোমা তৈয়ারী হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার এক জন বে-সরকারী .বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষক এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পাঁচ শতের বেশী পরমাণু-বোমা নাই, এমন কি উহার সংখ্যা মাত্র ৩০টিও হইতে পারে। এই উক্তিকে তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাবও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তির পক্ষগণকে—তাঁহাদের হাতে যে-সকল পরমাণু-বোমা আছে সেগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা পরমাণু-বোমা প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই চুক্তিকে কোনরূপে ভঙ্গ করা মানব জাতির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। তৃতীয়তঃ, পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছে। তৈয়ারী পরমাণু-বোমাগুলি অবিলম্বে বিনষ্ট করা এবং পরমাণু-বোমা তৈয়ারীর প্রণালী প্রকাশ করা হউক, ইহাই রাশিয়ার দাবী। আমেরিকা পরমাণু নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব শক্তি গঠিত ও সন্তোষজনকরূপে কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে তৈয়ারী পরমাণু-বোমা বিনষ্ট করিতে এবং উহার প্রস্তুত-প্রণালী প্রকাশ করিতে রাজী নয়। ইহা ব্যতীত ভেটো ক্ষমতা লইয়া আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। আমেরিকা মনে করে যে, পূর্ব্বেই যদি পরমাণু-বোমার প্রস্তুত-প্রণালী প্রকাশ করা এবং তৈয়ারী পরমাণু-বোমাগুলি বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হইবে এবং আমেরিকা বিপন্ন হইয়া পড়িবে। আবার রাশিয়া মনে করে যে, আন্তর্জাতিক পরমাণু-শক্তি উন্নয়ন কর্তৃত্ব-শক্তিতে অব্যর্থ প্রাধান্য থাকিবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এবং আসলে এই প্রাধান্য একক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য ছাড়া আর কিছুই হইবে না। অর্থাৎ পরমাণু-বোমা কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া হইয়া থাকিবে। রাশিয়ার এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গোল্ডকোষ্টের হত্যাকাণ্ড :—

চেকোশ্লোভিয়ার মন্ত্রিসভার রদ বদল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিপুল তোলপাড় সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ সংবাদপত্রে ভাল করিয়া প্রকাশিতও হয় নাই। ডক্টর মাসারিকের আত্মহত্যার জন্য ধনতন্ত্র-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি কম্যুনিষ্টদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গোল্ডকোষ্টে যে ২২ জন আফ্রিকাবাসীকে নিরস্ত্র ও অসহায় অবস্থায় হত্যা করা হইয়াছে এবং ২০০ আফ্রিকাবাসী যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক আহত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে বৃটিশ সংবাদপত্রের অপরিসীম ঔদাসীন্য বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিবার বিষয়। গোল্ড-কোষ্টের ঘটনাবলীর উপর এমন ভাবেই লৌহ-যবনিকা টানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বিশ্ববাসী প্রকৃত ঘটনা কিছুই জানিতে পারে নাই। গোল্ডকোষ্টের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড গোল্ডকোষ্ট কন্‌ভেনশন এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই গোল্ডকোষ্টের হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

গোল্ডকোষ্টের লড়াই-ফেরৎ সৈন্যদের ইউনিয়নের ৭ হাজার সদস্য গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গোল্ডকোষ্টের রাজধানী আক্রা সহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এক ব্যবস্থা করে। তাহাদের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা অথবা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবী জানাইয়া গোল্ডকোষ্টের গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত পেশ করাই ছিল এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য। গোল্ডকোষ্টের গবর্ণর স্যার জেরাল্ড ক্রিসি এই বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী লড়াই-ফেরৎ সৈনিকদের প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন। বৃটিশ পুলিশ কমিশনারের বিশেষ অনুরোধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় শোভাযাত্রা করিয়া লাট-প্রাসাদের দিকে যাইতেছিল। ক্রিশ্চিয়ান বোর্গ রোড, লাট প্রাসাদ অভিমুখী গিয়াছে। শোভাযাত্রাকারীরা যখন এই রাস্তা-এবং কাসল রোডের সংযোগস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় এক দল আফ্রিকান পুলিশ কয়েক জন বৃটিশ অফিসারের পরিচালনাধীনে সঙ্গীন উঁচাইয়া পথ আগুলিয়া রহিয়াছে। এই সকল বৃটিশ অফিসারদের মধ্যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইম্‌রেও ছিলেন। শোভাযাত্রাকারীরা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। পুলিশ-সুপার ইম্‌রে শোভাযাত্রকারীদিগকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই গুলী বর্ষণের আদেশ দেন। শোভাযাত্রা-কারীদের নেতা অগ্রসর হইয়া ইম্‌রেকে গুলী বর্ষণ বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আরও বেশী করিয়া গুলী বর্ষণ করিয়া এই অনুরোধের জবাব দেওয়া হয়। এই আক্রমণের ফলে কয়েক জন লড়াই ফেরৎ সৈন্য ও একটি ছাত্র নিহত হয় এবং এক জন পথচারী নারী সহ পাঁচজন অসামরিক নাগরিক আহত হয়। এই গুলী বর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় সহরে লুঠতরাজ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় এবং উহা সংক্রামিত হয় উপনিবেশের অন্যান্য অংশেও। কয়েক জন ইউরোপীয়ান আক্রান্ত হয় এবং ইউনাইটেড আফ্রিকান্ কোম্পানীর দোকান লুণ্ঠিত হয়। কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়িয়া এবং সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইউনাইটেড গোল্ডকোষ্টের কন্‌ভেনশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও শান্তি স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

এই সকল-লড়াই ফেরৎ সৈন্যরা ব্রহ্মদেশে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চতুর্দ্দশ বৃটিশ আর্ম্মীর সহিত একযোগে ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল। নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাদের উপরে কাপুরুষোচিত আক্রমণ কি সূচনা করে তাহা বলা বাহুল্য। কমন্স সভার কম্যুনিষ্ট সদস্য মিঃ গালাচার যখন এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন উপনিবেশের সহকারী সচিব শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্টরাই এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী। যাহা হউক, অতঃপর তদন্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু তদন্ত যে হইবে শুধু বৃটিশ শাসকের নিপীড়নের উপর চুণকাম করিবার জন্য

তাহাতে সন্দেহ নাই। একনায়কত্বমূলক শাসন ও বৃটিশ শাসনের মধ্যে কতটুকু তফাৎ, গোল্ডকোষ্টের ঘটনায় তাহা কিছু বুঝা যায় কি?

প্যালেষ্টাইনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ—

প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা-ই ঘটিয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা প্রত্যাহার করিয়াছে এবং সমগ্র প্যালেষ্টাইনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সাময়িক অছিগিরির একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করা হইয়াছে। গত ১৯শে মার্চ্চ মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারেন অষ্টিন সরকারী ভাবে নিরাপত্তা পরিষদে উল্লিখিত বিষয় জানাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, সকল দলের সহিত আলাপ-আলোচনায় পরও প্যালেষ্টাইন সমস্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহুদী এজেন্সীর মতে প্যালেষ্টাইন বিভাগই মীমাংসার একমাত্র উপায়। আরব উর্দ্ধতন কমিটি বিভাগ-পরিকল্পনার ভিত্তিতে মীমাংসার কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। মিঃ অষ্টিন নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। ইহুদী এজেন্সী এবং আরব উর্দ্ধতন কমিটি উভয়েই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজ নিজ অভিপ্রায় বহু বার প্রকাশ করিয়াছেন। উহা জানিবার জন্য নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা চালাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহারের একটা অজুহাত সৃষ্টির জন্যই যে সকল দলের সহিত আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়ায় প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের পথ সহজ ও সুগম হইয়াছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। বরং সমস্যা আরও অধিকতর জটিল হইয়া উঠিবারই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ আরও অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট আগামী ১৫ই মে তারিখে অবসান হইবে বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে দিন স্থির করিয়াছেন, কমন্স সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। গত ২০শে মার্চ্চ বৃটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলেও ১৫ই মে তারিখে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত এবং ১লা আগষ্টের মধ্যে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সঙ্কল্পের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসানের পর প্যালেষ্টাইনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গত ২৫শে মার্চ্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বনাশ রোধ করিতে হইলে অবিলম্বে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটান আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে যুদ্ধবিরতি ঘটান যাইতে পারে তাহার কোন উপায়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি? প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য আরব ও ইহুদীদের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহার এই আবেদনের যে কোন ফলই হয় নাই, আরব-ইহুদী সংঘর্ষ পূর্ব্বের মতই অব্যাহত থাকার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গত ১লা এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত অবিলম্বে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এবং প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ১৬ই এপ্রিল তারিখে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। গত ২৫শে মার্চ্চের বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন বিভাগের বিকল্প হিসাবে অছি-ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় নাই। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, তিনি এখনও প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষপাতী এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রবেশ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিভাগ প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না তাহা আমরা অনুমান করিতে চেষ্টা করিব না। আমেরিকা যদি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করে তবে তাহা-ই যে গৃহীত হইবে, সে-সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। হয়ত বা বিভাগের উপযোগী শান্ত অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনে ট্রাষ্টিশিপ বা অছিগিরি বহাল থাকার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু এই ট্রাষ্টিশিপ যে কাহার ট্রাষ্টিশিপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। গত ৩০শে মার্চ্চ ট্রাষ্টিশিপ প্রস্তাব সম্পর্কে রুশ-প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো নিরাপত্তা পরিষদে বলিয়াছিলেন, "It is not difficult to understand what these new proposals mean and what their aunthors are aiming at." অর্থাৎ 'এই সকল প্রস্তাবের তাৎপর্য্য কি এবং প্রস্তাব-রচয়িতাদের উদ্দেশ্যই বা কি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।' কার্য্যতঃ এই অছিগিরি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অছিগিরি ছাড়া আর কিছুই হয়ত হইবে না। কিন্তু বিভাগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পক্ষে যে-সকল বাধা উপস্থিত হইয়াছে ট্রাষ্টিশিপ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পথেও সেই সকল বাধা আসিয়াই যাইবে। বিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়ায় আরবরা যেমন খুসী হইয়াছে তেমনি ইহুদীরা হইয়াছে গুরুতর অসন্তুষ্ট। কিন্তু ট্রাষ্টিশিপ যে আরবরাই পছন্দ করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আরবরা পছন্দ করিলেই ইহুদীরাও যে করিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি স্বীকার করা যায় যে, প্যালেষ্টাইনের অছিগিরি শুধু আমেরিকার অছিগিরি হইবে না, হইবে জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের অছিগিরি, কিন্তু সমস্যা তাহাতেও দূর হইবে না। প্যালেষ্টাইনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক জন সৈনিক শাসন-কর্ত্তা নিয়োগ সম্পর্কে একটা সর্ব্বসম্মত মীমাংসাও হইতে পারে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্যবাহিনী না পাইলে সৈনিক শাসনকর্ত্তা একা 'নিধিরাম সর্দ্দার' সাজিয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন কি?

প্যালেষ্টাইনে ট্রাষ্টিশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৫ দফা কার্য্যসূচী সম্বলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। এই ১৫ দফা ছাড়াও আর এক দফা অপ্রকাশিত কর্ম্মসূচী আছে বলিয়া শোনা যায়। রাশিয়াকে বাদ দিয়া প্যালেষ্টাইনের জন্য ট্রাষ্টিশিপ গঠন করাই না কি এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৫ই মের পরে প্যালেষ্টাইনের অবস্থা আরও বেশী গুরুতর হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় বলিয়া এখন পর্য্যন্ত মনে হয় না।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সনদ—

দীর্ঘ চারি মাস আলোচনার পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সনদ রচনার কাজ হাভানা সম্মেলন শেষ হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর ৬২টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন

এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। গত ২৪শে মার্চ ৫৩টি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই সনদ স্বাক্ষর করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা এই সনদে স্বাক্ষর করে নাই। তুরস্কের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা আন্‌কারার নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সনদের মূল খসড়া দাখিল করেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র বিভাগ। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে এই খসড়া সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া এই খসড়া সনদ লইয়া আলোচনা চলে। প্রথমে লণ্ডনের Preparatory Conference বা উদ্যোগ সম্মেলনে এই খসড়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়। অতঃপর সম্মেলন আরম্ভ হয় জেনেভায়। জেনেভা সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু অচল অবস্থার পর অচল অবস্থার মধ্য দিয়া যে জেনেভা সম্মেলনের অগ্রগতি অগ্রসর হইয়াছে সে সংবাদ অবশ্য গোপন রাখা হয় নাই। গত গ্রীষ্মকালে জেনেভা সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সনদের যে খসড়া রচিত হয়, তাহারই ভিত্তিতে হাভানা সম্মেলনে সনদ রচিত হইয়াছে আদর্শের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, একটা মহান্ আদর্শ লইয়াই এই সনদ রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সনদে যে সকল বিধি-নিষেধ স্থান পাইয়াছে সেই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির উপর শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার কোন ব্যবস্থাই বাদ দেওয়া হয় নাই। হাভানা সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নেতা মিঃ ক্লেটন এই সনদ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "The Charter might will prove to be the greatest step in history towards order and justice in economic relation among members of the world." অর্থাৎ 'পৃথিবী বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সম্বন্ধের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই সনদ বৃহত্তম পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে।' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক।

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিয়া বিশ্বের সম্পদ-বৃদ্ধির পথ সুগম ও সুদৃঢ় করিবার জন্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি হ্রাস করার উদ্দেশ্য লইয়া সনদ রচিত হইয়াছে। বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি হ্রাস পাইলে শিল্পোন্নত দেশগুলির নর-নারীর জীবনযাত্রা অবশ্যই উন্নততর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলি যদি নিজেদের দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্ত দেশে উৎপন্ন পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্কের হার অপেক্ষা বেশী হারে বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য না করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ সকল দেশ চিরকালের জন্তই কৃষিপ্রধান ও কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হইয়া আসিবে। হাভানা সম্মেলনে পৃথিবীর দেশগুলি ব্যাপক ভাবে একমত হইতে পারিয়াছে দেখিয়া মিঃ ক্লেটন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। কার্য্যতঃ এই একমত হওয়ার অর্থ আমেরিকার মতে মত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সনদ সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্শাল-পরিকল্পনার প্রয়োগান্তর মাত্র।

রুশ-ফিনিশ চুক্তি—

গত ৬ই এপ্রিল রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সামরিক সাহায্য ও মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্রগণ বলিয়াছেন যে, রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের উপর অত্যধিক চাপ দেওয়ার ফলেই ফিনল্যাণ্ড এইরূপ সন্ধিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সন্ধির সর্ত্তাবলী আলোচনা করিলে এইরূপ উক্তির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। কত দিন এই সন্ধি বহাল থাকিবে প্রকাশিত সর্ত্তাবলীতে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না বটে, তবে রাশিয়া যে ফিনল্যাণ্ডের প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছে, সর্ত্তাবলী হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সন্ধিতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী অথবা জার্ম্মাণীর সহিত মিত্রতাসম্পন্ন কোন শক্তি কর্ত্তৃক ফিনল্যাণ্ড বা রাশিয়া আক্রান্ত হইলে ফিনল্যাণ্ড এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্ত যুদ্ধ করিবে এবং সোভিয়েট রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবে। এই সর্ত্তের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। পঞ্চশক্তির সন্ধির মুখবন্ধেও ঠিক এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে।

সম্প্রতি ট্রান্সজর্ডানের সহিত বৃটেন যে চুক্তি করিয়াছে তাহার সর্ত্তাবলী অপেক্ষা রুশ-ফিনিশ চুক্তি অনেক ভাল। ট্রান্সজর্ডানে এই চুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাজা আবদুল্লা স্বৈর-শাসক বলিয়া এই অসন্তোষ ইরাকের মত অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবে ট্রান্সজর্ডানের প্রধূমায়িত অসন্তোষ বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন।

ফিনল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন দেশের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন না। ফিনিশ পার্লামেণ্টে রুশ-ফিনিশ চুক্তি অনুমোদিত না হওয়ার কোন কারণ নাই।

রজত জয়ন্তী সংখ্যা

সরকারী শিল্পনীতি

২৪শে চৈত্র শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি সংক্রান্ত যে প্রস্তাব ভারতীয় পার্লামেণ্টে পেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য আমাদের রাষ্ট্রনায়করা দেশবাসীর কাছে ক্রমাগত আবেদন জানান, কিন্তু ভারতের শিল্পনীতি নির্দ্ধারণে তাঁহারা নিজেরাই সেই আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ভারতের শিল্পনীতি ধনতান্ত্রিক শিল্পনীতি ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। কতকগুলি শিল্পের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, কতকগুলির উপর কেবল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে এবং কতকগুলি শিল্পকে বেসরকারী প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। প্রথম শ্রেণীতে পড়িয়াছে—রেলপথ, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান ও জাহাজ নির্ম্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ এবং খনিজ তৈল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে—লবণ, চিনি, সূতী ও পশমী বস্ত্র, সিমেণ্ট, সাধারণ কাগজ ও সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ, ঔষধপত্র, মূল রসায়ন শিল্প, মোটরযান, বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে—অবশিষ্ট অন্যান্য শিল্প। যে সকল শিল্পের উপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব থাকিবে সেগুলি এমন শিল্প যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই ঐ সকলের উপর রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। নূতনত্ব কিছুই করা হয় নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেসরকারী শিল্পোদ্যমের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও নূতন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য শিল্পপতিরা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও সংরক্ষণ চাহিলে নিয়ন্ত্রণও স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোন সুবিধা নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত শিল্পের উপরেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এখনও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। তাহাতে জনসাধারণের অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্ট শিল্পপতিদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি মাত্র। আর যে সকল শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জনসাধারণ কতটুকু উপকার পাইবে তাহা না বলাই ভাল। অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ, বণ্টন এবং মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণরূপে পুঁজিপতিদের হাতেই থাকিয়া যাইতেছে।

——

উৎপাদন সঙ্কট

ভারতবর্ষ আজ একটা ভীষণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ বলিতেছেন যে, উৎপাদন হ্রাস পাইবার কারণ শ্রমিকদের বেয়াড়া আবদার। তাদের শায়েস্তা করিতে পারিলে এবং শিল্পপতিদের যথেচ্ছা লাভ করিতে দিলেই উৎপাদন হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। নয়াদিল্লীতে এই সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ এম, এ, মাষ্টার তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সন্মুখম চেটি যে ধনিক শ্রেণীর উপর হইতে কর হ্রাস করিয়াছেন তাহা ভাল বটে, কিন্তু সন্তোষজনক নহে। আরও করভার লাঘব করা উচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশের শিল্পপতিদের মুখপাত্র হিসাবে মিঃ ড্রাইভারও জানাইয়াছিলেন যে, আগামী কুড়ি বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি শিল্পপতিদের যথেচ্ছ ভাবে চলিতে না দেন, তবে দেশে শিল্পপ্রসার অসম্ভব।

ভারত এখন স্বাধীন। শিল্পপতিদের মধ্যে যদি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা অথবা দেশের প্রতি মমতা এক বিন্দুও থাকিত, তাহা হইলে এই ধরণের কথা উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন। যুদ্ধের সময় চোরাবাজারে ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণকে শোষণ করিয়া তাঁহারা অভাবিত লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিরাট লাভের একটা সামান্য অংশও যদি শ্রমিকদের দিতে স্বীকৃত হইতেন তবে ধর্ম্মঘট হইত না। সুতরাং উৎপাদন হ্রাস এবং মূল্যবৃদ্ধিও হইতে পারিত না। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শিল্পক্ষেত্রে মালিকানা রহিত করা একান্ত আবশ্যক। সঙ্ঘের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল স্বীকার করিয়াছেন যে, উৎপাদন সঙ্কটের জন্য কেবল শ্রমিকদের দায়ী করা চলে না, ইহার মূল আরও গভীর। কিন্তু মূল কি এবং তাহার প্রতিকারই বা কি, তাহা তিনি আলোচনা করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে চালু শিল্পগুলি জাতীয়করণ হইবে না। যেগুলির অস্তিত্ব নাই সেগুলিই জাতীয়করণ পরিকল্পনার মধ্যে পড়িবে। সর্দ্দার প্যাটেলও ইতিপূর্ব্বে শিল্পপতিদের এই আশ্বাসই দিয়াছিলেন। এই ভাবে গবর্ণমেণ্ট শিল্পপতিদের মন ও স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন। শ্রমিকদের অথবা জনসাধারণের জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ কেবল মৌখিক। গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত কয়েক দিন পূর্ব্বে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, জাতীয়করণ কর্ত্তব্য, তবে ইহা একটা জটিল সমস্যা। ভারতের সমস্ত শিল্প জাতীয়করণ করিবার অর্থও ভারতের নাই।" সমস্ত শিল্প জাতীয়করণের দাবী কেহই করেন নাই। বিদেশী মূলধনে পরিচালিত শিল্প, দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় শিল্প এবং ইস্পাত, সিমেণ্ট, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দাবীই উঠিয়াছে। কয়েক জন মুষ্টিমেয় শিল্পপতির কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে ভারত সরকার নারাজ, কারণ শিল্পপতিদের তাঁহারা চটাইতে চাহেন না। ইহাই আমাদের জাতীয় সরকার।

——

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের দানকে ভারতীয় নেতারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। বৃটিশ আমলের তথাকথিত শৃঙ্খলার মাপকাঠির সাহায্যে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিচার করিবার চেষ্টা দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ১৫ই আগষ্টের পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, এই পুরাতন নীতির হয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে দেশরক্ষা-সচিব সর্দার বলদেব সিং সেই পুরাতন নীতির উল্লেখ করিয়া সকলের আশাই নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জানাইয়াছেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে যাঁহাদের পেন্সন প্রাপ্য হইয়াছে, তাঁহাদের পেন্সন দেওয়া হইবে এবং সৈন্যদের ক্ষতিপূরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ লক্ষ টাকা পৃথক্ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাঁহারা মারা গিয়াছেন বা যাঁহারা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের স্ত্রী ও পোষ্যরাও সাহায্য পাইবেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের পুনরায় ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে নিযুক্ত করা হইবে না। তাঁহারা যোগ্যতা অনুসারে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীতে, হোম-গার্ডে, দেশীয় রাজ্য-বাহিনী ও অন্যান্য অসামরিক কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরদিন সেনা-বাহিনীকে জনসাধারণের নিকট হইতে তফাতে রাখিতেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা জানিতে দিতেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করিয়াছেন এবং ফলে কিছুটা রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই কি তাঁহাদের পুনরায় গ্রহণ করিতে গভর্ণমেণ্টের আপত্তি? অথচ গবর্ণমেণ্টই এক সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সেনা-বাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদান আশা করেন। জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, সেনা-বাহিনী তাঁহাদেরই আপনার জিনিষ। বৃটিশ অফিসারদের নিকট হইতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন সেনাদের দেশপ্রেমের উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের অপেক্ষা স্বাধীন ভারত সরকারের আস্থা অধিক। এই মনোভাব কি সুস্থ ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়? ইহা কি নেতাজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সেই পুরাতন মনোভাবের পরিচায়ক নয়?

—

নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মী

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বৃটিশ রাজত্বে তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল কেবল নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা। দেশ স্বাধীন হইবার পর আশা হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকার ইঁহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বিলম্বে হইলেও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার যে ইঁহাদের প্রতি সুবিচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা সত্যই আনন্দের বিষয়। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহাকে কোন মতেই প্রচুর বলা চলে না। অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের অপরিমেয় ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ যৎসামান্য নিবেদন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।" দেশবাসীও যে সেই দিক্ দিয়াই গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার বিচার করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিকল্পনা হিসাবে রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করিতে গিয়া অঙ্গহানি, জরা, স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদিতে যাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক বৃত্তি অথবা অবস্থা বিবেচনায় এককালীন অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অংশ গ্রহণের ফলে যাঁহারা পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিধবাদের আজীবন মাসিক ভাতা এবং তাঁহাদের পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া ও কন্যাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু সাহায্য দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া যোগ্য ও সক্ষম অথচ জীবিকার অভাবে দুর্গতিতে পড়িয়াছেন, যোগ্যতা থাকিলে ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরীতে অপরের অপেক্ষা তাঁহাদের দাবীই আগে বিবেচিত হইবে। স্বাধীনতা লাভ যে কেবল ফাঁকা কথা নয়, ইহা যে জাতীয় জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা আমূল পরিবর্ত্তন, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ দিয়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকার জনসাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমরা কেবল এই কথাই বলিব, মতভেদের জন্য যেন বিভিন্ন দলের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে পার্থক্য না করা হয়। অসহযোগী অথবা সন্ত্রাসবাদী উভয়েই দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। আমরা আশা করি, নিপীড়িত কর্ম্মীদের সাহায্য দানের সময় দল ও মতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই পরিকল্পনার পবিত্র মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গবর্ণমেণ্ট সক্ষম হইবেন।

—

বঙ্গ-বিভাগ

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যায্য দাবীর জন্য বঙ্গীয় বিভাগ-পরিষদ যে ১৭টি বিষয় অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল, সালিশ ট্রাইব্যুনালের কর্ত্তৃক তাহা মীমাংসিত হওয়ায় বঙ্গবিভাগ কার্য্য একরূপ সম্পন্ন হইল বলা যাইতে পারে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৭টি বিষয়ের সকল বিষয়ই ট্রাইব্যুনালের দুই জন সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হইয়াছে, চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় নাই। সিদ্ধান্তগুলি যে পশ্চিম-বঙ্গের অনুকূল হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তবে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। দেনা ও পাওনা উভয়ই উভয় প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বিভক্ত হইয়াছে এবং পশ্চিম-বঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে শতকরা ৩৫'২ ভাগ। কিন্তু দেনার জন্য যে লীগ মন্ত্রিসভার অবস্থাই দায়ী, সে কথা বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তৎসংক্রান্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই অন্যায় অতি-উদারতার পরিবর্ত্তে প্রতিদানস্বরূপ তাঁহারা কিছুই পান নাই। রাস্তা সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। আর্থিক বাঁটোয়ারার জন্য উহার মূল্য ধরা সঙ্গত হয় নাই। অথচ ঢাকায় যে সকল সরকারী সম্পদ আছে, শুনানীর সময় সেগুলির উল্লেখ করা হয় নাই। তবে কি তাহা আর্থিক বাঁটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না? না হইলে অত্যন্ত

অসঙ্গত হইবে। আশা করি, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা স্মরণ করিয়া কেবল বাহবার লোভে উদারতার সীমা অতিক্রম করিবেন না।

পশ্চিম-বঙ্গের দাবী

বিহারভুক্ত বাঙ্গালাকে যে আমরা ফিরিয়া পাইবার দাবী তুলিয়াছি, তাহার প্রধান কারণ দুইটি প্রথম, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস সাধারণ ভাবে যখন স্বীকার করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালার দাবী তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধীও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, র‍্যাড্‌ক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহার জন্ত বিহারভুক্ত বাঙ্গালা অবিলম্বে পশ্চিম-বঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়া আবশ্যক। পশ্চিম-বঙ্গের আয়তন সমগ্র বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, কিন্তু লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে অনেক বেশী। তাহার উপর পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানী নেতাদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছেন। সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি না পাইলে এই বিপুল সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান সঙ্কুলান করা অসম্ভব। আশ্রয়প্রার্থীদের উপর সুবিচার এবং করুণার দিক দিয়া দেখিলে এই দাবী যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ভারত সরকার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে একান্ত নারাজ। পণ্ডিত জওহরলাল কিছু দিন পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে, বিহারভুক্ত বাঙ্গালা পশ্চিম-বঙ্গের সহিত যুক্ত হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের কি সুবিধা হইবে তাহা না কি তাঁহার মস্তিষ্কে ঢুকিতেছে না। বুঝিয়া না বুঝিবার ভাণ করিলে বুঝান অসম্ভব। যাঁহারা নিজেদের প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে বলিয়া সময়ে অসময়ে গগন-ভেদী চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অন্যতম নায়ক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলকে জোর করিয়া বিহারের সহিত যুক্ত রাখিবার জীগির তুলিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। বিহার সরকার এই আন্দোলনে যোগদানকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সতর্ক থাকিতে এবং প্রয়োজন হইলে 'ডিসিপ্লিনারী ষ্টেপ্‌স্' নিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গের মন্ত্রিসভা শ্রেফ নীরব। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে জনগণের দাবীর এই ভাবে উপেক্ষা জাতীয় সরকারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে না। কিছু দিন পূর্ব্বে পণ্ডিতজী অন্ধ্রবাসীদের আশ্বাস দিয়াছেন স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের দাবী সম্পর্কে। অথচ যত গাফিলতি বাঙ্গালার বেলায়। কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড চিরটা কাল বাঙ্গালার উপর এই অবিচার করিয়াছেন। আজ বৃটিশ শাসনের জোয়াল স্কন্ধ হইতে নামিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের জোয়াল আরও চাপিয়া বসিয়াছে।

সমাবর্ত্তন উৎসব

৭ই চৈত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। নূতনত্ব কিছুই চোখে পড়িল না। সেই ডিগ্রী প্রদান ও সেই সঙ্গে অকাতরে সদুপদেশের পুষ্পবৃষ্টি। কেবল পেঁয়াজের উগ্র রসের স্থানে ভিজিভিজি অম্ল রস। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, "বক্তৃতা গ্রাজুয়েটদের প্রকৃত জীবনে কোন কাজে লাগে না"—বলিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাধীনতা লাভের জন্ত বাহিরের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। এখন হইতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নীতি ও রাষ্ট্রগত আদর্শ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, তাহার জন্ত আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তাঁহাদের জীবনে রাষ্ট্রগত কোন আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কি আমরা গত সাত মাসের স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষ করিতেছি না? শিক্ষার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের বিপক্ষেও একটু ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। হঠাৎ ধান ভানতে শিবের গীত কেন, বোঝা গেল না। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণের হিতার্থে কাজ করিতে পারে, তাহাই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সত্যিকার উদ্দেশ্য।' কথাটি চমৎকার, কিন্তু নিজের হিত যাহারা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে সকলের হিত করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। ছাত্র-জীবনের অবসানে আমাদের দেশের যুবকেরা যখন কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করে, তখন জীবন-সংগ্রামের কঠোর চাপে তাহাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-উৎসাহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা এবং নেতৃবৃন্দ সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের এই বাস্তব অবস্থার সহিত পরিচিত ন'ন বলিয়াই গালভরা এই সকল উপদেশ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

সমাবর্ত্তন অভিভাষণ প্রদানের জন্ত আমন্ত্রিত শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী তাঁহার বক্তৃতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ও দেশের লোকদের মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক অপরিপক্কতার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসী যদি শাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, তাহা হইলে নেতৃবৃন্দ অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ হইলেন কি রূপে? পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ সেই শিক্ষারই ফল, সে কথা কি মুন্সীজী অস্বীকার করিতে পারেন? বর্ত্তমানের নূতন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষা বিস্তার করা উচিত, এই উপদেশ তিনি দিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-নীতিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ প্রদর্শক। সুতরাং এই উপদেশ সরকারকে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শ্রীযুক্ত মুন্সী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচীন আশ্রমের তুল্য করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দুইটি গলদ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, আজিকার সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভব কি না তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রম বলিতে হিন্দু ঋষিদের আশ্রমই বুঝায়। তাঁহার উপদেশ পালন করিতে গেলে শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে না কি? মুন্সীজী মনে করেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা আধুনিক জগতের উপর জোর দিয়া নৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া থাকে। ভারতের আশ্রমিক শিক্ষা তাহা রোধ করিবে কি প্রকারে? আজ যদি যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আশ্রমিক শিক্ষার দোহাই দিয়া আমরা কি নিরপেক্ষ থাকিতে পারিব?

বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজাজী বলেন যে, তৃতীয় যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। ভারত ও পাকিস্তান যদি একত্র হয়, তবেই নূতন বিপদ হইতে উভয় দেশই রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এই সদিচ্ছা কেবল ভারতের হইলেই মিলন সম্ভব নয়, পাকিস্তানেরও ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তান মিলনে রাজী হইবে কি না, সে সম্বন্ধে রাজাজী নীরব।

সমাবর্ত্তন উৎসবে একমাত্র ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তব অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইতেও ত্রুটি করেন নাই।

মোটের উপর, নূতন গ্রাজুয়েটদের বহু ভাল কথা ও সদুপদেশ শুনিবার সুযোগ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবার কোন গঠনমূলক প্রস্তাব অথবা কোন আশার বাণী শুনিবার সৌভাগ্য তাহাদের হয় নাই।

কমিউনিষ্ট দলন

কমিউনিষ্ট পার্টি ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই উদ্দেশ্য কৃষক ও মজুরদিগের ভালো করা। কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করেন, দেশের কৃষক ও মজুরদিগের হাতে ক্ষমতা না আসিলে দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রও বলেন যে, দেশে কৃষক ও শ্রমিক-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। গোল বাধিয়াছে পন্থা লইয়া। কমিউনিষ্টদের মতে এই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় কৃষক ও মজুরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জমিদার ও কল-কারখানার মালিক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, ইহাতে অশান্তি বাড়িবে মাত্র, কাজ কিছুই হইবে না। তাহার চেয়ে যদি জমিদার ও পুঁজিপতিদের বুঝাইয়া স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কৃষক ও শ্রমিকদিগের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষায় যত্নবান্ হইবে এবং জগতে রামরাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইখানে উল্লেখযোগ্য, উভয় দলের নেতারা কেহই কখন কৃষক ও শ্রমিকের কাজ করেন নাই, তাহাদের জীবনযাত্রার সহিত সুপরিচিত নহেন, এবং সহরে প্রাসাদে বসিয়াই তাঁহারা কুটীরবাসীদের দুঃখে ব্যাকুল।

স্বেচ্ছায় কোন শ্রেণী যে দল বাঁধিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এই মানসিক পরিবর্ত্তনের আশায় বসিয়া থাকিলে অনন্ত কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। জোর করিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে প্রথমটা একটু অশান্তি দেখা দিলেও পরে তাহা সহ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট দাঁড়াইতে সাহস করিবেন কি?

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ এক দিন কমিউনিষ্ট দলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিয়াছেন,—"শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে ইহারা শ্রমিক ও কৃষকদের হিংসাত্মক কার্য্যে প্ররোচনা দিয়া নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। কলিকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পার্টির সম্মেলনে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সর্ব্ব ক্ষেত্রে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া একটি গণফৌজ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।" কমিউনিষ্ট দল পশ্চিম-বাঙ্গালায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পথে ক্রমবর্দ্ধমান বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। পশ্চিম-বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে এখন অনেক সমস্যা। খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব দূর করিতে হইবে, আশ্রয়প্রার্থীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা দূরে থাক, কমিউনিষ্ট দল নানা কল-কারখানায় শ্রমিকদের উস্কানি দিয়া ধর্ম্মঘট ও কৃষকদের বস্ত্র ও অন্নাভাবের সুযোগ লইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। এই সমস্ত অপচেষ্টার ফলে রাষ্ট্র বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিয়মতান্ত্রিক নহে, সন্ত্রাসবাদী, সশস্ত্র গণবিপ্লব। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। দেশের শান্তিরক্ষার চেষ্টায় কমিউনিষ্ট দল বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

কিন্তু বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করা ঠিক গণতান্ত্রিক উপায় নয়। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের 'কালো আইনের' তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর। সেই আইনেরও উদ্দেশ্য একই ছিল—বিশেষ ক্ষমতা হাতে লইয়া দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা। বৃটিশ শাসনকেও আমরা এই কারণেই নিন্দা করিয়াছি। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কিরণ বাবু রাষ্ট্ররক্ষার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাহারও স্বাধীনতা যাহাতে অন্যায় ভাবে ব্যাহত না হয়, সেদিকে যেন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সময় থাকিতে যদি অন্ন-বস্ত্রসমস্যা সমাধানের দিকে গভর্ণমেণ্ট মন দিতেন, তাহা হইলে কমিউনিষ্ট দল এই আন্দোলনের সুযোগ পাইত না, এবং সরকারকে এই 'বে-আইনী আইন' প্রয়োগ করিতে হইত না। জনসাধারণ মনে করেন যে, সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ-রক্ষায় যতটা যত্নবান, দরিদ্রের দিকে ততটা দৃষ্টি নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কেবল কমিউনিষ্ট দলন করিলেও চলিবে না কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধি।

শ্রীমতী বিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বিলাত রওনা হইয়াছেন। ১৯৪৫ সালে ইনি যুদ্ধে যোগদান করেন এবং বোম্বাইয়ে নৌ-বিভাগে কার্য্যে ব্রতী হন। ... ভারতীয় রেড-ক্রশ সোসাইটি হইতে

একটি বৃত্তি লইয়া বাস্থ্যগ্রামে ধাত্রীবিদ্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিলাত গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি। ইনি সুন্দরবন জমিদার-সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদকের সহধর্ম্মিণী।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের জন্ত ভারতীয় টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই বৎসরের জন্ত তিনি ভারতীয় টী এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সভার

সভ্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুক্ত সেন এই পদে প্রথম ভারতবাসী। তিনি ন্যাশনাল এজেন্সী কোম্পানী লিমিটেড ও ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

হাওড়া হোম্‌স

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার গবর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর পৌরোহিত্যে হাওড়া হোম্‌সের শ্রমশিল্প এবং পুস্তক বিভাগের উদ্বোধন হয়। হোমসের অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ কর কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য নাগরিক করিয়া তুলিবার জন্ত দরিদ্র বালকদের *শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে হাওড়া হোম্‌স রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই হোম্‌সের বিস্তারের জন্ত কমপক্ষে আট লক্ষ টাকা* খরচ হইবে। সাধারণের নিকট হইতে অর্দ্ধ ভাগ পাইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অবশিষ্ট অর্থ সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার ভাষণে হাওড়া হোম্‌সের কার্য্য-প্রণালী ও কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেন। এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তিনি জনসাধারণকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে বলেন, যাহাতে ইহা শক্তিশালী হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ করিতে পারে।

অন্যতম সম্পাদক শ্রীরাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ প্রদান কালে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালা সরকারের কোন প্রকার সাহায্য দানে ঔদাসীন্ত দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত। বাঙ্গালার গবর্ণরকে এই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে পাইয়া তিনি আশা করেন যে, সরকারের সাহায্য ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত কে বসু

শ্রীযুক্ত কে বসু এই বৎসর ভারতীয় মাইনিং এসোসিয়েশনের ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি ন্যাশনাল বরাকর কোল কোম্পানী ও নর্থ‌ওয়েষ্ট কোল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩৪। সাময়িক প্রসঙ্গ—		
(ক) সরকারী শিল্পনীতি	...	১৫২
(খ) উৎপাদন-সঙ্কট	...	ঐ
(গ) আজাদ হিন্দ ফৌজ	...	১৫৩
(ঘ) নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মী	...	ঐ
(ঙ) বঙ্গ-বিভাগ	...	ঐ
(চ) পশ্চিম-বঙ্গের দাবী	...	১৫৪
(ছ) সমাবর্ত্তন উৎসব	...	ঐ
(জ) কমিউনিষ্ট দলন	...	১৫৫
(ঝ) শ্রীমতী বিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী	...	ঐ
(ঞ) শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন	...	১৫৬
(ট) হাওড়া হোমস্	...	ঐ
(ঠ) শ্রীযুক্ত কে বসু	...	ঐ